প্রবাসী

সচিত্র মাসিক পত্র

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

পঞ্চদশ ভাগ—প্রথম খণ্ড
১৩২২ সাল, বৈশাখ—আশ্বিন

প্রবাসী কার্য্যালয়
২১০।৩।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
মূল্য তিন টাকা ছয় আনা

প্রবাসী ১৩২২ শ্রাবণ—আশ্বিন,

১৫শ ভাগ ১ম খণ্ড।

বিষয়ানুক্রমণিকা।

চিত্রানুক্রমণিকা

লেখক ও তাঁহাদের রচনা।

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ

১৫শ ভাগ
১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩২২

১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

অগ্নিপরীক্ষা।

কতকগুলা খড় বা ঘাস একবার আগুনে ফেলিলেই পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। লোহার কোন জিনিষ গড়িতে হইলে তাহাকে বার বার আগুনে ফেলিয়া হাতুড়ি পিটিয়া খাদ বাহির করিয়া ফেলিতে হয়। তাহার পর আবার আগুনে ফেলিয়া নরম করিয়া হাতুড়ির ঘা মারিয়া যাহা তৈয়ার করিবার তাহা প্রস্তুত করিতে হয়। অনেক মহৎ ব্যক্তির জীবনে দেখা যায় তাঁহারা অনেক বিপদ উৎপীড়ন লাঞ্ছনা প্রলোভনের আগুনে পুড়িয়াছেন, অনেক ঘা সহিয়াছেন, তবে বড় হইয়াছেন। এক-একটা জাতির ইতিহাস লইলেও এইরূপ দেখা যায়। ভারতবর্ষকে এত শতাব্দী ধরিয়া এত প্রকারে আগুনের মধ্য দিয়া যাইতে হইতেছে, এত ঘা সহিতে হইতেছে, যে, বিধাতা এই দেশকে বড় করিবেন, এইরূপ তাঁহার উদ্দেশ্য বলিয়া অনুমান হয়। ঘাস-খড়ের মত হইলে এতদিন ভারতীয় জাতি লোপ পাইত। কিন্তু আগুনে পুড়িয়া ঘা খাইয়াও যদি আমাদের চেতন না হয়, যদি আমরা খাঁটি ধাতু হইতে না চাই, খাদগুলাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকি, তাহা হইলে খাঁটি ধাতুতে নির্ম্মিত বিধাতার হাতের যন্ত্র কেমন করিয়া হইব? আমাদের যুগযুগব্যাপী অগ্নিপরীক্ষা বৃথা হইবে, যদি আমরা মানুষ না হই।

বর্দ্ধমানে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন।

কথিত আছে চীনদেশের সম্পাদকেরা কোন লেখকের রচনা ছাপিবার উপযুক্ত না হইলে নিম্নলিখিত রূপ সৌজন্য প্রকাশ করিয়া তাহা লেখককে ফেরত দেন:—

"হে চন্দ্রসূর্য্যের যশস্বী ভ্রাতা, আপনার অতুলনীয় রচনা পাইয়া আমি সাতিশয় আনন্দিত হইয়াছি; আমার জন্ম সার্থক মনে করিতেছি। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে উহা ছাপিতে আমার সাহসে কুলাইতেছে না। উহা এরূপ উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে উহা আমার কাগজে বাহির হইলে পাঠকেরা কেবল ঐরূপ লেখাই চাহিবে। কিন্তু এমন রচনা ত নিত্য আমার হাতে আসিবে না। সুতরাং গ্রাহকেরা অসন্তুষ্ট হইয়া আমার কাগজ আর লইবে না; তাহা হইলে উহা উঠিয়া যাইবে। এই ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় আমায় আপনার রচনাটি ফেরত দিতে হইতেছে। কৃতাঞ্জলিপুটে ভিক্ষা এই, ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।"

চীন-সম্পাদকদের নাম দিয়া এই যে পরিহাস করা হইয়াছে, ইহা কৌতুকাবহ হইলেও বোধ হয় তাঁহারা বাস্তবিক এরূপ কিছু করেন না। কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ ও পৌরজনের আয়োজন কতক নিজে কেবল মাত্র দেখিয়া, অর্থাৎ পান-ভোজনের অধিকারী না হইয়া, কতক অন্যের মুখে শুনিয়া, সত্যসত্যই মনে হয় যে তাহাতে ভবিষ্যতে অন্যান্য সহরে

সম্মিলনের উদ্যোগকর্ত্তাদিগকে মুস্কিলে ফেলা হইয়াছে। সব জায়গায় ত মহারাজাধিরাজ নাই।

মহারাজাধিরাজের অভিভাষণ।

আমাদের মনে হয় বক্ষ্যমাণ অধিবেশনে কবিতার কিছু বাহুল্য হইয়াছিল। ইহাতে কবিদিগের দোষ নাই; তাঁহারা ভাবুক মানুষ, তাঁহারা ত লিখিবেনই। কিন্তু এত কবিতা ও গানের ব্যবস্থা করিলে যাহার জন্য লোকে উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে, সেই সভাপতির অভিভাষণে পৌছিবার পূর্ব্বেই লোকে কিছু চঞ্চল হইয়া উঠে;—বিশেষতঃ যদি কবিতাগুলি সুগঠিত ও সংগীতগুলি সুগীত না হয়।

বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ মহ্‌তাব বাহাদুর।

যাহা হউক, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতিরূপে তাঁহার অভিভাষণে খুব দয়া ও বিবেচনার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার স্বর এরূপ উচ্চ যে সভা যত বড় হইয়াছিল তাহার দুই তিন গুণ বড় হইলেও দূরতম স্থান পর্য্যন্ত উহা শুনা যাইত। সুতরাং তাঁহার বক্তব্য সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু অনুমান করিতে হয় নাই, সবই শুনা গিয়াছিল। তাহার উপর তিনি দয়া ও বিবেচনা এই করিয়াছিলেন যে তাঁহার অভিভাষণটি যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন।

দেশের রাজনৈতিকগণ সম্বন্ধে মহারাজাধিরাজ এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে—

> বর্ত্তমান যুগে আমাদের দেশবাসীগণ রাজনৈতিক আলোচনা ও গবেষণায় এত অধিক পরিব্যাপ্ত (?) যে দেশের ও সমাজের অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় সংস্কার-কার্য্যে মনোনিবেশ করিবার যথোপযুক্ত অবসর তাঁহাদের মিলে না; ইহা অতীব আক্ষেপের বিষয় সন্দেহ নাই। এই উপেক্ষিত কর্ত্তব্যের কিয়দংশ পালন করা সাহিত্যপরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য। সেই কারণে আমি এই পরিষদের কার্য্যে বিশেষরূপে আকৃষ্ট এবং কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি আপনাদের এই সদ্দৃষ্টান্ত পূর্ব্বকথিত রাজনৈতিকগণের অনুকরণীয় হউক এবং আপনাদের সাধু চেষ্টা সম্যক ফলবতী হউক।

এই মন্তব্য সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আছে। রাজনীতির আলোচনা বাদ দিয়া দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভবপর নহে। এমন কি যে সাহিত্যের উন্নতির জন্য সাহিত্য-সম্মিলন প্রয়াসী, তাহাও রাজনৈতিক উন্নতির উপর নির্ভর করে। রাজনৈতিক সংস্কার কেমন করিয়া গবর্ণমেণ্টকে দিয়া করাইতে পারা যায়, রাজনৈতিক আলোচনা ও আন্দোলন কিরূপ হওয়া উচিত, ঠিক্ সেইরূপে হইতেছে কি না, এ সকল বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে ও আছে। কিন্তু রাজনীতির চর্চ্চার কোন প্রয়োজনই নাই, এমন বলা যায় না। দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতি পরস্পরসাপেক্ষ। ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য, রাষ্ট্রীয়কার্য্য, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, স্বাস্থ্য,—যে দিকে মন দেওয়া যায়, সেই দিকেই বিস্তর কর্ত্তব্য রহিয়াছে দেখা যায়। কিন্তু অপর সকল রকম উন্নতিচেষ্টা বাদ দিয়া কোন দিকেই উন্নতি করা যায় না। ইহা যেমন সত্য, তেমনি ইহাও সত্য যে সাধারণ মানুষের শক্তি এত বেশী নয় যে সে সব দিকেই চেষ্টা করিতে পারে। দুই একটা বিষয়েই সাধারণতঃ মানুষের চেষ্টা আবদ্ধ থাকে। সুতরাং কেহ যদি কেবল রাজনীতির চর্চ্চা করে, তাহাকে এই বলিয়া দোষ দেওয়া উচিত নয় যে সে কেন সাহিত্যের বা কৃষির বা স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা করে না। অবশ্য কেহ যদি এমন কথা বলে যে শুধু রাজনৈতিক আন্দোলন করাই দরকার, আর কিছুর প্রয়োজন নাই, তাহা হইলে তাহার ভ্রম বা একদেশদর্শিতা তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত।

মুখে বলুন আর নাই বলুন, এমন লোক আমাদের দেশে বিস্তর আছেন যাঁহাদের আচরণে মনে হয় যে তাঁহারা রাজনৈতিক আন্দোলনের ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া আর কিছুর প্রয়োজন দেখেন না। মহারাজাধিরাজের কথাগুলি তাঁহাদের প্রণিধানযোগ্য।

তিনি যখন রাজনৈতিকদের নিন্দা করিয়া সাহিত্য-পরিষদের প্রশংসা করিতেছিলেন, তখন যদি কেহ বলিত, "সাহিত্যপরিষদ সমাজসংস্কারে মন দেন না, ইহা বড় আক্ষেপের বিষয়," তাহা হইলে সেরূপ সমালোচনাও ন্যায়-সঙ্গত হইত না।

আমরা মনে করি আমাদের দেশে "রাজনৈতিক আলোচনা ও গবেষণা" খুব অল্পই হয়, এবং যেমন ভাবে হওয়া উচিত, তেমন করিয়া হয় না। সুতরাং এ বিষয়ে মহারাজাধিরাজের কথায় সায় দিতে পারিলাম না। তিনি ঠিক্ কথা বলেন নাই।

ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে রাজনৈতিক আলোচনা ও গবেষণা নানা রকমের হইতে পারে। অনেক ইংরেজ রাজপুরুষ আছেন, তাঁহারা মনে করেন যে বর্ত্তমান শাসন-প্রণালী ও আইনসমূহ বা বর্ত্তমান রাজকর্ম্মচারীদের কার্য্যের সমর্থক যাহা কিছু লেখা বা বলা হয়, তাহা বুঝি রাজনৈতিক রচনা বা বক্তৃতা নহে। কিন্তু তাহা ভুল। বর্ত্তমান আইনসমূহ, শাসনপ্রণালী এবং রাজকর্ম্মচারী-বর্গের অনুকূলে বা বিরুদ্ধে যাহা কিছু লেখা বা বলা হয়, সমস্তই রাজনৈতিক আলোচনা। সুতরাং বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজও রাজনৈতিক আলোচনা ও গবেষণা করিয়া থাকেন। তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েশ্যনের সভাপতিরূপে বা ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরূপে যাহা বলেন, তাহাও রাজনৈতিক বক্তৃতা; যদিও তজ্জন্য তাঁহাকে গবর্ণ-মেণ্টের বিরাগভাজন হইতে হয় না। অবশ্য তিনি সাহিত্য সঙ্গীত প্রভৃতির চর্চ্চাও করেন। কিন্তু তিনি জানেন বা অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন যে বঙ্গে যাঁহারা রাজনৈতিক আলোচনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে, ধর্ম্মসংস্কার, সমাজসংস্কার, শিক্ষা-সংস্কার, শিক্ষার বিস্তৃতি সাধন, শিল্পের উন্নতি, স্বাস্থ্যের উন্নতি, প্রভৃতির জন্যও চেষ্টা করেন, এমন মানুষ বিরল নহে।

বঙ্গের সমবেত সাহিত্যসেবীদিগকে সম্বোধন করিয়া মহারাজাধিরাজ বলেন :—

আপনারা যে কার্য্যে ব্রতী তাহা সাধু ও স্বদেশানুরাগপ্রণোদিত সন্দেহ নাই। পরন্তু এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য এইটুকু মাত্র যে আপনারা নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে, বনে বনে, বহু পরিশ্রমে পরিভ্রমণ করিয়া যে-সকল প্রাচীন গ্রন্থ, ইষ্টক ও প্রস্তরফলকাদি সংগ্রহ করিতেছেন এবং তাহা হইতে যে অভিনব তত্ত্ব ও বিস্মৃত বা বিকৃত ইতিহাসের যথার্থ কাহিনী আবিষ্কার করিয়া তাহার প্রচারকল্পে বিপুল অর্থব্যয়ে গ্রন্থাদি মুদ্রণ করিতেছেন, তাহার ফল যাহাতে স্থায়ী হয় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। ইহা শুধু অর্থবল-সাপেক্ষ নহে—লোকবল ব্যতীত এই চেষ্টা কদাচিৎ সম্পূর্ণরূপে সার্থক হইতে পারে না। আপনারা যদি আপনাদিগের উদ্দেশ্য স্পষ্টরূপে না বুঝাইয়া পল্লীবাসীগণের নিকট হইতে তাহাদের পুথিপত্র বিগ্রহাদি সংগ্রহ করিতে থাকেন, তাহা হইলে হয়ত তাহারা কিছুকাল পরে আপনাদিগকে স্বদেশবৎসল, লোকহিতব্রত মহা-পুরুষ-স্বরূপ মনে না করিয়া কোনও নূতন জাতীয় তস্কর মাত্র মনে করিতে পারে। কারণ নিরীহ অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত পল্লীবাসীগণ সাধারণতঃ সাহিত্যপরিষদের বড় একটা ধার ধারে না বা নবপ্রচারিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির কোন খোঁজখবরও রাখে না। যদি বলেন, "এ সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য কি?" তাহার উত্তরে আমার প্রস্তাব এই যে—যে যে ব্যক্তির নিকট হইতে প্রত্নতত্ত্বের বা পুরাতত্ত্বের আলোচনার্থে কোনও দ্রব্য সংগৃহীত হইবে তাহাদের প্রত্যেককে তত্তৎ বিষয়ের আলোচনাসম্বলিত সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকাদি বিনামূল্যে বিতরণ করা ত উচিতই অধিকন্তু সেই স্থানে যদি কোন লোকপূজ্য, চিরস্মরণীয় কবি বা মহাপুরুষের সংশ্রব থাকে তাহা হইলে তাহার নিদর্শনার্থে কোনও রূপ স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করা কর্ত্তব্য ও প্রাচীন প্রথার অনুকরণে কথক বা গায়কসম্প্রদায়-সাহায্যে তাঁহাদের পবিত্র কাহিনী স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রচার করিবার ব্যবস্থা করা উচিত। স্বদেশানুরাগ ও স্মৃতিপূজার ইহা একটি প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া আমার মনে হয়। যদি জনসাধারণের হৃদয়ে এই অনুরাগ বদ্ধমূল না হয় এবং মহাপুরুষগণের উজ্জ্বল আদর্শ যদি আমরা সকলের সমক্ষে তুলিয়া ধরিতে অক্ষম হই তাহা হইলে আমরা ক্রমে জনসাধারণের সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হইয়া পরিণামে বিফল-প্রযত্ন হইব।

মহারাজাধিরাজের প্রস্তাবটি ভাল। ইহার অনুযায়ী কাজ করিতে হইলে অর্থবল ও লোকবলের প্রয়োজন হইবে। উভয় বলই তাঁহার আছে। সুতরাং যদি সাহিত্য-পরিষৎ বা অন্য কোন সভা এইরূপ কার্য্যে ব্রতী হন, তাহা হইলে তাহাতে বর্দ্ধমান-রাজের সাহায্য পাওয়া যাইবে, এইরূপ আশা করা যাইতে পারে।

অন্যান্য অভিভাষণ।

অন্য পাঁচটি অভিভাষণের মধ্যে সাহিত্য-শাখার সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিভাষণ এবং ইতিহাস-শাখার সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের অভিভাষণ বেশী লম্বা হয় নাই। বাকী তিনটিও অধিক দীর্ঘ নহে; কিন্তু সমবেত সম্মিলনকে

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

এবং ইহার প্রত্যেক শাখাকে অল্প সময়ের মধ্যে যেরূপ অধিক কাজ করিতে হয়, তাহার পক্ষে দীর্ঘ হইয়াছিল। অভিভাষণগুলি ছোট হইলে অন্যান্য কাজ করিবার ও অপরাপর প্রবন্ধ পড়িবার এবং আলোচনা করিবার জন্য বেশী সময় পাওয়া যায়। যাহাই হউক, সভাস্থলে সেগুলি পড়িতে বেশী সময় লাগিলেও, তাহাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। সবগুলিই বেশ সারবান্। মন দিয়া পড়িলে পাঠকেরা উপকৃত হইবেন।

সভাপতির অভিভাষণ।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ নিজে যতটুকু পড়িয়াছিলেন, ততটুকু বোধ হয় কাছের লোকেরাই শুনিতে পাইয়াছিল। অল্প পড়িয়াই তিনি শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বাকী অংশ পড়িতে বলেন। রাখাল বাবুর গলা আরও কিছু বেশী দূর পৌঁছিয়াছিল, কিন্তু বোধ হয় অন্ততঃ অর্দ্ধেক লোক তাঁহার পড়াও শুনিতে পায় নাই। এ সব সামান্য বিষয়ের উল্লেখ এইজন্য করিতেছি যে লোকে দূর হইতে কেবল দেখিতে যায় না; শুনিতেও যায়। সুতরাং সকল বিষয়ে সুব্যবস্থা করা উচিত। স্বভাবতঃ কাহারও গলা উঁচু কাহারও বা নীচু; এইজন্য কাহারও প্রশংসা করা বা না করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যাহাতে ভবিষ্যতে শ্রোতাদের সুবিধা হয়, তজ্জন্য এইসব কথা লিখিলাম। যে গৃহে বা মণ্ডপে সভার অধিবেশন হয়, তাহার অভীষ্টরূপ শব্দ-সঞ্চালন ক্ষমতা (accoustic property) কিরূপে বাড়ে, এঞ্জিনীয়ারদের নিকট সে বিষয়ে পরামর্শ লওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধ যুগের ইতিহাস এবং বঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিলুপ্তপ্রায় নানা চিহ্ন সম্বন্ধে অনেক অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। এসকল বিষয়ে তাঁহার কথা প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। অতএব বাঙ্গলার প্রাচীন গৌরব সম্বন্ধে তাঁহার অভিভাষণ যে সারবান্ হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। ইহা হইতে আমরা অনেক নূতন কথা জানিতে পারি। বাঙ্গালীর প্রাচীন

গৌরবের কথা শুনিয়া আমাদের যে কেবল আনন্দ হয়, তাহা নহে, বর্ত্তমান কালে ও ভবিষ্যতেও যে আমরা মহৎ হইতে পারি এবং মহৎ কার্য্য করিতে পারি, এই বিশ্বাস জন্মে।

শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিভাষণটি নানা ঐতিহাসিক তথ্যে পূর্ণ হইলেও উহার একটি অসম্পূর্ণতা লক্ষিত হইবে। ইতিহাস কেবল কতকগুলি ঘটনার একত্র সমাবেশ নহে। ঐতিহাসিক বিষয়ে অভিভাষণও কতকগুলি প্রাচীন তথ্যের সংগ্রহমাত্র হইলে চলে না। কোন দেশের ইতিহাস যেরূপ, সেরূপটি কেন হইল, সেই দেশের লোকদের প্রকৃতি, দেশের ভৌগোলিক সংস্থান প্রভৃতির সহিত উহার কি সম্পর্ক, ঐতিহাসিক যদি এ সব বিষয়ের আলোচনা না করেন, তাহা হইলে কৌতূহল নিবৃত্তি ভিন্ন ইতিহাস পাঠের অন্য ফল সাধারণ পাঠকেরা পান না। অবশ্য যাঁহারা চিন্তাশীল ও সূক্ষ্মদর্শী তাঁহারা কেবল ঘটনা-সংগ্রহ ও তথ্য-সংগ্রহ হইতেই নানারূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন। শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গলার প্রাচীন গৌরবের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালীর যে প্রকৃতিনিহিত গুণে বঙ্গদেশ এরূপ গৌরবান্বিত হইয়াছিল, তাহাকে সূত্রের মত করিয়া তাহা দিয়া যদি এই গৌরবরত্নমালা গাথিতেন তাহা হইলে পাঠকদের আরও উপকার হইত। এই গুণ বা গুণাবলীরও কারণ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। বাঙ্গালী জাতি যে যে জাতির সংমিশ্রণে গঠিত, বাঙ্গলার জল বায়ু মাটী যেরূপ, বাঙ্গলার ভৌগোলিক সংস্থান যেরূপ, বাঙ্গালীর সঙ্গে অন্যান্য নিকট বা দূরবর্ত্তী জাতিদের যে যে প্রকারে সংস্পর্শ ও সংঘর্ষ ঘটিয়াছে, এবম্বিধ নানা কারণ প্রাচীন বাঙ্গালীর চরিত্রকে গড়িয়া তুলিয়াছিল। এই সব কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিলে অভিভাষণটি হইতে আমরা আরও অধিক উপকার পাইতাম। কারণ তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারিতাম যে, যে-সব কারণে ও যে প্রকার অবস্থায় বাঙ্গালী গৌরবান্বিত হইয়াছিল, সে-সব এখনও আছে কি না। যদি কিছু না থাকে, তাহা হইলে সেইরূপ বা তৎসদৃশ সমুদয় অবস্থা ও কারণের সমবায় আবার যেমন করিয়া ঘটিতে পারে, সমস্ত জাতিকে সেইরূপ চেষ্টা করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করা যাইতে পারিত। ইতিহাস জাতীয় নৈরাশ্য ও অবসাদের ঔষধ, কিন্তু ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইলে নিদান জানা চাই। ঐতিহাসিকদিগের নিকট হইতে আমরা এ বিষয়ে সাহায্য চাই। ঐতিহাসিকদের নিকট হইতে এইরূপ সাহায্য পাইলে সমাজস্থিতি-বিজ্ঞান এবং সমাজগতি-বিজ্ঞান (social statics and social dynamics) আলোচনার সুবিধা হয়। জাতির কোন্ পথে চলা উচিত, তাহাও বুঝিতে পারা যায়।

সাহিত্য-সম্মিলনের কয়েকটি প্রস্তাব।

এবারকার বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে কয়েকটি উত্তম প্রস্তাব করা হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট এই আবেদন করা হইবে যে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য ভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষার অন্যান্য বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর ছাত্রেরা যেন বাঙ্গলায় লিখিতে পায়। মাতৃ-

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি।

ভাষার ভিতর দিয়া যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা অপেক্ষাকৃত সহজে আয়ত্ত হয়, এবং মাতৃভাষাতেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পাইলে ছাত্রেরা অপেক্ষাকৃত সহজে নিজের জ্ঞানের পরিচয় দিতে পারে। অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের যে অভিভাষণটি আমরা অন্যত্র মুদ্রিত করিলাম, তাহাতে

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার।

দেখিবেন যে তিনি বাঙ্গলা ভাষার সাহায্যে কত অল্প সময়ে কটকের মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রদিগকে কত বেশী বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে পারিতেন। স্কুলের সমুদয় বিষয়ের জ্ঞান ইংরেজী পুস্তক পড়িয়া লব্ধ না হইলে ছাত্রদের ইংরেজীর জ্ঞান এখন অপেক্ষা কম হইবে, এরূপ আশঙ্কা হওয়া অসঙ্গত নহে। কিন্তু যদি ক্রমশঃ ভাল শিক্ষক পাইবার চেষ্টা করা হয়, এবং ইংরেজী শিখাইবার প্রণালীরও উন্নতি করা হয়, তাহা হইলে ছাত্রদের ইংরেজী-জ্ঞান ভাল হইবারই কথা। জার্ম্মেনীতে ছাত্রেরা যে সকল স্কুলে ইংরেজী ফরাসী প্রভৃতি আধুনিক ভাষা শিখে, তথায় তাহারা কোথাও বা উপরের কেবল তিনটি ক্লাসে কোথাও বা ছয়টি ক্লাসে সপ্তাহে মাত্র তিন ঘণ্টা করিয়া ইংরেজী শিখে; কচিৎ কোন ক্লাসে সপ্তাহে ৪ঘণ্টা ইংরেজী শিখে। তাহারা আর সব বিষয় জার্মেন ভাষাতেই শিখে করে। জার্মেনীর বিশ্ববিদ্যালয়-সকলেও জার্মেন ভাষাতেই সব শিক্ষা দেওয়া হয়; ইংরেজীর চলন নাই। কিন্তু দেখা যায় যে জার্মেনীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত জার্মেন জাতীয় অধ্যাপকেরা ভারতবর্ষের অনেক কলেজে ইংরেজীতে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিয়া থাকেন। জার্মেন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত জার্মেন পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষীয় প্রত্নতত্ত্ব ও অন্যান্য বিভাগে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ইংরেজী ভাষাতেই সমুদয় রিপোর্টাদি লিখেন এবং অন্যান্য কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়-সকলে ভারতবর্ষ অপেক্ষাও অনেক অধিকসংখ্যক জার্মেন অধ্যাপক নিযুক্ত হন, এবং তাঁহারা ইংরেজীতেই ছাত্রদিগকে নানা বিষয় শিক্ষা দেন। স্কুলে কয়েকটি ক্লাসে সপ্তাহে ৩।৪ ঘণ্টা মাত্র ইংরেজী পড়িয়া জার্মেনরা যদি ইংরেজীতে অধ্যাপনা করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের ছেলেরা তাহার চেয়ে বেশী ক্লাসে সপ্তাহে অধিকতর ঘণ্টা ইংরেজী পড়িয়াও ইংরেজী শিখিতে পারিবে না, এরূপ ত মনে হয় না। জাপানেও ছাত্রেরা ইস্কুলের কয়েকটি ক্লাসে সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা ইংরেজী, জার্মেন বা ফরাসী ভাষা শিখে। যখন তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় তখন জার্মেন, ইংরেজ বা ফরাসী অধ্যাপকদের কাছে তাঁহাদের নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষা পায়। অধ্যাপকদের বক্তৃতা বুঝিতে তাহাদের কষ্ট হয় না। যদি তাহারা জার্মেন, ফরাসী বা ইংরেজ অধ্যাপকদের কথিত বিষয় বুঝিতে না পারিত, তাহা হইলে জাপান-গবর্ণমেণ্ট কখনই এই-সব বিদেশী অধ্যাপকদিগকে বেতন দিয়া নিযুক্ত করিতেন না।

সাহিত্যসম্মিলনের আর-একটি প্রস্তাব এই যে ছাত্রদিগকে ইণ্টারমীডিয়েট ও বিএ ক্লাস-সকলে অন্যান্য বিষয় শিক্ষার জন্য যেমন শতকরা নির্দ্দিষ্টসংখ্যক ঘণ্টা উপস্থিত থাকিতে হয়, বাংলা শিক্ষার জন্যও তেমনি উপস্থিত থাকিতে হইবে, এবং ঐ দুই পরীক্ষার জন্য অবশ্যপঠনীয় বাংলা কিছু পুস্তক নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। এই প্রস্তাবও ভাল। ইহাতে কেবল এইটুকু বক্তব্য আছে যে আজ-কাল যেমন কিছু কিছু ভাল বহির সঙ্গে অনেক বাজে বই নির্ব্বাচিত হয়, তাহা নিবারণের উপায় না হইলে সম্মিলনের প্রস্তাবে সুফল অপেক্ষা কুফলই অধিক হইবার সম্ভাবনা।

পালি ও বাংলা একত্র করিয়া এই উভয় ভাষায় এম্‌এ পরীক্ষা লইবার প্রস্তাবও আমাদের নিকট ভাল বোধ হইল। নজীর ও দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারা যায় যে মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তামিল এবং বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে মরাঠী ভাষায় এম্‌এ পরীক্ষা হইয়া থাকে। প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যের গৌরবে বাংলা এই দুই ভাষা অপেক্ষা হীন নহে।

বাংলা পঞ্জিকার সংস্কারের জন্য দৃগ্‌গণিতৈক্যের প্রয়োজন। অর্থাৎ দেশীয় জ্যোতিষের নিয়মানুসারে গণনা করিয়া গ্রহনক্ষত্রাদি সম্বন্ধে যে ফল পাওয়া যায়, আকাশ সাক্ষাৎভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সেই পর্য্যবেক্ষণের ফল দ্বারা গণিতের ফল সংশোধন করা আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে একটি মানমন্দির প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সম্মিলনে উপস্থিত করা হয়। মন্দির নির্ম্মাণের ব্যয়, যন্ত্রাদি ক্রয়ের ব্যয় এবং, অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের অনুমান অনুসারে, মন্দিরের মাসিক ব্যয় ২০০৲ টাকা কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এজন্য তিনি সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন।

বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের গতি।

বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের গতি সম্বন্ধে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহার অনেক কথা, নূতন না হইলেও, মনে করিয়া রাখিবার মত। নূতন তথ্যও তাহাতে অনেক আছে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বংলা রচনা দীনেশবাবুর মতে শূন্যপুরাণ; কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় দেখাইতেছেন যে নাথ-পন্থের যোগীদের ছড়া এবং বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যদের দোহা, ছড়া ও গীতিকা শূন্যপুরাণের চেয়ে আরও পাঁচ শত বৎসরের প্রাচীন।

মহাকাব্য।

বাংলা ভাষায় এখন যে আর মহাকাব্য লেখা হইতেছে না, তজ্জন্য শাস্ত্রী মহাশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। নূতন মহাকাব্য রচিত না হওয়াটা অবশ্য আমাদের প্রশংসার বিষয় নহে; এবং ভাল মহাকাব্য রচিত হইলে তাহা আমাদের আনন্দ ও গৌরবের বিষয়ও হইত বটে। কিন্তু কতকগুলি কথা মনে রাখিলে হয় ত আমাদের ততটা দুঃখ ও লজ্জা বোধ না হইতে পারে।

এক এক সময়ে এক এক রকমের রচনার চলন বেশী হয়। যেমন ধরুন ইংরেজী সাহিত্যে রাণী এলিজাবেথের যুগে এবং তাহার ঠিক্ আগে ও পরে ইংলণ্ডে খুব নাটক লিখিবার উৎসাহ দেখা গিয়াছিল, তেমনটি ইংলণ্ডে পূর্ব্বে বা পরে আর কখন হইল না। এখন সে দেশে নবেল ও ছোটগল্প লেখার খুব রেওয়াজ। কি কারণে এক এক যুগে এক এক রকমের রচনার রীতি খুব চলিয়া পরে প্রায় থামিয়া যায়, তাহার অনুসন্ধান এখানে করিব না।

আর-একটা মনে রাখিবার কথা এই যে কোন সাহিত্যেই মহাকাব্যের সংখ্যা বেশী নয়। এত বড় যে গ্রীক সাহিত্য তাহাতে এখন কেবল ইলিয়াড্ এবং অডিসী ছাড়া আর কোন মহাকাব্য নাই। আরও ২।১ খানার নাম শুনা যায়; কিন্তু সেগুলির নামই শুনা যায় বলিলেই চলে। বহুবিস্তৃত লাটীন সাহিত্যে একমাত্র ইনীয়িড্ এখনও অধীত হয়। থিবাহড্ প্রভৃতি আরও ২।৩ খানি এখনও সম্পূর্ণ বা খণ্ডশঃ পাওয়া যায়। কিন্তু পাণ্ডিত্যপ্রয়াসী ভিন্ন আর কেহ সে-সকলের খোঁজ রাখে না। ইতালীয় ভাষাতে টাসোর লেখা "জেরুসালেমের মুক্তি" সর্ব্বপ্রধান মহাকাব্য। আরও ৩।৪টি আছে। সেগুলি তেমন প্রসিদ্ধ নয়। ডান্টে-লিখিত "কমেডিয়া" অতি উৎকৃষ্ট ও বৃহৎ কাব্য কিন্তু ইহা এপিক বা মহাকাব্য নহে। ইংরেজীতে মিণ্টনের প্যারাডাইজ্ লষ্ট একমাত্র উৎকৃষ্ট মহাকাব্য। স্পেন্সারের ফেয়ারী কুঈনকে ঠিক্ মহাকাব্য বলা যায় না। প্রাচীন যুগের পর হইতে এখন পর্য্যন্ত ফ্রান্সে একটিও ভাল মহাকাব্য লিখিত হয় নাই। এমন কি ভল্টেয়ারের আঁরিয়াদ্‌ও (Henriade) ভাল মহাকাব্য নহে।

পৃথিবীর কোন দেশেই আধুনিক সময়ে মহাকাব্য লিখিত হইতেছে না। কেন, তাহার আলোচনা এখানে হইতে পারে না। বাঙ্গলা দেশে যে এখন মহাকাব্য লিখিত হইতেছে না, তাহার কারণ আমাদের কবিদের অক্ষমতা বা শ্রমবিমুখতা না হইতেও পারে।

এই সব কথা মনে রাখিলে, আমাদের মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র যাহা করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালীর পক্ষে অগৌরবের বিষয় মনে হইবে না; বিশেষতঃ যদি আমরা ইংরেজশাসনের আগেকার বাঙ্গলা বড় বড় কাব্যগুলির কথা স্মরণ করি।

চুট্‌কী ও বড় জিনিষ।

আমরা চুট্‌কী সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের কথায় সায় দিতে পারি। তবে, ক্ষুদ্র রচনা মাত্রকেই চুটকী বলিয়া অল্প-আদর বা অনাদর করিতে ইচ্ছা করি না। ভয়ে ভয়ে ইহাও বলি যে, যে কাব্যে বা যে রচনায় অনেক শব্দ নাই, যাহা বেশ লম্বা চৌড়া নয়, তাহা যে "বড় জিনিষ" হইতে পারে না, এমন মনে করি না। এক গাদা খড়ের চেয়ে একটি ছোট প্রদীপের শিখা নানা অর্থে বড় হইতে পারে।

দ্রুত রচনা।

শাস্ত্রী মহাশয়, তিন তিন মাস অন্তর এক এক খানা নাটক লিখিয়া দেওয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ঠিক্। ফরমাইস্ অনুযায়ী লেখা ক্বচিৎ ভাল হয়। কিন্তু গড়ে কত বড় কাব্য, নাটক, নবেল বা অন্য রকম বই লিখিতে কত সময় লাগে, তাহার কোন নিরিখ নির্দ্দেশ করা যায় না। কেহ শীঘ্র শীঘ্র কেহ বা আস্তে আস্তে লেখে। দ্রুত লিখিলেই লেখা অপকৃষ্ট হইবেই এমন বলা যায় না। বঙ্কিম বাবুর এক এক খানা নবেল লিখিতে দু দু বৎসর লাগিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু স্কট্ প্রতিবৎসর অন্যান্য প্রকারের বিস্তর রচনা ছাড়া, কখন দুখানা কখন তিনখানা উপন্যাস লিখিতেন। তাহার গাই ম্যানারিং ছয় সপ্তাহে লেখা হইয়াছিল। ওয়েভার্লির প্রথম ২।৪ অধ্যায়ের একটা খসড়া তিনি এক সময়ে করিয়াছিলেন। তাহার পর বহিখানা সম্পূর্ণ করিতে মাত্র চারি সপ্তাহ লাগিয়াছিল। ডুমা ২৭৭ ভল্যুম, ভিক্টর হিউগো বড় বড় ৫৮ ভল্যুম লেখা রাখিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা নিকৃষ্ট লেখক ছিলেন না।

কাব্যের দোষগুণ পরীক্ষা।

কাব্যেরই বলুন, বা অন্যবিধ গ্রন্থেরই বলুন, দোষ গুণ পরীক্ষা আজকাল কোন সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রেই ভাল করিয়া হয় না, ক্বচিৎ এক আধখানা বহির হয়, ইহা অতি যথার্থ কথা। ভাল সমালোচনা করিবার মত যোগ্যতা যে আজকাল কাহারও নাই, তাহা বলা যায় না। যোগ্য লোক আছেন, কিন্তু তাঁহারা বড় একটা একাজে হাত দেন না। গ্রন্থের দোষগুণ সম্বন্ধে মতভেদ, এমন কি ভ্রম, সব দেশেই হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে কোন গ্রন্থের কোন দোষের উল্লেখ করিলেই অনেক গ্রন্থকার সমালোচক ও সম্পাদককে শত্রু মনে করেন, এবং তদ্রূপ ব্যবহার করেন। অন্য দেশে কি হয় জানি না; কিন্তু সমালোচক ও সম্পাদকের দুরভিসন্ধি নিশ্চয় আছে, গ্রন্থের দোষ নিশ্চয় নাই, এরূপ ভাবিলে কোন প্রকার রচনার দোষগুণ পরীক্ষা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।

বাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্য এবং মুসলমান সম্প্রদায়

শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন—

সাত শত বৎসর মুসলমানের সহিত একত্র বাস করিয়া বাঙ্গলা মুসলমান হইতে অনেক জিনিস লইয়া ফেলিয়াছে। সেসব জিনিস বাঙ্গলার হাড়ে মাসে জড়িত হইয়াছে। এখন তাহাকে বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা কিছুতেই সফল হইবে না। মুসলমানেরা বাঙ্গলা ভাষাকে যেমন বদলাইয়া দিয়াছে, ভারতবর্ষের আর কোন ভাষাকে সেরূপ পারে নাই। আমাদের বাঙ্গলার বিভক্তি 'রা' ও 'দের' মুসলমানদের কাছ হইতে লওয়া। সে বিভক্তি তুমি ভাষা হইতে তাড়াইবে কি করিয়া? অথচ আমাদের পণ্ডিত লেখক মহাশয়েরা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করিবেন না।

এতদিন পণ্ডিত মহাশয়েরা ইচ্ছা-মত পারসী শব্দকে তাড়াইয়া দিতে পারিয়াছেন, কারণ বাঙ্গলার মুসলমানেরা বাঙ্গলা-সাহিত্যে লিখিতে আরম্ভ করেন নাই। এখন তাঁহারা বলিতেছেন, "চলিত মুসলমানী শব্দ তোমরা তাড়াইবে কেন? তাড়াইবার তোমাদের কি অধিকার আছে? যেসকল শব্দ তিন, চার, পাঁচ শত বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের ত ভাষায় থাকিবার কায়েমী স্বত্ব জন্মিয়া গিয়াছে। তোমরা সে স্বত্ব হইতে তাড়াইবার কে?" শুধু যে এই কথা বলিয়া নিশ্চিন্ত আছেন তাহা নয়, তাঁহারা আরও বলিতেছেন, "তোমরা যদি মুসলমানী শব্দ তাড়াইয়া বড় বড় সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার কর, আর যদি বুঝিতে আমাদের বেশী কষ্ট হয়, তবে আমরা বড় বড় পারসী শব্দ, আরবী শব্দ ব্যবহার করিব; আমাদের ভাষা স্বতন্ত্র করিয়া লইব—তোমাদের মুখাপেক্ষা করিব না।" সুতরাং ভাষার সমস্যাটি এখন বড় কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ বিষয়ে নবাব-আলি চৌধুরী মহাশয় "বাঙ্গলা ভাষার গতি" নামে ঢাকায় যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, সেটি সকলেরই মন দিয়া দেখা উচিত। বাঙ্গলায় যখন অর্দ্ধেক মুসলমান, তখন তাহারা যে হিন্দুরা যাহা বলিবে তাহাই করিবে—এরূপ আশা করা যায় না।

ঠিক্ কথা। সংস্কৃতজ্ঞ সুপণ্ডিতের মুখ দিয়া কথাগুলি বাহির হওয়ায় উহার জোর আরও বেশী হইয়াছে।

আমরা আরবী ফারসী জানি না। বলিতে পারি না "রা" ও "দের" বিভক্তি ঐ দুই ভাষার কোনটি হইতে আসিয়াছে কি না। ফারসী-জানা লোককে এবিষয়ে সন্দেহ

প্রকাশ করিতে শুনিয়াছি। কিন্তু "ও" শব্দটি যে ফারসী হইতে লওয়া তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা বাংলা ভাষার হাড়ে মাসে জড়িত হইয়া গিয়াছে।

সাহেবী বাঙ্গলা

সাহেবী বাঙ্গলা সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের মনের ভাব যাহা, মোটের উপর তাহাতে আপত্তি করিবার মত কিছু দেখিতেছি না। কিন্তু এ বিষয়ে "শুচিবায়ু"গ্রস্ত হওয়াও আমরা ভাল মনে করি না। আমাদের দেশের অনেকে সাহেবী পোষাক্ ভাল বাসেন না; কিন্তু তাঁহাদের আপত্তির দৌড় সাহেবী টুপি, বুক-খোলা কোট এবং নেক-টাই পর্য্যন্ত। ইংরেজদের নিকট হইতে ধার-করা কামিজ, ইংরেজী কেতার পা-জামা ও জুতা এবং গলা পর্য্যন্ত বোতাম আঁটা কোট, সাহেবী পোষাকের বিরোধীরাও অনেকে ব্যবহার করেন। ভাষা সম্বন্ধেও এইরূপ বলা যাইতে পারে, যে, লিখিবার বা বলিবার সময় অকারণ কতকগুলা ইংরেজী শব্দ বাংলার সহিত মিশান ত উচিত নয়ই, ইংরেজী শব্দের ঠিক্ ঠিক্ বাংলা প্রতিশব্দ দিয়া বাক্য রচনা করাও উচিত নয়। কিন্তু ইংরেজী সভ্যতা ও ইংরেজী সাহিত্যের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও মেশামিশি হওয়ায় অনেক পাশ্চাত্য ভাব ও চিন্তা আমাদের মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে। সেগুলি প্রকাশ করিতে গেলে, আধুনিক বাঙ্গালী যেমন আর ধুতি ও উত্তরীয়তে সর্ব্বত্র কাজ চালাইতে পারেন না, কেহ বা মুসলমানী কিম্বা আধ-মুসলমানী চোগা চাপকান শাম্লা পাগড়ী, কেহ বা পুরা সাহেবী পোষাক, কেহ বা কতকটা সাহেবী পোষাক পরেন, তেমনই আধুনিক বাঙ্গলা ভাষাও কতকটা ইংরেজী-ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে;—যেমন মুসলমানী আমলের বাঙ্গলায় এবং এখনকার আদালতের বাঙ্গলায় আরবী ফারসীর ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ইংরেজী-শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙ্গালী লেখকদের একচেটিয়া ব্যাধি-বিশেষ বলিয়া মনে করিতে পারি না। আধুনিক যে কোন দেশের সাহিত্যে বিদেশী সভ্যতা ও সাহিত্যের প্রভাবের এইরূপ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। চসারের কাব্যে একই কথা একবার এংলো-সাক্সন ও আবার ফরাসী শব্দ দ্বারা বলা হইয়াছে; পদ-যোজনার রীতি অনেক স্থানে ফরাসী। অনেক স্থানে ভাষা এমন যে বোধ হয় যেন দেহটা ইংরেজের আত্মাটা ফরাসীর। এই জন্য আর্ল্ বলিয়াছেন—

"The French language has not only left indelible traces on the English, but it has also imparted to it some leading characteristics."

চসারের ফরাসী ধরণ ধারণ, ফরাসী ভাব সত্ত্বেও তিনি ইংলণ্ডের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। আমরা যখন ছেলেবেলায় মিল্টন পড়িতাম তখন উহার টীকার মধ্যে কতই না গ্রীক লাটিন ও ইহুদীভাষার অনুকরণের দৃষ্টান্ত মুখস্থ করিতে হইয়াছিল। টীকাকার কোন্‌টিকে Hellenism কোন্‌টিকে Latinism, কোন্‌টিকে Hebraism বলিয়াছেন, তাহা মনে করিয়া রাখিতে হইত। কিন্তু মিল্টনের লেখায় এইরূপ বিদেশী সাহিত্যের স্পষ্ট ছাপ পড়াতেও কেহ মিল্টনকে অপকৃষ্ট লেখক বলে না, বা ঐসব লাটিনিজম্ প্রভৃতির জন্য তাঁহাকে বিদ্রূপ করে না। আরও অনেক শ্রেষ্ঠ ইংরেজ লেখকের রচনায় ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের ছাপ (Gallicism) এবং জার্ম্মেন ভাষা ও সাহিত্যের ছাপ (Germanism) লক্ষিত হয়। ইংরেজী সাহিত্যের পাঠকমাত্রেই জানেন, কার্লাইল তাঁহার গ্রন্থাবলীতে বহুস্থানে শব্দ ইংরেজীই ব্যবহার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার শব্দযোজনার রীতি জার্ম্মেন, ভাব ও চিন্তা জার্ম্মেন; ঠিক্ যেন একজন জার্ম্মেন ইংরেজী শব্দের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে। কার্লাইলের এই যে জার্ম্মেনীভূত ভাষা, ইহা সত্ত্বেও তিনি আমেরিকান ও ইংরেজদের নিকট একজন খুব বড় লেখক বলিয়া পরিগণিত। ইংরেজী-জানা বিদেশীরাও তাঁহাকে খুব সম্মান করেন। ভাষার ও সাহিত্যের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য চেষ্টা করা খুব উচিত। কিন্তু বাড়াবাড়ি কোন বিষয়েই ভাল নয়। সাহেবীপোষাক-পরা বাঙ্গালী মাত্রেই যেমন দেশদ্রোহী বা দুরাত্মা নহেন, ধুতি-ও-উত্তরীয়-পরিহিত বাঙ্গালী মাত্রেই যেমন দেশভক্ত ও পুণ্যাত্মা নহেন; তেমনি কাহারও রচনায় ইংরেজীর গন্ধ পাওয়া গেলেই তিনি অপকৃষ্ট লেখক হইয়া যান না, এবং কাহারও রচনায় বিদেশী সাহিত্যের বিন্দুমাত্রও প্রভাব লক্ষিত না হইলেই তিনি "সাহিত্যসম্রাট", "সাহিত্য-

স্থলতান", বা "সাহিত্য-খলিফা" হইয়া যান না। কেবল খোসা বা বাহিরের আবরণটা দ্বারা বিচার না করিয়া যেমন মানুষটার ভিতরে কি জিনিষ আছে তাহা দেখা কর্ত্তব্য, তেমনি লেখকদেরও কেবলমাত্র ভাষা দ্বারাই বিচার করিলে অবিচার হয়। তাঁহাদের লেখার মধ্যে মহৎ চিন্তা, মহৎ ভাব, মহৎ আদর্শ, জ্ঞান, রস, সৌন্দর্য্য, আছে কি না-আছে, তাহা দেখা নিতান্ত অনাবশ্যক না হইতেও পারে।

"রচনার বই"

শাস্ত্রীমহাশয় বলেন :—

বাঙ্গলায় রচনার বই বড় কম, নাই বলিলেও হয়। যে কখানি সেকেলে বই আছে, প্রায়ই তর্জ্জমা। বাঙ্গালী নানা বিষয়ে ভাবিয়া চিন্তিয়া হেল্প সাহেবের মত বা এডিসন সাহেবের মত রচনা লিখিতেছে—এ ত দেখা যায় না। যাহা কিছু আছে এক কমলাকান্তের দপ্তরে—অতুল্য অমূল্য। আর ত দেখি না। আমাদের দেশের লোক এ পথটা কেন ছাড়িয়া দিতেছে, বুঝিতে পারি না।

আমাদের বোধ হয় প্রবন্ধের "সেকেলে বই"গুলির উপর শাস্ত্রী মহাশয় অবিচার করিয়াছেন। বঙ্কিমবাবুর বিস্তর প্রবন্ধ আছে। সে গুলি ত তর্জ্জমা নয়। ভূদেববাবুর সামাজিক প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ, পারিবারিক প্রবন্ধ, এই-সকল চিন্তাপূর্ণ বহিও ত তর্জ্জমা নয়। শাস্ত্রী মহাশয় "সাহেবী" বাঙ্গলার বিরোধী। সেইজন্য বলিতে সাহস হইতেছে যে হেল্পস্ "সাহেব" বা এডিসন "সাহেব"দিগের ধাঁচের রচনা না হইলেও বাংলায় ভাল ভাল সন্দর্ভ আছে। কমলাকান্তের দপ্তরে "অতুল্য অমূল্য" জিনিষ থাকিতে পারে। কিন্তু পরিহাস ও তৎসদৃশ রসে ভরা অন্য ধরণের ভাল রচনা বাংলায় আরো আছে। কোন গ্রন্থ বা রচনাকে ভাল হইতে হইলে স্বদেশী বা বিদেশী আর-কোনটির মত হইতে হইবে, এরূপ মনে হয় না।

জীবিত লেখকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম করিতে সাহস হয় না; যদিও তাঁহার অনেক গদ্য রচনা খুব মূল্যবান্, অনুবাদেও সমজদার বিদেশীরাও তাহার মূল্য বুঝিয়াছে। কেননা, বঙ্গ দেশে রবিবাবুকে তুচ্ছজ্ঞান না করিলে বিজ্ঞ হওয়া যায় না। এইজন্য তাঁহাকে বাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করি, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ও কি ভাবিয়া চিন্তিয়া রচনা লিখেন নাই?

ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলন

ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন গত মাসে বীরভূম জেলার সাঁইথিয়ায় হইয়াছিল। নানাস্থান হইতে প্রায় ২০০ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিয়াছিলেন। সভাস্থলে সর্ব্ব-সমেত প্রায় ২০০০ লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। এবার সমুদ্র-যাত্রা বৈধ কি না, এবম্বিধ কোন প্রশ্নের উত্থাপন না হওয়ায় কোন বাদবিতণ্ডা হয় নাই। সভাপতি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি, দারিদ্র্যব্রতধারী জ্ঞানী তপশ্চর্য্যাপরায়ণ আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্ন প্রাচীন ব্রাহ্মণ-গণের আদর্শ সকলকে অনুসরণ করিতে বলেন। তিনি যখন পণগ্রাহী বরের পিতামাতার কঠোর ব্যবহারের বর্ণনা করিতে থাকেন, তখন সকলেরই হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল। তিনি বলেন, পণের টাকা সংগ্রহ করিতে পিতা মাতার কষ্ট দেখিয়া, নববধূর মন শ্বশুরবাড়ীর লোক-দের উপর প্রথম হইতেই বিরূপ হইয়া যায়, এবং তজ্জন্য পরিণামে অতিশয় কুফল ফলে। পুষ্করিণী খনন, গোপালন, গোচারণের ভূমি রক্ষা, হিন্দুধর্ম্ম শিক্ষাদান, প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি উপদেশ দেন।

পণ বা যৌতুক আদায় করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ এবং পাপ-কার্য্য, এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব ধার্য্য হয়। বর্ত্তমান টোল-গুলির রক্ষা ও উন্নতির চেষ্টা করা উচিত বলিয়া সভা স্থির করেন। আমাদের বিবেচনায় টোলগুলিতে কিছু লৌকিক বিদ্যা, যেমন কিছু অঙ্ক, ভূগোল ও ইতিহাস, শিখান হইলে ভাল হয়। জমীদারদিগকে অনুরোধ করা হয় যেন তাঁহারা প্রত্যেক গ্রামে কিছু নিষ্কর গোচারণ-ভূমি রক্ষার বন্দোবস্ত করেন। টোলের অধ্যাপকদিগকে গৃহে গোপালন করিতে অনুরোধ করা হয়। ব্রাহ্মণ-দিগকে নিত্য সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিতে এবং পবিত্রচরিত্র সংযমী ও সদাচারী হইতে অনুরোধ করা হয়। ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনের এই-সকল অনুরোধ যদি সকলে পালন করেন, তাহা হইলে দেশের কল্যাণ হয়। সভাপতি মহাশয় শেষ বক্তৃতায় সকলকে, নিজ নিজ স্বার্থ চিন্তা না করিয়া, আপন আপন নাম জাহির করিবার চেষ্টা না করিয়া, নির্ম্মল চিত্তে হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম্মের উন্নতির জন্য যত্নশীল হইতে উপদেশ দেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি

এবার কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। প্রতিনিধি বা দর্শক অন্যান্য স্থানের মত বেশী হয় নাই। কিন্তু তজ্জন্য কৃষ্ণনগরবাসীরা দায়ী নহেন। নদীয়া জেলা ও কৃষ্ণনগর ম্যালেরিয়ায় উৎসন্ন হইতে বসিয়াছে; কিন্তু কৃষ্ণনগরে সমিতির উদ্যোগকর্তারা আশ্চর্য্য উৎসাহ ও সেবানিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। "সঞ্জীবনী" বলেন—

আজকাল মফস্বলের ছাত্রগণ আর দেশের পূজনীয় ব্যক্তিদের সেবা করিতে পারেন না। সুতরাং কৃষ্ণনগরের উকীল, ডাক্তার, মোক্তার, উকীলের মোহরের, তালুকদার, জমিদারগণই ভলান্টিয়ারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রতিনিধিদের মোট বহিয়াছেন, স্নানের সময় তৈল গামছা আনিয়া দিয়াছেন, আহারের সময় ভৃত্যের কার্য্য করিয়াছেন, দিন রাত্রি হুকুম তামিল করিয়াছেন। ভদ্র যুবকগণ পদমর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়া দেশবাসীর সেবা করিয়াছেন। এই এক পুণ্যে এই মৃত দেশে নবজীবনের সঞ্চার হইতেছে। কৃষ্ণনগরের উকীল-সম্প্রদায় ঐশ্বর্য্যের জন্য তেমন সুবিখ্যাত নহেন। তবু তাঁহারা আপনাদের মধ্য হইতে প্রায় ১২ শত টাকা দেশপূজার জন্য দান করিয়াছেন। নদীয়া জেলার সর্ব্বশ্রেণীর লোক আনন্দমনে টাকা দিয়াছিলেন, কর্ম্মকর্ত্তৃগণ প্রতিনিধিদের সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য প্রচুর আয়োজন করিয়াছিলেন। পান, ডাব, বরফ, সোডা, লেমনেড, কাহারও চাহিতে হয় নাই, ভলান্টিয়ারগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রতিনিধিদিগের নিকট উহা উপস্থিত করিতেন। কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ সরপুরিয়া, সরভাজ, বরফি, রসগোল্লা প্রভৃতি প্রাতে, মধ্যাহ্নে, বৈকালে, রাত্রিতে প্রচুর পরিমাণে পরিবেষণ করিয়াছেন। প্রতিনিধিদের আদর সমাদরের কোন ত্রুটী হয় নাই। কর্ম্মকর্ত্তৃগণ গাড়ীর এমন আয়োজন করিয়াছিলেন যে, কাহারও এক পদ অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন হইলে অমনই গাড়ী হাজির করিতেন। প্রতিনিধিদের বাসস্থান হইতে খড়িয়া নদী ১০।১৫ মিনিটের পথ। যাঁহারা নদীতে স্নান করিতে যাইতেন তাঁহাদিগকে কর্ম্মকর্ত্তারা হাঁটিয়া যাইতে দেন নাই। প্রতিনিধিদের বাসের জন্য সহরের উৎকৃষ্ট স্থান মনোনীত হইয়াছিল। জমিদার শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী, বিপ্রদাস পাল-চৌধুরী, ও টাউন হলের প্রশস্ত পরিষ্কৃত বাটীতে প্রতিনিধিগণ অবস্থিতি করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগর-রাজবাটীর চারিদিকে সুগভীর পরিখা। এই পরিখার তীরে সুবৃহৎ ঠাকুরবাটী। ঠাকুরবাটী এমন বৃহৎ যে তিন সহস্র লোক অনায়াসে উপবেশন করিতে পারে। ঠাকুরবাটীতেই প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

কৃষ্ণনগরের একটি বিষয় অতি অসাধারণ। সৎকর্ম্মশীল উকীল শ্রীযুক্ত বেচারাম লাহিড়ী মহাশয়ের পত্নী স্বয়ং বঙ্গলক্ষ্মীর কাপড় পীত বস্ত্রে রঞ্জিত করিয়া নিজহস্তে ১০০ ভলান্টিয়ারের বক্ষ্যচিহ্নিত পেটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং ব্যারিষ্টার মিঃ বি, কে লাহিড়ীর পত্নী স্বহস্তে প্রতি-নিধিদের জন্য রেসমনির্ম্মিত স্তবক নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই নারীদ্বয়কে আমরা নমস্কার করি।

বঙ্গে সেবার ইচ্ছা আবালবৃদ্ধবনিতা সকল শ্রেণীর লোকের প্রাণে জাগিয়াছে। কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য নানা জনের হৃদয়ের এই ইচ্ছার সমবেত শক্তিকে যেরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহার এখনও সুব্যবস্থা হইতেছে না।

যুদ্ধের শিক্ষা ও বঙ্গের অভাব

আমরা গত বৎসরের কোন কোন মাসের প্রবাসীতে যুদ্ধের হিতাহিতের বিচার করিয়াছিলাম। দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে যুদ্ধের দ্বারা মানুষের যে উপকার হয়, বা যুদ্ধের সময় মানুষের বীরত্ব আদি যে-সকল সদ্‌গুণ প্রকাশ পায়, সেইরূপ উপকার লাভ এবং সেইরূপ সদ্‌গুণের বিকাশ শান্তির সময়ে অন্যপ্রকার কার্য্যেও হইতে পারে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত একটি বিষয়ে যুদ্ধের প্রাধান্য রহিয়াছে। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবার সময় এবং প্রকৃত যুদ্ধের সময় মানুষের মধ্যে যেমন নেতৃত্ব, যেমন দল বাঁধিবার শক্তি, যেমন অকাতরে অবিচারে বাধ্যতা, যেমন একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য লক্ষ লক্ষ লোকের একাগ্র চেষ্টা দেখা যায়, শান্তির সময়ে কোনও কার্য্যক্ষেত্রে তাহা দেখা যায় না। যুদ্ধের জন্য আয়োজনকালে ও যুদ্ধের সময়ে লক্ষিত এই-সব গুণ ও শক্তি যে শান্তির সময়েও বিকশিত এবং প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহার একটি দৃষ্টান্ত পানামার স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য সকল চেষ্টায় প্রমাণিত হইয়াছে। ইহার বৃত্তান্ত "স্বাস্থ্যের উন্নতি" প্রবন্ধে দৃষ্ট হইবে। কিন্তু সাধারণতঃ ঐসব গুণ যুদ্ধক্ষেত্রেই দেখা যায়। এইজন্য অনেকে মনে করেন, যোদ্ধৃজাতির মধ্যে নেতৃত্বশক্তি, সুশৃঙ্খলভাবে কার্য্য করিবার শক্তি, দল বাঁধিবার শক্তি, এবং বাধ্যতা যেমন দেখা যায়, যুদ্ধে অনভ্যস্ত জাতির মধ্যে তেমন দেখা যায় না। সেই কারণেই কেহ কেহ অনুমান করেন যে বোম্বাই ও পঞ্জাবে লোকহিতচেষ্টা যেমন সুশৃঙ্খল, প্রবল, নিয়মিত, বিস্তৃত, এবং সমস্ত বৎসর ব্যাপিয়া অবিরাম, বাঙ্গলা দেশে তেমন নয়। অথচ বাঙ্গলার যুবকেরা সাহসে, কর্ম্মিষ্ঠতায়, আত্মোৎসর্গে, নিঃস্বার্থ নেতার আজ্ঞানুবর্ত্তিতায়, দেশভক্তিতে অন্যান্য প্রদেশের যুবক-দের চেয়ে নিকৃষ্ট নহে।

কারণ যাহাই হউক, অন্য যে-কোন দেশে যাহা হইয়াছে, বঙ্গেও ঠিক্ তাহাই হইতে পারে। নির্ভীক, প্রেমিক, উদারচেতা, নিঃস্বার্থ, কর্ম্মকুশল, বুদ্ধিমান নেতা যেখানে

পাইব, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ ত্রুটি অগ্রাহ্য করিয়া, সাম্প্রদায়িক বা অন্যবিধ ঈর্ষ্যাদ্বেষ মন হইতে দূর করিয়া দিয়া, সেখানেই যদি আমরা তাঁহার সহিত একমত হইয়া কাজ করিতে পারি, তাহা হইলে বাঙ্গলা যে-কোন দেশের সমকক্ষ হইতে পারিবে। ইন্দ্রিয়ের দাস, ক্ষুদ্রাশয়, ভীরু, পরশ্রীকাতর, অন্যের প্রশংসায় ম্রিয়মাণ, স্বার্থান্বেষী, খোসামোদলোলুপ, হাম্‌বড়া নেতাদের দ্বারা দেশের উদ্ধার হইবে না। যাহারা আমাদের মত সম্বৎসর সহরের পরিষ্কার জল পান করিয়া দিব্য আরামে চেয়ারে বসিয়া অপরের উপর ত্যাগের ফরমাইস করে, তাহারাও নেতৃত্বের অযোগ্য। যিনি আপনাকে অজ্ঞতম, দরিদ্রতম, হেয়তম ব্যক্তির সমদুঃখভাগী করিয়াছেন, বা যে-কোন মুহূর্ত্তে করিতে প্রস্তুত, তিনিই নেতা হইতে পারেন। আসুন তিনি, আসুন তাঁহারা। ভগবান্ তাঁহাকে, তাঁহাদিগকে প্রেরণ করুন। হয় ত তাঁহারা আমাদের মধ্যেই রহিয়াছেন; ভগবান্ তাঁহাদিগকে চিনাইয়া দিউন।

কিন্তু আমাদের নেতারা কিছু করিতেছেন না, বা আমাদের ভাল নেতা নাই, ইহাও অনেক স্থলে অলস লোকদের বিশ্বনিন্দুকদের একটা বাজে ওজর মাত্র। নাই বা নেতারা কিছু করিলেন, নাই বা রহিলেন যোগ্য নেতা;—আমাদের নিজের নিজের কর্ত্তব্য প্রত্যেকেরই করা উচিত। ভগবান্ প্রত্যেককে যে শক্তি দিয়াছেন, তাহার সদ্ব্যবহারের জন্য তিনি দায়ী। নেতৃত্বও আকাশ হইতে পড়ে না। কার্য্যক্ষেত্রে নামিলে অনেক নগণ্য লোকের মধ্যে প্রকৃত নেতৃত্ব দেখা যায়।

বজ্র কি ?

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির স্বেচ্ছাসেবকেরা এবার এক পুণ্যশীলা নারীর নির্ম্মিত বজ্রচিহ্নিত পেটী পরিয়াছিলেন। এই বজ্রটি কি ?

পৌরাণিক কাহিনীগুলির অর্থ ও উপদেশ ত্রিকাল-ব্যাপী। কথিত আছে একদা দেবগণ অতিশয় বিপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারা অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে কোন মতেই আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহারা নিরুপায় হইয়া দধীচি মুনির শরণ লইলেন। পবিত্রচেতা ঋষি দেবগণের মঙ্গলের জন্য, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নহে, প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার অস্থি হইতে বজ্র নির্ম্মিত হইল, এবং তাহার দ্বারা দেবগণ বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিলেন।

এই কাহিনীটিতে দেবাসুরের যুদ্ধকে শুভ ও অশুভের বিরোধ, এবং দধীচির তনুত্যাগ ও তাঁহার অস্থিনির্ম্মিত বজ্রে দেবগণের জয় ও বিপদুদ্ধারকে প্রেম-প্রণোদিত আত্মবলিদান দ্বারা শুভের প্রতিষ্ঠা বলিয়া বুঝিলেই ইহা একটি ত্রিকালে সদাসম্ভব ব্যাপার বলিয়া অনুভূত হইবে। উপদেশ এই—বজ্র তিনি, যিনি নির্ভীক নিঃস্বার্থ প্রজ্ঞাবান্ ও প্রেমিক। তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইবেই হইবে, তাঁহার অকৃতকার্য্যতা নাই। যিনি কাহাকেও বিদ্বেষ করেন, তিনি বজ্র নহেন, অমোঘ অস্ত্র নহেন। যিনি প্রজ্ঞারহিত, স্বার্থপর, ভীরু, তিনি বজ্র নহেন, অমোঘ অস্ত্র নহেন। বঙ্গের নরনারী বজ্র হউন, বিশেষ করিয়া যাঁহারা তরুণবয়স্ক। তাঁহারা অজ্ঞতা নাশ করুন, রোগ নাশ করুন, দুর্নীতি নাশ করুন, দারিদ্র্য নাশ করুন, স্বদেশের ও স্বজাতির উপর অবিশ্বাস নাশ করুন, দুর্ব্বলচিত্ততা নাশ করুন, চিন্তায় ও আচরণে নাস্তিকতা নাশ করুন।

ধন, এবং হৃদয়ের প্রীতি ও শ্রদ্ধা

সকলেই জানেন, আমরা বিস্তর বিদেশী জিনিষ কিনি; তাহাতে অনেক টাকা বিদেশে যায়। এই-সব জিনিষ আমরা নিজেরা প্রস্তুত করিতে পারিলে দেশের অনেক টাকা দেশেই থাকিতে পারে। বিস্তর বিদেশী আমাদের দেশে উচ্চ বেতনের কাজ করেন, এবং বার্দ্ধক্যে স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া মোটা পেন্‌স্যন পান। আমরা চেষ্টা করিয়া এই-সব কাজ যদি পাই তাহা হইলেও অনেক টাকা দেশে থাকে। দেশের টাকা বাহিরে আরও নানা পথ দিয়া যায়। দেশের ধন রক্ষা ও বৃদ্ধি করা আমাদের কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও বড় কর্ত্তব্য আর-একটি আছে।

পুস্তকের বিজ্ঞাপনদাতারা বিজ্ঞাপন দেন, "সুন্দর বিলাতী বাইণ্ডিং" এইরূপ লিখিয়া। অনেক দেশী ব্যবসাদার দেশের লোকদের বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্য

দোকানের ও ব্যবসার দেশী নাম না রাখিয়া সাহেবী নাম রাখেন। ইহাতে বুঝা যায় এই যে আমরা নিজেই নিজেকে হেয়, অবিশ্বাস্য মনে করি, এবং সিংহের চামড়া পরিয়া গৰ্দ্দভত্ব দূর করিতে চেষ্টা করি। দেশের কোন প্রকার হিতের ক্ষুদ্র বা বৃহৎ চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে দেশী লোকের দ্বারা সফল হওয়া একান্ত আবশ্যক। আমরা কতকগুলা রূপার বা সোনার টুকরা বিদেশে গেল বলিয়া চীৎকার করি, কিন্তু বিদেশীর কাছে যে হৃদয়টা বিকাইয়া যাইতেছে, তাহার উপায় কি? তুমি প্রজা রাইয়তের খাজনা, মক্কেল রাইয়তের টাকা, ক্রেতা রাইয়তের নিকট হইতে কাপড় বা অন্য জিনিষের মূল্য লইতে পার, কিন্তু তাহার মঙ্গলের চেষ্টা, তাহার শিক্ষা, তাহার পানীয় জলের ব্যবস্থা, তাহার গ্রাম পরিষ্কার করা, এই-সব কাজ যদি রাজভৃত্য বিদেশীর জন্য রাখিয়া দাও, তাহা হইলে খাজনার চেয়ে বহুবহু গুণে মূল্যবান্ যে প্রীতি ও শ্রদ্ধা তাহা ত তুমি পাইলে না।

আমাদের অনেক রাষ্ট্রীয় অধিকার নাই, আমাদের অনেক অসুবিধা আছে, আমাদের অনেক লাঞ্ছনা হয়, ইহা সত্য। কিন্তু যতটুকু কাজ করিবার স্বাধীনতা ও অধিকার আমাদের আছে, তাহাতে আমরা বিদেশীর সমান বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা দেশবাসীদের নিকট হইতেও কেন পাই না? আমরা কেন নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হই না? আমাদের দ্বারা স্বদেশবাসীর অপমান লাঞ্ছনা পীড়ন কেন হয়? আমরা স্বাধীন হইতে চাই, তাহার মানে দেশের সমস্ত কাজ চালাইবার ভার আমরা লইতে চাই। ইহা সত্য যে জলে না নামিলে যেমন মানুষ সাঁতার দিতে পারে না, তদ্রূপ বড় কাজের ভার না পাইলে মানুষের শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ হয় না। কিন্তু ছোট ছোট স্বায়ত্ত কাজে আমরা কতটা শক্তি দেখাইতেছি, তাহা ভাবা উচিত। ইংরেজ বর লইয়া আমাদের দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে, আমরা যোগ্য হইলেই বর দিয়া স্বদেশে চলিয়া যাইবে, ইহা আমরা মনে করি না; কিন্তু আমরা মনে করি ও বলি যে সর্ব্বপ্রকারে দেশের সেবা করিবার ভগবদ্দত্ত অধিকার অর্জ্জন করিতে হইবে যোগ্যতা দ্বারা। এই যোগ্যতা বাড়িতেছে কি না, তাহার মাপ-কাঠী দেশের মানুষের প্রতি দেশের লোকের আস্থা, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, নির্ভর, প্রীতি বাড়িতেছে কি না। দেশের শ্রদ্ধা ও প্রীতি যদি বিদেশে চলিয়া যায়, তাহার মত দারিদ্র্য ও হীনতা কি হইতে পারে? বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, শিল্প, আদি সব বিষয়ে খাঁটি-খবর ও আদর্শের জন্য আমাদের মনটা পড়িয়া থাকে বিদেশে, ইহার মত দারিদ্র্য আর কি আছে।

আশার কথা এই যে যেমন বিলাতী বাঁধাইয়ের বিজ্ঞাপন বাহির হয়, তেমনি আবার কোন কোন বিলাতী কাপড়েরও প্রশংসা লোকে এখনও এই বলিয়া করিতে বাধ্য হয় যে উহা দেশী কাপড়ের মত। দেশী মানুষ কবে এই ভাবে সব বিষয়ে তুলনার স্থল হইবেন?

ইতিহাস চর্চ্চার প্রণালী।

আজকাল বাঙ্গলা মাসিক পত্রে, এমন কি সাপ্তাহিক ও দৈনিক কাগজে পর্য্যন্ত, ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ছাপা হয়। এখন ইতিহাস চর্চ্চার ও ইতিহাস রচনার প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া খুব দরকার। এ বিষয়ে অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের যে প্রবন্ধটি আমরা ছাপিলাম, তাহা ঐতিহাসিক লেখকদিগের খুব কাজে লাগিবে।

টডের রাজস্থান সম্বন্ধে যদুবাবু আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের অন্য একটি কথা মনে পড়িল। মুসলমান শাসনকালের ইতিহাস লিখিতে গিয়া আমাদের ভ্রমে পড়িবার অনেক কারণ আছে। কিন্তু মুসলমান-বিজয় ও শাসন সম্বন্ধে অপ্রিয় সত্য বলিবার সময়ও আমরা মুসলমান বিজয়ের ফলে পরোক্ষ-ভাবে দেশের কি উপকার হইয়াছে, তাহাও যেন সব সময়ই বলি। সব ধর্ম্মাবলম্বীকে লইয়া আমাদিগকে ঘর করিতে হইবে। সকলের ন্যায্য পাওনা সকলকে দিতে হইবে। আজকাল আমাদের অরাজনৈতিক সভাসমিতিতেও যেমন রাজভক্তিব্যঞ্জক একটি প্রস্তাব প্রথমে ধার্য্য হয়, তেমনি মুসলমানদের ভারত-আগমনের শুভফল সত্যকে অতিক্রম না করিয়া আন্তরিক বিশ্বাসের সহিত ভারতবর্ষের সব ইতিহাসে ঘোষিত হওয়া কর্ত্তব্য।

দেশে বিজ্ঞানের স্থিতি

অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় যেরূপ ভাষায় "পত্রালি" লিখিয়াছিলেন, আজকাল তাহা পরিত্যাগ

করিয়াছেন। আজকাল কেবল পুষ্টিকর খাদ্যটি দেন, তাহাতে নুন ঝাল গুড় অম্ল দিতে চান না। যাই হোক্‌, তাঁর লেখায় যখন খাঁটি জিনিস আছে তখন কোথাও কোথাও বেশী মনোযোগের দরকার হইলেও আমরা তাহা পড়িতে ছাড়ি না। তাঁহার রচিত "দেশে বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠা" প্রবন্ধের "দেশে বিজ্ঞানের স্থিতি" শীর্ষক অংশটি পাঠকেরা যদি আগে পড়েন, তাহা হইলে বাকী সবটুকু পড়িতে আগ্রহ জন্মিবে। পড়িলে সময়ের ও মস্তিষ্কের সদ্ব্যবহার হইল বলিয়া ধারণা জন্মিবে।

ভারতীয় দর্শন

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয়ের "ভারতীয় দর্শন" সম্বন্ধেও আমরা বলি পাঠকেরা "অনুবাদ ও মৌলিক গ্রন্থ রচনা" এবং "দর্শন-অনুসন্ধান" শেষের এই দুইটি অংশ আগে পড়িয়া ফেলিবেন। তাহা হইলে এই বহুঅধ্যয়ন ও চিন্তাপ্রসূত অভিভাষণটির অন্য অংশগুলি আক্রমণ করিতে সাহস হইবে। ভারতবর্ষের প্রাচীনদর্শন বাঙ্গালীদের বোধগম্য করিবার চেষ্টা, এবং বাঙ্গলা ভাষায় দার্শনিক গ্রন্থাদি লিখিবার চেষ্টার বিষয় দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন। ইংরেজ-শাসনকালে এ বিষয়ে রামমোহন রায় প্রথম পথ দেখান। তিনি বেদান্তের বাঙ্গলাভাষ্য রচনা করেন, এবং ভাষ্যসহ কতকগুলি উপনিষদের বাঙ্গলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। দত্ত মহাশয় তাঁহার নাম করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গৌরগোবিন্দ রায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৈলাসচন্দ্র সিংহ, প্রভৃতির নামও বোধ হয় করা চলিত।

বঙ্গে শিল্প ও সমাজসংস্কার

অন্যান্য প্রদেশে প্রতিবৎসর রাজনৈতিক প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজসংস্কার সমিতি এবং শিল্পোন্নতিবিধায়িনী সমিতিরও অধিবেশন হয়। বঙ্গে হয় না। কেন হয় না?

শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের মৃত্যু

ভাইজ্‌ম্যান (Weismann) পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ছিলেন। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর স্বোপার্জ্জিত দোষ বা গুণ, শক্তি বা অক্ষমতা, ইত্যাদি, তাহার সন্তানেরা উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রায় না, তিনি ইহা প্রমাণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

জাপান চীনে পা ফেলিয়াছে। কখন্ কি সর্ত্তে পা সরাইবে, তাহা সে নিজেই স্থির করিবে। আমেরিকা, চীন, বা আর কাহারও শুনিবে না।

—টোকিও পাক্।

"ভগবানের কৃপায় আমরা হাজার হাজার শত্রুর প্রাণ বধ করিয়াছি।" যুদ্ধের তারের খবর।

—ডি নোটেনক্রাকের (আমষ্টার্ডাম)।

পল্লীর উন্নতি

সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় বাষ্পের প্রভাব যখন বেশি তখন গ্রহনক্ষত্রে ল্যাজামুড়োর প্রভেদ থাকে না। আমাদের দেশে সেই দশা—তাই সকলকেই সব কাজে লাগতে হয়, কবিকেও কাজের কথায় টানে। অতএব আমি আজকের এই সভায় দাঁড়ানোর জন্যে যদি ছন্দোভঙ্গ হয়ে থাকে তবে ক্ষমা করতে হবে।

এখানকার আলোচ্য কথাটি সোজা। দেশের হিত করাটা যে দেশের লোকেরই কর্ত্তব্য সেইটে এখানে স্বীকার করতে হবে। এ কথাটা দুর্ব্বোধ নয়। কিন্তু নিতান্ত সোজা কথাও কপাল-দোষে কঠিন হয়ে ওঠে সেটা পূর্ব্বে পূর্ব্বে দেখেছি। খেতে বল্লে মানুষ যখন মারতে আসে তখন বুঝতে হবে সহজটা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেইটেই সব চেয়ে মুস্কিলের কথা।

আমার মনে পড়ে এক সময়ে যখন আমার বয়স অল্প ছিল সুতরাং সাহস বেশি ছিল সে সময়ে বলেছিলুম যে বাঙালীর ছেলের পক্ষে বাংলা ভাষার ভিতর দিয়ে শিক্ষা পাওয়ার দরকার আছে। শুনে সেদিন বাঙালীর ছেলের বাপদাদার মধ্যে অনেকেই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

আর একদিন বলেছিলুম, দেশের কাজ করবার জন্য দেশের লোকের যে অধিকার আছে সেটা আমরা আত্ম-অবিশ্বাসের মোহে বা সুবিধার খাতিরে অন্যের হাতে তুলে দিলে যথার্থপক্ষে নিজের দেশকে হারানো হয়। সামর্থ্যের স্বল্পতাবশত যদিবা আমাদের কাজ অসম্পূর্ণও হয় তবু সে ক্ষতির চেয়ে নিজশক্তি চালনার গৌরব ও সার্থকতার লাভ অনেক পরিমাণে বেশি। এত বড় একটা সাদা কথা লোক ডেকে যে বল্‌তে বসেছিলুম তাতে মনের মধ্যে কিছু লজ্জা বোধ করেছিলুম। কিন্তু বলা হয়ে গেলে পরে লাঠি হাতে দেশের লোকে আমার সেটুকু লজ্জা চুরমার করে দিয়েছিল।

দেশের লোককে দোষ দিইনে। সত্য কথাও খামকা শুনলে রাগ হতে পারে। অন্যমনস্ক মানুষ যখন গর্ত্তর মধ্যে পড়তে যাচ্চে তখন হঠাৎ তাকে টেনে ধরলে সে হঠাৎ মারতে আসে। যেই সময় পেলেই দেখ্‌তে পায় সাম্‌নে গর্ত্ত আছে তখন রাগ কেটে যায়। আজ সময় এসেছে, গর্ত্ত চোখে পড়েছে, আজ আর সাবধান করবার দরকারই নেই।

দেশের লোককে দেশের কাজে লাগ্‌তে হবে এ কথাটা আজ স্বাভাবিক হয়েছে। তার প্রধান কারণ, দেশ যে দেশ এই উপলব্ধিটা আমাদের মনে আগেকার চেয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সুতরাং দেশকে সত্য বলে জানবামাত্রই তার সেবা করবার উদ্যমও আপনি সত্য হল —সেটা এখন আর নীতি-উপদেশ মাত্র নয়।

যৌবনের আরম্ভে যখন বিশ্বসম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা অল্প অথচ আমাদের শক্তি উদ্যত, তখন আমরা নানা বৃথা অনুকরণ করি, নানা বাড়াবাড়িতে প্রবৃত্ত হই। তখন আমরা পথও চিনিনে, ক্ষেত্রও চিনিনে, অথচ ছুটে চলবার তেজ সাম্‌লাতে পারিনে। সেই সময়ে আমাদের যাঁরা চালক তাঁরা যদি আমাদের ঠিকমত কাজের পথে লাগিয়ে দেন তাহলে অনেক বিপদ বাঁচে। কিন্তু তাঁরা এ পর্য্যন্ত এমন কথা বলেন নি যে, এই আমাদের কাজ, এস আমরা কোমর বেঁধে লেগে যাই। তাঁরা বলেন নি, কাজ কর, তাঁরা বলেছেন প্রার্থনা কর। অর্থাৎ ফলের জন্যে আপনার প্রতি নির্ভর না করে বাইরের প্রতি নির্ভর কর।

তাঁদের দোষ দিতে পারিনে। সত্যের পরিচয়ের আরম্ভে আমরা সত্যকে বাইরের দিকেই একান্ত করে দেখি —আত্মানং বিদ্ধি এই উপদেশটা অনেক দেরিতে কানে পৌঁছয়। একবার বাইরেটা ঘুরে তবে আপনার দিকে আমরা ফিরে আসি। বাইরের থেকে চেয়ে পাব এই ইচ্ছা করার যেটুকু প্রয়োজন ছিল তার সীমা আমরা দেখ্‌তে পেয়েছি, অতএব তার কাজ হয়েছে। তার পরে প্রার্থনা করার উপলক্ষ্যে আমাদের একত্রে জুটতে হয়েছিল, সেটাতেও উপকার হয়েছে। সুতরাং যে-পথ দিয়ে এসেছি আজ সে-পথটা এক জায়গায় এসে শেষ হয়েছে বলেই যে তার নিন্দা করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। সে পথ না চুকোলে এ পথের সন্ধান পাওয়া যেত না।

এতদিন দেশ আকাশের দিকে তাকিয়ে কেবল হাঁক দিয়েছে "আয় বৃষ্টি হেনে।" আজ বৃষ্টি এল। আজও যদি হাঁকতে থাকি তাহলে সময় চলে যাবে। অনেকটা বর্ষণ ব্যর্থ হবে, কেননা ইতিমধ্যে জলাশয় খুঁড়ে রাখিনি। এক দিন সমস্ত বাংলা ব্যেপে স্বদেশপ্রেমের বান ডেকে এল। সেটাকে আমরা পুরোপুরি ব্যবহারে লাগাতে পারলুম না। মনে আছে দেশের নামে হঠাৎ একদিন ঘণ্টা কয়েক ধরে খুব এক পসলা টাকার বর্ষণ হয়ে গেল, কিন্তু সে টাকা আজ পর্য্যন্ত দেশ গ্রহণ করতে পারল না। কত বৎসর ধরে কেবল মাত্র চাইবার জন্যেই প্রস্তুত হয়েছি কিন্তু নেবার জন্যে প্রস্তুত হইনি। এমনতর অদ্ভুত অসামর্থ্য কল্পনা করাও কঠিন।

আজ এই সভায় যাঁরা উপস্থিত তাঁরা অনেকেই যুবক-ছাত্র—দেশের কাজ করবার জন্যে তাঁদের আগ্রহ পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে অথচ এই আগ্রহকে কাজে লাগাবার কোনো ব্যবস্থাই কোথাও নেই। সমাজ যদি পরিবার প্রভৃতি নানা তন্ত্রের মধ্যে আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকে চালনা করবার নিয়মিত পথ করে না দিত তাহলে স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ কি রকম বীভৎস হত; প্রবীণের সঙ্গে নবীনের, প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর সম্বন্ধ কি রকম উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠ্‌ত। তা হলে মানুষের ভালো জিনিষও মন্দ হয়ে দাঁড়াত। তেমনি দেশের কাজ করবার জন্যে আমাদের বিভিন্ন প্রকৃতিতে যে বিভিন্ন রকমের শক্তি ও উদ্যম আছে তাদের যথাভাবে চালনা করবার যদি কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা দেশে না থাকে তবে আমাদের সেই সৃজনশক্তি প্রতিরুদ্ধ হয়ে প্রলয়শক্তি হয়ে উঠ্‌বে। তাকে সহজে পথ ছেড়ে না দিলে সে গোপন পথ আশ্রয় করবেই। গোপন পথে আলোক নেই, খোলা হাওয়া নেই, সেখানে শক্তির বিকার না হয়ে থাকৃতে পারে না। একে কেবলমাত্র নিন্দা করা শাসন করা এর প্রতি সদ্বিচার করা নয়। এই শক্তিকে চালনা করবার পথ করে দিতে হবে। এমন পথ যাতে শক্তির কেবলমাত্র অসদ্ব্যয় হবে না তা নয় অপব্যয়ও যেন না হতে পারে। কারণ আমাদের মূলধন অল্প। সুতরাং সেটা খাটাবার জন্যে আমাদের বিহিত রকমের শিক্ষা এবং ধৈর্য্য চাই। শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি চাই এই কথা যেমন বলা অমনি তার পর দিনেই কারখানা খুলে বসে সর্ব্বনাশ ছাড়া আমরা অন্য কোনো রকমের মাল তৈরি করতে পারিনে। এ যেমন, তেমনি যে করেই হোক মরীয়া হয়ে দেশের কাজ করলেই হল এমন কথা যদি আমরা বলি তবে দেশের সর্ব্বনাশেরই কাজ করা হবে। কারণ সে অবস্থায় শক্তির কেবলি অপব্যয় হতে থাকৃবে। যতই অপব্যয় হয় মানুষের অন্ধতা ততই বেড়ে ওঠে। তখন পথের চেয়ে বিপথের প্রতিই মানুষের শ্রদ্ধা বেশি হয়। তাতে করে কেবল যে কাজের দিক থেকেই আমাদের লোকসান হয় তা নয়, যে ন্যায়ের শক্তি যে ধর্ম্মের তেজ সমস্ত ক্ষতির উপরেও আমাদের অমোঘ আশ্রয় দান করে তাকে সুদ্ধ নষ্ট করি। কেবল

যে গাছের ফলগুলোকেই নাস্তানাবুদ করে দিই তা নয়, তার শিকড়গুলোকে সুদ্ধ কেটে দিয়ে বসে থাকি। কেবল যে দেশের সম্পদকে ভেঙেচুরে দিই তা নয়, সেই ভগ্নাবশেষের উপরে সয়তানকে ডেকে এনে রাজা করে বসাই।

অতএব যে শুভ ইচ্ছা আপন সাধনার প্রশস্ত পথ থেকে প্রতিরুদ্ধ হয়েছে বলেই অপব্যয় ও অসদ্ব্যয়ের দ্বারা দেশের বক্ষে আপন শক্তিকে শক্তিশেলরূপে হানচে তাকে আজ ফিরিয়ে না দিয়ে সত্যপথে আহ্বান করতে হবে। আজ আকাশ কালো করে যে দুর্যোগের চেহারা দেখচি, আমাদের ফসলের ক্ষেতের উপরে তার ধারাকে গ্রহণ করতে পারলে তবেই এটি শুভযোগে হয়ে উঠবে।

বস্তুত ফললাভের আয়োজনে দুটো ভাগ আছে। একটা ভাগ আকাশে, একটা ভাগ মাটিতে। একদিকে মেঘের আয়োজন, একদিকে চাষের। আমাদের নব শিক্ষায়, বৃহৎ পৃথিবীর সঙ্গে নূতন সংস্পর্শে চিত্তাকাশের বায়ুকোণে ভাবের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। এই উপরের হাওয়ায় আমাদের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা এবং কল্যাণসাধনার একটা রসগর্ভশক্তি জমে উঠ্‌চে। আমাদের বিশেষ করে দেখ্‌তে হবে শিক্ষার মধ্যে এই উচ্চভাবের বেগ সঞ্চার যাতে হয়। আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিষয় শিক্ষা। আমরা নোট নিয়েছি, মুখস্থ করেছি, পাস করেছি। বসন্তের দক্ষিণ-হাওয়ার মত আমাদের শিক্ষা মনুষ্যত্বের কুঞ্জে কুঞ্জে নতুন পাতা ধরিয়ে ফুল ফুটিয়ে তুল্‌চে না। আমাদের শিক্ষার মধ্যে কেবল যে বস্তুপরিচয় এবং কর্ম্মসাধনের যোগ নেই তা নয়—এর মধ্যে সঙ্গীত নেই, চিত্র নেই, শিল্প নেই,—আত্মপ্রকাশের আনন্দময় উপায় উপকরণ নেই। এ যে কত বড় দৈন্য তার বোধশক্তি পর্য্যন্ত আমাদের লুপ্ত হয়ে গেছে। উপবাস করে করে ক্ষুধাটাকে পর্য্যন্ত আমরা হজম করে ফেলেছি। এই জন্যেই শিক্ষা সমাধা হলে আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটা পরিণতির শক্তিপ্রাচুর্য্য জন্মে না। সেই জন্যেই আমাদের ইচ্ছাশক্তির মধ্যে দৈন্য থেকে যায়। কোনো রকম বড় ইচ্ছা করবার তেজ থাকে না। জীবনের কোনো সাধনা গ্রহণ করবার আনন্দ চিত্তের মধ্যে জন্মায় না। আমাদের তপস্যা দারোগাগিরি ডেপুটিগিরিকে লঙ্ঘন করে অগ্রসর হতে অক্ষম হয়ে পড়ে। মনে আছে একদা কোনো এক স্বাদেশিক সভায় এক পণ্ডিত বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষের উত্তরে হিমগিরি, মাঝখানে বিন্ধ্যগিরি, দুইপাশে দুই ঘাটগিরি, এর থেকে স্পষ্টই দেখা যাচ্চে বিধাতা ভারতবাসীকে সমুদ্রযাত্রা করতে নিষেধ করচেন। বিধাতা যে ভারতবাসীর প্রতি কত বাম তা এই-সমস্ত নূতন নূতন কেরাণীগিরি ডেপুটিগিরিতে প্রমাণ করচে। এই গিরি উত্তীর্ণ হয়ে কল্যাণের সমুদ্রযাত্রায় আমাদের পদে পদে নিষেধ আস্‌চে। আমাদের শিক্ষার মধ্যে এমন একটি সম্পদ থাকা চাই যা কেবল আমাদের তথ্য দেয় না, সত্য দেয়; যা কেবল ইন্ধন দেয় না, অগ্নি দেয়। এই ত গেল উপরের দিকের কথা।

তার পরে মাটির কথা—যে মাটিতে আমরা জন্মেচি। এই হচ্চে সেই গ্রামের মাটি, যে আমাদের মা, আমাদের ধাত্রী, প্রতিদিন যার কোলে আমাদের দেশ জন্মগ্রহণ করচে। আমাদের শিক্ষিত লোকদের মন মাটি থেকে দূরে দূরে ভাবের আকাশে উড়ে বেড়াচ্চে—বর্ষণের যোগের দ্বারা তবে এই মাটির সঙ্গে আমাদের মিলন সার্থক হবে। যদি কেবল হাওয়ায় এবং বাষ্পে সমস্ত আয়োজন ঘুরে বেড়ায় তবে নূতন যুগের নববর্ষা বৃথা এল। বর্ষণ যে হচ্চে না তা নয়, কিন্তু মাটিতে চাষ দেওয়া হয় নি। ভাবের রসধারা যেখানে গ্রহণ করতে পারলে ফসল ফল্‌বে সেদিকে এখনো কারো দৃষ্টি পড়চে না। সমস্ত দেশের ধূসর মাটি, এই শুষ্ক তপ্ত দগ্ধ মাটি, তৃষ্ণায় চৌচীর হয়ে ফেটে গিয়ে কেঁদে উর্দ্ধপানে তাকিয়ে বল্‌চে, তোমাদের ঐ যা-কিছু ভাবের সমারোহ, ঐ যা-কিছু জ্ঞানের সঞ্চয় ও ত আমারই জন্যে—আমাকে দাও, আমাকে দাও!—সমস্ত নেবার জন্যে আমাকে প্রস্তুত কর। আমাকে যা দেবে তার শতগুণ ফল পাবে। এই আমাদের মাটির উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস আজ আকাশে গিয়ে পৌচেছে, এবার সুবৃষ্টির দিন এল বলে, কিন্তু সেই সঙ্গে চাষের ব্যবস্থা চাই যে।

গ্রামের উন্নতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব আমার উপর এই ভার। অনেকে অন্তত মনে মনে আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি কে হে, সহরের পোষ্যপুত্র, গ্রামের খবর কি জান? আমি কিন্তু এখানে বিনয় করতে পারব না। গ্রামের কোলে মানুষ হয়ে বাঁশবনের ছায়ায় কাউকে খুড়ো কাউকে দাদা বলে ডাক্‌লেই যে গ্রামকে সম্পূর্ণ জানা যায় এ কথা সম্পূর্ণ মান্‌তে পারিনে। কেবল মাত্র অলস নিশ্চেষ্ট জ্ঞান কোনো কাজের জিনিষ নয়। কোনো উদ্দেশ্যের মধ্য দিয়ে জ্ঞানকে উত্তীর্ণ করে নিয়ে গেলে তবেই সে জ্ঞান যথার্থ অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়। আমি সেই রাস্তা দিয়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। তার পরিমাণ অল্প হতে পারে কিন্তু তবুও সেটা অভিজ্ঞতা—সুতরাং তার মূল্য বহুপরিমাণ অলস জ্ঞানের চেয়েও বেশি।

আমার দেশ আপন শক্তিতে আপন কল্যাণের বিধান করবে এই কথাটা যখন কিছুদিন উচ্চৈঃস্বরে আলোচনা করা গেল তখন বুঝলুম কথাটা যাঁরা মানচেন তাঁরা স্বীকার করার বেশি আর কিছু করবেন না; আর যাঁরা মানচেন না, তাঁরা উদ্যম সহকারে যা-কিছু করবেন সেটা কেবল

আমার সম্বন্ধে, দেশের সম্বন্ধে নয়। এইজন্য দায়ে পড়ে নিজের সকল প্রকার অযোগ্যতা সত্ত্বেও কাজে নাম্‌তে হল। যাতে কয়েকটি গ্রাম নিজের শিক্ষা স্বাস্থ্য আর্থিক উন্নতি প্রভৃতির ভার সমবেত চেষ্টায় নিজেরা গ্রহণ করে আমি সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলুম। দুই একটি শিক্ষিত ভদ্রলোককে ডেকে বললুম "তোমাদের কোনো দুঃসাহসিক কাজ করতে হবে না—একটি গ্রামকে বিনা যুদ্ধে দখল কর।" এজন্য আমি সকল প্রকার সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলুম এবং সৎপরামর্শ দেবারও ত্রুটি করিনি। কিন্তু আমি কৃতকার্য হতে পারিনি।

তার প্রধান কারণ, শিক্ষিত লোকের মনে অশিক্ষিত জনসাধারণের প্রতি একটা অস্থিমজ্জাগত অবজ্ঞা আছে। যথার্থ শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর গ্রামবাসীদের সংসর্গ করা তাদের পক্ষে কঠিন। আমরা ভদ্রলোক, সেই ভদ্রলোকদের সমস্ত দাবী আমরা নীচের লোকদের কাছ থেকে আদায় করব এ কথা আমরা ভুলতে পারিনে। আমরা তাদের হিত করতে এসেছি, এটাকে তারা পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করে এক মুহূর্ত্তে আমাদের পদানত হবে, আমরা যা বলব তাই মাথায় করে নেবে, এ আমরা প্রত্যাশা করি। কিন্তু ঘটে উল্টো। গ্রামের চাষীরা ভদ্রলোকদের বিশ্বাস করে না। তারা তাদের আবির্ভাবকে উৎপাত এবং তাদের মংলবকে মন্দ বলে গোড়াতেই ধরে নেয়। দোষ দেওয়া যায় না—কারণ, যারা উপরে থাকে তারা অকারণে উপকার করবার জন্যে নীচে নেমে আসে এমন ঘটনা তারা সর্ব্বদা দেখে না—উল্টোটাই দেখ্‌তে পায়। তাই, যাদের বুদ্ধি কম তারা বুদ্ধিমানকে ভয় করে। গোড়াকার এই অবিশ্বাসকে এই বাধাকে নম্রভাবে স্বীকার করে নিয়ে যারা কাজ করতে পারে তারাই এ কাজের যোগ্য। নিম্নশ্রেণীর অকৃতজ্ঞতা, অশ্রদ্ধাকে বহন করেও আপনাকে তাদের কাজে উৎসর্গ করতে পারে এমন লোক আমাদের দেশে অল্প আছে। কারণ নীচের কাছ থেকে সকল প্রকারে সম্মান ও বাধ্যতা দাবী করা আমাদের চিরদিনের অভ্যাস।

আমি যাঁদের প্রতি নির্ভর করেছিলুম তাঁদের দ্বারা কিছু হয়নি—কখনো কখনো বরঞ্চ উৎপাতই হয়েছে। আমি নিজে সশরীরে এ কাজের মধ্যে প্রবেশ করতে পারিনি, কারণ আমি আমার অযোগ্যতা জানি। আমার মনে এদের প্রতি অবজ্ঞা নেই কিন্তু আমার আজন্মকালের শিক্ষা ও অভ্যাস আমার প্রতিকূল।

যাই হোক্ আমি পারিনি তার কারণ আমাতেই বর্ত্তমান—কিন্তু পারবার বাধা একান্ত নয়। এবং আমাদের পারতেই হবে। প্রথম ঝোঁকে আমাদের মনে হয় আমিই সব করব। রোগীকে আমি সেবা করব, যার অন্ন নেই তাকে খাওয়াব, যার জল নেই তাকে জল দেব। একে বলে পুণ্যকর্ম্ম, এতে লাভ আমারই—এতে অপর পক্ষের সম্পূর্ণ লাভ নেই, বরঞ্চ ক্ষতি আছে। তা ছাড়া, আমি ভাল কাজ করব এদিকে লক্ষ্য না করে যদি ভালো করব এই দিকেই লক্ষ্য করতে হয় তা হলে স্বীকার করতেই হবে বাইরে থেকে একটি একটি করে উপকার করে আমরা দুঃখের ভার লাঘব করতে পারিনে। এইজন্যে উপকার করব না, উপকার ঘটাব, এইটেই আমাদের লক্ষ্য হওয়া চাই। যার অভাব আছে তার অভাব মোচন করে শেষ করতে পারব না, বরঞ্চ বাড়িয়ে তুল্‌ব, কিন্তু তার অভাব মোচনের শক্তিকে জাগিয়ে তুল্‌তে হবে।

আমি যে-গ্রামের কাজে হাত দিয়েছিলুম সেখানে জলের অভাবে গ্রামে অগ্নিকাণ্ড হলে গ্রাম রক্ষা করা কঠিন হয়। অথচ বারবার শিক্ষা পেয়েও তারা গ্রামে সামান্য একটা কুয়ো খুঁড়তেও চেষ্টা করেনি। আমি বল্লুম "তোরা যদি কুয়ো খুঁড়িস্ তা হলে বাঁধিয়ে দেবার খরচ আমি দেব।"—তারা বল্লে, "এ কি মাছের তেলে মাছ ভাজা!"

এ কথা বলবার একটু মানে আছে। আমাদের দেশে পুণ্যের লোভ দেখিয়ে জলদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতএব যে লোক জলাশয় দেয় গরজ একমাত্র তারই। এইজন্যই যখন গ্রামের লোক বল্লে, মাছের তেলে মাছ ভাজা, তখন তারা এই কথাই জানত যে, এক্ষেত্রে যে-মাছটা ভাজা হবার প্রস্তাব হচ্চে সেটা আমারি পারত্রিক ভোজের —অতএব এটার তেল যদি তারা জোগায় তবে তাদের ঠকা হল। এই কারণেই বছরে বছরে তাদের ঘর জ্বলে যাচ্চে, তাদের মেয়েরা প্রতিদিন তিন বেলা দুতিন মাইল দূর থেকে জল বয়ে আন্‌চে, কিন্তু তারা আজ পর্য্যন্ত বসে আছে যার পুণ্যের গরজ সে এসে তাদের জল দিয়ে যাবে।

যেমন ব্রাহ্মণের দারিদ্র্যমোচনের দ্বারা অন্যের পারলৌকিক স্বার্থসাধন যদি হয় তবে সমাজে ব্রাহ্মণের দারিদ্র্যের মূল্য অনেক বেড়ে যায়। তেমনি সমাজে জল বল অন্ন বল বিদ্যা বল স্বাস্থ্য বল যে-কোন অভাবমোচনের দ্বারা ব্যক্তিগত পুণ্যসঞ্চয় হয় সে অভাব নিজের দৈন্যে নিজে লজ্জিত হয় না, এমন কি, তার একপ্রকার অহঙ্কার থাকে। সেই অহঙ্কার ক্ষুব্ধ হওয়াতেই মানুষ বলে উঠে, "এ কি মাছের তেলে মাছ ভাজা!"

এতদিন এমনি করে একরকম চলে এসেছিল। কিন্তু এখন আর চল্‌বে না। তার দুটো কারণ দেখা যাচ্চে। প্রথমত বিষয়বুদ্ধিটা আজকাল ইহলোকেই আবদ্ধ হয়ে উঠ্‌চে—পারলৌকিক বিষয়-বুদ্ধি অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে এখন অন্তঃপুরের দুই-একটা কোণে মেয়ে-মহলে স্থান নিয়েছে। পরকালের ভোগসুখের বিশেষ একটা উপায়রূপে পুণ্যকে এখন অল্প লোকেই বিশ্বাস করে। তারপরে দ্বিতীয় কারণ

এই, যারা নিজেদের ইহকালের সুবিধা উপলক্ষ্যেও পল্লীর শ্রীবৃদ্ধিসাধন করতে পারত তারা এখন সহবে সহরে দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়চে। কৃতী সহরে যায় কাজ করতে, ধনী সহরে যায় ভোগ করতে, জ্ঞানী সহরে যায় জ্ঞানের চর্চ্চা করতে, রোগী সহরে যায় চিকিৎসা করাতে। এটা ভাল কি মন্দ সে তর্ক করা মিথ্যা—এতে ক্ষতিই হোক্ আর যাই হোক এ অনিবার্য্য। অতএব যারা নিজের পরকাল বা ইহকালের গরজে পল্লীর হিত করতে পারত তারা অধিকাংশই পল্লী ছেড়ে অন্যত্র যাবেই।

এমন অবস্থায় সভা ডেকে নাম সই করে একটা কৃত্রিম হিতৈষিতাবৃত্তির উপর বরাত দিয়ে আমরা যে পল্লীর উপকার করব এমন আশা যেন না করি। আজ এই কথা পল্লীকে বুঝতেই হবে যে তোমাদের অন্নদান জলদান বিদ্যাদান স্বাস্থ্যদান কেউ করবে না। ভিক্ষার উপরে তোমাদের কল্যাণ নির্ভর করবে এতবড় অভিশাপ তোমাদের উপর যেন না থাকে। আজ গ্রামে পথ নেই, জল শুকিয়েছে, মন্দির ভেঙে গেছে, যাত্রা গান সমস্ত বন্ধ, তার একমাত্র কারণ এতদিন যে-লোক দেবে এবং যে-লোক নেবে এই দুই ভাগে গ্রাম বিভক্ত ছিল। একদল আশ্রয় দিয়ে খ্যাতি ও পুণ্য পেয়েছে, আর এক দল আশ্রয় নিয়ে অনায়াসে আরাম পেয়েছে। তাতে তারা অপমান বোধ করেনি, কারণ তারা জান্‌ত এতে অপর পক্ষেরই লাভ পরিমাণে অনেক বেশি। কারণ মর্ত্তে যে-ওজনে দান করি স্বর্গে তার চেয়ে অনেক বড় ওজনে প্রতিদান প্রত্যাশা করি। এখন যখন সেই অপর পক্ষের পারত্রিক লাভের খাতা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে, এবং যখন তারা নিজে গ্রামে বাস করলে নিজের গরজে জল বিদ্যা স্বাস্থ্যের যে ব্যবস্থা করতে বাধ্য হত তাও উঠে গেছে, তখন আত্মহিতের জন্য গ্রামের আত্মশক্তির উদ্বোধন ছাড়া তাকে কোনমতেই কোনো দয়ায় বা কোন বাহ্যব্যবস্থায় বাঁচানো যেতেই পারে না। আজ আমাদের পল্লীগ্রামগুলি নিঃসহায় হয়েছে, এইজন্য আজই তাদের সত্যসহায় লাভ করবার দিন এসেছে। আমরা যেন পুনর্ব্বার তাতে বাধা দিতে না বসি। আমরা যেন হঠাৎ সেবা করবার একটা সাময়িক উত্তেজনা নিয়ে সেবার দ্বারা আবার তাদের দুর্ব্বলতা বাড়িয়ে তুল্‌তে না থাকি।

দুর্ব্বলতা যে কি রকম মজ্জাগত তার একটা দৃষ্টান্ত দিই। আমি আমাদের শান্তিনিকেতন আশ্রম থেকে কিছুদূরে এক জায়গায় একলা বাস করছিলুম। হঠাৎ রাত্রে আমাদের বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছেলে লাঠি হাতে আমার কাছে এসে উপস্থিত। তাদের জিজ্ঞাসা করাতে বল্লে, একটা ডাকাতির গুজব শোনা গেছে তাই তারা আমাকে রক্ষা করতে এসেছে। পরে শোনা গেল ব্যাপারখানা এই:—কোনো ধনীর এক পেয়াদা তুরলাবস্থায় রাত্রে পথ দিয়ে চলছিল, চৌকিদারের অবস্থাও সেইরূপ ছিল। সে অপর লোকটাকে চোর বলে ধরাতে একটা মারামারি বাধে। দুচারজন লোক যোগ দেয় অথবা গোলমাল করে। অমনি বোলপুর সহরে রটে গেল যে পাঁচশো ডাকাত বাজার লুঠ করতে আস্‌চে। বোলপুরে কেউ বা দরজায় স্ক্রু এঁটে দিলে, কেউ বা টাকাকড়ি নিয়ে মাঠের মধ্যে গিয়ে লুকোলো, কেউ বা শান্তিনিকেতনে সস্ত্রীক এসে আশ্রয় নিলে। অথচ শান্তিনিকেতনের ছেলেরা সেই রাত্রে লাঠি হাতে করে বোলপুরে ছুট্‌ল। এর কারণ এই বোলপুরের লোক নিজের শক্তিকে অনুভব করে না। এইজন্য সামান্য দুই-চারজন মানুষ মিথ্যা ভয় দেখিয়ে সমস্ত বোলপুর লণ্ডভণ্ড করে যেতে পারত। শান্তিনিকেতনের বালকদের শক্তি তাঁদের বাহুতে নয়, তাদের অন্তরে।

বোলপুর-বাজারে যখন আগুন লাগ্‌ল তখন কেউ যে কারো সাহায্য করবে তার চেষ্টা পর্য্যন্ত দেখা গেল না। এক ক্রোশ দূর থেকে আশ্রমের ছেলেরা যখন তাদের আগুন নিবিয়ে দিলে তখন নিজের কলসীটা পর্য্যন্ত দিয়ে কেউ তাদের সাহায্য করে নি, সে কলসী তাদের জোর করে কেড়ে নিতে হয়েছিল। এর কারণ, পুণ্য আমরা বুঝি, এমন কি গ্রাম্য আত্মীয়তার ভাবও আমাদের বেশি কম থাকতে পারে, কিন্তু সাধারণ হিত আমরা বুঝিনে এবং এইটে বুঝিনে যে সকলের শক্তির মধ্যে আমার নিজের অজেয় শক্তি আছে।

আমার প্রস্তাব এই যে বাংলাদেশের যেখানে হোক্ একটি গ্রাম আমরা হাতে নিয়ে তাকে আত্মশাসনের শক্তিতে সম্পূর্ণ উদ্বোধিত করে তুলি। সে গ্রামের রাস্তাঘাট, তার ঘর বাড়ির পারিপাট্য, তার পাঠশালা, তার সাহিত্যচর্চ্চা ও আমোদপ্রমোদ, তার রোগী-পরিচর্য্যা ও চিকিৎসা, তার বিবাদ নিষ্পত্তি, প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যভার সুবিহিত নিয়মে গ্রামবাসীদের দ্বারা সাধন করাবার উদ্যোগ আমরা করি। যাঁরা এ কাজে প্রবৃত্ত হবেন তাঁদের প্রস্তুত করবার জন্যে আপাতত কলকাতায় একটা নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা আবশ্যক। এই বিদ্যালয়ে স্বেচ্ছাব্রতী শিক্ষকদের দ্বারা প্রজাস্বত্বসম্বন্ধীয় আইন, জমি জরীপ ও রাস্তাঘাট ড্রেনপুকুর ঘরবাড়ি তৈরি, হঠাৎ কোনো সাংঘাতিক আঘাত প্রভৃতির উপস্থিতমত চিকিৎসা, ও কৃষিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে মোটামুটি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকা কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য দেশে গ্রাম প্রভৃতির আর্থিক ও অন্যান্য উন্নতি সম্বন্ধে আজকাল যে-সব চেষ্টার উদয় হয়েছে সে সম্বন্ধে সকল প্রকার সংবাদ এই বিদ্যালয়ে

সংগ্রহ করা দরকার হবে। পল্লীগ্রামে নানা স্থানেই দাতব্য চিকিৎসালয় এবং মাইনর ও এণ্ট্রেন্স স্কুল আছে। যাঁরা পল্লীগঠনের ভার গ্রহণ করবেন তাঁরা যদি এইরকম একটা কাজ নিয়ে পল্লীর চিত্ত ক্রমে উদ্বোধিত করার চেষ্টা করেন তবে তাঁরা সহজেই ফললাভ করতে পারবেন এই আমার বিশ্বাস। অকস্মাৎ অকারণে পল্লীর হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশলাভ করা দুঃসাধ্য। ডাক্তার এবং শিক্ষকের পক্ষে গ্রামের লোকের সঙ্গে যথার্থভাবে ঘনিষ্ঠতা করা সহজ। তাঁরা যদি ব্যবসায়ের সঙ্গে লোকহিতকে মিলিত করতে পারেন তবে পল্লী সম্বন্ধে যে-সমস্ত সমস্যা আছে তার সহজ মীমাংসা হয়ে যাবে। এই মহৎ উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে একদল যুবক প্রস্তুত হতে থাকুন, তাঁদের প্রতি এই আমার অনুরোধ। *

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বাস্থ্যের উন্নতি

আমাদের দেশের লোক স্বাস্থ্যোন্নতির প্রতি যে এত উদাসীন তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। স্বাস্থ্যতত্ত্বে অধিকাংশ লোকই অজ্ঞ। আমাদের শিক্ষার মধ্যে স্বাস্থ্যভঙ্গের অনেক কারণ আছে বটে, কিন্তু স্বাস্থ্য রক্ষার জ্ঞান অর্জ্জনের কোন কথাই নাই। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ-উপাধি-প্রাপ্ত পুরুষগণকেও কোন দিন স্বাস্থ্যতত্ত্বের এক বর্ণও শিখিতে হয় না। ব্যক্তিগত জীবনে আমাদের দেশীয় লোকেরা কতক শাস্ত্রীয় অনুশাসনে কতক অভ্যাসের বশে অন্যান্য অনেক দেশ অপেক্ষা অনেক পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। কিন্তু অজ্ঞানতা-বশতঃ অনেক সময় আমরা অনেক নিয়ম লঙ্ঘন করি। এরূপ অবস্থায় স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা আমাদিগকে সজীব করিয়া তুলিতে পারে না। কাজেই যখন নূতন নূতন অবস্থার ভিতর হইতে নূতন নূতন সমস্যা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন আমরা তাহা বুঝিতে একেবারে অসমর্থ হইয়া পড়ি। আমাদের পুরাতন দেশ ও পুরাতন জাতি এখন নূতন নূতন অবস্থার ভিতর দিয়া প্রত্যহ অগ্রসর হইতেছে। কি নিয়মে আমরা এই-সকল বিরাট পরিবর্ত্তনের ভিতর সুস্থ ও সবল থাকিতে পারি, তাহা না জানিলে আমরা কিছুতেই এ জীবন-সংগ্রামে বাঁচিতে পারিব না।

বাঙ্গলা দেশের লোকসংখ্যা ৪,৫৩,২৯,২৪৭। ১৯১৩ সালে তন্মধ্যে ১৩,৪৯,৭৭৯ জনের মৃত্যু হয়। প্রত্যেক হাজারে মৃত্যুসংখ্যা ৩০। জন্মের সংখ্যা গত বৎসর ১৫,২৯,৯২১ অর্থাৎ হাজারে ৩৩·৭৮। মৃত্যু অপেক্ষা জন্মের সংখ্যা ১,৯৮,০৫৩ অধিক। শিশুদের মধ্যে ৩,২০,৬৬২টির অর্থাৎ যত শিশু জন্মায় তাহাদের শতকরা ২০·৯৫টির মৃত্যু হইয়াছে। এত অধিক শিশুর মৃত্যু অতি অল্প দেশেই হয়।

উপরিউক্ত মৃত্যুসংখ্যার মধ্যে অধিকাংশ অর্থাৎ ৯,৬৫,৫৪৬ (২১·৩০ হাজারকরা) মৃত্যুর কারণ জ্বররোগ। অর্থাৎ সমস্ত মৃত্যুসংখ্যার প্রায় শতকরা ৭২টির কারণ জ্বররোগ। ইহাদের মধ্যে ২৫,৬৬৭টি সহরে, বাকী ৯৩৩,৫২৪টি পল্লীগ্রামে। ৩৩,১৯৫টি মৃত্যুর কারণ উদরাময় ও অতিসার, ১২,০৬৩টির কারণ শ্বাসযন্ত্রের রোগ। এই জাতীয় রোগের সংখ্যা সহরে বেশী। ৭৮,৪৯৪টির মৃত্যুর কারণ কলেরা। এতদ্ব্যতীত বসন্তরোগে ৯,০৬২ ও প্লেগরোগে ৯৮৪টির মৃত্যু ঘটিয়াছে। বাঙ্গলা দেশে মৃত্যুর প্রধান কারণ কলেরা, জ্বর, বসন্ত, প্লেগ, ও শ্বাসযন্ত্রের পীড়া।

এদেশে কলেরার প্রাদুর্ভাব খুব বেশী। এই রোগের অণুজীবের নাম কমা ব্যাসিলাস (comma bacillus)। আহার্য্য বা পানীয় দ্রব্যের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কোন রোগীর মল মিশ্রিত থাকিলে এই রোগ হইবার সম্ভাবনা। কোক্ (Koch) প্রথমে বেলেঘাটার একটি পুষ্করিণীর জলে এই অণুজীব প্রাপ্ত হন। কোন কলেরাগ্রস্ত রোগীর মল দ্বারা দূষিত কাপড় ঐ পুষ্করিণীতে ধোয়া হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌতে এক সৈন্যদলের ফিল্টারের বালি পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন বালি নদীতল হইতে আনাইয়া দেওয়া হয়। ঐ বালি কলেরা-মল দ্বারা দূষিত ছিল। ঐ সৈন্যদলে অনেকের কলেরা হয়। সকলেই জানেন বড় বড় মেলার স্থানে অনেকের কলেরা হয়। পূর্ব্বে সেখানে কলেরা-বীজ থাকে না। কোন যাত্রী এই রোগ বহন করিয়া এই-সকল স্থানে যায়। মাছি ইহার আর-একটি বাহক। তাহারা যে কেবল পায়ে করিয়া এই অণুজীব মল হইতে লোকের আহার্য্য দ্রব্যে বহন করে তাহা নহে। তাহাদের নিজের মলেও এই অণুজীব অনেক পাওয়া যায়।

কোন সহরে জলের কল নূতন খোলা হইলে অনেক দিন সেখানে কলেরা থাকে না। কলের জল কলেরা-রোগের ইতিহাসে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। পরিষ্কার পানীয় জলের ব্যবস্থাই কলেরা রোগ নিবারণের প্রধান উপায়। এতদ্ভিন্ন আহার্য্য দ্রব্য এবং দুগ্ধ প্রভৃতি সমস্ত ফুটাইয়া আহার করা কর্ত্তব্য। আহার্য্য দ্রব্যে যাহাতে মাছি বসিতে না পারে তাহার বন্দোবস্ত সর্ব্বত্রই করা কর্ত্তব্য।

বঙ্গদেশের প্রায় ৯,৬৫০০০ লোক প্রতি বৎসর জ্বররোগে মারা যায়। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশের, অন্ততঃ অর্দ্ধেকের, মৃত্যুর কারণ ম্যালেরিয়া জ্বর। অন্ততঃ পক্ষে দশজনের এই রোগ হইলে একজন মারা যায়। সুতরাং প্রায়

* বঙ্গীয় হিতসাধন-মণ্ডলীর প্রথম অধিবেশনে কথিত এবং তৎপরে বক্তা মহাশয়ের দ্বারা প্রবাসীর জন্য লিখিত।

৫০ লক্ষ লোক অর্থাৎ এই দেশের প্রায় প্রত্যেক ৯ জনের মধ্যে একজন এই রোগে আক্রান্ত হয়। যদি আমেরিকান-দিগের ন্যায় আমাদের সকল বিষয়ে হিসাব ঠিক থাকিত, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারিতাম যে এই রোগে প্রতি বৎসর আমাদের কত লোক্সান হয়।

এই-সকল মৃত্যুতে লোকের কষ্ট ত আছেই। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক মানব-জীবনের একটা আর্থিক মূল্য এখন স্বাস্থ্য-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নির্দ্ধারিত করেন। কোন্ ব্যক্তির উপার্জ্জন-ক্ষমতা কত এবং তাহার বাঁচিবার সম্ভাবনা কত দিন, এই দুইটি অঙ্ক লইয়া ঐ ব্যক্তির জীবনের আর্থিক মূল্য স্থির করা হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে মিঃ ফার (Farr) হিসাব করিয়াছিলেন যে একটি নবজাত কৃষকসন্তানের জীবনের মূল্য ৫ পাউণ্ড। আমেরিকার মিঃ ফিষার (Fishers) যুক্তরাজ্যের অধিবাসীদিগের জীবনের মূল্য গড়ে ৫৮০ পাউণ্ড এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। নিকলসন্ ইংলণ্ডের এক-একটি লোকের জীবনের মূল্য স্বদেশের পক্ষে ১০০০ পাউণ্ড এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। আমরা কৃষ্ণবর্ণ হইলেও, মাতৃভূমির পক্ষে এক এক জনের জীবনের মূল্য গড়ে উহার ৩০ ভাগের একভাগ ধরিয়া লইতে বোধ হয় কেহ আপত্তি করিবেন না। ম্যালেরিয়াতে বৎসর বৎসর যে ৪,৮০,০০০ লোক মারা যায়, তাহাতে আমাদের দেশের যে কত ক্ষতি হইতেছে তাহা উপরিউক্ত অঙ্কগুলি হইতে গণনা করা যাইতে পারে। একটি জীবনের মূল্য ৫০০ টাকা ধরিলে ৪,৮০,০০০এর অর্দ্ধেক ২,৪০,০০০ উপার্জ্জনক্ষম লোকের জীবনের মূল্য বার কোটী টাকা প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়া রোগ আমাদিগের নিকট হইতে হরণ করিতেছে।

এই রোগের কারণ যে কি তাহা আপনারা অনেকেই জানেন। এক রোগী হইতে এই রোগের বীজ অন্য রোগীতে সংক্রামিত হয়। কোন কোন জাতীয় মশা এই সংক্রামণে সাহায্য করে। ইহার কারণ কেবল যে ঐসকল মশা তাহা মনে করিলে চলিবে না। যে-কোন অবস্থা উহাদের দ্বারা এই সংক্রামণের সাহায্য করে সে-সকলই ইহার গৌণ কারণ। ছোট ছোট পুরাতন অপরিষ্কার পুষ্করিণী, ডোবা, খানা, বিল, নদীর কোল, পুরাতন নদীর স্রোতহীন অবশিষ্ট ভাগ, পুরাতন পাতকুয়া, এমন কি গামলার পচা জল ও ফুলগাছের টব, গোষ্পদের জল, এই-সকল মশার ডিম পাড়িবার স্থান; আর বন জঙ্গল, বা কোন অন্ধকারময় স্থান ইহাদের বাস-স্থান। আমাদের পল্লীগ্রামের এক-একটি গোয়াল-ঘরে শত শত ম্যালেরিয়ার বাহন মশা পাওয়া যায়। তারপর আবার আমাদের এই উর্ব্বরা জমীতে জল নিকাশের বন্দোবস্ত ভাল না থাকায় বন জঙ্গল খুব সহজেই বাড়িয়া যায়; আর ছোট ডোবা খানা শীঘ্র শুকায় না। আবদ্ধ জল বন জঙ্গল, ম্যালেরিয়াকে বিশেষ সাহায্য করে। এইরূপ প্রত্যেক বাটীর নিকটে নানাপ্রকার ময়লা ম্যালেরিয়ার সাহায্য করে।

প্রদীপ হইতে যেমন প্রদীপ জ্বালা যায়, সেইরূপ ম্যালেরিয়াগ্রস্ত এক রোগী হইতে মশা ম্যালেরিয়া-বীজ অন্য রোগীর শরীরে বপন করে মাত্র; ইহা ত আর কোথাও জন্মে না, আর মশাও নিজে কিছু ইহা প্রস্তুত করে না। সুতরাং পূর্ব্বকার এক রোগীই পরবর্ত্তী অপর রোগীর রোগের কারণ।

ম্যালেরিয়া নিবারণ করিতে হইলে নিম্নলিখিত উপায়-গুলি অবলম্বন করিতে হয়।

১। যাহাতে লোকের বসত-বাটীর সন্নিকটে অর্থাৎ ১০০ গজের মধ্যে ম্যালেরিয়া-বাহক মশা ডিম পাড়িতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। এই-সকল বাটীর নিকট যে-সকল ছোট ছোট ডোবা, খানা, গর্ত্ত, পানা-পুষ্করিণী, পুরাতন পাতকুয়া প্রভৃতি থাকে, তাহাতে একটু জল জমিয়া থাকিলেই মশার ডিম পাড়িবার সুবিধা হয়। এজন্য এইগুলি সব ভরাট করিয়া জল নিকাশের বন্দোবস্ত করা আবশ্যক।

২। বাটীর নিকটে যে-সকল ঝোপ জঙ্গল থাকে, তাহা মশাদের আশ্রয়স্থান। ইহারা কোন প্রকার একটু থাকিবার স্থান পাইলেই সেখানে আশ্রয় লয়। এজন্য জঙ্গল পরিষ্কার করা আবশ্যক। জঙ্গল থাকিলে জমীর জল নিকাশ কখনও ভালরূপ হয় না।

৩। জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত। অনেক স্থানেই পল্লীগ্রামের নিকটস্থ খাল নদী মজিয়া যায়, এবং অনেক স্থানে জল আবদ্ধ হয়। নদী নালা খালের উপর দিয়া অপ্র-শস্তভাবে রেলওয়ের রাস্তা বা অন্য কোন রাস্তা নির্ম্মিত হইলে জল আবদ্ধ হয়।

৪। ম্যালেরিয়ারোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে কুইনাইন সেবন করিতে দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। তাহাদের শরীর হইতেই বীজ অন্য শরীরে সংক্রামিত হয়। তাহাদের শরীরেই এই বীজ যদি নষ্ট করা যায় তাহা হইলে সংক্রামণের সম্ভাবনা অনেক কমিয়া যায়। এ বিষয়ে কুইনাইন আমাদের প্রধান অস্ত্র। উহা উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করাইলে ম্যালেরিয়া দমন সুনিশ্চিত।

পল্লীগ্রামের পক্ষে যেমন ম্যালেরিয়া, সহরে তেমনি যক্ষ্মারোগ। নানা কারণে এই রোগ দিন দিন আমাদের ভিতর বদ্ধমূল হইতেছে। এই সহরে বৎসর বৎসর প্রায় ২।৩ শত লোক এই কারণে মারা যায়। একটি কথা এই যে এই রোগ নির্ধন মধ্যবিত্ত অবস্থার ভদ্র পরিবারের ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। নানাপ্রকার কারণ একত্র হওয়ায় এই কুফল ফলিয়াছে। তাহার মধ্যে কতক সামাজিক এবং কতক

আর্থিক। নানা কারণে পল্লীগ্রাম হইতে অগণ্য লোক কলিকাতায় আসিতেছে। তাহাদিগকে যৎসামান্য আয়ে খুব কষ্টে বহুলোকপরিপূর্ণ ছোট ছোট অন্ধকারময় অস্বাস্থ্যকর ঘরে বাস করিতে হয়। একে অন্নের অভাব, তাহার উপর আবার পরিষ্কার বাতাসটুকু নাই। প্রথমেই দেখা যায়, স্বার্থত্যাগ ও ধৈর্য্যের প্রতিমা-স্বরূপিণী আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। এ রোগ বড়ই বৈষম্যবাদী; ধনী ও দরিদ্র রোগীর প্রতি ইহার প্রকোপের বিশেষ তারতম্য আছে। যদি এই সমিতি চেষ্টা করিয়া আমাদের বঙ্গসমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ মধ্যবিত্ত অবস্থার লোকদিগের এই রোগ নিবারণের কিছু সদুপায়ও করিতে পারেন, তবে ইহার জন্ম সফল হইবে। কিন্তু এই প্রশ্ন কিছু জগতের সম্মুখে নূতন নহে। প্রত্যেক বড় বড় সহরেই এই প্রশ্ন আছে। লণ্ডন, পারিস, নিউইয়র্ক, বার্লিন, এ-সকল সহরে এই রোগে মৃত্যুসংখ্যা কতই কমিয়া গিয়াছে। বোম্বাই সহরে গত দুই বৎসর হইতে এই রোগ নিবারণের জন্য সমবেত চেষ্টা হইতেছে। আমরা অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছি। ইহাতে অর্থের আবশ্যক আছে সত্য; কিন্তু সমবেত উদ্যম ও চেষ্টা এবং সর্ব্বোপরি বিশ্বাস মিলিত হইলে আর্থিক অভাব কোথায় চলিয়া যাইবে।

আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে উপযুক্ত লোকের সমবেত চেষ্টা দ্বারা স্বাস্থ্যের যে কত উন্নতি হইতে পারে, পানামা নগর ও পানামা যোজকের বর্ত্তমান অবস্থা তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। এই নগর পানামা খালের প্রশান্ত মহাসাগরের দিকের মোহানার নিকট অবস্থিত। লোকসংখ্যা প্রায় ৩৭০০০। ১৯০৪ সালের জুলাই মাস হইতে ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত এই নগর পীতজ্বরের (yellow fever) মহামারী দ্বারা প্রপীড়িত হয়; কিন্তু সুখের বিষয় এই যে সেই মহামারীই এই নগরের শেষ মহামারী। আমেরিকানেরা এই নগরের ভার লইবার পর এক বৎসরের মধ্যে এই রোগ সমূলে এই সহর হইতে উৎপাটিত করিয়াছেন। এখন এই সহরের অবস্থা এত ভাল যে এ রোগ এখানে হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। গত নয় বৎসরের মধ্যে এক জনও এই রোগে বিনষ্ট হয় নাই। পীতজ্বর ষ্টেগোমাইয়া ফ্যাশিয়াটা (stegomyia fasciata) নামক একপ্রকার মশা দ্বারা সংক্রামিত হয়। এই সহরে যাহারা উক্ত সময়ে রোগগ্রস্ত হইয়াছিল অথবা যাহাদিগের প্রতি ঐ রোগগ্রস্ত বলিয়া সন্দেহ হইত তাহাদিগকে সম্পূর্ণ ভাবে পৃথক করিয়া মশার অগম্য গৃহের মধ্যে রাখা হইত। যে-সকল ঘরে পূর্ব্বে এই-সকল রোগী অথবা রোগী বলিয়া সন্দিগ্ধ লোক থাকিত, সে-সকল ঘরে মশা বিনাশ করিবার জন্য উপযুক্ত ধূম ও ঔষধবাষ্প দ্বারা তাহা পরিপূর্ণ করিয়া লওয়া হইত। আর এই জাতীয় মশককে তাহাদের জন্মস্থানে মারিবার জন্য উপযুক্তরূপ সেনানী-সকল নিযুক্ত করা হইত। এই সময় এই নগরের প্রত্যেক ঘরের ছাদের বৃষ্টির জল খোলা নর্দ্দমা দিয়া কতকগুলি পিপাতে ধরা হইত। ইহাই এই নগরের ব্যবহার্য্য জল ছিল। কোন প্রকার জল নিকাশের নর্দ্দামা বা পয়ঃপ্রণালী ছিল না। রাস্তা কাঁচা, সুতরাং বর্ষাকালে উহা কর্দ্দমে ভরিয়া যাইত। এই রাস্তারই ছোট ছোট গর্ত্তে এই মশা ডিম পাড়িত। আমেরিকানরা প্রথমেই কলের জল ও ড্রেনের পায়খানা ও পাকা ভূনিম্নস্থ পয়ঃপ্রণালীর সুবন্দোবস্ত করে। পরে প্রত্যেক রাস্তা পাকা করে ও তাহাতে ড্রেন বসায় এবং যতদূর সম্ভব ছাদের খোলা নল এবং উহার জল ধরিবার পিপা দূর করিয়া দেয়। এতদ্ভিন্ন স্বাস্থ্য রক্ষার সুবন্দোবস্তের জন্য কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করে। তাহাতে প্রথমে এই স্থানের লোকদের মধ্যে একটু অসন্তোষ জন্মিলেও পরে তাহাদের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। প্রত্যেক বাটীর নীচের তলা সিমেণ্ট দ্বারা ঢাকিতে হইতেছে। ইহাতে ইন্দুরের বাস একবারে অসম্ভব হইয়াছে। ইহাতে প্রথমে ৬৮,২৫,০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে সত্য, কিন্তু এখন ঐ সহরে আর প্লেগ, টাইফয়েড জ্বর, অতিসার, ম্যালেরিয়া, পীতজ্বর প্রভৃতি কোন জ্বরই নাই। এই ত গেল পানামা নগরের কথা।

পানামার যে নূতন খাল প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরকে একত্র করিয়াছে, ঐ খাল নির্ম্মাণ করিবার জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে একটি ফরাসী কোম্পানী গঠিত হয়। কিন্তু তাঁহারা এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। ম্যালেরিয়াই তাহাদের অন্যতম প্রতিবন্ধক। এই স্থানটি ভয়ানক প্রবল ম্যালেরিয়ার বাসভূমি। এজন্য এখানকার স্বাস্থ্যোন্নতির প্রধান উপায় মশকবিনাশ। খালের দুই ধারে অগণ্য জলাশয়ই ম্যালেরিয়া-বাহক এনোফিলীসের জন্মস্থান। দুইটি উপায়ে এই জলাগুলিকে ভরাট করা হইয়াছে। খালের রাশি রাশি মাটি রেলগাড়িতে আনিয়া এই-সকলের মধ্যে ফেলা হইয়াছে, আর খালের তলদেশ আরও গভীর করিবার জন্য তথা হইতে কর্দ্দম-ও-বালি-মিশ্রিত গাঢ় ঘোলা জল বা তরল কর্দ্দম পম্প দ্বারা শুষিয়া তুলিয়া এমন কি এক মাইল পর্য্যন্ত দূরে নলের ভিতর দিয়া চালান করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বড় বড় জলার উপর স্থানে স্থানে অনেক মাটির রাশি, এমন কি বড় বড় গাছের গলা পর্য্যন্ত, এইরূপে জমান হইয়াছে। বালবোয়া নামক একটি নূতন সহর এইরূপ ভরাট জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

যে স্থানের মধ্যস্থল দিয়া পানামা খালটি গিয়াছে তাহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৫ মাইল এবং প্রসার ১০ মাইল। এই পাঁচ শত বর্গমাইল স্থানে প্রায় ৫০,০০০ শ্রমজীবী ও তাহাদের স্বজনবর্গ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া কাজ করিত। ইহাদিগকে ম্যালেরিয়া হইতে রক্ষা করাই প্রধান প্রশ্ন। ইহা-

দের জন্য প্রায় ৪০টি পল্লী গঠিত হইয়াছিল। এই স্থানে জল বায়ু আতপ ও বার্ষিক বৃষ্টির পরিমাণ (বার্ষিক ১০০ইঞ্চি) সবই এনোফিলীসের বংশবৃদ্ধির সুবিধাজনক। এদেশে চারিমাস কাল বৃষ্টি হয় না, কিন্তু তখনও খানা গর্ত্ত ডোবায় এত জল থাকে যে তাহাতে মশক সহজেই ডিম পাড়িতে পারে। অধিকন্তু এই-সব শ্রমজীবীরা দলে দলে আসিয়াছে, আবার চলিয়া গিয়াছে। ১৯০৫ হইতে ১৯০৯ সাল পর্য্যন্ত প্রায় ২,৫০,০০০ লোক এই স্থানে অস্থায়ী ভাবে বাস করিয়াছে। এজন্য স্বাস্থ্যবিভাগের কার্য্যও কিঞ্চিৎ অধিক কঠিন হইয়াছে। এখানে নিম্নলিখিত ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক উপায়গুলি অবলম্বন করা হইয়াছিল :—

১। বসত-বাটীর ১০০ গজের মধ্যে এনোফিলীসের ডিম পাড়িবার স্থান-সকল একেবারে নষ্ট করা হইয়াছিল।

২। উক্ত সীমার মধ্যে পূর্ণবয়ঃপ্রাপ্ত মশকের সমস্ত আশ্রয়স্থান নষ্ট করা হইয়াছিল।

৩। সকল বাড়ীর দরজা জানালা তামার জাল দ্বারা মশকের অগম্য করা হইয়াছিল।

৪। যেখানে জল নিকাশ দ্বারা ডিম পাড়িবার স্থানগুলিকে নষ্ট করিতে পারা যায় নাই, সেখানে কেরোসিন তৈল বা অন্য কোন ডিম্বনাশক বিষ ব্যবহার করা হইয়াছিল।

এই ৫০০ বর্গমাইল স্থানকে ১৭টি বিভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেকটির ভার এক এক-জন-পরিদর্শকের অধীনে রাখা হয়। এই ব্যক্তি নিজ বিভাগের ড্রেন ভরাট, জঙ্গল পরিষ্কার প্রভৃতি সব কাজের জন্য দায়ী এবং সকল ঘরের জানালা দরজায় তারের জাল দিতে বাধ্য। প্রতি সপ্তাহে প্রধান আফিসে এই-সকল বিভাগের রিপোর্ট আসে। যদি রোগীর সংখ্যা শতকরা ১॥০এর অধিক হয় তাহা হইলেই কোথাও কোন ত্রুটি হইয়াছে ইহা ধরিয়া লওয়া হয় এবং কর্ম্মচারীদিগকে এই কারণ নির্ণয় করিবার জন্য বিশেষ ভাবে তাগিদ দেওয়া হয়, এবং আবশ্যক মত স্থানে যেখানে এনোফিলীসের ডিম পাড়িবার স্থান বলিয়া সন্দেহ হয় সেখানে নূতন নূতন ড্রেন বসান হয়। জল নিকাশের সুবন্দোবস্তই এই রোগ নিবারণের প্রধান উপায় বলিয়া যথাসম্ভব ড্রেনগুলি পরিষ্কার রাখা হয়, এবং আবশ্যক-মত তাহাতে কেরোসিন তৈল ঢালা হয়।

বয়ঃপ্রাপ্ত মশক তাড়াইবার জন্য প্রত্যেক বসত-বাটীর ১০০ গজের মধ্যে যত বন জঙ্গল থাকে তাহা পরিষ্কার করা হয়। এতদ্ব্যতীত জানালা দরজা সব তারের জাল দিয়া বন্ধ করা হয়। প্রত্যেক কার্য্য কার্য্যাধ্যক্ষের চক্ষুর সম্মুখে হওয়া চাই। তিনি এসকল কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী।

রোগ-প্রতিষেধকরূপে কুইনাইন মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু এজন্য কাহাকেও বাধ্য করা হয় না। প্রায়ই দেখা যায় নূতন বসতিতে প্রথম সপ্তাহে শতকরা ২৫ জনের ম্যালেরিয়া হয়, কিন্তু একমাস কি দুইমাস পরে যখন ড্রেনগুলি সব প্রস্তুত হয় এবং বনগুলি সব পরিষ্কার হইয়া যায়, তখন রোগীর হার শতকরা ১ জন মাত্র থাকে।

পানামাতে উপরিউক্তরূপ ম্যালেরিয়া-নিবারক উপায়সকল অবলম্বন করিয়া যে সুফল হইয়াছে তাহা কর্ণেল গর্গাস্ (Gorgas) এইপ্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন :—

১৯০৪ সালে যখন যুক্তরাজ্য পানামার ভার গ্রহণ করেন, ঐ স্থানের স্বাস্থ্যের অবস্থা তখন অত্যন্ত মন্দ ছিল। ৪০০ বৎসর ধরিয়া এই যোজকটিকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া মনে করা হইত, এবং ঐ স্থানের মৃত্যুসংখ্যাও অত্যন্ত অধিক ছিল। পানামার পূর্ব্বতন রেলওয়ে প্রস্তুত করিবার জন্য প্রথমে ১০০০ নিগ্রোকে আফ্রিকা হইতে আনান হয়। ছয় মাসের মধ্যেই তাহারা সকলে মরিয়া যায়। অন্য আর-একবার ১০০০ চীনাকে ঐ উদ্দেশ্যেই আনান হয়। তাহারাও ৬ মাসের মধ্যে সকলে মরিয়া যায়। এজন্য একটি ষ্টেশনের নাম মেটাচিন। ফরাসী কোম্পানীর অধীনে ১৮৮১—৮৯ সালে মোট ২২,১৪৯ কুলির অর্থাৎ হাজারকরা বার্ষিক ২৪০ জনের মৃত্যু হয়। যুক্তরাজ্যের হাতে ভার পড়িলে পর প্রথম প্রথম প্রত্যেক হাজারে বার্ষিক ৪০ জন মারা যাইত, কিন্তু এক্ষণে সাড়ে সাত জন মাত্র মারা পড়ে। কেবল ম্যালেরিয়া আক্রমণের সংখ্যা হাজারকরা ৮২১ হইতে এক্ষণে ৮৭ হইয়াছে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ম্যালেরিয়ার দ্বারা হাজারকরা ৮২ জন, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ৪৫ জন, ১৯০৮এ ২৮ জন, ১৯০৯এ ২২ জন, ১৯১০এ ১৯ জন, ১৯১১তে ১৯ জন, ১৯১২তে ১১ জন, ১৯১৩তে ৮ জন মাত্র আক্রান্ত হইয়াছিল।

পীতজ্বর একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। ১৯০৫ সাল হইতে এখনও পর্য্যন্ত একটিও রোগী পাওয়া যায় নাই। ইহাতে খরচ যে খুব বেশী হইয়াছে তাহা নহে, অন্ততঃ মার্কিন দেশের পক্ষে সে খরচ কিছুই নহে; এই খালের নির্ম্মাণ-কার্য্যের শেষ পর্য্যন্ত মোট বার্ষিক ৭৩০০০ ডলার অর্থাৎ মোটামুটি ২২০০০০ টাকা।

কর্ণেল গর্গাস্ একস্থলে লিখিয়াছেন—"ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা বুঝিবেন যে এই খালদ্বারা কেবল যে বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইল এবং একটা অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হইল তাহা নহে, কিন্তু ইহাদ্বারা প্রমাণ হইল যে বিষুব রেখার নিকটস্থ অতি অস্বাস্থ্যকর স্থানও উপযুক্ত উপায়ে মানুষের সমবেত চেষ্টায় এমন স্বাস্থ্যকর করা যাইতে পারে যে সেখানে যে-কোন স্থান হইতে ইউরোপীয়গণ যাইয়া নির্ভয়ে বাস করিতে পারেন।"

পানামাতে ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য যে উপায়

অবলম্বিত হইয়াছে সেগুলি রস্ সাহেবের নির্দ্দিষ্ট পুরাতন উপায়। কিন্তু এইগুলি অবলম্বন করিতে যে উদ্যম, যে ভবিষ্যৎদৃষ্টি, যে যত্ন, যে সাবধানতা দেখান হইয়াছিল, ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে যে মনোযোগ এবং প্রত্যেক খুটিনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সম্পন্ন করিবার যে সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছিল, তাহা আমাদের কেন সমস্ত জগতের শিক্ষার বিষয়।

ইটালিতে পূর্ব্বে অনেক স্থান ম্যালেরিয়ার বাসভূমি ছিল। কিন্তু এখন ঐ দেশে ম্যালেরিয়া অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। যে যে উপায়ে উহা কমিয়াছে তাহা ১৯০১ সালের ঐ দেশীয় ম্যালেরিয়া সম্বন্ধীয় আইন হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায় ম্যালেরিয়াক্রান্ত স্থানে সকল সরকারী ও সাধারণ আফিস, সকল রেলওয়ের বাড়ী এবং সকল সরকারী কন্‌ট্রাক্টরের আফিসসমূহের দরজা জানালায় জুন হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত জাল দিতে হইবে, যাহাতে ঐসকল স্থানে মশা প্রবেশ করিতে না পারে। বেসরকারি কারখানার অধিকারীরা ঐরূপে জাল দিয়া তাঁহাদের বাড়ী রক্ষা করিলে তাহারা ম্যালেরিয়া ফণ্ড হইতে ১০০০ ফ্রাঙ্ক (প্রায় ৬০০ টাকা) পর্য্যন্ত পুরস্কার পাইবেন। যতদূর সম্ভব ভূম্যধিকারীগণ তাঁহাদের বাটীর জল নিকাশের সুব্যবস্থা করিবেন এবং কোন মতেই ছোট ছোট গর্ত্ত বা ডোবায় জল জমিতে দিবেন না। রাস্তা এবং খালের কন্ট্রাক্টরগণকে এমন করিয়া মাটি কাটিতে হইবে যে, জল জমিতে পারে এরূপ গর্ত্ত কোথাও না থাকিয়া যায়। স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ম্মচারীগণ যদি ঐসব ঠিকাদারদিগের দোষ দেখিয়া উপেক্ষা করেন তবে তাঁহারা নিজেই দণ্ড পাইবেন। পূর্ত্তবিভাগের ঠিকাদারদিগকে স্বাস্থ্যবিভাগ হইতে এই সর্ত্তে হুকুম লইয়া কাজ করিতে হইবে যে রাস্তা বা খাল প্রস্তুত করিতে যে মাটির আবশ্যক হইবে, স্বাস্থ্যবিভাগের নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতেই তাহা লইতে হইবে এবং এইজন্য যে-সকল খানা খন্দ হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভরাট করিয়া দিতে হইবে। যাঁহারা এরূপভাবে ধানের চাষ করিতে পারিবেন, যে, তজ্জন্য কোথাও জল জমিবে না, তাঁহাদিগকে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে। এতদ্ভিন্ন সরকারি বেসরকারি সকল মনিবই নিজ নিজ অধীনস্থ সকল লোককেই কুইনাইন দিবেন। প্রত্যেক ম্যালেরিয়াক্রান্ত বিভাগে দুই মাইলের মধ্যে কুইনাইনের দোকান থাকা চাই।

এখন দেখা যাউক আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া নিবারণের কি কি উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ মনোযোগ আছে। ভারতগবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান সার্জ্জন জেনারেল সার্ পার্ডী ল্যুকিসের এ বিষয়ে উৎসাহ ও উদ্যম যথেষ্ট আছে। কিন্তু এখানে স্বাস্থ্যবিভাগের কার্য্য সবে আরম্ভ হইয়াছে। ১৮৪৯ সালে ইংলণ্ডে একবার কলেরা রোগে প্রায় ৩৫০০০ লোক মারা যায়। সেই সময় হইতেই ইংরেজেরা স্বাস্থ্যতত্ত্বের মূল্য বুঝিয়াছে। আমাদের প্লেগের মহামারীতে ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। তবে গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে আমাদিগের অপেক্ষা অনেক অগ্রসর। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট বৎসরে জল নিকাশের জন্য ও পল্লীগ্রামে স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য অর্থ ব্যয় করেন। এতদ্ব্যতীত মিউনিসিপালিটিগুলি বৎসর বৎসর ৩৪।৩৫ লক্ষ টাকা কেবল স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য খরচ করেন। ইহাতেও গবর্ণমেণ্টের অনেক সাহায্য আছে। কিন্তু আমাদের ভার আমরা নিজে বহন করিতে চেষ্টা না করিলে কেহই আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারিবে না। এখন আমাদের ভাবিবার বিষয় বেশী নাই, করিবার অনেক আছে। ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য বন জঙ্গল পরিষ্কার করা চাই, বসত-বাটীর নিকটস্থ (১০০ গজের মধ্যে) ডোবা খানা ভরাট করা চাই,—ছোট ছোট পগার খাল পৃথক্ পৃথক্ থাকিলে তাহাদিগকে একত্র করিয়া, জল নিকাশের সুবিধা করিয়া দেওয়া চাই। এতদ্ভিন্ন যে-সকল ভাইভগ্নীরা রোগগ্রস্ত হইবে, তাহাদিগকে যথাসাধ্য কুইনাইন সেবন করান চাই। কলেরা নিবারণের জন্য প্রত্যেক পল্লীতে পরিষ্কার পানীয় জলের সুব্যবস্থা করা চাই এবং আহার্য্য দ্রব্য যাহাতে মক্ষিকা-স্পর্শে দূষিত না হইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করা চাই। সহরে যক্ষ্মারোগ নিবারণের জন্য ধনহীন ভ্রাতাভগ্নীদিগের নিমিত্ত স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ ও যথেষ্ট পরিমাণে পরিষ্কার মাছ ও পুষ্টিকর আহারের বন্দোবস্ত করা চাই। বসন্ত ও প্লেগ নিবারণের জন্যও উপযুক্ত টীকা প্রভৃতির বন্দোবস্ত করা চাই।

সর্ব্বোপরি এই-সকল উদ্দেশ্যের সফলতা সমাজের লোকের শিক্ষার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। সেবা-সমিতি প্রতিজ্ঞা করুন যে স্বাস্থ্যতত্ত্বের জ্ঞানের প্রচার তাঁহাদের জীবনের ব্রত হইবে। একদিনে কিছু হইবে না, কিন্তু সমবেত হইয়া, বদ্ধপরিকর হইয়া, আমরা কাজ আরম্ভ করিলে নিশ্চয়ই বিধাতার কৃপায় সফল হইব।

কর্ত্তব্যের ভার কখনও মানবের শক্তি অপেক্ষা অধিক হয় না। সেবা-ব্রতের শক্তির সীমা নাই। একবার ভারতের সেই অতীতের আত্মোৎসর্গময়ী শক্তির আরাধনা করিয়া, সকলে আপনাকে ভুলিয়া, সকলে একত্র হইয়া সমবেত সামর্থ্যকে পরসেবায় নিযুক্ত করিলে সব বাধা দূর হইয়া যাইবে। আমাদের স্বপ্ন ও বাস্তব-রাজ্যের মধ্যে নূতন সেতু নির্ম্মিত হইবে। প্রতিকূল ঘটনার খরস্রোতা পদ্মাও তাহা নষ্ট করিতে পারিবে না। *

শ্রীনীলরতন সরকার।

* বঙ্গীয় হিতসাধন-মণ্ডলীর অধিবেশনে পঠিত।

প্রেম ও কৃচ্ছ্রসাধন
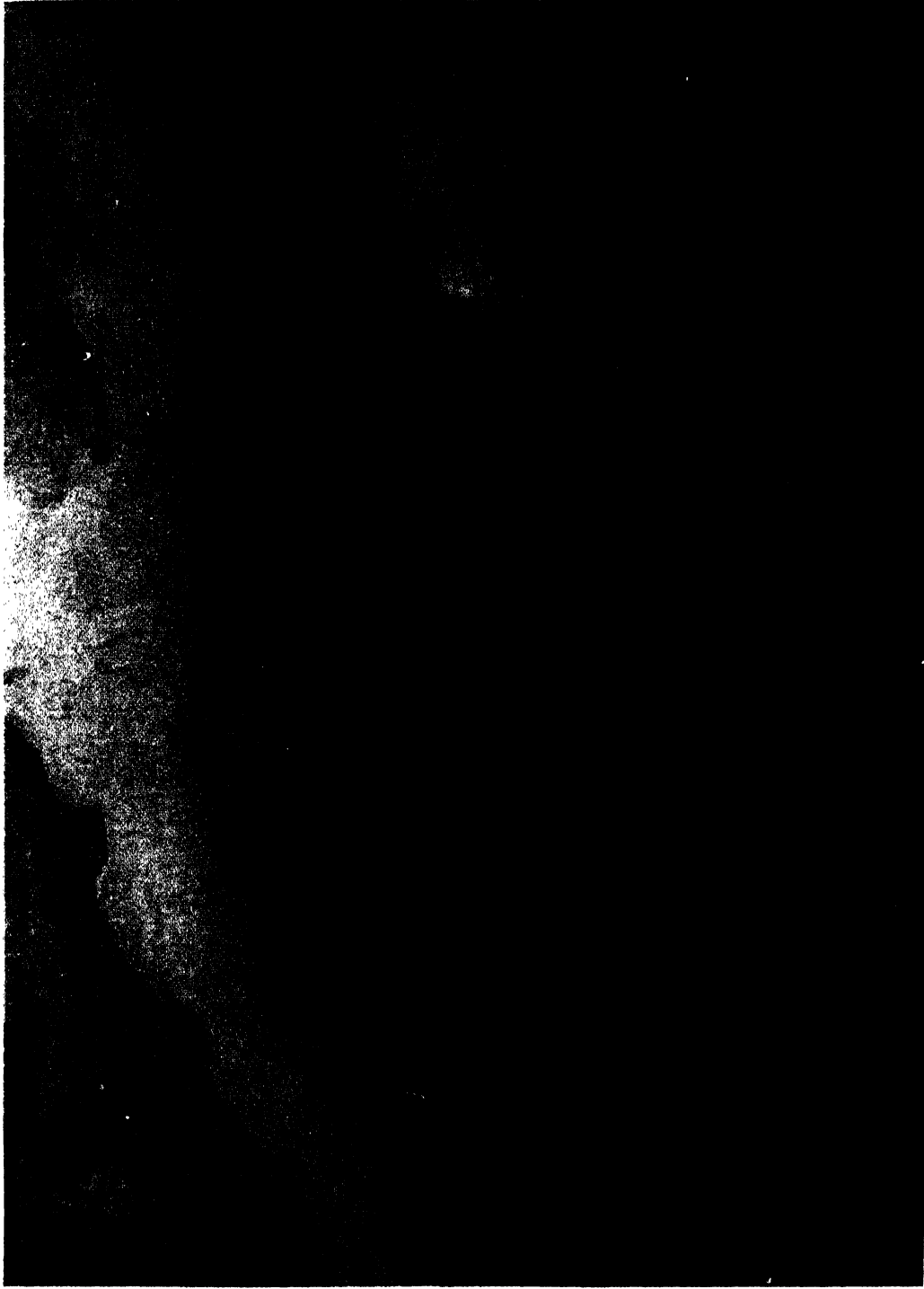
শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার কর্তৃক অঙ্কিত ও চিত্রকরের সৌজন্যে মুদ্রিত।

ইতিহাস চর্চ্চার প্রণালী

এই যে দেশময় ইতিহাস-চর্চ্চার একটা প্রবৃত্তি জাগরূক হইয়াছে, এই যে কেহ কেহ দুঃখ করিয়া বলিতেছেন 'ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ছোটগল্পকে বাঙ্গলা মাসিকের পৃষ্ঠা হইতে নিষ্কাশিত করিয়াছে,' এ সু-খবর যদি সত্য হয়, তবে জাতীয় মনের এই বিকাশ সম্বন্ধে সাহিত্য-নেতা ও পরিষৎগুলির এক গুরুতর কর্ত্তব্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আর বেশীদিন অবহেলা করিলে চলিবে না। আমাদের কর্ত্তব্য, এই নবজাগ্রত ইতিহাস-সেবার চেষ্টাকে সমবায়-সূত্রে বাঁধি, এই উদ্যমকে উপদেশ দ্বারা সংযত ও উচিতপথে চালিত করি, যেন বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের অপব্যয় না হয়, যেন শ্রমের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল উৎপাদন হয়, যেন যন্ত্রের বা প্রণালীর দোষে ঐতিহাসিক কারিগরের প্রস্তুত দ্রব্যগুলি অঙ্গহীন বা ভঙ্গুর আকার ধারণ না করে। সুধীমণ্ডলীই এই কাজ করিতে পারেন। ব্যক্তিবিশেষ একাকী এই কাজ করিতে সক্ষম নহেন, তাঁহার অধিকারও সাধারণে স্বীকার না করিতে পারে। সকলেই জানেন যে, কারিগর যেরূপ যন্ত্র হাতে পায় এবং যেরূপ প্রণালীতে কাজ করে, তাহার প্রস্তুত দ্রব্যও তেমনি হয়। মহা-মেধাবীর সুদীর্ঘ পরিশ্রমের ফলও যন্ত্রের দোষে বিশ্রী ও অকার্য্যকর হয়। আর উচিত প্রণালী অবলম্বন না করিলে সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

ইতিহাস-চর্চ্চার যাহা শ্রেষ্ঠ পন্থা তাহা বৈজ্ঞানিক পন্থা। দেশকাল ভেদে বা বিষয়ের পার্থক্য অনুসারে এই পন্থাটি ভিন্ন হয় না, কারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রের সকল বিভাগেই ইহা সমান কার্য্যকর, এবং সর্ব্ববিধ সত্যের অন্তরে ইহা নিহিত রহিয়াছে। আমরা যদি জাতীয়তার অভিমানে মত্ত হইয়া, এই প্রথা নব্য ইউরোপীয়গণ অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া ইহাকে অবহেলা করি, তবে আমাদেরই ক্ষতি হইবে। জগৎ অগ্রসর হইবে; শুধু আমরা মধ্যযুগে পড়িয়া থাকিব; আমাদের রচিত ইতিহাস বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ সুতরাং অশুদ্ধ হইবে; এবং বিদেশীরা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যে ইতিহাস রচনা করিয়া যাইতেছেন তাহাই সত্যের বলে বলীয়ান্ হইয়া কিছুদিন পরে আমাদের প্রাচীন ধরণের ঐতিহাসিক জল্পনা কল্পনাকে পরাস্ত করিবেই করিবে। কারণ ঋষিবাক্য মনে রাখিবেন—"সত্যই জয় লাভ করে, অসত্য করে না!"

ঐতিহাসিকের কি উদ্দেশ্য তাহা বুঝিলে ইতিহাস লিখিবার শ্রেষ্ঠ প্রণালী জানিতে পারা যায়। প্রকৃত ইতিহাস অতীতকে জীবন্ত করিয়া চোখের সাম্‌নে উপস্থিত করে; আমরা যেন সেই সুদূর কালের লোকদের দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের ভাবে ভাবি, তাহাদের সুখ দুঃখ আশা ভয় আমাদের হৃদয়ে অনুভব করি। এইরূপে অতীতকাল সম্বন্ধে অবিকল ও পূর্ণাঙ্গ সত্য উপলব্ধি করাই ইতিহাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

সত্যের দৃঢ় প্রস্তরময় ভিত্তির উপর ইতিহাস দাঁড়াইয়া থাকে। যদি সেই সত্য নির্দ্ধারিত না হইল, যদি অতীতের একটা মনগড়া ছবি খাড়া করি অথবা আংশিক ছবি আঁকিয়াই ক্ষান্ত হই, তবে ত কল্পনার জগতেই থাকিলাম। তার পর সে বিষয়ে যাহাই লিখি বা বিশ্বাস করি তাহা বালুকার ভিত্তির উপর তেতলা বাড়ী নির্ম্মাণের চেষ্টা মাত্র।

সত্য-নির্দ্ধারণের প্রণালী কি? সর্ব্বপ্রথমে নিজের মনকে এই কার্য্যের উপযোগী করিয়া তোলা। যশ, ধন, বা প্রতিপত্তি লাভের লালসা দূর করিয়া, নিজের অন্তরের অনুরাগ বিরাগ দমন করিয়া, সব পূর্ব্ব-সংস্কার ত্যাগ করিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে —

মোরা সত্যের পরে মন
আজি করিব সমর্পণ!
মোরা বুঝিব সত্য, পূজিব সত্য,
খুঁজিব সত্যধন!

সত্য প্রিয়ই হউক আর অপ্রিয়ই হউক, সাধারণের গৃহীত হউক আর প্রচলিত মতের বিরোধী হউক, তাহা ভাবিব না। আমার স্বদেশ-গৌরবকে আঘাত করুক আর না করুক, তাহাতে ভ্রুক্ষেপ করিব না। সত্য প্রচার করিবার জন্য সমাজে বা বন্ধুবর্গের মধ্যে উপহাস ও গঞ্জনা সহিতে হয়, সহিব; কিন্তু তবুও সত্যকে খুঁজিব বুঝিব গ্রহণ করিব। ইহাই ঐতিহাসিকের প্রতিজ্ঞা। ভারতের অতি প্রাচীন কালের কথা, মহাভারত রামায়ণ প্রভৃতির রাজকাহিনী যদি কাল্পনিক বলিয়া ধরি তবে হিন্দুধর্ম্মের

গ্লানি হইবে, এই যে আমাদের একটি স্বাভাবিক ধারণা আছে তাহা উচ্ছেদ করিতে হইবে। প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে প্রমাণ না পাইলে কিছুই বিশ্বাস করিব না।

প্রামাণিক ঘটনা হইতেই ইতিহাসের আরম্ভ। এই জন্য ইউরোপে ইতিহাস রচনায় এক ক্রমোন্নতির ধারা দেখিতে পাই। জ্ঞানের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত পুরাতন মত, পুরাতন গ্রন্থ ঠেলিয়া সরাইয়া দেওয়া হইতেছে। আইনের পুস্তকের মত ইতিহাসেরও ক্রমাগত নূতন সংস্করণ কিনিতে হইতেছে। পিতামহদের সময় হইতে আগত বিশ্বাসের মূল পরীক্ষা করিয়া, সেই পুরাতন অট্টালিকাগুলি ক্রমাগত নির্ম্মমভাবে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহাদের স্থানে নূতন নূতন গৃহ রচিত হইতেছে। ইহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত কিছু পরে দিতেছি।

সভ্যতা, সমাজ ও বিশ্বাসের বৃদ্ধি ও পরিবর্ত্তন ইতিহাসের বিষয়ের মধ্যে বটে। ইহার মানবের লিখিত সাক্ষী না পাইলেও মানবের হাতের কাজ কত যুগ ধরিয়া পৃথিবীর নানা স্থানে সঞ্চিত আছে। কিন্তু ইতিহাস বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি তাহার আরম্ভ প্রামাণিক ঘটনা হইতে। প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য সংগ্রহ ও বিচার করা ঐতিহাসিকের সর্ব্বপ্রথম কার্য্য। এই মূল মন্ত্রটি এত সহজ, আপনারা প্রত্যহ আদালতে, সাংসারিক কাজে ইহার এত ব্যবহার করেন, যে ইহার ব্যাখ্যা করা অনাবশ্যক বোধ হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের নানা প্রদেশে লিখিত আধুনিক ইতিহাস ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধ পড়িয়া মনে হয় যে ইতিহাসের ক্ষেত্রে এ নিয়ম আমরা এখনও স্বীকার করি নাই।

সাক্ষ্য পাইলেই আপনারা তিনটি প্রশ্ন করেন,—(১) সর্ব্বাগ্রে কে এজাহার দিয়াছে? সেই first information অর্থাৎ প্রথম সাক্ষ্যের নকলটা সংগ্রহ হইয়াছে ত? পুলিস ডায়েরীর গোপনীয় নকল কি করিয়া পাওয়া যায়?

(২) এই সাক্ষীটি ঘটনা জানিবার কি সুযোগ পাইয়াছিল? এ কি স্বচক্ষে দেখিয়াছে, না পরের কথা শুনিয়া বলিতেছে?

(৩) মোকদ্দমায় কোন পক্ষের সহিত ইহার স্বার্থ জড়িত আছে কি?

প্রত্যেক ইতিহাস-লেখককেও পদে পদে এই প্রশ্ন তিনটি করিতে হয়। ঘটনা সম্বন্ধে যাহারা কিছু লিখিয়া গিয়াছে, তাহাদের নামের তালিকা প্রস্তুত, শ্রেণী বিভাগ, পরস্পরের উক্তির বিরোধভঞ্জন ও সমালোচনা করিয়া, তবে ইতিহাস লেখা আরম্ভ করা উচিত। প্রথমে এইরূপ তালিকা (critical bibliography) সংগ্রহ না করিয়া রচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যে মহা ভ্রম তাহা আমরা এখনও সম্পূর্ণরূপে বুঝি না।

বর্ণিত ঘটনার সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান সাক্ষীর উক্তি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। সমসাময়িক লেখক না থাকিলে, ঘটনার যত অদূরবর্ত্তী সাক্ষী পাওয়া যায় ততই ভাল। পুরাতন বিবরণ সংক্ষিপ্ত বা কর্কশভাষায় লিখিত হইলেও, আধুনিক সময়ের সুদীর্ঘ ও সুললিত বর্ণনার উপরে তাহাকে স্থান দিতে হইবে। আদি গ্রন্থ পাইলে অনুবাদ ব্যবহার করা অনুচিত।

অথচ আমাদের দেশের অনেক ঐতিহাসিকের নিকট মুড়ী মুড়কী এবং সীতাভোগের একই দর। ঘটনা সম্বন্ধে যাহারাই দুকথা লিখিয়া গিয়াছে সকলেই সমান বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া আমরা মানিয়া লই; বিচার করি না, সমালোচনা করি না, সত্যের আদি উৎসে পৌঁছিতে চেষ্টা করি না। এই দেখুন, পাঠান-যুগের ভারত-ইতিহাস লিখিতে গিয়া আমরা ফিরিষ্‌তা এবং আল্‌বাদায়ূনীর উপর, এবং সপ্তদশ শতাব্দীর মুঘল সম্রাটগণ সম্বন্ধে খাফি খাঁর উপর অন্ধ-ভক্তি করিয়া নিজ নিজ গ্রন্থ রচনা করি। অথচ এই তিন লেখকই বর্ণিত ঘটনার অনেক পরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ঐ ঐ যুগের সম-সাময়িক বিবরণ হইতে শুধু সংকলন করেন। আমরা সেই-সব সমসাময়িক বিবরণ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করি না; তাহা যে গ্রহণের উপযোগী এ কথাও মনে মনে বিশ্বাস করি না। একজন সমসাময়িক সাক্ষীর বিরুদ্ধে হাজার জন পরবর্ত্তী যুগের নকলনবিশ খাড়া হইলেও ঘটনা সম্বন্ধে তাহাদের সাক্ষ্যের কোন মূল্য নাই; তাহাদের কথা সমালোচনা হইতে পারে, ইতিহাসের মূল উপাদান নহে,—এই সত্যটি কার্য্যতঃ মানিয়া লই না।

আবার, সাক্ষীটি সত্য জানিবার কতটুকু সুযোগ পাইয়াছিল, তাহা দেখা আবশ্যক। এই যেমন, শাহজাহানের

পুত্র শূজা আরাকানে মারা যান; সেখানে হিন্দু মুসলমানের যাতায়াত নিষেধ ছিল, মগরাজা ওলন্দাজ ও পর্ত্তুগীজ ভিন্ন অন্য বিদেশীকে তাঁহার রাজ্যে ঢুকিতে দিতেন না। এই ইউরোপীয় বণিকগণ শূজার শেষ দশা সম্বন্ধে যে সংবাদ ভারতে তাহাদের কুঠীতে প্রেরণ করে তাহা বর্ণিয়ারের ভ্রমণবৃত্তান্তে কিছু কিছু, এবং আর্ভিন-অনূদিত মানুশীর আত্মজীবনীতে বিস্তৃতভাবে দেওয়া হইয়াছে। অথচ আমাদের লেখকেরা অন্য সব স্থান হইতে নানা গুজব সংগ্রহ করিয়া প্রবন্ধ পূরণ করেন, এই দুই গ্রন্থ দেখেন না, দেখিলেও ইহাদের উক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করেন না।

আদি সাক্ষীর অনুসন্ধান করায় বিলাতে ইতিহাসক্ষেত্রে কি রাষ্ট্রবিপ্লবের ন্যায় পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহার দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। চারি শত বৎসর ধরিয়া ইংলণ্ডরাজ ৩য় রিচার্ড ইতিহাসে নরপিশাচ বলিয়া বর্ণিত হইয়া আসিতেছেন। অধুনা সার ক্লেমেণ্টস্ মার্কহাম এই বিশ্বাসের ভিত্তি পরীক্ষা করিয়া ইহাকে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা পড়িয়া আসিতেছি যে স্পেনের ভিসিগথ বংশীয় শেষ রাজা রডেরিক্ তাঁহার সেনাপতি জুলিয়ানের কন্যার প্রতি অত্যাচার করায়, জুলিয়ান মুসলমানদের ডাকিয়া রাজাকে বিনষ্ট করেন। কিন্তু ডোজি প্রভৃতির অনুসন্ধানের ফলে প্রমাণ হইয়াছে যে এই বিবরণটি উপন্যাস মাত্র; রমণীর প্রতি অত্যাচারের গল্প ঘটনার ছয় শত বৎসর পরে একজন ইটালীয় সন্ন্যাসী প্রথম রচনা করে; জুলিয়ান বলিয়া কেহ ছিল না, স্পেন দেশীয় যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মুসলমানদের পক্ষ লয় তাহার নাম আর্বান; রডেরিক স্পেন রাজ্যের ন্যায্য অধিকারী ছিলেন না, ইত্যাদি। ফলতঃ আরবদের স্পেন-বিজয়-কাহিনী একেবারে নূতন করিয়া লিখিতে হইতেছে; পুরুষগণের নাম ও চরিত্র, ঘটনা-পরম্পরা, ঘটনার কারণ পর্য্যন্ত বদলাইয়া দিতে হইতেছে। নেপোলিয়ন সম্বন্ধে তিয়র (Thiers) যে ইতিহাস লিখিয়া যান, এবং যাহা আমাদের দেশে আদৃত য়্যাবটের নেপোলিয়ন-চরিতের মূল, তাহা নানা দেশের সরকারী কাগজ পত্র ও গোপনীয় চিঠি অনুসন্ধানের ফলে এখন শিক্ষিত-সমাজে কাব্য বলিয়া ঘৃণায় পরিত্যক্ত হয়। অথচ এই নব অনুসন্ধানের ফল যেখানে একত্রীভূত করা হইয়াছে সেই Holland Rose's *Life of Napoleon I*-এর নাম পর্য্যন্ত আমরা অনেকে শুনি নাই। সেই য়্যাবট লইয়াই আমরা নেপোলিয়ন জোসেফিন প্রভৃতির চরিত্র বর্ণনা করিতেছি। আমাদের দ্বিতীয় নীলমণি টডের "রাজস্থান"ও যে অনেকস্থলে অবিশ্বাসযোগ্য উপন্যাস মাত্র, একথা আমরা ভাবি না।

আসল গ্রন্থ বর্ত্তমান থাকিতে অনুবাদের উপর নির্ভর করা যে কি ভুল তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। গ্র্যাণ্ট ডফের "মারাঠাজাতির ইতিহাস" এক উপাদেয় গ্রন্থ; অথচ ডফ সাহেবের পণ্ডিত ভুল করায় আফজল খাঁর দূতের নাম শিবাজীর দূতকে দেওয়া হইয়াছে। এটি নগণ্য বিষয় নহে; আফজল খাঁর দূত যদি শিবাজীর টাকা খাইয়া নিজ প্রভুকে বধ্যভূমিতে ভুলাইয়া আনিত তবে সে বিশ্বাসঘাতক হইত; শিবাজীর দূতের পক্ষে ঐ কাজ ততদূর নীতিগর্হিত নহে। সেইমত, Dow's *History of Hindostan* নামক একখান ইংরেজী গ্রন্থ অনেকে মুঘল সম্রাটদের অতি বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস মনে করিয়া তাহার মত উদ্ধৃত করেন; অথচ ডাওসাহেব সমসাময়িক ও প্রামাণিক কোন ফার্সী গ্রন্থ ব্যবহার করেন নাই, এবং যে-সব নব্য ফার্সী গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছেন তাহারও বিশুদ্ধ বা অবিকল অনুবাদ দেন নাই; অধিকাংশ স্থলেই নিজের কল্পনাবলে সুরঞ্জিত কাহিনী লিখিয়াছেন। এখন পণ্ডিত-সমাজে কেহই ডাওএর গ্রন্থকে ইতিহাস বলিয়া মানেন না। সমসাময়িক লেখককে অন্ধভাবে বিশ্বাস করিয়া পূর্ব্বে গ্রীস দেশের ইতিহাস রচিত হইত। কিন্তু এখন প্রস্তরফলক, মুদ্রা, প্রভৃতির সাহায্যে এবং যুক্তিসঙ্গত সমালোচনার ফলে গ্রীস-ইতিহাসে যে কি মহা পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা বিউরী (Bury) প্রণীত *History of Greece* পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। সেইরূপ, ইস্‌লামের অভ্যুদয় ও আদিযুগের বিশুদ্ধ ইতিহাস নবপ্রকাশিত *Cambridge Medieval History*তে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে অনেক ভ্রম দূর করে।

অতএব যদি মারাঠা-ভাষাবিদ লেখক শুধু গ্র্যাণ্টডফ্ অবলম্বনে এবং ফার্সী-জানা লেখক ডাও অবলম্বনে ইতিহাস লেখেন তবে সে পুস্তকের মূল্য কি? তাহা আমাদের জ্ঞান

বৃদ্ধি করিতে পারে না। এরূপ গ্রন্থের আমরা কেন আদর করিব? এরূপ উপগ্রন্থকে, মহাগ্রন্থের গায়ে পরগাছা গ্রন্থকে বিলাতে rechauffee বলে, অর্থাৎ বাসি চপ্ কট্‌লেট্ পরদিন গরম করিয়া টাট্‌কা জিনিষ বলিয়া বেচিবার চেষ্টা করা হইতেছে এরূপ মাল। বাঙ্গলা সাহিত্যে যদি এইরূপ গরম-করা বাসি ইতিহাসের বেশী কাটতি হইতে দেওয়া যায় তবে সাহিত্য-ভোক্তাদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ শঙ্কিত হইতে হইবে। এরূপ গ্রন্থের নির্ম্মম সমালোচনা করা একটি অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য, যদিও ইহা অত্যন্ত অপ্রীতিকর। এ কাজ ব্যক্তিবিশেষ না করিয়া সুধীমণ্ডলী করিলে ভাল দেখায়, এবং তাহাতে বেশী ফল হয়।

যেখানে অনুবাদ ব্যবহার না করিলে চলে না সেখানে সর্ব্বশেষে রচিত অথবা সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ অনুবাদটি অবলম্বন করিতে হইবে। এই দেখুন, সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্ম-জীবনীর ইংরেজী দুই অনুবাদ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রাইস্ ও এণ্ডারসন্ নামক দুইজন সাহেব বাহির করেন; তাহা অত্যন্ত অশুদ্ধ ফার্সী পুঁথী অবলম্বনে লিখিত, এবং অনুবাদকেরাও অনেক স্থলে অর্থ ভুল বুঝিয়াছেন। ঐ পুস্তকের বিশুদ্ধ ফার্সী পাঠ অবলম্বন করিয়া রজার্স সাহেব যে ইংরেজী অনুবাদ রচনা করেন তাহাতে মূল্যবান ভৌগোলিক টীকা ও সংশোধনী যোগ করিয়া দিয়া বেভরিজ সাহেব তাহা কয়েক বৎসর হইল প্রকাশ করিয়াছেন। যদি আমরা প্রথমোক্ত অশুদ্ধ ইংরেজী অনুবাদের বাঙ্গলা অনুবাদ করি, রজার্সের অনুবাদ দেখা আবশ্যক বিবেচনা না করি, তবে এরূপ অনুবাদে বঙ্গসাহিত্য পরিপুষ্ট হইল এ কথা বলা যায় না। সেইমত, চীন পর্য্যটকদিগের ভ্রমণ-কাহিনীর, মানুশীর গ্রন্থের এবং অশোকের অনুশাসনের একাধিক ইংরেজী অনুবাদ আছে। তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদটিই বাঙ্গলা লেখকেরা ব্যবহার করুন এই বলিয়া জেদ করা সুধীমণ্ডলীর কর্ত্তব্য।

কখন কখন বাধ্য হইয়া অনুবাদের অনুবাদ ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু কোটেসনের কোটেসন তস্য কোটেসন কেন ব্যবহার করিব?' ইংরেজীতে একটি বড় কাজের কথা আছে, "Always verify your references," অর্থাৎ যাঁহার মত উল্লেখ করিলে তিনি ঠিক সেই কথাগুলি বলিয়াছেন কিনা তাহা ভাল করিয়া দেখিবে। আমি যে পরের বচনটি তুলিয়া দিলাম, তাহা কাহার বচন এবং কোন্ গ্রন্থ হইতে আমি পাইয়াছি তাহা নির্দ্দেশ না করিলে সাহিত্যিক অসাধুতা হয়, এবং ভ্রম সংশোধনেও বাধা পড়ে।

ইতিহাসে লেখক বিস্তৃত ও বিশুদ্ধ প্রমাণপঞ্জী দিতে বাধ্য। আইনের পুস্তক যেমন গুঁড়িগুঁড়ি অক্ষরে ছাপা নজীরের উল্লেখে পূর্ণ না হইলে চলে না, তেমনি ইতিহাসও বর্জাইস অক্ষরের ফুটনোটে আবৃত হওয়া আবশ্যক; ইহা পাণ্ডিত্য ফলাইবার উপায় নহে, ইহা না থাকিলে গ্রন্থের মূল্যহানি হয়। প্রত্যেক প্রকৃত ঐতিহাসিক প্রতি-পৃষ্ঠার পাদদেশে টীকা দিয়া তাহাতে প্রামাণিক গ্রন্থের নাম, সংস্করণ বা প্রকাশের বৎসর, পৃষ্ঠাঙ্ক প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শুদ্ধ করিয়া উল্লেখ করা অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করেন। আমাদের বড় দোষ যে আমরা অনেকেই নিজের রচিত ইতিহাস বা প্রবন্ধে এইরূপ আদি বৃত্তান্তের নাম ও পৃষ্ঠাঙ্ক উল্লেখ করার পরিশ্রমটুকু সহিতে চাহিনা; হয়ত প্রথমে কতকগুলি গ্রন্থের নাম মাত্র করিয়া ছাড়িয়া দিই। ইহাতে আমাদের জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত ভ্রমগুলি সংশোধন করিবার উপায় থাকে না, এবং জ্ঞানপিপাসু পাঠকও নিজে আদিবৃত্তান্ত পড়িয়া কোন বিষয়ে বেশী জানিবার পথ দেখিতে পান না।

এই যে সব প্রণালী এ পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিলাম, তাহা হিসাব রাখার মত শুধু পরিশ্রমের কাজ, ইহাতে বিশেষ মেধার আবশ্যক নাই। আমরা যদি এই কাজ অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি এবং আলস্য ত্যাগ করি, তবে আমাদের মধ্যে সকলেই এ কাজ করিতে পারেন।

এখন ইতিহাস রচনার আরও উচ্চতর সোপানে চড়া যাউক। ইতিহাসলেখক ব্যক্তিগত ভ্রমসংশোধনের যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন; একই ঘটনার উপর ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে আলোকপাত করিবেন। শত্রুপক্ষ ইহা বলিয়াছে, মিত্র-পক্ষ উহা বলিয়াছে, বিদেশী ভ্রমণকারী এরূপ দেখিয়া গিয়াছে, স্বদেশী কবি ওরূপ সাক্ষ্য দিয়াছে—এই সকল তথ্য একত্র করিয়া, তাহার মধ্যে কোন্ সাক্ষীটি বিশ্বাস-যোগ্য এবং কতদূর পর্য্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য তাহা স্থির করিলে,

তবে অতীত ঘটনার প্রকৃত স্বরূপ জানা যায়। যদি ইতিহাসে কোন পক্ষ প্রথমে একতর্ফা ডিক্রী পান, তবে তাহা একদিন আপসেট হইবেই হইবে, কারণ জগতের জ্ঞানের আদালতে আপীল কখন তমেয়াদি দোষে বারিত হয় না; শত শত বৎসর পরেও অন্যায় মতের বিরুদ্ধে নালিশ করা চলে; আপীলের চূড়ান্ত সীমা সত্যনির্দ্ধারণ পর্য্যন্ত গিয়া তবে থামে। যদি মার্জ্জনা করেন তবে আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে দুটি দৃষ্টান্ত দিতে চাই। আমি এখন মির জুমলার আসাম ও কুচবিহার জয়ের ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত আছি; এজন্য একপক্ষে মুঘল সংবাদদাতার ফার্সী গ্রন্থ ও বাদশাহী ফার্সী ইতিহাস, অপরপক্ষে আসামী-দের লিখিত বুরঞ্জী এবং একজন ডাচ জাহাজী সৈন্যের কাহিনী ব্যবহার করিতে হইতেছে। সেইমত, শিবাজীর ও শম্ভাজীর কার্য্যকলাপের জন্য মুঘল বাদশাহদিগের পক্ষে লিখিত ফার্সী ইতিহাস, দুইজন সমসাময়িক নিরপেক্ষ হিন্দুর লিখিত ফার্সী ইতিহাস, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদের জন্য লিখিত ফার্সী ইতিহাস, মারাঠী ভাষায় লিখিত বখর ও পত্রাদি, এবং ইউরোপীয় বণিকদের সাক্ষ্য,—এই পাঁচ প্রকার বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করিতে হইয়াছে।

ঘটনার সত্যনির্দ্ধারণ করিয়াই ঐতিহাসিকের কার্য্য শেষ হইল না। অতীত যুগের বাহ্য আবরণ, তাহার গায়ের চামড়াটি, চক্ষুর সম্মুখে সহজে আনা যায়; কিন্তু তাহার হৃদয়টি দেখাইতে না পারিলে প্রকৃত ইতিহাস হয় না। শুধু রাজা, রাজ্যপরিবর্ত্তন, যুদ্ধ বিগ্রহ লইয়া ইতিহাস নহে। ইতিহাস দর্শননামের যোগ্য, কিন্তু পদেপদে দৃষ্টান্ত নজীর দেখাইয়া এই দর্শন লিখিতে হয়। দার্শনিক না হইলে প্রথম শ্রেণীর ঐতিহাসিক হওয়া যায় না। কিন্তু এরূপ লেখক ক্ষণজন্মা পুরুষ; আমাদের পরিষৎ বা সম্মিলন তাঁহাকে সৃষ্টি করিতে পারে না। সুতরাং সুধীমণ্ডলীর চেষ্টায় এ মহাকার্য্যের যতদূর সাহায্য হইতে পারে, কেবল তাহার বিষয়েই আমি বলিব।

(১) প্রত্যেক বিভাগের প্রধান প্রধান বিষয়ে ও শাখায় যে কয়খানি বই হইতে নূতনতম ও সর্ব্বাধিক মূল্যবান জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে তাহার তালিকা প্রকাশ। সেই বিষয়ে দেশী বিদেশী পণ্ডিতমণ্ডলী এ-পর্য্যন্ত কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন তাহার ঠিক বিবরণ এই-সব বই হইতেই আমরা পাইব। পূর্ব্বে অর্জ্জিত জ্ঞানের সিঁড়ির উপর না দাঁড়াইলে আমরা বিদ্যা-বৃক্ষের উচ্চতর শাখায় চড়িতে পারি না।

(২) পরিষৎ ও অন্য সুধীমণ্ডলী অথবা মহানুভব জমিদারগণ এইসব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক, প্রাচীন মুদ্রার সচিত্র তালিকা, লণ্ডন ও বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি-দ্বয়ের গত ৩০ বৎসরের পত্রিকা, ইণ্ডিয়ান্ এণ্টিকোয়েরী ও এপি-গ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, সার্বেয়ার জেনেরালের আফিস হইতে প্রকাশিত ১ ইঞ্চি = ৪ মাইল স্কেলের ভারতবর্ষের ম্যাপ, প্রভৃতি অত্যাবশ্যক উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। সেগুলির মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া এক এক বাক্স গ্রন্থ ক্রমান্বয়ে সমস্ত শাখা-পরিষৎ ও মফস্বলের বিশ্বাসযোগ্য পুস্তকালয় ঘুরিয়া আসিবে। আমাদের গবর্ণমেণ্ট চিকিৎসা-বিভাগে এইরূপ ভ্রাম্যমান পুস্তকালয় স্থাপন করিয়া মফস্বলের ছোট ছোট শহরের ডাক্তারদের জ্ঞানের বিস্তার ও নবীনতার উপায় করিয়া দিয়াছেন।

(৩) মূল পরিষদের এক বিভাগ খুলিতে হইবে যাহার নিকট আবেদন করিলে জিজ্ঞাসু নিজের চর্চ্চার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কর্ত্তৃক রচিত প্রমাণপঞ্জী পাইবেন। পরিষৎ বাছিয়া ইতিহাসের প্রতি শাখার জন্য এক বা দুই জন বিশেষজ্ঞ স্থির করিবেন, এবং জিজ্ঞাসুর পত্রখানি উপযুক্ত শাখার বিশেষজ্ঞের নিকট পাঠাইয়া দিবেন, তিনি তাহার উত্তর দিবেন। এইসব বিশেষজ্ঞের নাম ও ঠিকানা পরিষৎ-পত্রিকায় সর্ব্বদা ছাপা থাকিবে, এবং তাঁহারা জিজ্ঞাসুদের নিকট যেসব সমালোচনাপূর্ণ প্রমাণপঞ্জী (critical bibliography) পাঠাইবেন তাহাও প্রকাশিত হইবে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের মডার্ণ রিবিউএ শিখ-ইতিহাস সম্বন্ধে এরূপ একটি তালিকা প্রকাশিত হয়।

আমাদের সম্মিলন বঙ্গভাষাভাষীদিগের। সুতরাং ঐতিহাসিক চর্চ্চার অত্যাবশ্যক গ্রন্থগুলি বাঙ্গলা আকারে সাধারণের হাতে দিতে না পারিলে আমাদের কর্ত্তব্যে ত্রুটি হইবে। এই দেখুন প্রতি বৎসর শত শত বঙ্গভাষী সংস্কৃত পরীক্ষা দেয়, তাহারা ইংরেজী জানে না, এবং অসংখ্য বাঙ্গলা মাসিকের পৃষ্ঠায় ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি খুঁজিয়া

পড়িবার অবসর এবং সুযোগও তাহাদের নাই। সুতরাং ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস ও সভ্যতা সম্বন্ধে যেসব নব নব সত্য ইংরেজীতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা এইসব ছাত্রদের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তাহারা প্রত্নতত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক ইতিহাস সম্বন্ধে এখনও মধ্যযুগে বাস করিতেছে; মানবজ্ঞান যে এতদিনে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহার কিছুই জানে না। অথচ তাহাদের মধ্যে অনেক মেধাবী ও মৌলিকতা-সম্পন্ন ছাত্র আছে; দেশ-সম্বন্ধে, তাহাদের পাঠ্যবিষয়-সম্বন্ধে, নিজ ধর্ম্ম-জাতি-সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান হইতে শুধু ত্রিভাষী নয় বলিয়া ইহারা যে চিরবঞ্চিত হইয়া থাকিতেছে ইহা কি পরিতাপের কথা নয়? প্রাচীন লেখমালার উদাহরণ হিন্দীতে গ্রন্থাকারে একত্র ছাপা হইয়াছে; বাঙ্গলায় হয় নাই। (নব-প্রকাশিত "গৌড়লেখমালা" আংশিক গ্রন্থ।) ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ-রচিত প্রাচীন ভারতের ইতিহাস এবং ম্যাকডনেলের সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস যে এপর্য্যন্ত বাঙ্গলায় অনুবাদ করা হয় নাই ইহা আমাদের মণ্ডলীর পক্ষে লজ্জার বিষয়। গুজরাতী ভাষা বাঙ্গলার চেয়ে কত কম লোক বলে, অথচ গুজরাতী ভাষার সেবকগণের আগ্রহ শ্রমশীলতা ও দূরদর্শিতার ফলে সর্ব্ববিধ বিভাগের পুস্তকের অনুবাদে গুজরাত ছাইয়া গিয়াছে। আর আমরা বঙ্কিম রবীন্দ্রের মৌলিকতার গর্ব্ব করিয়া অলস হইয়া বসিয়া আছি! লোকশিক্ষার দিকে দৃষ্টি নাই! অথচ এই লোকশিক্ষার প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দেওয়ার ফলে ক্রমে গুজরাত ও মহারাষ্ট্রে সাধারণের জ্ঞানের সীমা বঙ্গের লোকসমষ্টির জ্ঞানের সীমাকে অতিক্রম করিবে। তখন বাঙ্গালীর মানসিক প্রাধান্য কোথায় থাকিবে? পুনা ও বরোদা ভ্রমণ করিয়া তথাকার স্কুলগুলি দেখিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে আর বিশ বৎসরের মধ্যে মারাঠাগণ জ্ঞানের বিস্তৃতিতে বাঙ্গালীদিগকে পিছু ফেলিয়া যাইবে।

ইতিহাসের জ্ঞান জাতীয় উন্নতির প্রথম সোপান। যে পরিমাণে অতীত জগৎ সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য আবিষ্কার করিব, যে পরিমাণে অতীতের উপদেশগুলি বর্ত্তমানে লাগাইতে পারিব, সেই পরিমাণে আমাদের জনগণ-মন উচিতপথে ধাবিত হইবে, আমাদের সমবেত শক্তি ফল প্রসব করিবে। আর, যে পরিমাণে আমরা অসত্য বা অর্দ্ধসত্য লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিব, সেই পরিমাণেই আমাদের জাতীয় উন্নতিতে বাধা পড়িবে, জনসমষ্টির শ্রম বিফল হইবে।

ইতিহাস কাব্য নহে। চিত্তবিনোদক ললিত আখ্যান অথবা শুষ্ক গবেষণাই ইহার চরম ফল নহে। অধ্যাপক সীলী সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন রাষ্ট্রনেতার সমাজনেতার পক্ষে ইতিহাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক, পথপ্রদর্শক, মহা বন্ধু। ইতিহাসের সাহায্যে অতীতকালের স্বরূপ জানিয়া সেই জ্ঞান বর্ত্তমানে প্রয়োগ করিতে হইবে। দূরবর্ত্তী যুগে বা দেশে মানবভ্রাতারা কি করিয়া উঠিলেন, কি কারণে পড়িলেন, রাজ্য সমাজ ধর্ম্ম কিরূপে গঠিত হইল, কি জন্য ভাঙ্গিল, সেই তত্ত্ব বুঝিয়া আমাদের নিজের জীবন্ত সমাজের গতি ফিরাইতে হইবে। অতীত-হইতে-উদ্ধার-করা সত্য ও দৃষ্টান্তের দীপশিখা আমাদেরই ভবিষ্যতের পথে রশ্মিপাত করিবে। ইহাই ইতিহাস-চর্চ্চার চরম লাভ।

মহাকবিদের সম্বন্ধে সত্যই বলা হইয়াছে যে তাঁহারা অমরধামে গমন করিবার পরও পৃথিবীতে নিজ নিজ আত্মা রাখিয়া গিয়াছেন, যাহা হইতে আমরা শিখি—

ব্যক্তিগত গৌরব কি? লজ্জার বিষয় কি?
লোকে কিসে বল লাভ করে, কিসে পঙ্গু হয়?
(কীট্‌স্‌।)

সেইরূপ আমরা বলিতে পারি যে প্রকৃত ঐতিহাসিক, জনসঙ্ঘকে, ব্যক্তি-সমষ্টিকে শিখান—কিসে জাতীয় উত্থান পতন, রোগ স্বাস্থ্য, নবজীবনলাভ ও মৃত্যু ঘটে। এই মহাশিবতন্ত্র, এই জাতীয় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র সাধনা বিনা, সত্যনিষ্ঠা বিনা, ক্রমোন্নতির অদম্য স্পৃহা বিনা, লাভ করা সম্ভব নহে।*

শ্রীযদুনাথ সরকার।

পরিণাম

ফুল্ল মালতীরে ঘিরে কাল চন্দ্রালোকে
কি উৎসব হয়েছিল, পড়ে নাই চোখে—
প্রভাত-কিরণে আজি পাই দেখিবারে
অসংখ্য পতঙ্গ-পক্ষ পড়ে' চারিধারে!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

* বর্দ্ধমান সাহিত্য সম্মিলনে ইতিহাস শাখার সভাপতির অভিভাষণ।

অরুণা

(প্রবাসীর প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত গল্প)

(১)

নবীন চক্রবর্ত্তীর ছোট ছেলের নাম গণেশ। লম্বা, চওড়া, জোয়ান ছোকরা; ষোল সতের বৎসর বয়স; দাদাদের চোখ-রাঙানির ভয়ে কোন গতিকে একটা হাইস্কুলের সেকেণ্ড ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়িয়াই ইতি। ফুটবল খেলিতে, মারামারি করিতে, সাঁতার কাটিতে বিলক্ষণ মজবুত। ঘণ্টা দেড়েক ধরিয়া বাড়ীর নিকটবর্ত্তী গঙ্গা তোলপাড় না করিলে তাহার স্নান হইত না। বাংলা নাটক ও নভেল—বঙ্কিমচন্দ্র এবং দীনবন্ধু হইতে আরম্ভ করিয়া বটতলা পর্য্যন্ত—কিছুই তাহার বাকী ছিল না। ইয়ার বন্ধুদের সহিত গোপনে থিয়েটার দেখা, যে-কোন একটা নাটক লইয়া রিহার্স্যাল দেওয়া, গ্রামোফোনের গানগুলির সুর হুবহু অনুকরণ করিয়া গাওয়া,—এইসব ছিল তার কাজ।

বদমায়েসী বুদ্ধিতে গণেশ ছিল দলের মধ্যে ওস্তাদ। কাহারও নধর পাঁটাটি চরিতে দেখিলে গণেশ তৎক্ষণাৎ সেটিকে বেওয়ারিস ধার্য্য করিয়া বন্ধুমহলে আনন্দভোজ ঘোষণা করিত। একবার একটার মালিক কোনো সুত্রে এ বিষয় জানিতে পারিয়া গোলযোগ উপস্থিত করে। সেইজন্য সকলের ভুক্তাবশিষ্ট অস্থি পাকস্থলী এবং অন্ত্র তন্ত্র ছাগচর্ম্মখানিতে ভরিয়া অভুক্ত মুণ্ডটির সহিত নিপুণ ভাবে সেলাই করিয়া গণেশ সেই রাত্রেই সেটা তাহার বাড়ীর প্রাঙ্গণে ফেলিয়া দিয়া আসিল; এবং দরজায় খড়ি দিয়া লিখিয়া আসিল— দেখ বাবা, আমাদের বড় সাধের জিনিষটি যেমন কেড়ে নিলে, ও তোমার ভোগে হবে না।

গণেশদের বাড়ীর দক্ষিণদিককার অপর একটা বাড়ীর ঝি মিছামিছি তাহাকে গালি দিয়াছিল। সেইজন্য সে ছাদে উঠিলেই গণেশ নিজেদের ছাদ হইতে দেড়তে একখানা ঘুঁড়ি উড়াইয়া অন্যমনস্কা ঝিয়ের ঠিক ব্রহ্মতালু লক্ষ্য করিয়া প্রচণ্ড রবে গোঁৎ মারিত; এবং পরক্ষণেই আলিশার নীচে বসিয়া পড়িয়া বিস্মিতা ঝিয়ের ক্রুদ্ধ আক্রমণ হইতে সুকৌশলে ঘুঁড়িখানাকে উদ্ধার করিয়া আনিত। ঝি নিষ্ফল আক্রোশে কোমর বাঁধিয়া গালি দিত এবং গণেশ কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া ঘুঁড়িখানাকে ক্রমাগত তাহার মাথার উপর ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া তাহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিত।

যে-কোন প্রকারে হউক আনাড়ী লোককে ভয় দেখাইয়া গণেশ বিশেষ আনন্দ অনুভব করিত। কখন কখন অন্ধকার রাত্রে লম্বা একটা দড়ি রাস্তায় সটান ফেলিয়া রাখিয়া একটা খুঁট ধরিয়া ঘরের মধ্যে চুপ্‌টি করিয়া বসিয়া থাকিত। অন্যমনস্ক পথিক দড়ির কাছে পা বাড়াইবামাত্র সড়াৎ করিয়া টান দিয়া তাহাকে সর্পভয়ে সচকিত করিয়া তুলিত। কখনো বা পাঁচ সাত জনে পরামর্শ করিয়া গভীর রাত্রে ভৌতিক উপদ্রব আরম্ভ করিত। কোন অতিপরিপক্ক লোক তাহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া ষড়যন্ত্র বিফল করিয়া দিবার চেষ্টা করিলে গণেশ গভীর স্বরে কহিত—দেখ, আমার নাম গণেশ চক্রবর্ত্তী; গোলমাল করলে ভাল হবে না বলে' রাখ্‌ছি। আস্তে আস্তে আপনার পথ দেখ।

পিতা, মাতা, এবং ভ্রাতৃবর্গ গণেশকে সংশোধন করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বারবার বিফল হইয়া শেষটা হাল ছাড়িয়া দিলেন।

(২)

গণেশদের বাড়ীর ঠিক লাগোয়া একটা বাড়ী হঠাৎ বিক্রী হইয়া গেল। ক্রেতা ভবেশ মুকুর্য্যে সপরিবারে আসিয়া বাড়ীটায় বাস করিলেন। তাঁহার মেয়েটির নাম অরুণা।

সেদিন গঙ্গাপূজা। ঘাটে ঘাটে বালকবালিকার আনন্দরব উঠিয়াছে। অরুণা তখন কুমারী। প্রদীপ্ত কৈশোর উচ্ছ্বসিত যৌবনপ্রবাহের তীরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। একরাশি কালচুল গুচ্ছে গুচ্ছে তাহার পিঠে, মুখে এবং বক্ষের উপর নামিয়া আসিয়াছে। তরুণ সূর্য্য তাহার মুখের উপর কুঙ্কুম ছড়াইয়া দিল। উদ্দাম ঢেউগুলা পূজার ফুল মাথায় লইয়া তাহার পা-দুখানির নীচে আছাড় খাইয়া পড়িল।

ভাগীরথীর এই পক্ষপাত লক্ষ্য করিয়া গণেশ হঠাৎ হাতজোড় করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া অভিনয়ের ভঙ্গীতে বলিয়া উঠিল—হায় মা গঙ্গে! তোমার অমল ধবল পাদ-

পদ্মে কি অপরাধ করেছি মা? হতভাগ্য আমরা, তোমার প্রসাদী ফুল-দুটো একটা পাবারও কি যোগ্য নই মা?

গণেশের এই অকস্মাৎ উচ্ছ্বাসের কারণ ঠিক না বুঝিয়াও বন্ধুর দল অজস্র হাসিতে লাগিল। গণেশ লক্ষ্য করিল—কিশোরীর মুখমণ্ডলে সলজ্জ বিরক্তির রেখাগুলি ফুটিয়া উঠিয়া ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতেছে। গণেশের ইয়ার্কি-প্রোজ্জ্বল মুখরুচি একমুহূর্ত্তে কালী হইয়া গেল।

(৩)

কিছুদিনের মধ্যেই দুই পরিবারে আলাপ বেশ জমিয়া উঠিল। নবীনচক্রবর্ত্তীর সহিত ভবেশবাবুর মৌখিক স্বাগত-সম্ভাষণ শীঘ্রই প্রাত্যহিক পানতামাক ও রসগল্পের কোটায় উঠিয়া পড়িল। গণেশদের দোতলার ছাদ হইতে একটা কাঠের সিঁড়ি উঠিয়া ভবেশবাবুদের তেতলার ছাদটাকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল।

ইহার মধ্যেই গণেশ বেশ একটু গম্ভীর হইয়া গিয়াছে। ইয়ার-মহলে পূর্ব্বের মত হৈ হৈ করিয়া বেড়ান বড় একটা দেখা যায় না। পিতামাতা মনে করিলেন বুঝি বা এতদিনে ছেলেটার একটু সুবুদ্ধি হইল; এইবার যদি স্থির হইয়া একটা কিছু কাজকর্ম্মের চেষ্টা দেখে।

ভবেশবাবুর ছোটছেলে সুধীর প্রত্যহ সকালে গণেশের নিকট পড়িতে আসিত। তাহাদের বাড়ীতে আধুনিক এবং পুরাতন বাংলা বই অনেক ছিল। ভবেশবাবু শিক্ষিতা কন্যার হস্তে পুস্তকগুলির তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন।

গণেশ কহিল—সুধীর, তোমাদের 'গুপ্তরত্নোদ্ধার' বই-খানা একবার নিয়ে এস ত।

সুধীর রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসিয়া কহিল—দিদি বল্লেন, সে বই আমাদের নেই।

গণেশ।—সে কি! আমি যে তোমার বাবার হাতে সে বই দেখেছি!

তখনই তাহার মনে পড়িল ভবেশবাবুরা কোন বই অপর কাহাকেও পড়িতে দেন না। কয়েকখানা বই পরকে পড়িতে দিয়া আর ফিরিয়া পান নাই। কিন্তু তাহাকেও অবিশ্বাস! একটা মস্ত অভিমান তাহার হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে উঁকি দিতে লাগিল। কিন্তু অভিমান কাহার উপর?

পরদিন সুধীর বইখানা লইয়া আসিয়া কহিল—কে একজন এখানা পড়তে নিয়ে গিছল, কাল রাত্রে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে।

গণেশ সমস্তই বুঝিল, কহিল—ও বই আমি আর-এক জায়গায় পেয়েছি, ও তুমি বাড়ীতে রেখে এসগে।

মধ্যাহ্নে গণেশ দোতলার একটা কোণের ঘরে বসিয়া একখানা ইংরেজী বইএর পাতা উলটাইতেছিল। সহসা দরজার কাছে পদশব্দ শুনিতে পাইল। চাহিয়া দেখিল—অরুণা,—তাহার বামহস্তে সেই বইখানা। গণেশ শশব্যস্তভাবে উঠিয়া কহিল—একি! আপনি এসেছেন?

বলিয়াই বইখানি লইবার জন্য হাত বাড়াইল। অরুণার মুখে চাঞ্চল্যের আভাস পড়িল। সে তাড়াতাড়ি বইখানা আঁচলে ঢাকিতে ঢাকিতে কহিল—না, সে জন্যে নয়। আপনি আমাদের...... আপনাদের বাড়ীতে একটা গরু ঢুকেছে—

এই বলিয়া সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। গণেশের বিমূঢ় হৃদয়ে যেন একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। অরুণার কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণে বীণাধ্বনির মত বাজিতে লাগিল। কিছুক্ষণ হতভম্ব গোছ থাকিয়া গণেশ উচ্চস্বরে হাঁকিল—ওরে নিধে!

(৪)

গণেশদের বাড়ীর মাইল খানেক দূরে তাহার পিসিমার বাড়ী। পিসিমা বিধবা। তাঁহার একমাত্র পুত্র গজেন বাবু একজন এঞ্জিনিয়ার,—বেশ দু'পয়সা রোজগার করেন। সাতাশ আটাশ বৎসর বয়স হইল, এখনও বিবাহ করেন নাই। অল্প বয়সে বিবাহ করার উপর তিনি হাড়ে চটা ছিলেন; এবং অতি শীঘ্র পৌত্রমুখ সন্দর্শনের জন্য পিসিমাও উদ্‌গ্রীব ছিলেন না।

ভবেশবাবু নবীনবাবুকে মধ্যে রাখিয়া পিসিমার কাছে কথাটা পাড়িয়া ফেলিলেন। পিসিমা অরুণাকে দেখিয়াছিলেন; নবীনবাবুকে কহিলেন—ভবেশবাবুর সঙ্গে কাজ হবে, এতে আর আপত্তি কি? বেশ ত হয়ে যাক্‌না।

ভবেশ।—কি রকম খরচ পত্তর কর্ত্তে হবে?

পিসিমা হাসিয়া কহিলেন—উনি যদি দিতে থুতে চান,

তা'হলে আমি এত বেশী চেয়ে বস্‌ব যে ওঁর তবিল ফতুর হয়ে যাবে।

ভবেশবাবু চিন্তিত ভাবে কহিলেন—কথাটা একটু বুঝিয়ে বল্লে—ওর নাম কি—

পিসিমা কহিলেন—কথাটা এমন কিছুই নয়,—ওঁর কাছে আমি একপয়সাও নিতে ইচ্ছে করি না।

ভবেশবাবু অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া কহিলেন—সে ত আমার পরম সৌভাগ্য। তা'হলে ত শুভকার্য্যে আর কোন বাধাই থাকল না। তবে একটা দিন স্থির করে ফেলা যাক,—কি বলেন নবীনবাবু!

পিসিমা।—কিন্তু আমার সামান্য একটু প্রার্থনা আছে। ওঁর দু'তিনটি ছেলে,—উনি শুধু একটা কথা দিন যে, বড় ছেলেটির বিয়েতে কনের বাপের কাছে এক পয়সাও নেবেন না। বাস্, এটুকুতে ওঁর কোন আপত্তি থাক্‌তে পারে না ত?

ভবেশবাবু একটা হাতে আর একটা হাতের অঙ্গুলি পীড়ন করিয়া কহিলেন—উনি যা' বলছেন, অবিশ্যি ন্যায্য কথাই বলছেন; তবে বাড়ীতে এঁরা কি বলেন একবার জিগ্যেস করে দেখি।

ভবেশবাবু পিসিমার নিকট আর ফিরিলেন না। উক্ত এঁরা সম্ভবতঃ এমন একটা ঝড় তুলিয়াছিলেন যাহাতে ফোট-ফোট ফুলটির নিকট হইতে প্রজাপতি মহাশয় উড়িয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

নবীনবাবু দীর্ঘশ্বাস ছাড়িলেন—হায় ভবেশদা! বাড়ীর কথাটাই বড় হ'ল!

(৫)

গজেনবাবুর বিবাহ হইয়া গিয়াছে—একজন খ্যাতনামা ধনীর কন্যার সঙ্গে। অরুণার বিবাহ হইয়া গিয়াছে—একজন পাঠজীর্ণ বি-এসসির সঙ্গে। আর গণেশ?—তাহার পিতা এবং ভ্রাতারা দেখিয়া শুনিয়া অনুপমার সঙ্গে তাহার বিবাহ দিয়া দিলেন। বধূর নামের সহিত রূপের সামঞ্জস্য পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া গণেশ মদ ধরিয়া ফেলিল।

ছেলেবেলা হইতেই গণেশকে বাড়ীর কেহ দেখিতে পারিতেন না। সেইজন্য সে তাহার পিসিমার বড় আদরের ছিল। তাহার যত আবদার উপদ্রব পিসিমার কাছে। পিসিমার নিজের টাকাকড়ি যথেষ্ট ছিল, সেই-জন্য গণেশকে কখনও অভাব অনুভব করিতে হয় নাই। বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে গণেশ বাড়ীর কাহারও সহিত কথাই কহিত না। সে বুঝিত, যেখানে মনো-মালিন্য বেশী সেখানে কথাবার্ত্তা যত কম হয় ততই মঙ্গল।

পিসিমা কিন্তু প্রয়োজনের অধিক অর্থ দিতেন না। এবং যখন জানিতে পারিলেন যে গণেশ গোপনে মদ খাইতেছে, তখন জলখাবারের টাকা একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহার জলখাবার তিনি বাড়ীতে প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন এবং জামা কাপড় সরকারকে দিয়া কিনাইয়া দিতেন।

বিবাহের কিছুদিন পরেই গজেনবাবু শ্বশুরবাড়ীর নিকট একটা বাড়ী কিনিয়া, তাহাতে নানা সৌখীন আসবাব-পত্র মনের মত সাজাইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করিতে মনস্থ করিলেন। পুত্রের এবং তাহার শ্বশুর শ্বাশুড়ীর মনোভাব বুঝিয়া পিসিমা বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া গণেশকে লইয়া তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িলেন। এক ঢিলে দুই পাখী মারা পিসিমার প্রকৃতিগত বিশেষত্ব ছিল।

অতঃপর প্রত্যেক যাত্রায় পিসিমা ভারতবর্ষের এক-একটা দিকের সমস্ত তীর্থস্থান নিঃশেষে দর্শন করিয়া বাড়ী ফিরিতেন; এবং দু'এক মাস বিশ্রাম করিয়া আর-একটা দিক আক্রমণ করিবার উদ্দেশ করিয়া বাহির হইতেন। গণেশ প্রতিবারই তাঁহার সঙ্গী হইত।

(৬)

অনুপমার বিবাহ হইয়াছে প্রায় তিন বৎসর; এ পর্য্যন্ত স্বামীর সহিত একদিনের জন্যও তাহার কথাবার্ত্তা হয় নাই। স্বামীর এইরূপ ঔদাসীন্য তাহার বুকের উপর একটা বোঝার মত চাপিয়া ছিল। শ্বাশুড়ী, ননদ এবং জায়েরা কেহই তাহার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাহার দোষ—সে কালো; তাহার দোষ—সে স্বামীর মনোরঞ্জন করিতে পারে না; তাহার দোষ—তাহার স্বামী টাকা রোজগার করে না।

বাড়ীর মধ্যে কেবল শ্বশুর তাহাকে পরম স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। কোন দিন হয়ত অনুপমা একবেলা ধরিয়া কড়া মাজিতেছে। শ্বশুর চীৎকার করিয়া বলিতেন—

ওকি মা, এখনি উঠে এসো। দেখ গিন্নি, তুমি যদি ছোট বৌমাকে দিয়ে অমন করে' কড়া মাজাও তা'হলে আমি আজ থেকে আর বাড়ীতে ভাত খাব না।

গিন্নি কহিতেন—কে ওকে কড়া মাজতে মাথার দিব্যি দিয়েছে?

কোন দিন বা কর্ত্তা বলিতেন—হাঁগা গিন্নি, যে বোম্বাই আম ক'টা এনেছিলুম, ছোট বৌমাকে একটা দিয়েছিলে ত?

গিন্নি ঝঙ্কার দিয়া কহিতেন—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, দিয়েছিলুম, দিয়েছিলুম, দিয়েছিলুম! আমরা যেন রাক্কুসী, ওঁর বৌকে না দিয়ে সবই আমরা গিলেছি!

শুনিয়া কর্ত্তা তাড়াতাড়ি তামাকের চেষ্টায় ভবেশ-বাবুর বৈঠকখানায় পলাইয়া যাইতেন।

সেদিন অনুপমার শরীরটা ভাল ছিল না। ননদ বিমলা কহিল—হ্যাঁ গা বউ, তোমার ত আজ অসুখ করেছে; তুমি আজ আর কিছু থাবে না ত?

এরূপ প্রশ্নে ভোজনের আসক্তি স্বতঃই কমিয়া যায়। অনু সংক্ষেপে কহিল—না।

বিমলা গিন্নির কাছে গিয়া কহিল—মা, বউ বলছিল আজ আর সে কিছু খাবে না।

গিন্নি কহিলেন—না খায় ত আমি কি আর গিলিয়ে দেব!

শুনিয়া অনুপমার মনে পড়িত তাহার বাপের বাড়ীর কথা। পিতামাতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া কতদিন সে অন্নের উপর অভিমান করিয়া বসিত। ঠাকুরমার বারম্বার সস্নেহ আহ্বানেও ভোজনে সম্মত হইত না। তার পর ক্ষুধা যখন অত্যন্ত প্রবল হইত এবং বহুপ্রত্যাশিত পুনরাহ্বান কোমলতর মূর্ত্তিতে দেখা দিত, তখন সে যেন নিতান্ত দয়াপরবশ হইয়াই অন্নের উপর সঞ্জাত ক্রোধ বড়জোর ব্যঞ্জনবিশেষের উপর নিক্ষেপ করিয়া শান্ত হইত। এখন আর সেদিন নাই। এখানে দ্বিতীয় আহ্বান প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

গৃহিণী কিন্তু সেদিন একবার দয়া করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—একটু সাবু-টাবু খাবে ত? না, আর-কিছু এনে দিতে বলব?

উক্ত সুপথ্যে অনুপমার কোন কালেই রুচি ছিল না। সে কিন্তু বেশ জানিত উহার প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া উপাদেয়তর কোন পথ্য নির্দ্দেশ করিলে, সে কথাটি অপরাহ্ণ-বৈঠকে সমুপস্থিত হইয়া সমবেত রঙ্গময়ীদের সম্মুখে হাসির নূপুর পায়ে দিয়া বিবিধ ভঙ্গীতে নৃত্য করিতে থাকিবে, এবং ভূরি ভূরি রঙ্গরসের সৃষ্টি করিয়া আসর সরগরম করিয়া তুলিবে। অগত্যা সে সম্মত হইল।

নানা দুশ্চিন্তায় অনুর শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। অনুর পিতা কন্যার অসুখের সংবাদ পাইয়া কিছুদিনের জন্য তাহাকে পশ্চিমে তাঁহার কর্ম্মস্থানে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। কর্ত্তার আপত্তি ছিল না, গৃহিণী কিন্তু বাঁকিয়া বসিলেন।

নিভৃতে দুদণ্ড কাঁদিয়া যে হৃদয়ভার লঘু করিবে, অনুপমার সে উপায়ও ছিল না। গানে আছে—

> রন্ধনশালাতে যাই তুয়া বঁধু গুণ গাই
> ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি।

অনুপমাও রন্ধনশালাতে গিয়া কাঁদিত; এবং সেটা শুধু বঁধুয়ারই গুণ স্মরণ করিয়া নহে। বিমলা দেখিতে পাইলে অনু কহিত—'তোমার দুটি পায়ে পড়ি ঠাকুরঝি, মাকে বোলো না।' বিমলা তখনি গিয়া বলিয়া দিত। গৃহিণী কহিতেন—উনি কচি খুকী! পশ্চিমে হাওয়া খেতে যাবেন বলে' রাতদিন প্যানপেনিয়ে মরছেন! দণ্ডবৎ বাবা মেয়ের খুরে, আমার চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি যে এখনো দড়ি ছেঁড়েন নি।

(৭)

অনুপমার একটিমাত্র সুহৃৎ ছিল,—সে বিধবা অরুণা। বিবাহের দুইবৎসর পরেই তাহার স্বামী ইহধাম পরিত্যাগ করেন। অনুপমা তাহার সমস্ত দুঃখের কথা অরুণার কাছে বলিয়া অত্যন্ত আরাম পাইত। শুনিতে শুনিতে তাহার চোখদু'টি সমবেদনায় ছল ছল করিয়া উঠিত। মধ্যে মধ্যে অনাহারে দিনযাপন করা যে কি কষ্ট অরুণা তাহা বিলক্ষণ বুঝিত। তাহারও একটু ইতিহাস আছে।

অরুণার স্বর্গীয় শ্বশুরের দুই পুত্র; তাহার স্বামী ছিলেন কনিষ্ঠ। কনিষ্ঠের অংশটা পাছে হাতছাড়া হয়, এই আশঙ্কায় ভবেশবাবু বিধবা কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়াছিলেন।

সেখানে অরুণার গৃহ ছিল না এবং গৃহকর্ম্মের অ

সেদিন একবেলা পরিশ্রমের পর অরুণা মধ্যাহ্নে দু'টি ভাত লইয়া বসিয়াছে মাত্র;—প্রথম গ্রাস তুলিতেই কোথাকার একটা ক্ষুদ্র চিংড়ী অন্নের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিল; এবং বড় জা একেবারে আকাশ হইতে পড়িয়া গঙ্গাজল-আনা মালীটার প্রতি অজস্র গালিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। আবার কোনদিন ঠিক এমনি সময়ে বড় জার নগ্নকায় জুতা-পায়ে আঁস্তাকুড়-মাড়ান ছেলেটি আসিয়া পরম আদরে ছোট-কাকীর গলা জড়াইয়া ধরিত। অবোধ বালকের আদর লাভের স্পৃহা ঠিক কাকীমার খাবার সময়টিতে কেন যে এত অসম্ভব রকম উদ্দাম হইয়া উঠিত—সেটা অনুসন্ধানসাপেক্ষ। যাহাই হউক এমনি করিয়া প্রতিমাসে কন্যার গোটাপাঁচ-সাত একাদশীর সংবাদ পাইয়া ভবেশবাবু সেখানে দাঁত ফুটাইবার দুরাশা পরিত্যাগ করিলেন। অরুণা বাপের বাড়ী ফিরিয়া আসিল। অনুপমার প্রতি তাহার সহানুভূতি ক্রমে প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইল।

একদিন অরুণা তাহার অসুস্থ সখীর জন্য কিছু জল-খাবার আনিয়াছে দেখিয়া গৃহিণী কহিলেন—তোমার এত দরদে কাজ কি বাপু; ছোটবউ কি আমাদের বাড়ী খেতে পায় না?

সেই দিন হইতে তাহাদের প্রকাশ্য আদান প্রদান রহিত হইয়া গেল।

(৮)

সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত সারিয়া পিসিমা সেবার বাড়ী ফিরিলেন। গণেশ মাতাপিতাকে প্রণাম করিয়া বাহিরের ঘর আশ্রয় করিল।

একদিন সুধীরের নিকট অরুণার বৈধব্যসংবাদ পাইয়া, গণেশ বহুকালের পর খুব একগ্লাস মদ খাইল। চেয়ারে বসিয়া দূর আকাশেরদিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া আপন মনে গুনগুন করিয়া কি একটা গান ধরিল। এই সময়ে অনুপমা একরেকাব ফলমূল মিষ্টান্ন এবং এক গ্লাস জল লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল। রেকাবখানা গণেশের সম্মুখস্থ টেবিলে রাখিয়া জলের গ্লাস হাতে নতমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গণেশের কি মনে হইল কে জানে, সে একটানে রেকাবখানা উঠানে ফেলিয়া দিয়া চটিজোড়া পায়ে দিয়া চটচট শব্দে বাহির হইয়া গেল। উপরতলা হইতে অনেকগুলি স্ত্রীকণ্ঠের একটা চাপা উচ্চহাস্য তাহার কানে গিয়া পৌঁছিল।

অরুণাদের বাড়ীর পাশ দিয়া যাইতে যাইতে গণেশ সুধীরের গলা শুনিতে পাইল—দিদি, দিদি, আর-একটু হ'লেই আট আনা পয়সা লোকসান হয়ে যাচ্ছিল!

অরুণা।—সে কিরে! কেমন করে'?

গণেশের গমনবেগ অত্যন্ত মন্দীভূত হইয়া গেল। সে রাস্তার একপাশে বসিয়া একটা পাথর কুড়াইয়া রাস্তার উপর যা'-তা' লিখিতে লাগিল।

সুধীর।—বাজারের দিকে যাচ্ছি, রাস্তায় দেখি একটা খোঁড়া ভিকিরী। আমার পকেটে ছিল একটা পয়সা আর একটা আধুলি। আমি অত দেখিনি, পয়সাটা দিতে দিয়ে ফেলেছি আধুলিটা। আধুলি কি না! তার হাতে অম্‌নি চকচক্ করে উঠেছে! খোঁড়ার মুখে হাসি আর ধরে না; সে মনে মনে কল্লে—কেল্লা মার দিয়া!

অরুণা।—তারপর তুই বুঝি আধুলিটা কেড়ে নিয়ে এলি?

সুধীর।—তা' কেন? আমি পয়সাটা দিয়ে আধুলিটা ফিরিয়ে নিলুম।

অরুণা।—ছিঃ! তুই এমন নিষ্ঠুর! যা, ছুটে গিয়ে এখনি তাকে আধুলিটা দিয়ে আয়।

সুধীর।—কিন্তু আমাকে একটা লাটাই আর দশবাণ্ডিল সুতো কিন্‌তে হ'বে যে!

অরুণা।—সে হ'বে এখন, তুই যা। দেখিস্, যেন পয়সাটা আবার ফিরিয়ে আনিস্ নি।

(৯)

ফাল্গুন মাস। সে রাত্রে চাঁদের আলো, বসন্তের বাতাস। গণেশ গোলাপীগোছ একটু মাত্রা চড়াইয়া একখানা মাদুর বিছাইয়া ছাদে শয়ন করিল। রাত তখন প্রায় এগারটা। ইতর সাধারণ ঘুমাইয়াছে; কেবল যাহাদের প্রেমালাপের পালা তাহারাই জাগিয়া আছে।

গণেশ দেখিল ভবেশবাবুদের ছাদ হইতে কাঠের সিঁড়ি দিয়া কে একজন স্ত্রীলোক নামিয়া আসিতেছে। তাহার হাতে একখানি ছোট থালা। গণেশ ছিল সিঁড়ি হইতে

অনেকটা দূরে। স্ত্রীলোকটি বোধ হয় তাহাকে দেখিতে পায় নাই।

একটু লক্ষ্য করিয়া গণেশ চিনিল—সে অরুণা। সে স্তব্ধ হইয়া দেখিতে লাগিল, সিঁড়ির ধাপে ধাপে শুভ্র সুন্দর চরণ দু'খানি দু'টি ফুটন্ত পদ্মের মত নামিয়া নামিয়া আসিতেছে।

এমন দু'একটি স্ত্রীলোক দেখা যায়, যাহারা অত্যন্ত নিকট হইলেও মনে হয় যেন অনেক দূর। তাঁহাদের নিজস্ব একটি ভিতরকার তেজ আছে, যাহা বাহিরের স্নিগ্ধ মাধুর্য্য ভেদ করিয়া প্রকাশ পায়। চপল ধৃষ্টতা তাঁহাদের সম্মুখে মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের মত স্থির হইয়া থাকে।

গণেশ ধীরে ধীরে মাদুর ছাড়িয়া উঠিয়া সিঁড়ির দিকে যাইতে লাগিল। সহসা তাহাকে সম্মুখে দেখিয়া অরুণা দুইহাত পিছাইয়া গেল। পরে স্থির কণ্ঠে কহিল—তোমার পত্নীর আজ সমস্ত দিন খাওয়া হয় নি। এই খাবার তাকে দিয়ে আসতে পারবে?

এ যেন তাঁর আজ্ঞা। গণেশ হাত বাড়াইয়া রেকাবখানি লইয়া কহিল—আমি দিয়ে আসছি; কিন্তু আপনি কি চলে যাবেন?

অরুণা।—এখানে আমি কি করব?

গণেশ অনুনয়ের স্বরে কহিল—আপনি শুধু এক মিনিট অপেক্ষা করুন; আমি এখনি আসছি।

গণেশ চলিয়া গেল। অনুপমার ঘরে গিয়া, রেকাবখানা তাহার সম্মুখে রাখিয়া, তখনি সে ফিরিয়া আসিল।

অরুণা।—আমার কাছে তোমার কি দরকার?

গণেশ বিহ্বল দৃষ্টিতে অরুণার পায়ের দিকে চাহিয়া রহিল; কিছুই বলিতে পারিল না।

অরুণা।—দেখ, এগুলো তোমাদের ভণ্ডামি। যে লোক স্ত্রীর প্রাণে এত কষ্ট দেয়, মদখেয়ে দিবারাত্রি মাতলামি করে' বেড়ায়, সে আবার ভালবাসার কি জানে?

গণেশ এরূপ তিরস্কার প্রত্যাশা করে নাই। তাহার নেশা ছুটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। বিনীতভাবে কহিল—কিন্তু কেন যে মদ খাই, তা' আপনি জানেন না।

অরুণা।—খুব জানি;—তুমি একজন পরস্ত্রীর উপর আসক্ত। তুমি যদি এমন অসৎ প্রকৃতির না হ'তে, তোমাকে আমি দাদার মত মান্য করতুম।

গণেশ ক্ষণকাল নতমুখে চিন্তা করিল; পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল—তবে সেই ভাল। আজ থেকে আমি আর মদ খাব না।

ঠিক সেই সময়ে অনুপমা সিঁড়ি হইতে উঁকি মারিল; এবং তাহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া তাহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল। আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া কহিল—আ আমার পোড়াকপাল! তুমি সর্ব্বনাশী এইজন্যে আমার ভাল করতে আস!

অনুপমার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া গণেশ কহিল—অনু, ইনি আমার দিদি; এঁকে প্রণাম কর।

অনুর প্রতি গণেশের এই প্রথম সম্ভাষণ। অনুপমা সরোষে মুখ ফিরাইয়া নামিয়া যাইতে যাইতে কহিল—মরণ আর কি!

মুহূর্ত্তে গণেশের মন বিষাক্ত হইয়া উঠিল। তখনি সে বাহিরের ঘরে গিয়া অর্দ্ধপূর্ণ বোতলটার সমস্ত তরল পদার্থটুকু মু'খর মধ্যে ঢালিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

সেই রাত্রেই বাড়ীর স্ত্রীলোকদের কানে উঠিল—ওদের অরুণা ছাদে আসিয়া ছোটবাবুর সঙ্গে কথা কহিতেছিল। কোথাও খুন হইলে পুলিসের দল যেরূপ তদারকে লাগিয়া যায়, বাড়ীর সধবা, বিধবা এবং কুমারী সকলে মিলিয়া ছাদে উঠিয়া সেই ভাবে জটলা করিতে লাগিলেন। এবং অরুণার চরিত্রের উপর নানাপ্রকার কটাক্ষপাত করিয়া অনুপমার প্রতি সবিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বেচারা অনুপমা এতদিন বুঝিতেই পারে নাই যে, এতগুলি হিতৈষিণী ছদ্মবেশে গা ঢাকা দিয়া তাহার এত নিকটে বিরাজ করিতেছিলেন।

গোলমাল শুনিয়া বিরলকেশা মেজবউ স্বামীর অনুনয় সত্ত্বেও সুখশয্যা ত্যাগ করিলেন; এবং দ্রুতপদে অকুস্থলে উপস্থিত হইয়া ঘটনা শুনিয়া অবাক হইয়া গেলেন। পরক্ষণেই কহিলেন—এতে আর তোমরা আশ্চর্য্য হচ্ছ কি? ওঁর গুণ আমি আগে থেকেই জানি। দেখতে ভিজে বেড়ালটি, কিন্তু ডুবে ডুবে জল খান। সেদিন সন্ধ্যেবেলা হঠাৎ গিয়ে দেখি, ঠাকরুণ আর্শী চিরুনী নিয়ে চুল আঁচড়া-

চ্ছেন। আমি পাকে প্রকারে বুঝিয়ে বল্লুম যে, দেখ ভাই বিধবা মানুষের গোছা গোছা চুল রাখা কি ভাল দেখায়? শুনে উনি বল্লেন কি—এ চুল ভাই মান্‌সিক করেছি; চল্লিশ বছর বয়েস হলেই প্রয়াগে গিয়ে মাথাটা মুড়িয়ে আস্‌ব। আমি ত হেসে আর বাঁচিনা, বল্লুম—হ্যাঁলা যার পতি নেই, পুত্তুর নেই, তার আবার মান্‌সিক করা কার জন্যে? শুনে ঠাকরুণ দেমাকে আর কথাই কইলেন না।

ডুবে জল খাওয়ার এমন একটা প্রমাণ পাইয়া স্ত্রী-মণ্ডলী গালে হাত দিয়া পড়িলেন।

(১০)

গণেশের নেশা ছুটিল তখন বেলা আটটা। চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল সে তাহার পিসিমার বাড়ীর বাহিরের ঘরে পড়িয়া আছে। গত রাত্রের ঘটনাগুলি একে একে তাহার মনে পড়িতে লাগিল। সে ভূমিশয্যা ছাড়িয়া উঠিল না। পড়িয়া পড়িয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইল।

—একি কল্লুম! তুই মুহূর্ত্ত চোখের তৃষ্ণা মিটাতে গিয়ে তোমার শুভ্র ললাটে একি কলঙ্ক লেপন কল্লুম! তোমার ত কোন অপরাধ ছিল না। হায়! ফুলের মত নির্ম্মল হৃদয়খানি, আমার চক্ষের বিষে বিষময় করে দিলুম! যে চরণ দুখানি চিন্তা করবারও যোগ্য নই, তা দেখতে গেলুম কোন্ সাহসে? ক্ষমা কর। ক্ষমা কর। হে আমার চোখের আড়াল! এবারকার মত আমায় ক্ষমা কর। এ জীবনে আর কখনো দেখতে চাইব না। তোমার ভুবন-ভোলান কণ্ঠস্বর আর কখনো শুন্‌তে চাইব না।—

গণেশ মেঝেয় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। তাহার অনুতপ্ত দগ্ধ হৃদয় জুড়াইবার একমাত্র স্থান পিসিমার আশ্রয়। কিন্তু পিসিমা কোথায়?—মাসখানেক হইল তিনি কালীঘাটে একটা ঘরভাড়া করিয়া কালীগঙ্গার সেবা করিতে-ছিলেন। কালীগঙ্গার চরণতলেই তাঁহার মরিবার বাসনা। গণেশ সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল।

(১১)

মাস তিনেক পরে পিসিমা একদিন বলিলেন—গণশা, আমাকে গজেনের বাড়ী নিয়ে চল।

গণেশ।—সেখানে কেন পিসিমা?

পিসিমা।—তাকে একবার দেখতে বড় সাধ হয়েছে।

গাড়ী আসিয়া দরজার গোড়ায় থামিল। গজেনবাবু বৈঠকখানায় চেয়ার হেলান দিয়া বসিয়া ছিলেন। গাড়ী থামার শব্দে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভিতরে মাকে দেখিয়া এদিক ওদিক চারদিক চাহিয়া গাড়ীর মধ্যেই একটা প্রণাম করিয়া ফেলিলেন।

গণেশ হাসিয়া কহিল—নমস্কারটা না হয় নাই করতে দাদা!

গজেনবাবু কহিলেন—যা, যা, জ্যেঠামি করিস্‌নে। তার পরে মা, হঠাৎ এসে পড়লে যে?

পিসিমা।— শীগগির আমাকে যেতে হবে, তাই তোদের কাছে একবার এলুম।

গজেনবাবু।—তা' অসুখ বিসুখ কল্লে আমরা গিয়ে দেখে আসতে পারতুম ত?

গণেশ।—শুনছ পিসিমা, উনি ভাল কথাই বলছেন। মরবার সময় পুণ্যধাম কালীঘাট ছেড়ে এখানে আসা কি ঠিক হয়েছে? আহা দাদা! তুমিই ধন্য! মায়ের আত্মার যাতে সদ্‌গতি হয়, সেটি পর্য্যন্ত ভেবে রেখেছ। পিসিমা, তুমি না হয় শেষের ক'টা দিন আমাদের বাড়ীতেই থাকবে চলনা।

পিসিমা সংকল্প স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন, কহিলেন —না বাবা, আমি এখানেই থাকব।

শ্বাশুড়ীর অকস্মাৎ আবির্ভাবে সচকিত হইয়া গজেন-বাবুর পত্নী কন্যাটিকে লইয়া দ্রুত পিত্রালয়ে সরিয়া পড়িলেন।

(১২)

কবিরাজ মহাশয় নাড়ী টিপিয়া রীতিমত সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইয়া গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা দিলেন। ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইতে বিলম্ব হইল না। বড় লোকের মা,—খাট বিছনা, সাজ রসঞ্জাম, লোক লস্কর কোন কিছুরই ক্রটি হইল না। পিসিমা আপত্তি করিলেন না। এসব না হইলে তাঁহার পুত্রের যে নিন্দা হইবে।

দু'দিন দু'রাত কাটিয়া গেল, পিসিমার অবস্থার কিছু ইতর-বিশেষ হইল না। গণেশ তাহার প্রকাণ্ড বপু লইয়া দিবারাত্রি পিসিমার শিয়রে বসিয়া রহিল। তাহার মুখে বিরক্তির চিহ্নমাত্র নাই। সেবা এবং যত্ন যেন তাহার

শরীরে মূর্ত্তি ধরিয়াছে। তৃতীয় রাত্রে কবিরাজের উপর বিষম বিরক্ত হইয়া গজেনবাবু বিলাতে পাশকরা বি কে মল্লিককে আনিয়া হাজির করিলেন।

এই ডাক্তারটির চক্ষে চর্ম্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান ছিল। বিশেষ অনুনয় বিনয়েও কেহ কখন তাঁহার দয়া উদ্রেক করিতে পারে নাই। একবার এক ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট রোগের বিবরণ বলিয়া, ব্যবস্থা লইয়া, তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিবার চেষ্টা করেন যে, তিনি তাঁহাদের কুলগুরুর দৌহিত্র। ডাক্তার সাহেব বলিয়াছিলেন—দেখ বাপু, আমি সমুদ্রযাত্রা করেছি, মুর্গী খাই এবং তোমাদের শাস্তরের মতে আরো কত কি অনাচার অবিচার করে থাকি; তবু যদি আমাকে তোমার শিষ্য বলে ভ্রম হয়, তা'হলে ত আমি নাচার।" ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ ভিজিটের টাকা ফেলিয়া দিতে পথ পান নাই।

ডাক্তার সাহেব নাড়ী পরীক্ষা করিলে গজেনবাবু ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন—কেমন দেখছেন মশায়! আরো কতদিন ভোগাবে?

প্রশ্ন শুনিয়া গণেশের মুখ লাল হইয়া উঠিল, তীব্রস্বরে কহিল—দাদা অফিসার মানুষ কি না, সব কাজই চটপট শীগগির সেরে ফেলতে চান। আপনার ঘুমের বড় ব্যাঘাত হচ্ছে, না?

ডাক্তার মৃদুমন্দ হাসিতে লাগিলেন।

একে গজেনবাবুর মেজাজ খিটখিটে হইয়াই ছিল; তাহার উপর ডাক্তার সাহেবের সম্মুখেই এমন অপমান তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। হাঁকিয়া দরোয়ানকে কহিলেন—উস্‌কো কান পাকড়কে হিঁয়াসে নিকাল দেও।

গণেশ ব্যাঘ্রের মত হিংস্র হইয়া উঠিল, এবং এক মুহূর্ত্তে বিছানা হইতে নামিয়া প্রচণ্ড ঘুসি পাকাইয়া কহিল—গোটা পাঁচেক দরোয়ান আগে জোগাড় করে আনগে;—ও একটা আধটার কর্ম্ম নয়।

পিসিমা ক্ষীণস্বরে ডাকিলেন—গণশা! আমার কাছে আয়।

গণেশ পোষা কুকুরটির মত পিসিমার কাছে গিয়া বসিল।

ডাক্তার সাহেব গজেনবাবুকে কহিলেন—তোমার মায়ের আর বেশী দেরী নেই।

পিসিমা ডাকিলেন—গজেন! একবার আমার কাছে এস ত বাবা!

গজেনবাবু ডাক্তারের দিকে চাহিয়া অনুচ্চস্বরে কহিলেন—কি যে বলবে তার ঠিক নেই, মিছে জ্বালাতন করবে।

কথাটা ডাক্তার সাহেবের ভাল লাগিল না। তিনি অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া গেলেন।

পিসিমা ক্ষীণতর স্বরে ডাকিলেন—একটিবার এস বাবা, তোমায় শেষ দেখে যাই।

গজেন বিরক্তভাবে কাছে আসিলে, পিসিমা তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহার স্নিগ্ধ ছায়াময় চক্ষু দু'টি দিয়া যেন গজেনের সমস্ত আপদ মুছিয়া লইলেন।

গণেশের চক্ষু সিক্ত হইয়া উঠিল, সে রুদ্ধস্বরে কহিল—পিসিমা! আমায় কি তোমার কিছু বলবার নেই?

পিসিমা ক্ষীণ স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কহিলেন—তোকে আর মুখের আশীর্ব্বাদ কি করব, বাবা? আমার যা-কিছু পুণ্য তোকে অক্ষয় কবচের মত ঘিরে থাক্‌বে।

ডাক্তার সাহেব ব্যস্তসমস্ত ভাবে উঠিয়া টুপী খুলিয়া কহিলেন—গুড নাইট গণেশবাবু।" এবং গজেনবাবুকে সম্ভাষণ মাত্র না করিয়া বুকপকেট হইতে রুমালটা টানিতে টানিতে গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন।

গজেনবাবু অগ্রসর হইয়া কহিলেন—ডাক্তার মল্লিক, আপনার ভিজিট!

ডাক্তার সাহেব কর্ণপাত না করিয়া কোচ্‌ম্যান্‌কে কহিলেন চালাও।

(১৩)

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। তখনও চার-পাঁচটা চিতার আলোকে শ্মশানভূমি আলোকিত। দুই-তিনটা কুকুর দীর্ঘছায়া ফেলিয়া প্রেতের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। একটা সন্ন্যাসী গাঁজার কলিকায় অগ্নি সংযোগের জন্য চিমটাহস্তে একটা অর্দ্ধনির্ব্বাপিত চিতার নিকট বসিয়া আছে। সম্মুখে গঙ্গা বহিয়া চলিয়াছে। পাশের ঘাটে দুই-একটি করিয়া স্নানার্থী জড়ো হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

সকলে চলিয়া গিয়াছে; গণেশ তখনও পিসিমার চিতার দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল। তাহার চক্ষে অশ্রু ছিল না। তিন রাত্রি জাগিয়া তাহার চুলগুলো উস্কোখুস্কো, চোখদুটো রক্তবর্ণ,—সে যেন কি একটা স্বপ্ন দেখিতেছিল। সহসা উঠিয়া সে চাঁদনীর ভিতর হইতে জামাটা পরিয়া আসিল। পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া পিসিমার নির্ব্বাপিত চিতার কাছে গিয়া বসিল। খানিকটা ভস্ম তুলিয়া কাগজখানাতে মুড়িয়া সযত্নে জামার পকেটে রাখিয়া দিল। তারপরে আবার কি মনে করিয়া গাত্র হইতে জামাটা খুলিয়া একটা প্রজ্বলিত চিতার মধ্যে ফেলিয়া দিল। বারম্বার কাহার উদ্দেশে প্রণাম করিল; এবং পিসিমার চিতা হইতে মুঠা মুঠা ভস্ম লইয়া মাথায় এবং সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে লাগিল।

পশ্চাতে মধুর কণ্ঠে শব্দ হইল—দাদা!

এ কণ্ঠস্বর গণেশের পরিচিত, সে চমকিয়া উঠিল। পিছন ফিরিয়া দেখিল সদ্যঃস্নাতা অরুণা সুধীরের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

গণেশ কহিল—দিদি! আপনি এখানে? যদি কেউ দেখতে পায়?

অরুণা আকাশের দিকে হাত তুলিয়া কহিল—দেখ ভাই, ঐ অসংখ্য পাণ্ডুর তারাগুলি যাঁর চোখ, তাঁকে ছাড়া আর কাউকে আমি ভয় করি না। তুমি বাড়ী যাবে না?

গণেশ।—আপনি বাড়ী যেতে বলছেন,—কিন্তু সেখানে আমার আছে কি?

অরুণা।—কেন, তোমার সব কর্ত্তব্য কি শেষ করে' এসেছ?

গণেশ একবার মাত্র অরুণার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল; পরে কহিল—তবে একটু পরেই আমি যাচ্ছি। গঙ্গাস্নানটা সেরে নি।

উষার রক্তরাগ একটি স্নিগ্ধ মহিমার মত অরুণার মুখে আসিয়া পড়িল।

(১৪)

আজ এক বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিয়াও ভবেশবাবু তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিতে পারিলেন না। কন্যাকর্ত্তা পাত্র দেখিতে আসেন এবং পাড়া-প্রতিবেশীর নিকট ভবেশবাবুর কন্যা-সম্বন্ধে কানাঘুষা শুনিয়া সরিয়া পড়েন। কন্যাদায়প্রপীড়িত বঙ্গদেশে পুত্রের বিবাহ দেওয়াও যে এত কঠিন ভবেশবাবু পূর্ব্বে তাহা স্বপ্নেও অনুমান করেন নাই। দুই-একটি অরক্ষণীয়া কন্যার পিতা সকল কানাকানি উপেক্ষা করিয়া বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন বটে কিন্তু সুযোগ বুঝিয়া প্রত্যাশিত পণের পরিমাণ অত্যন্ত কমাইয়া দিলেন। ভবেশবাবু কন্যাপক্ষের এই অসঙ্গত প্রস্তাব কিছুতেই অনুমোদন করিতে পারিলেন না।

অরুণা সমস্তই দেখিল। পিতামাতার অসন্তোষ এবং বিরক্তি তাহার মর্ম্মে গিয়া বিঁধিল। সে আজ দেখিল সংসার একটা রক্তচক্ষু দানবের মত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। বুঝিল যে, এখানে সময়বিশেষে পরমস্নেহময়ী মায়ের হৃদয়ে পর্য্যন্ত দয়ামায়ার অভাব হইয়া থাকে। এতদিনে তাহার জ্ঞান হইল, শুধু আকাশের দেবতাকে ভয় করিয়া সংসারে থাকা চলে না। এখানে সমাজদেবতা এবং লোকদেবতার মন রাখিয়া না চলিলে পদে পদে বিভ্রাট ঘটে।

সেদিন সমস্ত গৃহকর্ম্ম শেষ করিয়া অরুণা দুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া ভাবিল। সহসা উঠিয়া একখানা কাগজ লইয়া লিখিল—

গণেশ দাদা,

বাড়ীর কাউকে কিছু না বলে' কাল ভোরেই আমি তীর্থে চল্লুম। কাল সকালে তুমি যখন এই চিঠি পাবে, তখন আমি অনেক দূর গিয়ে পড়ব। তুমি চিরদিনই আমার পাগলা ভাই; তোমায় না জানিয়ে চলে গেলে পাছে তুমি একটা পাগলামি করে বসো সেইজন্যেই তোমাকে জানালুম। তুমি আর-কাউকে একথা বোলো না।

তুমি কখনো আমার কোন কথা অমান্য করনি। আজ আমার শেষ অনুরোধটি এই যে, তুমি আমার খোঁজ করে মিছামিছি সময় নষ্ট কোরোনা। যে কাজগুলো দুজনে করবার কথা ছিল সেগুলো তোমাকে একাই করতে হবে। তুমি নিরাশ হলে চলবে না, আমি তোমার উপর অনেক ভরসা রাখি। যেদিন তোমায় প্রথম দেখি সেইদিনই আমার মনে হয়েছিল—হাঁ, পুরুষমানুষ বটে! তোমার মতন জীবন্ত লোকগুলি যদি সৎপথে থাকে তবেই আমাদের সোনার বাংলার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে। তুমি

দুঃখ কোরোনা,—আমার সঙ্গে আবার দেখা হবে।
ইতি— তোমার দিদি।

চিঠিখানা লিখিয়া অরুণা একখানা খামের মধ্যে পূরিয়া ঠিকানা লিখিল। সুধীরকে নিকটে দেখিয়া কহিল—বেশ করে পড়াশুনো করবি ত সুধীর?

সহসা এরূপ প্রশ্নে বালক একটু আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—আমিই ত দিদি আমাদের ক্লাশের ফাষ্ট বয়।

অরুণা।—দেখিস্ যেন কখনো সেকেণ্ড হস্‌নি। এই চিঠিখানা ডাকে দিয়ে আয় দেখি।

রাত্রি তখন প্রায় দ্বিপ্রহর। ভবেশবাবুদের বাড়ীর খিড়কী দরজা দিয়া একটি স্ত্রীলোক নিঃশব্দে বাহির হইল। পথে লোক ছিল না। রমণী দ্রুতপদে নিকটবর্ত্তী গঙ্গার ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইল। অন্ধকার রাত্রি, নির্জ্জন ঘাট, নিকটে কোথাও নৌকার আলোটি পর্য্যন্ত দেখা যায় না। শুধু গঙ্গার জল ছলছল রবে কোন্ অনন্ত তীর্থাভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে।

গণেশ এবং অনুপমা তখনও তাহাদের ছাদে বসিয়া গল্প করিতেছিল। সহসা গণেশ আকাশের দিকে অঙ্গুলি তুলিয়া কহিল—ঐ দেখ অনু, একটা তারা গঙ্গার বুকে খসে পড়ল!

শ্রীক্ষেত্রমোহন সেন।

মধ্যাহ্ন

আজি স্তব্ধ মধ্যাহ্নের অন্তরের মাঝে
নিখিল বিশ্বের গূঢ় মর্ম্মবীণা বাজে
বক্ষের গোপন তালে; নীরব, সুধীর;
মহান্ প্রণব জাগে মৌন সুগভীর।
একি তব অগ্নি-যোগ, হে মহা তাপস!
পিপাসী চকোর সম তোমার মানস
ফিরে কোথা ব্যোম-পথে! প্রখর কিরণ
অনল-রসনা মেলি' পরশে চরণ!
তৃপ্ত তব হিয়া আজি কোন্ সুধা পানে?
দীপ্ত ও আননখানি কার মহা ধ্যানে?
নিখিল ভুবন আজি তব পদকাছে
নীরব বচনহারা নত হয়ে আছে।
হেরি এ মূরতি তব, হে রুদ্র সুন্দর।
সম্ভ্রমে নমিয়া পড়ে আমার অন্তর।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

শ্রীবৃন্দাবন দর্শন

কিছুদিন বৃন্দাবনে বাসের ফলে যেসকল পবিত্র প্রাচীন স্মৃতিবিজড়িত স্থান, মন্দির, বন ও কুণ্ডাদি দর্শন করিয়াছি ও ব্রজবাসীদিগের নিকট এবং পুস্তকাদি হইতে তৎসম্বন্ধে বিবিধ তথ্য অবগত হইয়া ঐসকলের যেসমস্ত আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়াছি, তাহার অধিকাংশই অপ্রকাশিতপূর্ব্ব। এক্ষণে ঐসকল চিত্র যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ সহ পাঠকপাঠিকাগণকে উপহার দিতে অগ্রসর হইয়াছি।

মিউনিসিপ্যালিটী। বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়াই এতৎদেশীয় লোকের তথাকার মিউনিসিপ্যালিটীর কদর্য্য কার্য্যপ্রণালী সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। দুর্গন্ধময় আবর্জ্জনা, এমন কি মলমূত্র পর্য্যন্ত, পল্লীর প্রসিদ্ধ রাস্তার পার্শ্বে স্থানে স্থানে স্তূপীকৃত দেখিতে পাওয়া যায়। উহা মধ্যে মধ্যে পথের মাঝে ছড়াইয়া দিতেও দেখিয়াছি। আর বৃষ্টি হইলে ত কথাই নাই, ড্রেন না থাকায় ঐ-সকল ময়লা সমস্ত পথে বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। স্থান-মাহাত্ম্যে তথায় ঐ-সকল অস্পৃশ্য দ্রব্য রজে পরিণত হইয়া অতি পবিত্র অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও, স্বাস্থ্যতত্ত্বের হিসাবে উহার অপবিত্রতা অক্ষুণ্ণই থাকে এবং অনেক সময় যে কলেরা ও অন্য সংক্রামক ব্যাধিসকল ভীষণাকারে দেখা দেয় তাহার মূল কারণও উহাই বলিয়া অনুমিত হয়। এরূপ তীর্থস্থানে দেবালয়পার্শ্বস্থ পথগুলিতে রাত্রে যেরূপ আলোকের বন্দোবস্ত থাকা উচিত, সকল স্থানে তাহা নাই। মিউনিসিপ্যালিটীর আয় হয়ত যথেষ্ট না থাকাতেই এইসকল অভাব। কিন্তু লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া যেসকল মহাত্মা বহু মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন তাঁহারা এ বিষয়ে একটু লক্ষ্য করিলেই অচিরে সমস্ত অভাব দূর হইতে পারে।

পথ ঘাট। গ্রামের ভিতর সোজা প্রশস্ত খুব দীর্ঘ পথ না থাকিলেও অনতিপ্রশস্ত সদর রাস্তাগুলি নিতান্ত মন্দ নহে। কোন কোন গলিপথ বড় বড় পাথর ফেলিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে ছোট ইটের খাদ্‌রি করাও দেখিতে পাওয়া যায়। মথুরা হইতে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত যে পথ আছে উহা বেশ প্রশস্ত ও পরিষ্কার, কিন্তু

সন্ধ্যার পর হইতে এই পথ বিপদ-সঙ্কুল। সময় সময় দস্যু ডাকাতের ভয়ের জন্য সরকার রাত্রে ঐ পথে গমনাগমন বন্ধ করিয়া দেন। এই পথ শেষ হইয়া বৃন্দাবনের ভিতর প্রবেশ করিয়া যে পথ প্রথম পাওয়া যায়, উহা অতিশয় প্রশস্ত এবং উহাই গ্রামের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান রাস্তা। প্রধান পোষ্ট অফিষ, মিউনিসিপ্যাল অফিষ, থানা, গোবিন্দজীউর মন্দির ও শেঠেদের ঠাকুরবাটী প্রভৃতি ইহার পার্শ্বেই অবস্থিত।

শ্রীশ্রীরাধাগোপীজনবল্লভজীউ।

জলবায়ু ও প্রাকৃতিক দৃশ্য। বৃন্দাবনধাম একটি ছোট উপদ্বীপের ন্যায়, ইহার প্রায় তিন দিক যমুনার দ্বারা মেখলার ন্যায় পরিবেষ্টিত। আমি যখন গিয়াছিলাম তখন বর্ষাকাল। যমুনা কূলে কূলে ভরা, অতি প্রবলা স্রোতস্বতী। স্রোত অতি প্রখর হইলেও তরঙ্গ নাই, অতি প্রশস্ত, নৌকা ভিন্ন পারাপারের অন্য উপায় নাই। নৌকায় ভ্রমণে যমুনার একদিকে বহু উচ্চচূড় মন্দির, প্রাচীন দেবালয় এবং বৃহৎ ও সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট প্রস্তরনির্ম্মিত ঘাট প্রভৃতিতে শোভিত প্রাচীন নগরী এবং অন্য পারে কেবল হরিৎ বনরাজীশোভা, অতি মনোরম দৃশ্য। কেশী-ঘাট, বস্ত্রহরণঘাট, সূর্য্য-ঘাট, প্রভৃতি দেখিয়া স্বতই মনে হয় এই কি সেই শ্রীকৃষ্ণের পদস্পৃষ্ট পবিত্র স্নিগ্ধসলীলা যমুনা? তখন যে ভাবে হৃদয় ভরিয়া যায় তাহা বর্ণনা করিবার সাধ্য নাই।
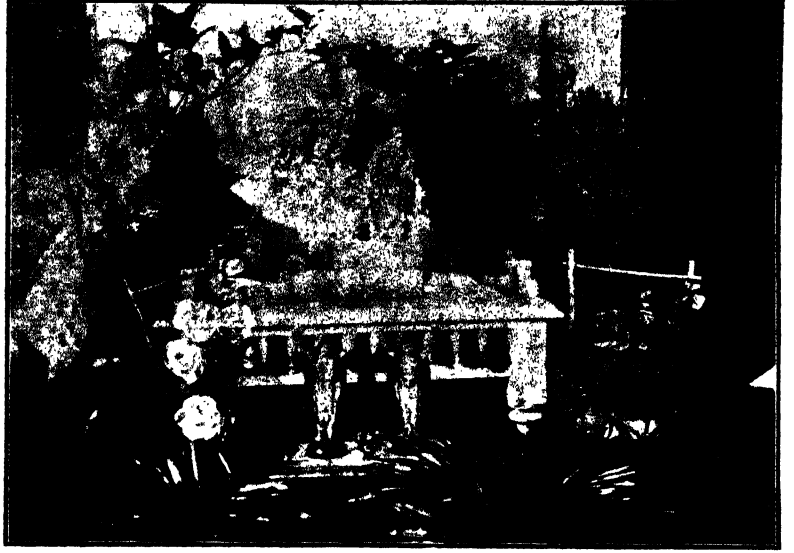
যমুনা-পুলিন।

নগরের মধ্যে,—প্রেমিক ভাবুকের চক্ষে অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যের অভাব নাই ইহা নিশ্চয়, কিন্তু সাধারণ চক্ষে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিশেষ নাই। শীত ও গ্রীষ্মের প্রভাব অত্যন্ত বেশী থাকায় ও তাদৃশ বৃষ্টি না থাকায় সবুজ তৃণ ও শাকসব্জীর একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। আর স্থলে কুকুর, বাঁদর, মশা এবং যমুনার জলে কচ্ছপ তথাকার বিশেষত্ব বলা যাইতে পারে।

বিস্তর কূপ থাকিলেও যমুনার জলই পানীয়ের প্রধান ভরসা, জলও গঙ্গাজলের ন্যায় সুমিষ্ট। কূপের জল

শ্রীগোবিন্দজীর পুরাতন মন্দির।

এইরূপ কিম্বদন্তি রাধারাণীর শ্রীচরণকমলে তেঁতুলের খোলা ফুটিয়া যাওয়ায় তাঁহার অভিসম্পাতে তেঁতুলগাছে ফল ধরিয়া পাকিবার পূর্ব্বেই শুকাইয়া যায়।

পটল, আমড়া, চালদা, তাল, আনারস, নারিকেল, রম্ভা, বাতাবি লেবু আদৌ পাওয়া যায় না। বেদানা, দালিম, আঙ্গুর, নাসপাতি প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। মৎস্য, মাংস বৃন্দাবনের মধ্যে পাওয়া যায় না, বা কোন হিন্দু ব্যবহার করেন বলিয়া শুনি নাই। এখানে দরিদ্রের পক্ষে মোটামুটি আহারীয় সুলভ।

বেশ পরিষ্কার হইলেও অধিকাংশ কূপের জলের আস্বাদন ভাল নয় তবে স্থানে স্থানে বেশ সুস্বাদুজল-পূর্ণ ইন্দারা আছে, তাহার জল অনেকেই পানার্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। এদেশের মত পুষ্করিণী তথায় নাই, কতকগুলি অতি প্রাচীন, পাথরে-বাঁধান বৃহৎ কুণ্ড আছে, তাহার সেই সবুজ অল্পজল অতি পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইলেও মনুষ্যের পানীয়-রূপে ব্যবহৃত হইবার অযোগ্য। জলবায়ু বিশেষ স্বাস্থ্যকর বলিয়া প্রসিদ্ধ না থাকিলেও, বিশেষ অস্বাস্থ্য-কর নহে। তথায় ম্যালেরিয়া প্রায় নাই বলিতে পারা যায়, কিন্তু পেটের পীড়ার প্রাদুর্ভাব কিছু অধিক।

শ্রীমদনমোহনজীর পুরাতন মন্দির।

শাকসব্জী ও আহারীয়। দুগ্ধ, ঘৃত, দধি, ক্ষীর, লাড়ু, পেড়া প্রভৃতি এখানে সস্তা এবং উৎকৃষ্ট পাওয়া যায়। ময়দা, চাউল, তৈল প্রভৃতি উৎকৃষ্ট না পাওয়া যাইলেও যাহা পাওয়া যায় তাহা বাংলা দেশ অপেক্ষা সস্তা। কিন্তু আমাদের পরিচিত শাকসব্জীর মধ্যে ঢ্যাঁড়শ, বিলাতীকুমড়া, কচু, কাঁকুড়ই প্রধান সম্বল। তেঁতুল-গাছ তথায় অনেক দেখিতে পাওয়া যাইলেও, তেঁতুল পাওয়া যায় না।

চৌর্য্য মদ্যসেবন প্রভৃতি অপকর্ম্ম। কোন্ প্রধান তীর্থ আর এ সকল হইতে বঞ্চিত? তবে ইহা দৃঢ়ভাবে বলা যায়, অন্য তীর্থের তুলনায় এখানে এসকল বেশী ত নয়ই বরং অনেক কম। বিলাসিতাও এখানে বিশেষভাবে স্থান পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অনেক লোকই এখানে চর্ম্মপাদুকা ব্যবহার করেন না।

স্থানীয় অধিবাসী এবং তাহাদের প্রকৃতি ও শিক্ষা। বৃন্দাবনে ব্রজবাসী অপেক্ষা বাঙালী বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর

লালা বাবুর মন্দির।

সংখ্যা অধিক বলিয়া অনুমিত হয়। মনে হয় যাহাদের এ দেশে কোন-না-কোন কারণে স্থান নাই, বা অনন্ত শোক, দুঃখে যাঁহাদের সংসার অসহনীয় হইয়াছে এমন লোকই তথায় অনেক; কিন্তু শ্রীভগবানের অশেষ কৃপাবলে তন্মধ্যে এখন অনেকে মহাপুরুষ, ত্যাগের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া মনে হয়।

ব্রজমণ্ডলের যাঁহারা প্রকৃত অধিবাসী তাঁহাদিগের নাম ব্রজবাসী, তাঁহারা ধীরপ্রকৃতি, সদালাপী এবং ব্যবহার সৌজন্যপূর্ণ, কিন্তু বেশ সাহসী বলিয়া মনে হয় না। ইঁহাদের শিক্ষা সাধারণতঃ সামান্য এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন খুবই কম। ইঁহারাই তথাকার পাণ্ডা, তীর্থপুরোহিতের কার্য্য করিয়া থাকেন এবং অধিকাংশ যাত্রীদের প্রধান অবলম্বন, কিন্তু অনেকেই সময় সময় যাত্রীদের নিকট জুলুম করিয়া অর্থসংগ্রহ করিতেও ছাড়েন না।

সেখানে উপস্থিত যেসকল খ্যাতনামা ভক্ত ও পণ্ডিত বাস করিতেছেন তন্মধ্যে অধিকাংশই বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত। এখানকার সমগ্র অধিবাসীগণের, সেবা ও অহিংসা প্রধান ধর্ম্ম।

ব্রজবাসী বালকদিগের শিক্ষার্থে পাঠশালা যে-কয়টি আছে তন্মধ্যে প্রেম-মহাবিদ্যালয় প্রধান। এই স্থানে হিন্দী, উর্দু, ইংরেজি ও সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে এবং নানাপ্রকার শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বিদ্যালয় ও এতৎসংলগ্ন ছাত্রাবাস সমস্তই হাথরাসের রাজার প্রকাণ্ড বাটীতে অবস্থিত এবং তাঁহারই ব্যয়ে চলিতেছে। এখানে যেসকল দাতব্য চিকিৎসালয় আছে তাহার মধ্যে শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ-সেবাশ্রম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।
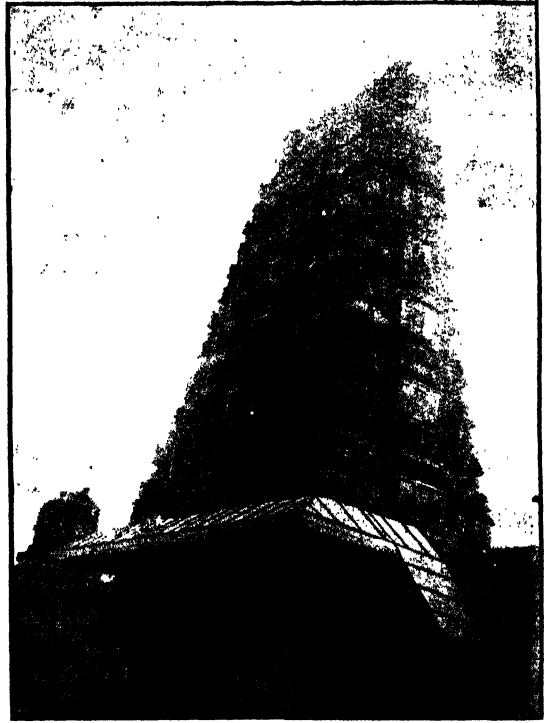
শেঠের ঠাকুর-বাটীর দ্বিতীয় প্রবেশদ্বারের উপরকার চূড়া।

সেখানকার রমণীগণের প্রকৃতি ও ভাব মধুর। সেই-সকল বিশালায়তলোচনা রূপলাবণ্যময়ী ব্রজরমণীগণকে দর্শন করিলে মনে হয় প্রকৃতই তাঁহারা যেন বাংলা দেশের রমণী হইতে কিছু স্বতন্ত্র।

মন্দির ও দেবালয়াদি। ব্রজধামে অন্যূন ছয় সহস্র দেবালয় ও তন্মধ্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি বিরাজিত আছে

সাহাজির মন্দিরের বারান্দায় পাকান শ্বেত পাথরের থাম।

শ্রীবৃন্দাবনে যে সোনার তালগাছের কথা শুনা যায়, উহা অনুমানিক প্রায় ৪০ হাত উচ্চ সুবর্ণমণ্ডিত এক গড়ুরস্তম্ভ, উহা এই মন্দিরপ্রাঙ্গণেই অবস্থিত আছে। এই দেবালয়ের ভিতর একটি চতুর্দ্দিক বাঁধান সরোবর আছে। ইহা খুব বৃহৎ না হইলেও এত বড় সরোবর তথায় অতি অল্পই আছে।

এই মন্দির নির্ম্মাণের ব্যয় সম্বন্ধে একজন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন ৪৫ লক্ষ টাকা, অন্য লেখক লিখিয়াছেন ৩ কোটী টাকা। আমাদের কল্পনা করিবারও ক্ষমতা নাই যে এই মন্দির নির্ম্মাণের ও সমস্ত আসবাবপত্রের ব্যয় কত। এই মন্দিরের অতি নিকটেই একটি সুন্দর
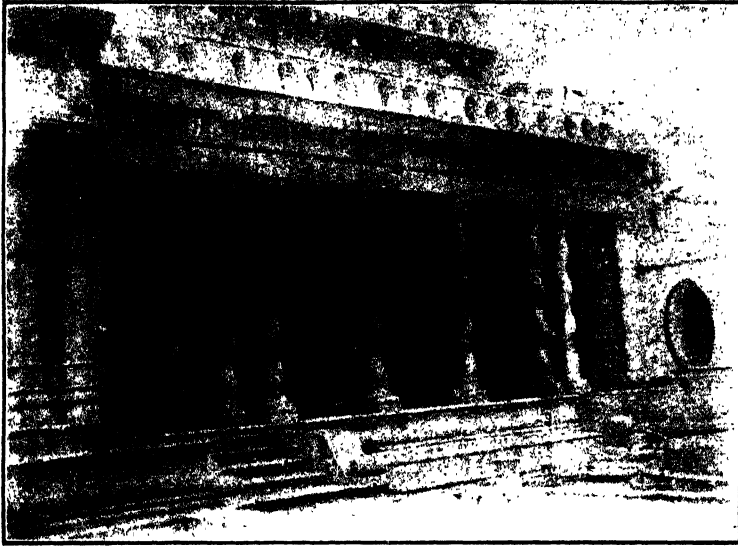
এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে শ্রীগোবিন্দ, শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীরাধারমণ, শ্রীগোকুলানন্দ, শ্রীরাধাদামোদর, ও শ্রীশ্যামসুন্দরের কয়টি মন্দিরই সাত দেবালয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে এবং এইগুলিই প্রধান।

উক্ত সকল দেবালয় ভিন্ন অপেক্ষাকৃত আধুনিক অনেক বৃহৎ ও সুন্দর সুন্দর দেবালয় আছে, তাহার মধ্যে শেঠেদের ঠাকুরবাটী, সা-জীর মন্দির ও লালাবাবুর মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শেঠেদের কীর্ত্তিসকল না দেখিলে উহাদের অতুল অর্থব্যয়ের কল্পনা করা যায় না। উহাদের দেবালয় ও তন্মধ্যস্থিত স্বর্ণ-রৌপ্য-রাশি, উদ্যান প্রভৃতি সকলই এক অসাধারণ ব্যাপার, না দেখিলে তাহার ধারণা করা অসম্ভব। সমগ্র মন্দির বা দেবালয়টি এত বৃহৎ, উচ্চ ও এরূপ-আকারবিশিষ্ট যে উহা একটি সুরক্ষিত লোহিতপ্রস্তর-নির্ম্মিত কেল্লার ন্যায় মনে হয়। দুই দিকের দুইটি দ্বিতীয় প্রবেশদ্বারের উপর অতি উচ্চ চূড়া আছে, তাহাতে বহু দেবদেবীর ও অন্যান্য মূর্ত্তি আছে। তদ্ভিন্ন আরও কয়েকটি উচ্চ চূড়া আছে। অভ্যন্তরে শ্রীরঙ্গজীর মূর্ত্তি বিরাজিত।

সাহাজির মন্দিরমধ্যস্থ বাসন্তী গৃহের কিয়দংশ।

সুবৃহৎ বাটী ও তৎসংলগ্ন বৃহৎ বাগান আছে; উহা সান্ধ্য ভ্রমণের পক্ষে একটি রমণীয় স্থান। যমুনাতীরে "যমুনাবাগ" নামে মথুরায় উঁহাদের আর-একটি উদ্যান আছে, তাহা ইহা অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। এই-সকলের উপস্থিত মালিক কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত লছমি চাঁদ রাধাকিশন।

শ্রীশ্যামকুণ্ড।

আধুনিক মন্দিরগুলির মধ্যে ইহার পরই সা-জীর মন্দির। ইহার আকার ও আনুসঙ্গিক সকলই শেঠেদের মন্দিরের তুলনায় অনেক হীন হইলেও সৌন্দর্য্যে ইহাকেই লোকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন। বাস্তবিকই ভিতর ও বাহির সমস্ত কারুকার্য্যময় শ্বেতমর্ম্মরে মণ্ডিত, বারান্দায় শ্বেত পাথরের পাকান থামগুলি দেখিয়া, আর সেই ঝুলনের সময় সহস্র আলোক ও বহু ফোয়ারায় পূর্ণ, শ্বেতপুষ্পমাল্যে শোভিত সৌগন্ধে আমোদিত "বাসন্তীগৃহ" ও তন্মধ্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি বিরাজিত ও অন্যান্য সুসজ্জিত গৃহগুলির স্বর্গীয় শোভা দেখিয়া কে-না মোহিত হইবেন? মনে হয় ইহা বুঝি কোন স্বপ্নরাজ্য।

শ্রীরাধাকুণ্ডের অপর পার্শ্ব।

এই মন্দির লক্ষ্ণৌনিবাসী শাহ বিহারীলাল ও তৎপুত্র কুন্দনলাল প্রস্তুত করাইয়া শ্রীরাধারমণ নামক বিগ্রহ স্থাপন করেন। মন্দিরের প্রথম সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় সোপানের ঠিক উপরে মর্ম্মর-মণ্ডিত মেঝের উপরে বিভিন্ন বর্ণের প্রস্তর সংযোগে মন্দিরের অধিকারী বিহারীলাল করযোড়ে স্ত্রী, পুত্র, পৌত্রাদি লইয়া বসিয়া রহিয়াছেন তাহার চিত্র আছে। উহা ঠিক পথের উপর থাকায় লক্ষ লক্ষ লোক দেখিয়া বা না-দেখিয়া পদদলিত করিয়া যাইতেছে। এই চিত্রে অঙ্কিত মহাত্মাদের নিরভিমান দৈন্যভাব দেখিয়া মনে হইল ইঁহারাই প্রকৃত বৈষ্ণব।

এই চিত্রের কিছুদূরে বিহারীলালের কামদারের (প্রধান কর্ম্মচারী) একটি চক্ষুহীন ছবি আছে। কথিত

নিধুবন।

এই অত্যুচ্চ বৃহদায়তন মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এই মন্দির-চূড়ার শীর্ষে তখন প্রতিদিন বৃহৎ প্রদীপ দেওয়া হইত। একদা দিল্লির প্রাসাদ হইতে বাদসাহ ঔরঙ্গজেব এই আলোক দর্শন করিয়া যখন ইহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে এই আলোক বৃন্দাবনে কোন হিন্দুমন্দিরে দেওয়া হয়, তখন হিন্দুর মন্দির বাদসার প্রাসাদ অপেক্ষা উচ্চ, ইহা তাঁহার অসহ্য হওয়ায় তিনি অচিরে উহা ভাঙ্গাইয়া দিলেন। এবং ঐ সঙ্গে শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীমদনমোহনের মন্দিরও শ্রীভ্রষ্ট করিয়া দেন। এক্ষণে যে যে মন্দিরে এই তিন বিগ্রহের

শ্রীগোবর্দ্ধন।
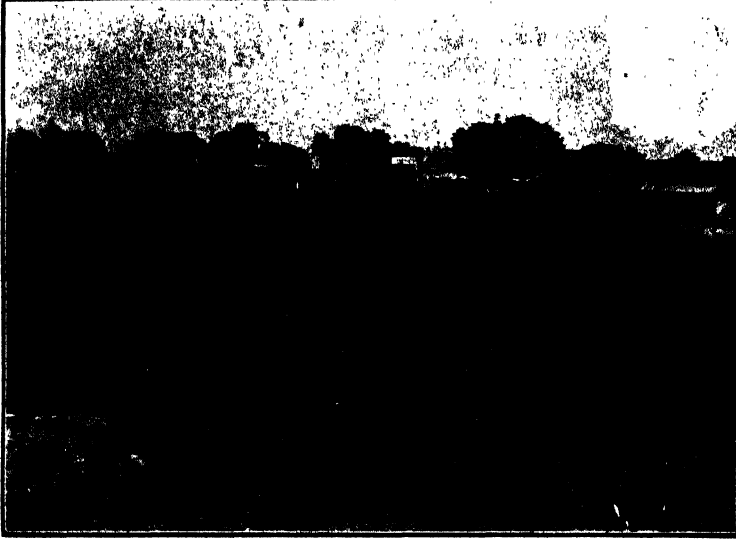
আছে ঐ কামদার মন্দির নির্ম্মাণের সময়ে বহুব্যয়ে মন্দিরের বাহিরের শ্বেত প্রস্তরের স্তম্ভ ও অন্যান্য কাজগুলির পরিবর্ত্তে অন্য কোন অল্পমূল্যের প্রস্তর দিবার জন্য মালিককে পরামর্শ দিয়াছিলেন, এই কারণে মন্দির নির্ম্মাণ হইলে কামদার তাহা দেখিতে পারিবেন না বলিয়া মালিক চিত্রে তাঁহার চক্ষু অন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

আকার ও সৌন্দর্য্যে এইসকল মন্দির শ্রেষ্ঠ হইলেও স্থাপত্যসৌন্দর্য্যে গোবিন্দজীর পুরাতন প্রস্তরনির্ম্মিত সুবৃহৎ মন্দিরটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অধুনা ইহার পূর্ব্বশ্রী লোপ পাইলেও এখনও বুঝিতে পারা যায় ইহা একটি অলৌকিক কারুকার্য্যসম্পন্ন অত্যুচ্চ প্রাচীনকীর্ত্তি ও শিল্পের নিদর্শন। শুনিতে পাওয়া যায় এ ভাবের হিন্দুমন্দির উত্তরভারতে আর নাই এবং ভারতবর্ষের অন্যত্রও প্রায় দেখা যায় না। ইহা পূর্ব্বে অতি উচ্চ ছিল। কিম্বদন্তি এইরূপ, প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মা মানসিংহ

সেবা হইতেছে উহা প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে ২৪-পরগণা-নিবাসী স্বনামধন্য জমিদার নন্দলাল বসু মহাশয়ের দ্বারা নির্ম্মিত হয়। ইহা ভিন্ন নন্দলালবাবু আর একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে শ্রীরাধাগোবিন্দ নামে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত মন্দির "হাড়াবাড়ী" নামে পরিচিত।

এই মন্দিরত্রয় ভিন্ন বহু বাঙ্গালী ভক্তের প্রতিষ্ঠিত আরও অনেক মন্দির আছে, তন্মধ্যে পাইকপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ লালাবাবুর (মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ) মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার আকারও বৃহৎ এবং সুন্দর। শুনিতে পাওয়া যায় প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা এই মন্দির নির্ম্মাণে ব্যয় হইয়াছিল। ইহাই বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত প্রথম মন্দির। ইহাতে মহারাজ নিজনামে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নামে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রাচীন মন্দিরের মধ্যে মদনমোহন দেবের পুরাতন মন্দিরও অতি প্রসিদ্ধ। ইহার সৃষ্টিকৌশল ও সৌন্দর্য্য দেখিয়াও আমাদের প্রাচীন প্রস্তরশিল্পের উন্নত অবস্থা কল্পনা করিতে পারা যায়। এই মন্দির ও গোবিন্দজীর পুরাতন মন্দির উভয়ই উচ্চ টীলার উপর নির্ম্মিত থাকায় বহুদূর হইতে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।
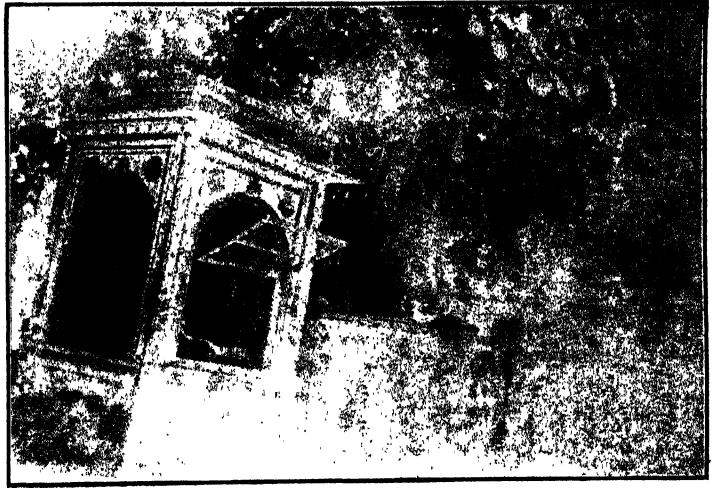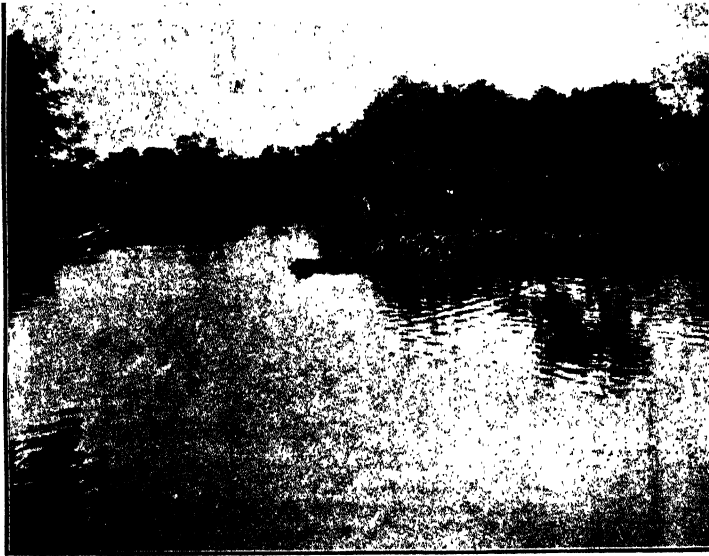
বংশী বট।

মানসী গঙ্গা।

মুসলমান সম্রাট কর্ত্তৃক বিনষ্ট আর একটি প্রস্তরনির্ম্মিত পুরাতন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আজিও ধরণীপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহা উচ্চতায় ও আকারে খুব বৃহৎ না হইলেও সৌন্দর্য্যে উল্লিখিত দুইটি অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। ইহা শ্রীরাধাবল্লভজীর পুরাতন মন্দির। এই মন্দিরগাত্রে একখণ্ড কাষ্ঠে এই বিজ্ঞাপন লেখা আছে, "কেহ মন্দিরের কোন অনিষ্ট করিলে তিন মাস পর্য্যন্ত মেয়াদ হইতে পারিবে।"

এইসকল ভিন্ন আরও বহুসংখ্যক বৃহৎ দেবালয় আছে। ঐসকলও প্রস্তর-নির্ম্মিত এবং বিবিধকারুকার্য্যসম্পন্ন, কিন্তু আকার প্রায় এদেশের দালান-সমেত ঠাকুরবাটীর ন্যায়, চূড়াবিশিষ্ট মন্দিরের মত নহে। এইগুলির মধ্যে রাধারমণ, শ্যামসুন্দর, বঙ্কুবিহারী, শাহজাঁহাপুরের মন্দির, রাধাবল্লভ, মদনমোহন ও গোবিন্দজীর নূতন মন্দির, ব্রহ্মচারীর মন্দির প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন তথায় প্রায় সকল হিন্দুরাজার প্রতিষ্ঠিত মন্দির আছে, সকলের উল্লেখ বা বর্ণনা একপ্রকার অসম্ভব।

বিগ্রহসকলের প্রকটকাল। ঠিক কোন সময় কাহার দ্বারা কি প্রকারে কোন সেবা প্রকট হয় তাহার সকল তথ্য সংগ্রহ করা সুকঠিন। সপ্তদেবালয়ের বিগ্রহগণের প্রথম
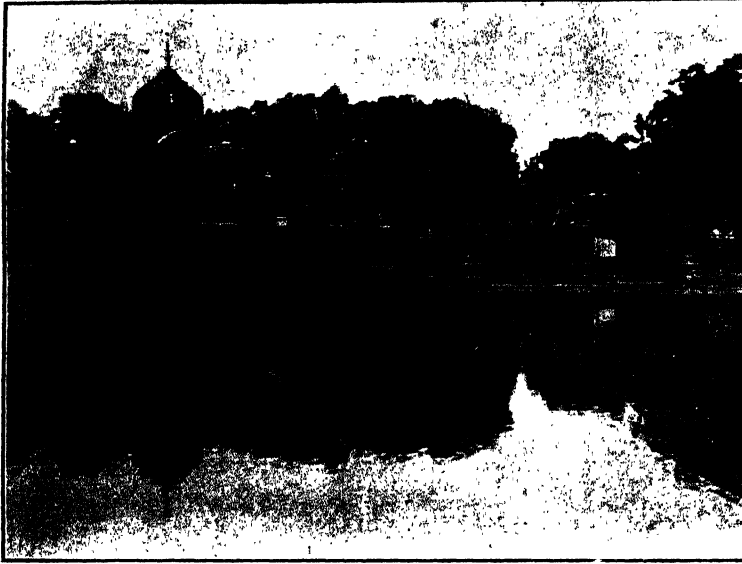
কুসুম-সরোবরের পার্শ্বস্থ উদ্যান ও মন্দিরাদি।

অন্যান্য দেবদেবী। শ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেবা ভিন্ন অন্য দেবদেবীর পূজা বৃন্দাবনে বিশেষ প্রচলিত নাই। অন্য দেবতার মধ্যে প্রধানতঃ গোপী-শ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন, গোবিন্দ দেবের মন্দিরের পার্শ্বে যোগমায়াদেবী ও বেলবনে লক্ষ্মীদেবী আছেন এবং প্রত্যহ পূজা হইয়া থাকে। সমগ্র ব্রজমণ্ডলের মধ্যে অবশ্য আরও কতিপয় মহাদেবমূর্ত্তি, বলদেবমূর্ত্তি এবং বৃন্দাদেবী, কাত্যায়নী দেবী প্রভৃতির মূর্ত্তি আছে।

বন ও কুণ্ডাদি। বহু বন উপবন লইয়াই ব্রজধামের সৃষ্টি, তন্মধ্যে তালবন, মধুবন, বৃন্দাবন, কাম্যবন প্রভৃতি দ্বাদশ বনই প্রধান। সুপ্রসিদ্ধ নিধুবন ও নিকুঞ্জবন বৃন্দাবনের ভিতরেই অবস্থিত এবং ইহার মধ্যেই ললিতাকুণ্ড ও বিশাখাকুণ্ড বিরাজিত। এই দুইটি বন এখন একপ্রকার গাছে পরিপূর্ণ, উহার ডালগুলি মৃত্তিকাসংলগ্ন, ইহাকেই লোকে মুক্তালতা বলিয়া থাকেন। নিধুবনে বঙ্কুবিহারীর

প্রকাশ সম্বন্ধে বহুগ্রন্থে অনেক ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা স্থানাভাবে বাহুল্যভয়ে এ স্থানে উল্লেখ করিলাম না। এইসকল হইতে যাহা অবগত হইতে পারা যায় তাহাতে বুঝা যায় মদনমোহন-জীর সেবা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং তৎপরে গোবিন্দজী ও গোপীনাথের সেবা প্রকট হয়। কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র ব্রজনাভ কর্ত্তৃক তাঁহার মাতৃ-আদেশে যে তিন মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয় ইহা তাহাই এবং বহুকাল ভূগর্ভে প্রোথিত থাকার পর গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাত্মা শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ-গোস্বামী ও মধুপণ্ডিত শ্রীভগবান কর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইলে স্থাপিত হয়। কিন্তু আসল বিগ্রহ-সকল মুসলমানদের অত্যাচারের জন্য যখন জয়পুরে পাঠান হয়, তাহার পর হইতে সেই স্থানেই আছেন। এগুলি জয়পুরাধিপতি কর্ত্তৃক তাঁহাদের অনুরূপ মূর্ত্তি প্রেরিত হইয়া এখানে স্থাপিত হয়।
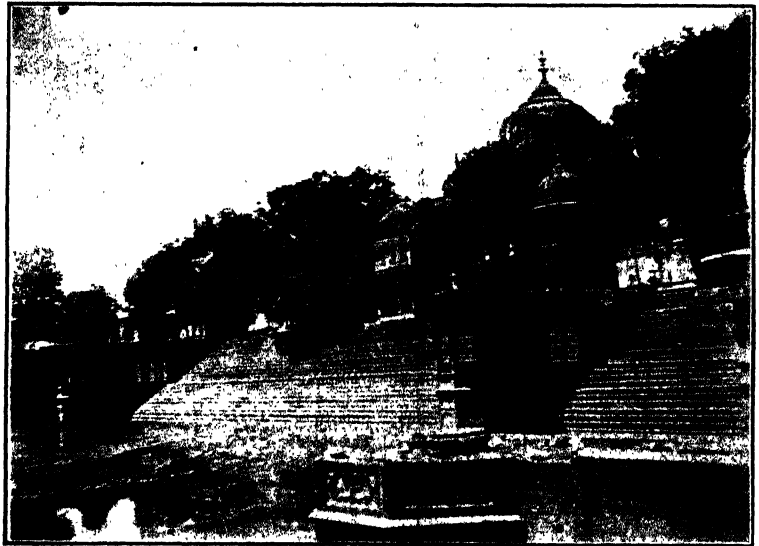
কুসুম-সরোবরের তীরে ভরতপুরের রাজার সমাধি-মন্দির।

চৈতন্য দেবের সাধন-কুটির।

সেবা-স্থাপনকারী সিদ্ধ হরিদাস স্বামীর একখানি চিত্র আছে।

নিকুঞ্জবনে প্রবেশ করিয়া ঠিক দক্ষিণে একটি শ্যাম তমাল-বৃক্ষ আছে, তাহার নানাস্থানে দেখিলে মনে হয় বুঝি শালগ্রাম-শিলা-সকল বসান রহিয়াছে। যাত্রীগণ পরম ভক্তিভরে এই গাছটি দর্শন ও স্পর্শ করিয়া থাকেন।

বৃন্দাবনের মধ্যে ব্রহ্মকুণ্ড প্রসিদ্ধ। সমগ্র ব্রজের মধ্যে নব্বইটি কুণ্ড আছে। প্রায় সকল কুণ্ডেরই জল এক্ষণে অতি অপরিষ্কার। তথাপি শুনিতে পাওয়া যায় এমন মহাত্মা অনেক আছেন, যাঁহারা এখনও এই জল অতি পবিত্র বিবেচনা করিয়া পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া থাকেন। অধিকাংশ কুণ্ডই অতি অল্পপরিসর ও অত্যন্ত গভীর, এমন কি কোন কোনটি একটি বৃহৎ কূপের মত দেখায়। এই কুণ্ডসকলের উৎপত্তির বিবরণ ও স্নানের ফল বেশ কৌতূহলোদ্দীপক, কিন্তু বাহুল্যভয়ে তাহা বলিতে বিরত থাকিলাম।

সমস্ত কুণ্ডগুলির মধ্যে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডই প্রধান। ব্রজধামের মধ্যমণি শ্রীরাধা এই স্থানে জলক্রীড়া করিতেন। এই দুই কুণ্ডের আকার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং ইহারও চতুর্দ্দিকে প্রস্তর-সোপান শোভিত এবং অধিকাংশ কুণ্ডের ন্যায় জল অতি অপরিষ্কার। কুণ্ডের নামে গ্রামের নাম শ্রীরাধাকুণ্ড হইয়াছে, ইহা বৃন্দাবন হইতে প্রায় ২২।২৩ মাইল দূরে। এই স্থান অতি পবিত্র, কুণ্ডের চারিপার্শ্বে অনেক ত্যাগী সাধু, বৈষ্ণবের বাস। ইহার তীরে মহাত্মা জীব গোস্বামীর ক্ষুদ্র ভজনকুটীর আজিও জীর্ণাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় এবং কুণ্ডদ্বয়ের পুনরুদ্ধারকর্ত্তা মহাত্মা রঘুনাথ দাস গোস্বামী মহাশয়ের
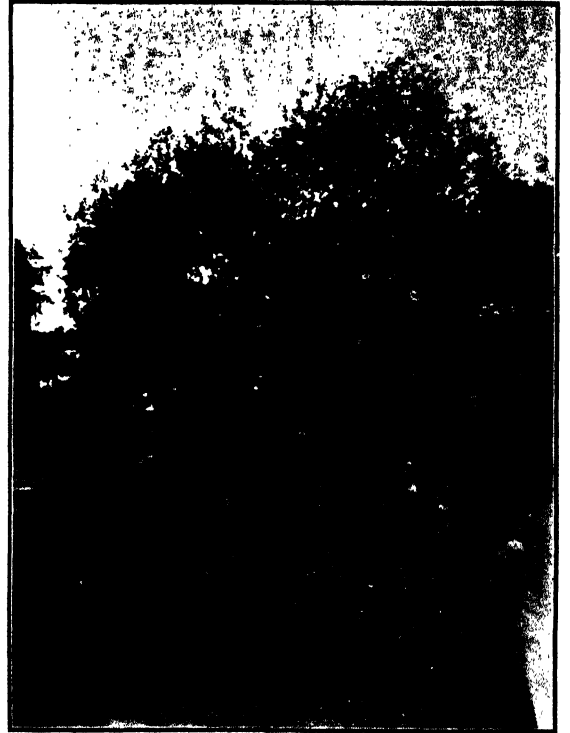
অদ্বৈত বট।

সমাধি, পাবনঘাটের উপর আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। কালের প্রভাবে রাধাশ্যামকুণ্ড লুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, কথিত আছে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যখন তীর্থপর্য্যটনে এই স্থানে আইসেন তখন কুণ্ডের চিহ্নও ছিল না, তিনি এখানকার মৃত্তিকা লইয়া তিলকসেবা করিয়াছিলেন।

রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সমাধি।

বৃন্দাবনের ন্যায় এখানেও গোবিন্দ, গোপীনাথ প্রভৃতির মন্দির আছে ও সেবা হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ "গোপকূপ" এই স্থানে আছে, এই কূপের জল অতি সুশীতল ও সুমিষ্ট। বৃন্দাবন অপেক্ষা এই মনোরম স্থানটি অনেকটা নির্জ্জন এবং মহাতীর্থস্থান বলিয়া অনেক মহাপুরুষ এখানে জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত কঠোর ভজনানন্দে অতিবাহিত করিয়া থাকেন।

মহাত্মাদিগের সমাধিস্থান। চৌষট্টি মহান্তের সমাধি-ক্ষেত্র বৃন্দাবনের মধ্যে একটি দর্শনীয় স্থান। ইহা শেঠের ঠাকুরবাটীর অতি সন্নিকটে অবস্থিত একটি প্রাচীনকালের সাধারণ সমাধিস্থান। নিতান্ত দুঃখের বিষয় এক্ষণে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টির অভাবে ক্রমে সমাজগুলি নষ্ট হইবার উপক্রম হইতেছে। এই স্থানে বহু খ্যাতনামা বৈষ্ণবগণের ক্ষুদ্র বৃহৎ সমাধি বর্ত্তমান থাকিলেও রূপ সনাতন গোস্বামী মহাশয়গণের প্রকৃত সমাধি বৃন্দাবনের অন্যত্র বিদ্যমান আছে, যথা—রূপ ও জীব গোস্বামীর এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সমাধি রাধাদামোদর জিউর মন্দিরের পশ্চাতে, গোপালভট্ট গোস্বামীর সমাজ রাধারমণ জীর মন্দিরের পার্শ্বে, সনাতন গোস্বামীর সমাজ মদনমোহন জিউর মন্দিরের পশ্চাতে, শ্যামানন্দ গোস্বামীর সমাজ শ্যামসুন্দর জিউর মন্দিরের পূর্ব্বে, লোকনাথ গোস্বামীর ও নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের সমাধি গোকুলানন্দ জিউর মন্দিরের নিকট, শ্রীনিবাস আচার্য্য ও তাঁহার কন্যা হেমলতা দেবীর সমাধি আচার্য্যপ্রভুর কুঞ্জে।

নরোত্তম দাস ঠাকুরের সমাধি।

অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান। ব্রজধামের মধ্যে ভক্ত প্রেমিকের চক্ষে কোন্‌টি দ্রষ্টব্য নয়, প্রকৃত পক্ষে তাহাই নির্ণয় করা সুকঠিন। তথায় সকলই দেখিবার, সকল স্থানেই শ্রীকৃষ্ণের লীলাচিহ্ন এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। তথাপি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিতে হইলে পূর্ব্বলিখিত বিষয়গুলি ভিন্ন এইগুলি সকলের দেখা উচিত—

কেশীঘাট,—এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ কেশী নামক দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন।

জীব গোস্বামী ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সমাধি।

ধীরসমীরণ,—ইহা এক্ষণে একটি মন্দির ও কতকগুলি জীর্ণ বাসভবনের সমষ্টিমাত্র দেখিলাম। ধীরসমীরণের বিশেষত্ব আমার মনে বা দেহে কিছু উপলব্ধি করিতে পারি নাই।

যমুনাপুলিন,—ইহা লালাবাবুর মন্দিরের নিকট যমুনাতীরে অবস্থিত। এই স্থানে রজে গড়াগড়ি দিলে জীবন জন্ম সার্থক হয়। ইহা শ্রীরাধাকৃষ্ণের রাসলীলার স্থান।

গোবর্দ্ধন,—গিরিরাজ গোবর্দ্ধন ও যমুনা ইহাই এখনো প্রত্যক্ষ রহিয়াছে। গোবর্দ্ধন দিনে দিনে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে একটি অনুচ্চ ক্ষুদ্র গিরিমাত্র হইয়াছে। কালে হয়ত ইহাও লুপ্ত হইয়া তখন গিরিরাজ এই স্থানে ছিলেন
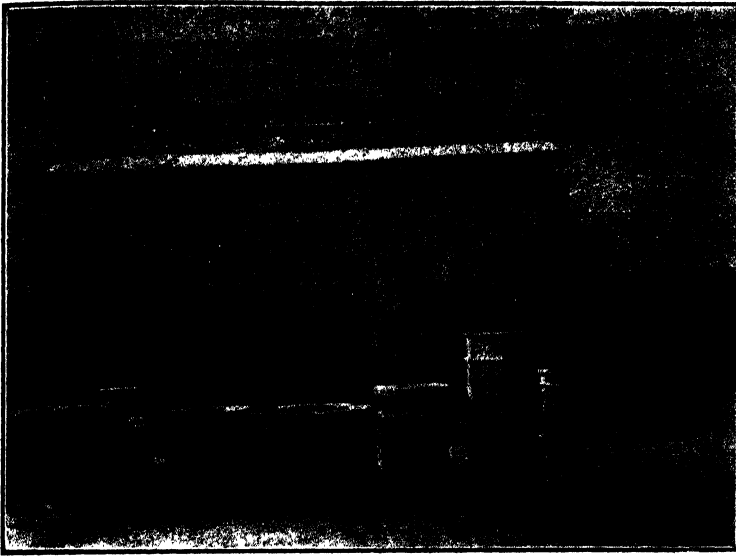
বংশীবট—এই স্থানে একটি বটবৃক্ষ আছে, কথিত আছে এই স্থানে শ্রীরাধাকৃষ্ণ বংশী বাজাইয়া মহারাস করিয়াছিলেন।

কালীয়হ্রদ,—এই হ্রদে শ্রীকৃষ্ণ কালীয়নাগকে নির্য্যাতন করিয়াছিলেন। এই স্থানে একটি অতি বৃহৎ কেলিকদম্বের গাছ আছে, পাণ্ডারা বলিয়া থাকেন এই তরু শ্রীকৃষ্ণের লীলার সময়ের। এই হ্রদে এক্ষণে কেবল বর্ষার সময় সামান্য জল থাকে।

কালীয়হ্রদের অল্পদূরে মদনমোহন জিউর পুরাতন মন্দিরের নিকট একটি উচ্চ টিলার উপর এক বৃহৎ নিম্ব-বৃক্ষের তলে এক ক্ষুদ্র গৃহ আছে। কথিত আছে চৈতন্যদেব যখন সনাতন গোস্বামীকে বৃন্দাবনে পাঠান, তখন বলিয়া দেন তাঁহার ভজনের জন্য একটু স্থান ঠিক করিয়া রাখিতে। গোস্বামী মহাপ্রভুর জন্য এই স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখেন এবং পরে তিনি এই কুটীরের মধ্যে ভজনা করিয়াছিলেন। এই টিলা হইতে অধুনালুপ্ত কালীয়হ্রদের স্থানটি বেশ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

অদ্বৈতবট,—ইহাও মদনমোহন জীর পুরাতন মন্দিরের অতি নিকটে। জনশ্রুতি অদ্বৈত প্রভু এই তরুমূলে বসিয়া ভজন করিয়াছিলেন। •

গোপাল ভট্ট গোস্বামীর সমাধিস্থান।

বলিয়া প্রদর্শিত হইবে। বৈষ্ণবগণ বলিয়া থাকেন ইহাই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, ইহাতে তাঁহার পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে। গোবর্দ্ধন বৃন্দাবন হইতে প্রায় ১৮৷১৯ মাইল।

মানসী গঙ্গা,—ইহা গোবর্দ্ধনের অন্তর্গত একটি দীর্ঘ দীর্ঘিকা। এইরূপ প্রবাদ আছে গোপরাজ নন্দের গঙ্গা-স্নানের ইচ্ছা হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ ইহার সৃজন করেন। ইহা পরম রমণীয় হ্রদ, চতুর্দ্দিকে পাথরে বাঁধান।

চৌষট্টি মহান্তের সমাজ।

কুসুম-সরোবর,—গোবর্দ্ধন অতিক্রম করিয়া আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে একটি অতি মনোরম সুবৃহৎ সরোবর দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাই কুসুম-সরোবর। এই অতি রমণীয় স্থান দেখিলে মনে হয় বুঝি ইহাই পুরাকালের মুনিঋষি-বাঞ্ছিত তপোবন বা আশ্রম। এরূপ স্নিগ্ধ নিস্তব্ধ সৌন্দর্য্যময়, প্রাণমুগ্ধকর স্থান সচরাচর দৃষ্ট হয় না। কথিত আছে রাধিকা এই সরোবরে কুসুমচয়ন করিতে আসিতেন। এই পুষ্করিণীতীরে ভরতপুরের রাজার সমাধিমন্দির, উদ্যান প্রভৃতি দর্শনীয়।

উক্ত স্থান-সকল ভিন্ন কদম্বখণ্ডি, বর্ষাণ গ্রাম, নন্দগ্রাম, বস্ত্রহরণ ঘাট, শৃঙ্গারবট প্রভৃতি স্থানসমূহের সঙ্গেও পৌরাণিক স্মৃতি বিজড়িত আছে।

প্রাচীনপুঁথি। পুরাকাল হইতে বৃন্দাবনে বহু পণ্ডিতের বাস। শুনিয়াছি চেষ্টা করিলে তথায় এখনও অনেক প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য পুঁথি পাওয়া যাইতে পারে। আমার তথায় অবস্থিতিকালে বৃন্দাবননিবাসী আমার কোন আত্মীয় ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে চেষ্টা করিয়া একখানি অতি প্রাচীন হস্তলিখিত শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা দেখিয়াছিলাম। আমার সংস্কৃতজ্ঞান নাই, সুতরাং তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিতে অক্ষম, কিন্তু তাহাতে যে-সকল বহুবর্ণে চিত্রিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তঅঙ্কিত চিত্র দেখিয়াছি তাহা আমি কখনও ভুলিতে পারিব না এবং তাহার বিষয় না বলিয়া থাকিতে পারি না। চিত্রগুলি আনুমানিক একখানি পোষ্টকার্ডের আকারের। এত ছোট ছোট চিত্রে কিরূপে এক-একটি বিষয় এত সুনিপুণ ও সুস্পষ্ট-ভাবে বিবিধ বর্ণসংযোগে অঙ্কিত করিয়াছে তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এত সূক্ষ্ম বিষয় অঙ্কিত করিতে কিরূপ তুলিকা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাই কল্পনা করিতে পারি না। শুনিয়াছি সেখানি শতাধিক বর্ষের পূর্ব্বের লেখা, কিন্তু বলিতে কি চিত্রের বর্ণ ও গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ লেখাগুলি আজিও নূতন বলিয়া মনে হয়। এগুলি অন্য হিসাবে দেখিলেও আমাদের প্রাচীন ললিত শিল্পকলার প্রমাণ দিতেছে।

অতি সংক্ষেপে বৃন্দাবনের বাহ্যিক স্থূল বিষয়গুলি বলা হইল। আমার ন্যায় প্রেমভক্তিহীন লোকের চক্ষে বৈষ্ণব-কথিত ব্রহ্মাদি-দেবতা-বাঞ্ছিত শ্রীবৃন্দাবন এখন মোটামুটি উচ্চচূড়-দেবালয়াদি-পূর্ণ যমুনাতীরে একটি সামান্য নগর। সে ফলে ফুলে ভরা, মৃদু-মধুর-বায়ুহিল্লোল-সঞ্চারিত, বিহগ-কাকলিতে পূর্ণ, ময়ূর ময়ূরীর কেকারবে মুখরিত শোভা না দেখিয়া নিরাশ হইতে হয়। কিন্তু ভক্ত সাধকের চক্ষে এখনও সেই বৃন্দাবন, সেই যমুনা। তাঁহাদের বিশ্বাস আজিও সেই নিধু নিকুঞ্জ আদি বনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য লীলা হইয়া থাকে। এখনও এমন অনেক বৈষ্ণব আছেন

যাঁহারা মেঘ দরশনে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হন, শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার নাম ভিন্ন অন্য কথা মুখে নাই। এখনও সেখানে অনেক সাধারণ লোক অন্যকে সম্বোধনের জন্য নাম ধরিয়া না ডাকিয়া রাধে বলিয়া ডাকে, প্রভু ভৃত্যকে, ভৃত্য প্রভুকে রাধে বলিয়া সম্বোধন করে, কি হিন্দু কি মুসলমান এখনও রাত্রিতে রাধে রাধে বলিয়া চৌকি দেয়।

হরিহর শেঠ।

দাক্ষিণাত্যের মূর্ত্তিশিল্প

শুক্রচার্য্যের শুক্রনীতিসার অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ইহাতে মূর্ত্তিশিল্প সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। শুক্রাচার্য্য বলিতেছেন "মানবের প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ বা অঙ্কন করিবে না, তাহাতে মানব-সমাজের কল্যাণ হইবে না। শুধু দেবদেবীর মূর্ত্তিই ভাল হউক মন্দ হউক তৈরী করিবে।" কিন্তু আচার্য্যের এই কঠোর আদেশ প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু শিল্পীরা নির্ব্বিরোধে মানিয়া লয় নাই ; বরং তাহারা মনুষ্যাকৃতিতে দেবদেবীর নানামূর্ত্তি গঠন করিয়া শিল্পনৈপুণ্যবর্দ্ধনের চেষ্টা করিয়াছে। বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যের শিল্পীরা দেবদেবীর মূর্ত্তি ব্যতীত অন্যান্য বহু মানবমূর্ত্তি খোদাই করিয়া গিয়াছে। কোনও কোনও মূর্ত্তি এত সুন্দর যে তাহার তুলনায় দেবদেবীর মূর্ত্তি সৌন্দর্য্যে ও ভাবপ্রকাশের চাতুরীতে বহু হীন বলিয়া মনে হয়। এইরূপ মূর্ত্তি ব্যতীত অন্যান্য মূর্ত্তিনির্ম্মাণপ্রথা খ্রীষ্ট জন্মিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল। নবাবিষ্কৃত কবি ভাসের নাটকসমূহে ইহার সমুহ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার "প্রতিমা-নাটকে"র তৃতীয় দৃশ্যে প্রতিমাগৃহের উল্লেখ দেখিতে পাই। প্রতিমাগৃহে অজ, দিলীপ, রঘু ও দশরথের চিত্র ছিল—দশরথের চিত্রদর্শনে ভরত সন্দেহাকুলচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন "জীবিত ব্যক্তিরও কি মূর্ত্তি গঠন করা হয় ?" উত্তর হইল "না, শুধু মৃতের।" এইরূপে ভরত দশরথের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাত হইলেন। সুতরাং মহাকবি ভাসের সময় মৃতব্যক্তি, রাজা মহারাজার মূর্ত্তি গঠনের প্রথা বিদ্যমান ছিল। ভাস প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক পাণিনির সময় ছিলেন বলিয়া অনেকের মত। অতএব

১। তিরুমাল ও তাঁহার পত্নীগণ।

দেখা যাইতেছে খ্রীষ্ট জন্মিবার পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বেও পারিবারিক চিত্র রক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এইসকল চিত্র অশেষ নৈপুণ্যের সহিত প্রস্তরফলকে খোদিত বা উৎকীর্ণ হইত, কারণ প্রতিমানাটকের উক্ত দৃশ্যেই অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় যে ভরত খোদিত মূর্ত্তিগুলির প্রশংসা করিতেছেন। প্রেমপীড়িত রাজা দুষ্মন্তের দ্বারা শকুন্তলার চিত্র অঙ্কনের কথা অনেকেই জানেন। শ্রীহর্ষের নৈষধচরিতে পাওয়া যায় দময়ন্তী নিজের ও নলের একখানি যুগলমূর্ত্তি অঙ্কিত করাইয়াছিলেন। রামচন্দ্রের স্বর্ণসীতা নির্ম্মাণের আখ্যায়িকাও আমাদের অনুমান সমর্থন করে।

যেসকল দ্রব্য দান করিলে দানপুণ্য সঞ্চয় হয় হেমাদ্রির

২। চোলরাজ ও তাঁহার দুই কন্যা।

৩। পল্লবরাজ ও তাঁহার দুই মহিষী।

মতে "আত্মপ্রতিকৃতি দান" তাহাদের মধ্যে অন্যতম। হেমাদ্রি ভবিষ্যোত্তর পুরাণ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া নিজের বচনের সার্থকতা প্রমাণ করিয়াছেন। ভবিষ্যোত্তর পুরাণ আরও বলিতেছেন যে, দাতার প্রতিকৃতির সহিত প্রিয়জনের প্রতিকৃতি থাকা চাই। দাক্ষিণাত্যের মন্দিরসমূহে এই নিয়ম অনুসৃত হইয়াছে। রাজা তাঁহার পরিবার পরিজনের সহিত উপস্থিত, এইরূপ বহু চিত্র মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ বা খোদিত আছে। মিশরের খোদিত শিল্পেও এই প্রথার পরিচয় দৃষ্ট হয়।

মাদুরায় তিরুমাল নায়ক ও তাঁহার পত্নীদের চিত্র (১নং চিত্র), রামনাদে সেতুপতি রাজাদের চিত্র ও কুম্ভকোণমে রামস্বামীর মন্দিরে দুই কন্যার সহিত চোলরাজার চিত্র (২নং চিত্র) ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এইসকল মূর্ত্তির বিশ্বাসযোগ্য প্রাচীন প্রমাণ পল্লবরাজা প্রথম মহেন্দ্রবর্ম্মণের ত্রিচিনপল্লীর গুহামন্দিরগাত্রে যে উৎকীর্ণ শিলালেখ আছে তাহা হইতে পাওয়া যায়। পর্ব্বতের উপরে মহেন্দ্রবর্ম্মণ একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন ও মন্দিরাভ্যন্তরে নিজের প্রতিমূর্ত্তিও রাখিয়া যান। কিন্তু এই মূর্ত্তিটি এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। মম্মল্লপুরমে পল্লবরাজা ও তাঁহার দুই পত্নীর (৩নং চিত্র) একটি উৎকীর্ণ মূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তিটি কোন্ পল্লব রাজার তাহা অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই। চিত্র দেখিলেই বুঝা যায় রাজা অঙ্গুলি-সঙ্কেতে মন্দিরমধ্যস্থিত দেবমূর্ত্তি রাণীদ্বয়কে দেখাইতেছেন। এই মম্মল্লপুরমেই অর্জ্জুনের রথের দক্ষিণ প্যানেলে আরও দুইটি সুন্দর প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। ইহার একটি (৪নং চিত্র) রাজা প্রথম পরমেশ্বর বর্ম্মণের মূর্ত্তি। কোনারি রাজপুরমে আবিষ্কৃত লিপিতে জানা যায় যে, চোল রাজা গান্ধারাদিত্যের রাণী

ত্রিরুনাল্লমুদাত্তীর মন্দিরে স্বীয় স্বামীর এক প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঞ্জোর জেলায় উত্তর-পাদেশ্বরের মন্দিরে চোলরাজা কাদম্বর-কোণ ও তাঁহার পত্নীর একটি মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজার মৃত্যুর পর রাজা দেবতারূপে পূজিত হইতেন। এই মূর্ত্তিটি পিত্তলের। নাগাপটামে রাজা অতিভক্ত নায়নারের ঠিক ঐরূপ আর-একটি মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু এই দুইটি মূর্ত্তি ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, ঠিক ইহাকে রাজারাজড়ার মূর্ত্তি বলিলে চলে না। এইরূপ বহুমূর্ত্তি চোল রাজাদের প্রাধান্যের সময়ে মূর্ত্তিনির্ম্মাণের বহুল প্রচলনের সাক্ষ্য দিতেছে।

মাদুরার নায়কাপ্রাধান্যের সময় ও পরে বিজয়নগরের রাজাদের সময় এইরূপ মূর্ত্তিগঠনের অধিকতর প্রয়াস হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। শ্রীরঙ্গম মন্দিরের মণ্ডপস্থিত দুইটি মুখোমুখী স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ এই জাতীয় মূর্ত্তির চিত্র দেওয়া হইল (৫ ও ৬নং চিত্র)। চিত্র দুইটি ত্রিমূলনায়ক ও তাঁহার ভ্রাতা বিজয়লিঙ্গ চোক্কলিঙ্গের প্রতিকৃতি। শিল্পসৌন্দর্য্যে মূর্ত্তিদুইটি মনোরম। কিন্তু হায়, চূনকাম করিয়া মূর্ত্তি দুইটিকে অনেকটা নষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছে। ইহাকেই বলে "বানরের হাতে খন্তা দেওয়া।"

৪। পরমেশ্বর বর্ম্মণ।

উপরিউক্ত রাজারাজড়ার মূর্ত্তিগুলির অধিকাংশই ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত। লক্ষ্যহীন অনন্তশূন্যে ধ্যানমগ্ন রাজাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি স্থির হইয়া আছে, তাহারি ভিতর দিয়া তাঁহারা যেন কাহাকে হৃদয়ের আনন্দ জানাইতেছেন।
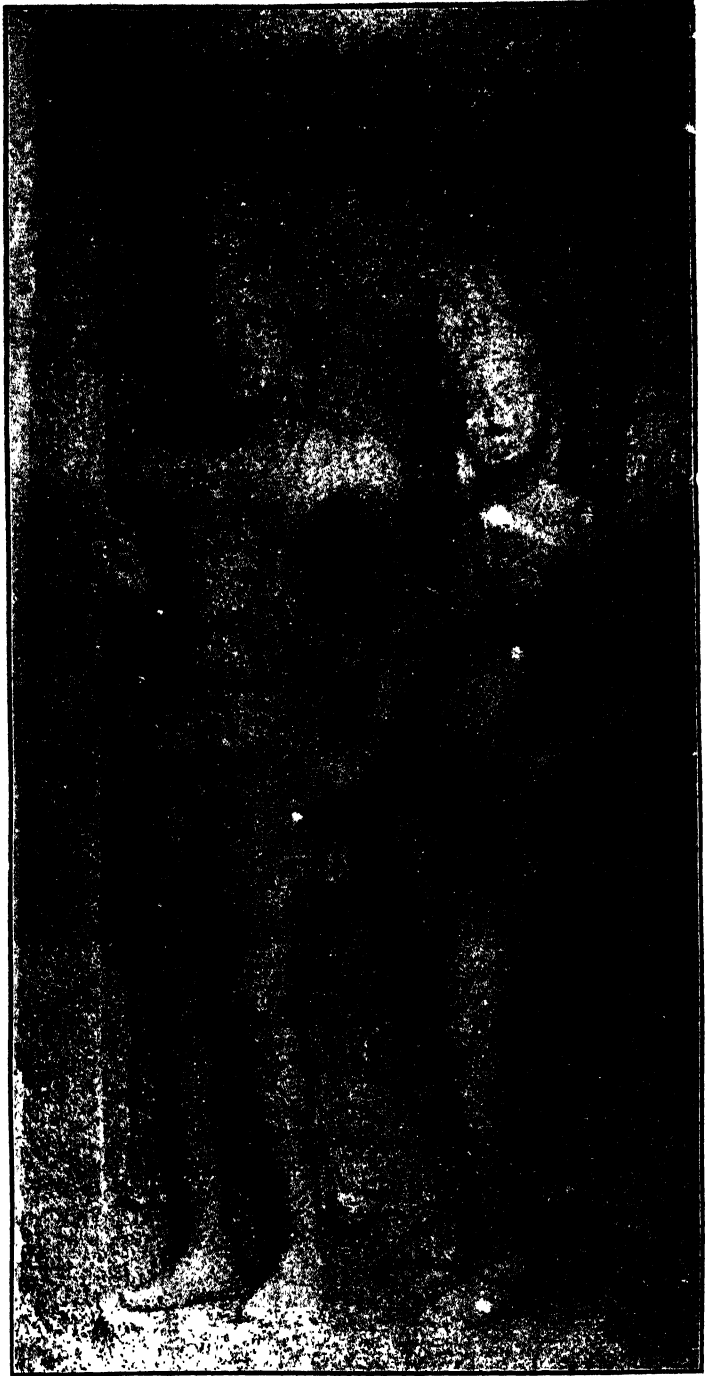
কিন্তু মাদুরার বিশ্বনাথ নায়কের (১৫৫৭-১৫৬৩) প্রধানমন্ত্রী আর্য্যনাগের মূর্ত্তিটি (৭ নং চিত্র) সম্পূর্ণ

৫। ত্রিমুলনায়ক।

করেন, দেবদেবীর চরণতলে সেইসকল ধ্যানপরায়ণ ভক্তের মূর্ত্তিটি অঙ্কিত থাকে। চীঙ্গলপেট জেলার তিরুবত্তীয়র স্থানে যিয়াগরাজার মন্দিরে সুব্রহ্মণ্যমূর্ত্তির পদতলে প্রতিষ্ঠাতা ভক্তের মূর্ত্তিটি (৮নং চিত্র) ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এইরূপে ভক্তরা যে তাঁহাদের নিজমূর্ত্তি সন্নিবেশে যত্নপরায়ণ হইয়াছিলেন তদ্দ্বারা দাক্ষিণাত্যের মূর্ত্তিশিল্প উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। আর একটি কারণেও শিল্পের উন্নতি হয়—সেটি দাতার মূর্ত্তিসম্বলিত দানকাহিনীর শিলালেখ। প্রসিদ্ধ তীর্থ-স্থানের মন্দির-প্রাঙ্গণে যেসমস্ত পাথরের পাটাতন পাতা থাকে, তাহা যাহার দান সে তাহাতে নিজের নাম ধাম খোদাই করাইয়া দেয়; উদ্দেশ্য বহু তীর্থযাত্রী-ভক্তের পদরজ মাখিয়া তাহাদের নাম ধন্য হইয়া যাইবে। স্থানে স্থানে লেখার সহিত দাতার মূর্ত্তিও খোদাই করা হয়। ইহার দৃষ্টান্ত বৃন্দাবনের শাহাজীর মন্দিরে ও দাক্ষিণাত্যের বহু মন্দিরে দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রিবন্দরমের পদ্মনাভের মন্দিরের মেঝে হইতে এইরূপ একটি শিলাপট্টে খোদাই-করা চিত্র ও লেখার ছবি দেওয়া হইল (৯ নং চিত্র)। শিলালেখটির নিকটে একটি মূর্ত্তিও

বিভিন্ন প্রকারের। যদি রাজারাজড়াদের মূর্ত্তিগুলি ধর্ম্মানু-প্রাণিত, তথাপি প্রতি মূর্ত্তিটিতেই একটা বিভিন্নতা আছে, প্রত্যেকটিতেই ভাবাভিব্যক্তির প্রথা সুন্দর এবং প্রত্যেকটিই ব্যক্তির জীবিতকালে প্রস্তুত বলিয়া বোধ হয়। ১,৫,৭,১১,১৩ ও ১৪ নং চিত্রকএকটি একটু ধীরভাবে লক্ষ্য করিলেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি হইবে। দাক্ষিণাত্যের মূর্ত্তিশিল্পে আমরা ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের একটা বিশেষ পরিচয় পাই। দাক্ষিণাত্যের শিল্পে আর-একটি বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাঁহারা মন্দির বা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা

অঙ্কিত রহিয়াছে। আরকট হইতে পাঁচ মাইল দক্ষিণে ত্রিরুপ্পমালইএও এইরূপ আর-একটি মূর্ত্তিসমন্বিত শিলালেখের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

এইরূপে শিল্পে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা মন্দিরে দীপদান দ্বারাও করা হইয়াছে। দুইপ্রকারের দীপদান করা হইত। এক আরতির জন্য, অপর সারারাত্রি দেবসমক্ষে আপনি পুড়িয়া পুড়িয়া দাতার অচলাভক্তির পরিচয় প্রদানের জন্য। সময় সময় দীপের ঘৃতের জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড একদল গাভীও দান করা হইত। কোনও নারীমূর্ত্তি

৬। বিজয়লিঙ্গ চোক্কলিঙ্গ।

৭। আয্যানাগ।

এই দীপাধারগুলি ধরিয়া রাখিত এবং মূর্ত্তিটি দাতার প্রতিনিধির কার্য্য করিত (১০ নং চিত্র)। এই সমস্ত দীপগুলিতেও চমৎকার সুন্দর কারুকৌশল যথেষ্ট দেখা যায়।

দাক্ষিণাত্যের মূর্ত্তিশিল্পের পরিচয় দিতে গিয়া শৈব-ঋষি, বৈষ্ণব আলোয়ার প্রভৃতির কথা না বলিলে ইহা অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। ঋষি ও আলোয়ারগণের মৃত্যুর বহু পরে তাঁহাদের মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। তাঞ্জোর জেলার কোদিয়া-কড়াই স্থানের শিবমন্দিরে কালগ মহর্ষির একটি পিত্তল-মূর্ত্তি (১১নং চিত্র) পাওয়া গিয়াছে। এই মূর্ত্তিটিতে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের বেশ একটা পরিচয় পাওয়া যায়।

উত্তর আরকট জেলার উত্তর তরুমলাই পর্ব্বতের শ্রীনিবাস-মন্দিরে অতি উৎকৃষ্ট কতকগুলি মূর্ত্তিশিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে অচ্যুতরায় ও তাঁহার পত্নীর মূর্ত্তিটি অতি মনোরম (১২ নং চিত্র)। প্রবেশ-পথের উপরে বেঙ্কটপতিরায়ের মূর্ত্তি দাক্ষিণাত্যের মূর্ত্তিশিল্প-গরিমার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। শুধু এই মূর্ত্তিটি দেখিলেই সহজেই উপলব্ধি হইবে যে দাক্ষিণাত্যে মূর্ত্তিশিল্প কতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছিল। পিতাবিবির পিত্তল-মূর্ত্তিটি (১৪ নং চিত্র) খুব স্বভাবানুগত ও তাহাতে আড়ষ্ট ভাব নাই বলিলেও চলে। রাজা ও দাতাদের দেখাদেখি অপর লোকেরাও স্ব স্ব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নবান হয়েন। কালক্রমে ইহা সকল সমাজের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। উদাহরণস্বরূপ মাদুরার মীনাক্ষি মন্দিরস্থিত মুদারম আয়ার ও তৎপত্নীর মূর্ত্তির উল্লেখ করা যাইতে পারে। মুদারম আয়ার কর্ত্তৃক মীনাক্ষি মন্দির তিনশতাব্দী পূর্ব্বে নির্ম্মিত হয়। নায়কের দরবারগৃহে মহারাষ্ট্র রাজা
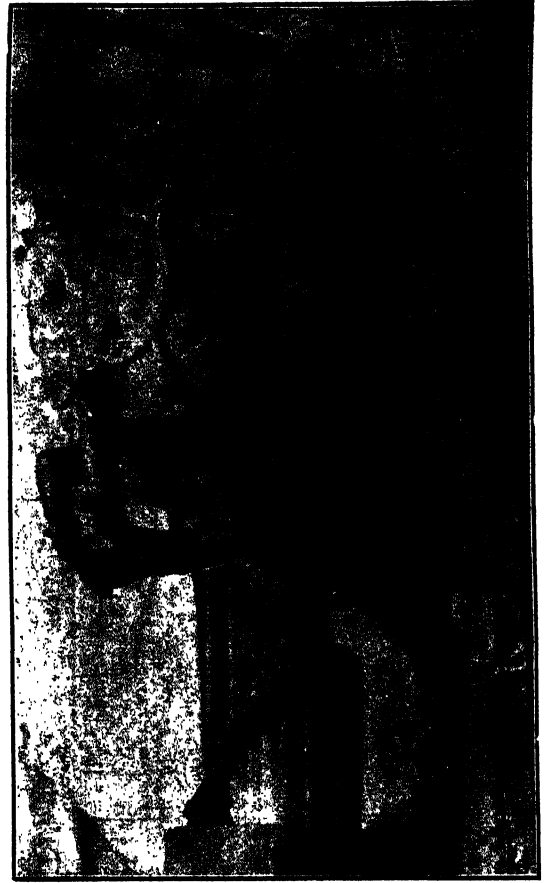
৮। সুব্রহ্মণ্য দেব ও তাঁহার পদতলে মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠাতা ভক্তের মূর্ত্তি।

সারভোজীর যে মূর্ত্তিটি রহিয়াছে সেটি যদিও ইউরোপীয় শিল্পী ফ্লাক্সম্যানের প্রস্তুত এবং তাহার মধ্যে ভারতীয়-ভাবের অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি তাহাতে ভারতীয় শিল্পীর নির্ম্মিত মূর্ত্তির অনুকরণে বিনয়-সূচক জোড়হাত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। (১৫ নং চিত্র) কুম্ভকোণমের চক্রপাণির মন্দিরে সারভোজীর যে পিত্তল-মূর্ত্তি আছে সেটি মূর্ত্তিশিল্পের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিন্নভেলীর শিবমন্দিরের বারান্দায় একটি নায়ক্য রাজার সুন্দর মূর্ত্তি (১৬ নং চিত্র) দৃষ্ট হয়। এই জাতীয় বহু সুন্দর উৎকীর্ণ মূর্ত্তি মন্দিরের বারান্দাটিকে অলঙ্কৃত করিতেছে ও শিল্পীর শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিতেছে।

সিংহলের শিল্প দাক্ষিণাত্যের শিল্পের নিকট বহু পরিমাণে ঋণী। দাক্ষিণাত্যের শিল্পইতিহাসের সহিত তাহার কথা জড়িত করিলে দোষের কিছু নাই। যদিও সিংহলশিল্প বৌদ্ধশিল্পের সাহায্য ও আদর্শ পাইয়াছে তথাপি দাক্ষিণাত্যের শিল্পের ছাপ তাহার উপর পড়িয়া গিয়াছে। মহাবংশে ইহার একটু উল্লেখও আছে। সিংহলশিল্প একেবারে নকল করিয়া চলে নাই, কলমের গাছের মত সে আপনি স্বতন্ত্র ভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছে।
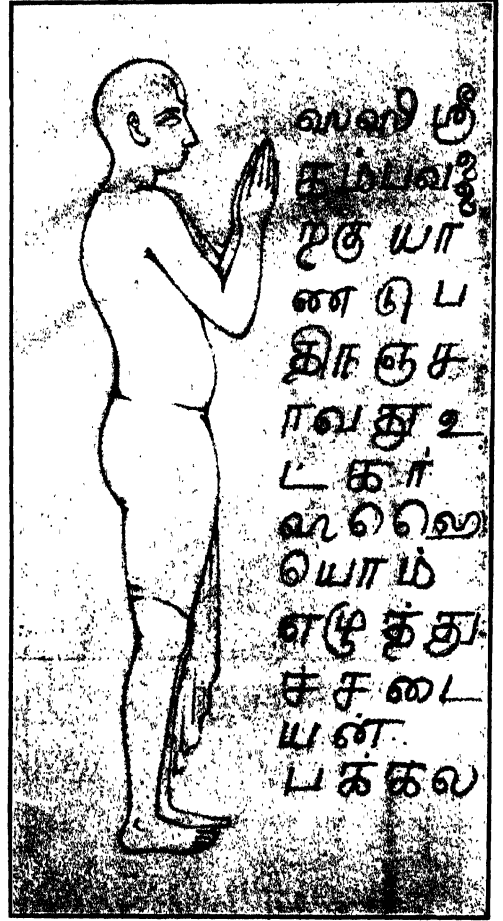
৯। শিলাপটে খোদাই-করা চিত্র ও লেখ।

খ্রীঃ পূঃ ১৯ সালে প্রাদুর্ভূত রাজা বতিয় ভিষ্যের মূর্ত্তিটি অতি প্রাচীন সিংহলীশিল্পের নিদর্শন। এইটি অনুরাধপুরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর রাজা দুত্তগামিনীর একটি মূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে—এই মূর্ত্তি উচ্চতায় মানুষের চেয়েও বড় (১৭ নং চিত্র)। মূর্ত্তিটির পোষাকপরিচ্ছদ দেখিলে মনে হয় ইহা পহ্লবদের সময় নির্ম্মিত। পরাক্রমবাহুর (১১৪০ খ্রীঃ) মূর্ত্তিটি তামিল-

১০। নারীমূর্ত্তি দীপাধার।

১১। কালগমর্ষি

শিল্পানুযায়ী নির্ম্মিত। জটামুকুট ও কোমরে কাপড়ের গ্রন্থি তামিলশিল্পের নিদর্শন। ইহা ১১॥ ফুট উচ্চ—পল্লনল্লাকুভের তপোবেব পুষ্করিণীর ধারে পাওয়া গিয়াছে। (১৮ নং চিত্র)। বৌদ্ধশিল্পে আর-এক প্রকারে মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। বৌদ্ধস্তূপের নিকট ভক্তেরা আপনাদের প্রণত মূর্ত্তি সমর্পণ করে। এই সব মূর্ত্তি পিত্তলে নির্ম্মিত এবং শিল্পহিসাবে খুব উৎকৃষ্ট না হইলেও মানুষের নির্ম্মাণের চেষ্টা বলিয়া উল্লেখযোগ্য।

মূর্ত্তিশিল্পে ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের চেষ্টা দাক্ষিণাত্যের শিল্পেই বেশী হইয়াছে, আর্য্যাবর্ত্তে একরূপ হয় নাই বলিলেই হয়। সময় সময় অবশ্য মুদ্রায় রাজাদের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদিগকে মূর্ত্তিশিল্পের কোটায় না ফেলিলেই ভাল হয়। অবশ্য কিছুদিন হইল সম্রাট কনিষ্কের একটি মূর্ত্তি (১৯নং চিত্র) আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু দাক্ষিণাত্যের বিপুল মূর্ত্তিশিল্পের নিকট ইহা অকিঞ্চিৎকর। আর্য্যাবর্ত্তের শিল্প চাহিয়াছে দেবদেবীর মূর্ত্তি গড়িয়া

১২। অচ্যুতরায় ও তাঁহার পত্নী।

তাহাদের শিল্পচাতুর্য্যের পরিচয় দিতে ও লোকের মনে ধর্ম্মের বীজ বপন করিতে; সে সংসারকে মানুষকে আমল দেয় নাই। মানব-সাধারণের নিকট বিশ্বনিয়ন্তার বিচিত্র লীলা দেখাইবার, সান্তের সহিত অনাদি অনন্তের সম্মিলন ঘটাইবার উদ্দেশ্য লইয়া আর্য্যাবর্ত্তের শিল্প জন্মগ্রহণ করিয়াছে ও এতদিন সেইরূপ করিয়াই টিকিয়া গিয়াছে। যাহা হউক দাক্ষিণাত্য ও আর্য্যাবর্ত্ত উভয়েরই শিল্পচাতুর্য্য জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছে ও প্রাচীন ভারতের গৌরবময় কাহিনী দিকে দিকে প্রচারিত করিয়াছে।

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়,
ও
শ্রীনলিনীমোহন রায় চৌধুরী।

১৩। বেঙ্কটপতি রায়।

১৪। পিতাবিবি।

১৫। সারভোজী।

ফরাসীর অর্ঘ্য

আমার পূজার সামগ্রীটির প্রতি যখন অপর কেহ শ্রদ্ধার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তখন তাহার ভাষা বুঝি আর নাই বুঝি সে ব্যক্তির সঙ্গে একটা গভীর আত্মীয়তার সূত্রপাত হইয়া যায়। যেমন এক গুরুর নিকট অধ্যয়নে শিষ্যদল পরস্পরের সতীর্থ হইয়া থাকে তেমনি একই বস্তুর প্রতি যাহারা শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্পণ করিয়া থাকে তাহাদের মধ্যে একটা নিঃস্বার্থ আত্মীয়তার সূত্রপাত হওয়া অনিবার্য্য।

ভারতবর্ষকে আমরা ভালবাসি, অনেক সময়ে অন্ধভাবে ভালবাসি। অনেক সময়ে আবার আমরাই শতমুখে নিন্দা করিয়া থাকি। অনেক সময়ে শাস্ত্র ও দেশরীতির দোহাই দিয়া অননুষ্ঠেয় কার্য্যের সমর্থন করিয়া দেশপ্রীতির নিরর্থক অভিনয় করি, আবার অতীত পদ্ধতি বলিয়া অনেক শ্রদ্ধেয় ও সর্ব্বথা অনুষ্ঠেয় কর্ত্তব্যের ব্যতিক্রম করিয়া থাকি। ভারতের প্রাণপদ্ম যুগে যুগে বিচিত্র সূর্য্যালোকস্পর্শে কেমন অপূর্ব্বভাবে আপনার শতদল জগতের কাছে খুলিয়া ধরিয়াছে তাহা নিরপেক্ষভাবে ও ধৈর্য্যের সহিত আমরা সকল সময় লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পারি না। এমন সময় নিরপেক্ষ বিদেশীয়ের চক্ষে ভারত কি ভাবে প্রতিভাত হইয়াছে তাহা আমরা একটু খুঁজিয়া দেখিতে পারি।

১৬। নায়ক্য রাজা।

১৭। রাজা দত্তগামিনী।

১৮। পরাক্রমবাহু।

বিখ্যাত ফরাসী ঐতিহাসিক জুল মিশ্‌লে ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে আগষ্ট পারী নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার "বিশ্বমানবের গীতা" (Bible of Humanity) একখানি গদ্য মহাকাব্যবিশেষ। ইহা ফরাসী ভাষায় রচিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পর ইটালীয় লেখক ভিন্সেঞ্জো ক্যাল্‌ফা উহার ইংরেজী অনুবাদ করেন। ঐতিহাসিক জুল মিশ্‌লে তাঁহার গ্রন্থে ভারতকে বড় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে তাহার সামান্য আভাস দিবার চেষ্টা করিব।

মিশ্‌লে বলিতেছেন :—

উজ্জ্বল দিবালোকে আমার এই গ্রন্থের সূচনা; আলোকের পুত্রগণকে লইয়া আমি গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছি। রোমান্, সেল্ট ও জার্ম্মানগণ যাঁহাদের শাখা-পরিবার মাত্র, সেই হিন্দু, পারসিক ও গ্রীক্ এই তিন আর্য্য পরিবারকে
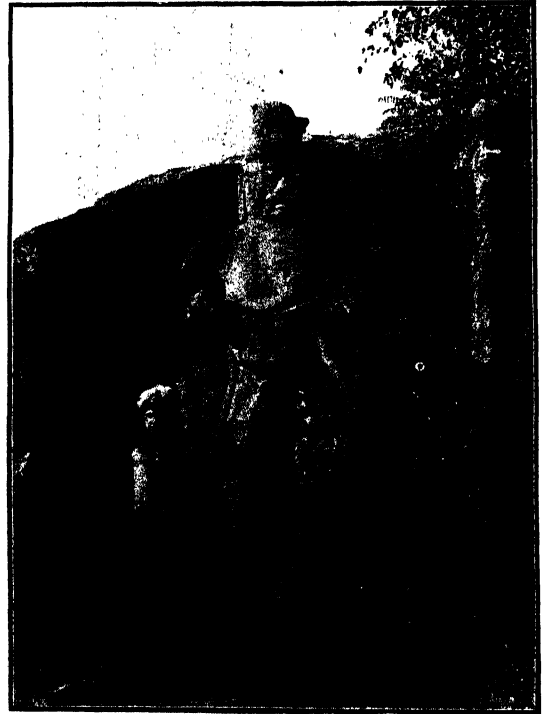
লইয়া আমি পত্তন করিয়াছি। ইঁহাদের অলৌকিক প্রতিভা মানবজগতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সামগ্রী সর্ব্বপ্রথমে সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রাচীন বৈদিক ভারত আমাদের কাছে মানব-পরিবারের যে নির্ম্মল ছবি উপস্থিত করে তাহা পরবর্ত্তী কোনো যুগের আদর্শের কাছে আদৌ ক্ষুণ্ণ হয় নাই। পারস্য জগৎকে বীরের মত শ্রম করিতে শিখাইয়াছে, সে শিক্ষা আজও নূতন হইয়া রহিয়াছে। গ্রীস্ তাহার লোকাতীত শিল্পবিদ্যার

সুদূর অতীত কাল হইতে পরিবার, শ্রম, ও শিক্ষা এই তিনটি উপকরণ মিলিত না হইলে মানুষের চিহ্ন এতদিনে পৃথিবী হইতে লোপ পাইত। কি সমষ্টিভাবে কি ব্যষ্টিভাবে মানুষের টিকিয়া থাকা অসাধ্য হইত। সেইজন্য এই তিন জাতির আদর্শ এখনো পর্য্যন্ত লোপ পায় নাই এমন নয়, আজ পর্য্যন্ত উহা অতুলনীয় সৌন্দর্য্যে দীপ্তি পাইতেছে। তাহাদের পবিত্রতা, শক্তি, দীপ্তি ও অনবদ্যতা অতুলনীয়। সবই তরুণ, কিন্তু তবু

১৯। সম্রাট কনিষ্ক।
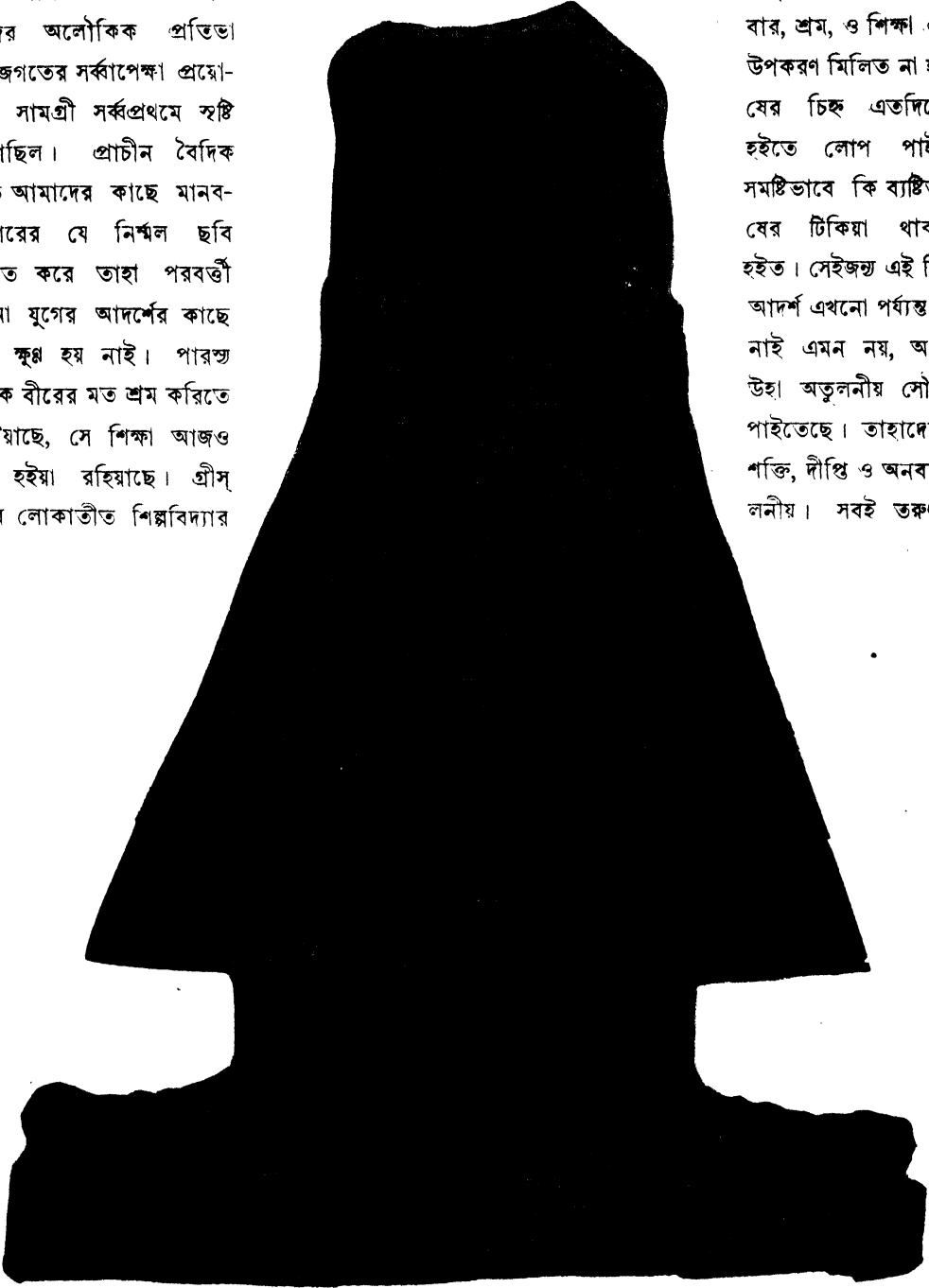
বাড়া মানুষ-গড়িবার বিদ্যা জগৎকে শিখাইয়াছে। এই তিন উপকরণে জগৎসভ্যতার পত্তন বলিলে হয়; সেই কত পূর্ণ কত গভীর! এস বালকবালিকাগণ, তোমরা দুই হাতে এই "আলোকের গীতা" শ্রদ্ধার সহিত

গ্রহণ কর। রবিরশ্মির মত উজ্জ্বল এই আবেস্তা সকল গীতার সার। হোমার, এস্কাইলাস্, এবং আরো যত প্রাণময় গ্রীক্ পুরাণ আজ আদরে বরণ করিয়া লও; কারণ উহা নববসন্তের প্রাণশক্তি ধারণ করে, এবং উহা পরিণত বসন্তের নিবিড় নীলাকাশের মত দীপ্তিমান। বেদে উহার প্রথম অরুণরাগ; রামায়ণে উহার রক্তিম গোধূলি; সৃষ্টির নির্ম্মল শৈশবে প্রকৃতির কোলে, দেবতা ফুল তরু ও পশুপক্ষীর সরল ক্রীড়া এখানে মানব-মনকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করিয়া ফেলে।

আমার কাছে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ অতি স্মরণীয় বৎসর। ঐ বৎসর আমি সর্ব্বপ্রথম ভারতের চির অমৃতের খনি রামায়ণ পাঠ করি। যখন এই কাব্য প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল স্বয়ং ব্রহ্মাও নাকি আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন। দেবগণ পশুপক্ষী ও সরীসৃপ সংসারী ও সন্ন্যাসী সকলে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। যে এ মহাকাব্যের সমগ্র পাঠ করিয়াছে তাহার কি সৌভাগ্য! যে ইহার অর্দ্ধেক পাঠ করিয়াছে সেও কত ভাগ্যবান্! রামায়ণশ্রবণে ব্রাহ্মণ জ্ঞানী হয়, ক্ষত্রিয় বললাভ করে, বৈশ্যের ধনপ্রাপ্তি হয়। দৈবাৎ যদি শূদ্র রামায়ণ শুনিতে পায় তবে তাহার শূদ্রত্ব দূর হয়। যে রামায়ণ পাঠ করে সে সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। এ কথা বড় সত্য কথা। এই মহাকাব্যপ্রবাহ আমার যথার্থই চিত্তশুদ্ধি করে। সংসারের যত জ্বালাযন্ত্রণা, যত তিক্ততা তাহা ইহা ধৌত করিয়া দিয়া বিমল আনন্দরসের সঞ্চার করে। যাহার হৃদয় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে তাহাকে এই রামায়ণ পড়িতে দাও। যদি কেহ তাহার প্রিয়জনকে হারাইয়া শোকে জর্জ্জরিত হইয়া থাকে তাহাকে এই রামায়ণ পড়িয়া প্রাণ জুড়াইতে দাও। যদি কেহ জীবনসংগ্রামে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়া থাকে তাহাকে এই রামায়ণসুধা পান করিতে দাও, তাহার সকল শ্রান্তি ও অবসাদ দূর হইবে।

মানুষ অবিশ্রান্ত খাটিতে পারে না। প্রতি বৎসর তাহার বিশ্রাম চাই; তাহাকে দম লইতেই হইবে ও জীবনের উৎস হইতে নবজীবনধারা পান করিয়া তাহাকে নূতন কাজের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। সে নবজীবনধারা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের গৃহ ছাড়া আর কোথায় সঞ্চিত থাকিতে পারে বল? একদিকে ঐ হিমগিরিচ্যুত সিন্ধু ও গঙ্গা, অপরদিকে পারস্যের ক্ষীরনদীগুলি তাহাকে ঐ জীবন-ধারা জোগাইবে, আর কাহারো উহা দিবার সাধ্য নাই।

পাশ্চাত্য জগতে সবই সঙ্কীর্ণ। গ্রীস্ এত ক্ষুদ্র যে সেখানে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে; জুডিয়া এত শুষ্ক যে সেখানে তৃষ্ণায় আমার ছাতি ফাটে। তখন আমি একবার এশিয়ার উদার উচ্চভূমির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করি, —গভীর প্রাচ্যের দিকে চাহিয়া থাকি। তখন ভারত-মহাসমুদ্রের মত সূর্য্যালোকে-সমুজ্জ্বল একটি বিরাট কাব্য আমার সম্মুখে দেখিতে পাই; তাহার মধ্যে এক অপূর্ব্ব ঐক্যের সুর শুনিতে পাই, দ্বন্দ্ব তাহার কাছেও ঘেঁষিতে পারে না। একটি পরিপূর্ণ শান্তি সমস্ত গ্রন্থখানিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এমন কি উহাতে বর্ণিত যুদ্ধগুলির মধ্যেও একটা সীমাহীন মাধুর্য্য, একটি উদার ভ্রাতৃত্ব অনুভব করি;—সে ভ্রাতৃত্ব শুধু মানুষকে আলিঙ্গন করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই—জীবমাত্রেই সে ভ্রাতৃত্বের আস্বাদনে অধিকারী; সীমাহীন অন্তহীন একটা বিরাট সমুদ্র; প্রেম প্রীতি ও করুণার অনন্ত পারাবার। আমি যাহা খুঁজিতে-ছিলাম রামায়ণে তাহা পাইয়াছি; সে কি? সে প্রেমের গীতা। মহাকাব্য! আমাকে গ্রহণ কর! ক্ষীরসমুদ্র! আমি একবার তোমাতে অবগাহন করি!

রামায়ণ শুধু কাব্য নয়! ইহা একটি বিরাট ধর্ম্মগ্রন্থ। ইহাতে ভারতের ইতিহাস পাইবে। ভারতের লোক-প্রকৃতি, সমাজ, শিল্প, প্রকৃতির সুষমা, তরুলতা, পশুপক্ষী ও ষড়ঋতুর বিচিত্র লীলা ও অপূর্ব্ব ইন্দ্রজাল ইহার মধ্যে দেখিতে পাইবে। ইহার সঙ্গে ইলিয়ডের তুলনা হইতে পারে না। ইহার মধ্যে একদিকে যেমন প্রাচীন ভারতের চিত্র দেখিতে পাইবে তেমনি আধুনিক ভারতের আভাসও পাইবে; স্নিগ্ধ রসমাধুর্য্যে ও লালিত্যে উহা একমাত্র ইটালীয় কাব্যকলার সহিত তুলনীয়।

পাশ্চাত্য জগতে যেমন আটঘাট বাঁধিয়া, মাপসই করিয়া সব জিনিস রচিত হয়, রামায়ণের মধ্যে সেরূপ একটা কৃত্রিম বাঁধাবাঁধি দেখিতে পাইবে না। কেহ সেজন্য মাথা ঘামাইয়া মরে নাই। কিন্তু উহার বিচিত্র ছায়ায়, বর্ণসম্পাতে ও সুরে বিরোধের সৃষ্টি না হইয়া এক অপূর্ব্ব

ঐক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। রামায়ণ-বর্ণিত অরণ্য ও পর্ব্বতেরই সহিত কেবল উহার তুলনা হইতে পারে। প্রচুর প্রাণ-শক্তি-বিশিষ্ট ছোট ছোট তরুলতা বিরাট বনস্পতিসমূহের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছে; এইসকল অরণ্যানী আবার শ্রেষ্ঠতর প্রাণীর লীলাভূমি। উর্দ্ধে কত বিচিত্রবর্ণের পাখীর পক্ষসঞ্চালনশব্দ শুনিতে পাইবে; ডালে ডালে কত শাখামৃগের দোল দেখিতে পাইবে; আবার ভূতলে তরুলতার নিবিড় শ্যামলতার অন্তরালে কৃষ্ণসারের ভুবন-মোহন যুগল আঁখি তোমার মনকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিবে। এই অখণ্ড পরিপূর্ণতাকে তুমি একটা মহা শূন্য বলিতে চাও! কখনই না। এইসকল সৌন্দর্য্যের মধ্যে কেমন একটা মাধুর্য্য বিরাজিত রহিয়াছে। সন্ধ্যায় যখন সূর্য্য গঙ্গার বক্ষে আপনার দুঃসহ দীপ্তিকে মিলাইয়া দেন, যখন পৃথিবী শান্ত হইয়া আসে, তখন বনান্তে এই যে বিচিত্র অথচ নির্দ্বন্দ্ব জীবনের খেলা, এবং গোধূলির নিবিড় শান্তিতে যুগপৎ মগ্ন পশুপক্ষী ও জড়জীবের যে অপূর্ব্ব সম্মিলন, উহার মধ্য হইতে প্রতিদিন এক অনির্ব্বচনীয় সঙ্গীত উত্থিত হয়। এই মহাসঙ্গীতের নামই রামায়ণ।

ঐ অরণ্যসঙ্কুল বিরাট পর্ব্বতের দিকে চাহিয়া দেখ। উহার মধ্যে কিছু কি তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে না? তবে ঐ অতল নীল জলধির নিবিড় নীলিমার দিকে চাহিয়া দেখ; কিছু কি তোমার দৃষ্টিতে ঠেকে? ঠিক ঐখানে অতলের তলে একটি অতুলন মুক্তা পড়িয়া আছে; আর ঐ বিপুল পর্ব্বতের সানুদেশে একটি কৌতূহলপূর্ণ আঁখির উজ্জ্বল দৃষ্টি দেখিতে পাইবে; উহা হীরকখণ্ডের দীপ্তি বলিয়া তোমার ভুল হওয়া অসম্ভব নয়। ভারতের গোপনতম আত্মা ঐটি; উহার মধ্যে একটি পরশপাথর আছে; ভারত নিজেও উহা সর্ব্বদা দেখিতে যেন কুণ্ঠা বোধ করে। যদি এ সম্বন্ধে তাহাকে প্রশ্ন কর তবে নীরব মৃদু হাস্য ব্যতীত তুমি তাহার নিকট হইতে আর কোনো উত্তরই পাইবে না।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ঋগ্বেদের সামান্য নমুনা পাশ্চাত্য জগতে প্রথম আনীত হয়। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিতপ্রবর বার্ণুভ উহার নিগূঢ় অর্থ সাধারণের নিকট ব্যক্ত করেন। তাহার পর হইতে যত দিন যাইতেছে ও গবেষণা যতই গভীরতর বিষয়সমূহে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে ততই এই সত্যই প্রমাণিত হইতেছে যে য়ুরোপ ও এসিয়ায় কোনো বিরোধ ছিল না। এই গবেষণার ফলে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে যুগ যুগ ধরিয়া মানুষ একই ভাবে ভাবিয়াছে, অনুভব করিয়াছে ও ভালবাসিয়াছে; মানবসমাজ এক—মানবহৃদয় এক। সকল যুগ ও সকল দেশের মধ্যে যে একটি পরম ঐক্য নিহিত আছে আজ আমরা তাহার স্থির সন্ধান পাইয়াছি। তর্কবাদী, সংশয়বাদীদের সকল তর্ক, সকল সংশয় আজ দূর হউক। বিশ্ববাসীর গগনপ্লাবী একতান-বাদ্যের বিজয়-দুন্দুভিতে তাহাদের কণ্ঠস্বর আজ ডুবিয়া যাক।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাঁতী-বৌ

(প্রবাসীর নবম পুরস্কার প্রাপ্ত গল্প)

চুল ছোট, চোখ কটা, পেট মোটা, আড়ং থাট, নাক চ্যাপ্টা, ডাক পাখীর ডাক, হাত ছিনে, মেয়েমানুষ বেশী বয়সের দেখিলে বোধ হয় যেন বিয়ের কনে ঘোমটা-দেওয়া তাঁতীবৌ।

জন্মস্থান চাকদিঘী, পাড়া ঘোল্‌পুকুর, পরগণা সুখসাগর, থানা কোতলপুর, জেলা আরামবাগ, বাঙ্গলা দেশ, নল-ডাঙ্গা রেলষ্টেশন খুব কাছে।

উল্‌বুনা, পুথিশুনা, গানবাজনা বয়সে নেই। সূতার টানা দিতে ছেলে-বয়সে শিখেছিল, মাড় মাখাতে শিখেছিল বয়স হলে।

মা শীতলার স্বপ্ন পেয়ে সকলে যখন সই পাতিয়েছিল, ছেলেমানুষ তাঁতী-বৌ মার কাছে কেঁদে কুমোর-কন্যা কাদম্বিনীকে সই করেছিল। বসন্তের তখন খুব দুরন্ত প্রাদু-র্ভাব, সাহেবমহলেও মা শীতলার পূজা হচ্ছিল গাধার উপর মার-মূর্ত্তি গড়ে'।

কাদম্বিনী কুঁদুলে। কপালপোড়া, বয়স যখন বারবছর। বাপের বাড়ীতে খুরির কাজ শিখেছিল কুমোরের মেয়ে। এখন সরা মালসা গড়ে আর গামলা পেটে, গামলার কানা বাঁধে, হাড়ির গায়ে রং দেয় নক্সা করে। পুতুল গড়ে,

কাঁচাপুতুল ভেঙ্গে যায়—পোড় পায় না, পোড়াতে নেই সকলকে।

বর ঘর দুজনারই জন্মস্থান সেই চাকদিঘীতে বিধাতা ঠিক করে রেখেছিলেন। বোধ হয় কোনও দিন কেউ ভাত খায়নি পা মেলে।

সৌভাগ্য, সতীন নেই তাঁতী-বৌএর। তাহার ফুলগাছ সতীনগুলিও মরে গেছে। এই ফুলগাছ প্রথমে টগর, তারপর শিউলি, তারপর জবা। গাছগুলি বেশি দিন বাঁচে, তাই বৌ-মরার বিয়ের সময়ে বিয়ের কনে অধিক দিন বাঁচবে বলে আগে ঐসকল গাছে মালা দিয়ে গাছের আশীর্ব্বাদ নিয়ে থাকে। হিঁদুর মতে সকলই জীবদেহ, ইন্দ্রিয় কাহারও কম কাহারও বেশি। ফুলগাছ দেবতার সখা; দেবতারা যাওয়া আসা করেন ফুল গাছে, ফুলে ফুলে পা ফেলে।

তাঁতী-বৌএর ভাই নেই, বোন নেই, বাপমার আদর একলা খেয়েছে। বিয়ের পরে আগে মা পরে বাপ মারা পড়ে। বাপের বাড়ীর বাগান বেড়, গোয়াল গোরু, গোলা ঢেঁকি, দেওয়ালের মাটি, চালের খড়, দাওয়ার খুঁটী জলের দামে একে একে বিক্রমপুরে দিয়েছে। হাতে টাকা করেছে। চুনের ফোঁটা, দড়ির গেরো, ঘেঁচিকড়ি তাঁতী-বৌকে হিসাব মিলিয়ে দ্যায়; তাঁতী-বৌ লেখাপড়া জানে না। কিন্তু স্বয়ং বাক্‌দেবী মুখের ভিতর আড্ডা গেড়েছেন—হাজার দু'হাজার জিহ্বা সঞ্চালন করেন একেবারে, কথা-সব বিষ-মাখান তাঁতী-বৌএর। হাতের পয়সা-কড়ী সুখের স্থলে দুঃখের কারণ হয়ে উঠেছে। দন্তদাপট পাঠক যদি ভুগে থাকেন বুঝতে পারবেন। অফলা ফলাতে পারে অবলা পয়সা পেলে। পয়সা পেলে পর করে কোলের ছেলে। পয়সা পেলে তাঁতী-বৌ না করে এমন কোনও কর্ম্ম নেই। ঘির ভাঁড় কানিবাঁধা, পয়সা রোজকার করে। ঘোলের হাঁড়ি সকাল থেকে পয়সা দেয়। ঘুঁটে, মাচায় থাক-দেওয়া ঝোড়া-মাপা পয়সা আনে। মিষ্টি কেনে, শিকায় রাখে, আপনি খায় তাঁতী-বৌ। গলা, নোলা নিয়ে মর তুমি তাঁতি-বৌ,—তুমি তাঁতীর শীতের কাঁথা গায়ে দিতে দাওনি, তেষ্টার জল ক্ষিদের অন্ন কেড়ে নিয়েছ। মেয়ে-মহলে ছি ছাই দূর বালাই তুমি তাঁতী-বৌ!

তাঁতীর বয়স এখন আশী, বৌএর বয়স ত্রিশ। সাহিত্য-সম্রাট্ সুরসিক বঙ্গের সুসন্তান বঙ্কিমবাবু মেয়েমানুষের পূর্ণযৌবন ত্রিশ বছরে কল্পনা করেছেন। তাই দেখে তাঁতী-বৌ ত্রিশবছর নয়। সত্যি সত্যি বয়স ত্রিশ বছর। তাঁতিনীর দশবছরে বিয়ে, তাঁতী তখন ষাট বছরের। বিয়ের পর বিশবছর এখন পার হয়েছে। শত্রুর মুখে বাসী উনানের ছাই দিয়ে ষেটের কোলে তাঁতীর পা আশী বছরে পড়েছে।

প্রথম বিয়ে ধুমধামে বাজী পুড়িয়ে, হাওয়াই উড়িয়ে, বম ফাটিয়ে, তুবড়ি ছুটিয়ে। রংমশালের তেজে হাঁপানি ব্যামো হয়েছিল অনেকের। একটা গেরস্তের ঘর পুড়ে গিয়েছিল। তাঁতীর বাপ তখন বেঁচে। দেওয়ানি ফৌজ-দারি মোকর্দ্দমা। মোকর্দ্দমার যোগাড়ে দালাল—মেদিনী-পুরের পাতীমোক্তার,—বীরভূমের খেঁড়ো-খোর—হাই-কোর্টের কোর্টে-পাওয়া উকিল মোক্তার ব্যারিষ্টার অনেক দিন হতেই আছে। তবে তখন বষ্টম ছিল না। যদিও ছিল, সে জাতি-হারান নয়। মাটী পাবার জন্যে জাত খুইয়ে বষ্টম হয়, ভেক নেয়। লেখাপড়া শিখে পাশ করে উপার্জ্জনের পথ না পেলেই পেশো উকিল মোক্তার হয়। এঁরা তখন এত অধিক ছিলেন না। দুটো থলিতে পা-গলানো লোকে ভালবাসত না।

ঘড়পোড়া গৃহস্থ দৈব আগুন মনে করলে, আপনার চারপোয়া পাপের ফল বুঝ্‌লে। নূতন কাপড়, কড়ার দুধ, কাঁদির-কলা শিকের-সন্দেশ শাঁখ বাজিয়ে আগুনে আহুতি দিতে লাগল। আকাশ-তড়তড়া, ঘরে আগুন, সর্পাঘাত হিন্দুতে বলে' থাকে বিশ্বাস করে ব্রহ্মশাপ। ব্রহ্মার তৃপ্তির জন্যে স্তুতিপাঠ করতে লাগল।

তাঁতীর বাপ খবর পেলে ঘরে আগুন লেগেছে। হাজির হলেন ঘরপোড়া গৃহস্থের কাছে, ক্ষমা চাইলেন ক্ষতি পূরণ করলেন। বৌভাতের দিন নিমন্ত্রণ করলেন। গৃহস্থের ছেলে মেয়ে ঘর-গস্তি সকলের, রাখালের, নূতন কাপড় দিলেন। দুইজনে বন্ধু হলেন।

দেবতার স্বভাব! জলে ময়লা ধুই, জল আবার তেষ্টা মেটায়; ঘুম ভাঙ্গলেই ধরিত্রীকে লাথি মারি, দুপায়ে মাড়াই, আবার আমার ঘুমের সময়ে কোলে রেখে ধরিত্রী

আমাকে ঘুম পাড়ায়; ময়লা কাপড় লেপ কাঁথা রৌদ্রে দিই, বাতাসে শুখাই, তবু রোদ বাতাসের মধ্যেই আমি বেঁচে থাকি। আমি সকল দেবতাকেই অল্পাধিক তাচ্ছিল্য করি, কেহই আমার উপর রুষ্ট হন না। তুষ্ট করি না দেবতাকে। যদি করি—করে থাকি একটু জল দিয়ে, নয়ত দুটো পাতা দিয়ে, ফুল দিয়ে। ঘর-পোড়া গৃহস্থ দেবতা নয় ত কি বল্‌ব? গৃহস্থের যেমন বিশ্বাস যেমন ভক্তি যেমন ত্যাগ, ঠিক সেই সঙ্গে সঙ্গেই "সর্ব্বাশুভবিনাশিনী, অপবর্গপ্রদায়িনী" জগদ্ধাত্রী মহামায়া মহাশক্তি সঞ্চার করে তাঁতীর বাপের হৃদয়ে আবির্ভাব হলেন! তুমি আমি সেই মূর্ত্তিটি চোখে দেখলাম না, কাজ ত দেখলাম। সমুদ্রের মধ্যে জলচর-সকলকে জানবার উপায় নেই। শূন্যে অলক্ষ্য বস্তু কত আছে কে জানে? যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় এমন জীব আছে। যন্ত্র আমাদের কল্পনাপ্রসূত। কল্পনা করলেই বুঝতে পারব কল্পনা অলক্ষ্য বস্তু। জীব ভাব, আধারে অবস্থান করে থাকে। "আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা" দেবতারা এই কথা বলিয়া চণ্ডীর উপাসনা করেছেন। ঘরপোড়া গৃহস্থকে আমি বলব দেবতা। জ্বলন্ত অগ্নি আধার দেখে আরাধনা করেছিল।

এ বিয়ের কিছু নেই; ছেলে মেয়ে জামাই নাতি নাতিনী, বিয়ের পর পঁচিশ বছরেই সব ফাঁক। এই জীবনসংগ্রামে তাঁতীর বয়স যখন চল্লিশ বৎসর ধুলামুঠা ধরলে কড়িমুঠা হত। সুতার কারবার, কাপড়ের কারবার, নামজাদা দোকানদার, আশপাশ চল্লিশ ক্রোশের মধ্যে এই তাঁতী তখন একলা আড়ংদার। আবার বিয়ে করলে। ডাগর মেয়ে তাঁতীর ঘরে তেমন পাওয়া যায় না—সদ্য সদ্য সব কাজ করতে পারে—হাঁড়ি হেঁসেল ধরতে পারে, বাটনা-বাঁটা গোবর-ঘাঁটা গরুতোলা। তাঁতীর এসমস্ত কর্ম্মের জন্যে বিয়ের দরকার ছিল না? ভাগ্যদেবী তাঁতীকে তখন কোলে নিয়েছেন, কিছু অভাব নেই। তাই ডেপুটীবাবু তাঁতীকে এখন জামাই করলেন। সালঙ্কারা রূপবতী কন্যা দান করলেন। কনের বাপ যশোহরে হাকিমি করেন। পয়সা ছিল, তাই তাঁতীর আবার পয়সা এল। বরাভরণ—দানসামগ্রী—গায়েহলুদ ফুলশয্যা ইত্যাদি অনেক রকমে তাঁতী দেড়হাজার টাকার উপর পেলে। কন্যার গহনা দুহাজার টাকা। দু-নম্বর তাঁতী-বৌ, বাপের একলা মেয়ে। বাপ ছিল। উনিশ পার হয়নি, এমন সময়ে এয়োরাণী ভাগ্যিমানী সিঁতের সিঁদুর শাঁখা সাড়ী সিঁদুরচুপ্‌রি এয়োসাজ নিয়ে আলতা-পায়ে স্বামী রেখে স্বর্গে গেল। এই সময়ে তাঁতীর পড়তা কমতে লাগ্‌ল।

কারবারে দেনা হল। প্রসার প্রতিপত্তি সব গেল। পাকাবাড়ী, পূজোর দালান, অতিথশালা, জমিদারি, বিষয়-সম্পত্তি হুণ্ডির দেনায়, দেনার দেনায়, হাওলাত দেনায়, বাজার দেনায় সবই গেল, নাতক হল। জেল খাটল। হাতীর-খাওয়া হজমকরা হালকা একটা কয়েত-বেল তাঁতী এখন! এই বিয়ের পর পাঁচবছর বেশ ভোগে ছিল, পাঁচবছর বয়স গেল এমন বোধ হয় না, আহার এবং উপাসনা শরীরে রোগ আসতে দেয় না। রোগ প্রবল হলেই জরা ও বার্দ্ধক্য শীঘ্র আক্রমণ করে। তাঁতী উপাসনা করত না, আহার করত বেশ। শরীর ছিল বেশ বলবান। আবার বিয়ে করলে।

এই তিন নম্বর বিয়ে—বয়স পঞ্চান্ন পূর্ণ হবার কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত টিকে ছিল। আপনি এখন কাপড় বুনে। তৃতীয় পত্নী স্বামীর কর্ম্মে সহায় হল। অল্প উপার্জ্জনে পেটে কুলোয় না, চারটি বহু কষ্টে দিতে লাগল। কষ্টকে কষ্ট মনে হয় না। এ তাঁতী-বৌ সর্ব্বদা হাসিমুখ, মুখে কথা নেই, সতীলক্ষ্মী। দুটি কন্যা রেখে দেহত্যাগ করলে। একটি পাঁচবছরের, অপরটি তিন বছরের। তাঁতী এখন তিনকুড়ি পার হতে চলেছে, আর বিয়ে করবে না। মেয়ে দুটি আছে। বিয়ে দিবে অল্প বয়সে। টাকা পাবার ভরসা আছে। তাঁতী, কুমোর, নাপিতের মেয়ে এখনও বিক্রী হয়। বরপাত্র টাকা পায় না। মেয়ের বাপ ক্ষতি খরচা পুষিয়ে নেয়। ঠিক যেন ছাগল বেচে দর করে। বেশি পেলেই বিক্রী করে। বিয়ে দেওয়া নয়।

জনরব—তাঁতীর টাকা আছে। টাকা পোঁতা আছে, গুজব। তাঁতী-বৌ গরিবের মেয়ে, বয়স দশ বছর, বাপ-মার একলা মেয়ে। মার আর হয়নি। ঐ পাঁচবছর আর তিনবছরের কন্যা দুটি নিয়ে ষাটবছর বয়সে দরিদ্র অবস্থায় যতদূর কষ্ট আমরা অনুমানে আনতে পারি, তার চেয়ে অনেক অধিক ঐ তাঁতী আর ওর মত বৌ-মরা ঠেকে

ঠেকে ঠোকর খেয়ে পেয়েছে। যার মরেনি সে জানে না।

বাবা, মা কোথায়? মা মরে গেছে?—তিন বছরের মেয়েটি তাঁতীর দাড়ী ধরে' তাঁতীর মুখ উঠিয়ে চোখে চোখ রেখে বলে—হ্যাঁ বাবা, মা নেই, মা মরে গেছে?—শুনে শুকনো কাঠে জল আসে, তপ্ত পাথর ঘেমে উঠে, ডাকাত আর শিঁদেল চোর সরে পড়ে, জলন্ত আগুন জল হয়ে যায়।

মেয়েদুটিকে তাঁতী-বৌ বিয়ের আগেই সঙ্গে রেখে খেলা করত। বৌএর মা বেলা হলে এক-একদিন তাঁতীর রান্না রেঁধে দিত।

নিকট প্রতিবাসী, স্বজাতি, সম্বন্ধ খুঁজলে পাওয়া যায়। দূর সম্বন্ধ। তাঁতী বিয়ে করল তাঁতী-বৌকে। বৌএর মা বড় লক্ষ্মী।

ষাটবছর আর দশ বছর। তফাত তত বেশি কি? তিন বারে তিনটা ফুলগাছের সঙ্গে বিয়ে ধরলে তাঁতীর এই তাঁতী-বৌ সপ্তম পত্নী—ষাটের কোলে ঠিক যেন ছেলের মেয়ে, নাত্নী।

মেয়ে দুটির বিয়ে হয়েছে। বিয়ে দিয়ে তাঁতী টাকা পেয়েছিল। অন্ন বস্ত্রের দুঃখ। সব কেড়ে নিয়েছে। কেড়ে নিয়েছে তাঁতী-বৌ। বুড়োর হাতে কিছু নেই।

তাঁতী-বৌ যা চায় তা পায় না। অভাবে অসদ্ভাব অধিক বাড়তে লাগল। মেয়ে দুটিকে হিংসা করতে লাগল। জামাই এলে তাঁতীকে তিরস্কার করে।

তাঁতী তখনও অধিক অশক্ত হয় নি। দুকথা চড়া করে বলে তাঁতী-বৌকে। তাঁতী বলে—খাট খাও শোও ঘুমাও ঘর কর, বিয়ে-করা ধর্ম্মপত্নী ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি রাখ। সংসার দুজনারই। অভাব অনাটন সুখ দুঃখ দুজনারই সমান বুঝতে হবে। তাঁতী-বৌ এতে রাজী নয়। কুলী ভীল সাঁওতালের স্ত্রী মাটি কাটে মজুরি করে স্বামীর তরে। তাঁতী-বৌ এক-একদিন বগলামূর্ত্তি—তাঁতীর জিব টেনে বার করে। তাঁতী-বৌ ছিন্নমস্তা—বঁটি কাটারি ধরে। পাড়ার লোক অস্থির। নিন্দা করলে লোকে গালি খায়। তাঁতী-বৌএর মা-বাপ এখন বেঁচে নেই। নিজের গলায় দড়ি দিয়ে ভয় দেখায়, তাঁতীকে ফেরে ফেলতে যায়। চৌকীদার ডাকে। তাঁতী নিতান্ত দুর্ব্বল হতে লাগল। ভাবনা শরীর শুকিয়ে তুলতে লাগল।

চিন্তার সমান নাই শরীর-শোষিকা।
মাতার সমান নাই শরীর-পোষিকা।
কান্তার সমান নাই শরীর-তোষিকা।

কান্তা তাঁতীর খোন্তা হইয়াছে। রোজ রক্তপাত করে। মারব বললেই তাঁতী মার খায়। সইকে সঙ্গে নেয় তাঁতী-বৌ। কাদম্বিনী আর তাঁতী-বৌ দুজনেই তাঁতীর জীবন্ত মূর্ত্তিমান যম, মনে পড়লে তাঁতী ভয় পায়। কল্পনায় আনা যায় না এমন শাসন করতে লাগল দুজনে।

হিন্দুর বিয়ে বখেয়া শেলাই। কাপড় ছিঁড়ে যায় শেলাই খোলে না। সুতায় টান মারলে শেলাই আরও অধিক শক্ত হয়। দুঃখ দরিদ্রতায় পতী পত্নীর সহৃদয়তা বাড়বার কথা, তাঁতী-বৌ তুমি এমন হলে কেন? মনে করতাম মেয়ে মায়ের গুণ পায়, তোমার মা যে স্বয়ং লক্ষ্মী ছিলেন দেখেছি। তোমার বাপ অর্থলোভী পিশাচ। তোমার বিয়েতেই তার চরিত্রের পরিচয় পেয়েছি। তোমার মার মত ছিল না, এজন্যে ভালমানুষের মেয়ে মার খেয়ে পিঠে কাপড় চাপা দিয়েছে। মুখে তার কথা ছিল না। তাঁতী-বৌ, তুমি মায়ের ধারায় যাওনি, বাপের ধারা বেশ পেয়েছ!

তাঁতী-বৌ ছাতারে, কাল-পেঁচা, কাঁদা-খোচা, কাঠ-ঠোক্‌রা, হাঁড়িচাঁচা, ডোমচিল, শিকরে, শকুনি,—চিঁহিঁ করে' ডানা তুলে ঝাপটা মেরে সব নিবালে। অন্ধকার তাঁতীর ভিটে।

অন্ধকার হলেই লোকে আলো খোজে, অসুখ হলেই সুখের অন্বেষণ করে। অভাব হলেই স্বভাব বদলিয়ে ফেলে। এখন ঘোর অন্ধকার তাঁতীর বাড়ীতে। তাঁতীর আর কেউ নেই। পাড়াপড়সী বাড়ীতে আসতে সাহস করে না। অসুখ অত্যন্ত, সুখের কোনও কিছু নেই। অভাব নিত্যই, স্বভাব তাই সরে পড়ল। তাঁতীর শত্রু তাঁতী-বৌ তাঁতীর পরম মিত্রের অনুসন্ধানে তাঁতীকে পাঠাতে লাগল। মহিম্ন-স্তোত্রে পুষ্পদন্ত বলেছেন—অমঙ্গল্যং শীলং ভবতু তব নাম্নৈবমখিলং—মন্দটাই ভাল হয় মহাদেব, তোমার নামে। তাঁতী-বৌএর নির্য্যাতনে তাঁতী নিরুপায়। প্রতিবাসীর সঙ্গে কথা বলতে দেখলে তাঁতী-বৌ তাঁতীকে মারে।

তাঁতী মনে করলে তুলসী-গাছের কাছে দুঃখের কান্না কাঁদবে। যত্ন করে তুলসী-গাছ আনলে। জালার ভিতরে মাটি রেখে জালাটিকে অৰ্দ্ধেক পুঁতে মাটি হতে প্রায় এক হাত উঁচুতে গাছটিকে রাখলে—তাঁতী-বৌ গাছটিকে ঝাঁটা মারতে না পারে, ঝাঁটার ধুলা গাছে না পড়ে। তাঁতী-বৌ জালাটি ভেঙ্গে ফেললে। অপরাধ? তাঁতী অনেক সময় জালার কাছে বসে থাকে।

তাঁতী ইট খুঁজে মুড়ি গেঁথে তুলসীমঞ্চ তোয়ের করলে। সাপ, ব্যাঙ, বিছার আড্ডা—এই ছলে তাঁতী-বৌ আবার সেটি ভেঙ্গে দিলে। মাটিতে গাছ লাগালে। তাঁতী-বৌ তার উপর জঞ্জাল চাপিয়ে গাছটিকে নষ্ট করলে।

বনের পশু শৃগাল কুকুরকে কে যেন কি ইঙ্গিত করে দিলে। ঘর দুয়ার এরা ময়লা করতে লাগল। ইঁদুর ছুঁচো শত্রুতা করতে লাগল। ব্যাঙ নাচে চেঙ ডাকে। অলক্ষিত ভাবে আবর্জ্জনা আসে। আহার করছে এমন সময় গুবরে-পোকা ভাতে পড়ে, প্রদীপ নিবায়। তাঁতী-বৌ তাঁতীর উপর খড়্গহস্ত। এ সমস্ত অপরাধ তাঁতীর। ঘাট পথ নোংরা। বিছানায় আবৰ্জ্জনা। তাঁতী-বৌ ক্ষেপে উঠে। স্নান করে দুতিনবার শীতকালে। শুচিবাই রোগ জন্মাল। তাঁতী-বৌএর গলাবাজীতে পাড়া কাঁপতে থাকে। নিত্যই কোন্দল। পাড়ার সকলেই তাঁতী-বৌএর শত্রু।

তাঁতী-বৌ লোকের কাছে মুখ দেখাতে সাহসী নয়। ছল করে শুয়ে থাকে। বেলায় উঠে।

নিকটে ব্রাহ্মণের বাড়ী। নিত্য দেবসেবা অতিথসেবা হয়ে থাকে। প্রত্যহ দুইবেলা তুলসীতলায় তাঁতী এই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে প্রণাম করে। প্রণাম করে ঠাকুরঘরে। প্রণাম করে ব্রাহ্মণীকে। ব্রাহ্মণকন্যারা যত্ন করে' তাঁতীকে আহার দেন। তাঁতী-বৌ তাতে নিজের নিন্দার কারণ বুঝে। তাঁতীকে যেতে দিতে চায় না ব্রাহ্মণের বাড়ীতে।

তাঁতী একদিন তুলসীগাছে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূৰ্ত্তি দেখতে পেলে। ভাল করে দেখতে চাইলে, দেখতে পেলে না। ভাবলে তাঁতীর ভ্রম হয়েছে। একথা কাকেও তাঁতী বললে না। মনের দৌড় সৎপথে নিয়ে যায়। আবার সেই দৌড় দৌড়ে নিয়ে যায় নরকে। মন কখন কি করে কাহারও সহিত পরামর্শ করে না। মন সদাই স্বাধীন। তাঁতী-বৌএর কঠোর তাড়নায় তাঁতীর মন পালিয়ে বেড়াচ্ছে স্বাধীনতার তরে।

স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নে উত্তম জিনিষ খায়, উত্তম সুগন্ধ পায়, সেবা করে দাস-দাসীতে। স্বপ্নে দেখে নারায়ণ চতুর্ভুজ।

ব্রাহ্মণ-বাড়ীতে সে কথা গল্প করতে লাগল। তাঁতীর লাবণ্য বাড়তে থাকল। আনন্দ সৰ্ব্বদাই, পাগল নয়। লোকে তাকে পাগল বলতে লাগল। ভিমরতি ধরেছে—আশীবছরের তাঁতী।

বাড়ীর কর্ত্তা তাঁতীকে বুঝিয়ে দিলেন—তুলসীগাছেই সেই নারায়ণমূৰ্ত্তি আছে। প্রহ্লাদের স্ফটিকস্তম্ভের গল্প করলেন। ভগবান যে ফুলে ফলে গাছে পালায় আকাশে বাতাসে মনের মধ্যে অন্তর্য্যামী।

জন্ম মৃত্যু ভেঙ্গে-গড়া। নূতন করা, নূতন আধার দেহান্তর মাত্র। মনটাকে দেহান্তর করে' অন্য একটা আধারে অর্পণ করতে পারলে সেই আধার হতে নূতন একটা অপরূপ রূপাধার বাহির হতে পারে। যে-তাড়নায় মন এই অন্য আধারে পালিয়ে আসে মনকে তখন আর সে-তাড়না সহ্য করতে হয় না। মন তখন ভেঙ্গে-গড়া হয়। মনের নূতন জন্ম হয়।

একদিন সন্ধ্যাকালে তুলসীতলায় তাঁতী প্রণাম করছে। কে যেন তাকে বললে "তুমি কি চাও?" গাছটি ফুলবাগানের মধ্যে। বাগানটি বেশ বড়, ছোট ছোট ফুলগাছ। মাঝখানে তুলসী গাছ। টগর করবী জবা সেফালিকা বক বকুল ধারে ধারে আছে। তুলসী-গাছটি অনেক দিনের। অধিক যত্ন না করলে তুলসীগাছ এতবড় হয় না, এতদিন বাঁচে না। ব্রাহ্মণের বড় যত্নের সামগ্রী এই তুলসীগাছ। বেলগাছ একটু তফাতে।

তাঁতী সেদিন ঘরে এসেই এই কথা তাঁতী-বৌকে বললে। তাঁতী-বৌ উড়িয়ে দিলে, বললে—তাঁতীর মরবার আর দেরী নেই। ঠাট্টা করে' সোনার সিংহাসন চেয়ে নিতে বল্‌লে। কর্কশ কথা মিশিয়ে কঠোর তাড়না করতে লাগল। তাঁতী চুপ করে রইল।

পরদিন সকাল-বেলা তাঁতী আবার জিজ্ঞাসা করলে—

তাঁতী-বৌ, বলনা আমি কি চাইব ? তুমি কষ্ট পাও, তাই আমাকে তিরস্কার কর। তা আমি বুঝি। আমার সাধ্য নাই তোমার দুঃখ দূর করি। তোমার অদৃষ্টে নেই সুখ। আমার বৃদ্ধ বয়সে তুমি আমাকে নিমিত্তের ভাগী দাঁড় করাচ্ছ।

তাঁতীর কথা শুনে তাঁতী-বৌ রেগে উঠল, বললে—মরতে তুই বিয়ে করেছিলি কেন ? আমাকে আদর করে অনেকেই রত্নসিংহাসন দিত।

তাঁতী বলেল—আমার সে সমস্তই ত ছিল, এখন কিছু নেই। কেবল তুমি আছ। তুমি কি চাও বল; তোমার জন্যে আমি চেয়ে নেবো। সত্য হয় ভালই, না হয় ক্ষতি নেই। গহনা চাইব ? না, নগদ টাকা চাইব ?

তাঁতী-বৌ বললে—আর দুটা হাত আর দুটা পা আর একটা মাথা চেয়ে লও। দুপায়ে তাঁতের কাজ করে ক্লান্ত হও, পা হাত ব্যথা করে। আমার কথা শুন। যা বলি তাই কর। তোমার দুহাত দুপা কর্ম্ম করবে, দুহাত দুপা বিশ্রাম করবে। এক মাথা ঘুমাবে, অন্য মাথা ভাববে। শরীর তোমার ডবল হবে। দিনরাত কর্ম্ম বন্ধ হবে না। আমি কাজ চাই। কাপড় বুনে তুমি আবার বড়মানুষ হবে। আমার সই আর আমি সূতায় মাড় মাখাব, টানা দিব, নাটাই ঘুরাব।

একদিন দুইপ্রহরের পরে স্নান করে তাঁতী তুলসীতলায় প্রণাম করতে গিয়ে বৌএর উপদেশ-মত বর চাইলে। তাঁতী বর পেলে।

উৎকট চেহারা! ব্রাহ্মণ-বাড়ীর ছেলেমেয়েরা আঁৎকে কেঁদে উঠল। লোক জমা হল। তাঁতী-বৌ এল। সে ভয় কাকে বলে জানত না। দেখে ভয় পেলে। তাঁতী বললে—ভয় নেই, তুমিই আমাকে এরূপ করেছ। আমাকে ঘরে নিয়ে চল। চল ঘরে যাই। কুকুর কামড়াতে আসছে।

অনেকগুলি স্ত্রীলোকের অনুরোধে তাঁতী-বৌ তাঁতীকে ঘরে নিয়ে গেল। ভয়ে কাছে আসে না। পথের লোকে ভয় পায়। পুলিশ গ্রেপ্তার করলে। বিচারে তাঁতীর শূলদণ্ডের আদেশ হল।

তাঁতী আপন চেহারা দেখে আপনাকে আর সেই ভূধর তাঁতী মনে করে না। ঘুমাতে পারে না। দুটা মাথা। ভাবনার বিরাম নেই। ঘুম না হলে মানুষ এপাশ ওপাশ করে। তাঁতীর তার উপায় নেই। নাক মুখ চোখ কান হাত পা প্রত্যেকটিই ডবল হয়েছে। ঘুম কিন্তু একেবারে নেই। ঘুমপাড়ানি মাসি ভুলে গেল, মায়া কাটালে। ঘুম আমাদের মাসি, মাসির বাড়ী থাকি আমরা ঘুমের সময়। মৃত্যুই আমাদের মা। এই মা আমাদের সকল জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণ করেন। গর্ভধারিণী সৎমা। সৎমা আমাকে সংসারে এনে অনেক দুঃখ ভোগ করান।

এই সময় হতে তাঁতী তুলসীর কাছে আর প্রণাম করে না। শূলদণ্ড হবে জেনে পাগল হয়ে উঠল। কথা কয় না, খায় না, চায় না। দুতিন দিন অনাহারে, তবু বেশ সবল এবং সুস্থ।

শূলের উপর বসান হল। অনেক লোক জড়ো হল। স্ত্রীলোক অনেকেই পালিয়ে গেল। কান্নার রোলে প্রাণ মানুষের ব্যাকুল হয়ে উঠল। সকলেই দেখলে তাঁতীর দুই হাত দুই পা এক মাথা এক এক দিকে। যে যেখান হতে দেখে ভূধর তাঁতীর দুই হাত দুই পা দুই চোখ দুই কান এক নাক—তাঁতী যেন সকলের দিকেই চেয়ে আছে। শূলদণ্ড বেঁকে পড়ে' তাঁতীর সামনে গরুড়ের আকার ধারণ করলে। শরীরটি প্রস্তরময় হয়েছে। চন্দনের ফোঁটা কে কখন কপালে দিলে কেউ বুঝতে পারলে না। চন্দনের দাগ ধুলে যায় না। কালো পাথরে সাদা চন্দন পাথর হয়ে গিয়েছে।

সেইখানে ঐ শূলের দিনের তিথি উপলক্ষে বৎসর বৎসর মেলা হয়, দূর দেশ হতে লোকজন দোকানদার আসে, ১৫।১৬ দিন মেলা থাকে। হিন্দুর তীর্থস্থান।

তাঁতী-বৌ যে কয়েকদিন বেঁচে ছিল, সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীতেই থাকত, ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবার মত একাহার করত। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করলে, ব্রাহ্মণের এবং ব্রাহ্মণ-কন্যাদের উপদেশে তাঁতী-বৌএর চরিত্র মার্জ্জিত হল।

মৃত্যুর পূর্ব্বে আপন নামে পাথর খোদাই করিয়ে সেই শূলের স্থানে বসিয়ে দিলে; তাতে লেখা ছিল—স্ত্রীলোকের মূর্ত্তিমান দেবতা স্বামী।

শ্রীমতী বিজয়উজ্জয়িনী দেবী।

———

হালখাতা

(গল্প)

(১)

অনুকুলমল্লিকের পিতৃ-পরিত্যক্ত বাসগৃহখানি বন্ধকের সুদে দিন দিন যেমন জীর্ণ ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতেছিল, ঋণের চিন্তায় তাঁহার স্বভাব-শীর্ণ দেহখানিও যে তেমনি কৃশ ও ক্রমে কঙ্কালকল্প হইয়া যাইতেছিল সেদিকে লক্ষ্য করিবার অবসর তাঁহার ছিল না। শওদাগরী আফিসে চল্লিশটাকা মাসিকের চাকরীটুকু রক্ষা করিতেও তাঁহাকে অনন্যোপায় মসীজীবীর অনুরূপ অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে হইত। শরীর যেমন ক্ষণবিধ্বংসী তেমনি কষ্ট-সহিষ্ণু— অন্ততঃ চাকরীগতপ্রাণ বাঙ্গালীর পক্ষে বটে।

চির-সহচর চিন্তা লইয়া অনুকূলবাবু বসিয়া ছিলেন। মনোরমা আসিয়া বলিল—বাবা, চান্ করবে না?

"ক'রব।"

"কি ভাবছ বাবা?"

"কিছু না।"

"ঐ যে ভাবছ—তুমি চান করবে এস।"

পিতা বিস্ফারিত নেত্রে একবার কন্যার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

"বাবা, তুমি বুঝি সেই টাকার কথাই ভাবছিলে?"

"স্বরূপদত্তের এখনি আসবার কথা আছে—টাকার কিন্তু কোন বন্দবস্ত হয় নি।"

"সে এত বেলায় আর আসবে না।"

"আসবেই, ওয়াদা করে গেছে।"

"তার কি কথার ঠিক আছে? দিদির বিয়ের গহনা-গুলি দিতে কত ওয়াদা ভেঙেছিল তা কি মনে নেই? তুমি এস বাবা, সে আসবে না।"

"বোকা মেয়ে! সে যে ভিন্ন কথা! পাওনার তাগাদায় স্বরূপদত্ত কখনও সত্যভঙ্গ করে না। চল, চান্ ত করতেই হবে।"

অনতিদূরে স্বরূপদত্তের আবির্ভাব তাঁহাকে দুনিয়ার আর-সমস্ত চিন্তা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিয়া দিল। স্বরূপচন্দ্রের অন্তিম যতই ঘনাইয়া আসিতেছিল অর্থসঞ্চয়ের উদ্দাম প্রবৃত্তি ততই বাড়িয়া যাইতেছিল—বিশেষতঃ বিলাতবাকীর অংশ আদায় না করিয়া মরা তাঁহার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব। সেইজন্য আপাততঃ চলৎশক্তিতে কিঞ্চিৎ মন্থরতা আসিয়া পড়িলেও দেনাদারের দীন-কুটীরে দিনের মধ্যে দু-বার একবারও পদার্পণ না করিলে রাত্রিকালে তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িত। তবে অধুনা সর্ব্বত্রই পুত্রকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। তাহার কারণ—পুত্র যতটা বুঝুক আর নাই বুঝুক—তিনি প্রতিনিয়তই প্রকাশ করিতেন—"সব দেখিয়া শুনিয়া লউক, আমার ত' আর অধিক দিন নয়।"

* * *

"কি অনুকূলবাবু চুপ ক'রে বসে রইলেন যে। যান বাড়ীর মধ্যে—টাকা আনুন, বেলা হয়েছে। বিশ্বনাথ! পার কর।"

"আপনার টাকার বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত নেই দত্তমশায়, নিশ্চয় পাবেন—কিন্তু এখনও কিছু করে উঠতে পারিনি।"

"আজ যে কতক টাকা দেবার কথা ছিল। আপনি কি রকম ভদ্রলোক মশায়? কতবার কতরকম কথা বলেন। আজ আমার কিছু টাকা চাই-ই। আর এই নিন, হাল-খাতার পত্র—সেদিন যেন আমার এক পয়সাও বাকি না থাকে।"

"আমি খুব চেষ্টায় আছি—আপনাকে সে আর বল্‌তে হবে না।"

"আরে মশায়—ও রকম ঢের বলেছেন—আচ্ছা এবার দেখা যাক! দেখবেন কিন্তু ভাল ক'রে নিমন্ত্রণ রেখে আসবেন। আপনি বারবার আমার সঙ্গে আর এ রকম জুয়াচুরি করবেন না। দেখ নির্ম্মল, এই মল্লিকটি ভারি বাঁকা লোক। টাকাগুলো বুঝি ডুবোয়! বাবা বিশ্বনাথ!"

নির্ম্মল লজ্জিত হইয়া বলিল—"উনি যখন বল্‌ছেন, হাল-খাতার মধ্যে টাকা মিটিয়ে দেবেন, তখন আর কথা কচ্ছ কেন। এখন বাবা বাড়ী চল।"

(২)

মনোরমা অন্তরাল হইতে সকলই শুনিয়াছিল। "বাবা, ওরা নিমন্ত্রণ করতে এসে অমন কড়া কথা বলে গেল কেন?"

"সে কথা থাক। তোর দিদিকে বলগে আমি এবেলা কিছু খাব না।"

"বাবা, আমি বুঝতে পেরেছি, ভেবে ভেবে তোমার অসুখ করেছে। আচ্ছা, ওরা ত সেই গয়নার টাকা চাইছিল? —তাহ'লে দিদির গহনাগুলি ওদের ফেরত দিলেই ত' হয় —তিনি ত' আর পরবেন না।"

"তোর দিদির গয়না? সে কোথায়?"

"কেন দিদির কাছে।"

"নেই—"

"কি হ'ল?"

"তোর দিদির গহনা শ্মশানে ছাই হয়েছে।"

"বাবা, তোমার কথা আমি বুঝতে পাচ্ছিনে—অত গহনা তুমি দিয়েছিলে!"

"আমি দিয়েছিলাম—তারা নিয়েছে।"

"কেন? গয়না ত' দিদির! যাই দেখি, দিদিকে জিজ্ঞাসা করতে।"

মনোরমা ছুটিয়া দিদির কাছে গেল।

"দিদি, তোমার গয়না সব কোথায়? নিয়ে আসনি?

"আমার গয়না কোথায়? সে সব কি আমার? যাদের, তারা নিয়েছে।"

"সে কি? তোমার না ত কার? বাবা দিয়েছিল, অত গয়না!"

"আমার নাম মাত্র—আমার জন্যে হলে কি বাবাকে ঋণ করে সর্ব্বস্বান্ত হতে দিতাম—আমাকে দরকার-মত পরিয়ে দিয়েছিল—এখন দরকার নেই, খুলে নিয়েছে।"

দিদির কথা মনোরমা ভাল করিয়া বুঝিল না। বিবাহের বরকর্ত্তা ভাবী বধূর অঙ্গাভরণের জন্য কেন যে এত নির্য্যাতনপর হইয়া পড়েন এবং যাহার নামে অলঙ্কার আদায়ের জন্য গলদঘর্ম্ম ব্যাপার ঘটিয়া যায়—সে যে একটা অধিকারবিহীন নিমিত্ত মাত্র, এতটা বুঝিয়া উঠা বালিকার পক্ষে এখনও সম্ভবপর হয় নাই। সে পিতার কাছে ফিরিয়া আসিল—"বাবা, তোমার-দেওয়া দিদির গহনা, তারা নিয়েছে কেন?"

"তারা যে দয়া করে নিয়েছে, এই তোমার বাবার চোদ্দপুরুষের ভাগ্য। তারা যদি অনুগ্রহ ক'রে দেড়হাজারের গয়নায় সম্মত না হ'ত—তা হ'লে তোমার দিদির আইবুড়ো নাম ঘুচত না। এখন সব ঘুচেছে। আমি নিশ্চিন্ত, তোমার দিদিও নিশ্চিন্ত।"

"তবে গয়না যখন তাদের কাছে, তখন পোদ্দার মশায়কে বলে দাও, দাম তারাই দেবে। তুমি কেন দিতে যাবে?"

"না, মা! গয়না তাদের, ঋণ আমার, আমাকেই দিতে হবে।"

"সে কেমন কথা! আমায় তোমাকে একখানিও গয়না দিতে হবে না, আমি চাইব না।"

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কন্যাকে অন্যদিকে লওয়াইবার জন্য পিতা বলিলেন—"তুই চল, আমার খিদে পেয়েছে।"

মনোরমা দ্বিরুক্তি না করিয়া পিতার আহারের আয়োজনে চলিয়া গেল।

(৩)

১লা বৈশাখের প্রাতঃকাল। আফিসে বহির্গত হইবার অগ্রে অনুকূলচন্দ্র স্থির করিতে পারিলেন না কি করিয়া সায়াহ্নে স্বরূপদত্তের নিমন্ত্রণ রক্ষা হইবে। পাওয়ানা প্রায় একশত টাকা—হাতে কিন্তু কিছুই সংগ্রহ হয় নাই। মাহিয়ানা পাইতেও বিলম্ব আছে। তবু আপিসে একবার আগাম চাহিয়া দেখিতে হইবে।

আপিসে টাকা মিলিল না। সমস্ত দিন চিন্তা করিয়া নিয়মিত সময়ে বাটী ফিরিলেন। তখনও চিন্তা, যদি আজকার মত পোদ্দারকে সন্তুষ্ট করিতে না পারি কাল আর তাহার কাছে মুখ দেখান যাইবে না। তিনি আকাশপাতাল ভাবিতে লাগিলেন।

মনোরমা অনন্যচিন্তায় ১লা বৈশাখের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিল। সে পিতার চিন্তার কারণ সর্ব্বতোভাবে বুঝিতে পারিয়াছিল।

"বাবা, আমার কাছে এই একখানা দশটাকার নোট আছে, এটা তুমি নাও বাবা।"

পিতা কিছু বলিলেন না—নোটখানি লইবার জন্য হস্তও প্রসারিত হইল না—অনুকূলচন্দ্র নির্ব্বাক বসিয়া রহিলেন। মনোরমা নোটখানি পিতার হস্তে গুঁজিয়া দিয়া চলিয়া

গেল। পর-পরিচালিত পুত্তলিকার মত অনুকূলচন্দ্র নোট-খানি লইয়া স্বরূপদত্তের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে প্রস্থান করিলেন।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। স্বরূপদত্তের দোকানে হালখাতার কৌশলমূলক আমন্ত্রণ-উৎসব ইতিপূর্ব্বেই লাগিয়া গিয়াছিল। পুত্র নির্ম্মলচন্দ্র এ বৎসর লক্ষ্মীর ভাণ্ডার খুলিয়া সুসজ্জিত দোকানের উপযুক্ত স্থানে বসিয়া গিয়াছেন। খাতায় নাম লিখিয়া বৎসরের প্রথম দিনে তহবিল পূর্ণ করিবার জন্য যে নিমন্ত্রণ করা হয় সেই কার্য্যে পোদ্দার-তনয় পরিপক্ক না হইলেও পিতা যখন ইদানীং সকল কার্য্যে পুত্রকে পাকাইয়া তুলিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন তখন এই অনভ্যস্ত গদীয়ানের কার্য্যে নির্ম্মলচন্দ্র অগত্যা বসিয়া গিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে পিতা পুত্রকে একাধিকবার সতর্ক করিয়া দিয়াছেন—অনুকূল মল্লিক কত টাকা দিয়া যায় তাহা যেন তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে জানান হয়।

এতটাকা পাওনা, কি করিয়া দশটাকা লইয়া মুখ দেখাইবেন, এই ভাবিতে ভাবিতে অনুকূলচন্দ্র ক্ষুব্ধচিত্তে পোদ্দার-সদনে উপস্থিত হইলেন। ঠিক সেই সময়টায় স্বরূপদত্ত কার্য্যান্তরে অন্যত্র ব্যস্ত ছিলেন। অনুকূলচন্দ্র সন্তর্পণে নোটখানি নির্ম্মলচন্দ্রের সম্মুখে রাখিয়া দিয়া চোরের ন্যায় কুণ্ঠিতহৃদয়ে চুপিচুপি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। নির্ম্মল তাহাকে কোন-প্রকার অভ্যর্থনাসূচক জিজ্ঞাসা-বাদ করিল না। সময়োচিত আপ্যায়ন লাভ করিতে নিমন্ত্রিতেরও কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না।

দরজার গোড়ায় রহমানের সহিত দেখা হইল।

"আমি আপনাদের বাড়ী গিয়েছিলাম। বাবা এই কুড়িটা টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন—তিনি আপিসে জানতে পেরেছিলেন যে আজ আপনার টাকার বিশেষ দরকার আছে। আপনি বাড়ী ছিলেন না; মনু বললে এ-দিকেই আপনি এসেছেন—তাই আমি আপনার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। এই টাকা নিন্।"

"বাবা, তোমার বাবাকে আমার নমস্কার দিও। আজ-কার মত কাজ সেরেছি। পরে দরকার হলে জানাব।"

(৪)

অনুকূলবাবু বাড়ীতে আসিয়া একছিলিম তামাক সাজিয়া খাইতে বসিয়াছেন মাত্র, পাশের বাড়ীতে বিবাহের উৎসবের কোলাহল ভেদ করিয়া নহবতের সানাই করুণ-স্বরে বিলাপ করিতেছিল, রহমান দৌড়িয়া আসিয়া বলিল—"কাকা, কাকিমাকে শীগগির জোগাড় করতে বলুন, আজ মনু বোনটির বিয়ে। বর আসছে!"

অনুকূলচন্দ্রের হাতের হুঁকা হাতে রহিল, অবাক হইয়া রহমানের মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া থাকিয়া বলিলেন—রহমান, তুমি কি বলছ? পাগল হয়েছ? বড় মেয়ের বিয়ের ঋণ এখনো শোধ করতে পারিনি। মনুর বিয়ে দেবো কোথা থেকে?"

"কাকা, সে আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। আপনি একজন পুরুত ডেকে আনুন? আর মনুকে একখানা ফরসা কাপড় পরিয়ে দিন। বর এই এসে পড়ল বলে! আমি বরং নিমু ভট্‌চাজকে ডেকে আনছি; আপনি বাড়ীতে একটু জোগাড় করে ফেলুন।"

রহমান ছুটিয়া চলিয়া গেল; সে ও তাহার বাবা অনুকূলচন্দ্রের সুখে দুঃখে বড় আপনার। রহমান বড় ভালো ছেলে। সে ত ঠাট্টা করিবার পাত্র নয়। ব্যাপার কি! দেখিতে দেখিতে খবর পাড়ায় পাড়ায় রাষ্ট্র হইয়া গেল; নিমু ভটচাজ আসিয়া উপস্থিত; পাড়ার মাতব্বরেরাও আসিয়া জুটিলেন! রহমানের তাগাদায় তাঁহারাই সমস্ত উদ্যোগ আয়োজনে লাগিয়া গেলেন; অনুকূলচন্দ্র হতভম্ব হইয়া বসিয়াই রহিলেন, তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন না, তিনি নিদ্রিত অথবা জাগ্রত।

অল্পক্ষণ পরেই স্বরূপদত্তের পুত্র নির্ম্মলচন্দ্র বরবেশে আসিয়া উপস্থিত। রহমান অনুকূলচন্দ্রকে ডাকিয়া বলিল—কাকা, কাকা, বর এসেছে।

অনুকূলচন্দ্র অবাক হইয়া চাহিয়া চাহিয়া বলিল—এ যে নির্ম্মল!

"হাঁ, নির্ম্মলই ত মনুকে বিয়ে করবে। ও-ই ত আমাকে আগে পাঠিয়ে দিয়েছিল আপনাকে খবর দিতে।"

অনুকূলচন্দ্র কাঁদিয়া ফেলিলেন। দুই হাতে নির্ম্মলের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—"বাবা নির্ম্মল, তোমাদের হালখাতায় সব দেনা শোধ করতে পারিনি; তার জন্যে কি আমাকে এমনি করেই অপদস্থ করতে হয়?"

নির্ম্মল বলিল—"আমি সত্যই আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে এসেছি; আপনি সম্প্রদান করবেন চলুন।"

"আমার ত বাবা বাড়ীতে আজ এক পয়সার সংস্থান নেই।"

রহমান বলিল—"কিচ্ছু ভাবতে হবে না কাকা, আমি দীনু মল্লিককে দিয়ে সব বাজার করিয়ে এনেছি।"

অনুকূল তথাপি বিমূঢ়ের মত বলিল—"কিন্তু দত্ত-মশায় কৈ?"

নির্ম্মল হাসিয়া বলিল—"বাবা এই এলেন বলে। কিন্তু লগ্ন বয়ে যায়, আপনি চলুন।"

(৫)

পুরোহিত অনুকূলচন্দ্রকে বলাইতেছিলেন—"সালঙ্কারাং এনাং কন্যাং তুভ্যমহং সম্প্রদদে।"

নির্ম্মল বলিল—"প্রতিগৃহ্লামি।"

এমন সময় স্বরূপদত্ত পাগলের মত ঘরের মধ্যে আসিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল—"ওরে নির্ম্মল, এ তুই কি সর্ব্বনাশ করলি!"

নির্ম্মল বলিল—"ভটচায্যি মশায়, মন্ত্র পড়ান।"

স্বরূপদত্ত বলিলেন—"মল্লিক মশায়, নির্ম্মলকে ছেলে-মানুষ পেয়ে এমন করে ঠকানোটা আপনার কি উচিত হল? যা হোক শুভকার্য্যে আমি বিঘ্ন করব না। আপনি কিন্তু আপনার মেয়ে জামাইকে একেবারে বঞ্চিত কর-বেন না।"

"আমার আর অসাধ কি দত্ত মশায়? তবে আপনি ত জানেন আমার অবস্থা। আমি আপনার ঋণ এখনো শোধ করতে পারিনি। অধিক পরিচয়ের আবশ্যক কি?"

"শোধ করতে পারেননি কি মশায়! আমি কি জানিনে আপনি খুব হিসাবী লোক। এই ত হালখাতায় আমার পাওনা ১০০্ টাকা দিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে এসেছেন।"

"কই? আমি ত দশটাকা মাত্র জমা দিয়েছি।"

"সে কি! আপনার নামে ১০০্ টাকা জমা আমি বেশ করে দেখেছি।"

"আমি দশটাকা দিয়ে এসেছি। অত টাকা আমি কোথায় পাব?"

"দেখুন মশায়রা, মল্লিকমশায় কত চাপা লোক। আচ্ছা, সে আপনি বিবেচনা করবেন, আপনারাই ত মেয়ে জামাই, আমার কি বলুন না? বাবা বিশ্বনাথ, পার কর!"

(৬)

মহৎ উদ্দেশ্যের অন্তরালে ইষ্টদেবতার আশীর্ব্বাদ লুক্কায়িত থাকে বলিয়া মানুষ অনেক সময় জটিল হইতে জটিল-তর সমস্যার মীমাংসা অনায়াসে সাধিত করিয়া লয়। জ্যৈষ্ঠের নীরব মধ্যাহ্নে নির্ম্মলচন্দ্র মনোরমার পার্শ্বে বসিয়া অতীত জীবনকাহিনীর যে অংশ আর-কাহারও নিকট বিবৃত করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায় না সেই নিভৃত প্রদেশের নিগূঢ়তম আত্মকথার অবতারণা করিয়া স্নিগ্ধ আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন।

"এই নোটখানার পিঠে তোমার নাম দেখে বুঝলাম তোমার বাবা আমার বাবার হালখাতায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার জন্যে আর কোথাও কিছু না পেয়ে তোমার এই সযত্নে সঞ্চিত নোটখানিও জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হয়েছেন। আমি এই নোটখানি নিয়ে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখলাম, আর খাতায় তোমার বাবার নামে ১০০্ টাকা জমা করলাম। আর ওদিকে রহমানকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে দিলাম যে তোমার বর আসছে।"

মনোরমা গর্ব্বসুখে হাসিয়া বলিল—"এই নোটখানি বকুল ঠাকুরঝি আমাকে দিয়েছিল। ছোটবেলায় দুজনে একসঙ্গে ভোরবেলা শিবপূজোর ফুল তুলতে যেতাম। তার যখন ভাল বর হল, আর সেই বর যখন বিয়ের পরেই পরীক্ষায় জলপানি পেলে, তখন প্রথম মাসের দুখানি নোটই বকুল উপহার পেয়েছিল। একখানি এখনও তার কাছে আছে, আর একখানি এই—তারই হাতে আমার নাম লেখা।"

"বাবার সঙ্গে আমিও নিমন্ত্রণ করতে এসেছিলাম, দেখেছিলে?"

"জিজ্ঞাসা করছ কেন?"

"নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলে?"

"জানিনে।"

"অনেক দেরী করে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছ। আমি নিমন্ত্রণ করে ফিরবার পর হতেই আসন পেতে রেখেছিলাম কখন আমার লক্ষ্মী হৃদয়ের হালখাতায় এসে ধরা দেবে।"

"বকুলের এই হাতের লেখা আমার প্রতিনিধি হয়ে এসেছিল।"

"খুব জবরদস্ত প্রতিনিধিই বটে। এই প্রতিনিধিই আমাকে সেদিন একদণ্ডেই একেবারে বর সাজিয়ে তোমার কাছে টেনে এনেছিল। ওদিকে তোমার বকুল, আর এদিকে আমার রহমান! আর দুজনের ঘটকালিতে সহায় হয়েছিলেন ভগবান।"

মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লা।

অজন্তা গুহার চিত্রাবলী

আমাদের দেশের অনেক জিনিষই আমাদের কাছে অপরিচিত। অজন্তা গিরিগুহাগুলি কোথায় ও সেখানে কি প্রকারের কত পুরাতন চিত্রের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে তাহা আমাদের অনেকেরই জানা নাই। একে ত গুহাগুলি দক্ষিণ হায়দ্রাবাদের এক কোণে অবস্থিত, তাহাতে আবার সেখানে যাইবার পথও কিছু দুর্গম; কাজেই সকলের পক্ষে সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়। পথ যে নিতান্ত অগম্য এমন নয়। সামান্য কষ্ট স্বীকার করিলেই সেখানে যাওয়া যায়। অসুবিধা ও কষ্ট যতই হউক না কেন গুহাগুলির অপূর্ব্ব শিল্পকলা দর্শন করিলে সকল কষ্টই সার্থক হয়। ভারতবর্ষীয় সকল শিল্পী ও শিল্পপ্রিয় ব্যক্তিরই অজন্তা যাওয়া উচিত। অজন্তা ভারতচিত্রশিল্পের শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান; সে পুণ্যতীর্থে না যাইলে ভারতবাসী কোন শিল্পীরই সাধনা পূর্ণ হয় না।

এককালে অজন্তার নাম ভারতবর্ষে এবং অন্যান্য দেশেও সুপ্রসিদ্ধ ছিল। ধর্ম্ম ও শিল্পের যুগল মিলন কেমন মনোরম হয় তাহা দেখিতে এক কালে কত সাধক, কত শিল্পী এই অজন্তার মঠে আসিয়াছে। এখন কিন্তু এই গিরি ও গুহাগুলি পরিত্যক্ত, অনাদরের মলিন ছায়ায় লুক্কায়িত। আধুনিক মানচিত্রে অজন্তার নামের উল্লেখই নাই। সেখানকার যাত্রীদিগের মধ্যে এখন প্রধানতঃ বিদেশীয় ভ্রমণকারী। আর আমরা কয় জন এই গিরিগুহার অতুল শিল্পাগারের খোজ রাখি? যে সংখ্যা আঙ্গুলে গণিয়া লওয়া যায় সে সংখ্যা নাইবা দিলাম!

জি, আই, পি রেলওয়ে লাইনে বম্বে অঞ্চলে ভোসাওয়ল জংশনের পরবর্ত্তী ষ্টেশন জলগাঁও হইতে প্রায় ৩৫ মাইল গরুর গাড়ী করিয়া অজন্তার গিরিগুহায় যাইতে হয়। টাঙ্গা গাড়ীও পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার ভাড়া অত্যন্ত বেশী অথচ বিশেষ কোন সুবিধাও নাই। গরুর গাড়ী—আধুনিক সভ্যতার চক্ষে হেয় হইলেও খুব সস্তা। উহার গতি মন্থর এই যা

১। অজন্তা গুহার চিত্র

২। অজন্তা গুহার চিত্র।

অসুবিধা; ইহা ছাড়া ইহার বিপক্ষে আর কিছু বলিবার নাই। পথ বেশ ভাল, কেবল গুহার নিকটবর্ত্তী খানিকটা পার্ব্বত্য পথ অত্যন্ত খারাপ।

প্রাচীনকালে অজন্তা একটি সুবৃহৎ প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মঠ ছিল। ধর্ম্মমঠের স্থান প্রকৃত কেমন হওয়া উচিত অজন্তায় যাইলে তাহা অনুভব করা যায়। রমণীয় অরণ্যের মধ্যে একটি পর্ব্বতের গায়ে সারি সারি খোদাই-করা প্রশস্ত গুহা। নীচে স্বল্পসলিলা প্রবাহিণী; উপরে আরণ্য শ্যামল শোভা। স্থানটি নিভৃত, নির্জ্জন;—সাংসারিক কোলাহল অশান্তি হইতে মুক্তি লাভ করিবার উপযুক্ত স্থান।

পর্ব্বতটি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, তাহারি গায়ে একের পর অন্য গুহা খনিত হইয়াছে। সবসুদ্ধ ২৯টি গুহা আছে, তাহার মধ্যে কয়েকটি অসমাপ্ত। গুহা দুই শ্রেণীর—চৈত্য ও বিহার। চৈত্য উপাসনা-মন্দির, বিহারগুলি সাধকদিগের আবাসস্থান। অজন্তায় চারিটি চৈত্য, ও বাকিগুলি বিহার গুহা। সব গুহা-গুলি এক সময়ের নির্ম্মিত নহে। প্রত্নতত্ত্ববিৎদিগের মতে ইহাদের সকলকার নির্ম্মাণকাল খৃষ্টপূর্ব্ব ২য় হইতে ৬ষ্ঠ শতাব্দ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছে। চৈত্য ও বিহার গুহার প্রস্তরপ্রাচীরে ও ছাদে চিত্র অঙ্কিত। চিত্রগুলি গুহাগুলির সমসাময়িক এ কথা বলা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন গুহার চিত্রাবলীর ভিন্ন ভিন্ন অঙ্কন-কাল নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ১ম হইতে ৭ম খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সকল চিত্রগুলি অঙ্কিত হয়। এ বিষয়ে মতান্তর আছে। সে ঐতিহাসিক গণ্ডগোলের গণ্ডীর ভিতর আমাদের যাইবার প্রয়োজন নাই।

ভারতীয় চিত্রশিল্পের ইতিহাস অতি প্রাচীন। এ ইতিহাসের আরম্ভ কোথায় তাহা বলা কঠিন। রামায়ণেও চিত্রশালার উল্লেখ আছে। কিন্তু অত পুরাতন চিত্রশিল্পের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। কাজেই এ সাহিত্যিক উল্লেখের উপর বিশেষ কোন জোর দেওয়া চলে না। বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বের চিত্রশিল্পের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে উড়িষ্যার নিকটবর্ত্তী রামগড় গিরিগুহায় অঙ্কিত চিত্রই প্রত্নতত্ত্ববিৎ-দিগের মতে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন*। এই চিত্রগুলি যে প্রাচীন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু সেগুলি যে সেই সময়ের

* রামগড় গিরিগুহার বৃত্তান্ত ১৩২১ সালের কার্ত্তিক মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদারের লিখিত "রামগড়" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।—প্রবাসীর সম্পাদক।

ভারত-চিত্রশিল্পের নমুনা এ কথা বলিলে অন্যায় হয়। রামগড়ের চিত্রগুলি কোন এক চিত্রশিল্পে-অশিক্ষিত ব্যক্তির দ্বারা অঙ্কিত বলিয়া মনে করিলে তাহার উপযুক্ত সমালোচনা ও আদর করা হয়। যে ব্যক্তি এ চিত্রগুলি আঁকিয়াছিল সে শিল্পের কোন ধার ধারিত না এ কথা বেশ বলা যাইতে পারে। তাহার শিল্পের সহিত সমসাময়িক চিত্রশিল্পের যে কোন সম্বন্ধ ছিল না ইহা বলিলেই ভাল হয়। রামগড়ের কথা ছাড়িয়া দিলে অজন্তার সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন চিত্রগুলি ১ম বা ২য় খ্রীষ্টাব্দের এবং শেষেরগুলি ৭ম খ্রীষ্টাব্দের বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রথমোক্ত সময়ের চিত্রগুলি এখন সব লোপ পাইয়াছে। যেসকল চিত্র এখনও দেখিতে পাওয়া যায় সেগুলি অধিকাংশই ৫ম হইতে ৭ম খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চিত্রিত হইয়াছিল। এখন চিত্রগুলি জীর্ণ, লুপ্তপ্রায়। পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহার শতাংশও এখন অবশিষ্ট নাই। তবুও এই ধ্বংসোন্মুখ চিত্রাবশেষ দেখিলে আমাদের দেশের শিল্পকলা এককালে কি অসাধারণ পূর্ণত্ব লাভ করিয়াছিল তাহা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। বড় দুঃখের বিষয় এ অপূর্ব্ব চিত্রভাণ্ডার কালের করাল সংস্পর্শে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। কয়েক বৎসর পরে হয়ত চিত্রগুলির কেবল স্মৃতি অবশিষ্ট থাকিবে। আরও দুঃখের বিষয় এই যে অজন্তা-চিত্রাবলীর প্রতিলিপি আমাদের দেশে নাই। কেবল জয়পুরের কৌতুকাগারে কয়েকটি মাত্র নকল রক্ষিত আছে। এ পর্য্যন্ত তিনবার কতক কতক চিত্রের প্রতিলিপি লওয়া হইয়াছে। ক্যাপ্টেন গাইল প্রথম বারে কয়েকটি ছবির

৩। অজন্তা গুহার চিত্র।

নকল করেন। তাহার পর বম্বে শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গ্রিফিথ্‌স্‌ কয়েকটি ছাত্রের সাহায্যে প্রায় ১৩ বৎসর ধরিয়া অনেকগুলি ছবির নকল করেন। এইসকল নকলের প্রতিলিপি গ্রিফিথ্‌স্‌ সাহেবের পুস্তক The Paintings in the Buddhist Cave Temples of Ajantaতে আছে। কিন্তু গাইল ও গ্রিফিথ্‌সের প্রায়

সকল মূল নকলগুলি পুড়িয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে বিলাত হইতে শ্রীমতী হেরিংহ্যাম আসিয়া বহু ব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিয়া অনেকগুলি চিত্রের নকল নিজে করেন ও কয়েকজন শিল্পীর দ্বারা প্রস্তুত করান। এইসকল নকলের প্রতিলিপি লণ্ডনের ভারত-সমাজ (India Society, London) কর্ত্তৃক শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। শেষোক্ত চিত্রগুলির মধ্যে অনেকগুলির নকল শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট রক্ষিত আছে।

অজন্তার চিত্রগুলি প্রাচীর ছাদ ও থামের উপর অঙ্কিত। অসমতল খোদিত প্রস্তরের গাত্র সমতল করিবার জন্য প্রস্তরের উপর—ইটের উপর চুন বালির মত—একপ্রকার বিলেপন আছে। এই লেপনটি বোধ হয় গোবর, মাটি ও তুষ দিয়া প্রস্তুত। এই মোটা লেপনের উপর খুব পাতলা সাদা ও মসৃণ—প্রায় ডিমের খোলার মত—আর-এক লেপন আছে। চিত্রের প্রথম রেখাঙ্কন এই সাদা লেপনের উপর রক্ত গৈরিক বর্ণে অঙ্কিত। চিত্রের অন্যান্য বর্ণ এই রেখাঙ্কন অনুসরণ করে। অজন্তার সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন চিত্রগুলিতে গোময়-লেপন ব্যবহৃত হয় নাই। প্রাচীর খুব সমতল করিয়া কাটা হইয়াছিল এবং পাথরের গায়ে কেবল সাদা লেপনটি লাগান হইয়াছিল। ১ম চিত্রটি সেইরূপ একটি ছবির নমুনা। অনুমান হয় এই ছবিতে শিবিরাজার উপাখ্যান চিত্রিত ছিল। থামগুলিতেও গোময়-লেপন ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হইত না। ভাস্কর্য্য-নৈপুণ্যে সেগুলি এমন মসৃণ ও সুগঠিত হইত যে তাহাদিগের উপর কেবল সাদা লেপনটি ব্যবহার করিলেই চলিত।

২য় চিত্রে প্রথম রেখাঙ্কনের গঠন কিরূপ হইত তাহার পরিচয় বেশ স্পষ্ট পাওয়া যায়। এই চিত্রে অনেক স্থানে—বিশেষতঃ পুরুষের মূর্ত্তিতে—রং উঠিয়া যাওয়ায় প্রথম রক্ত-বর্ণ রেখাঙ্কন বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সকল সময়েই যে প্রথম রেখাঙ্কন বাহাল থাকিত এমন নয়। কখন কখন রং করিতে করিতে রেখাঙ্কন সংশোধিত বা পরিবর্ত্তিত হইত। ৩য় চিত্রে ছয় স্থানে এইরূপ সংশোধনের চিহ্ন আছে।

প্রকৃতির লাবণ্য দেখিলে যেমন স্রষ্টার কথা মনে পড়ে, শিল্পের সৌন্দর্য্য দেখিলে সেই শিল্পের স্রষ্টা শিল্পীর কথা মনে পড়ে। অজন্তার চিত্রশিল্প দেখিলে যে-শিল্পীরা সেগুলি আঁকিয়াছিল তাহাদের বিষয় কিছু জানিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু তাহাদের বিষয় সবিশেষ কিছু জানিবার উপায় নাই। ইহাতে যদিও আমরা এইসকল চিত্রকরের নাম জানিতে বঞ্চিত হই, কিন্তু ইহাতে আক্ষেপের বিষয় কিছুই নাই। নামে আসে যায় কি? যদি অজন্তার চিত্রাবলী শিল্পীদিগের স্বাক্ষরিত হইত, তাহা হইলে চিত্রগুলি আরও মূল্যবান হইত না। আমার মনে হয় অজন্তার এই অসংখ্য চিত্রাবলীর মধ্যে যে একটিও চিত্রকরের নাম নাই ইহা আমাদের সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয়। কত শত বৎসরের শিল্পসাধনা এই অজন্তায়; কত শত শিল্পী এইখানে আপনার শিক্ষা-নৈপুণ্যের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছে, অথচ কেহ কখন আপনার নাম পর্য্যন্ত লিখিয়া যায় নাই। ইহার অন্তরে কি এক মহান অপরিসীম বিনয়ের ভাব আছে! ভক্ত যেমন সকল স্বার্থের কথা ভুলিয়া আত্মনিবেদন করে, এই শিল্পীরাও আজীবনের সাধনফল তাহাদের ধর্ম্মমন্দিরে অঞ্জলি দিয়া গিয়াছে!

কবির কাব্যের মত শিল্পীর শিল্পই তাহার পরিচয় দিয়া দেয়। শিল্পীর মনের ভাব ও আদর্শ তাহার শিল্পে ফুটিয়া উঠে। শ্রেষ্ঠ শিল্পের রূপে অন্তরাত্মার ভাবপ্রকাশ। অজন্তার শিল্পীদিগের আদর্শের মূলে যে চিরপ্রফুল্ল অথচ বিনীত নিবেদনের আভাস পাওয়া যায় তাহাতেই তাহাদের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। শিল্প তাহাদের কাছে পবিত্র সাধনা ছিল; শিল্পের প্রতিষ্ঠায় তাহারা ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা দেখিত; শিল্পের নিবেদনকে তাহারা আত্মনিবেদন বুঝিত। ধন্য সেই নাম-বিহীন শিল্পীরা! তাহাদের নাম নাই, অথচ তাহারা চির-স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাহাদের শিল্পসাধনার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া যদি আমরা শিল্পের আরাধনা করি তাহা হইলে ভারতশিল্পের লুপ্ত গৌরব একদিন-না-একদিন ফিরিয়া আসিবেই।

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

যাত্রাগান

আনন্দ-গান উঠুক তবে বাজি
এবার আমার ব্যথার বাঁশিতে।
অশ্রুজলের ঢেউয়ের পরে আজি
পারের তরী থাকুক্ ভাসিতে।

যাবার হাওয়া ঐ যে উঠেছে,—ওগো
ঐ যে উঠেছে,
সারারাত্রি চক্ষে আমার
ঘুম যে ছুটেছে।

হৃদয় আমার উঠ্‌চে দুলে দুলে
অকূল জলের অট্টহাসিতে,
কে গো তুমি দাও দেখি তান তুলে
এবার আমার ব্যথার বাঁশিতে।

হে অজানা, অজানা সুর নব
বাজাও আমার ব্যথার বাঁশিতে,
হঠাৎ এবার উজান হাওয়ায় তব
পারের তরী থাক্‌না ভাসিতে।

কোনো কালে হয়নি যারে দেখা—ওগো
তারি বিরহে
এমন করে ডাক দিয়েছে,
ঘরে কে রহে?

বাসার আশা গিয়েছে মোর ঘুরে,
ঝাঁপ দিয়েছি আকাশরাশিতে;
পাগল, তোমার সৃষ্টিছাড়া সুরে
তান দিয়ো মোর ব্যথার বাঁশিতে।

২৯ পৌষ, রেলগাড়ি। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষিত দেশ"

ডব্লিউ বি ইয়েট্‌স্ প্রণীত।

কর্ত্তা
গিন্নি
পুত্র
বধূ
গুরুঠাকুর
পরী-বালিকা

[পুরাতন কালে, অজানা দেশে দৃশ্যটি অবস্থিত। দৃশ্য—ডানদিকে ছায়া-সমাকীর্ণ বিশ্রাম-ঘরের মাঝে একটি কুঠরীতে আগুনের চুলা। সেখানে কয়েকখানা আসন বিছানো আছে, দেয়ালে একটি ঠাকুরের মূর্ত্তি। আগুনের আলোতে ঘর উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। বাঁদিকে একটি দরজা আছে—তা দিয়ে বাইরে বন দেখা যায়—এখন সন্ধ্যা—সূর্য্যাস্তের আভা মিট্‌মিট্ করচে—চন্দ্র গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে—এ সব মিলে এমন এক দৃশ্য হয়েছে, যা দেখে অস্পষ্ট অজানা এক অদ্ভুত দেশের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। গুরুঠাকুর, কর্ত্তা, গিন্নি, ও পুত্র আগুনের চারপাশে বসে আছে। আসনের সামনে খাদ্য এবং পানীয় আছে। বধূ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একখানা বই পড়্‌ছে। যদি সে চোখ উঁচু ক'রে চায় তবে দরজা দিয়ে বন দেখ্‌তে পাবে।]

গিন্নি

রাতের আহারের জন্যে বাসনগুলি পরিষ্কার করতে বলেছি। কিনা তাই ও কুঁড়ে থেকে বইখানা এনেছে। সেই হতে কতবার ও ঘুরে ফিরে এসে এটাকেই নিয়ে পড়ছে। ঠাকুর মশায়, যদি অন্য কারো মত ওকে কাজ করতে হত তবে ওর গেঙানি শুনতে শুনতে আমরা কালা হয়ে যেতাম। আমার মত যদি রোজ ভোরে উঠে ঘসা মাজা করতে হত, কিংবা আপনার মত দুর্য্যোগ রাত্রিতে কোষাকুষি আর পুথি বগলে করে বাইরে যেতে হত তা হ'লে ও না জানি কিই করত?

পুত্র

মা, তুমি বড় বেশী রাগ কর।

গিন্নি

তুমি ওকে বিয়ে করেছ কি না, তাই ওকে বিরক্ত করতে তুমি ভয় পাও, আর তাই তার পক্ষ হও।

কর্ত্তা

(গুরুঠাকুরের প্রতি)

তরুণ তরুণীর পক্ষ সমর্থন করবে এ ত ঠিকই। ও সময় সময় আমার স্ত্রীর সঙ্গে একটু আধটু ঝগড়া করে, কিন্তু

এখন ঐ প্রাচীন পুঁথিখানিতে একেবারে ডুবে রয়েছে। কিন্তু ওর বেশী দোষ নেই; বছর দশেকের মধ্যে যখন পরিণয়ের চাঁদিমা নব সূর্য্যালোকে লোপ পাবে তখন ও শান্ত হয়ে যাবে।

গুরুঠাকুর

ছেলে মেয়ে না হওয়া পর্য্যন্ত পাখীর মত মন বন্ধনহীন থাকে।

গিন্নি

ও বাসন মাজবে না, গাই দুইবে না, এমন কি খাবারের ঠাঁই করতে আসন বিছাবে না, জলও আনবে না।

পুত্র

মা, কেবল যদি—

কর্ত্তা

দেখ বাবা, মধু যে ফুরিয়ে গেছে, যাও, সব চাইতে ভাল মধু যা আছে তাই নিয়ে এস।

গুরু

আমি তো পূর্ব্বে ওকে কখন বই পড়তে দেখি নি— এ কেমন করে হল?

কর্ত্তা

(পুত্রের প্রতি) তুমি কিসের জন্যে অপেক্ষা করচ? যখন কাগ খুলবে তখন বোতলটাকে ঝাঁকাবে না। এ খুব চমৎকার মধু—ধীরে সুস্থে কাজ কোরো।

(পুত্র যাচ্ছে)

(গুরুর প্রতি) যখন আমি যুবক ছিলাম তখনকার বসন্তকালের শর্ষেফুলের এই মধু। এখনো তার কয়েক বোতল আছে।…বৌএর নিন্দা ও সহ্য করতে পারে না। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হল বইটা কুঁড়ে ঘরে পড়ে ছিল। বাবা বলেছেন ঠাকুরদা ওটা লিখেছিলেন; ওটা বাঁধাতে একটা হরিণের বাচ্চা মেরে চামড়া নেওয়া হয়। খাবার দেওয়া হয়েছে, খেতে খেতে কথা বলা যাবে…এই বই থেকে তাঁর কোনো উপকারই হয় নি, কারণ এতে তাঁর ঘর কেবল ভবঘুরে কবিওয়ালা আর বাউলদের দিয়েই ভর্ত্তি হয়ে উঠেছিল আপনার খাবার ঐ যে সামনেই…বৌমা ঐ বইটাতে কি কিছু আশ্চর্য্য আছে যে তুমি খাবার ঠাণ্ডা করে ফেল্‌ছ? বাবা অথবা আমি যদি বসে বসে বই পড়্‌তাম আর লিখতাম তা-হলে একটা গেঁজে চক্‌চকে মোহরে ভর্ত্তি হয়ে উঠ্‌ত না, আর আমার মৃত্যুর পর তোমরাও তা পেতে না।

গুরু

বাজে কল্পনায় মাথা ঘামিয়ো না। তুমি কি পড়্‌ছ?

বধূ

কেমন করে এক রাজার মেয়ে নন্দনমঞ্জরী, ফাল্গুন মাসের এমনি এক বিশেষ সন্ধ্যায় গান শুনতে পেয়েছিল— আধ-জাগা ও আধ-নিদ্রায় সেদিকে সে চলে যায়—তারপর পরীদের রাজ্যে গিয়ে সে পৌছল—সেখানে কেউ বৃদ্ধ এবং অতিগম্ভীর হয় না, আর ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে' কেউ মরে না—সেখানে কেউ বৃদ্ধ, ধূর্ত্ত অথবা জ্ঞানী হয় না— বৃদ্ধা এবং মুখরাও সেখানে কেউ নেই। সে এখনও সেই-খানেই আছে—যেখানে তারাগুলি পাহাড়ের উপর দিয়ে চলে যায়, সেখানে; গাছের শিশিরভেজা গভীর ছায়াতে এখনও সে নেচে বেড়ায়।

কর্ত্তা

বৌমাকে ও বই রেখে দিতে বলে দিন্। ঠাকুরদাও ঠিক ঐ রকমই বিড়্‌বিড়্ করতেন। তাঁর সংসারের কোন জ্ঞানই ছিল না—একটা যেমন-তেমন ছেলেও ওঁকে ঠকিয়ে যেতে পারত। আপনার কি মনে হচ্ছে বলুন দেখি।

গুরু

লক্ষ্মী বৌমা, ওটা রেখে দাও। পরমেশ্বর প্রকাণ্ড ডানার মত এই আকাশ আমাদের উপর মেলে রেখেছেন এবং ছোটখাট কাজ করতে দিন দিয়েছেন। কিন্তু মাঝে মাঝে অপদেবতা এসে আমাদের জালে ফেলে; খেলো আশা এবং মন-ভারীকরা স্বপ্ন দিয়ে আমাদের প্রলোভন দেখায়—তখন অন্তঃকরণ গর্ব্বে ফুলে ওঠে এবং পরমেশ্বরের শাস্তি হতে অর্দ্ধেক ভয়ে এবং অর্দ্ধেক আনন্দে দূরে চলে যাই। এই রকম কোনো সয়তানই মিষ্টি কথা বলে' রাজকন্যা নন্দনমঞ্জরীর মন ভুলিয়েছিল। কিন্তু বৌমা আমি এমন মেয়েও দেখেছি যারা একসময় অসোয়াস্তিতে ছিল কিন্তু কয়েক বৎসর কেটে যেতেই তারাও প্রতিবেশিনীদের মত হয়ে গেল—ছেলে মেয়ের যত্ন করতে, মাখন তুল্‌তে, বিয়ের গল্প করতে এবং মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসব নিয়ে আলাপ করতে ভালবাসত। জীবন

ক্রমে কল্পনার রক্তিম আভা হতে দিনের সাধারণ আলোকে এসে পড়ে—বৃদ্ধ বয়সে আবার সেই রক্তিমা দেখা দেয়।

কর্ত্তা

একথা ঠিক—কিন্তু ওর বয়স এত কাঁচা যে এ সত্য বলে ও বুঝ্‌বে না।

গিন্নি

পেঁচার মত মুখ ভার করে নিষ্কর্ম্মা হয়ে বসে থাকা যে অন্যায় এ বুঝবার বয়স ওর হয়েছে।

কর্ত্তা

আমি ওকে খুব কমই দোষ দিই। যখন আমার ছেলে মাঠে কাজ করে তখন ওকে বিষণ্ণ দেখায়—হয়ত বা গিন্নির মুখ-নাড়াই ওকে কল্পনার মধ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে—যেমন শিশু অন্ধকারের ভয়ে বিছানার চাদরের নীচে আশ্রয় নেয়।

গিন্নি

যদি আমি চুপ করে থাকতেম তবে ও কোন কাজই করত না।

কর্ত্তা

এটাও খুব সম্ভব—আজ এই বিশেষ সন্ধ্যায় ও অপদেবতাদের কথা স্মরণ করছে। বউমা, বল ত, বাড়ীতে ওরা লক্ষ্মী এনে দেবে এই আশায় মেয়েরা যে দরজাতে তুলসী-গাছের শাখা ঝুলিয়ে রাখে তুমি কি তা করেছ? মনে রেখো ওরা কিন্তু নববিবাহিতা স্ত্রীকে এই ফাগুন মাসের সন্ধ্যায় নিয়েও যেতে পারে—বুড়ো মেয়েরা চুলোর ধারে বসে এমনি কত-কিছু যে বলে—হয়ত বা তার সবই মিথ্যা!

গুরু

এ সত্যও হতে পারে। পরমেশ্বর অপদেবতাদের উদ্দেশ্য সাধন করতে তাদের শক্তির সীমা যে কোথায় করেছেন তা কে জানে। (বধূর প্রতি) তুমি ভালই করেছ; নির্দ্দোষ পুরাতন প্রথা মেনে চলাই ভাল।

[বধূ তুলসীগাছের শাখা নিয়ে দরজার চৌকাঠে একটি পেরেকের উপর ঝুলিয়ে রাখলে। একটি মেয়ে অদ্ভুত পোষাক পরে'—পরীদের সবুজ রংয়ের মত সে পোষাক—বন হতে এসে ডালখানি নিয়ে গেল]

বধূ

আমি যেই ডালটি ঝুলিয়েছি অমনি একটি মেয়ে বাতাস থেকে ছুটে এল। সে ওটাকে হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল। সূর্য্য ওঠবার আগে জল যেমন ম্লান দেখায় ওর মুখ তেমনি!

গুরু

ও কার মেয়ে?

কর্ত্তা

মেয়েটেয়ে কিছু নয়—ও প্রায়ই কল্পনায় দেখে যে কেউ যেন চলে গেল, তখন হয়ত দমকা বাতাস ছাড়া আর কিছুই বয় নি।

বধূ

তারা ত পবিত্র তুলসীগাছের ডালটি নিয়ে গেছে, তারা এই বাড়ীর মঙ্গল করবে না! আমি তাদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করেছি তা ভালই—তারা কি আমাদেরই মত ভগবানের জীব নয়?

গুরু

বৌমা, তারা তো অপদেবতার বংশধর—কাল শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাদেরও ক্ষমতা থাকবে, পরে পরমেশ্বর ভীষণ যুদ্ধে তাদের টুক্‌রা টুক্‌রা করে কেটে ফেল্‌বেন।

বধূ

ঠাকুরমশায়, কে জানে! হয়ত বা ভগবান হাসবেন আর তাদের জন্যে বড় দরজা খুলে দেবেন।

গুরু

নিয়মভঙ্গকারী অপদেবতারা যদি সে দরজা একবার দেখতে পায় তবে চিরশান্তির প্রভাবে তারা মৃত্যুগ্রাসে পতিত হবে। আর যখন এইরূপ অপদেবতা আমাদের ঘরে এসে ডাকে এবং যে তাদের সঙ্গে যায় তাদের প্রবল ঝড়ের ভিতর দিয়েই চল্‌তে হবে।

[একটি শীর্ণ বৃদ্ধ-হাত দরজার চৌকাঠের পাশ দিয়ে বাড়িয়ে আঘাত করছে ও ইসারা করছে। শুভ্র আলোতে তা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। বধূ দরজার কাছে গিয়ে মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াল। কর্ত্তা গুরুঠাকুরকে খাবার দিতে ব্যস্ত। গিন্নি আগুন উস্‌কাচ্ছে]

বধূ

(আসনের কাছে এসে) ওখানে বাইরে কেউ আছে। একটি বাটি হাতে করে হাতখানি তুলে ও আমাকে ইসারা করছিল। ঐ বাটি থেকে ও খাচ্ছিল। বোধ হয় ওর খুব তেষ্টা পেয়েছে।

[বধূ খাবারের জায়গা থেকে দুধ নিয়ে দরজার কাছে চলে গেল]

গুরু

এ নিশ্চয়ই সেই শিশুটি যার অস্তিত্বই নেই তুমি বল্‌ছিলে।

গিন্নি

তা হতে পারে—কিন্তু উনি যা বলেছিলেন তাও সত্যি। আজকের মত খারাপ রাত বছরে আর দ্বিতীয়টি নেই।

কর্ত্তা

যতক্ষণ পুণ্যাত্মা গুরুঠাকুর আমাদের ঘরে আছেন ততক্ষণ কোন অমঙ্গল ঘট্‌তে পারবে না।

বধূ

সবুজ পোষাক-পরা একটি অদ্ভুত বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ঐ যে।

গিন্নি

অপদেবতারা ফাগুন মাসের এই সন্ধ্যায় আগুন আর দুধ ভিক্ষা করে—কিন্তু যে বাড়ী ভিক্ষা দেয় তাদের সর্ব্বনাশ হয়—কারণ একবৎসর সেই বাড়ীর উপর তাদের প্রভাব থাকে।

কর্ত্তা

চুপ কর, গিন্নি, তুমি চুপ কর।

গিন্নি

ও ত দুই দিয়ে দিয়েছে। ও যে বাড়ীতে অমঙ্গল আনবে তা আমি জান্‌তেমই।

কর্ত্তা

ঐ বৃদ্ধাটি কে?

বধূ

ওর ভাষা ও মুখ দু-ই অজানা।

কর্ত্তা

গত সপ্তাহে কৃষ্ণচুড়া পর্ব্বতের উপর কয়েকজন বিদেশী লোক এসেছিল—বুড়ী তাদেরই একজন কেউ হবে।

গিন্নি

আমার কিন্তু ভয় করছে।

গুরু

যতক্ষণ ঘরে ঠাকুরের প্রতিমা আছে ততক্ষণ ঘরে কোন অমঙ্গল আসতে পারবে না।

কর্ত্তা

বৌমা, আমার কাছে এস, বস। অসন্তুষ্টিতে তুমি যে কল্পনার আশ্রয় নাও তা দূর করে দাও। আমি চাই যে তুমি আমার শেষ কালে আনন্দ দিবে। আমি মরে গেলে তোমরা পাড়াপড়সী সকলের চাইতে ধনী হবে—জানন৷ বৌমা, আমার এক গেঁজে ভরা হল্‌দে হল্‌দে মোহর লুকান আছে—তার খোঁজ আর কেউ জানে না।

গিন্নি

তুমি সুন্দর মুখ দেখলেই গলে যাও। ও যেন চুল বাঁধবার নানা রকমের রেশমের ফিতে না পায় তার দিকে কড়া দৃষ্টি রাখা তোমার উচিত।

কর্ত্তা

রাগ কোরো না; ও ত বেশ ভাল মেয়ে। ঠাকুরমশায়, আপনার হাতের কাছেই যে মাখন আছে...লক্ষ্মী বৌমা, ভাগ্যই বল, কালই বল, আর পরিবর্ত্তনই বল ওরা কি আমার আর বুড়ী গিন্নির ভাল করে নি? আমাদের একশ বিঘা জমি আছে—আগুনের কাছে পাশাপাশি আমরা আরামে কেমন বসে থাকি! এই পুণ্যাত্মা গুরুঠাকুরকে আমার সহায় পেয়েছি—আর আমি তোমার ও আমার ছেলের মুখের দিকে কেমন চেয়ে থাকি! তোমার থালা ছেলের থালার কাছেই দিয়েছি—এই যে সে আস্‌ছে, —যা আমাদের ছিল না তা ও সঙ্গে করে এনেছে—যথেষ্ট ভাল মধু পাওয়া গেল।

[পুত্র ঘরে ঢুকল] আগুন উস্কিয়ে দাও,—জ্বলে' না-ওঠা পর্য্যন্ত তাতে ফুঁ দাও। আগুন থেকে ঘুরপাক খেয়ে ধোঁয়াগুলি কেমন উঠতে থাকে, তা দেখে হৃদয়ে তৃপ্তি ও জ্ঞানলাভ কর—এই ত জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ। যখন আমরা যুবক থাকি তখন যে-পথে কেউ কোন দিন যায়নি তাই দিয়ে চল্‌তে ব্যগ্র হয়ে উঠি। কিন্তু প্রেম আবার আমাদিগের চমৎকার সেই পুরাতন পথে নিয়ে যায়—ছেলে মেয়ের যত্ন করতে করতে—ভাগ্য কাল আর পরিবর্ত্তনের কাছ হতে বিদায় নিই।

[বধূ আগুন হতে একটি কাঠ নিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল; তাহার স্বামী পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেল; বধূ যখন ঘরে ঢুক্‌ছে তখন তার সঙ্গে দেখা হ'ল]

পুত্র

এই বনের ঠাণ্ডাতে তোমাকে কিসে আকর্ষণ করে নিয়ে গিয়েছিল? গাছের গোঁড়াতে আলো দেখা যাচ্ছে—গা যেন কেমন ছম্‌ছম্‌ করে উঠ্‌ছে!

বধূ

একটি ছোট অদ্ভুত বুড়ো মানুষ তামাক ধরাবার জন্যে আগুন চেয়ে আমায় ইসারা করছিল।

গিন্নি

বৎসরের সব চাইতে অমঙ্গল দিনে তুমি আগুন আর দুধ দিয়েছ—জেনে রেখো এই বাড়ীর উপর তুমিই অমঙ্গল আন্‌লে। বিয়ের আগে তুমি নিষ্কর্ম্মা ছিলে ও ফিট্‌ফাট্‌ থাক্‌তে আর মাথায় নানা রংয়ের ফিতে পরে ঘুরে বেড়াতে। এখন—আমায় নিষেধ কচ্ছেন কেন? আমি আমার মনের কথা বলবই—ও কোন পুরুষেরই বউ হবার উপযুক্ত নয়।

পুত্র

মা, চুপ কর।

কর্ত্তা

তুমি বড় বেশী রাগ কর গিন্নি।

বধূ

যে বাড়ীতে চব্বিশ ঘণ্টা আমাকে এমনি করে বকুনি খেতে হয় সে বাড়ী পরীদের হাতে দিয়ে দিলেই বা আমার কি আসে যায়।

গিন্নি

অপদেবতাদের তুমিই না ঐ নামেই ডাক। ওদের নিয়ে অত আলোচনা কর বলেই ত বাড়ীতে সব রকম অমঙ্গল আসে।

বধূ

পরীর দল! তোমরা এস, এই নিরানন্দ বাড়ী হ'তে আমাকে নিয়ে যাও। আমি যেসব স্বাধীনতা হারিয়েছি আমায় তা ফিরিয়ে দাও। নিজ ইচ্ছায় যেন কাজ করি, নিজ ইচ্ছাতেই যেন অলস হয়ে বসে থাকি। পরীর দল, আমাকে এই নিরানন্দ পৃথিবী হতে নিয়ে যাও। আমি তোমাদের সঙ্গে বাতাসের উপর চড়ব, ছিন্নবিচ্ছিন্ন ঢেউয়ের উপর ছুটে বেড়াব, আর আগুনের হল্কার মত পাহাড়ের উপর নাচব।

গুরু

তুমি কি বলছ হয়ত তুমি নিজেই বোঝ না।

বধূ

ঠাকুর মশায়, আমি চার রকম তীব্র ভাষায় জর্জ্জরিত হয়ে আছি—অতি-ধূর্ত্ত এবং অতি-জ্ঞানের যে ভাষা, অতি ভাল এবং অতি গম্ভীর যে ভাষা, জোয়ারের লবণাক্ত জলের চাইতে তিক্ত যে ভাষা, প্রেমে আবিষ্ট যে মধুর ভাষা। এই ভালবাসার আবেশই ত আমাকে বন্দী করে রেখেছে।

[পুত্র দরজার বামপার্শ্বে যে একটি বসবার জায়গা আছে সেখানে বধূকে নিয়ে গেল]

পুত্র

আমাকে তুমি দোষ দিও না; আমি অনেক সময় জেগে জেগে ভাবি কত কিছু তোমাকে বিরক্ত করে—আহা কি সুন্দর—তোমার মেঘের মত কাল ফুলান চুলের নীচে প্রশস্ত ম্লান ললাটখানি! আমার পাশে এখানে বস—তাঁরা সব বুড়ো হয়ে গেছেন—কখনও যে তাঁরা যুবক ছিলেন সে কথা ভুলে গেছেন।

বধূ

হায়—তুমিই তো এ বাড়ীর বড় দরজার চৌকাঠ—আমি পবিত্র তুলসীগাছের ডাল, পরিবারে সৌভাগ্য না আসা পর্য্যন্ত যদি পারতেম তবে আমি কাঠখানিতে ঝুলে থাকতেম।

(ও বাহুতে তাকে আবেষ্টন করতে গিয়ে গুরুঠাকুরের দিকে চেয়ে লজ্জা পেয়ে হাত ছেড়ে দিলে)।

গুরু

মা লক্ষ্মী ওর হাতখানি ধর—প্রেমেই পরমেশ্বর আমাদের তাঁর সঙ্গে আর পরিবারের সঙ্গে বেঁধেছেন। প্রেমই তাঁর শাস্তির সীমার ওপারে যে উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিপথগামী আলেয়া আছে তা হতে আমাদিগকে দূরে রাখে।

পুত্র

হায়! যদি সমুদয় পৃথিবী আমার থাক্‌ত আর তোমাকে দিয়ে দিতে পারতেম! শুধু শান্ত বাড়ীগুলি নয়—এমন কি যা কিছু স্বাধীনতা আর আলোক সবই যদি দিয়ে দিতে পারতেম! তুমি কি তা চাও?

বধূ

আমার ইচ্ছা হচ্ছে এই পৃথিবীকে এক মুঠার মধ্যে নিয়ে তাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিই এবং তুমি যেন একে চূর্ণ হতে দেখে হাস।

পুত্র

তারপর আমি আগুন ও শিশিরের এক পৃথিবী তৈয়ার করতাম—তাতে অতি-বুদ্ধিমান, গম্ভীর ও অপ্রিয় কেউ থাকৃত না; তোমাকে বাধা দিতে অথবা তোমার অনিষ্ট করতে বৃদ্ধ কেউ থাকত না। তোমার কেবলমাত্র এক-

খানি মুখের উপর আলো দিতে, এই শান্ত মুগ্ধ আকাশ বাতিতে বাতিতে ভরে ফেলতাম।

বধূ

কেবল তোমার চোখের দৃষ্টিই ত আমার সকল বাতির কাজ করে।

পুত্র

এক সময় ছিল যখন সূর্য্যালোকে একটি মাছিকে নাচতে দেখ্‌লে, অথবা ভোরে একটু মৃদু বাতাস দিলেই তোমার চিত্ত কত কল্পনায় ভরে উঠত, অন্যে তা জান্‌তও না। কিন্তু এখন অচ্ছেদ্য ধর্ম্মগ্রন্থিতে তোমার অত্যন্ত-গর্ব্বিত প্রেমবর্জ্জিত হৃদয় আমার অনুরক্ত হৃদয়ের সঙ্গে চিরদিনের জন্য বেঁধে দিয়েছে—চন্দ্র সূর্য্য নিস্তেজ হয়ে যাক, আকাশ কাগজের মত ফ্যাকাসে হয়ে যাক—কিন্তু তোমার শুভ্র আত্মা তবুও আমার আত্মার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে।

[কে একজন বনে গান করছে]

কর্ত্তা

ওখানে কেউ একজন গান করছে। তাইত একটি শিশুর মত ঠেকৃছে। গাচ্ছে—"যাদের হৃদয় উদাসীন তাদের প্রাণ শুকিয়ে যাবে।" শিশুর পক্ষে এ বড় অদ্ভুত গান! কিন্তু গাচ্ছে ভারী মধুর—তোমরা শোন, শোন।

(দরজার কাছে গেল)

বধূ

আমার কাছে থেকো—আজ রাত্রে আমি অমঙ্গলের কথা বলেছি কি না!

অদৃশ্য বাক্য

দিনের তোরণদ্বার হতে বাতাস বইছে; উদাসীন হৃদয়ের উপর দিয়েই বইছে; যাদের হৃদয় উদাসীন তারা শুকিয়ে যাবে। চক্রাকারে যখন পরীরা তাদের দুধের মত সাদা পা ঝেড়ে ঝেড়ে, এবং বাতাসে দুধের মত সাদা হাত নেড়ে নেড়ে দূরে দূরে নাচে, তখন আমি কিন্তু কুলকুলুনি নদীর বাঁশীতে এই সুর শুন্‌তে পাই "বাতাস যদি হেসে মর্ম্মর শব্দে গান গায় তবে উদাসীন হৃদয় যাদের তারা শুকিয়ে যায়"—যখন বাতাস হেসে মর্ম্মর শব্দ ক'রে সেই দেশের গান গায় যে দেশে বৃদ্ধেরাও সুন্দর এবং এমন কি জ্ঞানীরাও মজার কথা কয়, তখন পরীরাও তা শুন্‌তে পায়।

কর্ত্তা

আমি নিজে সুখী কি না তাই ইচ্ছা হয় সকলেই যেন সুখী হয়—আমি ওকে বাইরের ঠাণ্ডা হতে ঘরে নিয়ে আসব।

[সে একটি পরীশিশু নিয়ে এল]

বালিকা

বাতাস বৃষ্টি আর ম্লান আলো ভাল লাগে না।

কর্ত্তা

এটা কিছুই আশ্চর্য্য নয়—কারণ রাত্রি হলে বন ঠাণ্ডা হয়ে যায় এবং গোলক-ধাঁধায় পরিণত হয়। কিন্তু এখানে তুমি যত্নে থাকবে।

বালিকা

আমি তা হলে এখানে আদরেই থাকব। যখন এই আরামভরা ছোট্ট ঘরখানা আমার ভাল লাগবে না, তখন এখানকার একজন চলে যাবে, চলে যাবে!

কর্ত্তা

শোন, ও কী সব অদ্ভুত আশ্চর্য্য কথা বল্‌ছে! তোমার শীত করছে না?

বালিকা

আমি তোমার পাশেই শুয়ে পড়ব—আজ রাত্রিতে আমি অনেক দূর থেকে এসেছি।

গিন্নি

তোমার চেহারা ত বেশ।

কর্ত্তা

তোমার চুল ভিজে গেছে।

গিন্নি

আমি তোমার ঠাণ্ডা পা দুখানা গরম করে দি।

কর্ত্তা

তুমি সত্যি অনেক দূর থেকে এসেছ—আমি ত তোমার সুন্দর মুখখানি আর কখনও দেখিনি—তোমার নিশ্চয়ই ক্ষিদে পেয়েছে আর তুমি হয়রানও হয়েছ। এই যে খাবার নাও।

বালিকা

মা, আমাকে একটু মিষ্টি খেতে দাও না।

গিন্নি

একটু মধু আন্‌ছি—নববসন্তের নতুন ফুলের টাটকা মধু, এই ফাগুন মাসের চাক-ভাঙা মধু!

(অন্য ঘরে চলে যাচ্ছে)

কর্ত্তা

মন ভুলাবার তোমার বেশ কায়দা আছে। তোমার মা ত তোমার আসবার আগে বেশ গাল ভার করেই ছিলেন।

[গিন্নি মধু নিয়ে ফিরে এল এবং একটি পাত্র করে দুধ নিয়ে এল]

গিন্নি

ওগো ও ভালমানষের ঝি, ওর সাদা হাত দুখানি আর সুন্দর পোষাকটি দেখ। আমি তোমার জন্যে টাট্‌কা দুধ এনেছি—একটু দেরী কর—আমি আগুনে একটু গরম করে দিই। আমাদের গরীব লোকদের পক্ষে যা উপযুক্ত তোমার মত বড়ঘরের মেয়ের তা মনোমত হবে না।

বালিকা

সকালে যখন বাতাস দিয়ে চুলায় আগুন জ্বালিয়ে দিতে হয় তখন হতে তোমাকে হাড়ভাঙা খাটুনি খাট্‌তে হয়। যুবক যারা তারা বিছানায় শুয়ে আশা ও কল্পনায় ডুবে থাকৃতে পারে। তোমার অন্তঃকরণ বৃদ্ধ কি না তাই কাজ করতেই হবে।

গিন্নি

যুবকরা সব অলস।

বালিকা

তোমার স্মৃতিশক্তি তোমাকে জ্ঞানী করেছে। যুবকরা আশা এবং কল্পনার কথা স্মরণ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবে। তোমাদের হৃদয় শুষ্ক কি না তাই তোমরা জ্ঞানী।

[গিন্নি তাকে আরো রুটী ও মধু দিল]

কর্ত্তা

হায়! কে ভেবেছিল যে এমন একটি মেয়ে পাওয়া যাবে যে বৃদ্ধ ও জ্ঞানীদেরও ভালবাসবে?

বালিকা

মা, আর না।

কর্ত্তা

কি ছোট ছোট গ্রাস ও মুখে দেয়! দুধ গরম হয়েছে। (তার হাতে দুধ দিল) কি একটু একটু করে ও চুমুক দেয়!

বালিকা

মা, আমায় নূপুর পরিয়ে দাও। আমার খাওয়া হয়েছে, আমি এখন নাচব। কুলকুলুনী নদীর ধারে নলগুলি নাচ্‌ছে। নল আর সাদা ঢেউগুলি নাচতে নাচতে ঘুমিয়ে না পড়া পর্য্যন্ত আমিও নাচতে চাই।

[গিন্নি নূপুর পরিয়ে দিলে বালিকাটি নাচতে আরম্ভ করবে এমন সময় হঠাৎ দেব-প্রতিমা দেখতে পেয়ে চীৎকার করে উঠ্‌ল এবং চোখ ঢেকে ফেললে।]

ঐ কালো অন্ধকার কুলুঙ্গিটাতে ঐ বিশ্রী জিনিষটা কি?

গুরু

হায়! তোমার কথাগুলি যে কিরূপ খারাপ তা বোঝবারও তোমার ক্ষমতা নেই! ঐ যে আমাদের বাস্তুদেবতা।

বালিকা

ওটা লুকিয়ে ফেল।

গিন্নি

আমিও ওকে ভয় করতে আরম্ভ করেছি।

বালিকা

লুকিয়ে ফেল—

কর্ত্তা

ওযে অন্যায় হবে।

গিন্নি

সেটি ধর্ম্মগর্হিত কাজ হবে!

বালিকা

ও আমাকে কষ্ট দিচ্ছে—ওটা লুকিয়ে ফেল।

কর্ত্তা

ওর বাপ মায়ের কুশিক্ষারই দোষ!

গুরু

পরমেশ্বরের অবতারের মূর্ত্তি ঐ যে!

বালিকা আবদারের স্বরে

ওটা লুকিয়ে ফেল, লুকিয়ে ফেল।

কর্ত্তা

না, না!

গুরু

তুমি অত ছোট আর পাখীর মত, তাই এমন কি প্রত্যেক পাতার কাঁপুনিতেও তুমি ভয় পাও, আমি গিয়ে ওটা নামিয়ে রাখছি।

বালিকা

ওটা লুকিয়ে রাখ! ওটাকে দৃষ্টির বাইরে ঢেকে রাখ! ওটার কথা আর মনেও কোরো না।

[গুরু প্রতিমাটিকে কুলুঙ্গি থেকে নিয়ে ভিতরের একটা ঘরে রেখে এল]

গুরু

তুমি যখন এখানে এসে পৌঁচেছ, আমি তোমায় পবিত্র ধর্ম্মে দীক্ষিত করব। তোমার যেরূপ প্রখর বুদ্ধি দেখছি, তুমি শীগ্‌গিরই সব মন্তর শিখে ফেলবে।

(অন্য সকলের প্রতি)

স্ফুটনোন্মুখ সকল জিনিষের প্রতিই আমাদের করুণা দেখান উচিত। প্রাতঃকালের তারাগুলি তাদের প্রথম গানে সেই বিষাদের স্বর ত গায় না।

বালিকা

এইখানে নাচবার উপযুক্ত সমতল জায়গা আছে—আমি নাচব।

(গান করছে)

"দিনের তোরণদ্বার হতে বাতাস বইছে, উদাসীন হৃদয়ের উপর দিয়েই তা বইছে; যাদের হৃদয় উদাসীন তারা শুকিয়ে যাবে।"

(সে নাচছে)

বধূ (স্বামীর প্রতি)

এইমাত্র যখন ও আমার কাছে এসেছিল, আমার মনে হল যে আমি শুনতে পেলাম আরও অনেক পা মেজের উপর নাচ্‌ছে এবং বাতাসে মৃদুস্বরে গান শুনা যাচ্ছে, অদৃশ্য একটি বাঁশী এই নাচের তালে তালে বাজছে।

পুত্র

আমি ত ওর পায়ের শব্দ ছাড়া আর কিছু শুন্‌তে পাচ্ছিনে।

বধূ

আমি এখন শুন্‌তে পাচ্ছি, অপদেবতারা ঘরে নাচ্‌ছে।

কর্ত্তা

এখানে এস; পবিত্র বিষয় নিয়ে তুমি আর মন্দ কথা বল্‌বে না, এই প্রতিজ্ঞা কর; আমি তোমাকে কিছু জিনিষ দেবো।

বালিকা

বাবা, আমাকে কি দেবে, দাও।

কর্ত্তা

আমার ছেলের বৌএর জন্যে কিছু চুলের ফিতা সহর থেকে কিনে এনেছিলাম—তোমার বাতাসে উন্টান চুল গুলি বাঁধতে যদি আমি তা দিই উনি কিছু মনে করবেন না।

বালিকা

এস এখানে, বল, তুমি কি আমাকে ভালবাস?

কর্ত্তা

হ্যাঁ, আমি তোমাকে ভালবাসি।

বালিকা

আহা! তুমি ত এই চুলার ধারটি ভালবাস। তুমি কি আমাকে সত্যি ভালবাস?

গুরু

যখন ভগবান তাঁর অফুরন্ত যৌবনের অতখানি অংশ এই একটি প্রাণীতে দিয়ে রেখেছেন—তখন কেবল চাইলেই যে ভালবাসতে ইচ্ছা করে।

বালিকা

কিন্তু তুমি কি তাঁকে ভালবাস?

গিন্নি

ওযে ধর্ম্মের নিন্দা করছে।

বালিকা

আর তুমিও কি আমাকে ভালবাস?

বধূ

আমি তা জানি না।

বালিকা

ঐ যে ওখানে যুবকটি আছে তুমি তাকে ভালবাস। তবু তোমাকে এমন করে দিতে পারি যে তুমি বাতাসের উপর চড়্‌তে পারবে—ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ঢেউয়ের উপর ছুটে বেড়াবে এবং আগুনের হল্কার মত পাহাড়ের উপর তুমি নাচতেও পারবে।

বধূ

ভগবান আমাদের রক্ষা কর। ভীষণ কাণ্ড ঘট্‌বে। একটু আগেই ও পবিত্র তুলসীগাছের ডালটি নিয়ে গেছে।

গুরু

তুমি ওর অর্থহীন অত বেশী কথা শুনে বুঝি ভয় পাচ্ছ? এ ছাড়া ও বেশী আর কি জানে? বাছা, তোমার বয়স কত?

বালিকা

যখন শীতল ঘুম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে তখন আমার চুল পাতলা হয়ে যায়, আমার পা কাঁপতে থাকে—যখন পাতা গজিয়ে ওঠে, তখন মা তাঁর সোনার হাত দুখানিতে

করে' আমাকে কোলে নিয়ে থাকেন। আমি এখন যৌবনে পদার্পণ করব এবং জলস্থলের দেবতাদের বিয়ে করব—কিন্তু কবে আমার প্রথম জন্ম হয়েছিল তা কে বল্‌তে পারে। কৃষ্ণচূড়া পাহাড়ের উপর ঐ যে মদ্দা শকুনটা বসে চোখ বুজছে আর মেলছে—আমি তার চাইতে বয়সে বড়। আমার বিশ্বাস ও পৃথিবীর মধ্যে সকলের চাইতে বয়সে বড়।

গুরু

তাইত! ওযে পরীদের লোক!

বালিকা

আগে একজন এসেছিল, আমিই তাকে দুধ ও আগুন নিতে পাঠিয়েছিলেম—ও আর-একবার এসেছিল—তারপর আমি এসেছি।

[পুত্র ও বধূ ছাড়া সকলেই গুরুর পিছনে আশ্রয়ের জন্য জড়ো হল।]

পুত্র (উঠে)

যদিও তুমি এদের সকলকেই তোমার ইচ্ছামত চলিয়েছ—তুমি আমার দৃষ্টিকে এখনও বশীভূত করতে পার নি—আমি তোমার কোন ইচ্ছাই পূর্ণ করিনি—তোমাকে কিছু দিইওনি যে আমার উপর তোমার কোন ক্ষমতা খাটাবে। আমি বাড়ী হ'তে তোমাকে তাড়িয়ে দেবো।

গুরু

না, আমিই ওর সামনে যাচ্ছি।

বালিকা

আপনি দেবপ্রতিমা নিয়ে গিয়েছেন, তাই আমার এখন এমন ক্ষমতা যে, যে জায়গায় আমার পা একবার নেচেছে অথবা আমার আঙ্গুলের অগ্রভাগ একবার ঘুরিয়ে এনেছি আমি ইচ্ছা না করলে সেখানে কারো যাবার ক্ষমতা নেই।

[পুত্র ওকে ধরতে চেষ্টা করলে—কিন্তু পারলে না]

কর্ত্তা

দেখ, দেখ, কে যেন ওকে থামিয়ে দিচ্ছে, দেখ ও কেমন হাত নাড়চে—কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কাঁচের দেয়ালের উপর হাত ঘসচে।

গুরু

আমি একাই এই প্রতাপশালী অপদেবতার বিরুদ্ধে দাঁড়াব। ভয় কোরো না—পরমেশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন। যেসব মহাত্মারা ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিয়েছেন তাঁরা, পুণ্যাত্মারা, এবং নয়দল দেবদূত সকলেই আমাদের পক্ষে আছেন।

(বালিকাটি বধূর পাশে আসনের উপর হাঁটু গেড়ে বসল এবং তাকে জড়িয়ে ধরল)

বৌমা, বৌমা, দেবদূত ও মহাপুরুষদের সাহায্য প্রার্থনা কর।

বালিকা

নবপরিণীতা—তুমি আমার সঙ্গে চল; সেখানে আরও বেশী সুখী লোকদের দেখ্‌তে পাবে এবং হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষিত দেশও দেখ্‌বে—যেখানে সৌন্দর্য্যের জোয়ারে ভাটা পড়ে না; ধ্বংসের বন্যা সেখানে নাই, আর জ্ঞানই সেখানে আনন্দ; কাল অফুরন্ত গানের মত। আমি তোমাকে চুম্বন কর্‌ছি—এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী তোমার কাছে লোপ পেতে থাকুক।

পুত্র

মোহ হ'তে তুমি জাগ—তোমার চোখ কান বন্ধ কর।

গুরু

এখন ওর কান খাড়া করে চোখ মেলে থাকা উচিত। তার আত্মার নির্ব্বাচনই শুধু তাকে এখন রক্ষা করতে পারে। আমার কাছে চলে এস—আমার পাশে দাঁড়াও, এই বাড়ীর কথা ভাব, আর এখানে তোমার যা কর্ত্তব্য আছে তা স্মরণ কর।

বালিকা

থাম—আমার সঙ্গে এস,—তুমি যদি ওর কথা শোন তবে অন্যান্য সকলের মত হয়ে যাবে—ছেলে মেয়ে প্রসব করবে, রাঁধবে, বাড়বে—মাখন তুলতে পিঠ বাঁকা হয়ে যাবে—মাখন, মুরগী ও ডিম নিয়ে কত ঝকমারি সইতে হবে—অবশেষে বুড়ো হয়ে মানুষকে কটু কথা কইবে—তারপর ওখানটায় কুঁজোর মত হাঁটবে—আর শেষে কাঁদতে কাঁদতে কবরে যাবে।

গুরু

আমি তোমাকে স্বর্গের রাস্তা দেখাচ্ছি।

বালিকা

নবপরিণীতা, আমি কিন্তু তোমাকে এমন জায়গায় নিতে পারি যেখানে জরা নেই—ধূর্ত্ত ও অতিবুদ্ধিমান নেই—যেখানে ধার্ম্মিক ও অতিগম্ভীরও নেই—যেখানে

কর্কশভাষী লোকও নেই—সেখানে মনোহর কথায় কেউ তোমাকে বেঁধে রাখবে না। চক্ষের নিমেষে আমাদের মনের উপর দিয়ে যেসব চিন্তা বয়ে যায় আমরা শুধু তারই দাস।

গুরু

ভগবানের নাম স্মরণ করে তোমায় আদেশ কর্‌চি, বৌমা, আমার কাছে এস।

বালিকা

তোমার নিজের হৃদয়ের প্রভাবেই আমি তোমাকে রাখছি।

গুরু

দেবপ্রতিমা আমিই দূরে রেখেছিলাম বলে আমার কোন মূল্য নেই, আমার শক্তিও ঘুচে গেছে। আমি আবার প্রতিমা এখানে আনব।

কর্ত্তা (গুরুর গায়ে ঝুলে পড়ে)

না!

গিন্নি

আমাদের ছেড়ে যাবেন না।

গুরু

বেশী দেরী হবার আগে আমাকে যেতে দাও; আমার পাপই ত এসব ঘটিয়েছে।

[বাইরে গান শুনা যাচ্ছে]

বালিকা

আমি তাদের গাইতে শুনছি "হে নব-পরিণীতা তুমি এস, বনে নদীতে এবং ম্লান আলোতে এস।"

বধূ

আমি তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই যাব।

গুরু

হায়! ওর উদ্ধারের আর উপায় নেই।

বালিকা (দরজার পাশে দাঁড়িয়ে)

নশ্বর মানুষের আশা ভরসা তোমাতে যা এখনও লেগে আছে তা ছেড়ে যাবে। প্রভাতের পতাকার উপর যে শিশিরকণা থাকে তা হতেও আমরা হালকা কিনা, তাই আমরা বাতাসে চড়ে বেড়াই, ঢেউয়ের উপর ছুটি, এবং পাহাড়ের উপর নাচতে পারি।

বধূ

আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও।

পুত্র

প্রিয়ে আমি তোমাকে রাখব। আমার শুধু কথাই সম্বল নয়—এই দুই বাহু দিয়ে তোমাকে ধরে রাখব। সমস্ত পরীর দল শত চেষ্টা করেও তোমাকে আমার বাহুবেষ্টন হতে ছাড়িয়ে নিতে পারবে না।

বধূ

আহা! কি সুন্দর মুখখানি! মিষ্টি গলার স্বর!

বালিকা

নবপরিণীতা—এস!

বধূ

আমি সর্ব্বদাই পরীর দেশ ভালবাস্‌তাম—কিন্তু তবু—তবু—

বালিকা

সাদা পাখিটি, ছোট্ট পাখিটি, এস।

বধূ

ও যে আমাকে ডাক্‌ছে।

বালিকা

ছোট্ট পাখিটি আমার কাছে এস।

[দূরে যারা নাচছিল তারা বনের মধ্যে দেখা দিল]

বধূ

আমি নাচ ও গানের শব্দ শুন্‌তে পাচ্ছি।

পুত্র

আমার সঙ্গে থাক।

বধূ

আমার মনে হচ্ছে আমি হয়ত থেকে যাব—কিন্তু তবু—তবু—

বালিকা

স্বর্ণশিখা মাথায় নিয়ে এস—ছোট্ট পাখিটি!

বধূ (অতি আস্তে আস্তে)

কিন্তু তবু—

বালিকা

রূপার পা নিয়ে এস, ছোট্ট পাখিটি!

(বধূ মরে গেল—বালিকাও চলে গেল)

পুত্র

হায়! ও মরে গেছে।

গিন্নি

আত্মা ও শরীর চলে গেছে—ঐ ছায়ার কাছ হতে ফিরে এস। বাতাসে-ছেঁড়া এক গোছা পাতাকে বেষ্টন করে

তোমার হাত রয়েছে যে! শিরীষ গাছের ফুলগুলো সব ওর মূর্ত্তি ধরেছে।

গুরু

এই রকম করেই অপদেবতারা একেবারে যেন পরমেশ্বরের হাত থেকে মানুষকে বশীভূত করে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। দিনের পর দিন তাদের শক্তি যেন বেড়েই চলেছে—গর্ব্ব এসে তাদের হৃদয়কপাটে আস্তে আস্তে ঘা মারছে। তাই নরনারী পুরাতন পন্থা ছেড়ে দিচ্ছে।

[বাইরে একটি মূর্ত্তি নাচছে আর বোধ হচ্ছে একটি সাদা পাখীর সঙ্গে অনেক গলা মিলে গান করচে]

গান

দিনের তোরণদ্বার হতে বাতাস বইছে, উদাসীন হৃদয়ের উপর দিয়ে বইছে; যাদের হৃদয় উদাসীন তারা শুকিয়ে যাবে। চক্রাকারে যখন পরীরা তাদের দুধের মত সাদা পা ঝেড়ে ঝেড়ে এবং বাতাসে দুধের মত সাদা হাত নেড়ে নেড়ে দূরে দূরে নাচে, তখন আমি কিন্তু কুলকুলুনী নদীর বাঁশীতে এই স্বর শুনতে পাই, "বাতাস যদি হেসে মর্ম্মর শব্দে গান গায়, তবে উদাসীন হৃদয় যাদের তারা শুকিয়ে যাবে।" যখন বাতাস হেসে মর্ম্মর শব্দ ক'রে সেই দেশের গান গায় যে দেশে বৃদ্ধেরাও সুন্দর, এবং এমনকি জ্ঞানীরাও মজার কথা বলে, তখন পরীরাও তা শুনতে পায়।

সমাপ্ত

শ্রীদ্বিজেশচন্দ্র সেন।

হিন্দুর নব্য দর্শনবাদ

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'বসন্ত-প্রয়াণের' * ভূমিকায় লিখিয়াছেন, যে, গ্রন্থখানি কাব্য। কিন্তু ইহা সাধারণ কাব্য নহে; ইহাতে রসের অংশ যেমন তত্ত্বের অংশও তেমনিই। তিনি বইখানিকে কাব্যের দিক হইতেই মুখ্যভাবে দেখিয়াছেন। নরনারীর প্রেম যে একটা আনন্দময় জগতের সৃষ্টি করে, বিশেষতঃ যখন সে প্রেম দুঃসহ বিচ্ছেদের দ্বারা পরিপূর্ণরূপে সচেতন হইয়া উঠে, তখন যে রহস্যলোক শোকাহত চৈতন্যের আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, রবীন্দ্রবাবু বলিয়াছেন সেই জগতের খবর আমরা এই বইতে পাইয়াছি।

আমি ইহার তত্ত্বের দিকটি বুঝিবার চেষ্টা করিব।

এই গ্রন্থে আমরা কোন দার্শনিকের মতামতের আলোচনা পাই না, ইহাতে একজন নূতন দার্শনিকের অভ্যুত্থান দেখি, একটা নূতন দর্শনবাদের সৃষ্টি, বিকাশ ও পরিণতির ইতিহাস দেখি। যিনি গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন, তিনি বিশ্বের সহিত আপনার সম্বন্ধ সহজ সরল ও স্বাধীন ভাবে স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, কাহারও মতের তিনি অপেক্ষা করেন নাই। তিনি নিজেই নিজের দর্শন একা সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে প্রাচীন দর্শনের অনেক পুরাতন কথা দেখিতে পাই, আবার সম্পূর্ণ নূতন দার্শনিক তথ্যেরও পরিচয় পাই।

প্রথম দুই অধ্যায়ে মানসিক জীবনের প্রধান অবলম্বন দুই একটি মূল সূত্রের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ভোগে চির-অতৃপ্তি ও হাহাকার,—বাসনা-বহ্নিতে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরা। জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইলেই আনন্দ। তখন, মন যাহাকে বাহিরে হারায় তাহার জন্য আর হাহাকার করে না। অন্তরদৃষ্টিতে তখন প্রত্যেককে দিয়া তাহাকে দিবার ইচ্ছা পূরণ করিয়া তৃপ্তি পায়। দেওয়া মানে, আমার ভিতরকার আকাঙ্ক্ষাকে অবকাশ দেওয়া। তাহার বিকাশে তৃপ্তি। দিলেই পাই। জ্ঞানপথ উন্মুক্ত হইলে আর কর্ম্মশূন্য হইয়া বসিয়া থাকা যায় না। কর্ম্মেই প্রকৃত শান্তি ও তৃপ্তি আসে।

এইবার আসল আলোচনা আরম্ভ হইল। প্রথম প্রশ্ন হইতেছে, আমি-জ্ঞান কোথা হইতে আসিল? কাল-জ্ঞান হইতে আমি-জ্ঞান আসে, আমিত্বের বিকাশ হয় নানারকম সম্বন্ধ স্থাপনে, এবং ইহার পূর্ণ বিকাশ যুগল সম্বন্ধ হইতে। প্রথমে যুগল সম্বন্ধ একটা ক্ষুধার্ত্ত অন্ধ প্রবৃত্তির হাতড়ান মাত্র, কিন্তু তাহাতেই 'আমির' স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পর উহা জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হয়। যখন জ্ঞানের বিকাশ হয় নাই, তখন যুগল সম্বন্ধ শুধু ভোগের সহায়, তাহা একটা ভোগশরীর দান করে, সে ভোগশরীর চিতানলে দগ্ধ হয়,—তাহা হইতে অনন্ত অতৃপ্তি ও হাহাকার। প্রবৃত্তি ও বাসনার দান ভোগশরীর, যৌনরূপ; জ্ঞানের দান,—বিশ্বরূপ, অমূর্ত্ত অনন্তমূর্ত্ত রূপ, তাহা চিতায় দগ্ধ হয় না, তাহা কেবল মানবের দগ্ধহৃদয়ে শান্তিবারি ঢালিবার জন্য। যে চিতায় ভস্মীভূত হইয়াছে, যে কিছু না লইয়া শুধু উৎসর্গ করিয়া চলিয়া গেল, সেও দ্বিতীয়বার জন্ম লয়। যাহাকে ফেলিয়া যায় তাহাকে কর্ম্মে প্রেরণ করিয়া সে তাহারই ভিতর দিয়া পূর্ণ হয়।

চাঁদই হইতেছে এই ভাবটার প্রতিরূপ। পূর্ণিমার পর অমাবস্যা। চাঁদের পূর্ণ দেওয়ার পর অদৃশ্য হওয়া। মৃত্যুর কারণ পূর্ণ দেওয়া। চাঁদ কতবার আসে কতবার যায়, জন্ম ও মৃত্যুরও সেরূপ অনন্তপরম্পরা। একবার জন্ম ও মৃত্যুতে যে কাল লাগে, তাহাই বিশেষ মূর্ত্তি, তাহাই কর্ম্ম। জন্ম ও মৃত্যুর, কর্ম্ম ও মুক্তির সংখ্যা ও ধারা কে বলিতে পারে?

জ্ঞানের দান বিশ্বরূপ। ইন্দ্রিয়ের পাওয়া শেষ হইলে প্রেয়জ্ঞান থাকে না। তখন শ্রেয়জ্ঞানে আত্মদান হয়। সেই প্রেয়ের অতীত হওয়া, শ্রেয়জ্ঞানে আত্মদান করাই পূজা। বিশ্বরূপের পূজা যদি সুন্দরের উপাসনা হয় তাহা হইলে তৃপ্তি নাই, শান্তি নাই,—তাহাও যে রূপের প্রতি রাগ, প্রচ্ছন্ন বাসনা। এই রূপবিলাস অতিক্রম করিয়া অসুন্দরকে ভালবাসিতে হইবে, দুঃখময়ের সেবা করিতে হইবে—দুঃখময় বিধাতৃমূর্ত্তির ধ্যানে বিশ্বের সহিত একযোগে যুক্ত হইতে হইবে। আরাধ্যকে দুঃখের আগারে প্রতিষ্ঠা করা চাই, ধূলাতে পূজার আসন ও অশ্রুজলে পূজা চাই, তাহা না হইলে শান্তি নাই, শান্তি নাই।

বিধাতা দুঃখময়, কারণ তিনি যে প্রেমময়। প্রেমের মর্ম্ম বুঝা যায় বিরহে। বিধাতার বিরহেই বিধাতার রূপ দেখিতে পাই। বিরহে বিধাতার প্রকাশ,—বিরহেই বিধাতার জন্ম মৃত্যু, এই সৃষ্টি। হে আমার দুঃখময় বিধাতা, একবার আমাকে অস্থিচর্ম্মসার করিয়া আমাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সতীকে যেমন মহাদেব করিয়াছিলেন, তেমনি করিয়া জীবে জীবে রূপে রূপে বিলাইয়া দাও। যেন জীবে জীবে, হে দুঃখময়, তোমারই দুঃখ বেদনা হাহাকার অনুভব করি, তাহাতেই তোমার সহিত চিরযুক্ত হইব।

এতক্ষণ দেওয়া পাওয়ার কথা হইতেছিল। কর্ম্ম কি বুঝা গেল।

---

* বসন্ত-প্রয়াণ—শ্রীসরযূবালা দাস গুপ্তা প্রণীত।

কিন্তু কর্ম্মে এখনও পাওয়ার আশা অতিক্রম করি নাই। পাওয়ার কথা এখন ভুলিতে হইবে, দেওয়া পাওয়ার রাজ্য অতিক্রম করিয়া, এখন পাওয়ার কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, শুধু দেওয়ার কর্ম্ম করিতে হইবে। তবেই তৃপ্তি, তবেই জ্ঞান আসিবে।

বিশ্বের দানযজ্ঞে প্রথম দান সৃষ্টি। নিজে যাহা নিজের অংশে সৃষ্টি করি নাই তাহাকে দান করিবার অধিকারও আমার নাই। তাই দানকর্ম্মের আরম্ভ, সৃষ্টি করা। সৃষ্টি দানে তুমি আদ্যা-প্রকৃতির ধ্যান করিবে। ঈশার মাতা মরিয়ম বা জননী দেবকীর সৃষ্টি প্রাকৃত সৃষ্টি নহে, পরকীয়া সৃষ্টি,—জ্ঞানের সহায়ে দুই জনই ভগবতী বিশ্বমাতৃকা হইতে পারিয়াছিলেন। তুমিও বাৎসল্যরসে স্বকীয় ভাব ত্যাগ কর, পরকীয় ভাব অবলম্বন কর। তবেই তুমি বিশ্বমাতৃকার মাতৃত্বের ভিতর দিয়া আদ্যা-প্রকৃতির সন্ধান পাইবে।

জ্ঞানের সহায়ে সৃষ্টি ত করিলাম। এবার আত্মসৃষ্টিকে পালন করিতে হইবে। পালনধর্ম্মে জগদ্ধাত্রীর ধ্যান কর। জগদ্ধাত্রী শক্তিময়ী, ইচ্ছাময়ী; কিন্তু তিনি আপনার শক্তি ধারণ করিয়াছেন, সন্তানদের ইচ্ছাশক্তির নিকট নিজ ইচ্ছাকে সংবরণ করিয়াছেন। ইহাই মাতৃত্বে সন্ন্যাস। ইহা না থাকিলে জীব লীলা করিতে পাইত না, সৃষ্টিও থাকিত না, পালনও থাকিত না।

শেষ দান,—সংহার দান। ইহাই শ্রেষ্ঠ দান। যে দানের বলে সন্তান বিশ্বমাতৃকার ক্রোড়ে ফিরিতে পারে, ইহা সেই দান। সৃষ্টিতে ও পালনে যেমন এক পক্ষের দান, অপর পক্ষের আদান, এখানে উভয় পক্ষেরই দান। জীব সজ্ঞানে ভগবানের নিকট আপনার সংহার চায়,—ইহা কি চরম সন্ন্যাস নহে,—আবার ভগবান জীবের নিকট আপনাকে পূর্ণভাবে আত্মদান করেন। সংহারধর্ম্মে সেই প্রলয়কর্ত্রী সংহারিণীর ধ্যান কর,—তিনিই আনন্দময়ী, তাঁহার নিকট স্বেচ্ছায় যাও, পতঙ্গ-বৃত্তিতে যাইও না, বিরাগে নহে অরাগে যাও, তিনি বরাভয় দিবার জন্য বসিয়া আছেন।

"আমি" ত দান করিলাম। কিন্তু "লীলার সহচরকে" কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই। "মন"কেও কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই। "আমি",—একবারে নির্ব্বিকার; কিন্তু লীলার সহচর, সে যে তৃপ্তি চাহে, লীলা চাহে। আত্মা সর্ব্বসাক্ষী ও সর্ব্বকাম। লীলাতে আত্মার সাধ নাই, তাহার তৃপ্তিবোধ নাই, অবসাদ নাই। তবুও আত্মাকে লীলা করিতে হয়। ইহা অহেতুকী লীলা। ইহাতে লীলার সহচরের তৃপ্তি, সে তৃপ্তি আমার "আমি-আনন্দের" বহিরংশ, ভিতরের নয়। মন আত্মার ভিতরই লীলার সহচরকে খুঁজিয়াছিল,—লীলার সহচরকে আত্মার সমান মনে করিয়াছিল। তাহা হইল না। মন নিঃস্ব ও নিরাবরণ না হইলে লীলার সহচর সমগ্র হইয়া আত্মার সমান হইবে না। মনোময় কোষ মধুময় না হইলে অকিঞ্চন-আনন্দ আসিবে না।

আনন্দের প্রকারভেদ। ক্ষুদ্রতারক ক্ষীণ আলোকে শূন্য অজ্ঞেয় আকাশকে রহস্যময় করিয়া তুলিতেছে। ইহা রহস্যানন্দ। শূন্যের বায়ু মহাবর্ত্তে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্ষুদ্রকে বিরাম দিতেছে। ইহা বিরাম-আনন্দ। বাগানে তরুলতাটি পুষ্পিত হইতেছে। ইহা শোভানন্দ। মাতৃক্রোড়ে শিশু সংসারে প্রেম ও করুণা আনিল। ইহা প্রাণানন্দ। তরঙ্গ অগাধ সমুদ্রবক্ষে নূতনত্বের সৃষ্টি করিল, নূতন আনন্দের আধান করিল। ইহা লীলানন্দ। ধরণীগর্ভে আগ্নেয়গিরির বীজ আকস্মিক ধ্বংস আনিয়া দিল। ইহা রুদ্রানন্দ। প্রকৃতি নীরবে ও অকাতরে অফুরন্ত আনন্দ দিতেছে। আমরা ভাবি প্রকৃতি অজ্ঞান তাই সে সকলের কর্ম্মদাস হইয়াছে। আমাদের "আমি-জ্ঞানের" জন্য প্রকৃতির এই অজ্ঞানের মহিমা বুঝিতে পারি না। আমি প্রকৃতিকে অজ্ঞানেই পাইতে চাই। জ্ঞানের রাজ্যে কেবলই নূতন পুরাতন, হ্রাস বৃদ্ধি, কেবলই জন্ম মৃত্যু। কিন্তু প্রকৃতির লীলা চিরন্তন; তাই সেখানে জরা নাই, অবসাদ নাই, অশান্তি নাই। আমি আজ প্রকৃতির মতই জ্ঞানহারা হইতে চাই। প্রকৃতির ধৃতি ক্ষান্তি ও বিস্মৃতি আমার চাই। জ্ঞানের নূতন পুরাতন, জন্ম মৃত্যু, রূপ ও কর্ম্মের ঘোরে আর ঘুরিতে চাই না।

প্রকৃতির নিকট আমি সব পাইলাম। আমি অজ্ঞান অরূপ অসীমকে পাইলাম। এখন শূন্যতায় অভাব বোধ হয় না। সৃষ্টি আর চাই না। সময় এখন আমার নিকট সীমাবদ্ধ। আমি একরাট।

তবুও আমি ভিখারী। জীবের নিকট ভগবান ভিখারী। জীব ও ভগবান দুই হইয়া থাকা ভগবান চান না। কিন্তু জীব না চাহিলে ভগবান তাহাকে পাইতে পারেন না। হে অজ্ঞান, পাষাণ জীব, তোমার জন্য আমি কি অনন্তকাল প্রতীক্ষা করিব? এস বঁধু, এস, আমার সমান হইয়া এস, আমার বৈকুণ্ঠের সিংহাসনের দক্ষিণ যে খালি রহিয়াছে।

আজ ভগবানের সহিত জীবের মিলন। কি মধুর মৃত্যু! কি করুণ সংহার! আজ আমি ও বঁধুর লয়। "লীলার সহচর" এখন আর আমার সাথী নহে। সে তোমাদের সহচর। আজ "আমি" চির অস্তগত হইবে। এমন "আমি" আর হইবে না।

মার কোলে শিশু স্তন্য পান করিতেছে। শিশুর অধর নড়ে না, মায়ের স্তন স্রস্ত হইয়া পড়ে। ভগবান ও জীবের মিলন এইরূপ।

যুগল মিলনে যে রসমূর্ত্তি গড়িয়া উঠে তাহা এক রসে গলিয়া গেল। বিগ্রহ চলিয়া গিয়া যে নূতন সমগ্র আসিল তাহাতে জ্ঞানের রস বিশ্লেষণ নাই। ইহা কৈবল্য রস, জ্ঞানাজ্ঞানের অতীত।

* * * *

সবেরই লয় হইয়াছে। এখন বিরামও নাই, স্তব্ধতাও নাই, শূন্যও নাই।

আবার কিসের কম্পন উঠিতেছে। একটা ক্রন্দনধ্বনি এই স্তব্ধতার মধ্যে শুনা যাইতেছে।

মিলনের আনন্দ বিনষ্ট হইল। আবার দুঃখ জাগিয়া উঠিল। বাসনা জন্মিল, বাসনা কর্ম্ম হইয়া জাগিয়া উঠিল। আবার দুজনের সৃষ্টি হইল। তুমি ও তোমার বঁধু। অসংখ্য তুমি, অসংখ্য তোমার বঁধু। ইহাই বিশ্বের রাসমঞ্চ, জীবের লীলাক্ষেত্র।

বৈষ্ণবের রাধাকৃষ্ণলীলা ও শাক্তের সৃষ্টিস্থিতিসংহার-তত্ত্ব, উপনিষদের অরূপ উপাসনা ও বেদান্তের সোঽহং-তত্ত্ব, বৌদ্ধের শূন্যবাদ ও গীতার নিষ্কামধর্ম্ম, গ্রীকদর্শনের প্রকৃতিপূজা ও খৃষ্টান থিয়লজি, সকলেরই কিছু কিছু আমরা পূর্ব্বলিখিত আলোচনায় পাইতে পারি। প্রথম অধ্যায় হইতে শেষ অধ্যায় পর্য্যন্ত পর পর অতিক্রম করিয়া আমি যে আত্ম-চিন্তা ও ভগবদুপলব্ধির ক্রম দেখাইতে চেষ্টা করিলাম তাহাতেই বুঝা যাইবে সকল চিন্তা ও সকল অভিজ্ঞতাই পর পর আপনি স্বতন্ত্রভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে, আপনাদের স্বাতন্ত্র্যে ও প্রাণময় সত্তায় জীবন্ত সত্য হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। অন্যের চিন্তা বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতার একটু ছায়া থাকিলে, যে জ্ঞানের স্পষ্ট সুন্দর জ্যোতি আত্মার রহস্যলোককে একবারে আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে তাহার পরিবর্ত্তে আমরা অসমুজ্জ্বল অস্বাভাবিক প্রদীপের আলোয় অন্ধকার পাইয়া রহস্যালোকে হাতড়াইতাম। প্রকাশটা একবারেই স্বাধীন বলিয়া এ ক্ষেত্রে হিন্দু ও পাশ্চাত্য দর্শনের সহিত ইহার যেখানে সাম্য ও বৈষম্য আছে তাহা দেখাইবার জন্য ইহার তত্ত্বগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিলে ইহার অমর্য্যাদা হইবে। ইহা যে আপনার সত্তায় আপনার প্রাণে আপনার সত্যে একবারে পরিপূর্ণ। তাই আমি ইহাকে নব্য দর্শনবাদ বলিয়াছি। ইহা সম্পূর্ণ নূতন, তাই এই আত্মচিন্তা ও তত্ত্বদর্শনের দেশেও ইহা একটা সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি। বাগানের কোণে একটা লতায় ফুল ধরিল। ফুল অন্য গাছেরও আছে।

তবুও এই গাছ ও ফুলের একটা স্বতন্ত্রতা আছে, তাহাই সৌন্দর্য্যের উপাদান। গাছ ও ফুল উভয়ই সত্য। বাগানের কঠিন মাটি ভেদ করিয়া চারিদিক হইতে জীবনীশক্তি সংগ্রহ করিয়া গাছকে উঠিতে হইয়াছে। এবং ফুলেই ঐ গাছের জীবনের পরিণতি। এই নূতন দর্শনবাদ তাহার স্বতন্ত্রতার জন্য যে শুধু সুন্দর তাহা নহে। বিশ্বের সহিত সম্বন্ধের সত্যানুভূতি জীবনে এ ক্ষেত্রে পুষ্পিত ও ফলিত হইয়াছে এবং জীবনই এই দর্শনবাদকে সত্য পূর্ণ ও প্রাণময় করিয়া দিয়াছে। তাই ইহা পাঠ করিয়া যে আনন্দ হয় তাহা একটা শুধু স্বতন্ত্রতার আনন্দ নহে, একটা প্রাণময় সত্তার সহিত পরিচয়ের আনন্দ, তাহা প্রাণানন্দ।

জৈব শক্তিকে যেমন সমগ্রের ভিতর পাওয়া যায়, আবার অংশের ভিতরও পাওয়া যায়, এ রচনার প্রাণানন্দ সেরূপ সমগ্র ও অংশে সমান ভাবেই রহিয়াছে। যে-কোন অংশ পাঠ করি একটা নূতন প্রাণ আসিয়া যেন আমাদিগকে পরিপূর্ণরূপে সচেতন করিয়া দেয়, আমাদের মোহ দূর করে।

আমরা প্রত্যেক লীলা হইতে একটি উদাহরণ মাত্র দিব। আদি লীলায় আমি বিশেষের পথে বিশ্বকে খুঁজিয়াছিলাম। অথবা বিশ্বরূপের ভিতর আত্মচৈতন্যকে খুঁজিয়াছিলাম। যে আমার বিশেষ প্রেম, সেই আমার বিশ্বপ্রেম। সে যে কেবল প্রেম। তবে আর হারাইবে কেমন করিয়া। বিচ্ছেদে সে ত আরও নিকটে আসিবে। প্রেমের মর্ম্ম বুঝা যায় বিচ্ছেদে। দুঃখে আমি প্রেমকে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দুঃখেই প্রেমময়কে খুঁজিয়াছিলাম। প্রত্যেক সৃষ্ট জীবের অন্তরে ভগবানের বিচ্ছেদ-বেদনা অনুভব করিয়া ভগবৎপ্রেমে বিভোর হইয়াছিলাম।

ভগবান প্রেমময় তাই তিনি দুঃখময়। তিনি জীবের সহিত প্রেমের সম্বন্ধ সার্থক করিবার জন্য আপনার সহিত জীবের বিচ্ছেদ ঘটাইলেন। ভগবান ও জীবের সৃষ্টি এককালীন, কিন্তু ভগবান প্রেমে জীবকে পাইবার জন্য বিরহ ঘটাইলেন।

জীব বলিতেছে, হে প্রভু, তোমারি ক্রোড়ে চিরনিদ্রার আশ্রয় লইবার আগে তোমাকে একবার অংশে অংশে, প্রত্যেক জীবে, প্রত্যেক রূপে দেখিয়া লই। হে প্রেমময়, জীবে জীবে তোমার দুঃখ, বিচ্ছেদে বেদনা অনুভব করি। বিচ্ছেদ বেদনা অনুভব না করিয়া তোমার প্রেমের ভিতর দিয়া পাইব কি করিয়া?

জীব ও ভগবানে দুঃখ বেদনায় প্রেমের মিলন হইতেছে। তখন বর্ণনাটি কি মর্ম্মস্পর্শী, স্থানকল্পনা কি হৃদয়গ্রাহী!—

"চতুর্দ্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আসছে, প্রকৃতি নটীর রঙ্গমঞ্চের আলোক আজ চিরদিনের তরে নিবে যাচ্ছে। আমার জগৎ ও জীব-সমূহ, সেই রূপসমষ্টি, রঙ্গমঞ্চের দৃশ্য, আঁধারে স্বপনের ন্যায় ভেসে গেল। হে দুঃখময়, সুখ যেমন তোমা হতে বিচ্ছিন্ন হলে, তোমার আশায় তোমার স্বপনের মোহে বিভোর হয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে, হে আমার জীবনমরণাতীত প্রভু! তুমিও তেমনি আমায় নিয়ে, নিজক্রোড়ে আশ্রিত করে, তোমারই অতলস্পর্শে অ-স্বপন-সাগরে চিরতরে নিমজ্জিত হও।"

আদি লীলার অবসান হইল। জীবে জীবে তোমার প্রকাশ বুঝিলাম। তুমি যে আসল প্রেমিক তাই তুমি বিচ্ছেদ চাও। বিচ্ছেদেই সৃষ্টি,—জীবে তোমার প্রকাশ। তোমারই প্রেমে তুমি জীবে জীবন দিয়াছ, তাহাকে মূর্ত্তি দিয়াছ। আমি জীবে জীবে তোমার প্রেম এবং বিরহ-বেদনা অনুভব করিলাম। আমি জীবের সুখ দুঃখের কথা ভাবিয়া কর্ম্ম পাইয়াছিলাম। কর্ম্মপথে সুখদুঃখের বাসনাবহ্নি নির্ব্বাপিত করিলাম। আর আমার আশা নাই, অনুরাগ নাই, উৎসাহ নাই। আমার কর্ম্ম নাই।

কর্ম্মপথে এতকাল দিয়াছি, আবার পাইয়াছিও। এখন শুধুই দিব। একবারে "আমি"কেই দিব, আমাকে সংহার করিব। জীব বলিতেছে,—

"হে আত্মা, হে অন্তরতম, দেখ, তোমার দ্বারে আজ কত অতিথি আসছে। একে একে উপস্থিত হচ্ছে। এখন দ্বার খোল। নিজের বহিঃসৃষ্টিকে নিজের ক্রোড়ে আশ্রয় দাও। এখন মহাপ্রলয় আরম্ভ করে' কেবল নির্ব্বিকার হয়ে কাজ কর। কারো সুখদুঃখের কথা ভেবো না, তুমি কেবল নীরব হয়ে তোমার কাজ কর, তোমার কাজ শেষ করে' পূর্ণ জ্ঞানের অরূপে, অকর্ম্মে বিহার কর।"

অন্ত্যলীলা আরও করুণ, আরও মধুর। মর্ম্মের কথা এখানে আরও আশ্চর্য্য ও স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত।

আমি পূর্ণ জ্ঞান ছিলাম। কিন্তু আমার এ "আমি-জ্ঞান"ও আর ভাল লাগে না। আমি এখন জ্ঞান-হারা হইতে চাই। আমি এখন অজ্ঞান অসীম অরূপ অকর্ম্ম হইতে চাই।

আমি অজ্ঞান অসীম হইলাম। আমি প্রকৃতিকে সাথী করিয়া বিশ্ব-মহা-কাল-চক্রে এখন ঘুরিতেছি। আর কি চাই?

ভগবানের কি চাই? ভগবান জীবের নিকট ভিখারী। ভগবান জীবের সহিত মিলন চাহিতেছেন। জীবের নিকট জীবের প্রাণভিক্ষা চাহিতেছেন।

নিম্নলিখিত অংশের তুলনা সাহিত্যে পাওয়া কঠিন,—

"বঁধু, আজ আমি তোমার নিকট তোমার প্রাণ ভিক্ষা করছি। আমারই প্রেমে তোমায় জীবন দিয়েছিলাম, তোমায় মূর্ত্তি দিয়েছিলাম। সে মূর্ত্তি সবাই দেখেছিল। আজ তোমার মূর্ত্তি আর কেহ দেখে না। তবে এসো বঁধু, আজ আমার এই অন্তঃপুরে এই গুপ্ত আগারে তোমায় সংহার করবার আগে আমি একা তোমায় প্রাণ ভরে দেখি। এসো বঁধু, রহসি তোমার সেই রসপান করি, যাহা সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে আমার জন্যই চিরামৃতের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। * * * এস বঁধু, শেষবার এসো। কাছে, আরও কাছে, আরো আরো কাছে। আমার আশা যে মিটছে না। তুমি অন্তরে। তুমি যে এখনও দূরে। একি, তোমায় কেমন করে পাব? তুমিই যে তোমার অন্তরায়। তোমাকে সংহার না করলে এ অনন্ত আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি কোথায়? মিলন কোথায়?

"তুমি আসতে পারছ না? কিছু চাও কি? তোমার চাওয়া শেষ হয় নাই বলে কি তুমি আসতে পারছ না? হে তৃষ্ণাতুর, তোমায় চির-নিদ্রা দেবার আগে আমি তোমার সকল তৃষ্ণা মিটাব। কি চাও বল। আমার ভাণ্ডারে সব আছে। * * তুমি আমার বঁধু, আমার প্রিয়তম, তোমাকে দেব না? আমার কাছে তোমার কি আদর তা তুমি জান না। নিজের মূল্য জান না। তাই চুপ করে আছ, কিছু চাচ্ছ না। তুমি না চাইলে যে আমি তোমাকে পাই না। * * আমি আমার বৈকুণ্ঠে প্রিয়তমের আশায় বসে আছি। হে অজ্ঞান, হে পাষাণ, এমন করে কি অনন্তকাল তোমার জাগরণের প্রতীক্ষায় বসে থাকব?

"তবে এস বঁধু, এস, বৈকুণ্ঠে আমার দক্ষিণে তোমার সিংহাসন যে শূন্য রয়েছে। এসো বঁধু, এসো, আমার সমান হয়ে এস, আমার মতন হয়ে এস। তুমি তা পারবে না? অবশ্য পারবে। তা যদি না হয় তবে ত অনন্ত বিরহ, অনন্ত দুঃখ। তুমি যদি আমার সমান না হও, তা হ'লে ত তুমি আমার বঁধু হয়ে থাকবে। তা ত আমি চাই না। আমি ও আমার বঁধু দুই হয়ে থাকব তা ত আমি চাই না। আমি যে তোমার এই বাঁধ ভাঙ্গতে চাই।"

উল্লিখিত অংশের সহিত আমাদের সাহিত্যে বা অন্য কোন সাহিত্যে তুলনা পাওয়া কঠিন। ভাবের বিকাশ হিসাবে, ও প্রকাশের প্রণালী হিসাবে রচনাটি বাস্তবিকই নূতন।

রচনায় প্রকাশের প্রণালীর দুই একটি উদাহরণ দিলাম। এই-বার ভাবের আরও দুই-একটি অপূর্ব্ব স্বাধীনতার উদাহরণ দিয়া শেষ করিব। আদি লীলায় মধ্য লীলায় ও অন্ত্য লীলায়, তিন লীলাতেই

কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। প্রশ্নগুলির মীমাংসা হয় নাই, বোধ হয় মীমাংসা হইতে পারে না। (১) সৃষ্টির আদি কে? তুমি? তুমি কে? (২) তুমি কি অনাদি-পরম্পরায় সূত্রবদ্ধ? তোমার মুক্তি আছে? (৩) কেন সৃষ্টি হইল?

প্রথম—আদি লীলা হইতে

"তোমার প্রভাবেই নূতনের পরিচয়, তোমার প্রভাবে চির-পুরাতনের আশ্রয়। তুমি এই দুইএর মাঝে শয়ান। তুমি আমার এপার ওপারের ব্যবধান, এক ধূসর মহাসাগর, আর আমি সেই সাগরে তরণী। এ পারে ঐ রং ও রূপের ছটা, ও কারসঞ্জীবনীমূর্ত্তি? ওপারে ঘন আঁধার, অ-কাল-গ্রস্তের আবাস। মধ্যে তুমি? না আমারই ছায়া? আমারই প্রতিরূপ? এ মধ্য সাগর কেন। এ তোমার রাজ্য! তোমার সৃষ্টি! তুমি কে?"

দ্বিতীয়—মধ্য লীলা হইতে—

"তবে কি বিশ্বেশ্বরের যজ্ঞ হীনাঙ্গ হইল? তবে এই যে তোমার সৃষ্টি, তাহা তোমার হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারে?

"হে আমার আত্মার আত্মা! তোমার সৃষ্টি ও সংহারের কি কোন ক্রম আছে? সেই মহাকালেরও পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট ক্রম, সে ক্রম কে জানে? তুমিই কি সেই ক্রম? তুমি এই অনাদ্যনন্ত-পরম্পরার সূত্ররূপ? তুমি গ্রন্থি? তুমিই বন্ধন? তবে তোমার কি মুক্তি নাই?"

তৃতীয়—অন্ত্য লীলা হইতে

যখন সবেরই লয় হইয়াছে, যখন স্তব্ধতাও স্তব্ধ, বিরামও বিরত, যখন শূন্যও নাই, তখন আবার কিসের কম্পন উঠিল? কোথা হইতে কাহাদের হাহাকার উঠিয়া আবার কর্ম্মের বাসনা জাগাইয়া দিল? আবার সেই প্রশ্ন, এ আনন্দে দুঃখের সৃষ্টি কেন?

প্রশ্ন হইল। "সর্ব্বাগ্রে জেগেছিল কে? কার ক্রন্দনধ্বনি কার কানে লাগল? কে ও কার সখা জাগল? আবার দুজনের সৃষ্টি হল? সেই উষালোকে কোন্ দ্বন্দ্ব প্রথমে সৃষ্টিপথে প্রয়াণ করলে? এদের কাহারও রূপ নাই। এরা কে? পুরুষ ও প্রকৃতি? আমি ও আমার বঁধু?"

তিন লীলার শেষে একই প্রকার প্রশ্ন। সৃষ্টির সৃষ্টি কেন? দুঃখের সৃষ্টি কেন? মহাকালেরও পূর্ব্বে কে জাগিয়াছিল? কে সে? সে জাগিল কেন?

চিন্তাই আমাদিগকে চিন্তার অগম্য স্থানে লইয়া পৌঁছিয়াছে। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" স্বাতন্ত্র্য ও পূর্ণতার মহিমায় নব্য দর্শনবাদের সৃষ্টি হইল। অনুভূতির সত্যতা ইহাকে প্রাণময় সত্তা দান করিল, ভাষা ও রচনাপ্রণালী ইহাকে সকলের নিকট প্রত্যক্ষ করিয়া দিল।

এই জাগ্রত চৈতন্য কি হিন্দুর চৈতন্য জাগাইতে পারিবে না? এই প্রাণানন্দ কি হিন্দুর প্রাণে আনন্দসঞ্চার করিতে পারিবে না?

হিন্দু যুগে যুগে নূতন দর্শনের সৃষ্টি করিয়াছে, নূতন নূতন অধ্যাত্ম সাধনার পথ উন্মুক্ত করিয়াছে; হিন্দুত্ব যে সজীব রহিয়াছে, হিন্দুত্ব যে ক্রমবিকাশমান, ক্রমোন্নতিশীল। আজও এই গ্রন্থে হিন্দুর অধ্যাত্ম সাধনার সেই চিরপুরাতন চিরনূতন বাণী প্রচারিত হইল। হিন্দুত্ব যে অতীতের স্মৃতি নহে, হিন্দুত্ব যে মৃত অতীতের শব নহে, কল্পনার জীর্ণ কঙ্কাল নহে,—বর্ত্তমানের অনুভূতিতে তাহার নূতন প্রমাণ পাওয়া গেল। ক্রমবিকাশমান হিন্দুত্বের কথা স্মরণ করিলে প্রথমে মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা মনে পড়ে। বিরোধ ও সামঞ্জস্যের মধ্যে মহাত্মা রামমোহন হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান দর্শন মন্থন করিয়া এক অভিনব তত্ত্বদর্শনের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আধুনিক যুগের বিরোধী পারিপার্শ্বিকের মধ্যে হিন্দুত্বের সেই প্রথম সাড়া পাওয়া গেল। তাহার পর অনেক বৎসর অতীত হইয়াছে। নূতন নূতন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম ও দর্শনের সৃষ্টি হইল। নূতন সম্প্রদায়েরা বলিল,—হিন্দুত্ব অসাড়, অচেতন, ইউরোপের ভাব ও চিন্তার দ্বারা তাহারা হিন্দুর তত্ত্বদর্শনকে পরিবর্ত্তন করিতে প্রয়াস পাইল। হিন্দুত্ব তখন অতীত মহিমার স্মৃতিতে বর্ত্তমান লজ্জাকে ঢাকিয়া রহিয়াছিল। তাহার কিছু পরেই, এখন হইতে প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে যখন হিন্দুর দর্শন ও হিন্দুর অধ্যাত্মসাধনা বিদেশের পরানুকরণ ও পরানুবাদের মোহে লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, তখন একজন তরুণ সন্ন্যাসী পাশ্চাত্য সমাজের বক্ষে দাঁড়াইয়া সগৌরবে বেদান্তের মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি যে শুধু অতীতের গৌরবস্মৃতি বক্ষে করিয়া সাহস পাইয়াছিলেন তাহা নহে; তিনি হিন্দুর দর্শনকে প্রাণময় সত্তা দান করিলেন, যুগোপযোগী নূতন আকার দিলেন, তাহাকে তুলনামূলক সমালোচনার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া নবযুগের উপযোগী করিয়া দিলেন। হিন্দুদর্শন বিংশশতাব্দীর উপযোগী হইল, নব কলেবরের পূর্ণ মহিমায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে পূজা পাইতে লাগিল। রামকৃষ্ণশিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ জিগীষু হিন্দুত্বের (Aggressive Hinduismএর) প্রবর্ত্তক,—তরুণ সন্ন্যাসী হিন্দুত্বকে এক অপূর্ব্ব তেজ ও গরিমায় ভূষিত করিলেন। চিকাগোর ধর্ম্মসভা নব্য হিন্দুত্বের প্রথম পরিচয় লাভ করিল। চিকাগোর পর রোম নগরীতে দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ বৈষ্ণবধর্ম্ম ও দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া বিশ্ববাসীর নিকট প্রচার করিলেন,—বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে ভগবানের সহিত জীবের যে সম্বন্ধ নির্ণয় করা হইয়াছে তাহা দর্শন হিসাবেও মহনীয় ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুত্ব যে শুধু সংসারকে মায়া বলিয়া কল্পনা করিয়াছে তাহা নহে, হিন্দু যে এ সংসারের মধ্যেও পূর্ণ মুক্তি ও আনন্দ লাভের জন্য মধুর সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছে ব্রজেন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সমাজকে তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা তাহাই বুঝাইলেন। বর্ত্তমান ইউরোপের লোকহিতবাদ ও প্রত্যক্ষবাদ (Humanitarianism ও Positivism) এবং খৃষ্টধর্ম্মে ভগবানের সহিত খৃষ্টের পুত্রসম্বন্ধে যে ব্যক্তি-গত জীবনের সাধনার ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহাই মধুর, পূর্ণ ও বিচিত্ররূপে বৈষ্ণব সাধনায় বর্ত্তমান,—তাহা অন্তর্জ্জাতীয় যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে অহিংসা ও প্রেমের প্রতিষ্ঠা করিয়া জগতে চির-শান্তি আনিতে পারিবে।

বিংশশতাব্দীর হিন্দুত্বের প্রধান সম্বল এই নব্য দর্শনবাদ।

হিন্দুর সমাজ-জীবন বিরোধী শক্তিপুঞ্জের ঘাতপ্রতিঘাতে এখন বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। বিশ্বজগতে এখন যে আমরা দিন দিন সভ্যতা ও সমাজের পূর্ণ বিকারের পরিচয় পাইতেছি আমাদের বিশ্বাস হিন্দুসমাজ ও হিন্দুসভ্যতা সে বিকার হইতে বিশ্বমানবকে রক্ষা করিবে। বিংশশতাব্দীর ক্রমবিকাশমান হিন্দুর ইহাই জীবনের আশা, হৃদয়ের বল, ও আত্মার আনন্দ। কিন্তু বাস্তবের সংঘর্ষে হিন্দুসমাজের সহিত তাহার আদর্শের অনেক ব্যবধান হইয়া পড়িয়াছে। আদর্শ ও বাস্তবের এই নিষ্ঠুর ব্যবধান দূর করা হিন্দুসমাজের এখন একমাত্র সমস্যা। ওপারে হিন্দুসমাজের সোনালি রং ও রূপের ছটা, এপারে ঘন-তমসাবৃত বর্ত্তমান, বর্ত্তমানের দৈন্য ও লজ্জা। মধ্যে এক ধূসর মহাসাগর। মহাসাগরের জীবনস্রোতে পাশ্চাত্যসভ্যতা এখন ভাসিয়া চলিতেছে। হিন্দুসমাজের ইহাই যে অনন্ত বিরহ অনন্ত হাহাকার,—এ ধূসর মহাসাগর সে অতিক্রম করিবে কি করিয়া! সম্মুখের জীবনস্রোতে কত সমাজ কত সভ্যতা ভাসিয়া গেল। কত মৃত আদর্শের জীর্ণ কঙ্কাল, কত বাসনার কত আশার শুভ্র ফেনরাশি উত্তাল তরঙ্গমালা হিন্দু-সমাজের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। সাগরকূলে সে কি চিরকালই শুধু অপরের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিবে। নিয়তির ইহাই কি নিদারুণ অভিশাপ, তাহার পক্ষে কি অনন্তকালই বিচ্ছেদ-বেদনার

দুঃখ। এ ধূসর মহাসাগর তাহাকে অতিক্রম করিতেই হইবে। আদর্শ যে নির্ম্মম পাষাণ, সে ত কিছুতেই মধুর মিলনের জন্য বাস্তবের নিকট আসিবে না। বাস্তবকেই তাহার নিকট পৌছিতে হইবে। আর এই মহাসাগর পার হওয়া ভিন্ন গতি নাই, ইহাই যে কর্ম্মসাগর। কর্ম্মস্রোতে স্নান না করিলে, কর্ম্মমহাসাগর অতিক্রম না করিলে, বাস্তবের পক্ষে অনন্তকাল বিচ্ছেদ, অনন্ত হাহাকার।

এই ধূসর সাগরের ব্যবধান দূর হইবে কি করিয়া ?

হিন্দুর দর্শনই এপার ওপারের ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে। এবং হিন্দুর দর্শনই এই ব্যবধান দূর করিবে। দর্শনই বাঁধ তৈয়ারী করিয়াছে, দর্শনই বাঁধ ভাঙ্গিবে। দর্শনের প্রভাবেই হিন্দু আদর্শের পরিচয় পাইয়াছে এবং দৈন্যের মধ্যেও বাস্তবের আশ্রয় লইয়াছে। দর্শনই আদর্শের পূর্ণতা প্রচার করিয়াছে, এবং ইহাও বলিয়াছে বাস্তবের অন্তরেই আদর্শ তাহার পূর্ণ মহিমায় বিরাজিত। দর্শনই বাস্তবকে কর্ম্মস্রোতে ভাসাইয়া আদর্শের নিকট পৌছাইয়া দিবে। দর্শনের দীক্ষায় বাস্তব কর্ম্মপ্রবাহে ভাসিয়া পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইয়া আদর্শের সহিত মিলিত হইবে।

তাই বলিয়াছি এই হেয় ও নিকৃষ্ট বাস্তবের মধ্যে হিন্দুত্বের আশ্রয় ও সম্বল হিন্দু দর্শন। রামমোহন বিবেকানন্দ ব্রজেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হিন্দুর নব্যদর্শন হিন্দুত্বের ক্রমবিকাশের পরিচায়ক, হিন্দু-সমাজের বর্ত্তমান দৈন্যের অন্ধকারের মধ্যে ধ্রুব ও স্নিগ্ধ জ্যোতি। হিন্দুর নব্যদর্শনের আমরা আবার পরিচয় পাইলাম,—এইবার পাণ্ডিত্যের তর্ক নাই, বিচারের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ নাই, সমালোচনার তীব্রতা নাই; এইবার নব্যদর্শন একবারে সরল, অকৃত্রিম, মর্ম্মস্পর্শী, জীবন্ত; ইহা অধীতবিদ্যায় প্রাণহীন নহে, ইহা জীবনের সত্যানুভূতিতে প্রাণময়। এই নব্যদর্শন হইতে হিন্দুসমাজ কি জীবন পাইবে না, হীন বাস্তবকে অতিক্রম করিয়া হিন্দুসমাজ কি আদর্শের দিকে অগ্রসর হইবে না ?

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

"বসন্ত-প্রয়াণ" গ্রন্থখানির তত্ত্বের দিকটি বুঝান রাধাকমল বাবুর প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু তিনি প্রসঙ্গতঃ এরূপ কয়েকজন বাঙ্গালীর নাম করিয়াছেন, যাঁহারা সাক্ষাৎভাবে দার্শনিক নূতন কিছু লিখিয়াছেন, বা যাঁহাদের রচনার মধ্যে নূতন কিছু দার্শনিক তত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে। তিনি যাঁহাদের নাম করিয়াছেন, তাহাতে কোন ভুল হয় নাই; কিন্তু এমন অনেকের নাম করা উচিত ছিল যাঁহাদের নাম উল্লিখিত হয় নাই। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গৌরগোবিন্দ রায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিলে ভাল হইত। যাঁহারা ভারতীয় প্রাচীন চিন্তার সহিত পাশ্চাত্য দার্শনিক চিন্তাকে সম্মিলিত করিয়া নূতন কিছু গড়িয়াছেন, কিংবা আমাদের দেশীয় প্রাচীন চিন্তাকে নিজের স্বাধীন চিন্তার সংমিশ্রণে বা স্বাধীন চিন্তার সঞ্জীবনী শক্তিকে নূতন মূর্ত্তি, নূতন প্রাণ, নূতন শক্তি দিয়াছেন, রাধাকমল বাবু এইরূপ বাঙ্গালী-দিগেরই নাম করিয়াছেন। আমরাও সেই ভাবেই নূতন কয়েকটি নাম তাঁহার তালিকায় যোগ করিয়া দিলাম; প্রধানতঃ বা যাঁহারা কেবল মাত্র ভারতীয় বা প্রাচ্য দার্শনিক চিন্তার অনুবাদ বা বিবৃতি করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম উল্লেখ করি নাই। আমাদের উল্লিখিত ব্যক্তিগণের চিন্তার আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করা আমাদের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত, এবং নামগুলিও সেরূপ কোন ক্রম অনুসারে লিখিত হয় নাই। আমাদের তালিকাও যে সম্পূর্ণ তাহা বলিতে পারি না। বলা বাহুল্য, রাধাকমল বাবুর মতের সহিত আমাদের মতের কতটুকু মিল আছে বা নাই, তাহা বিচার না করিয়াই আমরা তাঁহার রচনাটি মুদ্রিত করিয়াছি।

ধৰ্ম্মপাল

[বরেন্দ্রমণ্ডলের মহারাজা গোপালদেব ও তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপাল সপ্তগ্রাম হইতে গৌড় যাইবার রাজপথে যাইতে যাইতে পথে এক ভগ্নমন্দিরে রাত্রিযাপন করেন। প্রভাতে ভগীরথীতীরে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে দস্যুলুণ্ঠিত এক গ্রামের ভীষণ দৃশ্য ও অরাজকতা দেখাইলেন। সন্ন্যাসীর নিকট সংবাদ আসিল যে গোকর্ণ দুর্গ আক্রমণ করিতে শ্রীপুরের নারায়ণ ঘোষ সসৈন্যে আসিতেছেন; অথচ দুর্গে সৈন্যবল নাই। সন্ন্যাসী তাঁহার এক অনুচরকে পার্শ্ববর্ত্তী রাজাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনার জন্য পাঠাইলেন এবং গোপালদেব ও ধর্ম্মপালদেব দুর্গরক্ষার সাহায্যের জন্য সন্ন্যাসীর সহিত দুর্গে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দুর্গ শীঘ্রই শত্রুর হস্তগত হইল। ঠিক সেই সময়ে উদ্ধারণপুরের দুর্গস্বামী উপস্থিত হইয়া নারায়ণ ঘোষকে পরাজিত ও বন্দী করিলেন। সন্ন্যাসীর বিচারে নারায়ণ ঘোষের মৃত্যুদণ্ড হইল। দুর্গস্বামিনী কন্যা কল্যাণীকে বধূরূপে গ্রহণ করিবার জন্য মহারাজ গোপালদেবকে অনুরোধ করিলেন। গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করার উৎসবের দিন মহারাজের সভায় সপ্ত সামন্ত রাজা উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাসীর পরামর্শক্রমে তাঁহাকে মহারাজাধিরাজ সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিলেন।

গোপালদেবের মৃত্যুর পর ধর্ম্মপাল সম্রাট হইয়াছেন। তাঁহার পুরোহিত পুরুষোত্তম খুল্লতাত-কর্ত্তৃক হৃতসিংহাসন ও রাজ্যতাড়িত কান্য-কুব্জরাজের পুত্রকে অভয় দিয়া গৌড়ে আনিয়াছেন। ধর্ম্মপাল তাঁহাকে পিতৃসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এই সংবাদ জানিয়া কান্যকুব্জরাজ গুর্জ্জররাজের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া দূত পাঠাইলেন। পথে সন্ন্যাসী দূতকে ঠকাইয়া তাহার পত্র পড়িয়া লইলেন।

গুর্জ্জররাজ সন্ন্যাসীকে বৌদ্ধ মনে করিয়া সমস্ত বৌদ্ধদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিবার উপক্রম করিলেন। এদিকে সন্ন্যাসী বিশ্বনন্দের কৌশলে ধর্ম্মপাল সমস্ত বৌদ্ধকে প্রাণপাত করিয়া রক্ষা করিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন। সম্রাট ধর্ম্মপাল সামন্তরাজাদিগকে সঙ্গে লইয়া কান্যকুব্জ রাজ্য জয় করিতে যাত্রা করিলেন।]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চক্রের পরিবর্ত্তন।

রজনীর দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে, বারাণসী নগরীর পথগুলি অন্ধকার, বিপণিসমূহের আলোকমালা নিভিয়া গিয়াছে। এই সময়ে একটি বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে একজন মুণ্ডিতশীর্ষ সন্ন্যাসী অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সন্ন্যাসী বোধ হয় কাহারও আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল, কারণ সে দণ্ডে দণ্ডে অগ্রসর হইয়া জনশূন্য পথ পরীক্ষা করিতেছিল। দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে তোরণে তোরণে মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল, বারাণসীর অসংখ্য দেবালয়ে নৈশপূজার শঙ্খঘণ্টা ধ্বনিত হইল, ক্রমে সমস্ত শব্দ থামিয়া গেল, অন্ধকারাচ্ছন্ন নগর পুনরায় নিঃশব্দ হইল। এই সময়ে পাষাণাচ্ছাদিত পথে মনুষ্যপদশব্দ শ্রুত হইল, সন্ন্যাসী তাহা শুনিয়া দ্বারের পার্শ্বে লুকাইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে জনৈক অস্ত্রধারী পুরুষ অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন সন্ন্যাসী অট্টালিকার অভ্যন্তর হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?" উত্তর হইল, "আমি ভিল্লমালের অতিথি।"

"প্রমাণ কি?"

"আর্য্যসঙ্ঘের আদেশে আমার নিকট ধর্ম্মচক্র প্রেরিত হইয়াছিল।"

"সঙ্গে আনিয়াছ?"

"হাঁ।"

"দেখি?"

সৈনিক বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে গোলাকার ধাতুখণ্ড বাহির করিয়া সন্ন্যাসীর হস্তে প্রদান করিল, সন্ন্যাসী তাহা পরীক্ষা করিয়া কহিল, "ভিতরে আইস।"

সৈনিক অট্টালিকার ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। সে পথ দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোন পথে যাইব?" সন্ন্যাসী উত্তর না দিয়া তাহার হস্তধারণ করিয়া তাহাকে লইয়া চলিল। অন্ধকারাচ্ছন্ন কয়েকটি কক্ষ পার হইয়া উভয়ে অট্টালিকার প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল। সৈনিক লক্ষ্য করিয়া দেখিল যে, বৃহৎ অট্টালিকা ধ্বংসোন্মুখ, উপরের তলের কিয়দংশ পড়িয়া গিয়াছে, প্রাঙ্গণে বহু লতা গুল্ম জন্মিয়াছে এবং অট্টালিকার অবশিষ্টাংশ জনশূন্য। তাহারা প্রাঙ্গণ পার হইয়া আর-একটি অন্ধকারময় গৃহে প্রবেশ করিল এবং সোপানশ্রেণী অবলম্বন করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। সন্ন্যাসী অভ্যাসবশতঃ অনায়াসে সোপান বাহিয়া নামিয়া গেল। সুরঙ্গী পথে অর্দ্ধদণ্ড চলিয়া উভয়ে পুনরায় সোপানশ্রেণী অবলম্বন করিয়া উপরে উঠিল, সন্ন্যাসী উপরের সোপানে দাঁড়াইয়া সম্মুখের রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিল। তৎক্ষণাৎ দ্বারের অপর পার্শ্ব হইতে জিজ্ঞাসা হইল, "কে?"

"বুদ্ধমিত্র।"

"একা আসিয়াছ?"

"সঙ্গে ভিল্লমালের অতিথি আছেন।"

"প্রমাণ পাইয়াছ?"

"হাঁ।"

রুদ্ধদ্বার মুক্ত হইল, উভয়ে আর-একটি অন্ধকার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল, দ্বার পুনরায় রুদ্ধ হইল। সৈনিক ভীত হইয়া অসিতে হস্ত স্থাপন করিল। তখন দ্বাররক্ষক জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে।"

"আমি ভিল্লমালের অতিথি।"

"কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছ?"

"উত্তরাপথের আর্য্যসঙ্ঘের চরণ দর্শনের মানসে আসিয়াছি।"

"তুমি কি জাতি?"

"গুর্জ্জর প্রতীহার।"

"তুমি কোন ধর্ম্মাবলম্বী?"

"আমি সদ্ধর্ম্মী, পুরুষানুক্রমে ত্রিরত্নের অর্চ্চনা করিয়াছি।"

"কি উদ্দেশ্যে আর্য্যসঙ্ঘের দর্শন কামনা কর?"

"পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ গুর্জ্জরেশ্বর নাগভটদেবের আদেশে দূতস্বরূপ আর্য্যসঙ্ঘের সমীপে আসিয়াছি।"

"নিদর্শন আনিয়াছ?"

"হাঁ।"

"কি ?"

"পরমেশ্বর পরমসৌগত মহামণ্ডলেশ্বর বাহুকধবলের মুদ্রাঙ্কিত পত্র।"

"দেখি।"

সহসা আলোক জ্বলিয়া উঠিল, সৈনিক চক্ষুমার্জ্জনা করিতে করিতে প্রশ্নকর্ত্তার হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিল। সে ব্যক্তিও একজন মুণ্ডিতশীর্ষ সন্ন্যাসী, তাহার পরিধানে গৈরিকরঞ্জিত বস্ত্র। গুম্ফ, শ্মশ্রু ও মস্তক মুণ্ডিত ও দক্ষিণ হস্তে জপমালা। দ্বিতীয় সন্ন্যাসী পত্র পাঠ করিয়া কহিল, "উত্তম। তুমি আমার সঙ্গে আইস।" তিনজনে কক্ষ পার হইয়া একটি দ্বারের সমীপবর্ত্তী হইলেন। দ্বার রুদ্ধ, দ্বিতীয় সন্ন্যাসী তাহাতে করাঘাত করিলে কক্ষাভ্যন্তর হইতে প্রশ্ন হইল, "কে ?" দ্বিতীয় সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, "ভিক্ষু জিনদাস, ভিক্ষু বুদ্ধমিত্র ও গুর্জ্জরেশ্বরের প্রতিনিধি নায়ক রুদ্রেণ।"

"গুর্জ্জররাজের প্রতিনিধি কি অভিপ্রায়ে নিশীথ রাত্রিতে এখানে আসিয়াছেন ?"

"উত্তরাপথের আর্য্যসঙ্ঘের দর্শনের মানসে।"

"উপযুক্ত প্রমাণ ও নিদর্শন পাইয়াছ কি ?"

"হাঁ।"

দ্বার মুক্ত হইল, রুদ্রেণ কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তৎক্ষণাৎ দ্বার পুনরায় রুদ্ধ হইল। দ্বারের পার্শ্বে আর-একজন মুণ্ডিতশীর্ষ ভিক্ষু দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি রুদ্রেণকে লইয়া কক্ষের মধ্যস্থলে অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে কক্ষের চারিদিকে চারিটি উল্কা জ্বলিয়া উঠিল। রুদ্রেণ দেখিতে পাইলেন যে, তিনি পাষাণনির্ম্মিত বেদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন, বেদীর উপরে ত্রিরত্নের মূর্ত্তি স্থাপিত আছে ও তাহার পশ্চাতে তিনজন অতি বৃদ্ধ ভিক্ষু কুশাসনে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহাদিগের পশ্চাতে কিঞ্চিদ্দূরে কুশাসনে আরও দ্বাদশ জন ভিক্ষু বসিয়া আছেন। বেদীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দ্বাররক্ষক রুদ্রেণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নায়ক রুদ্রেণ, আপনি কি সদ্ধর্ম্মী ?"

"হাঁ।"

"ত্রিরত্নে আপনার বিশ্বাস আছে কি ?"

উত্তরস্বরূপ রুদ্রেণ রত্নত্রয়কে তিনবার প্রণাম করিলেন। তখন ভিক্ষু পুনরায় কহিলেন, "ত্রিরত্ন স্পর্শ করিয়া শপথ করুন।"

"কি শপথ করিব ?"

"শপথ করুন যে, আপনি অদ্য রাত্রিতে যাহা দর্শন করিবেন বা শ্রবণ করিবেন তাহা অন্যের নিকটে প্রকাশ করিবেন না ?"

"শপথ করিলে মহারাজাধিরাজকে দৌত্যের ফলাফল জানাইব কেমন করিয়া ?"

বৃদ্ধ ভিক্ষুত্রয়ের মধ্যে একজন কহিলেন, "গুর্জ্জরেশ্বর ও মহামণ্ডলেশ্বর বাহুকধবল ব্যতীত তৃতীয় ব্যক্তির নিকটে কোন কথা প্রকাশ করিবেন না।"

রুদ্রেণ তখন ত্রিরত্ন স্পর্শ করিয়া তিনবার শপথ করিলেন। পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধভিক্ষু তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুর্জ্জরেশ্বর আপনাকে কি অভিপ্রায়ে আর্য্যসঙ্ঘের সমীপে প্রেরণ করিয়াছেন ? আমরা আর্য্যসঙ্ঘের প্রতিনিধি।" তাঁহার কথা শুনিয়া রুদ্রেণ তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরমবৈষ্ণব মহারাজাধিরাজ নাগভটদেব আর্য্যসঙ্ঘের সহিত সন্ধিস্থাপনে প্রয়াসী। পরম সৌগত মহামণ্ডলেশ্বর বাহুকধবলদেবের পরামর্শানুসারে মহারাজাধিরাজ বৌদ্ধসঙ্ঘের প্রতি বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস এই যে, আর্য্যসঙ্ঘের সহিত সন্ধি স্থাপিত হইলে অচিরে গৌড়যুদ্ধের অবসান হইবে এবং মহারাজাধিরাজের মিত্র কান্যকুব্জেশ্বর পুনরায় অপহৃত অধিকার প্রাপ্ত হইবেন।"

"আর্য্যসঙ্ঘের সহিত গৌড়যুদ্ধের সম্পর্ক কি ?"

"পরম সৌগত সঙ্ঘনায়কগণ দাসের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন; আমি দূত মাত্র। মহারাজাধিরাজের বিশ্বাস যে, আর্য্যসঙ্ঘের আনুকূল্য ব্যতীত ক্ষুদ্র গৌড়েশ্বর কখনই মধ্যদেশ অধিকার করিতে পারিত না।"

"গুর্জ্জরেশ্বর আর্য্যসঙ্ঘের সহিত কি ভাবে সন্ধি স্থাপনে প্রয়াসী ?"

"মহারাজাধিরাজ আপনাদিগকে জানাইতে আদেশ করিয়াছেন যে, সন্ধি স্থাপিত হইলে, গুর্জ্জররাষ্ট্রে সঙ্ঘের অপহৃত সম্পত্তি পুনঃপ্রদত্ত হইবে এবং গুর্জ্জররাজ আর্য্য-

সঙ্ঘের আদেশানুসারে সদ্ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাবর্গের বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।"

"সন্ধি স্থাপিত হইলে, গুর্জ্জরেশ্বর যে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন তাহার প্রমাণ কি?"

"পরম সৌগত মহামণ্ডলেশ্বর বাহুকধবলদেব সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবেন এবং গুর্জ্জরেশ্বরের প্রতিভূস্বরূপ স্বীয় পুত্র-দ্বয়কে আর্য্যসঙ্ঘে প্রেরণ করিবেন।"

"উত্তম। আর্য্যসঙ্ঘ সন্ধিস্থাপনে সম্মত। সন্ধিপত্রে অন্য কোন লক্ষণ থাকিবে কি?"

"থাকিবে। সন্ধিবন্ধনের পরে আর্য্যসঙ্ঘ গৌড়রাজকে অর্থসাহায্য করিতে পারিবেন না।"

"উত্তম। আর্য্যসঙ্ঘ ইহাতেও সম্মত আছেন। সন্ধি-পত্র কি আপনার সঙ্গে আছে?"

রুদ্রেণ বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে সন্ধিপত্র বাহির করিয়া সঙ্ঘ-নায়কের হস্তে প্রদান করিলেন। বৃদ্ধ তাহা পাঠ করিয়া তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বস্থিত অপর বৃদ্ধকে সন্ধিপত্র প্রদান করিলেন। সঙ্ঘনায়কত্রয়ের পাঠ শেষ হইলে, একজন ভিক্ষু উহা পশ্চাৎস্থিত দ্বাদশজন স্থবিরকে প্রদান করিলেন। তাঁহারা সন্ধিপত্র পাঠ করিয়া, উহা পুনরায় সঙ্ঘনায়কগণকে প্রত্যর্পণ করিলেন। পূর্ব্বোক্ত সঙ্ঘনায়ক তখন স্থবিরগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সন্ধি সম্বন্ধে চক্ররাজগণের কোন আপত্তি আছে কি?" একজন স্থবির কহিলেন, "আর্য্য, চক্ররাজ বিশ্বানন্দ এখানে উপস্থিত নাই।" "একজন চক্ররাজের অনুপস্থিতির জন্য আর্য্যসঙ্ঘের কার্য্য স্থগিত থাকিতে পারে না। সমবেত চক্ররাজগণের অভিপ্রায় কি?"

কিয়ৎক্ষণ পরে স্থবিরগণ কহিলেন যে, গুর্জ্জরেশ্বরের সহিত সন্ধিবন্ধনে তাঁহাদিগের কোনই আপত্তি নাই। তখন সঙ্ঘনায়কগণ বেদীর তলদেশ হইতে লেখনী ও মস্যাধার গ্রহণ করিয়া গুর্জ্জররাজের স্বাক্ষরের নিম্নে স্বাক্ষর করিলেন। রুদ্রেণ সন্ধিপত্র গ্রহণ করিবামাত্র কক্ষের আলোক নির্ব্বা-পিত হইল, পূর্ব্বোক্ত ভিক্ষু তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া কক্ষ পরিত্যাগ করিল এবং অন্য পথ অবলম্বনে তাঁহাকে রাজ-পথে আনয়ন করিল। রুদ্রেণ বিস্মিত হইয়া দেখিলেন যে, তিনি বিশ্বেশ্বরের বিশালকায় মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রত্যাবর্ত্তন।

দুইদিন পরে ধর্ম্মপালদেব কান্যকুব্জনগরের প্রান্তে ফিরিয়া আসিলেন এবং বিনা আয়াসে অবরুদ্ধ নগরে প্রবেশ করিলেন।

সিংহ স্বেচ্ছায় নগরে প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া গুর্জ্জর-সেনা তাঁহাকে বাধা দিল না। গৌড়েশ্বর পঞ্চাশৎ ক্রোশ ভ্রমণ করিয়াও আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, যাহা পাইয়াছিলেন তাহা পথেই পঞ্চদশ সহস্রের জন্য ব্যয় হইয়াছে। ধর্ম্মপাল কান্যকুব্জে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার শুষ্ক মুখ দেখিয়া সামন্তগণ বুঝিতে পারিলেন যে, গৌড়েশ্বরের যুদ্ধযাত্রা বিফল হইয়াছে। ভীষ্মদেব তৎক্ষণাৎ মন্ত্রণাসভা আহ্বান করিয়া স্থির করিলেন যে, সময় থাকিতে থাকিতে প্রত্যাবর্ত্তন করাই শ্রেয়। গৌড়েশ্বরের প্রত্যাবর্ত্তনের দুইদিন পরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধর্ম্মপাল কান্যকুব্জ নগর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু গৌড়ীয় সামন্তগণের কৌশলে ও প্রত্যাবর্ত্তনোন্মুখ প্রবাসী গৌড়ীয় সেনার দুর্দ্দমনীয় বেগে গুর্জ্জরসেনা পরাজিত হইল। বহু বলক্ষয় করিয়া ধর্ম্মপাল অবরুদ্ধ নগর হইতে বাহির হইলেন এবং যথাসম্ভব দ্রুতবেগে প্রতিষ্ঠানের পথে অগ্রসর হইলেন। পরাজিত হইয়াও গুর্জ্জরসেনা গৌড়গণকে পরিত্যাগ করিল না, তাঁহারা মধুমক্ষিকার ন্যায় প্রত্যাবর্ত্তনশীল গৌড়ীয়-সেনাকে বেষ্টন করিয়া চলিতে লাগিল। তখন নাগভটের অত্যাচারে মধ্যদেশ মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে, গ্রাম ও নগরসমূহ জনশূন্য, ক্ষেত্রসমূহ হস্তী ও অশ্বের পদদলিত, অধিবাসীগণ সমতল ভূমি পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতের উপত্যকাসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। অনশনক্লিষ্ট, ভীত, নিরাশ গৌড়ীয়সেনা ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠানাভিমুখে চলিতে লাগিল। গুর্জ্জর সেনা অবসর পাইলেই তাহা-দিগকে আক্রমণ করে, খাদ্যদ্রব্য সংগৃহীত হইলে তাহা লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায় এবং সর্ব্বদা দূরে থাকিয়া শর, বর্শা ও ভল্ল নিক্ষেপ করিয়া প্রাণহানি করে। এইরূপে সপ্তাহকাল অতিবাহিত হইল, বৃথা যুদ্ধে অর্দ্ধসৈন্য ক্ষয় করিয়া গৌড়েশ্বর প্রতিষ্ঠান-দুর্গে উপস্থিত হইলেন।

যুদ্ধ চলিতে লাগিল, সমগ্র মধদেশ গুর্জ্জরসেনার অত্যাচারে জনশূন্য হইয়া উঠিল। ক্রমে খাদ্যাভাবে প্রতিষ্ঠানদুর্গে গৌড়ীয়সেনার অবস্থান অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। ভগ্নহৃদয়ে ধর্ম্মপাল সামন্তচক্রের সহিত বারাণসীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বারাণসীতে সহস্র সহস্র গৌড়ীয়সেনা কান্যকুব্জে যাত্রার জন্য একত্র হইয়াছিল, সেইজন্য মহাকুমার বাক্‌পাল বারাণসীদুর্গে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ পাইয়া পশ্চিম গৌড়ে বহুস্থানে সহস্র সহস্র পদাতিক সেনা স্থাপন করিলেন। তাহারা হিমালয়ের চরণপ্রান্ত হইতে বিন্ধ্যপর্ব্বত পর্য্যন্ত মৃণ্ময় প্রাকার নির্ম্মাণ করিল। এইবার গুর্জ্জর অশ্বারোহীগণের গতি রুদ্ধ হইল। প্রতিষ্ঠান হইতে সমগ্র গৌড়ীয়সেনা বারাণসীতে আসিয়া পৌঁছিলে ধর্ম্মপালদেব নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পাইলেন। মৃণ্ময় প্রাকারের পশ্চাতে থাকিয়া গৌড়ীয় পদাতিকগণ সর্ব্বত্র গুর্জ্জর অশ্বারোহীগণকে অনায়াসে পরাজিত করিল; অবসর পাইয়া গৌড়ীয় অশ্বারোহীগণ প্রতিষ্ঠানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। এই সময়ে রাজধানী হইতে মহামন্ত্রী গর্গদেবের দূত ভাগ্যচক্র পরিবর্ত্তনের সংবাদ লইয়া গৌড়েশ্বরের সমীপে উপস্থিত হইল।

কান্যকুব্জযুদ্ধে মণিদত্তের সঞ্চিত ধনরাশি বহুপূর্ব্বে ব্যয় হইয়া গিয়াছিল। মহাস্থবির বুদ্ধভদ্র গৌড়েশ্বরকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে বৌদ্ধসঙ্ঘে সঞ্চিত অর্থ হইতে তিনি গুর্জ্জর যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন। ধর্ম্মপাল যখন বারাণসীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তখন গর্গদেব জানাইলেন যে, বুদ্ধভদ্রের প্রদত্ত অর্থ প্রায় শেষ হইয়াছে, দ্বিতীয়বার অর্থ প্রদানের সময় অতিবাহিত হইয়াছে, কিন্তু বুদ্ধভদ্রের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। সংবাদ শ্রবণ করিয়া বিশ্বানন্দ ভীষ্মদেব ও ধর্ম্মপাল অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। বিশ্বানন্দ স্বয়ং বহু চেষ্টা করিয়াও সঙ্ঘনায়কগণের সাক্ষাৎ পাইলেন না। তখন বাধ্য হইয়া গৌড়েশ্বর গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ প্রদান করিলেন, গৌড়ীয় অশ্বারোহী সেনা বাধ্য হইয়া প্রতিষ্ঠান ভুক্তির সীমা হইতে ফিরিয়া আসিল।

গৌড়ীয় পদাতিকগণ পরাজিত গুর্জ্জরসেনার হস্তে মৃণ্ময় প্রাকার সমর্পণ করিয়া শোণ ও গণ্ডকীতীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, গৌড়রাজ্যে মুদ্‌গগিরি, মণ্ডলা, গৌড় ও কর্ণসুবর্ণ প্রভৃতি প্রাচীন প্রসিদ্ধ দুর্গসমূহ অবরোধের জন্য সুসজ্জিত হইল। ভগ্নহৃদয়ে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ধর্ম্মপালদেব স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কান্যকুব্জরাজ্যের যে-সমস্ত সামন্ত যুদ্ধের প্রারম্ভে চক্রায়ুধের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া গৌড়রাজ্যে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন।

জয়পালদেবকে তীরভুক্তি রক্ষার্থ নিয়োজিত করিয়া ধর্ম্মপাল স্বয়ং শোণতীরে শিবির স্থাপন করিলেন। নাগভটের আদেশে উত্তরাপথ মরুভূমিতে পরিণত হইল। লুণ্ঠনতৎপর গুর্জ্জরসেনা বহুদিন শোণ বা গণ্ডকী অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিল না। যখন উত্তরাপথে লুণ্ঠন করিবার আর কিছু রহিল না, তখন গুর্জ্জরসেনানায়কগণ গৌড়রাজ্য আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন। তখন গৌড়ীয় সামন্তগণ নদীদ্বয়ের তীরে দুর্ভেদ্য মৃণ্ময়দুর্গের মালা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। গুর্জ্জরসেনা মগধ ও তীরভুক্তিতে প্রবেশের চেষ্টা করিয়া বার বার পরাজিত হইল। পরাজয়বার্ত্তা যথাসময়ে নাগভটের শ্রুতিগোচর হইল, গুর্জ্জররাজ তখন কান্যকুব্জে অবস্থান করিতেছিলেন। কান্যকুব্জরাজ্য বিজিত হইলেও গুর্জ্জররাজ ইন্দ্রায়ুধকে মুক্তি প্রদান করেন নাই; তিনি তখনও সামান্য বন্দীর ন্যায় ভিল্লমালে অবস্থিতি করিতেছিলেন। গৌড়রাজ্য অধিকারের চেষ্টা বিফল হইয়াছে শুনিয়া নাগভট ও বাহুকধবল কান্যকুব্জ হইতে শোণতীরে যাত্রা করিলেন। গুর্জ্জররাজ স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করিয়াও মগধে প্রবেশলাভ করিতে পারিলেন না। নিশীথরাত্রিতে বিমলনন্দী ও চক্রায়ুধ অল্পসংখ্যক সেনা লইয়া গুর্জ্জররাজের বস্ত্রাবাসে অগ্নিসংযোগ করিয়া আসিলেন, নাগভট পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন।

এইরূপে একবৎসরকাল অতিবাহিত হইল। বার বার পরাজিত হইয়া গুর্জ্জরসেনা অবশেষে গৌড়রাজ্য অধিকারের চেষ্টা পরিত্যাগ করিল। তথাপি আত্মরক্ষার জন্য গৌড়েশ্বরকে পশ্চিম সীমান্তে সহস্র সহস্র সেনা সুসজ্জিত করিয়া রাখিতে হইল। ধর্ম্মপালের দুঃসময়ে সন্ন্যাসী বিশ্বানন্দ শত্রুনাশের এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন।

গোপালদেবের সম্রাটপদবী লাভের পূর্ব্বে গৌড়দেশ বহু বিদেশীয় রাজা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। কামরূপের

রাজা হর্ষদেব ও নাগভটের পিতা বৎসরাজ এক সময়ে প্রায় সমস্ত গৌড়রাজ্য হস্তগত করিয়াছিলেন। গৌড়বাসীর সৌভাগ্যক্রমে দক্ষিণাপথেশ্বর রাষ্ট্রকূটবংশীয় ধ্রুবধারাবর্ষ এই সময়ে গুর্জ্জররাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিলেন এবং ধ্রুবের বাহুবলেই গৌড়রাজ্য বৎসরাজের কবলমুক্ত হইয়াছিল। বিশ্বানন্দ চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, গুর্জ্জরযুদ্ধে ধর্ম্মপালের পক্ষ অবলম্বন করে উত্তরাপথে এমন কোন রাজা নাই। সহসা তাঁহার ধ্রুবের কথা স্মরণ হইল। ধ্রুব তখন স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, তাঁহার পুত্র রাষ্ট্রকূট রাজ্যের অধীশ্বর। বিশ্বানন্দ দেখিলেন যে গোবিন্দের সাহায্য ব্যতীত গুর্জ্জরযুদ্ধে জয় অসম্ভব: তিনি ভীষ্মদেব, বীরদেব, কমলসিংহ, প্রমথসিংহ প্রভৃতি প্রধান প্রধান গৌড়ীয় সামন্তগণকে এই কথা জানাইলেন। বিশ্বানন্দের কথা শুনিয়া ভীষ্মদেব শোণতীরে বস্ত্রাবাসে মন্ত্রণাসভা আহ্বান করিলেন। বহু বাদানুবাদের পর স্থির হইল যে গুর্জ্জরযুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া গোবিন্দের নিকট দূত প্রেরণ করা হউক। বিশ্বানন্দ স্বয়ং গৌড়েশ্বরের দূতস্বরূপ রাষ্ট্রকূটরাজের নিকটে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ধর্ম্মপাল বিশ্বানন্দ ও উদ্ধবঘোষকে দূতস্বরূপ গোবিন্দের নিকটে প্রেরণ করিলেন।

বিশ্বানন্দের দক্ষিণাপথ যাত্রার এক পক্ষ পরে কৌশলময় নাগভটের চক্রান্তে গৌড়েশ্বর পরাজিত হইলেন। মগধের দক্ষিণে বনময় প্রদেশে তখনও বহু বর্ব্বরজাতি বাস করিত, বাহুকধবল তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া বহু অশ্বারোহী সেনা লইয়া মগধে প্রবেশ করিলেন। অসংখ্য, অগণিত গুর্জ্জর অশ্বারোহী মগধ ও অঙ্গদেশ আচ্ছন্ন করিল। উদ্দণ্ডপুরে ভীষ্মদেব, মুদ্গগিরিতে জয়বর্দ্ধন, গয়ায় বীরদেব ও মণ্ডলায় রণসিংহ সসৈন্যে আবদ্ধ হইলেন। ধর্ম্মপাল প্রমথসিংহ, কমলসিংহ ও বিমলনন্দীর সহিত রাঢ় রক্ষা করিতে লাগিলেন। গুর্জ্জর সেনা তীরভুক্তিতে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া বার বার পরাজিত হইল। জয়পাল মগধের অবস্থা দেখিয়া গৌড় রক্ষার জন্য চিন্তিত হইলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

অগ্রণী

ওরে তোদের ত্বর সহেনা আর?
এখনো শীত হয়নি অবসান।
পথের ধারে আভাস পেয়ে কার
সবাই মিলে গেয়ে উঠিস্ গান?
ওরে পাগল চাঁপা, ওরে উন্মত্ত বকুল,
কার তরে সব ছুটে এলি কৌতুকে আকুল?

মরণপথে তোরা প্রথম দল,
ভাব্‌লিনে ত সময় অসময়।
শাখায় শাখায় তোদের কোলাহল
গন্ধে রঙে ছড়ায় বনময়।
সবার আগে উচ্চে হেসে ঠেলাঠেলি ক'রে
উঠ্‌লি ফুটে রাশি রাশি পড়্‌লি ঝরে ঝরে।

বসন্ত সে আস্‌বে যে ফাল্গুনে
দখিন হাওয়ার জোয়ার জলে ভাসি'
তাহার লাগি রইলিনে দিন গুণে'
আগে ভাগেই বাজিয়ে দিলি বাঁশি!
রাত না হতে পথের শেষে পৌঁছবি কোন্ মতে?
যা ছিল তোর কেঁদে হেসে ছড়িয়ে দিলি পথে!

ওরে ক্ষ্যাপা, ওরে হিসাব-ভোলা,
দূর হতে তার পায়ের শব্দে মেতে
সেই অতিথির ঢাক্‌তে পথের ধূলা
তোরা আপন মরণ দিলি পেতে'।
না দেখে না শুনেই তোদের পড়্‌ল বাঁধন খসে,
চোখের দেখার অপেক্ষাতে রইলিনে আর বসে।

৮ই মাঘ, কলিকাতা, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বরলিপি

গা মা [[পা না না না । না না র্সা র্র্সা [র্না া া া ।]
ও গো দ ০ খি ন হা ও য়া ০ ০ ০ ০ ০

া া র্সা র্গা [র্রা া র্সা না । ধা না পা না [না া র্সা না
০ ০ ও ০ প ০ থি ক হা ও য়া ০ দো ০ দু ল

ধা না পা ধপা [মা ধা পা ধপা । মা পা গা মা [পা না না না ।
দো ০ লা য় দা ও ডু ০ লি ০ য়ে ০ দ ০ খি ন

না না র্সা া । গা মা মা পা । পা া পা পা [পা ধা
হা ও য়া ০ নূ ০ ত ন পা ০ তা র পু ০

না না । ধা নধা পা া । পা ধা না না । ধা মধা পা ধপ [
ল ক ছা ও য়া ০ প ০ র শ খা ০ নি ০

মা ধা পা ধপা । মা পমা গা মা [পা না না না । না না র্সা র্র্সা ।
দা ও বু ০ লি ০ য়ে ০ দ ০ খি ন হা ও য়া ০

র্নর্সা া া া । া া পা পা]]
০ ০ ০ ০ ০ আ মি

[[মা া পা পা । পা না না না । র্সা া র্সা র্গা । র্রা া র্সনঃ র্রঃর্সঃ ।
পা ০ থে র ধা ০ রে র ব্যা ০ কু ল বে ০ ণু ০

র্নর্সা । া া । া া া া । র্সা র্গা র্গা র্গা । র্রা া র্সা র্রা [না র্রা র্সা না ।
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ হ ০ ঠা ৎ তো ০ মা র সা ০ ড়া ০

পা না ধা র্সা [না া া া । না া ধঃনঃ র্সা [র্সা া া া ।
পে ০ য়ু ০ গো ০ ০ ০ আ ০ ০ ০ হা ০ ০ ০

া া া া [গা মা মা পা । পা া পা পা [পা ধা না র্না । ধা নধা
০ ০ ০ ০ এ ০ স ০ আ ০ মা র শা ০ খা য় শা ০

পা পা [পা ধা না র্না । ধা নধা পা ধপা [মা ধা পা ধপা । মা পা
খা য় প্রা ০ ণে র গা ০ নে র ঢে উ তু ০ লি ০

গা মা [পা না না না । না না র্সা র্র্সা । র্নর্সা া া া ।
য়ে ০ দ ০ খি ন হা ও য়া ০ ০ ০ ০ ০

। । গা গা ।I
• • ও গো

II গা মা মা পা। পা পা পা । I পা ধা না না। ধা না পা । I
দ • খি ন হা ও য়া • প • থি ক হা ও য়া •

। । । ধা। মা পা গা গা I গা মা মা পা। পা পা পা । I
• • • • • • ও গো দ • খি ন হা ও য়া •

পা ধা ধা ধা। ধা । ধা নধা I পা না না না। ধা না পা মা I
প • থে র ধা • রে • আ • মা র বা • সা •

গা মা মা পা। পা পা পা । I না । না র্সা। র্সা । র্সা র্রর্সা I
দ • খি ন হা ও য়া • জা • নি • তো • মা র

না । না র্রা। র্সা র্সা র্সা র্রর্সা I না । না র্রা। র্সা । র্সা র্রর্সা I
আ • সা • যা ও য়া • শু • নি • তো • মা র

না র্রা র্সা না। না ধা পা মা I গা মা মা পা। পা পা পা পা
পা • য়ে র ভা • ষা • দ • খি ন হা ওযা আ মায়

মা । পা পা। না । না র্সা I র্সা র্সা । র্সা। র্সা । র্সা । I
তো • মা র ছোঁ • য়া • লা গ্ • লে প • রে •

র্সা র্সা । র্গা। র্রা । র্সা র্রর্সা I না র্রা সা না। পা না ধা র্সা I
এ ক • টু কু • তে ই কাঁ • প ন ধ • রে •

না । না র্সা। ধা । র্সা । I গা মা মা পা। পা । পা । I
গো • আ • হা • • • কা • নে • কা • নে •

পা পা । না। ধা নধা পা পা I পা ধা না না। ধ নধা পা ধপা I
এ ক • টি ক • থা য় স • ক ল ক • থা •

মা ধা পা ধপা। মা পা গা মা I পা না না না। না না র্সা র্রর্সা I
দে য় ভু • লি • য়ে • দ • খি ন হা ও য়া •

নর্সা । । ।। । । । । II II
• • • • • • • •

(প্রবাসীর জন্য লিখিত) শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বরলিপির গান

ওগো দখিন হাওয়া, ও পথিক হাওয়া,
দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে !
নূতন পাতার পুলক-ছাওয়া
পরশখানি দাও বুলিয়ে !
আমি পথের ধারের ব্যাকুল বেণু
হঠাৎ তোমার সাড়া পেনু গো,
আহা এস আমার শাখায় শাখায়
প্রাণের গানের ঢেউ তুলিয়ে !
ওগো দখিন হাওয়া, ও পথিক হাওয়া,
পথের ধারে আমার বাসা।
জানি তোমার আসা যাওয়া
শুনি তোমার পায়ের ভাষা।
আমায় তোমার ছোঁওয়া লাগলে পরে
একটুকুতেই কাঁপন ধরে, গো
আহা, কানে কানে একটি কথায়
সকল কথা দেয় ভুলিয়ে !

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভারতীয় দর্শন

দর্শন শব্দের নিরুক্ত।

শ্রীমন্ মাধবাচার্য্য স্বকৃত 'সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে' চার্ব্বাক দর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর ১৫টি দর্শনের পরিচয় দিয়া গ্রন্থশেষে বলিয়াছেন :—

ইতঃ পরং সর্ব্বদর্শন-শিরোমণি-ভূতং শাঙ্করদর্শনমন্যত্র লিখিতম্ ইত্যত্র উপেক্ষিতমিতি।

'শাঙ্কর দর্শন' সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের শিরোমণি কি না, সে বিষয়ে নিশ্চয়ই মতভেদ হইবে। কিন্তু ঐ প্রসঙ্গ সম্প্রতি আমাদের আলোচ্য নহে। আমাদিগের জিজ্ঞাসার বিষয় এই যে, মাধবাচার্য্য যে এস্থলে পারিভাষিক অর্থে দর্শন শব্দের প্রয়োগ করিলেন, ইহার মূল কোথায় ?

আর্য্যজাতির আদিম গ্রন্থ বেদ। সংহিতাভাগের পদসূচীর সাহায্যে জানা যায় যে, কেবল একবার মাত্র ঋগ্‌বেদে 'দর্শন' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদে 'দর্শন' শব্দের আদৌ প্রয়োগ নাই।

পশুং ন নষ্টম্ ইব দর্শনায় বিষ্ণাপ্‌বং দদথু বিশ্বকায়ং।—ঋগ্‌বেদ, ১।১১৬।২৩।

এখানে "দর্শনায়" পদের অর্থ "দেখিবার নিমিত্ত"। বেদের সংহিতাভাগে "দর্শত" শব্দের বহু স্থলে প্রয়োগ আছে। তাহার অর্থ—"দর্শনীয়"।

স দর্শতশ্রীরতিথির্গৃহে গৃহে।—১০।৯১।২

ঋক্ সংহিতায় 'দর্শন' শব্দ যে অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাই ইহার মৌলিক অর্থ। এই অর্থে ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন :—

দর্শনায় চক্ষুঃ।—৮।১২

গর্ভ-উপনিষদ্ হইতে আমরা জানিয়াছি :—

দর্শনাগ্নী রূপাণাং করোতি। গর্ভ, ৫।

"দৃশ্যতে অনেন" এই ব্যুৎপত্তিতে যদ্দ্বারা দর্শন করা যায়, সেই চক্ষুকে 'দর্শন' বলা স্বাভাবিক। উপনিষদ্ বলেন :—

মনোঽস্য দৈবং চক্ষুঃ।—ছা, ৮।১২।৫

অর্থাৎ 'মন মানবের দৈব চক্ষু।' এই দৈব চক্ষুর দ্বারা যে দর্শন নিষ্পন্ন হয়, তাহাকেও 'দর্শন' বলা অসঙ্গত নহে। চর্ম্মচক্ষু নয়ন যেমন ভ্রমপ্রমা উভয়ই 'দর্শন' করে, দৈব চক্ষু মনও সেইরূপ মিথ্যা দৃষ্টি ও সম্যক্ দর্শন উভয়ই করিয়া থাকে। অতএব 'দর্শন' শব্দের এই অর্থসম্প্রসার অবৈধ নহে। পাতঞ্জল সূত্রের ব্যাসভাষ্যে এই ভাবে 'দর্শন' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

বস্তু সাম্যেঽপি অবিদ্যাপেক্ষং তত এব মূঢ় জ্ঞানং, সম্যগ্ দর্শনাপেক্ষং তত এব সাধ্যস্থ্য জ্ঞানম্।

পালী ত্রিপিটকেও ঐ ভাবে সম্যক্ দর্শনের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। শ্রীশঙ্করাচার্য্যও লিখিয়াছেন :—

যে তু নির্ব্বন্ধং কুর্ব্বন্তি তে বেদান্তার্থং বাধমানা শ্রেয়োদ্বারং সম্যগ্ দর্শনমেব বাধন্তে।—১।৪।২২ সূত্রের শঙ্করভাষ্য।

শঙ্করের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী পঞ্চশিখাচার্য্য সূত্র করিয়াছিলেন :—

একমেব দর্শনং খ্যাতিরেব দর্শনম্।

এখানে 'দর্শন' শব্দের কোন পারিভাষিক অর্থ নাই। দর্শনশাস্ত্র বলিলে যাহা বুঝায়, 'দার্শনিক' শব্দের সহিত যে

অর্থ জড়িত, 'দর্শন' শব্দের এই পারিভাষিক অর্থ কোথা হইতে আসিল ?

বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক বা উপনিষদে এরূপ পারিভাষিক অর্থে 'দর্শন' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। সূত্রাকারে যে ষড়্‌দর্শন আমাদের দেশে এখন প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার মধ্যেও পারিভাষিক অর্থে 'দর্শন' শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায় না। ব্রহ্মসূত্রে (যাহাকে 'বেদান্ত দর্শন' বলে) কয়েকবার 'দর্শন' শব্দের প্রয়োগ আছে বটে, কিন্তু তাহার অর্থ "Philosophy" নহে। তবে 'দর্শন' শব্দের এই পারিভাষিক অর্থ কোথা হইতে আসিল ?

মাধবাচার্য্য যখন "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ" রচনা করেন, তখন 'দর্শন' শব্দ নিষ্কপটে পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন :—

শ্রীমৎসায়ন দুগ্ধাব্ধি কৌস্তভেন মহৌজসা।
ক্রিয়তে মাধবাচার্য্যেণ সর্ব্বদর্শনসংগ্রহঃ॥

তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সর্ব্বসিদ্ধান্তসংগ্রহেও (যাহা শ্রীশঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচলিত) 'দর্শন' শব্দের philosophy অর্থ বিস্পষ্ট। ঐ গ্রন্থে গ্রন্থকার লোকায়তিক, আর্হত, বৌদ্ধ, বৈশেষিক, নৈয়ায়িক, প্রভাকর, ভট্ট, সাংখ্য, পতঞ্জলি, বেদব্যাস ও বেদান্ত—এই একাদশ পক্ষ বা দার্শনিক মতের পরিচয় দিয়াছেন। এই সংগ্রহ-গ্রন্থ ভাষ্যকার শ্রীশঙ্করাচার্য্যের বিরচিত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের সময়ে "দর্শন" শব্দ যে পারিভাষিক অর্থে প্রযুক্ত হইত, ইহা নিঃসংশয়। কারণ, আমরা দেখিতে পাই, শঙ্করাচার্য্য বেদান্তকে ঔপনিষদ দর্শন বলিয়াছেন :—

তস্মাৎ অনতিশঙ্কনীয়ম্ ইদং ঔপনিষদং দর্শনম্ ইতি।—২।১।৩৭ ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য।

তিনি অন্যত্র লিখিয়াছেন—

বেদান্তবাক্যানি ব্যাচক্ষাণৈঃ সম্যক্‌দর্শন প্রতিপক্ষভূতানি সাংখ্যাদি দর্শনানি নিরাকরণীয়ানি।

খৃষ্টের পূর্ব্ববর্ত্তী ভাস কবি প্রতিমা নাটকে রাবণের মুখে এই কথা বলিয়াছেন :—

ভোঃ কাশ্যপগোত্রোস্মি সাঙ্গোপাঙ্গং বেদমধীয়ে, মানবীয়ং ধর্ম্মশাস্ত্রং মাহেশ্বরং যোগশাস্ত্রং বার্হস্পত্যম্ অর্থশাস্ত্রং মেধাতিথেঃ ন্যায়শাস্ত্রং প্রাচেতসং শ্রাদ্ধকল্পং চ।

এখানে আমরা মাহেশ্বর যোগশাস্ত্র ও মেধাতিথির ন্যায়শাস্ত্রের উল্লেখ পাইলাম—কিন্তু দর্শন 'শব্দের প্রয়োগ পাইলাম না। কৌটিল্য সম্ভবতঃ ভাসের কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী। তিনি প্রায় ২৩০০ বৎসরের লোক। কৌটিল্য চতুর্ব্বিধ বিদ্যার উল্লেখ করিয়া

আন্বীক্ষকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিশ্চেতি বিদ্যাঃ * * চতস্র এব বিদ্যা ইতি কৌটিল্যঃ।

সাংখ্যং যোগং লোকায়তঞ্চ ইত্যান্বীক্ষকী—আন্বীক্ষিকী ত্রিবিধ, সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত—এই ত্রিবিধ দর্শনের উল্লেখ করিয়াছেন। এখানেও দর্শন শব্দের প্রয়োগ পাওয়া গেল না। তথাপি আন্বীক্ষিকীর এই বিভাগ দেখিয়া, বেদান্ত মীমাংসা ন্যায় ও বৈশেষিক সে সময়ে প্রচলিত ছিল না—এরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন হইবে না। কারণ, বেদান্ত ও মীমাংসা ত্রয়ীর অন্তর্গত এবং ন্যায় বৈশেষিক হয়ত কৌটিল্যের দৃষ্টিতে লোকায়তের অন্তর্ভুক্ত।

রামায়ণ বিদ্যাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন :—

অষ্টবর্গং ত্রিবর্গঞ্চ বিদ্যাস্তিস্রশ্চ রাঘব।—২।১০০।৬৮

এই তিন বিদ্যা—ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি। কারণ, আন্বীক্ষকী রামায়ণের মতে বিদ্যার উচ্চ নামের অধিকারী নহে :—

বুদ্ধিমান্বীক্ষিকীং প্রাপ্য নিরর্থং প্রবদন্তি তে।—২।১০০।৩৯

রামায়ণে দেখিতে পাই, রাম ভরতকে সতর্ক করিতেছেন :—

কচ্চিন্ন লোকায়তিকান্ ব্রাহ্মণান্ তাত সেবতে।

অতএব লোকায়ত আলোচনার যোগ্য নহে। কিন্তু বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি ?

বার্ত্তায়াং সাম্প্রতং তাত! লোকোঽয়ং সুখমেধতে।—অযোধ্যা।১০০।৪৭
যাত্রা দণ্ডবিধানঞ্চ দ্বিযোণী সন্ধিবিগ্রহৌ।
কচ্চিদ্ এতান্ মহাপ্রাজ্ঞ! যথাবদ্ অনুমন্যসে॥—অযোধ্যা,, ১০০।৭০

ভাস কবি মহাভারতের আখ্যানবস্তু অবলম্বন করিয়া কয়েকখানি নাটক রচনা করিয়াছেন। কৌটিল্যও মহাভারতের সহিত পরিচিত ছিলেন।

এই মহাভারতে সাংখ্য, যোগ, বেদ, পাশুপত ও পঞ্চরাত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয় :—

সাংখ্যং যোগঃ পাঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা।
জ্ঞানান্যেতানি রাজর্ষে বিদ্ধি নানামতানি বৈ॥
সাংখ্যস্য বক্তা কপিলঃ পরমর্ষিঃ স উচ্যতে।
হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বেত্তা নান্যঃ পুরাতনঃ॥

অপান্তরতমাশ্চৈব বেদাচার্য্যঃ স উচ্যতে।
প্রাচীনগর্ভং তমৃষিং প্রবদন্তীহ কেচন।
উমাপতিভূ তপতিঃ শ্রীকণ্ঠো ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
উক্তবানিদমব্যগ্রো জ্ঞানং পাশুপতং শিবঃ॥
পাঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বেত্তা তু ভগবান্ স্বয়ম্।
—শান্তিপর্ব্ব—৩৪৯।৬৪—৬৮

অধিকন্তু দেখা যায় যে, মহাভারতকার 'দর্শন' শব্দ পারিভাষিক অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন :—

এতদ্ আহুঃ মহাপ্রাজ্ঞাঃ সাংখ্যং বৈ মোক্ষদর্শনং।—শান্তিপর্ব্ব—৩০০।৫
যোগদর্শনমেতাবৎ উক্তং তে তত্ত্বতো ময়া
সাংখ্যজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি পরিসংখ্যান দর্শনম্।—ঐ ৩০৬।২৬
সাংখ্য দর্শনমেতাবদ্ উক্তং তে নৃপসত্তম।—ঐ ৩০৭।১

এই কয়েকটি শ্লোক শান্তিপর্ব্বের অন্তর্গত। মহাভারতের এই অংশের বয়ঃক্রম নির্দ্ধারণ করা দুরূহ; সেইজন্য 'দর্শন' শব্দের এই প্রয়োগ দেখিয়া কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। সুতরাং আমরা 'দর্শন' শব্দের নিরুক্ত নির্দ্ধারণ করিতে অক্ষম।

প্রাচীন ভারতবর্ষে উপসন্ন শিষ্যকে নির্জ্জনে গুরু যে রহস্য উপদেশ দিতেন, তাহাকে প্রাচীনেরা উপনিষদ্ বলিতেন। ঐসকল রহস্য উপদেশ (গুহ্যা আদেশাঃ) সংক্ষিপ্ত সূত্রের আকারে রক্ষিত হইত। ইহাদিগের সাধারণ নাম ছিল উপনিষদ্। 'তদ্বন' 'তজ্জলান্' প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। পরবর্ত্তী-কালে ঐসমস্ত রহস্য উপদেশ যে-পুস্তকে গ্রথিত হইল, তাহার নাম হইল উপনিষদ্। "উপনিষদ্" শব্দের এই নিরুক্তে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। কিন্তু 'দর্শন' শব্দের নিরুক্ত তমসাচ্ছন্ন। এই অন্ধকারে পথনির্ণয়ের জন্য কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ অসঙ্গত নহে।

দর্শন সর্ব্বতোমুখ সত্যের এক মুখ দর্শন।

প্রাচীনেরা সত্যের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করিতেন। তাঁহারা জানিতেন, সত্য সর্ব্বতোমুখ। সত্যের সার্ব্বভৌম ভাবের যে ভাবাংশ যে ঋষি অনুভূতি করিয়াছেন, সত্যের সর্ব্বতোমুখ স্বরূপের যে মুখ যাঁহার মানসদৃষ্টির গোচর হইয়াছে, তাহাই তাঁহার 'দর্শন'। সত্য সূর্য্যের শুভ্র জ্যোতিঃ, তাহা সর্ব্ববর্ণের সমন্বয়ে গঠিত। যে বর্ণ যাঁহার চক্ষুতে যে পরিমাণে প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহাই তাঁহার 'দর্শন'।

সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম।

সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে বিদ্যার যে বিপুল ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, কোন এক খাতে তাহার সংকুলান হইতে পারে না। হিমালয়ের জলধারার ন্যায় তাহা নানা নদনদীর মধ্যে দিয়া সাগরের অভিমুখে প্রবাহিত হয়। ইহারই জন্য প্রস্থান ভেদ; ইহারই জন্য দার্শনিক মতান্তর। শঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচলিত সর্ব্বসিদ্ধান্তসংগ্রহের নমস্কার শ্লোকে যেন এই তত্ত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায় :—

বাদিভির্দর্শনৈঃ সর্ব্বৈর্দৃশ্যতে যত্ত্বনেকধা।
বেদান্তবেদ্যং ব্রহ্মেদমেকরূপমুপাস্মহে॥

অর্থাৎ, "বেদান্ত-বেদ্য একরূপ যে ব্রহ্মকে বিবাদকারী দর্শনসমূহ অনেকরূপ দেখে, তাঁহাকে উপাসনা করি।"

সত্যও একরূপ। জ্ঞানবিজ্ঞানের উপরিতন যে প্রজ্ঞান, সত্য সেই প্রজ্ঞানলব্ধ। বাদী বিবাদী দর্শনসমূহ সেই সত্যকে অনেক রূপে দর্শন করে। কিন্তু দর্শন অনেক হইলেও যাহা দৃশ্য, যাহা সত্য, তাহা একই।

ভিন্ন ভিন্ন দর্শনশাস্ত্র যে সত্যের ঐকদেশিক সাক্ষাৎকার, দার্শনিকপ্রবর বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্য-প্রবচন-ভাষ্যের উপোদ্ঘাতে এ কথার ইঙ্গিত করিয়াছেন :—

তত্র * * শ্রুত্যবিরোধিনীরুপপত্তীঃ ষড়াধ্যায়ীরূপেণ বিবেকশাস্ত্রেণ কপিলমূর্ত্তির্ভগবান্ উপদিদেশ। ননু ন্যায়বৈশেষিকাভ্যাম্ অপি এতেষ্বর্থেষু ন্যায়ঃ প্রদর্শিত ইতি তাভ্যামস্য গতার্থত্বং সগুণনির্গুণত্বাদি-বিরুদ্ধরূপৈরাত্মসাধকতয়া তদ্যুক্তিভিরত্রত্যযুক্তীনাং বিরোধে নোভয়োরপি দুর্ঘটং চ প্রামাণ্যমিতি। মৈবম্ ব্যাবহারিকপারমার্থিকরূপবিষয়ভেদেন গতার্থত্ববিরোধয়োরভাবাৎ। ন্যায়বৈশেষিকাভ্যাং হি সুখিদুঃখ্যাদ্যনুবাদতো দেহাদিমাত্র বিবেকেনাত্মা প্রথম ভূমিকায়ামনুমাপিতঃ। একদা পরমসূক্ষ্মে প্রবেশাসম্ভবাৎ। তদীয়ং চ জ্ঞানং দেহাদ্যাত্মতানিরসনেন ব্যাবহারিকং তত্ত্বজ্ঞানং ভবত্যেব। * * তথা তদীয়মপি জ্ঞান মপরবৈরাগ্যদ্বারা পরম্পরয়া মোক্ষসাধনং ভবত্যেবেতি। তৎজ্ঞানাপেক্ষয়াপি চ সাংখ্য জ্ঞানমেব পারমার্থিকং পরবৈরাগ দ্বারা সাক্ষান্মোক্ষসাধনং চ ভবতি। * * ন্যায়বৈশেষিকোক্ত জ্ঞানস্য পরমার্থভূমৌ বাধিতত্বাচ্চ। * * স্যাদেতৎ। ন্যায়বৈশেষিকাভ্যামত্রাবিরোধো ভবতু। ব্রহ্মমীমাংসাযোগাভ্যাং তু বিরোধোঽস্ত্যেব। তাভ্যাং নিত্যেশ্বরসাধনাৎ। অত্র চেশ্বরস্য প্রতিষিধ্যমানত্বাৎ। * * অস্মিন্নেব শাস্ত্রে ব্যাবহারিকস্যৈবেশ্বরপ্রতিষেধস্যৈশ্বর্য্য বৈরাগ্যাদ্যর্থমনুবাদত্বৌচিত্যাৎ। যদি হি লোকায়তিক মতানুসারেণ নিত্যৈশ্বর্য্যং ন প্রতিষিধ্যেত তদা পরিপূর্ণনিত্যানির্দ্দোষৈশ্বর্য্য-দর্শনেন তত্র চিত্তাবেশতো বিবেকাভ্যাসপ্রতিবন্ধঃ স্যাদিতি সাংখ্যাচার্য্যাণামাশয়ঃ। * * তদ্বিবেকাংশ এব সাংখ্যজ্ঞানস্য দর্শনান্তরেভ্য উৎকর্ষং প্রতিপাদয়তি।ন ত্বীশ্বরপ্রতিষেধাংশেঽপি। * * কিঞ্চ ব্রহ্মমীমাংসায়া ঈশ্বর এব মুখ্যো বিষয় উপক্রমাদিভিরবধৃতঃ। তত্রাংশে তস্য বাধে শাস্ত্রস্যৈবাপ্রামাণ্যং। * * সাংখ্যশাস্ত্রস্য তু পুরুষার্থতৎসাধনপ্রকৃতি-পুরুষ বিবেকাবেব মুখ্যো বিষয় ইতীশ্বরপ্রতিষেধাংশ বাধেঽপি নাপ্রামাণ্যং। * * তস্মাদভ্যুপগমবাদপ্রৌঢ়িবাদাদিনৈব সাংখ্যস্য ব্যাবহারিকেশ্বর-প্রতিষেধপরতয়া ব্রহ্মমীমাংসা যোগাভ্যাং সহান বিরোধঃ।

অর্থাৎ “এই সাংখ্যদর্শনে কপিলমূর্ত্তিধারী ভগবান্ বিবেক জ্ঞানের নিমিত্ত শ্রুতির অবিরোধী বিবিধ যুক্তির উপদেশ করিয়াছেন। আপত্তি হইতে পারে যে, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনেও যখন ঐসকল যুক্তি সবিশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে, তখন তাহাদিগের পুনর্বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। বিশেষতঃ যখন তাহাদিগের সহিত কপিল-প্রযুক্ত যুক্তির বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে। কারণ, ন্যায় বৈশেষিকের যুক্তি সগুণ-প্রতিবাদক, কপিলের যুক্তি নির্গুণপর। অতএব উভয় মত কখনই প্রামাণিক হইতে পারে না। এ আপত্তির উত্তর এই যে, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক বিষয়ভেদ লক্ষ্য করিলে কপিলসূত্রের পুনরুক্তি ও বিরোধ কিছুই থাকে না। প্রথমেই পরম সূক্ষ্মে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। এইহেতু ন্যায় বৈশেষিক সগুণ ব্যবহারিক আত্মার প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং সেই আত্মাকে দেহাদি হইতে ভিন্ন ও সুখদুঃখের আশ্রয়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এতএব ন্যায় বৈশেষিকের জ্ঞান পারমার্থিক না হইলেও ব্যবহারিক তত্ত্বজ্ঞানরূপে সত্য। এবং তদ্দ্বারা অপর বৈরাগ্য সিদ্ধ হয় বলিয়া, তাহা পরম্পরায় মোক্ষ-সাধন। তাহার তুলনায় সাংখ্যজ্ঞান পারমার্থিক জ্ঞান এবং পরবৈরাগ্য দ্বারা সাক্ষাৎ ভাবে মোক্ষসাধন। * * * আপত্তিকারী হয়ত বলিবেন, আচ্ছা, ন্যায় ও বৈশেষিকের সহিত না হয় সাংখ্য মতের অবিরোধ স্বীকার করিলাম কিন্তু বেদান্ত ও যোগের সহিত ইহার বিরোধ ত অপরিহার্য্য। কারণ, সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বরবাদী কিন্তু বেদান্ত ও যোগদর্শন নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করেন। এ আপত্তির উত্তর এই যে, সাংখ্যদর্শনে ঐশ্বর্য্যে বৈরাগ্য-সিদ্ধির নিমিত্ত ঈশ্বরবাদের প্রতিষেধ ব্যবহৃত হইয়াছে মাত্র। যদি সাংখ্যদর্শন লোকায়তিদিগের অনুকরণে নিত্য ঐশ্বর্য্যের প্রতিষেধ না করিতেন তাহা হইলে পরিপূর্ণ নিত্য নির্দ্দোষ ঐশ্বর্য্য দর্শনে তাহাতে চিত্তের অভিনিবেশ হইয়া বিবেকাভ্যাসের প্রতিবন্ধক হইতে পারিত। ইহাই ঈশ্বরপ্রতিষেধে সাংখ্যাচার্য্যদিগের অভিপ্রায়। * * * বিশেষতঃ বেদান্ত দর্শনে ঈশ্বরই আদ্যোপান্ত মুখ্য বিষয়। সেই অংশের বাধ হইলে শাস্ত্রই ত' অপ্রামাণিক হইয়া পড়ে। সাংখ্যশাস্ত্রে কেবল পুরুষার্থ-সাধন প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞানই মুখ্য প্রতিপাদ্য। অতএব সাংখ্য দর্শনে ঈশ্বর-প্রতিষেধাংশের বাধ হইলেও সাংখ্যমতের অপ্রামাণ্য হয় না। * * অতএব অভ্যুপগমবাদ ও প্রৌঢ়িবাদ অঙ্গীকার করিয়া সাংখ্যদর্শন যে ঈশ্বরের ব্যবহারিক প্রতিষেধ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা বেদান্ত ও যোগদর্শনের সহিত ইহার বস্তুতঃ বিরোধ হয় নাই। কারণ বেদান্ত ও যোগ দর্শনে সেশ্বরবাদ পারমার্থিক, কিন্তু সাংখ্যের নিরীশ্বরবাদ ব্যবহারিক মাত্র।”

তাহাই যদি হয়, তবে দার্শনিকেরা বাদী বিবাদীর আসন পরিত্যাগ করিয়া সত্যের মিলন-মন্দিরে সমবেত হইবেন না কেন? বস্তুতঃই সত্য সর্ব্বতোমুখ, সত্যকে ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে দেখা যায়। সকল বাদীরই একথা স্মরণ রাখা উচিত। এক্ষেত্রে যিনি স্বমতকে প্রবদন করেন, যিনি নান্যদস্তি-বাদী—তিনি নিশ্চয়ই অবিপশ্চিৎ।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্য বিপশ্চিতঃ।

প্রাচীন যুগে সমন্বয়ের চেষ্টা।

ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, যেসকল প্রাচীন দর্শনসূত্রের উপর ভিত্তি করিয়া আমরা বাদ-বিবাদের পরিখা রচনা করিয়াছি, সেইসকল সূত্রগ্রন্থের মধ্যেও বহুস্থানে এই সমন্বয়ের ভাব বিস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এইসকল সূত্র-গ্রন্থ বর্ত্তমান আকারে নিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে এ দেশের দার্শনিক-সমাজে দর্শনের মুখ্য প্রতিপাদ্যসকল লইয়া যথেষ্ট মতভেদ ছিল। বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র (যাহার সহিত অন্যান্য দর্শন অপেক্ষা আমার কথঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে) তাহার আলোচনায় দেখিয়াছি যে, ব্রহ্মসূত্রকার বাদরায়ণ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমীপবর্ত্তী দার্শনিকদিগের শুধু মতবাদের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা নহে, স্থানে স্থানে তাহাদিগের সমন্বয়ও করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রে যেসকল বেদান্তাচার্য্যের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা আশ্মরথ্য, ঔড়ুলোমি, কার্ষ্ণাজিনি, কাশকৃৎস্ন, জৈমিনি, বাদরি,—বাদরায়ণ সম্ভ্রমের সহিত তাঁহাদিগের মতের উপন্যাস করিয়াছেন এবং কয়েক স্থলে তাঁহাদিগের বিরোধী মতের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। দৃষ্টান্তের দ্বারা এই কথা প্রতিপন্ন করিতেছি। ব্রহ্মসূত্রের পাঠক

অবগত আছেন যে, চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে বাদরায়ণ মুক্ত জীবের স্বরূপ ও ঐশ্বর্য্যের বিচার করিয়াছেন। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে উপদিষ্ট আছে :—

এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে।

"সেই জীব এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পর-জ্যোতিকে প্রাপ্ত হইয়া স্ব-স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন।"

বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন যে, ঐ শ্রুতিতে মুক্তের অবস্থা লক্ষিত হইয়াছে :—

সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ।
মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ—ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।১-২

"(মুক্ত) জীব আত্মার সহিত মিলিত হইয়া স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন ;—তাঁহার যে স্বরূপ, তখন তাহারই আবির্ভাব হয়।"

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ।—ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।৪

"সে অবস্থায় জীবের আত্মার সহিত অবিভাগ (অভেদ) হয়। অর্থাৎ জীবে ও আত্মাতে তখন কোন ভেদ থাকে না।"

'জীব স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন।' এই স্বরূপ কি প্রকার বাদরায়ণ অতঃপর তাহারই বিচার করিয়াছেন। তিনি বলেন, জৈমিনির মতে ইহা ব্রাহ্মরূপ এবং ঔড়ুলোমির মতে ইহা চিন্মাত্র।

ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ।
চিতিতন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদ্ ইতি ঔড়ুলোমিঃ।—ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।৫-৬

স্বম্ অস্য রূপং ব্রাহ্মম্ অপহতপাপ্মত্বাদিসত্যসংকল্পত্বাবসানং তথা সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বেশ্বরত্বঞ্চ তেন স্বরূপেণাভিনিষ্পদ্যতে ইতি জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে * * চৈতন্যমেবতু তস্যাত্মনঃ স্বরূপমিতি তন্মাত্রেণ স্বরূপেণাভিনিষ্পত্তির্যুক্তা * * তস্মাৎ নিরস্তাশেষপ্রপঞ্চেন প্রসন্নেনাব্যপদেশ্যেন বোধাত্মনাভিনিষ্পদ্যত ইতি ঔড়ুলোমিরাচার্য্যো মন্যতে।—শঙ্কর-ভাষ্য।

অর্থাৎ, 'আচার্য্য জৈমিনি বলেন যে, মুক্ত ব্রহ্ম-স্বরূপ হন। ব্রহ্ম নিষ্পাপ, সত্য-সংকল্প, সত্যকাম, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ। মুক্তও সেইরূপ হন। ঔড়ুলোমি আচার্য্য বলেন যে, চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ। অতএব মুক্তের স্বরূপ চিন্মাত্র হওয়া উচিত। * * অতএব মোক্ষে সমস্ত প্রপঞ্চ তিরোহিত হইয়া জীব একান্ত প্রসন্ন ও অচিন্ত্য চৈতন্যরূপে অবস্থিত হন।'

বাদরায়ণ এই উভয় মতের সামঞ্জস্য করিয়া বলিতেছেন,—

এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্ব-ভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৭

'আত্মা চিন্মাত্র হইলেও তাঁহার ব্রহ্মরূপ হওয়াতে কোন বিরোধ নাই, কারণ—মুক্তের ব্রাহ্ম ঐশ্বর্য্য শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে।'

যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন যে, মুক্তের সমস্ত ঐশ্বর্য্যের প্রাপ্তি হয় ; তিনি কামচার হন, তিনি স্বরাট হন।

আপ্নোতি স্বারাজ্যম্ * * তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। * * সংকল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি। * * সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাহরন্তি।

'তিনি স্বরাট্ হন। তাঁহার সমস্ত লোকে ইচ্ছাগতি হয়। তাঁহার সংকল্পমাত্রে পিতৃগণ উপস্থিত হন। সমস্ত দেবতারা তাঁহার জন্য বলি আহরণ করেন।'

বাদরায়ণ ইহার সমর্থন করিয়া বলিতেছেন যে, মুক্তের যে ঐশ্বর্য্য তাহা সংকল্পমাত্রে উপনীত হয়।

সংকল্পাদেব তৎশ্রুতেঃ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৮

অতএব তিনি অনন্যাধিপতি (স্বরাট্) হন।

অতএব চ অনন্যাধিপতিঃ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৯

এ অবস্থায় তাঁহার শরীর থাকে কি না? বাদরি বলেন, থাকে না ; জৈমিনি বলেন, থাকে। বাদরায়ণ উভয়মতের সামঞ্জস্য করিয়া বলিতেছেন যে, শরীরের থাকা না-থাকা, মুক্তের ইচ্ছাধীন। যদি শরীর থাকে, তবে জাগ্রতবৎ ভোগ হয় ; যদি না থাকে, তবে স্বপ্নবৎ ভোগ হয়।

অভাবং বাদরিরাহহ্যেবম্। ভাবং জৈমিনির্বিকল্পামননাৎ। দ্বাদশাহবৎ উভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ। তন্বভাবে সন্ধ্যবদুপপত্তেঃ। ভাবে জাগ্রদ্বৎ।—ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।১০-১৪।

মুক্ত ইচ্ছাবশে কায়ব্যূহ রচনা করিতে পারেন এবং সেইসমস্ত দেহে অনুপ্রবেশ করিতে পারেন।

প্রদীপবদ্ আবেশ স্তথা হি দর্শয়তি।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৫

সেইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন :—

স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা।

'তিনি এক হন, তিন হন, পাঁচ হন, সাত হন!'

ইহা দিগদর্শন মাত্র। জীবের উৎক্রান্তি এবং ব্রহ্মলোকে উন্নীতি এবং জীব-ব্রহ্মের ভেদাভেদ সম্বন্ধেও ব্রহ্মসূত্রে বিরোধী মতের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা লক্ষিত হয়।

কিন্তু বিরোধী মতবাদের সমন্বয়সাধনের অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ ভগবদ্গীতা। এ সম্বন্ধে আমি অন্যত্র এইরূপ লিখিয়াছি,—

"গীতার আলোচনা করিলে বোধ হয় যে, গীতা প্রচারের সময় ভারতবর্ষে মোক্ষলাভের জন্য চারিটি বিভিন্ন মার্গ প্রচারিত ছিল। সেই মার্গচতুষ্টয়ের নাম যথাক্রমে—কর্ম্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ, ধ্যানমার্গ ও ভক্তিমার্গ। যিনি যে পথে চলিতেন, তিনি ভাবিতেন যে, সাধনমার্গের সেই একমাত্র পথ, দ্বিতীয় পথ নাই। ভগবান্ গীতা প্রচার করিয়া ঐসকল বিভিন্ন সাধনমার্গের অপূর্ব্ব সমন্বয় বিধান করিয়াছেন। তাহার ফলে দেখা যায় যে, প্রয়াগে যেমন গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী পুণ্য সঙ্গমে মিলিত হইয়া পতিতপাবনী ধারায় দেশ প্লাবিত করিয়া সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছেন, সেইরূপ গীতাতে, কর্ম্ম, জ্ঞান, ধ্যান ও ভক্তিরূপ মার্গচতুষ্টয় অপূর্ব্ব সমন্বয়ে সমন্বিত হইয়া জগৎকে পবিত্র করিয়া ভগবানের অভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। এই সমন্বয়বাদ গীতার নিজস্ব—শাস্ত্রের আর কোথাও এমন উজ্জ্বল ভাবে উপদেশ দেখা যায় না। * * অতএব, কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও ধ্যানের সমন্বয় উপদেশ দিয়া গীতা দেখাইয়াছেন যে, জীবের সম্পূর্ণ-বিকাশের জন্য কেবল কর্ম্ম, কেবল জ্ঞান, কেবল ভক্তি, কেবল ধ্যান যথেষ্ট নহে; জীবকে ব্রহ্মে বিকশিত করিতে হইলে, এ মার্গচতুষ্টয়কেই সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে হইবে। নতুবা আত্মার আংশিক ঐকদেশিক বিকাশমাত্র হইবে। সেইজন্য গীতা কর্ম্মবাদ, জ্ঞানবাদ, ভক্তিবাদ ও ধ্যান-বাদের সামঞ্জস্য করিয়া এই অপূর্ব্ব সমন্বয়বাদের উপদেশ দিয়াছেন।"

কেবল সাধনাসম্বন্ধে নহে, দার্শনিক বাদবিবাদ সম্বন্ধেও গীতাতে এই সমন্বয়ের ভাব অত্যুজ্জ্বল। তাহার ফলে সাংখ্য ও বেদান্ত, দ্বৈত ও অদ্বৈত, বিবর্ত্ত ও পরিণাম—সত্য-দৃষ্টির মিলনভূমিতে সমন্বিত হইয়া গীতারূপ কল্পবৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। আমরা যদি এই সমন্বয়ের ভাবে ভাবিত হইয়া সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে অনায়াসে জল্প বিতণ্ডার কণ্টকিত ক্ষেত্র পরিহার করিয়া সামঞ্জস্যের ঊর্দ্ধ চূড়ায় আরূঢ় হইতে পারিব।

বুদ্ধি ও বোধি।

আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তত্ত্বদর্শনের করণ বুদ্ধি নহে—বোধি। মার্জ্জিত-বুদ্ধি দ্বারা তর্কবিচার নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু বোধি ভিন্ন তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয় না। এসম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁ কয়েকটি উপাদেয় কথা বলিয়াছেন—তাহা আমাদের প্রণিধানযোগ্য :—

"Intuition and intellect represent two opposite directions of the work of consciousness. Intuition goes in the very direction of life: intellect in the opposite direction. * * Intellect is characterised by a natural inability to know life. Instinct is sympathy and turned towards life."

এই কথার সম্প্রসারণ করিয়া তাঁহার শিষ্য Wildon Carr বলিতেছেন :—

"What then is the intellect? It is to the mind what the eye or the ear is to the body. Just as in the course of evolution the body has become endowed with certain special sense-organs which enable it to receive the revelation of the reality without, and at the same time limit the extent and the form of that revelation, so the intellect is a special adaptation of the mind, which enables the being endowed with it to view the reality outside it, but which at the same time limits both the extent and character of the view the mind takes."

তবেই বুঝা গেল—বুদ্ধি তত্ত্ব-সাক্ষাতের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। সেইজন্য পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন :—

"Cease to identify your intellect and your Self. Become at least aware of the larger truer Self, that free creative self which constitutes your life as distinguished from the scrap of consciousness which is its servant * * * Smothered in daily life by the fretful activities of our surface-mind, reality emerges in our great moments, and seeing ourselves in its radiance, we know, for good or evil, what we are. We are not pure intellects. * * Around our conceptional and logical thought, there remains a vague, nebulous somewhat, the substance at whose expense the luminous nucleus we call the intellect is formed."
—Underhill's Mysticism pp. 38-9.

অর্থাৎ বুদ্ধি সম্বিতের সর্ব্বস্ব নহে—একটি ভগ্নাংশ মাত্র। বোধি তাহার উপরে। এই বোধিকে লক্ষ্য করিয়া জার্ম্মান দার্শনিক অয়কেন (Eucken) বলিয়াছেন :—

"There is a definite transcendental principle in man."

(ইহাই বোধি)। তিনি ইহার নামকরণ করিয়াছেন—Gemuth.

"It is the core of personality. There God and man initially meet."

উপনিষদ্ যাহাকে 'গুহা,' 'হৃদয়', 'দহর' আখ্যা দিয়াছেন—Gemuth কি তাহারই ছায়া?

এই বুদ্ধির কোলাহল নিবৃত্ত না হইলে বোধির বাণী শ্রুতিগোচর হয় না। সেইজন্য উপনিষদ্ বলিয়াছিলেন :—

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানম্ ঐক্ষৎ আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥

এই মর্ম্মে Jacob Boehme বলিয়াছেন :—

"When both the intellect and will are quiet and passive * * then the eternal hearing seeing and speaking will be revealed in thee."

সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, জাতির জীবনে দুইটি যুগ পর্য্যায়ক্রমে ক্রীড়া করে; এক বোধির যুগ, অপর বুদ্ধির যুগ। বোধির যুগে তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয়, সত্যের প্রত্যক্ষ দর্শন হয় এবং বুদ্ধির যুগে তত্ত্বের বিচার হয়, সত্যের বিতণ্ডা হয়। বোধির যুগ ঋষির

যুগ, বুদ্ধির যুগ ভাষ্যকারের যুগ। এ সম্বন্ধে একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত কয়েকটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন :—

"Civilisation, like everything else in the world, is subject to unceasing alternation, and two phases stand out clearly all through its history, ever replacing and succeeding each other. In the one, the positive phase, civilisation creates; in the other, the negative phase, it reproduces and copies. In the first phase it is in touch with realities which furnish the ever-flowing source of new invention and inspiration; in the second it has lost touch with the realities themselves and bases itself on *descriptions* of realities —on tradition, books, ancient authorities; it copies explains, comments and follows."—M. Van Menon, in the Commonweal.

ভারতবর্ষে বোধির যুগ ঋষিদিগের সহিত অন্তর্হিত হইলে তর্কযুগের আরম্ভ হইয়াছিল; সে যুগের এখনও অবসান হয় নাই। ভাষ্য, বার্ত্তিক, টীকা, নিবন্ধ, অনুবন্ধ ইত্যাদি এই যুগের কীর্ত্তি। বুদ্ধির দ্বারা তত্ত্বের যতদূর নিরাকরণ হইতে পারে, তৎপক্ষে ইঁহারা কিছুমাত্র ত্রুটী করেন নাই। কাউএল সাহেব বলিতেন যে, এইসকল গ্রন্থের মধ্যে প্রবেশের চেষ্টায় পাশ্চাত্য মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হয়—makes the European head dizzy। পাশ্চাত্য কেন, এরূপ প্রাচ্যও বিরল যিনি অবাধে এইসকল নিশিত বুদ্ধিভেদ্য তর্কারণ্যে প্রবেশ করিয়া অক্ষত মস্তিষ্কে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন।

প্রাচীন দর্শনেও যে পরবাদ আছে, এ কথা অস্বীকার করি না। ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় ইহারই যথেষ্ট উদাহরণ। পঞ্চশিখাচার্য্যের ষষ্ঠিতন্ত্র (ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্য-কারিকা যাহার আর্য্যাশ্লোক-নিবদ্ধ সংগ্রহগ্রন্থ) সেই ষষ্ঠিতন্ত্রও পরবাদ-বিবর্জ্জিত ছিল না। ইহাও স্বীকার করি যে,

> কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
> যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

কিন্তু তথাপি মনে হয়—বাদ ও বিতণ্ডা এক বস্তু নহে। আর মনে পড়ে :—

> নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া।

এবং মনে পড়ে বাদরায়ণের সূত্র

> তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদ্।—ব্রহ্মসূত্র ২।১।১১

ইহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন :—

'লোকে বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া যে তর্কের উত্থাপন করে সে তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। কারণ এক বুদ্ধিমানের অনুমোদিত তর্ক অপর বুদ্ধিমান নিরাস করেন। পক্ষান্তরে, তাঁহার তর্কও তৃতীয় বুদ্ধিমান কর্ত্তৃক খণ্ডিত হয়। অতএব তর্কের শেষ কোথায়?'

শঙ্করাচার্য্য তৃতীয় বুদ্ধিমানেই বিশ্রান্ত হইয়াছেন। কিন্তু যদি তৃতীয়ের পর চতুর্থ থাকে, চতুর্থের পর পঞ্চম, তাহার পর ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ইত্যাদি, বীজগণিতের "n" পর্য্যন্ত, তাহা হইলে তর্ক কোথায় গিয়া পর্য্যবসিত হয়? আমাদের দেশে তর্কযুগে ইহাই ঘটিয়াছিল।

কেহ দ্বিতীয় ধাতার ন্যায় "বেদান্ত—মার্ত্তণ্ড" রচনা করিয়া—'রবির পরিধি যেন ধাঁধিল নয়ন।' অমনি প্রতিপক্ষ সেই সূর্য্যের উপর প্রকাণ্ড এক মেঘ নিক্ষেপ করিলেন, অর্থাৎ 'হেন কালে কাল মেঘ উদিল আকাশে'; অমনি বিপক্ষ পক্ষ প্রচণ্ড তর্ক-'প্রভঞ্জনের' অবতারণা করিলেন। মেঘে ও পবনে তুমুল যুদ্ধ বাধিল; বিমানচারী দেবগণ বিস্মিত নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

কোথাও বা আমাদের মানস-রসনার পরিতৃপ্তির জন্য প্রচুর 'খণ্ডন-খাদ্য' বিরচিত হইল, কিন্তু মণ্ডনের অভাবে তাহার শর্করা কর্করায় পরিণত হইল। কেহ আমাদের নাসারন্ধ্র পুলকিত করিবার আশয়ে 'বেদান্ত—পারিজাত' বিকশিত করিলেন; কিন্তু তাহা—

> "অকাল কুসুমানীব ভয়ং সঞ্জনয়ন্তি নঃ।"

কেহ 'শতদূষণী' রচনা করিয়া মায়াবাদ খণ্ড খণ্ড করিবার উপক্রম করিলেন। প্রতিপক্ষ তৎক্ষণাৎ 'শতদূষণী-খণ্ডন' প্রচার করিলেন। কিন্তু দূষণকর্ত্তা নির্ব্বাক হইবার লোক নহেন; কারণ মৌন মুনির অলঙ্কার, তার্কিকের নহে। এইরূপে খণ্ডন মণ্ডনের সন্ধান প্রতিসন্ধানে তর্কস্থল কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তখন প্রতিপক্ষ 'বেদান্ত—ডিণ্ডিম' নিনাদিত করিয়া বিবাদীকে সম্মুখ সমরে আহ্বান করিলেন। অমনি বিবাদী রণমুখে অগ্রসর হইয়া বাদীর প্রশস্ত গণ্ডে বিপুল দার্শনিক 'চপেটাঘাত' করিয়া সংকুল যুদ্ধনীতি প্রদর্শন করিলেন। ফলে বিতণ্ডাক্ষেত্র 'ক্ষেত্রং ক্ষত্র-প্রধনপিশুনং'এ পরিণত হইল এবং তার্কিকপুঙ্গবদিগের রক্তে রঞ্জিত হইয়া 'রন্তিদেবস্য কীর্ত্তিং'কে পরাজিত করিল।

আমার ধারণা, যদি আমাদিগকে আর্য্য-সত্যের পুনরাবিষ্কার করিতে হয়, তবে আমাদের গৌতম বুদ্ধের ন্যায় আবার 'বোধি'দ্রুমতলে ধ্যানমগ্ন হইতে হইবে; যদি আমরা তত্ত্বমসি মহাবাক্যের উপলব্ধি করিতে ইচ্ছা করি,

তবে শ্বেতকেতুর ন্যায় আমাদিগকে আবার ন্যগ্রোধ ফল আহরণ করিয়া গুরুর চরণতলে উপসন্ন হইতে হইবে এবং মৌনী হইয়া বলিতে হইবে :—

চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যা গুরুর্যুবা।
গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ।

তর্ক বিতণ্ডারাজ্যের রাজদণ্ড দেখাইয়া আমাদিগকে প্রলোভিত করিবে, কিন্তু যিশুখৃষ্টের ভাষায় আমাদিগকে বলিতে হইবে :—

Who reads
Incessantly and to his reading brings not
A spirit and judgment equal or superior,
(And what he brings what needs he elsewhere seek?)
Uncertain and unsettled still remains,
Deep-versed in books and shallow in himself,
Crude or intoxicate, collecting toys
And trifles for choice matters, worth a sponge,
As children gathering pebbles on the shore.
—Paradise Regained, 4th book.

বোধ হয়, এখন দিন আসিয়াছে যখন বিতণ্ডা ছাড়িয়া আমাদিগকে সিদ্ধান্তের দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে। অভেদে ভেদ না দেখিয়া ভেদে অভেদ দৃষ্টি করিতে হইবে। আবার আমাদিগকে বলিতে হইবে, "সত্য এক, তত্ত্ব এক, কেবল বাদীর দর্শনভেদে তাহা অনেক, তাহা ভিন্নরূপ।"

ভেদে অভেদ।

একটি উদাহরণ দিলে একথা একটু বিশদ হইতে পারে। সকলেই জানেন, এ দেশের দার্শনিক-সমাজে জীবের স্বরূপ লইয়া যথেষ্ট বাদ বিবাদ আছে। জীব কি অণু না বিভু? জীব কি ব্রহ্মের অংশ না ছায়া? জীব কি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন না অভিন্ন? ইহা দর্শনের এক মূল সমস্যা। ইহার বিচারবিতণ্ডায় এক মন্বন্তর অতিবাহিত করিতে পারা যায় এবং মৈনাককে লেখনী করতঃ সমুদ্র-জলকে মসিরূপে ব্যবহার করিয়া নিঃশেষ করা যায়। তথাপি তর্কে ইহার মীমাংসা হয় না, কিন্তু ভেদে অভেদ দৃষ্টি করিলে হয়।

যাহাকে বেদের মহাবাক্য বলে, সেই মহাবাক্যচতুষ্টয় জীব-ব্রহ্মের ঐক্য উপদেশ দিয়াছেন। "তত্ত্বমসি", "সোঽহং", "অয়মাত্মা ব্রহ্ম", "অহং ব্রহ্মাস্মি"—চারিবেদের এই চারি মহাবাক্য ব্রহ্মের ও জীবের অভেদ উপদেশ করিতেছেন। কিন্তু অন্যত্র আমরা শুনিয়াছি :—

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্যভাবা প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি।
—মুণ্ডক, ২।১।১

যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।—বৃ, ২।১।২০।
মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।—গীতা

ব্রহ্মসূত্রও বলিয়াছেন :—

অংশো নানাব্যপদেশাৎ ইত্যাদি—২।৩।৪৩

অথচ গীতা বলিতেছেন :—

অবিনাশি তু তদ্ বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্। বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি।

অন্যত্র আবার উপনিষদ্ বলিতেছেন :—

এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ।—ব্রহ্মবিন্দু, ১২।

'একই (অদ্বিতীয়) ভূতাত্মা ভূতে ভূতে অবস্থিত রহিয়াছেন। জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ববৎ তিনি এক ও বহুরূপে দৃষ্ট হইতেছেন।' এই আভাস বা প্রতিবিম্ববাদের সমর্থন করিয়া বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন :—

আভাস এব চ।—২।৩।৫০ সূত্র।

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন :—

অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ।—৩।২।১৮ সূত্র।

অতএব আমরা উপনিষদে তিনটি বিরোধী মতের উপন্যাস দেখিতে পাইতেছি :—প্রথম জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, দ্বিতীয় জীব ব্রহ্মের অংশ বা স্ফুলিঙ্গ; তৃতীয়, জীব ব্রহ্মের আভাস বা প্রতিবিম্ব। যে উপনিষদ্ বলিতেছেন, জীব বিভু,

স বা এষ মহান্ অজ আত্মা।
আকাশবদ্ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ।

"এই আত্মা (জীব) মহান্ ও জন্মরহিত। তিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ও নিত্য।" তিনিই অন্যত্র বলিতেছেন :—

বালাগ্র শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।

অর্থাৎ 'কেশের অগ্রভাগের শতভাগের শতভাগ জীবের পরিমাণ।'

এইসকল বিরোধী শ্রুতিবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া দার্শনিক-সমাজে যে বহু বাদ বিবাদ উত্থিত হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু সমন্বয় দৃষ্টিতে দেখিলে ইহার সামঞ্জস্য-বিধান অসম্ভব নহে। এই সমন্বয়-ভূমি আমরা গীতাগ্রন্থে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। গীতা উপদেশ দিয়াছেন :—

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এবচ
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥
গীতা, ১৫।১৬—১৮

'লোকে দুই পুরুষ, ক্ষর ও অক্ষর। সমস্ত ভূত ক্ষর পুরুষ এবং কূটস্থ অক্ষয় পুরুষ। আর-একজন পুরুষোত্তম আছেন, যাঁহাকে পরমাত্মা বলে; যিনি অব্যয় ঈশ্বর, লোকত্রয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ধারণ করিতেছেন। যেহেতু তিনি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষরের উত্তম, সেইজন্য লোকে ও বেদে তাঁহাকে পুরুষোত্তম বলে।'

এই ত্রিপুরুষ-তত্ত্বের সাহায্যে গীতা আমাদিগকে যে মীমাংসার ধামে উপনীত করিয়াছেন, তাহার প্রতি একটু লক্ষ্য করা যাক।

উপরিধৃত শ্লোক হইতে আমরা জানিলাম যে, গীতার মতে পুরুষ তিন:—ক্ষর পুরুষ, অক্ষর পুরুষ ও উত্তম পুরুষ। উত্তম পুরুষ=পরমাত্মা; অক্ষর পুরুষ=অধ্যাত্মা; এবং ক্ষর পুরুষ=জীবাত্মা। উত্তম পুরুষকে শাস্ত্রে চিদাকাশ বলে; অক্ষর পুরুষ=চিন্মাত্র, যাহাকে কূটস্থ বলে; এবং ক্ষর পুরুষ=চিদাভাস। চিদাকাশ সিন্ধু, চিন্মাত্র যেন বিন্দু। ইহাই বিস্ফুলিঙ্গবাদ। এই ভাবে জীব ব্রহ্মের অংশ। কিন্তু সিন্ধু ও বিন্দুতে স্বরূপতঃ কোন ভেদ থাকিতে পারে না। অংশ ও অংশী তত্ত্বতঃ অভিন্ন। সেইজন্য জীব ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারে, "সোঽহং", "অহং ব্রহ্মাস্মি"। সেইজন্য জীবকে লক্ষ্য করিয়া বলা যাইতে পারে:—"অয়মাত্মা ব্রহ্ম", "তত্ত্বমসি"। এই অধ্যাত্ম বা চিন্মাত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উপনিষদ্ বলিয়াছেন:—

অথ যদিদম্ অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, দহরোঽস্মিন্ অন্তর্ আকাশঃ। তস্মিন্ যদন্তঃ তদ্ অন্বেষ্টব্যং তদ্ বিজিজ্ঞাসিতব্যম্।—ছান্দোগ্য ৮।১।১

'এই ব্রহ্মপুরে (দেহে) ক্ষুদ্র পুণ্ডরীকরূপ এক গৃহ আছে; তথায় ক্ষুদ্র অন্তর-আকাশ বিরাজিত। তাহাতে যাহা অন্তর্গত, তাহার অন্বেষণ করা, তাহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।'

এই অন্তর-আকাশ কি? শঙ্করাচার্য্য বলেন, এই আকাশই ব্রহ্ম। বেদান্তের পরিভাষায় হৃদয়স্থ আত্মার নাম দহরাকাশ। এই আকাশ যে আত্মা, ইহা উপনিষদ্ই স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন:—

এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরোবিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ। ছা, ৮।১।৫

'ইনিই আত্মা, পাপহীন, জরাহীন, মৃত্যুহীন, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-হীন, সত্যকাম, সত্যসংকল্প।'

উপাধির সূক্ষ্মতা উপলক্ষ্য করিয়া এই আত্মাকে অণু বলা হয়:—

অণুরেষ আত্মা।

ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে:—

অণোরণীয়ান্।

'তিনি অণু হইতে অণু'। অথচ 'তিনি মহান্ অপেক্ষাও মহান্।'

মহতো মহীয়ান।

কারণ, যে আত্মা দহর-পুণ্ডরীকে বিরাজিত আছেন, তিনিই জগতের সর্ব্বত্র অনুস্যূত আছেন। সেইজন্য ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলিতেছেন:—

যাবান্বা অয়মাকাশ স্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয়আকাশঃ। উভে অস্মিন্দ্যাবা-পৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতম্ ইতি। ছা, ৮।১।৩

"সেই অন্তর-হৃদয়ের আকাশ, এই আকাশের ন্যায় বৃহৎ। তাহাতে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যুৎ নক্ষত্র—যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু নাই, সমস্তই তাহার অন্তর্গত।'

ব্রহ্ম যে আত্মারূপে হৃদয়ে রহিয়াছেন, ইহা শ্রুতি অন্যত্রও উপদেশ দিয়াছেন—

কতম আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদি অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ। —বৃহদারণ্যক।

'আত্মা কে?' ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'যিনি চিন্ময় অন্তর্জ্যোতি পুরুষ, প্রাণসমূহের মধ্যে হৃদয়ে বিরাজিত রহিয়াছেন।'

এই চিন্মাত্রকে লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিয়াছেন,—

"অহমাত্মা গুড়াকেশ! সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।"—গীতা, ১০।২০।

"ভগবান্ আত্মারূপে সকল ভূতের আশয়ে প্রতিষ্ঠিত।"

যেমন জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যের দর্পণস্থ প্রতিবিম্ব অন্য স্বচ্ছ পদার্থে প্রতিফলিত হইয়া আভা বিকীর্ণ করে; সেই আভা সূর্য্যও নয়, সূর্য্যের প্রতিবিম্বও নয়; সেইরূপ হৃদিস্থিত (গুহাহিত) আত্মা বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হন। ইঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন,—

আভাস এব চ।—ব্রহ্মসূত্র ২।৩।৫০
অত এব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ। –ব্রহ্মসূত্র। ৩।২।১৮।

অর্থাৎ—'জলে যেমন সূর্য্যের প্রতিবিম্ব হয়, বুদ্ধিতে সেইরূপ পরমাত্মার প্রতিবিম্ব হয়: সেই প্রতিবিম্বই জীব।'

ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া উপনিষদ্ বলিয়াছেন:—"জলচন্দ্রবৎ"। এই চিন্মাত্র ও চিদাভাস, এই বিম্ব ও প্রতিবিম্বের ভেদ লক্ষ্য করিয়া মুণ্ডক উপনিষদ্ রূপকের ভাষায় বলিয়াছেন:—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায় সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদু অত্তি অনশ্নন্ অন্যোঽভিচাকশীতি।
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নঃ অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যতি অন্যমীশম্ অস্য মহিমানম্ ইতি বীতশোকঃ ॥

"দুইটি সুন্দর পক্ষী একই বৃক্ষে অধিষ্ঠিত আছে। তাহারা পরস্পর পরস্পরের সখা। তাহাদের মধ্যে একজন সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করে; অপর ভক্ষণ করে না, শুধুই দেখে। একই বৃক্ষে একজন (জীব) নিমগ্ন হইয়া ঈশ্বর-ভাবের অভাবে মোহাচ্ছন্ন হইয়া শোক করে; কিন্তু যখন সে অন্যকে (ঈশ্বরকে) দেখিতে পায়, তখন সে তাঁহার মহিমা অনুভব করিয়া শোকের অতীত হয়।"

এই চিন্মাত্র ও চিদাভাসের ভেদ লক্ষ্য করিয়া বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে বলিয়াছেন:—

অধিকন্তু ভেদ নির্দ্দেশাৎ।—২।১।২২ সূত্র।
অধিকোপদেশাৎ তু বাদরায়ণস্যৈবং তদ্দর্শনাৎ। ৩।৪।৮ সূত্র

'অধিকস্তাবৎ শারীরাদ্ আত্মনোঽসংসারী ঈশ্বরঃ কর্ত্তৃত্বাদিসংসারিধর্ম্ম রহিতোঽপহত-পাপ্মত্বাদি বিশেষণঃ পরমাত্মা বেদান্তেষূপদিশ্যতে বেদান্তেষু। * * তথাহি তমধিকং শারীরাদ্ ঈশ্বরম্ আত্মানং দর্শয়ন্তি শ্রুতয়ঃ।'—শঙ্কর-ভাষ্য।

'জীব (দেহী আত্মা) অপেক্ষা ঈশ্বর (পরমাত্মা) অধিক। কারণ, বেদান্ত-বাক্য তাঁহাকে অসংসারী, কর্ত্তৃত্বাদিসংসারধর্ম্মরহিত, অপহতপাপ্মা প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া বেদ্য বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। শ্রুতি ঈশ্বরকে জীব হইতে অধিক দেখাইয়াছেন।'

কিন্তু তথাপি দেহস্থ আত্মা পরমাত্মার সহিত অভিন্ন। এই অর্থে গীতা বলিয়াছেন:—

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতিচাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥—গীতা, ১৩।২২

'এই দেহে পরম পুরুষ পরমাত্মা মহেশ্বর বিরাজিত আছেন; তিনি সাক্ষী, অনুমন্তা, ভর্ত্তা ও ভোক্তা।

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥

'সেই অব্যয় পরমাত্মা অনাদি ও নির্গুণ; সেইজন্য দেহস্থ হইয়াও তিনি নিষ্ক্রিয় ও নির্লেপ।' সেইজন্য চিদাভাস বা জীবাত্মার মুখে "সোঽহম্", "তত্ত্বমসি" বাক্য অতিশয় অশোভন হইলেও কূটস্থ বা চিন্মাত্রের পক্ষে এ উপদেশ সম্পূর্ণ উপযোগী। কারণ, যিনি গুহাহিত, গহ্বরেষ্ঠ, পুণ্ডরীকাধিষ্ঠিত, তিনি পরমাত্মা হইতে অভিন্ন। সেইজন্য বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন:—

অভ্যুপগমাৎ হৃদি হি।—২।৩।২৫।
দহর উত্তরেভ্যঃ।—১।৩।১৫।

প্রত্যেক লোকেরই এক-একটা ব্যসন থাকে, যাহাকে আমরা এখন 'hobby' বলি। আমার ব্যসন 'গীতা'। এই ব্যসনারূঢ় হইলে কোন্ ধামে উপনীত হইব তাহার ঠিকানা নাই। অতএব এস্থানেই বল্গা সংযত করিয়া দুই চারিটা কাজের কথার অবতারণা করি।

দর্শনালোচনার প্রকার ও প্রণালী।

একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বঙ্গদেশে সম্প্রতি যেভাবে দর্শনালোচনা হইতেছে তাহা সন্তোষজনক নহে। একপক্ষে প্রাচ্যদর্শনের আলোচনা-স্রোত বিশেষ মন্দীভূত হইয়াছে। বাসুদেব রঘুনাথ মথুরানাথ জগদীশ গদাধর মধুসূদন সরস্বতীর বংশধরগণ দর্শনের আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য পরীক্ষার পল্লবগ্রাহিতায় সন্তুষ্ট রহিয়াছেন। গভীরভাবে আন্তরিকভাবে কয়জন পণ্ডিত দর্শনধ্যানে নিমগ্ন আছেন? আমরা বিক্রমপুর ভট্টপল্লী নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে আবার 'বুনো' রামনাথের আবির্ভাব দেখিতে চাই।

অন্যপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীদিগের মধ্যে পাশ্চাত্য দর্শনের আলোচনাও আশানুরূপ হইতেছে না। কদাচিৎ স্বাধীন চিন্তা ও সফল গবেষণার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। প্রায় সর্ব্বত্রই চর্ব্বিতচর্ব্বণ ও বান্তনিষেবন। ইহার জন্য দায়ী কে? প্রধানতঃ আমাদিগের ঔদাসীন্য ও অকর্ম্মণ্যতা। কিন্তু শিক্ষাপ্রণালীরও যে কোন দোষ নাই একথা বলিতে পারি না। গাছের ডাল কাটিয়া উষর ভূমিতে প্রোথিত করিলে রাজকীয় জলসেক দ্বারাও তাহাকে সজীব মহীরুহে পরিণত করা দুর্ঘট। এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষারও প্রায় সেই দশাই হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক

প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্তলেখক স্বনামখ্যাত ভিনসেণ্ট স্মিথ মহোদয় এ সম্বন্ধে কয়েকটি সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন। তাহা আমাদিগের প্রণিধানযোগ্য :—

"The Indian Universities suffer from the want of root. They are mere cuttings struck down in an uncongenial soil and kept alive with difficulty by the constant watering of a paternal Government."

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কি ভাবে দর্শনের পঠন পাঠন হওয়া উচিত সে সম্বন্ধেও ভিনসেণ্ট স্মিথ মহোদয় কয়েকটি অমূল্য বাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন :—

"When an Indian student is bidden to study Philosophy he should not be forced to try and accommodate his mind to the unfamiliar forms of European speculation, but should be encouraged to work on the lines laid down by the great thinkers of his own country, who may justly claim equality with Plato, Aristotle and Kant. The lectures and examinations in Philosophy for the students of an Indian University should be primarily on Indian Ethics and Metaphysics, the European systems being taught only for the sake of contrast and illustration. So far as I know, the courses prescribed by the Indian Universities are not on these lines."

* * *

"It is useless to ask an Indian University to reform itself, because it does not possess the power. Some day, perhaps, the man in power will arise who is not hidebound by the University traditions of his youth who will perceive that an Indian University deserving of the name must devote itself to the development of Indian thought and learning and who will care enough for true higher education to establish a real University in India."

আমরা ঐরূপ শক্তিধর মহাপুরুষের আশাপথ চাহিয়া আছি—যাঁহার আগমনে ভারতবর্ষে প্রকৃত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং যিনি ভারতবাসীর স্থগিত ভাবধারা এবং স্তম্ভিত চিন্তাস্রোতকে আবার গতি দান করিবেন। যতদিন না সেই শুভদিনের উদয় হয়, ততদিন আমরা যেন সেই মহাপুরুষের ভাবী কর্ম্মক্ষেত্রকে সুবীজ ধারণের উপযোগী করি।

পরিভাষা সংকলন।

দর্শনক্ষেত্রে আমাদের একটি প্রধান কার্য্য দার্শনিক পরিভাষা-সংকলন। যাঁহারা পাশ্চাত্য দর্শনের সম্ভারে বঙ্গীয় দর্শন-সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিতে চেষ্টা করেন, দার্শনিক পরিভাষার অভাবে তাঁহাদিগকে কতই না বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়। এসম্বন্ধে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কিছু চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ এই যে, দার্শনিক সাহিত্য রচিত না হইলে দর্শনের পরিভাষা নিশ্চিত করা অসম্ভব। যতদিন না বাংলা ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্য দর্শনের পঠন পাঠন সাধিত হইবে, ততদিন প্রকৃত দার্শনিক পরিভাষা সংকলিত হইবার সম্ভাবনা অল্প। সজীব দর্শন-চর্চ্চা দেশমধ্যে প্রচলিত হইলে ভিন্ন ভিন্ন লেখক একই দার্শনিক তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন পরিভাষার প্রয়োগ করিবেন। সেইসকল শব্দের মধ্যে যাহা যোগ্যতম তাহাই টিঁকিয়া যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে বহু আয়াস ও সময় ব্যয় করিয়া সংস্কৃত দর্শন-সাহিত্যে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দের সূচী সংকলন করিতে হইবে। ইহা একের সাধ্য নহে, সমবেত চেষ্টা এবং যথেষ্ট সময় ব্যয় ভিন্ন এ কার্য্যে সফলতা হইবে না। আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে, এদেশে বহু যুগ ধরিয়া শিক্ষিত-সমাজে নানা দার্শনিক আলোচনা প্রচলিত ছিল। মুদ্রা ব্যতীত যেমন বাণিজ্য নিষ্পন্ন হওয়া দুষ্কর, পরিভাষা ভিন্ন সেইরূপ দর্শনচর্চ্চা অসম্ভব। অতএব এদেশের দার্শনিক-সাহিত্য পরিভাষা-ভূয়িষ্ঠ হইবারই সম্ভাবনা। এই সম্পর্কে বিগত রাজসাহী সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বঙ্গ-সাহিত্যে ইংরেজীযুগের সূত্র-পাতের প্রসঙ্গে কয়েকটি সারগর্ভ কথা বলিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

'সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রভাব হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া বঙ্গ-সাহিত্য ইংরেজি-সাহিত্যের একান্ত অধীন হইয়া পড়িল। ফলে বঙ্গসাহিত্য তাহার স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ আবার হারাইয়া বসিল। এই ইংরেজি-নবিস লেখকদিগের হস্তে বঙ্গভাষা এক নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিল।

সংস্কৃতের অনুবাদ যেমন পণ্ডিতদিগের মতে সাধুভাষা বলিয়া গণ্য হইত, ইংরেজির কথায় কথায় অনুবাদ তেমনি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট সাধুভাষা বলিয়া গণ্য হইল। এই অনুবাদের ফলে এমন বহু শব্দের সৃষ্টি করা হইল যাহা বাঙ্গালীর মুখেও নাই এবং সংস্কৃত অভিধানেও নাই, এবং এইসকল কষ্টকল্পিত পদই এখন বঙ্গসাহিত্যের প্রধান সম্বল।

নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এইসকল নব শব্দ গড়িবার কোনই আবশ্যকতা ছিল না। সংস্কৃত দর্শন বিজ্ঞানে কাব্যে অলঙ্কারে যথেষ্ট শব্দ আছে, যাহার সাহায্যে আমরা আমাদিগের নবশিক্ষা-লব্ধ সকল মনোভাব বঙ্গভাষার জাতি ও প্রকৃতি রক্ষা করিয়া অনায়াসে ব্যক্ত করিতে পারি।'

ইহা অতি সত্য কথা। বাস্তবিকই সংস্কৃত ভাষা দর্শন-পরিভাষা-সম্পদে সাতিশয় সমৃদ্ধ। অথচ আমরা সেই খনির রত্ন-রাজির সন্ধান না করিয়া মনগড়া কিম্ভূতকিমাকার শব্দের প্রয়োগ করিতেছি। জার্ম্মান দর্শন হইতে আমরা Subject Object, Noumenon Phenomenon শব্দের

প্রয়োগ শিখিয়াছি। কিন্তু জর্ম্মান দর্শনের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্বে দ্রষ্টা দৃশ্য, বিষয় বিষয়ী, বিবর্ত্ত পরমার্থ প্রভৃতি শব্দ প্রচলিত ছিল। সম্প্রতি বার্গসঁর আলোচনায় আমরা intellect ও intuitionএর প্রভেদ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু বুদ্ধি ও বোধির প্রভেদ এদেশে সুপ্রাচীন। মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় আমাদিগকে motor nerves ও sensory nervesএর ভেদের সূচনা করিতে হয়। কিন্তু আজ্ঞা নাড়ী ও সংজ্ঞা নাড়ীর প্রভেদ অবগত থাকিলে এজন্য পরিভাষা গঠনের ব্যর্থশ্রম আবশ্যক হয় না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আলোচনায় আমরা অবরোহণ-প্রণালীর ব্যাপ্তিগ্রহ সাধনের জন্য তিনটি শব্দের আশ্রয় লইতে বাধ্য হই—observation, experiment ও inference; কিন্তু ইহাদিগের প্রতিশব্দ গড়িবার প্রয়োজন নাই, কারণ প্রাচীন কাল হইতে এদেশের দার্শনিকগণ সমীক্ষা পরীক্ষা ও অন্বীক্ষার সাহায্যে ব্যাপ্তিগ্রহ করিতে আমাদিগকে শিখাইয়াছেন। এইরূপ কত না শব্দসম্ভারে আমাদের প্রাচীন সাহিত্য সজ্জিত। বাংলার দর্শন-সাহিত্যের জন্য ঐসকল শব্দের আবিষ্কার অত্যাবশ্যক। এক সময় আমি এইরূপ শব্দসূচী সংকলনের সূত্রপাত করিয়াছিলাম, কিন্তু অল্পদূর অগ্রসর হইয়া সে কার্য্য স্থগিত হইয়া গেল। কারণ—উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে উৰ্কীলানাং মনোরথাঃ। এইরূপ শব্দসূচী সংকলিত হইলে প্রাচীন শব্দের নবীন অপপ্রয়োগের পথে কতকটা কাঁটা পড়িবে। আমরা সহযোগী সাহিত্যে প্রায়ই শুনিতে পাই যে, এদেশে কিছুদিন হইতে নাটকীয় 'প্রতিভার' উদ্ভব হইয়াছে। আমরা আরও শুনিয়াছি যে, এযুগে বঙ্গদেশে বহু 'প্রতিভা'শালী লেখকের উদয় হইয়াছে। সংস্কৃত-সাহিত্যের আলোচনা করিলে জানা যায় যে, আমরা এসকল স্থলে প্রতিভা শব্দের অপপ্রয়োগ করিতেছি। ন্যায়-সূত্রের ভাষ্যে বাৎসায়ন লিখিয়াছেন:—স্মৃত্যনু মানাগম সংশয় প্রতিভা স্বপ্ন জ্ঞানোথ সুখাদি প্রত্যক্ষম্ ইচ্ছাদয়শ্চ মনসো লিঙ্গানি। এখানে প্রতিভা শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়াদি নিরপেক্ষ জ্ঞান বিশেষ। বাস্তবিক ইহাই প্রতিভা শব্দের প্রকৃত অর্থ। পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাসভাষ্যে আমরা পড়িয়াছি—তারকং স্বপ্রতিভোত্থম্ অনৌপদেশিকং (৩।৫৪ সূত্রের ভাষ্য)। প্রশস্তপাদের 'পদার্থধর্ম্মসংগ্রহে' এবং শ্রীধরের "ন্যায়-কন্দলীতে' এই প্রাতিভ জ্ঞানের ব্যাখ্যা আছে। তথাপি প্রতিভা শব্দের বর্ত্তমান প্রয়োগ বরং কতকটা মার্জ্জনীয়, কারণ দণ্ডীতে প্রয়োগ আছে—ন বিদ্যতে যদ্যপি পূর্ব্ববাসনা। গুণানুবন্ধি প্রতিভানমদ্ভুতম্। মহাভারতকার লিখিয়াছেন:—প্রজ্ঞা নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা মতা।

কিন্তু বাংলায় যে Scienceএর প্রতিশব্দ রূপে আমরা 'বিজ্ঞান' শব্দ গ্রহণ করিয়াছি তাহার মার্জ্জনা নাই। ঐতরেয় উপনিষদে আমরা সংজ্ঞানং, আজ্ঞানং, বিজ্ঞানং, প্রজ্ঞানং, শুনিতে পাই।

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন:—

বিজ্ঞানং বাব ধ্যানাদ্ ভূয়ঃ।
বিজ্ঞানেন বা ঋগ্ বেদং বিজানাতি।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলিয়াছেন:—

বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ হইতে শিখিয়াছি:—

বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম।

বৌদ্ধ-দর্শনে বিজ্ঞান স্কন্ধের উল্লেখ দেখিয়াছি এবং ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী মাধ্যমিকের সহিত আস্তিক দার্শনিকের তর্কযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ব্যাসভাষ্যে পড়িয়াছি:—

নাস্ত্যর্থঃ বিজ্ঞান বিসহচরঃ।

এসকল প্রয়োগের সহিত Science অর্থে বিজ্ঞানের প্রয়োগের কোনই যোগ নাই। কিন্তু 'প্রতিভা' এদেশে যেরূপ বদ্ধমূল হইয়াছে এবং Science অর্থাৎ 'বিজ্ঞান' যেরূপ শিকড় গাড়িয়াছে তাহাতে এই দুই শব্দের অপপ্রয়োগ নিষেধ করা অসম্ভব।

দার্শনিক শব্দ-সূচীর সঙ্গে সূত্রাকারে গ্রথিত প্রাচীন মূল দর্শনসমূহে প্রযুক্ত শব্দসকলেরও সূচী প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহার উপকারিতা ও উপযোগিতা মণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট প্রদর্শন করা বোধ হয় অনাবশ্যক, তথাপি ব্রহ্মসূত্রের দৃষ্টান্ত দিয়া দুই এক কথা বলিতে ইচ্ছা করি। সকলেই অবগত আছেন যে, বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদের অর্থাৎ প্রধানতঃ উপনিষদের বিরোধাদি মীমাংসার জন্য রচিত। এইসকল সূত্রের ভিত্তি অধিকাংশ স্থলে উপনিষদ্বাক্য। কোন্ সূত্র কোন্ উপনিষদ্-বচনকে লক্ষ্য করিতেছে, সে সম্বন্ধে ভাষ্যকারদিগের মধ্যে স্থানে

স্থানে মতভেদ দৃষ্ট হয়। সেইজন্য সংক্ষিপ্ত সূত্রকে বিবাদী ভাষ্যকারগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক যে যাঁহার দিকে টানিয়াছেন। অথচ অনেক সূত্রে বাদরায়ণ উপনিষদের ব্যবহৃত শব্দ অবিকল প্রয়োগ করিয়াছেন।

অপীতি অন্ন আরম্ভণ ঈক্ষতি সেতু সন্ধ্যা প্রভৃতি ঐরূপ শব্দ। উপনিষদ্-বাক্যকোষ হইতে আমরা সহজেই ধরিতে পারি, কোথায় ঐসকল অপ্রচলিত শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে এবং তাহা হইতে কোন্ সূত্রের সম্বন্ধি কোন্ উপনিষদ্-বচন, তাহা নির্ব্বচন করা সহজ হয়। যখন আমরা "তদ্ অনন্যত্বম্ আরম্ভনশব্দাদিভ্যঃ" এই ব্রহ্মসূত্রের আবৃত্তি করি, সঙ্গে সঙ্গে "বাচারম্ভনং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্"—এই ছান্দোগ্য-শ্রুতির স্মরণ হয়। যখন "ঈক্ষতে নাশব্দম্"—এই সূত্র পাঠ করি, তখন "সোঽকাময়ত একোঽহং বহুস্যাম্" এই শ্রুতিবাক্য স্মৃতিপথে উপস্থিত হয়। এইরূপ অন্যান্য সূত্রেরও উল্লেখ করা যাইতে পারে।

অনুবাদ ও মৌলিক গ্রন্থ রচনা।

কিন্তু পরিভাষা রচনা ও শব্দ-সূচী সংগ্রহ করিলেই যথেষ্ট হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থসমূহের অনুবাদ করিতে হইবে। আমরা দেখিতে পাই যে, সংস্কৃত ও পালির প্রধান প্রধান দার্শনিক গ্রন্থ প্রায়ই ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছে। শুনিয়াছি, জর্ম্মান ভাষায় আরও সমধিক ভারতীয় গ্রন্থের অনুবাদ সাধিত হইয়াছে। এ দেশ হইতে যদি না লজ্জা কাদম্বরীর ভাষায় 'লজ্জিতৈব পলায়িতা' হইয়া থাকে, তবে ইহাতে আমাদের নিশ্চয়ই লজ্জা বোধ করা উচিত। সুখের বিষয়, আমাদের পণ্ডিতমণ্ডলী এ বিষয়ে ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের পূর্ব্বে ধারণা ছিল যে, দরিদ্র বঙ্গভাষায় সংস্কৃত দর্শনের গুরু গম্ভীর ভাব ব্যক্ত করাই অসম্ভব। কিন্তু স্বর্গীয় কালীবর বেদান্তবাগীশ, চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু এবং মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, পণ্ডিত শশিভূষণ তর্কবাগীশ, দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, পঞ্চানন তর্করত্ন, হরিহরানন্দ আরণ্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রাচীন ভাষ্যসমূহের বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকের পন্থা সুগম করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে রায় বাহাদুর রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষালের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং ইঁহাদিগের চেষ্টায় ভাষা-পরিচ্ছেদ এবং বেদান্ত-পরিভাষা নামক দুইখানি কঠোর সংস্কৃত গ্রন্থ বঙ্গীয় পাঠকের আয়ত্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসুর বিরাট গীতাগ্রন্থ, শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্যের উপনিষদের উপদেশ এবং শ্রীযুক্ত সীতানাথ তর্কভূষণের উপনিষদাদিও এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে আদিম কৃতকর্ম্মা শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র পাল। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি সভাষ্য উপনিষদ্ সাংখ্য-দর্শন পাতঞ্জল-দর্শন পঞ্চদশী বেদান্তসার প্রভৃতি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া সংস্কৃত শাস্ত্রদ্বার বঙ্গীয় পাঠকের জন্য অপাবৃত করিয়াছিলেন।

পরন্তু কেবল সংস্কৃত ও পালি হইতে দার্শনিক রত্নরাজি সংগ্রহ করিলে যথেষ্ট হইবে না। পাশ্চাত্য সাহিত্যে যে-সকল প্রসিদ্ধ দর্শনগ্রন্থ আছে তাহার দ্বারাও আমাদের দার্শনিক-সত্তার সমৃদ্ধ করিতে হইবে। প্লেটো ও অ্যারিষ্টটল প্রভৃতি গ্রীক্ দার্শনিক, লাইবনিট্স্, ক্যাণ্ট, ফিক্‌টে, হেগেল প্রভৃতি জর্ম্মান দার্শনিক, বার্গসঁ প্রভৃতি ফরাসী দার্শনিক, হ্যামিলটন্ স্পেনসার প্রভৃতি ইংরেজ দার্শনিক প্রত্যেকেরই প্রধান প্রধান গ্রন্থের সহিত বাংলা ভাষার সাহায্যে বাঙ্গালী পাঠকের পরিচয়ের সুযোগ হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে ইংরেজী-সাহিত্য আমাদিগের দৃষ্টান্তস্থল হইতে পারে। শুনিয়াছি ইংরেজী-সাহিত্যের অনুবাদ-শাখা যেরূপ সমৃদ্ধিশালী, সেরূপ য়ুরোপীয় কোন সাহিত্যই নহে। অথচ ইংরেজীতে মৌলিক সদ্‌গ্রন্থ আদৌ বিরল নহে। সঙ্গে সঙ্গে ইস্‌লামীয় দর্শন-সাহিত্য বঙ্গভাষায় অনূদিত হওয়া আবশ্যক। ইস্‌লাম আমাদিগের অতি নিকট প্রতিবেশী; অথচ তাহার দার্শনিক গ্রন্থের সহিত আমাদিগের একেবারেই পরিচয় নাই। অভিজ্ঞ মৌলভী দ্বারা ইস্‌লামের দর্শনভাণ্ডার হইতে রত্ন আহরণ করিয়া বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিতে হইবে।

বলা বাহুল্য, ভাষার সৌষ্ঠবসাধনের জন্য অনুবাদ পর্য্যাপ্ত নহে। যদি বাংলা সাহিত্যের দার্শনিক শাখাকে

সজীব ও সৌষ্ঠবময় করিতে হয়, তবে তাহা মৌলিক গ্রন্থ ভিন্ন হইবে না। এ পর্য্যন্ত বাংলায় কয়খানা মৌলিক দার্শনিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে? মৌলিক দার্শনিক চিন্তার কথা বলিতেছি না। তাহা উড়ুম্বর-পুষ্পের ন্যায় শতাব্দে একবারের অধিক প্রস্ফুটিত হয় না। মৌলিক-চিন্তা-চর্চ্চিত দর্শন-কুসুম যদি বাংলার কোন তরুশাখে বিকসিত হয়, তবে তাহার সৌরভে নিশ্চয়ই সমগ্র দেশ আমোদিত হইবে; কিন্তু যতদিন তাহা না হয়, ততদিন আমাদের নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। প্রথমতঃ দর্শন-চর্চ্চাকে আমাদের দেশে ব্যাপ্ত করিতে হইবে। তজ্জন্য সহজ ভাষায় ও সরল প্রণালীতে দার্শনিক নিবন্ধ-গ্রন্থ-সকল রচিত হওয়া আবশ্যক। এই অত্যাবশ্যক কার্য্যে অগ্রসর হইবার জন্য আমি সাহিত্যসম্মিলনকে আহ্বান করিতেছি। পাশ্চাত্য ভাষায় নানা প্রকারের philosophical series প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, আমি বঙ্গভাষায় ঐ ধরণের শ্রেণী-গ্রন্থ রচিত দেখিতে চাই। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের প্রধান প্রধান দার্শনিকের দার্শনিক মতের পরিচায়ক নিবন্ধ রচিত হউক। সঙ্গে সঙ্গে সোয়েগলার, ইউবারওয়েগ প্রভৃতির History of Philosophy'র ধরণে দার্শনিক মতবাদের ইতিহাস বঙ্গভাষায় রচনা করিবার ব্যবস্থা করা হউক এবং ভারতীয় ও য়ুরোপীয় Logic, Ethics ও Psychology'র সারসংকলন ও সমন্বয় করিয়া এক-এক-খানি উৎকৃষ্ট তর্কবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান ও কর্ত্তব্যবিজ্ঞানের গ্রন্থ রচনা করিবার উদ্‌যোগ করা হউক।

দর্শন-অনুসন্ধান।

কয়েক বৎসর হইতে এ দেশে ইতিহাস-ক্ষেত্রে এবং বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে মৌলিক অনুসন্ধান (original research) আরম্ভ হইয়াছে। ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং তাঁহাদের শিষ্যপ্রশিষ্যগণ বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে নূতন আবিষ্কার ও গবেষণার দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইতিহাস-ক্ষেত্রে বারেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি, রাঢ়-অনুসন্ধান-সমিতি প্রভৃতি সমিতির এবং স্বনামখ্যাত ব্যক্তিগণের সমবেত ও ব্যক্তিগত চেষ্টায় ইতিহাসে অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে; কিন্তু দর্শন-ক্ষেত্রে প্রকৃত research এখন পর্য্যন্ত অল্পই অগ্রসর হইয়াছে। অধ্যাপক ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের জীবনব্যাপী অধ্যয়ন ও আলোচনার ফল আমরা এতদিনে আস্বাদন করিতে পাইব, এরূপ সম্ভাবনা দেখিতেছি। কিন্তু এক্ষেত্রে কেবল তাঁহারি হস্তে হলচালনার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। সংস্কৃত দর্শন-ক্ষেত্রে এখনও বহু গবেষণা ও অনুসন্ধানের অবসর আছে। আমাদের যে প্রচলিত ষড়্‌দর্শন, ইহার অতিরিক্ত কোনও দর্শনশাস্ত্র এদেশে ছিল কি না? অবশ্য "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ" হইতে আমরা কয়েকটি দার্শনিক মতের পরিচয় পাই। কিন্তু ঐসকল মতের আদি গ্রন্থ কোথায়? বুদ্ধদেবের জীবনচরিতে দেখা যায় যে, তিনি নানাবিধ দর্শন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এইসকল মতের ভিত্তিভূমি কি? বাস্তবিক বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে এদেশে আজ পর্য্যন্ত অতি অল্পই আলোচনা হইয়াছে। এক্ষেত্রে মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের কে কে সহচর হইবেন? এ সম্বন্ধেও আমাদিগকে পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদের মুখাপেক্ষা করিতে হইতেছে। কতদিন আর আমরা পরপ্রত্যাশী থাকিব?

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের নামের সহিত সংযুক্ত "সর্ব্বসিদ্ধান্ত-সংগ্রহ" হইতে আমরা জানিতে পারি :—

> চতুর্দ্দশসু বিদ্যাসু মীমাংসৈব গরীয়সী।
> বিংশত্যধ্যায়যুক্তা সা প্রতিপাদ্যার্থতো দ্বিধা
> কর্ম্মার্থা।পূর্ব্বমীমাংসা দ্বাদশাধ্যায় বিস্তৃতা ॥
> অস্যাং সূত্রং জৈমিনীয়ং শাবরং ভাষ্যমস্য তু
> ভবত্ত্যুত্তরমীমাংসা ত্বষ্টাধ্যায়ী দ্বিধা চ সা।
> দেবতাজ্ঞানকাণ্ডাভ্যাং ব্যাসসূত্রং দ্বয়োস্সমম্ ॥
> পূর্ব্বাধ্যায়চতুষ্কেণ মন্ত্রবাচ্যাত্র দেবতা।
> সংকর্ষণোদিতা তদ্ধি দেবতাকাণ্ডমুচ্যতে ॥

ইহা হইতে জানা যায় যে, প্রতিপাদ্য বিষয়ের ভেদে মীমাংসাদর্শন দ্বিবিধ এবং বিংশ অধ্যায়ে বিভক্ত। কর্ম্মকাণ্ড-বিষয়ক ১২ অধ্যায়-বিস্তৃত পূর্ব্বমীমাংসা—জৈমিনি ইহার সূত্রকার এবং শবর ভাষ্যকার। অন্যপক্ষে উত্তরমীমাংসা অষ্টাধ্যায়ী। উত্তর-মীমাংসার দুই ভাগ। দেবতা কাণ্ড ও জ্ঞান কাণ্ড। উভয় কাণ্ডেরই সূত্রকার ব্যাস। প্রথম চারি অধ্যায় মন্ত্রোল্লিখিত দেবতার মীমাংসায় নিয়োজিত। অপর চারি অধ্যায় আমাদিগের সুপরিচিত ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত-দর্শন। কিন্তু উত্তরমীমাংসার পূর্ব্বার্দ্ধ, যাহাকে দেবতাকাণ্ড বলা হইল, তাহা কোথায়? ঐ দেবতাকাণ্ডের নাকি

ভগবৎপাদ-নির্ম্মিত ভাষ্য ছিল। ভাষ্যং চতুর্ভিরধ্যায়ৈ র্ভগবদ্‌পাদনির্ম্মিতম্। সে ভাষ্য কোথায় গেল? ইহার সবিশেষ অনুসন্ধান আবশ্যক। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কাশীস্থ ভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডল দৈবীমীমাংসা বলিয়া এক সূত্রাকার দর্শনগ্রন্থের সন্ধান পাইয়া 'বিদ্যারত্নাকর' মাসিকপত্রে তাহার রসপাদ উৎপত্তিপাদ ও স্থিতিপাদ—এ তিন পাদ প্রকাশ করেন। প্রথমতঃ মনে হইয়াছিল যে, এই দৈবী-মীমাংসাই সর্ব্ব-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহোল্লিখিত দেবতাকাণ্ড। কিন্তু গ্রন্থ পাঠে সে বিশ্বাস স্থায়ী হইল না। দৈবী মীমাংসার আরম্ভ সূত্র এই—অথাতো ভক্তিজিজ্ঞাসা। দৈবীমীমাংসার আর কয়েকটি সূত্র এইরূপ—

রসরূপঃ পরমাত্মা, জড়রূপা মায়া—। স্বৈরতীতো বুদ্ধেশ্চপরঃ স ভক্তিলভ্যঃ। বৈধী রাগাত্মিকা নাম ভিন্না সাধনলভ্যা গৌণী। তদ্‌বিস্মরণাদেব ব্যাকুলতাপ্তৌ ইতি নারদঃ। মাহাত্ম্যজ্ঞানম্ অপেক্ষ্যং। তদভাবে জারবৎ।

এইসকল ও অন্যান্য সূত্রের প্রতি মনোনিবেশ করিলে ধারণা হয় যে, এ দৈবী-মীমাংসা নারদ-ভক্তি-সূত্রের অপেক্ষা অর্ব্বাচীন গ্রন্থ; ইহা প্রাচীন দেবতাকাণ্ড নহে।

ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা দার্শনিকের সুপরিচিত গ্রন্থ। শুনিয়াছি, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই গ্রন্থের চীন ভাষায় অনুবাদ হইয়াছিল। ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, তাঁহার গ্রন্থ পঞ্চশিখাচার্য্যের ষষ্টিতন্ত্রের সংক্ষিপ্তসার।

সপ্তত্যাং কিল যেঽর্থাস্তেঽর্থাঃ কৃৎস্নস্য ষষ্টিতন্ত্রস্য।
আখ্যায়িকাবিরহিতা পরবাব বিবর্জ্জিতাশ্চাপি।—৭২

পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাসভাষ্য নামে যে ভাষ্য প্রচলিত আছে, তাহার কয়েক স্থলে ষষ্টিতন্ত্রের সূত্র বা বচন উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়। এই ষষ্টিতন্ত্র কোথায় কোন্ গ্রন্থাগারে হয়ত এখনও কীটদষ্ট হইতেছে। কে ইহার উদ্ধার-সাধন করিবে? বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্য শাস্ত্রকে কালার্ক-ভক্ষিত বলিয়াছেন। বস্তুতঃ, প্রচলিত ষড়াধ্যায়ী—যাহাকে আমরা সাংখ্যসূত্র বলিয়া জ্ঞাত আছি, তাহা যে কপিলের মূল সূত্র নহে, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের পরবাদ-প্রসঙ্গে সাংখ্য এবং অন্যান্য দার্শনিক মতের যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু ঐ প্রসঙ্গে শঙ্কর যেরূপ কণাদ-সূত্র, ন্যায়-সূত্র, জৈমিনি-সূত্র এবং যোগ-সূত্র হইতে সূত্র উদ্ধার করিয়াছেন, সেরূপ সাংখ্য-সূত্র হইতে কোন সূত্র উদ্ধার করেন নাই। তাহা না করিয়া তিনি ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকাই উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহার কারণ কি? শঙ্করাচার্য্যের সময়ে কি সাংখ্যসূত্র প্রচলিত ছিল না? সাংখ্যসূত্রের সহিত তৎপূর্ব্ববর্ত্তী তত্ত্বসমাসের কি সম্বন্ধ? কেহ কেহ ইহাকেই কপিলপ্রণীত মূল সাংখ্য দর্শন বিবেচনা করেন। এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন:—

নম্বেবমপি তত্ত্বসমাসাখ্য সূত্রৈঃ সহাস্যাঃ ষড়ধ্যায়্যাঃপৌনরুক্ত্যমিতি চেৎ। নৈবম্। সংক্ষেপ বিস্তররূপেণ উভয়োরপ্যপৌনরুক্ত্যাৎ।

তত্ত্বসমাসই কি প্রাচীন সাংখ্যসূত্র? তত্ত্বসমাসকে দর্শনের সূচীপত্র বলাই সঙ্গত। তত্ত্বসমাসের কয়েকটি সূত্র এইরূপ:—

অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ। ষোড়শ বিকারাঃ।
পুরুষঃ। ত্রৈগুণ্যং।
সঞ্চরঃ। প্রতিসঞ্চরঃ।

সাংখ্য-মত যে অতি সুপ্রাচীন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার উপায় নাই। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সাংখ্যমতের উল্লেখ আছে। বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রে পরবাদ অধ্যায় ভিন্ন অন্যত্রও সাংখ্য-মত নিরাসের প্রযত্ন দৃষ্ট হয়।

এই প্রাচীন সাংখ্য-মত কি গ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল? সাংখ্যসূত্র ও যোগসূত্র এখন আমরা যে আকারে দেখিতে পাই, তাহাদের মধ্যে কয়েকটি সূত্র অবিকল একরূপ। এ ক্ষেত্রে কে কাহার সূত্র গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

ষড়্‌দর্শন এখন আমরা যে আকারে পাইতেছি, ইহাই কি তাহাদিগের আদিমরূপ অথবা পরবর্ত্তী সংস্করণ? ব্রহ্মসূত্রে জৈমিনিসূত্র উদ্ধৃত দেখা যায়। আবার পূর্ব্বমীমাংসায় ব্রহ্মসূত্রের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। সাংখ্যসূত্রে বৈশেষিক দর্শনের প্রতি কটাক্ষ আছে। ইহা হইতে এবং সাধারণতঃ পরবাদ হইতে সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত নহে যে, প্রাচীন সূত্রকারদিগের সংক্ষিপ্ত সূত্রগ্রন্থ তাঁহাদিগের শিষ্য অনুশিষ্যদিগের দ্বারা বর্দ্ধিতাকার লাভ করিয়াছে। ষড়্‌দর্শনের আদিম রূপ কি ছিল? ইহার অনুসন্ধান হওয়া বিশেষ আবশ্যক। শুধু সূত্র নহে, ভাষ্য সম্বন্ধেও অনেক অনুসন্ধান বাকী রহিয়াছে। কেহ কেহ শঙ্করাচার্য্যকেই অদ্বৈত মতের প্রবর্ত্তক মনে করেন, কিন্তু তাঁহার গুরুর গুরু

গৌড়পাদাচার্য্য মাণ্ডুক্য উপনিষদের যে কারিকা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে অদ্বৈত মতের পরিণত অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্য্য ঐ কারিকার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার শারীরকভাষ্যে আত্মমত সমর্থনের জন্য ভগবান্ উপবর্ষকে প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি আর-একজন বৃত্তিকারেরও উল্লেখ করিয়াছেন। উপবর্ষই কি বৃত্তিকার? এই উপবর্ষ কে এবং তাঁহার গ্রন্থ কোথায় গেল? বিশিষ্টাদ্বৈতাচার্য্য রামানুজ তাঁহার শ্রীভাষ্যের ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, তাঁহার ভাষ্য প্রাচীন ভাষ্যকার বোধায়নের ভাষ্যের অনুসরণ মাত্র। এই বোধায়ন কতদিনের লোক এবং তাঁহার সে ভাষ্যগ্রন্থ কোথায়? রামানুজ বেদার্থসংগ্রহে বলিয়াছেন :—

যথোদিত-ক্রম-পরিণতঃ ভক্ত্যেকলভ্য এব ভগবদ্ বোধায়ন টঙ্ক দ্রমিড় গুহদেব কপর্দ্দি ভারুচি প্রভৃতিভিরবগীতঃ * * শ্রুতিনিকর-নিদর্শিতোঽয়ং পন্থাঃ।

এই টঙ্ক, দ্রমিড়, গুহদেব, কপর্দ্দি, ভারুচি প্রভৃতির গ্রন্থসকল কি কি এবং কোথায় পাওয়া যাইবে? শ্রীযুক্ত রঙ্গাচারী তাঁহার শ্রীভাষ্যের অনুবাদের ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—

"There is evidence to show that it (the Visistadwaita School) must have come down in the form of an unbroken tradition from very ancient times."

একথা যদি সত্য হয়, তবে ঐসকল প্রাচীন গ্রন্থের উদ্ধার না হইলে আমরা বিশিষ্টাদ্বৈত মতের প্রাচীনতা কিরূপে সপ্রমাণ করিব?

এ বিষয়ে আরও অনেক কথা বলা যায়। আমি দিক্ প্রদর্শন করিলাম মাত্র। ইহাতেই বুঝা যাইবে যে, দর্শনক্ষেত্রেও আমাদের কত অনুসন্ধান, কত গবেষণা, কত লুপ্তোদ্ধার অবশিষ্ট আছে।

এইসকল গুরুতর অথচ অত্যাবশ্যক কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবার জন্য আমি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনকে সাগ্রহে আহ্বান করিতেছি। আমাদের এ সম্মিলন কেবল উৎসবক্ষেত্র নহে, ইহা কর্ম্ম-ক্ষেত্র। আসুন কর্ম্মের সফলতায় মণ্ডিত করিয়া আমরা এই সম্মিলনকে সার্থক ও সমৃদ্ধ করি।*

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

* বর্দ্ধমানে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে দর্শনশাখার সভাপতির অভিভাষণ।

বাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্যের গতি

আমাদের পদ্যের ও কাব্যের ইতিহাস অতি প্রাচীন, দীনেশবাবু যতদূর দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা আরও পাঁচ শত বৎসরের প্রাচীন। দীনেশবাবুর মতে শূন্যপুরাণ সকলের চেয়ে পুরাণ। কিন্তু সেও মুসলমান-আক্রমণের পরে লেখা। কারণ, উহাতে "নিরঞ্জনের উষ্মা" নামে যে ছড়া আছে, তাহাতে মুসলমান-আক্রমণের বর্ণনা আছে। কিন্তু আমাদের দেশের নাথ-পন্থের যোগীরা খৃষ্টের অষ্টম শতকের বাঙ্গলায় ছড়া লিখিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যেরাও সেই কালেরই লোক। তাঁহারা অনেক দোহা লিখিয়া গিয়াছেন, গীতিকা লিখিয়া গিয়াছেন, ছড়াও লিখিয়া গিয়াছেন। দোষগুণ বিচার করিতে গেলে বলিতে হয়, এসকল ছড়া বা গীতিকা খুব উচ্চ অঙ্গের না হইলেও রস ও ভাবে পরিপূর্ণ। সে রস ও সে ভাব এখনকার রুচিসিদ্ধ নয়, কিন্তু তথাপি বাঙ্গলার প্রাচীন কাব্য বলিয়া তাহার আদর আছে। উহাতে আমরা আমাদের ভাষা হাজার বৎসর পূর্ব্বে কি অবস্থায় ছিল, তাহা বেশ দেখিতে পাই। প্রাচীন কাব্যের একটা দোষ এই যে, যত লোকে ঐ ছড়া কাপি করে তাহারা অবুঝ অংশ সোজা করিয়া লয়। যেসকল পুরাণ কথার অর্থ বুঝে না, নূতন কথা দিয়া সেগুলিকে বদ্‌লাইয়া ফেলে। ক্রিয়াপদগুলিকে ত একেবারে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেয়। এইরূপে গোবিন্দচন্দ্রের গীত ও মাণিকচন্দ্রের গীত এত বদ্‌লাইয়া ফেলিয়াছে যে, তাহাকে আর প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। সিদ্ধাচার্য্যদের গীতগুলি কিন্তু সেই কালের লেখায় সেই কালের টীকার সহিত পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে পরিবর্ত্তন হয় নাই, সুতরাং হাজার বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার যে অবস্থা ছিল, তাহার একটা ঠিক ফটোগ্রাফ পাওয়া গিয়াছে। উহাতে পারসী কথার লেশমাত্র নাই। বড় বড় সংস্কৃত কথা একেবারেই নাই। সে কালের ভদ্রলোকে যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত, ঠিক সেই ভাষায় লেখা। সুতরাং উহার দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার যথেষ্ট উপকার হইতে পারে। সেকালে বাঙ্গলা ভাষার কিরূপ গতি ছিল, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। গোবিন্দচন্দ্রের গীত অনেক বদল

হইয়া গেলেও উহাও মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বে লেখা। তখন লোকে কিরূপে সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়া যাইত, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি।

মুসলমান-বিজয়ের পর যখন দেশে অনেকেই মুসলমান হইয়া যাইতে লাগিলেন, তখন ব্রাহ্মণেরা দেখিলেন ভাষায় রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি না লিখিলে এ মুসলমানী স্রোত রোধ করা যাইবে না। তাই তাঁহারা ঐসকল গ্রন্থ বাঙ্গলা করিতে লাগিলেন কাব্যের দোষগুণ সংস্কৃতে যাহা ছিল, বাঙ্গলাতেও তাহাই রহিল, বেশীর মধ্যে বাঙ্গালীর মনে যাহা লাগে, তাহাই উহাতে ঢুকাইয়া দিলেন। বাঙ্গালী হাস্যরসে পটু, তাই উহাতে হাসির জিনিস বেশী করিয়া আসিল। বাঙ্গালী কথাকাটাকাটি ভাল বাসে। উহাতে কথাকাটাকাটি বেশী আসিয়া ঢুকিল। এইজন্যই অঙ্গদ রায়বারে লবকুশের যুদ্ধে কথাকাটাকাটি আসিল। বাঙ্গালী বড় ভক্ত, তাই রামায়ণে দুর্গোৎসব আসিল। এইরূপে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলি বাঙ্গালী আকারে বাঙ্গলা ভাষায় বিরাজ করিতে লাগিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ-ঠাকুরেরা মনসা, মঙ্গলচণ্ডীর গান আপনাদের মত করিয়া বাঙ্গলা করিয়া লইলেন। অনেক ব্রাহ্মণ পাকা বৌদ্ধ যে ধর্ম্মঠাকুরের গান, তাহাও সংস্কৃত কাব্যের রসভাব দিয়া লিখিতে লাগিলেন।

এমন সময় চৈতন্য-দেবের আবির্ভাব হইল। কাব্য ও নাটকই তাঁহার ধর্ম্মের প্রাণ। অলঙ্কারের রস ও ভাবই তাঁহাদের দেবতা। নয় রস, বিয়াল্লিশ ভাব ও আটটি সাত্ত্বিক ভাব লইয়াই তাঁহাদের কীর্ত্তন। পদকর্ত্তারা দেখিতেন এই এই ভাবের গান আছে, এই এই ভাবের গান নাই, সেইগুলি তাঁহারা জুড়িয়া দিতেন। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, এক গানে একজন যে ভাব দিয়া গিয়াছেন, আর-একজন তাহাতে অন্য ভাব লাগাইলেন। নানা ভাবে নানা রসের সঙ্কীর্ত্তনের গান হইতে লাগিল। তাহার পর অনেক গান জমিয়া গেলে সংগ্রহ আরম্ভ হইল। সংগ্রহে পূর্ব্বরাগ হইতে আরম্ভ করিয়া বিরহ ও মিলন পর্য্যন্ত গানগুলি একটির পর একটি করিয়া সাজান হইল। অনেকগুলি সংগ্রহ হইলে শেষে একজন মহাকবি সেই গানগুলি ভাঙ্গিয়া একখানি মহাকাব্য রচনা করিলেন। বহুকাল পূর্ব্বে যেমন কুশীলবের গানগুলি একত্র করিয়া বাল্মীকি মুনি রামায়ণ করিয়াছিলেন, আমাদের মহাকবি রঘুনন্দন সেইরূপ সঙ্কীর্ত্তনের পদ ভাঙ্গিয়া "রাধামাধবোদয়" নামে এক মহাকাব্য রচনা করিলেন। রঘুনন্দনের "রাম-রসায়ন" লোকে পড়ে, কিন্তু "রাধামাধবোদয়" লোকে বড় পড়ে না। কিন্তু সঙ্কীর্ত্তনের সহিত যদি "রাধামাধবোদয়" পড়ে, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে কবি কিরূপ অদ্ভুত কারিকুরি করিয়া গিয়াছেন। আমার এক এক বার মনে হয়, রাধামাধবোদয়ই বৈষ্ণব ধর্ম্মের একখানা বড় মহাকাব্য।

বৈষ্ণবদের এই মহাকাব্যের পর আমরা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-দের কতকগুলি বাঙ্গলা কাব্য দেখিতে পাই। সেগুলি ঠিক সংস্কৃত কাব্যের ছাঁচে ঢালা। এইসকল কাব্যের মধ্যে বিদ্যাসুন্দরের গল্প প্রধান। গল্পটি সোজা, উহাতে ঘটনা অধিক নাই, কিন্তু সেই সামান্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া রস, ভাব ও অলঙ্কারের ছড়াছড়ি করা হইয়াছে। ইংরেজী যুগের পূর্ব্বে বাঙ্গালীর কাব্যের বিশেষত্ব এই যে, বাঙ্গালীরা একটি বিষয় লইয়া অনেকে কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। এক রামায়ণেরই অনেক রূপ বাঙ্গলা আছে, মহাভারতেরও আছে। মঙ্গলচণ্ডী, মনসা ও ধর্ম্মঠাকুরের গানের ত কথাই নাই। সত্যপীরের পাঁচালী যে কত আছে, গণিয়া ঠিক করা যায় না। সব বাড়ীতেই স্বতন্ত্র সত্যপীরের গান আছে।

প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে, আমাদের কাব্যে ও গানে ইংরেজী ভাব আসিয়া ঢুকিয়াছে। এই ইংরেজী ভাবের প্রধান মহাকাব্য "মেঘনাদবধ"। কাব্যের বিষয় আমাদের দেশের, কাব্যের নায়ক-নায়িকা আমাদের দেশের, রস ও ভাব অনেকটা আমাদের দেশের, কিন্তু আর-সবই বিলাতী। মাইকেল মধুসূদন দত্ত নানা ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন, নানা ভাষা হইতে উপমা সংগ্রহ করিয়াছেন, ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন ও সংস্কৃত কাঠামোয় সেগুলি সব সাজাইয়াছেন। মহাকাব্য-খানি ভালই হইয়াছে। কারণ ঐ কাব্য দেখিয়া ও ঐ কাব্য পড়িয়া যখন অনেকেই কাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ও কবি হইয়াছিলেন, তখন উহা যে শিক্ষিত-সমাজকে বিশেষ রূপে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছিল,

তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাহার পর আর এইরূপ মহাকাব্য হইল কই? যদি বল, মহাকাব্য কি রোজ রোজ হয়? হয় না সত্য, কিন্তু সে দিকে চেষ্টা কই? ও পথটা যেন লোকে ছাড়িয়াই দিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এখন মনে হয় যেন, বেশী দিন ভাবিয়া, বেশী দিন চিন্তিয়া বড় একখানা কাব্য লিখিয়া জীবন সার্থক করিব—সে চেষ্টাই লোকের মনে নাই। চটকদার দু চারটা গান লিখিয়া চট করিয়া নাম লইব, সেই চেষ্টাই যেন অধিক। গানের দিকে, ছোট ছোট কবিতার দিকে, চুট্‌কীর দিকেই লোকের ঝোঁক বেশী। উহাদের কবি আছে—চিরকালই থাকে, আমাদের দেশেও আছে। চুট্‌কীতে সময় সময় মুগ্ধও করে, কিন্তু চুট্‌কীই কি আমাদের যথাসর্ব্বস্ব হইবে? বড় জিনিস কি আর হইবে না? আমাদের সাহিত্যের খুব শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে আমরা আনন্দিত। বাঙ্গলায় যত বই বাহির হয়, ভারতবর্ষের আর-কোন ভাষায় তত হয় না। এটা আমাদের আনন্দের বিষয়। বাঙ্গলার যত বই অন্য ভাষায় তর্জ্জমা হয়, এত ভারতবর্ষের অন্য ভাষার হয় না। ইহাও আমাদের আনন্দের বিষয়। রবিবাবু "নোবেল প্রাইজ" পাইলেন, বাঙ্গলা ভাষার জয়জয়কার হইল; ইহাতে কে না আনন্দিত। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, ভবিষ্যতের কি হইতেছে? ঝোঁক যদি চুট্‌কীর উপর হয়, ক্রমে সে চুট্‌কীও যে খারাপ হইয়া যাইবে। কালিদাস ও ভবভূতির পর চুট্‌কী আরম্ভ হইয়াছিল; কেননা, শতক, দশক, অষ্টক, সপ্তশতী—এইসব ত চুট্‌কী-সংগ্রহ ছাড়া কিছুই নয়। তাই আমার ভয় হয় পাছে বাঙ্গলার কাব্যটা চুট্‌কীতেই অবসান হইয়া যায়।

পদ্য ও কাব্যের ইতিহাস খুব প্রাচীন হইলেও বাঙ্গলা নাটকের ইতিহাস তত প্রাচীন নয়। ছাপাখানা হইবার অনেক পরে নাটক আরম্ভ হয়। নাটকের মহারথীগণ একে একে অস্তগত হইয়াছেন। যাঁহারা আছেন, তাঁহারাও প্রাচীন হইয়াছেন। কিন্তু এখানেও দেখিতেছি ঐ ব্যাপার —লোকে যেন বেশী দিন ভাবিয়া বই লিখিতে চান না। বই পড়িলেই বোধ হয়, তাড়াতাড়ি করিয়া ছাপাইয়া নাম লইবার চেষ্টা। একজন প্রাচীন নাটককার বলিলেন, "আমি দশ বৎসর ধরিয়া 'রত্নাবলী'খানিকে বাঙ্গালা করিবার চেষ্টা করিতেছি, ঠিক মনের মত হইয়া উঠিতেছে না।" কিন্তু আবার দেখিতেছি অনেকে তিন মাস অন্তর একখানি করিয়া নাটক থিয়েটারে জোগান দিতেছেন। এক-একবার মনে হয় যেন, কিছুদিন নাটক লেখা বন্ধ করিলে ভাল হয়।

নবেলেও সেইরূপ দেখিতে পাইতেছি। নবেলের ইতিহাসও বেশী প্রাচীন নয়। কিন্তু এখানেও ঐ ভাব হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমবাবু দুই বৎসরের কমে একখানি নবেল লিখিতেন না। কিন্তু এখন হু হু করিয়া নবেল বাহির হইতেছে। এখানেও দেখিতে পাই, চুট্‌কীই অধিক। চুট্‌কী যে মন্দ, তাহা বলিতেছি না। অনেক চুট্‌কী অতি সুন্দর, বেশ মনে লাগে। অনেক সময় চুট্‌কীতে বেশ গুণপনাও প্রকাশ পায়। কিন্তু ভাবি, চুট্‌কীই কি আমাদের যথাসর্ব্বস্ব হইবে। চুট্‌কীর একটি দোষ আছে—যখনকার তখনই, বেশী দিন থাকে না। একখানা বই পড়িলাম, অমনি আমার মনের ভাব আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, যতদিন বাঁচিব ততদিন সেই বইয়ের কথাই মনে পড়িবে এবং সেই আনন্দেই বিভোর হইয়া থাকিব—এ রকম ত চুটকীতে হয় না। তাই চুটকীর চেয়ে কিছু বড় জিনিস চাই। সেই আকাঙ্ক্ষাতেই এত কথা বলিতেছি।

বাঙ্গলায় রচনার বই বড় কম, নাই বলিলেও হয়। যে কখানি সেকেলে বই আছে, প্রায়ই তর্জ্জমা। বাঙ্গালী নানা বিষয়ে ভাবিয়া চিন্তিয়া হেল্প সাহেবের মত বা এডিসন সাহেবের মত রচনা লিখিতেছে—এ ত দেখা যায় না। যাহা কিছু আছে এক কমলাকান্তের দপ্তরে—অতুল্য অমূল্য; আর ত দেখি না। আমাদের দেশের লোক এ পথটা কেন ছাড়িয়া দিতেছে, বুঝিতে পারি না।

জীবনচরিতে দিন কতক বাঙ্গালীরা খুব পটুতা দেখাইয়াছিল। কতকগুলি জীবনচরিত বাস্তবিক মহামূল্য রত্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু আরও চাই। এখনও জীবনচরিত ঠিক জীবনচরিত হয় নাই। দু চারখানি জীবনচরিতে দেখিতে পাই, কেবল জীবনের ঘটনাগুলি পর পর সাজান আছে। কিন্তু তাহাকে জীবনচরিত বলে না। ঐ সাজান ঘটনাগুলির কার্য্যকারণভাবগুলি সব দেখিতে হইবে।

সমাজটি বেশ করিয়া বুঝিতে হইবে। ইতিহাস ভাল করিয়া জানা চাই। তবে ত ভাল জীবনচরিত হইবে। একজন মানুষের জীবনচরিত দেখাইতে গিয়া তিনি যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন তাঁহাদ্বারা সমাজের, সাহিত্যের, ব্যবসায়ের, বাণিজ্যের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে—সেগুলি সব দেখান চাই। এরূপ দেখাইবার চেষ্টা অনেকবার হইয়াছে, যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য ও ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বঙ্কিমবাবুর ভাল জীবনচরিত আজিও বাহির হইল না! যিনি ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের "আদিত্যস্বরূপ" ছিলেন, তাঁহার একখানি ভাল জীবনচরিত আজিও বাহির হইল না। এ সম্বন্ধে একটা কথা বলা যাইতে পারে। মানুষ মরিলেই তাঁহার জীবনচরিত বাহির হওয়া, অনেক সময় ঠিক নয়। কারণ মানুষ থাকিলেই তাঁহার সম্বন্ধে 'সুবিধা' 'কুবিধা' দুই থাকে। যাহারা সুবিধা তাহারা শতমুখে তাঁহার সুখ্যাতি করিবে, যাহারা কুবিধা তাহারা শতমুখে নিন্দা করিবে—দোষ ছাড়া কিছুই দেখিতে পাইবে না। তাই মরিবার বিশ ত্রিশ বৎসর পরে জীবনচরিত লিখিলে ভাল হয়। কিন্তু তাহাতে আবার আর-এক দোষ হয়। অনেক ঘটনা লোকে ভুলিয়া যায়। জীবনচরিত সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় বড়ই ভাগ্যবান, কারণ তাঁহার মৃত্যুর পরই তাঁহার ভাই তাঁহার এক প্রকাণ্ড জীবনচরিত লেখেন। তাহার পর অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার আরও দুইখানি জীবনচরিত বাহির হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে ঘটনা ছাড় হইবার সম্ভাবনা কম। তবে পক্ষপাতশূন্য হইয়া তাঁহার জীবনচরিত লিখিবার সময় এখনও আসে নাই।

কাব্যের দোষগুণ-পরীক্ষা এখনও আরম্ভ হয় নাই বলিলেই হয়। বঙ্কিমবাবু ও ভূদেববাবু এ বিষয়ে দু চারটি রচনা লিখিয়া গিয়াছেন। সে রচনা কোন কাব্যের কোন বিশেষ অংশ ধরিয়া। পুরা কাব্যখানি পড়িয়া, তাহা সম্পূর্ণ-রূপে হজম করিয়া, তাহার দোষ-গুণ দেখান এখনও হয় নাই। বঙ্কিমবাবুর নবেলের দোষগুণ-পরীক্ষা দুই তিনবার হইয়া গিয়াছে, তিনি বাঁচিয়া থাকিতেই দুই একবার হইয়া গিয়াছে। দুই একটা রচনা পড়িয়া তিনিও অত্যন্ত খুসী হইয়াছিলেন। মাইকেলের দোষগুণও অনেকে পরীক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু সব কাব্য পড়িয়া মাইকেলের কবিতা বুঝাইবার চেষ্টা হয় নাই। এ বিষয়ে বাঙ্গলার একটা মস্ত অভাব আছে। সে অভাব দূর করিবার ভার একা দীনেশ বাবুর ঘাড়ে চাপাইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। এই একটা ব্যাপারে অনেকেই দেশের ভাল কাজ করিতে পারেন। কিন্তু নির্ভয়ে দোষগুণ দুইই দেখাইয়া দেওয়া দরকার। বঙ্কিমবাবু "বঙ্গদর্শনে" একবার চেষ্টা করিয়া-ছিলেন, তাহার পর সে চেষ্টা আর দেখি নাই। এখন সংবাদপত্রে ও মাসিকপত্রে যেসব দোষগুণ-পরীক্ষা হয়, সেটা যেন বিজ্ঞাপন দেওয়ার মত। "ওগো অমুক এই বই লিখিয়াছেন, তোমরা কেন'।"—এই যেন সে বিচারের মানে। অনেক মাসিকপত্র ও সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা বলেন, "আমাদের পড়িবার সময় নাই। গ্রন্থকারেরা আপনার গ্রন্থের দোষগুণ দেখাইয়া দিলে আমরা ছাপাইতে পারি।" এ কথাটা যে নিতান্ত মিথ্যা তাহা নহে, কিন্তু এরূপ দোষগুণ-বিচার আমরা চাহি না। আসামী জজ হইয়া বিচার করিবে, এটা বোধ হয় কেহই চাহিবেন না।

অনেকের সংস্কার বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতের কন্যা। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় সংস্কৃতকে বাঙ্গলা ভাষার ঠান্‌দিদি বলিয়াছেন। আমি কিন্তু সংস্কৃতকে বাঙ্গলার অতি-অতি-অতি-অতি-অতি-অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহী বলি। পাণিনির সময় সংস্কৃতকে ভাষা বলিত অর্থাৎ পাণিনি যে সময় ব্যাকরণ লেখেন, তখন তাঁহার দেশে লোকে সংস্কৃতে কথাবার্ত্তা কহিত। তাঁহার সময় আর-এক ভাষা ছিল, তাহার নাম "ছন্দস্"—অর্থাৎ বেদের ভাষা। বেদের ভাষাটা তখন পুরাণ; প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। সংস্কৃত ভাষা চলিতেছে। পাণিনি কতদিনের লোক তাহা জানি না, তবে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ সপ্তম শতকের বোধ হয়। তাহার অল্প দিন পর হইতেই ভাষা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরই তাঁহার চুলার ছাই কুড়াইয়া এক পাথরের পাত্রে রাখা হয়। তাহার গায়ে যে ভাষা লিখিত আছে, সে ভাষা সংস্কৃত নয়; তাহার সকল শব্দই সংস্কৃত হইতে আসা, কিন্তু সে ভাষা সংস্কৃত হইতে অনেক তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পরই অশোকের শিলালেখের ভাষা।

তাহার পর মিশ্রভাষা, ইহার কতক সংস্কৃত ও কতক আর-এক রকম। একটি বাক্যে দু রকমই পাওয়া যায়। এ ভাষায় বইও আছে, শিলালেখও আছে। তাহার পর সুঙ্গ ও খারবেলদিগের শিলালেখের ভাষা। তাহার পর সাত-কর্ণিদের শিলালেখের ভাষা। তাহার পর পালি ভাষা। তাহার পর নাটকের প্রাকৃত। সরল প্রাকৃতের সহিত আমাদের সম্পর্ক নাই। মাগধীর ও ওড্রমাগধীর সহিত আমাদের কিছু সম্পর্ক আছে। তাহার পর অনেক দিন কোন খবর পাওয়া যায় না। তাহার পর অষ্টম শতকের বাঙ্গলা। তাহার পর চণ্ডীদাসের বাঙ্গলা। তাহার পর বৈষ্ণব কবিদের বাঙ্গলা। সব শেষে আমাদের বাঙ্গলা।

সুতরাং সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙ্গলার সম্পর্ক অনেক দূর। যাঁহারা বাঙ্গলাকে সংস্কৃতের পথে চালাইতে চান, তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনাও খুব কম। সংস্কৃতের গতি একরূপ ছিল, এতদিনে বাঙ্গলার গতি আর-একরূপ হইয়া গিয়াছে। এখন এই বাঙ্গলাকে সংস্কৃতের দিকে চালাইবার চেষ্টা, আর গঙ্গার স্রোতকে হিমালয়ের দিকে চালাইবার চেষ্টা, একই রকম। সাত শত বৎসর মুসলমানের সহিত একত্র বাস করিয়া বাঙ্গলা মুসলমান হইতে অনেক জিনিস লইয়া ফেলিয়াছে। সেসব জিনিস বাঙ্গলার হাড়ে মাসে জড়িত হইয়াছে। এখন তাহাকে বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা কিছুতেই সফল হইবে না। মুসলমানেরা বাঙ্গলা ভাষাকে যেমন বদ্‌লাইয়া দিয়াছে, ভারতবর্ষের আর কোন ভাষাকে সেরূপ পারে নাই। আমাদের বাঙ্গলার বিভক্তি 'রা' ও 'দের' মুসলমানদের কাছ হইতে লওয়া। সে বিভক্তি তুমি ভাষা হইতে তাড়াইবে কি করিয়া? অথচ আমাদের পণ্ডিত লেখক মহাশয়েরা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিতে-ছেন, তাঁহারা মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করিবেন না। যে-সকল শব্দ একেবারে আপামর-সাধারণের ভিতর চলিয়া গিয়াছে, লিখিবার সময় সেগুলি তাঁহারা ব্যবহার করিবেন না। "কলম" মুসলমানী শব্দ, তাঁহারা কলমের বদলে "লেখনী" শব্দ ব্যবহার করিবেন, অথচ "লেখনীর" অর্থ—উড়েদের তালপাতায় আঁচড় কাটিবার লোহার খুন্তি, তাহাতে কালি লাগে না। "কলম" ও "লেখনী" দুটি একেবারে ভিন্ন জিনিষ। "দোয়াত" মুসলমানী কথা। দোয়াত লেখা হইবে না "মস্যাধার" লিখিতে হইবে। "পাট্টা" মুসলমানী কথা। পাট্টা লিখিবেন না, "ভোগ-বিধায়ক পত্র" লিখিবেন। "আদালত" লিখিবেন না, লিখিবেন—"বিচারালয়"। এইরূপে তাঁহারা বাঙ্গলাকে শুদ্ধ বা মার্জ্জিত করিয়া লইতে চান। তাঁহাদের সে চেষ্টা কখনই সফল হইবার নয়।

আবার এক দল আছেন, তাঁহারা চলিত কথা দেখিলেই নাক সিঁটকাইয়া উঠেন; বলেন—"ওটা ইতুরে কথা।" উহার বদলে তাঁহারা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে চান। আমরা বলি, "সময় আর কাটে না", তাঁহারা বলেন, "কাটেনা, ছি!—ইতুরে কথা।" বলেন, "সময় কর্ত্তন হয় না।" আমরা কথায় বলি "বাড়িয়ে গুছিয়ে লও।" তাঁহারা বলেন, "ছি! ও ইতুরে কথা। পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া লও।" আমরা বলি, "দল বাঁধিয়া কাজ করিতে হয়", তাঁহারা বলেন, "দলবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে হয়।" আমরা কথায় বলি, "এটা গালগল্প", তাঁহারা বলেন, "স্বকপোলকল্পিত।" আমরা বলি, "ভ্যাবা-চাকা খাইয়া গেল," তাঁহারা বলেন, "কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল।" এইরূপে তাঁহারা কেতাবের ভাষাকে কথা কওয়ার ভাষা হইতে অনেক দূরে আনিয়া ফেলিয়াছেন। এখন ইংরেজী ও সংস্কৃত পড়িতে যত কষ্ট হয়, তাঁহাদের সাধু ভাষা পড়িতেও তত কষ্ট হয়।

আর একদল আছেন, তাঁহারা পড়েন ইংরেজী, ভাবেন ইংরেজীতে, লিখিতে চান বাঙ্গলায়—সে একরকম সাহেবী বাঙ্গলা হইয়া পড়ে।

মোট কথা দাঁড়াইতেছে এই যে, বাঙ্গলা যখন একটা ভাল ভাষার মধ্যেই দাঁড়াইতেছে, তখন উহা কিছু পরিমাণে শিক্ষা করা আবশ্যক। উহার একটা স্বতন্ত্র ব্যাকরণ আছে, স্বতন্ত্র পদ-যোজনার প্রণালী আছে, পদ বাছিয়া লইবার প্রণালী আছে। সেগুলি নিপুণ হইয়া দেখার দরকার, তবে ত বাঙ্গলা লেখক হইবে? নহিলে বাঙ্গলা আমার মাতৃভাষা, আমি যাহাই লিখিব তাহাই বাঙ্গলা—এই বলিয়া রাশি রাশি ইংরেজী ও সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিয়া দিলে, তাহাকেও কি বাঙ্গলা বলিব? তাহা হইলে ত এটি খাসা বাঙ্গলা—

"আমি ল্যাণ্ডো গাড়ীতে ড্রাইভ করিতে করিতে হাওড়া ষ্টেশনে পঁহুছিয়া বেনারসের জন্য বুক করিলাম। ফার্ষ্ট ক্লাসে লোয়ার বার্থ ভেকাণ্ট ছিল না, আপার বার্থে বেডিংটা স্প্রেড্ করিয়া একটু সট ন্যাপ্ দিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় হুইসিল দিয়া ট্রেন ষ্টার্ট করিল।" ইহাকে কি আপনারা বাঙ্গালা বলিবেন ?

দেশের লোকে যেসকল শব্দ বুঝে, অথচ সত্য সত্য ইতুরে কথা নয়, যেসব কথা ভদ্র লোকের কাছে কহিতে আমরা লজ্জিত হই না, সেইসকল কথায় মনের ভাব ব্যক্ত করিলে লোকে সহজে বুঝিতে পারিবে, ভাষাও ভাল হইবে। "গালগল্প" লিখিতে আপত্তি কি ? গালগল্পে যেমন অর্থ বোধ হয় "স্বকপোলকল্পিত" বলিলে কি সে অর্থ বোধ হয়, না সকলে সহজে বুঝিতে পারে ? সুতরাং এইসকল সোজা কথা ছাড়িয়া দিয়া তাহার জায়গায় অপ্রচলিত, কঠিন—অনেক সময় অশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করার কি দরকার ? একবার রবিবাবু বলিয়াছিলেন, "লেখ না সংস্কৃত ! বাজারে তোমার বই কাটিবে না। তাহাতে তোমার কি ক্ষতি হইবে ? পোকায় ত কাটিবে ?" বাস্তবিকই বেশী সংস্কৃতওয়ালা বাঙ্গালা বই পোকাতেই কাটে !

এখন বাঙ্গলাকে এই সংস্কৃত ও ইংরেজীর হাত হইতে মুক্ত করিয়া সহজ করা, মিষ্ট করা ও সরল করা আবশ্যক হইয়াছে। এতদিন পণ্ডিত মহাশয়েরা ইচ্ছা-মত পারসী শব্দকে তাড়াইয়া দিতে পারিয়াছেন, কারণ বাঙ্গলার মুসলমানেরা বাঙ্গলা-সাহিত্যে লিখিতে আরম্ভ করেন নাই। এখন তাঁহারা বলিতেছেন, "চলিত মুসলমানী শব্দ তোমরা তাড়াইবে কেন ? তাড়াইবার তোমাদের কি অধিকার আছে ? যেসকল শব্দ তিন, চার, পাঁচ শত বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের ত ভাষায় থাকিবার কায়েমী স্বত্ব জন্মিয়া গিয়াছে। তোমরা সে স্বত্ব হইতে তাড়াইবার কে ?" শুধু যে এই কথা বলিয়া নিশ্চিন্ত আছেন তাহা নয়, তাঁহারা আরও বলিতেছেন, "তোমরা যদি মুসলমানী শব্দ তাড়াইয়া বড় বড় সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার কর, আর যদি বুঝিতে আমাদের বেশী কষ্ট হয়, তবে আমরা বড় বড় পারসী শব্দ, আরবী শব্দ ব্যবহার করিব ; আমাদের ভাষা স্বতন্ত্র করিয়া লইব—তোমাদের মুখাপেক্ষা করিব না।" সুতরাং ভাষার সমস্যাটি এখন বড় কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ বিষয়ে নবাব আলি চৌধুরী মহাশয় "বাঙ্গলা ভাষার গতি" নামে ঢাকায় যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, সেটি সকলেরই মন দিয়া দেখা উচিত। বাঙ্গলায় যখন অর্দ্ধেক মুসলমান, তখন তাহারা যে হিন্দুরা যাহা বলিবে তাহাই করিবে—এরূপ আশা করা যায় না। এখন উভয়ে মিলিয়া বাঙ্গলা কি হইবে স্থির করিয়া লওয়া উচিত। উহার একটা ব্যাকরণ ও অভিধান স্থির করিয়া লওয়া উচিত। লেখকদিগের স্বেচ্ছাচারিতার উপর ভাষার উন্নতি আর নির্ভর করিতে পারে না। যত দিন যাইতেছে কথাটা ক্রমেই শক্ত হইয়া দাঁড়াইতেছে। আমি বলি, যাহা চল্‌তি, যাহা সকলে বুঝে—তাহাই চালাও ; যাহা চল্‌তি নয়, তাহাকে আনিও না। যাহা চল্‌তি, তাহা ইংরেজীই হউক, পারসীই হউক, সংস্কৃতই হউক—চলুক। তাহাকে বদ্‌লাইয়া শুদ্ধ সংস্কৃত করিবার দরকার নাই। "রেলওয়েকে" "লৌহবর্ত্ম" করিয়া লইবার প্রয়োজন নাই। একজন শ্বশুর শব্দটাকে ইতুরে মনে করিয়া তাহার বদলে "শ্বশ্রূ মহাশয়" লিখিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন। এরূপ করা বড়ই অন্যায়।

ভাষাকে সোজা পথে চালান উচিত, এই ত গেল এক কথা। তাহার পরে আর-একটা কথা আছে—এই আমার শেষ কথা, সেটা নূতন কথা গড়া। বাঙ্গলার সমাজ এখন আর নিশ্চল নয়। যে ভাবে বহু শত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, সে ভাবে এখন আর কাটিতেছে না। নানা দেশ হইতে নানা ভাব আসিয়া বাঙ্গলায় জুটিতেছে। যেসকল ভাব প্রকাশ করিবার কথা বাঙ্গলায় নাই, তাহার জন্য কথা গড়িতে হইতেছে। যাহাদের চলিত ভাষার কথা লইয়াই গোলযোগ, নূতন ভাবে নূতন কথা গড়িতে তাহাদের আরও কষ্ট পাইতে হইবে, আরও বেগ পাইতে হইবে—সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি। পূর্ব্বে দেশে "মিউজিয়ম" ছিল না, এখন হইয়াছে। মিউজিয়মকে কি বলিব ? সংস্কৃত পণ্ডিত বলিলেন, "চিত্রশালিকা"। কথাটা কেহ বুঝিলও না, মিউজিয়মের ভাবও উহাতে প্রকাশ হইল না। চিত্রশালিকা বলিলে ছবির ঘর বুঝায়, সুতরাং

মিউজিয়ম বুঝাইল না। এ জায়গায় "মিউজিয়ম" শব্দ লইতে দোষ কি? দেশের লোকে কিন্তু চট্ করিয়া উহার একটা নাম দিয়া বসিয়াছে। তাহারা উহাকে "যাদুঘর" বলে। সুদূর পশ্চিমে উহাকে "আজবঘর" বলে। চিত্রশালিকার চেয়ে এ দুটা কথাই ভাল্। উহার একটা চালাইলে দোষ কি? বাঙ্গলায় আকাশে তারা মাপিবার যন্ত্রঘর ছিল না। যখন কলিকাতায় সেই ঘর হইল, পণ্ডিত মহাশয়েরা তাহার তর্জ্জমা করিলেন "পর্য্যবেক্ষণিকা"। কথাটা একে ত চোয়ালভাঙ্গা, তাহাতে আবার কঠিন সংস্কৃত—শুদ্ধ কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ। হিন্দুস্থানী গাড়োয়ানেরা অতশত বুঝে না—তাহারা উহার নাম রাখিল "তারা-ঘর", মোটামুটি উহার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিল, কথাটি শুনিতেও মিষ্ট। তবে উহা চালাইতে দোষ কি? এইরূপ অনেক নূতন জিনিস, নূতন ভাব নিত্যই আসিতেছে; তাহাদের জন্য কথা গড়া একটা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার বোধ হয়, বাঙ্গলা হইতেই ঐ সমস্যার পূরণ হওয়া ভাল, বাঙ্গলা কথা দিয়াই নূতন কথা গড়া উচিত। নিতান্ত না পারিলে, আসামী, উড়িয়া ও হিন্দী খুঁজিয়া দেখা উচিত; তাহাতেও না হইলে যে ভাষার ভাব, সেই দেশের কথাতেই লওয়া উচিত। আমরা ত চিরকালই তাহাই করিয়া আসিতেছি, নহিলে "বাতাবী লেবু", "মর্ত্তমান কলা," "চাঁপা কলা" কোথা হইতে পাইলাম? সেইরূপ এখনও সোজা বাঙ্গলায়, সোজা কথায় এইসকল নূতন জিনিসের নাম দেওয়া ও নূতন ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা উচিত; নহিলে কতকগুলা দাঁতভাঙ্গা কট্‌কটে শব্দ তৈয়ার করিয়া লইলে ভাষার সঙ্গে তাহা খাপ খাইবে না। যে দিকেই হউক ভাষা লইয়া স্বেচ্ছাচারিতা করাটা ঠিক নয়। ফরাসীরা যেমন একটা একাডেমী করিয়া কোন্ কোন্ শব্দ ভাষায় চলিবে, কোন্ কোন্ শব্দ চলিবে না ঠিক করিয়াছিলেন, আমাদেরও সেইরূপ একটা করিয়া লওয়া উচিত; নহিলে কথার সংখ্যায় আমাদের অভিধান অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে এবং কথার ভারে ভাষা অতল জলে ডুবিয়া যাইবে। *

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

* বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সাহিত্য-শাখার সভাপতির সম্বোধন লেখক মহাশয়ের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

কষ্টিপাথর

বৌদ্ধধর্ম্ম কোথা হইতে আসিল?

বৌদ্ধধর্ম্মের মতামত আচার ব্যবহার পূর্ব্বদেশ হইতেই আসিয়াছিল। বঙ্গ বগধ চের জাতির উল্লেখ ঐতরেয় আরণ্যকের একটি ব্রাহ্মণে অল্পদিন হইল পাওয়া গিয়াছে; ঐ শব্দগুলির অর্থ সায়ণ ধরিতে পারেন নাই; ইউরোপের পণ্ডিতেরাও ধরিতে পারেন নাই। বঙ্গ আমাদের বাংলা, বগধ মগধ, চের তামিল জাতির একটি শাখা যাহারা ছোটনাগপুরের ভিতর দিয়া কপিলবাস্তু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ঐতরেয় আরণ্যকে দেখা যায় যে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত ছিল আর্য্য দেশ; তাহার পূর্ব্বে ছিল বঙ্গ বগধ চের; উহার অধিবাসীরা পক্ষীবিশেষ, উহাদের ধর্ম্ম নাই, উহারা আর্য্যগণের শত্রু, আর্য্যগণের বসতি-বিস্তারে বাধা দেয় সুতরাং উহারা নরকগামী হইবে। আর্য্যরা যাহাদিগকে দেখিতে পারিত না, তাহারা হইত বানর, নয় ভল্লুক, নয় রাক্ষস—তামিলগণ তাহাদের কাছে বানর, কর্ণাটগণ ভালুক, লঙ্কার লোক রাক্ষস। সেইরূপ বাংলার লোক পাখী। বুদ্ধদেব সেই পাখীর দেশেই জন্মান; এই অঞ্চলেই জৈনধর্ম্মপ্রচারক মহাবীর জন্মান। চব্বিশজন বুদ্ধ ও চব্বিশজন তীর্থঙ্কর—প্রায় সকলেই পূর্ব্বাঞ্চলের লোক। শাক্যসিংহের পূর্ব্ববর্ত্তী কনকমুনি যেখানে নির্ব্বাণ লাভ করেন সেখানে কনকমুনির থাম্বা পাওয়া গিয়াছে। ইঁহারা খৃষ্টের পূর্ব্বে ছয় শতের লোক। বুদ্ধ ও মহাবীরের পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চলে পরকাল লইয়া নাড়াচাড়া হইতেছিল; পশ্চিমাঞ্চলে আর্য্যেরা যাগযজ্ঞ, দেশ দখল, শূদ্রগণকে দাস করিতে বিশেষ ব্যস্ত ছিল। বুদ্ধদেবের সময়ে ছয়টি ধর্ম্ম প্রচার হইয়াছিল,—গোশালা মংখলি-পুত্রের ধর্ম্ম আজীবক, মহাবীরের ধর্ম্ম নিগ্রন্থ, পূর্ণ কাশ্যপের ধর্ম্ম, অজিতকেশব কম্বলের ধর্ম্ম, সঞ্জয়ের ধর্ম্ম, পোকুদ কত্যায়ণের ধর্ম্ম। ইহারা সকলেই পূর্ব্বাঞ্চলের লোক। ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চলের লোক যে কেবল ধর্ম্ম লইয়াই থাকিত, এরূপ নহে; অস্ত্রচিকিৎসা, হস্তিশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, সংখ্যাশাস্ত্র, প্রভৃতির উৎপত্তি রচনা ও আরম্ভ এইদেশ হইতেই। আর্য্যগণ যখন সেই সুসভ্য দেশ আক্রমণ করিয়া তাহার রাজ্য সমাজ আচার ব্যবহার রীতিনীতি সব ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে আর্য্য সভ্যতা দান করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, সেই সময়ে তাহাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় উঠিতে লাগিল এবং সেইসকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে তাহাদের পূর্ব্বসমাজ, পূর্ব্ব-আচার ও পূর্ব্বব্যবহার বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাই এত ধর্ম্ম হইল। শেষ সব ধর্ম্ম উঠিয়া গিয়া এক বৌদ্ধ-ধর্ম্মই পূর্ব্বভারতে থাকিয়া পূর্ব্বভারতের অতীত গৌরবের সাক্ষী দিতে লাগিল। বৌদ্ধদিগের অনেক আচারব্যবহার আর্য্যগণের মধ্যে নাই। বৌদ্ধেরা সব মাথা কামায়। কিন্তু হিন্দুর পক্ষে মাথার মাঝখানে একটা শিখা রাখা নিতান্ত দরকার। আহার বৌদ্ধেরা বারটার আগে করিবে। বারটার এক মিনিট পরে আহার করিতে পারিবে না। তাহাদের কিছুই অখাদ্য নহে। যদি তাহাদের আহারের উদ্দেশ্যে মারা না হয়, তবে তাহারা সকল জন্তুর মাংস অনায়াসে খাইতে পারে। রাত্রে তাহারা পেয় খাইতে পারে কিন্তু চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য খাইতে পারে না। এটি আর্য্য-নিয়মের বিরোধী। আর্য্যগণ এক সূর্য্যে দুইবার খাইতেন না। সুতরাং দিনে একবার ও রাত্রে একবার। তাঁহাদের কল্যবর্ত্ত বা প্রাতরাশের কথা আমরা সর্ব্বদা শুনিতে পাই। একবার খাইয়া আর্য্যগণ চব্বিশ ঘণ্টা থাকিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। তাঁহাদের ক্ষুধা সতেজ ছিল।

বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ সোনা রূপা ছুঁইতে পারিতেন না। পূর্ব্বভারতে উঁহাদের ছোঁয়ার দরকার ছিল না। এদেশে কড়ির ব্যবহার অধিক ছিল, সোনা রূপার টাকা অতি কমই ব্যবহার হইত। বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ উচ্চাসন মহাসন ত্যাগ করিতেন। ভারতবর্ষের সব দেশেই খাটিয়ার উপর শোয়, পারতপক্ষে তাহারা মাটিতে শোয় না। কিন্তু বাঙ্গালায় তাহার বিপরীত। বৌদ্ধমতে মদ খাওয়া একবারে নিষেধ। গৃহস্থ যাহারা পঞ্চশীল মাত্র গ্রহণ করিবে তাহারাও মদ খাইতে পারিবে না। একথা আর্য্যগণের পক্ষে খাটে না। পুরাণে বলে পূর্ব্বে সকলেই সুরাপান করিতেন, কিন্তু শুক্রাচার্য্য শাপ দেওয়ায়, মদ খাওয়া মহাপাতকের মধ্যে গণ্য হয়। কিন্তু বৈধ মদ্য সকল সময়েই চলিত, যথা পশুযোগে সোম, সৌত্রামণিযোগে সুরা। এইরূপে দেখা যায় যে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ও আর্য্য-ধর্ম্মে অনেক কাজের কথায়ই প্রভেদ। তখন বৌদ্ধ-ধর্ম্ম কোথা হইতে আসিল বলিতে গেলে, আর্য্য-ধর্ম্ম হইতে আসিল একথা বলা যায় না; আর কোনও দিক হইতে আসিয়াছে। এত প্রাচীন কালে আর কোন্ দিক হইতে আসিবে? সুতরাং পূর্ব্বদিক হইতেই আসিয়াছে। বুদ্ধদেবের ধর্ম্মের মূল কথাগুলি, বিষয়গুলি যদি প্রাচীন ধর্ম্ম বা প্রাচীন সমাজ হইতে লওয়া, তবে তাঁহার নূতনত্ব কি? বুদ্ধদেবের পূর্ব্বেও লোকে সংসার ত্যাগ করিত, ভিক্ষু হইত, যেমন পার্শ্বনাথের দল, কনকমুনির দল। সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হইয়া থাকিতে গেলেই অহিংসা, অস্তেয় প্রভৃতি শীল গ্রহণ করিতে হয়, খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে খুব সাবধান হইতে হয়। প্রাচীন ভিক্ষুরাও তাহাই করিত। কিন্তু বুদ্ধদেব যে বিহার ও সঙ্ঘারামের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, ভিক্ষুদিগের শাসনের জন্য যে-সকল নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, এক জায়গায় অনেক ভিক্ষু থাকার যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, যে-সকল সুন্দর সুন্দর গল্প করিয়া তিনি সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিতেন, সেগুলি প্রাচীন ভারতে চলিত থাকিলেও, যে আকারে তাহাদিগকে এখন দেখিতে পাওয়া যায় সে আকারটি তাঁহার নিজের দেওয়া। তাঁহার সঙ্ঘ যেমন প্রবল হইয়াছিল এমন আর কাহারও হয় নাই। তিনি যে শুদ্ধ ভিক্ষুদের বন্দোবস্ত করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন তাহা নহে। তিনি গৃহস্থ বৌদ্ধদিগের জন্যও বেশ বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের পঞ্চশীল ও অষ্টশীল দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কিন্তু যাহাতে বুদ্ধের ধর্ম্ম এত বড়, যাহাতে বুদ্ধের নাম এত বড়, যাহার জন্য সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা তাঁহার ধর্ম্ম এত উদার, সেটি তাঁহার মধ্যমা প্রতিপৎ অর্থাৎ 'মাঝামাঝি চল, বাড়াবাড়ি করিও না।' তিনি নৈরঞ্জনার ধারে ছয় বৎসর তপস্যা করিয়া যে জ্ঞান প্রাপ্ত হন, যাহা পাইয়া তিনি আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া প্রচার করেন, যে জ্ঞান পাওয়ায় ইন্দ্র ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন, যাহা পাওয়ায় মার একেবারে হতাশ হইয়া পড়ে, সে এই মধ্যমা প্রতিপৎ—মাঝামাঝি চল। অহিংসা ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে বলিয়া, একেবারে মুখে কাপড় বাঁধিয়া চল যেন কোন কীট মুখে না ঢুকিতে পারে। রাত্রে প্রদীপ জ্বালিও না, পাছে তাহাতে কীট পতঙ্গ পড়ে। মলত্যাগ করিয়া তাহা কাঠি দিয়া নাড়িয়া দিও যেন পোকামাকড় তাহার মধ্যে লুকাইয়া না যায়। রাস্তায় চলিবার সময় একগাছ ঝাঁটা হাতে করিয়া যাইও যেন তোমার পায়ের চাপনে কোন পোকা মাকড় মারা না যায়। বুদ্ধদেব এতদূর বাড়াবাড়ি করিতে বলেন না। তিনি বলেন ইচ্ছা করিয়া কোন জীবহত্যা করিও না, তাহা হইলেই অহিংসা ধর্ম্ম পালন হইবে। তিনি বলেন অত্যন্ত ভোগাসক্তি ভাল নয়; কেবল ভাল খাইব, ভাল পরিব, তারি চেষ্টা করা, সেটা ভাল নয়; আবার ক্রমাগত উপবাস করিব, পঞ্চতপা করিব, চারিদিকে আগুন জ্বালিয়া সূর্য্যের দিকে চাহিয়া দিন কাটাইয়া দিব, ইহাও ভাল নয়। তিনি নিজে যথেষ্ট কঠোর ব্রত করিয়াছিলেন, যথেষ্ট উপবাস করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে বুঝিয়াছিলেন যে উহাতে কোনও লাভ নাই, শরীরের কষ্টই সার; তখন তাঁহার জ্ঞান হইল যে এগুলা করা ভাল নয়। ভোগও করিবে না, কঠোরও করিবে না, তবে করিবে কি? অশ্বঘোষ বুদ্ধের মুখে বলাইয়াছেন,—আহারঃ প্রাণযাত্রায়ৈ ন ভোগায় ন দৃপ্তয়ে। এই যে মধ্যমা প্রতিপৎ এইটিই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মজ্জা, সার, নিগূঢ় কথা, উপনিষৎ। বুদ্ধদেব যতদিন জীবিত ছিলেন, সর্ব্ব বিষয়ে মধ্যমা প্রতিপৎ অবলম্বন করিয়াই চলিতেন, শিষ্যদিগকে শিখাইতেন। দুটা বিরোধী জিনিস উপস্থিত হইলে, সে দুটার বিরোধ মিটাইয়া দিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

(নারায়ণ, চৈত্র) শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

* *
*

প্রতিমা-পূজা

আমাদের বাঙ্গলা দেশে আজকাল যেমন মৃণ্ময়ী প্রতিমা গড়াইয়া পূজা করা হয়, পূর্ব্বে এমন ছিল না। পূর্ব্বে বাঙ্গালার হিন্দু যন্ত্রের পূজা করিতেন, যন্ত্রের উপর হোম করিতেন এবং মন্ত্র জপ করিতেন। রাজা জগদ্রাম রায়ের সময় (১৪শ শতাব্দী) হইতে বাঙ্গালায় আধুনিক প্রথামত দুর্গোৎসব প্রচলিত হইয়াছে। গৃহস্থের গৃহে কালী গড়াইয়া পূজা আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দই (১৬শ শতাব্দী) চালাইয়া গিয়াছেন। জগদ্ধাত্রী পূজা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় হইতেই প্রচলিত হইয়াছে। সরস্বতী পূজা কখনই মাটির প্রতিমা গড়াইয়া হইত না; গ্রন্থের পূজা হইত এবং দেবীসূক্ত পাঠ করিয়া হোম হইত। প্রতিমা গড়াইয়া সরস্বতী পূজা বোধ হয় শত বৎসরের অধিক হইবে না। বাঙ্গালা ছাড়া ভারতের আর কোন প্রদেশে এমন ভাবে মৃণ্ময়ী প্রতিমার পূজা হয় না। মহারাষ্ট্রদেশে গণপতি-উৎসবে গণেশের মূর্ত্তি গড়াইয়া পূজা হয় বটে, কিন্তু সে মূর্ত্তি-গঠন উৎসবের অঙ্গবিশেষ, উপাসনার আলম্বনরূপে গ্রাহ্য নহে। ভারতবর্ষের অন্য সকল প্রদেশে ঘটস্থাপনা করিয়া, মন্ত্র অঙ্কিত করিয়া হোমযাগাদি যথারীতি হয়, প্রতিমা পূজা হয় না। তবে প্রতিষ্ঠিত দেবতার মন্দিরে যাইয়া পূজার ব্যবস্থা আছে বটে। সেসকল মন্দিরে শিবলিঙ্গ ছাড়া যন্ত্রাঙ্কিত প্রস্তরখণ্ড থাকে, তাহারই উপর সোনারূপার মূর্ত্তি গড়াইয়া আরোপ করা হয় মাত্র। কাশীর অন্নপূর্ণা আমাদের তন্ত্রোক্ত অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি নহে, একখণ্ড পাথরের উপর সোনার মুখ বসান মাত্র। কাশীর অনেক মন্দিরে পুরাতন শূন্যমূর্ত্তি, প্রজ্ঞাপারমিতার মূর্ত্তি, আধুনিক দেবতার আকার ধারণ করিয়া পূজিত হইতেছেন। অনেক স্থলে ধ্যানী বুদ্ধকে বিষ্ণু সাজাইয়া পূজা চলিতেছে। বাঙ্গালায় যেমন ঘরে ঘরে মাটির মূর্ত্তি গড়াইয়া পূজা হয়, পূজান্তে তাহার বিসর্জ্জন হয়, এ ব্যবস্থা ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে নাই, পূর্ব্বে বাঙ্গালায়ও ছিল না। দশম কি একাদশ শতাব্দীর পর হইতে এই পদ্ধতির ধীরে ধীরে প্রচলন হইয়াছে।

(নারায়ণ, চৈত্র) শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

* *
*

বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু

বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর বন্ধুত্ব বঙ্গে আদর্শস্বরূপ ছিল। তাঁহারা যখন উভয়েই ১৩।১৪ বৎসরের বালক তখন ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য হইয়া প্রভাকরে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। পত্রের দ্বারা এই সময় উভয়ের বন্ধুত্ব জন্মিল। কখনও কখনও পত্রের ভিতর কবিতা থাকিত,—আদরের কবিতা, গালাগালির কবিতা। প্রভাকরে দ্বারকানাথ দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্র কবিতাতে পরস্পরকে গালি দিতেন, সংবাদপত্রে উহাকে কবিতা-

যুদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিত। বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেন, রহস্যপ্রিয় দীনবন্ধুর জন্য উহা ঘটিয়াছিল। এইরূপ পত্রের দ্বারা বিদ্রূপ করার অভ্যাস তাঁহাদের চিরদিনই ছিল। দীনবন্ধু কোন এক বিশেষ সরকারী কার্য্যোপলক্ষে কাছাড়ে প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেস্থলের একজোড়া জুতা বাটি ফিরিয়া আসিয়া, বঙ্কিমচন্দ্রকে পাঠাইয়াছিলেন ও তাহার সহিত একখানি তিন কথায় পত্র লিখিয়াছিলেন,—"বঙ্কিম, কেমন জুতো!" বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরে লিখিয়াছিলেন,—"তোমার মুখের মতন।"

হাস্যরসে ও বাক্‌পটুতায় দীনবন্ধু অপরাজেয় ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, এইরূপ অনেকেই তাঁহার নিকট পরাস্ত হইতেন, কেবল এক ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে পরাভূত করিতেন। তিনি অতি সামান্য ব্যক্তি, অশিক্ষিত, কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধিমান। ইনি ভাঁড়ামিতে অদ্বিতীয় ছিলেন। সেকালের বিখ্যাত ভাঁড় শান্তিপুরের গুরুচরণ বাঁড়ুযো ওরুফে গুরোদুষ্যে মধ্যে মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের বাটীতে আসিতেন, কিন্তু তিনিও এই ব্যক্তিকে পরাস্ত করিতে পারিতেন না। ইঁহার নাম—মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি নাচ দেখিয়া নাচিতে, গান শুনিয়া গাহিতে শিখিয়াছিলেন। ইনি সর্ব্বদা বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতাদিগের বৈঠকখানায় থাকিতেন। একদিন কাঁঠালপাড়ার বাটীতে দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র এবং অনেকগুলি ভদ্রলোক বসিয়া আছেন, এক ভট্টাচার্য্য মহাশয় কথায় কথায় দীনবন্ধুর পত্নীর সুখ্যাতির কথা কহিতে লাগিলেন। সকলেই আনন্দ সহকারে উহা শুনিতেছিলেন, কিন্তু উল্লিখিত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একজোড়া ঘুঙুর পায়ে দিয়া একটি গীত ধরিয়া নাচিতে আরম্ভ করিলেন।

"কালা তাই বটে, কালা তাই বটে,
বাবলার গাছে গোলাপফুল ফোটে।"

এই গীত শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল। দীনবন্ধুও খুব হাসিলেন। দীনবন্ধুর পত্নীর সুখ্যাতির পর এই গীতের অর্থ এই বুঝাইল যে দীনবন্ধু বাবলাগাছ ও তাঁহার পত্নী গোলাপফুল—বাবলা গাছে গোলাপ ফুল ফুটিয়াছে। ঐ দিবস হইতে দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে পত্নীসহোদর বাচক সম্বোধন করিয়া ডাকিতেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহাতে নারাজ ছিলেন না। দীনবন্ধু তাঁহার পত্নীর নাম করিয়া ইহাঁকে ভাই-ফোঁটার দ্রব্যাদি দিতেন।

যশোহরে দীনবন্ধু ও বঙ্কিমের প্রথম চাক্ষুষ আলাপ হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ঐস্থানে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে বাহাল হইয়া যান, দীনবন্ধু তখন ঐ ডিভিসনের পোষ্ট-আফিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। একজন বঙ্গের প্রধান নাটককার হইলেন, দ্বিতীয় প্রধান ঔপন্যাসিক হইলেন। প্রথম ব্যক্তি নীলদর্পণ রচনা করিলেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি দুর্গেশনন্দিনী প্রণয়ন করিলেন। দীনবন্ধুর নীলদর্পণ সাহিত্য-সমাজে ও দেশের মধ্যে একটা সাড়া জাগাইয়া তুলিয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস সাহিত্য-জগতে ভাষার ও ভাবের নবযুগ প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। দুর্গেশনন্দিনীর আবির্ভাবে প্রথমতঃ কলিকাতার সংস্কৃতওয়ালারা খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। ইংরেজিওয়ালারা অবশ্য দু'হাত তুলিয়া বাহাবা দিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কোন পুস্তক প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে কাহাকেও পড়িয়া শুনাইতেন না, অথবা সহোদর ভিন্ন কাহাকেও সে পাণ্ডুলিপি স্পর্শ করিতে দিতেন না। দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে উহা কাঁঠালপাড়ার বাটীতে অনেককে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। বোধ হয় তাঁহার নিজের লেখনী-শক্তির প্রতি তখন তাদৃশ বিশ্বাস জন্মে নাই, সেজন্য অন্যের মতামত জানিবার আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল। আমাদের পিতাঠাকুরের সহিত ও ভ্রাতৃপ্রবর বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত অনেক ভদ্রলোক দেখা করিতে আসিতেন, ভাটপাড়ার খ্যাত্যাপন্ন পণ্ডিতগণও আসিতেন; একদিন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার হস্তলিখিত দুর্গেশনন্দিনী তাঁহাদের নিকট পাঠারম্ভ করিলেন। সকলে নিঃশব্দে বসিয়া শুনিতে লাগিলেন, কেহ ঐ ঘরে প্রবেশ করিলেও শ্রোতাগণ বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। একজন প্রাচীন ভদ্রলোক মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া বলিতেছিলেন "আমরি আমরি! কি বক্তৃতাই করিতেছেন!" এইরূপে দুইদিনে গল্পপাঠ শেষ হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম হইতে ধারণ ছিল যে, দুর্গেশনন্দিনীর ভাষ ব্যাকরণ-দোষে দূষিত। সেজন্য তিনি গল্পপাঠ শেষ হইলে উপস্থিত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাষায় ব্যাকরণ-দোষ আছে—উহা কি লক্ষ্য করিয়াছেন? ৺ মধুসূদন স্মৃতিরত্ন (সংস্কৃত কলেজের ৺ হৃষিকেশ শাস্ত্রীর পিতা) বলিলেন "গল্প ও ভাষার মোহিনী শক্তিতে আমরা এতই আকৃষ্ট হইয়াছিলাম যে আমাদের সাধ্য কি যে অন্যদিকে মন নিবিষ্ট করি!" বিখ্যাত পণ্ডিত ৺ চন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন বলিলেন যে "আমি স্থানে স্থানে ব্যাকরণ-দোষ লক্ষ্য করিয়াছি বটে, কিন্তু সেই সেই স্থানে ভাষা আরও মধুর হইয়াছে।" কিন্তু কলিকাতার যেসকল পণ্ডিত বাঙ্গালাভাষায় সংবাদ-পত্র চালাইতেন, তাঁহারাই কেবল নবীন লেখকের নবীন ভাষা অবতারণার অসমসাহসে খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। যতদিন না দেবীচৌধুরাণী প্রকাশিত হইয়াছিল ততদিন দুর্গেশনন্দিনীরই বিক্রয় বেশী ছিল।

শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্র অনুজের উপন্যাসখানি শুনিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছিলেন।

ভাটপাড়ার বিখ্যাত পণ্ডিতগণ মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন, তাঁহার অনুজ ৺ তারাচরণ বিদ্যারত্ন (শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণের পিতা) যিনি পাণ্ডিত্যে দেশ বিদেশে জয়ী হইয়া দিগ্বিজয়ী উপাধি পাইয়াছিলেন ও চন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন, মধুসূদন স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি ১০।১২ জন ধুরন্ধর পণ্ডিত বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট সর্ব্বদাই আসিতেন; বঙ্কিমচন্দ্র মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন। বঙ্কিমচন্দ্র ন্যায় কি দর্শনশাস্ত্রে ইঁহাদের সমকক্ষ ছিলেন না বটে, কিন্তু সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে এবং ইংরেজি-সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন থাকাতে পণ্ডিত মহাশয়েরা বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত শাস্ত্রবিচারে হটিয়া যাইতেন।

যখন বঙ্কিমচন্দ্র নেগুঁয়া মহকুমাতে ছিলেন, (এক্ষণে উহাকে কাঁথি মহকুমা বলে), তখন সেইখানে একজন সন্ন্যাসী কাপালিক তাঁহার পশ্চাৎ লইয়াছিল, মধ্যে মধ্যে নিশীথে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিত। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করিতেন, তবুও মধ্যে মধ্যে আসিত। যখন তিনি সমুদ্রতীরে চাঁদপুর বাঙ্গালায় বাস করিতেন, তখন এই সন্ন্যাসী প্রতিদিন গভীর রাত্রিকালে দেখা দিত। চাঁদপুরের কিছু দূরে সমুদ্রতীরে নিবিড় বনজঙ্গল ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা হইয়াছিল যে ঐ সন্ন্যাসী সমুদ্রতীরে সেই বনে বাস করিত। কিছুদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্র ঐ স্থান হইতে খুলনা মহকুমায় (খুলনা তখন জেলা ছিল না) বদলি হন। ঐ সময়ে ৩।৪ দিন বাটীতে অবস্থিতিকালে দীনবন্ধু আসিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে একটা প্রশ্ন করিলেন, যথা।—

"যদি শিশুকাল হইতে ষোলবৎসর পর্য্যন্ত কোন স্ত্রীলোক সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কাপালিক দ্বারা প্রতিপালিতা হয়, কখনও কাপালিক ভিন্ন অন্য কাহারও মুখ না দেখিতে পায়, কেবল বনে বনে সমুদ্রতীরে বেড়ায়, পরে সেই স্ত্রীলোকটিকে যদি কেহ বিবাহ করিয়া সমাজে লইয়া আইসে, তবে সমাজসংসর্গে তাহার কতদূর পরিবর্ত্তন হইতে পারে ও তাহার উপরে কাপালিকের প্রভাব কি একেবারে অন্তর্হিত হইবে?" যখন বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুকে এই প্রশ্ন করেন, তখন সেইস্থানে কেবল সঞ্জীবচন্দ্র ও আমি উপস্থিত ছিলাম।

সঞ্জীবচন্দ্র বড় ব্যঙ্গপ্রিয় ছিলেন। তিনি বলিলেন 'যদি দরিদ্র ঘরে তাহার বিবাহ হয় তাহা হইলে মেয়েটা চোর হইবে, বনজঙ্গলে ভাল দ্রব্যাদি খাইতে পাইত না, সমাজে আসিয়া ভাল খাদ্যদ্রব্যাদি দেখিয়া বড়

দুর্গাদাস, রাজপুত বীর—প্রাচীন চিত্র হইতে

শ্রীযুক্ত অনন্তরাজের সৌজন্যে মুদ্রিত।

U. RAY & SONS.

লোভী হইবে, দরিদ্রঘরে ভাল আহার জুটিবে না, পরের ঘরের চুরী করিয়া খাইবে, অলঙ্কারাদি চুরী করিয়া পরিবে।" পরে ব্যঙ্গ ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কিছুকাল সন্ন্যাসীর প্রভাব থাকিবে, পরে সন্তানাদি হইলে স্বামীপুত্রের প্রতি স্নেহ জন্মাইলে সমাজের লোক হইয়া পড়িবে, সন্ন্যাসীর প্রভাব তাহার মন হইতে একেবারে তিরোহিত হইবে।" ভাবগতিকে বুঝিলাম বঙ্কিমচন্দ্রের এ কথা মনোমত হইল না। দীনবন্ধু কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না।—ইহার পর দুই বৎসরের মধ্যে কপালকুণ্ডলা প্রকাশিত হইল।

বঙ্গদর্শনের বিদায় প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"দীনবন্ধু আমার সাহিত্যের সহায়, সংসারের সুখদুঃখের ভাগী।" বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম তিনখানি পুস্তক, দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী দীনবন্ধুর মতামত লইয়া প্রচারিত হইয়াছিল। বিষবৃক্ষ প্রচারের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি সেই সময়ে দীনবন্ধুর মৃত্যু হয়।

দীনবন্ধুরও সমস্ত পুস্তক বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত লইয়া প্রচারিত হইয়াছিল। "বিয়ে-পাগলা বুড়ো" পুস্তকখানির প্রচার করিতে বঙ্কিমচন্দ্র নিষেধ করিয়াছিলেন, সে জন্য উহা অনেক দিবস অপ্রকাশিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র-লিখিত দীনবন্ধু-জীবনীতেও উহার উল্লেখ আছে। দীনবন্ধুর "লীলাবতী"তে বঙ্কিমচন্দ্র স্থানে স্থানে লিখিয়াছিলেন, বন্ধুত্বহিসাবে, আমোদ করিয়া লিখিয়াছিলেন, কিন্তু হাস্যরসে দীনবন্ধুর লেখার সহিত সুর মিলিয়াছিল কিনা, জানি না। বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তকে কিন্তু দীনবন্ধু কখনও কিছু লেখেন নাই। তাঁহার কোন কোন পুস্তকে শিক্ষানবীশরূপে তাঁহার অনুজ এই ক্ষুদ্র লেখক দুই এক পরিচ্ছেদ লিখিয়াছে বটে।

আমি দুই একটি পরিচ্ছেদে এক মেটোমো করিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র দোমেটোমো করিয়াছিলেন। কোন্ পরিচ্ছেদে কি ঘটনা লিখিতে হইবে তাহা তিনি বলিয়া দিতেন, আমি সেইরূপ লিখিতাম, পরে তিনি উহা তাঁহার লেখার সুরের সহিত মিলাইয়া লইতেন। আমি উপযাচক হইয়াই লিখিতাম, কখনও কখনও তিনি ইচ্ছা করিয়াও আমাকে লিখিতে বলিতেন। কৃষ্ণকান্তের উইলের কোন কোন পরিচ্ছেদে আর উহার উইলচুরি পরিচ্ছেদে আমার একটু আধটু লেখা আছে। একদিন বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকান্তের উইলচুরি পরিচ্ছেদ লিখিতেছিলেন, তাঁহার দুইটি বন্ধু আসিলেন, তিনি কাগজ কলম ফেলিয়া উঠিলেন। আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম "কি লিখিতেছিলেন বলিয়া দিন, আমি উহা লিখিব।" তিনি আমার আবদার রক্ষা করিয়া হাসিতে হাসিতে লিখিতে অনুমতি দিয়া ঐ পরিচ্ছেদে যাহা লিখিতে হইবে বলিয়া দিলেন। আমি তখন ঐ হাসির অর্থ বুঝিতে পারি নাই, পরে লিখিতে বসিয়া বুঝিলাম—দেখিলাম "ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু আসিয়া বৃষভারূঢ় মহাদেবের কাছে এক কৌটা আফিং কর্জ্জ লইয়া এই দলিল লিখিয়া দিয়াই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বন্ধক রাখিয়াছেন, মহাদেব গাঁজার ঝোঁকে ফোরক্লোজ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।" এই পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন,—এই সুরে লেখা আমার অসাধ্য বুঝিয়া আমি এইখানে রোহিণীকে আনিয়া কৃষ্ণকান্তের সহিত সাক্ষাৎ করাইলাম এবং তাঁহাদের উভয়ের কথোপকথন আমার সাধ্যমতে লিখিলাম। পরদিন বন্ধুগণ চলিয়া গেলে বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকান্তের উইল লিখিতে বসিয়া ঐ পরিচ্ছেদে আমার লেখার প্রথমাংশ অর্থাৎ রোহিণীর সহিত কৃষ্ণকান্তের আফিমের ঝোঁকে কথোপকথন নূতন করিয়া লিখিলেন, আমার লেখার অবশিষ্ট অংশে "দোমেটোমো" করিতে হয় নাই, তবে এক আধ স্থানে "মাটী" লাগাইয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্য কিছুকাল আমাদের পরিবারে প্রায় সকলেরই মধ্যে সাহিত্যানুশীলন অর্থাৎ literary activity জন্মিয়াছিল, কিন্তু বঙ্গদর্শনের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে উহার অবসান হইল।

বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু উভয়ে আফিসের কি সাহেবসুভার কথা কহিতে ভালবাসিতেন না, ঐরূপ কথোপকথন তাঁহাদের ভাল লাগিত না। একরাত্রিতে কোন ডেপুটির বাড়ী একটা বড় ভোজ ছিল; ডেপুটিতে ডেপুটিতে ঘর পুরিয়া গিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতারাও উপস্থিত ছিলেন। একজন প্রসিদ্ধ ডেপুটি ইহার কিছু পূর্ব্বে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা এই সভাতে আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিতেছিলেন। তাঁহার কথা শেষ হইলে বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন :—

"ধনা এক জনা হয়েছে,
পেথের কলম কানে দিয়ে সাহেবের সঙ্গে কথা কয়েছে।"

এই ডেপুটি বাবু বঙ্কিমের বন্ধু ছিলেন। একজন ডেপুটি কোন বিশেষ সরকারী কার্য্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষেরা স্থির করিয়াছিলেন যে ঐ কার্য্য তিন বৎসরে শেষ হইবে, কিন্তু ডেপুটি বাবুটি ঐ কার্য্য দেড় বৎসরে শেষ করিয়া বাহবা পাইয়াছিলেন। ডেপুটি বাবু তাঁহার কার্য্যদক্ষতা ও কি প্রকারে এত অল্প সময়ের মধ্যে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় দিতেছিলেন। পরিচয় শেষ হইলে দীনবন্ধু বলিলেন "ওহে—, তবে তুমিই বুঝি ত্রেতাযুগে সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কা দগ্ধ করিয়াছিলে!"

ডেপুটি বাবুরা দীনবন্ধুকে যমের ন্যায় ভয় করিতেন, তাঁহার নিকটে বড় ঘেঁসিতেন না। কিন্তু নানা কারণে বঙ্কিমচন্দ্রের আনুগত্য করিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র কি প্রকৃতির ব্যক্তিদিগকে লইয়া বাটী আসিলে সর্ব্বদা আনন্দে থাকিতেন, তাহা একটি লোকের পরিচয়ে কতকটা বুঝিতে পারা যাইবে। এই লোকটি ব্যবসাবাণিজ্য করিতেন; কিন্তু বড় মূর্খ ছিলেন, আবার সেই সঙ্গে এইরূপ অভিমান ছিল যে চেষ্টা করিলে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর ন্যায় লেখক হইতে পারেন—সর্ব্বদা লিখিবার জন্য 'subject' খুঁজিতেন। একদিন সঞ্জীবচন্দ্র বলিলেন "আপনি চূত ফল সম্বন্ধে লিখুন, বেশ ভাল subject।" মুখোপাধ্যায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "চূত ফল কাহাকে বলে?" সঞ্জীবচন্দ্র বলিলেন "আম।"

কিছুদিন পরে মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটি প্রবন্ধ লিখিয়া আনিয়া আমাদের শুনাইলেন।

"আঁব অতি মিষ্ট, আঁব আবার অতি টক, বাগাতেঁতুলের মত টক, আঁব আঁশাল, কোন কোন আঁব আঁশাল হয় না, কারণ ভাল গাছের আঁব আঁশাল হয় না—ইত্যাদি!" এই প্রবন্ধের পাঠ শেষ হইলে আমাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্যামাচরণ বাবু গম্ভীর ভাবে উহার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন, সকলেই প্রশংসা করিলেন, কিন্তু একব্যক্তি হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না—তিনি বঙ্কিমচন্দ্র। মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই হাসিতে অতিশয় দুঃখিত হইয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন, পরে বঙ্কিমচন্দ্রের সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বস্ত হইয়া মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন, "তবে আমার প্রবন্ধটি ছাপাইয়া দিন।" বঙ্কিমচন্দ্র উহা হাত পাতিয়া লইলেন বটে, কিন্তু যেখানে রাখিয়াছিলেন সেইখানেই তাহা পড়িয়া রহিল। আমি উহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিলাম এবং রহস্যের জন্য মধ্যে মধ্যে অনেককে পাঠ করিয়া শুনাইতাম।

এখানে আর-একটি লোকের কথা বলিলে সেকালের পল্লীগ্রামের কবির পরিচয় পাইবেন। ইঁহার নিবাস আমাদের বাটীর অর্দ্ধক্রোশ পূর্ব্বে মাত্রালগ্রামে, নাম কৃষ্ণমোহন মুখুয্যে। ইনি একজন উপস্থিত কবি ছিলেন। এই কবি সর্ব্বদা বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের নিকট আসিতেন, সকলেই তাঁহাকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিত, কিন্তু কেহই তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র কখনও তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করেন নাই। একদিন কবি বঙ্কিমচন্দ্রকে বলিলেন, "আপনি

কখনও আমায় প্রশ্ন করেন নাই, আমার ইচ্ছা আপনার প্রশ্নের উত্তর দিই।" বঙ্কিমচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা।" অল্পক্ষণ পরেই একটি প্রশ্ন করিলেন—

"গগনেতে ডাকে শিবা হুয়া হুয়া করে।"

এই প্রশ্নে সকলেই বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এ কি উদ্ভট প্রশ্ন? যাহা কখনও পৃথিবীতে ঘটে নাই, তাহার কবিতা কিরূপে হইবে? আকাশে কখনও কি শেয়াল উঠিয়াছে যে গগনেতে হুয়া হুয়া করিয়া ডাকিবে?"

এইরূপে সকলে পরস্পরে বলাবলি করিতেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র এই ভর্ৎসনাতে মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন, কবিবর মস্তক নত করিয়া ভাবিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি চাহিয়া একটি কবিতা শুনাইতে লাগিলেন। ঐ কবিতার প্রথম দুই চারি পংক্তি শুনিবামাত্র বঙ্কিমচন্দ্র চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ঘাট হইয়াছে, আপনি অপরাজেয়।" পরে কবিবর সমুদয় কবিতাটি শুনাইলেন। উহার মর্ম্ম এই, লক্ষ্মণ শক্তিশেলে আহত হইলে ধন্বন্তরিপুত্র সুষেণের ব্যবস্থানুসারে হনুমান গন্ধমাদন পর্ব্বতে বিশল্যকরণীর পাতা আনিতে গিয়া উহা খুঁজিয়া না পাইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বত উপাড়িয়া লইয়া মাথায় করিয়া আসিতেছিলেন; ঐ পাহাড়ের শিবাগণ ভোরের সময় তাহাদের সংস্কারসিদ্ধ হুয়া হুয়া ডাক ডাকিয়া উঠিল; দারুণ গ্রীষ্মযন্ত্রণায় এক দম্পতি গৃহছাদে শয়ন করিয়াছিল, আকাশে ঐ হুয়া হুয়া ডাক শুনিয়া স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ করিয়া স্ত্রী বলিল,—

"কভু শুনি নাই নাথ, ভুবন-মাঝারে
গগনেতে ডাকে শিবা হুয়া হুয়া করে।"

দীনবন্ধু কলিকাতায় সদর আফিসে আসিলে পোষ্টাল ডিপার্টমেণ্টে তাঁহার একাধিপত্য জন্মিল। কত দরিদ্র-সন্তানকে তিনি চাকরী দিয়া অন্নদান করিয়াছেন তাহার গণনা হয় না। কাহাকেও কেরাণীগিরি, কাহাকেও সব-পোষ্ট-মাষ্টারী, যে যাহার যোগ্য তাহাকে তাহাই দিতেন। সেজন্য উমেদারগণের মধ্যে তিনি প্রাতঃস্মরণীয় ছিলেন।

একদিন আমাদের বাটীতে "গোলামচোর" খেলা হইতেছিল, এমন সময়ে একজন ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "দীনবন্ধু বাবুর নিকট আমার এক দরখাস্ত আছে।" দীনবন্ধু তখন খেলিতে বসিয়াছিলেন, বলিলেন "একটু বসুন পরে শুনিব।"

আমাদের গ্রামস্থ ৭।৮ জন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। দীনবন্ধু, সঞ্জীবচন্দ্র ও আরও কয়েকজন লোক খেলা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ও (যাঁহাকে দীনবন্ধু ভাইফোঁটা দিয়াছিলেন) খেলিতে বসিয়াছিলেন। দীনবন্ধু ও সঞ্জীবচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল যে এই বন্দ্যোপাধ্যায়কে চোর করিয়া সাজা দেন, কারণ ইনি সকলকেই গালি দিতেন। দীনবন্ধু, সঞ্জীবচন্দ্র এবং এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রও অনেক কৌশল করিতে লাগিলেন যাহাতে বন্দ্যোপাধ্যায় চোর হন; কিন্তু দীনবন্ধু সঞ্জীবচন্দ্রের মধ্যেই একজন চোর হইলেন। তখন বন্দ্যোপাধ্যায় মহানন্দে ঘুঙ্গুরজোড়াটি পায়ে দিয়া রূপচাঁদ পক্ষীর একটি গীত ধরিয়া তাঁহাদের সম্মুখে নাচিতে আরম্ভ করিলেন। নৃত্যগীত শেষ হইলে, দীনবন্ধু তখন পূর্ব্বোক্ত উমেদার ব্রাহ্মণকে নিকটে বসাইয়া তাহার কথা শুনিতে লাগিলেন। দীনবন্ধু ব্রাহ্মণটিকে পুত্রের সহিত তাঁহার আফিসে যাইতে বলিলেন। কিছুদিন পরে শুনিলাম ব্রাহ্মণ-পুত্রের পোষ্টআফিসে চাকুরীর জন্য নাম রেজিষ্টারী হইয়াছে, খালি হইলেই পাইবে। ইতিমধ্যে হুগলীর একটি ডেপুটি বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত দেখা করিতে আসিলেন, তাঁহার অধীনে রোডশেশ ডিপার্টমেণ্টে একটি চাকুরী খালি ছিল, ব্রাহ্মণ-পুত্রকে বঙ্কিমচন্দ্র ঐ চাকুরী দেওয়াইলেন। আবার মাস দুই বাদে দীনবন্ধু তাহাকে সাবপোষ্টমাষ্টারের পদে বাহাল করিয়া পরওয়ানা পাঠাইলেন। ঘটনাটি অতি সামান্য, এইরূপ উপকার অনেকেই করিয়া থাকেন, কিন্তু এই ব্রাহ্মণের দারিদ্র্যের পরিচয় শুনিয়া দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্র তাহার কষ্ট সত্বর বিমোচন করিতে কিরূপ ব্যস্ত হইয়াছিলেন তাহার পরিচয়স্বরূপ ইহা এ স্থলে উল্লেখ করিলাম।

পরোপকার দীনবন্ধুর জীবনের ব্রত ছিল, তাহার প্রথম পরিচয় নীলদর্পণ প্রচারে পাওয়া যায়। এ ত গেল একটা গুরুতর উদাহরণ। কিন্তু অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাতে সর্ব্বদা উহার পরিচয় পাওয়া যাইত। যে ঘটনা অন্যের পক্ষে রহস্যজনক, দীনবন্ধুর নিকট উহা কষ্টকর বোধ হইত। একজন মাতাল টলিয়া টলিয়া খানায় পড়িতেছে, লোকে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছে, হাসিতেছে, কিন্তু দীনবন্ধু তৎক্ষণাৎ দৌড়াইয়া গিয়া তাহার সাহায্য করিতেন। এই গুণটি বঙ্কিমচন্দ্রেরও ছিল। বহুকাল হইল সপ্তমী কি অষ্টমী পূজার রাত্রিতে, দীনবন্ধু, কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় (দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা) ও আমি নৈহাটী ষ্টেশন হইতে প্রশস্ত বারাকপুর ফীডার রোড দিয়া বাটী আসিতেছিলাম। ষ্টেশন হইতে প্রায় এক বিঘা পথ অন্তরে রাস্তার পশ্চিমদিকের ড্রেনে একটি ধবল পদার্থ দেখিলাম। মেটে মেটে জ্যোৎস্না, ভাল বুঝিতে পারিলাম না, এই ধবল পদার্থটি কি? উহা মাঝে মাঝে নড়ায়, প্রথমে বোধ হইল একটা গরু ড্রেনে পড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। কিন্তু নিকটস্থ হইয়া দেখিলাম উহা গরু নয় একটা বাবু মাতাল ড্রেনে পড়িয়া রহিয়াছে। আমরা তিনজনে তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া দেখিলাম, একটি নবীন যুবা, পরিপাটি বেশবিন্যাস, কিন্তু খানায় পড়িয়া উহা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে, তিনি আমাদের তিনজনেরই অপরিচিত। দীনবন্ধুর জিজ্ঞাসায় মাতাল বাবু বলিলেন, তিনি কলিকাতা হইতে শ্বশুরবাড়ী আসিতেছিলেন। ষ্টেশনের বাবুদের সহিত শুঁড়ির দোকানে মদ খাইয়া শ্বশুরবাটী যাইতে যাইতে খানায় পড়িয়া গিয়াছেন। শ্বশুরের নামধামেরও পরিচয় দিলেন। তাঁহার শ্বশুর সেখানকার একজন সম্ভ্রান্ত লোক, আমরা সকলেই তাঁহাকে জানিতাম। দীনবন্ধু শ্বশুরের নাম শুনিয়া বলিলেন "আপনি অমুকের জামাই!" এই কথাতে মাতালবাবু বলিলেন—"You know my father-in-law sir, then you are my father-in-law, sir, yes sir son-in-law sir, I sir son-in-law sir"—যতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন কেবল তাঁহার মুখে ঐ বুলি। দীনবন্ধু কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে তাহার উত্তর দিতে লাগিলেন, কিন্তু শেষ কথাতে "Yes sir son-in-law sir." এই ধুয়া বরাবরই ছিল। পৃথিবীর উপরিস্থ পদার্থের প্রতি মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি যেমন স্যার আইজাক নিউটন আবিষ্কার করিয়াছিলেন, ঐদিন আমরা মাতালের প্রতি খানাডোবার আকর্ষণশক্তি আবিষ্কার করিলাম। কেননা মাতাল বাবু যেদিকে খানা কেবল সেইদিকেই টলিয়া টলিয়া আসিতেছেন, পূর্ব্ব দিকে সমতল ভূমি, সেদিকে কোনমতে টলিবেন না। ইহা দেখিয়া দীনবন্ধু কোমরে চাদর জড়াইয়া তাঁহার বাম হাতখানি ধরিলেন। আমি দক্ষিণ-দিকে অর্থাৎ ড্রেনের দিকে দাঁড়াইলাম ও তাঁহাকে ঠেলিয়া রাখিতে লাগিলাম। এই প্রকারে কিছুদূর যাইয়া দীনবন্ধুর কষ্ট দেখিয়া আমি বলিলাম, "আপনি ছাড়িয়া দিন, আমি ড্রেনের দিকে আছি, কোনমতে বাবুকে খানায় পড়িতে দিব না।" তিনি বলিলেন, "না হে না"। তিনি আমাকে বিশ্বাস করিলেন না। আমার তখন ২২।২৩ বৎসর বয়স। পশ্চিমদিকে বৈদিকপাড়ার একটি গলি হইতে দুইটি বৈদিক ঠাকুর বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন। দীনবন্ধুকে তাঁহারা চিনিতেন, আনন্দ সহকারে তাঁহার সহিত কথা কহিতে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু দীনবন্ধু একজনের হাত ধরিয়া টানাটানি করিতেছেন দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "একি, ইনি কে!" তখন মাতালরাজ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বুক চাপড়াইয়া "Son-in-

law sir, yes sir son-in-law sir" বলিয়া তাঁহাদের দিকে ধাবমান হইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দীনবন্ধু তাহার হাত ছাড়িলেন না। সহসা এইরূপ সম্বোধনে বৈদিক-ঠাকুরদ্বয় নিঃশব্দে টিকি উড়াইয়া দৌড়িতে লাগিলেন, তাঁহাদের চটিজুতার ফট্‌ফট্ শব্দ অনেকক্ষণ ধরিয়া শুনিতে লাগিলাম—বৈদিক ঠাকুরেরা দাঁতাল মাতালকে' বড় ভয় করিতেন। এইরূপে প্রায় ১০।১৫ মিনিটে আমরা বাটী পৌছিলাম, পরে অনেকক্ষণ ধরিয়া দীনবন্ধুকে বাতাস দিতে হইল। যতক্ষণ রাস্তায় মাতালকে ধরিয়া ছিলেন ততক্ষণ তিনি গম্ভীর ভাবে ছিলেন; এক্ষণে বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতাদিগকে দেখিয়া নিজমূর্ত্তি ধরিলেন। ঘামিতেছেন, হাঁপাইতেছেন, আবার হাসাইতেছেন, ও হাসিতেছেন। এথানে বলা বাহুল্য মাতালবাবুকে খাওয়াইয়া পাল্কি করিয়া শ্বশুরবাটী পাঠান হইল, শ্বশুরবাটী গ্রামান্তরে।

অজ্ঞান অপরিচিত ব্যক্তি, যাহার পেশা মাতাল হইয়া থানায় পড়া, তাহাকে কে এরূপ যত্ন করিয়া আশ্রয় দিয়া থাকে? যে দেয় সে দীনবন্ধু। দীনবন্ধু বিপদগ্রস্ত লোককে প্রাণপণে সাহায্য করিতেন। করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার একটি বিশেষ রোগ ছিল, বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া যদি উহাকে নাটকোপযোগী মনে করিতেন, তাহা হইলে কোন নাটকে সে চরিত্রটি অঙ্কিত করিতেন। এই মাতাল বাবুই "সধবার একাদশীর' "ভোলা" মাতাল।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক বন্ধু ছিল, দীনবন্ধুর অসংখ্য বন্ধু ছিল, কিন্তু ইঁহারা দুইজনে পরস্পরের প্রাণতুল্য বন্ধু ছিলেন। যখন বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয় তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "সাহিত্যের সহায়" দীনবন্ধুর নিকট বিশেষ সাহায্য পাইবেন এমন ভরসা করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গদর্শন প্রকাশের অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইল। এই সময়ে তাঁহার জন্য বঙ্গসমাজের চারিদিক হইতে ক্রন্দনরোল উঠিল, কেহ বা সংবাদপত্রে, কেহ বা মাসিক পত্রিকাতে, কেহ বা কবিতাতে কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু বঙ্গদর্শন মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল। ইহা অনেকে লক্ষ্য করিয়া অনেক কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু দীনবন্ধুর শোকে বঙ্গদর্শনের যে কণ্ঠরোধ হইয়াছিল তাহা কেহ বুঝিতে পারেন নাই। প্রায় তিন বৎসর পরে যখন বঙ্গদর্শন বিদায়গ্রহণ করিল তখন বঙ্কিমচন্দ্র ঐ বিদায়-প্রবন্ধে বঙ্গদর্শন-লেখকগণের নিকট কৃতজ্ঞতাস্বীকার করিতে গিয়া দীনবন্ধুর কথা উত্থাপন করেন। কিন্তু কিরূপ কাতরতার সহিত উত্থাপন করিয়াছিলেন তাহা নিম্নের কয়েকছত্রে প্রকাশ পাইবে :—

"আর-একজন আমার সহায় ছিলেন—সাহিত্যে আমার সহায়, সংসারে আমার সুখদুঃখের ভাগী—তাঁহার নাম উল্লেখ করিতে পারিতেছি না। এই বঙ্গদর্শনের বয়ঃক্রম অধিক হইতে না হইতেই দীনবন্ধু আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার জন্য তখন বঙ্গসমাজ রোদন করিতেছিল, কিন্তু এই বঙ্গদর্শনে তাঁহার নামোল্লেখও করি নাই। কেন, তাহা কেহ বুঝে না। আমার যে দুঃখ, কে তাহার ভাগী হইবে? কাহার কাছে দীনবন্ধুর জন্য কাঁদিলে প্রাণ জুড়াইবে? অন্যের কাছে দীনবন্ধু সুলেখক, আমার কাছে প্রাণতুল্য বন্ধু—আমার সঙ্গী। সে শোকে পাঠকের সহৃদয়তা হইতে পারে না বলিয়া, তখনও কিছু বলি নাই, এখনও আর কিছু বলিলাম না।"

বস্তুতঃ আমরা সকলেই লক্ষ্য করিতাম দীনবন্ধুর মৃত্যুর পর হইতে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কথা উত্থাপন করিতেন না। যদি কেহ দীনবন্ধুর কথা বা তাঁহার রহস্য-পটুতার কথা কহিত, তখনই বঙ্কিমচন্দ্রের একটা পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইত, তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন। ইহাতে আমরা বুঝিতাম যে তিনি দীনবন্ধুর শোক ভুলিতে পারেন নাই, দীনবন্ধুর স্মৃতি তাঁহার কষ্টকর হইয়াছিল। প্রায় ৮।৯ বৎসর পরে "আনন্দ-মঠের" উৎসর্গ-পত্রে "কুমারসম্ভব" হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন, "হে ক্ষণভিন্ন সুহৃদ আমাকে ফেলিয়া কোথায় গেলে!" বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয় বড় স্নেহপ্রবণ ছিল।

(ভারতী, চৈত্র) শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দেশে বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠা

বিজ্ঞান, কলা ও বার্ত্তা।

বিজ্ঞান কি তাহা বুঝা যাউক। কেহ কেহ বলিয়াছেন, কোন বিষয়ের বিশেষ জ্ঞান বি-জ্ঞান, কিংবা যাবতীয় বিষয়ের বিশেষ জ্ঞান বিজ্ঞান। এই অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। একটু সঙ্কোচ করিয়া মোক্ষ-বিষয়ক জ্ঞান বিজ্ঞানের বহির্ভূত করা হইয়াছে। অমরকোষের মতে,—শিল্প ও শাস্ত্রের যে জ্ঞান, তাহা বিজ্ঞান। শিল্প চিত্রাদি, শাস্ত্র ব্যাকরণাদি। এই অর্থও বিস্তৃত হইল। আর একটু সঙ্কোচ করা যাউক। অমরকোষের টীকাকার রঘুনাথ বলেন, বিরূপং জ্ঞানং বিজ্ঞানং। বিভিন্ন রূপের যে জ্ঞান তাহা বিজ্ঞান। চিত্রশিল্পে বিভিন্ন মূর্ত্তি, ব্যাকরণ-শাস্ত্রে শব্দের নানা রূপ প্রদর্শিত হয়। এই কারণে শিল্প ও ব্যাকরণ বিজ্ঞান। কিন্তু এই অর্থ আমাদের আলোচ্য বিজ্ঞানের নহে। নানা রূপে প্রকৃতি কার্য্য করিতেছেন; প্রকৃতির এই যে অসংখ্য রূপ, রূপপরিবর্ত্তন-প্রবৃত্তি তাহার জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। ক্ষিতি অপ্ তেজাদি পঞ্চভূত আমাদের পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়। এই পাঁচভূতের জ্ঞান, বিজ্ঞান, ভৌতিক বিজ্ঞান। প্রকৃতি বহুভেদবিশিষ্ট বিচিত্র। ইহার উপাদান জড় কল্পিত হইয়াছে; শক্তি জড়কে স্পন্দিত করিতেছে। এই জড়-শক্তিময়ীর জ্ঞান বিজ্ঞান, জড়-বিজ্ঞান। আমরা যে-ভাবেই দেখি, সেই একেরই জ্ঞান; এইহেতু বিজ্ঞান সংজ্ঞা দ্বারা, প্রাকৃতিক, ভৌতিক বা জড়বিজ্ঞান বুঝি।

কখন কখন গ্রাম্যজন কলেজের বিজ্ঞানশালায় আসিয়া সজ্জা ও উপকরণাদি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করে, এখানে আপনারা কি করিতেছেন? বলিতে হয় খেলা করিতেছি; পণ্ডিত দেখিলে বলিতে হয় প্রকৃতির সহিত খেলা করিতেছি। এই উত্তরে পণ্ডিত দর্শক সন্তুষ্ট হন না। কিন্তু বুঝাইবারও উপায় নাই। পঠন, পাঠন, অধ্যাপন, ইহাই ত বিদ্যালয়ে হইয়া থাকে। পঠন পাঠনাদি বিদ্যালয়ের

কাজ বটে; কেননা বাগ্‌দেবী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী। শুক্রাচার্য্যও বলিয়াছেন, যদ্ যৎস্যাৎ বাচিকং সম্যক্ কর্ম বিদ্যাভিসংজ্ঞকম্, যাহা যাহা সম্যক্ বাচিক কর্ম তাহা বিদ্যা। বিদ্যালয়ে মনন ব্যতীত বাগিন্দ্রিয় প্রধান; বিজ্ঞানালয়ে মনন ব্যতীত চক্ষুকর্ণনাসিকাদি পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রধান। বিজ্ঞানালয়ে এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞানার্জন হইয়া থাকে।

কিন্তু দর্শক এই উত্তরেও সন্তুষ্ট হন না। তিনি প্রশ্ন করেন, ফল কি? উত্তরে প্রতিপ্রশ্ন করি, বিদ্যার ফল কি? বিদ্যায়াশ্চ ফলং জ্ঞানং, আর, বিদ্যা দদাতি বিনয়ং। বিদ্যার ফল জ্ঞান আর বিনয়; বিজ্ঞানেরও ফল তাই। বোধ হয় বিজ্ঞানের দ্বারা বিনয় অধিক লাভ হয়। কারণ জ্ঞানের মূলে জ্ঞানেন্দ্রিয়, যাহার সাহায্যে আমরা সৎ-অসৎ, সত্য-মিথ্যা পরীক্ষা ও বিবেক করিয়া থাকি। প্রকৃতির নিকট প্রতারণার ঠাঁই নাই। জ্ঞান ও বিনয়, এই দুই কাম্য করিয়া বলা যায়, বিদ্যার্থে বিদ্যা অভ্যাস কর, বিজ্ঞানার্থে বিজ্ঞান অভ্যাস কর। দুই-ই ফলে এক।

কিন্তু জ্ঞান ও বিনয় এই দুইএর প্রয়োজন কি? চরকে ভগবান্ আত্রেয় বলিয়াছেন, মানবের তিন এষণা, অন্বেষণ, ইচ্ছা আছে। প্রথম প্রাণৈষণা, প্রাণরক্ষার ইচ্ছা, কারণ প্রাণত্যাগে সর্ব্বত্যাগ। প্রাণৈষণার পর ধনৈষণা, ধন প্রাপ্তির ইচ্ছা, কারণ ধন না থাকিলে পাপী হইতে হয়, আয়ু দীর্ঘ হয় না। অনন্তর পরলোকৈষণা, পরলোকে সদ্গতির চিন্তা। এই তিন এষণার পক্ষে জ্ঞান ও বিনয় সহায়। প্রাণৈষণা হইতে আয়ুর্বিদ্যার, ধনৈষণা হইতে বার্তা ও কলার, এবং পরলোকৈষণা হইতে দর্শন ও ধর্ম-শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। বিজ্ঞান দ্বারা প্রথম দুই এষণার কতদূর সিদ্ধি হইয়াছে তাহা পৌরজনের নিকট অবিদিত নাই। নীতিকার শুক্রাচার্য্যও বলিয়াছেন, সংসৃতৌ ব্যবহারায় সারভূতঃ ধনং স্মৃতম্—সংসারে ব্যবহারের নিমিত্ত ধনই সার। ধন নইলে প্রাণরক্ষা হয় না—ইহা ত প্রত্যক্ষ হইতেছে।

কিন্তু কিসে ধন আসিতে পারে? সুবিদ্যয়াসু সেবাভিঃ শৌর্য্যেণ কৃষিভিস্তথা। কৌসীদ বৃদ্ধ্যাপণ্যেন কলাভিশ্চ প্রতিগ্রহৈঃ। যয়া কয়াচাপি বৃত্ত্যা ধনবান স্যাৎ তথাচরেৎ॥ উত্তমবিদ্যা, উত্তমসেবা যেমন রাজসেবা, শৌর্য যেমন সৈনিকের, কৃষি, কুসীদবৃত্তি যেমন মহাজনি বেঙ্কিং, বাণিজ্য, কলা ও প্রতিগ্রহ—দান প্রাপ্তি ও গ্রহণ, ইত্যাদি বৃত্তি এমন আচরণ করিবে যাহাতে ধনবান্ হইতে পারিবে। ইহা আমাদের দেশের নীতি, সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের নীতি। জ্ঞান ও বিনয় থাকিলে এইসকল বৃত্তি সম্যক্ আচরিত হয়। কিন্তু কলা কাহাকে বলে? সংস্কৃত কলনা বশীভূতত্ব, বশতা। ইহা হইতে, অনেক-রূপাবির্ভাবকৃতি জ্ঞানং কলা স্মৃতা। এক পদার্থের নানা আকারে আবির্ভাব করিবার জ্ঞানের নাম কলা। যেমন কার্পাসের সূত্রকর্তন এক কলা, বস্ত্রবয়ন আর-এক ক।। করিতে জানার নাম কলা। একারণ শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন, শক্তো মূকোঽপি যৎকর্ত্তুং কলাসংজ্ঞং তু তৎ স্মৃতম্—যাহা মূক ব্যক্তিও করিতে পারে তাহা কলা। মূক বিদ্যাবান্ হইতে পারে না। বিদ্যা বাচিক কর্ম্ম, কলা হাস্তকর্ম্ম, বিজ্ঞান বুদ্ধীন্দ্রিয় কর্ম্ম। কারু হাস্ত কর্ম করে, এবং যে কারু কলাভিজ্ঞ ও কলা-সংস্কর্ত্তা তিনি শিল্পী। সংস্কর্ত্তা তৎকলাভিজ্ঞঃ শিল্পী প্রোক্তো মনীষিভিঃ (শুক্র)। প্রকৃতিদত্ত পদার্থে বুদ্ধি-প্রয়োগ করিয়া হস্তদ্বারা সিদ্ধির নাম কলা। আকর হইতে লৌহবহিষ্করণ লৌহকলা, বালুকা ও ক্ষারযোগে কাচকরণ কাচকলা, এবং পুষ্পমাল্যরচনা মাল্যকলা, গীতবাদ্যাদি সঙ্গীতকলা, ইত্যাদি। কোন কলা লৌকিক উপযোগের নিমিত্ত, কোন কলা আনন্দের নিমিত্ত। কারুকলা ও নন্দকলা বলি, ভাগ যাহাই করি, বিদ্যাহ্যনন্তাশ্চ কলাঃ সংখ্যাতুং নৈব শক্যতে—বিদ্যা ও কলা অনন্ত, সংখ্যা করিতে পারা যায় না।

কিন্তু বিদ্যা ও কলা অভ্যাস ব্যতীত জীবিকার অন্য উপায় আছে। তন্মধ্যে বৈশ্য অর্থাৎ প্রজাবর্গের যে বৃত্তি তাহা বার্ত্তা। কুসীদকৃষিবাণিজ্যং গোরক্ষ বার্ত্তয়োচ্যতে। —কুসীদ প্রয়োগদ্বারা ধনবৃদ্ধি, কৃষি, বাণিজ্য ও পশুপালন এই চারি বার্ত্তা নামে কথিত হয়। কৃষি ও পশুপালনের নিমিত্ত মানুষ আয়োজন করে, কিন্তু ফল প্রকৃতিদত্ত। আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যাবিশেষ; কিন্তু চিকিৎসাবৃত্তি বিদ্যা নহে, কলা নহে। বাণিজ্য-বৃত্তি ত্রিবিধ দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়। (১) স্বচ্ছন্দলব্ধ দ্রব্যের, যেমন মণি মুক্তার ও কাষ্ঠ ও

আরণ্যবৃক্ষ-ফলাদির; (২) কৃষি ও পশুপালন দ্বারা লব্ধ দ্রব্যের, যেমন ধান গমের ঘি দুধের; (৩) কলাজাত দ্রব্যের। বাণিজ্য ব্যতীত সমাজ টিকিতে পারে না এবং কলা ও বার্ত্তার নিমিত্ত বাধুর্ষির প্রয়োজন।

বার্তা ও কলা হইতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি। বার্তা ও কলায় বিজ্ঞানের স্থিতি। জীবনধারণপ্রবৃত্তি বার্তা ও কলার জননী। বার্তা ও কলার অনুষ্ঠানে প্রকৃতির রহস্য উদ্ভেদ আরম্ভ হইয়াছিল। একথাও স্বীকার্য্য,—জ্ঞানান্বেষণা, জ্ঞানৈষণা, মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এই এষণার মূলে কিন্তু জীবনসংগ্রাম বিদ্যমান। প্রকৃতি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কিছুই দেন না; সব বুদ্ধিবলে কাড়িয়া লইতে হয়। আমি আহার বিনা পড়িয়া থাকি, প্রকৃতি বলেন, কর কি! কিন্তু এই পর্য্যন্ত। তারপর আমাকে দেখিয়া শুনিয়া শিখিয়া খুঁজিয়া লইতে হইবে। কোথায় কোন্ দেশে কোন্ গাছে সুমিষ্ট ফল পাকিয়াছে, তাহা আমাকে খুঁজিয়া লইতে হইবে। তেমন ফল আমার দেশে আমার গ্রামে বাড়ীর কাছে ফলাইতে পারি কি না, এই এষণা আসিবে। এইরূপ এষণা হইতে বিজ্ঞানের জন্ম। কৃষক উত্তম শস্য অন্বেষণ করে; অধিক শস্য আকাঙ্ক্ষা করে; কিন্তু পায় না। দেখে, কোথায় উত্তম শস্য অধিক শস্য জন্মিয়াছে। কেন জন্মিয়াছে তাহার কারণ অন্বেষণ করে। কারণ ঠিক কি না পরীক্ষা করিয়া দেখে। হয়ত কারণ অসিদ্ধ হয়, হয়ত সিদ্ধ হয়। অসিদ্ধি ও সিদ্ধি, সিদ্ধি ও অসিদ্ধি, চলিতে থাকে। বিজ্ঞানেও তাই।

বিজ্ঞানের অনুসন্ধানমার্গ পুরাতন। চরকে, পার্থিব ঔদ্ভিদ জাঙ্গম এই ত্রিবিধ দ্রব্য কথিত হইয়াছে। ইহাদের জাতি গুণ ক্রিয়া অনুসন্ধানে জ্ঞানের উৎপত্তি। জ্ঞানের পরীক্ষা চতুর্বিধ; প্রত্যক্ষ, অনুমান, যুক্তি ও আপ্তোপদেশ। আত্মা মন ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়বিষয় অর্থাৎ পঞ্চভূত, ইহাদের যোগে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। অনুমান ত্রিবিধ; ধূম হইতে বহ্নির অনুমান—কার্য্যলিঙ্গানুমান; বৃক্ষ হইতে বীজের অনুমান—কারণলিঙ্গানুমান; বীজদর্শনে তৎকারণভূত ফলের প্রত্যক্ষ দ্বারা তৎকার্য্য ভাবী ফলের অনুমান—কার্য্যকারণলিঙ্গানুমান। লিঙ্গ অর্থে হেতু। যে বুদ্ধি বহু-কারণযোগজাত ফল দর্শন করিতে সমর্থ হয়, তাহার নাম যুক্তি অর্থাৎ অনেক কারণের যোগে ফল বলিয়া যুক্তি। জল কৃষি বীজ ও ঋতুর যোগে শস্য হয়। ইহা যুক্তি। যাঁহারা জ্ঞানী ও শিষ্ট, যাঁহাদের জ্ঞান নির্ম্মল ও সর্ব্বদা অব্যাহত, তাঁহারা আপ্ত। আপ্তের বাক্যে সংশয় নাই, তিনি সত্য কহেন। আমরা আপ্তোপদেশ ব্যতীত একদণ্ড চলিতে পারি না। কণাদ অণুপরমাণু গণিয়াছেন, কণাদ আপ্ত; নিউটন মাধ্যাকর্ষণে পৃথিবীকে ঘুরাইয়াছিলেন, নিউটন আপ্ত। অণুপরমাণু গণিবার, মাধ্যাকর্ষণ প্রমাণ করিবার বুদ্ধি আমার নাই। সে বুদ্ধি আমার থাকিলে কণাদ ও নিউটনকে আপ্ত বলিতাম না। আপ্তোপদেশ মানিলেও চিন্তা যে স্বাধীন হইতে পারে, তাহা আমাদের দর্শনে ও ধর্ম্মবিশ্বাসে সুস্পষ্ট রহিয়াছে।

কার্য্যকারণ-অনুসন্ধানের পূর্ব্বে ভূয়োদর্শন আবশ্যক। বহুবার দর্শন এবং দর্শন হইতে অনুমান করিলে ভূয়োদর্শন বলা যায়। জল বিনা বীজের অঙ্কুর হয় না; ইহা কৃষক জানে, ভূয়োদর্শনে জানে। কিন্তু কৃষকের দৃষ্টি এটা ওটা সেটার প্রতি, যে যে বীজের অঙ্কুরোদ্গম সে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি এটা ওটা নহে, এ বীজ সে বীজ নহে; তিনি দেখিলেন যাবতীয় বীজ, বীজ নামায়, বীজবর্গ, জল না পাইলে অঙ্কুরিত হয় না। কৃষকের জ্ঞান অস্পষ্ট, তাহার চিন্তাপদ্ধতি অস্পষ্ট, তাহার ভূয়োদর্শন গৌণ। বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান স্পষ্ট, তাঁহার পদ্ধতি স্পষ্ট, তাঁহার ভূয়োদর্শন মুখ্য। ভূয়োদর্শন হইতে বর্গীকরণ, আরোহ, তাঁহার উদ্দেশ্য। যে বিজ্ঞানে বর্গীকরণ যত, সে বিজ্ঞান তত উন্নত বলা যায়। দ্রব্যের বড় বড় তালিকা, গুণের বিশদ বর্ণনা, কিংবা পূর্ব্বাপরসম্বন্ধ-সূচনা বিজ্ঞান নহে। কিন্তু একটা মুখ্য উদ্দেশ্য, একটা সূত্র ধরিয়া দ্রব্য গুণ ক্রিয়া বর্ণিত হইলে বিজ্ঞান হইতে পারিবে। নদীর বালি গণিয়া মাপিয়া জুখিয়া ভাঙ্গিয়া আকৃতি বর্ণ প্রভৃতি লিখিয়া এক বিপুল গ্রন্থ পূর্ণ করিলেই বালুকা-বিজ্ঞান হইবে না। নানারূপতার মধ্যে একরূপতার সাধন চাই। নানারূপ এক নির্দ্দিষ্ট সূত্রে গাঁথা চাই। ভূয়োদর্শন উদ্দেশ্যানুসারে বিন্যস্ত হইলে বিজ্ঞান হয়, নতুবা দর্শনমাত্র হয়। একারণে বলা যায়, সুবিন্যস্ত জ্ঞান বিজ্ঞান।

কিন্তু জ্ঞানের অভাবে, উপাদানের অভাবে বিজ্ঞান

সম্পূর্ণ হয় না। সাংখ্যকার বলিয়াছেন, অতিদূরত্ব হেতু, অতিসামীপ্য হেতু, সূক্ষ্মত্ব হেতু, অন্য বস্তুর ব্যবধান হেতু, অন্য পদার্থের দ্বারা অভিভব হেতু, সমান বস্তুর সহিত মিশ্রণ হেতু প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বাধা হইয়া থাকে। তখন সূত্রের বিন্যাসে সংশয় আসে। সংশয় ও বিতর্কে সূত্র কল্পিত হয়, উহ আশ্রয় করিতে হয়। নূতন-লব্ধ জ্ঞান পুরাতন সূত্রের, উহের অন্তর্গত না হইলে উহ পরিবর্ত্তন করিতে হয়। অতএব মনে রাখিতে হইবে, উহ বিজ্ঞান নহে, উহী আপ্ত নহেন। সংশয় চিরদিন থাকিবে, সংশয়-মোচনের প্রয়াস—গবেষণাও চিরদিন থাকিবে!

কিন্তু এত চেষ্টা এত গবেষণা কাহার নিমিত্ত? প্রকৃতি কার্য্য-কারণের হেতু; পুরুষ সুখ-দুঃখের হেতু। সেই পুরুষের, সেই আমার, নিমিত্ত, আমার বর্ত্তন নিমিত্ত বিজ্ঞান। আমাকে ছাড়িয়া বিজ্ঞান নহে। আমার সৌখ্য-চিন্তা বিজ্ঞানের কর্ত্তব্য না হইলে বিজ্ঞানে কি ফল? আজিকার কালিকার আমি নহে, এ গ্রামের সে গ্রামের স্বদেশের বিদেশের আমির সৌখ্য নহে, মানবের সৌখ্য বিজ্ঞানের চিন্তা। ইহার দেশ বিস্তীর্ণ, কাল বিস্তীর্ণ, পাত্র বিস্তীর্ণ। এই হেতু বিজ্ঞানের সমাদর, পূজা; বিজ্ঞানের মহত্ত্ব।

দেশে বিজ্ঞানের স্থিতি।

এখানে অনেক বিজ্ঞান-অধ্যাপক উপস্থিত আছেন, তাঁহাদিগকে আমি একটা প্রশ্ন করিতেছি। তাঁহারা বিজ্ঞানের সার্থকতা দেখিতেছেন কি? কয়জন ছাত্র পাইয়াছেন, যাহারা বিজ্ঞানের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে, যাহাদের চরিত্রে বিজ্ঞানের বিনয় ও জ্ঞানের লক্ষণ দৃষ্ট হইয়াছে, যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিসংগ্রহ মুখ্য উদ্দেশ্য না করিয়া বিজ্ঞানশালায় প্রবিষ্ট হইয়াছে? আমার জানায় শত জনের পাঁচজনও হয় কিনা, সন্দেহ। কিছুকাল বিজ্ঞানশালায় কাটাইলে বৈজ্ঞানিক মার্গে চলিলে বিনয় অবশ্য অভ্যাস হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার যোগ্য জ্ঞানও অবশ্য হয়। কিন্তু ইহাই কি পরম লাভ বলিতে হইবে?

কেহ কেহ বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার দ্বারা বিজ্ঞান-অভ্যাসের সফলতা দেখিতে অভিলাষী। এই যথার্থ অভিলাষ পূর্ণ হইতেছে না কেন? ছাত্রের দোষে? আমাদের ছাত্রেরা জড়বুদ্ধি, অধ্যবসায়হীন? বিলাতের লোকেরা, অধ্যাপকেরা কিন্তু আমাদের ছাত্রদিগের মেধা দেখিয়া চমৎকৃত হন। কেহ কেহ বলেন, আমাদের, অধ্যাপকবর্গের অসিদ্ধিহেতু ছাত্রগণেরও অসিদ্ধি। যাঁহারা স্বয়ং অসিদ্ধ, তাঁহারা অপরকে সিদ্ধ করিতে পারেন না। কথাটা একেবারে অমূলক বলিতে পারি না; কিন্তু ইহাও স্মরণ করিতে হইবে, অধ্যাপকবর্গের অসিদ্ধিরও কারণ আছে। অধিকাংশ সময় দৈনন্দিন অধ্যাপনায় কাটে। ইহার পর ক্লান্তি আসে, শরীর মন বয় না। যাঁহারা এই গুরুকর্ম্মের পর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে রত হইতে পারেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই অসাধারণ। হয়ত তাঁহারা লোহার দেহ পাইয়াছেন, কিংবা দেহটা ক্ষণভঙ্গুর করিয়াছেন। এখানে মধ্যমের কথা সাধারণের কথা আলোচ্য। চারিপাচ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কলেজের অধ্যাপকের নিজের বলিতে একটু সময় থাকিত না; এমন ঘটনাও জানা আছে অধ্যাপকের গবেষণার প্রতি-কূলতা করা হইত। কলেজের বাহিরের লোকে এসব সংবাদ রাখেন না, অধ্যাপনার ঘণ্টা গণিয়া অধ্যাপকের শ্রমের পরিমাণ করেন। তাঁহারা জানেন না, ছাত্রদিগের বিজ্ঞানকর্ম্মশালায় তাহাদের সহিত দুই ঘণ্টা পরিশ্রমে কি ক্লান্তি ও অবসাদ আসে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশযোগ্য হইলেই সকল ছাত্র মেধাবী ও শ্রমশীল হয় না। গ্রীষ্মের অবকাশ আছে বটে, কিন্তু সকল দেশ দার্জ্জিলিঙ্গ নহে; এবং নহে বলিয়া অবকাশ দেওয়া হইয়া থাকে। তথাপি কলেজের বিজ্ঞান-অধ্যাপকগণের নিকট গবেষণা আশা করা অন্যায় নহে।

কি কারণে এদেশে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না, তাহার পর্য্যালোচনা আবশ্যক হইয়াছে। ডাঃ বসু কিংবা ডাঃ রায় কিংবা তাঁহার দুই চারিজন ভাগ্যবান্ ছাত্রের দ্বারা দেশের দশা ফিরিতে পারে না। সকল বিষয়েই মধ্যম লইয়া বিচার করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন বিধানে ছাত্রের জ্ঞান পূর্ব্বাপেক্ষা গাঢ় হইতেছে। এখনও ইহার ফলভোগের সময় আসে নাই, কিন্তু অধিক প্রত্যাশার হেতুও দেখিতেছি না। এই নূতন বিধানও আমাদের দোষে সম্যক্ ফলদায়ক হইতেছে না। অধিকাংশ

বিজ্ঞানকর্ম্মশালায় ছাত্রেরা চর্ব্বিত চর্ব্বণ করে, যে বিষয়ের অধ্যাপনা হইয়াছে, যাহা ছাত্রেরা শুনিয়াছে দেখিয়াছে, তাহারই পুনরাবৃত্তি করে। ইহাতে তাহাদের হাত আসে, কিন্তু বুদ্ধি আসে না। হাত আনা চাই না, নহে; কিন্তু কেবল অভ্যাস উদ্দেশ্য নহে। বহু বহু ছাত্র চোখ বুজিয়া অভ্যাস করে; অধ্যাপকের উপদেশ শুনিয়া কিংবা কর্ম্ম-পুস্তকে মুদ্রিত উপদেশ পড়িয়া যথাযথ ভাবে এ দ্রব্যের সহিত সে দ্রব্যের যোগাযোগ করে। অর্থাৎ তাহারা অনুকরণে দক্ষ হয়, প্রকরণে হয় না। বলা বাহুল্য, প্রকরণের সঙ্গে-সঙ্গে কর্ম্মে অভ্যাস জন্মিতে পারে। কলেজে প্রথম বর্ষ হইতে ছাত্রকে গবেষণায় প্রবৃত্ত করিতে পারিলে তাহার কর্ম্মশক্তি, আত্মপ্রত্যয় জন্মে, শিক্ষায় উৎসাহ হয়। কখনও কোন ছেলেকে মক্‌ষ করিতে ব্যগ্র দেখিয়াছেন কি? দেশের ছুতারের ছেলে কি বাটালি করাত লইয়া কিছুদিন হাত করে, না প্রথম হইতেই ছোট ছোট কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্য গড়ে, কিংবা পিতার সাহায্য করে? চেষ্টা করিলে আমিও পারি, আমিও মানুষ; এই প্রত্যয় দৃঢ় হইলে আর কিছু দেখিতে হয় না। অন্ততঃ জ্ঞানান্বেষণা, গবেষণার নামে ভয় ঘুচিয়া যায়। অবশ্য, কথাটা বলা যত সোজা, কথার মতন কাজ করা তত সোজা নহে। তথাপি এই আদর্শ ধরিয়া চলিতে চলিতে উপায়ও আসিতে পারিবে।

বস্তুতঃ, আমরা যে বিজ্ঞানের অন্বেষণ করিতেছি, তাহা ধনশালী ইয়ুরোপের বিজ্ঞান। বিজ্ঞানশিক্ষা ব্যয়সাধ্য; ইয়ুরোপে ও আমেরিকায় যেখানে ছাত্রের শিক্ষার সম্যক্ ব্যবস্থা আছে সেখানে আরও ব্যয়সাধ্য। অথচ আমরা সে দেশের সিদ্ধির সহিত এদেশের কৃত কর্ম্মের তুলনা করিতে চাই। বামুনের গরু সুলভ নহে। অবশ্য এমন বিষয় আছে, যাহার এষণায় প্রচুর অর্থব্যয় আবশ্যক হয় না। নাই হউক; কিন্তু যে ছাত্রের অন্নচিন্তা চমৎকারা, তাহার নিকট অন্য চিন্তা উপহাস্য নহে কি? কি কায়ক্লেশে অধিকাংশ ছাত্র বিদ্যা অভ্যাস করে, তাহা ত আমাদের অজ্ঞাত নহে। আগে প্রাণৈষণা, তার পর অন্য কথা। প্রাণৈষণার পর ধনৈষণা স্বাভাবিক। আমরা চাই, জ্ঞানৈষণা। আমরা চাই, আমাদের ছাত্রেরা ধন মান তুচ্ছ করিয়া, মরি-বাঁচি পণ করিয়া জ্ঞানমার্গে ধাবিত হউক। কিন্তু চাইলেই আকাশের চাঁদ হাতে চলিয়া আসে না। যে সমাজ জ্ঞানৈষণার আকাঙ্ক্ষা করে কিন্তু উপায় করে না, সে সমাজের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না। এই ঘোর কলিকালে, জ্ঞানার্থে জ্ঞান অর্জ্জন, ধর্ম্মার্থে ধর্ম্মাচরণ কদাচিৎ সম্ভবে। সত্যযুগেও বিনা আয়োজনে বিনা ব্যয়ে যজ্ঞ সমাধা হইত না। অন্যকে যজ্ঞকারীকে ঋত্বিক্‌গণের গ্রাসাচ্ছাদনের ভার লইতে হইত। যখন উপযুক্ত ছাত্র সমাজকে জিজ্ঞাসা করে, কেন তাহাকে অনশনে নিষ্কাম-ব্রতের আদেশ হইতেছে, কেন সেই "চৌর্য্যাপরাধে দোষী" হইয়াছে, কেন সে উকীল হাকিম হইয়া অপর দশজনের তুল্য সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করিবে না, তখন সমাজের উত্তর কি আছে, জানি না। ডাক্তার রায়ের কয়েকটি কৃতী ছাত্র গবেষণা ত্যাগ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে ধনোপার্জ্জনে মনোযোগী হইয়াছে। আমি ইহা দূষ্য মনে করিতে পারিতেছি না। আমাদের আশাভঙ্গ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদিগকে কি প্রত্যাশা দিয়াছিলাম? এই দুশ্চিন্তার সময় স্যর তারকনাথ পালিত ও মহোদয় রাস-বিহারী ঘোষ বদান্যতার দ্বারা আমাদিগকে কিঞ্চিৎ আশা-ন্বিত করিয়াছেন। কিন্তু আরও পালিত, আরও ঘোষ মহাশয়গণের আবির্ভাব না হইলে দুশ্চিন্তার হ্রাস হইবে না।

বিজ্ঞানার্থী ছাত্র নির্ধন, দেশও নির্ধন; ধনসাধ্য বিজ্ঞান তিষ্ঠিতে পারিতেছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধানের উদ্দেশ্য —ছাত্রকে কেবল বিনয় ও জ্ঞানদান নহে। সে উদ্দেশ্য হইলে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রকে আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটি দুইটি বিষয়ে আবদ্ধ রাখিতেন না, বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় শিখিবার, মনে রাখিবার পরীক্ষা করিতেন না। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রগণকে এক এক বিষয়ে প্রাজ্ঞ করিতে অভিলাষী। বিলাতে যাহা সম্ভাবিত হইয়াছে, এদেশেও তাহা হইবে, এই আশায় বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয় এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু দেখা যাইতেছে, সে আশা সম্যক্ ফলবতী হইতেছে না। দেশের প্রজা উত্তম হউক, বিদ্বান্ হউক, জ্ঞানী হউক, প্রথমে এই কামনা। কেহ কেহ এক এক বিষয়ে প্রাজ্ঞ হউক, ইহা দ্বিতীয় কামনা। প্রথমে সমাজদেহ পুষ্ট ও বলবান্ হউক, তার পর আবশ্যক অঙ্গ হউক। এই ভাবে দেখিলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম

হইতেই প্রাজ্ঞ উৎপাদনের ব্যবস্থা না করিলে ভাল হইত। প্রজাবর্গ সামান্য জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, ইহা অবশ্য দেখিতে হইবে। এই নিমিত্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যা ও বিজ্ঞানের মিলন বাঞ্ছনীয় হইতেছে। সাধারণের নিমিত্ত বিশেষ বিদ্যা বিশেষ বিজ্ঞান অনাবশ্যক মনে হইতেছে।

সমাজের সহিত এই কথার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এখানে সে সম্বন্ধ-প্রদর্শনের লোভ ত্যাগ করিয়া উপস্থিত প্রসঙ্গ অনুসরণ করি। বিলাতে বিজ্ঞানার্থে বিজ্ঞান-চর্চ্চা আছে, এই চর্চ্চার নিমিত্ত যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে; আর আছে ধনার্থে বিজ্ঞানচর্চ্চা। সে দেশে তিন শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক আছেন। কেহ জ্ঞানার্জ্জনেই জীবন যাপন করিতেছেন; সে জ্ঞানের প্রয়োগ দেখিতেছেন না, ভাবিতেছেন না। ইহাঁরা বৈজ্ঞানিক সন্ন্যাসী। এরূপ সন্ন্যাসী কোন দেশে অধিক হইতে পারেন না। দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক কলাশালায় কলার উন্নতি সাধনের ব্যয়লাঘবের চিন্তা করিতেছেন। ইহাঁরা নিজেদের জ্ঞান দ্বারা কলাস্বামীর সেবা করিতেছেন এবং তদ্দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিতেছেন। তৃতীয় শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক স্বয়ং কলাস্বামী। ইহাঁরা কলায় অভ্যস্ত বিজ্ঞান প্রয়োগ করিয়া ধনোপার্জ্জন করিতেছেন। স্বামী ও কর্ম্মী দুইই হইতে হইলে কেবল বিজ্ঞানে কুলায় না, স্বামীত্বের, কলাপ্রবর্ত্তনের জ্ঞানও প্রচুর আবশ্যক হয়।

এদেশে আমাদের বৈজ্ঞানিক ছাত্রদিগের নিকট এই তিন ক্ষেত্রের একটাও নাই। দেশে এমন কলাকারখানা নাই, যাহার স্বামী বৈজ্ঞানিক নিযুক্ত করিতে পারেন। এক যে ঔষধ-করণশালা হইয়াছে, তাহাতে কয়েকজন কৃতী রাসায়নিক নিযুক্ত আছেন। কারখানা থাকিলেও বৈজ্ঞানিকের কর্ম্মাভ্যাস এমন নাই যাহাতে কলার উন্নতি সাধিত হইত। এই কারণে কয়েক বৎসর হইতে কয়েকজন সদাশয়ের চেষ্টায় ইয়ুরোপ আমেরিকা ও জাপানে কলা ও মূর্ত্ত বিজ্ঞান শিখিবার নিমিত্ত আমাদের শিক্ষিত যুবক যাইতেছেন। কয়েকজন কৃতকর্ম্মা হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু আমরা ফলে সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছি না। আমার মনে হয়, কর্ত্তৃপক্ষ দুই বিষয়ে যথোচিত মনোযোগী হন নাই। প্রথম এই, কলা-বিজ্ঞান শিখিলেই কলা স্থাপিত হইতে পারে না। দ্বিতীয় এই, দেশ না দেখিয়া বিদেশে-শেখা কলাবিজ্ঞান সহজে কার্য্যকারী হয় না। বস্তুতঃ কলা-প্রবর্ত্তনের চারি পাদ আছে। ধন, নির্ব্বাহন, কলাজ্ঞান, ও উপাদান। এই চারি পাদের একটির অভাব ঘটিলে কলা চলে না। যুবকেরা কলাজ্ঞান লাভ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। কিন্তু অপর তিন পাদ পূর্ণ করিবে কে? আমরা নানা সময়ে, প্রায় সর্ব্বদা, কলাবিজ্ঞানালয় প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সরকারের নিকট প্রার্থনা করিতেছি। কিন্তু অন্য তিন পাদ কোথা হইতে জুটিবে তাহা ভাবিতেছি না। বোধ হয় এখন আমরা বুঝিতেছি, হঠাৎ কিছু করিতে পারা যায় না; দেশে একটা কিছু করিতে গেলে অন্য কিছুও করা আবশ্যক হয়।

অথচ নিশ্চিন্ত মনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেও দেশে বিজ্ঞান-বিস্তার ঘটিবে না। যখন বিজ্ঞান-বিস্তার খুঁজি, তখন কেবল জ্ঞানমার্গে চলি না। বিজ্ঞানের সাহায্যে দেশের ধনবৃদ্ধিও খুঁজি। এই কথায় কেহ কেহ চমকাইতে পারেন। তাঁহারা বিজ্ঞানের পদচ্যুতির শঙ্কায় কাতর হইতে পারেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য কি? বিজ্ঞানালোচনার আনন্দে যাহার দিন চলে না, তাহাকে বিজ্ঞানার্থে বিজ্ঞান বলায় নির্ম্মমতা হয় না কি? বিদ্যার্থে বিদ্যা কথাটায় নিষ্কাম ব্রতের উচ্চ ধ্বনি শুনিতে পাই বটে কিন্তু যে সংসারে বাস করিতেছি সেটা অগ্রাহ্য করা বুদ্ধিমানের যোগ্য নহে। আমাদের ছাত্রেরা কি শিশু নির্ব্বোধ যে তাহারা হিতাহিত বিবেক করিতে পারে না? তাহারা কি মনে করে না, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পাইবার অন্য পন্থা নাই বলিয়াই কলেজের দ্বারস্থ হইয়াছে? তাহারা জানে ডিগ্রি না পাইলে বৃত্তিহীন হইয়া অর্দ্ধাশনে থাকিয়া ঘরে বাহিরে লোকগঞ্জনায় দিন কাটাইতে হইবে? যখন পিতা-মাতা ভ্রাতা-ভগিনী কাতরস্বরে বলেন, "হায় সে ফেল হইয়াছে", সে বৈজ্ঞানিক হইল না, মূর্খ হইয়া রহিল, এই শোকে কি হাহারব করেন? সকাম হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিলে ফল হয় না, ইহা বিশ্বাস করি না। যে কাজ করিয়া ধনমান লাভ হয় না, সে কাজে কয় জন অভিনিবিষ্ট হইতে পারে? কবি-সিংহ মনে মনে কাব্য রচনা করিয়া কিংবা নির্জ্জনে লিখিয়া নিজে পড়িয়া তৃপ্ত হন না; ধনের আশা না করিলেও যশের আশা করেন, কাব্য ছাপাইয়া প্রচারিত করেন।

"নিষ্কাম" বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দ্বারা যশের আশা করেন। নতুবা প্রতিদ্বন্দ্বীর ঈর্ষাভাগী হইতেন না। যিনি সৌভাগ্য-সম্পৎকরী সকল-বিভবসিদ্ধি বাগ্‌দেবীর পূজা করেন, তিনি বিদেশে মান্য স্বদেশে ধন্য হন। পরা বিদ্যা নির্জ্জনে সাধনীয়া; অপরা বিদ্যা লোকসমাজের হিতের নিমিত্ত, নিজেরও হিতের নিমিত্ত, একারণ শিক্ষণীয়া। বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে, ইহা আমাদেরই দেশের নীতি; আর আমরাই বিদ্যাং দেহি ধনং দেহি যশো দেহি বলিয়া ঠাকুরের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিই। বিদ্যাহীন মানুষ পশুর সমান, এ কথা সবাই জানে। বিদ্যা চাই নতুবা বাঁচিতে পারি না। জ্ঞানের গরিমা অবশ্য আছে। জ্ঞানের নিকট সংসারের মান-অপমান কিছুই নহে। কিন্তু জ্ঞানীর জীবন-সংগ্রাম মায়াময় নহে।

মূর্ত্ত-বিজ্ঞানের সাহায্যে আজি-কালি কি অভাবনীয় কাণ্ড সাধিত হইতেছে, তাহা আমাদের অবিদিত নাই। বিলাতী দীপশলা হইতে তড়িৎদীপের উদ্ভাবনা পর্য্যন্ত চিন্তা করিলেই মাথা ঘুরিয়া পড়ে। শস্ত্র-চিকিৎসায়, বিষের প্রতিষেধে, অণুজীব-ধ্বংসের উপায়ে নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বিলাতী মূর্ত্ত-বিজ্ঞান বিশেষতঃ মূর্ত্ত-রসায়ন ও চিকিৎসা-বার্ত্তার উন্নতির নিমিত্ত বহু বহু লোক অহোরাত্রি পরিশ্রম করিতেছেন।

অমূর্ত্ত বিজ্ঞান হইতে মূর্ত্ত বিজ্ঞানের জন্ম। কিন্তু মূর্ত্ত বিজ্ঞান হইয়াছে বলিয়া অমূর্ত্ত বিজ্ঞানের প্রসার বাড়িয়াছে। প্রকৃতির শক্তি কাড়িয়া লইতে হইলে সে শক্তির পরিচয় প্রথমে চাই। গেলিলিও লণ্ঠন ত্তুলিতে দেখিয়া দোলকের দোলনসূত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি জ্ঞানভিক্ষু ছিলেন। তাঁহার আবিষ্কারে সংসারের কি হিত হইবে, তাহা তিনি ভাবেন নাই। অন্য দিকে, টেলিগ্রাফের ইতিহাস স্মরণ করুন। ভল্টা তাড়িত-প্রবাহ আবিষ্কার করিলেন। তাহার পর কেহ চুম্বকের প্রতি তাড়িত-প্রবাহের ক্রিয়া দেখাইলেন। টেলিগ্রাফি সৃষ্টি হইল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গবেষণার প্রয়োজন হইল। নূতন পরিমাণ-যন্ত্র, সূক্ষ্ম-যন্ত্র, মান প্রভৃতি আবশ্যক হইল। ক্লার্ক মাক্‌স্‌বেল এই ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে করিতে ঈথারের তরঙ্গ সিদ্ধ করিলেন। ইহা হইতে ক্রমে বিনা তারে বার্ত্তাপ্রেরণ সম্ভাবিত হইয়াছে। অমূর্ত বিজ্ঞান নূতন কিছুর সংবাদ শোনায়; মূর্ত-বিজ্ঞান তাহার প্রয়োগ বৃদ্ধি ও পুষ্টি করে। একের সহিত অন্যের এই অভেদ্য বন্ধন আছে বলিয়াই আমরা বিজ্ঞান বিজ্ঞান রব করিতেছি।

বিজ্ঞান দ্রব্য গড়ে না, কলা গড়ে। বিজ্ঞান কলা গড়িবার সন্ধান বলিয়া দেয়। বিজ্ঞান জ্ঞান লইয়া সন্তুষ্ট, কলা-বিজ্ঞান (কলার অন্তর্নিহিত বিজ্ঞান) জ্ঞান ও কর্ম্মের যোগ ঘটায়। কৃষি চিকিৎসা প্রভৃতির অন্তর্নিহিত বিজ্ঞান বার্ত্তা-বিজ্ঞান। কলা-বিজ্ঞান ও বার্ত্তা-বিজ্ঞান মূর্ত্ত-বিজ্ঞান। অমূর্ত্ত-বিজ্ঞান বিস্তীর্ণ, জগৎব্যাপী; আকাশের নাড়ী নক্ষত্র হইতে পাতালের নীচে কূর্ম ছিল কি না, তাহার অনুসন্ধান করে। এই বিশাল বিজ্ঞানের মধ্যে দিশাহারা হইয়া পড়িতে হয়। এই কারণে বিজ্ঞানের নানা শাখা-কল্পনা। ইহাদের মধ্যে কিমিতি-বিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অন্য শাখারও উপস্তম্ভ। এই দুই বিজ্ঞান অধিকাংশ মূর্ত-বিজ্ঞানের আদি। মূর্ত-বিজ্ঞান ক্ষুদ্র; আমার তোমার যাহাতে হিত হইতে পারিবে তাহার বিজ্ঞান। এই কারণে খণ্ডিত। কিন্তু অধিকারী-ভেদ ত আছে। যে জ্ঞান কেবল জ্ঞান না থাকিয়া ফলদায়ক হয় এবং যাহা লাভ করিতে ছাত্রের উৎসাহ হয়, তাহা মূর্ত-বিজ্ঞান হউক, কলা-বিজ্ঞান হউক, তাহা হিতকর। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিকাল কলেজ, টিচার-ট্রেনিং কলেজ, ল-কলেজ, এ-সব কলেজের ছাত্রদিগের জ্ঞান ও বিনয় হয় না, বলিতে পারি না। ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকাল কলেজ ধরুন। এখানে বার্ত্তার আবশ্যক নানা বিজ্ঞান শেখানা হয়, সবই খণ্ডিত; মেডিকাল কলেজে সুস্থ দেহের রক্ষা ও রুগ্ন দেহের আরোগ্য এই দুই বিষয় লইয়াই বিশাল বিজ্ঞান শেখানা হয়। কিন্তু এই দুই কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্র ও অমূর্ত-বিজ্ঞান-কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্রের তুলনা করুন। শেষোক্ত ছাত্র জীবনসংগ্রামের যোগ্য নহে। বিশ বৎসরের যুবক বি-এ, বি-এস্‌সি পাশ করিয়া খণ্ডিত জ্ঞানের ফলে সংসার-ধর্ম্মে অনভিজ্ঞ থাকে।

বিলাতের কথা স্বতন্ত্র। সেখানে মূর্ত-বিজ্ঞান শিখিবার কলেজ আছে, অমূর্ত-বিজ্ঞান শিখিবারও আছে। জর্ম্মানীর বর্ত্তমান আস্পর্দ্ধা ও বাহ্বাস্ফোটে অমূর্ত-বিজ্ঞান-

চর্চ্চার পরিধি পাওয়া যাইতেছে। বার্ত্তাশ্রয় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচুর আয়োজন সত্ত্বে চারি বৎসর পূর্ব্বে বার্লিনে জর্ম্মান সম্রাট্ নিজের নামে এক "ইনষ্টিটিউট্" প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের যাবতীয় কলার বার্ত্তার বৈজ্ঞানিক গবেষণার মূল দৃঢ় ও পুষ্ট করিয়াছেন। চরক বলিয়াছেন সম্যক্ প্রয়োগং সর্ব্বেষাং সিদ্ধিরাখ্যাতি কর্ম্মণাম্—সর্ব্বকর্ম্মে সম্যক্ প্রয়োগ করিতে পারিলে সিদ্ধি বলা যায়। পূর্ব্ব কালে আমাদের দেশে মূর্ত্ত-বিজ্ঞান-বলে বার্ত্তা ও কলায় উত্তম সিদ্ধি লাভ হইয়াছিল। প্রাচীন কালে যজ্ঞকুণ্ড নির্ম্মাণে শুল্ব-সূত্রের আরম্ভ হইয়াছিল, ক্ষেত্রবিভাগে ক্ষেত্র-তত্ত্বের সৃষ্টি হইয়াছিল। নিম্ন সোপান হইতে উচ্চে উঠিতে বাধা হয় না। তেমন মূর্ত্ত-বিজ্ঞান শিখিলে অমূর্ত্ত-বিজ্ঞান শিখিতে বাধা হয় না।

অতএব দাঁড়াইল এই, অমূর্ত্ত-বিজ্ঞান যিনি শিখিতে চান শিখুন, কিন্তু মূর্ত্ত-বিজ্ঞান শিখিবার আয়োজন আবশ্যক। মূর্ত্ত-বিজ্ঞান দ্বারা অমূর্ত্ত-বিজ্ঞান-জাত বিনয় লাভ হইবে, লৌকিক জ্ঞান হইবে, আর সেই জ্ঞান প্রকৃত হইবে। ইহাতে পারগ ছাত্র হাকিম হউন, উকীল হউন, এই দেশের সম্পর্কে থাকিবেন, তাঁহার অধীত বিদ্যা প্রয়োগের সুযোগ পাইবেন, এবং যত্ন করিলে মূর্ত্ত মার্গ ধরিয়া অমূর্ত্ত মার্গে উপস্থিত হইতে পারিবেন। ফলে দেশে বিজ্ঞান-বিস্তার হইবে। এতদিন অমূর্ত্ত-বিজ্ঞান শিক্ষার ফল দেখা গেল; এখন মূর্ত্ত-বিজ্ঞান শিখিলে কি হয়, তাহাও ত দেখা কর্ত্তব্য।

দেশের বিজ্ঞানপ্রচারের তৃতীয় অন্তরায় বিদেশী ভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা। এই বিদেশী ভাষা, ইংরেজী ভাষা এত কঠিন যে, শৈশব হইতে যৌবন পর্য্যন্ত দশ বার বৎসরের যত্নে ও শ্রমে যৎকিঞ্চিৎ আয়ত্ত হয়। মস্তিষ্কের শক্তি অফুরন্ত নহে, আমাদের বয়সও নহে। এই ভাষা শিখিতে আমাদের কত রক্ত জল হইতেছে, কত শক্তি তাপ হইতেছে, তাহা চিন্তা করুন। অথচ এই বিদেশী ভাষা শিক্ষা আমাদের কাম্য নহে; কাম্য বিজ্ঞান। কাম্যের চতুর্দ্দিকের কণ্টকের প্রাকার ভেদ করিতেই শক্তি সামর্থ্য ক্ষয় হইতেছে। ইহাও সহ্য হইত; মাতৃভাষায় না শেখাতে বিদেশী বিজ্ঞান বিদেশী থাকিয়া যাইতেছে! বিজ্ঞান-বিষয়ে কিছু বলিতে কিছু লিখিতে হইলে বিদেশী ভাষায় বলিতে লিখিতে হইতেছে; চিন্তা করিতে হইলেও বিদেশী শব্দ-মূর্ত্তির উপাসনা করিতে হইতেছে। কারণ, অন্য সাধন জানা নাই। ফলে দাঁড়াইয়াছে, সভাসমিতি আপিশ আদালতে যাইতে হইলে গৃহবেশ ত্যাগ করিয়া যেমন সভ্যবেশ পরিধান করি, এবং সেখান হইতে আসিয়াই সে বেশ ত্যাগে সুস্থ বোধ করি, আমাদের পক্ষে বিজ্ঞানও তেমন হইয়াছে। উহা দেশের ধাতুতে মিশিতেছে না, বাহিরে বাহিরে শোভাসম্পাদনের নিমিত্ত থাকিতেছে। ইংরেজীতে বিজ্ঞান শিখিতে ছাত্রের যত বৎসর লাগিতেছে, মাতৃভাষায় শিখিলে অর্দ্ধেক সময় লাগিত না।

কয়েক বৎসর আমাকে কটকের মেডিকাল ইস্কুলে রসায়নবিজ্ঞান শিখাইতে হইয়াছিল। ছাত্রদিগের শিক্ষণীয় বিষয় অল্প ছিল না, এখানকার আই-এসসি পরিক্ষার নিমিত্ত যতখানি আছে প্রায় ততখানি ছিল। ছিল না কর্ম্মাভ্যাস। কিন্তু কুড়ি দিনের মধ্যে অধ্যাপনা শেষ করিতে হইত। আমরা কলেজে কত কুড়ি দিন দিয়া থাকি, তাহা সবাই জানি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আদেশে অন্যূন সাতকুড়ি দিন অধ্যাপনা করিতেছি। এই প্রভেদের প্রধান কারণ ভাষার প্রভেদ। মেডিকাল ইস্কুলের ছাত্র মাতৃভাষায় শিখিত। দেখিয়াছি, ইংরেজিতে যাহা এক ঘণ্টা বুঝাইয়া ছাত্রের হৃদ্‌গত করিতে পারি নাই, অল্প বাঙ্গালা কথায় তাহা অক্লেশে পারিয়াছি। জল কেন ছাঁকি, কি কাজে কেমন ছাঁকনি চাই, ইত্যাদি হাজার বলি, এক "ফিল্‌টার" শব্দে একটা বিদেশী অজানা অদেখা বস্তুর আব্‌ছায়া মনে ভাসিতে থাকে। বিলাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা যে বয়সে যত বিদ্যা আয়ত্ত করে, সে বয়সে তত বিদ্যা আমাদের ছাত্রেরা পারে না। এই যে ভাসা-বিভীষিকা যাহার জন্য আমাদের ছাত্রদিগের দেহ মন জড়ভাবাপন্ন হইতেছে, ইহার প্রতিকার কি হইবে না? ইংরেজি ভাষা, বিদেশী ভাষা শিখিলে হিত হয় না, কিংবা বিনয় অভ্যাস হয় না, এমন বলি না। বলি, কি মূল্য দিয়া এই হিত ক্রয় করিতেছি? মাতৃভাষায় শিখিলে বিজ্ঞানের তত্ত্ব মনে গাঁথা হইয়া যায়, বিদেশী ভাষায় বহু সময় লাগে। আরও দেখুন, বিদেশী ভাষা হেতু শিক্ষার ফল দেশময় ছড়াইয়া পড়িতেছে না। বিজ্ঞান জনকয়েকের অধিকৃত থাকিতেছে, সকলের ভোগে আসিতেছে না।

কৃষি-বার্ত্তার দ্বারা বিজ্ঞান প্রচার

কৃষিকর্ম্মে যে বিজ্ঞান আবশ্যক, অথবা কৃষিকর্ম্মের অন্তঃনিহিত বিজ্ঞান, কৃষি-বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। ইহা মূর্ত্ত-বিজ্ঞান, এক স্বতন্ত্র বিজ্ঞান নহে। উদ্ভিদ-বিজ্ঞান ইহার অমূর্ত্ত আকার। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানেও অপর সমুদয় বিজ্ঞান আবশ্যক হয়। আকাশ হইতে পাতালের স্থাবর অস্থাবর সকল দ্রব্যের, কোন স্থলে গভীর কোন স্থলে অগভীর জ্ঞান আবশ্যক হয়। মৃত্তিকা-জল-বায়ুর ভৌতিক বিজ্ঞান, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের স্বভাবনির্ণয় প্রভৃতি হইতে উদ্ভিদ-বিজ্ঞান পৃথক্ করিতে পারা যায় না। বৃক্ষের জীবন ধারণ, বর্দ্ধন পোষণ, সন্তানজনন প্রভৃতি ব্যাপার ভৌতিক জড়ধর্ম্ম বলিয়া অদ্যাপি প্রমাণিত হয় নাই। বস্তুতঃ যখনই জন্মমরণ বলি, তখনই এক অজ্ঞাত অনির্দ্দিষ্ট, বোধহয় চির-অজ্ঞেয়, সত্ত্ব স্মরণ হয়। বাহ্য-প্রকৃতি অর্থাৎ ক্ষেত্র জীবকে কতদিকে নিয়মিত করিতেছে, তাহারই মধ্যে জীব জন্মিতেছে বাড়িতেছে মরিতেছে, কিছু রাখিয়াও যাইতেছে। ইহার তুলনায় ভানুমতী বাজি কিছুই নয়। আচার্য্য বসুর জগৎ-বিখ্যাত আবিষ্কারে জঙ্গমের সহিত উদ্ভিদের বিলক্ষণ সাদৃশ্য স্পষ্ট হইতেছে। রাসায়নিকের গোটাদশবার মূল পদার্থ পাইলে এক-একটা বৃক্ষ জীবিত বর্দ্ধিত ফলপ্রসূ হইতে পারে, কিন্তু রসায়নবিজ্ঞানের অতিরিক্ত কিছু আছে।

সেটা কি, কে জানে। কিন্তু জানি সর্ষপবীজ ও বটবীজ একক্ষেত্রে উপ্ত হইলেও সর্ষপ ও বটবৃক্ষ এক হয় না। কৃষক ভূয়োদর্শনে ভর করিয়া শস্য জন্মাইতেছে, বীজ সংগ্রহ করিতেছে, মাটি বিচার করিতেছে, বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখিতেছে, ক্ষেত্র বীজাঙ্কুরোৎপত্তির যোগ্য করিতেছে, বৃক্ষের শত্রু বিনাশ করিতেছে, নবজাত বৃক্ষশিশু পালন করিতেছে, মাটি জল বায়ু রবিকর তেজ অব্যাহত রাখিয়া ফলের প্রত্যাশা করিতেছে, একটি বীজ হইতে বহু পাইতেছে। বীজের সেটা কি শক্তি যাহাতে তাহা বহুধা বিভক্ত হইয়াও পূর্ণ থাকিতেছে? যে সর্ষপ সে সর্ষপ, যে বট সে বট থাকিতেছে, সঙ্গে-সঙ্গে বহু হইতেছে। জীবন ত দ্রব্যগুণ বলিতে পারা যায় না। অথচ সরিষা-ক্ষেতের দুইটি সরিষা-গাছ অবিকল এক নহে; আমবাগানের সব গাছের আম সমান বড় সমান মিষ্ট নহে। তবে, বৃক্ষের আকার-প্রকার স্বভাব-চরিত্র পরিবৃত্তিশীলও বটে। দেখিলে বোধ হয়, প্রকৃতি জাতিভেদ করেন নাই; আমরা করিয়াছি। আমাদের স্বল্প জ্ঞানে ভেদাভেদ আসিয়াছে। যাহা বিজ্ঞান বলি, বিজ্ঞানের সূত্র বলি, তন্ত্র বলি, তাহা মানুষের কল্পিত রচিত; প্রকৃতির তন্ত্র আমরা জানিতে চাই, জানিতে পারিতেছি না। এ কথা প্রাণী-সম্বন্ধেও সত্য। উচ্চ প্রাণী সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হইয়া এক সত্ত্ব। ইহার আয়ু নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহার যাবতীয় অঙ্গ সেই একের জীবন-নির্ব্বাহ করিতেছে, সত্ত্ব রক্ষা করিতেছে। একটা অঙ্গ ছিন্ন হইলে উহা বিকলাঙ্গ হয়, হয়ত মরিয়া যায়, ছিন্ন অঙ্গ গজায় না, বাড়ে না, আর-একটা সত্ত্বের উৎপত্তি করে না। গাছের এরূপ নহে। গাছের আয়ু স্থির নাই; ইহার ডাল মাটিতে পড়িলে গজায়, পাতা ফুল ফল ধরে, বীজ উৎপাদন করে। অথচ উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের যে ভূত-পদার্থে জীবন ব্যক্ত হইতেছে সে প্র-পঞ্চ রাসায়নিক উপাদানে ও প্রাকৃতিক লক্ষণে এক বোধ হইতেছে।

ফলোৎপত্তির পক্ষে বীজ প্রধান কি ক্ষেত্র প্রধান, তাহা লইয়া পূর্ব্বকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত বিলক্ষণ বিতর্ক চলিতেছে। বৃক্ষের, ইহার ডাল-পালার ফুলফলের বীজের স্থিরতা আছে নাই-ও। একের মধ্যে বহুরূপতার দৃষ্টান্ত জীবেই পাই। যখন ডাল হইতে গাছ হয়, এবং বহু বৃক্ষ বীজ বিনা অরণ্য হইয়া পড়ে, তখন বীজোৎপত্তির বিচিত্র ব্যবস্থা কেন হইয়াছে? ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় পশু-বর্দ্ধক ও বৃক্ষবর্দ্ধক জনক-জননী নির্ব্বাচন করিয়া, কখনও ক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিয়া অদ্ভুত অদ্ভুত সন্তান জন্মাইতেছে। পিতা মাতা হইতে সন্তান কি কি গুণ হরণ করে, তাহার পরিসংখ্যান সমাপ্ত হইতে বিলম্ব আছে। এই হারিতার কারণ কি, কে জানে? এ বিষয়ে কে কি বলেন, তাহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। জন্মদ হইতে জাতের প্রভেদ হয়, জাত অধিক হয়, সকলের খাইবার থাকিবার সম্ভাবনা হয় না, যোগ্যের জয় হয়, এবং যে পরিবৃত্তি হেতু জয় তাহার কিছু কিছু হারিত হয়। এসব কথা জীববিজ্ঞানে পুরাতন হইয়া গিয়াছে। যোগ্যের জয় বলি, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বলি, এসব কথার-কথা মাত্র। অসৎ হইতে সতের উদ্ভব হয় না, যাহা নাই তাহার সঞ্চয় হইতে পারে না। অতএব বীজে কিছু

থাকে যাহা হেতু জাত জীব জন্মদের সদৃশ হয়, সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু কথা এই, সন্তানে যে পরিবৃত্তি লক্ষিত হইল তাহা পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে বাড়িয়া চলিতে পারে কি? মাঠে হাজার মূলা-গাছের মধ্যে দশটা পুষ্ট হয়, সে দশটার বীজ হইতে জাত মূলা আরও পুষ্ট হইয়া ক্রমশঃ ফুলিয়া কলাগাছের মতন মোটা হইতে পারে কি? মানুষের বেলা এরূপ প্রশ্ন তুলিলে জিজ্ঞাস্য হয় গাণিতিক বংশের পুত্র-পৌত্রেরা ক্রমে ক্রমে অতি-গাণিতিক হইয়া উঠিবে কি? কিন্তু ভূয়োদর্শনে জানা যায় যে, তাহা হয় না। অষ্ট্রীয়া-বাসী মেণ্ডেল বর্ণসংকরণে প্রচুর পরীক্ষা ও ভূয়োদর্শন দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে বর্ণসংকরণের ফল দৈবায়ত্ত। দৈবায়ত্ত বলিয়া কিন্তু অন্য দৈবঘটনার তুল্য সন্তানের দ্বারা জন্মদের গুণ-হরণ গণিতবিদ্যায় সাধিত হইতে পারে।

তা বলিয়া ক্ষেত্র যে কিছু নহে এমন নহে। বরং দেখা যায়, ক্ষেত্র অনুসারে গাছের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিবৃত্তি হয় এবং হয় বলিয়াই কৃষক ঈপ্সিত ফল প্রত্যাশা করে। বস্তুতঃ কৃষিকর্ম্ম দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়, বীজকর্ম্ম ও ক্ষেত্রকর্ম্ম। বীজকর্ম্মে বীজ নির্ব্বাচন, বপন, অঙ্কুরোদ্গমন, জাত বৃক্ষের পালন, এবং শেষে বীজ রক্ষণ। ক্ষেত্রকর্ম্মে মাটির উৎপত্তি স্থিতি জলবায়ু ও রবি-তেজ নির্ব্বাহ, বৃক্ষের শত্রুর বিনাশ প্রভৃতির নিমিত্ত কর্ম্ম। ইহার এক এক কর্ম্মে প্রচুর বিজ্ঞান আছে, অনেক গবেষণা করিবার আছে। এক মাটিই—ধরি। দেখা যায়, যে মাটি স্বভাবতঃ অধম তাহাতে হাজার রসায়ন প্রয়োগ করি, তাহা কদাপি উত্তম মাটির তুল্য সুফলা হয় না। ফলসহিত বৃক্ষদেহ ভস্মীভূত করিলে মাটির প্রায় যাবতীয় উপাদান ভস্মে পাওয়া যায়। অথচ নির্দ্দিষ্ট পদার্থ মিশ্রিত করিয়া জলে বৃক্ষ জন্মাইলে গোটাদশবার মূল পদার্থ পর্য্যাপ্ত হয়। এইরূপে জানি, নাইট্রোজেন গন্ধক ফস্ফরস পটাসিয়ম্ মেগনিসিয়ম্ কেলসিয়ম্ লৌহ এবং বোধ হয় সোডিয়ম্ ও ক্লোরিন্ মাটিতে না থাকিলে নয়। নাইট্রোজেন গন্ধক ফসফরস প্র-পক্ষে আছে। অতএব এই তিন কেন আবশ্যক তাহা বুঝিতে পারি। সেইরূপ অক্সিজেন হাইড্রোজেন কার্ব্বন কেন চাই, তাহা বুঝিতে কষ্ট নাই। অপর কয়টা সম্বন্ধে বিজ্ঞান এখনও স্পষ্ট উত্তর দিতে পারে না। পটাসিয়ম্ বিনা বৃক্ষপত্রে পললীয় (শ্বেতসার) উৎপন্ন হয় না, কেলসিয়ম্ বিনা ব্যাপ্ত হয় না, লৌহ বিনা পত্রের রঞ্জক অর্থাৎ পলপিত্ত উৎপন্ন হয় না, এবং বোধ হয় মেগনিসিয়ম্ বিনা পলপিত্তের প্রাচুর্য্য হয় না। ভূয়োদর্শনে জানিতেছি, হয় না; কিন্তু ভূয়োদর্শন ত বিজ্ঞান নহে। আমাদের দেহের পুষ্টির কারণ যেমন অজ্ঞাত, ভূমির উর্ব্বরতা-শক্তি কিসে তাহাও প্রায় সেইরূপ অজ্ঞাত।

এখানে এক বৃত্তান্ত স্মরণ হইতেছে। আমার এক উদ্‌যোগী বন্ধু কৃষিকর্ম্মের নিমিত্ত পাঁচ ছয় শত বিঘা জমি কিনিয়াছিলেন। সে জমিতে কি ফসল উত্তম জন্মিতে পারিবে, তাহা জানিবার অভিপ্রায়ে জমির কিছু মাটি এক রাসায়নিকের নিকট বিশ্লেষণের নিমিত্ত পাঠাইয়াছিলেন। বিশ্লেষণ-ফল রসায়নের সাঙ্কেতিক ভাষায় লিখিত হইয়া আসিল। এই সঙ্কেত বুঝিতে না পারিয়া বন্ধুবর বুঝাইয়া বলিতে আমায় অনুরোধ করিলেন। তখন আমার যে সঙ্কট উপস্থিত হইল, তাহা আপনারা অনুমান করিতে পারেন। মাটিতে বালি এতভাগ, আলুমিনা এতভাগ ইত্যাদি শুনিয়া তিনি অধীর হইয়া যে প্রশ্ন করিলেন, তাহাতে আমার অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িল। তিনি জানিতে চান, কি শস্য উত্তম জন্মিতে পারিবে। বলা বাহুল্য, ইহার উত্তর রসায়ন-বিজ্ঞান দিতে পারে না। পরদিন জমি হইতে স্বচ্ছন্দ-জাত বৃক্ষাদি আনাইয়া দিলেন। দেখিয়া বলিলাম, ভূমি অনুর্ব্বরা, এমন অনুর্ব্বরা যে, প্রচুর অর্থব্যয় করিলেও কয়েক বৎসর ধান কলাই ভাল জন্মিবে না। জাত বৃক্ষের বৃদ্ধি ও পুষ্টির সহিত মাটির উপাদান মিলাইয়া দেখিলে উর্ব্বরতা অনুমান করিতে পারা যায়, নতুবা নহে। পরে শুনিলাম বন্ধুবর এক পাহাড়ের ধারে জমি কিনিয়াছেন।

বস্তুতঃ, কৃষি-বিজ্ঞান এত অজ্ঞাত যে ভূয়োদর্শন ব্যতীত কৃষি চলিতে পারে না। এ কারণ, জমি নূতন হইলে অর্থাৎ ক্ষেত্র ও বীজ দুইই অজ্ঞাত হইলে ভাবী ফলও অজ্ঞাত থাকে। মৃৎকুণ্ডে দুই চারিটা আখ গাছ যত্নে বর্দ্ধিত ও পুষ্ট করিতে পারা যায়; কিন্তু বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে, এবং যেটা কাজের কথা, কৃষকের বর্ত্তমান সহায়-সম্পত্তি

লইয়া পারা যায় কি না, সেটাই গুরুতর সমস্যা। সে সমস্যার পূরণ না হইলে কৃষি-বিজ্ঞান আর উদ্ভিদ-বিজ্ঞান প্রায় এক থাকিয়া যায়, কৃষি-বার্ত্তা দাঁড়াইতে পারে না। দেশের কৃষক জানে, গোবর জমির "সার", এ কারণ সারকুড়ে সার গাদা করিয়া রাখে। গোবরের উপাদান কি, তাহা জানে না; কিন্তু জানে কোন্ মাটিতে কোন্ ফসলের পক্ষে গোবর হিতকর, কিসের পক্ষে খইল হিতকর। মাঠের মাটি পরীক্ষা করিয়া জানি, জমিতে নাইট্রোজেন ফস্ফরস্ ও পটাসিয়মের ন্যূনতা আশঙ্কা করিবার কথা। সব মাটিতেই কিছু না কিছু আছে, কিন্তু একটার ন্যূনতায় বৃক্ষ-জীবন-ক্রিয়া আটকাইয়া যায়। নাইট্রোজেনের সদ্ভাব কদাচিৎ হয়, এ বৎসর সদ্ভাব হইলেও পর বৎসর হয় না। কারণ বৃক্ষকে যে সোরা আকারে নাইট্রোজেন লইতে হয়, তাহা জলে ধুইয়া চলিয়া যায়, জমিতে থাকে না। এ কারণ কৃষক গোবর, গোমূত্র, অন্য পশুর বিষ্ঠা মূত্র চর্ম্ম ও শৃঙ্গচূর্ণ, গাছ-পচা প্রভৃতি দ্বারা নাইট্রোজেন নির্ব্বাহ করে। বরাহের বৃহৎ-সংহিতায়, অগ্নিপুরাণে, শুক্রনীতিতে, বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ আছে। পূর্ব্বকালে দ্রব্যগুণ প্রচুর আলোচিত হইয়াছিল। আমাদের আয়ুর্ব্বেদে যে দ্রব্যগুণ বর্ণিত আছে, তাহা যে কত ভূয়োদর্শনের ফল তাহা ভাবিলে এই বিজ্ঞানের দিনেও পূর্ব্ব-পিতামহদিগের প্রতি মস্তক আপনি নত হয়। দ্রব্যগুণ জানিলে লৌকিক কাজ চলে বটে, বিজ্ঞান-এষণা তৃপ্ত হয় না। ইহাতে কেহ মনে করিবেন না যে পূর্ব্বকালের মানব অপেক্ষা আজিকালির মানব অধিক বুদ্ধিশালী। স্যর ৰালেসের প্রমাণে বলিতেছি, বুদ্ধি পূর্ব্বাপর সমান আছে; পূর্ব্বেকার জ্ঞানের সহিত নূতন জ্ঞান যুক্ত হইতেছে। ইহাতেই, এই উত্তরাধিকারিত্বেই, সভ্য মানবের বড়াই। পূর্ব্বকাল হইতে "ক্ষণশঃ কণশঃ সাধিত" জ্ঞান একত্র হইয়া আধুনিক বিজ্ঞান। পূর্ব্বে ও এখন দেশ বিদেশে যে জ্ঞান লব্ধ হইয়াছে, তাহা আমাদের সকলের ভোগে আসিবার সুযোগ হইয়াছে। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান আমাদের কৃষিকর্ম্মে প্রয়োগ করিয়া বুঝিতেছি গোবর ও খইলে নাইট্রোজেন ফস্ফরস্ পটাসিয়ম্ আছে বলিয়া জমির সার হইয়াছে। দেশের কৃষক হাড়ের গুণ জানিত না। তাহার জানিবার প্রয়োজন ঘটে নাই। গ্রামের গবাদির হাড় গ্রামেই পড়িয়া থাকিত, দূর দেশান্তরে চলিয়া যাইত না। নদী-মাতৃকা ভূমি, যে ভূমি নদীর পলি-হেতু মাতৃস্বরূপা হইয়া শস্য দ্বারা প্রজাপালন করে, তাহার গুণ আমরা ভুলিয়া যাইতেছি। আমরা নদীর দুই পাশে অবিচ্ছিন্ন বাঁধ বাঁধিয়া উর্ব্বরতা-শক্তি সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতেছি। দামোদরের বন্যা বাঁধ ভাঙ্গিয়া ঘর বাড়ী নষ্ট করে বটে, কিন্তু যে কৃষক দামোদরের পলি পায় সে অপর সার খইল খোঁজে না। দেশের জ্বালানি কাঠ দুর্ল্লভ; কৃষক গোবর না পোড়াইয়া পারে না; গোবরের নাইট্রোজেন বায়ুসাৎ হয় তাহা জানিয়াও গোবর পোড়ায়। খইল মহার্ঘ; গরুকেই খাওয়াইতে পারে না। এই অবস্থায় প্রকৃতিলব্ধ পলির অপচয় চলে কি? নদীর পলি খাল ডোবা বুজাইয়া দেশ ভরাইয়া উচা করে, যে মেলেরিয়া পশ্চিম-বঙ্গ উৎসন্ন করিতেছে তাহারও নাকি প্রতিকার করে। বস্তুতঃ কৃষির একটা মূল কথা এই যে, ভূমি হইতে শস্যরূপে যাহা উঠাইয়া লইবে, কোন-না-কোন আকারে প্রত্যর্পণ করিবে, নতুবা ভূমি নিঃসার হইয়া পড়িবে। অতএব দেশ হইতে তিল তিসি গম কাপাস-বীজ প্রভৃতি স্থানান্তরিত হইলে খইল দিয়া ভূমি-ঋণ পরিশোধ করিতে হয়।

নাইট্রোজেন ফস্ফরস্ পটাসিয়মের ন্যূনতার শঙ্কায় জমিতে প্রচুর গোবর খইল হাড়-শিংগুড়া প্রভৃতি ঢালিলেই কর্ম্ম নিষ্পত্তি হয় না। গোমূত্রে মাটির তেজ বাড়ে বটে, কিন্তু অবস্থাগুণে গাছ জ্বলিয়াও যায়। জল বিনা গাছ বাঁচে না, কিন্তু আধিক্যে মরিয়া যায়। মাটির গুণে রবির তেজে শস্যের পক্ষে অধিক জল অল্প হয়; ক্ষেত্রভেদে অল্প জল অধিক হয়। রন্ধনকলায় অনভিজ্ঞ পাচক মসলার আধিক্য ঘটাইয়া ব্যঞ্জন সুস্বাদু করিতে চায়; কিন্তু যেমন মাত্রাজ্ঞ পাচক শ্রেষ্ঠ, মাত্রাজ্ঞ কৃষকও তেমন শ্রেষ্ঠ। জল ও সারের মাত্রা, বৃক্ষানুসারে মাত্রা সম্বন্ধে পরীক্ষা হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু অদ্যাপি ভূয়োদর্শনে নির্ভর করিতে হইতেছে। কিসে কখন কোন্ শস্যের পক্ষে মাত্রা অধম, কখন উত্তম হয়, তাহার বিজ্ঞান ত জানি না।

কৃষিকর্ম্মের এক ক্ষুদ্র অংশেও আমাদিগকে দৈবের মুখ চাহিয়া থাকিতে হইতেছে। সংক্ষেত্রে মূর্খ দ্বারাও বীজ উপ্ত হইলে উপচয় হয়। আশা এই যে আমার ক্ষেত্র

সম্মুখে পশ্চাতে চারিদিকে বিস্তৃত। আমরা যে বার্ত্তা আশ্রয় করিয়া জীবিকা করিতেছি, ক্ষেত্রস্বামীগণ তাহার উপায় বিধান করিবেন।

কৃষিবার্ত্তা দৃষ্টান্ত করিবার অপর উদ্দেশ্য আছে (১) দেখা যায় এই বার্ত্তা ধরিয়া দুরূহ বিজ্ঞানে প্রবেশ করিতে পারা যায়। যে-সকল ছাত্র মূর্ত্ত-বিজ্ঞান সহজ মনে করেন, তাঁহারা দেখিবেন কৃষিকর্ম্মের এক এক বিজ্ঞান অদ্যাপি অজ্ঞাত। (২) গবেষণা জাগ্রত করিবার পক্ষে কৃষি-বার্ত্তাও সুন্দর উপায়। গবেষণা শব্দের মূলার্থ নাকি গরু খোঁজা। গরু হারাইলে লোকে খুঁজিতে বাহির হয়। কৃষি-বার্ত্তার অসংখ্য গরু, মূল্যবান্ গরু খুঁজিবার আছে, যেগুলা পাইলে আমাদের বহু মঙ্গল হইবে। চাণক্য নাকি বলিয়াছেন, কৃষির্যস্য ন বাণিজ্যং গাবো যস্য ন ধেনবঃ। দারিদ্র্যং সততং তস্য গৃহে তস্য কুভোজনম্॥ আমাদের গৃহে যে কুভোজন হইতেছে, তাহা পল্লীতে প্রবেশ করিলেই প্রত্যক্ষ হয়।

এই যে অভাব-বোধ হইতে গবেষণা তাহাই প্রকৃত; অন্যের দেখাদেখি যাহা তাহা কৃত্রিম। আরও দেখিতেছি কৃষি ধরিয়া প্রায় যাবতীয় বিজ্ঞান শিখাইতে পারা যায়। বিজ্ঞানের এমন শাখা মনে হইতেছে না যাহা ইহাতে কিছু-না-কিছু না লাগে। ইহাই ত প্রজ্ঞাসাধারণের আবশ্যক। বিজ্ঞানের স্থূল তত্ত্ব প্রচারিত হউক, পরিচিত কৃষি-বার্ত্তার দৃষ্টান্তে প্রচারিত হউক। দেশের আপামর সাধারণে প্রচারিত হউক, পুস্তক দ্বারা হউক, কথা দ্বারা হউক। কিন্তু দেখিবেন যেন পুস্তক ও কথা দ্বারা পাঠক ও শ্রোতার মনে বিজ্ঞানের প্রতি আদর জন্মে। তাহাদের জ্ঞাত বিষয় লইয়া বিজ্ঞান প্রচার করিবেন; কেননা তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে। উহ উল্লেখ করিতে পারেন; কিন্তু তদ্ দ্বারা অজ্ঞতা ঢাকিতে চেষ্টা করিবেন না। পাঠক ও শ্রোতা হাজার বিষয়ে অজ্ঞ হউন, তাহারা মানুষ, বুদ্ধিশালী মানুষ, এ কথা কদাপি ভুলিবেন না।

আমাদের বৈজ্ঞানিক যুবকের নিকট কখনও কখনও দ্বিবিধ প্রশ্ন শুনিয়াছি (১) গবেষণার কি বিষয় বাকি আছে যাহা তিনি আরম্ভ করিতে পারেন। (২) গবেষণার বিষয় থাকিতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞান-কর্ম্মশালা নইলে ত কিছুই করা যাইতে পারে না। প্রথম প্রশ্নের উত্তর প্রায় দিয়াছি; দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে বলি, বিজ্ঞান-শালায় পরীক্ষার পূর্ব্বে প্রথমে ভূয়োদর্শন চলুক। পরিসংখ্যান কিংবা ভূয়োদর্শনের নিমিত্ত বিজ্ঞান-শালার প্রয়োজন হয় না। উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া চলিতে থাকিলে বিধেয় আপনি জুটিবে। আমরা সংসার-বৃত্তিতে "বাবু" হইয়া পড়িয়াছি। আমার মনে হয় জ্ঞানের পথে চলিবার সময়ও ভোগাসক্তি ভুলিতে পারি না। আমরা আর্য্য ঋষি মহর্ষি ইত্যাদির নাম উচ্চারণ দ্বারা মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করি। কিন্তু যাঁহাদের জ্ঞানের জন্য আমাদের গর্ব্ব তাঁহারা কি টানা-পাখার বাতাসে বসিয়া ভোগ-বিলাসে থাকিয়া জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন? বিজ্ঞান-শালা নাই, যন্ত্র-পাতি নাই; নাই থাক। এমন বিষয়ও ত আছে যাহাতে যন্ত্র-পাতি লাগে না। মানুষই বড়, যন্ত্র ত বড় নহে। এইত সে দিন ওড়িশার চন্দ্রশেখর সিংহ দুই-খণ্ড কাষ্ঠ লইয়া অসাধ্য-সাধন করিয়া গিয়াছেন। যে পঞ্জিকাসংস্কার-কোলাহলে কর্ণ পীড়িত হইয়াছে, দুইখানা কাঠির জোরে ওড়িশায় সে কোলাহল উঠিতে দেন নাই।

তৃতীয় প্রশ্নও শুনিয়াছি। বিজ্ঞান-শালা আছে, অবসরও আছে। কিন্তু কোন্ বিষয়ে গবেষণা কতদূর হইয়াছে তাহা জানি না, ইয়ুরোপ ও আমেরিকার যাবতীয় বৈজ্ঞানিক পত্র দেখিতে পাই না, যাবতীয় ভাষাও বুঝি না। ইহাদিগকে আমার নিবেদন এই যে, দেশের বার্ত্তা কিংবা কলা ধরিয়া গবেষণা করুন, তাহা নিশ্চয়ই নূতন এবং নিশ্চয় অফুরন্ত আছে। যে কোন একটা ধরুন, সেটা শেষ হইতে না হইতে দশটা আক্রমণ করিবে। সেটার বিজ্ঞান অন্য কেহ ব্যাখ্যা করিয়া থাকিলেও ক্ষতি হইবে না। দেশভেদে পাত্রভেদে ব্যাখ্যাভেদ হইতে পারে, পূর্ব্ব আবিষ্কার সত্য কি না পরীক্ষা হইবে। ইহাও না হয়, আপনার চেষ্টিত দ্বারা আপনার শক্তি বাড়িবে। আত্মশক্তি-লাভ শ্রেয়স্কর। হলাণ্ড দেশীয় ডি-ভিরিজ্ নামক উদ্ভিদ্‌বেত্তা তাঁহার বাগানের একটা গাছের পরিবৃত্তি দেখিয়া তাহার তত্ত্ব আবিষ্কারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরে ডারবিনের মতের অপবাদ ধরিতে পারিলেন। তিনি দেখিলেন অল্পে অল্পে ধীরে ধীরে জঙ্গম ও উদ্ভিদের জাতি-বহুলতা ঘটে নাই, অর্থাৎ জীবসৃষ্টি অবিচ্ছিন্ন ভাবে নাই। তাঁহার গবেষণার সময় তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী

মেণ্ডেলের গবেষণার ফল কিছুই জানিতেন না। ডি ভিরিজ বর্ণসংস্করণ দ্বারা গুণহারিতা অনুসন্ধান করিতেছিলেন, মেণ্ডেলও সে বিষয়ে গবেষণা করিয়া এমন এক তথ্য পাইয়াছিলেন যাহা এখন মেণ্ডেলের সূত্র নামে প্রচারিত হইয়া বিবর্ত্তনবাদীর মহা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ডি-ভিরিজ মেণ্ডেলের সূত্র অবগত থাকিলে হয়ত তাঁহার গবেষণা পাইতাম না, কিংবা তাঁহার চিন্তা-প্রসূত অনুমানও আসিত না। অতএব দেখা যাইতেছে, কে কোথায় কি তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা না জানিলেও গবেষণার ফল ব্যর্থ হয় না।

তবে এ কথা মানি, কাজের একটা শৃঙ্খলা থাকিলে ভাল হয়। সাহিত্য-পরিষৎ বাঙ্গলা গ্রন্থ অনুসন্ধান করিতেছেন, এই নিমিত্ত কর্ম্মী নিযুক্ত করিয়াছেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে কি ফল ফলিয়াছে তাহা আমরা সবাই জানি। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি কর্ম্মীর দল বাঁধিতে পারিয়াছেন এবং আমাদের দেশের ইতিহাস উদ্ধারে নিযুক্ত হইয়াছেন। দেশের বিজ্ঞানৈষণার এইরূপ এক সমিতি হইলে অনেক অকর্ম্মা ও নিষ্কর্ম্মা কর্ম্মীর দলে পড়িয়া কর্ম্মের পথ দেখিতে পাইতেন। মনে করুন যেন তাঁহারা দেশের সকলকেই আহ্বান করিয়া বলিতেছেন, আসুন আমরা দেশের বার্ত্তার বিজ্ঞান উদ্ধার করি। এ কাজে ছোট-বড় ভেদ নাই, দেহের হাত ছোট কি পা ছোট, তাহা যেমন নিরর্থক প্রশ্ন, এ কাজের কাজীদিগের ছোট বড় নাই। যিনি আবহ-বিদ্যা ভালবাসেন, তিনি কৃষি ও আবহের সম্বন্ধ স্থির করুন। কোন্ মেঘে কখন কি পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া থাকে, অমাবস্যা পূর্ণিমায় বৃষ্টি হয় কি না, "চাঁদের সোভা নিকট জল" এ কথা সত্য কি না, বাতাসে ঝড়ে কোন্ শস্যের কি ক্ষতি হয়, ক্ষতি হয় কেন, আমের মুকুলের কোন্ অবস্থায় কুয়াসা হিতকর নহে, ইত্যাদির উত্তর সংগ্রহ করুন। যিনি রাসায়নিক গবেষণা ভালবাসেন, তিনি কৃষির পক্ষে মাটির তিন আবশ্যক উপাদানের হ্রাস-বৃদ্ধি পরিমাণ করুন; শস্যের সহিত মাটির উপাদানের সম্বন্ধ নির্ণয় করুন, শস্যের পরিমাণ ও গুণের সহিত করুন, কিংবা শস্য-বৃক্ষের বয়স অনুসারে করুন, ইত্যাদি। এইরূপ নানা বিষয় আছে। যিনি যে শাখা ভালবাসেন তিনি সেই শাখাতেই জ্ঞাতব্য বিষয় পাইবেন। ডাক্তার কবিরাজ সকলেরই কাজ করিবার আছে। বিজ্ঞান ছাড়িয়া অর্থবিদ্যারও প্রচুর ক্ষেত্র আছে। উপরে যে সমিতির উল্লেখ করিয়াছি, সে সমিতি প্রশ্ন ছাপাইয়া, কোথাও কোথাও মার্গ সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিয়া, দেশের মধ্যে বিতরণ করিবেন। আমার বিশ্বাস, এইরূপে দেশে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। যাহার ফল সদ্য সদ্য পাই, তাহার দিকে আমরা স্বভাবতঃ ধাবিত হই। এই কারণে কৃষি-বার্ত্তা ধরিয়া বিজ্ঞান প্রচার করিতে বলিতেছি।

কিন্তু বিজ্ঞান-প্রচারের কথা উঠিলেই ইহার ভাষা পরিভাষার প্রশ্ন উপস্থিত হয়। আমরা পরিভাষা-সমস্যা যত কঠিন মনে করি, বস্তুতঃ তত নহে। এ বিষয়ে দুই চারি কথা সংক্ষেপে বলিতেছি।

ব্যাকরণে শব্দের চারি প্রবৃত্তি বা অর্থ ধরিয়া শব্দসমূহ চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। জাতি-শব্দ, গুণ-শব্দ, দ্রব্য-বা সংজ্ঞা-শব্দ, এবং ক্রিয়া-শব্দ।—এই চতুর্ব্বিধ শব্দের মধ্যে দ্রব্য-শব্দ সম্বন্ধে সঙ্কট মনে হইয়াছে। কথাটা এই, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন বলিব, না অন্য নামে বলিব? এরূপ বিতর্ক ওঠে কেন, তাহা বুঝা কঠিন। গরুকে গরু বলিব, না অন্য কিছু বলিব, এই বিতর্ক যেমন, অক্সিজেনকে অক্সিজেন বলিব, না অম্লজান বলিব, সে বিতর্কও তেমন। নূতন দ্রব্য যাহার নিকট পাই, সে যে নাম বলে, সে নামেই তাহা পরিচিত হয়। সকল ভাষাতেই ইহা সাধারণ নিয়ম। সংস্কৃত কোষে গ্রীক ও আরবী নাম পাইবেন; বাঙ্গলা কোষে, ইংরেজী কোষে নানা ভাষার শব্দ পাইবেন। কত ইংরেজী শব্দ বাঙ্গলায় চলিতেছে স্মরণ করুন, সে-সকল শব্দ কেবল দ্রব্য-বাচকও নহে। ইয়ুরোপে বিজ্ঞানের অভ্যুদয়; আমরা সে বিজ্ঞান ইংরেজীতে শিখিতেছি। শুধু বাঙ্গালী নহে, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের লোক শিখিতেছে। সকল প্রদেশের সহিত মিলিয়া ভারতবর্ষের নিমিত্ত সংজ্ঞা-শব্দ নির্ণয় করিতে পারিলে অন্ততঃ কিছু সুবিধা হইত। কোন্ প্রদেশে অক্সিজেনকে কি বলা হইতেছে তাহা জানা নাই। মনে রাখিতে হইবে, ভারতবর্ষে কেবল সংস্কৃতমূলক ভাষা নহে, মুসলমানী ভাষা ও দ্রবিড় ভাষা চলিত আছে। যদি

বিভিন্ন প্রদেশে অক্‌সিজেনের বিভিন্ন নাম হয়, তাহা হইলে এক ইংরেজী নাম স্থানে পঁচিশ নাম আসিয়া জুটিবে। যদি অধিকাংশ প্রদেশে অক্‌সিজেন কিংবা ইহার কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত নাম চলে, তাহাতে আমাদের সকলের সুবিধা। প্রদেশভেদে বিভিন্ন নাম না হইলে মাতৃভাষা ছাড়িয়া ইংরেজী পড়িতে গেলে নূতন নাম শিখিতে হয় না। ইয়ুরোপের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে বৈজ্ঞানিক নাম কিন্তু এক রহিয়াছে। যে নাম পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল, সে নাম আছে, বৈজ্ঞানিক নামও আছে। লোহা না বলিয়া সব স্থানে যে আয়রন কিম্বা অয়স বলিতে হইবে, তাহা নহে। ছেলের ডাকনাম রাখার মতন দুই পাঁচটা ইংরেজী নামের বাঙ্গলা ডাকনাম রাখিলে ক্ষতি নাই। জাপানীরা বৈজ্ঞানিক নাম জাপানী ভাষায় অনুবাদ করে নাই, কাজ বেশ চলিতেছে। যখন আমরা কোন দ্রব্য আবিষ্কার করিব তখন বিশেষ কারণ না থাকিলে আমাদের প্রদত্ত নাম ইয়ুরোপেও চলিবে।

একটা কথা এই, কোন কোন ইংরেজী নাম আমাদের মুখে সহজে উচ্চারিত হয় না, আমাদের কানে ভাল শোনায় না। বড় বড় শব্দ, সংস্কৃত শব্দ, ইংরেজী শব্দ, আরবী ফারসী শব্দ বাঙ্গলাতে কিছু কিছু বিকৃত হইয়া পড়ে। কিন্তু বিকারের সূত্র জানা আছে। সেই সূত্র ধরিয়া ইংরেজী নাম-শব্দের কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া লইলে বাঙ্গলা ভাষায় স্বচ্ছন্দে মিশিয়া যাইবে। যিনি ইংরেজীতে বিজ্ঞান লিখিবেন, তাঁহাকে একেবারে নূতন নাম শিখিতে হইবে না, বাঙ্গালায় যাহা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে দেখিয়াছেন, তাহাই পূর্ণ আকারে পাইবেন। এমন কি ইংরেজী নামের জেন্ অস্ অম্ প্রভৃতি কাটিয়া দিলে যৌগিক নাম রচনায় সুবিধা হয়। অক্‌সিজেন—অক্‌সি, সল্‌ফর—সল্‌ফ, পটাসিয়ম্—পটাসি করিলে ক্ষতি দেখি না। ইংরেজী নাম লইলে আপত্তি হয় যে নামটা একেবারে সঙ্কেত থাকিয়া যায়। কিন্তু আমরা কয়টা শব্দের ব্যুৎপত্তি স্মরণ করিয়া মনে রাখি কিংবা প্রয়োগ করি? রূপাকে কেন রূপা বলি, তাহা জানি না; গন্ধক নাম কেন দেওয়া হইয়াছিল তাহা অন্বেষণ না করিয়াও আমরা বাজার হইতে গন্ধক কিনিয়া আনি। দ্রব্যের গুণ লক্ষ্য করিয়া নাম রচিত হইলে মনে রাখার সুবিধা হয় বটে, কিন্তু অন্য অসুবিধা ঘটে। ইংরেজীতেও অনেকগুলা রাসায়নিক মূল পদার্থের নামের অর্থ নাই; নামকর্ত্তার সখ বই আর কিছু নাই। গুণবাচক শব্দ সংজ্ঞা করিতে সংস্কৃত ভাষা অদ্বিতীয় ছিল। প্রাণী ও উদ্ভিদের এমন সংস্কৃত নাম প্রায় নাই যদ্দ্বারা লক্ষণ প্রকাশিত হয় না। এখন সংস্কৃতের কাল নহে, অপর এক ভাষারও নহে। মনে রাখার সুবিধা হইবে ভাবিয়া অক্‌সিজেন অম্লজান, হাইড্রোজেন উদজান, জলজান, ইত্যাদি না-বাঙ্গালা না-সংস্কৃত না-ইংরেজী এমন অদ্ভুত নাম রচিত হইয়াছিল। কিন্তু কেবল রসায়ন বিজ্ঞানের অক্‌সিজেন হাইড্রোজেন নহে, ইহাদের অসংখ্য যৌগিক দ্রব্যের নাম আছে। এই এক কারণে সংস্কৃত নাম-করণ ব্যর্থ হইবে। ভূ-বিজ্ঞানের অসংখ্য মণির নাম বাঙ্গলায় রচিত হইবে কি? গাছপালা জীবজন্তুর নাম কি হইবে? লেটিন্ নামের সঙ্গে-সঙ্গে কি এক-একটা সংস্কৃত বৈজ্ঞানিক নাম রচনা করিতে হইবে? প্রয়োজন অনুসারে দেশী গাছপালা পশু-পক্ষীর দেশী নাম বাঙ্গলা নাম না থাকিলে গড়িতে হইবে, কিন্তু সকল স্থলে নহে, কিম্বা শ্রেণী-বিভাজনে নহে। ইংরেজীতেও ডাকনাম ও বৈজ্ঞানিক নাম আছে। উদ্দেশ্য ও অধিকারীভেদে কোথাও ডাকনাম কোথাও বৈজ্ঞানিক লেটিন্ নাম করিতে হয়। এখানেও, বোধ হয়, দীর্ঘ লেটিন নামগুলা বাঙ্গলায় সংক্ষিপ্ত করিতে হইবে। ইহাতে দোষ হইবে না, কারণ বাঙ্গলাতে লেটিন নামের অর্থ কিংবা ব্যাকরণ কিছুই জানা থাকিবে না। আকাশের তারার গণ-নাম ও জাতি-নাম যোগে ইংরেজী নাম হয় নাই। তারার নামে সে রীতি চলিতে পারে না। বোধ হয়, নক্ষত্র নাম বাঙ্গলায় করিয়া তারার নাম প্রভা ধরিয়া এক দুই তিন অঙ্ক দ্বারা রচনা করিতে হইবে। সংজ্ঞা শব্দ ব্যতীত গুণ ক্রিয়া অবশ্য বাঙ্গলায় বলিতে হইবে। কদাচিৎ ইংরেজী শব্দও লইতে হইবে। এ বিষয় বহুবার বহুস্থানে আলোচিত হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, যদি সাহিত্য-পরিষৎ উপযুক্ত লেখক দ্বারা এক এক বিজ্ঞান বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রামাণিক পুস্তক লেখাইয়া প্রচার করিতেন, তাহা হইলে এতদিন একটা পথ দেখা যাইত। লেখার গুণে দুরূহ বিষয় সুবোধ্য হয়। সংজ্ঞা বুঝাইয়া দিলে বুঝিতে পারা

যায়, কিন্তু লেখার দোষ থাকিলে সংজ্ঞায় ভয়সঞ্চার করে।

এখন উপসংহার করি। আপনাদের নিকট পিষ্ট-পেষণ করিলাম, পেষণ শব্দে কর্ণপীড়াও জন্মাইলাম। গ্রামবাসীর নিকট গ্রামের সংবাদ ব্যতীত অন্য কিছু আশা করিলে আপনাদের ভূয়োদর্শিতায় দোষ স্পর্শিবে। সময়ে অসময়ে আমরা কলা, বিজ্ঞান প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করি। সব সময় বুঝিয়া করি না। এই হেতু কলার লক্ষণ, কলার সহিত বিজ্ঞানের সম্বন্ধ, বিজ্ঞান শব্দের অর্থ স্থিতি মার্গ মহিমা অনুবোধন করিয়াছি। দেখিয়াছি প্রাচীনে ও নবীনে বিজ্ঞানের মার্গ এবং তর্ক-বিদ্যা এক। অতএব আধুনিক বিজ্ঞানে আমাদের অগ্রসর হইবার বিঘ্ন দেখা যাইতেছে না। তথাপি দেশে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না। আমার অনুভবসিদ্ধ প্রতিকার জ্ঞাপন করিয়াছি। বহুর নিমিত্ত মূর্ত-বিজ্ঞানের প্রয়োজন দেখাইয়াছি। শেষে কৃষিবার্ত্তা উপলক্ষ্য করিয়া দেশের সকলকে, বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক, গ্রামবাসী ও পুরবাসী, সকলকে সম্বোধন করিয়াছি। মানব-সমাজ যেমন হউক, তাহার আয়ুর্ব্বেদ নিশ্চয় থাকে, বার্ত্তাও থাকে। আমাদেরও ছিল ও আছে। চরক লিখিয়াছেন, বায়ু বিনা অগ্নি জ্বলে না, মেঘের সৃষ্টি হয় না, জলের বর্ষণ হয় না, পুষ্প ফলের উৎপাদন, উদ্ভিদের উদ্ভেদন, শস্যের বর্দ্ধন, লৌহ পিত্তলাদি ধাতুর প্রভেদকরণ, প্রভৃতি হয় না। এ সব কথা নিশ্চয়ই ভূয়োদর্শনের ফল, পরীক্ষার ফল। এইরূপ কৃষিবার্তায় কত বিজ্ঞান লুক্কায়িত আছে। তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনারও সময় নাই। আমরা কোন কোন বিষয়ে চারি শত, কোন কোন বিষয়ে দুই-একশত বৎসর ইয়ুরোপের পশ্চাতে পড়িয়াছি। এখন আমাদিগকে দৌড়াইতে হইতেছে। তার উপর, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অল্প বয়সেই এত লাফাইতেছে এত দৌড়াইতেছে যে আমরা পেছু ধরিতে পারিতেছি না। কিন্তু আমাদিগকে নাকি দ্বিবিধ পাপের ফল ভুগিতে হয়। কালকৃত পাপে আমরা বাধা দিতে পারি না, যদিও ফলভোগ করিতেই হয়। ইহার উপর, আলস্য ও প্রমাদজনিত পাপ জুটিলে উদ্ধারের আশা থাকে না।

কিন্তু এক বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। সে কালের একঘ্ন অসির পরিবর্ত্তে এই যে ইয়ুরোপে শতঘ্ন বাণ নির্ম্মিত হইয়াছে, প্রকৃতির উপর আধিপত্যলাভে ইয়ুরোপ ও আমেরিকার ভোগ-প্রবৃত্তির আস্ফালনে দিগন্ত কম্পিত হইতেছে, তাহা হইতে বিরত হইতে হইবে। যে বিদ্যা বা বিজ্ঞান বিনয় না দেয়, যাহাতে "জ্ঞান" না জন্মায়, সে বিদ্যা বা বিজ্ঞান পয়োমুখ বিষকুম্ভ জানিতে হইবে। এদেশ চিরদিন মোক্ষাভিলাষী ; এদেশ নির্ব্বাণের দেশ, বৈষ্ণবের দেশ। এদেশে শক্তিও বৈষ্ণবী মূর্ত্তিতে পূজিতা হন। নাস্তিক্যের প্ররোচনা বর্জ্জন করিয়া শ্রেয়ের পথে চলিতে হইবে। আমাদের প্রাচীনেরা এ কথা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা বিজ্ঞান ও দর্শন এক করিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন প্রকৃতির জ্ঞান বা বিজ্ঞান খণ্ড জ্ঞান। সে জ্ঞান দ্বারা আমাদের সত্তা ও জীবনের লক্ষ্য বুঝিতে পারা যায় না। ইদানী দর্শন হইতে বিজ্ঞান পৃথক করা হইয়াছে। প্রকৃতির মন্দিরে প্রবেশ-পথে আধুনিক বিজ্ঞান নিম্ন সোপান হইয়াছে ; দর্শন উচ্চে রহিয়াছে। কিন্তু উভয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে, বিজ্ঞান ও দর্শনের, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের কৃত্রিম কলহ সৃষ্টি হইয়াছে। আজিকালির অধিকাংশ বিজ্ঞান-সেবী ধূলা-কাদা লইয়া খেলা করিয়া জীবন কাটাইতেছেন। কদাচিৎ কেহ খেলাঘর ছাড়িয়া দূরদর্শী হন, প্রকৃতি-বিকৃতি ছাড়িয়া মূল-প্রকৃতি দর্শন করেন ; ভাগ্যবান কেহ বা ইহারও উর্দ্ধে প্রকৃতি-পুরুষের যুগলমিলন প্রত্যক্ষ করেন। ইঁহারা ধন্য, ইঁহাদের সাধনা ধন্য। বিজ্ঞানকে ধূলাখেলা সার মনে করিলে, প্রকৃতির লীলা-নর্ত্তনে আনন্দ পাইলে ও তাহাতে বিমোহিত হইলে, আমাদের দেশের বিজ্ঞান ভুলিলে বিজ্ঞানচর্চ্চা সার্থক হইবে না।*

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

* বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বিজ্ঞানশাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় সাহেব অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায়, এম্, এ, এফ আর এ এস, এফ আর এম এস, বিদ্যানিধি মহাশয়ের অভিভাষণ।

সেখ আন্দু

(১)

গ্রীষ্মকালের নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর। চারিদিক প্রচণ্ড রৌদ্র-তেজে ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। পৃথিবীর বক্ষভেদ করিয়া একটা গভীর উত্তাপ ঠেলিয়া উঠিতেছে। চারিদিকের জমাট গ্রীষ্মের গাম্ভীর্য্য যেন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।

ভাগলপুরের উকীল চৌধুরী-সাহেবের ইন্দ্রপুরী-বিনিন্দিত কলরব-মুখর অট্টালিকা এখন সম্পূর্ণ নীরব; গ্রীষ্ম-ক্লিষ্ট লোকজন সকলেই যে-যাহার ঘরে বিশ্রাম করিতেছে। দ্বিতলে কর্ম্মনিরতা দুই একজন দাসীর বিরক্তিব্যঞ্জক উচ্চ চীৎকার মাঝে মাঝে শোনা যাইতেছে। পালিত কুকুর-বিড়ালগুলি, সাড়াশব্দ বন্ধ করিয়া, স্থানে স্থানে পড়িয়া, অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে।

কুঠীর বামদিকের সীমানায় চাকরদের একতলা গৃহ-শ্রেণী। চাকরেরা ছুটি পাইয়া সকলেই গৃহদ্বার ঠেসাইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। ঘরগুলি সবই উত্তরদ্বারী, কাজেই বারান্দায় রৌদ্র না পড়িলেও ঘরগুলা রৌদ্রতাপে অতিশয় গরম হইয়া উঠিয়াছে।

বারান্দার প্রান্তে টুলের উপর সেলাইয়ের কল রাখিয়া একটা ছোট চৌকীতে বসিয়া গায়ে তোয়ালে জড়াইয়া চৌধুরী-সাহেবের মোটর-গাড়ী-চালক তরুণ যুবা আন্দু মিঞা কতকগুলি কাপড়ে লেশ্ বসাইতেছিল। পাশে বেঞ্চির উপর কয়েকটা লেশের পাকানো বাণ্ডিল ও কতক-গুলা নূতন কাপড় ভাঁজ করা রহিয়াছে।

আন্দুর দৈহিক গঠন পৌরুষ-কঠিন,—কিন্তু লালিত্য-বর্জ্জিত নয়। প্রশস্ত ললাটে মমতাশীলতার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিতেছে, চক্ষু দুটি নম্র স্নিগ্ধ, বিশাল বক্ষ, আজানুলম্বিত বাহু, সর্ব্বশরীর পেশীসবল, পুষ্টসুন্দর, মনোরম লাবণ্যে উদ্ভাসিত।

অবিশ্রাম কলের শব্দের সহিত যুবা একমনে সেলাই করিতেছে। অনেকক্ষণ কাটিল। মধ্যাহ্নের খরতপ্ত বাতাস মাঝে মাঝে আগুনের হল্কা ছড়াইয়া, হু-হু করিয়া বহিয়া যাইতেছে। কপালের উপর অবিন্যস্ত রেশমের মত কোমল মসৃণ কেশরাশি ঘামে ভিজিয়া উঠিল, টস্‌টস্ করিয়া ঘাম ঝরিল! যুবা তোয়ালে খুলিয়া, সর্ব্ব শরীরের ঘাম মুছিয়া তোয়ালে আবার কাঁধে ফেলিল। গ্রীষ্ম-ভারাক্রান্ত নিঃশ্বাস ছাড়িয়া মাথা তুলিয়া একবার রৌদ্রঝলসিত বহিঃপ্রকৃতির পানে দৃষ্টিপাত করিয়া আবার সেলাই আরম্ভ করিল।

পাশের দ্বার খুলিয়া সুপ্তিরক্ত চক্ষু মুছিতে মুছিতে অশ্ব-চালক আকবর আসিয়া পাশের চৌকীতে বসিল। বারম্বার চক্ষু মুদিয়া বাহিরের আলোটা চোখে ভাল করিয়া সহাইয়া লইয়া সশব্দে কণ্ঠের শ্লেষ্মা দূর করিয়া বিরক্ত স্বরে বলিল—ইস্ গরমের চোটে জান জখম্ হয়ে উঠছে, এ সময় কলের খ্যাচ্‌খ্যাচানি আওয়াজ!—তোমার এসব ভালও তো লাগে বাপু! উঃ ভারি অসহ্য।"

কলের সূচের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মৃদু হাস্যে আন্দু বলিল, "শুয়ে শুয়ে ছট্‌ফট করার চেয়ে একটা কাজে জোড়া থাকা মন্দ কি।"

আকবর সে কথার জবাব না দিয়া বলিল, "এসব হচ্ছে কি?"

"দরজা জান্‌লার পর্দ্দায় হাতে-বোনা সুতোর লেশ্ বসান হচ্ছে।"

"বরাৎ কার? ফরমাস দিলে কে?"

"খুকুমণি।"

"হুঁ! তোমার যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তাই বাজে কাজের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে অনর্থক ভূতের ব্যাগার খেটে মর্‌ছ,—তুমি-সাহেব তাই পার, আমি হলে ঠিক্ হাঁকিয়ে দিতুম, সে দাদাই হোক্ আর দিদিই হোক!"

আকবরের বীরত্বগর্ব্বিত উক্তির উত্তরে আন্দু কিছু বলিল না, শুধু একটু হাসিল। আন্দু অন্য কথা পাড়িল।

উভয়ে বসিয়া কথা কহিতেছে, এমন সময় চৌধুরী-সাহেবের সপ্তদশ বর্ষীয়া তনয়া লতিকাদেবী বারান্দায় আসিয়া দেখা দিল। লতিকা অবিবাহিতা; কলিকাতায় বোর্ডিঙে থাকিয়া পড়াশুনা করে, এবারে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছে।

লতিকার চেহারা মোটের উপর মন্দ নয়। তবে অস্বাভাবিক অহঙ্কারের আবরণে আপাদমস্তক আবৃত থাকায় তাহার রমণী-সুলভ সুকোমল সৌন্দর্য্য-শ্রীর উপর একটা উগ্রতা আসিয়া পড়িয়াছে। লতিকার বেশভূষা পরিচ্ছন্ন মার্জ্জিত, শুভ্র সুন্দর।

লতিকার হাতে একটা ফুটন্ত গোলাপ ফুল; সেটাকে উঁচু করিয়া ধরিয়া, তাচ্ছিল্য দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে, আসিয়া তাহাদের ঠিক সম্মুখে দাঁড়াইল। স্থানটা এসেন্সের তীব্র মধুর সৌরভে আমোদিত হইয়া উঠিল। লতিকার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আন্দুর মাথা অনাবশ্যকরূপে খুব বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়া কলের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

স্বভাব-সিদ্ধ চঞ্চল কটাক্ষে চারিদিকে চাহিয়া লইয়া লতিকা যথাসাধ্য গম্ভীর মুখে বলিল "বাঃ! তুমি ত দর্জ্জির কাজ বেশ জান দেখ্‌ছি। এ কলটা কার? তোমার?"

আন্দু বিনীত ভাবে বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তোমার আগে দর্জ্জির দোকান ছিল না?"

"আজ্ঞে আমার বাবার ছিল।"

আকবরের দিকে ফিরিয়া লতিকা বলিল—"আকবর, তোমার ছেলেদের দেশে পাঠিয়েছ অনেকদিন, আর আন না কেন? কেমন আছে তারা সব?"

আকবরের ছেলেদের জন্য লতিকার যে খুব গুরুতর আগ্রহ আছে, তাহার প্রশ্নের ভঙ্গীতে এমন কোন ভুলক্ষণ প্রকাশ পাইল না। আকবর একটু সরিয়া বসিয়া বলিল, "তাদের সব অসুখ করেছে।"

"অসুখ করেছে? ওঃ! কি অসুখ?"

আকবরের মুখপানে চাহিয়া কথা কয়টি জিজ্ঞাসা করিয়াই তাহার উত্তর শুনিবার অবকাশ হইল না, লতিকা আন্দুর দিকে চাহিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, তুমি দোকান ছাড়লে কেন?"

আন্দু একটু হাসিল, বলিল—"সে নানা কারণে তুলে দিয়েছি।"

"তোমার কলটা বেশ ভাল, সরসী এটা কিন্‌ব বলছিল। আচ্ছা এ কাপড়গুলো কার? তারি কি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"উঃ কি গরম!" বলিয়া দুইহাতের মধ্যে সজোরে মুখটা ঘসিয়া বাঁ হাতের চুড়িগুলি লতিকা নাড়িয়া দেখিতে লাগিল। সে এবার কলিকাতা হইতে পছন্দ করিয়া রং মিলাইয়া এক হাত কাঁচের সরু সরু চুড়ি পরিয়া আসিয়াছে। চুড়ি দেখিতে দেখিতে মুখ তুলিয়া আকবরকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কখনো কলকাতা গিছলে?"

আকবর বলিল "না।"

"কল্‌কাতা বেশ জায়গা, ভাগলপুরটা অতি বিচ্ছীরি গরম দেশ।"—কলিকাতার তুলনায় ভাগলপুর অত্যন্ত দুঃসহ হতশ্রী অনুভব করিয়া লতিকা বিরক্ত হইল। অতিশয় অস্থিরভাবে বারান্দার প্রান্তাবধি এক চক্র ঘুরিয়া আসিয়া তাহার পর আবার সেইখানে দাঁড়াইল। প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া কলের কাজ দেখিতে লাগিল।

হাতের ফুলটার পাপ্‌ড়ি ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে বলিল, "আচ্ছা তুমি কতক্ষণে এগুলো সেলাই কর্‌ত্তে পার?"

আন্দু আনত দৃষ্টিতে বলিল, "ঘণ্টা দেড়েকের বেশী সময় লাগবে না বোধ হয়।"

ঠিক এই সময় বিলাতী বুটের মশমশানি শব্দে চারিদিক মুখর হইয়া উঠিল। দুপ দাপ শব্দে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া চৌধুরী-সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র কিরণচন্দ্র বারান্দায় উঠিলেন। কলেজে পড়াশুনার কিছু গোলযোগ হওয়ায় সেখানে কিঞ্চিৎ গুঁতা খাইয়া বেচারীর মেজাজ সেদিন নিতান্তই বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছিল। বারান্দায় উঠিয়াই নিশ্চিন্ত উপবিষ্ট আকবরকে দেখিয়া উগ্রস্বরে বলিল, "নবাব সাহেব, নতুন ঘোড়াকে টহল দেওয়া হয়েছে? না বয়ে গেছে?"

কিরণের অকারণ উগ্রতায় আকবরও অকস্মাৎ চটিল; সেও সমান স্বরে গলা চড়াইয়া জবাব দিল—"না।"

আর যায় কোথা! গুঁতার উপর বিষম হুঁচট্‌! অপমানিত কিরণচন্দ্র রুখিয়া দাঁড়াইয়া আকবরের উদ্দেশে সোজা বাক্যের উৎস খুলিয়া দিল। কলেজের ছাত্র কিরণের যুবক-জীবন যে মলয়ের বাতাস জ্যোৎস্নার আলো আর ফুলের গন্ধে ভরপুর ছিল না, তাহা অনেকে জানিত—সর্ব্বাপেক্ষা ভাল জানিত, চাকরেরা; আজ সে আহতচক্র ভুজঙ্গের ন্যায় তাহার প্রচণ্ড প্রমাণ বর্ষণ করিয়া আকবরকে পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিল—সে যে-সে লোক নহে। রুক্ষ-স্বভাব পুরাতন চাকর আকবরও চুপ করিয়া সহিবার পাত্র নহে, সেও সুস্পষ্টরূপে জানাইয়া দিল এত রৌদ্রে ঘোড়া ঘুরাইয়া আনা তাহার কর্ম্ম নহে।

কিরণচন্দ্র চাকরদের কাজে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দৃষ্টি রাখিত বলিয়া কেহই তাহাকে প্রসন্ন চক্ষে দেখিতে পারিত না। কিন্তু হইলে কি হয়? পিতৃব্যের অনর্থক অপব্যয়,

সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র নীরবে দেখে কেমন করিয়া? কাজেই তাহাকে বাধ্য হইয়া বলিতে হয়, না হইলে তাহার কি মাথা-ব্যথা?

মাথা-ব্যথা যাহারই হোক্, আন্দুর কেমন অসহ্য বোধ হইল। উভয়ে বচসা চলিতেছে, মাঝখান হইতে সে কল, কাপড়, কাঁচি, সুচ, সুতা, সব গুটাইয়া তুলিয়া ফেলিল; সংযত স্বরে বলিল, "যান্ বাবু যান্, এত রাগারাগির দরকার কি,—আমি ঘোড়া ঘুরিয়ে আন্‌ছি।"

বাড়ীর সকলেই চাকরদের শ্রেণী হইতে আন্দুকে একটু স্বতন্ত্র চক্ষে দেখিত। কেননা সে লেখাপড়াও জানিত এবং রীতিনীতির জ্ঞানও তাহার যথেষ্ট ছিল। কঠোরপ্রকৃতি ছিদ্রান্বেষী কিরণচন্দ্রও তাহাকে অনেকখানি শ্রদ্ধা করিত। কিন্তু আজ ক্রোধের মুখে গর্জ্জনের মাত্রা সম্বরণ করিতে পারিল না, বলিল—"তোমার তো করবার কথা নয়, তুমি কেন ফফরদালালি করতে এসেছ? যে নবারজাদারা..."

আন্দু নিজের দালালি করার কোনো কারণ দিতে পারিল না। বিপন্ন ভাবে সবিনয়ে বলিল—"হোক্ না বাবু, এরা সকাল থেকে গাড়ী ঘোড়ার পিছুতে ঢের খিদ্‌মদ্ খেটেছে। আমিই ঘোড়াটাকে দৌড় দিয়ে আনি।"

উত্তপ্ত কিরণচন্দ্র গজ্‌গজ করিতে লাগিল। এতক্ষণ লতিকা নীরবে এক পাশে দাঁড়াইয়া বিদ্বেষপূর্ণ নয়নে কিরণের ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করিতেছিল। সেই সময় সে হঠাৎ তাড়াতাড়ি অন্যত্র চলিয়া গেল।

কিরণও চলিয়া গেল। আক্‌বর রুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসিয়া ফুঁসিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল—সে অমন ঢের লাল চোখ দেখিয়াছে।

আন্দু নরম সুরে বলিল, "যেতে দাও দাদা, চল ঘোড়াটাকে দুরুস্ত করে আনা যাক্—"

প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া আকবর বলিল—"আরে না না, সে আমি পারবই না! এক ফোঁটা ছেলে, কাল যাকে আমি হতে দেখলেম, তারই কথা শুনে কাজ! কখনই না।"

আকবর আরো শক্ত হইয়া বসিল। রাগের চোটে তাহার গলা দিয়া কি যেন একটা ঠেলিয়া উঠিতেছিল। চৌধুরী-সাহেবের এতদিনের পুরানো চাকর সে, তাহাকে কি না খামকা যখন-তখন এমনি তাড়াহুড়া।—ইস্! না হয় সে চাক্‌রীই ছাড়িয়া দিবে, এত সে সহ্য করিতে পারে না।

বছর খানেকের পরিচয় হইলেও, আন্দু আক্‌বরকে বেশ চিনিয়াছিল, কিন্তু বকাবকিটা সে বড় অপছন্দ করিত। ক্ষুণ্ণমনে আকবরের মাথার চুলে হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নেহময় কণ্ঠে আন্দু বলিল—"কি করবে বল দাদা, দুনিয়ায় সব লোক তো সমান নয়, পাচটা আঙ্গুল মানুষের,—কেউ ছোট, কেউ বড়, তবু এই নিয়েই তো মানুষকে কাজ চালাতে হয়। জান ত দাদা, জায়গা-বিশেষে চড়া বুলি শুন্‌তেও হয়, আবার শোনাতেও হয়! ছেলেমানুষের কথায় রাগ করা কি তোমায় সাজে! তুমি ত ওদের হাতে করে মানুষ করেছ..."

আক্‌বরের মন নরম হইয়া গেল। আন্দুর কণ্ঠস্বরের ভঙ্গীতে সুদূর অতীতের সহস্র রঙীন ছবি তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। ক্রোধ-উৎক্ষিপ্ত চিত্তের তিক্ততা অনেকটা প্রশমিত হইল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ঘোড়া নিয়ে আমি যাচ্ছি, তুমি থাক।"

"আরে না না, দাদা তাও কি হয়! তুমি এখন জীরোও আমি যাচ্ছি—"

আন্দুর কোমল সহৃদতায় আকবরের কঠিন অন্তরে মমতার সঞ্চার হইল, বলিল, "না না ভারি রোদের তেজ, তুমি থাক—"

বাধা দিয়া সহাস্যে আন্দু বলিল—"কিছু ভেবো না দাদা, চাঁদের আলো, সুযির আলো আমার ঠিক সমানই বরদাস্ত হয়।—চাবুকটা দেবে চল।"

আকবরকে টানিয়া লইয়া আন্দু চলিল। আন্দুর সরল সহানুভূতিতে যদিও আকবরের অন্তর্নিহিত ঝাঁঝটা চাপা পড়িয়াছিল কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নয়। পথের পাশে কিরণের সখের কুকুরটা শুইয়া গাঢ় নিদ্রায় আরাম উপভোগ করিতে-ছিল, আকবর যাইবার সময় সেই নিরীহ প্রাণীটার পৃষ্ঠে এমন ভাবে চরণস্পর্শ করিয়া গেল যে কুকুরটা হঠাৎ জাগিয়া আর্ত্তরবে কেঁউ কেঁউ করিয়া ছুটিয়া পলাইল।

আকবরের আচরণে আন্দুর মুখ গম্ভীর হইল। নূতন অনর্থ বাঁধিবার আশঙ্কায় সে তখনকার মত আর কিছু উচ্চবাচ্য করিল না, কিন্তু তাহার অপ্রসন্ন দৃষ্টির নির্ব্বাক

তিরস্কারে আকবর মনে মনে বড় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, আব্দু মুখ ফুটিয়া ভৎর্সনা করিলে তাহার বুঝি সে লজ্জা হইত না। সে তাড়াতাড়ি চাবুক দিয়া নীরবে চলিয়া গেল।

কুঠীর সামনে ময়দানে দাঁড়াইয়া প্রকাণ্ড লাল ঘোড়ার গায়ে মাথা ঘসিয়া তাহাকে একটু আদর করিয়া প্রসন্নমুখে শীস্ দিতে দিতে আব্দু ঘোড়ার মুখে লাগাম কসিল। তারপর ঘোড়াশালা হইতে নিদ্রিত সহিস রহিম খাঁকে ডাকিয়া জাগাইয়া তুলিল। রহিম বাহিরে আসিলে বলিল, "চাচা, তুমি আর ঘুমিও না, আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরব। সাহেবের আফিস-ঘরখানা ঝাড়্‌তে হবে, হরিহরের শরীর ভাল নেই।"

লাফাইয়া ঘোড়ার অনাবৃত পিঠে চড়িয়া আব্দু ঘোড়া ছুটাইল। সচরাচর আব্দু ঘোড়ার মুখে লাগাম না দিয়া ঘোড়া ছুটাইত। ঘোড়ার ঘাড়ের কেশগুচ্ছ মুঠাইয়া ধরিয়া, কান ধরিয়া লাগামের অভাব সারিয়া লইত। বজ্জাত ঘোড়াকেই শুধু লাগাম কসিত; বিচিত্র কৌশলময় মোটর-কার ও দুরন্ত তেজস্বী অশ্ব, এই দুইটি তাহার জীবনের প্রধান কৌতুকের সামগ্রী ছিল।

রহিম খাঁ আড়ামোড়া দিয়া গা ভাঙ্গিল। এই দুপুর রৌদ্রে ঘোড়া লইয়া বাহির হওয়ায় আব্দুর উপর ভারি বিরক্ত হইল এবং এই বাহাদুরীর ফলে যে ছোকরাটি কোন্ দিন সর্দ্দিগর্ম্মি হইয়া মারা পড়িবে, সে সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় করিয়া অসন্তুষ্ট রহিম খাঁ বিড়্‌বিড়্ করিয়া বকিতে বকিতে চলিয়া গেল।

আব্দুর জীবনের অতীত অধ্যায়ের কাহিনী একটু বৈচিত্র্যরঞ্জিত, বিস্ময়াবহ। তাহার পিতার ভাগলপুরে একটি মাঝারি রকম দর্জ্জির দোকান ছিল। পিতা সচ্চরিত্র এবং অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু নিষ্ঠাপরায়ণ লোক ছিলেন। সকলেই তাঁহাকে সবিশেষ শ্রদ্ধা করিত। অতি শৈশবে আব্দুর মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল, কিন্তু তিনি আর দারান্তর গ্রহণ করেন নাই। পুত্রকে তিনি অল্প বয়স হইতে দর্জ্জির কাজ শিখাইতে আরম্ভ করেন। পুত্রের কিন্তু সে কাজে মন বসিল না, লেখাপড়ার উপর তাহার অদম্য কৌতূহল দেখিয়া পুত্রবৎসল পিতা তেরো বছরের পর তাহাকে স্কুলে পাঠাইলেন।

নারীসম্পর্কশূন্য গৃহে, পিতার স্নেহে, পিতার আদর্শে আব্দু ঠিক পিতার মতই শুচিতা-সম্পন্ন, সুকোমলহৃদয় হইয়া উঠিয়াছিল। দরিদ্রের উপর তাহার করুণার সীমা ছিল না, পিতার সহানুভূতিতে তাহার দয়া প্রবৃত্তির যথেষ্ট অনুশীলন করিবার সুযোগও হইত। পিতা তাহার প্রায় কোন কার্য্যেই বাধা দিতেন না। ফলে ন্যায় অন্যায়ের মীমাংসার ভার নিজের উপর পড়ায়, সে বিকৃতবুদ্ধি স্বেচ্ছাচারী না হইয়া দৃঢ়প্রকৃতির স্বাবলম্বীরূপে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল।

স্কুলে গিয়া, অখণ্ড অধ্যবসায়ী বালক শীঘ্রই প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইল, তখন পিতা তাহাকে স্কুল ছাড়াইয়া জাতীয় ব্যবসায় অবলম্বন করিতে অনুমতি দিলেন। আব্দুর উৎসুক শিক্ষা-পিপাসা নিবৃত্ত হইল না, সে পিতার অজ্ঞাতে এক অভিজ্ঞ লোকের কাছে আরবী ফারসী শিখিতে লাগিল। কিছুদিন শিখিয়া সে বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়া ফেলিল। এই সময়ে সাধু সন্ন্যাসী ফকির মহলে তাহার গতায়াত অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল। পিতা উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিলেন, পুত্র বুঝি বা দেওয়ানা হয়। কয়েকজন বন্ধুর পরামর্শে তাহাকে স্থানান্তর করিবার উদ্দেশ্যে আগ্রায় একজন বিশিষ্ট লোকের কাছে চিত্রবিদ্যা শিখিতে পাঠাইলেন। কিছুদিন সেখানে চিত্রবিদ্যায় আব্দুর খুব ঝোঁক দেখা গেল! তাহার পর যেদিন শিক্ষক তাহার প্রশংসা করিয়া বলিলেন "তুমি সময়ে মস্ত নামজাদা হইবে"—সেই দিন তাহার সমস্ত উৎসাহের স্রোত নিঃশেষিত হইল, যাহা দুষ্প্রাপ্য তাহার উপরই আব্দুর আগ্রহ,—যাহা অনায়াস-লভ্য, তাহার আর বিশেষত্ব কি? আব্দুর চিত্রবিদ্যা শিক্ষা ঐখানেই শেষ হইল।

এই সময় তাহার পিতা তীর্থ দর্শনে বাহির হইলেন। আব্দুর উপর দোকানের ভার পড়িল; আব্দু ভাগলপুরে আসিয়া দোকান চালাইতে লাগিল। সেই সময় কুস্তির উপর তাহার ঝোঁক পড়িল, সঙ্গে-সঙ্গে গান বাজনাতেও মাতিল। পিতার দোকানের কাজ করিয়া যেটুকু সময় পাইত, ঐসব চর্চ্চায় কাটাইত। একদিন এক সাহেবের সহিত ঘুষি লড়িয়া তাঁহাকে চমৎকৃত করিল। সাহেবের সহিত আলাপ হইলে আব্দু তাহাকে ধরিয়া মোটর-গাড়ী

পরিচালনের কৌশল সব শিখিয়া লইল, সাহেবটি নিজেও একজন গাড়ী-চালক। আন্দুর কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া সাহেব কলিকাতায় উচ্চ বেতনে তাহার একটি চাকরী ঠিক করিয়া দিলেন, কিন্তু পিতার দোকান ছাড়িয়া আন্দু কলিকাতায় গেল না।

যথাসময়ে মক্কায় গিয়া তীর্থ দর্শন শেষ করিয়া পিতা ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া দেশে ফিরিলেন। পুত্র যথেষ্ট ধার ফের করিয়া, প্রাণপণে পিতার সেবা শুশ্রূষা করিল। কিন্তু বৃথা, কিছুদিন ভুগিয়া পিতার মৃত্যু হইল।

পিতৃশোক আন্দুর বড় লাগিল। কিছুদিন উদ্‌ভ্রান্তের মত কাটাইয়া, অবশেষে দেনা পরিশোধে মনোযোগী হইল। দোকান বিক্রী করিয়া দেনা শুধিয়া হাতে কিছু টাকা জমিতেই, সে নিশ্চিন্ত হইয়া কলিকাতায় গিয়া মোটরকারের সবিশেষ তত্ত্ব শিক্ষা করিল। উচ্চ বেতনে চাকরীও জুটিল। কিন্তু সেই সময় ভাগলপুরে চৌধুরী-সাহেব নূতন গাড়ী কিনিয়াছেন শুনিয়া, সে কলিকাতার চাকরী ছাড়িয়া এখানে আসিয়া অল্প বেতনে ঢুকিল। তদবধি এইখানেই আছে। সে প্রায় এক বৎসরের কথা।

তাহার পর কার্য্যগুণে সন্তুষ্ট হইয়া চৌধুরী-সাহেব তাহার বেতনও কিছু বাড়াইয়াছেন। বেহিসাবী দানবাহুল্যে মাসান্তে তাহার হাতে কিছুই জমিতে পায় না,—দেখিয়া শুভাকাঙ্ক্ষী চৌধুরী-সাহেব তাহার বেতনের অর্দ্ধাংশ কাটিয়া রাখিতেন। আন্দু এখন পর্য্যন্ত অবিবাহিত, হিতৈষী প্রভুর ইচ্ছা, তাহার কিছু অর্থ জমিলেই, বিবাহ দিয়া গৃহস্থালি পাতাইয়া দিবেন। আন্দু শুনিয়া নীরবে হাসিত।

(২)

আন্দু ঘোড়া লইয়া ফিরিয়া আসিয়া রহিম খাঁকে ঘোড়া দিল। রহিম ঘোড়া লইয়া আস্তাবলে যাইতে আন্দুও পিছু পিছু গেল। এদিক ওদিক চাহিয়া নিম্নস্বরে বলিল, "চাচা, আমার দুধটা এসেছে কি?" প্রভুর গৃহ হইতে আন্দুর দেড় সের দুগ্ধ বরাদ্দ ছিল।

রহিম খুঁটায় ঘোড়ার দড়ি পরাইতেছিল, মাথা তুলিয়া মুখ ফিরাইয়া বিরক্ত স্বরে বলিল, "কি?"

আন্দু ক্লিষ্টস্বরে বলিল, "দুধটা এসেছে কি?"

"হাঁ, কারুর চাই নাকি?"

আন্দু অপ্রতিভ হইয়া হাসিল—"গুরুদয়ালের বড় অসুখ—"

"সে ত সবাই জানে। দুধ তাকে দিতে হবে?"

"হাঁ, চুপ কর, একটু আস্তে, কেউ শুন্‌তে পাবে—"

"তোমার তো নিত্যি খয়রাতি কারখানা, বিলুতেই সব যায়, এর আর ঢাকঢাক কি? নিয়ে যাও, ওঘরে কাঁচা দুধ আছ। সবটা চাই?"

"না তুমি একটু খেয়ো—" বলিয়া আন্দু ঘর হইতে দুগ্ধের পাত্র লইয়া তখনি বাহির হইয়া গেল।

রহিম রাগ করিয়া বলিল, "ঘোড়া টহল দিতে যাওয়া তো নয়, রাজ্যির লোকের খোঁজ নিতে যাওয়া! বাদ্‌শা-জাদার ব্যাটা, না খেয়েই মর্‌বে! আরে বাপু, তুই যখন মর্‌বি, তখন কে তোর খবর নেবে!"

ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা ভাবিবার সময় ছিল না, আন্দু তখন বর্ত্তমান লইয়া ব্যস্ত। অল্পক্ষণ পরে শূন্য দুগ্ধপাত্রটি পুকুর হইতে ধুইয়া মুছিয়া আনিয়া রহিমের ঘরে উপুড় করিয়া রাখিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তনের জন্য নিজের ঘরে গেল। আন্দু রহিমের কাছে আহারাদি করিত।

আন্দু নিজের ঘর হইতে গায়ের ঘাম মুছিয়া জামা বদলাইয়া তোয়ালে কাঁধে ফেলিয়া হরিহর খানসামার কাজ করিতে উপরে চলিল। বাহিরের সিঁড়ি দিয়া বৈঠকখানায় যাইতে হয়। অর্দ্ধেক সিঁড়িতে উঠিয়াছে এমন সময় দেখিল, লতিকার সহিত জ্যোৎস্না দেবী সিঁড়ি দিয়া নামিতেছে। জ্যোৎস্না লতিকার সহাধ্যায়িনী, পিতার বন্ধুকন্যা। জ্যোৎস্নার পিতা হাইকোর্টের উকিল। জ্যোৎস্না লতিকার সহিত ছুটিতে ভাগলপুরে বেড়াইতে আসিয়াছে, শীঘ্রই চলিয়া যাইবে। জ্যোৎস্না লতিকা অপেক্ষা বয়সে কিঞ্চিৎ ছোট, সে বিবাহিতা। তাহার স্বামী বিবাহের পরই আমেরিকায় ইঞ্জিনীয়ারী শিখিতে গিয়াছে।

তাহাদের দেখিয়া আন্দু সিঁড়ি হইতে নামিয়া নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। লতিকা নামিতে নামিতে হাই তুলিয়া বলিল, "তুমি কি বাবাকে আন্‌তে যাবে কাছারী থেকে?"

নত দৃষ্টিতে আন্দু বলিল, "আজ্ঞে হাঁ।"

"এলে গাড়ীখানা ঠিক করে রেখ, আমরা রোদ পড়লে বেড়াতে যাব।"

"যে অজ্ঞে।"

জ্যোৎস্না মৃদুস্বরে বলিল, "বাগানে যাচ্ছ বটে, কিন্তু যে রোদ, পুড়ে মর্‌তে হবে।"

লতিকা বিদ্রূপের হাসিতে বলিল, "পুড়েই তো মর্‌ছ।"

অর্থ বুঝিয়া জ্যোৎস্না ঈষৎ হাসিল। আন্দু সসঙ্কোচে আরো একটু সরিয়া দাঁড়াইল। তরুণীদ্বয় নামিয়া বাগানের দিকে বেড়াইতে গেল। আন্দু হাঁপ ছাড়িয়া, সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া, ঘরে ঢুকিল। প্রসন্ন চিত্তে শীস্ দিতে দিতে ঘরের কাজ আরম্ভ করিল।

ক্ষিপ্র হস্তে ঘর দ্বার টেবিল চেয়ার ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া সমস্ত পরিপাটী রূপে সাজাইয়া গুছাইয়া, আলমারির পুস্তক-রাশির পানে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আলস্য ভাঙ্গিল। সমস্ত পৃথিবীর কোন জিনিসের দিকে তাহার দৃষ্টি নাই, তাহার যত লোভ ঐ বইগুলির দিকে; মাঝে মাঝে দুই একখানা বই লইয়া গিয়া লুকাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিত, দুরূহ শব্দার্থ অভিধান দেখিয়া বুঝিয়া লইত; বিষয় লইয়া আইনের মার-প্যাঁচ তাহার অত্যন্ত নীরস ঠেকিত, তবু তাহাও পড়িতে ছাড়িত না। যাহা জানে না, তাহাই জানিবার জন্য তাহার দুর্জ্জয় ঝোঁক! সামান্য বিদ্যা হইলেও সেক্‌স্‌পীয়ারও তাহার হস্তে পরিত্রাণ পান নাই। সে গভীর রাত্রে দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া ঐসব করিত। কোন কোন দিন পড়ার ঝোঁকে সারারাত্রি কাটিয়া যাইত; পরদিন তাহার নিদ্রাহীন শুষ্ক ক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া কেহ যদি জিজ্ঞাসা করিত "তোমার কি জ্বর হইয়াছে?" তাহা হইলে আন্দু তৎক্ষণাৎ জবাব দিত, "আজ্ঞে হাঁ, সমস্ত রাত, ভোর বেলা ছেড়েছে!"

বইগুলির দিকে চাহিয়া, নিজের দুর্ব্বুদ্ধিজাত ছেলে-মানুষীর কথা ভাবিতে ভাবিতে আন্দুর হাসি পাইল। তাহার বন্ধুরা তাহার আচরণে বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিত—"আমাদের পড়ে কি হবে?"—কি যে হইবে, সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে আন্দু আকুল হইয়া উঠিত, অনেকগুলা উত্তর হুড়াহুড়ি করিয়া ঠোঁটের কাছে ঠেলিয়া আসিলে, হঠাৎ সব কটাকে নিরস্ত করিয়া অপরাধীর মত কুণ্ঠিত হাসি হাসিয়া বলিত, "কি যে হয় তা জানি না, ভাল লাগে তাই পড়ি!"

বন্ধুরা মন্তব্য প্রকাশ করিত, "যাকে গাড়ী চালিয়ে খেতে হবে, তার আবার লেখাপড়া কেন?"

আন্দু কোমল ভাবে বলিত, "কি জানি দাদা, মনে করি পড়ব্ না, কিন্তু ছাড়তে পারি না! ও যেন নেশার মত আমায় পেয়ে বসেছে!"

অনেকে ইহাতেই চুপ করিয়া যাইত, অনেকে বিদ্রূপ ব্যঙ্গ করিত, আন্দু সন্ত্রস্ত হইয়া বলিত, "আরে চুপ, চুপ, এইবার সব ছেড়ে দেব, আব পড়ব না!"—

নিজের নিষ্ফলা বিদ্যার জন্য, সে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের কাছেই মাথা হেঁট করিয়া থাকিত। দর্জ্জির ছেলে হইয়া কেন সে ঐটুকু লেখাপড়া শিখিয়াছিল! পরিতাপের মধ্যে সন্তোষ টানিয়া সে আপনার মনকে আপনি সান্ত্বনা দিত,—সে ত তোতা-পাখীর মত মুখস্থ কোটেশ্যন কাটিয়া বিদ্যার প্রাণহীন বড়াই করিতে চায় না, সে ত শুধু চায় পাঁচজন ভাল লোকের কাছে উপদেশ! মনকে একটু উন্নত করিতে! ইহাতে কি খুব বেশী দোষ আছে?

ভাবিতে ভাবিতে বন্ধুদের "কি হয়?" প্রশ্নের একটা নূতন উত্তর আন্দুর মনে সদ্য জন্মলাভ করিল। "কি হয়?" উত্তর "কি হইবে? কিছুই না, অন্ততঃ পৃথিবীর তো কোন অপকার নাই!"

নিজের মনের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটিতে খানিক সময় অন্যায় ভাবে কাটিল দেখিয়া, আন্দুর অনুতাপ হইল। ঘরের ধূলাগুলা তুলিয়া বাহিরে ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া, সিঁড়ি ঝাঁট দিতে দিতে নীচে নামিয়া আসিল। সমস্ত জঞ্জাল তুলিয়া বাহিরে ফেলিয়া যখন সে মুখ তুলিয়া চাহিল, তখন দেখিল, বাগানে দাঁড়াইয়া তরুণীরা তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে। কুণ্ঠিত আন্দু তাড়াতাড়ি ঝাঁটা তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। ঘরে গিয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে হাস্যমুখে ভাবিল, হৌক, পরের জন্য ঝাঁটা ধরিয়াছে, তাহাতে যাহার খুসি উপহাস করুক্ অবজ্ঞা করুক, তাহাতে দুঃখ করিলে চলিবে না! নিজের সখের জন্য অনেকেই 'বার্ড'সাই' টানে, কিন্তু পরের সুখের জন্য কেহ কি আগুনে ফুঁ দিতে যায়? এও তাহার নিজের সখের উৎকট আমোদ!

আন্দু মুখ ফুটিয়া হাসিয়া ফেলিল। ঘরে অন্য কেহ ছিল না, থাকিলে তাহার অকারণ হাস্য দেখিয়া কি মনে করিত?

খানিক পরে গা হাত মুছিয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামা জুতা পরিয়া সে আবার ঘর হইতে বাহির হইল। মোটর-কার লইয়া বাহির হইয়া, রাজপথে গাড়ী ছুটাইয়া, নিজের পানে চাহিয়া সে হাসিল, এই সেই ঝাড়ুদার আব্দু!

(ক্রমশ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষ।

পঞ্চশস্য

হেলা ইমারত—

কোনো জিনিসের ভারকেন্দ্র তাহার পায়ার সীমার মধ্যে থাকিলে তাহা খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে; এইজন্য চতুষ্পদ-শাবক জন্মিয়াই হাঁটিতে পারে; দ্বিপদ পক্ষীশাবকও ডিম হইতে বাহির হইয়াই হাঁটে; কিন্তু মনুষ্যশিশুকে অনেক কসরৎ করিয়া তবে খাড়া হইতে শিখিতে হয়। ইমারতের ভিত একদিকে বসিয়া গেলে ইমারত হেলিয়া পড়ে; কিন্তু উহার ভারকেন্দ্র যতক্ষণ ভিতের পায়ার সীমার ভিতরে থাকে ততক্ষণ উল্টাইয়া পড়ে না। ইটালীর পিজা নগরের হেলা মিনারটি ইহার বিখ্যাত উদাহরণ। আমেরিকায় একটা প্রকাণ্ড শস্যের গোলাবাড়ীর
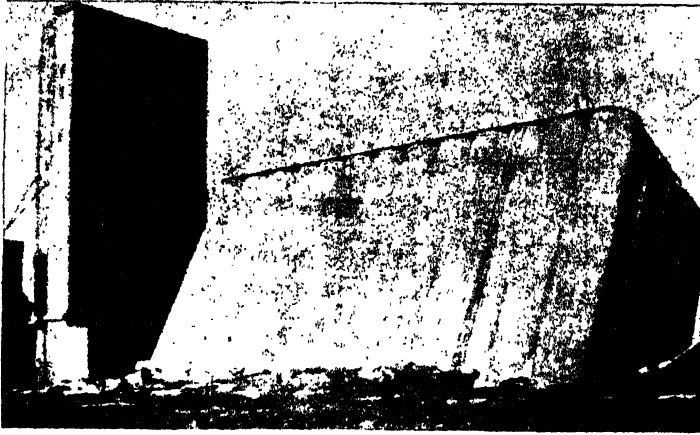
হেলিয়া-পড়া ইমারত;
আমেরিকার ইঞ্জিনিয়রেরা ইহাকে পুনরায় সোজা করিয়া বসাইয়া দিয়াছে।

একদিককার ভিত ৪০ ফুট বসিয়া বাড়ীটি হেলিয়া উল্টাইয়া পড়িবার ভয় হইয়াছিল। এই গোলাবাড়ীটিতে ৬৫টি গোলগোল পিপের মতন ঘর পাশাপাশি কংক্রীট করিয়া গাঁথা ছিল; উহার উচ্চতা ৮০ ফুট; উহার সবগুলিতে দশলক্ষ বুশেল শস্য ধরিত; এবং সমগ্র ইমারতটি ২০ হাজার টন ভারী। ইহাকে আমেরিকার ইঞ্জিনিয়রেরা আবার সোজা করিয়া পোক্ত ভিতের উপর বসাইয়া দিয়াছে। কেমন করিয়া এই দুঃসাধ্য কাজ সম্পন্ন হইল তাহার একটি বর্ণনা সায়েন্টিফিক আমেরিকান পত্রে প্রকাশ পাইয়াছে।

ইমারতটি যেদিকে হেলিয়া পড়িয়াছিল সেই দিকে খুব মজবুত ঠেকনো লাগাইয়া, যেদিকের ভিত বসে নাই সেই দিকে ১৫ ফুট অন্তরে অন্তরে সুড়ঙ্গ কাটিয়া বসা-ভিতের তলায় পোক্ত কংক্রীট করিয়া ৮০টি পিলপা গাঁথা হয়। তারপর বসা-ভিতের তলে স্ক্রু-কলে চাড়া দিয়া দিয়া ও আস্ত ভিতটাকে নীচে বসাইয়া বসাইয়া ইমারতটাকে সোজা করা হইল; এবং যেমন যেমন সোজা হইতে লাগিল অমনি হেলা দিকের ঠেকনো-তেও জোর দিয়া সরাইয়া বড় করিয়া নানাবিধ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইতেছিল। কিন্তু ইহাতে ইমারতটা যে উঁচু জমির উপর আগে ছিল, তাহা অপেক্ষা এখন নীচু হইয়া পড়িল। ইহা আমেরিকার ইঞ্জিনিয়ারদের একটি অত্যদ্ভুত কৌশল বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু যাহারা পানামার খাল কাটিয়া প্রশান্ত ও অতলান্তিক মহাসাগরের উঁচু নীচু জল মিলাইয়া দিতে পারিল, যাহারা ইমারতকে-ইমারত এক স্থান হইতে তুলিয়া লইয়া গিয়া অন্য স্থানে বসাইয়া দিতে পারে, তাহাদের পক্ষে একটা হেলা ইমারত সোজা করা আর বেশী শক্ত ব্যাপার কি? তবে আশ্চর্য্য যে তাহাতে সন্দেহ নাই।

* *
*

ভবিষ্যতের বাড়ী—

য়ুরোপে ও আমেরিকায় ভবিষ্য-পন্থী (Futurist) নামে এক সম্প্রদায় লোক হইয়াছেন যাহারা ভবিষ্যতে মানুষের কার্য্যকলাপ কিরূপ হইবে তাহার আন্দাজ করিতেছেন। ভবিষ্য যুগের চিত্র কিরূপ হইবে, স্থাপত্য কিরূপ হইবে, ভাস্কর্য্য কিরূপ হইবে, কবিতা বা সঙ্গীত কিরূপ হইবে সমস্তই আন্দাজ করিয়া করিয়া বিভিন্ন বিষয়ের ভবিষ্যপন্থীরা অদ্ভুত অদ্ভুত নমুনা আমাদের দিতেছেন। ইটালীতেই ইঁহাদের প্রধান আড্ডা, তারপরে ফ্রান্সে। ভবিষ্য যুগের চিত্রের নমুনা গত বৎসর আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে 'শিল্পে অত্যুক্তি' প্রবন্ধে ছাপা হইয়াছিল; ভবিষ্যযুগের ভাস্কর্য্যের আভাস রোদাঁ প্রভৃতির গঠিত মূর্ত্তিতে পাওয়া যায়; বিদেশী কবিতা ও সঙ্গীতের নমুনা বাংলায় দেওয়া কঠিন। সিঞোর শান্ত-এলিয়া নামক একজন ইটালিয়ান ভবিষ্যপন্থী স্থপতি য়ুরোপীয় যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরগুলির ভবিষ্যমূর্ত্তি কিরূপ হইবে আন্দাজ করিয়া নক্সা আঁকিতে লাগিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার বাড়ীর নক্সায় প্রাচীন বা কোনো দেশবিশেষের স্থাপত্যরীতি অনুসরণ করেন নাই; তিনি ইমারতের প্রসাধনের কারুকার্য্য বর্জ্জন করিয়া সাদামাঠা ধরণের পক্ষপাতী; তিনি বলেন ইমারতের নিজের আকার ও রেখার টান, খাঁজ ভাঁজ হইতে যে সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে তাহাই তাহার আসল সৌন্দর্য্য, ইমারতের গায়ে ফুলপাতার নক্সা কাটা সে ত রমণীকে গহনা পরাইয়া তাহার নিজস্ব রমণীয়তাকে ঢাকিয়া ফেলা। ইঁহার ভবিষ্য যুগের বাড়ী আকাশচুম্বী হইবে; ধরণীর ধুলা ও কোলাহল সেখানে পৌঁছিবে না; পথগুলিও থাক থাক হইবে—এক থাকে চলিবে পদচারী মানুষ, এক থাকে জন্তু-টানা গাড়ী, এক থাকে কলে-চলা গাড়ী চলিবে। পথের মোড়ে মোড়ে অতার,,টেলিগ্রাফের আড্ডা থাকিবে। বাড়ীতে বাড়ীতে আস্তাবলের মতো এরোপ্লেনের আস্তানা থাকিবে; সৌখীন বাবুরা ইচ্ছা হইলেই বোঁ করিয়া আকাশের খোলা ময়দানে এক চক্কর ঘুরিয়া হাওয়া খাইয়া আসিবে। বাড়ীর উপর হইতে পথে নামিতে

হইবে ঝোলায় দোলায়, একশ আট সিঁড়ি ভাঙিয়া নহে। ভবিষ্যযুগের বাড়ীর সর্ব্বত্র থাকিবে শুধু গতি, সজীবতা, যেন বিরাট একটা কলের কারখানা! এসব বাড়ীতে সেকেলে ইট পাথর চুন সুরকির সম্পর্ক থাকিবে না; লোহা লক্কর, কাচ, পেষ্টবোর্ড, প্রভৃতি দিয়া হালকা ফঙফঙে ছিপছিপে বাড়ীগুলি হইবে। এসব বাড়ী একপুরুষের ভোগের বাড়ী; কর্ত্তার জীবনের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীরও পরমায়ু ফুরাইবে; উত্তরাধিকারীকে আবার নূতন ঢঙের নূতন বাড়ী গড়িয়া বাস করিতে হইবে।

* *
*

ভবিষ্য বাড়ী।

পুতুলের কারবার—

সভ্য সমাজের জীবনযাত্রার জন্য আবশ্যক যত কিছু সামগ্রী তাহার প্রায় সমস্তই সস্তায় ও উৎকৃষ্ট রকমে জার্ম্মেনী ও অষ্ট্রীয়াতে তৈয়ারি হইত। যুদ্ধের ফলে জার্ম্মান সামগ্রী অব্যবহার্য্য ও অপ্রাপ্য হওয়াতে সকল দেশের শিল্প বাণিজ্যে নূতন নূতন সামগ্রী প্রস্তুতের ও কেনা বেচার ধূম লাগিয়া গিয়াছে। আমরা যখন স্বদেশী ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আমাদের দেশেই আবশ্যকীয় সকল সামগ্রী তৈয়ার করিয়া

পুতুলের মাথায় রং ফলানো।

লইবার সঙ্কল্প ও আয়োজন করিতেছিলাম, তখন ইংরেজরা আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই; তাঁহাদের কাছে আমরা উৎসাহ ত পাইই নাই, বহুস্থলে বাধা ও প্রতিবন্ধক পাইয়াছিলাম। কিন্তু বড় লাট লর্ড মিণ্টো Honest Swadeshi সাধু স্বদেশী ভাবের প্রশংসা করাতে ছোটখাটো কর্ত্তাদের মনটাও একটু নরম হইয়াছিল। এখন জার্ম্মান জিনিসের আমদানি বন্ধ হওয়াতে স্বদেশী শিল্পের পুনঃপ্রবর্ত্তনের জন্য ইংরেজ সরকার মুখে আমাদিগকে খুব উৎসাহ দিতেছেন; টাকা দিয়া কারবার খুলিতে সাহায্য করিতেছেন স্বদেশ ইংলণ্ডে। এবং ইংলণ্ডে যে-সকল সামগ্রী প্রস্তুত হয় তাহা এদেশে করিবার আবশ্যক নাই, এমন কথাও তাঁহাদের মুখে শোনা যাইতেছে। এখানেও পুরা স্বদেশী ভাব। আমাদেরও স্বদেশী শিল্প স্বদেশী চেষ্টাতেই করিতে হইবে।

জার্ম্মান শিল্পের আমদানি বন্ধ হওয়াতে মস্ত অভাব পড়িয়াছিল ছেলেদের খেলনা পুতুলের। গত বড়দিনের উৎসব টায়ে টোয়ে কাটিয়া গিয়াছে; ভবিষ্যতের ভাবনায় ইংলণ্ড আমেরিকায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। ইহার ফলে ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় পুতুলের কারখানা খোলা হইয়াছে। এইসব কারখানায় ছাঁচে তুলিয়া পুতুলের মাথা তৈরি হয়; এবং হাওয়ার তুলিতে অর্থাৎ ঝাঁঝরা-পিচকারীতে বাতাসের চাপে রঙের শীকর ছিটাইয়া সেগুলি রং করা হয়। আমেরিকার একটি কারখানায় ৫০ জন কারিকর দিনরাত ২৪ ঘণ্টা খাটিয়া সাতহাজার মুখ তৈরি করে। এই ছাঁচে-তোলা মুখ শুখাইয়া রং করিয়া করাতগুঁড়া-ভরা দেহের কাঠামোতে জোড়া হয় ১২ টা কারখানাতে। সেই দেহের কাঠামোতে কাপড় পরাইয়া সেই সম্পূর্ণ পুতুল তখন দেশে দেশে রপ্তানি হয়।

মুখ গড়া হয় ময়দা ও মোমের মণ্ড ছাঁচে ফেলিয়া। ছাঁচের মধ্যে মণ্ড জমিয়া শুখাইয়া গেলে ছাঁচ খুলিয়া মুখগুলিকে ঈষৎ লাল আভার ময়দা-ও-মোম-গোলার মধ্যে ডুবাইয়া চামড়ায় রক্তের আভার অনুকরণ

করা হয়। এই ময়দা-গোলা শুখাইয়া গেলেই বড় বড় ঠেলা বারকোষে করিয়া সেগুলি অন্য ঘরে লইয়া যাওয়া হয়; সেখানে রঙীরা রং দিয়া চোখ ভুরু চানকাইয়া দ্যায়; নাক মুখ সুডৌল করিয়া দ্যায়। তারপর আর-এক ঘরে লইয়া গিয়া হাওয়ার তুলিতে গালে লাল ছোপ লাগায়; অপর ঘরে মাথায় চুল পরায়; অপর ঘরে কাপড় পরায়। চুলের তুলি চালাইতে যেমন দক্ষতার দরকার, হাওয়ার তুলি দিয়া রং করিতে তেমনি দক্ষতার দরকার। এই কারখানায় এখন ছয় রকমের মুখ তৈয়ারি হয়; আগামী বৎসরে আরো বেশী রকমের মুখ হইবে।

* *
*

স্বয়ংক্রিয় নক্সার কল—

জার্ম্মানীর জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ পুলফ্রিক কাপড়ের ছিট, কার্পেট, অয়েল ক্লথ প্রভৃতিতে নক্সা কাটিবার একটি স্বয়ংক্রিয় কল উদ্ভাবন করিয়াছেন। কলের নাম দিয়াছেন—ফটো-ক্যালিডো-গ্রাফ। ছেলেদের একরকম খেলনা এক আনায় কিনিতে পাওয়া যায়,—একটা কাগজের চোঙের মধ্যে তিনখানা লম্বা কাচ ফাঁপা তেশিরা কাচের মতো করিয়া ত্রিভুজের আকারে ভরা হয়; তার এক মুখে দুখানা ঘষা কাচের মধ্যে নানান রঙের কতকগুলি কাচের কুচি থাকে, অপর মুখেও একটা ঘষা কাচ লাগানো থাকে, কিন্তু তার মাঝখানের একটু জায়গা ঘষা

ফটো-ক্যালিডো-গ্রাফ বা নক্সা তুলিবার যন্ত্র।

থাকে না, সাদা থাকে; সেইখানে চোখ দিয়া চোঙটি ঘুরাইলে রঙিন কুচিগুলি বিবিধ বিচিত্র নক্সায় বারবার সজ্জিত হইতে দেখা যায়। ইহাকে বলে ক্যালিডোস্কোপ অর্থাৎ বৈচিত্র্যদর্শক। এই বৈচিত্র্যদর্শকের মূল প্রণালী ফটোগ্রাফের ক্যামেরার সঙ্গে যোগ করিয়া ফটো-ক্যালিডো-গ্রাফ যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। আগে ক্যালিডোস্কোপে চোখ দিয়া পেন্সিলে নক্সাগুলি আঁকিয়া লওয়া হইত; এখন এ যন্ত্রে একেবারে নক্সার ফটোগ্রাফ হইয়া যায়। সুতরাং নূতন প্রথায় সহজে শীঘ্র ও নির্ভুল নক্সা পাওয়া সম্ভব হইয়াছে।
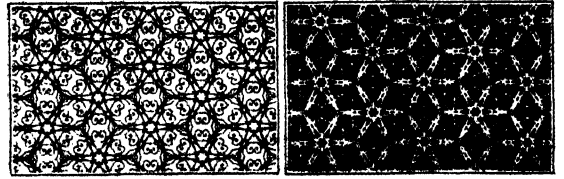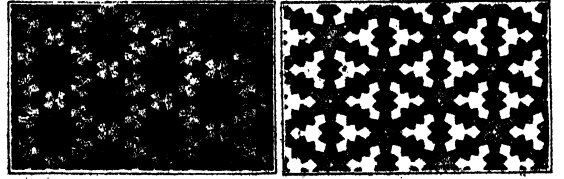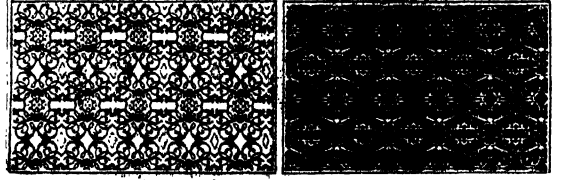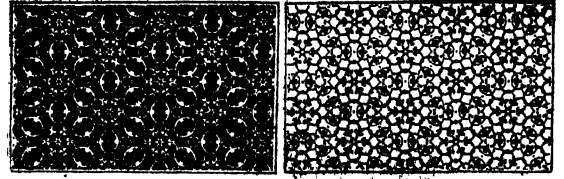
নক্সা-যন্ত্রে অঙ্কিত নক্সা।
নকসার একদিকেরটি পার্শ্বের নক্সার পরিপূরক; একটায় যেখানে কালো অপরটায় সেখানে সাদা।

সায়েন্টিফিক আমেরিকান পত্রে এই যন্ত্রের নির্ম্মাণ-কৌশল বিবৃত হইয়াছে। এই যন্ত্রে ক্যালিডোস্কোপের ফাঁপা তেশিরা কাচ-ত্রিভুজের বদলে নিরেট তেশিরা-কাচ থাকে। এই তেশিরা কাচের তিন পাশ খুব পালিশ করা ও তাহার কোণগুলি খুব ঠিক এক মাপের। এই তেশিরা-কাচ একটা চোঙে ভরিয়া ফটোগ্রাফের ক্যামেরার সঙ্গে সংলগ্ন করিয়া ফটোগ্রাফের প্লেটের সম্মুখে রাখা হয়; পারদ-বাষ্পের ল্যাম্প হইতে আলো ফেলিয়া কোনো দ্রব্যের ছায়া একটা কাতকরা সমতল আয়নার উপর ফেলা হয়; সেই আয়নার ছায়া গিয়া একটা ঘষা কাচের পর্দ্দার উপর পড়ে; সেই প্রতিচ্ছায়া অনেকে একসঙ্গে দেখিতে পায়; যদি সেই নক্সাটি দর্শকদের পছন্দ হয়, তবে কাত-করা আয়নাটি ঘুরাইয়া আলোর পথ বন্ধ করা হয়; এবং সেই আলো ফটো ক্যামেরার লেন্সের ভিতর দিয়া গিয়া ফটো-প্লেটের উপর পড়ে, তাহাতে নক্সার ফটো উঠিয়া যায়। ক্যালিডো-স্কোপের হাতে-আঁকা নক্সার ফটো এই যন্ত্র দিয়া লইলে আরো চমৎকার নক্সা পাওয়া যায়। এইরূপ নক্সা আঁকার যন্ত্রের বিবরণ আমরা পূর্ব্বে গত বৎসরের জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে পঞ্চশস্যের মধ্যে প্রকাশ করিয়াছিলাম।

* *
*

বীর ও ভীরু গাছ—

সাহস ও ঠেলিয়া আগে যাইবার হিম্মত থাকাকেই বীরত্ব বলে। অপরের অত্যাচারে মুষড়িয়া পড়া, অপরের প্রতাপের সম্মুখে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে না পারাকে বলে ভীরুতা। বনের গাছের মধ্যে এই দুই জাতের গাছ দেখা যায়। কোনো কোনো মানুষ যেমন অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করিয়া আপনার ভিটা মাটি দেশ ছাড়িয়া অপর দেশে পলায়ন করে, তেমনি অনেক উদ্ভিদও গণ্ডগোলের মধ্যে না থাকিয়া এমন জায়গায় পলায়ন করে যেখানে বেশ শান্তিতে নিরুপদ্রবে তাহারা থাকিতে পায়। আমেরিকার The Hardwood Record কাগজে এইরকম গাছেদের একটি বৃত্তান্ত বাহির হইয়াছে।

প্রকাণ্ড লম্বা চওড়া জোয়ান মন্দ পাইন বা দেবদারু গাছ বড় ভীরু, কাপুরুষ যদি বলা চলে ত সে তাই। এ গাছ আগে উর্ব্বর সমতলে জন্মিত; খাইয়া দাইয়া বাঁচার জন্য লড়াই করা ল্যাঠা দেখিয়া ইহারা হটিতে হটিতে অনুর্ব্বর পাহাড়ের মাথায় গিয়া আশ্রয় লইয়াছে; সেখানে অনাহার ও অল্পাহারের সম্ভাবনা আছে বটে কিন্তু সেখানে অন্য উদ্ভিদ বড় একটা জ্বালাতন করিতে জন্মে না, এ একটা মস্ত বাঁচোয়া! এদের মূলমন্ত্র যঃ পলায়তি সঃ জীবতি! নিশ্চিন্ত নীরবে নিরুপদ্রবে অনাহারে মরাও এদের কাছে লাঠালাঠি করিয়া মুখের গ্রাস বাঁচাইয়া বাঁচিয়া থাকার চেয়ে ঢের ভালো! পাইন গাছ ঘাষের চাপকেও ভয় পায়!

সাইপ্রেস গাছ খুব জোরালো, মোটা-সোটা, দীর্ঘজীবী; কিন্তু সেও ভীরু। দেবদারু আশ্রয় লইল বেলে মাটিতে পাথুরে দেশে; সাইপ্রেস সরিয়া পড়িয়াছে জলা ভুঁইয়ে স্যাঁতা সেঁতায়, যেখানে অপর উদ্ভিদ বড় একটা ঠেলাঠেলি করিয়া বিরক্ত করে না। সিডার, বাবলা, এল্‌ম প্রভৃতি গাছও সাইপ্রেসেরই মতন জলে ডুবিয়া গেছো ডাকাতদের হাত হইতে প্রাণ বাঁচাইয়াছে। ম্যাংগ্রোভ গাছ ত তার ডাঙায় বাসের অভ্যাস একদম হারাইয়া বসিয়াছে; এখন জলা ছাড়া তার বীজ আজ্ঞানোই যায় না; কিন্তু আগে সে ডাঙার গাছ ছিল।

ওক গাছ বীর বটে, কিন্তু একেবারে হটেন না, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন না, এমন নয়। এঁরাও কেউ কেউ পাইনের পিছু লইয়া পাহাড়ে হাওয়া খাইতে ছুটেন, কেউ কেউ সাইপ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে জলবিহারে নামেন।

সরু পাতার গাছ চওড়া পাতার গাছকে ডরায়—তারা ছাতার মতন পাতা মেলিয়া আলো বাতাস সবটাই নিজেরা দখল করিতে চায় বলিয়া সরুপাতার গাছেরা হাঁপাইয়া মরে।

জগতের আদিম বাসিন্দা সরু-ছুঁচ-পাতাওয়ালা গাছ। চওড়াপাতাওয়ালার আবির্ভাবে বেচারারা একেবারে কোণঠাসা হইয়া পড়িয়াছে।

* *
*

এক চিলুতে ফাঁস কাগজ—

১৮৩৯ সালে য়ুরোপের প্রধান শক্তিবৃন্দ য়ুরোপে শান্তি রক্ষার জন্য এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। তাহাতে অতিশক্তিশালী দুই দেশের মধ্যে একএকটি ক্ষুদ্র রাজ্যকে অনধিক্রম্য বলিয়া স্বীকার করিয়া দুই প্রতিবেশী প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরোধ শান্ত রাখিবার উপায় করা হয়। এই সর্ত্তে সন্ধির ৭ম ধারা অনুসারে বেলজিয়ম স্বতন্ত্র ও সর্ব্বথা অনধিক্রম্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। সন্ধিটি ফরাসী ভাষায় লেখা। তাহার ৭ম ধারা ও কথায় কথায় ইংরেজি ও বাংলা অনুবাদ নিম্নে দিতেছি—

Article VII

La Belgique, dans les limites indiquees aux articles I, II et IV formera un Etat independant et propetuellement neutre. Elle sera tenue d'observer cette meme neutralite envers tous les autre Etats.

The Belgium within the limit indicated in the articles 1, 2 and 4 will form a State independent and perpetually neutral. She will be held the observer of this same neutrality towards all the other States.

১, ২, ও ৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে বেলজিয়ম একটি স্বাধীন ও চিরকালের জন্য অনধিক্রম্য রাজ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। সেও অপর পক্ষে অপর সকল রাজ্যকে এইরূপ অনধিক্রম্য বলিয়া বিবেচনা করিবে।
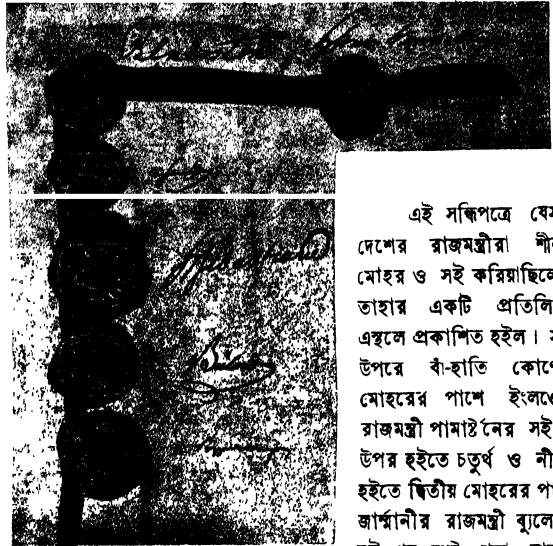
য়ুরোপে শান্তিরক্ষার সন্ধিপত্রের স্বাক্ষর।

এই সন্ধিপত্রে যেসব দেশের রাজমন্ত্রীরা শীলমোহর ও সই করিয়াছিলেন তাহার একটি প্রতিলিপি এস্থলে প্রকাশিত হইল। সব উপরে বাঁ-হাতি কোণের মোহরের পাশে ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রী পামার্ষ্টনের সই ও উপর হইতে চতুর্থ ও নীচে হইতে দ্বিতীয় মোহরের পাশে জার্ম্মানীর রাজমন্ত্রী ব্যুলোর সই খুব স্পষ্ট, পড়া যায়। ব্যুলোর সইএর ঠিক উপরে যে নামটি, তাহার শেষাংশ পড়া যায় সেবাষ্টিয়ানি—বোধ হয় ইহা ইটালীর রাজমন্ত্রীর সই। অপর সইগুলি অস্পষ্ট।

ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া যে সত্যে আবদ্ধ হইয়াছিল জার্ম্মানি তাহা রক্ষা ত করিলই না, অধিকন্তু সন্ধিপত্রকে scrap of paper বা এক চিলুতে ফাঁস কাগজ বলিয়া অবজ্ঞা দেখাইতে পারিল। সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা কি ততক্ষণই যতক্ষণ আমার স্বার্থের ক্ষতি না হয়? সত্য ও ন্যায় যে শাশ্বত—তাহা স্বার্থহানি করিয়াও পালনীয়, তাহা রাজনীতির বিরোধী নয়, এ বোধ শক্তিশালীর বিশেষ করিয়া থাকা উচিত। যে সত্যপ্রতিজ্ঞা অবহেলা করিয়া জার্ম্মানি যুদ্ধে নামিল, সেই সত্যপ্রতিজ্ঞা পালন করিবার জন্য ইংলণ্ডকে যুদ্ধে নামিতে হইল। এবং বেলজিয়ম আপনার সর্ব্বনাশ করিয়াও সন্ধিসর্ত্ত মান্য করিয়া ফ্রান্সকে রক্ষা করিল, ইংলণ্ডের সুবিধা করিয়া দিল। যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ—ইহা নিশ্চিত। কৃতজ্ঞ ফ্রান্সবাসীরা চাঁদা করিয়া বেলজিয়মের মহারাজাকে একখানি তরবারি উপহার দিয়াছে। সেই তরবারির বাঁটের নক্‌সার চিত্র অন্যত্র প্রকাশ করা গেল।

চারু।

স্বরালাপ

মা মা II গা মা গা। রা সা । I ণ্সা । ণ্।। ধ্। ধ্। ণ্।
আ মি কো থা . য় পা ব ০ তা ০ রে ০ আ মার

সা সঃরঃ গা। রা সা রসা I ণ্। সা ।। রা গা রা I সা । সা
ম নে র মা নু ষ যে রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ হা

সা সা । I রা মা মা। পা পা । I পা পা ধা। পা মা । I
রা য়ে ০ সে ই মা নু ষে ০ তা র উ দ্দে শে ০

পা পা ণা। ধা পা । I । । ।। । র্সা র্সা I ণা র্স ণা।
দে শ বি দে শে ০ ০ ০ ০ ০ আ মি দে শ বি

ধা পা ধপা I মা পঃমঃ গা। গা গঃমঃ পা I মা পা পা।
দে শে ০ বে ড়া ই ঘু রে ০ কো থা য় ... ...

ণ্। সা ।। রা গা রা I সা । ।। । পা পা II
... যে রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ মি

II মা ণা ধা। । ধা না I র্সা র্সা র্গা। র্রা র্সা র্রর্সা I না র্সা না।
প্রে মা ০ ০ গু নে ম রূ ছি জ্ব লে ০ নি বা ই

ধা ধা না I না র্সা ।। র্রা র্গা। র্রা I র্সা । ।। । না না I
কে ম ন ক রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ও তার

না র্সা র্সা। র্সা র্সঃনঃ র্সঃর্রঃ I র্সা র্সা ণা। ধা পা মা I পা ণা ধণা।
বি ০ চ্ছে দে প্রা ণ কে ম ন ক রে ০ দে খ্ না

পধা পা । I । । ।। । না র্সা I নর্সা র্সা ণা। ধা পা ধপা I
তো রা ০ ০ ০ ০ ০ ও ভাই দে খ্ না তো রা ০

মা পঃমঃ গ। গা গঃমঃ পা I মা গা গা ণা সা ।।
হৃ দ য় চি রে ০ কো থা য় ·· ... যে রে

রা গা রা I সা । ।। । । সা II
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ না

II সা সা ᵍসা। ণ্া সা রা I সা ᵖধ্া । । । । ধ্া I ধ্া ধ্া ণ্া।
গি সে ই হৃ দ য় শ শী • • • স দা ম ন

সা গা গা I গা মা ᵖমা। গা । মা I গা সা রা। গা গা । I
হ য় উ দা সী • • • পে লে ম ন হ ত •

মা পা মা। ᵖমা গা । I সা গা । । মা মা গা I রা সা ᵍসা।
খু সি • দি বা • নি শি • দে খ্ তেম ন য় ন

ণ্া সা । I রা গা রা। সা । । I । পা পা।
ভ রে • • • • • • • • তা রে

মা পা ধা I ধা ধা না। র্সা র্সা র্গ I র্রা র্সা ᵣর্সা। না র্সা ধা I
যে • দে খে ছে • সে ই ম জে ছে • ছা ই দি

না র্সা ᵣর্সা। না র্সা । I র্রা র্গা র্রা। । । । I । না না
য়ে সং • সা রে • • • • • • • • ও সেই

না র্সা র্সা I র্সা র্সঃনঃ র্সঃর্রঃ। র্সা ᵖণা পা I ধা পা মা। পা পঃধঃ পা I
মা নু ষের উ দ্দে শ্র জা নি স্ য দি • দ য়া •

ᵖধা পা । । । । । I । পা র্সঃর্রঃ। র্সা পা । I ᵖধা পা ᵍপা।
ক রে • • • • • ব্য থার ব্য থী • হ য়ে •

মা পঃমঃ গা I গা গা পা। । । । I মা গা গা ণ্া সা ।
ব লে • দে রে • • • • কো থা য় … … যে রে •

রা গা রা। সা । । । । । II II
• • • • • • • • •

(প্রবাসীর জন্য লিখিত) শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হারামণি

[**এই বিভাগে আমরা** অজ্ঞাত অখ্যাত প্রাচীন কবির বা নিরক্ষর স্বল্পাক্ষর **গ্রাম্য কবির** উৎকৃষ্ট কবিতা ও গান ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ **করিব। প্রবাসীর** পাঠকপাঠিকা এই কার্য্যে আমাদের সহায় হইবেন **আশা করি।** অনেক গ্রামেই এমন নিরক্ষর বা স্বল্পাক্ষর কবি মাঝে মাঝে **দেখা যায় যাঁহারা** লেখাপড়া অধিক না জানা সত্ত্বেও স্বভাবতঃ উৎকৃষ্ট **ভাবের কবিত্বরসমধুর** রচনা করিয়া থাকেন; কবিওয়ালা, তর্জ্জাওয়ালা, **জারিওয়ালা**, বাউল, দরবেশ, ফকির প্রভৃতি অনেকে এই দলের। **প্রবাসীর** পাঠক-পাঠিকারা ইঁহাদের যথার্থ কবিত্বপূর্ণ বা রসভাবপূর্ণ **রচনা সংগ্রহ করিয়া** পাঠাইলে আমরা সাদরে প্রকাশ করিব।]

নিম্নে প্রকাশিত গানটি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জমিদারী **শিলাইদহের পোষ্ট আফিসের** ডাক-হরকরা গগন গাহিয়া গাহিয়া ঘরে **ঘরে চিঠি বিলি করিত।** এই গানটি ঠাকুর মহাশয়ের দ্বারা সংগৃহীত। **এই সঙ্গে গানটির** স্বরলিপি ও চিত্র প্রকাশিত হইল—সে দুটিও ঠাকুর **মহাশয়দেরই** রচিত।

মনের মানুষের সন্ধান

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে!
হারায়ে সেই মানুষে
তার উদ্দেশে
দেশ বিদেশে
আমি দেশ বিদেশে
বেড়াই ঘুরে।
কোথায় পাব তারে?
প্রেমাগুনে মরচি জ্বলে নিবাই কেমন করে?
ও তার বিচ্ছেদে প্রাণ কেমন করে
দেখনা তোরা, ও ভাই দেখনা তোরা
হৃদয় চিরে।
কোথায় পাব তারে?
লাগি সেই হৃদয়-শশী
সদা মন হয় উদাসী;
পেলে মন হত খুসি,
দিবানিশি
দেখতেম নয়ন ভরে।
তারে যে দেখেছে
সেই মজেছে
ছাই দিয়ে সংসারে।
ও সেই মানুষের উদ্দেশ জানিস্ যদি
দয়া করে,
ব্যথার ব্যথী হয়ে
বলে দে রে।
কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে?
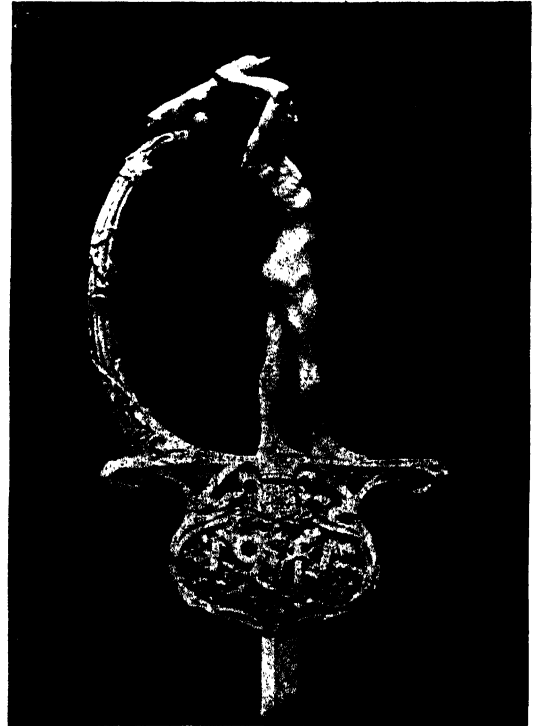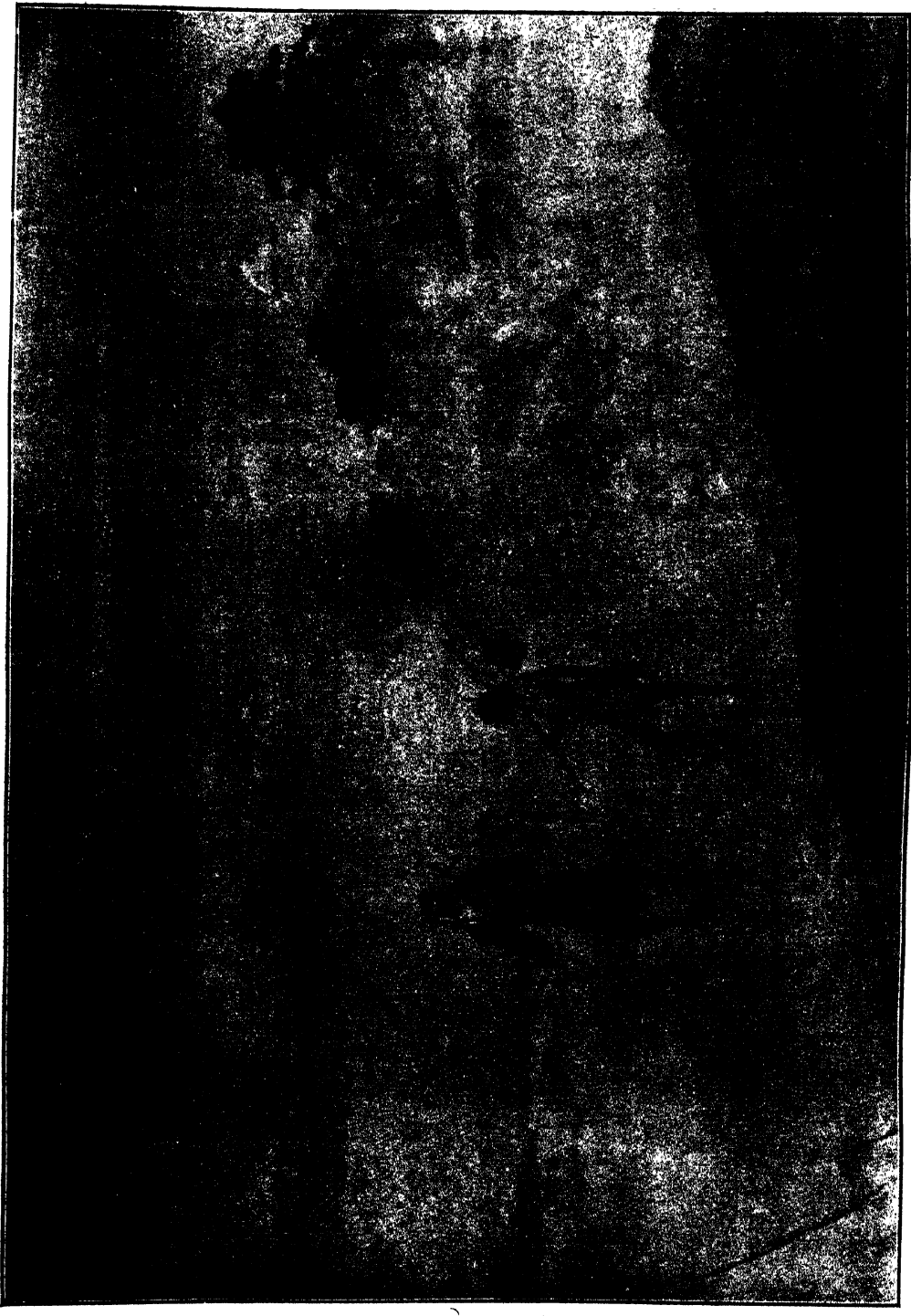
গগন হরকরা।

বেলজিয়মের রাজাকে উপহার-প্রদত্ত তরোয়ালের বাঁটের চিত্র।

"আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে!"—গগন হরকরা।

[শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অঙ্কিত ও তাঁহার সৌজন্যে মুদ্রিত।]

বাঙ্গলার প্রাচীন গৌরব

প্রথম গৌরব—হস্তি-চিকিৎসা

বেদের আর্য্যগণ যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা হাতী চিনিতেন না। কারণ, ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে হাতী পাওয়া যায় না। বেদের আর্য্য জাতির প্রধান কীর্ত্তি ঋগ্বেদে "হস্তী" শব্দটি পাঁচ বার মাত্র পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে তিন জায়গায় সায়ণাচার্য্য অর্থ করিয়াছেন, হস্তযুক্ত ঋত্বিক্ বা পদযুক্ত ঋত্বিক্। দুই জায়গায় তিনি অর্থ করিয়াছেন, হাতী। এ দুই জায়গায়ই, হস্তী মৃগের ন্যায়, "মৃগা ইব হস্তিনঃ", "মৃগো ন হস্তী" এইরূপ প্রয়োগ আছে। ভারতবর্ষে আসিয়া যখন তাঁহারা হাতী দেখিলেন, তখন তাঁহারা তাহাকে হাতওয়ালা মৃগ বলিলেন। ঋগ্বেদে হাতীর নাম ত ঐ দুই বার আছে। ও যে ঠিক হাতীরই নাম, সে বিষয়েও একটু সন্দেহ। কারণ, "হাতওয়ালা" মৃগ বলিতেছে, যদি স্পষ্ট করিয়া "শুঁড়-ওয়ালা" বলিত, তবে কোন সন্দেহই থাকিত না। আরও সন্দেহের কারণ এই যে, সংস্কৃতে হাতীর অনেক নাম আছে—করী, গজ, দ্বিপ, মাতঙ্গ—ইহার একটি শব্দও ঋগ্বেদে নাই, এমন কি ঐরাবতের নাম পর্য্যন্তও নাই। যাহারা কাল হাতীই চিনিত না, তাহারা সাদা হাতী কেমন করিয়া জানিবে? ঋগ্বেদে হাতীর নাম থাকুক বা না থাকুক, তৈত্তিরীয় সংহিতায় উহার নাম আছে। খৃঃ পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকে হাতী পোষা চলিত হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের এক হাতী ছিল। তাঁহার ভাই দেবদত্তেরও হাতী ছিল। বুদ্ধদেব কুস্তী করিতে করিতে একটা হাতী শুঁড় ধরিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দেন, তাহাতে হাতী যেখানে পড়ে সেখানে একটি ফোয়ারা হইয়া গিয়াছিল। উদয়ন রাজার "নলাগিরি" নামে একটি প্রকাণ্ড হাতী ছিল। তাঁহার নিজের ও চণ্ডপ্রদ্যোতের বড় বড় হাতীশালা ছিল, হাতী ধরারও খুব ব্যবস্থা ছিল। এই যে হাতী ধরা ও পোষ-মানান, তাহার চিকিৎসা, তাহার সেবা, যুদ্ধের জন্য তাহাকে তৈয়ার করা—এ সব কোথায় হইয়াছিল? আমরা এখন যে দেশে বাস করি, যাহা আমাদের মাতৃভূমি, সেই বঙ্গদেশই এই প্রকাণ্ড জন্তুকে বশ করিতে প্রথম শিক্ষা দেয়। যে দেশের এক দিকে হিমালয়, এক দিকে লৌহিত্য ও এক দিকে সাগর—সেই দেশেই হস্তিবিদ্যার প্রথম উৎপত্তি। সেই দেশেই এমন এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, যিনি বাল্যকাল হইতেই হাতীর সঙ্গে বেড়াইতেন, হাতীর সঙ্গে খাইতেন, হাতীর সঙ্গে থাকিতেন, হাতীর সেবা করিতেন, হাতীর পীড়া হইলে চিকিৎসা করিতেন, এমন কি এক রকম হাতীই হইয়া গিয়াছিলেন। হাতীরাও তাঁহাকে যথেষ্ট ভাল বাসিত, তাঁহার সেবা করিত, তাঁহার মনের মত খাবার যোগাইয়া দিত, ব্যারাম হইলে তাঁহার শুশ্রূষা করিত। অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদ বঙ্গবাসীর সুপরিচিত। তিনি রাজা দশরথের জামাই ছিলেন। তাঁহার একবার সখ হইল, 'হাতী আমার বাহন হইবে। ইন্দ্র স্বর্গে যেমন হাতী চড়িয়া বেড়ান, আমিও তেমনি করিয়া হাতীর উপরে চড়িয়া বেড়াইব।' কিন্তু হাতী কেমন করিয়া বশ করিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি সমস্ত ঋষিদের নিমন্ত্রণ করিলেন। ঋষিরা পরামর্শ করিয়া কোথায় হাতীর দল আছে, খোঁজ করিবার জন্য অনেক লোক পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা এক প্রকাণ্ড আশ্রমে উপস্থিত হইল। সে আশ্রম "শৈলরাজা-শ্রিত", "পুণ্য" এবং সেখানে "লৌহিত্য সাগরাভিমুখে বহিয়া যাইতেছে।" সেখানে তাহারা অনেক হাতী দেখিতে পাইল এবং তাহাদের সঙ্গে একজন মুনিকেও দেখিতে পাইল। দেখিয়াই তাহারা বুঝিল যে, এই মুনিই হাতীর দল রক্ষা করেন। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া রাজা ও ঋষিদিগকে খবর দিল। রাজা সসৈন্য সেই আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঋষি আশ্রমে নাই; তিনি হস্তিসেবার জন্য দূরে গমন করিয়াছেন। রাজা হাতীর দলটি তাড়াইয়া লইয়া চম্পানগরে উপস্থিত হইলেন ও ঋষিদের পরামর্শ-মত হাতীশালা তৈয়ার করিয়া সেখানে হাতীদের বাঁধিয়া রাখিয়া ও খাবার দিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। ঋষি আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার হাতীগুলি নাই। অনেক দিন খুঁজিয়া খুঁজিয়া শেষে চম্পানগরে আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার হাতীগুলি সব চম্পানগরে বাঁধা আছে, তাহারা রোগা হইয়া গিয়াছে, তাহাদের গায়ে ঘা হইয়াছে, নানা রূপ রোগের উৎপত্তি হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ লতা, পাতা, শিকড়,

মাকড় তুলিয়া আনিয়া বাটিয়া তাহাদের গায়ে প্রলেপ দিতে লাগিলেন, হাতীরাও নানারূপে তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। রাজা সব শুনিলেন। তিনি কে, কি বৃত্তান্ত জানিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। অনেক সাধ্য-সাধনার পর মুনি আপনার পরিচয় দিলেন। তিনি বলিলেন, "হিমালয়ের নিকটে যেখানে লৌহিত্য নদ সাগরাভিমুখে যাইতেছে, সেখানে সামগায়ন নামে এক মুনি ছিলেন। তাঁহার ঔরসে ও এক করেণুর গর্ভে আমার জন্ম। আমি হাতীদের সহিতই বেড়াই, তাহারাই আমার আত্মীয়, তাহারাই আমার স্বজন। আমার নাম পালকাপ্য। আমি হাতীদের পালন করি, তাই আমার নাম পাল। আর কাপ্যগোত্রে আমার জন্ম, সেইজন্য আমার নাম কাপ্য। লোকে আমায় পালকাপ্য বলে। আমি হস্তি-চিকিৎসায় বেশ নিপুণ হইয়াছি।" তাহার পর রাজা তাঁহাকে হাতীদের বিষয় নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তাহার উত্তরে তিনি হস্তীর আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার শাস্ত্রের নাম "হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ" বা "পাল-কাপ্য"। চেন্তসাল রাও সি, আই, ই, যে "গোত্রপ্রবর-নিবন্ধকদম্বম্" সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার শেষে তিনি প্রায় সাড়ে চারি হাজার গোত্রের নাম দিয়াছেন, ইহাতে কাপ্যগোত্র নাই। সুতরাং অনুমান করিতে হইবে, তিনি আর্য্যগণের মধ্যে চলিত গোত্রের লোক নহেন, এ গোত্র বোধ হয় বাঙ্গলা দেশেই চলিত ছিল। পালকাপ্য পড়িতে পড়িতে অনেক স্থানে মনে হয় যেন, উহা অন্য কোন ভাষা হইতে সংস্কৃতে তর্জ্জমা করা হইয়াছে, অনেক সময় মনে হয় উহা সংস্কৃত ব্যাকরণের মতে চলিতেছে না। এ গ্রন্থ যে কত প্রাচীন তাহা স্থির করা অসম্ভব। কালিদাস ইহাকে অতি প্রাচীন শাস্ত্র বলিয়া গিয়াছেন। রঘুর ষষ্ঠ সর্গে তাঁহার সুনন্দা অঙ্গরাজকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, বহুকাল হইতে শুনা যাইতেছে যে, স্বয়ং সূত্রকারেরা ইঁহার হাতীগুলিকে শিক্ষা দিয়া যান, সেই জন্যই ইনি পৃথিবীতে থাকিয়াই ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে "হস্তিপ্রচার" অধ্যায়ে হস্তি-চিকিৎসকের কথা আছে। সুতরাং কৌটিল্যেরও পূর্ব্বে যে হস্তি-চিকিৎসার একটি শাস্ত্র ছিল, তাহা বুঝা যাইতেছে। যে আকারে পালকাপ্যের সূত্র লেখা, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, উহা অতি প্রাচীন। সুতরাং ম্যাক্সমুলার যাহাকে "Suttra period" বলেন, সেই সময়েই পালকাপ্য সূত্র রচনা করিয়াছিলেন। বিউলার সাহেব বলেন, আপস্তম্ব ও বৌধায়ন খ্রীঃ পূর্ব্ব পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে সূত্র লিখিয়াছিলেন এবং তাহারও আগে বশিষ্ঠ ও গোতমের সূত্র লেখা হয়। পালকাপ্যও সেই সময়েরই লোক বলিয়া বোধ হয়। ভারতের পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, সূত্র-রচনার কাল আরও একটু আগে হইবে। খ্রীঃ পূর্ব্ব পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকে যদি বাঙ্গলা দেশে হস্তি-চিকিৎসার এত উন্নতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেটা বঙ্গদেশের কম গৌরবের কথা নয়।

দ্বিতীয় গৌরব—নানা ধর্ম্ম-মত

জৈন ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম, আজীবক ধর্ম্ম এবং যে-সকল ধর্ম্মকে বৌদ্ধেরা তৈর্থিক মত বলিত, সে সকল ধর্ম্মই বঙ্গ মগধ ও চের জাতির প্রাচীন ধর্ম্ম প্রাচীন আচার প্রাচীন ব্যবহার প্রাচীন রীতি প্রাচীন নীতির উপরই স্থাপিত। আর্য্য জাতির ধর্ম্মের উপর উহা ততটা নির্ভর করে না। ইহা বঙ্গদেশের কম গৌরবের কথা নয়। এই সকল ধর্ম্মেরই উৎপত্তি পূর্ব্ব-ভারতে; বঙ্গ মগধ ও চের জাতির অধিকারের মধ্যে, যে-সকল দেশের সহিত আর্য্যগণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল সেসকল দেশের বাহিরে। এ সকল ধর্ম্মই বৈরাগ্যের ধর্ম্ম। বৈদিক আর্য্যদের ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে গৃহস্থের ধর্ম্ম। ঋগ্বেদে বৈরাগ্যের নাম গন্ধও নাই। অন্যান্য বেদেও যাগযজ্ঞের কথাই অধিক, সেও গৃহস্থেরই ধর্ম্ম। সূত্রগুলিতেও গৃহস্থের ধর্ম্মের কথা। এক ভাগ সূত্রের নামই ত গৃহ্যসূত্র। সূত্রগুলিতে চারি আশ্রম পালনের কথা আছে। শেষ আশ্রমের নাম ভিক্ষুর আশ্রম। ভিক্ষুর আশ্রমেও বিশেষ বৈরাগ্যের কথা দেখা যায় না। এ আশ্রমের লোক ভিক্ষা করিয়াই খাইবেন, এই কথাই আছে। কিন্তু আমরা যেসকল ধর্ম্মের কথা বলিতেছি, তাহাদের সকলেই বলিতেছে গৃহস্থ-আশ্রম ত্যাগ কর। গৃহস্থ-আশ্রমে কেবল দুঃখ। গৃহস্থ-আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাহাতে জন্ম জরা মরণ—এই 'ত্রিতাপ নাশ হয় তাহারই

ব্যবস্থা কর। আর তাহা নাশ করিতে গেলে “আমি কে ?” “কোথা হইতে আসিলাম ?” “কেন আসিলাম ?” —এইসকল বিষয় চিন্তা করিতে হয়। সেই চিন্তার ফলে কেহ বলেন আত্মা থাকে, কিন্তু সে “কেবল” হইয়া যায়, সংসারের সহিত তাহার আর কোন সম্ভ্রব থাকে না, সুতরাং সে জরামরণাদির অতীত। কেহ বলেন, তাহার অহঙ্কার থাকে না ; যখন তাহার অহঙ্কার থাকে না, তখন সে সর্ব্বব্যাপী হয়, সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান হয়, মহাকরুণার আধার হইয়া যায়। এসকল কথা বেদ ব্রাহ্মণ বা সূত্রে নাই। এসব ত গেল দর্শনের কথা, চিন্তা-শক্তির কথা, যোগের কথা। বাহিরের দিক হইতেও দেখিতে গেলে, এই সকল ধর্ম্মের ও আর্য্যধর্ম্মের আচার-ব্যবহারে মিল নাই। আর্য্যগণ বলেন, পরিষ্কার কাপড় পরিবে, সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে, নিত্য স্নান করিবে। জৈনেরা বলেন, উলঙ্গ থাক, গায়ের মলা তুলিও না, স্নান করিও না। মহাবীর মলভার বহন করিতেন। অনেক জৈন যতি গৌরব করিয়া “মলধারী” এই উপাধি ধারণ করিতেন। আর্য্যগণ উষ্ণীষ উপানহ ও উপবীত ধারণ করিতেন ; জৈনেরা খালি মাথায় থাকিতেন, জুতা পরিতেন না, এক ধুতি ও এক চাদরেই কাটাইয়া দিতেন। আর্য্যগণ সর্ব্বদাই খেউরি হইতেন। অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায় একেবারে খেউরি হইত না। আর্য্যেরা মাথা মুড়াইলে মাথার মাঝখানে একটা টিকী রাখিতেন। বৌদ্ধেরা সব মাথা মুড়াইয়া ফেলিত। আর্য্যগণ দিনে একবার খাইতেন, রাত্রিতে একবার খাইতেন। বৌদ্ধের বেলা ১২টার মধ্যে আহার না হইয়া উঠিলে তাহাদের সেদিন আর আহারই হইত না। রাত্রিতে তাহারা রস বা জলীয় পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই খাইতে পারিত না। খাট ছাড়া আর্য্যগণের শয়ন হইত না। বৌদ্ধেরা উচ্চাসন মহাসন একেবারে ত্যাগ করিত। আর্য্যগণ সংস্কৃতে লেখা পড়া করিতেন, অন্য সকল ধর্ম্মের লোক নিজ দেশের ভাষাতেই লেখা পড়া করিত। এসকল নূতন জিনিস যখন আর্য্যদের মতের বিরোধী, তখন তাহারা আর্য্যদের নিকট হইতে সেসব পায় নাই। উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত, হিমালয়ের উত্তর দেশের লোকের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিতেই পারে না। দক্ষিণ হইতেও ঐসব জিনিস আসিতে পারে না, কেননা ; দক্ষিণের সহিত তাহাদের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই ; বরং বিন্ধ্যগিরি পার হইয়া যাওয়া অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং যাহা কিছু উঁহারা পাইয়াছে, পূর্ব্বাঞ্চল হইতেই পাইয়াছে এবং পূর্ব্বাঞ্চলেই আমরা এইসকল জিনিস কতক কতক এখনও দেখিতে পাই। জৈনদের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর ৩০ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করেন, তাহার পর কিছুদিন বৈশালির জৈন-মন্দিরে বাস করেন, তাহার পর বার বৎসর নিরুদ্দেশ থাকেন। এ সময় তিনি পূর্ব্বাঞ্চলেই ভ্রমণ করিতেন। বার বৎসরের পর তিনি জ্ঞান লাভ করিয়া বৈশালিতে ফিরিয়া আসেন। তাঁহারও পূর্ব্বে তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ কাশীতে জন্মগ্রহণ করেন, ৩০ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করেন, তাহার পর নানাদেশে ভ্রমণ করেন। তাঁহার ভ্রমণও পূর্ব্বাঞ্চলেই অধিক। শেষ জীবনে তিনি সমেতগিরিতে বাস করেন—সমেতগিরি পরেশনাথ পাহাড়। তাঁহারও পূর্ব্বে যে ২২ জন তীর্থঙ্কর ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সমেতগিরিতেই বাস করিতেন ও সেইখানেই দেহ রক্ষা করেন। সাংখ্য-মত এই সকল ধর্ম্মেরই আদি। সাংখ্যের দেখাদেখিই জৈনেরা কেবলী হইতে চাহিত—কৈবল্য চাহিত। বৌদ্ধেরা বলেন, তাঁহারা সাংখ্যকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু সাংখ্য-মত আর্য্য-মত নহে, উহার উৎপত্তি পূর্ব্বদেশে। সাংখ্যকার কপিলের বাড়ী পূর্ব্বাঞ্চলে, পঞ্চশিখের বাড়ী পূর্ব্বাঞ্চলে।

তৃতীয় গৌরব—রেসম

ইউরোপীয়েরা চীনদেশ হইতে রেসমের পোকা আনিয়াছিলেন এবং অনেক শত বৎসর চেষ্টা করিয়া তাঁহারা রেসমের কারবার খুলিতে পারিয়াছেন। তাঁহাদের সংস্কার চীনই রেসমের জন্মস্থান, চীনেরাও তাহাই বলে। তাহারা বলে খ্রীষ্টের ২৬৪০ বৎসর পূর্ব্বে চীনের রাণী তুঁত-গাছের চাস আরম্ভ করেন। রেসমের ব্যবসা সম্বন্ধে অতি প্রাচীন কাল হইতেই চীনদেশে অনেক লেখা পড়া আছে। চীনেরা রেসমের চাস কাহাকেও শিখিতে দিত না। উটি তাহাদের উপনিষৎ বা গুপ্ত বিদ্যা ছিল। জাপানীরা অনেক কষ্টে

খ্রীষ্টের তৃতীয় শতকে কোরিয়ার নিকট রেসমের চাস শিক্ষা করে। ইহারই কিছুদিন পরে চীনের এক রাজকন্যা ভারতবর্ষে উহার চাস আরম্ভ করেন। ইউরোপে খ্রীষ্টের প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে স্থল-পথে চীনের সহিত রেসমের ব্যবসা চলিত। অনেকে মনে করেন, এই রেসমের ব্যবসার জন্যই পঞ্জাবের শক রাজারা বেশী করিয়া সোনার টাকা চালান। ইউরোপে রেসমের চাস ইহার অনেক পরে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু আমরা চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাই, বাঙ্গলা দেশে খ্রীষ্টের তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে রেসমের চাস খুব হইত। রেসমের খুব ভাল কাপড়ের নাম "পত্রোর্ণ" অর্থাৎ পাতার পশম। পোকাতে পাতা খাইয়া যে পশম বাহির করে, সেই পশমের কাপড়ের নাম "পত্রোর্ণ"। সেই পত্রোর্ণ তিন জায়গায় হইত—মগধে, পৌণ্ড্র দেশে ও স্বুবর্ণকুড্যে। নাগবৃক্ষ, লিকুচ, বকুল আর বটগাছে এই পোকা জন্মিত। নাগবৃক্ষের পোকা হইতে হল্‌দে রঙের রেসম হইত; লিকুচের পোকা হইতে যে রেসম বাহির হইত, তাহার রঙ গমের মত; বকুলের রেসমের রঙ সাদা; বট ও আর আর গাছের রেসমের রঙ ননীর মত। এই সকলের মধ্যে স্বুবর্ণকুড্যের "পত্রোর্ণ" সকলের চেয়ে ভাল। ইহা হইতেই কৌষের বস্ত্র ও চীনভূমিজাত চীনের পট্টবস্ত্রেরও ব্যাখ্যা হইল। অর্থশাস্ত্রের যে অধ্যায়ে কোন্ কোন্ ভাল জিনিস রাজকোষে রাখিয়া দিতে হইবে, তাহার তালিকা আছে, সেই অধ্যায়ের শেষ অংশে ঐসকল কথা আছে। অধ্যায়ের নাম "কোষপ্রবেশ্যরত্নপরীক্ষা।" এখানে রত্ন শব্দের অর্থ কেবল হীরা জহরৎ নয়; যে পদার্থের যাহা উৎকৃষ্ট, সেইটির নাম রত্ন। এই রত্নের মধ্যে অগুরু আছে, চর্ম্ম আছে, পাটের কাপড় আছে, রেসমের কাপড় আছে ও তুলার কাপড় আছে। মগধ—দক্ষিণবেহার, আর পৌণ্ড্র—বারেন্দ্রভূমি। প্রাচীন টীকাকার বলেন, স্বুবর্ণকুড্য কামরূপের নিকট। কিন্তু কামরূপের নিকট যে রেসম এখন হয়, তাহা ভেরাণ্ডা-পাতায় হয়। আমি বলি, স্বুবর্ণকুড্যেরই নাম শেষে কর্ণস্বুবর্ণ হয়। কর্ণস্বুবর্ণও মুর্শিদাবাদ ও রাজমহল লইয়া। এখানকার মাটী সোনার মত রাঙ্গা বলিয়া, এ দেশকে কর্ণস্বুবর্ণ, কিরণস্বুবর্ণ বা স্বুবর্ণকুড্য বলিত। এখানে এখনও রেসমের চাস হয় এবং এখানকার রেসম খুব ভাল। নাগবৃক্ষ শব্দের অর্থ নাগকেশরের গাছ। নাগকেশর বাঙ্গালার আর কোনখানে বড় দেখা যায় না, কিন্তু এখানে অনেক দেখা যায়। লিকুচ মাদারগাছ। মাদারগাছেও রেশমের পোকা বসিতে পারে। বকুল ও বটগাছ প্রসিদ্ধই আছে। কৌটিল্য যে ভাবে চীনদেশের পট্টবস্ত্রের উল্লেখ করিলেন, তাহাতে বোধ হয়, তিনি চীনদেশের রেসমী কাপড় অপেক্ষা বাঙ্গালার রেসমী কাপড় ভাল বলিয়া মনে করিতেন। রেসমী কাপড় যে চীন হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণই অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায় না। চীনের রেসম তুঁতগাছ হইতে হয়। বাঙ্গালার রেসমের তুঁতগাছের সহিত কোন সম্পর্কই নাই। স্বুতরাং বাঙ্গালী যে, রেসমের চাস চীন হইতে পাইয়াছে, একথা বলিবার যো নাই। রেসমের চাস বাঙ্গলাতেও ছিল, চীনেও ছিল। তবে তুঁতগাছ দিয়া রেশমের চাস চীন হইতেই সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের অন্যত্র যে, রেসমের চাস ছিল, এ কথা চাণক্য বলেন না। তিনি বলেন, বাঙ্গলায় ও মগধেই রেসমের চাস ছিল। কারণ, পৌণ্ড্র ও বাঙ্গলায়, স্বুবর্ণকুড্যও বাঙ্গলায়। চাণক্যের পরে কিন্তু ভারতবর্ষের নানা স্থানে রেসমের চাস হইত। কারণ, মান্দাসোরে খ্রীঃ ৪৭৬ অব্দে যে শিলালেখ পাওয়া যায়, তাহাতে লেখা আছে যে, সৌরাষ্ট্র হইতে এক দল্ রেসম-ব্যবসায়ী মান্দাসোরে আসিয়া রেসমের ব্যবসা আরম্ভ করে এবং তাহারাই চাঁদা করিয়া এক প্রকাণ্ড সূর্য্য-মন্দির নির্ম্মাণ করে। অর্থশাস্ত্র হইতে আমারা যে সংবাদ পাইলাম, সেটি বাঙ্গলার বড়ই গৌরবের কথা। যদি বাঙ্গালীরা সকলের আগে রেসমের চাস আরম্ভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ত তাঁহাদের গৌরবের সীমাই নাই। যদি চীনেই সর্ব্ব প্রথম উহার আরম্ভ হয়, তথাপি বাঙ্গালীরা চীন হইতে কিছু না শিখিয়াই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে যে রেসমের কাজ আরম্ভ করেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কারণ, তাঁহারা ত আর তুঁতপাতা হইতে রেসম বাহির করিতেন না। যেসকল গাছ বিনা চাসে তাঁহাদের দেশে প্রচুর জন্মায়, সে-সকল গাছের পোকা হইতেই তাঁহারা নানা রঙের রেসম বাহির করিতেন। চীনের রেসম সবই সাদা, তাহা রঙ করিতে হয়। বাঙ্গালার রেসম রঙ করিতে হইত না, গাছ-বিশেষের পাতার জন্যই

ভিন্ন ভিন্ন রঙের সূতা হইত। আর এ বিদ্যা বাঙ্গলার নিজস্ব—ইহা কম গৌরবের কথা নয়।

চতুর্থ গৌরব—বাকলের কাপড়

প্রথম অবস্থায় লোকে পাতা পরিত। কটকের জঙ্গল-মহলে এখন দু-এক জায়গায় লোকে পাতা পরিয়া থাকে। তাহার পর লোকে বাকল পরিত; গাছের ছাল পিটিয়া কাপড়ের মত নরম করিয়া লইত, তাহাই জড়াইয়া লজ্জা নিবারণ করিত এবং কাঁধের উপর একখানি ফেলিয়া উত্তরীয় করিত। সাঁচী পাহাড়ের উপর এক প্রকাণ্ড স্তূপ আছে, উহার চারিদিকে পাথরের রেলিং আছে, রেলিংএর চারিদিকে বড় বড় ফটক আছে। ছুই-ছুইটি থামের উপর এক-একটি ফটক। এই থামের গায়ে অনেক চিত্র আছে। এই চিত্রের মধ্যে বাকল-পরা অনেক মুনিঋষি আছেন। তাঁহাদের কাপড় পরার ধরণ দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি, কেমন করিয়া সেকালে লোকে বাকল পরিয়া থাকিত। তাহার পর লোকে আর বাকল পরিত না, বাকল হইতে সূতা বাহির করিয়া কাপড় বুনিয়া লইত; শণ, পাট, ধঞ্চে—এমন কি আতসী গাছের ছাল হইতেও সূতা বাহির করিত। এখন এই-সকল সূতায় দড়ী ও থলে হয়। সেকালে উহা হইতে খুব ভাল কাপড় তৈয়ার হইত এবং অনেক কাপড় খুব ভালও হইত। বাকল হইতে যে কাপড় হইত, তাহার নাম "ক্ষৌম"; উৎকৃষ্ট ক্ষৌমের নাম "দুকূল"। ক্ষৌম পবিত্র বলিয়া লোকে বড় আদর করিয়া পরিত।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মতে বাঙ্গলাতেই এই বাকলের কাপড় বুনা হইত। বঙ্গে "দুকূল" হইত, উহা শ্বেত ও স্নিগ্ধ, দেখিলেই চক্ষু জুড়াইয়া যাইত। পৌণ্ড্রেও দুকূল হইত, উহা শ্যামবর্ণ ও মণির মত উজ্জ্বল। সুবর্ণকুড্যে যে দুকূল হইত, তাহার বর্ণ সূর্য্যের মত এবং মণির মত উজ্জ্বল। এই অংশের শেষে কৌটিল্য বলিতেছেন, ইহাতেই কাশীর ও পৌণ্ড্রদেশের ক্ষৌমের কথা "ব্যাখ্যা" করা হইল। ইহাতে বুঝা যায়, বাঙ্গলাতেই বাকলের কাপড় সকলের চেয়ে ভাল হইত এবং "দুকূল" একমাত্র বাঙ্গলাতেই হইত। সুতরাং ইহা আমরা বাঙ্গলার চতুর্থ গৌরবের বিষয় বলিয়া উল্লেখ করিলাম। এখানে আমরা কাপাসের কাপড়ের কথা বলিলাম না। কারণ, চাণক্যের মতে কাপাসের কাপড় যে সুধু বাঙ্গলাতেই ভাল হইত, এমন নয়—মধুরার কাপড়, অপরান্তের কাপড়, কলিঙ্গের কাপড়, কাশীর কাপড়, বৎস দেশের কাপড় ও মহিষ দেশের কাপড়ও বেশ হইত। মধুরা পাণ্ড্যদেশ, মহিষ দেশ নর্ম্মদার দক্ষিণ, অপরান্ত বোম্বাই অঞ্চলে। কিন্তু চাণক্যের অনেক পরে কাপাসের কাপড়ও বাঙ্গলার একটা প্রধান গৌরবের জিনিষ হইয়াছিল, তাহা ঢাকাই মস্‌লিন।

পঞ্চম গৌরব—থিয়েটার

থিয়েটারের সেকালের নাম "প্রেক্ষাগৃহ" বা "পেক্‌খা ঘরঅ"। ইউরোপের অনেক পণ্ডিত বলিয়া থাকেন যে, ভারতবর্ষে থিয়েটার ছিল না, থিয়েটারের ব্যাপার গ্রীস হইতে এখানে আসিয়াছে, থিয়েটার রাজাদের নাচ-ঘরে থাকিত। এ কথা একেবারে ঠিক নয়। থিয়েটারের ঘর তিন রকম হইত:—এক রকম টানা—অর্থাৎ আগা সরু, গোড়া সরু, মাঝখানটা মোটা, ইহা ১০৮ হাত লম্বা, এরূপ ঘর দেবস্থানেই হইত; আর একরূপ ঘর চৌকোণা—৬৪ হাত লম্বা, ৩২ হাত চেটাল—ইহা রাজাদের জন্য; আর সাধারণ ভদ্রলোকেদের বাড়ীতে যে থিয়েটার হইত, তাহা তেকোণা, সমবাহু-ত্রিভুজ—প্রত্যেক বাহুর পরিমাণ ৩২ হাত। থিয়েটার করিবার সময় কানা খোঁড়া কুঁজা কুরূপ কোন লোককে সেখানে যাইতে দেওয়া হইত না, এমন কি মজুরী করিতেও ঐরূপ লোক লওয়া হইত না; সন্ন্যাসী ভিখারীকেও সেস্থানে যাইতে দেওয়া হইত না। ঘর করিবার সময় ঠিক মাঝখানে জর্জ্জর [ডগা-ছেঁচা বংশদণ্ড] পুতিয়া রাখিতে হইত। থিয়েটারের অর্দ্ধেকটা প্রেক্ষকদিগের জন্য, অর্দ্ধেকটা নটদিগের জন্য। থিয়েটারও দোতালা হইত, প্রেক্ষকদিগের জায়গাও দোতালা হইত। দোতালা ষ্টেজ (রঙ্গ) পৃথিবীর আর কোনও দেশে এখনও নাই। পৃথিবীর ব্যাপার একতালায় হইত, স্বর্গের ব্যাপার দোতালায় হইত। প্রেক্ষকদিগের যে অর্দ্ধেকটা স্থান থাকিত, তাহার সম্মুখটা ব্রাহ্মণদের জন্য, সেখানকার থাম সাদা। তাহার পিছনে ক্ষত্রিয়দের স্থান, সেখানকার থামগুলি রাঙ্গা। তাহার

পিছনে বৈশ্যের ও শূদ্রের অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক করিয়া স্থান, সেখানকার থাম হল্‌দে ও কাল। সম্মুখের সারির অপেক্ষা পিছনের সারি ১ হাত উচা—তাহার পিছনে আর ১ হাত উচা—তাহার পিছনে আর ১ হাত উচা—এইরূপে গেলারি করা ছিল। দোতালার অবস্থাও এইরূপ। ষ্টেজের পিছনে সাজঘর ও বাজনার ঘর, তাহার পিছনে বিশ্রামঘর, তাহারও পিছনে দেবতাদের পূজা করিবার স্থান। ষ্টেজে চিত্র থাকিত; কিন্তু সেগুলি নড়ান যাইত না। ষ্টেজের দেওয়ালের গায়ে উজ্জ্বল বর্ণে কোথাও বাগান, কোথাও বাড়ী, কোথাও শোবার ঘর, কোথাও নদীতীর, কোথাও পর্ব্বত আঁকা থাকিত। ষ্টেজের উপরে জর্জ্জরের পূজা হইত ও নান্দী পাঠ হইত। ষ্টেজের দুই পাশে দুই দরজা থাকিত, সেইখান দিয়া পাত্রের প্রবেশ হইত। যাঁহারা অভিনয় করিতেন, তাঁহারা প্রথম প্রথম ব্রাহ্মণই ছিলেন। ঋষিদের উপর কটাক্ষ করিয়া কয়েকখানি প্রহসন করায় ঋষিরা শাপ দেন—'তোমরা শূদ্র হইয়া যাইবে।' সেই অবধি উহাঁরা শূদ্র হইয়া যান। চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে উহাঁদিগকে শূদ্রই বলা হইয়াছে। থিয়েটারের কথা বলিতে গিয়া ভরত মুনি উহার কতকটা ইতিহাস দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, অনেক সম্প্রদায়ের নটসূত্র ছিল। প্রত্যেক সূত্রেরই ভাষ্য ছিল, বার্ত্তিক ছিল, নিরুক্ত ছিল, সংগ্রহ ছিল, কারিকা ছিল। এই সমস্ত সূত্র একত্র করিয়া ভরত-নাট্যশাস্ত্র হইয়াছে। এই নাট্য-শাস্ত্রখানি বোধ হয় খ্রীষ্টের দুই শত বৎসর পূর্ব্বে লেখা হইয়াছিল। কারণ, উহাতে শক যবন ও পহ্লব এই তিনটি জাতির নাম একত্র পাওয়া যায়। ভরতসূত্র যদি খ্রীষ্টের ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে লেখা হয় তাহা হইলে তাহারও পূর্ব্বে অনেক নাট্য-সম্প্রদায় ছিল। পাণিনিতে আমরা দুইখানি নটসূত্রের নাম পাই, একখানি শিলালির, অপরটি কৃশাশ্বের। ভাসের নাটকে আছে যে, বৎসরাজ উদয়ন সূত্রকার ভরতকে আপনার পূর্ব্বপুরুষ মনে করিয়া অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকের প্রবৃত্তির অনুসারে নাটকের প্রবৃত্তি চারি রকম ছিল। সেই চারিটি প্রবৃত্তির নাম—আবন্তী, দাক্ষিণাত্যা, পাঞ্চালী, ও ওড্র‌মাগধী। দাক্ষিণাত্যের লোকে নাটকে নৃত্য গীত বাদ্য বেশী বেশী দেখিতে ভাল বাসিত, তাহারা অভিনয়ও ভাল বাসিত, কিন্তু উহা চতুর মধুর ও ললিত হওয়া আবশ্যক ছিল। এইরূপ পূর্ব্বাঞ্চলের লোকেরও একটা প্রবৃত্তি ছিল, তাহার নাম ওড্র‌মাগধী। ওড্র‌মাগধী প্রবৃত্তি যে-সকল দেশে প্রচলিত ছিল, তাহার মধ্যে বঙ্গদেশ প্রধান। কারণ বঙ্গদেশ হইতেই মলচ, মল্ল, বর্ধক, ব্রহ্মোত্তর, ভার্গব, মার্গব, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, পুলিন্দ, বৈদেহ, তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি দেশ নাটকের প্রবৃত্তি গ্রহণ করিত। এই নাটকের প্রবৃত্তি এই যে, ইহারা প্রহসন ভাল বাসিত, ছোট ছোট নাটক ভাল বাসিত, পূর্ব্ববঙ্গে আশীর্ব্বাদ ও মঙ্গলধ্বনি ভাল বাসিত, কথোপকথন ভাল বাসিত, আর সংস্কৃত পাঠ ভাল বাসিত; স্ত্রীর অভিনয় তাহাদের আদৌ ভাল লাগিত না, পুরুষের অভিনয়ই তাহাদের পছন্দ ছিল। তাহারা নাটকে গান বাজনা নাচ—এ সব ভাল বাসিত না। খ্রীষ্টের দুই শত বৎসর পূর্ব্বেও যদি বাঙ্গলায় নাটকের একটা স্বতন্ত্র রীতি চলিয়া থাকে, তবে তাহা বাঙ্গালীর কম গৌরবের কথা নয়।

ষষ্ঠ গৌরব—নৌকা ও জাহাজ

বাঙ্গলায় যেরূপ বড় বড় নদী আছে, তাহাতে বাঙ্গালীরা যে অতি প্রাচীন কালেও নৌকা গড়িত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নৌকাও অনেকরূপ ছিল—দোণা, ডুণি, ডিঙ্গি, ভেলা, নৌকা, বালাম, ছিপ, ময়ুরপঙ্খী ইত্যাদি। এ সকলই ছোট ছোট নৌকা, সকল দেশেই আছে। বাঙ্গলায় কিন্তু বড় জাহাজও ছিল। বুদ্ধদেবেরও আগে বঙ্গদেশে বঙ্গনগরে এক জন রাজা ছিলেন। এক সিংহ রাজকন্যাকে বিবাহ করিল। রাজকন্যার এক পুত্র ও এক কন্যা হইল। পুত্রের হাত দুইখানি সিংহের মত হইল, এইজন্য তাহার নাম হইল সিংহবাহু। সিংহবাহু বড় হইলে মা ও ভগিনীকে লইয়া সিংহের গুহা হইতে পলায়ন করিল। বাঙ্গলার সীমানায় উপস্থিত হইলে সীমারক্ষক রাজার শালা রাজকন্যা ও তাহার ছেলে মেয়েকে বঙ্গনগরে পাঠাইয়া দিলেন। সিংহবাহু রাজা হইল। তাহার বড় ছেলের নাম হইল বিজয়। সে বড় দুরন্ত, লোকের উপর বড় অত্যাচার করে। লোকে উত্যক্ত হইয়া উঠিল, রাজাকে বলিল,

"ছেলেটিকে মারিয়া ফেল।" রাজা ৭০০ অনুচরের সহিত বিজয়কে এক নৌকা করিয়া দিয়া সমুদ্রে পাঠাইয়া দিলেন। বিজয়ের ও তাহার অনুচরবর্গের ছেলেদের জন্য আর-এক নৌকা দিলেন ও তাহাদের স্ত্রীদের জন্য আরও একখানা নৌকা দিলেন। ছেলেরা একটা দ্বীপে নামিল, তাহার নাম হইল নগ্নদ্বীপ; মেয়েরা আর-একটি দ্বীপে নামিল, তাহার নাম হইল নারীদ্বীপ। বিজয় ঘুরিতে ঘুরিতে, এখন যেখানে বোম্বাই, তাহার নিকটে সুপ্পরাক নগরে আসিয়া উপস্থিত হইল, সংস্কৃতে উহার নাম সুপরার্ক, এখন উহার নাম সুপারা। বিজয় সেখানেও অত্যাচার আরম্ভ করিল। লোকে তাহাকে তাড়া করিল, সেও আবার নৌকায় চড়িয়া পলাইয়া গেল ও লঙ্কাদ্বীপে আসিয়া নামিল। সে যেদিন লঙ্কাদ্বীপে নামে, সেদিন বুদ্ধদেব কুশীনগরে দুই শালগাছের মাঝে শুইয়া নির্ব্বাণ লাভ করিতেছিলেন। তিনি ইন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "আজ বিজয় লঙ্কাদ্বীপে নামিল। সে সেখানে আমার ধর্ম্ম প্রচার করিবে, তুমি তাহাকে রক্ষা করিও।" যে তিনখানি নৌকায় সিংহবাহু বিজয় ও তাহার লোকজন, উহাদের ছেলেপিলে ও পরিবারবর্গ পাঠাইয়া দেন, সে তিনখানিই খুব বড় নৌকা ছিল। ৭০০ লোক যে নৌকায় যায়—সে ত জাহাজ। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশে বড় বড় নৌকা তৈয়ার হইত। বিজয় যে জাহাজে লঙ্কা যান, সে জাহাজের একখানি ছবি অজন্ত-গুহার মধ্যে আছে। তাহাতে মাস্তল ছিল, পাল ছিল, ষ্টীম এঞ্জিন হইবার আগে যে-সব জিনিষ তাহাতে দরকার, সবই ছিল। সে ছবিও অল্প দিনের নয়, অন্তত ১৪০০ বৎসর হইয়া গিয়াছে। তখনও লোকে মনে করিত, বিজয় এই ভাবে এইরূপ নৌকায় লঙ্কায় নামিয়াছিলেন। বুদ্ধের আগেও ভারতবর্ষের অন্যত্র এরূপ অনেক বড় বড় নৌকা ছিল। এক জাহাজে ৭০০ লোক যাইবার কথা অনেক জায়গায় শুনা যায়। কিন্তু তাম্রলিপ্তি বা বাঙ্গলা হইতে এরূপ জাহাজ যাইবার কথা বুদ্ধদেবের আগে বা পরেও অনেক বৎসর ধরিয়া আর শুনা যায় না। তথাপি ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মনে করেন, বুদ্ধের সময়ও তাম্রলিপ্তি একটি বড় বন্দর ছিল। অর্থশাস্ত্রে বলে যে, যিনি রাজার "নাবধ্যক্ষ" থাকিতেন, তিনি "সমুদ্রসংযানের"ও অধ্যক্ষতা করিতেন। সুতরাং তখনও যে বঙ্গ মগধ হইতে সমুদ্রে জাহাজ যাইত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বঙ্গ মগধ হইতে জাহাজ যাইতে হইলে, তাম্রলিপ্তি ছাড়া আর বন্দরও নাই। দশকুমারচরিত একখানি প্রাচীন গ্রন্থ। উইলসন সাহেব মনে করেন যে, উহা খ্রীষ্টের জন্মের ছয় শত বৎসর পরে লিখিত। অনেকে কিন্তু মনে করেন, উহা খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে। উহাতে তাম্রলিপ্তি নগরের বিবরণ আছে। সেখান হইতে অনেক পোত বঙ্গসাগরে যাইত। দশকুমারের এক কুমার তাম্র-লিপ্তি হইতে সেইরূপ এক পোতে চড়িয়া দূর সমুদ্রে যাইতেছিলেন। রামেষু নামে এক যবনের পোত তাঁহার পোতকে ডুবাইয়া দেয়। 'রামেষু নাম্নো যবনস্য' পড়িয়া ইজিপ্টের রাজা রামেসিসের কথা মনে পড়ে। দশকুমার যখন লেখা হয়, তখনও বোধ হয় রামেসিসের স্মৃতি কিছু জাগরূক ছিল। খ্রীষ্টের জন্মের চারি শত বৎসর পরে ফাহিয়ান তাম্রলিপ্তি হইতে এক জাহাজে চড়িয়া চীনযাত্রা করিয়াছিলেন। সে জাহাজে নানা দেশের লোক ছিল। চীন-সমুদ্রে ভয়ঙ্কর ঝড় উঠে, জাহাজ ডুবুডুবু হয়, ফাহিয়ান বুদ্ধদেবের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ও ঝড় থামিয়া গেল। তাহার পরও তাম্রলিপ্তি হইতে চীন ও জাপানে জাহাজ যাইত শুনা যায়। কিছুদিন পর হইতেই সুমাত্রা, জাবা, বালি প্রভৃতি দ্বীপে ভারতবাসীরা যাইয়া বাস করেন এবং তথায় শৈব, বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করেন। কিন্তু তাঁহারা কলিঙ্গ ও ভরুকচ্ছ হইতেই গিয়াছিলেন, তাম্রলিপ্তি হইতেও যাওয়ার সম্ভব, কিন্তু এখনও তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ব্রহ্মদেশের প্রাচীন বৃত্তান্তে লেখা আছে যে, মগধ হইতে অনেকবার লোকে যাইয়া ব্রহ্মদেশ দখল করে ও তথায় সভ্যতা বিস্তার করে। ড্রসেল সাহেবের রিপোর্টে প্রকাশ যে, পেগানে বহু পূর্ব্বে মগধ হইতে লোকজন গিয়াছিল ও তথায় ভারতবর্ষের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিল। কালিদাস বলিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গলার রাজারা নৌকা লইয়া যুদ্ধ করিতেন। পালরাজাদের যে যুদ্ধের জন্য অনেক নৌকা থাকিত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। খালিমপুরে ধর্ম্মপালের যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ধর্ম্মপালের যুদ্ধের জন্য অনেক নৌকা প্রস্তুত

থাকিত, এ কথা স্পষ্ট লেখা আছে। রামপাল নৌকার সেতু করিয়া গঙ্গা পার হইয়াছিলেন, এ কথা রামচরিতে স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে। ইংরেজী ১২৭৬ সালে তাম্রলিপ্তি হইতে কতকগুলি বৌদ্ধভিক্ষু জাহাজে চড়িয়া পেগানে গিয়া তথাকার বৌদ্ধ ধর্ম্ম সংস্কার করেন, একথাও কল্যাণীনগরের শিলালেখে স্পষ্ট করিয়া বলা আছে। কিন্তু মনসা ও মঙ্গলচণ্ডীর পুথিতেই আমরা বাঙ্গলা দেশের নৌকাযাত্রার খুব জাঁকাল খবর পাই,—চৌদ্দ, পোনের, ষোলখানি জাহাজ একজন সদাগর একজন মাঝীর অধীনে ভাসাইয়া লইয়া গঙ্গা বাহিয়া সমুদ্র বাহিয়া সিংহলে যাইতেন এবং তথা হইতেও ১৪।১৫ দিন বাহিয়া মহাসমুদ্রের মধ্যে নানা দ্বীপ উপদ্বীপে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। চাঁদসদাগরের প্রধান জাহাজের নাম মধুকর। কোন কোন পুথিতে লেখে যে, মধুকরের ১২০০ শত দাঁড় ছিল। দ্বিজ বংশীদাসের মনসার ভাসানে লেখা আছে, সিংহল হইতে ১৩ দিন মহাসমুদ্রে যাওয়ার পর ভীষণ ঝড় উঠিল, তূলারাশির মত ফেনরাশি নৌকার উপর দিয়া চলিতে লাগিল। চাঁদসদাগর কাঁদিয়াই আকুল।—তিনি মাঝীকে ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন,—"তুমি ইহার একটা উপায় কর।" মাঝী তখন মধুকর হইতে কতকগুলা তেলের পিপা খুলিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিলেন, ঢেউ থামিয়া গেল। এইসকল বই লেখার পরও যখন কেদাররায় ও প্রতাপাদিত্য খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা সর্ব্বদাই নৌকা লইয়া যুদ্ধ করিতেন, অনেক সময় দূরদূরান্তরও যাইতেন। কিন্তু তখন তাঁহাদের সহায় ছিল পর্ত্তুগীজ বোম্বেটের দল। ইহার পরেও আবার যখন আরাকানের রাজা ও পর্ত্তুগীজ বোম্বেটেরা বাঙ্গলায় বড়ই অত্যাচার আরম্ভ করিল, দেশটাকে সত্য-সত্যই 'মগের মুল্লুক' করিয়া তুলিল, তখন আবার বাঙ্গালী মাঝী দিয়াই সায়েস্তা খাঁ তাহাদের শাসন করিলেন। বঙ্গসাগরে বোম্বেটেগিরি থামিয়া গেল।

সপ্তম গৌরব—বৌদ্ধ শীলভদ্র

চীনে যত বৌদ্ধ পণ্ডিত জন্মিয়াছিলেন, য়ুয়াং চুয়াং তাঁহাদের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়। তাঁহারই শিষ্য-প্রশিষ্য এক সময় জাপান, কোরিয়া, মঙ্গলিয়া ছাইয়া ফেলিয়াছিল। য়ুয়াং চুয়াং বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও যোগ শিখিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাহার চেয়ে অনেক বেশী শিখিয়া যান। যাঁহার পদতলে বসিয়া তিনি এত শাস্ত্র শিখিয়াছিলেন, তিনি একজন বাঙ্গালী। ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়। ইঁহার নাম শীলভদ্র, সমতটের এক রাজার ছেলে। য়ুয়াং চুয়াং যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখন তিনি নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষ; বড় বড় রাজা, এমন কি সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন পর্য্যন্ত, তাঁহার নামে তটস্থ হইতেন। কিন্তু সে—পদের গৌরব, মানুষের নহে। শীলভদ্রের পদের গৌরব অপেক্ষা বিদ্যার গৌরব অনেক বেশী ছিল। য়ুয়াং চুয়াং একজন বিচক্ষণ বহুদর্শী লোক ছিলেন। তিনি গুরুকে দেবতার মত ভক্তি করিতেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, নানা দেশে নানা গুরুর নিকট বৌদ্ধশাস্ত্রের ও বৌদ্ধযোগের গ্রন্থসকল অধ্যয়ন করিয়া, তাঁহার যে-সকল সন্দেহ কিছুতেই মিটে নাই, শীলভদ্রের উপদেশে সেইসকল সন্দেহ মিটিয়া গিয়াছে। শীলভদ্র মহাযান বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধদিগের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সমস্ত গ্রন্থই তাঁহার পড়া ছিল। তিনি ব্রাহ্মণদের সমস্ত শাস্ত্রও আয়ত্ত করিয়াছিলেন। পাণিনি তাঁহার বেশ অভ্যাস ছিল এবং সে সময় উহার যে-সকল টীকা-টিপ্পনী হইয়াছিল, তাহাও তিনি পড়াইতেন। ব্রাহ্মণের আদি গ্রন্থ যে বেদ, তাহাও তিনি য়ুয়াং চুয়াংকে পড়াইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার যেমন পাণ্ডিত্য ছিল, তেমনি মনের উদারতা ছিল। য়ুয়াং চুয়াংএর পাণ্ডিত্য ও উৎসাহ দেখিয়া যখন নালন্দার সমস্ত পণ্ডিতবর্গ তাঁহাকে দেশে যাইতে দিবেন না স্থির করিলেন, তখন শীলভদ্র বলিয়া উঠিলেন, "চীন একটি মহাদেশ, য়ুয়াং চুয়াং ঐখানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিবেন, ইহাতে তোমাদের বাধা দেওয়া উচিত নয়। সেখানে গেলে ইঁহার দ্বারা সদ্ধর্ম্মের অনেক উন্নতি হইবে, এখানে বসিয়া থাকিলে কিছুই হইবে না।" আবার যখন কুমাররাজ ভাস্করবর্ম্মা য়ুয়াং চুয়াংকে কামরূপ যাইবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন এবং তিনি যাইতে রাজী হইলেন না, তখনও শীলভদ্র বলিলেন, "কামরূপে বৌদ্ধ ধর্ম্ম এখনও প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই, সেখানে গেলে যদি বৌদ্ধ ধর্ম্মের কিছুমাত্র বিস্তার হয়, তাহাও পরম লাভ।" এইসমস্ত ঘটনায় শীলভদ্রের ধর্ম্মানুরাগ, দূরদর্শিতা ও নীতিকৌশলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁহার বাল্যকালের কথাও কিছু এখানে বলা আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তিনি সমতটের রাজার ছেলে, তিনি নাকি ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার বিদ্যায় অনুরাগ ছিল এবং খ্যাতি-প্রতিপত্তিও খুব হইয়াছিল। তিনি বিদ্যার উন্নতির জন্য সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া ত্রিশ বৎসর বয়সে নালন্দায় আসিয়া উপস্থিত হন। সেখানে বোধিসত্ত্ব ধর্ম্মপাল তখন সর্ব্বময় কর্ত্তা। তিনি ধর্ম্মপালের ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহার শিষ্য হইলেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই ধর্ম্মপালের সমস্ত মত আয়ত্ত করিয়া লইলেন। এই সময় দক্ষিণ হইতে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মগধের রাজার নিকট ধর্ম্মপালের সহিত বিচার প্রার্থনা করেন। রাজা ধর্ম্মপালকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ধর্ম্মপাল যাইবার জন্য উদ্যোগ করিলেন। শীলভদ্র বলিলেন, "আপনি কেন যাইবেন?" তিনি বলিলেন, "বৌদ্ধ ধর্ম্মের আদিত্য অস্তমিত হইয়াছে। বিধর্ম্মীরা চারিদিকে মেঘের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। উহাদিগকে দূর করিতে না পারিলে সদ্ধর্ম্মের উন্নতি নাই।" শীলভদ্র বলিলেন, "আপনি থাকুন, আমি যাইতেছি।" শীলভদ্রকে দেখিয়া দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হাসিয়া উঠিলেন,—"এই বালক আমার সহিত বিচার করিবে?" কিন্তু শীলভদ্র অতি অল্পেই তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া দিলেন। সে শীলভদ্রের না যুক্তি খণ্ডন করিতে পারিল, না বচনের উত্তর দিতে পারিল, লজ্জায় অধোবদন হইয়া সে সভা ত্যাগ করিয়া গেল। শীলভদ্রের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া রাজা তাঁহাকে একটি নগর দান করিলেন। শীলভদ্র বলিলেন, "আমি যখন কাষায় গ্রহণ করিয়াছি, তখন অর্থ লইয়া কি করিব?" রাজা বলিলেন, "বুদ্ধদেবের জ্ঞানজ্যোতি ত বহুদিন নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে, এখন যদি আমরা গুণের পূজা না করি, তবে ধর্ম্ম কিরূপে রক্ষা হইবে? আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন না।" তখন শীলভদ্র তাঁহার কথায় রাজী হইয়া নগরটি গ্রহণ করিলেন এবং তাহার রাজস্ব হইতে একটি প্রকাণ্ড সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। য়ুয়াং চুয়াং একজায়গায় বলিতেছেন যে, শীলভদ্র বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্মানুরাগ, নিষ্ঠা প্রভৃতিতে প্রাচীন বৌদ্ধগণকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি দশ-কুড়িখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তিনি যে-সকল টীকা টিপ্পনী লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অতি পরিষ্কার ও তাহার ভাষা অতি সরল।

অষ্টম গৌরব—বৌদ্ধ লেখক শান্তিদেব

আমি মনে করি যে, যিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মের কয়েকখানি খুব চলিত পুথি লিখিয়া গিয়াছেন, সেই মহাত্মা বাঙ্গালি ছিলেন। কিন্তু তারানাথ আমার বিরোধী। তিনি বলেন, শান্তিদেবের বাড়ী সৌরাষ্ট্রে ছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, আমি শান্তিদেবের যে অমূল্য জীবন-চরিতখানি পাইয়াছি, তাহাতে কে তাঁহার জন্মভূমির নামটি কাটিয়া দিয়াছে,—এমন করিয়া কাটিয়াছে যে, পড়িবার যো নাই। কিন্তু তাঁহার লীলাক্ষেত্র মগধের রাজধানী ও নালন্দা। তিনি যখন বাড়ী হইতে বাহির হন, তাঁহার মা বলিয়া দিয়াছিলেন, "তুমি মঞ্জুজ্ঞান লাভ করিবার জন্য মঞ্জুবজ্র সমাধিকে গুরু করিবে।" সৌরাষ্ট্রে মঞ্জুশ্রীর প্রাদুর্ভাব বড় শোনা যায় না। সেখানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব বড় কম ছিল। এমন কতকগুলি বাঙ্গলা গান আছে, যাহার ভণিতায় লেখা আছে "রাউতু ভণই কট, ভুসুকু ভণই কট।" এই রাউতু, ভুসুকু ও শান্তিদেব একই ব্যক্তি। আরও এক কথা, শান্তিদেব তিনখানি পুস্তক লিখিয়াছেন:—(১) সূত্র-সমুচ্চয়, (২) শিক্ষাসমুচ্চয় ও (৩) বোধিচর্য্যাবতার। শেষ দুইখানি পাওয়া গিয়াছে ও ছাপা হইয়াছে। প্রথম খানি এখনও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ভুসুকুর নামে আমরা আর একখানি বই পাইয়াছি, উপরের দুইখানির মত এইখানিও সংস্কৃতে লেখা, তবে মাঝে মাঝে বাঙ্গলা আছে। উপরের দুইখানির মধ্যেও আবার শিক্ষা-সমুচ্চয়ে অনেক অংশ সংস্কৃত ছাড়া অপর আর-এক ভাষায় লেখা। আরও কথা, একটি ভুসুকুর গানে আছে,—"আজ ভুসুকু তু ভেলি বাঙ্গালী। নিজ ঘরিণী চণ্ডালী নেলী॥" আজ ভুসুকু তুই সত্য সত্য বাঙ্গালী হইয়াছিস ইত্যাদি। তেঙ্গুর গ্রন্থে লেখা আছে, শান্তিদেবের বাড়ী জাহোর। জাহোর কোথায় জানি না, তবে উহার সন্ধান হওয়া আবশ্যক।

নবম গৌরব—নাথ-পন্থ

আমাদের দেশে এখন যে-সব যোগীরা আছেন, তাঁহাদের সকলেরই উপাধি নাথ। তাঁহারা বলেন, "আমরা

এ দেশে রাজাদের গুরু ছিলাম, ব্রাহ্মণেরা আমাদের গুরুগিরি কাড়িয়া লইয়াছে।" তাই এখন আবার তাঁহারা পৈতা লইয়া ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টায় আছেন। নাথেদের আচার-ব্যবহার কিন্তু ব্রাহ্মণদের মত নয়। নাথ-পন্থ (Nathism) নামে এক প্রবল ধর্ম্মসম্প্রদায় বহু শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলায় এবং পূর্ব্ব-ভারতে প্রভুত্ব করিয়া গিয়াছে। গোরক্ষনাথ খৃষ্টের আট শ বছর পরের লোক। নেপালে বৌদ্ধদিগের সংস্কার যে, সব নাথেরাই বৌদ্ধ ছিলেন, কেবল গোরক্ষনাথ বৌদ্ধ ধর্ম্ম ছাড়িয়া শৈব হন। বৌদ্ধ অবস্থায় তাঁহার নাম ছিল রমণবজ্র কি অনঙ্গবজ্র। ক্রমে খুঁজিতে খুঁজিতে "কৌলজ্ঞানবিনিশ্চয়" নামে মৎস্যেন্দ্র-নাথ বা মচ্ছঘ্নপাদের "অবতারিত" একখানি তন্ত্র পাইলাম। উহা যে অক্ষরে লেখা, সে অক্ষর খৃষ্টের নয় শত বৎসরের পর উঠিয়া গিয়াছে। তাহাতে কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মের নাম গন্ধও নাই। একখানি বৌদ্ধ গ্রন্থে মীননাথের একটি বাঙ্গলা পদ তুলিয়া বলিয়াছে যে, ইহা পরদর্শনের মত। আরও অনেক কারণ আছে, যাহাতে বেশ বোধ হয় যে নাথেরা না-হিন্দু, না-বৌদ্ধ এমন একটি ধর্ম্মমত প্রচার করেন। শিব তাঁহাদের দেবতা। তাঁহাদের বইগুলি হরপার্ব্বতী-সংবাদে তন্ত্রের আকারে লেখা। তাঁহারাই সেইগুলি কৈলাস হইতে নামাইয়া লইয়া আসেন। তাঁহারাই হঠযোগ প্রচার করেন। নানারূপ আসন করিয়া যোগ করা তাঁহাদের ধর্ম্ম। তাহাদের ধর্ম্মের মূল কথাগুলি এখনও পাওয়া যায় নাই। যা কিছু পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যে, তাঁহারা লোককে গৃহস্থাশ্রম ছাড়িতেই পরামর্শ দিতেন। তাঁহাদের ধর্ম্মে স্বর্গ-অপবর্গের দিকে তত ঝোঁক ছিল না। তাঁহাদের চেষ্টা সিদ্ধিলাভ। এই সিদ্ধি পরিণামে ভেল্কী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মূল নাথেরা কি করিতেন, জানা যায় না; কিন্তু এখন অনেক নাথেরা ভেল্কী দেখাইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। ইন্দ্রিয়সেবায় নাথেদের কোন আপত্তি নাই নাথেরা যে বাঙ্গলা দেশের বা পূর্ব্ব-ভারতের লোক, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ —মীন-নাথের একটি পদ পাইয়াছি, সেটি খাঁটি বাঙ্গলা। গোরক্ষনাথের লীলাক্ষেত্র বাঙ্গলাতেই অধিক। তাঁহারই চেলা হাড়িপা আমাদের ময়নামতীর গানের নায়ক। মীননাথ যখন তাঁহার নিজের ধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছিলেন, গোরক্ষনাথই তখন তাঁহাকে সে কথা মনে করাইয়া দেন। মৎস্যেন্দ্রনাথকে অনেক সময় মচ্ছঘ্ননাথ বলে, অর্থাৎ তিনি জেলের ছেলে ছিলেন। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাঁহার বাঙ্গলা দেশের লোক হওয়াই সম্ভব। ক্রমে নাথ-পন্থ খুব প্রবল হইয়া উঠিলে বৌদ্ধেরা ও হিন্দুরা নাথেদের উপাসনা করিত। মৎস্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্ম্মের নাম গন্ধ না থাকিলেও, তিনিই এখন নেপালী বৌদ্ধদিগের প্রধান দেবতা। তাঁহার রথযাত্রায় নেপালে যেমন ধুমধাম হইয়া থাকে, এমন আর কোনও দেবতার কোনও যাত্রায় হয় না। গোরক্ষনাথের উপর নেপালী বৌদ্ধেরা সকলে খুসী না থাকিলেও অনেক বৌদ্ধেরা এখনও তাঁহার পূজা করে, তিব্বতেও তাঁহার পূজা হয়।

দশম গৌরব—দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান।

তাঁহার নিবাস পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমণীপুর। তিনি ভিক্ষু হইয়া বিক্রমশীল বিহারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি প্রধান পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হন। সে সময় মঠের অধ্যক্ষ তাঁহাকে সুবর্ণদ্বীপে প্রেরণ করেন। তিনি সুবর্ণদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্ম সংস্কার করিয়া প্রসিদ্ধ হন। তখন নালন্দার চেয়েও বিক্রমশীলের খ্যাতি প্রতিপত্তি অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। অনেক বড় বড় লোক, অনেক বড় বড় পণ্ডিত, বিক্রমশীল হইতে লেখা পড়া শিখিয়া, শুধু ভারতবর্ষে নয়, তাহার বাহিরেও গিয়া বিদ্যা ও ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। বিক্রমশীল-বিহারের রত্নাকর শান্তি একজন খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধি নৈয়ায়িক ছিলেন। প্রজ্ঞাকরমতি, জ্ঞানশ্রীভিক্ষু প্রভৃতি বহুসংখ্যক গ্রন্থকার ও পণ্ডিতের নাম বিক্রমশীলের মুখ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। এরূপ বিহারের অধ্যক্ষ হওয়া সৌভাগ্যের কথা। দীপঙ্কর অনেক সময় ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ও অন্য যানাবলম্বীদিগের সহিত ঘোরতর বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন ও তাহাতে জয়লাভ করিতেন। এই সময় তিব্বত দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রায় লোপ হইয়া আসে ও বনপার দল খুব প্রবল হইয়া উঠে। তাহাতে ভয় পাইয়া তিব্বত দেশের রাজা

বিক্রমশীল-বিহার হইতে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে সসম্মানে আপন দেশে লইয়া যান। যাইবার সময় তিনি কয়েক দিন নেপালে স্বয়ম্ভুক্ষেত্রে বাস করেন। যিনি তাঁহাকে আহ্বান করিয়া নিজ দেশে লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার রাজধানী পশ্চিম-তিব্বতে ছিল। যে-সকল বিহারে তিনি বাস করিয়াছিলেন, সে-সকল বিহার এখনও লোকে অতি পবিত্র বলিয়া মনে করে। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বা অতিশা যখন তিব্বত দেশে যান, তখন তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর। এরূপ বৃদ্ধ বয়সেও তিনি তিব্বতে গিয়া অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং তথাকার অনেক লোককে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে তিব্বতে নানা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উদয় হইয়াছে। তিব্বতে যে কখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের লোপ হইবে, এরূপ আশঙ্কা আর হয় নাই। তিনি তিব্বতে মহাযানমতেরই প্রচার করেন। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, তিব্বতীরা বিশুদ্ধ মহাযানধর্ম্মের অধিকারী নয়; কেননা, তাহারা তখনও দৈত্যদানবের পূজা করিত, তাই তিনি অনেক বজ্র-যান ও কালচক্রযানের গ্রন্থ তর্জ্জমা করিয়াছিলেন ও অনেক পূজাপদ্ধতি ও স্তোত্রাদি লিখিয়াছিলেন। তেঙ্গুর ক্যাটালগে প্রতি পাতেই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বা অতিশার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। আজিও সহস্র সহস্র লোক তাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করে। অনেকে মনে করেন, তিব্বতীয়দিগের যা কিছু বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা—এ সমুদায়ের মূল কারণ তিনিই।

একাদশ গৌরব—জগদ্দল মহাবিহার ও বিভূতিচন্দ্র

শান্তিদেবের শিক্ষাসমুচ্চয় নামে পুথিখানি কাগজের, হাতের লেখা, অধিকাংশই বাঙ্গলা। অনেক পূর্ব্বে নেপালে 'কায়গদ' ছিল। 'কায়গদ' শব্দটি চীনের। আমরা কাগজ পরে পাইয়াছি, কেননা আমরা উহা সরাসর চীন হইতে পাই নাই, মুসলমানদের হাত হইতে পাইয়াছি, মুসলমানেরা চীন হইতেই পাইয়াছিল। মুসলমানেরা কায়গদ শব্দটিকে কাগজ করিয়া তুলিয়াছে। পুথিখানির শেষে লেখা আছে:—'দেয় ধর্ম্মোয়ং প্রবরমহাযানযায়িনো জাগদ্দল-পণ্ডিত বিভূতিচন্দ্রস্য" ইত্যাদি। কয়েকখানি পুথিতে জগদ্দল মহাবিহারের নাম পাই; বিভূতিচন্দ্রেরও নাম পাই। তিনি "অমৃতকর্ণিকা" নামে "নামসংগীতির" একখানি টীকা করেন, ঐ টীকা কালচক্রযানের মতে লিখিত হয়। তাহার পর রামচরিত কাব্য ছাপাইবার সময় জানিতে পারি, রামপাল রামাবতী নামে যে নগর বসান, 'জাগদ্দল মহাবিহার" তাহারই কাছে ছিল। উহা গঙ্গা ও করতোয়ার সঙ্গমের উপরেই ছিল। এখন করতোয়া গঙ্গায় পড়ে না—পড়ে যমুনায়; গঙ্গাও এক সময় বুড়ীগঙ্গা দিয়া যাইত। তাই ভাবিয়াছিলাম, রামপাল নামে মুন্সীগঞ্জে যে এক পুরাণ গ্রাম আছে, হয়ত সেই রামাবতী ও জগদ্দল উহারই নিকটে কোথাও হইবে। আমি এ কথা প্রকাশ করার পর, অনেকেই জগদ্দল খুঁজিতেছেন, কেহ মালদহে, কেহ বগুড়ায়; কিন্তু খোঁজ এখনও পাওয়া যায় নাই, পাওয়া কিন্তু নিতান্ত দরকার। কারণ, মগধে যেমন নালন্দা, পেশোয়ারে যেমন কনিষ্ক-বিহার, কলম্বোতে যেমন দীপদন্তম বিহার, সেইরূপ বাঙ্গলার মহাবিহার জগদ্দল। তেঙ্গুরে কোথাও লেখে উহা বরেন্দ্রে ছিল, কোন কোন জায়গায় লেখে বাঙ্গলায়, কোন কোন জায়গায় লেখে পূর্ব্ব-ভারতে। যাহা হউক উহা একটি প্রকাণ্ড বিহার ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। রামপালই যে ঐ বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না। এই বিহারে অনেক বড় বড় ভিক্ষু থাকিতেন, তাঁহাদের মধ্যে বিভূতিচন্দ্রই প্রধান। বিভূতিচন্দ্র অনেকগুলি সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থের টীকা-টিপ্পনী লিখিয়াছিলেন। যখন তিব্বত দেশে এইসকল বৌদ্ধগ্রন্থ তর্জ্জমা হইতেছে, তখন তিনি অনেক পুস্তকের তর্জ্জমায় সাহায্য করিয়াছেন এবং নিজেও দুই-চারিখানি পুস্তক তর্জ্জমা করিয়াছেন। জগদ্দলের আর-একজন মহাভিক্ষুর নাম দানশীল। তিনিও এইরূপ অনেক পুস্তক তর্জ্জমায় সাহায্য করিয়াছেন। সুতরাং তিব্বতওয়ালারা যে এক সময় জগদ্দল-ভিক্ষুদের উপর নির্ভর করিত, সেটা বেশ বুঝা যায়।

দ্বাদশ গৌরব—লুইপাদ ও তাঁহার সিদ্ধাচার্য্যগণ

লুইপাদ আদি-সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন। তাঁহার বাড়ী বাঙ্গলায় ছিল। রাঢ়দেশে এখনও তাঁহার নামে পূজা হয়, তাঁহার নামে পাঁটা ছাড়িয়া দেয়। ময়ূরভঞ্জেও তাঁহার

পূজা হয়। তিব্বতীরা তাঁহাকে সিদ্ধাচার্য্য বলিয়া পূজা করে। তিনি অনেক বাঙ্গলা গান লিখিয়াছেন, অনেক সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থের টীকা-টিপ্পনীও লিখিয়া গিয়াছেন, তিনি একটি সম্প্রদায়ই সৃষ্টি করিয়াছেন। সে সম্প্রদায় হয় সহজযান হইবে, না হয় সহজযানেরই কোন ভাগ হইবে। খ্রীষ্টের জন্মের ১৩ শত বৎসর পরে হরিসিংহ নামে একজন রঘুবংশী মিথিলায় রাজা হইয়াছিলেন। তিনি এক সময় নেপাল আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাঁহার ভয়ে বাঙ্গলা ও দিল্লীর মুসলমানেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পরিণামে তাঁহারই বংশের সন্তান নেপালে রাজা হন। হরিসিংহের মন্ত্রী চণ্ডেশ্বর অনেকগুলি স্মৃতির পুস্তক লেখেন। তাঁহার সভায় একজন কবি ছিলেন, তিনি সংস্কৃতে বেশ প্রহসন লিখিতেন। ইঁহার নাম জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখরাচার্য্য। ইনি বোধ হয় বা লাতেও কবিতা লিখিতেন। ইঁহার আধা-বাঙ্গলা, আধা-সংস্কৃত একখানি অপূর্ব্ব পুস্তক আছে, তাহার নাম বর্ণনরত্নাকর। কবিতা লিখিতে গেলে কাহার কিরূপ বর্ণনা করিতে হয়, সেই বিষয়ে উপদেশ দেওয়া পুস্তকের উদ্দেশ্য। তিনি ঐ পুস্তকে চৌরাশি সিদ্ধের নাম করিতে গিয়া ৭৬ জনের নামমাত্র করিয়াছেন, ইঁহাদের মধ্যে লুইএর অনেকগুলি শিষ্যের নাম আছে। হরিসিংহের সময় পর্য্যন্ত লুইএর দল যে চলিয়া আসিতেছিল, ইহাতেই বোধ হয় যে, লুই একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তেঙ্গুরে লেখা আছে যে, লুইকে মৎস্যান্ত্রাদ বলিত, অর্থাৎ—তিনি মাছের পোঁটা খাইতে বড়ই ভাল বাসিতেন। (কোন্ বাঙ্গালীই বা না বাসেন !) তেঙ্গুরে আবার সেই-খানেই লেখা আছে, "তাই বলিয়া লুই মৎস্যেন্দ্রনাথ নহেন, মৎস্যেন্দ্রনাথ মীননাথের পুত্র, লুই মহাযোগীশ্বর।" সিদ্ধাচার্য্য-গণের মধ্যে লুই, কুক্কুরী, বিরুআ, গুড়রী, চাটিল, ভুসুক, কাহ্নু, কামলি, ডোম্বী, শান্তি, মহিত্তা, বীণা, সরহ, শবর, আযদেব, ঢেণ্ঢন, দারিক, ভাদে, তাডক,—এই কয়জনের "চর্য্যাপদ" বা কীর্ত্তনের গান পাওয়া গিয়াছে। ঐসকল পদ মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বেই দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিয়াছিল, তাই সহজিয়ামতে উহার সংস্কৃত টীকা করিতে হইয়াছিল। ইহা ছাড়াও বহু-সংখ্যক দোহাকোষেরও সংস্কৃত টীকা ছিল। অনেকগুলি দোহাগীতিকা ছিল, তাহারও সংস্কৃত টীকা ছিল। এই সমস্তেরই ভুটিয়া ভাষায় তর্জ্জমা আছে। যে কয়জন সিদ্ধাচার্য্যের নাম করিলাম, ইঁহাদের সকলেরই গ্রন্থ আছে, সমস্তই ভুটিয়া ভাষায় তর্জ্জমা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ভুটিয়া ভাষাগ্রন্থ, বিশেষ তেঙ্গুর গ্রন্থ খুঁজিলে যে শুধু বাঙ্গালীদের ধর্ম্মমত পাওয়া যাইবে এমন নয়, বাঙ্গলা সাহিত্যেরও একটি ইতিহাস পাওয়া যাইবে। বাঙ্গালীর পূর্ব্বপুরুষের কথা বাঙ্গালী কিছুই জানেন না, কিন্তু তাঁহাদের শিষ্য ভুটিয়ারা বিশেষ যত্ন করিয়া তাঁহাদের গ্রন্থ রক্ষা করিতেছে। এটা বাঙ্গালীর কলঙ্কের কথা হইলেও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের বিশেষ গৌরব, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ত্রয়োদশ গৌরব—ভাস্করের কাজ

মহাযান হইতে যতই নূতন নূতন ধর্ম্ম বা হর হইতে লাগিল, হিন্দুদের মধ্যেও যতই তন্ত্রের মত প্রবেশ করিতে লাগিল, ততই নূতন নূতন দেবতা, নূতন নূতন বুদ্ধ, নূতন নূতন বোধিসত্ত্ব-পূজা আরম্ভ হইল। এক এক দেবতারই নানা মূর্ত্তি হইতে লাগিল, কখন ক্রোধমূর্ত্তি, কখন শান্তমূর্ত্তি, কখন করুণামূর্ত্তি—নানারূপ মুদ্রা বাহির হইতে লাগিল। সে-সকল মুদ্রায়, সে-সকল মূর্ত্তির ও সে-সকল দেবতার নাম অসংখ্য। বৌদ্ধদের এক সাধন-মালায় ২৫৬ রূপ মূর্ত্তির সাধনের কথা বলা আছে। তেঙ্গুরে ১৭৯ বাণ্ডিলে প্রায় ১৬৬ দেবতার সাধন আছে। নেপালের চিত্রকর জাতির লোকে এখনও এই-সকল দেখিয়া মূর্ত্তি আঁকিয়া দিতে পারে। বাঙ্গলায় এরূপ আঁকিয়া দিবার লোক কত ছিল বলা যায় না। পাথর তাহারা মোমের মত ব্যবহার করিত। পাথর দিয়া যে তাহারা কত রকম মূর্ত্তি গড়িয়া দিত, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। এই মূর্ত্তিবিদ্যার ইংরেজী নাম "Iconography"। সেদিন একজন প্রসিদ্ধ Iconographist এক সভায় বলিয়াছেন যে, মূর্ত্তিবিদ্যা শিখিবার একমাত্র জায়গা বাঙ্গলা। বাস্তবিকই হিন্দু ও বৌদ্ধগণের কত মূর্ত্তিই যে ছিল, আর কত মূর্ত্তিই যে পাথরে গড়া হইত, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়। বরেন্দ্র-রিসার্চ্চ-সোসাইটী অনেক মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষদেও অনেক মূর্ত্তি সংগ্রহ হইয়াছে। সকল মিউ-

জিয়মেই কিছু কিছু মূর্ত্তি সংগ্রহ আছে। তথাপি বনে জঙ্গলে পুরাণ গ্রামে পুরাণ নগরে এখনও গাড়ী গাড়া মূর্ত্তি পাওয়া যাইতে পারে। এই-সকল মূর্ত্তির এখন আর পূজা হয় না। সুতরাং মিউজিয়মই তাহাদের উপযুক্ত স্থান। যে-সকল মূর্ত্তি এখনও পূজা হয়, তাহাই বা কত সুন্দর! এক-একটি কৃষ্ণমূর্ত্তির ভাব দেখিলে সত্য-সত্যই মোহিত হইতে হয়। এখনও ভাস্করেরা নানারূপ সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। দাঁইহাটের ভাস্করদের কথা ত সকলেই জানেন। চৈতন্যের সময়েও চমৎকার চমৎকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ হইত। পালরাজাদের সময়েই এই ভাস্করশিল্পের চরম উন্নতি হইয়াছিল। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এখানকার ভাস্করেরা কার্য্য করিত। তাম্রপত্রলেখ, শিলালেখ বারেন্দ্র কায়স্থদিগের যেন একচেটিয়াই হইয়াছিল। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও মূর্ত্তি নির্ম্মাণ হইত। মহিসুর, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি দেশেও নানারূপ মূর্ত্তি পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহাতে সাজসজ্জাই বেশী—গহনা, ফুল, সাজ—ইহাতেই পরিপূর্ণ, ভাব দেখাই-বার চেষ্টা খুব কম। যে ভাবে ভাবুকের মন মুগ্ধ করে, সে ভাব কেবল বাঙ্গলাতেই ছিল, কতক কতক এখনও আছে। অনেক সময় মূর্ত্তি দেখিলে মনে হয় যে, উহা কথা কহিতেছে। অনেক সময় মনে হয় যেন উহা এই নৃত্য করিয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণ বাঁশী হাতে দাঁড়াইয়া আছেন, আমরা যেন সে বাঁশীর আওয়াজ শুনিতেছি। শিল্পের এত উন্নতি অল্প সাধনার ফল নয়। বাঙ্গালী এককালে সে সাধনা করিয়াছিল, তাহার ফলও পাইয়াছে। শুধু পাথরে নয়, পিতলে তামায় রূপায় সোনায় অষ্টধাতুতে—যাহাতেই বল, মূর্ত্তিগুলি যেন সজীব। চৈতন্যদেবের পর গরীব বৈষ্ণবেরা কাঠের ও মাটীর মূর্ত্তি তৈয়ার করিত। মহাপ্রভুর দুই-একটি কাঠের মূর্ত্তি দেখিলে সত্য-সত্যই মনে হয়, মহাপ্রভু কথা কহিতেছেন, ঠোঁটদুটি যেন নড়িতেছে। চৈতন্যের কীর্ত্তনমূর্ত্তি অনেকেই দেখিয়াছেন, কি সুন্দর! মাটীর মূর্ত্তিতে কৃষ্ণনগরের কুমারেরা এখনও বোধ হয় ভারতে অদ্বিতীয়। একজন ইউরোপের ওস্তাদ কতক-গুলি মাটীর গড়া মানুষের মূর্ত্তি দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "ইহারা সত্য-সত্যই অনেক দিন ধরিয়া মানুষের শিরা-ধমনী পর্য্যন্ত তলাইয়া দেখিয়াছে ও বুঝিয়াছে।"

চতুর্দ্দশ গৌরব—বাঙ্গলায় সংস্কৃত

মুসলমান-আক্রমণের পূর্ব্বে বাঙ্গলায় অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। ভবদেব একজন প্রকাণ্ড পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃতে যাহা কিছু পড়িবার ছিল, তিনি যেন সবই পড়িয়াছিলেন। বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার প্রশস্তি লিখিয়াছেন। সেই প্রশস্তিতে যাহা লেখা আছে, তাহা যদি চারিভাগের একভাগও সত্য হয়, তাহা হইলেও ভবদেব যে-দেশে জন্মিয়াছিলেন, সে দেশ ধন্য। তাঁহার কত পুস্তক ছিল, আমরা এখনও জানিতে পারি নাই। তবে সামবেদীদের পদ্ধতি ছাড়া আরও তাঁহার দশ-বার-খানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। লোকে বলে বাঙ্গলায় বেদের চর্চ্চা ছিল না, এ কথা সত্য। অন্য জায়গায় যেমন সমস্ত বেদটা মুখস্থ করে, বাঙ্গালীরা তাহা করিত না, তাহারা তত আহাম্মুক ছিল না। তাহারা যেটুকু পড়িত, অর্থ করিয়া পড়িত; নিজের কর্ম্মকাণ্ডের জন্য যতখানি জানা দরকার, সবটুকু বেশ ভাল করিয়া পড়িত। সুতরাং প্রথম বেদের ব্যাখ্যা বাঙ্গলাতেই হয়। সায়ণাচার্য্যের দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে গুগড়াচার্য্য এক নূতন ধরণের বেদব্যাখ্যা সৃষ্টি করেন। গুগড়ের পুস্তক এখনও পাওয়া যায় নাই, কিন্তু তাঁহার সম্প্রদায়ের পুস্তক অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে। হলায়ুধ তাঁহার সম্প্রদায়ের, গুণবিষ্ণু তাঁহার সম্প্রদায়ের। ইঁহাদের ব্যাখ্যা বেশ পরিষ্কার ও বেশ সুগম। দর্শনশাস্ত্রে বৌদ্ধদের সঙ্গে সর্ব্বদাই তাঁহাদের বিচার করিতে হইত। সুতরাং বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ মাত্রকেই দর্শনশাস্ত্রের কিছু চর্চ্চা রাখিতে হইত। শ্রীধরের লেখা প্রশস্তপাদের টীকা এখনও ভারতবর্ষে খুব প্রচলিত। স্মৃতিতে গৌড়ীয় মতই একটা স্বতন্ত্র ছিল। কাশী মিথিলা ও নেপাল দেশের প্রাচীন স্মৃতি-নিবন্ধে অনেকবার গৌড়ীয় মতের নাম করিয়াছে। মনুর টীকাকার গোবিন্দরাজ যে স্মৃতিমঞ্জরী বলিয়া এক প্রকাণ্ড স্মৃতি-নিবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। দায়ভাগকার জীমূতবাহন, জিকন, শ্রীকর প্রভৃতি অনেক স্মৃতি-নিবন্ধ-কারের ও জোগ্লোক, অন্ধুক ভট্ট প্রভৃতি অনেক জ্যোতিষ-নিবন্ধকারের নাম করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে যাহা করিয়া তুলিয়াছেন, সেই ত একটি অদ্ভুত জিনিস। সম্পত্তি পূর্ব্বে বংশগত ছিল, তিনি তাহাকে ব্যক্তিগত করিয়া গিয়াছেন; এ কাজটি ত ভারতে আর কেহই করিতে পারেন নাই। বল্লালও ত নিজে দুখানি বিরাট গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, একখানি দানসাগর ও আর-একখানি অদ্ভুত-সাগর। শ্রীনিবাসাচার্য্যের শুদ্ধির গ্রন্থও ত স্মৃতি ও জ্যোতিষের একখানি ভাল বই।

পঞ্চদশ গৌরব—বৃহস্পতি, শ্রীকর, শ্রীনাথ ও রঘুনন্দন

ধর্ম্মের গৌরব, বিদ্যার গৌরব ও শিল্পের গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া বৌদ্ধগণ ও হিন্দুগণ বাঙ্গলা দেশে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছিলেন। বৌদ্ধেরা তিব্বতে গিয়া সেখানে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন, ব্রাহ্মণেরাও বাঙ্গলায় নূতন সমাজের সৃষ্টি করিতেছিলেন। এমন সময় ঘোর বন্যার ন্যায় আফগান দেশ হইতে মুসলমানেরা আসিয়া উপস্থিত হইল। বাঙ্গালী ও বেহারী

ভাল ভাল জিনিসগুলি সব নাশ হইয়া গেল। দুই শত বৎসর পর একবার একজন হিন্দু বাঙ্গলার রাজা হইয়াছিলেন। অমনি আবার হিন্দুসমাজে সংস্কৃত সাহিত্য, বাঙ্গলা সাহিত্য জাগিয়া উঠিল। যে মহাপুরুষের একান্ত আগ্রহ, একান্ত যত্ন ও দূরদর্শিতার ফলে সংস্কৃত সাহিত্য আবার বাঁচিয়া উঠে, তাঁহার নাম বৃহস্পতি, উপাধি রায়মুকুট। তিনি নিজে অনেক সস্কৃত কাব্যের টীকা লিখিয়া একখানি স্মৃতিনিবন্ধ রচনা করিয়া, অমরকোষের টীকা লিখিয়া, অনেক পণ্ডিতকে প্রতিপালন করিয়া, আবার সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই কার্য্যে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন শ্রীকর। ইনিও বৃহস্পতির ন্যায় নানা গ্রন্থ রচনা করেন এবং দুই জনে মিলিয়া অমরকোষের আর-একখানি টীকা লিখেন। শ্রীকরের পুত্র শ্রীনাথ পূরা এক সেট নিবন্ধ সংগ্রহ করিয়া আবার হিন্দুসমাজ বাঁধিবার চেষ্টা করেন। তিনি বিশেষরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার শিষ্য রঘুনন্দন সমাজ বাঁধিয়া দিয়া গেলেন। তাঁহার বাঁধা সমাজ এখনও চলিতেছে। বৃহস্পতি, শ্রীকর, শ্রীনাথ ও রঘুনন্দন আমাদের সমাজ বাঁধিয়া দিয়াছেন বলিয়া আমরা আজিও হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে পারিতেছি। ইঁহারা আমাদের পূজ্য, নমস্য এবং গৌরবের স্থল।

ষোড়শ গৌরব—ন্যায়শাস্ত্র

মুসলমান আক্রমণে অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় দর্শনশাস্ত্রও লোপ হইয়াছিল। রাজা গণেশের পর হইতে যে আবার সংস্কৃত চর্চ্চা আরম্ভ হইল, তাহার ফলে ন্যায়ের চর্চ্চা আরম্ভ হইল। এই চারি শত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলার ন্যায়শাস্ত্র ভারতবর্ষময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের যেখানেই যাও, যিনি নৈয়ায়িক, তিনি কিছু-না-কিছু বাঙ্গলা কথা কহিতে পারেন। নবদ্বীপে না আসিলে তাঁহাদের চলে না। সুতরাং বাঙ্গলা ভাষা শিখিতেও হয়। বাঙ্গালীর এটা বড় কম গৌরবের কথা নয়। ভারতে বাঙ্গালীর এই প্রাধান্য যাঁহারা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের পূজ্য ও নমস্য। তাঁহাদের মধ্যে প্রথম বাসুদেব সার্ব্বভৌম। তিনি কিন্তু কোন গ্রন্থ রাখিয়া যান নাই বা তাঁহার কোন গ্রন্থ চলিত হয় নাই। দ্বিতীয় রঘুনাথ শিরোমণি। ইঁহার বুদ্ধি ক্ষুরের ধারের মত সূক্ষ্ম ছিল। তিনি ন্যায় ও বৈশেষিক সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইঁহার তত্ত্বচিন্তামণির টীকাই লোকে বেশী জানে। তিনি যে শুধু বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও পক্ষধর মিশ্রের নিকট পড়িয়াছিলেন, এমন নহে,—তিনি মহারাষ্ট্রদেশে যাইয়া রামেশ্বরের নিকটও পড়িয়াছিলেন। তাঁহার ছাত্র যে শুধু বাঙ্গলা দেশেই ছিল, এমন নহে—দ্বারবঙ্গের রাজার পূর্ব্বপুরুষ মহেশ পণ্ডিতও তাঁহার ছাত্র ছিলেন। শিরোমণির পর আমাদের দেশের লোক হরিরাম, জগদীশ ও গদাধরকেই চিনে ও ইঁহাদের টীকা-টিপ্পনী পাঠ করে। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে এককালে ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের বড়ই আদর হইয়াছিল। মহাদেব পুন্তামকর ভবানন্দের টীকারই টীকা লিখিয়াছেন ও সেই টীকা এখনও দুই-চারি জায়গায় চলে। ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থকারদিগের মধ্যে সকলের শেষ বিশ্বনাথ। তিনি কয়েকটি কারিকার মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রের সমস্ত দুরূহ সিদ্ধান্তের যেরূপ সমাবেশ করেন, তাহা দেখিয়া সকল দেশেরই লোক আশ্চর্য্য হইয়া যায়। এখনও তাঁহার তিন শত বৎসর পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু ভারতের সর্ব্বত্রই তাঁহার সিদ্ধান্তমুক্তাবলী চলিতেছে। বাঙ্গলায় তাঁহার টীকাকার কেহ জন্মে নাই—তাঁহার টীকাকার একজন মারহাট্টি, তাঁহার নাম মহাদেব দিনকর। এখন বলিতে গেলে, এই নৈয়ায়িকগণই এখনও ভারতে বাঙ্গলার নাম বজায় রাখিয়াছেন। কারণ, বাঙ্গলার স্মার্ত্তকে অন্য দেশের লোকের চিনিবার দরকার নাই, কিন্তু বাঙ্গলার নৈয়ায়িকদের না চিনিলে ভারতবর্ষে কাহারও চলে না।

সপ্তদশ গৌরব—চৈতন্য ও তাঁহার পরিকর

বৌদ্ধ মতগুলি যখন ক্রমে ক্রমে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল, বিলুপ্তই বা বলি কেন, ধ্বংস হইয়া গেল, তখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের কি দশা হইল? পাদরী না থাকিলে খৃষ্টানদের যে দশা হয়, ব্রাহ্মণ না থাকিলে হিন্দুদের যে দশা হয়, মৌলবী না থাকিলে মুসলমানদের যে দশা হয়, বৌদ্ধ ধর্ম্মের ঠিক সেই দশা হইল। বাহির হইতে কেহ উহা আক্রমণ করিলে রক্ষা করিবার লোক রহিল না। ভিতরে গোলযোগ হইলে, তাহার সংস্কার করিবার লোক রহিল না। রহিল কেবল মূর্খ পুরোহিতকুল, আর অসংখ্য কৃষক বণিক ও কারিকর। মুসলমানেরা জোর করিয়া অনেককে মুসলমান করিয়া ফেলিল। প্রায়ই দেখা যায়, যেখানে বড় বড় বিহার ছিল, অনেক নিষ্কর জমী বিহারওয়ালারা ভোগ করিত। মুসলমানেরা সে-সমস্ত জমী বাজেয়াপ্ত করিয়া আফগান সিপাহীদিগকে ভাগ করিয়া দিল। ওদন্তপুর ও নালন্দার জমী লইয়া মল্লিক নামে এক মুসলমান-কুলেরই উৎপত্তি হইয়াছে। বাঙ্গলার বালাণ্ডা পরগণায় খুব ভাল মাদুর হয়, তখনও হইত, এখনও হয়। সেখানে একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল, অনেক ভিক্ষু ছিল, পুথি কাপি হইত, ঠাকুর দেবতার পূজা হইত। বালাণ্ডার একখানি "অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা" এখনও নেপাল-দরবার-লাইব্রেরীতে আছে, বালাণ্ডার বৌদ্ধ কীর্ত্তির এই মাত্র স্মৃতি জাগরূক আছে। এখন সেই বালাণ্ডায় সব মুসলমান। মুসলমানেই মাদুর বুনে, মাদুর বুনিবার জন্য এক ঘরও হিন্দু নাই। বিহারগুলি এইরূপে শুধু যে ধ্বংস হইল এমন নহে, সেখানে মুসলমান

আসিয়া বসিল এবং তাহারা অনায়াসেই চারি পাশের লোককে মুসলমান করিয়া ফেলিল। তাই আজ বাঙ্গলায় অর্দ্ধেকের উপর মুসলমান। বাকি যাহারা ছিল, তাহারা হিন্দু হইয়া গেল। তাহাদিগকে হিন্দু করিল কে? ব্রাহ্মণেরা। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের ত এ বিষয়ে কৃতিত্ব আছেই, সঙ্গে-সঙ্গে আরও দুই দল ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সহায় হইলেন। এক দলের নেতা চৈতন্য অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ। আর-এক দলের নেতা গৌড়ীয় শঙ্কর, ত্রিপুরানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ ও আগমবাগীশ। একদল বৈষ্ণব, আর একদল শাক্ত। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে চৈতন্যদেব একটি প্রকাণ্ড সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে বাঙ্গালী ছিলেন, তাঁহার পরিকরও প্রায় সবই বাঙ্গালী। ইঁহারা অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালা ভাষার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। রূপ, সনাতন, জীব, গোপালভট্ট, কবিকর্ণপুর, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, বলদেব বিদ্যাভূষণ হইতে আরম্ভ করিয়া উপেন্দ্র গোস্বামী পর্য্যন্ত কত লোক যে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। বাঙ্গালার ত কথাই নাই। বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ হইতে আরম্ভ করিয়া রঘুনন্দন গোস্বামী পর্য্যন্ত কত কত বৈষ্ণব লেখক বাঙ্গালায় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে মার্জ্জিত করিয়া গিয়াছেন, নূতন জীবন দিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালায় বৈষ্ণবদিগের প্রধান কীর্ত্তি—কীর্ত্তনের পদ। বৌদ্ধদিগের চর্য্যাপদের অনুকরণে এই-সকল পদাবলীর সৃষ্টি। পদাবলীর পদকর্ত্তা অসংখ্য। রাধামোহন দাস ৮০০।৮৫০ পদ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার দুই পুরুষ পরে বৈষ্ণবদাস ৩৩০০ পদ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। এখনও সংগ্রহ করিলে ২০০০০ হাজারেরও অধিক হইবে। ভাবের মাধুর্য্যে, ভাষার লালিত্যে, সুরের বৈচিত্র্যে এই-সকল গান সকল সমাজেরই পরম আদরের জিনিস। এই-সকল পদ গান করিবার জন্য নানারূপ কীর্ত্তনের সৃষ্টি হইয়াছে। সেকালে যেমন বাঙ্গলায় নাটকের একটা স্বতন্ত্র 'প্রবৃত্তি' ছিল, এখনও কীর্ত্তনের সেইরূপ নানারূপা 'প্রবৃত্তি' হইয়াছে, তাহার মধ্যে দুইটি প্রধান—মনোহরসাহী ও রেণেটি। বাঙ্গলার কীর্ত্তন একটা সত্য-সত্যই উপভোগের জিনিস। তাহার জন্য চৈতন্যদেবের ও তাঁহার সম্প্রদায়ের নিকট আমরা সম্পূর্ণরূপে ঋণী।

অষ্টাদশ গৌরব—তান্ত্রিকগণ

তন্ত্র বলিলে কি বুঝায়, এখনও বুঝিতে পারি নাই। বৌদ্ধেরা বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান—সকলকেই তন্ত্র বলে। কাশ্মীরী শৈবদের সকল গ্রন্থই তন্ত্র। নাথ-পন্থের সকল গ্রন্থই তন্ত্র। অন্যান্য শৈব সম্প্রদায়ের গ্রন্থও তন্ত্র। আবার শাক্তদের সব গ্রন্থই তন্ত্র। এখন আবার বৈষ্ণবদের পঞ্চরাত্রগুলিকেও তন্ত্র বলিতেছে। বাস্তবিকই বৈষ্ণবদের কয়েকখানি তন্ত্র আছে। কিন্তু মূল তন্ত্র বড় একটা পাওয়া যায় না, যাহা পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই সংগ্রহ। একজন তান্ত্রিক পণ্ডিত দুই-চারিখানি মূল তন্ত্র ও বহুসংখ্যক সংগ্রহ একত্র করিলেন, আবার তাহার উপর নিজের একখানি সংগ্রহ বাহির করিলেন। তাঁহার দলে সেই সংগ্রহ চলিতে লাগিল। এইরূপে অনেক সংগ্রহ চলিয়া গিয়াছে। বাঙ্গলায় এই-সকল সংগ্রহ-কর্ত্তাদের প্রথম ও প্রধান—গৌড়ীয় শঙ্করাচার্য্য। তাঁহার অনেকগুলি সংগ্রহ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার স্তবগুলি বিশুদ্ধ সংস্কৃতে লেখা। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। তিনি নানা ছন্দে নানা স্তব লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনেক গ্রন্থ বড় শঙ্করাচার্য্যের বলিয়া চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু বড় শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদী ছিলেন, তিনি তন্ত্র লিখিতে যাইবেন কেন? তন্ত্রের সৃষ্টি-প্রক্রিয়া একটু নূতন। উহা ব্রাহ্মণদের কোন সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার সহিত মিলে না। কিন্তু এখন বাঙ্গলার লোকে ঐরূপ সৃষ্টি-প্রক্রিয়াই জানে। সংগ্রহকারেরা মূল তন্ত্র অনেক পরিষ্কার করিয়া তুলিয়াছেন। মূল তন্ত্রে অনেক প্রক্রিয়া আছে, যাহা সভ্যসমাজে বাহির করা চলে না। সংগ্রহকারেরা উহা মার্জ্জিত করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু মার্জ্জিত করিয়া লইলেও তাঁহাদের গুহ্য উপাসনা বড় সুবিধার নয়। আমার বিশ্বাস তন্ত্র-সম্বন্ধে আলোচনা যত কম হয়, ততই ভাল। কিন্তু যে-সকল মহাপুরুষেরা এই লোকায়ত তন্ত্র-শাস্ত্রকে মার্জ্জিত করিয়া সভ্য সমাজের উপযোগী করিয়া গিয়াছেন এবং এইরূপ করায় অনেক লোক হিন্দু হইয়াছে ও হিন্দু হইয়া রহিয়াছে, তাঁহারা যে খুব দূরদর্শী ও সমাজ-নীতিকুশল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহা হউক শঙ্করের পর ত্রিপুরানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও পূর্ণানন্দ পূর্ব্ববঙ্গে বৌদ্ধদিগকে হিন্দু করিয়া লইয়াছিলেন। রাঢ়ে আগমবাগীশের সংগ্রহ আরও মার্জ্জিত। তাঁহার গ্রন্থে পঞ্চ-মকারের কথা নাই বলিলেই হয়, তাই এ দেশে তাঁহার বড়ই আদর। কিন্তু তাঁহারও গ্রন্থে মঞ্জুঘোষের উপাসনার ব্যাপার আছে। মঞ্জুঘোষ যে একজন বোধিসত্ত্ব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তান্ত্রিক সংগ্রহকারেরা হতাবশিষ্ট বৌদ্ধগণকে নানা উপায়ে হিন্দু করিয়া লইয়াছেন, আপনার করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা বাঙ্গলা সমাজের যথেষ্ট উপকার করিয়া গিয়াছেন। তান্ত্রিক মহাশয়েরা বঙ্গ-সমাজের অস্থি-মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা ভাষার সাহিত্য তাহার সাক্ষী। তাঁহাদের দলে বাঙ্গালা বই প্রচুর না হইলেও যথেষ্ট আছে এবং সেগুলি বেশ ভাল। তাঁহাদের শ্যামাবিষয়ক গানগুলি বাঙ্গালার একটি শ্লাঘার

বিষয়। আজিও কেহ সংগ্রহ করে নাই, তাই তাহাদের সংখ্যা করা যায় না। রামপ্রসাদের গান শুনিয়া মোহিত হয় না এমন বাঙ্গালী কি কেহ আছে? দেওয়ানজী মহাশয়ের ও কমলাকান্তের গান অনেক সময় হৃদয়ের নিগূঢ় তন্ত্রীগুলি বাজাইয়া দেয়। বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে একেবারে বৈষ্ণব—অর্থাৎ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের অপেক্ষা স্মার্ত্ত পঞ্চোপাসকের দলই অধিক। ইঁহারা যদিও শাক্ত-সম্প্রদায়ভুক্ত নন, কিন্তু বাঙ্গালীরা জানে হিন্দু হইলেই, হয় তাহাকে বৈষ্ণব, না হয় শাক্ত হইতে হইবে। সেইজন্য যাহারা বৈষ্ণব নহে, তাহারা সকলেই শাক্ত, শাক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত না হইলেও শাক্ত। এই দলকে বৈষ্ণবের গান অপেক্ষা শ্যামাবিষয়ক গানেই বেশী মাতাইয়া তুলে।

একোনবিংশ গৌরব—বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ

এই যে এত বড় একটা অনার্য্য দেশ, এখানে বৌদ্ধ জৈন এবং অন্যান্য অব্রাহ্মণ ধর্ম্মের এত প্রাদুর্ভাব ছিল, অথচ এখন এ দেশে জৈন বৌদ্ধ দেখিতেও পাওয়া যায় না, তাহাদের কীর্ত্তিকলাপ পর্য্যন্ত লোকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে,—চারিদিকের লোকে জানে বাঙ্গলা হিন্দুধর্ম্মের দেশ—এটা কে করিল? কাহার যত্নে, কাহার দূরদর্শিতায়, কাহার নীতিজ্ঞানে এই দেশটা আর্য্য-আচারে আর্য্য-বিদ্যায় আর্য্য-ধর্ম্মে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে? এ প্রশ্নের ত এক উত্তর। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরাই এই কাজটি করিয়াছেন। বাঙ্গলায় রাজশক্তির বিরুদ্ধে অনবরত সংগ্রাম করিয়া দেশটাকে হিন্দু করিয়া তুলা একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার, বঙ্গের ব্রাহ্মণেরা তাহা সুসিদ্ধ করিয়াছেন, আর এমনি ভাবে সুসিদ্ধ করিয়াছেন যে, মুসলমান ঐতিহাসিকেরা জানেন না যে, তাঁহাদের আগমনের সময়েই এদেশে হিন্দু ছাড়া আরও একটা প্রবল ধর্ম্ম ছিল। স্মৃতি, দর্শন, বৈষ্ণব ধর্ম্ম, শাক্ত ধর্ম্ম, তাঁহাদের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতেই ব্রাহ্মণেরা নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, দেশীয় ভাষায় গান গাইয়া বৌদ্ধেরা কেমন দেশটাকে মাতাইয়া তুলিত। সুতরাং দেশ মাতাইতে হইলে যে, মাতৃভাষা ভিন্ন হয় না, এ তাঁহাদের বেশ জ্ঞান হইয়াছিল। তাই তাঁহারা প্রথম হইতেই রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি বাঙ্গলা করা আরম্ভ করিয়া দেন। বস্তুতিকই স্মৃতি ও দর্শন অপেক্ষা এই-সকল বাঙ্গলা তর্জ্জমায় হিন্দুসমাজের বন্ধন বেশ শক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এ তর্জ্জমার মূলে ব্রাহ্মণ। এ কথাটা প্রথম তাঁহাদেরই মাথায় আসিয়াছিল এবং তাঁহারাই আগ্রহসহকারে এই কার্য্য করিয়া বাঙ্গালীর গৌরব যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন।

বিংশ গৌরব—কায়স্থ ও রাজা

পরে কিন্তু ব্রাহ্মণেরা এ বিষয়ে কায়স্থদের নিকট যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। উঁহারা পূর্ব্বেই বোধ হয় একটু দো-টানায় ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের আগে বেশ শ্রদ্ধা ছিল, কেননা, অনেক কায়স্থ অনেক বৌদ্ধগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মপালের সময় হইতে বল্লাল সেনের সময় পর্য্যন্ত তেঙ্গুরে আমরা অনেক কায়স্থের নাম দেখিতে পাই। পরে, যখন তাঁহারা দেখিলেন বৌদ্ধ ধর্ম্ম আস্তে আস্তে লোপ হইল, তখন তাঁহারা একেবারে ব্রাহ্মণের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন এবং ব্রাহ্মণদের হইয়া পুরাণাদি বাঙ্গলা করিতে লাগিলেন। গুণরাজখাঁর কৃষ্ণমঙ্গল ও কাশীদাসের মহাভারত বাঙ্গালীকে অনেক বড় করিয়া দিয়াছে। কাশীদাসের আরও দুই ভাই গদাধর ও কৃষ্ণদাস ভাল ভাল বই লিখিয়া গিয়াছেন। সকলেরই উদ্দেশ্য সেই এক—বাঙ্গালী হিন্দু হউক। কায়স্থেরা শুধু বই লিখিয়াই সমাজের উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে। এদেশের অনেক জমীই তাঁহাদের হাতে ছিল, জমীদারভাবেও দেশের ও সমাজের যথেষ্ট উপকার করিয়া গিয়াছেন। রাজা গণেশ ও তাঁহার সন্তানসন্ততি বাঙ্গলার সুলতান না হইলে রায়মুকুট বড় কিছু করিতে পারিতেন না। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন না থাকিলে চৈতন্য সম্প্রদায় গড়িতেই পারিতেন কিনা সন্দেহ। বুদ্ধিমন্ত খাঁ না থাকিলে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সমাজকে অর্থের জন্য বিস্তর কষ্ট পাইতে হইত। এইরূপে কায়স্থ-ব্রাহ্মণে মিশিয়া বাঙ্গলায় একটা প্রকাণ্ড হিন্দুসমাজ গড়িয়া তুলিলেন। এমন সময় মোগলেরা বাঙ্গলায় আসিল। মোগলদের সঙ্গে অনেক বিদেশী হিন্দু এ দেশে আসিয়া বড় বড় চাকরী ও বড় বড় জমিদারী পাইতে লাগিলেন। পাঠানের সহায় বলিয়া কায়স্থদের উপর তাঁহাদের বেশ একটু রাগও হইল, অনেক কায়স্থের জমীদারী গেল। তাঁহাদের জায়গায় হয় ব্রাহ্মণ, না হয় কোন বিদেশী আসিয়া বসিলেন। ক্রমে বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ ও বিদেশী জমীদারই বেশী হইয়া গেল। বিদেশীদের মধ্যে প্রধান হইলেন মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান; ব্রাহ্মণদের মধ্যে হইলেন কৃষ্ণনগর, নলডাঙ্গা, নাটোর ও মুক্তাগাছা। ব্রাহ্মণের ঘরগুলি ক্রমে ভাগ-বাঁটোয়ারায় ও অন্যান্য কারণে ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু মহারাজাধিরাজ এখনও অক্ষুণ্ণ আছেন। হরিহরমঙ্গলের লেখক মহারাজাধিরাজেরই আত্মীয় ও তাঁহারই উৎসাহে ঐ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ঘনরাম মহারাজাধিরাজের যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। ভাল কবি হইলে যতদিন বর্দ্ধমানে মুজরা না পাইতেন, ততদিন তিনি কবি বলিয়াই গণ্য হইতেন না। ভাল কথক বর্দ্ধমানে বৎসরে একদিন মাত্র কথা কহিতে পারিলে

কৃতার্থ মনে করিতেন। ভাল যাত্রার, বৰ্দ্ধমানে না গাইলে, পসার হইত না। বৰ্দ্ধমানও ভাল জিনিসের যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন, বৃত্তি দিতেন, বার্ষিক দিতেন। *

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

দেশের কথা

প্রায় একবৎসর হইতে চলিল আমরা বাংলাদেশের পল্লীগ্রাম ও মফঃস্বলের সুখ দুঃখ অভাব অভিযোগের প্রতি আমাদের দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের দৃষ্টি ও সহানুভূতি আকর্ষণ এবং নগরবাসী ও পল্লীবাসীদিগের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপনের অভিপ্রায়ে প্রবাসীর কলেবরে দেশের কথা এই নূতন অঙ্গটি যোগ করি। বলা বাহুল্য আমাদের এই সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে একমাত্র সহায় বাংলার মফঃস্বল হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি। আমরা তাঁহাদেরই ভরসায় এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া দেখিলাম আমাদের মফঃস্বলস্থ সহযোগীগণের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকই পল্লীকথা লইয়া আলোচনা করেন। তাঁহারা অনেকেই বড় বড় কথার ও বড় বড় ব্যাপারের আলোচনায় ব্যস্ত। তখন আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করিয়া তাঁহাদিগকে এই অনুরোধ জানাইয়াছিলাম যে দেশ বিদেশের নানা বৃহৎ ব্যাপারের আলোচনার ভার শহরের সংবাদপত্রগুলির হস্তে দিয়া তাঁহারা "যেখানে রোগ শোকের তাড়নায় জর্জ্জরিত, অন্নাভাবে ক্লিষ্ট, পিপাসায় তৃষিতকণ্ঠ, লক্ষ লক্ষ নরনারী আপনাদিগের অদৃষ্ট লইয়া প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করিতেছে, অজ্ঞতার ঘনান্ধকার যেখানে পূর্ণভাবে রাজত্ব করিতেছে সেই পল্লীভূমির কথা লইয়া আলোচনা করুন এবং কি করিলে আপনাদিগের অভাব অভিযোগ, সুখ দুঃখ দেশবাসীর চক্ষের সম্মুখে উজ্জ্বলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, কি করিলে তাহাদিগের নিদ্রিত সমবেদনা জাগিয়া উঠে, কি করিলে শাসকসম্প্রদায়ের কর্ত্তব্যবুদ্ধি উদ্বোধিত হয়" সেই উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া আপনাদিগকে পরিচালিত করুন।

আজ একবৎসর পরে দেখিতেছি আমাদের সেই অনুরোধ একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। এখন দেখি মফঃস্বলস্থ অনেক পত্রিকাতেই "দেশের স্বাস্থ্য," "পানীয় জলের অভাব," "কৃষকের অবস্থা," "চাষের কথা," "ম্যালেরিয়া রাক্ষসী" প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা থাকে এবং ইহাদের সম্পাদকীয় স্তম্ভেও মধ্যে মধ্যে পল্লীর উন্নতি সম্বন্ধে বহু সারবান মন্তব্য ও প্রয়োজনীয় তথ্য দেখিতে পাওয়া যায়। যে-সমুদয় পত্রিকা আমাদের অনুরোধের বহু পূর্ব্ব হইতেই পল্লীকথা লইয়া আলোচনা করিতেন এবং এখন আরো বিশেষভাবে ঐ বিষয়ে আপনাদিগের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে, আমাদের মতে, পাবনার "সুরাজ" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা আশা করি "সুরাজ" যাবজ্জীবন সেই পথে চলিয়া দেশের পক্ষে আপনাকে একান্ত প্রয়োজনীয় ও দেশের মধ্যে আপনাকে প্রভূত শক্তিশালী করিয়া তুলিবেন। "সুরাজ" বাস্তবিকই মফঃস্বলস্থ অনেক পত্রিকার আদর্শস্থানীয়।

"সুরাজ" ব্যতীত ময়মনসিংহের "চারুমিহির", শ্রীহট্টের "সুরমা", কাঁথির "নীহার", বরিশালের "বরিশাল-হিতৈষী", যশোরের "যশোহর", ঢাকার "ঢাকা-প্রকাশ", চট্টগ্রামের "জ্যোতি" প্রভৃতি কয়েকখানি মফঃস্বলস্থ সংবাদপত্র অল্লাধিক পরিমাণে নিজ নিজ জেলা ও পল্লীর কথা লইয়া প্রায়ই আলোচনা করিয়া থাকেন। ইঁহাদিগকেও আজ এই অবসরে সেজন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা অর্পণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই এখনো পর্য্যন্ত মফঃস্বলের বহুসংখ্যক কাগজ তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। এখনো দেখি তাঁহাদের ক্ষুদ্র কলেবর ইউরোপের মহাযুদ্ধের ফলাফল, "সাম্রাজ্য রক্ষা আইনের" ঔচিত্যানৌচিত্য কিম্বা বিচিত্র বিলাতী খবর ও খোসগল্পের আলোচনায় পূর্ণ থাকে।

বহুবার বলিয়াছি, আবার বলি—"আমরা চাই মফঃস্বলের সংবাদপত্রসমূহ পল্লীর সুখ দুঃখের কাহিনীতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠুক, তাঁহারা পল্লীতে পল্লীতে সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করুন, পল্লীকথা থাকিতে অন্য আবস্তুর কথার আলোচনা হইতে পারিবে না এইরূপ সঙ্কল্প করুন—দেখিবেন অচিরাৎ তাঁহারা দুর্জ্জয় শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছেন। বিরাট বিশ্বের কোথায় কি হইল যাহারা তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্ব সংগ্রহের জন্য ব্যাকুল, মহানগরীর বিরাট সংবাদপত্রসমূহের দ্বার তাঁহাদিগের নিকট উন্মুক্ত রহিয়াছে। দীন দরিদ্র পল্লীবাসীর সেবায় নিয়োজিত, পল্লীর বার্ত্তাবহ, পল্লীর সুখ দুঃখ লইয়া আনাগোনা করুন" * ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

দেশের স্বাস্থ্য।—

মফঃস্বলের চারিদিক হইতেই কলেরা উদরাময় বসন্ত প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাবের সংবাদ আসিতেছে। এই সময় বাংলার পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়া একটু মন্দ ভাব ধারণ করে বটে কিন্তু অন্যান্য রোগ ভীষণ মূর্ত্তিতে দেখা দেয়। মফঃস্বল,

* অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্বোধন। কিছু সংক্ষিপ্ত। লেখক মহাশয়ের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

* সুরাজ

পল্লীগ্রামের তো কথাই নাই, এমন কি মিউনিসিপ্যাল শহরেও কলেরা প্রভৃতি মহামারী দেখা দিয়াছে। অধিকাংশস্থলেই মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষগণের অবহেলাই এই-সমস্ত মহামারীর কারণ বলিয়াই মনে হয়। বরিশাল শহরে কলেরার প্রকোপ সম্বন্ধে "বরিশাল-হিতৈষী" লিখিতেছেন—

সহসা সহরে এমন ভাবে কলেরার প্রকোপ কেন হইল তাহা কেহই বুঝিতে পারিতেছেন না। জলের কল সৃষ্ট হওয়ার পর কলেরা কমিয়া-ছিল। খালের পাড় দিয়াই বরাবর কলেরার উৎপত্তি হয়। জেল-খানার যাবতীয় ভাত, মাড়, ভুক্তাবশিষ্ট পচা জিনিষ খালে পড়িয়া খালের জল দূষিত হয়, ইহাই অনেকের অভিমত। সাহেব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ করা আবশ্যক মনে করেন না।

বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষগণের অবহেলাই যে জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের এই স্বাস্থ্যক্ষতিকর কার্য্যকে প্রশ্রয় দিতেছে সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মিউনিসিপ্যালিটির করদাতাগণ সত্বর এদিকে দৃষ্টিপাত করুন।

দেশের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মফঃস্বলস্থ কয়েকটি পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে যে-সমুদয় আলোচনা চলিতেছে তাহার মধ্যে কয়েকটি এই স্থলে সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইল।

দেশের স্বাস্থ্য—দেশের স্বাস্থ্য যে কত খারাপ হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যে কোনও প্রাচীন পল্লী পরিদর্শন করিলেই প্রমাণ পাওয়া যাইবে। পল্লীগ্রাম বলিতে এখন কতকগুলি হিংস্রপশুসমাকুল জঙ্গলাকীর্ণ উদ্বাস্তু ভিটা ও ক্ষীণকায় শুষ্ককণ্ঠ কোটরপ্রবিষ্টচক্ষু স্ফীতোদর মানবনামধারী দ্বিপদ প্রাণীবিশেষের সমষ্টি বুঝায়। বাঙ্গলা দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ আজকাল সকলেই নেতা সাজিয়া 'ইহা করা উচিত' বলিয়া অযাচিত উপদেশ প্রদান করিতেছেন, কিন্তু প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে কেহই অগ্রসর হইতেছেন না। আর এদিকে কলেরা, প্লেগ, বসন্ত, ম্যালেরিয়ায় দেশ উৎসন্ন যাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট প্রতিকারের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। তোমরা তাঁহার ভুল দেখাইতেছ। আচ্ছা, একবার তোমরা নিজেদের ইচ্ছামত একটু কাজ করিয়া দেখনা কেন? যদি তোমাদের চেষ্টা বিন্দুমাত্রও সফল হয়, তবে গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই তোমাদের অনুকরণ করিবেন। না করেন, তাতেই বা ক্ষতি কি? * * * টাকার জন্য ভাবিতেছ? তোমরা যখনই যে টাকা চাহিয়াছ, এই হতভাগ্য দেশ তো তখনই বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাই দিয়াছে, তাহার হিসাবটি পর্য্যন্ত চায় নাই। তোমরা ন্যাশন্যাল ফণ্ড খুলিলে, ঝালাকাটি রিলিফ ফণ্ড খুলিলে, বন্দেমাতরম ফণ্ড খুলিলে, তারপুর সুগার ফ্যাক্টরী, রঙ্গপুর টুবাকো কোম্পানী, বেঙ্গল হোসিয়ারী কোম্পানী, আরও কত কি খুলিবে বলিয়া সরলবিশ্বাস দেশবাসীর নিকট টাকা লইলে। একটি বারও তো তোমরা রিক্তহস্তে ফিরিয়া যাও নাই। এখন একবার প্রকৃত দেশহিতকর কাজে হাত দাও, কায়মনো-বাক্যে দেশহিতব্রতে দীক্ষিত হও, দেখিবে টাকার অভাব হইবে না, ভগবান্ তোমাদের সহায় হইবেন। * * * আমরা তোমাদিগকে কৃষক হইতে বলিতেছি না, কৃষকের সহিত বাস করিতে বলিতেছি,—তাহাদের দুঃখময় জীবনযাপন নিজ চক্ষে দেখিতে বলিতেছি, আর তাহা-দের যাহাতে উপকার হয়, উন্নতি হয়, প্রাণপণে তাহারই চেষ্টা করিতে বলিতেছি। —সুরাজ, পাবনা।

"সুরাজ" যে-সমুদয় ফণ্ড ও কোম্পানীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহাদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বাস্তবিকই সাধারণের কেহই বিন্দুমাত্র অবগত নহেন। এত টাকা কোথায় গেল এবং কি হইল ইহা জানিবার অধিকার দেশ-বাসীমাত্রেরই আছে। এ বিষয়ে রীতিমত আন্দোলন হওয়া উচিত। ন্যাশনাল ফণ্ড, বন্দেমাতরম্ ফণ্ড প্রভৃতি নানা ফণ্ডে যে অর্থ এখনো আছে তাহা ব্যয় করিলে নানা দেশহিতকর কার্য্য হইতে পারে। আমাদের মনে হয় বাংলার পল্লীর স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে ঐ সমুদয় অর্থ ব্যয়িত হইলে তাহার সদ্ব্যবহার হইবে।

দেশের স্বাস্থ্যের অবস্থা ক্রমে ক্রমে যেরূপ শোচনীয় দশায় উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে এদেশের লোক অদূর ভবিষ্যতেই যে সর্ব্ব কার্য্যের অনুপযোগী হইয়া পড়িবে তৎবিষয়ে সন্দেহ নাই। কি রাজনৈতিক অধিকার লাভ, কি শিল্প বাণিজ্যের বিস্তার, কি কৃষির উন্নতি কোনও বিষয়েই যে জনসাধারণের তেমন উৎসাহ দৃষ্ট হয় না তাহার এক প্রধান কারণ, দেশের স্বাস্থ্যের শোচনীয় অবস্থা। যে দেশের লোক সর্ব্বদা রোগের তাড়নায় অস্থির সে দেশের লোকের মনে কোনও বিষয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষা স্থান পাওয়া সম্ভবপর নহে। এ দেশ হইতে ম্যালেরিয়া ওলাউঠা প্লেগ ও বসন্ত ইত্যাদি রোগে প্রতি বৎসর যে পরিমাণ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহা মনে করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। এক ম্যালেরিয়াজ্বরে গত বৎসর তের লক্ষ লোক জীবন হারাইয়াছে। যে দেশে একটি মাত্র রোগে প্রতি-বৎসর তের-লক্ষ লোকের অস্তিত্ব লোপ পায় সে দেশের অবস্থা ভাবিবার বিষয় বটে। বর্ত্তমান ইয়ো-রোপীয় যুদ্ধে যেপ্রকার লোকক্ষয় হইতেছে তাহা দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু সেই-সকল স্বদেশ-সেবক বীরগণ আপন আপন দেশের জন্য প্রাণত্যাগ করিয়া অক্ষয় স্বর্গে গমন করিতে-ছেন। তদপেক্ষা কত অধিক সংখ্যক লোক এদেশে প্রতি বৎসর বিনাপ্রয়োজনে প্রাণত্যাগ করিতেছে তাহার প্রতি অনেকেই দৃষ্টিপাত করিতেছেন না। এখন এই শোচনীয় অবস্থার প্রতীকার কি তাহা নির্ণয় করিতে না পারিলে দেশ অচিরে উৎসন্ন যাইবে। দরিদ্রতা যে নানা প্রকার রোগের কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশের অন্যান্য অবস্থাও রোগ উৎপন্ন ও রোগ বৃদ্ধির সহায়, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দেশে জল নিষ্কাশনের পথ বর্ত্তমান না থাকিলে স্থানে স্থানে জল সঞ্চিত হইয়া মৃত্তিকা সিক্ত করিয়া রাখে এবং তাহা হইতেই দেশে ম্যালেরিয়ার সঞ্চার হয়। মশক সিক্ত ভূমি হইতে ম্যালে-রিয়ার বিষ গ্রহণ করিয়া তাহা অন্যত্র সঞ্চালিত করে। ইটালি দেশ পূর্ব্বে ম্যালেরিয়ার আবাসভূমি ছিল। কিন্তু সে দেশে জল নিষ্কাশনের পথ অর্থাৎ ড্রেন সৃষ্টি করিয়া দেওয়ার পর হইতে ম্যালেরিয়া দূরীভূত হইয়াছে। সম্প্রতি মালয় দ্বীপে ম্যালেরিয়া দূর করিবার জন্য জল নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহাতে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে মালয়বাসীগণ অনেকটা উদ্ধার পাইয়াছে। যে উপায়ে মালয়-দেশে ড্রেন নির্ম্মাণ করা হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে, আমাদের দেশে জল নিষ্কাশনের পথ নির্ম্মাণ করা সাধ্যের অতীত নহে। ক্রমে ক্রমে রীতিমত ভাবে চেষ্টা করিলে এদেশেও ড্রেন নির্ম্মাণ করিয়া দেশের ভূমি শুষ্ক রাখা যাইতে পারে। এদেশে যে যে কারণে জল নিষ্কাশনের পথ রুদ্ধ হইয়াছে তন্মধ্যে রেলওয়ে প্রধান। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট এই কথার প্রতি এ পর্য্যন্তও মনোযোগ প্রদান করিতেছেন না। এ বৎসর রেলওয়ে নির্ম্মাণের জন্য বজেটে আট কোটী টাকা পৃথক রাখা

হইয়াছে। দেশীয় সভ্যগণ উহা হইতে অর্দ্ধ কোটী টাকা শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ব্যয় করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট সে কথা গ্রাহ্য করেন নাই।

—চারুমিহির, ময়মনসিংহ।

"চারুমিহির" যে বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন সে বিষয়ে দেশীয় লোকের কর্ত্তব্য কি তাহা ভাবিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

কৃষি-কর্ম্মে দারিদ্র্যদূর —

ময়মনসিংহের 'চারুমিহির' পত্রিকায় কৃষিকর্ম্মদ্বারা এ দেশের দারিদ্র্য দূর করা যাইতে পারে কি না সে বিষয়ে একটি সারগর্ভ আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে সেটি সঙ্কলিত হইল।

আমাদের দেশের অনেকের ধারণা যে, আমাদের দরিদ্রতা নিবারণের জন্য এই কৃষিপ্রধান দেশে কৃষির উন্নতিসাধন করাই সকলের প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য। আমাদের অনেক ইয়োরোপীয় শুভানুধ্যায়ী এবং গভর্ণমেণ্টের উচ্চ কর্ম্মচারী ঐ বিষয়ে আমাদিগকে সর্ব্বদাই উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন; এবং আমাদের ভদ্রশ্রেণীর শিক্ষিত যুবকগণ কৃষি ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের চেষ্টা না করায় অনেক সময় তাঁহাদের নিন্দাভাজন হইয়া থাকেন। এ দেশের অধিবাসীগণের মধ্যে শতকরা ৮৫ জন কৃষিজীবী। এই বিপুল কৃষককুলের সকল ব্যক্তিরই যথোপযুক্ত পরিমাণ কৃষিকার্য্যের উপযোগী ভূমি আছে, বোধ হয় কেহই তাহা সাহস করিয়া বলিতে পারিবেন না। ফলে তাহাদিগকে কোনপ্রকারে কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করিতে হয়। পূর্ব্বে দেশের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য দেশেই প্রস্তুত হইত। ইয়োরোপীয় প্রতিযোগিতার তাড়নায় দেশের শিল্প অন্তর্হিত হইয়াছে। শিল্পীশ্রেণীর সমস্ত লোক উপায়হীন হইয়া কৃষি ব্যবসা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কৃষকের পক্ষে ভূমি প্রাপ্তির প্রতিযোগিতা ক্রমেই কঠিন আকার ধারণ করিতেছে। এই অবস্থায় দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদিগকেও এই কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর করিতে উপদেশ দেওয়া দেশের পক্ষে কতদূর শুভকর তাহা সকলকে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। দেশের কৃষকশ্রেণী যাহাতে উন্নত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ভূমি কর্ষণ ও শস্য বপনাদির কার্য্য শিক্ষা করিতে পারে, যাহাতে তাহারা নানা শ্রেণীর শস্য উৎপাদন করিয়া অধিক অর্থাগম করিতে সক্ষম হয়, তাহার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় ও আবশ্যক। নূতন প্রণালীতে চাষাবাদ করিয়া ও নূতন শস্যাদি উৎপন্ন করিয়া যে অধিক অর্থাগম হওয়ার সম্ভাবনা তাহা বর্ত্তমান কৃষকবর্গের অভাব মোচনের পক্ষেই যথেষ্ট নহে। অন্য শ্রেণীকে ঐ ব্যবসায়ে লিপ্ত করিলে কোনও সম্প্রদায়েরই দরিদ্রতা দূর হইবার সম্ভাবনা নাই। পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাস এবং বর্ত্তমান সময়ের সম্পদশালী অন্যান্য দেশের অবস্থা আলোচনা করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে শুধু কৃষিকার্য্যদ্বারা কোনও দেশ ধনী হইতে পারে নাই। কৃষিকার্য্যলব্ধ উপাদান হইতে সংসারের নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা শিল্পীর কার্য্য এবং উহা দেশে বিদেশে বিক্রয় করা বাণিজ্য-ব্যবসায়ীর কার্য্য। এই দুই কার্য্য দ্বারাই দেশে ধনাগম হইয়া থাকে। যাহাতে দেশে শিল্পী ও বাণিজ্য-ব্যবসায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় প্রত্যেক দেশই তৎপক্ষে যত্নবান। অন্যান্য সভ্য দেশের সমকক্ষ হইবার আকাঙ্ক্ষা করিলে শিল্প ও বাণিজ্য-ব্যবসা গ্রহণ না করিলে ধনবৃদ্ধির কোনও সম্ভাবনা নাই।

দেশীয় শিল্পোন্নতি—

বর্ত্তমান সময়ে দেশের অনেক লোক কল কারখানা স্থাপনার জন্য চেষ্টা করিয়া কি কারণে এবং কি প্রকারে তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা অনেকে অবগত আছেন। এইসকল অবস্থা সত্ত্বেও বোম্বাই ও অন্যান্য অঞ্চলে এদেশীয় লোক দ্বারা যে কয়েকটি কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে ঐ প্রদেশের লোকদিগের অসাধারণ কার্য্য-কারিতা-শক্তি প্রকাশ পায়। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে দেশীয় লোককে কোনও সাহায্য করেন নাই। বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় যুদ্ধ উপলক্ষে জার্ম্মানী ও অষ্ট্রিয়া দেশোৎপন্ন দ্রব্যাদির আমদানী বন্ধ হইলে ঐসকল দ্রব্য যাহাতে এদেশে উৎপন্ন করা যাইতে পারে তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট উদ্যোগী হইয়াছেন বলিয়া জনরব প্রচারিত হয়। ঐ উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট একটি প্রদর্শনীও স্থাপনা করেন। কিন্তু সে দিবস ব্যবস্থাপক সভায় এই বিষয়ে প্রশ্ন করিলে গবর্ণমেণ্ট তাহার উত্তর দিয়াছেন যে এ দেশে কোনও কল কারখানা স্থাপনার জন্য গবর্ণমেণ্ট অর্থসাহায্য করিতে প্রস্তুত নহেন। অধিকন্তু ইংলণ্ড ইত্যাদি দেশে যেসকল দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহা এ দেশে উৎপন্ন করিবার চেষ্টার আবশ্যকতা নাই, বলিয়া গবর্ণমেণ্ট স্পষ্টভাবে মত প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং দেশের শিল্পোন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যাইবে বলিয়া যাঁহারা মনে করিয়াছিলেন তাঁহারা এখন সে ধারণা পরিত্যাগ করিবেন। বর্ত্তমান অবস্থায় দেশের লোকের কর্ত্তব্য কি তাহা বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। এ বিষয়ে আমাদিগকে সম্পূর্ণ আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিতে হইবে। চেষ্টা করিলে এ দেশের লোক কলকারখানা চালাইয়া যে লাভবান হইতে পারেন, তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সুতরাং হতাশ্বাস হইবার কোনও কারণ নাই। উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত লোক দ্বারা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির কারখানা স্থাপন করিয়া কৃতীলোক দ্বারা উহা পরিচালিত করিতে হইবে। অন্যের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিবার সময় নাই।

—চারুমিহির, ময়মনসিংহ।

গভর্ণমেণ্ট উদ্যোগী হইয়া আমাদের দেশীয় শিল্পের উন্নতি করিয়া দিবেন এই ভ্রান্ত ধারণা যে গভর্ণমেণ্টই ভাঙিয়া দিয়াছেন সেজন্য বাস্তবিকই আমরা তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ। আমাদের শিল্পোন্নতির ভার আমাদিগের নিজের হস্তেই যে লইতে হইবে, আর কেহই আমাদের হইয়া যে তাহা করিয়া দিতে পারিবে না—এই সামান্য কথাটি কেন যে আমরা বার বার ভুলিয়া যাই তাহা বুঝিতে পারি না। বারম্বার আঘাতেও আমাদের চৈতন্য হয় না—ইহার অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি আছে?

জলকষ্ট—

গ্রীষ্ম পড়িতে না পড়িতেই এই চির পিপাসাতুর দেশের কাতরকণ্ঠ হইতে জল-প্রার্থনা শোনা যাইতেছে। সকল জেলার সকল পল্লীতেই পানীয় জলের অভাব। গ্রামবাসী-দিগের এমন শক্তি নাই এবং শক্তি থাকিলেও সকলে মিলিয়া মিশিয়া, গ্রাম্য দলাদলি ছাড়িয়া কাজ করিবার এমন ক্ষমতা নাই যাহাতে গ্রামে নূতন পুষ্করিণী খনন কিম্বা পুরাতন পুষ্করিণীর সংস্কার হয়। এ অবস্থায় চিরকাল যাহা

হয় তাহাই হইতেছে। কোন গ্রাম গভর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন, কোন গ্রাম বা লোকাল বোর্ডের মুখ চাহিয়া বসিয়া আছেন, এবং অবশেষে দুই স্থানেই ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া পচা ডোবার জল পান করিয়া সপরিবারে মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিতেছেন। এই মূঢ় নিশ্চেষ্টতার পরিণাম যে কি ভীষণ তাহা ভাবিতেও হৃৎকম্প হয়।

(১) বৰ্দ্ধমান জেলার মুনীপুর গ্রামে পানীয় জলের জন্য ভাল পুষ্করিণী নাই। যেসকল পুষ্করিণী আছে তাহার অধিকাংশই অপরিষ্কার ও তাহাদের জল শুকাইয়া গিয়াছে। * * * গ্রামের মধ্যস্থলে একটি ইন্দারা হইলে গ্রামের পানীয় জলের কষ্ট কতকটা নিবারণ হইবে। (২) বৰ্দ্ধমান—পূর্ব্বস্থলী চক বামনগড়িয়া। + + + গ্রামে ভাল পুষ্করিণী না থাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের একান্ত অভাব। স্থানীয় ভদ্র মহোদয়গণকে মামলা মোকদ্দমায় বৎসর বৎসর বহু টাকা অপব্যয় করিতে যেরূপ উদ্যোগী দেখা যায়, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, রাস্তাঘাট মেরামতের সময় সেরূপ যত্ন ও উদ্যম থাকিলে এই গ্রাম আজ শ্মশান-সদৃশ হইত না। যদি লোকাল বোর্ড হইতে একটি ইন্দারা কাটাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে পানীয় জলের কষ্ট কতকাংশে দূর হয়। (৩) পাবনা—গুয়াপাড়া * * * প্রধান অসুবিধাই জলকষ্ট। গ্রামের ভিতর ৫০।৬০টি পুষ্করিণী আছে। সকল পুষ্করিণীই কেবল মাত্র জঙ্গলে বেষ্টিত ও দামে আচ্ছাদিত। জল মনুষ্যের ত দূরের কথা পশুর পানেরও অনুপযুক্ত। গ্রামে এইরূপ পানীয় জলের অভাব-হেতু দূষিত জলপান ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। * * (৪) জলাভাবে চারিদিকে লোকের উৎকণ্ঠার বার্ত্তা পাইতেছি। সহরে ধূলার জ্বালায় আমরা পথে বাহির হইতে পারিতেছি না। মিউনিসিপালিটির উপর দোষ দিব কি, জল সরবরাহেরই উপায় দেখিতেছি না। জলাশয়গুলি শুষ্কপ্রায়। পুকুরগুলির জলের রং বদলাইয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুকুরের জল দুর্গন্ধি ও ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

—সুরমা, শ্রীহট্ট।

পানীয় জলের অভাব—বঙ্গের বহু পল্লীগ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব বারমাসই বর্ত্তমান। এক্ষণে গ্রীষ্ম সমাগত। সহস্রকিরণ যতই উগ্ররশ্মি হইতেছেন এই অভাব যেন সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া ভীষণ ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। সংবাদপত্রের স্তম্ভ এই অভাবের আলোচনায় নিত্যই পূর্ণ হইতেছে। ম্যালেরিয়া কলেরা প্রভৃতি ব্যাধিনিচয় বঙ্গের নিত্যসহচর হইয়া বহু পল্লীগ্রামকে শ্মশানে পরিণত করিতেছে, লোকের বিশ্বাস, বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংস্থান, জল-নিকাশের ব্যবস্থা ও বন জঙ্গলের অপসারণ, এই ত্রিবিধ উপায় অবলম্বিত হইলে বঙ্গের পল্লীস্বাস্থ্যের নিশ্চয়ই উন্নতি সাধিত হইবে। কোথাও কোথাও দুই-একটা পুষ্করিণী সংস্কার কিম্বা দুই-একটা কূপ খনন হইতেছে বটে, কিন্তু তাহা যে "সমুদ্রে পাদ্য অর্ঘ্য"। জলাভাবক্লিষ্ট পল্লীগ্রামের সংখ্যা ত কম নহে, দুই-চারিটা গ্রামে এই অভাব দূরীভূত হইলেই কর্ত্তব্য সাধিত হইল ইহা মনে করা ভুল। বঙ্গের যাবতীয় পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতিসাধনে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে অবশ্য বিস্তর অর্থের প্রয়োজন তাহা বুঝি। কিন্তু, নামোল্লেখ করিতে চাহি না, কত শত ব্যাপারে বৎসর বৎসর রাশি রাশি অর্থ ব্যয়িত হইতেছে, অথচ যে বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে মনোযোগী হওয়া দরকার, যাহার জন্য অপর দিকে ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া অর্থ নিয়োজিত করা দরকার, যাহার প্রয়োজনীয়তা শাসনকর্ত্তৃগণ উপলব্ধি করিয়া প্রায়ই বক্তৃতা প্রদান করিয়া থাকেন, সরকারী গেজেটে মন্তব্য বাহির করিয়া থাকেন, তাহার জন্য অর্থের অনাটন হয় ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। কলিকাতায় উন্নতিকল্পে, রেল বিস্তারে, বৃহৎ সেতু নির্ম্মাণে, নগর সংস্থাপনে, নূতন বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপনে, জেলা বিভাগে, এবম্বিধ কত ব্যাপারে কোটী কোটী টাকা জলের মত খরচ হইতেছে; কয়েক বৎসর এই শ্রেণীর কার্য্য বন্ধ রাখিয়া দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করিয়া লইলে কি মন্দ হয়? স্বাস্থ্যই যে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়।

—বৰ্দ্ধমান সঞ্জীবনী।

বৰ্দ্ধমান সঞ্জীবনীর এই-সমস্ত কথাই সত্য বটে কিন্তু অপ্রিয়। আর এ দেশে অপ্রিয় সত্যভাষণ ও অরণ্যে রোদন একই কথা।

কৃষি-সঙ্কট—

শ্রীহট্টের "সুরমা" পত্রিকাতে গত কয়েক মাস ধরিয়া এদেশের শস্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ ও কৃষিকার্য্যের বিষয় আলোচিত হইতেছে। শস্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ সম্বন্ধে লেখক যে-সকল কথার অবতারণা করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। লেখক বলিতে চান যে বিদেশে শস্য-রপ্তানী শস্যের মূল্যবৃদ্ধির একমাত্র কারণ নহে। তাঁহার মতে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস, জমিতে সার দেওয়া বা ফসল পরিবর্ত্তনের অভাব বা অসুবিধা, ভূস্তরের অবস্থা পরিবর্ত্তন, উপযুক্ত সুস্থ সবল লাঙ্গল-বলদের অভাব, দেশের লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি ও বল-স্বাস্থ্য-হানি এবং শহরের প্রতিযোগিতায় পল্লীগ্রামের খাদ্যাভাব প্রভৃতি নানা কারণে শস্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইসকল কারণ ভিন্ন লেখক শস্যের মূল্যবৃদ্ধি সম্বন্ধে আরো কতকগুলি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে দেশে গোচরভূমির অভাবে গোজাতির অবনতি এবং সুস্থ সবলকায় কৃষকের অভাব প্রধান।

যেখানে লাঙ্গলরেখা অর্দ্ধহস্ত গভীর করা আবশ্যক, সেখানে, কৃষক ও গোজাতির দুর্ব্বলতানিবন্ধন, উহা চতুরঙ্গুলিপরিমিত গভীর হইতেছে না—ধান্যবৃক্ষগুলি অঙ্কুরিত হইয়া শিকড় মেলিবার অবকাশ পাইতেছে না। এই অবস্থায়, পূর্ণশস্যলাভের আশা করা যাইতে পারে কি? দীর্ঘকাল পরে সরকারবাহাদুরের এদিকে সুনজর পড়িয়াছে। আসাম-গবর্ণমেণ্ট "গোচর রক্ষার" জন্য বিশিষ্ট যত্ন করিতেছেন। আমাদের পল্লীতে পল্লীতে গোচরভূমি চাই। প্রত্যেক পল্লীবাসী এদিকে অবহিত না হইলে, গ্রামে গ্রামে গোচর রক্ষার সুব্যবস্থা করিতে না পারিলে, গবর্ণমেণ্টের 'পল্লীব্যবস্থা'র সকল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে, আমাদের ইহাই দৃঢ়বিশ্বাস।"

—সুরমা।

ডাকাতি ও অস্ত্রআইন—

এ দেশে এমনই মজা যে ইচ্ছা করিলেই কতকগুলি বদলোক বে-আইনীভাবে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া যে-কোন নিরপরাধ আইনভীরু লোককে সর্ব্বস্বান্ত করিতে পারে, কিন্তু সেই নিরপরাধ লোকটি কোন রূপেই আত্মরক্ষা করিতে পারে না। আজকাল তো

প্রাতঃকালে সংবাদপত্র খুলিলেই দেখি একটা-না-একটা ডাকাতির সংবাদ আছেই আছে। কলিকাতা হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলাদেশের এমন কোন জেলা নাই যেখানে একবার-না-একবার ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। বাস্তবিক আমাদের দেশ অস্ত্র-আইনের কৃপায় যেরূপ নিরুপায় ও নিঃসহায় তাহাতে যে এখানে আরো অধিক-সংখ্যক ডাকাতি হয় না ইহাই আশ্চর্য্যের কথা। ডাকাতির হাত হইতে এদেশবাসীকে রক্ষা করিতে হইলে অস্ত্র-আইনের কঠোরতা যে অল্লাধিক পরিমাণে শিথিল করিতে হইবে সে বিষয়ে আর দ্বিমত নাই। এ সম্বন্ধে মফঃস্বলের দুইখানি সংবাদপত্রের মত এ স্থলে উদ্ধৃত করা হইল।

"গবর্ণমেণ্টের নীতির সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসী মন প্রাণ ঢালিয়া দিতে প্রস্তুত। যে-কোনও পথে পুলিশের সহায়তা করিতে সকলে এক পায়ে দণ্ডায়মান। কিন্তু খালি হাতে তাহাদের প্রাণের আশঙ্কা নিবারণের পথ কোথায়? দস্যুদলের সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে বাধা দিতে ও ধরিতে অস্ত্রহীনের ক্ষমতা কি? এইজন্যই আমরা প্রার্থনা করিয়াছিলাম উদার গবর্ণমেণ্ট দেশবাসীকে বিশ্বাস করিয়া অস্ত্র-আইনের কঠোরতা দূর করিতে একটু অগ্রসর হন। তার পর পুলিশের কড়া-দৃষ্টি ও কড়াশাসনও এখন বেশীর ভাগ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সে পথেও কর্তৃপক্ষের একটু মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। এই ঘৃণিত দস্যুবৃত্তি শান্তিপূর্ণ বৃটিশ-রাজ্যে যে অশান্তির বীজ বপন করিতেছে, যে-কোনও ভাবে শীঘ্র তাহার প্রতিকার বাঞ্ছনীয়।"

—ইসলাম-রবি।

আজকাল বঙ্গের বহুস্থানে ঘন ঘন ডাকাতি হইতেছে। দস্যুগণ অধিকাংশ স্থলেই সশস্ত্র থাকে অথচ গ্রামবাসীগণ নিরস্ত্র, কাজেই ডাকাইতগণের সম্মুখীন হওয়া তাহাদের পক্ষে মৃত্যুকে ডাকিয়া আনা। ফলে ডাকাইতগণ লুণ্ঠনে কোনও বাধা পায় না। গ্রামবাসীগণের এই অসহায় অবস্থা ডাকাইতগণের কুকার্য্যের যে বিলক্ষণ সহায়তা করে ইহা অনেকেই বুঝিয়াছেন; এইজন্য অস্ত্র-আইনের কঠোরতা হ্রাসের জন্য অনেকে গবর্ণমেণ্টকে বারম্বার অনুরোধ করিতেছেন; কিন্তু অস্ত্র-আইনের কঠোরতার হ্রাসের কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না; বরং যেন কঠোরতা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্তই হইতেছে।

—বৰ্দ্ধমান সঞ্জীবনী।

বাঁকুড়া কুষ্ঠাশ্রম—

বহু দিন হইল বাঁকুড়ায় একটি কুষ্ঠাশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। বাঁকুড়া জেলায় কুষ্ঠব্যাধি-গ্রস্ত রোগীর সংখ্যা বিরল নহে এবং বহু কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোক নিরাশ্রয়। তাহারা অনেক সময়ে কষ্ট পায়। এক মহিলা মিসেস ব্রায়েন কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের দুঃখের বিবরণ পাঠ করিয়া এখানে একটি কুষ্ঠাশ্রম স্থাপনের জন্য টাকা পাঠাইয়া দেন। লেপার মিশনের কর্ত্তাদের তথা বাঁকুড়া ওয়েস্লিয়ান মিশনের পাদরী স্মিথ সাহেবের তত্ত্বাবধানে এই আশ্রম নির্ম্মিত হইয়া আজ ১৩ বৎসর উত্তমরূপে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। আশ্রমবাসী কুষ্ঠরোগীদের খাদ্য সরবরাহের জন্য সদাশয় গবর্ণমেণ্ট বৎসরে ১৮৭২৲ টাকা দান করেন। ওয়েস্লিয়ান মিশনের বর্ত্তমান পাদরী শ্রীযুক্ত এ, ই, ব্রাউন সাহেব এক্ষণে বিলক্ষণ দক্ষতার সহিত উক্ত আশ্রম পরিচালন করিতেছেন।

—বাঁকুড়া-দর্পণ।

এই কলিকাতা শহরে পথিমধ্যে কত কুষ্ঠরোগী পড়িয়া থাকে দেখিতে পাই। এই হতভাগ্যদের জন্য যত সত্বর সম্ভব কলিকাতায় দেশীয় লোকের দ্বারা একটি কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

লোকসেবা—

বরিশাল সহর হইতে প্রকাশিত "বরিশাল হিতৈষীতে" প্রকাশ—

এই ভয়াবহ কলেরার প্রকোপ—আত্মীয় স্বজনগণের ক্রন্দন-রোলের মধ্যে সাধারণের একটা পরম আনন্দের হেতু আছে। দরিদ্র-বান্ধব ৺কালীশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের অকালমৃত্যুর পরে যে আশঙ্কা হইয়াছিল আজ সে আশঙ্কা দূর হইয়াছে—কালীশচন্দ্রের পরিত্যক্ত কর্ম্ম-ভার জনৈক সহৃদয় যুবক সোৎসাহে গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি ব্রজমোহন কলেজের অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ। ইনি রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত যোগে তাঁহার ছাত্র যুবকগণের সাহচর্য্যে সহসা-আপতিত গুরুভার সুচারুরূপে বহন করিতেছেন। আরও সুখের বিষয় সহরে সহসা সর্ব্বশ্রেণীর ৪০।৫০টি লোক যুগপৎ আক্রান্ত হইয়া থাকিলেও কোনও একটি রোগীও সেবা শুশ্রূষার অভাবে ক্লেশ পাইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। অনেক নীরব সেবক লোক-লোচনের অন্তরালে অনাড়ম্বরে অক্লান্ত ভাবে স্বীয় স্বেচ্ছাগৃহীত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছেন—ইহা অতীব সুখের কথা।

পল্লীসেবা---

পাবনার "স্বরাজ" বলেন—

যাঁহারা পল্লীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে চাহেন তাঁহাদের মনে রাখা উচিত, শ্রদ্ধা, প্রীতি, ভক্তি ও আন্তরিকতা না লইয়া যাঁহারা পল্লীর দ্বারে উপনীত হইবেন, তাঁহারা পল্লীর অন্তর্নিহিত মাধুর্য্য ও মহত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। যেদিন পল্লীসেবক, আপনার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে গাহিতে পারিবেন—

"স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি
রেখ রেখ মনে এ ধ্রুব জ্ঞান।
যাঁহার সলিলে মন্দাকিনী চলে
মলয়-অনিল সদা বহমান॥"

ঐ পূতিগন্ধময়, ম্যালেরিয়ার আবাসস্থল ঈর্ষা ঘৃণা ও চিরকোলাহলের প্রিয় নিকেতন পল্লীভূমিকে এইরূপ আন্তরিকতার সহিত যিনি দেখিতে পারিবেন, তিনিই পল্লীর সেবায় নিয়োজিত হউন, নচেৎ অহঙ্কার-গর্ব্বিত মদোদ্ধত হৃদয় লইয়া কেহ দীন পল্লীকুটীরে উপস্থিত হইবেন না।

আমাদের মনুষ্যত্ব—

পুরুলিয়া হইতে প্রকাশিত "মানভূমে" নিম্নলিখিত ঘটনাটি প্রকাশিত হইয়াছে।

সেদিন একটা আধ-বয়সী মেয়েলোক একটি ছেলে সঙ্গে করিয়া ভাত ভিক্ষা করিতেছিল। কদিন খাইতে পায় নাই, তার চেহারা দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইতেছিল যে, সে যাহা বলিতেছে, তাহা সত্যই। কাপড়ও নাই, শতছিন্ন মৃত্তিকারঙের একখানি ন্যাকড়া তার লজ্জানিবারণ করিতেছিল। গরুর প্রতি দয়াপরবশ যারা, তারা মানুষকে কি গরুরও অধম বিবেচনা করে? পাশ্চাত্য জাতির কুকুর-প্রীতি এবং আমাদের গরুভক্তি সীমা অতিক্রম করিতে পারে, কিন্তু মানুষগুলি যে জানোয়ার অপেক্ষা বেশি কৃপা-পাত্র সে কথা ভুলিয়া গেলে প্রমাণিত হইবে যে, আমরাই মনুষ্যত্বের অনেক নিম্নস্তরে নামিয়া আসিয়াছি। মানুষ যখন কুকুর কোলে করিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া গরীবলোককে পিষিয়া চলিয়া যাইতে পারে এবং গরুর পূজা করিয়া মানুষকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতে লজ্জাবোধ করে না, তখনই মনে হয় বুঝি মনুষ্যত্ব অপেক্ষা পশুত্বই বড়।

বঙ্গীয় হিতসাধন-মণ্ডলী

সমবেত চেষ্টার দ্বারা বঙ্গদেশের নানাস্থানে বিবিধ লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানকল্পে দেশের বহু মান্য গণ্য ব্যক্তিকে লইয়া সম্প্রতি কলিকাতা শহরে উপরোক্ত নামে একটি মণ্ডলী গঠিত হইয়াছে।

অন্যান্য নানা কর্ম্মের মধ্যে

১। নিরক্ষরদিগকে অন্ততঃ যৎসামান্য লেখাপড়া ও অঙ্ক শিখানো। ২। ছোট ছোট 'ক্লাশ' ও পুস্তিকা প্রচার দ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষা, সেবাশুশ্রূষাদি সম্বন্ধে শিক্ষাদান। ৩। ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, নানাবিধ অজীর্ণ ও উদরাময় রোগ প্রভৃতির প্রতিষেধের জন্য সমবেত চেষ্টা। ৪। শিশুমৃত্যু নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণ ও অবলম্বন। ৫। গ্রামে উৎকৃষ্ট পানীয় জলের ব্যবস্থা। ৬। গ্রামে গ্রামে যৌথ ঋণদান সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা ও দরিদ্র লোকদিগকে ইহার উপকারিতা প্রদর্শন। ৭। দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মড়ক প্রভৃতির সময়ে দুঃস্থদিগের বিবিধপ্রকারে সাহায্য।—

এই মণ্ডলীর উদ্দেশ্য। অবশ্য বঙ্গীয় হিতসাধন-মণ্ডলী একেবারেই এই-সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা সমীচীন বা সম্ভব বিবেচনা করেন না। যাহা এখন সাধ্যায়ত্ত ও একান্ত আবশ্যকীয়, এইরূপ সময়োপযোগী দু-একটি বা ততোধিক কার্য্য আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করেন। কি প্রণালীতে ও কিরূপ ব্যয়ের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবক কর্ম্মী যুবকদলের সাহায্যে কোন্ কোন্ স্থানে, কি কি বিশেষ উপায় দ্বারা ও কত শীঘ্র এই মহাকার্য্যের অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে এতদ্বিষয়ে যিনি যাহা পরামর্শ দিবেন তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত ও বিবেচিত হইবে। এই মণ্ডলী গঠন ও ইহার কার্য্য সুচারুরূপে আরম্ভ করিবার জন্য কলিকাতা মেয়ো হস্পিটালের সুযোগ্য রেসিডেণ্ট সার্জ্জন ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, এম-বি অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। যাঁহারা এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক তাঁহারা তাঁহাকে পত্র লিখিলেই সমুদয় জানিতে পারিবেন।

শ্রীঅমলচন্দ্র হোম।

পুস্তক-পরিচয়

পোষ্যপুত্র (উপন্যাস)—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত। মূল্য এক টাকা চারি আনা। কলিকাতা, কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক, শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায়, ভূদেব-ভবন চুঁচুড়া।

আমরা অতিশয় আগ্রহের সহিত এই উপন্যাসখানি পাঠ করিয়াছি, এবং গ্রন্থকর্ত্রীর চরিত্র-চিত্রণ-ক্ষমতা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। তিনি সুনিপুণ তুলিকায় এক-একটি চরিত্র বেশ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের প্রত্যেক চরিত্রটি সজীব এবং প্রত্যেকের বিকাশে একটি সুন্দর সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে। কোনওটি অস্বাভাবিক হয় নাই। কেবল মাদুরায় শান্তির সহিত মিঃ রায়ের প্রথম সাক্ষাতেই প্রেমের উৎপত্তি হওয়া এবং শান্তির সহিত মিঃ রায়ের ইংরেজী ধরণে কোর্টশিপ করিতে যাওয়া—এই দুইটি ব্যাপার অস্বাভাবিক ও বে-মানান্ হইয়াছে। হিন্দুর গৃহে এরূপ ব্যাপার সংঘটিত হয় না। সম্ভবতঃ এই কারণে, গ্রন্থকর্ত্রী ইহার বর্ণনায় তেমন কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, মাদুরার ব্যাপারটি কোনও ইংরেজী নভেলের একটি পরিচ্ছেদের অনুবাদ বলিয়া ভ্রম জন্মে। সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরাণীর চরিত্র-চিত্রণে, অন্তঃপুরের চিত্র অঙ্কনে, পুষ্করিণীর ঘাটে মহিল-বৈঠকের বর্ণনায়, নানারূপ ঘাতপ্রতিঘাতে শ্যামাকান্ত, শিবানী, নীরদ, শান্তি, রজনীকান্ত, হেমেন্দ্র প্রভৃতির মানসিক অবস্থার সমালোচনায় ও বিশ্লেষণে, শিশুদের মনোরাজ্যের চিত্রপ্রকটনে, মাতৃহীনের শূন্যহৃদয় বর্ণনায়, সন্তানবাৎসল্য ও পুত্রশোকের চিত্রপ্রদর্শনে, পিতৃস্নেহ ও মাতৃস্নেহের বৈচিত্র্য প্রকটনে এবং প্রাকৃতিক শোভাবর্ণনায় গ্রন্থকর্ত্রী যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা আধুনিক অনেক উপন্যাসে দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেকস্থলে শোকের করুণ কাহিনী পড়িতে পড়িতে নেত্রপল্লব আর্দ্র হইয়া আসে। মোটের উপর "পোষ্যপুত্র" একটি সুন্দর উপন্যাস হইয়াছে। পুস্তকের ভাষা আড়ম্বরশূন্য—কোথাও তেমন ছটা নাই। তবে মানসিক অবস্থার দার্শনিক বিশ্লেষণে স্থানে স্থানে তাহা কিছু অস্পষ্ট ও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ বিশ্লেষণ একটু কম হইলেই যেন ভাল হইত। তদ্দ্বারা গল্পের গতি প্রতিহত হওয়াতে পাঠক কখনও কখনও কিছু অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন এবং তাহা পরিত্যাগ করিয়া গল্পের সূত্রটি ধরিবার জন্য অগ্রসর হয়েন। স্থানে স্থানে প্রাকৃতিক শোভাও অনাবশ্যক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উপন্যাসখানি সুন্দর হইয়াছে বলিয়াই, তাহার সামান্য দুই-চারিটি দোষের কথাও উল্লেখ করিলাম। ভবিষ্যৎ সংস্করণে ইহা পরিমার্জ্জিত হইলে বাঙ্গলা সাহিত্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিবে। সকলকেই আমরা ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।' গল্পটি "মধুরেণ" সমাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

Iron in Ancient India, by Panchanan Neogi, M. A., F. C. S., Professor of Chemistry, Rajshahi College. Bulletin No. 12, Indian Association for the Cultivation of Science. Calcutta. Illustrated. 1914.

প্রাচীন ভারতে লৌহ সম্বন্ধে কি বিশেষ জ্ঞান ছিল তাহা এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। দিল্লীর লৌহস্তম্ভ দেখিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বিস্মিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের মনে ইহা স্বতঃই উদয় হয় যে কি প্রকারে এত বড় সাড়ে তেইশ ফুট লম্বা থাম সেকালের ভারতীয় কর্ম্মকারেরা প্রস্তুত করিলেন। পারস্য দেশীয় বণিকগণ যে ভারতবর্ষ হইতে ইস্পাত লইয়া গিয়া স্বনামপ্রসিদ্ধ তরবারি প্রস্তুত করিতেন সেটা তো এখন ঐতিহাসিক ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছে। পঞ্চাননবাবু বেদ পুরাণ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদি হইতে নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অনেকগুলি হাফ্‌টোন ছবিও আছে। শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেরই এই পুস্তক পাঠ করা উচিত। আশা করি পঞ্চাননবাবু অন্যান্য ধাতু সম্বন্ধেও এইরূপ প্রবন্ধ লিখিবেন।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম্‌-এ, এফ্‌-সি-এস্‌।

বেতালের বৈঠক

[এই বিভাগে আমরা প্রত্যেক মাসে প্রশ্ন মুদ্রিত করিব। প্রবাসীর সকল পাঠকপাঠিকাই অনুগ্রহ করিয়া সেই প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া পাঠাইবেন। যে মত বা উত্তরটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক ব্যক্তি পাঠাইবেন আমরা তাহাই প্রকাশ করিব; সে উত্তরের সহিত সম্পাদকের মতামতের কোনো সম্পর্কই থাকিবে না। কোনো উত্তর সম্বন্ধে অন্তত দুইটি মত এক না হইলে তাহা প্রকাশ করা যাইবে না। বিশেষজ্ঞের মত বা উত্তর পাইলে তাহা সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হইবে। ইহদ্বারা পাঠকপাঠিকাদিগের মধ্যে চিন্তা উদ্বোধিত এবং জিজ্ঞাসা বর্দ্ধিত হইবে বলিয়া আশা করি।]

বঙ্গসাহিত্যের জীবিত শ্রেষ্ঠ লেখক।

১৪ জন বিভিন্ন লোকের নামে ভোট আসিয়াছিল। অধিকসংখ্যক লোকের মতে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—

১। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

২। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অনুবাদ বা অনুসরণ গ্রন্থ।

১৫ খানি বিভিন্ন গ্রন্থের নামে ভোট আসিয়াছিল। অধিক সংখ্যক লোকের মতে নির্ব্বাচিত হইয়াছে—

১। টম কাকার কুটির—চণ্ডীচরণ সেন।

২। তীর্থ-সলিল—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

৩। কল্পকথা—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

৪। { ইংরেজবর্জ্জিত ভারতবর্ষ—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
ম্যাকবেথ—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। }

বঙ্গীয় প্রজার হিতকারী শ্রেষ্ঠ বড় লাট।

৩ জন মহাত্মার নাম উল্লিখিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে অধিক সংখ্যক লোকের শ্রদ্ধা পাইয়াছেন—

লর্ড রিপন।

নূতন প্রশ্ন

১। ইংরেজ সমাজে কথাবার্ত্তার সময় বিবাহিতা স্ত্রীলোককে সম্বোধন করিতে মিসেস, ও অবিবাহিতাকে মিস বলা হয়। ফরাসীরা বলে মাদাম ও মাদ্‌মোআজেল। জার্ম্মানরা বলে ফ্রাউ ও ফ্রাউলীন। জাপানীরা বলে ওকামি-সান ও ওজো-সান। প্রত্যেক জাতির সম্বোধন করিবার স্বতন্ত্র রীতি আছে। আমরা ইংরেজদের দেখাদেখি মিসেস ও মিস কথাবার্ত্তার ভাষায় চালাইতেছি। বাঙ্গলার নিজস্ব রীতিতে কিরূপ সম্বোধন হওয়া উচিত? ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেই বা কিরূপ সম্বোধন প্রচলিত আছে, প্রবাসী বাঙালীরা বা অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহা জানাইবেন আশা করি।

২। রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত অন্য লেখকদের বাংলা-সাহিত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ১২টি ছোট গল্পের নাম করুন। গল্পের নামের পাশে লেখকেরও নাম লিখিতে হইবে।

প্রশ্নকর্ত্রী—শ্রীমতী হেমপ্রভা রায়।

৩। ভারত-ইতিহাসের এমন ১০টি প্রসিদ্ধ যুদ্ধের নাম করুন যাহা দ্বারা কোন জাতির বা দেশের ভাগ্য নির্ণীত হইয়াছে।

প্রশ্নকর্ত্তা—শ্রীকুমারেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৪। সংস্কৃত ধর্ম্ম- এবং কাব্য-সাহিত্যের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দ্বাদশটি স্ত্রী- ও দ্বাদশটি পুরুষ-চরিত্রের নাম করুন।

প্রশ্নকর্ত্তা—শ্রীবিজয়কুমার রায়, এম্‌, এ, প্রোফেসর অফ্‌ ফিলসফি। মজঃফরপুর গ্রিঃ ব্রিঃ কলেজ।

অ !

এই চট্ করে যাহা বলে ফেলা যায়
চুট্কি তাহারে কয়,
ওগো ছোট লেখা যত লেখে ছোটলোকে
জানিবে সুনিশ্চয়।
ওই চুট্কি রচনা কেট্-কেট্-গ্র্যাম্
বিকিকিনি চলে চোটে,
ও যে ফুট্-কড়ায়ের ছুট্কো বেসাতি
হুণ্ডি চলে না মোটে।
ভুয়ো সজ্জনের খুঁটি চুট্কি রচনা
দেখিতে নিরেট বটে,
ভায়া, ভর দিলে ভারে ভেঙে পড়ে চাল
আয়ু-সংশয় ঘটে।
ওগো লিখো না চুট্কি, লিখিলে পড়িবে
যশোভাগ্যেতে দ,
আর পণ্ডিত-সভা পুছিবে না তোরে
দুখ না ঘুচিবে।—

(কোরাস) অ !

দেখ চুট্কি সূত্র গোটা সত্তর
লিখিল সাংখ্যকার,
তাই কন্ফারেন্সে ডায়েসের পরে
চেয়ার পড়েনি তার।
দাদা, তিনটি ভালুমে লিখিলে মালুম
হইত এলেম যত,
আর দর্শন-শাখে হত যোগে-যাগে
শাখা-পতি অন্তত।
হায় অল্পে সারিতে মরিল বেচারা
লিখে হ য ব র ল,
এই জম্বুদ্বীপে কোনো ফেলোশিপে
বক্তা না হল।—

(কোরাস) অ !

দেখ হাফেজ কেবল চুটকি লিখিল
ফেল খোয়াইল তাই,
আর রবি শেলি রুমি বার্ণস্ হাইন
পড়ে সে কজন ভাই ?
হোথা শ্লোক তিন টন লিখি মিলটন্
অমর হইল ভবে,
লোকে পড়ে কি না পড়ে জানেন বিধাতা,
হরি হরি বল সবে।
ওগো লেখ লুসিয়াড্ লেখহ মেসায়া
অথবা রৈবতক,
আছে সস্তার ছাপাখানা যতদিন
রইবে সে ইস্তক।
আর বিপুল গতর দেখি কেতাবের
দুনিয়াটা হবে থ,
যত বেকার ক্রিটিক্ ভুলি টিক্‌টিক্
'ঠিক্ ঠিক্' কবে।

(কোরাস) অ !

দেখ ছ-শো-পাতা-রেগুলেশন নভেল
বটতলা লিখেছেন,—
বাপু, বঙ্কিমস্যার তুলনে চুটকি
Bamboor কাছে Cane !
এখন বাঁশের চাইতে যাঁহাদের মতে
কঞ্চি অধিক দড়,
হায় তাহারা বলিবে চুট্কি-লেখক
বঙ্কিমবাবু বড় !
হা হা কাঁচা মগজের ধাঁচা ওয়ে—ওকি
লিটারেচারের ল,
ওগো চটক-মাংস চুটকিতে পেট
ভরে না মোদের।

(কোরাস) অ !

দেখ দুএক অঙ্কে মেটারলিঙ্কী
চুট্কি নাটক আছে,

হুঁ হুঁ　দাঁড়াবে কি তাহা পায়ে সেড়-সেরী
　যাত্রা-পালার কাছে ?
ওগো　চটক দেখিয়া ভুলিও না কেউ,
　ভুলিও না চুট্‌কিতে,
বড়　মজা পাবে রায়-মশায়ের বড়
　গীতাভিনয়ের গীতে।
তাহে　পাবে খাঁটি সুর যেন চিটা গুড়
　হবু চিনি সে যে raw,
আর　চিটা সে শুদ্ধ, চিনি অশুদ্ধ
　শাস্ত্রে লিখেছে।—

(কোরাস)　অ!

দেখ　বিশ্বামিত্র আড়াই ছত্রে
　রচিল গায়ত্রী,
উহা　চুট্‌কি বলিয়া পাইল না ঋষি
　ফলারের পত্রী।
শেষে　প্রলয়-পয়োধি গরাসিল বেদ
　চুট্‌কির ঝুলি বলি,
অহো　মীনরূপে হরি চুট্‌কি চুনিল,
　ঘোর কলি! ঘোর কলি!
ওরে　দেবতার লীলা মানবে ছলিতে,
　ছলে ভুলিও না ভাই,
চুপ্　রাঘব-বোয়াল কাব্য এখনি
　ভাষা-জলে দিবে ঘাই!
ওগো　কলমের ডগে ফাৎনা লাগাও
　নড়িও না এক য'
ওরে　চুট্‌কি ছাড়িলে রাঘব-বোয়াল
　চারে আসে দেখ্।—

(কোরাস)　অ!

দেখ　রৌদ্র রসের চুট্‌কি রচনা
　না মাসে টপ্পা গান,
ও সে　চুট্‌কি বলিয়া হল না আদর,
　হল না ক সম্মান।

এখন　যুদ্ধের কালে গাহে ইউরোপ
　হোমারের ইলিয়াদ,
ওরে　চুট্‌কি ছাড়িয়া মহাকাব্যের
　মহা মহা খাতা বাঁধ!
ওরে　বড় বড় বই লিখে ক্রমশই
　মানুষের মত হ।
দেখ্　ধারে না কাটিস ভারে কেটে যাবি,
　ল্যাটা নিয়ে কথা।—

(কোরাস)　অ!

ওরে　ইতিহাস কেউ লেখেনি চুট্‌কি
　কিম্বদন্তি জুড়ি'
ঢালি　তিন পয়সার তাম্রশাসনে
　টিপ্পনী ত্রিশ ঝুড়ি।
আর　গুরুগম্ভীর বিজ্ঞান-পুথি
　পড়ানো হবে না পুত্রে,
ওতে　চুট্‌কি ঢুকেছে, লিখেছে—বিজলি
　ধরেছে ঘুড়ির সূত্রে।
আর　চায়ের কেটুলি ঢাকন ঠেলিয়া
　নাচন দেখায় তারি,
হল　হাজার চুট্‌কি গল্পের ভারে
　ভিজা কম্বল ভারী।
যদি　পুছ 'কেন মাথে চুট্‌কি ?' ওযে গো
　আত্মা-বটের ব,
ওগো　ও যে চৈতন, চাঁই হয় উহা
　চুট্‌কি দলের।—

(কোরাস)　অ!

ওগো　চুট্‌কি লিখিলে থেকে যাবে মনে
　আরসোলা-চাটা-ভয়,
হয়　কীর্ত্তি লোপের সুবিধা বেজায়।
　ছোট আর লেখা নয়!

[illegible] [illegible]
করেও না যায় [illegible]

[illegible] চারি যুগে চাটি ফুরাতে নারে যা
ছনিয়ার আরসোলা।
ওরে লেখ ব্যাসকুট দাঁতে বিস্কুট
আদা জল খেয়ে ল,
[illegible] বিরাট হলেই হইবে কেতাব
অজর অমর।—

(কোরাস) অ!

লেখ বিনা সম্বল বেকার উড়িয়া
চুট্‌কির কাম করে,
ওলে ভিক্ষার চাল জড়ো করি শেষে
বেচে গো স্থবিধা দরে।

ওগো [illegible]
[illegible]
উহা তোমরা করিলে আমরা [illegible]
লজ্জায় মারা যাই।
ছি ছি চুট্‌কি ঘৃণ্য দৈন্যের ধ্বজা,
চুটি শুধু তার ভালো,
ওগো পণ্ডিত-শির নারীর চরণ
চুট কিতে করে আলো!
ওরে এ চুটি চুট্‌কি রক্ষা করিয়া
রণে আগুয়ান হ,
আর চুট্‌কি-নিধনে চ রে ভাই, জিভে
দিয়ে খর শান।—

(কোরাস, হাই তুলিতে তুলিতে) অ!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ [illegible]

[illegible]।—যোগ্য সন্তান তোমরা যুদ্ধে যাও, স্বদেশের জন্তে প্রাণ দাও দিয়ে। স্বদেশের ভবিষ্যতের জন্তে ভেব না, ওঁচলা রেজলা যারা ঘরে রইল তারাই নূতন ভাবে দেশের সভ্যতা গড়ে তুলবে।

—শিকাগো [illegible]।

৯১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৫শ ভাগ
১ম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২

২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

আত্মোপলব্ধি, আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রকাশ।

মানুষ আপনাকে জানিতে চাহিতেছে, আপনার সমুদয় গুণ, বৃত্তি ও শক্তি সম্যক্‌রূপে বিকশিত করিতে চেষ্টা করিতেছে, এবং বাক্যে ও কার্য্যে আপনাকে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইতেছে। সকল দেশে, সকল সময়ে, সকল অবস্থায় মানুষের এই ত্রিবিধ চেষ্টায় নানা প্রকার ব্যাঘাত ও বিঘ্ন আছে। মানুষের নিজের প্রবৃত্তি, ব্যসন, কুঅভ্যাস, শারীরিক ব্যাধি প্রভৃতি তাহার আত্মোপলব্ধি আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রকাশে বাধা দেয়। এক-একটি পরিবারে এক এক রকম বিঘ্ন থাকিতে পারে। তা ছাড়া এক এক দেশের এক এক শ্রেণীর লোকের পরিবারের গঠন এরূপ, পারিবারিক রীতি নীতি এরূপ, যে, তাহা হইতেও অনেক বাধা পাইতে হয়। তৎপরে প্রত্যেক দেশের কোন-না-কোন সামাজিক প্রথা এক-একটি বিঘ্ন। সমাজের গঠনও এরূপ হইতে পারে যে তাহা একটি বাধা হইয়া দাঁড়ায়। প্রচলিত ধর্ম্মমতের কোন কোন অংশ এবং নানা কুসংস্কারও আর-এক প্রকারের অন্তরায়। এই সকলের উপর দেশের শাসনপ্রণালী, আইন, নানা প্রকারের রাষ্ট্রীয় বন্দোবস্ত, মানুষের আত্মোপলব্ধি আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রকাশের অনুকূল না হইয়া সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ প্রতিকূল হইতে পারে।

নানা প্রকারের এই-সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম ও বিনাশ করিয়া মানুষকে আত্মোপলব্ধি, আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রকাশ করিতে হইবে। এই চেষ্টা, এই সাধনাতেই তাহার মনুষ্যত্ব, এবং যে পরিমাণে ইহাতে সিদ্ধিলাভ হয়, সেই পরিমাণে তাহার জন্ম ও জীবন সার্থক হয়।

দোষে সাম্য ও গুণে সাম্য।

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার বৈশাখ মাসের "গম্ভীরা"য় লিখিয়াছেন :—

জাহাজের খালাসীগিরি করিতে বিশেষ কুস্তীগির পালোয়ান হওয়ার আবশ্যকতা নাই। ফরাসী নাবিকদিগকে দেখিয়া ধারণা হইল যে, যে-কোন লোকই এসব কাজ করিতে পারে। বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মারাঠী (?), পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী ইত্যাদি যে-কোন জাতির পক্ষেই জাহাজে চাকরী করা অসম্ভব নয়। ফরাসী খালাসীদের মধ্যে খুব হৃষ্টপুষ্ট, গোল-গাল, লম্বাচৌড়া লোক প্রায়ই নাই, অধিকাংশই বেঁটে খাট, পাতলা রোগা। ভারতবাসীর শারীরিক দুর্ব্বলতা যতই হউক না কেন, সে বিনা কষ্টে জাহাজের কাজ করিতে পারে। সুযোগ পাইলে বোধ হয় এখনও সম্ভব। তবে বহুকালের অনভ্যাসে এখন আমরা আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারাইয়াছি। আর বুলি শিখিয়াছি যে, চাটগেঁয়ে মুসলমানদের মত শরীর না থাকিলে কি অত কষ্টকর কার্য্য করা যায়? বস্তুতঃ সাধারণ বাঙ্গালীর জাহাজের নাবিক হইবার উপযুক্ত স্বাস্থ্য ও শারীরিক শক্তি আছে।

আর-একটা ভুল বিশ্বাস আমাদের মাথায় ঢুকিয়াছে। কথায় কথায় আমরা শুনিতাম—ইউরোপীয়েরা অত্যন্ত শৃঙ্খলাপ্রিয়, তাহারা বেশ প্রণালীবদ্ধরূপে কাজ করে। সত্য কথা, ইহারা ভারতবাসীর মতই মানুষ—কুলীগিরি, কেরাণীগিরি ইত্যাদি নিম্নশ্রেণীর কাজগুলি ইহারা আমাদের লোকজন অপেক্ষা বিশেষ ভালরকম সমাধা করে না। অসাধুতা, অসত্যপ্রিয়তা, অবাধ্যতা ইত্যাদি সকল দোষইইহাদের আছে।

ফাঁকি দিতে পারিলে কেহ ছাড়ে না—এবং ঘুস ও বকশিশ পাইলে ইহারা করিতে পারে না এমন কাজ নাই ।

অন্য জাতিরা যাহা করিতেছে, আমরাও তাহা করিতে পারি, ইহা আমাদেরও ধারণা।

বিনয়বাবু এইসব কথা সদভিপ্রায়েই লিখিয়াছেন। তাঁহার কথাগুলি পড়িয়া যদি সকলে সাহস-ও-শ্রম-সাধ্য কাজ করিতে উৎসাহিত হন, তাহা হইলে সুখের বিষয় হইবে। কিন্তু যদি আমরা এই রকম মনে করি যে অগ্রসর বিদেশী জাতিদের সমান হইতে হইলে আমাদিগকে কিছুই করিতে হইবে না, কারণ আমাদের যেসব দোষ আছে, তাহাদেরও সেই-সকল দোষ আছে, তাহা হইলে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হইবে। মানুষ অন্যকে ছোট করিয়া এক প্রকার সুখ পায়। আমরা সে রকম সুখ চাই না। বড়কে ছোট করিয়া বা ছোট ভাবিয়া তাহার সমান হওয়ায় লাভ নাই। নিজে বড় হইয়া বড়র সমান হওয়ায় লাভ আছে। বাস্তবিক, বিনয় বাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সত্য হইলেও আংশিক সত্য মাত্র। আমাদের সব দোষই সভ্য বিদেশীদের থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাদের যে-সব গুণ তাহাদিগকে অগ্রসর, প্রবল ও বড় করিয়াছে, সে-সব গুণ কি আমাদের আছে? তাহা থাকিলে আমরা আমরা কেন, এবং তাহারাই বা তাহারা কেন? তাহারা শক্তিশালী, আমরা শক্তিহীন কেন? দোষে সাম্যে কোন আনন্দ নাই, কোন আশা ভরসা নাই। গুণে সাম্যই প্রকৃত আশা ভরসার কারণ হইতে পারে।

আমাদের ইহা বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে, যে, যে পশ্চাতে পড়িয়া যায় সে যদি হাঁটিয়া বা দৌড়িয়া সাম্‌নের মানুষটিকে ধরিতে চায় বা তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে অগ্রবর্ত্তীর চেয়ে অধিকতর দ্রুতগামী হইতে হয়। পশ্চাৎবর্ত্তী যে, তাহার হাঁটিবার বা দৌড়িবার শক্তি অগ্রবর্ত্তীর চেয়ে কম হইলে ত চলিবেই না, সমান হইলেও চলিবে না; বেশী হওয়া চাই। কারণ, সে যতটা পথ পেছনে পড়িয়াছে, তাহা সারিয়া লইতে হইবে, এবং তাহার পর অগ্রবর্ত্তীর পাশাপাশি বা তাহাকে পেছনে ফেলিয়া চলিতে হইবে। সুতরাং পশ্চাৎবর্ত্তী মানুষটির দৌড়িবার শক্তি বেশী হওয়া দরকার।

কার্য্যক্ষেত্রেও দেখিতে পাই, আমাদের মধ্যে খুব শক্তিশালী বা প্রতিভাশালী যিনি, তিনিও সাধারণ একজন ইউরোপীয়ের সমকক্ষ বলিয়া পরিগণিত হন না। বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সাধারণ একজন ইংরেজ যুবক যে কাজের উপযুক্ত বিবেচিত হন, ঠিক্ সেই পরীক্ষায় যে ভারতীয় যুবক প্রথম বা তাহার কাছাকাছি স্থান অধিকার করিয়াছেন, তিনিও সে কাজের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হন না। যে-সব ভারতীয় বিজ্ঞানাধ্যাপক ও বিজ্ঞানের ছাত্র নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহারা, যে-সকল ইংরেজ গবেষণা করেন নাই, তাঁহাদের সমকক্ষ বিবেচিত হন না। এসব অবিচার বটে, কিন্তু সংসারের রীতিই এইরূপ। এ দেশেও বিদ্বান্ (ও অবিদ্বান) "উচ্চ"-জাতীয়ের যতটা সম্মান আছে, ঠিক্ তাহার সমান বিদ্বান্ "নিম্ন"-শ্রেণীস্থ লোকের ততটা সম্মান নাই।

যে কারণেই হউক, সংসারে যিনি বা যে জাতি পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে বিশেষ চেষ্টা ও বিশেষ তপস্যার দ্বারা অগ্রবর্ত্তীদের সমকক্ষতা করিতে হইবে। পরীক্ষার ভাষায় বলিতে গেলে, অগ্রবর্ত্তীরা যদি পরীক্ষায় শতকরা ৩৫ নম্বর পান, এবং পশ্চাৎবর্ত্তীরা বার বার শতকরা ৭০ নম্বর পান, তবেই তাঁহারা অগ্রবর্ত্তীদের সমান ও সমকক্ষ বলিয়া বিবেচিত হইবেন। অতএব, সভ্য ও প্রবল বিদেশীদের কি কি দোষ আছে, তাহা আমরা ভাবিব না। আমরা সকলপ্রকার গুণে তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিব। শারীরিক স্বাস্থ্যে ও শক্তিতে, সাহসে, বুদ্ধিমত্তায়, প্রতিভায়, পাণ্ডিত্যে, সচ্চরিত্রতায়, স্বার্থত্যাগে, মানবের ও অপর জীবের সেবায়, দলবদ্ধভাবে কাজ করিবার ক্ষমতায়, আমরা কোন জাতি অপেক্ষা হীন থাকিব না, এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আমাদিগকে করিতে হইবে। কিন্তু সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে আমাদিগের চেষ্টা অন্যজাতিদের চেষ্টা অপেক্ষা প্রবল হওয়া আবশ্যক। আমরা বিদেশীদের চেয়ে অনেক বড় হইলে তবে তাহাদের সমকক্ষতা করিতে পারিব।

কাঠের মধ্যে যেমন আগুন লুকান থাকে, ঘষিতে

ঘষিতে তাহা প্রকাশ পায়, তেমনি সকল রকমের শক্তি সব জাতির মধ্যেই আছে; চেষ্টার দ্বারা তাহার বিকাশ হয়। সুতরাং আমাদের নিরাশ হইবার কোনই কারণ নাই। কিন্তু প্রত্যেককে জীবনব্যাপী চেষ্টা করিতে হইবে।

শ্রমসাধ্য কার্য্যে বাঙ্গালী।

অনেকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, যে, রেলের কুলি, পাটের কলের মজুর, কলিকাতার মুটিয়া, বাড়ীর চাকর, নদীর মাঝি মাল্লা, এমন কি ধানের ক্ষেতের মজুর, প্রভৃতি শ্রমজীবীদের মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যা খুব কমিয়া যাইতেছে। কোন কোন রকমের শ্রমজীবী সবই অবাঙ্গালী। ইহা বড় দুর্লক্ষণ। ইহার কারণ নির্ণয় করা একান্ত আবশ্যক। শারীরিক কারণের মধ্যে অকালমাতৃত্ব প্রভৃতি সামাজিক প্রথা, যথেষ্ট আহারের অভাব, এবং রোগ, এই তিনটি দেশবিশেষের লোককে দুর্ব্বল ও শ্রমে অসমর্থ করিয়া ফেলিতে পারে। যে-সকল প্রদেশ হইতে সাধারণতঃ কুলি মজুর বাঙ্গলা দেশে আসে, তথাকার সামাজিক রীতিনীতি ও বাঙ্গালার রীতিনীতিতে, অনিষ্টকারিতা হিসাবে, বিশেষ প্রভেদ নাই; অকালমাতৃত্ব বঙ্গে কিছু বেশী হইতেও পারে। সে-সব প্রদেশের চেয়ে বঙ্গে অন্নাভাবও বেশী নয়। কিন্তু বহুকাল হইতে বঙ্গে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব বেশী। তাহা হইলে, বাঙ্গালী কি রোগে জীর্ণ হইয়া শ্রমে অসমর্থ হইয়া পড়িতেছে? নৈতিক ও মানসিক কারণও থাকিতে পারে। কিন্তু শ্রমজীবী শ্রেণীর বাঙ্গালীরা অন্যান্য প্রদেশের শ্রমজীবীদের চেয়ে কি বেশী দুশ্চরিত্র? তাহা ত বোধ হয় না। হয় ত মোটের উপর বাঙ্গালীরা একটু অধিক বিলাসী ও আরামপ্রিয়। আমরা ভদ্রশ্রেণীর বাঙ্গালীরা দৈহিকশ্রমে অনভ্যস্ত ও কাতর। অন্য সব শ্রেণীর লোকেদের আদর্শ আমরা। তাহারা আমাদের মত "বাবু" হইতে চায়। আমরা যদি তাহাদিগকে লেখায় ও বক্তৃতায় শারীরিক শ্রমের গৌরব শিক্ষা দিতে থাকি, কিন্তু কাজে "বাবু"ই থাকিয়া যাই, তাহা হইলে কোন প্রতিকার হইবে না। কারণ, তাহারা ভাবিতে পারে, বাবুরা সুখটি নিজেদের জন্য রাখিয়া কষ্টটি আমাদের ঘাড়েই রাখিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। আমরা নিজে যদি দৈহিকশ্রমসাধ্য কাজগুলিও করিতে থাকি, তাহা হইলে মঙ্গল হইবে। বাস্তবিক, দেশের মধ্যে একদিকে যেমন একটা বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছে, অন্যদিকেও তেমনি হওয়া চাই। লেখাপড়ার কাজ যেমন এখন সব শ্রেণীর লোকই করিতে আরম্ভ করিতেছে, "ভদ্র" ও "সাধারণে" কোন প্রভেদ থাকিতেছে না, তেমনি শারীরিক শ্রমের কাজও সব শ্রেণীর লোকেরই করা আবশ্যক। মাটি চষিয়া তাহা হইতে প্রচুর শস্য পাইতে হইলে লাঙ্গল দিয়া উপরের মাটিকে নীচে, নীচের মাটিকে উপরে করিয়া ফেলিতে হয়। সব দেশের মানবসমাজেও আজকাল এইরূপে সমুদয় সামাজিক স্তর, কোথাও ধীরে ধীরে কোথাও বা দ্রুতবেগে, উল্টাপাল্টা হইয়া যাইতেছে। ইহাতে আপাততঃ বুনিয়াদি, অভিজাত, সম্ভ্রান্ত বা ভদ্রলোকদের আরামের ব্যাঘাত হইলেও, পরিণামে ইহা হইতে মঙ্গল হইবে।

মফঃস্বলের সংবাদপত্র।

কলিকাতায় বসিয়া কাগজ চালাইবার সময় আমরা কখন কখন মফঃস্বলে কাগজ চালান যে কিরূপ কঠিন তাহা ভুলিয়া যাই। এখানে আমরা, সামান্য রাজকর্ম্মচারীর ত কথাই নাই, রাজা উজীরকেও অবাধে কলমের খোঁচা দিয়া থাকি; কিন্তু মফঃস্বলে কোনও শ্রেণীর হাকিম বা কোনও শ্রেণীর পুলিসকর্ম্মচারীকে অসন্তুষ্ট করিলে কষ্ট ভোগ করিতে হয়। এমন কি বিচারকদের কোন একটা রায়ের সমালোচনা করিলে অনেকের জীবনোপায় নীলামের ইস্তাহারগুলি বন্ধ হইয়া যায়। তাহার পর সামাজিক হিসাবেও কলিকাতায় যিনি যাহাই লিখুন, তাহাতে কখন কখন কাগজের কাটুতি কমিলেও, প্রায় কাহাকেও ব্যক্তিগত বা পারিবারিক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয় না। মফঃস্বলের সর্ব্বত্র, অন্ততঃ ছোট ছোট সহরগুলিতে, অবস্থা এরূপ নয়। মফঃস্বলের কোন কাগজের গ্রাহকসংখ্যা ও বিজ্ঞাপনের আয় কলিকাতার কাগজগুলির মত হইতে পারে না। এইরূপ নানাবিধ কারণে মফঃস্বলের সম্পাদকদিগকে বহু অসুবিধার মধ্যে কাজ করিতে হয়। ইহাতে তাঁহাদের পূর্ণমাত্রায় শক্তিপ্রয়োগে ব্যাঘাত জন্মে।

কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে মফঃস্বলের কাগজগুলির সুবিধাও আছে। যেটি যে জেলার কাগজ তাহার সেই জেলার ইতিহাস, কিম্বদন্তী, প্রাচীনকীর্ত্তি, ব্যবসাবাণিজ্য, প্রাচীন

সাহিত্য, লোকমুখে প্রচলিত গান ছড়া, প্রধান প্রধান লোকদের জীবনচরিত, প্রভৃতি নানাবিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া লিখিবার সুবিধা আছে। জেলার স্বাস্থ্য শিক্ষা ধনাগম প্রভৃতি বিষয়ে লিখিবারও বিশেষ সুযোগ আছে। কোন্ জেলার বিশেষ অভাব প্রয়োজন কি, তাহা সেই জেলার কাগজ যেমন করিয়া লিখিতে পারিবে, অন্যে তেমন পারিবে না। বাঙ্গলাদেশের প্রত্যেক হাজার অধিবাসীর মধ্যে কেবল ৬৪ জন সহরে, বাকী ৯৩৬ জন গ্রামে বাস করে। দেশের উন্নতির মানে গ্রামের উন্নতি। গ্রামের উন্নতির বিষয়ে মফঃস্বলের কাগজে যেমন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে লেখা যায়, সহরের কাগজে ততটা পারা যায় না। মফঃস্বলের কাগজগুলিতে বর্ত্তমান যুদ্ধের সংবাদ বা অন্য সাধারণ সংবাদ কিছুই থাকিবে না, ইহা আমরা বলি না। কিন্তু এসব বিষয়ে মফঃস্বলের কাগজগুলি কলিকাতার অতিকায় কাগজগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবেন না। আমরা যেসব বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার আলোচনায় মফঃস্বলেরই জিত হইতে পারে। এইজন্য সাধারণ বড় বড় খবরগুলি ছাপিয়া, ঐসকল স্থানীয় বিষয়ে যিনি যত মন দিবেন, তাঁহার দ্বারা দেশের সেবা তত বেশী হইবে। সত্য বটে, বার বার কেবল রোগ ও অন্নকষ্টের একঘেয়ে খবর দিয়া কাগজ চালান যায় না। কিন্তু একঘেয়ে হইলেও এসব খবর দেওয়া দরকার। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকারের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া আশার কথাও মানুষকে শুনাইতে হইবে। অন্য যেসব বিষয়ে লেখা যায়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। গ্রাম্যজীবনের বাস্তব-চিত্রপূর্ণ গল্পও বেশ উপাদেয় এবং হিতকর হইতে পারে।

জেলাশাসন কমিটীর রিপোর্ট এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে ভারতগবর্ণমেণ্টের মন্তব্য, এই-দুটি বিষয়ের মফঃস্বলের সংবাদপত্রগুলিতে বিস্তৃত আলোচনা হইলে ভাল হয়। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে কেবল স্থানিক স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে আলোচনার জন্য একটি কাগজ আছে; বঙ্গে নাই। আমাদের ভিন্ন ভিন্ন জেলার কাগজগুলি ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, লোক্যালবোর্ড ও মিউনিসিপালিটির কার্য্যের বিশেষভাবে আলোচনা করিলে এই অভাব পূর্ণ হইতে পারে।

জাতীয় গৌরব।

ভারতবাসীরা স্বাধীন না হইলেও প্রত্যেক প্রদেশের লোকদেরই সত্য বা কল্পিত একএকটা গৌরবের বিষয় আছে। আমরা বাঙ্গালী, আমরা মারাঠা, আমরা রাজপুত, আমরা পাঞ্জাবী, এই বলিতে বলিতে প্রত্যেকের মনে নিজের প্রদেশের প্রাধান্যের একটা অস্পষ্ট অনুভূতির উদ্রেক হয়। যতক্ষণ এই গৌরববোধ মানুষকে ভাল ও বড় কাজে প্রেরণা দেয়, ততক্ষণ ইহা ভাল। কিন্তু যখন ইহার বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ ঈর্ষ্যাদ্বেষে জর্জ্জরিত হইতে থাকে এবং অপরকে ছোট করিতে চায়, অপরের উপর প্রভুত্ব করিতে চায়, পরশ্রীকাতর হয়, অপরের অনিষ্ট করিতে চায়, তখন ইহার যে একটা অপকারিতাও আছে, তাহা বুঝা যায়। এই অপকারিতা পরাধীন জাতিদের ব্যবহার দ্বারা সব সময় স্পষ্ট বুঝা যায় না। কিন্তু স্বাধীন ও প্রবল জাতিদের ব্যবহারে ইহা সহজেই চোখে পড়ে। ইউরোপে যে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে, তাহার মূলে জাতীয় প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা বিদ্যমান।

ঐতিহাসিক লর্ড ব্রাইস্ অল্পদিন পূর্ব্বে লণ্ডনে "Race Sentiment as a Factor in History", এই বিষয়ে (অর্থাৎ জাতীয়তা বোধ দ্বারা ইতিহাসের গতি কিরূপে নিয়মিত হইয়াছে, বা ইতিহাস কিরূপে গঠিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে) একটি বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি বলেন, বিদ্বান্ লোকেরা তাঁহাদের পুস্তকগুলি দ্বারা এক-একটা জাতিকে তাহাদের নিজের শ্রেষ্ঠতা-বোধ দ্বারা অহঙ্কৃত করিয়া তুলিয়া গ্রন্থলিখনের যে অপব্যবহার করিয়াছেন, তদপেক্ষা অপব্যবহার তাঁহারা আর কখন করেন নাই। নিজের জাতি সম্বন্ধে তিনি বলেন যে তাহাদের আপনাদের শ্রেষ্ঠতায় দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিলে তাহারা অন্যজাতিসকলকে অবজ্ঞা করিয়া তাহাদিগকে অধঃপাতিত করিতে চেষ্টা করিতে পারে। আরও নিখুঁত জ্ঞান এবং আরও গভীর অন্তর্দৃষ্টি সকল লোককে শিক্ষা দিতে পারে যে প্রতিযোগিতায় যত লাভ হয় বন্ধুত্ব দ্বারাও তত হয়, এবং বিদ্বেষ অপেক্ষা প্রেম দ্বারা বেশী লাভবান হওয়া যায়।

লাভলোকসান্ ধরিতে গেলে ব্রাইস্ যাহা বলিয়াছেন

তাহা সত্য। কিন্তু লাভলোক্‌সানের কথাটা তোলাই ঠিক্ নয়। কারণ ধর্ম্মবুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকে ক্ষতিলাভ গণনার অধীন করিলে অনেকস্থলে মানুষ ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিবে। আপাততঃ যদি ক্ষতিও হয়, তথাপি প্রেম ও বন্ধুত্ব ভাল।

আমরা ভাল হইব, আমরা বড় হইব, এইরূপ ইচ্ছা স্বাভাবিক ও বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আমরা সকলের চেয়ে ভাল ও বড় থাকিব বা হইব, এরূপ ইচ্ছা জগতে শান্তিরক্ষার অনুকূল নহে। কাহাকেও যদি বল, তুমি চিরকাল ছোট থাকিবে, তাহাতে তাহার অপমান হইবে। সে সেই অপমানকর অবস্থায় চিরকাল কেন থাকিবে? যে তাহাকে ছোট রাখিতে চায়, তাহাকে সে ভাল বাসিবে কেমন করিয়া? বাস্তবিকও ইতিহাসে দেখা যাইতেছে, কোন জাতিই চিরকাল বড় ছিল না, কোন জাতিই চিরকাল বড় থাকে না; এখন যাহারা শক্তিহীন ও অনুন্নত, তাহাদের মধ্যে অনেকে পূর্ব্বে শক্তিশালী ও উন্নত ছিল। অনেকে অধঃপতিত হইয়া আবার সবল ও উন্নত হইয়াছে। অতএব যাহারা ধার্ম্মিক, প্রেমিক, মানবজাতির প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন, তাহাদের পক্ষে এইরূপ ইচ্ছা হওয়াই স্বাভাবিক যে আমরাও ভাল এবং বড় হই, তোমরাও ভাল এবং বড় হও; সকলে বন্ধুভাবে সকলের সমকক্ষতা করি। সকল জাতি প্রত্যেক বিষয়ে পরস্পরের সমান হইতে পারে কিনা সন্দেহ। ভৌগোলিক ও অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে কেহ এক বিষয়ে কেহ বা অন্য বিষয়ে বেশী পারদর্শী হইবে। কিন্তু মোটের-উপর সাম্যের ভাবই মানবের লক্ষ্যস্থল হওয়া উচিত।

পণের বিরুদ্ধে হিন্দুরাজার ব্যবস্থা।

দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগর সাম্রাজ্যের রাজা দ্বিতীয় দেব রায় আনুমানিক ১৪২২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বকালে মরকতনগর প্রদেশে ব্রাহ্মণদের মধ্যে কন্যাপণ গ্রহণের খুব প্রাদুর্ভাব হয়। দেব রায় মরকতনগর-প্রান্তের তমিল, তেলুগু, কর্ণাট ও লাট শ্রেণীর সমুদয় ব্রাহ্মণদিগের প্রতিনিধিগণকে একত্র করেন। প্রত্যেক গ্রামের অন্ততঃ একজন লোককে প্রতিনিধি পাঠাইতে আদেশ করা হয়। সকলে সমবেত হইলে এই বৃহৎসভায় পণগ্রহণ শাস্ত্রীয় কিনা, তাহার বিচার হয়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে উহা অশাস্ত্রীয়। তাহার পর শাস্ত্রের বিধি লঙ্ঘনের দণ্ড কিরূপ হওয়া কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে আলোচনা হইয়া ধার্য্য হয় যে পাতিত্য এবং সমাজ হইতে বহিষ্কার ইহার দণ্ড। অতঃপর রাজা বিবাহ-উপলক্ষে কোনপ্রকার আর্থিক আদানপ্রদান নিষেধ করিয়া দেন, এবং আদেশ করেন যে অপরাধীদিগকে কেবল যে পতিত ও সমাজবহিষ্কৃত করা হইবে তাহা নয়, অন্যান্য অপরাধীদের মত তাহারা সাধারণ আইন অনুসারেও দণ্ডিত হইবে। এই দণ্ড কিরূপ ছিল, তাহা ইতিহাস হইতে জানা যায় নাই।

দেশীয় রাজ্যে অবৈতনিক শিক্ষা।

সাচিন বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর একটি ক্ষুদ্র দেশীয়রাজ্য। উহার রাজা আদেশ করিয়াছেন যে আগামী ১লা আগষ্ট হইতে তাঁহার প্রজারা বিনাব্যয়ে শিক্ষা পাইবে। ভারতবর্ষের আরও কয়েকটি দেশীয়রাজ্যে বালকবালিকারা বিনাব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষা পাইয়া থাকে। বাঙ্গলাদেশে কেবল কুচবিহার এবং পার্ব্বত্য ত্রিপুরা দেশীয় রাজার অধীন। এই দুই রাজ্যে সমুদয় বালকবালিকা অন্ততঃ প্রাথমিকশিক্ষা যদি বিনাব্যয়ে পায়, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। বাংলা দেশের অনেক জমিদারের আয় অনেক ছোট ছোট দেশীয়-রাজ্যের সমান। তাঁহারা নিজ নিজ জমিদারীতে যদি সর্ব্বত্র অবৈতনিক প্রাথমিক পাঠশালা স্থাপন করেন, তাহা হইলে প্রজাদের মঙ্গল হয়। কৃষি এইসকল পাঠশালার একটি প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য।

অবৈতনিক বিদ্যালয়।

আমেরিকায় সমুদয় বালকবালিকা স্কুলসমূহে বিনা-বেতনে প্রাথমিক ও উচ্চতর শিক্ষা পাইতে পারে। বিলাতে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক। সিংহলদ্বীপে দেশীয়ভাষায় শিক্ষা দিবার বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে বেতন দিতে হয় না। মলক্কা, পেনাংদ্বীপ এবং ওয়েলেস্‌লী প্রদেশে বালকগণ বিনাবেতনে মাতৃভাষায় শিক্ষা পায়। মরিশশ-দ্বীপে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক। কানাডার বিদ্যালয়ে বিনাব্যয়ে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা পায়। ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় বিদ্যালয়সকলে বেতন দিতে হয় না। নোভাস্কোশিয়া

এবং নিউব্রান্স্‌উইকেও তদ্রূপ। জামেকাদ্বীপের সরকারী বিদ্যালয়গুলি অবৈতনিক। অষ্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েল্‌সে প্রাথমিক ও উচ্চতর বিদ্যালয়গুলি অবৈতনিক; ভিক্টোরিয়ার বিদ্যালয়ের শিক্ষা অবৈতনিক; কুইন্স্‌ল্যাণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা তদ্রূপ; দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ায় বিনাবেতনে লেখা পড়া শিখান হয়। নবজীলণ্ডে বিদ্যালয়ের শিক্ষা অবৈতনিক। দক্ষিণ আমেরিকার আর্গেণ্টাইন সাধারণতন্ত্রে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক। বেল্‌জিয়মে ব্রসেল্‌স্‌ ও লুভেন বিশ্ববিদ্যালয় দুটিতে বিনাবেতনে শিক্ষা দেওয়া হয়; অবৈতনিক বেসরকারী ইস্কুলও অনেক আছে। দক্ষিণ আমেরিকার সাল্‌ভাডর, পারাগুয়ে, হণ্ডুরাস, গোয়াটিমালা, ইকোয়েডর, কোলোম্বিয়া ও বোলিভিয়া, এই সাধারণতন্ত্রগুলিতে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক। চিলিতে এবং ব্রেজিলেও সর্ব্ববিধ শিক্ষা ঐরূপ। বুল্‌গেরিয়াতেও তাই। ডেন্মার্কের সরকারী ইস্কুলগুলি, দুএকটি মধ্যশ্রেণীর ইস্কুল ছাড়া, অবৈতনিক। ফ্রান্সের সমুদয় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় অবৈতনিক। জার্ম্মেন সাম্রাজ্যের প্রশিয়া ও অন্যান্য রাজ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেতন লওয়া উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। হাইটীদ্বীপ সাধারণতন্ত্র। ইহার অধিকাংশ অধিবাসী নিগ্রো। এখানে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক। ইটালীর নিম্ন ও উচ্চ প্রাথমিক স্কুলসকলে বেতন লওয়া হয় না। জাপানের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে বেতন লওয়া হয় না। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে শতকরা কেবল ১৪ জন ছাত্রছাত্রী বেতন দিয়াছিল। এখন কাহাকেও দিতে হয় না। মেক্সিকোতে ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে বেতন দিতে হয় না। মণ্টিনিগ্রোতেও তাই। পেরুতে সরকারী পাঠশালাসকলে বেতন লওয়া হয় না। রুমেনিয়ায় শিক্ষা অবৈতনিক। সাণ্টো ডোমিঙ্গোর পাঠশালাসকলে বেতন লওয়া হয় না। সার্ভিয়াতেও তাই। স্পেনের স্কুলসকলের অধিকাংশ বালকবালিকা বিনাবেতনে শিক্ষা পায়। সুইডেনে বালকবালিকারা বিনাব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষা পায়। সুইজারল্যাণ্ডেও তাই। এই দেশে পাঠশালার ছেলেমেয়েরা স্কুল হইতে বিনামূল্যে পুস্তক, শ্লেট, কাগজ, কলম, পেন্সিল পায়। অন্য অনেক দেশেও এইরূপ ব্যবস্থা আছে। তুরস্কেও বিনা ব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়। ভেনিজুয়েলার বন্দোবস্তও ঐ প্রকার।

অতএব দেখা যাইতেছে, পৃথিবীর প্রায় সমুদয় সভ্য দেশে অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক। ধনশালী দেশে যেমন, অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশেও তেমনি। ভারতবর্ষে কেন সমুদয় বালকবালিকাকে বিনাব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষা পাইবার অধিকারী করা হইতেছে না? যিনি যে উপায়ে পারেন গবর্ণমেণ্টকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন, এবং নিজেও জ্ঞান দান করুন।

সম্পাদকের কর্ত্তব্য।

সম্পাদকের কাজ ভাল করিয়া করিতে হইলে যেরূপ শিক্ষার প্রয়োজন, ভারতবর্ষে সেরূপ শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত কোথাও নাই। কেহ কেহ ভাল করিয়া সাধারণ শিক্ষা পাইয়া সম্পাদক হন; কেহ কেহ তাহার উপর কোন যোগ্য সম্পাদকের অধীনে কাজ করিয়া খবরের কাগজ চালাইবার বিশেষ শিক্ষা লাভ করেন। অনেকে ভাল করিয়া সাধারণ শিক্ষা বা কার্য্যতঃ খবরের কাগজ চালাইবার শিক্ষা না পাইয়াও সম্পাদকের কাজে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু আমরা যে-ভাবেই কাজে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি, চেষ্টা করিলে অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারি। সাধারণ লেখাপড়া ছাড়া, সম্পাদকদের ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান (political science), সমাজতত্ত্ব (sociology), ব্যবস্থাবিজ্ঞান (jurisprudence), অপরাধতত্ত্ব (criminalogy), নানা লৌকিক ও বৈষয়িক ব্যাপারের সাংখ্যিকতত্ত্ব statistics), বার্ত্তাশাস্ত্র, পৌর ও জানপদবর্গের অধিকার ও কর্ত্তব্য (civics), নানাদেশে গ্রামের সহরের ও সমস্তদেশের সার্ব্বজনিক কাজ কিরূপে সম্পন্ন হয় তাহার বৃত্তান্ত, নানাদেশের শিক্ষার শান্তিরক্ষার ও স্বাস্থ্যরক্ষার বিবরণ, কৃষি বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতির উপায়, প্রভৃতি জানা আবশ্যক। আমরা এসব বিষয় অল্পই জানি। কিন্তু তথাপি হাল ছাড়িয়া দিয়া কেবল শূন্যগর্ভ মুরুব্বিয়ানা এবং ফাঁকা প্রশংসা নিন্দা বা গালাগালিকেই আমাদের হাতের একমাত্র হাতিয়ার করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

দেশের স্বাস্থ্য কেমন করিয়া ভাল হয়, কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি কেমন করিয়া হয়, শিক্ষার বিস্তৃতি ও

উৎকর্ষসাধন কিরূপে হয়, কি উপায় অবলম্বন করিলে আমরা রাষ্ট্রীয় নানা অধিকার লাভ করিতে পারি, এবং লাভ করিয়া তদনুরূপ কর্ত্তব্য পালন করিতে পারি, সামাজিক কুরীতিসকল যে কুরীতি তাহা দেশবাসীকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা বুঝাইয়া দিয়া কেমন করিয়া তৎসমুদয় উন্মূলিত করা যায়, ইত্যাদি নানা বিষয়ে আমাদিগকে লিখিতে হয়। কিন্তু সম্পাদক বলিয়া আমরা সবজান্তা নহি। বহুবিষয়ের জ্ঞানও আমাদের নাই। আমরা প্রত্যেকে যদি অন্ততঃ একএকটা বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে, সমুদয় সম্পাদকগণের সম্মিলিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় দেশবাসী কর্ত্তব্যসম্বন্ধে আলোক পাইয়া পথ চিনিয়া লইতে পারে। কিন্তু এখন অবস্থা এরূপ যে আমরা কেবল পাঠকদিগকে বলি, হ্যান কর, ত্যান কর, কিন্তু তাঁহারা যদি আমাদিগকে শিক্ষা স্বাস্থ্য শিল্প বা অন্য কোন বিষয়ে কেজো রকমের কোন একটি বিশদ প্রণালী দেখাইয়া দিতে বলেন, তাহা হইলেই আমরা বিপদে পড়ি। দৃষ্টান্তস্বরূপ লোকশিক্ষার কথাই ধরুন। এই কাজ যাঁহারা হাতে কলমে করিতেছেন, তাঁহারা যদি সব বৃত্তান্ত খবরের কোগজে ছাপেন ত ঐরূপ কাজ করিতে ইচ্ছুক অপর লোকদের সুবিধা হয়। কেমন করিয়া স্কুল স্থাপিত হইল, ছাত্র কাহারা, শিক্ষক কাহারা, ছাত্রসংগ্রহ কেমন করিয়া হইল, কোন্ সময়ে কতক্ষণ শিক্ষা দেওয়া হয়, কি কি বিষয় শিখান হয়, স্কুলের ব্যয় নির্ব্বাহ কেমন করিয়া হয়, বৎসরের কোন্ কোন্ মাসে স্কুলের ছুটি থাকে, পুস্তক পড়ান ও বাচনিক উপদেশ দেওয়া ব্যতীত আর কি কি উপায়ে শিখান হয়, কি কি পুস্তক পড়ান হয়, এইরূপ নানা কথা লেখা যাইতে পারে।

জ্ঞাপন।

নিজের বা নিজের কাজের সম্বন্ধে নানাভাবে নানাস্থানে নানা কাগজে বলান ও লেখান দুই প্রকার উদ্দেশ্যে দুই রকমে হইতে পারে। একরকম হ'চ্চে আপনাকে জাহির করা; নিজের নাম নিজের খ্যাতি সর্ব্বত্র বিস্তারিত হয়, তাহার চেষ্টা দেখা; সভাসমিতিতে সাম্নের আসনে, সভাপতির পাশে, উচ্চমঞ্চে, ঠেলাঠেলি করিয়া আসন দখল করা। আর একরকম হচ্চে, কোন সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা যখন সেই কার্য্যে বহুলোকের যথেষ্ট পরিমাণ সাহায্য পাইবার জন্য, নানাপ্রকারে সর্ব্বদা সেই ভাল কাজটিকে সর্ব্বসাধারণের চোখের সামনে রাখিতে চান। এরূপ করিতেও বিনয়ী আত্মগোপনশীল লোকদের নিতান্ত সঙ্কোচ বোধ হয়। কিন্তু কাজটি সুসম্পন্ন করিতে হইলে তাঁহাদিগকে সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া আসরে নামিতে হয়। অবশ্য তাঁহারা কাজটিকে জাহির করিবেন বলিয়া সত্যকে অতিক্রম কখন করিবেন না। কাজটি সম্বন্ধে সত্য যাহা তাহাই বলিবেন। একখানি ভাল বহি লিখিয়া বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিলে যেমন তাহারও প্রচার হয় না, লোকেরও উপকার হয় না, তেমনি যেসব সদনুষ্ঠানের সফলতার জন্য বহুলোকের সাহায্যের দরকার, সেইসকল সদনুষ্ঠানের কথা সর্ব্বদা কাগজে পত্রে নানাভাবে লোককে বলা দরকার। সবাই নিজের নিজের কাজে, আমোদে, সুচিন্তায়, দুর্ভাবনায় ব্যাপৃত থাকেন। তাঁহাদিগকে সদনুষ্ঠানটির কথা বারবার শুনাইয়া উহার জন্য সাহায্য পাইতে হয়, এবং তাঁহাদিগকেও সৎকার্য্যে সহকারিতা করিবার সুযোগ দিয়া উপকৃত করিতে হয়। অনেকের মুখে এইরূপ যুক্তি শুনা যায়, ভগবানের উপর নির্ভর করিলেই সব হয়; লোককে জানাইবার আবশ্যক কি? আমরাও ভগবানের উপর নির্ভর করায় বিশ্বাস করি। কিন্তু চেষ্টার সঙ্গে বিশ্বাসের কোন বিরোধ দেখি না। ভগবান্ যে-রকমের কাজে সাফল্যের জন্য যে-সকল শক্তি আমাদিগকে দিয়াছেন, আমাদের বুদ্ধি ও অপরের অভিজ্ঞতা দ্বারা আমাদিগকে যেসব উপায় দেখাইয়া দিয়াছেন, সেইসকল শক্তির সুব্যবহার না করা, সেইসব উপায় অবলম্বন না করা, কখনই ভগবানে বিশ্বাস নামের যোগ্য নহে। শক্তি প্রয়োগ ও উপায় অবলম্বনও বিশ্বাসের পরিচায়ক। ফসল পাইবার জন্য চাষী মাঠে লাঙ্গল না দিয়া যদি ঘরে বসিয়া থাকে, তাহাকে আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী বলি না। আমাদের দেশের অনেক সদনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তক ও কর্ম্মকর্ত্তারা অনেক সময় দুঃখ করিয়া বলেন যে তাঁহারা লোকের কাছে যথেষ্ট সাহায্য পান না। কিন্তু তাঁহারা সাহায্য পাইবার চেষ্টা কতটুকু করেন তাহাও বিবেচ্য। এমন কর্ম্মকর্ত্তা

আছেন, যাঁহাদিগকে তাঁহাদের কাজ সম্বন্ধে চিঠি লিখিয়া প্রয়োজনীয় সংবাদ ও অন্যবিধ উপকরণ পাওয়া যায় না, বা যাঁহারা যথাসময়ে বার্ষিক রিপোর্ট ছাপেন না বা যাঁহারা ছাপিয়াও সম্পাদকদিগকে প্রেরণ করেন না, কিংবা যাঁহারা চাঁদা দিতে অভ্যস্ত ও ইচ্ছুক এরূপ লোকদের নিকট হইতেও নিয়মিতরূপে চাঁদা আদায় করেন না। আর একরকমের লোক আছেন যাঁহারা কেবল ২।৪ জন ধনী লোকের অনুগ্রহলব্ধ ১০।২০ হাজার বা ২।১ লাখ টাকার প্রত্যাশায় থাকেন, সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে অল্প অল্প সাহায্য পাইবার বন্দোবস্ত করেন না। সৎকাজটিকে লোকের কাছে উপস্থিত করিবার লোক থাকিলে এবং কাজটি ভাল করিয়া করিবার লোক থাকিলে আমাদের দেশেও, আপাততঃ যাহা দুঃসাধ্য মনে হয়, তাহা সুসাধ্য হইতে পারে।

সমালোচনা।

সমালোচকের যে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার, এটা বলিলে অনেকেই স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিবেন। সমালোচনার সময় কিন্তু আমরা অনেকে এরূপ সুবুদ্ধির পরিচয় দি না। যে বহি বা প্রবন্ধের সমালোচনা হইতেছে, তাহার সমালোচক যদি লেখক অপেক্ষা বেশী বিদ্বান্ ও যোগ্য লোক হন, তাহা হইলে ত সমালোচনা বেশ ভালই হইতে পারে। কিন্তু সমালোচ্য বিষয়ের যথেষ্ট জ্ঞান যদি সমালোচকের থাকে, তাহা হইলেও কাজ চলিতে পারে। আরও কোন কোন স্থলে সমালোচনা মন্দ হয় না। মনে করুন একজন লেখক স্পেনদেশের একখানি ইতিহাস লিখিয়াছেন। সমালোচক স্পেনের ইতিহাস লেখেন নাই, কিন্তু তিনি অন্যের লেখা স্পেনের ইতিহাস পড়িয়াছেন এবং অন্য একদেশের ভাল ইতিহাস লিখিয়াছেন; এক্ষেত্রে তাঁহার সমালোচক হইবার যোগ্যতা আছে বলিতে হইবে। কিম্বা যদি তিনি নিজে কোন ইতিহাস না লিখিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি যদি উৎকৃষ্ট ইতিহাস পড়িয়া থাকেন, এবং ইতিহাস রচনার প্রণালী অবগত থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহার দ্বারা সমালোচনা হইতে পারে। যিনি নিজে কবি নহেন, তিনি নানা কাব্যের রস আস্বাদন করিয়া এবং শ্রেষ্ঠ সমালোচকদিগের কাব্যসমালোচনা অধ্যয়ন করিয়া কাব্যসমালোচনার যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন।

এক রকমের সমালোচনা আছে, তাহার নাম মুরুব্বিয়ানা। সমালোচক গ্রন্থকারের পিট চাপড়াইয়া বলিলেন বেশ লিখেছ হে, বেশ লিখেছ। ইহাতে বিজ্ঞাপন দিবার সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু ইহাকে সমালোচনা বলা চলে না। আর এক রকমের সমালোচনা আছে, যাহাকে পণ্ডিতি বলা চলে। এইরূপ সমালোচনায় সমালোচক গ্রন্থকারের বানান, ব্যাকরণ, ছন্দ, অলঙ্কার, প্রচলিত পুস্তকলিখিত নিয়ম অনুযায়ী কিনা, প্রধানতঃ তাহাই দেখেন, এবং উহার সঙ্গে মিল না থাকিলে গ্রন্থকারকে পাস না করিয়া ফেল্ করেন। বানান-ভুল, ব্যাকরণের নিয়মভঙ্গ, ছন্দ ও অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়মভঙ্গ, এইগুলি থাকিলেই কোন গ্রন্থ শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হয়, এমন কথা কে বলিবে? কিন্তু অন্যদিকে বিবেচনা করিবার বিষয়ও কিছু আছে। বিদেশের দৃষ্টান্ত লইলে ধীরভাবে বিচারের সুবিধা হয়। ইংরেজের লেখা ইংরেজী ব্যাকরণে আমরা অনেক দুষ্ট প্রয়োগ এবং অনেক ব্যাকরণের ভুলের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। যে বাক্যগুলি দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত হয়, তাহার মধ্যে অনেকগুলি প্রসিদ্ধ বড় বড় ইংরেজ গ্রন্থকারের লেখা হইতে সংগৃহীত। কিন্তু ইংরেজ বৈয়াকরণেরা যেগুলিকে ভুল বলেন, তাহা সত্ত্বেও এইসকল লেখক শ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছেন; এমন কি তাঁহাদের লিখন-প্রণালী অনুসারে ইংরেজী ব্যাকরণেরই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বাঙ্গলা দেশেও শ্রেষ্ঠ লেখক জন্মিয়াছেন। তাঁহারা যদি বানান, ব্যাকরণ, ছন্দ, অলঙ্কার আদিতে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ না করেন, এমন কি যদি সত্য সত্যই দু চারটা ভুলও করেন, তাহা হইলেও শিক্ষক মহাশয়েরা ছাত্রদের রচনা যেমন করিয়া কাটেন, কোন সমালোচক তাঁহাদের লেখার উপর সেইরূপ পণ্ডিতি ফলাইলে বড় অবিবেচনার কাজ হয়, এবং অত্যন্ত অশোভন হয়। বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের গতি বিদ্যালয়পাঠ্য ব্যাকরণের লেখকদের দ্বারাও নিয়মিত হইবে না, এইসব সমালোচকদের দ্বারাও নিয়মিত হইবে না; নিয়মিত হইবে শ্রেষ্ঠ লেখকদের লেখার দ্বারা। সব দেশে যাহা হইয়াছে, বঙ্গেও তাহাই

হইবে। বাংলা [illegible] লক্ষ্মীছাড়া নয়। অন্যান্য চলিত ভাষার ন্যায় বাংলারও বরাবর পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে, পরেও হইবে। সুতরাং ইহার ব্যাকরণ, ছন্দ, অলঙ্কার আদি চিরকাল এক রকম থাকিবে না। পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন নিশ্চয়ই হইবে; এবং তাহা শ্রেষ্ঠ লেখকদের লেখা অনুসারে হইবে।

কোন কোন সমালোচক কলম চালাইতে চালাইতে চাবুক চালাইবেন বলিয়া ভয় দেখান। শুনা যায়, বঙ্কিমবাবু কখন কখন সমালোচনা করিতে গিয়া কোন কোন গ্রন্থকার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিতেন যে তাহাদের পৃষ্ঠদেশ তাঁহার বেত্রাঘাতের উপযুক্ত নয়। কি অবস্থায় কিরূপ গ্রন্থ সম্বন্ধে তিনি এরূপ লিখিয়াছেন, তাহার বিচার না করিয়া এরূপ সমালোচনা সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য প্রকাশ করা সঙ্গত হইবে না। যাহাই হউক, গ্রন্থকারদের মধ্যে বঙ্কিম বাবুর আসন এরূপ উচ্চে যে তিনি গুরুমহাশয় ও অনেক গ্রন্থকার তাঁহার পাঠশালার পোড়ো, এবং তিনি পোড়োদের পিঠে বেত কষাইয়া দিতেছেন, এরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে। কিন্তু আমরা ত আর সবাই বঙ্কিম নই। সুতরাং আমরা কলম ছাড়িয়া চাবুক ধরিলে লোকে হঠাৎ ভাবিতে পারে যে আমাদের রাখালী বা গাড়োয়ানী করাই পেশা, হঠাৎ লেখক হইয়া বসিয়াছি।

সমালোচনার সকলের চেয়ে সোজা পথ, বিজ্ঞভাবে বলা, "লেখক কি যে লিখিয়াছেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না।" বুঝিতে না পারা দুই কারণে ঘটে। হয় লেখক অসম্বদ্ধ, বা অর্থহীন, বা দুর্ব্বোধ্য, বা প্রলাপবৎ কিছু লিখিয়াছেন, নয় সমালোচকের বুঝিবার শক্তি নাই। কিন্তু নিজের শক্তির অভাব কয়জন স্বীকার করে? সুতরাং দোষটা যে লেখকের তাহাই স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া সমালোচক ধরিয়া লন। গদ্য বা পদ্য যে রচনাটি বুঝিতে হইবে, তাহার প্রত্যেক শব্দের অর্থ, এবং রচনাটি যে ভাষায় লেখা, তাহার ব্যাকরণ আমাদের জানা থাকিতে পারে, অথচ রচনাটি আমাদের হৃদয়ঙ্গম না হইতে পারে। বাংলা লেখকের দৃষ্টান্ত দিলে ঝগড়া হইবে। ইংরেজীর কথাই বলি। ব্রাউনিং, সুইন্‌বার্ন, শেলীর অনেক কবিতার শব্দগুলির অর্থ জানিলেও আমরা কবিতাগুলি বুঝিতে পারি না; শ্রেষ্ঠ সমজ্‌দার কেহ বুঝাইয়া দিলে অর্থগ্রহণ ও রসাস্বাদন করিতে পারি। ইংরেজী আমাদের মাতৃভাষা নয় বলিয়াই যে এমন ঘটে, তাহা নয়। বিদ্বান্ ইংরেজদিগকেও অনেক সময় ভাল ভাল সমালোচনা টীকা ভাষ্য পড়িয়া ভাল ভাল ইংরেজী গ্রন্থ বুঝিতে হয়। দার্শনিক ও কবি যে চিন্তার, রসের, ভাবের, আদর্শের কথা বলিতেছেন, আমাদের তাহা উপলব্ধি, আস্বাদন, অনুভব করিবার শক্তি থাকিলে তবে আমরা তাঁহাদের কথা বুঝিতে পারি। যে যে-স্তরের মানুষ তাহার ভাবগ্রাহিতা ও রসগ্রাহিতা তদ্রূপ। ইংরেজ, ফরাসী, জার্মেন নিজের নিজের মাতৃভাষার অনেক শ্রেষ্ঠ রচনা সমজ্‌দারদের সাহায্য ব্যতিরেকে বুঝিতে পারেন না। বাংলাভাষা ও সাহিত্যই কি এত হীন যে তাহার যে-কোন রচনা শিক্ষিত বাঙ্গালীদের প্রত্যেকের নিকটই অতি সহজ বোধ হইবে? অবশ্য, দুর্ব্বোধ্য রচনা মাত্রেই গভীরভাবপূর্ণ, এমন হাস্যকর কথা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু, আমি বুঝিতে পারিতেছি না বলিয়াই কোন রচনা অসার, এমন মনে করাও উচিত নয়।

কোন গ্রন্থে বা রচনায় কি বলা হইয়াছে এবং কেমন করিয়া বলা হইয়াছে, তাহাই প্রধানতঃ বিচার্য্য। ভিতরের ও বাহিরের জগৎটা পুরাতনও বটে, নূতনও বটে। লেখক নূতন কিছু দেখিয়াছেন, শুনিয়াছেন, অনুভব করিয়াছেন কি না, অথবা পুরাতন যাহা তাহা স্বয়ং নূতন রকমে অনুভব করিয়া নিজস্ব নূতন প্রকারে ব্যক্ত করিয়াছেন কি না, তাহারই আলোচনা করা আগে দরকার।

"প্রবন্ধ-গৌরব"।

ল্যাণ্ডরের "কাল্পনিক কথোপকথন" (Imaginary Conversations) একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। তাহার একটি কথোপকথনে ডাইয়োজেনীস্ প্লেটোকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছেন, "ঘোলা জল অগভীর হইলেও গভীর মনে হয়, স্বচ্ছ জল গভীর হইলেও অগভীর মনে হয়। তেমনি তুমি বাগাড়ম্বর করিয়া লোকের এমন চমক লাগাইয়া দাও যে তাহারা ভাবে যেন তোমার ভাব অতি প্রগাঢ় এবং চিন্তা অতি গভীর। তোমার বক্তব্য সোজা বিশদ ভাষায় বলিতে পার না কেন?"

প্লেটোর রচনা সম্বন্ধে এই বিদ্রূপ সমূলক না অমূলক, তাহার বিচার না করিয়া সাধারণ ভাবে ইহা বলা যাইতে পারে যে অনেক পাঠক ও সমালোচক সেই-সকল প্রবন্ধকে "পাণ্ডিত্যপূর্ণ" বলেন, যাহাতে অনেক কঠিন কঠিন সংস্কৃত শব্দ থাকে, বহু সংস্কৃত বচন উদ্ধৃত থাকে, ইউরোপের নানা দেশের পণ্ডিত ও লেখকদের নাম থাকে এবং ইংরেজী নাম শব্দ ও বাক্য ইংরেজী অক্ষরে লিখিত থাকে। আমাদের মনে হয় বাংলায় কিছু লিখিতে হইলে, তাহা যথাসম্ভব এমন করিয়া লেখা উচিত যে, যে কেবল বাংলা জানে সেও তাহা বুঝিতে পারে। মাসিকপত্রে "পাণ্ডিত্যপূর্ণ" সংস্কৃত ও ইংরেজী শব্দ ও বাক্য দ্বারা লাঞ্ছিত প্রবন্ধ ছাপিলে "প্রবন্ধ-গৌরবের" প্রসিদ্ধি হয় বটে, কিন্তু লোকের জ্ঞান ও আনন্দদানের উদ্দেশ্য কতটা সিদ্ধ হয়, তাহা বিবেচ্য। একজন বাঙ্গালী বাবু পশ্চিমে এক কলেজে প্রিন্সিপ্যালের কাজ করিতেন। তাঁহাকে তাঁহার এক বন্ধুর কন্যা মেসো-মহাশয় বলিত। এই বালিকার ভ্রাতৃসম্পর্কীয় একটি

গ্রাম্য ছেলে একদিন কথাপ্রসঙ্গে খুব সম্মানের সহিত বাবুটির উল্লেখ না করায়, বালিকা বলিল, "জানিস্ মেসোমশায় এম্ এ পাশ, কলেজে প্রিন্সিপ্যালের কাজ করেন? তাঁকে এমন বল্‌চিস্।" তাহাতে বালকটি বলিল, "আমি মনে করে'লাম ইন্টিন্সে (Entrance) পাস্।" বালিকা বলিল, "তুই কেন ইন্টিন্সে পাস্ মনে কর্‌লি।" তখন ছেলেটি বলিল, "কই বুড়ো বাবু যে এম্ এ পাশ, ত একটাও যে ইংরিজী কয় না।"

আমাদের দেশে বোধ হয় এই ছেলেটির মত সরল অনেক প্রাপ্তবয়স্ক লোক আছেন। ইংরেজীর খুব বুকনি না দিলে তাঁদের কাছে লেখকদের "ইন্টিন্সে পাস্" বলিয়া অখ্যাতি হইতে পারে। কিন্তু সেরূপ অখ্যাতির ভয় থাকিলেও বাংলা রচনা বাংলা অক্ষরে বাংলা শব্দের সাহায্যে লেখাই বাঞ্ছনীয়। অবশ্য, ইংরেজী বা সংস্কৃত কোন গ্রন্থ বা গ্রন্থকার, কিম্বা ইংরেজী বা সংস্কৃতে লিখিত কোন জিনিষ যদি প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হয়, তাহা হইলে ইংরেজী বা সংস্কৃত বাক্য কিছু উদ্ধৃত করা আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য কতকগুলা ইংরেজী বা সংস্কৃত বচন উদ্ধার বাঞ্ছনীয় নয়। হাল্কা, গম্ভীর, সোজা, কঠিন, নানারকমের ইংরেজী সাময়িক পত্র শিক্ষিত বাঙ্গালীর চোখে পড়ে। তাহাতে প্রবন্ধসকলে লাটিন, গ্রীক্, হীব্রুর ছড়াছড়ি থাকে কি? নিজের কিছু বলিবার থাকিলে তাহা মাতৃভাষাতেই বলা খুব কঠিন নয়।

নারী-শিল্পশিক্ষালয়।

বঙ্গদেশে অনেক ভদ্রপরিবারে অত্যন্ত আর্থিক কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগের অনেকে কঠিন পরিশ্রম করিয়াও গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারেন না, মৃত্যুকালে পত্নী ও সন্তানদিগকে অকূলে ভাসাইয়া চলিয়া যান। এই সঙ্কট কালে নারীদিগকে অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে না পারিলে গৃহস্থের জীবন আরও শোচনীয় হইবে। নারীগণ যাহাতে স্বোপার্জ্জিত অর্থে স্বামীর ক্লেশভার লঘু করিতে পারেন এবং স্বামীর দেহান্তে পরের গলগ্রহ না হইয়া সসম্মানে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তাহার উপায় করিবার জন্য কলিকাতা নগরীতে নারী-শিল্প শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশের অনেক ভদ্রসন্তান, জাপান, জার্ম্মেনী ও আমেরিকা হইতে নানাপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্য নির্ম্মাণের প্রণালী শিক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তাঁহারা আমাদের দেশের অসহায়া নারীদের অবস্থা দর্শনে সন্তপ্ত হইয়া তাঁহাদিগকে বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। জাপান-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মজুমদার ও তাঁহার কর্ম্মোৎসাহিনী সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মনোরমা মজুমদার এই শিক্ষালয়ে অবস্থিতি করিয়া বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে আপনাদের শক্তি সামর্থ্য নিয়োগ করিতেছেন।

শিল্প-শিক্ষালয়ে নিম্নলিখিত বিষয়সকল শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে:—

মাটির পুতুল ও ফল নির্ম্মাণ, দর্জ্জির কাজ, চিরুণী ও বোতাম নির্ম্মাণ, খাম ও কাগজের বাক্স নির্ম্মাণ, টাইপ-রাইটিং, কৃত্রিম ফুল, মোজা, মোমবাতি, ধোবার সাবান ও সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করণ, ফল সংরক্ষণ, চাট্‌নী ও জেলি, এবং নিব্ ও চুলের কাঁটা প্রস্তুত করণ, কলে কাপড় ধোত করা, কাপড় রং করা, আলোয়ান হইতে শাল প্রস্তুত করা, জরীর কাজ, চিকনের কাজ, ঘড়ী মেরামত শিক্ষা, সাইন-বোর্ড লেখা, পুস্তক বাঁধাই, জমাট দুগ্ধ প্রস্তুত করা, রুমাল, ও তোয়ালে বুনা, ফোটোগ্রাফী।

আপাততঃ পরিচ্ছদ প্রস্তুত করা, মাটির ফল ও পুতুল এবং কৃত্রিম ফুল নির্ম্মাণ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

এই বিদ্যালয়ের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে হইলে যাঁহারা বাটী হইতে শিক্ষালয়ে আসিবেন, তাঁহাদের জন্য গাড়ীর ব্যবস্থা, এবং যাঁহারা বিদেশ হইতে আসিবেন, শিক্ষালয়ে তাঁহাদের বাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষালয়ের ভাড়ার জন্য মাসিক ১৫০ টাকা, ৩০টি স্ত্রীলোককে বাটী হইতে আনিতে ২ খানি গাড়ীর ভাড়া মাসিক ১৬০ টাকা এবং ২০ জন মফঃস্বলের স্ত্রীলোকের ভরণ পোষণের জন্য মাসিক ৩০০ টাকা ব্যয় হইবে।

কয়েকজন বিদেশাগত শিক্ষক বিনাবেতনে শিক্ষাদান করিবেন, কিন্তু কয়েকজন বেতনভোগী শিক্ষক নিযুক্ত করাও আবশ্যক হইবে; তজ্জন্য মাসিক ১৫০, এবং দ্বারবান ও চাপরাশির জন্য মাসিক ২০টাকা ব্যয় হইবে। শিল্প দ্রব্য নির্ম্মাণের উপকরণ ক্রয় করিতেও প্রতি মাসে অন্যূন ৫০ টাকা আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত যন্ত্রাদি ক্রয়ের জন্য ১০০০, ও বাসন, শয্যাদ্রব্য ও স্কুলের আসবাবের জন্য ১০০০ টাকা, মোট ২০০০ টাকা একদা সংগ্রহ করা আবশ্যক।

নারী-শিল্প-শিক্ষালয়ের কর্ম্মপরিচালনের জন্য সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু, সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, প্রভৃতিকে লইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হইয়াছে।

সর্ব্বপ্রকারের সাহায্য সম্পাদক মহাশয়ের নামে ৬নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

বিহারী ও বিহারপ্রবাসী বাঙ্গালী।

বিহারে কোন একটি সহরে প্রবাসী বাঙ্গালীদের নববর্ষ-সম্মিলন উপলক্ষে একটি কবিতা পঠিত হয়। প্রথম কলির শেষে লেখক বলিতেছেন:—

"স্বদেশে অথবা পরবাসে তব রাখিতে উচ্চ শির,
একতা-বাঁধন, বঙ্গনিবাসি ! উপায় জানিও স্থির।"

ইহা অতি সত্য কথা। ইহার সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে বাঙ্গালীদের মধ্যে যেমন একতার প্রয়োজন, তেমনি সমুদয় ভারতবাসীর মধ্যেও একতার প্রয়োজন। নতুবা বাঙ্গালীও শির উচ্চ রাখিতে পারিবে না, বিহারী, হিন্দুস্থানী, পঞ্জাবী, কেহই শির উচ্চ রাখিতে পারিবে না; এটা খুব একটা মামুলি, পুরাতন কথা; কিন্তু মনে রাখিবার যোগ্য। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে চিন্তাশীল স্বদেশপ্রেমিক বিহার-প্রবাসী বাঙ্গালীরা ইহা জানেন এবং তাঁহাদের দৈনিক আচরণে ইহা বিস্মৃত হন না। তাহা হইলেও, সম্ভবতঃ অনেকে এই কবিতাটির লেখকের নিম্নলিখিত কথাগুলিতে ব্যক্ত ভাব হৃদয়ে পোষণ করেন বলিয়া বোধ হয়:—

যেথা হৃদয়ে গরল, মুখের মিলন,
কেন মোরা তথা যাই ?
যেথা হিংসা কেবল প্রেম প্রতিদান,
নিজেরে করিতে শুধু অপমান,
আপনার জনে ফেলি' অবহেলে,
সেথা কি মোদের ঠাঁই ?
*　　*　　*
যারে করেছে মানুষ তোমার শিক্ষা,
আজ কিনা চাও করিতে ভিক্ষা,
ছি ছি ভাই ! তার কৃপার বিন্দু
তোমার সকল কাযে ?

বাঙ্গালীরা বাঙ্গলার বাহিরে যে যে প্রদেশে বসবাস করিয়াছেন, তথায় অল্লাধিক পরিমাণে তথাকার প্রাচীনতর অধিবাসীদের সঙ্গে তাঁহাদের প্রতিযোগিতা আছে। তজ্জন্য মনোমালিন্যও আছে। অসদ্ভাবের জন্য কে কতটুকু দায়ী, তাহার বিচার করিয়া এই অসদ্ভাব দূর করা যাইবে না। অপ্রেম দূর করিবার একমাত্র উপায় প্রেম। যদি প্রেমের প্রতিদানস্বরূপ কেহ বাস্তবিকই হিংসা করে, সে অবস্থাতেও প্রেমই একমাত্র অবলম্বনীয় উপায়। প্রেমিকের প্রেমের জয় হইবেই হইবে। প্রেমিক যিনি তিনি এরূপ অবস্থাতেও কখন অপমানিত বোধ করেন না। আর, এরূপ স্থলে, যিনি আপনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তাঁহাকেই অগ্রসর হইয়া প্রথমে সপ্রেম ও ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিতে হইবে। বিহারী যদি আপনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তিনি অগ্রসর হইয়া অকপটে বাঙ্গালীকে আলিঙ্গন করুন। বাঙ্গালী যদি আপনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তিনি অগ্রসর হইয়া অকপটে বিহারীকে আলিঙ্গন করুন। ইহাতে কাহারও অপমান নাই।

বিহারী মাত্রেরই "হৃদয়ে গরল মুখের মিলন" ইহা মনে করিলে বড় বেশী ভুল করা হইবে। বিহারীরাও যদি ঐরূপ ভাবেন যে বাঙ্গালীরা সকলেই কপটাচারী তাহা হইলে তাঁহারাও ভ্রান্ত। কেবল বাঙ্গালীই বাঙ্গালীর "আপনার জন" এবং বিহারীই বিহারীর "আপনার জন" এরূপ মনে করা উচিত নয়, এবং ইহা সত্যও নয়। বাঙ্গালীও বাঙ্গালীর শত্রুতা করে, বিহারীও বিহারীর শত্রুতা করে। কিন্তু তা বলিয়া বাঙ্গালী মাত্রকেই বাঙ্গালী পর ভাবে না, বা বিহারী মাত্রকেই বিহারী পর ভাবে না। অতএব অনেকগুলি বিহারী ও বাঙ্গালীর মধ্যে অসদ্ভাব থাকিলেও সমুদয় বাঙ্গালী ও বিহারী পরস্পরকে পর মনে করিবে কেন ?

"যারে করেছে মানুষ তোমার শিক্ষা," ইত্যাদি কথাগুলিতে বড় বেশী অহঙ্কার এবং বিহারীদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পাইতেছে। এরূপ অহঙ্কার ও অবজ্ঞা হৃদয়ে থাকা বড় দুর্লক্ষণ। এরূপ অহঙ্কারের কোন কারণ আছে বলিয়াও মনে হয় না। আমরা বাঙ্গালীরা বিহারে ও অন্য নানা প্রদেশে শিক্ষকতা করিয়া আসিতেছি, কিন্তু সর্ব্বত্রই আমরা বেতন পাইয়া আসিতেছি। বিহারে বাঙ্গালীরা কোথাও কোথাও স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে সাধারণতঃ আর্থিক লাভ হইয়াছে, অন্ততঃ লোক্‌সান হয় নাই। আর যাঁহারা লাভের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন না, লাভবান্ হন না, যাঁহারা বেতন না লইয়া শিক্ষকতা করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই কাহাকেও শিক্ষা দিয়া মানুষ করিয়াছেন বলিয়া অহঙ্কার করেন না। যদি বিহারে এরূপ কেহ থাকেন, তিনি বিহারীদিগকে আত্মীয় ভাবিয়াই তাঁহাদের সেবা করিয়াছেন। কেহ আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বা অন্য আত্মীয়কে লেখাপড়া শিখাইয়া তাহার বড়াই করে না। ইংরেজেরা বহুবৎসর ধরিয়া আমাদের শিক্ষকতা করিয়া আসিতেছেন। কেহ কেহ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবেও শিক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু তথাপি ইংরেজরা যদি আমাদিগকে অবজ্ঞা করেন, তাহা কি আমাদের ভাল লাগিবে ?

বিহার নামটিতেই বিহার ও বিহারীদের গৌরব সূচিত হইতেছে। বুদ্ধদেব ও অশোককে ভারতবাসী মাত্রেই আপনার জন বলিয়া গৌরব করেন। বিহারীদের এই গৌরবে যতটা দাবী আছে, অন্য কোন প্রদেশের লোকদের ততটা নাই। মুসলমান রাজত্বকালে শের শাহের চেয়ে বীর ও রাজনীতিজ্ঞ কয়জন বাদশাহ জন্মিয়াছিলেন ? সেই শের শাহ বিহারী। বিহারেই তাঁহার সমাধিমন্দির রহিয়াছে। আমরা অধুনা ইংরেজী লেখা পড়ায় একটু অগ্রসর হইয়াছি বটে। কিন্তু সুযোগ পাইলে বিহারীরাও অগ্রসর হইবে। আমি এলাহাবাদে বহু বৎসর বিহারী, বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মরাঠা, প্রভৃতি,নানা-ভাষাভাষী ছাত্র পড়াইয়াছি। শারীরিক বা মানসিক শক্তিতে কোন প্রদেশের সমুদয়

লোক মোটের উপর অন্য কোন প্রদেশের লোকের চেয়ে হীন, এমন ধারণা জন্মে নাই।

শুনা যায় আর সকল প্রদেশের লোকদের ধারণা, বাঙ্গালীরা বড় অহঙ্কারী ও অমিশুক। ইহা সত্য কিনা জানি না। কিন্তু আমাদের সাবধান হওয়া উচিত। যে ডালে যত ফল ধরে, তাহা তত নত হয়। আমাদের যদি বেশী গুণ থাকে তাহা হইলে আমাদের নম্র হওয়াই উচিত। সমগ্র ভারতবর্ষ আমাদের জন্মভূমি, এই ধারণা-মূলক স্বদেশভক্তি সম্ভবতঃ বঙ্গেই প্রথম পরিস্ফুট হইয়াছে। অতএব সকলের সঙ্গে বিনয়নম্র সপ্রেম ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার দ্বারা ভারতীয় জাতি গঠনে বাঙ্গালী ভাল করিয়া লাগুন।

কবে কখন্ কোন্ ইংরেজ ভীরু বলিয়া বাঙ্গালীকে অবজ্ঞা করিয়াছিল, বাঙ্গালীরা এখনও তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই। অবজ্ঞা কেমন মিষ্ট লাগে, তাহা জানিয়াও কি আমরা অপরকে অবজ্ঞা করিব?

মাননীয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

অমায়িক বিনয়নম্র সপ্রেম ব্যবহার এবং দেশের সেবা দ্বারা কেমন করিয়া প্রবাসী বাঙ্গালী অন্য সকলের বিশ্বাস-ভাজন হইতে পারেন, আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে একটি ঘটনায় সম্প্রতি তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। মাননীয় পণ্ডিত সুন্দরলাল উক্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি ছিলেন। বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় আইনের পাণ্ডুলিপি আলোচিত ও সংশোধিত হইয়া পাস্ হইবে। এইকার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য পণ্ডিত সুন্দরলাল বড় লাটের সভার সভ্য নিযুক্ত হওয়ায়, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহার পদ খালি হয়। তাঁহার স্থানে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যগণ শ্রীযুক্ত ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে মনোনীত করিয়াছেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ফেলো বাঙ্গালী নহেন। যাঁহারা ভোট দিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশের ভোটে সতীশবাবু নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

সতীশবাবু কলিকাতা ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্‌-এ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি-প্রাপ্ত এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এল্ এল্‌-ডী। তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের ব্যবহার জীবীদের অন্যতম অগ্রণী। তিনি আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার মত পণ্ডিত, দেশসেবক ও পরোপকারী ব্যক্তির বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হওয়া ঠিকই হইয়াছে।

তিনি আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের হিতচেষ্টা করেন; আবার কেবলমাত্র প্রবাসী বাঙ্গালীদের হিতকর কার্য্যেও যোগ দেন ও সাহায্য করেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২১।

১৩২১ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বিংশ সাংবৎসরিক কার্য্য-বিবরণী নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। মফঃস্বলের সদস্যগণের সংখ্যা গণনায় ভুল হইয়াছে। ১০৯৯ এর পরই ২০০০ ছাপা হইয়াছে। উহা ১১০০ হওয়া উচিত ছিল। সুতরাং মফঃস্বলের মোট সদস্যসংখ্যা ২০৬৪ না হইয়া ১১৬৪ হইবে। এই সংখ্যাই দ্বিতীয় খণ্ডের ৪র্থ পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে।

"দেশমধ্যে লোকশিক্ষা, মৌলিক গবেষণায় উৎসাহ প্রদান, নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশ, পুরাতন হস্তলিখিত পুথি সংগ্রহ ও রক্ষার ব্যবস্থা, একটি প্রাদেশিক চিত্রশালার উপযুক্ত সম্ভার সংগ্রহ প্রভৃতি নানাবিধ কার্য্যে পরিষৎ হস্তক্ষেপ করিয়াছেন; কিন্তু উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাবে সে-সকল কার্য্য আশানুরূপে অগ্রসর হইতেছে না। দুই সহস্রাধিক সদস্য লইয়াও পরিষৎকে প্রকৃত কর্ম্মীর সাহায্য-বিহনে অন্যদেশের তুলনায় কার্য্যক্ষেত্রে এখনও অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হইতেছে। পরিষদের সদস্যগণের মধ্যে গণ্য, মান্য, বিদ্বান্, ধনী, পণ্ডিত, অধ্যাপক, সাহিত্য-সেবী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকই আছেন; কিন্তু এখনও পরিষৎ যে-সকল উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াছেন, সে-সকল সুসম্পন্ন করিবার জন্য যত কর্ম্মীর আবশ্যক, তাঁহাদের মধ্য হইতে তত বেশী কর্ম্মী পাওয়া যাইতেছে না; কাজেই বলিতে হয়, এখনও ইহার সদস্যসংখ্যা বর্দ্ধনের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, এখনও আশা করা যায় যে, দেশীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার সদস্যসংখ্যা আরও বৃদ্ধি হইবে।"

পরিষদের সদস্যদিগের মধ্যে যথেষ্ট কর্ম্মী থাকিলেও সদস্যসংখ্যা বাড়া আবশ্যক হইত। যথেষ্ট কর্ম্মী যখন নাই, তখন ত সদস্য বাড়াইবার দরকার আছেই। কিন্তু সদস্য বাড়িলেই কর্ম্মী বাড়িবে, নিশ্চয় করিয়া এরূপ বলা যায় না; কর্ম্মী সংগ্রহ করিতে জানিতে হয়।

সাহিত্য-পরিষদের মুসলমান সদস্য।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় লেখা হইয়াছে:—

বঙ্গদেশে শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা বড় কম নহে এবং অত্যন্ত সুখের বিষয় এই যে, এই সংখ্যা উত্তরোত্তর দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। অনেকেই অবগত আছেন যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে মুসলমান-সম্প্রদায়ের ক্ষমতা ও প্রভাব দেদীপ্যমান। বর্ত্তমান সময়েও আমাদের অনেক মুসলমান ভ্রাতা অত্যন্ত উৎসাহ ও দক্ষতার সহিত বঙ্গভাষার সেবায় নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদের পরিচালিত মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রে তাঁহারাই দিন দিন উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন যে, বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা বাঙ্গালা, আর তাহার পঠন-পাঠন বাঙ্গালী মুসলমানের একান্ত কর্ত্তব্য। গত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের

অধিবেশনেও চট্টগ্রামের প্রবীণ সাহিত্যিক মুন্সী আবদুল করিম সাহেব উহা সমর্থন করিয়া প্রবন্ধ পাঠ করিয়া গিয়াছেন; অথচ বাঙ্গালার এই সর্ব্বপ্রধান সাহিত্য-পরিষদেই মুসলমান সদস্যের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প, ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। আমরা এ বিষয়ে দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশেষতঃ আমাদের মুসলমান ভ্রাতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বঙ্গদেশবাসী হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই সম্পত্তি। উভয় সম্প্রদায় একযোগে কার্য্য না করিলে ভাষা ও সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভবপর নহে। এতদিন ইহা ছিল না বলিয়াই "মুসলমানী বাঙ্গালা" নামে একটা মিশ্রভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে। আজ-কাল সহৃদয়, শিক্ষিত, বাঙ্গালার সুলেখক মুসলমান ভ্রাতারা সেই অপভাষাকে দমন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এইরূপ একক্রিয়তাই বাঞ্ছনীয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মুসলমান শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের সহানুভূতি আশানুরূপ পাইতেছেন না, ইহা বড়ই ক্ষোভের কারণ হইয়া রহিয়াছে। শিক্ষিত মুসলমানেরা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সদস্য হইয়া আরব্য ও পারস্য ভাষায় নিহিত নানাবিধ রত্ন-সম্ভার উদ্ধার করিয়া তাঁহাদেরই মাতৃভাষা বঙ্গবাণীর মন্দিরে উৎসর্গ করিবেন। বঙ্গভাষার অঙ্গ সেই-সকল রত্নে সুশোভিত হইলে তাঁহাদের এবং তাঁহাদেরই মাতৃভাষার গৌরব বৰ্দ্ধিত হইবে। ইহাও সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম আশা। আশা করি, আমাদের এই আবেদন ব্যর্থ হইবে না এবং সাহিত্য-পরিষদে মুসলমান সদস্যের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে।

পরিষদের কর্ম্মকর্ত্তাদের যে এবিষয়ে দৃষ্টি পড়িয়াছে, ইহা সুখের বিষয়। বর্ত্তমানে রাজকার্য্যের সুবিধার জন্য যে ভূখণ্ডকে বাংলাদেশ বলা হয়, তাহাতে হিন্দু আছেন ২কোটি ৯ লক্ষ, মুসলমান আছেন ২ কোটি ৪২ লক্ষ। অতএব বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি করিতে হইলে উভয় সম্প্রদায়ের আন্তরিক সহযোগিতা আবশ্যক। পরিষদের মুসলমান সদস্যের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প কেন, তাহা স্থির করিতে চেষ্টা করা উচিত। শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যার অল্পতা বা তাঁহাদের ঔদাসীন্য ছাড়া আর কোন কারণ আছে কিনা, তাহা শিক্ষিত মুসলমানদিগের নিকট হইতে জানা উচিত।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি বিদ্যালয়-গৃহে মুসলমানদিগের মধ্যে বাংলার চর্চ্চা বাড়াইবার জন্য তাঁহাদের একটি সভা হয়। তাহাতে মফঃ-স্বল হইতেও শিক্ষিত মুসলমানেরা আসিয়া যোগ দিয়া-ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রভৃতি ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। আমাদের মনে পড়িতেছে যে সভাস্থলে কোন কোন মুসল-মান বক্তা এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া আক্ষেপ করেন, যে, বাংলা হিন্দুদের মত তাঁহাদেরও মাতৃভাষা, কিন্তু হিন্দুদের বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ আছে, মুসলমানদের তদ্রূপ কোন সমিতি বা পরিষৎ নাই। আমরা ঐ সভায় কিছু বলিয়া-ছিলাম। তাহার মধ্যে ইহাও বলিয়াছিলাম যে সাহিত্য-পরিষৎকে কেবল হিন্দুর সমিতি মনে করা ভুল, বাংলা যাহাদের মাতৃভাষা, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে তাহাদের সকলেরই পরিষদে দাবী আছে। আমাদের মনে হয় শিক্ষিত মুসল-মানদের মধ্যে এরূপ ধারণা আছে যে পরিষৎ হিন্দু সমিতি। এরূপ ধারণার কারণ কি, তাহা শিক্ষিত মুসলমানদিগকে জিজ্ঞাসা করা উচিত।

পরিষদের মৃত সদস্য ও সাহিত্যসেবিগণ।

এই তালিকায় পঞ্জিকাতে ১৯ জন সদস্যের এবং তদ্ব্যতীত ৮ জন সাহিত্যসেবীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। স্বর্গীয় শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়ঃসম্বন্ধে লেখা হইয়াছে:—

বাঙ্গালা শিক্ষার উন্নতিকল্পে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু টাকা দিয়া গিয়াছেন। ইহার উপস্বত্ব হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা-অধ্যাপক পদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। নিজ পিতা এবং মাতার স্মৃতি-রক্ষার্থ "রামতনু পদক" ও "গঙ্গামণি পদক" নামে প্রতি বৎসর বিএ-পরীক্ষায় বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্ব্বপ্রথম ছাত্র ও ছাত্রীকে দুইটি পদক দিবার উপযুক্ত পরিমাণে অর্থও দান করিয়া গিয়াছেন।

স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর বসু মহাশয় সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে:—

৺চন্দ্রশেখর বসু—ইনি একজন প্রাচীন দার্শনিক ছিলেন। ইঁহার রচিত প্রলয়-তত্ত্ব, পরলোক-তত্ত্ব, বেদান্তদর্শন, হিন্দু ধর্ম্মের উপদেশ, সৃষ্টি, বক্তৃতা-কুসুমাঞ্জলি, অধিকার-তত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গ-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। বহু পূর্ব্বে তিনি পরিষদের সদস্য ছিলেন।

সাহিত্য-সম্মিলনের দর্শনশাখার অভিভাষণে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়, যাঁহারা দর্শনের আলোচনা বিস্তারে সাহায্য করিয়াছেন এরূপ বাঙ্গালীদের মধ্যে বসু মহাশয়ের নাম করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকায় স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে বলা হইয়াছে:—

৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত্র-প্রণেতা ৺নগেন্দ্রনাথ যেমন সুলেখক, তেমনি সুবক্তা ছিলেন। তিনি একনিষ্ঠ ব্রাহ্ম ছিলেন। সকল অবস্থাতেই সকল স্থানে সকল উৎ-পীড়নের মধ্যে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতেন। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের "সমদর্শী" নামক কাগজে তাঁহার বাঙ্গালা লেখার আরম্ভ হয়। তাঁহার স্বাধীনচিত্ততা আমরণ বজায় ছিল। তিনি নিজের মতের বিরুদ্ধে কোথাও মাথা নোয়াইতেন না। তিনি সুতার্কিক ছিলেন। তাঁহার ভাষা অতি সহজ এবং সরল ছিল। তাঁহার "রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত্র" এই শ্রেণীর সাহিত্যের আদর্শ। এতদ্ভিন্ন তাঁহার 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' প্রভৃতি আরও অনেক সদ্গ্রন্থ আছে। তিনি ছল বা কল-কৌশল জানিতেন না—সোজাসুজি যাহা বুঝিতেন, সোজাসুজি তাহাই বলিতেন; সত্যকথা বলিতে হইবে বলিয়া তিনি লাঠিমারা কথা কহিতেন না। তিনি সর্ব্বপ্রকারে সুরসিক ছিলেন, তাঁহার কথায় হাসিতে হইত, তাঁহার ভাবে হাসিতে হইত।

তাঁহার "ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়" নানা দার্শনিক বিষয়ের বিশদ আলোচনা আছে। ইঁহার নামও হীরেন্দ্রবাবুর তালিকায় থাকিলে ভাল হইত।

স্বর্গীয় হৃষীকেশ শাস্ত্রী মহাশয় সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

৺হৃষীকেশ শাস্ত্রী—শাস্ত্রী মহাশয় "বিদ্যোদয়" নামক সংস্কৃত মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার পিতা ৺মধুসূদন স্মৃতিরত্ন ও পিতামহ ৺আনন্দচন্দ্র শিরোমণি। ইঁহারা ভাটপাড়ার বশিষ্ঠগোত্রের অলঙ্কার ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় টোলে শিক্ষা লাভ করিয়া লাহোরে ওরিএণ্টাল কলেজের দ্বিতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন বলিয়া পিতা তাঁহাকে দূরে রাখিয়া থাকিতে পারিতেন না। পিতার আদেশে তিনি ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ নষ্ট করিয়া ৩০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজে আসেন। এখানে তাঁহার বিশেষ পদোন্নতি হইয়াছিল। তাঁহার পাঠনা-প্রণালী সুন্দর ছিল। সাধুতা, নম্রতা, চরিত্র-বল তাঁহার অসাধারণ ছিল। স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। বঙ্গবাসীর প্রকাশিত স্মৃতিগুলির তিনিই অনুবাদ করেন। তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির ৪৫০০ পুথির তালিকা প্রস্তুত করিয়া গিয়াছিলেন।

পরিষদের পুথিশালায়

"আলোচ্য বর্ষে মোট ১১১ খানি পুথি উপহার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে এবং ১৯৬ খানি পুথি ক্রীত হইয়াছে। পরিষৎ নিজ কর্ম্মচারী পাঠাইয়া ৬৪ খানি পুথি সংগ্রহ এবং বিশৃঙ্খল পত্রাদি মিলাইয়া ১৬৮ খানি পুথি উদ্ধার করিয়াছেন। পূর্ব্ব বৎসরে ১৯৯৬ খানি পুথি ছিল। আলোচ্য বর্ষের শেষে এইরূপে মোট ২৫৩৫ খানি পুথি হইয়াছে। ইহার মধ্যে বাঙ্গালা পুথির সংখ্যা ১৭৩৯, সংস্কৃত ৭৭৯, অসমীয়া ৩, ওড়িয়া ১, হিন্দি ১, পারসী ১২ খানি। ইহার মধ্যে ৪৯৯ খানি পুথি তালিকাভুক্ত হইয়াছে; ২৭খানি তালিকাভুক্ত হইবার উপযুক্ত হইয়া আছে। ৫৪৫ খানিতে পুথির নাম, রচয়িতার নাম, প্রতিলিপির তারিখ,পত্র-সংখ্যাদিযুক্ত বীজক দেওয়া হইয়াছে।"

বঙ্গে ডাকাতি

১৯১৩-১৪ সালের বাংলাদেশের শাসন-বিবরণী হইতে জানা যায় যে ঐ বৎসর ২৪৫টা ডাকাতি হইয়াছিল। তাহার মধ্যে ৮টা "ভদ্রলোক" ডাকাতদের কার্য্য। এই আটটাকে রাজকর্ম্মচারীরা রাজনৈতিক ডাকাতি মনে করেন। তাঁহাদের অনুমান ঠিক বলিয়া ধরিলেও দেখা যায় যে বঙ্গে রাজনৈতিক ডাকাতির যেরূপ বাড়াবাড়ি হইয়াছে বলিয়া একটা ধারণা লোকের মনে জন্মাইবার চেষ্টা করা হয়, তাহা ভ্রান্ত। এই সরকারী রিপোর্টেও বলা হইয়াছে যে সাধারণ ডাকাতির তুলনায় রাজনৈতিক ডাকাতির গুরুত্ব অনেক সময় বাড়াইয়া বলা হয় (the importance of political as compared with ordinary dacoities is often exaggerated)।

আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে ৫৫৭টা ডাকাতি হইয়াছিল। অর্থাৎ ঐ প্রদেশে বাংলা দেশের দ্বিগুণেরও বেশী ডাকাতি হইয়াছিল। অথচ ডাকাতির বদনামটা বাঙ্গালীর উপরই বেশী করিয়া চাপান হইতেছে, এবং নূতন ফৌজদারী আইন অনুসারে বিচারও বঙ্গদেশের অধিকাংশ জেলায় হইবে। আমরা চাই না যে আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশেও এই আইন জারী হয়। কিন্তু বাংলাদেশে ডাকাতি এত কম হওয়াতেও এখানে এই আইনটা কেন প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাই জিজ্ঞাস্য।

সরকারী রিপোর্ট হইতে জানা যায়, ব্রহ্মদেশের প্রতি দশহাজার অধিবাসীর মধ্যে ৮৭ জন অপরাধী, বোম্বাইয়ে প্রতি দশ হাজারে ৮১ জন অপরাধী, মান্দ্রাজে প্রতি দশ হাজারে ৬৯ জন, এবং বাংলাদেশে প্রতি দশ হাজারে ৫০। প্রাণনাশ বা প্রাণনাশের চেষ্টা-ঘটিত অপরাধ ভারতবর্ষের যে প্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছে, তথায় প্রতি দশ হাজার অধিবাসীর মধ্যে ২টা হইয়াছে, কিন্তু বাংলাদেশে প্রতি লক্ষ অধিবাসীতে ২টা হইয়াছে।

সুতরাং আইন ভঙ্গ করিতে বাঙ্গালী সকলের সেরা, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। কথা উঠিতে পারে যে বাংলা দেশে রাজনৈতিক অপরাধ খুব বেশী এবং ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া এণ্ড পব্লিক সেফটি আইন নামক নূতন ফৌজদারী আইন রাজনৈতিক অপরাধ দমনের জন্য বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার উত্তর মান্দ্রাজের নিউ ইণ্ডিয়া দিয়াছেন।

"Where ordinary crime is low, and political crimes are found, the remedy is the removal of grievances, not the confiscation of popular liberty."

"যদি কোথাও সাধারণ অপরাধ কম দেখা যায় অথচ রাজনৈতিক অপরাধ দৃষ্ট হয়, তথায় সেরূপ অবস্থায় লোকদের অভিযোগ ও অসন্তোষের কারণ দূর করাই প্রকৃত প্রতিকার, জনসাধারণের স্বাধীনতা খর্ব্ব করা প্রতিকার নহে।"

চাঁদপুর অন্নকষ্টনিবারিণী সমিতি।

এই সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দে, বি-এ, মহাশয় লিখিয়াছেন :—"এপর্য্যন্ত আমরা নিম্নলিখিত গ্রাম সমূহের ১০৪টি পরিবারে সাহায্যদান করিতে পারিয়াছি। বিষ্ণুপুর, দামোদরদী, আমিরাবাদ, ছৈরন, সেনগাও, কামুদামদী, নরুল্লাপুর, আশীকাটী, লালদিয়া, কেতুয়া, লালপুর, দিয়ারমণ্ডল, বালীযুবা, সিলন্দিয়া, বাকিলা, রাজারগাও, কাদবা, পাইকাস্তা, কড়ৈতলী, বাজাপ্তী, হানারচর, হাইমচর, বাহেরচর, গাজিপুরিয়াকান্দি, পূর্ব্ববাজাপ্তী, দেইচর, গোক্ষদী, রাজাপুর, বিধুরবন্দ, খলিসাডুলী, দাসদী, কল্যাণদী, ব্রাহ্মণদী, পাখালিয়া, সাহাতলী ও হোসনপুর।

"২২শে বৈশাখ পর্য্যন্ত আমরা এই কার্য্যের জন্য নানাস্থান হইতে ৪৩০৵০ আনা প্রাপ্ত হইয়াছি।

"আমাদের কার্য্যালয় বাবুরহাট হইতে প্রতি রোজ প্রচুর চাউল বিতরিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত হানারচর ২টী ও বাজাপ্তী, দেইচর, বাকিলা ও হাজিগঞ্জে এক-একটী শাখা কেন্দ্র স্থাপিত করিয়া চাউল বিতরণ করা যাইতেছে।

"শ্রাবণ ভাদ্র মাসে পাট ও আউস ধান্ত কৃষকের ঘরে আসিবে। সে পর্য্যন্ত ইহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।"

পাঠকপাঠিকাগণ উক্ত সম্পাদকমহাশয়ের নামে ত্রিপুরা জেলার বাবুরহাট ডাকঘরের ঠিকানায় যথাসাধ্য সাহায্য পাঠাইলে সুখী হইব।

গোয়াড়ী শ্রমজীবী নৈশবিদ্যালয়।

এই বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য্যবিবরণী হইতে জানা যায় যে

"তথা-কথিত নিম্ন শ্রেণীর—বিশেষতঃ শ্রমজীবিগণের মধ্যে, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচার করাই এই বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। এখান হইতে শিক্ষা পাইয়া ছাত্রগণ যাহাতে স্ব স্ব কর্ত্তব্য সাধন করিতে এবং জাতীয় ব্যবসায় অধিকতর ভালরূপে পরিচালন করিতে পারে তদুপযোগী বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। চরিত্র সংশোধন ও চরিত্র গঠনই আমাদের শিক্ষা দেওয়ার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য।

"কার্য্যপ্রণালী—রবিবার ব্যতীত শীতকালে প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৮টা এবং গ্রীষ্মকালে ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের কার্য্য হইয়া থাকে। দৈনিক শিক্ষাকার্য্য সমাধানের পর ছাত্রগণ দলবদ্ধ হইয়া স্তোত্র পাঠ করে। সাধারণ বিষয় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নীতি শিক্ষা প্রদান করা হয়। ইতিহাস, ভূগোল ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান মৌখিক ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। ছাত্রদিগকে বিনামূল্যে খাতা, পুস্তক, শ্লেট, পেন্‌সিল প্রভৃতি দেওয়া হইয়া থাকে।

"শিক্ষকগণ—আলোচ্য বর্ষের প্রথম তিন মাস বৈতনিক এবং অবৈতনিক শিক্ষকগণ শিক্ষাকার্য্য পরিচালনা করিতেন। কৃষ্ণনগর কলেজ, কলেজিয়েট স্কুল, মিশনারি স্কুল প্রভৃতি বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র এবং অন্যান্য কতিপয় ভদ্রমহোদয় অধ্যাপনাকার্য্যে সহায়তা করিতেন। শেষ নয় মাস দুইজন বৈতনিক শিক্ষকের দ্বারাই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।"

এই বিদ্যালয়ে বাংলাভাষা, গণিত, ইংরেজী, ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান এবং সাধারণনীতি শিখান হয়। বিদ্যালয়ের গড়ে মাসিক ছাত্রসংখ্যা ৮৬ জন। দৈনিক উপস্থিত গড়ে ৪০ জন। ইহা সন্তোষজনক নহে। কুমার, ছুতার, রাজমজুর, দোকানদার, ডাকপিয়ন, প্রভৃতি সকল জাতির ও শ্রেণীর ছাত্রেরা পড়ে। ছাত্রদিগের বয়স ৫ হইতে ৩৫ পর্য্যন্ত। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টিয়ান সকলেই সমানভাবে গৃহীত হয়। ছাত্রদিগকে আকৃষ্ট করিবার জন্ত এবং নানাপ্রকার শিক্ষাপ্রদ ছবি দেখাইবার জন্য ৭৩ টাকা দামে একটি ম্যাজিক লণ্ঠন কেনা হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে ছাত্রদের জলযোগের বন্দোবস্ত করা হয়।

দুই বৎসরের শিক্ষার ফলে অনেক ছাত্রের চরিত্রের উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। একটি ছেলে স্থানীয় পোষ্ট অফিসে ডাকপিয়ন হইয়াছে, এবং কয়েকজন পাঠ সমাপনান্তে স্ব স্ব ব্যবসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

কিন্তু এতাদৃশ সফলতা সত্ত্বেও বর্ত্তমানে ছাত্রসংখ্যা বড়ই কমিয়া গিয়াছে। শ্রমজীবিগণ বিদ্যালাভের উপকারিতা তাদৃশ হৃদয়ঙ্গম করিতেছে না—বোধ হয় ইহাই প্রধান কারণ। এমন কি মধ্যে মধ্যে শিক্ষকগণ শ্রমজীবী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে গিয়া শিক্ষালাভের উপকারিতা প্রচার করিলেও, এখন তেমন ছাত্র জুটিতেছে না। সেই জন্য আমরা আমাদের ছাত্রগণের অভিভাবকদিগকে বিনীত অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা যেন যত্নপূর্ব্বক নিজ নিজ পুত্রদিগকে আমাদের বিদ্যালয়ে পাঠান।

সাধারণের নিকট আমাদের প্রার্থনা যে আপনারা সকলে আমাদিগকে আরও অধিক লোকবল ও অর্থসাহায্য প্রদান করুন এবং শিক্ষার উপকারিতা প্রচারের দ্বারা আমাদের ছাত্র সংগ্রহ করিয়া দেশের এবং দশের কল্যাণ সাধন করুন।

এইরূপ নৈশবিদ্যালয়সকলে সাধারণ জ্ঞান দান ও নীতিশিক্ষা দান ছাড়া যদি ছাত্রদের জা'ত-ব্যবসা শিখাইবার বন্দোবস্ত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে ছাত্র পাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হইতে পারে। যদি কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়া ছুতারের ছেলে অশিক্ষিত ছুতার অপেক্ষা ভাল কারিগর হয়, বা কামারের ছেলে অশিক্ষিত কামারের চেয়ে নিজের পৈত্রিক কাজ ভাল করিয়া করিতে পারে, তাহা হইলে বোধ হয় ছাত্রের অভাব হয় না। কিন্তু এরূপ শিক্ষার বন্দোবস্ত করা সহজ নয়। অথচ ইহার প্রয়োজন আছে। কলিকাতায় উৎকৃষ্ট ছুতারের কাজ চীনারা করে; বাঙ্গালী ছুতার থাকিতে তাহাদের এরূপ পসার বাড়িল কেন?

আমাদের ছেলেরা যে স্কুল কলেজে পড়ে তাহা শুধু জ্ঞানলাভের জন্য বা নীতিশিক্ষার জন্য নয়, ভবিষ্যতে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারা একটা প্রধান লক্ষ্য। শ্রমজীবীদেরও এই লক্ষ্য আছে। তাহাদের শিক্ষাও তদুপযোগী হইলে তাহারা আকৃষ্ট হইবে।

যশোদার গোদোহন।

চিত্রকর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সৌজন্যে মুদ্রিত।

U. RAY & SONS.

ভাষার অত্যাচার

হাতের কাছেই যাহা থাকে, যাহাকে লইয়া অহরহ কারবার করিতে হয়, তাহার যথার্থ মূল্য ও মর্য্যাদা সম্বন্ধে খুব একটা স্পষ্ট অনুভূতি আমাদের মধ্যে অনেক সময়েই দেখা যায় না। এই দেহটাকে মাটির উপর খাড়াভাবে দাঁড় করাইয়া রাখা যে কতটা অচিন্তিত নৈপুণ্যের পরিচায়ক, ও প্রতিমুহূর্ত্তে তাহার পতনের সম্ভাবনাকে অক্লেশে এড়াইয়া চলায় গণিতের কত জটিল তর্ক যে পদেপদেই অতর্কিতে মীমাংসিত হইয়া যায়, তাহার বিস্তৃত হিসাব লইতে গেলে এ ব্যাপারের গুরুত্ববোধে হয়ত আমাদের চলাফিরার স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ঘটিত।

তেমনি, কতকগুলা কৃত্রিম অযৌক্তিক ধ্বনির সংযোগে কেমন করিয়া যে আমার মনের নাড়ী-নক্ষত্র সমস্ত দশজনের কাছে প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তাহার সূত্রান্বেষণ করিতে গেলে মনে হইতে পারে যে এত বড় আজগুবি-কাণ্ড বুঝি আর কিছু নাই। 'গাধা' শব্দটা উচ্চারণ করিবামাত্র দশজন লোকে কোন্ চতুষ্পদবিশিষ্ট সহিষ্ণু জীবের কথা ভাবিতে লাগিল! নিমন্ত্রিতের পেটে যে ক্ষুধানল জ্বলিতেছে তাহা কেহ দেখে নাই; কিন্তু সে 'লুচি' 'লুচি' বলিয়া বাতাসে একটা তরঙ্গ তুলিবামাত্র চক্রাকার ঘৃতপক্ক দ্রব্য-বিশেষ দেখিতে দেখিতে তাহার পাতে হাজির! অথচ এ-সকলের কোন ন্যায়সঙ্গত সাক্ষাৎ কারণ দেখা যায় না; কারণ নামের সঙ্গে নামীর সাদৃশ্য বা সম্পর্ক যে কোথায়, তাহা আজপর্য্যন্ত কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারে নাই। সুতরাং বলিতে হয়, ভাষা জিনিষটা গোড়া হইতেই একটা কৃত্রিমতার কারবার। কিন্তু তাই বলিয়া ভাষার ব্যবহারে কেবা নিরস্ত থাকে!

সুবিধার খোঁজ করিতে গেলেই তাহার আনুষঙ্গিক দুচারটা অসুবিধা স্বীকার করিতেই হয়। সুবিধার খাতিরে আজ একটা জিনিষকে স্বীকার করিয়া লইলে দুদিন বাদে সে কিছু-না-কিছু অন্যায় দাবী করিবেই। কার্য্যের সুব্যবস্থার জন্যই লোকে নানারূপ কার্য্যপ্রণালী ও নিয়মতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু কার্য্যত অনেক সময়ে তাহার ফল দাঁড়ায় ঠিক উল্টা। যেটা উপলক্ষ্য থাকা দরকার সেইটাই একটা প্রধান লক্ষ্য হইয়া নূতন কতগুলা অসুবিধার কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। সমাজের এক-একটা বিধিব্যবস্থা মূলত সুযুক্তিপ্রতিষ্ঠিত হইলেও, কালক্রমে অন্যায়রকম ব্যাপকতা ও ঔদ্ধত্য লাভ করিয়া তাহারা কিরূপে পুরুষপরম্পরা মানুষের সহজবুদ্ধির ঘাড়ে চাপিয়া বসে, আমাদের দেশে তাহার ব্যাখ্যা বা দৃষ্টান্তের আড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন। যে কারণে মানুষ শাস্ত্রব্যবস্থার উদ্দেশ্যকে ছাড়িয়া তাহার অনুশাসন লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে, ঠিক সেই কারণেই মানুষের চিন্তা আপনার উদ্দিষ্ট সার্থকতাকে ছাড়িয়া কতগুলা বাক্যের আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে চায়। এ অবস্থায় বাক্য যে মাথায় চড়িয়া বসিবে তাহাতে বিচিত্র কি?

সব জিনিষেরই একটা সোজাপথ বা short cut খুঁজিবার চেষ্টা মানুষের একটা অস্থিমজ্জাগত দুর্ব্বলতা। কোন একটা চিন্তাধারার আদ্যোপান্ত অনুসরণরূপ দুরূহ কার্য্যকে সংক্ষেপে সারিবার জন্য আমরা মোটামুটি কতগুলা শ্রুতি বা আপ্তবাক্যের আশ্রয় লইয়া মনে করি ঐসকল তত্ত্বের সহিত যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইল। ডারউইনের Evolution Theory বা অভিব্যক্তিবাদ জিনিষটা যে কি, সেটা অনুসন্ধান করা আবশ্যক বোধ করি না, কিন্তু Evolution বা অভিব্যক্তি কথাটাকে আমরা খুব বিজ্ঞের মত গ্রহণ করিয়া বসি; এবং আবশ্যক হইলে ও-বিষয়ে সাবধানে দুচারটা মতামত যে ব্যক্ত করিতে না পারি এমন নয়।

কথায় বলে "ঘোড়া দেখলেই খোঁড়া হয়।" ভাষারূপ বাহনটার খাতিরে চিন্তা যে কেমন করিয়া পঙ্গুত্ব লাভ করে তাহার দৃষ্টান্তের ছড়াছড়ি চারিদিকেই। যে-কোন জটিল জিনিষকে কতগুলা পরিচিত নামের কোঠায় ফেলিয়া লোকে মনে করে বিষয়টার একটা নিষ্পত্তি করা গেল। ইংরেজি গীতাঞ্জলি পাঠ করিয়া একজন ইংরেজ আকাশ-পাতাল ভাবিয়া অস্থির যে এই লেখাগুলিকে তিনি কোন্ পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া কি ভাবে দেখিবেন! পরে যখন তাঁহার খেয়াল হইল যে এগুলাকে Mystic Idealism বা ঐরূপ একটা কিছু বলা যাইতে পারে তখন তাঁহার সমস্ত উৎকণ্ঠা দূর হইল এবং তিনি এমন একটা নিশ্চিন্ততার ভাব প্রকাশ করিলেন যেন তাঁহার আর কিছু বুঝিতে বাকী নাই।

এক-একটা কথা আসে অতি নিরীহভাবে চিন্তার বাহনরূপে। কিন্তু চিন্তার আদর ত চিরকাল সমান থাকে না; সুতরাং তাহার আসনচ্যুতি ঘটিতে কতক্ষণ? বাহনটা কিন্তু অত সহজে হটিবার নয়; সে তখন একাই চিন্তার ক্ষেত্রে দাপাদাপি করিয়া আসর জমাইয়া রাখে। ইহাকেই বলি ভাষার অত্যাচার। ভাষা ভাববহন কার্য্যেই নিযুক্ত থাকুক; সে আবার চিন্তার আসরে নামিয়া আপনার জের টানিতে থাকিবে কেন? শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈততত্ত্বে 'মায়া' শব্দটার অর্থ কি, আমরা হয়ত কোন্ কালে ভুলিয়া বসিয়াছি, কিন্তু ঐ 'মায়া' শব্দটা আমাদের ছাড়ে নাই। সংসারকে এই-ভাবে 'কিছু নয়' বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াটা যুক্তিযুক্ত কি না, সে বিষয়ে আলোচনা করিবার সময় বাস্তবিক কি ভাবে কি করিতে বলা হইয়াছে সেকথা ভাবিবার অবসর হয় না। কতগুলি শব্দ শুনি যাহার অর্থ বা ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের চিন্তার যোগ অতি সামান্য —অথচ আমাদের ধারণা এই যে কথাগুলির মধ্যে খুব এক-একটা গভীর চিন্তা নিহিত আছে। তাহার উপর একএকটি শব্দ আবহমানকাল হইতে নিরঙ্কুশভাবে চলিত থাকিলে কালক্রমে তাহার মধ্যে স্বভাবতই এমন একটা চূড়ান্ত মীমাংসার ভড়ং প্রকাশ পায় যে শব্দের মোহে পড়িয়া আমরা কথাগুলিকেই নাড়াচাড়া করি আর মনে করি খুব একটা উচ্চচিন্তার আলোড়ন চলিতেছে। একটি প্রবীণ গোছের ভদ্রলোক কৃষ্ণলীলার সমর্থনের উদ্দেশ্যে তর্ক করিতেছিলেন। তাঁহার যুক্তিপ্রণালীটা এইরূপ:— সত্ব রজ তম এই তিনগুণাশ্রিত পুরুষ তিন রকম ভাবাপন্ন— সুতরাং তিনের সাধনমার্গ ও অধিকারভেদ তিন প্রকার। সুতরাং নিম্নস্তরের অবিদ্যাশ্রিত আদর্শের দ্বারা সাত্বিকী প্রকৃতির আশ্রয়ীভূত নিত্যমুক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিচার করিলে চলিবে কেন?—ইত্যাদি। প্রতিপক্ষ বেচারা বাক্যজালে আবদ্ধ ও প্রত্যুত্তরদানে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। সগুণনির্গুণ পুরুষপ্রকৃতি প্রাণ কারণ শব্দব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি শব্দঘটার সাহায্যে নিজ নিজ বক্তব্যের মধ্যে গাম্ভীর্য্য সঞ্চারের জন্য অনেকেই সচেষ্ট, কিন্তু শব্দের মধ্যে যে ভাবটুকু ছিল, সে কোন্‌কালে খোলস ছাড়িয়া পলাইয়াছে কে তাহার খবর রাখে? ঐ একএকটা কথায় আমরা যে-পরিমাণে অভ্যস্ত হইয়া পড়ি, তাহাকে যতবার এবং যত সহজে মুখস্থ বুলির মত আওড়াইতে থাকি, চিন্তাও ততই প্রমাদ গণিয়া একপা দুইপা করিয়া হটিতে থাকে। কে অত পরিশ্রম করিয়া লুপ্তচিন্তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে! শব্দের গায়ে চিন্তার ছাঁটছুট যাহা লাগিয়া থাকে তাহাই যথেষ্ট,— বাকীটুকু তোমার রুচি ও কল্পনা অনুসারে পুরাইয়া লও। ছাতার নীচে চটি চলিতেছে দেখিয়া লোকে বুঝিত বিদ্যাসাগর চলিয়াছেন। আমরা দেখি ভাষার ছাতা আর চটি—স্বয়ং জীবন্ত বিদ্যাসাগরকে আর দেখা হয় না।

একএকটা কথার ধুয়া আমাদের স্বাভাবিক চিন্তাশক্তিকে আড়ষ্ট করিয়া দেয়। মানুষের যে-কোন আচার অনুষ্ঠান চালচলন বা চিন্তাভঙ্গীর প্রতি কটাক্ষ করিয়া লোকে জিজ্ঞাসা করে "তুমি কি সনাতন ধর্ম্মবিধিকে উড়াইয়া দিতে চাও?" এবং সনাতন ধর্ম্মের নজীরকে— অর্থাৎ ঐ "সনাতন" শব্দটার নজীরকে—এমন অকাট্যভাবে মনের সম্মুখে দাঁড় করায়, যেন ইহার উপর আর কথা বলা চলে না। তখন যাহা কিছু যথেষ্ট জীর্ণ ও পুরাতন তাহাই আমাদের কাছে সনাতনত্বের দাবী করে এবং আমাদের কল্পনায় সনাতনধর্ম্ম জিনিষটা যে-কোন বিধি নিয়ম আচার অনুষ্ঠানাদির সমারোহে সজারুবৎ কণ্টকাকীর্ণ হইয়া উঠে। কারণ, এই-সকল শোনা কথায় আমরা এতই অভ্যস্ত যে ইহাদের একএকটা মনগড়া অর্থ আমাদের কাছে আপনা হইতেই দাঁড়াইয়া গিয়াছে; সেটাকে আবার ঘাঁটাইয়া দেখা আমরা আবশ্যক বোধ করি না। শাস্ত্রে 'ত্যাগ' বলিতে কি কি ছাড়িতে উপদেশ দেয় তাহা বুঝি আর নাই বুঝি আমরা ঐ ত্যাগ শব্দটার সঙ্গে ছাড়ার সংস্কারটুকুকে ধরিয়া রাখি। অমুক সংসার ছাড়িয়া পলাইয়াছেন, তিনি ত্যাগী; অমুক এত টাকা দান করিয়াছেন, তিনি ত্যাগী; অমুক এই অনুষ্ঠানে শক্তি ও সময় নষ্ট করিয়াছেন, তিনিও ত্যাগী। কর্ম্মফলাসক্তি কিছুমাত্র কমিল না,—দেহাত্মবুদ্ধির জড়সংস্কার ঘুচিল না— প্রভুত্বের অভিমান ও অহঙ্কার গেল না; অথচ শাস্ত্রবাক্যেরই দোহাই দিয়া 'ত্যাগের মাহাত্ম্য' প্রমাণিত হইল। এইজন্য একএকটা কথাসংশ্লিষ্ট চিন্তাকে মাঝে মাঝে

আঘাত দিয়া জাগাইয়া দিতে হয়। কারণ, চিন্তা সে নিজগুণে যতই বড় হউক না কেন, আর-দশজনের মনে নিত্য নূতন খোরাক না পাইলে তাহার ক্ষয় অনিবার্য্য। 'জাতীয়ভাব', 'ভারতীয় বিশেষত্ব', 'হিন্দুত্বের ছাঁচ' প্রভৃতি নাম দিয়া আজকাল যে জিনিষটাকে আমরা শিল্পে সাহিত্যে অশনে বসনে প্রয়োগ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছি, তাহার স্বরূপলক্ষণাদির বিষয়ে আমাদের ধারণা যতই অস্পষ্ট হউক না কেন, তাহাতে ঐ ঐ শব্দনির্দ্দিষ্ট বিষয়গুলার প্রতি আমাদের আস্থা ও সম্ভ্রমের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় না। সেটা হয়ত ভালই; কিন্তু দশদিক হইতে যথেষ্ট মাত্রায়, অথবা যথার্থভাবে, আঘাত না খাওয়ায় জিনিষটা যে-ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে বোধ হয় যে ঐ শব্দগুলাকে একবার বিশেষ রকমে ঘাঁটাইয়া দেখা আবশ্যক।

আমার চিন্তাকে কতগুলা শব্দের ঘাড়ে চাপাইয়া দিলাম বলিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। সে চিন্তাটিরজের ভবিষ্যৎ-ইতিহাস তাহাতেই আমার অজ্ঞাতসারে কতগুলা শব্দের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়ে। শব্দের অর্থ ত চিরকাল একভাবে থাকে না—পরে এক সময়ে হয়ত একএকটা শব্দের অর্থ লইয়াই মারামারি বাধিয়া যাইবে—আমার চিন্তার সদ্গতি হওয়া ত দূরের কথা। ঋগ্বেদের একটি ঋকের অর্থ রমেশবাবু প্রভৃতি এইরূপ করেন—

"বৃষ্টিজল শব্দ করিয়া পড়িল এবং (মেঘ বায়ু ও কিরণ) এই তিনের যোগে গাভীরূপী পৃথিবী বিশ্বরূপী (অর্থাৎ শস্যাচ্ছাদিত) হইল"—ইত্যাদি।

পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের মতে, ইহারই অর্থ—

"পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে—সূর্য্যশক্তি এই ঘূর্ণনকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। এই শক্তি-সকলের মধ্যস্থলে গর্ভদেবতা অটলভাবে স্থির রহিয়াছেন" ইত্যাদি! *

এখানে একএকটি শব্দের অর্থবাহুল্যই এরূপ ব্যাখ্যা-বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে। আবার, পুরাণাদিবর্ণিত রূপকগুলিকে নিংড়াইয়া বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব নিষ্কাশনের চেষ্টায় যে ইহা অপেক্ষাও গুরুতর অর্থবিভ্রাট ঘটিয়া থাকে, তাহা সকলেই জানেন। একই কথার অর্থ তোমার আমার কাছে একরকম, আর অন্য দশজনের কাছে অন্যরকম, এরূপ ঘটিলে ভাষার উদ্দেশ্যই পণ্ড হইয়া যায়। তত্ত্ব জিনিষটা যখন কবিত্বের খাতিরে রূপকের মধ্যে একেবারে হাত পা গুটাইয়া বসে, অথবা সে যখন 'হিংটিংছটে'র আকার ধারণ করে, তখন ভবিষ্যদ্বংশের কল্পনায় সে অতি সহজেই কাব্য বা ইতিহাস বা বৈজ্ঞানিক গবেষণা—যাহা-ইচ্ছা-তাহাই—হইয়া দাঁড়ায়।

একে ত ভাষার অর্থভেদ সর্ব্বদাই ঘটিতেছে—তাহার উপর নিজের পছন্দমত অর্থ বাহির করিবার দিকে মানুষের স্বভাবতই একটু আধটু নজর থাকে। ইহার মধ্যে আবার যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক বা স্পষ্টই খানিকটা ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা রাখিয়া দেওয়া হয়, তবে মানুষের বুদ্ধি এ অনর্থ ঘটাইবার সুযোগ ছাড়িবে কেন? সেকালে রোমীয় ধর্ম্মশাসনের বিধি অনুসারে অবিশ্বাসী ধর্ম্মদ্রোহীর জন্য এই মর্ম্মে একটা ব্যবস্থা দেওয়া হইত :—"ইহাকে আঘাত করিও না, কিন্তু বিনা রক্তপাতে ইহার দুর্ম্মতির প্রতিবিধান কর।" এ কথাটার অর্থ করা হইত "এ ব্যক্তিকে পোড়াইয়া মার!" এইরূপে অশ্বত্থামার নিধনসংবাদে "ইতিগজ" সংযোগের ন্যায়, ব্যক্তভাষার পশ্চাতে অব্যক্ত অভিপ্রায়ের স্বগত উক্তিটা ভাষার অর্থকে যে কখন কোন্ মুখে ফিরাইয়া দেয় তাহা অনেক সময়ে নির্ণয় করা কঠিন।

ভাষা যে কেবল চিন্তাকে বিপথে ঘোরাইয়া বা তাহার আসন দখল করিয়াই ক্ষান্ত হয়, তাহা নয়; সে এক এক সময়ে উদ্যোগী হইয়া আমাদের অজ্ঞতার উপর পাণ্ডিত্যের রং ফলাইয়া থাকে। নিতান্ত সামান্য বিষয়েরও প্রকাণ্ড সংজ্ঞানির্দ্দেশ করিয়া, অথবা যাহার সম্বন্ধে কিছুই জানিনা তাহারও একটা নামকরণ করিয়া, আমাদের বিজ্ঞতার ঠাট বজায় রাখে এবং আমাদের পাণ্ডিত্যের অভিমানকে নানারূপ ছেলেভুলান কথার সাহায্যে আশ্চর্য্য রকমে জাগাইয়া রাখে। একটা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্যে কোন একটা জিনিষ হয়ত আপাতদৃষ্টিতে সাক্ষীগোপালের কাজ করে মাত্র—অথচ তাহার উপস্থিতিটা কেন যে সেই ক্রিয়ানিষ্পত্তির সহায়তা করে, বৈজ্ঞানিক তাহার কারণ খুঁজিয়া পান না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ছাত্র যখন এই ব্যাপারটাকে Catalytic action নাম দিয়া ব্যাখ্যা করে তখন সে হয়ত মনেই করে না যে এখানে ঐ শব্দটার আড়ালেই একটা প্রকাণ্ড অজ্ঞতার

* "আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ"।

ফাঁক রহিয়া গিয়াছে। আফিং খাইলে ঘুম আসে কেন—এ প্রশ্নের উত্তরে মানুষ এক সময়ে Somniferous principle বা নিদ্রোৎপাদিকা শক্তির কল্পনা করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিত। কিন্তু নিদ্রোৎপাদিকা শক্তির গুণে নিদ্রা আসে এ ব্যাখ্যা আর এখনকার যুগে ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রাহ্য হয় না; কারণ কেবল ভাষার উলটপালটে যে যুক্তির প্রতিষ্ঠা হয় না—এ তত্ত্বটা এ ক্ষেত্রে নিতান্তই স্পষ্ট দেখিতে পাই। কিন্তু সৃষ্টি-রহস্যের মূলে 'মায়া' বা 'অবিদ্যা'র কল্পনা ঠিক এই শ্রেণীভুক্ত না হইলেও উহা যে আদৌ একটা ব্যাখ্যা বা মীমাংসা নয়—মূল প্রশ্নেরই স্পষ্টতর পুনরুক্তি মাত্র—এবং এই নামকরণে যে কেবল আমাদের চিন্তার পরাজয়কেই স্বীকার করা হয়, একথা অনেকেই ভাবিয়া দেখেন না। বিজ্ঞানের একএকটি সিদ্ধান্ত বা 'law' আওড়াইয়া আমরা মনে করি খুঁব একটা কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইল। অমুক কাজটা অমুক law অনুসারে সম্পন্ন হইল; According to Newton's third law of motion, নিউটনের গতিবিষয়ক তৃতীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সমান হইল। বলাবাহুল্য আইনটার খাতিরে কাজটা নিষ্পন্ন হয় না। কার্য্যতঃ, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার তুল্যতা দেখা যায় বা এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। 'অমুক সিদ্ধান্ত অনুসারে হয়' বলায় নূতন কিছুই বলা হইল না, কেবল সিদ্ধান্তকে তথ্যের সঙ্গে মিলাইয়া দেখা গেল। তেমনি, আলোকতত্ত্বের বর্ণনায় Transverse Vibrations of the Luminiferous Ether বলায় চিত্তের চমক লাগিতে পারে; কিন্তু তাহাতে যে আমার আলোকচৈতন্যের কোনরূপ মীমাংসা হয় না, এ কথাটা শিক্ষিত লোকেও অনেক সময়ে ভুলিয়া বসে।

ভাষার একটা বিশেষ সুবিধা ও অসুবিধা এই যে, চিন্তার আদ্যোপান্ত ইতিহাস বহন করিতে সে বাধ্য নয়। বড় বড় তত্ত্বগুলাকে সে একএকটা সংক্ষিপ্ত নাম বা সূত্রের আকারে ধরিয়া রাখিতে পারে। জ্যামিতিতে বিন্দু-কল্পনার আবশ্যক হইলে, প্রত্যেকবার বলিতে হয় না যে—"এমন একটি অতিক্ষুদ্র দেশাংশ গ্রহণ কর যাহার আয়তন-কল্পনা সম্ভব নয় কিন্তু অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।" বিন্দু শব্দটার উল্লেখ করিলেই এইসকল চিন্তার ছায়া মনের মধ্যে আপনা হইতেই জাগিয়া উঠে। সেইরূপ অনেক জটিলতত্ত্ব আছে যাহাকে গোটাতত্ত্বের আকারে প্রত্যেকবার আওড়ান চলে না—অথচ তাহাকে সংক্ষেপে দুচারিটা কথায় সারিতে গেলেও বিপদের সম্ভাবনা। বিশেষত আত্মতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে এক-একটা কথার সঙ্গে মানুষের সঙ্গত অসঙ্গত নানাপ্রকার সংস্কার এমনভাবে জড়িত থাকে যে একএকটা শব্দ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের অলক্ষিতে একএকটা ব্যক্তিগত সংস্কারের প্রতিষ্ঠা করা হয়। ধর্ম্ম বলিতে, আত্মা বলিতে হাজার লোকে হাজার রকম অর্থ করে, অথচ এই কথাগুলি লইয়া লোকে এমনভাবে মারামারি করে যেন অর্থ সম্বন্ধে আর কোন মতান্তর নাই।

এক ইংরেজ ভদ্রলোক বাইবেলের একটু উক্তি তুলিয়া বলিতেছিলেন, 'তোমরা ত বিশ্বাস কর যে এই সংসারটা কেবল flesh নয়, জড়ের ব্যাপার নয়, ইহার মধ্যে spirit আছেন?" আমি অতর্কিতে কথাটাকে স্বীকার করায় তিনি ভারি খুসী হইয়া বলিলেন, "হাঁ তোমরা oriental (প্রাচ্য) লোক কিনা, তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি আছে। তোমাদের পক্ষে প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস করা খুব স্বাভাবিক!" তখন বুঝিলাম তিনি Spirit বলিতে ভূতপ্রেত ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না!

জগতের কাছে দাঁড়াইতে গেলে চিন্তামাত্রকেই কতকগুলা শব্দকে বিশেষভাবে আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইতে হয়। কোন কোন স্থলে এই যোগটা এত ঘনিষ্ঠ হইয়া দাঁড়ায় যে শব্দটাকে বাদ দিয়া চিন্তাটাকে ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব তত্ত্বের আলোচনা করিতে গেলেই লীলা রস ভক্তি ভক্ত ভগবান প্রভৃতি কতকগুলা শব্দকে একেবারেই বাদ দেওয়া চলে না। পাশ্চাত্য ক্রমবিকাশতত্ত্বের আলোচনা করিতে গেলেই Heredity, Variation, Struggle for Existence, Natural Selection (উত্তরাধিকার, পরিবর্ত্তি, জীবন-সংগ্রাম, যৌন নির্ব্বাচন) প্রভৃতি কথাগুলি অপরিহার্য্যরূপে আসিয়া পড়ে। কথাগুলিকে না বুঝিয়া গ্রহণ করায় ত বিপদ আছেই, বুঝিয়া গ্রহণ করিলেই যে বিপদ একেবারে কাটিয়া যায় তাহাও নহে। মনের একএকটি চিন্তাকে কতগুলা শব্দের আট

ঘাটের মধ্যে বাঁধিয়া দিলে সে চিন্তার পথ ভবিষ্যৎ যাত্রীর পক্ষে অনেকটা সুগম হইতে পারে; কিন্তু চিন্তাটাও ক্রমে প্রণালীবদ্ধ হইয়া পড়ে এবং অনেক সময়ে দেখা যায় যে পরবর্ত্তী যুগে যাঁহারা সেইসকল তত্ত্বের পুনর্মীমাংসা করিতে আসেন, তাঁহারা গোড়াতেই দুএকটা কথার বাঁধ ভাঙিয়া লইতে বাধ্য হন। যে বিষয়কে বা মতকে সাধারণ কথায় তত্ত্বের মত করিয়া বুঝাইতে গেলে মনে তেমন কোন সম্ভ্রমের উদয় হয় না—সে-ই যখন দুএকটা বহুজনস্বীকৃত শব্দের ধ্বজা উড়াইয়া আসে তখন তাহার মর্য্যাদা ও গুরুত্ব যেন অসম্ভব রকম বাড়িয়া যায়। শব্দের আধিপত্য তখন আমাদের কাছে নানারূপ অসঙ্গত দাবী করিতে থাকে। ক্রমে হয়ত সেই ব্যাপারটাই যদি কেহ অন্যরূপ ভাষায় বা অন্য কোন দিক হইতে ব্যক্ত করিতে আসে, সেই পরিচিত শব্দগুলির অভাবে তাহা আমাদের কাছে দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠে। অথবা কাহারও চিন্তা ঠিক সেই সেই শব্দনির্দ্দিষ্ট পথে না চলিলেই মনে হয় যেন তাহা না জানি কোন্ অদ্ভুত পথে চলিয়াছে। হয়ত আর-দশজন লোকের চিন্তার মধ্যে সেই পরিচিত প্রচলিত শব্দগুলার যথাযথ স্থান নির্ণয় করাটা তখন ভারি একটা আবশ্যকীয় ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। মনের এই প্রকার সংস্কারই মানুষের কাছে সর্ব্বদা 'হাঁ-কি-না' 'এটা-না-ওটা' 'মানো-কি-মানো না' গোছের একটা প্রশ্ন দাঁড় করায়। নিরীহ ধর্ম্মার্থীর কাছে সে ধমক দিয়া জিজ্ঞাসা করে "তুমি দ্বৈতবাদী না অদ্বৈতবাদী?" অথচ সে বেচারা হয়ত কোন একটা বিশেষ-বাদের পক্ষ হইয়া লড়াই করিবার কোন প্রয়োজনই অনুভব করে না—হয়ত তাহার মনের কথাটাকে ঐরূপ একটা তত্ত্বের মারামারির আকারে প্রকাশ করা তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। আমাদের রাজনৈতিক মত নির্ণয়ের জন্য এক সময় জিজ্ঞাসা করা হইত "তুমি Moderate না Extremist?" এই প্রশ্নই যেন রাজনীতির প্রকাণ্ডতম সমস্যা—আর ইহার মধ্যেই যেন রাজনৈতিক শ্রেণীবিভাগের নিগূঢ়তম সঙ্কেত নিহিত রহিয়াছে। Moderate Extremist (মধ্যপন্থী ও চরমপন্থী), Liberal Conservative (উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল), Catholic Protestant (প্রাচীনপন্থী ও প্রতিবাদপন্থী) প্রভৃতি কথার দ্বন্দ্ব একেবারে নিরর্থক না হইলেও, ইহার ফলে কতগুলা সাময়িক মতবৈষম্য অযৌক্তিক দ্বৈততত্ত্বের আকার ধারণ করিয়া একএকটি বিরোধকে চিরস্থায়ী করিবার পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। আপাতবিরুদ্ধ কথার মূলে যে সমন্বয়তত্ত্ব নিহিত থাকে, ভাষার বিরুদ্ধতা সে তত্ত্বটাকে গোপন করিয়া রাখে। এদেশে জ্ঞান ও ভক্তির বিরোধ, কর্ম্ম ও বৈরাগ্যের বিরোধ, প্রেম ও অনাসক্তির বিরোধ, কতক-পরিমাণে শব্দবৈষম্যমূলক কৃত্রিম দ্বন্দ্বেরই পরিচায়ক। যাহারা দুর্ভাগ্যক্রমে এই-সকল কথার ঘোরফেরের মধ্যে আটকাইয়া যান তাঁহাদের ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, একটা না-হয় অপরটার পর্য্যায়ে পড়িতেই হয়।

মানুষে প্রশ্ন করে "তুমি জাতীয়তা জিনিষটাকে বিশ্বাস কর কি না" "তুমি হিন্দুত্বকে মান কি না"—আর সঙ্গে সঙ্গে একটা হাঁ-না গোছের জবাব প্রত্যাশা করে। বাস্তবিক কিন্তু অনেক স্থলেই পাল্টা প্রশ্ন ছাড়া আর কোন জবাব সম্ভব হয় না; নতুবা কোন্ কোন্ অর্থে কি কি কথা কতদূর স্বীকার করি বা না করি তাহার একটা বিস্তৃত ফর্দ্দ দিতে হয়। আগে শুনি তুমি যাহাকে জাতীয়তা বল সেটার লক্ষণ কি? হিন্দু বা হিন্দুত্ব বলিতে তুমি কি কি জিনিষ বুঝিয়া থাক? তবে ত বলিতে পারি তোমার জাতীয়তাকে তোমার হিন্দুত্বকে আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত কি না। আমি অমুক জিনিষটাকে মানি আর অমুকটাকে মানি না একনিশ্বাসে একথা বলিয়া ফেলা কার্য্যত যেমন সহজ তেমনি মারাত্মক। জগতের অর্দ্ধেক মারামারি কেবল কথারই মারামারি। আমার অমুক ধর্ম্ম বাস্তবিক কি বলেন তাহাও আমি জানি না, আর তোমার যথার্থ বক্তব্য ও আদর্শ কি তাহারও ধার ধারি না; অথচ তোমার কাছে উত্তর দাবী করি তুমি অমুক ধর্ম্মটা মান কি না—অর্থাৎ ঐ শব্দসংসৃষ্ট আমার সংস্কারগুলাকে মান কি না! পুরাণে লেখে গন্ধর্ব্বেরা বাক্যভোজী—তাহারা নাকি শব্দ আহার করিয়া থাকে। এক হিসাবে, গন্ধর্ব্বশ্রেণীর জীব আমাদের মধ্যেও বড় কম নয়। কিন্তু অর্থই যে বাক্যের সার এবং অর্থটাকে সম্যক্‌রূপে পরিপাক না করিলে শব্দটা যে মনের পুষ্টিসাধনের অন্তরায় হইয়া উঠিতে পারে এই সহজ কথাটা আমাদের মনে থাকে না

বলিয়াই চিন্তার কুপুষ্টিজনিত নানারকম রোগের সৃষ্টি হয়। বিচারবুদ্ধির পাদুকাস্পর্শে বাক্যমাত্রসার প্লীহাজীর্ণ সংস্কারগুলার অপঘাত-মৃত্যুর আশঙ্কা করিয়া আমরা এক-একটা শিখান বুলিকে অতিরিক্ত যত্নের সঙ্গে যুক্তিতর্ক-সন্দেহের কবল হইতে বাঁচাইয়া রাখি। "বিশ্বাসে পাইবে বস্তু তর্কে বহুদূর" বলিয়া প্রাণপণে তর্ক করি, এবং বিশ্বাস করিতে চেষ্টা করি যে "বস্তু"কে পাইতে আর অধিক বিলম্ব নাই।

ভাষা যে নিজের অর্থগৌরবেই সত্য, একথা ভুলিয়া সে যখন কেবলমাত্র শব্দগৌরবে বড় হইতে চায়, তখন তাহার অত্যাচার অনিবার্য্য। চিন্তা কোন দিনই শব্দের দ্বারা নিঃসন্দেহরূপে ও সম্যক্‌রূপে ব্যক্ত হইতে পারে না। সেইজন্যই একএকটা সত্যকে পঞ্চাশবার পঞ্চাশ-রকম ভাষায় পঞ্চাশদিক হইতে দেখা আবশ্যক হয়। কিন্তু তবু দেখা যায় যে সত্যের মূলে প্রবেশ করিতে হইলে আর ভাষা পাওয়া যায় না, অথবা এমন ভাষা পাওয়া যায় না যাহা সত্যানভিজ্ঞের কাছে তত্ত্বকে ব্যক্ত করিতে পারে। অদ্বৈততত্ত্বের কথা নির্ব্বিকল্প সমাধির কথা বলিয়াও এবং "যথা নদ্যঃ স্যন্দমানা সমুদ্রে অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপং বিহায়" ইত্যাদি রূপকের ব্যবহার করিয়াও ঋষিরা বলিতেছেন এসকল তত্ত্বকে প্রকাশ করা যায় না—ইহা ভাষায় জানাজানি হইবার বিষয়ই নহে। বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ-তত্ত্বের কথা আজীবন বলিয়া গেলেন কিন্তু "নির্ব্বাণ কি" এ প্রশ্নের সোজাসুজি কোন উত্তরই দিলেন না। আমরা কিন্তু এ-সকল কথাকে ভাষার মজলিসে টানিয়া অহরহই মারামারি করিয়া থাকি।

ভাষার আশ্রয় লইয়া যে-কোন অপকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহাকেই যদি ভাষার অত্যাচার বলা যায়, তবে ভাষাঘটিত আরও অনেকপ্রকার অত্যাচারের উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমার কার্য্যটা তোমার মনঃপূত না হইলে, তুমি যেসকল শব্দের ব্যবহার কর, সেও এক হিসাবে ভাষার অত্যাচার। অনিচ্ছুক ছাত্রকে পণ্ডিত মহাশয় যখন শাসন অনুশাসনের দ্বারা সংস্কৃত পড়িতে বাধ্য করেন ছাত্র নিশ্চয়ই তাহাকে ভাষার অত্যাচার বলিবে। তোমার ক্ষুধার সময় বা ব্যস্ততার মুহূর্ত্তে তোমার কাছে দর্শনের তত্ত্ব বা কবিত্বের কথা আওড়াইতে গেলে তুমিও বলিবে—'ভাষার অত্যাচার!' ভাষা যখন বন্ধন ছিঁড়িয়া B-u-t 'বাট' P-u-t 'পুট' ইত্যাদিবৎ বৈষম্যের সৃষ্টি করে অথবা সে যখন রুশিয়ার মানচিত্রে বসিয়া তোমার উচ্চারণশক্তির পরীক্ষা করিতে থাকে, সেও একরূপ ভাষার অত্যাচার বৈকি। আর সর্ব্বশেষে, এই প্রবন্ধটিকে আরও বিস্তৃত করিয়া ফেনাইতে গেলে তাহাও অত্যাচার বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

শ্রীসুকুমার রায়।

পরশুরাম-ক্ষেত্র

বর্ত্তমান ভারতীয় ভূগোলে পরশুরাম-ক্ষেত্র নামে কোন ভূ-খণ্ডের নির্দ্দেশ পাওয়া না যাইলেও প্রাচীন হিন্দু-ভারতে ইহার আসন নিতান্ত অগৌরবের ছিল না। কিম্বদন্তি এইপ্রকার যে পুরাণবিখ্যাত বীরকুলচূড়ামণি পরশুরাম ভারতকে নিঃক্ষত্রিয় করিবার পর সমুদ্রতীরে আসিয়া জলগর্ভ হইতে এই ভূভাগকে উদ্ধার করিয়া তথায় আপনার রাজ্য সংস্থাপন করেন। আজ ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম-প্রান্তে ইহা একটি ক্ষুদ্র প্রদেশ মাত্র। সীমায় ক্ষুদ্র হইলেও শোভায় ও সৌন্দর্য্যে, জাতীয় চরিত্রের মধুরতায় ও বাণিজ্য-সম্ভারের প্রাচুর্য্যে পুণ্যভূমি ভারতে ইহার স্থান আজ নিতান্ত হেয় নহে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই প্রদেশে ভ্রমণ করিতে আসিয়া তদানীন্তনকালের ভারতীয় রাজ-প্রতিনিধি ইহাকে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে এক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন। বাস্তবিক এই প্রদেশে ভ্রমণ করিতে আসিয়া মনে হয় প্রকৃতিরাণী এই ভূভাগকে যেন আপনার সুকোমল অঙ্কে অতি সন্তর্পণে সবিশেষ যত্নে রক্ষা করিতেছেন। ইহার পূর্ব্বে ও উত্তরে দক্ষিণ-ভারতের পূর্ব্ব ও পশ্চিম ঘাট-পর্ব্বতমালা আকাশ-চুম্বী মস্তক উত্তোলন করিয়া সস্নেহে ইহাকে আবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ইহার দক্ষিণে ও পশ্চিমে নৃত্য-চঞ্চল আরব-সমুদ্র আপন অঙ্গের সরব আলোড়ন বিলোড়নে এবং সহাস্য কৌতুকে প্রিয়সখার

ন্যায় ইহার সহিত ক্রীড়া কৌতুক করিতেছে। ইহার উত্তর-পশ্চিম-প্রান্তে গোকর্ণপুর এবং দক্ষিণ-পূর্ব্বে কন্যা-কুমারিকা বা কেপ কমোরিন অবস্থিত। বর্ত্তমানে এই ভূখণ্ড বহুভাগে বিভক্ত। ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন রাজ্য ইহার অন্তর্ভুক্ত; ব্রীটিশ মালাবার এবং উত্তর ও দক্ষিণ কর্ণাট ইহার অংশ। ফরাসী-অধিকৃত মাহি সহরও ইহার মধ্যে বিরাজ করিতেছে। কন্যা-কুমারী দেবীর মন্দির এবং উড়ুপীর শ্রীকৃষ্ণের মন্দির তীর্থহিসাবে এই ভূভাগকে ভারতের হিন্দুর নিকট পুণ্য-স্মৃতিতে জড়িত করিয়া রাখিয়াছে। এতদ্ভিন্ন বহু নদনদী, হ্রদ ও দীর্ঘিকা, পর্ব্বত ও টিলা, নানাবিধ সুদৃশ্য ফলফুলের বৃক্ষরাজি ও বিহঙ্গমের মধুর কল-কূজন ইহার সৌন্দর্য্য শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছে।

দুই বৎসর পূর্ব্বে যেদিন রেলপথে টিনেভেলি হইতে আসিয়া এই ক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ করিলাম, সে দিনের মধুর প্রাকৃতিক দৃশ্য আজিও বিস্মৃত হইতে পারি নাই। তখন সন্ধ্যা আগত-প্রায়, সুনীল গগন ঘন-কৃষ্ণ জলদ-জালে আচ্ছাদিত। দিনমণি তখনই সেই কনক-কিরণ-মণ্ডিত মেঘমালার অন্তরাল হইতে অবতরণ করিয়া গিরিশিখরে আপনার প্রোজ্জ্বল কীরিট-ভূষণ স্থাপন করিয়া মলয়-পর্ব্বতের বন্ধুর গাত্রে ইন্দ্র-দেবতার স-ঘন বজ্র-নিক্ষেপের চেষ্টা সভয়চকিতনেত্রে অবলোকন করিতেছিলেন। পর্ব্বতের পাদপ্রান্তে শ্যাম-শোভাময়ী ধরণী আপনার নববর্ষণ-স্নাত অঙ্গে আনন্দ-উল্লাস অনুভব করিতেছিলেন। মধ্যভাগে জলদজালের আবরণ উন্মোচন করিয়া বিজলির চমকের ক্ষণিক আলোকে খেচর দেবতাগণ বুঝিবা পত্র-পল্লবাচ্ছাদিত গুহামধ্যস্থ গোপন কুঞ্জে অপ্সরীগণের আনন্দ-নৃত্য দেখিতেছিলেন। প্রকৃতির এই মাধুরী দেখিয়া আমার মনে কুমারসম্ভবের অমর কবির অমিয়-মাখা হিমালয়-ছবি অঙ্কিত হইয়া উঠিল। কবি গাহিয়াছেন,

> "আমেখলং সঞ্চরতাং ঘনানাম্
> ছায়ামধঃ সানুগতং নিষেব্য।
> উদ্বেজিতা বৃষ্টিভিরাশ্রয়ন্তে
> শৃঙ্গানি যস্যাতপবন্তি সিদ্ধাঃ॥

এই প্রথম দর্শনের পর যতই এই দেশের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে লাগিলাম ততই মনে হইতে লাগিল যে পরশুরাম-ক্ষেত্র যেন সুজলা সুফলা মলয়জ-শীতলা মাতা বঙ্গভূমিরই এক প্রান্তসীমা। ওষধি-তরু-লতা-বেষ্টিত স্নিগ্ধ কোমল আনন্দমূর্ত্তি, কূল-প্লাবিনী স্রোতস্বিনীকূলের চঞ্চল নৃত্যোচ্ছ্বাস, বিবিধ বর্ণাচ্ছাদন-ভূষিত সঙ্গীত-মুখর বিহঙ্গমকুলের প্রণয়-কাকলি এবং আরও কতশত ভাব সর্ব্বদাই সুদূর বঙ্গ-ভূমির স্নেহস্মৃতি আমার মনে জাগাইয়া তুলিত। কেবল বাহ্য-সৌন্দর্য্যেই যে ইহার সহিত বাঙ্গলার সাদৃশ্য অনুভব করিতাম তাহা নহে। উভয়দেশের অধিবাসী-বৃন্দের শারীরিক গঠনে এবং অন্তঃকরণের বাহ্য পরি-চয়েও সাদৃশ্য নিতান্ত অল্প অনুভব করি নাই। তমি-ড়ের মসিকৃষ্ণ-গাত্রবর্ণ এদেশে নিতান্তই বিরল। নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণ-সমাজের রমণীদিগের অবরোধপ্রথা বাঙ্গলার প্রথা অপেক্ষা তীব্রতর হইলেও তাহা আমাদের দেশের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। তমিড় এবং মহারাষ্ট্রের ন্যায় এতদ্দেশীয় মহিলাগণ বিচিত্রবর্ণের রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করেন না। এইরূপে দেখা যায় বঙ্গদেশের ও পরশুরাম-ক্ষেত্রের সাদৃশ্য বহুবিধ, নিকট ও ঘনিষ্ঠ।

এই প্রদেশের প্রাচীন ইতিহাস নানাভাবে আজি পর্য্যন্ত সভ্যজগতে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। এ প্রদেশ একদিন সুবিখ্যাত অদ্বৈতবাদ-প্রচারক পুণ্য-শ্লোক শঙ্করাচার্য্যের জন্মভূমি বলিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই প্রদেশই পুনরায় দ্বৈতবাদ-প্রচারক অক্ষয়-কীর্ত্তি পূজ্যপাদ শ্রীমন্ মধ্বা-চার্য্যের জন্মস্থান হইয়া পরম গৌরব-পদ লাভ করিয়াছে। যে ক্ষেত্রে অদ্বৈতবাদের জন্ম, সেই ক্ষেত্রেই দ্বৈতবাদের উৎপত্তি। বহু শতাব্দী অন্তে আজ জনসাধারণ এই উভয় আচার্য্য-পাদের কলহকথা ভুলিয়া উভয়কেই গুরু-জ্ঞানে সম্মান ও পূজা করিতেছে।

প্রাচীন হিন্দু-ভারত নানাস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া যে জাতীয় জীবনের প্রসারতা বৃদ্ধি করিয়া-ছিলেন পরশুরাম-ক্ষেত্রে তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখা যায়। যবদ্বীপ ও সিংহলদ্বীপের ন্যায় পরশুরাম-ক্ষেত্রও বঙ্গ-দেশের এক প্রধান উপনিবেশ। সিংহল বিজয়ের পর বহু

বঙ্গবাসী সিংহলে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, ইহা ইতিহাসের কথা। সিংহল হইতে বহু বাঙ্গালী বাণিজ্য-ব্যপদেশে পরশুরাম-ক্ষেত্রে আগমন করিয়া তথায় বঙ্গদেশীয় সভ্যতা বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন। ইহা প্রাচীন কিম্বদন্তি। কেবল বঙ্গদেশীয় বণিকগণ যে এই প্রদেশে আসিয়া ধনাগমের পথ সরল করিয়া লইয়াছিলেন তাহা নহে। বাঙ্গালীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বহু আরবদেশবাসী এই ক্ষেত্রে শুভাগমন করেন। উপনিবেশে জাতিভেদের প্রকোপ ছিল না, তখন বৌদ্ধ আদর্শেরই প্রভাব। সুতরাং আরব ও বঙ্গের অধিবাসীবৃন্দ শীঘ্রই এক নূতন সংমিশ্রিত জাতির সৃষ্টি করিলেন। তখনও আরবে মুসলমানধর্ম্ম প্রচারিত হয় নাই, হিন্দুধর্ম্মের কঠোরতাও তখন ছিল না। স্বার্থের সম্বন্ধে পরস্পরের পরিচয় ও মিশ্রণ হইতে বিলম্ব হইল না। উভয়ের মধ্যে বিবাহাদি সম্বন্ধও স্থাপিত হইল। এইভাবে এক নবজাতির পত্তন হইল।

আরবের অধিবাসীবৃন্দ এই ক্ষেত্রের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত করিবার পূর্ব্বে পূর্ব্বউপকূলের নায়ক বা যোদ্ধৃবৃন্দ ইহার সুদৃঢ় ও দুর্লঙ্ঘ্য গিরিপ্রাচীর ভেদ করিয়া প্রাচীনতম অধিবাসী "থিয়ন"দিগকে পরাজয় করেন। থিয়নগণ রণ-কুশলী ছিলেন না; নিরীহ কৃষি- ও মৎস্য-মাংস-জীবী হইয়া ফল-মূল-শস্য-ভূষণা নদী-স্রোতস্বতী-প্রবহমানা এবং মৃগ-মৎস্যাদি-বহুলা ভূমিখণ্ডকে নির্ব্বিবাদে ও নিশ্চিন্তমনে উপভোগ করিতেছিলেন। পূর্ব্ব ও উত্তর প্রান্তের পর্ব্বত অধিত্যকা ও অরণ্যাদি ভেদ করিয়া অসি বর্ম্ম ও ধনুর্ব্বাণ হস্তে নায়কগণ পঙ্গপালের মত এই দেশে পতিত হইয়া থিয়নগণের অংশীদার হইলেন। অংশীদার ক্রমে প্রভু হইলেন, প্রভু অবশেষে বিজিতের উপর নির্য্যাতন আরম্ভ করিলেন এবং সর্ব্বশেষে দর্শন-সুন্দর দেশসমূহ হইতেও অধিকতর লাভজনক ব্যবসায় ও উচ্চতর সম্মানের কর্ম্মসকল হইতে বিতাড়িত করিয়া সর্ব্ববিষয়ে ইহাদিগকে জেতার অধীনতা স্বীকার করাইলেন। ক্রমে নায়কদিগের পশ্চাতে হিন্দুসভ্যতা ও বৈষ্ণবধর্ম্মও তথায় শুভাগমন করিল, কেননা নায়কগণ হিন্দু ও বৈষ্ণব। এই হিন্দু-সভ্যতা- ও ধর্ম্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে যাঁহারা আগমন করিলেন তাঁহারাও বঙ্গদেশবাসী। ইহাঁদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইলেন নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণ। এতদ্ভিন্ন কোঙ্কনি প্রভৃতি পঞ্চ-গৌড়ীয় ব্রাহ্মণও ক্রমে ক্রমে এই প্রদেশে আগমন করিয়া বসবাস আরম্ভ করিলেন। এই-সকল কোঙ্কনি প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এখনও বঙ্গীয় ব্রাহ্মণত্বের বহু দাবীচিহ্ন বর্ত্তমান; যেমন তাঁহাদের মৎস্যভক্ষণ-বিধি।

নম্বুদ্রী নেতাগণ নবসভ্যতার দুন্দুভিধ্বনি নিনাদিত করিতে করিতে এদেশে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমেই আপনাদিগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোচ্চ বলিয়া সাধারণের নিকট প্রচার করিলেন। তাঁহাদিগের বাসস্থানের জন্য ভিন্ন পল্লী নির্দ্দিষ্ট হইল, স্নানাদি শৌচের জন্য ভিন্ন তড়াগ নির্দ্দিষ্ট হইল। তিনি ধর্ম্মের নেতা, সমাজের কর্ত্তা, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তিনি বিধি-প্রণেতা বা আইনকর্ত্তা ও নম্বুদ্রীপাদ হইলেন স্বাধীন স্বতন্ত্র এবং সকলের প্রভু। এমন কি দেশ-নায়কগণও ইহাঁর নিকট অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান হইতেন। নম্বুদ্রী সর্ব্ববিষয়ে প্রভু হইয়াও এক বিষয়ে কিন্তু আপনার স্বতন্ত্রতার গর্ব্ব অক্ষুন্ন রাখিতে পারিলেন না; তিনি সামাজিক জীব, সমাজস্থিতির অত্যাবশ্যকীয় বিধানে তাঁহার উদ্বাহ-ক্রিয়ার জন্য সহধর্ম্মিণীর সন্ধানে তাঁহাকে বড়ই বিপন্ন হইতে হইল। এসকল অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের কথা। উত্তর-ভারতে তখন বোধ হয় মুসলমান প্রাদুর্ভাব আরম্ভ হইয়াছে। সেই পদব্রজে বা গো-যানে যাতায়াতের দিনে হিন্দু ললনার পক্ষে হিমালয়-প্রান্ত হইতে কন্যা-কুমারিকা প্রদেশে গতায়াত করা নিতান্ত নির্ভয়-যাত্রা ছিল না। তদ্ভিন্ন উত্তরভারতের ব্রাহ্মণ-সমাজের লোকেরা এই অজ্ঞাত দূরদেশে স্বেচ্ছায় পুত্র কন্যা প্রেরণ করিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক হইল। সুতরাং নম্বুদ্রী প্রমাদ গণিলেন। তাঁহার সংসারের আশায় বুঝিবা জলাঞ্জলি দিতে হয়। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি অসবর্ণ বিবাহে সম্মত হইলেন। স্মৃতি ও পুরাণ এ বিষয়ে তাঁহার সহায়তা করিল। নম্বুদ্রীপাদ অসবর্ণ বিবাহে সম্মত হইয়া নায়কবংশীয়া রমণীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করিলেন। বোধ হয় এই বিষয়ে বহু আন্দোলন ও আলোচনার পর বিবাহের সমুদায় বিস্তৃত কথা মীমাংসিত হইয়া গিয়াছিল। নায়ার রমণী নম্বুদ্রীপাদের সহধর্ম্মিণী হইতে প্রতিশ্রুত হইলেন কিন্তু

শ্রীমদ্ আনন্দতীর্থ-ভগবৎ-পাদাচার্য্য-করার্চ্চিত মন্থ-পাশ-ধর শ্রীউড়ুপী কৃষ্ণ।

সেই সঙ্গে ইহাও স্থির হইল যে সম্পত্তির অধিকার কন্যাতে বর্ত্তিবে, পুত্রে নহে।

বর্ত্তমান সময়ে নম্বুদ্রী-সমাজে দুইপ্রকার বিবাহ প্রচলিত। প্রথম "কল্যাণম্," দ্বিতীয় "সম্বন্ধম্।" প্রথম বিবাহ সবর্ণ এবং বিধিসঙ্গত যজ্ঞাদি করিয়া, আর দ্বিতীয় বিবাহ অসবর্ণ এবং অতি সামান্য অনুষ্ঠানের দ্বারা। এই দ্বিতীয় প্রকারের অসবর্ণ সম্বন্ধম্ বিবাহ সামান্য একটা মন্ত্র পাঠ করিয়া ও কিছু বস্ত্র উপহার প্রদান করিয়া হয়। এই সম্বন্ধম্ বিবাহের স্ত্রী-পরিত্যাগের বিধিও সহজ। এইরূপ পরিত্যক্ত স্ত্রীর দ্বিতীয়বার বিবাহেও আপত্তি নাই। বিগত কয়েকবৎসর এই সম্বন্ধম্ বিবাহের বিরুদ্ধে সমাজনেতৃগণ যুদ্ধঘোষণা করিয়াছেন। আমার ত্রিবাঙ্কুরে অবস্থানকালে সেই রাজ্যে এক আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে; তাহার বলে সম্বন্ধম্ বিবাহের অনিষ্টকারিতা অনেক লাঘব করা হইয়াছে। এখন নম্বুদ্রী মহোদয় নায়ক বা নায়ার-বংশজা রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া আর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যভুক্ত নায়ারগণ এই আইন পাশ হওয়ায় মহোৎসব করিয়াছিলেন। এমন কি ব্রিটিশরাজ্যভুক্ত নায়ারগণও তাঁহাদের ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যভুক্ত স্ব-জাতীয়গণের সৌভাগ্যের জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন এবং

উড়ুপী কৃষ্ণের মন্দির।

রাজারও বিশেষ প্রশংসা করিলেন। বর্ত্তমানকালে নায়ারগণ এক মিশ্রজাতি। ইঁহারা আকৃতি ও প্রকৃতিতে বহুল রূপে বাঙ্গালিরই মত। বুদ্ধিতে ও পদমর্য্যাদায় তাঁহারা আমাদের কায়স্থ ভদ্রলোকদিগেরই অনুরূপ।

এই নম্বুদ্রী বনাম নায়ার ভিন্ন অন্য দুই পথ দিয়াও এই প্রদেশে মিশ্রজাতির সংগঠন হইয়াছে ও হইতেছে। এই দ্বিতীয় প্রকারের সংমিশ্রণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের হইলেও সংখ্যা হিসাবে ইহাদিগকেও অগ্রাহ্য করা
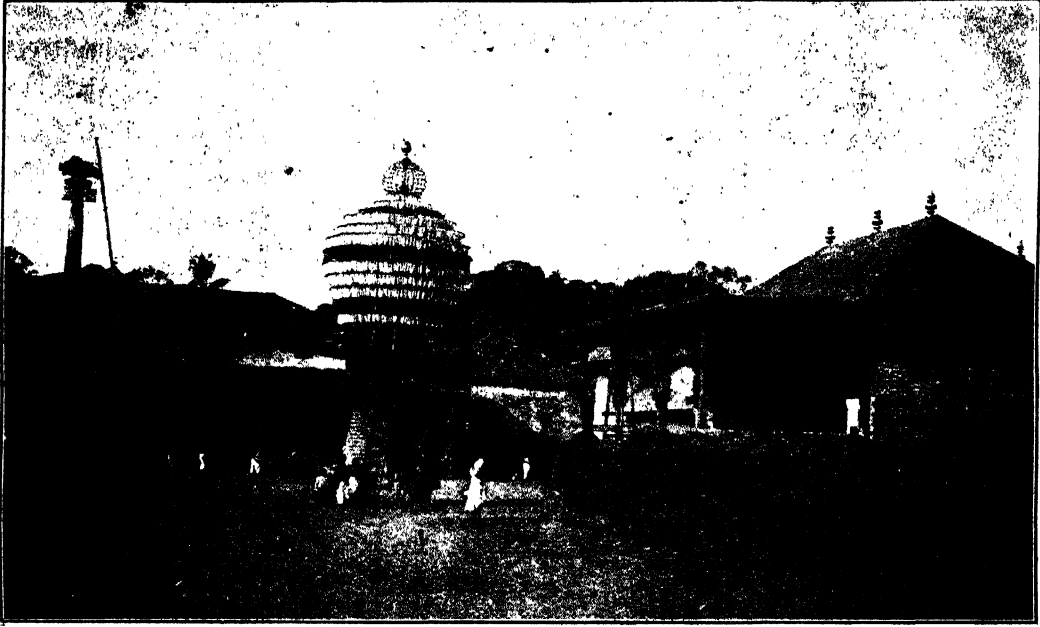
উড়ুপী কৃষ্ণের মন্দির ও রথ।

নম্বুদ্রী বা নায়ার।

যায় না। এই জাতি-সঙ্কর সংঘটিত হইয়াছে আরব ও পরশুরাম-ক্ষেত্রবাসীর মধ্যে। মহম্মদের জন্মের পূর্ব্ব হইতেই এই সংমিশ্রণ চলিতেছিল; পয়গম্বর-প্রতিষ্ঠিত নবধর্ম্মের উন্মাদনা এবং সমাজের নূতন আদর্শ লইয়া আরবদেশবাসী পরশুরাম-ক্ষেত্রে আগমন করিয়া নূতন ভেরী বাজাইলেন। ক্রমে মহম্মদ-পন্থীগণ সমাজে এক বিপ্লবের সূচনা করিলেন। বহুশিষ্য সংগৃহীত হইতে লাগিল; সমাজ নূতন বেশ ধারণ করিয়া উঠিল। হিন্দুগণ মহম্মদীয় ধর্ম্মকে সহ্য করিলেন এবং মহম্মদীয়গণও সামাজিক আচার ব্যবহারে অনেকটা স্থানীয় রীতিনীতি মান্য করিয়া লইলেন। এইসকল বিধির মধ্যে কন্যাগত কুলের নিয়ম এবং নারী-সমাজে অবরোধ প্রথার শিথিলতা সর্ব্বপ্রধান। সম্ভ্রান্তবংশীয় মুসলমান রমণী মালাবার ভিন্ন অন্য কোথাও প্রকাশ্য রাজপথে উন্মুক্তমুখে বাহির হন না। মালাবারে সর্ব্বপ্রথম দেখিলাম সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ মুসলমান মহিলাগণ রেশমী বস্ত্র ও কামিজ পরিধান করিয়া ওড়না বা উত্তরীয় দ্বারা মস্তক ও অঙ্গ আবৃত করিয়া ছত্রহস্তে গৃহ হইতে গৃহান্তরে সখী-সম্ভাষণে গমনাগমন করিয়া থাকেন। পথে কোন পুরুষ দেখিলে উন্মুক্ত ছত্র কিঞ্চিৎ হেলাইয়া বদন

নায়ার রমণীগণের কবরী।

আবৃত করিয়া থাকেন। ইহাই সাধারণ ব্যবস্থা। সাধারণ হিন্দু রমণী পথে ছত্র ব্যবহার করিলেও তাহা অবগুণ্ঠন-কর্ম্মে কখন নিযুক্ত করেন না; মুসলমান রমণী তাহা করেন; প্রভেদ এইমাত্র। এইপ্রকার সন্ধি করিয়া আরবীয় মুসলমান পরশুরাম-ক্ষেত্রে নূতন মুসলমান উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। এই মিশ্রণে দুইটি ভিন্ন সভ্যতা মিশিল,

মলয়ালী বালিকা।

দুইটি ভিন্ন সমাজ মিশিল, দুইটি ভিন্ন দেশ মিশিল। এই নব-নিশ্রণে যে সন্তান জন্মিল তিনি হইলেন মাপলা বা মহাপিলা অর্থাৎ বড় ছেলে। বর্ত্তমানকালে এই প্রদেশে লক্ষ লক্ষ মাপলা শৌর্য্যে বীর্য্যে ও ব্যবসা বাণিজ্যে এক অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন।

এই প্রদেশে তৃতীয় আর-একপ্রকার মিশ্রজাতির উদ্ভব হইয়াছে; তাহা খ্রীষ্টানদিগের দ্বারা। যীশুর সময়কাল হইতে এই প্রদেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ হয়। তাঁহার প্রিয় শিষ্য সাধু টমাস্ যীশু-প্রচারিত মুক্তির নূতন সমাচার লইয়া এই ভূখণ্ডে প্রথম উপস্থিত হন। তিনি ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসিয়া সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি বলিতেন ধর্ম্মসাধন করিয়া আধ্যাত্মিক মুক্তি লাভ কর; ধর্ম্মের পশ্চাতে সমাজ আপনা হইতেই গঠিত হইয়া উঠিবে। সাধু টমাসের পূতচরিত্রের সংস্পর্শে আসিয়া ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলেই যীশুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণ প্রথমে যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করেন নাই; ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল খ্রীষ্টান-সমাজে আসিয়াও প্রথম প্রথম ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালই থাকিয়া গেলেন। কিন্তু অধিকদিন এ পার্থক্য স্থায়ী হইতে পারিল না। খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের পাশ্চাত্য আদর্শ ভারতীয় খ্রীষ্ট-সমাজকেও স্বাতন্ত্র্য-লাভের স্বাধীনতা দিল না। বিগত তিন চারি শতাব্দীর মধ্যে পরশুরাম-ক্ষেত্রের খ্রীষ্টীয় সমাজও বিশিষ্টরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণে ও চণ্ডালে ভেদ প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিল। স্থানীয় খ্রীষ্ট-সমাজ এখনও পর্য্যন্ত হিন্দু-আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত না হইলেও আভ্যন্তরীণ ঘটনাচক্র লক্ষ্য করিয়া অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে খ্রীষ্টসমাজ অচিরেই আপনার সামাজিক স্বতন্ত্রতা প্রতি-ষ্ঠিত করিয়া লইবে। ধর্ম্মের অনুষ্ঠানাঙ্গের রূপ বহুল-পরিমাণে হিন্দু থাকিলেও সামাজিক সংগঠনক্রিয়া পাশ্চাত্যপ্রথাই অবলম্বন করিবে। খ্রীষ্টান পুরুষানুক্রমে যতই বিস্তৃতি লাভ করিবে ততই স্বতন্ত্র হইতে থাকিবে। স্বকৃত-ভঙ্গ খ্রীষ্টান অপেক্ষা দ্বিতীয় পুরুষের খ্রীষ্টান মূল হিন্দুসমাজ হইতে দূরতর হইতে থাকিবে এবং ক্রমে ব্রাহ্মণ-খ্রীষ্টান ও চণ্ডাল-খ্রীষ্টানে পার্থক্য ঘুচিয়া যাইবে। কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই এই কথা বলিতেছি না। বহুদিবস বহু অবস্থায় ইহাঁদিগের সহিত মিলিয়া মিশিয়া পূর্ব্বোক্ত ধারণাতেই উপনীত হইয়াছি। এখনও স্থলবিশেষে পুলেয়ান খ্রীষ্টান ও উচ্চশ্রেণীর খ্রীষ্টানের জন্য পৃথক পৃথক গির্জাঘর থাকিলেও শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তারের সহিত এই-সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ পার্থক্য ভাঙ্গিয়া যাইতেছে।

বর্ত্তমানকালে খ্রীষ্টান-সমাজে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত

বলিয়া দুইটা শ্রেণী আছে। শিক্ষিতদলে ব্রাহ্মণে ও চণ্ডালে একাকার হইয়া গিয়াছে। অসবর্ণ বিবাহ, অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ অবাধে চলিয়া যাইতেছে। যতই দিন যাইতেছে ততই এই ভাবের জাতি-সঙ্কর দেশমধ্যে বাড়িয়া যাইতেছে।

লোকে মনে করিতে পারেন যে, ক্ষুদ্র খ্রীষ্টসমাজের সঙ্করজাতির সৃষ্টিতে বৃহত্তর হিন্দুসমাজের কি ক্ষতিবৃদ্ধি হইতে পারে? অল্প অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে এইরূপ ধারণা সমীচীন নহে। এই প্রদেশে খ্রীষ্টানের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক—স্থলবিশেষে শতকরা ৮০ জনেরও অধিক। যে স্থানে এত অধিকসংখ্যক খ্রীষ্টান, সে দেশের খ্রীষ্টসমাজের প্রভাব বৃহত্তর সমাজকেও যে অধিকার করিতে পারে তাহা একপ্রকার সুনিশ্চিত।

নানা জাতির খ্রীষ্টান বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া এক পথ দিয়া এই প্রদেশে মিশ্র-জাতির সৃষ্টি করিতেছে। অন্য এক পথ দিয়াও এই মিশ্র-জাতি-গঠন-ক্রিয়া চলিতেছে। এই মিশ্রণ খ্রীষ্টানে খ্রীষ্টানে নহে, হিন্দুতে ও খ্রীষ্টানে।

মলয়ালী রমণী।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, থিয়ান সমাজের লোকগণ নম্বুদ্রীদিগের দ্বারা নানাপ্রকারে নির্য্যাতিত। নায়ক বা নায়ারগণ দেশ অধিকার করিয়া জেতার গর্ব্ব লইয়া ইহাদিগকে পেষণ করিতে আরম্ভ করেন। নম্বুদ্রীপাদ সমাজে কর্ত্তৃত্বপদ লাভ করিয়া এই থিয়ান জাতির উপর কঠোর পীড়ন আরম্ভ করিলেন। থিয়ান হিন্দুর দেবতা পূজা করিবার অধিকার লাভ করিল না; মন্দিরের চতুঃসীমায় প্রবেশেরও তাহার অধিকার থাকিল না; সে অগ্রহারম্ বা ব্রাহ্মণ-পল্লী এবং নায়ার-পল্লীর মধ্য দিয়া যাতায়াত করিবার অধিকার হইতেও বঞ্চিত হইল। বৌদ্ধযুগের অবসানে থিয়ানেরা মন্দিরে প্রবেশাধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিলোপের পর তাহারা ক্রমে হিন্দুত্বে প্রবেশ করিতে চাহিল; এবং উত্তর ভারতের—বোধ হয় তিব্বত হইতে আনীত—তান্ত্রিক সাধন আরম্ভ করিয়া দিল। নম্বুদ্রীপাদ তান্ত্রিক আচারের ঘোর বিরোধী। সুতরাং থিয়ানের তান্ত্রিক আচার ব্যবহারের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম ঘোষণা করিলেন। থিয়ান বুদ্ধিমান ও তেজস্বী। সে জেতা নম্বুদ্রীপাদের এই কঠোর শাসনকে নির্য্যাতন বলিয়াই গ্রহণ করিল এবং নীরব দীর্ঘনিশ্বাসে ইহার প্রতিবাদ করিয়া এই নির্য্যাতনস্পৃহাকে দমন করিবার জন্য গোপন প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তিকে জাগরিত করিয়া তুলিল। এই প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি নানা আকারে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।

'স্বরবৎ'-বাদিনী মলয়ালী মহিলা। রবিবর্ম্মার অঙ্কিত চিত্র হইতে।

এইপ্রকার সম্বন্ধজাত বহু পুত্রকন্যা আজ "ইয়োথিয়ান" নামে অভিহিত হইয়া সমাজের মধ্যেই অবস্থান করিতেছে। ইহারা ইউরোপীয়ও নহে দেশীয়ও নহে, হিন্দুও নহে খ্রীষ্টানও নহে। ইহারা বর্ণসঙ্কর। এই জাতীয় শতসহস্র বালকবালিকা, পুরুষ ও নারী, ত্রিশঙ্কুর ন্যায় সমাজ-দেহে দুইয়ের বাহির হইয়া বিরাজ করিতেছে।

এই পরশুরাম-ক্ষেত্রের মধ্যে কয়েকটি স্থানের বিশেষভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক। যথা, (১) কন্যা-কুমারিকা, ২) উড়ুপী (৩) ত্রিভেণ্ড্রম্ বা তিরুবন্দনপুরম, অর্থাৎ পবিত্র বন্দনীয় সহর। এই তিনটি স্থানই রেলপথ হইতে বহুদূরে অবস্থিত। কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের হিসাবে প্রত্যেক স্থানটিই শোভন-বেশা রত্নাভরণভূষণা ভারতজননীর দেব-দেহের অঙ্গ-শোভা বিশেষভাবে বর্দ্ধন করিয়াছে।

কন্যা-কুমারিকা ভারতের পাদপীঠ, ভারতের শেষ ভূমি-রেখা। ইহার বামে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে আরব-সাগর এবং পদতলে ভারতসাগর। কুমারিকায় এই সাগরত্রয়ের ত্রিবেণী-

ইহার একটি মূর্ত্তি এইস্থলে উল্লেখ করিব। এক শ্রেণীর থিয়ান সংকল্প করিলেন যে ইউরোপীয় জাতিসকলের সহিত রক্তের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সন্তান সন্ততিকে সম্মানের উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন। আজ সমাজে যাহারা হেয় ও ঘৃণ্য, অবস্থার পরিবর্ত্তনে কাল তাহারা পদমর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ ও গরিষ্ঠ হইয়া উঠিবে। এই দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া বহু থিয়ান রমণী ইউরোপীয়ের নিকট আপন সতীত্ব বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন।

সঙ্গম। বঙ্গোপসাগর ভেদ করিয়া প্রাচ্য চীন ও জাপান যাইতে হয়, আরবসাগর ভেদ করিয়া প্রতীচ্য ইউরোপে যাইতে হয়, এবং ভারতসাগর ভেদ করিয়া আফ্রিকা আমেরিকা যাইতে হয়। জগতের সভ্যতার এই ত্রিধারা ভারতমাতার পাদপ্রান্ত কুমারিকায় মিলিত হইয়াছে। পুরাণে সমুদ্র মন্থনের বর্ণনায় দেখা যায়, শ্রীমতী লক্ষ্মী সাগর-সলিল হইতে অমৃতভাণ্ড লইয়া উত্থিত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষ কি সেই লক্ষ্মীর অঙ্ক-স্থিত অমৃতভাণ্ড! এই

মালাবারের চোয়া জাতীয় বালিকা।

ত্রিবাঙ্কুরের পথের গায়িকা।

অমৃতভাণ্ডরূপী ভারতবর্ষ কুমারিকায় সাগরসঙ্গম হইতে উত্থিত হইয়া আসমুদ্র হিমাচলে আপনার শোভন অঙ্গভার ন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

কন্যা-কুমারী বর্ত্তমানসময়ে সমুদ্র-উপকূলবর্ত্তী একটি প্রাচীন তীর্থস্থান। তমিড় ঐতিহাসিকগণ ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যে অদ্ভুত প্রত্নতত্ত্বের সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা এস্থলে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা বলেন জগতের আদি সভ্যতার কেন্দ্রস্থান এই কুমারী ও তাহার দক্ষিণ-ভাগস্থ ভূমিখণ্ড (বর্ত্তমানে এই ভূভাগ সাগরগর্ভে লীন হইয়াছে)। হিন্দু ও খ্রীষ্টান পুস্তকাদিতে যে মহা জল-প্লাবনের কথা লিখিত আছে তাহা ইহারই কূলে সংঘটিত হইয়াছিল। আদিমানব—হিন্দুমতে মনু এবং খ্রীষ্টান-মতে নহ বা নোয়া। মহাপ্লাবনের সময় আদিমানব এই স্থানেরই মলয়পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পরে প্লাবন-ধৌত পৃথিবীতে পদার্পণ করিয়া এক নূতন রাজ্যের সূত্রপাত করেন। কন্যা-কুমারীই সেই রাজ্যের রাজধানী। এই রাজ্য আরব ও আফ্রিকা লইয়া এক বিস্তৃত ভূখণ্ড ছিল।

Tamil Antiquary Vol I নামক পুস্তকে লিখিত আছে "According to this (tradition) the submerged land was bounded by the river Pattuli and the mount Kumari and it consisted of 49 districts to the south of the Cape Comorin, covering an area of 7 yojans."—অর্থাৎ, এই কিম্বদন্তির মতে জলমজ্জিত দেশ সাত যোজন বিস্তৃত ছিল, এবং কন্যা-কুমারিকার দক্ষিণে ৪৯টি জেলায় বিভক্ত ছিল।

এইসকল সিদ্ধান্ত সত্য কি কল্পনা তাহা আলোচনা করিবার আবশ্যকতা নাই। কেবল এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এই কন্যা-কুমারী বহু সহস্র বৎসরের

মালাবারের বন্য অসভ্য আদিয়ান জাতি। ইহারা পাতা বুনিয়া বস্ত্রের ন্যায় পরে

মালাবারের অস্পৃশ্য জাতি।

ইতিহাস-জড়িত হইয়া বর্ত্তমান সময়ে আমাদের নিকটে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। চারিদিকের সফেন সমুদ্রের আন্দোলনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমুদায় ভূখণ্ডের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক সংস্থান আলোচনা করিলে যাঁহার মন দেশভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া না উঠে তিনি স্থাণু বা জড়।

ত্রিবাঙ্কুরের সাধারণ লোক।

ত্রিবাঙ্কুরের খৃষ্টান।
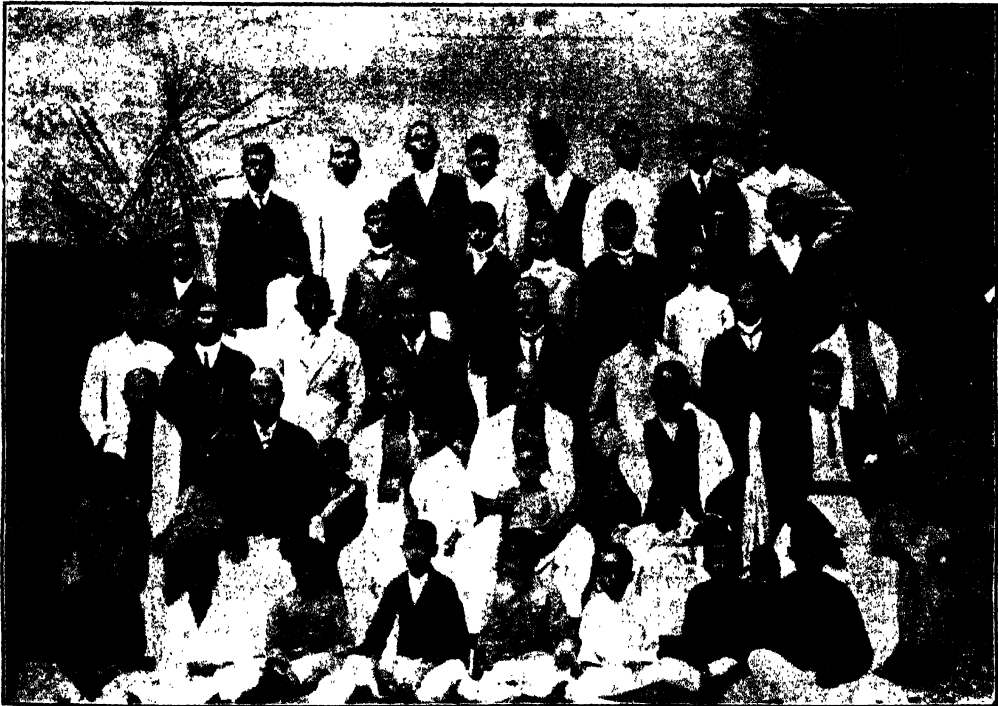
কন্যা-কুমারী যাইবার দুইটি পথ আছে। প্রথম টিনে-ভেলি হইতে ডাকের অশ্বযানে প্রায় ২৪ ঘণ্টা যাইয়া নগর-কইল বা নগর-কোভিল অর্থাৎ পবিত্র-মন্দির-নগর নামক স্থানে যাইতে হয়। সেই স্থান হইতে ৮।১০ ঘণ্টা গোযানে যাইলে কন্যা-কুমারীর মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হওয়া যায়। এই পথ সুলভ কিন্তু অত্যন্ত ক্লেশদায়ক। আর

দ্বিতীয় পথ টিনেভেলি হইতে কুইলোন পর্য্যন্ত রেলে, তৎপরে মোটর বাসে ত্রিভেণ্ড্রম এবং তথা হইতে নগরকইল যাওয়া যায় এবং এই শেষোক্ত স্থান হইতে পূর্ব্বোক্ত গোযানে কুমারিকা যাওয়া যায়। কবি ও চিত্রকরের দৃষ্টিতে এই পথের সৌন্দর্য্য দর্শন করিলে না জানি ইহার সৌন্দর্য্যে মনপ্রাণ কতই মুগ্ধ হইয়া যায়। উভয়পার্শ্বে জনপদের কল-কল্লোল, নরনারীর বেশভূষার পারিপাট্য, মন্দির-শ্রেণীর অর্চ্চনা-পূত গম্ভীর স্মৃতি, নদী, পর্ব্বত ও অরণ্যানী

ত্রিবাঙ্কুরের সরিয়ান খ্রীষ্টান সমাজের বিবাহ।

এবং পরিশেষে বালুকান্তর উত্তীর্ণ হইয়া কোলাহল-মুখর জনতা ভেদ করিয়া নীরব নির্জ্জনতার মধ্যে কুমারী দেবীর মন্দির-প্রাঙ্গণ। পথে দত্তাত্রেয়-মন্দির। জয়ন্ত-মন্দির ও কুমারীদেবীর শোভাযাত্রা-কালীন উৎসব-স্থান, প্রভৃতি দর্শন করিয়া কুমারী-মন্দিরে যাইতে হয়। এই উৎসব-স্থানে বৎসরে একবার কয়েকদিনের জন্য মহাসমারোহ উৎসব হয়। পথে তাল তমাল খর্জ্জুর বৃক্ষশ্রেণী শস্য-পাদপ-শূন্য মরুভূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চগ্রীবা ও উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া কি যেন অনির্দ্দেশ্য রত্নের অনুসন্ধান করিতেছে। বুঝিবা সে রত্ন কুমারিকার সমুদ্রতীরেই আছে। এই দেবীমন্দিরে তীর্থযাত্রীর সংখ্যা অন্যান্য তীর্থস্থানের তুলনায় নিতান্তই অল্প। তথাপি দুই তিন দল উত্তরভারতের যাত্রী দেখিলাম। এক দল রামেশ্বর হইতে পদব্রজে কি জানি কতদিনে এই স্থানে আসিয়াছেন। আর দ্বিতীয় দল ধনী মাড়োয়ার দেশীয় পুরুষ ও মহিলা কয়েকখানি গোযানে আসিয়াছেন।

কন্যা কুমারীর মূর্ত্তি-কল্পনার মধ্যে একটি বিশেষত্ব আছে যাহা অন্য কোথাও দেখা যায় না। দেবীমূর্ত্তি কুমারী, তিনি সালঙ্কারা, সুচিক্কণ-বেশা, বিবাহার্থিনী, মাল্য-হস্তে দণ্ডায়মানা। তিনি বিবাহ-যোগ্য স্বামীর সন্ধানে যেন অভিসারিকার বেশে অপেক্ষাকারিণী। কত যুগযুগান্ত ধরিয়া তিনি উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার দৃষ্টিতে পথের দিকে স্থির নয়নে চাহিয়া আছেন। দেখিয়া মনে হইল ইহা যেন সেই হিন্দুদর্শনের প্রকৃতি-পুরুষের লীলার কথা কল্পনার জীবন্ত তুলিকায় অঙ্কিত করিয়া রাখা হইয়াছে। পুরুষের সংযোগ বিনা প্রকৃতির লীলা প্রকট হইতেছে না। পুরুষও প্রকৃতির সংযোগ ভিন্ন নিষ্ক্রিয় ও শান্ত। প্রকৃতি পুরুষের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। কুমারী দেবীও স্বামীর অপেক্ষায় মাল্য-হস্তে বধূসাজে দণ্ডায়মানা। আবার ভাবিলাম জয়দেবের গীতগোবিন্দের কথা। প্রণয়িনী সখার অপেক্ষায় বৃক্ষপত্রের প্রতিমর্ম্মরশব্দে তাঁহার আগমন কল্পনা করিতেছেন। জয়দেব গাহিয়াছেন—

পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানম্!

সাধক এমনি আগ্রহে, এমনি আবেশে আপনার হৃদয়-স্বামীর প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকেন। কন্যা-কুমারীর দেবী-মূর্ত্তি সেই শাশ্বত কল্পনাকে রূপদান করিয়া চক্ষের সমক্ষে স্থাপন করিতেছে। মূর্ত্তি সকলেই দেখে, ভিতরের গভীর অর্থ কয়জন হৃদয়ঙ্গম করে?

কন্যা-কুমারীর পর উড়ুপী এই ক্ষেত্রের দ্বিতীয় তীর্থ। এইস্থান কৃষ্ণপূজার জন্য প্রসিদ্ধ; ইহা দ্বৈতবাদ-প্রচারক মধ্বাচার্য্য দেবের পীঠস্থান। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সহিত লীলা করিয়াছেন। তখন ভারতে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচার

ত্রিবাঙ্কুরের তাড়ি-খানা।

হইয়াছে। সুবিস্তৃত মন্দির, ইহার চারিদিকে গো-গৃহ, বাস-ভবন, নাট-মঞ্চ, দোল-লীলার স্থান বিশেষভাবে নির্ম্মিত। মন্দিরের মধ্যে একটি সংস্কৃত পাঠশালা এবং একটি বেদ-বিদ্যালয় আছে। উড়ুপীর অধীনে আটটি মঠ আছে এবং প্রত্যেক মঠের জন্যই পৃথক মঠাধিপতি পরমহংস সন্ন্যাসী আছেন। প্রধান মন্দিরের পূজাদি দুই বৎসর অন্তর এক এক মঠের তত্ত্বাবধানে থাকে। এই দুই বৎসরের জন্য সেই মঠের অধিপতি মন্দিরের সমুদায় আয় ব্যয়ের ভার গ্রহণ করেন; দুই বৎসরের জন্য মন্দিরের সম্পূর্ণ মালিক হন। এই দুই বৎসরের আয় ভিন্ন প্রত্যেক মঠেরই বিস্তৃত জমিদারী ও রত্নালঙ্কার আছে, সে সকলেরই আজীবনের মালিক মঠাধিপতি। স্বামী মধ্বাচার্য্যই এই আটটি মঠ স্থাপন করিয়া যান। প্রবাদ এইপ্রকার যে এক শুভ মুহূর্ত্তে দেবতার নিকট হইতে তিনি আটখণ্ড শিলা প্রাপ্ত হন এবং আটটিতে তাঁহার আটবার পদ-ক্ষেপের স্থান হয়। এই আটখণ্ড শিলার উপর তিনি আটটি মঠ স্থাপন করেন এবং এই আটটি মঠই তাঁহার মত-বাদ প্রচারের কেন্দ্রস্থান। প্রত্যেক মঠেরই আবাস-স্থান ও অতিথিশালা ভিন্ন মফস্বলে আশ্রম ও জমিদারী আছে।

সহরের আবাস-বাটী ঐশ্বর্য্য ও বিভবের লীলানিকেতন এবং বিলাসের কেলিকুঞ্জ। সুদূর মফস্বলের আশ্রম-বাটিকায় বিলাসবিভবের অপ্রতুল না থাকিলেও ঐশ্বর্য্য-প্রদর্শন-চেষ্টা নিতান্ত অশোভন বোধ করিয়া তাহার প্রকাশবাহুল্য নাই। সহরের লীলা-ভবনে প্রবেশ করিলেই মনে হয় যেন কোন রাজা মহারাজার প্রাসাদে প্রবেশ করিতেছি। প্রাচীর-গাত্রে স্ফটিকোজ্জ্বল চাকচিক্য, তাহার উপর বর্ণসম্পদের বিচিত্র সমাবেশে বহুবিধ চিত্রাবলী, সঙ্গে সঙ্গে বৃহদাকার তৈলচিত্র, মেঝের উপর সুদৃশ্য ও সুকোমল গালিচার মণ্ডন, নানা বিচিত্র ঝাড়লণ্ঠন হইতে আলোকমালার অত্যদ্ভুত বিচ্ছুরণ, চেয়ার, কাউচ, সোফা, মর্ম্মর-মণ্ডিত টেবিল, সুদৃশ্য ও সুচিত্রিত টানাপাখার মধুর কম্পন; অপর পার্শ্বে আফিসঘরে টাকাকড়ির হিসাব, নথিপত্র, কর্ম্মচারী ও প্রজাবৃন্দের জনতা ও কলহ-কোলাহল সকলই স্বামীজির ঐশ্বর্য্য-গৌরবের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে।

মফস্বলের আবাসবাটীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধানটি মাত্র

দেখিয়াছি এবং তাহারই উল্লেখ করিব। উড়ুপী হইতে গোখানে কয়েকমাইল পথ যাইয়া রাজপথ ত্যাগ করিয়া পদব্রজে প্রায় ৪ মাইল পথের জঙ্গল উত্তীর্ণ হইয়া চারিদিকের পর্ব্বতমালার মধ্যস্থ উপত্যকায় আশ্রম-বাটিকায় যাইতে হয়। পথে কদাচিৎ মানব-সমাগম দেখা যায়; বিজন প্রান্তর পর্ব্বত-চ্যুত ক্ষুদ্র বৃহৎ শিলাখণ্ডে পূর্ণ। চারিদিকে নিবিড় অরণ্যানী নির্জ্জনতাকে অধিকতর গম্ভীর করিয়া দিতেছে। পর্ব্বতের উপর উঠিয়া নামিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া উপরের নীলিমার শোভা দেখিতে দেখিতে এবং চতুর্দ্দিকের বৃক্ষরাজির পত্র-পল্লবকম্পনের মর্ম্মরোচ্ছ্বাস শ্রবণ করিতে করিতে ৪।৫ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আশ্রমদ্বারে উপনীত হইলাম। সেই বটবিটপী-ছায়া-শীতল, পত্র-পল্লব-বেষ্টন-সুন্দর আশ্রমের কথা কি আর বর্ণনা করিব। সে যেন অনাহত বাণীর দেশ, শব্দ লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া যেন আশ্রম ত্যাগ করিয়া দূরে সুদূরে পলায়ন করিয়াছে। নানাবিধ -রসাল ফলের ভরে নত, সুরম্য বৃক্ষাবলী আশ্রমের বেষ্টনীরূপে তাহার শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। বেষ্টনীর মধ্যে পুষ্প ও ফলের উদ্যান এবং মেখলা-সদৃশ সুবৃহৎ পুষ্করিণী, তাহার স্বচ্ছ-শীতল জলের উপর প্রস্ফুটিত পদ্ম, কুমুদ ও কহ্লার ধীর সমীরে ক্রীড়া করিতেছে। আশ্রমের দ্বারপ্রান্তে হস্তিশালা; এই-সকল অতিকায় পশু স্বামীজি ও অনুচরবর্গকে মঠ হইতে উড়ুপীতে বহন করিয়া লইয়া যায়। আশ্রমবাটী সুন্দর সুচিক্কণ ও মসৃণ শ্বেত ও কৃষ্ণ মর্ম্মরপ্রস্তরে নির্ম্মিত। স্বামীজি চেয়ারে বসিয়া আমার সহিত বহুক্ষণ বহুবিষয়ে আলাপ করিলেন। স্বামীজি সুন্দর-ও-শোভন-বেশী, অমায়িক, উদার প্রকৃতির লোক এবং শুনিলাম বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান এবং যুগোপযোগী সমাজ-সংস্কারে প্রয়াসী। এই মঠের নাম আদিমার মঠ, স্বামীর নাম আদিমার স্বামী। ইনি স্বামী-গণের মধ্যে সম্পদ ঐশ্বর্য্য ও পদগৌরবে শ্রেষ্ঠ।
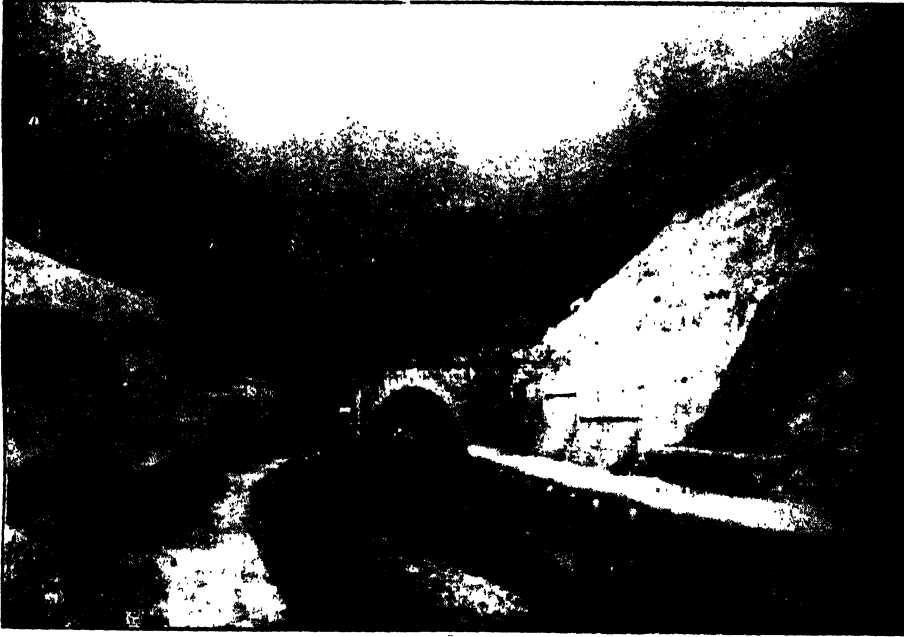
ত্রিবাঙ্কুরের একটি খাল একটি সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া কাটিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

উড়ুপী যাইবার একটিমাত্র পথ। মাঙ্গালোর হইতে "ট্রান্‌সিট ক্যারেজ" বা ডাকের ঘোড়ার গাড়ীতে প্রায় আট ঘণ্টায় যাওয়া যায়। এইসকল শকটের অশ্বগণ এক অদ্ভুত জীব। তাহারা জলচর, কর্দ্দমচর, বালুকাচর এবং পর্ব্বতচর, একাধারে সকলই। ইহারা একই প্রকার বেগে ৫।৬ মাইল পথ অবাধে দৌড়াইতে সক্ষম। যাতায়াতের সময় শকটসকল যে কিপ্রকার মোহন দৃশ্যের মধ্য দিয়া গতায়াত করে তাহা বর্ণনার অতীত। উঠিয়া নামিয়া, আঁকিয়া বাঁকিয়া, পর্ব্বতের শৃঙ্গসকল বেষ্টন করিয়া শ্যামল অরণ্যানীর শোভা ভেদ করিয়া এক পার্শ্বে উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশৃঙ্গ এবং অপর পার্শ্বে জঙ্গলাকীর্ণ গভীর খাত রাখিয়া, কখন বা নদীর উপর দিয়া তরণী-যোগে যাত্রীসমেত আপনাকে উত্থিত করিয়া, আবার

মালাবারের ধীবরেরা তীরে বিঁধিয়া মাছ ধরিতেছে।

কখন বা উচ্চচূড় পর্ব্বতশৃঙ্গে পথের ধূলি-সমুদ্র মন্থন করিয়া অতিদ্রুত দৌড়াইয়া যায়। এইভাবে ক্রমাগত ৫০।৬০ মাইল পথ অতিক্রম করিলে শরীর ও মনের যে অবস্থা হয় তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন কেহ অনুভব করিতে সক্ষম হইবেন না। কিন্তু এই পথের প্রাকৃতিক শোভা দর্শন করিবার জন্য শতবার এই পথ দিয়া গতায়াত করিতে ইচ্ছা করে। নদী পর্ব্বত ও সমুদ্রের সহিত এই ভূখণ্ড যেন আনন্দ-লীলা করিতেছে। এই লীলা দেখিলে সত্যই রাধাকৃষ্ণের বন-বিহার-লীলার কথা স্মরণ হয়। ইহার দর্শনে প্রাণ মন পুলকিত হয়, জীবন কৃতার্থ হয়, জন্ম সার্থক হয়।

ত্রিভেণ্ড্রম্ সহর ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজধানী। মাদুরা হইতে কুইলোন পর্য্যন্ত রেলে যাইয়া তথা হইতে মোটর গাড়ী, মোটর বোট, কিম্বা আমাদের দেশের শালতি নৌকার মত "ক্যানো বোটে" রাজধানী যাওয়া যায়। মোটর গাড়ীতে ৪।৫ ঘণ্টার মধ্যে যাওয়া যায়। মোটর বোটে প্রায় আঠার ঘণ্টা লাগে এবং "ক্যানো বোটে" প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা লাগে। সময় অধিক লাগিলেও এই সঙ্কীর্ণ খালপথ দিয়া যাইতে যাইতে লতা-পল্লব-ছায়া-সমাকীর্ণ তটভূমির পার্শ্বে সমুদ্রের ভীম-গর্জ্জন, মধ্যে মধ্যে মালাবারের আনন্দময় পল্লীদৃশ্য, জনগণের উচ্ছ্বসিত সঙ্গীতের মধুর তরঙ্গ-কম্পন, পর্য্যটকের প্রাণে যে পুলকের সঞ্চার করে তাহা সকল সময় সহজে মিলে না। এই পুলকের অনুভূতির জন্য শত সুবিধা ত্যাগ করিয়াও এই নৌকাপথে গতায়াত করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়। নৌকাপথে যাওয়ায় দেশের এবং দেশবাসীর প্রকৃতির যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায় তাহা পর্য্যটকের নিকট অমূল্য।

দেশীয় রাজ্যের রাজধানী বলিলে আমাদের মনে স্বভাবতই জয়পুর, বরোদা, মহীশূর প্রভৃতি স্থানের কথা উদয় হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত স্থানসমূহ দর্শনান্তে এই তিরুবন্দন-পুরমে আগমন করিলে পর্য্যটক নিশ্চয়ই নিরাশ হইবেন, তাঁহার আশার অনুরূপ কিছুই এইস্থানে দেখিবেন না। ঐ-

সকল সহরের ন্যায় নয়ন-বিস্ময়কর, নানা তক্ষণ-শিল্প-কলা-পূর্ণ, দূরবিস্তারী উত্তুঙ্গ প্রাসাদ এখানে নাই। প্রাসাদের সন্নিকটে সুরম্য উদ্যান বা প্রমোদ-কেলি-কুঞ্জও এখানে নাই। প্রাসাদপ্রাচীরে আলোকমালার রহস্য-ময় কম্পনে, চিত্রাবলীর শোভনীয় মণ্ডনে এ প্রাসাদের কোন বিশেষত্ব নাই। গৃহ-নির্ম্মাণের কৌশলে, স্থাপত্যবিদ্যার অনুশীলনে এই সহর প্রায় সর্ব্বপ্রকার বিশেষত্ব-বর্জ্জিত। এই সহরের মধ্যে এক মিউজিয়াম ভিন্ন কোন গৃহই সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। এই মিউজিয়াম ও সাহেবদিগের দুই-একটি বাসভবন ও ক্লব-গৃহ রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা সুদৃশ্য ও শোভন। আর সমস্তই দীনভাব-ব্যঞ্জক।

প্রাসাদে যাহা দেখি মহারাজার পরিচ্ছদাদির মধ্যেও সেই ভাবেরই প্রাবল্য দেখি। আরাট-মিছিলের সু-সজ্জিত হস্তী অশ্ব ও বাদ্যভাণ্ডের মধুর কম্পনের মধ্যে দুই দিন ত্রিবাঙ্কুর-নরেশকে দেখিলাম এবং দুই দিনই বেশভূষা দেখিয়া তাঁহার দীনতার কথাই বিশেষ করিয়া মনে হইতে লাগিল। প্রথম মিছিলের দিন দেখিলাম তিনি সামান্য প্রহরীর বেশে নগ্নপদে নগ্নদেহে অসি ও বর্ম্ম হস্তে পারিষদ-গণের সঙ্গে মূল্যবান কারুকার্য্য-খচিত বস্ত্র এবং স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার ভূষণে শোভিত হস্তী-অশ্ব-শ্রেণীর পশ্চাতে পশ্চাতে শ্রীশ্রীপদ্মনাভস্বামী নামক দেবতাকে তাঁহার মন্দির হইতে সমুদ্রে স্নান করাইতে যাইতেছেন। কিঞ্চিৎ অধিক দুই মাইল পথ মহারাজা এই ভাবে পদব্রজে ও নগ্নদেহে গমন করিলেন। দ্বিতীয় দিন তাঁহার ঐশ্বর্য্য

ভূতের নাচে ব্যবহৃত কাঠের মুখস।

বেশ হইলেও আমরা এই দেশে সামান্য জমিদারপুত্রেরও ঐশ্বর্য্যবেশে তদপেক্ষা বহু পরিমাণে বাহ্যাড়ম্বর-পূর্ণ পরিচ্ছদ দেখিয়া থাকি। দ্বিতীয় দিবস মহারাজা অগণিত তোপধ্বনির মধ্যে, বহু সু-সজ্জিত স-শস্ত্র সেনানীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, অযুত নরনারীর ভক্তিনত দৃষ্টি ভেদ করিয়া চতুরশ্বযোজিত শকটে আরোহণ করিয়া প্রাসাদ হইতে মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মহারাজা দেশাধিপতি হইলেও তিনি জানেন তিনি পদ্ম-

ভুতের নাচ।

নাভ স্বামীর দাসমাত্র। তাঁহার নামের উপাধিও পদ্মনাভদাস। তিনি দেশ শাসন করেন পদ্মনাভের নামে। যা কিছু করেন সমুদায়ই দেবতার গৌরবের জন্য। দেব-সেবা এক পরম পবিত্র অধিকার। দেবতা দয়া করিয়া তাঁহাকে এই সেবার অধিকার প্রদান করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারেই ধন্য ও কৃতার্থ করিয়াছেন। মহারাজা বাহ্য জীবনে যে দেবসেবার প্রাধান্য প্রকাশ করিতেছেন অন্তরে সেই ভাবের প্রকৃত অবস্থান হইলে তিনিও ধন্য, তাঁহার শাসিত দেশও ধন্য!

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান গৌরবের বিষয় পূর্ত্ত-কর্ম্ম। এই পূর্ত্তবিভাগ যেসকল অদ্ভুত কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন তাহার দুই একটি মাত্র উল্লেখ করিয়া আমার বক্তব্য প্রমাণ করিব। রাজ্যমধ্যে নানাস্থানে ক্ষুদ্র বৃহৎ যেসকল হ্রদ ছিল তাহারা দেশের কোন উপকার করিতে পারিত না। পূর্ত্তকর্ম্মচারীগণ এই-সকল হ্রদ সংযোজিত করিয়া বাণিজ্য-সম্ভার বহনের পথ সুগম ও সহজ করিয়া দিয়াছেন। এই সংযোজনক্রিয়া যে কত দুরূহ তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন সকলে সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। কোন হ্রদের গভীরতা অধিক, কোথাও তাহা অল্প। এইসকল বিভিন্ন-প্রকারের গভীরতা-বিশিষ্ট হ্রদকে একপ্রকার সমতলে আনয়ন করিয়া জলধারা ধীরে ধীরে অগভীর হইতে গভীরে আনিয়া কোন স্বাভাবিক স্রোতস্বতীর সহিত মিলিত করিয়া দেওয়া নিতান্তই দুরূহ কর্ম্ম। এই কর্ম্মে এই বিভাগ সফল হইয়া

ভুতের নাচে রাবণ ও মন্দোদরীর অভিনয়।

দেশকে সুখী ও ধনী করিয়াছেন। অপর আর-এক কর্ম্মে পূর্ত্তকর্ম্মচারীগণ অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। নগর-কইল অঞ্চলে কোন কোন পর্ব্বতশৃঙ্গে ঝরণা-নিঃসৃত জলধারা গিরি-গাত্র বহিয়া অধিকাংশস্থলেই অযথা অপ-ব্যয়িত হইতেছিল। পূর্ত্তকর্ম্মচারী এই জলধারাকে সংগ্রহ

ভূতের নাচে রাবণ ও মন্দোদরীর অভিনয়।

করিয়া অদ্ভুত কৌশলে আকাশ-মার্গে বৃহদায়তন ইষ্টক-নির্ম্মিত পাইপ প্রস্তুত করিয়া শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গে আকর্ষণ করিয়া কোথাও উঠাইয়া কোথাও নামাইয়া স্থানে স্থানে ভূমিতে তাহা প্রক্ষেপ করিয়া ধূসরবর্ণ বালুকা-ও-কঙ্করপূর্ণ ভূমিগুলিকে রস-সিঞ্চনে উর্ব্বরতা প্রদান করিয়া তাহাতে শ্যামল শস্য-তৃণের আচ্ছাদন প্রদান করিয়াছেন। ইহাতেও দেশের ধন স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য ও সুখ বর্দ্ধিত হইয়াছে। শুনিয়াছি ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের এইসকল পূর্ত্তকর্ম্মকুশলতা দেখিবার জন্য বিলাতের অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণও এইদেশে আগমন করিয়া থাকেন।

জেলখানার বন্দবস্তের জন্যও ত্রিবাঙ্কুর-নরেশ প্রজা-পুঞ্জের বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়াছেন। ইহার চতুঃসীমায় কঠোর শাসনের বিশেষ প্রভাব নাই। সময় সময় কয়েদী-গণ দিবসে অন্যত্র কর্ম্ম করিয়া সন্ধ্যাকালে কারাভবনে যাইয়া তালাবদ্ধ থাকে। অবশ্য বিশেষ বিশেষ কয়েদী সম্বন্ধেই এই নিয়ম প্রযুজ্য হয়।

মহারাজার সর্ব্বপ্রধান সৎকীর্ত্তি ব্রাহ্মণ-পোষণ-স্পৃহা। ইহা ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যের এক বংশানুক্রমিক প্রথা। রাজ-ধানীতে প্রত্যহ সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ বিনাব্যয়ে রাজ-অন্ন-সত্রে স্ত্রীপুত্রকন্যা লইয়া চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় প্রভৃতি নানা-রস-যুক্ত আহার্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু বিনা পরিশ্রমে এইরূপ আহার পাইয়া ব্রাহ্মণসমাজ লাভ-বান হইয়াছে বলিয়া শুনিলাম না। অলসতার জন্য নানাবিধ পাপ এই সমাজে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া শ্রবণ করিলাম। মহারাজ ব্রাহ্মণগণকে সংসারচিন্তা হইতে মুক্তি প্রদান করিয়া যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে যে সদনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছিলেন কালমাহাত্ম্যে তাহাতে বিষময় ফল উৎপন্ন হইল। সংসারের নিশ্চিন্ততা জ্ঞান কর্ম্ম ও ধর্ম্মসাধনের স্পৃহা বর্দ্ধিত না করিয়া আলস্য-জনিত ইন্দ্রিয়-সেবার ইচ্ছা জাগাইয়া তুলিল। গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহের কঠোর উদ্যমে যে প্রবৃত্তিকে বাধ্য হইয়া সংযত করিতে হইত সে উদ্যমের অভাবে ইন্দ্রিয়-চেষ্টাই প্রবল হইল। জ্ঞান কর্ম্ম ও ধর্ম্মসাধনের বিঘ্ন বাহিরে নয়, ভিতরে, মনে, একথা জগতের ইতিহাসে বহুবার প্রমাণিত হইয়াছে; কিন্তু এখনও বুঝি ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় নাই।

উপরে যে কয়েকটি স্থানের নাম করা হইল তদ্ভিন্ন কোচীন, এরনাকুলম, ত্রিচূড়, কালিকাট, মাহি, ক্যানানোর ও মাঙ্গালোর এই ক্ষেত্রমধ্যে কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্থান। কোচীন সহর ব্রিটিশ-অধিকারভুক্ত। এইস্থানে বহু ইহুদীর বাস। এমন ধূলি-মলিন আবর্জ্জনা-পূর্ণ সংস্কার-বিহীন স্থান আর আমি কখন দেখি নাই। পূর্ব্বে মনে করিতাম ঢাকা ও বাঁকিপুরের ন্যায় আবর্জ্জনা-পূর্ণ সহর ব্রীটিশ-ভারতে বুঝি আর নাই, কিন্তু কোচীন সহর দেখিয়া আমার পূর্ব্ব সংস্কার ত্যাগ করিয়াছি। এ দেশে মিউনিসিপালিটি নামক কোন

সহর-সংস্কার-সমিতি নাই। ব্রিটিশ-কোচীন অতি সঙ্কীর্ণ স্থান, কিন্তু ইহার অধিবাসীর সংখ্যা সে তুলনায় অত্যন্ত অধিক। ব্যবসাবাণিজ্যের ইহা এক প্রধান কেন্দ্র, কত দেশ বিদেশের লোক এখানে বাণিজ্য উপলক্ষে আগমন করিয়া থাকে। এই সহরের স্বাস্থ্য অতি খারাপ, শোথ-রোগের অত্যন্ত প্রাবল্য। পথে গতায়াতের সময় প্রায় শতকরা ৮০ জন লোকের এই ব্যাধি দেখা যায়! স্থানীয় নদীর জল ব্যবহার করিলে শুনা যায় এই ব্যাধি হয়। ধনী লোকদিগের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য গভর্ণমেণ্ট হইতে ষ্টীমারযোগে ১৯ মাইল দূরের এক স্থান হইতে পানীয় জল আনয়ন করা হয়। এইরূপে আনীত ১ গ্যালন জলের মূল্য ছয় আনা; জল প্রায় দুগ্ধের ন্যায় মূল্যবান। নদীর জল অগ্নি-সংযোগে উষ্ণ করিয়া সেই উত্তপ্ত জলে স্নান শৌচাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। জলের সঙ্গে যথাসম্ভব দূর-সম্পর্ক স্থাপন করাই এতদ্দেশীয় ভদ্রলোকের অভ্যাস। শোথ ভিন্ন ম্যালেরিয়ার প্রকোপও এস্থানে অত্যন্ত প্রবল। কোচীনের মত মশক-দংশন পূর্ব্বে কোন স্থানে অনুভব করি নাই। সন্ধ্যার পর উন্মুক্ত স্থানে নিরুদ্বেগভাবে বসিয়া থাকা সিদ্ধ-যোগী ভিন্ন কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে।

কোচীনের পরপারে এরনাকুলম্। মধ্যে নদী ও কয়েকটি শোভনদৃশ্য দ্বীপ। ইহা কোচীন-রাজ্যের রাজধানী, স্বাস্থ্যে ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ইহা ব্রিটিশ কোচীনের ঠিক বিপরীত। রাজ্যসংক্রান্ত আফিস আদালত, রাজবাটী সমস্তই সুগঠিত ও সুদৃশ্য। রাজ্যের আয়ও দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে।

এরনাকুলমের পরই ত্রিচুড়, ইহা রাজধানীর সমতুল্য গৌরবশালী। মহারাজা অধিকাংশ সময় এই স্থানেই বাস করেন। তদানীন্তন দেওয়ান এলবিয়ন রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই ত্রিচুড়েই বাস করিতেন। আরও একজন বাঙ্গালী রাজকর্ম্মচারী মিষ্টার সেন—ভূতত্ত্ব-বিদ্ পণ্ডিত—এইস্থানে বাস করিতেন। সাধারণ লোকের ধারণা ত্রিচূড়—রমণীর দেশ। বাস্তবিক নায়ার-সমাজের ইহাই কেন্দ্রস্থান, এই সমাজের আদর্শ-জীবন দেখিতে হইলে ত্রিচূড়ে কয়েক দিবস বাস করিলেই সে আশা পূর্ণ হইবে। বহু উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী এই স্থানে বাস করেন। এই স্থানের রমণীর ক্ষমতার কথা অনেক শ্রবণ করিলাম। আমাদের প্রাচীন পুস্তকাদিতে অপ্সরা-গণের কীর্ত্তিকাহিনী যেরূপ শ্রবণ করা যায় এই দেশীয় রমণীদিগের সম্বন্ধে সেইপ্রকার বহুকথা প্রবাদরূপে প্রচলিত। এই সহরের বাহিরের লোকেরা এই স্থানের

ভূতের নাচে রাবণ ও মন্দোদরীর অভিনয়।

প্রবাসী পুরুষদিগকে নানাপ্রকারে বিদ্রূপ করিয়া থাকে।

কালিকাট এক অতি প্রাচীন সহর। বহু শতাব্দীর প্রাচীন ইতিহাসের সহিত এই স্থানের স্মৃতি জড়িত। এই স্থানের জ্যামোরিন রাজা আজ একজন জমিদার মাত্র। যাঁহার দরবারে পোর্টুগীজ-রাজদূত একদিন সামান্য টুপী হস্তে লইয়া অবনত মস্তকে ভিক্ষার্থীরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন আজ সেই জামোরিন একজন নগণ্য ও সামান্য ব্যক্তি। পদ-গৌরব নাই, সম্পদ ঐশ্বর্য্য নাই, আছে কেবল নাম। কবি রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন, "মালা ছিল, তার ফুলগুলি
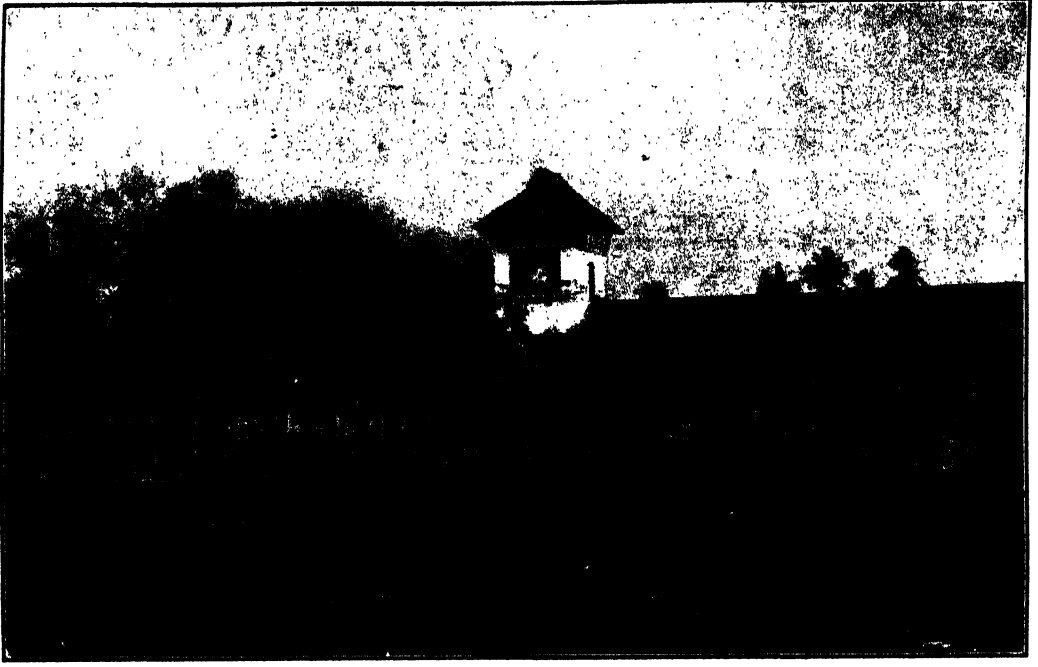
ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার প্রাসাদ।

গেছে রয়েছে ডোর।" জ্যামোরিন-রাজের রাজমাল্যেও শোভা নাই, সৌরভ নাই, আছে কেবল শূন্য অভিমান। বর্ত্তমান জ্যামোরিন, মানবল কবিরাজ মহাশয়, অতি উদার প্রকৃতির লোক, বিনয়ী, বিদ্যোৎসাহী, সংস্কৃত চর্চ্চার পক্ষপাতী, নিজেও সংস্কৃত ভাষায় কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। তিনি আপনাকে বাঙ্গালীজাতির গুণগ্রাহী বলিয়া প্রকাশ করিলেন এবং একবার কলিকাতা আসিয়া কি কি দেখিয়াছিলেন তাহা মহোৎসাহে বর্ণনা করিলেন।

মাহী ফরাসীসাম্রাজ্যভুক্ত একটি সুন্দর সমুদ্রতীরবর্ত্তী সহর। স্বাস্থ্যের হিসাবে এই সহর নাকি নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম। ইহার প্রাকৃতিক সংস্থানও অতি মনোরম। পথ ঘাটের বন্দবস্তও অন্যান্য সমুদায় ফরাসী সহরের ন্যায়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর একটি স্বাস্থ্যপ্রদ ও স্বাস্থ্যদায়ক স্থান।

মাহীর সন্নিকটেই ইংরেজের সৈনিক বিভাগ সুপ্রসিদ্ধ সহর ক্যানানোর। ইহাও দেখিতে অতি সুন্দর ও মনোরম। স্বাস্থ্য হিসাবেও ইহার গৌরব নিতান্ত সামান্য নহে। এই স্থানে জার্ম্মান মিশনারিগণের প্রতিষ্ঠিত একটি সুবৃহৎ কাপড়ের কল আছে। ইহাতে কোটের নানাবিধ বস্ত্র, গেঞ্জি, তোয়ালে, বিছানার চাদর, টেবিলের আচ্ছাদনবস্ত্র বয়ন করা হয়। শত শত খ্রীষ্টীয় পুরুষ ও রমণী এই কলে কাজ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। ইহা ভিন্ন হিন্দু-প্রতিষ্ঠিত অপর একটি ঐ জাতীয় কারখানা বিগত কয়েক বৎসর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার বস্ত্রাদিও সুন্দর।

মাঙ্গালোর সহর বোম্বাই ও মান্দ্রাজের মধ্যস্থলে অবস্থিত, সুতরাং উভয়কূলেরই সভ্যতাস্রোত এতদ্দেশের সামাজিক দেহে ঘাত প্রতিঘাত করিতেছে। এই স্থানে প্রাচ্যের সমাপ্তি ও পাশ্চাত্যের আরম্ভ। এই স্থানে আর্য্য ও তমিড় সভ্যতার মিলনের বহু আশ্চর্য্য নিদর্শন পাওয়া যায়। সমাজদেহে তমিড়-সভ্যতা যেন স্তরে স্তরে আত্মবিলোপ করিয়া আর্য্যসভ্যতার উজ্জ্বল কান্তি প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিতেছে। শ্মশানের মৃত্যু-ভীষণ চিতা-ভস্মের স্তূপের উপরে যেন নব-জীবনের বীজ উপ্ত হইয়াছে। এই স্থানে আসিলে অতি স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে এই মালাবারী ও তমিড়-সভ্যতাকে এইস্থানে সমাধিস্থ করা হইয়াছে। মাঙ্গালোর সহর দেখিতে অতি সুন্দর হইলেও

স্বাস্থ্যের হিসাবে অত্যন্ত নিন্দনীয়। স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের অনেকেই বৎসরের মধ্যে প্রায় দুই তিন মাস সহর ত্যাগ করিয়া কেহ ময়দানে শিবির সন্নিবেশ করিয়া এবং কেহ বা উপকণ্ঠ প্রদেশে বসবাস করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। এই সহর জার্ম্মান খ্রীষ্টীয় মিশনের প্রধান কেন্দ্র। ইঁহাদের অধীনে শতাধিক জার্ম্মান দেশীয় প্রচারক ও আচার্য্য এবং বহুসহস্র দেশীয় প্রচারক, ক্যাটিকিষ্ট পুরুষ ও স্ত্রীলোক কর্ম্ম করিতেছেন। এইসকল প্রচারকের ব্যয় বেসিল মিশনের কাপড় ও টালির কল-সকলের আয় হইতেই প্রধানতঃ সংগৃহীত হইয়া থাকে। জার্ম্মান দেশবাসীর চাঁদার অর্থের উপর প্রচারকার্য্য বিশেষভাবে নির্ভর করে না। এতদ্ভিন্ন এই বেসিল মিশনের কাপড় ও টালির কলে কত লক্ষ লক্ষ খ্রীষ্টান যে প্রতিপালিত হইতেছে তাহা বলা অসম্ভব। আজ যুদ্ধবিগ্রহের দুর্দ্দৈব বশতঃ এইসকল কল কারখানা বন্ধ হইলে দেশে যে হাহাকার উঠিবে তাহা ভাবিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। এই মাঙ্গালোর, কোঙ্কনি ব্রাহ্মণ-সমাজের এক প্রধান স্থান। ইঁহারা পূর্ব্বে বঙ্গদেশে ছিলেন, তাহার স্মৃতি এখনও জাগ্রত রহিয়াছে। ইঁহারা মৎস্যাশী এবং পঞ্চ-গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণের এক শাখা।

১ এই স্থলে পরশুরামক্ষেত্রবাসী নরনারীর সামাজিক আচার ব্যবহার সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এই প্রদেশের অধিবাসীবৃন্দের মধ্যে নায়ার-সমাজ সর্ব্বপ্রকার বিশেষত্বে পরিপূর্ণ। এই নায়ার ও নম্বুদ্রী-সমাজের বিবাহের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইঁহাদের মধ্যে মর্ম্মকথায়নবিধি বা কন্যার উত্তরাধিকারিত্ব বিধি প্রচলিত থাকায় পুত্রের নিকট পিতা অপেক্ষা মাতুল নিকট-তর আত্মীয় হইয়াছেন। বালক মাতুলকেই গৃহের স্বামী বলিয়া জানেন, জন্মদাতা গৃহের বা পরিবারের বিশেষ কেহ নহেন। সমাজমধ্যে এই প্রথার বিরুদ্ধে ঘোর বাদ প্রতিবাদ চলিতেছে। শিক্ষিত লোক মাত্রেই এই প্রথার বিরোধী। কিন্তু অসাড় সমাজ-দেহ এই দূষণীয় প্রথা দূর করিবার জন্য এখনও বদ্ধ-পরিকর হন নাই। সুবিখ্যাত দেশ-নায়ক সার শঙ্কর নায়ার প্রভৃতি সমাজহিতৈষীগণ এই প্রথার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া সফল হন নাই, কিন্তু সমাজের বেদনা ইহাতে এখনও দূরীভূত হয় নাই। পিতার স্বোপার্জ্জিত অর্থে পুত্রের কোন অধিকার নাই দেখিয়া অনেক পিতা এখন উইল করিয়া পুত্রের নামে অর্থ ও সম্পত্তি দান করিয়া যাইতেছেন, ভাগিনেয় সামান্য কিছু প্রাপ্ত হন মাত্র। মাতুলের বিষয় ভাগিনেয় উত্তরাধিকারী-সূত্রে প্রাপ্ত হইলেও তিনি তাহা যথেচ্ছা ব্যয় করিতে অধিকারী হন না। তিনি হন একজন ট্রষ্টী বা রক্ষক, তাঁহার নাম হয় করণম্। মাতুলের একাধিক ভাগিনেয় বা ভাগিনেয়ী থাকিলে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় করণম্ নিযুক্ত হন।

ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা যে বেশে দেব-যাত্রায় যোগ দেন বা অতিথি অভ্যাগতদের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

সমুদায় সম্পত্তির বন্দবস্ত করা, আর ব্যয়ের হিসাব রক্ষা করা প্রভৃতি কর্ম্ম তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকে। করণম্ সাধু ব্যক্তি হইলে সমুদায় আয় তিনি ন্যায়সঙ্গত প্রণালীতে আর-সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীকে বিভাগ করিয়া দেন। নতুবা গোপনে আপন পুত্র কন্যার জন্য যথেচ্ছা অর্থ অপহরণ করিয়া ভ্রাতা ভগ্নীকে বঞ্চিত করেন। সমাজের এই অবিধির হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য

কোন কোন লোক আজকাল ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৩ আইনের মতে বিবাহ সিদ্ধ করিয়া পুত্রকন্যার উত্তরাধিকারিত্বের পথ উন্মুক্ত করিয়া লইতেছেন। কিন্তু শেষোক্ত প্রণালীও সকলে পছন্দ করিতেছেন না। শ্রীযুক্ত শঙ্কর নায়ারের প্রবর্ত্তিত বিবাহ-আইনের সাহায্যেও কেহ কেহ বিবাহ সিদ্ধ করিয়াছেন। নানাকারণে এই বিধিও সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি লাভ করিতে পারে নাই। মালাবারের সর্ব্বত্রই অর্থাৎ নায়ার ভিন্ন অপর সমাজেও এই "মর্ম্মকথায়ন" বিধি প্রচলিত এবং সর্ব্বত্রই "করণমই" পরিবারের কর্ত্তা।

তর্পণের ন্যায় কি জাপানের সিণ্টো পূজার ন্যায় তাহা বলিতে পারি না। আমাদের সহিত ইঁহাদের এই এক ভিন্নতা কিন্তু প্রারম্ভেই দেখা যায় যে ইঁহাদের মধ্যে করণমের মূর্ত্তি গঠিত ও পূজিত হয়। প্রেতপূজা জগতে সর্ব্বত্রই যে কোন-না-কোন আকারে প্রচলিত আছে তাহা পূর্ব্বে আমরা গ্রাণ্ট অ্যালানের Evolution of the Idea of God নামক সুবিখ্যাত পুস্তক পাঠে জানি এবং ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতাতে যতদূর দেখিতেছি তাহাতে গ্রাণ্ট অ্যালানের কথাই সত্য বলিয়া মনে হইতেছে।
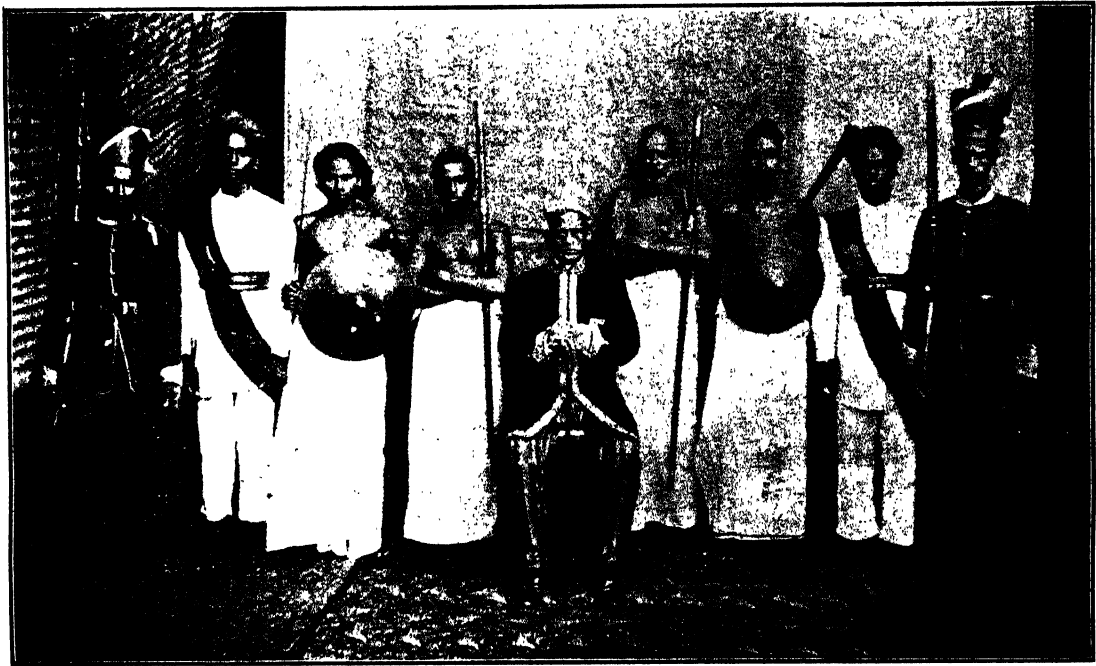
সপরিচর ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা দরবারী পোষাকে।

এই করণমের ক্ষমতা যে কতদূর তাহা নায়ার-সমাজের একটি প্রথা আলোচনা করিলেই সম্যক হৃদয়ঙ্গম হইবে। প্রত্যেক নায়ার-ভবনে একটি করণম্-কক্ষ থাকে। এই কক্ষে মৃত করণমদিগের মৃণ্ময় মূর্ত্তি থাকে এবং প্রত্যেক জীবিত করণমকে প্রত্যহ নিয়মিত পূজা পাঠের পর করণম্ পূজা করিতে হয়। এই করণম্ পূজাতে কোন বিশেষ সংস্কৃত মন্ত্রাদি আছে কি না জানি না, তবে শুনিয়াছি যে এই করণম্ পূজার প্রণালীর মধ্যে বিশেষত্ব কিছু নাই। এই করণম্ পূজা আমাদের

এই জাতির মধ্যে ভূতে বিশ্বাস অত্যন্ত প্রবল। আমাদের দেশের রামায়ণ গানের মত একপ্রকার অভিনয় এই দেশে হয়, তাহাকে "ভূতের নাচ" বলে। একজন লোক কচি নারিকেল-পত্রের বিচিত্র পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া তিন চারিজন গায়ক ও বাদক সঙ্গে লইয়া উচ্চাঙ্গের দার্শনিক তত্ত্ব-সম্বলিত সংগীত ও নৃত্য-সহযোগে অভিনয় করিয়া থাকে। নরনারী বালক-বালিকা সকলে এই অভিনয় দর্শন করিবার জন্য সমবেত হয়। নৃত্য ও সঙ্গীত করিতে করিতে অভিনেতার কখন

নাগপঞ্চমী

শ্রীযুক্ত মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর কর্তৃক অঙ্কিত ও চিত্রকরের সৌজন্যে মুদ্রিত।

কোলাটম্ খেলা।

কখন দশাপ্রাপ্তি হয়। তখন সে সমবেত সকল লোকের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে। কোন পরলোকবাসী আত্মা তাহার উপর ভর করিয়া ভূত ভবিষ্যতের বহু কথা বিবৃত করিতে থাকে। এই "ভূতের নাচ" বা devil dancing একপ্রকার ধর্ম্ম-অভিনয়। এই দশাক্রান্ত ভূতের নিকট সমবেত জনমণ্ডলী তখন ভক্তিবিশ্বাসের সহিত অবনত হইয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্যের কথা জানিয়া লয়। এই নৃত্যের অভিনেতা যে জাতীয় লোকই হউন সেই সময়ের জন্য তিনি সকলের পূজ্য ও নমস্য হইয়া উঠেন। এই অভিনয়ের এখনও বহুলপ্রচার আছে কিন্তু যেরূপ দ্রুতগতিতে ইহার অভিনয় হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে তাহাতে শীঘ্রই ইহার সম্পূর্ণ বিলোপসাধন হইবে অনেকে এইপ্রকার অনুমান করিতেছেন।

মালয়ালম বা মালাবার দেশে সর্পপূজা প্রায় সকল হিন্দুগৃহেই বিশেষভাবে প্রচলিত। আমাদের দেশে মনসাপূজা বৎসরে একবার হয়। এদেশে সর্পপূজার যে বিশেষ কোন ঋতু বা নির্দ্ধারিত সময় আছে তাহা শুনা যায় না। অধিকন্তু দেখি ইহাদের বাটীর মধ্যের বিস্তৃত প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র কুটীর নাগবংশের বসবাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে। এই কুটীরে প্রত্যহ সর্পের জন্য দুগ্ধাদি রক্ষিত হয়। গৃহের সমুদায় সর্প এই কুটীর-ছায়ায় গর্ত্ত করিয়া বসবাস করিয়া থাকে। সর্পজাতির এরূপ সম্মান আমি পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। এদেশে যেমন সর্পপূজা আছে তেমনি সাপুড়িয়ার প্রাদুর্ভাবও আছে। ইহারা সর্প লইয়া ক্রীড়া করে, সর্পদংশনের চিকিৎসা করে এবং সর্পের বিরুদ্ধে দংশিত ব্যক্তির কোন জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত অপরাধ থাকিলে সর্পের মনের ভাষা তাহার নিকট ব্যাখ্যা করিয়া সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তেরও ব্যবস্থা করিয়া দেয়।

মালাবার সমাজে একটি আনন্দ-দায়ক অনুষ্ঠান দেখিয়া প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। সঙ্গীত এ দেশের

ত্রিবাঙ্কুরের চন্দনকাঠের উপর খোদাই কাজ।

রমণীসমাজের একটি বিশেষ আদরের ও যত্নের ভূষণ। এমন কোন গৃহস্থ পরিবার নাই যেখানে সঙ্গীত চর্চ্চার সম্মানিত আসন নাই। বালিকার ত কথাই নাই, যুবতীরাও গৃহে নিয়মিতরূপে শিক্ষকের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া থাকে। প্রাতে ও সন্ধ্যায় পক্ষীর কলকূজনের ন্যায় মালাবারী বালিকা ও যুবতী কণ্ঠ- ও যন্ত্র-সঙ্গীতের সাহায্যে গৃহের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া থাকেন। নায়ার-সমাজে এই প্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত হইলেও সমগ্র দেশমধ্যেই এই প্রথার সমাদর ও প্রচলন আছে। এখানে কেবল যে সঙ্গীতের প্রচলন আছে তাহা নহে, নৃত্যেরও সমাদর আছে। রমণীর পক্ষে নৃত্য শিক্ষা করাও এক অত্যাবশ্যক বিদ্যা। এই নৃত্য ও সঙ্গীত শিক্ষা বালিকা-পাঠশালায় পর্য্যন্ত প্রদান করা হয়। স্কুলে একপ্রকার ক্রীড়া আছে তাহার নাম "কোলাটম্।" এই কোলাটম্ একসঙ্গে নৃত্য ও গীতের অভিনয়। স্কুলগৃহের ছাদে কয়েক খণ্ড রজ্জু সংলগ্ন করিয়া আট দশ বা ততোধিক বালিকা সেইসকল রজ্জুখণ্ড প্রত্যেকে একএকটি হস্তে গ্রহণ করিয়া তাল মান লয়ের সহিত নৃত্য ও সঙ্গীত করিতে করিতে সেইসকল রজ্জুর সাহায্যে বেণী বন্ধনের অভিনয় করিয়া থাকে। ইহার নাম "কোলাটম্"। "কোলাটম" অন্য প্রকারেরও আছে। কেবল দুই খণ্ড কাষ্ঠফলক হস্তে লইয়া নৃত্য ও গীতের তালে তালে সেই কাষ্ঠদ্বয় বাজাইয়া সকলে দলবদ্ধভাবে গৃহ হইতে গৃহান্তরে অভিনয় করিয়া ফিরে। এইপ্রকার অভিনয় বিশেষ বিশেষ সময়েই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, যেমন আয়ুধ পূজা বা বীরাষ্টমীর দিন স্কুলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক বালিকাগণ দলে দলে এই অভিনয়ের জন্য বহির্গত হইয়া গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে। ভিক্ষালব্ধ অর্থ শিক্ষক মহাশয় প্রাপ্ত হন। ইহাই শিক্ষক মহাশয়ের বার্ষিক গুরুদক্ষিণা। "কোলাটম" অভিনয় যে কেবল স্কুলের বালক বালিকারাই করিয়া থাকেন তাহা নহে, বয়স্কা মহিলারাও দেবমন্দিরে মধ্যে মধ্যে এইরূপ অভিনয় করেন

বলিয়া শুনিয়াছি। কোলাটম ক্রীড়া নহে, ইহা ধর্ম্মের অঙ্গ, বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার সহিত ইহার কিছু যোগ আছে।

মালাবারে স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট সমাদর আছে। ত্রিবাঙ্কুরে এমন কোন পল্লী নাই বলিয়া শুনিয়াছি যেখানে বালিকা-পাঠশালা নাই। এখানে ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অনেক সময় বালক ও বালিকা একত্রেই পাঠ করিয়া থাকে। উচ্চ কলেজীশিক্ষার প্রচলনও এখানে নিতান্ত নগণ্য নহে। ইংরেজিতে বাক্যালাপ করিতে পারেন এরূপ মহিলার সংখ্যাও অনেক। মহিলাদিগের মধ্যে অবরোধের প্রচলন না থাকাতে তাঁহারা স্ব স্ব স্বামী ভ্রাতা ও অন্যান্য পুরুষগণের সহিত মিলিত হইয়া বহুবিধ সদনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকেন। এই স্ত্রী-শিক্ষার ফলে সমাজ-অঙ্গ হইতে বহুবিধ কু-প্রথা অতি দ্রুত তিরোহিত হইতেছে। প্রাচীনকালে রমণীদিগের পক্ষে উন্মুক্ত বক্ষে বিচরণ করাই বিধি ছিল, বিশেষতঃ দেব-মন্দিরে এবং সম্মানিত ব্যক্তির সমক্ষে; এমন কি গৃহে কোন সম্মানিত অতিথি আগমন করিলে বক্ষাবরণ উন্মোচন করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হওয়াই ছিল বিধি। বর্ত্তমানে সে ব্যবস্থা লোপ পাইয়া কোথাও একখণ্ড উত্তরীয় বস্ত্র এবং কোথাও বা কামিজাদি ব্যবহৃত হইতেছে। মালাবার রমণী সাধারণতঃ দুইখণ্ড বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। কটীর উর্দ্ধদেশে একখণ্ড ও অধোদেশে অপর খণ্ড। ইহাও একপ্রকার পরিচ্ছদ-সংস্কার; বর্ত্তমান সময়ে স্থল-বিশেষে কলিকাতার ব্রাহ্মিকা পরিচ্ছদের ব্যবহার দেখিলাম এবং কোথাও বা কটীর অধোভাগে একখণ্ড বস্ত্র, উর্দ্ধভাগে একটি জামা এবং তদুপরি একটি উত্তরীয় ব্যবহৃত হইতে দেখিলাম। এই জামাও অদ্ভুতরূপে সীবন করা হয়। ইহা একখণ্ড ক্ষুদ্র বস্ত্র মাত্র; তাহার কণ্ঠদেশ ও বাহু কাটিয়া সীবন করা হয় এবং তাহার অধোভাগ উন্মুক্ত থাকে; এই অংশ বাঁধিয়া রাখা হয়। নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের মধ্যে এইরূপ কুর্ত্তা ব্যবহার করা হয়। সচরাচর কিন্তু আমাদের দেশের মহিলাদিগের জ্যাকেটের মত জামা ব্যবহার করা হয়। কিন্তু জ্যাকেট পরিধানও এক নব তন্ত্রের সংস্কার। সাধারণ স্ত্রীলোকের মধ্যে কেবলমাত্র দুইখণ্ড বস্ত্রই—কটীর উপরার্দ্ধে একখণ্ড ও নিম্নার্দ্ধে অপর একখণ্ড—ব্যবহৃত হয়। এইরূপ পরিচ্ছদ গৃহে এবং বাহিরে সর্ব্বত্রই ব্যবহৃত হয়।

বাণিজ্যের হিসাবে এই ক্ষেত্র মহামূল্যবান স্থান। বহুপ্রাচীনকাল—এমন কি খ্রীষ্টজন্মের পূর্ব্ব হইতে—এই প্রদেশ পৃথিবীর বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হইতেছে। নারিকেল ও গোলমরিচ ইহার প্রধান বাণিজ্য-দ্রব্য। নারিকেলের শাঁস, মালা, ছোবড়া ও কাটি সকলেরই প্রকাণ্ড ব্যবসা চলিতেছে। কোটী কোটী টাকার ব্যবসা চলিতেছে। বিদেশী বণিকগণই এই ব্যবসা করিয়া ধনী হইতেছে, ভারতবাসী ভারবাহী মাত্র। বাণিজ্যের ক্ষেত্র এখানে এখনও সুবিস্তৃত। দুই এক হাজার টাকা মূলধন লইয়া ব্যবসা আরম্ভ করিলেও যথেষ্ট লাভবান হওয়া যায়। অধিক মূলধন থাকিলে বিস্তৃত চালানি কারবার করা যায়। তদ্ভিন্ন বেসিল মিশনের অনুকরণে কাপড়ের ও টালির কারবার করিলেও যথেষ্ট লাভ করা যায়। জামার লেস বুনন করাও একটা লাভের ব্যবসায়। মূলধন থাকিলে সুদক্ষ কর্ম্মকুশলী সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এই বাণিজ্য-ব্যাপারে লণ্ডন মিশন ও বেসিল মিশনের খ্রীষ্টান মিশনরীগণের নিকট হইতে অধিক বাধা পাইবার সম্ভাবনা। বর্ত্তমানে জার্ম্মানীর পদগৌরব খর্ব্ব হওয়ায় তাহাদিগের বাধা গণনার মধ্যে না আনিলেও চলে। এই বিষয়ে কেহ বিশেষ তত্ত্ব জানিতে চাহিলে সানন্দচিত্তে তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারি। এতদ্ভিন্ন একপ্রকার শ্বেতবর্ণের বালুকা এই দেশে পাওয়া যায়; শুনিয়াছি এই বালুকা মূল্যবান, কিন্তু তাহার ব্যবহার কি আমি জানি না। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সে বিষয়ে অনুসন্ধান করেন ইহা বাঞ্ছনীয়।

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঙলার শিল্প

এই বাঙলাদেশ ভারতবর্ষের বিবিধ প্রাদেশিকতা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে আপনার শ্যামলতা স্নিগ্ধচ্ছায়া ও বিচিত্র রস-সৌন্দর্য্যে ভরপুর হয়ে ভারতের একপ্রান্তে আপনার আসনখানিকে উজ্জ্বল করে রয়েচে! আমরা যখন এই বাঙলার বাইরের দিকে চেয়ে দেখি তখন কেমন একটা নীরস কাঠখোট্টার ভাব কোথাও উঁচুউঁচু কালো কর্কশ পাথরের জমাট পাহাড়ে, কোথাও বা তাঁবাটে ঘাসে ধরণীর জীবন-রহস্যকে লোপ পাইয়ে দেবার চেষ্টা করচে বলে মনে হয়। আমাদের বাঙলার শিল্পের মধ্যেও এমন একটি অন্তর্নিহিত রস ও স্নিগ্ধতা আছে যার পরিচয় মোগল, কাংড়া বা রাজপুত কোন জাতীয় শিল্পের মধ্যেই পাওয়া যায় না। আমাদের মনে হয় দেশের এই আব-হাওয়ার সঙ্গে শিল্পের বা কাব্যেরও একটি যোগ আছে। বঙ্গলক্ষ্মীর শ্যামল ক্রোড়ে যে-সকল মানবশিশু জন্মান তাঁরা তাঁরই অনুরূপ কোমলতা এবং স্নিগ্ধতা প্রাপ্ত হন। আমাদের দেশে কবি এবং শিল্পীদের মধ্যে সেই কারণেই বোধ হয় এইরূপ ভাবপ্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।

আমাদের প্রাচীন কাঠের পাটায় আঁকা পোটোদের চিত্র দেখলে দেখা যায় যে তাতে মোগল প্রভৃতি ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের শিল্পীদের মত বর্ণযোজনা বা রেখার সহজ ও সরল গতির অভাব নেই। অজন্তা প্রভৃতি জগৎ বিখ্যাত প্রাচীন চিত্রশিল্পের রেখা ও বর্ণের মতই বাঙলার চিত্রের রং ও রেখা সরল ও লাবণ্যপরিপূর্ণ। আধুনিক যুগেও আমাদের দেশে এইরূপ অঙ্কনরীতির প্রচলন একেবারেই নেই বললে ভুল বলা হয়। কেননা, বিংশশতাব্দির ইংরেজি শিক্ষার গৌরবাভিমানীদের চক্ষুর অন্তরালে, কলকাতা সহরের একপ্রান্তে কালীঘাটে এখনও সেইরূপ পদ্ধতিতে আঁকার প্রচলন আছে। তবে, দুঃখের বিষয় সেইসকল শিল্পীদের পরিণাম বা পরিণতির দিকে আমাদের শিক্ষিত-সমাজের কিছুমাত্র লক্ষ্য নেই। এমন কি কালীঘাটের পটের উপর এরূপ অশ্রদ্ধা যে ভদ্রসমাজে নাম উল্লেখ করাও রুচিবহির্ভূত। যাহোক, আজ যে আমরা সেই বাংলার উপেক্ষিত শিল্পসম্বন্ধে এই বিরাট সাহিত্য-সভায় দুএকটি কথা বলবার সুযোগ পেয়েচি এইই-পরম ভাগ্য! বহুবৎসর থেকে মোগলরাজ্যের তিরোধানের অব্যবহিত পরে আমাদের দেশে পাশ্চাত্য -শিল্পের একটা প্রভাব চলে আসছিল; তার মধ্যেও অত্যন্ত সঙ্কীর্ণভাবে দুঃখীদের দ্বারা প্রতিপালিত হয়ে বঙ্গশিল্প এখনও যে জীবনীশক্তির পরিচয় দিচ্চে তা' পরম আনন্দের বিষয় সন্দেহ নেই।

আমরা পূর্ব্বে অপরাপর প্রবন্ধে অনেকবার বলেচি এবং এখনও বলচি যে আমাদের শিল্পের অবনতির কারণ বিদেশী শিক্ষা। আমাদের পটুয়ারা সৌভাগ্যক্রমে এই বিজাতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়নি বলেই এখনও পর্য্যন্ত এক-ভাবেই দেশীধরণটি বজায় রেখে পট এঁকে আসচে। অবশ্য এইসব শিল্পীদের উন্নতি বা অবনতির কোনই তারতম্য লক্ষিত হয় না। আমাদের এই শিল্পীদের ক্রমবিকাশের শক্তি জাগিয়ে তোলবার দিকে দেশের শিক্ষিত ব্যক্তি-মাত্রেরই লক্ষ্য রাখা উচিত। দেশীয় সাহিত্যই দেশীয় শিল্পের প্রধান সহায়। আমরা আশৈশব ইংরেজি শিশুপাঠ্য পুস্তকে, বিদেশী চিত্রপুস্তকে, বিদেশী শিল্পের রূপ দেখতে দেখতে চোখ বিগড়ে ফেলি; বিদেশী শিল্পের গৌরবের কথা শুনতে শুনতে মনও দেশের দিক থেকে বেঁকে বসে। সুতরাং তারই ফলে আমাদের মানসলক্ষ্মী বিদেশী মানসপ্রতিমার হুবহু প্রতিরূপে প্রকাশিত না হলেও একটি বিকৃতরূপে ধরা দেয় আমরা যখন ছেলেবেলা থেকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে চোদ্দ বৎসরকাল যান্ত্রিক নিয়মে ইংরেজি শিক্ষা করে প্রথম সংস্কৃত-সাহিত্যের পথ দিয়ে দেশীয় ভাবরাজ্যে প্রবেশলাভ করার অধিকার পাই, তখন আমাদের মানসপটে বিদেশী মানসলক্ষ্মীর ছবি এরূপ প্রবল হয়ে জেঁকে বসে যে এমন কি মেঘদূতের কবিবর্ণিত বিরহিণীর

"তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিত-হরিণী-প্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।
শ্রোণীভারাদ্ অলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্ যুবতি-বিষয়ে সৃষ্টির্ আদ্যেব ধাতুঃ॥

এই রূপটি ভিনাসের মূর্ত্তির উপর হাল্‌ফ্যাসানের কাপড় পরা একটি আধুনিক বিরহবিধুর রমণীমূর্ত্তি ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। আমাদের যদি অজন্তা প্রভৃতির

প্রাচীনচিত্র, বরভূধরের মূর্ত্তি প্রভৃতি দেশীয় শিল্পের সঙ্গে বিদেশী ভিনাসের ন্যায় পাঠ্যপুস্তক প্রভৃতির মারফতে শৈশবাবধি পরিচয় থাকত তবে আমরা ইংরেজি শিক্ষার দ্বারা বিদেশীর চোখ নিয়ে স্বদেশের শিল্পের বিচার করতে যেতুম না।

আমরা এখন বাঙলার প্রাচীন চিত্র ও আধুনিক পোটোদের সম্বন্ধে কিছু বলব। বাঙলার প্রাচীন শিল্পীরা মহাত্মা চৈতন্যের পরবর্ত্তী সময়ে তাঁর ধর্ম্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং সেইকারণেই তাঁদের ছবিতে তার প্রচুর আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক কালীঘাটের পোটোদের তামসিক চিত্রই বেশী আঁকতে দেখা যায়। আমাদের দেশীয় সাধারণের অর্থাৎ এই-সকল চিত্রের গ্রাহকদের এবং নিরক্ষর পটুয়াদের ধর্ম্মশিক্ষা না থাকাই ও নানাপ্রকার কুপ্রথার অনুরক্ত হয়ে পড়াই এই অবনতির প্রধান কারণ। প্রাচীন পটুয়াদের আঁকা গৌরাঙ্গলীলা প্রভৃতির ছবি এখনও জীর্ণ পুঁথির পাটার উপর যা পাওয়া যায় তা' দেখলেই হৃদয় পবিত্র ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে পড়ে! পাটাগুলির বর্ণ-বিন্যাস এবং রেখা-সম্পাতের মধ্যেও শিল্পীদের অসাধারণ সংযম ও শিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। আধুনিক পোটোদের অঙ্কন-দক্ষতা ও তৎপরতার প্রতি দৃষ্টি থাকলেও তার ভিতর শৈথিল্যের ভাবও যথেষ্ট আছে।

অজন্তা, মোগল-শিল্প প্রভৃতি জগৎ-বিখ্যাত শিল্পের ন্যায় অসাধারণ কৃতিত্ব ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেক যায়গার তুলনায় বাঙলার প্রাচীনচিত্রেই বেশী দেখা যায়। সমগ্র এসিয়াখণ্ডের মধ্যে জাপানী ও চীনা শিল্পের মধ্যে প্রাচ্যের এই বিশেষত্বটি দেখা যায়। বাঙলার শিল্পের সঙ্গে চীনা ও জাপানী শিল্পের এক এক স্থানে একটা বেশ একতা দেখা যায়। বাঙলার শিল্পে অঙ্কন-পদ্ধতির বিশেষ কোনো গণ্ডিবদ্ধ নিয়ম নাই বল্লেও হয়, শিল্প অবলীলাক্রমে শিল্পীর হাতে খেলার মত সহজে সংসাধিত হয়। এমন কি—সময় সময় তার প্রথাগত নিয়মকেও (traditions) ছাড়িয়ে যেতে দেখা যায়। যাঁরা বাঙলার প্রাচীনচিত্র অধিক পরিমাণে দেখবার সুযোগ পেয়েচেন তাঁরা এটা সহজেই বুঝতে পারবেন। দেশের মূল প্রকৃতিগত বিশেষত্বকে বজায় রেখে শিল্পী নিজের বিশেষত্বের ছাপ দিয়ে যা' প্রকাশ করবেন তাই যথার্থ শিল্পনামের যোগ্য।—এ বিষয়ের অভাবই শিল্পের দৈন্যের লক্ষণ। জাপান আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষায় বেশী বিধিবদ্ধ নিয়ম পালন করতে গিয়ে তার অমূল্য শিল্প-রত্ন বিসর্জ্জন দিতে বসেছিল। স্বর্গীয় মহাত্মা ওকাকুরা প্রভৃতি শিল্পরসজ্ঞ ব্যক্তিরা মিলে এই দেশীয় শিল্পের শক্তির হ্রাস হবার পূর্ব্বাহ্নেই সাবধান হবার চেষ্টা করেচেন।

আমাদেরও এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত।

কেহ কেহ বলেন আধুনিক বঙ্গদেশে এই ভারত-শিল্পের পুনরুত্থানের যুগে মোগল কাংড়া প্রভৃতির অনুকরণে ভারত-শিল্পের শ্রীসাধন করা উচিত। কিন্তু কেহই বাঙলার নিজের কোনো সম্পদ ছিল কিম্বা আছে সেদিকে দৃষ্টি দেন না। মোগল প্রভৃতি শিল্প বাঙলার শিল্পে তার সূক্ষ্ম-সৌন্দর্য্য ও কলানৈপুণ্য দিতে পারে, কিন্তু বাঙলার স্বাভাবিক ভাবপ্রবণতা ও স্নিগ্ধরস দিতে পারে কিনা সন্দেহ। আমাদের উচিত প্রাচ্য-শিল্পসমূহের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা এবং সেই সঙ্গে নিজের দেশের স্বাভাবিকতাকে বজায় রাখা।

আশ্চর্য্যের বিষয় ছয়শত বৎসর মুসলমানের রাজত্বেও বাঙলার শিল্পকে মোগলশিল্প অধিকার করে বসতে পারেনি। বৈষ্ণবসাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবশিল্প বাঙলায় নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করে চলেছিল। রাজপুত, কাংড়া প্রভৃতি ভারতের অপর সকল স্থানের শিল্পের মধ্যে এই মোগল-শিল্পের প্রভাব যথেষ্ট আছে। কিন্তু এ স্থানে একটি কথা স্মরণ রাখা উচিত যে মোগল-শিল্প এবং পারস্য-শিল্পের মধ্যে একটি বিশেষ যায়গায় পার্থক্য আছে। মোগল-শিল্প কেবল মুসলমানদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত নয়। হিন্দুরাই মোগলবাদশাহের সভা-শিল্পী ছিল এবং তাদের দ্বারাই প্রবর্ত্তিত এটি একটি নতুন ধরণের শিল্পের সৃষ্টি। মুসলমানরাজ্যের অভ্যুত্থানের যুগে পারস্যের শিল্প ভারতে যা' এসেছিল তা থেকে এখানকার প্রধানত হিন্দুরাই কয়েকটি মুসলমান-শিল্পীর সঙ্গে মিলে তাদের প্রাচীন রীতিটি বজায় রেখে পারস্য-শিল্পের সূক্ষ্মভাবটি গ্রহণ করে এই অভিনব মোগল-শিল্পের শাখাটির প্রবর্ত্তন করেছিলেন। এখন

বাঙলায় সেই মোগল-শিল্পের হুবহু চলন অসম্ভব। সুতরাং মোগলশিল্পের ভিতরকার কারুকার্য্যের দক্ষতা এবং সূক্ষ্মভাবটি গ্রহণ এবং সেই সঙ্গে দেশীয় চিন্তাপ্রবণতা রক্ষা করাই আমাদের দেশের শিল্পীদের প্রধান কর্ত্তব্য।

বাঙলার নিজের যে-সকল বিশেষত্ব আছে তার মধ্যে সরলতাই তার একটি প্রধান ভাব। খাঁটি বাঙলার মহিলাদের পরিচ্ছদের মধ্যেও এমন একটি সরলতা আছে যার সঙ্গে অন্যান্য দেশের জটিল পরিচ্ছদ-পুঞ্জের কোনই মিল দেখা যায় না। দুঃখের বিষয় আজকাল আমাদের দেশের প্রাচীন কালের অঙ্গবস্ত্রের স্থলে সাধারণত সপ্তদশ শতাব্দির পাশ্চাত্য-পরিত্যক্ত জ্যাকেট সেমিজ, এবং ফরাসডাঙ্গা ঢাকা শান্তিপুরের কাপড়ের স্থলে বম্বেদস্তুর বিদেশী সিল্কের শাড়ীর বহুল প্রচলন দেখা যায়। বল্‌তে কুণ্ঠা বোধ হয় আমাদের পুরুষেরা ত ধুতিচাদর একপ্রকার ছেড়েই দিয়েছেন; তাঁরা সভাসমিতিতে ধুতির উপর বুকখোলা কোট কিম্বা যাত্রার দলের জুড়ির মত সাজে যেতে কিছুমাত্র দ্বিধান্বিত হন না। প্রাচীন চিত্রগুলিতে দেশের জাতীয় সভ্যতার অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত হতে পারে। বাঙলার প্রাচীন চিত্র দেখলে বোঝা যায় যে আমরা আজকাল যেমন বিদেশী অন্তর্বাস (Underwear) কামিজ ও ওয়েষ্টকোট বাইরের সদরী পরিচ্ছদের মত ব্যবহার করি, তখন তার চলন ছিল না। প্রাচীনকালে বাঙলায় কোর্ত্তা পরার চলন ছিল। এই কোর্ত্তা কতকটা আধুনিক পাঞ্জাবীর মতই সুদৃশ্য ছিল। ধুতির সঙ্গে কামিজের মতন অতবড় ছন্দপতন-ব্যাপার আর কিছুই হতে পারে না। আমার মনে আছে ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে বিলাতের বিখ্যাত চিত্রকর শ্রীযুক্ত রোটেনষ্টাইন যখন ভারতবর্ষে এসেছিলেন তখন তিনি বাঙালীদের ধুতি ও চাদর পরার স্বাভাবিক ধরণটি দেখে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে ইউরোপের চিরপ্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রীকমূর্ত্তির সুকুঞ্চিত স্তরবিন্যস্ত পরিচ্ছদের চেয়েও বাঙালীর এই সরল ও সাধারণ পরিচ্ছদকে অধিকতর উর্দ্ধে স্থান দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নি।

প্রাচীন উড়িষ্যার চিত্র দেখ্‌লে দেখা যায় যে প্রাচীন বাঙলার ও প্রাচীন উড়িষ্যার পরিচ্ছদ প্রায় একধরণের ছিল। আমরাই অচিরে বিদেশী প্রভাবে পড়ে এই একতার খর্ব্বসাধন করেছি। কিন্তু উড়িষ্যার তুলনায় বাঙলার পরিচ্ছদরীতিই বেশী ভাল ছিল।

বাঙলার আধুনিক পোটোদের মত উড়িষ্যায়ও একদল আধুনিক পটুয়া সেই প্রাচীন রীতিতে ছবি এঁকে আসচে। উড়িষ্যাবাসীদের এই বিদেশী শিক্ষার অভাবেই এই প্রাচীনশিল্প এখনও টিঁকে আছে। এদের ছবি জগন্নাথ-তীর্থ-যাত্রীদের দ্বারা প্রতিপালিত হচ্চে। উড়িষ্যায় এখনও তক্ষণবিদ্যাপটু শিল্পী পাওয়া যায়। তারা অবশ্য অন্নাভাবে স্ব স্ব ব্যবসা প্রায় ছেড়ে দিয়েচে। একসময় গভর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃপক্ষের আদেশমত প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের তরফ থেকে উড়িষ্যায় একটি প্রাচীন মন্দিরের সংস্কারের জন্য কয়েকটি দেশী কারীকর নিযুক্ত হয়েছিল। তাদের দৈনিক মজুরী মাত্র কয়েক আনা দেওয়া হত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তারা এমন যত্নের সঙ্গে সুচারুরূপে কারুকার্য্যটি সম্পন্ন করেছিল যে গভর্মেণ্ট-শিল্পবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হ্যাভেল ও ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর প্রভৃতি তার শতমুখে প্রশংসাবাদ করেছিলেন। জয়পুর প্রভৃতি স্থানে ভারতের মধ্যেই ভাস্করশিল্পীদের অনুসন্ধান পাওয়া যায়। তবে উপযুক্ত উৎসাহের অভাবে ক্রমেই লোপ পেতে বসেচে। এসব দেখলে কি মনে হয় না যে আমাদের দেশের শিল্পের জীবনীশক্তি এখনও ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় লুকানো আছে?

আশ্চর্য্যের বিষয় বাঙলার আধুনিক পটুয়াদের এবং ভারতের অন্যান্যস্থানের শিল্পীদের অঙ্কনরীতির নামগুলির মিল দেখা যায়। যেমন, কালী দিয়ে ছবির উপর যে শেষ কাজ করার রীতি আছে তাকে সীয়াকলম করা অর্থাৎ কালী-তুলির কাজ বলে। ছবির জন্য বিশেষ ভাবে তৈরী কতকগুলি কাগজ একত্রে আঠা দিয়ে লাগিয়ে যা তৈরী হত তাকে 'ওয়াসলী' বলে। একসময় সমস্ত ভারতশিল্প যখন এক ছিল তখন হয় ত আরো কত রীতি ও পদ্ধতির সাঙ্কেতিক নাম প্রচলিত ছিল যা আজ আমাদের কাছে একেবারেই অপরিজ্ঞাত। যদি এখন

কোনো সুধীজন এইসকল পরিভাষার প্রচলন করেন তবে বোধহয় তাতে শিল্পীদের শিল্পবোধ-সম্বন্ধে বক্তব্য সহজে প্রকাশ করতে সাহায্য পাবেন এবং তাতে সাধারণের মধ্যেও শিল্পজ্ঞান বিস্তারের অনেক সুপন্থার আবিষ্কার হবার সম্ভাবনা। ইংরেজির অনেক শব্দ আধুনিক শিল্পীরা প্রায় প্রচলিত করে ফেলেচেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় সেস্থলে দেশী শব্দ ব্যবহৃত হওয়া উচিত। সপ্তবর্ণ এবং তাদের মিশ্রণের তারতম্যের অনুপাতে যতগুলি বর্ণের সৃষ্টি হয় সেগুলির পরিভাষা হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন আছে, এবং colour washএর জায়গায় 'রং পোতা' বা 'ভরা', sketchএর স্থলে 'তড়াকাম' বা 'আদ্‌রা', composition না ব'লে 'বাঁধুনী' প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে বিবিধ শব্দ যদি আমরা ক্রমাগত ব্যবহারের দ্বারা সড়গড় করে নি তবে আমাদের শিল্পেরও তাতে জোর বাড়ে বই কমে না।

এস্থলে বলা বাহুল্য আমাদের আলঙ্কারিক পরিকল্পনার শক্তিকে আমরা ক্রমশই জলাঞ্জলি দিতে বসেচি। এককালে যে বাঙলার বিশেষত্বের ছাপ দিয়ে আলঙ্কারিক পরিকল্পনা জাভার বরভুধরের ভিত্তি অলঙ্কৃত করেছিল আজ সেই বাঙলার শিল্পের পরিণতি যে কি দাঁড়িয়েচে তা মনে করুতেও কষ্ট হয়। আমাদের দেশে সামান্য ক্রিয়া-কর্ম্মে, উৎসবে, গৃহস্থালির মধ্যে যেসকল শিল্প এবং সৌন্দর্য্য-বোধের পরিচয় গৃহস্থের ঘরে ঘরে দেখা যেত, আজকাল তারও লোপ হবার সূচনা দেখা দিয়েচে। আমাদের দেশের আলিপনা ক্রমশ উপকথার পরী-কন্যার মত হয়ে পড়চে! আমাদের ছেলেমেয়েদের যে ইউরোপীয় শিক্ষা দি তাতে দোষ নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে দেশী আলঙ্কারিক নক্‌সার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করার দিকে দেশের লোকের যদি নজর যায় ত শিল্পের এবং দেশের উভয়েরই মঙ্গল। নতুবা, মুখে স্বদেশহিতৈষিতা এবং কার্য্যে ছেলেমেয়েদের বিলিতি ক্রসির 'ডয়লিং' 'ট্যাটিং' প্রভৃতি প্রস্তুত কর্‌তে ও বিলিতি নক্‌সায় কার্পেট বুন্‌তে শিখিয়ে শিল্প-বোধের মাথায় কুঠারাঘাত করুতে শেখালে চলবে না। কার্পেট যদি বুন্‌তে হয় তবে দেশী নক্‌সায় হওয়া চাই। আমাদের ভারতবর্ষের আলঙ্কারিক শিল্প যে শতদলকে কেন্দ্রগত করে আপনার বিশেষত্বের বিজয়নিশান উড়িয়ে একদিন সমগ্র ভারত-শিল্পের অন্তরে বিরাজ করত, আমাদের আবার সেই শতদলের কোমল পল্লবেই আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে।—এখন আর ক্রোটন ও আঙ্গুর-পাতার নক্‌সায় চলবে না। জীবন-কমলদলের বিকাশের মত ভারতশিল্পের সেই জীবনীশক্তির পরিচয় এবং সেই সঙ্গে আমাদের নিজেদের বিশেষত্বের পরিচয় দিতে হবে।

ছবি দেখা সম্বন্ধে আমাদের শেখবার অনেক কথা আছে। আমরা অনেকেই কেবল ছবির বাইরের দিকটা ফস্ করে দেখে যার-যা-ইচ্ছা একটা কিছু মতামত প্রকাশ করে থাকি। কিন্তু ভারতীয় ছবি জিনিষটা যে শিল্পীর কোথাকার জিনিষ এবং কোথা থেকে সেটা উৎসারিত হয়ে আমাদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হতে পেরেচে সেকথা আমরা মোটেই ভাবি না। এটা সর্ব্বাগ্রে মনে রাখা উচিত ভারতশিল্পীরা ইউরোপীয় শিল্পীদের মত যা-হয়-একটা চোখে দেখে হুবহু তার নকল এঁকে দিয়েই নিশ্চিন্ত হন না, তাঁদের কবিরই মত প্রকৃতির অন্তর থেকে তাঁদের চিত্রে প্রকাশযোগ্য রস সৌন্দর্য্য আহরণ করতে হয় এবং কলা-কৌশল দ্বারা ভাব প্রকাশ করুতে হয়। আমরা যদি এবিষয় আগে একটু ভেবে চিন্তে তবে ভারতশিল্প পর্য্যবেক্ষণ করি তবে খুব সহজেই তার অন্তরের দ্বারে প্রবেশলাভ করুতে পারি।

বাঙলায় চিত্রশিল্পের মত প্রাচীন ভাস্কর্য্যেরও নিদর্শন যথেষ্ট আছে। প্রাচীন মন্দির প্রভৃতির বিগ্রহ এবং তার বাইরের ইটে খোদাই (Terracotta) যেসব প্রাচীন কাজের নমুনা আজও পাওয়া যায় সেগুলি পূর্ব্বকালের চারুশিল্পকলার শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে পৃথিবীর যে-কোন স্থলে গৃহীত হতে পারে। গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যেসব মূর্ত্তি এবং পুষ্করিণী খননের সময়ে যেসকল তাম্রোৎকীর্ণ মূর্ত্তি এই বাঙলার মাটির মধ্যে থেকে আবিষ্কৃত হয়েচে সেগুলি শুধু বাঙলার কেন ভারত-শিল্পের ক্ষেত্রে অমূল্য বস্তু। গৌড়ের যেসব অতিনিম্নতা রক্ষা করে গঠিত (low relief) প্রাচীন খোদিত চিত্র পাওয়া যায় সেগুলির ভঙ্গী ও গঠন-

সৌন্দর্য্য ভারতের যে-কোন মূর্ত্তির চেয়ে হীন ত নয়ই বরং বেশী সুন্দর। দুঃখের বিষয় এই ভাস্কর্য্যের চর্চ্চা বাঙলায় নেই। অবশ্য কৃষ্ণনগরের কাছে ঘূর্ণীতে মাটির মূর্ত্তি এবং প্রতিকৃতি গঠনের চেষ্টা কুমোর-পরিবারের মধ্যে আজও প্রচলিত আছে, কিন্তু তারা তাদের প্রাচীনতা একেবারে হারিয়ে ফেলেচে এবং আজকাল বিলিতির অনুকরণে প্রকৃতির হুবহু নকল করার প্রাণপণ চেষ্টায় আছে। দুঃখের বিষয় তারাও ঠিক আমাদেরই মত দেশী শিল্পের খোঁজ না রেখে shade and light, anatomy, perspective প্রভৃতি হরবোলার বুলির আবৃত্তি করে। অবশ্য এজন্য আমরাই দায়ী। কেননা শিক্ষাভিমানী আমরাই নিরক্ষর শিল্পীদের এইসমস্ত কথা শিখিয়েচি। দুঃখের বিষয় আমরাই এদের শিল্প-বোধের বিকাশ হতে দিইনি। এখন তাদের বিলিতি হিসাবে মূর্ত্তিগড়ারও প্রশংসা করা যায় না, অথচ দেশীয় রীতিও সেখানে এখন অপ্রচলিত। চালচিত্র আঁকার প্রথাটি কোনো কোনো যায়গায় এখনও খুব প্রচলন আছে এবং তাতে শিল্পীদের কোনো কোনো যায়গায় খুবই দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। কোনো কোনো শিক্ষিত লোকের মুখে দুর্গোৎসব প্রভৃতির প্রতিমাগুলির সংস্কারসাধন করার প্রয়োজন আছে এমন কথাও শুনেচি। তাঁরা সেগুলিকে গ্রীকমূর্ত্তির মত অতিমানবীয় করে তুল্‌তে চান। কিন্তু আমাদের মতে এরূপ সংস্কার না হওয়াই আমাদের পক্ষে মঙ্গল।

আমাদের বলতে লজ্জা বোধ হয় যে আমাদের দেশের যাঁরা স্বদেশ-সেবক তাঁদের কাছে এই স্বদেশী সভ্যতার শ্রেষ্ঠসম্পদ ভারত-শিল্পের কোনই মূল্য নেই। শিশুরা যেমন ভালমন্দ বিচারশক্তি না থাকায় নয়নপথে কোন-একটি অভিনব ও রঙিন বস্তু দেখ্‌লেই সেইটেকে ধরবার জন্যে হাত বাড়ায়, আমরাও তেমনি অবুঝ শিশুর মতই অজ্ঞানভাবে বিদেশী শিল্পের চাকচিক্যতে মুগ্ধ হয়ে সেটাকে গ্রহণ করবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠি। আমাদের দেশের আধুনিক শিল্পীদের গোড়া থেকেই ধ্যানধারণা হয় র‍্যাফেল বা মাইকেল এঞ্জেলোর মত শিল্পী হয়ে ওঠবার; তাঁদের পোটো বল্লে তাঁরা ক্ষুণ্ণ হন—আর্টিষ্ট বলে তাঁদের অভিহিত করতে হয়। এটা যে ভারতশিল্পীদের কতদূর অগৌরব ও মানহানিকর বিষয় তা বোঝবার শক্তি আমরা হারিয়েচি। অবশ্য আমরা আমাদের দেশের প্রাচীন কালটাকে আঁকড়ে ধরে চিরকাল কূপমণ্ডুকবৎ একভাবে বসে থাক্‌তে বল্‌চি না। আমাদের দেশের বিশেষ রীতিটাকে অবলম্বন করে অবাধে অগ্রসর হতে হবে। কেননা, আমরা যদি আমাদের রীতিপদ্ধতির প্রতি শ্রদ্ধা হারাই তবে আমাদের উভয়কুলই নষ্ট হবে। আমরা আগে আমাদের ঘরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে নিয়ে তবে অন্যত্র থেকে যদি অভিজ্ঞতা আহরণ করি তবেই সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর করে গড়ে উঠতে পারব, এই আমাদের বিশ্বাস। ক্ষুদ্র জাপান যেমন অশনে বসনে সব বিষয়ে আপনাদের দেশীয় শিল্প-ভাবটির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বিদেশী শিক্ষার অভিজ্ঞতার দ্বারা দেশকে বড় করে তুলতে পেরেচে আমাদেরও ঠিক্ সেইরূপ করতে হবে।

বাঙলার শিল্পীরা প্রথমে ভারত-শিল্পের অন্যদিকে না চেয়ে আপনার বঙ্গপল্লীর শুধু ভিতরকার সকল শ্রেষ্ঠ সম্পদের আবিষ্কার করে পরে ভারতের এবং ক্রমে সমগ্র জগতের শিল্পের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের দ্বারা যদি দেশীয় শিল্পকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন তবেই দেশের শিল্পের মঙ্গল। গুজরাট পাঞ্জাব প্রভৃতি ভারতবর্ষের অপরাপর স্থানের শিল্পীরাও ঠিক্ এইপ্রকার স্বতন্ত্রতা-রক্ষা করে অথচ মূলগত ঐক্য বজায় রেখে যেদিন স্ব স্ব শিল্পের বিকাশের পথে অগ্রসর হবেন—সেইদিনই ভারতে শিল্পলক্ষ্মী পূর্ণশ্রীতে আবির্ভূত হবেন। *

শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

অবশেষ

সকল আকাশ ভাঙি যে বরষা এল নামি
দুরন্ত দুর্ব্বার,
স্মরণে জাগাতে তারে নাই কোথা একেবারে
কোন চিহ্ন তার!
কেবল কমল-দলে দুই চারি বিন্দু জলে
কাঁপিছে করুণ স্মৃতি মুকুতা-আকার!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

* অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

কর্পূরের মালা

(প্রবাসীর দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত গল্প)

গোলমালে ভিড়ের ভিতর মাসীমার হাত ছাড়াইয়া ছবি যে কখন পিছাইয়া পড়িয়াছিল তাহা সে কিছুই টের পায় নাই, হঠাৎ অপরিচিত লোকের ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ির মাঝে আপনাকে নিঃসহায় বেপথুমানা দেখিয়া ভয়ে সে কাঁদিয়া ফেলিল।

দোলযাত্রা উপলক্ষে সেদিন জগন্নাথ-দেবের শ্রীমন্দিরে লোকে লোকারণ্য। সকলেই কুনুইয়ের ধাক্কায় লোক হটাইয়া অগ্রসর হইতে উদ্‌গ্রীব। যাত্রী-পরিচালক পাণ্ডা ও ছড়িদারদের হাঁকডাকে কানে তালা ধরিয়া যাইতেছে। ত্রয়োদশবর্ষীয়া পাৎলা ডিগ্‌ডিগে মেয়ে ছবি—লোকের হুড়াহুড়ির ঠেলায় পিছু হটিতে হটিতে একেবারে মন্দিরের দরজার গোড়ায় আসিয়া পৌছিল।

ছবি আকুলক্রন্দনে অধীর হইয়া উঠিল। কে কাহাকে দেখে, কে কাহার কথা শোনে? তাহার পানে কেহ ফিরিয়া তাকাইলও না।—আজ দেবতা দর্শনে তাহারা আসিয়াছে—দেবতা দেখিবে, দুঃস্থকে দেখিবার অবকাশ নাই; দেবতার দর্শনে স্বর্গলাভ হয়,—সে স্বর্গ যদি বাহুবলের প্রভাবে, গুঁতাগুতির দ্বারা দুর্ব্বল দলনে পাওয়া যায়, তবে কোন্ বুদ্ধিমান তাহাতে ইতস্তত করে? কে এমন স্বার্থত্যাগী নির্ব্বোধ আছে, নির্লজ্জ আছে, যে পরের খোঁজ লইতে গিয়া নিজের অনায়াসলভ্য স্বর্গ হারাইতে আপত্তি করে না? কেহই না!—আতঙ্ক-পীড়িতা বালিকার ক্ষীণরোদন প্রচণ্ড কোলাহলের মাঝে ডুবিয়া তলাইয়া গেল।

"কি হয়েছে খুকি, কি হয়েছে তোমার—কেন কাঁদছ গা?" শ্যামবর্ণ, একহারা, কপালে চন্দনের ফোঁটা গলায় মালা, কোমরে গামছা জড়ান, ঈষদ্দীর্ঘাকৃতি একটি তরুণ কোমলমূর্ত্তি, ছবির মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া স্নেহময় স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "কেন কাঁদছ খুকি?—" চারিদিকে অদ্ভুত বৈচিত্র্যময়ী কটকীভাষার কিড়িমিড়ির মাঝে, হঠাৎ পরিষ্কার বাংলা প্রশ্ন শুনিয়া ছবির কান্না বন্ধ হইল; ছবি জলভরা বড় বড় চোক দুটি তুলিয়া সবিস্ময়ে প্রশ্নকর্ত্তার মুখপানে চাহিল, আহা কি সুন্দর মমতাময় সরল মুখখানি! সদ্য শঙ্কিতা ছবি অনেকটা আশ্বস্ত হইল।

আবার স্নেহময় স্বরে সেই ব্যগ্রপ্রশ্ন—।

সহসা পিছনের সজোর ধাক্কায়, সোনার পুতুলের মত ক্ষীণকায়া ছবি, ছিট্‌কাইয়া সেই লোকটির উপর গিয়া পড়িল,—ক্ষিপ্রহস্তে পতনোন্মুখ ছবিকে ধরিয়া ফেলিয়া সেই লোকটি অতি যত্নে তাহাকে বাম হাতের বেষ্টনে আগ্‌লাইয়া লইয়া, বিপুল বিক্রমে দক্ষিণ হস্তের অমিত প্রতাপে লোক ঠেলিয়া মন্দিরপ্রাঙ্গণে একটু তফাতে আসিয়া দাঁড়াইল।

ছবি এতক্ষণ প্রাণপণে অন্তিম অবলম্বনের মত সেই অপরিচিত লোকটির হাত চাপিয়া ধরিয়া ছিল। এখন ফাঁকা জায়গায় আসিয়া সঘন উচ্ছ্বসিত নিঃশ্বাস ফেলিয়া, লোকটির হস্তবদ্ধ নিজের ঘর্ম্মাক্ত হাতখানি খুলিয়া লইয়া সলজ্জ সঙ্কোচে একটু সরিয়া দাঁড়াইল। লাবণ্যময়ী কিশোরীর মুখপানে প্রীতি-পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া, তরুণ যুবাটি করুণা-কোমল কণ্ঠে সুধাইল, "কার সঙ্গে মন্দিরে এসেছিলে খুকি?"

থামিয়া থামিয়া শুষ্ক কণ্ঠে ছবি বলিল, "আমার মা, মাসীমা, মেশোমশাই, ঝি—সবাই এসেছে। আমি মাসীমার হাত ধরে ছিলুম, তার পর মন্দিরে ঢুকে—" ছবি আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

"চুপ কর, চুপ কর, এখনি তাদের পাবে, কান্না কি? তোমাদের ছড়িদার কেউ নেই?"

"হ্যাঁ আছে, কপালে ফোঁটা পরে একজন—"

"তার নাম কি বল দেখি?"

"তা জানিনে, তার মাথায়,—ঐ তোমার মত চুল ছাঁটা নেই ত,—বড় বড় চুলে চুড়ো বাঁধা আছে।

সরলা বালিকার এই অভ্রান্ত যুক্তিপূর্ণ অভিজ্ঞান নির্দ্দেশে লোকটির মুখ হাসিতে ভরিয়া উঠিল; চারিদিকেই তো শত শত চূড়া-বাঁধা মাথা, তাহার মধ্য হইতে একটি চূড়া-চিহ্নিত পরিচিত মাথা খুঁজিয়া বাহির করা নিতান্তই সহজ!

"আচ্ছা পাণ্ডার নাম কি জান?"

"না, মায়েরা কেবল সেই লোকটার সঙ্গেই ঠাকুর দেখ্‌তে ঢুকেছেন।"

"মন্দিরে ঢুকেছেন তো? আচ্ছা, তবে কোন ভয় নেই, এখনি বেরুলেই পাওয়া যাবে। তোমার নামটি কি খুকি?"

"আমার নাম ছবি।"

সেই রবিকরোজ্জ্বল মধুর প্রভাতে সেই স্নিগ্ধ লালিত্য-ময় সুন্দর মুখখানির প্রতি চাহিয়া চাহিয়া মুগ্ধ-হৃদয় যুবা ভাবিল "ছবি বটে!"

কোলাহল করিতে করিতে যাত্রীদল জলপ্রবাহ-বৎ যাওয়া-আসা করিতেছে। চলিতে চলিতে কেহ বা তাহাদের দিকে কৌতুকোজ্জ্বল কটাক্ষ হানিয়া যাইতেছিল,—ছবি নত দৃষ্টিতে সসঙ্কোচে জড়সড় হইতেছিল। অদূরে আবির-লাঞ্ছিত অদ্ভুতদৃশ্য কয়েকজন ছোকরা তাহাদের লক্ষ্য করিয়া, গোপন বিদ্রূপে চোখ টেপাটেপি করিয়া বেজায় হাসিতেছিল। তাহাদের মধ্যে একজন দণ্ড দুয়েকের জন্য সরিয়া গিয়া মন্দিরদ্বারে ভিড়ে মিশিল, তার পর সহসা অত্যন্ত ব্যস্তভাবে আসিয়া আচম্বিতে ছবির হাত ধরিয়া এক হ্যাঁচকা মারিল। "আরে আমার যাত্রীর মেয়ে ভিড়ে হারিয়েছে, আয়!"

সেই সর্ব্বদর্শী তরুণ যুবা এই লোকটার আচরণ আগাগোড়া সব লক্ষ্য করিতেছিল; বহুকষ্টে এতক্ষণ সংযত ছিল, আর পারিল না, সদ্যকৃত ধৃষ্টতার প্রত্যুত্তরে অকস্মাৎ রুদ্রমূর্ত্তি ধরিয়া সেই অসভ্যটার গালে সশব্দে এক চড় বসাইয়া দিল, "বিশ্বম্ভর পাণ্ডার হাতে-গড়া চেলা, ছড়িদারদের সর্দ্দার সে,—রঞ্জনমিশ্র তার নাম, তার কাছে বেয়াদবি!"

অপ্রত্যাশিত চপেটাঘাতে বিপর্য্যস্ত হইয়া আলোড়িত মস্তিষ্কে বুদ্ধিমান লোকটা যন্ত্রণাকাতর মুখে গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে তাড়াতাড়ি ভিড়ে ভিড়িয়া পড়িল, আর পাছু ফিরিয়া চাহিল না। ভয়াকুলা ছবিকে শান্ত-স্বরে আশ্বস্ত করিয়া রঞ্জন তাহাকে আবার আগলাইয়া দাঁড়াইল।

"মেয়ে কই, মেয়ে কই"—কোলাহল করিতে করিতে একদল লোক মন্দির হইতে বাহির হইয়া ব্যগ্র ব্যস্ততায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।—"ওগো এইদিকে একটি মেয়ে দেখেছ গা,—এই এতটুকু মেয়ে—পাৎলা চেহারা—সুন্দর মতন, কেউ দেখেছ গা—"

চারিদিকে প্রশ্নোত্তরের উচ্ছৃঙ্খল কলরব পড়িয়া গেল!

"আরে এই হরুয়া—এই, এই ধারে ফের, আরে—এই বোকা এ দিকে দেখ, এই, কি খুঁজছিস্—"

"আরে মেয়ে হারিয়েছে; মেয়ে হারিয়েছে, আমার যাত্রীর।"

"দেখ দেখি এই কি সেই?"—

"হাঁ হাঁ, এই এই!—ভয় নেই বাবু, পাওয়া গেছে, এই দিকে এই দিকে আসুন আসুন,—এই যে গো এই!"

ভয়ঙ্কর ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ির ভারি ধুম পড়িয়া গেল, কে কাহার ঘাড়ে পড়ে,—ঠিক নাই। অনেক লোক ছুটিয়া আসিয়া রঞ্জন ও ছবিকে ঘিরিয়া ফেলিল, রোরুদ্যমানা আকুলা বিধবা জননী ছবিকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। সদ্য-আশঙ্কা-মুক্ত আশ্বস্ত অন্তরে জগবন্ধুর উদ্দেশে তাঁহার চক্ষু হইতে পূর্ণ আবেগে অশ্রু উছলিয়া পড়িতে লাগিল!—

(২)

তাহার পর দিনকয়েকের মধ্যেই সেই পরিবারের সহিত অপরিচিত যুবার ঘনিষ্ঠতা খুব পাকাপাকি হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সেটা সকলের প্রীতিকর হইল না। সংসারে এক শ্রেণীর কতকগুলি জীব আছে, যাহারা নিজেরাও হাসিতে পারে না, আর পরের হাসিও সহ্য করিতে পারে না। গোপন অন্ধকারে, ব্যর্থ ঈর্ষাকে ক্রমাগত কঠিন বিদ্বেষে শানাইয়া বড়ই তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল করা যায়; কিন্তু সেটা যে কেবল পরের চর্ম্মই ভেদ করিবে,—এমন কথা নিঃসংশয়ে কেহ বলিতে পারে না, বরং সেটা বিপরীত মুখে প্রক্ষিপ্ত হইয়া অনেক সময় একে আর হইয়া দাঁড়ায়, এবং যন্ত্রণার ঝালটা বাড়িতে থাকে সেই লক্ষ্যচ্যুত পরের উপর।—

দুষ্ট গ্রহের অনুকম্পায় রঞ্জনের সেইরূপ কতকগুলি

সুহৃদ জুটিল। পাণ্ডার ছড়িদারেরা তাহার উপর মর্ম্মান্তিক চটিয়া গেল; বাস্তবিক এত উচ্ছৃঙ্খলতা কি সহ্য করিতে পারা যায়? কোথাকার কে,—সম্পূর্ণ অপরিচিত, অনাহূত, অন্য পাণ্ডার এক লক্ষ্মীছাড়া ছড়িদার—সে লোকটা সহসা অতর্কিতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়া তাহাদের একান্ত ইজারা-করা যাত্রী-পরিবারকে ছোঁ মারিয়া যে অসঙ্কোচে নিজের খাস দখলের অন্তর্ভূত করিয়া লইবে,—ইহা কখনই কোন সহিষ্ণু ব্যক্তি ক্ষমা করিতে পারে না! আর রঞ্জনের উপরই বা ইহাদের এত টান কেন রে বাপু! ছোঁড়া যাদু জানে না কি?—

বাস্তবিকই, সরল হাস্যমণ্ডিত মুখে এই প্রিয়দর্শন যুবাটি যাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইত তাহারই প্রাণে একটা স্নিগ্ধ মাধুরী ফুটাইয়া তুলিত; রমণীরা ছলছল নয়নে তাহার মুখপানে চাহিয়া ভাবিতেন, আহা ছেলেটি কি মায়াবী পুরুষেরা ভাবিত আরামের সঙ্গী বটে। দরিদ্রের প্রতি চিরতাচ্ছিল্যশালী ক্রূর দাম্ভিক অন্তঃকরণও এই আত্মসম্ভ্রমে উদাসী সুকোমলকান্তি যুবাটির নম্র সরলতায় অকপট স্নিগ্ধতায় চমৎকৃত হইত। রঞ্জন কাহারো খাতির রাখিত না, নিজেও খাতিরের জন্য লালায়িত ছিল না, কিন্তু সকলের উপরই তাহার অগাধ অপরিসীম ভালবাসা! রঞ্জনের একটা মহৎ গুণ ছিল, সে সকলের সঙ্গেই অবাধে মানাইয়া চলিত, কখনো কোথাও দ্বিধাপীড়িত হইয়া কেহ তাহাকে ইতস্তত করিতে দেখে নাই। সকল হৃদয়ের সঙ্গেই সে সমানভাবেই হৃদয় মিশাইতে অভ্যস্ত ছিল, কিন্তু কোথাও এতটুকু অসংযম বর্ব্বরতার চিহ্ন ছিল না। নিজেদের ক্রটি যাহারা সংশোধন করিতে জানে না, এবং পরের নৈপুণ্য সহ্য করাও যাহাদের ক্ষমতার অতীত, তাহাদের মত লোকের চক্ষুঃশূল ছিল রঞ্জন! কিন্তু উন্মুক্ত-উদার-প্রাণ রঞ্জনের তাহাতে কিছু আসিয়া যাইত না; সে প্রতিদ্বন্দ্বীর আক্রোশের আক্রমণ কৌতুকের হাসিতে নিষ্ফল করিয়া শত্রুকে অমায়িক ব্যবহারে অভিভূত করিয়া ফেলিত। তাহাকে যে অপদস্থ করিতে আসিত,—সেই অপ্রস্তুত হইয়া ফিরিত।

অবসরে অনবসরে রঞ্জন মেসো-মহাশয়ের অন্তরঙ্গ সহচর হইয়া উঠিল। শ্রীমন্দিরে বিগ্রহদর্শনের সময় তাঁহাদের নিজ পাণ্ডার ছড়িদার থাকা সত্ত্বেও তিনি রঞ্জনকে টানিয়া আনিতেন। সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে হইবে, তাও রঞ্জন সঙ্গী। রাত্রে বাসায় বসিয়া গল্প গুজব করিবেন, তাহাতেও প্রায় রঞ্জনই রঙ্গদার থাকিবে। দূরে দেবদর্শনে যাইতে হইবে, সেও রঞ্জন সঙ্গে থাকিলেই ভাল হয়। না হইলে মেসো-মশায়ের একান্ত অস্বস্তি বোধ হয়। সকল বিষয়েই রঞ্জন হইয়াছিল তাঁহার প্রধান নির্ভর!

নিজের প্রভুর কাজ বাজাইয়া একটুকু অবসর পাইলেই রঞ্জন আসিয়া তাঁহার কাছে জুটিত। তাঁহাদের সহিত ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহাদের সব দেখাইয়া শুনাইয়া, কে জানে কেন,—রঞ্জন এক অনির্ব্বচনীয় পরিতৃপ্তি পাইত। বিশেষ ছবি!—আহা ছবিটি বেশ মেয়ে, ছবির কমনীয় ছবিখানি দেখিবার জন্য তাহার প্রাণে সযত্নে লুক্কায়িত একটা অপরিসীম আগ্রহ সঞ্চিত ছিল; তাহার প্রাবল্যে রঞ্জন একটু বেশ রীতিমতই বিব্রত হইয়াছিল। ছবির নিকট হইতে সে ইদানি সতর্কতার সহিত তফাতে থাকিতে চাহিত। প্রাণপণে আত্মদমন করিয়া সকলের নিকট চিরপরিচিত আত্মীয়ের মত স্বভাবসিদ্ধ সহজস্বরে দিব্য কথাবার্ত্তা কহিত, কিন্তু এতটুকু ছোট মেয়ে,—সে সকলের নিতান্ত অগ্রাহ্যের বস্তু—তাহার কাছে রঞ্জনের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া হঠাৎ সব গোলমাল হইয়া যাইত। হাসিভরা মুখের সুধাভরা বাক্যগুলা অকস্মাৎ নির্ম্মম সঙ্কোচে পরস্পর আত্মঘাতী হইয়া মরিত। সকলের মুখপানে সে অসঙ্কোচে চাহিত, কিন্তু যদি দৈবাৎ অতর্কিতে ছবির সহিত চোখোচোখী হইত তবে সে আকুল উৎকণ্ঠায়, ত্রস্তে চোখ নামাইয়া, কোনমতে সেখান হইতে সরিয়া যাইতে পারিলে তবে হাঁফ ছাড়িয়া সুস্থ হইত; কিন্তু কে জানে কি একটা তীব্র আকর্ষণ তাহাকে ক্রমাগতই সেই দিকে টানিত।

পনের বছর বয়স হইতে সে যাত্রী চরাইতেছে, কিন্তু কই তাহার তো কাহারও কাছে এক মুহূর্ত্তের জন্য সঙ্কোচ হয় নাই। এখন তবে একি হইতেছে? এতটুকু একজনের কাছে এত কিসের⋯⋯।

নিজের গতিক বুঝিয়া সে নিজেই ধাঁধায় পড়িয়া গেল, একি হইল।—

(৩)

বিকালে, বাসার বারান্দায় পৈঠার উপর বসিয়া ছুরি দিয়া মেসো-মশাই কাঁচা আম ছাড়াইতেছেন ও অদূরবর্ত্তী রোয়াকে উপবিষ্টা, হরিনামের ঝুলি হস্তে, ছবির জননীর সহিত ছবির বিবাহ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। খিড়্কির পশ্চাদ্ভাগে পোড়ো জমীটায় ছেলেরা সকলে খেলা করিতেছিল। সেখান হইতে তাহাদের উচ্চ কলরব বেশ স্পষ্ট শোনা যাইতেছিল, অন্য স্ত্রীলোকেরা তখন রান্না-ঘরে ছিলেন।

সদর দুয়ার পার হইয়া প্রাঙ্গণে রঞ্জন মিশ্র দেখা দিল। মুহূর্ত্তে মেসোমহাশয়ের মুখের কথা ঠোঁটের মধ্যে থামিয়া গেল, হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলিলেন. "এস এস রঞ্জন এস, কাল তোমায় দেখ্‌তে পাইনি কেন ঠাকুর ?"

"বড় কাজের ভিড় পড়েছে বাবু। ওকি কচ্ছেন ? আম ? দিন আমায় আমি ছাড়াচ্ছি"—মেসোমশায়ের হাত হইতে ছুরি লইয়া রঞ্জন তৎক্ষণাৎ আম ছাড়াইতে বসিয়া পড়িল। সস্নেহ দৃষ্টিতে একবার তাহার পানে তাকাইয়া মেসোমশাই আবার ছবির বিবাহের প্রসঙ্গ লইয়া পড়িলেন।

রঞ্জনের শ্রবণেন্দ্রিয়ের উপর শরীরের সমস্ত তড়িৎ আসিয়া কাজ করিতে লাগিল। প্রাণপণে উত্তেজনা চাপিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত সে ছুরি চালাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রঞ্জন সব আমগুলি পরিষ্কাররূপে ছাড়াইয়া ফেলিল, "দেখুন তো বাবু হয়েছে ?"

"বেশ হয়েছে। আচ্ছা রঞ্জন, তুমি এত বাংলা শিখ্‌লে কোথা ? কখনো বাংলা দেশে গিছ্‌লে ?"

"না বাবু, এইখানেই যাত্রীদের সঙ্গে মিশে শিখেছি।"

"বাঃ ! বাহাদুর ছেলে তুমি, খাসা বুদ্ধিমান !"

রঞ্জন উপস্থিত কৌতুকে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বালকের মত অসঙ্কোচ আনন্দ-সুন্দর দৃষ্টিতে মেসো-মশায়ের পানে তাকাইয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল "আপনারা আমায় বড় ভালবাসেন। না ?"

তাহার সুকোমল সরল প্রশ্নে ছবির জননীর মনে গভীর মমতার উৎস উথলিয়া উঠিল; জীবনের সহস্র শোক বেদনায় সন্তপ্তা রমণীর চক্ষু হইতে বাৎসল্য-স্নেহের তপ্ত অশ্রু খসিয়া পড়িতেই তাড়াতাড়ি আঁচলে চক্ষু মুছিয়া আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন "নারায়ণ, নারায়ণ, হরিবোল !" মেসো-মশাই সস্নেহে রঞ্জনের পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে রহস্যস্মিতহাস্যে বলিলেন, "ঠিক হয়েছে দিদি, আপনি ছবির বের জন্যে ভাব্‌ছেন কেন ? এক কাজ করুন,— জগবন্ধুর সামনে দুটো ফুল ফেলে, ছবিকে এই ছেলেটির হাতে উচ্ছুগ্‌গু করে দিন, ভাবনা চিন্তে সব চুকুক্, আর রঞ্জনটিও আমাদের আপনার লোক হয়ে যাক্।"

রঞ্জনের কপালের শিরা লাফাইয়া ফুলিয়া উঠিল। আঘাতের ধাক্কাটা অবিচলিত ভাবে গোপন করিতে, তাড়াতাড়ি অঞ্জলি পুরিয়া আম লইয়া রঞ্জন রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। সজল নয়নে চাহিয়া চাহিয়া ছবির জননী ভাবিলেন "আহা অমন আত্মি-সো জামাই হওয়া ভাগ্যের কথা !"

রঞ্জন ফিরিয়া আসিয়া বসিল, অন্য প্রসঙ্গের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। কিন্তু রঞ্জন সেসকল কথা আর শুনিতে পাইল না। তাহার উদ্যত আনন্দফুল্ল শ্রবণশক্তি—সহসা কালান্তকের শরবিদ্ধ মুমূর্ষুর মত প্রাণের মাঝে লুকাইয়া পড়িল। হায় অশুভক্ষণে সেই তুচ্ছ ব্যঙ্গ উচ্চারিত হইয়াছিল—রঞ্জনের অন্তরে সেটা সাংঘাতিক বাজিয়াছে, থাকিয়া থাকিয়া রঞ্জন কেবলই অধীর হইয়া উঠিতেছিল। কঠিন পৌরুষের তীব্র ভ্রূকুটী-ভঙ্গিমায় যতই সেই মোহময় উদ্বেগটাকে সজোরে ধাক্কা মারিয়া তাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল ব্যাপারটা ততই দৃঢ় হইয়া তাহার অন্তরে প্রতিঘাত করিতে লাগিল। কি বিপদ!—রঞ্জন আকুল হইয়া উঠিল। কথাটা ক্রমশঃ তাহার সমস্ত মনটা জুড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল। কোন রকমে শিষ্টাচার বজায় রাখিয়া বিদায় লইয়া রঞ্জন খিড়্কির দুয়ার দিয়া বাহির হইল। সুবিধা হইত বলিয়া সে এই পথ দিয়াই প্রায় বাটী যাইত।

খিড়কির বাহিরে, খোলা জমীতে. বালির গণ্ডী কাটিয়া মহা উৎসাহ আস্ফালনে ছেলেরা সব খেলায় মাতিয়াছে। কেবল ছবি একাকী, ও-দিকের রাস্তার ধারে বেড়ার

কাছে দাঁড়াইয়া, একজন উড়িয়া স্ত্রীলোকের সহিত কথা কহিতেছিল। ছবি বড় হইয়াছে, সে কি আর খেলিতে পারে?—ছিঃ! তাহার কাজ এখন সকলকে আটকাইয়া খেলা করান।

রঞ্জনের পা আর সরিল না, চিত্রার্পিতের মত দুয়ার অবলম্বনে দাঁড়াইয়া আত্মবিস্মৃত রঞ্জন গভীর বিহ্বলতায় ছবির পানে চাহিয়া রহিল—আহা কি চমৎকার ছবিটি! রঞ্জনের মস্তিষ্কে ঘনীভূত উত্তেজনা জমাট বাঁধিয়া উঠিল।

ছবি স্ত্রীলোকটিকে আত্ম-পরিচয় দিতেছে, "আমার সবাই আছে, কেবল বাবা নাই।"

কথাটা রঞ্জনের মর্ম্মভেদ করিয়া ধ্যানস্থ হৃদয়ের সমবেদনার তারে সূক্ষ্ম আঘাতে গভীর করুণার আকুল ঝঙ্কনা বাজাইয়া তুলিল!—আহা তাহারো যে পিতা নাই!

সহসা তাহার স্বপ্নপূর্ণ চিত্ত আলোড়িত করিয়া তীব্র গ্লানির ধিক্কারে ক্ষণমধ্যে তাহার সহানুভূতিপূর্ণ সুখের আবেশে রচিত চিন্তা-গ্রন্থি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ক্ষুব্ধতাক্ষিপ্ত প্রাণ নিষ্করুণ যন্ত্রণায় হাহাকার করিয়া উঠিল হায় হায় সে করিতেছে কি?—করিতেছে কি! ভগবান জগন্নাথ দেব, তোমার আশ্রিত অনুগত সেবকের অন্তরে একি প্রলয়ঙ্কর প্রলোভনময় আকাঙ্ক্ষার দাবানল প্রজ্বলিত করিলে ঠাকুর!—রক্ষা কর রক্ষা কর প্রভু!

মাতালের মত টলিতে টলিতে রঞ্জন পথে নাবিয়া পড়িল।

(৪)

পরদিন শ্রীমন্দিরে মেসো-মশায়ের সহিত রঞ্জনের দেখা হইল। সকলকে লইয়া তিনি দেবতা দর্শনে আসিয়াছেন। রঞ্জনকে ডাকিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, আজ একবার ভাল করে দর্শন করিয়ে দাও, আজই তো শেষ, আর ত হবে না।"

"হবে না। কেন বাবু?"

"কাল যে আমরা দেশে ফিরব, ঠাকুর।"

নিমেষ-মধ্যে কে যেন রঞ্জনের হৃদ্‌পিণ্ডের শিরাগুলি তপ্ত সাঁড়াশীতে সজোরে চিম্‌টাইয়া ধরিল, কাল!—কালই—এত শীঘ্র! পীড়িত মর্ম্ম ভেদ করিয়া, বুকের মাঝখানে, বার বার আর্ত্তপ্রশ্ন ধ্বনিত হইতে লাগিল—কাল, কালই, এত শীঘ্র! হায় দুর্ভাগ্য!

কোমরে কসিয়া চাদর বাঁধিয়া, সজোরে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া রঞ্জন মনে মনে ভাবিল "আমারই অন্যায়!"

"আবার কবে আসবেন বাবু!"

"আবার!"—রহস্যচ্ছলে হাসিয়া মেসোমশাই বলিলেন "জগন্নাথ আবার যখন ডুরি ধরে টান্‌বেন্ তখন আস্‌ব, কি বলেন দিদি?"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া ছবির জননী মন্দির-পানে চাহিয়া বলিলেন "আহা তা আর নয়! জগবন্ধু আবার যখন মনে কর্‌বেন, তখন আস্‌ব।"

ম্লানমুখে ক্লিষ্টহাসি হাসিয়া রঞ্জন বলিল "তিনি সবাইকে মনে করেন মা, কিন্তু তাঁকে তো সবাইকার মনে পড়ে না!"

মেসোমশাই গম্ভীর মুখে বলিলেন "ঠিক্।"

"তা হলে সবাইকে নিয়ে রথের সময় আসবেন বাবু।" কথাটা বলিয়াই দুঃসহ কুণ্ঠা রঞ্জনের কণ্ঠ যেন চাপিয়া ধরিল, রঞ্জন তাড়াতাড়ি সকলকে লইয়া অগ্রসর হইল। চলিতে চলিতে মেসোমশাই বলিলেন "রঞ্জন তুমি আজ বিকালে আমাদের বাসায় যাবে?"

"না. বাবু, পাণ্ডার জরুরী কাজ আছে।"

"তাইত তোমার সঙ্গে যে তা হলে আর দেখা হবে না, আমরা কাল সকালের ট্রেনেই যে রওনা হব।"

ব্যস্তভাবে ছবির জননী বলিলেন "তা হলে এইখানেই—"

"হ্যাঁ তাই হবে।"

সকলে মন্দিরে ঢুকিলেন। নির্দ্দিষ্টসময়ে বিগ্রহকে প্রণাম করিয়া সকলে মন্দিরপ্রাঙ্গণে আবার সমবেত হইলেন। অকস্মাৎ-দৃষ্ট একটি পরিচিত লোকের সহিত মেসোমহাশয় একটু তফাতে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন দেখিয়া রঞ্জনও অন্যদিকে সরিয়া গেল, কয়েক ছড়া কর্পূরের মালা হাতে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে অন্যমনস্কভাবে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া তাকিতে-

ছিল। মর্ম্মান্তিক কাতরতায় তাহার সারা অন্তঃকরণটা আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল। হায় কাল হইতে সে আর ইহাদিগকে দেখিতে পাইবে না!

খানিক পরে মেসো-মশাই ফিরিলেন। রঞ্জন আসিয়া মেসোমশায়ের গলায় একছড়া মালা পরাইয়া ছেলেদের সকলের গলায় একএকছড়া মালা দিল। রমণীদের সকলের হাতে হাতে একএকছড়া মালা বিলাইয়া—অবশিষ্ট মালা-ছড়াটা হাতে করিয়া মার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল "মা, এ মালাটি আপনার ছবিকে দিন্।"

মমতাভরা মুখে চাহিয়া একটু হাসিয়া মা বলিলেন "তুমিই দাও না ঠাকুর।"

ঠাকুর চকিতনেত্রে একবার ছবির পানে তাকাইল। তাহার পর মুহূর্ত্তের জন্য একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল "না মা, আপনি দিন্।"

রুমাল হইতে গুটিকয়েক টাকা খুলিয়া ছবির হাতে দিয়া মেসো-মশাই বলিলেন "ছবি, ঠাকুরকে প্রণাম কর মা।"—ঠাকুরের চোখের সাম্নে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া উঠিল!

মাটীতে টাকা রাখিয়া ছবি প্রণাম করিল। কম্পিত হস্তে টাকা তুলিয়া মার হাতে দিয়া ঠাকুর বলিল "আমি আপনার ছবিকে আশীর্ব্বাদ করলুম্ মা।" চির প্রচলিত প্রথার অপব্যবহার!

"ওকি ঠাকুর, টাকা নাও, ছবির ওতে অকল্যাণ হবে, তুমি আমাদের কত উপকার করেছ,—"

গভীরদুঃখভরা হাসি হাসিয়া রঞ্জন বলিল "টাকা নিয়ে উপকার বিক্রী করি না মা, এ টাকা আপনার পাণ্ডার ছড়িদারদের পাওনা"—চট্ করিয়া রঞ্জন ভিড়ের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। লোকটার আত্মম্ভরিতায় হাড়ে হাড়ে চটিয়া বিদ্বেষ-বিস্ফারিত নয়নে পাণ্ডার চেলারা চাহিয়া রহিল।

(৫)

পরদিন মেসো-মশাইরা দেশে ফিরিয়া গেলেন। মনে একান্ত আগ্রহ থাকিলেও, কর্ত্তব্যপরায়ণ রঞ্জন বিদায়ের শেষ মুহূর্ত্তে, তাঁহাদের কাছে উপস্থিত থাকিতে পারিল না। পরাধীন জীবনের ক্লান্তিশূন্য কর্ম্মস্রোতের প্রবল তোড়ে দুর্দ্দম্য আকাঙ্ক্ষাকে নিঃশেষে দূরে ভাসাইয়া দিয়া কোলাহলের মধ্যে ডুবিয়া প্রাণের মহা শূন্যতাকে কোন রকমে পূর্ণ করিতে চাহিল, পারিল কি না কে জানে!

দিনের পর দিন কাটিয়া চলিল, রঞ্জন মেসো-মশায়ের পাণ্ডার কাছে সন্ধান লইতে লাগিল, তাঁহারা আসিবেন কি না, পত্রাদি কিছু আসিয়াছে কি?—

কিছুই না!—হতাশার নিদারুণ নিষ্পেষণে রঞ্জনের আবেগ ক্রমশঃ বাড়িয়াই উঠিতে লাগিল। হায়, মেসো-মহাশয়ের আসার গুরুত্ব কি তাহার মনের আকুলতার চেয়ে বেশী? কখনই না!

ক্রমে-রথের সময় কাছাকাছি হইতে লাগিল। পাণ্ডার কাছারিতে রঞ্জনের যাওয়া আসাটা ঘন ঘন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু বিফল প্রয়াস! পাণ্ডা কোন খবরই জানে না। অবশেষে সকল সঙ্কোচ দূরে ঠেলিয়া রঞ্জন নিজে পত্র লিখিতে বসিল। পত্র লিখিল। তাহার পর একবার তাহা পাঠ করিল, হঠাৎ কি ভাবিয়া তাহার কান দুইটা লাল হইয়া উঠিল, তৎক্ষণাৎ পত্রখানা টুক্রা টুক্রা করিয়া ছিঁড়িয়া সমুদ্রের জলে ভাসাইয়া দিল। ছিঃ! তাহার ছেলেমানুষী দেখিয়া তাঁহারা কি মনে করিবেন?

তবু রঞ্জন নিজেকে আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। রথের দিন যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, তাহার অধীরতাও তত বাড়িতে লাগিল, জীবন্ত আশা বুকে করিয়া সে প্রত্যহ ষ্টেশনে আসিয়া ব্যগ্র উৎকণ্ঠায় চতুর্দ্দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত, বিদেশ হইতে শত শত যাত্রী আসিতেছে, যাইতেছে, কিন্তু কই? যাহাদের খুঁজিতেছে তাহারা কই?

সুদক্ষ কর্ম্মচারী,—কাজে অমনোযোগী হওয়ায় প্রভু দুই চারিদিন মিঠে কড়া বচনে তাহাকে সাবধান হইতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু উদ্বিগ্ন রঞ্জনের কানে সে কথা স্থান পাইল না। ক্রমে রথের দিন আসিয়া পড়িল। জগন্নাথ রথে উঠিলেন, নাবিলেন, শুইলেন, পাশ ফিরিলেন—অবশেষে উঠিয়া বসিলেন পর্য্যন্ত, তথাপি মেসো-

মহাশয়ের দেখা নাই। পূজার ছুটী আসিল, ফুরাইল, তথাপি কাহারো খোঁজ নাই!

হায়! পৃথিবীতে কেহ কাহারো অন্তর্ভেদী যাতনা বোঝে না! রঞ্জন গণিয়া গণিয়া প্রতি মুহূর্ত্ত যাপন করিতেছিল। অবশেষে পূজার ছুটীর পর যখন দাসত্ব-জীবী, ধনগর্ব্বী হাওয়া-খাইয়েরা দলে দলে পুরী ছাড়িতে লাগিল, তখন রঞ্জন আর ভারাক্রান্ত মনটাকে লইয়া কোনমতে পুরীতে তিষ্ঠাইতে পারিল না। সে যখন কোন দিকে কিছু প্রতিকার খুঁজিয়া পাইল না তখন একদিন পাণ্ডার কাজে জন্মের মত জবাব দিয়া হঠাৎ ষ্টেশনে আসিয়া বঙ্গদেশের টিকিট কিনিয়া ট্রেনে চাপিয়া বসিল।

(৬)

গত রাত্রে ছবির বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আজ বর কন্যা বিদায়। মধুর প্রভাতী সুরের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই, সানাইয়ে সেই সবে, বিদায়ের করুণ-রাগিণী বাজিতেছে,—সুর বায়ুর স্তরে স্তরে ঘনায়মান হইয়া ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে পুঞ্জীকৃত বেদনায় ঠেলিয়া উঠিতেছে।

একটা লোক অত্যন্ত ব্যস্তভাবে, ব্যগ্র ঔৎসুক্যের সহিত বিবাহবাটীর চারিদিকে ক্রমাগত দ্রুতবেগে ঘুরিতেছে; তাহার মুখে উজ্জ্বল আনন্দ, ও আকুল আতঙ্ক—যেন আসন্ন ভীষণতায় গাঢ়ভাবে ঘনাইয়া আসিয়াছে; লোকটার ভাব দেখিয়া বোধ হয় সে যেন বাড়ীর ভিতরকার সমারোহের তত্ত্বনির্ণয়ে উদ্‌গ্রীব। কিন্তু না,—তাহাও তো হইতে পারে না, উৎসবের কারণ জ্ঞাত হওয়া তো কিছুই দুরূহ ব্যাপার নয়, দলে দলে লোক বাড়ী ঢুকিতেছে, বাহির হইতেছে,—চারিদিকে ঘুরিতেছে।—কতবার কত লোকের সহিত তাহার মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি হইয়া যাইতেছে, তথাপি কই, সে তো কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছে না,—বরং বন্দুকের গুলির মুখ হইতে যেমন শিকার ত্রস্তে পলায়ন করে, সেও সেইরূপ কুণ্ঠিত ভাবে সরিয়া যাইতেছে। লোকটার রকম কি?—

কিছুক্ষণ পরে, বাড়ীর কোলাহলের ঘরঘটা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। শীগ্গী নাও শীগ্গী নাও, ট্রেনের আর সময় নেই,—চারিদিকে এমনি একটা কলরব দ্বিগুণ মুখরতায় উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। সকলের ব্যস্ততার মাত্রা চতুর্গুণ চড়িয়া গেল।

প্রাণপণে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া, এইবার অন্তিম সাহসে ভর করিয়া, লোকটা বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। উৎসবের বাড়ীতে কে কাহার পানে চাহিতেছে? লোকটা অবাধে গিয়া বাড়ীর ভিতরে উপস্থিত হইল।

প্রাঙ্গণে আলিপনা-আঁকা পীঁড়ির উপর বর ও বধূকে দাঁড় করাইয়া, পৌরাঙ্গনারা তখন মাঙ্গলিক ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতেছিল। চারিদিকে শাঁখ ও উলুধ্বনির উচ্চ শব্দ!—লোকটা গিয়া একেবারে আসন্ন আগ্রহে ঝুঁকিয়া পড়িল। অকস্মাৎ বজ্রাগ্নি সম্পাতে তাহার চক্ষু যেন ঝলসিয়া গেল! প্রচণ্ড উন্মত্ত হৃদ্‌পিণ্ডটাকে সবলে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া সযত্নে পদশব্দ লুকাইয়া—সূর্য্যের উজ্জ্বল আলোকের মাঝে—সন্তর্পণে আপনাকে গোপন করিয়া নিঃশব্দে সে বাহিরে আসিল। কোলাহলময় জগৎ সহসা বিরাট নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া গেল! চারিদিক মৃত্যু-মলিন পাংশুবর্ণে রঞ্জিত হইয়া গেল, কোন দিকে একটা ক্ষীণ শব্দ অবধি আর তাহার কানে শুনা গেল না—শুনিতে সাহসও হইল না। একটা নিঃশ্বাসের শব্দ—না না, পবন অচল হোক, রুদ্ধ বায়ুতে সমস্ত জগৎ ধ্বংস হইয়া যাক্—সে বরং সহ্য হইবে, তবু এ সুসজ্জিত উৎসব-ক্ষেত্রে মর্ম্মভেদী ব্যর্থতার ঈষৎস্ফুরণ!—না না, সে কিছুতেই হইবে না! কিছুতেই না! যুগ-প্রলয়ের মহা ঝটিকা ভয়াবহ কঠিনতার গহ্বরে ধীরে ধীরে সুপ্তিলাভ করিল, কেহ দেখিল না, কেহ জানিল না, কেহ ফিরিয়া তাকাইল না! —ভগবান জগবন্ধু দেব! এখনো কামনা, এখনো একটি ভিক্ষা ঠাকুর, এক মুহূর্ত্তের জন্য এতটুকু শক্তি ভিক্ষা দাও ঠাকুর—ওগো দয়াময় এতটুকু বল, এতটুকু শুধু বল দাও!

সুউচ্চ হর্ষনিনাদের মধ্যে একটুখানি ক্রন্দনের অভিনয় সমাপ্ত হইলে প্রকাণ্ড অশ্বযুক্ত ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে ফিটনে, বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত বর বধূ সমারূঢ় হইল। গুরু গম্ভীর শব্দে মাটির অভ্যন্তরে কম্পন-হিল্লোল তুলিয়া ফিটন ছুটিল। পশ্চাতে আরো কয়েকখানা গাড়ীতে বরযাত্রীর দল চলিয়াছে।

গাড়ী অনেক দূর আসিয়াছে। হঠাৎ বেগগামী গাড়ীর হাতল ধরিয়া ছুটিতে ছুটিতে একটা লোক সেই চলন্ত গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল! লোকটার চক্ষু নিষ্পলক, মুখে দৃঢ় কঠোরতা, হস্ত পদে মৃত্যুর শীতলতা, শরীরে শোণিত-শূন্যতা, স্পষ্ট প্রতীয়মান। সে কোন দিকে না চাহিয়া, বরের গলায় একছড়া কর্পূরের মালা পরাইয়া দিয়া অচঞ্চল কণ্ঠে বলিল "জগন্নাথ দেবের সেবাইত ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ, আপনার জীবন সফলতায় চির গৌরবময় হোক্।"

বর নত মস্তকে নমস্কার করিল।

তার পরে আরো কঠিন হইয়া, আরো অসঙ্কোচে—অবগুণ্ঠিতা বধূর হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া আর-একগাছি কর্পূরের মালা জড়াইয়া দিতে দিতে ধীরে ধীরে, পরিষ্কার স্বরে বলিল "এই ক্ষণধ্বংসী কর্পূরের মত—তোমাদের জীবনের সমস্ত মালিন্য লুপ্ত হয়ে যাক্, ভগবান জগন্নাথ দেবের নামে আশীর্ব্বাদ করি তোমরা শান্তিময় সুখে সুখী হও।"

বক্তার ললাটে গভীর স্নিগ্ধতার সহিত মহিমাময় বিজয়-শ্রীর দীপ্ত জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল! মোহের দাসত্বের মুক্তি লাভে, আত্মজয়ের পূর্ণ সন্তোষে, মহা পূর্ণতায় প্রাণ পূর্ণ হইয়া গেল! প্রসন্ন সার্থকতায় সারা জগৎ ভরিয়া উঠিল। অপার্থিব শান্তির কিরণে সহসা চরাচর পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সে কি তৃপ্তি! কি আনন্দ! কি সুমহান্ জয়োল্লাস!

কণ্ঠস্বরে চমকিয়া বিস্ময়ব্যাকুলা ছবি অশ্রুসিক্ত অবনত দৃষ্টি তুলিয়া যখন কুণ্ঠিতভাবে বক্তার পানে তাকাইল, তখন সে গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছে! ছবি চিনিতে পারিল না, শুধু উদ্দেশে নমস্কার করিল। গাড়ী ছুটিয়া চলিল।

শ্রীশৈলবালা ঘোষ।

—— ——

রাজপুতানাপ্রবাসী বাঙ্গালী

(ভরতপুর)

ভরতপুর মথুরামণ্ডলের পশ্চিমে আগ্রা হইতে ৩৫মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার অধিকারভুক্ত কাম্যবন বা কদম্ববন আধুনিক "কামন্" ব্রজমণ্ডলের অন্তর্গত একটি প্রাচীন প্রসিদ্ধ তীর্থ। বৈষ্ণবগণ এই তীর্থ দর্শনের মানসে ভরতপুরে আগমন করিয়া থাকেন। রাজপুতানার এই মিত্ররাজ্য উত্তরে গুরুগাঁও, পূর্ব্বে আগ্রা, দক্ষিণে জয়পুর কেরৌলী ও ধোলপুর এবং পশ্চিমে আলবার কর্তৃক বেষ্টিত। ইহা পরিসরে জ্যামেকাদ্বীপের সমতুল্য এবং প্রজাবহুল। ভরতপুরের দুর্গ সুপ্রসিদ্ধ, ১৮০৫ অব্দে লর্ড লেক এবং ১৮৭২ অব্দে লর্ড কম্বল মিয়র কর্তৃক এই দুর্গ অবরুদ্ধ হইয়াছিল। দুর্গটি দুর্ভেদ্য বলিয়া ইহা "The Fort of Victory" (ফতে গড়) এবং এই নগর "City of Victory" অর্থাৎ "বিজয়-নগর" বা ফতেপুর নামে অভিহিত হইত।

Bharatpur, with an area of about five miles in circuit, was surrounded by a broad deep fosse, from the inner edge of which rose a massive and lofty wall of sunburnt clay, flanked by thirty-five bastions. It was dominated by the citadel or, as the natives, proud of its supposed impregnability, loved to call it, "The Fort of Victory," which lowered on its isolated hill high above the rest of the town and was enclosed by a ditch 150 feet wide, and 50 feet deep."—Davenport-Adams.

কথিত আছে প্রথম ভরতপুর-যুদ্ধে একজন বাঙ্গালী অসাধারণ সাহস ও বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। সমরক্ষেত্রে ইংরেজ সেনানায়ক হত হইল। তিনি সুবেদার ও হাবিলদার প্রভৃতির দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া মৃত সেনাপতির পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার অধিনায়কতায় ইংরেজপক্ষের জয়লাভ হয়। উক্ত হইয়াছে, কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে সেনাপতির পরিচ্ছদ ধারণ করার অপরাধে প্রথম তাঁহার ৫০০৲ শত টাকা অর্থদণ্ড হয়, এবং তৎপরে পুনর্বিচারে তাঁহার অসাধারণ রাজভক্তি সৎসাহস ও প্রতিভার পুরস্কারস্বরূপ গুণগ্রাহী ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ৩০০০০৲ টাকা প্রদান করেন। তদবধি তিনি সাধারণ কর্তৃক "জেনারেল" নামে অভিহিত হন। তাঁহার নাম ছিল বাবু কালীচরণ ঘোষ। তিনি কলিকাতা সুকিয়া ষ্ট্রীটের নিকট বাস করিতেন। তিনি সমরবিভাগের একজন কর্ম্মচারী ছিলেন, সর্ব্বদা যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাধ্যক্ষগণের সহিত অবস্থানহেতু যুদ্ধকৌশলে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতির জন্য অনেক সময় লেফটেনাণ্ট কর্ণেল কাপ্তেন প্রমুখ বড় বড় কর্ম্মচারী তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ

পূজা

স্পেনদেশীয় চিত্রকর মুরিলোর বলিয়া অনুমিত আরেথন-চিত্র হইতে চিত্রাধিকারী শ্রীযুক্ত ডবলুইউ ডবলুইউ পিয়াসন সাহেবের সৌজন্যে মুদ্রিত।

করিতেন। উপরোক্ত ঘটনার পর হইতে তিনি জেনারেল কালুঘোষ এবং তাঁহার অপভ্রংশে সাধারণতঃ "জাঁদরেল কালু" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কিন্তু মৃত সেনাপতির পরিচ্ছদ ধারণ করায় জন্য বঙ্গীয় সমাজে স্বশ্রেণীর মধ্যে তিনি অপাংক্তেয় হইয়াছিলেন, এমনকি তাঁহার বংশধরগণকে বহুদিন ইহার ফলভোগ করিতে হইয়াছিল।*

ইহার প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পরে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে বাঙ্গালীর প্রবাসবাসের সূত্রপাত হয় এবং বাঙ্গালীর সংস্রবে এই রাজপুতরাজ্যের শ্রী ফিরিয়া যায়। যে প্রতিভাবান্ বাঙ্গালীর দ্বারা তাহা সম্ভব হইয়াছিল তাঁহার নাম ডাক্তার ভোলানাথ বিশ্বাস রায় বাহাদুর।† তিনি কলিকাতা শোভাবাজারনিবাসী স্বর্গীয় রামচন্দ্র বিশ্বাসের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি ডাঃ ডাফের ফ্রি চার্চ ইনষ্টিটিউশন (Free Church Institution) বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৮৪৫ অব্দে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন। তাঁহার সময়ে তিনি উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত ছিলেন এবং সকল পরীক্ষাতেই ভূরি ভূরি প্রশংসাপত্র মেডেল ও ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি অস্থিবিদ্যায় (Anatomy) এবং (physiology) শারীরতত্ত্বে রৌপ্যপদক এবং (Botany) উদ্ভিদবিদ্যায় সুবর্ণপদক ও ধাত্রীবিদ্যায় সুবর্ণপদক লাভ করিয়া ভৈষজ্যবিদ্যা, রসায়ন, মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্স প্রভৃতিতে উচ্চপ্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৫০ অব্দে তিনি শেষ পরীক্ষায় গৌরবের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া জি, এম, সি, বি, উপাধি লইয়া ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আজমীঢ়ের মেডিকেল অফিসর নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করেন। আজমীঢ়ে তিনি ৫ বৎসর ছিলেন। এখানে রাজপুতানার তাৎকালীন গবর্ণর জেনারেলের এজেণ্ট সার্ হেন্‌রী লরেন্স মহোদয় এবং এজেন্সীর চীফ্ মেডিকেল অফিসর সাহেবের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ভোলানাথ বাবু তাঁহাদের এবং জনসাধারণের প্রিয় ও সকলের নিকট সম্মানিত হন। এখান হইতেই তাঁহার চিকিৎসার যশ বিস্তারলাভ করে। তিনি সাধারণের নিকট হইতে চিকিৎসার জন্য দক্ষিণা গ্রহণ করিতেন না; কিন্তু জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলকেই অতি যত্ন করিয়া দেখিতেন। তাঁহার এইরূপ জনহিতৈষণা এবং অনন্যসাধারণ স্বার্থত্যাগ সূক্ষ্মদর্শী রাজনীতিজ্ঞ সার হেনরীর দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। তিনি শীঘ্রই ভোলানাথ বাবুর সদ্‌গুণের পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। অতঃপর বিশ্বাস মহাশয় এখান হইতে যোধপুরে বদলি হইয়া যান। ১৮৫৩ অব্দে মহারাজা বলবন্ত সিংহের মৃত্যু হইলে রাজ্যচ্যুত মহারাজ রামসিংহের পিতা যশোবন্ত সিংহ তিন বৎসর বয়সে ভরতপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলে তথায় নূতন এজেন্সী গঠিত হয়। এই সূত্রে ভোলানাথ বাবু তিনমাস যোধপুরে অবস্থিতি করিবার পর ভরতপুরের মেডিকেল অফিসর হইয়া আসেন। মধ্যে দেড় বৎসর কাল মেডিকেল স্কুলের শিক্ষকতার কার্য্যে আগ্রায় প্রবাস ব্যতীত তিনি তাঁহার সমস্ত জীবন ভরতপুরেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ১৮৫৫ অব্দে তিনি চীফ্ মেডিকেল অফিসরের পদ প্রাপ্ত হইয়া এখানে চিকিৎসা-বিভাগ সংগঠিত করেন। তিনি এই সময় ভরতপুরের হাঁসপাতাল এবং নানাস্থানে ডিস্পেন্সরী স্থাপিত করেন। রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন নগরে বর্ত্তমান দ্বাদশটি হাঁসপাতালের মধ্যে প্রথম সাতটি ডাক্তার ভোলানাথ বিশ্বাসের দ্বারা স্থাপিত। চিকিৎসা-বিভাগ সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার পর ডাক্তার বিশ্বাস ভরতপুর রাজ্যের শিক্ষাবিভাগ সংস্থাপনের জন্য নিযুক্ত হন। তিনি শিক্ষাবিভাগের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া শেষ পর্য্যন্ত সেই পদেই স্থায়ী ছিলেন। ১৮৫৭ অব্দের প্রারম্ভে তাঁহাকে আগ্রা মেডিকেল স্কুলের অধ্যাপক (professor of medicine) করিয়া পাঠান হয়। আগ্রায় প্রবাসকালে বিদ্রোহের দুর্দ্দিনে তাঁহাকে বহু প্রকার কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু সে সময়েও তিনি কর্ত্তব্যবুদ্ধি হারান নাই। তিনি তখন ছাত্রদিগের হিতের জন্য উর্দ্দু ভাষায় চিকিৎসা সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ রচনা ও পরে প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিদ্রোহ দমনের পর তাৎকালীন পলিটিক্যাল এজেণ্ট মেজর মরিসন চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে পুনরায় ভরতপুরে আনিয়া পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

নাবালক মহারাজ বয়োপ্রাপ্ত হইলে ডাক্তার ভোলানাথ বিশ্বাসের হস্তে তাঁহার শিক্ষার ভার অর্পিত হয় এবং তিনি

---

* বিশ্বকোষ ৩য় খণ্ড, পৃ ৪০—৪১।

† ইহার এই সংক্ষিপ্ত জীবনীর জন্য আমি কেরৌলী কৌন্সিলের সদস্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় রাও সাহেবের নিকট ঋণী।—জ্ঞ।

এই কার্য্য গ্রহণ করিলে তাঁহার স্থলে জনৈক য়ুরোপীয় সার্জ্জন নিযুক্ত করা হয়। সেই সময় হইতে চীফ মেডিকেল অফিসারের পদ উঠিয়া যায় এবং এজেন্সী সার্জ্জনের পদ সৃষ্টি করা হয়। ইহার কয়েক বৎসর পরে একবার আগ্রায় দরবার হইলে, ডাক্তার ভোলানাথ বিশ্বাস তাঁহার প্রতাপান্বিত ছাত্র ভরতপুরের মহারাজকে লইয়া উপস্থিত হন। ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারেল লর্ড লরেন্স সমগ্র রাজপুতানা ও মধ্যভারতের সমবেত রাজন্যবর্গ ও প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণের সমক্ষে এই বাঙ্গালী ডাক্তার ও রাজগুরুর শতমুখে প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে স্বর্ণঘড়ি ও বহুমূল্য খেলাৎ (robe of honour) উপহার দিয়া সম্মানিত করেন। ১৮৬৭ অব্দে মহারাজা সাবালক হইলে ভারত-গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাজ্যের সকল ভার ও ক্ষমতা দান করেন। তখন হইতে তাঁহার শিক্ষার অবস্থা শেষ হয়। মহারাজা স্বীয় শিক্ষাগুরু ডাক্তার ভোলানাথ বিশ্বাসকে শিক্ষাবিভাগের ভার ব্যতীত, রাজকীয় মুদ্রাযন্ত্রাগারের অধ্যক্ষতা এবং জেল-সুপারীণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্যভার প্রদান করেন। ভারতগবর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্যদক্ষতা এবং বহুমুখী-প্রতিভা দর্শনে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া ১৮৭৭ অব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে দিল্লীর বিরাট দরবারে তাঁহাকে রায়বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন। পর বৎসর সমগ্র রাজপুতানার চীফ মেডিকেল অফিসরের পদ সৃষ্ট হইলে, ভরতপুরের এজেন্সি-সার্জ্জন সাহেব তৎপদে নিযুক্ত হন এবং ডাক্তার ভোলানাথ বিশ্বাসের হস্তে এজেন্সি সার্জ্জনের কার্য্য পুনরায় ন্যস্ত করা হয়। তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকিতেই পেন্সন্ গ্রহণ করেন। ১৮৮২ অব্দে তিনি গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু ভরতপুরের মহারাজা তাঁহাকে ছাড়েন নাই। ১৮৯৩ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

চিকিৎসায় তাঁহার যেমন অভিজ্ঞতা ও সুযশ ছিল, ইংরেজী সাহিত্যেও তেমনি তাঁহার অসাধারণ অধিকার এবং প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। ভরতপুর রাজ্যের শাসন-সংক্রান্ত যাবতীয় বিভাগের কঠিন ও জটিল কার্য্যাবলী সুসম্পাদন করিয়া যতটুকু সময় পাইতেন তিনি তাহারই মধ্যে উচ্চ সাহিত্য ও চিকিৎসাবিভাগের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলী ও সাময়িক পত্রাদি অধ্যয়ন করিতেন। রাজকার্য্য ব্যতীত মহারাজার প্রধান গৃহ-চিকিৎসকের পদে অধিষ্ঠিত থাকায় তাঁহাকে অনেক সময় রাজ-বাড়ীতেই ক্ষেপণ করিতে হইত ও রাজ্যশাসনসংক্রান্ত জটিল এবং অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে মহারাজের পক্ষ হইতে পলিটিকাল এজেণ্ট, এজেণ্ট গবর্ণর জেনেরাল এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহাকেই পত্রব্যবহার করিতে হইত। এ সম্বন্ধে কাজে কর্ত্তব্যে তিনি মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটরীর ন্যায়ই ছিলেন। ভরতপুর রাজ্যের বর্ত্তমান যাহা কিছু উন্নতি দেখা যাইতেছে এবং রাজপুতানার মধ্যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হাঁসপাতালের জন্য যে ভরতপুর আজি গৌরবান্বিত হইয়াছে, স্বর্গীয় ডাক্তার ভোলানাথ রায় বাহাদুরই সে সমুদয়ের মূল। এক কথায় বলিতে গেলে, তিনিই এ রাজ্যের পুনর্জন্মদাতা। ভরতপুরবাসী তজ্জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন সন্দেহ নাই। তাঁহার পর আর কোন বাঙ্গালী এ পর্য্যন্ত এখানে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। ১৩০৬ সালে মৈমনসিংহ বেত্তাগড়ির ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার মহাশয় ভরত-পুর ভ্রমণ করিয়া লিখিয়াছেন

"এখানে কয়েকজন বাঙ্গালী ছিলেন জানিতাম। কিন্তু রাজার রাজ্যচ্যুতির পর আর কোনও বাঙ্গালী এখানে নাই।"—হিতবাদী, ২৬ বৈশাখ, ১৩০৬।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রকৃতি

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি কি প্রকারে সংসাধিত হইয়াছে, সে বিষয়ে অনেকের মনে একটি ভুল ধারণা আছে। অনেকে মনে করেন বৈজ্ঞানিক একমনে কেবল পর্য্যবেক্ষণ অথবা পরীক্ষা (Observations or experiments) করিয়া যান—বহুসংখ্যক পর্য্যবেক্ষণ বা পরীক্ষার ফল একত্র করিয়া তাহা হইতে একটা সাধারণ নিয়ম গঠন করেন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাহা হয় না। পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিবার এত বিষয় আছে যে তাহার অতি অল্প-সংখ্যকই একজনের জীবিতকালের মধ্যে নিষ্পন্ন হওয়া

সম্ভব। অথচ এলোমেলোভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া গেলে তাহা হইতে একটি সাধারণ নিয়ম বাহির না হইবারই কথা। এইজন্য বৈজ্ঞানিকগণ দুই একটি মাত্র পর্য্যবেক্ষণ হইতে একটি সাধারণ নিয়ম মনে মনে আন্দাজ করিয়া ধরিয়া লন। পরে সেই অনুমিত সাধারণ নিয়মটি বা অনুমানটি (Hypothesis) সত্য কি না তাহাই নির্ণয় করিবার জন্য বহুসংখ্যক পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিয়া থাকেন। সমস্তগুলি পরীক্ষার ফলে যদি দেখা যায় অনুমানটি সত্য তখন তাহা প্রাকৃতিক নিয়ম (Law of Nature) বলিয়া গণ্য হয়— অপরদিকে যদি একটি মাত্র পরীক্ষার ফলও অনুমানের সহিত খাপ না খায় তাহা হইলে তখনই সেই অনুমানটিকে নির্ম্মম ভাবে বিসর্জ্জন দেওয়া হয় এবং তাহার স্থানে একটি নূতন অনুমান কল্পনা করিয়া লইতে হয়। আবার এই নূতন অনুমানটির সত্যতা নির্দ্ধারণের জন্য পরীক্ষা করিতে হয়।

এই অনুমানটি গঠন করিবার জন্য যথেষ্ট বুদ্ধি ও কল্পনার প্রয়োজন। বাহিরের লোকে মনে করে বৈজ্ঞানিক কেবল পরীক্ষাগারে বসিয়া পরীক্ষা করিবে তাহার আবার কল্পনার কি প্রয়োজন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় বিজ্ঞানেও কল্পনার ব্যবহার না করিলে চলে না। পরমাণুবাদের আলোচনা-প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছি। জৈবরসায়ন-বিদ্যায় কেকুলে ও ভাণ্ট হফের তুল্য আবিষ্কারক খুব কমই আছেন। কেকুলে কিরূপ কল্পনাপ্রবণ ছিলেন তাহা 'পরমাণুবাদ' প্রবন্ধে দেখাইয়াছি।* ভাণ্ট-হফও কম যান না। তিনি একবার একটি সুন্দর বক্তৃতা দেন—তাহার বিষয়—'বিজ্ঞানে কল্পনার ব্যবহার'। সেই প্রসঙ্গে তিনি দেখান যে অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কর্ত্তা, কবি ও ঔপন্যাসিকের উপযুক্ত কল্পনার অধিকারী ছিলেন। ভাণ্ট হফ নিজে একজন কাব্যরসের রসিক ছিলেন—জাতিতে ডাচ হইলেও তাঁহার মত বায়রন-ভক্ত সচরাচর দেখা যায় না।†

* বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের রাজসাহীস্থ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ দ্রষ্টব্য।

† Vide Vant Hoff Memorial Lecture in Chemical Society's Journal 1913.

অনুমান গঠনের জন্য বৈজ্ঞানিক নানা বিভিন্ন দিক হইতে সাহায্য পাইয়া থাকেন। প্রথমতঃ দেখা যায় কতকগুলি আবিষ্কারের আদি আকস্মিক ঘটনা। শারীর-বিদ্যার অধ্যাপক গ্যালভানি এক সময় বেঙের মাংসপেশী ও স্নায়ু সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতেছিলেন। একটি লোহার রেলিঙের উপর একটা তামার আঁকশিতে বেঙের একটা কাটা পা টাঙান ছিল। বাতাসে দুলিয়া যেমন পা-টা রেলিঙে লাগিতেছিল অমনি পা-টা কুঞ্চিত হইতেছিল। এই দেখিয়াই গ্যালভানি অনুমান করিলেন যদি দুই খণ্ড ধাতু একটি মাংসপেশী দ্বারা সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাড়িতের উৎপত্তি হয়। কেননা তাড়িতশক্তির প্রভাবে মাংসপেশী ঐরূপ কুঞ্চিত হইতে দেখা যায়। এইরূপে তাড়িতপ্রবাহের আবিষ্কারের সূচনা হইল।

পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক অয়েরষ্টেড একদিন ক্লাসে তাড়িত সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা করিয়া বুঝাইতেছিলেন। দৈবাৎ একটি তাড়িতবাহী তার একটি দোদুল্যমান চুম্বকের উপর ধরায় চুম্বকের মুখ ঘুরিয়া গেল। অমনি তিনি বুঝিলেন তাড়িতপ্রবাহের সহিত চুম্বকের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। পরে এ সম্বন্ধে রীতিমত গবেষণা করিয়া তিনি একটি স্মরণীয় আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন।

সম্প্রতি রণ্টগেন যে নূতন একরূপ আলোকরশ্মির আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহারও আদি একটি আকস্মিক ঘটনা। তিনি একটি অন্ধকার ঘরে বায়ুশূন্য কাচগোলকের মধ্যে তাড়িত প্রেরণ করিয়া একটি গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। তখন দৈবক্রমে সেই ঘরে কয়েকখানি ফটোগ্রাফের প্লেট ছিল। এক সময় সেই প্লেটগুলি বাহির করিয়া দেখেন আলোক লাগিয়া প্লেটখানি খারাপ হইয়া গিয়াছে। তিনি ভাবিতে লাগিলেন আলোক আসিল কোথা হইতে? তখন তাঁহার মনে হইল তাড়িতপূর্ণ কাচগোলক হইতেই একরূপ আলোকরশ্মি নির্গত হইয়াছে; উহা সাধারণ আলোকরশ্মির মত নহে, অথচ তাহাতেই ফটোগ্রাফের উপর দাগ হইয়াছে। এইরূপে সুপ্রসিদ্ধ রণ্টগেন-রশ্মির আবিষ্কার হইল।

রেডিয়ম-সংক্রান্ত গবেষণার পিতৃস্থানীয় অধ্যাপক

বেকারেল বলেন রণ্টগেনের মত তিনিও দৈবক্রমে রেডিয়ম জাতীয় পদার্থের অদ্ভুত রশ্মির (Radio-active Rays) সন্ধান অবগত হন।

তবে এস্থলে একটি কথা বলার প্রয়োজন। আকস্মিক ঘটনার সাহায্যে আবিষ্কার করা সকলের সাধ্য নয়। যিনি প্রকৃত বৈজ্ঞানিক শিক্ষা লাভ করিয়া প্রত্যেক ঘটনার কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে ব্যগ্র, তিনিই এরূপ ঘটনা হইতে নূতন সত্য উদ্‌ঘাটন করিতে সক্ষম হন। দৈব উদ্‌যোগী পুরুষেরই সহায় হয়, অলসের নহে।

দ্বিতীয়তঃ, কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক কোনও একটি লৌকিক সংস্কারের সাহায্য লইয়া তাঁহার অনুমান গঠন করিয়াছেন, এরূপও দেখা যায়। ডাক্তার জেনার ইংলণ্ডের এক পল্লীগ্রামে ডাক্তারি করিতেন। তাঁহার গ্রামে গোয়ালাদের মধ্যে একটা সংস্কার ছিল যে যাহার একবার গো-বসন্ত (cow pox) হয় তাহার আর ইচ্ছার বসন্ত (small pox) হয় না। জেনারের ইচ্ছা হইল এই সংস্কারের মধ্যে কতটুকু সত্য নিহিত আছে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও রীতিমত গবেষণা করিয়া দেখিবেন। তাঁহার ইচ্ছার কথা যখন তিনি বৈজ্ঞানিক-গবেষণাকারী ডাক্তার বন্ধুদের জানাইলেন, তখন তাঁহারা গোয়ালাদের এই কুসংস্কারটা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন (কেননা দেখা গিয়াছিল কথাটা সকল সময়ে খাটে নাই) এবং তাঁহাকে এ বিষয়ে গবেষণা করিয়া সময় নষ্ট করিতে নিষেধ করিলেন। তিনি কিন্তু তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া, ধীরভাবে এই বিষয়ে গবেষণা করিতে লাগিলেন। কিছুকালের মধ্যে দেখা গেল দুই রকম রোগকে গোয়ালারা ভুল করিয়া গো-বসন্ত বলিত; তাহার মধ্যে যেটা আসল গো-বসন্ত সেটা যাহার হয়, তাহার আর ইচ্ছার বসন্ত হয় না। এই বিষয় লইয়া কয়েক বৎসর ধরিয়া পরিশ্রম করিবার পর তাঁহার জগদ্বিখ্যাত বসন্তের টীকার আবিষ্কার হইল।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি মেচনিকফের একটি সুপরিচিত আবিষ্কারের উল্লেখ করিতে চাই। কি করিলে মানুষ দীর্ঘজীবী হয় এই সম্বন্ধে মেচনিকফ কিছুদিন চিন্তা করিতেছিলেন। তাঁহার ধারণা জন্মিল যে মানুষের বৃহৎ অন্ত্রের মধ্যে ভুক্ত দ্রব্য পচিতে থাকে এবং কয়েকটি বিষাক্ত পদার্থের সৃষ্টি করে; তাহারই ফলে মানুষ বৃদ্ধ হইয়া মরিয়া যায়। যদি কোনও রকমে অন্ত্রমধ্যস্থ ভুক্ত দ্রব্যের এই পচনক্রিয়া নিবারণ করা যায় তাহা হইলেই মানুষ বহুকাল বার্দ্ধক্য ও মৃত্যুর হস্ত এড়াইতে পারিবে।

ইতিমধ্যে তিনি দেখিলেন অনেক দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে একটা বিশ্বাস আছে যে দধি ও ঘোল জাতীয় জিনিস আহার করিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যাহারা এইরূপ জিনিস খায় তাহারা প্রায়ই দীর্ঘজীবী হয়। তারপর তিনি যন্ত্রাগারে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে দধিতে যে ব্যাক্‌টিরিয়া (জীবাণু) ল্যাক্‌টিক এসিড প্রস্তুত করিয়া দুধকে দধিতে পরিণত করে, সেই ব্যাক্‌টিরিয়া উপস্থিত থাকিলে কোনও একটা জিনিস পচনক্রিয়া হইতে রক্ষা পায়। কাজেই দধি ভক্ষণ (বা অন্য কোনও প্রকারে ল্যাকটিক এসিড ব্যাক্‌টিরিয়া ভক্ষণ) দীর্ঘজীবন লাভের একটি উপায়, এই সত্যটি আবিষ্কার হইল।

যে-সকল বৈজ্ঞানিক লৌকিক সংস্কার মাত্রকেই কুসংস্কার বলিয়া ঘৃণা করেন এবং তাহার মধ্যে কিছু প্রকৃত সত্য লুক্কায়িত আছে কিনা তাহা অনুসন্ধান করা কেবল পণ্ডশ্রম বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহারা উল্লিখিত দুইটি আবিষ্কারের ইতিহাস হইতে কিছু জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। ইহা স্বীকার্য্য যে অনেক স্থলে লৌকিক সংস্কারের অন্তর্নিহিত সত্যটুকু ভ্রান্তির আবরণে এরূপ আচ্ছাদিত থাকে যে হঠাৎ সেটুকু কাহারও নজরে পড়ে না—সে সত্যটুকু বাহির করিতে হইলে জেনারের মত অদম্য উৎসাহের প্রয়োজন।

আমাদের দেশে প্রাচীনকাল হইতে কতকগুলি সংস্কার চলিয়া আসিতেছে—তাহার মধ্যে কতটুকু সত্য আছে তাহা কে অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে? যদিই বা কেহ দেখিতে চাহে তাহা হইলে তাহাকে বিদ্বজ্জনসমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। যদি কেহ বলে, গাধাকে যে শীতলাদেবীর বাহন বলে তাহার অর্থ—বোধ হয় গাধার দুধে বসন্তের উপকার হয় এবং আমি এ বিষয়টা লইয়া গবেষণা করিতে চাই, তাহা হইলে অনেক বৈজ্ঞানিকই ভাবিবেন এই ব্যক্তির বুদ্ধির সঙ্গে শীতলার বাহনের বুদ্ধির অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে।

তেমনি হঠযোগ সম্বন্ধে কোনও বৈজ্ঞানিক গবেষণা করা আজকালকার ফ্যাসান-বহির্ভূত। এখানে বলিয়া রাখি পরিচ্ছদ সম্বন্ধে যেমন দেশকালপাত্রোপযোগী একটা ফ্যাসান থাকে তেমনি সাহিত্য এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধেও একটা একটা ফ্যাসান থাকে। যে দুঃসাহসিক লেখক বা বৈজ্ঞানিক সেই ফ্যাসানের শাসন মানিয়া না চলেন তাঁহার ভাগ্যে অশেষ লাঞ্ছনা থাকে।

অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সেদিন লা রিভিউ নামক একখানি উচ্চঅঙ্গের পত্রিকায় লিখিয়াছে যে ডাক্তার গিউটলিস নামক একজন জর্ম্মান বিশেষজ্ঞ দেখাইয়াছেন যে অনেকের কর্ণপটহে ছিদ্র থাকে, কিন্তু তাহা জানা যায় না। তাহারা হঠাৎ জলে ঝাঁপ দিলে কানের ভিতর জল ঢুকিয়া মারা যাইতে পারে। এই জন্য ডাক্তার সাহেব তাহাদিগকে কানে তুলার ছিপি লাগাইবার উপদেশ দিয়াছেন।* পড়িয়াই মনে হইল ছেলেবেলা বাবা বলিতেন 'ওরে, ডুব দেবার আগে কানে আঙ্গুল দে।' এতদিন ত আমি এটাকে একটা কুসংস্কার বলিয়াই জানিয়া আসিয়াছি।

এইবার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রকৃতি সম্বন্ধে আর-একটি কথার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পদার্থবিজ্ঞান বা রসায়নের মত কোনও একটি পুরাতন বিজ্ঞানের গবেষণাপ্রণালী শারীর-বিজ্ঞানের মত একটি নূতন বিজ্ঞানে প্রয়োগ করায় অনেক বড় বড় আবিষ্কার হইয়া গিয়াছে। বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ হেল্‌মহোলজে বলিয়াছেন তিনি যে শারীর-বিজ্ঞানে অতগুলি প্রয়োজনীয় আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহার কারণ এই যে তিনি পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণাপ্রণালী শারীর-বিজ্ঞানে প্রয়োগ করেন। তা'র পূর্ব্বে এই পদার্থবিজ্ঞানের প্রণালী শারীর-বিজ্ঞানে ব্যবহার হয় নাই। কাজেই তিনি যেন একটা নূতন জমি প্রথম আবাদ করিলেন—সেইজন্যই ফল খুব সন্তোষজনক হইয়াছিল।

বৈজ্ঞানিকপ্রধান পাস্তর প্রথমে রসায়ন সম্বন্ধে গবেষণা করেন। পরে তিনি জীববিজ্ঞানে অত্যদ্ভুত আবিষ্কার-পরম্পরা দ্বারা জগতের অনেক কল্যাণসাধন করিয়া গিয়াছেন। এই যে আজকাল ডাক্তাররা কথায় কথায় রোগের নিদানস্বরূপ ব্যাসিলির নাম উল্লেখ করেন তাহা পাস্তরেরই আবিষ্কার। তাঁহার পূর্ব্বে রোগসংক্রান্ত ঘটনাগুলি কেহই বৈজ্ঞানিক নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিতেছিলেন না। কোন্ গুপ্ত শক্তির বলে তিনি এ বিষয়ে সফলকাম হইলেন? রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় যেসকল নিখুঁত প্রণালী অবলম্বিত হয়, রোগ সম্বন্ধীয় এইসকল কঠিন প্রশ্নের সমাধানে সেইসকল প্রণালীর প্রয়োগই এই গুপ্ত শক্তি।

কেবল এক বিজ্ঞানের প্রণালীই যে অপর বিজ্ঞানে প্রযুক্ত হয় তাহা নহে, এক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তও অপর বিজ্ঞানে ব্যবহৃত হইয়া যথেষ্ট সুফল প্রসব করিয়াছে দেখা যায়। এই বিষয়ে একটি চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দিব। উদ্বর্ত্তনবাদের আবিষ্কারক ডারউইন ও ওয়ালেস দুইজনেই স্বীকার করিয়াছেন যে ম্যাল্‌থস্-প্রণীত লোকসংখ্যার আলোচনাবিষয়ক পুস্তক পাঠ করিয়াই তাঁহারা যোগ্যতমের জয় এই সত্যটি আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন। এ স্থলে দেখা যাইতেছে সমাজ-বিজ্ঞানের একটি সিদ্ধান্ত হইতে জীববিজ্ঞানের একটি সিদ্ধান্ত নির্ণীত হইল। সেইরূপ হার্বার্ট স্পেন্সার প্রমুখ কয়েকজন সমাজ-বিজ্ঞানবিদ্ জীববিজ্ঞানের অনেক সিদ্ধান্ত সমাজবিজ্ঞানে প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন।

পদার্থবিজ্ঞান জীববিজ্ঞান প্রভৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের গবেষণাপ্রণালী এবং কোনো কোনো সিদ্ধান্ত আমাদের হিন্দুসমাজের প্রতি প্রয়োগ করিলে যে অনেক নূতন তথ্যের আবিষ্কার হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু মুস্কিল এই, সমাজ সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে যাইলেই আপনাকে একটা-না-একটা দলের হাতে পড়িতে হইবে—আপনি যে বৈজ্ঞানিকোচিত অপক্ষপাতিতা অবলম্বন করিবেন তাহাতে কাহারও সহানুভূতি পাইবেন না। আপনার কথাগুলি যে-দলের মনোমত হইবে তাঁহারা আপনার সাহায্য করিবেন; কিন্তু খবরদার, সেই দলের মতের বিরুদ্ধে কোনও আলোচনা করিতে পারিবেন না, তা সে আলোচনা যতই বৈজ্ঞানিক হউক না কেন। কাজেই এদেশে যদি একজন প্রকৃত সমাজ-বিজ্ঞানবিদের একাই একদল হইয়া কাজ করিবার সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে অরণ্যে রোদন ভিন্ন দ্বিতীয় পন্থা নাই।*

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এস সি।

৯ প্রবাসী, ১৩২১ সালের পৌষ মাসের পঞ্চশস্য দ্রষ্টব্য।

*অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

পঞ্চশস্য

সাহিত্যের সহিত যুদ্ধের সম্বন্ধ—

বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে য়ুরোপীয় সাহিত্যের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহার উন্নতি হইবে, না অবনতি হইবে এবং সাহিত্যের সহিত যুদ্ধের সম্বন্ধ কি—এই বিষয় লইয়া য়ুরোপ ও আমেরিকার সাহিত্যমহলে তুমুল আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে। এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। এই কথা লইয়া ইংরেজ সাহিত্যিক এডমণ্ড গস্ যাহা বলিয়াছেন কয়েক মাস পূর্ব্বে "পঞ্চশস্যে" তাহা সংকলিত হইয়াছিল। এবার একজন প্রসিদ্ধ মার্কিন সাহিত্যিকের অভিমত ও তাহার প্রতিবাদ সংকলিত হইল।

উইলিয়ম ডীন হাওয়েলস্ অনেকের মতে আমেরিকার জীবিত সাহিত্যিকদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইঁহার লেখনী সাহিত্যের নানা বিভাগকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। ইনি একাধারে সম্পাদক, কবি, ঔপন্যাসিক, জীবনী-রচয়িতা ও সাহিত্য-সমালোচক। হাওয়েলস্ বহুদিন "আটলান্টিক মন্থলী" ও "হার্পার্স ম্যাগাজিন" প্রভৃতি নামজাদা মার্কিন পত্রিকার সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার রচিত প্রেসিডেন্ট লিঙ্কলনের জীবনচরিত একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ। মার্কিন সাহিত্যকে ইনি প্রায় কুড়িখানি উপন্যাস, অনেকগুলি কাব্য, ভ্রমণ-কাহিনী ও সমালোচনাপুস্তক উপহার দিয়াছেন। ঔপন্যাসিক হিসাবে আমেরিকায় ইঁহার যেমন খ্যাতি সাহিত্যসমজদার ও সমালোচক হিসাবে ইঁহার মতামতের তেমনি মূল্য। এখন ইঁহার বয়স প্রায় আশী বৎসর—কিন্তু তবুও ইঁহার রচনার বিরাম নাই। সেদিনও ইঁহার একখানি নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

সাহিত্যের সহিত যুদ্ধের সম্পর্ক এবং তাহার উপর বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রভাব সম্বন্ধে হাওয়েলস্‌এর মতামত জানিবার জন্য "নিউইয়র্ক টাইমস্"-এর জনৈক প্রতিনিধি সম্প্রতি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ "লিটারেরী ডাইজেষ্ট" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

হাওয়েলস্ বলেন, যুদ্ধব্যাপার কোন মতেই মানুষের শ্রেষ্ঠ সৃজনী শক্তিকে জাগাইতে পারে না। আকস্মিক ঘটনার উত্তেজনায় যে-সমস্ত রচনার সৃষ্টি, সাহিত্য হিসাবে তাহার কোন মূল্য নাই এবং তাহা সাহিত্যে কখনই স্থায়ী আসন পায় না।

তাঁহার মতে বর্ত্তমান যুদ্ধ কবি ঔপন্যাসিক বা নাট্যকারকে সাহিত্যসৃষ্টির কোনই উপাদান যোগাইতে পারে না। তিনি বলেন, "জার্ম্মানী যে এই যুদ্ধে আশ্চর্য্য সাহস দেখাইয়াছে এ কথা সকলেই স্বীকার করিবে। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা কেহ কবিতা রচনা করিয়া এই সাহসের কাহিনী গাহিবার চিন্তা মনেও স্থান দিই না। এমন একটা ব্যাপার প্রাচীন-যুগের লেখকদের চিত্তে যে ভাবে সাড়া পাইত আমাদের চিত্তে আর সে ভাবে পায় না। ইহার কারণ এই যে যুদ্ধ আর আমাদের আদর্শ নয়। সাহিত্যের পক্ষে এ ব্যাপার কখনই একটা বড় আদর্শ ছিল না এবং কখনো হইতেও পারে না। অসির ঝঞ্ঝনা, গোলার গর্জ্জন, কামানের ধূম্র, আহতের আর্ত্তনাদ—এ সমস্তই এখন সাহিত্য হইতে চলিয়া গিয়াছে। এখনকার দিনে সাহিত্যে ইহার পুনরাবির্ভাব প্রাচীনকে নবীন বলিয়া চালাইবার চেষ্টা মাত্র।

"এই ধরুন ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার "সিভিল-ওয়ার" বা ঘরোয়া যুদ্ধের কথা। তখন ঐ যুদ্ধের কথা লইয়া যে-সমস্ত উপন্যাস, গল্প, নাটক বা কবিতা রচিত হইয়াছিল তাহার কথা এখন কয়জনের মনে আছে? অথচ সে সময়ে সেগুলির মধ্যে অনেক পুস্তকই পাঠকমহলে বেশ সমাদর লাভ করিয়াছিল। সে-সমস্ত পুস্তকের যে কোন গুণই ছিল না এমন নয়। কয়েকটি গল্প ও উপন্যাস বাস্তবিকই বেশ সুলিখিত ছিল এবং যুদ্ধের চিত্র হিসাবে সেগুলি খুব আগ্রহের সহিত পড়িয়াছিলাম। কিন্তু এখন আর সে সব কেহই পড়ে না; কেননা সাহিত্য হিসাবে তাহার কোনই মূল্য নাই। যে ব্যাপারের উত্তেজনায় সে-সমস্ত পুস্তক রচিত হইয়াছিল, ঐতিহাসিক হিসাব ছাড়া আর কোন হিসাবে আজ আর তাহা গণ্য নহে। আমেরিকার "ঘরোয়া-যুদ্ধের" ফলে যে অসংখ্য কবিতা, গান ও উপন্যাস রচিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে, আমার মতে, লাওয়েলের রচিত এক "কমেমোরেশন ওড" ছাড়া আর কোনটিকেই সাহিত্য বলা চলে না। তখনকার শত শত রচনার মধ্যে ঐ একটি কবিতা খাঁটি সাহিত্যরসে ভরপুর। সেইজন্য ঐ কবিতাটিই কেবল টিকিয়া আছে ও থাকিবে।

"যুদ্ধব্যাপার যে সাহিত্য শিল্প কলা এ সমস্তকেই নষ্ট করে এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যুদ্ধের ফলে সাহিত্য সৃষ্টি হইতে পারে না, কেননা যুদ্ধে সভ্যতা বিধ্বস্ত হয় ও মানুষ আদিম বর্ব্বরতায় ফিরিয়া যায়। এমন কি যুদ্ধের আদর্শ এবং ভাবী যুদ্ধের জন্য সাজসজ্জা ও আয়োজন পর্য্যন্ত সাহিত্য-সৃষ্টির পক্ষে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। ঠিক এরূপ ব্যাপার জার্ম্মানীতে ঘটিয়াছে।

"ফ্রাঙ্কো-প্রুসীয় যুদ্ধের বহু পরে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে আমি যখন ফ্লোরেন্সে ছিলাম তখন সেখানে কোন বিখ্যাত জার্ম্মান সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকের সহিত আমার আলাপ হয় ও বিশেষ সৌহার্দ্দ জন্মে। কথায় কথায় আমি একদিন তাঁহাকে আধুনিক জার্ম্মান উপন্যাস ও ঔপন্যাসিকদের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন—জার্ম্মানীতে ঔপন্যাসিক বলিতে আজকাল আর কে আছে? জার্ম্মানীর নূতন আদর্শ "মিলিটারীজম্" আমাদের অন্য সমস্ত আদর্শ ও কল্পনাকে চাপিয়া মারিয়াছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে কাজে কাজেই জার্ম্মান উপন্যাসও মারিয়াছে।"

হাওয়েলস্‌এর এই কথা শুনিয়া "নিউইয়র্ক টাইমস্"এর প্রতিনিধি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা, তাহাই যদি হয় তবে গত শতাব্দীতে কেমন করিয়া রাষিয়াতে এত ভাল ভাল উপন্যাসের সৃষ্টি হইল? রাষিয়াও তো ঐ মিলিটারীজম্‌এর আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে।"

এই প্রশ্নের উত্তরে হাওয়েলস্ বলেন—"রাষিয়ার মিলিটারীজম্ ও জার্ম্মানীর মিলিটারীজম্‌এর মধ্যে প্রভেদ বিস্তর। রাষিয়ার মিলিটারীজম্ তাহার শাসকসম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ, আপামর সাধারণের মধ্যে সে আদর্শ আদরও পায় নাই, বিস্তারও লাভ করে নাই। রাষিয়ার জনসাধারণ শান্তিপ্রিয় ও ধর্ম্মভীরু। মিলিটারীজম্‌এর আদর্শে তাহারা তাহাদের জাতীয় প্রকৃতিগত কল্পনাপ্রিয়তা এখনো হারাইয়া ফেলে নাই। তাই তাহাদের সেই কল্পনাসম্পদ টুর্গেনেফ, টলষ্টয়, ডষ্টেয়ভস্কি ও গোগোলের উপন্যাস ও নাটকের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে ও এখনও গোর্কি ও চেকহফের রচনার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতেছে।

"কিন্তু জার্ম্মানীর মিলিটারীজম্‌এর আদর্শ সমস্ত দেশটার হাড়ে হাড়ে মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। গত পঞ্চাশ বৎসর ব্যাপিয়া যুদ্ধ বিগ্রহ, রাজ্যবিস্তার ও অধিকারের প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক জার্ম্মানের মনে শয়নে স্বপনে জাগিয়া রহিয়াছে। আর কোন আদর্শ বা আর কোন চিন্তার স্থান তাহার মনে নাই। তাই সেখানে কল্পনার লীলা স্ফূর্ত্তি পায় না; এক মিলিটারীজম্‌এর আদর্শ সমস্ত কল্পনাকে চাপিয়া মারিয়াছে। জার্ম্মানীর সাহিত্য-কুঞ্জবনে তাই আর এখন ভুবনমোহন ফুল ফোটে না, ফোটে কেবল কাঁটা।"

মোটামুটি এই তো গেল হাওয়েলস্‌এর মত। কিন্তু গত ফেব্রুয়ারী মাসের মার্কিনমাসিক "বুকম্যান" কাগজে জেমস লেন অ্যালেন এই মতের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। জেমস অ্যালেন আমেরিকার শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প-লেখকদের মধ্যে একজন।

তিনি বলেন—"মানবজাতির শ্রেষ্ঠ কাব্য হোমারের ইলিয়াদ। জিজ্ঞাসা করি যুদ্ধ বিগ্রহ এই মহাকাব্যকে সৃষ্টি করিয়াছে না বিনাশ করিয়াছে? যুদ্ধ-ব্যাপার অবলম্বনে রচিত কাব্য যদি না-ই টিকে তবে ইলিয়াদ টিকিল কি করিয়া? জগতের আর কোন্ কাব্য এতদিন টিকিয়া আছে? জগতের আর কোন্ কাব্য সাহিত্যে এমন স্থায়ী আসন পাইয়াছে? যদি যুদ্ধ সমস্ত শিল্প সাহিত্য কলাকে নষ্টই করে তবে গ্রীক শিল্প রক্ষা পাইল কেমন করিয়া? ফিদিয়াসের অতুলনীয় ভাস্করকর্ম্ম, পার্থেনন প্রাসাদের অপূর্ব্ব তক্ষণকারুকর্ম্ম কি গ্রীসে জন্মগ্রহণ করে নাই? অথচ গ্রীস তো চিরকালই যুদ্ধবিগ্রহের লীলানিকেতন। ইতিহাসে দেখি, আমরা এখন যাহাকে মিলিটারীজম্ বলি সেই মিলিটারীজম্ বা যুদ্ধের আদর্শ, গ্রীকদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ ছিল। প্রাচীন গ্রীসে যোদ্ধার সম্মানের আর অন্ত ছিল না। যোদ্ধাই দেশ শাসন করিত, যোদ্ধাই দেশ রক্ষা করিত; সমগ্র দেশে যোদ্ধাই ছিল সর্ব্বেসর্ব্বা। সমস্ত গ্রীক ইতিহাসটাকে একটা বিরাট যুদ্ধের ইতিহাস বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। যদি যুদ্ধের আদর্শ সাহিত্য গড়িবার পক্ষে অন্তরায় হয়, যদি যুদ্ধব্যাপার জাতিকে বর্ব্বরতার দিকে টানিয়া লইয়া চলে, তবে জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ গ্রীক সাহিত্য শিল্প ও সভ্যতা আসিল কোথা হইতে?

"তারপর রোমের কথা ধরা যাক। ল্যাটিনসভ্যতার মূলে যুদ্ধ ভিন্ন আর কোন্ জিনিস দেখিতে পাই? অত বড় রোম সাম্রাজ্য, অত শক্তি, অত সম্পদ—কিসের সৃষ্টি? যুদ্ধ বিগ্রহ যদি রোমকে বর্ব্বর করিয়াই দিত তবে জগতে আজ রোম-সভ্যতার এত খ্যাতি এত সম্মান কে করিত? যুদ্ধ বিগ্রহ বাস্তবিকই যদি সাহিত্য সৃষ্টির উৎস রুদ্ধ করিয়া দিত তবে রোমান-সাহিত্য কাব্যে মহাকাব্যে নাটকে ইতিহাসে নানা ভাবে আপনাকে প্রকাশ করিল কেমন করিয়া? রোমের মন্দির, রোমের প্রাসাদ, রোমের রাজপথ, রোমের সেতু, রোমের বিজয়তোরণ শান্তির আদর্শে নির্ম্মিত হয় নাই। রোম জগতকে সাম্রাজ্যশাসন ও আইন প্রণয়নের যে আদর্শ দান করিয়া গিয়াছে তাহার মূলে শান্তি নয়;—যুদ্ধ বিগ্রহ ও জয় পরাজয়। রোমের পতনের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই যে মিলিটারীজম্‌এর আদর্শ গ্রহণ করিয়া তাহার পতন হয় নাই, কিন্তু রোম বিলাসলালসায় অস্থির হইয়া ভোগবাসনায় যখন সে বীর্য্যের আদর্শ বিস্মৃত হইল তখনি তাহার পতন সুরু হইল। * *

"পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্যের অন্যতম, স্কানডিনেভিয় সাহিত্য শান্তির গাথা নয়, যুদ্ধের গাথা। অতি পুরাতন যুগের সাহিত্যের সন্ধান লইতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যুদ্ধের কথাতেই তাহার আরম্ভ। পৃথিবীর প্রাচীনতম শিল্পসাধনার পরিচয় লইতে গেলে প্রস্তরখণ্ডে, ধাতুফলকে, বৃক্ষগাত্রে কিম্বা গুহাকন্দরে যুদ্ধের চিত্র বা যোদ্ধার মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়।

"এ তো গেল প্রাচীন দেশের কথা। এখন আধুনিক দেশগুলি ও তাহার সাহিত্যের কথা দেখা যাক। প্রথমেই ইংল্যাণ্ডের কথা বলি। এই যে ইংরেজের জগতজোড়া সাম্রাজ্য—এ কি শান্তির সৃষ্টি না যুদ্ধের সৃষ্টি? যুদ্ধবিগ্রহ কি ইংরেজকে অবনতির পথে লইয়া গিয়াছে? যে শত শত বৎসর ধরিয়া ইংল্যাণ্ড অবিরাম যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্য দিয়া জগতে এক অদ্বিতীয় শক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে সেই শত শত বৎসরে কি ইংরেজের সাহিত্য, ইংরেজের শিল্প ধ্বংসের দিকে চলিয়াছে না পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মধ্যে আপনার স্থান করিয়া লইয়াছে? ইংরেজ সাহিত্যসম্রাট শেক্সপীয়ারের নাটকের মধ্যে কি যুদ্ধবিগ্রহের কোন কথাই নাই? তাহার মধ্যে কি অশ্বের হ্রেষারব, মাতঙ্গের বৃংহিত বিবিধ অস্ত্রের ঝঙ্কারঝঞ্ঝনা, বিজয়ী সেনার জয়োল্লাসধ্বনি শোনা যায় না? এলিজাবেথীয় যুগে জলে স্থলে ইংরেজের জয়ের বার্ত্তা সে যুগের সমস্ত সাহিত্যিকগণের উপর যে কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং সে বার্ত্তা তাঁহাদের সমস্ত রচনার মধ্য দিয়া বারম্বার আপনাকে কিরূপে নানা আকারে প্রকাশ করিয়াছে তাহা সাহিত্যপাঠকের অজানা নাই। ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য মিলটনের "প্যারাডাইজ লষ্ট" মর্ত্ত্যের না হউক স্বর্গের যুদ্ধকথা লইয়াই রচিত। তাহার মধ্যে কি সাহিত্যরস নাই, না তাহা সাহিত্যে স্থায়ী হয় নাই? আর্থার ও তাঁহার অনুচরগণের শৌর্য্যকাহিনী নানা ছন্দে, নানা আকারে, নানা ভাষায় রচিত ও রটিত হইয়া য়ুরোপীয় সাহিত্যে অমর হইয়া রহিয়াছে।

"আবার বর্ত্তমানকালের সাহিত্য ও শিল্পের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যুদ্ধের আদর্শ, যুদ্ধের কথা সে সাহিত্য শিল্পকে কতদূর উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কো-প্রুসীয় যুদ্ধের পর ফরাসী সাহিত্য ও চিত্রকলা এক নূতন আকার লাভ করিয়াছে। আলফঁস দোদে, মোপাসা, জোলা ঐ যুদ্ধ-কথা অবলম্বনে যেসব গল্প ও উপন্যাস রচনা করিয়াছেন তাহা শুধু ফরাসীসাহিত্য কেন য়ুরোপীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রত্ন। ফরাসী চিত্রশিল্পী দেতাই ও দ্য ন্যুভিল ঐ যুদ্ধেরই চিত্র আঁকিয়া ফরাসীসৈন্যের শৌর্য্য ও স্বদেশপ্রেম ও সেই সঙ্গে সঙ্গে ফরাসীচিত্রকলাকে অমর করিয়াছেন। * *

"সকল দেশের কথা বলা হইল, এবার আমেরিকার কথা বলা যাক। সকলেই জানেন দুইটি বিশেষ ঘটনার উপর মার্কিন সভ্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই দুইটি বিশেষ ঘটনার মধ্যে প্রথমটি ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতালাভের জন্য যুদ্ধ এবং দ্বিতীয়টি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে নিগ্রোক্রীতদাসগণকে স্বাধীনতাদানের জন্য উত্তর ষ্টেটগুলির সহিত দক্ষিণ ষ্টেটগুলির ঘরোয়া যুদ্ধ। এই দুইটি যুদ্ধের আদর্শ মার্কিন-বাসীর হৃদয়ে চিরদিন জাগিয়া আছে। যে স্বাধীনতার জন্য, যে আদর্শ রক্ষার জন্য অদ্যকার মার্কিনবাসীর পিতৃপিতামহ রণক্ষেত্রে প্রাণপণ ও প্রাণপাত করিয়াছিলেন সেই মহান আদর্শ এবং সেই প্রাণ-পাতের স্মৃতি তাঁহাদের সমস্ত সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞানের সাধনায় আপনাকে অহরহ প্রকাশ করিতেছে। আমেরিকার ভাস্কর্য্য, আমেরিকার কাব্য, আমেরিকার চিত্র সমস্তই রণবীর্য্যের আদর্শে গঠিত, রচিত ও অঙ্কিত। তাঁহাদের চিত্রশালায় যাও দেখিবে স্বাধীনতাসংগ্রামের যোদ্ধৃগণের চিত্র ও মূর্ত্তি, তাঁহাদের কাব্য পাঠ কর দেখিবে প্রত্যেক ছত্রে ছত্রে ঐ যুদ্ধেরই কথা, ঐ স্বাধীনতার সুর। যদি আমেরিকার সঙ্গীতের পরিচয় লইতে যাও তবে দেখিবে যেটুকু সঙ্গীত তাহার আছে তাহার সমস্ত হয় রণসঙ্গীত কিম্বা "স্বাধীনতার গান"—

"স্বদেশ আমার মাতৃভূমি
স্বাধীনতার ধাত্রী তুমি
সকল বনই জাগাক ধ্বনি
স্বাধীনতার গান!"*

"হাওয়েলস্ বলিয়াছেন "সিভিল ওয়ার" বা ঘরোয়া যুদ্ধের উত্তেজনায় সৃষ্ট রচনার মধ্যে লাওয়েলের "কমেমোরেশন ওড" ছাড়া আর কিছুই স্থায়ী হয় নাই। আমরা তাঁহার এ মতে সায় দিতে পারিলাম না। শত শত কবিতা ও অন্যান্য রচনার মধ্যে বাস্তবিকই কি তিনি ঐ একটি কবিতা ছাড়া আর কিছুই খুঁজিয়া পাইলেন না যাহা মার্কিনসাহিত্যে স্মরণীয় হইয়া আছে? হাওয়েলসের মতো আকস্মিক ঘটনার উত্তেজনায়

* মার্কিন জাতীয় সংগীত—তীর্থসলিল, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

যে সাহিত্যের সৃষ্টি তাহা স্থায়ী হয় না। সত্যই যদি তাই হয় তবে 'Gettysburg Address' আজও প্রত্যেক আমেরিকানের হৃদয়কে নাচাইয়া তোলে কেন, তাহার ধমনীতে সজোরে রক্তস্রোত বহায় কেন? আমেরিকার গণতান্ত্রিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠসৃষ্টি হুইটম্যানের "Leaves of Grass" কিসের প্রেরণায় রচিত? তাঁহার শ্রেষ্ঠ গান "Captain, my Captain" কিসের তালে বাজে ভাল,—রণ-দামামার না পিয়ানোর? যুদ্ধের আদর্শ যদি সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে অন্তরায় হয় তবে এ সব আসিল কোথা হইতে? * *

"যুদ্ধের আদর্শে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টির এত ভুরিভুরি দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও হাওয়েলস কি করিয়া বলিলেন যুদ্ধের আদর্শ বড় আদর্শ নয়, তাহা শিল্প গড়ে না, তাহার সাহিত্য টিকে না? তিনি কি করিয়া বলিলেন সাহিত্যকে যুদ্ধব্যাপার আর খোরাক যোগাইতে পারে না, যুদ্ধে শৌর্য্য বীর্য্য আর আমাদের তেমন করিয়া মাতায় না? যুদ্ধের আদর্শ যে জাতির চিত্তে আর সাড়া পায় না, যাহার শিল্প সাহিত্যকে আর রস যোগায় না, বুঝিতে হইবে সে জাতির অধঃপতন সুরু হইয়াছে, মৃত্যু তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া, তাহার সভ্যতা, তাহার সাহিত্যসাধনা তাহার শিল্পচর্য্যা সমস্তই মরণের মুখে চলিয়াছে।"

যুগে যুগে তিনটি জিনিস মানুষের সাহিত্যসৃষ্টির মূলে রস যোগাইয়াছে—ধর্ম্ম, প্রেম ও যুদ্ধ। পৃথিবীর যত সাহিত্য, যত শিল্প যত কলা ঐ তিনটি লইয়া রচিত। ও তিনটির একটিকেও বাদ দিলে সে সমস্তকে পঙ্গু করা হইবে—ইহাই জেমস লেন অ্যালেনের বিশ্বাস।

শ্রীঅমলচন্দ্র হোম।

সাদা-কালোয় বিবাহ—

আমেরিকায় মার্কিন ও নিগ্রোর মধ্যে বিবাহ নিবারণ করিবার জন্য একটি আইন বিধিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব হইতেছে। কৃষ্ণবর্ণ নারীর সহিত শ্বেতকায় মার্কিনের বিবাহ হইবে ইহা কি সহ্য হয়! এই সম্বন্ধে মার্কিন মহাসভার জনৈক সভ্য যে-বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে অনেক ন্যায়সঙ্গত কথা আছে এবং সভালোকের মনের ভাব ঐরূপই হওয়া উচিত। তিনি বলিয়াছেন: "এরূপ বিবাহ আইনতঃ গ্রাহ্য না করিলে সন্তানগুলির দশা কি হইবে? তাহাদের রক্ষা করিবে কে? ইহাতে দেশে নৈতিক আবহাওয়া মন্দ বই ভালো হইবে না। অনেক হৃদয়হীন বর্ব্বর এই আইনের কল্যাণে নিগ্রো-নারীর সর্ব্বনাশ করিয়া তাহাদিগকে পথে বসাইয়া যাইবে। শ্বেতকায় একজন নিগ্রো-নারীর সহিত একত্রে বাস করিবে অথচ আইন তাহাকে ঐ নারীকে বিবাহ করিতে বাধ্য করিবে না বা ঐ নারীর গর্ভজাত সন্তানগুলিকে প্রতিপালন করিতে বাধ্য করিবে না এমন অবস্থা কল্পনাও করা যায় না। অন্য সকল জাতির নারীকে আইন অত্যাচার হইতে রক্ষা করে, নিরীহ নিগ্রো-নারী কেন সে সাহায্যে বঞ্চিত থাকিবে? অনেক শ্বেতকায় ব্যক্তি যে অবৈধভাবে নিগ্রো-নারীর সঙ্গে বসবাস করে এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। তা না হইলে আমেরিকায় এত বর্ণ-সঙ্করের প্রাদুর্ভাব কেন? নিগ্রোরা বিজাতীয়ের সহিত বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছুক নয়, কিন্তু তাহাদের নারীরা যে-কোনো বিদেশীয়ের হাতে লাঞ্ছিত উৎপীড়িত হইবে ইহাও তাহারা নিশ্চয়ই চায় না।"

আর-একজন মার্কিনভদ্রলোক আমেরিকার একখানি সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন—"শ্বেতকায়েরা পছন্দ করে না যে একজন কৃষ্ণকায় ব্যক্তির সহিত কোনো শ্বেতাঙ্গিনীর বিবাহ হয়। সেইজন্য এরূপ মিশ্র বিবাহের বিরুদ্ধে আইন প্রচলিত করিবার প্রস্তাব হইতেছে। আইন চলিলে ফল এই হইবে যে যাহারা বৈধ সমাজানুমোদিত উপায়ে মিলিত হইত তাহারা অবৈধভাবে মিলিত হইবে। মিলনের ইচ্ছা যে শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায় উভয় জাতীয় লোকের মধ্যেই রহিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অবৈধ মিলনের প্রচলনও আছে যথেষ্ট। নীচশ্রেণীর লোকেই যে কেবল এরূপ অবৈধমিলনের পক্ষপাতী এমন নয়, আমরা জানি খুব সম্ভ্রান্ত লোকেও এরূপ মিলনে বদ্ধ হইয়া থাকেন। লক্ষ লক্ষ মার্কিন যাঁহাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ এরূপ মিলনকে ঘৃণা করেন নাই, এবং এরূপ মিলন-জাত সন্তানগণকে সমাজের ঘৃণা হইয়া দুর্গতির পঙ্কে নিমজ্জিত হইতে দেখিয়াও অবিচলিত ছিলেন।"

লোকে বলে সাদায়-কালোয় মিলন অস্বাভাবিক প্রকৃতিবিরুদ্ধ। অস্বাভাবিক হইলে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ অবৈধ-মিলনজাত ব্যক্তি রহিয়াছে কেন? যেমন আইনই চালান হউক এরূপ মিলন ঘটিবেই। অতএব বৈধ মিলন ঘটার পথে যাহাতে কোনো অন্তরায় না থাকে সেই চেষ্টা করাই উচিত। নিগ্রোদের মুখপত্র ক্রাইসিস এই আইনের অপকারিতা দেখাইতেছেন।

সু।

* *
*

স্পেনের যুবতী পল্লীবালা। রামোঁ জুবিঔরের অঙ্কিত।

বোবা কালার চিত্র—

স্পেনে দুই ভাই আছে, দুজনেই চিত্রকর; তাহাদের নাম ভালেণ্ট্যা জুবিঔর (Valentin Zubiaurre) ও রামোঁ জুবিঔর (Ramon Zubiaurre)। ইহাদিগের দুই ইন্দ্রিয় রুদ্ধ হওয়াতে ইহাদের কাজের বরং সুবিধাই হইয়াছে—কেহ বাজে বকিয়া তাহাদের সময় নষ্ট করে না, তাহারাও মুখ বুজিয়া আপন মনে কাজ করে, চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হইয়া আপন লক্ষ্যের দিকেই নিবদ্ধ থাকে। তাহাতে তাহাদের চোখে বস্তুর স্ব-রূপটি মর্ম্মকথাটি ধরা পড়ে, আলোর বিচিত্র খেলা ও ছায়ার অপরূপ সুষমা ধরা পড়ে; জেলে-বৌ বা চাষার পোর রোদপোড়া মুখ, পিচ

স্পেনের পাড়াগেঁয়ে লোকের নমুনা। ভ্যালেন্তাঁ দ্য জুবিওঁরের অঙ্কিত।

।জাপানের বিবর-বাসী লোকেদের বাসস্থান।।

ফলের মকমল-কোমল ত্বকের বা আপেল ফলের লালচে আভা সমান সুন্দর বলিয়া ঠেকে। আজকালকার বিশ্বপ্রাণতা শিল্পীদের দেশীয় বিশেষত্ব মুছিয়া দিতেছে। কিন্তু ইহারা কালা বোবা, বিশ্বের অর্দ্ধেক তাহাদের কাছে রুদ্ধ, এজন্য তাহাদের চিত্র খাঁটি স্বদেশী, তাহার মধ্যে স্পেনের বিশেষ মূর্ত্তিটি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের চিত্রে স্পেনেরই দৃশ্য, স্পেনেরই মানুষ, স্পেনেরই ঐতিহ্য, স্পেনেরই নিজস্ব সুখ দুঃখ আকার পাইয়াছে। কলাকুশল মৌলিকতা তাহাদের বস্তুতন্ত্র চিত্রগুলিতে ভাবের কোমলতা মাখাইয়া আবছায়া মরমিয়া করিয়া তুলিয়াছে। সমস্তই বাস্তব, কিন্তু বিশেষ কিছু দেখিয়া বা নকল করিয়া চিত্রগুলি যে আঁকা হইয়াছে, তাহা মনে করা যায় না। ইহাদের নরনারী পল্লীর সন্তান, যাহারা সহরে থাকিয়াও সহুরে হয় না। বাড়ী ঘর, নদীর গর্ভে নুড়ির বিছানা, স্পেনের গ্রামের ছবি—যাহা যাহা হাতের কাছে চোখে পড়িয়াছে উহারা তাহাই চিত্রে স্থান দিয়াছে, কেবল যাহার পর যেটি সাজে সুবিন্যস্ত করিয়া সাজাইয়া, হুবহু নকল করিয়া নহে। ইহাদের বয়স এখন সবে ৩৬ ও ৩৩ বৎসর। স্পেনে বড় বড় ওস্তাদ চিত্রকর জন্মিয়াছেন; কিন্তু এমন করিয়া স্পেনের বিশেষ ছবি কেহ বড়-একটা আঁকেন নাই; স্পেনের পল্লীজীবনের নিখুঁত ছবি আঁকিয়াছে ইহারা। ইহাদের চিত্র কলারসিকের চক্ষে সৌন্দর্য্যের মহাভোজ; আনাড়িদের কাছেও ইহা স্পেনের মর্ম্মের সহিত পরিচয়-সাধন। ইহাদের চিত্রে হয় আপেল নয় কমলা স্পেনের চিহ্নরূপে আঁকা থাকে; জাপানীদের যেমন চেরীমঞ্জরী, স্পেনবাসীদের তেমনি আপেল স্বদেশের চিহ্ন, আর ভারতবর্ষের চিহ্ন পদ্ম।

* *
*

বিবর-বাসী-মানব—

জাপানের সাইতামা জেলার মাৎসুয়ামা গ্রামের চারিদিকে যে খুব নীচু পাহাড় আছে, তাহার গায়ে অসংখ্য ছোট ছোট কৃত্রিম গুহা আছে; পাহাড়গুলি যেন একএকটা বোলতার চাক। দূর হইতে দেখিলে গাংশালিকের বাসার মতন মনে হয়। পুরাতত্ত্ববিদেরা

জাপানের বিবর-বাসী লোক বিবরে প্রবেশ করিতে যাইতেছে।

কেহবা বলেন ঐগুলি মৃতদেহ রক্ষার কবর, পরে উহাতে গৃহহীন ভিক্ষুক চোর ডাকাত বা ফেরারী আসামীরা আশ্রয় লইত; কাহারও মতে ঐগুলি জাপানের আদিম অধিবাসী সুচিগুমো অর্থাৎ ভুঁই-মাকড়সা-দের আবাসস্থল। এই ভুঁই-মাকড়সা জাতি আইনু জাতিরা জাপানে আসিবারও পূর্ব্বকার বাসিন্দা। গুহাগুলি সমস্তই পাহাড়ের দক্ষিণ পাশে; তাহাতে শীতকালে সেগুলি খুব রৌদ্র পায়; গুহাদ্বারে বসিয়া থাকিলে বহুদুর পর্য্যন্ত সমতল ক্ষেত্রে দৃষ্টি চলে; ইহা হইতে অনুমান হয় যে যাহারা বলে এগুলি বাসের জন্য নির্ম্মিত তাহাদের কথাই ঠিক; বাসিন্দারা গৃহদ্বার হইতেই শত্রুর আগমন বহুদুর হইতে দেখিয়া আগে-ভাগেই সাবধান হইতে পারিত। গুহাগুলির আকার সব সমান নয়; কিন্তু গঠনপ্রণালী সব সমান। বড় গুহাগুলি ৫।৬ ফুট উঁচু, এবং ৬ ফুট লম্বা চওড়া। বড় ঘরগুলিতে নুইয়া ঢোকা যায়, কিন্তু ছোটগুলিতে ঢুকিতে হইলে হামাগুড়ি দিয়া বা বুকে হাঁটিয়া সরীসৃপের মতন ঢুকিতে হয়। ঘরের মধ্যে দেয়ালের দুধারে দুটা করিয়া বেদির মতন আছে; তাহার উপর ঘাসপাতা বিছাইয়া গৃহবাসী শয়ন করিত বোধহয়। গুহার গায়ে এখনো বাটালি গাঁইতির কাটা দাগ আছে। তোকিওর রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ ৎস্বয় ছয় মাসে মাটি খুঁড়িয়া ২০০ গুহা আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই ঢালু পাহাড়ের গায়ে ঘাস ও গাছপালায় ঢাকা পড়িয়া এখনো কত যে গুহা ও কত যে তত্ত্ব গুপ্ত আছে তাহার ঠিকানা নাই। ১৩১৭ সালের ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতে (৫৫০ পৃষ্ঠায়) আফ্রিকা ও ইংলণ্ডের বর্ব্বর বিবর-বাসী মানবের একটি বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

চারু।

* *
*
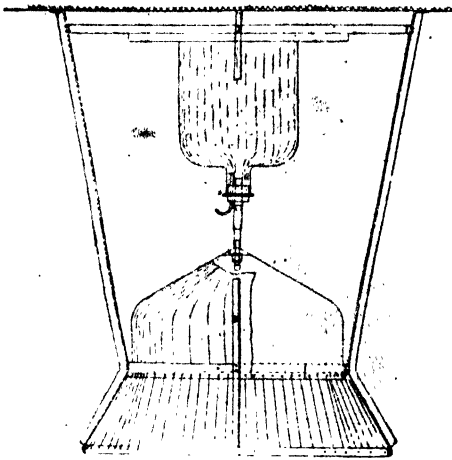
বায়ুতে ঝুল কালি ভুসা মাপিবার যন্ত্র।

বায়ু পরীক্ষা—

বৃষ্টি বা বরফপাতের পরিমাণ যেমন মাপা যায়, সম্প্রতি একটি নব-উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে তেমনি যে-কোনো সহরের ঝুল ভুসা পড়াও মাপা সম্ভবপর হইয়াছে। এই যন্ত্র দিয়া নিরূপিত হইয়াছে যে ভয়ানক কুয়াশা সত্ত্বেও লণ্ডনের বায়ু বার্মিংহাম, ম্যাঞ্চেষ্টার প্রভৃতি কারখানা-বহুল সহরের বায়ু অপেক্ষা অনেক নির্ম্মল। এই নূতন যন্ত্র দিয়া যেমন কালির পরিমাণ মাপা যায় তেমনি কালির উৎপত্তি কারখানার চিমনি হইতে না রন্ধনশালার উনান হইতে তাহাও স্থির করা যায়। কারখানার চুল্লীর আগুনের উত্তাপ খুব বেশী, তাই তাহা হইতে যে মলিন ধূম নির্গত হয়, তাহার ভুসা চিমনি দিয়া বাহির হইয়া যাইবার পূর্ব্বেই পুড়িয়া যায়; কিন্তু রাঁধিবার জন্য বা ঘর গরম করিবার জন্য যে-কয়লা ব্যবহৃত হয় তাহার ধোঁয়া অতি সহজেই বাহিরের বাতাসে মিশিয়া যায়। সেই হেতু সহরের ভুসা ঝুল কালির উৎপত্তি বেশীর ভাগ বসতবাড়ীর ধোঁয়া হইতে। একটি ভারি লোহার ফ্রেমের উপর একটি এনামেলের ফানেল বসান থাকে। ফানেলের তলায় থাকে একটি বোতল। ফানেলের তলার নলটি ঐ বোতলের মুখের মধ্যে প্রবিষ্ট। যেখানে বাতাসের বা ঝুলকালির দৌরাত্ম্য বেশী নয়, এমন একটি মুক্ত স্থানে ভূমির উপর যন্ত্রটি রাখা হয়। ঝুল-কালি ধূলাবালি বা অন্যান্য মলিন পদার্থ আপনাআপনি বা বৃষ্টির জলের সঙ্গে ফানেলের উপর আসিয়া পড়িয়া বোতলের মধ্যে জমা হয়। মাসান্তে উহা সংগ্রহ করিয়া রাসায়নিক পরীক্ষকের নিকট পাঠানো হয়। তিনি নিরূপণ করেন উহার মধ্যে জল, কঠিন পদার্থ, দ্রবনীয় পদার্থ, অদ্রবনীয় পদার্থ, আলকাতরা জাতীয় পদার্থ, অঙ্গার, চূন, অ্যামোনিয়া প্রভৃতির পরিমাণ কত।

* *
*

রঙে চটা উঠে কেন ?—

কাঠের উপর যে রঙ লাগান হয় তার উপরকার প্রলেপ কিছুকাল পরে সংহত ও কঠিন হইয়া ওঠে। ফলে হয় উপরকার প্রলেপটি ফাটিয়া যায়, নয় উহা পাতলা হইয়া পড়ে। তলার প্রলেপটি নরম থাকিলে উপরকার প্রলেপ শুকাইবার সময় উহাকে টানিয়া তোলে, সেইজন্য রঙ চটিয়া যায়। তলার প্রলেপ কঠিন হইলে এরূপ ঘটে না, উপ-রের প্রলেপ কেবল গুটাইয়া পাতলা হইয়া যায়।
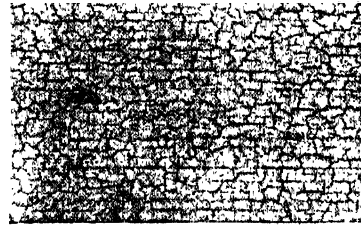
রঙের চটা।

তলার প্রলেপটি যতদুর সম্ভব কঠিন হওয়া আবশ্যক। সেইজন্য রঙের মধ্যে এমন কোনো পদার্থ থাকা উচিত নয় যা আপনা হইতে বা অন্য কিছুর সংযোগে যথেষ্ট পরিমাণ কঠিন হইবে না। সকল রঙেতেই তৈল দেওয়া হয়। রং শীঘ্র শুকাইবার জন্য এমন তৈল ব্যবহৃত হওয়া উচিত যা বায়ুসংস্পর্শে শীঘ্রই কাঠিন্য প্রাপ্ত হইবে। সাধারণত তিসির তৈল ব্যবহৃত হয়।

সম্ভবত রঙ চটা নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায়, দুইটি প্রলেপের মধ্যে যথেষ্ট সময়ের ব্যবধান রাখা।

রঙের উপর সরু সরু চুলের মত রেখা পড়ে। পরীক্ষা করিয়া দেখা

গিয়াছে উহা রঙের প্রলেপ ভেদ করিয়া একেবারে কাঠের উপর গিয়া পৌঁছে। ঐ-সব অল্প-পরিসর ফাঁকের মধ্যে দিয়া স্যাঁতা প্রবেশ করিয়া কাঠ ও রঙের প্রলেপের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে, ফলে রঙের প্রলেপ কাঠ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। রঙের চাক্‌লা উঠিবার ইহাই কারণ।

সাধারণত রঙের প্রলেপ পুরু হইলেই রঙ চটিয়া যায় বা রঙের চাক্‌লা ওঠে। নূতন করিয়া রঙ করিতে হইলে পুরানো রঙ শিরিশ কাগজ দিয়া ঘসিয়া তুলিয়া ফেলিয়া অপেক্ষাকৃত পাতলা প্রলেপ লাগাইতে হয়। পুরানো প্রলেপ খুব পুরু থাকিলেই এরূপ করা আবশ্যক।

আর-একটি উপায়ে রঙ চটা নিবারণ করা যায়। রঙ করিবার পূর্ব্বে কাঠ সম্পূর্ণরূপে শুকাইয়া লইতে হয়। উহাকে যতখানি সম্ভব সঙ্কুচিত হইতে দিয়া তারপর রঙ করা ভালো।

সু।

* *
*

সেণ্ট জেরোমী।
কাহারও মতে ইহা ফ্রা ফিলিপ্পো লিপ্পির আঁকা; কাহারও মতে ফ্লোরেঞ্জো দি লোরেঞ্জোর আঁকা। ইহা র‍্যাফেল, বতিচেলী প্রভৃতির চিত্রের সহিত এক শ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য বলিয়া সমজদারেরা মনে করেন।

অজানা ওস্তাদের উৎকৃষ্ট চিত্র—

আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইটালীয় চিত্রকরদের যে চিত্র-সংগ্রহ আছে তেমন সংগ্রহ আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের নাই। এগুলি জেম্‌স্ জ্যাকসন জারভেস নামক একজন আমেরিকানের সংগ্রহ, চিত্র-সংখ্যা ১৬০। এগুলি সব ১২৫০-১৫০০ সালের মধ্যে অঙ্কিত। এই সময়টাকে ইটালীয় শিল্পের যৌবনকাল বলা হয়। এগুলি জারভেস অতি স্বল্পমূল্যে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়কে বিক্রয় করে; তখন কেহ এগুলির কদর বুঝে নাই। এখন ইহার মূল্য দু শ গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। চোখে দেখিতে অসুন্দর, আড়ষ্ট, পরিপ্রেক্ষিতে ও ছায়া-সুষমায় ভুল আছে, বলিয়া এ-গুলিকে তখনকার লোকেরা হতাদরই করিয়াছিল; কিন্তু শিল্প বুঝিবার শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মন দিয়া ভাব বুঝিবার শক্তি বাড়িয়া উঠাতে এখন সকলে ইহার মাধুর্য্য ও তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়াছে। অক্ষর পরিচয় না থাকিলে যেমন ভাষা পড়া যায় না, উচ্চারণের প্রণালী না জানা থাকিলে যেমন ঠিক উচ্চারণ করা যায় না, দ্রব্যের বা অর্থের সহিত শব্দের সম্পর্ক না জানিলে যেমন ভাবগ্রহ হয় না, তেমনি চিত্র ভাস্কর্য্য প্রভৃতি শিল্পেরও প্রাণের কথা বুঝিতে হইলে তাহারও বিশেষ শিক্ষার আবশ্যক; যাহারা শুধু চোখে দেখিয়া শিল্পের ভালো মন্দ বিচার করে তাহারা প্রায়ই ভুল করে; মনে বুঝিয়া রস অনুভব করিয়া শিল্পের মাধুর্য্য ও তাৎপর্য্য ধরিতে হয়। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ম্যাথার বলেন—এইসব চিত্রের কোনো-কোনটি সাধারণ লোকের চক্ষে দেখিতে মোটেই সুন্দর নয়; কর্কশ ও কমনীয়তা-বর্জ্জিত বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু যাহার চোখ ফুটিয়াছে, যে কলা-রসিক, তাহার কাছে সেগুলি দিব্য সুন্দর।

এই সঙ্গে মুদ্রিত ছবি তিনখানির চিত্রকর অখ্যাত কিন্তু তাহারা চিত্রাঙ্কন করিতে ওস্তাদ। সাসেত্তা ওরফে স্তেফানো দি গিয়োভান্নির চিত্রে ভারতীয় কাংড়া উপত্যকার অঙ্কনপদ্ধতিতে পরিপ্রেক্ষিত ও পশ্চাৎদৃশ্য অঙ্কিত হইয়াছে, ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। চিত্রখানির বিষয় ঋষি এণ্টনির তপস্যাভঙ্গ। স্থানের নির্জ্জন শান্তভাব, অপ্সরার অকস্মাৎ আবির্ভাব ও ঋষির মনোবিকার-হেতুক চাঞ্চল্য চিত্রে সুস্পষ্ট। লুক্কা- সিগ্নোরেল্লির চিত্রখানি যেন একখানি গাথা কাব্য। য়িহুদি পুরোহিতেরা নবজাত যীশুকে পূজা করিতে আসিয়াছে—তাহাদের ভঙ্গিতে পূজার নতি ও আভিজাত্যের গর্ব্বাড়ম্বর দুই একসঙ্গে প্রকাশ পাইয়াছে। এই চিত্রে একটি গতি-চঞ্চলতার ভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

চারু।

মায়ের প্রাণ

(প্রবাসীর দশম পুরস্কার প্রাপ্ত গল্প)

পাঁচ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইলে রমেশচন্দ্র মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিল এক্ষণে সে বিমলাকে বাসায় আনিয়া একরূপ সবদিক সামলাইয়া চলিতে পারিবে। সেই দিন হইতে মেসের রান্নাটা রমেশের নিকট নিতান্ত অখাদ্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল,—নির্জ্জন প্রান্তরমধ্যস্থ প্রবাস-কুটীরের সঙ্গীহীন জীবনটা বড়ই অশান্তিময় বলিয়া জ্ঞান হইতে লাগিল।

রমেশচন্দ্র পশ্চিমে কোন রেলওয়ে আফিসে চাকরি করে। ইচ্ছা সত্ত্বেও এতদিন স্ত্রীকে বাসায় আনিতে পারে

সেণ্ট আণ্টনির তপস্যাভঙ্গ। স্তেফানো দি গিয়োভান্নি (সাস্সেত্তা) কর্ত্তৃক অঙ্কিত।
এই চিত্রের পশ্চাৎদৃশ্যের সহিত ভারতীর প্রাচীন চিত্রের পশ্চাৎদৃশ্য-অঙ্কনপদ্ধতির একটি খুব মিল দেখিতে পাওয়া যায়।

"মা, মেসে খেয়ে খেয়ে স্বাদ আস্বাদ আর কিছু জ্ঞান নাই, বাড়ী এসে যা খাই—বেশ লাগে।" রমেশের কথাগুলি মায়ের প্রাণে মৃদু আঘাত করিল। কাতরস্বরে মাতা বলিলেন—"মরে যাই বাবা, কি করব বাবা, পোড়া পেট তো বোঝে না। তা না হলে আজ পেটের দায়ে তোকে বিদেশে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকি!" ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া পুনরায় বলিলেন—"তা এক কাজ কর্—আমার মাথা খা'স্—বৌমাকে এবার বাসায় নিয়ে যা। আর কত কাল কষ্ট করে কাটাবি বাবা!"—মাতার শেষোক্ত বাক্য শ্রবণে কতক আনন্দে ও কতক লজ্জায় রমেশের মস্তক নত হইয়া পড়িল। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিল মা কি সত্যসত্যই সরল প্রাণে বলিতেছেন, না, আমার মন রাখিবার জন্য বলিতেছেন! কই এতদিন তো এমন কথা একবারও

নাই; কারণ, অল্প বেতন। এবং তাহার মাতাও কখন পুত্রবধূকে পুত্রের সহিত বাসায় পাঠাইবার চেষ্টা করেন নাই। সে কারণে রমেশ মাতার উপর অনেকদিন হইতে মনে মনে অভিমান পোষণ করিয়া আসিতেছে। রমেশের সংসারে এক বৃদ্ধামাতা, এবং এক মাতৃহারা ভাগিনেয় ভিন্ন অন্য কেহই ছিল না। রমেশ এতদিন স্ত্রীকে বাসায় আনিতে পারে নাই। কিন্তু এক্ষণে সে মনে মনে স্থির করিল যে,—মা একবার অনুরোধ করিলেই বিমলাকে সে বাসায় লইয়া আসিবে।

ছুটি লইয়া রমেশ বাটী আসিয়াছে। প্রবাসী পুত্র বাটী আসিয়াছে—মায়ের প্রাণ আনন্দে অধীর হইতেছে। কি করিলে পুত্র সুখী হয়, সেই চেষ্টাতেই বৃদ্ধামাতা সর্ব্বদা ব্যস্ত। একদিন রমেশ আহারে বসিলে মাতা পার্শ্বে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা, মাছের ঝোলটা কেমন হয়েছে?" রমেশ মৃদু হাস্য করিয়া উত্তর করিল—

বলেন নাই!—রমেশ মাতৃস্নেহে সন্দেহ করিল। পরে দুগ্ধের পাত্রটি কোলে টানিয়া লইয়া অভিমানের স্বরে বলিল—"তা কি হয়! তুমি একলা বাড়ীতে কি করে থাকবে!" মাতা—"কেন পারব না বাবা! তুই বিদেশে কষ্টে দিন কাটাবি, আর আমি এখানে সুখে থাকব—তার চেয়ে মরণ ভাল আমার। বাবা, তোরা সুখে স্বচ্ছন্দে, ধনে পুত্রে লক্ষ্মীশ্বর হয়ে বেঁচে থাক্—তাতেই আমার সুখ। আর আমি কিছুই চাই না।"—কথা কয়েকটি বলিতে বলিতে বৃদ্ধার চক্ষু দুইটি অশ্রুসিক্ত হইবার উপক্রম হইল। রমেশ আহার শেষ করিয়া উঠিতে উঠিতে বলিল—"আচ্ছা তাই হ'বে।" মাতাও উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, তাই ঠিক করে ফেল্ বাবা—আর অমত করিস্ না।" রমেশ নীরব সম্মতি প্রদান করিল।

দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইয়া মাতাপুত্রের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া বিমলার প্রাণ আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। কিন্তু

আবার ভাবিল—এটা কি ভাল হবে। বুড়ো মা একা বাড়ীতে থাক্‌বেন; আর আমাকে উনি বাসায় নিয়ে যাবেন।—না, দশের চক্ষে এটা ভাল দেখাবে না।—বিমলা চিন্তা করিতে করিতে রমেশের পরিত্যক্ত আহার-পাত্র লইয়া পাকশালে প্রবেশ করিল।

বিমলাকে বাসায় লইয়া কিরূপ-ভাবে নূতন সংসার গুছাইবে, এইরূপ নানা চিন্তা করিতে করিতে প্রফুল্লচিত্তে সন্ধ্যার পর রমেশ যখন তাসের আড্ডায় প্রবেশ করিল, অমনি এক-জন বন্ধু তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"কি রে! এবার নাকি গিন্নিকে গলায় ঝুলুবি?"—কথাটা শুনিয়া রমেশ একটু বিরক্ত হইল। একটু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিল—"হ্যাঁ, সেইরকম মতলব করছি তো!"

মাজিদিগের খ্রীষ্ট পূজা। লুকা সিঞোরেল্লী কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

এই চিত্রখানিকে একটি গাথা বলিয়া প্রশংসা করা হয়। মাজিদিগের আভিজাত্য-গর্ব্ব পূজায় নতিতেও চিত্রে সুস্পষ্ট হইয়াছে। ইহার রঙের বিচিত্রতার মধ্যে সামঞ্জস্যও নাকি খুব চমৎকার।

বন্ধু—"কাজটা কি ভাল হবে! বুড়ো মা বাড়ীতে থাকবে, আর তুই বৌ নিয়ে বাসায় যাবি—।" রমেশ অন্যমনস্কভাবে উত্তর করিল—"তার আর কি কচ্ছি বল!"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া, শরীর অসুস্থ বলিয়া রমেশ তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বিদায় লইল। পথে চিন্তা করিতে করিতে চলিল—চারিদিকে বাধা। আমি আমার স্ত্রীকে যেখানে খুসি লইয়া যাই, তাহাতে অন্যের কি? আর ইহারাই বা কি করিয়া জানিল, যে, আমি বিমলাকে বাসায় লইয়া যাইব! বোধ হয় মা বলিয়াছেন। বোধ হয় কেন, মাই বলিয়াছেন।—চিন্তা করিতে করিতে রমেশ বাটী আসিয়া পৌছিল। আহারান্তে গম্ভীর ভাবে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। আজ তাহার মায়ের উপর অভিমানের মাত্রাটা আরও অধিক বৃদ্ধি পাইল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে বিমলাকে লইয়া রমেশ কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেল। কিন্তু সামান্য একটা অসম্বন্ধ কারণে অযথা মাতৃ-স্নেহে বঞ্চিত হইয়া, মনে একটা অশান্তি পোষণ করিয়া গেল। আজ রমেশ অনুসন্ধানও করিল না যে মায়ের প্রাণ কি!—বুঝিতেও চেষ্টা করিল না—মায়ের মনে কি আছে। মূর্খ বুঝিল না—কুটিল সে, না মা।

রমেশ রওনা হইয়া গেলে বৃদ্ধা গৃহে প্রবেশ করিয়া বধূ-মাতার অভাবটা বেশ উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। কারণ বিবাহের পর হইতেই বিমলা তাঁহার নিকট ছিল। একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বৃদ্ধা মনে মনে বলিলেন—"এখন নির্ব্বিঘ্নে তারা বাসায় গিয়া পৌঁছাইলে বাঁচি।" এমন সময়—রমেশের ভাগিনেয়—নিরু নিকটে আসিয়া বলিল—"হ্যাঁ দিদিমা! মামীমা যে চলে গেল, আমরা খাব কি?"—নিরুর মস্তকে হস্ত রাখিয়া বৃদ্ধা বলিলেন—"কেন! ভাত খাব!"

নিরু—"কে রাঁধবে?"

বৃদ্ধা—"কেন! আমি?"

নিরু—"তোমার যে কষ্ট হবে।"

বৃদ্ধা—"তা হলেই বা!"—মনে মনে বলিলেন—আমার কষ্ট আমি দেখিনা দাদা,—রমেশ আমার সুখে থাক্।

আজ তিন দিন হইল রমেশ কর্ম্মস্থলে পৌছিয়াছে।

স্বামী স্ত্রীতে অনেক মাথা ঘামাইয়া, যেখানে যে জিনিসটি সাজে সেটি সেইখানে সাজাইয়া, ছোট সংসারটি বেশ গুছাইয়া পাতিয়া লইয়া, দুইটি প্রাণ এক হইয়া, সেই রেলকোম্পানির সঙ্কীর্ণ বাসাটিতে সুখে দিন কাটাইতে লাগিল।

একদিন রাত্রে আহারান্তে বিমলা যখন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল,—তখন অদূরবর্তী রেলওয়ে ষ্টেসন্ হইতে ৯টা ১৩ মিনিটের গাড়ীখানা ছাড়িয়া গেল। রমেশ নিদ্রাগত ছিল। কিন্তু সে নিদ্রা অধিকক্ষণ টিকিল না। বিমলার চুড়ির শব্দেই ভাঙ্গিয়া গেল। সে উঠিয়া বসিল। বিমলা তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিল। সম্মুখস্থ উন্মুক্ত বাতায়নপথে রমেশ চাহিয়া দেখিল—সুবিস্তীর্ণ অসমতল কঙ্করময় ভূখণ্ড তাহার বিশাল বক্ষ পাতিয়া পড়িয়া আছে। সে বক্ষে কি ভীষণ নিস্তব্ধতা। সেই নিস্তব্ধতার মাঝে মাঝে মহুয়া ও পলাশ বৃক্ষ তাহাদের মস্তক উন্নত করিয়া নিঝুম দাঁড়াইয়া আছে। চন্দ্র-কিরণ দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া যেন সেই নিস্তব্ধ বক্ষে আসিয়া প্রতিহত হইতেছে। ধূ ধূ—সুদূর প্রান্তে পর্ব্বতশ্রেণীর গাত্রে, শুষ্ক গুল্ম-লতা বৃক্ষ-শাখা-পত্রের অগ্নি-শিখা অতি মনোরম শোভা ধারণ করিয়াছে। যেন পর্ব্বতশ্রেণী অগ্নিমাল্য পরিধান করিয়া, কাহার প্রতীক্ষায় অনড় অচল হইয়া বসিয়া আছে। মধ্যে মধ্যে মৃদু হাওয়া সুদূর অরণ্যনিবাসী সাঁওতালগণের বাঁশের বাঁশীর মধুর সঙ্গীতের করুণ মূর্চ্ছনা বহন করিয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া রমেশ ও বিমলার গাত্রে কি একটা সুখানুভবের শিহরণ জাগাইয়া যাইতে লাগিল। রমেশ দেখিয়া শুনিয়া মুগ্ধ হইল। সে মনে মনে নিজেকে বড় সুখী জ্ঞান করিল। আবেগভরে বিমলাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"বিমলা! দেখ—কেমন সুন্দর রাত!" বিমলা মৃদু হাস্য করিয়া বলিল—"সত্যি—খুব সুন্দর।" রমেশ বিমলার আরও নিকটস্থ হইয়া, নিজ হস্তের মধ্যে তাহার দক্ষিণ হস্তখানি ধারণ করিয়া বলিল—"দেখ বিমলা, আমি অনেক দিন থেকে ভেবে আস্‌ছি—তোমাকে আমার কাছে নিয়ে আস্‌ব; কিন্তু কি করব বল! মা যদি একদিনও মুখ ফুটে বলত, তা হলেই তোমাকে নিয়ে আস্‌তাম। আমি ত আর সেধে বলতে পারি না!"

বিমলা রমেশের প্রতি বক্রদৃষ্টি ফেলিয়া বলিল—"এখন তো এনেছ!"

রমেশ—"এনেছি বটে; কিন্তু মার বোধ হয় আমার উপর মনে মনে রাগ হয়েছে। মা যে খুব সরলমনে তোমাকে পাঠিয়েছে, আমার এমন বিশ্বাস হয় না।"—বলিতে বলিতে রমেশের মুখ গম্ভীরভাব ধারণ করিল। বিমলা রমেশের বাক্যগুলি শ্রবণ করিতে করিতে স্তব্ধ হইয়া রমেশের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। মুহূর্ত্তে তাহার অধর-কোণের মৃদুহাসি কোথায় সরিয়া গেল। সে অবাক হইয়া ভাবিতেছিল—এ কি? তাহার স্বামী যে তাহার মাতার বিষয়ে এমন কুবিশ্বাস পোষণ করে, তা তো সে জানিত না। সে জানে তাহার স্বামী মাতৃভক্ত।—তাহার পর বিষণ্ণ-বদনে ধীরে ধীরে উত্তর করিল—"সে কি? তুমি বলছ কি? মা সরলমনে আমাকে পাঠান নাই? একি কখনও হতে পারে? তুমি যাতে সুখী হও মার কি তাতে রাগ হতে পারে! এর আগে আমাকে আন্‌বার জন্য বলেন নাই,-কারণ তিনি জানেন তোমার আয় কম। তবে তোমারও এটা বিবেচনা করা উচিত ছিল যে—আমাকে বাসায় আন্‌লে, বাড়ীতে একা মায়ের বড় কষ্ট হবে। এই আমাকে বাসায় এনেছ, গ্রামের দশজনে বোধ হয় তোমার নিন্দা করছে!—"

বিমলার কথাগুলি শুনিতে শুনিতে রমেশের মুখে বিরক্তির ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। বিমলা তাহা লক্ষ্য করিয়া আর বেশী কিছু বলিতে সাহস করিল না। রমেশ উপাধানের উপর বামহস্ত রাখিয়া, তাহার উপর মস্তক রাখিয়া দক্ষিণহস্তে চক্ষুদ্বয় আবৃত করিয়া অভিমানভরে বলিল—"তা বেশ, তোমাকে বাসায় এনে যদি অন্যায় করে থাকি, শীঘ্রই না হয় তোমায় রেখে আসব।"—তারপর একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল—"তোমরা তো সুখে থাকো—আমি না হয় কষ্টে দিন কাটাব।"

কথার ভাবে বিমলা বেশ বুঝিল—রমেশের অভিমান হইয়াছে। সে রমেশের চক্ষুদ্বয়ের উপরিস্থিত দৃঢ়-আবদ্ধ হস্তখানি বলপূর্ব্বক অপসারিত করিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল—"মিছে কেন রাগ করছ? আমি যা ভাল বুঝলাম বললাম। অন্যায় কিছু বলে থাকি—আমায় ক্ষমা

কর। তুমি নিজেই বিবেচনা করে যা ভাল বোঝ কর। আমি বলি মার উপর রাগ না করে' মাকেও বাসায় নিয়ে এস। তা হলে সবদিক বজায় থাকবে। দেখ, মাকে কষ্ট দিয়ে কেউ কখনও সুখী হতে পারে নি। তুমি ত বারমাস বিদেশে থাক, কিছুই জান না। আমি জানি মার প্রাণ তোমার জন্যে কি করে। দুদিন তোমার চিঠি পেতে দেরী হলে, নাওয়া খাওয়া ভুলে পাগলের মত ছুটে বেড়ান। রোজ দুসন্ধ্যে বুড়োশিবের মন্দিরে গিয়ে মাথা খোঁড়েন। তুমি কিনা সেই মায়ের উপর—" ঠিক এই সময় রমেশ পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল। বিমলা বলিতে বলিতে থামিয়া গেল। রমেশ কোন কথা কহিতেছে না দেখিয়া সে অন্য কথা পাড়িয়া বলিল—"মার চিঠির উত্তর দিয়েছ ?" রমেশ নিদ্রার ভান করিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল—"না দিই নি—কাল দেবো।"—আর কোন কথা হইল না। বিমলা সে রাত্রিকার মত শয়ন করিল।

তার পর ছয় মাস চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু রমেশের নিকট এ ছয় মাস যেন ছয় মুহূর্ত্তের মত দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল। এবং তাহার মাতার নিকট ছয় বৎসর বলিয়া জ্ঞান হইল। কারণ সুখের সময়ের গতি অতি দ্রুত, এবং কষ্টের সময়ের গতি বড় ধীর বলিয়া মনে হয়।

ছয় মাস পরে পুনরায় যখন রমেশ বিমলাকে লইয়া বাটীর দ্বারে গিয়া পৌছিল, বৃদ্ধা মাতা ছুটিয়া গিয়া গো-শকটের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। রমেশকে দেখিয়া বৃদ্ধার মনে হইল, যেন তিনি আজ কতদিনের হারান ধন কুড়াইয়া পাইলেন। দুই বিন্দু আনন্দাশ্রুর গতি তিনি কোন মতে রোধ করিতে সক্ষম হইলেন না। আহা! সে যে মায়ের প্রাণ!

পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া কয়েকদিন বৃদ্ধার বেশ সুখেই কাটিতে লাগিল। দ্বিপ্রহরে রমেশ যখন তাসের আড্ডায় চলিয়া যায়, বিমলা তখন শ্বশ্রূমাতার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার অঙ্গ-সেবা করে। শ্বশ্রূমাতার এক প্রশ্নের সে শত উত্তর প্রদান করে। বৃদ্ধা যদি জিজ্ঞাসা করেন—"হ্যাঁ মা, সেখানে খাবার জিনিসপত্র কেমন পাওয়া যায়?"—তাহার উত্তরে বিমলা বলে—"খাবার জিনিস সবই পাওয়া যায়, কিন্তু বড় আক্রা। ইলিশ মাছটা মোটেই পাওয়া যায় না মা! ওদেশে মাছকে 'মছলি' বলে। মা! আমি দু-একটা সাঁওতালী কথা শিখেছি। সাঁওতালদের মেয়েরা বন থেকে শাক তুলে এনে মাঝে মাঝে আমাদের বাসায় বিক্রি করতে আসত—তাদের কাছে। তারা গরম ভাতকে 'লোলোদাকা' বলে! আর মা জানেন! ওখান থেকে কাশী গয়া খুব কাছে। মা! আপনিও এইবার চলুন না! কেমন কাশী গয়া দেখে আস-বেন!—" বৃদ্ধা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতেন—আমার বরাতে কাশীগয়া দেখা কি আছে মা? রমেশ আমার বেঁচে থাক; অদৃষ্টে থাকে—দেখব।—" বিমলা মিনতির স্বরে বলিত—"না মা, আপনার দুটি পায়ে পড়ি, আপনি একবার চলুন।" বৃদ্ধা যখন বুঝিতেন যে, তাহার বৌমাটি বড়ই নাছোড়-বান্দা, তখন অগত্যা বলিতেন—"আচ্ছা, রমেশকে বলে দেখব, যদি নিয়ে যায় যাব।—" এইরূপে কয়েক দিন বৃদ্ধার বেশ আনন্দেই কাটিল। কিন্তু সে আনন্দ বেশী দিন স্থায়ী হইল না। রমেশের ছুটি ফুরাইল। যাত্রার শুভদিন নির্দ্ধারিত হইল। মায়ের প্রাণ যেন কি একটা আশঙ্কায় কাঁদিয়া উঠিল। বৃদ্ধা মনে মনে ভাবিলেন—আর রমেশকে বিদেশে যাইতে দিব না। অনা-হারে মরিব সেও ভাল, তবু রমেশকে আর চোখের আড়াল করিব না। উচ্ছ্বসিত মাতৃস্নেহের কঠিন তাড়নার ক্ষণিক আবেগে মাতা মনে মনে যে বন্দোবস্ত করিলেন—অভাবের কঠোর আঘাতে তাহা সব ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। মাতা ভাবিলেন—'তবু পোড়া পেট তো বোঝে না।'

বধূমাতার অনুরোধে মাতা একদিন পুত্রের নিকট প্রস্তাব করিলেন—"বাবা রমেশ, তোর ওখান থেকে কাশী গয়া নাকি খুব কাছে, তা আমাকে একবার নিয়ে চলনা; আর কদিন বা বাঁচব! জীবনে কাশী গয়াটা তো আর হয় নি!" রমেশ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া উত্তর করিল—"কে বল্লে—ওখান থেকে কাছে? অনেক দূর। তার উপর এখন খরচপত্রের টানাটানি—" রমেশের কথাগুলির মধ্যে বেশ একটু উদাসীনতার আভাস প্রকাশ পাইল। কিন্তু মায়ের প্রাণ তাহা বুঝিতে পারিল না। মাতা বুঝিলেন—সত্যই ত রমেশের আমার খরচপত্রের টানাটুনি। রমেশকে কষ্ট দিয়া আমি কাশী গয়া করিতে যাইব! তীর্থভ্রমণ অপেক্ষা পুত্রের সুখ শতবার বাঞ্ছনীয়।

তাই রমেশের কথা শেষ হইতে না হইতেই বৃদ্ধা বলিয়া উঠিলেন—"না, না, তবে থাক, এখন আর যেতে চাই না।"

নির্দ্ধারিত দিনে বিমলাকে লইয়া রমেশ কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেল।

মাঘমাসে রেল আফিসের কয়েকটি বাবু সস্ত্রীক পশ্চিম-ভ্রমণে যাইবার বন্দোবস্তে বড়ই ব্যস্ত হইয়াছেন। তদ্দর্শনে রমেশের মনেও একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। গোপনে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া বিমলার নিকট একদিন মনোভাব প্রকাশ করিল। বিমলা আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিল—"পশ্চিমে কোথায় যাবে?" রমেশ—"মাঘমাসে এলাহাবাদে একটা বড় মেলা হয়। সে মেলাটা একটা দেখ্‌বার জিনিস। তারপর সেখান থেকে ফিরবার পথে কাশী, গয়া, বিন্ধ্যাচল দেখে আসা যাবে।"

বিমলা বিস্মিত হইয়া উত্তর করিল—"আচ্ছা তোমার নাকি খরচপত্রের টানাটানি? মা কোন দিন কিছু বলেন না, তিনি কত বড় আশা করে মুখ ফুটে কাশী যেতে চাইলেন—তুমি তাঁকে বুঝিয়ে দিলে তোমার খরচপত্রের টানাটানি। আর এখন তুমি আমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবে, এ কথা মায়ের কানে পৌছলে তিনি কি মনে করবেন বল দেখি?"

রমেশ—"আমি টাকা খরচ করে বেড়াতে যাচ্ছি না! রেলের পাস্‌ পেয়েছি।"

বিমলা—"তা বেশ, তবে মাকেও নিয়ে এস। সবাই একসঙ্গে যাওয়া যাবে।"

রমেশ কিয়ৎক্ষণ নীরবে কি চিন্তা করিয়া ম্লানমুখে বলিল—"তবে থাক্, আর গিয়ে কাজ নাই।"

স্বামীর ম্লান মুখ দেখিয়া বিমলা মুহূর্ত্তে কর্ত্তব্যবিচার ভুলিয়া গিয়া উত্তর করিল—"দেখ, রাগ কর কেন? তুমি আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে আমি যেতে রাজি আছি। কিন্তু—"

রমেশ—"কিন্তু আবার কি? তোমার কোন ভয় নাই। আমি এই তোমাকে ছুঁয়ে বলছি—মাকে এ কথা কিছুতেই জান্‌তে দেবো না।"

বিমলার আর কোন জবাব যোগাইল না। সে চুপ করিয়াই রহিল। কিন্তু কি যেন একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা তাহার শরীরটাকে কাঁপাইয়া তুলিতে লাগিল।

সেই সপ্তাহেই রমেশ বিমলাকে লইয়া পশ্চিমযাত্রা করিল। যাইবার কালীন আনন্দে আত্মহারা হইয়া বৃদ্ধা মাতার কথা সে একেবারেই বিস্মৃত হইল।

এদিকে বৃদ্ধা মাতা অনেকদিন পুত্রের কোন পত্রাদি না পাইয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এক দুই করিয়া প্রায় এক মাস হইতে চলিল, তথাপি রমেশের কোন পত্র আসিল না। উপর্য্যুপরি পত্র লিখিয়া টেলিগ্রাম করিয়াও কোন সংবাদ মিলিল না। ডাকপিয়নকে শতবার জিজ্ঞাসা করিয়াও বৃদ্ধা পুত্রের একখানি পত্র পাইলেন না। আহার নিদ্রা ভুলিয়া পাগলিনীর মত তিনি চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দিবারাত্রি রমেশের একখানি পত্রের জন্য দুর্গা কালীর নিকট মানত করিতে লাগিলেন। কিন্তু কই? পত্র আসিল না।

একদিন বিকালে বাহিরের ঘরে গিয়া বৃদ্ধা দেখিলেন জানালায় কাহার একখানি পত্র পড়িয়া রহিয়াছে। ক্ষিপ্রহস্তে পত্রখানি তুলিয়া লইয়া দেখিলেন রমেশের পত্র। হ্যাঁ, এই তো রমেশের অক্ষর। পিয়ন হয়ত জানালা দিয়া ফেলিয়া গিয়াছে—এই বিশ্বাসে মায়ের প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল। পত্রখানি বক্ষে চাপিয়া, দ্রুতপদে এক প্রতিবাসীর নিকট গিয়া বলিলেন—"দেখ তো বাবা, রমেশ কেমন আছে? নিশ্চয়ই তার অসুখ বিসুখ হয়েছে। তা না হলে সে চিঠি দিতে এত দেরি কখনও করে না।" প্রতিবাসী পত্র লইয়া ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—"একি? এ চিঠি তো আজ-কালকার নয়! এ অনেকদিনের চিঠি।"—মায়ের প্রাণ কিছুতেই বুঝ মানিতে চাহিল না, যে, সেখানা পুরাতন পত্র। বিস্মিত হইয়া বৃদ্ধা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাল করে দেখ বাবা, বোধ হয় আজকালকার পত্রই।" প্রতি-বাসী বলিল—"না, এ অনেকদিনের—৩রা কার্ত্তিকের।" —বৃদ্ধার মস্তকে যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। মুহূর্ত্তের জন্য পায়ের তলে ভূমিকম্পন অনুভব করিলেন। চক্ষে আঁধার দেখিলেন। আহা! তিনি যে কত বড় আশা করিয়া পত্রখানি লইয়া আসিয়াছিলেন। রমেশের কথা ভাবিতে ভাবিতে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বৃদ্ধা সে স্থান হইতে

প্রস্থান করিলেন। মায়ের প্রাণ পুত্রের নিকট যাইবার জন্ত আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিল। হায়, রমেশ হয়ত তখন স্ত্রীকে এলাহাবাদে 'খসরু-বাগ' দেখাইতেছিল।"

বাড়ী ফিরিয়া বৃদ্ধা গৃহের দাবায় বসিয়া পড়িলেন। তখন কেবলমাত্র সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। ঘরে ঘরে সাঁঝের বাতি জ্বলিয়াছে। বৃদ্ধা আজ সন্ধ্যার বাতি জ্বালিতেও ভুলিয়া গেলেন। তিনি বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন—"রমেশের আমার হল কি?" ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার গণ্ড বাহিয়া দুইবিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। অদূরে ঠাকুর-বাড়ীর লক্ষ্মী-নারায়ণের আরতির কাঁসর ঘণ্টার ধ্বনি মুহূর্ত্তের জন্যও মানুষের মনে ভক্তির আবেগ আনয়ন করিতেছিল। বৃদ্ধা সিক্তচক্ষে ভক্তি-গদগদ-কণ্ঠে বলিল—"বাবা নারায়ণ, রমেশের আমার সংবাদ আনিয়ে দাও বাবা। আমি দুধ-ঘী দিয়ে তোমায় নাওয়াব বাবা!"

সারা রাত্রি অনিদ্রার পর ভোররাত্রে তন্দ্রাঘোরে বৃদ্ধা স্বপ্ন দেখিলেন—যেন, রমেশ রোগশয্যায় পড়িয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে ও মাঝে মাঝে—'মা গো মা' বলিয়া চীৎকার করিতেছে। পুত্রের সেই কাতর-ডাকেই যেন বৃদ্ধার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া দুর্গানাম স্মরণ করিতে লাগিলেন। কি একটা ভাবী আশঙ্কায় তাঁহার জীর্ণশরীর থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। 'ভোরের স্বপ্ন সত্য হয়' এই বিশ্বাসে মাতা ঠিক বুঝিলেন যে পুত্রের অসুখ হইয়াছে। মায়ের প্রাণ আর তো ধৈর্য্য মানিল না। সেই দণ্ডেই উড়িয়া পুত্রের পার্শ্বে যাইতে চাহিল। বৃদ্ধা স্থির করিলেন—নিরুকে তাহার পিতার নিকট পাঠাইয়া দিয়া, সেই দিনই রমেশের নিকট চলিয়া যাইবেন।

প্রায় একমাস পরে রমেশচন্দ্র পশ্চিম ভ্রমণ করিয়া রাত্রি ১২টার গাড়ীতে কর্ম্মস্থানে আসিয়া পৌঁছিল। সে মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে গিয়া নিজ বাসায় প্রবেশ করিল। আজ রমেশের এ ভাব কেন? তাহার মুখে সে আনন্দের ভাব নাই। চক্ষে সে প্রফুল্লতা নাই। মুখেচোখে যেন বিষম একটা নৈরাশ্যের ছায়া পড়িয়াছে। যেন কতদিন অনিদ্রা ও অনাহারে তাহার শরীরটা আধখানা হইয়া গিয়াছে। আর তাহার সঙ্গে নাই—বিমলা।

পরদিন রমেশ প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইল। সমস্তদিন শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে করিতে কাতরস্বরে কতবার 'মা গো মা' বলিয়া যন্ত্রণা প্রকাশ করিতে লাগিল। তন্দ্রা-ঘোরে কতবার পার্শ্বোপবিষ্ট কাহাকে ধরিতে হস্ত প্রসারণ করিল। ললাটে কাহার শীতল-কোমল কর-স্পর্শ অনুভব করিতে প্রাণে প্রবল ইচ্ছা হইল। কিন্তু কে কোথায়? আছে,—গৃহকোণে বিমলার অপরিহার্য্য স্মৃতিমাখান, আবরণ-আবৃত একটি ষ্টীল্ ট্রাঙ্ক্। তাহার উপর একখানি আয়না, চিরুণী ও সিন্দূরের কৌটা। তাহার পার্শ্বে দুইখানি ছিন্ন ও শূন্যমলাট পুরাতন প্রবাসী মাসিকপত্র। আর আছে, অর্দ্ধ-শূন্য একটি কুন্তল-কৌমুদী তৈলের শিশি। বিমলার এই শেষ চিহ্নগুলি দেখিতে দেখিতে রমেশের অন্তর-রুদ্ধ বেদনার রাশি প্রবল বেগে উছলিয়া উঠিল। সে দুই হস্তে তাহার শোক-দগ্ধ বক্ষ চাপিয়া, উপাধানে মুখ লুকাইয়া ভাবিতে লাগিল—এই আমার সাধের বাসা, যেখানে বিমলাকে লইয়া কত যত্নে সুখের খেলাঘর পাতিয়াছিলাম! কিন্তু, দুইদিনে আমার সব ভাঙ্গিয়া গেল। কেন গেল! বিমলাই একদিন বলিয়াছিল যে—'মাকে কষ্ট দিয়া কেহ কখনও সুখী হইতে পারে না।' মা তোমায় কষ্ট দিয়াই বুঝি আমার এ সুখ সহিল না। মা! আজ প্রায় এক মাস যে তোমার কোন খবর লই নাই!—ভাবিতে ভাবিতে রোগ-শয্যায় শায়িত রমেশের জ্বরতপ্ত গণ্ড বাহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু অতি ধীরে গড়াইয়া পড়িয়া উপাধানে মিশিয়া গেল। রমেশ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া যন্ত্রণা-ব্যঞ্জক-স্বরে বলিল—"উঃ, মা গো।" এমন সময় সে ললাটে কাহার কর-স্পর্শ অনুভব করিল। সে স্পর্শ কত শীতল, কত শান্তিদায়ক। স্পর্শ মাত্রেই যেন রমেশের সকল যন্ত্রণা কোথায় সরিয়া গেল। চমকিত হইয়া রমেশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। তাহার দুর্ব্বল শরীর কাঁপিতে লাগিল। সন্ধ্যার ঈষৎ অন্ধকারে সে বেশ দেখিল—শয্যাপার্শ্বে কে নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। কম্পিত কণ্ঠে রমেশ জিজ্ঞাসা করিল—"কে?"

—"বাবা রমেশ,—আমি! বাবা তোর এমন অসুখ করেছে, তা আমায় একটা সংবাদ দিতেও নাই!"

বিস্মিত রমেশ উত্তর করিল—"এঁ্যা, কে? মা! তুমি

এখন এখানে কেমন ক'রে ?"— 'কেমন করে', তা তুমি কেমন করিয়া বুঝিবে রমেশ ? সে যে মায়ের প্রাণ। তুমি যে রোগ-শয্যায় পড়িয়া একবার 'মা' বলিয়া ডাকিয়া ফেলিয়াছ। আর কি মা থাকিতে পারে! পুত্র যদি বিপদে পড়িয়া একবার 'মা' বলিয়া ডাকে, তবে—অসীম ব্যবধানে থাকিয়াও মায়ের প্রাণ যে আপনি কাঁপিয়া উঠে! সে যে সংসারের সার সৃষ্টি—"মায়ের প্রাণ।"

বৃদ্ধা রমেশের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া তাহার পৃষ্ঠে হস্ত রাখিয়া বলিলেন—"বাবা, আজ একমাস যে তোর কোন খবর পাই নাই। প্রাণ তো আর বুঝ মান্‌লো না—তাই ছুটে এলাম।"

জ্বর-তপ্ত-হস্তদ্বয়ের মধ্যে মাতার হস্তখানি চাপিয়া ধরিয়া, নত মস্তকে করুণস্বরে রমেশ বলিতে লাগিল—"তা এসেছ বেশ করেছ মা। মা তুমি বড় আশা করে কাশী দেখ্‌তে চেয়েছিলে। কিন্তু আমি সে কথা রাখতে পারি নি। চল মা এইবার তোমায় নিয়ে কাশী যাই। আর এখানে থাক্‌ব না। মা, তোমায় কষ্ট দিয়ে, তোমার উপর মিছে অভিমান করে সুখ খুঁজতে গিয়েছিলাম,—কিন্তু তার বেশ ফল পেয়েছি।" বলিতে বলিতে রমেশের কণ্ঠস্বর যেন রোধ হইয়া আসিতে লাগিল। বৃদ্ধা দুইহস্তে তাহাকে ক্রোড়ের মধ্যে টানিয়া লইয়া ভীত কম্পিত-স্বরে বলিলেন—"কেন? কি হয়েছে বাবা! পাগলের মত তুই কি বকছিস্, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।—বৌমাই বা গেলেন কোথায়! ঘরে এখনও আলো দেওয়া হয় নাই। ও বৌমা! বৌমা!"

রমেশের বুকের মধ্যে যেন একটা প্রবল ঝড় বহিতে লাগিল। সে মাতার ক্রোড়ে থাকিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"আর কাকে ডাকছ মা? এখানে কেউ নাই।"

মাতা—"সে কি? বৌমা কোথায়?"

রমেশ—"সে আছে—কাশীর মণিকর্ণিকার ঘাটে। আগে বল মা, আমায় ঘৃণা করবে না! আমার উপর রাগ করবে না? তাহলে আমি সব কথা বল্‌ব।"

বৃদ্ধা—"বাবা সব কথা খুলে বল্‌। তোর কথা শুনে আমার বড় ভয় হচ্ছে!"

রমেশ বলিতে লাগিল—"তবে শোন মা। তুমি কাশী যেতে চেয়েছিলে। তোমায় ফাঁকি দিয়ে, তাকে নিয়ে আমি পশ্চিমে বেড়াতে গিয়েছিলাম। অনেক জায়গা ঘুরে ফিরে কাশীতে এসে তার কলেরা হল। অনেক চেষ্টাতেও তাকে আর বাঁচাতে পারলাম না। মা, জন্মের মত তাকে কাশীতে ফেলে এসেছি। মা, তোমায় ফাঁকি দিয়ে হাতে হাতে তার সাজা পেয়েছি।" রমেশ মায়ের কোলে মুখ লুকাইয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিল। পুত্রের কথা শুনিয়া বৃদ্ধার প্রথমে ভ্রম হইতেছিল—সে বুঝি বিকারের ঘোরে বকিতেছে। তারপর অঞ্চলে চক্ষু আবৃত করিয়া ক্রন্দন-বিজড়িত-কণ্ঠে বলিলেন—"বাবা এক মাসের মধ্যে এত কাণ্ড হয়ে গেল, আমি তার কিছুই জান্‌তে পারলাম না—" বৃদ্ধা পুত্রকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আজও—চন্দ্রকিরণ দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া, উন্মুক্ত বাতায়নপথে রমেশের আঁধার-গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। বসন্তের মৃদু-হাওয়া দূর-অরণ্য-বাসী সাঁওতালদের বংশী-ধ্বনি আনিয়া রমেশের নীরব-কক্ষে পৌঁছাইয়া দিতেছে। সে বাঁশীর তান আজ বড়ই করুণ লাগিতেছিল। তদপেক্ষা অধিক করুণ লাগিতেছিল—সেই পার্ব্বত্যদেশের প্রায় পাদপশূন্য বিপুলায়তন ভূখণ্ডমধ্যস্থ রেলওয়ে ষ্টেসনের বিশ্রামাগারের কোন বাঙ্গালী যাত্রীর মধুর কণ্ঠের বাঙ্গলাগান;—

> "—আর ত কেউ চাইলে না ফিরে,
> নিশার আঁধার এলো ঘিরে;—
> শেষে মনে হল মায়ের কথা
> নয়নের জলে।"

রমেশ ঠিক মাতৃক্রোড়ের শিশুর মতই কাঁদিতে লাগিল। আর বৃদ্ধা তাঁহার মাতৃ-হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ ঢালিয়া তাহাকে সন্ত্বনা দিতে লাগিলেন। মাতাপুত্রের এই দারুণ শোকের দৃশ্য দেখিতে আর কেহই ছিল না। কেবল দেওয়াল-গাত্রে রমেশ ও বিমলার একখানি প্রতিচ্ছবি সংলগ্ন ছিল—চেয়ারে উপবিষ্ট রমেশের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বিমলা। বিমলা যেন রমেশের কানে কানে বলিতেছিল—"তুমি আজ মা চিনিয়াছ দেখিয়া আমি মরিয়াও সুখী হইলাম। আমার শেষ কথা, জীবনে কখনও মাতৃস্নেহে সন্দিহান হইও না। মাতৃস্নেহে কৃত্রিমতা নাই। মাতৃ-বাক্য

আশীর্ব্বাদ জ্ঞানে সর্ব্বদা নতশিরে মানিয়া চলিবে। মায়ের প্রাণে ব্যথা দিও না। তাঁকে সুখী করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। তাহা হইলে নিজেও সুখী হইতে পারিবে।"

রমেশ মায়ের প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া, ঠিক দুষ্টছেলের মত কাঁদিয়া কাটিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া মায়ের কোলেই ঘুমাইয়া পড়িল।

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সেখ আন্দু

(৩)

লতিকা নিজের ঘরে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া চুল-গুলা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া গুছাইয়া লইতেছিল। পাশে হেলান কেদারায় লাবণ্যময়ী জ্যোৎস্না শুইয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিল। উভয়েই বেড়াইবার বেশভূষায় সজ্জিতা।

লতিকার রূপরাশি রৌদ্রালোকের ন্যায় তীব্র উজ্জ্বল, জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য্য স্নিগ্ধ পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার ন্যায় মনোরম; লতিকা ঈষৎ খর্ব্ব ও স্থূল, জ্যোৎস্না একহারা অথচ অল্প দীর্ঘাকার; জ্যোৎস্নার মুখভাব রমনীয় কোমলতাব্যঞ্জক, লতিকার মুখভাব নারী-দুর্লভ দম্ভমণ্ডিত; জ্যোৎস্না শান্ত, লতিকা চঞ্চলা।

কেশপ্রসাধন সমাধা করিয়া লতিকা ফিরিয়া দাঁড়াইল। টেবিলের ফুলদানী হইতে মালা-ছড়াটি তুলিয়া হাতে জড়াইতে লাগিল। জ্যোৎস্না কাগজখানা রাখিয়া সহাস্যে বলিল "স্বয়ম্বরে নাকি?"

বক্রহাস্যে লতিকা বলিল "স্বয়ং আছি, বর কই?"

দ্বারের পর্দ্দা সরাইয়া পরিমল ঘরে ঢুকিল, "গাড়ী হয়েছে!" পরিমল লতিকার ভ্রাতা। জ্যোৎস্না হাসিল, "রথও তৈরী!"

লতিকা গম্ভীর হইয়া বলিল "অভাব যা, রথীর!" চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালক, তাহাদের রহস্য বিদ্রূপের মর্ম্ম বুঝিল না, পরিমল নিজের জামার সামনেদিকটা ঝাড়িয়া দিয়া, নিশ্চিন্ত মুখে বলিল—"আন্দু সাহেব রয়েছে"—জামাটা টানিয়া পুনরায় সোজা করিল।

পরিমলের নির্ব্বুদ্ধিতায় জ্যোৎস্না হাসিল। লতিকা সকোপ কটাক্ষে বলিল "হতভাগা ছেলে!"

জ্যোৎস্না বলিল "আহা, গাল দিও না, ও সারথি হয়েছে। চল, এস।"

গালি খাইয়া পরিমলের রাগ হইল, বলিল "আমি যাব না—" জ্যোৎস্না তাহাকে অনেক করিয়া ভুলাইয়া লইয়া চলিল; সিঁড়িতে নামিতে নামিতে জ্যোৎস্না বলিল "সরসী কই?"

লতিকা পশ্চাৎ হইতে ডাকিল "খুকি আয়।"

"যাই"—বলিয়া খুকি ওরফে সরসী, একাদশবর্ষীয়া ক্ষীণকায়া সুন্দরী বালিকা এলোচুলে ফিতা বাঁধিয়া, সাদা ফ্রক ইজের পরিয়া, পড়িবার ঘর হইতে ছুটিয়া আসিল। সরসী চৌধুরী-সাহেবের মধ্যমা কন্যা, ভাগলপুর ইস্কুলে পড়ে। বেশ শান্ত শিষ্ট মেয়েটি। সরসীর পিছনে পিছনে জামা জুতা পরিয়া টুপী হাতে সমীরণও ছুটিয়া আসিল, সমীরণ চৌধুরী-সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র, সপ্তমবর্ষীয় বালক।

সমীরণকে দেখিয়া লতিকা দাঁড়াইল, বিরক্ত হইয়া বলিল "এই হয়েছে! তুমিও! তোমায় আমি নিয়ে যাব না, যাও ফিরে যাও।"

দিদির ধমকে থতমত খাইয়া সে দাঁড়াইল; দিদিকে সবাই ভয় করিত। সরসীর ইচ্ছা তাহাকে লইয়া যায়, কিন্তু দিদির মুখের উপর প্রতিবাদ করিবার সাহস তাহার ছিল না, সে করুণদৃষ্টিতে জ্যোৎস্নার পানে চাহিল। জ্যোৎস্না কিন্তু তৎপূর্ব্বেই বলিল "আহা আসুক আসুক, জামা জুতো পরে এসেছে।"

লতিকা তাড়না করিয়া বলিল "আসুক পরে। এক পাল ছেলে নিয়ে আবার বেড়াতে যায়!"

জ্যোৎস্না সমীরণের হাত ধরিয়া টানিয়া অগ্রসর হইল, মৃদুস্বরে বলিল "আমরা তো কারো বাড়ীতে যাব না, শুধু গঙ্গার ধারে ধারে একটু বেড়িয়ে আসব, একে নিয়ে যেতে দোষ কি?"

লতিকা আর কথা কহিল না। সকলে গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। ফটকের সামনে প্রাঙ্গণে, মোটর-গাড়ী রহিয়াছে। গাড়ীর ও-পাশে, মাটিতে জানু পাতিয়া আন্দু একটা লোহার ভারি রেঞ্জ লইয়া গাড়ীর স্ক্রুগুলা কসিয়া, ঠুকিয়া, দেখিয়া লইতেছিল। গাড়ীর উপর দাঁড়াইয়া

মঙ্গল খানসামা গদী ঝাড়িতেছে ; এবং বালক চাকর দেবীদীনু, গাড়ীর এপাশে দাঁড়াইয়া চাকার ধূলা ঝাড়িয়া, চাকার রবারে ভ্যাসিলিন ঘসিলে তাহার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হয় কি না, একমনে তাহাই পরীক্ষা করিতেছিল। অদূরে বাবালোকদের আসিতে দেখিয়া মঙ্গল খানসামার মনে সহসা নিজের সততা প্রচারের সাধু সংকল্প জাগিয়া উঠিল, সে তৎক্ষণাৎ উচ্চকণ্ঠে দেবীদীনের নষ্ট-বুদ্ধি-সম্ভূত ব্যাপারটিতে আন্দুর মনোযোগ আকর্ষণ করিল। দন্তে অধর চাপিয়া, রুদ্ধহাস্যে কৌতুকোজ্জ্বল মুখে আন্দু ঘাড় উঁচাইয়া উঁকি দিয়া দেবীদীনকে দেখিতে গিয়া দেখিল—ছেলেদের লইয়া সৌন্দর্য্যের সাগরে শোভার হিল্লোল তুলিয়া অদূরে ত্রিদিবের জলন্ত রূপের চলন্ত প্রতিমা-দ্বয়! আন্দু চট্ করিয়া মাথা নামাইয়া প্যাঁচ কসিতে বসিল, দেবীদীনুকে কিছু বলা হইল না।

সকলে গাড়ীতে উঠিল। লতিকা ও পরিমল একদিকে বসিল, অপরদিকে সরসী ও জ্যোৎস্নার স্থান নির্দ্দেশ হইল। সমীরণ গাড়ীতে উঠিতেই লতিকা ঈর্ষিতনেত্রে সরসীর পানে চাহিয়া বলিল "একে তো বাহাদুরী করে নিয়ে এলে! এবার বসে কোথা?—চলুক দাঁড়িয়ে!"

এ তিরস্কারের প্রচ্ছন্ন শ্লেষটুকু জ্যোৎস্নার গায়ে বাজিল। সে তাড়াতাড়ি বলিল, "আমি ওকে কোলে করে নিয়ে যাচ্ছি।"

আন্দু মাথায় টুপী তুলিয়া গাড়ীতে উঠিবার উদ্যোগ করিতেছিল, ছোট ভাইটির প্রতি লতিকার রূঢ়তা দেখিয়া তাহার বড় অস্বস্তি হইল, একটু রাগও হইল, শিক্ষিতা লতিকার—অন্ততঃ সাংসারিকতা হিসাবে, এটুকু বুঝা উচিত, যে সে বড় হইয়া সামান্য সামান্য কারণে ছোট ভাই বোনদের প্রতি যেরূপ বিদ্বেষ ব্যবহার করিতেছে, উহারাও ইহার পর তাহারই দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া অমনই বিদ্বেষপরায়ণ, নির্ম্মম হইয়া উঠিবে। আন্দু মোটর-কারের চাকায় জুতার ঠোক্কর মারিয়া বলিল "ছোট সাহেব, তুমি আমার কাছে এস, জায়গা হবে।"

ছোটসাহেবের পূর্ব্বেই বড়সাহেব লাফাইয়া উঠিল, পরিমল বলিল "আমি যাচ্ছি।"

কিন্তু তাহার যাওয়া হইল না। লতিকার ধমকে চঞ্চল বালককে পুনরায় যথাস্থানে বসিতে হইল। সমীরণ আন্দুর ক্রোড়ে উঠিয়া হাওয়া খাইতে চলিল।

(৪)

পরদিন কিসের উপলক্ষ্যে আদালত বন্ধ থাকায় সকালে আন্দুর ছুটি ছিল। সমস্ত সকালটা এর ওর তার সংবাদ লইতে কাটাইয়া,—ফিরিবার সময় আন্দু বাল্যের সুহৃদ, বর্ত্তমানের কুস্তির আখ্ড়ার ক্রীড়াসঙ্গী, ভবতারণ চাটুজ্যের সংবাদ লইতে গেল, সে কয়দিন কুস্তির আখ্ড়ায় যায় নাই। আন্দু বাল্যকাল হইতে তাহাদের বাড়ীতে যায়, সুতরাং একেবারে বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল "মা—"

ভবতারণের বর্ষীয়সী বিধবা ভগিনীকে আন্দু মা বলিয়া ডাকিত, তাহার কারণ ভবতারণ আন্দুর সহিত 'শ্বশুরজামাই' সম্পর্ক পাতাইয়াছিল। ভবতারণ আন্দুর হৃষ্টপুষ্ট সুগৌর সুঠাম চেহারায় মুগ্ধ হইয়া তাহাকে আদর করিয়া জামাই বলিয়া ডাকিত; ভবতারণের অবশ্য কন্যা নাই, সেও আন্দুরই সমবয়স্ক, এবং সদ্য বিবাহিত মাত্র।

আন্দু মা বলিয়া ডাকিতেই ভবতারণের জ্যেষ্ঠা ভগিনী রান্নাঘরের রোয়াক হইতে উত্তর দিলেন "বাবা—"

তিনি তখন বঁটী পাতিয়া কুট্‌না কুটিতেছিলেন, আজ একটু বেলায় রান্না চড়িয়াছে, কেননা ভবতারণের আফিস বন্ধ; ভবতারণ আদালতের একজন ৪৫৲ টাকা বেতনের কেরানী। ভবতারণ অমায়িক উদার প্রকৃতির যুবা।

আন্দু অগ্রসর হইয়া, দূর হইতে মুষ্টির উপর মাথা নত করিয়া, মাতৃসম্বোধিতাকে হিন্দুয়ানী-ধরণে প্রণাম করিল। এ ধরণে অভিবাদন সে শুধু এই পরিবারের রমণীদেরই করিত, অন্য কাহাকেও নয়। ভবতারণের বৃদ্ধা জননী রান্নাঘর হইতে হাত ধুইয়া বাহিরে আসিলেন। আন্দু তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি সস্নেহে বলিলেন "আমি আজই ভাবছিলুম, যে, নাৎজামাই আমার অনেকদিন আসেনি কেন? তারপর, ভাল তো ভাই?"

আন্দু বলিল "শ্বশুর কোথায় দিদিমা?"

হাসিয়া ভবতারণের দিদি বলিলেন, "তোমার নতুন শাশুড়ী এসেছে যে, শুনেছ?"—বলিয়াই ওদিকের বারান্দায়

ক্রীড়ারত সপ্তম বর্ষীয় পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন "ওরে হরু, মামাকে ডেকে দে, আন্দু দাদা এসেছে।"

হরু আন্দুকে এতক্ষণ দেখে নাই, এখন দেখিয়া "মামা" বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাক দিয়াই খেলা ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিয়া আন্দুকে জড়াইয়া ধরিল। আন্দু ব্যস্ত হইয়া বলিল, "এই যাঃ! মোছলমানকে ছুঁয়ে ফেল্লে—" তাহার কথা শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল। ভবতারণের দিদি বলিলেন "তা হোক, জামা কাপড় ছেড়ে ফেলবে।"

হাসিতে হাসিতে ভবতারণ গৃহ হইতে বাহির হইল। ভগিনীকে লক্ষ্য করিয়া অনুযোগের স্বরে বলিল, "যা হোক মা বটে! ছেলে রৌদ্রে টিটুচ্ছে, আর মা দিব্বি বঁটীতে বসে আছে!" ভবতারণের দিদি কি বলিতে যাইতেছিলেন। কিন্তু আন্দু মুখ ফিরাইয়া প্রশ্নের জবাব দিল, "মার কাছে আবার ছেলের আসন কি!—" সে হরুকে পৃষ্ঠে তুলিয়া লইল।

ভবতারণের দিদি বলিলেন "তোর যে জামাই এসে উঠোনে দাঁড়িয়ে রইল, তুই ঘরে ছিলি কোন হিসেবে?"

আন্দু বলিল "বউমা কি সত্যি এসেছেন?"

ভবতারণের জননী বলিলেন "হঁ্যা, এই কদিন হল এনেছি। যারে ভব, বাছাকে বসা গে যা।"

ভবতারণ দুষ্টামি করিয়া নিজে আন্দুর পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া বলিল "দিদি, তোমার ছেলের আক্কেল দেখ্‌লে? আমায় ছুঁলে!"

দিদি হাসিয়া বলিলেন "আমার ছেলে তো সোনার চাঁদ! তুমি যে মেথর ছুঁয়ে আসছ, তোমায় কে আঁটবে বল!"

ভবতারণ তৎক্ষণাৎ বলিল, "যদি জানছই, যে একদিকে তোমরা যতখানি আচার করে চল্‌ছ অন্যদিকে আমি ততখানিই অনাচারে চল্‌ছি, তবে এত ছোঁয়াছুঁয়ি বিচার কেন?"

দিদি কুটনোগুলি ধুইয়া থালায় সাজাইয়া রান্নাঘরের দিকে যাইতেছিলেন। ভ্রাতার কথায় হাসিয়া মাথা নাড়িয়া ক্ষুণ্ণভাবে বলিলেন "তা জানি না ভাই।"

আন্দুকে লইয়া ভবতারণ শয়ন-গৃহের দাওয়ায় আসিল। ভবতারণ গৃহ হইতে দুটি বেতের মোড়া বাহির করিয়া তাহাতেই দুইজনে বসিল। ভবতারণ পান আনিতে ঘরে ঢুকিল, আন্দু বলিল, "বউমা কি ঘরে আছেন?"

ভবতারণ গৃহমধ্য হইতে উত্তর দিল "হাঁ, শাশুড়িকে কুর্নিশ করবে না কি?"

আন্দু হাসিল, বলিল "না, আমার পৈত্রিক বাসস্থান চব্বিশ পরগণা, আমি চব্বিশ পরগণার লোকেদের প্রণাম করতে জানি,—" আন্দু চৌকাঠের উপর মুষ্টি রাখিয়া তাহাতে মাথা ঠেকাইল।

ভবতারণ গৃহমধ্য হইতে বলিল "তোমার শাশুড়ি জিজ্ঞাসা কচ্ছে, কি বলে আশীর্ব্বাদ করব? বিয়ে হয়েছে কি?"

আন্দু বলিল "না মা, বিয়েটুকু বাদ দিয়ে যা খুসী তাই বলে আশীর্ব্বাদ করুন।"

ভবতারণ বলিল "আশীর্ব্বাদ কচ্ছে তুমি বুদ্ধিমান, জ্ঞানবান, চরিত্রবান 'মানুষ' হও,—"

আন্দু পুনরায় নত হইয়া বলিল "মার আশীর্ব্বাদ সফল হোক।"

ভবতারণ পান লইয়া হাসিতে হাসিতে বাহিরে আসিল, বলিল "শাশুড়ি জামাইকে প্রতিনমস্কার কচ্ছে, কিছু আশীর্ব্বাদ কর,—বল সাধা স্বরে বাঁধা বোল,—চুপ কেন, বল—ছেলে হোক্‌।"

আন্দু বলিল "হঁ্যা ঐ আশীর্ব্বাদই মেয়েদের শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ। কিন্তু এখন নয়, ওঁর বয়স কত?"

"চোদ্দ।"

"তবে আমি এরই মধ্যে ছেলে হবার আহাম্মুখী আশীর্ব্বাদ করব না। ছেলে মানুষের ছেলে! সে আশীর্ব্বাদ নয়, অভিশাপ!—আমি ভগবানের নামে প্রার্থনা করছি নিজেরা আগে 'মানুষ' হোন্‌,—ছেলেকে আগে 'মানুষ' করবার ক্ষমতা হোক্‌, তার পর যেন হয়, আরো বছর পাঁচ ছয় পরে।"

ভবতারণ প্রীত মুখে তাহার পিঠ ঠুকিয়া বলিল "ঠিক্‌ কথা! বুদ্ধিমান জামাই বটে"—তাহার পর সহসা বলিল "ভাল কথা মনে পড়েছে আন্দু, সেদিন আখ্‌ড়ায় শুনছিলুম, তুমি নাকি পল্টনে ঢোক্‌বার চেষ্টা চরিত্র করছ?—"

আন্দু অপ্রতিভ হইয়া হাসিল, তাহার পর মুখ তুলিয়া মৃদুস্বরে সুধাইল, "কাজটা কি মন্দ?—"

উৎসাহিত ভাবে ভবতারণ বলিল, "খুব ভাল, পণ্টনের কাজ!—সাহসের চর্চ্চা, শক্তির চর্চ্চা, উদ্যমের চর্চ্চা!—বেশ করছ তুমি চেষ্টা কর,—তোমার কাজে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। জীবনের সঙ্গে মরণের ঝগড়া বরাবরই চল্‌ছে।—যুদ্ধ!—সে না হয় জীয়ন্ত মরণের সঙ্গে লড়াই;—কিন্তু তাতে কতখানি তেজস্বিতা, কতখানি নির্ভীকতার উদ্বোধন, সেটাও ভেবে দেখা উচিত; শুধু মরণের ভয়ে সমস্ত জীবনটা কাবু করে রাখা ঠিক নয়।"

উত্তেজনার আবেগে ভবতারণের কণ্ঠস্বর ক্রমে উচ্চে উঠিতেছিল, আন্দু মৃদু হাস্যে বলিল "একটু আস্তে—মায়েরা ওখানে রয়েছেন—"

ভবতারণ হাসিয়া বলিল, "মিছে নয়। ওঁরা শুন্‌লে এখনি পা ছড়িয়ে কাঁদতে বস্‌বেন। দেখ্‌বে একটু রগড় করব—"

ভবতারণ উঠিতেছিল, আন্দু অসহিষ্ণুভাবে তাহার হাত ধরিয়া বসাইল, বলিল "আঃ কি কর, মেয়েমহলে বীরত্ব ফলিয়ে ছেলেমানুষী করতে হবে না।"

ভবতারণ সহাস্যে বলিল "ঐ দেখ, বাঙ্গালীর ছেলে, জাতীয় পৌরুষ কি ভুল্‌তে পারি, অভ্যাসের দোষে মুখের আস্ফালনটা মেয়েমহলেই বেশী রাষ্ট্র কর্ত্তে ইচ্ছে হয়!"

আন্দু মৃদুস্বরে বলিল, "পুরুষত্বের সাধনা চাই, মন্দ অভ্যাস জয় করতে হবে।"

ভবতারণ বলিল "এ কর, ও কর, তা কর, বলবার লোক ঢের পাচ্ছি, কিন্তু করবার শক্তি যে খুঁজে পাচ্ছি না।"

ভবতারণ ক্রীড়াচ্ছলে আন্দুর হাতে হাত দিয়া প্যাঁচ লড়িতে লাগিল। কিছু বলিল না। আন্দু উপস্থিত প্রসঙ্গ চাপা দিয়া বলিল "আচ্ছা ভাল কথা, আমাদের আখ্‌ড়ায় একটু গোলমাল চলছে, আখড়ার নামে একটা বদনাম উঠেছে, শুনেছ?"

ভবতারণ বলিল "সে ত শুনলুম, ঐ লক্ষীছাড়া লছ্‌মী ভকতকে নিয়ে যত গোল বেঁধেছে,—"

আন্দু ক্ষণেক নীরবে রহিল, তাহার পর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া দুঃখিতভাবে বলিল "এঃ! ছি ছি ছি! লছমী ভকত,—আমাদের চেয়ে ছেলেমানুষ, বেচারী এই বয়েসে এমন করে উচ্ছন্ন গেল, ভারি আপশোষের কথা। সত্যি কথা বল্‌ছি, তার ছেলেমানুষী রঙ্গ দেখে আমি তার ওপর এত খুসী ছিলুম, যে, বলতে পারি না, আমি নিজের ভাইয়ের মত তাকে ভালবাসতুম। আহা, হতভাগা এমন করে বয়ে গেল!"

ভবতারণ বলিল "বাপের পয়সা আছে, বড়লোকের ছেলে—"

সকাতরভাবে আন্দু বলিল "আহা ও যদি লেখা পড়া শিখে সচ্চরিত্র হত তা হলে কত উপকারে লাগত!—ওকে নষ্ট হতে দেওয়া হবে না।—"

"ওকে শোধরায় কার সাধ্য?"

"কেন, তোমার, আমার। তোমাকেই এই ভারটি নিতে হবে।"

ভবতারণ বলিল "ও সব আমার চেয়ে তোমার মাথায় কিন্তু পরিষ্কার খেলে আন্দু, ওসব বিষয়ের ভার তুমি নাও।"

আন্দু হাসিল, "আমি যে অস্থিত-পঞ্চানন, ভাগলপুরের অন্নজল যে কোন্ মুহূর্ত্তে আমার ফুরিয়ে যাবে, তার ত ঠিক নেই। অবশ্য যতদিন থাক্‌ব ততদিন তোমার উপলক্ষ্য আছি, কিন্তু তার পরে—"

ভবতারণ বিস্ফারিত চক্ষে আন্দুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "আচ্ছা আন্দু, সত্যি বল ত তোমার জীবনের লক্ষ্যটা কি?"

"আমার জীবনের লক্ষ্য!"—শান্তভাবে হাসিয়া আন্দু বলিল "আমার জীবনের লক্ষ্য?—সকলের সঙ্গে আমার জীবন জড়িয়ে রয়েছে, সকলের শুভ ভিন্ন আমার শুভ নাই, এই মোটা ধারণাটা মনের মধ্যে পুষে ভগবানের নাম নিয়ে সকল ভাল চেষ্টায় হাত দেবো, তার পর ঈশ্বরের ইচ্ছা!—"

ভবতারণ হাসিয়া বলিল "গাড়ী চালান, গুলি চালান তোমার চোখে একই কথা,—আচ্ছা একটা ছেড়ে আর-একটায় ঝুঁকছ কেন তবে?"

"দুটি মত্‌লবে। গুলির নামে সকলেরই একটা গুরুতর আতঙ্ক আছে, অনেকে ইচ্ছা সত্ত্বেও তাই এ কাজে এগুতে পারে না। আমার কেউ কোথাও নাই, কাজেই নির্ভাবনা, সুতরাং গুলিটা ঠিক আমারই উপযুক্ত—" একটু হাসিয়া বলিল "আর-এক কথা,—আমার চাকরীটির একটি বেকার উমেদার জুটেছে, সে এখানকারই বাসিন্দা, মা আছে, স্ত্রী আছে, ছেলেপুলে আছে, সুতরাং এইখানেই

একটি কাজ পেলে তার ভারি উপকার হয়, তাই খসবার চেষ্টায় আছি।”

“কে লোকটা?”

“আখড়ার পিয়ারী সাহেব।”

“তোমার মুনীব তোমায় ছাড়বেন?”

“না ছাড়েন, নিজেই খসব।”

ভবতারণ চুপ। স্থির দৃষ্টিতে মুগ্ধ নয়নে আন্দুর গর্ব্ব-লেশশূন্য সরল হাস্যস্মিত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

আন্দু উঠিয়া দাঁড়াইল, “আমি তবে আসি, অনেক বেলা হয়েছে,—” আন্দু স্ত্রীলোকদের পুনরায় প্রণাম করিয়া বিদায় লইল। ভবতারণ দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিল, ক্ষুণ্ণভাবে বলিল, “আন্দু, তুমি চলে যাবে শুনে মনটা ভারি দমে গেল।”

আন্দু কোমল হাস্যে বলিল “ভালবাসা কি চোখে? ভালবাসা প্রাণে!”

রাস্তায় নামিয়া চাদরে মাথা ঢাকিয়া, রৌদ্রে ঝলসিত দ্বিপ্রহরের পথ অতিবাহন করিতে করিতে আন্দু মনের আনন্দে গান ধরিল,—

“নয়নের নেশা নহে ভালবাসা—”

(৫)

কলহপীড়াক্রান্ত ব্যক্তির স্বভাব, সে বাহিরে কাহারো সহিত কলহের কোন উপকরণ খুঁজিয়া একান্ত না পাইলে বাতাসকে ধরিয়া ছিদ্র খুঁজিয়া দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয়; কেহ শুনুক না শুনুক, ব্যাধি বিকারের তাড়নায়, তাহাকে অন্ততঃ ঐ-টুকু করিতেই হইবে, না হইলে নিস্তার নাই। আমাদের জীবনের অতৃপ্তি-রাগিণীর সুরও সেই ভাবে বাঁধা। তাহার সহস্র সুখেও শান্তি নাই, সহস্র সৌভাগ্যেও স্বস্তি নাই,—তাহার জগতে সবই আছে, নাই শুধু সন্তোষ!

বিকালে চৌধুরী-সাহেব নিজের বসিবার ঘরে চটিপায়ে ইজের পরিয়া গ্রীষ্মাধিক্য-হেতু অনাবৃত দেহে কৌচে বসিয়া নথী দেখিতেছিলেন। পিছনে দাঁড়াইয়া একজন খানসামা হাতপাখায় বাতাস করিতেছিল। এমন সময় লতিকার পশ্চাতে জ্যোৎস্না আসিয়া ঘরে ঢুকিল। বৈকালিক ডাক বিলি হইয়া গিয়াছিল, উভয়েই চিঠির তদন্তে আসিয়াছে।

সোনার চশমার ভিতর হইতে চক্ষু তুলিয়া উভয়কে দেখিয়া চৌধুরীসাহেব নথীটা পাশে রাখিয়া কৌচে কনুইয়ের ভর দিয়া সোজা হইয়া বসিলেন, সাদরে বলিলেন “এস মা এস, কেমন আছ? কোন কষ্ট হয় নি ত?—” লতিকার দিকে চাহিয়া বলিলেন “কই মা, তোমরা আজ বেড়াতে যাওনি?”

লতিকা অপ্রসন্ন মুখে সংক্ষিপ্তভাবে বলিল “না।”

চৌধুরীসাহেব পাশের বেতের চেয়ারটা টানিয়া জ্যোৎস্নাকে ব্যগ্রভাবে বলিলেন “বস মা বস,—” খানসামাকে বলিলেন “ওরে ওটা থাক্, বড় পাখাটা টান।”

পাখা চলিতে লাগিল, জ্যোৎস্না নম্রভাবে আসন গ্রহণ করিল। লতিকা নিতান্ত উদাসীনভাবে টেবিলের কাছে চেয়ারে বসিয়া দাঁতে আঙ্গুল কামড়াইতে লাগিল। সরল-হৃদয় নিয়তকর্ম্মচিন্তাশীল চৌধুরীসাহেব, তাহার সে ভাব-বৈলক্ষণ্য বুঝিতে পারিলেন না, আপন মনে এদিক ওদিক কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। লতিকা কথা কহিল না, জ্যোৎস্না মৃদুভাবে উত্তর প্রত্যুত্তর দিতে লাগিল। হঠাৎ অন্য কথার মাঝখানে লতিকা অসহিষ্ণুভাবে জিজ্ঞাসা করিল—“বাবা, আমাদের চিঠিপত্র কিছু এসেছে?”

চৌধুরীসাহেব হঠাৎ বিস্মৃতি স্মরণে, প্রৌঢ়ত্ব-কুঞ্চিত ললাটে চক্ষু তুলিয়া মাথা উঁচাইয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন “হাঁ হাঁ, তোমাদের খানকতক চিঠি আছে, ভুলে গেছি, টেবিলে আছে, নাও,—” জ্যোৎস্নাকে বলিলেন “তোমার দাদাবাবুর চিঠি পেলুম মা, তিনি দিন চার পাঁচ পরে মুঙ্গেরে আসবেন, সেখান থেকে তোমায় নিতে এখানে আসবেন লিখে-ছেন,—তোমারও চিঠি আছে দেখে নাও।”

চৌধুরীসাহেব নথীখানা আবার তুলিয়া দেখিতে লাগি-লেন। জ্যোৎস্না টেবিলের কাছে আসিয়া দেখিল তাহার পিতার পত্র; তিনি দাদাবাবু অর্থাৎ জ্যোৎস্নার মাতামহের সহিত তাহাকে কলিকাতায় যাইতে আদেশ করিয়াছেন, এবং বন্ধুপরিবারের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। লতিকাকে তাহার দুইজন শিক্ষয়িত্রী দুইখানা পোষ্টকার্ডে সংক্ষিপ্ত মঙ্গলাশিস প্রেরণ করিয়াছেন, এবং আর-একখানা রঙীন্ পুরুখাম বোম্বের ছাপ দেওয়া তাহার নামে আসি-য়াছে, সেখানা লতিকা মুঠায় পুরিল। সেখানা লতিকার

ভাবী পতি, ডাঃ চক্রবর্ত্তীর পত্র। চক্রবর্ত্তী এম্, বি, পাশ করিয়া বোম্বের মেডিকেল কলেজে এম, ডি, পড়িতেছেন। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই তিনি বিবাহ করিয়া ব্যবসায়ে ব্রতী হইবেন। দুঃখের বিষয় দুইবার পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়ায় চৌধুরী সাহেবের আদেশে পুনরায় পরীক্ষা দিবার চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু পরীক্ষার অপেক্ষা পত্র লেখার উৎসাহ তাঁহার এতই গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে, যে, পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতার আশা অভিজ্ঞগণের মনে সুদূরপরাহত বলিয়া বোধ হয়। চিকিৎসক শরীরতত্ত্ব অপেক্ষা মনস্তত্ত্বে বিশেষ মনোযোগী হইলে তাহা যে নিতান্তই দুর্লক্ষণ এবং তাহা যে মোটেই কল্যাণকর নহে, এ কথা অনেকে তাঁহাকে বার বার স্মরণ করাইয়া দিলেও তিনি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না, তাহার কারণ অভিভাবক তাঁহার খরচ যেরূপেই হউক নিয়মিত জুটাইতেন, এবং তিনিও সময় এবং অর্থ, এ দুটির অযথা অপব্যয়ে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত ছিলেন না। অভাব যে মানুষের শুধু অবনতি করে, তাহা নহে, উন্নতিও করে।

নিজের চিঠি লইয়া জ্যোৎস্না গৃহত্যাগ করিল। কারণ চিঠিখানির উত্তর এখনই লিখিতে হইবে। লতিকাও তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইতেছিল, গোপনে নির্জ্জনে বোম্বের চিঠিখানা দেখিবে বলিয়া—কিন্তু সেই সময় চৌধুরীসাহেব নথী পড়িতে পড়িতে খানসামাকে বলিলেন, "ওরে আন্দুকে একবার ডাক্ তো!"

লতিকা উদ্যতচরণ সম্বরণ করিয়া টেবিলের উপরে একখানা খোলা বই ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে লাগিল।

খানিক পরে আন্দু আসিয়া জুতা খুলিয়া ঘরে ঢুকিল। চৌধুরীসাহেবকে অভিবাদন করিতেই তিনি ঘাড় তুলিয়া সহাস্যে বলিলেন "তোমার যে কাজ পড়েছে বাবা।"

আন্দু সবিস্ময়ে বলিল "হুকুম করুন।"

"কাল বেলা দশটার মধ্যে আমায় হাইকোর্টে পৌঁছে দিতে হবে, একটা আপীলের মামলা আছে।"

"বেশ ত।"

"ভোর চারটের সময় এখান থেকে ছাড়্‌বে, বেলা সাড়ে ছটায় আসানসোলে পৌঁছে আমায় চা খাওয়াবে, তারপর সেখান থেকে ছেড়ে বেলা সাড়ে আটটার মধ্যে আমায় ব্যাণ্ডেলের হোটেলে পৌঁছে দিতে হবে, ঘণ্টাখানেক পরে সেখান থেকে ছেড়ে হাইকোর্ট—বুঝ্‌লে, পারবে তো?"

তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়িয়া সেলাম দিয়া আন্দু বলিল "বহুৎ খুব।"

আন্দু প্রস্থানের উপক্রম করিতেই চৌধুরীসাহেব বলিলেন "দেখ, ভোর বেলা উঠতে হবে বলে' তুমি যেন সমস্ত রাত শ্মশান জাগিয়ে বসে থেক না। আমি নিজে তোমাদের ভোর বেলা উঠিয়ে দেব। রাত্রে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিও, বুঝ্‌লে!"

কোন প্রয়োজনীয় কাজে নির্দ্দিষ্ট সময়ে চৌধুরীসাহেবকে স্থানান্তরে পৌঁছাইয়া দিতে হইলে, কর্ম্মোৎসাহী আন্দু রাত্রে ঘুমাইতে পারিত না। চৌধুরীসাহেবের কাজ উৎরাইলে তবে সে নিশ্চিন্ত হইত। তাহার প্রশংসনীয় কর্ম্মদায়িত্বজ্ঞান, চৌধুরীসাহেবকে বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিত, পাছে অনিয়মে আন্দুর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। তাই তিনি পূর্ব্বাহ্নে তাহাকে সতর্ক করিয়া দিতেন।

হাসিয়া সসম্ভ্রমে মস্তক নত করিয়া আন্দু চলিয়া গেল।

একটা উৎকট উত্তেজনায় লতিকার ধমনীতে রক্তস্রোত দ্রুতবেগে ছুটিতে লাগিল। টেবিলটা দৃঢ়ভাবে চাপিয়া, সে বুক পর্য্যন্ত নুইয়া বইখানা দেখিতে লাগিল।

সেও কি এইসঙ্গে একবার কলিকাতা ঘুরিয়া আসিতে পারে না?—প্রস্তাবটা কি পিতার কাছে অসঙ্গত বিবেচিত হইবে?

হঠাৎ বিদ্যুতের মত অন্য একটা চিন্তা তাহার মনে ঈর্ষার তীব্রঝিলিক্ হানিয়া গেল! জ্যোৎস্না যদি যাইতে চায়! কি ভয়ানক!—সে আন্দুর প্রতি তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখিয়াছে,—তাহার পবিত্র সুন্দর দৃষ্টি সর্ব্বদাই নত বটে, কিন্তু কে জানে কেন জ্যোৎস্নাকে দেখিলেই তাহার সেই দৃষ্টি অতিমাত্রায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে। আন্দু যে জ্যোৎস্নার সহিত মুখ তুলিয়া কথা কহিবে, কিম্বা তাহার মাধুর্য্যস্মিত টানা চক্ষু দুটি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া ভাবিবে—"সুন্দর বটে!"—সেটি লতিকা কিছুতেই হইতে দিবে না। চৌধুরী-সাহেবের কলিকাতা যাওয়ার সংবাদটাও জ্যোৎস্নাকে জানান হইবে না। ভাগ্যে তাহার সমক্ষে পিতা একথা বলেন নাই!

কঠিনভাবে ওষ্ঠ চাপিয়া লতিকা অত্যন্ত শক্ত হইয়া চলিয়া গেল।

চৌধুরী-সাহেব দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের কূট সমস্যার মীমাংসায় মাথা ঘামাইতে লাগিলেন। কন্যার ভাবের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পারিলেন না।

(৬)

পরদিন প্রাতে নির্দ্দিষ্ট বন্দোবস্ত অনুসারে চৌধুরী-সাহেব দুইজন ভৃত্য ও আন্দুকে লইয়া মোটরকারে কলিকাতা চলিয়া গেলেন।

একটু বেলা হইলে, লতিকাকে না দেখিতে পাইয়া জ্যোৎস্না তাহার শয়নকক্ষে খুঁজিতে গেল; দেখিল লতিকা চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া আছে, একজন হিন্দুস্থানী দাই তাহার পা টিপিতেছে, লতিকা খুব ছটফট করিতেছে। লতিকার কপালে হাত দিয়া জ্যোৎস্না জিজ্ঞাসা করিল "জ্বর হল কখন?"

লতিকা প্রথমত কথা কহিল না। দুই তিনবার জিজ্ঞাসিত হইয়া বিরক্তস্বরে বলিল, "কাল রাত্রে।

থার্ম্মমিটার ঝাড়িতে ঝাড়িতে সরসী ঘরে ঢুকিল। দাই পা ছাড়িয়া সরিয়া বসিল। সরসী বলিল, "দিদি ফিরে শোও।"

দিদি কথা কানে তুলিল না। আপন মনে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া 'উঃ আঃ' করিতে লাগিল। সরসীর কথা লতিকা আদৌ গ্রাহ্য করিতেছে না দেখিয়া জ্যোৎস্না নিজে থার্ম্মমিটার লইয়া লতিকার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নেহময় স্বরে বলিল—"ফিরে শোও না ভাই।"

বারম্বার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে লতিকা ত্যক্ত হইয়া সবেগে ফিরিয়া শুইয়া সতেজে বলিল "দাও।"

জ্যোৎস্না যেন থতমত খাইয়া গেল। কয়দিন হইতে লতিকার ক্রুর দৃষ্টি এবং কঠোর আচরণগুলা ক্রমাগত তাহার চিত্ত অপ্রসন্ন করিয়া তুলিতেছিল। ধৈর্য্য ধরিয়া নির্ব্বিবাদে সহিষ্ণু জ্যোৎস্না তাহার ব্যবহারগুলা সহ্য করিয়া চলিতেছে, দাম্ভিকা লতিকা সকলের উপরই যেন সপ্তমে চড়িয়া আছে! বিশেষতঃ কয়দিন হইতে জ্যোৎস্না বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছে যে লতিকা তাহার প্রতি একটা বিদ্বেষময় স্বাতন্ত্র্যভাব গাম্ভীর্য্যের অন্তরালে গোপন রাখিয়াছে, কার্য্যক্ষেত্রে অতর্কিতে সেটা চোখে বেশ ধরা পড়িতেছে। জ্যোৎস্না শান্তভাবে থার্ম্মমিটারের দিয়া দেওয়ালের বড় ঘড়ীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া গায়ে হাত দিয়া মৃদুভাবে বলিল "একটু শান্ত হয়ে শোও।"

লতিকা জ্বলিয়া উঠিল! "আমি কি সাধ করে চ্যাচাচ্ছি! আমার যা হচ্ছে, তা কে জানবে!"—সজোরে জ্যোৎস্নার হাত ঠেলিয়া দিয়া, নিজেই থার্ম্মমিটার চাপিয়া ধরিয়া উঠিয়া বসিল। চক্ষু মুদিয়া সঘন নিশ্বাসের সহিত দুলিতে লাগিল, জ্বরের ঘোরে সে যেন আর ঠিক থাকিতে পারিতেছে না! ক্ষণ পরে চোখ খুলিয়া ভ্রুকুটী করিয়া সরসীকে বলিল "তোকে মা কেন আমার কাছে পাঠান,—তুই আসিস না!"

লতিকা সশব্দে আবার বিছানায় শুইয়া পড়িল। জ্যোৎস্না স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, সরসীর প্রতি তীব্র ভাবে বর্ষিত তিরস্কারের গোপন ইঙ্গিত, জ্যোৎস্না দেখিল সম্পূর্ণই তাহার উদ্দেশে! তাহার আত্মসম্মানে বিষম আঘাত লাগিল। অম্লানবদনে নীরবে সহ্য করিবার শক্তি—তাহার আজন্মের অভ্যাস, তাই নীরবে রহিল। তিরস্কৃত সরসী সভয়ে বলিল "পারাটা উঠে গেছে বোধ হয়।"

ঝাঁঝিয়া লতিকা বলিল "যাক্ উঠে, যা হবার আমার হবে তোমার তো নয়?" কথাটা যুক্তিসঙ্গত দেখিয়া সরসী চুপ করিয়া রহিল। গায়ে পড়িয়া ছেলেমানুষের সহিত ঝগড়া করিতে দেখিয়া জ্যোৎস্না বিমর্ষ-করুণ দৃষ্টিতে সরসীর পানে একবার চাহিল। তাহার পর থার্ম্মমিটার তুলিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে দেখিতে সবিস্ময়ে বলিল "এ যে অনেক হয়েছে, এত হবে!"

মাথা তুলিয়া লতিকা বলিল "কত হয়েছে?"

"এক শো পাঁচ, কিন্তু গায়ের উত্তাপে—"

"ঐ রকমই হবে," বলিয়া লতিকা আশ্বস্তভাবে মুখ ফিরাইয়া শুইল। অসুখটা বাড়িলেই সে যেন আরাম পায়! বলিল "আমার এ সাধারণ অসুখ নয়, বোধ হচ্ছে আমার প্লেগ হবে।"

দাসীটা এতক্ষণ বুকে হাঁটু গুঁজিয়া, হাত দুটি গুটাইয়া নীরবে বসিয়া ছিল। প্লেগের নামে চমকিয়া বলিল "আহো মায় পিল্‌কি!"

সরসীর দুর্ভাগ্য! সে আবার কথা কহিল "না না অত জ্বর হবে না, নাড়া চাড়া পেয়ে নিশ্চয়—"

লতিকা গর্জ্জন করিয়া উঠিল "হ্যাঁ গো হ্যাঁ আমি ঠাট্টু করে অসুখ বাড়াচ্ছি, যত দোষ সবই আমার। বেশ তাই তাই, তোমরা আমায় জ্বালিও না, চলে যাও সব।— দে দাই পা-টা টিপে দে,—উঃ, আঃ! বাবা!—" লতিকা ফিরিয়া শুইল।

মাতা আসিয়া গৃহদ্বারে দেখা দিলেন। হৃষ্টপুষ্ট স্থূলকায়া দিব্য সুন্দরী রমণী অতি নীরিহ রকমের ভালমানুষ; উচ্চ-শিক্ষিতা নহেন, সংসর্গগুণে অনেকটা উন্নত হইয়াছেন, স্বভাব অতি ধীর। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া জ্যোৎস্না উঠিয়া খাটে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল। মা বলিলেন "কত জ্বর দেখলি রে?"

সরসী উত্তর দিবার পূর্ব্বেই লতিকা বলিল "একশো পাঁচ! মা তুমি বাবাকে টেলিগ্রাম কর, আমি আর বাঁচবো না।"

মাতা অবাক হইয়া জ্যোৎস্নার পানে চাহিলেন। জ্যোৎস্না অনিচ্ছা সত্ত্বেও গোপন ইঙ্গিতে জানাইল তেমন কিছু নহে। মাতা আশ্বাস পাইয়া লতিকার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন "ডাক্তার বাবুকে ডেকে পাঠাই, তিনি আগে দেখুন, তারপর টেলিগ্রামের ব্যবস্থা কচ্ছি,—"

সরসী বলিল "বড়দাকে ডাকব মা, ডাক্তার বাবুর কাছে যেতে?"

কটমট করিয়া চাহিয়া লতিকা বলিল "ডাক্তার কি বলবে? কতক্ষণে মরব?"

এ কথার কোন সদুত্তর না দিয়া সরসী ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। সে দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে মাতা ব্যথিতভাবে হাসিয়া বলিলেন "তুই বাছা, দুরন্ত রাগী।"

ঝঙ্কার দিয়া লতিকা বলিল "আমি দুরন্ত রাগী! তোমার মেয়ে চিপটেন কেটে কথা কইবে, তাতে দোষ নেই, সে যে আদুরে মেয়ে!'"

কথা কহিলেই কথা বাড়িবে। কাজেই মাতা চুপ করিলেন। এই বিসদৃশ রৌদ্রাভিনয়ের মধ্যে তাহার কি করা কর্ত্তব্য ঠিক করিতে না পারিয়া জ্যোৎস্না অদূরে একটা চৌকী টানিয়া লইয়া বসিল। লতিকার আপত্তি টিকিল না। যথাসময়ে ডাক্তার আসিয়া নিজে থার্ম্মমিটার দিলেন, জ্বর উঠিল একশো দুই। ডাক্তার চলিয়া গেলে, কিরণ বলিল "পাঁচ জ্বর কে বল্লে, এ ত মোটে দুই—"

লতিকা মুখ বাঁকাইয়া বলিল "কে জানে ওরাই তো বল্লে!"

জ্যোৎস্নার কানে কথাটা গেল, সে ক্ষুব্ধ হইল! কাহারো সহিত বাদানুবাদ করিতে সে বড় ভয় পাইত। তাই নির্দ্দোষী হইলেও তাহার ঘাড়ে অকারণ অনেক দায় পড়িত, কিন্তু সে মুখ ফুটিয়া প্রতিবাদ করিতে পারিত না। সে স্বভাবতঃই ভীরু, তাহাতে পরের বাড়ী আসিয়া ক্রমাগত অপ্রত্যাশিত রূঢ় ব্যবহার লাভ করিয়া করিয়া সে যেন বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছে! তাহাতে সে জানিত না, যে, লতিকার দুটি মূর্ত্তি আছে!—সে 'এক মূর্ত্তিই লতিকার বরাবর দেখিয়াছে। বোর্ডিংয়ের হাস্য-মুখরিতা, চাঞ্চল্য-উচ্ছ্বসিতা, অনর্গল তীক্ষ্ণকণ্ঠের দম্ভময় পরিহাসবচন-বিস্ফুরিতা, অত্যন্ত সৌহৃদ্যশালিনী, প্রিয়সখী ঠাকুরাণীকে, বোর্ডিং ছাড়িয়া স্থানান্তরে আসিয়া অকস্মাৎ অদ্ভুত ভাবান্তরে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখিয়া সে যেন মহাফাঁফরে পড়িয়াছে। যে পরের কাছে অত হাসি হাসিতে পারে,—সে যে আত্মজনের নিকটে ক্রমান্বয়ে এমন রুক্ষ মূর্ত্তি কি করিয়া ধরিয়া থাকে, তাহা সে মোটে বুঝিতে পারিতেছিল না।

যাহাই হউক নিজে যথেষ্ট জ্বালাতন হইয়া এবং সকলকে যথেষ্ট জ্বালাতন করিয়া সে-যাত্রা লতিকার ব্যাধি-পর্ব্ব শেষ হইল। পরদিন বিকালে ঘাম হইয়া জ্বর ছাড়িয়া গেল।

কন্যার সংবাদ লইতে ঘরে আসিয়া মাতা দেখিলেন জ্যোৎস্না ও সরসী সেখানে বসিয়া আছে। মা আসিয়া মেয়ের বিছানায় বসিয়া গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। কেন জানি না লতিকার মেজাজ তখন একটু ভাল ছিল, মাতার সহিত কথাবার্ত্তা সরলভাবে কহিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে মাতা বলিলেন "আহা জ্যোচ্ছনার বড় কষ্ট হয়েছে। তুই পড়ে রয়েছিস, বাছার আমার কথা কবার লোকটি নাই।''

লতিকা চোখ চাহিয়া শান্তভাবে বলিল "যা না খুকি, তোরা দুজনে একটু বেড়িয়ে আয়।"

মৃদু আপত্তি করিয়া জ্যোৎস্না বলিল "থাক আজ; তুমি ভাল হও, কাল বেড়াতে যাব।"

হঠাৎ ঝঙ্কার দিয়া লতিকা বলিয়া উঠিল, "আর যাবেই বা কিসে ? গাড়ী টাড়ি ছাই আছে,—"

কথাটা কেহ বুঝিল না, নির্ব্বোধ সরসী বলিল "কেন? ব্রুহাম, ফিটন, ওগুলো তো রয়েছে।"

প্রতি পদে ছুতা ধরিতে ব্যগ্র, ঘোরতর অসন্তোষময়ী লতিকা তীব্রস্বরে বলিল, "তা যা না রে বাপু, আমোদ করে নেচে বেড়াতে কে তোদের বারণ কচ্ছে ?—আমার কাছে বসে থাকতে কে তোদের মাথার দিব্যি দিচ্ছে ?—"

দাসী সাগুর বাটি লইয়া ঘরে ঢুকিল। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। লতিকা মনের যতটা ঝাল এক করিয়া অকস্মাৎ তাহাকে এমনি তাড়না করিয়া উঠিল, যে, সে বেচারী পড়িয়া গিয়া ঘরময় সাগু ছড়াইল! লতিকা তো ক্রোধে খুন! মাতা অনেক সাধ্য সাধনায় বহু কষ্টে তাহাকে খানিক শান্ত করিলেন। কিন্তু সে আর কিছুতেই কিছু খাইল না, মাথা নাড়িয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "আমায় ত্যক্ত কোরো না, আমি কিছু খাব না।"

অসহ্য বিরক্তিতে জ্যোৎস্নার সারা চিত্ত ভরিয়া উঠিল। নীরবে দাসীর হাত ধরিয়া তুলিল, কিন্তু তাহাকে আহা বলিতে পারিল না, কেননা তাহাদেরই অপরাধে নির্দ্দোষের এ শাস্তি; নিজেকে সে অত্যন্ত অপমানিত জ্ঞান করিল। লতিকা কি মনে করে, যে, জ্যোৎস্না নিতান্ত নিরাশ্রয়, গলগ্রহ হইয়া তাহাদের বাড়ীতে বাস করিতে আসিয়াছে; তাই প্রতিপদে এমন নির্দ্দয়, দম্ভপূর্ণ, তাচ্ছিল্য ব্যবহার করে! ইহা তো স্বভাবজাত অভ্যাস নয়, ইহা যে ইচ্ছাকৃত অগ্নি-উদ্বোধন! জ্যোৎস্নার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল, তাহার কপালে ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিল।

কন্যার ক্রমাগত কর্কশতায় মাতাও মনে মনে কেমন সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িতেছিলেন। নিজের মেয়ের ব্যবহারের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে তাঁহার নিস্তার নাই অথচ পরের মেয়েটির নিঃশব্দে উৎপীড়ন সহ্য করাতেও তাঁহার প্রবল উৎকণ্ঠা বাড়িতে লাগিল। জ্যোৎস্নাকে সরাইবার জন্য তিনি বলিলেন "সরসী যা মা, তোরা ফুলবাগানে একটু বেড়িয়ে আয়, আমি এখানে বসছি।"

সরসী তৎক্ষণাৎ জ্যোৎস্নাকে টানিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল "আসুন—" দিদির সান্নিধ্য হইতে পলাইতে পারিলেই সে বাঁচে! জ্যোৎস্না নীরবে তাহার সঙ্গে চলিল।

সরসী বাগানে গিয়া জ্যোৎস্নাকে অনেক দুষ্প্রাপ্য ফল ফুল লতা পাতা দেখাইয়া তাহাদের পরিচয় সবিস্তারে বর্ণনা করিতে লাগিল। জ্যোৎস্না তাহাকে উৎসাহ দিয়া বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়া সে-সব কথা শুনিতে লাগিল। আসলে কিন্তু সে বড় মর্ম্মাহত হইয়াছিল, তাহার কিছুতেই তৃপ্তি হইতেছিল না। শুধু সরসী মনঃক্ষুণ্ণ হইবার ভয়ে তাহার কথায় সায় দিয়া যাইতে লাগিল।

ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা উভয়ে বাগানের মাঝে টিনের ছাউনীতে ঘেরা বিশ্রাম-কক্ষে আসিয়া সবুজ রং দেওয়া লোহার বেঞ্চিতে বসিল। সরসী গোটা কতক গাঁদা ফুল তুলিয়া আনিয়াছিল, সেগুলো দুহাতে লুফিতে লুফিতে বলিল, "দিদিকে নিয়ে আপনারা যে কি করেই সেখানে বাস করেন তা জানি না। আমি হলে এক দিনও ওঁর কাছে টিক্‌তে পারতাম্ না, বাবাঃ! খিঁচিয়ে খিঁচিয়ে আমায় মেরে ফেল্‌ত, নাকে কানে খৎ!" সে নাক কান মোচড়াইয়া উদ্দেশে নমস্কার করিল। জ্যোৎস্না হাসিয়া ফেলিল।

উৎসাহিত হইয়া সরসী বলিল "দেখ্‌ছেন্ তো কেমন নারা-কাতুরে মানুষ, একটু যদি অসুখ হল, তা হলেই বাড়ী মাথায় করেছে। দিদি ছুটিতে বাড়ী এলে আমি ত কাঁটা হয়ে থাকি, মনে হয় কত দিনে যাবে।"

একটি বড় গাঁদা ফুল লইয়া জ্যোৎস্নার জামায় গুঁজিয়া দিতে দিতে বলিল "আপনি বেশ মানুষ, আপনাকে আমার বড় ভাল লাগে। বাড়ীর মধ্যে শুধু আপনাকে, আর মাকে ভালবাসি, আর কাউকে নয়!"

সরসীর সরলবুদ্ধিতে জ্যোৎস্না নিজেকে তাহাদের বাড়ীর সামিল হইতে দেখিয়া আবার হাসিল। বলিল "আচ্ছা, দাদাদের?" সবেগে মাথা নাড়িয়া সরসী বলিল "উহুঁ ছোড়্‌দাকে তো মোটেই নয়, ভারি খুনসুটি করে, বরং বড় দাদাকে একটু ভালবাসি। আর বাড়ীর মধ্যে সব চেয়ে ভালবাসি, সকলের চাইতে বেশী—আন্দুকে!"

দীর্ঘটানে শেষের কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া সে জ্যোৎস্নার পানে এমনিভাবে চাহিল, যেন জ্যোৎস্না তখনই তাহাকে পরীক্ষার পুরাসংখ্যা দিবে, কারণ সে এমনি একটা মস্ত প্রশ্নের অভ্রান্ত উত্তরের সমাধান করিয়াছে! জ্যোৎস্না

কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে একটু দ্বিধায় পড়িয়া বলিল "আন্দু কে?"

বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া সরসী বলিল "কেন, আমাদের ড্রাইভার আন্দু!—ওর নাম আন্দু নয়, আনোয়ার উদ্দীন, সবাই তাই আন্দু বলে—"

"ওঃ!" জ্যোৎস্না হাসিয়া ফেলিল, "সে বুঝি খুব ভাল?"

"খুব ভাল! একদিন আকবরের সঙ্গে বাজি রেখে এই লোহার বেঞ্চিখানা একলা ঘাড়ে করে' সমস্ত বাগানটা ঘুরে আবার বেঞ্চিখানা এখানে এনে রেখে দিয়েছিল! গায়ে খুব জোর! কুস্তির আখ্‌ড়ায় কুস্তি করতে যায় কি না—" সে সোৎসাহে তাহাদের আন্দুর অদ্ভুত চরিত্রের ও অদ্ভুত পরাক্রমের কাহিনী বলিতে লাগিল। সে তাহাদের আখড়ার ওস্তাদকে আনিয়া একদিন দাদাদের কিরূপ ভয়াবহ লাঠিখেলা, মল্ল-কৌশল ইত্যাদি দেখাইয়াছিল; এক-একটা কাজে আন্দুর কিরূপ বিস্ময়াবহ জেদ; তাহার গল্প করিতে লাগিল। একদিন তাহার 'ডলি' পুতুল, ডেজী নামক কুকুরটা মুখে করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে সে কিরূপ কান্না কাঁদিয়াছিল, এবং পরিশেষে আন্দু যখন সেটা সাঁতার দিয়া পুকুর হইতে তুলিয়া আনিল, তখন বাটীস্থ সকলে কিরূপ চমৎকৃত হইল তাহা বলিল। সে কত লোকের কত উপকার করে, পিতা তাহাকে কিরূপ ভাল বাসেন, সেইসব গল্প সবিস্তারে দীর্ঘকাল ধরিয়া অক্লান্ত উৎসাহে সরসী আবৃত্তি করিয়া চলিল। জ্যোৎস্না অন্যমনস্ক ভাবে হুঁ হাঁ দিতে লাগিল।

সরসী আনন্দোজ্জ্বল মুখে মাথা নাড়িতে নাড়িতে ঈষৎ চুপে চুপে জ্যোৎস্নাকে বলিল "সে আবার এমন সুন্দর গান গায়, একদিন আড়াল থেকে শোনাব আপনাকে, ভারি চমৎকার! আবার নিজে নিজে কেমন গান তৈরী করে, জানেন!"

বিস্মিত ভাবে জ্যোৎস্না বলিল "তাই নাকি, লেখাপড়াও জানে?—"

ঘাড় কাত করিয়া সরসী সজোরে বলিল "ওঃ! খুব।" সে আবার নূতন গল্প-স্রোত আবিষ্কার করিল। জ্যোৎস্নার সদ্যলব্ধ অন্তর্দ্দাহের জ্বালা কথাবার্ত্তার মাঝখানে ডুবিয়া গেল, সে সকৌতুকে ব্যগ্র দৃষ্টিতে সরসীর মুখপানে চাহিয়া রহিল।

হঠাৎ সরসী চুপ করিল। জ্যোৎস্না সবিস্ময়ে দেখিল, একখানা কালো শাল গায়ে জড়াইয়া লতিকা ধীরে ধীরে তাহাদের দিকে আসিতেছে। জ্যোৎস্না ব্যস্ত হইয়া বলিল "ওকি! জ্বর ছাড়তেই উঠে এসেছ?"

লতিকা বলিল "হোক্‌গে যাক্‌, শুয়ে থাক্‌তে আর ভাল লাগে না, তাই বাগানে একটু বস্‌তে এলুম, বসনা, তুমি বস।"

লতিকার স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর শুনিয়া জ্যোৎস্না আশ্বস্ত হইল। কিন্তু সরসী শঙ্কিত প্রাণে ভাবিল, এতটুকু ত্রুটী হইলে এখনই দিদির ঘাড়ে ভৈরব চাপিবে। অতএব তাহার আগে পলায়নই শ্রেয়স্কর। সে উঠিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল, জ্যোৎস্না হাসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল "পালাচ্ছ কেন? বসনা, তোমার আন্দুর গল্পটা বলে যাও।"

দিদির সামনে আন্দুর গল্পের কথা প্রকাশ হইয়া পড়াতে, সে ভারি ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইল। দিদি কিন্তু খুব প্রসন্ন সদাশয় ভাবে বলিল "বস্ না, যাচ্ছিস কেন?"

সে বসিল, কিন্তু দিদির আগমনে তাহার উৎসাহের আগুন একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং বচনের খই আর ফুটিল না, সে নীরব রহিল।

তাহাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া লতিকা দয়া করিয়া নিজেই কথার সূত্র আবিষ্কার করিল। বলিল "হ্যাঁরে তোদের টীচারের বে হবার কথা ছিল, হয়ে গেছে?"

সে মাথা হেলাইয়া বলিল "হুঁ।"

"বের সময় তোরা গেছলি?"

"হুঁ, স্কুলের সব মেয়েই।"

"টীচারের সাহেবটা দেখ্‌তে কেমন?"

"বেশ ফরসা।"

লতিকা হাসিয়া উঠিল, "ফরসা তা জানি। বলি, মুখটা কেমন? বাঁদরের মত, না উল্লুকের মত?"

ক্ষুণ্ণ হইয়া সরসী বলিল "না, বেশ।" ভয়ে সে বেশী কথা কহিতে পারিল না।

লতিকা বলিল "আমাদের সময় মিসেস্ হুইলার ছিল, মেম নিজে দেখ্‌তে বেশ ছিল, কিন্তু তাঁর সাহেবটা যা ছিল, মেগ্যোঃ!—একেবারে হতকুচ্ছিত!"

এই সময় বাগানের উড়ে মালী সুন্দরীদের জন্য দুইটি তোড়া আনিয়া সাম্‌নে ধরিল। জ্যোৎস্না তোড়া লইয়া মালীকে কিছু বখ্‌শীস দিল। যোড় হাতে ঝুঁটিসুদ্ধ মাথা নোয়াইয়া মালী চলিয়া যাইতেছিল, সরসী বলিল "মালী আমাকে অর্কিড ফুল টুল দিয়ে একটা ভাল রকম তোড়া বেঁধে দেবে চল, কাল টীচারকে সকাল বেলা দিয়ে আস্‌ব।"

জরুর তাগাদায় তোড়া আদায় করিবার অভিপ্রায়ে সে মালীর সহিত চলিয়া গেল। তোড়ার ফুলগুলিতে সন্তর্পণ কোমল অঙ্গুলী সঞ্চালন করিয়া করিয়া সরাইয়া সরাইয়া দেখিতে দেখিতে জ্যোৎস্না বলিল "ডাক্তার সাহেবের চিঠির জবাব দিয়েছ?"

মুখ ফিরাইয়া লতিকা বলিল "না!"

"কেমন আছেন? ভাল আছেন তো।"

"না, লিখেছেন স্বাস্থ্য বড় খারাপ।"

চিন্তিতভাবে জ্যোৎস্না বলিল "তাই তো, একজামিনেরও তো খুব বেশী দেরী নেই। ডাক্তার-সাহেবের তো প্রায়ই অসুখের কথা শুনতে পাই। তিনি নিজে ডাক্তার অথচ তাঁরই শরীর এত খারাপ!"

বেঞ্চিতে ঠেস্‌ দিয়া সোজা হইয়া বসিয়া লতিকা বলিল "স্বাস্থ্য ভাল থাক্‌বে কোত্থেকে, ব্যায়াম-চর্চ্চা যে মোটে করেন না, একটু হাঁট্‌তে একটু খাট্‌তে মোটে চান না, কুড়ের বাদশা যে, শুয়ে শুয়ে দিনরাত পড়ছেন আর ঝুড়ি ঝুড়ি নোট লিখে আলমারি বোঝাই কচ্ছেন, কিন্তু হাঁসপাতাল এ্যাটেণ্ড করবার সময়, হাতে কলমে কাজ শেখ্‌বার সময়, একেবারে বেবাক্‌ ফাঁকি। তাঁর পছন্দ শুধু পুঁথিগত বিদ্যে, তাই করেই তো বছর বছর ফেল হচ্ছেন,—" বিরক্তিভরে লতিকা ঠোঁট দুটা বাঁকাইয়া মুখ ফিরাইল।

জ্যোৎস্না নিস্তব্ধ রহিল। লতিকা উত্তেজিত হইয়া বলিল "তোমরা বল শিক্ষিত শিক্ষিত,—শিক্ষিত কি?—শিক্ষার ভারে মনুষ্যত্বটুকু, রোলারের চাপে খোয়ার মত, গুঁড়িয়ে যাচ্ছে,—তাঁরা শিক্ষিত! স্বাধীনচিন্তাশক্তি, স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি,—সবই পরস্ব মতের মোমজামায় মুড়ে এক কিম্ভুতকিমাকার হয়ে দাঁড়াচ্ছেন,—এই তো শিক্ষার সার্থকতা! ঝাঁটা মার! তোতা-পাখীর মত খানকতক বই মুখস্থ করলেই মনুষ হয় না, মনুষ্যত্ব আলাদা জিনিস।"

লতিকার রুচিবৈচিত্র্য এবং মত পরিবর্ত্তনের অদ্ভুত বৈষম্যের কথা জ্যোৎস্না জানিত। সুতরাং প্রতিবাদ না করিয়া জ্যোৎস্না মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল "শিক্ষিতদের ওপর তোমার আজন্মের ভক্তি হঠাৎ এমন মূর্ত্তিমান নাস্তিক হয়ে দাঁড়াল কেন?"

লতিকা গম্ভীর স্বরে বলিল "শিক্ষিতদের অপদার্থতা দেখে।"

অদূরে ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষাচ্ছন্ন স্থানে,—সমাগত সন্ধ্যার ঘনীভূত অন্ধকাররাশির পানে জ্যোৎস্না নীরবে চাহিয়া রহিল।　　(ক্রমশ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

শিক্ষকের আশা ও আশঙ্কা

এবার অষ্টম সাহিত্যসম্মিলনের তথা সাহিত্যশাখার সভাপতি লব্ধাবসর শিক্ষক, বিজ্ঞান-শাখা ও ইতিহাস-শাখার সভাপতি উভয়েই শিক্ষক, কেবল দর্শন-শাখার সভাপতি শিক্ষাবিভাগের লোক নহেন। সপ্তম সাহিত্যসম্মিলনে, দর্শন বিজ্ঞান উভয় শাখায়ই শিক্ষক সভাপতি ছিলেন এবং সাহিত্য-শাখায় সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপক সভাপতি ছিলেন। বিজ্ঞান-শাখার সৃষ্টি অবধি কলেজের বিজ্ঞানশিক্ষকই সভাপতি হইয়া আসিতেছেন। শাখা-বিভাগের পূর্ব্বে দুইজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানশিক্ষক সাহিত্যসম্মিলনের সভাপতি হইয়াছিলেন। এ-সমস্ত নিতান্ত কাকতালীয়-ন্যায়ে সঙ্ঘটিত হইতেছে না। দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ক্রমেই শিক্ষক-সম্প্রদায়ের প্রসারবৃদ্ধি হইতেছে, ইহা বেশ স্পষ্টই বুঝা যায়। শিক্ষকগণ শুধু যে অজাতশ্মশ্রু বালক বা অর্ব্বাচীন যুবকগণকে শিক্ষা দিবার অধিকারী তাহা নহে, পরন্তু অভিরূপভূয়িষ্ঠা পরিষদে লোকশিক্ষকের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ, এই ব্যাপারে ইহা অনেকটা প্রমাণিত হইতেছে। এই-সব দেখিয়া শুনিয়া সমগ্র শিক্ষক-সম্প্রদায় বেশ একটু শ্লাঘাবোধ না করিয়াই পারেন না।

জগজ্জননীর পূজার ন্যায় জননী বঙ্গভাষার পূজার তিন দিনের ব্যাপার সাহিত্যসম্মিলনেই যে কেবল শিক্ষকগণ নেতৃত্ব লাভ করিতেছেন তাহা নহে, সাহিত্য-পরিষৎ

প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানেও তাঁহারা কার্য্যকুশলতার জন্য লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছেন। আবার বাঙ্গালাদেশে সংবৎসর ধরিয়া মাতৃভাষার যে সেবা অক্লান্তভাবে চলিতেছে, তাহার ভিতর অনুসন্ধান করিলে এ কথাটি আরও স্পষ্টীকৃত হয়। সত্য বটে, বিজ্ঞানে ডাঃ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু ও ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, দর্শনে ডাঃ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও ইতিহাসে শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার ও শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণ ইংরেজী ভাষা অবলম্বন করিয়া নিজেদের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও মৌলিক গবেষণার ফল প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি তাঁহারা মাতৃভাষাকে একেবারে বঞ্চিত করেন নাই বা করিবেন না, এরূপ আশা করা যাইতে পারে। তাঁহাদিগের আবিষ্কৃত তথ্যগুলি আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের কেন্দ্র ইউরোপের পণ্ডিতমণ্ডলীর গোচর করিবার জন্য তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া ইংরেজী ভাষার শরণ লইতে হইয়াছে। ইউরোপেও বহুকাল পর্য্যন্ত ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি জাতিকে দর্শন বিজ্ঞান গণিত ইত্যাদি দুরূহ শাস্ত্রের তথ্য পণ্ডিত-সমাজের নিকট প্রচারের উদ্দেশ্যে ল্যাটিন ভাষার আশ্রয় লইতে হইত। বেকন নিউটন প্রভৃতি তাহার উদাহরণ। ডেকার্ট লক প্রভৃতি মনীষিগণ এই নিয়ম রহিত করেন। এখন সাধারণতঃ প্রত্যেক পণ্ডিত (savant) নিজের দেশ-ভাষায় তথ্য প্রচার করেন, অচিরেই তাহা অন্যান্য দেশ-ভাষায় অনূদিত হয়। বাঙ্গালাভাষার সুদূর ভবিষ্যতে সে দিন আসিবে কি না, জানি না। এখন পর্য্যন্ত 'নিশার স্বপন সম এ বারতা'। যাহা হউক, সাক্ষাৎ সম্পর্কে নিজেদের আবিষ্কৃত তথ্য বাঙ্গালা ভাষায় প্রচার না করিলেও, এই শিক্ষক কয়েকজন জ্ঞান-গবেষণার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও দেশের গৌরবস্তম্ভ।

যে-সকল শিক্ষক নিজেদের গভীর চিন্তার ফল বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বিজ্ঞানে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যা-নিধি, শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী ও শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞানে ইঁহারা বিশেষজ্ঞ, কিন্তু বিজ্ঞানের বাহিরেও প্রথম দুইজনের কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ। ত্রিবেদী মহাশয়ের দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ 'জিজ্ঞাসা' 'কর্ম্মকথা' প্রভৃতি পুস্তক সম্বন্ধে মত প্রকাশ করা আমার মত অনধিকারীর পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। তবে এই-টুকু বলিতে পারি যে, তিনি রোগশয্যায় পড়িয়াও প্রলাপ বকেন না, পরন্তু সে অবস্থায়ও তিনি যেসব তত্ত্বের আলো-চনা করিয়াছেন, সেই 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' অনেকের সুস্থশরীরে খোসমেজাজে বাহাল তবিয়তে লিখিত গ্রন্থাদি অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্। ভাষাতত্ত্ব ও অভিধানের ক্ষেত্রে রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের কীর্ত্তি অতুলনীয়। যাঁহারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বহুভাষাবিৎ বলিয়া বাহাদুরী লইয়াছেন, তাঁহা-রাও ইঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্যের সহিত নিজেদের ক্ষমতার তুলনা করিয়া লজ্জায় অধোবদন হইবেন। ইতিহাসের ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ও শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এই শিক্ষকত্রয়ের গবেষণা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যতম শিক্ষক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের অনুষ্ঠিত বিরাট্ ব্যাপারও তাঁহার দক্ষতার পরিচায়ক।

ধর্ম্মালোচনা ও দার্শনিক আলোচনায় ৺নীলকণ্ঠ মজুম-দার, ৺কৃষ্ণবিহারী সেন, ৺ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত-লেখক), শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি শিক্ষকগণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। সুকুমার সাহিত্যের ক্ষেত্রেও শেষোক্ত শিক্ষকের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যানিধি প্রভৃতি শিক্ষকগণের কৃতিত্ব সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিপিন-বিহারী গুপ্ত, শ্রীযুক্ত রসিকলাল রায়, বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষকগণ পুস্তক ও প্রবন্ধসম্ভারে মাতৃভাষা-মন্দিরের নানা কক্ষ সুশোভিত করিতেছেন। শিক্ষক-সম্প্রদায়ের

মধ্যে তিন জন নবীন কবি—শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় ও শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক—বীণার ঝঙ্কারে আমাদের মন মুগ্ধ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন, মাসিক পত্র-পত্রিকাগুলি পাঠ করিলে বহু শিক্ষা-বিভাগের লোকের লিপিকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ করিয়া উদাহরণ দিতে হইলে প্রবন্ধটি সুদীর্ঘ তালিকায় পরিণত হয়।

মাসিকপত্র আজকালকার সাহিত্যচর্চ্চার প্রধান ক্ষেত্র। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আজকাল মাসিকপত্রের লেখকের মধ্যে বহু শিক্ষক দেখা যায়। কয়েকখানি মাসিকপত্রের সম্পাদকও শিক্ষক-শ্রেণীর লোক। দৃষ্টান্তস্থলে (ঢাকা রিভিউ ও) সম্মিলন, প্রতিভা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, সঙ্কল্প ও অধুনালুপ্ত বাণী এবং নবপর্য্যায়ের উপাসনার নাম করা যাইতে পারে। আজকাল কলেজে কলেজে যে ইংরেজী-বাঙ্গালা ম্যাগাজিনের উদ্ভব হইতেছে, তাহারও অধিকাংশের পরিচালক শিক্ষক-বর্গ। 'প্রবাসী'র সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অনেক দিন উভয় কার্য্য একত্র চালাইয়াছেন। মাসিকপত্রের সম্পাদকদিগের মধ্যে কেহ কেহ পূর্ব্বে শিক্ষকতা-কার্য্যে ব্রতী ছিলেন, যথা—শ্রীযুক্ত জলধর সেন, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার। তবে এই অজুহাতে তাঁহাদিগকে দলে টানিয়া দল পুষ্ট করিতে চাহি না।

এ স্থলে ইহা বলাও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য' নামক অমূল্য গ্রন্থের প্রণেতা রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ও 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত' নামক উপাদেয় গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু তত্তৎ গ্রন্থের প্রথম প্রণয়নকালে শিক্ষকতা-কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। দীনেশ বাবু অধুনা আবার শিক্ষকতা-বৃত্তিই অবলম্বন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে খ্যাতনামা নাটককার ও আখ্যায়িকাকার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ কয়েক বৎসর শিক্ষক ছিলেন, কিন্তু অনেকদিন হইল উক্ত বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন। অতএব তাঁহাকে এই শ্রেণী-ভুক্ত করা সঙ্গত বিবেচনা করি না। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়েক বৎসর হইতে আদর্শ শিক্ষালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষাদান ও শিক্ষাপরিচালন-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। কিন্তু তথাপি তাঁহাকেও শিক্ষক-শ্রেণীভুক্ত করিতে সাহসী নহি।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান অবস্থার কথা বলিলাম। ইংরেজের আমলে যখন নূতন প্রণালীর বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে লাগিল, তখনও শিক্ষকশ্রেণীর মধ্যে মাতৃভাষায় সুলেখকের অভাব ছিল না। ৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ৺তারাশঙ্কর তর্করত্ন, ৺হরিনাথ ন্যায়রত্ন, ৺রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺রামগতি ন্যায়রত্ন, ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, ৺দ্বারকানাথ অধিকারী প্রভৃতি যাঁহারা পণ্ডিতী বাঙ্গালার সৃষ্টি করিয়া এই নবপ্রণালীর সাহিত্যের স্রষ্টা ও পোষ্টা হইলেন, তাঁহাদিগের সকলেই শিক্ষক ছিলেন। এই ভাষাগঠন-কার্য্যে ৺কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্যও উল্লেখযোগ্য। তিনিও শিক্ষক ছিলেন। নাটক-রচয়িতা ৺রামনারায়ণ তর্করত্নও শিক্ষক ছিলেন। সেকালে ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ৺রাজনারায়ণ বসু ও ৺অক্ষয়কুমার দত্ত চিন্তাশীলতার ও মৌলিকতার জন্য প্রথিতনামা। ৺ভূদেব বাবু প্রথমে শিক্ষক ও পরে শিক্ষাপরিদর্শক ছিলেন। ৺রাজনারায়ণ বাবু বরাবর শিক্ষক ছিলেন। ৺অক্ষয়কুমার দত্তও শিক্ষক ছিলেন। ইঁহাদের বয়ঃকনিষ্ঠ 'সম্বন্ধ-নির্ণয়' নামক মূল্যবান্ গ্রন্থের রচয়িতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধিও শিক্ষক ছিলেন।

এ সময়ে অনেক শিক্ষক (ও শিক্ষাপরিদর্শক) বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকরচনায় শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন, যথা স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়, ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ৺অক্ষয়কুমার দত্ত, ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ৺রামগতি ন্যায়রত্ন, ৺হরিনাথ ন্যায়রত্ন, ৺রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী ও শ্রীযুক্ত ব্রহ্মমোহন মল্লিক। আধুনিক পাঠক বলিবেন, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন উচ্চ অঙ্গের কার্য্য নহে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, নবপ্রবর্ত্তিত শিক্ষাপ্রণালীর সেই প্রথম অবস্থায় আদর্শের অভাবে এই শ্রেণীর পুস্তক-রচনা কঠিন কার্য্য ছিল। সুতরাং বিদ্যাসাগর-ভূদেব-অক্ষয়কুমারের ন্যায় মনীষিগণকেও এই কার্য্যে ব্রতী হইতে হইয়াছিল।

নব্যবঙ্গের কবিগুরু মাইকেল মধুসূদন দত্ত এক সময়ে

শিক্ষক ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে মাতৃভাষার সেবক-হিসাবে শিক্ষক-শ্রেণীতে ধরিতে পারিলাম না। কেননা যৎকালে তিনি শিক্ষাব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন তৎকালে তিনি ইংরেজী বন্দীনারীর (Captive Lady) বন্দনায় ব্যস্ত, তিলোত্তমাসম্ভব বা মেঘনাদবধের আয়োজন করেন নাই। ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺নবীনচন্দ্র সেন, ৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺চন্দ্রনাথ বসু, ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ৺রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় (বিশ্বকোষের অনুষ্ঠাতা) ও ৺যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কর্ম্মজীবনের আরম্ভে শিক্ষক ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকেও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা অসঙ্গত হইবে।

এক্ষণে উভয় সময়ের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, মাতৃভাষায় পুস্তক-প্রবন্ধাদি-প্রণয়নে নিযুক্ত শিক্ষকের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে। অবশ্য আজকাল শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাড়িয়াছে, পুস্তক ও মাসিক-পত্রের সংখ্যা বাড়িয়াছে, পাঠকের সংখ্যা বাড়িয়াছে, বাঙ্গালা লেখকের সংখ্যা বাড়িয়াছে, শিক্ষকের সংখ্যাও বাড়িয়াছে। কিন্তু শুধু যে ইহারই অনুপাতে শিক্ষকশ্রেণীভুক্ত লেখকের পরিমাণ বাড়িয়াছে, আমার তাহা মনে হয় না। আমার ধারণা, এ বিষয়ে বর্ত্তমান শিক্ষক-সম্প্রদায়ের হৃদয়ে একটি নব-প্রেরণা আসিয়াছে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই প্রবৃত্তি উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে এত অধিক পরিমাণে ছিল না। ইহা নিশ্চয়ই আশার কথা, শ্লাঘারও কথা।

এ পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া দেখা গেল যে ইংরেজ-শাসনের প্রথম আমলে শিক্ষকদিগের মধ্যে বিদ্যাসাগর, ভূদেব, রাজনারায়ণ, অক্ষয়কুমারের ন্যায় প্রতিভাশালী লেখক আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং অধুনা ঐ শ্রেণীর মধ্যে জগদীশচন্দ্র প্রফুল্লচন্দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রতিভাশালী লেখক আবির্ভূত হইয়াছেন (যদিও শেষোক্ত তিনজনের কৃতিত্ব ইংরেজীভাষায় গ্রন্থাদি রচনায়)। ইহা অবশ্য খুব আশার কথা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কার কথাও আছে। আশঙ্কার কথা এই যে, শিক্ষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে আজও বঙ্কিম, রবীন্দ্র, হেম, নবীন, ইন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল আবির্ভূত হয়েন নাই। কখন হইবেন কি না সন্দেহ। বাঙ্গালা সাহিত্যের নানাবিভাগে অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন বা দিতেছেন, এরূপ শিক্ষক—পূর্ব্ব আমলের বিদ্যাসাগর-ভূদেব-রাজনারায়ণ-অক্ষয়কুমার ভিন্ন ও অধুনা রামেন্দ্রসুন্দর যোগেশচন্দ্র প্রভৃতি দুই চারি জন ছাড়া আর মিলে কই?

যাহাহউক শিক্ষক-সম্প্রদায় ক্রমশঃ অধিকতর পরিমাণে লেখক-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইতেছেন দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইতেছি। শিক্ষক-সম্প্রদায়কে মাতৃভাষার সাহিত্যের পুষ্টিবিধানে তৎপর দেখিয়া অনেকে এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইতেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে কয়েকটি ভাবিবার কথা আছে।

যে শ্রেণীর লোকে সর্ব্বদা জ্ঞানার্জ্জন ও জ্ঞানদানে ব্যাপৃত, তাঁহারা নিজেদের প্রভূত পাণ্ডিত্যের, মার্জ্জিত বুদ্ধিবৃত্তির, শৃঙ্খলাবদ্ধ চিন্তাশক্তির পরিচয় দিতে অগ্রসর হইবেন, আপাত-দৃষ্টিতে ইহাই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু ইহার প্রবল প্রতিবন্ধকও আছে। তাহা একটু তলাইয়া দেখিলে তবে ধরিতে পারা যায়। আধুনিক শিক্ষা-প্রণালীতে এদেশের ছাত্রজীবনে সকলকেই বহুপরিমাণে পরের চিন্তা, পরের ভাব, পরের সৌন্দর্য্যবোধ, পরের কলা-কৌশল (artistic expression) পরের ভাষার ভিতর দিয়া আত্মসাৎ করিতে হইতেছে। এ বিষয়ে ভাবী শিক্ষকে ও ভাবী বিচারকে, ভাবী ব্যবহারাজীবে, ভাবী ডাক্তার বা এঞ্জিনিয়ারে, ভাবী আমলা বা কেরানীতে, ভাবী ব্যবসায়ী বা দোকানদারে কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু শিক্ষকের জীবনে ছাত্রাবস্থার এই ব্যাপারের একটা শোচনীয় পরিণাম আছে। তাঁহাকে কর্ম্মজীবনেও সেই পূর্ব্বেকার মত পরের চিন্তার পরের ভাষায় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হয়। তাহাই তাঁহার ঘরের ও বাহিরের কাজ, তাহাই তাঁহার উপজীবিকা। তিনি শিক্ষাদানকার্য্যে ও প্রশ্ননির্ব্বাচনকার্য্যে পাঠ্যপুস্তকের বা পাঠ্যবিষয়ের খুঁটিনাটি লইয়া ব্যস্ত; পরীক্ষাগ্রহণ-কার্য্যে উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট উত্তরবিচারে ব্যাপৃত। ইহাতে বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক্ স্ফূর্ত্তি ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির সম্ভাবনা অল্প, জড়তা বা অবনতির সম্ভাবনা বেশী। শিক্ষকের মৌলিক চিন্তার অবসর কম, সুযোগও কম। যাঁহারা

বিচারক, ব্যবহারাজীব প্রভৃতির বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ন্যায় বিশাল মানবসমাজে মিশিয়া মানবচরিত্রের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করার, মানবহৃদয়ের রহস্য উদ্ঘাটন করার সুযোগ তিনি পান না। ইহার অপ্রতিবিধেয় ফল—মৌলিকতার বীজ একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা। ফলেও দেখা যায়, ব্যবহারাজীবের ভিতর হেমচন্দ্র-ইন্দ্রনাথের উদ্ভব হয়, বিচারকের ভিতর বঙ্কিমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের ও দ্বিজেন্দ্রলালের উদ্ভব হয়। শিক্ষকের ভিতর হয় না।

এ অবস্থায়, যিনি জগতের প্রতিভাশালী লেখকদিগের চিন্তারাশির অহরহ পেষণেও নিজের মৌলিকত্ব রক্ষা করিতে পারেন, তিনি ধন্য। কিন্তু অধিকাংশেরই সে সৌভাগ্য ঘটে না। পূর্ব্ব অনুচ্ছেদে বলিয়াছি, ছাত্রাবস্থায় সকলকেই চিন্তার জন্য, ভাবের জন্য, কলার আদর্শের জন্য পরপ্রত্যাশী হইতে হয় সত্য, কিন্তু শিক্ষক যেমন চির-জীবন 'সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান' করিয়া কাটান এমন আর কাহাকেও করিতে হয় না। অবশ্য যেমন অরণিদ্বয়ের সঙ্ঘর্ষণে অগ্নির উৎপত্তি হয়, তেমনই উভয় মনের সংঘাতেও চিন্তারাজ্য আলোড়িত হইতে পারে। একদিকে গ্রন্থকার-দিগের চিন্তার সহিত সঙ্ঘাতে, অন্যদিকে ছাত্রদিগের চিন্তার সহিত সঙ্ঘাতে, শিক্ষকের বুদ্ধিবৃত্তি কিঞ্চিৎ মার্জ্জিত হইতে পারে। তিনি সাধারণ ছাত্রের ভুল হইতে কিঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করেন, অসাধারণ ছাত্রের প্রশ্নপরম্পরা হইতে বা তাহার প্রদত্ত উত্তর হইতে কিঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করেন, একটা জিনিস নানাদিক্ হইতে দেখিবার সুযোগ পান, মানবমন কিরূপে ভ্রমে পড়ে, কোথায় কিপ্রকারে হেত্বা-ভাসের আশঙ্কা আছে তাহার সন্ধান পান। এগুলি শিক্ষকের পক্ষে পরম লাভ সন্দেহ নাই। শত শত জ্ঞানপিপাসু যুবককে জ্ঞানবিতরণ করিতে করিতে তাঁহার হৃদয়ে একটা উত্তেজনা উন্মাদনা আসে, ইহাও একটা মস্ত লাভ বটে। কিন্তু অনবরত এই কার্য্যে মগ্ন থাকিলে তাঁহার মন নূতন সৃষ্টির কার্য্যে প্রবণ হইবার মত শক্তি সঞ্চয় ও অবসর লাভ করিতে সমর্থ হয় না। দরিদ্র গৃহস্থের দিন আনা দিন খাওয়ার মত তিনিও তাঁহার দিনকার দিনের কর্ত্তব্য (Current duties) পালন করিয়া যান, তাহার উপর আর উঠিতে পারেন না। প্রকৃত সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য মনের যে নির্লিপ্ত ভাবের প্রয়োজন তাহা তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে না। তাঁহার জীবনে freshness বা নবীনতা থাকে না। বৎসরের পর বৎসর সেই একই কথা ছাত্রগণের কর্ণগোচর করিতে করিতে তাঁহার জীবন নিতান্ত একঘেয়ে হইয়া পড়ে।

আর এক কথা। শিক্ষাদান-কার্য্যে এক বিষয়ে মস্তিষ্ক-চালনা, ও রচনাকার্য্যে অন্য বিষয়ে মস্তিষ্ক-চালনা। এই উভয়-প্রকার মস্তিষ্ক-চালনা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে হইলেও অনেকটা এক ধরণের, সুতরাং একঘেয়ে হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে বিচারক, ব্যবহারাজীব প্রভৃতি নিজ নিজ বৃত্তিতে যে ভাবে মস্তিষ্ক-চালনা করেন, রচনা-কার্য্যে তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্নপ্রকারে মস্তিষ্ক-চালনা করেন। তজ্জন্য তাঁহাদের মনে একটা Freshness বা নবীনতা আসে। তাহার ফলে তাঁহারা রচনাকার্য্যে যেটুকু আয়েস পান, শিক্ষকগণ তাহা পান না।

ইহা ছাড়া 'শিক্ষাব্যবসায়ী'র নিজের ব্যবসায়ের কার্য্যে ঘরে ও বাহিরে এত সময় ব্যয় করিতে হয় এবং তাহাতে তাঁহার মস্তিষ্ক এমন অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে (বাহিরের লোকে তাঁহার ছোট বড় মাঝারী ছুটিই দেখিতে পান) যে তাঁহার নিকট বহুসময়সাধ্য বহুআয়াসসাধ্য একটা বিরাট্ অনুষ্ঠান sustained work, solid work আশা করা বিড়ম্বনা। হইতেছেও তাহাই। ত্রিবেদী মহাশয়ের ন্যায় মনীষাসম্পন্ন শিক্ষকের নিকট হইতেও কেবল fragments of Science, fragments of Philosophy, fragments of Sociology, fragments of the Science of Religion প্রভৃতি খণ্ড খণ্ড জিনিস পাওয়া যাইতেছে। আমরা উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিতে পারি, 'ইহা সুবর্ণের মুষ্টি'—কিন্তু তথাপি অস্বীকার করা যায় না যে ইহা 'মুষ্টিভিক্ষা'; 'যত কর বিতরণ অক্ষয় তব ভাণ্ডার' হইলেও বিতরণে কার্পণ্য ঘটিতেছে, ইহা স্পষ্ট দেখা যাই-তেছে। ইহা শুধু স্বাস্থ্যভঙ্গের দরুণ নহে, ইহার প্রকৃত গভীরতর কারণ রহিয়াছে, তাহাই নির্দ্দেশ করিবার জন্য চেষ্টা করিলাম।

অবশ্য প্রতিভার অসাধ্য কার্য্য নাই। জগতের ইতিহাসে

এমন দৃষ্টান্ত রহিয়াছে যে দারিদ্র্যের পেষণে, অন্নচিন্তা চমৎকারার দাপটেও প্রতিভা নিভিয়া যায় নাই, বরং আরও দীপ্ততর হইয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে; অথবা প্রতিভাশালী ব্যক্তি গুরুকর্ম্মভারে অবসন্ন হইয়া পড়েন নাই, নিজের অবলম্বিত বৃত্তির সকল কর্ত্তব্য শেষ করিয়াও সাহিত্য-সৃষ্টিতে বা মৌলিক তথ্যাবিষ্কারে অতুলকীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। বিজ্ঞান-জগতে জগদীশচন্দ্র-প্রফুল্লচন্দ্র, সাহিত্য-জগতে বঙ্কিমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র প্রভৃতি আমাদের দেশেও সপ্রমাণ করিয়াছেন, যে, প্রতিভা থাকিলে নিজের অবলম্বিত বৃত্তির সকল কর্ত্তব্য যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করিয়াও অন্যক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করা যায়। কিন্তু প্রতিভার কথা স্বতন্ত্র। আর অনেক সময়ে প্রতিকূল অবস্থার জন্য প্রতিভার সম্যক্ স্ফুরণ হয় নাই, ইহাও জগতের ইতিহাসে ঘটে নাই এমন নহে। যাহা হউক সাধারণতঃ, পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কারণপরম্পরাই যে বহু শিক্ষকের স্বাধীনচিন্তার ও সাধনার পথের অন্তরায়, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

এইজন্য আমার মনে হয়—যদি প্রকৃতপক্ষে দেশে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক গবেষণা ও সাহিত্যসৃষ্টির পথ সুগম করিতে হয়, তবে শিক্ষকশ্রেণীর মধ্যে এক সম্প্রদায়কে leisured classএ অর্থাৎ অবকাশভোগী সম্প্রদায়ে পরিণত করিতে হইবে। যুগপৎ শিক্ষকতা এবং গবেষণা ও সাহিত্য-সৃষ্টির কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে, অধিকাংশ স্থলে হয় শিক্ষাদানের, না হয় স্বাধীনচিন্তার ক্ষতি হইবেই। হয় নিয়মিত শিক্ষাদানে অবহেলা, অবসাদ, শৈথিল্য, অমনোযোগ আসিবে; না হয় গবেষণাকার্য্যে পদে পদে বাধা বিঘ্ন ব্যাঘাত ঘটিবে। ক্বচিৎ সব্যসাচী মিলিতে পারে, কিন্তু ইহাই সাধারণ নিয়ম। এ অবস্থায় দেশে প্রকৃত জ্ঞানচর্চ্চার প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে বা বাহিরে Endowed Research Chairs অর্থাৎ গবেষণা-বৃত্তি স্থাপন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অবশ্য এগুলি যে শিক্ষকশ্রেণীর একচেটিয়া হইবে এমন কথা বলিতেছি না। এরূপ প্রতিষ্ঠান দেশে থাকিলে যে পূর্ব্ব আমলে ৺রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ৺পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত (সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস প্রণেতা) এবং অধুনা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ও রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের ন্যায় মনীষিবৃন্দ অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে তাঁহাদিগের অমূল্য তথ্যগুলি আবিষ্কার ও প্রচার করিতে পারিতেন, তাহা বলা বাহুল্য। অবশ্য, ইহা অস্বীকার্য্য নহে যে মানবের চিন্তাশক্তি ও কার্য্যকরী শক্তি চির-রহস্যময়। দারিদ্র্যের ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও অনেকে গবেষণা প্রভৃতির দ্বারা যশস্বী হইয়াছেন; আবার গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব নাই, অখণ্ড অবসর আছে, যৌবনে শিক্ষা ও কার্য্যে প্রণোদনার অভাব হয় নাই, অথচ জগতে স্থায়ী কার্য্য করিতে পারেন নাই, এরূপ সাহিত্যসেবীও দেখা যায়; কিন্তু তথাপি প্রস্তাবিত উপায় অবলম্বন করিলে যে মোটের উপর বেশী কাজ হইবে, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে আমার মনে যেসকল চিন্তার উদয় হইয়াছে, পাঠক-সমাজে তাহা উপস্থাপিত করিলাম। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এতৎসম্বন্ধে আলোচনা করিলে সুখী হইব। ইতি

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইউরোপীয় মহাসমর

(আদি হইতে উদ্‌যোগ পর্ব্ব পর্য্যন্ত)

ইউরোপের মহাসমরের সকল কথা লইয়া ভবিষ্যতে বৃহদায়তন সংহিতা রচিত হইবে; কেহ কেহ পড়িবেন, কেহ বা পড়িবেন না। আমরা এই সমরের আদি হইতে উদ্‌যোগ পর্ব্ব পর্য্যন্ত কথাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি। ইউরোপীয় সভ্যতার প্রকৃতি ও ধাঁচা বুঝিবার পক্ষে এই বিবরণ কথঞ্চিৎ উপযোগী হইবে।

আলসেস্ ও লোরেইন ঘটিত কথা।

মোটামোটি সকল লোকেই জানে, যে, ফরাসিরা যখন ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে জর্ম্মানির সহিত যুদ্ধে হারিয়া যায়, তখন জর্ম্মানরা ফরাসিদেশের আল্‌সেস্ ও লোরেইন নামক উপপ্রদেশ দখল করিয়াছিল। ঐ উপপ্রদেশ পূর্ব্বকালে জর্ম্মনরাজ্যের পশ্চিমসীমান্ত-রাজ্যই ছিল। ফরাসিদেশের

রাজা চতুর্দ্দশ লুই, ছলে বলে কৌশলে ঐ প্রদেশ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, এবং সেইদিন হইতে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ফরাসির দখলেই ছিল। উপপ্রদেশের লোকেরা জর্ম্মানির অধিকারভুক্ত থাকিবার সময়েও রোমক এবং ফরাসিস্ সভ্যতা অবলম্বন করিয়া বাড়িয়াছিল, কাজেই ফরাসির দিকেই তাহাদের সহানুভূতি অধিক ছিল, এবং তাহারা জর্ম্মান-প্রভাব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সুখেই বসবাস করিতেছিল। যখন প্রুষিয়ার সহিত অন্যান্য খণ্ড খণ্ড রাজ্য মিলাইয়া জর্ম্মানি বলশালী হইতে চেষ্টা করিতেছিল, তখন রাজ্যের পশ্চিমসীমান্তে আল্‌সেস্ লোরেইন না থাকায়, দেশের একটি প্রাকৃতিক রক্ষা-স্তম্ভের অভাব অনুভূত হইতেছিল। ফরাসিরাও সীমান্তে পাহাড় প্রভৃতির কোনও প্রাকৃতিক বাধা না থাকায়, সুবিধা পাইয়া ক্রমাগত জর্ম্মানিকে বিধ্বস্ত করিতে ছাড়ে নাই। নামজাদা নেপোলিয়েন যাহা করিবার তাহা তো করিয়াছিলেন, তাঁহার পরেও বহু বৎসর ধরিয়া জর্ম্মানি ফরাসিস্ উপদ্রব সহিতেছিল। মন্ত্রীকুলতিলক জগৎপ্রসিদ্ধ বিসমার্ক এবং মল্টকে যখন জর্ম্মানির বিশাল প্রসার বাড়াইয়া সুদৃঢ় একতা স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন নির্ভয়ে ফরাসিসদিগকে দণ্ডিত করিয়া আল্‌সেস ও লোরেইন অধিকার করিয়াছিলেন।

জর্ম্মানি যদি কেবল বিচ্ছিন্ন উপপ্রদেশটুকুই দখলে আনিত, তাহা হইলে তেমন গোল বাধিত না। ঐ উপপ্রদেশের সহিত খাঁটি ফরাসিরাজ্যের অংশ লইতেও ছাড়ে নাই; সমগ্র মেট্‌জ্ (Metz) জেলা, জন্মে কর্ম্মে ও ধর্ম্মে ফরাসিস্। যুদ্ধজয়ের সময় ফরাসির বেলফোর্ট্ নগরও জর্ম্মানি দখল করিয়াছিল; কিন্তু টিয়ারের (M. Thiers) করুণ আবেদনে জর্ম্মানির মন গলিল বলিয়া বেলফোর্ট পরিত্যক্ত হইল। সুবুদ্ধি বিস্‌মার্ক মেট্‌জ্ দখল করিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন; কিন্তু স্বয়ং সম্রাট হইতে আরম্ভ করিয়া লোকসাধারণের সকলেই জয়স্তম্ভস্বরূপ ঐটুকু রাখিবার জন্য জিদ করিয়াছিল। তখন যদি সম্রাট বিস্‌মার্কের কথা শুনিতেন, তাহা হইলে হয়তো বা একালের নূতন মহাভারত রচিত হইত না। নবলব্ধ উপপ্রদেশ যে সুশাসিত হয় নাই তাহার অনেক পরিচয় আছে। কেবল মেট্‌জের অধিবাসী নয়, অনেক আল্‌সেটিয়ান এবং লোরেইনার আপনাদের ভিটামাটি ছাড়িয়া ক্রমাগত ফরাসিদেশের আশ্রয় লইতেছিল। উহাদের জন্য যদি স্বতন্ত্র স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা হইত; তবে জর্ম্মনিকে এত ভোগ ভুগিতে হইত না।

রোমক্-প্রভাবে অর্থাৎ প্রাচীন প্রথার খৃষ্টিয়ানের গুরু পোপের প্রভাবে জর্ম্মানির বিরুদ্ধে যে-সকল বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র হইতেছিল, তাহা অধিকপরিমাণে ফরাসিদেশে এবং বেল্‌জিয়মে হইতেছিল বলিয়া ভূতপূর্ব্ব কাইজার এবং বিস্‌মার্কের সন্দেহ ছিল। এই বিদ্রোহ নবলব্ধ উপপ্রদেশেও গোপনে আশ্রয় পাইতেছিল বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। এই জন্যই ১৮৭০ সালের সন্ধির কয়েকবৎসর পরেই আবার ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে বলিয়া জয়দৃপ্ত জর্ম্মানি বিশেষরূপে শাসাইয়াছিল। বিসমার্ক ফরাসিকে স্পষ্ট কথায় বলিয়াছিলেন, যে, তুমি পোপের প্রভাব জীর্ণবস্ত্রের মত দূরে পরিহার কর এবং আমার সাহায্যে বেলজিয়মরাজ্যকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া তার দক্ষিণ-পশ্চিমভাগ গ্রহণ কর এবং লুপ্ত মেট্‌জ্ প্রভৃতির কথা ভুলিয়া যাও। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে যে বেলজিয়ামের সর্ব্বনাশ কবিবার প্রস্তাব উঠিয়াছিল এ কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলে উপস্থিত বিগ্রহের একটি সমস্যা পূরণে সুবিধা হইবে।

একদিকে পরাভূত ফ্রান্সকে আবার বিধ্বস্ত করিবার সংবাদ, অন্যদিকে বেল্‌জিয়ম্‌কে পদদলিত করিয়া, বৃটনপদলাঞ্ছিত সাগর-শাখার উপকূল পর্য্যন্ত জর্ম্মানির প্রভাববিস্তারের আশঙ্কা; কাজেই ইংলণ্ড বহুবিধ যত্নে এবং উপায়ে জর্ম্মানিকে জৈত্রযাত্রা হইতে নিরস্ত করিলেন। অতুল্য প্রতিভাশালী নেপোলিয়নের সময় হইতে ফরাসিসেরা প্রতিবেশীর উপর যেরূপ উপদ্রব করিয়া শান্তিভঙ্গ করিতেছিল, তাহাতে জর্ম্মানির বিপুল একজাতীয়ত্ব এবং ফ্রান্সের পরাভব, মঙ্গলময় বলিয়াই সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু বিস্‌মার্কের নবপ্রচারিত নীতি পুষ্টিলাভ করিলে বিষম অমঙ্গল ঘটিত। ইংলণ্ড তখন একদিকে রুষিয়ার সহিত এবং অন্যদিকে ফ্রান্সের সহিত মিত্রতা স্থাপনের চেষ্টা করিলেন। ইংলণ্ডও জানিতেন জর্ম্মানিও জানিতেন যে বেলজিয়ম্ লইয়া বিবাদ তুলিলে ইংলণ্ডের সহিত জর্ম্মানির যুদ্ধ বাধিবে। বিস্‌মার্ক ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, যে, ১৮৩৯

খ্রীষ্টাব্দের সর্ত্ত অনুসারে, ইংলণ্ড বেলজিয়মকে রক্ষা করিতে বাধ্য। এই কথাটির প্রতি বিশেষভাবে পাঠকদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি; কারণ হালের যুদ্ধের প্রারম্ভে কাইজার প্রভু একেবারে নেকা সাজিয়া বলিয়াছিলেন, যে, বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে ইংলণ্ড যে কেন যুদ্ধে নামিবেন তাহা তিনি জানিতেন না। নিজের স্বার্থরক্ষা করা ছাড়াও যে আগেকার সন্ধি অনুসারে বেলজিয়মকে রক্ষা করিতে ইংলণ্ড ধর্ম্মতঃ বাধ্য, এ কথা বিসমার্কের মুখেই স্বীকৃত। যাহা হউক বিস্‌মার্কের চতুরতায় সে সময়ে রুষিয়ার সহিত ইংলণ্ডের পূর্ণমিত্রতালাভ ঘটে নাই। বল্‌কান রাজ্যে অষ্ট্রিয়ার ক্ষমতা বাড়াইয়া দিয়া ঐ প্রদেশে রুষিয়ার প্রভাববিস্তারের পথ রুদ্ধ করিয়াও যে-কূটনীতির চক্রে বিস্‌মার্ক রুষসম্রাটকে ভুলাইয়া আপনার দলে রাখিয়াছিলেন, সে কথা বলিতে গেলে পুথি বাড়িয়া যায়।

ফ্রান্স তখন ইংলণ্ডের দুইশত বৎসরের প্রাচীনশত্রু হইলেও ইংলণ্ডের সহিত তাহার রাজনৈতিক মিত্রতা করিবার সুবিধা হইয়াছিল। ইতিহাসে একথা তেমন অস্বীকৃত নহে, যে,১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধের সময়ে ফ্রান্সকে রসদাদি যোগাইয়া ইংলণ্ড কিঞ্চিৎ রাজনৈতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া জর্ম্মানির বিষচক্ষে পড়িয়াছিলেন। মৈত্রীস্থাপনের সময় ইংলণ্ড ফ্রান্সকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, যে, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের মাছ কিংবা শ্যামরাজ্যের পণ্যের জন্য বিবাদ করা মূর্খতা। ফ্রান্স ইংলণ্ডের মিত্র হইলেন, বিধ্বস্তরাজ্য সুসজ্জ করিয়া পাকা রকমের শাসননীতি স্থাপন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কি উপায়ে আল্‌সেটিয়ান্ এবং লোরেইনারদিগকে জর্ম্মান-উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিতে পারেন তাহাও ভাবিতে লাগিলেন।

ভূতপূর্ব্ব কাইজারের রাজত্বকালের মধ্যে কিংবা বিস্‌মার্ক জীবিত থাকা পর্য্যন্ত রুষিয়ার সম্রাট জর্ম্মানির মিত্রতার মোহজাল কাটাইতে পারেন নাই। জর্ম্মানি অষ্ট্রিয়াকে মিত্র করিয়া বল্‌কান্‌দিগকে পদদলিত করিবার চেষ্টায় ছিল এবং সুযোগ লাভ করিয়া আড্রিয়াটিককূলে বন্দর খুলিবার উদ্‌যোগ করিতেছিল এবং রুষিয়ার পথ রোধ করিয়া ক্ষমতার শিখরে উঠিতে চেষ্টা করিতেছিল, তবুও রুষিয়া কিছু করে নাই। এখনকার বর্ত্তমান কাইজার যখন দেখিলেন অথবা ভাবিলেন যে রুষিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে শত্রুতা করিতে পারিবে না এবং তাঁহার রাজ্যের পশ্চিমে ইউরোপের কোন অংশে আসিয়া সামরিক বল দেখাইবার তাহার কোন ক্ষমতা নাই, তখন তিনি রুষসম্রাটকে তুচ্ছ করিতে লাগিলেন। বুদ্ধিমান ব্যক্তি তৃণের সাহায্যও উপেক্ষা করে না কিন্তু এখনকার মহাসমরের অশান্তি এবং পাপের প্রবর্ত্তক কাইজার অতিদর্পে রুষকে শত্রু করিয়া তুলিলেন। জর্ম্মানি বিপুল প্রভুতা লাভ করিলে রুষিয়া এবং ফ্রান্সের যে অকল্যাণ হয় ফ্রান্স তাহা সহজেই রুষিয়াকে বুঝাইতে পারিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে রাজনীতির কথা আরও অনেক আছে; সহজে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে, ১৮৯০—১৮৯৪ পর্য্যন্ত জর্ম্মানিতে নূতন মন্ত্রণা চলিল এবং সেই সময়ের মধ্যে ইউরোপীয় রাষ্ট্রবিপ্লব রহিত করিবার জন্য ইংলণ্ড ফ্রান্স এবং রুষিয়া একত্রে মৈত্রী স্থাপন করিলেন। এই সময়ে আল্‌সেটিয়ান এবং লোরেইনারগণ প্রকাশ্যভাবে আন্তর্জাতিক সভায় উপস্থিত হইয়া আপনাদের স্বাধীনতার জন্য যে-সকল প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন, তাহাতে কাইজার স্বায়ত্তশাসনের কোন ব্যবস্থা না করিয়া বরং জাতি পিষিবার নীতি উগ্রতর করিলেন। একদিকের কথা এই পর্য্যন্ত বলিয়াই অন্যদিকের কয়েকটি কথা বলিতেছি। তাহার পর সকলদিকের কথা মিলাইয়া সমরের উদ্‌যোগ পর্ব্বের কথা বুঝিতে সুবিধা হইবে।

বাণিজ্য এবং উপনিবেশ-ঘটিত কথা।

এ যুগে বিস্‌মার্কের মত পাকা রাজমন্ত্রী দেখা যায় না; অনেকগুলি প্রদেশ যখন একসঙ্গে জমাট বাঁধিয়া নূতন জর্ম্মনরাজ্য দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত হইল, এবং ফ্রান্সকে পরাজিত করিবার পর যখন নবজর্ম্মানি সামরিকগৌরবে ইউরোপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল, তখন দেশের ধনসম্পদ বাড়াইবার দিকে বিবিধ উদ্‌যোগ চলিতে লাগিল। জর্ম্মানির বণিকসম্প্রদায় জিদ্ ধরিলেন যে, তাঁহারা ইংরেজের মত বহির্ব্বাণিজ্যে বড় হইবেন, এবং নূতন নূতন উপনিবেশ স্থাপন করিয়া দেশের প্রসার বাড়াইবেন। সুচতুর বিস্‌মার্ক দেখিলেন জর্ম্মানির লোকবল এবং অস্ত্রবল থাকিলেও নৌবল নাই। বিদেশবাণিজ্য বাড়াইতে গেলে সহজে সাগরপথে যাতায়াতে সুবিধা চাই; কিন্তু দেশের ভৌগোলিক

স্থিতি, উপযুক্ত এবং যথেষ্ট বন্দর লাভের প্রতিকূলে। তাহার উপর আবার বাণিজ্য রক্ষা করিতে গেলে, এবং উপনিবেশের উপযোগী স্থান লাভ করিতে গেলে, নৌ-সমরের উপযোগী যথেষ্ট যুদ্ধজাহাজ চাই; কিন্তু জর্ম্মানির তখন এ-সকল কিছুই ছিল না। উপযুক্ত-সংখ্যক জাহাজ গড়িতে হইবে, বল্টিকসাগরপথে জাহাজ যাতায়াতের জন্য প্রশস্ত করিয়া কীল-কেনাল কাটিতে হইবে, এবং আরও আনুসঙ্গিক অন্য উদ্‌যোগ করিতে হইবে; তবেই একার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। বিস্‌মার্ক এ-সকল কথা দেশের লোককে বুঝাইলেন, এবং সিদ্ধিলাভের জন্য সকলপ্রকার উদ্‌যোগই করিতে লাগিলেন, কিন্তু বণিকদিগের পক্ষে অধিকদিন চুপ করিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল।

বিস্‌মার্কের বিচারে, বাণিজ্য এবং উপনিবেশের দিকে দৃষ্টি না দিয়া, কৃষি এবং শিল্পের উন্নতি করাই প্রশস্ততর ছিল। এত বড় রাজশাস্ত্রদক্ষ ব্যক্তির এই নীতির কথা আমাদের ভাল করিয়া বিবেচনা করা উচিত। আমরা চকচকে বিদেশবাণিজ্যের দিকে তাকাইয়া, অর্ব্বাচীনযুগে একটি প্রবাদ সৃষ্টি করিয়াছি, যে, লক্ষ্মী বাণিজ্যেই প্রতিষ্ঠিতা হয়েন, এবং কৃষিকর্ম্মের গৌরব বাণিজ্যের অর্দ্ধেক। এ দেশের নৈসর্গিক অবস্থা দেখিয়া কি বলিতে পারি না, যে, কৃষকের ক্ষেত্রই চঞ্চলার যথার্থ অচল আসন? থাকুক সে কথা, এখন জর্ম্মানির কথাই বলি।

বিস্‌মার্কের নীতি অনুসরণ করিয়া কৃষি এবং শিল্পজাত সামগ্রী অতিরিক্ত বাড়াইয়া ফেলিবার পর, বিদেশের হাটে, উহার বিক্রয়ের সুবিধার জন্য, দেশের লোক ব্যগ্র হইয়া উঠিল। এই সময় কর্ম্মহীন এবং কর্ম্মপ্রার্থী লোকসংখ্যাও খুব বাড়িয়াছিল। ১৮৭২—১৮৮৩ পর্য্যন্ত বিস্‌মার্ক দেশের লোককে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু আর পারিলেন না। এই সময়ে জাহাজাদিরও কিঞ্চিৎ উন্নতি হইয়াছিল; কাজেই অবস্থার পরিবর্ত্তনে রাজমন্ত্রী বাণিজ্য এবং উপনিবেশবিষয়ে সতর্কভাবে দেশের লোককে সাহায্য করিতে লাগিলেন।

জর্ম্মানির বহির্ব্বাণিজ্য এবং উপনিবেশস্থাপন আরব্ধ হইবার পূর্ব্বের কয়েকটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রুষিয়া যাহাতে আপনাদের শ্লাবজাতির লোকের সহিত মিলিবার ছলে বল্‌কান্ রাজ্যের দিকে অগ্রসর না হয় অথচ জর্ম্মানির সহিত বন্ধুত্ব রাখে তাহার জন্য বিসমার্ক বাহাদুর তাহাকে গুপ্তপরামর্শ দিয়া তুর্কীর কনস্তান্তি-নোপল অধিকারের দিকে উৎসাহিত করিলেন। আড়াই পাক ঘুরাইয়া বেশ ঘোড়ার চালের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। বিস্‌মার্ক জানিতেন ইংরেজ তাহাকে একার্য্য করিতে দিবেন না, এবং উহা লইয়া লাভের মধ্যে রুষে ও ইংলণ্ডে মৈত্রীর ব্যাঘাত ঘটিবে। বলা বাহুল্য যে ১৮৭৬ এবং ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনায় বিস্‌মার্কের মন্ত্রণাই ফলবতী হইয়াছিল। ইহার পরে আবার রুষকে কাবুল এবং ভারত দেখাইয়া কৌটিল্য মহাশয় খাসা দাবার চাল চালিয়াছিলেন। রুষ, মর্ভ দখল করিবার পর ইংলণ্ডে যে রুষ-বিদ্বেষ জাগিয়া উঠিল তখনকার একজন ইংরেজ মন্ত্রী তাহাকে nervousness শব্দের সাদৃশ্যে mervousness —নাম দিয়াছিলেন। মধ্য-এসিয়ার দিকে লোলুপদৃষ্টি পড়ায়, পোলাণ্ড ও বল্‌কানের দিকে রুষিয়ার দৃষ্টি পড়িল না; কাজেই সুযোগ পাইয়া মন্ত্রীপ্রবর, অষ্ট্রিয়াকে নবিবাজার পর্য্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিতে দিলেন। ইংরেজিতে যাহাকে "বিড়ালের থাবা" বলে, জর্ম্মানি অষ্ট্রিয়াকে তাহাই করিয়া আসিতেছে। বাঙ্গলায় অনুবাদে ইহাকে পরের মাথায় কাঁটাল-ভাঙ্গা বলিতে পারি।

উত্তর আফ্রিকায় জর্ম্মানির উপনিবেশের প্রয়োজন ছিল না; ভারতরাজ্যের স্বার্থের এবং বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ইংরেজ অনায়াসেই মিসরের জন্য লোলুপ হইবে জানিয়া, বিস্‌মার্ক ইংলণ্ডকে মিসর লাভে উদ্‌যোগী করাইয়াছিলেন। ইহাতে একদিকে সুলতান আবদুল হামিদ ইংরেজের শত্রু হইলেন, অন্যদিকে ফরাসিও ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ হইয়া রহিলেন। এ-সকল যে একা বিস্‌মার্কের চাতুরীতে ঘটিয়াছিল, তাহা ইউরোপের ইতিহাসে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। ইংরেজকে মিসর দেখাইয়া দিয়া, বিস্‌মার্ক ফ্রান্সকে টিউনিস্ দেখাইয়া দিলেন, এবং উহা লাভের উপায়ও দেখাইয়া দিলেন। ঐ স্থানের প্রতি ইটালীর দৃষ্টি ছিল; কিন্তু মিসর লাভের পর ফ্রান্সকে একটু ঠাণ্ডা করিবার জন্য ইংরেজকে ফ্রান্সের টিউনিস্ লাভে সম্মতি দিতে হইয়াছিল বলিয়া, ইটালী কোন কথা কহিতে সাহস পাইল

না। বিস্‌মার্ক ইটালীকে কাছে টানিয়া বন্ধু করিলেন, এবং সে যাহাতে ত্রিপলি পাইতে পারে তাহার পন্থা দেখাইয়া দিলেন। ইটালী এই উপায়ে জর্ম্মানি এবং অষ্ট্রিয়ার সহিত "ত্রিগুণযোগে" (Triple Alliance) যুক্ত হইলেন। এটা হইল শ্রেণীক্রমে বল বাঁধা, ওস্তাদি রকমের বড়ের চাল।

ফ্রান্সের দৃষ্টি যাহাতে আলসেস্ লোরেইনের দিকে না থাকে, তাহার জন্য তাহাকে আফ্রিকার নিকটবর্ত্তী এবং অন্যস্থানের পচা পচা উপনিবেশ লাভের জন্য বিস্‌মার্ক অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতার সহিত উৎসাহিত করিয়াছিলেন। ইহার ফলে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সে বেশ ভুলিয়া ছিল; কিন্তু যখন অনেক খরচান্তের পর লাভের গুড়ে বালি পড়িল, এবং অনেকেই ম্যালেরিয়া প্রভৃতিতে পীড়িত হইয়া দেশে ফিরিল, তখন গা ঝাড়া দিয়া ইংরেজের সহিত মৈত্রী করিল, এবং আল্‌সেস্ লোরেইনের দিকে দৃষ্টি দিল। যদি এই দীর্ঘ অবসরে আল্‌সেস্ লোরেইন সুশাসিত হইত, তাহা হইলে বিস্‌মার্কের গজের চালে ফ্রান্স যেরূপ হস্তীমূর্খ প্রমাণিত হইয়াছিল, অবস্থাটি সেইরূপই থাকিত। আলসে-টিয়ান প্রভৃতির সম্বন্ধে যাহাই হউক, জর্ম্মানি কিন্তু এই অবসরে নৌবল কিয়ৎপরিমাণে বাড়াইয়াছিল। প্রতি-বেশীরা উপনিবেশ লইয়া ব্যস্ত ছিল বলিয়া তাহার প্রতি কেহ লক্ষ্য করে নাই।

উপনিবেশ সম্বন্ধে আর-একটা বড় রকমের রহস্য আছে। যদি উপনিবেশ করিতে হয় তবে দক্ষিণ আফ্রিকায়ই করিতে হইবে, একথা বিস্‌মার্ক স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। নৃতত্ত্ববিদেরা সকলেই বলেন যে দক্ষিণ আফ্রিকার উপনিবেশে ইউরোপীয়দিগের বর্ণমালিন্য ঘটে না, বরং সেখানকার নূতনবংশের লোকেরা দেখিতে অধিকতর সুন্দর হয়। অনেক পূর্ব্ব হইতেই বোয়ারেরা জর্ম্মানির সাহায্যের আশায় ট্রান্সভালে উপনিবেশ বাড়াইতেছিল। ইহাতে যখন ঐ দেশে ইংরেজদের সহিত বোয়ারদের সংঘর্ষণ ঘটিল, তখন বোয়ারদলের লোকেরা স্পষ্টভাবে জর্ম্মানিকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিল যে তাহারা জর্ম্মানির রক্ষাধীনে ট্রান্সভালে বাসা বাঁধিতে চায়। নৌবলের অভাবে বিস্‌মার্ক প্রত্যক্ষ সাহায্য দিতে পারেন নাই; কিন্তু ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে মাজুবা-হিলের যুদ্ধে ইংরেজ যখন হটিয়া গেলেন, তখন জর্ম্মান-প্রভাবের ফলেই গ্লাড্‌ষ্টোনকে মাথা হেঁট করিতে হইয়া-ছিল। কোন কোন লোক আপনাদের চক্‌চকের দিকটার চমকে, জীবদ্দশায় বেশ বড় লোক বলিয়া গণিত হন। গ্লাড্‌ষ্টোন্ যে এই শ্রেণীর লোক ছিলেন এবং যথার্থ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না, তাহা তীক্ষ্ণ সমালোচক মেথ্যু আর্‌নল্ড অনেকবার বলিয়াছিলেন। বিসমার্ক যখন ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে Angr -pequena দখল করিলেন, তখন ইংলণ্ডে একটু গোল উঠিয়াছিল; কিন্তু বিসমার্ক যখন গ্লাড্‌ষ্টোনকে বোকা বানাইয়া, মিসরে জর্ম্মানির যতটুকু যাহা ছিল, তাহা ইংরেজকে দিয়া Angra-pequena হইতে আরম্ভ করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত স্থান দখল করিয়া লইল এবং লুসিয়ানা উপসাগরের (Luciana Bay) কূলেও অনেক স্থান লাভ করিল। ট্রান্সভালের বোয়ারেরা যে ইহাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। শেষবারকার বোয়ারযুদ্ধ যে কারণে যাহা ঘটিয়াছিল, এবং কি জন্য জর্ম্মানি ক্রুগারের নিরন্তর অনুরোধ সত্ত্বেও বোয়ারকে সাহায্য করিতে পারে নাই, সেই-সকল কথার উল্লেখ করিতে পারিলাম না; জর্ম্মানি যে এ কালের সকল যুদ্ধের তলায়ই ছিলেন তাহার ইঙ্গিত মাত্র করিলাম।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বিসমার্ক ইংলণ্ডকে হেলিগোলাণ্ড দান করিতে অনুরোধ করিলেন এবং সেই সময়কার ইংরেজ-নীতিজ্ঞদিগের সরলতায় পরে উহা লাভ করিয়া জর্ম্মানির উত্তরকূল হইতে ইংরেজের দৃষ্টিপাত তিরোহিত করিলেন। ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভা সে সময়ে রুষিয়াকে দমাইয়া রাখিবার জন্য জর্ম্মানির অনেক আব্‌দার মঞ্জুর করিয়াছিলেন; সেই সুবিধায় দক্ষিণ আফ্রিকার অনেক স্থলে, এবং ব্রাজিলে জর্ম্মানির প্রভাব এবং উপনিবেশ বাড়িয়া গিয়াছিল। ইহার পরে আর-একটি বড় রকমের ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

জর্ম্মানির বর্ত্তমান কাইজার ক্ষমতাশালী সুবক্তা এবং লোকপ্রিয়। ইঁহার চতুরতা যথেষ্ট আছে, কিন্তু বিস্‌মার্কের পর ইঁহাকে সুমন্ত্রণা দিবার কেহ নাই। বিস্‌মার্কের পন্থা অনুসরণ করিয়া চলিলেও, অনেকস্থলে হঠকারিতার পরি-চয় দিয়াছেন। বোয়ারযুদ্ধে ক্রুগারের প্রত্যাশিতরূপে কোন সাহায্য দিতে পারেন নাই; কিন্তু ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে বোয়ারযুদ্ধের গোলমালের শেষ পর্য্যন্ত রণতরীগুলি

খুব ভাল করিয়া প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছিলেন, এবং তীর্থদর্শনের ছুতায় নিজে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে পেলেষ্টিন গমনের সময় তুরস্করাজ্য দিয়া বাগদাদ-রেলপথ নির্ম্মাণের অনুমতি-টুকু আবদুল হামিদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন আর গ্লাড্‌ষ্টোনের দিন ছিল না; সুচতুর ইংরেজ জর্ম্মানির প্রতিপক্ষতা পরিষ্কার বুঝিয়া লইলেন। রুষিয়া এ সময়ে একবার আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু কাইজার উইলিয়ম্ তাহাকে গোপনে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, যে, রেল প্রস্তুত হইলে তিনি ও রুষিয়া পারস্যদেশকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ভাগ করিয়া লইবেন; এবং তাহাতে ভারতবর্ষের উপরে রুষিয়ার আধিপত্য বাড়িতে পারিবে। রুষিয়া প্রথমতঃ আহাম্মক বনিয়াছিল বটে, কিন্তু শেষে সকল চাতুরী বুঝিয়া ফেলিয়াছিল।

রুষিয়ার জার জর্ম্মানির কূটনীতি আর-এক কারণে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। জর্ম্মানি যে সর্ব্বঘটেই আছেন, এবং একালের সকল বিদ্রোহের তলে তলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়, উহা পূর্ব্বে একবার বোয়ারপ্রসঙ্গে বলিয়াছি। "পীতজ্বর" নিবারণের জন্য এবং মহাচীনের কূলে বাণিজ্যের সুবিধার জন্য জর্ম্মানি যে রুষিয়াকে জাপানের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছিল, একথা অল্পদিন পূর্ব্বে প্রকাশ পাইয়াছে। রুষ যখন জাপানের কাছে হারিল, তখন রুষ এবং জাপান উভয়েই জর্ম্মানির দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া অতি শীঘ্র বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিল। এই কারণেই মরক্কঘটিত বিবাদের সময়, ফ্রান্স ইংলণ্ডের প্রতি অতি ক্রুদ্ধ হইয়াও, পরে রুষিয়ার সহিত মিলিয়া ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সহিত পাকারকম রাজনৈতিক বন্ধুত্ব স্থাপন করিল। ইহার মধ্যে কীল-কেনালও খুব প্রশস্ত হইয়া গেল, জর্ম্মানির রণতরীও বাড়িয়া গেল; কাজেই জর্ম্মানি এ-সকল সন্ধি উপেক্ষা করিয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধ বাধাইবার অবসর এবং সুবিধা খুঁজিতে লাগিল। জর্ম্মানি ১৯১১ খৃষ্টাব্দে আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিমকূলে অগাদির (Agadir) দখল করিয়া লইলেও যখন ইংলণ্ড কিছু করিল না, তখন সে ইংলণ্ডকে নির্ব্বীর্য্য মনে করিয়াছিল। কাইজার উইলিয়ম এবারে নৌকার চাল চালিয়া, কিস্তিমাৎ করিতে পারিবেন ভাবিয়াছিলেন।

অষ্ট্রিয়ার রাজপারিবারিক হত্যাকাণ্ডের অনেকপূর্ব্বে যে জর্ম্মানি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল, তাহা দেখিতেছি। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকার জর্ম্মান উপনিবেশে যুদ্ধের বিপুল আয়োজনে অত্যধিক অস্ত্র শস্ত্র সংগৃহীত হইয়াছিল এবং ৬ বৎসরেও নিঃশেষিত না হইতে পারে এরূপ আহার্য্য-সামগ্রী সঞ্চিত হইয়াছিল। ইংরেজ ইহা গুপ্ত উপায়ে জানিতে পারিয়া জর্ম্মানিকে এই উদ্‌যোগের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কোন উত্তর দেয় নাই; একবার এইমাত্র বলিয়াছিল যে আফ্রিকার অসভ্যজাতির সঙ্গে বিবাদ বাধিবার ভয়ে ঐরূপ করিয়াছে। সে অঞ্চলে যে কোন উপদ্রবের আশঙ্কা ছিল না এবং নাই, ইংরেজ তাহা জানিতেন বলিয়া, আত্মরক্ষায় বিশেষ উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন। যে উদ্‌যোগ দক্ষিণ আফ্রিকার উপনিবেশে হইয়াছিল, তাহা যে কত অধিকপরিমাণে খাস জর্ম্মান-দেশের জন্য হইয়াছিল, তাহাও কিয়ৎপরিমাণে জানিতে পারা গিয়াছে। ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধটি যে দৈবাৎ ঘটে নাই, জর্ম্মানি যে মুখ্যভাবে ইংলণ্ডের দিকেই অগ্রসর হইতেছিল, ইংরেজ তাহা ১৯১০ খৃষ্টাব্দেই পরিষ্কার বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ট্রাইট্‌শে (Treitsche) ছাত্রদিগের মধ্যে চিরদিন প্রকাশ্যে ইংরেজ-বিদ্বেষ বাড়াইয়া আসিতেছিলেন, এবং কাইজার তাঁহাকে উৎসাহিত করিতেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে একখানি নূতন রণতরী সাজাইয়া সুবক্তা কাইজার যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে ইংলণ্ডের প্রতি বিদ্বেষের ভাব অনেক-স্থলেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সমগ্র জর্ম্মানদেশের লোক কাইজার উইলিয়মকে দেবতার মত পূজা করে। তাঁহার এই বক্তৃতার পর লোকসাধারণের মধ্যে যেপ্রকার উৎসাহের উদ্দীপনা দেখা গিয়াছিল, ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞেরা তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে ছাড়েন নাই। সরকারি কাগজ-পত্রে সে কথা লইয়া গভীর আলোচনা হইয়াছিল। কাইজার এখন যতই নেকা সাজুন, পৃথিবীর লোক তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিয়াছে।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফরাসিকে পরাজিত করিয়া এবং দেশের একতা দৃঢ় করিয়া, জর্ম্মানি যে-সকল অনুষ্ঠান করিয়াছিল, উহা হইল এই মহাসমরের আদিপর্ব্ব। অষ্ট্রিয়াকে মিলাইয়া,

রুষকে ভুলাইয়া, এবং ইংরেজকে প্রতারিত করিয়া বিসমার্ক যে অশান্তির বীজ-বহুল শান্তির যুগ আনিয়াছিলেন, উহাই হইল সভাপর্ব্বের কথা। রুষকে মধ্যএসিয়ায় তাড়াইয়া এবং ফরাসিকে বনের মহিষ তাড়াইবার পথে পাঠাইয়া বিসমার্ক যখন জর্ম্মনদেশের আভ্যন্তরীণ উন্নতি বিধান করিতেছিলেন, তখনকার ঘটনা লইয়াই বনপর্ব্ব রচিত হইবে। কাইজার উইলিয়মের ছদ্মবেশে তুরুষ্ক পেলেস্টিন ভ্রমণের কথা লইয়া হয়ত বিরাটপর্ব্ব রচিত হইতে পারে না; কারণ কাইজারের পক্ষই হইল দুর্য্যোধনের পক্ষ। উদ্‌যোগ পর্ব্বের পক্ষসংস্থানের কথা বলিয়াছি। কি ছুতা এবং কল্পিত সুবিধা লইয়া সহসা যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল, উহা যুদ্ধের সময়কার পর্ব্বের কথা। জর্ম্মানি কি কারণে কোন্‌ দেশকে হীনবল বলিয়া ভাবিয়া, দুঃসাহসিক পাপের কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা সকল পত্রেই পুনঃ পুনঃ আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ধর্ম্মপাল

[বরেন্দ্রমণ্ডলের মহারাজা গোপালদেব ও তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপাল সপ্তগ্রাম হইতে গৌড় যাইবার রাজপথে যাইতে যাইতে পথে এক ভগ্নমন্দিরে রাত্রিযাপন করেন। প্রভাতে ভাগীরথীতীরে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে দস্যুলুণ্ঠিত এক গ্রামের ভীষণ দৃশ্য ও অরাজকতা দেখাইলেন। সন্ন্যাসীর নিকট সংবাদ আসিল যে গোকর্ণ দুর্গ আক্রমণ করিতে শ্রীপুরের নারায়ণ ঘোষ সসৈন্যে আসিতেছেন; অথচ দুর্গে সৈন্যবল নাই। সন্ন্যাসী তাঁহার এক অনুচরকে পার্শ্ববর্ত্তী রাজাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনার জন্য পাঠাইলেন এবং গোপালদেব ও ধর্ম্মপালদেব দুর্গরক্ষার সাহায্যের জন্য সন্ন্যাসীর সহিত দুর্গে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দুর্গ শীঘ্রই শত্রুর হস্তগত হইল। ঠিক সেই সময়ে উদ্ধারণপুরের দুর্গস্বামী উপস্থিত হইয়া নারায়ণ ঘোষকে পরাজিত ও বন্দী করিলেন। সন্ন্যাসীর বিচারে নারায়ণ ঘোষের মৃত্যুদণ্ড হইল। দুর্গস্বামিনী কন্যা কল্যাণীকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিবার জন্য মহারাজ গোপালদেবকে অনুরোধ করিলেন। গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করার উৎসবের দিন মহারাজের সভায় সপ্ত সামন্ত রাজা উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাসীর পরামর্শক্রমে তাঁহাকে মহারাজাধিরাজ সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিলেন।

গোপালদেবের মৃত্যুর পর ধর্ম্মপাল সম্রাট হইয়াছেন। তাঁহার পুরোহিত পুরুষোত্তম খুল্লতাত-কর্ত্তৃক হৃতসিংহাসন ও রাজ্যতাড়িত কান্যকুব্জরাজের পুত্রকে অভয় দিয়া গৌড়ে আনিয়াছেন। ধর্ম্মপাল তাঁহাকে পিতৃসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এই সংবাদ জানিয়া কান্যকুব্জরাজ গুর্জ্জররাজের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া দূত পাঠাইলেন। পথে সন্ন্যাসী দূতকে ঠকাইয়া তাহার পত্র পড়িয়া লইলেন। গুর্জ্জররাজ সন্ন্যাসীকে বৌদ্ধ মনে করিয়া সমস্ত বৌদ্ধদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিবার উপক্রম করিলেন। এদিকে সন্ন্যাসী বিশ্বানন্দের কৌশলে ধর্ম্মপাল সমস্ত বৌদ্ধকে প্রাণপাত করিয়া রক্ষা করিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন। সম্রাট ধর্ম্মপাল সামন্তরাজাদিগকে সঙ্গে লইয়া কান্যকুব্জ রাজ্য জয় করিতে যাত্রা করিলেন।]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গোকর্ণ দুর্গে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে গোকর্ণদুর্গের বাহিরে নদীতীরে বসিয়া একজন কৃষ্ণকায় বৃদ্ধ বাঁশ কাটিতেছিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, সূর্য্যদেব আম্রপনসের ঘনকুঞ্জের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, বেণুকুঞ্জ ঝিল্লীরবে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, পক্ষীকুল দিবাবসানে বৃক্ষে বৃক্ষে আশ্রয় লইয়াছে। গোকর্ণদুর্গের তোরণ উন্মুক্ত ও জনশূন্য। এই বৃদ্ধ ব্যতীত দুর্গের সম্মুখে আর কেহই নাই। বৃদ্ধ হঠাৎ অস্ত্র ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, ঝিল্লীরবের জন্য অন্য শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল না, সে ঈষৎ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া দূরে সরিয়া আসিল। দূরে আসিয়া বৃদ্ধ দূরে অশ্বপদশব্দ শুনিতে পাইল। তখন সে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া নিকটস্থিত একটি আম্রবৃক্ষে আরোহণ করিল।

তখন চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে। বৃদ্ধ দেখিতে পাইল যে, রণগ্রামের ঘাটের পথ অবলম্বন করিয়া মাত্র একজন অশ্বারোহী গোকর্ণদুর্গের দিকে আসিতেছে। তাহা দেখিয়া সে আশ্বস্ত হইয়া নামিয়া আসিল। কিয়ৎক্ষণপরে অশ্বারোহী দুর্গে আসিয়া পৌঁছিল। সে দুর্গদ্বারের সম্মুখে কেদারকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে? দুর্গে এখন কে আছেন?" বৃদ্ধ কহিল, "আমার নাম কেদার, আমি গোকর্ণদুর্গের পদাতিক। অমাত্য উদ্ধবঘোষ মহারাজের সহিত যুদ্ধে গিয়াছেন, শুনিয়াছি তিনি মহারাজের আদেশে দক্ষিণদেশে গিয়াছেন।"

"এখন দুর্গরক্ষার ভার কাহার উপরে আছে?"

"নবীন সামন্তের উপরে।"

"দুর্গস্বামিনী কোথায়?"

"দুর্গমধ্যে, অন্তঃপুরে।"

"তুমি অন্তঃপুরে গিয়া তাঁহাকে বল যে, মহারাজ ধর্ম্মপাল দুর্গদ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন। নবীন সামন্তকে বল যে, শীঘ্র তূর্য্যধ্বনি করুক ও গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা

দুর্গমধ্যে লইয়া আসুক। শত্রুসেনা বোধ হয় শীঘ্রই দুর্গ আক্রমণ করিবে।"

কেদার গৌড়েশ্বরকে একাকী সন্ধ্যাকালে দুর্গদ্বারে উপস্থিত দেখিয়া এতই আশ্চর্য্য হইয়াছিল যে, সে তাঁহাকে প্রণাম করিতে ভুলিয়া গেল, বৃদ্ধ উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। কিয়ৎক্ষণপরে গোকর্ণের পদাতিক সেনার নায়ক নবীন সামন্ত দুর্গদ্বারে আসিয়া সম্রাটকে অভিবাদন করিল। নবীন পূর্ব্বে গোকর্ণের যুদ্ধে ধর্ম্মপালদেবকে দেখিয়াছিল, তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিবার পরেও দুই একবার উদ্ধব ঘোষের সহিত গৌড়ে গিয়াছিল। সে তাঁহাকে একাকী দেখিয়া কহিল, "মহারাজের কি কোন বিপদ হইয়াছে? আপনাকে একাকী দেখিতেছি কেন?"

ধর্ম্মপাল কহিলেন, "সামন্তসেনা যুদ্ধ করিতে করিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সেইজন্য আমি একাই সংবাদ দিতে আসিয়াছি। তুমি শীঘ্র তূর্য্যধ্বনি কর।"

এই সময়ে কেদার অন্তঃপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "মহারাজ, অন্তঃপুরে আসুন, দেবী আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।"

ধর্ম্মপাল কেদারের সহিত অন্তঃপুরে যাত্রা করিলেন। নবীন তোরণে দাঁড়াইয়া তূরী বাজাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে গ্রামের বালক বৃদ্ধ বনিতা দুর্গমধ্যে পলাইয়া আসিল, অস্ত্রধারণক্ষম পুরুষগণ দুর্গে আসিয়া অস্ত্র গ্রহণ করিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বহু অশ্বারোহী আসিয়া গোকর্ণদুর্গের সম্মুখে সমবেত হইল, তাহা দেখিয়া গ্রামবাসীগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। এই সময়ে একজন অশ্বারোহী দুর্গের তোরণের নিকটে আসিয়া কহিল, "মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বরের জয় হউক; আমরা গৌড়ীয় সেনা, দুর্গ রক্ষার জন্য আসিয়াছি। মহারাজ কি গোকর্ণদুর্গে আসিয়াছেন?" নবীন সামন্ত তোরণের নিম্নে দাঁড়াইয়াছিল, সে প্রাকারে আরোহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা যে গৌড়ীয় সেনা তাহার প্রমাণ কি?"

"গোবর্দ্ধনের সন্ন্যাসী অমৃতানন্দ আমাদিগের সঙ্গে আছেন। তোমরা দূত পাঠাইয়া দাও, অদ্যকার সঙ্কেতের কথা বলিতেছি।"

নবীন গোবর্দ্ধনমঠের সন্ন্যাসী অমৃতানন্দকে চিনিত, কিন্তু সে সঙ্কেতের কথা জানিত না। সে বলিল, "তুমি অপেক্ষা কর, আমি জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।" অশ্বারোহী কহিল, "শীঘ্র ফিরিয়া আইস, শত্রুসেনা বোধ হয় আসিয়া পড়িল।" নবীন দ্রুতপদে অন্তঃপুরের দিকে চলিল।

ধর্ম্মপালদেব গোকর্ণদুর্গের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, রঘুসিংহের বিধবাপত্নী শুভ্রবসনে আবৃতা হইয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছেন। গৌড়েশ্বর তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "মা, বড়ই বিপদ উপস্থিত। গুর্জ্জরসেনা গঙ্গাতীরে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহারা বোধ হয় শীঘ্রই দুর্গ আক্রমণ করিবে।"

"তুমি যখন আসিয়াছ, তখন আর কিসের বিপদ বৎস?"

"আমি বিপদ বুঝিতে পারিয়া একাকী সংবাদ দিতে আসিয়াছি, আমার সঙ্গে সৈন্য সামন্ত কিছুই নাই।"

"তাহার জন্য চিন্তা কি বৎস! স্বর্গীয় মহারাজের প্রসাদে গোকর্ণের শ্রী ফিরিয়াছে। গ্রামবাসীগণ দুই দশদিন দুর্গরক্ষা করিতে পারিবে।"

"মা, গুর্জ্জরসেনা দুর্গ আক্রমণ করিলে বোধ হয় দুই দশদিনে সে যুদ্ধ শেষ হইবে না।"

"ততদিনে কি তোমার সৈন্যসামন্ত আসিয়া পৌছিবে না?"

"পৌছিবে। কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"

"আমি বলিতেছিলাম ভীষণ গুর্জ্জরযুদ্ধে—"

ধর্ম্মপালদেব কথা শেষ না করিয়াই অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহা দেখিয়া বিধবা দুর্গস্বামিনীর হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "পুত্র, কি বলিতেছিলে বল?"

"আমি বলিতেছিলাম যে, যুদ্ধের সময়ে পুরমহিলাদিগকে স্থানান্তরিত করা উচিত।"

"মহিলাদিগকে কোথায় পাঠাইবে?"

"ঢেক্করীতে।"

"কে লইয়া যাইবে?"

"দেখি কি ব্যবস্থা করিতে পারি।"

এই সময়ে নবীন সামন্ত অন্তঃপুরের দ্বারে দাঁড়াইয়া

কহিল, "মা, দুর্গের বাহিরে অনেক অশ্বারোহী সেনা আসিয়াছে। তাহারা বলিতেছে যে, তাহারা মহারাজের সেনা এবং গোবর্দ্ধন মঠের সন্ন্যাসী অমৃতানন্দ তাহাদিগের সঙ্গে আছেন।"

দুর্গস্বামিনী কহিলেন, "তোরণ উন্মুক্ত কর, প্রভু অমৃতানন্দকে অন্তঃপুরে লইয়া আইস এবং মহারাজের সেনাগণকে প্রবেশ করিতে দাও।"

"মা!"

"কেন, নবীন?"

"গৌড়ীয়সেনা চিনিব কেমন করিয়া?"

ধর্ম্মপালদেব কহিলেন, "তাহাদিগকে অদ্যকার সঙ্কেতের কথা জিজ্ঞাসা কর।" নবীন উত্তর করিল, "প্রভু, আমি ত সঙ্কেতের কথা জানি না।"

"অদ্যকার সঙ্কেতের কথা—"

গৌড়েশ্বর কথা শেষ না করিয়াই অবনতমস্তকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণপরে নবীন কহিল, "প্রভু,—?"

গৌড়েশ্বর মস্তকোত্তলন না করিয়াই কহিলেন, "অদ্যকার সাঙ্কেতিক কথা 'কল্যাণী'।"

নবীন প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। অন্তঃপুরের চারিপার্শ্বে নারীকণ্ঠোত্থিত মৃদু হাস্যধ্বনি কঙ্কণবলয়শিঞ্জনের সহিত মিশিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণপরে অমৃতানন্দ ও জনৈক বস্ত্রাবৃতসৈনিক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। ধর্ম্মপাল অমৃতানন্দকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, আপনি কি করিয়া এখানে আসিলেন?"

"আমি ময়ূরাক্ষিতীরে শিবিরে ছিলাম। ভীষ্মদেব মহারাজের অদর্শনে চিন্তিত হইয়া আমাকে গোকর্ণে পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

"আপনার সহিত কত লোক আছে?"

অমৃতানন্দ সৈনিকের দিকে চাহিলেন। সৈনিক গৌড়েশ্বরকে অভিবাদন করিয়া কহিল, "সহস্র অশ্বারোহী।"

ধর্ম্মপাল কহিলেন, "প্রভু, সহস্র সেনা দুর্গরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। আমি পুরমহিলাদিগকে স্থানান্তরে পাঠাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম।"

"কোথায় পাঠাইবে?"

"ঢেক্করীতে।"

"দুর্গস্বামিনী কি বলেন?"

রঘুসিংহের বিধবাপত্নী অবগুণ্ঠন টানিয়া দূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি অমৃতানন্দকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "প্রভু, কল্যাণী ব্যতীত আর কাহাকেও পাঠাইবার আবশ্যক নাই। কল্যাণীকে বহুপূর্ব্বে মহারাজের হস্তে সমর্পণ করিয়া দিয়াছি, সুতরাং কল্যাণীর জন্য গৌড়েশ্বর যে ব্যবস্থা করিবেন তাহাই হইবে, এ বিষয়ে আমার মতামত অনাবশ্যক।"

অমৃতানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি?"

"প্রভু! আমি গোকর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারিব না। বিবাহের দিনে এই গৃহে আসিয়াছি, আর চিতারোহণের দিনে বাহির হইব। আপনারা আমাকে কোন অনুরোধ করিবেন না। কল্যাণীর ভদ্রবংশজাতা দুই তিনটি সখী আছে, তাহাদিগকেও কল্যাণীর সহিত লইয়া যান।"

অমৃতানন্দ কহিলেন, "তবে তাহাই হউক। মহারাজ! কল্যাণীদেবীর সহিত কে যাইবে? আমি স্বয়ং দুর্গরক্ষায় থাকিব।"

ধর্ম্মপালদেব কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া সৈনিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?" উত্তর হইল, "গুরুদত্ত।"

"তুমি কল্যাণীদেবীকে ঢেক্করীতে লইয়া যাইতে পারিবে?"

"মহারাজ, আমি সৈনিক, যুদ্ধ আমার ব্যবসায়, কিন্তু অপরিচিতা কুলকামিনীকে কেমন করিয়া রাত্রিকালে লইয়া যাইব?"

"তোমার সহিত সেনা থাকিবে—"

"মহারাজ, অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, আমি ভয়ে এ কথা বলি নাই—"

এই সময়ে দুর্গস্বামিনী সৈনিকের কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "পুত্র, কল্যাণী যুবতী, রাত্রিকালে তুমি তাহার সহিত না থাকিলে লোকে কুৎসা রটাইবে।"

ধর্ম্মপাল কহিলেন, "তবে তাহাই হউক।"

অর্দ্ধদণ্ড পরে শিবিকারোহণে কল্যাণীদেবী ও তাঁহার সহচরী চতুষ্টয় গোকর্ণদুর্গ ত্যাগ করিলেন। গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালদেব স্বয়ং পঞ্চাশৎ অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে তাঁহাদিগকে ঢেক্করী নগরে লইয়া চলিলেন। তাঁহারা দুর্গত্যাগ করিবার এক দণ্ড পরে দুর্গ হইতে ভীষণ কোলাহল উত্থিত

হইল, গৌড়েশ্বর বুঝিতে পারিলেন যে, গুর্জ্জরসেনা গোকর্ণদুর্গ আক্রমণ করিয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নিশীথে বিপদ।

অন্ধকারময় বনপথে একের পর একখানি করিয়া পাঁচখানি শিবিকা চলিয়াছে। সম্মুখে পঁচিশজন অশ্বারোহী, অবশিষ্ট পঁচিশজন শিবিকাগুলি বেষ্টন করিয়া চলিয়াছে। মধ্যদেশে কল্যাণীদেবীর শিবিকা, গৌড়েশ্বর অশ্বারোহণে তাহার পার্শ্বে চলিয়াছেন। রজনীর দ্বিতীয়প্রহর অতীত হইয়াছে, গোকর্ণদুর্গ তখন তিনচারি ক্রোশ পশ্চাতে পড়িয়াছে। বাহকগণ নিশ্চিন্তমনে চলিয়াছে, অশ্বারোহীগণ সতর্কতা পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। এই সময়ে চারিদিকের অন্ধকারময় বনভূমি হইতে ভীষণ জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গেই শত শত অশ্বারোহী বন হইতে বাহির হইয়া গৌড়েশ্বরের ক্ষুদ্রসেনার দিকে অগ্রসর হইল। যে-সকল অশ্বারোহী শিবিকার অগ্রে চলিতেছিল, তাহারা অস্ত্রধারণ করিবার পূর্ব্বেই অশ্বারোহীগণ তাহাদিগের উপর আসিয়া পড়িল। তাহাদিগের পশ্চাতে যখন শত শত অশ্বারোহী আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন গৌড়েশ্বরের মুষ্টিমেয় শরীররক্ষীসেনা প্রবল স্রোতের মুখে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে সহস্রাধিক অপরিচিত সেনা সঙ্কীর্ণ বনপথে শিবিকাগুলি অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। এক নিমেষের মধ্যে এই ঘটনা ঘটিয়া গেল, ধর্ম্মপাল কোষ হইতে তরবারি বাহির করিবার অবসর পাইলেন না। তাঁহার অশ্ব তাঁহাকে লইয়া কল্যাণীর শিবিকার নিকট হইতে চলিয়া যায় দেখিয়া তিনি লম্ফ দিয়া অশ্ব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যখন অপরিচিত অশ্বারোহীর দল চলিয়া গেল, তখন ধর্ম্মপাল দেখিলেন যে, অপর চারিখানি শিবিকা নাই, বাহক নাই, শরীররক্ষী নাই, শত্রুসেনা নাই, তাঁহার অশ্ব নাই। অন্ধকার বনমধ্যে আছে কেবল কল্যাণীদেবীর ভগ্নশিবিকা এবং তিনি তাহার পার্শ্বে অক্ষতদেহে দাঁড়াইয়া আছেন। গৌড়েশ্বর ভাবিলেন যে শত্রুসেনা শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে, সুতরাং এই অবসরে পলায়ন করাই শ্রেয়। ধর্ম্মপাল ঈষৎ কম্পিতকণ্ঠে ডাকিলেন, "দেবি? কল্যাণি?" শিবিকার অভ্যন্তর হইতে উত্তর হইল, "কি?" বহুকাল পরে কল্যাণীদেবীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া হর্ষে ধর্ম্মপালের দেহ রোমাঞ্চিত হইল। তিনি উত্তর পাইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার অঙ্গে কি আঘাত লাগিয়াছে?" তৎক্ষণাৎ উত্তর হইল, "না।"

ধর্ম্মপাল তখন আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, "তবে শীঘ্র শিবিকা হইতে বাহির হইয়া আসুন, শত্রুসেনা হয়ত এখনই ফিরিয়া আসিবে, আমরা এইবেলা পলায়ন করি।" কল্যাণী শিবিকার যবনিকা সরাইয়া বাহিরে আসিলেন, কিন্তু চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার দেখিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। বিলম্ব দেখিয়া ধর্ম্মপাল কহিলেন, "শীঘ্র আসুন।" ধীরে ধীরে উত্তর হইল, "বড় অন্ধকার।"

"আমি আছি, ভয় নাই, আপনি আসুন।"

"কিছুই যে দেখিতে পাইতেছি না।"

"আপনি আমার হাত ধরিয়া আসুন।"

কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া কল্যাণী অবশেষে ধর্ম্মপালের হস্তধারণ করিলেন, উভয়ে বনপথ পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষরাজির নিম্নে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, চন্দ্রকিরণ নাই। অনন্ত আকাশে অন্ধকারে অসংখ্য তারকা হীরকখণ্ডের ন্যায় জ্বলিতেছে। একস্থানে অধিকক্ষণ অবস্থান করা নিরাপদ নহে ভাবিয়া ধর্ম্মপাল কল্যাণীকে লইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে কল্যাণী যন্ত্রণাব্যঞ্জক-অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কল্যাণীকে পতনোন্মুখ দেখিয়া ধর্ম্মপাল ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?" কাতরকণ্ঠে উত্তর হইল, "পদতলে কণ্টকবিদ্ধ হইয়াছে।" ধর্ম্মপাল তখন একহস্তে কল্যাণীকে ধারণ করিয়া অপরহস্তে চরণতল পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন কোমল পদপল্লবতলে সূচীবৎ তীক্ষ্ণ সুদীর্ঘ কণ্টক আমূলবিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ধর্ম্মপাল কৌশলে কণ্টক টানিয়া বাহির করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন, অনুভবে বুঝিতে পারিলেন যে, ক্ষতস্থান হইতে শোণিতস্রাব হইতেছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে উভয়ে এক বাপীতীরে উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মপাল কল্যাণীকে পরিষ্কৃতস্থানে বসাইয়া পুষ্করিণী হইতে উষ্ণীষ ভিজাইয়া আনিলেন এবং বস্ত্রখণ্ড ছিন্ন করিয়া

ক্ষতস্থান বন্ধন করিলেন। কল্যাণীদেবী কিয়ৎক্ষণ উপবেশন করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বাহুমূলে মস্তকরক্ষা করিয়া শয়ন করিলেন। ধর্ম্মপাল ক্রমে বুঝিতে পারিলেন যে কল্যাণী নিদ্রিতা হইয়াছেন, তখন তিনি উন্মুক্ত তরবারি হস্তে ইতস্তত পাদচারণ করিতে লাগিলেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, রজনীর অবশিষ্টাংশ জাগিয়া থাকিবেন, সেই জন্যই উপবেশন না করিয়া পাদচারণা করিতেছিলেন, কিন্তু সমস্তদিনের ঘোর পরিশ্রমে গৌড়েশ্বর অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পাদচারণ অসম্ভব হইয়া উঠিল, ধর্ম্মপাল নিদ্রিতা কল্যাণীর নিকটে আসিয়া উপবেশন করিলেন। তৎক্ষণাৎ নিদ্রা আসিয়া তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল, গৌড়েশ্বর কোষমুক্ত অসির উপরে মস্তক স্থাপন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

ক্রমে পাখী ডাকিল, পূর্ব্বদিক হইতে অন্ধকার পলাইয়া গেল। তরুণ উষার শুভ্র আলোকে দিগন্ত সদ্যস্নাতা কিশোরীর ন্যায় সুন্দরী হইয়া উঠিল, ধর্ম্মপাল ও কল্যাণী তখনও গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। পূর্ব্বাকাশে খণ্ড মেঘগুলি রক্তরঞ্জনে রঞ্জিত হইয়া উঠিল, শিশিরস্নাত তরুশীর্ষগুলি নবীন তপনের কিরণে সুবর্ণবর্ণে রঞ্জিত হইল, তখনও তাঁহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল না। ক্রমে রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিল, প্রভাত-সূর্য্যের কিরণ মুখমণ্ডল স্পর্শ করিবামাত্র ধর্ম্মপাল জাগিয়া উঠিলেন। তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিয়া দেখিলেন যে জনশূন্য প্রশস্ত দীর্ঘিকাতীরে শ্যামল তৃণক্ষেত্রে কল্যাণীদেবী তখনও নিদ্রিতা রহিয়াছেন। গৌড়েশ্বর চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া অসি হস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু কল্যাণীর সুন্দর মুখমণ্ডল হইতে তাঁহার দৃষ্টি অন্যত্র যাইতে চাহিল না। ধর্ম্মপাল দেখিলেন কল্যাণীর মুখখানি অতি সুন্দর, এমন সুন্দর মুখ তিনি বোধ হয় আর কখনও দেখেন নাই। তখন দীর্ঘিকায় তরুণ তপনের করস্পর্শে শত শত কমলিনী বিকশিতা হইয়া উঠিতেছিল, তাঁহার মনে হইল বাপীতীরে তৃণক্ষেত্রে তেমনই আর-একটি কমল ফুটিয়া উঠিয়াছে। কেমন আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নযুগল, তাহার উপরে প্রসাধনপটু শিল্পী যেন কজ্জলের রেখা টানিয়া দিয়াছে, নাতিপ্রশস্ত কপালের উপরে চূর্ণকুন্তল আসিয়া পড়িয়াছে, ওষ্ঠ দুইটির বর্ণ কি সুন্দর!

এই সময়ে রৌদ্র আসিয়া কল্যাণীদেবীর নিদ্রা-নিমীলিত নয়নদ্বয়ের উপরে পড়িল, কল্যাণীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। জাগিয়া দেখিলেন ধর্ম্মপাল সতৃষ্ণ নয়নে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া আছেন। কল্যাণীর সুন্দর মুখখানি লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি অবগুণ্ঠন টানিয়া উঠিয়া বসিলেন, ধর্ম্মপালও লজ্জিত হইয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন।

এতক্ষণে গৌড়েশ্বরের দৃষ্টি অন্য পথে চলিল, তিনি দেখিতে পাইলেন যে, অদূরে ইষ্টক-নির্ম্মিত প্রশস্ত ঘাট। ঘাট বোধ হয় ব্যবহার হয় না, কারণ সোপানসমূহ ঘন শ্যামল তৃণরাজিমণ্ডিত। ঘাটের অদূরে একটি বৃহৎকায় অশ্বত্থবৃক্ষ, তাহার নিম্নে বহু শুষ্ক পত্র পতিত রহিয়াছে। অশ্বত্থ বৃক্ষ দেখিয়া ধর্ম্মপালের মনে হইল যে, স্থানটি তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত। এক মুহূর্ত্ত পরে সমস্ত কথা মনে পড়িয়া গেল। আর-একদিন কল্যাণীদেবীর সহিত পলায়ন ও এই দীর্ঘিকার ঘাটে আশ্রয় গ্রহণ, একে একে গৌড়শ্বরের মানসপটে চিত্রিত হইল। তখন তাঁহার মনে হইল যে, দীর্ঘিকার তীরে তখন জনশূন্য গ্রাম ছিল; এতদিন গ্রামের লোক নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিয়াছে, সুতরাং গ্রামে নিশ্চয় আশ্রয় মিলিবে। ধর্ম্মপাল তখন কল্যাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবি! পায়ের বেদনা কমিয়াছে কি?" কল্যাণী অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "হাঁ।"

"চলিয়া যাইতে পারিবেন?"

"বোধ হয় পারিব।"

"তবে চলুন গ্রামে যাই।"

কল্যাণী ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন ধর্ম্মপাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবি, এই স্থান চিনিতে পারেন কি?" অস্ফুটস্বরে উত্তর হইল, "হাঁ।"

"আর-একদিন—আর-একদিন আপনার সহিত এইস্থানে আসিয়াছিলাম।" কল্যাণী দেবী উত্তর না দিয়া মস্তকের অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন।

ধর্ম্মপাল ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন, কল্যাণী অতি কষ্টে তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মপাল পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন যে কল্যাণী তখনও চলিতে অত্যন্ত যাতনা অনুভব করিতেছেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার হস্তধারণ করিলেন। কল্যাণী ভাবী

ভর্ত্তার স্কন্ধে ভর দিয়া ধীরে ধীরে গ্রামে প্রবেশ করিলেন।

গ্রাম তখনও জনশূন্য, অরাজকতা দূর হইলেও গ্রাম-বাসীগণ আর ফিরিয়া আসে নাই। তাহা দেখিয়া ধর্ম্মপাল অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কল্যাণী দেবী চলিতেছেন বটে, কিন্তু বোধ হয় অধিকদূর চলিতে পারিবেন না। ধর্ম্মপাল ভরসা করিয়াছিলেন যে, গ্রামে কোন গৃহস্থের আশ্রয়ে তাঁহাকে রাখিয়া তিনি একটি গৌড়ীয় সেনার অন্বেষণে যাইবেন, কিন্তু এখন তাহা অসম্ভব। কল্যাণী কিয়দ্দূর চলিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। ধর্ম্মপাল বুঝিলেন যে, তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি কল্যাণীকে বসিতে অনুরোধ করিয়া স্বয়ং তৃণক্ষেত্রে উপবেশন করিলেন। তখন দিবসের প্রথম প্রহর অতীত হইয়াছে, শেষ বসন্তের সূর্য্য প্রচণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। গৌড়েশ্বর ক্রমে তৃষ্ণাতুর হইয়া উঠিলেন এবং কিয়ৎক্ষণপরে কল্যাণীকে কহিলেন, "দেবি! সেবারে এই গ্রামে ফলমূল পাইয়াছিলাম, আপনি এই স্থানে অপেক্ষা করুন, আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছি।"

কল্যাণী কহিলেন, "একা আমার বড় ভয় করিবে।"

"আমি নিকটেই থাকিব, আপনার কোন ভয় নাই।"

কল্যাণীদেবী সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন, ধর্ম্মপাল আহার্য্যের অন্বেষণে বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বহুক্ষণ অন্বেষণ করিয়া গৌড়েশ্বর কোনই আহার্য্য সামগ্রী দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি হতাশ হইয়া গ্রাম্যপথে ফিরিয়া আসিলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, কল্যাণী যে-স্থানে বসিয়া ছিলেন সে-স্থান শূন্য। ধর্ম্মপাল ভীত হইয়া চারিদিকে অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন, কিন্তু কোন স্থানেই কল্যাণীদেবীকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে কল্যাণীর নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন, কেহই উত্তর দিল না। কল্যাণীর সন্ধানে বিজনগ্রামের সীমায় আসিয়া ধর্ম্মপাল পৃষ্ঠে সহসা দারুণ আঘাত অনুভব করিলেন, পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন যে পৃষ্ঠে কে শরাঘাত করিয়াছে, দেখিতে দেখিতে আরও দুই তিনটি শর তাঁহার দেহে বিদ্ধ হইল, গৌড়েশ্বর চেতনা হারাইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। (ক্রমশ)

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমরা

(গান)

আমরা সবাই নাই ভিড়ে ভাই
নাই মোরা নাই দলে,
বাসা আমাদের গন্ধরাজের
পরিমল-মণ্ডলে।
আমরা জানিনে চিনিনে শুনিনে
আমরা মানিনে কারে;
হৃদয়ে যাহার রাজ্য,—হৃদয়
রাজ-পূজা দেয় তারে;
মন যদি মানে তবেই মানি গো
পুলক-অশ্রুজলে।

অরসিকে মোরা যোড় হাতে কহি
ভিড় বাড়ায়ো না ভাই,
মরমী রসিকে হৃদয়ের দিকে
টেনে নিতে মোরা চাই!
নাই আমাদের ভিতর বাহির
কোনো কিছু নাই ছাপা,
নিশানের পরে আগুন-বরণ
আঁকি বৈশাখী চাঁপা;
মিলন মোদের কাব্যরাজের
কল্প-ছত্র-তলে।
বসতি মোদের গন্ধরাজের
পরিমল-মণ্ডলে॥ *

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

---

* শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে রচিত।

স্বরলিপি

সা ন্‌া দ্‌ন্‌া সা জ্ঞা জ্ঞা I রজ্ঞা রজ্ঞা মপা মজ্ঞা ঋা সা I ঋা । ন্‌া
ধী ০ রে ব ন্‌ ধু গো ০ ০ ধী ০ রে ধী ০ ০

সা । । I সপা পা ধা ধর্সা ণা ধা I পধা পা ধপা মা পা গা I
রে ০ ০ চ ল ০ তো মা র বি জ ন ম ন্‌ দি

গমা গা পা । । দা I মপা রমা জ্ঞরা সা ন্‌া দ্‌ন্‌া I সা জ্ঞা ।
রে ০ ০ ০ ০ ০ ধী ০ রে ব ন্‌ ধু গো ০ ০

জ্ঞঋা । সা I ঋা । ন্‌া সা । । II
ধী ০ রে ধী ০ ০ রে ০ ০

II পা পজ্ঞা পা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা I জ্ঞা পা পা পজ্ঞা পা ণা ।
জা নি ০ নে প থ না ই যে আ লো ০

ণা ণা ণা ধা ণা ণা I র্রা র্সা ণা র্সা ণা ধপা I পধা ণা ।
ভি ত র বা হি র কা লো য় কা লো ০ গো ০ ০

। দা পজ্ঞা I পণা ণা ণা ণা ধা ণা I ধা ণা ণা ধা ণা ধা ।
০ তো মার চ র ণ শ ব্‌ দ ব র ণ ক রে ০

র্সণা । । দা পা পা I পা পা দা পা মা পা I জ্ঞ পা । মা I
ছি ০ ০ আজ এ ই অ র ০ ণ্য গ ০ ভী ০ ০

পা । দা II
রে ০ ০

II মপা রমা জ্ঞরা সা ন্‌া দ্‌ন্‌া । সা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞরা । সা I ঋা । ন্‌া
ধী ০ রে ব ন্‌ ধু গো ০ ০ ধী ০ রে ধী ০ ০

সা । । I সা পা ধা পা র্সা ণধা I পদা পা দা মপা মা । I
রে ০ ০ চ ল ০ অ ন্‌ ধ কা রে র তী রে ০

জ্ঞমা জ্ঞা । । । । I জ্ঞা রা সা ন্‌া দ্‌া ন্‌সা I সজ্ঞা । ।
তী রে ০ ০ ০ ০ ধী ০ রে ব ন্‌ ধু গো ০ ০

ঋা । সা I　ঋা ন্‌া সা　সা । । II
ধী ০ রে　ধী ০ ০　রে ০ ০

II পা পা ^মপা　জ্ঞা জ্ঞা মা I　পা না না　র্সা না র্সা I　নর্রা র্সা ণা
চ ল্‌ ব　০ আ মি　নি শী থ　রা তে ০　তো মা র

ণধা ণা ণা I　র্সা ণা ধা　পা পধা ণা I　দা পা ।　। পা পমা ।
হাও য়া র　ই সা ০　রা তে ০　গো ০ ০　০ তো মার

পণা ণা ণা　ণা ধা ণা I　ধা ণা ণা　ণা ধা ণা I　র্সা ণা I
ব স ন　গ ন্‌ ধ　ব র ণ　ক রে ০　ছি ০ ০

দা পা পা I　পা পা দা　পদা মা পা I　জ্ঞা । পমা　পা । দা I
আজ এ ই　ব স ন্‌　ত স ০　মী ০ ০　রে ০ ০

মপা রমা জ্ঞরা　সা ন্‌া দন্‌া I　সা জ্ঞা ।　ঋা । সা I　ঋা না সা
ধী ০ রে　ব ন্‌ ধু　গো ০ ০　ধী ০ রে　ধী ০ ০

সা । । II II
রে ০ ০

(প্রবাসীর জন্য লিখিত)　　শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বরলিপি

পা পা ^দপা । I　মা ^পমা জ্ঞা ।　রা সা ^রসা I　ণ্‌া সা সা ।　গা । মা I
আ মা র　ডু ব্‌ ল　ন য় ন　র সে র　তি ০ মি

গমা গমা পদা ।　^মপা । । I　রা মা জ্ঞা ।　রা সা সা I
রে ০ ০　০ ০ ০　ডু ব্‌ ল　ন য় ন

মা মা পা ।　পা পা পা I　পা পা দা ।　পা ^দপা মা I
ক ম ল　যে তা র　গু টা ০　লো দ ল

মপা মগা । ।　গা মা মা I　গমা গমা পদা ।　^মপা । । I
আঁ ধা ০　রে র তী　রে ০ ০　০ ০ ০

রা মা জ্ঞা ।　রা সা সা II
ডু ব ল　ন য় ন

।। সা সা জ্ঞা।	রা জ্ঞা I	রা জ্ঞা ৷।	পা পা দপা I
গ ভী র	কা লো য়	য মু ০	না তে ০
মা মা জ্ঞরা।	মজ্ঞা ৷ রা I	সা ৷ ৷।	৷ মা মা I
চ ল্ ছে	ল ০ হ	রী ০ ০	০ ও তার
মা পা ৷।	পা পা ৷ I	পা পা দা।	পা দপা মা I
জ লে ০	ভা সে ০	কা নে ০	আ সে ০
মপা মগা গা।	গা মা মা I	গমা ৷ ৷।	৷ মা মা I
র সে র	বাঁ ০ শ	রী ০ ০	০ আ মি
মা পা পা।	পা পা দা I	পা পা দা।	পা দপা মা I
বা ই রে	ছু টি ০	বা উ ল	হ য়ে ০
মপা মগা গা।	গা মা মা I	গমা ৷ ৷।	৷ মা মা I
স ক ল	পা ০ স	রি ০ ০	০ আ মি
ম্মা মা পা।	পা পা দা I	পা দা দা।	পা দা পা I
কেঁ দে ০	ম রি ০	হা য় কি	ক রি ০
মপা মা গা।	গা মা মা।	গমা গমা পদা।	মপা ৷ ৷ I
য মু ০	না র নী	রে ০ ০	০ ০ ০
রা মা জ্ঞা।	রা সা সা ।I		
ডু ব্ ল	ন য় ন		

(প্রবাসীর জন্য লিখিত)

শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

———

হিন্দুর মুখে আরঙ্গেবের কথা

আমাদের দেশে যাঁহারা ইতিহাস লেখেন, তাঁহাদের সংস্কার—এ দেশে ইতিহাসের মালমসলা পাওয়া যায় না, ইতিহাস কাহাকে বলে, এ দেশের লোক তাহা জানিত না; এ দেশে কখন ইতিহাস লিখিত না; এ পৃথিবীটাকে তাহারা অসার অপদার্থ মনে করিত বলিয়া এ পৃথিবীর কোন ঘটনাই তাহাদের মনে লাগিত না; তাহারা পরকালের জন্যই ব্যস্ত থাকিত, পরকালের চিন্তাতেই জীবন কাটাইয়া দিত।

এ দেশের লোকের এতটা নিন্দা করা উচিত কিনা জানি না। ইহারা বড় বড় ইতিহাসের বই লেখে নাই সত্য, কিন্তু ছোটখাট বই যে একেবারে লেখে নাই, তাহা বলিতে পারি না। হর্ষচরিত পাকা ইতিহাস, রামচরিত পাকা ইতিহাস, দ্ব্যাশ্রয়কোষ পাকা ইতিহাস, রাজতরঙ্গিণীও পাকা ইতিহাস। খুঁজিলে আরও মিলে। নবসাহসাঙ্কচরিত, বিক্রমার্কচরিত ইত্যাদি পুস্তক কাব্য হইলেও এই পৃথিবীর ঘটনা লইয়াই লেখা। ইহারাও ইতিহাস। খুঁজিলে যে আরও ইতিহাস মিলিবে না, একথা কেহই বলিতে পারেন না। নেপালের যে চলিত বংশাবলী আছে, যাহার উপর নির্ভর করিয়া রাইটসাহেব তাঁহার বই লিখিয়া গিয়াছেন, নেপালে যত পুথি আছে তাহার পুষ্পিকা ধরিয়া দেখা গেল যে, সে বংশাবলী এখন হইতে ৩০০।৪০০ বৎসর পর্য্যন্ত ঠিক হইলেও তাহার আগে সব ভুল। তখন পুথির পুষ্পিকা হইতেই প্রথম রাজাবলী ও পরে ইতিহাস রচনা করার চেষ্টা হইল। রাজাবলীটা এক রকম তৈয়ার হইয়াও গেল। চলিত বংশাবলীতে বলে যে, হরিসিংহ ১৩২১ খৃঃ অব্দে নেপাল আক্রমণ করিয়া দখল করিয়া লন ও সেই অবধিই তাঁহার বংশধরেরা নেপালের রাজা। কিন্তু পুষ্পিকায় রাজাবলী আর-একরূপ হইয়া গেল। হরিসিংহের পর জন কতক নেপালী রাজার নাম পাওয়া গেল। তাহার পর দুজন রাণীর নাম, তাহার পর মল্লগণের অর্থাৎ হরিসিংহের বংশধরগণের নাম। পুষ্পিকার কথাই আমরা বিশ্বাস করিলাম। নেপালীরা চটিয়া গেল। বেশ গোলযোগ চলিতে লাগিল। তাহার পর ১৮৯৮।৯৯ সালে খুঁজিতে খুঁজিতে একখানি তালপাতের লেখা ছোট বংশাবলী পাইলাম। উহার শেষ রাজা প্রায় ৩০০ বৎসরের পূর্ব্বে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। বংশাবলীখানি প্রাচীন বলিয়া বিশেষ যত্ন করিয়া পড়া গেল। পড়া বড় কঠিন, সেকালের কথাবার্ত্তার ভাষায় লেখা। সে ভাষা কেহই জানে না। যাহা হউক, তাহা হইতে জানা গেল যে, হরিসিংহ একবার মাত্র আক্রমণ করিয়াছিলেন, দেশ দখল করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রায় ৫ পুরুষ পরে বিবাহসূত্রে তাঁহার বংশে নেপাল রাজ্য যায়। পুষ্পিকার ইতিহাস ও বংশাবলীর ইতিহাস মিলিয়া গেল। এখনকার বংশাবলী ভুল বলিয়া প্রমাণ হইয়া গেল। বাঙ্গালায়ও এইরূপ নূতন বংশাবলী দুই শত, আড়াই শত বৎসর পর্য্যন্ত ঠিক থাকে। তাহার আগে গেলেই একটু গোলমাল, সমাজ যত দিন এক ভাবে রয়, তত দিন সব ঠিক থাকে। কিন্তু একটা যদি বিপ্লব হইয়া যায় তাহা হইলে ফের বংশাবলীও গোলমাল হইয়া যায়। আবার সেই কালের বংশাবলী খুঁজিতে হয়, তবে ঠিক কথা পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণদের কুলশাস্ত্র অনেক দিনের, প্রায় বার শত বৎসরের। ইহার মধ্যে অনেক বিপ্লব হইয়া গিয়াছে। সুতরাং অনেক জায়গায় গোল আছে। বিশেষ যত্ন করিয়া বহুকাল ধরিয়া খুঁজিয়া, খুব মন দিয়া পড়িয়া, তবে কোন্‌টা ঠিক, কোন্‌টা ঠিক নয়, স্থির করা যাইতে পারে। সেইটা যখন হইবে, তখন বার শত বৎসরের একটা ইতিহাসের আদরা তৈয়ার হইবে।

অতি পুরাণ কালের ইতিহাস লিখিতে গেলে হিন্দুদের বই পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু মুসলমান-বিজয় হইতে এই যে আট শত বৎসর হইয়া গিয়াছে, ইহার জন্য সত্য-সত্যই কি মুসলমানদের লেখা ছাড়া আর কোনও ইতিহাস নাই? অন্ততঃ ইতিহাসের মালমসলাও কি একেবারে পাওয়া যায় না? যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কলঙ্কের কথা বটে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, খুব বড় বই না থাকুক, ছোট ছোট রাজাদের ছোট ছোট ইতিহাস আছেই আছে এবং খোঁজ করিলে পাওয়া যাইবেই যাইবে। আমাদের অদ্যকার সভাপতি মহাশয় [শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার] আরঙ্গেবের রাজত্ব সম্বন্ধে মুসলমানদের

দিক * হইতে যত সংবাদ পাওয়া যায়, সব সংবাদই দিয়াছেন। তাঁহার আরঙ্গেবের ইতিহাস অতি সুন্দর গ্রন্থ। লোকে আরঙ্গেবকে যত মন্দ বলে তিনি যে ততটা ছিলেন না, সেটা উনি বেশ করিয়া দেখাইয়াছেন। উনি আরও দেখাইয়াছেন যে, আরঙ্গেব একজন খুব ভাল রাজা ছিলেন। প্রজা হিন্দু হউক আর মুসলমান হউক, প্রজার উন্নতিতে যে রাজার উন্নতি, তাহা তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন এবং সেইমত কার্য্যও করিতেন। সুতরাং তাঁহার রাজত্বে প্রজা বেশ সুখে ছিল। তাঁহার সুবেদারেরা গর্ব্ব করিতেন যে, তাঁহারা টাকায় ৮ মণ চাউল বিক্রয় করাইতেছেন। কিন্তু আমি বলি, হিন্দুর দিক হইতে মালমসলা সংগ্রহ করিয়া কি আরঙ্গেবের একটা ইতিহাস লেখা যায় না? এত বড় ভারতবর্ষটা,—এ দেশের নানা ভাষা, নানা সাহিত্য রহিয়াছে, সমস্ত একত্র করিয়া খুঁজিলে কি আরঙ্গেবের একটা ইতিহাস লেখা যায় না? আমার বিশ্বাস, যায়। কেন বিশ্বাস, ক্রমে বলিতেছি।

ইতিহাসে বাঙ্গলাই সকলের পিছনে পড়িয়াছে। এই-খান হইতে আরঙ্গেবের ইতিহাসের কোন খবরই পাওয়া যাইবে না, লোকের দৃঢ় বিশ্বাস। আমি কিন্তু জানি, এখান হইতেও গোটাকতক মালমসলা সংগ্রহ হইতে পারে। কিন্তু চেষ্টা করিয়া খুঁজিতে হয়। ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত ব্রহ্মমোহন মল্লিক দুইখানি সংস্কৃত পুথি আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখ দেখি এই দুইখানি কি?" আমি দেখিলাম এক খানি ১৬২৯ শকে লেখা, আর তাহার পাশে লেখা আছে 'সাহারং দেবস্য পঞ্চত্বাব্দে।' ব্রহ্মমোহনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও রাজাটি কে? সাহারং দেব কে?" আমি ত প্রথমে ভাবিয়াই আকুল। হঠাৎ ১৬২৯ শকে ৭৮ যোগ করিয়া দেখিলাম ১৭০৭ হয়। তখন আমি বলিলাম, "সাহারং দেব—সাহা আরঙ্গেব। কারণ, তিনি ১৭০৭ [খৃষ্টাব্দে] অথবা ১৬২৯ শকে মরেন।" আমরা সেই কালের লোকের হস্তের একটা প্রমাণ পাইলাম যে, আরঙ্গেব ১৭০৭ খৃঃ অব্দে মরেন। অথচ এটা একজন পাকা হিন্দুর হাতের লেখা পুথি হইতে।

বুদ্ধচরিত নামে এক অদ্ভুত পুথি আছে, পুথি একখানি বৈ লেখা হয় নাই। নাথুরাম নামে যোশীমঠে এক পণ্ডিত কাশীতে রামাপুরায় বাস করিতেন। তিনি মারাঠী, মৈথিলি, বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী জনকতক বিদ্যার্থী লইয়া বুদ্ধচরিত নামে এক প্রকাণ্ড পুথি লেখান। পুথির আগাগোড়া পাওয়া যায় না, কিন্তু এখানে একটুকরা ওখানে একটুকরা পাওয়া যায়। বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ দুবে মহাশয়ের নিকট যে অংশ আছে, সেটা প্রায় এক শত পাতা। কিসের জন্য সে পুথি লেখা হয়, তাহা বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু ফরুখ-সিয়ারের রাজত্বকালে লেখা হয়। তাহাতে সব মোগল বাদসাদের নাম পাইলাম এবং কাহার পর কে রাজা হইয়াছেন, তাহাও পাইলাম।

ত্রিপুরা ও কুচবিহারে হাতের লেখা যে-সকল রাজাবলী আছে, তাহাতে অনেক জায়গায় আরঙ্গেবের সহিত যে তাঁহাদের সন্ধি-বিগ্রহ হইয়াছিল, তাহা লেখা আছে। কুমায়ুন-গড়োয়ালের রাজাবলীতেও তাহাই আছে। আরঙ্গেবের সময় কুমায়ুনে বাজবাহাদুর চন্দ্র নামে একজন বড় রাজা ছিলেন। তিনি একবার মহাসমারোহে আরঙ্গেবের সহিত দেখাও করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশেষ আদর পান নাই। তাঁহার ঠাকুরদাদা আকবরের কাছে যে আদর পাইয়াছিলেন, তাহার দশভাগের একভাগও তিনি পান নাই। সুতরাং দেশে ফিরিয়া গিয়া তিনি আরঙ্গেবের অনেক বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। বাজবাহাদুর চন্দ্র একজন বড় রাজা ছিলেন। তিনি আপদেবের পুত্র অনন্তদেব নামে একজন মাহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণকে মহারাষ্ট্র হইতে আনাইয়া কাশীতে বাস করাইয়াছিলেন এবং তাঁহার দ্বারা একটা স্মৃতি-নিবন্ধ লেখাইয়াছিলেন। আরঙ্গেবের সময় অনেক রাজপুত রাজা তাঁহার চাকরী করিতেন, কেহ কেহ তাঁহার সহিত যুদ্ধও করিতেন। তাঁহাদের সকলেরই ইতিহাস আছে। কাহারও দপ্তরখানায় যাইবার প্রয়োজন হয় না; ভাট ও চারণের পুথি হইতেই অনেক মালমসলা সংগ্রহ হইতে পারে। আরঙ্গেবের একজন প্রধান সেনাপতি যোধপুরের রাজা যশোবন্তসিংহের প্রধান মন্ত্রী মুতা নয়ানসী

* এ কথা ঠিক নহে। আমি ভীমসেন কায়েথ এবং ঈশ্বরদাস নাগর নামক ২ জন হিন্দুর রচিত ফার্সী ইতিহাস ব্যবহার করিয়াছি। এবং ফার্সীভাষায় হিন্দুর লিখিত অনেক ঐতিহাসিক চিঠিপত্র আমার কাজে লাগিয়াছে।—যদুনাথ সরকার।

রাজপুতানার একখানি মস্ত ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার নাম খ্যাত নয়ানসী। রাজপুতেরা বলে, খ্যাত নয়ানসী তাহাদের যথার্থ ইতিহাস। কিন্তু নয়ানসীর কথা তাহার পূর্ব্বেই দুই তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত ঠিক। তাহার আগে গেলেই শিলালেখের সহিত তফাৎ হইয়া পড়ে। নয়ানসীর পর অনেক সময়ের লেখা হইয়াছে। সেই সময়ের কথা যাহা লিখিয়াছে, তাহাই ঠিক, তাহার আগের কথা একটু একটু বেঠিক।

নয়ানসী যে শুধু একখানি খ্যাত লিখিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, তাহা নয়। আমি তাঁহার বাড়ী গিয়া দেখিয়াছি যে, তিনি সমস্ত রাজপুত রাজ্যের আয়-ব্যয়ের বিবরণও লিখিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার ইতিহাস যেমন প্রসিদ্ধ, এ আয়-ব্যয়ের বিবরণটা তত প্রসিদ্ধ নয়। কিন্তু এ বিবরণ খুব বিস্তৃত, ইহাতে মোগল-সাম্রাজ্যের আরঙ্গেবের সময়ের একটা প্রকাণ্ড দেশের অনেক বিবরণ পাওয়া যায়।

আরঙ্গেবের মৃত্যুর ২০ বৎসরের মধ্যে যোধপুরের রাজা অভয়সিংহ গুজরাটের সুবাদার হন। তিনি একজন পোকর্ণা ব্রাহ্মণকে হিসাবের কার্য্যে নিযুক্ত করেন। সে ব্রাহ্মণের বংশ এখনও আছে। তাহাদের বলে খ্যাতবালা জোষী। তাহাদের বাড়ীতে গুজরাট সুবার অনেক দিনের হিসাবপত্র মজুত আছে। ইহাতেও আরঙ্গেবের আর একটি সুবার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়।

যোধপুরের কেল্লায় পুস্তকপ্রকাশ নামে একটি পুথিখানা আছে। উহাতে সংস্কৃতে লেখা ২ খানি মহাকাব্য আছে, এক খানির নাম অজিতোদয় ও আর-এক খানির নাম অভয়োদয়। অজিতোদয়ে অজিতসিংহের বাল্যকাল হইতে তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত মোগলদের সহিত তাঁহার যত যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়, সমস্ত ইতিহাস আছে। বাস্তবিকই আরঙ্গেব অজিতসিংহের উপর যেরূপ কঠোর ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তিনি ৪।৫ বার অজিতসিংহকে আপন দরবারে লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন। অজিতসিংহ কিছুতেই যান নাই। যোধপুরের সিংহদের বাড়ীতে আরঙ্গেবের পাঞ্জাওয়ালা ঐ-সকল চিঠিপত্র আছে। যশোবন্তসিংহ যখন মরেন, তখন অজিতের বয়স ৫ বৎসর। অজিতের একটি ভাই ছিল, তাহার বয়স ৩ বৎসর। উহাদিগকে দিল্লীতে আটক করিয়া আরঙ্গেব সমস্ত মাড়বার রাজ্য দখল করিয়া লন। দিল্লীতে উহাদের প্রাণনাশের সম্ভাবনা দেখিয়া দুর্গাদাস রাঠোর ও মুকুন্দ খীচী উহাদিগকে লইয়া পলায়ন করেন। চারিদিকে পাহারা, দিল্লী সহর, তাহার ভিতর হইতে পলায়ন—অতি অদ্ভুত ব্যাপার। শিবাজী সন্দেসের ওড়ায় পালাইয়াছিলেন। মুকুন্দ খীচী এবার সাপুড়ে সাজিলেন, জোড়া বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে দিল্লীর মাঝখান দিয়া চলিয়া গেলেন; কাঁধে বাঁক, বাঁকের দুই দিকে সিকে, প্রত্যেক সিকেয় ৩টি করিয়া সাপের পেঁড়ি। উপরের পেঁড়িতে গোখরো সাপ, মাঝের পেঁড়িতে অজিত; নীচের পেঁড়িতে আবার গোখরো সাপ। এইরূপ আর এক দিকের মাঝখানে অজিতের ভাই। মুকুন্দ খীচী জোড়া বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে দিল্লীর মাঝখান দিয়া যমুনা পার হইয়া, কিছু দূরে ঘোড়া তৈয়ার ছিল, তাহাতে চড়িয়া পলায়ন করিলেন। অজিতের প্রাণরক্ষা হইল। দুর্গাদাস রাণীকে লইয়া ক্রমে দিল্লী ত্যাগ করিলেন। ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দুর্গাদাস সন্ন্যাসী সাজিলেন। অজিত তাঁহার চেলা হইলেন। অজিতের ভাই মরিয়া গেল। দুর্গাদাস ক্রমে রাঠোরদিগকে একত্র করিয়া অনেকগুলি পরগণা ও শেষে যোধপুরের কেল্লাটি পর্য্যন্ত দখল করিয়া লইলেন। মেড়তা ও তাহার নিকটবর্ত্তী পরগণাগুলি দিল্লীর হইয়া গেল। ১০।১২ বৎসর পরে রাঠোরেরা যখন দুর্গাদাসকে ধরিয়া বসিল, "আমরা কাহার জন্য যুদ্ধ করিতেছি? আমাদের রাজা কোথায়?" তখন দুর্গাদাস বলিলেন, "৩।৪ দিন পরে তোমাদের রাজা আসিবেন ও এখানে দরবার করিবেন।" দরবার হইল, সব রাঠোর আসিয়া জুটিল, কেহই রাজাকে চেনে না। রাজা কিন্তু সকলকেই চিনেন এবং যে যে-উপকার করিয়াছে এবং যেস্থানে যে-বীরত্ব দেখাইয়াছে, তিনি সব জানেন। দুর্গাদাসের চেলাভাবে তিনি সব চিনিয়া রাখিয়াছিলেন। রাঠোরেরা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। রাজার এই অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া তাহারা আরও আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তাহারা অদম্য উৎসাহে মোগলের অধিকৃত সকল যায়গা দখল করিতে লাগিল।

আরঙ্গেব আবার অজিতকে ভুলাইয়া দিল্লী লইবার চেষ্টা করিলেন, হইল না। তিনি এক নূতন কল করিলেন, তিনি দুর্গাদাসকে দিল্লীতে ডাকাইয়া লইয়া তাঁহাকে যোধপুরের পাট্টা লিখিয়া দিলেন। মনে করিলেন, ইহাতে অজিত ও দুর্গাদাস—ইহাদের পরস্পরের মধ্যে অবিশ্বাস হইবে। কিন্তু দুর্গাদাসেরও প্রভুভক্তি টলিল না, অজিতেরও অবিশ্বাস হইল না। আরঙ্গেবের মতলব সিদ্ধ হইল না বলিয়া তিনি আর-এক কল করিলেন। তিনি দুর্গাদাসকে দিল্লীর মুন্‌সবদারি দিলেন। ক্রমে অজিত ও দুর্গাদাসের মনোমালিন্য হইল। দুর্গাদাস মাড়বার ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু আরঙ্গেব তথাপি অজিতের কিছু করিতে পারিলেন না। রাঠোরেরা এখন খুব দল বাঁধিয়া ফেলিয়াছে।

এইরূপে যাবজ্জীবন আরঙ্গেবের জ্বালায় জ্বালাতন হওয়ার পর একদিন খবরওয়ালা আসিয়া খবর দিয়া গেল, আরঙ্গেব মরিয়াছে! সেইদিন অজিতের বুক ফাটিয়া এক গাথা বাহির হইল—

"আইয়ো খবর অচিন্ত্যরী
মিট গীয়ো তনরী দাহ।
কসীদা ইম ভাখী ও
মরগীও আওরঙ্গ সাহ।"

'যাহা আমি কখন চিন্তা করি নাই, এমন খবর আসিয়াছে। আমার তনুর দাহ মিটিয়া গিয়াছে। খবরওয়ালারা বলিয়া গেল, আওরঙ্গ সা মরিয়াছে।' যোধপুরের লড়াই লইয়া কত কাব্য, কত গীত, কত দোহা যে আছে—তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না।

যোধপুরে যেমন, তেমনি প্রত্যেক রাজপুতরাজ্যের ইতিহাসে ও ভাট-চারণের পুথিতে আরঙ্গেবের রাজ্যের অনেক খবর পাওয়া যাইতে পারে। বিকানিয়ারের রাজা অনূপসিং আরঙ্গেবের একজন সেনাপতি ছিলেন। তিনি দক্ষিণ দেশে আরঙ্গেবের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। [তাঁহারই বীরত্বে আদোনী সহর দখল হয়। আদোনীতে ইহার পূর্ব্বে কখনও মুসলমান যায় নাই, আদোনীর ব্রাহ্মণেরা সমস্ত পাজি-পুথি লইয়া নদীর জলে ভাঁসাইয়া দিতে গেল। অনূপসিং তাঁহাদের বলিলেন, "কেন নষ্ট করিয়া ফেলিবে, আমাকে দাও। আমি উহা যত্ন করিয়া রাখিব।" সেই পুথি তিনি আনিয়া বিকানিয়ারের কেল্লায় রাখিয়াছেন। রাজপুতানায় তত বড় পুথিখানা আর কোথাও নাই।]*

অনূপসিং দক্ষিণদেশ হইতে ৩৫ ক্রোর দেবতা লইয়া আসিয়াছিলেন। বিকানিয়ারের কেল্লায় এখনও তাঁহাদের পূজা হয়। তিনি অনেক দেশের পণ্ডিত সংগ্রহ করিয়া এক খানি প্রকাণ্ড স্মৃতি-নিবন্ধ লেখাইয়াছিলেন। উহার নাম 'অনূপবিলাস'। উহা এখনও কোথাও কোথাও চলে। তিনি কাশীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত নাগোজী ভট্টকে লইয়া গিয়া একখানি পুথি লেখাইয়াছিলেন। অনূপসিংএর তত্ত্বাবধানে শিবতাণ্ডব-তন্ত্রের টীকাও লেখা হয়।

জয়পুরের মহারাজা জয়সিংহ আরঙ্গেবের একজন সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার ইতিহাসেও আরঙ্গেবের রাজত্বের অনেক খবর পাওয়া যায়। তাঁহারই কথামত শিবাজী দিল্লী আসিয়াছিলেন। যাঁহার তত্ত্বাবধানে শিবাজী দিল্লীতে থাকিতেন, তিনি জয়পুরের একজন জায়গীরদার আচ্‌রোলের ঠাকুর। আচরোলের বাড়ীতে শিবাজীর অনেক কথা এখনও পাওয়া যায়। বুঁদীর হাড়াচৌহানরাজ আরঙ্গেবের একজন সেনাপতি ছিলেন। বংশ-ভাস্কর নামে হাড়াচৌহানদের এক প্রকাণ্ড ইতিহাস আছে, উহাতেও আরঙ্গেবের রাজত্বের অনেক খবর পাওয়া যায়। কারণ, হাড়ারা খুব বীর ছিলেন এবং আরঙ্গেবের হইয়া অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। শত্রুশল্যচরিত নামে এক খানি সংস্কৃত বই আছে, এখানি আরঙ্গেবের † সেনাপতি হাড়া-রাজ শত্রুশল্যের জীবনচরিত। উদয়পুরের রাজাদের সহিত আরঙ্গেব যাবজ্জীবনই যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার খবর টডের রাজস্থানে পাওয়া যায়। কিন্তু টড খবর পান নাই, এমন অনেক খবরও আছে। মহামহোপাধ্যায় শ্যামল দানের চেষ্টায় বীরবিনোদ নামে উদয়পুরের একটা প্রকাণ্ড ইতিহাস লেখা হয় ও ছাপা হয়, কিন্তু উদয়পুরের মহারাণা তাহা প্রকাশ

* এই অংশ পড়িতে দেওয়া হয় নাই, কারণ ইহাতে ঐতিহাসিক ভুল আছে। আদোনী দুর্গ অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে মুসলমানদের হস্তে ছিল। আওরাংজীব সিদ্দি মাসুদ নামক বিজাপুরী কেলাদারকে ঘুষ দিয়া এই দুর্গ দখল করেন, রণে নহে।—যদুনাথ সরকার।

† আওরাংজীবের নহে, দারার।—যদুনাথ সরকার।

হইতে দেন নাই, একটি কুঠরীতে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু এখনও কুঠরীর বাহিরে কোথায়ও প্রুফ-আকারে, কাপি-আকারে, ফর্ম্মা-আকারে বীরবিনোদের টুকরা রাজপুতানাময় ছড়াইয়া আছে। তাহা হইতেও আরঙ্গেবের রজেত্বের অনেক খবর পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ ইতিহাস-লেখক গৌরীশঙ্কর ওঝা শিরোহির দেবড়া ও সোলংখি রাজপুতদিগের ইতিহাস লিখিতেছিলেন, তাহা হইতেও আরঙ্গেবের রাজত্বের অনেক সংবাদ সংগ্রহ হইতে পারে। রতলামের ইতিহাস আরঙ্গেব হইতেই আরম্ভ। রতনসিংহের বচনীকা চারণদের মধ্যে খুব প্রসিদ্ধ। উহাতেও আরঙ্গেবের অনেক কীর্ত্তির কথা আছে।

শিখদিগের উপর আরঙ্গেব কিরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস শিখদের সাহিত্য হইতে অনেক পাওয়া যায়। শিখেরা ইতিহাস লিখিতে খুব মজবুত; ঐ সকল ইতিহাস পঞ্জাবী ভাষায় লেখা। মহারাষ্ট্রদেশের লোকেও অনেক ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। মারাঠাদের প্রথম অভ্যুদয় আরঙ্গেবের সময়েই হইয়াছিল, সুতরাং সেই সময়ের মারাঠা-ইতিহাস ও আরঙ্গেবের ইতিহাস এক। ইহা ছাড়া রাজপুতানায় যেমন ভাট চারণ আছে, তেমনি মহারাষ্ট্রদেশে গন্ধালী নামে একটি জাতি আছে। তাহারা ছড়া কাটে ও গান করে। মারাঠারা যুদ্ধে গেলে ২।১ জন গান্ধালী সঙ্গেই থাকিত। যুদ্ধে জয় হইলে, কর্ত্তারা সব একত্র হইয়া সেই যুদ্ধের ঘটনা গান করিতে বলিতেন, তাহারাও স্ফূর্ত্তি করিয়া গাইত, উঁহারাও স্ফূর্ত্তি করিয়া শুনিতেন। মারাঠা-ইতিহাসের প্রত্যেক ঘটনার এইরূপ পোবাড়া আছে। তাহা হইতেও ইতিহাসের অনেক উৎকৃষ্ট মসলা সরবরাহ হইতে পারে।

নাগরী-প্রচারিণী-সভা হিন্দী পুস্তকের যে সকল বিবরণ প্রস্তুত করিতেছেন, তাহা হইতেও অনেক সময় যথেষ্ট ইতিহাস পাওয়া যায়। বগেলখণ্ড ও বুন্দেলখণ্ডের রাজারা অনেকেই হিন্দী পুস্তক লিখিয়াছেন এবং রাজকবিদের দিয়া পুস্তক লিখাইয়াছেন। তাঁহাদের ভণিতায়, সূচনায় ও শেষে অনেক ইতিহাসের কথা পাওয়া যায়। হিন্দী পুস্তক হইতে ইতিহাসের অনেক মালমসলা সংগ্রহ হইতে পারে। কবিগণের জীবনচরিত আছে, অনেক সময় তাহা হইতেও ইতিহাসের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে। [সৎনামীরা অতি নিরীহ লোক। তাহাদের মঠ হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্রই ছিল। আরঙ্গেব তাহাদের উপর বড়ই অত্যাচার করেন। তাহারা নিরীহ লোক, কিন্তু এতই চটিয়া যায় যে, দুই বৎসর ধরিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করে। পরে হারিয়া গিয়া আবার শান্তমূর্ত্তি ধারণ করে। তাহাদের মঠ খুঁড়িলে এই-সকল যুদ্ধের বৃত্তান্ত পাওয়া যাইতে পারে।] * গোকুলে বল্লভীসম্প্রদায়ের বারটি মঠ ছিল, বারটি কৃষ্ণমূর্ত্তি ছিল। আরঙ্গেব যখন বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দির ভাঙ্গিবার হুকুম দেন তখন বল্লভীরা মনে করিল—আমাদের মন্দিরও বোধ হয় ভাঙ্গিয়া দিবে। তাহারা ঠাকুর লইয়া পলাইল,—কেহ করৌলি গেল, কেহ জয়পুর গেল, কেহ কোটা গেল, কেহ বুন্দী গেল। বল্লভের নিজ বিগ্রহ, বল্লভীদিগের প্রধান বিগ্রহ—উদয়পুরে যাইতে যাইতে পথে আটকাইয়া গেলেন। যেখানে আটক ছিলেন, সে জায়গা উদয়পুর হইতে দশ পোনের মাইল। ভক্তেরা বিশ্বাস করিলেন, ঠাকুর এই খানেই থাকিবেন। সেখানে এক প্রকাণ্ড নাথদুয়ারা (নাথদ্বার) প্রস্তুত হইল। উহার আয় এখন বার লক্ষ টাকা। একজন ইংরেজ লিখিয়াছেন, সমরকন্দ হইতে বঙ্কক পর্য্যন্ত এই সমস্ত ভূভাগে যাহা কিছু পাওয়া যায়, সবই নাথজীর সেবায় আনিয়া দেওয়া হয়। এই যে বল্লভীদের পলায়ন, ইহা হইতেও আরঙ্গেবের সময়ের অনেক ইতিহাস সংগ্রহ হইতে পারে। কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দির আরঙ্গেবের একজন সুবাদার ভাঙ্গিয়া দেন, মন্দির ভাঙ্গার জন্য আরঙ্গেব সুবাদারকে খুব ধমক দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই ধমকের পত্র † সম্প্রতি বাহির হইয়াছে ও ছাপা হইয়াছে। বিশ্বেশ্বরের মন্দির কয়েকবার ভাঙ্গা ও গড়া হইয়াছে। তাহারও

* সাহিত্য-সম্মিলনে পাঠের সময় এই অংশ বর্জ্জন করা হয়।—যদুনাথ সরকার।

† এটি ঐতিহাসিক ভ্রম। আওরাংজীবের সরকারী ইতিহাসে স্পষ্টই লেখা আছে যে তাঁহার আজ্ঞায় বিশ্বেশ্বর ও কেশব রায়ের মন্দির ভাঙ্গা হয়। "ধমকের পত্র" কাল্পনিক। যে ফর্ম্মান চাটগ্রামের রজনীকান্ত সেন J. A. S. B. তে ছাপাইয়াছেন, তাহা আওরাংজীব নিজভ্রাতা শুজাকে পশ্চাদ্ধাবন করিবার সময় কাশীর কোন ব্রাহ্মণকে দেন, এবং তাহাতে লেখা আছে "আমাদের ধর্ম্মে নূতন দেবমন্দির নির্ম্মাণ নিষেধ, কিন্তু পুরাতন মন্দির ভাঙ্গার বিধি নাই, সুতরাং এই ব্রাহ্মণের মন্দিরে পূজায় কোন বাদসাহী কর্ম্মচারী যেন বাধা না দেয়।"—যদুনাথ সরকার।

ইতিহাস সংগ্রহ করিতে পারিলে, শুধু আরঙ্গেবের সময়ের কেন, মুসলমানদিগের শাসনের অনেক ইতিহাস বাহির হইতে পারে।

কাথিবাড়, মাড়বার, উদয়পুর, গুজরাট প্রভৃতি স্থানে অনেক জৈন মঠে নানাবিধ ইতিহাসের গ্রন্থ পাওয়া যায়। এক প্রকারের গ্রন্থের নাম "রাসা"; উহা হইতেই ফরবেস সাহেব 'রাসমালা' নামক একখানি ইতিহাসের গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। আর এক প্রকারের গ্রন্থ আছে, তাহার নাম "ঢাল", তাহা হইতেও অনেক ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ হইতে পারে। আর এক রকম গ্রন্থ আছে তাহার নাম "সিঝাই"। সিঝাইগুলি হইতেও অনেক প্রকার ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ হইতে পারে।

আমার প্রবন্ধ লম্বা হইয়া আসিল, আর লম্বা করিয়া শ্রোতৃবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে চাহি না। আজ আমার শেষ কথা এই যে, হিন্দুর তরফ হইতেও চেষ্টা করিলে মুসলমান-ইতিহাসেরও অনেক মালমসলা সংগ্রহ হইতে পারে। আরঙ্গেব ত মুসলমানদিগের এক প্রকার শেষ রাজা বলিলেও চলে। হিন্দুদের তরফ হইতেও তাঁহার পুরা ইতিহাস লেখা হইতে পারে। যতদিন হিন্দুদের তরফ হইতে মুসলমানদিগের ইতিহাস লেখা না হয়, ততদিন ঐ ইতিহাস পূরাও হইবে না; কারণ, আমরা শুধু এক দলের কথা লইয়াই তাহাকে ইতিহাস বলিয়া বিশ্বাস করিতেছি *।†

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

ধীমান ও বীতপাল

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিব্বতদেশীয় বৌদ্ধ-ভিক্ষু লামা তারানাথ 'বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক তথ্যই সংগৃহীত হইয়াছে। এই সকল তথ্যের সত্যাসত্য এখনও নিরূপিত হয় নাই। তারানাথের ইতিহাস তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত, জর্ম্মানদেশীয় পণ্ডিত শিফ্‌নার (Schiefner) এই গ্রন্থ জর্ম্মান ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। তারানাথ আর্য্যাবর্ত্তে বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ আশ্রয়ভূমি গৌড়মগধের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সম্পূর্ণ গ্রন্থের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ইহার মধ্যে কতকগুলি সত্য এবং কতকগুলি মিথ্যা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। পালরাজগণের আবির্ভাবকালের পূর্ব্বে গৌড়দেশে যে অরাজকতা হইয়াছিল তাহা সত্য; কারণ পালবংশের প্রথম রাজা গোপালদেবের পুত্র ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনে বলা হইয়াছে যে, প্রজাপুঞ্জ অরাজকতা দূর করিবার জন্য গোপালদেবকে রাজলক্ষ্মীর করগ্রহণ করা-ইয়াছিল। তারানাথের গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং তারানাথের গ্রন্থের এই অংশটুকু সত্য। তারানাথ বলিয়াছেন যে, প্রথম মহীপালদেব ৫২ বৎসর ও রামপাল ৪৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তারা-নাথের গ্রন্থের এই অংশ সত্য হইলেও হইতে পারে; কারণ মহীপালদেবের ৪৮ রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত একাধিক পিত্তল-মূর্ত্তি এবং রামপালের ৪২ রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রস্তর-মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং মহীপাল ৫২ বৎসর এবং রামপাল ৪৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। পক্ষান্তরে যে পালরাজবংশ বৌদ্ধ-ধর্ম্মের শেষ আশ্রয়দাতা, যাঁহাদিগের অধিকারে বজ্রযান মন্ত্রযান কালচক্রযান প্রভৃতি মহাযানের শাখাসমূহের উৎ-পত্তি হইয়াছিল, তারানাথ সেই পালরাজবংশের প্রকৃত বংশলতা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তারানাথ বলিয়া-ছেন যে, দেবপাল ধর্ম্মপালের পিতা ও যক্ষপাল রামপালের পুত্র। কিন্তু খোদিত লিপি ও তাম্রশাসনের প্রমাণ হইতে নিশ্চিতরূপে জানিতে পারা গিয়াছে যে, দেবপাল ধর্ম্মপালের পুত্র এবং যক্ষপাল জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাঁহার সহিত পাল-রাজবংশের কোনই সম্পর্ক ছিল না। দিনাজপুর জেলায় মনহলি গ্রামে আবিষ্কৃত মদনপালদেবের তাম্রশাসনে পাল-রাজগণের সম্পূর্ণ বংশলতা পাওয়া গিয়াছে। ইহার সহিত তারানাথ কর্ত্তৃক সংগৃহীত বংশলতার তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তারানাথের ইতিহাসে বহু ভ্রমপ্রমাদ আছে।

* শাস্ত্রী মহাশয় হিন্দি কবি ভূষণের নামোল্লেখ করেন নাই। আমি তাঁহার কাব্য এবং লাল কবির "ছত্রপ্রকাশ" (হিন্দি) দেখিয়াছি, এবং মারাঠী বখর ও চিঠিপত্র এবং আসামীদের "বুরঞ্জী" (ইংরেজীতে অনূদিত) ব্যবহার করিতেছি।—যদুনাথ সরকার।

† অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের ইতিহাস-শাখায় পঠিত এবং শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

সুতরাং ইহা স্থির যে, বাঙ্গলাদেশের কুলগ্রন্থের ন্যায় তারানাথের ইতিহাসের অনেক কথাই ভিত্তিহীন এবং উপযুক্ত বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত না হইলে, তারানাথের উক্তিও ঐতিহাসিক প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে না। তারানাথ বলিয়া গিয়াছেন যে, মগধবাসী পণ্ডিত ক্ষেমেন্দ্রভদ্র-প্রণীত একখানি গ্রন্থে রামপালের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ প্রদত্ত আছে; ক্ষত্রিয়-জাতীয় পণ্ডিত ইন্দ্রদত্ত-প্রণীত বুদ্ধপুরাণ নামক গ্রন্থে সেনবংশের প্রথম চারিজন রাজার ইতিহাস সঙ্কলিত আছে। দুঃখের বিষয় এই গ্রন্থদ্বয়ের একখানিও অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। বাঙ্গালাদেশের একজন প্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক তাঁহার গ্রন্থে এইরূপ কথা বলিয়া গিয়াছেন। মালদহনিবাসী রিয়াজ-উস্-সালাতীন্-প্রণেতা তাঁহার গ্রন্থের অনেক স্থানে বলিয়াছেন "বচন্দ কিতাবে দীদা অম্" 'কোন' গ্রন্থে দেখিয়াছি। কোন গ্রন্থকার এই সকল গ্রন্থের নাম দেন নাই এবং অদ্যাবধি কোনও ইতিহাসে এই-সকল নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় নাই; কিন্তু ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত শত শত আরবি-ভাষায় লিখিত শিলালিপি দ্বারা রিয়াজ-উস্-সালাতীন-লেখকের উক্তি সমর্থিত হইয়াছে। তারানাথের অনেক উক্তির বিরুদ্ধবাদী প্রমাণই আবিষ্কৃত হইয়াছে। তারানাথের উক্তির উপরে নির্ভর করিয়া ভারতশিল্পের ইতিহাস-প্রণেতা শ্রীযুক্ত ভিন্সেণ্ট স্মিথ্ বলিয়াছেন, "নাগার্জ্জুনের সময়ের নাগজাতীয় শিল্পীগণের নিদর্শনসমূহ (প্রস্তর অথবা ধাতুমূর্ত্তি এবং চিত্র) বরেন্দ্রবাসী ধীমান এবং তৎপুত্র বিৎপালো (বীতপাল) কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বা অঙ্কিত নিদর্শনসমূহের তুলনায় কোন

অংশে শ্রেষ্ঠ নহে। ইঁহারা দেবপাল ও ধর্ম্মপালের রাজত্ব-কালে জীবিত ছিলেন। পিতাপুত্র উভয়েই প্রস্তর- ও ধাতুমূর্ত্তি নির্ম্মাণে এবং চিত্রাঙ্কণে দক্ষ ছিলেন। বিৎ-পালো (বীতপাল) বঙ্গদেশে বাস করিতেন এবং তিনি ধাতুমূর্ত্তি নির্ম্মাণের পূর্ব্বদেশীয় রীতির শ্রেষ্ঠ (স্থাপয়িতা) বলিয়া-গণিত হইতেন। মগধে তাঁহার চিত্রাঙ্কণ-পদ্ধতির বহু ছাত্র ছিল বলিয়া তিনি পরবর্ত্তীকালের মধ্যদেশের প্রধান চিত্রকর এবং তাঁহার পিতা পূর্ব্বদেশের চিত্রকরগণের প্রধানরূপে গণ্য হইতেন।" তারানাথের ইতিহাসের "মূর্ত্তি-নির্ম্মাণ পদ্ধতির উৎপত্তি" নামক চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়ে গৌড়ীয়শিল্প সম্বন্ধে এই কথা দেখিতে পাওয়া যায়। তারানাথের গ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থে, শিলালিপিতে বা তাম্রশাসনে ধীমান বা বীতপালের নাম পাওয়া যায় নাই। তথাপি গৌড়রাজমালার উপক্রমণিকায় শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলিয়াছেন, "এই যুগে, বরেন্দ্রমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া [ধর্ম্মপালদেবের এবং দেবপালদেবের শাসন-সময়ে] ধীমান এবং তৎপুত্র বীতপাল গৌড়ীয়শিল্পে যে অনিন্দ্যসুন্দর রচনাপ্রতিভা বিকশিত করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ "শিল্পকলায়" সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাহার সন্ধানলাভে অসমর্থ হইয়া, লেখকগণ এই যুগের মগধের এবং উৎকলের শিল্প-নিদর্শনকে মগধের এবং উৎকলের প্রাদেশিক শিল্পপ্রতিভার নিদর্শন বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছেন।"

গৌড়বিবরণের শিল্পকলাখণ্ড অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই; কিন্তু বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা যখন বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির চিত্রশালা দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, তখন উক্ত চিত্রশালার যে তালিকা মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, বরেন্দ্র-অনুসন্ধানসমিতি স্থির করিয়াছেন তাঁহাদিগের সংগৃহীত মূর্ত্তিসমূহের মধ্যে ধীমাননির্ম্মিত কতকগুলি প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। এই তালিকা ইংরেজি-ভাষায় লিখিত, ইহাতে সংগৃহীত মূর্ত্তিগুলির বিশদ বিবরণ প্রদত্ত আছে। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি যে কয়টি মূর্ত্তি ধীমাননির্ম্মিত মনে করিয়াছেন, তাহার কোনটিতেই খোদিতলিপি নাই; থাকিলে তালিকায় অবশ্যই তাহার উল্লেখ থাকিত। খোদিত লিপির অভাবে কোন একটি মূর্ত্তি কি প্রমাণের বলে ব্যক্তিবিশেষের শিল্পনিদর্শনরূপে গণ্য হইতে পারে, তাহা উল্লিখিত হয় নাই। যাঁহারা বিজ্ঞানানুমোদিত ঐতিহাসিক রচনা-প্রণালীর গর্ব্ব করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের লেখনী হইতে কেমন করিয়া এই-সকল কথা নিঃসৃত হইল? বলা বাহুল্য ইহা ইতিহাস নহে। বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত না হইলে তারানাথের উক্তিও ইতিহাস বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না।

রাঢ়ে ও বঙ্গে যে-সমস্ত নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি বরেন্দ্রভূমিতে আবিষ্কৃত মূর্ত্তি অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র-নাথ বসু বর্দ্ধমান জেলার অট্টহাস গ্রামে একটি প্রস্তরমূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। মূর্ত্তিটি পদ্মাসনে উপবিষ্টা জরাজীর্ণা শীর্ণা নারীমূর্ত্তি। মূর্ত্তির পাদপীঠে উপাসক ও উপাসিকার মূর্ত্তি এবং একটি অশ্ব বা গর্দ্দভের মূর্ত্তি দেখা যায়। ইহা কোন্ দেবতার মূর্ত্তি তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই; কিন্তু মূর্ত্তিটি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, যিনি ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাঁহার শিল্পপ্রতিভা অসাধারণ। দেবীর কটিদেশে একখানি বস্ত্র আছে, কিন্তু তাঁহার দেহের উর্দ্ধভাগ অনাবৃত। যেরূপ কৌশলের সহিত জীর্ণদেহের পঞ্জরগুলি এবং শীর্ণ স্তনদ্বয় খোদিত হইয়াছে তাহা দেখিলেই বোধ হয়, যে, দেবীর শ্বাসরুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। তাঁহার শীর্ণ অধরপ্রান্তে ক্ষীণ হাস্যরেখা শিল্পীর অপূর্ব্ব কলাকৌশলের নিদর্শন। দেবীর কণ্ঠে সূত্রহারে লম্বিত কবচ এবং মণিবন্ধে সামান্য বলয় ব্যতীত তাঁহার দেহে অন্য কোন অলঙ্কার নাই, তাঁহার কেশপাশ আলু-লায়িত, গণ্ডদ্বয় শীর্ণ, তথাপি মূর্ত্তি হইতে যেন এক অপূর্ব্ব প্রভা বাহির হইতেছে। এই জাতীয় মূর্ত্তি, এমন অপূর্ব্ব শিল্পনিদর্শন, ইতিপূর্ব্বে গৌড়ে, বঙ্গে, রাঢ়ে অথবা মগধে আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। কয়েকবৎসর পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমায় যে তিনটি পিত্তল-ময় মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল সেরূপ মূর্ত্তি ইতিপূর্ব্বে বরেন্দ্র-ভূমিতে আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী রোটেনষ্টাইন বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর কোন চিত্রশালাতেই এইরূপ অনিন্দ্যসুন্দর ভারতীয় ধাতুমূর্ত্তি নাই। কয়েকবৎসর পূর্ব্বে ঢাকা জেলার চূড়াইন গ্রামে

একটি রজতের বিষ্ণুমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা এখন কলিকাতার সরকারী চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। ভারতের অন্য কোন স্থানে এরূপ মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। রাঢ়ে ও বঙ্গে আবিষ্কৃত এই-সমস্ত নিদর্শনের প্রমাণের বিরুদ্ধে কেবল তারানাথের উক্তির উপরে নির্ভর করিয়া বরেন্দ্রবাসী ধীমানকে গৌড়ীয় শিল্পরীতির প্রতিষ্ঠাতা নির্দ্দেশ করা বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর অনুমোদিত হয় নাই। গৌড়ীয় শিল্পের প্রকৃত ইতিহাস এখনও রচিত হয় নাই। গৌড়, বঙ্গ, মগধ, অঙ্গ ও রাঢ়ে একই শিল্পরীতি প্রচলিত ছিল। এই-সমস্ত প্রদেশের মূর্ত্তিসমূহের বিশেষত্ব বিশ্লেষণ না করিয়া কেবল প্রদেশমাত্রের মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া গৌড়ীয় শিল্পরীতির ইতিহাস রচিত হইতে পারে না। পাল- ও সেনবংশীয় রাজগণের নাম- ও রাজ্যাঙ্কসমেত খোদিত-লিপিযুক্ত, বহু প্রস্তর- ও ধাতুমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই-গুলির সাহায্যে রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের কঙ্কাল অবলম্বন করিয়া গৌড়ীয়শিল্পরীতির ইতিহাস রচনা করিতে হইবে, নতুবা তাহা বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে রচিত ইতিহাসরূপে পরিগণিত হইবে না।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার।

অজন্তা গুহার চিত্রাবলী

কাব্যের সহিত ছন্দের যে সম্বন্ধ, চিত্রে মূর্ত্তির ভঙ্গিমা ও গঠন-সৌষ্ঠবের সেই সম্বন্ধ। ভাব প্রকাশের পথ ভাষা; ভাষায় ভাবের সৌন্দর্য্য ফুটাইবার জন্য কবিত্বের প্রয়োজন। সেইরূপ চিত্রশিল্পে ভাব-সৌন্দর্য্যের আভাষ দিবার জন্য গঠন- ও ভঙ্গিমা-বৈচিত্র্যের প্রয়োজন। কবিতায় যেমন কথার বাঁধুনি ছন্দের অনুবর্ত্তী হয়, চিত্রে তেমনি মূর্ত্তির রচনা-কৌশল কোন-এক নির্দ্দিষ্ট আদর্শ গঠনের অনুসরণ করে। কবির মত শিল্পীর প্রথম কাজ চিত্রের বিষয় স্থির করিয়া লওয়া। চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে লক্ষ্য স্থির হওয়া চাই। চিত্রের সমাদর প্রধানতঃ চিত্রে বর্ণিত বিষয়ের জন্যই হয়। কেবল দক্ষতা বা নৈপুণ্যের আদর অত্যন্ত অল্প। চিত্রের বিষয়টি যদি সুন্দর-ভাব-সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে চিত্রাঙ্কনে সামান্য দোষ থাকিলেও সে

সাজির ফুল ফেলা।

চিত্র আমাদের নিকট প্রীতি ও সম্মানের বস্তু। চিত্রের বর্ণনীয় বিষয় বাছিতে শিল্পীর কল্পনা ও আদর্শের পরীক্ষা হয়। যে শিল্পীর কল্পনাশক্তি যত উচ্চ, যত মৌলিক হইবে, তাহার শিল্প-আরাধনার ফল ততই উন্নত, ততই নূতনত্ব-পূর্ণ হইবে। সকল শিল্পেরই ভাব হইল প্রাণ; রচনাপ্রণালী কেবল আকার মাত্র। রচনাপ্রণালী যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন, ভাবের দৈন্য থাকিলে কোন শিল্পই শ্রদ্ধেয় হয় না।

বর্ণনীয় বিষয় স্থির হইলে আকৃতি বা রূপের কথা আসিয়া পড়ে, অর্থাৎ চিত্রটি কিরূপে বর্ণিত হইবে তাহার নির্দ্ধারণ করা। এই সময় মূর্ত্তির গঠন ও ভঙ্গিমার বিচার করিতে হয়। ভাবটি যেমন উন্নত ও হৃদয়গ্রাহী
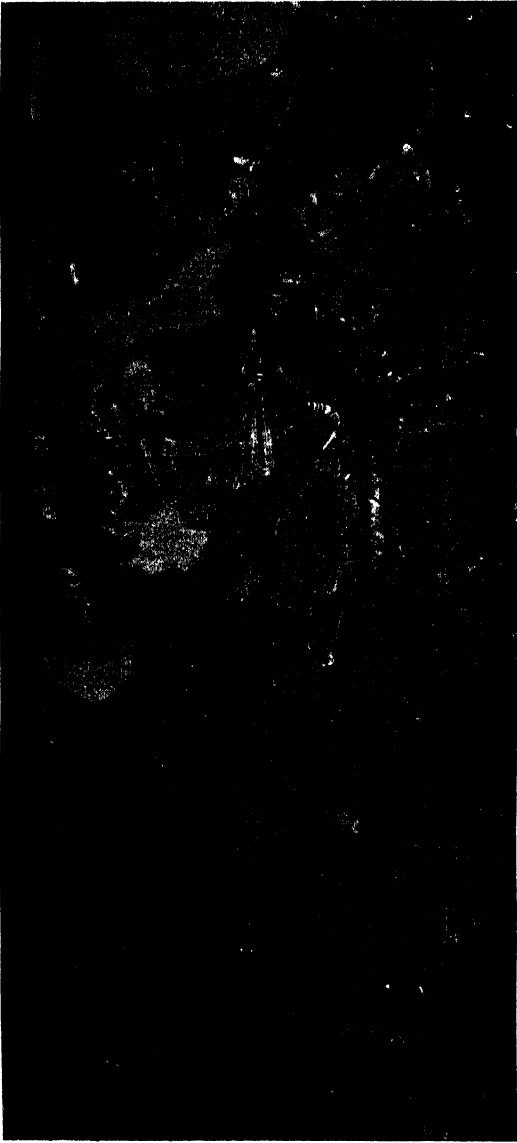
ফুলের জোগানদার।

সৌখীন বাবু।

হইবে, সেই ভাবপ্রকাশের পথও তদনুযায়ী প্রশান্ত ও মনোরম হওয়া চাই। চিত্রের আসল ভিত্তি রেখাঙ্কন। রেখাঙ্কনে যে ভাব ও সৌন্দর্য্যের আভাস থাকে চিত্রেও সেই ভাব ও সৌন্দর্য্য আপনি ফুটিয়া উঠে। রেখাঙ্কনে ভাব ও সৌন্দর্য্য প্রবেশ করাইবার একমাত্র উপায় গঠন-সৌষ্ঠবের অবতারণা। শরীরাবয়বের গঠন আমাদের নিকট পরিচিত হইলেও চিত্র-পরিকল্পনায় তাহাতেই অশেষ নূতনত্বের বিকাশ থাকিতে পারে। আকৃতি দুই প্রকার হইতে পারে। স্বাভাবিক অর্থাৎ প্রাকৃতিক ভাবমূলক ও অস্বাভাবিক অর্থাৎ কাল্পনিক। স্বাভাবিকটা আমাদের নিকট বড় পরিচিত; কাল্পনিকটা প্রায় অপরিচিত।

পরিচিতের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়া অপেক্ষা অপরিচিতের সহিত আমাদের সম্বন্ধ নিকট করিতে পারিলে শিল্পের প্রধান উদ্দেশ্য সাধন করা হয়। প্রকৃতিতে আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই তাহাদিগকেই অবলম্বন করিয়া আমরা অনেক ভাব অনুভব করি। অন্তর্দৃষ্টিতে আমরা সেই ভাবের রূপ দেখিতে পাই। সেই অদৃশ্য-ভাব-ব্যঞ্জক রূপের বিকাশ চিত্রশিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য। যে শিল্পে তাহার প্রকাশ সে শিল্প পূর্ণসাফল্যের মুকুটে অভিষিক্ত।

অজন্তার অসংখ্য চিত্রাবলী এই মুকুটে শোভিত ছিল কি না তাহা এই প্রবন্ধের সহিত মুদ্রিত কয়েকটি মাত্র প্রতিলিপি দেখিয়া বিচার করা যাইতে পারে। এখন এ চিত্রাবলী বিকৃত, কঙ্কালসার; পূর্ব্বের লাবণ্য ও সৌন্দর্য্য সব লোপ পাইয়াছে। কিন্তু তবুও এই নষ্ট-রূপ চিত্রাবলীর ধ্বংসাবশেষ দেখিলে এখনও বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় এককালে এগুলি কি বিচিত্র শ্রীসম্পন্ন ছিল। মানবের শরীরাবয়বের গঠনে যে এত বৈচিত্র্য থাকিতে পারে তাহা এই-সকল চিত্রে অঙ্কিত দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। প্রত্যেক মূর্ত্তির পরিকল্পনায় যেন ভিন্ন ভিন্ন রচনা-মাধুর্য্য ও অপরূপ ভঙ্গিমা-বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিতেছে। ভাষায় ইহার বর্ণনা হয় না। প্রকৃত কবির রসগ্রাহী হৃদয়ই কেবল এই সৌন্দর্য্য-সম্পদের আস্বাদন পাইতে পারে।

মুখবন্ধ-স্বরূপ অজন্তা চিত্রাবলীর বিষয়ে দুই-একটি কথা বলা প্রয়োজন। চিত্রগুলি দেখিলে সাধারণতঃ অনেকেরই মনোনীত হইবে না। এ-সকল চিত্রের সহিত আমাদের অনেকেরই পরিচয় নাই। অপরিচিত বলিয়া ইহাদের ভাব ও সৌন্দর্য্যের বিশেষত্ব কি তাহাও আমরা জানি না। ইয়োরপীয় চিত্র-শিল্প ইহা অপেক্ষা আমাদের নিকট অধিক পরিচিত। পাশ্চাত্য শিল্পের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ও আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া অজন্তার চিত্রশিল্পের সমালোচনা করিলে ইহা কতকটা অস্বাভাবিক বলিয়া অনাদৃত হইতে পারে। কিন্তু পারিপ্রেক্ষিক, অস্থি-সংস্থান ও আলো ও ছায়া ইত্যাদি গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া যদি অজন্তার চিত্রাবলী বুঝিতে চেষ্টা করা যায় তাহা হইলে আমরা অতি সহজেই বুঝিতে পারিব যে যে-ভাব শিল্পের প্রাণস্বরূপ এ চিত্রগুলি সেই ভাবসৌন্দর্য্যে অনুপ্রাণিত।

রাজকুমার সিদ্ধার্থ।

প্রথম চিত্রে একটি তন্বঙ্গী রমণী দাঁড়াইয়া হাতের সাজি উন্টাইয়া ফুল ফেলিয়া দিতেছে। চিত্রের বিষয়ে কোন গভীর ভাবের সংযোগ নাই, কিন্তু চিত্রকরের

তুলিকা-সম্পাতে চিত্রে কেমন মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। রমণীর দাঁড়াইবার ভঙ্গী কেমন কমনীয়, কেমন সুঠাম! সাজি উল্টাইয়া রমণী ফুল ফেলিয়া দিতেছে, অথচ তাহার শরীরে কোন চাঞ্চল্যের লক্ষণ নাই। পাত্র-বিচ্যুত ফুলগুলিই যেন সকল চাঞ্চল্য সকল স্ফূর্ত্তি অঙ্গে মাখিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। মুখাবয়ব ভাব প্রকাশের প্রধান বা একমাত্র অবলম্বন, সাধারণতঃ সকলের এই বিশ্বাস। এই চিত্রে রমণীর মুখাবয়ব নষ্ট হইয়া যাওয়াতে লক্ষিত হইতেছে না; কিন্তু তাহার শরীরের ভঙ্গিমা এরূপ সুনিপুণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে যে মুখ বিলুপ্ত হইলেও চিত্রটি যে শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে তাহা মনেই হয় না।

সঙ্গীতকারিণী নর্ত্তকীর দল।

দ্বিতীয় চিত্র একটি দাসের। কয়েকটি শতদল হাতে লইয়া দাস দাঁড়াইয়া আছে। পুষ্পপাত্র একটি পদ্মপত্র; ইহা অপেক্ষা আর কোন্ সাজি সুন্দর হইতে পারে? দাসের দাঁড়াইবার ভঙ্গী মনোরম।

সৌখীন বাবুদের অভাব কোন কালেই ছিল না। তৃতীয় চিত্রে খুব বাহারে কাপড় পরা একজন সৌখীন বাবু দাঁড়াইয়া আছেন। বাবুটির এক হাত কোমরে, ও অন্য হাতে একটি ফুল। দাঁড়াইবার ভঙ্গীতে বাবুগিরি আরাম-প্রিয়তা ও গর্ব্বের ভাব বেশ স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে।

চতুর্থ চিত্রের প্রধান মূর্ত্তি রাজকুমার সিদ্ধার্থের। সিদ্ধার্থ এখনও সংসার ত্যাগ করেন নাই। মণিমুক্তাখচিত কিরীট এখনও তাঁহার মাথায় শোভা পাইতেছে; অঙ্গে এখনও সুচারু বেশ রহিয়াছে। কিন্তু পার্থিব সম্পদ ও রাজকীয় বেশে তাঁহার কোন স্পৃহা নাই। কবে তিনি ভিক্ষুর বেশ গ্রহণ করিয়া নির্ব্বাণ-পথের পথিক হইবেন অর্দ্ধনিমীলিত নয়নদ্বয়ে যেন সেই চিন্তার ভাবটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সিদ্ধার্থের দাঁড়াইবার ভঙ্গী কেমন সৌম্যভাবাপন্ন।

দাসদাসীতে পরিবেষ্টিত নৃপতি।

পূর্ব্বোক্ত চিত্রগুলিতে কেবল এক-একটি মাত্র মূর্ত্তিরই ভঙ্গিমা-সৌন্দর্য্যের কথা বলা হইয়াছে। একাধিক-মূর্ত্তিবিশিষ্ট বড় বড় চিত্রেও ঠিক এইরূপ ভঙ্গিমা-বৈচিত্র্য দেখা যায়। পঞ্চম চিত্রে একদল নর্ত্তকী গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। এই চিত্রটি সিংহল বিজয়ের বৃহৎ চিত্রের একটি অংশ। বিজয় সিংহের অভিষেক-সময়ে রাজার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে যাইতে নর্ত্তকীগণ মঙ্গলগীতি গাহিতেছে। বাদক ও নর্ত্তকীদের ভঙ্গীতে কেমন অপরূপ ক্রীড়ার ভাব। সঙ্গীতের মাধুর্য্য, নৃত্যের গতি চিত্রে সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে ভগবান বুদ্ধদেব।

প্রভু বুদ্ধের নিকটে মাতা ও সন্তান।

কেবল চলনশীল মূর্ত্তিতেই যে এরূপ রম্য ভঙ্গিমা দেখিতে পাওয়া যায় এমন নয়। স্থির বা নিশ্চেষ্ট মূর্ত্তিতেও অতি রমণীয় ভঙ্গী-মাধুর্য্য দেখা যায়।

ষষ্ঠ চিত্রে কয়েকটি দাসদাসীতে পরিবেষ্টিত কোন এক নৃপতি অঙ্কিত হইয়াছে। চিত্রিত সকল মূর্ত্তিতেই দাঁড়াইবার ও বসিবার ভঙ্গী কেমন সুন্দর, কেমন চিত্তাকর্ষক!

সপ্তম চিত্রের বিষয় বুদ্ধদেবকে পরিবেষ্টন করিয়া ভক্ত-মণ্ডলীর অবস্থিতি। বুদ্ধদেব উপদেশ দিতেছেন, ভক্ত-মণ্ডলী ভক্তিবিহ্বল চিত্তে তাহা শুনিতেছে। ভক্তগণের মধ্যে কেহ মুকুট পরিয়া আছে, আর কেহ বা পরিয়া আছে ভিক্ষুর বাস। এ আসরে রাজা প্রজা, ধনী নির্ধনের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। নিজের কথা বিস্মৃত হইয়া সকলে মহাতাপস প্রভু বুদ্ধের শান্তিময় প্রচার শুনিতেছে! সকলের মুখে আত্মহারা শান্তির ভাব। চিত্রটি জীর্ণ, অস্পষ্ট, কিন্তু তবুও ইহাতে কেমন একটি মহান্ ভক্তিবিহ্বল আনুগত্য ও প্রেমের বিকাশ রহিয়াছে। এরূপ ভাব-ব্যঞ্জক চিত্রের বর্ণনা হয় না। ভাবই যাহার একমাত্র রূপ, সে রূপটা অনুভব করিতে হইলে ভাবটাই কেবল হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়। কেবল শিক্ষা-নৈপুণ্যে এরূপ চিত্র অঙ্কিত হয় না; কেবল প্রাকৃতিক ভাবের প্রতিলিপিকে চিত্রের চরম আদর্শ বুঝিলে এরূপ চিত্র অঙ্কিত হয় না। অজন্তার শিল্পীগণ ভক্তির নেশায় মাতোয়ারা হইয়া অন্তর্দৃষ্টিতে যাহা দেখিতে পাইত তাহাই কেবল ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিত, বলিয়া তাহাদের শিল্পে এত গভীর ও অপরূপ ভাবব্যঞ্জক মাধুর্য্যের বিকাশ।

অষ্টম চিত্রে প্রভু বুদ্ধের সম্মুখে মাতা সন্তানকে লইয়া

প্রণয়-বেদনার নিবেদন।

উপস্থিত হইয়াছে। উভয়ের হাবভাবে ও ভঙ্গীতে একটি ভক্তিগদ্‌গদ তন্ময়তা চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নবম চিত্রে দেখা যাইতেছে একটি পুরুষের পদতলে বসিয়া একটি রমণী দীন নয়নে পুরুষটির দিকে চাহিয়া কিছু নিবেদন করিতেছে। রমণীটির বসিবার অবস্থান, হাতের ভঙ্গী, মুখ ও চোখের ভাব অত্যন্ত কমনীয়, করুণ ও কোমল।

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

প্রত্যক্ষশারীরম্

'বৈদ্যাবতংস'-বিদ্যানিধি- কবিভূষণ-কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন, এম্ এ, এল্ এম্ এস্ বিরচিত। কলিকাতার ৬৫।নং বিডনষ্ট্রীট হইতে গ্রন্থকারের ছাত্র পণ্ডিত শ্রীনাথুরাম শর্ম্মার দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ৩৲।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে "বঙ্গে সংস্কৃত-শিক্ষা" নামক ইংরেজি পুস্তকে লিখিয়াছিলাম :—

In the teaching of both of them [Hindu Astronomy and Medicine], a reform is most urgently called for. The student should be taught to make observations and experiments for himself. He must be made to understand that, in science at any rate, the authority of the writers of text-books must give place to the facts of nature as determined by his own observation and experiment. Let him study the old books and find out where they are insufficient, misleading or wrong. Let him supplement his knowledge by reading English or Bengali books. The East and the West must meet. Here lies the work for the future scholar. Kavirajas Gananath Sen, M.A., L.M.S., Vidyanidhi, Kavibhusan and Jaminibhusan Ray, M.A., M.B., may be mentioned as the two most notable examples of the happy blending of Eastern and Western lore. The country naturally expects that they would do something to place the indigenous medical studies on a scientific basis. I know that the gifted Dr. Gananath Sen has already undertaken to write a supplement to the Nidana and a book on Anatomy and Physiology in Sanskrit.

Sanskrit Learning in Bengal, pp. 50—51.

এই প্রবন্ধে কবিরাজিশিক্ষার যে গুরুতর অভাবের কথা বলা হইয়াছিল, মনীষী শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন "প্রত্যক্ষশারীরম্" রচনা করিয়া সেই অভাবের কথঞ্চিৎ পূরণ করিয়াছেন। "প্রত্যক্ষশারীরম্" অধ্যয়ন করিয়া আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যার্থীরা শারীরবিদ্যা বা এনাটমির অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি নির্ভুল-রূপে আয়ত্ত করিতে পারিবে। বঙ্গীয় কবিরাজদিগের এবং সাধারণ

বাঙ্গালী শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের নিকট প্রত্যক্ষশারীরের পরিচয় দেওয়ার জন্য এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে।

"প্রত্যক্ষশারীর" সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। উহার ১৪৮ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রথমভাগে অস্থি ও সন্ধি (joints, articulations) বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণিতবিষয়গুলি বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য, গ্রন্থে ৬৬টি চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। পুরশ্চিত্রটি (frontispiece) বিবিধবর্ণে রঞ্জিত। সকলগুলি চিত্রই বেশ পরিষ্কার, বিলাতী এনাটমীর চিত্রেরই মতন। ইহা ছাড়া, প্রায় একশতপৃষ্ঠাব্যাপী উপোদ্ঘাত-ভাগও প্রকাশিত হইয়াছে। উপোদ্ঘাতে চিকিৎসাবিদ্যার ইতিবৃত্ত সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন।

শ্রীযুক্ত গণনাথ সেনের "প্রত্যক্ষশারীরম্" প্রাচ্য- ও প্রতীচ্যবিদ্যার সম্মেলনের মধুর ফল। কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতে এম্ এ পরীক্ষা প্রথম শ্রেণীতে পাশ করিয়াছেন। সংস্কৃতে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। তাঁহার সংস্কৃতরচনা-চাতুরীতে ও বেদান্তাদি দর্শনে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যে বহুবার মুগ্ধ হইয়াছি। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ যে-সমস্ত কৃতী বহুশ্রুত তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোককে নিজের বলিয়া গৌরব করেন, শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন, অমর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সি, আই, ই প্রভৃতির যোগ্য কনিষ্ঠ সতীর্থ। ইনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে যথারীতি বিদ্যাভ্যাস করিয়া এল্ এম্ এস্ উপাধি লাভ করিয়াছেন। ইহার পঠদ্দশায় মেডিকেল কলেজে ইহা অপেক্ষা প্রতিভাশালী ছাত্র কমই ছিল। কেবল দৈবের দুর্ব্বিপাকে, শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম্ ডি হইতে পারেন নাই। বঙ্গের বাহিরেও ইঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের খ্যাতি আছে। ইনি নিখিল ভারতবর্ষীয় বৈদ্যসম্মেলনের এলাহাবাদ অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন।

অধুনাতন ভারতীয় কবিরাজেরা শবব্যবচ্ছেদ করিয়া শারীরবিদ্যা আয়ত্ত করেন না। তাঁহারা শরীরের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রগুলির পরিচয় রাখেন না। মানুষের দেহের কোথায় কিরূপ কতগুলি অস্থি, ধমনী (arteries), সিরা (veins), নাড়ী (nerves) প্রভৃতি আছে, ইত্যাদি তত্ত্ব কবিরাজেরা জানেন না। অথচ এইগুলি জানা না থাকিলে, চিকিৎসা-বিদ্যায় সম্যক্ জ্ঞানলাভ অসম্ভব। শারীরবিদ্যা আয়ুর্ব্বেদের দ্বার-স্বরূপ। শল্যতান্ত্রিকদের (surgeons) তো ইহা ছাড়া চলেই না; কায়চিকিৎসকদিগেরও (physicians) শারীরজ্ঞান অত্যাবশ্যক। মহর্ষি চরক বলিয়াছেন:—"শরীরবিচয়ঃ শরীরোপকারার্থমিষ্যতে ভিষগ্-বিদ্যেয়ম্। জ্ঞাতে হি শরীরতত্ত্বে শরীরোপকারকেষু ভাবেষু জ্ঞানমুৎপদ্যতে। তস্মাৎ শরীরবিচয়ং প্রশংসন্তি কুশলাঃ।"

বস্তুত জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী প্রভৃতি রোগের নিদানও শরীরতত্ত্ব-জ্ঞান ব্যতিরেকে বুঝা যায় না। মেডিকেল কলেজে এবং মেডিকেল স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত ডাক্তারেরা শারীরবিদ্যা জানেন। দেশের সাধারণ লোকে তাঁহাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ শারীরজ্ঞানে এবং অস্ত্রচিকিৎসা-কৌশলে মুগ্ধ হইয়া যান। ফলে, ধীরে ধীরে লোকে কবিরাজি বিদ্যার প্রতি হতাদর হইতেছেন। কিন্তু এটা আয়ুর্ব্বেদবিদ্যার দোষ নহে। কবিরাজি সুপ্রাচীন গ্রন্থে শবচ্ছেদের যথেষ্ট ব্যবস্থা ছিল। সুশ্রুত স্পষ্টই বলিয়াছেন যে যাঁহারা অস্ত্রচিকিৎসা করিবেন, তাঁহাদের শরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া উহার প্রত্যেক অবয়ব সাবধানে পর্য্যবেক্ষণ করা বিধেয়।

তস্মান্নিঃসংশয়ং জ্ঞানং হর্ত্রা শল্যস্য বাঞ্ছতা। শোধয়িত্বা মৃতং সম্যগ্ দ্রষ্টব্যোঽঙ্গবিনিশ্চয়ঃ॥ অপিচ, সর্ব্বানেব বাহ্যাভ্যন্তরাঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বিশেষান্ যথোক্তান্ লক্ষয়েৎ চক্ষুসা।—অর্থাৎ মৃতদেহ পচাইয়া তাহার সমস্ত চোখে দেখা চাই। (সুশ্রুত, শারীরস্থান ৫ অধ্যায়)।

প্রাচীন ভারতে শারীরবিদ্যার বহু গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল। সুশ্রুতের সহাধ্যায়ী ভোজঋষিপ্রণীত সংহিতা শারীরবিদ্যার প্রধান আকর ছিল। (এই ভোজ ধারাধিপতি ভোজরাজার বহুতর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন)। ডল্লন, চক্রপাণি ও শ্রীকণ্ঠ ভোজের শারীরবিষয়ক বহু বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা ছাড়া, ভাস্করভট্টকৃত "শারীরপদ্মিনী" নামক সহস্রবর্ষের প্রাচীন শারীর গ্রন্থ পাশ্চাত্যপণ্ডিতেরা আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু ঐ গ্রন্থের রচয়িতা হয়ত শবচ্ছেদ না করিয়া কেবল সংগ্রহ মাত্র দ্বারা গ্রন্থ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদের মূলীভূত শারীরবিদ্যার অবনতি প্রায় সপাদদ্বিসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে আরব্ধ হইয়াছিল। কবিরাজ গণনাথের মতে, বৌদ্ধনৃপতি অশোকের শবচ্ছেদ নিবারণই শারীর-বিদ্যার অবনতির মূলকারণ। অশোকের পর ভারতের উপর দিয়া যে-সকল বৈদেশিক আক্রমণ চলিয়া গিয়াছে, তাহারা ভারতের গৌরব-ধায়ক আয়ুর্ব্বেদাদি নানাবিষয়ক বহু গ্রন্থের লোপের দ্বিতীয় কারণ। অধুনা সুশ্রুতের শারীরাংশ আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শারীরপ্রবন্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ। "শারীরে সুশ্রুতঃ শ্রেষ্ঠঃ" এই প্রবাদই উহার সাক্ষী। কিন্তু বর্ত্তমান সুশ্রুতে বহুতর ভ্রমপ্রমাদ ঢুকিয়া গিয়াছে। ডাক্তার হর্নেলি সাহেব এই-সকল ভ্রম সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। ডাক্তার গণনাথ সত্যই বলিয়াছেন অধুনা—শারীরে সুশ্রুতো নষ্টঃ। বাগ্ভটাচার্য্যের অষ্টাঙ্গহৃদয় ও অষ্টাঙ্গসংগ্রহে যে শারীরবিবরণ আছে, তাহাতেও ভুলের অসম্ভাব নাই। তিনি নিজে বৌদ্ধাচার্য্য ছিলেন, তিনি শবচ্ছেদ না করিয়াই চরক-সুশ্রুতের শারীরপ্রকরণ লইয়া তাহাকে নিজের কল্পনা দিয়া বিপর্য্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। শার্ঙ্গধর এবং ভাবমিশ্রের গ্রন্থও ঐ দোষে দুষ্ট। যাহা হউক, মূল প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদে শারীর-বিদ্যার প্রাচুর্য্য থাকিলেও অধুনা আয়ুর্ব্বেদাধ্যায়ীর জন্য নির্ভুল

শারীরবিদ্যার গ্রন্থের প্রয়োজন। বৈদ্যাবতংস শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন মহাশয় আধুনিক শারীরবিজ্ঞানের স্থূল প্রতিপাদ্যগুলি ও প্রাচীন শারীরবিদ্যার রক্ষিতব্য অংশগুলি একত্র গ্রথিত করিয়া এই "প্রত্যক্ষ-শারীর" রচনা করিয়াছেন। ইহা আয়ুর্ব্বেদবিদ্যালয়ে নিয়মপূর্ব্বক পঠিত হইলে, আয়ুর্ব্বেদের পুনরুজ্জীবনের সহায়তা হইবে। ঋষিপ্রণীত নয় বলিয়া প্রত্যক্ষশারীরের অনাদর হওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে। বাগ্‌ভট বলিয়াছেন

ঋষিপ্রণীতে প্রীতিশ্চেৎ মুক্ত্বা চরকসুশ্রুতৌ।
ভেলাদ্যাঃ কিং ন পঠ্যন্তে তস্মাদ্ গ্রাহ্যং সুভাষিতম্॥

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান। এখানে প্রত্যক্ষমূলক নবীনগ্রন্থ চিরকাল উপেক্ষিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। আমাদের দেশীয় সংস্কৃতজ্ঞ কবিরাজেরা গণনাথের বিরচিত "প্রত্যক্ষশরীরম্" তাঁহাদের ছাত্রদিগকে পড়াইতে আরম্ভ করুন। তবেই কবিরাজি রক্ষার সম্ভব হইবে। বর্ত্তমান অবৈজ্ঞানিকভাবে পঠিত পাঠিত হইতে থাকিলে, আয়ুর্ব্বেদের লোপ অবশ্যম্ভাবী।

পারিভাষিক শব্দের অভাবে, বঙ্গভাষায় দর্শনবিজ্ঞানাদি গ্রন্থ রচিত হইতেছে না, এইরূপ অনেকে বলেন। শারীরবিদ্যার পারিভাষিক শব্দগুলি সংগৃহীত ও বিরচিত করিয়া শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন মহাশয় ভারতীয় বিদ্বান্‌মাত্রের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। এই পুস্তক সংস্কৃতে বিরচিত হওয়ায় একটি প্রধান লাভ এই দাঁড়াইয়াছে যে, এই গ্রন্থের পরিভাষা ভারতীয় যাবতীয় কথ্যভাষায়ই অবিকল গৃহীত হইতে পারিবে। এই সেদিন, গৌহাটী সাহিত্যপরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সিংহ মহাশয় "তর্কবিজ্ঞান" প্রকাশিত করিয়াছেন। উহা বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত এবং বাঙ্গলা অক্ষরে মুদ্রিত। কাজেই ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা ঐ তর্কবিজ্ঞানে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দের গ্রহণ, বর্জ্জন বা আলোচনা করিবার সুযোগ পান নাই। ঐ গ্রন্থের অস্তিত্বই অনেকের অবিদিত। বাঙ্গলা, মারহাটি, হিন্দি, গুজরাটী, আসামী, ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় একই পারিভাষিক শব্দ চলা বাঞ্ছনীয়। এইরূপ এক অভিন্ন পরিভাষা সমস্ত ভারতে চালাইবার জন্য, সংস্কৃতে লিখিত এবং দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত, প্রত্যক্ষশারীরের ন্যায় পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজন।

আর-এক কথা। পরিভাষা সংকলন ও গঠনের কার্য্যে যেরূপ পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন, তাহা সাধারণত দুর্লভ। আমাদের দেশের প্রাচীন গ্রন্থে যে-সকল শব্দ আছে, তাহার সম্যক্ আলোচনা করিয়া, তাহারই অনুকরণে নূতন পারিভাষিক শব্দ গড়িতে হইবে। শ্রীযুক্ত গণনাথ তাহাই করিয়াছেন। এইরূপ না করিলে, নূতন শব্দসৃষ্টি সর্ব্বথা শোভন হয় না। যাঁহারা দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা গড়িতে ইচ্ছুক, তাঁহারা সংস্কৃত দর্শনবিজ্ঞান পড়ুন। স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাহাই করিয়াছেন। তদীয় "রাসায়নিক পরিভাষা" বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত করিয়াছেন। উহার দেবনাগর-ইংরেজি সংস্করণ অবিলম্বে প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। নতুবা ভারতের ভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা ঐ পরিভাষার দ্বারা উপকৃত হইতে পারিবেন না এবং কালে ভারতে বহু পরিভাষারূপ অনর্থের সৃষ্টি হইবে। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ এদিকে মন দিউন। মেন্‌ডেলিফের গ্রন্থ পড়ার জন্য ইংরেজ ও জর্ম্মান রাসায়নিকেরা রুসিয়ার ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ভারতে সে যুগ এখনও আসে নাই। বোম্বাই বা মান্দ্রাজের লোকে, বাঙ্গলা পরিভাষা না দেখিয়াই, হয়ত, তত্তদ্দেশে নূতন পরিভাষা চালাইয়া দিবেন।

শ্রীযুক্ত গণনাথ সেনের সংকলিত ও উদ্ভাবিত বহু উৎকৃষ্ট পারিভাষিক শব্দের মধ্যে Nerve অর্থে নাড়ী শব্দের দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। গ্রন্থকার বলেন যে সংস্কৃত নাড়ী শব্দ হইতে গ্রীক (neuron) ন্যুরন্ * এবং ইংরেজি নার্ভ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। ইংরেজি নার্ভ শব্দে পূর্ব্বে sinew বা tendon বুঝাইত। গ্রীকগ্রন্থে ঐ অর্থেই নার্ভ বা ন্যুরন্ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সে অর্থ এখন চলিত নহে। সংস্কৃত কবিরাজি গ্রন্থেও ঐরূপে নানা অর্থে নাড়ী শব্দের প্রয়োগ আছে। তন্মে nerve অর্থে নাড়ী শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার বলেন যে (nerve) নার্ভ অর্থে "স্নায়ু" শব্দ প্রযুক্ত হওয়া অনুচিত। অমরকোশে স্নায়ুশব্দে সূত্রবৎ অস্থিবন্ধনী বুঝাইয়াছে। ঐ (ligament) অর্থে স্নায়ুপদ ব্যবহৃত হওয়া উচিত। কোনো কবিরাজিগ্রন্থে স্নায়ু শব্দ নার্ভ (নাড়ী) অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই। তবে নাড়ী শব্দ "নার্ভ" অর্থে ব্যবহৃত হইলে, নাড়ীবিজ্ঞানের কি হইবে? নাড়ী-দেখা কবিরাজদিগের বিশেষত্ব। নাড়ী-দেখাকে ধমনী-দেখা বলিব? বিস্ময়ের বিষয় এই যে, চরক সুশ্রুত কি বাগ্‌ভটে নাড়ী পরীক্ষার নামগন্ধ নাই। ধমনী শব্দ আর্টারির ঠিক্ প্রতিশব্দ হইয়াছে। ইংরেজি artery, লাটিন arteria কথার যৌগিক অর্থ airholder বা বায়ুধারক। প্রাচীন গ্রীক্ গ্রন্থে windpipe বা কণ্ঠনালী বুঝাইতে artery শব্দ প্রযুক্ত হইত। প্রাচীন ইংরেজি গ্রন্থেও artery = windpipe। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, আর্টারিগুলি মরণের পর খালি পড়িয়া থাকে বলিয়া তাহাদিগকে পূর্ব্বে বায়ু-বহ-স্রোত (air-duct) বলিয়া মনে করা হইত। তাহারা কণ্ঠনালীরই শাখাপ্রশাখা বলিয়া বিবেচিত হইত। ধমনী বা ধমনি কথারও যৌগিক অর্থ arteria শব্দের মতন। ধম্ বা ধ্মা = শব্দ করা, ফুঁ দেওয়া। ধমনি শব্দের অন্যতম অর্থ a reed, a blowpipe —নল। 'নাড়ীন্ধম' শব্দের অর্থ স্বর্ণকার, কেননা সে নাড়ী বা বংশাদি চোঙ্গার মধ্যে ফুঁ দেয়। এই-সকল কারণে, ধমনী শব্দের "artery" অর্থে প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত।

আমরা কবিরাজ ডাক্তার নহি, কাজেই শ্রীযুক্ত গণনাথের সঙ্কলিত ও উদ্ভাবিত পরিভাষার বিচারে অশক্ত। কবিরাজ ডাক্তারদের কৃত ঐরূপ সমালোচনার জন্য ব্যগ্র রহিলাম। †

বাঙ্গালীরা শুনিয়া সন্তোষলাভ করিবেন যে, মথুরায় যে নিখিল ভারতবর্ষীয় পঞ্চম বৈদ্য সম্মেলন হইয়াছিল, উহাতে ভারতের নানাস্থান হইতে সমাগত ত্রিশতাধিক বৈদ্যগণ প্রত্যক্ষশারীরের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন এবং সমস্ত ভারতবর্ষের জন্য যে আয়ুর্ব্বেদ পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, উহাতে আলোচ্য গ্রন্থ অবশ্যপাঠ্য বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছে।

কিন্তু অবশ্যপাঠ্য বলিয়া বিঘোষিত হওয়া এক কথা—আর কবিরাজিশিক্ষার্থীদিগকে প্রকৃতই পড়ান আর-এক কথা। প্রথমত, এ নবীন মুদ্রিত গ্রন্থ পড়াইতে সেকেলে ধরণের প্রাচীন বিজ্ঞ কবিরাজেরা নানাকারণে অস্বীকৃত হইতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা রাজি হইলেও, তাঁহাদের এ গ্রন্থ পড়ানোর সামর্থ্য আছে কি? শারীরবিদ্যা পড়াইতে হইলে, শবব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা চাই। শবব্যবচ্ছেদ ব্যাপারটা তত সহজসাধ্য নহে, ঐজন্য প্রচুর আয়োজন চাই। সে আয়োজনের জন্য অর্থ চাই। এই-সকল কথা মনে করিয়াই "বঙ্গে সংস্কৃতশিক্ষায়" লিখিয়াছিলাম :—

It would be a shame if the genius of men like these [*i. e.* Dr Gananath Sen etc.] be suffered to remain unproductive for want of funds. Cannot the enlightened rich men of the country open an A[illegible] College, where the younger generation of *Kavirajas* should get initiated into the mysteries of the medical science of the East and the West under the guidance of these able teachers?

---

* ভুলে লাটিন্ লিখা হইয়াছে "লাটিন্ ভাষায়াং 'ন্যুরন্' ইতি"।

† স্বাস্থ্য-সমাচারে আলোচনা হইতেছে।—প্রবাসীর সম্পাদক।

আচার্য্য বসু ও আচার্য্যাণী, আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দুস্থান-সভার সদস্য-সমাবৃত।
প্রথম পংক্তিতে বাঁ হইতে ডাহিনে বসিয়া আছেন—মনসুর-উদ্দীন, সুধীন্দ্র বসু, আচার্য্য জগদীশ ও আচার্য্যাণী।
পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছেন বাঁ হইতে ডাহিনে—পি কে বসু, বন্দ্যোপাধ্যায়, সান্যাল, আহমদ, দাস।

লোকে জানালার উপর চড়িলেন কিম্বা মাটিতেই বসিয়া পড়িলেন। টেলিফোনের আবিষ্কর্ত্তা ডক্টর গ্রাহাম বেল্ সভা বসিবার কুড়ি মিনিট আগে আসিয়াছিলেন কিন্তু দরজার গোড়ায় লোকের এমন ভিড় জমিয়াছিল যে তিনি অতি কষ্টেসৃষ্টেও হলের অর্দ্ধেকের বেশী অগ্রসর হইতে পারিলেন না। কিন্তু অদম্য উৎসাহী টেলিফোনের আবিষ্কর্ত্তা বেলের উৎসাহ ও আগ্রহ একটুকুও কমিল না। জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতার পরদিন সন্ধ্যাকালে তিনি তাঁহার গৃহে আচার্য্যের সম্মানার্থ ওয়াশিংটনের কয়েকজন খ্যাতনামা পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন।

আচার্য্য বসু মহাশয় মার্কিনবাসীর নিকট সর্ব্বত্র আন্তরিক অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছেন। এমন কি যুক্ত-রাজ্যের ষ্টেট সেক্রেটারী বিখ্যাত কর্ম্মী ও বাগ্মী উইলিয়ম জেনিংস ব্রায়ান ওয়াশিংটনের ষ্টেট ডিপার্টমেন্টে জগদীশচন্দ্রকে তাঁহার আবিষ্কার দেখাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য এ সম্মান-সৌভাগ্য সকলের ঘটিয়া উঠে না। আচার্য্যবর যেখানেই তাঁহার বিচিত্র সরল যন্ত্রতন্ত্র লইয়া দেখা দিয়াছেন, যেখানেই তাঁহার অদ্ভুত আবিষ্কার দেখাইয়াছেন, সেখানেই সকলে তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিয়াছে তিনি কত বড় বিজ্ঞানবিদ্। আজ আমেরিকার সকলে একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার শরীরতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা নূতন দিক খুলিয়া দিয়াছে এবং সম্ভবত মনস্তত্ত্বরাজ্যেও যুগান্তর উপস্থিত করিবার সম্ভাবনা রাখে।

আচার্য্য বসু মহাশয়ের আবিষ্কার সম্বন্ধে আমেরিকার অনেক মাসিকে এবং দৈনিকে বহু প্রবন্ধ, রহস্য-চিত্র এবং এমন কি কবিতা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। তিনি

আচাৰ্য্য বসু ও আচার্য্যাণীর সম্মানার্থ তাঁহাদের সহিত হিন্দুস্থান-সভার সদস্যদিগকে শিকাগো লিউইস ইন্সটিটিউটের ডাঃ এড্‌উইন হার্বার্ট লিউইস যে সম্বর্দ্ধনা-সভায় আহ্বান করেন তাহার স্ফুরিতালোকে (flash light) তোলা ছবি।

যখন নিউ-ইয়র্কে যান তখন "নিউ-ইয়র্ক টাইমস"এ Song to Sensitive Plants নামে তাঁহার আবিষ্কার সম্বন্ধে এক কবিতা বাহির হয়। "নিউ-ইয়র্ক টাইমস্" মার্কিন যুক্তরাজ্যের একখানি শ্রেষ্ঠ দৈনিক পত্রিকা।

য়ুরোপে জগদীশচন্দ্র ভিয়েনা ও পারীতে বক্তৃতা করেন। পারী হইতে জার্ম্মানী যাইবার আয়োজন করিতেছিলেন এমন সময় যুদ্ধ বাধিল। কাজেই আর যাওয়া হইল না। ইংল্যাণ্ডে অবস্থানকালে তিনি লণ্ডনে রয়েল ইনষ্টিটিয়ুট, ইম্পিরীয়াল কলেজ অফ সায়ান্স, রয়েল সোসাইটি অব মেডিসিন এবং অক্‌স্‌ফর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমক্ষে বক্তৃতা করেন।

ইংল্যাণ্ডে তাঁহার আবিষ্কার সম্বন্ধে খুব উৎসাহ দেখা দিয়াছিল। তিনি যখন লণ্ডনে ছিলেন তখন, ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী সার আর্থার ব্যালফুর, রয়েল ইনষ্টিটিয়ুটের সভাপতি সার উইলিয়ম ক্রুকস্, অধ্যাপক জেমস্ মারে, রাজবৈদ্য সার জেমস্ রীড, বিখ্যাত নাট্যকার বার্ণার্ড শ, ভারত-সচিব লর্ড ক্রু প্রভৃতি ইংরেজ মনীষীগণের নিকট তাঁহার গৃহ ও গবেষণাগার মুসলমানের নিকট মক্কাতীর্থের ন্যায় আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

* * * *

জগদীশচন্দ্র বাগ্মী নন এবং বাগ্মী হইবার জন্যও তাঁহার কোন আগ্রহ নাই। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা বেশ সুস্পষ্ট, জোরালো ও মনোজ্ঞ। তাঁহার বক্তৃতার ভঙ্গীটিও বড় সুন্দর। বক্তৃতাকালে তিনি একেবারে সভামঞ্চের প্রান্তভাগে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসেন, তারপর বাম হাতখানি পশ্চাৎদিকে নিবদ্ধ করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া

কিছুক্ষণ শ্রোতৃমণ্ডলীর দিকে চাহিয়া থাকেন। সভা তখন একেবারে এমন নিস্তব্ধ যে সূচীপতনের শব্দটি পর্য্যন্ত শোনা যায়। আগ্রহান্বিত নরনারী তাঁহার বক্তৃতার প্রথম কথাটি শুনিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়েন। শ্রোতৃমণ্ডলীকে যথাবিহিত সম্বোধনের পর কোনরূপ বাহুল্য ভূমিকা সৃষ্টি না করিয়া তিনি সোজাসুজি আপনার বক্তব্য বিষয় বলিতে আরম্ভ করেন। বাগ্মিতাসূচক কোনরূপ অঙ্গভঙ্গী তাঁহার নাই; অতি সাদাসিধাভাবে, অতিশয় আন্তরিকতার সহিত মৃদু কণ্ঠস্বরে তিনি আপনার আশ্চর্য্য আবিষ্কারের কথা বলিয়া যান। রবার্ট বার্নস তাঁহার প্রাত্যহিক নীরস কর্ম্ম হইতে কবিতার সৃষ্টি করিতেন। আচার্য্য জগদীশও তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কারের মধ্যে কাব্য নাটক ও মহাকাব্য রচনা করিয়া তুলেন। তাঁহার বিচিত্র আবিষ্কারের আনন্দে তিনি একেবারে আত্মহারা; তিনি যাহা বলেন তাহা তাঁহার পরিপূর্ণ অন্তরের অন্তস্থল ভেদ করিয়া উঠে। সাধাগলা ব্যবসাদার বক্তার বোলচাল ও কলা-কৌশলের অবকাশ তাঁহার নাই। কিন্তু তবু শ্রোতারা এমন তন্ময় হইয়া তাঁহার কথা শুনিতে থাকেন যে করতালি দিতে পর্য্যন্ত ভুলিয়া যান।

মার্কিন সংবাদপত্রের রিপোর্টারেরা বসু মহাশয়কে লইয়া মহা ফাঁপরে পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের পক্ষে "সে বড় কঠিন ঠাই," তাঁহার ধরা ছোঁয়া পাওয়া বড়ই শক্ত। আচার্য্য জগদীশের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কোন কথা বাহির করা অপেক্ষা তোকিও, পেট্রোগ্রাড কিম্বা লণ্ডনের দশ পাঁচজন রাজনীতি-ধুরন্ধরকে আঁটিয়া ওঠা সহজসাধ্য। বসু মহাশয় লোকচক্ষুর দৃষ্টির সমক্ষে থাকিতে মোটেই ভালবাসেন না। বিশেষত মার্কিনসাধারণের সমক্ষে প্রকাশ হইতে তাঁহার বড়ই ভয়। যখনি তিনি বুঝিতে পারেন যে খবরের কাগজের লোক তাঁহার নিকট হইতে কিছু কথা বাহির করিয়া কাগজে মস্ত একটা গল্প ফাঁদিবার চেষ্টায় তাঁহার পিছু লইয়াছে তখনি তিনি একেবারে মুখ বন্ধ করিয়া ফেলেন। যদি তাঁহাকে কেহ এমন কোন কথা জিজ্ঞাসা করে যাহার উত্তর দেওয়া তিনি সঙ্গত মনে করেন না তাহা হইলে তিনি কোন কথা না বলিয়া শুধু একটু হাসেন। কিন্তু এমন সৌজন্যের সহিত এ কাজটি করেন যে কেহই তাহাতে অপরাধ লইতে পারেন না। আর বাস্তবিকই বসুমহাশয়কে এ জন্য দোষ দেওয়া যাইতে পারে না—কেননা আমেরিকার সংবাদপত্রের উপর আস্থা হারাইবার কারণ তাঁহার যথেষ্ট আছে। অল্পদিন পূর্ব্বে ডেট্রয়েটের একখানি সংবাদপত্র আচার্য্যবরের Plant Response বা উদ্ভিদের সাড়া নামক গ্রন্থের এক অধ্যায় এমন বেমালুমভাবে প্রবন্ধাকারে ছাপাইয়া দিয়াছিল যে মনে হয় যেন সেটি ঐ কাগজেরই জন্য বসুমহাশয় কর্ত্তৃক বিশেষভাবে লিখিত।

জগদীশচন্দ্রের আকৃতিতে এমন একটা কি আছে যাহা সকলকে আকর্ষণ করে। কবির মত তাঁহার ঈষৎশুভ্র ঘনকুঞ্চিত কেশরাশি প্রশস্ত ললাটের দুই পার্শ্বে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত। তাঁহার নিবিড়কৃষ্ণ জ্বলন্ত চক্ষুর দীপ্তিতে যেন সামান্য একটু গর্ব্বের লেশ মাখানো। তাঁহার সুশ্রী ও ভাবব্যঞ্জকপূর্ণ মুখখানি উচ্চবংশজাত, ধীমান ও আত্ম-শক্তিতে নির্ভরশীল পুরুষের মত। তাঁহার বক্ষ প্রশস্ত, স্কন্ধ বিস্তৃত, স্বাস্থ্য সুন্দর ও পাদবিক্ষেপ ধীর ও দৃঢ়। যদিও তাঁহার দেহে ও মুখে প্রৌঢ়তার চিহ্ন দেখা দিয়াছে তবুও তাঁহার কাজ করিবার শক্তি ও উৎসাহ যথেষ্ট আছে।

নেপোলিয়ন একবার ইংরেজ রাজনৈতিক ফক্স্ ও পিটের চরিত্র বর্ণনার প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন ফক্সের হৃদয় তাঁহার প্রতিভাকে দীপ্ত রাখিয়াছিল আর পিটের প্রতিভা তাঁহার হৃদয়কে শুকাইয়া ফেলিয়াছিল। আচার্য্য জগদীশের প্রতিভা পিটের মত নয়, ফক্সের মত। অসামান্য প্রতিভাশালী হইলেও তাঁহার হৃদয়খানি শুষ্ক নহে, পরন্তু মানবতা, সহমর্ম্মিতা ও প্রেমপ্রবণতায় পূর্ণ। মানবের ভ্রাতৃত্ব তাঁহার নিকট কেবল একটা উচ্চভাবের কথামাত্র নয়—সজীব ও সত্য আদর্শ। ধনীনির্ধন, উচ্চনীচ, সকল অবস্থার লোকের সঙ্গে তিনি সমানভাবে মিশিয়া সুখী-জনের সুখেতে হাসিয়া ও দুঃখীর দুঃখে অশ্রু ফেলিয়া আপনার মহৎ হৃদয়ের পরিচয়ে সকলকে মোহিত করেন।

ভারতবর্ষ, জগদীশচন্দ্রের অন্তরের ধ্যানমন্ত্র। যেখানে যতদূরেই তিনি থাকুন না কেন, ভারতের মঙ্গলচিন্তা তাঁহার চিত্তের অনেকখানি অংশ জুড়িয়া থাকে। আর এই কারণেই বোধ হয় তিনি আমেরিকাপ্রবাসী ভারত-

সন্তানগণের নিকট এত শ্রদ্ধা এত সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। আমেরিকার যেখানেই তিনি গিয়াছেন সেখানেই তথাকার "হিন্দুস্থান-সমিতি" তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছে, তাঁহার উপদেশ ও পরামর্শ প্রার্থনা করিয়াছে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রও তাঁহাদিগকে বারম্বার বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন—"জীবনের একটা নির্দ্দিষ্ট আদর্শ ঠিক করিয়া যতদিন না সে আদর্শ বাস্তবে ও সত্যে পরিণত হয় ততদিন ক্রমাগত অবিরাম চেষ্টা করিতে থাক। ইচ্ছাশক্তি থাকিলে কিছুই অসম্ভব বা অসাধ্য নয়। দুঃখক্লেশ স্বীকার না করিয়া কখনো কোন বড় কাজ হয় নাই। সুতরাং যদি বড় কিছু করিতে চাও তবে দুঃখকষ্ট নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনা সমস্তই নীরবে সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু মনে রাখিও ঐ দুঃখ ও নির্য্যাতনের মধ্য দিয়া কৃতকার্য্যতা লাভ করাই তোমাদের গৌরব-অধিকার। বড় হইবার সম্ভাবনা প্রত্যেকের মধ্যেই সমানভাবে বর্ত্তমান। প্রতিভা? সুশৃঙ্খলার সহিত কঠোর পরিশ্রমে কাজ করিয়া যাওয়া ভিন্ন প্রতিভা আর কিছুই নহে। যদি ইচ্ছা কর তবে তুমিও প্রতিভাশালী হইতে পার।"

বসু মহাশয় যখন কথা বলেন তখন খুব ধীরভাবে বলেন। কথায় জোর দিবার জন্য তিনি শূন্যে হাতও ছোড়েন না কিম্বা টেবিলও চাপড়ান না। অথচ যেন কি এক বিচিত্র উপায়ে তাঁহার আন্তরিকতা সমস্ত কথাবার্ত্তার মধ্যে ফুটিয়া উঠে।

ভারতীয় ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন—"স্বদেশের কোন-না-কোন একটা কাজে তোমরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ কর। শুধু নিজে মানুষ হইয়াই তৃপ্ত হইও না, অপরকেও মানুষ হইয়া উঠিতে সাহায্য কর। জীবনটা নিতান্তই ছোট,—কাজেই বৃথা সময় নষ্ট করিবার অবকাশ বা অধিকার কাহারো নাই। মাধুর্য্যে, আলোকে ও কর্ম্মনিষ্ঠতায় এই জীবনকে পূর্ণ ও সার্থক করিয়া তোলাই তোমাদের আদর্শ হউক।"

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ধনী হইবার আকাঙ্ক্ষা করেন না। তাঁহার মতে অর্থসঞ্চয় বা ব্যবসাবাণিজ্যে কৃতকার্য্যতাই মানুষের শক্তির সত্য বা প্রকৃত পরিচয় নয়। পৃথিবীতে টাকা জিনিসটাকেই তিনি পরম বস্তু বলিয়া মনে করেন না। খেতাবপদবীর প্রতিও তাঁহার কোন আকর্ষণ নাই। তিনি বলেন—"বিজ্ঞানের খাতিরেই বিজ্ঞানচর্চ্চা করা উচিত, কোনরূপ পুরস্কারের আশায় নয়। কোন একটা বড় কাজ করিয়াই এ কথা ভাবিও না যে সমস্ত পৃথিবীর লোক অমনি একেবারে সেটিকে স্বীকার করিয়া লইয়া আনন্দোল্লাসে মত্ত হইয়া উঠিবে এবং চারিদিকে তোমার জয়জয়কার পড়িয়া যাইবে।"

ভারতের একতা ও সমস্ত ভারতবাসীর এক মহাজাতিতে পরিণত হইবার কথা কহিবার সময় জগদীশচন্দ্র যেন তাঁহার সমস্ত শক্তি, মনীষা, ও প্রাণ তাহাতে ঢালিয়া দেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য এই—"সর্ব্ব প্রথমে তোমার সাধনার বস্তু হউক খাঁটি ভারতসন্তান হওয়া। তাহার পর সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতাকে ছাড়াইয়া উঠিয়া ভারতবর্ষের একত্বকে ধারণা করিতে শিক্ষা কর। ভারতে এক প্রদেশ আর-এক প্রদেশ হইতে শ্রেষ্ঠ, এক প্রদেশবাসী আর-এক প্রদেশবাসী হইতে বেশী বুদ্ধিমান, এরূপ মত ও ধারণা পোষণ নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। নবগঠিত ভারতে পাঞ্জাবী, মারাঠী কিম্বা বাঙ্গালী থাকিবে না—থাকিবে কেবল ভারতবাসী।"

একদিন কোন ধনী বিকানীরবাসীর এক পুত্র আচার্য্য বসু মহাশয়ের Autograph বা "হাতের লেখার" জন্য তাঁহার হোটেলে দেখা করিতে যান। জগদীশচন্দ্র তাঁহাকে জানাইলেন যে তিনি সচরাচর তাঁহার "হাতের লেখা" কাহাকেও দেন না এবং দিলেও তার মূল্য খুব বেশী লইয়া থাকেন। এই কথা বলিয়া বণিক-পুত্রটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা, তুমি আমায় কত দিবে?" উত্তর আসিল "আমি ভারতের সেবায় আমার জীবন দিব।" যুবকের এই উত্তর শুনিয়া জগদীশচন্দ্র কি করেন তাহা দেখিবার জন্য সকলে তাঁহার দিকে ব্যগ্র দৃষ্টিতে তাকাইলেন। আচার্য্যবরের চক্ষু আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; তিনি বিকানীর-যুবককে সম্বোধন করিয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন—"এই নাও আমার হাতের লেখা।"

আমাদের দেশের যুবকদের আমেরিকায় শিক্ষালাভ সম্বন্ধে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করাতে জগদীশচন্দ্র বলেন—"আমার মতে বি এস্ সী পাশ না করিয়া আমাদের দেশের

কোন ছাত্রেরই এ দেশে শিক্ষালাভের জন্য আসা উচিত নয়। ছাত্রদের চরিত্র ও ক্ষমতার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া শুধু কেবল দলে দলে জাহাজ বোঝাই করিয়া তাহাদিগকে এ দেশে পাঠানো কোন মতেই সমীচীন নয়। সংখ্যায় বেশী ছাত্র না পাঠাইয়া কয়েকজন বাছা বাছা ভাল ছাত্র পাঠানো বাঞ্ছনীয়।"

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় ভাল কি ইংল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় ভাল, বসু মহাশয়কে এই প্রশ্ন করাতে তিনি বলেন "ইংরেজ ও মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় দুই-ই আমার ভাল লাগে। উভয়েরই সুবিধা ও অসুবিধা দু-ই আছে। তবে আমার মনে হয় আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অর্থবল বেশী এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারগুলির বন্দোবস্ত আরো ভাল। মার্কিন যুক্তরাজ্যে অনেক মেধাবী অধ্যাপক আছেন কিন্তু তাঁহাদের বড় বেশী খাটানো হয় বলিয়া মনে হয়;—অন্ততঃ তাঁহারা তাঁহাদের ছাত্রদের অপেক্ষা বেশী পরিশ্রম করেন। আমেরিকা গণতান্ত্রিক দেশ, কাজেই সাধারণ লোকের পক্ষে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষালয়গুলিতে প্রবেশলাভ ইংল্যাণ্ডের অপেক্ষা অধিক সহজসাধ্য। কিন্তু এই নূতন দেশের পশ্চাতে সুচির কালের সঞ্চিত ইতিহাস বা "ট্রাডিসন্" নাই।"

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের সহিত তাঁহার পত্নী ও প্রাইভেট সেক্রেটারী আমেরিকায় আসিয়াছেন। তাঁহার পত্নী অতি রমণীয়া ও ধীরস্বভাবা মহিলা। যে-সমুদয় ভারতবাসী বিদেশে বেড়াইতে আসেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যেমন বিদেশী পরিচ্ছদ পরিধান করেন বসুজায়া তেমন করেন নাই। তিনি তাঁহার জাতীয় পরিচ্ছদ বজায় রাখিয়াছিলেন। গোলাপী রংয়ের জ্যাকেটের উপর তাঁহার স্তরবিন্যস্ত জরীপাড় সাড়ী বড়ই সুশ্রী ও শোভন দেখায়। তাঁহার উন্নত ললাট সুন্দর ঘন কেশরাশিতে মণ্ডিত, তাঁহার চক্ষুদুটি এক অপূর্ব্ব আলোকে পূর্ণ। বসুজায়ার জন্ম ও শিক্ষা যদিও ভারতবর্ষে তথাপি পাশ্চাত্যসমাজে তিনি বেশ স্বচ্ছন্দভাবে চলাফেরা করিয়া থাকেন।

আচার্য্য-পত্নীর কথা কহিবার শক্তি বড়ই চমৎকার এবং তাঁহার কণ্ঠস্বরটিও অতি মনোরম। য়ুরোপ আমেরিকার ভিতরকার জীবনটির সহিত তাঁহার পরিচয় থাকায় যখনই তিনি সে সম্বন্ধে কোন কথা বলেন তখনই তাহা শুনিবার জন্য বড়ই আগ্রহ হয়।

পাশ্চত্যসভ্যতার বাহিরের জাঁকজমক বসুজায়ার নয়ন ধাঁধিয়া দেয় নাই। তাঁহার মতে পাশ্চত্যদেশবাসীরা অর্থের পূজায়, ভোগের লালসায়, খেতাবের আকাঙ্ক্ষায় উন্মত্তপ্রায়;—সামাজিক দ্বন্দ্বসংঘর্ষে নিরন্তর ব্যতিব্যস্ত। যেমন পূর্ব্বদেশে তেমনি পশ্চিমদেশে জাতিভেদ। পশ্চিমের জাতিভেদ অর্থের উপর, আর পূর্ব্বের জাতিভেদ জন্মের উপর প্রতিষ্ঠিত—এই মাত্র যা তফাৎ। পশ্চিম যে-পথে চলিয়াছে সে-পথে বেশী দিন আর সে চলিতে পারিবে না। দুদিন আগেই হৌক দুদিন পরেই হৌক তাহাকে ফিরিতেই হইবে। তখন আর-একবার তাহাকে পূর্ব্ব-জগতের নিকট আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

শ্রীমতী বসুজায়া ভারতবর্ষকে ভালবাসেন বটে কিন্তু তাই বলিয়া অন্য দেশকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখেন না। তাঁহার মনে বিদ্বেষের লেশও নাই। এমন কি যে-সমুদয় সঙ্কীর্ণমনা ভারতপ্রত্যাগত খ্রীষ্টীয় মিশনারী ভারতের মিথ্যা কুৎসা রটনা করিয়া বেড়ান তাঁহাদের প্রতি পর্য্যন্ত তাঁহার কোন বিদ্বেষভাব নাই। তিনি তাঁহাদের কৃপানেত্রে দেখিয়া থাকেন এই পর্য্যন্ত।

ভারতনারীর শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা বসুজায়ার বড়ই মনোমত। ঐ বিষয়টি তাঁহার বিশেষ প্রিয়। গুজব এই তিনি নাকি আমাদের দেশে প্রচলনের জন্য আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের স্ত্রীশিক্ষাবিধি বিশেষভাবে অধ্যয়ন ও আলোচনা করিতেছেন। ইতিমধ্যেই তিনি তাঁহার বিদ্যালয়ের কার্য্যে সাহায্যের জন্য উইসকন্সিন বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক মার্কিন মহিলাকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

একদিন মধ্যাহ্ন-আহারকালে আলোচনাপ্রসঙ্গে য়ুরোপীয় ও মার্কিন মেয়েদের কথা উঠিল। বসুজায়ার মতে য়ুরোপের মেয়েদের অপেক্ষা আমেরিকার মেয়েরা বেশী স্বাধীনচেতা, উদারমনা ও চিত্তানন্দদায়িনী। একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি য়ুরোপীয় ও ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে বিবাহ হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করেন?" বিদ্যুতের মত উত্তর আসিল—"কখনই নয়! বিদেশীরা

আমাদের সঙ্গে কোনমতেই একীভূত হইতে কিম্বা আমাদের আদর্শ ও সভ্যতার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না। আমাদের জীবনের ভিতরকার সৌন্দর্য্য পাশ্চাত্যদের চোখে পড়ে না। ভারতবাসী ও য়ুরোপীয়দের মধ্যে বিবাহ কখনই সুখের হইতে পারে না, এবং এরূপ বিবাহকে কোন মতেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।"

এই কথা শুনিয়া প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন—"কেন, আপনি তো মার্কিন মেয়েদের এইমাত্র খুব প্রশংসা করিতেছিলেন? তাহাদের সঙ্গে যদি—"

বসুজায়া হঠাৎ বাধা দিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ তা বটে! কিন্তু আপনাদের মার্কিন মেয়েরা বড় বাবু। দরিদ্র ভারতমাতা তাহার বিলাসিতার খরচ জোগাইবেন কি করিয়া?"

এই কথা শুনিয়া সকলে চুপ করিয়া গেলেন।

শ্রীঅমলচন্দ্র হোম।

গ্রীষ্মের অভিলাষ

টলিয়া পড়ে পল্লীপথে তরুণ তৃণগুলি,
অনল ঢালে নিদাঘ-দিনমান;
ক্লান্ত-দেহ পান্থ ফেলে গাত্র-বাস খুলি,
শিয়র-তলে রাখিয়া বাহুখান
প্রসারি দেহ ঘাসের 'পরে নিবিড় বটছায়;
'ত্বরিতে বেলা তলিয়ে যাক,'—কেবলি এই চায়।

অদূরে তারি ধানের ক্ষেতে গাহিয়া গান চাষী
পাঁচনি হাতে নিড়িয়ে দেয় ঘাস,
ঘর্ম্মজল ঝরিয়া যায় নগ্নদেহ ভাসি,
শান্ত মুখপ্রান্তে মৃদু হাস;
বারেক মুখ তুলিয়া বেলা দেখিয়া ফিরে কয়,—
'এমনি দিন থাকিলে আজই নিড়েনি শেষ হয়।'

শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য।

পুস্তক-পরিচয়

শ্রীভাস্করাচার্য্য-বিরচিত সিদ্ধান্ত-শিরোমণি—বাসনা ভাষ্য সহিত গোলাধ্যায়। জ্যোতিষাচার্য পণ্ডিত গিরিজাপ্রসাদ দ্বিবেদী কৃত প্রভা-ভাষাভাষা-উপপত্তি-আদি সহিত॥ লখনউ মুন্‌শী নবলকিশোরকে যন্ত্রালয়মে মুদ্রিত হুআ॥

গ্রন্থখানি বৃহৎ আকারে ৪২৯ পৃষ্ঠায় পূর্ণ। নাগরী অক্ষরে মুদ্রিত। ইহাতে ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্তশিরোমণির গোলাধ্যায়, ভাস্করের বাসনাভাষ্য, এবং সংশোধক পণ্ডিতজীর রচিত প্রভানাম্নী সংস্কৃত টীকা, হিন্দীতে ভাষ্য ও উপপত্তি প্রদত্ত হইয়াছে। উপপত্তির আবশ্যক ক্ষেত্র যোজিত হইয়াছে।

ভাস্করাচার্য তাঁহার সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থের দুই অধ্যায় করিয়া প্রথম গণিতাধ্যায়ে গ্রহগণিত এবং দ্বিতীয় গোলাধ্যায়ে গোলগণিত লিখিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত জ্যোতির্বিদ্যাশিক্ষার্থীর নিকট গোলাধ্যায় চিরদিন আদরণীয় হইয়া আসিতেছে। ভাস্কর স্বয়ং ইহার ভাষ্য—বাসনাভাষ্য—লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সকল স্থলে তাহা পর্যাপ্ত নহে। একারণে পূর্ব্বকালে গণিততত্ত্বচিন্তামণি, মরীচি, বাসনাবার্ত্তিক, প্রভৃতি বহু টীকা রচিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় ইহাদের নামমাত্র শুনিতে পাই, টীকাগুলি অদ্যাপি অপ্রকাশিত আছে। অনেকগুলি লুপ্ত হইয়াছে। ৺পণ্ডিত বাপুদেব শাস্ত্রী মহাশয় বাসনাভাষ্য-সহিত সিদ্ধান্তশিরোমণি প্রকাশ করিয়াছিলেন। নিজের কিছু কিছু টীকাও দিয়াছিলেন। অদ্যাপি শাস্ত্রীমহাশয়ের সংস্করণ প্রসিদ্ধ আছে। তিনি গোলাধ্যায়ের ইংরেজী ভাষান্তরও করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে বঙ্গাক্ষরে বাসনাভাষ্য- ও বঙ্গানুবাদ-সহিত সিদ্ধান্তশিরোমণি মুদ্রিত হইয়াছে। এই সংস্করণের দুই এক স্থলে যৎসামান্য উপপত্তি আছে, কিন্তু তাহাতে কুলায় না। বঙ্গানুবাদে ব্যাখ্যা নাই। অন্যত্র সিদ্ধান্তশিরোমণির যে-সকল সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ৺শাস্ত্রীমহাশয়ের সংস্করণ শ্রেষ্ঠ। এই সংস্করণ মূল করিয়া উপস্থিত গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। ঠিক এই রকমের একখানি গ্রন্থ বহুদিন হইতে খুঁজিতেছিলাম। পণ্ডিতজীর গ্রন্থ পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি।

সংস্কৃতে এমন কোন জ্যোতিষ গ্রন্থ নাই, যাহা বিনা গুরু-উপদেশে পড়িয়া জ্যোতির্বিদ্যা শিখিতে পারা যায়। সেকালে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না; গুরু-উপদেশ ব্যতীত বিদ্যাভ্যাসের রীতি ছিল না। গোলাধ্যায়ের আরম্ভে ভাস্কর লিখিয়াছিলেন, "গোলগ্রন্থে যে যে অপূর্ব্ব (যাহা পূর্ব্বে ছিল না) ও বিষম (কঠিন) উক্তি আছে, তাহা বাল-অববোধের নিমিত্ত সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।" অর্থাৎ যাহা পুরাতন, সকলের জানা আছে, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই; যাহা নূতন ও কঠিন, তাহা ব্যাখ্যা করিতেছি, নতুবা বালকেরা বুঝিতে পারিবে না; কিন্তু সংক্ষেপে বলিব।

বস্তুতঃ বাল-অববোধের যোগ্য গ্রন্থ সংস্কৃতে দেখিতে পাই না। তবে যে গ্রন্থকার "বালাববোধায়" লেখেন, তাহা বিনয়ে বলেন, গুরুর সম্মানরক্ষার্থে বলেন। এইরূপ, জ্যোতিষাচার্য দ্বিবেদী মহাশয় যে টীকা ও ভাষা দিয়াছেন, তাহা গুরুর অন্তেবাসীর অববোধের নিমিত্ত। তথাপি, তিনি যথাসম্ভব প্রাঞ্জলতার প্রয়াস করিয়াছেন, সংস্কৃত উপপত্তির সহিত স্থানে স্থানে ইংরেজী গণিতের উপপত্তি দিয়া আধুনিক কালের উপযোগী করিয়াছেন। তিনি ইয়ুরোপীয় সিদ্ধান্তের কোন কোন বিষয়, যেমন মাধ্যাকর্ষণ, কেপ্‌লারের সিদ্ধান্ত, ভূভ্রমণবাদ প্রভৃতি নবীন বিষয় যোজনা করিয়া সংস্কৃত-জানা ও ইংরেজী-জানা পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন, ক্ষেত্র-সাহায্যে উপপত্তি বুঝাইয়া মূল শ্লোক সুগম করিয়াছেন।

জ্যোতিষাচার্য্য-মহাশয় স্থানে স্থানে পাদটীকায় স্বীয় মত প্রকাশ করিয়াছেন। সকলে এই মত গ্রহণ করিতে পারিবেন না। যথা, ৭ পৃষ্ঠে, তিনি যে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট গণিত অনুসারে স্মৃতির ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে বিলক্ষণ মতভেদ আছে। "দৃষ্ট জো আঁখোঁ-সে দেখা যায়, জৈসে গ্রহণ, উদয়াস্ত, যুতি ঔর শৃঙ্গোন্নতি আদি। ঔর অদৃষ্ট জো দেখনে-মেঁ ন আবে, জৈসে তিথি, যোগ আদি। গ্রহণ আদি-কে দেখনে সে হী উসকা ফল হোতা হৈ, ঔর ব্রত উপবাস আদিকা ফল বিনা দেখেহী হোতা হৈ। ফলকা আদেশ কেবল ঋষিয়োঁ-কে অনুভবসিদ্ধ বাক্যোঁ-সে হোতা হৈ। জো কুছ গ্রহোঁ কী স্থিতি-কে অনুসার ফল লিখা উপলব্ধ হোগা, মনুষ্য নহী জান সকেগা। ইস ফলকী কল্পনা ঋষিয়োঁ-কে সিবায় কোই নহী কর ঔর জান সকতা। আর্ষ গ্রন্থোঁ-মেঁ জো গ্রহ স্পষ্ট বনানে কী রীতি হৈ, উসী রীতি-সে স্পষ্ট কিয়ে গ্রহ ফলাদেশ-মেঁ উপযুক্ত হৈঁ। ক্যোঁ কি উন্হীঁ স্পষ্ট গ্রহোঁ কে আধার পর শ্রৌত ঔর স্মার্ত কর্মোঁ-কে সময় বটে হৈঁ। ইন লিয়ে উনা গণিত-সে জো তিথি আদি সিদ্ধ হোঁ উন্হীঁ-সে ধর্ম্মব্যবস্থা ঔর উসকা আচরণ করনা উচিত হৈ।" ইত্যাদি। অর্থাৎ জ্যোতিষাচার্য্যের মতে দুই প্রকার গণিত আবশ্যক, এক প্রকার গণিত আর্ষ সিদ্ধান্ত অনুসারে হইয়া একাদশী প্রভৃতি তিথির ব্যবস্থার মূল হইবে, অন্য প্রকার গণিত বেধসিদ্ধ হইয়া গ্রহণ উদয়াস্ত প্রভৃতি দৃষ্ট ফলের মূল হইবে। এখানে এ বিষয়, এই চির বিবাদের বিষয়, বিচারের স্থান নাই; তবে, এই মাত্র বলি, ৺ বাপুদেব শাস্ত্রী একপ্রকার গণিতের, বেধসিদ্ধ গণিতের, পক্ষে ছিলেন। এইরূপ, সকল প্রদেশেই কেহ কেহ দৃক্‌সিদ্ধ গণিতের পক্ষপাতী হইয়াছেন। বঙ্গদেশে ৺ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন বহু বিচার করিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিতজীকে সিদ্ধান্ত শব্দের অর্থ ও কত সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে এই দুই স্মরণ করিতে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। পুস্তকের ৩৭ পৃষ্ঠের পাদটীকায় দ্বিবেদীজী লিখিয়াছেন, "ইসকে সিবায় বেদমেঁ ভী পৃথ্বীকা গোল আকারহী মানা হৈ।" কিন্তু ইহার প্রমাণে যে ঋক্ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার সায়ন-ভাষ্যে গোলাকারত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না। জ্যোতিষাচার্য্য মহাশয় এই-সব অ-স্থির মত প্রকাশ না করিলে গ্রন্থের গৌরবহানি হইত না।

তিনি ভূমিকায় জানাইয়াছেন, সিদ্ধান্তশিরোমণির গণিতাধ্যায় যথাসম্ভব শীঘ্র অনুবাদ করিবেন। আমরা সে অনুবাদের অপেক্ষায় থাকিলাম। এই সময়ে তাঁহাকে একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি। তিনি এমন যত্নসাধ্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ কদর্য্য কাগজে ছাপাইলেন কেন? বোধ হয় মূল্য-লাঘব-কল্পনায় কিংবা মুদ্রাধ্যক্ষের অবিবেচনায় অসার কাগজে গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। ছোট অক্ষর পড়িতে কষ্ট হইতেছে। যাঁহারা পণ্ডিত তাঁহারা শব্দের একটা দুইটা অক্ষর অস্পষ্ট হইলেও শব্দ অনুমান করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু এই গ্রন্থের টীকা কেবল পণ্ডিতের নিমিত্ত লিখিত হয় নাই। অনেক বাঙ্গালী পাঠক হিন্দী লিখিতে কহিতে না পারুন, পড়িয়া বুঝিতে পারেন। তাঁহাদের পক্ষে গোলাধ্যায়ের এই সংস্করণ উত্তম হইবে। তথাপি, ইহার বঙ্গানুবাদ বাঞ্ছনীয় মনে করি। শুনিয়াছিলাম, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সিদ্ধান্তশিরোমণির বঙ্গানুবাদ ইচ্ছা করিয়াছেন। পরিষৎ নূতন টীকা ব্যাখ্যা না করাইয়া এই সংস্করণের বঙ্গানুবাদ দ্বারা অক্লেশে অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারেন। আমি ভাস্করের অন্যোক্তিপ্রকারে বলিতে পারি, যদি তুমি গোলবিদ্যা শুনিতে ইচ্ছা কর, তবে গিরিজাপ্রসাদ-কৃত ভাস্করীয় শ্রবণ কর। ইহা সংক্ষিপ্ত নহে, বহুবৃথাবিস্তরও নহে। ইহা হইতে জ্যোতির্বিদ্যার তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

রবীন্দ্র-প্রতিভা—মৌলভী একরামদ্দীন প্রণীত ও মৌলভী নছিরদ্দীন আহ্‌মদ্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ষোলপেজী ১২৯ পৃষ্ঠা। কাগজের মলাট। মূল্য এক টাকা।

আমাদের দেশে শিক্ষিত মুসলমানগণের মধ্যে বাংলাভাষার প্রতি একটা তীব্র অবজ্ঞা ও অবহেলার ভাব দেখা যাইত। তাঁহাদের অনেকেই বাংলাকে মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জাবোধ করিতেন এবং বাংলার পরিবর্ত্তে উর্দ্দুকে সেই স্থানে বসাইতে চাহিতেন। এক্ষণে সেই ভ্রম তাঁহারা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

তাহার নিদর্শন-স্বরূপ যখন দেখি কোন মুসলমান বাংলাভাষায় পুস্তক লিখিতেছেন ও বাংলাসাহিত্যের সেবা করিতেছেন তখন বাস্তবিকই বড় আনন্দ হয়। বিশেষত বর্ত্তমান পুস্তকখানি সমালোচনার জন্য পড়িয়া অবধি মনটি ভারী খুসী হইয়াছে। এমন সরস ও সুন্দর বাংলায় একজন মুসলমান যে রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা করিতে পারেন তাহা সত্যই আমাদের ধারণার মধ্যে ছিল না। কোন মুসলমানের বাংলারচনা পড়িতে বসিলেই আশঙ্কা হয়, না জানি উর্দ্দু ও ফার্সীর কদর্য্য-অপভ্রংশ-মিশ্রিত হইয়া বাংলাভাষা তাহাতে কি অপূর্ব্ব আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু এই পুস্তকখানির কয়েকপৃষ্ঠা পড়িয়াই বুঝিতে পারিলাম যে এ ক্ষেত্রে সে আশঙ্কা একেবারে অমূলক। ইহার ভাষায় কোথাও একটুকু জটিলতা কিম্বা উর্দ্দু-ফার্সী মুদ্রাদোষ নাই; লেখক তাঁহার মনোগত ভাব ও বক্তব্যকে অতি প্রাঞ্জলভাষায় প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে একেবারে বিস্ময়-পুলকিত করিয়া দিয়াছেন।

এখন পুস্তকের আলোচ্যবিষয়ের কথা বলা যাক। সমালোচ্য পুস্তকখানি রবীন্দ্রনাথের সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকাব্য "বিসর্জ্জনের" সমালোচনা হইলেও লেখক ইহার নামকরণ করিয়াছেন রবীন্দ্র-প্রতিভা;—কেননা "ইহাতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সাধারণভাবে অনেক কথা বলা হইয়াছে"। "সাধারণভাবে অনেক কথা বলা" হইলেও যে-পুস্তক মুখ্যভাবে রবীন্দ্রনাথের একখানি মাত্র নাটকের সমালোচনা তাহার নাম রবীন্দ্র-প্রতিভা রাখা যুক্তিযুক্ত হয় নাই বলিয়া আমাদের মনে হয়। আর "বিসর্জ্জন" রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিও নয় এবং "বিসর্জ্জনেই" তাঁহার "প্রতিভার" চরম বিকাশও প্রকাশ পায় নাই। সুতরাং শুধু "বিসর্জ্জনের" সমালোচনাকে "রবীন্দ্রপ্রতিভা" এই বৃহৎ এবং ব্যাপক নাম দিলে যে রবি-প্রতিভাকেই খর্ব্ব করা হয় এ কথা রসজ্ঞ লেখক যে কেন ভুলিয়া গিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

তাহার পর, পুস্তকের "প্রস্তাবনার" সহিত আসল পুস্তকখানির কোনই সম্বন্ধ নাই। উহা একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ, সুতরাং ইহার সহিত জুড়িয়া না দিলে কোনই ক্ষতি হইত না। পুস্তকের পরিচ্ছেদে "নানা কথায়" লেখক রবীন্দ্রনাথের কাব্যসম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা-প্রসঙ্গে যে-সকল মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেও আমরা কোনমতেই সায় দিতে পারিলাম না।

শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনা নিবিড়ভাবে আলোচনা করিয়া তাঁহার "রবীন্দ্রনাথ" পুস্তকে দেখান যে "সর্ব্বানুভূতিই রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ও জীবনের মূল সুর" এবং সেই ভাবটিই তাঁহার মধ্যে বরাবর কাজ করিয়া আসিয়াছে। এখন "রবীন্দ্র-প্রতিভা"র লেখক তাঁহার এই মতকে খণ্ডন করিয়া বলিতে চান "রবীন্দ্রনাথে মুখ্যভাবে সর্ব্বানুভূতি থাকা দূরের কথা তাঁহার সমগ্র গ্রন্থাবলীর মধ্যে কোথাও কোনরূপ ভাবেরই আধিক্য দেখিতে পাই না।" রবীন্দ্রনাথের কাব্যসম্বন্ধে এত বড় অদ্ভুতকথা বাস্তবিকই আমরা তাঁহার কোন কাব্য-সমজদারের নিকট কখনো আশা করি নাই। মৌলবী সাহেব যে এরূপ অদ্ভুতকথা বলিয়াছেন তাহার একমাত্র

কারণ এই যে তিনি সর্ব্বানুভূতি কথাটির অর্থ ধরিতে পারেন নাই। তিনি বলিতেছেন—"কেহ কেহ * * সমগ্র হৃদয়ের সমানুভূতিকে সর্ব্বানুভূতি বা বিশ্ববোধ নাম দিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে কবি রবীন্দ্রনাথে এই সর্ব্বানুভূতি বিদ্যমান।" এই পংক্তি কয়টি পড়িলেই স্পষ্ট দেখা যাইবে লেখক হৃদয়ের সহানুভূতিকে সর্ব্বানুভূতি বলিয়া ভুল বুঝিয়াছেন। অজিতবাবু যে সর্ব্বানুভূতির কথা বলিয়াছেন তাহা সহানুভূতি নহে। তাহা "অংশের মধ্যে সম্পূর্ণকে, সীমার মধ্যে অসীমকে নিবিড়রূপে উপলব্ধি এবং সমস্ত জল স্থল আকাশকে, সমস্ত মনুষ্য-সমাজকে আপনার চৈতন্যে অখণ্ড পরিপূর্ণ করিয়া অনুভব করিবার শক্তি।" রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্য সমস্ত রচনা জুড়িয়া তাঁহার এই সর্ব্বানুভূতি সকল খণ্ডতা ও অপূর্ণতার বাধাকে বিদীর্ণ করিয়া আপনাকে সবলে প্রকাশ করিয়াছে।

"রবীন্দ্র-প্রতিভার" লেখক শুধু যে "সর্ব্বানুভূতি" সম্বন্ধে এরূপ ভুল করিয়াছেন তাহা নহে, তিনি রবীন্দ্র-কাব্য সম্বন্ধে এমন অনেক কথা বলিয়াছেন যাহা যুক্তি ও বিচারের কষ্টিপাথরে ঘসিলে কোন মতেই খাঁটি মনে হয় না। দুঃখের বিষয় সে সমস্তের আলোচনা করিবার স্থান আমাদের নাই।

"বিসর্জ্জন" নাটকের দৃশ্যপরম্পরায় তাহার আখ্যানবস্তু উদ্ঘাটন ও চরিত্রগুলির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে লেখক তাহার বিশ্লেষণ ও সৌন্দর্য্য উদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ কার্য্য মোটামুটি বেশ নিপুণতার সঙ্গেই তিনি করিয়াছেন। তবে বিশ্লেষণ অনেক স্থলেই অতিরিক্ত পল্লবিত ও অবান্তর কথার পুনরাবৃত্তিতে পূর্ণ হইয়াছে। পুস্তকের কয়েকটা অধ্যায়ের কতক অংশ একেবারে বাদ দিলে কোন ক্ষতি ছিল না।

গ্রন্থকার "বিসর্জ্জনের" প্রত্যেক চরিত্র প্রত্যেক ঘটনাকে এত খণ্ড খণ্ড করিয়া বিচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন যে তাহাতে তাহার সমগ্রের সৌন্দর্য্যটুকু ধরা তো পড়েই নাই, অধিকন্তু একেবারে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। রঘুপতি আপনার সমস্ত কোমল বৃত্তিগুলিকে নিষ্পেষিত করিয়া হৃদয়ের চারিধারে যে এক পাষাণ "দেউল" রচিয়া তুলিয়াছিল সহসা একদিন নিদারুণ দুঃখের বজ্রাঘাতে তাহা ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল, জয়সিংহের আত্মত্যাগ ও অপর্ণার প্রেম তাহার হৃদয়ে করুণার অমৃতধারা বহাইয়া প্রেমের বন্ধনেই যে যথার্থ মুক্তি তাহা তাহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিল; বিসর্জ্জনের এই সম্পূর্ণ চিত্রখানির শিক্ষা লেখক ভাল করিয়া ফুটাইতে পারেন নাই।

সে যাহাই হউক, পুস্তকখানিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যতই ত্রুটি থাকুক তথাপি মোটের উপর ইহা একখানি উৎকৃষ্ট ও বাংলা সাহিত্যের অন্যতম নিরপেক্ষ-সমালোচনা-পুস্তক বলিয়া আমরা ইহাকে আনন্দ-অভিনন্দনে নন্দিত করিতেছি। আমরা আশা করি মৌলবী সাহেব এই শ্রেণীর আরো উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিবেন।

* *
*

স্পেনবিজয়-কাব্য—গাজী সৈয়দ আবু মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। এণ্টিক কাগজে পাইকা হরপে পরিষ্কার ছাপানো। কাগজের মলাট। মূল্য বারো আনা।

কথিত আছে স্পেনের ভিসিগথবংশীয় শেষ রাজা রডারিক তাঁহার সেনাপতি জুলিয়ানের কন্যার প্রতি অত্যাচার করায় জুলিয়ান মুসলমানদের ডাকিয়া রাজাকে বিনষ্ট এবং স্পেনরাজ্য ধ্বংস করেন। সিরাজী সাহেবের কাব্যখানি এই কাহিনী অবলম্বনে অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দে রচিত। কিন্তু বিখ্যাত ডচ্ ঐতিহাসিক রেনহার্ট ডোজী (১৮২০—৮৪) বহুদিন হইল তাঁহার Histoire des Mussulmans d'Espagne নামক মুসলমান-অধিকারে স্পেনের ইতিহাস-গ্রন্থে নিঃসন্দেহ প্রমাণ-প্রয়োগে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন যে মুসলমানগণের স্পেনবিজয়ের এই বিবরণ উপন্যাসমাত্র। আধুনিককালের আরও কয়েকজন ঐতিহাসিকের অনুসন্ধানের ফল প্রকাশ পাইয়াছে যে রমণীর প্রতি অত্যাচারের এই গল্প ঘটনার ছয়শত বৎসর পরে একজন ইটালীয় সন্ন্যাসী প্রথম রচনা করেন, জুলিয়ান বলিয়া কেহ ছিল না, স্পেন দেশীয় যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মুসলমানের পক্ষ লন তাঁহার নাম আর্বান, ইত্যাদি। এই বিবরণ "প্রবাসীর" গত বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের "ইতিহাস-চর্চ্চার প্রণালী" প্রবন্ধটিতে বর্ণিত হইয়াছে। সিরাজী সাহেবকে তাহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

সমালোচ্য এই কাব্যখানি আটটি সর্গে সমাপ্ত। প্রথম দুইটি সর্গ ছাড়া আর সমস্ত সর্গই অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দে গ্রথিত। ছন্দের উপর লেখকের মোটামুটি বেশ অধিকার আছে। কিন্তু অভিধান বাছিয়া কঠিন শব্দ ব্যবহার করায় অনেক স্থানেই ভাষা অত্যন্ত কর্কশ ও শ্রুতিকটু হইয়াছে। কবিত্বের পরিচয় পুস্তকের কোথাও পাইলাম না। মামুলি বর্ণনা ও মামুলি উপমা সমস্ত কাব্যখানি জুড়িয়া রহিয়াছে। মৌলিকতার বিন্দুমাত্র আভাষ কোথাও নাই। সপ্তম সর্গটি তো মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গের হুবহু অনুকরণ। রডারিকের সভা, দূতমুখে যুদ্ধক্ষেত্রে পুত্রের পতন-সংবাদে রডারিকের শোক, মন্ত্রীর প্রবোধবাক্য, পুত্রশোকে উন্মাদিনী রডারিক-মহিষীর অকস্মাৎ আলুথালু বেশে সভাপ্রবেশ ও বিলাপ এবং পরে সকলে মিলিয়া পুত্রের মৃতদেহ দেখিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে গমন—এ সমস্তই মাইকেল-বর্ণিত রাবণের সভা, রাবণের পুত্রশোক ও চিত্রাঙ্গদার বিলাপের নিতান্ত ব্যর্থ অনুকরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

* *
*

শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিত—শ্রীশশিভূষণ বসু প্রণীত ও কলিকাতা ৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট হইতে পুস্তকবিক্রেতা দাস গুপ্ত এণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ষোল পেজী ৩৬৫ পৃষ্ঠা। সোনার জলে নাম লেখা কাপড়ের মলাট। মসৃণ আইভরী ফিনিস কাগজে পরিষ্কার ছাপা। মূল্য এক টাকা।

কোন মহাপুরুষের জীবনচরিত আলোচনা করিতে গেলে সর্ব্বপ্রথম আমাদের চোখে পড়ে তাঁহার জীবনের ঘটনাগুলি। কিন্তু শুধু এই ঘটনাগুলির সমষ্টিই তাঁহার জীবনচরিত নহে। সমস্ত বাহ্য ঘটনার অন্তরালে তাঁহার যে মনটি কাজ করিয়াছে তাহার পরিচয় না পাইলে জীবনের কোন পরিচয়ই সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না। প্রত্যেক মহাপুরুষই একটি বিশেষ যুগ বা কালের সৃষ্টি। সুতরাং মহাপুরুষকে বুঝিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম তাঁহার যুগটিকে বুঝিতে হইবে।

তাই চৈতন্যদেবের এই জীবনচরিতখানি পড়িতে বসিয়া আমরা সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার আবির্ভাবের সময়ে বাংলার ধর্ম্ম ও সমাজের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আশা করিয়াছিলাম। কি শক্তি তখন এদেশে কাজ করিতেছিল তাহা বুঝিতে না পারিলে চৈতন্যের জীবনের সার্থকতা কোন মতে ভাল করিয়া বোঝা যাইতে পারে না। শাক্ত ও বামাচারীগণের পৈশাচিক উচ্ছৃঙ্খলতার বৃত্তান্ত না জানিলে গৌরাঙ্গদেবের আত্মবিহ্বল শান্ত-দাস্য-বাৎসল্য-সখ্য-মধুর রস সম্ভোগের বিচিত্র সাধনার সৌন্দর্য্য কি করিয়া উপলব্ধি করিব?

কিন্তু দুঃখের বিষয় গ্রন্থকার তাহার উল্লেখ পর্য্যন্ত না করিয়া শুধু চৈতন্যের জীবনকথার আলোচনা করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। এমন কি তাঁহার এই তিনশত-পঁয়ষট্টি-পৃষ্ঠাব্যাপী পুস্তকখানিতে বৈষ্ণবধর্ম্ম-তত্ত্বের বিন্দুমাত্র আভাস নাই। চৈতন্যদেবের যে বৈষ্ণবধর্ম্ম একদিন বাংলার একপ্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত পর্য্যন্ত মাতাইয়া তুলিল, যে ধর্ম্ম কত জগাই মাধাইয়ের কঠিন প্রাণ গলাইল, যে ধর্ম্ম বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি করিল, সেই ধর্ম্মের তত্ত্ব, বিস্তৃতি এবং প্রভাবের ইতিহাস চৈতন্যের এই জীবনচরিতে কেন যে স্থান পাইল না তাহা বুঝিতে পারিলাম না। গ্রন্থকার, চৈতন্যের জীবনের রাশি রাশি অলৌকিক ঘটনার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ না করিয়া চৈতন্যের কাল এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের পরিচয় দিলে পুস্তকখানি শিক্ষাপ্রদ এবং আরো সুখপাঠ্য হইত।

যাহাই হউক গ্রন্থখানি গৌরাঙ্গদেবের চরিতকথা হিসাবে বেশ সুন্দর হইয়াছে। ভাষা প্রাঞ্জল বর্ণনা-ভঙ্গীটিও মনোরম। স্ত্রী ও বালপাঠ্য হিসাবে পুস্তকখানির আদর হইলে আমরা সুখী হইব।

পুস্তকখানিতে কয়েকখানা ছবি আছে বটে, কিন্তু সেগুলি না থাকিলেই ভাল হইত।

* *
*

"গীতাঞ্জলি" সমালোচনা—শ্রীউপেন্দ্রকুমার কর, বি, এল প্রণীত ও শ্রীহট্টান্তর্গত মৌলভীবাজার চন্দ্রনাথ প্রেসে কৃষ্ণমোহন ধর কর্ত্তৃক মুদ্রিত। ডিমাই আটপেজী ১০৪ পৃষ্ঠা; মূল্য ছয় আনা মাত্র।

আমাদের দেশে এক শ্রেণীর কাব্য-সমালোচক (?) আছেন যাঁহারা সরল কথার সহজ অর্থ ছাড়িয়া বিকৃত ব্যাখ্যা করিবার এবং সুন্দরকে কুৎসিত করিয়া দেখিবার ও দেখাইবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। ইঁহারা কূটতর্ক বা sophistryর মায়ায় সাধারণ পাঠকের চোখ ধাঁধাইতে ও মন ভুলাইতে বিশেষ পটু। রবীন্দ্রনাথ "নোবেল পুরস্কার" পাইবার পর হইতেই এইরূপ একদল সমালোচক তাঁহার কাব্য, বিশেষত গীতাঞ্জলি ও ধর্ম্মসঙ্গীতগুলিকে নানাপ্রকারে হীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াসে বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এই প্রয়াসের মধ্যে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা নিতান্ত নির্লজ্জভাবে বর্ত্তমান।

বর্ত্তমান পুস্তকখানি ঐরূপ একটি সমালোচনার প্রতিবাদ। কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীহট্টের একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকাতে কোন একজন বিজ্ঞবেশী সমালোচক, "আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে" গীতাঞ্জলির এই প্রথম গানটি লইয়া গভীর পাণ্ডিত্যের ভান করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করেন যে রবীন্দ্রনাথের এই একটি গানের মধ্যে "রসাভাস দোষ" "দার্শনিক দোষ" "ব্যাকরণ দোষ" "স্বতোবিরুদ্ধতা দোষ" ইত্যাদি যত "দোষ" ঘটিতে পারে সমস্তই ঘটিয়াছে। সমালোচক মহাশয় ক্রমান্বয়ে কিছুকাল ধরিয়া ধারাবাহিকভাবে এই একটি গানের সমালোচনা করিয়া অসহনীয় ধৃষ্টতা দেখাইয়া প্রমাণ করিবার প্রয়াস পান যে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি সকল দিক দিয়াই অতিশয় নিকৃষ্ট! বর্ত্তমান পুস্তকের রচয়িতা তাহার পর উক্ত সমালোচনার কয়েকটি প্রতিবাদ ঐ পত্রিকাতেই প্রকাশ করেন। এখন তিনি সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। লেখক বিশেষ ধৈর্য্যের সহিত সবিশেষ নিপুণতা সহকারে সুযুক্তি-সুতর্কের সমাবেশে কূটতার্কিকের সমুদয় কুতর্ক ও কুযুক্তি একেবারে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিয়াছেন। এই প্রতিবাদে তিনি একদিকে যেমন সারবত্তা ও পাণ্ডিত্য অপরদিকে তেমনি মার্জ্জিত রুচি ও ধীশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। অবশ্য বাদবিতণ্ডার তপ্তহাওয়ায় যে গ্রন্থের সূচনা, বিরুদ্ধবাদীর মতামত খণ্ডন যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য তাহার মধ্যে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যবিশ্লেষণ কিম্বা সুনিবিড় রসসম্ভোগ আশা করা সঙ্গত নহে। লেখক নিজেও এই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তথাপি এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে সেদিক দিয়াও পাঠককে একেবারে নিরাশ হইতে হইবে না।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে—লেখক এক সামান্য পত্রিকায় প্রকাশিত নগণ্য লোকের সমালোচনার প্রতিবাদে এত সময় ব্যয় না করিয়া যদি স্বতন্ত্রভাবে গীতাঞ্জলির আলোচনা প্রকাশ করিতেন তবে তাঁহার শ্রম অধিক সার্থক হইত এবং আমরাও আরো অধিক তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতাম। তাঁহার সমালোচনার শক্তি ও রসানুভবের ক্ষমতা দেখিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি বলিয়াই আরো পাইবার আশা করিতেছি।

সুদূর মফঃস্বলের ছাপাখানায় ছাপা বলিয়া পুস্তকের বাহ্যসৌষ্ঠব সুশ্রী হয় নাই। আশা করি লেখক ভবিষ্যৎসংস্করণে এ ত্রুটি সারিয়া লইবেন।

* *
*

বিংশশতাব্দীর কুরুক্ষেত্র—শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম্ এ প্রণীত ও শ্রীক্ষেত্রনাথ বসু দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ষোল পেজী ১২৬ পৃষ্ঠা। মূল্য দশ আনা।

মহাযুদ্ধ সম্বন্ধে গ্রন্থকার-রচিত এই প্রবন্ধটি পূর্ব্বে যখন গৃহস্থ পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল তখন আমরা ইহা সাগ্রহে পাঠ করিয়াছিলাম। লেখক ইংল্যাণ্ডে বসিয়া এই প্রবন্ধটি রচনা করিয়াছেন। সুতরাং এমন কোন কোন জিনিস ইহাতে আছে যাহা আমাদের পক্ষে অন্য প্রকারে জানা সম্ভব ছিল না।

পুস্তকখানি কয়েকটি ছোট ছোট অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেকটি অধ্যায়ে কিছু-না-কিছু জানিবার আছে। আমরা এ স্থলে মাত্র কয়েকটি অধ্যায়ের নামোল্লেখ করিলাম। যথা—লড়াইয়ের খরচ, যুদ্ধকালে টাকার বাজার, খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের হুজুগ, আমদানী রপ্তানী ও দালালী, শ্রমজীবী-সমস্যা, লড়াইমণ্ডলের নিয়ম, বিলাতে স্বদেশরক্ষার আন্দোলন, শত্রু-পক্ষীয়গণের সামরিক ও সাধারণ নিয়ম ইত্যাদি।

এই সমস্ত অধ্যায় জুড়িয়া অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য সংগৃহীত ও আলোচিত হইয়াছে। যুদ্ধ ব্যাপারটা যে কি যাঁহারা তাহা জানিতে চান তাঁহারা এই পুস্তকখানি পড়িলে মোটামুটি সেটি বেশ বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধের উৎপত্তি ও তাহার কারণ সম্বন্ধে লেখক কোনই আলোচনা না করাতে তাঁহার এই পুস্তকখানি পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে নাই। অবশ্য এ সম্বন্ধে পাকাপাকি কোন কথা বলিবার সময় এখনও হয় নাই বটে, কিন্তু তবু যতটা সম্ভব অন্তত ততটা দুই পক্ষের কথা ও মতামত পাশাপাশি বসাইয়া দেওয়া উচিত ছিল বলিয়াই বোধ হয়।

আর-একটি কথা। লেখক তাঁহার এই প্রবন্ধটিতে নানা ইংরেজী পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকার অংশ বহুলপরিমাণে উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু প্রায় কোন স্থানেই তাহার অনুবাদ করেন নাই। ইংরেজী-অনভিজ্ঞ-পাঠকের ইহাতে যে কি পরিমাণ অসুবিধা হইতে পারে লোকসাহিত্যপ্রচারক বিনয় বাবুর সে কথাটা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল। বাস্তবিক যাঁহারা ইংরেজী জানেন না তাঁহারা এই বই পড়িয়া খুব অল্পই জ্ঞান লাভ করিবেন। বইখানির প্রায় প্রত্যেক ছত্রেই একটা-না-একটা ইংরেজী শব্দ! ভবিষ্যতে পুস্তকখানির যদি নূতন সংস্করণ হয় তবে এ-সমস্ত ত্রুটি সারিয়া লওয়া একান্ত প্রয়োজন।

আমাদের জীবন—রেভারেণ্ড জে, এম্, বি, ডনক্যান, এম্-এ, বি-ডি বিরচিত ও কলিকাতা ২৩ নং চৌরঙ্গী রোডস্থ "ক্রিশ্চিয়ান ট্র্যাক্ট অ্যাণ্ড বুক সোসাইটি" কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ষোল পেজী ১২৬ পৃষ্ঠা। মূল্য চারি আনা মাত্র।

এই পুস্তকখানি ডক্টর আর, ডবলিউ, ডেল প্রণীত Laws of Christ for Common Life নামক ইংরেজী পুস্তক অবলম্বনে রচিত। ইহাতে "খৃষ্টীয় ন্যায়পরতা", "অপরাধমার্জ্জনা", "পরের বিচার", "সহানুভূতি" প্রভৃতি মোট আটটি সন্দর্ভ আছে। সন্দর্ভগুলি খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ও নীতির ভিত্তির উপর রচিত হইলেও একেবারে সাম্প্রদায়িক নহে, যাঁহারা খৃষ্টান নহেন তাঁহাদেরও ইহাতে অনেক শিখিবার জিনিস আছে। পুস্তকখানির ভাষা, মিশনারীর লিখিত বাংলা চিরকাল যেমন হইয়া থাকে ঠিক তেমনি উৎকট ইংরেজী-গন্ধী।

* *
*

সোহরাব-বধ কাব্য—শ্রীআবুল-মআলী মহম্মদ হামিদ আলী প্রণীত ও শ্রীআবুনছর মহাম্মদ কমালদ্দিন হায়দার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য কাগজের মলাট ১ ও কাপড়ের বাঁধাই ১।০; পুস্তকের ছাপা কাগজ মন্দ নহে।

ফার্সী কবি ফিরদৌসীর রচিত সুপ্রসিদ্ধ শাহনামা কাব্যের সোরাব রুস্তমের করুণ কাহিনী অবলম্বনে Matthew Arnold হইতে আরম্ভ করিয়া স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় পর্য্যন্ত বহু বিদেশী ও স্বদেশী কবি অনেক কাব্য নাটক রচনা করিয়াছেন। এই কাব্যখানিও সেই কাহিনী লইয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় রচয়িতা এমন সুন্দর কাহিনীর কোনই সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। কাব্য রচনা করিতে বসিলে যে-সমস্ত শক্তি থাকা আবশ্যক লেখকের তাহার একটিও নাই; কাজেই রচনাটি নিতান্ত ব্যর্থ হইয়াছে।

শ্রীঅমলচন্দ্র হোম।

* *
*

আনোয়ারা—(উপন্যাস)—মোহাম্মদ নজীবর রহমান প্রণীত ও নুর লাইব্রেরি ১২।১ সারেঙ্গ লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

অতি অল্পসংখ্যক বাঙালী মুসলমান বাংলা ভাষার চর্চ্চা করিয়া থাকেন, যদিও বাংলা ভাষাই তাঁদের মাতৃভাষা, আরবী বা পারসী নয়। তাই বিশুদ্ধ ঝরঝরে বাংলায় বাঙালী মুসলমানের লেখা এই বইখানি পড়িয়া আমরা সুখী হইয়াছি। উপন্যাস হিসাবে বিচার করিয়াও বই-খানির প্রশংসা করিতে পারিলে আরও সুখী হইতাম।

প্লট বা ঘটনা-বৈচিত্র্য, চরিত্রসৃষ্টি, মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ—এই সবই উপন্যাসের প্রাণ। ইহার কোনোটিই সমালোচ্য পুস্তকে পাইলাম না। আর-একটি ত্রুটি—বইখানি অনাবশ্যক দীর্ঘ হইয়াছে। উপন্যাস রচনায় সফলকাম হইতে হইলে উপরিলিখিত ত্রুটিগুলির দিকে খুব নজর রাখিতে হইবে।

গ্রন্থকারের ভাষায় এমন কয়েকটি কথা ব্যবহৃত হইয়াছে যা বাংলা ভাষায় অচল। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—তিনি জল না লিখিয়া লিখিয়া-ছেন 'পানি'। বাংলায় 'জল' লিখিতে হইবে, পানি বাংলা নয়।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবারকার সাহিত্য-সম্মিলনের অভিভাষণে বলিয়াছেন—"যাহা চলতি, যাহা সকলে বুঝে, তাহাই চালাও; যাহা চলতি নয় তাহাকে আনিও না। যাহা চলতি, তাহা ইংরেজীই হউক, পারসীই হউক, সংস্কৃতই হউক—চলুক।" আমাদের মতও তাই। কিন্তু তাই বলিয়া যে-কোনো ইংরেজী, সংস্কৃত বা পারসী শব্দ বাংলা অক্ষরে লিখিলেই বাংলা হইবে না। সে শব্দগুলি চলতি হওয়া চাই।

বইখানির ছাপা কাগজ বাঁধাই বেশ ভালো। গ্রন্থকার বাঙালী-মুসলমান-পরিবারের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা বাঙালী-হিন্দু-পরিবারের চিত্রও হইতে পারিত—পার্থক্য বিশেষ নাই।

সু।

* *
*

রামায়ণ—শ্রীবিজয়গোপাল কবিরত্ন প্রণীত। মূল্য বারো আনা।

অনুবাদ বলিতে যাহা বুঝায় এখানি ঠিক তাহা নহে। মূলের ঘটনাগুলিকে সংক্ষিপ্ত করিয়া এখানি রচিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কবিগণের প্রসাদে রামায়ণ এমন ভাবেই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে গ্রন্থের আদত চেহারা আবিষ্কার করা এখন একরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই অগাধ সমুদ্রের ভিতর হইতে নীর বাদ দিয়া ক্ষীরটুকু বাহির করিয়া লইতে পারে বাংলা দেশে এরূপ ডুবারীর সংখ্যা খুব বেশী নাই। ফলে রামায়ণের মতো গ্রন্থের চর্চ্চাও লোপ পাইতে বসিয়াছে। গ্রন্থকার অনেক জিনিষ ছাঁট কাট দিয়া এই বিরাট বিষয়টি ছোট ও সহজ করিয়া আমাদের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন অথচ মূল সুরটি কোথাও খণ্ডিত হয় নাই। গ্রন্থের ভাষা সরস ও সরল। আমরা সকলকেই বইখানি পড়িতে অনুরোধ করি। গ্রন্থের ভিতর তিনখানি ছবি আছে—কোনোখানিই আমাদের কাছে ভালো লাগে নাই।

* *
*

চন্দ্রহাস-বিষয়া—শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ রায় প্রণীত—মূল্য পাঁচ সিকা।

জৈমিনি ভারতের একটি উপাখ্যান লইয়া গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। যদিও একটু সংস্কৃতঘেঁষা তবুও কষ্টকল্পিত নহে। একটা সহজ ছন্দ-প্রবাহ বর্ণনাগুলিকে বেশ সরস করিয়া তুলিয়াছে। কথোপকথনের বেলায় একথা মোটেই খাটে না। স্থানে স্থানে অতিরিক্ত রকমের দৈর্ঘ্য রসের দিকটা একেবারে মাটি করিয়া দিয়াছে। গ্রন্থকারের রচিত গানগুলির ভিতর কবিত্বের লেশমাত্র নাই।—ছন্দ এবং ভাব দু-ই বেজায় রকমে আড়ষ্ট। পুরাণের কাহিনী লিখিতে গেলে একালের সহিত খাপ খাওয়াইয়া তাহা লিখিতে হইবে। অসম্ভব ব্যাপারগুলিকে পরিত্যাগ করিতে হইবে ও সংযমের বল্গা আল্গা করিয়া দিলে চলিবে না। গ্রন্থকার এই সাধারণ সত্যটি অনেক জায়গায় ভুলিয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থের ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ ভালো। কিন্তু ছবিগুলির ভিতর কোনই আর্ট নাই।

* *
*

জপজী—গুরুনানক প্রণীত—শ্রীকিরণচন্দ্র দরবেশ দ্বারা পদ্যে অনুবাদিত। মূল্য ছয় আনা।

এখানি শিখদের আদিগ্রন্থ "গুরুগ্রন্থ সাহেবজীর" প্রথম অধ্যায় "জপজীর" অনুবাদ। অনুবাদ সব জায়গায় মূলানুগামী হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তবে গ্রন্থকারের ভাষা বেশ প্রাঞ্জল।—কৃত্রিমতার দ্বারা ভাবকে কোথাও আড়ষ্ট করিয়া তোলা হয় নাই।

* *
*

"পরমান্ন"

ফুল-ফোটানো আব্‌হাওয়া এই
করলে কে গো সৃষ্টি।
মধুর তোমার দৃষ্টি!
প্রণাম তোমায় করি,—
আমরা কমল, ভুঁইচাঁপা, যুঁই—
কুন্দ, নাগেশ্বরী।

মন-হরিণের মনোহরণ
রাজাও তুমি বংশী;
মানস সরের হংসী
তোমার পানে চায় গো,—
উল্লাসেরি কলধ্বনি
কণ্ঠ তাহার ছায় গো।

সত্য-যুগের আদিম!—গ্রহ-
ছত্রপতি সূর্য্য!
তোমার সোনার তূর্য্য
ব্যক্ত চরাচরে,—
রাস্প-গোপন-শক্তিতে সে
বজ্র সৃজন করে!

সত্য-মণি জাগাও তুমি,
চারু তোমার কর্ম্ম
ফুল-ফোটানো ধর্ম্ম,—
জাগরণের সঙ্গী!
বিশ্বে তুমি নিত্য কর
নূতন রঙে রঙ্গী!

তোমার প্রকাশ মহোৎসবে
আমরা মিলি হর্ষে
মিলি বরষ বর্ষে,
নাই আমাদের স্বর্ণ
আমরা আনি অন্তরেরি
প্রীতির পরম-অন্ন!

জন্মতিথির পরম প্রসাদ
দাও আমাদের ভক্তি,—
প্রাণে পরম শক্তি;
দেখাও দুর্নিরীক্ষ্য
অন্তরে যাঁর আরাম এবং
আসন অন্তরীক্ষ।*

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

* শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জন্মদিনের অর্ঘ্য।

দেশের কথা

গ্রীষ্মারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সর্ব্বত্র ভীষণ জলকষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। প্রতিবৎসরই এই সময়ে প্রায় প্রত্যেক স্থানে অল্লাধিক জল-সঙ্কট উপস্থিত হয়। গত পূজার পর হইতে প্রয়োজনানুরূপ বৃষ্টি না হওয়ায় এবার উহা সহজেই প্রচণ্ডভাব ধারণ করিয়াছে। মফঃস্বলের অনেক গ্রামে একটিমাত্র জলাশয় বহুপরিবারের পানীয় জল জোগাইয়া থাকে; সেই-সকল স্থলে সামান্য জলকষ্টও অধিবাসীবৃন্দের অসামান্য ক্লেশের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এবম্বিধ-ক্লেশ-নিবারণের পক্ষে ধন জন ও পন্থা সহরে যত সুলভ, পল্লীগ্রামে উহার দুর্লভতা ঠিক ততখানি। সুতরাং বর্ত্তমান জলকষ্টে নিরুপায় পল্লীবাসীর দুর্দ্দশার সীমা নাই। মফঃস্বলের অধিকাংশ পত্রিকা এ সম্বন্ধে সমস্বরে একই কথা বলিতেছেন। 'যশোহরে' প্রকাশ—

'এবার যশোহর-পল্লীর অবস্থা অতীব শোচনীয় হইতেছে,—যশোহরে এমন গ্রাম অল্পই আছে যেখানে জলাভাবের চীৎকার-ধ্বনি উত্থিত হয় নাই।'

'নীহারে' উহারই প্রতিধ্বনি—

'কূপ-সকল শুষ্কপ্রায়, নদী-পুষ্করিণীও ভরাট হইয়া গিয়াছে। পানীয় জলের অভাবে সাধারণকে বড়ই ক্লেশ ভোগ করিতে হইতেছে।'

বীরভূম, মালদহ, বাঁকুড়া, মৈমনসিংহ প্রভৃতি জেলারও তুল্য অবস্থা। ডায়মণ্ডহারবারের ন্যায় সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থলেও 'পানীয় জলের কষ্ট।'

নিজ জেলার অবস্থার আলোচনাপ্রসঙ্গে 'রঙ্গপুর-দর্পণ' পাবনার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—

'পাবনা জেলার পল্লীগুলিতে অত্যন্ত জলকষ্ট আরম্ভ হইয়াছে।'

পুরুলিয়া সহরের অবস্থা পল্লীগ্রামেরই অনুরূপ,—স্নান ও পান উভয়েরই নিমিত্ত দারুণ জলাভাব। 'পুরুলিয়া-দর্পণে' প্রকাশ—

'সহরে স্নানীয় জলের বিশেষ অভাব হইয়াছে। ইতিমধ্যেই অধিকাংশ গৃহস্থের কূয়া শুকাইয়া গিয়াছে। এমতাবস্থায় জলাভাবে অনেক গৃহস্থকে দারুণ কষ্ট পাইতে হইতেছে।'

একেই জলাভাবে দেশের কণ্ঠতালু বিশুষ্ক, তার উপর যে-সকল স্থলে গণ্ডুষের উপযোগী সামান্য ছিটাফোঁটা জল পাওয়ার সম্ভাবনা হইতে পারে তাহাও হয় মালিকানের অত্যাচারে, নয় অজ্ঞানী লোকের অবিবেচনামূলক কার্য্যে, অথবা মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষের উদাসীনতায় ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। 'পাবনা-বগুড়া-হিতৈষী' এবিষয়ের দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন—

"ইছামতী নদী শুষ্কপ্রায়; কোন কোন স্থানে সামান্য জল আছে, তাহাতে লোকে রাত্রিকালে মৎস্য ধরিয়া জল দূষিত করিতেছে।"

'মেদিনী-বান্ধবে' উহার অন্যতম দৃষ্টান্ত প্রকাশ—

"গোপীবল্লভপুর থানার অন্তর্গত চুপাড়া গ্রামে পানীয় জলের

একটি মাত্র বাঁধ ছিল। ঐ গ্রামের মধু মহাত মাঝিকের নিকট ঐ বাঁধটি পাট্টা করিয়া লইয়া জলের অপব্যয় করায় সাধারণের পানীয় জলের বড়ই অভাব হইয়াছে।"

ঐ পত্রিকায় আরো প্রকাশ—

গ্রীষ্মের প্রারম্ভে প্রায় প্রতি বৎসরই সর্ব্বাগ্রে সহরের মির্জ্জাবাজার পল্লীতেই পানীয় জলের অভাব বিশেষ ভাবে অনুভূত হয়। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির সুযোগ্য ভাইসচেয়ারম্যান মহোদয় পূর্ব্বে ,পূর্ব্বে এই নিমিত্ত প্রত্যেক বৎসর নদী হইতে ১০।১২ গাড়ী জল আনাইয়া পল্লী-গৃহস্থগণকে এই সময়ে সরবরাহ করিতেন। কিন্তু কি জানি কেন, এ বৎসর সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। কলেরা বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগের উৎপত্তি অনেক সময় বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবেই ঘটিয়া থাকে; সুতরাং এ সময়ে এখানকার পল্লীস্বাস্থ্য যে সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে তাহা সহজেই অনুমেয়। বিপদের উপর বিপদ. রাজা বাহাদুর দয়া-পরবশ হইয়া প্রায় ১৫ বৎসর হইল যে কূপটি এতদুদ্দেশ্যে দান করিয়াছিলেন মাসাবধি তাহা একেবারে শুষ্ক। সহরের এই দুর্দ্দিনে, দারুণ জলকষ্টের সময়ে সহৃদয় দানশীল রাজা বাহাদুর কূপটির প্রতি কি একবার কৃপাদৃষ্টি করিবেন না? শুনিতেছি মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষগণ এ বৎসর পল্লীর কূপ কয়েকটি ঝালাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং তদনুসারে কয়েকটি কূপ ঝালান হইতেছে; কিন্তু কূপ কয়েকটির কোথাও এক হাত, কোথাও দুই হাত, কোথাও বা কিছু বেশী মাটি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র। মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষগণের এইরূপ সুব্যবস্থার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। যদি জলের অভাবই দূর হইল না তাহা হইলে এ লোক-দেখান কূপ খননের ব্যবস্থা কেন?'

বস্তুতঃ একেই নানাবিধ কারণে পল্লীস্বাস্থ্য স্বভাবতঃ দূষিত, তার উপর বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব ঘটিলে পল্লীজীবন-রক্ষার কোন উপায়ই থাকে না। আজকাল কলেরা বসন্ত প্রভৃতি ব্যাধি যে পল্লীগুলিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে তাহার একতম প্রধান কারণ বিশুদ্ধ জলের অভাব। ঐ-সকল ব্যাধির সংক্রামকতা দূর করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম জলরক্ষার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে রংপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত জে-এন্-গুপ্ত মহাশয়ের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'রংপুর-দর্পণে' প্রকাশ—

রঙ্গপুরের জনপ্রিয় ডিষ্ট্রিক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ জে এন গুপ্ত, এম-এ, আই-সি-এস, মহোদয় জেলার সর্ব্বত্র কলেরার প্রকোপবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ব্যথিত হইয়াছেন। কি উপায়ে এই সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ হইতে জনসাধারণ মুক্তিলাভ করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে [মহকুমার হাকিমদিগকে সম্বোধন করিয়া] একখানি ঘোষণাপত্র প্রকাশিত করিয়াছেন। আমরা নিম্নে উহার অনুবাদ প্রকাশিত করিলাম।

২০এ এপ্রিল, ১৯১৫।

প্রিয় মহাশয়,

আপনি অবগত আছেন, অধুনা জেলার সর্ব্বত্র কলেরা সংক্রামক-ভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। আমার মনে হয়, আপনার এলেকাধীন মহকুমার অনেকস্থানে এই ব্যাধির প্রকোপ পরিলক্ষিত হইয়া থাকিবে। রোগপ্রপীড়িত অধিবাসীবর্গের জন্য সর্ব্বত্র ডাক্তার প্রেরণ করা আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। সেই জন্য আমি নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় নির্দ্দেশ করিতেছি।—

(১) কলেরা-প্রপীড়িত স্থানসমূহে আমরা বিনামূল্যে ও প্রচুর পরিমাণে কলেরা-পিল বিতরণ করিতে প্রস্তুত আছি। জেলার সিভিলসার্জ্জন মহোদয় বহুসংখ্যক কলেরাপিলের জন্য উপরে লিখিয়াছেন। এইগুলি পৌছিলেই উহার অনেকগুলি আপনাকে প্রেরণ করা হইবে। আপনি লোকাল বোর্ডের সাব-ওভারসিয়ার ও দফাদারগণের সাহায্যে এই-সকল কলেরা-পিল বিতরণ করিবেন। প্রয়োজন হইলে আপনি এই উদ্দেশ্যে একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমন ও ঔষধ বিতরণের জন্য অস্থায়ীভাবে কতিপয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে পারেন।

(২) জনসাধারণ যাহাতে উত্তম পানীয় জল প্রাপ্ত হয় আমাদিগকে তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু বিগত ও বর্ত্তমান বর্ষে সমগ্র রঙ্গপুর জেলায় যেরূপ অনাবৃষ্টি পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহাতে উপযুক্ত পানীয় জলের অভাবে লোকের নিশ্চিতভাবে বিশেষরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় আমার উপদেশ এই যে, যে স্থানে প্রবল জলকষ্ট অনুভূত হইবে, সেই-সকল স্থানে কাঁচা কূপ খনন করিতে হইবে। এইরূপ একটি কাঁচা কূপ খনন করিতে ২০ টাকার অধিক প্রয়োজন হইবে না। আমি আপনার এলেকাধীন মহকুমার জন্য এই উদ্দেশ্যে এক সহস্র মুদ্রা অনুমোদন করিলাম। এই অর্থের সাহায্যে আপনি অন্ততঃ ৫০।৬০টি কূপ খনন করিতে পারিবেন। যদি ইহাতেও লোকের জলকষ্ট বিদূরিত না হয়, আমি আপনার নির্দ্দেশ অনুসারে আরও অধিক অর্থ প্রদান করিব।

(৩) যাহাতে ব্যাধি সংক্রামক আকার ধারণ করিতে না পারে আমাদিগকে তৎপ্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আপনি অবগত আছেন যে পানীয় জল দূষিত হইলেই এই ব্যাধি প্রবলভাবে সংক্রামিত হইয়া থাকে। সুতরাং আপনি আপনার এলেকাধীন স্থানসমূহে এইরূপ কঠোর আদেশ প্রচারিত করিবেন যে, কোন প্রকার মৃতদেহ, বিষ্ঠা, মল প্রভৃতি সংপৃক্ত বস্ত্র ও শয্যাস্তরণাদি কেহ নদীগর্ভে, পুষ্করিণীতে, কূপে ও অন্যান্য জলাশয়সমূহে নিক্ষেপ করিতে না পারে। চৌকিদার-দিগের প্রত্যেক প্যারেডের সময় সাব-ইন্স্পেক্টর এই-সকল আদেশের মর্ম্ম তাহাদিগকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিবেন। চৌকিদারগণই অবশেষে গ্রামবাসীগণকে উল্লিখিত আদেশসমূহ পালনের জন্য যথাবিধি উপদেশ প্রদান করিবে। লোকে যাহাতে পানীয় জল সিদ্ধ করিয়া পান করে তদ্বিষয়েও উপদেশ প্রদান করিতে হইবে। আমি অবগত আছি, এই জেলায় এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী ফকির আছে। তাহারা এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে কলেরা চালান দিবার ভয় দেখাইয়া মূর্খ সরল গ্রাম্যলোক-দিগের নিকট হইতে অর্থ আদায় করিয়া থাকে। যে-সকল গ্রামের অধিবাসীগণ ফকিরের আদেশ প্রতিপালন করিতে অসম্মত হয়, সেই-সকল গ্রামে দুর্বৃত্ত ফকির বিদ্বেষবশতঃ কলেরা-রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মল কূপে নিক্ষেপপূর্ব্বক কলেরা সংক্রামিত করিয়া থাকে। আমি পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সাহায্যে সাবইনস্পেক্টরগণের প্রতি এইরূপ আদেশ প্রদান করিতেছি যে, এইরূপ দুষ্কার্য্যের আভাস প্রাপ্ত হইলেই দুষ্কৃতি-কারীকে ১১০ ধারায় আবদ্ধ করিতে হইবে।

আপনাকে ইহাও জানাইতেছি, অনাবৃষ্টি-নিবন্ধন বর্ত্তমান বর্ষে জেলার সর্ব্বত্র লোকের বিশেষ ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে। বিগত বর্ষে জেলার সর্ব্বত্রই শস্যহানি হইয়াছে, তদুপলক্ষে লোকের দুরদৃষ্ট-বশতঃ অধুনা জনসাধারণের মধ্যে কলেরা সংক্রামক ভাব ধারণ করিয়াছে। আপনাকে বোধ হয় বলিতে হইবে না যে, বর্ত্তমান অবস্থায় আপনি প্রবল সহানুভূতি ও উৎসাহে প্রণোদিত হইয়া দুঃস্থ প্রজামণ্ডলীর অবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শন ও তাহাদিগের দুঃখ মোচনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

আপনার বিশ্বস্ত

(স্বাক্ষর)—জে, এন, গুপ্ত।

পল্লীবাসীর প্রতি জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের এরূপ কৃপাদৃষ্টি

সর্ব্বথা প্রার্থনীয়। ফলতঃ, এইভাবে পল্লীসংস্কারের কার্য্য আরব্ধ হইলে উহার দৃষ্টান্ত স্থানীয় ভূম্যধিকারীকেও সহজে অনুপ্রাণিত করিতে সমর্থ হইবে। বলা বাহুল্য, ভূম্যধিকারীগণের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের উপযুক্ত যত্নের অভাব বর্ত্তমান পল্লীরও অবস্থান্তর ঘটাইবার একতম প্রধান কারণ। আমরা এ বিষয়ে গতবৎসরের 'প্রবাসী'তে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছি। সংপ্রতি 'সুরমা' এ সম্পর্কে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও উল্লেখযোগ্য। ঐ পত্রিকায় প্রকাশ—

"বসন্ত ও শরৎকালে পল্লীর সংস্কারকার্য্য চলিত। দুর্গোৎসব এবং দোলপার্ব্বণের সূচনাতে, প্রত্যেক বৎসর, পল্লীগ্রামগুলি পরিষ্কৃত হইত। তখন পুকুরগুলিতে পানা থাকিত না। ঘরের আশপাশে ঝোড়জঙ্গল থাকিত না। পথে ঘাটে আবর্জ্জনারাশি দেখা দিত না। এইরূপ পল্লীসংস্কারে বাধ্যবাধকতার কোনই সম্পর্ক ছিল না। কেহ কাহাকে এজন্য পীড়াপীড়ি করিত না—কেহ কাহাকে অনুরোধ জানাইত না। পল্লীর লোকে, সামাজিক ব্যবস্থায়, আপনা হইতেই যথাকালে এইসকল কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিত। তখন সামাজিক কর্ম্মশৃঙ্খলাই প্রত্যেককে উপযুক্তকালে, কর্ত্তব্যসম্পাদনে উৎসাহিত করিত।

গ্রাম্যপথঘাটের পরিচ্ছন্নতার তখন আরও একটা বিশিষ্টকারণ পল্লীগ্রামে বিদ্যমান ছিল। তখন অবস্থাপন্ন, এমন কি, মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকগণের ঘরে ঘরে পাল্কী নৌকা ঘোড়া চৌদল থাকিত। নৌকা রাখিতে গেলেই নৌকাপথ রক্ষা করিতে হয়, পাল্কী-ঘোড়ার ব্যবহার করিতে গেলেই তদুপযোগী পথঘাট চাই। এই কারণে, পল্লীর প্রত্যেক ভূম্যধিকারী তখন নিজের গরজে নৌকার পথ, ঘোড়াপাল্কী চালাইবার রাস্তার সংস্কার সংরক্ষণ করিতেন। অধুনা পল্লীগ্রামের ভূম্যধিকারীগণের ঘরে নৌকাপাল্কীর অস্তিত্ব নাই, অশ্বরক্ষাও প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। সেভাবে পথঘাটরক্ষার ব্যক্তিগত প্রয়োজন ভূম্যধিকারীগণের ফুরাইয়া গিয়াছে। পল্লীপথে অধুনা মানুষ গলাইতে পারিলেই হইল! এই কারণে, অনেক বড় বড় পুরাতন পল্লীগ্রামের খাল গোবাট পথ ঘাট অন্তর্হিত হইয়াছে। অনেকেই স্ব স্ব বাসসংলগ্ন গ্রাম্যপথগুলি আত্মসাৎ করিয়া আয়বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন।"

'সুরমা'র এ বাক্য অতিরঞ্জিত নহে। আজকালকার ভূম্যধিকারীর মধ্যে অনেকেই শুধু ভূমির অধিকারী বলিলেই চলে; উহার সংস্কার ও সংরক্ষণ এবং তৎসঙ্গে প্রজাবৃন্দের হিতচেষ্টায় অধিকাংশেরই আগ্রহের অভাব। নতুবা, জমিদারবর্গের সামান্য ইচ্ছায় কত দিকে দেশের কত কাজ যে হইতে পারে তাহার ইয়ত্তা নাই। মফঃস্বলের পত্রিকাস্তম্ভে সংপ্রতি বিভিন্ন বিভিন্ন ক্ষেত্রে এইরূপ কার্য্যের যে পরিচয় আমরা পাইয়াছি তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। 'রঙ্গপুর দিকপ্রকাশে' প্রকাশ—

'তুষভাণ্ডার ঘনশ্যাম গ্যাগরা প্রভৃতি স্থানে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। * * তুষভাণ্ডারের বড় তরফের ম্যানেজার চুনী বাবু রোগ-প্রশমনের নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্ন চেষ্টা করিতেছেন। বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রজাদিগকে জানান হইতেছে সকলকেই বিনাব্যয়ে পারমাংগনেট অব পটাস, ফেনাইল, কর্পূর, গন্ধক, ধুনা ইত্যাদি এবং অবস্থানুসারে রোগীদিগকে পথ্যাদিও প্রদান করা হইবে।'

'যশোহর' বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে স্থানীয় জমিদারবর্গের হিতানুষ্ঠানের পরিচয় দিয়া বলিতেছেন—

'যশোহর জেলার জমিদারকুল মামলা মোকদ্দমা কমাইবার জন্য বিশেষ ভাবে যত্নবান হইয়াছেন। নায়েব গোমস্তার উপর কড়া হুকুম জারী হইয়াছে,—যে তহশীলদারের এলাকার প্রজার নামে অধিক নালিশ করিতে হইবে সে তহশীলদারকে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য বলিয়া মনে করা হইবে, কোন কোন জমিদারের ম্যানেজার এরূপ হুকুমও দিয়াছেন। বাস্তবিক জমিদারবর্গ যদি মোকদ্দমা কমাইতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে এ বিষয়ে বহু ব্যয় লাঘব হইতে পারে।

'চুচুঁড়া-বার্ত্তাবহে' এবম্বিধ কার্য্যের অন্যতম দৃষ্টান্ত প্রকাশিত। ঐ পত্রিকা-পাঠে অবগত হওয়া যায়—

'কুণ্ডলার জমিদার বাবু রজনীভূষণ মুখোপাধ্যায় চৌদ্দ হাজার টাকা ব্যয়ে রামপুরহাটের দাতব্য-চিকিৎসালয়-বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।'

'হিন্দুরঞ্জিকা' উপরিউক্ত কার্য্যের অনুরূপ অপর একটি দান-কার্য্যের সন্ধান দিতেছেন—

'বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত অগ্রদ্বীপ গ্রামের অধিবাসী বাবু রমাপ্রসাদ মল্লিক তাঁহার স্বগ্রামের দাতব্য চিকিৎসালয়ের গৃহ-নির্ম্মাণ-কল্পে ৪০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।'

'পাবনা-বগুড়া-হিতৈষী'তে পাবনার এক জমিদারের আর-একটি সদনুষ্ঠানের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। উহাতে উল্লেখ—

এ বৎসর যেরূপ দস্যুভীতি উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে * * * জেলা পাবনা ষ্টেসন চাটমহরের অধীন হাণ্ডিয়াল গ্রামনিবাসী দয়াশীল ও অদ্বৈত-বংশোদ্ভব জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীধর গোস্বামী মহাশয় নিজে উদ্যোগ করিয়া তাঁহার এলাকাস্থ বাজারটি রক্ষা করিবার জন্য একটি সদুপায় করিয়াছেন। বাজারে ৩০।৩৫ ঘর মহাজন ও ব্যবসায়ী প্রজা বাস করে; তাহার মধ্যে বৃদ্ধ, বালক ও বিধবাও আছে। তিনি তাহাদিগকে বাদ দিয়া ২৪ জন লোক নির্ব্বাচন করতঃ পর্য্যায়ক্রমে প্রতিদিন রাত্রি ১১ টার পর ৩।৪ টা পর্য্যন্ত ৮ জন করিয়া পাহারা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং ৪ জন করিয়া বাজারের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যাতায়াত করিবে, উভয় দলের সহিত মাঝামাঝি দেখা হইবে। এইরূপ বন্দোবস্তের ফলে ইতিমধ্যেই একটু সুফল ফলিয়াছে।

কাশীমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সৎকর্ম্মমূলক গৌরবগাথা দেশে দেশে কীর্ত্তিত। সংপ্রতি তিনি যে কার্য্য করিয়াছেন তাহাও তাঁহারই উপযুক্ত। আমরা 'বীরভূম-বার্ত্তা'র ভাষায় নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

'কাশিমবাজারের বিদ্যোৎসাহী মাননীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়ের চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে বহরমপুরে একটি শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হইয়াছেন ক্যাপ্টেন পেটাভেল। আপাততঃ ১৫ জন ছাত্রকে এখানে তড়িৎবিদ্যা, যন্ত্রবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা ও সূত্রধরের কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইবে। এতদ্ব্যতীত কয়েক জনকে চর্ম্মরঞ্জন, বয়নবিদ্যা এবং বৈজ্ঞানিক কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইবে। ছাত্রগণ দ্বিবাভাগে হাতে হাতিয়ারে শিক্ষা করিবে ও রাত্রে কয়েক ঘণ্টা পুস্তক পাঠ করিবে। এক বৎসর পরে ছাত্রগণ স্বাধীনভাবে কাজে প্রবৃত্ত হইবে। মহারাজ কয়েক জন ছাত্রকে বিনাব্যয়ে আহার ও

শিক্ষার অন্যান্য উপকরণ যোগাইবেন, বাকী ছাত্রগণ মাসিক আট টাকার জোগাড় করিতে পারিলেই এখানে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারিবেন। এই বিদ্যালয় ও ছাত্রদের বাস-গৃহের জন্য মহারাজ একটি বৃহৎ বাড়ী দান করিয়াছেন।'

ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভূম্যধিকারীগণের চেষ্টায় এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে দেশহিতমূলক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে থাকিলে দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তন সুদূরপরাহত বলিয়া মনে হয় না। বাস্তবিক, আজকাল দেশের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে এরূপ হিতপ্রচেষ্টার প্রয়োজনও যথেষ্ট আছে। কি সহর, কি পল্লী, সর্ব্বস্থানেই ভীষণ হাহাকার! পাবনার 'স্বরাজ' দুচারিটি দৃষ্টান্তে দেশব্যাপী এহেন হাহাকারের যে চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে স্বভাবতঃই দেশহিতকল্পে নিজেদের নিশ্চেষ্ট ও নিরুদ্যম ভাবের প্রতি আপনা হইতে ধিক্কার আসে।

অন্নকষ্টের তীব্রতা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। কাঁচি ওজনের (৬০ তোলা) টাকায় ৮ সের মোটা চাউল বিক্রয় হইতেছে। পনর আনা লোকের ঘরে ভাত নাই, কোন কোন লোক ২।১ দিন ২।১ মুঠা ভাত খাইয়া প্রাণ ধারণ করিতেছে। এইরূপ অনাহারে দুশ্চিন্তায় কত লোক যে লোকচক্ষুর অন্তরালে নীরবে জীবন বিসর্জ্জন করিতেছে কে তাহার সন্ধান রাখে? কঠোর দারিদ্র্যজনিত এই অনাহার, অর্দ্ধাহার, কদর্য্য আহারই কি ব্যাধি পীড়া ও মৃত্যুর প্রধান কারণ নহে?

মজুরের দল কার্য্যাভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অনেকে পরিবার প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া স্থানান্তর চলিয়া যাইতেছে, পেটের জ্বালায় কি করিলে কি হইবে কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছে না।

ইহার উপর জলকষ্ট—সে কথা অবর্ণনীয়। মফঃস্বলের যে-কোন গ্রামে গেলেই ইহার ভীষণতা বুঝা যাইবে। চিরপিপাসাতুর পল্লীবাসীর জলকষ্ট কি নিবারণ হইবে না? গবর্ণমেণ্ট জলাশয় খননের জন্য ডিঃ বোর্ডের হাতে অনেক টাকা দিয়াছেন; কিন্তু কৈ এ পর্য্যন্ত জেলার মধ্যে একটি জলাশয়ও ত খনিত হইল না। শুনিয়াছি পুষ্করিণীর পরিবর্ত্তে বোর্ড হইতে গ্রামবিশেষে ইন্দারা দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। কিন্তু এই ইন্দারার জন্য গ্রামবাসীদিগকে সিকি ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে; সিকি ব্যয় দিতে হইলে প্রত্যেক ইন্দারার জন্য ১৫০।২০০ টাকার প্রয়োজন। পেটের জ্বালায় যাহারা সতত অস্থির, তাহারা যে এই টাকা দিতে পারিবে ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। এমতাবস্থায় গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য যে কতদূর সফল হইবে তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। কঠোর দারিদ্র্যের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ পল্লীবাসী জীবনরক্ষার কার্য্যোপযোগী সমুদয় শক্তি হারাইয়াছে—এখন তাহাদের রক্ষার ভার তাহাদের স্কন্ধে না রাখিয়া গবর্ণমেণ্ট ও দেশের শিক্ষিত ও জমিদার সম্প্রদায় তাঁহাদের সমবেত চেষ্টা ও শক্তি অবিলম্বে ইহাতে নিয়োগ করুন।

খাস সহরের অবস্থাও এবার শোচনীয়। মফঃস্বলের বিচ্ছিন্ন অর্থশক্তি এখানে কেন্দ্রীভূত—কাজেই তুলনায় কিছু উন্নত হওয়াই স্বাভাবিক। জলের অভাব এখানেও এবার বিলক্ষণ অনুভূত হইতেছে। দেশব্যাপী অর্থাভাবের ধাক্কাটা সহরকেও এবার বিষম আলোড়িত করিয়াছে। মহাজন তহবিল গুটাইয়াছেন, ব্যাঙ্কগুলিও দাদন বন্ধ করিয়াছেন, অল্প বেতনের কর্ম্মচারী, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকের অবস্থাও কঠিন। ব্যবসায় বাণিজ্য একরূপ নাই বলিলেই চলে। মামলা মোকদ্দমার সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় উকীল ও মোক্তার সম্প্রদায় একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। ডাক্তারের কথা স্বতন্ত্র, রোগ আছে কিন্তু ডাক্তারের খোরাক জোগাইতে পারে এরূপ অবস্থাপন্ন রোগীর সংখ্যা যে দিন দিনই কমিয়া আসিতেছে। আমরা আছি ভাল!

রোগ শুধু মানুষের নয়,—গোপীড়াও দেশে সংক্রামক হইয়া পড়িয়াছে। 'নীহারে' প্রকাশ

বহুগ্রামে গরুর 'খুর।' নামক একপ্রকার সংক্রামক পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

ঐ পত্রিকার পরবর্ত্তী সংখ্যায় পুনরায় উল্লিখিত দৃষ্ট হয়—

এ অঞ্চলে গো-মহিষাদির মধ্যে বসন্তের প্রাদুর্ভাব হইয়া অনেক গো মহিষ নিপাত হইতে শুনা যাইতেছে। এই কৃষিজীবন দেশের পক্ষে ইহা বিষম দুঃসংবাদ। সত্বর ইহার যথোচিত প্রতিকারের ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

শুধু যে রোগেই এই-সকল কৃষি-সহায় প্রাণীর মৃত্যু ঘটিতেছে, তাহা নহে; স্থানে স্থানে পৈশাচিক উপায়ে গো-হত্যাও সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'মেদিনীবান্ধব' ও 'বরিশাল-হিতৈষী' হইতে আমরা এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিতেছি। 'মেদিনীবান্ধব' বলেন—

আজকাল গৃহস্থদের গোপালন করা অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। পশু-খাদ্যের দুর্ম্মূল্যতা, খোঁয়াড়ের অত্যাচার ও গো-চারণ ভূমির অভাবপ্রযুক্ত কেহ গোপালন করিতে সক্ষম হইবে না দেখিতেছি। সম্প্রতি সহরে গরুকে বিষ খাওয়ানার উপদ্রব খুব বাড়িয়াছে। শুনিলাম সহরের সমুদয় খোঁয়াড় একব্যক্তি জমা করিয়া লইয়াছে। কাজেই টাউনের যেখানেই গো-মহিষাদি মরুক না কেন, একজনের অর্থাগম হইবেই হইবে। সুতরাং এই নৃশংস বিষ-প্রয়োগ-ব্যাপারের সহিত ভাগাড়-মালিকের যে পরোক্ষ গূঢ় সম্বন্ধ আছে তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহার প্রতিকার ও অনুসন্ধান হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। যতদিন খোঁয়াড়ের ও ভাগাড়ের আয় রাজস্বের পন্থাস্বরূপে গণ্য থাকিবে ততদিন ইহার প্রকৃত প্রতিকার হইবে না; এবং গৃহস্থগণকে ইহার বিষময় ফলভোগ করিতেই হইবে।

'বরিশাল-হিতৈষী'তে উহারই পুনরাবৃত্তিমূলক আর-একটি নৃশংস ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায়। উহাতে প্রকাশিত হইয়াছে—

"অদ্য সংবাদ পাইলাম অত্র জলাবাড়ী গ্রামের অদূরবর্ত্তী মৈশানি গ্রামে গত মঙ্গলবার রাত্রে দুই মুসলমানের ৬টি আবাল গরু ও এক ভদ্র লোকের ১টি ৬০।৭০ টাকা মূল্যের গাই গরু গোয়াল ঘরে বান্ধা ছিল। প্রাতে উঠিয়া গরুর মালিকগণ 'আধালে' গরু দেখিতে না পাইয়া নিশ্চয়ই চোরে নিয়াছে এই সন্দেহে অনুসন্ধানের পরামর্শ করিতেছে, ইতিমধ্যে লোকমুখে সকলেই সংবাদ পাইল যে, খালপাড়ে ৭টি গরু ছোলা অবস্থায় পড়িয়া আছে। শুনিবা মাত্র ত্রস্ততায় গ্রামবাসী অনেকে দৌড়িয়া গিয়া দেখিতে পাইল, প্রত্যেক গরুর চারিপা দড়ি দ্বারা বান্ধা আছে, প্রত্যেকেরই মস্তক অকর্ত্তিত। যেন তখন পর্য্যন্তও তাহারা ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া আছে। নিশ্চয়ই জীবিতাবস্থায় ছালগুলি খোলা হইয়াছে। কি ভীষণ ব্যাপার! শুনিতেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

অবশ্য এইরূপ লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের মূলে যাহাই থাকুক না, উহা যে গোজাতি ধ্বংসের সহায় হইয়াছে, ইহাই আমাদের বিষম ক্ষতি। কৃষিপ্রধান ভারতে একদিকে যেমন গোবংশবৃদ্ধির উপায় করার প্রয়োজন, অন্যদিকে

কৃষির ও রোগাতুর জনসমূহের স্বাস্থ্যের জন্য বর্ত্তমান অবস্থায় কৃষিকার্য্যের ও গো-দুগ্ধ-জাত জিনিষের সুলভতা সম্পাদনের নিমিত্ত গোজাতির কার্য্যকরী শক্তিও অক্ষুণ্ণ রাখার আবশ্যক। গো-সেবার ইহাই মূল সূত্র। দেশের সর্ব্ববিধ সৎকার্য্যের অগ্রণী মনুষ্যগণের সমবেত যত্নে গোরক্ষার উপায় হইতে পারে; এবং সম্প্রতি এক্ষেত্রে সাধু প্রচেষ্টার দৃষ্টান্ত বিরল হইলেও দেশভক্তবৃন্দের অনুষ্ঠিত অপরাপর সৎকর্ম্মের সহিত ইহাও তুল্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এই কার্য্যের প্রতি যথোচিত শক্তি প্রয়োগ করার আবশ্যক।

সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানমাত্রই প্রশংসনীয়। একদিকে যেমন দেশে সৎকর্ম্মের ভবিষ্যৎক্ষেত্র প্রস্তুত করার প্রয়োজন, অন্যদিকে যে-সকল ক্ষেত্রে উহার আদর্শ প্রত্যক্ষ হইয়া ধরা দিয়াছে সে-সকল ক্ষেত্রে উহাকে শ্রদ্ধার সহিত অভিনন্দিত করাও কর্ত্তব্য। আনন্দের বিষয়, আমরা প্রায় প্রত্যেক মাসেই এরূপ শ্রদ্ধাভিনন্দনের কিছু-না-কিছু সামগ্রী পাইতেছি। ঐ সম্বন্ধে এবার আমরা যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি দেব-পদ-লুণ্ঠিত পুষ্পাঞ্জলীর ন্যায় তাহা পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি।

'বদান্যতা—বাবু নফরচন্দ্র কল্যে ডেহুয়াপাড়া গ্রামে একটি দাতব্য ঔষধালয় স্থাপনের জন্য গবর্ণমেণ্টের হস্তে ৩২ হাজার টাকা অর্পণ করিয়াছেন।'—(বাঁকুড়াদর্পণ)

ছাত্রের সদনুষ্ঠান—পিয়ারপুর পোষ্টাফিসের অন্তর্গত অষ্টধার ইসলামিয়া মধ্য ইংরেজী স্কুলের ছাত্রবৃন্দ গত ১০ই চৈত্র অষ্টমীর দিন মেলার সন্নিকটে একটি জলছত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।'—(ঢাকাপ্রকাশ।)

'বালিকাদের পরদুঃখকাতরতা—বাজাপ্তী মডেল বালিকা বিদ্যালয় ত্রিপুরা চাঁদপুরের অন্তর্গত একটি সুপ্রসিদ্ধ স্কুল। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মের ছুটির পূর্ব্বে বিশেষ জাঁকজমকের সহিত এই স্কুলের পুরস্কার বিতরণ সম্পন্ন হইয়া থাকে। চাঁদপুরে অত্যন্ত অন্নকষ্ট হওয়াতে এই স্কুলের বালিকাগণ তাঁহাদের শিক্ষয়িত্রীর দ্বারা স্কুলের সেক্রেটারীকে জানাইয়াছেন যে, বর্ত্তমানে তাঁহাদের পুরস্কার বিতরণ স্থগিত রাখিয়া ঐ অর্থ দ্বারা চাঁদপুরের অন্নক্লিষ্ট গরীব কাঙ্গালগণকে সাহায্য করা হউক, ইহা তাঁহাদের প্রার্থনা। তাঁহারা বলিয়াছেন যে যদি এই অর্থ দ্বারা একটি গরীবেরও একমুষ্টি অন্নের সংস্থান হইতে পারে তবে তাঁহারা আপনাদিগকে সহস্রগুণ অধিক পুরস্কৃত মনে করিবেন। সেক্রেটারী মহাশয় বালিকাদের এই প্রস্তাবে যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া তাঁহাদিগের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন।' (ঢাকা-গেজেট)

'আটলাখ টাকা দান—মিঃ মালাদিসত্রলিঙ্গম্ নায়াকেরের জন্মস্থান মান্দ্রাজের অন্তর্গত কোকনদের নিকটবর্ত্তী করিঙ্গা বন্দরে। তিনি প্রথমে জাহাজের লস্কর ছিলেন। রেঙ্গুনে যাইয়া বিপুল সম্পত্তি উপার্জ্জন করেন। মৃত্যুকালে তিনি পাঁচ কোটী টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। কোকনদে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ব্যায়ামাগার ও একটি দেবমন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য আট লাখ টাকা দিয়া গিয়াছেন। ঐ বিদ্যালয়ে সকল জাতির ছেলেমেয়ে পড়িতে পাইবে। প্রতি বৎসর একটি মান্দ্রাজী হিন্দু যুবককে বিদেশে শিক্ষার্থে প্রেরণের বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন—আইন এবং ডাক্তারী ছাড়া অন্য যে-কোনো বিষয় তাঁহারা পড়িতে পারিবেন।'—(কাশীপুরনিবাসী)।

'যশোহর কেশবপুরের অধীন পাঁজিয়া গ্রামে অনেক দিন হইতে "পাঁজিয়া দরিদ্র-ভাণ্ডার" নামীয় একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত আছে। দরিদ্র বালকদিগের শিক্ষার সাহায্য, অন্নহীনকে অন্নদান, রোগীর সেবা-শুশ্রূষা প্রভৃতি কার্য্য এই সমিতির উদ্দেশ্য। কিছুদিন হইল পাঁজিয়ায় "অনাথ-কুটীর" নামে একটি সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই সমিতির সভ্যগণেরও একই উদ্দেশ্য হওয়ায় উভয় সমিতিরই অসুবিধা হইতেছিল। আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে গত ১লা বৈশাখ হইতে উভয় সমিতি সম্মিলিত হইয়াছে। এখন এই সম্মিলিত সমিতির নাম হইয়াছে, "পাঁজিয়া দরিদ্র-ভাণ্ডার ও অনাথ-আশ্রম।" সম্মিলনের যে মহৎ ফল তাহা লাভ হইবে, দেশের দশের বিশেষতঃ দরিদ্র জনগণের মহদুপকার হইবে, আমরা এইরূপ আশা করিতেছি।'—(যশোহর।)

'শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় রাজসাহী স্কুলের একজন শিক্ষক। ইনি "সর্ব্বমাত্মবশং সুখং" এই নীতি অবলম্বনে নিজের কাপড় অনেক সময় নিজে বুনিয়া পরেন। দড়ি আবশ্যক হইলে নিজেই পাকাইয়া লন। নিজে নিজে দড়ি পাকাইবার অতি সোজা যন্ত্র করিয়াছেন। ইনি এইরূপে সংসারযাত্রা চালাইয়া যাহা সঞ্চয় করেন তাহা সৎকার্য্যে ব্যয় করেন। 'পদ্মানদীতে আখড়ার ঘাটে ইনি একটি সুন্দর সিঁড়ি বাঁধিয়া দিয়াছেন। মন থাকিলে সৎকার্য্য এইরূপেই অনুষ্ঠিত হয়। রাজসাহী-বাসী রজনী বাবুকে তাঁহার এই নিঃস্বার্থ পরোপকারের জন্য শত শত ধন্যবাদ দিতেছেন। তাঁহার জীবনে বিলাস নাই।'—(হিন্দুরঞ্জিকা)

উপরি-উক্ত সৎকার্য্যসমূহের পরিচয়ের সঙ্গে একটি শুভ সংবাদও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। 'সম্মিলনী'তে প্রকাশ—

'বরোদার মহারাজার আদেশে পণ-প্রথা নিবারণের জন্য শীঘ্রই তাঁহার রাজ্যে এক আইন প্রণয়ন করা হইবে।'

বাংলাদেশে আশু প্রয়োজনীয় এমন একটা 'খোস খবর' কবে শুনিতে পাইব?

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশ গুপ্ত।

হারামণি

[এই বিভাগে আমরা অজ্ঞাত অখ্যাত প্রাচীন কবির বা নিরক্ষর স্বল্পাক্ষর গ্রাম্য কবির উৎকৃষ্ট কবিতা ও গান ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিব। প্রবাসীর পাঠকপাঠিকা এই কার্য্যে আমাদের সহায় হইবেন আশা করি। অনেক গ্রামেই এমন নিরক্ষর বা স্বল্পাক্ষর কবি মাঝে মাঝে দেখা যায় যাঁহারা লেখাপড়া অধিক না জানা সত্ত্বেও স্বভাবতঃ উৎকৃষ্ট ভাবের কবিত্বরসমধুর রচনা করিয়া থাকেন; কবিওয়ালা, ভর্জ্জাওয়ালা জারিওয়ালা, বাউল, দরবেশ, ফকির প্রভৃতি অনেকে এই দলের। প্রবাসীর পাঠক-পাঠিকারা ইঁহাদের যথার্থ কবিত্বপূর্ণ বা রসভাবপূর্ণ রচনা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলে আমরা সাদরে প্রকাশ করিব।]

রসের তিমির।

আমার ডুবল নয়ন রসের তিমিরে;
কমল যে তার গুটালো দল আঁধারের তীরে।
গভীর কালোয় যমুনাতে চলছে লহরী,
(গভীর কালোয় যমুনাতে রসের লহরী),

ও তার — জলে ভাসে কানে আসে রঙের বাঁশরী ;
(ও তার জলে ভাসে কানে আসে রঙ্গিয়ের বাঁশরী) ;
আমি বাইরে ছুটি বাউল হয়ে সকল পাসরি',
(আমি বাইরে ছুটি ঘর ছাড়িয়ে সকল পাসরি')
(আমি বাইরে ছুটি সব ছাড়িয়ে সকল পাসরি')
শুধু কেঁদে মরি ভাসাই কুন্ত রসের নীরে।
চোখ ডুবেছে রসের তিমিরে ॥

গোঁসাইদাসের চরণ ঘিরে ফুটেছে কমল,
ও তার কাঁপছে কমল টলটলাটল রাতের শিশির জল গো।
(ও সে দুলছে কমল টলটলাটল রাতের শিশির-জল গো),
(তার দুলছে যে দল টলটলাটল রাতের শিশির-জল গো)।
তারা টিকবে কিনা পড়বে টলে তলের অগাধ নীরে ॥

[এই গানটি কেন্দুবিল্বে জয়দেবের মেলায় মেদিনীপুরের বাউলের কাছে শোনা। নরহরিদাস ওরফে গোঁসাইদাস বাউলের শিষ্য পদ্মলোচনের পদ। অনুরাগ-তত্ত্ব। প্রায় ১৭৫ বৎসর পূর্ব্বেকার।]

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন।

গতবারে যে গানটি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা অসম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার সম্পূর্ণ পাঠ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বাউলের গান।

মিশ্র—একতালা।

আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দিশে দেশ বিদেশে
বেড়াই ঘুরে। ১।
লাগি সেই হৃদয়শশী, সদা প্রাণ হয় উদাসী,
পেলে মন হত খুসি,
দিবানিশি দেখিতাম নয়ন ভরে'। ২।
আমি প্রেমানলে মর্‌ছি জ্বলে' নিভাই কেমন করে'
(মরি হায় হায় রে)
ও তার বিচ্ছেদে প্রাণ কেমন করে
দেখনা তোরা হৃদয় চিরে'। ৩।
দিব তার তুলনা কি, যার প্রেমে জগৎ সুখী,
হেরিলে জুড়ায় আঁখি
সামান্যে কি দেখিতে পারে তারে। ৪।
তারে যে দেখেছে সেই মজেছে ছাই দিয়ে সংসারে
(মরি হায় হায় রে)
ও সে না জানি কি কুহক জানে,
অলক্ষ্যে মন চুরি করে। ৫।
কুলমান সব গেল রে, তবু না পেলাম তারে,
প্রেমের লেশ নাই অন্তরে,
তাইতে মোরে দেয় না দেখা সে রে। ৬।
ও তার বসত কোথায়, না জেনে তায়,
গগন ভেবে মরে (মরি হায় হায় রে)
ও সে মানুষের উদ্দিশ যদি জানিস্
কৃপা করে (আমার সুহৃদ হয়ে)
(ব্যথার ব্যথিত হয়ে) বলে দে রে। ৭।

৪র্থ ও ৬ষ্ঠ কলির সুর ২য়ের অনুরূপ এবং ৫ম ও ৭ম কলির সুর ৩য়ের অনুরূপ।

চিত্র-পরিচয়

গত বৈশাখ মাসের প্রচ্ছদপটের উপরকার ছবিটির বিষয় "পুরাতন ও নূতন"। জগতে চিরদিন অনুক্ষণ পুরাতন ও নূতনের এই আবর্ত্তন-লীলা চলিয়াছে; যাহা পুরাতন তাহাই আবার নূতন হইয়া নবজীবনের নূতন উৎসাহে পরিপূর্ণ আনন্দে আকার লাভ করে। ঠাকুরদাদা হইতে নাতি এবং বনস্পতি হইতে কোঁড় উদ্ভূত হইয়া জীবনের শৃঙ্খলা নিত্য নিয়ত অখণ্ড ও অক্ষুণ্ণ রাখিয়া থাকে।

গত বৈশাখমাসের মুখপাত "পদ্মপত্রে অশ্রুবিন্দু" নামক ছবির দ্যোতিত বিষয়ের ভাব এই যে—পদ্মপত্রে জল যেমন ক্ষণস্থায়ী, মানুষের দুঃখও তেমনি ক্ষণস্থায়ী; পদ্মপত্রে জল যেমন লাগে না, দুঃখও তেমনি মানুষের অন্তরকে কলুষিত করিতে পারে না। এই ছবিখানি একটি সুন্দর গীতি-কবিতার ন্যায় কোমল সুন্দরভাবে অনুপ্রাণিত।

"প্রেম ও কৃচ্ছ্র সাধন" নামক ছবিখানির ভাব এই যে, যে মূঢ়, সেই আপনাকে প্রকৃতির লীলা-বৈচিত্র্য হইতে বিযুক্ত করিয়া অন্ধকার গুহায় একান্তে কৃচ্ছ্র সাধনের দ্বারা স্বর্গের আলো ধরিতে চায়; সে চায় আলো, থাকে অন্ধকারে; চায় আনন্দ, করে কৃচ্ছ্র; সেই জন্য বাহিরের আলো ধরিতে গিয়া সে দেখিতেই পায় না যে তাহার পায়ের তলায় কি গভীর অন্ধকার অতল গর্ত্ত মুখ হাঁ করিয়া রহিয়াছে। আর যে প্রেমিক, যে রসিক, সে প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্য সম্ভোগ করিয়া অন্তরে স্বর্গের আলোক ও আনন্দ লাভ করে; সে মুখ ফিরাইয়া থাকে অনন্ত-বিস্তারী বিচিত্র শোভন বিশ্বের দিকে, পিঠ ফিরাইয়া থাকে অন্ধকার গোপন গুহার অন্ধকারে কৃচ্ছ্র সাধনের দিকে।

এবারকার ছবিগুলির বিষয় সুস্পষ্ট।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৫শ ভাগ
১ম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩২২

৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

রাষ্ট্রীয় কার্য্যে শক্তিহীনতার অসুবিধা।

আমরা গত মাসে দেখাইয়াছি পৃথিবীর কত দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বালকবালিকারা বিনা-ব্যয়ে পাইয়া থাকে। আমরা আমাদের আয়ের যে অংশ করস্বরূপ গবর্ণমেণ্টকে দি, ঐ-সকল দেশের লোকেরা তাহাদের আয়ের উহা অপেক্ষা বেশী অংশ তাহাদের গবর্ণমেণ্টকে করস্বরূপ দেয় না। কোন কোন সুসভ্য দেশের ট্যাক্সের হার এ দেশের চেয়ে বেশী হইতেও পারে; কিন্তু আমরা যাহা বলিয়াছি, মোটের উপর তাহাই সত্য।

ঐ-সকল দেশের লোকদের প্রতিনিধিদিগের মত অনুসারে দেশ শাসিত হইয়া থাকে। রাজস্বের কত অংশ শিক্ষার জন্য, কত অংশ স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য, কত অংশ সৈনিক বিভাগের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য, কত অংশ বা রাষ্ট্রীয় অন্যান্য বিভাগের জন্য খরচ করা হইবে, সে বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি দেশবাসীগণের প্রতিনিধিদিগের সভাতেই হয়। সকল দেশের প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের প্রণালী এক নয়, প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা দেশের কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোকের থাকিবে, সে বিষয়ের ব্যবস্থাও সকল দেশে এক নয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রতিনিধিদের ক্ষমতারও তারতম্য আছে। কিন্তু আমাদের দেশের ব্যবস্থাপক সভাসকলে দেশের লোকদের নির্ব্বাচিত সমুদয় প্রতিনিধি একমত হইলেও যেমন তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের মতের বিরুদ্ধে সরকারী আয়ব্যয়ের এক পয়সাও এ-দিক ও-দিক্ করিতে পারেন না, ঐ-সব দেশে প্রতিনিধিরা সে প্রকার শক্তিহীন নহেন। প্রকৃত শক্তি ও কার্য্যকারিতা হিসাবে আমাদের ব্যবস্থাপক সভাগুলি ভুয়ো জিনিষ, গবর্ণমেণ্টই সর্ব্বে-সর্ব্বা। দেশের কার্য্যে আমাদের কথা চলে না। ইহাতে যে কেবল আমাদের অভিমানে আঘাত লাগে, তাহা নয়; বাস্তবিক ক্ষতি ও অসুবিধাও আছে।

অন্য দেশের লোকেরা যেরূপ হারে ট্যাক্স দেয়, আমরাও তেমনি ট্যাক্স দি। কিন্তু তাহার উপর আমাদিগকে আরও ব্যয় করিতে হয়। দেশের সমুদয় বালকবালিকাদিগকে শিক্ষা দেওয়া অন্যান্য দেশের গবর্ণমেণ্টের ন্যায় আমাদের দেশেও গবর্ণমেণ্টেরই কাজ। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট নিজের কর্ত্তব্য সম্যকরূপে না করায়, আমাদের দেশে ছোট বড় অনেকগুলি সমিতি নিম্নশ্রেণীর লোকদের শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, প্রভৃতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তাহাতে তাঁহাদের শক্তি ব্যয় হইতেছে, সরকারী ট্যাক্সের উপর আমাদিগকে আবার এই-সকল সমিতিতে চাঁদা দিতে হইতেছে। দেশের স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য, প্লেগ ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধি সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্য, যাহা কিছু চেষ্টা,

যাহা কিছু ব্যয় করা আবশ্যক, তাহা অন্যান্য দেশের গবর্ণমেণ্টের মত আমাদের গবর্ণমেণ্টেরই করা উচিত। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট পরিমাণে নিজের কর্ত্তব্য না করায় এ বিষয়ে আমাদিগকে আন্দোলন করিতে হইতেছে। আমরা যুবকদিগকে বলিতেছি, তোমরা গ্রামের আগাছা জঙ্গল কাট, পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কার রাখ, পুকুর কাট, কুয়া খোঁড়, এবং এই-সকল কাজের জন্য গ্রামবাসীদিগকে চাঁদা দিতেও বলিতেছি। দেশে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য পরিশ্রম করা এবং টাকা খরচ করা খুব ভাল কাজ। দেশ আমাদের এবং এখানেই আমাদিগকে বাস করিতে হইবে। সুতরাং যদি দেশের উন্নতির জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয়, তাহা করা নিশ্চয়ই আমাদের কর্ত্তব্য। যদি ট্যাক্স দেওয়ার পর শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্য আবার চাঁদা দিতে হয়, তাহাও দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু অন্যান্য সুসভ্য দেশের মত যদি আমাদের দেশের শাসনকার্য্যে আমাদের ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে সমুদয় বালকবালিকার শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা, প্রভৃতির ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্টের দ্বারাই আমরা করাইতে পারিতাম; এবং আমাদের এই-সব চেষ্টা, এই-সব টাকা অন্যবিধ দেশহিতকর কার্য্যে নিযুক্ত হইত। কারণ, এরূপ দেশহিতকর কাজ অনেক আছে, যাহা সভ্যতম দেশেও গবর্ণমেণ্ট করেন না, এবং গবর্ণমেণ্টের দ্বারা ভাল করিয়া হইতেও পারে না।

মানুষ বাঁচিয়া থাকিলে ত দেশের উন্নতি করিবে। অতএব স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা করা যে একান্ত আবশ্যক তাহা বিস্তৃত ভাবে বুঝাইবার দরকার নাই। স্বাস্থ্যরক্ষা, কৃষিশিল্পবাণিজ্যের উন্নতি দ্বারা যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন, জ্ঞানলাভ দ্বারা মানসিক উৎকর্ষসাধন ও নির্ম্মল আনন্দ লাভ, জ্ঞানী ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া পরিবারে ও সমাজে সুনীতি ও সুরীতি প্রবর্ত্তন ও রক্ষা, ধর্ম্মসম্বন্ধে সত্যজ্ঞান লাভ, প্রভৃতি যে কোন চেষ্টা মানুষ করিতে চায়, তাহার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতি রাষ্ট্রীয় বিষয়ে শক্তিহীন লোকদের দ্বারা সাধিত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং রাষ্ট্রীয় বিষয়ে শক্তিলাভের চেষ্টা করা আমাদের একটি প্রাথমিক ও প্রধান কর্ত্তব্য।

স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য কি করা উচিত।

বহু বৎসর ধরিয়া বাংলা দেশে গবর্ণমেণ্ট রোডসেস ও পব্লিক ওয়ার্কস্ সেসের টাকা, ঐ ট্যাক্স দুটি যে জন্য লোকের নিকট লওয়া হয়, সম্পূর্ণরূপে তাহাতে ব্যয় না করিয়া অন্য প্রকারেও ব্যয় করিয়া আসিতেছিলেন। এই প্রকারে অনেক কোটি টাকা গবর্ণমেণ্ট অন্যায়রূপে ব্যয় করিয়াছেন। ১৯১৩-১৪ সালে গবর্ণমেণ্ট পব্লিক ওয়ার্কস্ সেসের টাকাটি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডগুলির হাতে দিয়াছেন। উহার পরিমাণ ২৯ লক্ষ টাকা। এখন হইতে এই টাকাটি সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য উপায়ে দেশের স্বাস্থ্যের ও অন্যবিধ উন্নতির জন্য যাহাতে ব্যয় করা হয়, সকলে সেই চেষ্টা করিতে থাকুন। মফঃস্বলের সংবাদপত্রগুলি এ বিষয়ে তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখুন। তাঁহারা ও মফঃস্বলের নির্ব্বাচকেরা ভাল করিয়া লক্ষ্য করুন, কোন্ মেম্বর এই টাকাগুলির সদ্ব্যয়ের জন্য কিরূপ চেষ্টা করিতেছেন। যাঁহার কাজ সন্তোষজনক হইবে না, তাঁহাকে পুনর্ব্বার যেন নির্ব্বাচন করা না হয়। মিউনিসিপালিটিগুলিরও কার্য্য সম্বন্ধে এইরূপ করা উচিত।

রোডসেসের টাকাও এখনও সম্পূর্ণরূপে আইনের অভিপ্রায় অনুসারে খরচ হইতেছে না। এ বিষয়ে খুব আন্দোলন হওয়া উচিত। পব্লিক ওয়ার্কস্ সেসের মত এই টাকাটিও সম্পূর্ণরূপে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডগুলির হাতে গিয়া তাহাদের দ্বারা আইনে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে ব্যয়িত হওয়া উচিত।

কিন্তু পব্লিক্ ওয়ার্কস সেস এবং রোডসেস হইতে প্রতি বৎসর যত আয় হয়, তাহা সম্পূর্ণরূপে নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ ও পুরাতন রাস্তা মেরামত, নূতন পুষ্করিণী ও কূপ খনন এবং পুরাতন জলাশয়গুলির মেরামত ও পঙ্কোদ্ধার, নূতন নর্দ্দামা খনন ও পুরাতনের সংস্কার দ্বারা জল নিঃসারণ, আগাছা ও জঙ্গল কাটা, যে-সব নদী ও খাল ভরাট হইয়া গিয়াছে তাহা আবার কাটান, প্রভৃতি কার্য্যে খরচ হইলেও বাংলাদেশকে শীঘ্র খুব স্বাস্থ্যকর করা যাইবে না। অথচ শীঘ্র ইহা না করিলে আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইতে পারে না। বৈশাখ মাসের প্রবাসীতে আমরা মাননীয়

ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয়ের যে প্রবন্ধটি ছাপিয়াছি, তাহাতে তিনি অঙ্ক দ্বারা দেখাইয়াছেন যে প্রতি বৎসর বাঙ্গলা দেশে কত লোক নিবার্য্য রোগে মারা পড়ে। তিনি অনুমান করেন যে কেবল জ্বরে মানুষ মরাতেই প্রতি বৎসর বঙ্গের ১২ কোটি টাকা ক্ষতি হয়। এই ১২ কোটি টাকার ক্ষতি নিবারণ করিতে হইলে যদি কয়েক বৎসর ধরিয়া ২১ কোটি টাকা করিয়া খরচ করিতে হয়, তাহাতেও লাভ আছে। মানুষগুলি বাঁচিয়া থাকিলে কৃষি শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি নানা উপায়ে তাহারা দেশের ধনবৃদ্ধি করিয়া এই ব্যয়ের টাকা উশুল করিয়া দিবে। কিন্তু প্রথমতঃ এত টাকা ব্যয় করিতে কোথা হইতে পাওয়া যাইবে? গবর্ণমেণ্ট অনেক বৎসর ধরিয়া পব্লিক ওয়ার্কস্ সেস এবং রোডসেসের টাকা আইনের অনভিপ্রেতভাবে খরচ করিতেছিলেন। সুতরাং তাঁহারা যে কোটি কোটি টাকা অযথা খরচ করিয়াছেন, তাহা ফিরাইয়া দিউন, এবং সুপ্রণালীক্রমে ঐ টাকা কয়েক বৎসর ধরিয়া বঙ্গের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য প্রযুক্ত হউক। নূতন নূতন রাজধানী নির্ম্মাণের জন্য, প্রধানতঃ সামরিক সুবিধা ও বিদেশী বণিকদের লাভের নিমিত্ত রেলওয়ে নির্ম্মাণের জন্য, গবর্ণমেণ্ট কোটি কোটি টাকা খরচ করিতে পারেন; আর আমাদের নিকট হইতে যে উদ্দেশ্যে ২০।৩০ বৎসর ধরিয়া ট্যাক্স আদায় করিতেছেন, তাহা এত দিন তজ্জন্য খরচ না করিয়া অন্য কাজে লাগাইয়াছেন, এখন সেই টাকা কেন সুদসমেত ফেরত দিয়া আইনের অভিপ্রেত কার্য্যে খরচ করিতে দিবেন না? আইন ও ধর্ম্ম অনুসারে গবর্ণমেণ্ট এই বহু কোটি টাকা সুদসমেত বাংলাদেশের উন্নতির জন্য ব্যয় করিতে প্রবৃত্ত হউন।

স্বাধীন দেশ-সকলে সমগ্র দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির মত বড় কাজের জন্য যথেষ্ট টাকা যদি বার্ষিক রাজস্ব হইতে খরচ করা না চলে, তাহা হইলে আর-এক উপায় অবলম্বিত হইতে পারে। যথেষ্ট পরিমাণ টাকা ঋণ করিয়া চলিত রাজস্ব হইতে তাহার সুদ দেওয়া হয় এবং ২০।২৫ বৎসরে তাহা শোধ করিবার ব্যবস্থা করা হয়। এই যে কোম্পানীর কাগজ ধনীরা ক্রয় করিয়া সুদ পান, তাহার মূল্য গবর্ণমেণ্ট-কেই ধার দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের কোন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা না থাকায় এরূপ সরকারী ঋণ গ্রহণের পরামর্শ দিতে সাহস হয় না। পরামর্শ দিলেই বা রাষ্ট্রীয় শক্তিহীন জনসাধারণের পরামর্শ কে গ্রহণ করিবে? নূতন আইন করিয়া যে উদ্দেশ্যে রোডসেস্ এবং পব্লিক ওয়ার্কস সেস্ বসান হয়, তাহা যখন এত বৎসর ধরিয়া অন্য উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইতে পারিয়াছে, তখন স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য কয়েক কোটি টাকা ঋণ করিলে আমরা রাজকর্ম্মচারীদিগকে সেই টাকা অভিপ্রেত কার্য্যে সুফলপ্রদ প্রণালী অনুসারে ব্যয় করাইতে সমর্থ যে নিশ্চয়ই হইব, তাহা কেমন করিয়া বলা যায়? সরকারী আয় ব্যয় আমাদের আয়ত্তাধীন হইলে আমরা ঋণ করিতে জোর করিয়া বলিতে পারিতাম।

সকল দিকে দেশের কাজ আমরা নিজেও যতটুকু পারি করিতে থাকি, গবর্ণমেণ্টের দ্বারাও করাইতে চেষ্টা করিতে থাকি; কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ যে এই প্রকার সকল কাজে সাফল্যের মূলীভূত তাহা আমরা যেন একদিনও ভুলিয়া না থাকি।

বিজিত ও বিজেতা।

লর্ড মর্লীর আমলে যখন ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভাগুলিকে বৃহত্তর করা হয়, এবং তাহাদের সম্বন্ধে নূতন নিয়ম প্রণীত হয়, তাহার কিছু দিন আগে হইতে ভারতবাসী মুসলমানেরা এই সভাগুলিতে, মুসলমান অধিবাসীদিগের সংখ্যার অনুপাতে যত প্রতিনিধি পাঠাইবার অধিকার পাইতে পারেন, তদপেক্ষা বেশী প্রতিনিধি পাঠাইবার দাবী যে-সকল যুক্তি দ্বারা সমর্থন করিয়া আসিতেছিলেন, তাহার মধ্যে একটি এই ছিল যে মুসলমানেরা এক সময়ে ভারতবর্ষের বিজয়ী রাজা ছিলেন, হিন্দুরা তাঁহাদের বিজিত প্রজা ছিল, ইংরেজরা মুসলমানদের হাত হইতে ভারতের রাজত্ব পাইয়াছিলেন, এবং এই-সব কারণে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদের রাজনৈতিক গুরুত্ব (political importance) বেশী আছে। কিছুকাল পূর্ব্বে মুসলমানদের একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক একখানি হিন্দু দৈনিকের সঙ্গে তর্কবিতর্ক উপলক্ষে হিন্দু সহযোগীকে "স্লেভ" অর্থাৎ গোলাম বলিয়াছিলেন। এই কাগজখানি এখন আর প্রকাশিত

হয় না। নূতন প্রকাশিত "আল্ এস্‌ল্যাম" নামক বাঙ্গালী মুসলমানদের মাসিকপত্রের বৈশাখ সংখ্যায় "বঙ্গসাহিত্যে মুসলমান রমণীর স্থান" শীর্ষক প্রবন্ধে একস্থানে বলা হইয়াছে—"পৃথিবীর আর কোথাও বিজেতার রমণী বিজিতের লেখনীতে এরূপ বীভৎস নারকীয় চিত্রে চিত্রিত হইয়াছেন কিনা, সন্দেহের বিষয়।" যে দৃষ্টান্তটিকে উদ্দেশ করিয়া এই বাক্যটি লেখা হইয়াছে, তাহাতে বিজেতা মুসলমান এবং বিজিত হিন্দু।

এই-সকল বৃহৎ ও ক্ষুদ্র কারণে বিজিত ও বিজেতা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক মনে হইতেছে।

ভারতবর্ষের সমুদয় অধিবাসীর অবস্থা এখন এক; ইংরেজ প্রধান, অন্যেরা অপ্রধান। অপ্রধানদের মধ্যে যদি কখনও কাহারও কিছু কৃত্রিম প্রাধান্য হয়, তাহা ইংরেজদের প্রাধান্যরক্ষার সহায়তা করিবে মাত্র।

পৃথিবীর যত দেশ ও জাতির কথা এখন মনে হইতেছে, তাহাদের মধ্যে সকলেই কখন না কখন বিজেতা বা বিজিত হইয়াছিলেন। অবশ্য ইহাতেও তারতম্য আছে। কিন্তু বিজিত হওয়া বা বিজেতা হওয়া একটা অসাধারণ ব্যাপার নয়। যে একবার বিজিত হয়, সে চিরকাল ছোট থাকে না; যে বিজয়ী হয়, সেও চিরকাল বড় থাকে না। যদি দুজন কুস্তিগীরের মধ্যে মল্লযুদ্ধ হইয়া একজন আর-একজনকে হারাইয়া দেয়, তাহা হইলে জেতা পালোয়ানের বংশধরেরা, পুরুষানুক্রমে, বিজিত কুস্তিগীরের বংশধরদিগকে হীন জ্ঞান করিবার অধিকার লাভ করে না। কারণ বাস্তবিক পূর্ব্বোক্তেরা বলবীর্য্যে বরাবর শেষোক্তদিগের চেয়ে শ্রেষ্ঠ থাকে না। আমার অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ হয় ত দুর্ব্বল ছিলেন, হয় ত তিনি আত্মরক্ষা ও সম্পত্তিরক্ষায় অসমর্থ ছিলেন; কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার সমুদয় বংশধরদিগকে, আমাকে ও আমার বংশধরদিগকে, মনুষ্যোচিত গুণে চিরকাল বঞ্চিত থাকিতে হইবে, বিধাতার এমন কোন বিধান নাই। শিশু যখন জন্মে তখন সে ললাটে বিজিত বা বিজেতার ছাপ লইয়া জন্মে না; সে নূতন মানুষ; পরিবার, সমাজ, সংসর্গ, শিক্ষা তাহাকে বহুপরিমাণে গড়ে, এবং বহুপরিমাণে পুরুষকার দ্বারা সে নিজেও নিজেকে গড়ে। আমার দেশ, আমার জাতি, প্রত্যহ নূতন করিয়া আমার চরিত্রে, আচরণে, জীবনে, বিজিত বা জয়ী হইতেছে, আমি এইরূপ মনে করি। আমি পূর্ব্বপুরুষের কলঙ্কের বোঝা-ই বা কেন বহন করিব, তাঁহাদের গৌরব ধার করিয়াই বা কেন নিজের যোগ্যতার অভাবকে ঢাকা দিবার চেষ্টা করিব? বিধাতা যখন আমাকে স্বতন্ত্র শারীরিক ও মানসিক শক্তি দিয়া সংসারে পাঠাইয়াছেন, পূর্ব্বপুরুষদের একটি প্রতিমূর্ত্তি মাত্র গড়িয়া পাঠান নাই, তখন আমি তাঁহাদের কাহারও দোষের বা গুণের জন্য হীন বা গৌরবান্বিত হইতে চাই না। তবে যে পূর্ব্বপুরুষদের কীর্ত্তির কথা মধ্যে মধ্যে বলি, তাহা ইহাই দেখাইবার জন্য যে আমাদের বংশে বা রক্তে অযোগ্যতাই মিশিয়া নাই, যোগ্যতাও আছে, বহুপূর্ব্বে এদেশে মানুষের মত মানুষ জন্মিয়াছিল, অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়েও জন্মিয়াছে, সুতরাং এখনও জন্মিতে পারে। বাস্তবিকও জন্মিতেছে।

বিজেতারা বিজিতদিগের চেয়ে জয়পরাজয়ের সময়েও সব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ থাকে না। রোমানরা যখন গ্রীস্ জয় করে, তখন গ্রীকরা রোমানদের চেয়ে নানা বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ ছিল। আবার যখন গথ প্রভৃতি জাতি রোম জয় করিল, তখন তাহারা জ্ঞানে ও সভ্যতায় রোমানদের চেয়ে নিকৃষ্ট ছিল। রোমানরা গ্রীকদিগের, এবং গথ প্রভৃতি জাতি রোমানদিগের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিল। ইংলণ্ড আয়র্লণ্ড জয় করিয়াছিল। কিন্তু প্রাচীন আইরিশরা প্রাচীন ইংরেজদের চেয়ে জ্ঞানী ও সভ্য ছিল। মুসলমানদিগের ভারত আক্রমণের সময়ে হিন্দুরা কিসে শ্রেষ্ঠ ছিল, মুসলমানেরাই বা কিসে শ্রেষ্ঠ ছিল, তাহা ঐতিহাসিকেরা বলিয়া দিতে পারেন।

বিজেতারা সাধারণতঃ পরদেশ আক্রমণ কি জন্য করেন, তাহা ইতিহাস পাঠকদের অবিদিত নাই। বিজিতদের উপকার করিবার জন্য, তাহাদিগকে মানুষ করিবার জন্য, তাহাদিগকে সভ্য করিবার জন্য, তাহাদের মোক্ষ সাধনের জন্য, বিজেতারা তাহাদের দেশ অধিকার করিয়াছেন, কখনও কখনও এরূপ বলেন বটে। কালক্রমে বিজেতাদের দ্বারা সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে বিজিতদের কিছু উপকারও অনেক স্থলে হয়। কিন্তু পরদেশ বিজয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য যে পরের ধনে ঐশ্বর্য্যশালী হওয়া ও পরের

উপর প্রভুত্ব করা, ইহা অস্বীকার করা যায় না। পৃথিবীর সব জাতিই কখন-না-কখন এই উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহাকে ধর্ম্মনীতির দিক্ দিয়া একটা শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য বলা যায় না। সুতরাং বিজেতা হওয়া মানুষের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতার পরিচায়ক ইহাও বলা যায় না। বিজেতা হওয়া শক্তিশালিতার পরিচায়ক বটে। কিন্তু গায়ে পড়িয়া বিদেশ আক্রমণ ও জয় শক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার নহে।

অনেকের এইরূপ ধারণা আছে, যে, মুসলমানেরা তরবারির সাহায্যে নিজের ধর্ম্ম প্রচার করিতেন; অর্থাৎ তাঁহাদের বিদেশজয়ের একটি উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। যদি এই ধারণা সত্য হয়, তাহা হইলে, এই প্রকারে ধর্ম্মপ্রচারের প্রণালী ভাল বা মন্দ যাহাই হউক, কোন কোন মুসলমান বিজেতার উদ্দেশ্য ভাল ছিল বলা যাইতে পারে। কিন্তু মুসলমানেরা নিজেই বলিতেছেন যে তাঁহারা এরূপ উপায়ে ধর্ম্মপ্রচার করেন নাই; যথা বৈশাখ মাসের আল্-এস্লামের এস্লাম-প্রচার নামক প্রবন্ধে—

> একদল লোকের ধারণা, এস্লাম ধর্ম্ম প্রধানতঃ তরবারির সাহায্যেই প্রচারিত হইয়াছে। মুসলমানগণ এক হস্তে কোরআন ও অপর হস্তে কৃপাণ ধারণ করিয়াই ধর্ম্ম প্রচারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এস্লামের পরম হিতৈষী ও মুসলমানগণের চিরসুহৃদ খৃষ্টান পাদ্রী সাহেবান, এ সম্বন্ধে তাঁহাদের মিশন ফণ্ডের অনায়াসলব্ধ কাগজ কলমের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের তালে তাল দিয়া ও সেই সুরে সুর মিলাইয়া আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু লেখকগণও আপনাদের সুপক্ক লেখনীপ্রসূত গদ্যের রচনাচাতুর্য্যের অন্তরালে, পদ্যের উদ্দীপনাময় ঝঙ্কারের আড়ালে, নভেল নাটকের ভাষার সৌন্দর্য্য ও রসাল ভাবমাধুর্য্যের অন্তর্ভাগে, ইতিহাসের ঘটনাপ্রসঙ্গে ও বর্ণনা-বিন্যাসে, এস্লাম প্রচারের এই অদ্ভুত কল্পনাকাহিনী অতি সুকৌশলে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই বিদ্বেষমূলক ও ভিত্তিহীন কল্পিত কাহিনীর প্রচার-বাহুল্যের ফলে, খৃষ্টান মুসলমান ও হিন্দু মুসলমানের মধ্যে অযথা হিংসা বিদ্বেষের সৃষ্টি হইয়াছে, সকলের একান্ত বাঞ্ছনীয় একতা ও সম্প্রীতি স্থাপনের পক্ষে মহা অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। এরূপ অকল্যাণকর ক্রটির জন্য যে খৃষ্টান পাদ্রী ও হিন্দু লেখকগণ সম্পূর্ণরূপে দায়ী, তাহা বলাই বাহুল্য। প্রকৃত প্রস্তাবে উপরোক্ত ধারণা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও ঐতিহাসিক প্রমাণশূন্য, তাহা অতি সহজেই প্রতীয়মান হইবে।

অতএব, মুসলমানদিগের বিদেশ আক্রমণের প্রধান বা অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম্মপ্রচার, ইহা আমরা বিশেষ প্রমাণ না পাইলে সত্য বলিয়া মনে করিতে পারি না।

কতকগুলি গুণে বিজেতারা বিজিতদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ না হইলে জয়পরাজয় হইতেই পারে না। যুদ্ধকৌশল, উৎকৃষ্ট অস্ত্র নির্ম্মাণ, সাহস, দৈহিক বল ও কষ্টসহিষ্ণুতা, নেতৃত্ব, ঐক্য, নেতার আনুগত্য, স্বদেশ স্বজাতি বা স্বদলের প্রতি একান্ত অনুরাগ, কূট নীতি, প্রভৃতি সমুদয় বিষয়ে বা অধিকাংশ বিষয়ে কোন জাতি বা সম্প্রদায় শ্রেষ্ঠ না হইলে তাহারা জয়ী হইতে পারে না। হিন্দুরা কিসে নিকৃষ্ট ছিল, তাহার আলোচনা এখানে করিব না। তবে মোটের উপর ইহা বলা যাইতে পারে যে তাহাদের শক্তি ও সাহসের অভাব ছিল না; সুতরাং তাহারা অবজ্ঞেয় ছিল না।

মুসলমানদের ভারতবিজয় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। তাঁহারা কোন সময়েই সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করিতে পারেন নাই। মোটামুটি ইহা বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারা এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার যে যে দেশ জয় করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে সমস্তটাই জয় করিয়াছিলেন। সাতশত বৎসরের প্রাধান্য সত্ত্বেও ভারতবর্ষকে যে তাঁহারা এইরূপে জয় করিতে পারেন নাই, তাহাতে প্রমাণ হইতেছে যে ভারতবর্ষের এমন কোন বিশেষত্ব ছিল ও আছে, যাহা মুসলমানদের বিজিত অন্য দেশগুলির ছিল না। মুসলমানেরা ভারতবর্ষ ছাড়া আর যত দেশ জয় করিয়াছিলেন, তাহার অনেকগুলির সমুদায় অধিবাসী মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন; অবশিষ্ট প্রায় সকল দেশগুলিরই অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে এরূপ হয় নাই। হিন্দুদের এই রক্ষণশীলতা ইহাই প্রমাণ করে যে তাঁহাদের অধিকাংশ লোক রাজানুগ্রহ এবং ঐহিক সুবিধা ও ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা স্বধর্ম্মের জন্য কষ্ট স্বীকার করাই শ্রেয়ঃ মনে করিতেন। ইহা তাঁহাদের দৃঢ়চিত্ততা ও ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচায়ক। এরূপ দেশ ও এরূপ জাতি অবজ্ঞার পাত্র নহে। অনেক সময় জ্ঞানহীন, স্থূলবুদ্ধি, আধ্যাত্মিকতাহীন অসভ্য জাতিরা ধর্ম্মের উচ্চ সত্য গ্রহণ করিতে পারে না বটে; কিন্তু হিন্দুরা জ্ঞান বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতায় মোটের উপর মুসলমানদের চেয়ে নিকৃষ্ট ছিলেন বলিয়া আমরা মনে করি না।

পক্ষান্তরে ইহাও বলা উচিত যে মুসলমানেরা যে ভারতবর্ষের মত দেশ ও হিন্দুর মত সাহসী দৃঢ়চিত্ত ও ধর্ম্মপ্রাণ জাতিকেও অনেকটা পরাজিত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের পক্ষে শ্লাঘার বিষয়।

মুসলমানদিগের ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে ইংরেজ-প্রাধান্তের অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারতবর্ষে নামে মোগল বাদশাহের প্রাধান্য থাকিলেও বাস্তবিক প্রাধান্য মহারাষ্ট্রীয়-দেরই ছিল। স্থানে স্থানে প্রাধান্য শিখ ও রাজপুতদের ছিল। সুতরাং ইংরেজ-অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেই মুসলমানেরা বিজেতার পদ হারাইয়াছিলেন, এবং নানা স্থানে বিজিতদের দ্বারা পরাজিত হইয়াছিলেন। ইংরেজেরা যেমন দেশ জয় প্রধানতঃ দেশবাসীদের দ্বারা করিয়াছেন, মুসলমানেরাও তেমনি নানা যুদ্ধে হিন্দু সেনা ও সেনাপতির সাহায্য লইয়া-ছিলেন। সুতরাং বিজয়ী হওয়ার যদি কিছু প্রশংসা থাকে, ত, তাহার কতকটা অংশ হিন্দুদেরও প্রাপ্য। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে, যে, ইংরেজ-প্রাধান্তের পূর্ব্বেও, শুধু মহারাষ্ট্র, রাজপুতানা, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে নয়, অন্যত্রও, মধ্যে মধ্যে হিন্দুরা মুসলমানদিগকে পরাজিত করিয়া রাজা হইয়াছিলেন। বাংলা দেশেও ইহা ঘটিয়াছিল।

আমরা পূর্ব্বে প্রকারান্তরে বলিয়াছি যে এক দল লোক যদি কোন সময়ে আর-একদল লোককে পরাজিত করে, তাহা হইলে পরবর্ত্তী সময়ে বিজেতাদের ও তাহাদের স্বজাতীয়দের বংশধরেরা বিজিতদের ও তাহাদের স্বজাতীয়-দিগের বংশধরগণকে হীন বলিয়া ন্যায়তঃ অবজ্ঞা করিতে পারে না। কিন্তু ধরা যাক্‌ যে বিজেতাদের বংশধরেরা এবং তাহাদের স্বজাতীয়গণের বংশধরেরা চিরকালই বিজেতা বলিয়া গৌরব করিতে পারে, এবং বিজিতগণের বংশধরেরা ও তাহাদের স্বজাতীয়দের বংশধরেরাও চিরকাল বিজিত বলিয়া অপমানের যোগ্য। এখন বিচার্য্য এই যে বিজেতা কাহারা, তাহাদের স্বজাতীয় কাহারা, এবং বিজিত কাহারা ও তাহাদের স্বজাতীয় কাহারা। প্রথমেই বেশ পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে হইবে, ধর্ম্ম (religion) আর জাতি (race) আলাদা জিনিষ। আমাদের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তাদের দৃষ্টান্ত লইলে ইহা ভাল করিয়া বুঝা যাইবে। আমরা সুবিধার জন্য ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের অধিবাসীদিগকে এক ইংরেজ নামেই অভিহিত করিব। ইংরেজেরা তাঁহাদের শাসনাধীন ভারতবর্ষের সমুদয় স্থান যুদ্ধে জিতিয়া অধিকার করেন নাই। কিন্তু ধরিয়া লওয়া যাউক যে তাঁহারা সর্ব্বত্রই জেতারূপে দখল পাইয়াছেন। বিজেতা বলিয়া অহঙ্কার করিবার অধিকার এখন কাহাদের আছে? যাহাদের মাতৃকুল পিতৃকুল উভয়কুলই ইউরোপীয়, তাহারাই আপনাদিগকে বিজেতা বলিতে পারে। কিন্তু যাহাদের মাতৃবংশ বা পিতৃবংশ ভারতবর্ষীয়, তাহাদের নাম ইউরো-পীয় এবং ধর্ম্ম খৃষ্টিয়ান হইলেও, তাহাদিগকে আমরা বিজেতা বলি না। আবার যাহাদের পিতৃবংশ ও মাতৃবংশ উভয়ই ভারতবর্ষীয়, তাহারা খৃষ্টিয়ান হইলেও, এবং তাহাদের কাহারও কাহারও নাম ইউরোপীয় হইয়া গিয়া থাকিলেও, তাহাদিগকেও আমরা বিজেতা বলি না এবং তাহারা সাধারণতঃ জেতৃত্বের দাবীও করে না। বস্তুতঃ বুদ্ধিমান্‌ স্বদেশপ্রেমিক দেশীয় খৃষ্টিয়ানেরা রাজনৈতিক হিসাবে আপনাদিগকে বিজিত হিন্দুদের সমশ্রেণীস্থ বলিয়াই মনে করেন। এই কথাগুলি স্মরণ রাখিয়া এখন ভারতবাসী সমুদয় মুসলমানদের জেতৃত্বের দাবী পরীক্ষা করা যাক্‌। প্রকৃত জেতা সেই-সব মুসলমানেরা যাঁহারা খাঁটি আরব, পাঠান, মোগল, তুর্কি বা ইরানী। মোটামুটি ইঁহাদেরই নাম করিলাম; অন্যান্য অল্পসংখ্যক বিদেশী মুসলমানও ভারতজয়ে অংশীদার ছিলেন। এখন কেবল সেই-সব ভারতবাসী মুসলমান বিজেতা বলিয়া অহঙ্কার করিতে পারেন, যাঁহাদের পিতৃমাতৃকুল বরাবর খাঁটি আরব, পাঠান, মোগল, তুর্কি ও ইরানী রহিয়া আসিয়াছে। এরূপ ভারতবাসী মুসলমানের সংখ্যা কত, তাহা কেহ স্থির করিতে পারিবেন কি না জানি না। যে-সকল মুসলমানের পূর্ব্বপুরুষেরা ভারতবর্ষীয় ও হিন্দু ছিলেন, নৃতত্ত্ববিদ্‌-দিগের মতে তাঁহাদের সংখ্যাই খুব বেশী। সুতরাং যেমন দেশীয় খৃষ্টিয়ানেরা বিজেতা ইংরেজদের সমধর্ম্মী হইলেও জেতৃত্বের অহঙ্কার করিতে পারেন না, তাঁহারাও বাস্তবিক বিজিত; তেমনি দেশীয় (অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের বংশধর) মুসলমানেরাও আরব, পাঠান, মোগল, তুর্কি, ইরানীদের সমধর্ম্মী বলিয়া জেতৃত্বের দাবী ও অহঙ্কার করিতে পারেন না, হিন্দুদের পূর্ব্বপুরুষদের মত তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরাও বিজিত হইয়াছিলেন। নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং সহজবুদ্ধি এই কথাই বলে। ভারতবাসী মুসলমানেরা ইহা মানুন বা না মানুন, ইহাই সত্য।

মুসলমানেরা যে উদ্দেশ্যেই ভারত আক্রমণ করিয়া থাকুন, তদ্দ্বারা পরোক্ষ ও সাক্ষাৎ ভাবে কোন কোন বিষয়ে ভারতবর্ষের উপকার হইয়াছিল। এমার্সন বলিয়াছেন, যে আমার সঙ্গে কুস্তি লড়ে, সে আমাকে বলশালী করে। মুসলমান আক্রমণের ফলে হিন্দুরা কালক্রমে পূর্ব্বাপেক্ষা একতাসূত্রে আবদ্ধ, দলবদ্ধ, যুদ্ধবিদ্যায় অধিকতর পারদর্শী, এবং মোটের উপর শক্তিশালী হইয়াছিলেন। যাঁহাদের ভারতবর্ষের উত্তর ও দক্ষিণ উভয় অংশ সম্বন্ধেই জ্ঞান আছে, তাঁহারা জানেন, উত্তর অপেক্ষা দক্ষিণে নিম্নশ্রেণীর সামাজিক অবস্থা অধিক হীন, এবং তথায় "অস্পৃশ্যতা"র প্রকোপ বেশী। ইহার একটি কারণ এই যে, উত্তরে মুসলমান-প্রাধান্য যেরূপ হইয়াছিল, দক্ষিণে সেরূপ হয় নাই। কবীর, দাদূ, নানক, প্রভৃতি ধর্ম্মোপদেষ্টাগণের আবির্ভাবের অন্যতম কারণ মুসলমানের প্রাধান্য। এ-সকল ছাড়া মুসলমানদের দ্বারা স্থাপত্য প্রভৃতি নানা শিল্পবিদ্যার উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, এবং সভ্যতার নানা নূতন অঙ্গ দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তাহার প্রমাণ বাংলা প্রভৃতি সংস্কৃতমূলক নানা ভাষার অন্তর্ভূত বহুসংখ্যক আরবী ফারসী ও তুর্কি কথায় নিহিত রহিয়াছে। বঙ্কিম বাবু বলিয়া গিয়াছেন, মুসলমানেরা হিন্দুদের চেয়ে পাকা রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। বঙ্কিম বাবু মুসলমানভক্ত ছিলেন বলা যায় না। সুতরাং তাঁহার সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইতে পারে।

হিন্দুদের কাছে মুসলমানেরা কি শিখিয়াছিলেন, তাহা আমরা বলিব না। মুসলমানেরা যদি হিন্দুদিগকে শ্রদ্ধা করিতে চান, ত, তাঁহারা ইহা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিবেন।

আমরা কাহাকেও ছোট বা বড় বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য, কাহাকেও মনঃকষ্ট দিবার জন্য, এই-সকল কথা লিখিতেছি না। আমাদের ধারণা এই যে ভারতবাসী সকল সম্প্রদায় পরস্পরকে শ্রদ্ধা করিতে না পারিলে কাহারও মঙ্গল নাই। যিনি অপরকে শ্রদ্ধা করিতে পারিবেন না, তাঁহারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অধোগতি হইবে। হিন্দু ও মুসলমান ভারতবর্ষের প্রধান দুই সম্প্রদায়। ইহাঁরা পরস্পরকে চিনিবার চেষ্টা করুন। কোন সম্প্রদায়ই অপর সমুদয় সম্প্রদায়ের উন্নতিতে সম্পূর্ণ বাধা দিতে পারিবেন না; কিন্তু অপরকে বাদ দিয়াও কাহারও সম্পূর্ণ উন্নতি হইবে না।

যখন সকলেই মহাপঙ্কে নিপতিত, তখন কাহার পূর্ব্বপুরুষ কখন হাতী চড়িয়া বেড়াইতেন, তাহার আলোচনায় কোন লাভ নাই।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অধিবাসীরা হিন্দু বৌদ্ধ জৈন খ্রীষ্টিয়ান মুসলমান শিখ ব্রাহ্ম আর্য্যসমাজী প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ইহাঁদের প্রত্যেকের অতীত ইতিহাসে এবং বর্ত্তমান জীবনে এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহার জন্য প্রত্যেককেই শ্রদ্ধা করিতে পারা যায়। সাঁওতাল কোল ভীল প্রভৃতি অসভ্য বন্য ও পার্ব্বত্য জাতিগণের চরিত্রেও অনেক সদ্‌গুণ আছে। তজ্জন্য তাহারাও সম্মান পাইবার যোগ্য। তাহাদের সমুদয় সদ্‌গুণের কথা না ভাবিয়া যদি কেবল তাহাদের অদম্য মনুষ্যত্বের কথাই ভাবি, তাহা হইলেও তাহাদের নিকট মাথা নত হয়। বনে জঙ্গলে তাড়িত হইয়া হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া বাঘভালুকের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রতিকূল প্রাকৃতিক শক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া বা অনুকূল করিয়া লইয়া তাহারা বাঁচিয়া আছে। এই যে শক্ত শ্রমপটু মানুষগুলি ইহাদিগকে অবজ্ঞা করিবার আমাদের কি অধিকার আছে?

আমরা পরস্পরকে সম্মান করিয়া, পরস্পরের সহযোগী হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হই।

মফঃস্বলের কাগজগুলির আলোচ্য বিষয়।

কি কলিকাতার কি মফঃস্বলের ক্ষুদ্রতম হইতে বৃহত্তম সকল কাগজেরই কাজ আছে, সকলের দ্বারাই দেশের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। কোনটিই নগণ্য নহে। সুতরাং আমাদের সকলের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা অনাবশ্যক নহে। বৈশাখ মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত "দেশের কথা" উপলক্ষ্য করিয়া এ বিষয়ে "বরিশাল-হিতৈষী" লিখিয়াছেন—

> মফঃস্বলের সাপ্তাহিক পত্রিকাসম্বন্ধে প্রকাশিত মতগুলি বেশ কার্য্যকরী। কিন্তু * * * মফঃস্বলের পত্রিকাগুলিকে বড়ই সীমাবদ্ধ আলোচনার মধ্যে নিবদ্ধ থাকিতে বলা হইয়াছে। মফঃস্বলের সংবাদপত্র-সম্পাদক বিশ্ব-উদার রাজনীতি সম্বন্ধে সুচিন্তিত আলোচনা করিতে পারিলে দেশের পক্ষে কোনও অমঙ্গল ত নিশ্চয়ই হয় না— কতক মঙ্গল হইলেও হইতে পারে এবং সেরূপ আলোচনাযুক্ত পত্রিকা

নানা বিভাগের লোকের নিকটে একটু অধিক সম্মান পাইতে পারে। তাহা হইতে বঞ্চিত করিবার পরামর্শ প্রদান যুক্তিসঙ্গত নহে। পল্লীর কথা আলোচনা করিতে গেলেও প্রায় থোড় বড়ি খাড়া খাড়া বড়ি থোড় হইয়া দাঁড়ায়। প্রত্যেক গ্রামের ম্যালেরিয়া, স্বাস্থ্য, পানীয় জলের অভাব নিত্য "লিখিলে দেশের মধ্যে আপনাকে প্রভূত শক্তিশালী করিয়া" তুলিব কাহার নিকট? দেশের লোক সপ্তাহের পর সপ্তাহ এই সংবাদ পাঠ করিয়াই কি সুস্থ, লক্ষ্মীমন্ত হইয়া উঠিবে? সরকারী কার্য্যাকার্য্যের সম্বন্ধে যোগ্যতাপূর্ণ সমালোচনা করিতে পারিলে সরকারী কর্ম্মচারীবর্গ সেই কাগজের সম্মান করেন। অন্যথা শুধু আমাদের জাতীয় জীবনের অচ্ছেদ্য বন্ধু দারিদ্র্য, ম্যালেরিয়া, জলাভাবের সংবাদে তাঁহারা কমই দৃষ্টি দেন। দুঃখের বিষয় আমাদের সহযোগীগণ রাজনীতি সম্বন্ধেও উপযুক্ত রূপ আলোচনা করেন না; করিলে মফঃস্বলের অবস্থা এমন হীন থাকিত না।

কথাগুলি অযৌক্তিক নহে। জগতের যে-কোন বিষয়ে যে-কোন কাগজের মন্তব্য প্রকাশ করিবার অধিকার আছে এবং আলোচনা করিবার মত বিষয়ও পৃথিবীতে অগণ্য আছে। কিন্তু এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে যে, কোন্ কাগজে কি বিষয়ের আলোচনা কি পরিমাণে হইবে, তাহা উহার কার্য্যক্ষেত্র ও মুখ্য উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে। "প্রবাসী" প্রধানতঃ বাঙ্গালীদের জন্য প্রকাশিত হয়। এই জন্য, যদিও ইহাতে পৃথিবীর কোন দেশের এবং ভারতবর্ষের কোন প্রদেশের কথা লিখিতে বাধা নাই, তথাপি আমরা প্রধানতঃ এরূপ বিষয়ের আলোচনা করিতে চেষ্টা করি, যাহা বঙ্গদেশবাসী ও প্রবাসী বাঙ্গালী-দিগকে আনন্দ দিতে পারে ও তাঁহাদের কাজে লাগিতে পারে। আমাদের "মডার্ণ রিভিউ" নামক ইংরেজী মাসিক পত্রের কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃততর। উহা ভারতবর্ষের সব প্রদেশের লোকে পড়ে, এবং ভারতবর্ষের বাহিরে নানা দেশে ইংরেজী-জানা কতকগুলি লোকেও পড়ে। সুতরাং উহা এই-সমুদয় শ্রেণীর উপযোগী করিয়া সম্পাদন করিতে চেষ্টা করা হয়। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, একই মানুষের দ্বারা সম্পাদিত দুখানা কাগজ কার্য্যক্ষেত্রের পার্থক্য বশতঃ কতকটা পৃথক্ ভাবে সম্পাদিত হয়। তেমনি যদিও মফঃস্বলের কোন কাগজেই কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে বাধা নাই, তথাপি যেটি যে জেলা বা সবডিবিজনে প্রকাশিত, তাহার সেবা করাই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই মুখ্য উদ্দেশ্য স্মরণ রাখিয়া কাজ করিলেই সব দিক্ রক্ষা হইতে পারে।

একটু পরিশ্রম করিয়া নানা দেশের তথ্য সংগ্রহ করিলে গ্রাম্য বিষয়ের আলোচনাতেও বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতে পারা যায়। বৃটিশ-শাসিত ভারতবর্ষেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে জেলার নানা বিভাগের কাজ কতকটা ভিন্ন-ভিন্নরূপে নির্ব্বাহিত হয়। বিচার, শাসন, শিক্ষা, জেল, মিউনিসিপালিটী, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, স্বাস্থ্যরক্ষা, প্রভৃতি নানা বিভাগে কোথায় কোন্ উৎকৃষ্ট প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহা বাংলা দেশের জেলা-সকলে চালাইবার জন্য লেখা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের কোন কোন দেশীয় রাজ্য কোন কোন বিষয়ে ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষ অপেক্ষা অগ্রসর। এই-সকল বিষয় বাঙ্গালীদের গোচর করা উচিত। তাহার পর ভারতবর্ষের বাহিরে গিয়া বিদেশের এই-সকল তথ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে। গ্রামের সাধারণ কাজ নানা দেশে নানা উপায়ে নির্ব্বাহিত হয়। আমাদের ভারতবর্ষেই মহীশূর-প্রদেশে গ্রামগুলির উন্নতির জন্য গ্রামবাসীদিগকে সচেষ্ট ও আত্মনির্ভরশীল করিবার নিমিত্ত মহীশূর-গবর্ণমেণ্ট উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করিয়াছেন। এইরূপ ব্যবস্থা আর কোথায় কিরূপ আছে, তাহার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলে লোকের জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন নূতন হিতকর কার্য্য-প্রণালী অবলম্বিত হইতে পারে।

গ্বালিয়রে বন-বিভাগ।

দেশে অরণ্যের অস্তিত্ব ও বিস্তৃতির সহিত উহার ঐশ্বর্য্য ও স্বাস্থ্যের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। সংকীর্ণতর ভাবে দেখিলেও বুঝা যায় যে অরণ্য হইতে নানা প্রকারে লোকের অর্থাগমের উপায় হইতেছে। কিন্তু আরও অধিক-তর প্রকারে অর্থাগম হইতে পারে। তজ্জন্য চেষ্টা হওয়া চাই। গ্বালিয়র দেশীয় রাজ্য হইতে জয়াজীপ্রতাপ নামে একখানি সাপ্তাহিক কাগজ বাহির হয়। উহার অল্প অংশ ইংরেজীতে লেখা, বাকী হিন্দী। সংপ্রতি ইহার একটি-সংখ্যাতে গ্বালিয়র রাজ্যে বনবিভাগ হইতে কি কি প্রকারে অর্থাগম হইতে পারে এবং তজ্জন্য রাজসরকার হইতে কিরূপ চেষ্টা হইতেছে, তাহার বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণকে অরণ্যের উপকারিতা সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার আবশ্যকতা, অরণ্য-নীতির ক্রমবিকাশ, অরণ্যের সুব্যবস্থা সম্বন্ধীয় উপদেশবচন, অরণ্যবিভাগে চাকরীর আদর্শ,

১৯১৩-১৪ খ্রীষ্টাব্দে (১৯৭০ সম্বতে) গ্বালিয়র অরণ্যবিভাগের রিপোর্ট, ইংরেজীতে এই পাঁচটি প্রবন্ধ আছে। হিন্দীতে ১১টি প্রবন্ধ আছে। তাহার নাম—১। আমাদের নম্র নিবেদন; ২। জঙ্গল কি, এবং সরকার কেন উহার বন্দোবস্ত করেন; ৩। গ্বালিয়র রাজ্যে জঙ্গল সম্বন্ধে সর্ব্ববিধ তথ্য, (ক) সাধারণ বৃত্তান্ত, (১) জঙ্গলের বিস্তৃতি, (২) ভীল ও অন্যান্য জঙ্গলী জাতি, (৩) তাহাদের শিক্ষা, (৪) জঙ্গলে শিকারের জন্য রক্ষিত স্থান এবং শিকারের পশুপক্ষী, (৫) বন-বিভাগের কর্ম্মচারীদের সংখ্যা, (৬) বন-বিদ্যা শিখাইবার বন্দোবস্ত, (৭) জঙ্গলের জলবায়ু এবং তথায় বৃক্ষ উৎপাদন; (খ) জঙ্গলে উৎপন্ন অর্থকর দ্রব্য; ৪। জঙ্গলগুলির ঐতিহাসিক বিবরণ ও বর্ত্তমান অবস্থা; ৫। যে যে প্রাকৃতিক কারণে জঙ্গলের উৎপত্তি, স্থিতি ও বৃদ্ধি হয়; ৬। গ্বালিয়রের অরণ্যের প্রধান প্রধান বৃক্ষ ও বনস্পতি; ৭। গ্বালিয়র অরণ্যবিভাগের ইতিহাস; ৮। সরকারের নূতন আরণ্য বন্দোবস্তে রাইয়তদিগকে কি সুবিধা দেওয়া হইয়াছে; ৯। জঙ্গল, ও গৃহপালিত পশু; ১০। জঙ্গলের অর্থাগমের উপযোগিতা—লাক্ষা, গঁদ, চামড়ার কস্, খয়ের, রোজা ঘাস (ইহা হইতে সুগন্ধি তেল চোয়ান হয়), ঔষধার্থ ব্যবহৃত উদ্ভিদ্, লাক্ষা-লেপন কার্য্যের উপযোগী উদ্ভিদ্, বিড়ী, কাগজ প্রস্তুত করিরার মণ্ডের উপযোগী কাঠ, দিয়াশলাইয়ের উপযোগী কাঠ, তৈল বাহির করিবার উপযোগী বীজ; ১১। জঙ্গলের নানাবিধ কাঠ কি কি কাজে লাগে, (১) চাষের কাজের যোগ্য, (২) শিল্পে ও নানাবিধ কারিগরীর কাজের যোগ্য, (৩) ঘরবাড়ী ও ও আসবাব নির্ম্মাণের যোগ্য।

"জয়াজী-প্রতাপে"র এই সংখ্যাটিতে ৫২ পৃষ্ঠা লেখা আছে। সুতরাং এখানে সমুদয় কাগজখানির সার সংগ্রহ করিয়া দেওয়া অসম্ভব। কেবল ২।১টি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। চামড়া কস্ করিবার জিনিস যে যে গাছের ছাল, শিকড়, কাঠ, পাতা, ফল ও ফুল হইতে পাওয়া যাইতে পারে, এইরূপ ৪৫টি গাছের হিন্দুস্থানী নাম ও ইংরেজী উদ্ভিদবিদ্যায় প্রচলিত নাম দেওয়া হইয়াছে, এবং গাছের কোন্ অংশ হইতে কস্ পাওয়া যায়, তাহাও লিখিত হইয়াছে। খয়ের কোন্ কোন্ গাছ হইতে কি উপায়ে প্রস্তুত হয়, লেখা হইয়াছে। কাঠকে মণ্ডে পরিণত করিয়া তাহা হইতে সস্তা কাগজ প্রস্তুত হয়। কোন্ কোন্ কাঠ ও তৃণ হইতে গ্বালিয়রে কাষ্ঠমণ্ড প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা লিখিত হইয়াছে। এইরূপ দিয়াশলাইয়ের উপযোগী কাঠের তালিকা আছে। লাঙ্গল, বখর (harrow), চাউল প্রস্তুত করিবার উদূখল মুষল, কোলুর ঘানি, গাড়ীর ভিন্ন ভিন্ন অংশ, কূপের জল তুলিবার যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশ, ছড়ী, ছাতা, পেন্সিল, প্যাকিং বাক্স, বাদ্যযন্ত্র, খেলনা, কুঠার আদির বাঁট, পাল্কি চতুর্দ্দোল আদি, তাঁত, চরখা, চিরুনী, চামচ, আবখোরা, প্লেট, কড়ি বর্গা, দরজা কপাট, চেয়ার টেবিল, প্রভৃতি নির্ম্মাণের উপযুক্ত নানাবিধ গাছের তালিকা আছে।

বাংলা বিহার ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার জঙ্গলের এইরূপ নানাবিধ কাজের উপযোগী গাছ সম্বন্ধে যদি একখানি বাংলা বহি গবর্ণমেণ্ট বাহির করেন, তাহা হইলে ব্যবসায়ী লোকদের উপকার হইতে পারে। যাঁহারা "জয়াজী-প্রতাপে"র এই সংখ্যাটি দেখিতে চান, তাঁহারা ইংরেজীতে To the Manager, Jayaji Pratap, Gwalior, এই ঠিকানায় কাগজখানির Gwalior Forest Number চাহিবেন। মূল্য লেখা নাই; সুতরাং ভিঃ পিঃ ডাকে কত খরচ পড়িবে বলিতে পারিলাম না।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

গত মাসে কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের তৈলচিত্র বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদ-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইনি সদ্ভাব-শতক-প্রণেতা বলিয়া পরিচিত। আমরা বাল্যকালে বিদ্যালয়ে সদ্ভাবশতক পড়িয়াছিলাম। আমাদের আগে ও পরেও অনেকে পড়িয়াছেন। ইহাঁর অনেক কবিতা প্রবাদ-বচনের মত প্রচলিত; অনেকে জানেন না যে সেগুলি তাঁহার রচিত। যথা—

"যে জন দিবসে,　　মনের হরষে
জ্বালায় মোমের বাতি,
আশু গৃহে তার　　দেখিবে না আর
নিশিতে প্রদীপভাতি।"

"চিরসুখী জন　　ভ্রমে কি কখন,
ব্যথিতবেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে　　বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে?"

"কেন পান্থ! ক্ষান্ত হও হেরে দীর্ঘ পথ?
উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ?
কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে,
দুঃখ বিনা সুখলাভ হয় কি মহীতে?"

তৈলচিত্র-উন্মোচন-সভায় বিখ্যাত সাহিত্যসেবীরা আরও অধিক সংখ্যায় উপস্থিত থাকিলে ভাল হইত; কারণ, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মানুষটি নমস্য ছিলেন, কবি-প্রতিভাতেও তিনি হীন ছিলেন না।

"বিকশিত কামিনী-কুসুম-তরুতলে
বসিলাম চিন্তাসখী সহ কুতূহলে।"
স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

সভাস্থলে অনেকে তাঁহার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের আখ্যায়িকাগুলি বেশ লাগিয়াছিল। তাঁহার কবিত্বের প্রশংসা করিতে গিয়া ২।১ জন বক্তা সুবিবেচনা ও তাঁহার কবিতা সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিচয় দেন নাই। কাহারও প্রশংসা করিতে হইলে অন্য কতকগুলি লোকের নিন্দা করা একান্ত আবশ্যক নহে। ২।১ জন বক্তা কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কবিতার দেশীয় ভাবের প্রশংসা করিতে গিয়া আধুনিক ইংরেজীশিক্ষিত কবিদের কাব্যে বৈদেশিক প্রভাবের অস্তিত্ব ঘোষণা ও তাহার নিন্দা করিয়াছিলেন। জীবিত প্রাণী যে অবস্থায় বাস করে, তাহার প্রভাব যেরূপ অনুভব করে এবং তদনুসারে নিজের জীবনে ও আচরণে যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটায়, সেই অবস্থায় একটা পাথর তদ্রূপ ব্যবহার করে না। চারিদিকের অবস্থা ও ঘটনার প্রভাবে পরিবর্ত্তিত হওয়া এবং জ্ঞাতসারে নিজেকে পরিবর্ত্তিত করা, জীবনেরই লক্ষণ। সুতরাং ইংরেজীশিক্ষা-প্রাপ্ত কবিদের কাব্যে যে পাশ্চাত্য শিক্ষার ও আধুনিক কালের প্রভাব অনুভূত হয়, ইহা নিন্দার কথা নয়; তাহাতে ইহাই বুঝায় যে তাঁহারা জীবিত মানুষ, পাথর নহেন। অবশ্য, বিদেশী জিনিষ গ্রহণ করিয়া তাহাকে নিজের প্রকৃতির সামিল করিয়া দেশী আকারে তাহাকে প্রকাশ করিতে পারা বাঞ্ছনীয়। বিদেশী চিনি, বিদেশী চাউল, কিম্বা বিদেশী বেদানা আদি নানারকম ফল খাইয়া তাহা বমন করিয়া দিলে ভোক্তারও কোন শক্তিবৃদ্ধি হয় না, প্রতিবেশীদেরও ঘৃণা বোধ হয়। হজম করিতে পারিলে ভোক্তারও বল বাড়ে, প্রতিবেশীরাও একটি সুস্থ মানুষের সঙ্গসুখ ও সাহায্য পাইতে পারে। বিদেশী চিন্তা-ও-ভাব-রূপ মানসিক খাদ্যও হজম করিতে পারা চাই। বাছিয়া বাছিয়া ভাল বিদেশী ভাব ও চিন্তা গ্রহণ করায় কোন দোষ নাই; বহুশতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে উহা গ্রহণ করিতেন, তাহার প্রমাণ প্রাচীন ভারতীয় নানা গ্রন্থে আছে; উহা গ্রহণ করিয়া নিজের প্রকৃতির অঙ্গীভূত করিতে পারা চাই। যদি আধুনিক কোন কবি তাহা না পারিয়া থাকেন, তবে তাহা দোষের বিষয় বটে।

যাঁহারা কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের কবিতায় দেশীয় ভাবের প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সদ্ভাবশতক পড়িয়াছেন কিনা, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবনচরিত পড়িয়াছেন কিনা, জানি না। দেশীয় ভাব তাঁহার ছিল না, এমন কথা আমরা বলিতেছি না; কিন্তু তিনি বিদেশী জিনিষকে বেশ নিজের করিয়া লইয়াছিলেন। মজুমদার মহাশয় পারসীক কবি সাদী ও হাফিজের নিকট বিশেষভাবে ঋণী ছিলেন। তাঁহার অনেক কবিতা ফারসীর অনুবাদ, অনেকগুলি ফারসী-

সাহিত্য হইতে প্রাপ্ত ভাব ও চিন্তা লইয়া রচিত। যিনি কেবল মাত্র সদ্ভাবশতক পড়িয়াছেন, তিনিও ইহা জানেন। সদ্ভাবশতকের ১ম, ২য়, ৩য়, ১৪শ, ১৬শ, ১৭শ, ১৯শ, ২৪শ, ২৭শ, ৩১শ, ৩৭শ, ৪০শ, প্রভৃতি বিস্তর কবিতায় হাফিজের ভণিতা রহিয়াছে। পারস্য দেশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত নয়, ফারসী-সাহিত্যও ভারতীয় সাহিত্য নয়। কোন কবি ফারসী হইতে অনুবাদ করিয়া এবং ফারসী সাহিত্য দ্বারা সাক্ষাৎভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যদি কবিতা লেখেন, তাহা হইলে যদি তাহাতে দেশীয় ভাব আছে বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করা চলে, তবে ইংরেজী শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রভাব কি অপরাধ করিল? সত্য, কৃষ্ণচন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বাঙ্গলা ভাষায় লিখিয়াছেন, এবং তাঁহার বক্তব্যকে একটি দেশী রূপ দিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক ইংরেজী-শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙ্গালী কবিরাও ত বাঙ্গলায় লিখিয়াছেন, এবং তাঁহাদের রচনার রূপও দেশী। যদি সর্ব্বত্র পূর্ণমাত্রায় দেশী না হয়, তাহাতেই বা দোষ কি? আমাদের যে ঘরবাড়ী, তাহাও ত গথিক, গ্রীক, হিন্দু-সারাসেনিক, কত স্থাপত্যরীতির খিচুড়ী। তাহাতে আমাদের বাসের অসুবিধা হয় না, এরূপ অনেক অট্টালিকা সুন্দরও বটে। কামিজ, কোট, প্যাণ্টালুন, জুতা, বুট, সবই ত বিদেশী ধাঁচের, সাবেক রকমের যাহা তাহারও অনেকগুলা মোগল ও পারসীকদের অনুকরণ। তাহাতেও ত কাজ চলিতেছে। বাংলা সাহিত্যেও বিদেশ হইতে আমদানী চেহারা লইয়া চতুর্দ্দশপদী কবিতা এবং বিদেশ হইতে আমদানী অমিত্রাক্ষর ছন্দ বেশ চলিয়া যাইতেছে।

একজন বক্তা কৃষ্ণচন্দ্রের দেশীয় ভাবের প্রশংসা করিতে করিতে বাংলা কথায় মনের ভাব প্রকাশ করিতে না পারিয়া ইংরেজী appeal কথাটি ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলেন। আমরা ইহাকে একটা গুরুতর অপরাধ মনে করি না। কারণ বক্তা তাহার পর যে যে বাংলা কথা দ্বারা ঐ ভাবটি প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিলেন, তাহার কোনটি দ্বারাই appeal কথাটির মত তাহার মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত হইল না। ইহা হইতে বক্তা মহাশয়ও বোধ হয় বুঝিতে পারিবেন, যে, আজকাল কেবল দেশী দ্বারা সব কাজ চলে না। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সভাপতি মহাশয়ও তাঁহার বাংলা বক্তৃতায় advertisement, advertise প্রভৃতি ইংরেজী কথা ব্যবহার করিলেন; "আপনাকে জাহির করা," "বিজ্ঞাপন দেওয়া" প্রভৃতি কথা তিনি ব্যবহার করিতে পারিতেন। কিন্তু সম্ভবতঃ তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করার পক্ষে ইংরেজী কথাগুলিই বেশী উপযোগী মনে করিলেন, এবং হয় ত যে দোষের নিন্দা তিনি করিতেছিলেন তাহা তাঁহার মতে পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্যপ্রভাবাধীন সমাজেই বেশী, সুতরাং ইংরেজী কথাই সে স্থলে বেশী কাজে লাগে।

আত্মার জাতি নাই। উচ্চ অঙ্গের তত্ত্বকথা, উচ্চ অঙ্গের ভাব, চিন্তা, কবিত্ব, এ সকলে দেশভেদ, জাতিভেদ, বর্ণভেদ নাই। তাহা থাকিলে পাশ্চাত্যেরা উৎকৃষ্ট হিন্দুসাহিত্যের রস গ্রহণ করিতে ও তাহার আদর করিতে পারিত না, আমরাও পাশ্চাত্য উৎকৃষ্ট সাহিত্যের সমজদার হইতাম না। ভাল লেখকের লেখা পড়িতে পড়িতে কত বার মনে হয়, "ইনি ঠিক্ আমার প্রাণের কথা বলিয়াছেন।" যিনি আমার প্রাণের কথা বলিতে পারেন, তিনি বিদেশী, ভিন্নধর্ম্মী, ভিন্নভাষাভাষী হইলেও আমার নিজের লোক।

স্বদেশপ্রেম খুব ভাল জিনিষ। কিন্তু উহার বিকৃতি ব্যাধি ও ভাল নয়। বিদেশীর প্রতি বিদ্বেষ, অবজ্ঞা বা বিরাগ ভাল নয়। আমরা ইংরেজী শিখিয়া বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়া নূতন করিয়া বিশ্বজনীনতা প্রচার করিতেছি না; আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরাও বলিয়া গিয়াছেন—

"উদারচরিতানাস্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।"

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের কবিতাপাঠে হৃদয় আনন্দিত ও উন্নত হয়। তাঁহার জীবনচরিত হইতেও অনেক শিখিতে পারা যায়। তজ্জন্য শ্রীযুক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা "কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবনচরিত" পাঠ করা উচিত। আমরা তাঁহার যে ছবি দিলাম, তাহা ইন্দুপ্রকাশ বাবুর পুস্তকের ছবির অনুকৃতি।

মনের দেশ বিদেশ।

নানা দেশের লোকদের পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ন্যায় বা তর্কশাস্ত্র পড়িলে দেখা যায়, যে, সর্ব্বত্রই মানুষের মনের চিন্তার নিয়ম, যুক্তির প্রণালী একই রকম।

নানা দেশের সাধুদের উপদেশ-বাক্যেও খুব ঐক্য ও সাদৃশ্য দেখা যায়। ইহার কারণ, মূলতঃ মানুষের আত্মার, মানুষের হৃদয় মনের, জাতি নাই। সকলেরই অন্তরে ঐক্য আছে। মানুষের শরীর দেশে ও কালে আবদ্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু মন সর্ব্বত্র, সর্ব্বকালে বিচরণ করিতে পারে।

ইহা করিবার প্রয়োজনও আছে। মানুষ যদি সকল সময়ে ঘরের বদ্ধ বাতাসে বাস করে, তাহা হইলে তাহার শরীর ভাল থাকে না। বাহিরের মুক্ত বাতাস স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন। মানুষের মনও চিরকাল নিজের গ্রামের, নিজের দেশের, নিজের সমসাময়িক ভাব ও চিন্তা লইয়া নাড়াচাড়া করিলে সুস্থ থাকিতে ও শক্তিশালী হইতে পারে না, তাহার ভাবসম্পদ্ চিন্তার ঐশ্বর্য্য যেরূপ হইবার সম্ভাবনা, তাহা হয় না। বিকৃত স্বাদেশিকতার বশবর্ত্তী হইয়া কেহ, তর্কস্থলে, জনতার হাততালির লোভে, মুখে ইহা অস্বীকার করিলেও কার্য্যতঃ ইহা শিক্ষিত লোকেরা স্বীকার করেন। যদি আমরা বিদেশী কোন ভাব ও চিন্তাই লইব না, তাহা হইলে বিদেশী দর্শন ও সাহিত্যাদি কলেজে পড়ি কেন? পাশ করিয়া টাকা রোজগার করিবার জন্য পড়ি, বলিলে, আংশিক সত্য বলা হইবে, সম্পূর্ণ সত্য বলা হইবে না। কারণ, মোটের উপর ইংরেজীশিক্ষিত লোকদের চেয়ে ইংরেজী-না-জানা ব্যবসাদারেরা বেশী উপার্জ্জন করে। কিন্তু ইংরেজীশিক্ষিতদের সম্মান বেশী, কারণ তাহাদের জ্ঞান বেশী; এবং তাহাদের এই জ্ঞান প্রধানতঃ বিদেশী ভাব ও চিন্তার সমষ্টি।

চলিত ধারণা অনুসারে আমরা ভাব ও চিন্তাকে দেশী বা বিদেশী বলিলাম। কিন্তু প্লেটোর যে চিন্তা আমিও করিতে পারি, শেক্সপিয়রের যে ভাব আমার হৃদয়েও উঠে, তাহা আর শুধু বিদেশী রহিল কেমন করিয়া? তাহা দেশীও হইয়া গেল। সংস্কৃত সাহিত্যের যে-সব ভাব ও চিন্তা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ধারণা ও গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের দেশেরও সম্পত্তি হইয়া গিয়াছে। পারস্যের গোলাপ ও বুল্‌বুল্ এখন ভারতবর্ষেরও বটে। গোলআলু এখন আর বিদেশী জিনিষ নয়। বসুন্ধরা যেমন বীরভোগ্যা, উৎকৃষ্ট ভাব ও চিন্তাও তেমনি যে-দেশে যে-ভাষাতেই থাক, তাহা মনস্বীর ন্যায্য অধিকারভুক্ত।

ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমরা গত সংখ্যায় যখন এলাহাবাদের মাননীয় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গুণ কীর্ত্তন করিতেছিলাম, তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে এত শীঘ্র তিনি দেহত্যাগ করিবেন। কিন্তু মানুষ যাহা ভাবে না, তাহাও অহরহ পৃথিবীতে ঘটিতেছে। তিনি ৮ দিনের জ্বরে রক্ত বিষাক্ত হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। একটা ফোড়াও হইয়াছিল। তিনি অনেক বৎসর হইতে বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছিলেন। আঠার মাস পূর্ব্বে তাঁহার বড় ভাই মারা যান। এখন তিনিও গেলেন তাঁহার পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণীকে যে কি শোক পাইতে হইল, ভাষায় তাহা বর্ণনা করা যায় না।

সতীশচন্দ্র ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ২০ শে জুন আগ্রায় জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪৪ বৎসরও পূর্ণ হয় নাই। অকালে আমাদের দেশের অনেক কৃতী পুরুষের মৃত্যু হয়। ইংরেজেরা শীতপ্রধান দেশের লোক; গ্রীষ্মপ্রধান ভারতে বাস করিয়াও তাহারা দীর্ঘজীবী হয় এবং অনেক বয়স পর্য্যন্ত কার্য্যক্ষম থাকে। অতএব কেবল জলবায়ুর দোষ দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। জলবায়ু ছাড়া ব্যক্তিগত, শিক্ষাগত, পারিবারিক, সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক কি কি কারণে আমাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ ও আয়ুহ্রাস হয়, তাহা নির্দ্ধারিত হওয়া চাই, এবং প্রতিকার কি কি উপায়ে হইতে পারে, তাহা নিরূপিত হওয়া চাই। জলবায়ুর উৎকর্ষসাধনও মানুষের সাধ্যাতীত নহে। তাহা ইটালী, পানামা, প্রভৃতি নানাদেশে প্রমাণিত হইয়াছে।

সতীশচন্দ্র ১৫ বৎসর বয়সে আলিগড় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি বি-এ পরীক্ষায় ইংরেজীতে এলাহাবাদ ও কলিকাতা উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ ছিলেন, এবং কলিকাতার প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি প্রাপ্ত হন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনিই প্রথমে আইনের পরীক্ষা দিয়া সর্ব্বোচ্চ এল্‌এল্-ডী উপাধি প্রাপ্ত হন, এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টের এডভোকেট হন। তিনি কিছুকাল হুগলী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন।

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পাইয়া তিনি সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে একটি উৎকৃষ্ট দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন। উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর আইন-অধ্যাপক নির্ব্বাচিত হইয়া স্পেসিফিক্ রিলীফ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাগুলি ১৫০০ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি পুস্তকের আকারে মুদ্রিত হইয়াছে। তাহা

একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ বিবেচিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত তিনি কলেজপাঠ্য অনেকগুলি ইংরেজী সাহিত্যিক ও দার্শনিক পুস্তকের উৎকৃষ্ট সটীক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিন্দুস্তান রিভিউ, মডার্ণরিভিউ, ইণ্ডিয়ানরিভিউ, প্রভৃতি মাসিক পত্রে মুদ্রিত তাঁহার ইংরেজী প্রবন্ধগুলি সাদরে পঠিত হইত। প্রবাসীতে তিনি কয়েকটি বাংলা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ভক্তিভাজন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "স্বপ্নপ্রয়াণ" কাব্যের একটি বিস্তৃত সমালোচনা তিনি এই গ্রীষ্মকালে পাহাড়ে গিয়া লিখিবেন, কিছু দিন পূর্ব্বে আমাদিগকে এই কথা লিখিয়াছিলেন। কয়েকমাস পূর্ব্বে আর-একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, যে, সমসাময়িক ঘটনাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর রাখিতে কিম্বা সমসাময়িক নানা রাজনৈতিক ব্যাপারের আলোচনা করিতে তাঁহার তত ভাল লাগে না। লিখিয়াছিলেন, গ্রীক নাট্যকারদের প্রাচীন নাটকগুলি পড়িয়া খুব আনন্দ পাই; গ্রীক জানি না, সুতরাং সেগুলির যত উৎকৃষ্ট ইংরেজী অনুবাদ আছে, সমস্ত সংগ্রহ করিয়া পড়িতেছি। গ্রীক ট্র্যাজিডিগুলি সম্বন্ধে মডার্ণরিভিউতে তিনি প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

তাঁহার পিতা স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ছোট আদালতের জজ ছিলেন। তিনি এক সময়ে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের প্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সতীশ বাবুর মাতা চিরকাল হিন্দুধর্ম্মে অনুরাগিনী। ব্রাহ্মসমাজের সহিত অবিনাশ বাবুর যোগ স্থায়ী হয় নাই, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা বরাবরই ছিল। সতীশ বাবুর এলাহাবাদস্থ বাটীতে অনেক বৎসর হইতে দুর্গোৎসব হইয়া আসিতেছে। ইহাতে সতীশ বাবু পূর্ণমাত্রায় যোগ দিতেন। আমরা যখন এলাহাবাদে কায়স্থ পাঠশালায় কাজ করিতাম, তখন হালিশহরের স্বর্গীয় দীননাথ গাঙ্গুলী মহাশয় তথায় ভারতবর্ষের বিখ্যাত লোকদের স্মরণার্থ বার্ষিক সভা আহ্বান করার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। এইরূপ একটি রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভায় সতীশ বাবু তাঁহার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহা ইংরেজী কায়স্থ-সমাচার মাসিকপত্রের প্রথম বৎসরের এক সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। প্রবন্ধে সতীশ বাবু বলেন যে তাঁহার মতে রামমোহন রায়ের যে হিন্দু ধর্ম্ম তাহাই প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্ম।

সতীশ বাবুর পিতা চরিত্রবান্ লোক ছিলেন। মাতা ঠাকুরাণীও ধর্ম্মপরায়ণা ও নিষ্ঠাবতী। ইঁহাদের সদ্‌গুণ সতীশবাবুর চরিত্রে পরিস্ফুট হইয়াছিল। তাঁহার নম্রতা তাঁহার পাণ্ডিত্যেরই অনুরূপ ছিল। তিনি বড় অমায়িক, সরল, মৃদু ও শান্ত স্বভাবের লোক ছিলেন। পরোপকারে তিনি খুব আনন্দ পাইতেন। তিনি আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ স্বামী ও আদর্শ পিতা ছিলেন।

তাঁহার মাতা অবরোধ-প্রথার পক্ষপাতী নহেন। সতীশ বাবুও ইহার পক্ষপাতী ছিলেন না। কিছুকাল পূর্ব্বে এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূর একখানি পুস্তক সমালোচনা উপলক্ষে সতীশবাবু বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন, এবং এ বিষয়ে তাঁহার আচরণ ঐ মতের অনুযায়ী না হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেন। স্নেহলতার মৃত্যুর পর তিনি পণগ্রহণ প্রথার বিরুদ্ধে হিন্দীতে একটি উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে অনুলোম প্রতিলোম বিবাহ আইনসঙ্গত করিবার জন্য বড়লাটের সভায় যে আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করেন, সতীশ বাবু তাহার সপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই মত মডার্ণরিভিউতে প্রকাশিত তাঁহার রচিত একটি প্রবন্ধে ব্যক্ত হইয়াছিল।

তিনি আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের অন্যতম রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। তথাকার প্রাদেশিক রাজনৈতিক কন্‌ফারেন্সে সভাপতির কাজ করিয়াছিলেন। প্রাদেশিক শিল্পসম্বন্ধীয়

কন্‌ফারেন্সেরও তিনি সভাপতি হইয়াছিলেন। এখন এলাহাবাদে লীডার নামে যে ইংরেজী দৈনিক কাগজ আছে, তাহা একটি যৌথ কারবার। সতীশ বাবু এই কাগজের সঙ্কটকালে ৪ বৎসর পূর্ব্বে এই কোম্পানীর অন্যতম পরিচালক (director) হন, এবং তখন হইতে উহার পরিচালক-সমিতির সভাপতি ছিলেন। ইহাতে তাঁহাকে অনেক টাকা ফেলিতে হইয়াছে। লীডারের পূর্ব্বে এলাহাবাদে ইণ্ডিয়ান পীপল্ নামে যে কাগজ ছিল, তাহা শেষ তিন বৎসর চালাইবার জন্য সতীশ বাবু কয়েক হাজার টাকা ক্ষতি সহ্য করিয়াছিলেন। তিনি কর্ত্তব্য-বোধে ইহা করিয়াছিলেন; লাভ বা নামের আশায় করেন নাই। নাম অন্যের হইয়াছে। তিনি যে ইহাতে এত টাকা লোকসান দিয়াছিলেন, তাহা অল্প লোকেই জানিত। বেহারের মিঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ আমাদের প্রবর্ত্তিত কায়স্থসমাচারের (বর্ত্তমান হিন্দুস্তান রিভিউএর) যখন ভার লন, তখন প্রথম অবস্থায় সতীশবাবু সম্পাদন কার্য্যে এবং লেখা দিয়া তাঁহার অনেক সাহায্য করেন। সতীশ বাবু খুব বড় উকীল ছিলেন। বোধ হয় আইনবিদ্যায় তাঁহার মত পণ্ডিত পশ্চিম অঞ্চলে কেহ ছিল না। এলাহাবাদ জার্ণেল নামক আইনের কাগজের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। স্বদেশীতে তাঁহার উৎসাহ ছিল। এজন্য তাঁহার বিস্তর অর্থনাশও হইয়াছে। স্ত্রীশিক্ষার জন্য তিনি অর্থ ব্যয় করিতেন, সময়ও দিতেন। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের সমুদয় অধিবাসীর হিতকর নানা কাজের সহিত তাঁহার যেমন যোগ ছিল, প্রবাসী বাঙ্গালীদের হিতকর কার্য্যের সহিতও তাঁহার তেমনি যোগ ছিল।

তিনি যে বাঙ্গালী ছিলেন, ইহা কখন বিস্মৃত হন নাই; কিন্তু ইহাও বিস্মৃত হন নাই যে তিনি আগ্রা-অযোধ্যার অধিবাসী ও ভারতসন্তান। তিনি হিন্দু ছিলেন; কিন্তু অহিন্দুবিদ্বেষ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি দেশের প্রায় সমুদয় সৎকার্য্যে টাকা ও সময় দিতেন, কিন্তু কখন নামের আশায় কিছু করিতেন না। তিনি অতিশয় অনাড়ম্বর, সরল লোক ছিলেন।

৪৪ বৎসর বয়স ইউরোপে মানুষের উঠতি বয়স, পূর্ণ-শক্তি লাভের, মনুষ্যত্বের জোয়ারের বয়স। এমন বয়সে কৃতী, বিদ্বান, সৎকর্ম্মোৎসাহী ভারতসন্তানের মৃত্যু গভীর পরিতাপের বিষয়।

সতীশবাবু শ্যামবর্ণ, দীর্ঘকায় পুরুষ ছিলেন। তাঁহার চক্ষু দেখিলেই তাঁহাকে অতি ভদ্র, বুদ্ধিমান্ ও মানব-প্রেমিক বলিয়া বুঝা যাইত। তাঁহার চালচলনে যেমন সৌজন্য ও নম্রতার পরিচয় পাওয়া যাইত, তেমনই ইহাও বুঝা যাইত যে তিনি স্বাধিকারী (self-possessed) এবং নিজের শক্তিসামর্থ্যে তাঁহার বিশ্বাস আছে। মানুষের নানা সখ থাকে। তাঁহার দুটি সখের কথা আমরা জানি। এক শিকার। আর-এক ফোটোগ্রাফী। ফোটো-গ্রাফীর দ্বারা চিত্রকলার অনুশীলন সম্বন্ধে তিনি প্রবাসীতে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

আমরা তাঁহার জীবনচরিত লিখিবার চেষ্টা করিলাম না। তাড়াতাড়ি তাহা হইতে পারে না। তাঁহার নানা-বিষয়ক মতের আলোচনাও করিলাম না। কেবল তাঁহার সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া মানুষটি কি রকমের ছিলেন তাহারই কিছু আভাস দিতে চেষ্টা করিলাম।

সমালোচনায় শাদা ও কালো।

আমাদের কলেজগুলিতে সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস ও অন্যান্য বিদ্যার যে-সকল ইংরেজী বহি পড়ান হয়, তাহার প্রায় সবগুলিই খ্রীষ্টিয়ানের, অন্ততঃ পক্ষে অহিন্দুর ও অমুসলমানের, রচিত। লেখকেরা শ্বেতকায়। অনেক স্থলেই ভারতবর্ষীয় অধ্যাপকেরা এই-সকল বহি পড়ান।

জাতিভেদে ও ধর্ম্মভেদে বিজ্ঞান নানা রকম হয় না; দর্শনে পার্থক্য হয় বটে, এবং সাহিত্যে আরও বেশী হয়।

বিদ্যামন্দিরগুলিতে দর্শন পড়াইবার সময় ভারতবর্ষীয় অধ্যাপকেরা দার্শনিকবিশেষের মত ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত, যুক্তিসঙ্গত কি অযৌক্তিক, তাহাই দেখেন, এবং তদনুসারে শিক্ষা দেন। দার্শনিক যদি অধ্যাপক বা ছাত্রদিগের সমধর্ম্মী না হন, তাহা হইলে তজ্জন্য তাঁহাকে বিদ্রূপ করা হয় না, তাঁহাকে হেয় মনে করা হয় না, বা তাঁহার সম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধ ভাব পোষণ বা উত্তেজন করা হয় না।

সাহিত্য পড়াইবার ও পড়িবার সময়ও এই শ্রেষ্ঠ রীতির অনুসরণ করা হয়। শেক্সপীয়রের নাটকে নাটকের গুণ কি আছে, সাহিত্য হিসাবে সেগুলি কিরূপ, তাহাই দেখা হয়। হিন্দু ও মুসলমান অধ্যাপক ও ছাত্রগণ, শেক্সপীয়র ভিন্নধর্ম্মী ছিলেন বলিয়া, তাঁহার প্রতি একটুও বিরূপ হন না।

বিলাত হইতে রাশি রাশি ইংরেজী খবরের কাগজ, মাসিক পত্র, ত্রৈমাসিক পত্র, উপন্যাস প্রতি সপ্তাহে এ দেশে আসিতেছে। তাহাদের লেখক ও সম্পাদকেরা প্রায় সকলেই খৃষ্টিয়ান। হিন্দু মুসলমান পাঠকগণ এই-সমস্ত পয়সা দিয়া ক্রয় করেন ও পড়েন। উহাদের রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক উৎকর্ষ অপকর্ষ অনুসারে তাহাদের আদর বা অনাদর করেন। লেখক বা সম্পাদক যে ভিন্নধর্ম্মী তাহা গণনার মধ্যে আসে না।

এইরূপই হওয়া উচিত।

কিন্তু আমাদেরই দেশে লিখিত ও মুদ্রিত পুস্তক-পত্রিকাদি সম্বন্ধে অনেক সমালোচক ও পাঠকের মনের ভাব ঠিক এরূপ নয়। এখানকার কোন্ লেখাটির, কোন্

পুস্তকটির দার্শনিক মূল্য বা সাহিত্যিক উৎকর্ষ কিরূপ, তাহার আগেই অনেক স্থলে, প্রকাশ্যভাবে বা গোপনে, ইহাই বিবেচিত হয়, যে লেখক বা সম্পাদক কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী বা কোন্ দলের। অমুক ব্যক্তি আমাদের সম্প্রদায়ের লোক নয়, অতএব তাহার কাগজে লিখিও না, বা তাহার বহি অপাঠ্য, এরূপ কথা সভায় বৈঠকে শোনা গিয়াছে। এই শ্রেণীর সমালোচকেরা অবশ্য জানেন, যে, বিলাত হইতে যে-সব কাগজ ও বই আসে, সেগুলি শুদ্ধাচারী হবিষ্যান্নভোজী নৈকেষ্য-কুলীন-সন্তানের লেখা নহে। শিক্ষিত মুসলমানেরা বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চা বেশী করেন না। যাঁহারা করেন, তাঁহাদের অনেকে হিন্দু লেখকদের প্রতি সদয় নহেন। তাঁহারা বিলাতী কাগজ ও বহি অবশ্য পড়েন। কিন্তু তাঁহারা ইহা জানেন যে ইউরোপীয় লেখকেরা হিন্দু লেখকদের চেয়ে মুসলমানদের প্রতি অধিক সুবিচার করেন নাই এবং তাঁহারা ইস্‌লাম্‌বিশ্বাসী সৈয়দও নহেন।

বিলাতী জিনিষ ও দেশী জিনিষ সম্বন্ধে এই যে প্রভেদ করা হয়, ইহার কারণ কি ? ইহা কি কল্যাণকর ? বিদেশী লেখকদের সম্বন্ধে যে সুবিবেচনা করা হয়, দেশী লেখকদের সম্বন্ধে তাহা না করা কি আমাদের আত্মমর্য্যাদার পরিচায়ক ?

যদি বলেন, ভিন্নধর্ম্মীদের যে লেখাই পড়া যাক্ না তাহাতে আমাদের ছেলেমেয়েরা বিগড়াইবে, সমাজে বিপ্লব ঘটিবে, অতএব তাহা পড়া উচিত নয়; তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, শৈশব হইতে ২২।২৩ বৎসর পর্য্যন্ত, বিলাত হইতে আগত, ভিন্নধর্ম্মীর লিখিত, বহুসংখ্যক পুস্তক পড়িলে ও কণ্ঠস্থ করিলে ছেলেরা বিগড়ায় কি না, সমাজে বিপ্লব ঘটে কি না ? যদি বলেন, হাঁ, তাহা হইলে ইংরেজী শিক্ষা বন্ধ করেন না কেন ? যদি বলেন, না, তাহা হইলে, ভিন্নধর্ম্মী ভারতবাসীর লেখা পড়িলেই দোষ হয়, ভিন্নধর্ম্মী বিদেশীর লেখা পড়িলে হয় না, ইহা বলিলে লোকে হাসিবে। যাহাতে অনিষ্ট হয়, তাহা পেটের দায়ে পড়াই ও পড়ি, ইহা বলিলে সম্পূর্ণ সত্য কথা বলা হইবে না, এবং একথা বলিতে লজ্জিত হইবেন না এরূপ লোক কয়জন আছেন জানি না।

এখানে ঠিক্ প্রাসঙ্গিক না হইলেও বলা দরকার, যে, সব সামাজিক পরিবর্ত্তন যেমন ভাল নয়, তেমনি সামাজিক পরিবর্ত্তন মাত্রেই অকল্যাণকর নহে। ইংরেজদের ও মুসলমানদের ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে ভাল মন্দ দুই রকমের অসংখ্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।

জাতিধর্ম্মবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার করা অতি দুঃসাধ্য কাজ কিন্তু এই রকমের ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিতে চেষ্টা করা দুঃসাধ্য নহে। কিন্তু আমাদের দেশের অনেক নামজাদা লোকও, ইংরেজ এই রকম ন্যায্য ব্যবহার করেন না বলিয়া তাঁহার সমালোচনা করেন, অথচ নিজেরা ন্যায়পরায়ণ হইতে চেষ্টাও করেন না। এই শ্রেণীর সমালোচকেরা কৃপাপাত্র। তাঁহাদের এক চমৎকার রীতি আছে—যে আমার ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বা রাজনৈতিক দলের লোক নয়, কিম্বা আমার খোসামোদ করে না, তাহার সম্বন্ধে নির্ব্বাক্ থাকিব; তাহাকে চাপা দিব।

কিন্তু শক্তি চাপা থাকে না, সত্যও চাপা থাকে না। কারণ, সুখের বিষয়, সত্য ও শক্তিকে চিনিবার লোক বিধাতা সব দেশে সব যুগেই সংসারে পাঠাইয়া থাকেন। সামান্য নিন্দা বিদ্রূপ ত তুচ্ছ কথা, প্রাণনাশের সম্ভাবনা সত্ত্বেও লোকে সত্যকে শক্তিকে চিনিয়াছে ও স্বীকার করিয়াছে।

অনেকে পুস্তক লেখার এবং কাগজ সম্পাদনের ব্যবসার দিক্‌টা খুব বড় করিয়া দেখেন, উহাই গ্রন্থকার ও সম্পাদকদিগের একমাত্র বা মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করেন; সুতরাং যেন তেন প্রকারেণ অপ্রিয় জনের "অন্ন মারিবার" চেষ্টা করেন। কিন্তু অন্নই যাহাদের প্রধান লক্ষ্য, তাহাদেরও ইহাতে ভয় পাইবার কারণ নাই। কেননা, প্রবাদ বাক্য অনুসারে, গ্রাম্য ভিক্ষুক যদি স্বগ্রামে ভিক্ষা না-ই পায়, ভিন্ন গ্রামে ত পাইতে পারে। সাহিত্য-জগতেও একাধিক গ্রাম আছে।

পঞ্জাবে উপদ্রব।

কয়েকমাস পূর্ব্বে হইতে পঞ্জাবের মুলতান, ঝাং, ও মুজফ্‌ফরগড় জেলায় খুব ডাকাতি, হাজার হাজার টাকার জিনিষ লুট ও মহাজনদের অনেক হাজার টাকার ঋণদানের দলিল ও খাতাপত্র ধ্বংস, গৃহদাহ, স্ত্রীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচার, চলিয়া আসিতেছিল। দলবদ্ধ ভাবে, প্রকাশ্য স্থানে, দিবালোকে, কখন কখন আগে হইতে খবর দিয়া, অনেক জায়গায় এই-সব অত্যাচার হইয়াছে। বেলজিয়ামে জার্ম্মেনরা যে যে অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে তৎসম্বন্ধে সত্য নির্ণয়ের জন্য লর্ড ব্রাইসের সভাপতিত্বে এক কমিটি বসিয়াছিল। অন্যান্য পৈশাচিক ব্যাপারের মধ্যে তাঁহারা এরূপ প্রমাণ পাইয়াছেন যে জার্ম্মেনরা প্রকাশ্য স্থানে দিনের বেলায় স্ত্রীলোকদের পুরুষ আত্মীয়দের সম্মুখে তাহাদের সতীত্ব নাশ করিয়াছে। যুদ্ধের অন্যান্য আসুরিক ও পৈশাচিক ব্যাপারের মধ্যে হাজার হাজার বেলজীয় নারীর যে চরম দুর্গতি হইয়াছে, পঞ্জাবে এই-সব জেলায় শান্তির সময়ে বহুসংখ্যক নারীর সেই লাঞ্ছনা হইয়াছে।

অত্যাচারীরা মুসলমান, এবং অত্যাচরিতেরা হিন্দু। এই-সব জায়গায় পুলিশ কর্ম্মচারীরা বেশীর ভাগ মুসলমান। ইহা সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের সহিত সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের ঝগড়া নহে। আমরা কেবল যাহা ঘটিয়াছে, এবং যে

অবস্থায় ঘটিয়াছে, তাহাই বলিতেছি। অত্যাচারীরা বলিয়াছে, এখন ইংরেজের মুলুক আর নাই, জার্মেনরা রাজা হইয়াছে। নূতন "ভারতবর্ষ-রক্ষা" আইন অনুসারে অপরাধীদের বিচার হইতেছে। শত শত লোক ধৃত হইতেছে, কিন্তু অধিকাংশই প্রমাণ অভাবে খালাস পাইয়াছে। খালাস পাইয়া তাহারা আবার হিন্দুদিগকে শাসাইয়া বেড়াইতেছে। এই-সকল ব্যাপারে ভীত হইয়া পঞ্জাবের হিন্দুসভা তথাকার ছোটলাটকে তাঁহাদের আতঙ্কের কথা জ্ঞাপন করেন, এবং সুবিচার ও ভবিষ্যতে অত্যাচার হইতে রক্ষিত হইবার প্রার্থনা করেন। দারভাঙ্গার মহারাজাও হিন্দুদের পক্ষ হইতে ছোটলাট সাহেবকে অনেক কথা বলেন। ছোটলাটসাহেব হিন্দুসভার প্রতিনিধিদিগকে সিমলায় বলিয়াছেন যে ইতিমধ্যে ৪২০ জনের গড়ে ৫ বৎসর করিয়া কারাদণ্ড হইয়াছে। তিন জেলাতেই পুলিশের বল বৃদ্ধি করা হইয়াছে। আত্মরক্ষার জন্য সম্ভ্রান্ত লোক-দিগকে অস্ত্র রাখিবার অনুমতি দেওয়া হইতেছে। বদ্-মায়েসদের নিকট হইতে জামিন লওয়া হইতেছে। কয়েক-জন লোক আইনভঙ্গে উত্তেজনা দিয়াছিল বলিয়া সন্দেহ হওয়ায় তাহাদিগকে "ভারতবর্ষরক্ষা" আইন অনুসারে জেলা হইতে সরাইয়া ফেলা হইতেছে। যে-সব রাজকর্ম্মচারী অত্যাচার সম্বন্ধে নিজের কর্ত্তব্য করিতে পারে নাই বলিয়া শুনা যায়, তাহাদের কার্য্যাকার্য্য সম্বন্ধে তদন্ত হইতেছে। প্রধান প্রধান পলাতক আসামীদিগকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য বেশী বেশী টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে। উপদ্রবের জায়গাগুলিতে নিগ্রহ-পুলিশ বসাইবার প্রস্তাব বিবেচিত হইতেছে। নিগ্রহ-পুলিশের খরচ নিরপরাধ লোকদের উপর না পড়িয়া অপরাধী শ্রেণীর লোকদের উপরই যাহাতে পড়ে তদ্রূপ ব্যবস্থা করা হইবে।

পঞ্জাব-সীমান্তে বহু বৎসর হইতে স্বাধীন বা অর্দ্ধস্বাধীন পাঠানেরা ব্রিটিশশাসিত গ্রামে আসিয়া লুট খুন প্রভৃতি করে। তাহারা হিন্দুদের উপরই এইরূপ অত্যাচার করে। গবর্ণমেণ্ট অনেক সময় দস্যুদিগকে ধরিতে সমর্থ হন ও শাস্তি দেন।

গবর্ণমেণ্ট যাহা করেন ও করিতে পারেন, তাহা ভাল; কিন্তু তা ছাড়া হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই এ বিষয়ে কর্ত্তব্য আছে। হিন্দুরা কি প্রকারে সবল ও আত্মরক্ষায় সমর্থ হইতে পারেন, তাহার উপায় অবলম্বন করা তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের তাঁহাদের সাহায্য করা উচিত। মৌলবী আব্দুল করীম্ সাহেব সেদিন এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে কোরান-শরীফে স্ত্রীলোকের সতীত্বনাশ প্রভৃতি পাপের ভীষণ শাস্তির ব্যবস্থা আছে শিক্ষিত মুসলমানগণ প্রধানতঃ খৃষ্টিয়ান সমালোচকদিগের কথার উত্তরে কোরান-শরীফ ও মুসলমান ইতিহাস হইতে দেখাইয়া থাকেন যে মুসলমানদের নারীর সম্বন্ধে ধারণা হীন নহে। ইহা আমরা অবিশ্বাস করি না কিন্তু ইহাও দেখিতেছি যে দুশ্চরিত্র মুসলমানদের দ্বারা নারীর ধর্ম্মনাশের সংবাদ কাগজে প্রায়ই বাহির হয়। তাহাদের অনেকে দণ্ডিত হয়। শিক্ষিত ভদ্র সচ্চরিত্র মুসলমানেরা বদ্মায়েসদের কাজের অনুমোদন করেন, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু সাধারণ মুসলমানদের সামাজিক মত এ-সব বিষয়ে কিরূপ, তাহাই বিবেচ্য। যদি তাহা কোরানের অনুরূপ বা আশানুরূপ না হয়, তাহা হইলে মুসলমান সমাজের নেতারা তাঁহাদের শাস্ত্রানুযায়ী সামাজিক মত গঠন ও সামাজিক শাসন প্রবর্ত্তিত করিতে কি প্রকার চেষ্টা করিতেছেন, আমরা তাহা জানিতে পারিলে সুখী হইব।

পূর্ব্ববঙ্গে স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার।

সংবাদপত্র পড়িয়া এবং আদালতে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাম হইতে আমাদের এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছে যে পঞ্জাব পূর্ব্ববঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চলে যে-সব দুর্বৃত্ত লোক স্ত্রীলোকদের উপর অত্যাচার করে, তাহাদের মধ্যে মুসল-মানের সংখ্যা এত বেশী যে তাহারা প্রায় সকলেই মুসলমান হঠাৎ এইরূপ মনে হয়। অশিক্ষিত দুশ্চরিত্র নিম্নশ্রেণীর লোক সব সম্প্রদায়েই আছে। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর মুসলমান-দের মধ্যেই এই পাপের এত আতিশয্য কেন, তাহা ভদ্র সচ্চরিত্র মুসলমানদিগের চিন্তনীয়। সামাজিক মত গঠন তাঁহারাই করিতে পারেন।

নারীদের রক্ষার জন্য সকলেরই যথোচিত ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা নারীকে রক্ষা করিতে পারিবেন না, তাঁহাদের পৃথিবী হইতে লুপ্ত হওয়াই ভাল। শুনিতে পাই, অনেক যুবক প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া গর্হিত দস্যুতা করে! নারীর সতীত্ব রক্ষা-রূপ যে অতি মহৎ ও একান্ত প্রয়োজনীয় সাধুকার্য্য, তাহা করিবার জন্য মানুষ মিলিবে না কি?

বঙ্গনারীগণও আত্মরক্ষার জন্য কোমর বাঁধুন। আত্ম-রক্ষার জন্য দা বঁটি যে-কোন অস্ত্র থাকে তাহা চালাইতে ধর্ম্মও নিষেধ করেন না, আইনও নিষেধ করেন না। নারী আপনাকে অবলা মনে করিবেন না। তিনি শক্তি।

গাধা ও ফুলবাগান।

গর্দ্দভ পুষ্পোদ্যানে গিয়া বলিল, "মানুষ বড় মূর্খ, পয়সা খরচ করিয়া ফুলগাছ রোপণ করে। আমি বাগানের মালিক হইলে এখানে কেবল ঘাস ও খড় রাখিতাম।" গাধার মনে ছিল না যে মানুষ ঘাস ও খড়ের জন্যও জমী রাখিয়াছে।

ইতিহাসের ক্রম

আমি বিজ্ঞান-ব্যবসায়ী; কিন্তু ইতিহাসের ক্রম খুঁজিতে যাইতেছি। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কথা। কিন্তু ইতিহাস-বেত্তা নই বলিয়াই ইতিহাস জানিতে চাই। কেমন ইতিহাস চাই, ইহার কি ক্রম হইলে জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হইতে পারে, তাহা বলিতেছি।

ইতিহাস শব্দের ব্যাপক অর্থ ধরিলে বিজ্ঞানেও, আধুনিক ভৌতিক বিজ্ঞানেও, ইতিহাস আছে, এবং ইতিহাসে বিজ্ঞান না থাকিলেও বৈজ্ঞানিক মার্গ আছে। ইতিহাস শব্দের মূলে ইতিহ অর্থাৎ পারম্পর্য্য-উপদেশ। ইতিহ—ইতি এই, হ নিশ্চয়ে। এই বটে,—এই অর্থে ইতিহ। ইতিহ + আস—এইরূপই ছিল, ইহাই হইয়াছিল। এই ছিল, এই হইয়াছিল; অতএব ইতিহাসের নামান্তর পুরাবৃত্ত, পূর্ব্বকালের বৃত্তান্ত। মহাভারত ইতিহাস, অর্থাৎ মহাভারতে যাহা বর্ণিত আছে, তাহা ছিল হইয়াছিল। মহাভারত পুরাকালের এক বৃত্তান্ত।

পুরাণও পুরাকালের বৃত্তান্ত। পুরাণ অর্থাৎ নূতন নহে। লোকে পুরাকালের যে বৃত্তান্ত শুনিয়া আসিতেছে তাহা পুরাণ। বহু পূর্ব্বকালের কথা লোক-পরম্পরায় যাহা শুনিয়া আসিতেছি তাহা পুরাণ। অতি পুরাকালে পৃথিবী জলময় ছিল, ইহা লোক-পরম্পরায় শুনিয়া আসিতেছি। সে কথা কেহ লিখিয়াছেন, পুরাণ রচনা করিয়াছেন।

ব্যাসদেব অষ্টাদশ পুরাণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইহার অর্থ, তিনি যাহা পড়িয়াছিলেন, শুনিয়াছিলেন, তাহা অষ্টাদশ গ্রন্থে নিজের ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। যে-সময়ে তিনি ছিলেন, লিখিয়াছিলেন, সে-সময়ে অপর পুরাণকথা ছিলনা, এমন নহে। তিনি যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা লিখিয়াছেন। যাহা শুনিয়াছিলেন সবই লিখিয়াছেন, কিংবা অবিকল লিখিয়াছেন, এমনও না হইতে পারে। যত কথা শুনিয়াছিলেন, হয়ত সব লেখেন নাই, লেখার প্রয়োজন মনে করেন নাই।

তিনি শোনেন নাই, অন্যে শুনিয়াছিলেন, এমন কথাও ছিল। অন্যে সে-সব লইয়া অন্য পুরাণ লিখিয়াছেন। ব্যাসের তিরোভাবের পরে অপর পুরাতন কথা শোনা গিয়াছে। অন্যে সে-কথা লইয়া পুরাণ লিখিয়াছেন। এ-গুলার নাম উপ-পুরাণ, অর্থাৎ অধিকপুরাণ, ব্যাসের পুরাণের অতিরিক্ত। ব্যাস যত মান্য ছিলেন, তিনি যত অনুসন্ধান করিয়া লিখিয়াছিলেন, অন্য পুরাণ-লেখক তত মান্য ছিলেন না, তত করেন নাই। এইহেতুও ইঁহাদের পুরাণ উপপুরাণ।

ইতিহাসেও শোনা কথা। ইহাতে দেখা ঘটনার কথা অল্প থাকে কিংবা আদৌ থাকে না। অতীত ঘটনা শোনা ছাড়া দেখার সম্ভাবনা নাই। বিশেষ এই,—এইরূপ ছিল, এইরূপ হইয়াছিল,—বলিতে পারা চাই। নতুবা ইতিহাস হইবে না, পুরাণ হইবে। আমি শুনিয়াছি, তুমি শুনিয়াছ, তিনি শুনিয়াছেন,—সমাজ এইপ্রকার ছিল, লোকেরা এই ধর্ম্ম আচরণ করিত, রাজনীতি এই ছিল, যুদ্ধকলহ এইরূপ হইয়াছিল, ইত্যাদি। এই প্রত্যয়-হেতু ইহা ইতিহাস।

আমাদের জ্ঞানের শোনা ছাড়া দেখা বিষয় আছে। আমরা অনেক ঘটনা স্বয়ং দেখিতে পারি, দেখিয়া থাকি। সেটা আদ্য-জ্ঞান, স্বয়ং-জ্ঞান। সেটা শোনা নহে, অন্যের উপদেশ-লব্ধ নহে, স্বয়ং-লব্ধ। ইহার নাম উপজ্ঞা। অতএব ইতিহ ও উপজ্ঞা, এই দুইভাগে আমাদের জ্ঞান বিভক্ত করিতে পারি, এবং মানবজাতিসম্বন্ধে এই দুই জ্ঞানকে ইতিহাস বলি।

ইতিহাসের প্রয়োজন কি? এক প্রয়োজন, আমাদের যে স্বাভাবিক ঔৎসুক্য আছে, তাহার নিবৃত্তি। এটা কি সেটা কি, এজাতি কে সেজাতি কে, ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর চাই। অপর প্রয়োজন, অতীত বুঝিয়া বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বুঝিবার প্রয়াস। বিজ্ঞানেরও জন্ম মানবের ঔৎসুক্যের নিবৃত্তিতে এবং উদ্দেশ্য ভবিষ্যৎ জানিতে। ইতিহাস দ্বারা আমাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ নীতি বুঝিতে পারিলে ইতিহাস সার্থক। অমুক অবস্থায় এই জাতি এই নীতি আচরণ করিত, করিয়া এই ফল পাইয়াছিল; সে অবস্থা আমাদের হইলে আমাদেরও নীতি তদ্বৎ হইবে, ফলও তদ্বৎ হইবে, এই ভবিষ্যৎ সূচনা করিতে না পারিলে ইতিহাস দ্বারা কেবল ঔৎসুক্যের নিবৃত্তি হয়।

ইতিহাস দ্বারা ভবিষ্যৎসূচনা হইতে পারে কি না, তাহা পরে দেখিতেছি। প্রথমে দেখি, ঔৎসুক্য-নিবৃত্তির উপায় কি? এ-জাতি কে সে-জাতি কে, ইহার উত্তরে এ-জাতি হিন্দুজাতি ভারতবর্ষের লোক, সে-জাতি খ্রিষ্টান-জাতি ইয়ুরোপের লোক, বলিলে মনের পরিতোষ হয় না, জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত হয় না। এটা কি গাছ? এটা কদম গাছ; সেটা কি নদী? সেটা মহানদী; ইত্যাদি উত্তরে বালকের সন্তোষ হইতে পারে, বয়স্থের হয় না। কারণ বালকের পক্ষে দুইটা নামই নূতন; সে অন্য গাছ নদী দেখিয়াছে, তাহার দেখা গাছ নদীর যে জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞানের সহিত কদম ও মহানদী মিলাইয়া তুষ্ট হয়। বয়স্থের জ্ঞান অধিক; সে কদম ও মহানদীর বিশেষ জানিতে চায়। অতএব জিজ্ঞাসুর জ্ঞানের পরিধি অনুসারে উত্তরের পরিধি বিভিন্ন হইবে।

কিন্তু যে উত্তরই হউক, তাহা সত্য হওয়া চাই। এখানেই সঙ্কট। ইতিহাসের মূলে ইতিহ হউক, উপজ্ঞা হউক, সকলের পরীক্ষা চাই। প্রমাণ দ্বারা সত্য-অসত্যের পরীক্ষা হয়। ইহা স্থূলকথা, সবাই জানে। প্রমাণ কি? সাংখ্যকারিকা বলেন,—দৃষ্ট, অনুমান, ও আপ্তবচন, এই ত্রিবিধ প্রমাণ। এই ত্রিবিধ প্রমাণই পর্য্যাপ্ত, কারণ যাবতীয় প্রমাণ এই তিনের মধ্যে আছে। যাহা প্রমাণ করিতে হইবে, তাহার নির্দ্ধারণ প্রমাণ হইতেই হয়।

ইতিহাসে প্রত্যক্ষপ্রমাণ কদাচিৎ পাওয়া যায়। ইয়ুরোপের বর্ত্তমান যুদ্ধের কারণ আমরা জানি না। হয়ত জর্ম্মান-সম্রাট জানেন, তাঁহার মন্ত্রীবর্গ জানেন। কিন্তু তাঁহারা যুদ্ধের ইতিহাস লিখিবেন না; যদিবা লেখেন তাহাতে নিজেদের দোষ লিখিবেন না, নিজেদের প্রমাদ গোপন করিবেন। যুদ্ধক্ষেত্রে আমি গিয়া যুদ্ধের ইতিহাস লিখিতে বসিলে সব যে সত্য লিখিব, লিখিতে পারিব, এমন নিশ্চয় নাই। আমি ত ভ্রমশীল মানবের বাহিরে নই, আমি ত কল্পনা বর্জ্জন করিতে পারি না। তা ছাড়া, যাহা সত্য ভাবিয়া লিখিব, তাহা আমার অবুদ্ধি-হেতু সত্য বোধ হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা। আমার হয়ত অবধান থাকিবে না, এক ঘটনার সহিত অন্য ঘটনা মিশাইয়া ফেলিব, এককে ছোট অন্যকে বড় করিয়া বসিব, যেপক্ষে টান আছে সেপক্ষকে বড় করিব, ইত্যাদি। বস্তুতঃ, কেহ দেখিয়াছে বলিলেই আমরা দর্শকের উক্তি বেদবাক্য মনে করি না। কে দেখিয়াছে, তাহার দেখিবার কি সুযোগ কি যোগ্যতা ছিল, তাহার বুদ্ধি অব্যাহত ছিল কি না, ইত্যাদি কত তর্ক করি।

বস্তুতঃ কি সত্য কি নহে, কি আছে কি নাই, কে জানে; আমার কাছে কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা। রাত্রিকালে অন্ধকারে পথে সর্প দেখিলাম, অন্যে তাহা রজ্জু দেখিল। আমার নিকট সর্প, অন্যের নিকট রজ্জু। নিদ্রায় কত কি দেখিয়া সত্য ভাবিয়া হৃষ্ট হই, ভীত হই, চমৎকৃত হই। নিদ্রা ভাঙ্গিলে বলি মিথ্যা। হিষ্টিরিয়া-রোগী রজ্জুতে সর্পভ্রম করে। শিশু মাটির পুতুলকে সত্য মানুষ মনে করে, নচেৎ তাহাতে মুগ্ধ হইত না।

অতএব আমার তোমার তাঁহার দেখা শোনা ঘটনা সত্য না হইতে পারে। কিন্তু আমি তুমি তিনি, বহু বহু লোকে যাহা দেখিয়াছে শুনিয়াছে, তাহাও কি অসত্য হইতে পারে? এত লোকের বুদ্ধিবিবেচনা ছিল না বলিতে পারি কি? কিন্তু দেখা যায় একের ভুল নহে, অনেকেরও ভুল হইতে পারে। সূর্য্য থালার মতন দেখায়। দেখিয়া কে বলিতে পারে তাহা বৃহৎ গোল-পিণ্ড? পূর্ব্বে লোকে মনে করিত এবং সবাই দেখিত পৃথিবী স্থির, নভোমণ্ডল অস্থির।

যাহা সৎ যাহা আছে তাহা সত্য; আর "সৎসু সাধুষু ভবং" যাহা সাধুব্যক্তি বলেন তাহাও সত্য। যদি লোকের মতন লোক কেহ দেখিয়া শুনিয়া থাকে, তাহা সত্য হইতে পারে। একদিকে একজনের, অন্যদিকে বহুজনের সাক্ষ্য; কিন্তু একজনের, সজ্জন সাধুজনের, বাক্য বিশ্বাস্য হইতে পারে। কারণ বহুজন মোহাচ্ছন্ন, নির্ব্বোধও হইতে পারে, তাহাদের দেখার যোগ্যতা না থাকিতে পারে। আদালতে একদিকে গ্রামের দশ বার জন যাহা বলে, অন্যদিকে এক সাধুর কথায় তাহা অবিশ্বাস্য হয়। কারণ সাধু পরার্থ সাধন করেন; কারণ তাঁহার মিথ্যা বলিবার প্রলোভন নাই; তিনি সর্ব্বদা এমন আচরণ করেন, যে তাহা কেহ দোষযুক্ত দেখে নাই।

বস্তুতঃ সত্য বলি মিথ্যা বলি, আমার জ্ঞানে বিশ্বাসে

সত্য বা মিথ্যা। আমার সত্য তোমার জ্ঞানে বিশ্বাসে মিথ্যাও হইতে পারে। যাহার নিকট যেটা সত্য সেটায় তাহার সংশয় নাই। অর্থাৎ সত্য-অসত্য-বিবেককারী জ্ঞাতা অনুসারে কোনটা সত্য কোনটা অসত্য।

কিন্তু যদি জ্ঞাতাভেদে জ্ঞানভেদে সত্যের তারতম্য হয়, যদি জোর করিয়া বলিতে না পারি এটা সত্য, তাহা হইলে কেমন করিয়া লোক-ব্যবহার চলিবে? সত্য-অসত্য-বিবেক না করিয়া লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। এস্থলে দেখা যায়, যাহা বহুলোকে সত্য বলে তাহা সত্য মানিতে হইতেছে। কেবল আমি তুমি নহে, সকলে; মোহাচ্ছন্ন নির্বোধ সকলে নহে, অধিকাংশ লোক যেমন হইয়া থাকে, তেমন জ্ঞান-বুদ্ধি-সম্পন্ন লোক যেটা সত্য বলে সেটা সত্য। ইহার অধিক বলিবার সাধন নাই।

অতএব যখন লোকে বলিত পৃথিবী স্থির, তখন তাহাই সত্য ছিল। পুরাণ সত্য, বহুজনের নিকট সত্য; অতএব সত্য। যদি কেহ বলেন পুরাণ কাল্পনিক কথায় পূর্ণ; উহাতে সত্য-অসত্য দুই আছে। একথা যিনি বলিবেন, তাঁহাকে প্রমাণ করিতে হইবে। না করিতে পারিলে পুরাণ সত্য। কারণ বহুলোকে সত্য মনে করে। এমন প্রমাণ চাই, যাহা সকলেই মানিবে। যাহারা সত্য বলিতেছিল প্রমাণ দ্বারা তাহাদিগকেও বিশ্বাস করাইতে হইবে, পুরাণ অসত্য।

এখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণের স্থান নাই। অনুমান করিতে হইবে। অনুমান ত্রিবিধ। (১) পূর্ব্ববৎ—আকাশে মেঘ দেখিয়া বৃষ্টির অনুমান করিতেছি। পূর্ব্বে দেখিয়াছি, মেঘ হইলে বৃষ্টি হয়; এখন মেঘ দেখিতেছি, বৃষ্টির অনুমান করিতেছি। (২) শেষবৎ—নদীর জলবৃদ্ধি দেখিয়া বৃষ্টির অনুমান করিতেছি। (৩) সামান্যতো দৃষ্ট—দুই বস্তুর গুণ-সাদৃশ্য দেখিতেছি, দুই বস্তু একজাতীয় অনুমান করিতেছি। একজাতীয় অনুমান করিয়া একে যে গুণ দেখিতেছি, অন্যতে সে গুণ অনুমান করিতেছি।

খ্রিষ্টানেরা বাইবেল-গ্রন্থ সত্য মনে করেন। তাঁহারা বলেন স্বয়ং ভগবান্, জিশু নামে অবতার হইয়া, বাইবেল বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু লোকের উক্তি মাত্রেই গ্রাহ্য হইতে পারে না। যাহা বহুলোকে বলিতেছে, তাহাও নিঃসংশয়ে গ্রাহ্য হইতে পারে না। নিত্য ঘটনা সম্বন্ধীয় উক্তি আমরা অল্পপ্রমাণে বিশ্বাস করিতে পারি; কিন্তু যে ঘটনা কদাচিৎ ঘটিয়াছে কিংবা ঘটিতে পারে, তাহার প্রমাণ আরও চাই।

প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা যখন প্রমাণ হয় না, তখন আপ্তবচন প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয়। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিবচন আপ্তবচন। আপ্তবচনে সংশয় নাই। যদি কাহারও সংশয় আসে, তাহার পক্ষে আর প্রমাণ নাই। পূর্ব্বে যে সজ্জন সাধুর বচন বলিয়াছি আপ্তবচন তদপেক্ষা বিশ্বাস্য। আমাদের প্রাচীনেরা দেখিয়াছিলেন আপ্তবচন মিথ্যা হয় নাই। অতীত ঘটনা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সত্য প্রমাণিত হইয়াছে; ভবিষ্যৎঘটনা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাও মিলিয়াছে। যতগুলা মিলাইতে পারা গিয়াছে, যখন সে-সব মিলিয়াছে, তখন অপর কথাও সত্য মানিতে হইতেছে। এইরূপ যুক্তি দ্বারা আমরা শাস্ত্রকে আপ্তবচন বলি। যখন বলি "শাস্ত্রে" আছে, তখন আর দ্বিরুক্তি করি না।

কিন্তু আবার সংশয়ে পড়িলাম। পুরাণকার ব্যাস মহর্ষি ছিলেন, শুনিয়াছি ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি ছিলেন। একথা মানিতে পারি; কিন্তু ব্যাস মহর্ষির সাক্ষাৎ পাইতেছি না। সাক্ষাৎ পাইলে তিনি আপ্ত কি না, বুঝিয়া লইতে পারিতাম। অনেক সাধু তাঁহাকে আপ্ত বলিয়াছেন; তাঁহাদের উক্তিও শিরোধার্য্য। কিন্তু সাধুকেও যে চিনিতে চাই। ব্যাসদেবের নামে যে গ্রন্থ লিখিত দেখিতেছি, তাহা বাস্তবিক তিনি লিখিয়াছিলেন কি না জানিতে পারিতেছি না। অন্ততঃ এখন যে গ্রন্থ পাইতেছি, পড়িতেছি, তাহা তাঁহার লেখা, সব তাঁহার লেখা, না হইতে পারে। কে জানে কে কবে ব্যাসের নাম দিয়া নিজের রচনা প্রবেশ করাইয়া দেয় নাই? তা ছাড়া, যদি ব্যাসের বচনও স্বীকার করি, তাহা হইলেও সংশয় যাইতেছে না। তিনি অর্থ বলিয়া দিবেন না, আমাকে অর্থ করিয়া লইতে হইবে। ব্যাস কি উদ্দেশ্যে কি লিখিয়াছিলেন, কি অর্থে কি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহা আমাকে অনুমান করিয়া লইতে হইবে। অতএব ষোল কলায় যেমন পূর্ণচন্দ্র, তেমন ষোল কলায় পূর্ণ সত্য ধরিলে

১৬ কলা সত্য দুর্লভ। কোন সত্য ১৫ কলা, কোন সত্য ৮ কলা, কোন সত্য ১ কলা। যাহাতে ১ কলা সত্য, তাহাতে ১৫ কলা অসত্য আছে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন বখ্‌তিয়ার খিল্‌জি আঠার সেনা লইয়া বঙ্গদেশ অধিকার করিয়াছিল। যাঁহারা একথা বলেন, তাহাঁরা আপ্ত নহেন। সামান্যতো দৃষ্টিতে বুঝিতেছি কথাটা অসত্য। আঠার জন লোক, অশ্বারোহী হউক, অস্ত্রধারী হউক, একটা বিস্তীর্ণ দেশ জয় করিতে পারে না। কথাটা ১৫কলা কিংবা আরও অধিক মিথ্যা।

কিন্তু ১৬ কলা মিথ্যা, তাহাও বলিতে পারি না। অষ্টা-দশ সেনা পারে না, কিংবা পারে নাই, বলিবার প্রমাণ কি? আর কোথাও পারে নাই, তা বলিয়া এখানেও পারে নাই এমন বলিতে পারি না।

বাস্তবিক সামান্যতো দৃষ্টিতে যখন কিছু অনুমান করি, তখন সম্ভব অসম্ভব বিচার করি। মরা মানুষ বাঁচে না, অদ্যাপি কেহ বাঁচিতে দেখে নাই। কত হাজার হাজার লাখ লাখ বছর মানুষ জন্মিয়াছে মরিয়াছে, অদ্যাপি এক-জনকেও মরিয়া বাঁচিয়া উঠিতে দেখা শোনা যায় নাই। তুমি যে বলিতেছ, লক্ষ্মণ শল্যাহত হইয়া মরিয়া ঔষধ-গুণে বাঁচিয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা তোমার একার কিংবা দুইদশ হাজার লোকের কথায় বিশ্বাস করিতে পারি না। কারণ একদিকে অসংখ্য মানুষের, অন্যদিকে দুই দশ হাজারের সাক্ষ্য। যদি লক্ষ্মণ বাঁচিয়াছিলেন, তাহা হইলে হয় তিনি মরেন নাই, মৃতবৎ হইয়াছিলেন কিন্তু মরেন নাই; কিংবা তিনি মানুষ ছিলেন না। আমরা মরা মানুষ বাঁচিতে দেখি নাই, মানুষ-সম্বন্ধেই বলিতে পারি। আমরা মৃতবৎ মানুষকে ভাষায়-অতিশয়োক্তি অলঙ্কার প্রয়োগ করিয়া বলি, মৃত। লক্ষ্মণও মৃত হন নাই, মৃতবৎ হইয়াছিলেন। তথাপি যখন এত লোক বলিতেছে তিনি বাস্তবিক মৃত হইয়া পুনর্জীবিত হইয়াছিলেন, তখন সে কথা ১৬ কলা অসত্যও বলিতে পারি না। লক্ষ্মণের না-মরার পক্ষে যদি কোটি কোটি, মরার পক্ষে দুই দশ হাজার কিছুই নহে বটে; কিন্তু নিঃসংশয় হইতেছি না। অর্থাৎ কোটি কোটি, সংখ্যাতীত ঘটনায় যাহা সত্য, একটা ঘটনায় তাহা মিথ্যা হইতে পারে, মরা মানুষ বাঁচিয়া উঠিতে পারে।

এইরূপ, যখন শুনি রাবণের ভাই বিভীষণ অমর, তখন বুঝি তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন বলিয়া লোকে বলিত তিনি অমর, কিংবা বাস্তবিক তাহাঁর মৃত্যু হয় নাই, হইবে না।

এমন কি, যে সূর্য্য হয়ত সৃষ্টির আরম্ভ হইতে প্রত্যহ উদিত ও অস্তগত হইয়া আসিতেছে, সে সূর্য্য যে একদিন উদয়াস্ত-রুদ্ধ হইয়া নিশ্চল থাকিবে না, তাহা বলিতে পারি না। তবে যদি কেহ বলেন, আগামী কল্য সূর্য্যোদয় হইবে না, তখন তাহাঁর উক্তি অবিশ্বাস্য হইবে। অবিশ্বাস্য হইবে; কিন্তু নিসংশয়ে বলিতে পারি না, কল্য সূর্য্যোদয় হইবে। বলিতে পারি কল্য সূর্য্যোদয়ের সম্ভাবনা আছে, অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পক্ষে কোটি কোটি, বিপক্ষে এক। কিন্তু কে জানে সেই এক কল্য ঘটিবে না। সংশয় অসংশয়ের যে সম্বন্ধ তাহার নাম সম্ভাবনা। একদিকে অল্প অন্যদিকে বহু সম্ভাবনা থাকিলেও যখন অল্প জয়ী হয়, তখন বলি দৈব।

আমরা কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ যত বুঝিতেছি, দৈব তত লুপ্ত হইতেছে। বিধাতার বিধান-ভঙ্গের নাম দৈব। বিধাতার বিধান, ভৌতিক জগতের বিধান আমরা সব জানি না, বুঝি না। জানিলে বুঝিতে পারিলে বিধানের ব্যভিচার দৈবাধীন ঘটনা বলিতাম না। হিন্দুজাতি ক্রমশঃ লুপ্ত হইতেছে; যত জন্মিতেছে তাহার অধিক মরিতেছে; সুতরাং শেষে কেহ থাকিবে না। অনেক প্রাচীনজাতি পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং হিন্দুজাতির উৎসেদ একেবারে অসম্ভব নহে। কিন্তু বিধাতার বিধান জানি না। অতি প্রাচীনজাতি লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া হিন্দুজাতিও যে তদ্বৎ লুপ্ত হইবে, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি না। বলিতে পারি, লোপের দিকে চলিয়াছে, এবং যদি লোপের প্রতীকার না হয়, তাহা হইলে কয়েক শত বৎসর পরে হিন্দুজাতি লুপ্ত হইবে। অর্থাৎ যে বিধান এখন চলিতেছে, ঠিক সে বিধান চিরদিন থাকিলে লুপ্ত হইবে। কিন্তু জাগতিক বিধান জগৎ-বিধাতা জানেন; আমরা জানি না।

পুরাণে আছে, নারায়ণের নব অবতার হইয়া গিয়াছে, দশম অবতার হইবে। যুক্তি এই,—যখন প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম অবতার সত্য হইয়াছে, তখন দশম অবতারও সত্য হইবে। কিন্তু এখানে প্রথমে পূর্ব্বপক্ষ প্রমাণ করিতে হইবে। প্রমাণ করিতে

হইবে নব অবতার হইয়াছে, এবং যে বিধানে হইয়াছে, সে বিধান দশম.পর্য্যন্ত টিকিবে, পরে টিকিবে না।

উপরে যে বিচারমার্গ প্রদর্শিত হইল, তাহা বিজ্ঞানেরও মার্গ। বিজ্ঞানের অন্বেষণও ত্রিবিধ প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত। প্রভেদ এই, বিজ্ঞান আপ্তেরও প্রমাণ চায়। বিজ্ঞানের আপ্তপ্রমাণ এমন, যে, তুমি আমি সেও সে প্রমাণ পরীক্ষা করিতে পারিবে। যেখানে এত কড়াকড়ি, যেখানকার বিচারক মমতাহীন চক্ষু-লজ্জাহীন হইয়া সত্য অসত্যের তুলনা করিতেছেন, সেখানে বিজ্ঞানের প্রমাণ আপ্ততুল্য গণ্য হইতেছে।

বাইবেলে আছে ছয়দিনে এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছিল। বিজ্ঞান বলিতেছে,—না, হয় নাই। অমনই সকলকে মাথা নোআইয়া স্বীকার করিতে হইতেছে, বলিতে হইতেছে,—না, পৃথিবী ছয়দিনে সৃষ্ট হয় নাই। বিজ্ঞানের যে এত গৌরব, এত তেজ, তাহার কারণ বিজ্ঞানের সত্যবাদিতা, বিজ্ঞানের পরার্থপরতা। তাহার দয়া-মায়া নাই, আমার তোমার ভেদজ্ঞান নাই, যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছে, তাহা অকুতোভয়ে স্পষ্টভাষায় শোনাইয়া দেয়। বিজ্ঞানের যুক্তিমার্গ বিজ্ঞানকে বড় করিয়াছে। এমন করিয়াছে যে অন্য যাবতীয় বিদ্যাতে সে মার্গ দেখিতে না পাইলে মনের পরিতোষ হয় না।

কিন্তু এখানে একটু সাবধান হইতে হইবে। ব্যাসদেবের নামে যেমন কত কথা প্রচারিত হইয়াছে, তেমন বিজ্ঞানের নামেও হইতেছে। অনেকে যেমন "শাস্ত্রে আছে" বলিয়া শ্রোতার সংশয় চাপা দিতে চায়, এখানেও তেমন বিজ্ঞানের নামের জোরে অসত্যকে সত্য বলিয়া প্রচার করে। বিজ্ঞান তোমার আমার কথা কিংবা তোমার আমার মন-গড়া কথা নহে। বিজ্ঞান বলে না, যে, সে সর্বজ্ঞ; বরং বলে "আমি কিছুই জানি না, জানিতে চাই; এই যে অল্পস্বল্প জানিয়াছি, অজানার তুলনায় ইহা কিছুই নয়।" বিজ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করুন, চাঁদে মানুষ আছে কি? বলিবে, জানি না। জিজ্ঞাসা করুন, ইহকালের পর পরলোক আছে কি না। উত্তর হইবে, জানি না। অত কথায় কাজ কি, জিজ্ঞাসা করুন, মানুষ মরিয়া ভূতপ্রেত হয় কি না। বলিবে, জানি না। যদি বলেন, জানি আছে; বিজ্ঞান তর্ক করিবে না। যদি বলেন বিশ্বাস কর ভূতপ্রেত আছে; বলিবে প্রমাণ দিন, এমন প্রমাণ দিন যাহাতে আমার বিশ্বাস হইবে। একদিকে, বিজ্ঞান যেটা পাইয়াছে সেটা কিছুতেই "না" বলিবে না, অন্যদিকে যেটা না পাইয়াছে সেটা "হাঁ" "না" কিছুই বলে না। এটা হইতে পারে না, মানুষ নিজ দেহ লঘু করিয়া শূন্যে থাকিতে পারে না, মানুষ মরিয়া বাঁচিতে পারে না, ইত্যাদি বিজ্ঞানের নিকট শুনিবেন না। যেটা তাহার জানা আছে, সে সেটার সম্বন্ধেই বলিতে পারে। সে জানে, যে, অনেক অজানা আছে; যেটা জানে মনে করিতেছে সেটা সম্পূর্ণ জানে না।

ইহার নাম বৈজ্ঞানিক প্রবৃত্তি। ইতিহাসে এই বৈজ্ঞানিক প্রবৃত্তি দেখিতে চাই। ইতিহাসে অনেক অজানা কথা থাকে। অনেক মন-গড়া কথার দ্বারা ইতিহাস-লেখক আমাদিগকে ভুলাইতে চান। সবসময়ে নিজেরাও সাবধান হন না; মন-গড়া কথাতে নিজেরাও ভুলিয়া যান। অঙ্গীকারের উপর অঙ্গীকার চাপাইয়া শেষে নিজের একটা অনুমান সত্য বলিতে চান। ইতিহাসের উহ বাদ দিলে কতটুকু সত্য থাকে? বিজ্ঞানেও উহ আছে, এবং বিজ্ঞানে কেন, নিত্যজীবনেও উহ আমাদের সহচর। পরে পরে সব তথ্য জানা থাকে না; তথ্যগুলি পরস্পর গাঁথিতে উহ আশ্রয় করিতে হয়। কিন্তু কোন্‌টা উহ, কোন্‌টা তথ্য, তাহা স্পষ্ট বলিয়া না দিলে সত্য অসত্য মিশিয়া যায়।

তা ছাড়া, বিজ্ঞানের তথ্যসমূহ এমন শৃঙ্খলায় সম্বদ্ধ থাকে যে উদ্দেশ্য বুঝিতে কষ্ট হয় না। আজিকালি যে বিষয়ই আলোচনা করি, বিচার করি, এইরূপ সাজাইয়া গুছাইয়া বলিতে না পারিলে চিত্তের সন্তোষ হয় না, পড়িতে বুঝিতে মনে রাখিতে কষ্ট হয়। ইতিহাসে বহু চমৎকার তথ্য, বহু জ্ঞানের কথা থাকিতে পারে, এক বৈজ্ঞানিক বিন্যাসের অভাবে আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। ইতিহাসে বৈজ্ঞানিকমার্গ যেমন আবশ্যক, বৈজ্ঞানিক বিন্যাসও তেমন আবশ্যক।

এই বিন্যাসের নিমিত্ত ইতিহাস কালানুসারী হয়। ঘটনা-পরম্পরা দ্বারা কাল পরিমিত হয়, এবং কাল দ্বারা ঘটনা-পারম্পর্য্যের এবং সত্যাসত্যের নির্ণয় হইয়া থাকে। বাস্তবিক এক এক ইতিহাস এক এক মানবজাতির উৎপত্তি-

স্থিতি-লয়ের বৃত্তান্ত। আমরা উৎপত্তি জানিতে পারি না; কোন্ নিসর্গজ বস্তুর উৎপত্তি জানি? যদি বলি ছোটনাগপুরের কোল-জাতি বেদের সময় ছিল, এবং তৎকালে দস্যুনামে আখ্যাত হইত, তাহা হইলে স্থিতির একাংশ, অতীতাংশ, অতীতাংশের এক ক্ষুদ্রাংশ বুঝিলাম, উৎপত্তি বুঝিলাম না। প্রাচীন কোলেরা যে দস্যু ছিল, কিংবা বেদের দস্যু বর্ত্তমান কোলজাতির পূর্ব্বপুরুষ, ইহা প্রমাণের নিমিত্ত প্রাচীন হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে নিদর্শন চাই। কটকে একটা নদী আর সমুদ্রতীরে একটা নদী দেখিলে যেমন বলিতে পারি না দুই নদী একেরই দুই অংশ, তেমন এখানেও পারি না। সমস্ত নদী না দেখি, মাঝে মাঝে যোগ দেখা চাই। এই যোগ দেখিতে না পারিলে, বৈজ্ঞানিকবিন্যাস না থাকিলে, ইতিহাস উপকথা হয়।

বাস্তবিক এমন জাতি কদাচিৎ দেখা যায়, যাহা বহুকাল অন্যজাতির সংসর্গে থাকিয়াও স্বতন্ত্র রহিয়াছে। কেননা, সেজাতি স্বাতন্ত্র্য আকাঙ্ক্ষা করিলেও পার্শ্ববর্ত্তী জাতি তাহা ভঙ্গ করিতে পারে, দৈবঘটনায় হইতে পারে। বহু কোল খ্রিষ্টান হইয়াছে। তাহারা সকলেই স্বেচ্ছায় খ্রিষ্টান হইয়াছে কি না কে জানে। যদি বা হইয়া থাকে, খ্রিষ্টান পাদরি না গেলে খ্রিষ্টান হইত না। এইরূপ, যে জাতির ইতিহাস দেখি, তাহার কোন চেষ্টার ইতিহাস, ধর্ম্মবিশ্বাসের ইতিহাস, রীতিনীতির ইতিহাস, সাহিত্যের ইতিহাস দেখি, তাহার সহিত পার্শ্ববর্ত্তীজাতির ইতিহাস জানিতে বুঝিতে হইবে। ইতিহাস অদ্যাপি বিজ্ঞান-পদবী পায় নাই। ইহার কারণ ইহা নহে যে বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মূলগত পার্থক্য আছে। ইতিহাসে সংশয় আছে, বিজ্ঞানেও আছে। কারণ এই, মানবের ইতিহাস, মানোবিজ্ঞান অত্যন্ত জটিল; বহুমানব-গোষ্ঠীর জাতির ইতিহাস আরও জটিল।

এই প্রবন্ধের প্রথমে ইতিহাসের প্রয়োজন উল্লেখ করিয়াছি। এক প্রয়োজন, আমাদের স্বাভাবিক ঔৎসুক্যের নিবৃত্তি। ইহার কারণ আর কিছু নহে, আমি আমার ক্ষেত্র বুঝিতে চাই। আমি আছি, কিন্তু একা নই। আমার সুখদুঃখ অন্যের কর্ম্মদ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়; আমি এই অন্যের, আমা-ছাড়া মানবের স্বভাব চরিত্র বুঝিতে চাই। কাহার সহিত বাস করিতেছি, তাহা জানিয়া নিজের দুঃখের মাত্রা অল্প সুখের মাত্রা অধিক করিতে চাই। এইকারণে দেশের ইতিহাস জানিতে চাই। দেশে কে ছিলেন, কেমন ব্যবহার করিতেন, তাঁহার বংশ আছে কি না, থাকিলে সে বংশের চরিত কেমন, ইত্যাদি আমার প্রতিবেশীর আদ্যন্ত স্বভাবচরিত জানিতে চাই। মানব-ছাড়া যে দেশ, তাহার জ্ঞান ভূগোলে পাই। অতএব ইতিহাস ও ভূগোল আমার বিচরণ-ক্ষেত্রের বিবরণ। প্রাণরক্ষার্থে যেমন আমার দেহতত্ত্ব জানা আবশ্যক, তেমন আমার দেশের ইতিহাস ও ভূগোল জানা আবশ্যক। কারণ আমি'র জ্ঞান, আমি'র ক্ষেত্র-জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ। আমার ক্ষেত্র বুঝিবার সম্ভাবনা দেখিয়া আমি আমার দূরবর্ত্তী দেশের ইতিহাস ও ভূগোলও অবগত হইতে চাই, দ্বিতীয় প্রয়োজনে আসিয়া পড়ি, জ্ঞাত হইতে অজ্ঞাতে, অতীত ও বর্ত্তমান হইতে ভবিষ্যতে প্রবেশ করিতে চাই। যে ইতিহাস ও ভূগোলে আমার ভবিষ্যৎ বুঝিবার সাহায্য না পাই, তাহা আখ্যান হইতে পারে, ইতিহাস হইতে পারে না। তেমনই যে বিজ্ঞানে জ্ঞাত হইতে অজ্ঞাতের, বর্ত্তমান হইতে ভবিষ্যতের সূচনা না থাকে তাহা বিজ্ঞান নহে, তাহা দ্রব্য-গুণ-কর্ম্মের তালিকা। অদ্যাপি বৈজ্ঞানিক ইতিহাস রচিত হইতে পারিয়াছে কি না জানি না, হইবে কি না সন্দেহ। কারণ যে ক্ষেত্রে মানবজাতি বাস করিতেছে সে ক্ষেত্র পৃথক করিয়া প্রত্যেক অংশের কার্য্য নিরূপণ অসাধ্য। গোটাকয়েক স্থূলকথা অবশ্য আছে; যেমন রাজা অত্যাচারী হইলে প্রজাও হয়, যেমন এক জাতি অন্যের সংসর্গে না আসিলে স্বয়ং ভাল কিংবা মন্দের দিকে যায় না, ইত্যাদি।

কারণ ক্ষেত্র বুঝিতে গেলেই ক্ষেত্রস্বামী বুঝিতে হয়। ক্ষেত্র-স্বামী মানবের চরিত্র বোঝা সহজ নহে। এই শিষ্ট শান্ত জাতি, বিদ্যা ও বুদ্ধিতে পণ্ডিত-জাতি; তাহার মধ্যে একজন দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিল। এই দুর্দ্দান্ত জাতি, তাহার মধ্যে একজন শান্তিপ্রিয় বৈরাগী জন্মগ্রহণ করিল, এমন হইল যে সেজাতির মতিগতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। মুসলমানরাজত্ব-সময়ে কে জানিত চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া দেশে প্রেমরসের প্রবাহ চালাইয়া দিবেন। মোগল-

রাজ্য বেশ চলিতেছিল; কে জানিত ঔরঙ্গজেবের প্রবল প্রতাপে সব উলট-পালট হইয়া পড়িবে।

জীববিদ্যাতেও ঠিক এইরূপ অসম্ভাবিত জীবের উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। ঝাড়ের বাঁশ হইতে হঠাৎ একটা বাঁশ দীর্ঘ হইয়া উঠিল, যেন প্রকৃতির কূর্দন। এইরূপ, মানব-সমাজে এক এক মানুষ প্রকৃতির কূর্দন-স্বরূপ। কে জানিত কালাপাহাড় কূর্দন করিতে জন্মিবে। এই যে কূর্দন, এই যে কেলি তাহা গণিয়া বলিবার নহে; কখন আসিবে, কি আকারে দেখা দিবে, তাহা কেহ জানে না।

এই অসম্ভা কাণ্ড না ঘটিলে সব দেশের ইতিহাস প্রায় একরূপ হইত। অবশ্য ক্ষেত্রভেদে প্রান্তর-পর্ব্বত নদ-সমুদ্র শীত-গ্রীষ্ম ভোজ্য-পানীয় প্রভৃতি ভেদে লোক-চরিত্র প্রভেদ হইবে। গ্রীষ্মদেশের গাছ শীতদেশে বাড়ে না, মরিয়া যায়। মানুষ মরে না, কারণ মানুষ বুদ্ধিশালী, বুদ্ধিবলে প্রকৃতির পরিবর্ত্তন অগ্রাহ্য করিতে পারে। কিন্তু কোন্ দিকে কোন্ মানুষের বুদ্ধি খুলিবে তাহা কতক জানিতে পারা যায়, কতক পারা যায় না। উর্বরভূমির নদী-মাতৃকা-ভূমির মানুষ অলস হইয়া পড়ে, সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপের মানুষ পীবর হয়, পার্ব্বত্যদেশের লোক কষ্টসহিষ্ণু হয়, ইত্যাদি কয়েকটা স্থূলবৃত্তান্ত জানা যাইতে পারে। কিন্তু এসব ছাড়া মানুষ ইচ্ছা করিয়া দশজনের সহিত মন্ত্রণা করিয়া এক এক বিধি ব্যবস্থা চালাইতে পারে, যাহার ফলে সে মানুষ অন্য হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। এই কারণে এই দৈব-হেতু মানুষের ইতিহাসে বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতা অসম্ভব হইয়াছে, ইতিহাস বহুপরিমাণে লেখকের বিতর্কে পূর্ণ হইতেছে, "বোধ হয় হইয়াছিল" "বোধ হয় হয় নাই" ইত্যাদি "বোধ হয়" পুনঃ পুনঃ লিখিত হইতেছে। যখন "বোধ হয়"-এর ছড়াছড়ি তখন সত্য অপ্রকাশিত। এইকারণে, "কাহার বোধ হইয়াছে" "কে বলিতেছে", ইহা জানা আবশ্যক। অনেকস্থলে এক জনের, যিনি আপ্ত নহেন এমন একজনের, 'বোধ হয়' ইতিহাসের নামে লোকে পড়িতেছে।

ইতিহাসকে একটা সুরম্য হর্ম্ম্য মনে করা যাইতে পারে। হর্ম্ম্য-নির্ম্মাণের নিমিত্ত ইট পাথর কাঠ লোহা প্রভৃতি উপাদান চাই, প্রত্যেক উপাদানের দৃঢ়তা পরীক্ষা করা চাই, কে সে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছে, কে পরীক্ষা করিয়াছে, কবে পরীক্ষা করিয়াছে, ইহা উপাদানের গায়ে ছাপ মারিয়া দেখাইয়া দেওয়া চাই। ইহার অভাবে তথ্য কি শোনা কথা, গল্পকথা কি মনগড়া কথা, কিছুই বুঝিবার উপায় থাকে না। যিনি যে ইতিহাসই লিখুন, যত বৃহৎ ইতিহাসই লিখুন, তাঁহাকে আপ্ত স্বীকার করিতে পারি না। তাঁহার বিতর্ক রাখিয়া দিয়া তিনি পরীক্ষিত প্রমাণিত তথ্য-গুলি পর পর সাজাইয়া গেলে পাঠক নিজে ইতিহাস রচনা করিতে পারেন। পাঠকের সাহায্যের নিমিত্ত ইতিহাস-কার উপাদানগুলি যথাযোগ্য স্থানে বসাইয়া নিজের কল্পনা দ্বারা গাঁথিয়া সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণে প্রয়াসী হন। প্রাচীন ভারতের অর্ব্বাচীন ভারতের ইতিহাসের বহু উপা-দান এখানে ওখানে বিক্ষিপ্ত লুক্কায়িত অপ্রকাশিত আছে, কিন্তু ইতিহাসের সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হয় নাই। এইকারণে আমরা বলি আমাদের দেশের ইতিহাস নাই। ইহার এমন অর্থ নহে যে, ইতিহাসের উপাদান নাই। আবশ্যক যাবতীয় উপাদান না থাকিতে পারে; শিল্পী দুই পাঁচটা উপাদানের অভাবেও মনোহারী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে পারেন।

অতএব ইতিহাস রচনা যার-তার কর্ম্ম নহে। যে-সে স্থপতি ভুবনেশ্বরের মন্দির গড়িতে পারিত না। আমি ইতিহাস পড়িতেছি, কিংবা দুই দশটা উপাদান সংগ্রহ করি-য়াছি বলিয়া আমার ঐতিহাসিকতা জন্মে না। আদালতে কত বিচারক নিত্য সাক্ষ্য গ্রহণ করিতেছেন, রায় প্রকাশ করিতেছেন, ঘটনা ব্যাখ্যা করিতেছেন। কিন্তু তাহা ইতিহাস নহে। কদাচিৎ কোনটা ইতিহাস, কোনটা বিচারকের মত বা রায়; অধিকাংশ ইট-কাঠের ঢিপি।

এখানেও বিজ্ঞানের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কত শত জন বিজ্ঞানের উপাদান সংগ্রহ করিতেছেন, সংগ্রহ করিয়া জীবন শেষ করিতেছেন, তা বলিয়া তাঁহারা বৈজ্ঞানিক নহেন। যিনি বিজ্ঞান-শিল্পী বিজ্ঞান-দার্শনিক, তিনি বৈজ্ঞানিক, অন্যে নহেন। তিনি বিপুল গ্রন্থ না লিখুন, তিনি সমুদায় উপাদান না জানুন, (সমুদায় উপাদান ত জানিবার নহে), বৈজ্ঞানিক হইতে পারেন। একারণ বৈজ্ঞানিককে কবি বলিতে পারা যায়, ঐতিহাসিককেও বলিতে পারা যায়। যেমন ছন্দ অনুসারে অক্ষর সাজাইয়া

গেলেই কবি হয় না, তেমন উপাদানগুলা পর পর সাজাইয়া গেলেই ঐতিহাসিক হইতে পারা যায় না। কবিত্ব দুর্লভ, ঐতিহাসিকতাও দুর্লভ।

আমাদের দেশে ঐতিহাসিক ছিলেন মহর্ষি ব্যাস। মহাভারতের তুল্য ইতিহাস দুর্লভ। পদ্যে রচিত বলিয়া ইতিহাসের দোষ হয় নাই, বরং গুণ বাড়িয়াছে। অষ্টাদশ পুরাণের বংশানুচরিত ইতিহাস বই আর কি?

কিন্তু কেহ কেহ বলেন মহাভারত ইতিহাস নহে, পুরাণ ইতিহাস নহে। কেন নহে, কি অর্থে নহে? মহাভারত ও পুরাণে মন গড়া কবি-কল্পিত কথা আছে কি? উপাদান, বৃত্তান্ত অসত্য কি? উপাদান যথাযথ বিন্যস্ত হয় নাই কি? গ্রন্থনে কলাকৌশল প্রকাশ পায় নাই কি?

মনগড়া কথা আছে, কিন্তু সব মনগড়া অসত্য বলিতে পারি না; অতিশয়োক্তি থাকিতে পারে, উক্তি মিথ্যা নহে; বিন্যাসে গ্রন্থনে দোষ নাই। একটা অভাব, কালানুসারিতা অনুসৃত হয় নাই। সময়নির্দ্দেশ না থাকাতে এক বৃত্তান্তের সহিত অন্য বৃত্তান্তের, এক পুরাণের সহিত অন্য পুরাণের মিল করিতে পারি না; পরে পরে বৃত্তান্ত না পাইয়া ইতিহাস-অট্টালিকার গোড়া কোথায় আগা কোথায় বুঝিতে পারি না।

একটা শ্লোক আছে, লোকমুখে প্রচলিত শ্লোক আছে, সত্যযুগে অত্রি, ত্রেতায় চরক, দ্বাপরে সুশ্রুত, কলিতে বাগ্‌ভট আয়ুর্ব্বেদ লিখিয়াছিলেন। এখানে সময়ের উল্লেখ আছে, অথচ নাই। যদি এই সত্য-ত্রেতাদিযুগ পাঁজির যুগ হয়, তাহা হইলে কথাটা বিচারেরও যোগ্য নহে। কারণ, সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপরযুগ, বহু বহু বৎসর পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে।

যদি বলি সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি এই নাম চতুষ্টয়ে কালের পৌর্ব্বাপর্য্যমাত্র বিজ্ঞাপিত হইয়াছে; অর্থাৎ যে কাল চলিতেছে, তাহা কলি এবং যে কাল অতীত হইয়াছে তাহা তিন ভাগ করিয়া কলির পূর্ব্বে অতীত দ্বাপর, তাহার পূর্ব্বে অতীত ত্রেতা, তাহার পূর্ব্বে অতীত সত্য যুগ ছিল; তাহা হইলে বরং একটা সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায়। অর্থাৎ বুঝিলাম আত্রেয় সংহিতা প্রথমে, তার পর চরক সংহিতা, তার পর সুশ্রুত সংহিতা, এবং তার পর বাগ্‌ভটের অষ্টাঙ্গহৃদয় রচিত হইয়াছিল। এই প্রতিজ্ঞার বিরোধী প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

কিন্তু বিরোধী প্রমাণ নাই কিম্বা পাওয়া যায় নাই বলিয়া প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইল না। বস্তুতঃ রাগিণীর যেমন অসংবাদী ও বিবাদী রাগিণী বা স্বর আছে, প্রতি প্রতিজ্ঞার সংবাদী, অনুবাদী প্রমাণ পাইলে এবং বিবাদী প্রমাণ না থাকিলে সে প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হয়। কেহ বলিল, রাবণের দশমুণ্ড ছিল। এই উক্তি মাত্র গ্রাহ্য হইতে পারে না; ইহার বিবাদী, বিরোধী প্রমাণ না থাকিলেও উক্তি গ্রাহ্য হইবে না। দশমুণ্ড থাকার সংবাদী, অনুবাদী প্রমাণ চাই। এইরূপে দেখা যায় আয়ুর্ব্বেদের যে ইতিহাস জানা গিয়াছে, তাহাতে আত্রেয়াদি চারি আয়ুর্ব্বেদের পৌর্ব্বাপর্য্যে আত্রেয় সর্ব্বপুরাতন, বাগ্‌ভট সর্ব্বনূতন বটে।

এইসব দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতেছি ইতিহাসে কালনির্ণয় অত্যাবশ্যক। কালদ্বারা যে প্রমাণ তাহার পরীক্ষার উপায় পাওয়া যাইতে পারে। এ দেশে এক রাজা ছিলেন; এটা কথামাত্র, ইতিহাস নহে। সত্যযুগে মান্ধাতা নামে এক রাজা ছিলেন; বুঝিলাম বহুপূর্ব্বকালে। কলির আরম্ভ সময়ে কিংবা দ্বাপর শেষে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল, এখানে জ্ঞান অপেক্ষাকৃত নিশ্চিত হইল। যেখানে কালের উল্লেখ নাই, সেখানে ইতিহাস নাই।

কিন্তু বৎসর ধরিয়া সকলঘটনার উল্লেখ না করিলেও ইতিহাস হইতে পারে। মাঝে মাঝে বিশেষ দুই একটা ঘটনার বৎসর জানিলেই ইতিহাস গড়িতে বুঝিতে বিঘ্ন হয় না। যে ঘটনা লিপিবদ্ধ হইতেছে তাহার সত্যাসত্য নিরূপণের নিমিত্ত বৎসরের উল্লেখ আবশ্যক হয়। যখন সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ আবশ্যক হয় না, যখন অন্যপ্রমাণে জানি অসত্য নাই, তখন বৎসরের উল্লেখ না থাকিলেও চলে। এই যুক্তিতে মহাভারতের যুদ্ধ সত্য, পুরাণের বর্ণিত বংশ ও বংশানুচরিত অসত্য নহে। পুরাণের পাঁচ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে বংশ ও বংশানুচরিত দুই লক্ষণ। আধুনিক ইতিহাসেও এই দুই থাকে। যে-সে বংশ নহে; যে বংশ এক এক জাতির দেশের ভাগ্যের নিয়ামক হইয়াছিলেন তেমন বংশের বর্ণনা। বংশানুচরিত-বর্ণনা, ইতিহাসে থাকে পুরাণেও আছে। ব্যাস-

দেবের পর কত ব্যাস বংশানুচরিত লিখিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা হয় না। দেশের রাজবংশের ইতিহাস ছিল, আমাদের দেশে পূর্ব্বকালে মান্য গণ্য যাবতীয় বংশের ইতিহাস ছিল। এই-সকল কুলপঞ্জী দ্বারা জানা যাইতেছে যে আমাদের ইতিহাস চিরদিন লিখিত হইয়া আসিতেছিল। পুরীর মাদলা-পাঁজি, আসামের বুরুঞ্জি, ইতিহাস। অতএব আমাদের দেশে ইতিহাস ছিল না, নাই, এ কথা বলা দুঃসাহস। ইতিহাসের উপাদান আছে, নাই ঐতিহাসিক।

ইতিহাসে বৈজ্ঞানিক মার্গ চাই, নতুবা তাহা বিশ্বাস্য হইবে না। বৈজ্ঞানিক মার্গে লিখিত ইতিহাসের একটা গুণ এই যে পড়িবা-মাত্র তাহা পাঠককে মানিতে হয়। অন্যদিকে অন্য বিদ্যায় ঐতিহাসিক ক্রম অবলম্বিত হইলে জ্ঞাতব্য বিষয় বোঝা সহজ হইয়া পড়ে। কেননা, কাহার পর কি হইয়াছিল, ইহা ইতিহাসে জানিতে পারি, জ্ঞানের পর পর যোগ জানিতে জানিতে বর্ত্তমানে আসিয়া পড়ি। ইহাই আবশ্যক। সমাজবিদ্যা ধরি, ভাষাবিদ্যা ধরি, যে-কোন বিদ্যাই ধরি, ঐতিহাসিক ক্রমে শিক্ষা করাতে কত দুরূহ বিষয় সহজ হইয়া গিয়াছে।

ইতিহাসের নামে নভেল লিখিতে বলি না, এককথা ফেনাইয়া ফেনাইয়া লঘু করিতে বলি না; কারণ ফেনাইতে গেলেই অসত্য আসিবে। কিন্তু রচনার লালিত্য, বিন্যাসের সুস্পষ্ট ক্রমে বৈজ্ঞানিক মার্গ চাই। "বোধ হয় হইয়াছিল", "বোধ হয় হয় নাই", "হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না" ইত্যাদির প্রয়োগ বাস্তবিক আবশ্যক হয় কি? যদি হয়, তাহা পৃথক না বলিলে সত্য-অসত্য মিশিয়া যায়, আদ্যোপান্ত গোটা বই পড়িয়া কিছুই জ্ঞানলাভ হয় না।

এই সমস্ত আলোচনা করিয়া দেখা গেল, যে-সে যা-তা লইয়া ইতিহাস লিখিতে পারেন না। ইতিহাস শব্দের অর্থ হইতে বুঝিতেছি উহা পড়িলে সত্য বলিয়া বিশ্বাস হইবে। শোনা কথা হউক, দেখা ঘটনা হউক, সত্য নির্ণয় চিরদিন দুরূহ। এইকারণে অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় ইতিহাসেও বিতর্কের সমাপ্তি নাই। অথচ বিতর্কে চিত্ত তৃপ্ত হয় না। একটা-না-একটা ঠিক ধরিতে চায়। এই আকাঙ্ক্ষা হইতে প্রাচীনকালে আপ্তপ্রমাণ গৃহীত হইয়াছিল। একালে আমরা আপ্ত পাই না, সমুদায় অনুমান প্রমাণে সিদ্ধ করিতে চাই। এই হেতু ইতিহাসে বৈজ্ঞানিকমার্গ অনুসরণ আবশ্যক, এবং যে ইতিহাসে এই মার্গ নাই, বিন্যাস নাই, তাহা ইতিহাস নামের যোগ্য নহে। তাহা পুরাণ হইতে পারে, গল্প হইতে পারে, কিন্তু ইতিহাস হইবে না। যদিও মহাভারত আধুনিক ইতিহাসের ধারায় লিখিত নহে, তথাপি আদর্শ উচ্চ বলিতেই হইবে। এককালের মানবসমাজের এমন উজ্জ্বল সুস্পষ্ট চিত্র দুর্লভ। ইহাতে পরে পরে বহু আখ্যান যোজিত হইয়াছে, কোন কোন স্থানে সমধিক হইয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু সর্ব্বত্র সূত্রটি স্পষ্ট আছে। ইতিহাস পড়িতেই হইবে, শুনিতেই হইবে, নতুবা আমাদের চরিতের ধারা বুঝিতে পারি না। শুধু তথ্য, অসম্বদ্ধ তথ্য, একটা দুইটা তথ্য ধরিয়া রচিত বিপুল গ্রন্থে যদি আমার সম্বন্ধ, মানবজাতির সম্বন্ধ, স্পষ্ট দেখিতে না পাই, তাহা হইলে তাহাকে ইতিহাস বলিতে পারি না। সমুদ্রতটের বালুকাকণা হইতে দূরের অতিদূরের তারকার বৃত্তান্ত লিখিতে পারেন; কিন্তু শুধু সত্য, আমাকে ছাড়িয়া সত্য, হাজার বলুন, তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই। এইকারণে প্রথমে নিজের দেশের ইতিহাস চাই, পরে অন্যদেশের; প্রথমে দেশের ভূগোল চাই, পরে অন্যদেশের। *

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

তীর্থ

রাখাল তাহার গাভীরে হারায়ে বৈশাখী জল ঝড়ে
দুই দিন পরে খুঁজে পেয়ে তারে কণ্ঠ চাপিয়া ধরে।
লেহন-পরশ-শিহরিত তনু, দরদর ধারা বয়
বাৎসল্যের গোমুখী তীর্থ নিভৃতে অভ্যুদয়।

গ্রীষ্মের দিনে গোঠের রৌদ্রে ক্লান্ত তপ্ত কায়ে
রাখাল যখন শ্রান্তি দূরিয়া সুশীতল বটছায়ে
তরুর কাণ্ড বুকে ধরি কহে "বৃক্ষ, ঠাকুর তুমি"
সেথা জাগে প্রেম কৃতজ্ঞতার বোধিদ্রুমতলভূমি।

শ্রীকালিদাস রায়।

* উৎকল-সাহিত্য-সমাজে ওড়িয়া ভাষায় পঠিত।

রুটল্যাণ্ডশায়ারের উইং নামক স্থানে পাহাড়ের গায়ের গোলকধাঁধা।

লুক্কা গির্জার গোলকধাঁধা।
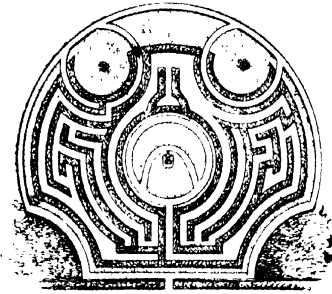
সোমরলিটন হলের গোলকধাঁধা।

শার্ত্র্ গির্জার গোলকধাঁধা। ইহার একদিক হইতে অপর দিক ৪০ ফুট।

চীনেম্যানের গোলকধাঁধা। চীনেম্যানের নাকের ডগায় যাইবার রাস্তা বাহির করিতে হইবে।
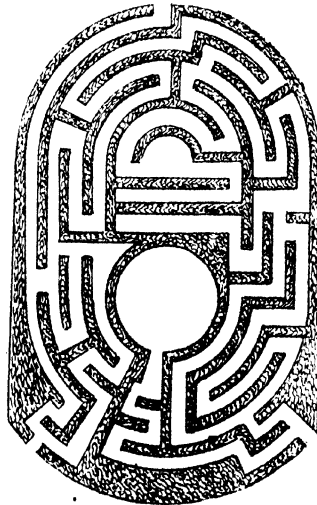
কেনসিংটনের ফুলের বাগানে কেয়ারির গোলকধাঁধা। বর্দ্ধমানের গোলকধাঁধাটিও গাছের বেড়ার কেয়ারির ধাঁধা।

গোলকধাঁধা

গোলকধাঁধার নাম সকলেই শুনিয়াছেন। ইহাকে ইতিহাসের ন্যায় প্রাচীন বলিলেও চলে। কোন দিন হয়ত কোন পুরাতত্ত্ববিদ্ প্রস্তরযুগে গোলকধাঁধার অবস্থিতির প্রমাণ আবিষ্কার করিয়া বসিবেন।

ইয়ুরোপের অনেক সহরে গির্জ্জা মন্দির প্রভৃতির মেঝেতে গোলকধাঁধা দেখিতে পাওয়া যায়। এই-সকল গোলকধাঁধায় ভ্রমণ করিলে তীর্থযাত্রার সমান পুণ্যলাভ হয় বলিয়া মধ্যযুগের লোকের ধারণা ছিল।

পৃথিবীর সকল প্রদেশেই সুন্দর সুন্দর গোলকধাঁধা দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশেও ইহার কিছুমাত্র অভাব নাই। বিলাতের হ্যাট্‌ফিল্ড হাউস, সোমরলিটন হল প্রভৃতি অনেক স্থলে আধুনিক গোলকধাঁধা দেখিতে পাওয়া যায়। কেনসিংটনের কোন উদ্যানে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স এলবার্ট একটি গোলকধাঁধা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তরুণ দর্শকদের নিকট ইহা একটি আনন্দের উৎস ছিল। হ্যামটন কোর্টের গোলকধাঁধা খুব বিখ্যাত। কিন্তু ইহার কেন্দ্রস্থলে প্রবেশের রহস্যটি খুব সহজেই উদ্‌ঘাটন করা যায়। এই ব্যূহের মধ্যস্থিত হতবুদ্ধি ও বিপথগামী পথিকদের প্রতি দৃষ্টি না দিয়া কেহ যদি বরাবর দক্ষিণদিকে থাকিয়া রাস্তাগুলি বেষ্টন করিয়া চলিতে থাকেন, তাহা হইলে তিনি অনায়াসেই গম্যস্থানে উপস্থিত হইবেন। অবশ্য কোন উচ্চ স্থান হইতে সমস্ত পথগুলি একসঙ্গে

A. B-ওয়াল গোলকধাঁধা। ? চিহ্নিত স্থানে যাইবার রাস্তা বাহির করিতে হইবে।

রুষভালুকের গোলকধাঁধা। কপালের তিলকে যাইতে হইবে

পাতার গোলকধাঁধা, ত্রিপত্রের উপর-দিককার পাতার মাঝখানে যাওয়াই ইহার সমস্যা।

দেখিতে পাইলে আরও সোজা রাস্তা বাহির করা যাইতে পারে।

গোলকধাঁধার রক্ষক দরজার কাছে একটা খুব উচ্চমঞ্চে বসিয়া পথভ্রান্ত দর্শকদের চীৎকার করিয়া করিয়া পথ বলিয়া দেয়। আবার মাঝে মাঝে ভুল রাস্তা বলিয়া দিয়া একটু মজাও করিয়া লয়। এই সর্ব্বজ্ঞ রক্ষক মহাশয়ও কখন কখন লোকের কাছে ঠকিয়া যান। একবার একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক এই গোলকধাঁধার একখানি নক্‌সা আনাইয়া পথগুলি উত্তমরূপে চিনিয়া লইয়া গ্রাম্য চাষার বেশে হ্যাম্‌টন কোর্টে উপস্থিত হইয়া রক্ষককে বাজিতে হারাইয়া আসিয়াছিলেন।

হাম্পটন কোর্ট প্রাসাদের বিখ্যাত গোলকধাঁধা।
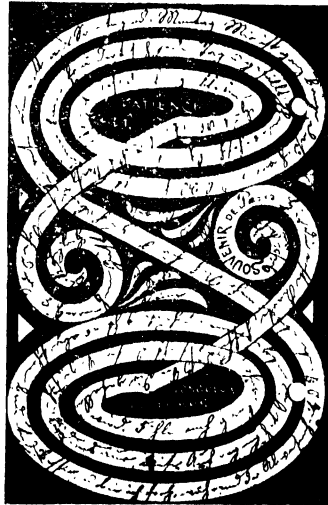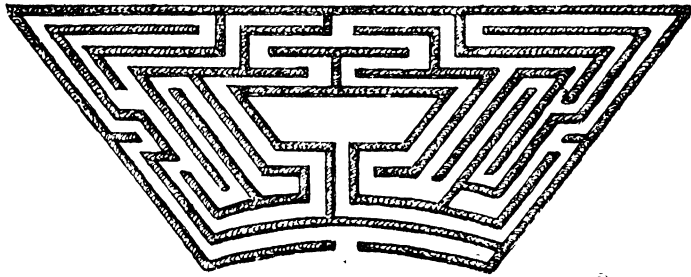
প্রাচীন মুসলমান বাদশাহদের রাজধানীতে প্রমোদ-উদ্যানে বা প্রমোদ-ভবনে গোলকধাঁধা থাকিত। ফতেপুর সিক্রি দিল্লি প্রভৃতি স্থানের গোলকধাঁধা আঁখমিচৌলী খেলিবার ঘর প্রভৃতি এই জাতীয়। বর্দ্ধমানে মহারাজাধিরাজের গোলাপবাগের গোলকধাঁধা বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ।

গোলকধাঁধা যে কেবল উদ্যান মন্দির ও উপবন প্রভৃতিতেই দেখা যায় তাহা নহে; একবার একখানা চিঠিতেও এইরূপ ধাঁধা ছিল; আর ছবিতে ত সর্ব্বদাই দেখা যায়।

কাগজের গোলকধাঁধা তৈরি করা বিশেষ শক্ত কাজ নয়। ইহার চর্চ্চা করিলে ইহাতে বেশ আমোদ পাওয়া যায়। শ্রীশান্তা চট্টোপাধ্যায়।

গোলকধাঁধা চিঠি।
এই চিঠিখানি একজন জার্ম্মান পারী হইতে লণ্ডনে একজন আত্মীয়কে লিখিয়াছিল।

হাঁচির প্রতাপ

(রবীন্দ্রনাথের "বিচারক"এর অনুকরণে)

পুণ্যকীর্ত্তি লক্ষ্মণ সেন
রাজকুল-অবতংস,
রাজাসনে বসি কহিলেন বীর,
"হরণ করিব ভার পৃথিবীর ;
বক্তিয়ারের করেছি স্থির,
দর্প করিব ধ্বংস।"

দেখিতে দেখিতে পূরিয়া উঠিল
সেনানী আশী সহস্র।
নানা দিকদিকে নানা পথে পথে,
বাংলার যত মাঠ ঘাট হতে,
বীরগণ যেন শ্রাবণের স্রোতে
ছুটিয়া আসে অজস্র।

উড়িল গগনে বিজয়-পতাকা,
ধ্বনিল শতেক শঙ্খ,
হুলুরব করে অঙ্গনা সবে,
বঙ্গ বিহার কাঁপিল গরবে,
রহিয়া রহিয়া প্রলয়-আরবে
বাজে ভৈরব ডঙ্ক।

ধূলার আড়ালে ধ্বজ-অরণ্যে
লুকাল প্রভাত-সূর্য্য।
হস্তী অশ্বে ধরা টলমলে,
আকাশ বধির জয়-কোলাহলে,
শত অম্বুদ-মন্দ্রে সবলে
তর্জ্জিছে রণতূর্য্য।

মুক্ত-কৃপাণে চলিছে ভূপতি,
না জানে শঙ্কা দৈন্য।
সমরোন্মাদে নাচিতে নাচিতে
একটি নিমেষে তাঁর ইঙ্গিতে
যুদ্ধভূমিতে পারে প্রাণ দিতে
আশী সহস্র সৈন্য।

"দেব ব্রাহ্মণে দেছেন আশিস,
নাস্তি রে ভয় নাস্তি।"

রাজা কহে বাহু তুলিয়া উধাও
"বঙ্গের জয় আজি সবে গাও,
দুষ্ট দস্যু শত্রুরে দাও
পাপের উচিত শাস্তি।"

নব উৎসাহে উঠে কোলাহল,
বাজি উঠে রণবাদ্য।
গুরু গরজিয়া কহে নরনাথ—
"পাপের রাজ্য কর ধূলিসাৎ,
কর কর সবে শত্রু নিপাত,
যোগাও যমের খাদ্য।

বঙ্গভূমির অঙ্গ পরশে
যত শত্রুর পুত্রে
কে সহিবি তোরা কে রে এত হীন ?
জন্মভূমিরে করিবি অধীন ?
বন্দী রহিবি অমোঘ কঠিন
শত্রুদাস্য-সূত্রে ?"

"জীবন থাকিতে করিব না মোরা
নীচ শত্রুর দাস্য।"—
সহসা এ কি এ! কেমনে কে জানে,
হাঁচির শব্দ পশে আসি কানে,
ঐ দেখা যায় পথ-মাঝখানে
কাহার ব্যায়ত আস্য!

ফেলিয়া অস্ত্র হটে পশ্চাতে
সেনা-সেনাপতি শুদ্ধ।
"আমরা অস্ত্র ছাড়িনু এবার,
ফিরিয়া চলিনু গৃহে আপনার,
অসীম সাহস থাকে ত তোমার
নিজে কর গিয়া যুদ্ধ।"

থামিল শঙ্খ, থামিল ডঙ্ক,
ঝলসে না আসি দীপ্র।
আশীসহস্র রণবিশারদ,
গোলায় যাদের টলায় না পদ,
শুনিয়া একটি হাঁচির শবদ
ফিরিয়া ধাইল ক্ষিপ্র!

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়।

চট্টগ্রামের বলীখেলা

আবহমানকাল হইতে ভারতের নানা দিগ্দেশে মল্লক্রীড়া চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যতই আমরা শিক্ষিত হইতেছি—অর্থাৎ যতই দাসত্বের উৎকৃষ্ট শৃঙ্খল চাকরির জন্য প্রস্তুত হইতেছি—ততই এই স্ফূর্ত্তিজনক দৈহিকশক্তি রক্ষার উপাদেয় পন্থাটি বিস্মৃত হইতেছি। ধনী জমীদার-পুত্রগণের জন্য এ ব্যবস্থা মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ক্রমে তাহাও বিরল হইয়া আসিতেছে। আমাদের বর্ত্তমান রাজা ও রাজপুরুষগণের মধ্যে ব্যায়াম-শিক্ষা এবং কুচ্‌কাওয়াজ, ঘোড়দৌড়, শিকার প্রভৃতি দৈহিক কস্‌রতের ব্যবস্থা কিরূপে সতেজে চলিয়া আসিতেছে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। এজন্য তাঁহাদের স্বাস্থ্য এখনও সতেজ রহিয়াছে। দুঃখের বিষয় বাঙ্গালী যেদিন হইতে
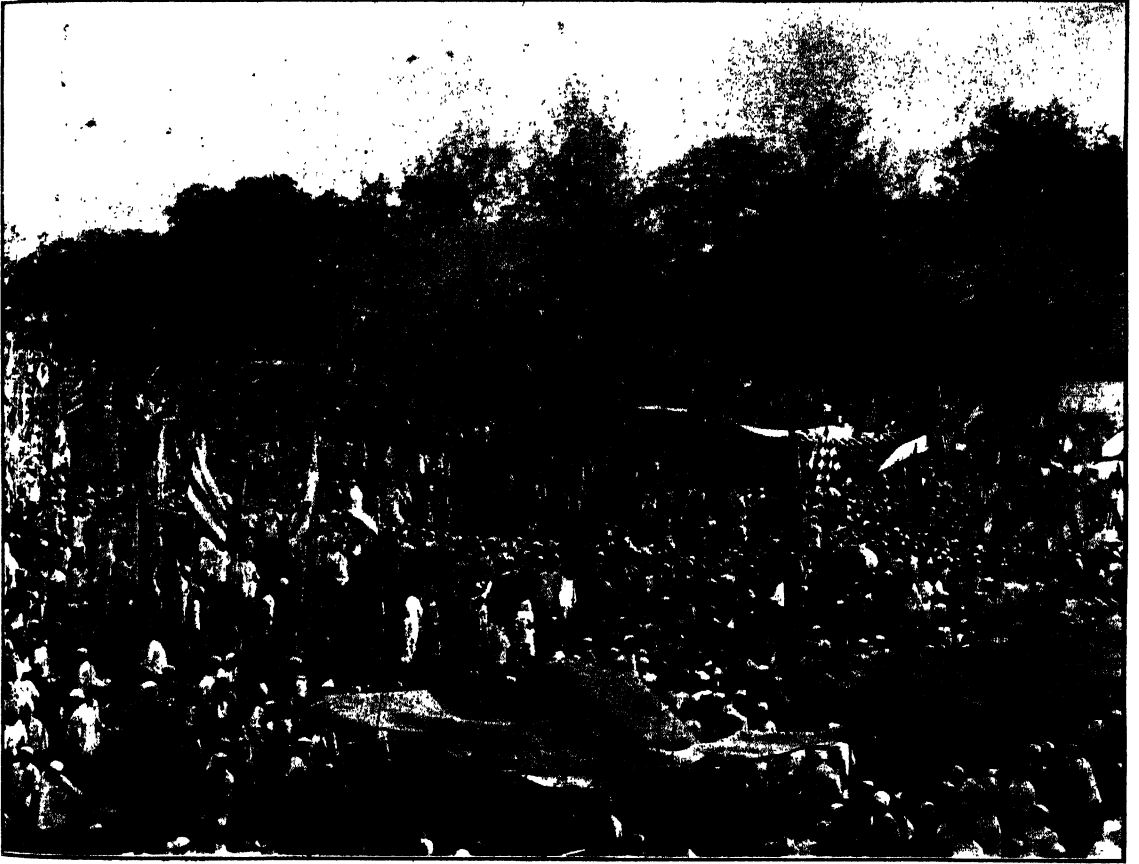
চট্টগ্রামের বলীখেলা।

এবং দেহের ঘুণের দংশনে জর্জ্জরিত হইতেছি—ম্যালেরিয়ার ভক্ষ্যরূপে পরিণত হইতেছি। আজকাল মল্লক্রীড়া একটি হীনজনোচিত কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িতেছে। পৌরাণিকযুগে কিন্তু ইহা সাধারণের ন্যায় রাজা ও রাজপুত্রগণেরও অবশ্যকর্ত্তব্য ছিল। শক্তিরক্ষা তখনকার দিনের একটা গৌরবের বিষয় ছিল। এখনও পশ্চিমদেশীয় বড় বড় পল্লীজননীর অঙ্কে থাকিয়া জলে পড়িয়া দীর্ঘ দুইঘণ্টা-কালব্যাপী সাঁতার-কাটা, "হাডুডুডু খেলা", পরখেলা (গোল্লাদাইর, গুলিডাণ্ডা খেলা ছাড়িয়াছে, যেদিন হইতে ডন, কুস্তী, মুগুরভাঁজা ছাড়িয়াছে, যেদিন হইতে হাঁটাপথে দিনে ৩০।৪০ মাইল "পাঁওদলে" চলিয়া যাওয়ার কথায় আঁৎকাইয়া উঠিতে শিখিয়াছে সে-দিন হইতে তাহাদের হাড়ে

ঘুণ ঢুকিয়াছে। বৃদ্ধ বয়সেও একজন ইংরেজ যেরূপ বালকের উৎসাহে ছুটাছুটি, হুটোপাটি খেলার কৌতুকে যোগদান করে তাহা আমাদের আবার নূতন করিয়া শিখিয়া লওয়া কর্ত্তব্য মনে করিতেছি। কিন্তু যদি অস্মদ্দেশীয় কোন ভদ্রসন্তান আজকাল ডন্ ও কুস্তীর আখাড়ায় কস্রৎ করিয়া "লালমাটী" মাখিতে আরম্ভ করেন তবে তিনি বিংশ শতাব্দীর "আদর্শ বাবুদের" নিকট ঘৃণাস্পদ হইবেন সন্দেহ নাই। আজকাল স্কুলের ছাত্রদিগের মধ্যে কেহ কেহ ফুটবল, ব্যাটবল খেলায় যোগদান করিয়া এবং কেহ কেহ বা স্যাণ্ডোর প্রণালীতে ডাম্বেল ভাঁজিয়া কস্রত করিতেছেন বটে।

মল্লক্রীড়ার এই দুর্গতির দিনে কয়েক বৎসর যাবত চট্টগ্রামে বাস করিয়া তাহার যে একটি সজাগ চিত্র দর্শন করিতেছি এবং তাহার ভিতর যে একটা চেতনার আভাস পাইতেছি তাহাই আজ পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিতে প্রয়াসী হইলাম।

সুবেবাঙ্গালার অন্যান্য জিলায় এরূপ সমারোহ মল্লক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয় কি না তাহা জানি না। বাল্যকালে বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগরী কলিকাতায় এবং যৌবনে ঢাকায় বাসকালে ২।১টি পশ্চিমী পালোয়ানের কুস্তী-ক্রীড়ার অভিনয় দর্শন করিয়াছি, কিন্তু এত সমারোহ ও এত আড়ম্বর তাহাতে দেখি নাই। এবং সেখানে মল্লক্রীড়া এরূপ কৌলিক "বারমাসে তের পার্ব্বণের" পর্য্যায়ভুক্ত নহে। এখানকার মল্লক্রীড়ার (বলীখেলার) অনুষ্ঠাতারা প্রত্যেক বৎসর নির্দ্দিষ্ট দিনে এই ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। পিতার অনুষ্ঠান পুত্রে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। অনুষ্ঠানের তারিখ পূর্ব্ব হইতে সর্ব্বত্র বিজ্ঞাপনাদি এবং নিমন্ত্রণ-পত্র বিলি করিয়া প্রচারিত হইয়া থাকে। নানাস্থানের বলী-গণকে আহ্বান করা হইয়া থাকে।

চট্টগ্রামে "বলীখেলার" একটা সার্ব্বজনীনতা আছে। এই জিলার প্রায় প্রত্যেক গ্রামে বলীখেলার ছোট বড় মেলা হইয়া থাকে। "গাজনের ঢাকে" কাঠি পড়িলে যেমন পূর্ব্বকালে চড়কের সন্ন্যাসীদের পিঠ সুড়সুড় করিত, চৈত্র মাসে চট্টগ্রামের বলীদের মধ্যেও তেমনি একটি উন্মাদনা পরিলক্ষিত হয়। এজন্য সম্পন্ন হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে অনেকেই রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। সমস্ত জিলা ব্যাপিয়া কতগুলি "বলীখেলা" হয় তাহার সংখ্যা করা দুরূহ। এক চট্টগ্রাম নিজ সহরেই ১৫।২০টি খেলার "থলা" (স্থল) হইয়া থাকে। তাহাতে দেশের নানাস্থান হইতে বলীগণ আসিয়া নিজ নিজ দক্ষতা দেখাইয়া যথাযোগ্য পারিতোষিক লাভ করিয়া থাকে। আমরা তন্মধ্যে একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেলার বিবরণ দ্বারা পাঠকগণকে তাহার একটা আন্দাজ দিতে চেষ্টা করিব।

আমরা যেটির বর্ণনা করিব তাহা "আবদুল জব্বরের বলীখেলা" বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই খেলা গত ১৩ই বৈশাখ সোমবার হইয়া গিয়াছে। প্রতি বৎসরই বৈশাখ মাসের এমনি তারিখে এ খেলা হইয়া থাকে। চট্টগ্রাম সহরের ঠিক বক্ষঃস্থলে পুরাতন কাছারীর (বর্ত্তমান থানা ও মাদ্রাসা স্কুলের) ইমারতের নিম্নস্থ ময়দানে এই খেলার স্থান করা হইয়া থাকে। ময়দানের মধ্যস্থলে মল্লগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট রঙ্গস্থল বাদ রাখিয়া চারিদিকে লোহার কাঁটা-তার দিয়া দোহারা বেড়া দেওয়া হয়। তৎপর সেই রঙ্গস্থলের ঠিক মধ্যস্থলে একটি উচ্চ সুপারীগাছের থাম পুঁতিয়া তাহার উপরিভাগে একটি "বায়ু-চক্র" বসাইয়া দেওয়া হয়, বায়ু-প্রবাহের তাড়নায় তাহা অবিরাম গতিতে ঘুরিতে থাকে, এবং তন্মধ্যে বসান কয়েকটি ছবির তরঙ্গায়িত গতি দেখিতে পাওয়া যায়। সুপারীগাছের থামটি রঙ্গীন কাগজ দিয়া মুড়িয়া দেওয়া হয় এবং তাহার অগ্রভাগ হইতে কতকগুলি রশিতে ঝুলান বিচিত্রবর্ণের পতাকাশ্রেণী চারিদিকে টানিয়া বাঁধা হয়। এবং চারিদিকে বংশদণ্ডের উপর নানা-বর্ণের পতাকা-সকল উড়িতে থাকে। রঙ্গস্থলের এক পার্শ্বে কয়েকটি সামিয়ানা খাটাইয়া নিমন্ত্রিত দর্শকগণের বসিবার বন্দোবস্ত করা হয় (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। রবাহূত ব্যক্তিগণ চারিদিকে দাঁড়াইয়া বসিয়া গাছে ছাদে চড়িয়া এই দৃশ্য দর্শন করে। পাহাড়ের ঢালুগাত্রে লোকগুলি কেমন গ্যালারীর ন্যায় উপবেশন করিয়াছে তাহা ২নং চিত্র দর্শন করিলেই সহজে অনুমান করা যাইবে। * এই ব্যাপারে

* চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ ফটোগ্রাফার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দস্তিদার মহাশয় কষ্টস্বীকার করিয়া চিত্রগুলি তুলিয়া দিয়া আমাদের চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।—লেখক।

চট্টগ্রামের বলীখেলা।

উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী হইতে আরম্ভ করিয়া উকীল আমলা এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। এই উদ্দেশ্যে অনেক আফিস আদালতের অৰ্দ্ধ কাছারী হয়।

খেলার দিন রাত্রিপ্রভাতের পূর্ব্ব হইতে চট্টগ্রামের স্থানীয় ডোম বাদ্যকরগণের ঢোল কাড়া সানাইয়ের মিশ্রিত একঘেয়ে আওয়াজে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠিতে থাকে। এবং ঘন ঘন বোমের আওয়াজ হইতে থাকে। নানা স্থান হইতে দোকানীরা আসিয়া মেলার উপযোগী দোকান সাজাইতে আরম্ভ করে। মেলায় "নাগরদোলা", "রাধাচক্র", এমন কি ছোটখাট ভূঁয়ে-গেঁয়ে সার্কাসের দলও আগমন করিয়া থাকে।

ক্রমে বলীগণ আসিয়া উপস্থিত হয়। এক-একজন বলীর সহিত তাহার সহচর সাথী প্রায় ১০০।১৫০ লোক দলবদ্ধ হইয়া আগমন করে। রঙ্গস্থল হইতে ঢোল বাজাইতে বাজাইতে যাইয়া তাহাদিগকে "থলার" মধ্যে আগবাড়াইয়া আনিতে হয়। একে দুয়ে, দশে বিশে, দলে দলে প্রায় ৫০০০ হাজার দর্শক ক্রীড়াস্থলে সমবেত হয়। মোটর গাড়ী, মোটর বাস, গাড়ী ঘোড়ার অবিরামগতিতে সহর তোলপাড় হইতে থাকে। উত্তেজিত জনসঙ্ঘকে পথে আসিতে আসিতে বলীখেলার কথা ভিন্ন অন্য কথা বড় একটা বলিতে শোনা যায় না। কোন্ বলী বড়, কাহার "তাকত" বেশী, কাহার সঙ্গে কাহার কুস্তী হইবার সম্ভাবনা, কে কাহাকে হারাইবে, ইত্যাকার কোলাহলে সহর মুখরিত হইয়া উঠে। কেহ কাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে "সালাম মাউ, কঁড়ে যাওর?" অন্য উত্তর

দিতেছে "এক্কানা বলীখেলা চাইতাম যাইর।" ইত্যাদি। দেখিতে দেখিতে স্থানটি লোকারণ্যে পরিণত হয়। বেলা দশটার পর মল্লগণ আসরে অবতীর্ণ হইতে থাকে। তখন সজোরে ঢোলে কাঠি পড়িতে থাকে এবং আরো ঘন ঘন বোম ফুটিতে থাকে। শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ উপস্থিত থাকিয়া মধ্যস্থতা করিয়া থাকেন। বেলা দশটার পর হইতে জনতার ভিড় এত বাড়িতে থাকে যে তখন রাস্তা দিয়া গাড়ী ঘোড়া চলাচলও প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। খেলা আরম্ভ হইলে মল্লগণ রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ হইয়া বাদ্যের তালে তালে নৃত্য করিতে থাকে এবং মালসাটে প্রতিপক্ষকে ক্রীড়ায় আহ্বানসূচক সঙ্কেত করিতে থাকে। এখানকার খেলার নিয়ম এই যে ৮।১০ জোড়া বলী বা পালোয়ান একসঙ্গে কুস্তী আরম্ভ করে।

মল্লগণের মধ্যে একজন অন্যজনকে "চিৎপট্‌কন" দিতে পারিলেই তাহার জিত হইল। কোন বলী কাহাকেও হারাইতে পারিলে উপস্থিত জনতার মধ্য হইতে যে গভীর আনন্দধ্বনি উত্থিত হয় তাহাতে গগন বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হয়। যে বলী জয়লাভ করে সে খেলাদাতার নিকট হইতে যথোপযুক্তরূপে বস্ত্র ও অর্থাদি পুরস্কার লাভ করিয়া থাকে। এরূপে অনেক জোড়া বলী যার যার কেরামৎ দেখাইয়া পুরস্কার লইয়া যায়।

দুঃখের বিষয় ঢাকার, কলিকাতার ও পশ্চিমী পালোয়ানগণের খেলার প্রতিযোগিতায় প্রতিপক্ষগণ একে অন্যকে হারাইবার জন্য যে-সকল অপূর্ব্ব কৌশল (পাঁচ) দেখাইয়া থাকে, এক এক জোড়া মল্লের খেলায় যেরূপ ২।৪ ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হয়, এখানকার মল্লগণের খেলায় তাহার অনুরূপ বড় বেশী কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না—এক এক জোড়ার খেলায় ১০।১৫ মিনিটের বেশী সময় লাগে না। ইহার কারণ স্থানীয় বলীগণ অধিকাংশই "ভুঁইফোঁড়", এখানে কুস্তী কসরৎ শিক্ষার তেমন কোন নির্দ্দিষ্ট "আখড়া" নাই; নিজে নিজে যে যত দেহের শক্তি সঞ্চয় করিতে পারে সেই তত বড় বলী বলিয়া পরিগণিত হয়। এখানে বলী খেলায় যেরূপ একাগ্রতা আছে, যেরূপ উন্মাদনা আছে, তাহাতে যদি কসরৎ ও কৌশলাদি শিক্ষার তেমন কোন ব্যবস্থা থাকিত তবে সোনায় সোহাগা হইত সন্দেহ নাই। আশা করি খেলার অনুষ্ঠানকারীগণ এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবেন। এবং সময় সময় ঢাকা প্রভৃতি স্থান হইতে নামজাদা পালোয়ানদিগকে আনাইয়া বলীখেলার প্রকরণ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া ইহার উন্নতিসাধনে যত্নবান হইবেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে খেলা ভাঙ্গিয়া যায়। তখন রুদ্ধ জলস্রোত হঠাৎ মু· হওয়ার ন্যায় জনসঙ্ঘ গৃহাভিমুখে প্রস্থান করে। বহুদূর হইতে আগত বলীগণ তাহাদের পাথেয় ও খোরাকী ইত্যাদি পায়। এ উপলক্ষে অনুষ্ঠাতার ৪০০৲, ৫০০৲ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। চট্টগ্রাম মুসলমান-প্রধান স্থান বলিয়া দর্শকগণের মধ্যে প্রায় পনর আনাই মুসলমান। পাঠকগণ চিত্রগুলি মন দিয়া দেখিলে টুপীর বাহুল্যে এই তথ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

চট্টগ্রামে বলীখেলার ভিতর যে চেতনাটুকু এখনও ক্ষীণ দীপালোকের মত জ্বলিতেছে তাহাতে কিঞ্চিৎ উৎসাহের তৈলসেক করিয়া যদি ইহাকে সর্ব্বত্র এইরূপ সচেতন করা যায় এবং পূর্ব্ব কালের ব্যায়াম কৌশলপূর্ণ ক্রীড়াদি পুনরায় নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়া আমাদের ভাবী বংশধরগণের ব্যায়ামের ব্যবস্থা করা যায়, তবে এই পোড়া বাঙ্গলায় আবার স্বাস্থ্যের উজ্জ্বলতেজ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতে পারে। শাস্ত্রে আছে—

"শরীমাদ্যম্ খলু ধর্ম্মসাধনম্"।

কোহিনুর প্রেস, চট্টগ্রাম। শ্রীমোহিনীমোহন দাস।

রজনী

(সুইনবার্ণ কৃত ইতালীয় কবিতার অনুবাদ)

১

দেখিছ না রজনীর রূপ—শান্ত-সৌম্য-মধুর-সুন্দর—
নিদ্রায় মগন,—যেন ভাস্কর-গঠিত
মর্ম্মর-মূরতি; কিন্তু চেতনা-পূরিত,
ঘুমায় সে। বিশ্বাস কর না? ডাক তারে, সে দিবে উত্তর।

২

নিদ্রা মোরে বাসে ভালো; মোর কাছে চাহ পরিচয় আর?—
পাষাণ-প্রতিমা আমি। যাক্ লজ্জা, যাক্ দুখ,
মোর ভাগ্য ভালো, দেখিতে হয়না কারো মুখ!
শুন তবে, কথা কও ধীরে—ভাঙ্গিও না সুষুপ্তি আমার!

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

উত্তরবঙ্গের পীর-কাহিনী*

উত্তরবঙ্গ সাহিত্যপরিষদের বিগত মালদহ-অধিবেশনে আমার লিখিত "উত্তরবঙ্গের পীর-কাহিনী" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। প্রবন্ধটি পরে প্রবাসীপত্রে (১৩১৭ সনে) মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধে আমি উত্তরবঙ্গের পীরস্থানগুলির তত্ত্বানুসন্ধান করিতে সাহিত্যসেবী মহাশয়গণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলাম। পরে জানিতে পারিয়াছি উক্ত পরিষদের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় রঙ্গপুরের পীরস্থানগুলির বিবরণ-সংগ্রহে ব্রতী হইয়া পূর্ব্বেই একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবন্ধটি পড়িয়া দেখিবার সৌভাগ্য এপর্য্যন্ত আমার হয় নাই। যাহাই হউক পরিষদের একজন পরিচালকরূপে তিনি যে উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া কোন কথা আরম্ভ করিতে পারিতেছি না।

দুঃখের বিষয় বঙ্গীয় মুসলমানসমাজ কথিত পীর-কাহিনী উদ্ধারে ততটা মনোযোগ প্রদান করিতেছেন না। কেহ কেহ এসম্বন্ধে ভিন্ন মতও পোষণ করেন। যাঁহাদের অক্লান্ত চেষ্টা ও অমানুষিক ত্যাগস্বীকার-হেতু বঙ্গীয় অধিকাংশ মুসলমানের পূর্ব্বপুরুষ ইসলামের আশ্রয়ে দণ্ডায়মান হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, খুব সম্ভব যাঁহাদের আগমন না হইলে ভারতের এই পূর্ব্বোত্তর প্রান্তে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য ঘটিত না, তাঁহাদের জীবনচরিত আলোচনা বরং একটি সাম্প্রদায়িক কার্য্য বলিয়াই বিবেচিত হওয়া উচিত। কেবল ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধান বলিয়া কোন কথা নহে, ইসলামের ভক্তিযোগ কি পরিমাণে পরিস্ফুট ও উজ্জ্বল এই সমস্ত পীর বা সাধুচরিত তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সৎসঙ্গ ও সাধুচরিত আলোচনায় মানুষ যতটা উপকৃত হইতে পারে, শত বক্তৃতাতেও তাহা সম্ভবে না। সত্য বটে ইসলামের শিক্ষার বহির্ভূত আচরণ পীরগণের অনেকের জীবনচরিত ও সমাধিস্থানে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু তজ্জন্য পীরগণ অশ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারেন না। যিশুখ্রীষ্ট (ঈশা) কোরানসরিফে একজন পয়গাম্বর বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন, খ্রীষ্টানগণ তাঁহাকে যেভাবে পরিচিত করিয়া থাকেন, কোরানসরিফে তিনি সেভাবে বর্ণিত হন নাই। খ্রীষ্টানগণের বর্ণনা মনঃপূত নহে বলিয়া কি মুসলমানগণ খৃষ্টকে অগ্রাহ্য করিতে পারেন? ঈশ্বরপরায়ণ সাধু হিন্দু মুসলমান যে-কোন বংশে জন্মগ্রহণ করুন না কেন তিনি জগতের মাননীয় ব্যক্তি এবং জনসমাজের কর্ণধারস্বরূপ। তাঁহাদের বাস্তব ও পূতচরিত্র অনুশীলনে চিন্তাশক্তি নিয়মিত হয় এবং অধ্যাত্মবিজ্ঞানে সাহিত্য সম্পদশালী হইয়া উঠে। শিষ্যগণ অতিরিক্ত রং ফলাইতে গিয়া অনেক সময় তাঁহাদের স্বাভাবিক চিত্র আচ্ছাদিত করিয়া ফেলেন, এজন্য তাহাদের বর্ণিত বিবরণের প্রতি নির্ভর সর্ব্বত্র নিরাপদ মনে করা যাইতে পারে না। যিনি যাহাই বলুন, ধর্ম্মের জীবন্তমূর্ত্তি মহাজনগণ যে যুগে যুগে জনসমাজের শ্রদ্ধালাভ করিয়া আসিতেছেন তাহাই তাঁহাদের পরিচয়ের পক্ষে যথেষ্ট। মিথ্যা সত্যের ভীতি হইতে পারে না, ধর্ম্মরাজ্যে মিথ্যার স্থায়িত্ব সম্ভবে না।

পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রবন্ধে সত্যপীর গাজী ও একদিল সাহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে। বিস্তারিত ও প্রামাণিক পীরকাহিনী সঙ্কলনের প্রয়াসপথে বিস্তর বাধাবিঘ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। সত্যপীরের পুথিতে "যেই সত্যনারায়ণ সেই সত্যপীর" দৃষ্ট হয়। পাঁচালীতে "সত্যপীর নামে পূজা করিবে যবনে" লিখিত আছে। এতদ্দ্বারা সত্যপীর ও সত্যনারায়ণ অভিন্ন ব্যক্তি মনে করা যাইতে পারে। রাজসাহীর অন্তর্গত পোরসার জমিদার মহাশয়দের বদনগাছির কাছারীতে রক্ষিত চিঠার স্থানবিশেষে "মৈদলন রাজার বাড়ী সত্যনারায়ণের জমি" লিখিত থাকায় ঐ অনুমান বিশ্বাসে পরিণত হইতেছে। গৌড়ের ইতিহাসে প্রকাশ, "কথিত আছে গৌড়েশ্বর গণেশ বা কংসের চেষ্টায় সত্যপীর হিন্দুমুসলমান উভয় সমাজে মান্যাস্পদ হইয়াছেন।" প্রকৃত হইলে সত্যপীর রাজা গণেশের সময়ে অথবা তাঁহার পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন।

একদিল সাহের সময় ১৪শ শতাব্দী অনুমিত হইতে পারে। তাঁহার শিক্ষাগুরু মৌলানা আতা ১৪শ শতাব্দীতে দিনাজপুরের নিকট দেবকোটে অবস্থান করিতেন; তাঁহার

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের ৭ম অধিবেশনে পঠিত।

দীক্ষাগুরু চট্টগ্রামের সাহ বদরউদ্দিন বদরউল আলম ১৪৪০ খৃঃ দেহত্যাগ করেন।

মুসলমান-রাজত্ব অবসানের সঙ্গে-সঙ্গে বঙ্গীয় মুসলমানের মধ্যে শিক্ষাহীনতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় ধর্ম্মের মূল-শিক্ষাগুলি ক্রমশঃ অজ্ঞানিত হইয়া পড়িয়াছে, এবং সেই পরিমাণে স্বধর্ম্মী পীর বা সাধুপুরুষগণের প্রতি অযথা ও অতিরিক্ত ভক্তি সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। বঙ্গের শেষ মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ শিয়ামতাবলম্বী থাকায় উত্তর-বঙ্গে শিয়ামতের আচার অনুষ্ঠানও বিশেষভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। রঙ্গপুর ফৌজদারীতে একটি "ইমামবাড়া" ও গোয়ালপাড়ার নিকট কৃষ্ণাই নদীর তীরে "পাঞ্জতন" স্থাপিত হইয়াছিল। স্বয়ং প্রেরিতপুরুষ, তাঁহার কন্যা, জামাতা ও দুইজন দৌহিত্র এই পাঁচ "তন" (শরীর) লইয়াই "পাঞ্জতন"। "পাঞ্জতন" বলিতে উপরোক্ত পাঁচ "তনে"র কৃত্রিম সমাধি মনে করিতে হইবে। কোচবিহারের স্বাধীন রাজগণ পর্য্যন্ত শিয়ামতানুযায়ী তাজিয়া দেওয়াইতেন। এপর্য্যন্ত সে প্রথা বিলুপ্ত হয় নাই। সেই সময় "খোয়াজের ব্যাড়া" দেওয়ার একটি প্রথা উত্তরবঙ্গের মুসলমানসমাজে ধর্ম্মোৎসবে পরিণত হইয়াছিল। ভাদ্র-মাসে মুর্শিদাবাদে এই উপলক্ষে বিশেষ ধুমধাম হইত। নৌকার আকারে বিবিধ কারুকার্য্য-সমন্বিত "ব্যাড়া" দীপা-লোকে সজ্জিত করিয়া জলে ভাসান হইত। ঢাকার নবাব মোকরম খাঁ কর্ত্তৃক এই প্রথা বঙ্গে প্রবর্ত্তিত হয়। কেহ কেহ বলেন এই উৎসব চীনদেশ হইতে আমদানি। খোয়াজ পীরের (খাজে খেজের) উদ্দেশ্যে "ব্যাড়া" জলে ভাসান হইয়া থাকে। খোয়াজপীর বঙ্গে হিন্দুর জলদেবতা বরুণ-দেবের স্থলাভিষিক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এই পীরের প্রকৃত পরিচয় প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। ইঁহার সময়-নির্দ্দেশ লইয়া ঐতিহাসিক-সমাজে মতভেদের অভাব নাই। পারস্যের অন্তর্গত সিরাজনগরের অদূরে খাজে খেজেরের জন্মস্থান কথিত হইয়া থাকে। তাঁহাকে মুসার, মতান্তরে ইব্রাহিমের, সমসাময়িক বলা হয়। কেহ কেহ খাজেখেজেরকে সেকেন্দারের সমকালীন ব্যক্তি বলিয়াছেন। ইলিয়াশ ও খেজের অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াও মনে করা হইয়া থাকে। খেজেরের অমর বলিয়া খ্যাতি আছে। কথিত আছে ইনি নুহের (নোয়া) বংশধর। প্রকৃতপক্ষে খাজে-খেজের একজন ঈশ্বরপরায়ণ, পরোপকারী ও ভ্রমণশীল সাধুপুরুষ ছিলেন। কাবুলনগরের অদূরে একটি পার্ব্বতীয় জলস্রোত তাঁহার নামে পরিচিত হইয়া থাকে। শকর জেলায় খেজেরের আস্তানা (আশ্রম) ছিল। বর্দ্ধমানের নিকট সমাধিপ্রাপ্ত সাধু বাহরাম সাহের তিনি গুরু ছিলেন। গৌহাটীর নিকট কামাখ্যা পাহাড়ের একটি ঝরণাকে "চশমে খাজে খেজের" বলে।

মদিনাবাসী সুবিখ্যাত সাধু বদিউদ্দিন মাদারের নাম উত্তরবঙ্গে সুপরিচিত। মাদারের প্রবর্ত্তিত মতের অনু-সরণকারী একশ্রেণীর ফকির আছেন, তাঁহারা "মাদারী ফকির" নামে পরিচিত। অশিক্ষিত মাদারী ফকিরেরা মাদারের সম্বন্ধে ইসলাম-শাস্ত্র-বহির্ভূত মত পোষণ করিয়া থাকেন। উত্তরবঙ্গের অশিক্ষিত মুসলমানসমাজে মাদা-রের বাঁশ খাড়া করার প্রথা ছিল, এখনও স্থানবিশেষে দৃষ্ট হয়। মাদার অত্যন্ত তেজস্বী, স্বার্থত্যাগী ও ঈশ্বর-পরায়ণ সাধু ছিলেন। তৈমুরলঙ্গের ভারত-আক্রমণকালে তিনি এদেশে আগমন করেন। জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শারকি মাদারের সমসাময়িক ছিলেন। উত্তরবঙ্গে মাদারের প্রতিপত্তি সামান্য ছিল না। ইঃ বিঃ রেলওয়ের জামালগঞ্জ ষ্টেসনের পশ্চিম পাহাড়পুরে ও বগুড়া সেরপুরে মাদারের দরগা আছে। গোরক্ষপুরের উত্তর একটি পর্ব্বত-শৃঙ্গ মাদারের নামে পরিচিত হইয়া থাকে। কানপুরের নিকট মাকানপুরে তিনি সমাহিত হইয়াছেন।

ক্ষিপ্ত পশু দংশন করিলে পাগলাপীরের সন্তোষ বিধা-নার্থে তাঁহার নামে বাঁশ খাড়া করার প্রথা উত্তরবঙ্গে বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল, শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। এই পীরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। রঙ্গপুরের অন্তর্গত চিলমারীর নিকট পাগলা নদীর তীরে প্রতি বৎসর চৈত্রমাসে পাগলাপীরের নামে একটি মেলা বসিয়া থাকে। রঙ্গিনবস্ত্র ও চামর দ্বারা সুসজ্জিত কতকগুলি বাঁশ লইয়া বাদ্যভাণ্ডসহ লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ান বাঁশ খাড়া করার অর্থ সঙ্গে একজন "ভঁওরিয়া" থাকে, সে পাগলাপীরের নামে ভবিষ্যৎবাণী করে ও লোককে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকে।

খাজা খেজের।
প্রাচীন মুঘল চিত্র হইতে।

বঙ্গীয় মুসলমানসমাজে অতিরিক্ত পীরভক্তি ব্যতীত কৃত্রিম দরগা ও পীরস্থান সৃষ্টি করার প্রবৃত্তিও দেখা দিয়াছিল। পশ্চিমোত্তর সীমান্তপ্রদেশের অশিক্ষিত মুসলমান-সমাজে এইরূপ পীরপ্রীতি লক্ষিত হইয়া থাকে। জলপাইগুড়ির অন্তর্গত পাটগ্রামে "কদম-রসুল" অর্থাৎ পয়গাম্বরের পদচিহ্ন নামে একটি স্থান আছে। কিছুকাল পূর্ব্বে এই কদম-রসুলের প্রতি লোকের অসাধারণ ভক্তি ছিল। কদম-রসুলের নিকট "মির্জ্জার কোট" নামে একটি দুর্গের চিহ্ন আছে, ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে এইস্থানে মোগল-পক্ষের সহিত কোচবিহার-রাজের যুদ্ধ হইয়াছিল। কদম-রসুলের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে কোচবিহার-রাজসরকার লাখেরাজ প্রদান করিয়াছেন। সম্ভবতঃ মুসলমানগণের মির্জ্জার কোটে অবস্থানকালে উপরোক্ত পদচিহ্ন স্থাপিত হইয়াছিল।

রঙ্গপুরের দক্ষিণ পীরগঞ্জের এলাকায় সুপ্রসিদ্ধ পীর ইসমাইলগাজীর সমাধি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই পীর কেবলই যে সাধুপুরুষ ছিলেন তাহা নহে, একজন ধর্ম্ম-যোদ্ধাও ছিলেন। ঘোড়াঘাট অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম্ম প্রচার ও মুসলমান উপনিবেশ স্থাপনে তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ছিল। গাজীর সমাধিমন্দিরের মতওল্লির নিকট প্রাপ্ত একখণ্ড হস্তলিখিত পুথির সাহায্যে মিঃ ড্যামণ্ট অবধারণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন যে, সম্ভবতঃ গাজী বারবাক সাহের রাজত্ব-কালে ১৪৬০ খৃঃ কামতাপুরের সেন রাজাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছিলেন। বারবাক্ সাহের রাজত্বকালে (১৪৬০ খৃঃ) ভদায় সেনাপতি রহমত খাঁ কর্ত্তৃক কামতা-পুর আক্রান্ত হইবার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বুকানন সাহেবের মতে ইসমাইল-গাজী ১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ঘোড়াঘাটের শাসনকর্ত্তা ছিলেন এবং নসরত সাহ কাটা-দুয়ারের অধিবাসী নীলাম্বর নামক কোন স্থানীয় রাজার রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। গাজীর প্রকৃত সমাধি কোথায় তাহার মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। গৌড়ের ইতিহাসে প্রকাশ, ১৫১০ খৃঃ হোসেন সাহের উড়িষ্যা আক্রমণের কালে ইসমাইলগাজী সেনাপতি ছিলেন; সেইসময় কোন কারণে তাঁহার প্রতি সন্দেহ হওয়ায় হোসেন সাহের

আদেশে গাজী হতে হন এবং দক্ষিণ গড়মান্দারণে তাঁহার সমাধি হয়।

গৌহাটীর পশ্চিমে ও ব্রহ্মপুত্রের উত্তর হাজো নামক স্থানের "পোয়ামক্কা" মসজিদ তদঞ্চলের মুসলমান-সমাজে সুপরিচিত ও সমধিক মান্য। এই মসজিদের ব্যয়নির্ব্বাহার্থে বাদসাহী আমলের পীরোত্তর ভূমি আছে। আহম-রাজগণের আধিপত্যকালেও তাহার অন্যথা হয় নাই। নানা কারণে মসজিদের অবস্থা এখন আর পূর্ব্ববৎ নহে। মক্কা হইতে মৃত্তিকা আনিয়া মসজিদের মেঝে পূর্ণ করা হইয়াছিল বলিয়া এই মসজিদ "পোয়ামক্কা" নামে অভিহিত হইয়াছে। যেসময় হেজ্জাজ গমন করিতে হইলে দেশত্যাগের আবশ্যক হইত, সেইসময় মালদহের অন্তর্গত পাণ্ডুয়া, গোয়ালপাড়ার "পাঞ্জতন" বা "বিবির পঁইত" ও গৌহাটীর "পোয়ামক্কা" তদঞ্চলের মুসলমান-সমাজে তীর্থস্থানে পরিগণিত ছিল। হিন্দুরাও শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ ছিল না। পোয়ামক্কায় ধর্ম্মাত্মা গিয়াশ-উদ্দিনের সমাধি আছে। এই গিয়াশউদ্দিনের পরিচয় ও সময় সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ একমত হইতে পারেন নাই। কথিত আছে গিয়াশউদ্দিন মোগলপক্ষে আহম-রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে বিশ্বনাথে হত হন এবং তাঁহার দেহ হাজোতে নীত ও সমাহিত হয়। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা-রিভিউ পত্রে প্রকাশ গিয়াশউদ্দিন ১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভে হোসেন সাহের পুত্র দানিয়ান সাহের পর-বর্ত্তী হাজোর শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনিই পোয়ামক্কায় মসজিদ নির্ম্মাণ ও হাজোর নিকট একটি মুসলমান উপনিবেশ স্থাপন করেন। গিয়াশউদ্দিন তথায় ধর্ম্মার্থে ভূমি দান করিয়াছিলেন। গৌহাটী কটনকলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ তত্ত্বসরস্বতী মহাশয়ের অনুগ্রহে পোয়ামক্কা মসজিদের দ্বারলিপির একখণ্ড নকল সংগ্রহে সক্ষম হইয়াছি; তাহাতে উক্ত মসজিদ, সাহজাহান বাদ-সাহের রাজত্বকালে ১০৬৭ হিজরীর (১৬৫৭ খৃঃ) রমজান মাসে, বঙ্গের শাসনকর্ত্তা বাদসাহপুত্র সুজাউদ্দিন মহম্মদের পক্ষ হইতে, সাহ নিয়ামতউল্লার শিষ্য লোতফউল্লা সিরাজী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত লিখিত আছে। লোতফউল্লা সিরাজী ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নিম্ন আসামের ফৌজদার ছিলেন। আলমগীর-নামায় প্রকাশ, কোচবিহার- ও আহম-রাজের আক্রমণে সিরাজী আসাম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

শ্রীআমানতউল্লা আহম্মদ।

"অবিচার"

(প্রবাসীর তৃতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত গল্প)

ভাবপ্রবণ বৃদ্ধ হরিহর যখন করুণভাষায় নিজের অতীত জীবনের করুণকাহিনী বর্ণনা করিত সেসময় খুব কম লোকই চক্ষের জল সংবরণ করিতে পারিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমি ভিন্ন তাহার এই করুণরসের ভক্ত ছিলও বড় কম।

সেদিন যখন গেলাম তখন সে গান গাহিতেছিল। আমাকে দেখিয়া ক্ষণিকের জন্য থামিয়া বলিল "কে, বিনোদ? বস।"

একখানা পুরাণ চৌকির উপর একটা জীর্ণ মাদুর পাতা ছিল, আমি গিয়া বসিলাম। বৃদ্ধ তখন তানপুরার এক-ঘেয়ে স্বরের সঙ্গে গলা মিশাইয়া গীয়মান গীতের শেষ পদটি শেষ করিয়া ফেলিল। তারপর একটি দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে তানপুরাটি নামাইয়া রাখিয়া বলিল—"একেবারে মন ভেঙ্গে পড়েছে বিনোদ!"

বৃদ্ধের স্বরের চিরন্তন কারুণ্য আজ যেন একটু বেশী—যেন আমায় নূতনভাবে আঘাত করিল!

আজ অনেকদিনের পর হরিহরের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি। বাড়ীটাতে একেবারেই মন টিকিতেছিল না, তাহাতে যেন একটা বিশাল পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, যেন তাহার প্রাণেরই অভাব! প্রাণহীন বাড়ীটা বিভীষিকার উৎকট ছবিটির মত স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছে। একটা গভীর নদ শুষ্ক হইয়া গেলে তার গভীরতা যেরূপ ভাব মনে জাগাইয়া দেয়, আজ এই জীর্ণ শীর্ণ বাড়ীটার গভীর নিস্তব্ধতা ঠিক সেইভাবে আমার মনটাকে আকুল করিয়া তুলিল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "মুকুজ্যে মশায়, অমলী কোথায়?"

"অমলী? সে নেই রে!"—আর একটা কথা বলিলেই যেন তাহার বুকখানা ভাঙ্গিয়া যাইত, ঠিক এমনিভাবে

আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বৃদ্ধ আনতচক্ষে তামাক খাইতে লাগিল।

"নেই!"—কথাটা বুকে বাজিল। সে যে আমার বড় স্নেহের অমলী! আমি আসিলেই যে সে দাদা দাদা করিয়া ছুটিয়া আসিত, আমার হাত ধরিয়া কত উৎসাহে তাহারই মত স্নিগ্ধ তাহার ছোট বাগানটিতে লইয়া যাইত, তাহার পুতুলের সংসারের সুখ দুঃখের কথা তুলিয়া আমার সহানুভূতি চাহিত, মিনি বিড়ালটাকে ধরিয়া আনিয়া তাহার নিষ্ঠুরতা চৌর্য্য প্রভৃতি অন্যায়ের বিচার করিতে বলিত। তাহার শৈশবসুলভ মধুর অজ্ঞতার একটা পরিচয়ও এপর্য্যন্ত না পাওয়ায় আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম 'সে কোথায়?' কিন্তু "নেই!"

চক্ষের জলে বৃদ্ধের বয়ঃশীর্ণ গণ্ডস্থল ভিজিয়া গিয়াছিল। আমি চুপ করিয়া ভাবিতেছিলাম। অমলীর বিড়ালটা পা ঘেঁসিয়া গায়ে ল্যাজ বুলাইয়া চলিয়া গেল, আর অমলীর বাগানের একটা শুকনো গোলাপ যেন এই দুটি কথার বেদনাতেই ঝুরঝুর করিয়া ঝরিয়া পড়িল। হুকা রাখিয়া বৃদ্ধ বলিল—"বিনোদ, অমলীর কথা বোধ হয় তোমায় এক দিনও বলিনি?"

আমি বলিলাম "বলবেন আর কি? আমি তো জানিই।"

"আমার নাতনী বলে জানতে তো? কিন্তু বাস্তবিক তা নয়।"

অনেকটা বিস্মিত হইয়া মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম —বৃদ্ধের কোটরগত চক্ষু দুটি অশ্রুর নূতন উচ্ছ্বাসে ভাসিতেছে।

বৃদ্ধ বলিতে লাগিল।

"সে তিন বছরের কথা। বর্ষা পেরিয়ে গেছে। নদীর জল কমে এসেছে, ততটা ঘোলাও নেই। সবে দু'একখানা নৌকা ক্বচিৎ-কখনো দামোদরে দেখা যায়; কিন্তু স্রোত তখনও পুরো!

"সে রাত্তিরটা বড় গরম ছিল—গাছের পাতাটি নড়ে না। পূর্ণিমার চাঁদটা আকাশের মাঝামাঝি। অনেকক্ষণ উঠোনে এসে বসে রইলুম—ভাল লাগল না। ফেরি-ঘাটটা তখন ঐ বটতলা পর্য্যন্ত সরে এসেছিল; ওখান থেকে বাড়ীটা বেশ দেখা যায়। নৌকাটা ঘাটে বাঁধা ছিল— তারই ওপর গিয়ে বসে রইলুম। একলা চুপ করে বসে থাকলে আমাদের মত বুড়ো লোকদের আর ভাবনার অন্ত থাকে না। আকাশপাতাল কত কি ভাবছিলুম—আমার মত হতভাগার জীবনে কি ভাববার উপকরণের অভাব আছে? দূরে একটা কঙ্কালসার গাছ নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আমারই মতন সে ঝড় বৃষ্টি তুষারের প্রচণ্ড আঘাতে ডাল-পালা-ফল-পাতা-শূন্য হয়ে, তার শুকনো বুকে অতীতের সবুজস্মৃতি নিয়ে, সবুজ বাগানের কলঙ্ক হয়ে মরণের জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। পৃথবীর একদিনের স্নেহের চারাটি আজ একটা মিথ্যা দুর্বহ ভার মাত্র!—মনে হচ্ছিল কবে একটা দুরন্ত বাজ পড়ে এই নীরস কাঠটার চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ করে দেবে?

"এইরকম কত কি ভাবছিলাম। দূরে একটা গাছ বাঁধ ভেঙ্গে মড় মড় করে জলে পড়ে গেল। মনে হল, এমনি আর-একটা অকর্ম্মণ্য শুকনো গাছ বুঝি পৃথিবীর কাছে চিরবিদায় নিলে—ওঃ তার কী হিংসনীয় শুভমুহূর্ত্ত!"

আমি একজন যুবা। বোধ হয় সৌন্দর্য্যভরা এই পৃথিবীর সঙ্গে সুখময় নূতন পরিচয়ের দিনে বৈরাগ্যের করুণ-কাহিনী বড় একটা পছন্দসই হইবে না ভাবিয়া বৃদ্ধ একটু চুপ করিয়া রহিল। তার পর আবার বলিতে লাগিল।

"আবার পরক্ষণেই একটা ডুবন্ত লোকের আর্ত্তনাদ মানুষের কাছে শেষ সাহায্য ভিক্ষে করে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। আমি ভাবলাম এই এক মাহেন্দ্র সুযোগ—যদি কাউকে বাঁচাতে পারি তো ভালই, নয়ত সাহায্য করবার ছুতো করে যদি দামোদরের গর্ভে একটু জায়গা পাই তো মন্দ কি? আমি নৌকার কাছি খুলে দিলাম।

"যা দেখলাম তাতে ত চক্ষুস্থির! মাঝ-নদীতে একটা প্রকাণ্ড গাছ—তার গোড়াটা আর দু-একখানা ডালপালা জলের ওপর জেগে আছে, আর গোড়ার ওপর মোচার খোলাটির মতন একটা নৌকা উলটে পড়ে আছে—!"

এরূপ একটা বিভীষিকাময় দৃশ্যের বর্ণনা করিতে হরিহরের মত বৃদ্ধের যথেষ্ট শক্তিরই প্রয়োজন হইয়াছিল, তাই ভস্মসার-কলিকাশীর্ষ হুঁকাটাতে ঘন ঘন দুটা টান দিয়া আবার বলিতে লাগিল—

"আকাশে ফুটফুটে জ্যোৎস্না ছিল; কিন্তু একটা লোকেরও সন্ধান পেলাম না। হার মেনে ডাঙায় আসবার চেষ্টা দেখছিলাম, এমন সময় তোড়ের চোটে গাছটা ঘুরে যাওয়ায় ঘন ডালপালার মধ্যে একটা ছোট মেয়ে দেখতে পেলাম। একটা বাঁকা শুকনো ডালে তার পেনিটা আটকে রয়েছে!

"বিনোদ, সেই আমার অমলী। গাছটা কচি মেয়েটাকে প্রাণ ধরে ছেড়ে দিতে পারে নি! শত শাখা মেলে বুকের মাঝে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল।"

বৃদ্ধ কাঁদিয়া ফেলিল। বক্ষের অন্তরতম দেশ হইতে ক্রন্দনের হাহা-ধ্বনি যেন তাহার পঞ্জর ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ আবার বলিতে লাগিল "অমলীকে কোনরকমে বাঁচালুম। পরের মেয়ে অমলী আমায় আবার নূতন মায়ায় সংসারের সঙ্গে বেঁধে ফেললে। এখন সেই কথাগুলো ভাবি। আচ্ছা ঠাকুর-দেবতার আবার মানুষের সঙ্গে এ অসহ্য পরিহাস কেন? সংসার থেকে তো আমার সব বাঁধনগুলোই একে একে ছিঁড়ে দিয়েছিল। দুঃখের পসরা মাথায় নিয়ে আমি মরণের জন্যে বসে ছিলুম; আমায় মরণ দিলেই তো বেশ সুবিচার হত। তা না দিয়ে, এ কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে কেন? বোধ হয় পূর্ব্বজন্মের ফল। কিন্তু একটুও মার্জ্জনা করতে নেই কি?

"তিন বৎসর ধরে অমলী আমার অন্ধের যষ্টি হয়ে ছিল। পর বলে পরিচয় দিতে কষ্ট হত বলে তোমার কাছে তাকে আমার নাতনী বলে পরিচয় দিয়েছি, আর-সবার কাছেও তাই বলেই দিতুম। তাকে ছিনিয়ে নেবে তা কে জানতো? সে যে আমা ছাড়া থাকতে পারে এটা একদিনও ভাববার অবসর পাইনি। এত আপনার তাকে যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও চখের আড়ালে থাকতে হবে, ঈশ্বরের রাজ্যে এটা সম্ভব, তা কিরকম করে জানবো? তাকে নিয়ে আমার কত সাধ! সে বড় হবে। তার বিয়ের জন্যে ভাবনা আমিই ভাববো; সে ভাবনাই বা কি সুখের! অনেক দিন যে সংসারের কাছে বিদায় নিয়েছি তার স্বাদ এইরকম ভাবনায় স্পষ্ট হয়ে উঠত।

"যাক, গল্পটাই আগে শোন। দেখ, এইরকম করে সবার কাছে আমার দুঃখের কাহিনী বলাই আমার কাল হয়েছে। আবার না বলেও থাকতে পারি না। বোঝাটা এতই ভারি হয়েছে যে না বললে যেন বুকে চেপে থাকে। তাই বলি। কিন্তু এমন হবে তা কে জানতো?

"তুমি চলে যাবার পরদিন এখানে খুব বৃষ্টি হয়। আমি দাওয়ার ওপর বসে মহাভারত পড়ছিলাম; আর অমলী পা ছড়িয়ে বেড়ালটাকে নিয়ে খেলা করছিল। এমন সময় একটি ভদ্রলোক ভিজতে ভিজতে আমাদের দাওয়ায় এসে উঠলেন। আমি উঠে তাঁকে আমার চৌকিতে বসালুম। তিনি জমিদার, এদিকে কোথায় বসন্তপুর আছে সেখানে কাযের জন্যে গিয়েছিলেন। ফিরে আসবার সময় পথে বৃষ্টি আসে; কিন্তু মাঝে কোন গ্রাম দেখতে না পাওয়ায় অগত্যা ভিজতে হয়। এখানে আমার কুঁড়েটি দেখতে পেয়ে ঘাটে নৌকো বেঁধে একটু আশ্রয়ের জন্যে আসেন। জমিদার বাবুর সঙ্গে দুজন পশ্চিমেও ছিল।

বাবুর গায়ের জড়োয়া শাল ভিজে গেছে। কালো বার্ণিস-করা জুতোয় জলের দাগ নেই বটে কিন্তু ভিজে চুপসে গেছে। চেহারাটিও জমিদারেরই মতন। একটু লজ্জিত হয়ে আমার ভাঙা চৌকিখানিতে জমিদার বাবুকে বসতে দিলাম। তার পর অনেক কথা হল। আমি আমার জীবনের সমস্ত কথা বলে শেষে অমলীর কথা বলতে লাগলাম। আমার কথা শেষ হলে বাবুটির মুখের ভাব দেখে প্রাণে কেমন একটা আতঙ্ক উপস্থিত হল। তিনি অনেকক্ষণ অমলীর দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন 'মশায়, আপনার এই অমলী আমার অনেক দিনের হারানো ভাইঝি। এর মা বাপ আপনি যেদিনের কথা বলছেন সেইদিনেই নৌকোডুবি হয়ে মারা যান। আমরা এর আশাও ছেড়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু ভগবান আমাদের ভাগ্যে এই গুঁড়োটি রেখে দিয়েছেন। আজ জলঝড় তুলে ভগবান আমায় আপনার কাছে এর জন্যেই পাঠিয়েছেন।'

"তখন বৃষ্টি আরও জোরে নেমেছে, মেঘ আরও ঘোর করে এসেছে, ঘন ঘন বাজ পড়ছে। বিনোদ, এ বুড়োর মাথায় একখানা বাজ ফেলে দিলে কি ভগবানের এতই ক্ষতি হত!

"কোন কথাই শুনলে না। আমার কাতরানি, অমলীর কান্না, সব অগ্রাহ্য করে লোকটা নিষ্ঠুরের মত আমার বুকের মধ্যে থেকে অমলীকে ছিঁড়ে নিয়ে গেল। আর আমায় বলে গেল যে আমি ওদের বাড়ী অমলীকে না দেখতে গেলেই ভাল; কারণ তা না হলে মায়া আরও বেড়ে যাবে।"

অনেকক্ষণ পরে আমি বৃদ্ধ হরিহরকে জিজ্ঞাসা করলাম "কোথাকার জমিদার তিনি, তা জিজ্ঞাসা করেন নি ?"

বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ বৃদ্ধ আবার বলিতে লাগিল—"শোন না, আমার গল্প এখনও শেষ হয় নি। জিজ্ঞেস করেছিলাম। বর্দ্ধমানের ভবানীগড় জান তো?—তিনি সেখানকার জমিদার, নাম মথুরাপ্রসাদ, পদবীটা কি বললেন মনে নেই।

"অমলী চলে যাওয়াতে বাড়ীটা যেন খাঁখাঁ করতে লাগলো। তবু নিজের অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে দিনকতক কোনরকম করে রইলাম; কিন্তু শেষে একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। বাড়ীর সমস্ত জিনিষেই যে অমলীর যত্নের চিহ্ন রয়েছে। যদি সর্ব্বদাই তার কথা এই রকম করে ভাবতে হয় তো পাগল হয়ে যাব যে!

"কোথায় ভবানীগড়, কোথায় কি, তা কিছুই জানি না—তবুও অমলীকে খুঁজে বা'র করতেই হবে। জমিদারের বাড়ী আমার অমলী কত সুখে রয়েছে, তা একবার দেখব না? না দেখলে যে আমার মরণে সুখ হবে না!

"একদিন এই ভাঙা বাড়ীটাতে কুলুপ লাগিয়ে দুর্গা শ্রীহরি বলে বেরিয়ে পড়লাম।

"জিজ্ঞেস করে করে আটদিনের-দিন ভবানীগড়ে পৌছুলাম। ওঃ সে কী কষ্ট বিনোদ! তখন বেশ একটু-একটু শীত পড়েছে; তার ওপর এই পরিশ্রম!—আধমরা হয়ে একটা দোকানে গিয়ে উঠলাম। সেখানে শর্দ্দি আর জ্বরে দুদিন শয্যাধরা করে রাখলে। খুবই কষ্ট হয়েছিল অবশ্য—কিন্তু কেই বা দেখে আর কেই বা শোনে। যখন ভাল হলাম, অমলীর খবর একটু-একটু টের পেতে লাগলাম। আমি যেটাতে ছিলাম সেটা ময়রার দোকান। রোজ কতলোকে সেখানে খাবার নিতে আসতো—তারা প্রায় সকলেই অমলীর কথাই কইতো—সে নাকি দাদা দাদা করে বড় হেদোয়, বড় রোগা হয়ে গেছে, প্রায়ই অসুখ। কেউ কেউ আবার নিজের মন্তব্য প্রকাশ করতেও ছাড়তো না—সে আর বোধ হয় বাঁচবে না। কথা শুনে আমার প্রাণটা ছাঁৎ করে উঠত।

"কিন্তু সে যে বাস্তবিকই বাঁচবার জন্যে আসে নি। পৃথিবীতে সুধু দুঃখ ভোগ করবার জন্যে স্বর্গের পরী নেমে এসেছিল। পৃথিবীর দুঃখে তার বুকের পাঁজরা তো ভেঙে গেছে—আর সে থাকবে কেন? আহা, দুধের মেয়ে সে কত কষ্টই সইলে—মা বাপ হারালে, জলে ডুবলো, তার সাধের দাদামশাইকে হারালে, আবার শুনলাম নাকি এখানেও বড় একটা যত্নে ছিল না। হা ঈশ্বর!"

রোরুদ্যমান বৃদ্ধ হস্তের উপর কপোল রাখিয়া কি ভাবিতে লাগিল, তাহার পর মাথা তুলিয়া আবার বলিতে লাগিল—

"একদিন সকালে উঠেই শুনলাম তার ভয়ানক অসুখ—কোন আশাই নেই! মনটা বড়ই আকুল হয়ে উঠলো। বেশ বুঝতে পারলাম আমার জন্যেই তার অসুখ। একবার তার বুড়ো ঠাকুরদাদাকে দেখলেই সব অসুখ কোথায় চলে যাবে। কিন্তু যেতে দেবে কি? তাকে আনবার সময়েই যে আমায় আস্‌তে মানা করে এসেছিল। তবুও ভাবলাম একবার যাব। যদি একবার দেখতে পাই। আর ত পাব না।

"জমিদারের বাড়ী—তাতে আবার ওরকম একটা বিপদ—ডাক্তার বদ্যি প্রভৃতি অনেকরকম মানুষে ভরে উঠেছে। দরজায় দারোয়ান দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে একবারটি যেতে দিতে বললুম। সে যেতে দিলে না—জিজ্ঞেস করলে 'তুমি কে?' সে কি বুঝবে আমি কে—অমলীর আমি কত আপনার? তাকে সুধু বললাম 'আমি অমলীর দাদা-মশাই।' 'অমলীর দাদামশাই!'—বলে লোকটা খানিকক্ষণ হাঁ করে রইল, তারপর বললে 'দাঁড়াও একটু।' লোকটা ওপরে চলে গেল।

"অমলী শুনতেও পেলে না যে তার বড় সাধের দাদা-মশাই এসেছে। সে ওপরে পহুছিতে না পহুছিতে বাড়ীতে কান্নার রোল উঠল। আমি সব অন্ধকার দেখে সেখানে বসে পড়লাম। যখন একটু-একটু জ্ঞান হল তখন দেখলাম আমার অমলী খাটে ঢাকা শুয়ে আছে,

'আর শুনলাম কে বললে 'বুড়ো মেয়েটাকে খেতে এসেছিল'।"

* * * * *

বৃদ্ধের নিকট বিদায় হইয়া একবুক দুঃখ বেদনা বহিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতে আসিতে শুনিলাম বৃদ্ধ সুপ্তিমগ্ন গ্রামখানির নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া গাহিতেছে—"তারা কোন্ অপরাধে এ দীর্ঘ মেয়াদে সংসার-গারদে থাকি বল।"

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

সেখ আন্দু

(৭)

পরদিন প্রত্যূষে চৌধুরী-সাহেব নিজ কার্য্য সমাধা করিয়া ভৃত্যবর্গসহ বাটী ফিরিলেন।

আন্দু গাড়ী যথাস্থানে রাখিয়া ঘরে ঢুকিয়া জামাজুতো ছাড়িয়া ঘর দ্বারে ঝাঁট দিতেছে, এমন সময় লছমী ভকতের দ্বারবান আধথান নূতনকাপড় লইয়া ঘরে ঢুকিল। আন্দু তাহাকে বসিতে বলিয়া হাতমুখ ধুইয়া আসিল। দ্বারবান ধনুকধারী বলিল, "দর্জ্জি সাহেবের কি এত বেলায় ঘুম ভাঙ্গল ?"

আন্দু তাহাকে কলিকাতা গমনের কথা বলিল। শুনিয়া ধনুকধারী অপ্রস্তুতভাবে তাড়াতাড়ি উঠিতে উদ্যত হইল, বলিল "আমি বিকালে আস্‌ব এখন।"

আন্দু তাহাকে ধরিয়া ফের বসাইল। বলিল "তোমার দেদার সময় নেই সে আমি জানি। কি দরকারে এসেছিলে, কাজটা সেরে যাও দাদা।"

ধনুকধারী ব্যস্ত হইয়া বলিল "না না, সে এখন থাক, তুমি এই এক জায়গা থেকে আসছ, এখনো বসতে দাঁড়াতে সময় পাওনি, সে এখন থাক।"

আন্দু বলিল "কিছু দরকার নেই, এতক্ষণ দিব্বি বসে এসেছি, এখনো নেহাৎ ঘানি টেনে কাবু হচ্ছিনে, আরামে দাঁড়িয়ে আছি। কি কাজ বলো দেখি ?"

ধনুকধারী বগলদাবা হইতে নতুন কাপড়টি বাহির করিয়া আন্দুর খাটের উপর রাখিল; বলিল "আমায় গোটা-চার জামা সেলাই করে দিতে হবে, কাপড়খানা এখন থাক, এর পর ধীরে সুস্থে মাপ দিয়ে যাব।"

আন্দু হাসিয়া বলিল "এই জন্যে! তা মাপটা এখনই দিয়ে যাও, ধীরে সুস্থে বরং আমি সেলাই করে নেব যখন হোক। তোমার তো অন্য কাজ ঢের আছে।"

ধনুকধারী আপত্তি করিল, আন্দু শুনিল না, গজ বাহির করিয়া মাপ জোক করিয়া তাহাকে বিদায় দিল। তাহার পর চারিটি জামার কাটছাঁট ঠিক করিয়া রাখিয়া বাহিরে আসিল।

সেদিন রবিবার। সুতরাং আদালত বন্ধ। আন্দু মনে করিল জামাগুলা যতটা পারি সেলাই করিয়া রাখি, কিন্তু রাত্রে অর্দ্ধজাগরণের জন্য এবং একাক্রমে বহুক্ষণ গাড়ী চালাইয়া আসিয়াছে বলিয়া শরীর কিছু অবসাদগ্রস্ত বোধ হইল। বলিষ্ঠ কর্ম্মঠের শরীর, বলের কাজেই স্ফূর্ত্তিলাভ করে,—আন্দু বাগানে আসিয়া দেখিল মালী ফুলগাছের জমী তৈয়ারী করিতেছে। আন্দু বিনাবাক্যে আর-একখানি কোদাল লইয়া আসিয়া মালকোঁচা মারিয়া মালীর সহিত জমী কোপাইতে লাগিল! কিছুক্ষণ পরে জমীটা শেষ হইল; মালী তামাক দোক্তা খাইতে বসিল; আন্দু কোদাল ফেলিয়া গায়ের ঘাম মুছিতেছে; এমনসময় বাগানের ধারে, মেহেদীর বেড়ার ওপাশে রাস্তায় একখানা টম্‌টম্ আসিয়া দাঁড়াইল। আরোহী শ্রীরাম ভকতের পুত্র উনবিংশ বর্ষীয় বালক, অথবা যুবক, লছমী ভকত, আন্দুকে দেখিয়া গাড়ী থামাইল।

আন্দু তস্‌লীম দিয়া বেড়া ডিঙ্গাইয়া গাড়ীর কাছে আসিল। লছমীভকত দূর হইতে তাহাকে কোদাল চালাইতে দেখিয়াছিল, কাছে আসিতেই হাসিয়া বলিল "বাকী আর কিছু রাখলে না, কোদাল ধরেছ ?"

আন্দু হাস্যমুখে জবাব দিল, "সবই ধরতে হয়, বাকী কিছু না রাখাই তো মঙ্গল। তারপর আপনি কেমন আছেন ?"

আন্দুর ঘর্ম্মাক্ত শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া লছমী-ভকত বলিল "এঃ! একি হয়েছে, নেয়ে উঠেছ যে।"

আন্দু মালকোঁচা খুলিয়া কাপড়টা কোমরে জড়াইয়া কাঁশ দিয়া টানিয়া বাঁধিল, গামছায় সর্ব্বাঙ্গ মুছিয়া বলিল "কোদাল চালান স্ফূর্ত্তির কাজ বটে।"

লছমীভকত অবজ্ঞার স্বরে বলিল "তোমার সবতাতেই স্ফূর্ত্তি! চুপ করে থাক্‌তে পার না, তাই বল।"

আন্দু মৃদু হাসিয়া বলিল "চুপ করে থাকতে না পারা-কেই ত তর্ক বলে। আপনি কি বেড়াতে বেরিয়েছেন ?"

লছমীভকত বলিল "হাঁ এই দিকে একটু। তোমায় কদিন দেখিনি তাই জানতে দাঁড়িয়েছিলুম কেমন আছ, আসি।"

সে চাবুক উঠাইয়া অশ্বকে তাড়না করিল। আন্দু তৎ-ক্ষণাৎ গাড়িতে উঠিয়া পড়িল, পা-দানে পা দিয়া গাড়ীর পাশে বসিল। এই অভাবনীয় আচরণে লছমী ভকত সীমার অতিরিক্ত বিস্মিত উৎকণ্ঠায় বলিল "একি! খালি গায়ে এবেশে যাবে কোথায় ?"

আন্দু তাঁহার হাত হইতে চাবুক ও অশ্ববল্গা লইয়া ঘোড়া হাঁকাইতে হাঁকাইতে বলিল "চলুন বেড়িয়ে আসি, আপনি সঙ্গে সহিস নেন্ নি কেন ?"

কুণ্ঠিতভাবে লছমীভকত বলিল "আমি একলাই যাই।"

আন্দু আয়ত-নেত্রের বিস্ফারিত দৃষ্টি তাহার মুখের পানে একবার স্থিরভাবে রাখিল। সে দৃষ্টির মর্ম্ম কি, তাহা লছমীভকত বুঝিল, সে চক্ষু নামাইল। আন্দু ধীরভাবে বলিল "আপনার সঙ্গে আমার গোটাকতক কথা আছে, কথা কটা শুনতে হবে আপনাকে, মাঝখানে ধমক দিয়ে, কি তর্ক করে থামাতে পারবেন না, আগে শুনুন—"

মুহূর্ত্তে লছমীভকত বুঝিল আন্দু এবার তাহাকে কি বলিতে চাহে। তাহার মনটা অত্যন্ত দমিয়া গেল, লজ্জায় তাহার মুখ তুলিতে ইচ্ছা হইল না, কিন্তু পরক্ষণে জোর করিয়া সে আত্মসম্বরণ করিল, আক্রমণের আরম্ভেই পরাভব স্বীকারে উদ্যত মনটাকে তীব্র ধাক্কায় সোজা করিরা উগ্র স্বরে বলিল "এ আমি অন্য কোথাও যাইনি ত, আমি একটু সোজা রাস্তায় বেড়াতে যাচ্ছি!"

আন্দু শান্তভাবে বলিল "সে ত জানি। আমি আপনাকে কিছু বলতে চাই। আপনার মা আছেন, ভাই আছেন, বাপ আছেন; মনে করুন আপনার আন্দুও তাদের সামিল আজ একজন আপনার নিজের লোক।—হয়ত যে কথাটা আমি আপনাকে বলতে চাই সেটা আপনি বুঝেছেন, আর এও নিশ্চয় যে, আমার মত অনেকে আপনাকে এই কথাটা এর আগে অনেকবার বলেছে, কিন্তু সে কথা নয়। আমি অন্য দিক দিয়ে কথাটা আরম্ভ করছি। দেখুন আমি বাক্য-যুদ্ধ জিনিষটা মোটে পছন্দ করি না, তাই কারো সঙ্গে ইচ্ছা করে তর্ক করি না, আপনার সঙ্গেও করব না, সে শুধু আপনাকে বেশী জালাতন করা হবে আমি জানছি। আপনি লেখাপড়া শিখেছেন, মন্দচরিত্র লোক কখনো চুচক্ষে দেখতে পারতেন না, সৎকার্য্যের মাহাত্ম্যও আপনার মত খুব অল্প লোকেই জানে, তবু আপনি একি ভুল করে বসেছেন ?"

লছমীভকত মস্তিষ্কটা ঠিক করিয়া লইল। আন্দুর মন্দ মন্দ ভর্ৎসনায় সে কিসের জন্য কাবু হইবে ? তাহার কার্য্যা-কার্য্যের সমালোচনা—সমালোচনা ? না না আন্দু যে আগেই আত্মীয়তার পথ দেখাইয়া রাখিয়াছে, তাহার ঐ মৃদু গভীর আক্ষেপের উপর তো ক্রোধ অভিমান চলিবে না; চলিত শুধু নিষ্ফল বাক্যাড়ম্বর; তাহাও ত আন্দুর বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু সে ত হটিবার পাত্র নহে. লছমীভকত প্রাণপণে হাসিয়া জবাব দিল, "তুমি আমার চরিত্র নিয়ে তর্ক করতে চাও ? বেশ! কর। আমরা মানুষ—"

বাধা দিয়া আন্দু বলিল "হাঁ, আমরা মানুষ, আমরা কেন মদ খেয়ে, মন্দ সংসর্গে পড়ে, বাপ মা বিষয় আশয় কার কারবার পাঁচরকম বাজেকাজে পাঁচরকম অমানুষিক ব্যাপারে সব বিসর্জ্জন কর্ত্তে পারব না ? কেমন এই ত বলতে চান আপনি ?"

এই কথাটাই বটে, এই রকমই সে বলিতে চাহিতেছিল। কিন্তু আন্দু যখন তাহার মুখ হইতে কথাটা লইয়া আপনিই তাহার জবানী তাহাকে শুনাইল তখন সেটা যেন লছমী-ভকতের কানে অত্যন্ত অস্বাভাবিক লাগিল। সে সঙ্কুচিত হইয়া বলিল "আহা! কেন ? একটু আমোদ করা কি এতই দোষ ?"

আন্দু বলিল "আমোদ কই ? আমোদ কাকে বলে ? একি আমোদ ? এযে সর্ব্বনাশ!"—আন্দু ক্রমশঃ উত্তেজিত হইয়া উঠিল, সে যে-তর্ক যে-যুক্তি লছমীভকতের উপর বর্ষণ করিবে না বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিল, সেইগুলা সবই আবে-গের মুখে তাহার রসনা হইতে উৎসারিত হইতে লাগিল, লছমীভকত নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। এ ত সবই সে জানে, সবই তাহার মনে আছে, নাই শুধু—আন্দু যে-

জোরে তাহাকে এইগুলা শুনাইতেছে, সেই জোরটুকু!—পুরাতন কথাগুলাই তাহার কানে নূতন সুরে নূতন করিয়া বাজিতে লাগিল। কিছুই নয় বলিয়া সেগুলা উড়াইবার চেষ্টা করার চেয়ে, আমি কিছুই নই এইটুকু প্রতিপন্ন করা বরং সহজ মনে হইল,—কথাগুলা এমনই তেজস্বী, এমনি প্রাণবন্ত।

ভকতজী মাথা হেঁট করিয়া রহিল, আন্দু ইচ্ছামত পথে গাড়ী হাঁকাইয়া চলিল, সে প্রতিবাদ মাত্র করিল না, তাহার মনের ভিতর যে তখন কি হইতেছিল, তাহা অন্তর্যামীই জানেন। ভকত যেন অভিভূত জড় হইয়া বসিয়া রহিল। এই আন্দু সেই আন্দু! যে কুস্তির আখড়ায় ধুলা মাখিয়া, সরল শিশুর মত হাসিয়া খেলা করে? এ সেই লোক? ভকতের সারা মনটা যেন কেমন বিকল হইয়া আসিল।

গঙ্গার ধারের নির্জ্জন রাস্তা দিয়া গাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছে, আন্দু মাত্র রাশটি ধরিয়া আছে, আর রোখের সহিত প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতেছে, ভকত কিন্তু একেবারে নিঝুম।

রাস্তার ধার হইতে একজন লোক ডাকাডাকি করিয়া গাড়ী থামাইতে বলিল। আন্দু চাহিয়া দেখিল, শম্ভু মাড়োয়ারী। শম্ভু মাড়োয়ারী এখানকার একজন প্রসিদ্ধ আড়তদার। বিষয়সম্পত্তি একসময় যথেষ্টই ছিল, কুসংসর্গে পড়িয়া সবই খোয়াইয়াছে, এখন আছে শুধু ঠাটটুকু। বয়স প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়াছে, তবু নেশা এখনো ছুটিল না। আন্দু শুনিয়াছিল, বালক লছমীভকত ইহার সঙ্গে মিশিয়াই এমন দ্রুতবেগে উৎসন্নে চলিয়াছে। তাহাকে মধ্যপথে দেখিয়া এখন সে লছমী ভকতের সোজাপথে ভ্রমণের অনাবশ্যক কৈফিয়ৎটার মর্ম্ম স্পষ্ট বুঝিল। গাড়ী থামাইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছে, তথাপি সে মাথা নোয়াইয়া নমস্কার করিল।

শম্ভু মাড়োয়ারীর কপালে রক্তচন্দনের প্রকাণ্ড ফোঁটা, মাথায় টিকির উপর জরির ফুলকাটা মখমলের টুপী, পায়ে জরির লপেটা, গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী, কাঁধে বেনারসী চাদর, হাতে আবলুশ কাঠের সৌখীন ছড়ি। মাড়োয়ারী গাড়ীতে উঠিয়া আন্দুকে বলিল, "একি সাহেব, তুমি যে বড় এরাস্তায় এলে।"

আন্দু বলিল "আজ্ঞে হাঁ, বুঝতে পারিনি, বাঁকা রাস্তায় এসেছি।"

লছমীভকত কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া একটু সরিয়া তাহাকে বসিতে জায়গা দিল। মাড়োয়ারী এই বালকটির আসন্ন অভিভাবকের মত সদম্ভে জাঁকিয়া বসিল। গাড়ী পুনশ্চ ছুটিল।

মাড়োয়ারী বুঝিল গাড়ী আজ ঠিক গন্তব্যপথে ছুটিতেছে না। সঙ্গে আন্দু রহিয়াছে, সুতরাং কথাটা খোলসা করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেও দ্বিধা বোধ করিল। অগত্যা পকেট হইতে চামড়ার সিগার-কেস বাহির করিয়া দুটি সিগারেট লইয়া একটা লছমী ভকতকে দিল, দ্বিতীয়টি নিজে মুখে ধরিল; কি ভাবিয়া পুনরায় আর-একটি সিগারেট লইয়া আন্দুর দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল, "নাও, তুমি একটা নাও, জন্মটা সার্থক কর।"

চাবুকসুদ্ধ মুষ্টি কপালে ঠেকাইয়া আন্দু বলিল "সিগারেট আমি খাই না, কালে ভদ্রে কখনো এক আধ টান সখ করে খেয়েছি। এখন সখ চুকে গেছে।"

মাড়োয়ারী জেদের সহিত বলিল "আহা খেয়েই দেখনা একটা।"

আন্দু হাসিয়া বলিল, "খেয়ে আর দেখ্‌ব কি? সে ত পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, চোখে দেখব শুধু চমৎকার ধোঁয়া! ও আপনি রেখে দিন।"

ভকত একদৃষ্টে আন্দুর মুখপানে চাহিয়া রহিল। মাড়োয়ারী অগত্যা সিগারেট যথাস্থানে রাখিয়া, দেশলাই জ্বালিয়া নিজের মুখে অগ্নিসংস্কারে প্রবৃত্ত হইল। ভকত সিগারেট হাতে চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে দেখিয়া ঠোঁটে সিগারেট চাপিয়া অস্পষ্ট স্বরে বলিল "কই খেলে না?"

ভকত শুষ্ক মুখে বলিল না, "বড় মাথা ধরেছে।"

মাড়োয়ারী বলিল, "রোদে রোদে কোথায় ঘুরবে? বেলাও তো হল, কোথাও জিরুবে চল।"

আন্দু ভকতের মুখপানে চাহিল। ভকত ত্রস্তস্বরে বলিল "না না, যে রাস্তায় যাচ্ছ সেই রাস্তাতেই চল।"

মাড়োয়ারী যেন বিষম ধাঁধায় পড়িল। সে একবার ভকতের মুখপানে একবার আন্দুর মুখপানে বিস্ময়পূর্ণ নয়নে চাহিতে লাগিল, কিছুই বুঝিতে পারিল না। ইহারা উভয়েই যেন নিজেদের অগোচরে কি একটা কিছু করিয়া বসিয়াছে, উভয়েরই এমনিতর ভাবখানা। ভকতের

প্রতিবেশী খোঁচাখুঁচি যুক্তিসঙ্গত নহে দেখিয়া চুপ করিয়া রহিল।

হঠাৎ আন্দু ভকতের হাতে অশ্ববল্গা ও চাবুক দিয়া গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িল। ভকত্‌ ব্যগ্র ব্যাকুলতায় বলিল "কোথায় যাচ্ছ ?"

আন্দু মাথা নাড়িয়া হাসিমুখে বলিল "চলে যান গাড়ী হাঁকিয়ে, আমি আমার কাজে চল্লুম।"

আন্দুর সেই শান্তমুখের সহজ কথাটি দেবতার আদেশের মত ভকতের বক্ষে যেন মহা-নির্ভীকতার বর্ম পরাইয়া দিল। তাহার অন্তরের মধ্যে এতক্ষণ যে অনুতাপ পুঞ্জীকৃত হইয়া উঠিয়াছিল, এতক্ষণে তাহাতে যেন পরম সান্ত্বনা আসিল; স্পর্দ্ধা ও গ্লানির দ্বন্দ্বের এতক্ষণে বিবেকের বিচারে নিঃসংশয় মীমাংসা হইয়া গেল; তাহার মনে হইল আন্দু তাহার জীবনসূত্র লইয়া এতক্ষণ জট ছাড়াইতেছিল, এবার তাহার সমস্ত গ্রন্থি নির্ম্মুক্ত করিয়া তাহার হাতে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে সমর্পণ করিয়া ভকত আদেশ দিল, "চলে যাও!"

ভকত আশ্বস্তচিত্তে সোৎসাহে ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষিয়া তীরবেগে গাড়ী ছুটাইল। পিছুদিকে মুখ ফিরাইয়া একবার চাহিল, দেখিল আন্দু একটি নবজাত ছাগশিশুকে বুকে করিয়া লইয়া যাইতেছে, ছানাটি এতক্ষণ রাস্তার ধারে মাতৃহারা হইয়া চীৎকার করিয়া ডাকিয়া ফিরিতেছিল। ভকতের স্মরণ হইল, তাহারা খানিক আগে, এক ছাগীকে পথের ধারে ঐরূপ একটি শাবক লইয়া বিশ্রাম করিতে দেখিয়াছে, আন্দু বোধ হয় সেইখানেই যাইতেছে। ভকতের চক্ষু অশ্রুসজল হইল, ধন্য আন্দুর কোমলপ্রাণ, একটা ছাগশিশুর কাতরতাও তাহার কর্ণ অতিক্রম করিল না!

মাড়োয়ারী একটা অভাবনীয় বিপ্লবের স্পষ্ট সূচনা দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইল, খানিকদূর গিয়া বলিল "গাড়ী থামাও, আমি পাঁড়ের সঙ্গে দেখা করে যাব।" ভকত বিরুক্তি না করিয়া তাহাকে নামাইয়া দিয়া, গাড়ী ঘুরাইয়া ফিরিয়া চলিল। মাড়োয়ারী বুঝিল ভকত আর তাহার হাতে নাই। আন্দুকে অভিশাপ দিয়া সে পাঁড়ের বৈঠকখানায় চলিল।

ভকত আসিয়া দেখিল, আন্দু মিঞা ছাগমাতার নিকট পথের ধূলির উপর জানু পাতিয়া বসিয়া হাস্যসুন্দর মুখে ছাগশিশুকে ধরিয়া মাতৃদুগ্ধ পান করাইতেছে। কাছাকাছি হইয়া ভকত রাশ টানিয়া গাড়ী থামাইল। আন্দু মাথা তুলিয়া বলিল "ফিরে এলেন ?"

ভকত বলিল "ফিরেই চলেছি, গাড়ীতে এস।"

আন্দু বলিল "না, আপনি চলে যান। কার ছাগল খোঁজ করে বাড়ী দিয়ে যাব—"

ভকত শান্তমুখে বলিল "আন্দু সাহেব তোমায় বলতে এসেছি, আমি আজই মামার বাড়ী যাব, এখানে থাকলে ঐ সব বদ্‌সঙ্গীর টান হয়ত এড়াতে পারব না; লক্ষ্মীছাড়ার মত আবার বদ্‌খেয়ালীতে মাতব, কিন্তু আর নয়।"

ভকত ঘোড়ার পিঠে চাবুক কসিল। আন্দু আদাব দিয়া, বিহ্বলভাবে সেইদিকে চাহিয়া রহিল।

(৮)

আন্দু যখন স্নানের জন্য গামছা আনিতে রহিমের কাছে আসিল, তখন অনেক বেলা হইয়াছে। রহিম রাগ করিয়া তাহার উপর অনেক কটুকাটব্য বর্ষণ করিয়া যখন নবাবের পৌত্র বলিয়া তাহাকে অভিহিত করিল, তখন আন্দু হাসিয়া বলিল "আমি যদি নবাবের নাতী হই, তা হলে আমার চাচা নবাবের কে হয় ?"

রাগের মাথায় রহিম বলিল "ব্যাটা হয়!"

"কেয়াবাৎ!" বলিয়া আন্দু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। "দেখলে চাচা, তাই তোমার মেজাজে এত নবাবীর গন্ধ পাই। নবাবের সঙ্গে তোমার এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তা কি জানি—"

অপ্রস্তুত হইয়া রহিম বলিল "যাও যাও, ঢের বেলা হয়েছে, চান্ টান্ করে এস। কোথাকার ছেলেমানুষ জানি না, রাত্রে খাওয়া নেই ঘুম নেই, তা খেয়ালই নেই! সাহেবের সঙ্গে যারা গেছল, তারা খেয়ে দেয়ে এক ঘুম ঘুমিয়ে উঠল, আর তুমি টো টো করে কোথায় ঘুরছ তার ঠিক নেই। যাও শীঘ্রি—"

আন্দু মিনতি করিয়া বলিল, "চাচা, তুমি ভাত বেড়ে খেতে বস, আমি নিশ্চিন্দি হয়ে নাইতে যাই।"

রহিম অসম্মতি প্রকাশ করিল। কিন্তু আন্দুর মিষ্ট মুখের পীড়াপীড়ি এড়ান বড় শক্ত কথা, অগত্যা আন্দুর অন্নব্যঞ্জন

রাখিয়া নিজে আহারে বসিল। খাইতে খাইতে রহিম বলিল "পিয়ারী সাহেব তোমায় খুঁজতে এসেছিল।"

আব্দু বলিল "কেন?"

"কেন আর, টাকা চাই। আমি ফেরৎ দিয়েছি, বল্লুম আব্দুরই এখন টাকার টানাটানি গেল মাসে যে টাকা ধার নিয়েছে তাই শোধ করতে পারছে না, আবার টাকা। পিয়ারী সাহেবকে আর টাকা দিও না।"

আব্দু কথা কহিল না। অন্যমনে পায়চারি করিতে লাগিল। সহসা মুখ তুলিয়া বলিল "চাচা, পিয়ারী সাহেবের কোন কাজ কর্ম্মই জোটে নি?"

রহিম বলিল "কই আর জুটল? খালি দেনার মাথায় সংসার আর কতই চলে? অনেকগুলি পুষ্যি, লোকটা যেন ন্যাঙ্গারী হয়ে পড়েছে।"

"হুঁ"—বলিয়া আব্দু নীরবে চিন্তান্বিত মুখে গামছাখানি গলায় ফেলিয়া পুষ্করিণীর উদ্দেশে চলিল। দ্বারবানের ঘর পার হইয়া গেটের বাহিরে যেমন আসিয়াছে, অমনি পশ্চাৎ হইতে দুইটা লৌহকঠিন হস্ত অকস্মাৎ তাহার হাত দুইটা পিছন দিকে টানিয়া সবলে টিপিয়া ধরিল। হাসিয়া পিছনদিকে চাহিয়া আব্দু বিস্মিত হইল, একি! এ তো পরিচিত লোক নয়! এ যে জুল্পিবহুল প্রকাণ্ডপাগড়ীওলা, দীর্ঘাকৃতি বিশাল মূর্ত্তি! আব্দু বলিল "আপনি কাকে খুঁজছেন, আমি অন্য লোক।"

কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া লোকটা প্রবল গম্ভীর কণ্ঠে বলিল "না, তোমাকেই খুঁজছি, পিছমোড়া করে বাঁধব।"

দৃপ্ত স্বরে আব্দু বলিল "কেন?"—সে হাতটা ছাড়াইবার জন্য ঈষৎ টানিল। লোকটা তৎক্ষণাৎ আরো জোরে হাতটা টিপিয়া ধরিয়া বিদ্রূপের স্বরে বলিল "গায়ে জোর কত? ছাড়াও দেখি!"

অপরিচিত লোকটার ধৃষ্টতা আব্দুর আর সহ্য হইল না। সে আড় হইয়া ভূমি পর্য্যন্ত নুইয়া এক প্রচণ্ড হ্যাচ্‌কা মারিল। চর্ব্বি-থল্‌থলে বিপুল-চেহারা লোকটা সে নিরেট আকর্ষণ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল, অল্পবীর আব্দু চক্ষের নিমিষে হাঁটুর গুঁতায় বাঁ হাত ছাড়াইয়া লোকটার মোটা ঘাড় ধরিয়া রীতিমত ধাক্কায় ভূমে পাড়িল, লোকটা হাঁফাইয়া তাহার ডান হাতখানা ছাড়িয়া দিল, আব্দু ঘুসি পাকাইয়া শূন্যে উঠাইল,—অমনি হাঁ হাঁ করিয়া কয়েকজন লোক ছুটিয়া আসিল, বিস্মিত আব্দুর উদ্যত বজ্রমুষ্টি শিথিল হইয়া গেল! দেখিল তাহার আখ্‌ড়ার ওস্তাদের সহিত দুইজন খেলওয়ার বন্ধু!—আব্দু প্রতিদ্বন্দ্বীকে ছাড়িয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। ওস্তাদ হাসিতে হাসিতে বলিল "কেমন সিংহজী, কেমন পালোয়ান দেখ্‌লেন? সখ মিটল তো?"

আব্দু অবাক্ হইয়া একবার ওস্তাদের মুখপানে একবার সেই লোকটার মুখপানে তাকাইতে লাগিল। সে ওস্তাদকে অভিবাদন করিতে ভুলিয়া গেল। ভূপতিত লোকটা ধূলা হইতে উঠিয়া জামাটামাগুলো ঝাড়িয়া ফুঁকিয়া লইল। আব্দুর কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল "সাবাস জোয়ান, আমায় এক লহমায় ফেলেছ, বাহাদুর বটে!"

অপ্রতিভ আব্দু কিছুমাত্র উৎসাহিত না হইয়া মাথায় একবার হাত ঠেকাইল মাত্র। ঘন ঘন ব্যগ্র দৃষ্টিতে ওস্তাদের পানে চাহিতে ওস্তাদ বলিলেন "এঁকে চিনতে পারলে না? এঁরই আসবার কথা ছিল, ইনিই আমাদের শিখ ভাই হরকিষণ সিং বাহাদুর।"

আব্দু সসম্ভ্রমে ভূমিস্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিয়া পুনঃ পুনঃ ক্ষমা চাহিল। হরকিষণ সিং গভর্ণমেণ্টের বেতনভোগী একজন সৈন্য; ওস্তাদের সহিত তাহার বন্ধুত্ব বলিয়া, ছুটিছাটা পাইলে মাঝে মাঝে ভাগলপুরে বেড়াইতে আসে, ও এখানকার বাছা বাছা পালওয়ানদের সহিত লড়াই দিয়া আমোদ করিয়া যায়। আব্দু ইহাকে চিনিত না, শুধু নাম শুনিয়াছিল মাত্র। আব্দু ক্ষমা চাহিতে হরকিষণ হাসিল। স্ফূর্ত্তিদীপ্ত মুখে ওস্তাদজী আব্দুর বিস্তৃত পরিচয় পাড়িয়া বসিল, আর ওস্তাদের সঙ্গী দুটি বক্ষ-সম্বদ্ধ করে হরকিষণের প্রতি গোপনে ব্যঙ্গরঞ্জিত কটাক্ষপাত করিয়া হাসিতে লাগিল। তাহাদের রঙ্গ দেখিয়া আব্দু জলিয়া গেল, একে ত নিজের অসহিষ্ণুতার দোষে সামান্য রহস্যের উত্তরে এত বড় মর্ম্মান্তিক জবাব পাঠাইয়া সে মহালজ্জায় পড়িয়াছিল, তাহাতে হরকিষণের আচরণে ক্ষুণ্ণতার চিহ্নমাত্র না দেখিয়া সে অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া গেল। হরকিষণ ওস্তাদের সমস্ত কথা শুনিয়া আব্দুকে

হাসিতে হাসিতে বলিল "নয়া দোস্তসাহেব, আমি তোমায় 'নেওতা' কর্ত্তে এসেছি, কাল বল-খেলার মাঠে আমাদের ডুয়ণ্টা খেলা হবে, ম্যাজিষ্টার সাহেবের কাছে পাশ নিতে লোক গেছে, অনেক সাহেবলোক্ খেলা দেখতে আসবে, তোমায়ও খেলতে হবে।"

আন্দু প্রমাদ গণিল, বুঝিল এ সব ওস্তাদের চাল,—আন্দু প্রকাশ্যস্থলে মল্লযুদ্ধ করিয়া নাম জাঁকাইতে ভয় খায় বলিয়া, ওস্তাদ কত কৌশলে তাহাকে কতবার খেলাইতে লইয়া গিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছেন; তাই এইবার বুঝি এই বিদেশীকে পাকড়াইয়াছেন? আন্দু ওস্তাদের দিকে চাহিল, ওস্তাদ তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন "আমি সে ওঁকে বলেছি। উনি বলেন, না খেললে আমি ছাড়ব না। তাইত তোমায় অমন করে আটকেছিলেন। তুমি নেহাৎ হারালে····· তাই!"

আন্দুর হাত দুইখানা নিজের প্রকাণ্ড হাতে মুঠাইয়া ধরিয়া প্রীতিপূর্ণ স্বরে হরকিষণ বলিল "বল, তুমি আমার কথা রাখবে?"

আন্দু হাসিয়া বলিল "কি মুস্কিল!"

সে একটু আবেগভরে আন্দুর হাতটা নাড়া দিয়া বলিল, "না; তোমার সঙ্গে ভাল করে আলাপ করতে হবে, তোমায় আমি ভালরকম জানতে চাই!"

আন্দু সসম্ভ্রমে শুষ্কহাস্যে বলিল "আমার সৌভাগ্য"—কিন্তু মনে মনে সেই সৌভাগ্যের কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য বিলক্ষণ শঙ্কিত হইয়া উঠিল, নাম জাঁকাইতে যাহারা ব্যতিব্যস্ত তাহাদের সংসর্গ আন্দুর কাছে অত্যন্ত অপ্রীতিকর!

ওস্তাদের অনুচর শীতলচাঁদ আন্দুকে জ্বালাইবার অভিপ্রায়ে নষ্টামি করিয়া বলিল "জানেন সিংহজী, এই পালওয়ানের ভারি সখ আপনাদের লড়ায়ে কাজ নেয়!"

উৎসাহিত হরকিষণ বলিল "সত্যি নাকি?"

হাসিহাসি মুখে ঘাড় নাড়িয়া ওস্তাদজী বলিলেন "হ্যাঁ কথাটা মিছে নয়, কিন্তু এখন সেসব খেয়াল চুকে গেছে, না আন্দু?" আসল কথা স্নেহবৎসল ওস্তাদ, আন্দুর এসব খেয়াল মোটে পছন্দ করিতেন না, যুদ্ধোৎসাহ ওস্তাদের বাঞ্ছনীয় নহে, তিনি চান আন্দু আন্দুই থাকিবে।

শীতলচাঁদের উপর কৃত্রিম কোপ দেখাইয়া আন্দু বলিল "শোনেন কেন? এটা মহা পাজি!"

চোখ টিপিয়া শীতল বলিল "শোনেন কেন?—সেই জন্যে তুমি আজও বিয়ে করলে না, লড়ায়ে যাবার মতলব তোমার নেই?"

মহাদেব মিশ্র আর একটু রসান লাগাইয়া বলিল "তুমি ত এতদিন কানপুর চলে যেতে, তোমার সাহেব শুধু তোমায় আটকে রেখেছেন বইত নয়!"

আন্দু মহা বিরক্ত হইয়া বলিল "আঃ থাম না।"

হরকিষণ একদৃষ্টে আন্দুর মুখপানে চাহিয়া ছিল, এতক্ষণে সবিস্ময়ে বলিল 'তুমি সত্যি লড়ায়ে যেতে চাও?"

অকস্মাৎ সঙ্কোচের পর্দ্দা সরাইয়া পূর্ণ আশায় আন্দুর চক্ষুদুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, আন্দু আবেগের সহিত কি বলিতে উদ্যত হইল, কিন্তু আসন্ন বিপদ বুঝিয়া ওস্তাদ তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল "আরে না না ভাই, ও ছেলেমানুষের কথায় কান দিও না, আমাদের আন্দু আমাদেরই থাক, বাপ পিতামোর নাম খুইয়ে, কি ছাই হানাহানির ব্যবসা শিখতে যাবে? আন্দু লড়াই করতে গেলে আমাদের রোগে শোকে সেবাসুশ্রূষা করবে কে? না কাজ নেই, এই ভাল।"

অনেকগুলো মনের কথা, একসঙ্গে জড়াজড়ি করিয়া, আন্দুর ঠোঁটের কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু পিতৃস্থানীয় ওস্তাদের ব্যগ্র আপত্তির উপরে সেগুলা ব্যক্ত করা অসঙ্গত বিবেচনায় সব কটাকে দমন করিয়া আন্দু মৃদুস্বরে বলিল "লড়ায়ের কাজে কি বাপদাদার নাম খোয়া যায়? মরণ তো আছেই, আমি নামের জন্যেও লড়ায়ে যেতে চাই না, টাকার জন্যও যেতে চাই না, আমি শুধু যেতে চাই—" আন্দু থামিল।

হরকিষণ উৎসুক হইয়া বলিল "তুমি শুধু কি জন্যে যেতে চাও?"

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া, আন্দু একটু জোরের সহিত বলিল "আমি?—আমি লড়ায়ে যেতে চাই শুধু লড়াইয়ের জন্যে!"

উৎসাহভরে আন্দুর পিঠ ঠুকিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে হরকিষণ বলিল "ঠিক ঠিক, লড়ায়ে ঢুকতে হয় ত শুধু

লড়াইয়ের জন্যে। লড়াই ধনেরও নয় মানেরও নয়,—লড়াইয়ের দাম শুধু লড়াই! এই ধরণে স্ফূর্ত্তি, কুস্তি কি ব্যবসার জিনিস? না সখের জিনিস? যে ব্যবসার জন্যে, পয়সার খাতিরে কুস্তি শিখতে আসে, তার উচিত আলু পটল বিক্রির কসরৎ শেখা!…"

হরকিষণ ঝোঁকের মাথায় অনেক কথা বলিয়া চলিল। ওস্তাদের সারা চিত্ত কিন্তু ঐ সর্ব্বনেশে লড়ায়ের উৎসাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, তিনি এ অভিনয়ের যবনিকা এইখানেই পতন করাইবার জন্য—আন্দুর ধূল্যবলুণ্ঠিত গামছাখানির প্রতি অকস্মাৎ অচিন্ত্যনীয় সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া, সুগভীর করুণায় বলিলেন "আহা আন্দু, তোমার গামছাটা যে ধুলোয় লুটোপুটি খাচ্ছে, তুমি চান করতে যাও।"

গামছাটা তুলিয়া আন্দু বলিল "এই যে যাই।"—তাহার পর হরকিষণের পানে ফিরিয়া একটু আগ্রহের সহিত বলিল "আপনি কদিন এখানে থাকবেন?"

হরকিষণ বলিল "বেশী নয়, দিন-চার।"

শীতলচাঁদ মাথা নাড়িয়া তৎক্ষণাৎ বলিল "ততদিনে তুমি লড়াইয়ের হাল হদিস্ সব মুখস্ত করে নিতে পারবে।"

প্রত্যুত্তরে আন্দু শীতলের পৃষ্ঠে এক চপেটাঘাত বসাইল। মহাদেবমিশ্র আস্তিন গুটাইয়া একটা পাকা লড়াইয়ের উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া ওস্তাদ হাসিয়া বলিলেন "এখন নয় বাবা, আন্দু আগে 'আসনান্' করে আসুক।"

আন্দু বলিল "আপনারা বসবেন না?"

ওস্তাদ বলিলেন "না বাবা, কাল বলখেলার মাঠে খেলা হবে, অনেক লোককে বলতে আছে, সিংহজী তোমায় কখনো দেখেন নি বলে মাত্র আলাপটা করাতে তোমার কাছে একবার এসেছিলুম, এখন তবে যাই।"

ওস্তাদ অগ্রসর হইলেন। আন্দুর হাত নিজের মুষ্টির মধ্যে পুরিয়া বিরাটকায় হরকিষণ সিং গম্ভীর মুখে বলিল "তোমার সঙ্গে আলাপের আমার অনেক বাকী রইল, মনে রেখ। আমি তোমার জন্যে বোধ হয় আবার শীঘ্রই ভাগলপুরে আসব। কাল কিন্তু আমার সঙ্গে তোমায় 'পনের মিনিট্ বি' খেলতে হবে। রাজী?"

স্বীকার অস্বীকারের কোন লক্ষণই না দেখাইয়া আন্দু শুধু হাসিতে লাগিল। মহাদেব ও শীতল অত্যন্ত খুসী হইয়া চোখ টেপাটেপি করিয়া, প্রচুর হাস্যপরিহাসে হরকিষণ যে আন্দুকে ঠিক জব্দ করিয়াছেন, এই কথাটা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিয়া আন্দুর ধৈর্য্য রক্ষা অসম্ভব করিয়া তুলিল। ওস্তাদ মাঝে পড়িয়া, তাহাদের টানিয়া লইয়া গেলেন। আন্দু নিষ্ফল মুষ্টি শূন্যে উঁচাইয়া, তাহাদের ভবিষ্যতে প্রাপ্তির সম্ভাবনা বুঝাইয়া হাসিতে হাসিতে গন্তব্য পথে ফিরিল।

অকস্মাৎ কোথা হইতে দমকা বাতাসের মত পরিমল ছুটিয়া আসিয়া লাফাইয়া আন্দুর গলা ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িয়া মহা আব্দার জুড়িয়া দিল। সে এত দ্রুতস্বরে কথা কহিতেছিল যে আন্দু তাহার একবর্ণও বুঝিল না। বিস্মিত হইয়া বলিল "কি হয়েছে?"

পরিমল বলিল "কাল তুমি খেলার সময় বাবাকে বলে' আমায় স্কুল থেকে নিয়ে যাবে কি না বল।"

পরিমল কথাটা কোথা হইতে শুনিল অনুসন্ধান করিয়া জানিবার অবকাশ হইল না, তাহার হস্ত হইতে সদ্যপরিত্রাণ লাভের জন্য, আন্দু পুনঃ পুনঃ আশ্বাস দিয়া পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সে কিছুতেই মানিবে না, শপথ করাইবার জন্য বিষম হাঙ্গামা করিতে লাগিল। বিপন্ন আন্দুর অনুনয় বিনয় সমস্তই সজোরে অগ্রাহ্য করিয়া সে নিজের জেদ ধরিয়া রহিল। এদিকে আন্দুও প্রতিজ্ঞা করিতে অসম্মত; শেষে দুরন্ত বালক চেঁচাইয়া বলিল "দিদি, তুমি বলে দাও না।" চমকিত আন্দু চাহিয়া দেখিল দ্বিতলের রৌদ্রনিবারক পর্দ্দার পাশ হইতে একখানি সুন্দর মুখ সরিয়া গেল। সর্ব্বনাশ! তাহা হইলে তাহাদের সমস্ত কথাবার্ত্তাই তো ঐ অন্তরালবর্ত্তিনী শুনিয়াছে! হয়ত হরকিষণের সেই অতর্কিত আক্রমণের পরিণামটাও দেখিয়াছে! ছিঃ ছিঃ! আন্দুর দেহ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল, সে সবলে পরিমলের হাত খুলিয়া তাহাকে সুদ্ধ লইয়া স্নানের ঘাটে চলিয়া গেল।

আহারান্তে আন্দু আড্ডায় হরকিষণের সহিত গল্প করিতে যাইবে বলিয়া জুতা জামা পরিতেছে, এমন সময় বর্গীর হাঙ্গামার মত পরিমল আসিয়া মহা উৎপাত বাধাইল সেও আন্দুর সহিত যাইবে। আন্দু অনেক বুঝাইল, কিন্তু

সে কিছুই মানিল না। ত্যক্ত হইয়া আন্দু বলিল "মাইজীর হুকুম নিয়ে এস।" পরিমল টলিবার পাত্র নহে, সে ধরিয়া বসিল "তুমি মার কাছে চল।"

আন্দু বিস্তর আপত্তি করিল। কিন্তু না-ছোড়বান্দা পরিমল তাহাকে অকুতোভয়ে টানিয়া লইয়া চলিল। সিঁড়ির পরে বারান্দায় উঠিতেই সরসীর দেখা পাওয়া গেল। সে আন্দুকে নাছোড়বান্দা ছোড়দার কবলিত দেখিয়া নিতান্ত দয়াদ্র হইল, এবং ছোড়দার অন্যায় আব্দার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বলিল "তুমি চলে যাও তো, ওর কথা কখ্খোনো শুনো না।"

আজ্ঞাটি প্রতিপালন বড় সহজ ব্যাপার নহে। বিপন্ন আন্দু বেশ বুঝিল, এই দুর্দ্দমনীয় লোকটি উচ্চ শাসনালয়ের আদেশ ব্যতীত কিছুই মানিবে না। অগত্যা সে সরসীকে বিনয় করিয়া কহিল "মাইজী সাহেবকে একবার ডেকে দাও খুকু—"

খুকু যদিচ আন্দুর নিকটে অনেক অসঙ্গত 'ফাই-ফরমাসের দরুন সবিশেষ কৃতজ্ঞ আছে বটে, কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে আন্দুর সহিত ছোড়দার কাজের যোগটা তাহার চিত্তের সমস্ত কৃতজ্ঞতার সলিলটুকু বিদ্বেষের রুক্ষ বায়ুর সহযোগে বাষ্পাকারে উড়াইয়া দিল। সে প্রাণপণ বেগে মাথা নাড়িয়া বলিল "মা? মা এখন কিছুতেই আসতে পারবেন না। মার কাছে মাদ্রাজী কাপড় বিক্রী কর্ত্তে এসেছে, তিনি বলে এখন তাই নিয়ে ব্যতিব্যস্ত রয়েছেন, এখন আসবেন কি করে—"

পুনশ্চ অনুরোধের আশঙ্কায় আবশ্যকীয় কর্ম্মের অনুরোধের অসম্ভব ব্যস্ততায় সরসী দ্রুতপদে চলিয়া গেল; মনে মনে অবশ্য ভরসা রহিল যে আন্দুর মত নীরিহ জীব তাহার কৃতঘ্নতার জন্য কিছুমাত্র অনুতপ্ত হইবে না। যাহাই হউক, সরসীর ব্যবহারে পরিমলও কিছুমাত্র নিরুদ্যম না হইয়া আন্দুকে টানিয়া লইয়া চলিল। পরিমল তাহাকে সত্যই বিপদে ফেলিয়াছে।

যে হলঘরখানার মধ্য দিয়া কর্ত্রীর ঘরে যাইতে হয়, সেই গৃহের সম্মুখে আসিতেই দেখা গেল, লতিকা কৌচে আড় হইয়া গালে হাত দিয়া রাজনৈতিক-কায়দায় গভীর ভাবনা ভাবিতেছে। আন্দু দ্বারের পাশে থমকিয়া দাঁড়াইল, একটু বিশেষরকম শব্দ করিয়া হেঁট হইয়া জুতা খুলিতে লাগিল। লতিকা গলা বাড়াইয়া চাহিতেই দ্বারান্তরালবর্ত্তী আন্দুর সহিত চোখোচোখি হইল। সে উঠিয়া টে[illegible] হেলান দিয়া দাঁড়াইল। পরিমলের সহিত আন্দু নতশিরে কক্ষে ঢুকিল। লতিকার হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া একটু উত্তেজনার সহিত চলিল, বলিল "কি হয়েছে পরিমল?"

পাছে দিদি আবার কিছু ফ্যাসাদ বাধায় এই ভয়ে পরিমল সংক্ষেপে বলিল "আমি আন্দুর সঙ্গে বেড়াতে যাব।"

দ্বিতীয় কথার অবসর হইল না, তাহারা কক্ষ অতিক্রম করিয়া গেল। লতিকার মনের মধ্যে অজ্ঞাত প্রদেশে এক সুপ্ত সমুদ্র অকস্মাৎ সবেগে উছলিয়া উঠিল। অধীরতায় লতিকার কপালের শিরা দপ্‌দপ্ করিতে লাগিল! সে শ্লথ শীতল হস্তে, পেনের ডগে করিয়া, বাতিদানের পোড়া মোমগুলা তুলিতে লাগিল।

অবিলম্বে জননীর অনুমতি করিয়া আন্দুকে ছাড়িয়া দিয়া পরিমল কাপড়জামা পরিতে চলিয়া গেল। আন্দু সসঙ্কোচে আবার সেই ঘরের ভিতর দিয়া ধীরপদে পার হইয়া চলিয়া যাইতেছিল। সহসা মুখ তুলিয়া যথাসাধ্য সহজভাবে লতিকা বলিল "যে-লোকটি ও-বেলা এসেছিল সে কি শিখ?"

আন্দু দাঁড়াইল, নতদৃষ্টিতে বলিল "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কি নাম তার?"

"আজ্ঞে হরকিষণ সিং।"

'কাল তুমি তার সঙ্গে খেলা করবে?"

কুণ্ঠাকাতর আন্দু প্রাণপণে জবাব যোগাইল, "আজ্ঞে বলতে পারি না, এখনো ঠিক করতে পারিনি।" আন্দু দুইপদ অগ্রসর হইল, লতিকা হঠাৎ গভীরস্বরে বলিল "তুমি কি পল্টনে যেতে চাও?"

পল্টনে যাওয়ার কথা লইয়া ইহারা সুদ্ধ নাড়াচাড়া আরম্ভ করিয়াছেন! আন্দু বিষম থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া হঠাৎ চোখ তুলিয়া চাহিল, দেখিল, লতিকার চক্ষে আনন্দ রহিয়াছে, উৎসাহ রহিয়াছে, আর রহিয়াছে, এক কোণে একটু কোমল মোহমুগ্ধতার চিহ্ন!

আন্দুর মুখ লাল হইয়া উঠিল। শুষ্কহাসি হাসিয়া লতিকার কথার জবাব না দিয়া টুপী তুলিতে ভুলিয়া গিয়া

ক্রুতপদে পলায়ন করিল! আর লতিকা?—সে স্পন্দিত হৃদপিণ্ডটা দুই হাতে চাপিয়া চেয়ারে বসিয়া চক্ষু মুদিল, তাহার মনে হইল সমস্ত আইন-কানুন-নিয়ম বাঁধন ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া মরণোন্মাদ রক্তকেন্দ্র বক্ষের মধ্যে উর্দ্ধশ্বাসে তাণ্ডব নৃত্য জুড়িয়াছে, কি ভয়ঙ্কর! (ক্রমশ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস

কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেনের প্রত্যক্ষশারীরের উপোদ্ঘাত ভাগ হইতে কবিরাজিবিদ্যার একটু ইতিহাস সংকলন করিয়া দিতেছি। এই ভাগে গ্রন্থকার যেরূপ পাণ্ডিত্য ও বিচারপ্রণালী দেখাইয়াছেন, তাহা ইতিহাস-গ্রন্থ বঙ্গদেশে আজিও সম্পূর্ণ দুর্লভ।

আয়ুর্বেদের প্রধানত দুই সম্প্রদায়, (১) ধন্বন্তরি-সম্প্রদায়—ইহাদের আয়ুর্ব্বেদে শল্যতন্ত্র (Surgery) প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে, (২) ভরদ্বাজ-সম্প্রদায়—ইহাদের আয়ুর্ব্বেদে কায়চিকিৎসা (Medicine) প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে।

ধন্বন্তরি কাশীর রাজা ছিলেন। তাঁহার অপর নাম দিবোদাস। তিনি নিজে এবং তাঁহার প্রধান শিষ্য সুশ্রুত ক্ষত্রিয় ছিলেন। শস্ত্রব্যবসায়ী ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শল্যতন্ত্রের আলোচনা সমধিক উপযোগী সন্দেহ নাই। ধন্বন্তরি- বা সুশ্রুত-সম্প্রদায়ে মূলগ্রন্থ চারিখানি—ঔপধেনবতন্ত্র, ঔরভ্রতন্ত্র, সৌশ্রুততন্ত্র ও পৌষ্কলাবততন্ত্র।

ঔপধেনবমৌরভ্রং সৌশ্রুতং পৌষ্কলাবতম্।
শেষাণাং শল্যতন্ত্রাণাং মূলান্যেতানি নির্দ্দিশেৎ॥

ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি পুনর্বসু আত্রেয়ের অধ্যাপক। আত্রেয় পঞ্চালক্ষেত্রে কাম্পিল্যরাজধানীতে আশ্রম স্থাপন করিয়া অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর, হারীত ও ক্ষারপাণি নামক ছয়জন ব্রাহ্মণ শিষ্যকে ব্রাহ্মণ-স্বভাবের অনুগুণ কায়চিকিৎসাপ্রধান আয়ুর্বেদ শিক্ষা দেন। এইটি ভরদ্বাজ-সম্প্রদায় বা আত্রেয়-সম্প্রদায়। অগ্নিবেশ প্রভৃতি ছয় জনের প্রত্যেকের এক-একখানি মূলগ্রন্থ ছিল।

অধুনা প্রচলিত আয়ুর্বেদগ্রন্থের মধ্যে একমাত্র চরকসংহিতা ও সুশ্রুতসংহিতা ঋষিপ্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। বাগ্‌ভট, শার্ঙ্গধর, ভাবমিশ্র, চক্রপাণি, বঙ্গসেন প্রভৃতির কৃত গ্রন্থগুলি সংগ্রহ (Compilation) মাত্র, মূলগ্রন্থ নহে। নিঘণ্টু, নিদান প্রভৃতি আয়ুর্বেদের এক এক অংশের প্রতিপাদক (monograph)।

অগ্নিবেশ ঋষির প্রণীত অগ্নিবেশতন্ত্র চরক কর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত হইয়া চরকসংহিতা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। চরকসংহিতাকে সাক্ষাৎ অগ্নিবেশতন্ত্র বলা চলে না, কেননা চক্রপাণি, বিজয়রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠ, শিবদাস প্রভৃতি বৈদ্যগ্রন্থকারগণ অগ্নিবেশতন্ত্রের যে-সকল পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাদের সকলগুলি বর্ত্তমান চরকসংহিতায় পাওয়া যায় না। বিশেষত বর্ত্তমান চরকসংহিতার চিকিৎসাস্থানের ৩০শ অধ্যায়ে আছে—

* অস্মিন্ সপ্তদশাধ্যায়াঃ কল্পাঃ সিদ্ধয় এব চ।
নাসাদ্যন্তেঽগ্নিবেশস্য তন্ত্রে চরকসংস্কৃতে*॥

তানেতান্ কাপিলবলঃ শেষান্ দৃঢ়বলোঽকরোৎ।
তন্ত্রস্যাস্য মহার্থস্য পূরণার্থং যথাযথম্॥

অর্থাৎ "চিকিৎসিত স্থানের সপ্তদশ অধ্যায়, কল্পস্থান এবং সিদ্ধিস্থান এই-সমস্ত অগ্নিবেশকৃত চরকসংস্কৃত তন্ত্রের মধ্যে পাওয়া যায় না। এই মহামূল্য "তন্ত্রের যথাযথ পূরণের জন্য" কপিলমতাবলম্বী * দৃঢ়বল এই বাকি "সপ্তদশ অধ্যায় এবং কল্প ও সিদ্ধিস্থান প্রস্তুত করিয়াছিলেন।" এই শ্লোকদ্বয় হইতে প্রমাণিত হয় যে দৃঢ়বল প্রচলিত চরকসংহিতার বহু অংশের রচয়িতা। দৃঢ়বলের রচিত অংশের প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অবশ্য লিখা আছে "অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে"!

ব্যাকরণ-মহাভাষ্য ও যোগসূত্রের প্রণেতা প্রসিদ্ধ পতঞ্জলিমুনিরই অপর নাম চরক। এই মত সুপ্রাচীন। এই মত সত্য হইলে বলিতে হইবে যে, খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতে অগ্নিবেশতন্ত্রের জীর্ণোদ্ধার করিয়া বর্ত্তমান চরকের অধিকাংশ সংকলিত হইয়াছিল। তারপর, "পঞ্চনদপুরে" জাত দৃঢ়বল (৩য় শতাব্দী?) চরকের শেষ অংশ রচনা করেন।

আর্ষ সৌশ্রুততন্ত্রই কেহ প্রতিসংস্কৃত করিয়া সুশ্রুত নামে চালাইয়াছেন। প্রাচীন সৌশ্রুততন্ত্র এবং বর্ত্তমান সুশ্রুতসংহিতা কদাচ অভিন্ন হইতে পারে না। ঐ মূল সৌশ্রুততন্ত্র কখন কখন বৃদ্ধসুশ্রুত বলিয়া উল্লিখিত হয়। টীকাকারেরা বৃদ্ধসুশ্রুত হইতে যে-সমস্ত পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, বর্ত্তমান সুশ্রুত সংহিতায় সেগুলি পাওয়া যায় না। বিশেষত বাগ্‌ভট বর্ত্তমান সুশ্রুতসংহিতায় অনার্ষ বাক্যের বাহুল্য লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন—

ঋষিপ্রণীতে প্রীতিশ্চেৎ মুক্ত্বা চরকসুশ্রুতৌ।
ভেলাদ্যাঃ কিং ন পঠ্যন্তে তস্মাদ্‌গ্রাহ্যং সুভাষিতম্॥ †

সুশ্রুতে অনেক প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ ভুল কথা আছে। ঐ-সকল স্থল অজ্ঞাতনামা অজ্ঞ শোধকের সংশোধনের ফল বলিয়া মনে হয়। অরুণদত্ত ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন "অতশ্চরকসুশ্রুতবদনার্ষমপীদং (অষ্টাঙ্গহৃদয়ম্) গুণবত্ত্বান্ মতিমদ্ভির্গ্রাহ্যমেব।" প্রচলিত সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা কে তাহা ঠিক বলা যায় না। সুশ্রুতটীকাকার ডল্লন বলিয়াছেন যে, নাগার্জুন সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা। প্রাচীন ইতিহাসে অনেক নাগার্জ্জুনের উল্লেখ আছে। একজন রসতন্ত্রাচার্য্য, একজন বৌদ্ধ নরপতি, একজন মাধ্যমিক-মতপ্রবর্ত্তক। যাহা হউক, সুশ্রুত-প্রতিসংস্কর্ত্তা নাগার্জ্জুন প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এইরূপ মনে করার কারণ আছে।

চরক ও সুশ্রুতের প্রতিসংস্কারদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে আয়ুর্বেদের নিতান্ত দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছিল। তখনই মূল চরক সুশ্রুত পাওয়া যাইত না। তাই পতঞ্জলি ও নাগার্জ্জুন উহাদের জীর্ণোদ্ধার করিয়া প্রচলিত সংহিতার সংকলন করেন। এই

---

* বিস্তারয়তি লেশোক্তং সংক্ষিপত্যতিবিস্তরং।
সংস্কর্ত্তা কুরুতে তন্ত্রং পুরাণঞ্চ পুনর্নবম্॥

অতস্তন্ত্রোত্তমমিদং চরকেনাতিবুদ্ধিনা
সংস্কৃতম্..............॥ চরকসংহিতা শেষ অধ্যায়॥

* শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্নের অনুবাদে আছে "মহর্ষি কাপিলবল ও দৃঢ়বল।" দৃঢ়বল ঋষি ছিলেন বলিয়া প্রমাণ নাই। কাপিলবলঃ= কপিলমতাবলম্বিনাং শ্রেষ্ঠঃ। কপিল একজন আয়ুর্বেদগ্রন্থকার ছিলেন। ঋতুচর্য্যা ব্যাখ্যায় সুশ্রুতটীকায় চক্রপাণি একটি কপিলবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

† এই শ্লোক দ্বারা চরক ও সুশ্রুতের অনার্ষত্ব নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় না। বরং এই শ্লোকের দ্বারা মনে হয় যে, বাগ্‌ভটের মতে চরক সুশ্রুতও ঋষি ছিলেন। কিন্তু টীকাকারের মতে, এই শ্লোকে চরক সুশ্রুতকে স্পষ্টই অনার্ষ বলা হইয়াছে।

প্রতিসংস্কারের পর কেবল সংগ্রহ ও টীকার যুগ। তদবধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আয়ুর্ব্বেদের তত্ত্বনির্দ্ধারণ ক্রমেই কমিয়া গিয়াছে।

কৃতী ভিষক্ গণনাথ পুনরায় আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে প্রত্যক্ষ ও পর্য্যবেক্ষণ আনিয়া উহার পুনর্জ্জীবনের ব্যবস্থা করিতেছেন, তাঁহার "প্রত্যক্ষশারীরম্" তাঁহাকে চিরজীবী রাখিবে। প্রাচীনকালে মহর্ষি পতঞ্জলি বা নাগার্জ্জুন যাহা করিয়াছিলেন, অধুনা তিনি তদনুরূপ কার্য্যই করিতেছেন। আমাদের কবিরাজদের চক্ষু উন্মীলিত হউক। তাঁহারা যেন আর অর্ব্বাচীন টীকা ও সংগ্রহের মধ্যে নিবদ্ধ না থাকেন। তাঁহারা মূল গ্রন্থ পাঠ করুন, এবং মূল গ্রন্থেরও যাহা মূল সেই শরীর ও ঔষধাদির হাতে হাতে পরীক্ষা করুন। এই প্রত্যক্ষ পরীক্ষার অভাবে আয়ুর্ব্বেদের বৈজ্ঞানিকত্ব অনেক ঘুচিয়া গিয়া উহা এখন অনেকটা প্রত্যক্ষানুমানাতীত "বেদে" পরিণত হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাসকে চারিভাগে বিভক্ত করা যায়। (১) দৈবযুগ —এ যুগের গ্রন্থ ব্রহ্মসংহিতা, প্রজাপতিসংহিতা, অশ্বিসংহিতা ও বলভিৎ-সংহিতা। এই যুগের কালনির্ণয় অসম্ভব। কেহ কেহ আয়ুর্ব্বেদকে ঋক্‌বেদের, কেহ বা উহাকে অথর্ব্ববেদের অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। (২) আর্ষযুগ। এইটি আয়ুর্ব্বেদের শ্রেষ্ঠযুগ। এই যুগে আয়ুর্ব্বেদের প্রত্যেক অঙ্গের বহুতর গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। অধুনা কেবল তাহাদের নাম ও প্রত্যেকের কয়েকটি পংক্তি টীকাকারদের টীকায় পাওয়া যায়। সম্ভবত ইহাদের জীর্ণশেষ কিছু কিছু হাজার বছর পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল। নিম্নে একটি তালিকা সঙ্কলিত হইল।

(ক) কায়চিকিৎসাতন্ত্র (Medicine) :—(১) অগ্নিবেশ (২) ভেল (৩) জতূকর্ণ (৪) পরাশর (৫) ক্ষারপাণি (৬) হারীত (৭) খরনাদ (৮) বিশ্বামিত্র (৯) অত্রি-সংহিতা।

(খ) শল্যতন্ত্র (a kind of Surgery) :—(১০) ঔপধেনব (১১) ঔরভ্র (১২) সৌশ্রুত (১৩) পৌষ্কলাবত (১৪) বৈতরণ (১৫) ভোজ (১৬) করবীর্য্য (১৭) গোপুররক্ষিত (১৮) ভালুকি তন্ত্র।

কায়চিকিৎসা বা শল্যতন্ত্র :—(১৯) কপিলতন্ত্র (২০) গৌতমতন্ত্র।

(গ) শালাক্যতন্ত্র (ocular and some other kinds of surgery, especially with pointed instruments):—(২১) বিদেহ (২২) নিমি (২৩) কাঙ্কায়ন (২৪) গার্গ্য (২৫) গালব (২৬) সাত্যকি (২৭) শৌনক (২৮) করাল (২৯) চক্ষুষ্য (৩০) কৃষ্ণাত্রেয়-তন্ত্র।

(ঘ) ভূতবিদ্যাতন্ত্র :—ভূতবিদ্যার কোনও গ্রন্থকারের নাম পর্য্যন্ত টীকাদিতে পাওয়া যায় না। সুশ্রুত ও বাগ্‌ভট ভূতবিদ্যাকে পৃথক্ বিদ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু চরক উন্মাদাধিকারেই উহার অন্তর্ভাব করিয়াছেন। ভূতবিদ্যা অর্থাৎ ভূতে পাওয়া প্রভৃতির নিদান ও চিকিৎসাদি।

(ঙ) কৌমারভৃত্য তন্ত্রকার (৩১) জীবক (৩২) পার্ব্বতক ও (৩৩) বন্ধকের নাম উল্লেখে আছে। জীবক বৌদ্ধেতিহাসে প্রসিদ্ধ। তিনি বিম্বিসার রাজার এবং স্বয়ং বুদ্ধদেবের চিকিৎসা করিয়াছিলেন। পালিতে "জীবক কোমারভচ্চ বলিয়া ইহার উল্লেখ ও পরিচয় আছে। ইহা ছাড়া (৩৪) হিরণ্যাক্ষ্যতন্ত্র নামে তন্ত্রও ছিল বলিয়া অনুমান হয়।

(চ) অগদতন্ত্র অর্থাৎ নিখিল স্থাবর-জঙ্গম-বিষ-চিকিৎসা :—(৩৫) কাশ্যপতন্ত্র এবং (৩৬) অলম্বায়ন (৩৭) উশনঃ (৩৮) সনক (৩৯) লাট্যায়ন-সংহিতা।

(ছ) রসায়নতন্ত্র :—(৪০) পাতঞ্জল (৪১) ব্যাড়ি (৪২) বসিষ্ঠ (৪৩) মাণ্ডব্য ও (৪৪) নাগার্জ্জুন-তন্ত্র।

(জ) বাজীকরণ-তন্ত্র :—পুরাণ-টীকাকারেরাও এই বিভাগে কোনও গ্রন্থের নাম করেন নাই।

এই চুয়াল্লিশখানি গ্রন্থের নাম ও শ্লোক প্রাচীন টীকা ও সংগ্রহে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া আর কত শত গ্রন্থের যে নামও বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহা কে বলিবে ?

গজায়ুর্ব্বেদ এবং অশ্বায়ুর্ব্বেদও এই আর্ষ যুগে সম্যক পুষ্টি লাভ করিয়াছিল। এই যুগের শালিহোত্র এবং পালকাপ্য সংহিতা উল্লেখ-যোগ্য।

এই যুগে ভারত পৃথিবীর বিদ্যাপীঠ ছিল। প্রাচ্য প্রতীচ্য বহু দেশ-দেশান্তর হইতে বিদ্যার্থীরা ভারতে আসিয়া বিদ্যা ও ধর্ম্মের অভ্যাস করিতেন। এই আর্ষ যুগের পরে বৌদ্ধ যুগেও, ভারতীয়েরা পৃথিবীর বিদ্যা ও ধর্ম্মের গুরু ছিলেন। পশ্চিমে মিশর ও আরব, গ্রীস এবং রোম প্রভৃতি, পূর্ব্বে ও উত্তরে তিব্বত, চীন ও জাপান, দক্ষিণে যবদ্বীপ প্রভৃতি যে ভারতীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

এই মহামহিমান্বিত যুগের কেন এইরূপ শোচনীয় পরিণাম হইল ? গ্রন্থকারের মতে, অলিকসন্দরের ভারত আক্রমণ, নন্দবংশধ্বংস-বিপ্লব, অশোকের কৃত প্রজাক্ষয়, ও শকদিগের আক্রমণ, এই সকলে প্রজাদের শান্তি দূর হইল। ফলে লোকে বিজ্ঞানচর্চ্চার অবসর পাইল না। শুঙ্গবংশীয় পুষ্য (ষ্প) মিত্র কর্ত্তৃক ভারতে কথঞ্চিৎ শান্তি স্থাপিত হইলে, বিশীর্ণপ্রায় অগ্নিবেশসংহিতার পুনঃসংস্করণ হইয়াছিল। অনেকে বলেন, যে, সুশ্রুতের প্রতিসংস্করণের এই সময়।

তার পর, শকদিগের আক্রমণে আবার সমস্ত রাজ্যের শোচনীয় দশা উপস্থিত হইল ; পণ্ডিতেরা বিজ্ঞানচর্চ্চার অবসর হারাইলেন। পরে কুশাণবংশীয় কনিষ্ক বহুযুদ্ধে হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্য্যন্ত ভূভাগের একচ্ছত্র রাজা হইলেন। শান্তি ফিরিয়া আসিল। এই সময়ে কাশ্মীরের দৃঢ়বল চরকসংহিতার শেষাংশ রচনা করেন।

ইহার পর, হূণ ও কাম্বোজীয়গণ শতবর্ষব্যাপী বিপ্লবের সৃষ্টি করেন। এই বিপ্লবের সমাপ্তিতে শকারি বিক্রমাদিত্যের সময়ে আবার দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিল। বিজ্ঞান ও শাস্ত্রের আলোচনা দ্বিগুণ উৎসাহে চলিতে লাগিল। এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েক শতাব্দী ভারত শান্তিতে ছিল। এই দীর্ঘ শান্তির সময়ে কালিদাস, অমরসিংহ, বররুচি, বরাহমিহির, দণ্ডী, বাণ, ভবভূতি, আর্য্যভট, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি প্রাদুর্ভূত হন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও এই সময়ের মধ্যেই পড়েন। আয়ুর্ব্বেদেও অষ্টাঙ্গসংহিতার রচয়িতা বাগ্‌ভট, ও বৃন্দমাধব প্রভৃতি সংগ্রাহকেরা এবং জেজ্জট, গয়দাস, ভাস্কর, ব্রহ্মদেব প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ এই সময়েরই লোক। বঙ্গদেশীয় চক্রপাণিদত্ত ও মাধবকর, এবং সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ভোজরাজা খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। এই যুগের পরে, গজনীর সর্ব্বধ্বংসকারী মামুদের আক্রমণ ; মহম্মদ ঘোরীর আক্রমণ ; চেঙ্গিসখাঁ, তৈমুর প্রভৃতির অত্যাচার ; মোগল পাঠানের যুদ্ধবিপ্লব, ইত্যাদি ভারতীয় বিদ্যাকে বহুদিন নিগৃহীত করিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে বুক্ক-রাজাদের প্রতাপে ভারতীয় বিদ্যার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ সায়ণমাধব এইসময়ে বেদের টীকা করেন। এই সময়েই শার্ঙ্গধর দাক্ষিণাত্যে স্বীয় সংহিতা রচনা করেন (১৪২০ সং)। সুগৃহীতনামা আকবর শাহের সময়ে দেশে পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে, বিদ্যার আবার উন্নতি হইল। এই সময়েই কান্যকুব্জে ভাবমিশ্রের প্রাদুর্ভাব হয়। আকবরের পরেও কিছু দিন বিদ্যাচর্চ্চা ছিল। বৈয়াকরণ ভট্টোজি-দীক্ষিত এবং কবি, আলঙ্কারিক ও বৈয়াকরণ জগন্নাথ পণ্ডিত প্রভৃতি সাজাহানের সময়ের লোক।

আরঙ্গজীবের সময়ে আবার বিদ্যালোচনার বিঘ্ন ঘটিল। এ বিঘ্ন দূর হইতে-না-হইতে, নাদির শাহা, মহম্মদ শাহা প্রভৃতির সংহারলীলার অভিনয় আরম্ভ হইল। ভারতীয় বিদ্যা আর মাথা তুলিতে পারিল না।

গ্রন্থকার গণনাথ এইখানেই কবিরাজীবিদ্যা এবং অন্যান্য ভারতীয়-বিদ্যার অবনতির কারণ বর্ণনা শেষ করিয়া লিখিয়াছেন যে, ইহার পর ঈশ্বর দয়ার্দ্র হৃদয়ে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপিত করিলেন। এখন আবার বিদ্যালোচনার পথ প্রশস্ত হইয়াছে। দেশে শান্তি বিরাজ করিতেছে। এখন আমরা বহু দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ও কবির আশা করিতে পারি। কাব্যে মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়া এই যুগকে মহিমান্বিত করিয়াছেন। দর্শনে রামমোহন, ভূদেব, চন্দ্রকান্ত, রবীন্দ্রনাথ ও ব্রজেন্দ্রনাথের নাম করা যায়। বিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র আছেন। ভবিষ্যৎ আয়ুর্বেদের ইতিহাসে, ব্রিটিশশান্তির ফলস্বরূপ "প্রত্যক্ষশারীরের" রচয়িতার নাম জাজ্বল্যমান থাকিবে।

শ্রীবনমালি-চক্রবর্ত্তী।

পঞ্চশস্য

গুপ্তচরের গুপ্তচিত্র—

যুদ্ধবিগ্রহের সময় শত্রুর দেশের রাস্তা ঘাট দুর্গ ও সৈন্য প্রভৃতির সংস্থান কোথায় কিরূপ আছে তাহা জানা দরকার হয়। পথ ঘাট ইত্যাদি জানা থাকিলে শত্রুর দেশ আক্রমণ ও জয় করা সহজ হয় এবং জয়ের পর নির্ভয়ে আটঘাট বাঁধিয়া সকল দিক আগলাইয়া অগ্রসর হইতে পারা যায়। এই জন্য শত্রুর দেশে গুপ্তচর পাঠাইবার দরকার হয়। গুপ্তচরেরা সাধারণ পথিকের বেশে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া পথ ঘাট চিনিয়া লয় এবং জটিল স্থানের নক্‌সা আঁকিয়া লয়। কিন্তু দেশে ফিরিবার সময় সীমান্তে যখন তাহার জিনিসপত্র তল্লাসি হয় তখন তাহার মধ্য হইতে নক্‌সা ধরা পড়িলে তাহার উদ্দেশ্য বিফল ত হয়ই,
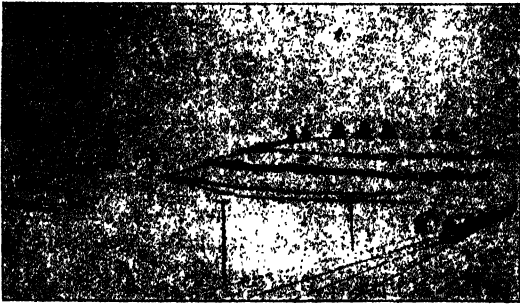
গুপ্তচরের গুপ্তচিত্র।

অধিকন্তু তাহার নিজের বিপদেরও অন্ত থাকে না। এজন্য সে নিজে যেমন ছদ্মবেশে থাকে তাহার নক্‌সাগুলিকেও তেমনি ছদ্মবেশ পরাইয়া নিরীহ আকার দিয়া লয়। সেই ছদ্মবেশী নক্‌সা দেখিলে একটা নির্দ্দোষ নিসর্গচিত্র মনে হয়। টেলিগ্রাফের যেমন সাঙ্কেতিক ভাষা আছে, এইরূপ চিত্রাঙ্কনেরও একএক দেশের একএক প্রকার সাঙ্কেতিক নিয়ম আছে। দেশে নিরাপদে ফিরিয়া গিয়া সঙ্কেত-চিহ্নগুলিকে সাধারণ ও যথার্থরূপে অনুবাদ করিলে চিত্রখানি নক্‌সায় পরিণত হইয়া যায়।

Illustrated London News পত্রিকায় এইরূপ দুখানি ছবির নমুনা মুদ্রিত হইয়াছে। প্রথমখানি একটি স্থানের দৃশ্য মাত্র; গুপ্তচরের কাছে এই ছবি ধরা পড়িলে লোকে সহজেই মনে করিবে সে একটি স্থানদৃশ্য চিত্র করিয়াছে মাত্র, ইহার মধ্যে দুষ্য বা আপত্তিজনক কিছুই নাই। কারণ ছবিতে দুর্গ প্রভৃতির কোনো নাম গন্ধও নাই। কিন্তু সাঙ্কেতিক চিহ্নের অর্থ জানা থাকিলে উহার অনুবাদ হইতে একটি দুর্গের অবস্থানের নক্‌সা বাহির হইয়া পড়িবে। ঝোপ গাছের মানে পাহারাদারের গোপন আস্তানা; ঝাড় গাছের মানে কামান বসাইবার চাতালের আড়াল; লম্বা হটকা গাছের মানে কামানের স্থান ও অবস্থান; ঝোপ ঝাড়ের বেড়া মানে কেল্লার পরিখা; বেড়ার গায়ে দরজার ঝাঁপ দুর্গপ্রবেশের পথের চিহ্ন; জাফরি বেড়া মানে কাঁটা-দেওয়া তারের বেড়া; ছবির মাথার পাশে দুটি দাগ স্থানের দিক-নিরূপণের চিহ্ন। এই সমস্ত সঙ্কেত জানা থাকিলে নিরীহ ছবিখানি একটি বিলক্ষণ ভয়ানক আকার ধারণ করিবে। সুতরাং এই ছবিখানি গুপ্তচর দেশে লইয়া পৌঁছিতে পারিলে তাহার দেশের কর্ত্তারা শত্রুর দেশের একটা দুর্গের আশে পাশের হদিস জানিয়া লইতে পারিবে।
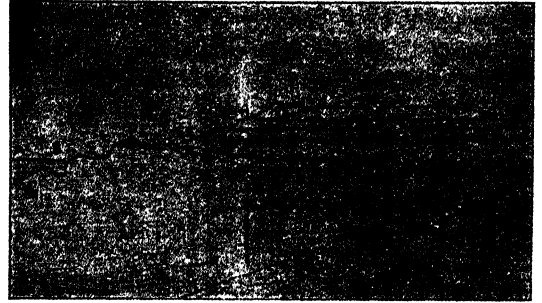
গুপ্তচরের গুপ্তচিত্রের ব্যাখ্যা।

চিত্রখানির অর্থ বিশেষ করিয়া বুঝাইবার জন্য নক্সাতে কতকগুলি অক্ষর-চিহ্ন বসানো হইয়াছে। A—চিহ্নিত স্থানে তারের বেড়া; B—পদাতিক সৈন্যের যুদ্ধাশ্রয় ট্রেঞ্চ বা খানা; C—কামানের অবস্থান; D—হাউইটজার কামানের অবস্থান; E—দুর্গাবরোধক কামানের অবস্থান; F—রাস্তা; G—বাহিরের পরিখা; H—ভিতরের পরিখা; I—কামানের বর্ম্মাবৃত আড়াল; J—নজর-ঘর; K—দুর্গে প্রবেশের ডবল দরজা; L—রেলগাড়ীর ষ্টেসন; M—রেলগাড়ী; N—ডবল রেল লাইন; O—রেললাইনের পাশে জলভরা খানা; P—দিক্‌-নিরূপণের চিহ্ন লম্বালম্বি একটা বড় ও একটা ছোট কসির মানে স্থানটি পূর্ব্ব-পশ্চিমে অবস্থিত, খাড়া বড় ছোট কসির মানে হইবে উত্তর দক্ষিণ।

* *
*

দাঁত ও স্বাস্থ্য—

আমেরিকার The Dental Summary নামক পত্রিকায় প্রকাশ যে ফ্রান্সে আমেরিকার ডাক্তারদের চিকিৎসাধীনে থাকিয়া বর্ত্তমান যুদ্ধে আহত সৈনিকেরা অন্যান্য ডাক্তারদের চিকিৎসাধীন সৈনিকদের অপেক্ষা দশ দিন আগে আরোগ্য লাভ করিতেছে। ফরাসী ইংরেজ প্রভৃতি ইহাতে অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ করিতেছে। কিন্তু উক্ত পত্রিকার মতে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। দাঁতের সহিত স্বাস্থ্যের খব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক; যার দাঁত যত পরিষ্কার তার স্বাস্থ্য তত ভালো থাকে। আমেরিকার ডাক্তারেরা দন্তচিকিৎসায় সুদক্ষ। তাহারা আহত সৈনিকদের দাঁত মাজিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিয়া দ্যায়, ভাঙা ফুটা

মেরামত করে ; ফলে তাহাদের গায়ের ঘা চটপট শুকাইয়া পুরিয়া উঠে। আমেরিকার ডাক্তারেরা এইরূপে দেখিতে পাইয়াছে যে, ইংরেজদের দাঁত সব চেয়ে অপরিষ্কার ও খারাপ, আরবীদের সব চেয়ে ভালো। মরক্কো ও আলজিরিয়ার আরবী (মুসলমান) সৈনিকদের দাঁত নিখুঁত। ইহার কারণ বোধ হয় মুসলমান-ধর্ম্মশাসনে দাঁতন করা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া মুসলমানদের দাঁত পরিষ্কার ও সুস্থ হয়। ইংরেজ ও ফরাসীদের দাঁতের গোড়া ফোলা আছেই ; তাহারা যুদ্ধক্ষত অপেক্ষা দাঁতের গোড়ার বেদনায় অধিক কাতর দেখিতে পাওয়া যায় আমেরিকার ডাক্তারেরা দাঁতের চিকিৎসা করিয়া অন্যবিধ ব্যাধির চিকিৎসা সহজ ও শীঘ্র করিয়া তুলিয়াছে। এজন্য জার্ম্মানী ও তাহার শত্রুসমবায় উভয়পক্ষেই তাহাদের আদর ও চাহিদা বাড়িয়াছে।

* *
*

টেলিফোনের সাহায্যে দেহে বিদ্ধ গুলির স্থান নির্ণয়—

The Lancet নামক চিকিৎসা-বিষয়ক পত্রিকায় যুদ্ধে আহত সৈনিকদের দেহে বিদ্ধ গুলির স্থান নির্ণয়ের এক নূতন কৌশলের কথা বিবৃত হইয়াছে। রঞ্জন-রশ্মির দ্বারা সব সময় গুলির অবস্থান ধরা যায় না। এজন্য এক্ষণে য়ুরোপের সামরিক হাসপাতালগুলিতে

টেলিফোনের সাহায্যে দেহে বিদ্ধ গুলির স্থান নির্ণয়।

টেলিফোনের সাহায্যে গুলির সন্ধান করা হইতেছে। আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল এই উপায় প্রথম নির্দ্দেশ করেন। একটা টেলিফোনের এক প্রান্তের তারে একটা ধাতব সূচ সংলগ্ন করা হয় ; অপর প্রান্তের তারে সেই ধাতুর একটা চাকতি লাগানো হয় ; যে অঙ্গে গুলি বিদ্ধ হইয়াছে সেই অঙ্গে চাকতিটা চাপিয়া ধরিয়া যেস্থানে গুলি আছে আন্দাজ হয় সেইস্থানে সূচটা ফুটাইয়া দেওয়া হয় ; সূচটি গুলির গায়ে ঠেকিলেই শরীরের মধ্যে একটি তাড়িত-কোষের সৃষ্টি হয় এবং যতবার সূচটি গুলিতে ঠেকে ততবার টেলিফোনে টক টক শব্দ শোনা যায়।

এই নির্দ্দেশ অনুসারে সার জেম্‌স্ ম্যাকেঞ্জি ডেভিডসন বহু পরীক্ষায় ইহার উপকারিতা প্রমাণ করিয়া এই প্রণালীতে গুলি নিষ্কাশনের চিকিৎসা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শুধু গুলি নয়, শরীরে যে-কোনো বাহ্য-পদার্থ প্রবেশ করিলে এই উপায়ে ধরা সহজ হইয়াছে ; এবং ইহা হইতে তাহার স্থানাবরোধের সীমা চৌহদ্দি সঠিক জানিয়া দেহের ঠিক ততটুকু স্থান কাটিয়া সেই পদার্থটি বাহির করিয়া আনা যায় ; পূর্ব্বে অস্ত্রক্ষত অনাবশ্যক বড় করিতে হইত, এখন যতবড় পদার্থ ঠিক ততবড়ই করিতে পারা যায়। ইহা আহত ব্যক্তির কম সৌভাগ্য ও আরামের কথা নহে।

* *
*

যুদ্ধের শিক্ষা—

আমেরিকার ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বাধ্যক্ষ ডাঃ ষ্টানলি হল যুদ্ধের শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে এই যুদ্ধের ফলে আমরা দেশবিদেশের রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক অবস্থার এমন বিশেষ পরিচয় পাইতেছি যাহা কিছুদিন আগে রাষ্ট্রনীতিবিশারদেরাও জানিতেন না। খবরের কাগজগুলি চটপট বিজ্ঞ হইয়া উঠিতেছে ; তাহারা এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় আনাড়ি রকমের মন্তব্য করিতেছে না। যখন জগতের সমস্ত লোকেই ওয়াকিফ-হাল হইয়া উঠিতেছে, তখন যাহাদের ব্যবসা লোকশিক্ষা তাহাদের কাজ অনেকটা সহজ হইয়া আসিতেছে। স্কুলের শিক্ষক ছাত্র পর্য্যন্ত বিশ্বব্যাপার, যুদ্ধের রীতিনীতি, ফলাফল, ঔচিত্য অনৌচিত্য লইয়া বিচার করিতেছে ; চাষাভুসারা পর্য্যন্ত খবর রাখিতেছে ; সুতরাং দেশের নিম্নস্তর পর্য্যন্ত বিশ্বের বোধ ছড়াইয়া পড়িতেছে।

ভারতবর্ষের স্কুলের ন্যায় আমেরিকারও কোনো কোনো ষ্টেটের স্কুলে চলতি ব্যাপারের, রাষ্ট্রীয় সমস্যার, ও যুদ্ধের আলোচনা নিষিদ্ধ ; এজন্য সেসব স্কুলে য়ুরোপের ভূগোল ইতিহাস ম্যাপ পড়ানো ত হয়ই না, রাখাও হয় না ; নিষিদ্ধ ব্যাপারের উল্লেখ পর্য্যন্ত বারণ। এই বারণ করিবার কারণ এক স্কুলের অধ্যক্ষ এইরূপ দেখাইয়াছেন—যুদ্ধ করা পাপ ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। যুদ্ধ ভয়ঙ্কর দানবীয় কাণ্ড। সুতরাং তাহার আলোচনা শিশুদের কোমল চিত্ত কঠিন ও নিষ্ঠুর করিয়া তুলে। দ্বিতীয়ত সেন্সরদের মারফতে যে অসম্পূর্ণ ও অসত্য খবর পাওয়া যায়, তাহার আলোচনায় কোনো ফল নাই, হয়ত অনেকসময় অবিচার হইতে পারে। তৃতীয়তঃ যে কারণে স্কুলে ধর্ম্মালোচনা উচিত নয় সেই কারণেই পলিটিক্স বা রাষ্ট্রনীতি ও যুদ্ধকথা আলোচনা করা উচিত নয়—তাহাতে একপক্ষ ক্ষুব্ধ হইতে পারে। চতুর্থত মাষ্টারেরা সবিশেষ খবর রাখে না এবং তাহাদের একদিকে না একদিকে ঝোঁক থাকা সম্ভব। যুদ্ধের প্রসঙ্গটা এমনি মাদক যে তাহা অপর সকল কাজের কথা চাপা দিয়া ফেলে এবং অপর সকল দেশ ছাড়িয়া একটি বিশেষ দেশকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত মনোযোগ সেইদিকে সংহত করিতে থাকে।

কিন্তু যে যে ষ্টেটের স্কুলে রাষ্ট্রনীতি ও যুদ্ধব্যাপারের আলোচনা হয় তাহারা উহার পাল্টা কারণ দেখাইয়া বলে—যুদ্ধপ্রসঙ্গ ভূগোল শিক্ষায় বিশেষ সাহায্য করে ; ভবিষ্যৎ ইতিহাসের সংগঠন ছাত্রদের মনের সম্মুখে চলিতে থাকে ; সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতি, বার্ত্তাশাস্ত্র, শিল্প ও বাণিজ্য-ব্যাপার, সামাজিক ও স্থানিক ব্যবস্থা প্রভৃতি শিক্ষার ও আলোচনার

সুযোগ ঘটে। ছাত্রদের মনে যুদ্ধের বীভৎস নিষ্ঠুরতা ও শান্তির কল্যাণভাব মুদ্রিত হইয়া যায়। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সহিত স্কুলের সংস্রব থাকিলে স্কুলের শিক্ষা অধিকতর কার্য্যকরী হয়। প্রত্যেক বালকবালিকা জগতের বাসিন্দা হইয়া নিজের প্রাদেশিকতা পরিহার করিতে শিখে এবং সমস্ত বিশ্বের সহিত যোগ অনুভব করিয়া যুযুৎসু জাতিদের ন্যায় অন্যায় নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে পারে। ইহাতে তাহারা সহিষ্ণুতা, মার্জ্জনা, বিরোধের মধ্যে একতা, বিচারশক্তি, নিরপেক্ষতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ অর্জ্জন করিতে পারে। এইসব গুণই জাতিকে বড় করে; ছাত্রছাত্রীরাই জাতির ভবিষ্যৎ প্রাণ ও শক্তি।

এই মন্তব্যের পূরকরূপে আরো অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন। কেহ বলেন যুদ্ধ নিয়মানুবর্ত্তিতা আজ্ঞানুবর্ত্তিতা শিখিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। যুদ্ধ বিরুদ্ধমতকে সমতা দ্যায়; বিরুদ্ধমতের লোককে পাশাপাশি দাঁড় করায়—হিন্দুমুসলমান, য়িহুদি খ্রীষ্টান, শাদা কালো পাশাপাশি দাঁড়াইয়া লড়িতেছে; জাতবিচার ধর্ম্মবিচার দেশাত্মবুদ্ধির নিকট খর্ব্ব হইয়া যাইতেছে।

একজন সুপ্রজননবাদী যুদ্ধ যে জাতির কিরূপ অকল্যাণের তাহাই দেখাইয়া বলিয়াছেন—এই যে কোটি কোটি সৈন্য লড়িতেছে ইহারা সকলেই আরো কত কোটি সুস্থ সবল সন্তানের পিতা হইতে পারিত। যাহারা মরিতেছে তাহাদের পিতা হওয়ার সম্ভাবনা ঐখানেই খতম হইয়া যাইতেছে; যাহারা কোনো মতে বাঁচিয়া ঘরে ফিরিতেছে তাহারা প্রায়ই এমন বিকলাঙ্গ অকর্ম্মণ্য ও দুর্ব্বল হইয়া ফিরিতেছে এবং যুদ্ধ সৈনিকের স্নায়ুজালের উপর এমন উৎকট অত্যাচার করে যে তাহাদের সুসন্তান উৎপাদন করিবার সম্ভাবনা কিছুই থাকিতেছে না। অতএব যুদ্ধে জেতা ও হারা জাতির পক্ষে সমান ক্ষতিকর। পুষ্ট দক্ষ বলিষ্ঠ লোকই জাতির উন্নতির অবলম্বন; তাহাদের অভাব জাতির বিনাশ। সুতরাং য়ুরোপের এই যুদ্ধ য়ুরোপের নানা প্রকারে সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে। ওদিকে বহু সন্তানের জনক প্রাচ্যদেশ নিরুপদ্রবে থাকিয়া প্রচুর পরিমাণে সন্তানের জন্ম দিতেছে; তাহার উপর তাহাদের মধ্যে নবজাগরণের উৎসাহ দেখা দিয়াছে। বুঝিবা জগৎবিধানের দাঁড়িপাল্লায় ফেরতা দিয়া লইবার সময় সন্নিকট হইয়া আসিতেছে।

* *
*

যুদ্ধ ও পুস্তকের ব্যবসায়—

য়ুরোপে যুদ্ধ বাধাতে পুস্তকপ্রকাশকেরা উত্তম নভেল না পাইয়া হাহাকার করিতেছে। সব দেশেই নভেলটাই বিক্রী হয় বেশী। যাহারা নভেল-লিখিয়ে তাহারা বলে যে যুদ্ধের হিড়িকে তাহারা মতি স্থির করিতে পারে না, ভাবিয়া চিন্তিয়া ঘটনা-বিন্যাস গড়িয়া তুলিতে পারে না। য়ুরোপের ম্যাপে ও অবস্থার ব্যবস্থায় নিত্য নিত্য এত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে যে নভেলের স্থান কাল পাত্র আজ এক রকম ঠিক করিলে কাল তাহা বেঠিক হইয়া পড়িতেছে, লেখকের কল্পনা নিরন্তর পরিবর্ত্তমান ঘটনার সহিত পাল্লা দিয়া উঠিতে পারিতেছে না। লণ্ডনের পল মল গেজেটে একজন লেখক আন্দাজ করিতেছেন যে এই যুদ্ধের ক্ষয় ক্ষতি য়ুরোপের লোকের মনে একটি দুঃখ-বেদনার ছাপ দিয়া তাহাদিগকে ভারিক্কি করিয়া তুলিবে; এবং তাহার ফলে জাতীয় প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিবে। তখন চটুল কথা-সাহিত্যের বদলে করুণ রসের কবিতা ও ভাব-ভারী প্রবন্ধ নিবন্ধ সাহিত্যের বাজারে সমধিক সমাদৃত হইবে। ভবিষ্যযুগে যুদ্ধব্যাপারের ঘটনা বহু নভেলের জন্মের কারণ হইবে হয়ত; কিন্তু পাঠকের মনে তখনও যুদ্ধের উপর এমন বিতৃষ্ণা থাকিয়া যাইবে যে ঐসব বই আর কাহারও রুচিবে না। তখন তাহারা যুদ্ধের ঘটনার চিত্র অপেক্ষা যুদ্ধের মনস্তত্ত্ব ও কার্য্যকারণ-ফল অধিক করিয়া আলোচনা করিবে। এই যুদ্ধে সকলেরই কিছু-না-কিছু ক্ষতি হইয়াছে—আত্মীয় বন্ধুর মৃত্যু, ব্যবসা চাকরির মন্দা পড়তা, অথবা যুযুৎসুদের অত্যাচারে ভিটামাটি উচ্ছন্ন হইয়াছে। এ অবস্থায় সকলের ইচ্ছা এমন বই পায় যাহার মধ্যে ডুব দিয়া মনটা কিছুক্ষণের জন্যও সকল জ্বালাযন্ত্রণা জুড়াইতে পারে, ভুলিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু তেমন উৎকৃষ্ট রচনা জন্মিতেছে না বলিয়া পুস্তকপ্রকাশকেরা খুঁতখুঁত করিতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় বোয়ারযুদ্ধের সময়ও এইরূপ ব্যাপার হইয়াছিল; যুদ্ধব্যাপার লইয়া বই লেখা হইয়াছে দেখিলেই খরিদদার তাহা হাত হইতে নামাইয়া রাখিয়া দিত, যাহারা শুনিত তাহারা আর ছুঁইত না; যুদ্ধের কথায় লোকের এমনি অরুচি ধরিয়া গিয়াছিল।

* *
*

জেপেলিন-মার—

৭৮ বৎসরের বৃদ্ধ কাউণ্ট জেপেলিন অবিশ্রাম জার্ম্মানীর জন্য আকাশযান তৈয়ারী করিতেছেন; একদিন হয়ত দেখা যাইবে পঙ্গপালের ন্যায় একঝাঁক জেপেলিন জাহাজ মরণ-বৃষ্টি করিতে করিতে সকল দেশ ছাইয়া ফেলিতেছে। এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য ব্রিটিশ গভমেণ্ট আমেরিকার এরোনটিক্যাল সোসাইটিকে ফরমাস দিয়া এক বহর জেপেলিন-মার উড়োজাহাজ তৈয়ার করাইতেছেন। উক্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ টমাস রাদারফোর্ড ম্যাকমেহেন এই জেপেলিন-মার উড়ো জাহাজ উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইহা নিরেট চলন্ত বেলুন, দেখিতে অনেকটা জেপেলিনেরই মতন, ২৩০ ফুট লম্বা, ২৮ ফুট বেড়। ইহা মিনিটে এক মাইলেরও বেশী চলে, দশ ঘণ্টা আকাশে উড়িয়া থাকিতে পারে, চারজন লোক ও একটা টর্পেডো-দাগা কামান বহন করিবার শক্তি রাখে; এই কামান ১৬০০ ফুট পর্য্যন্ত অব্যর্থ লক্ষ্যে টর্পেডো দাগিতে পারে, জেপেলিনে ধাক্কা লাগিলেই টর্পেডো বিদীর্ণ হইয়া জেপেলিন ধ্বংস করে। ইহা আকারে ছোট বলিয়া খুব ক্ষিপ্র, তৎপরতার সহিত ঘুরিয়া ফিরিয়া উড়িতে পারে; আড্ডা ছাড়িয়া ৭৫ মাইল একদমে যাওয়া আসা করিতে পারে; দরকার হইলে আড্ডায় অ-তার টেলিগ্রাফে খবর পাঠাইতে পারে। ইহার অধিকাংশ হাল্কা কাঠে তৈয়ারী; সেজন্য ইহা হাল্কা অথচ মজবুত। ইহার উপরটা নূতন পালিশ করা চামড়ের মতন চকচকে; এজন্য ইহা উড়িলে শীঘ্র চোখে পড়ে না। যেমন ব্যাধি, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি ঔষধিও আবিষ্কার হইতেছে। ডুবো জাহাজ হইল, ডুবো জাহাজ মারিবার জাহাজ পিছু লইল; জেপেলিন হইল, জেপেলিন-মার হইতেছে। কিন্তু এরূপ প্রতিযোগিতার শেষ কোথায়?

* *
*

খামের দাঁত-খামাটি—

অনেকসময় অনেকে চুপিচুপি খাম খুলিয়া চিঠি পড়িয়া আবার বেমালুম খাম আঁটিয়া দেয়। খামের যেদিকে আঠা লাগানো থাকে, সেইদিকে জলের গরমবাষ্প লাগাইলে আঠা গলিয়া জোড়া আল্গা হইয়া যায়; তখন খাম খুলিয়া চিঠি পড়িয়া আবার বেমালুম জুড়িয়া দেওয়া চলে। The Scientific American Supplement খামের দাঁত খামাটির এক নূতন পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—

৪০ গ্রেন জেলাটিন এক আউন্স জলে গুলিয়া আধ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখ। জেলাটিন জমিয়া গেলে পাত্রটা গরম জলে বসাইয়া দিলে

জেলাটিন গলিয়া যাইবে। তখন সেটা বেশ করিয়া নাড়িয়া গুলিয়া একটা চেপ্টা বুরুশ দিয়া একখানা সাধারণ মসৃণ কাগজের উপর লম্বালম্বিভাবে মাখাও। কাগজখানা আগে জলে ভিজাইয়া লওয়া দরকার। মাখানো হইলে শুকাও। শুকাইলে কাগজের আড়াআড়িভাবে আবার জেলাটিন-গোলা লাগাও। তারপর আবার শুকাও। কাগজের চার কোণে চারটা পিন অাঁটিয়া রাখা দরকার যেন কাগজটা গুটাইয়া কুঁকড়াইয়া না যায়, চৌরস থাকে। কাগজ শুকাইলে জেলাটিন-লাগানো দিকটা নীচে উল্টাইয়া অপর পিঠে এমিল-এসিটেট-কলোডিন বেশ ঘন করিয়া লাগাও, শুকাও। শুকাইলে কাগজের চাকতি কাটিয়া শীলমোহর তৈয়ার কর। চিঠি লিখিয়া খামের কান সাধারণভাবে আঠা দিয়া জুড়িয়া তাহার উপর ঐ চাকতি বসাইয়া দিলে খাম এমন দাঁতখামাটি মারিবে যে কিছুতেই খাম না ছিঁড়িয়া খোলা যাইবে না। ১২০ গ্রেন ফটকিরি চার আউন্স পরিষ্কার জলে গুলিয়া তাহাতে শীলমোহরের কাগজচাকতি ভিজাইয়া খামে অাঁটিলে বজ্র হইয়া বসিয়া যাইবে। সেই ভিজা চাকতির উপর ব্লটিংকাগজ দিয়া চাপিয়া নথ দিয়া ঘসিয়া দিলে চাকতি চৌরস হইয়া বসিবে ও শীঘ্র শুকাইয়া যাইবে। একবার শুকাইলে সে জেলাটিন আর কিছুতেই গলিবে না—গরমজলের বাষ্প বা ফুটন্তজল লাগাইলেও না। এমিল-এসিটেট-কলোডিন কাগজের শীলমোহরটাকে জলাবরোধক (water proof) করিয়া রাখে; এনভেলাপ জল লাগিয়া গলিয়া যাইতে পারে কিন্তু তাহার জোড়ের মুখে যে দাঁতখামাটি বজ্র হইয়া অাঁটিয়া বসিয়াছে তাহার নড়চড় কিছুতেই হইবে না।

* *
*

জগতের বৃহত্তম টাইপ-রাইটার—

পানামা-প্রদর্শনী আরম্ভ হইয়াছে। সায়েন্টিফিক আমেরিকানে প্রকাশ, সেখানে একটা টাইপ-রাইটার বা লেখার কল প্রদর্শিত হইতেছে সেটা সাধারণ কলের ১৭২৮ গুণ বড়। মেলা ভোর এই কলে প্রত্যহ মেলার খবর লেখা হইবে ৯ ফুট চওড়া কাগজে ৩ ইঞ্চি লম্বা অক্ষরে দু দু ইঞ্চি ফাঁক ফাঁক করিয়া। একটি ছোট সাধারণ টাইপ-রাইটারের সহিত এই বিরাট কলের তাড়িত-যোগ থাকিবে; ছোট কলের যে হরপের চাবি টেপা হইবে অমনি বড় কলের সেই হরপের চাবিতে চাপ পড়িবে; এইরূপে শব্দের মাঝে ফাঁক, পংক্তিবিন্যাস প্রভৃতি সমস্তই হইবে। বড় কলটির ওজন ১৪ টন অর্থাৎ প্রায় ৪০০ মণ; সাধারণ ছোট কলের ওজন ১৫ সের। উহা ২১ ফুট চওড়া, ১৫ ফুট খাড়া, এবং ইহা রাখিয়া কাজ করিবার জন্য একটা ২৫-৩০-২৫ ফুটের ঘর দরকার। একএকটা চাবির চাকতি ৭ ইঞ্চি। ইহা দুই বৎসরে তৈয়ার হইয়াছে, খরচ পড়িয়াছে এক লক্ষ ডলার বা ৩ লক্ষ ১২ হাজার ৫ শত টাকা!

বৃহত্তম টাইপ-রাইটার।

* *
*

বহুরূপী সহর—

আমেরিকার কালিফর্ণিয়া ষ্টেটের প্রধান সহর লস এঙ্গেলেস হইতে অল্প দূরে স্যান ফার্ণাণ্ডো নামক উপত্যকায় একটি নূতন সহরের পত্তন হইতেছে যাহা এক রাত্রের মধ্যে যে-কোনো দেশের যে-কোনো জাতির যে-কোনো স্থাপত্যরীতিতে গঠিত যে-কোনো রং বেরঙের যে-কোনো অবস্থার বাড়ীঘর সুদ্ধ সহরে পরিণত করিয়া ফেলিতে পারা যাইবে। এক রাত্রির মধ্যে তাহা রোম, এথেন্স, পারী, লণ্ডন, শিকাগো, নিউইয়র্ক বা যে সহর তুমি বলিবে তাহাই হইয়া উঠিবে। এইজন্য প্রত্যেক বাড়ীর একএকটা পাশ একএক স্থাপত্যরীতিতে গঠিত; একএকটা বাড়ী একাধিক কাজের উপযোগী করিয়া তৈয়ারি।—একটা বাড়ীর এক পাশ দেখিলে মনে হইবে তাহা চামারের দোকান, অপর পাশ দেখিলে মনে হইবে উহা কামার-শালা, অপর পাশ দেখিলে হয়ত মনে হইবে সৈনিকের ব্যারাক, অপর পাশ দেখিলে হয়ত মনে হইবে ঘোড়ার আস্তাবল কি আর-একটা কিছু। এইরকম সে সহরের সব বাড়ী; আর ইচ্ছামত বাড়ীগুলাকে ঘুরানো ফিরানো নাড়াচাড়া যাইবে।

এই সহরের পশ্চাতে একটি বড় হ্রদ আছে। প্রত্যেক বাড়ীর জানলা হইতে পাহাড় ও হ্রদের দৃশ্য দেখা যাইবে এরূপভাবে বাড়ীগুলির পত্তন। হ্রদে ডোঙা কোশা নৌকা হইতে যুদ্ধজাহাজ পর্য্যন্ত ভাসাইতে পারা যাইবে।

সহরের আশে পাশে নদী খালও আছে, স্বাভাবিক ও কৃত্রিম। উহাদের উপরকার সাঁকো পুল এমন কৌশলে তৈয়ারি যে ইচ্ছামাত্র তাহা জাপানী খিলান সাঁকো, রোমক পাথরের সাঁকো, বা আধুনিক লোহার পুল যেমন খুসি তেমন আকারের করা যাইবে।

রাস্তা ঘাট খাজরি করা, পাটাতন করা; গ্যাস, বিদ্যুতের আলো প্রভৃতির হালী ব্যবস্থায় সজ্জিত। সহরের মাঝখান দিয়া ৬মাইল লম্বা একটা চওড়া পথ যাইবে, তাহার দুপাশে ও মধ্যখানে লম্বালম্বি বাগান থাকিবে—ইংরেজি ফরাসীতে যাহাকে বলে boulevard। অন্যান্য রাস্তাও ইহারই উপযোগী সহচর হইবে। পথগুলির আকার ও সজ্জা এত বিভিন্ন প্রকারের হইবে, যাহাতে জগতের সকলরকম রাস্তার ছবি এই একসহরের মধ্য হইতেই পাওয়া যায়। ঘরে ঘরে জলের কলে শতকরা ৯৯ অংশ নির্ম্মল জল দিনে ৩ লক্ষ গ্যালন হিসাবে ৭টা ইন্দারা হইতে সরবরাহ করা হইবে।

সহরের একপ্রান্তে সিকিমাইল পরিধির একটা ঘোড়দৌড়ের মাঠ দস্তুরমতো দর্শকচত্বর ইত্যাদিতে সজ্জিত হইয়া ঘেরা হইয়াছে। ইহা দরকার-মতো রোমের কলোসিয়ম, গ্রীসের ওলিম্পিক খেলার রঙ্গক্ষেত্র, ভারতবর্ষের দরবারস্থান বা কোনো মেলার জায়গায় পরিণত করিতে পারা যাইবে।

একটা থিয়েটার-ঘর তৈয়ারি হইতেছে; তাহা ইচ্ছা মাত্রেই একটা
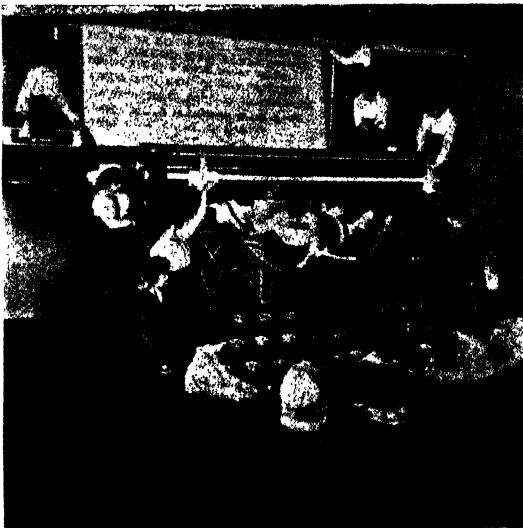
প্রদর্শনী-গৃহ, সেনানিবাস, হাসপাতাল, প্রভৃতিতে পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে।

এই সহরে ১৫০০০ নর নারী ও শিশু থাকিতে পারিবে। তাহাদের খোসখেয়ালি পোষাকের জন্য একটা বড় বাড়ী তৈয়ারী হইয়াছে; সেই বাড়ীটায় জগতের নানান দেশের নানান কালের নানাবিধ পোষাক তৈয়ারী আছে; পাতা-বোনা কাপড়, বল্কলবাস, পশমী রেশমী কার্পাস যত রকম মানুষে এপর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়াছে বা যতদূর কল্পনা করিতে পারে সেসমস্তই আছে। এই বাড়ীর সামনে যে রাস্তা সেটা দর্জ্জিপাড়া; কুড়িটা বিদ্যুৎ-চালিত কলে পোষাক সেলাই হইতেছে; কল্পনা বা ফরমাস করিতে যা দেরী, অমনি ওস্তাদ ওস্তাগরেরা সেটিকে সেলাই করিয়া আকার দিয়া তুলিতেছে। এই কাপড়ের বাড়ী-সিন্দুকটিতে ৩৫ হাজার ডলার বা ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকার পোষাক তৈয়ারি মজুত আছে।

এইসমস্ত আরব্য-উপন্যাসের আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের অদ্ভুত ব্যাপার গড়িয়া তুলিতে ২০ লক্ষ ডলার বা সাড়ে বাষট্টি লক্ষ টাকা খরচ হইবে।

এত টাকা খরচ করিয়া এই অদ্ভুত খেয়ালী বহুরূপী সহর গড়া হইতেছে কিসের জন্য? আমেরিকার Modern Mechanics বলেন—বায়োস্কোপের ছবি তুলিবার জন্য! অভিনয় করিয়া বায়োস্কোপের ছবি তুলিবার ও দেখাইবার জন্য ঐ সহরে যে রঙ্গমঞ্চ তৈয়ারী হইয়াছে তাহা জগতের মধ্যে বৃহত্তম। এই সহরের ১৫ হাজার বাসিন্দারা হইবে অভিনেতা ও অভিনেত্রী এবং খেয়াল হইবামাত্র জগতের যে-কোনো স্থানে যে-কোনো ঘটনা ঘটাইয়া তাহারা জগৎকে তাক লাগাইয়া দিবে। মানুষের মনের উত্তেজনা জোগাইবার জন্য এত জোগাড়, এত আয়োজন। সেদিন এরোপ্লেনে এরোপ্লেনে যুদ্ধ-অভিনয় করিতে গিয়া একটা বোম অকালে ফাটিয়া এরোপ্লেন ভাঙিয়াছে, একজন ওড়ন্দাজ মারিয়াছে। সেই ছবি লোকে দেখিয়া বলিবে—বাঃ! কি হুবহু সত্যের নকল! অগ্নিকাণ্ড দেখাইবার জন্য এই সহরের একাংশ পুড়াইয়া ফেলিয়া আবার গড়া হইয়াছে। এই যে অকারণ টাকার শ্রাদ্ধ তাহা জোগাইতেছে কে? আমরা—যাহারা অল্প অল্প চাঁদা দিয়া বায়োস্কোপ দেখি। আমাদের ক্ষণিক উত্তেজনার আনন্দ জোগাইবার জন্য কত প্রাণ কত অর্থ অনর্থক অপব্যয় হইতেছে! অথচ জগতে দুঃখ দারিদ্র্য অভাবের অন্ত নাই।

চারু।

ধর্ম্মপাল

[বরেন্দ্রমণ্ডলের মহারাজা গোপালদেব ও তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপাল সপ্তগ্রাম হইতে গৌড় যাইবার রাজপথে যাইতে যাইতে পথে এক ভগ্নমন্দিরে রাত্রিযাপন করেন। প্রভাতে ভাগীরথীতীরে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে দস্যুলুণ্ঠিত এক গ্রামের ভীষণ দৃশ্য ও অরাজকতা দেখাইলেন। সন্ন্যাসীর নিকট সংবাদ আসিল যে গোকর্ণ দুর্গ আক্রমণ করিতে শ্রীপুরের নারায়ণ ঘোষ সসৈন্যে আসিতেছেন; অথচ দুর্গে সৈন্যবল নাই। সন্ন্যাসী তাঁহার এক অনুচরকে পার্শ্ববর্ত্তী রাজাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনার জন্য পাঠাইলেন এবং গোপালদেব ও ধর্ম্মপালদেব দুর্গরক্ষার সাহায্যের জন্য সন্ন্যাসীর সহিত দুর্গে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দুর্গ শীঘ্রই শত্রুর হস্তগত হইল। ঠিক সেই সময়ে উদ্ধারণপুরের দুর্গস্বামী উপস্থিত হইয়া নারায়ণ ঘোষকে পরাজিত ও বন্দী করিলেন। সন্ন্যাসীর বিচারে নারায়ণ ঘোষের মৃত্যুদণ্ড হইল। দুর্গস্বামিনী কন্যা কল্যাণীকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিবার জন্য মহারাজ গোপালদেবকে অনুরোধ করিলেন। গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করার উৎসবের দিন মহারাজের সভায় সপ্ত সামন্ত রাজা উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাসীর পরামর্শক্রমে তাঁহাকে মহারাজাধিরাজ সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিলেন।

গোপালদেবের মৃত্যুর পর ধর্ম্মপাল সম্রাট হইয়াছেন। তাঁহার পুরোহিত পুরুষোত্তম খুল্লতাত-কর্ত্তৃক হৃতসিংহাসন ও রাজ্যতাড়িত কান্যকুব্জরাজের পুত্রকে অভয় দিয়া গৌড়ে আনিয়াছেন। ধর্ম্মপাল তাঁহাকে পিতৃসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এই সংবাদ জানিয়া কান্যকুব্জরাজ গুর্জ্জররাজের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া দূত পাঠাইলেন। পথে সন্ন্যাসী দূতকে ঠকাইয়া তাহার পত্র পড়িয়া লইলেন। গুর্জ্জররাজ সন্ন্যাসীকে বৌদ্ধ মনে করিয়া সমস্ত বৌদ্ধদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিবার উপক্রম করিলেন। এদিকে সন্ন্যাসী বিশ্বানন্দের কৌশলে ধর্ম্মপাল সমস্ত বৌদ্ধকে প্রাণপাত করিয়া রক্ষা করিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন। সম্রাট ধর্ম্মপাল সামন্তরাজাদিগকে সঙ্গে লইয়া কান্যকুব্জ রাজ্য জয় করিতে যাত্রা করিলেন। এই যুদ্ধের মধ্যে গুর্জ্জরেরা গোকর্ণ দুর্গ আক্রমণ করিতে যাইবার উদ্‌যোগ করিতেছে জানিয়া ধর্ম্মপাল তাঁহার বাগ্‌দত্তা পত্নী কল্যাণীকে লইয়া প্রস্থান করিলেন; পথে কল্যাণী অপহৃত ও ধর্ম্মপাল আহত হইয়াছেন।]

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মাধিকারের ভগিনীপতি

সন্ধ্যাকালে জনৈক বর্ম্মাবৃত অশ্বারোহী দ্রুতবেগে উত্তর হইতে ঢেকরী নগরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। নগরের নিকটে অশ্ব সহসা ভূমিতে পতিত হইল। তখন অশ্বারোহী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিল। নগরতোরণে উপস্থিত হইলে দৌবারিকগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?

আগন্তুক কহিল, গোকর্ণদুর্গ হইতে. এ নগরে কি মহারাজ আসিয়াছেন?

কে মহারাজ?

মহারাজ আবার কয়টা হয় হে বাপু? আমাদের মহারাজ, মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরম ভট্টারক শ্রীধর্ম্মপাল দেব।

না, মহারাজ গৌড়েশ্বর নগরে আসেন নাই।

নগরে এখন কোন মহানায়ক আছেন কি?

হাঁ, কমলসিংহ আছেন।

তিনি কোথায় আছেন আমাকে বলিয়া দাও।

আমরা ত তোরণ ছাড়িয়া যাইতে পারির না, তুমি এই রাজপথ ধরিয়া চলিয়া যাও।

এই সময়ে আর-একজন দৌবারিক বলিয়া উঠিল,

তুমি ত খুব পথ দেখাইয়া দিলে দেখিতেছি ; দেখুন মহাশয়, আপনি প্রথমে উত্তরে যাইবেন, তাহার পর পূর্ব্বে, তাহার পর দক্ষিণে, আর শেষে পশ্চিমে ফিরিয়া এই তোরণে আসিয়া পৌছিবেন—ইহাই রাঢ় দেশের সোজা পথ।

দৌবারিক রহস্য করিতেছে দেখিতে পাইয়া আগন্তুক কহিল, দেখ, আমি বিশেষ রাজকার্য্যে আসিয়াছি, তোমরা র রস ছাড়িয়া শীঘ্র আমাকে কমলসিংহের বস্ত্রাবাসের বা গৃহের পথ বলিয়া দাও, নতুবা বড়ই ক্ষতি হইবে।

তাহার কথা শুনিয়া তোরণের পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ হইতে একজন বৃদ্ধ দৌবারিক উঠিয়া আসিল, তাহাকে দেখিয়া অন্যান্য দৌবারিকগণ পথ ছাড়িয়া দিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে ? কি চাও ?

আগ।— আমি গোকর্ণদুর্গ হইতে আসিতেছি, প্রভু অমৃতানন্দ আমাকে পাঠাইয়াছেন। আমাকে মহানায়ক কমলসিংহের গৃ হ পৌছাইয়া দিলে বড়ই উপকার হয়।

বৃদ্ধ।— যুদ্ধের সময়ে নগরতোরণ প রত্যাগ করিয়া যাইবার আদেশ নাই, নতুবা আমরা একজন তোমার সঙ্গে যাইতাম। মহানায়ক কমলসিংহ ধর্ম্মাধিকারের গৃহে বাস করিতেছেন। তুমি এই পথ ধরিয়া উত্তর দিকে চলিয়া যাও, পথে নাগরিকগণের নিকট ধর্ম্মাধিকারের গৃহের সন্ধান করিও।

আগন্তুক বৃদ্ধ দৌবারিকের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া চলিল ; কিয়ৎক্ষণ পরে একজন নাগরিককে জিজ্ঞাসা ক রয়া ধর্ম্মাধিকারের গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইল। মহানায়ক কমলসিংহ বর্দ্ধমান-ভুক্তির ধর্ম্মাধিকারের গৃহের একাংশে বাস করিতেছিলেন ; ধর্ম্মাধিকার গৃহের অর্দ্ধাংশ মহানায়কের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিয়া, অপরার্দ্ধে বাস করিতেছিলেন, তিনি যে অংশে বাস করিতেছিলেন তাহা পূর্ব্বে অন্তঃপুর ছিল। আগন্তুক অন্ধকারে ধর্ম্মাধিকারের অন্তঃপুরদ্বারে উপস্থিত হইল। অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণে জনৈক মহিলা সান্ধ্যপূজার আয়োজন করিতেছিলেন। আগন্তুক ডাকিল, "গৃহে কে আছ ?" রমণী তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিত হইলেন, তিনি কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ?" উত্তর হইল, "আমি বিদেশী, এই কি ধর্ম্মাধিকারের গৃহ ?"

আগন্তুকের কণ্ঠস্বর দ্বিতীয়বার শ্রবণ করিয়া রমণীর হস্ত হইতে পুষ্পপাত্র সশব্দে ভূমিতে পতিত হইল, তিনি আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি ? কোথায় তুমি—?" আগন্তুকের কণ্ঠস্বর ঈষৎ কম্পিত হইল, সে কহিল, "আমি গৌড়ীয় সেনানায়ক, আমার নাম গুরুদত্ত।"

"তবে তুমি—তুমি সে—"

রমণীর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে আগন্তুক বলিয়া উঠিল, "মহানায়ক কমলসিংহ কি এখানে আছেন ?" রমণী মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

অনেকক্ষণ উত্তর না পাইয়া আগন্তুক ধর্ম্মাধিকারের গৃহের অন্যপার্শ্বে গিয়া কমলসিংহের সন্ধান পাইলেন। কমলসিংহ তখন গৃহের সম্মুখে সুখাসনে বিশ্রাম করিতেছিলেন। আগন্তুক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। কমলসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন,"তুমি কে ?"

আমি মূক। প্রভু কান্যকুব্জ দুর্গে আমাকে দেখিয়াছেন।

গুরুদত্ত ? কি সংবাদ ?

গোকর্ণ হইতে প্রভু অমৃতানন্দ মহারাজের সংবাদ লইবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন। মহারাজ কি ঢেক্করী নগরে আসিয়াছেন ?

মহারাজ ? কৈ না ?

মহাদেবী কল্যাণীকে লইয়া পরশ্ব রাত্রিতে মহারাজ গোকর্ণ হইতে যাত্রা করিয়াছেন, কল্য সন্ধ্যায় তাঁহার এখানে পৌছিয়া দূত প্রেরণের কথা ছিল।

গুরুদত্ত, মহারাজ ত এখানে আসেন নাই।

কমলসিংহ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সম্মুখে একজন প্রতীহার দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাহাকে কহিলেন, আমার অশ্ব আনিতে বল। গুরুদত্ত ! তোমার অশ্ব কোথায় ?

পথে মরিয়া গিয়াছে।

তুমি আমার অশ্ব লইয়া যাও, মহারাজের সহিত কত শরীররক্ষী সেনা ছিল ?

পঞ্চাশৎ জন।

তোমার সেনা কোথায় ?

অজয়তীরে শিবিরে।

আমার সেনা হইতে পঞ্চশত অশ্বারোহী লইয়া মহারাজের সন্ধান করিতে যাও।

গুরুদত্ত পুনরায় অভিবাদন করিলেন ও প্রতীহারের সঙ্গে শিবিরে যাত্রা করিলেন। ভীষ্মদেব ও জয়বর্দ্ধনের নিকট ধর্ম্মপালের নিরুদ্দেশের সংবাদ প্রেরণ করিবার জন্য কমলসিংহ দূত আহ্বান করিলেন। দূত আসিয়াছে এমন সময়ে উত্তরীয়বিহীন, নগ্নপদ ধর্ম্মাধিকার বরাহরাত কমলসিংহের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কমলসিংহ তাঁহাকে প্রণাম করিতে যাইতেছিলেন, বরাহরাত তাঁহাকে বাধা দিয়া ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, সে কোথায় ?"

কাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ?

কেন, আমার ভগিনীপতির কথা ?

আপনার ভগিনীপতি ?

হাঁ, সর্ব্বানন্দ ন্যায়ালঙ্কার ?

তিনি ত এখানে আসেন নাই।

অমলা বলিল সে এই মাত্র এই দিকে আসিয়াছে ?

ঠাকুর! গত দুই দণ্ডের মধ্যে কোন ব্রাহ্মণপণ্ডিত আমার নিকট আসেন নাই।

নূতন লোক কেহ আসিয়াছিল কি ?

হাঁ আসিয়াছিল, সে গুরুদত্ত, আমাদের একজন সেনা-নায়ক।

মহারাজ, তাহার আকৃতি কিরূপ ?

ঠাকুর, তাহাকে বর্ম্মাবৃতই দেখিয়াছি, সুতরাং তাহার আকৃতি ত বলিতে পারিব না।

সে কোথায় গেল ?

এইমাত্র প্রতীহারের সঙ্গে শিবিরে গেল।

ধর্ম্মাধিকার বরাহরাত শর্ম্মা নগ্নপদে নগ্নশীর্ষে ঊর্দ্ধশ্বাসে শিবিরের দিকে ছুটিলেন।

পথে যাইতে যাইতে ধর্ম্মাধিকারের অন্তঃপুরদ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া গুরুদত্ত প্রতীহারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কাহার গৃহ ?

প্রতীহার কহিল, এ ধর্ম্মাধিকারের অন্তঃপুর।

ধর্ম্মাধিকারের নাম কি ?

বরাহরাত শর্ম্মা।

সেই সময়ে ধর্ম্মাধিকারের অন্তঃপুর হইতে কয়েকজন দাসী বাহির হইয়া আসিল, কলরব শুনিয়া প্রতীহার তাহা-দিগকে জিজ্ঞাসা করিল, এত গোলমাল হইতেছে কিসের ?

তাহারা কহিল, ধর্ম্মাধিকারের ভগিনী হঠাৎ মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন।

গুরুদত্ত সেখান হইতে দ্রুতপদে শিবিরে যাত্রা করিলেন এবং অল্পক্ষণ পরে পঞ্চশত অশ্বারোহী সঙ্গে লইয়া গৌড়েশ্বরের সন্ধানে যাত্রা করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মুক্তি

চেতনা ফিরিলে ধর্ম্মপাল দেখিলেন যে, তিনি একটি অট্টালিকার ক্ষুদ্র কক্ষের আবর্জ্জনাময় গৃহতলে শয়ন করিয়া আছেন; কক্ষটি জনশূন্য, কিন্তু কক্ষের জীর্ণদ্বার সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। অনেকগুলি ক্ষতস্থান হইতে শোণিতস্রাব হওয়ায় তাঁহার পরিচ্ছদ রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছে।

গৌড়েশ্বর গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার অসি অপহৃত হইয়াছে। তখন তিনি কক্ষের ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মপাল দেখিতে পাইলেন যে গৃহটি ধনীর গৃহ, কিন্তু তাহা বহুকাল মনুষ্য কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয় নাই। বাতায়নপথগুলি লৌহকীলকদ্বারা সুরক্ষিত, কিন্তু তাহাদিগের কবাটগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বাতায়নপথ দিয়া অট্টালিকার পার্শ্বের উদ্যান দেখা যাইতেছে? কক্ষের প্রাচীরে অনেকগুলি অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষ জন্মিয়াছে, অট্টালিকা তাহাদিগের ভারে পতনোন্মুখ।

ধর্ম্মপাল অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে, বাতায়নপথে পলায়ন করিবার চেষ্টা করাই শ্রেয়ঃ। তিনি একটি একটি করিয়া বাতায়নের কীলকগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কক্ষের এক প্রান্তের একটি বাতায়নে একটি বৃহদাকার অশ্বত্থবৃক্ষ জন্মিয়াছিল, তাহার ভারে কক্ষের প্রাচীর হেলিয়া পড়িয়াছিল। এই বাতায়নের কীলকগুলির বন্ধন শিথিল হইয়াছে দেখিয়া গৌড়েশ্বর সেগুলিকে স্থান-চ্যুত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দুই একটি কীলক নড়িল বটে কিন্তু তাহা স্থানচ্যুত হইল না। তখন ধর্ম্মপাল একটি কীলকে সবেগে পদাঘাত করিলেন।

কীলক স্থানচ্যুত হইল, সঙ্গে সঙ্গে দুই একখানি ইষ্টক ভূমিতে পড়িয়া গেল। শব্দ শুনিয়া কক্ষের বাহির হইতে একজন পরুষকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কে রে?" ধর্ম্মপাল উত্তর না দিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। প্রশ্নকারী আর কোন কথা কহিল না। অর্দ্ধদণ্ডপরে তিনি দ্বিতীয় কীলক স্থানচ্যুত করিতে আরম্ভ করিলেন। ইষ্টকগুলি পড়িয়া যাওয়াতে কীলকগুলির বন্ধন শিথিল হইয়াছিল, দ্বিতীয় কীলক সহজেই খুলিয়া আসিল। ধর্ম্মপাল ধীরে ধীরে বাতায়নপথে দেহ বাহির করিয়া অশ্বত্থবৃক্ষের শাখা অবলম্বন করিয়া ঝুলিয়া পড়িলেন।

সেই স্থানে অট্টালিকার প্রাচীরে জাত অশ্বত্থবৃক্ষের শাখাগুলি উদ্যানের সহকারবৃক্ষের শাখাগুলিকে ঘন আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়াছিল। গৌড়েশ্বর অশ্বত্থবৃক্ষ হইতে আম্রবৃক্ষ আশ্রয় করিয়া ভূমিতে নামিয়া আসিলেন। ধর্ম্মপাল বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া অনেকক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে মানুষের সাড়া শব্দ না পাইয়া তিনি অতি সন্তর্পণে জীর্ণ অট্টালিকার চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

গৌড়েশ্বর দেখিলেন যে, অট্টালিকার বাহিরে লোক নাই, লতাগুল্মে চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া আছে। চারিদিক ঘুরিয়া ধর্ম্মপাল অবশেষে ভগ্ন বাতায়নপথে অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন। তিনি যে কক্ষে প্রবেশ করিলেন সে কক্ষে কেহ ছিল না, কিন্তু সেই স্থান হইতে একজন মনুষ্যের ঘোর নাসিকা-গর্জ্জন শুনা যাইতেছিল। ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গৌড়েশ্বর দেখিতে পাইলেন যে, পার্শ্বের একটি কক্ষের দ্বারে জনৈক অস্ত্রধারী পুরুষ নিদ্রা যাইতেছে। তাহার ধনুর্ব্বাণ ও অসি চর্ম্ম ভূমিতে পড়িয়া আছে, মুখে শত শত মক্ষিকা বসিয়াছে। গৌড়েশ্বর বুঝিতে পারিলেন যে, সে সুরাপানে অচেতন হইয়া আছে। তখন তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া তাহার অস্ত্র অপহরণ করিলেন এবং ফিরিয়া গিয়া সহসা তাহার বক্ষে জানু পাতিয়া তাহার গলদেশ টিপিয়া ধরিলেন। সে জাগিয়া উঠিল বটে কিন্তু কোনরূপ শব্দ করিতে পারিল না; গৌড়েশ্বর তখন তাঁহার মহার্ঘ উষ্ণীষ দিয়া তাহার মুখ হস্ত ও পদ বন্ধন করিয়া তাহাকে প্রথম কক্ষের এক কোণে নিক্ষেপ করিলেন।

সে ব্যক্তি যে কক্ষের দ্বারে শয়ন করিয়া ছিল, সে কক্ষের দ্বার রুদ্ধ ছিল। ধর্ম্মপাল দ্বারের নিকটে গিয়া অস্ফুটস্বরে ডাকিলেন, "কল্যাণি?"

কক্ষ হইতে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা হইল, "হাঁ, তুমি কে?" ধর্ম্মপাল বুঝিতে পারিলেন যে কল্যাণীদেবী তাঁহার কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিয়াছেন, তথাপি সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য প্রশ্ন করিয়াছেন। তিনি পুনরায় ধীরে ধীরে কহিলেন, "ভয় নাই কল্যাণি! আমি ধর্ম্ম।" কল্যাণীদেবী কক্ষের দ্বারের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাহা শুনিতে পাইয়া ধর্ম্মপাল কহিলেন, "কল্যাণি! এখন কোন কথা কহিও না, তোমার দৌবারিককে বাঁধিয়া রাখিয়াছি বটে, কিন্তু গৃহে বোধ হয় এখনও দুই একজন লোক আছে। আমি দ্বারের বন্ধন মোচন করিতেছি, তুমি ভিতর হইতে খুলিবার চেষ্টা কর।"

উভয়ের চেষ্টায় রুদ্ধদ্বার মুক্ত হইল, কল্যাণী ছুটিয়া আসিয়া ধর্ম্মপালের হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, "আমাকে শীঘ্র লইয়া চলুন, তাহারা এখনই ফিরিয়া আসিবে।" গৌড়েশ্বর বিস্মিত হইয়া দেখিলেন যে, কল্যাণীর সর্ব্বাঙ্গে ক্ষতচিহ্ন, পরিধেয় বস্ত্র শতধা ছিন্ন ও কেশপাশ আলুলায়িত। উভয়ে ত্রস্তপদে জীর্ণ অট্টালিকা হইতে বাহির হইয়া বনমধ্যে লুকাইলেন। কল্যাণীদেবী অধীর হইয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। ধর্ম্মপাল বহুকষ্টে তাঁহাকে শান্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বলিতেছিলে তাহারা আসিবে, তাহারা কাহারা?"

"দস্যুরা।"

"তাহারা কি গুর্জ্জর?"

"না; তাহারা গৌড়ীয়, তবে তাহাদিগের সঙ্গে একজন গুর্জ্জর ছিল।"

"সে গুর্জ্জরের কোন কথাবার্ত্তা শুনিলে?"

"হাঁ, শুনিলাম; তাহার নাম রাহিল, সে গুর্জ্জর সেনাপতির দূত! গুর্জ্জরেরা অর্থ দিয়া সমস্ত দস্যুগণকে বশীভূত করিতেছে, এবং তাহাদিগের দ্বারা দেশ লুণ্ঠন করাইতেছে।"

"তবে আমরা গুর্জ্জর সেনার হাতে পড়ি নাই?"

"না, তবে সন্ধ্যা অবধি বন্দী থাকিলে নিশ্চয় পড়িতে হইত, কারণ আজি সন্ধ্যায় গুর্জ্জর সেনা এই বনে শিবির স্থাপন করিবে।"

"আমি যখন ফল আনিতে গিয়াছিলাম, তখন তুমি কোথায় গিয়াছিলে কল্যাণি ?"

"আমি ভয় পাইয়া বনে লুকাইতে যাইতেছিলাম, সেই বন হইতে একজন দস্যু বাহির হইয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিল। আমি তাহার নিকট হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিয়া এই লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছি।"

কল্যাণীদেবী এই বলিয়া তাঁহার নবনীত কোমল দেহে অসংখ্য ক্ষত ও আঘাতের চিহ্ন দেখাইলেন, তাহার পরে কহিলেন, "তখন আপনার কথা মনে হইল, আমি কাঁদিতে লাগিলাম।"

"আমার কথা কেন মনে হইল কল্যাণি ?"

ধর্ম্মপালের বক্ষে মুখ লুকাইয়া কল্যাণী কহিলেন, "তাহা জানি না।" গৌড়েশ্বর ভাবী পত্নীকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে উভয়েরই ঘোরতর লজ্জা উপস্থিত হইল, তাঁহারা সরিয়া বসিলেন। তখন ধর্ম্মপাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার পর কি হইল ?" কল্যাণী অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে অবনত মস্তকে কহিলেন, "আমি কাঁদিতেছি দেখিয়া দস্যুরা আমার মুখ বাঁধিয়া ফেলিল।"

"তাহার পর ?"

"তাহার পর আপনি আসিলেন, দস্যুরা দূর হইতে আপনাকে শরবিদ্ধ করিল, আপনি অচেতন হইয়া পড়িয়া গেলেন। দুইজন দস্যু আপনাকে বহন করিয়া জীর্ণ অট্টালিকায় লইয়া গেল। তাহার পর আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম, উঠিয়া দেখি রাত্রি হইয়াছে।"

"তবে কি একদিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে ?"

"হাঁ; আপনি অচেতন হইয়া ছিলেন, সেইজন্য জানিতে পারেন নাই।"

"কল্যাণি, তুমি কিছু আহার করিয়াছ কি ?"

উত্তর পাইলেন না দেখিয়া ধর্ম্মপাল বুঝিলেন দুইদিন যাবৎ কল্যাণীর আহার হয় নাই। উভয়ে ধীরে ধীরে নিবিড় বনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বনমধ্যে একটি পুরাতন পুষ্করিণী দেখিতে পাইয়া উভয়ে আকণ্ঠ জলপান করিলেন এবং পিপাসা শান্ত হইলে তীরে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অপরাহ্ণ হইয়া আসিল। কল্যাণী অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন দেখিয়া ধর্ম্মপাল সেদিন আর যাত্রার উদ্যোগ করিলেন না। তিনি দেখিতে পাইলেন যে পুষ্করিণীতে পদ্মবনে শত শত ফল ফলিয়াছে। ধর্ম্মপাল জলে নামিয়া পদ্মের ফল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর ও গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের ভাবী পট্টমহাদেবী পদ্মের বীজ ভক্ষণ করিয়া জঠরজ্বালা নিবৃত্তি করিলেন।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে দেখিয়া ধর্ম্মপাল শুষ্ক কাষ্ঠ ঘাস ও লতা সংগ্রহ করিয়া একটি বৃক্ষতলে কল্যাণীর জন্য আশ্রয় নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়ে একমনে কুটীর নির্ম্মাণ করিতেছেন, এমন সময়ে পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া ধর্ম্মপাল ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। গৌড়েশ্বর বিস্মিত হইয়া দেখিলেন অদূরে একজন বর্ম্মাবৃত যোদ্ধৃপুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। তিনি ফিরিবা মাত্র সে ব্যক্তি অসি নিষ্কাসন করিয়া সামরিক প্রথানুসারে অভিবাদন করিয়া কহিল, "গৌড়েশ্বরের জয় হউক।" ধর্ম্মপাল কোষ হইতে অসি নিষ্কাসন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি ?"

"মহারাজ, অধীনের নাম গুরুদত্ত। গৌড়ীয় সেনাদলে অধীন 'মূক' নামে পরিচিত।"

ক্ষুধার্ত্ত, ক্লান্ত, আহত তরুণ গৌড়েশ্বর ছুটিয়া গিয়া সৈনিকের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "গুরুদত্ত, ভাই! তুমি আজি আমাদের জীবন দান করিলে।"

এই সময়ে নির্জ্জন বনস্থলী কম্পিত করিয়া ভীষণ জয়-ধ্বনি উত্থিত হইল। গৌড়েশ্বর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরুদত্ত, ব্যাপার কি ?" গুরুদত্ত উত্তর করিল, "মহারাজ, পঞ্চশত সেনা লইয়া আপনার সন্ধানে বাহির হইয়াছিলাম, তাহারা বোধ হয় শত্রুসেনা দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে।"

"তাহারা কোথায় ?"

"পুষ্করিণীর উত্তর তীরে।"

"আমার সহিত মহাদেবী কল্যাণী আছেন।"

"তাঁহার জন্য শিবিকা আনিয়াছি।"

তিন জনে দ্রুতপদে শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

(ক্রমশ)

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

গোবর গণেশ

(প্রবাসীর অষ্টম পুরস্কার প্রাপ্ত গল্প)

(১)

আমার নাম 'গণশা'। দৈবজ্ঞঠাকুর বলিয়া গিয়াছেন আমি খুব একটা বড়লোক হইব। আমার তিন কুলে কেহ নাই। মাতাপিতা ছেলেবেলায় ছাড়িয়া গিয়াছেন। আমি কুলীনের ছেলে, কাজেই মামার বাড়ীই আমার বাড়ী; কিন্তু সে কুলেও কেহ নাই। মাতামহ বড়লোক ছিলেন, তাঁহারই পোষ্যবর্গ আমাকে প্রতিপালন করেন। অন্ন বস্ত্রের আমার অভাব নাই;—খোসা-পরা মটর ডাউল সংযোগে খুব মোটা-সোটা চাউলের নিরামিষ অন্ন আমার উদরস্থ হইয়া থাকে; আর শুনিয়াছি বৎসরান্তে আমার জন্য সওয়া পাঁচ আনা খরচ করিয়া একখানা ধুতি ক্রয় করা হইত, কিন্তু আমি তাহার ধার ধারিতাম না। এ হেন আমি দিন দিন বাড়িতে লাগিলাম এবং দৈবজ্ঞ ঠাকুরের কথাও সফল হইতে লাগিল। বড় হইব বটে কিন্তু সে যে কত বড়—পাঁচ হাত কি ছয় হাত—তাহা দৈবজ্ঞঠাকুর দয়া করিয়া বলিয়া দেন নাই; তাহা হইলে দৈবজ্ঞঠাকুরের বিদ্যার দৌড়টা একবার পরিমাপ করিতে পারিতাম।

আমার মাতামহের একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বলিয়া নিজ বাড়ীতেই তাঁহাকে সপরিবারে স্থান দিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে কাকা বলিয়া ডাকিতাম। তিনিই এখন আমার অভিভাবক। আমাকে তিনি 'গোবর গণেশ' বলিয়া ডাকিতেন, আর বলিতেন—"ছেলেটার কিছু হবে না, একটা হাবা গণ্ডমুখ্যু ছেলে, ওর মাথায় গোবর পোরা, ওকে ইস্কুলে পাঠিয়ে কি হবে।" আমিও মনে করিতাম হবেও বুঝি বা আমার মাথায় গোবর পোরা, সেই জন্য আমায় গোবর গণেশ বলিয়া ডাকেন।

আমাদের গ্রামের প্রতিবাসীগণ আমাদের শত্রু একথা কাকা আমাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। তাহারা আমাদের সম্পত্তি লইতে বহু চেষ্টা করিয়াছে; সুধু তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জোরে তখনও টিকিয়া আছে। তাহারা আরও একটা শত্রুতা করিল—গ্রামের গুরুমহাশয়কে ডাকিয়া আমাকে স্কুলে লইয়া যাইতে বলিয়া দিল। কি জানি কেন গুরুমহাশয় আমার জন্য মাহিয়ানা চাহিলেন না, কাজেই কাকাও জানিতে পারিলেন না যে আমি স্কুলে যাই; স্কুলে গিয়া পরের কালি কলমে পরের তাল-পাতার উল্টা পৃষ্ঠে লিখিয়া, লিখিতে শিখিলাম। অন্যের পুস্তক লইয়া পড়িতে শিখিলাম। পণ্ডিত মহাশয় অন্য ছেলেকে পড়াইতেন তাহা শুনিয়া অনেক কথা শিখিয়া ফেলিলাম।

সমবয়সীর মধ্যে আমার একচ্ছত্র সাম্রাজ্য। তাঁহাদের কোন কার্য্য আমার মনের মত না হইলে বলিতাম তাহাকে ভূতে পাইয়াছে এবং উত্তম মধ্যম দিয়া তাহার ভূত ছাড়াইবার ব্যবস্থা করিতাম। কানাইকে কানা বলিয়া ক্ষেপাইবার রোগ অনেকের ছিল; আমি একদিন মুদ্গর-আইন প্রচার করিলাম। সেই দিন হইতে কাহাতেও উক্ত রোগ দৃষ্ট হয় নাই। প্রবোধ একদিন মিথ্যা কথা বলিয়া ভুলোকে গুরুমহাশয়ের নিকট মার খাওয়াইয়াছিল। আমার আদালতে আর্জ্জী পেশ হইল। আমার রায় অনুসারে প্রবোধকে নিজ হাতে পাঁচটি কানমলা গণিয়া খাইতে হইল। কানাই আমার কাকার ছেলে। কাকার ভয়ে সহসা তাহাকে কিছু বলিতাম না। একদিন সে হবির বই ছিঁড়িয়া দিল। হবি একটি খোঁড়া মেয়ে, বেশ শান্ত শিষ্ট, আমি তাহাকে স্নেহ করিতাম। সে বলিল আমি গণেশ দাদার কাছে বলে দেব। কানাই তাহাকে ক্ষেপাইল :—

> খোঁড়া বীর,
> গাছে উঠে মারলো তীর,
> তীর গেল বেকায়ে,
> খোঁড়া পলো কেকায়ে।

আমি শুনিয়া আর সহ্য করিতে পারিলাম না। গুরুমহাশয়ের সাক্ষাতেই কানাইকে প্রহার করিলাম। সেই কথা কানাই কাকার নিকট বলিয়া দিল। একে তাঁহার পুত্রের গায়ে হাত দিয়াছি, তার উপর তাঁহার সহিত শত্রুতা করিয়া গ্রামের লোক আমাকে পাঠশালায় পাঠাইয়াছে, এ জ্বালা তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। আমার পৃষ্ঠের সহিত তাঁহার হস্তের কিছু সদ্ব্যবহার হইয়া গেল,

এবং তাঁহার মনের জ্বালা আমি পৃষ্ঠে বিলক্ষণ অনুভব করিলাম।

সেই দিন হইতে আমার স্কুলে যাওয়া বন্ধ করার জন্য একাজ সেকাজ দিয়া আমাকে আটক রাখিতেন। তবু আমি পালাইয়া স্কুলে যাইতাম। কিন্তু সেখানে আর-এক বিপদের সূচনা হইয়া পড়িল। "পুত্রাৎ (ছাত্রাৎ) ইচ্ছেৎ পরাজয়ম্"—এ নীতি বোধ হয় গুরুমহাশয়ের কণ্ঠে ছিল না। অন্যান্য ছাত্রদের সম্মুখে আমার নিকট তিনি পদে পদে পরাজয় স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইয়া আমার গোবর গণেশ নাম সার্থক ইহার প্রমাণ সংগ্রহ করিলেন এবং গ্রামস্থ কাকার শত্রুদের ডাকিয়া বলিলেন—"গণেশের কিছু হবে না, ওর মাথায় গোবর পোরা। কানাইএর বাপ তো তার পর নয়, তিনি সত্যই বলে থাকেন ও 'গোবর গণেশ'। তার ওপর ও বড় মারখুটে, ছেলেপেলেদের কেবল মারে।" সেইদিন হইতে স্কুল থেকে আমার জবাব হইল। আমি বাটীতে আসিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলাম।

(২)

এইরূপে কাকার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। আমার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইল। তিনিও নির্ভয়ে আমার মাতামহের সম্পত্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। কাকার শত্রুগণ যখন আমার মাতামহের সম্পত্তি তাঁহার হস্তচ্যুত করিয়া আমার হস্তগত করিতে পারিলেন না, তখন আমাকে লেখাপড়া শিখাইয়া সেই শত্রুতা সাধন করিতেছিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহারা কৃতকার্য্য হইলেন না। কাকারই জিত।

আমি নিরস্ত হইবার পাত্র নহে। দেওয়ালের গায়ে "মন দিয়া কর সবে বিদ্যা উপার্জ্জন" ইত্যাদি অধীত বিদ্যা অঙ্গার দ্বারা ফলাইতে আরম্ভ করিলাম। ফলে জুটিল প্রহার। কানাইএর কাগজ কলম লইয়া লিখিয়া দিতাম, কানাই তাহাই স্কুলে গুরুমহাশয়কে দেখাইয়া নিষ্কৃতি লাভ করিত। কাকা জানিতে পারিয়া বলিলেন "কানাইএর মাথা খাইতেছ—তোমার পিঠের ছাল উঠাইয়া দিব।" এবং বলিতে না বলিতে। কানাই ঘুমাইলে তাহার বই লইয়া পড়িতে বসিলে খুড়িমা তৈল খরচ হইতেছে বলিয়া কেরোসিনের টেমিটি নিবাইয়া দিতেন। কানাই কলম পেনসিল হারাইয়া ফেলিলে আমি চুরি করিতেছি এই অপবাদ দিতেন। খুড়িমা চিররুগ্না; দূর ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ আনিতে শিশি ভাঙ্গিলে পুরাতন Limb for the limb * প্রথার অনুসরণ করা হইত, ফলে আমারও হাড় ভাঙ্গিত।

আমাদের সবে উপনয়ন হইয়াছে। সকাল-বেলার সফেন অন্নের মধুর আস্বাদ এখন আর পাই না। কানাই সকালে স্কুলে যাইবার পূর্ব্বে জলখাবার খাইয়া "পিত্ত রক্ষা" করে। যাহারা স্কুলে যায় না তাহাদের পিত্ত নাই। তাহার প্রমাণ আমি একদিন হাতে হাতে পাইয়াছিলাম। দুগ্ধের আস্বাদ ঘোলে মিটাইব মনে করিয়া একদিন নারিকেল-কোরা সংযোগে চাউল ও গুড় খাইব বলিয়া লইয়াছি। খুড়িমা বেশী স্নেহ করিতেন কি না তাই বলিলেন "এত বেশী নারিকেল খাইলে পেটের অসুখ হয়।" তাহাতে যখন কর্ণপাত করিলাম না তখন তাঁহার তিরস্কার "হাবাতে, কিছুতেই খাঁই মিটে না, একটা নারিকেল সব খাইয়া ফেলিল" এইবার কর্ণে পৌঁছিল, পাত্র সহিত চাউল গুড় সজোরে ভূমিতে নিক্ষেপ করিলাম। কাকা শুনিলেন খুড়িমাকে আমি মারিয়াছি। খুড়িমা যে "মাটির মা।" আর আমি মাটি, তাই সর্ব্বংসহ। কাকার হস্তমাধুর্য্যও বেশ সহ্য করিলাম।

কাকা তামাকু সাজিতে বলিলেন। আমি বাহিরে দাঁড়াইয়া কলিকায় ফুঁ দিতেছি। প্রাচীরের যে কর্ণ থাকিতে পারে তাহা কাকা ও খুড়িমার খেয়াল ছিল না। আমি শুনিলাম "তাহা হইলে শীঘ্র ঠিক করিয়া ফেল। হবির মা গরীব, এ কাজে খুব রাজী হইবে। তারপর তার খোঁড়া মেয়ে পার হইয়া যাইবে। টাকা কড়ি যা দিতে পারে তাহাতেই স্বীকার করিও। গণেশের অন্য কোথাও বিবাহ দিলে ওর শ্বশুর আসিয়া হয়ত সম্পত্তি লইয়া গোল করিবে। হবির সহিত একবার বিবাহ দিতে পারিলে আর তার ভয় নাই।" খুড়িমার কথা শেষ হইতে না হইতেই কাকা বলিলেন "তোমরা মেয়েমানুষ, তোমাদের কোন কাজেই তর সয় না। এসব কাজ প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ (এই সময় উপরে টিকটিকি ডাকিল, কাকা মাটিতে

* ইউরোপে পূর্ব্বে এইরূপ বিচারপদ্ধতি প্রচলিত ছিল যে কেহ কাহারও কোন অঙ্গহানি করিলে দোষীরও সেই অঙ্গ নষ্ট করিয়া দেওয়া হইত।

আঙুলের টোকা দিয়া বলিলেন) সত্য সত্য, চুপে চুপে ধীরে সুস্থে করিতে হয়। একদিন গোপনে হবির মাকে ডাকিয়া আনিও, আমি সব ঠিক করিয়া দিব। রায়গাঁর ব্রজবাবুর একটি ছোট মেয়ে আছে। তারা জমিদার, তাই যার সম্পত্তি আছে এমন ছেলের সহিত বিবাহ দিতে চায়। গণেশের সহিত বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিয়া ঘটক পাঠাইয়াছে। তা আমি একেবারে জবাব দেই নাই, ব'লয়াছি মেয়ে ত বড় ছোট, গণেশেরও বয়স বেশী নয়; এখন বিবাহ হইবে না।" খুড়িমা বাধা দিয়ে বলিলেন—"এই ত বুদ্ধি? এই বুদ্ধিতে আবার পরের সম্পত্তি খাইবে? একেবারে জবাব দিলে না কেন?" কাকা বলিলেন—"তোমরা মেয়েমানুষ, তোমাদের বুদ্ধিতে আমি চলি কি না? আশা দিয়া রাখিয়াছি, এখন একদিন সেখানে যাইব, ব্রজবাবু খুব আদর করিয়া কথা পাড়িবেন, তখন কানাইএর বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করিয়া আসিব।" আমি আর অপেক্ষা না করিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম। খুড়িমা থতমত খাইয়া বলিলেন "কিরে গণশা বে করবি?" আমি মনে মনে বলিলাম "তোমার মুণ্ডু পাত করিব।" মুখে কিছু বলিলাম না।

(৩)

মানুষ হস্তগত সৌভাগ্য রক্ষা করা অপেক্ষা অনাগত সৌভাগ্যের বেশী আদর করে। কাকাও তাই আমার বিবাহ স্থির করিবার পূর্ব্বে ব্রজবাবুর কন্যার সহিত কানাই-এর বিবাহ স্থির করিবার জন্য ছুটিলেন। কাকা যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন তখন আমি লোলুপ দৃষ্টিতে বিবাহের ব্যাপার শুনিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কাকা খুড়িমাকে বলিলেন "যে জন্য গিয়াছিলাম তাহা হইল না। যে দিন কাল পড়িয়াছে। কলিকাতা হইতে কে একজন আসিয়া ব্রজবাবুর মত বদ্‌লিয়া দিয়াছে; তিনি তার সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রীশিক্ষা করিয়া পাগল হইয়াছেন। তাঁর পায়ে পর্য্যন্ত ধরিলাম, তবু তিনি এখন মেয়ের বিবাহ দিতে রাজী নহেন।"

এক পথে নিরাশ হইয়া কাকা অন্য পথ ধরিলেন। কিছু দিন ধরিয়া তিনি হবির মায়ের নিকট হাঁটাহাঁটি করিতে আরম্ভ করিলেন। তার পর একদিন শুনিলাম আমার সহিত হবির বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। একথা গ্রামময় রাষ্ট্রও হইয়া পড়িয়াছিল; কারণ বহুদিন ধরিয়া ইহার কথাবার্ত্তা হইতেছিল। কাকাও হবির মায়ের নিকট হইতে পণ আদায় না করিয়া ছাড়িবেন না, হবির মাও কিছু দিতে চাহে না। অবশেষে কৌলীন্য-মর্য্যাদা বজায় রাখিবার জন্য ১৬৲ টাকা পণে বিবাহ স্থির হইল। বিবাহের পাকা-দেখা ও দিনস্থির হইয়া গিয়াছে, উভয় পক্ষেই বিবাহের উদ্যোগ চলিতেছে। আর উভয়ের মাঝখানে পড়িয়া আমি বিবাহ-ব্যাপারের মর্ম্ম সম্পূর্ণ না বুঝিলেও মনে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করিতেছি। সে যন্ত্রণার কথা আমি কাহাকেও বলিতে পারি না, বলিও না; শুনিবার লোকও ছিল না।

আমাদের দেশে বিবাহের রাত্রির পরের রাত্রিকে 'কাল-রাত্রি' বলে, কিন্তু অনেকের পক্ষে বিবাহ-রাত্রির পূর্ব্ব-রাত্রিই কালরাত্রি। জুলিয়েট ও রজনী এ সত্য উপলব্ধি করিয়াছিল। আর আজ আমি করিতেছি। গভীর রাত্রে শয্যা ত্যাগ করিয়া নদীতীরে আসিলাম। শ্মশানভূমি হইতে দড়ি ও কলসী সংগ্রহ করিলাম। ইচ্ছা ডুবিয়া মরিব। কিন্তু সাহস হইতেছে না। দুইটি বিরুদ্ধ মত আসিয়া অন্তরকে তোলপাড় করিয়া তুলিল। ভগবানের কি ইচ্ছা বুঝিতে পারিলাম না। নিকটস্থ জঙ্গল হইতে একটি বৃক্ষ-পত্র আনিলাম। মনে করিলাম এই বৃক্ষপত্র উর্দ্ধে নিক্ষেপ করিব, যদি উল্টা দিক উপরে পড়ে তবে নিশ্চয় মরিব। ভগবানের নাম করিয়া সেইরূপ নিক্ষেপ করিলাম। পত্র চিত্ত হইয়া পড়িল। মরা হইল না। তখন কলিকাতায় যাওয়া স্থির করিয়া কলিকাতার পথ বাহিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম।

(৪)

বেলা ১০।১১ টার সময় আমার পলায়নব্যাপার কাকা জানিতে পারিলেন। চারিদিকে খুঁজিতে লোক পাঠাইলেন। দুঃসংবাদের পাঁচ পা হয়। কনের বাটীতেও এসংবাদ পৌছিল। প্রথমে নিজ গ্রামে, পরে নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে অনুসন্ধান করা হইল, কোথায়ও আমাকে পাওয়া গেল না। তখন গ্রামের লোক কাকাকে চাপিয়া ধরিল; তাহাদের শত্রুতার একটা অবসর জুটিয়া গেল; তাহারা বলিল কানাইএর সহিত হবির বিবাহ দিতে হইবে, হবির

মা কতবড় লোকের বউ; তার জাত মারিতে আমরা কিছুতেই দিব না। কাকা মহাশয় চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন, খুড়িমা কাঁদিয়া মাটি ভিজাইলেন। অবশেষে গ্রামের লোকের দৌরাত্ম্যে বিবাহ স্বীকার করিতে হইল। কাকা খুড়িমাকে সান্ত্বনা দিলেন,—সম্পত্তির একটা কণ্টক ছিল সে কণ্টক দূর হইল; এখন কানাইএর একটা কেন পাঁচটা বিবাহ দিলে মারিবে কে?

চোখের জল ও ক্রন্দনের মধ্যে হবির সহিত কানাইএর বিবাহ শেষ হইয়া গেল।

এদিকে আমি দুই দিন অভুক্ত অবস্থায় হাঁটিয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এখানে কোথাও কাহাকেও চিনি না, পথ ঘাট জানি না, কোথায় যাইব তাহার ঠিকানা নাই। যেদিকে দৃষ্টি যায় সেইদিকে যাইতে লাগিলাম। একটা বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দেখি উপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে "স্ত্রী-শিক্ষা-সমিতি।" আমি বিশ্রামার্থ উক্ত বাড়ীর সিঁড়ির উপর বসিলাম, বসিয়া বসিয়া শুইলাম; শুইয়াই ঘুমাইয়া পড়িলাম। সন্ধ্যার সময় একটি দয়ার্দ্র স্বর আমাকে উঠাইল। একটা হলের ভিতর অনেকগুলি ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। যিনি আমাকে উঠাইলেন তিনি আমার অবস্থা জানিয়া প্রথমে আমার ক্ষুৎতৃষ্ণার অপনোদন করিয়া সমিতিগৃহে সঙ্গে লইয়া গেলেন। অদ্য সমিতির একটি অধিবেশন, অনেকে অনেক বক্তৃতা করিলেন। যিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন তিনিও কিছু বলিলেন; তাঁহার শেষ কথা এইরূপ—

"সম্প্রতি আমি রায়গাঁ হইতে আসিতেছি, তথাকার জমিদার ব্রজবাবুর সহিত আলাপ করিয়া তথায় স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছি।"

আমার উপকর্তা অনাদিবাবু। তিনি তাঁহার বাটীতে আমাকে কিছুদিন রাখিয়া আমাকে স্কুলে দিলেন।

এন্ট্রান্স পাশ করিবার পর অনাদিবাবু আমাকে বলিলেন "যদি আমার আশ্রয়ে থাকিয়া কিছুমাত্র উপকার বোধ করিয়া থাক, তবে তোমার শিক্ষাসমাপ্তির পর স্ত্রী-শিক্ষার জন্য কিছু স্বার্থ ত্যাগ করিতে হইবে।" আমি অবনত মস্তকে স্বীকৃত হইলাম।

(৫)

বিবাহের পর হইতেই কানাই পড়া ছাড়িয়া দিয়াছে। কাকা বোধ হয় সম্পত্তির সীমাবদ্ধ আয়ে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া কানাইএর চাকরীর জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চাকরীও জুটিল। ব্রজবাবুর একটি মুহুরী আবশ্যক ছিল। অনেক সুপারিস করিয়া কানাইয়ের জন্য সেইটি সংগ্রহ করিলেন। মাহিয়ানা পঞ্চমুদ্রা। কার্য্য—হিসাব রাখা এবং মফস্বল পরিদর্শনের সময়ে ব্রজবাবুর জন্য রন্ধন। দায়-ধারা কার্য্য ভিন্ন তাহার নিজ ইচ্ছাকৃত আরও একটি কার্য্য ছিল—সেটি অবসর সময়ে ব্রজবাবুর তোষামোদ। ব্রজবাবু একদিন বিরক্ত হইয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও সে ঐ কার্য্য হইতে বিরত হয় নাই। উপরি কার্য্যের জন্য উপরি আয়ও ছিল। বাবুর বাড়ীতে যে-সকল দ্রব্যাদি খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না তাহার অংশ কানাই পাইত, ব্রজবাবুর পরিবারস্থ সকলের নিকট হইতে পরবী পাইত এবং মফঃস্বলে গেলে প্রজাদের নিকট হইতে ব্রজবাবু কিছু পাওয়াইয়া দিতেন, এবং নিতান্ত বিরক্ত হইলে ব্রজবাবু নিজে কখনো কখনো উত্তম-মধ্যম দিতেন।

ব্রজবাবুর কন্যা রূপে গুণে অসামান্যা। শিক্ষারূপ "সোনার কাঠির" স্পর্শে সে রূপ ও গুণ যেন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল। তাহার নাম লাবণ্যপ্রভা হইলেও সে নাম কেহ জানিত না; সবাই আটপৌরে নাম "ছবি" বলিয়া ডাকিত। ছবির মত দেখিতে সুন্দর বলিয়া যেন নামটি আরও মধুর শুনাইত।

ছবির বিবাহের সময় হইয়াছে। অনেক স্থান হইতে অনেক সম্বন্ধ আসিতেছে, কিন্তু ব্রজবাবুর কোনটিই মনোমত হইতেছে না। কাকা মহাশয়ও এই অবসর ছাড়িলেন না। একদিন ব্রজবাবুর বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া কানাইএর সহিত ব্রজবাবুর কন্যার বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়া বলিলেন "এরূপ বংশ ও সম্পত্তিশালী বর আপনি খুঁজিয়া পাইবেন না। একবার বিবাহ হইয়াছে তাহাতে কি আসে যায়; সে বউকে বাড়ী না আনিলেই হইবে।" বৈঠকখানায় একটা হাসির হররা ছুটিল। মস্তিষ্ক বিকৃত বলিয়া তাঁহাকে ঘরের বাহির করিয়া দেওয়া হইল। তিনিও বাটীতে গিয়া গুজব রটাইলেন যে

ব্রজবাবুর বংশের দোষ আছে, ছোট বংশ বলিয়া তাহার কন্যাকে কেহ বিবাহ করিতে চাহিতেছে না। সে বংশে তিনি তাঁহার একমাত্র বংশের দুলাল কানাইএর বিবাহ কি দিতে পারেন ?

ছবির বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে। বরের বাড়ী কলিকাতায়। তিনি এবার বি-এ পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য। সবার মুখেই হাসি, গলায় ফুলের মালা, পরিধানে উত্তম পোষাক। এই কোলাহলের মধ্যে কানাই নাই; কানাইএর রন্ধনব্যাপারে খুব সুখ্যাতি ছিল বলিয়া হলুদ ও মশলার রঙে রঞ্জিত বস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া সে অদ্য রন্ধনশালার বরাসন অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। সন্ধ্যার সময় খুব জোরে একবার বাজনা বাজিয়া উঠিল। সবাই বলিল এইবার বর আসিয়াছে। সবাই দেখিতে ছুটিল। কানাই তখন প্রেয়সী হাঁড়ির গলা ধরিয়া লজ্জারক্ত নবোঢ়া বধূর ন্যায় পোলাওএর জাফরানি রং পরখ করিতেছিল। কানাই হাঁড়ির কানা ধরিয়া দুম করিয়া হাঁড়ি মাটিতে বসাইয়া বর দেখিতে ছুটিল। বরমণ্ডপের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ভিড়ের পশ্চাৎ হইতে উঁচু হইয়া একজনের কাঁধের উপর দিয়া কানাই দেখিল গণেশচন্দ্র বরবেশে সভামধ্যে উপবিষ্ট। কানাই সংজ্ঞাশূন্য। সে কি দেখিতেছে? সে তাহার চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। নিকটে একজন পড়িতেছিল "শ্রীমান গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত লাবণ্যপ্রভার শুভ পরিণয় উপলক্ষে প্রীতি-উপহার।" সত্য যেন কঠোর হইতেও কঠোরতর হইয়া তাহাকে গ্রাস করিতে আসিল। এই সময়ে কানাইএর সহিত আমার চোখোচোখি। কানাই ডিঙি মারিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সে ভিড়ের পিছনে ডুব মারিল। সেই রাত্রি হইতে কানাইকে আর কোথাও পাওয়া গেল না।

বিবাহের পর একদিন বাটীতে গেলাম। খুড়িমাতা একরাশি কুম্ভীর-ক্রন্দন কাঁদিলেন। কাকা—আমার অনুপস্থিতিতে কত দুঃখ করিয়াছেন এবং আমার জন্য কত অনুসন্ধান করিয়াছেন তাহার পরিচয় দিলেন। আমি ডেপুটীগিরি চাকুরী পাইয়াছি শুনিয়া খুড়িমাতা তাড়াতাড়ি আমার জলখাবারের উদ্যোগ করিতে গেলেন। আমি ফিরিয়া আসিয়াছি শুনিয়া গ্রামের অনেকে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। গ্রামের পাঠশালার গুরুমহাশয় আসিয়া বলিলেন "না হবে কেন? এটি আমারই ছাত্র! এটি আমারই ছাত্র!"

কাকা আদালতের সাহায্য ভিন্ন সম্পত্তি ফিরিয়া দিলেন না। সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া তাঁহাকেই পুনরায় কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলাম। কলিকাতায় একটি অবৈতনিক স্ত্রী-বিদ্যালয় স্থাপন করিলাম। কানাইএর অনুসন্ধান করিয়া মার্চেণ্ট অফিসে তাহার চাকরী করিয়া দিলাম। শিক্ষা গোবরগণেশকে গণেশচন্দ্র করিয়া দিল।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীবিক্রমপুর ও তাহার উপকণ্ঠ*

বাঙ্গলাদেশের অনেক মনীষীর মতে এখন বাঙ্গলা-সাহিত্যে ঐতিহাসিক আলোচনার যুগ চলিতেছে।

এই যে দেশব্যাপী ঐতিহ্যানুসন্ধানের স্পৃহা জাগিয়া উঠিয়াছে তবু আমরা সম্পূর্ণ সজাগ হইতে পারিয়াছি কি? আমার ত তাহা বোধ হয় না। এখনো যেন মতসঙ্কলনেই,—ইংরেজী ফরাসী জার্ম্মেন পুথি অনুবাদ ও সেগুলি হইতে না বলিয়া বেমালুম গ্রহণেই আমাদের অধিকাংশ শক্তি অপব্যয়িত হইতেছে;—অধিকাংশ চেষ্টা বিফলে অবসান লাভ করিতেছে।

এই মহাবিদ্বজ্জন-সমাগমে, বাঙ্গলার ঐতিহ্যালোচনার সূর্য্যরথের সপ্তাশ্ব শাস্ত্রী বসু মৈত্রেয় চন্দ বিদ্যাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বসাক মহাশয়দিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে তিন-তিনটা রাজবংশ—বর্ম্ম চন্দ্র সেন বংশ—তাম্রশাসনাবলী প্রচার করিয়া গিয়াছেন, এবং সময় সময় সমস্ত বাঙ্গালা বিহারের শাসনদণ্ড পরিচালিত করিয়াছেন, আপনারা বারেকও কি সেই অতীতগৌরবমণ্ডিত পুণ্যভূমিতে যাইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিবার অবসর পাইয়াছেন? যদি না পাইয়া থাকেন তবে কি করিয়া বলি যে প্রকৃতই অতীত ইতিহাস উদ্ধারের

* গত বৎসর কলিকাতা সম্মিলনীতে ইতিহাস-বিভাগে পঠিত। নানা কারণে এপর্য্যন্ত ইহা ছাপিতে দেই নাই। এখন ছাপিতে দেওয়া আবশ্যক বোধ করিলাম।—লেখক।

চেষ্টা বঙ্গদেশে সম্পূর্ণ জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে? কোথায় সেদিন একটা কথা শুনিলাম যে ঢাকা জেলায় স্থিত বিক্রমপুর, বর্ম্ম-চন্দ্র-সেনরাজদের রাজধানী এবং দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জন্মস্থান বিক্রমপুর নহে। কথা যখন উঠিয়াছে তখন প্রমাণও শীঘ্রই বাহির হইবে।†

বিক্রমপুর আমার জন্মভূমি, তাঁহার অতীত ও বর্ত্তমান গৌরবে আমি গৌরবান্বিত। শ্রীবিক্রমপুর নগরের উপকণ্ঠে আমার ত্রয়োদশ পুরুষের বসতবাটী—জ্ঞান হওয়া অবধি বিক্রমপুরাধিপদের কত বিস্ময়জনক কাহিনী শুনিয়া শুনিয়া মানুষ হইয়াছি। কত মেঘগম্ভীর সন্ধ্যায় পিসিমার মুখে বল্লালরমণীর অদ্ভুত আত্মবিসর্জ্জন-কাহিনী শুনিয়া, বীরাঙ্গনা সোনামণির অসাধারণ বীর্য্যের পরিচয় পাইয়া, চাঁদ-কেদারের বিপুল কীর্ত্তিকাহিনী অবগত হইয়া, ভীষণা কীর্ত্তিনাশার বিরাট ধ্বংসোৎসব মানসনয়নে দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছি। বাল্যাবধি শ্রীবিক্রমপুরের মহাশ্মশান রামপালনগরী ও তাহার উপকণ্ঠে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিপুল প্রাচীনগৌরবের চিন্তায় ডুবিয়া গিয়াছি। তবু কি মনের আশা মিটিয়াছে? বাল্যকালে মুগ্ধ হইয়া কেবলি দেখিয়াছি,—দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছি। ঐতিহাসিকের চক্ষে যখন দেখিতে শিখিলাম, তখন হইতেই নানা কাজে নানা দাসত্বশৃঙ্খলে জড়িত হইয়া মাতৃভূমি হইতে দূরে থাকিতে হইয়াছে। কিছু কিছু দেখিয়াছি কিন্তু এখনও ঢের বাকী রহিয়া গিয়াছে,—জীবনে ভাল করিয়া, তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে পাইব কি না কে জানে? কিন্তু যাহা দেখিয়াছি, তাহাই আজ এই মহাসম্মিলনীতে নিবেদন করিতে চাই।

ইচ্ছামতী-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্র-ধলেশ্বরীসঙ্গমে অবস্থিত বিক্রমপুর নগরের অবস্থান প্রাচীনকালে অতি মনোরম ছিল। কবে হইতে যে বিক্রমপুর ভূভাগে আর্য্যনিবাস হইয়াছে তাহা ঠিক করা যায় না। অশোক নাকি সমতটেও তাঁহার ধর্ম্মরাজিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আমি "প্রতিভা" এবং এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত আমার "একটি বিস্মৃত জনপদ" নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে সমতটের রাজধানী কর্ম্মান্তনগরীর নিকটে অশোক-প্রতিষ্ঠিত এবং হিউএনসঙ কর্ত্তৃক দৃষ্ট ধর্ম্মরাজিকার ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে। কর্ম্মান্তনগর বর্ত্তমান ত্রিপুরা জেলায় কুমিল্লাসহরের অদূরে বর্ত্তমান ছিল। কাজেই বিক্রমপুর ভূভাগ অশোকের রাজ্যের মধ্যে ছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। কিন্তু অশোকযুগের বলিয়া অসঙ্কোচে নির্দ্দেশ করা যায় এমন কিছু বিক্রমপুর হইতে এপর্য্যন্ত বাহির হয় নাই।

বিক্রমপুরের বিক্রমপুর নাম কি করিয়া হইল? বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রবাদ আছে যে রাজা বিক্রমাদিত্য বঙ্গবিজয়ে আসিয়া এই সুন্দর সুরক্ষিত স্থানটিতে শিবির স্থাপন করেন এবং স্বনামে একটি নগর প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। প্রবাদের মূলে সত্য থাকিলেও থাকিতে পারে। কালিদাসের রঘুর দিগ্বিজয়ে নৌসাধনোদ্যত বঙ্গদেশীয়গণের বাহুবলের পরিচয় পাইয়া স্বতঃই মনে হয় যে গুপ্তরাজাদের মধ্যে কোন বিক্রমাদিত্য-উপাধিধারী রাজা বোধ হয় আসিয়া সেই বাহুবলের পরীক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন; চন্দ্র নামক রাজার দিল্লীলৌহস্তম্ভে খোদিত লিপি পাঠ করিয়া জানা যায় যে তিনি সমবেত বঙ্গাধিপগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক হিসাবে বঙ্গ বলিতে প্রাচীনকালে বিক্রমপুর এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বকেই বুঝাইত। ভিন্সেন্ট স্মিথ-প্রমুখ মণ্ডিতমণ্ডলীর মত যে এই চন্দ্রই সমুদ্রগুপ্তের পুত্র চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য। যদি এই চন্দ্রই চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য হন, তবে তাঁহার বিক্রমপুরে আগমনের ত মস্ত প্রমাণই রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু কিছুদিন হয় মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় Indian Antiquary পত্রে এই চন্দ্রকে শুশুনিয়া গিরি-লিপির পুষ্করণার অধিপতি চন্দ্র হইতে অভিন্ন প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা সফল হইয়া থাকিলে বিক্রমপুর নামের উৎপত্তিরহস্য যে তিমিরে সে তিমিরেই রহিয়া গেল। এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে দেখিতে পাই যে সমতট ডবাক কামরূপ সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যের প্রান্তস্থিত অনুগত রাজ্য। সমুদ্রগুপ্ততনয় চন্দ্রের শাসন-সময়ে এই প্রান্তস্থিত রাজ্যগুলিকে তাঁহার শাসনাধীনে আনিবার চেষ্টা খুব স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। তাই মেহেরৌলির চন্দ্রকে চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য

† প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অশেষ পরিশ্রম করিয়া অধুনা প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছেন।

বলিয়া ধরিয়া লইতে ইচ্ছা হইতেছে। বিচার বিতর্কের স্থান ইহা নহে। ফরিদপুরের তাম্রশাসনগুলি যদি কূটশাসন না হয় তবে গুপ্তরাজাদের প্রভুত্ব যে এই অঞ্চলে বদ্ধমূল হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতনের পর এবং হর্ষবর্দ্ধনের একপুরুষ-স্থায়ী প্রভুত্বের অবসানে পূর্ব্ববঙ্গে খড়্গাবংশ মাথা তুলিয়াছিল। কর্ম্মান্ত-নগরে তাহাদের রাজধানী ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। বিক্রমপুরে তাহাদের অন্যতম রাজধানী ছিল কিনা অবগত হওয়া যায় না। বিক্রমপুরে যত প্রস্তরমূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার প্রাচীনতমগুলি সমস্ত বৌদ্ধমূর্ত্তি। বিক্রমপুরের প্রায় প্রত্যেক গ্রামে দেউল নামে পরিচিত একপ্রকার উচ্চ মৃৎস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন গ্রামে চারি পাঁচটি পর্য্যন্ত দেউলের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। বিক্রমপুর হইতে যত মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহা প্রায়ই এই প্রাচীন দেউলগুলির সন্নিহিত পুকুর বা চৌগাড়া হইতে উঠিয়াছে। এইগুলি যে পুরাকালে দেবালয় ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বিক্রমপুরের লুপ্ত ইতিহাস এই দেউলগুলির আশেপাশেই লুকাইয়া আছে, কিন্তু এগুলির দিকে কাহারও দৃষ্টি ভাল করিয়া আকৃষ্ট হয় নাই। বিক্রমপুরের ইতিহাস যথাসম্ভব উদ্ধার করিতে হইলে কোন্ দেউল হইতে কি উঠিয়াছে তাহার সাবধানে পর্য্যালোচনা আবশ্যক। সুখবাসপুর কালীর বাড়ীর অব্যবহিত পশ্চিমদিকে স্থিত দেউলকে, পাইকপাড়া গ্রামে আমার নিজ বসতবাটীর দক্ষিণসীমায় স্থিত দেউলটিকে এবং জৈনসার গ্রামস্থ দেউলটিকে আমি বৌদ্ধ খড়্গাবংশের প্রাধান্যের সময়ে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে করি। প্রথম দেউলটি হইতে একটি সুগঠিত বালুকা-প্রস্তরে নির্ম্মিত তারা-দেবীর মূর্ত্তি উঠিয়াছে, তাহার গঠনভঙ্গী দেখিয়াই বুঝা যায় যে মূর্ত্তিটি বরেন্দ্র-শিল্পের জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের,—যে সময়ে কৃষ্ণপ্রস্তরের ব্যবহার তখনও বহুলভাবে প্রচলিত হয় নাই। পাইকপাড়া দেউলের সংলগ্ন প্রকাণ্ড পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ মঘাদীঘি নামে পরিচিত দীঘির অস্তিত্ব হইতে বুঝা যায় যে দেউলটি বৌদ্ধ দেউল ছিল। এই দেউলের নিকটবর্ত্তীস্থান হইতে একটি অষ্টধাতুর ধ্যানীবুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহা নিকটেই এক বাড়ীতে সরস্বতী বলিয়া বহুবৎসরাবধি পূজা পাইতেছে। দেউলের পূর্ব্বদিকস্থ চৌগাড়া হইতে একটি জম্ভলের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিটির পিছনে এক লাইন বিলুপ্ত-প্রায় লিপি আছে। বহু কষ্টে তাহা পাঠ করিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় জম্ভল-পূজার বীজমন্ত্রটি লিখা রহিয়াছে। লিপিটিতে নয়টি অক্ষর মাত্র আছে যথা—ওঁ জম্ভল জলেশায় স্বাহা। লিপিটির অক্ষর অত্যন্ত প্রাচীন ঢঙের—আসরফপুর শাসনদ্বয়ের লেখার সহিত তাহার বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। এই লিপি হইতে আমরা অনুমান করিতে চাই যে দেউলটি খড়্গাদের সময়ে প্রতিষ্ঠিত। সরস্বতীরূপে পূজিত বুদ্ধমূর্ত্তিটিরও নাক মুখ চোক কালবশে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া এরূপ হইয়া গিয়াছে যে কেবল উপবেশন-ভঙ্গী দেখিয়া উহাকে ধ্যানী-বুদ্ধ বলিয়া চেনা যায়। এই অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্ত্তির আবিষ্কারও দেউলটির প্রাচীনত্বের একটি প্রমাণ। জৈনসারের দেউল হইতে একটি বালুকাপ্রস্তরের (sandstone) ত্রৈলোক্য-বিজয়িনীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহারও গঠনভঙ্গী দেখিয়া মনে হয় যে এটিও পালদের অভ্যুত্থানের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের। এই মূর্ত্তিটির ছবি গৃহস্থে বাহির হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবুও সাহিত্য পত্রিকায় বঙ্গের ভাস্কর্য্য নামক প্রবন্ধে এই মূর্ত্তিটিকে তারানামে পরিচিত করাইয়া ছবি বাহির করিয়াছিলেন। মূর্ত্তিটি ঢাকা-পরিষদের উৎসাহী সভ্য শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া ঢাকা-পরিষদের মন্দিরে সুরক্ষিত আছে।

খড়্গাবংশের পতন হইতে বর্ম্মবংশের অভ্যুত্থান পর্য্যন্ত বিক্রমপুরের ইতিহাস সম্পূর্ণ তমসাচ্ছন্ন। খড়্গাবংশের বিক্রমপুরে অধিকারের বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ কিছুই নাই, যাহা আছে তাহাই উপরে উল্লিখিত হইল। কিন্তু বর্ম্মবংশের বিক্রমপুরে রাজত্বের বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। বর্ম্ম-বংশ কোন্ সময়ে রাজত্ব আরম্ভ করেন, হরিবর্ম্ম এবং বজ্র-শাসন ভোজবর্ম্ম একই ধারার রাজা কি না, সে-বিষয়ে বিতর্কে নিযুক্ত হইবার স্থান ইহা নহে। আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের জন্য এইটুকুই জানা আবশ্যক যে বর্ম্মবংশের রাজ-ধানী বিক্রমপুরে ছিল। বিক্রমপুর বলিতে বর্ত্তমানে এক প্রকাণ্ড পরগণাকে বুঝায় এবং প্রাচীন শ্রীবিক্রমপুরনগরী যেখানে ছিল তাহাতে রাজবংশের পর রাজবংশ রাজত্ব

করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের রাজধানীগুলির মহাশ্মশান অধুনা প্রায় ২৫ বর্গমাইল স্থান জুড়িয়া আছে। আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই ২৫ বর্গমাইল স্থানের কোন্ অংশে কোন্ বংশের রাজধানী ছিল যথাসম্ভব এবং যথাপ্রাপ্ত প্রমাণ ও যুক্তি দিয়া তাহারই নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিব।

প্রথমতঃ প্রাচীন তাম্রশাসনাবলিতে উল্লিখিত শ্রীবিক্রমপুরনগরীই যে বর্ত্তমান রামপাল তাহার প্রমাণ আবশ্যক। ইহার প্রমাণ করিতে আমি বক্র প্রমাণের সহায়তা গ্রহণ করিব। যদি রামপালের চতুর্দ্দিকে ২৫ বর্গ-মাইল-ব্যাপী ভগ্নাবশেষরাশি শ্রীবিক্রমপুর নগরের ধ্বংসাবশেষ না হয় তবে বিক্রমপুর পরগণা হইতে এমন স্থান খুঁজিয়া বাহির করা আবশ্যক যাহা শ্রীবিক্রমপুর নগরীর ধ্বংসাবশেষ হওয়া সম্ভব। বিক্রমপুর পরগণায় দ্বিতীয় এমন স্থান আর নাই। পুরুষ-পরম্পরাও এই স্থানকেই প্রাচীন রাজাদের রাজধানী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছে। তাই শ্রীবিক্রমপুর নগরী যে বর্ত্তমান রামপালের আশে-পাশেই বর্ত্তমান ছিল সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে বর্ম্ম-চন্দ্র-সেনবংশের রাজধানী একই স্থানে ছিল বলিয়া মনে হয় না; এই বিপুল ধ্বংসাবশেষের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন বংশের রাজধানী ছিল বলিয়া আমার বিশ্বাস। প্রথমে বর্ম্মবংশের রাজধানী কোথায় ছিল তাহারই নির্দ্ধারণের চেষ্টা করা যাউক।

এই নির্দ্ধারণ ঠিকমত অনুসরণ করিতে হইলে রামপাল ও তৎসন্নিহিত ভূভাগের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আবশ্যক।

বর্ম্মবংশের বিষয়ে আমরা প্রধান এই একটি বিষয় অবগত আছি যে তাঁহারা বৈষ্ণব ছিলেন। হরিবর্ম্মদেব স্বীয় রাজধানী হইতে মাতার পদব্রজে কাশী যাইবার জন্য এক রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আমি তৃতীয় সংখ্যা বিক্রমপুর পত্রিকায় মিরকাদিমের খাল নামক প্রবন্ধে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে পাইকপাড়া আবদুল্লাপুরের সীমায় অবস্থিত বৃহৎ ইষ্টক-নির্ম্মিত পোল-টির উপর দিয়া যে দীর্ঘ রাস্তা সোজা পশ্চিমদিকে চলিয়া গিয়াছে তাহাই হরিবর্ম্মের নির্ম্মিত রাস্তা।

এখন দেখা আবশ্যক যে রামপাল ও তাহার উপকণ্ঠের কোন্ স্থান হইতে বেশী বৈষ্ণব-কীর্ত্তি-চিহ্ন বাহির হইয়াছে,—হরিবর্ম্মের রাস্তা কোন্ স্থান হইতে বহির্গত হইয়াছে, এবং বর্ম্মবংশের স্মৃতি-বিজড়িত আর অন্য কোন কীর্ত্তি রামপালের কোন অংশে আছে কি না।

রামপালের দক্ষিণে সুখবাসপুর গ্রামের আশেপাশে বহু বৈষ্ণব-কীর্ত্তি-চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুখবাসপুর গ্রামে বহু প্রাচীনকাল হইতে জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে যে এখানে রাজার বাটী অবস্থিত ছিল। সুখবাসপুর মনসা-বাড়ীতে সুখবাসপুরের প্রকাণ্ড দীঘি হইতে উত্থিত এক বিপুলায়তন বিষ্ণুমূর্ত্তি রক্ষিত আছে। আর একখানা প্রায় ছয় ফুট উচ্চ অতি সুন্দর কারুকার্য্যঘটিত বামন অবতারের মূর্ত্তি এই গ্রাম হইতে আবদুল্লাপুরের বৈষ্ণবদের আখড়ায় লইয়া গিয়া রাখা হইয়াছে। তাহার নীচে প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে "নমো বা—" পর্য্যন্ত লিখিত আছে। লিপিটি বোধ হয় নমো বামনায় বলিয়া আরব্ধ করা হইয়াছিল—কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে তাহা সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। সুখবাসপুর হইতে সংগৃহীত এই দুইটি প্রকাণ্ড মূর্ত্তি দেখিয়াই মনে হয় যে এরূপ বিপুলায়তন মূর্ত্তি কোন প্রতাপশালী রাজা ভিন্ন অন্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব।

সকলের চেয়ে বড় প্রমাণ, সুখবাসপুর গ্রামের পশ্চিম-প্রান্তস্থিত হরিশ্চন্দ্রের দীঘি। আমার মনে হয় এই হরিশ্চন্দ্র হরিবর্ম্ম ব্যতীত আর কেহই নহেন। নামসাদৃশ্য ভিন্ন অবশ্য অন্য কোন বিশেষ প্রমাণ নাই। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত হরিবর্ম্মের রাস্তাও যে হরিশ্চন্দ্রের দীঘির উত্তর পাড় ঘেঁসিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে সুখবাসপুরেই বর্ম্ম-বংশের রাজধানী ছিল। সুখবাসপুরের উত্তর প্রান্তে দেবসার গ্রামে এক প্রকাণ্ড দীঘি এবং তাহার পাড়ে এক উচ্চ দেউল আছে। দেবসার গ্রাম রামপালের বিখ্যাত দীঘির পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত। আমার মনে হয় এই দেবসার দেউলে বর্ম্মরাজাদের অনেক কীর্ত্তি লুকাইয়া আছে। সুখবাসপুরের পূর্ব্বে একটি প্রকাণ্ড মাঠ আছে—তাহার নামটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাহার নাম সরস্বতীর মাঠ। বিষ্ণুপত্নী সরস্বতীদেবীর সম্মানে কোন্ অতীত-কালে বর্ম্মরাজাদের সময় হয়ত এখানে সারস্বত-সম্মিলনের

ব্যবস্থা ছিল, সেই প্রাচীন গৌরবযুক্ত নামটি এখনও রহিয়া গিয়াছে। সরস্বতীর মাঠের পূর্ব্বপ্রান্তে কেওয়ার গ্রাম। কেওয়ার গ্রাম বর্ম্মদের সময়ে বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কেওয়ার দেউল হইতে একখানা বিষ্ণুমূর্ত্তি বাহির হইয়াছে—তাহার পাদপীঠে চারি লাইন লিপি আছে। তাহার যতদুর পাঠ উদ্ধার করিতে পারিয়াছি তাহা নিম্নে দিলাম।

লিপি।

(১) অয়মাঙ্ক (?) য (?) মেয়ে (?) ন সযোগা ইযু বারেযুঃ।

(২) বঙ্গোকেন ক্বহো (তো ? রিষু বিষ্ণু সালোক্য-কাম্যয়া ॥

(৩) বরেন্দ্রী হ (ত ?) টকীয়েন শাণ্ডিল্য কুল সূ (?) মু (?) না পি তা (?) ম।

(৪) হস্য পৌত্রেণ প্রণপ্ত্রা শৌরি শর্ম্মণঃ ॥

লিপিটির ভাষা অশুদ্ধ সংস্কৃত বলিয়া বোধ হয়। নীচের দুই লাইনের শেষ অংশ অত্যন্ত ক্ষয় পাইয়া গিয়াছে বলিয়া নিঃসংশয় পাঠ দিতে পারিলাম না। প্রথম দুই লাইন বেশ পরিষ্কারভাবে খোদিত থাকিলেও তাহারও তিন চারিটি অক্ষরের পাঠ-অশুদ্ধি অথবা বৈচিত্র্য-হেতু সংশয়-যুক্ত। "অঙ্ক যমেয়" শব্দটি ঠিকরূপ পড়িতে পারিয়াছি কি না সন্দেহ,—পারিয়া থাকিলেও ইহার অর্থ পরিষ্কার নহে। অঙ্ক=৯ আর দিকের সহিত সংশ্লিষ্ট অর্থযুক্ত বলিয়া যমেয়=১০ যদি ধরা যায় তবে ৯১০ শকাব্দ পাওয়া যায়। তবে লিপিটির অর্থ এই দাঁড়ায় যে গৌরীশর্ম্মার পুতি, পিতামহশর্ম্মার নাতি, কুলশর্ম্মার ছেলে শাণ্ডিল্য-গোত্রজ বরেন্দ্রীহট্ট-নিবাসী বঙ্গোক শর্ম্মা ৯১০ শকে ক্বহোরি অর্থাৎ বর্ত্তমান কেওয়ার গ্রামে সালোক্য কামনায় বিষ্ণু-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। শকাব্দের ৯১০, খ্রীষ্টাব্দের ৯৮৮র সমান। সময়টি ঠিক বর্ম্মবংশের অভ্যুত্থানের সময়।

বিক্রমপুরের অন্যতম রাজবংশ চন্দ্রবংশের অভ্যুত্থানের সময় এখনও সঠিকরূপে নিরূপিত হয় নাই। তাহারা বর্ম্মদের পূর্ব্ববর্ত্তী না পরবর্ত্তী তাহা নূতন তথ্যাবলীর আবিষ্কার ভিন্ন নির্ণীত হওয়া দুরূহ। চন্দ্রবংশের রাজধানী বর্ত্তমান বজ্রযোগিনী গ্রামের পুকুরপাড় অংশে ছিল বলিয়া মনে হয়। সেখানে পরস্পর-সংলগ্ন তিনটি প্রকাণ্ড দীঘির পাড়ে অনেক ভগ্নাবশেষের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এখানেও রাজার আবাসবাটী ছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে। চন্দ্ররাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন। বজ্রযোগিনী বিখ্যাত বৌদ্ধনাম—তাহার আশেপাশের গ্রামগুলির নামও বৌদ্ধগন্ধি—যথা—ধামদ অর্থাৎ ধর্ম্মদেহ, ধানারণ অর্থাৎ ধর্ম্মারণ্য, মহা-কালী ইত্যাদি। ধামদ গ্রামের প্রান্তস্থিত দীঘিতে মাটি তুলিতে একখানা স্বর্ণপত্রের পুঁথি পাওয়া যায়। পুঁথির এক-একখানা পাতা ৩০ ভরি ওজনের ছিল এবং এরূপ ২৪ খানা পাতাতে পুঁথিখানা সমাপ্ত ছিল। যতদূর খবর জানি, পুঁথির ২৩ খানা পাতা গালাইয়া ফেলা হইয়াছে, একখানা পাতা এখনও আছে। কিন্তু তাহা এরূপ গোপনে রক্ষিত হইতেছে যে তাহা বাহির করা দুষ্কর! এই মূল্যবান পুঁথিখানিতে কি লিখা ছিল ভগবানই জানেন। পুকুরপারের দীঘি হইতে একখানি সুন্দর সরস্বতীমূর্ত্তি উঠিয়াছে, তাহা নিকটবর্ত্তী এক বাড়ীতে পূজা পাইতেছে।

প্রসিদ্ধ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের বাড়ী "বিক্রমনিপুর বাঙ্গালা" ছিল বলিয়া তাঁহার তিব্বতীয় ভাষার জীবনচরিতে লিপিবদ্ধ আছে। ঐতিহাসিকগণের এই মত যে ইহা বঙ্গদেশান্তর্গত বিক্রমপুর ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিক্রমপুরে প্রবাদ বজ্রযোগিনী গ্রামই দীপঙ্করের জন্মস্থান। বজ্রযোগিনীকে কেহ কেহ বরদাযোগিনীও বলিয়া থাকেন। বজ্রযোগিনীকে স্থানীয় লোকে বদরযোগিনী নামে অভিহিত করে। এই বদরযোগিনী অথবা বজ্রযোগিনী একটি প্রকাণ্ড গ্রাম, ইহার নানা অংশ নানা "পাড়া" নামে অভিহিত, যথা—নাহাপাড়া, ভট্টাজপাড়া, আটপাড়া, পুরোহিতপাড়া ইত্যাদি। যতদুর প্রমাণ পাইয়াছি, আমার বোধ হয় সোমপাড়াতেই দীপঙ্করের আবাসভূমি ছিল। সোমপাড়াতে একটি প্রকাণ্ড পূর্ব্বপশ্চিমে দীর্ঘ মঘাপুকুর আছে। এই পুকুর হইতে দুইখানা বরদাতারার মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। দীঘিটির মধ্য দিয়া একটা বাঁধ দিয়া বর্ত্তমানে দুইটি পুকুরে পরিণত করা হইয়াছে। তাহার পশ্চিমের দিকেরটির জল এখনও ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বের দিকেরটি এখন দুর্ভেদ্য তারাবনে আবৃত। পশ্চিমের পুকুরটির

মালিকগণ পুকুরটিতে একটি ঘাট বাঁধাইয়া তাহাতে বড় তারা মূর্ত্তিটি আঁটিয়া দিয়াছেন। তারামূর্ত্তিটির নীচে এক লাইন লিপি ছিল তাহার অনেকটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—যাহা আছে তাহা এরূপ পাঠ করিয়াছি—

কায়স্থ শ্রীসজ্ঞেশগু [প্ত]......

নিকটেই একটি দেউল হইতে ষোড়শ মহাস্থবিরের এক মহাস্থবির বজ্রায়নিপুত্রের মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সকলেই জানেন মহাস্থবিরমূর্ত্তি ভারতবর্ষের অন্য কোথাও আর আবিষ্কৃত হয় নাই। অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তিব্বত-অভিযানে আনীত এবং মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় বর্ণিত মহাস্থবির-মূর্ত্তির সহিত মাপে ও আকৃতিতে এই মূর্ত্তিটির কোন প্রভেদ নাই। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বর্ণিত মূর্ত্তিসকল ৪।। ইঞ্চি উচ্চ—এই মূর্ত্তিটিও ঠিক ৪।। ইঞ্চি উচ্চ। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন যে তিনি বরদাতারা ও ষোড়শ মহাস্থবিরের বিশেষ ভক্ত ছিলেন এবং তিব্বতে তাহাদের পূজা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্ম-গ্রামের যেস্থানে তারা ও মহাস্থবিরের মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে সেই স্থানের কাছেই তাঁহার বসতবাটী ছিল এমন সিদ্ধান্ত করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে। নিকটবর্ত্তী নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা নামে খ্যাত প্রাচীন বসতবাটী সেই স্থান হইতে পারে।

সেনবংশের রাজধানীর অবস্থান লইয়া কোন গোলমালই নাই। প্রকাণ্ড পরিখা-বেষ্টিত বল্লালবাড়ী নামে পরিচিত সুরক্ষিতস্থান এখনও সর্ব্বজনবিদিত। সেনবংশীয়গণ শৈব ও সৌর মতের উপাসক ছিলেন। কেবল লক্ষ্মণসেন প্রথমে শৈব, পরে নারসিংহ এবং পরে পূরাদরের বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। বল্লালবাড়ীর চৌগাড়ার দক্ষিণ পাড়ে এক পুকুর হইতে প্রকাণ্ড এক নটেশ শিবের মূর্ত্তি বাহির হইয়াছে। তাহা এখন ঢাকা মিউজিয়মে আছে। এইখান হইতেই সম্ভবতঃ ঢাকার লিপিযুক্ত-চণ্ডীমূর্ত্তিটি লওয়া হইয়াছিল।

সেনবংশের সময় শ্রীবিক্রমপুর নগরের সকলের চেয়ে বেশী বিস্তৃতি হইয়াছিল—তাহা দৈর্ঘ্যে পাঁচ মাইল ও প্রস্থে পাঁচ মাইল এই বিপুল আয়তন ধারণ করিয়াছিল। নানা প্রমাণ দৃষ্টে প্রতীতি হয় যে পশ্চিম বিক্রমপুরের জলাভূমিকে সেনরাজগণ আবাসযোগ্য করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মিরকাদিমের খালের পূর্ব্বপাড়ে নাটেশ্বর নামে এক গ্রামে এক প্রকাণ্ড দেউল আছে। তাহা হইতে কেবল বিষ্ণুমূর্ত্তিই চারি পাঁচ খানা বাহির হইয়াছে। দেউলটির নাম হইতে বোধ হয় যে নটেশমূর্ত্তিও একদিন বাহির হওয়া সম্ভব। বোধ হয় দেউলটি বৈষ্ণব বর্ম্মরাজগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেনরাজগণ কর্ত্তৃক শৈব দেউলে পরিণত হয়। এই দেউলের অদূরবর্ত্তী সোনারঙ্গের দেউল হইতে প্রকাণ্ড একটি সূর্য্যমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। দেউলটি খুব বিপুলায়তন। তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত স্থানকে এখনও লোকে সিংহদরজা বলে। সিংহদরজার সম্মুখে মেদিনীমণ্ডলের দীঘি নামক প্রকাণ্ড এক দীঘি আছে। এই দীঘি ও সিংহদরজার মধ্যবর্ত্তী স্থানটুকুকে লোকে এখনও লুড়াইতগি বলে। রাস্তা দিয়া যাইবার সময় প্রত্যেক পথিক খড়কুটা দিয়া একটা লুড়া বানাইয়া সময় সময় অগ্নি দিয়া এবং অনেকসময় তাহা অগ্নিসংযুক্ত না করিয়াই দেউলের উদ্দেশে এক অশ্বত্থবৃক্ষের তলে নিক্ষেপ করিয়া যায়। এই প্রথাটি এখনও বর্ত্তমান আছে। ইহা সূর্য্যপূজার স্মৃতি বলিয়া মনে হয়।

সোনারঙ্গ হইতে একটু অগ্রসর হইয়া টঙ্গিবাড়ী নামক গ্রাম পাওয়া যায়। এক বৃদ্ধ মুসলমানের নিকট অবগত হইলাম যে টঙ্গিবাড়ীর দীঘির মধ্যে লক্ষ্মণসেনের জলটঙ ছিল। বল্লালসেনের নামই জনসাধারণে জানে, এ অবস্থায় বৃদ্ধের মুখে লক্ষ্মণসেনের নাম শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইয়াছিলাম। টঙ্গিবাড়ীর দীঘিটির মধ্য দিয়া বাঁধ দিয়া দীঘিকে হতশ্রী করিয়া ফেলা হইয়াছে। দীঘি হইতে একটি নৃসিংহ-মূর্ত্তি উঠায় মনে হইতেছে যে বৃদ্ধের কথা সত্য হইলেও হইতে পারে—পরমনারসিংহ লক্ষ্মণসেনের হয়ত এক গ্রীষ্মাবাস এই দীঘির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

আরিয়ল ও তৎসন্নিহিত বলই ও পুরাপাড়া গ্রামে সেনরাজগণের কীর্ত্তিচিহ্ন ছিল বলিয়া মনে হয়। বলই গ্রামে এক দেউল আছে এবং তৎসন্নিহিত স্থানকে রাণীহাটি বলে। বলই দেউল হইতে অনেক মূর্ত্তি বাহির

মহাদেব

চিত্রকর শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দের সৌজন্যে মুদ্রিত।

U. RAY & SONS.

হইয়াছে—তাহার অনেকগুলি আউটসাহি গ্রামে সুরক্ষিত আছে। পুরাপাড়া দেউল হইতে একটি অপূর্ব্বসুন্দর অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি বাহির হইয়াছিল—তাহা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া এখন রাজসাহীর চিত্রশালায় আছে। আরিয়ল গ্রামের দেউল হইতে প্রকাণ্ড সূর্য্যমূর্ত্তি বাহির হইয়াছিল, তাহা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া ঢাকা সাহিত্য-পরিষদে আছে। আরিয়ল গ্রামের যে অংশে দেউল অবস্থিত তাহাকে সানবান্ধা গ্রাম বলে। তাহার চারিদিকে বিল। তাহা দৃষ্টে মনে হয় যে বিল হইতে মাটি উঠাইয়া তাহা শানবান্ধা করিয়া অর্থাৎ ইষ্টক দিয়া বাঁধাইয়া তাহার উপর দেউল প্রতিষ্ঠিত হয়।

হিউনসঙের সমতট বর্ণনা হইতে অবগত হই যে সমতটে অনেক নিগ্রর্ন্থ জৈন অর্থাৎ উলঙ্গ জৈন ছিল। তাহারা কোথায় গেল ইহা এক বিস্ময়ের বিষয়। আমরা বিক্রমপুরের দুইখানা গ্রামের নামে মাত্র জৈনস্মৃতি দেখিতে পাই। এক জৈনসার; সেখানে এক অতি প্রাচীন ধর্ম্মস্থলী আছে, সেখানে এখনও প্রতি বৎসর মেলা বসে। আর এক বজ্রযোগিনী গ্রামের দক্ষিণস্থ ডেকরাপাড়া। যাহারা অনেক বয়সেও উলঙ্গ হইতে সঙ্কোচ বোধ করে না তাহাদিগকে ডেকরা বলিয়া গালি দেওয়া হয়। তাই ডেকরাপাড়া নামে বোধ হয় যে গ্রামটিতে উলঙ্গ জৈনদিগের নিবাস ছিল।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

কর্ম্মভূমি

(গান)

শান্তি-হাওয়ায় ঘুম পাড়িয়ে রেখোনা মা, দিনের বেলায়।
বিশ্বভরা লোকের সাথে মাত্‌ব আমি ধূলা-খেলায়।
তোমারি যে হাতের গড়া, খাঁটি তাই ও মাটির ধরা;
আমাদেরও স্নেহপ্রীতি রচেছ ত মাটির ঢেলায়।
সারাটা দিন ধরে খাটাও, যেথা হোক ছুটিয়ে পাঠাও,
ক্লান্তি এলেও আমায় হাঁটাও বিশ্ববাসের লোকের মেলায়।
স্বর্গটি ত স্বার্থে রচা; সে কূপে যে গন্ধ পচা!
নর-সেবার কর্ম্ম-ভূমি কেমন করে ঠেল্‌ব হেলায়?
শান্তি আনে সুখের সাজা; শক্তি দানে, কর তাজা!
ঝড় তুফানে দিব পাড়ি অকূল সাগর ক্ষুদ্র ভেলায়।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

অজন্তা গুহার চিত্রাবলী

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এক সময়ে অজন্তায় একটি বৃহৎ বৌদ্ধমঠ ছিল এবং গিরিগুহাগুলি হয় উপাসনা-মন্দির অথবা সাধকদিগের আবাসস্থান ছিল। সকল গুহাই চিত্রিত হইত। চিত্রের যাহা কিছু ভগ্নাবশেষ আজও বর্ত্তমান আছে তাহা দেখিলে বোঝা যায় যে চৈত্য অথবা উপাসনা-মন্দিরে কেবল প্রভু বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি অঙ্কিত হইত এবং বিহার অর্থাৎ বৌদ্ধ ভিক্ষু্দিগের বাসভবনে নানাবিধ চিত্র অঙ্কিত হইত। প্রায় সকল চিত্রই ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, ধর্ম্মমঠের উপযুক্ত উপাদান। কেবল শোভার জন্য এসকল চিত্রের রচনা হয় নাই, পবিত্র ধর্ম্মমন্দির আরও পুণ্যময় ও প্রযত করিবার জন্য ইহাদের প্রতিষ্ঠা।

অজন্তায় যে কেবল ধর্ম্মসম্বন্ধীর চিত্রই আছে এমন নয়; ঐহিক চিত্রও অনেক দেখা যায়। রাজসভা, মহাসমারোহ, বিলাস ও দাম্পত্য প্রেমের চিত্র ও হাস্যোদ্দীপক ব্যঙ্গচিত্র ইত্যাদি অনেক আছে। ঐতিহাসিক চিত্রও স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ চিত্রের সংখ্যা অতি অল্প। পূর্ব্বে হয়ত এরূপ চিত্র ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। যে কয়েকটি ঐতিহাসিক চিত্র এখনও বর্ত্তমান আছে তাহাতে ইহা বেশ প্রমাণ হয় যে প্রাচীনকালে প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি অবজ্ঞা করা হইত না, বরং তাহাদিগকে ধর্ম্মের সহিত একই সুত্রে একই স্থানে গাঁথিয়া চিরস্মরণীয় করিয়া রাখা হইত। অজন্তার আলঙ্কারিক চিত্রাবলীও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেবল স্তম্ভ ও ছাদের উপর এই-সকল চিত্রাবলী আছে। তাহাদের শোভা বর্দ্ধন করিবার নিমিত্তই এগুলি অঙ্কিত হইয়াছিল। এসকল চিত্রের গঠন-মাধুর্য্য অতি মনোহর ও অবর্ণনীয়। আলঙ্কারিক চিত্রকলার এমন রচনা-বৈচিত্র্য, এমন মুক্ত সৌন্দর্য্যের ছন্দোন্মেষ আর কোথাও দেখা যায় না।

অজন্তার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় চিত্রাবলীর বিষয় অধিকাংশই বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ জাতক হইতে গৃহীত। ভগবান বুদ্ধদেব শাক্যবংশীয় রাজকুমার সিদ্ধার্থরূপে জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে দেবতা মানব ও বিভিন্ন জীবের রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। জাতক-গ্রন্থে এই-সকল উপাখ্যান বিবৃত হইয়াছে। এই ধর্ম্মগ্রন্থের

ছয়দন্ত হস্তীর জলবিহার।
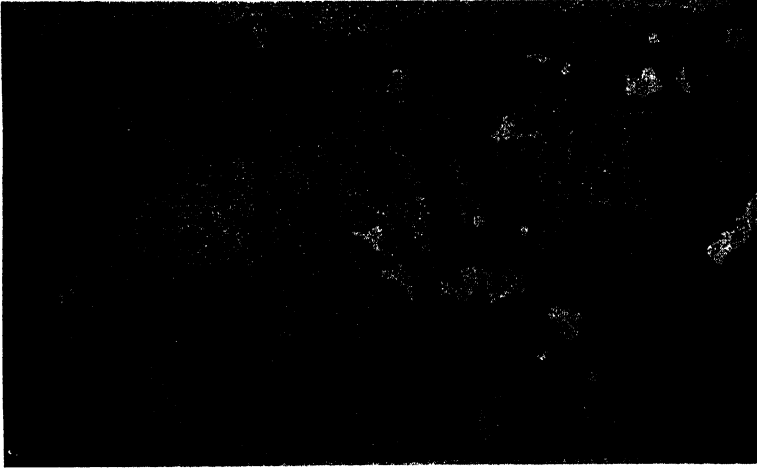
ছয়দন্ত হস্তীর বনবিহার।

অনেক উপাখ্যান অজন্তায় চিত্রিত দেখা যায়। উদাহরণ-স্বরূপ একটি উদ্ধৃত হইতেছে।

কোন এক সময়ে বোধিসত্ত্ব একটি ছয়দন্তবিশিষ্ট হস্তী-রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। হিমালয়ের অভেদ্য গিরি-মালা-পরিবেষ্টিত গভীর বনের মধ্যে একটি স্বচ্ছ শীতল কমল-শোভিত জলাশয়ের নিকট তিনি তাঁহার অনুগত আট সহস্র হস্তীদিগের সহিত বাস করিতেন। গ্রীষ্মাগমে যখন সরোবর শতদলে ভরিয়া উঠিত, বোধিসত্ত্ব তখন হস্তীদের লইয়া সেই কমলবনের মধ্যে মাতামাতি করিতেন। বোধি-সত্ত্বের দুই স্ত্রী ছিল, মহাসুভদ্রা ও চুল্লসুভদ্রা। গুণের জন্য তিনি মহাসুভদ্রাকেই অধিক ভাল বাসি-তেন। একদিন বোধিসত্ত্ব একটি সপ্তকোরকযুক্ত অপরূপ কমল পাইয়া-ছিলেন। তিনি উহা মহাসুভদ্রাকে দিলেন। আর এক দিবস বোধিসত্ত্ব মহাসুভদ্রা ও চুল্লসুভদ্রাকে লইয়া একটি বৃহৎ বৃক্ষের শীতল ছায়ায় বিশ্রাম করিতে করিতে শুঁড় দিয়া একটি শাখা নাড়াইলেন। তখন মহাসুভদ্রার মাথার উপর পুষ্পরেণু ঝরিয়া পড়িল, কিন্তু বিলাসিনী চুল্লসুভদ্রার মাথায় পড়িল কেবল শুষ্ক পাতা কাঠি ও পিপীলিকা। এই দুই ঘটনা সামান্য হইলেও চুল্লসুভদ্রা ঈর্ষায় জ্বলিয়া উঠিল। বোধিসত্ত্ব যে মহাসুভদ্রাকে অধিক প্রীতির চক্ষে দেখেন ইহা তাহার পক্ষে অসহ্য হইল। রোষে অন্ধ হইয়া সে বোধিসত্ত্বকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিল, ও কিরূপে তাঁহার উপর প্রতিশোধ লইবে তাহাই ভাবিতে লাগিল। অবশেষে সে একান্ত মনে প্রার্থনা করিল সে যেন পরজন্মে মধুরাজের কন্যা সুভদ্রা হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং কাশীরাজের সহিত তাহার পরিণয় হয়, তাহা হইলে সে কাশীরাজের সাহায্যে বোধিসত্ত্বের উপর যথেষ্ট প্রতিশোধ লইতে পারিবে।

কালে চুল্লসুভদ্রার কু-ইচ্ছা পূর্ণ হইল। সে মধুরাজের কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিল ও কাশীরাজের সহিত পরিণীত হইল। এ জন্মে তাঁহার নাম হইল সুভদ্রা। পূর্ব্বজন্মের সকল কথা তাহার স্মরণ ছিল। পূর্ব্ব জন্মের ঈর্ষা ও
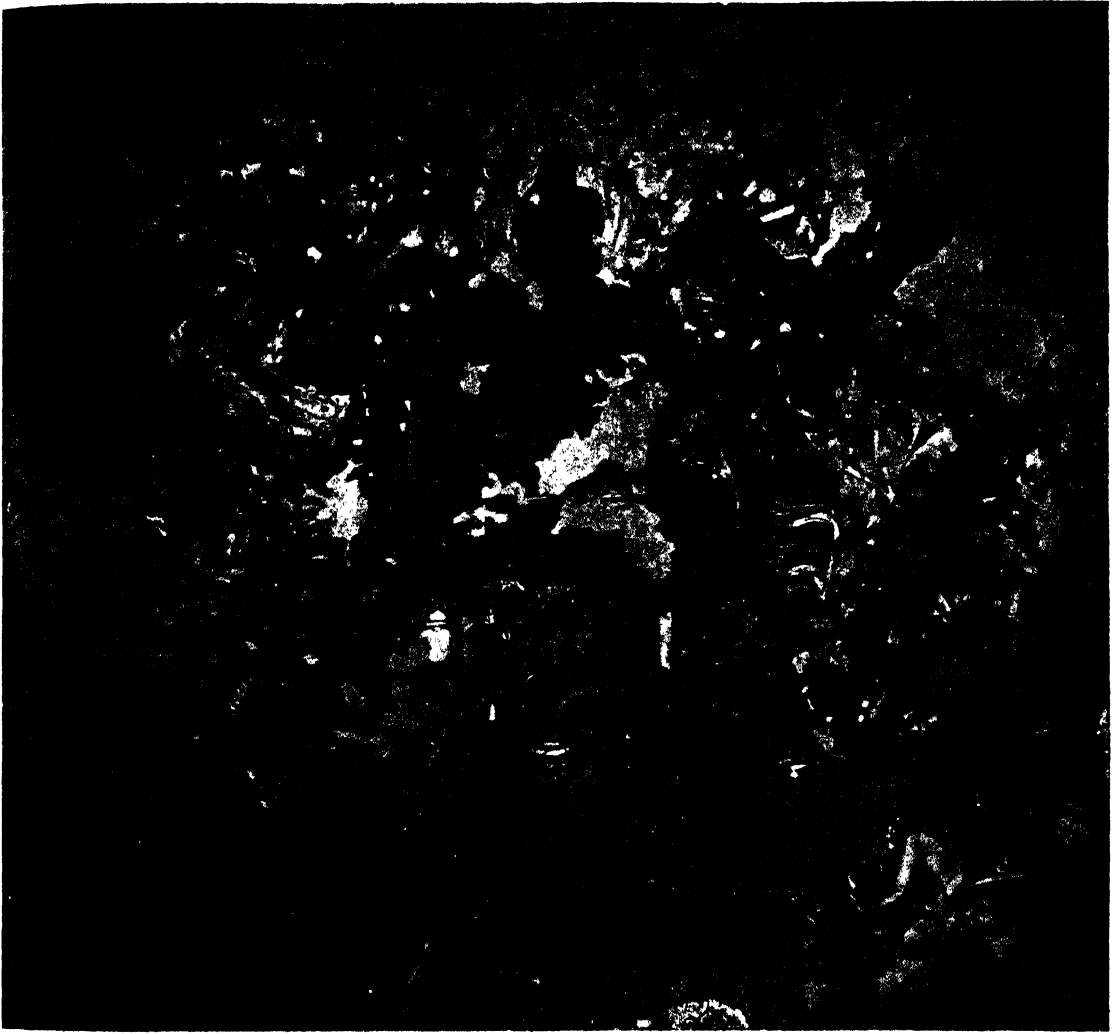
বুদ্ধদেবকে মারের প্রলোভন।

প্রতিশোধের ইচ্ছা তাহার মনে প্রবলভাবে জাগিতে-ছিল। ছয়দন্ত হস্তীর প্রাণবধ না করিতে পারিলে কিছুতেই তাহার তৃপ্তি বোধ হইতেছিল না। কাশীরাজের সহিত তাহার বিবাহ হইতেই সে ছয়দন্ত হস্তীর প্রাণ বিনাশ করিবার উপায় ভাবিতে লাগিল। কিন্তু কি করিয়া সে তাহার পূর্ব্বজন্মের প্রতিশোধের বাসনার কথা কাশীরাজকে জানাইবে স্থির করিতে পারিল না। অবশেষে সুভদ্রা পীড়ার ভান করিয়া শয্যাগত হইল। কাশীরাজ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি বার বার সুভদ্রাকে জিজ্ঞাসা করিলেন কি পাইলে সুভদ্রা প্রফুল্ল থাকিবে, সুস্থ হইয়া উঠিবে। অনেক সাধ্য সাধনার পর সুভদ্রা কহিল, সে যাহা চায় তাহা অনায়াসে লব্ধ নহে, কিন্তু কাশীরাজ ইচ্ছা করিলে আনাইয়া দিতে পারেন। কাশীরাজ তখনই সম্মত হইলেন যে সুভদ্রার অভিলষিত বস্তু আনাইয়া দিবেন। তখন সুভদ্রা ছয়দন্ত হস্তীর দন্তগুলি লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। ইহার অনতিকাল পরেই একজন ব্যাধ ছয়দন্ত হস্তীকে বধ করিয়া দন্তগুলি লইয়া আসিবার জন্য প্রেরিত হইল। সুভদ্রা হিমাচলে ছয়দন্ত হস্তীর নির্জ্জন আবাসস্থানের কথা ব্যাধকে বলিয়া দিল।

দুর্গম পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া ব্যাধ ছয়দন্ত

বুদ্ধদেবের ধর্ম্মপ্রচার।

হস্তীর আবাসস্থানে উপস্থিত হইল। বোধিসত্ত্ব প্রত্যহ স্নানান্তে একটি নিভৃত স্থানে ধ্যান করিতেন। ব্যাধ দেখিল হস্তীকে বধ করিবার সেই উপযুক্ত স্থান। সে তথায় একটি গর্ত্ত খুঁড়িয়া গৈরিক বস্ত্র পরিয়া বসিয়া রহিল। পর দিবস ব্যাধকে সেস্থানে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন কোন তাপস ভগবৎ-আরাধনায় বসিয়া আছেন। ব্যাধ ইতিমধ্যে বস্ত্রের মধ্যে লুক্কায়িত ধনুর্বাণ বাহির করিয়া তীক্ষ্ণ বিষাক্ত তীরের দ্বারা বোধিসত্ত্বকে বিদ্ধ করিল। মর্ম্মান্তিক আহত হইয়াও বোধিসত্ত্ব ব্যাধের কোন অনিষ্ট করিলেন না। কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন সে কেন তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিতেছে। ব্যাধ উত্তর দিল যে সে কাশীরাজের মহিষী সুভদ্রার ইচ্ছানুসারে তাঁহাকে বধ করিতে আসিয়াছে। তখন বোধিসত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন যে চুল্লসুভদ্রা পূর্ব্ব জন্মের ঈর্ষাবশতঃ এ জন্মে তাঁহার জীবন নাশ করাইতেছে। তিনি ব্যাধকে বলিলেন যে সে তাঁহার দন্তগুলি লইতে পারে। কিন্তু দন্তগুলি এত বৃহদাকার যে ব্যাধ কিছুতেই সেগুলি কাটিতে পারিল না, কেবল বোধিসত্ত্বকে অসহ্য যাতনা দিতে লাগিল। অবশেষে বোধিসত্ত্ব নিজেই শুঁড় দিয়া করাত ধরিয়া দন্তগুলি কাটিয়া দিলেন। ব্যাধ গজদন্ত লইয়া বিষণ্ণ মনে কাশী যাত্রা করিল। দেহ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে বোধিসত্ত্ব সুভদ্রার ইতিবৃত্ত ব্যাধকে বলিয়াছিলেন। ব্যাধ বোধিসত্ত্বের প্রাণ নাশ করিল বলিয়া তাহার ক্ষোভের সীমা ছিল না। সুভদ্রার নিকট গজদন্তগুলি ফেলিয়া

বুদ্ধদেবের ধর্ম্মপ্রচার।

দিয়া সে বোধিসত্ত্বের অপূর্ব্ব আত্মত্যাগের কথা বলিয়া কোন পুরস্কার না লইয়াই বিদায় লইল।

গজদন্তগুলি দেখিয়া পাপিষ্ঠা সুভদ্রা নিজের গর্হিত দুষ্টতা বুঝতে পারিল, আর সেই সঙ্গে বুঝিতে পারিল বোধিসত্ত্বের মহত্ত্ব। সে লজ্জায় ঘৃণায় অনুতপ্ত হইয়া সেই দিবসই কাশীরাজের ক্রোড়ে প্রাণ ত্যাগ করিল।

জাতক গ্রন্থের উপাখ্যান ব্যতিরেকে অজন্তায় বুদ্ধদেবের জীবনবৃত্তান্ত নানা স্থানে নানারূপে অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। রাজকুমার সিদ্ধার্থের জন্ম হইতে ভগবান বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণের অসংখ্য চিত্রের ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে। তাহার মধ্যে বুদ্ধের প্রলোভন নামক একটি বিখ্যাত চিত্রের প্রতিলিপি এই প্রবন্ধের সহিত মুদ্রিত হইতেছে।

পাছে রাজকুমার সিদ্ধার্থ. সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান এইজন্য সকল সময়ে তাঁহাকে আমোদ প্রমোদে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা হইত। কিন্তু কিছুকাল পরেই তিনি যখন পার্থিব সুখ সম্পদের অনিত্যতা বুঝিতে পারিলেন তখন তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন স্থির করিলেন। গভীর রাত্রে তিনি গৃহ ত্যাগ করিলেন। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে একবার মাত্র সুপ্ত সন্তান ও সহধর্ম্মিণীর প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। তাহার পর মানবের কল্যাণের জন্য নির্ব্বাণ পথের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন।

জ্ঞানালোক দেখিতে পাইবার পূর্ব্বে সিদ্ধার্থকে অনেক পরীক্ষার ভিতর দিয়া পার হইতে হয়। সন্ন্যাসী হইয়া প্রথমে তিনি কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন করিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিলেন না। জীবের মুক্তির উপায় কি কৃচ্ছ্রসাধনে? তিনি সে কথার উত্তর পাইলেন না। কঠোর তপস্যায় কেবল দেহ ক্ষীণ হইল; দেহের দুর্ব্বলতার সহিত মনের সংশয়, ও অনিশ্চয়তা

বুদ্ধগণ ও বোধিসত্ত্বগণ।

করিল। বায়ুর বেগ এমন প্রবল হইল যে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড পর্ব্বত-চ্যুত হইয়া চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, কিন্তু গৌতমের নিকটে আসিতেই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া সৌরভময় পুষ্পরেণুতে পরিবর্ত্তিত হইল। অবিশ্রান্ত জলের ধারায় মহাবন্যা উপস্থিত হইল কিন্তু সে মায়া-জল গৌতমের অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিল না। নিজের সকল দুষ্ট শক্তি দিয়া মার গৌতমের কোন অনিষ্ট করিতে পারিল না। পরাজিত মার ক্ষুণ্ণমনে বিদায় হইল। মহাতাপস বুদ্ধের জয় হইল। জ্ঞানালোকের অপূর্ব্ব জ্যোতি তাঁহার মনে প্রকাশ হইল। যখন তিনি সেই বোধিবৃক্ষের মূল হইতে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন তখন তিনি সর্ব্বজ্ঞ ভগবান বুদ্ধদেব। ইহার পর তিনি তাঁহার নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার আশ্বাসপ্রদ মুক্তিময়ী বাণীর আহ্বানে রাজা প্রজা, ধনী নির্ধন দেশ-দেশান্তর হইতে আসিয়া তাঁহার আশ্রয় ল'ল।

বাড়িল। এই সময় সকল দুষ্টাচারের অধিনায়ক 'মার' প্রলোভন ও ভীতি দ্বারা সিদ্ধার্থকে সংসারধর্ম্মে ফিরাইবার চেষ্টা করিল। বোধিবৃক্ষের মূলে সিদ্ধার্থ ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় পাপমতি মার সেখানে উপস্থিত হইল। তাহার আদেশে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য রিপুগণ সুন্দর মোহন বা বীভৎস রূপ ধারণ করিয়া সিদ্ধার্থের ধ্যান ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু মহাতাপস সিদ্ধার্থ তখন বাহ্যজ্ঞান-শূন্য। রিপুগণের চেষ্টা ব্যর্থ হইলে মার ভীষণ বাত্যা ও অবিশ্রান্ত বৃষ্টির দ্বারা গৌতমের অনিষ্ট করিতে চেষ্টা

অজন্তা চিত্রাবলীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করা। প্রাণে যাহার অনুভূতি সহজে হয় না চিত্রে তাহার রূপ দেখিলে ভাবার্থ বুঝিতে অনেক সময়ে সুবিধা হয়। অশিক্ষিতের পক্ষে নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিতে ও বুঝিতে পারা সহজ নয়। ধর্ম্মের সার উদ্দেশ্য জ্ঞানালোকের উপলব্ধি। জ্ঞানের লক্ষ্য সত্য। এই সত্যের উপলব্ধি করাইবার জন্য নানা ধর্ম্মের নানা রূপ। অজন্তার এই অপূর্ব্ব ধর্ম্মচিত্রাবলী বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য নিরন্তর সচেষ্ট ছিল। এসকল চিত্র ধর্ম্মের কূট তত্ত্বকথা বাদ দিয়া সরলভাবে সত্যের আনন্দপ্রদ আদর্শ বর্ণনা করিয়াছে।

ভাষায় যাহা গভীর, শিল্পে তাহারই প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা হইয়াছে। চিত্রগুলির পূর্ব্বগৌরবের আর কিছু অবশিষ্ট নাই। কিন্তু এখনও এই পরিত্যক্ত গুহাগুলিতে এই লুপ্তপ্রায় চিত্রাবলী দেখিলে বৌদ্ধধর্ম্মের বীজমন্ত্র নিমেষের মধ্যেই হৃদয়ঙ্গম হয়। বোধিসত্ত্বের অপূর্ব্ব আত্মত্যাগের মাহাত্ম্য; গৌতমের জন্ম; তাঁহার বাল্যক্রীড়া; যশোধরার সহিত তাঁহার পরিণয়; সংসারধর্ম্মে তাঁহার বৈরাগ্য; সংসার ত্যাগ; ধর্ম্মপ্রচার ও অবশেষে মহাপরিনির্ব্বাণ—এই-সকল অপূর্ব্ব লীলা একের পর অন্যটি ধীরে ধীরে চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে এবং এককালে বৌদ্ধধর্ম্ম কি এক মহান শান্তিময় রূপ ধারণ করিয়াছিল তাহা আপনি হৃদয়ঙ্গম হইয়া যায়।

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

হারামণি

[এই বিভাগে আমরা অজ্ঞাত অখ্যাত প্রাচীন কবির বা নিরক্ষর স্বল্পাক্ষর গ্রাম্য কবির উৎকৃষ্ট কবিতা ও গান ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিব। প্রবাসীর পাঠকপাঠিকা এই কার্য্যে আমাদের সহায় হইবেন আশা করি। অনেক গ্রামেই এমন নিরক্ষর বা স্বল্পাক্ষর কবি মাঝে মাঝে দেখা যায় যাঁহারা লেখাপড়া অধিক না জানা সত্ত্বেও স্বভাবতঃ উৎকৃষ্ট ভাবের কবিত্বরসমধুর রচনা করিয়া থাকেন; কবিওয়ালা, তর্জ্জাওয়ালা জারিওয়ালা, বাউল, দরবেশ, ফকির প্রভৃতি অনেকে এই দলের। প্রবাসীর পাঠক-পাঠিকারা ইহাঁদের যথার্থ কবিত্বপূর্ণ বা রসভাবপূর্ণ রচনা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলে আমরা সাদরে প্রকাশ করিব।]

বাউলের গান

যেদিন জনম সেদিন আমি দীক্ষা পেয়েছি,
এক অক্ষরের মন্ত্র মায়ের ভিক্ষা পেয়েছি।
দীক্ষা বিনা চলে না যে একটি প্রাণের শ্বাস,
এই কথাতে গভীর আমার রয়েছে বিশ্বাস।
আমি নীর পেয়েছি, ক্ষীর পেয়েছি, পবাণ পেয়েছি,
তারি সাথে সাথে মায়ের শিক্ষা পেয়েছি॥

[কেন্দুবিল্বে জয়দেবের মেলায় মেদিনীপুরের বাউলের কাছে শোনা। রচয়িতা বা সময় সম্বন্ধে কিছুই জানা নাই।]

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন।

গান

তুমি আমায় নেওনা টেনে,
আমায়, এদেশে বান্দিয়া রাখ্‌ছে, কামিনী কাঞ্চনে।
একা মোরে এ বিদেশে,
পাঠাইয়া কোন্ সাহসে,
আছ তুমি ঘরে বসে,
হৃদয় বেন্দে পাষাণে।
অনেক দিন হয় সঙ্গ ছাড়া,
হয়েছি জীবনে মরা,
তোমার কাছে যেতে, রে প্রাণ,
প্রাণ আমার সদা টানে।
অনেক দিন হয় এসেছি হেথা,
পাইনা কোনো খবর বার্ত্তা,
তোমার ঠিকানা ভুলিয়া, রে প্রাণ,
কান্দি কেবল রাত্র দিনে।
একবার মোরে করে স্মরণ,
প্রাণের জ্বালা কর বারণ,
তুমি যে নাথ, কার্য্য কারণ,
মনোমোহন তা' খুব জানে।

মনোমোহনের গান প্রায় প্রতি সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া পল্লী-ভূমির পথে প্রান্তরে গীত হয়। কিন্তু পল্লীবাসী গায়কগণের নিকট হইতে, মনোমোহনের বাসস্থান কোথায়, তিনি জীবিত আছেন কি না, তাঁহার গানগুলি কোন্ কালের লেখা, এই-সব তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া দেখিতে গেলে, তাঁহার গানগুলি নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর মনে হয় না। একটি মহামিলনের আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় গ্রাম্য কবি মনোমোহন, গ্রাম্য ভাষার ভিতর দিয়া, গাহিয়াছেন, "তুমি আমায় নেও না টেনে" ইত্যাদি।

মনোমোহন, গ্রাম্য কবি—তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তিনি নিতান্ত নিরক্ষর—এ কথা বলিতে পারা যায় না। "কারণ" ও "কার্য্য" সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান আছে। ভগবানকে সমুদয় "কারণ" ও "কার্য্যের" আধার-স্বরূপে গ্রহণ করিয়া তিনি বলিয়াছেন,—

"তুমি যে, নাথ, কার্য্য কারণ
মনোমোহন তা' খুব জানে।"

তাঁহার গানগুলি যে কোনো পল্লীবিশেষেই আবদ্ধ—এমন মনে হয় না। তাঁহার রচিত, এই প্রকার, বহু গান যে আছে, তাহারও প্রমাণ পাইয়াছি। "প্রবাসীর" পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ মনোমোহনের সবিশেষ তত্ত্ব ও তাঁহার গানগুলি ক্রমশঃ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে পারিলে ভালো হয়।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী।

স্বরলিপি

সা সা ।। সা রা রা। মা পা পা I র্সা ণা ণা। ধা পা ধপা I
আ মার যে দি ন জ ন ম সে দি ন আ মি ০

মা । পা। ধা পা ।। মগা গা ।। । । । I
দী ০ ক্ষা পে য়ে ০ ছি ০ ০ ০ ০ ০

র্সা না ।। র্সা র্সা র্র্সা। ণা র্সা ণা। ধা পা ধপা I
এক অ ০ ক্ষ রে র ম ন্ ত্র মা য়ে র

মা । পা। ধা পা ধপা I মগা গা ।। । । । II
ভি ০ ক্ষা পে য়ে ০ ছি ০ ০ ০ ০ ০

II মা । ধা। ধা ধা না। র্সা র্সা র্গা। র্রা র্সা র্র্সা I
দী ০ ক্ষা বি না ০ চ লে ০ না যে ০

না র্সা ধা। না না না। র্সা । । I । । র্সা I
এ ক টি প্রা ণে র শ্বা ০ ০ ০ ০ স

ধা র্সা না। র্সা র্সা র্র্সা। নর্সা না না। ধা পা ধপা I
এ ই ক থা তে ০ গ ভী র আ মা র

মা পা ।। ধা পা ধপা। ম গা ।। গা গা মা I
র য়ে ০ ছে বি ০ শ্বা ০ ০ স আ মি

I পা র্সা না। র্সা র্সা র্র্সা। না র্সা না। ধা পা ধপা I
নী র পে য়ে ছি ০ ক্ষী র পে য়ে ছি ০

মা পা পা। ধা পা ধপা I মা গা ।। । । । I
প রা ণ পে য়ে ০ ছি ০ ০ ০ ০ ০

পা র্সা না। র্সা র্সা র্র্সা। না র্সা না। ধা পা ধপা I
তা রি ০ সা থে ০ সা থে ০ মা য়ে র

মা পা পা। ধা পা ধপা। মা গা ।। । সা সা I
শি ০ ক্ষা পে য়ে ০ ছি ০ ০ ০ আ মার

সা রা রা। মা পা পা। মগা গা ।। । রা সা II II
যে দি ন জ ন ম.................... ছি ০ ০ ০ ০ ০

(প্রবাসীর জন্য লিখিত)

শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কষ্টিপাথর

পথে পথে।

নালাটি হচ্ছে মানুষের হাতে কাটা, সুতরাং নালার জল সোজা পথটি বেয়ে গাছের গোড়ায় বা ধানের ক্ষেতে এসে পড়তে বাধ্য। কিন্তু নদী—যেটা সৃষ্ট হচ্ছে—সে নিজের পথ নিজেই করে নেয়, দিনে দিনে তিলে তিলে সে শক্তি সঞ্চয় করে স্বচ্ছন্দ স্বাধীন গতিতে পথের বাধা অতিক্রম করে ক্রমশঃ পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়।

স্বাধীন যে পথ, স্বাভাবিক যে পথ, তাতে প্রাণ আছে, বৈচিত্র্য আছে, শক্তি আছে, গতি-স্থিতির ছন্দ আছে; আর মানুষের হাতে-বাঁধা পথটিতে এ-সকলের একটাও নাই—স্থিতিটুকু ছাড়া।

আমাদের শিল্প কোন্ পথে যাবে? বাঁধের পথে কি বাঁধ-ভাঙা স্বাভাবিক পথে?—এই প্রশ্নই চারিদিকে শুনতে পাচ্ছি। মহাজনদের পদাঙ্কচিহ্নিত বাঁধা পথটি আমাদের চোখের সম্মুখে রয়েছে—এবং নীতি ও শিল্প-শাস্ত্রের সাইন্‌বোর্ডখানি সেই পথের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করে বল্‌ছে—'নান্যেন মার্গেন। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।'

পথ যখন সম্মুখে পরিষ্কার পড়ে রয়েছে তখন শিল্পটাকে এই পথেই চালাও—এই কথা হচ্ছে যারা প্রাচীন তাদের কথা। তারা বলবে, পণ্ডিতদের অভিমত যে শিল্প, তাই শিল্প; এবং মনুসংহিতার মতো শিল্পসংহিতার বচনগুলোই পালন করে চলাই প্রশস্ত। পণ্ডিতের দেওয়া মান-পরিমাণের নাগপাশে শিল্পীর সমস্ত শক্তি এবং স্ফূর্ত্তি মূর্চ্ছাহত। প্রাচীন ভারতের লক্ষকোটী শিল্পী, যাদের প্রাণের অভাব ছিল না, পণ্ডিতদের অপেক্ষা সুকুমার মনোবৃত্তি-সকলেরও অভাব ছিল না, তারা একাসনে একমনে বসে শুক্র-নীতি ও মানসারের পুঁথির রেখাগণিত ও অগণিত সম্পাদ্য প্রতিজ্ঞাসকল পূর্ণ করছে এবং তারি ফলগুলি স্তূপাকার করে সাজিয়ে যাচ্ছে—কখনো রাজমন্দিরের মতো, কখনো বা তেত্রিশ কোটী মূর্ত্তির বত্রিশ-সিংহাসনের মতো। এই মন্দিরে এই সিংহাসনে ভারতশিল্পীরা তাদের প্রতিভাকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছে বল্লে ভুল হয়, কেননা, সিংহাসন কি মন্দির, যা-কিছু তার গড়েছে, সে তাদের হৃদয়-দেবতার জন্য নিজের মনোমত করে গড়তে তাদের অনুমতি ছিল না। গড়েছে তারা অনুশাসন এবং হুকুমের চাকর, দেশের বিক্রমাদিত্যসকলের জন্য—যারা প্রাচীনের ছদ্মবেশে আজও সমান-বিক্রমে রাজত্ব করছে—আমাদের ধর্ম্মে কর্ম্মে শিক্ষায় দীক্ষায়।

প্রাচীন ভারতে শিল্পীও ছিল, শিল্পসামগ্রীর আদর করবার মানুষও ছিল। যদি কেবল এই দুই দলই থাকতো তবে আমাদের শিল্প হয়তো পরিপূর্ণ মূর্ত্তিতে যথার্থরূপে দেখা দিত—যেমন দেখা দিয়েছে চীন-শিল্প জাপান-শিল্প। কিন্তু তা হয়নি। এই দুই জাতিকে দুই পায়ে চেপে দাঁড়িয়ে আছে দেখি আর-এক বলবান জাতি, বুক ফুলিয়ে যে বল্‌ছে, 'নান্যেন মার্গেন'—আমরা যে পথ বেঁধে দিলেম শিল্পের জন্য এই পথই একমাত্র বাঞ্ছনীয়, তোমার নিজের যদি কোন বাঞ্ছা কি বাঞ্ছিত থাকে থাক্, আমরা যা চাই, যে রূপটা চাই, সেইটাই দাও।

ভারতবর্ষে শিল্প, শিল্প-আচার্য্যগণের শাস্ত্রসংহিতায় বাঁধা পড়ে সম্পূর্ণ বাড়তে পারেনি। তাতে পাতাও ধরেছে, ফুলও ফুটেছে, কিন্তু মঞ্চে-বাঁধা পঞ্চবটীর মতো সে কোনদিন অনেকখানি ছায়া দেয়নি ব দেশের অন্তরের অন্তরেও শিকড় গাড়েনি। সেটা-থেকে আমরা শিল্পাচার্য্যের কলাবিদ্যার প্রকৃষ্ট পরিচয় লাভ করি; আর লাভ করি—শিল্পীর স্বাধীনতার উপরে শিল্পাচার্য্যগণের হস্তক্ষেপ করার আদ্যন্ত একটি সুস্পষ্ট ইতিহাস।

পণ্ডিতগণের দিক থেকে দেখতে গেলে যেটা 'পণ্ডিতানাং মতম্' সেটারই গুরুত্ব অধিক; কিন্তু শিল্প এবং শিল্পীর দিক দিয়ে দেখলে বলতেই হবে যে, শিল্পের পক্ষে শিল্পীর অভিমত হওয়াই সর্ব্বতোভাবে উচিত এবং সেই পথই শ্রেষ্ঠপথ, যে পথ শিল্পের জন্যে শিল্পী নিজে আবিষ্কার করে।

কৃত্তদাসের কাজগুলোকে ভক্তের সেবার সঙ্গে তুলনা করলে যে ভুলটি করা হয়, আমাদের হ্যাট্‌কোটের ফ্যাসন্‌টাকে মায়ের হাতের কাঁথাখানি বলে ভুল করলে যে মূর্খতাটা করা হয়, পণ্ডিতানাং মতম্ যেটা সেটাকে শিল্পীরও অভিমত বল্লে ঠিক সেই ভুল আমাদের করা হবে। পণ্ডিতেরা খুব উচ্চজাতি হতে পারেন এবং তাঁদের অভিমত শিল্পটাও খুব বড়-দরেরও হতে পারে, কিন্তু সে বা সে-জাতির শিল্প এত বড় নয় যে আমাদের বোলে, শিল্পীর নিজস্ব বোলে পরিচয় দেওয়া চলে। শিল্পটা পণ্ডিতদেরই বচনগুলির তেত্রিশ-কোটী পাষাণ-মূর্ত্তি,—দুই পায়ে শিল্পীর হৃদ্‌পদ্ম দলিত করে বরাভয়ের অভিনয় করছে। প্রাচীন ভারতশিল্পে এই করুণ রসটুকুই সত্যকার, কেননা এইটুকুর সঙ্গেই শিল্পীর প্রাণের যোগ ছিল; আর যে রসগুলো পাষাণের ভানে ধরা যাচ্ছে সেগুলোর সঙ্গে শাস্ত্র-বচনের যোগ, শাস্ত্রীগণের যোগ;—যথার্থ রসের উৎপত্তির যোগাযোগ সেখানে নাই।

আমরা যখন চলতে চাচ্ছি, পথ চাচ্ছি, তখন গোড়া-থেকেই প্রাচীনের এই ভয়ঙ্কর বোঝাটাকে আমাদের কাঁধ থেকে নামাতে হবেই হবে। আর-একবার আমাদের সেইখানে বেরিয়ে দাঁড়াতে হবে যেখানে আমরা শিল্পী সম্পূর্ণ স্বাধীন, আমাদের পুরাতনটা আমাদের বাধা দেবে না, অন্যের নতুনটাও আমাদের ভুলিয়ে রাখতে পারবে না। নিজের মনের নবীনতা সজীবতা অক্ষুণ্ণ রেখে চলাই হচ্ছে চলবার শ্রেষ্ঠ উপায় এবং নিজের দুখানা পা সুখ-দুঃখ আলো-আঁধারের তালে-তালে যেখান দিয়ে উঠে-পড়ে চলে যায় সেই পথই হচ্ছে আমাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পথ। শাস্ত্রগড়া শিল্প নয়, শিল্পীর মনগড়া শিল্পই হচ্ছে উত্তম শিল্প—একথা সপ্রমাণ করতে আমরাই যে নতুন করে উদ্যত হয়েচি তা নয়, প্রাচীন কালেও শিল্পীরা প্রাচীনতার বোঝা বারবার নামিয়েচেন এবং পণ্ডিতানাং মতম্ ঠেলে নিজের মতকেই প্রতিষ্ঠা দিতে চেষ্টা করেছেন। শিল্প-শাস্ত্রকার শুক্রাচার্য্য সেটাকে 'একেষাং মতম্' বলে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেও পারেন নি। এই যে 'একেষাং মতম্'—যার মূল মন্ত্র হচ্ছে 'লগ্নং যত্র চ যস্য হৃদ্' বা মনোমত পথে যাওয়া—তাকে ঠেলে রাখা পণ্ডিতদের সাধ্য হয় নি, হবেও না। মনের সোনার কাঠি, শাস্ত্রকারের রূপোর কাঠিকে জয় করে প্রাচীনকালেও এতটা কাজ করেছিল যে, পণ্ডিতকেও সেটার জন্য দুই ছত্র শ্লোক রচনা করতে হয়েচে এবং সেই শ্লোকটাকে শিল্পশাস্ত্রের ভিতরে স্থান দিতে হয়েছে।

হৃদয় হৃদয়, যে পথে সে চলে সেইই পথ, যাকে সে চায় তাকেই পাওয়া, যা সে দেয় সেই দানই শিল্পে শ্রেষ্ঠদান।

এই যে পণ্ডিতানাং মতম্ ঠেলে আমরা শিল্পীর মনোমত শিল্পকে বরণ করতে চাচ্চি এর জন্য বিজ্ঞদের কাছ থেকে, প্রাচীনদের কাছ থেকে, এবং দেখতে নবীন হলেও সমস্ত মনটি যাদের জরায় সাদা হয়ে গেছে—কোন রং যাতে নেই—এমন-সব মানবকদের কাছ থেকে আমাদের অনেক কথা শুনতে হবে। আমরা যে নিজেদের সহজ ভঙ্গীতে বলতে চল্‌তে এবং লিখতে চাই এটা ওদের প্রাণে সইবে না আমরা যে গণপতির শুঁড়টিতে তেল সিঁদুর মাখিয়ে শুঁড়টির আধ্যাত্মিক অর্থের চিন্তা করতে ব্যস্ত নই, কিন্তু সেটাকে দিয়ে আঁকসীর কাজ করিয়ে নিতে চাচ্ছি এই-সব ছেলেমানুষির জন্য, লতার মতো মনোমত পথে লতিয়ে ওঠার জন্য, এই আমাদের টেরচা চোখের ইঙ্গিত আভাষ পণ্ডিতগণের উপরে নিক্ষেপ করার জন্য ওঁরা আমাদের কিছুতে ক্ষমা

করবেন না। আমরা যে শাস্ত্রকারকে জানি না, শাস্ত্রকে মানি না, চাইনা যে আমরা anatomical accuracy বা Law of perspective! আমরা আমাদের নিজস্বটা—তা সে যতটাই হোকনা—বিশ্বমানবের পাদপীঠরূপ খুব একটা বড় এবং পণ্ডিতগণের অভিমত জায়গায় সযত্নে হাজির না করে দিয়ে এই যে অবাধে ফুটে উঠতে চাচ্ছি, আনন্দের বীজ মুঠো মুঠো আবীরের মতো যথা-তথা বিকীর্ণ করে মরতে চাচ্ছি, আমরা বাবাজীদের তুলসীমঞ্চে বা বাবুদের সখের মালঞ্চে যে বাঁধ পড়তে চাচ্ছিনে, এই যে আমাদের যা-তা নিয়ে আমরা যা-খুসি-তাই করতে চাচ্ছি, এর জন্য কথা আমাদের অনেক শুনতে হবে;—শিল্পাচারভ্রষ্টতা মূঢ়তা ইত্যাদি অনেক কথার ইটপাটকেল এবং আরো কত কি তার ঠিকানা কি! কিন্তু আমরা যেন ভুলি না যে আমাদের প্রাণের একতারা প্রাণেশের হাতে দিলে তবেই তাতে নিতান্তুরের ঝঙ্কারটি উঠবে, নইলে কেবলি ওস্তাদি হুঙ্কার।

(ভারতী, জ্যৈষ্ঠ) শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* *
*

বিজ্ঞানে রমণীর প্রভাব।

ভারতবাসী নারীর মূল্য জানে না, নারীজাতিকে সম্মান করিতে জানে না, ভারতে নারী একটা হেয় জিনিষ। আমরা নারী জাতিকে বন্দী করিবার চেষ্টা করিয়াছি, শিক্ষার আলোক হইতে বহু শত যোজন দূরে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি। আজ যে ভারতের সমস্ত গৃহই কুসংস্কারাচ্ছন্ন তাহা আমাদের এই নিজকৃত পাপের ফল। আজ পুরুষগণ যতই সভ্য হউন না কেন তিনি পরিবারিক কুসংস্কারের হাত হইতে যে নিষ্কৃতি না পাইয়া ক্ষোভে দুঃখে মর্ম্মাহত হইতেছেন ইহা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ-রোপিত বিষবৃক্ষের ফল। যাহাতে ভবিষ্যতে আমাদের সন্তানসন্ততিদিগকে ইহা ভোগ করিতে না হয় তাহার জন্য, এই বিষের বীজ যাহাতে আর না উপ্ত হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য করিতে হইবে।

ভারতবাসী আজ বৈজ্ঞানিক হইতে চাহেন, তাঁহারা আজ উন্নতির সোপানে উঠিতে চাহেন, কিন্তু আজ নারীজাতিকে বাদ দিয়া তিনি উঠিতে পারেন না। আমি শিক্ষিত হইয়াও কুসংস্কারাচ্ছন্ন, স্বাধীন হইয়াও শৃঙ্খলিত; ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় কি থাকিতে পারে।

আজ যে আমাদের দেশে মহামারী রোগ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছে তাহার নানা প্রকার প্রতিষেধক জানিয়াও আমরা কিছু করিতে পারিতেছি না কেন? আমরা স্ত্রীলোককে শিক্ষা দিই নাই।

আজ কি ভারতের বৈজ্ঞানিক বুকের উপর হাত দিয়া জোর করিয়া বলিতে পারেন যে তাঁহার গৃহে প্রত্যহ অবৈজ্ঞানিক ভাবে চিকিৎসা হইতেছে না, যে স্থলে বিশুদ্ধ বায়ু আসা দরকার, সে স্থলে বিশুদ্ধ বায়ু ত দূরের কথা বায়ু চলাচলের পথ একেবারেই রুদ্ধ হয় না? আরও দুঃখের বিষয় এই যে স্ত্রীলোকেরা বিজ্ঞ চিকিৎসক অপেক্ষা হাতুড়িয়াকে বেশী বিশ্বাস করিতেছেন। এইখানে বিজ্ঞান বাস্তবিকই পরাস্ত হইয়াছে।

শুধু বিজ্ঞানের সেবা করিলে লাভ কি? জ্ঞান যদি না ছড়াইয়া পড়িল তবে জ্ঞান নাই বা অর্জ্জন করিলাম! দেশের কাজে বিজ্ঞান লাগিতেছে না। তাহার কারণ কি? কুসংস্কার। কোন্ বৈজ্ঞানিকের ঘরে কুসংস্কার নাই? এমন বাঙ্গালীর বাড়ী খুব কমই আছে যাহাতে ইন্দুর, আরসুলা, টিক্‌টিকী, উইচিংড়া দুই দশ শত নাই। এমন বৈজ্ঞানিক গৃহস্থ খুব কমই আছেন, যাঁহার ঘরের তাকে ধূলা নাই, রান্নাঘরের হাঁড়ি ও নেতা অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন নহে, যিনি একই মৃত্তিকা-ভাণ্ড যতদিন না ভাঙ্গিয়া যায় ততদিন অন্ন সিদ্ধ করিয়া না খান। এমন গৃহস্থ কোথায় যে তিনি উঠানের উপর সমস্ত দিন মাছের আঁইস ও কুটনার খোলা ফেলিয়া না রাখেন?

তাই বলিতেছি বাস্তবিক বৈজ্ঞানিক হইতে হইলে নারীজাতিকে সঙ্গের সাথী করিতে হইবে। জ্ঞানের আলোক তাহাদের নিকট লইয়া যাইতে হইবে।

স্ত্রীজাতিকে যে বিজ্ঞানাগারে গিয়া test tube লইয়া পরীক্ষা করিতে হইবে অথবা "European reputation" অর্জ্জন করিতে হইবে আমার বক্তব্য তাহা নহে। সাধারণ জ্ঞান না থাকিলে মানুষ আপনা হইতেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। মানুষের স্বভাব, যাহা দেখে সে তাহার অর্থ বুঝিতে চায়, কিন্তু যখন সে জ্ঞানের দ্বার, শিক্ষার দ্বারা অর্থ বুঝিতে পারে না তখন তাহাকে বাধ্য হইয়া অস্বাভাবিক বিষয়ের আলোচনা, ভৌতিক বিষয়ের গবেষণা করিতে হয়। একারণেই যেখানে যত জ্ঞানের অভাব সেইখানেই তত কুসংস্কার দেখিতে পাওয়া যায়।

আমাদের চতুষ্পার্শ্বে আমরা যাহা দেখিব আমরা সেই মতই শিক্ষা করিব। নির্দ্দয়ের গৃহে সহৃদয়ের জন্ম অসম্ভব বা অভাবনীয়। তাই কবে নির্দ্দয়ের গৃহে প্রহ্লাদ জন্মিয়াছিল তাহা লোকে মনে করিয়া রহিয়াছে।

আমাদের আবহাওয়াটা আদৌ বৈজ্ঞানিক নহে। বাল্য হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুর শেষ দণ্ড পর্য্যন্ত অবৈজ্ঞানিক অবস্থায় পড়িয়া থাকি। আমাদের শিশু অবৈজ্ঞানিক ভাবে পালিত হয়। মাতা বিজ্ঞানের ধার ধারা ত দূরের কথা, সাধারণ জ্ঞানে বঞ্চিত। তিনি কিরূপে বৈজ্ঞানিক মতে শিশু পালন করিবেন? আজন্ম যিনি কুসংস্কারে আছেন তাঁহার নিকট কি আশা করা যায়? আমাদের দেশের এত শিশু মারা যাইবার কারণ মাতার অজ্ঞতা।

শিশু যখন দিন দিন বাড়িতে থাকে জ্ঞানহীনা মাতা তাহাকে দিন দিন জ্ঞানের দ্বার দেখাইয়া না দিয়া অজ্ঞানতার গাঢ় অন্ধকারের পথ দেখাইয়া দেন। শিশু তখন "জুজু" শিখে; সে জুজু, সে ভূত অনেকেরই পক্ষে ইহজীবনে আর সঙ্গ ত্যাগ করে না। জ্ঞানের বদলে অজ্ঞানতা দৃঢ়ভাবে শিশুর মন অধিকার করিয়া বসে। দিন দিন সে বেশ কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া উঠে।

বাল্যের এই শিক্ষার এতদূর প্রভাব যে বয়সে বিজ্ঞান শিখিয়াও সেই ভ্রান্তি যায় না। বরং আবার অনেক সময় তাহাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলিকেই বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে।

এ সবের কারণ কি? ইহার প্রতিকারই বা কি? আমরা শিক্ষিত হইয়াও কেন মূর্খ হই; জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া, শাস্ত্র পড়িয়া কেন শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করি? এই প্রশ্নের সমাধান করিবার সময় আসিয়াছে। একথার উত্তর এই যে, আমরা যদি স্ত্রীজাতিকে শিক্ষা দিতাম তাহা হইলে আমাদের দুর্দ্দশাটা এত হইত না।

সাধারণতঃ আমাদের মানসিক তেজটা অনেক কম—কার্য্যে লিপ্সা, "সমুদ্র শুষিব" এরূপ পণ খুবই কম। এসব গুণ না থাকায় শিশুতে সেসব গুণ পিতা মাতার তরফ হইতে আসিতে পারে না। বিজ্ঞান আলোচনা করিতে অনেকটা তেজ, অনেকটা হৃদয়ের বল, অনেকটা সত্যের আকাঙ্ক্ষা থাকা চাই. কর্ম্মে আসক্তি থাকা চাই। কিন্তু আমাদের কয়জনের কর্ম্মে আসক্তি আছে? আমরা কিছু বেশী "ফাঁকিবাজ" হইয়া পড়িয়াছি। কার্য্য করিতে যাইয়া কোন একটা বাধা পাইলে দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্যে লাগা আমাদের অনেকের পক্ষেই ঘটিয়া উঠে না; বরং কার্য্য না করিবার ইচ্ছাটাই প্রবল হইতে থাকে। কাজেই পিতার এই দোষগুলা অল্প-বিস্তর পুত্রে যাইবে তাহা বিজ্ঞানসম্মত।

সাধারণ বাঙ্গালী-রমণী বড়ই ভীরু। সাহস পুরুষেরই নাই, ত নারীর কথা কি? সত্যের জন্য কোনও কথা নারী জোর করিয়া বলিতে পারে না। শাস্ত্রকার হইতে আরম্ভ করিয়া নিরক্ষর লোক পর্য্যন্ত নারীকে শাসনে রাখিয়া পিশিয়া ফেলিতে চায়। এখানে কি সদ্গুণের আশা করা যাইতে পারে? নারীর কাহারও সহিত মেশামিশি করা ত দূরের কথা, বাক্যালাপও নিষিদ্ধ। বাল্যকাল হইতে অসূর্য্যম্পশ্যা হইয়া তাঁহাকে জীবন কাটাইতে হইতেছে। জ্ঞানের দ্বার শাস্ত্রকার বন্ধ না করিলেও সমাজ করিয়াছে। নারীকে শাস্ত্র ত যথেষ্ট শাসন করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু সমাজ আবার "জবাই" করিবার আদেশ দিয়া রাখিয়াছে। অনেক স্থলে নারীর শিক্ষা কুচরিত্রতার সম-অর্থবোধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এইরূপ পিতা মাতার সন্তানের পারিপার্শ্বিক বা বাহ্য প্রভাবের কথা দেখা যাউক। বালক জন্মাইল কোথায়—বাটীর যেস্থল সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট সেই স্থলে। তাহার পর যখন সে বাড়িতে লাগিল তখন কুসংস্কার তাহাকে বেষ্টন করিয়া বসিল। তাহার ভাবপ্রবণ মস্তিষ্ক—জুজু, ভুত, ভয়, অস্পৃশ্য, অখাদ্য, ঘৃণা প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে শিখিল চারিদিকেই তাহার ভয়—এই বাল্যকালের ভয় জীবনে কখনও তিরোহিত হয় না। সে বেশ শিখিয়াছে, কোন্ লোককে ছুঁইলে স্নান করিতে হয়, কাহার বাড়ী যাইতে নাই। সে শিখিল কাহাকে দেখিয়া ঘৃণা করিবে। কিন্তু শিখিল না যাহা গুণ—চিত্তকে কিরূপে উদার করিতে হয়, সকলকেই সমান দেখিতে হয়, সকলই এক।

তাহার পর পঠদ্দশায় বালকের অবস্থা কি? বালক এক কুসংস্কার-কারাগার ত্যাগ করিয়া আসিয়া আবার এক নূতন আরও রহস্যময় কুসংস্কার-কারাগারে আসিয়া রুদ্ধ হইল। তখন তাহার মস্তিষ্কে ভয়টার বেশ ভাল করিয়া ছাপ খাইল। বেত্রাঘাতের ভয়ে "সর্ব্বদা সত্য কথা বলিবে" এরূপ পড়িলেও, মিথ্যা ছাড়া সত্য বলিবার উপায় নাই। আদর যত্নের পরিবর্ত্তে শাসন ও ত্রাস বেশ আধিপত্য করে। এরূপে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয়।

তাহার পর উচ্চ বিদ্যালয়েও বালকের অবস্থাটা অনেকটা পূর্ব্বেকার মত। শিক্ষক মনে করে যে ছাত্রের সহিত মিশিলে তাহার মর্য্যাদা কমিবে, বালক আর মানিবে না। বালক শিক্ষককে এক অভিনব জিনিস ভাবিতে থাকে—সে এক সৃষ্টিছাড়া জীব, সে ইতিহাস অঙ্ক ছাড়া আর কিছু জানে না। ভাবের বিনিময় না হইলে মানুষ উচ্চে উঠিতে পারে না, কিন্তু ভাবের বিনিময় আদৌ হয় না।

তাহার পর কলেজে গিয়া অনেক শেখা-জিনিস ভুলিতে হয়। এখানে আসিয়া যুবক একটু আধটু ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আইসে। ইউরোপীয় সভ্যতার বাহিক প্রভাবটা—প্যাণ্ট, নেকটাই আর সিগারেট—আসিয়া জুটে, গুণগুলা বড় আসে না।

এই সময় যুবক এক কুসংস্কারগ্রস্তা নাবালিকা বধূ লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়ে। সংসারের জালে জড়াইতে থাকে। কুসংস্কার তাহাকে ছাড়িতে চাহে না, যেন ছাড়িতে পারে না।

আমাদের জাতির জীবনীটা অনেকটা এইরূপ একটা চক্রে ঘুরিতেছে। স্ত্রীলোকের প্রভাবে আমরা জোর করিয়া উন্নতি করিতে পারিতেছি না।

জগতে সামান্য জিনিষকে বাদ দিয়া চলা দায়, আর স্ত্রীজাতিকে বাদ দিয়া উন্নতি করিব একি সম্ভবপর?

বাস্তবিক ভাবে বিজ্ঞান আলোচনা করিতে হইলে নারীজাতিকে সাধারণ জ্ঞান দিতে হইবে। আজ হইতে যদি আমরা স্ত্রীজাতির শিক্ষার সম্বন্ধে কৃতসংকল্প হই তাহা হইলে চাই কি আমাদের বংশধরগণ অর্দ্ধ-শতাব্দী পরে ইহার ফল ভোগ করিতে পারিবে। চাই কি দেশ কিয়ৎ পরিমাণে রোগ-শোক-মুক্ত হইতে পারিবে। এমন কি দেশের আর্থিক উন্নতিও হইতে পারে। এমন দিন কি কেবল কল্পনা—না আসিবে?

(বিজ্ঞান, ফেব্রুয়ারী) শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

* *
*

আর্থিক অপচয়।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশ যে দরিদ্র সে বিষয়ে দ্বিমত নাই। প্রকৃতির পক্ষপাতিত্ব আমাদিগের এই দারিদ্র্যের কারণ নহে। প্রকৃতি ভারতবর্ষকে ধন-ধান্যে পূর্ণ করিয়াছেন, ভারতের ভূগর্ভে কতই না রত্ন আমাদিগের জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু সেই-সকল ধনরত্নের ব্যবহারে আমাদিগের অনভিজ্ঞতা আমাদিগের এতাদৃশ দারিদ্র্যের কারণ। অপচয়ই অভাবের জনক। আমাদের দেশের ন্যায় পৃথিবীর আর কোনও দেশে এতাদৃশ আর্থিক অপচয় হয় কি না তাহা জানিনা। আমাদের দেশের অর্থোৎপাদক কত যে সামগ্রী আমাদিগের অবহেলা-হেতু নষ্ট হইতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমাদিগের প্রত্যেক গ্রামে ও পল্লীতে কত যে উদ্ভিদ আপনা হইতে জন্মিয়া নষ্ট হইতেছে কে তাহার সংবাদ রাখেন? সেই-সকল উদ্ভিদ কি প্রয়োজনে লাগে, তাহা যদি আমরা জানিতাম এবং জানিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিতাম তাহা হইলে বৃথা চাকরীর উমেদারীতে সময়-ক্ষেপ না করিয়া স্বকীয় চেষ্টাতে কতক পরিমাণে অর্থোপার্জ্জন করিয়া আপনাদিগের অভাব মোচন করিতে পারিতাম।

একমাত্র ধুতুরার অপচয় কিরূপ হইতেছে এবং তদ্দ্বারা দেশের অর্থ-ক্ষতিই বা কিরূপ হইতেছে দেখা যাক। আলোপ্যাথিক ও হোমিও-প্যাথিক মতের চিকিৎসায় বেলেডোনা নামে ঔষধ ব্যবহার হইয়া থাকে। তাহা ধুতুরার পাতা ও শিকড় হইতে প্রস্তুত। এই বেলেডোনা ইংলণ্ড ও মার্কিন হইতে এদেশে আমদানী হইয়া থাকে এবং সেজন্য আমরা সেই দেশে অনেক টাকা পাঠাইয়া থাকি। কিন্তু আমরা যদি যত্নপূর্ব্বক আমাদের দেশের ধুতুরা-গাছগুলিকে স্বভাবের নিয়মে জন্মিতে ও মরিতে না দিয়া রক্ষা করি অথবা তাহা উৎপাদনের জন্য একটু যত্ন করি তাহা হইলে তাহা হইতে আমরা অনায়াসে দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারি। সত্য বটে আমাদের এদেশে কোন কোন রাসায়নিক কারখানায় বেলেডোনা প্রস্তুত হইতেছে, কিন্তু য়ুরোপ ও আমেরিকায় ইহা ভুরি-প্রমাণে প্রস্তুত হয় এবং সেজন্য নানাদেশ হইতে তথায় ধুতুরার শুষ্ক শিকড় পাতা ও ডাঁটা প্রেরিত হইয়া থাকে। বিলাতের বাজারে রাসায়নিকেরা ১১ হইতে ১২ টাকা মণ দরে ধুতুরার পত্র মূলাদি ক্রয় করে। অথচ উহা বিলাতে পাঠাইতে এখানকার রেলভাড়া ও পাঠাইবার জাহাজভাড়া সমেত মণকরা আড়াই টাকার অধিক খরচ পড়ে না। অতএব প্রতি মণে সাড়ে আট টাকা হইতে সাড়ে নয় টাকা পর্য্যন্ত লাভ থাকে। অবশ্য এইসকল গাছ সংগ্রহ করিতে ও তাহা শুকাইতে যে ব্যয় হইতে পারে ইহাতে তাহা ধরা হয় নাই। আমরা উপরে ধুতুরা বিক্রয়ের যে মূল্য দিয়াছি তাহা প্রথম শ্রেণীর পাতার মূল্য। বড় বড় সবুজ বর্ণের পাতা ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া পরে তাহা ছায়াতে শুকাইয়া গাঁইট বাঁধা হয়। যাহাতে পাতার সবুজ রং বিকৃত না হয়, ছায়াতে শুকাইবার সময় সেপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। এইরূপ পাতা উল্লিখিতরূপ উচ্চমূল্যে বিক্রয় হয়। ছোট পাতা ডাঁটা ও শিকড় ইহা অপেক্ষা কমদরে বিক্রয় হইয়া থাকে। তথাপি উহাও আট টাকা, নয় টাকা করিয়া মণ দরের নীচে বিক্রয় হয় না। তাহা হইলেও খরচ বাদে সাড়ে পাঁচ টাকা হইতে সাড়ে ছয় টাকা মণ-প্রতি লাভ থাকে। চালানের উপযোগী ধুতুরা সংগ্রহ করিতে হইলে একটু যত্ন করিয়া

ইহার আবাদ করা আবশ্যক। ইহার আবাদে কোন কষ্ট নাই। অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি বা হাজা শুকার ভয় নাই। কেবল মাত্র একখণ্ড ভূমিতে উহা রোপণ করা আবশ্যক। গ্রামের বিভিন্ন স্থান হইতে গাছ সংগ্রহ করা অপেক্ষা আপনার আয়ত্তাধীন ভূমিখণ্ডে উহা চারাইলে ব্যবসায়ের সুবিধা হয়। এক বিঘা জমীতে চারি হাত অন্তর ধুতুরার গাছ বসাইলে চারিশত গাছ হইবে। এই চারিশত গাছ হইতে উপর্য্যুপরি তিন বা চারি বৎসর প্রতি গাছে বৎসরে একসের পাতা পাওয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে এক বিঘায় এক বৎসরে দশ মণ পাতা উৎপন্ন হইবে। ইহার দাম ৯ টাকা করিয়া মণ ধরিলে ৯০ টাকা পাওয়া যাইবে। আর গাছ ও শিকড়ে তিন বৎসরে প্রতি গাছে তিন সের পাওয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে তিন বৎসরের শেষে ৩০ মণ গাছ ও শিকড় উৎপন্ন হইবে। ইহার মূল্য ৬৲ টাকা করিয়া মণ ধরিলে ১৮০৲ টাকা হয় অর্থাৎ বৎসরে ৬০ টাকা করিয়া পাওয়া যায়। এতদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে এক বিঘা জমীতে ধুতুরা বসাইলে বৎসরে দেড় শত টাকা লাভ হইতে পারে। বিনা মূলধনে এরূপ আয় কি বাঞ্ছনীয় নহে?

এদেশে এক্ষণে কতকগুলি রাসায়নিক কারখানা সংস্থাপিত হইয়াছে। এইসকল কারখানা যদি এদেশজাত ধুতুরা হইতে বেলেডোনা প্রস্তুত করিয়া বিদেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে এদেশের লোকের এই উপেক্ষিত উদ্ভিদের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে, এবং তদ্দ্বারা ইহার ব্যবসায়েরও প্রসার হইতে পারে।

(বিজ্ঞান, ফেব্রুয়ারী) শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায়।

* *
*

আলকাতরা।

আলকাতরা জিনিসটা দেখিতে অতি কদর্য্য। বিশ্রী চট্‌চটে জিনিষ। কিন্তু এই কুৎসিত দ্রব্যের মধ্যে যে কত প্রকার সুন্দর সুন্দর রঙ, সুগন্ধ এসেন্স প্রভৃতি নিভৃত আছে তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এ ছাড়া আলকাতরা হইতে কত প্রকার যে ঔষধ প্রস্তুত হয় তাহার সংখ্যা নাই।

কাষ্ঠ কিম্বা পাথুরে কয়লা বায়ুর সংস্রব বন্ধ করিয়া উত্তপ্ত (Destructive distillation) করিলে, আলকাতারা প্রস্তুত হয়। বিভিন্ন প্রকার কাষ্ঠ বা কয়লা হইতে বিভিন্ন প্রকার আলকাতরা পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে পাথুরে কয়লা হইতে যেরূপ ভাবে আলকাতরা প্রস্তুত হইত, তাহাতে অনেক পরিমাণে আলকাতরা নষ্ট হইয়া যাইত। আজকাল কোল্ গ্যাসের প্রচলন প্রত্যেক সহরেই বর্ত্তমান। এই কোল্ গ্যাস প্রস্তুত করিতে পাথুরে কয়লাকে বায়ুর সংস্পর্শ-রহিত করিয়া উত্তাপ দিতে হয়। কোল্ গ্যাসের সহিত এমনিয়া গ্যাস, আলকাতরা ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। আলকাতরা চোলাই হইয়া আসিয়া কতকগুলি ট্যাঙ্কে জমা হয়। যদি কেহ নারিকেলডাঙ্গায় কোল্ গ্যাস ওয়ার্কস দেখিতে যান, দেখিবেন কি প্রচুর পরিমাণে প্রতিদিন এদেশে আলকাতরা প্রস্তুত হইয়া থাকে। বড় বড় চৌবাচ্ছায় এই আলকাতরা থিতান হয়।

এই আলকাতরা কখনও তরল রূপে প্রস্তর ইষ্টক প্রভৃতি সামগ্রীর উপর লাগাইতে বা ভুষা প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হইত, কিন্তু আজকাল এই আলকাতরার অধিকাংশই বায়ুর সংস্পর্শ-রহিত করিয়া চোলাই করা হয়। চোলাই হইয়া নানা প্রকার সামগ্রী আলকাতরা হইতে বাহির হইয়া আসে। বিভিন্ন তাপমাত্রায় বিভিন্ন পাত্রে ইহা সংগ্রহ করা হয়। লাইট অয়েল, কার্ব্বলিক অয়েল, (creosote) ক্রিয়োজোট অয়েল, আনথাসিল অয়েল প্রভৃতি ইহাদের বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে। এই-সমস্ত দ্রব্য চোলাই হইয়া যাইবার পর যে সামগ্রী পড়িয়া থাকে সে দ্রব্য হইল পিচ্। আজকাল চৌরাঙ্গীতে যে চকচকে পরিষ্কার রাস্তা দেখিতে পান তাহা আস্‌ফাল্ট নামক দ্রব্যের প্রস্তুত। এই আসফাল্টের প্রধান উপকরণ পিচ। ইউরোপে বড় বড় রাজধানীতে সমস্ত রাস্তাই এই আসফাল্ট হইতে প্রস্তুত। ইলেকট্রিক তার রাস্তার মধ্য দিয়া লইয়া যাইতে পিচের কিরূপ ব্যবহার তাহা কলিকাতাবাসী সকলেই জানেন।

ক্রিয়োজোট অয়েল কাষ্ঠের কড়িতে লাগাইবার জন্য এবং পিচ নরম করিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কার্ব্বলিক অয়েল হইতে কার্ব্বলিক এসিড প্রস্তুত হয়। কার্বলিক এসিড শুধু যে ডাক্তারীতে ব্যবহৃত হয় এমন নহে। যে এনিলিন রঙ্গের ব্যবসার জন্য জার্ম্মানি প্রসিদ্ধ এবং যাহা উৎপাদনের জন্য ইংলণ্ড আজ ব্যস্ত, সেই এনিলিন রং কার্বলিক এসিড প্রভৃতি ঐ আলকাতরা হইতে চোলাই-করা দ্রব্য হইতে প্রস্তুত। মরিতে ও মারিতে কার্বলিক এসিডের বড় কম প্রচলন নয়। কার্বলিক এসিড খাইয়া আত্মহত্যা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। বর্ত্তমান ইউরোপীয় মহাসমরের অধিকাংশ শেল যে পিকরিক্ এসিডে প্রস্তুত সেই পিকরিক্ এসিড এই কার্বলিক এসিড হইতে প্রস্তুত। টি, এন্, টি নামক যে ভয়ানক বিস্ফোরক পদার্থ শেল প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়, তাহা টোলুইন নামক একটি তৈল হইতে প্রস্তুত। এই তৈলও আলকাতরা চোলাইএর লাইট অয়েলে থাকে।

আমরা বস্ত্রের বা পুস্তকের দেরাজে ন্যাপথেলিনের গুলি রাখিয়া থাকি। ইহাও আলকাতরা চোলাই করিয়া যে ক্রিয়োজোট অয়েল পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে থাকে। কার্বলিক এসিড বাহির করিয়া লইবার পর ক্রিয়োজোট ঠাণ্ডা যায়গায় রাখিয়া দিলে ন্যাপথেলিন দানা বাঁধিয়া যায়। রং প্রস্তুত করিবার জন্য ন্যাপথেলিনও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। মাঞ্চেষ্টার ইয়েলো এবং সুন্দর সুন্দর লাল রং ন্যাপথেলিন (Napthol) হইতে প্রস্তুত হয়।

এই আলকাতরা-চোলাই-করা দ্রব্যের ব্যবসা জার্ম্মানিতে যত অধিক তত আর জগতে কোথাও আছে কি না সন্দেহ। সেই জার্ম্মানি এখন শত্রু হওয়াতে তাহার সহিত ব্যবসা বন্ধ হইয়াছে। দেশে কার্ব্বলিক এসিড প্রভৃতি অত্যাবশ্যক দ্রব্যের অভাব পড়িতেছে। যে দেশে প্রাতঃস্মরণীয় মহামতি তাতা লৌহের কারখানা স্থাপন করিয়া দেশের মহৎ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, যে দেশে মাননীয় অধ্যাপক চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী বেঙ্গল কেমিক্যালে সালফিউরীক এসিড প্রস্তুত করিতে বৃহৎ কারখানার সৃষ্টি করিয়াছেন, সে দেশে এমন একজন কি উঠিবেন না যিনি আলকাতরা চোলাইয়ের ব্যবসা করিয়া নিজের ও দেশের মহৎ কল্যাণ সাধন করেন। আরও একটি কথা। গবর্ণমেন্টের সাহায্য না পাইলে ব্যবসা বাণিজ্য সম্যকরূপে উন্নতি লাভ করিতে পারে না। বাণিজ্য-জগতে আমরা এখন নাবালক। এসময়ে আমাদের সাধারণ লোকে প্রচুর অর্থ দিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিতে ভরসা করেন না। জাপান প্রভৃতি দেশের গবর্ণমেন্টের মতন আমাদের বৃটিশ গবর্ণমেন্ট যদি অর্থ-সাহায্য করিয়া দেশের ব্যবসা বাণিজ্য প্রচলন করেন, যদি শুধু প্রদর্শনীর (Exhibition) ব্যবস্থা না করিয়া তৎসঙ্গে প্রজার অর্থ প্রজার হিতকল্পে লাগাইয়া গবর্ণমেন্টের বা গবর্ণমেন্ট-সাহায্যকৃত বড় বড় কারখানার প্রতিষ্ঠা করেন, তবেই আমাদের বাণিজ্য-জগতে উন্নতির আশা। তাহা না হইলে আমরা "যে তিমিরে, সে তিমিরে"।

(বিজ্ঞান, ফেব্রুয়ারী) শ্রীসতীশচন্দ্র দে, বি এস সি।

* *
*

সংবাদ-পত্রের প্রভাব।

সংবাদপত্র, সভা, সমিতি, সম্মিলনী প্রভৃতি অনুষ্ঠান ও নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় প্রজাশক্তি নিজ প্রভাব সংরক্ষিত ও বর্দ্ধিত

করেন। ইহাদিগের মধ্যে সংবাদপত্র প্রজাসাধারণের একটি প্রধান শক্তি।

১০ বৎসর পূর্ব্বের বিবরণী অনুসারে ইংলণ্ডের যুক্তরাজ্যে সংবাদপত্রের সংখ্যা লণ্ডন নগরে ৪৫৪, ইংলণ্ডের অন্যান্য প্রদেশে ১৪৪৩, স্কটল্যাণ্ডে ২৩৩, আয়র্লণ্ডে ১৭৫, ওয়েল্‌সে ১০৭ খানা অর্থাৎ এক যুক্তরাজ্যের সংবাদপত্রের মোট সংখ্যা ২৪১২; এতদ্ব্যতীত ১৯০৩ সনে মাসিক প্রভৃতির সংখ্যা ২৫৩১ খানি ছিল। অথচ সমগ্র যুক্তরাজ্য আয়তন ও জনসংখ্যায় বর্ত্তমান বাঙ্গালা প্রদেশের প্রায় সমান। আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেটস সংবাদপত্রের দেশ বলিয়া খ্যাত; ঐ দেশে ১৯০০ সালে সংবাদপত্রের সংখ্যা ২০,০০০ অপেক্ষা বেশী ছিল। ইহাদিগের মধ্যে ২২২৬ খানি দৈনিক ও ১৩০০০ সাপ্তাহিক ও ১৯১৮ খানি মাসিকপত্র।

গ্রাহক-সংখ্যাও এইরূপ বিস্ময়কর। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস নগরের লাজেতি জার্ণাল (?) নামক সান্ধ্য পত্রিকা দৈনিক সাড়েনয়লক্ষ বিক্রয় হয়। পৃথিবীর মধ্যে ইহাই সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা। ঐ নগরে "ফিগারো" নামক পত্রিকার বিলির সংখ্যা একলক্ষ। অথচ এক প্যারিস নগরে ৪৪ খানি দৈনিক পত্রিকা বাহির হয়। লণ্ডনের দৈনিক "ডেলি টেলিগ্রাফ" "ষ্টাণ্ডার্ড" প্রত্যহ আড়াই লক্ষ, "একো" "ইভনিং নিউজ এণ্ড পোষ্ট" প্রত্যহ দুই লক্ষ বিলি হয়। লণ্ডনের সাপ্তাহিক "লয়েড্‌স্ নিউস পেপার" দশ লক্ষ বিলি হয়। ১৯০০ সালের মার্কিন যুক্তরাজ্যের বিবরণীতে দেখা যায় ৪৬ খানি সংবাদপত্রের প্রত্যেকের প্রচার দেড় লক্ষের উপর। ২৩ খানির এক লক্ষ হইতে দেড় লক্ষের মধ্যে। ৫৩ খানির পঞ্চাশ হাজার হইতে এক লক্ষের মধ্যে। ইউরোপ ও আমেরিকার প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রের প্রচার সাধারণতঃ এক লক্ষের উপর।

ইউরোপে ও আমেরিকাতে সংবাদপত্রের সংখ্যা ও প্রচার যেরূপ বিস্ময়কর, ইহাদিগের ক্ষমতাও সেইরূপ অদ্ভুত। লণ্ডনের সুবিখ্যাত "টাইমস্" পত্রিকার অনুকূল মতের জন্য জার্ম্মানী ও রুসিয়ার সম্রাট্ হইতে ইংলণ্ডের রাজা মন্ত্রী সকলেই ব্যগ্র। যুদ্ধ বিগ্রহ সন্ধি প্রভৃতি রাজনৈতিক ব্যাপার সংবাদপত্রের মতামতের উপর নির্ভর করে। দেশের আইন কানুন শাসনপ্রণালী প্রভৃতি তাহাদিগের প্রভাবে পরিচালিত হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দান, শ্রমজীবীসম্মিলনী প্রভৃতি যাবতীয় সভা সমিতি সম্মিলনী সংবাদপত্রের সাহায্যে পরিপুষ্ট বর্দ্ধিত ও প্রভাবশালী হইয়া থাকে। ব্যবসায় বাণিজ্য শিল্প বিজ্ঞান সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক দেশের যাবতীয় সমবেত চেষ্টা ইত্যাদি সংবাদপত্রের সাহায্যে সফল হয়। ব্যক্তিগত স্বত্ব স্বাধীনতা অধিকার প্রভৃতিও সংবাদপত্রের সাহায্যে রক্ষিত হয়।

বস্তুতঃ এই-সকল দেশে সংবাদপত্র লোকশিক্ষার ও জনসাধারণের মত সংগঠিত করিবার প্রধানতম উপায়। দেশের লোকের চিন্তা যে-কোন বিষয়ে আকৃষ্ট করা প্রয়োজন, তাহা সংবাদপত্রই করিয়া থাকে। জাতীয় জীবনের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের ক্ষেত্র, সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের ক্ষেত্র, সর্ব্বপ্রকার আশা আকাঙ্ক্ষা উদ্যম চেষ্টা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা ও চেতনা—দেশের সংবাদপত্রের বিষয়ীভূত। সাধারণের মধ্যে সেই-সকল বিষয়ের সংবাদ প্রচার ও আলোচনার দ্বারা, দৃষ্টান্ত ও উপায় নির্দ্দেশদ্বারা স্বদেশের সেই-সকল বিষয়ের অভাব দূর করিবার জন্য সাধারণকে উৎসাহিত ও সাহায্য করা সংবাদপত্রের কার্য্য। ইউরোপ ও আমেরিকার সংবাদপত্র এত উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে যে, একমাত্র সংবাদপত্র পাঠ করিয়াই লোকে প্রকৃত শিক্ষিত হইতে পারে ইহাই অনেকের ধারণা; আর সংবাদপত্র পড়ে না বর্ণজ্ঞানবিশিষ্ট এরূপ ব্যক্তিও দেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে বিরল।

সংবাদপত্রের প্রসার ও প্রভাব জাতীয় জীবনের অবস্থার অনুরূপ হইয়া থাকে। আমাদের দেশে জাতীয় জীবনের সম্যক্ উন্মেষ হয় নাই, তাহা দেশের সংবাদপত্রের অবস্থা দেখিলেই বুঝা যাইতে পারে।

১৯১১ সনে হিসাব করা হইয়াছিল যে, পৃথিবীর যাবতীয় দেশে প্রচারিত সংবাদপত্রের সংখ্যা মোট ৪১,০০০ হাজার, তন্মধ্যে ইউরোপে ২৪০০০ ও আমেরিকাতে প্রায় ১৬০০০ এবং অবশিষ্ট ১০০০ অন্যান্য মহাদেশে প্রকাশিত হয়। মাসিক ত্রৈমাসিক পত্রাদি এই হিসাবে ধরা হয় নাই। ইউরোপের কয়েকটি দেশের সংবাদপত্রের সংখ্যা ১৮৯১ সনে এইরূপ ছিল—জার্ম্মানী ৫,৫০০; ফ্রান্স ৪,১০০; যুক্তরাজ্য ৪,০০০; অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্য ৩৫০০; ইটালি ১৪০০; স্পেন ৮৫০; রুষিয়া ৮০০; সুইজারল্যাণ্ড ৪৫০; বেলজিয়াম ৩০০; হল্যাণ্ড ৩০০; এই সময় আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে সংবাদপত্রের সংখ্যা ১২,৫০০ ও ক্যানেডায় ৭০০ ছিল।

ভারতবর্ষে ১৯১১—১২ সনে মোট ৬২৮ খানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে যুক্তপ্রদেশে ১৪১, বোম্বাই প্রদেশে ১৩৯, বাঙ্গালায় ১১৫, মান্দ্রাজে ৮৭, পাঞ্জাবে ৭৬, ব্রহ্মদেশে ৫০, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে ২০ খানি। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে ২০ বৎসর পূর্ব্বে একমাত্র লণ্ডন সহরেই ৪৪৫ খানি সংবাদপত্র প্রচারিত হইত।

মাসিক প্রভৃতির সংখ্যা কয়েকটি দেশের সহিত তুলনা করিয়া নিম্নে দেখান হইল। যুক্তরাজ্যে ১৯০৩ সনে ২৫৩১, আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে ১৯০০ সনে প্রায় ৩৫০০, সমগ্র ভারতবর্ষের ১৯১১—১২ সনে মোট সংখ্যা ২,১৬৫ খানি। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সংখ্যা এইরূপ—মান্দ্রাজ প্রদেশে ১৪৯৯, বোম্বাই প্রদেশে ৩০৩, বাঙ্গালায় ১৬৩, যুক্তপ্রদেশে ১০৩, ব্রহ্মদেশে ৫৭, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে ২০ খানি।

অতএব দেখা যাইতেছে যে সংবাদপত্রের সংখ্যা হিসাবে ইউরোপ আমেরিকার প্রধান দেশের সহিত ভারতবর্ষের তুলনাই চলিতে পারে না। অথচ ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা এই-সকল দেশ অপেক্ষা তিনগুণ হইতে প্রায় দশগুণ পর্য্যন্ত বেশী হইবে। ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যান্য প্রদেশের সংবাদপত্র ও মাসিকপত্রের সংখ্যার তুলনায় বাঙ্গালার মাত্র তৃতীয় স্থান; অথচ লোকসংখ্যার হিসাবে বাঙ্গালার স্থান দ্বিতীয়।

অনেকে মনে করেন, বাঙ্গালা দেশে সংবাদপত্র মাসিকপত্র প্রভৃতির সংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। উপরোক্ত বিবরণ পাঠ করিয়া তাঁহারা নিজেদের এ ভ্রম বুঝিতে পারিবেন আশা করি। বর্ত্তমান যুগে সংবাদপত্র প্রভৃতি সাময়িক পত্রের সংখ্যা প্রচার ও প্রভাব প্রভৃতি জাতীয় উন্নতির পরিচায়ক। উপরোক্ত বিবরণপাঠে আমাদিগের দেশ সম্বন্ধেও এ বিষয়ের সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

(মালঞ্চ, বৈশাখ) শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মজুমদার।

ব্যাকরণ-বিভীষিকা

(৫)

এইবার আমরা ললিতবাবুর আর-আর কথাগুলি আরো সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। অ র্থ ঘো রা শ ব্দ প্রকরণের কয়েকটা শব্দ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এইরূপ—

অ থ র্ব্ব। যাস্ক এই শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখাইয়াছেন (নিরুক্ত, ১১.১৯):—"থর্ব্বতিশ্চরতিকর্ম্মা, তৎপ্রতিষেধঃ।" অর্থাৎ থর্ব্ব ধাতুর অর্থ গতি, তাহারই নিষেধ, অর্থাৎ গতিহীন। ইহা হইতে বাঙ্‌লার প্রসিদ্ধ অর্থ পাওয়া যায়।

অ প রূ প। ললিতবাবু লিখিয়াছেন, কৃষ্ণকমল-বাবুর মতে ইহা

অপূর্ব্ব শব্দের অপভ্রংশ। ইহা নিতান্ত অসঙ্গত মনে হয় না। বিদ্যাপতি বহুস্থলে (পৃঃ ২২, ২৫, ২৬, ইত্যাদি, পরিষৎ) অপরুব লিখিয়াছেন। (প্রাকৃতেও প=ব হয়)। আবার অপরূপও বহু স্থানে লিখিয়াছেন (পৃ ২৮, ৩৬)।

অপর্য্যাপ্ত। বাঙলায় প্রচলিত অর্থ সংস্কৃতেও আছে। গীতার (১।১০) ব্যাখ্যায় মধুসূদন সরস্বতী লিখিয়াছেন—"অপর্য্যাপ্তম্ অনন্তম্ ..., পর্য্যাপ্তং পরিমিতম্।" সংস্কৃতে প্রচুর-অপ্রচুর উভয়ই অর্থ আছে।

অপ্রতিভ। সংস্কৃতেও অপ্রস্তুত অর্থ আছে। ন্যায়দর্শনের (৫-২-১৯) "উত্তরস্যাপ্রতিপত্তিরপ্রতিভা" এই কথাটি পর্য্যালোচ্য।

অহঙ্কার। দর্শন-শাস্ত্রে অহঙ্কার ও গর্ব্বে ভেদ আছে বটে, কিন্তু সাধারণভাবে সাহিত্যে ঐ দুইটি পর্য্যায়-শব্দ। অন্তত অমরকোষেও (১-৬-২২) ইহা পাওয়া যাইবে।

তত্ত্ব। ইহার আসল অর্থ (তৎ+ত্ব) স্বরূপ। আলোচ্য স্থলে কুটুম্ব পরিবারের স্বাস্থ্যাদির স্বরূপ। তত্ত্ব করা=স্বাস্থ্যাদির স্বরূপ (জিজ্ঞাসা) করা। যে দ্রব্যসম্ভার পাঠাইয়া এই স্বাস্থ্যাদির স্বরূপ (কুশলাকুশল) জিজ্ঞাসা করা হয়, কালক্রমে তাহাই তত্ত্ব বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। পালিতে উপহার অর্থে পণ্ণাকার শব্দ আছে। পূর্ব্বে ফলাদি উপহার পর্ণ অর্থাৎ পত্রের মধ্যে করিয়া দেওয়া হইত বলিয়া কালক্রমে ঐ শব্দটি সাধারণত উপহার অর্থেই পালিসাহিত্য চলিয়া গিয়াছে। আলোচ্য তত্ত্ব-শব্দেরও এইরূপ গতি হইয়া থাকিবে।

তাবৎ। সংস্কৃতে ইহা সাকল্য-অর্থ প্রকাশ করে, তাহা হইতেই বাঙলায় সমস্ত অর্থ বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে।

ভাসুর। ভ্রাতৃ-শ্বশুর হইতে, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। বাণান সম্বন্ধে যদি উচ্চারণ অনুসরণ করা হয়, তবে ভাশুর লেখাই ঠিক। নতুবা প্রাকৃত প্রভাবে শ-স দুই-ই হইতে পারে। বৈদিক সাহিত্যে স্ত্রীর ভ্রাতা স্যাল, কিন্তু প্রাকৃত-প্রভাবে উচ্চারণ অনুসারে সংস্কৃতেও শ্যাল হইয়াছে। এ সম্বন্ধে অন্যত্র ("বাঙলার উচ্চারণ") অনেক কথা বলিয়াছি।

রাগ। কোপ অর্থে সংস্কৃতে ইহার প্রয়োগ নাই। ললিতবাবুর সংস্কৃতজ্ঞ বন্ধু যে দুইটি বাক্য দেখাইয়াছেন, * তাহার কোনটিই কোপ অর্থ প্রকাশ করে না। সেখানে রাগ-শব্দের অর্থ আসক্তি ও রক্ততা—লৌহিত্য। কোপ রজোগুণসম্ভূত। রজোগুণ লোহিত।† রজঃ শব্দেরও অর্থ রক্ত বা লোহিত। এই জন্যই "ক্রোধে মুখে-চোখে রক্তিমা আসে।" ইহা হইতেই রাগ-শব্দ ক্রোধকে বুঝায়।

বেগ। বেগ পাইতে হইবে, ইত্যাদি স্থলে সংস্কৃতের উদ্বেগ-শব্দের অর্থ প্রকাশিত হইতেছে।

বেদনা। ব্যথা-অর্থে সংস্কৃতেও প্রয়োগ আছে, যথা—"অবেদনা জ্ঞং কুলিশক্ষতানাম্", কুমারসম্ভব, ১.২০; "সহতাং হতজীবিতং মম, প্রবলামাত্মকৃতেন বেদনাম্," (বেদনাং=দুঃখম্,—মল্লিনাথ)—রঘুবংশ ৮.৫০।

সমস্ত। সকল-অর্থে ত ইহা সংস্কৃতেও আছে।

সম্ভ্রান্ত। শব্দকল্পদ্রুমে মেদিনীকোষের প্রামাণ্যে আদর-অর্থে সম্ভ্রম শব্দ লিখিত হইয়াছে। সম্ভবত ইহাই অনুসরণ করিয়া আপ্তে মহাশয় উহার অর্থ সম্মান (respect, reverence) লিখিয়াছেন। তিনি প্রমাণও তুলিয়াছেন—"(প্রদানং প্রচ্ছন্নং) গৃহমুপগতে সম্ভ্রমবিধিঃ",—ভর্তৃহরি-নীতিশতক, ৬৪, (নির্ণয়সাগর, ৫৭)। কিন্তু টীকাকার রামচন্দ্র বুধেন্দ্র ঐ পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"সম্ভ্রমবিধিঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনাদি সত্বরব্যাপারবিধিঃ।" আপ্তের প্রদর্শিত আর-একটি প্রয়োগ—"তব বীর্য্যবতঃ কশ্চিদ্ যদ্যস্তি ময়ি সম্ভ্রমঃ।" ইহা রামায়ণের বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু স্থান নির্দ্দেশ না করায় পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইলাম না। আমার মনে হইতেছে বাঙলায় প্রচলিত অর্থেই সম্ভ্রান্ত শব্দ যেন গীতার শাঙ্করভাষ্যে প'ড়িয়াছি।

দোআঁশলা শব্দ (hybrid word) সম্বন্ধে এরূপ কোনো নিয়ম করিতে পারা যায় না, যে, এই এই শব্দ প্রয়োগ করা চলিবে, বা এইগুলি চলিবে না। ইহাকে একবারে বর্জ্জন করা অসম্ভব। স্থূলত এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে, যেগুলি বাঙ্গালা ভাষার ধাতের সঙ্গে বেশ মিশিয়া যায়, এবং বেশ "শ্রুতিমধুর লাগে," সেইগুলি প্রয়োগ করা চলিবে। আবশ্যক হইলে, ভাল লাগিলে ইংরেজী শব্দেরও সহিত সন্ধি সমাসে দোষ হইতে পারে না। তাই ইংলণ্ডেশ্বরী, পঞ্চম জর্জ্জ মহিষী, অথবা খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী লিখিলে আমি কোনো দোষ দেখিতে পাই না। জর্জ্জপাঠ চলিতে পারে; কেননা, জর্জ্জের নাম দিয়া পাঠ লিখিতে হইলে তাহা ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া বিজ্ঞানরীডার চলিতে পারে না, ইহা উৎকট। এই প্রকরণের সন্ধির কথা পরে আলোচনা করিব।

লিঙ্গবিচার প্রকরণটি উপাদেয় ও বিশেষভাবে প্রণিধানের যোগ্য। ইহাতে অনেকের দৃষ্টি খুলিয়া যাইবে। "বিশেষ্যের বিশেষণ-প্রয়োগে লিঙ্গবিপর্য্যয় কিরূপ হইয়া উঠিয়াছে, ললিতবাবু তাহা বিশদ-ভাবে দেখাইয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে দুই-চারিটি কথা বলিব।

স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণে পুংলিঙ্গ-প্রয়োগ স্থানে স্থানে অপভ্রংশ প্রাকৃতেও দেখা যায় (এমন কি স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্যও পুংলিঙ্গ-আকারে কখনো কখনো প্রযুক্ত হয়; যথা, "তরুণিবর তম্মুহঁ বিলসই;" তরুণীবর= তরুণীবরা,—প্রাকৃতপিঙ্গল, ১.৮৯)। প্রাচীন বাঙলাতেও এইরূপ প্রয়োগের ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। হিন্দীতেও দেখিয়াছি। কয়েকটা উদাহরণ দিতেছি—

"ব্যভিচারী নারী না হবে কাণ্ডারী
নায়কে বাছিয়া লবে।"
চণ্ডীদাস (বৈষ্ণবপদাবলী, বসু), ১৪৯ পৃঃ

"না ঠেলহ ছলে অবলা অথলে।"
ঐ, ১৩২ পৃ

রাধিকা বলিতেছেন—
"কে বা না করয়ে প্রেম, আমি সে কলঙ্কী।"
"একে নারী কুলবতী অবল বলে লোকে।"
ঐ, ১০৯ পৃ.

"ঘর গুরুজন হেরি পলটতি কত বেরি
শশিমুখি পরম সসঙ্ক।"
বিদ্যাপতি, (পরি), ৩২১ পৃ.।

"আকুল ভেলি নারী।" ঐ, ৩৪৬ পৃ.।

অতএব যেস্থলে শ্রুতিমধুর হয়, সেখানে স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্যের বিশেষণ পুংলিঙ্গ দেওয়া দোষাবহ নহে। ইহা "বাংলার মাটি বাংলার জল"এর গুণ। কিন্তু পুংলিঙ্গ বিশেষ্যের বিশেষণরূপে স্ত্রীলিঙ্গ প্রয়োগ করা—যথা মহীয়সী মহিমা ইত্যাদি,—কিছুতেই সঙ্গত নহে। ইহা নিতান্তই অদ্ভুত ও বিকট। এরূপ স্থলে লেখকের অজ্ঞতাই প্রকাশ

* (১) "আদাবিন্দ্রিয়াণি (কোন কোন স্থলে পাঠ "আদাবিন্দ্রিয়াধিষ্ঠানম্"; Bombay Sanskrit Series and Jambu Edition, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠানম্=মনঃ) রাগঃ সমাস্কন্দতি, চরম্ চক্ষুঃ।" (২) পরদোষ-দর্শনদক্ষা দৃষ্টিরিব কুপিতা বুদ্ধির্ ন তে আত্মরাগদোষং পশ্যতি।"

† দ্রষ্টব্য "অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাম্" ইত্যাদি সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী, মঙ্গলাচরণ।

পায়। তবে সত্যের অনুরোধে বলিতেই হইবে ইমন্‌প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি প্রাকৃতে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয় লিঙ্গেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে (হেম ৮.১.৩৫)। যথা—এ সা (=এষা) মহিমা, এ স (=এষ) মমা ইত্যাদি।

অ ন্তঃ পু র বা সি নী দ রি দ্রা ম হি লা গ ণ ইত্যাদি স্থলে ললিত-বাবু বলিতে চাহেন "খাঁটি বাংলা বহুবচনের চিহ্ন 'দিগ' 'রা' বসাইলেই ত গোল মিটে।" 'দিগ' নিতান্ত অশোভন হইবে। 'রা' বসাইলে কতক গোল মিটে, কিন্তু একবারে মিটে না, আর বিশেষত ওজোগুণযুক্ত বর্ণনায় তাহাতে বন্ধনও শ্লিষ্ট হয় না। "কেহ বাঙ্গালা সাহিত্যের মুরুব্বি" সাজুন বা না-ই সাজুন, "'স র্ব তো মু খী প্র তি ভা বলে' 'পু ণ্য তো য়া ভা গী র থী তী রে' স্বীয় অপূর্ব্ব অভিভাষণ পাঠ" করিলে, আমরা তাঁহার সেই অভিভাষণ আগ্রহেরই সহিত শ্রবণ করিব, প্রত্যাখ্যান করিতে পারিব না। এই-সকল স্থানে সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসরণ করিলে চলিবে না, বাঙ্‌লা ব্যাকরণের সূত্র গড়িয়া লইতে হইবে। ললিতবাবুও অন্যত্র এরূপ সূত্র গড়িয়া লইয়া 'মাদৃ শ (মাদৃ শী নহে) বা ক্তি' লিখিয়া মীমাংসা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। অন্যথা উপায় নাই। স ধ বা স্ত্রী লো ক বলিতে পারা যাইবে না, স ধ বা না রী বলিতে হইবে, ললিতবাবুর এ মীমাংসা মীমাংসা হইতে পারে, কিন্তু তাহা চলিবে না। মনে হয় ললিতবাবুও নিজের ঐমাত্র মীমাংসায় সন্তুষ্ট নহেন। তিনি সু শি ক্ষি তা না রী স মা জে, ইত্যাদি স্থলে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"এ-সকল কঠিন সমস্যা-পূরণের কি উপায়?" আমার উত্তর হইতেছে, বাঙ্‌লা ব্যাকরণের নিয়ম লিখিতে হইবে যে, সমাসবদ্ধ পদের পূর্ব্ববর্ত্তী স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের সমাসবহির্ভূত বিশেষণ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ উভয়ই হইতে পারে। সু শি ক্ষি তা না রী স মা জ, এখানে স্ত্রীলিঙ্গ নারী-শব্দের সমাসবহির্ভূত বিশেষণ সু শি ক্ষি তা স্ত্রীলিঙ্গ হইয়াছে। ক ঠি ন স ম স্যা-পূ র ণ; এখানে ক ঠি ন পদ স ম স্যা পদের বিশেষণরূপে বিবক্ষিত; অন্তত তাহা হইতে পারে; কিন্তু তাহা হইলেও ক ঠি না স ম স্যা-পূরণ বলা চলে না।

স্ত্রীপ্রত্যয়ের ব্যভিচার দেখাইতে গিয়া ললিতবাবু "স্ত্রীলিঙ্গে কোথায় 'আ' হইবে, কোথায় 'ঈ' হইবে, তাহা লইয়া বাঙ্গালা প্রাচীন ও আধুনিক উভয় সাহিত্যেই বেশ একটু গোলযোগ" (৩৭পৃ.) দেখিয়াছেন। পালি-প্রাকৃত সাহিত্য আলোচনা করিলে এই গোলযোগটা তত ঠেকিবে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি অপভ্রংশ প্রাকৃতের সহিত বাঙ্‌লার অতিঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। তাই অপভ্রংশ প্রাকৃতেরই স্ত্রীপ্রত্যয় প্রয়োগের রীতি প্রাচীন বাঙ্‌লায় সমধিক প্রচলিত হইয়াছে। এবং তাহারই প্রভাব আধুনিক ভাষাতে উপস্থিত হইয়াছে। অতএব সর্ব্বত্র লেখকগণের অজ্ঞতাকে অভিযুক্ত করিলে ন্যায্য বিচার করা হইবে না। অপভ্রংশ প্রাকৃতের এই নিয়ম যে, ইহাতে অকারান্ত ও কখনো কখনো অন্য-স্বরান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হইয়া থাকে (মার্কণ্ডেয়, ১৭.১৬; ত্রিবিক্রম, ৩.৩.৩১)। এই নিয়মেই আমাদের রা ধা প্রথমত রা ধী হইয়া তাহার পর রা হী (প্রাকৃতে ধ=হ, বিদ্যাপতি, ৩৩৫, ৩৩৬ পৃ.—রা হী বব হেরল হরিমুখ ওর),* এবং তাহার পর রা ই হইয়াছেন। এই নিয়মেই চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন—

"হম অভাগিনী পরের অ ধী নী
সকলি পরের বশে। বৈষ্ণবপদাবলী, ১০৮ পৃ.।

আবার আর-এক পদকর্ত্তা গাহিয়াছেন—

"কারণ কহিয়া লুকাঞা রাখিয়া
কানন-দে ব তী যায়। †
মাধবী মাধব মিলন দেখিয়া
হাসয়ে শেখর রায়।" ১৩০।
শ্রীশ্রীপদকল্পতরু (সতীশচন্দ্র রায়, ৩.৪), ১৮৫১পৃ.।

আবার ললিতবাবু যে, অ প্স রী র আমদানী দেখিয়া (৩৮পৃ.) বিচলিত হইয়াছেন, তাহাও প্রাকৃত-প্রভাবে এই নিয়মেই হইয়াছে। তাই বিদ্যাপতি শুনাইতেছেন—

"সুর অ প্‌ স রী কিয়ে নাগকুমারী তুহু
সরূপ কহবি তুহু মোয়।"
৫৩৬ পদ, ২০ (৩২৯পৃ.)।

আবার অ প্স রা (আকারন্ত) বৈদিক সাহিত্যেও আছে (তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ১০.৪১,—"অ প্স রা সু চ যা মেধা")।

ললিতবাবু এই প্রসঙ্গে পাদটীকায় লিখিয়াছেন (৪৮পৃ.) তিনি গানে ও কবিতায় ভ্র ম রা র ঝঙ্কার শুনেন, "সেটা কি ভোমরার সাধুবেশ না ভ্রমরের প্রণয়িনী?" সেটা যে ভ্রমরের প্রণয়িনী নহে, তাহা তিনি বৈষ্ণবপদাবলীতে নিশ্চয়ই দেখিয়াছেন। একটা মনে করাইয়া দিতেছি, জ্ঞানদাস বলিতেছেন—

"ভ্র ম রা ভ্র ম রী গণ গাওয়ে রসাল।"
বৈষ্ণবপদাবলী, ২০২পৃ.।*

এইরূপই

"তাহাতে কি শো রা কি শো রী বশ।"
চণ্ডীদাস, (বৈষ্ণপদাবলী), ১৪০, ১৪১, ১৪২, ইত্যাদি।

এইপ্রকার ভূরি-ভূরি রহিয়াছে। অপভ্রংশ-প্রাকৃতেরই নিয়মে যে অকার আকার হয়, তাহা পূর্ব্বে বিশদভাবে বলিয়াছি।

প্রসঙ্গত একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি। ললিতবাবু বলিতেছেন—"সেটা কি ভো ম রা র সাধুবেশ…?" তবে কি তাঁহার মতে ভো ম রা পদ অ সা ধু বলিতে হইবে? আমি ত বলিতে ইচ্ছা করি ভ্র ম রা ভো ম রা উভয়ই সা ধু, কিন্তু সং স্কৃ ত নহে, সংস্কৃত হইতেছে ভ্র ম র। অতএব এতাদৃশ স্থলে প্রয়োজন-অনুসারে সংস্কৃত, প্রা কৃ ত, সংস্কৃত-প্রা কৃ ত, বা বাঙ্‌লা শব্দ ব্যবহার করাই সঙ্গত, সা ধু-অ সা ধু বলিলে ঠিক হয় না। আলোচ্য শব্দে ভ্র ম র সংস্কৃত, ভ্র ম রা সংস্কৃত-প্রাকৃত, ভ ম র প্রাকৃত, ভো ম রা বাঙ্‌লা।

আবার প্রকৃত বিষয় অনুসরণ করা যাউক। প্রথমে স্ত্রীলিঙ্গে ই নী প্রত্যয়ের কথা বলি। ললিতবাবু র জ কি নী, চা ত কি নী, ন টি নী, না গি নী, ইত্যাদি বহু পদ প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য হইতে তুলিয়া দেখাইয়াছেন (৪০ পৃ.)। অতএব আমার আর উদাহরণ দিবার আবশ্যকতা নাই। বাঙ্‌লা ভাষায় এই-সমস্ত প্রয়োগকে আমি অসাধু বলিতে পারিব না। মূল প্রকৃতি দেখিয়া বাধ্য হইয়াই আমাকে ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে। পালিভাষার সুপ্রসিদ্ধ ব্যাকরণ মহা-সদ্দনীতিতে (সিংহল) লিখিত হইয়াছে (৫৯৫ পৃ)—পতি-প্রভৃতি, ভিক্ষুপ্রভৃতি ও রাজপ্রভৃতি শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ইনী প্রত্যয় হয় (৪৬৯ সূত্র), যথা—ই সি নী (আক্ষরিক ঋষিণী, ঋষি হইতে), ক পি নী (কপি), কি মি নী (কৃমি), অ রি নী (অরি), প র চি ত্ত-বি দু নী (◦বিদু), উ তু নী (আ◦ ঋতুনী=ঋতুমতী), রা জি নী (=রাজ্ঞী), য ক্‌ খি নী (যক্ষ), † না গি নী (নাগ)। আবার ই দ্ধি ম ন্তি নী (=ঋদ্ধিমতী),—ঐ, ৪৭০পৃ.। দ্রষ্টব্য—পালিপ্রকাশ,

---

* মার্কণ্ডেয়ও পূর্ব্বোক্ত স্থলে এই উদাহরণটি ধরিয়াছেন।

† ললিতবাবু শুনিয়াছেন (৩৯ পৃ.) "কোন রাজবংশে পুরুষেরা 'দেবতা' ও স্ত্রীগণ 'দেবতী' বলিয়া অভিহিত।"

* আবার একটু পরেই তিনি লিখিয়াছেন—"ভ্র ম র ভ্র ম রী কত রঙ্গে।" ২০৩ পৃ.

† য ক্ষি ণী সংস্কৃতেও খুব চলিয়া গিয়াছে।

৫. § ৪২, ৪৩। মিলিন্দপ্রশ্ন (৩।৪।৪) হইতে কয়েকটি পঙ্ক্তি তুলিব—

"যা তা সন্তি ম ক রি নি য়োপি (মকর), সুংসুমা রি নি য়োপি (সুংসুমার=শিশুমার), ক চ্ছ পি নি য়োপি (কচ্ছপ), মো রি নি য়োপি (মোর=ময়ূর), ক পো তি নি য়োপি (কপোত)।"

আরও

"যা তা সন্তি সী হি নি য়োপি (সীহ=সিংহ), ব্যগ্ঘিনি য়োপি (ব্যগ্ঘ=ব্যাঘ্র), দী পি নি য়োপি (দ্বীপিন্), কু কু রি নি য়োপি (কুকুর)।" *

প্রাকৃতেও এইরূপ আছে, হিন্দীতেও যথেষ্ট। এ সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না, এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, রচনা-বিশেষে এতাদৃশ প্রয়োগ বঙ্গভাষায় দূষণীয় হইতে পারে না। সংস্কৃত ন না ন্দ বাঙলায় তিন আকার ধারণ করিয়াছে—(১) ন ন দ, (২) ন ন দী, (৩) ন ন দি নী; আবার (৪) ন ন দি য়া আছে। এইসব ছাড়িয়া দিলে বাঙলার থাকিল কি? †

এইবার আ নী প্রত্যয়। পাণিনির "ইন্দ্র-বরুণ..." ইত্যাদি সূত্রে (৪.১.৪৯) সমস্ত কুলায় না বলিয়া বার্ত্তিককারকে অনেক সূত্র বাড়াইতে হইয়াছে, তথাপি হয় নাই। পু রু কু ৎ সা নী (পুরুকুৎস-পত্নী, ঋগ্বেদ, ৪.৪২.৯) কাহারো নজরে পড়ে নাই। ইহাতেই বুঝা যাইবে ভাষায় আ নী প্রত্যয় কিরূপ চলিয়া আসিয়াছে। লেখ্য সংস্কৃত ভাষা বন্ধন প্রাপ্ত হইয়াছে, বন্ধন-বশত আ নী ইহাতে সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কথ্য ভাষায় বন্ধন না থাকায় ইহাতে তাহা নির্বাধে বিচরণ করিতেছে। হিন্দীতেও ইহার বহুল প্রচার। বাঙলাতেও না পি তা নী প্রভৃতি চলিতেছে, চলিবে; আবার না পি তী ও চলিবে। আবার স্থলবিশেষে না প্‌ তি নী ও না পি ত্‌ নী ও হইবে। ‡

অপভ্রংশ প্রাকৃতের প্রভাবে স্ব জ ন স্ত্রীলিঙ্গে স্ব জ নী, § এবং তাহার পর স জ নি হইয়াছে; এবং ধ ন শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ করিয়া ধ নী করা হইয়াছে, ইহা ধ নি নী, ধ নি কা বা ধন্যার অপভ্রংশ নহে। প্রাকৃতেও ধ নী ব্যবহৃত হয়, যথা—

"রে ধ নি মত্তমঅংগজগামিণি,
খঞ্জন লো অ ণি চন্দমুহি।"
প্রাকৃতপিঙ্গল, ১.১০৫ (নির্ণয়, ৬৪পৃ)

---

* কু কু র প্রাকৃত শব্দ, খাঁটি সংস্কৃত হইতেছে কু কু র (অথর্ব্ববেদ সংহিতা, ৭.১০০.২) কিন্তু প্রাকৃত ক ক্ক ট (সংস্কৃত ক র্ক ট) বৈদিক-সাহিত্যে রহিয়াছে (তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৫.৫.১৫.১, কিন্তু বেবারের পাঠ ক ট্‌ ক ট; বাজসনেয়ি সংহিতা, ২৪.৩২)। তুলঃ বৈদিক গুল্গুলু, লৌকিক গু গ্‌ গু লু।

† (১) "কি বলিব ওগো ন ন দ আমার।"—গৌরপদতরঙ্গিণী, ২০৬ পৃ. (১২১ পদ)।

(২) "বঁধুয়ার ভরমে ন ন দী কোরে নিনু।"—চণ্ডীদাস, বৈষ্ণব-পদাবলী, ৮৪ পৃ.

(৩) "সঙ্গে ন ন দি নী ছিল।"—জ্ঞানদাস, ঐ ১৭৫ পৃ.

(৪) "ন ন দি য়া গেলা ঘরের পরে।"—গৌরপদতরঙ্গিণী, ১৯৬পৃ.।

‡ পেত্নীর দেখাদেখি প্রে ত্‌ নী নহে, প্রে তি নী কে সংক্ষিপ্ত করিয়াই পে ত্নী হইয়াছে।

§ জ্ঞানদাসের একটি পদে মুদ্রিত দেখা যায়—

"স্ব জ নি তুহুঁ সে কহসি মঝু হিত।"
বৈষ্ণবপদাবলী (বসু.), ২২৬ পৃ.।

"ধ নি করহ বিসাউ।" হেমচন্দ্র, ৮.৪.৩৮৫।

ললিতবাবু বলেন, ম ঙ্গ লা স্প দা স্থানে "ম ঙ্গ লা ল য়া লিখিলে দোষ হয় না" (৩৮পৃ.)। আমাদের ত মনে হয় দোষ হয়, কারণ আ ল য় স্ত্রীলিঙ্গ নহে, পুংলিঙ্গ। আর যদি ব্যাকরণের সূক্ষ্ম তর্ক করিয়া ম ঙ্গ লা-ল য়া রাখা যায়, তবে ম ঙ্গ লা স্প দা ও রাখা যায়। অর্থ যাহাই হউক, পদটা হইলেই হইবে, ইহা ত ঠিক নহে।

পা ত্র শব্দ তিন লিঙ্গেই হইতে পারে, সংস্কৃতের এইরূপই নিয়ম আছে। তাই পা ত্রী অশুদ্ধ নহে।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

পুরাবৃত্ত আলোচনা

অন্যান্য সভ্যদেশে আত্মচরিত, চিঠিপত্র, প্রত্যক্ষকারীর রচিত বিবরণ অবলম্বনে ইতিহাস রচিত হয়। এদেশের হিন্দুর আমলের এই শ্রেণীর উপাদান এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, এবং কখনও যে হইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। হিন্দুর ইতিহাসের আমলের যেকিছু উপাদান আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহা হয় সভাকবির কৃত স্তুতি-নিন্দা, আর না হয় জনশ্রুতি-মূলক গালগল্প। এইরূপ যৎসামান্য উপকরণ লইয়া ইতিহাস গড়িতে বসিলে, পদে পদে অনুমানের আশ্রয় না লইয়া উপায় নাই। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি, স্বচক্ষে দেখিয়া, একই ঘটনার যে বিবরণ প্রদান করে, নানাকারণে তাহার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হয়। একই ঘটনা সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কৃত অনুমানের মধ্যে যে ততোধিক পার্থক্য লক্ষিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? যেখানে প্রত্যক্ষকারীর রচিত বিবরণ পাওয়া যায়, সেইখানে ঐতিহাসিক বিচারপূর্ব্বক এইপ্রকার বিভিন্ন বিবরণের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ইতিহাস রচনা করিয়া থাকেন। যেখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণের মধ্যে প্রশস্তিকারের স্তুতিনিন্দাপূর্ণ দু-চারিটি শ্লোক, এবং পরোক্ষ প্রমাণের মধ্যে পরবর্ত্তীকালের গালগল্প ভিন্ন আর কিছু পাওয়া যায় না, সেখানে যুক্তিসঙ্গত সর্ব্ববাদিসম্মত অনুমান-গঠন ঐতিহাসিকের প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু বাদানুবাদ বা অবাধ-আলোচনা ভিন্ন সর্ব্ববাদিসম্মত অনুমানে উপনীত হওয়া সুকঠিন। সুতরাং এ দেশের ইতিহাস গড়িতে হইলে, প্রত্যেকটি অনুমানের, প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তের অবাধ-আলোচনার ব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য। অবশ্যই কোন বিষয় লইয়া কথা কাটাকাটি করিতে গেলেই

সময় সময় ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে পারে, রাগরঙ্গ প্রকাশ পাইতে পারে। সত্যনির্ণয় যাঁহার লক্ষ্য, তিনি বাদীবিবাদী হউন আর পাঠকপাঠিকাই হউন, অবান্তর কথার দিকে লক্ষ্য না করিয়া আলোচনার মধ্যে যে ভাগে যুক্তি আছে তাহাই তাঁহার বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় জ্যৈষ্ঠের "প্রবাসী" পত্রে (২৯৬-২৯৯ পৃঃ) "ধীমান ও বীতপাল" নামক এবং "ভারতবর্ষ" পত্রে (১০১৮ পৃঃ) "প্রতিবাদের প্রতিবাদ" নামক প্রস্তাব প্রকাশ করিয়া, গুটিকয়েক ঐতিহাসিক সমস্যার সম্বন্ধে কতকগুলি যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। এইজন্য সুরেনবাবুকে আন্তরিক সাধুবাদ প্রদান করিয়া, আমি তাঁহার কয়েকটি কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

১। ধীমান ও বীতপাল।

সুরেনবাবু লিখিয়াছেন,—

"বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা যখন বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির চিত্রশালা দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, তখন উক্ত চিত্রশালার যে তালিকা মুদ্রিত হইয়াছিল তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি স্থির করিয়াছেন তাঁহাদের সংগৃহীত মূর্ত্তিসমূহের মধ্যে ধীমাননির্ম্মিত কতকগুলি প্রস্তরমূর্ত্তি আছে।......খোদিত লিপির অভাবে কোন একটি মূর্ত্তি কি প্রমাণের বলে ব্যক্তিবিশেষের শিল্পনিদর্শনরূপে গণ্য হইতে পারে তাহা উল্লিখিত হয় নাই। যাঁহারা বিজ্ঞানানুমোদিত ঐতিহাসিক রচনা-প্রণালীর গর্ব্ব করিয়া থাকেন, তাঁহাদের লেখনী হইতে কেমন করিয়া এই-সকল কথা নিঃসৃত হইল?"

আমার জিজ্ঞাসা, সুরেনবাবুর লেখনী হইতে কেমন করিয়া এই-সকল কথা নিঃসৃত হইল? আমাদের তালিকার যে অংশ লক্ষ্য করিয়া সুরেনবাবু এই-সকল কথা লিখিয়াছেন তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি—

"A comparison of exhibits nos 11, 14, 34, 95 and 99, which may be safely attributed to Dhiman or to his immediate follower, with the best specimens of medieval sculptures of Orissa, Behar and other parts of Northern India, reproduced in Chapter VII of Mr. V. A. Smith's monumental work "A History of Fine Art in India and Ceylon," clearly shows that the Tibetan historian is substantially correct, and that we have to look to Varendra for the fountain-head of medieval art of Northern India (p. 8-9)."

"বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি স্থির করিয়াছেন তাঁহাদের সংগৃহীত মূর্ত্তিসমূহের মধ্যে ধীমান-নির্ম্মিত কতকগুলি প্রস্তর-মূর্ত্তিও আছে" এ কথা এখানে নাই। এখানে আছে, ১১, ১৪, ৩৪ এবং ৯৫ নং মূর্ত্তি "নির্ব্বিবাদে (safely) ধীমান অথবা তাঁহার নিজশিষ্যগণের নির্ম্মিত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে (may be attributed)"; সুতরাং বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি কোনও মূর্ত্তি "ধীমান-নির্ম্মিত মনে করিয়াছেন" এ কথা বলা ঠিক হয় নাই! মূর্ত্তিবিশেষকে ধীমান অথবা তাঁহার নিজশিষ্যগণের নির্ম্মিত মনে করার অর্থ, ধীমান-প্রতিষ্ঠিত শিল্পিগোষ্ঠীর বা শিল্পশাখার রচিত মূর্ত্তিনিচয়ের মধ্যে উক্তমূর্ত্তিকে আদর্শরূপে গণ্য করা। কিরূপ প্রমাণের বলে যে এই অনুমান করা হইয়াছে, তাহা উদ্ধৃত বাক্যে খুলিয়া বলা না হউক, ধ্বনিত করা হইয়াছে। সেই প্রমাণ তুলনা (comparison)। (১) বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সংগ্রহালয়ে এই তালিকা রচনার সময়ে যতগুলি মূর্ত্তি ছিল তাহা একই শিল্পগোষ্ঠীর (School) রচনা বলিয়া মনে করা হইয়াছে। (২) তন্মধ্যে ১১, ১৪, ৩৪ এবং ৯৫ সংখ্যার মূর্ত্তিগুলিকে আদর্শস্থানীয় এবং গোষ্ঠীর যিনি ওস্তাদ ছিলেন তাঁহার বা তাঁহার শিষ্যগণের রচনা বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। (৩) তারানাথকে অনুসরণ করিয়া সেই ওস্তাদকে ধীমান নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সুরেনবাবু যে সিদ্ধান্তের সূত্র ধরিয়া আমাদের "বিজ্ঞানানুমোদিত ঐতিহাসিক রচনা-প্রণালীর গর্ব্ব" খর্ব্ব করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তন্মধ্যে এই তিনটি অনুমান একত্র গ্রথিত হইয়াছে। এই তিনটি অনুমানের মধ্যে প্রথম দুইটি অনুমান যে ভুল, অর্থাৎ উক্ত পাঁচটি মূর্ত্তি যে অভিনব শিল্পরীতির উদ্ভাবনকারী ওস্তাদের বা তাঁহার নিজ শিষ্যগণের তৈয়ারি বলিয়া মনে হয় না, স্বচক্ষে না দেখিয়া, কলিকাতায় বসিয়া, সুরেনবাবু কিপ্রকারে যে ইহা স্থির করিলেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। এখন তৃতীয় সিদ্ধান্তের—অর্থাৎ তারানাথের লেখার উপর নির্ভর করিয়া ধীমানকে পালযুগের শিল্পিগোষ্ঠীর ওস্তাদ বলিয়া স্বীকার করা যায় কিনা, তাহার বিচার করা যাক। ধীমানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তারানাথের কথার বিচার করিবার আগে জমা খরচ করিয়া দেখিতে হইবে তারানাথ ধীমানের সময়ের, অর্থাৎ গোপাল ধর্ম্মপাল এবং দেবপালের আমলের, খাঁটি ইতিহাস কতটা জানিতে পারিয়াছিলেন। তারানাথ লিখিয়াছেন—

(১) গোপাল রাজা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন (had been elected) এ কথা খালিমপুর তাম্রশাসনসম্মত।

(২) গোপাল প্রথমে বাঙ্গলার রাজা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন অর্থাৎ বাঙ্গলা তাঁহার নিবাস-ক্ষেত্র ছিল এবং পরে মগধ জয় করিয়াছিলেন (He began to reign in Bengal, but afterwards reduced Magadha also under his power—*Indian Ant.* Vol. IV, p. 366)। বৈদ্যদেবের প্রশস্তি এবং রামচরিত বরেন্দ্রদেশকে পালবংশের "জনকভূ" বা পিতৃভূমি বলিয়া এই কথার সমর্থন করিয়াছে।

(৩) গোপালের পুত্রের নাম দেবপাল; ধর্ম্মপাল দেবপালের পৌত্র, গোপালের প্রপৌত্র। একথা তাম্রশাসনে প্রদত্ত বংশাবলীর বিরোধী।

(৪) ধর্ম্মপাল সম্বন্ধে তারানাথ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, ভিনসেণ্ট স্মিথ তাহার সিফনার-কৃত জর্ম্মন অনুবাদের অবিকল ইংরেজী অনুবাদ প্রদান করিয়াছেন। যথা—

"After him [scil. Devapala], Dharmapala, the son of this king, was chosen as sovereign. He exercised sovereignty for 64 years, and since he had also brought under his rule Kamarupa, Tirahuti, Gauda, &c., his dominions were very extensive, reaching on the east as far as the ocean, on the west inland to Delhi (Dili), on the north to a point below Jalandhar, and on the south over the inner valleys from the skirts of the Vindhya mountains ... .Contemporary with this king in Western India was Cakrayudha, as appears from the inscription on the pillar (obelisk) of the younger Sita of Jayasena. Roughly speaking, it appears that he was a contemporary of the Tibetan king Khri srong lde bstan (J. R. A. S. 1909, pp. 260-261)."

অর্থাৎ দেবপালের পর তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপাল রাজা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মপাল ৬৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপাল কামরূপ, তীরহুত, গৌড় প্রভৃতি দেশ স্বীয় শাসনাধীন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য পূর্ব্বদিকে সমুদ্র পর্য্যন্ত, পশ্চিমে দিল্লি পর্য্যন্ত, উত্তরে জলন্ধরের সীমান্ত পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণদিকে বিন্ধ্য পর্ব্বতের পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জয়সেনের কনিষ্ঠ সীতার স্তম্ভলিপি হইতে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়, ধর্ম্মপালের সমসময়ে চক্রায়ুধ ভারতের পশ্চিমাংশের অধিপতি ছিলেন। ধর্ম্মপাল তিব্বতের রাজা খ্রিস্রোং দেবস্তানের সমসময়ে বিদ্যমান ছিলেন—মোটামোটি একথা বলা যাইতে পারে।

"জয়সেনের কনিষ্ঠ সীতা" অর্থ যে কি, তাহা এখনও স্থির হয় নাই, এবং কথিত স্তম্ভলিপিও আবিষ্কৃত হয় নাই। ধর্ম্মপালের সময় সম্ভবতঃ দিল্লি হয় নাই। ধর্ম্মপালের সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমা নির্দ্দেশ করিবার জন্য তারানাথ তাঁহার গ্রন্থ রচনার কালে সুপরিচিত দিল্লি নাম ব্যবহার করিয়াছেন। এই অংশে তারানাথ যে-কয়েকটি কথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে এক দেবপালের ও ধর্ম্মপালের পরস্পরের সম্বন্ধ ভুল প্রমাণিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে ধর্ম্মপালের রাজ্যের বিস্তৃতি সম্বন্ধে এবং চক্রায়ুধের সম্বন্ধে তারানাথ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পালবংশের এবং প্রতীহার-বংশের লিপির দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। মোটামোটি বলিতে গেলে ধর্ম্মপাল যে তিব্বতের রাজা খ্রিস্রোং দেবস্তানের সমসময়ে বিদ্যমান ছিলেন একথাও সত্য। তিব্বতের এই সুপ্রসিদ্ধ নরপতির সময়ের একটি তারিখ আমরা ঠিক জানি। ৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চীনের সম্রাট্ তিৎসাংএর সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। লাসার জোকাং মন্দিরের দ্বারদেশের নিকট প্রতিষ্ঠিত একটি স্তম্ভগাত্রে সেই সন্ধিপত্র উৎকীর্ণ রহিয়াছে (J. R. A. S. 1909, ৯২৩-৯৫২ পৃঃ)। জৈন "হরিবংশ" হইতে জানিতে পারা যায়, ধর্ম্মপাল যে ইন্দ্রায়ুধ বা ইন্দ্ররাজকে পরাজিত করিয়া, চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তিনিও ৭৮৩-৭৮৪ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন (গৌড়রাজমালা ১৯ পৃঃ)। সুতরাং ইন্দ্রায়ুধের সমসময়ে বিদ্যমান ধর্ম্মপালকে তিব্বতরাজ খ্রিস্রোং দেবস্তানের সমসময়ের লোক স্থির করিয়া তারানাথ অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। তারানাথের গ্রন্থে গোপালের এবং ধর্ম্মপালের ইতিহাসের এতগুলি খাঁটি কথার উল্লেখ দেখিয়া অনুমান হয়—এই যুগের ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের কোনও নির্ভরযোগ্য আকর—কোনও গ্রন্থ বা লিপি—গ্রন্থরচনার সময় তারানাথের হাতের কাছে ছিল। একখানি স্তম্ভলিপির আভাস তারানাথ স্বয়ংই দিয়াছেন। তিনি ধীমান ও বীতপাল সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অমূলক নাও হইতে পারে। গোপালের এবং ধর্ম্মপালের সম্বন্ধে আমরা যে-কিছু প্রমাণ পাইয়াছি, আমাদের এই সিদ্ধান্ত সেই-সকল প্রমাণসম্মত, সুতরাং বৈজ্ঞানিক-রীতিসম্মত (scientific induction)। এই

সিদ্ধান্তই যে ধীমান ও বীতপাল সম্বন্ধে চরম সিদ্ধান্ত একথা বলি না। বিজ্ঞান চরম সিদ্ধান্ত জানে না; বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসারে বিচারনিষ্ঠ ব্যক্তি কোনও সিদ্ধান্তকেই চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া অনুসন্ধান ত্যাগ করে না।

প্রবন্ধের উপসংহারে সুরেন বাবু বর্দ্ধমান জেলার অট্টহাসগ্রামে সম্প্রতি আবিষ্কৃত একখানি প্রস্তরমূর্ত্তির, এবং আর চারিখানি সুপরিচিত ধাতুমূর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমখানি কোন্ দেবতার মূর্ত্তি তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। দেবীর শ্বাসরুদ্ধ হইবার উপক্রমের সঙ্গে সঙ্গে "শীর্ণ অধরপ্রান্তে ক্ষীণ হাস্যরেখা শিল্পীর অপূর্ব্ব কলাকৌশলের নিদর্শন" বলিয়া কথিত হইয়াছে। তুলনার জন্য

চর্চ্চিকা দেবী।

আমাদের সংগ্রহালয়ে স্থিত একখানি "জরাজীর্ণা শীর্ণা" দেবী-মূর্ত্তির প্রতিকৃতি দিলাম। এই মূর্ত্তিখানি দীনাজপুর জেলায় পাওয়া গিয়াছে। মূর্ত্তির উপরদিকে খোদিত আছে "চর্চ্চিকা"। অর্থাৎ মূর্ত্তিখানি চর্চ্চিকার বা চামুণ্ডার মূর্ত্তি। মূর্ত্তি-কয়খানির গুণগান করিয়া সুরেন বাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—

"রাঢ়ে ও বঙ্গে আবিষ্কৃত এই-সমস্ত নিদর্শনের প্রমাণের বিরুদ্ধে কেবল তারানাথের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া বরেন্দ্রবাসী ধীমানকে গৌড়ীয় শিল্পরীতির প্রতিষ্ঠাতা নির্দ্দেশ করা বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর অনুমোদিত হয় নাই।"

এই-সকল মূর্ত্তি হইতে সুরেন বাবু যে কি প্রমাণ সংগ্রহ করিলেন, এবং আমরাই বা কেমন করিয়া সেই প্রমাণের বিরুদ্ধাচরণ করিলাম, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এই-সকল মূর্ত্তির রচনারীতি যদি বরেন্দ্রে আবিষ্কৃত মূর্ত্তিনিচয়ের রচনারীতির অনুরূপ না হয়, অন্যরূপ হয়, তবে আমরা রাঢ়ে বঙ্গে এবং বরেন্দ্রে স্বতন্ত্র ওস্তাদের প্রতিষ্ঠিত স্বতন্ত্র শিল্পিগোষ্ঠীর অস্তিত্বই স্বীকার করিব, একই ধীমান বরেন্দ্রে এক প্রকার শিল্পিরীতি প্রবর্ত্তিত করিয়া, রাঢ়ে অন্যপ্রকার শিল্পরীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন একথা কখনই বলিতে পারিব না। সুরেনবাবু কিন্তু রীতিবৈষম্য স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, "গৌড় বঙ্গ মগধ অঙ্গ ও রাঢ়ে একই শিল্পরীতি প্রচলিত ছিল।" এ কথা মানিয়া লইলে, সেই রীতির উৎপত্তিস্থানও যে একটাই ছিল, তাহাও মানিয়া লইতে হয়। যিনি ধর্ম্মপালের খালিমপুরের তাম্রশাসন আবিষ্কারের পূর্ব্বে আমাদিগকে গোপালের নির্বাচনের কথা শুনাইয়াছিলেন, এবং নারায়ণপালের ভাগলপুরের তাম্রশাসন আবিষ্কারের পূর্ব্বে চক্রায়ুধের কথা শুনাইয়াছিলেন, সেই তারানাথের কথার অনুসরণ করিয়া, আমরা আপাতত বলিতে চাই—গৌড়শিল্পরীতির জন্মস্থান ধীমান ও বীত-পালের কারখানা। এই সিদ্ধান্তও আমরা চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া ধরিয়া থাকিতে চাই না।

২। বৌদ্ধধর্ম্ম কোথা হইতে আসিল।

পত্রান্তরে (ভারতবর্ষ, ১০১৮ পৃঃ) প্রকাশিত প্রবন্ধের গোড়ায় সুরেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—

"মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'বৌদ্ধ ধর্ম্ম' সম্বন্ধে যে-সকল প্রবন্ধ 'নারায়ণে' ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছে, সেগুলি সারগর্ভ ও শিক্ষাপ্রদ হইলেও উত্তরবঙ্গের কতকগুলি ব্যক্তির তুষ্টি সম্পাদন করিতে পারে নাই। উত্তরবঙ্গের দুইজন অধ্যাপক দুইখানি স্থানীয় মাসিক পত্রিকায় শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়াছেন।"

এই কতকগুলি ব্যক্তির মধ্যে দুইজন অধ্যাপক ছাড়া আর যাঁহারা থাকিতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে কিছু বলিব। সারগর্ভ এবং শিক্ষাপ্রদ মনে করিয়াই, শাস্ত্রী মহাশয় যখন যাহা লেখেন, তাহা আমরা সাদরে পাঠ

করি। "বৌদ্ধধর্ম্ম"ও পাঠ করিয়াছি। কিন্তু সুরেন-বাবু যাহা অনুমান করিয়াছেন তাহা ঠিক,—আমরা ঐসকল পাঠ করিয়া তুষ্ট হইতে পারি নাই। কেন তুষ্ট হইতে পারি নাই, তাহার কয়েকটি হেতু এখানে প্রদান করিতেছি। কেহ যদি আমাদের ভুল বুঝাইয়া দিতে পারেন, তবে বাধিত হইব। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম যে সাংখ্য হইতে উৎপন্ন, ইহা শাস্ত্রী মহাশয়ের নূতন কথা নহে। জেকবি গার্ব প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ একথা বরাবরই বলিয়া আসিতেছেন। শাস্ত্রী মহাশয় এই মতের বলে একটি অভিনব মত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যথা,

"যদি সাংখ্য হইতে বুদ্ধমতের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে বৈদিক আর্য্য মত হইতে উহার উৎপত্তি বলা যাইতে পারে না। (নারায়ণ, ফাল্গুন, ৩৯৭ পৃঃ)।"

এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে শাস্ত্রী মহাশয় যে-সকল যুক্তি প্রমাণ দিয়াছেন, এখানে তাহার আলোচনা করিব।

(১) "সাংখ্যমত কি বৈদিক আর্য্যগণের মত?......বাস্তবিকও কপিলকে কেহ ঋষি বলে না।......শ্বেতাশ্বতরে তাঁহাকে 'পরমর্ষি' বলা হইয়াছে। কিন্তু ভাব ভাষা ও মত দেখিলে এখানি নিতান্ত অল্পদিনের পুস্তক বলিয়া মনে হয় (৩৯৫)।" "মহাভারতে আসুরির নাম নাই পঞ্চশিখের নাম আছে (৩৯৬)।"

মহাভারতে এবং অন্যান্য প্রাচীন শাস্ত্রে এই কথার একেবারে বিরোধী প্রমাণ দৃষ্ট হয়। যথা মহাভারতের শান্তি-পর্ব্বে (২১৮।৯-১০) পঞ্চশিখ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"যমাহুঃ কপিলং সাংখ্যাঃ পরমর্ষিং প্রজাপতিম্।
স মন্যে তেন রূপেণ বিস্মাপয়তি হি স্বয়ং॥
আসুরেঃ প্রথমং শিষ্যং যমাহুশ্চিরজীবিনম্।"

"তাঁহারে দেখিলে বোধ হয় যেন সাংখ্যমতাবলম্বীরা যাঁহারে কপিল মহর্ষি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তিনিই স্বয়ং পঞ্চশিখ নাম ধারণ করিয়া সমুদায় লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছেন। ঐ মহাত্মা আসুরির প্রধান শিষ্য ও চিরজীবী ছিলেন (৺কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ)।"

মহাভারতের এই বচনে কপিলকে ঋষি (পরমর্ষি) বলা হইয়াছে, এবং আসুরির নামও করা হইয়াছে। বোম্বাইয়ে ছাপা মহাভারতেও এই বচন দৃষ্ট হয়, কলিকাতায় ছাপা মহাভারতেও এই বচন দৃষ্ট হয়।

সাংখ্যকারিকার ভাষ্যকার (শঙ্করাচার্য্যের গুরুর গুরু) গৌড়পাদ তাঁহার ভাষ্যের উপোদ্‌ঘাতে এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
আসুরিঃ কপিলশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখ স্তথা।
ইত্যেতে ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ সপ্ত প্রোক্তা মহর্ষয়ঃ॥"

অর্থাৎ সাংখ্যবক্তা কপিল, আসুরি এবং পঞ্চশিখ এই তিন জনই ব্রহ্মার পুত্র এবং মহর্ষি।

মহাবস্তু অবদান নামক প্রাচীনতম সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থে "কপিলবস্তু" (বাস্তু নহে) নগর প্রতিষ্ঠার বৃত্তান্ত আছে (Vol. I, pp 348-352)। তাহাতে কপিল ঋষি বলিয়াই কথিত হইয়াছেন। এক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—

"কপিলেন ঋষিণা বস্তু দিন্নং তি কপিলবস্তু সমাখ্যা উদপাসি।"
"কপিল ঋষি জমী [বস্তু] দান করিয়াছিলেন বলিয়া নগরের নাম 'কপিলবস্তু' হইল।"

পরবর্ত্তী পুরাণাদির কথা নাই তুলিলাম। কপিলকে সকলেই ঋষি বলে। শাস্ত্রী মহাশয় কেমন করিয়া যে ইহার বিপরীত কথা বলিতে পারিয়াছেন, সুরেনবাবু তাহা বুঝাইয়া দিতে পারিবেন না?

"শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ"ও "নিতান্ত অল্পদিনের পুস্তক" নহে। কারণ এই উপনিষদের শাঙ্করভাষ্য আছে, এবং শঙ্করাচার্য্য শারীরক ভাষ্যে ইহার অনেক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বাঙ্গলা দেশের কোন অংশে যে কপিলের আশ্রম ছিল, একথা কোনও শাস্ত্রে নাই। কপিল সম্বন্ধে চব্বিশ পরগণায় যে প্রবাদ আছে, তাহার মূল্য কিছুই নয়। বগুড়া জেলায় বিরাট নামক গ্রামের ধ্বংসাবশেষ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে—সেখানে বিরাট রাজার বাড়ী ছিল, এবং পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীর সহিত অজ্ঞাতবাসের কালে তথায় ছিলেন। এই শ্রেণীর শাস্ত্রবিরুদ্ধ স্থানীয় প্রবাদের কোনও মূল্য নাই। রামায়ণের মতে যে কপিল সগরসন্তানগণকে ভস্মীভূত করিয়াছিলেন, তাঁহার আশ্রম ছিল রসাতলে। কপিলঋষির আশ্রম সম্বন্ধে যদি কোনও প্রবাদের কিছু মূল্য থাকে, তবে সে মহাবস্তু অবদানাদি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে রক্ষিত প্রবাদের। কপিলবস্তু কোশলরাজ্যের সীমান্তে, হিমালয়ের পাদদেশে, অবস্থিত ছিল। কোশল ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রাজন্যগণের অধিকৃত এবং বৈদিক আর্য্য-সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র ছিল। শতপথ ব্রাহ্মণের বিদেঘ মাথবের আখ্যায়িকা হইতে এবং জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ হইতে জানা যায় বৈদিক আর্য্যসভ্যতা বিদেহ বা মিথিলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। বিদেহ দেশের পূর্ব্বসীমান্তে স্থিত পুণ্ড্রদেশ এবং দক্ষিণ সীমান্তে স্থিত অঙ্গ এবং মগধদেশ বাহ্যদেশ বলিয়া

গণ্য হইত। মহাবস্তু অবদানে কপিলকে ঋষি বলা হইয়াছে এবং গৌতম বুদ্ধকে ইক্ষ্বাকু-বংশোদ্ভব বলা হইয়াছে। বংশে বা আচারে ম্লেচ্ছ বা অনার্য্য হইলে, সেই সুপ্রাচীন কালে কপিল কখনও ঋষি বলিয়া এবং গৌতম বুদ্ধ ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য হইতেন কি? যেখানে আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে কপিলবস্তু নগর অবস্থিত ছিল, তাহার নিকটে এখন থারুজাতি বাস করে। কিন্তু আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বেও যে সেখানে থারুগণ বাস করিত, এবং থারু ও চেরপাদা যে একজাতি, বিনাপ্রমাণে একথা বিশ্বাস করা যায় না।

(২) বৌদ্ধধর্ম্ম যে বৈদিক আর্য্যসভ্যতামূলক নহে, প্রাচ্য বাহ্যসভ্যতামূলক, এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে শাস্ত্রী মহাশয়ের দ্বিতীয় প্রমাণ—

"বৌদ্ধধর্ম্মে আরও অনেক জিনিষ আছে যাহা আর্য্যধর্ম্মের খুব বিরোধী। আর্য্যগণ তিন আশ্রম পালন না করিয়া ভিক্ষু আশ্রম গ্রহণ করিতেন না। আপস্তম্ব প্রভৃতি সকল সূত্রকারেরই মত এই যে, ব্রহ্মচারী হইয়া গৃহস্থ, তাহার পর বানপ্রস্থ ও তাহার পর ভিক্ষু হইবে। কিন্তু বুদ্ধ উপদেশ দিতেন যে যখনই সংসারে বিরাগ উপস্থিত হইবে, তখনই সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হইতে পারিবে।"—নারায়ণ, ৩৯৭ পৃঃ

ধর্ম্ম-সূত্রকার আপস্তম্ব (২.৯.২১।১) এবং গৌতম (১।৩।২) যে আশ্রম-চতুষ্টয়ের মধ্যে ভিক্ষু আশ্রমকে তৃতীয় স্থান, বানপ্রস্থ আশ্রমকে চতুর্থ স্থান প্রদান করিয়াছেন, শাস্ত্রী মহাশয় সে কথা লক্ষ্যই করেন নাই। টীকাকার হরদত্ত গৌতমীয় সূত্রের টীকায় লিখিয়াছেন—

"শাস্ত্রান্তরেষু বৈখানসস্তৃতীয়ো ভিক্ষুশ্চতুর্থ আশ্রম। ইহ তু ক্রমভেদ প্রাগুক্তত্রয় আশ্রমিণ ইত্যত্র বৈখানস বর্জ্জনার্থঃ।"

অন্যান্য (স্মৃতি) শাস্ত্রে বানপ্রস্থ তৃতীয় আশ্রম এবং ভিক্ষু চতুর্থ আশ্রম। এখানে যে আশ্রমের ক্রমভেদ করা হইয়াছে তাহার কারণ (গৌতমের মতে) প্রথম তিন আশ্রম পালনীয়, এবং বৈখানস আশ্রম বর্জ্জনীয়।

আপস্তম্ব প্রভৃতি সূত্রকারগণের দোহাই দিয়া শাস্ত্রী মহাশয় আর যাহা বলিয়াছেন মূল গ্রন্থে এবং বুলরের অনুবাদে তাহার ঠিক বিপরীত কথা আছে। আপস্তম্বের এবং গৌতমের মতে ব্রহ্মচর্য্যের অব্যবহিত পরেই ভিক্ষু আশ্রম গ্রহণের কোন বাধা নাই। আপস্তম্ব ব্যবস্থা করিয়াছেন (২।৯।২১।৮)—

"অতএব ব্রহ্মচর্য্যবান্ প্রব্রজতি।"

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ধর্ম্ম পালন করিয়া "ব্রহ্মচর্য্যবান্ ব্যক্তি পরিব্রাজক হইবেন।

এখানে ব্রহ্মচর্য্যের পরেই পরিব্রাজক- বা ভিক্ষু-ধর্ম্ম গ্রহণ বিহিত হইয়াছে। ধর্ম্ম-সূত্রকার গৌতমও বলিয়াছেন (৩।১)—

"তস্যাশ্রমবিকল্পমেকে ব্রুবতে।"

কেহ কেহ বলেন সেই (অধীতবেদ ব্রহ্মচারী) ইচ্ছামত যে কোন আশ্রম গ্রহণ করিতে পারেন।

বৌদ্ধ-আচারের এবং আর্য্য-আচারের ভেদ সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের আর-একটি উদাহরণও এইরূপ অমূলক। তিনি লিখিয়াছেন,

"বৌদ্ধেরা সব মাথা কামায়—কোথাও একগাছি কেশ রাখে না। কিন্তু হিন্দুর পক্ষে মাথার মাঝখানে একটা শিখা রাখা নিতান্ত দরকার। একথা যে আমরাই বলিতেছি এমন নহে, যে-সকল মুসলমানেরা প্রথম বেহার দখল করেন তাঁহাদেরও আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছিল।......সব মাথা কামান হিন্দুর হইতেই পারে না। তবে ইদানীং কোন কোন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী শিখা ত্যাগ করিতেছেন।"—নারায়ণ, ১ম খণ্ড, ৪৬৩—৪৬৪ পৃঃ

ভিক্ষুপ্রসঙ্গে ধর্ম্মসূত্রকার গৌতম ইহার ঠিক বিপরীত কথা বলিয়াছেন—

"মুণ্ডঃ শিখী বা। ৩।২১।"

(ভিক্ষু) সকল মাথা মুণ্ডন করিতে পারেন অথবা শিখা রাখিতে পারেন।

এই সূত্রের টীকায় হরদত্ত লিখিয়াছেন—

"সর্ব্বানেব কেশান্ সহ শিখয়া বাপয়েৎ। শিখাবর্জ্জং বাপয়েদ্বা। মুণ্ডঃ শিখী বেতি বিকল্পে নৈকদণ্ডত্রিদণ্ডগ্রহণবিকল্পোঽপ্যুক্তঃ। অত শ্রুতিস্মৃতী—

অগ্নেরিব শিখা নান্যা যস্য জ্ঞানময়ী শিখা।
স শিখীত্যুচ্যতে বিদ্বান্নেতরে কেশধারিণঃ। ইতি।
সশিখং বপনং কৃত্বা বহিঃ সূত্রং ত্যজেদ্ বুধঃ।
একদণ্ডং গৃহীত্বা চ ভিক্ষুধর্ম্মং সমাচরেৎ।
শিখী যজ্ঞোপবীতী চ যদ্বা সম্যক্ প্রবোধিতঃ।
ত্রিদণ্ড গ্রহণং কৃত্বা ভিক্ষুধর্ম্ম সমাচরেৎ।"

শিখার সহিত সকল চুল ফেলিয়া দিবে অথবা শিখা রাখিয়া সকল চুল ফেলিবে। সকল মস্তক মুণ্ডন অথবা শিখা রাখিয়া মস্তক মুণ্ডনের বিকল্পব্যবস্থা করায় একদণ্ড বা ত্রিদণ্ড গ্রহণ সম্বন্ধেও বিকল্প বিহিত হইয়াছে। এই বিষয়ে শ্রুতির এবং স্মৃতির বিধান এইরূপ—"অগ্নির শিখার ন্যায় যাঁহার জ্ঞানময়ী শিখা আছে, অন্যপ্রকার শিখা নাই, সেই বিদ্বান্ ব্যক্তিকে শিখী বলে, অপর লোকেরা কেশধারী মাত্র ইতি।

জ্ঞানী ব্যক্তি শিখার সহিত মস্তক মুণ্ডিত করিয়া, উপবীত ত্যাগ করিয়া একদণ্ড গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুধর্ম্ম আচরণ করিবে। যিনি সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনি শিখা এবং যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুধর্ম্ম আচরণ করিবেন।

গৌতমীয় ধর্ম্মসূত্রকে নিতান্ত অল্পদিনের পুস্তক বলা যায় না। গৌতম বুদ্ধ নূতন একটি ভিক্ষুসম্প্রদায় (শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ) গঠন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, কোন কোন পুরাতন

আচার গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং প্রয়োজনমত পুরাতন বর্জ্জন করিয়া, নূতন আচার প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। পুরাতন আচার গ্রহণের দৃষ্টান্তের স্বরূপ বর্ষাব্রতের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভিক্ষুধর্ম্ম-প্রসঙ্গে গৌতমীয় ধর্ম্মসূত্রে (৩।১২) বিহিত হইয়াছে "ধ্রুবশীলো বর্ষাস্থ", "বর্ষাকালে ভিক্ষু বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না, একস্থ নে অবস্থান করিবেন।" শাক্যপুত্রীয় শ্রমণেরা আদৌ এই নিয়মটি প্রতিপালন করিতেন না। বিনয়পিটকের অন্তর্গত মহাবগ্‌গে কথিত হইয়াছে (৩।১), বুদ্ধ একসময়ে রাজগৃহে বেণুবনে কলন্দকনিবাসে অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময় লোকেরা তাঁহাকে জানাইল, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণেরা বর্ষার সময়ও ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাতে কচি ঘাস এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অথচ অন্যান্য সম্প্রদায়ের ভিক্ষুরা বর্ষার সময় একস্থানে অবস্থান করে। এই কথা শুনিয়া বুদ্ধ আদেশ দিলেন যে তাঁহার ভিক্ষুশিষ্যগণও বর্ষাকালে ধ্রুবশীল হইবেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে (আপস্তম্ব ২।৯।২১।১০) ভিক্ষুগণের বাসগৃহে বাসের ব্যবস্থা নাই। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ প্রথম প্রথম বাসগৃহে থাকিতেন না,—বনে জঙ্গলে, গাছতলায়, পর্ব্বতের গুহায়, খোলা মাঠে বাস করিতেন। চুল্লবগ্‌গে (৬।১) কথিত হইয়াছে, রাজগৃহের জনৈক শ্রেষ্ঠীর অনুরোধে বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে বিহারে বা আশ্রমে বাস করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন।

"বৌদ্ধগণের অনেক আচারব্যবহার আর্য্যগণের মধ্যে নাই" এই প্রমাণের বলে শাস্ত্রী-মহাশয় সূচিত করিয়াছেন আদিম বৌদ্ধগণ, স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ, অনার্য্য ছিলেন। তর্কের স্থলে যদি স্বীকারও করা যায় বৌদ্ধগণের অনেক আচারব্যবহার আর্য্যগণের মধ্যে নাই, তথাপি গৌতম বুদ্ধ এবং তাঁহার আদিম শিষ্যগণকে অনার্য্য বলিয়া সাব্যস্ত করা যায় না। মানবতত্ত্ববিদ্‌গণ আচারভেদকে স্থলবিশেষে জাতিভেদের (ethnic difference) প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু তাহা সভ্যসমাজের আচার নহে। অসভ্য সমাজে যে আচারভেদ লক্ষিত হয় তদনুসারে জাতিবিভাগ (classification of races) করা যাইতে পারে। সভ্যসমাজে যে-সকল অসভ্যজনোচিত আচার লক্ষিত হয়, এবং যে-সকল আচার বর্ব্বর অবস্থার আচারের ধ্বংসাবশেষ (survivals) বলিয়া মনে হয়, তাহাও জাতিবিভাগের প্রমাণস্বরূপ স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু উন্নতিশীল সমাজের পরিবর্ত্তনশীল আচারকে জাতিভেদের (ethnic difference) প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা জাতিবিজ্ঞানসম্মত নহে। আধ্যাত্মিক হিসাবে ভারতবাসী যখন সভ্যতার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন, তখনই ভিক্ষু বা সন্ন্যাস আশ্রম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সুতরাং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিক্ষুর মধ্যে যে আচারভেদ ছিল, তাহা জাতিভেদমূলক মনে না করিয়া, মতভেদমূলক মনে করাই সঙ্গত।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

গো-ধন

(সমালোচনা)

গো-সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার জ্ঞাতব্যতত্ত্ব-সম্বলিত পুস্তকখানি আকারে বড়, পৃষ্ঠায় ৩৩০। ইহার লেখক শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমার অভিমতি জানিবার নিমিত্ত উপহার দিয়াছেন। কিন্তু এই পুস্তকে এত বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য হইতে ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞান, গো-বিদ্যা, গো-রোগ ও চিকিৎসা পর্য্যন্ত এত বহুতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে আমা দ্বারা এই পুস্তকের সম্যক সমালোচনা হইতে পারিবে না। বিশেষতঃ, আমি আমার পুস্তকাদি হইতে সম্প্রতি দূর-প্রবাসে আছি। এখানে বসিয়া এই পুস্তকের সকল কথা সংক্ষেপে সমালোচনারও সুবিধা নাই। গ্রন্থকার মহাশয় আমার অযোগ্যতা ক্ষমা করিবেন এই আশায় যৎকিঞ্চিৎ লিখিতেছি।

গ্রন্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "পিতৃব্য মহাশয় একটি দুগ্ধবতী গাভী দিয়াছিলেন। গাভীটি এক দিবস সর্দ্দি ও জ্বরে আক্রান্ত হইল। একটি কৃষক দ্বিতীয় কৃতান্তের ন্যায় তাহার চিকিৎসক-রূপে উপস্থিত হইল। তাহার একদিনের চিকিৎসায় যন্ত্রণায় ছটফট করিয়া গাভীটি প্রাণত্যাগ করিল। বড় আঘাত পাইলাম। দেখিলাম দেশে গো-চিকিৎসক নাই; গো-চিকিৎসার গ্রন্থ নাই।" যে গ্রন্থের মূলে সর্ব্বভূতে দয়া, হিন্দুর "ভগবতী", দেশের অভাববোধ, সে গ্রন্থে গুণের ভাগ অবশ্য অধিক হইয়া থাকে। বস্তুতঃ গ্রন্থকার গো-জাতির মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া লিখিয়াছেন, লিখিতে বহু পরিশ্রম করিয়াছেন, নানা পুস্তক হইতে উপদেশ সংগ্রহ করিয়াছেন, পাঠকের নিকট জ্ঞাতব্য তত্ত্ব পুঞ্জীভূত করিয়াছেন। অত্যধিক যত্ন দ্বারা স্নেহময়ী মাতা সময়ে সময়ে সন্তানের অহিত করিয়া বসেন। আমার মনে হয়, গ্রন্থকার একটু ধৈর্য্য একটু সংযম রক্ষা করিলে পুস্তকখানি সর্ব্বতোভাবে "কেজো" হইতে পারিত।

তিনি পুস্তকের নাম "গো-ধন" করিয়াছেন। গোরু আমাদের ধনবিশেষ, গোধন-বিচার অর্থ-বিদ্যার অন্তর্গত, এই কথা সর্ব্বত্র স্মরণ রাখিলে তাঁহার উদ্দেশ্য এবং দেশের অভাব পূরণ হইত। যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে যে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই, এমন নহে। আছে অনেক; আমার বোধ হয় অল্প থাকিলে সাধারণ পাঠকের কাজে অধিক লাগিত।

কথাটা একটু বিস্তর করিতেছি। আমরা চাই, গো-পরিচর্য্যা, গো-পালন, গো-চিকিৎসা শিখিতে, গো-ধন রক্ষা ও বৃদ্ধি করিতে। এই এই বিষয় শিখাইতে একদিকে বেদ স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি, অন্যদিকে ইংরেজী বিশ্বকোষ ও অসংখ্য পুস্তক, সব মন্থন করিতে পারেন, আপত্তি নাই। কিন্তু মন্থন দেখাইয়া ক্ষান্ত হইলে চলিবে না; আমরা নবনীতের আশায় বসিয়া আছি। তিনি নবনীত দিয়াছেন, কিন্তু সব সময় নবনীত জমে নাই, সব সময় শীঘ্র দেন নাই।

তিনি লিখিয়াছেন, "আইন আকবরীতে দেখা যায়, আকবরের সময়েও এক আনায় এক সের ঘৃত, ও ।৵০ আনায় এক মণ দুগ্ধ বিক্রীত হইত। সেই স্থলে এখন এক সের ঘৃতের দাম ২।০ টাকা; এবং টাকায় এখন খাঁটি দুগ্ধ /৩, /৪, সেরের অধিক প্রাপ্ত হওয়া যায় না।* আমরা দুধ ঘি সস্তা পাইতে চাই। ভাতের সঙ্গে একটু দুধ ঘি না জুটিলে বাঙ্গালী কিসে শক্তি ও সামর্থ্য, আয়ু ও কান্তি রক্ষা করিবে? দেশের গোরুর অবনতি ও হানির নানাকারণ জুটিয়াছে। গ্রন্থকার একে একে ২৩টা কারণ গণিয়াছেন! তন্মধ্যে দুই পাঁচটা শুনিলেই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িতে হয়, মনে হয় গো-ধন রক্ষার উপায় নাই। যেকালে দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম-রক্ষা সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে, সেকালে গো-ধন রক্ষা কে করে? সব দিন সব মানুষেরই "দানাপানি" জোটে না, গোরুর কথা কে জিজ্ঞাসে? গো-পালনে ধর্ম্ম, পুণ্য, হিত, প্রভৃতি যাহা হয় হউক; গোড়ার কথা অর্থনীতি। গোআলা দুধে জল মিশায়; কারণ না মিশাইলে তাহার সংসার চলে না। যখন টাকায় ৬।৭ সের মাত্র চাউল, তখন দুধ ঘি মহার্ঘ ত হইবেই। ধান গম সস্তা হউক, দুধ-ঘিও সস্তা হইতে পারিবে। কটকে দেখিয়াছি, রাখাল মাঠে গোরু চরাইতে লইয়া যায়; সন্ধ্যাকালে খোলা পেটে গোরু ফিরিয়া আসে। চলিতে পারে না, ডাকিলে ডাক শোনে না, গায়ের হাড় জির্‌জির্ করে। দেখিলে রাখালের প্রতি রাগ হয়। কিন্তু রাখালেরও হাড়-জির্‌জিরা দেহ দেখিলে রাগ আর থাকে না। নামে মাঠ; বালিতে ঘাস গজাইতে পারে না। ঘরে পয়সা নাই; বিনা পয়সায় খড় কিনিতে পাওয়া যায় না। গ্রন্থকার যে তেইশটা কারণ উল্লেখ করিয়াছেন, সে সবের মূলে প্রজাসাধারণের দারিদ্র্য বর্ত্তমান। "অবাধ গোহত্যা" চলিতেছে বটে, কিন্তু লোকে গোরু কেন বিক্রয় করে? দেশে গোচারণ-ভূমির অভাব কেন হইয়াছে? গো-খাদ্যের গো-পানীয়ের অভাব কিসে দূর হইবে? মনে করুন, গোবধ নিবারিত হইল; দেশে ঘরে ঘরে গোরু রাখা বিধিবদ্ধ হইল। কিন্তু সে-সব গোরু কি খাইবে? গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "ভারতবাসীরা আর এখন জানে না যে গোজাতিকে কি রীতিতে আহার দেওয়া কর্ত্তব্য।" এ উক্তি সত্য নহে; তাহারা জানে, কিন্তু আহার যোগাইতে পারে না। "ভারতে গোদিগকে কোনপ্রকার খাদ্যদানের বিধান নাই, গো-গণ নিজের চেষ্টায় যে দুই চারি গ্রাস আহার করিতে পারে [? পায় ?] তাহাই তাহার আহার। আমরা নিজেদের খাদ্য শস্য উৎপাদন করি, তাহার পরিত্যক্ত অংশ যদি গোজাতি পায়, তবে তাহাই তাহাদিগের যথেষ্ট, কিন্তু ইহাতে আর চলিতে পারে না। এখন গো-খাদ্যের রীতিমত চাষাবাদ করা আবশ্যক, গ্রেটব্রিটেনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জমী স্থায়ী গোচারণ-মাঠ। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থানে গো-খাদ্য ঘাস ও বীজের চাষ হয়। * * * ইংলণ্ডে গো না থাকিলে তথাকার লোকের কিছুই ক্ষতি হইবে না।" এই-সকল উক্তির মধ্যে কিছু কিছু ভুল আছে। অনেকস্থলে গোরু মাঠে চরিয়া কোনও রকমে বাঁচিতেছে বটে, কিন্তু বহু স্থানে খাদ্যও পাইতেছে। তবে, যত পাইলে যেমন পাইলে গোরু পুষ্ট ও বলবান, গাই পুষ্ট ও দুগ্ধবতী হইতে পারিত, তত খাদ্য কিংবা তেমন খাদ্য পায় না। আমরা ধান চাষ করি; চাউল আমরা খাই, খড় কুঁড়া গোরুকে খাওয়াই। আমরা তিল সরিষা তিসীর তেল খাই, গোরুকে খইল খাওয়াই। দেশে গো-গ্রাসের উপায় আছে। যে-সব অঞ্চলে ধানের চাষ নাই কিম্বা অল্প, সে-সব অঞ্চলে গোরুর নিমিত্ত অন্য খড়ের চাষ আছে। গ্রন্থকার কথায় কথায় গ্রেটব্রিটনের সহিত আমাদের দেশের তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু সে দেশের একটা অবস্থা স্মরণ করিতে হইবে। গ্রেটব্রিটন ধনশালী, গোধন-হেতু গ্রেটব্রিটনের ধন নহে। দ্বিতীয়তঃ, সে দেশের লোক মাংসাশী; গোরু ভেড়ার মাংস খাইয়া বাঁচে। এই কারণে সে দেশে গোচারণ-মাঠ বিস্তীর্ণ, এবং "গো না থাকিলে তথাকার লোক" আহার বিনা মরিয়া যাইত। সে দেশের উৎপন্ন শস্যে ও মাংসে লোকের সম্বৎসরের খাদ্য কুলায় না; বিদেশ হইতে খাদ্য কিনিয়া আনিতে হয়। এদেশে মানুষের ও গোরুর খাদ্যের অভাব হয় না। ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময়েও ধান গম পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালে গ্রামে গ্রামে গোচর ছিল, অনেক মাঠ অনাবাদী থাকিত। এখন নাই কেন? গ্রন্থকার গোচর ভূমির নিমিত্ত কয়েকটা উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "নিম্নবঙ্গের প্রত্যেক প্রজা যদি প্রতি ১০ বিঘা জমিতে অন্ততঃ ১ বিঘা ভূমি গোচারণ-জন্য রক্ষা করিয়া চাষাবাদ করে, যদি প্রত্যেক প্রজা গো-গ্রাসের জন্য প্রতি ১০ বিঘায় ১ বিঘা জমিতে গো-ঘাস উৎপাদন করে, যদি জমিদার তালুকদারগণ প্রতি গ্রামে অন্ততঃ ৪০ বিঘা জমির এক-একটা গোচারণ মাঠ রাখিয়া অন্য জমি চাষের জন্য পত্তন করেন, তবে যদি এই দেশে পুনঃ গো সৃষ্টি হয়।" আমার অল্পজ্ঞানে এই ভূমি পর্য্যাপ্ত হইবে না, পরামর্শটা প্রজার মনে লাগিবে না। শুনিয়াছি জমিদার, বোর্ড, গভর্ণমেণ্ট গোচারণের উপায় চিন্তা করিতেছেন। কোন কোন স্থলে জোর করা আবশ্যক হইতে পারে, নির্ব্বোধকে জোর করিয়া তাহার শ্রেয়ের পথে চালনা আবশ্যক হইতে পারে। গ্রন্থকার উকীল; লোকচরিত্র জানেন। তিনি (ময়মনসিংহ) কিশোরগঞ্জের লোকেল বোর্ড ও মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান। বোর্ড দ্বারা কি হইতে পারে, তাহাও তাঁহার অজ্ঞাত নাই। গ্রামে হালের গোরুর অযত্ন প্রায় হয় না। গাই কমিয়া গিয়াছে; যাহা আছে তাহা আবশ্যক আহার বিনা জীবন্মৃত হইয়া আছে। এমন গাই আমাদের গোধন সৃষ্টি করিতেছে। পূর্ব্বকালে গোপালন হিন্দুর পুণ্য কর্ম্ম বিবেচিত হইত, শ্রাদ্ধে বৃষোৎসর্গে কৃতীর জয়জয়কার পড়িত। গোদান, ধেনুদান যেমন-তেমন দান ছিল না। সে ধর্ম্মজ্ঞান হ্রাস পাইয়াছে, সমাজ ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে, গ্রামের ভদ্রশ্রেণী অন্নচিন্তায় ব্যাকুল হইয়াছে। গ্রামে গো-চিকিৎসক দুর্ঘট হইয়াছে। গো-বৈদ্য নিন্দিতপদ হইয়াছে। গোরুর রোগ হইয়াছে, একথা শুনিবামাত্র গো-চিকিৎসক দৌড়াইয়া আসিত, বিনা পয়সায় চিকিৎসা করিত। এখনও এরূপ চিকিৎসক নাই, এমন নহে। এখনও এমন বংশ আছে যে বংশের চাষ দামড়ায় হয় না, ষাঁড়ে হয়; বাছুর দুধ খাইয়া মুখ না ফিরাইলে গাই দোহা হয় না। কিন্তু এসব অচিরে উপকথায় কিংবা পুরাণ কথায় দাঁড়াইবে। এই সঙ্কটের দিনে "গোধন" প্রণয়নের প্রয়োজন অল্প নহে।

এই কথাই বলিতেছিলাম। "গোধন"-প্রণেতা দেশের অভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহার লব্ধজ্ঞানে পুস্তক পূর্ণ করিলে আমাদের হিত অধিক করিতেন। পুস্তক ছোট হইত, সুলভ হইত। লেখক মহাশয় তাঁহার পুস্তকে ইংরেজী হইতে অনেক তত্ত্ব উদ্ধার করিয়াছেন। অধিকাংশ অনাবশ্যক; অধিকাংশ পুনরুক্তি। পুস্তকে সাত খণ্ড আছে। প্রথম খণ্ডে উপক্রমণিকা। ইহার প্রথম পরিচ্ছেদে "গোজাতির উপযোগিতা" পৃথক্ লিখিবার প্রয়োজন ছিল না। কারণ সমস্ত পুস্তকেই

* পয়সা সের দুধ হইলে আনা সের ঘি পাওয়া অসম্ভব বোধ হইতেছে। হয়ত মহিষা ঘি বুঝিতে হইবে। দুধ ঘির এখনকার দামের অনুপাত ১ : ১২। তখন ১ : ৪ হওয়ার কারণ কি?

গোরুর প্রয়োজন প্রদর্শিত হইয়াছে। "উপযোগিত," শব্দটাতেই পনীরের পচা গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, "প্রাচীনকালে ও প্রাচীনসাহিত্যে গোজাতির স্থান ও অধিকার।" এখানে "গোজাতির অধিকার" খুঁজিয়া পাইলাম না; তথাপি পুরাকালের সহিত একালের তুলনা চাই। কিন্তু গোরুর কথা বলিতে বলিতে একেবারে বৃন্দাবন-বিহারীর বংশীরব শোনার কিংবা গিরীশচন্দ্র ঘোষের "প্রভাসযজ্ঞে" যাওয়ার প্রয়োজন কিছুই ছিল না। অন্যান্য পরিচ্ছেদে এদেশের গোরুর দুরবস্থা ও অবস্থা পরিবর্তনের উপায় বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমে এ সম্বন্ধে দুইএক কথা লিখিয়াছি। দ্বিতীয় খণ্ডে, "গোজাতীয় পশুর শ্রেণীবিভাগ।" ভূমণ্ডলে যেখানে যত প্রকার গোরু আছে, কিংবা বর্ণিত হইয়াছে, এই খণ্ডে সে সকলের নাম ধাম ও অস্পষ্ট লক্ষণ লিখিত হইয়াছে, পুস্তকের ৬২ পৃষ্ঠা পূর্ণ হইয়াছে। ভারতবর্ষের কিংবা অন্য দেশের গোরুর বিশেষ বর্ণনায় গো-বিদ্যাবিদের চক্ষু চাই। শ্রেণীবিভাগ হয় নাই, তালিকা হইয়াছে। জাতির লক্ষণ নির্দেশ কঠিন, জাতের আরও কঠিন। কিন্তু গোরু দেখিয়া পুস্তকের প্রদত্ত লক্ষণ মিলাইয়া যদি জাতি ও জাত নির্ণয় না হয়, তাহা হইলে উদ্দেশ্য ব্যর্থ বলিতে হইবে। "ভাগলপুরী গোগুলির পা অতি লম্বা লম্বা, বর্ণ শুভ্র, কর্মঠ ও পরিশ্রমী। গাভীগণ ৫ সের পর্যন্ত দুগ্ধ দেয়।" এইরূপ বর্ণনায় পাঠকের জ্ঞানলাভ দুষ্কর। আমি যতটুকু জানি, ভাগলপুরের গোরু ও পশ্চিম বঙ্গের গোরু একই জাত। তৃতীয় খণ্ডে "বৃষাদির বিশেষ বিবরণ।" এই খণ্ডে কেবল বৃষ নহে, গাভীর পরিচর্য্যা ও গোরুর উৎকর্ষ সাধনও বর্ণিত হইয়াছে। এই খণ্ডে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় আছে। লেখক বলদ ও দামড়া একার্থবাচক মনে করিয়াছেন। বাস্তবিক তাহা নহে। বলীবর্দ্দ শব্দ হইতে বলদ; বলদ অর্থে যে গোরু ভার বহে। যে গোরু গাড়ী টানে তাহাকেও কোথাও কোথাও বলদ বলে। এখন বৃষের পরিবর্তে দামড়া বলীবর্দ্দ হইতেছে; কিন্তু তাহা হইলেও সব বলদ দামড়া নহে, কিংবা সব দামড়া বলদ নহে। চতুর্থ খণ্ডে গোপালন। কিন্তু বাস্তবিক ইহাতে গোপালন ব্যতীত দুগ্ধের ব্যবসায়, দুগ্ধবৃদ্ধির উপায় প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ও আছে। ইংরেজী dairy অর্থে বাথান শব্দ ভাল মনে হয় না। দেশে "গোঠ" বলে। বিশেষ করিতে হইলে বরং "ব্রজ" বলা চলে। পঞ্চম খণ্ডে দুধ দই ঘি ছেনা মাখন ননী প্রভৃতি গব্য, এবং ষষ্ঠ খণ্ডে গোচর্ম্ম শৃঙ্গ অস্থি প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক বর্ণনা আছে। এই দুই খণ্ড কোন রাসায়নিককে দেখাইয়া ছাপাইলে ভাল হইত। সে যাহা হউক, "দুগ্ধে চর্বী" আছে শুনিলে হিন্দুর দুগ্ধস্পৃহা কমিয়া যাইবে। লেখক বহু সংস্কৃত পুথি ঘাঁটিয়াছেন, কিন্তু "স্নেহ" শব্দ ভুলিয়া গিয়াছেন। "দুধে ঘি আছে" বলিলেও স্বচ্ছন্দে কথাটা স্পষ্ট হয়। অনেক স্থলে দেখিতেছি গ্রন্থকার ইংরেজী তর্জমা করিতে গিয়া বাঙ্গালাভাষা বিকৃত করিয়াছেন। মাখন ও ননী এক নহে। দুধের স্নেহ ভাগ মাখন, দইর ননী। "ছানাকে ইংরেজীতে কার্ড (curd) বলে।" ছেনার নাম ইংরেজীতে নাই; ছেনাকে বরং চীজ (cheese) বা পনীর বলা যাইতে পারে। কিন্তু ছেনার ইংরেজী নাম শেখাইবার কি প্রয়োজন ছিল? এইরূপ, "শুষ্ক গোবরকে ঘুটে বলে।" কিংবা "দুগ্ধ শ্বেতবর্ণ অস্বচ্ছ তরল পদার্থ," ইত্যাদি লিখিয়া জানাইবার প্রয়োজন ছিল না। "কোন কোন উৎকৃষ্ট গোর মস্তকে হরিদ্রাবর্ণ শুষ্ক পিত্ত থাকে, তাহাকে গোরোচনা বলে।" গ্রন্থকার এই সংবাদ কোথায় পাইলেন? আমার জানায়, গোরোচনা গোরুর উদরে জন্মে। "চর্ম্ম পাকা করার প্রণালী" না লিখিলে ক্ষতি হইত না। চামড়া কষাইবার স্থূল কথা লিখিয়া ছাড়িয়া দিলেই ভাল হইত। দেশে কোন্ কোন্ গাছের কষে চামড়া কষানা হয়, বরং সে সে গাছের নাম করিলে লোকে কিছু শিখিতে পারিত, বিলাতী গাছের নাম শুনিয়া কি শিখিবে? হরীতকী বয়ড়ার সামান্য ইংরেজী নাম "মাইরোবোলান"। "ক্রোম" দ্বারা চামড়া কষাইবার প্রণালী আধুনিক। দেশে বহুকাল হইতে কটিকারী দিয়া চামড়া কষানা হইয়া আসিতেছে। সপ্তম খণ্ডে "গোজাতির রোগ ও চিকিৎসা" বর্ণিত হইয়াছে। এ বিষয়ে আমি একেবারে অজ্ঞ। দেখিতেছি, গ্রন্থকার দেশীয় মতে, ডাক্তারী মতে ও হোমিওপেথী মতে, অনেক রোগের ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন। এবিষয়ে গ্রন্থকারের স্বয়ংলব্ধ জ্ঞান অধিক আদরণীয় হইত। বাঙ্গালা "গো-পরিচর্য্যা" এবং ইংরেজীতে গভর্ণমেণ্টের প্রকাশিত Cattle Diseases of India নামক গ্রন্থ লেখক দেখিয়াছেন কি না, বুঝিতে পারিলাম না। ৺নগেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জীর কৃষি বিষয়ক গ্রন্থেও গোচিকিৎসা আছে। তা ছাড়া, এখনও অনেক গ্রামে গোবৈদ্য ও অন্য গোচিকিৎসক আছে। তাহারা নিরক্ষর বটে, কিন্তু অশিক্ষিত কিংবা অজ্ঞান নহে। তাহাদের নিকটে বহু উপকারী ঔষধ জানা যাইতে পারে। এই কথা আবার বলিতে চাই যে বঙ্গদেশের বহু লোক নিরক্ষর বটে, কিন্তু নির্ব্বোধ কিংবা অশিক্ষিত নহে।

মোটের উপর বলিতে পারি, "গো-ধন" ভাল হইয়াছে। ইহার দোষের ভাগ সংক্ষেপে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। আশা করি গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে দোষের ভাগ থাকিবে না, গ্রন্থকলেবর হ্রস্ব হইবে, ইংরেজী হইতে অনুবাদে ইংরেজী গন্ধ থাকিবে না, এবং ছাপাইবার পূর্ব্বে গো-বিদ্যাবিদের দৃষ্টিতে পড়িবে। গ্রন্থকার যাহা জানেন, তাহা দিয়াই গ্রন্থ পূর্ণ করিলে দেশের অভাব পূরণ হইবে, পাঠক অনেক শিখিতে পারিবেন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

আলোচনা

দেশীয় রাজ্যে অবৈতনিক শিক্ষা

জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীর "দেশীয় রাজ্যে অবৈতনিক শিক্ষা"র শুম্ভে লিখিত হইয়াছে যে—"বাঙ্গলাদেশে কেবল কুচবিহার এবং পার্ব্বত্যত্রিপুরা দেশীয় রাজার অধীন। এই দুই রাজ্যে সমুদয় বালকবালিকা অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষা যদি বিনাব্যয়ে পায়, তাহা হইলে বড় ভাল হয়।" আপনারা অনেকেই বোধ হয় জ্ঞাত নহেন যে পার্ব্বত্যত্রিপুরার প্রাথমিক শিক্ষা তো বালকবালিকাগণ অবৈতনিকই পাইয়া থাকেন—অপরন্ত ছাত্রবৃত্তি, মধ্য ইংরেজী ও উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়গুলিও অবৈতনিক। যাহাতে প্রজাসাধারণ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারে তজ্জন্য ষ্টেটের কর্তৃপক্ষগণ প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন।

মোটের উপর পার্ব্বত্যত্রিপুরায় বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৬০ বা ১৭০টির ন্যূন হইবে না। প্রজাসাধারণ যাহাতে খোরাকী খাইয়া নিশ্চিন্তভাবে পড়াশুনা করিতে পারে তজ্জন্য প্রায় ছাত্রেরই ৫।৬৲ টাকা করিয়া বৃত্তি আছে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যাহাতে বালকগণ উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারে সেইজন্য প্রায় গরীব ছাত্রকেই ১৫।২০৲ টাকা করিয়া বৃত্তি দেওয়া হইয়া থাকে।

কেবল যে, মহারাজের প্রজারাই অবৈতনিক শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছেন তাহা নহে—পার্ব্বত্যত্রিপুরার বাহিরের ছাত্রগণও এইখানে আসিয়া অবৈতনিক শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছেন।

তারপর, এই রাজ্যের পক্ষে যে ১৬০ বা ১৭০টি স্কুল নিতান্ত অল্প তাহা নহে। কারণ পার্ব্বত্যত্রিপুরার লোকসংখ্যা অন্যান্য রাজ্যের অনুপাতে অনেক অল্প। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় নাই—চার পাঁচটি গ্রাম একত্র করিয়া একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া থাকে।

কারণ প্রত্যেক গ্রামে ২।৩ ঘরের বেশী প্রজা বসতি করে না। সুতরাং প্রত্যেক গ্রামে স্কুল স্থাপিত হওয়া যে এই ক্ষুদ্র রাজ্যের পক্ষে অসম্ভব তাহা সহজেই বোধগম্য হইতেছে।

সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ত্রিপুরার মহারাজা শিক্ষার জন্য যে অর্থব্যয় করিতেছেন—অনেক কম দেশীয় রাজ্যেই তাহা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এখানে একটি 'ফ্রি কলেজ'ও ছিল। কিন্তু কোনো বিশেষ কারণে মহারাজের নিজ অনিচ্ছা সত্ত্বেও মহারাজ স্বয়ংই কলেজটি উঠাইয়া দিতে বাধ্য হয়েন। কলেজের বিজ্ঞানের প্রায় সমস্ত সরঞ্জাম-পত্রই শান্তি-নিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে দান করা হইয়াছে।

ত্রিপুরার মহারাজা তাঁহার প্রজার এবং বাহিরের গরীব ছাত্রদিগের শিক্ষার জন্য অত্যন্ত চেষ্টা করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানেও করিতেছেন। যাহাতে প্রজাসাধারণ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে বাধ্য হয় তাহারও চেষ্টা চলিতেছে।

পার্ব্বত্যত্রিপুরার শিক্ষা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ভাব এইখানে প্রদত্ত হইল। বিশেষ ভাবে জানিতে হইলে পার্ব্বত্যত্রিপুরার Administration Report পাঠ করা বাঞ্ছনীয়।

শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য।
আগরতলা—ত্রিপুরা।

দেশের কথা

আজকাল অন্নসমস্যার ন্যায় দুগ্ধসমস্যাও দেশের পক্ষে মহা-আশঙ্কার কারণ হইয়াছে। ধান-জন-গো এই তিনে লক্ষ্মীলাভ—ইহা একটি প্রাচীন প্রবাদ-বাক্য। বাস্তব-ক্ষেত্রেও এই বাক্য অন্বর্থ বলিয়া মনে হয়। কারণ ধান জন ও গো—এই তিনের পরস্পর সম্পর্ক এতদূর ঘনিষ্ঠ যে, একেকে ছাড়িয়া অপরের উন্নতি কল্পনায়ও অসম্ভব। ধান জন্মাইতে জন ও গোএর প্রয়োজন যতটুকু, জনের প্রাণরক্ষায় কিংবা গো-সেবায় অপর দুইএর প্রয়োজন তদপেক্ষা কিছুমাত্র কম নহে। 'স্বরাজ' সত্যই বলিয়াছেন—

কিছুদিন পূর্ব্বেও পল্লীগ্রামে প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থের বাড়ীতে গাভী-পালন অবশ্যকর্ত্তব্য বিবেচিত হইত। কিন্তু সম্প্রতি নানাবিধ কারণ-বশতঃ পল্লীগ্রামের প্রায় হিন্দুর বাড়ী হইতেই গো-লক্ষ্মী বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। দুধের জন্য এখন আমাদিগকে সাধারণতঃ মুসলমানদেরই মুখাপেক্ষী হইতে হয়। আবার মুসলমানগণও এক্ষণে নানাকারণে ব্যাপারীদের কাছে গরু বেচিয়া মহিষ সম্বল করিতেছে।

দেশে গোজাতির সংখ্যা হ্রাস ও অবনতি হওয়াতে দুধের পরিমাণ অনেক কমিয়াছে, কিন্তু ভদ্র পরিবার হইতে গো-পালন-প্রথা এককালীন উঠিয়া যাওয়াতে দুধের খরিদ্দার যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং এমত-অবস্থায় দুধের দর অল্পদিনের মধ্যেই এত অধিক চড়িয়া গিয়াছে যে বড়-লোক ছাড়া আজকাল আর কেহ বড় একটা দুধের মুখ দেখিতেই পায় না। এমন কি অনেক ভাগ্যবানের সদ্যপ্রসূত সন্তানকেও প্রথম ঝিনুক দুধের জন্য সাতসমুদ্র তের নদী পারে সুদূর হলাণ্ড ও সুইজরল্যাণ্ডের দিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতে হয়। শুধু তাহাই নহে, অগ্নিমূল্য দিয়াও বাজারে যে দুধ মিলে, তাহারও অন্ততঃ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ খানা-ডোবা প্রভৃতির দূষিত বিষাক্ত জল। সুতরাং দিন দিনই যে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহানি হইতেছে ও হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

এই সমস্যার সমাধান-কল্পে 'স্বরাজে'র মতে

পূর্ব্বে যেমন ঘরে ঘরে গো-পালন-প্রথার প্রচলন ছিল পুনরায় সেই মঙ্গলপ্রদ প্রথার প্রচলন করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

এই প্রথা প্রচলনের পথে যে-সকল অন্তরায় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা 'স্বরাজ' তাহারও আলোচনা করিয়া বলিতেছেন—

গৃহস্থের ঘরে ঘরে গো-পালনের এক্ষণে কতকগুলি বিশেষ অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। তন্মধ্যে (১) চাকর মজুরের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতা এবং (২) পশু-খাদ্যের অভাব প্রধানভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রথম অন্তরায়ের সমাধান বড়ই জটিল—আদৌ সম্ভবপর কি না সন্দেহ। সুতরাং এস্থলে তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অন্তরায় অনেকটা সমাধানসাধ্য। কিছুদিন পূর্ব্বেও দেশে অনেক প্রকার শিল্প ও বাণিজ্য ছিল—সুতরাং তখন সকলকেই শুধু কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর করিতে হইত না। তখন যত লোক সাক্ষাৎ-ভাবে কৃষিকার্য্যদ্বারা জীবিকার্জ্জন করিত, জমির পরিমাণ তদপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বেও প্রত্যেক গ্রামেই দেখা যাইত যে এক মাঠ তিন বৎসর পতিত থাকিত—অন্য মাঠ তিন বৎসর আবাদ হইত। সুতরাং তখন গবাদি পশুর উন্মুক্ত স্থানে চরিয়া খাইবার যথেষ্ট স্থান পাওয়া যাইত। বর্ত্তমানে দেশের অবস্থা আর তেমন নাই। দেশ হইতে সর্ব্বপ্রকার শিল্প-বাণিজ্য এককালীন লুপ্ত হইয়াছে। জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলকেই আজ কৃষি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। ফলে, কৃষিজীবী লোকসংখ্যার তুলনায় ভূমির পরিমাণ অনেক কম হইয়া পড়িয়াছে। লোকে আর জমি পতিত রাখিতে পারিতেছে না। ইহাতে আশানুরূপ ফসল উৎপাদিত না হইলেও গবাদি পশু চারণের স্থানের অভাব ও অনাটন হইয়াছে। পাটের আবাদের প্রসার বৃদ্ধিতেও এই অসুবিধা আরও শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ফল কথা, গোচারণের উপযোগী স্থানের অভাবেই পল্লীবাসীগণ গোপালন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে ও হইতেছে।

এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। এবং বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ইহার প্রতিকারের জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে জমিদারগণকে যদি খানিকটা জমি গোচারণের জন্য পৃথকভাবে রাখিতে বাধ্য করা যায়, তাহা হইলে সম্ভবতঃ এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য সাধু; কিন্তু উপযুক্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা আদৌ সম্ভবপর বলিয়া আমাদের বোধ হয় না।

গোচর-জমি যখন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাইবার সম্ভাবনা নাই, তখন দেশের কৃষক-সম্প্রদায় যাহাতে ব্যবসা হিসাবে ঘাসের আবাদ করিতে আরম্ভ করে, আমাদের মতে তাহারই বন্দোবস্ত করিতে চেষ্টা করা প্রয়োজন। কৃষকদের মধ্যে ঘাসের আবাদের প্রচলন নিতান্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না। জেলাবোর্ড এ বিষয়ে চেষ্টা করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের বোধ হয় গবর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগ হইতে চেষ্টা করিলেই এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও উৎকৃষ্ট ফল লাভের সম্ভাবনা। আজকাল প্রায় প্রত্যেক জেলারই সদরে ও মহকুমায় একাধিক সরকারী কৃষিকর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন। কৃষকদের জমীতে যাইয়া কৃষিবিষয়ক উপদেশ দেওয়াই ইঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য। ইঁহাদের দ্বারা এই কাজটি অনায়াসে ও সুন্দরভাবে সম্পাদিত হইতে পারে।

আজকাল অনেক শিক্ষিত ভদ্রসন্তানও কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু পশু-খাদ্যের অভাবে ইঁহারাও বিস্তর অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন। ইঁহারা যদি স্ব স্ব কৃষিক্ষেত্রের অংশবিশেষে ঘাসের আবাদ করেন, তবে একদিকে যেমন তাঁহারাও অসুবিধার হাত অনেকটা এড়াইতে পারিবেন, অপর পক্ষে তাঁহাদের দেখাদেখি নিরক্ষর কৃষককুলের মধ্যে ঘাসের আবাদের প্রচলন হইতে পারিবে।

এসম্বন্ধে উন্নতির পন্থা অপরদিকে যতই থাকুক না কেন, সরকার বাহাদুরের সাহায্য সর্ব্বোপরি বাঞ্ছনীয়। মহীশূরের রাজসরকার এক্ষেত্রে যে সমপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছেন 'জাগরণ' তাহার আলোচনা-প্রসঙ্গে যে কথা বলিয়াছেন তাহা সর্ব্বপ্রদেশের কর্ত্তৃপক্ষের প্রণিধানযোগ্য। ঐ পত্রে প্রকাশ—

মহীশূরের দুগ্ধের অভাব দূর করিবার এবং গোশালা-প্রতিষ্ঠা-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মহীশূর-রাজসরকার ব্যবসায়ীদিগকে ঋণ দানের ব্যবস্থা করিবেন স্থির করিয়াছেন। যে-সব ব্যবসায়ী রাজ-সরকারে সাহায্য-প্রার্থী হইবেন, সরকারী-তহবিল হইতে তাঁহাদিগকে বার্ষিক শতকরা ৫৲ টাকা সুদে ৫০০০৲ ও গোচর ও ঘাস জন্মাইবার জন্য জমী পাট্টা দেওয়া হইবে। আমরা দয়ালু বঙ্গেশ্বরকে মহীশূরের অনুকরণ করিয়া বঙ্গদেশে দুগ্ধের অভাব দূর করিবার জন্য এরূপ ঋণ-দান ও জমী পাট্টা দিতে অনুরোধ করি। বাঙ্গালার সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ ছোট বড় সহরমাত্রেই, দুগ্ধের মূল্য এত অধিক যে মধ্যবিত্ত বিশেষতঃ অল্প-বেতন-ভোগী সহরবাসীর শিশু-প্রতিপালন করা নিতান্ত কঠিন। অনেক গরীব পরিবারে শিশু-সন্তানকে দুগ্ধ দিতে না পারিয়া পিতা-মাতা পাষাণে বুক বাঁধিয়া বার্লি এরোরুট এমন কি ভাতের ফেন পর্য্যন্ত খাওয়াইতে বাধ্য হয়েন। ফলে শিশু-সন্তান রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইতে থাকে এবং উপযুক্ত পুষ্টিলাভ করিতে পারে না; শিশু-সন্তানের দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া এবং তাহার কারণ বুঝিয়াও প্রতিকার করিতে অক্ষম। তাহাদের হৃদয়ের বেদনা চিন্তা করিয়া লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর প্রতিকার করুন। স্থানে স্থানে আদর্শ গোশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেশবাসীগণকে উৎসাহিত করুন।

বস্তুতঃ দেশের প্রয়োজনসিদ্ধির সহায়স্বরূপে রাজপুরুষগণ যদি প্রজাসাধারণের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিদান করেন তাহা হইলে এদেশের অনেক লুপ্তপ্রায় কলার উন্নতি সহজসাধ্য ও নবপ্রচেষ্টার সাফল্যের সম্ভাবনা হইতে পারে। সংপ্রতি বঙ্গে ও যুক্তপ্রদেশে রাজপক্ষের এরূপ সহানুভূতিমূলক যে কার্য্যের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহা সর্ব্বদেশে আদর্শস্বরূপে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার যোগ্য। 'যশোহরে' প্রকাশ—

যশোহরের গৌরবের সামগ্রী "যশোহরের চিরুণী" এখন হইতে বঙ্গেশ্বর মহামতি লর্ড কারমাইকেল মহোদয়ের নিত্যব্যবহার্য্য হইল। সম্প্রতি তিনি কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট নলডাঙ্গার রাজা-বাহাদুরকে পত্র লিখিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, যশোহরের চিরুণী-কোম্পানীকে তাঁহার নিত্যব্যবহার্য্য চিরুণী সরবরাহ করিবার জন্য নিযুক্ত করা হইল। বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল মহোদয় আমাদের যশোহরের চিরুণী-কোম্পানীকে এই সম্মান প্রদান করায় কোম্পানীর অংশীদার এবং পরিচালকবর্গ প্রীত হইবেন সন্দেহ নাই, পরন্তু গবর্ণমেন্ট দেশীয় শিল্পের সহায়তা করিতেছেন, ইহার একটা বিশিষ্ট প্রমাণ প্রকাশিত হওয়ায় সাধারণের মনে আশার প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইবে।

'রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ' যুক্তপ্রদেশের বার্ত্তা বহন করিয়া বলিতেছেন—

দেশের মধ্যে দরিদ্র চাষীর অনেক ছোট ছোট শিল্প লইয়া পল্লীর কোণে গোপনে দিন যাপন করে। বাহিরের বৃহৎ ক্রেতৃদল তাহাদের কোনও সন্ধানই জানে না। তাহাদের সেই-সমস্ত শিল্প-দ্রব্য যদি আমেরিকা ও ইয়ুরোপে প্রেরিত হয়, তবে তাহাদের খুব আদর হইতে পারে। কিন্তু গ্রাম্য শিল্পীর সেই সামর্থ্য ও সাহস কিছুই নাই। যুক্তপ্রদেশে শিল্পসমূহের ডিরেক্টর ইহাদের খবর সংগ্রহের জন্য অবৈতনিক শিল্পসংবাদদাতা নিয়োগ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। ইহাদের দেওয়া তথ্যাদি জনসাধারণের সম্মুখে গবর্ণমেন্ট উত্থাপিত করিলে উক্ত শিল্পসমূহের প্রসারের বড়ই সুবিধা হইবে।

উপরি-উক্ত পত্রে কারমাইকেল-পত্নীর যে সদনুষ্ঠানের নব কাহিনী প্রচারিত হইয়াছে তাহাও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। ইহাতে প্রকাশ—

বঙ্গেশ্বরের মধুর-হৃদয়া পত্নী লেডী কারমাইকেল মহোদয়া নানা সদনুষ্ঠানের উৎসাহদাত্রী। যাহাতে অল্প-শিক্ষিতা স্ত্রীলোকেরা রোগিচর্য্যা বা শুশ্রূষা-কার্য্য শিখিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন করিতে পারে অথচ হাসপাতালে রোগীদিগের শুশ্রূষার পথ পূর্ব্বাপেক্ষা সুপ্রসর হয় তজ্জন্য তিনি ভবানীপুরের শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষ ও পরিচালকগণকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে উক্ত হাসপাতালে স্ত্রীলোকদিগকে শুশ্রূষা-কার্য্য শিখাইবার জন্য একটি শ্রেণীখোলা হইতেছে। যে-সকল স্ত্রীলোক বাঙ্গালা ভাষা লিখিতে ও পড়িতে পারেন এবং একটু ইংরেজীও জানেন তাঁহাদিগকে রোগিচর্য্যা শিখাইবার জন্য উক্ত শ্রেণীর ছাত্রীপর্য্যায়-ভুক্ত করা হইবে। ছাত্রীদিগকে তিন বৎসর কাল শিক্ষা করিতে হইবে। এ বিষয়ে শিক্ষার্থিনীদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষ বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। ছাত্রীদিগকে প্রথম বৎসর ১০৲ টাকা, দ্বিতীয় বৎসর ১৫৲ টাকা এবং তৃতীয় বৎসর ২০৲ টাকা হিসাবে বৃত্তি প্রদান করা হইবে। শিক্ষান্তে ছাত্রীদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে প্রশংসা-পত্র দেওয়া হইবে।

একদিকে যেমন রাজপুরুষগণ দেশের জীবনীশক্তির অভিভাবকস্বরূপে আপনাদের দায়িত্ব আপনারা বুঝিয়া লইবেন, অন্যদিকে উহার অঙ্গরাগের কার্য্যভার গছিয়া লইয়া দেশবাসীগণকেও কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে—তবে তো দেশ জগৎ-সভায় দাঁড়াইবার স্থান পাইবে। ভরসার কথা, আশানুরূপ কর্ম্মপটু না হইলেও, দেশবাসী আপন কর্ত্তব্য পালনে যে একেবারে পরাঙ্মুখ নহেন প্রায়শঃই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। সংপ্রতিও এ সম্বন্ধে যে দু একটি সদনুষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। বলাবাহুল্য, এইরূপ সৎকার্য্যই দেশমাতৃকার শ্রেষ্ঠ অঙ্গপ্রসাধন।

স্বদেশহিতৈষী ধনকুবের জমিদার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল চৌধুরী মহোদয় নিজ এলাকার অধীন মৌজাহারে বহু পুকুর খনন করাইয়া দিয়াছেন। জমিদার মহোদয় স্বয়ং রাণীবাটী মহালে উপস্থিত থাকিয়া বহু প্রজার অভাব মোচন করিতেছেন।

স্থানীয় জমিদার মহোদয়গণ এইরূপ নিজ নিজ এলাকার প্রজা রক্ষায় যত্নবান হইলে শীঘ্রই হাহাকার দূর হইতে পারে।—(মালদহ সমাচার)।

কিছুদিন পূর্ব্বে বগুড়া সহরে প্রতিরাত্রেই চুরি হইত। কিছুতেই উহার নিবারণ হইতেছে না দেখিয়া সহরের কতিপয় উৎসাহী লোক প্রধান উকিল বাবু বৈদ্যনাথ সান্যাল মহাশয়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে এক দল সংগঠন করিয়াছেন। উচ্চপদস্থ গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী, উকিল মোক্তার ও তাঁহাদের মহুরিগণ, স্কুলের শিক্ষক ইত্যাদি বহু লোক এই দলে যোগদান করিয়াছেন। ৬ জন করিয়া এক এক দল গঠিত হয় এবং রাত্রিতে দুই দল পালাক্রমে সহরের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া লোকদিগকে ডাকিয়া সতর্ক করিয়া দেয়। রাত্রি ১২ টা হইতে ২ টা পর্য্যন্ত একদল এবং ২ টা হইতে ৫ টা পর্য্যন্ত অন্যদল এই কার্য্য করিয়া থাকে। ফলে সহরে চুরি একেবারে বন্ধ হইয়াছে।—(রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ)।

গত সপ্তাহের কলিকাতা গেজেটে চট্টগ্রাম বিভাগের নিম্নলিখিত দানের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে।

চট্টগ্রামে।

বরমায় দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্য কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন ২০০০৲।

সাধবপুরের 'রঘুনাথ' খালের উপর পোল নির্ম্মাণের জন্য তত্রত্য শ্রীযুক্ত সফরালী মুন্সী ১৫০০৲।

কাটাখালী খালের উপর সেতু নির্ম্মাণের জন্য জলদি-নিবাসী শ্রীযুক্ত মুন্সী কেরামত আলী ১২০০৲।

ত্রিপুরায়।

গোবিন্দপুর গ্রামে একটি পুকুর খননের কার্য্যে সেখানকার শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র কর ৩০০০৲।

শিলমুরী গ্রামে একটি মধ্য-ইংরেজী স্কুল স্থাপনের কার্য্যে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ-মোহন মজুমদার ২০০০৲।

শ্রীঘর গ্রামের রায় শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন নাহা জলাশয় খননের কার্য্যে ২০০০৲।

আথাউড়ায় একটা পুরাতন জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধারের জন্য ত্রিপুরা রাজসরকার হইতে ১৭৪০৲।'—(ঢাকা-প্রকাশ)।

মাহিলাড়া গ্রামের সাধুপ্রকৃতির কয়েকটি লোক একত্র-যোগে স্থানীয় মাহিলাড়া স্কুলের নিকটবর্ত্তী ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের রাস্তার পার্শ্বে প্রসিদ্ধ শিমূলতলায় একখানি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, পথিকদের কষ্ট নিবারণের জন্য জলদান ও বিশ্রামের সুবিধা করিয়াছেন। প্রায় ৪ মাইলের মধ্যেও পথিকদের বিশ্রাম অথবা জলপান করিবার স্থান নাই। এই জলছত্র দ্বারা তাহার অনেক অভাব ও ক্লেশ দূর হইয়াছে। পথিকদিগকে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তামাক, পান, বাতাসা ও জল দেওয়া হইতেছে।—(বরিশাল-হিতৈষী)।

এ জেলার (বরিশাল) গৈলার প্রসিদ্ধ "আগৈল-ঝাড়ার" হাটখোলায় দেবমন্দির, অবৈতনিক বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, পান্থশালা, এবং অনাথআশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানকার কার্য্যাদি জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সম্পাদিত হইয়া থাকে। উক্ত গ্রামের ভেগাই হাওলাদার তাহার সঞ্চিত বহু অর্থ ও সম্পত্তি এই কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছে, এবং অন্যান্য মহাত্মাদিগের নিকট হইতেও এই জন্য প্রায় চারি শতাধিক টাকা এযাবৎ পাওয়া গিয়াছে ; তথাপি সুচারুরূপে কার্য্যাদি পরিচালন করিতে হইলে আরও অর্থের প্রয়োজন। সে-কারণ ধর্ম্মপ্রিয় মহাজনদিগের নিকট নিবেদন, তাঁহারা যে যাহা এই কার্য্যের জন্য প্রেরণ করিবেন তাহা আনন্দের সহিত গৃহীত হইবে। টাকা পয়সা শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র সেন, বি-এ, গৈলা,—এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।—(কাশীপুরনিবাসী)।

চাঁচলের দানবীর রাজা শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী বাহাদুর নিজ রাজবাটীতে ও তদধীন নিজ এলাকায় বিভিন্ন স্থানে আরো ৭টি দাতব্য চিকিৎসালয় পাশ-করা ডাক্তারগণের তত্ত্বাবধানে স্থাপন করিয়া সমস্ত খরচ নিজে বহন করিতেছেন। প্রজাগণের জলাভাব পূরণের জন্য বহু স্থানে কূপ, ইন্দারা, পুকুর ইত্যাদি খনন করাইয়া দিয়াছেন। গরীব প্রজাদের অকাতরে অর্থ ও খাদ্য সাহায্য করিতেছেন। এই বৎসর সমস্ত মহালে খাজনা আদায় বন্ধ রাখিয়াছেন। এক কথায় বলিতে কি সকলেই বলিয়া থাকে "চাঁচলের প্রজা রাম-রাজত্বে বাস করিতেছে"। —(মালদহ-সমাচার)।

প্রজাসাধারণের হিতকামনায় চাঁচলরাজ ও জমিদার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল চৌধুরী যাহা করিতেছেন তাহা জমিদার-মাত্রেরই অনুকরণযোগ্য। রাজসরকারের ন্যায় জমিদার সরকারও এদেশের অনেক সৎকার্য্যের পৃষ্ঠপোষক হইতে পারেন ; ফলতঃ দশের সহিত মিলিবার অধিকতর সুযোগ থাকায় জমিদারবর্গ আপন আপন এলাকাধীন প্রজাসাধারণের অবস্থা সম্যক জ্ঞাত হইয়া তাহাদের দুঃখ প্রতিকারের পক্ষে সহজে যত্নবান হইতে পারেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। এদেশের প্রাচীন সাহিত্য, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি স্থানীয় জমিদারবর্গের সহায়তায়ই যে একদিন প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, একথা অস্বীকার করিবার জো নাই। এখনও অনেক স্থলে জমিদারগণের আশ্রয়ে অনেক সৎপ্রচেষ্টা টিকিয়া রহিয়াছে। দেশের ও দশের উন্নতিসাধনে জমিদারের কর্ম্মক্ষেত্র নির্দ্দেশ করিয়া 'রঙ্গপুরদিকপ্রকাশ' তাই বলিয়াছেন—

গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা, চিকিৎসা, পথঘাট প্রভৃতির বার্ষিক বিবরণ প্রকাশ করিয়া থাকেন। প্রত্যেক জেলা, তদন্তর্গত প্রত্যেক মহকুমা ও তাহাদের অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রত্যেক থানা হইতে দেশের বিবিধ তথ্য সংগৃহীত হয়। জমীদারগণ যদি তাঁহাদের প্রত্যেক মফঃস্বলস্থ ডিহী বা তরফের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীগণের উপর তাঁহাদের তরফের বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করিয়া বার্ষিক রিপোর্ট বা বিবরণ দাখিল করিবার আদেশ প্রচারিত করেন, তাহা হইলে দেশের একটি মহোপকার সাধিত হইবে। প্রত্যেক তরফে কত জন কামার, কুমার, ছুতার ও কৃষিজীবী আছে, তাহাদের বার্ষিক সফলতা ও বিফলতা এবং স্থানীয় স্বাস্থ্য, পথ-ঘাট প্রভৃতির বিবরণ সংগৃহীত হইলে যাহাতে তাহাদের উন্নতিসাধনের প্রতি উপযুক্ত ব্যবস্থাও অবলম্বিত হয়, তৎপ্রতি অনেকেই মনোযোগ দিতে পারেন। মধ্যে মধ্যে প্রত্যেক জমীদারীর অন্তর্গত কর্ম্মকার, কুম্ভকার, সূত্রধার প্রভৃতির নির্ম্মিত সামগ্রী-সমূহের প্রদর্শনী খুলিলে তাহাদের মধ্যে একটা প্রতি-যোগিতার ভাব জন্মিয়া তাহাদের কার্য্যের উৎকর্ষ-সম্পাদনে সহায়তা করিতে পারে।

দেশের সম্ভ্রান্ত জমীদারবর্গের পুণ্যাহের সময় আগতপ্রায়। এই সময়ে অনেক বড় বড় জমীদারের কাছারীতে "রোবকারী" পাঠ করিয়া কর্ম্মচারীসমূহের কৃতকার্য্যের সমালোচনা-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত অথবা তিরস্কৃত করা হইয়া থাকে। তাঁহাদের কার্য্য-সমালোচনার সময় তাঁহারা তাঁহাদের অধীন বিভাগ বা তরফের উন্নতির কি কি কার্য্য করিয়াছেন, তাহার একটা বার্ষিক রিপোর্টও গ্রহণ করা হইয়া থাকে। যদি এই-সমুদায় রিপোর্টে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প-বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি বিষয়েরও উল্লেখ থাকে এবং পুরস্কার তিরস্কারের সময়েও এই-সমুদায় এবং কর্ম্মচারীবৃন্দের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন সদ্‌গুণ (সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্র-বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ক) থাকিলে এবং তাহার যথাযোগ্য চর্চ্চা ও উন্নতিসাধন করিলে তৎপ্রতিও দৃষ্টি রাখা হয়, তাহা হইলে দেশের উন্নতি অবশ্যম্ভাবিনী। আমরা এই বিষয়ে দেশের সম্ভ্রান্ত জমীদারবর্গের কৃপাদৃষ্টি প্রার্থনা করি।

দেশের উন্নতিকল্পে 'রঙ্গপুর দিকপ্রকাশে'র প্রস্তাবিত অনুষ্ঠান সর্ব্বথা প্রয়োজনীয়। আমাদের নিজেদের অবহেলায় আমরা দেশের বহু বিদ্যা, বহু শিল্প নষ্ট করিয়াছি; এখনও যদি সজাগ হইয়া আপনাদের গৌরব আপনারা পুনরুদ্ধার না করি তাহা হইলে 'বরিশাল-হিতৈষী'র ভাষায়ই আক্ষেপ করিয়া বলিতে হইবে—

আজ এই জগৎ-জোড়া মহাসমরাগ্নির ভিতরে কত নগণ্য জাতি ভারতের ধনভাণ্ডারে নূতন করিয়া অংশ বসাইতেছে, আজ জাপান সর্ব্ব-শ্রেণীর বাণিজ্য-সম্ভারে দশ গুণ বিশ গুণ অর্থ নিতেছে, আজ বিলাতের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বাঙ্গালীর জন্য জাপান পরিধেয় বস্ত্র প্রেরণ করিতেছে, আর "ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।" কি দুঃখ! কি তীব্র জ্বালা!

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত।

বাজারদর ও বর্ত্তমান সমস্যা

৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বেও চাউলের মণ গ্রাম অঞ্চলে এক টাকা দেড় টাকা হইতে দুই টাকা নয় সিকার মধ্যে ছিল। নদী খাল বিল যেসব গ্রামের কাছে ছিল, সেখানে মাছ এত মিলিত যে, দুই এক পয়সার মাছ কিনিলেই একটি ছোট গৃহস্থের ঘরে ডাল তরকারী বড় রাঁধিতে হইত না। দুধ দুইপয়সা তিনপয়সা সেরে প্রচুর মিলিত, ঘিয়ের দাম টাকায় একসেরের উপরে কখনও উঠিত না। ডাইল ২।৩ পয়সায় সের মিলিত, তেল মিলিত তিন চারি আনায় একসের। চিনি বিলাসভোগ্য ছিল,—গুড় অতি সুলভে মিলিত। ছাগমাংস শাক্ত পূজার প্রসাদরূপে ব্যতীত কমই ব্যবহৃত হইত,—দুর্গোৎসবের ভিড়ের সময়েও একটাকা পাঁচসিকায় একটি ছাগ মিলিত। ঘর বাঁধিতে বেত খড় চাটাই হোগলা কৃষাণ ঘরামী—সবই অতি সুলভ ছিল। এক কাপড়ের কথায় বোধ হয় বলা যাইতে পারে, এখনকার তুলনায় তখন বেশী সস্তা ছিল না। এখন কাপড়ে আমরা খরচ করি বেশী, কারণ, তখন প্রায় শুধু কাপড়েই চলিত, এখন কাপড়ের সঙ্গে 'চোপড়' বড় বেশী লাগে, আর এই কাপড়চোপড়ের রকমও অনেক উঁচুতে উঠিয়াছে। নতুবা তখনকার আটপৌরে মোটা কাপড় তখন যে দামে মিলিত, এখনও বোধ হয় প্রায় সেই দামেই মিলে। এ বিষয়ে আমি একেবারে নিঃসন্দেহ নই। আমার বয়োজ্যেষ্ঠ যাঁহারা, তাঁহারাই বলিতে পারিবেন একথা ঠিক কিনা।

ভাত কাপড় ও বাড়ী ঘর,—এ পৃথিবীতে দেহ ধরিয়া থাকিতে হইলে, এই তিনটি সকলেরই প্রয়োজন। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য আগে এই তিনটি—তারপর সুখে থাকিবার জন্য আরও অনেক জিনিষ লোকে চায়। শুনিয়াছি, শেষের এই-সব জিনিষ লোকে যত চায়, তত তারা সভ্যতায়ও উন্নত হয়। তবে আমাদের দেশে অতীত ও বর্ত্তমান বাজারদরের হিসাবে এসব না ধরিলেও এক রকম চলে। কারণ, নূতন নূতন বহু এমন অভাব ও প্রয়োজন এখন সৃষ্ট হইয়াছেন, যা তখন ছিল না। এসব যেমন নূতন, এসবের দরের কথাও তেমনই নূতন। তুলনা করিতে, কি গণনা করিতে, এসবের পুরাতন দর কিছু নাই।

বসনের কথাও ছাড়িয়া দিতে পারি, গৃহের উপকরণের কথাও না ধরিলে চলে। সব চেয়ে বড় প্রয়োজন অশন,—দর সম্বন্ধে সেই অশনের সমস্যাই আমাদের সব চেয়ে বড় সমস্যা হইয়াছে। সেই সমস্যা যদি আমরা কিছু বুঝিতে পারি, সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রয়োজনের সমস্যা আপনিই বোঝা হইবে। সুতরাং বাজারদর বলিতে, এই দীন প্রবন্ধে প্রধানতঃ অশনের দরই আলোচিত হইবে।

বাজারদর অনেক পূর্ব্ব হইতেই বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। গত ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যে যে বৃদ্ধিটা হইয়াছে, তাহা আমাদের অনেকেরই সাক্ষাৎ জ্ঞানগোচরে আসিয়াছে। সেই অবধি এই পর্য্যন্ত দর মোটের উপর বরাবরই বাড়িয়া চলিয়াছে, গত ৮।১০ বৎসরের মধ্যে বড় বেশী বাড়িয়া পড়িয়াছে। প্রতি বৎসর এমন ভাবে বাড়িতেছে, যে,

আমরা সকলেই তার কঠোরতা বড় তীব্র ভাবে অনুভব করিতেছি। ইহাও দেখিতেছি, যার দর একবার যা বাড়ে, তা বড় কমে না।

৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে বাজারদর যাহা ছিল, তার সঙ্গে এখনকার বাজার তুলনা করিলে আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হইব, মোটের উপর আহার্য্যাদির দর ৩।৪ গুণ বাড়িয়াছে। তুলনা করিলে ইহাও মনে হইবে, আহা সেই দর যদি এখন থাকিত, কি সুখেই দিন যাইত—কোনও দুঃখ আর থাকিত না,—প্রচুর পরিমাণে মাছ তরকারী দুধ ঘি খাইয়া বাঁচিতাম। কি সুখেই তখনকার লোক যেন ছিল। কিন্তু তখনই যে লোক-সব একেবারে সুখে স্বচ্ছন্দেই ছিল, কেহ কোনও অভাব জানিত না, দুঃখ পাইত না, তা নয়। বহু লোক তখনও অনেক দুঃখ পাইত, এমন সুলভ দুধ ঘি মাছ তরকারী সকলেই যথেষ্ট খাইতে পাইত না,—ক্ষুদ কুঁড়াও অনেকের জুটিত না। ইহার আগে, যখন সব আরও সস্তা ছিল—তখনকার পুঁথিতেও এরূপ দুঃখকষ্টের কথা, অভাবের কথা অনেক পাওয়া যায়। তখনকার দিন যাঁদের মনে আছে,—তাঁরাও এ কথা স্বীকার করিবেন। সেই সস্তার দিনেও সকলে যে যাহা ইচ্ছা পেট ভরিয়া খাইত, তা নয়। এখনকার দুর্ম্মূল্যের দিনেও যে সকলে উপবাস করিতেছে, তাও নয়। আরও তখন অন্য ব্যয় কম ছিল, এখন তা অনেক বাড়িয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ ইহাই বলিতে হইবে, তখন লোকের টাকা এত কম ছিল, যে, বাজে খরচ কম থাকা সত্ত্বেও সস্তা জিনিষও স্বচ্ছন্দমত কিনিতে পারিত না;—এখন টাকা এত বাড়িয়াছে যে বাজে খরচ এত বাড়িয়াও দুর্ম্মূল্যের জিনিষও কিছু কিনিয়া খাইতে পারিতেছে!

দেশ ক্রমে দরিদ্র হইতেছে, এই কথাই আমরা সর্ব্বদা বলিয়া থাকি। সুতরাং আগের চেয়ে দেশের টাকা বাড়িয়াছে, এ কথা বলিলে, সহজেই আমাদের মনে হইবে, এ কি পাগলের মত অসম্ভব কথা! কিন্তু একটু তলাইয়া এ কথা ভাবিয়া দেখিলেই আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব,—উপর উপর অসম্ভব মনে হইলেও প্রকৃত পক্ষে কথাটা অসম্ভব নয়।

টাকার হিসাবে, লোকের আয় বৃদ্ধির সঙ্গেও লোকের দারিদ্র্য বাড়িতে পারে। কেবল যে অন্ত ব্যয়ের প্রয়োজন বাড়িয়াই এরূপ হয়, তা নয়। ব্যয়ের প্রয়োজন সমান থাকিয়াও এরূপ হইতে পারে। আস্ত টাকা আমরা চিবাইয়া গিলিয়া খাই না, টাকায়-বোনা কাপড় পরি না, টাকা সাজাইয়া ঘর বাঁধি না। সুতরাং টাকায় আয় কত বাড়িল, কেবল তার হিসাবে দারিদ্র্য বা সম্পদ বৃদ্ধির হিসাব হয় না,—সেই টাকায় আমাদের আহার্য্যাদি কি পরিমাণে মিলিতেছে, টাকার কি দাম হইয়াছে,—তার হিসাব আমাদিগকে করিতে হইবে। এক টাকায় যদি দিন চলে, তখন দুই টাকা আয় হইলেই সে ধনী। আর ঠিক সেই দিন চালাইতে যখন কাহারও ৫৲ টাকা লাগে, তখন ৪৲ টাকা আয়েও সে দরিদ্র। অথচ টাকার হিসাবে তার আয় দ্বিগুণ বাড়িল।

এখন আমাদের দেখিতে হইবে, বাজারদর যে অনুপাতে বাড়িতেছে, আমাদের টাকার আয় সে অনুপাতে বাড়িতেছে কি না। যদি তা হয়, তবে বলিতে হইবে, বাজারদর বৃদ্ধিতে আমাদের কোনও ক্ষতি হয় নাই। আর যদি তা না হয়, তবে বলিতে হইবে, আমাদের বড় দুঃসময় আসিয়াছে। ইহার প্রতিকার আবশ্যক। সেই প্রতিকার কি হইতে পারে? হয় আয় বাড়াইতে হইবে, না হয় বাজারদর নামাইতে হইবে। ইহার কোন্‌টা সম্ভব বা সহজ-সাধ্য হইতে পারে? একথা বুঝিতে হইলে, আগে বুঝিতে হইবে, বাজারদর কেন চড়িয়াছে, কেন চড়িতেছে,—আর নামিতে পারে কি না। যদি পারে ভাল, না যদি পারে, সম্ভব যদি তা না হয়, তবে টাকার আয় যাতে বাড়ে, সেই পথ দেখিতে হইবে। অন্য উপায় নাই।

লোকে যত চায়, তার চেয়ে কম যদি পায়, তবে চাওয়া জিনিষের দর চড়ে। দেশের বর্ত্তমান লোকসংখ্যার হিসাবে আহার্য্যের আমদানী বাজারে বড় কম হইতেছে, তাই দর চড়িতেছে—স্বভাবতঃই এইরূপ আমাদের মনে হইতে পারে। পাটের টাকার লোভে কৃষকেরা ধান বোনে কম, আবার চাউল যা জন্মে তাও অনেক পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হয়। সুতরাং দেশের বাজারে চাউল আসে কম, দরও আগুন। গরু ঘাস পায় না, না খাইয়া মরিতেছে, দুধ কমিতেছে, তাই দুধের আর

ঘি-মাখনের দাম এত বাড়িয়াছে। খাল বিল শুকাইতেছে, নদী মরিতেছে, আবার সর্ব্বত্র ষ্টীমার জল তোলপাড় করিয়া যাতায়াত করিতেছে, সুতরাং মাছ কমিতেছে,—যেমন মাছ কমিতেছে, তেমন তার দর বাড়িতেছে। বন জঙ্গল সাফ হইতেছে, কাঠ কমিতেছে, কাজেই লকড়ীর দাম এত চড়িয়াছে। এই-সবই সাধারণতঃ আমরা বাজারদর বৃদ্ধির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। সুতরাং ইহাও বলিয়া থাকি যে, এই-সব কারণ দূর হইলেই বাজারদর কমিবে। যদি পাট উঠিয়া গিয়া সকল ক্ষেতে ধান হয়, যদি বিদেশে চাউলের রপ্তানী বন্ধ করা যায়, তবে তার দর নামিবে। যদি গোবংশের উন্নতিসাধন করা যায়, তবে দুধের দর নামিবে। যদি মাছের চাষে বিশেষ যত্ন নেওয়া যায়, তবে বাজারে মৎস্যের আমদানী বাড়িবে, সস্তায় মাছ মিলিবে, সকলে বাটি-ভরা—কেবল ঝোল নয়—মাছও খাইবে।

প্রয়োজনের হিসাবে আমদানী কমিলে, চাওয়ার চেয়ে পাওয়া কম হইলে, দর যে বাড়ে, তা ঠিক। কিন্তু তাই বলিয়া দর বাড়িলেই যে মনে করিতে হইবে, প্রয়োজনের হিসাবে—চাওয়ার তুলনায়—পাওয়া কম হইয়াছে, তা নয়। ডাকাতরা কালীপূজা করে, তাই বলিয়া কালীপূজা যে করে সেই ডাকাত হয় না। জলে ভিজিলে জ্বর হয় বলিয়া কারও জ্বর হইলে সে জলেই ভিজিয়াছে, এরূপ মনে করা ভুল। না খাইয়া মানুষ মরে, তাই মানুষ মরিলেই মনে করা চলেনা যে, সে না খাইয়াই মরিয়াছে। চাওয়ার চেয়ে পাওয়া কমিলে দর বাড়ে, তাই বলিয়া দর বাড়িলেই ইহাই মাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা ঠিক নয়। এ কারণেও বাড়িতে পারে, আবার বাড়িবার আরও পাঁচটা কারণও থাকিতে পারে।

কেবল চাওয়া পাওয়ার অসামঞ্জস্যে দর যদি বাড়ে কমে, তবে সাধারণতঃ সে বাড়া কমা দীর্ঘ কাল থাকে না,—স্বাভাবিক কোনও অলঙ্ঘ্য বাধা না থাকিলে, অল্পদিনেই এ অসামঞ্জস্য দূর হয় এবং দর আবার আগের মত হয়।

যাহা হউক, লোকের চাওয়ার তুলনায় পাওয়া কমিয়াছে কি না, লোকের খাইতে যা লাগে, তার তুলনায় বাজারে খাদ্যের আমদানী কম কি না, তাহার একটু আলোচনা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে প্রধানতঃ চাউলের অবস্থা ধরিয়া আলোচনা করিলে, সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়। কারণ, এই খাদ্যবিশেষের প্রয়োজনের একটা মোটামুটি সীমা নির্দ্দেশ করা যায়। মাছ দুধ তরী তরকারী আমরা বেশী হইলে বেশী খাই, কম হইলে কম খাইয়াও পারি। কিন্তু চাউল বেশী হইলেই বেশী খাই না। কম হইলেও, জীবন ধারণ দুষ্কর। ধরুন, আমরা প্রত্যেকে গড়ে বেলায় এক পোয়া করিয়া চাউল খাই, এবং সেই হিসাবে চাউল কিনি। আগামী বৎসর হইতে পাটের রপ্তানী বন্ধ হইয়া (যুদ্ধের যেরূপ অবস্থা তাতে হইতেও পারে) বাজারে চাউলের আমদানী যদি চারি গুণ বৃদ্ধি পাইয়া দর চারি গুণ নামে, তবে কি আমরা বেলায় অমনই একসের করিয়া চাউলের ভাত খাইতে আরম্ভ করিব? তবে যদি এমন হয়, এখন বহুলোক ভাত খাইতেছেই না,—তবে তারা তখন ভাত পাইবে। কিন্তু আমরা কি বলিতে পারি, এই বাঙ্গলা দেশে অনেক লোক ভাত না খাইয়া মরিতেছে? ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অবস্থা যেমনই হউক, বাঙ্গালার বাজারে চাউল কম বলিয়া যে বহু লোকে উপবাস করিতেছে, দেশের অবস্থা যাঁরা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছেন, তাঁরা এমন কথা বলিবেন না। অনেক পরিবার এমন থাকিতে পারে, যারা এক বেলা খায়। কিন্তু তাও যে সাধারণতঃ খুব বেশী, তা নয়। মধ্যে মধ্যে কোনও কারণে সাময়িক 'অজন্মা' উপস্থিত হইলে, কিছু-কালের জন্য এরূপ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু সাধারণ অবস্থা এরূপ নহে। যখন একটাকা দুটাকায় চাউলের মণ মিলিত, তখনও এরূপ অর্দ্ধাশন যে একেবারে ছিল না, তা নয়। আর তখন যে লোকসংখ্যার হিসাবে, চাউল অনেক বেশী বাজারে আসিত, তাই সস্তা ছিল,—এরূপ মনে করা ভুল। কারণ লোকে যা খাইতে পারে, তার অনেক বেশী চাউল বাজারে আসিলে, সে চাউল দিয়া লোকে কি করিত? বেশী হইলে কিছু অপচয় হয়, লোকে ফেলাইয়া ছড়াইয়া খায়। আর কম হইলে তা করে না। কিন্তু এখনকার চেয়ে আগেকার লোকে যে বড় বেশী ফেলাইয়া ছড়াইয়া খাইত, তা নয়। সেকালের গৃহিণীরা এসম্বন্ধে বড় কড়া ছিলেন। ভাত লক্ষ্মী, ভাতের অনিষ্ট তাঁরা সহিতে পারিতেন না। পাতে লবণের কাছে দুটি ভাত থাকিলেও, বউরা তাহা কুড়াইয়া রাখিয়া খাইত। এখন বরং পাতের

ভাত অবজ্ঞায় অনেকে ফেলিয়া দেয়। মুষ্টিভিক্ষার ভিখারী তখনও ছিল, এখনও আছে। সম্পন্ন গৃহস্থেরা তখন লোককে ভোজ দিতেন বেশী।—কিন্তু ভোজ যারা খাইত, তাদের ঘরের ভাতটা বাঁচিত। ঘরের ভাতে পেট ভরিয়া কেহ পরের বাড়ী ভোজ খাইতে আসে না।

যাহা হউক, যদি একথা আমরা স্বীকার করি যে, বাঙ্গলার ছোট বড় প্রায় সকলেই আগেও যেমন মোটের উপর দুবেলা ভাত খাইত, এখনও তা খাইতেছে,—তবে একথাও স্বীকার করিতেই হইবে যে, বাঙ্গলার বাজারে লোকসংখ্যার তুলনায় চাউলের আমদানী কম নয়, এবং তার জন্য চাউলের দর স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি পায় নাই। ইহার কারণ অনুসন্ধান অন্য দিকে করিতে হইবে।

মাছ দুধ তরকারী প্রভৃতির আমদানী এখন লোক-সংখ্যার হিসাবে অত্যন্ত কম কি না, এবং তাহাই এসবের দর বৃদ্ধির প্রধান কারণ কি না, একথা বলা শক্ত। তবে ইহা ঠিক যে আগে মাছ দুধ তরকারী প্রভৃতির জন্য গৃহস্থেরা যত ব্যয় করিতেন, এখন প্রায় সকলেই তার চেয়ে বেশী ব্যয় কারন। কিন্তু বেশী ব্যয় করিয়াও অনেকে প্রচুর পরিমাণে খাইতে পান না। খাইতে কম পান, সেই কমেও যে তাঁদের টাকা বেশী ব্যয় করিতে হয়, করিতে পারেন ও করেন, একথা অস্বীকার করা সহজ নয়। ইঁহাদের দুঃখের কারণ প্রধানতঃ এই যে, যত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে পারিলে, স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে এসব খাওয়া যতটা প্রয়োজন, তত অর্থ তাঁহাদের নাই। আগেকার অপেক্ষা বেশী হইয়াছে,—কিন্তু যত বেশী হইলে এই বেশী দরের সঙ্গে চলিতে পারেন, তত বেশী হয় নাই।

এই-সব অবস্থা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিলে মনে হইবে, কোনও কোনও পদার্থ সম্বন্ধে কতক পরিমাণে সত্য হইলেও আহার্য্যাদির অপ্রাচুর্য্যই বাজারদর বৃদ্ধির প্রধান কারণ নয়। সঙ্গে সঙ্গে আর-একটি অবস্থাও আমরা দেখিতে পাই যে, সাধারণ লোকে পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অধিক অর্থব্যয় করিতে পারে,—কিন্তু ব্যয় করিয়াও প্রচুর পরিমাণে সকল খাদ্য পায় না। ইহাতে এই এক সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয় যে, দেশের লোকের হাতে মোটের উপর টাকা বাড়িয়াছে, কিন্তু টাকার দাম বড় কমিয়াছে, অর্থাৎ টাকায় আগে যা মিলিত, তা মেলে না। তাই দেখিতে পাই, বাজারদর বাড়িয়াছে। যাদের আয়ের তুলনায় দর বাড়িয়াছে, তাদের বড় কষ্টও হইয়াছে।

মোটের উপর অপ্রাচুর্য্য নয়, লোকের হাতে এখন যে টাকা আসিতেছে, তার দাম কমিয়া যাওয়াই বাজারদর বৃদ্ধির প্রধান কারণ। চাউলের দর যে এই কারণে বাড়িয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ। চাউলের সম্বন্ধে একথা যদি সত্য হয়, তবে অন্যান্য জিনিষের পক্ষেও একথা বহু পরিমাণে সত্য। যেসব কারণে কোনও দেশে টাকার দাম কমে, সেসব কারণ সাধারণতঃ এমন কায়েমী হইয়া দাঁড়ায়, যে, টাকার দাম আর সহজে বাড়ে না, বাজারদরও কমে না।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই মধ্যে মধ্যে এইরূপ টাকার দাম স্থায়ীভাবে কমিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি সর্ব্বত্রই প্রায় টাকার দাম বড় নামিয়াছে।

ব্যবসায় বাণিজ্যের বিস্তারে যত টাকা আসে এবং তাহাতে যত টাকা জনসাধারণের মধ্যে ছড়ায়, ততই বিনিময়ে চলতি টাকা বেশী হয়, টাকার দাম কমে। দেশ বিদেশের মধ্যে যাতায়াত ও খবরাখবর যত সহজ হয়, বাণিজ্যের সম্বন্ধ যত বাড়ে, তত যে-দেশে টাকা কম ও দর সস্তা, সে-দেশে টাকার আমদানী আর সঙ্গে সঙ্গে দরও বাড়িতে থাকে। বিদেশী যদি কোনও দেশে অবাধে বাণিজ্য করিতে পারে, আর যদি দেখে তার দেশ অপেক্ষা সেই দেশে বহু জিনিষ দরে সস্তা, তবে তার টাকা থাকিলে, প্রচুর পরিমাণে সে সেই-সব জিনিষ কিনিয়া নিয়া নিজের দেশে বিক্রয় করিবে। তার দেশের বহু টাকা এইরূপে সেইদেশে আসিবে, লোকের মধ্যে ছড়াইবে,—ফলে টাকার দাম কমিবে, বাজারদর বাড়িবে।

বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে টাকা বাড়ে, লোকের মধ্যে বেশী ছড়ায়, এবং যেসব জিনিষ একেবারে কাঁচা নয়, উৎপাদনের পরেও বহুদিন থাকে, দূরে রপ্তানী হইতে পারে, তার দরে দেশবিদেশে মোটের উপর একটা সমতা হইবার মত হয়।

বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে টাকা বাড়ে, টাকা ছড়ায়। কিন্তু এই টাকা কোথা হইতে আসে ? নূতন নূতন সোনা-

রূপার খনি আবিষ্কৃত হইতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে সোনা রূপা যে-পরিমাণে বাড়িয়াছে, তার চেয়ে বাণিজ্য এবং বাণিজ্যের জন্য অর্থবিনিময়ের প্রয়োজন অনেক বেশী বাড়িয়াছে। মূল্যবান্ ধাতুর মুদ্রায় এই বিপুল আয়তনের ব্যবসায়বাণিজ্য চলে না বলিয়া, বণিকসমাজে ধার বিনিময়-পত্র বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, এবং সকল দেশের গবর্ণমেণ্ট এবং বড় বড় ব্যাঙ্ক বহু পরিমাণে নোট প্রভৃতি কাগজের মুদ্রা বাহির করেন। এসবও অর্থবিনিময়ের সম্পর্কে টাকার স্থায় চলে।

ধার বিনিময়-পত্রাদির কথা সাধারণতঃ আমরা বেশী জানি না, কারণ বাঙ্গালী শিক্ষিত ভদ্রলোকের মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্য বড় কম। যাঁরা সাধারণ সাহিত্য লইয়া নাড়াচাড়া করেন, তাঁরা এসব চক্ষেও বড় দেখেন না। তবে নোটটা যে টাকার স্থানে প্রচুর পরিমাণে চলিতেছে, ইহা সকলেই আমরা দেখিতেছি। আস্ত টাকার চেয়ে নোটই আমরা বেশী দেখিতে পাই। রূপার টাকা যত চলিতেছে, তার চারিগুণ যদি নোট চলে, তবে বলিতে হইবে, বিনিময়ে চল্‌তি টাকা পাঁচগুণ বাড়িয়াছে। আবার সেই টাকা ব্যবসায়াদির বিনিময়ে যত দ্রুত হাত-বদলায়, তত সে হাত-বদলান, সংখ্যা বৃদ্ধিরই ন্যায় ফলদায়ক হয়। অর্থনীতি-শাস্ত্রের বড় জটিল সমস্যা এগুলি, এ প্রসঙ্গে তার বিশদ ব্যাখ্যাও নিষ্প্রয়োজন। মোটের উপর এই স্থলে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে, টাকায় ও নোটে, এবং আজকালকার বাজারবিনিময়ে তাদের দ্রুত হাত-বদলানতে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই চল্‌তি টাকার সংখ্যা অনেক বেশী বাড়িয়াছে। অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমরা বড় ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যের সম্বন্ধে আসিয়া পড়িয়াছি,—দেশের মধ্যেও সর্ব্বত্র অতি দ্রুত বিবিধ বাণিজ্যের বিস্তার হইতেছে। ইহাতে চল্‌তি টাকার পরিমাণ আমাদের দেশেও বাড়িয়াছে।

দেশের মধ্যে চলতি টাকা বাড়িয়াছে,—তাই বলিয়া দেশের সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে সম্পদসৌভাগ্য যে বাড়িয়াছে, তা বলি না। 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ',—কিন্তু দেশে বহুল বাণিজ্যবিস্তার হইতেছে বলিয়া এ কথাও বলিতে পারি না যে দেশে ঘরে ঘরে লক্ষ্মী বসতি করিতেছেন। দেশের মধ্যে এবং বিদেশের সঙ্গে প্রচুর ব্যবসায় বাণিজ্য এখন যেমন চলিতেছে, বোধ হয় কোনও কালে ভারতের বাণিজ্য এত বিপুল আকারের হয় নাই। কিন্তু এই বাণিজ্য যাঁহাদের হাতে, বাণিজ্য প্রধানতঃ যাঁহারা চালাইতেছেন, তাঁহারা বিদেশী বণিক,—এ দেশের স্থায়ী অধিবাসী নন। কিন্তু বিদেশী হইলেও তাঁহাদের ব্যবসায় বাণিজ্য এ দেশেই চলিতেছে,—বাণিজ্য উপলক্ষে তাঁহাদের বহু অর্থ এদেশে আসিয়া পড়িয়াছে। রেলষ্টীমারে, বহু কলকারখানায়, খনিতে, চায়ের বাগানে, নীলের ক্ষেতে, তাঁহাদের প্রচুর মূলধন এ দেশে খাটিতেছে। ব্যবসায়ে যে টাকা খাটে, তা সব কেহ নিজের ঘরেই রাখিতে পারে না। আর পাঁচজনের মধ্যে বহু পরিমাণে তাহা ছড়াইতে হয়, তবে তাঁহাদের সাহায্যে মূলধনে লাভ দাঁড়ায়। বিদেশীর মূলধন যে এ দেশে খাটিতেছে, তাহা বহু পরিমাণে তাঁহাদের সহকারী, কেরানী, সরকার, দালাল, মিস্ত্রী, কুলী প্রভৃতি রূপে এ দেশের লোকের মধ্যে আসিতেছে। এইসব ব্যবসায়ের সংস্রবে এ দেশেরও হাজার হাজার লোক অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন। যদি এ মূলধন দেশীয় লোকের হইত, ব্যবসায়ের কর্ত্তৃত্ব দেশের অধিবাসীরাই করিতেন, তবে খুবই ভাল হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশীয় লোক যদি তাহা না করেন বা না করিতে পারেন, তবে ইহাই বা মন্দ কি?

এ দেশে উৎপন্ন বহু কৃষিজ ও খনিজ দ্রব্যাদি বিদেশী বণিকেরা কিনিয়া বিদেশে চালান দিতেছেন। কেবল যে তাঁহাদের দেশের জিনিষ বিক্রয় করিয়া এদেশের টাকা তাঁহারা লুটিয়া নিতেছেন তা নয়, যাহা নিতেছেন, তাহাও প্রচুর পরিমাণে আবার এদেশে আনিয়া ব্যবসায় বাণিজ্য করিতেছেন। তাঁহারা কত নিতেছেন, কত দিতেছেন,—এই বিনিময়ের খতিয়ানে কোন্ পক্ষের লাভ লোকসান কি হইতেছে, তার আলোচনা আমাদের এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। এখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বিদেশীর বাণিজ্যের ফলে দেশের চল্‌তি টাকা অনেক বাড়িয়াছে।

কেবল বিদেশের ও বিদেশীর বাণিজ্যেই যে চল্‌তি টাকা বাড়িয়াছে, তা নয়। গবর্ণমেণ্টের শাসন পরিচালনার বিধি ব্যবস্থাতেও দেশের চল্‌তি টাকা বৃদ্ধির পক্ষে অনেক সহায়তা করিয়াছে। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের শাসনব্যাপার

বড় জটিল ; বহু বিভাগে, বহু রকম কর্ম্মভার গবর্ণমেণ্ট নিজের কর্ত্তৃত্বাধীনে চালাইতেছেন। বড় বড় সাহেব কর্ম্মচারী যাঁরা আছেন, তাঁহাদের নিয়ে যত দেশীয় কর্ম্মচারী এখন নিযুক্ত হইয়া কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের তহবিল হইতে যে টাকা দেশের লোকের মধ্যে ছড়াইতেছে, তাও নিতান্ত কম হইবে না। অনেকে বলিতে পারেন, গবর্ণমেণ্টের আয় ত প্রজার প্রদত্ত কর হইতে আসে, তবে ইহাতে চল্‌তি টাকার বৃদ্ধির সহায়তা করিবে কেন ? কররূপে গবর্ণমেণ্ট যাহা নিতেছেন, তার কতক অংশ মাত্র রাজসেবার বিনিময়ে প্রজাকে দিতেছেন।

ইহার উত্তর আছে। এখন গবর্ণমেণ্টের আয় কেবল প্রজার প্রদত্ত কর হইতেই হয় না। গবর্ণমেণ্ট প্রজার নিকট হইতে বহু ঋণ গ্রহণ করেন। সেভিংস ব্যাঙ্কের টাকা, কোম্পানীর কাগজের টাকা প্রভৃতি এই ঋণ। এই টাকা দেশের লোক ব্যবসায়ে খাটাইলেও দেশের লোকের মধ্যেই ছড়াইত। কিন্তু যে টাকা লোকে ব্যবসায়ে খাটাইতে চায়, তা দিয়া কোম্পানীর কাগজ কেনে না, সেভিংস ব্যাঙ্কেও তা জমা রাখে না। গবর্ণমেণ্ট অনেক নূতন টাকা মুদ্রিত করেন এবং অনেক নূতন নোট বাহির করেন,—তাহা হইতেও আয় কিছু বাড়ে। বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে চল্‌তি টাকা বৃদ্ধির প্রয়োজন, তাই প্রধানতঃ গবর্ণমেণ্টকে মধ্যে মধ্যে নূতন টাকা এবং নূতন নোট বাহির করিতে হয়। ইহা ব্যতীত গবর্ণমেণ্টের হাতে ব্যবসায় বাণিজ্যও অনেক আছে,—তাহাতেও আয় কম হয় না।

আরও একটি কথা আছে। প্রজার প্রদত্ত রাজস্ব যে সর্ব্বত্র, সকল প্রকার রাজশাসনাধীনে, বেশীর ভাগে আবার প্রজার মধ্যেই ফিরিয়া আসে, তা নয়। কর প্রজারা দেয়, প্রজাকে দিতেই হইবে। সেই টাকা যত পরিমাণে প্রজার মধ্যে ফিরিয়া আসে, তত পরিমাণে প্রজার মধ্যে চল্‌তি টাকা বাড়ে বলিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের এই কর-লব্ধ আয়, ইংরেজ কর্ম্মচারীদের বেতনে, পেন্সনে এবং আরও আরও অনেক রকমে দেশের বাহিরে যায়, তা সত্য। কিন্তু দেশের প্রজাদের মধ্যেও নিতান্ত কম আসে না। পূর্ব্বে মুসলমান রাজাদের আমলে রাজস্ব বিদেশে যাইত না। কিন্তু তাই বলিয়া সব যে প্রজাদের মধ্যেই ফিরিয়া আসিত তা নয়। তাঁহাদের শাসনপ্রণালী অন্যরূপ ছিল। দেশীয় কি বিদেশী—বেতনভোগী এত বেশী কর্ম্মচারীর প্রয়োজন তাঁহাদের হইত না। বড় রাজকর্ম্মচারীরা প্রায়ই বেতনের পরিবর্ত্তে জায়গীর ভোগ করিতেন। রাজস্ব বহু পরিমাণে রাজকোষেই সঞ্চিত থাকিত। তারপর নোটে কি কোম্পানী কাগজে, কি কোনও রূপ ব্যবসায়বাণিজ্যে, রাজসরকারের কোনও আয় ছিল না। প্রজারা সোনা রূপার টাকায় রাজস্ব দিত,—তাই রাজাদের একমাত্র আয় ছিল,—তারও অনেক রাজকোষে সঞ্চিত থাকিত। কেবল রাজাদের কথা কেন ? জমিদারেরাও টাকা বহুপরিমাণে সঞ্চিত রাখিতেন। দেশে যুদ্ধবিগ্রহাদিতে অনেক সময় অশান্তির অবস্থা ছিল। নানা রকমে টাকা লুণ্ঠিত হইত। তাই অনেকে বহু টাকা ও মোহর মাটির নীচে পর্য্যন্ত পুতিয়া রাখিতেন। দেশে তখন সোনা রূপা এখন অপেক্ষা বেশী ছিল, সন্দেহ নাই,—কিন্তু তাহার অধিকাংশই প্রজার মধ্যে চল্‌তি হইয়া ছড়াইয়া পড়িত না। রাজস্ব বিদেশে না গেলেও, দেশীয় প্রজার মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে ফিরিত না, ছড়াইত না—রাজ-কোষেই বেশী সঞ্চিত থাকিত।

কতক নূতন ব্যবসায়বাণিজ্যের ফলে, এবং কতক রাজ-শাসন-সংক্রান্ত নূতন ব্যবস্থার ফলে দেশের মধ্যে চল্‌তি টাকা অনেক বাড়িয়াছে, বাড়িয়া টাকার দাম কমিয়াছে, এবং ইহাই বর্ত্তমান চড়া বাজারদরের প্রধান কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কেবল মাছ, দুধ, তরকারী প্রভৃতি অনেক পদার্থ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, অপ্রাচুর্য্যতা হয়ত কতক পরিমাণে এই দরবৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছে।

আরও একটি কারণও কতক পরিমাণে কোনও কোনও দ্রব্য সম্বন্ধে এই দরবৃদ্ধির সহায়তা করিতে পারে।

এক ব্যবসায়ে যাঁহারা নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা মিলিয়া জোট বাঁধিয়া অনেক পরিমাণে দর চড়াইয়া রাখিতে পারেন। অনেক সময় কতিপয় ধনী ব্যবসায়ী কোনও কোনও উৎপন্ন দ্রব্য গোলাজাত করিয়া তাহার উপর প্রায় একচেটিয়া প্রভুত্ব করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এইরূপ প্রভুত্বাধীন দ্রব্যাদির উপরে তাঁহারা যে দর নির্দ্দিষ্ট করেন,

সে দরের ব্যতিক্রম করা খুচরা ব্যবসায়ীদের পক্ষে বা ক্রেতাদের পক্ষে বড় সহজসাধ্য হয় না। সকল দেশেই এই রকমে কোনও কোনও দ্রব্যের দর অনেক সময়ে বেশ চড়া থাকে। আমাদের দেশেও এরূপ যে হইতেছে না, তা বলা যায় না। বড় বড় পাইকারী 'বাজার-প্রভু'দের লোভে ও শক্তিতে কি হইতেছে না হইতেছে, তাহা সর্ব্বদা আমরা দেখিতে বা বুঝিতে পারি না। তবে সকলের গোচরে চলতি বাজারে এক ব্যবসায়ের মধ্যে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে মিলের লক্ষণ আমরা মধ্যে মধ্যে বেশ দেখিতে পাই। ধরুন, কলিকাতার দুধের বাজারের অবস্থা, সর্ব্বত্রই 'খাঁটি' নামে অভিহিত দুধ টাকায় চারিসের এখনও পাওয়া যায়। দুধ এমন একটা জিনিষ, যাহা মজুত রাখা যায় না, যাহা ঠিক সমান বাঁধা ব্যয়ে সমান পরিমাণেও প্রতিদিন উৎপন্ন হয় না। অথচ কয়েক বৎসর যাবৎ আমরা দেখিতেছি, কলিকাতায় দুধের দর বারমাস সমান চারি আনা সেরে চলিতেছে। এই বৃহৎ কলিকাতায় কোথাও একটি দিন তাহার পার্থক্য কিছু হয় না। কলিকাতার দুগ্ধব্যবসায়ীদের মধ্যে একটা মিল ব্যতীত এমন হইতে পারে না। তারপর কলিকাতার কয়লার বাজার। আজ ২।৩ বৎসর যাবৎ দেখা যাইতেছে, কলিকাতার কয়লার দর কখনও বাড়ে, কখনও কমে। যেদিন বাড়ে, সর্ব্বত্র সমান ভাবে বাড়ে,—আবার যেদিন কমে, সর্ব্বত্র সমানভাবে কমে। ইহাতেও কয়লাব্যবসায়ীদের মধ্যে একটা মিলের আভাস পাওয়া যায়। অবশ্য কয়লা দোকানে দোকানে উৎপন্ন হয় না, খনি হইতেই আমদানী হয়। খনির কর্ত্তা ও আমদানীর কর্ত্তারাই বুঝিয়া ইহার দর নির্দ্দিষ্ট করেন। কিন্তু দোকানদারদের মধ্যেও যে কিছু একটা মিল নাই, এমন বলা যায় না। প্রত্যহ প্রতি দোকানে নূতন কয়লা আসে না। অথচ সহসা একদিন প্রাতঃকালে দেখা যায় সর্ব্বত্র প্রায় সমানভাবে কয়লার দর বাড়িয়াছে বা নামিয়াছে। মিল ব্যতীত এমন হওয়া সম্ভব নয়। বহু দৃষ্টান্ত এমন পাওয়া যাইবে। কিন্তু দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া প্রবন্ধ অতিদীর্ঘ করিয়া ফল নাই।

তবে দুই চারি জনের, বা কোনও সম্প্রদায়ের, কোনও ব্যবসায়ের উপরে এই একচেটিয়া প্রভুত্বে অতিরিক্ত চড়া দর বেশী দিন থাকিতে পারে না। ব্যবসায়ী মাত্রেই লাভ চান,—কত দরে বিক্রয় করিলে মোটের উপর সব-চেয়ে বেশী লাভ হইবে, তাঁহারা ইহাই হিসাব করিয়া বিক্রেয় জিনিষের দর নির্দ্দিষ্ট করেন। জিনিষ কম বিক্রী হইয়া মোটের উপর লাভ কম হইবে, এত বেশী দর চড়াইয়া তাঁহারা কখনও রাখেন না। যদি খরচ পোষায়, আর খাটনি পোষায়, তবে সাধারণ লোকের সাধ্যের অতিরিক্ত দরে ইঁহারা কখনও জিনিষ বিক্রয় করিতে চান না। কি খরচ তাঁহাদের করিতে হয় এবং খাটনি পোষাইতে তাঁরা কত চান, তাও অনেক পরিমাণে টাকার দামের উপরে নির্ভর করে। টাকার দাম যে পরিমাণে কম হইবে, সেই পরিমাণে টাকা খরচ তাঁহাদিগকে বেশী করিতে হইবে, টাকার হিসাবে তাঁহারা বেশী চাহিবেন। সুতরাং এ স্থলেও টাকার দামের হ্রাস বৃদ্ধির কথা আসিয়া পড়িতেছে।

অপ্রাচুর্য্য এবং ব্যবসায়ীদের একচেটিয়া প্রভুত্ব প্রভৃতি কারণ বাজারদর যেটুকু চড়াইয়া রাখিয়াছে, সেটুকু নামান দুঃসাধ্য হইলেও অসাধ্য নয়। কিন্তু চলতি টাকা বাড়িয়া, টাকার দাম কমিয়া, বাজারদর যাহা চড়িয়া গিয়াছে, তাহা আর কমার সম্ভাবনা নাই। কমা দূরে থাক্, যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে আরও কিছু বাড়িতে পারে।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই মধ্যে মধ্যে এইরূপ বাজারদর স্থায়ীভাবে চড়িয়াছে। বর্ত্তমান যুগে যে খুবই চড়িয়াছে, তাহাও ঠিক। ইহাতে সর্ব্বশ্রেণীর লোকেরই যে সমান কষ্ট হয়, তা নয়। কোনও কোনও শ্রেণী বরং ইহাতে বিশেষ লাভবানই হইয়া থাকেন।

যাঁহারা উৎপাদনে এবং বিনিময়ে নিযুক্ত থাকেন, অর্থাৎ ব্যবসায় বাণিজ্যাদি করেন, সাধারণতঃ তাঁহারাই, বাজারদর চড়াতে, লাভবান্ হন। কিন্তু যাঁহারা নির্দ্দিষ্ট হারে মাসিক বেতনে, অথবা দৈনিক বা ঠিকা মজুরীতে কাজকর্ম্ম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করেন,—তাঁহাদিগকে দর চড়ায় কিছুকাল বড় কষ্ট পাইতে হয়। কারণ দর যে-হারে চড়ে, তাঁহাদের বেতন বা মজুরী সে হারে বড় চড়িতে পারে না। যতদিন বাজারদরে এবং তাঁহাদের আয়ের হারে একটা সামঞ্জস্য না হইয়া দাঁড়ায়, ততদিন তাঁহাদিগকে বড় কষ্ট পাইতে হয়।

আমাদের দেশেও ঠিক এই অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাঁহারা উৎপাদন বিনিময় প্রভৃতি বিবিধ ব্যবসায়বাণিজ্যে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন, তাঁহারা বাজারদর বৃদ্ধিতে সাধারণতঃ কোনও কষ্ট পাইতেছেন না। কিন্তু যাঁহারা নির্দ্দিষ্ট হারের বেতনে বা মজুরীতে কাজকর্ম্ম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই বাজারদরের বৃদ্ধি অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যেও যাঁহারা যে পরিমাণে বাজারদরের সঙ্গে আপনাদের আয় বাড়াইতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের ক্লেশ তত কম হইতেছে।

অনেক সাধারণ কাজকর্ম্মের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, এইরূপ আয়ের হার বেশ বাড়িয়াছে। দিন-মজুরের মজুরী এখন দ্বিগুণ বাড়িয়াছে,—যেখানে বাড়ে নাই, সেখানে তারা কাজের সময় কমাইয়া ক্ষতি পোষাইয়া নেয়। ভৃত্য আগে যে বেতনে মিলিত, এখন তায় মেলে না, বেতন অনেক বেশী দিতে হয়। আবার তারা কাজ কম করে, কথা বলিলে উল্টা দুকথা শুনাইয়া দেয়, কথায় কথায় কাজ ছাড়িয়াও চলিয়া যায়। নাপিত আগে একপয়সায় কামাইত, এখন দুপয়সা করিয়া নেয়। ধোপারা কাপড় কাচিতে বেশী দাম চায়,—আবার কাপড় ছিঁড়িয়া হারাইয়া চুরি করিয়াও বেশ চলিয়া যাইতেছে। কুলিরা এখন মোট বহিতে বেশী পয়সা নেয়। লোকের কাজে ইহাদের যত দরকার হয়, লোকে তত ইহাদের পায় না। বরং ইহারা যত চায়, তার বেশী কাজ পায়। কাজেই ইহারা সহজেই আপনাদের আয়ের হার বাড়াইতে পারিয়াছে, এবং যাদের পয়সায় ইহারা আয় করে, তাদের খাতিরও কম করে।

কিন্তু বর্ত্তমান বাজারদরে সব চেয়ে বেশী কষ্ট হইয়াছে, বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ভদ্রসম্প্রদায়ের। ইঁহারা অনেকেই নির্দ্দিষ্ট বাঁধা বেতনে কাজকর্ম্ম করেন। ইঁহাদের মধ্যে আবার বেশীর ভাগই অল্প বেতনের কেরানী বা স্কুলমাষ্টার। যাঁহারা আইন বা চিকিৎসা ব্যবসায় করেন, তাঁহাদের বাঁধা বেতন নাই বটে, কিন্তু লোকের মামলা মোকদ্দমা কি রোগচিকিৎসার যে প্রয়োজন, অথবা তার জন্য অর্থব্যয়ের যে সামর্থ্য আছে, তার তুলনায় ইঁহাদের সংখ্যা এত বাড়িয়াছে ও বাড়িতেছে, যে, অনেকেরই আয় ইহাতে অত্যন্ত কম হইয়াছে। যাঁহারা নির্দ্দিষ্ট বেতনে কাজ কর্ম্ম করেন, তাঁহাদের মধ্যেও কর্ম্মপ্রার্থীর সংখ্যায় তুলনায় প্রাপ্য কর্ম্মের সংখ্যা এত কম এবং প্রতিযোগিতা তাই এত বেশী হইয়াছে, যে, অনেকে কাজকর্ম্ম পানই না। যাঁরা পান, তাঁদেরও এই প্রতিযোগিতার জন্য বেতনের হার বৃদ্ধির কোনও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। ২০৷২৫ টাকা বেতনের একটি কেরানীগিরি বা মাষ্টারী খালি হইলে, তার জন্য সেই কার্য্যের যোগ্য বা যোগ্যেরও অধিক বিদ্যার অধিকারী বহুলোক যদি প্রার্থী হন, তবে সেরূপ কোনও কার্য্যের বেতনের হার বৃদ্ধি না পাইয়া যে হ্রাস হইবারই অধিক সম্ভাবনা একথা বলাই বাহুল্য। এইসব চাকরীর অবস্থা এখন এইরূপই হইয়াছে।

পূর্ব্বে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থের সাধারণ অবস্থা অন্যরূপ ছিল। খাদ্যাদি অতি সুলভ ছিল,-অন্যান্য প্রয়োজনও কম ছিল। যৌথ পরিবারের দায়িত্ব ও অধিকারের দাবী এমন শিথিল ছিল না। এক পরিবারে ২৷১ জন মাত্র কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিলে অন্যান্য সকলের চলিয়া যাইত। অনেক গৃহস্থ সম্পন্ন জ্ঞাতিকুটুম্বের সাহায্যেও প্রতিপালিত হইতেন। এখন সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, দিনকাল আর-একরকম হইয়াছে। পৈতৃক কোনও সম্পদ নাই, এমন বয়স্ক পুরুষ মাত্রেরই কিছু-না-কিছু উপার্জ্জনের প্রয়োজন হইয়াছে। প্রচুর ব্যবসায়-বাণিজ্যের বৃদ্ধি, এবং বর্ত্তমান রাজকীয় শাসনপদ্ধতির প্রয়োজনে বহু নূতন নূতন জীবিকার পথ বাহির হইয়াছে; এদিকে গবর্ণমেণ্টের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বিস্তারে, এইসব কাজকর্ম্মের যোগ্যতাও অনেকে লাভ করিতেছেন। মধ্যবিত্ত ভদ্রসম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহাদের জীবিকা উপার্জ্জনের প্রয়োজন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই এই শিক্ষালাভ করিয়া এইসব বৃত্তির দিকে ধাবিত হইতেছেন। কিন্তু যতলোক এদিকে ধাবিত হইতেছেন, তত লোকের মত জীবিকার বৃত্তি এসব পথে হইতেছে না,—হইবার সম্ভাবনাও নাই।

কিন্তু তবু, পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক লোক এখন নানাদিকে জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতে ৩০৷৪০ কি ২৫৷৩০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী ভদ্রগৃহস্থের গড়ে যে আর্থিক আয় ছিল, তাহা এখন অনেক বাড়িয়াছে,

তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে অর্থের প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা আরও অনেক বেশী বাড়িয়াছে। টাকার হিসাবে আয় বাড়িয়াছে, ঘরে ঘরে টাকা বাড়িয়াছে, কিন্তু বাজারদরের হিসাবে সে টাকার দাম অনেক কমিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আবার অনেক ব্যয়বহুল নূতন নূতন প্রয়োজনও তাঁহাদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে ও পড়িতেছে। যদি আগের মত অতি সরল গ্রাম্যভাবে, কেবল মোটা ভাত কাপড়ে, আমাদের জীবন যাপন এখন সম্ভব হইত, তবে হয়ত বাজারদরের সঙ্গে যে এই আয়বৃদ্ধি (অথবা আয়ের সঙ্গে যে এই বাজারদর বৃদ্ধি) হইয়াছে, তাহাতে কষ্টে একরূপ চলিয়া যাইত—যদিও তাও ঠিক বলা যায় না। কিন্তু তাহা আর সম্ভব নয়। নূতন নূতন ব্যয় যাহাতে বাড়িয়াছে, তার কতক অবশ্য-পরিত্যাজ্য তুচ্ছ বিলাস হইলেও, অধিকাংশ আমাদের বর্ত্তমান যুগের নূতন ধরণের জীবনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন।

বাঙ্গলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রসন্তানগণের টাকার হিসাবে আয় যতই বাড়ুক, বাজারদরে এবং অন্যান্য নূতন প্রয়োজনে, টাকা যত চাই, তত বাড়ে নাই। তাই এই বাজারদর বৃদ্ধি হওয়াতে তাঁহাদের পক্ষে বড় একটা ক্লেশকর আর্থিক সঙ্কটের কাল উপস্থিত হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, প্রধানতঃ যে কারণে বাজারদর বাড়িয়াছে, সে কারণ দূর হইবার নহে, এই চড়া দরই স্বাভাবিক দর হইয়া দাঁড়াইতেছে, ও দাঁড়াইবে। এইরূপে স্থায়ী ভাবে বাজারদর যখন বাড়ে, তখন নির্দ্দিষ্ট হারের বেতন বা মজুরীতে কাজকর্ম্ম করিয়া যাঁহাদের জীবিকা অর্জ্জন করিতে হয়, তাঁহারাই প্রথমে ইহার ক্লেশভোগ করেন। কারণ, বাজারদরের সঙ্গে সঙ্গেই বেতন ও মজুরীর হার বাড়ে না। যাদের যত শীঘ্র বাড়ে, তাদের ক্লেশ তত শীঘ্র কমিয়া যায়। বাঙ্গালার কুলি মজুর ভৃত্যাদি সম্প্রদায় বাজারদরের সঙ্গে সঙ্গে ইতিমধ্যেই তাহাদের আয়ের হার বাড়াইতে পারিয়াছে, তাহাদের ক্লেশও অনেক কমিতেছে। কিন্তু বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ভদ্রসম্প্রদায় যেসব বৃত্তি অবলম্বনে জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের চাওয়ার তুলনায় এসব বৃত্তি আবার এত কম প্রাপ্য, যে, তাহাতে তাঁহাদের আয়বৃদ্ধির সুবিধা হইতেছে না। নূতন নূতন আরও বহু ব্যয়ের প্রয়োজন বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহাদের অবস্থা যারপরনাই কঠোর হইয়া উঠিয়াছে।

এখন ইহার কি প্রতিকার হইতে পারে? একমাত্র প্রতিকারের উপায় এই দেখা যায় যে, তাঁহাদিগকে নিজেদের আয় বাড়াইতে হইবে। এখন তাঁহারা গড়ে জনে জনে যত আয় করিতেছেন, তার অনেক বেশী আয় তাঁহাদিগকে করিতে হইবে। এই আয় বাড়াইতে হইলে, অর্থবহুল নূতন নূতন পথে জীবিকা অন্বেষণের চেষ্টা তাঁহাদিগকে করিতে হইবে। পুরাতন পথগুলি অবশ্য একেবারে বন্ধ হইতে পারে না। সে পথেও বহুলোককে যাইতে হইবে। কিন্তু তাহাতেও বেতনের হার বৃদ্ধির নিতান্ত প্রয়োজন। প্রতিযোগিতা অনেক পরিমাণে শিথিল না হইলে, বেতনের হার বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। অনেকে এসব পথ ছাড়িয়া নূতন পথ না ধরিলে, প্রতিযোগিতাও শিথিল হইবে না। এখন এইসব নূতন পথ কি হইতে পারে? নূতন নূতন দিকে ব্যবসায়বাণিজ্যের বিস্তার ব্যতীত নূতন পথ পাইবার আর উপায়ান্তর নাই। শিক্ষিত বাঙ্গালী ভদ্রসন্তানগণের কর্ম্মশক্তি এখন প্রধানতঃ এই দিকেই নিয়োজিত করিতে হইবে। তাঁহাদের শিক্ষার ব্যবস্থাও এখন তদনুরূপ করিতে হইবে।

কেমন করিয়া এসব দিকে কি করা যাইতে পারে, তার পক্ষে কি-সব বাধা আছে, কেমন করিয়া সে-সব বাধাই বা দূর হইতে পারে, তার বিস্তৃত আলোচনার স্থান এ প্রবন্ধে নাই। তবে দেশের মঙ্গল যাঁহারা কামনা করেন, তাঁহাদের সম্মুখে যতগুলি বড় বড় সমস্যা এখন উপস্থিত হইয়াছে, তার মধ্যে এ সমস্যা অন্য কোনও সমস্যা অপেক্ষা গুরুত্বে ন্যূন নহে।

ইহার গুরুত্ব বুঝিয়া তাঁহারা যদি বিশেষ আগ্রহে এই দিকে মনোনিবেশ না করেন, তবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রসম্প্রদায় দেশ হইতে বিলুপ্ত হইবে। তার চেয়ে বড় অমঙ্গল বড় দুর্ভাগ্য দেশের আর কিছু হইতে পারে না। *

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত।

* সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম বর্দ্ধমান অধিবেশনে পঠিত।

মিস্ত্রালের কবিতা

[১৯০৪ সালে মিস্ত্রাল শাশ্বত সাহিত্য সৃষ্টির জন্য নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন। জন্ম ১৮৩০—মৃত্যু ১৯১৪। ইনি ফ্রান্সের প্রভেন্স প্রদেশের লোক; তাঁহার মা পণ্ডিতীভাষা বুঝিবেন না বলিয়া ইনি নিজের প্রদেশের চলতি কথায় সাহিত্য রচনা করেন; তাহাতে বস্তু আছে বলিয়া সেই রচনাই সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতেছে, প্রাদেশিক ভাষায় লেখা বলিয়া কেহ উপেক্ষা করিতে পারিতেছে না। মিস্ত্রাল সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ ১৩২১ সালের আষাঢ় মাসের প্রবাসীর ৩১১ পৃষ্ঠায় পঞ্চশস্য-বিভাগে দ্রষ্টব্য।]

ঝিঁঝি।

ওরে ঝিঁঝি! এতটুকুন্ ঝিঁঝি!
আন্‌মনে কি বকিস্ হিজিবিজি?
কেমন ক'রে হলি এমন কালো?
মুখ ফোটে না থাকতে দিনের আলো?
সন্ধ্যা হলে মিলে চাঁদের সাথে
দিন-মজুরের গান কি রে গাস রাতে?

"হায় গো দিনে কেবল কোলাহল
করে ভ্রমর-ভীম্‌রুলেরি দল;
গান আমাদের বন্ধ থাকে তাই,
আঁধার কোণে তাই মোরা ঘুম যাই;
দিনের বেলা ভারি পাখীর ভয়,—
উড়ব কি হায়?—উড়লে ধরে' লয়!"

হায় বেচারা!—"শোনো তো সবখানি,
আমরা শুনি নিশ্চুপেরি বাণী;
পীঁপড়ে-বুড়ি ফেরে যখন ঘরে,—
টিপি-সাড়ে খাবার মুখে করে,—
আমরা তখন চৌকীদারী করি
ওৎ পেতে ওই কেঁচো-টিলার 'পরি!"

দুঃখে সুখে আমরা সমান, ভাই!
তোর গানে আয় গানটি মোর মিলাই;
উঁচু নীচু হোকগে এক-আধ সুর,
দুটি প্রাণীর মিলন—সে মধুর!
ক্ষুদ্র কবির ক্ষুদ্র ঝিঁঝির গান
চাঁদ শোনো আর বোনো চাঁদির থান!

মিলন-গীতি।

বাহুর ডোরে পরস্পরে বন্দী কর!
বন্দী কর,—তারায় তারায় সন্ধি কর!
তারার বুকে নেই কুয়াসার মলিন মালা,
মোহন-মালা আন্‌গো তোরা বরণ-ডালা।

ডালার মাঝে যে ধন আছে লুকিয়ে দেখো,
আঁচল দিয়ে ঝড় বাদলে বক্ষে ঢেকো;
বক্ষে রেখো—স্বর্গেরি ফুল—চয়ন কোরো,
প্রেম-সোহাগে কোমল রাগে মরম ভোরো।

আদর-সোহাগ-আবেগ-ভরা বিহ্বলতায়,—
নবীন প্রীতির হৃদয়-রীতির গোপন-কথায়
আকুল-করা পাগল-করা অকূল অধীর
পরাণ মনের ভাব-কদমের মিলন মদির!

অসীম দোঁহার মিলন হিয়ার, দোঁহার শিরে
দৈব আশিস্ বর্ষে, দোঁহায় রয় গো ঘিরে।
রও গো ঘিরে পরস্পরে এম্‌নি করে
হাতে হাতে মিলাও চির-মিলন-ডোরে!

গোত্র-সঞ্জীবন।

জাগহে লাতিন্-গোত্র-গরবী!
　জাগ ফিরে ভানু-কিরণ-ভায়,
রাঙা আঙুরের রস ওঠে মেতে
　দৈবী মদিরা উছলি ধায়!
রুদ্র শিঙার দ্রুত ফুৎকারে
　ওড়ে তোমাদের মুক্তকেশ,
তোমরা জ্যোতির সন্ততি সব
　উৎসাহী উল্লাসীর শেষ;
সিদ্ধবাকের জাতি যে তোমরা
　সময়-ঘোড়ারে হানো চাবুক,
তোমাদের পাণি শস্য বুনিছে
　বাণী বিতরিছে তোমারি মুখ!
জাগহে লাতিন্-গোত্র-গরবী...ইত্যাদি।

তোমারি মাতৃভাষা লহরিয়া
সপ্তধারায় উথলি ধায়,
ভালোবাসা আর আলোকের গান
স্বরগেরি তান ধ্বনিছে তায়;
রাইয়ং-রাজের রাজ্যে যে বাণী
তাহারি পুত্রী ভাষা তোমার,
নর-রসনায় দেবে সে রসান্
হবে যবে লোক সত্য-সার।
জাগহে লাতিন্-গোত্র-গরবী...ইত্যাদি।

ন্যায়-ধর্ম্মের মর্য্যাদা- হেতু
ঢেলেছ শোণিত সলিলবৎ;
অকূলে ভাসিয়া নাবিক তোমার
জগতে দেখাল নব-জগৎ।
ভেঙেছ প্রবল চিন্তার বলে
রাজ্য ও রাজা হাজারো বার,
জাতি-বৈরিতা বর্জ্জিতে যদি
তোমরা হতে যে বজ্র-সার।
জাগহে লাতিন্-গোত্র-গরবী...ইত্যাদি।

তারার আলোকে জ্বেলেছ মশাল
অতুল তোমরা চমৎকার!
অরূপে বেঁধেছ রূপ-অবয়বে
মর্ম্মর 'পরে পটেতে আর!
দেবতার প্রিয় শিল্প গানের
তোমাদেরি দেশ জন্ম-ঠাঁই
স্ফূর্ত্তির চির-নির্ঝর তুমি
চির-যৌবন তুমি যে ভাই!
জাগহে লাতিন্ গোত্র-গরবী···ইত্যাদি।

তোমারি নারীর নিখুঁৎ ছবি সে
আলো করে আছে দেউল যত,
তব গৌরবে গরবী পৃথিবী,
তুমি যদি কাঁদ কাঁদে সে স্বত;
তোমাদের ফুলে ফুল্ল মেদিনী
তোমাদের ভুলে ভোলে সবাই,
তোমরা রহিলে রাহুর কবলে
শয়তান পূজা পায় যে, ভাই!
জাগহে লাতিন্-গোত্র-গরবী...ইত্যাদি।

স্বচ্ছ তরল সিন্ধু গভীর
সাজি' জাহাজের হাজার পালে
চরণ তোমার নিত্য চুমিছে
গগনের নীল মাখিয়া ভালে;
সদানন্দ এ সিন্ধু উদার
বিধাতার বরে এ মহীয়ান্,—
এ মহামূল্য মেখলা অতুল—
তোমাদেরি ইহা;—দৈব দান।
জাগহে লাতিন্ গোত্র গরবী·· ইত্যাদি।

রৌদ্রে রূপালি সাগরের কূল,
কূলে জলপাই-গাছের সার,
আর সে প্রচুর সরস আঙুর
মেতে আছে দেশ রসেতে যার;
তোমরা চলিলে পথ উজ্জ্বল
ধরা পাদপীঠ তোমা-সবার
নব আশা-বুকে জাগ উৎসুকী!
সত্য মিলনে মিলি' আবার।
জাগহে লাতিন্-গোত্র-গরবী
জাগ ফিরে ভানু-কিরণ-ভায়;
রাঙা আঙুরের রস ওঠে মেতে
দৈবী মদিরা উছলি' ধায়।

বন্ধু-বিরহে।

গেছে দূর কতদূর বন্ধু আমার,
মনে সুখ নাই আর,
বুক ভরা হাহাকার।
বন্ধু কোথায় হায় কে কবে মোরে?
আমি দিব মোহরে—
তার দু'হাত ভোরে।

যে দিবে বারতা আনি' তাহার তরে
আমি করিব ঘরে
মহা- উৎসব রে !
গেছে কি অনেক দূর ?—বন্ধু সে মোর ?
সে কি রাজার সহর ?—
সে কি শাজাদ-নগর ?
সেকি রাইরাজাতলা হ'তে আরও বেশী দূর ?
সে কি ছোটো গাজীপুর ?
মোর পরাণ বিধুর !
বলে দাও, পাখী হ'য়ে যাই গো উড়ে,
কিবা জনতা ফুঁড়ে—
ঘোড়া ছুটাই তুড়ে।

*   *   *

সে কেমন—বলি শোনো—শুনিলে ওযে
ছবি রবে মগজে,—
চিনে লবে সহজে।
যখন সে যেথা রয় সে ঠাঁই ভাসে
জুঁই- ফুলের বাসে,
মন ভরিয়া আসে !
স্মিত হাসি খেলে যায় যবে সে মুখে
বায়ু বহে গো সুখে
চূত- মুকুল-বুকে।
যখন সে কয় কথা বন্ধু আমার,—
ঝাউ ঝিমায় না আর,—
চলে চামর তাহার !
সে যদি গো গাহে গান কণ্ঠ তুলে,—
শামা গাহিতে ভুলে,—
তালে কেবলি দুলে !

*   *   *

হে প্রিয় ! হতাম যদি রাজ্যভাগী
তবু তোমারি লাগি
ফিরি- তাম বিরাগী।
দেখা পেলে, যুগ যুগ হাতে রেখে হাত
কেটে যেত দিনরাত,
অনি- মেষ আঁখিপাত !

যে অবধি গেছ তুমি, একেলা রহি,
দিন- মণিরে কহি
কেন ফেলনা দহি ?
সন্ধ্যা কাটে না মোর বন্ধু আমার !
দূতী নহে উষা আর
জাগ- রণের আশার।
তোমার বয়সী যারা বন্ধু আমার
হাসি খুসী সে-সবার
মন জাগায় না আর।

*   *   *

ভাল বেসে ভাল সব আছে দুনিয়ায়
শাল সরলের ছায়
গিরি- মল্লিকা ভায়।
তোমার মদির আঁখি স্মরি নিয়ত,—
সে যে মদেরি মত,—
মাতে মাতায় স্বত !
তোমার পরশ-মধু মনের মিতা !
কি যে বলিব কি তা' ?
বুঝি নিধি-সবিতা !

*   *   *

হে প্রিয় ! পাহাড়ে আজ তুষার কেবল,—
চূড়া ধবলে ধবল,—
নাই তৃণ ফুল ফল।
বন্ধু ! নিদাঘ ফিরে আসিবে যবে
গিরি শ্যাম-গরবে
ফিরে গরবী হবে।
অমনি বিরহ-শেষে হে প্রিয়তম !
দুখী হিয়ার মম
দূরে যাবে এ তম।
অমনি যদি গো ফিরে এস তুমি দেশ
হবে নিমেষেই শেষ
মোর মরমেরি ক্লেশ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

পুস্তক-পরিচয়

সদানন্দ—শ্রীহেমন্তচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত—মূল্য চারি আনা।

সদানন্দ ইংরেজ কবি মিলটনের L'Allegroর অনুবাদ। মূলকে অত্যধিক পরিমাণে অনুসরণ করিতে গিয়া ভাষা এবং ছন্দের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে—আদি সুরটিও ধরা পড়ে নাই।

"যেথা 'করিণ্ডন' আর 'থারসিস্' মিলি
বসে গেছে সান্ধ্য ভোজে, রাঁধিয়াছে ফিলি,
পল্লী-শাকসব্জী দিয়া, স্বাদু খাদ্য কত;
আবার তখনি বালা দ্রুত গৃহ ত্যজি
'থেষ্টিলিস্' সনে যায় ভরা ক্ষেত পানে"—

অনুবাদ হইতে পারে কিন্তু বাংলা হয় নাই।

সুরভি—শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত।

এখানি কবিতা-গ্রন্থ। কয়েকটি কবিতা আমাদের কাছে বেশ ভালো লাগিয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ কবিতার ভিতরেই উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু নাই। ছন্দ অনেক জায়গায় আড়ষ্ট, বহু লাইন যতি-পতনে দুষ্ট। শিরে—ভরে; সাধনা—বীণা; মিলে—খুলে; রাগিণী—জানি প্রভৃতি মিল সেকালে চলিতে পারিত কিন্তু একালে ইহারা একেবারেই অচল। লেখকের ভিতর সুরভি আছে। কিন্তু রৌদ্র, বাতাস ও শিশিরের খাদ্য যোগাইয়া যে সংযমের দ্বারা তাহাকে পুষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে-তাহার একান্তই অভাব। ফুলকে অসময়ে জোর করিয়া ফুটাইলে গন্ধ তো জমেই না—ফুলের সৌন্দর্য্যও তাহাতে নষ্ট হয়। সংযমের সহিত, ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করিতে না জানিলে ভাব জমাট বাঁধিবার অবকাশ তো পায়ই না—ছন্দ ও মিলের ভিতরেও প্রচুর গলদ থাকিয়া যায়। লেখকের ভবিষ্যৎ আমাদের কাছে অনুজ্জ্বল বোধ হয় নাই—তাই এত কথা বলিতে হইল।

কৈশোরক—শ্রীরবিদত্ত প্রণীত। মূল্য দুই আনা। এখানিও কবিতা-পুস্তক। সেই সাবেকি ধরণ। কোথাও এতটুকু বিশেষত্ব নাই। কবি তাঁহার কবিতার ভিতর নিজের নামের এক একটি অক্ষর বসাইয়া বাহাদুরী লইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন এরূপ কবিতা এযুগে কেবল হাস্যেরই উদ্রেক করে মাত্র—বাহবা আদায় করিতে পারে না।

শ্রীহে—

প্রভাবতী—ঐতিহাসিক উপন্যাস। শ্রীআশুতোষ ঘোষ বি, এ, প্রণীত, মূল্য সাত আনা। পুস্তকখানি ভদ্রলোকের অপাঠ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী শিক্ষিত লোকে যে এমন জঘন্য রুচির পরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না, তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে উদ্ধৃত কবিতাটি অত্যন্ত অশ্লীল। লেখকের রচনা-ভঙ্গী নিতান্তই কাঁচা। স্থানে অস্থানে কথা গণিয়া কবিতা ও গান বাঁধিবার প্রয়াস আছে। কিন্তু তাহার না আছে ভাব, না আছে মিল, না আছে ছন্দ। "গুনগুন"এর সহিত "মধুর তান" প্রভৃতি পদের মিল যোজনা এই-সব কবিতার পদে পদে দৃষ্ট হয়। এরূপ অদ্ভুত পুস্তকের সমালোচনা করাও একটা বিড়ম্বনা।

অদৃষ্টলিপি—শ্রীসরোজকুমারী দেবী প্রণীত। মূল্য আট আনা। একটি মাঝারি গল্প ও তিনটি ছোট গল্পের সমষ্টি। প্রথম গল্পটিতে ইঙ্গবঙ্গ সমাজের চিত্র ও অপর তিনটিতে বাঙ্গালীর সংসার-চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। তন্মধ্যে "পরিবর্ত্তন" গল্পটি আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে। "চিত্র" গল্পটিতে দত্ত-গৃহিণীর চরিত্র বেশ ফুটিয়াছে। "ইষ্টলাভ" গল্পটি অপেক্ষাকৃত কাঁচা। প্রথম গল্প "অদৃষ্টলিপি"র ভাষা বেশ একটু ইংরেজি-গন্ধী। এই গল্পটি এবং লেখিকার পূর্ব্বপ্রকাশিত "ভুল" প্রভৃতি কয়েকটি গল্পের সহিত Mrs. B. M. Crokerএর রচিত "Diana Barringtons" "Proper Pride" "Beautiful Miss Neville" প্রভৃতি কয়েকটি উপন্যাসের ঘটনাগত অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখিয়া মনে হয় যে এই গল্পগুলি শ্রীমতী ক্রোকারের অনুসরণে লিখিত। আমাদের অনুমান যদি সত্য হয় তবে তাহা পুস্তকে স্বীকৃত হওয়া উচিত ছিল। এরূপ সাধারণ গল্পের অনুবাদ বা অনুসরণের সার্থকতাও দেখি না।

প্র—।

গ্রাম্য উপাখ্যান—৺রাজনারায়ণ বসু লিখিত। ডঃ ফুঃ ১৬ অং ১১৬+২৸৹ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা। প্রকাশক রায় এম সি সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

১২৯০ সালে সুরভী নামক পত্রিকায় প্রকাশিত রাজনারায়ণ বাবুর লিখিত "গ্রাম্য উপাখ্যান" ও "চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশ ভ্রমণ" নামক প্রবন্ধ দুটি এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে। রাজনারায়ণ বাবুর জন্মস্থান বোড়াল গ্রামের বিবরণ উপলক্ষ্য করিয়া গ্রামবাসীদের পরিচয়, রীতি-নীতি, স্বভাব চরিত্র, এবং প্রসঙ্গক্রমে তাৎকালীন বঙ্গদেশের কিছু কিঞ্চিৎ আভাস বর্ণিত হইয়াছে। রচনার মধ্যে হাস্যরস ও বেপরোয়া ভাবের রচনাভঙ্গি বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে। গ্রন্থে বর্ণিত লোকগুলি বাংলার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ নহেন বলিয়া আমাদের পরিচিত না হইলেও তাঁহাদের মধ্যে আমরা সেকেলে গ্রামবাসীদের ছবি দেখিতে পাই। কিন্তু বর্ণনা অত্যন্ত scrappy রকমের, ভাসা ভাসা, খাপছাড়া; বিচিত্র বিবরণে জমাট বা অখণ্ড সূত্রে গ্রথিত হয় নাই। বঙ্গদেশ ভ্রমণ প্রস্তাবটিও সেইরূপ। তাহার ভিতর দিয়া বঙ্গের বিশেষ কিছুই পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে যতটুকু পাওয়া যায় তাহাই এমন রঙিন যে মন খুসি হইয়া যায়।

যাঁহারা রাজনারায়ণ বাবুর "সেকাল ও একাল" এবং "আত্মচরিত" পড়িয়াছেন তাঁহারা ইহা পাঠ করিলে সেকেলে বাংলাদেশের সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। এ পুস্তকখানি উক্ত পুস্তক দুখানির পরিশিষ্টস্বরূপ।

গ্রন্থের ভূমিকায় রাজনারায়ণ বাবুর জীবন-কথা Modern Review হইতে সংকলিত ও সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বইয়ের মুখপাতে রাজনারায়ণ বাবুর ছবি আছে। মলাটের উপর একটি গ্রাম্য দৃশ্যের আদ্‌রা সুন্দর হইয়াছে। বইয়ের ছাপা কাগজ ভালো। তথাপি মূল্য অত্যন্ত বেশী হইয়াছে। অর্দ্ধেক হইলে ন্যায্য হইত।

ফুলের মালা—প্রথম ভাগ। কলিকাতা রিপন কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন, এম-এ, বি-এল প্রণীত। প্রকাশক সেন গুপ্ত কোম্পানী, ১৫৫।৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দুরঙে ছাপা। সচিত্র। মূল্য তিন আনা।

এখানি ছোট ছেলেদের অসংযুক্ত বর্ণপরিচয়ের বই। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকারের হাসিখুসি ও শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম ভাগ বর্ণপরিচয় যে প্রণালীতে লেখা, সেই দুই প্রণালী মিশাইয়া এই ফুলের মালা গাঁথা হইয়াছে। ছবিগুলি অসুন্দর; পদ্য রচনা নীরস—ছন্দ যতিরও পতন আছে। ছোট ছেলেদের বই ওস্তাদ লোকেরই রচনা করা উচিত; আমাদের দেশে সব উল্টা কারবার। ছোটবেলা হইতে ছেলেদের কানে যদি খোঁড়া ছন্দ বেতালা নৃত্য করিয়া তাহাদের

বান খারাপ করিয়া রাখে তবে তাহারা বড় হইয়াও তাল সামলাইতে পারিবে না। আমাদের দেশের পুরাতন ছড়া তালে ওজনে ছন্দে ভারি খাঁটি ছিল; সেগুলির তাল ধরিতে না পারিয়া মধ্য যুগে অক্ষর গণিয়া পদ্য রচনা চলিয়াছিল। বেতালা ছড়ার চেয়ে অক্ষরগণিয়া পদ্য লেখা ছিল ভালো। সুতরাং অধ্যাপক মহাশয় যে দুইখানি বইয়ের নকল করিয়াছেন তাহাদের অতিরিক্ত কিছু ত দিতে পারেনই নাই, অধিকন্তু পঙ্গু পদ্য লিখিয়া প্রত্যবায়ভাগী হইয়াছেন। এই বইখানিতে একমাত্র প্রশংসার বিষয় এই দেখিলাম যে বহু উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে; তাহাতে প্রথম শিক্ষার্থী শিশুর বানান ও শব্দ শিক্ষার পক্ষে বিশেষ সাহায্য হইবে।

মুদ্রা-রাক্ষস।

A Short Review of the University Sanskrit Grammar, by Bhavaniprasanna Lahiri, Kavyavyakaranatirtha, Rangpur, 1914.

পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার থিবো ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বহুবল্লভ শাস্ত্রী মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন-পরীক্ষার্থী ছাত্রদের জন্য ইংরেজী ভাষায় যে একখানা সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয় এই আলোচ্য পুস্তিকায় তাহারই কিয়দংশের সমালোচনা করিয়াছেন। এই সমালোচনায়* ব্যাকরণখানির এত ভুল দেখান হইয়াছে যে, আমরা বিস্মিত হইয়াছি। ছেলেদের হাতে এরূপ বই কিছুতেই দেওয়া উচিত নহে, আগাগোড়া সংশোধন করিয়া পুনর্ব্বার লিখিলে বইখানি উপযোগী হইতে পারে। কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ মহাশয় এই সমালোচনা লিখিয়া অনেকের চক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছেন। "অনেন ব্যাকরণমধীতম্, এবং ছন্দোঽধ্যাপয়।" এই প্রয়োগটিকে সমালোচক ভুল বলিতে চাহেন। এ সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা Modern Review (June, 1915) পত্রিকায় দেখিতে পাওয়া যাইবে। কোন একখানি ক্ষুদ্র সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়াইলে ইস্কুল ও কলেজের ছাত্রদের বস্তুত উপকার হইতে পারে। এ বিষয়ে তাঁহার সহিত আমরা সম্পূর্ণ একমত। বিদ্যালয়ের কর্ত্তারা ইহা গভীরভাবে বিচার করিয়া দেখিবেন।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

শোভা—(সামাজিক উপন্যাস) শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস প্রণীত। প্রকাশক মেঃ সান্যাল এণ্ড কোং ২৫ নং রায় বাগান ষ্ট্রীট্ কলিকাতা। মূল্য ১৲।

চরিত্রগুলি বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে, গল্পও বেশ জমিয়াছে। উত্তর-বঙ্গের পল্লীচিত্রও সুন্দর হইয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শে হিন্দু-সমাজ ও গৃহের সংস্কার সাধন করিতে গেলে যেরূপ কুফলের উদয় হয়, ইহাতে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি পড়িলে অনেকের চৈতন্যোদয় হইবে। শোভা, কুসুম ও গোকুলঠাকুরের চরিত্র উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থের ছাপা কাগজ ভাল; বাঁধাইও উত্তম। কিন্তু রচনায় প্রাদেশিকত্ব-দোষের ভাগ কিছু বেশী; ছাপার ভুলও অনেক। "বেয়াই" ও "বেয়ান" শব্দদ্বয় উত্তরবঙ্গে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, পশ্চিমবঙ্গে সে অর্থে ব্যবহৃত হয় না। কাজেই এই শেষোক্ত প্রদেশের পাঠকপাঠিকাবর্গকে একটু গোলে পড়িতে হইবে। "ভাতিত বদন" (৬৭ পৃঃ) "সর্পিণীবৎ" (৫১ পৃঃ) "রাত্র" "উচাবাচ্য" (৩৯ পৃঃ) "ইদানিক ব্যবহার" (২৬ পৃঃ) "শ্মরণাগত আর্ত্ত" (২৫ পৃঃ) "বুকে বসে চোখের ভোঁয়া উপরাচ্ছেন" (৩৫ পৃঃ) "চক্ষুর জল ছাড়িয়া দিলেন" (৩৬ পৃঃ) "আর একজন" (স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একে৷ অন্যের উল্লেখ করিলে) "সখ্যতা" (৯৪ পৃঃ) "মরণাপন্ন কাতরে" প'ড়েছি" (১২৯ পৃঃ) "আরক্তিম" (২৬ পৃঃ) "পঙ্কজিনীবহুল পচা পুকুরটি" (১৩ পৃঃ) "দাঁতে দড়ি দিয়ে আছ" (৪৪ পৃঃ) "গণাপড়া" "বিলাসী বিলাসপবনে বাহির হইয়াছেন" (২০৯ পৃঃ) "গোকুল ত্রস্ত জল আনয়ন করিলেন" (২১৯ পৃঃ) ইত্যাদি প্রাদেশিকত্ব ও ভ্রমের প্রতি গ্রন্থকার মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। "আর একজন" পদটি পরিত্যাগ করিতে বলিতেছি না। পশ্চিমবঙ্গে ইহার পরিবর্ত্তে "উনি" "তিনি" "সে" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। গ্রন্থখানি ভাল হইয়াছে বলিয়া কয়েকটি দোষেরও উল্লেখ করিলাম। ভবিষ্যৎ সংস্করণে পরি-মার্জ্জিত হইলে ইহা একখানি সুপাঠ্য পুস্তক হইবে।

পুরোহিত—(নাটক) শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত। কলিকাতা। মূল্য ।• আনা। হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের যে অবনতি ঘটিয়াছে এবং তাঁহার অবনতিতে সমাজ ও ধর্ম্মেরও যে অবনতি হইয়াছে, তাহা নাটকাকারে গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন। এই অবনতির স্রোত কিরূপে রুদ্ধ হইতে পারে, তাহারও উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে। লেখকের উদ্দেশ্য সাধু। তিনি "সূচনা"য় লিখিয়াছেন "যা দেখিতেছি, তাই লিখিতেছি।" কিন্তু সর্ব্বত্রই যে পুরোহিতের চিত্র এইরূপ, তাহা স্বীকার করি না। যাঁহারা ধর্ম্মের যাজনা করেন, তাঁহাদের শাস্ত্রজ্ঞান যে গভীর এবং তাঁহাদের চরিত্র যে আদর্শস্থানীয় হওয়া উচিত, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। লেখকের বোধ করি এই প্রথম উদ্যম। তাই কোথাও কোথাও ত্রুটি লক্ষিত হয়। হাত পাকিলে তাঁহার রচনা ভাল হইবে বলিয়া আশা করি। সমাজের জঘন্য চিত্র দেখাইতে হইলেও, যতদূর সাধ্য সুরুচি রক্ষা করা কর্ত্তব্য। দ—।

The Dietetic Treatment of Diabetes. By Major B. D. Basu, I.M.S. (Retired). Fifth Edition. Re. 1-8. Panini Office, Allahabad.

এই পুস্তকে সার্জ্জন-মেজর বামনদাস বসু মহাশয় বহুমূত্র-রোগীদের পথ্য কিরূপ হওয়া উচিত, তাহার আলোচনা ও ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। পুস্তকখানি এরূপ ভাবে লিখিত হইয়াছে যে ইহা রোগী এবং চিকিৎসক উভয়েরই কাজে লাগিবে। বাংলাদেশে বহুমূত্র রোগের যেরূপ প্রাদুর্ভাব, তাহাতে এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। যাঁহাদের এখন ঐ রোগ হয় নাই, কিন্তু হইবার আশঙ্কা আছে, তাঁহারা ইহা পড়িয়া সাবধান হইবার উপায় স্থির করিতে পারিবেন বলিয়া বোধ হয়।

The Indian Literary Year Book and Authors' Who is who for 1915: Edited by Prof. Nalinbihari Mitra, M.A. Panini Office, Allahabad. Rs. 2.

এই পুস্তকের বিষয় আমরা গত মাঘ মাসের প্রবাসীতে ৩৮৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলাম। ইহাতে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় নিবদ্ধ হইয়াছে। ভূমিকাতে অনেকগুলি তালিকা আছে। যথা, ১৯১১ সালে ভারতবর্ষের কোন্ ভাষায় কত বহি ছাপা হইয়াছিল, কোন্ প্রদেশে ছাপাখানা, খবরের কাগজ ও সাময়িক পত্র কত ছিল এবং কত বহি ছাপা হইয়াছিল, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান কোন্ কোন্ ভাষা কত ব্যক্তির মাতৃভাষা, কোন্ প্রদেশের অধিবাসী কত ও তন্মধ্যে লিখন-পঠনক্ষম কত, কত লোক কোন্ কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ও তন্মধ্যে লিখনপঠনক্ষম কত, কোন্ প্রদেশে শতকরা কতজন পুরুষ ও স্ত্রীলোক লিখনপঠনক্ষম, ইত্যাদি। তদ্ভিন্ন বহিখানিতে ভারতবর্ষের সংবাদপত্রের ইতিহাসও ভূমিকাতে আছে। গ্রন্থকারদের নাম ও তাঁহাদের প্রণীত পুস্তকাবলীর নাম, সংবাদপত্রাদির নাম ও ঠিকানা, লাইব্রেরী ও পাঠাগার, ছাপাখানা এবং পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক প্রভৃতির নাম ও ঠিকানা আছে। তদ্ভিন্ন খবরের কাগজের

আইন, মুদ্রাযন্ত্র আইন, কপিরাইট আইন এবং কপিরাইটের নিয়মাবলী ইহাতে আছে।

এরূপ বার্ষিক পুস্তক ভারতবর্ষে এই প্রথম বাহির হইল। সুতরাং ইহার এই প্রথম সংস্করণে কিছু কিছু অসম্পূর্ণতা ও ভুল আছে। আগামী বৎসরের বহিতে ইহা আরও ভাল হইবে। যে যে শ্রেণীর লোকের নিকট ইহার জন্য খবর পাওয়া দরকার, তাঁহারা খবর দিলে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইবে। আশা করি গ্রন্থকার, পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক, সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক, ছাপাখানার স্বত্বাধিকারী, লাইব্রেরীর সম্পাদক, প্রভৃতি ব্যক্তিগণ এলাহাবাদে পাণিনি কার্য্যালয়ে, নিজ নিজ সংবাদ দিবেন।

পুস্তকখানি গ্রন্থকার, সম্পাদক, প্রকাশক, সংবাদপত্রের লেখক, এবং দেশের খবর জানিতে ইচ্ছুক শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাজে লাগিবে।

স।

ফুলঝুরি—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রণীত। কে ভি সেন য়্যাণ্ড ব্রাদার্স কর্তৃক প্রকাশিত। বিক্রেতা আশুতোষ লাইব্রেরী কলিকাতা, ঢাকা, চট্টগ্রাম। মূল্য ছয় আনা।

৩২ পৃষ্ঠার চটি বই। তাহার এক পাতে ছবি, ছবির সামনের পাতে সেই ছবির বিষয়ে লেখা। এমনি ১৫ খানা পাতা-সই রঙিন ছবির পাশে ছোট বড় ১৫টি সরস পদ্য নৃত্য-দোদুল ছন্দে অসংযুক্ত বর্ণে অতি সহজ মিষ্ট কথায় লেখা হইয়াছে। পদ্যের মধ্যে কবিত্বেরও অসদ্ভাব নাই। পদ্যগুলির মধ্যে আনন্দ, হাসি, সরসতা, কবিত্ব থাকাতে বয়স্ক লোকেরও উপভোগ্য হইয়াছে; শিশুর জীবনের লীলা খেলা শিশুর মনের ভাষাতে লেখাতে তাহা শিশুদেরও উপভোগ্য হইয়াছে। শিশুরা ইহা হইতে অনেক নূতনতর আনন্দের খেলা খেলিতে শিখিবে; অনেক ফুলের নাম শিখিবে। কিন্তু রচনা প্রাদেশিকতা-বর্জ্জিত নহে বলিয়া স্থানে স্থানে ভাতের মধ্যে কাঁকরের মতো অসতর্ক পাঠকের মুখে বাজিয়া যায়। প্রারম্ভিক ফুলঝুরি কবিতাটি আমার কাছে একটি হেঁয়ালির মতো অবোধ্য ঠেকিয়াছিল; যদিও আমি কোনো বিশেষ প্রদেশের নিজস্ব লোক নহি, তবু আমি উহার অর্থোদ্ধার সহজে করিতে পারি নাই। একটু প্রাদেশিকতা-বর্জ্জিত করিলে শ্লোকটি উপাদেয় ও সুন্দর হইত। ভিতরেও 'শুনবে' স্থানে 'শোনবে'; 'তুল্‌বে' স্থানে 'তোল্‌বে'; 'রোদে' স্থানে 'রৌদে'; 'হেঁটে' স্থানে 'হেটে'; 'কুড়ে' স্থানে 'কুঁড়ে'; 'কোঁচড়' স্থানে 'কোঁচর'; এবং হ্রস্ব ইকার দিলে যেখানে চলিত সেখানে দীর্ঘ ঈকারের ছড়াছড়ি বড় দৃষ্টিকটু ও শ্রুতিকটু হইয়াছে। এ ত্রুটি অবশ্য অতি অকিঞ্চিৎকর; ইচ্ছা করিলে দ্বিতীয় সংস্করণে সহজেই সারিয়া লওয়া যাইবে। কবিতাগুলি সমস্তই স্বতন্ত্র; কোনো একটা যোগসূত্রে পরস্পর গ্রথিত নহে। লেখকের সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত। চিত্রকর বইখানিকে সাজাইয়াছেন ভালো। মলাটের উপর ফুলঝুরির স্ফুলিঙ্গের মধ্যে বই লেখক ও প্রকাশকের নাম রাতের অন্ধকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বইয়ের পুস্তিন অর্থাৎ মলাট ও লেখার মাঝখানের দুটি পাতাও আগে পিছে ফুলঝুরি তুবড়ি প্রভৃতির স্ফুলিঙ্গে খচিত ও পুস্তক লেখক প্রকাশকের নামে সুসজ্জিত। প্রারম্ভিক কবিতার জমির ছবিটিও রচনার ভাব-প্রকাশক—

আসমানের এই ফুলঝুরি
রঙিন আলোর সুড়সুড়ি!
হাউই মাতাম (?) তুবড়ি তার।
এক সাথে দেয় থুরথুরি।

মাত্র দুটি বানান বদলাইয়া শ্লোকটি আমি পশ্চিম বঙ্গের ভাষায় উদ্ধৃত করিলাম।

শ্লোকের শেষ চরণটি চমৎকার ভাবব্যঞ্জক; সমস্ত শ্লোকটিই কবিত্বময়; এবং ছবির সঙ্গে ভারি মিল হইয়াছে। ভিতরকার রচনা-সংলগ্ন ছবিগুলিও রঙে ভাবে বেশ হইয়াছে; বাংলা বইয়ে প্রায়ই এমন জীবন্ত ছবি দেখা যায় না; এ ছবিগুলিতে একটু প্রাণসঞ্চার আছে। তারপর প্রকাশকের পালা। ছাপা পরিপাটি সুদৃশ্য সুন্দর হইয়াছে। এই-সবের হিসাবে দাম খুব সস্তা হইয়াছে বলিতে হইবে। এখন এই ফুলঝুরি কচি শিশুর মুখে হাসির ফুলঝুরি ফুটাইবে ইহা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি। অসংযুক্ত বর্ণে লেখা বলিয়া খুব ছোট ছেলেরাও পড়িতে পারিবে।

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত। প্রকাশক শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়, ৫০নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ডবল ডিমাই ষোড়শাংশিত ৫৫৭+৭+১৬+৮০ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা, সোনালি অক্ষরে নাম লেখা। বহু লোকের মূর্ত্তিচিত্র-সম্বলিত। মূল্য তিনি টাকা মাত্র।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের প্রবাসী বাঙালীর বৃত্তান্ত যে কিরূপ উপাদেয় ও বিচিত্র তথ্যে পূর্ণ তাহা প্রবাসীর পাঠক মাত্রেই জানেন। প্রবাসীর প্রথম বৎসর হইতে এ পর্য্যন্ত জ্ঞানেন্দ্রবাবু প্রবাসী বাঙালীদের কীর্ত্তি, সাহস, উৎসাহ, কর্ম্মপটুতা, মহত্ত্ব ও বিশেষত্ব দেশবাসী বাঙালীদের পরিচিত করিবার জন্য যতগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহারই মধ্যে উত্তর ভারতের বাঙালীদের প্রবাসবাস ও উপনিবেশ সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধগুলি এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে। তাহাতেই এত পুরুষ ও স্ত্রীর জীবনকাহিনী আলোচিত হইয়াছে যে শুধু তাঁহাদের নামের তালিকাই বর্জ্জাইস অক্ষরে ছাপিয়াও এই প্রকাণ্ড আকারের পুস্তকের ১৫ পৃষ্ঠা ভরিয়াছে। এই পুস্তকের প্রশংসা করা প্রবাসীর পক্ষে অনেকটা আত্মপ্রশংসারই সামিল। তবে বাঁচোয়া এই যে প্রবাসীর সকল পাঠকপাঠিকারই এই পুস্তকের গুণপনা কিছু-না-কিছু জানা আছে। সুতরাং যাহা বলিব তাহার সত্য মিথ্যা প্রত্যেকেই কতকটা নিজের মনে যাচাই করিয়া লইতে পারিবেন।

বইখানি উত্তর ভারতে বাঙালীদের কর্ম্মপ্রচেষ্টার পঞ্জী হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে যে-সমস্ত বাঙালীর গৌরব আলোচিত হইয়াছে তাঁহাদের ও তাঁহাদের বংশধরদের ত ইহা আদরের সামগ্রী হইয়াছেই; সেই সঙ্গে ইহা প্রত্যেক বাঙালীরই সমাদরের যোগ্য। বহু অনুসন্ধান ও কষ্ট স্বীকার করিয়া জ্ঞানেন্দ্র বাবু এই-সমস্ত জীবনের কাহিনী ও প্রবাসী বাঙালীদের প্রতিকৃতি সংগ্রহ করিয়াছেন। পাঠকসাধারণ, এবং বিশেষ করিয়া যাঁহাদের জীবনকথা আলোচিত হইয়াছে তাঁহারা বা তাঁহাদের বংশধরেরা, এই বহুবৎসরব্যাপী চেষ্টার ও পরিশ্রমের ফলকে সাদরে ঘরে ঘরে গ্রহণ করিবেন বলিয়া আশা করি। Greater Bengal বা বিস্তৃততর বঙ্গের কাহিনী প্রত্যেক বাঙালীর জানা উচিত।

রচনার ভাষা বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল। তবে তাহার মধ্যে সরসতা বা সাহিত্যরস বা বিশেষ রচনাভঙ্গীর (style) কারিকুরি খুঁজিলে পাওয়া যাইবে না। ইতিহাসের ভাষায় তাহা প্রায়ই পাওয়া যায় না।

গ্রন্থের ভূমিকা ও সূচী উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ভূমিকায় বাঙালীর কৃতিত্বের একটি মোটামুটি বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে বাঙালীর আত্মপ্রত্যয় আত্মসম্মান আত্মবোধ বাড়িবে।

গ্রন্থমুখে উপনিবেশ স্থাপনের কারণাবলীর যে অনুক্রম-চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহাও বিশেষ শিক্ষাপ্রদ ও মৌলিক।

গ্রন্থখানি কিনিয়া যত্নে রাখিবার উপযুক্ত।

মুদ্রারাক্ষস।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত প্রকাশিত

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৫শ ভাগ
১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩২২

৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

সন্তোষ।

একদিন রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইয়া দেখিলাম এক জায়গায় কয়েকটি হৃষ্টপুষ্ট গাভী শয়ন করিয়া রোমন্থন করিতেছে। নিজেদের অবস্থায় এমনই তৃপ্ত যে পৃথিবীর রাজা বলিয়া গর্ব্বিত মনুষ্যনামধারী পথিকদিগের প্রতি দৃক্‌পাত করিতেও প্রবৃত্তি নাই। কাজেই আমাকে এই আত্মতৃপ্ত গাভীগুলির বিশ্রামসুখ ভঙ্গ না করিয়া পাশ কাটাইয়া যাইতে হইল।

কিছুক্ষণ পরে মনে হইল গাভীগুলি সন্তোষের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি;—কিন্তু মনুষ্যত্বের নহে। অনেক মানুষ আছে, তাহারা এই হৃষ্টপুষ্ট গাভীগুলির মত; দেখিতে বেশ, কিন্তু অমানুষ। সন্তোষের বহু প্রশংসা আছে; তাহা ন্যায়সঙ্গতও বটে। কিন্তু সন্তোষের নিন্দা এবং অসন্তোষের প্রশংসারও প্রয়োজন আছে। জগতে সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষের মত অসন্তুষ্ট আর কেহ নয়। মানুষের মত এমন উন্নতিও আর কাহারও হয় নাই। এখনও হইতেছে, ভবিষ্যতে আরও হইবে। মানুষের মধ্যে যে জাতি যত অসন্তুষ্ট, তাহার উন্নতির সম্ভাবনা তত বেশী। কিন্তু, আমার অদৃষ্টে এই ছিল, ভাবিয়া সর্ব্বপ্রকার দুরবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা যেমন নিষ্ফল, তেমনি অসন্তুষ্টচিত্তে কেবল খুঁৎখুঁৎ করাও বৃথা। অসন্তোষ যেমন চাই, তেমনি উদ্যোগ ও পরিশ্রমও চাই।

শিক্ষা ও বেকার অবস্থা।

শিক্ষার, বিশেষ করিয়া উচ্চশিক্ষার বিস্তারের বিরোধীরা বলেন, "যেদিকে যাও কোথাও আর চাকরীর সুবিধা নাই, উকীল ব্যারিষ্টারও বহুৎ হইয়া গিয়াছে। আরও শিক্ষার বিস্তার করিয়া আরও কতকগুলা বেকার লোকের সংখ্যা বাড়াইয়া লাভ কি?" যেন টাকা-রোজগার ছাড়া শিক্ষার আর কোন উদ্দেশ্যই নাই। কিন্তু টাকা রোজগারই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া যদি ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্য এই যে, মানুষ অশিক্ষিত থাকিলেই তাহার একটা-না-একটা কাজ জুটিয়া যায় এবং রোজগারের পথ খুলিয়া যায়, এবং শিক্ষা পাইলেই সে বেকার হয়, ইহা কি সত্য? কখনই না। সত্য কথা এই যে, অশিক্ষিত অনেক লোকও বেকার অবস্থায় আছে, এবং শিক্ষিত অনেক লোকও বেকার অবস্থায় আছে। শিক্ষিতেরা চীৎকার করিতে পারে, লিখিতে পারে; কাজেই তাহারা ক্ষুধিত ও অসন্তুষ্ট হইলে তাহা প্রচার হইতে বাকী থাকে না। আর আমাদের এই অদৃষ্টবাদী দেশের ধর্ম্মভীরু অশিক্ষিত লোকেরা অর্দ্ধাশনে থাকিলেও কিছু বলে কম না, অনেকে নীরবে প্রাণত্যাগ করে; কচিৎ কখন ক্ষুধিত গরীব লোকেরা লুটপাট করে। মোটের উপর বেকার ক্ষুধিত অশিক্ষিত লোকেরা বেকার ক্ষুধিত শিক্ষিত লোকদের চেয়ে রাজকর্ম্মচারীদিগকে ও দেশের অবস্থাপন্ন লোকদিগকে কম বিব্রত করে। এইজন্য রাজকর্ম্মচারীরা শিক্ষার

বিস্তার চান না, অবস্থাপন্ন লোকেরাও চান না। রাজকর্ম্মচারীরা ভাবেন, শিক্ষা বাড়িলেই অসন্তোষ বাড়িবে, এবং মনে মনে এ ভয়টাও আছে যে শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের প্রভুত্বটা কমিবে এবং শিক্ষিতেরা তাঁহাদের চাকরীতেও উত্তরোত্তর অধিক ভাগ বসাইবে। অবস্থাপন্ন লোকেরাও অনেকে, শিক্ষার বিস্তার হইলে চাকর পাইবেন না, এই কাপুরুষোচিত চমৎকার চিন্তায় আকুল। তাঁহাদেরও চাকরী ওকালতী প্রভৃতিতে ভাগ বসিবে, এ চিন্তা যে নাই, তাহাও নয়। কিন্তু এসব স্বার্থপরতার কথা। সমগ্র দেশের পক্ষে কি ভাল তাহাই বিবেচ্য— বিস্তর অশিক্ষিত বেকার লোক ভাল, না অনেক শিক্ষিত বেকার লোক ভাল? অবশ্য, যদি সকলেই শিক্ষিত ও কর্ম্মান্বিত রোজগারী হয়, তাহা হইলে ত কথাই নাই। স্বাধীন, সুসভ্য, খুব অগ্রসর দেশেরও অবস্থা কিন্তু এরূপ নহে। আমাদের দেশে বেকার লোকদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা যত বাড়ে ততই ভাল। অশিক্ষিত লোক যদি খাইতে পরিতে না পায়, তাহা হইলে সে অদৃষ্টকে নিন্দা করিয়াই ক্ষান্ত হয়, কখন বা লুটপাট করে। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকে দুরবস্থাকে বিধাতার বিধান মনে করেন না। দেশের জমী উর্ব্বরা, খনিতে কত কয়লা, ধাতু, রত্ন, অথচ আমরা খাইতে কেন পাইব না, শিক্ষিতেরা এই চিন্তা করিতে করিতে উপায় ও প্রতিকার নিরূপণ করিতে পারেন শিক্ষিতেরা জানেন যে পৃথিবীর অন্যত্র মানুষ প্লেগ ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট করিয়াছে, গ্রাসাচ্ছাদন, শিক্ষা ও আনন্দের ব্যবস্থা করিতে পরিয়াছে। তাঁহারা পৃথিবীর নানা স্থানে, "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ, দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি", এই বাক্যের দৃষ্টান্ত দেখিতে পান; দেখিতে পান, যে, আমাদেরই দেশে বিদেশীরা সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করে এবং লক্ষপতি ক্রোড়পতি হয়। এই-সব দেখা-শুনা, এইরূপ চিন্তার ফল ফলিবেই ফলিবে। সুতরাং শিক্ষিতেরা অসন্তুষ্ট হয় বলিয়া শিক্ষা বন্ধ করা আমরা কখনই যুক্তিযুক্ত মনে করি না। বরং বৈধ অসন্তোষের প্রয়োজন আছে বলিয়া, এবং শিক্ষায় এই অসন্তোষ জন্মায় বলিয়া আমরা প্রত্যেক পুরুষ নারী, প্রত্যেক বালক-বালিকাকে শিক্ষিত দেখিতে চাই। শাসনকর্ত্তাদের মনের ভাবও এই কারণে শিক্ষার প্রতি অনুকূল হওয়া উচিত।

বঙ্গনারী হিন্দীর পরীক্ষক।

পাটিয়ালার মহারাজার বালিকাবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী **হেমন্তকুমারী চৌধুরানী** পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দীর পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। তিনি হিন্দীতে একজন সুলেখিকা বলিয়া পরিচিত। আদর্শমাতা, মাতা ও কন্যা, প্রভৃতি তাঁহার কয়েকখানি হিন্দী বহি আছে। তাঁহার এক বালিকা কন্যাও ছেলেমেয়েদের পড়িবার একখানি হিন্দী গল্পের বহি লিখিয়াছে। শ্রীমতী হেমন্তকুমারী হিন্দীতে বেশ বক্তৃতা করিতে পারেন।

হিন্দী শিক্ষার প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের এক প্রদেশের শিক্ষিত লোকেরা অন্য প্রদেশের শিক্ষিত লোকদের সঙ্গে কথা বার্ত্তা বা পত্রব্যবহার করিতে হইলে ইংরেজী ব্যবহার করেন। অনেকস্থলে ইহা ভিন্ন উপায় নাই। আমরা ইহার নিন্দাও করিতেছি না। কিন্তু আমরা যদি কোন দেশভাষায় এই কাজটি সারিতে পারিতাম, তাহা হইলে দেশের পক্ষে আরও ভাল হইত; আনন্দও বেশী পাওয়া যাইত। বাস্তবিক, আমি যাঁর বাড়ী অতিথি হইলাম, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার মাতৃভাষায় কথা কহিতে পারিলে তাঁহার সহিত যতটা ঘনিষ্ঠতা ও হৃদ্যতা হয়, ইংরেজী দ্বারা ততটা হয় বলিয়া মনে হয় না। শুধু এক হিন্দী শিখিলেই আমরা উত্তর-ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র মোটামুটি কাজ চালাইতে পারি। রাজপুতানা, মধ্যভারত, এমন কি কিয়ৎপরিমাণে মহারাষ্ট্রেও, হিন্দী দ্বারা কাজ চলে। শিক্ষিত বাঙ্গালীর পক্ষে হিন্দী শিক্ষা করা খুব সহজ। দুই-তিন মাস পড়িলেই কাজচালান-গোছ শিক্ষা হয়। আমরা কেবল ইংরেজী-শিক্ষিতদিগকে শিক্ষিত বলি না। আজকাল কেবল বাঙ্গলা-জানা লোকও যদি সমুদয় উৎকৃষ্ট বাংলা বহি ও সাময়িক পত্র পড়েন, তাহা হইলে তাঁহার শিক্ষা নিতান্ত অল্প হয় না। তদ্ভিন্ন সংস্কৃত টোলের অধ্যাপক এবং উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগকেও আমরা শিক্ষিত মনে করি। সর্ব্বপ্রকারের শিক্ষিত লোকেই ২।৩ মাসে

হিন্দীশিক্ষায় অনেকদূর অগ্রসর হইতে পারেন। অবশ্য ভাল করিয়া শিখিতে হইলে বরাবর লাগিয়া থাকা দরকার।

শুধু কথা কহিবার ও চিঠি লিখিবার জন্যই যে হিন্দী-শেখা দরকার তা নয়। আধুনিক হিন্দীসাহিত্যে খুব ভাল গ্রন্থ না থাকিলেও পাঠযোগ্য কতকগুলি বহি লিখিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু প্রাচীন হিন্দীসাহিত্যে অনেক অমূল্য রত্ন আছে। ভারতবর্ষ ধর্ম্মসাহিত্যের জন্য বিখ্যাত। এই ধর্ম্মসাহিত্য সমস্তই সংস্কৃত ও পালিতে লেখা নয়। তামিল, তেলুগু, মরাঠী, গুজরাতী, হিন্দী, গুরুমুখী, বাংলা, প্রভৃতি ভাষার ধর্ম্মসাহিত্যও ভারতের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্য বাড়াইয়াছে। মীরাবাঈ, কবীর, দাদূ, তুলসীদাস, রবিদাস, গরীবদাস, সূরদাস, প্রভৃতির রচিত গীত, পদাবলী ও উপদেশমালা ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণের অতি আদরের ধন। শুধু এইগুলি পড়িতে পারিলেই হিন্দী শিক্ষার শ্রম সার্থক হয়। এগুলি কিন্তু চলিত হিন্দীতে লিখিত নয়। তাহা হইলেও, হিন্দী শিক্ষায় কতক দূর অগ্রসর হইলেই এগুলি বুঝা যায়।

যদি দুই পরিবারের নারী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যেই আলাপপরিচয় ও বন্ধুত্ব থাকে, তাহা হইলেই তাঁহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে বলিতে পারা যায়। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ইংরেজীশিক্ষিত পুরুষেরা পরস্পরের সহিত হা-ডু-ডু করিলেই সকলে একজাতিত্বসূত্রে বদ্ধ হইবে না। দুটি-একটি ইংরেজীশিক্ষিতা মহিলা পরস্পরের সঙ্গে ইংরেজী বলিলেও বিশেষ কিছু ফল ফলিবে না। দেশভাষার সাহায্যে তাঁহাদের মধ্যে সখিত্ব স্থাপন হইলে তবে রাষ্ট্রীয় পরিবারগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মিবে। মেয়েদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার এত কম, যে, ইংরেজীর সাহায্যে কথাবার্ত্তা ও ভাববিনিময় দ্বারা একজাতিত্ব কতকটা জন্মিলেও তাহা সুদূরপরাহত। কিন্তু বাঙ্গালীর মেয়ের পক্ষে হিন্দী-শেখা, ও হিন্দী-ভাষিনী মহিলার পক্ষে বাংলা-শেখা অপেক্ষাকৃত সহজ। আমাদের মেয়েদের হিন্দী-জানা খুব দরকার। হিন্দী জানিলে শিক্ষিতা বঙ্গমহিলার কার্য্যকারিতাও খুব বাড়ে। বাংলাদেশে অনেক শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন; হিন্দুস্থানে ততোধিক। আমরা মাঝে মাঝে হিন্দুস্থান ও পঞ্জাব হইতে শিক্ষয়িত্রীর জন্য চিঠি পাই। যাঁহারা ঐসব প্রদেশে কাজ করিতে যাইবেন, তাঁহাদের হিন্দী জানা দরকার।

বাঙালী ফার্সীর পরীক্ষক।

শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন মৈত্র, এম্-এ, লাহোরের দয়াল সিং কলেজে আরবী ও ফারসীর অধ্যাপক। তিনি পঞ্জাব-বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্সীর পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহা আনন্দের বিষয়। আগে বাংলাদেশেও বাঙালীহিন্দুদের মধ্যে অনেকে খুব ভাল করিয়া আরবী ও ফার্সী শিখিতেন। আরবী শক্ত হইলেও ফার্সী শেখা কঠিন নয়। যাঁহারা মুসলমানী আমলের ইতিহাসের আলোচনা করিতে চান, তাঁহাদের পক্ষে ফার্সী জানা খুব আবশ্যক। আমাদের মধ্যে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রচনার ফ্যাশন বেশ প্রচলিত হইতেছে; কিন্তু ফার্সী শিখিবার শ্রম খুব অল্প লোকেই স্বীকার করিতেছেন।

টিলকের ভগবদ্গীতা।

শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর টিলক যখন মান্দালে জেলে আবদ্ধ ছিলেন, তখন (কালী কলম পাইবার অধিকার না থাকায়) পেন্সিল দিয়া গীতা সম্বন্ধে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। এই গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। মডার্ন রিভিউতে সমালোচনার জন্য আমরা একখানি পাইয়াছি। ইহা মরাঠীভাষায় লিখিত ও সুমুদ্রিত। পৃষ্ঠার সংখ্যা প্রায় নয় শত। মূল্য তিন টাকা। প্রথম সংস্করণে ইহা ছয় হাজার ছাপা হইয়াছিল; কিন্তু পুস্তক প্রকাশিত হইবামাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই এই ছয় হাজার বহি বিক্রী হইয়া গিয়াছে। বিস্তর লোক কিনিতে চাহিয়াও না পাওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হইতেছে। ইহার বাংলা, ইংরেজী ও গুজরাতী অনুবাদ প্রস্তুত হইতেছে।

মহারাষ্ট্রে ও বঙ্গে সাহিত্যের আদর।

বাঙ্গালীরা ব্যাপারখানা একবার ভাবিয়া দেখুন। ভারতবর্ষে বাঙ্গলাভাষীর সংখ্যা চারিকোটি তিরাশী লক্ষ, মরাঠীভাষীর সংখ্যা এককোটি আটানব্বই লক্ষ, অর্থাৎ বাঙ্গালীর অর্দ্ধেকেরও কম। শুধু হিন্দু বাঙ্গালীর সংখ্যাও মরাঠাদের চেয়ে বেশী। বাংলাদেশে নিরক্ষর লোক হাজারকরা ৯২২.৪ জন, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে ৯৩০.৩ জন। সুতরাং, মরাঠী বেশী লোকের মাতৃভাষা, যা বোম্বাই প্রেসি-

ভেজীতে শিক্ষার বিস্তার বেশী বলিয়া টিলকের বহি বেশী বিক্রী হইয়াছে, বলিলে চলিবে না। টিলকের মত বিদ্বান্ কোন লোক যে বঙ্গে গীতা সম্বন্ধে বহি লেখেন নাই, তাহাও নয়। ভক্তিভাজন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় দর্শনে পাণ্ডিত্যের জন্য প্রসিদ্ধ এবং তাঁহার দার্শনিক প্রতিভা অসামান্য। তাঁহার "গীতাপাঠ" কয়খানি বিক্রী হইয়াছে? অনেক উদারচরিত ব্যক্তি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বেকন, বার্কলীর বহি নির্ব্বিবাদে পড়েন, কিন্তু ব্রাহ্ম বলিয়া হয় ত দ্বিজেন্দ্রনাথের লেখা না পড়িতে পারেন। তজ্জন্য জিজ্ঞাসা করি, হিন্দু এবং বিদ্বান বলিয়া বিখ্যাত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের "গীতায় ঈশ্বরবাদ" কয়দিনে, কয়-সপ্তাহে, কয়মাসে বা কয় বৎসরে কত হাজার বিক্রী হইয়াছে? অন্য গভীর বিষয়ের বহিই বা কয়খানি বিক্রী হয়? যদি বলেন, টিলক খুব লোকপ্রিয়; তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, আমাদের বঙ্গের হিন্দু নেতারা ওরূপ লোকপ্রিয় নন্ কেন? যদি বলেন, টিলক জেলে গিয়াছিলেন, অতএব তাঁহার গীতার কাট্‌তি হইয়াছে বেশী। কিন্তু আমাদেরও ত কয়েক জন নেতা জেলে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বহি পড়িবার জন্য ত লোকের এত আগ্রহ হয় নাই। মহারাষ্ট্রেও দলাদলি আছে; বাঙ্গলাদেশের চেয়ে মজবুত রকমের দলাদলি আছে। আমরা আজ চরমপন্থী সাজিয়া যাহাকে গালাগালি দি, কালই তাহার দলভুক্ত হই বা তাহার চাকরী করি। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় এত সহজে নোয় না। এই সে-দিন চরমপন্থীরা পুণায় প্রাদেশিক সমিতি করিল। তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর বলিয়া ঘোষণা করিয়া বোম্বাইয়ের নরমপন্থী নেতারা আবার পুণাতেই প্রাদেশিক সমিতি বসাইয়াছেন। আমরা এরূপ দলাদলির প্রশংসা করিতেছি না। কেবল দেখাইতেছি যে মহারাষ্ট্রে বাংলার চেয়ে শক্ত রকমের দলাদলি আছে। সাহিত্যক্ষেত্রেও ঠিক্ এই রকম দলাদলি সেখানে আছে। যেমন, এক ঐতিহাসিক রাজাওাড়ের দল, এক তাহার বিরোধী দল। এসব সত্ত্বেও টিলকের বহি বিক্রী হইয়াছে। তথায় দলাদলি নাই, অতএব বিক্রী বেশী হইয়াছে, বঙ্গে দলাদলি আছে, অতএব বিক্রী কম, এরূপ বলিবার জো নাই।

বাঙ্গালীর সাহিত্যানুরাগের অল্পতার কারণ তবে কি? আমাকে কোন কোন ভারতবর্ষীয় ইংরেজীপুস্তক-প্রকাশক বলিয়াছেন যে স্কুলকলেজপাঠ্য ছাড়া অন্তবিধ ইংরেজী বহি বাঙ্গলা দেশে অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে কম বিক্রী হয়; ইংরেজী মাসিকপত্রও অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাংলায় কম পঠিত হয়। আমাদেরও অভিজ্ঞতা এইরূপ। বাঙ্গালী যে খুব বেশী বাংলা বহি ও মাসিকপত্রাদি পড়ে বলিয়া ইংরেজী পড়ে না, তাও নয়। শুনিয়াছি মরাঠী একখানি মাসিকপত্রের এত গ্রাহক আছে যে বাংলা কোন মাসিকের তাহার অর্দ্ধেক গ্রাহকও নাই।

এমন হইতে পারে যে বঙ্গে সাহিত্যক্ষেত্রে মহারাষ্ট্র অপেক্ষা দলের সংখ্যা বেশী। বাস্তবিকই আমাদের অবস্থা এরূপ যে মনে হয় যেন আমাদের মধ্যে সিপাহী অপেক্ষা সেনাপতির সংখ্যাই অধিক। মোটামুটি যাঁহাদের মত ও আদর্শ এক রকমের তাঁহারাও একত্র কাজ না করিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া শক্তিক্ষয় করেন। ঈর্ষ্যা পরশ্রীকাতরতা থাকিলে দল বাঁধে না। ইহাও সত্য, যে, বড় যিনি, ছোটকে ছাড়িয়া তাঁহার সাফল্য হয় না, ছোট যিনি, তিনি হাম্‌-বড়া হইলে অকেজো হইয়া পড়েন।

বাংলাদেশে অনেকের মধ্যে শ্রেষ্ঠতার একটা শূন্যগর্ভ অহঙ্কার আসিয়া পড়িয়াছে। অন্যান্য প্রদেশের উন্নতি ও কৃতিত্বের খবর তাঁহারা রাখেন না। সেইজন্য সর্ব্বজ্ঞতা ও বিজ্ঞতার দম্ভে লোকের প্রীতি ও শ্রদ্ধা হারাইতেছেন। বঙ্গের সকল দলেই সম্ভবতঃ সারগ্রাহী ও গুণগ্রাহী লোক থাকিলেও গালাগালিবাজ কুৎসানিপুণ লোকদের আধিপত্য বাড়িয়াছে।

বিদেশে বাঙ্গালীছাত্রের কৃতিত্ব।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সেন ও শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী দে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-এস্‌সী উপাধি পাইয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ রায়-চাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত। লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষাই বড় কঠিন; ডি-এস্‌সীর ত কথাই নাই। এই উপাধি অতি অল্প লোকেই পাইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত সুধাময় ঘোষ এডিন্‌বরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-এস্‌সী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া-

ছেন। ইহাও কঠিন পরীক্ষা। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত আমেরিকায় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ্‌-ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। হার্ভার্ড বিলাতের অক্সফর্ড কেম্ব্রিজের সমকক্ষ। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানের ট্রাইপস্‌ (বি-এ অনার্স) পরীক্ষায় শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীস প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আড়াই বৎসরের জন্য বার্ষিক ১২০০৲ টাকা গবেষণা-বৃত্তি পাইয়াছেন। ভারতীয় কোন ছাত্র এ পর্য্যন্ত এই পরীক্ষায় এরূপ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই।

শূকর না মানুষ?

বার্নেস্‌ নামক একব্যক্তি প্রায় সন্ধ্যা ৭ টার সময় কাশীর জেলের হাতায় বন্যশূকর শিকার করিতে যায়। দূরে কালমত একটা কি দেখিয়া সেটাকে শূকর মনে করিয়া সে গুলি করে; কিন্তু তাহা শূকর ছিল না, এক জন দেশী মানুষ (মাজিষ্ট্রেট হামিল্টন 'নেটিভ' কথাটি প্রয়োগ করিয়াছেন)। মাজিষ্ট্রেট বলেন, পগার-দেওয়া জেলের হাতার মধ্যে এই নেটিভের বিদ্যমান থাকিবার কোন অধিকার ছিল না। অবশ্য, বার্নেস্‌ জেলের কোন কর্ম্মচারী না হইলেও এবং লক্ষ্যীভূত পদার্থটা মানুষ কি শূকর তাহা পরিষ্কার বুঝিতে না পারিলেও, জেলের হাতায় গুলি করিবার অধিকার তাহার নিশ্চয়ই ছিল! যাহা হউক, মাজিষ্ট্রেট হামিল্টন নেটিভটার জেলের হাতায় অনধিকার অস্তিত্ব সত্ত্বেও, এতটুকু বলিয়াছেন যে ঐ ব্যক্তি জেলের কোন কর্ম্মচারীর চাকরও ত হইতে পারিত; ভাল করিয়া না দেখিয়া গুলি করা আসামীর উচিত হয় নাই। তবে কি না ফৌজদারী সোপর্দ্দ হওয়ায় তাহার বড় উদ্বেগ হইয়াছে, এই উৎকণ্ঠারূপ শাস্তিই তাহাকে পুনর্ব্বার এইরূপ কার্য্য হইতে বিরত রাখিবে! তথাপি তাহার ১৫০৲ টাকা জরিমানা হইয়াছে। ঐ টাকা মৃত ব্যক্তির বিধবা পত্নী ভাগীরথী পাইবে। তাহা দ্বারা তাহার জীবিকা অর্জ্জনের নিশ্চিত উপায় হইবে ("will effectively aid the widow of the deceased in gaining a livelihood")!

আমাদের বিবেচনায় ইহা অত্যন্ত অবিচার হইয়াছে। দণ্ডও বড় কঠোর হইয়াছে। যদিও জেলের হাতা চাঁদমারী নয়, শিকারের জায়গাও নয়, তথাপি দেশী লোকটার সেখানে যাইবার আগে গণকের বাড়ী হইতে জানিয়া যাওয়া উচিত ছিল যে সেদিন সেখানে শূকরভ্রমে মানুষ খুন হইবে কি না। যখন সে তাহা করে নাই, তখন বার্নেসের দোষ কি? আর আসামীর যে দারুণ উদ্বেগ হইয়াছিল, তাহার উপর আবার ১৫০৲ টাকা জরিমানা আদায় করিয়া বিধবা ভাগীরথীকে দেওয়া বড়ই অন্যায় হইয়াছে। লোকটা শূকরের মত কাল চেহারা লইয়া গুলি খাইয়া মরিয়া বার্নেস্‌কে এত উদ্বেগের মধ্যে ফেলিয়াছিল বলিয়া বরং তাহার স্ত্রী ভাগীরথীর নিকট হইতে উদ্বেগের ক্ষতিপূরণস্বরূপ কিছু টাকা লইয়া বার্নেসকে দিলে সুবিচার হইত। তাহার পর, একজন দেশীলোকের জীবনের মূল্য দেড় দেড় শত টাকা, নয় হাজার ছয়শত পয়সা, আটাশ হাজার আটশত পাই, ধার্য্য করা বড়ই বাড়াবাড়ি! পরের পয়সায় এরূপ বদান্যতা হামিল্টন ফের যেন না করেন।

আমাদের মনে সামান্য একটু সন্দেহও হইতেছে। দেশী লোককে হঠাৎ গুলি করিয়া বসিলে ইংরেজদের গুরুতর কিছু শাস্তি ত প্রায়ই হয় না; একথা ভারত-প্রবাসী ইংরেজদের অবিদিত নাই। সুতরাং এরূপ মোকদ্দমায় অভিযুক্ত হইলে আসামীদের উদ্বেগ হয় কি না, তাহাই আগে নির্দ্ধার্য্য। আমাদের অনুমান এই যে তাহাদের বিশেষ কিছু উদ্বেগ হয় না। অতএব বার্নেসের উদ্বেগ হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া বোধ হয় মাজিষ্ট্রেট হামিল্টনের ভ্রম হইয়াছে। কিন্তু এরূপ তুচ্ছ ব্যাপারে এমন সামান্য এক-আধটা ভুলচুক হইয়াই থাকে। মাজিষ্ট্রেট হইলেও, হাজার হউক মানুষ ত বটে। সুতরাং এ বিষয়ে আর বেশী আলোচনা করা উচিত নয়।

দুর্ভিক্ষ।

ত্রিপুরা, নোয়াখালি, বাখরগঞ্জ, রংপুর, প্রভৃতি জেলায় দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। অনাহারে মানুষও মরিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিতেছেন, সর্ব্বসাধারণেও কিছু করিতেছেন। সরকারী বা বেসরকারী সাহায্য যথেষ্ট হইতেছে কি না,

কলিকাতায় বসিয়া ঠিক্ বুঝিতে পারা যায় না। যথেষ্ট হইতেছে না বলিয়াই বোধ হয়। কেননা দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র-সকলে দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোকদের সাহায্যার্থ প্রার্থনাপত্র প্রত্যহ বাহির হইতেছে। খাদ্যদ্রব্য ব্যতীত ঔষধ ও চিকিৎসকেরও অনেক স্থানে বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। তথায় উদরাময়, ওলাউঠা, প্রভৃতি রোগের আবির্ভাব হইয়াছে।

আমাদের অধিকাংশের প্রাণে যে দয়ামায়া একেবারে নাই, তাহা বলিতে পারি না। তথাপি যে আমরা প্রত্যহ নিয়মিতরূপ আহার করিতেছি, যাহার যাহা আমোদ প্রমোদ, তাহাও চলিতেছে, অথচ দুর্ভিক্ষগ্রস্ত স্থানসকলে লোকে অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে, কেহ কেহ বা মারা পড়িতেছে ; তাহার কারণ এই যে আমরা কল্পনার দ্বারা অনাহার, অর্দ্ধাহার, উপবাস, অনশনে মৃত্যু, এসকল যে কি তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারি না। আমাদের অনেকের অবস্থা এরূপ, যে, চেষ্টা সত্বেও একবেলা একদিন বা দু-তিন দিন আহার জুটিল না, এমন অবস্থা হইবার সম্ভাবনা কম। কিন্তু বাধ্য হইয়া অনাহারে থাকিতে হইতেছে, এমন দশা না হইলেও, ইচ্ছাপূর্ব্বক একদিন বা দু-দিন উপবাস দিয়া আমরা দেখিতে পারি অনাহার কেমন লাগে। পুত্রকন্যা আদি থাকিলে তাহাদিগকে ন্যূনকল্পে একদিন খাইতে না দিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলে কিরূপ অবস্থা হয়, আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি। পাঠকেরা হয়ত ভাবিবেন, এ বড় বিকট সখ। কিন্তু আমরা সখ করিয়া এসব কথা লিখিতেছি না। কোন প্রকারে উপবাসী লোকদের প্রতি একটু যদি প্রাণের প্রকৃত টান জন্মে, এই উদ্দেশ্যে উপায় চিন্তা করিতেছি।

যখনই দেশে অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়, তখনই সরকারী কর্ম্মচারী এবং দেশের সহৃদয় লোকদের মধ্যে, ঐ অন্নকষ্টকে দুর্ভিক্ষ বলা হইবে, বা খাদ্যদ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা বা দুষ্প্রাপ্যতা বলা হইবে, সে বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়। নাম যাহাই দেওয়া হউক, কেহ অন্নাভাবে দুর্ব্বল না হয় বা মারা না পড়ে, ইহা দেখা গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্টও যে ইহা অস্বীকার করেন, তাহা নয়। কিন্তু অন্নকষ্টের সময় যখন মানুষ মারা পড়ে, তখন আবার সরকারী কর্ম্মচারী ও সর্ব্বসাধারণের মধ্যে মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে মতভেদ উপস্থিত হয়, এবং তর্কবিতর্ক চলিতে থাকে। দেশের লোকে বলে, মানুষটি অনাহারে মরিয়াছে, সরকারী কর্ম্মচারী হয়ত বলেন যে সে উদরের পীড়ায় বা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় মারা পড়িয়াছে। কিন্তু ইহাও কথাকাটাকাটি মাত্র। মৃত্যুর অব্যবহিত কারণ যাহাই হউক, অন্নাভাবই যে মূলীভূত কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং, গ্রাম্যসমিতি হইতে আরম্ভ করিয়া বড়লাটের সভা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র যখন গবর্ণমেণ্টের লোকেরাই প্রভু, তখন দেশের লোকের অন্নবস্ত্রের অভাব, রোগ, চোরের উপদ্রব, প্রভৃতি যে কোন রকমে অসুবিধা বা কষ্ট হউক, তাহা দূর করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টই যে খুব বেশী পরিমাণে দায়ী, তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই। ভূমিকম্প বা ঝড়ের মত আকস্মিক নৈসর্গিক কারণের উপর অবশ্য মানুষের হাত নাই।

ত্রিপুরা জেলায় বন্যা হওয়ায় লোকের কষ্ট আরও বাড়িয়াছে।

বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের একটি বিশেষত্ব এই যে ইহার সমস্ত কারণ ভারতবর্ষে আবদ্ধ নহে। ইউরোপে যে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহাতে প্রথম অবস্থায় পাটের ব্যবসার ক্ষতি হওয়ায় চাষীরা বড় অভাবে পড়িয়াছে। অন্যান্য ব্যবসাতেও মন্দা পড়ায় বিস্তর লোক বেকার বসিয়া আছে।

যুদ্ধে অনেক সিপাহী হত ও আহত হইতেছে। তাহাদের পরিবারবর্গ নিরাশ্রয় হইতেছে। তাহাদের সাহায্যার্থ লক্ষ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইতেছে। যখন টাকা সংগৃহীত হইতে আরম্ভ হয়, তখন বড়লাট হার্ডিং বলিয়াছিলেন, যে, সিপাহীরা ছাড়া আর যাহারা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে যুদ্ধের জন্য বিপন্ন হইতেছে, তাহারা এই সংগৃহীত অর্থ হইতে সাহায্য পাইবে। যুদ্ধে-বিপন্ন লোকদের জন্য টাকাও ত কম উঠে নাই। বর্ত্তমানে সমগ্র ভারতবর্ষের ফণ্ড এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ফণ্ডে কত টাকা জমিয়াছে জানি না। কিন্তু গত ৬ই মার্চ্চের লণ্ডনে-প্রকাশিত সিমলার টেলিগ্রাম হইতে জানা যায় যে তখন মান্দ্রাজের ২৪ লক্ষ ও বোম্বাইয়ের ২৫ লক্ষ ছাড়া ৯০ লক্ষ টাকা উঠিয়াছিল। তাহার পর আরও উঠিয়াছে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের

জন্য যে ৩৯ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল, তার চেয়ে বেশী টাকা অন্নকষ্ট নিবারণের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে কখনও উঠে নাই। আর, যুদ্ধে-বিপন্ন লোকদের জন্য ৪ মাস পূর্ব্বেই ১ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা উঠিয়াছিল। টাকা নাই একথা গবর্ণমেণ্ট বলিতে পারেন না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, পূর্ব্ববঙ্গের বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষে একটি মানুষেরও অনাহারে মৃত্যু হওয়া উচিত ছিল না। যাহা ঘটিয়াছে, তাহা হইতে মনে হয় সরকারী কর্ম্মচারীদের এদিকে কিছু কম দৃষ্টি ছিল।

এখন দেশের লোকদের নিকট হইতেও বেশী টাকা পাইবার আশা কম। ধনীদিগকে যুদ্ধজনিত কষ্ট নিবারণের জন্য এবং অন্যবিধ সামরিক ফণ্ডে বিস্তর টাকা দিতে হইয়াছে। সিপাহীদের ও তাহাদের পরিবারবর্গের দুঃখ দূর করা রাজভক্তি ও দয়াধর্ম্মের কাজ। কিন্তু যে-সকল গরীব লোক পূর্ব্ববঙ্গে খাইতে পাইতেছে না, তাহারাও সম্রাট পঞ্চম জর্জের প্রজা। সুতরাং তাহাদের জন্য দান করিলে তাহা দ্বারা রাজভক্তির অভাব প্রকাশ পাইবে না। দয়াধর্ম্মের কাজও হইবে।

দুর্ভিক্ষের মূল উচ্ছেদ।

এক একবার দুর্ভিক্ষ হয়, আর কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া উপবাসী মানুষগুলিকে খাইতে দিয়া বাঁচাইয়া রাখা হয়। ইহাতে সাময়িক প্রতিকার হয়। কিন্তু দুর্ভিক্ষের মূলোচ্ছেদ হয় না। অথচ মূল উচ্ছেদ করা মানুষের অসাধ্য নহে। ইউরোপের প্রধান প্রধান দেশের মধ্যে কেবল রুশিয়ায় বর্ত্তমান যুগেও দুর্ভিক্ষ হয়। কিন্তু ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মেনী, হল্যাণ্ড, প্রভৃতি দেশে দুর্ভিক্ষ হয় না। আমেরিকার সম্মিলিত-রাষ্ট্রে দুর্ভিক্ষ হয় না। অথচ এসব দেশেও অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঝড়, প্রভৃতি নৈসর্গিক বিপদ্ ঘটে। এ-সব সত্ত্বেও যে সে-সকল দেশে দুর্ভিক্ষ হয় না, তাহার কারণ, তথাকার লোকদের কেবল চাষের উপর নির্ভর নয়। যাহারা চাষী, তাহারাও কৃষিবিদ্যায় শিক্ষা পাওয়ায় এবং এদেশের লাঙ্গলাদির চেয়ে উৎকৃষ্ট যন্ত্র ব্যবহার করিতে পারায় আমাদের চাষীদের চেয়ে বেশী শস্য উৎপাদন করিতে পারে। অনাবৃষ্টির সময়েও ক্ষেত্রে জলসেচনের কৃত্রিম বন্দোবস্ত সুসভ্য দেশসকলে ভারতবর্ষ অপেক্ষা ভাল আছে। ঐসব দেশের কৃষকেরা শস্যের আকারে যে ধন উৎপাদন করে, তাহার যতটা অংশ নিজেরা ভোগ করিতে পায়, আমাদের চাষীরা নিজেদের উৎপন্ন ধনের ততটা অংশ ভোগ করিতে পায় না। তাহার পর দেশের স্বাস্থ্য ভাল না হওয়ায় চাষীরা অন্যদেশের চাষীদের সমান কাজ করিতেও পারে না। এইরূপ নানাকারণে দুর্বৎসরের জন্য সঞ্চয় অল্প চাষীই করিতে পারে। সঞ্চয় অভাবে তাহারা মহাজনের আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। একবার মহাজনের হাতে পড়িলে তাহারা আর সহজে ঋণমুক্ত হইতে পারে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পাশ্চাত্য সুসভ্য দেশ-সকলে যে দুর্ভিক্ষ হয় না, তাহার একটি কারণ এই যে তথাকার লোকেরা কেবল চাষের উপর নির্ভর করে না। নানা প্রকার শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া তাহারা স্বদেশে ও বিদেশে বিক্রয় দ্বারা ধন উপার্জ্জন করে। আমাদের দেশেও এইরূপ হইতে পারে। কোন কোন লোক বা কোন কোন পরিবার কেবল শিল্প লইয়া থাকিতে পারে; আবার স্থলবিশেষে চাষ ও শিল্পের সহযোগে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে। বহুকাল হইতে এইরূপ চলিয়া আসিতেছে যে যে তাঁতি বা কামার সে অনেক স্থলে চাষও করে। কিন্তু এখন পাশ্চাত্য কারখানার সঙ্গে আমাদের তাঁতি বা কামার টক্কর দিতে পারিতেছে না। সুতরাং চাষের সময় ছাড়া অন্য সময়ে তাঁতি কামার প্রভৃতি শিল্পীদিগকে বসিয়া থাকিতে হয়। কারখানার মজুরীতে দক্ষতা লাভ করিতে হইলে চাষ করা চলে না। অতএব, যে-সব দেশে গৃহে বসিয়া শিল্পী শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করে, অথচ কারখানার নিকট তাহাকে পরাস্ত হইতে হয় না, সেই-সব দেশের সমুদয় অবস্থা ও যন্ত্রাদির বিষয় অবগত হইয়া কোন্ কোন্ গৃহশিল্প ঐ প্রকারে আমাদের দেশে চলিতে পারে, তাহা স্থির করিয়া প্রচলিত করা কর্ত্তব্য।

সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি করা। যে খাটিবে সে যদি আধমরা হইয়া রহিল, তাহা হইলে ধন উৎপাদন কে করিবে? দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি; এখানে তিন পুরিয়া কুইনাইন বিতরণ বা সেখানে পাঁচটা আগাছা

কর্ত্তন দ্বারা হইবে না। সমগ্র দেশের জন্ত একটি সুচিন্তিত বিজ্ঞানসম্মত কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়া তাহার জন্ত যত কোটি টাকার প্রয়োজন, গবর্ণমেণ্ট ব্যয় করুন। রেল বিস্তারের প্রয়োজন আছে, কিন্তু তার চেয়ে হাজার গুণ আবশ্যক একটা দেশের লোকের প্রাণ বাঁচান ও শক্তিবৃদ্ধি করা। রেল বিস্তারের জন্ত যখন প্রতিবৎসর কোটি কোটি টাকা পাওয়া যায়, তখন আমাদের প্রাণ বাঁচাইবার জন্তও পাওয়া উচিত। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট শীঘ্র সম্যক্‌রূপে মন না দিলে গুরুতর কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইবে।

মধুসূদনের স্মৃতিসভা।

যে খৃষ্টিয়ান সমাধিক্ষেত্রে মাইকেল মধুসূদন দত্তের দেহ সমাধিস্থ আছে, তথায় অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও তাঁহার মৃত্যুদিনে সভা ও বক্তৃতাদি হইয়াছিল। স্থান সমাধিক্ষেত্র। সময় মৃত্যুদিনের সাম্বৎসরিক। অতএব এ উপলক্ষে যাহা কিছু বলা করা হয়, তাহাতে গাম্ভীর্য্য রক্ষিত হইবে, আশা করা স্বাভাবিক। কিন্তু শুনিলাম এবৎসর যাত্রার দলের সংএর ভাঁড়ামির মত কিছু হইয়াছিল। ভবিষ্যতে এরূপ না হওয়া বাঞ্ছনীয়। শুনিতেছি এইরূপ প্রস্তাব হইয়াছে যে মধুসূদনের সমাধির উপর একটি বাগ্দেবী-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং তজ্জন্য অর্থ সংগৃহীত হইবে। খৃষ্টিয়ান সমাধিক্ষেত্রে হিন্দুর বীণাপাণি-মূর্ত্তি স্থাপিত হইতে পারিবে কি না, জানি না। ইহা খৃষ্টান, হিন্দু, উভয় ধর্ম্মেরই বিরোধী। গ্রীক্ মিউজের মূর্ত্তিও হইতে পারে কি না, বিবেচ্য। কিন্তু বাঙ্গালী কবির সমাধির উপর গ্রীক দেবতার মূর্ত্তিও সুসঙ্গত হইবে না।

সাম্বৎসরিক সভা প্রভৃতির ব্যয়নির্ব্বাহার্থ টাকা তুলিয়া একটি স্থায়ী ফণ্ড স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে শুনিতেছি। একজন ভদ্রলোক ৫০৲টি টাকা দিবেন বলিয়া এবারকার সভাস্থলে লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু কোন কারণে তিনি উহা না দিয়া ফিরাইয়া আনিয়াছেন।

প্রত্যেক সাহিত্যিকের স্মৃতিসভা করিবার জন্য পৃথক্ পৃথক্ কমিটি না করিয়া এরূপ কাজের ভার সাহিত্য-পরিষদের উপর দেওয়াই ভাল। পরিষদের সম্পাদক রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীও এইরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

প্রবাসী বাঙ্গালীর শিক্ষানুরাগ।

বেহার হেরাল্ড বলেন যে এবার বেহার ও উড়িষ্যার কলেজগুলি হইতে মোট ৩০৫ জন ছাত্র আই-এ পরীক্ষায় পাস্ হইয়াছে। তাহার মধ্যে ১৬৭ জন বেহারী হিন্দু, ৪৮ জন বাঙ্গালী, ৪৫ জন মুসলমান, ৪২ জন ওড়িয়া এবং ২ জন খৃষ্টিয়ান। আই-এস্ সী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৬১ জনের মধ্যে ২৭ জন বাঙ্গালী, ১৫ জন বেহারী হিন্দু, ১২ জন ওড়িয়া এবং ৭ জন মুসলমান। বেহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের অন্যান্য শ্রেণীর অধিবাসীদের তুলনায় বেহার-ও-উড়িষ্যা-প্রবাসী বাঙ্গালীদের সংখ্যা খুব কম। তাঁহাদের শিক্ষানুরাগ প্রশংসনীয়।

কংগ্রেসের সভাপতিত্ব।

কংগ্রেসের সভাপতি আগামী ডিসেম্বর মাসে কাহাকে করা হইবে, তাহা লইয়া কাগজে আলোচনা চলিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেস্ কমিটি হইতে অনেক ব্যক্তির নাম করা হইয়াছে। ব্যক্তিবিশেষের নিন্দা করা আমরা প্রীতিকর মনে করি না। একান্ত আবশ্যক না হইলে কাহারও প্রতিকূল সমালোচনা আমরা করিতে চাহি না।

কংগ্রেসের সভাপতির নানা রকমের যোগ্যতা থাকা চাই। প্রথমতঃ, তাঁহার চরিত্রবান্ হওয়া দরকার। দুঃখের বিষয়, পূর্ব্বে কোন কোন ব্যক্তিকে সভাপতি নির্ব্বাচন করিবার সময় এদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। যাহাদের দুশ্চরিত্রতা সুবিদিত, এরূপ কোন কোন লোককে ইতিপূর্ব্বে কংগ্রেসের সভাপতি করা হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় কার্য্যে সচ্চরিত্রতার প্রয়োজন যাহারা স্বীকার করে না, তাহাদের সঙ্গে সাধারণ ভাবে তর্ক এখানে করা সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক হইবে না। আমরা কেবল তাহাদিগকে পার্নেল ও ডিল্কের শক্তি ও অকৃতকার্য্যতার কথা স্মরণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি।

রাষ্ট্রীয় বিষয়ে দেশকে কেমন করিয়া সচেতন করা যায়, কেমন করিয়া রাষ্ট্রীয় শক্তি লাভ করা যায়, কেমন করিয়া পৌর, জানপদ ও রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য পালন করা যায়, এ-সব বিষয় বুঝিবার মত বুদ্ধি বিদ্যা অধ্যয়ন কংগ্রেসের সভাপতির থাকা চাই। তিনি দেশের লোককেও এ-সকল বিষয়ে উদ্বুদ্ধ

করিয়া তৎসমুদয় শিক্ষা দিবার নিমিত্ত কি চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করা সভাপতি-নির্ব্বাচকদিগের কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষকে স্বায়ত্তশাসনে সমর্থ ও অধিকারী করা এবং ভারতবাসীদিগকে রাষ্ট্রীয়-শক্তিশালী করা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য। যাঁহা.ক সভাপতি করিতে যাইতেছি, তিনি এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজের কতটা সময় ও শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন, কত অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, কত অর্থ উপার্জ্জনের সুযোগ ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা দেখিতে হইবে। দেশে রাষ্ট্রীয় শক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা জাগাইবার চেষ্টা করিলে, দেশের লোকদের লুপ্ত অধিকার উদ্ধারের চেষ্টা করিলে, বর্ত্তমান অধিকার বিস্তৃততর করিতে গেলে, তাহাদের মানবীয় সমস্ত অধিকার সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া নির্ভয়ে দাবী করিলে, তাহাদের প্রতি কখন কখন যে অবিচার উৎপীড়ন হয় তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিলে, বহুসংখ্যক রাজ-কর্ম্মচারীর বিরাগভাজন হইতে হয়। এইরূপে অপ্রিয় হইবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও, কিম্বা এইরূপ অপ্রিয় হইয়াও, যিনি দেশের প্রতি নিজের কর্ত্তব্য-পালনে অবহেলা করেন না, তিনিই সভাপতি হইবার যোগ্য। বর্ত্তমান বৎসরে যাঁহাদের নাম করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জন যোগ্য লোক আছেন। কিন্তু পঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায় অপেক্ষা যোগ্য কেহই নহেন। আমরা যত প্রকারের যোগ্যতার কথা বলিয়াছি, সমস্তই তাঁহার আছে। তাঁহার বুদ্ধি বাগ্মিতা কর্ম্মিষ্ঠতা লোকহিতৈষণা শিক্ষিত লোকদের নিকট সুপরিজ্ঞাত। তাঁহার সময় শক্তি অর্থ তিনি দেশের সেবায় প্রভূত পরিমাণে নিয়োগ করিয়াছেন। তিনি স্বদেশে ও বিদেশে জাতীয় উন্নতির উপায়-সকল সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ ও একাগ্র চিন্তা বহুকাল হইতে করিতেছেন। সভ্যতার পথে অগ্রসর কেমন করিয়া হওয়া যায়, রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করিয়া রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য কেমন করিয়া করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ ও তাহারই অনুশীলনের জন্য তিনি দীর্ঘকাল বিলাতে আমেরিকায় ও জাপানে যাপন করিতেছেন। দেশের কাজ করিতে গিয়া তিনি কোন কোন রাজকর্ম্মচারীর বিরাগভাজন হন, এবং তাঁহারা তাঁহাকে মিথ্যা সন্দেহ করেন। ফলে বিনাবিচারে তাঁহার নির্ব্বাসন হয়। ভারতসচিব লর্ড মর্লী বা আর কেহ তাঁহার বিরুদ্ধে কখন কোন প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন নাই। স্বর্গীয় গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, লালা লাজপৎ রায় যে সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন, নিজের এই ধারণা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন। সরকারী কোন কোন কর্ম্মচারীর কুপরামর্শে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি অবিচার করিয়াছিলেন বলিয়া এরূপ লোককে যদি আমরা সভাপতি নির্ব্বাচন না করি, তাহা হইলে আমাদের নিজেদেরই অযোগ্যতা প্রমাণিত হইবে। পঞ্জাবের কোন লোক এ পর্য্যন্ত সভাপতি নির্ব্বাচিত হন নাই, অতএব একজন পাঞ্জাবী সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত, এ যুক্তির ততটা জোর হইত না, যদি তথায় কোন যোগ্য লোক না থাকিত। কিন্তু লাজপৎ রায়ের মত যোগ্য লোকও যদি সভাপতি নির্ব্বাচিত না হন, তাহা হইলে পঞ্জাবীরা যে কিছু দিন হইতে কংগ্রেসে যোগ দিতেছেন না, কংগ্রেসের প্রতি তাঁহাদের এই বিমুখতা যে অকারণ তাহা বলা সহজ হইবে না।

কোন কোন কাগজে দেখিলাম, একটা কথা উঠিয়াছে, যে, গবর্ণমেণ্ট যাঁহার কথা শুনেন বা শুনিবেন, গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাসভাজন এরূপ কোন লোককে সভাপতি করা উচিত। এ কথার অর্থ বুঝা কঠিন। দেশের রাষ্ট্রীয় উন্নতির জন্য সচেষ্ট ধীরবুদ্ধি লোকদের মধ্যে গোখলের মত দেশের জন্য ত্যাগী কর্ম্মী ত অধুনা আর কেহ ছিলেন না। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সী, আই, ঈ, উপাধি দিয়াছিলেন, এবং সার্ উপাধিও দিতে চাহিয়াছিলেন। রাজকর্ম্মচারীরা তাঁহার খুব খাতির করিতেন শুনা যায়। কিন্তু জাতীয় উন্নতির মূলীভূত সার্ব্বজনীন শিক্ষার জন্য তিনি যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট বা গবর্ণমেণ্টের কয়জন কর্ম্মচারী তাহার সমর্থন করিয়াছিলেন? রাজ কর্ম্মচারীরা তাঁহার কথা অনুসারে দেশের লোককে কি উচ্চ অধিকার দিয়াছেন, জানি না। শুধু তাই নয়। গোখলের মত লোকের পিছনেও যে গোয়েন্দা টিক্‌টিকি লাগিয়া ছিল, তাহা তিনি নিজে ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে গোখলে সরকারী লোকদের "বিশ্বাস-ভাজন" ছিলেন না। অতএব রাজকর্ম্মচারীদের বিশ্বাসভাজন লোক খুঁজিতে গিয়া যদি গোখলের মত লোককেও বাদ দিতে হয়, তাহা হইলে কংগ্রেস না করাই ভাল। "আমরা সশস্ত্র

বিদ্রোহ করিব না, কাহাকেও সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে বিদ্রোহী হইতে উত্তেজিত বা প্রবৃত্ত করিব না, কোন বিদ্রোহীর সাহায্য করিব না," কংগ্রেস এই কথা অন্তরের সহিত বলিবেন। তাহার পর সরকারী লোকদের তুষ্টি-অতুষ্টির প্রতি দৃক্‌পাতও না করিয়া নিজের কর্ত্তব্য করিবেন। তাহা যদি না করিতে পারেন, তাহা হইলে কংগ্রেসের নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হউক।

বোম্বাইয়ের লোকেরা সার্ সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়কে সভাপতি করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তিনি বিদ্বান্ অতি বুদ্ধিমান ও আইনজ্ঞ এবং ধীর ব্যক্তি। এই প্রকারের গুণ তাঁহার আরো অনেক আছে। কিন্তু তিনি রাষ্ট্রীয় বিষয়ে দেশকে সচেতন করিবার জন্য, দেশের লোকদের রাষ্ট্রীয় অধিকার বৃদ্ধির জন্য বা এবম্বিধ কোন প্রচেষ্টার জন্য কখন কিছু করেন নাই। তাঁহার সময় ও শক্তি প্রধানতঃ (সম্পূর্ণরূপে বলিলেও দোষ হয় না) অন্য প্রকারে যাপিত ও প্রযুক্ত হইয়াছে। অধিকন্তু তিনি পাব্লিক সার্বিস্ কমিশনের নিকট যে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, তাহাতে বুঝা যায় যে উচ্চ রাজকার্য্য সম্বন্ধে কংগ্রেসের দাবীর তিনি সম্পূর্ণ সমর্থন করেন না। সম্পূর্ণ কেন, আধা-আধিও করেন কিনা, সন্দেহ। যাঁহারা তাঁহার সভাপতিত্বের পক্ষপাতী, তাঁহারা এখন একবার সেই সাক্ষ্য মুদ্রিত করিয়া আমাদিগকে বুঝাইয়া দিউন যে ঐ সাক্ষ্যের সহিত কংগ্রেসের দাবীর ঐক্য আছে। কলিকাতায় যাঁহারা কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে, গবর্ণমেণ্টের চাকরী করা সত্বেও, অনেকে ভারতবাসীদের দাবী সিংহ মহাশয়ের চেয়ে অনেক বেশী সাহস ও দৃঢ়তার সহিত সমর্থন করিয়াছিলেন। যথা, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মিত্র, বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। ভারতবাসীর বর্ত্তমান যোগ্যতায় এবং ভবিষ্যতে অধিকতর যোগ্যতা-অর্জ্জনের সম্ভাবনায়, ইঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে-প্রকারে ইঁহাদের সাক্ষ্যে ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল, সিংহ মহাশয়ের সাক্ষ্যে এরূপ কোন বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। কলিকাতায় যখন সাক্ষ্য লওয়া হইতেছিল, তখন আমরা শুনিয়াছিলাম যে কমিশনের একজন ইংরেজ সভ্য বলিয়াছিলেন যে সিংহ মহাশয়ের এবং আর একজন বাঙ্গালীর সাক্ষ্যে ভারতবাসীদের কেস্‌টা (case) একেবারে মাটি হইয়া গিয়াছে। একজন বা দুজন বাঙ্গালী বাংলার বা ভারতবর্ষের প্রতিনিধি নহেন; সুতরাং তাঁহাদের সাক্ষ্যে সত্যসত্যই ভারতবাসীদের দাবী উড়িয়া যাইতে পারে না। কিন্তু সে সময়ে আমাদেরও এই ধারণা হইয়াছিল বটে যে সিংহ মহাশয়ের ও আর-একজনের সাক্ষ্যে ভারতবাসীদের কেস্‌টা কাঁচা হইয়া গেল।

সিংহ মহাশয় যখন বড়লাটের ব্যবস্থাসচিব নিযুক্ত হন, তখন আমরা প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় তাঁহার যোগ্যতা যেরূপে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছিলাম, আর কোন সম্পাদক্ সেরূপ করেন নাই বলিয়া আমাদের ধারণা। এখনও তাঁহার প্রতি আমাদের মনে কোন প্রতিকূল ভাব নাই। আমাদিগকে কেবলমাত্র কর্ত্তব্যের অনুরোধে মানসিক ক্লেশের সহিত ইহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে হইল, যে, তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হইবার যোগ্য নহেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্র, ধীরতা, বিদ্যা, বুদ্ধি ও পরিশ্রমশক্তি যেরূপ, তাহাতে তিনি, দেশের রাষ্ট্রীয় উন্নতিবিষয়ে মনোযোগী হইলে, ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই খুব যোগ্য হইতে পারিবেন।

দুটি পঞ্জাবী মুসলমান বালকের সৎকার্য্য।

পঞ্জাবের কয়েকটি জেলায় কয়েক মাস পূর্ব্বে যে অরাজকতা হইয়া গিয়াছে, তাহা যে সমগ্র মুসলমান সমাজের সহিত সমগ্র হিন্দুসমাজের ঝগড়া নয়, তাহা আমরা গত মাসে বলিয়াছি। তাহার প্রমাণস্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। আরও কোন কোন জায়গায় মুসলমানের দ্বারা হিন্দুর সাহায্য নিশ্চয়ই হইয়া থাকিবে।

ঝাং জেলার বিণ্ডি পাটোআনা খুর্দ্দ্ নামক মৌজায় কেবল একটি হিন্দুপরিবারের বাস। এই পরিবারের কর্ত্তা ডাকাতির ভয়ে মৌজার প্রধান মুসলমান অধিবাসী আমীর হাইদার শাহের বাড়ীতে নিজের জিনিষপত্র রাখিবার অনুমতি গ্রহণ করেন। তিনি নিজের সম্পত্তি এই নিরাপদ আশ্রয়-স্থানে সরাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় ডাকাতরা তাঁহার দোকান ও বাড়ী আক্রমণ করিয়া সমস্ত লুটিয়া লইল। ইতিপূর্ব্বে, আমীর হাইদার শাহ্‌কেও

ডাকাতদের লোক, "আপনার অমুক অমুক আত্মীয়গণ বিপন্ন হইয়া আপনার সাহায্য চাহিতেছেন," এই বলিয়া ভুলাইয়া দূরে লইয়া যায়। আমীর হাইদার শাহের বাড়ীতে হিন্দুপরিবারটির স্ত্রীলোকেরা আশ্রয় লইয়াছিলেন। ডাকাতরা যখন তাঁহাদের উপর অত্যাচার করিবার জন্য ঐ গৃহ আক্রমণ করিল, তখন আমীর মহাশয়ের দুটি ছোট ছেলে বাড়ীতে ছিল। ডাকাতদের সঙ্গে লড়িবার মত বয়স তাহাদের নয়। হঠাৎ একটি সুকৌশল তাহাদের মাথায় আসিল। যে ঘরে হিন্দু স্ত্রীলোকেরা ছিলেন, এই দুই সাহসী ও সাধু বালক এক একখানি কোরান শরিফ মাথায় করিয়া সেই ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল, এবং ডাকাতদিগকে বলিল, "কই, আমাদিগকে আক্রমণ কর দেখি।" কোরানকে আক্রমণ না করিয়া কিছু করা যায় না দেখিয়া বাড়ীর সম্মুখের ডাকাতরা কিছু করিতে পারিল না। কিন্তু বাড়ীর পশ্চাৎদিকে যাহারা ছিল, তাহারা দেওয়াল কাটিয়া ঘরে ঢুকিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ইত্যবসরে বালক দুটির পিতা আমীর হাইদার শাহ ফিরিয়া আসিলেন, এবং ডাকাতদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। ৫৫ জন লোককে ডাকাত বলিয়া গ্রেপ্তার করা হয়, ৩৬ জনের বিচার হয়। তার মধ্যে ১৫ জনের সাজা হইয়াছে। দলের সর্দার দু জনের ৭ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাবাস এবং বাকী ১৩ জনের ৫ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

এই বালক দুটির ছবি সংগ্রহ করা উচিত এবং নাম জানা উচিত। ইহাদের কীর্ত্তি শিশুদের পাঠ্যপুস্তকে মুদ্রণযোগ্য।

ভবিষ্যৎ মহাসংঘর্ষ।

রুশিয়ার সহিত যুদ্ধ করিয়া জাপান নিজের শক্তির প্রমাণ পাইয়াছে। পৃথিবীর সকল জাতি এখন জাপানকে আপনাদের সমকক্ষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। জাপান নিজের দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে অনিচ্ছুক, এবং বহুবিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপনে অভিলাষী। ইউরোপের শক্তিশালী জাতিরা যে যে কারণে সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ চায়, জাপানও সেই সব কারণে সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ চায়। সে-সব কারণ প্রধানতঃ দুটি। জাপানের লোক বাড়িতেছে; স্বদেশে সকলের স্থানই বা কোথায়, জীবিকা-নির্ব্বাহই বা হয় কেমন করিয়া? অতএব বিদেশে যাওয়া দরকার। আমেরিকায় অনেক জায়গা আছে বটে; সেখানে অনেক হাজার জাপানী গিয়াছেও বটে। কিন্তু আমেরিকার সম্মিলিত-রাষ্ট্রের লোকেরা ইউরোপের অতি ওঁছা লোকদিগকেও জায়গা দিতে রাজী, কিন্তু এশিয়ার লোকদিগকে স্থান দিতে রাজী নয়। সুতরাং যে-সব দেশ কোন শক্তিশালী জাতির সম্পত্তি নয়, তাহার উপরই জাপানীদের লোভ বেশী। সেইজন্য তাহারা কোরিয়া দখল করিয়াছে এবং তাহার নামটা পর্য্যন্ত বদলাইয়া দিয়া নাম রাখিয়াছে "চোসেন।" ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের উপর তাহাদের লোলুপ দৃষ্টি পড়িয়াছে বলিয়া আমেরিকানরা মনে করে। কিন্তু আমেরিকানরা যতদিন উহার শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে ও উহা রক্ষা করিতেছে, ততদিন সম্ভবতঃ জাপানীরা কিছু করিবে না। আপনাদের অঙ্গীকার অনুসারে ফিলিপিনোদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়া যখন আমেরিকানরা চলিয়া যাইবে, তখন হয়ত জাপানীরা উহার প্রভু হইবার চেষ্টা করিবে। সম্প্রতি জাপান চীনকে যে-সকল সর্ত্তে আবদ্ধ করিয়াছে, তাহাতে কোন ইউরোপীয় জাতির আর চীনে প্রভাব বা প্রভুত্ব বিস্তার করা সম্ভব হইবে না; কিন্তু জাপান তথায় খুব কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিবে। চাই কি, কালে উহাকে নিজের সাম্রাজ্যভুক্তও করিতে পারে।

আর যে একটি কারণে ইউরোপীয় জাতিরা সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করিয়া আসিতেছে এবং যাহা বর্ত্তমান-ইউরোপীয় যুদ্ধের নিগূঢ় কারণ, জাপানে তাহাও বিদ্যমান। কলকারখানার দ্বারা নানারকম জিনিষ প্রস্তুত করিতে যে-সব জাতি সুনিপুণ, তাহারা এত জিনিষ প্রস্তুত করে যে স্বদেশে সে-সমুদয়ের কাটতি হওয়া অসম্ভব, এবং কেবল স্বদেশে জিনিষ বেচিয়া মানুষের অর্থপিপাসা মিটে না। এই জন্য বাজার চাই, বিক্রয়ের জায়গা চাই। কিন্তু পর-রাজ্যে বিক্রয়ের সম্পূর্ণ সুবিধা হয় না। এই দেখুন না, ভারতবর্ষে জার্ম্মেনীর জিনিষ কেমন বিক্রী হইতেছিল, কাটতি ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছিল, চীন প্রভৃতি দেশেও এইরূপ জার্ম্মেন জিনিষের কাটতি বাড়িতেছিল। কিন্তু তাহাতে জার্ম্মেনী সন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না। কারণ কি?

পররাজ্যে ও স্বাধিকৃত দেশে বাণিজ্য করার প্রভেদের একটি কল্পিত দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করি।

জার্মেনী চীনে জিনিষ বিক্রী করিতেছিল কিন্তু সেখানে অন্যান্য বিদেশী জাতি তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। চীনারা নিজেও নিজেদের দরকারী জিনিষ অনেক প্রস্তুত করে, ভবিষ্যতে হয় ত আরও বেশী পরিমাণে করিবে। জার্মেনী যদি চীন জয় করিতে পারিত, তাহা হইলে নানা উপায়ে চীনের দেশী শিল্প ও দেশী জাহাজ নষ্ট করিয়া নিজের জিনিষের কাট্‌তি আরও বাড়াইতে পারিত। ভবিষ্যতে যাহাতে চীনের শিল্প মাথা তুলিতে না পারে, তাহারও নানা প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য উপায় অবলম্বন করিতে পারিত। যেমন, জার্মেন-মালের রেলভাড়া কম ও চীনা-মালের রেলভাড়া বেশী ধার্য্য করিয়া এবং কৌশলপূর্ব্বক অন্য বিদেশী বণিক্‌দিগকে অপেক্ষাকৃত অধিক অসুবিধায় ফেলিয়া শিল্পবাণিজ্যে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীরহিত আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিত।

জাপানী জিনিষও নানাদেশে, যেমন ভারতবর্ষে, খুব কাটে। এখন যুদ্ধের জন্য ইউরোপের জিনিষের আমদানী, বিশেষতঃ জার্মেনী, অষ্ট্রিয়া ও বেলজিয়মের সস্তা জিনিষের আমদানী, বন্ধ হওয়ায় জাপানী জিনিষের কাট্‌তি ভারতবর্ষে হু হু শব্দে বাড়িয়া চলিতেছে। কিন্তু জাপান কি ইহাতে সন্তুষ্ট হইবে? অর্থলালসা "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব" বাড়িয়াই চলে। বিদেশে খুব একটা বড় সাম্রাজ্য না হইলে বাণিজ্যের বিস্তার মনের মত করিয়া হয় না। তাহা জার্মেনীর চীনজয়ের কল্পিত দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়াছি। জাপানের এই জন্য একটা বড় সাম্রাজ্যের প্রয়োজন হইয়াছে। জাপান তাহার সূত্রপাতও করিয়াছে। ইউরোপের প্রবলতম জাতিরা এখন নিজেদের অস্তিত্ব লইয়াই চিন্তাকুল। এই অবসরে জাপান চীনদেশে নিজের কাজ বেশ গুছাইয়া লইতেছে। বর্ত্তমান যুদ্ধে হার জিত যে-পক্ষেরই হউক, যুদ্ধের অবসানে, তৎক্ষণাৎ আবার একটা বড় যুদ্ধ করিবার মত লোকবল ধনবল কাহারও থাকিবে না। কেবল জাপানের শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে। তখন জাপান যে এশিয়ায় নিজের কাজ গুছাইতে চেষ্টা করিবে, এরূপ মনে করিবার কারণ আছে। একথা, কতক লোক-মুখে শুনিয়া, কতক জাপানী ও আমেরিকান কাগজ পড়িয়া, বলিতেছি। একটি প্রমাণ দিতেছি। জাপান ম্যাগাজিন্ নামক মাসিক পত্রে "নিউ জাপান"এর সম্পাদক "শান্তি ও যুদ্ধ" (Peace and War) শীর্ষক প্রবন্ধে বলিতেছেন —

"One of the most important questions arising out of this war is the attitude that England, France and Russia will assume toward Asia. This was a great question before the war; it will be a much greater one after the war. Should the belligerents make peace on terms maintaining the conditions obtaining before the war, the results would be fatal to Japan's most important interests in East Asia, and she would be forced to change both her ambitions and her policy."

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যুদ্ধের পর ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ও রুশিয়া এশিয়াকে এখন যে চোখে দেখেন, সেইরূপই দেখিবেন, না তাঁহাদের মনের ভাব ও নীতি বদলাইবে, ইহা একটি গুরুতর প্রশ্ন। তাঁহারা যদি এশিয়ার বর্ত্তমান অবস্থা (অর্থাৎ বর্ত্তমানে উহার অনেক অংশে তাঁহাদের প্রভুত্ব বিদ্যমান, এবং অবশিষ্ট অংশে ভবিষ্যতে তাঁহাদের কর্ত্তৃত্ব স্থাপিত হইবে, এই অবস্থা) বজায় রাখিতে চান, তাহা হইলে পূর্ব্ব-এশিয়ায় জাপানের স্বার্থহানি হইবে; সুতরাং জাপানকে তাহার আকাঙ্ক্ষা, লক্ষ্য ও নীতি পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

জাপান নরম ভাষায় যাহা বলিয়াছে তাহার সোজা মানে এই যে, সমস্ত এশিয়া না হউক, পূর্ব্ব-এশিয়া জাপানকে ছাড়িয়া না দিলে, তথায় জাপানকে নিজের সুবিধা অনুযায়ী কাজ করিতে না দিলে, জাপান যাহা ভাল বুঝে তাহাই করিবে। ইহাতে বলপূর্ব্বক কর্ত্তৃত্ব-বিস্তার বা দখল করিবার ইঙ্গিতই করা হইতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বর্ত্তমান যুদ্ধের পর এশিয়াতেও একটা কুরুক্ষেত্র হইতে পারে। অন্যান্য কারণ এবং লক্ষণও বিদ্যমান। অষ্ট্রেলিয়ার লোকেরা মনে করে জাপানের অষ্ট্রেলিয়ার উপর নজর আছে। তজ্জন্য অষ্ট্রেলিয়ানরা আত্মরক্ষার্থ যথেষ্টসংখ্যক যুদ্ধ-জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে উৎসুক। ঐ মহাদেশে বহুবিস্তৃত ভূমি পড়িয়া আছে। তথায় এশিয়াবাসী ভিন্ন আর কেহ বসবাস করিতে পারে না। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ান্‌রা শ্বেতকায় ভিন্ন আর কাহাকেও সেখানে উপনিবেশ করিতে দিবে না। ইহা লইয়া ভবিষ্যতে জাপানের সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার সুতরাং বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিবাদ হইতে পারে। ভবিষ্যতে ঘটিতে

পারে এরূপ একটি মহা বিবাদের কারণ "ইউনাটেড্ এম্পায়ার" নামক বিলাতী মাসিকে মিঃ জি, এইচ্, লেপার (G. H. Lepper) একটি প্রবন্ধে সাধারণভাবে নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন —

It is one of the certainties of the future that although the present war may prove to be the final conflict in Europe, the extent to which the earth has been appropriated by European peoples will some day cause an even more terrible struggle between the white race and the peoples of Asia, unless the "dog in the manger" policy is definitely replaced by some more conciliatory attitude on the part of the race which, by virtue of its discoveries in regard to the control of natural forces and its administrative capacity, has acquired the dominant position on the earth.

তাৎপর্য্য—যদিও ইউরোপে ইহাই শেষ যুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে ভবিষ্যতে এশিয়াবাসী এবং শ্বেতকায়দের মধ্যে ইহা অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইবে যদি শ্বেতকায়েরা পৃথিবীর আধিপত্য-বিষয়ে সুবিবেচনা না করেন।

পৃথিবীর শক্তিশালী জাতিরা ন্যায়পরায়ণ ও সহৃদয় ব্যবহার করিলে যুদ্ধ হয় না। তাঁহারা সেইরূপ ব্যবহার নিশ্চয়ই করিতে পারেন।

লেখক মনে করেন যে এরূপ যুদ্ধ হইলে জাপান এশিয়াবাসীদের অগ্রণী হইবে এবং তাহার দৃষ্টান্তের প্রভাব অন্যদের উপর পড়িবে —

Japan has shown that there is nothing inherent in the Asiatic mind to prevent it from working on similar lines, and the example of Japan cannot fail to exert a powerful influence on other Asiatic peoples.

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কল্যাণের জন্য ভারতবাসীদিগকে ইউরোপের বিরুদ্ধে এশিয়ার এই সংগ্রাম হইতে বিচ্ছিন্ন রাখা যে দরকার এবং তাহা যে ইংরেজদের সাধ্যায়ত্ত, লেখক তাহাও বলিয়াছেন :—

If we fail to deal with the Indian question in good time, it will tend to merge in the still greater issue of European against Asiatic. By the exercise of the necessary foresight and statesmanship, the Indian and the Mongol problems can be kept detached. . . .

সুতরাং ভবিষ্যতে জাপানের সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরোধ-সম্ভাবনা আমাদের একটা কল্পনা মাত্র নহে। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিবার মত নেতা, জাতীয়তা, দলবদ্ধতা, সামরিক শিক্ষা, এবং জল স্থল আকাশে যুদ্ধ করিবার অস্ত্রশস্ত্র সরঞ্জাম আমাদের নাই; খুব শীঘ্র হইবারও সম্ভাবনা দেখিতেছি না। কয়েক বৎসর ইংলণ্ডের আনুকূল্য ও শিক্ষার দ্বারা ভারতবাসীর দেশরক্ষায় সামর্থ্য জন্মিতে পারে। অন্য দিকে ইহাও সত্য যে ইংলণ্ডও ভারতবর্ষের সাহায্য ব্যতিরেকে স্বাধীন ও প্রবল থাকিতে পারেন না। ইংল্যণ্ড এখনও ইহা ভাল করিয়া বুঝিয়াছেন কি না, জানি না। কিন্তু ইহা খাঁটি সত্য। ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার যুদ্ধে যে ভারতীয় সিপাহীরা ইংলণ্ডের তরফে লড়িতেছে, ইহা ইংলণ্ডের রাজনৈতিকদিগের খেয়াল সৌজন্য বা অনুগ্রহ নহে। সিপাহীদিগকে যুদ্ধে পাঠান আবশ্যক হইয়াছিল বলিয়া এরূপ ঘটিয়াছে। ভবিষ্যতে এশিয়ার প্রভুত্ব লইয়া যুদ্ধ ঘটিলে ইংলণ্ডকে ভারতবর্ষের সাহায্য আরও অনেক অধিক পরিমাণে লইতে হইবে। অন্যদিকে আমাদিগকেও ইংলণ্ডের উপর নির্ভর করিতে হইবে। ভারতবর্ষ মানুষ দিবেন, ইংলণ্ড শিক্ষা দিবেন। কেন, তাহা বলিতেছি।

জাপান যদি এশিয়ার পক্ষ হইতে ইউরোপের সহিত লড়ে, তাহা হইলে সে এশিয়াকে স্বাধীন করিয়া দিবার জন্য লড়িবে না, এশিয়াকে পদানত করিবার জন্য, নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করিবার জন্য লড়িবে। ভারতবর্ষ লইয়া যদি জাপানের সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ হয়, তাহা হইলে আমরা ইংলণ্ডেরই পক্ষ অবলম্বন করিব। কারণ, জাপান আমাদিগকে স্বাধীন করিয়া দিবে না, তাহাদের অধীন করিতে চাহিবে। বিদেশীর অধীন হইবার সময় প্রথম প্রথম অনেক অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয়। আমরা নূতন করিয়া আবার কেন অত্যাচার উৎপীড়ন সহিতে যাইব? বিশেষতঃ, জাপানীরা ইংরেজদের চেয়ে সভ্য, চরিত্রবান বা ধার্ম্মিক নহে, যে, বৃটিশসাম্রাজ্যভুক্ত থাকার চেয়ে জাপানসাম্রাজ্যভুক্ত হওয়া আমাদের পক্ষে অধিকতর বাঞ্ছনীয় হইবে। ইংলণ্ডের ভাষা ও ভারতবর্ষের আর্য্যভাষা-সকলের পরস্পর সাদৃশ্য আছে। বিদ্যা ও সভ্যতার আদানপ্রদান দ্বারা এবং অন্যান্য উপায়ে ইংলণ্ডের সহিত আমাদের কতকটা বুঝাপড়া হইয়াছে। জাপানের ভাষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পুরাকালে আমরা কিয়ৎপরিমাণে জাপানকে ধর্ম্ম ও সভ্যতা দিয়াছিলাম বটে কিন্তু এখন সে ভারতকে জিনিষ বিক্রীর জায়গামাত্র মনে করে।

বৃটিশসাম্রাজ্যে আমাদের যতটুকু সুবিধা ও অধিকার আছে বা ভবিষ্যতে থাকিবার সম্ভাবনা, জাপান কোরিয়াবাসীদিগকে ততটুকুও দেয় নাই।

রুশসাম্রাজ্যকে কতক ইউরোপীয় কতক এশিয়াটিক, বলা যাইতে পারে। অতএব এশিয়াটিক প্রবল জাতি দুটি, রুশ ও জাপানী। সুতরাং সম্ভবতঃ এশিয়া লইয়া জাপানের ঝগড়া রুশিয়ার সহিত হইবে না, যে-সব জাতি সম্পূর্ণ ইউ-রোপীয় তাহাদের সহিত হইবে। রুশিয়ার বিস্তৃতি লোকবল ও অন্য বল এত বেশী যে তাহার সঙ্গে জাপানের আঁটিয়া উঠাও খুব সহজ হইবে না। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে রুশিয়ার সহিত জাপানের যুদ্ধ আরও কিছু দিন চলিলে, রুশিয়া জিতিত, ইহা বিশেষজ্ঞের মত। বর্ত্তমান যুদ্ধে জাপান রুশিয়াকে তোপ, সৈনিকদের বুট আদি পরিচ্ছদ, গোলাগুলি, গোলন্দাজ এবং গোলন্দাজী-শিক্ষক জোগাইয়া সাহায্য করিতেছে। ভবিষ্যৎ মহাসংঘর্ষ ঘটিলে উভয়দেশের এই বন্ধুত্ব, উভয়েরই স্বার্থমূলক বলিয়া, টিকিবার সম্ভাবনা। তাহাদের মধ্যে সম্ভবতঃ এই বন্দোবস্ত হইতে পারে, যে উত্তর ও পশ্চিম-এশিয়া রুশিয়ার এবং পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-এশিয়া জাপানের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিবে। রুশিয়ার সাহায্য না পাইলেও জাপানীরা জাপান কোরিয়া ও চীন হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিবে। জাপানের লোকসংখ্যা ৫ কোটি, কোরিয়া প্রভৃতি অধীন দেশের দেড় কোটি, চীনের ৪০ কোটি, রুশিয়ার সাড়ে ষোল কোটি। বৃটিশসাম্রাজ্যের শ্বেতঅধিবাসীদের সংখ্যা ৬ কোটি, তাহাও নানা দূর দূর দেশে ছড়ান; অশ্বেতদের সংখ্যা ৩৭ কোটি, তন্মধ্যে ভারতবাসী সাড়ে একত্রিশ কোটি। ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে আমরা যদি জাপানের বা রুশ-জাপানের গ্রাস হইতে বাঁচিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগকে যেমন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও যুদ্ধবিদ্যা শিখিতে হইবে, এবং আমরা বৃটিশ-সাম্রাজ্যভুক্ত বলিয়া তাহা ইংরাজের সাহায্যে শিখিতে হইবে; তেমনি অন্যদিকে ইংলণ্ডকে ভারতবর্ষ রক্ষা করিতে হইলে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ লোক লইয়া তাহাদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিতে হইবে। আমাদের অনুমান অনুসারে ভবিষ্যতে মহা সংগ্রাম হইলে ভারতবাসী জাপানের পক্ষ অবলম্বন করিবে না; শুধু নিষ্ক্রিয় ইংরেজপক্ষাবলম্বী না হইয়া ইংরেজের সহিত একযোগে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়িতে চাহিবে। বেতনভোগী ভারতবাসী সিপাহীও শৌর্য্যে কাহারও নিকট হার মানে না। কিন্তু ভারতবাসীরা যদি রাষ্ট্রীয় অধিকার পায়, সকল বিষয়ে ইংরেজের সমান ও সমকক্ষ বলিয়া গৃহীত হয়, তাহা হইলে তাহাদের আন্তরিক উৎসাহ আরও বৃদ্ধি পাইবে, এবং তাহারা সভ্য স্বাধীনদেশের স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত-সৈন্যগণ হইতে উৎসাহে ও বিক্রমে কোন অংশে হীন হইবে না।

কোনদেশে বা তাহার সীমায় যুদ্ধ ঘটিলে দেশবাসী যে-সকল পুরুষনারী যুদ্ধে ব্যাপৃত হয় না, তাহাদের নিকট হইতেও নানাপ্রকারে সাহায্য লওয়ার প্রয়োজন হয়। এইরূপ সাহায্য পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যায় যদি অধিবাসীরা রাষ্ট্রীয়-অধিকারভোগী, সন্তুষ্ট ও অনুরক্ত থাকে। ইহাও বিবেচ্য।

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনুমান করিয়া তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। যে মহাসংঘর্ষের আশঙ্কা আছে, তাহার জন্য ২।১ মাসে বা বৎসরে প্রস্তুত হওয়া যায় না; দীর্ঘতর সময়ের প্রয়োজন। যদি কোন সংঘর্ষ না ঘটে, তাহা হইলে তাহা পরম আনন্দের বিষয় হইবে। আমরা চাই শান্তির পথে সমুদয় জগতের উন্নতি। যুদ্ধের কারণ সকল বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে ঈর্ষ্যাদ্বেষ দূর করিয়া, জাতিসকলের মধ্যে সাত্ত্বিকভাব বাড়াইতে যত্ন করিয়া, এবং বিবাদের কারণ ঘটিলে সালিসী দ্বারা তাহার মীমাংসা করিয়া, সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু যদি কেহ অশান্তি ঘটায়, তাহার জন্যও প্রস্তুত থাকা উচিত।

মাতৃভূমি।

কয়েকমাস পূর্ব্বে বিলাতের অধ্যাপক গিল্‌বার্ট মারে ইংলণ্ডপ্রবাসী ভারতবর্ষীয় যুবকগণকে এক বক্তৃতায় এই মর্ম্মে উপদেশ দিয়াছিলেন, "তোমরা তোমাদের মাতৃভূমিকে 'বন্দে মাতরম্' বলিয়া অভিবাদন কর। ইহা খুব ভাল। কিন্তু ভারতভূমি অপেক্ষা বৃহত্তরা জননী আছেন। তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত 'বন্দেমাতরম্'

বলিতে শিখিতে হইবে।” গত মাসে লর্ড কারমাইকেল কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনৃষ্টিটিউট গৃহের ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতেও বাঙ্গালী যুবকদিগকে তিনি ঐ প্রকারের কথা বলেন। তিনি এই আশা প্রকাশ করেন যে কালক্রমে ভারতভূমি অপেক্ষা বিস্তৃততর মাতৃভূমির ধারণা জন্মিবে। তখন স্বরাজের অর্থ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিবে না। বৃটিশসাম্রাজ্যের সকল অধিবাসীর মধ্যে তখন কেবল এই এক ভাব থাকিবে, যে, সকলকেই এক সাম্রাজ্যের স্বাধীন ও সমান-রাষ্ট্রীয়-অধিকারসম্পন্ন অধিবাসী (citizen) হইতে হইবে। এই আদর্শ হইতে আমরা দূরে আছি, সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাকে সম্মুখে রাখিতে হইবে, এবং শিক্ষা দ্বারা এই লক্ষ্যের মূল্য বুঝিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

অধ্যাপক মারে এবং লর্ড কারমাইকেলের কথাগুলি ভালই। কিন্তু এ রকম কথা ভারতবাসীদের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় বলিলে তাহাদের মনে আনন্দের সঞ্চার না-হইতেও পারে,—যদিও তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়া বক্তাদিগের একটুও অভিপ্রেত নহে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে যখন মহারাণী ভিক্টোরিয়া সাক্ষাৎভাবে ভারতশাসনের ভার গ্রহণ করেন, তখন তিনি এই বলেন যে তাঁহার সব প্রজা জাতিধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সমান ব্যবহার পাইবে। তিনি অবশ্য “বন্দেমাতরম্” কথা দুটির উল্লেখ করেন নাই, এবং বৃহত্তর মাতৃভূমি সম্বন্ধেও কোন উপদেশ দেন নাই। কিন্তু তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় যাহা ছিল, অধ্যাপক মারে ও লর্ড কারমাইকেল তদপেক্ষা বেশী কিছু বলেন নাই। যাহা হউক, মহারাণী যাহা বলিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র এবং পৌত্রও তাহার সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের কর্ম্মচারীরা তাঁহাদের আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য বেশী ব্যগ্রতা দেখাইয়াছেন, বলা যায় না। বৃটিশসাম্রাজ্যে ইংরেজ ও ভারতবাসী কোন বিষয়েই সমান বলিয়া বিবেচিত হয় না, ইহা আমরা বলি না; কারণ তাহা সত্য নয়, কোন কোন বিষয়ে বাস্তবিক সাম্য আছে। ভবিষ্যতে আরও কোন কোন বিষয়ে সাম্য হইতে পারে। কিন্তু খুব গুরুতর বিষয়সকলে ইংরেজের যে অধিকার আছে, ভারতবাসীর তাহা নাই। যেমন, ইংলণ্ড এবং বৃটিশ উপনিবেশগুলি অধিবাসীদের মত-অনুসারে শাসিত হয়, অর্থাৎ তথায় প্রজাতন্ত্র-শাসনপ্রণালী প্রচলিত; কিন্তু ভারতবর্ষে প্রত্যেক বিষয়ে রাজকর্ম্মচারীদেরই প্রভুত্ব। বিনা বিচারে কোন ইংরেজের নির্ব্বাসন হইতে পারে না, ভারতবাসীর হইতে পারে। ইংরেজ ব্রিটিশসাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র ব্যবসাবাণিজ্য যাতায়াত করিতে পারে, ভারতবর্ষীয়েরা বৃটিশ উপনিবেশ-সকলে স্বচ্ছন্দ যাতায়াতের অধিকারী নহে। ইংরেজেরা সাম্রাজ্যের যে-কোন সরকারী চাকরী পাইতে পারে। কিন্তু জলযুদ্ধ এবং আকাশযুদ্ধ বিভাগের কোন কাজে কোন ভারতবাসী নিযুক্ত নাই। স্থলযুদ্ধ বিভাগে ভারতবাসী নিম্নতম কমিশন্‌ড্ সেনানায়কের কাজও পায় না। সকল প্রদেশের লোক সিপাহী হইতে পায় না। ভারতবাসীরা ভলাণ্টিয়ার হইতে পায় না। যুদ্ধের ব্যাপার ছাড়িয়া দিয়া সাধারণ শাসন, বিচার, পুলিশ, শিক্ষা, ভূতত্ত্ব, অরণ্য, লবণ, প্রভৃতি সমুদয় বিভাগের বড় কাজগুলি অধিকাংশস্থলে ইংরেজদের একচেটিয়া। ফৌজদারী বিচারপ্রণালী সম্বন্ধে ইংরেজ ও ভারতবাসী আসামীর সমুদয় অধিকার এক রকম নহে। যে-সময়ে এত প্রভেদ রহিয়াছে, তখন, শ্বেত ও অশ্বেত আমরা সকলেই এক মায়ের সন্তান, এইরূপ মনে করিবার জন্য আমাদিগকে উপদেশ দিলে আমরা আনন্দিত না-হইতেও পারি। যদি সাম্রাজ্যের সকল অধিবাসীকে একই রকমের উচ্চ শিক্ষা ও অধিকার দিবার জন্য আন্তরিক, প্রবল, অবিরাম চেষ্টা করা হয়, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর মাতৃভূমির আদর্শের বিষয় বলা হয়, তাহা হইলে সমালোচনার কোন কারণ থাকে না। কাজ অপেক্ষা কথার দৌড় বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। অতএব আমাদের অনুরোধ কথার সঙ্গে সঙ্গে কাজও হইতে থাকুক।

অধ্যাপক মারে এবং লর্ড কারমাইকেল ভারতবর্ষীয় যুবকদের সমক্ষে যে আদর্শের কথা বলিয়াছেন, যুবা, প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ ইংরেজদের নিকট সেরূপ কথা কোন ইংরেজ বলেন নাই। উপদেশ উভয় পক্ষকেই দেওয়া উচিত। ইংরেজদিগকেও বলা উচিত, “তোমরা তোমাদের জননী ব্রিটানিয়াকে ভক্তি কর ও ভালবাস, তাহা খুব ভাল; কিন্তু

তোমাদের বৃহত্তর মাতৃভূমি বৃটিশসাম্রাজ্য। ভারতভূমি তাহার অংশ। ভারতভূমিকে একটা জমিদারী সম্পত্তি, দাসী, বা কামধেনু মনে না করিয়া, জননীর প্রাপ্য ভক্তি ও প্রীতির অর্ঘ্য তাঁহাকে প্রদান করিও।” এই প্রকার উপদেশ বৃটিশ ঔপনিবেশিকদিগকে আরও বেশী করিয়া দেওয়া উচিত।

আমরা সসাগরা ধরিত্রীকে মা বলিয়া থাকি। সুতরাং বসুন্ধরার বিশেষ কোন অংশকে আমরা মা বলিবই না, এমন কোন প্রতিজ্ঞা আমাদের নাই। পৃথিবীকে বা বিশেষ কোন ভূখণ্ডকে যে জননী বলা হয়, তাহা রূপক হইলেও, ইহার মধ্যে নিগূঢ়তর কথা আছে। তাহা বুঝান আমাদের এই আলোচনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

আমরা বৃটানিয়ার আইন মানি, বৃটানিয়াকে খাজনা দি, বৃটানিয়ার যুদ্ধে প্রাণ দি, অথচ বৃটানিয়া আমাদের মাতৃভূমির অংশ, এ ধারণা আমাদের এখনও জন্মে নাই। তাহার কারণ কি? কারণ এই যে হৃদয়ের যোগ, আত্মীয়তা-বোধ এখনও জন্মে নাই। কোন জমিদারের বাড়ীর প্রজা বা কর্ম্মচারী খুব বাধ্য, খুব অনুগৃহীত, খুব উপকৃত ও খুব কৃতজ্ঞ হইলেও, এমন কি জমিদারগৃহিণীকে মা বলিলেও, “গিন্নী মা”কে সে বাস্তবিক মা মনে করে না। কেননা, উভয়ের মধ্যে আত্মীয়তা-বোধ নাই; উভয়ের মধ্যে তফাৎ বহুৎ।

তেলুগুভাষী ও সিন্ধীভাষীর ভাষা স্বতন্ত্র, বাসভূমি স্বতন্ত্র, এবং আচারব্যবহারও কিয়ৎ পরিমাণে স্বতন্ত্র হইলেও, উভয়েই ভারতীয় সভ্যতার দ্বারা গঠিত, উভয়ের অনেক প্রাচীন জনশ্রুতি ও কিম্বদন্তী এক, পূর্ব্বগৌরবস্মৃতি বহুপরিমাণে উভয়ের এক। ভারতবাসী হিন্দুমুসলমানকে আপাতদৃষ্টিতে খুব দূর দূর মনে হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের খুব প্রাচীন সভ্যতার সহিত মুসলমানের কোন সম্পর্ক না থাকিলেও, হাজার বৎসর ধরিয়া হিন্দুমুসলমান ভারতীয় সভ্যতাকে, উহার স্থাপত্যাদি শিল্প, এবং সঙ্গীত চিত্র প্রভৃতি কলাকে গড়িয়া তুলিয়াছে। ভারতের মধ্য যুগের এবং তাহার পরবর্ত্তী যুগের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যে মুসলমানেরও সাধনার ফল নিহিত রহিয়াছে। গোবধঘটিত ঝগড়া মন হইতে দূর করিয়া দিয়া ভাবিলে বুঝা যায়, হিন্দুমুসলমানের ধর্ম্মে ব্রত নিয়ম আচার উপবাস সাধনায় কত ঐক্য আছে। এক কথায় বলিতে গেলে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই প্রাচ্য।

বিস্তৃত ভূভাগের সমুদয় শ্রেণীর অধিবাসীদের মধ্যে নানা পার্থক্য থাকিলেও যদি পূর্ব্বোক্ত প্রকারের আভ্যন্তরীন আত্মীয়তাবোধ থাকে, তাহা হইলে সকলেই আপনাদের সাধারণ বাসভূমিকে জননী জন্মভূমি বলিতে পারে। এই জন্য ইংরেজ বা ফরাসীর পক্ষে ইউরোপকে মাতৃভূমি মনে করা তত শক্ত হইবে না, একজন ইংরেজের পক্ষে ভারতবর্ষকে মাতৃভূমি মনে করা যত কঠিন হইবে। ইউরোপের সভ্যতা, ইউরোপের মানসিক ঐশ্বর্য্য, ইউরোপের অনেক প্রাচীন ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক গৌরবের স্মৃতি, সমুদয় ইউরোপীয় জাতির সাধারণ সম্পত্তি। কিন্তু ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড এবং বৃটিশ উপনিবেশসকলের এই প্রকারের সাধারণ সম্পত্তি এখন কিছুই নাই বলিলেও হয়। ভবিষ্যতে হওয়া অসম্ভব, এমন কথা বলিতে পারি না। ভবিষ্যতে হয় ত হইতেও পারে। কিন্তু তাহা ততদিন কোন মতেই হইবে না, যতদিন একদল আপনাকে অনুগ্রাহক ও অন্যদল আপনাকে অনুগৃহীত মনে করিবে। লর্ড কারমাইকেলও বলিয়াছেন যে সহানুভূতির মধ্যে কোন মুরুব্বিয়ানা-রকমের অনুগ্রহের ভাব থাকিলে চলিবে না।

বৃটিশসাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র ভারতবাসীর স্বচ্ছন্দ বসবাস ও গতিবিধির ব্যবস্থা হওয়া চাই, রাষ্ট্রীয় সমুদায় অধিকার ইংরেজ ও ভারতবাসীর সমান হওয়া চাই; শুধু মুখের কথায় বা আইনের পাতায় নয়, কাজে হওয়া চাই। কিন্তু সমুদয় ব্রিটিশসাম্রাজ্যকে মাতৃভূমি মনে করিবার পক্ষে ইহাও যথেষ্ট নয়। ইহার উপর হওয়া চাই, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের রাসায়নিক মিশ্রণ-সম্ভূত একটি সাধারণ যৌগিক সভ্যতা, একটি সাধারণ মানসিক ও আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যবোধ, একটি সাধারণ গৌরবস্মৃতি। হইবে কিনা, বিধাতা জানেন।

"রাজার দুলাল গেল চলি মোর
ঘরের সমুখ-পথে
মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া
রহিব বল কি মতে।"

রবীন্দ্রনাথ।

চিত্রকর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়ের সৌজন্যে

U. RAY & SONS.

সমাধিসাধনা ও বিভূতি লাভ

মাধবাচার্য্য বলিতেছেন যে, কাপালিক উগ্রভৈরব যখন শঙ্করকে বধ করিবার জন্য ত্রিশূল হস্তে অগ্রসর হইতেছিল, তখন শঙ্করাচার্য্য "অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে" অবস্থিত ছিলেন। সমাধি কি, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিই বা কি, তাহা জানিবার জন্য পাঠকের ইচ্ছা হইতে পারে। ধর্ম্মসাধনার সঙ্গে সমাধি এবং দশা বা মূর্চ্ছার (Trance) যোগ যে কেবল আমাদের দেশেই আবদ্ধ, তাহা নয়,—রোমীয় খ্রীষ্টবাদীদিগের মধ্যে এবং মোসলমান সুফি দিগের মধ্যেও তাহা দৃষ্ট হয়। জানা যায় যে, সক্রেটিসেরও, সমাধি না হউক, এক প্রকার দশা হইত, এবং তখন তিনি নানাপ্রকার বাণী শ্রবণ করিতেন। হজরৎ মহম্মদও একপ্রকার দশার অবস্থাতেই কোরানের সুরা-সকল লাভ করিতেন। দশার অবস্থাতেই সুইডেনবাসী বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সাধু সুইডেনবর্গেরও নিউটন প্রভৃতির প্রেতাত্মার সহিত নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক ("absolute vacuum, etc.") বিষয়ের আলোচনা হইত। সাধারণ লোকের ধারণা যে, এই দশার অবস্থা স্নায়বিক-দুর্ব্বলতা-জনিত। দশা যদিও স্নায়বিক-দুর্ব্বলতা-জনিত হইতে পারে, সমাধি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সেইরূপ বলা যায় না, কারণ 'সমাধি' বিশেষ প্রণালী-বদ্ধ সাধনার ফল। সমাধি ভারতেরই বিশেষ সম্পত্তি। আস্তিক-অনাস্তিক উভয়বিধ তত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগের বিশেষ পরীক্ষিত। পাতঞ্জল-যোগ-সূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে সমাধি সম্বন্ধে যেরূপ দার্শনিক আলোচনা দৃষ্ট হয়, তাহাতে সমাধিকে স্নায়বিক বিকার মাত্র বলিয়া কোন মতেই উপেক্ষা করা যায় না। একথা সত্য যে, শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি আধুনিক উপনিষদ ভিন্ন অন্য উপনিষদে সমাধিসাধনার কোন উল্লেখ নাই। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ"—দর্শন শ্রবণ মনন এবং নিদিধ্যাসন বা পুনঃ পুনঃ ধ্যানেরই উল্লেখ। নিরীশ্বর বৌদ্ধদিগের মধ্যে এবং বৌদ্ধশিক্ষাপ্রাপ্ত তৎপরবর্ত্তী পৌরাণিককালেই যে সমাধিসাধনার বিশেষ বিকাশ এবং বিস্তার হইয়াছিল, তাহাতে সংশয় নাই।

সে যাহা হউক, পাতঞ্জল-যোগসূত্রে সমাধি এবং অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির যে বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তাহারই সংক্ষিপ্ত সারাংশ আমরা পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। পাতঞ্জল 'ধ্যানের' সংজ্ঞা করিতেছেন—"প্রত্যয়ৈকতানতা" অর্থাৎ প্রত্যয় বা অনুভূতির একাগ্রতা বা একনিষ্ঠতা। ধ্যানের স্বরূপই প্রত্যয় বা অনুভূতি, এবং প্রত্যয় বা অনুভূতি বলিতে সেই প্রত্যয় বা অনুভূতির বিষয়ও তাহারই অন্তর্নিহিত। ধ্যান যখন গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হয়, পাতঞ্জলের মতে তখন তাহা স্বরূপ-শূন্য হইয়া অর্থাৎ আপন প্রত্যয়-স্বরূপত্ব বিস্মৃত হইয়া সেই প্রত্যয়ের বিষয়ীভূত ধ্যেয় বস্তুতে লীন হইয়া ধ্যেয় বস্তুর আকার ধারণ করে, "অর্থমাত্রনির্ভাসং"। ইহাকেই বলে "মনসো হ্যমনীভাবঃ"। মনের অমনীভাবাত্মক সেই ধ্যানকেই "সমাধি" নামে অভিহিত করা যায় (বিভূতিপাদ, ৩)। পাতঞ্জলের ব্যাস-ভাষ্যের টীকাকার বাচস্পতিমিশ্র বলিতেছেন—"ধনুর্ধারী যেমন প্রথমে স্থূললক্ষ্য বিদ্ধ করিতে করিতে পরে সূক্ষ্মলক্ষ্যকে বিদ্ধ করিতে সক্ষম হয়, যোগীও সেইরূপ প্রথমে স্থূল পাঞ্চভৌতিক চতুর্ভুজাদি ধ্যেয় বস্তুর সাক্ষাৎকার সাধন করিতে করিতে পরে সূক্ষ্মের সাক্ষাৎকার সাধন করেন।" পাঠক লক্ষ্য করিবেন এই-সকল স্থূল পাঞ্চভৌতিক চতুর্ভুজাদি ধ্যেয় মূর্ত্তি সাধকের মনগড়া মাত্র, অথবা "কৃষ্ণ কেমন ? যার মনে যেমন।" এইরূপ সমাধি সম্পূর্ণ পুরুষতন্ত্র, স্ত্রীলোকে অগ্নিবুদ্ধির তুল্য। ইহাতে অগ্নিতে অগ্নি-বুদ্ধির ন্যায় শঙ্কর যাহাকে বলেন বস্তুতন্ত্রজ্ঞান তাহার কিছুই নাই।

সমাধি দুই প্রকার—(১) সম্প্রজ্ঞাত বা সবীজ বা সালম্ব, এবং (২) অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্বীজ বা নিরালম্ব। আবার বীজ বা আলম্বনের ভেদ অনুসারে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিও চারি প্রকার—(ক) স্থূলবস্তু অবলম্বনে প্রবৃত্ত সম্প্রজ্ঞাত সমাধির নাম সবিতর্ক, (খ) বিতর্ক-রহিত সূক্ষ্মবস্তু অবলম্বনে প্রবৃত্ত সম্প্রজ্ঞাত সমাধির নাম সবিচার, (গ) বিচাররহিত আনন্দমাত্র অবলম্বনে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির নাম আনন্দ এবং (ঘ) আনন্দরহিত অস্মিতা বা 'আমি আছি' এই প্রত্যয় অবলম্বনে প্রবৃত্ত সম্প্রজ্ঞাত সমধির নাম সাস্মিত। এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধির নিরোধেই সর্ব্বনিরোধ, এবং সর্ব্বনিরোধেরই নাম অসম্প্রজ্ঞাত, বা নির্জীব বা নিরালম্ব সমাধি (সমাধিপাদ ,৫২)। (তাহাই বৌদ্ধদিগের নির্ব্বাণ কিনা, পাঠক বিবেচনা করিবেন)। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি

সম্বন্ধে পাতঞ্জলসূত্র আবার বলিতেছেন—বিরাম-প্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কার-শেষোঽন্যঃ—চিত্তবৃত্তির বিরাম বা অভাবপ্রত্যয়ের পুনঃ পুনঃ অভ্যাসজনিত সংস্কারের শেষই অথবা চিত্তবৃত্তির নিরোধই অন্য, অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। আলম্বন- বা বিষয়-রহিত হওয়াতে তখন মনে হয় যেন চিত্ত নাই। এইরূপ সর্ব্ববিষয়ের পরিত্যাগ-হেতু পুরুষ তখন আলম্বন-রহিত এবং স্বরূপপ্রতিষ্ঠিত হয়। পাতঞ্জলের ভোজবৃত্তিকার বলিতেছেন—যেমন সুবর্ণসহযোগে সীসাকে উত্তাপিত করিলে সেই সীসা আপনাকে এবং সেই সঙ্গে সুবর্ণের মলকেও দগ্ধ করে, সেইরূপ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি দ্বারাও সেই সর্ব্বনিরোধজনিত সংস্কার তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী একাগ্রতাজনিত সংস্কারকে এবং সেইসঙ্গে আপনাকেও দগ্ধ করে (সমাধিপাদ, ১৯)। ভোজবৃত্তিকার আরও বলিতেছেন—পুরুষঃ স্বরূপনিষ্ঠঃ শুদ্ধো ভবতি—অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্বীজ সমাধি লাভ করিলে পুরুষ স্বরূপনিষ্ঠ এবং শুদ্ধ হয়। পাতঞ্জলমতে সম্প্রজ্ঞাত বা সবীজ সমাধি অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্জীব সমাধিরই বহিরঙ্গমাত্র (বিভূতি, ৮)। একটি কথা এস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—"ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ বা" ভক্তিপূর্ব্বক ঈশ্বরারাধনা করিলেও সমাধি, সম্প্রজ্ঞাত বা অসম্প্রজ্ঞাত, লাভ হয়। ইহা দ্বারা আমরা দেখিতেছি পাতঞ্জলমতে ঈশ্বরারাধনাও সমাধিলাভের অন্যান্য উপায়ের মধ্যে একটি উপায় মাত্র। পাতঞ্জলের মতে ঈশ্বরবাদী এবং নিরীশ্বরবাদী উভয়েই সেই সমাধিলাভের সমান অধিকারী। সমাধিই পাতঞ্জলের লক্ষ্য বা উপেয়, ঈশ্বরারাধনা উপায় মাত্র। ইহাতে ঈশ্বরারাধনার গৌরব কতদূর রক্ষা হয়, ভগবদ্ভক্ত পাঠক তাহার বিচার করিবেন। বরং পাতঞ্জলোক্ত সমাধিসাধনা যে নিরীশ্বরপ্রধান এবং নিরীশ্বর বৌদ্ধ এবং তৎপরবর্ত্তী পৌরাণিক ও তান্ত্রিক সময়েই বিশেষ ভাবে প্রচলিত, ইহা দ্বারা তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। আবার এই নিরীশ্বরপ্রধান সাধনার দিকে লোকের চিত্ত আকৃষ্ট করিবার জন্য মিথ্যা প্রলোভনেরও প্রয়োজন। এজন্যই বোধ হয় যোগশাস্ত্রে বিভূতি এবং অষ্টসিদ্ধির এত প্রসার। শুধু "স্বরূপনিষ্ঠ" এবং "শুদ্ধ" হইবার আশায় জনসাধারণ সমাধিসাধনায় প্রবৃত্ত হইতে না পারে, এই আশঙ্কায় সেই নিরীশ্বরপ্রধান বৌদ্ধ এবং পৌরাণিক ও তান্ত্রিকসময়ে অণিমাদি বিভূতি লাভের ভূয়সী প্রশংসা দৃষ্ট হয়। এই-সকল বিভূতি লাভের আশায় সেইকালে নিরীশ্বর-প্রধান বৌদ্ধ এবং অন্যান্য যোগীগণ প্রাণপণে সমাধি-সাধনায় প্রবৃত্ত হইতেন, এবং অদ্যাপি অনেকে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা কতদূর কৃতকার্য্য হইতেন তাহা আমরা বলিতে অক্ষম। পাতঞ্জলের মতে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিদ্বারা যে-সকল বিভূতি লাভ হয় তাহা এই—(১) অতীত- এবং অনাগত-জ্ঞান, (২) সকল প্রাণীর শব্দার্থ-জ্ঞান, (৩) পূর্ব্বজন্মবিষয়ক জ্ঞান, (৪) পরচিত্ত-জ্ঞান, (৫) অন্তর্ধান-শক্তি, (৬) হস্তীর ন্যায় বল লাভ, (৭) সূক্ষ্ম এবং দূর বস্তুর জ্ঞান, (৮) ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি, (৯) পরশরীরে প্রবেশ, এবং (১০) অণিমাদি সিদ্ধি * (বিভূতিপাদ ১৬- ৭)।

শঙ্করাচার্য্য তাঁহার স্বরচিত বিবেকচূড়ামণি অথবা উপদেশসহস্রী প্রভৃতিতে অথবা তাঁহার সূত্রভাষ্যে যে ব্রহ্মসাধনার ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহাতে পাতঞ্জলোক্ত অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি এবং তাহার ফল আকাশ-গমনাদি বিভূতি লাভের কোন উল্লেখ নাই। এমন কি প্রাণায়াম প্রভৃতি যোগের বহিরঙ্গ বলিয়া যোগশাস্ত্রে যে-সকল সাধনার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, শঙ্কর কার্য্য-কারণের অনন্যত্বের দৃষ্টান্তরূপেই মাত্র সে-সকলের উল্লেখ করিয়াছেন—যথা চ লোকে প্রাণাপানাদিষু প্রাণভেদেষু প্রাণায়ামেন নিরুদ্ধেষু কারণমাত্রেন রূপেণ বর্ত্তমানেষু জীবনমাত্রং কার্য্যং নিবর্ত্ত্যতে নাকুঞ্চন-প্রসারণাদিকং কার্য্যান্তরং, ন চ প্রাণভেদানাং প্রাণাদন্যত্বং এবং কার্য্যস্য কারণাদনন্যত্বং (২-১-২০)। সাধনার অঙ্গরূপে তিনি নিজে কোথাও প্রাণায়ামের উপদেশ করেন নাই। বিবেকচূড়ামণিতে তিনি চারিটি মাত্র সাধনার উল্লেখ করেন—(১) নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, (২) ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, (৩) শমাদিষট্‌ক সম্পত্তি, এবং (৪) মুমুক্ষুত্ব। বিবেকচূড়া-

* (১) অণিমা বা পরমাণুরূপতা, (২) মহিমা বা আকাশাদির ন্যায় মহত্ত্ব, (৩) লঘিমা বা তুলাপিণ্ডের ন্যায় লঘুত্ব, (৪) গরিমা বা লৌহপিণ্ডের ন্যায় গুরুত্ব, (৫) প্রাপ্তি বা অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা চন্দ্রাদিস্পর্শনের শক্তি, (৬) প্রাকাম্য বা ইচ্ছার অনভিঘাত, (৭) ঈশিত্ব বা স্বীয় শরীরাদির উপরে প্রভুত্ব, এবং (৮) বশিত্ব বা সর্ব্বভূতের উপরে প্রভুত্ব। ইহারই নাম অষ্ট সিদ্ধি।

মণিতে তিনি শমাদিষট্‌ক নামে শম দম উপরতি তিতিক্ষা শ্রদ্ধা এবং শুদ্ধবুদ্ধ নির্ম্মলস্বরূপ ব্রহ্মে চিত্তের সমাধানকে লক্ষ্য করিতেছেন। সূত্রভাষ্যের "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" সূত্রের 'অথ' শব্দের 'অনন্তর' অর্থ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শঙ্কর বলিতেছেন—"বলা আবশ্যক কিসের 'অনন্তর' ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উপদেশ। তাহা বলা যাইতেছে। নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক, ইহামুত্রার্থভোগবিরাগ, শমদমাদি সাধন-সম্পৎ, এবং মুমুক্ষুত্ব। এ-সকল থাকিলে, (যজ্ঞাদি) ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার পূর্ব্বেও যেমন পরেও তেমন, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকার থাকে। এ-সকল না থাকিলে সে অধিকার কখনও থাকে না।" (১-১-১) শঙ্করভাষ্যের 'রত্নপ্রভা' ব্যাখ্যা "সমাধান" শব্দের এইরূপ অর্থ করিতে-ছেন—"নিদ্রা আলস্য এবং প্রমাদ পরিত্যাগ করিয়া মনের অবস্থানের নাম সমাধান।" আনন্দগিরি সমাধানের ব্যাখ্যা করিতেছেন—"বিধিৎসিত শ্রবণাদির বিরোধী নিদ্রাদির নিরোধপূর্ব্বক চিত্তের অবস্থানের নাম সমাধান।" ভামতী ব্রহ্মসাধনাবিষয়ক শ্রুতিবচনেরও উল্লেখ করিতে-ছেন—"তস্মাচ্ছান্তো দান্ত উপরত স্তিতিক্ষুঃ শ্রদ্ধাবিত্তো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ, সর্ব্বমাত্মনি পশ্যেৎ।" 'রত্নপ্রভা' শ্রদ্ধার অর্থ করিতেছেন, "সর্ব্বত্রাস্তিকতা"।* বিভূতি সম্বন্ধে দেখা যায় সূত্রভাষ্যে শঙ্কর তাঁহার সমসাময়িক-দিগের ধারণানুসারে শুকদেবের আকাশ-গমনের উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। যোগীদিগের অলৌকিক বিভূতি লাভ সম্বন্ধে যে সকল উপকথা † আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহা সত্যই হউক অথবা অর্থবাদমাত্রই হউক, শঙ্করের স্বরচিত গ্রন্থ পাঠে এরূপ মনে করিবার কোন কারণ পাওয়া যায় না যে সত্যসত্যই তিনি নিজে কোন অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। আধুনিক শিক্ষিতদিগের মধ্যে যাঁহারা এই-সকল বিভূতি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায় তাঁহারা অনেকেই ঔষধরূপে হইলেও অতিমাত্রায় আফিম্-সেবী; তাঁহাদের কথার উপরে কোন সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হইবে না। অপর দিকে একথা অতি সত্য যে অলৌকিক শক্তির পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া আমাদের দেশ এবং সমাজ লৌকিক শক্তি লাভ হইতে বঞ্চিত হইয়া, পৃথিবীর অপরাপর জাতির তুলনায় অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে!

প্রমাণরূপে গ্রহণযোগ্য উপনিষদ্-সকলের মধ্যে যে যোগ অথবা ধ্যান এবং সমাধিসাধনা উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা অত্যন্ত বিশুদ্ধ এবং স্বাভাবিক। মুণ্ডকের (২-২-৩, ৪) "ধনুর্গৃহিত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং শরং হ্যুপাসানিশিতং সংধয়ীত" "শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ" ইত্যাদি তাহারই নিদর্শন। শ্বেতাশ্বতর অপেক্ষাকৃত আধুনিক উপনিষদ; অন্যান্য উপনিষদের সহিত ইহার ভাষার তুলনা দ্বারাই তাহা প্রতিপন্ন হয়। শ্বেতাশ্বতরে (২-৮ হইতে ১৪) যোগের যে বর্ণনা আছে, তাহাতেই দেখা যায় যে সেই পুরাতন বিশুদ্ধ মূল হইতে এই উপনিষদুক্ত যোগ যেন কতক পরিমাণে ভ্রষ্ট হইয়াছে। এই উপনিষদেই দেখা যায় যে যোগের অঙ্গরূপে মুণ্ডকের উপাসা-নিশিতংএর (সন্ততাভিধ্যানেন তনূকৃতং সংস্কৃতমিত্যেতৎ —শঙ্কর) পরিবর্ত্তে প্রাণায়াম-সাধনা সূচিত হইতেছে—প্রাণান্ প্রপীড্যেহ স যুক্তচেষ্টঃ ক্ষীণে প্রাণে নাসি-কয়োচ্ছ্বসীত" (প্রাণায়ামক্ষপিত মনোমলস্য চিত্তং ব্রহ্মণি স্থিতং ভবতি—শঙ্কর)। সেইসঙ্গেই আবার উপ-নিষদে যোগসাধনাদ্বারা কোন কোন প্রকার অলৌকিক শক্তিলাভেরও উল্লেখ দৃষ্ট হয়—ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরং। লঘুত্বম্ আরোগ্যম্ অলোলুপত্বং বর্ণপ্রসাদং স্বরসৌষ্ঠবঞ্চ। গন্ধঃ শুভো মূত্র-পুরীষম্ অল্পং যোগপ্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি। ইহা দ্বারা দেখা যায় উপনিষদ্-সিদ্ধ বিশুদ্ধ যোগ উপনিষদেরই শেষ সময়ে কতদূর বিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। বুদ্ধদেব আবার

* কিমপি বক্তব্যং যদনন্তরং ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপদিশ্যতে উচ্যতে নিত্যা-নিত্যবস্তুবিবেকঃ ইহামুত্রার্থভোগবিরাগঃ শমদমাদিসাধনসম্পৎ মুমুক্ষুত্বং চ। তেষু হি সংসু প্রাগপি ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়া উর্দ্ধং চ শক্যতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসিতুং জ্ঞাতুং চ, ন বিপর্য্যয়ে। তস্মাদথশব্দেন যথোক্ত সাধনসম্পত্ত্যানন্তর্য্যং উপদিশ্যতে। ব্রহ্মসূত্র ১-১-১। রত্নপ্রভার ব্যাখ্যা—লৌকিকব্যাপারাৎ মনস উপরমঃ শমঃ। বাহ্যকরণানামুপরমোদমঃ। জ্ঞানার্থং বিহিতমিত্যাদি-কর্ম্মসংন্যাস উপরতিঃ। শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহনং তিতিক্ষা। নিদ্রালস্য-প্রমাদত্যাগেন মনঃস্থিতিঃ সমাধানং। সর্ব্বত্রাস্তিকতা শ্রদ্ধা। এতৎ-ষট্‌ক প্রাপ্তিঃ "শমাদি সম্পৎ"।

† রণজিৎসিংহের যোগীর সমাধির বিবরণ এবং ভূকৈলাসের যোগীর সমাধি সম্বন্ধে স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ দ্রষ্টব্য। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, দ্বিতীয়ভাগ, পৃঃ ১২০-১২৩।

এই যোগসাধনার শোধন করেন। মূলের প্রতি দৃষ্টি করিলে বলা যায় বুদ্ধদেবের যোগসাধনা সেই উপনিষদুক্ত "শরবৎতন্ময়ো ভবেৎ"রূপ বিশুদ্ধ যোগসাধনারই পুনরুদ্দীপনা মাত্র,—অতি বিশুদ্ধ এবং স্বাভাবিক। মুণ্ডকের "অক্ষরব্রহ্মে তন্ময়ত্ব" প্রাপ্তি আর বুদ্ধের "সমাধি" লাভ একই—জীবাত্মার কেবল-ভাবে অথবা স্বরূপে অবস্থান। বুদ্ধদেবের পরেও যে তাঁহার শিষ্যগণ কিছুকাল এই যোগ-সাধনার বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ প্রথমে প্রাতঃসন্ধ্যা নির্জ্জনে বসিয়া পাঁচপ্রকার ভাবনা সাধন করিতেন—(১) মৈত্রী বা শত্রুমিত্র সকলের কল্যাণ কামনা, (২) করুণা বা পরের দুঃখে সমবেদনা এবং পরের দুঃখ মোচনের উপায় চিন্তা, (৩) মুদিতা বা পরের সুখে সুখী বোধ এবং পরের সুখ বৃদ্ধির চিন্তা, (৪) অশুভ বা শরীরের অশুদ্ধত্ব এবং ক্ষণ-ভঙ্গুরত্ব, এবং (৫) উপেক্ষা বা উচ্চনীচ সর্ব্বপ্রাণীতে এবং ভালমন্দ সর্ব্বব্যাপারে সমদর্শিতা। এইরূপ "ভাবনা"-সাধন দ্বারা প্রস্তুত হইলে পর ভিক্ষুগণ ধ্যান বা চিত্তের একাগ্রতা এবং বিষয়াসক্তিশূন্যতা সাধন করিতেন। গভীরতা অনুসারে বৌদ্ধগণ ধ্যানেরই চারিটি সোপান নির্দ্দেশ করেন। তাহার শেষ-সোপান ধ্যেয় বিষয়ের সহিত জীবের তন্ময়ত্ব প্রাপ্তি। বৌদ্ধ শাস্ত্রে ইহারই নাম সমাধি। বৌদ্ধমতে জীব সমাধির সোপানে আরোহণ করিলে 'কেবল' ভাব লাভ করে। তখন তাহার "ভাব-জ্ঞানও থাকে না, অভাব-জ্ঞানও থাকে না।" তখন চিত্ত সম্পূর্ণ দুঃখমুক্ত হইয়া শান্তিসলিলে নিমগ্ন হয়। পাতঞ্জলের সংজ্ঞামত এই অবস্থাকেই একপ্রকার "অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি" বলা যায়। পাতঞ্জলোক্ত বিভূতি এবং অণিমাদি সিদ্ধির অঙ্কুর আমরা বৌদ্ধ শাস্ত্রেই দেখিতে পাই। যদিও বৌদ্ধ ভিক্ষুর পক্ষে দীক্ষাকালেই আপনার প্রতি দৈবীশক্তির অরোপ করা নিষিদ্ধ হইত, কারণ বুদ্ধের অল্পকাল পরেই দেখা গিয়াছিল যে ভিক্ষুদিগের মধ্যে নানাপ্রকার ভণ্ডামিও স্থান পাইত,—তথাপি বৌদ্ধশাস্ত্রেও সমাধি দ্বারা ছয় প্রকার "অভিজ্ঞা" বা দৈবীশক্তি উপার্জ্জনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়—যথা, দিব্য দর্শন, দিব্য শ্রবণ, পরচিত্তজ্ঞান, জাতিস্মরত্ব, শত্রু-দমন-ক্ষমতা, এবং ঋদ্ধি বা লোকাতীত শক্তি। এ-সকল পর্য্যালোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে পাতঞ্জলের যোগ-সাধনা বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের ধ্যানসাধনার এবং পাতঞ্জলোক্ত বিভূতি এবং আণিমাদি সিদ্ধি বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের "অভিজ্ঞা" বা দৈবীশক্তিরই বর্দ্ধিত এবং অধিকতর বিকারপ্রাপ্ত সংস্করণ মাত্র। এতৎদ্বারা পাঠক বুঝিবেন বৌদ্ধধর্ম্ম আজও আমাদিগের কতদূর নিকটে।

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

অজন্তা গুহার চিত্রাবলী

অজন্তায় কতকগুলি ঐতিহাসিক চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীনকালের ইতিহাসের সহিত জাতীয় ধর্ম্ম ও ঐতিহ্য অভিন্নরূপে সংযুক্ত। এইজন্য প্রাচীন ইতিহাসে অনেক স্থানে কাল্পনিক পৌরাণিক বার্ত্তার অন্তর্নিবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এইকারণে প্রাচীন ইতিহাসের যে-অংশে এইরূপ কাল্পনিক সঙ্কলনের সংযোগ আছে তাহাকে অমূলক বলিয়া ত্যাগ করা চলে না। পৌরাণিক সংহিতার অবিশ্বাসযোগ্য অসম্ভব অংশগুলি বাদ দিলে প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্যের বিবরণ পাওয়া যায়।

মহাবংশ পুরাণে বর্ণিত একটি ঐতিহাসিক বিবরণ অজন্তার একটি গুহায় অতি বিস্তৃতরূপে অঙ্কিত আছে। এ চিত্রাবলী অন্যান্য অনেক চিত্র অপেক্ষা ভাল অবস্থায় আছে।

পুরাকালে কোন এক বঙ্গেশ্বরের সহিত কলিঙ্গরাজ-দুহিতার বিবাহ হয় ও তাঁহাদের সুপ্রাদেবী নামে একটি কন্যা জন্মে। সুপ্রাদেবী ভূমিষ্ঠ হইলেই দেশ দেশান্তর হইতে দৈবজ্ঞ জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নবজাত শিশুর করকোষ্ঠী গণনা করিয়া সকলেই একবাক্যে কহিলেন যে সুপ্রাদেবীকে পশুরাজ সিংহ পত্নীরূপে গ্রহণ করিবে। জ্যোতিষীদিগের এইকথা শুনিয়া বঙ্গেশ্বরের ক্ষোভের সীমা রহিল না। কিন্তু অদৃষ্ট-লিপি খণ্ডাইবার উপায় কি?

সুপ্রাদেবী দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন। যখন তাঁহার বিবাহ-যোগ্য বয়স তখন তাঁহার রূপের ষোলকলা পূর্ণ। এই সময় তাঁহাকে একবার মগধ দেশের অভিমুখে যাত্রা

লঙ্কাদ্বীপে বিজয়সিংহের অবতরণ। চিহ্নিত ছত্রের তলে মুকুট মাথায় বিজয়সিংহ।

করিতে হয়। পথে যাইতে যাইতে এক বিজন কাননে তাঁহার সহিত এক সিংহের সাক্ষাৎ হয়। সিংহকে দেখিয়া সুপ্রাদেবীর অনুচরবর্গ পালাইয়া গেল। তখন সিংহ সুপ্রাদেবীকে লইয়া গভীর অভেদ্য অরণ্যে চলিয়া গেল। কিছুকাল পরে সুপ্রাদেবীর দুইটি সন্তান জন্মিল। একটি পুত্র ও একটি কন্যা। সুপ্রাদেবী পুত্রের নাম রাখিলেন

বিজয়সিংহের সহিত লঙ্কার আদিম নিবাসী যক্ষদিগের যুদ্ধ।

সিংহবাহু। যখন সিংহবাহুর বয়স ষোল বৎসর তিনি একদিন তাঁহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহার পিতার সহিত তাঁহাদের শরীরাবয়বের কোন সাদৃশ্য নাই কেন। সুপ্রাদেবী তখন পুত্রকে তিনি কিরূপে সিংহ কর্ত্তৃক সেই অরণ্যে আনীত হইয়াছিলেন তাহার সকল ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিলেন। তাহা শুনিয়া সিংহবাহু অরণ্য। ত্যাগ করিয়া

যক্ষদিগের প্রাণরক্ষার জন্য বিজয়সিংহের নিকট যক্ষিণীদিগের প্রার্থনা।

লোকালয়ে আসিবেন স্থির করিলেন। একদিবস সিংহের অনুপস্থিতিতে মাতা ও ভগ্নীকে লইয়া সেই নিবিড় বন ত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এদিকে সিংহ সুপ্রাদেবী ও সন্তানদিগকে না দেখিতে পাইয়া অধীর হইয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইল। অবশেষে অরণ্য ত্যাগ করিয়া লোকালয়ে সুপ্রাদেবীর অনুসন্ধান করিতে আসিল। তখন চারিদিকে মহা আতঙ্ক উপস্থিত হইল। গ্রামবাসীগণ গ্রাম ত্যাগ করিল, কৃষকগণ চাষ বন্ধ করিল। বঙ্গেশ্বরের নিকট এ সংবাদ পৌঁছিল। তিনি ঘোষণা করিলেন, যে সিংহকে বিনাশ করিতে পারিবে সে পুরস্কৃত হইবে। কিন্তু কেহই সিংহকে বধ করিতে পারিল না।

ইতিমধ্যে সিংহবাহু তাঁহার মাতা ও ভগ্নীকে লইয়া বঙ্গদেশে উপস্থিত হইলেন। কেহই যখন সিংহকে বধ করিতে সাহস করিল না, তখন সিংহবাহু সিংহকে হনন করিলেন। সিংহবাহু যে বঙ্গেশ্বরের দৌহিত্র ইহা প্রকাশ পাইল এবং বঙ্গেশ্বরের মৃত্যুর পরে সিংহবাহু বঙ্গেশ্বরের স্থান অধিকার করিলেন।

সিংহল-বিজেতা বিজয়সিংহ সিংহবাহুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। যৌবনকালে বিজয়সিংহ অতি দুর্ব্বৃত্ত ও দুর্দ্দান্ত ছিলেন।

বিজয়সিংহের অভিষেক

পুলকেশীর সভায় পারস্যরাজ খসরুর দূতের অভ্যর্থনা।

সিংহবাহু পুত্রকে তাহার দুষ্টাচারের জন্য অনেক অনুযোগ করিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। অবশেষে রাজ্যে শান্তি-রক্ষার জন্য তিনি বিজয়সিংহ ও তাঁহার সাত শত অনুচরবর্গকে বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া যাইবার আদেশ দিলেন। বিজয়সিংহ নৌযানে যাত্রা করিলেন এবং নানা-স্থান পর্য্যটন করিতে করিতে অবশেষে লঙ্কাদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতিমধ্যে বিজয়সিংহের অনেক পরি-বর্ত্তন হইয়াছিল। বঙ্গদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া তিনি তাঁহার নির্বুদ্ধিতা ও দুষ্ট প্রবৃত্তির জন্য অতিশয় লজ্জা বোধ করিলেন এবং নিজ আচরণ সংশোধন করিয়া আপনার বংশ-গৌরব রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

যে সময় বিজয়সিংহ লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন সে সময় সেখানে মানবের বাস ছিল না। দ্বীপটি যক্ষদিগের বাসস্থান ছিল। পাছে যক্ষগণ বিজয়সিংহের অনুচরবর্গকে বিনাশ করে এইজন্য দেবগণ তাহাদের রক্ষা করিতে যত্নবান হইলেন। তাপসের রূপ ধরিয়া একজন দেবতা বিজয়-সিংহের নিকট উপস্থিত হইলেন ও তাঁহার অনুচরবর্গের উপর পবিত্র জল সিঞ্চন করিয়া প্রত্যেকের হাতে এক একটি রক্ষাকবচ বাঁধিয়া দিলেন। কিছুক্ষণ পরেই এক যক্ষিণী বিজয়সিংহের অনুচরবর্গকে দেখিতে পাইল কিন্তু তাহাদের হাতে রক্ষাকবচ থাকায় কাহারও কিছু অনিষ্ট করিতে পারিল না। অবশেষে সে এক অসামান্য সুন্দরী রমণীর রূপ ধারণ করিয়া কৌশলে একের পর অন্য বিজয়-সিংহের সকল অনুচরকে এক মায়া-সরোবরে নিক্ষেপ করিল। শেষকালে বিজয়সিংহও যক্ষিণীর নিকট আসিলেন, কিন্তু যক্ষিণী তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করিতে পারিল না। বিজয়সিংহের নিকট পরাজিত হইয়া যক্ষিণী তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল। সেই রাত্রে একস্থানে সকল যক্ষ মিলিত হইয়া আমোদ প্রমোদে উন্মত্ত ছিল। বিজয়-সিংহ সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার অনুচর-

পারস্যরাজ খসরু ও তাঁহার মহিষী সিরীন।

অংশ। পরাভূত হইয়া যক্ষগণ পালাইতেছে, যক্ষিণীগণ যুক্তকরে প্রাণ ভিক্ষা চাহিতেছে। যক্ষিণীদিগের রূপ বীভৎস, মুক্ত জটা, লম্বিত স্তন। চতুর্থ চিত্র বিজয়সিংহের অভিষেক-সভা।

অজন্তায় আর-একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক চিত্র আছে। অনুমান করা হইয়াছে এই চিত্রটির বিষয় দাক্ষিণাত্যের চালুক্য বংশীয় নৃপতি দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজসভায় পারস্যরাজ দ্বিতীয় খসরুর প্রেরিত দূতের অভ্যর্থনা। প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল কি না তাহার কোন প্রমাণ নাই। ইতিহাসে কেবল এইমাত্র পাওয়া যায় যে দ্বিতীয় পুলকেশী দ্বিতীয় খসরুকে কিছু উপঢৌকন দিয়া পারস্যদেশে দূত প্রেরণ করেন ও গোপনে সেই সঙ্গে খসরুর পুত্রকে একটি পত্র পাঠান। খসরু যে পুলকেশীর নিকট দূত প্রেরণ করেন ইতিহাসে তাহার কোন উল্লেখ নাই। এ প্রমাণাভাব থাকিলেও ইহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে যে খসরুও পুলকেশীর নিকট দূত পাঠাইয়া থাকিবেন। কিন্তু খসরুর দূত সম্ভবতঃ পুলকেশীর দূতের পূর্ব্বে প্রেরিত হইয়াছিল, কারণ পুলকেশীর দৌত্যের সহিত যে পত্র খসরুর পুত্রকে পাঠান হইয়াছিল তাহাতে গোপনে খসরুকে রাজ্যবিচ্যুত করিবার কথা ছিল। ইতিহাসে পাওয়া যায় এই পত্রটি খসরুর হস্তগত হয় এবং তিনি পুলকেশীর উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। এ ঘটনার পর পুলকেশীর সভায় খসরুর সখ্য-সূচক দূত প্রেরণ করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক অজন্তার এই চিত্রের বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও উহার যে কোন পারস্য ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত সম্বন্ধ আছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অজন্তায় আরও কয়েকটি চিত্র ভিন্ন ভিন্ন গুহায় দেখা যায় যাহাতে পারসিকের মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। দৌত্য-চিত্রের নিকট যে কয়েকটি এইরূপ চিত্র আছে তাহার মধ্যে

দিগের সহিত যক্ষগণের ভীষণ যুদ্ধ বাধিল। যক্ষদিগের আমোদ প্রমোদ ঘুচিয়া গেল; তাহারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু একে একে তাহারা বিনাশপ্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং যখন তাহাদের অধিনায়ক কালসেন নিহত হইল তখন যক্ষগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া যে যেখানে পারিল পালাইয়া গেল। সেই অবধি লঙ্কা যক্ষ-বিমুক্ত হইল। বিজয়সিংহ লঙ্কা অধিকার করিলেন ও তাঁহার অনুচরবর্গ তথায় বাস করিতে লাগিল। বিজয়সিংহ লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন বলিয়া সেই অবধি লঙ্কার নাম হইল সিংহল।

বিজয়সিংহের সিংহল বিজয়ের যে চিত্রাবলী অজন্তায় অঙ্কিত আছে তাহা হইতে চারিটি চিত্রের প্রতিনিধি এই প্রবন্ধের সহিত মুদ্রিত হইল। প্রথম চিত্রে বিজয়সিংহের লঙ্কায় অবতরণ অঙ্কিত হইয়াছে। তাঁহার রাজছত্রে X চিহ্ন লক্ষিত হইবে। দ্বিতীয় চিত্র যুদ্ধক্ষেত্রের। যক্ষদিগের সহিত বিজয়সিংহের অনুচরদিগের ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়াছে। বিজয়সিংহ (× চিহ্নিত) আকর্ণ জ্যা টানিয়া তীর ছুড়িতেছেন। তৃতীয় চিত্র পূর্ব্বোক্ত চিত্রের আর-একটি

একটি দ্বিতীয় খসরু ও তাঁহার পত্নী সিরীন বলিয়া বিবেচিত হয়।

অজন্তায় এককালে এইরূপ ঐতিহাসিক চিত্র কত ছিল বলা যায় না। কিন্তু যে কয়েকটি চিত্রের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে তাহা দেখিলে ইহা স্পষ্ট বোঝা যায় যে প্রাচীনকালে প্রধান প্রধান স্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর যথেষ্ট সমাদর হইত এবং যাহাতে সেগুলির স্মৃতি লোপ না পায় তাহার জন্য বিশেষ যত্ন হইত।

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

বিবাহ-বৈচিত্র্য

পৃথিবীর সভ্য অসভ্য ও অর্দ্ধসভ্য সকল জাতির মধ্যে প্রচলিত বিবাহ-প্রথাকে সমাজের উন্নতির বেশ একটি মাপকাঠিরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। সভ্যতার একই স্তরে অবস্থিত অনেক জাতি বিভিন্ন দেশে বাস করে, বিভিন্ন ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করে এবং বিভিন্ন বংশ হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, কিন্তু বিবাহাদি প্রথায় তাহাদের পরস্পরের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধে আমরা কতকগুলি অদ্ভুত সামাজিক প্রথার কথা বলিব। এই দেশাচারগুলি আমাদের নিকট যে পরিমাণে অপূর্ব্ব বলিয়া বোধ হয়, আমাদের দেশের প্রথাগুলিও অন্যান্য জাতির নিকট ঠিক সেই পরিমাণেই অপূর্ব্ব বলিয়া বোধ হইতে পারে। কাজেই ইহাদের অপূর্ব্ব বা অদ্ভুত না বলিয়া অজ্ঞাত বা অপরিচিত বলাই অধিকতর সঙ্গত।

ফিজিদ্বীপের রমণী-জীবন দুই কথায় বলিতে হইলে বলা যায়, বাল্যকাল হাস্যমুখরিত, এবং অবশিষ্ট জীবন দাস্যপীড়িত ও অশ্রুধৌত। চিরকালই তাহাদের জীবন এইভাবে চলিয়া আসিতেছে। ফিজিদ্বীপনিবাসীরা যখন নরভুক্‌ ছিল, তখন হইতেই তাহারা শিশু বালিকার বাক্‌দান করিত, ব্রিটিশসাম্রাজ্যভুক্ত হইবার পরেও তাহা করিয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই বর বিগতযৌবন। দেখিলে মনে হয় কন্যা যত শিশু হইবে বরের যেন সেই পরিমাণে বৃদ্ধ হওয়াই নিয়ম; শীত বসন্তের বিবাহ বলিলেই হয়।

প্যালেষ্টাইনের একটি বাক্‌দত্তা কন্যার বেশ।

এই প্রথায় অনেক মুস্কিল ছিল। বাগদত্তাকন্যার কোন অপরাধের জন্য পিতাকে জামাতার নিকট দায়ী থাকিতে হইত। বাগ্‌দানের চুক্তি ভঙ্গ করিলে কঠিন দণ্ড হইত। বালিকা নায়ক কিম্বা দলপতির বংশের বাগ্‌দত্তা বধূ হইলে মৃত্যুই তাহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত, কিন্তু সাধারণতঃ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক তিমি মৎস্যের দাঁত কিম্বা সেই রকম আর কিছু দিলেই অপরাধ মার্জ্জনা করা হইত। কোন কোন ফিজিযুবক কখন কখন বাগ্‌দানজালমুক্তা পরিচিতা বয়স্থা

কুমারীকে পছন্দ করিতে পাইত; পৃথিবীর যে-কোন স্থানের নবীন যুবকেরাই ত ইহা করিয়া থাকেন। এই-রূপ স্থলে প্রাথমিক মনোরঞ্জন ও প্রণয় নিবেদনের ব্যাপারটা ভাবী স্বামীকেই করিতে হয়।

আজকাল ফিজিয়ান গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন যে ভাবী বধূর জন্য গৃহ না থাকিলে বিবাহ হইতে পারিবে না। গৃহের সংস্থান ঠিক করিয়া বর পুরাতন প্রথা-অনুসারে কন্যার গৃহে প্রণয়-নিবেদন করিতে যায়। সারাঅঙ্গে

এসিয়া মাইনরের শিশু দম্পতি।

নারিকেল তেল মাখিয়া, মাথার চুলগুলি একটা বৃহৎ টুপির মত করিয়া বাঁধিয়া, অপরূপ ভারিকি চালে বর কন্যার পিতৃগৃহে উপস্থিত হন; তারপরে তিমির দাঁত, কাপড়, মাদুর প্রভৃতি উপহার দিয়া তাঁহাদের নিকট কন্যাভিক্ষা করেন। কন্যার পিতামাতা রাজি হইলে, তাহার সখীরা তাহাকে তাহার শ্বশুরালয়ে লইয়া যায়; সেখানে আবার ঐ-সকল উপহার দিতে হয়। তারপর কন্যা খুব একপালা কান্না জুড়িয়া দেয়, এই বিদ্যায় ফিজি-রমণীরা আশ্চর্য্যরকম পটু। ম্লানমুখী সুন্দরীরা তাহাকে বেষ্টন করিয়া সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করে ও ছোটখাট কিছু উপহার দেয়; বেশ-খানিকক্ষণ পরে কন্যা হঠাৎ শান্ত হইয়া যায়। ইহাকে বলে "অশ্রুমোচন"।

তাহার পর কন্যাকে তাহার ভাবী প্রভুর রন্ধন খাইতে দেওয়া হয়। কোন কোন স্থলে ইহার পরে বধূ তিন চারি দিন ধরিয়া হলুদ মাখিয়া তাহার নবগৃহে বসিয়া থাকে।

মিশর দেশের নববধূ পূর্ণ বিবাহবেশে।

এই বিষম পরীক্ষার সময় তাহার স্ত্রীবন্ধুগণ ব্যতীত আর কেহ নিকটে যাইতে পায় না। এই অপূর্ব্ব 'গায়ে হলুদের' পরে কন্যা মনের সুখে একটা লোণাজলের পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া লয়, সেইখানে সখীদের সঙ্গে হাসিগল্প করিতে করিতে তাহাদের সাহায্যে কতকগুলি মাছ ধরে; ইহারা এই বিদ্যায় সিদ্ধহস্ত। বধূ এই মাছ দিয়া তাহার ভাবী স্বামী ও বন্ধুদের জন্য এক ভোজের আয়োজন করে।

ভোজের সমস্ত প্রস্তুত হইলে বর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে

তেল মাখিয়া সাজসজ্জা করিয়া বন্ধুবান্ধব সহ উপস্থিত হয়; কিন্তু ভোজ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে বরকন্যা উৎসব-সজ্জা খুলিয়া দুখানা ছোট কাপড় কোমরে জড়াইয়া আসে। তখন কন্যা স্বামীকে স্বহস্তপক্ব খাদ্য দিয়া তাহার গার্হস্থ্য-জীবনের কর্ত্তব্যের সুচনা করে। ইহার পর আবার উপবাসের পালা আসে। এই অনুষ্ঠান শেষ করিয়া নব দম্পতির মুক্তি হয়।

আরবরমণী বিধবা হইবার পর বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইলে, বিবাহের পূর্ব্বরাত্রে মৃত স্বামীর সমাধিস্থলে গিয়া তাহার নিকট হাঁটু গাড়িয়া প্রার্থনা করিতে বসে। সে অনুনয় করিয়া বলে, "তুমি আমার অপরাধ গ্রহণ করিয়ো না, ঈর্ষ্যান্বিত হইয়ো না" মনে মনে মৃত স্বামীর ক্রোধের ও ঈর্ষ্যার ভয় থাকে বলিয়া সে গাধার পিঠে করিয়া দুই মোশক জল সঙ্গে আনে। প্রার্থনা ও মিনতি প্রভৃতি হইবার পর সে এই বিরক্তিকর ঘটনায় প্রথম স্বামীর মন ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য কবরের উপর জল ঢালিতে আরম্ভ করে।

নিউগিনির উত্তরে একটি প্রকাণ্ড সুন্দর দ্বীপে অসভ্য নরভুক্ জাতি বাস করে। তাহাদের বিবাহ-প্রথার একটু বিশেষত্ব আছে। মিঃ উইলফ্রেড পাওএল এই অজ্ঞাত দ্বীপে প্রায় তিন বৎসর কাটাইয়াছেন। তিনি বলেন, যখন কোন দ্বীপবাসী যুবক অবিবাহিত জীবনে ক্লান্ত হইয়া জীবনসঙ্গিনী লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তখন সে তাহার মনের কথা পিতা কিম্বা মাতার নিকটে বলে, সেই সঙ্গে তাহার বাঞ্ছিতার নামটিও বলিয়া দেয়। পিতামাতা না থাকিলে সেই প্রদেশের দলপতির কাছে বলে। বরকে ঝোপজঙ্গলের মধ্যে পাঠাইয়া দিয়া তাহার আত্মীয় বন্ধুরা কন্যার আত্মীয়ের নিকট যায়। তাহাদের উপহারাদি দিয়া কন্যার দরের কথা তোলে। অনেক দরদস্তুরের পর মূল্য স্থির হয়; প্রায়ই কন্যাপক্ষের জয় হয়। বিবাহের দিনে কন্যা আত্মীয়স্বজনের সহিত ভাবী স্বামীর গৃহে যাত্রা করে। সেখানে ভোজ ও নাচ হয়। নাচে কন্যাই প্রধান অংশ গ্রহণ করে। উৎসবান্তে অতিথি অভ্যাগতরা কন্যাকে রাখিয়া চলিয়া যায়। এতক্ষণ পর্য্যন্ত বেচারা বর ঝোপের মধ্যে একাকী বসিয়াই থাকে। অতিথিগণ বিদায় হইবা-

য়ুডিয়ার নববধূর যৌতুকলব্ধ মুদ্রা গাথিয়া মাথার টুপি।

মাত্র তাহাকে আনিবার জন্য লোক পাঠান হয়। অনেক সময় শুভদিনে অশুভের আগমন হয়, কারণ বেচারা বর এই ভীষণ নির্জ্জনতা সহ্য করিতে না পারিয়া অরণ্যের মধ্যে অনেক দূরে গিয়া পড়ে, কখন বা কোনও শত্রুদল তাহাকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া দুর্ভাগাকে মারিয়া আহার করিয়া চলিয়া যায়।

স্ত্রী সর্ব্বদাই স্বামীর সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হয়, এমন কি তাহার জীবন মরণও স্বামীর হাতে। বিবাহ-সংক্রান্ত নিয়মগুলির বেশ কড়াকড়ি আছে। প্রত্যেক জাতিতে (tribe) দুইটি বিভিন্ন ভাগ আছে। কতকটা আমাদের দেশের গোত্রের মতন বোধ হয়। এই এক গোত্রের বর ও কন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ। সচরাচর পুরুষেরা অন্য জাতির রমণী কিনিয়া কিম্বা চুরি করিয়া লইয়া আসে। একই জাতির মধ্যে বিবাহ চলিলে জাতি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, ইহা তাহারা কোনপ্রকারে জানিতে পারিয়াছে। বিবাহযোগ্য কুমারীর দুগুণ মূল্য, একগুণ কন্যার পিতা-মাতার প্রাপ্য, আর একগুণ কন্যার জাতির সমাজপতির অনুমতি গ্রহণের মূল্য; এই অনুমতি না হইলে বিবাহ
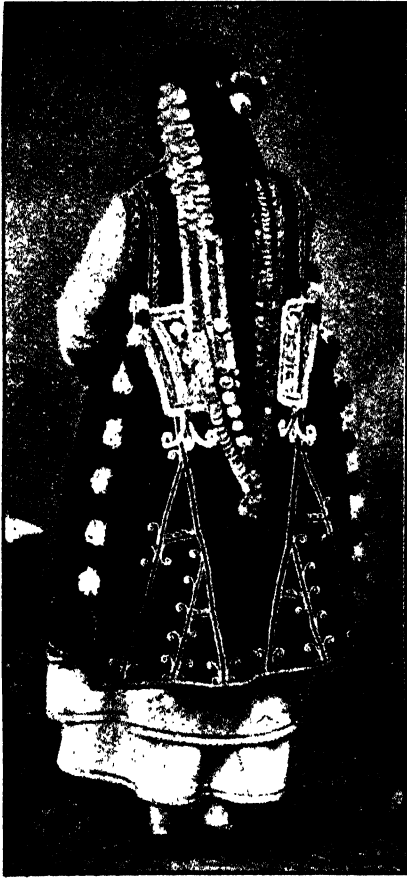
বুলগেরিয়ার বধূর বিবাহের যৌতুকের মুদ্রা গাঁথিয়া কেশের অলঙ্কার।

হইতে পায় না। দলপতির অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করিলে মূল্যস্বরূপ বরের জীবন দিতে হয়।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে সালিয়ান ফ্রাঙ্কদের (Salian Franks) রাজা ক্লভিস্ Clovis) বিবাহের সময় বধূকে একটি সু (ডবল পয়সা) ও একটি দেনিয়ে (আধ পাই) দিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই বোধ হয় বধূকে বরের অর্থদান একটি আইনসম্মত উপহার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফ্রান্সে ইহা আজও চলিত আছে। মুদ্রার মূল্য অবশ্য বরকন্যার অবস্থার উপর নির্ভর করে। ইংলণ্ডে পূর্ব্বে এইরকম একটি প্রথার প্রচলন ছিল। কন্যা কিম্বা তাহার সঙ্গিনী একটি সুদৃশ্য থলি সঙ্গে রাখিতেন, ইহাতে বরের প্রদত্ত অর্থ থাকিত। গ্রাম্য-প্রদেশে এই নিয়ম বহুদিন পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। ইহা হইতেই বিবাহকালীন যৌতুকের বা পণপ্রথার সৃষ্টি হইয়াছে।

তুরস্কে প্রতিনিধির দ্বারা বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। কন্যার সম্পত্তি ও বরের সম্পত্তি প্রভৃতির একখানা দলিল প্রস্তুত করা হয়, তৎপরে বন্ধু ও সাক্ষীদিগের সম্মুখে প্রতিনিধিরা বিবাহের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিলেই বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হয়। ইহারা চারিজন পর্য্যন্ত রমণীকে বিবাহ করিতে পারে। স্বামী স্ত্রীকে কিছু-না-কিছু যৌতুক দিতে বাধ্য। এই অর্থের কিয়দংশ বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার পোষাক পরিচ্ছদের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ তাহার পিতামাতা পাইয়া থাকেন। বাকি অর্থ কয়েক জন বন্ধুর নিকট গচ্ছিত থাকে। বিবাহের পূর্ব্বদিনে কন্যা যখন সদলে স্নান করিতে যায়, তখন একটি সুন্দর পবিত্র অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বিবাহ-উপলক্ষে কন্যার চুল ও পা দুখানি রক্তবর্ণে রঞ্জিত হয়, তাহার অগ্রে আলো জ্বালাইয়া মশালধারীরা চলে। বিবাহের পরদিন বরের প্রতিনিধি আসিয়া মহাআড়ম্বরের সহিত বধূকে লইয়া যায়। বিবাহের মিছিলের সঙ্গে অভ্যাগতরাও যোগ দেন। ইঁহাদের মধ্যে বধূর যে-সমস্ত আত্মীয় থাকেন, তাঁহাদের প্রায়ই ভীষণভাবে বিলাপ করিতে শোনা যায়। রাস্তা দিয়া এইরূপে যাইতে যাইতে যত লোকের সঙ্গে দেখা হয় বধূ সকলকে নমস্কার করিয়া যান, অন্যসময় এইরূপ করা নিষিদ্ধ। এই দেশে কোন বর যদি ভগিনীগণের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠাকে প্রথমে বিবাহ করেন তাহা হইলে সেই স্ত্রীর বর্ত্তমানে কিম্বা অবর্ত্তমানে তাঁহার অন্য ভগিনীগণকেও বিবাহ করিতে পারেন, ইহার অন্যথা হইলে আর পারেন না। এই-সমস্ত প্রথা মুসলমান-আইনের অনুমত।

রুশিয়ার গ্রাম্যবধূরা বিবাহের পর গির্জ্জা হইতে বাড়ী ফিরিয়া তাহাদের কেশগুচ্ছ কাটিয়া সযত্নে রাখিয়া দেয়। সে দেশের কৃষকদের মধ্যে প্রচলিত একটি মনোহর সঙ্গীতে শোনা যায় নববধূ তাঁহার সদ্যকর্ত্তিত স্বর্ণকুন্তলের জন্য বিলাপ করিতেছেন। বিবাহ-অনুষ্ঠানের মধ্যে পুরোহিত বর ও বধূকে খাদ্য লাভের জন্য আশীর্ব্বাদ করেন। তৎপরে তাহাদের দুই হস্ত একত্র করিয়া উভয়কে জিজ্ঞাসা করেন, "তোমরা কি পরস্পরের প্রতি সুব্যবহার করিতে ও উত্তমরূপে গৃহধর্ম্ম পালন করিতে প্রতিশ্রুত হইবে?" তাহার পরে তাহাদের মস্তকে একটি সোমরাজের (worm-

wood) মালা স্থাপন করেন। বিবাহিত জীবনের আনন্দ-স্রোতের মধ্যে যে মাঝে মাঝে দুঃখের বাধা আসিয়া পড়িতে পারে ইহা দ্বারা তাহাই বুঝাইয়া দেওয়া হয়। নবদম্পতিকে শুভ আশীর্ব্বাদ করিয়া পুরোহিত বিবাহ অনুষ্ঠান শেষ করেন।

ইহার পর আর-একটি অপূর্ব্ব অনুষ্ঠান হয়। পুরোহিত নবদম্পতির মঙ্গলকামনা করিয়া একটি গিল্টি-করা কাষ্ঠ-পাত্রে মদ্যপান করেন। বর ও বধূ উভয়েই তাঁহার অনু-

সিংহলের এক রাজদম্পতি।

করণ করিবার পর বর পানপাত্রটি মাটিতে আছড়াইয়া পা দিয়া গুঁড়া করিয়া ফেলিতে ফেলিতে চীৎকার করিয়া বলেন, "যাহারা ঈর্ষাপরবশ হইয়া আমাদের পরস্পরের মধ্যে অসদ্ভাব জাগাইয়া তুলিতে ও আমাদের অনিষ্ট করিতে চায় তাহারা যেন এইরূপে পদদলিত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।" ইহা অনেকটা আমাদের দেশের ছাদনাতলায় স্ত্রী-আচারের সময় বরকন্যার শুভদৃষ্টি উপলক্ষ্যে নাপিতের সকল কুলোককে গালি ও অভিসম্পাত দিয়া ছড়া কাটিবার নিয়মের অনুরূপ। ইহা অপেক্ষাও মজার আর-একটি প্রথা রুশিয়াতে প্রচলিত আছে। বিবাহের পর বাড়ীতে পৌঁছিয়া স্বামী স্ত্রীকে তাঁহার জুতা খুলিয়া দিতে আজ্ঞা করেন এবং বলেন যে, আমার এক হাতে চাবুক ও আর-এক হাতে টাকার থলি আছে তুমি একটি বাছিয়া লও। স্বামী ভবিষ্যতে তাঁহার উপর সদয় ব্যবহার করিবেন কি নির্দ্দয় ব্যবহার করিবেন বেচারী স্ত্রীর এই নির্ব্বাচনের উপরই তাহা নির্ভর করে।

সুইডেনে কন্যা যদি বরের অগ্রে বেদীর সম্মুখে দক্ষিণ পদ রাখিতে পারে, তাহা হইলে বিবাহিত জীবনে সে বরের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিবে। আবার বিবাহের দিন সকালে বর তাহাকে দেখিবার পূর্ব্বেই যদি সে বরকে দেখিতে পায় তবে তাহার প্রতি তাহার স্বামীর ভালবাসা চিরকাল স্থির থাকিবে এইরূপ বিশ্বাস। ইহুদী বরকন্যা বিবাহের সময় একটি পাত্র হইতে পান করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলে। ইহা তাহাদের মনে পার্থিব সুখের ক্ষণস্থায়িত্ব জাগাইয়া দেয়।

কোরিয়ার যুবকদের চুলের ধরণ দেখিলেই বিবাহিত কি অবিবাহিত বোঝা যায়। অবিবাহিত যুবক একগুচ্ছ চুল পিঠের উপর ঝুলাইয়া খোলা মাথায় থাকেন। বিবাহের পর চুলের গ্রন্থি বাঁধিয়া তাহা মাথার উপর তুলিয়া দেন। বিবাহের গ্রন্থি চুলের উপর গিয়া পড়ে।

শ্রীজগদ্দুর্লভ ভট্টাচার্য্য।

উপলখণ্ড

চিত্রকলা অনুকরণ নহে; ভাষার ন্যায় প্রকাশের একটি উপায় মাত্র। চিত্রের সার্থকতা প্রকৃতির অনুগামী হওয়ায় নহে; ভাবের পরিস্ফুট ব্যঞ্জনায়।

পুরুষ দেবতা নহে; নারী পূজার কুসুম নয়।

মেঘ কাহার জন্য বারিধারা সঞ্চয় করিতেছে? বিদ্যুৎ কাহার জন্য বজ্র নির্ম্মাণ করিতেছে?

শ্রেষ্ঠকাব্য লিখিতে হইলে কবিত্ব, ভাবুকতা এবং কলার (লিপিকৌশলের) সামঞ্জস্য করিতে হইবে। শুধু কবিত্ব

অবসাদ আনয়ন করে ; ভাবহীন কলা—ক্ষণিক, কলাহীন ভাবুকতা—অসহ্য।

ভাবের আবেগে স্পন্দিত হও ; নদীর মত প্রবাহিত হও ; সমুদ্রের মত গভীর হও ; উর্ম্মির মত আঘাত কর ; অগ্নিগর্ভ গিরির মত জ্বলিয়া ওঠ।

কবি এবং চিত্রকর অনুভূতির দ্বারা সকল সৌন্দর্য্যের যিনি আধার তাঁহার পরিচয় পাইয়া থাকেন, তাই তাঁহারা বিচিত্র সৌন্দর্য্যময়ী প্রকৃতিকে আরও সুন্দর করিয়া তুলিতে পারেন।

সৌন্দর্য্য চিরসুন্দরকে মনে করিয়া দেয়, আবার তাঁহাকে ভুলাইয়াও দেয়। চিত্রে সৌন্দর্য্যের আবশ্যকতা আছে ; কিন্তু পবিত্র ও গভীর ভাবের আবশ্যকতা আরও অধিক।

আজ দিবাশেষে রবি তাহার সমস্ত আলোক লইয়া পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে ; কাল প্রভাতে আবার নূতন সূর্য্যের নবীন আলোকে প্রাচীর দেহে পুলক-সঞ্চার হইবে।

কবিতার পরিণতি মধুর ভাষা ও সুন্দর ছন্দে নহে ; তাহার সার্থকতা কবিত্বে ও ভাবে।

পূজনীয় হইতে চেষ্টা করিও ; কৃপাপাত্র হইবার দীনতা স্বীকার করিও না।

পদ্ম পূর্ব্বদিকে চাহিয়া থাকে নবোদিত রবির কিরণ-ধারায় হৃদয়কে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য ; আমরা নয়ন মুদিত করিয়া পশ্চিমে ফিরিয়া রহিয়াছি গত দিবসের কিরণোজ্জ্বল আকাশকে হৃদয়ে অনুভব করিবার জন্য।

চিত্রে যাহা রেখা, কাব্যে তাহা ছন্দ ; চিত্রে যাহা বর্ণ-সুষমা, কাব্যে তাহা ভাষা। যেমন কোমল ভাষা এবং নিষ্কলঙ্ক ছন্দ হইলেই কাব্য হয় না, তেমনি অপূর্ব্ব বর্ণ-সুষমা এবং নির্ভুল রেখাপাতেই চিত্র হয় না। উভয়েরই পরিণতি শুধু সৌন্দর্য্যে নহে—ভাবে। উভয়কেই প্রাণের স্পন্দনে সঞ্জীবিত হইতে হইবে।

কল্পনা যাহাকে সৃষ্টি করে, প্রত্যক্ষ তাহাকে ধ্বংস করে।

যে দেশে জাতীয় একতা বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে সে দেশে পারিবারিক একতা বিরল। যে দেশ পারিবারিক একতার গর্ব্বে স্ফীত সে দেশ জাতীয় একতার মহিমা কবে বুঝিবে ?

কাব্য ও দর্শন মূলতঃ একই। কাব্য প্রেমের পথ ; দর্শন জ্ঞানের পথ। কাব্য হৃদয়ের দ্বারা যাহা উপলব্ধি করে, দর্শন বুদ্ধির দ্বারা তাহার বিচার করে।

চিত্রে ভাবপ্রবণতা বিকৃতি নহে ; সৌন্দর্য্য—দেহের পরিপূর্ণ লাবণ্য বিকাশে নহে।

ভাষা ভাবকে যেরূপ প্রকাশ করে সেইরূপ নিবিড়ও করিয়া তোলে।

চন্দ্রকরে তরল আকাশ কাহার জন্য ? আবার ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ মেঘময় আকাশই বা কাহার জন্য ?

পার্থিবতা চাও—ইউরোপের বর্ত্তমান শিল্পে পাইবে। স্বর্গকে জানিতে চাও—ভারতশিল্পে পাইবে।

নানারূপ পাখীর কলরবে পূর্ণ বিশাল বট দেখিলেই একান্নবর্ত্তী পরিবারের কথা মনে পড়ে।

কুসুমকে প্রখর রৌদ্র-তাপের অন্তরালে রাখিও, কিন্তু আলোক ও সলিলকণা হইতে বঞ্চিত করিও না।

অন্বেষণ কর—সঞ্জীবনী সুধা মিলিবে।

কাব্যে ভাবকে সহজ করিবার জন্য ভাষা ও ছন্দকে খর্ব্ব করিবার দরকার হইয়া পড়ে ! চিত্রে তাহার আত্মাকে পরিস্ফুট করিবার জন্য সৌন্দর্য্যকে খর্ব্ব করিতে হয়।

তোমার আপন হৃদয়ের স্পন্দন থামিয়া গিয়াছে তাই জগতের প্রাণের স্পন্দন বুঝিতে পারিতেছ না।

কবি এবং বৈজ্ঞানিক উভয়ে একেরই উপাসক। কবি যাহাকে তাঁহার সমস্ত প্রেম উপহার দেন, বৈজ্ঞানিক তাঁহাকে তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করেন। কবি হৃদয়ের বিনিময়ে যাঁহার অন্তর-রহস্য জানিতে চান, বৈজ্ঞানিক স্বাস্থ্যের বিনিময়ে তাঁহাকেই বুঝিতে চেষ্টা করেন। কবি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ; বৈজ্ঞানিক একনিষ্ঠ সাধক।

বন আপনার নবীন পল্লবের মহিমায় গর্ব্বিত ; আমরা পুরাতনের গৌরবে ভাবমগ্ন।

স্বর্গকে স্বর্গরূপে দেখিতে চাও—ভারতশিল্প দেখিও। পৃথিবীতে স্বর্গ দেখিতে চাও—প্রাচীন ইতালির শিল্পের আলোচনা করিও।

জগতের বিচিত্র রসধারায় স্নান করিয়া কৃতার্থ হও, সকল রসধারা যাঁহা হইতে প্রবাহিত তাঁহাকে স্পর্শ করিবার যোগ্য হইবে।

ভারত অসীমকে সীমাবদ্ধ করিতে চাহিয়াছে—মূর্ত্তিশিল্পে। সীমাবদ্ধকে অসীমত্ব আরোপ করিয়াছে—উপনিষদে।

কর্ম্ম কর—প্রাণের স্পন্দনে আপনিই সঞ্জীবিত হইবে। অগাধ আলস্যে ডুবিয়া থাক—মরণ আপনিই আসিবে।

চিত্রে বাস্তবতার আবশ্যক—সাধারণকে ভুলাইবার জন্য। ভাবপ্রবণতার আবশ্যক—চিত্রকরের কৃতার্থ হইবার জন্য।

গিরিগৃহে যখন বৃষ্টিধারা নামিয়া আসে তখন শিলা নির্ঝরের গতি রোধ করিতে পারে না। একটা জাতির হৃদয়ে যখন ভাবধারা নামিয়া আসে তখন কেহই তাহাকে তাহার লক্ষ্য হইতে দূরে রাখিতে পারে না।

সমুদ্র আপন বীর্য্যে অসংযত; গিরি আপন মহিমায় অটল; নদী তাহার সলিলস্ফীত গর্ব্বে প্রবাহিত; কানন তাহার কুসুমসম্পদে সুখী, মেঘ সলিলকণায় স্নিগ্ধ; আর আমরা?—আপন দীনতায় ম্রিয়মাণ।

আগ্নেয়গিরির গহ্বরে যখন উত্তপ্ত ধাতুদ্রব সঞ্চিত হইতে থাকে, তখন সহসা সে একদিন গ্রাম নগর এবং বনরাজিকে ধ্বংস করিবার জন্য সেই উগ্র এবং তরল ধাতুধারাকে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। একটা জাতি যখন আপন বীর্য্যে অসংযত, তখন সে স্বতঃই একদিন ধ্বংসের আনন্দে মত্ত হইয়া উঠে।

শ্রীকৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী।

তালের চিনি

ভারতবর্ষের সমতলভূমিতে তালের (Borassus Flabellifer) মতো এরূপ বন্যগাছ আর নাই। নারিকেল, সুপারী প্রভৃতি তালজাতীয় অন্যান্য গাছ লোণা এবং ভিজা জায়গা ভিন্ন হয় না এবং বন্যভাবে জন্মাইতে তাহাদের কদাচিৎ দেখা যায়, কিন্তু তাল মানুষের চেষ্টাযত্নের কোন অপেক্ষা না করিয়া আপনা-আপনিই জন্মায় এবং বাড়িয়া উঠে। ইহার রস অনেকদিন হইতে চিনির জন্য প্রসিদ্ধ। মান্দ্রাজের দক্ষিণ প্রদেশে এবং উত্তর ব্রহ্মে এই রস জাল দিয়া গুড় তৈয়ারী হয়; এই গুড় বাহিরে বড় একটা আসিতে পায় না, স্থানীয় লোকেরাই ইহা কিনিয়া লয়। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে বিহারের মতো স্থানে যেখানে তালগাছ অজস্র পরিমাণে জন্মায়, সেখানে লোকে ইহার রস হইতে শুধু "তাড়ি" নামক মাদকদ্রব্য প্রস্তুত করে; ইহার রস হইতে যে ভাল চিনি পাওয়া যায় সেকথা সেখানে কেহ জানে বলিয়া মনে হয় না।

চৈত্রমাসে তালগাছে ফুল ধরিতে সুরু করে এবং তখন হইতেই তাড়ির সময় আরম্ভ হয়; ভাদ্র আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত তাড়ি তৈয়ারী পুরাদমে চলে। পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়গাছ হইতেই রস পাওয়া যায়, কিন্তু একই সময়ে স্ত্রী-গাছ পুরুষ-গাছের প্রায় দেড়গুণ রস দেয় এবং স্ত্রী-গাছের রসে চিনির পরিমাণ পুরুষগাছের অপেক্ষা ঢের বেশী। বিহারে পুরুষ-গাছকে "সিশ" এবং স্ত্রী-গাছকে "ফালা" বলে। স্ত্রী-গাছ হইতে প্রায় সারা বৎসরই রস পাওয়া যাইতে পারে, তবে শীতকালে রসের পরিমাণ অনেক কমিয়া যায়। পুরুষ-গাছ হইতে প্রায় একহাত লম্বা গোছা গোছা মোটা ডাঁটা বাহির হয়, তাহাকে বাংলা দেশে জটা বলে। এই-সকল ডাঁটার উপর অসংখ্য ছোট ছোট ফুল থাকে। এই-সকল ফুল পুরুষ-ফুল, সুতরাং তাহাদের হইতে ফল বাহির হয় না, স্ত্রী-ফুলের গর্ভসঞ্চার হইলেই তাহাদের কাজ শেষ হইয়া যায়, তখন তাহারা ঝরিয়া পড়ে। খুব তীক্ষ্ণ ছুরী দিয়া এই-সকল ডাঁটার অগ্রভাগ কাটিয়া দিয়া গোটাকতক ডাঁটা একসঙ্গে একটা ভাঁড়ের মধ্যে ঢুকাইয়া দেওয়া হয়; এই-সকল ডাঁটা হইতে রস চুইয়া বাহির হয় এবং পাতার বোঁটা হইতে ঝুলানো সেই ভাঁড়ের মধ্যে গিয়া জমে। স্ত্রী-গাছ হইতেও ঐরূপ অসংখ্য-ফুল-সংযুক্ত ডাঁটা বাহির হয়, এই-সকল স্ত্রী-ফুল পরে ফলে পরিণত হয়। পুরুষ-গাছের ন্যায় এই-সকল ডাঁটারও অগ্রভাগ কাটিয়া ফেলিয়া গোটাকতক একসঙ্গে ভাঁড়ের মধ্যে ঢুকাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহার মধ্যে রস গিয়া জমে। রসের জন্য খেজুর গাছের ন্যায় তালগাছের কাঠ কাটিতে হয় না, সুতরাং রস বাহির করিলে তালগাছের কোন অনিষ্ট হয় না।

১৫—২০ বৎসর বয়স হইতে তালগাছ রস দিতে আরম্ভ করে, এবং ৫০।৬০ বৎসর রস দেয়। তিন বৎসর অন্তর এক বৎসরের জন্য গাছকে "জিরেন" দিতে হয়, তাহা না হইলে গাছ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং অবশেষে মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। দিনে দুইবার করিয়া রস পাড়া হয়—একবার সকালে ও আর একবার বৈকালে। সকাল বেলাকার রস খুব স্বচ্ছ, ঠাণ্ডা এবং বেশ সুগন্ধপূর্ণ। কিন্তু যতই বেলা বাড়িতে থাকে ততই দিনের উত্তাপে রস পচিতে (ferment) আরম্ভ করে। ঐ রস হইতে তাড়ি করবে বলিয়াই একটু বেলা না হইলে শিউলিরা রস নামায় না। একটা পূর্ণবয়স্ক গাছ হইতে পাঁচ ছয়মাস ধরিয়া প্রতিদিন সকালে ৬।৭ সের রস পাওয়া যায়। সন্ধ্যা বেলাকার রস সাধারণতঃ চিনি তৈয়ারীর পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, কারণ সারাদিনের উত্তাপের মধ্যে পচন (fermentation) বন্ধ করা এক-প্রকার অসম্ভব, সুতরাং সে রস হইতে তাড়ি করাই শ্রেয়।

তালের রসে শতকরা ১২ ভাগ চিনি (Saccharose) থাকে, গুড় (glucose) একেবারে নাই বলিলেও চলে। অধিকন্তু পত্রহরিত (chlorophyll) নামক সবুজ পদার্থ একেবারে না থাকার দরুণ তালের রস স্বচ্ছ চিনি তৈয়ারীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সুতরাং যদি সকালবেলার রস হইতে চিনি তৈয়ারী করা যায় তাহা হইলে প্রতিদিন একটা গাছ হইতে তিন পোয়া হইতে একসের পর্য্যন্ত চিনি পাওয়া যায় এবং পাঁচ ছয়মাসে প্রায় সাড়ে তিন মণ চিনি হয়, অধিকন্তু বৈকালের রস হইতে অজস্র তাড়িও পাওয়া যায়। কিন্তু রস তাজা রাখা এবং পচন বন্ধ করা বড় দুরূহ ব্যাপার। মাদ্রাজের শিউলিরা ভাঁড়ের ভিতর-দিকে চুন মাখাইয়া দেয়, তাহাতে রস পচিতে পারে না। বিহারে চুনের উপযোগিতা পরীক্ষা করা হইয়াছিল, তাহাতে ইহা বেশ কার্য্যকর বলিয়া দেখা গিয়াছে; তবে বিহারের মতো দেশে ফর্ম্যালীন্ই (formaline) এই কার্য্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গাছে লাগাইবার আগে ভাঁড়টাকে বেশ ভাল করিয়া ধোঁয়া লাগাইয়া (smoking) দুই সি-সি (c. c.) পরিমাণ ফর্ম্যালীন্ তাহার মধ্যে দিলে রস খুব তাজা থাকে এবং একটুও পচিতে পারেনা। প্রত্যেকবারই ব্যবহারের পূর্ব্বে ভাঁড়গুলিকে ভাল করিয়া ধুইয়া গরম করিয়া ধোঁয়া লাগাইতে হইবে। চুন-মাখানো রস হইতে যে চিনি পাওয়া যায় তাহার অপেক্ষা ফর্ম্যালীন্-লাগানো রসের চিনি ঢের পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হয়।

এখন পর্য্যন্তও তাল-গাছের কোন নিয়মিত চাষ হয় নাই, এই গাছ আপনা-আপনিই এখানে ওখানে জন্মাইয়া থাকে। সাধারণতঃ দুইটি পাশাপাশি জমীর সীমানায় এক এক সারি তাল গাছ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, তবে চাষের হিসাবে সেগুলিকে কেহ লাগায় নাই। যদি চিনির হিসাবে তাল-গাছের আদর বাড়ে তবে আশা করা যায় লোকে ইহার চাষের প্রতি মনোযোগী হইবে। বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের আধুনিক কৃষিরসায়ণবিদ্ এ্যানেট্ সাহেব (Mr. Annett) বলেন (Memoirs Chemical Section; Vol. II, No. 6.) যেখানে তাল এবং খেজুর পাশাপাশি জন্মায় সেখানে একটা কারখানা বেশ লাভের সহিত সারা বৎসর চালানো যায়, কারণ খেজুররসের সময় শীতকাল, এবং তখন তালের রস বন্ধ থাকে।

শ্রীনির্ম্মল দেব।

বঙ্গে অর্থনীতির চর্চ্চা

জগৎ-সভ্যতার মূল খুঁজিতে গিয়া প্রায় সকল বিষয়েই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের প্রাচীর রবিকিরণোজ্জ্বল স্বর্ণতোরণে গিয়া উপস্থিত হইতে হইয়াছে, বিশেষভাবে বর্ত্তমান সময়ে বহুধা লাঞ্ছিত ভারতবর্ষের শ্রীচরণে মাথা নোয়াইয়া সসম্ভ্রমে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে।

ইতঃপূর্ব্বে দর্শন, সাহিত্য, রসায়ন, গণিত, ভাস্কর্য্য, নৌনির্ম্মাণ প্রভৃতি বিষয়ে ভারতের অগ্রগামিতা, অসামান্য গবেষণা ও শিল্পনৈপুণ্য সভ্য জগতের নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল। সভ্য জগতের শিশু-বিজ্ঞান "অর্থনীতি"র সূত্রপাতও ভারতবর্ষে হইয়াছিল তাহা পাশ্চাত্য অর্থনীতি-বিদ্‌গণ অধুনা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন।

বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার বীজ মূলতঃ গ্রীসদেশে উপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু হিন্দু ও গ্রীকদের মধ্যে যে ভাব ও

চিন্তার গভীর আদানপ্রদান হইয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই অতীত ঘনিষ্ঠতানিবন্ধন ও গ্রীক-সভ্যতার স্থিতিশীলতা লক্ষ্য করিয়া অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত আজকাল গ্রীকদিগকে প্রাচ্যের সামিল বলিয়া ধরিয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগকে ইহুদী ও হিন্দুদিগের নিকট-আত্মীয় বলিয়া বিবেচনা করেন।

যাহাই হউক অর্থনীতিশাস্ত্রের মোটামুটি কতকগুলি সত্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ জানিলেও তাহাকে বিজ্ঞানের আকার তাঁহারা দান করেন নাই। তাঁহাদের মননশক্তির অক্ষমতার জন্য যে তাঁহারা এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই তাহা বলা চলে না, কারণ উহা অপেক্ষা দুরূহতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া তাঁহারা অদ্ভুত সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ জনসমাজ যেপ্রকার পরিণত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ অবস্থায় উপনীত হইলে অর্থনীতিশাস্ত্রের সম্যক্ অনুশীলন সম্ভবপর হইতে পারে তাঁহাদের সময়ে তাহা হয় নাই।

যে কারণেই হউক যাহা হয় নাই সেজন্য আমাদের আজ আক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই। বস্তুতঃ পাশ্চাত্য জগতে অর্থনীতি-বিজ্ঞানের বয়স এখনো দেড়শত বৎসর উত্তীর্ণ হয় নাই। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে এডাম্ স্মিথের "দি ওয়েল্থ্ অফ্ দি নেশন্স" প্রকাশিত হয়; সাধারণতঃ ঐ গ্রন্থেই সর্ব্বপ্রথম অর্থনীতি-বিজ্ঞানের পত্তন হইয়াছিল বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। য়ুরোপ বহুযুগের সাধনায় যে-সকল বিজ্ঞানে আপেক্ষিকপূর্ণতা লাভ করিয়াছে সেগুলি আজ ভারতীয় মনীষীদের শুধু অধিগত নহে, তাহারা এ-সকল বিষয়ে তাঁহাদের স্বাধীন গবেষণালব্ধ নবতর সত্য-সকল আজ সভ্য জগৎকে দান করিতেছেন। অর্থনীতির ন্যায় শিশুবিজ্ঞানকে ভারতের মাটিতে ও জলবায়ুতে লালনপালন করিয়া তাহাকে পুষ্ট করিবার সময় আসিয়াছে। এ বিষয়ে আর ঔদাসীন্য কিছুতেই শোভনীয় নহে।

এই চেষ্টায় যাঁহারা প্রবৃত্ত হইয়াছেন ও হইবেন তাঁহাদের একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। য়ুরোপ মুখে স্বীকার না করিলেও তাহার সভ্যতা বহির্মুখীন ও জড়প্রধান; অত্যুক্তি হইবে এই ভয়ে "জড়সর্ব্বস্ব" বলিলাম না, কিন্তু জড়সর্ব্বস্বতার দিকেই তাহার ঝোঁকটা বেশি তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারত চিরদিন আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝোঁক দিয়া আসিয়াছে; সুতরাং জড়সভ্যতা সৃষ্টি করিবার উপযোগী প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও বর্ত্তমান য়ুরোপীয় জড়-সভ্যতার উচ্চগ্রামে ভারত উপনীত হইতে পারে নাই। অক্ষমতা উহার কারণ নহে, অনিচ্ছাই উহার অন্তর্নিহিত কারণ। এই আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আদর্শকে খর্ব্ব না করিয়া জড়সভ্যতার উচ্চতর গ্রামে দেশবাসীকে উন্নীত করিতে হইবে এই কথাটি আমাদের মনে রাখিতে হইবে। বলা বাহুল্য কাজটি অত্যন্ত কঠিন। যে খৃষ্টীয় সভ্যতার আদর্শ, "কল্যকার জন্য ভাবিও না," "সূচীর ছিদ্র দিয়া উষ্ট্রের যাতায়াত বরং সম্ভবপর, তথাপি ধনীর স্বর্গপ্রবেশ সম্ভবপর নহে" প্রভৃতি উক্তির মধ্যে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই খৃষ্টীয় সভ্যতার বিলাসবিভ্রম ও তদানুষঙ্গিক ঔদ্ধত্য দেখিলে হিন্দুর ত্রাস জন্মানো কিছুই অস্বাভাবিক নহে। শুধু তাহাই নহে, "হিন্দু অল্পে সন্তুষ্ট" ("of a low standard of living") এই খৃষ্টোচিত অপরাধে য়ুরোপীয় উপনিবেশসমূহ হইতে হিন্দুনির্ব্বাসনের মহা আয়োজন চলিয়াছে। তথাপি এই অসম্ভব ব্রত আমাদের উদ্‌যাপন করিতে হইবে। জড়সভ্যতার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার সমাবেশ সম্ভবপর ইহা প্রমাণ করিবার ভার ভারতের উপর নির্ভর করিতেছে। খৃষ্টীয় সভ্যতা যেখানে প্রতিদিন হার মানিতেছে সেখানে আমাদের জয়পতাকা উড্ডীন করিতে হইবে।

ভারতবর্ষে অর্থনীতি সম্বন্ধে যাঁহারা এ পর্য্যন্ত অল্পাধিক আলোচনা করিয়াছেন তাহা প্রায় ইংরেজীতেই করিয়াছেন। কংগ্রেসের কয়েকজন নেতা এবং তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ-ভাবে স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নাম এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। বস্তুতঃ দত্তমহাশয় ছাড়া আর কেহ আধুনিক ভারতীয় অর্থনীতির ধারাবাহিকতা নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সম্প্রতি একমাত্র অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহাশয়ের নাম উল্লেখ করিলে আমাদের তালিকা শেষ হইয়া যায়। ইংরেজীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রচনার মধ্যে বঙ্গদেশে শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও বিনয়কুমার সরকারের নাম উল্লেখ-

যোগ্য। বাঙালায় যাঁহারা এ বিষয়ে লেখনী চালনা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় সখারাম গণেশ দেউস্কর, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

এতদিনকার প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী হইয়াও আমাদের অর্থনৈতিক সাহিত্য নিতান্ত দরিদ্র। ভাষার বিকাশ সম্বন্ধে চৈনিক ও জাপানী ভাষা সভ্য জগতের বহির্দ্বারে বাস করিলেও অর্থনীতি সম্বন্ধে উভয় ভাষাতেই বহুগ্রন্থ অনূদিত ও রচিত হইয়াছে। বাঙ্‌লাভাষা য়ুরো-ভারতীয় (Indo-European) ভাষাসমূহের মধ্যে একটি প্রধান ভাষা; জনসংখ্যার হিসাবে ধরিলে ন্যূনাধিক সপ্তকোটি লোক এই ভাষায় কথা বলে; সমাদরের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহা বিশ্বের সভায় নোবেল্ পুরস্কারে সমাদৃত হইয়াছে; সুতরাং কোনো দিক দিয়াই ইহাকে উপেক্ষার চক্ষে দেখা চলিতে পারে না। অর্থনীতি-বিজ্ঞানের উপযোগী শব্দের অভাব হইবে এরূপ আশঙ্কা অমূলক। সংস্কৃতরত্নাকর ছাড়া উর্দ্দূ, ফার্সি শব্দসমূহ আমরা অবাধে লইতে পারিব; আবশ্যক হইলে নূতন শব্দ রচনা করা যাইতে পারে, নিতান্ত শ্রুতিকটু না হইলে ফরাসী, ইংরেজী, জার্ম্মান ও ইটালীয় শব্দও প্রচলনের চেষ্টা করা যাইতে পারে। এজন্য বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ যাহাতে অবিলম্বে একটি "অর্থনৈতিক শাখা" স্থাপিত করেন তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়কে এই শাখার সভাপতি করিলে সমীচীন হইবে। আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার (যশোহর), এই সভার সহকারী সভাপতি অথবা সম্মানিত সভ্য থাকিলে খুব ভালো হয়। শীল মহাশয়ের প্রতীচ্যভাষায় জ্ঞান, রায় মহাশয়ের ব্যবসায়সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা ও শব্দজ্ঞান, ও মজুমদার মহাশয়ের প্রধান প্রধান ভারতীয় ভাষাসমূহে ব্যুৎপত্তি অর্থনীতিসম্বন্ধীয় পরিভাষা সৃষ্টি করিবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিতে পারে। সার্ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ন্যায় কর্ম্মীলোকের সহযোগিতাও একান্ত আবশ্যক। বাঙ্‌লা-দেশের মধ্যে ও বাহিরে বিভিন্ন কলেজে যে-সকল বাঙালী অধ্যাপক অর্থনীতি পড়াইতেছেন তাঁহাদের এই সভার সভ্য হইতে নিমন্ত্রণ করা হউক। এতদ্ব্যতীত যাঁহারা স্বাধীনভাবে অর্থনীতির চর্চ্চা করিয়া থাকেন তাঁহাদের সহযোগিতা সাদরে আহ্বান করা হউক। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের চতুষ্পার্শ্বে যেমন পদার্থবিদ্যায় পারদর্শী যুবকদিগের একটি মণ্ডলী রচিত হইয়াছে, আচার্য্য প্রফুল্ল-চন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া যেমন রাসায়নিকমণ্ডলী পুষ্ট হইতেছে, তেমনি আচার্য্য যদুনাথ অথবা তত্তুল্য কাহাকেও মধ্যস্থ-রূপে গ্রহণ করিয়া অর্থনীতির অনুশীলনে একদল যুবককে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত উক্ত যুবকদিগকে কামার কুমোর তেলি মুদী মাঝি মজুর কাঁসারি শাঁখারি স্যাকরা গন্ধবণিক জেলে চাষা প্রভৃতির সঙ্গে মিশিতে হইবে, এবং তাহা-দের ব্যবসায় ও জীবনযাত্রার বৃত্তান্ত প্রকাশিত করিতে হইবে। বঙ্গের বিভিন্ন অংশ হইতে এই-সকল বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া তাহার সার সঙ্কলন করিতে হইবে। এই-সকল লোকের মধ্যে কি পরিমাণ শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে ও অন্ততঃ আরো কতটুকু হইলে অপেক্ষাকৃত অল্পসময় শ্রম করিয়া অধিকতর অর্থ-উপার্জ্জনে ইহারা সমর্থ হইতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। যে-সকল ছাত্র অর্থ-নীতি অধ্যয়ন করিতেছেন তাঁহারা অবকাশমত শ্রম-জীবীদের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করিবার চেষ্টা করিবেন। ইহাতে তাঁহাদের ইজ্জৎ যাইবে না। ভারতের কোটি কোটি নরনারী সহানুভূতি ও শিক্ষার অভাবে নিতান্ত হীন-ভাবে দিন যাপন করিতেছে; উহাদের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার জন্য আমরা অংশতঃ দায়ী। উহাদের অপরিচ্ছন্নতা ও আনুষঙ্গিক ব্যাধি দূর করিবার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে পারি। পথে, রেলে, নৌকায় ও ষ্টীমারে সময়ে সময়ে যখন আমরা ইহাদের কাছে পাই তখন শুচিতর, উচ্চতর জীবনের আকাঙ্ক্ষা ইহাদের মধ্যে জাগ্রত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে পারি। শুধু বৈজ্ঞানিকের মত অর্থনীতির থিওরি লইয়া মারামারি কাটাকাটি করিলে চলিবে না। ভারতে অর্থনীতির চর্চ্চার অর্থ এই, যে, দিন-দিন ভারতবাসী সুস্থতা ও সচ্ছলতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া উদার জগৎ-সভ্যতার মাঝখানে আপনার বিশিষ্টসভ্যতার আসনখানি অম্লানমুখে দাবি করিবে। কয়েক সহস্র বা

কয়েক লক্ষ শিক্ষিত লোক লইয়া বাঙ্‌লাদেশ বা ভারতবর্ষ নহে। যে পরিমাণে আমরা আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ অসহায় নরনারীকে উচ্চতর মনুষ্যত্বের আস্বাদনসুখে সুখী করিতে পারিব সেই পরিমাণে আমাদের অর্থনীতির অনুশীলন সার্থক হইবে। অর্থনীতি পাথেয় মাত্র, উদ্দিষ্ট তীর্থ নহে; একথা সর্ব্বদা মনে জাগরূক রাখিতে হইবে।

বাঙ্‌লাদেশে ও উহার বাহিরে আজকাল কলের ছড়াছড়ি। বহুসংখ্যক পুরুষ ও নারী এই-সকল কলে কাজ করে। অনেক স্থলে এই-সকল কল য়ুরোপীয়দের সম্পত্তি; তথাপি ইচ্ছা করিলে যুবকগণ এই-সকল কলবাড়ী দেখিয়া আসিতে পারেন এবং তাহার বিবরণ কাগজে প্রকাশ করিতে পারেন। শ্রমজীবীগণ প্রত্যহ কয় ঘণ্টা খাটে ও কি হারে মজুরী পায়; কলঘরে আলো ও বাতাস আসে কি না; ঘরের মেঝে শুষ্ক কিংবা স্যঁতানে; পুরুষ ও স্ত্রীলোক একসঙ্গে কাজ করে কি না; তাহাদের নৈতিক অবস্থা কিরূপ; গর্ভবতী ও দুগ্ধপোষ্য-সন্তানবতী নারী কাজ করে কি না; সন্তানবতী সন্তানকে কোথায় রাখিয়া আসে; ইহাদের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্রামগৃহ ও পায়খানা আছে কি না; শ্রমজীবীগণের মধ্যে শতকরা কতজন পড়িতে পারে; নিকটে তাড়িখানা আছে কি না; কতদূর হইতে ইহারা কাজে আসে; প্রত্যেক পুরুষের সাপ্তাহিক আয় ও তাহার পরিবারের ব্যয়ের আভাস; তাহারা কি কি সামগ্রী আহার করিতে পায় ও তাহাদের প্রত্যেকের কয়খানি কাপড় ও জামা আছে; জুতা থাকিলে কয় জোড়া; পুত্র কন্যা থাকিলে তাহারাও কাজ করে কি না; সর্ব্বাপেক্ষা কমবয়স্ক মজুরের বয়স (বালক অথবা বালিকা); নিকটে নৈশ বিদ্যালয় আছে কি না; শ্রমজীবীদের মধ্যে কতজন সেখানে গিয়া থাকে; বৎসরের মধ্যে রবিবার ছাড়া আর কত দিন তাহারা ছুটি পায়; ছুটির সময়ে তাহারা অন্য উপায়ে অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা করে কি না; বার্ষিক আয়ব্যয়; প্রধান প্রধান রোগ, ও তাহার চিকিৎসার উপায় ও ব্যয়। ইহা ব্যতীত আরো অনেক বিষয়ে তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া নোট লইতে পারেন। বলা বাহুল্য যতক্ষণ তাঁহারা কলবাড়ীতে থাকিবেন অন্ততঃ ততক্ষণ কোনোরূপ প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ করিবেন না, এবং বাহিরে আসিয়া ঐ বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে, বিশেষ কারণ না ঘটিলে, সাধারণভাবেই আলোচনা করিবেন; নতুবা অন্যান্য ছাত্রের পক্ষে প্রবেশলাভ কঠিন হইবে। এই-সকল শ্রমজীবীদের সহিত ভাবের আদান প্রদান করিবার প্রকৃষ্ট স্থান গ্রাম্য হাট ও বাজার। গ্রীষ্মের ও পূজার ছুটিতে ও অন্যান্য অবকাশকালে ছাত্রগণ ইহাদের নিকট তাহাদের জীবনের আদর্শ স্পষ্ট করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে পারেন।

শ্রমজীবীদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারচেষ্টা একান্ত আবশ্যক। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে এ বিষয়ে চেষ্টা বেশ অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু বিরাট ভারতবর্ষের পক্ষে উহা অতি সামান্য; এই চেষ্টা দ্বিগুণিত হউক; তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যে শ্রমজীবীদের উপযোগী মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক কাগজ প্রচলন সম্ভবপর হইবে। স্বাস্থ্য, নীতি, ধর্ম্ম, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ সহজ ভাষায় লিখিত হইতে পারিবে ও তাহা দ্বারা জগতের আধুনিকতম সভ্যতার সহিত ইহাদের পরিচয় সম্ভবপর হইবে।

কৃষকদের নিকট আধুনিক চাষপদ্ধতি ও যন্ত্রব্যবহার সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করিতে হইবে এবং এ বিষয়ে বাঙ্‌লা সাপ্তাহিক কাগজে সর্ব্বদা প্রবন্ধাদি লিখিতে হইবে। জমীদারগণের খাসে যে-সকল জমী আছে তাহাতে আধুনিক উপায়ে চাষ আরম্ভ করাইয়া দৃষ্টান্ত দেখাইলে খুব ভালো হয়। যৌথ কারবারসমূহের কার্য্যপ্রণালী, আয়ব্যয় প্রভৃতির বিবরণ মধ্যে মধ্যে বাঙলায় মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইলে ভালো হয়। যাত্রা, পাঁচালি ও কথকতায় শুধু স্বদেশ-প্রেমের বাঙ্ময় উৎস খুলিয়া না দিয়া কাজের কথা প্রচার করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সদুপায়ে অন্নসংস্থান পার্থিব জীবনের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কথা।

থিওরির রাজ্যে ভারত সহজেই প্রবেশলাভ করিতে পারে; সেই থিওরি প্রয়োগ করিবার ও তাহার ফল প্রত্যক্ষ করিবার সাহস ও শক্তি আমাদের আছে কি না তাহা আমরা অচিরেই বুঝিতে পারিব। দুনিয়ার সর্ব্বত্র শ্রমে-মূলধনে দৌলত বাঁটিয়া লইতেছে, শুধু ভারতবর্ষে দৌলত (অতি সামান্য যাহা আছে) এক শ্রেণীর লোকের একচ-

চেষ্টিয়া হইয়া থাকিবে ইহা হইতে পারে না। অর্থনীতির চর্চ্চা আমাদের অলস লক্ষপতিকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবে এবং ধূলিধূসরিত কৃষক ও দিনমজুরকে অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্যশালী করিবে; তাহাতে ঐশ্বর্য্যসুলভ নিশ্চেষ্টতার পাপ ধনীর গৃহে তিষ্ঠিতে না পারিয়া বিদায় লইবে, অপর-দিকে অসহনীয় দারিদ্র্যের কশাঘাত হইতে রক্ষা পাইয়া শ্রমজীবী নবজীবন লাভ করিবে। ধর্ম্ম উভয়ের গৃহেই তখন আনন্দে বাস করিতে পারিবেন। আমরা আগ্রহে বঙ্গে ও সমগ্র ভারতবর্ষে সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছি।

ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাতালের অক্সফোর্ড

নিউইয়র্ক প্রদেশ ছাড়াইয়া ম্যাসাচুসেট্‌স্ প্রদেশে আসিয়াছি। এই প্রদেশ-রাষ্ট্রের কেন্দ্র বষ্টননগর। কেম্ব্রিজ ইহারই উপনগর-স্বরূপ। কলিকাতার সঙ্গে ভবানীপুর বা কালীঘাটের যেরূপ সম্বন্ধ, বষ্টনের সঙ্গে কেম্ব্রিজের প্রায় তদ্রূপ। অবশ্য নগরদ্বয়ের শাসন স্বতন্ত্র।

বষ্টনের হোটেলে দুই রাত্রি কাটাইয়া সম্প্রতি কেম্ব্রিজে বিশ্ববিদ্যালয়ের আব্‌হাওয়ায় বাস করিতেছি। বিলাতী অক্‌স্‌ফোর্ড ও কেম্ব্রিজ ত্যাগ করিবার পর এইরূপ আব-হাওয়া আর পাই নাই। এখানে ক্ষুদ্র গৃহে বাড়ীর কর্ত্তার মত স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার সুযোগ পাইতেছি। হট্টগোল, লোকজনের ভিড় ইত্যাদি নগণ্য। ঘরে বসিয়া খোলা আকাশ ও গাছপালা দেখিতে পাই। নায়াগ্রা হইতে বরফপড়া সুরু হইয়াছে। এক সপ্তাহ ধরিয়া শ্বেত-তুষারের আবরণ সর্ব্বত্রই দেখিয়াছি। ঘরের জানালা হইতে গাছের শাখা প্রশাখায় কাচের পোষাক দেখা যায়। দিনে সূর্য্যরশ্মি, রাত্রে চন্দ্রকিরণ এই তুষারমণ্ডিত বৃক্ষশির-সমূহের অভিনব শোভা সৃষ্টি করে। মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়িয়া রাস্তাঘাট এবং বাড়ীঘর ও গাছপালার বরফ ধুইয়া ফেলে। তখন পত্রহীন বৃক্ষগুলি নিতান্তই কেঠো নীরস জীবনহীন পাহারাওয়ালার ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকে। শীতের প্রারম্ভে লণ্ডনে এই অবস্থা দেখিয়াছি। আর বৃষ্টির জন্য রাস্তায় চলা বিশেষ অসুবিধাজনক। বরফের উপর হাঁটিতে সত্যসত্যই খানিকটা আনন্দ পাওয়া যায়। কিন্তু বৃষ্টির জলে রাস্তার উপর বরফের কাদা জমিতে থাকে। তখন আমাদের বাঙ্গালাদেশের পল্লীগ্রামের কথা মনে পড়ে। বর্ষাকালে পাড়াগাঁয়ের রাস্তায় একহাঁটু কাদা বা পাঁক জমিয়া যায়। তাহার উপর গরুর গাড়ীর গতায়াতে পথে হাঁটা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। এখানেও দেখিতেছি বরফের পর বৃষ্টি হইলে পথগুলি সেইরূপই দুর্গম ও দুর্গন্ধময় হয়। প্রদীপের নীচেই অন্ধকার! অবিমিশ্র সুখ মানুষ কোথায় পাইবে?

বিলাতী ঔপনিবেশিকেরা অনেক বিলাতী নগরের নামে আমেরিকায় নগরের নাম রাখিয়াছে। এইজন্য যুক্তরাষ্ট্রেও কেম্ব্রিজনগর। সেইরূপ ফরাসীরা তাহাদের দেশীয় নগরের নামে যুক্তরাষ্ট্রে অনেক নগরের নাম রাখিয়াছে। ইয়োরোপের নানা দেশের নানা নগরের নামে যুক্তরাষ্ট্রের বহু নগর পরিচিত।

ইয়াঙ্কি-কেম্ব্রিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম হার্ভার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়। হার্ভার্ড একজন লোকের নাম—স্থানের নাম নয়। কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম অনুসারে ইয়োরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিচিত হয় না। আমেরিকায় কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয় হার্ভার্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় ব্যক্তিবিশেষের নামে পরিচিত—যথা লীল্যাণ্ড ষ্টান্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, জন্‌স্ হপ্‌কিন্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি। হার্ভার্ড নামক এক ইংরেজ এই অঞ্চলে অল্পকাল বাস করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময়ে তিনি ৩০০ পুস্তক এবং ১০।১২ হাজার নগদ টাকা শিক্ষাপ্রচারের জন্য দান করেন। সে ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দের কথা,—তখন ভারতবর্ষে মোগল-মারাঠার যুগ। তখনকার দিনে এই দানই চূড়ান্ত কৃতজ্ঞতার বস্তু ছিল। কাজেই গ্রহীতারা দাতার নাম চিরস্মরণীয় রাখিবার জন্য "হার্ভার্ড-বিদ্যালয়" নাম স্থির করিলেন। হার্ভার্ড আজ জীবিত থাকিলে নিশ্চয়ই লজ্জিত হইতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু ২৭৫ বৎসরে একটা ক্ষুদ্র প্রতি-ষ্ঠান কি বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে দেখিয়া জগদ্বাসী বিস্মিত হইতেছে। বিলাতী অক্‌স্‌ফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় সহস্র বৎসরের প্রতিষ্ঠান—হার্ভার্ড মাত্র ৩০০ বৎসর পূর্ণ করিতে চলিতেছে। অথচ বর্ত্তমান

হার্ভার্ড অনেকাংশে অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া পরিগণিত হয়। হার্ভার্ডের অধ্যাপক অক্সফোর্ডে নব্যদর্শন প্রচার করিলেন। তাহার পর হইতে ফরাসী ব্যার্গস ইংরেজ-সমাজে পরিচিত। শিশু হার্ভার্ড প্রবীণ অক্সফোর্ডকে নূতন পথ দেখাইয়া দিল।

আমরা ভারতবর্ষে যে ধরণের বিশ্ববিদ্যালয় দেখি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় সেই ছাঁচে গড়া প্রতিষ্ঠান নয়। ইহার আকৃতি বিলাতী অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ের অনুরূপও নয়। ইয়াঙ্কি দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ই এই হার্ভার্ডের ছাঁচে ঢালা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে যদি হার্ভার্ডের ছাঁচে ঢালিতে হয় তাহা হইলে কতকগুলি আমূল পরিবর্ত্তনের জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রথমতঃ, কলিকাতার বাহিরে বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার ভিতর যতগুলি কলেজ আছে সেগুলিকে স্বাধীন করিয়া দিতে হইবে। তখন রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বহরমপুর বিশ্ববিদ্যালয়, হুগলি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, কটক বিশ্ববিদ্যালয়, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়, ইত্যাদি জেলায় জেলায় স্বস্বপ্রধান বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিবে। এতদ্ব্যতীত কলিকাতার ভিতর যতগুলি কলেজ আছে সেইগুলির নূতন আকার দিতে হইবে। তাহার ফলে কলিকাতা সহরের ভিতর ৩।৪ টা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্ট হইবে। অথবা সকলগুলিকে একত্র করিয়া একটা বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তুত করা যাইবে।

দ্বিতীয়তঃ রিপন কলেজ, সিটি কলেজ, প্রেসিডেন্সী কলেজ ইত্যাদি কলেজগুলি স্বস্বপ্রধান ষোলকলায়-পূর্ণ কলেজ থাকিবে না। এই-সকল কলেজ একটা বিরাট পরিচালনা-সমিতি কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে। প্রত্যেকের খরচপত্র আয়ব্যয় আস্‌বাব গৃহ ইত্যাদি সেই কেন্দ্র হইতে নির্দ্ধারিত হইবে। তখন প্রেসিডেন্সী কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা বিভাগ বা শাখাস্বরূপ থাকিবে—রিপন আর-একটা শাখা বা বিভাগ-স্বরূপ থাকিবে—ইত্যাদি। এই শাখাগুলির মধ্যে কোন হিসাবে তারতম্য, অথবা উচ্চনীচ ভেদজ্ঞান থাকিবে না। তখন রিপন কলেজের ছাত্র, কিম্বা প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র বলিয়া কেহই পরিচিত হইবে না। সকলকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বলা হইবে।

তৃতীয়তঃ, কলেজগুলি এক একটা বিভাগের গৃহমাত্র-রূপে পরিগণিত হইবে। হয়ত সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস-বিভাগ, ইতিহাস-বিষয়ক গ্রন্থশালা, ইতিহাস-বিষয়ক বক্তৃতাগৃহ ইত্যাদি রিপন কলেজের ভবনে সন্নিবেশিত হইবে। আর বিজ্ঞানবিষয়ক সকলপ্রকার অনুষ্ঠান প্রেসিডেন্সী কলেজের গৃহে চলিতে থাকিবে। এক্ষণে কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ, আর্টস্কুল, এবং শিবপুরের সিবিল এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ অনেকটা এইরূপেই পরিচালিত হয়। হার্ভার্ড-ছাঁচের বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে এই তিনটা বিদ্যালয় অন্যান্য সাধারণ কলেজের সঙ্গে সমসূত্রে গ্রথিত হইয়া পড়িবে। ইহাদের কোনটিরই স্বাধীন অস্তিত্ব থাকিবে না। প্রেসিডেন্সী-ভবনে যে-সকল ল্যাবরেটরী থাকিবে মেডিক্যাল কলেজের ভবনে সেই-সকল ল্যাবরেটরী থাকিবে না—এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ভবনেও সেই-সমুদয় থাকিবে না। সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটা বিরাট গ্রন্থশালা, একটা বিরাট মিউজিয়াম, একটা বিরাট হাঁসপাতাল, একটা বিরাট চিড়িয়াখানা, একটা বিরাট চিত্রভবন একটা বিরাট ল্যাবরেটরী, এবং কতকগুলি বক্তৃতাগৃহ স্থাপিত হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা-সমিতি হয়ত ৮।১০টা শাখা বা বিভাগে বিভক্ত হইবে। এই বিভাগগুলির অধীনে এক-একটা গৃহ বা ভবন বা কলেজ বা মিউজিয়াম ইত্যাদি পরিচালিত হইবে। বিজ্ঞান-বিভাগ প্রেসিডেন্সী-ভবনের ভার লইবেন। ইতিহাস-বিভাগ রিপন-ভবনের ভার লইবেন। এঞ্জিনীয়ারিং-বিভাগ শিবপুরের ভার লইবেন। চিকিৎসা-বিভাগ হাঁসপাতালের ভার লইবেন, ইত্যাদি।

চতুর্থতঃ, কোন ছাত্র হয়ত মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, চিত্রকলার ইতিবৃত্ত, প্রাণ-বিজ্ঞান এবং রসায়ন শিক্ষা করিবে। হার্ভার্ডের ছাঁচে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে এই ছাত্রকে তাহার মনোনীত শিক্ষণীয় বিষয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিভাগীয় নিয়মসমূহ দেখিতে হইবে। এইজন্য একবার তাহাকে রিপন-ভবনে, আর একবার প্রেসিডেন্সী-ভবনে, আর একবার আর্টস্কুল-গৃহে ইত্যাদি নানা ভবনে

যাওয়া আসা করিতে হইবে। কোন এক গৃহে তাহার সকল শিক্ষালাভ হইবে না। ফলতঃ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ রিপন, প্রেসিডেন্সী, শিবপুর, মেডিক্যাল, আর্ট ইত্যাদি সকল ভবনকে একস্থানে এক প্রাঙ্গণের ভিতর আনিতে সচেষ্ট থাকিবেন। অন্ততঃ কোন বাড়ী যেন অন্যান্য বাড়ী হইতে বেশী দূরে না থাকে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

পঞ্চমতঃ ছাত্রেরা নিজ নিজ সুবিধা অনুসারে যেখানে ইচ্ছা সেখানে থাকিতে পারিবে। মেস, বা বোর্ডিং, অথবা পরিবার ইত্যাদি বাসস্থান সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করিবেন না। আজকাল ছাত্র-শাসনের জন্য ভারতবর্ষে "রেসিডেন্‌শ্যাল" প্রথা প্রবর্ত্তনের হুজুগ উঠিয়াছে। ইহার বিধানে ছাত্রগণকে কোন নির্দ্দিষ্ট গৃহে থাকিতে বাধ্য করা হইবে। এনিয়ম দুনিয়ায় কোথাও নাই—একমাত্র বিলাতী অক্‌স্‌ফোর্ড ও কেম্ব্রিজের ভিতর এই রীতি প্রচলিত। ইয়াঙ্কি কেম্ব্রিজের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় এই রেসিডেন্‌শ্যাল প্রথা মানিয়া চলেন না। জার্ম্মানি বা আমেরিকার কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই ছাত্রদের উপর এই ধরণের জুলুম করা হয় না।

অতি সহজে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আকৃতি কল্পনা করিতে হইলে কলিকাতার বর্ত্তমান কলেজগুলিকে এক একটা বিশ্ববিদ্যালয় বিবেচনা করা যাইতে পারে। অবশ্য তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের উপরওয়ালা আর কেহ থাকিবেন না। প্রেসিডেন্সীর অধ্যাপকগণই বিজ্ঞান-বিভাগ, ইতিহাস-বিভাগ, দর্শন-বিভাগ ইত্যাদি সকল বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা থাকিবেন। ইঁহারাই পাঠ্য নির্ব্বাচন করিবেন, ছাত্রগণের পরীক্ষা লইবেন এবং যথাসময়ে উপাধি দিবেন। সেইরূপ মেট্রপলিটান, সিটি, রিপন প্রভৃতি কলেজকেও এক একটা স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় বিবেচনা করা যাইতে পারে। ইহাদের বিভাগগুলি সবই কলেজের অধ্যাপকগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতে থাকিবে। ইঁহাদের নিকটই ছাত্রেরা সার্টিফিকেটও পাইবে।

এই উপায়ে ছাঁচটা মাত্র বুঝা গেল। তাহা বলিয়া রিপন কলেজকে একটা বিশ্ববিদ্যালয় বিবেচনা করা কখনই চলিতে পারে না। বর্ত্তমান অবস্থায় প্রেসিডেন্সী, মেডিক্যাল এবং আর্টস্কুল ও মিউজিয়াম এই চারিটা প্রতিষ্ঠান একত্র করিলে এবং তাহার সঙ্গে সিনেট-হাউসের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি যোগ করিলে হার্ভার্ড-ধরণের একটা চলনসই বিশ্ববিদ্যালয় তৈয়ারী করা যায়। বিলাতের লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয় অনেকটা এই দরের বিশ্ববিদ্যালয়। এইরূপ ১৫ টা বিশ্ববিদ্যালয় একত্র করিলে বর্ত্তমান হার্ভার্ডের আয়তন বুঝা যায়। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বা অকীর্ত্তি অধ্যাপকগণের কৃতিত্বের উপর নির্ভর করিবে। সেকথা সম্প্রতি আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই।

লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটা ভারতীয় সংস্করণ এক্ষণে আমাদের দেশে সুরু করা যাইতে পারে। হার্ভার্ডের চালচলন খরচপত্র আসবাব গৃহ ইত্যাদির সংবাদ লইয়া কোন লাভ নাই। এখানে কোটি টাকার কমে কোন গৃহ নির্ম্মিত হয় না!

হার্ভার্ডের অধ্যাপকগণ নানা বিভাগে কিরূপ মৌলিক গবেষণা করিতেছেন তাহার পরিচয় লইলেই এখানকার বিরাট কাণ্ড বুঝিতে পারা যায়। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যতপ্রকার গ্রন্থ, পুস্তিকা, সাময়িক পত্র ইত্যাদি প্রকাশিত হয় তাহার ব্যয়েই আমাদের দেশে একটা বড় কলেজ চলিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা-বিষয়ক গ্রন্থাদি ছাড়া নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি ও গ্রন্থাবলী ধারাবাহিকরূপে প্রচারিত হইয়া থাকে।—

1. Publications of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology.
2. Architectural Quarterly of Harvard University.
3. Publications of the Arnold Arboretum.
4. Publications of Astronomical Observatory.
5. Publications of the Gray Herbarium.
6. Contributions and Memoirs from the Cryptogamic Laboratory.
7. Contributions from the Chemical Laboratory.
8. Harvard Studies in Classical Philology.
9. Harvard Historical Studies.
10. Harvard Economic Studies.
11. The Quarterly Journal of Economics.
12. Harvard Oriental Series.
13. Harvard Law Review.
14. Bibliographical Contributions.
15. Journal of Medical Research.
16. Harvard Studies in Comparative Literature.
17. Studies and Notes in Philology and Literature.

18. Contributions from the Jefferson Physical Laboratory.
19. Harvard Psychological Studies
20. Publications of the Department of Social Ethics.
21. Harvard Theological Review.
22. Publications of the Museum of Comparative Zoology.
23. Contributions from the Zoological Laboratory of the Museum of Comparative Zoology.

জ্ঞানরাজ্যের বিশেষজ্ঞ এবং ওস্তাদ মহাশয়গণ এই-সকল রচনাবলীর মূল্য বুঝিয়া থাকেন। কি আইন-বিভাগ, কি চিকিৎসা-বিভাগ, কি মনোবিজ্ঞান-বিভাগ, সকল বিভাগের পণ্ডিতেরা হার্ভার্ডে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী পাইবার জন্য ব্যগ্র।

হার্ভার্ডে প্রথম সপ্তাহ।

নিউইয়র্কে দেখিয়াছি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ছাত্র বেশী নাই। বষ্টন-কেম্ব্রিজেও দেখিতেছি হার্ভার্ডে ভারতীয় ছাত্রের আমদানী বড় কম। যুক্তরাষ্ট্রের আট্‌লাণ্টিক অঞ্চলে খরচ অত্যধিক। প্রশান্ত-সাগর অঞ্চলে এবং মধ্যভাগে খরচ অপেক্ষাকৃত অল্প। এইজন্য ভারতীয় ছাত্র যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম ও মধ্য প্রদেশে বেশী আসে। অবশ্য ঐ-সকল অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রায়ই সুপ্রসিদ্ধ নয়।

ধনবান ভারতবাসীর সন্তানগণ আমেরিকায় উচ্চশিক্ষার জন্য আসে না। আমেরিকার অধিকাংশ ভারতীয় ছাত্রই জনসাধারণ-প্রদত্ত চাঁদার উপর নির্ভর করিয়া লেখাপড়া শিখিতেছে। আমাদের "ভাল" ছেলেরা এবং পয়সা-ওয়ালা লোকের ছেলেরা সাধারণতঃ বিলাতকেই উচ্চ শিক্ষার একমাত্র কেন্দ্র বিবেচনা করে। বিগত ৫০ বৎসর ধরিয়া আমাদের এই মোহ রহিয়াছে। এক্ষণে বোধ হয় নেশা কিছু ভাঙ্গিয়াছে। আজকাল ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে আমাদের ছাত্রেরা যাইতে শিখিতেছে। আমেরিকার দিকে ভাল ও ধনী ছেলেদের নজর এখনও পড়ে নাই।

বিগত ৫।৬ বৎসরের পূর্ব্বে বোধ হয় হার্ভার্ডে কোন ভারতীয় ছাত্র আসে নাই। ইতিমধ্যে কয়েকজন বাঙ্গালী ও মারাঠা ছাত্র হার্ভার্ডের শিক্ষা পাইয়া স্বদেশে ফিরিয়াছে। শুনিলাম ইহারা বেশ যোগ্যতাও দেখাইয়াছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চতম পুরস্কার ছাত্রবৃত্তি ইত্যাদি ইহাদের কেহ কেহ অর্জ্জন করিয়াছে। দুএকজন পি এইচ-ডি উপাধিও লাভ করিয়াছে। এখানকার অধ্যাপকগণ ভারতীয় ছাত্রের সুখ্যাতি করিয়া থাকেন। লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়েও আমাদের শিক্ষার্থীদিগের প্রশংসা শুনিয়াছি।

অক্‌স্‌ফোর্ড ও কেম্ব্রিজে আমাদের ছাত্রেরা মাসিক ৩০০৲ হইতে ৫০০৲ খরচ করিয়া থাকে। ইহারা ব্যারিষ্টারী অথবা সরকারী চাকরীর জন্য তিন বৎসরকাল এইরূপ খরচ করে। হার্ভার্ডে স্বচ্ছন্দে থাকিতে হইলে মাসিক অন্ততঃ ২০০৲ খরচ করা আবশ্যক। যাহারা ব্যারিষ্টারী অথবা চাকরীর প্রত্যাশা রাখে না এরূপ ছাত্র ভারতবর্ষে আজকাল অনেক দেখা যায়। ইহাদের মধ্য হইতে বাছিয়া "ভাল" ছেলেদিগকে হার্ভার্ডে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলে দেশের সুনাম শীঘ্রই জগতে ছড়াইয়া পড়িতে পারে। অক্‌স্‌ফোর্ড কেম্ব্রিজের মায়া পরিত্যাগ করিয়া দেশের কিয়দংশ হার্ভার্ডে আসিতে থাকুক। অল্পব্যয়ে অধিক ফল পাওয়া যাইবে।

কলাম্বিয়ায় দেখিয়াছি, হার্ভার্ডেও দেখিতেছি—বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তারা ইয়োরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নামজাদা অধ্যাপকগণকে দুএক বৎসরের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন, এবং তাঁহাদের পরিবর্ত্তে নিজেদের অধ্যাপকগণকে সেইসকল বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দেন। এইরূপ অধ্যাপক-বিনিময় ইংলণ্ড ফ্রান্স ও জার্ম্মানির সঙ্গে সাধারণতঃ হইয়া থাকে। জেনা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ দার্শনিক অয়কেন হার্ভার্ডে এইরূপ Exchange Professor বা বিনিময় অধ্যাপক হইয়া আসিয়াছিলেন। এই বৎসর দেখিতেছি—তোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আনেসাকি হার্ভার্ডে বৌদ্ধদর্শন প্রচার করিতেছেন। ভারতবর্ষের দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ অথবা বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রও একদিন হার্ভার্ডে নিমন্ত্রিত হইবেন না কি? প্র্যাগম্যাটিজম-তত্ত্বের প্রবর্ত্তক এবং অক্‌স্‌ফোর্ডে বার্গসোঁদর্শনপ্রচারক অধ্যাপক জেম্‌সের আমলে বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ হার্ভার্ডে সুপরিচিত ছিলেন। ইঁহার প্রণীত Pragmatic Pluralistic Universe, এবং Varieties of Religious Experience নামক গ্রন্থত্রয়ে তাহার পরিচয় পাই।

বর্ত্তমানে রবীন্দ্রনাথ হার্ভার্ডে সুপরিচিত। তাঁহার Sadhana—সাধনা গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি এই বিশ্ববিদ্যালয়েই পঠিত হইয়াছিল। জগদীশচন্দ্রও দুএকবার হার্ভার্ডে বক্তৃতা দিবার জন্য আহূত হইয়াছেন। তাহা ছাড়া শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার এখানকার প্রত্নতাত্ত্বিক মহলে প্রসিদ্ধ। বলা বাহুল্য ভারতবর্ষ এখনও সুপ্রচারিত নয়।

শুনিলাম—সম্প্রতি একটা নূতন নিয়ম করা হইয়াছে। তাহার ফলে ভারতীয় ছাত্রেরা হিন্দী, মারাঠী, বাঙ্গালা অথবা অন্য কোন মাতৃভাষায় পারদর্শিতা দেখাইতে পারিলে ভাষা-পরীক্ষা সম্বন্ধে অনেকটা অব্যাহতি পাইবে। ইংরেজী ভাষাকে ইহাদের দ্বিতীয়-ভাষা-স্বরূপ গ্রহণ করা হইবে। ইংরেজ অথবা ইয়াঙ্কি-ছাত্রেরা ইংরেজীর সঙ্গে ল্যাটিন অথবা ফরাসী ভাষা না শিখিলে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পায় না। ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষে ল্যাটিন অথবা ফরাসী শিখিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়া কঠিন। এজন্য তাহাদের মাতৃভাষার সঙ্গে মাত্র ইংরেজী ভাষায় জ্ঞান পরীক্ষিত হইবে। ইহাতে ভারতীয় ছাত্রদিগের সুবিধা হইল সন্দেহ নাই।

একয়দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী, মিউজিয়াম, পাঠাগার ইত্যাদি দেখিতেছি। সঙ্গে সঙ্গে কিছু পড়াশুনাও করা যাইতেছে। পর্য্যটকগণের শরীর খুব সুস্থ ও শক্ত থাকা আবশ্যক। প্রতিদিন সকাল ৮টা হইতে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত কর্ম্মঠ থাকিতে হয়। কাইরো হইতে এইরূপ নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতি সুরু হইয়াছে। লোক দেখা, জিনিষ দেখা, আন্দোলন দেখা সর্ব্বত্রই প্রায় একরূপ। মাশুল দিয়া যখন আসা গিয়াছে তখন কিছুই বাদ দিতে প্রবৃত্তি হয় না। কাজেই শারীরিক পরিশ্রম অত্যধিক। তাহার উপর পড়াশুনার চাপও কম নয়। বিগত দশ বৎসরের ভিতর বিশ্বচিন্তায় অনেকদিকে নূতন নূতন তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে বসিয়া এ সকলগুলির সাক্ষাৎলাভ ত দূরের কথা—অনেক সময়ে উল্লেখ পর্য্যন্ত শুনিতে পাই না। ভারতবর্ষে নূতন চিন্তা ৩০ বৎসর পরে পৌঁছিয়া থাকে। অথচ বর্ত্তমান জগতের এই-সমুদয় তত্ত্বের ও তথ্যের মোটামুটি জ্ঞান না থাকিলে অন্ধের ন্যায় পর্য্যটন করা হয়,—অন্ততঃ কোন বিচক্ষণ ব্যক্তির সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিবার অধিকার জন্মে না। ফলতঃ পর্য্যটনকারীকে মস্তিষ্ক সর্ব্বদা সজাগ রাখিয়া চলিতে হয়। টাকা পয়সা খরচ ছাড়া শারীরিক এবং মানসিক খরচও পর্য্যটকগণের ব্যয়ের মধ্যে ধরা উচিত। এই দুই প্রকার ব্যয়ের জন্য প্রস্তুত না থাকিলে দেশের বাহিরে আসিয়া লাভ নাই।

কোন প্রধান নগরের মিউজিয়ামগুলির সঙ্গে হার্ভার্ডের সংগ্রহালয়সমূহের তুলনা করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকগণের নিত্য-ব্যবহারের উপযোগী বস্তুসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে। পুঁথিগত বিদ্যাকে সরস ও সজীব করিবার জন্য এই-সমুদয় মিউজিয়ামের উৎপত্তি। কাজেই নিউইয়র্কের জীব-নমুনার সংগ্রহালয় (Natural History Museum) এবং বোটানিক্যাল গার্ডেন অথবা লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ম দেখা থাকিলে হার্ভার্ডে নূতন করিয়া কোন দ্রব্য দেখিবার প্রয়োজন হয় না।

হার্ভার্ডের (Botanical Museum) উদ্ভিদ-সম্বন্ধীয় মিউজিয়মে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটা বস্তু দেখিলাম। কাচের প্রস্তুত উদ্ভিদ্ লতাপাতা ও ফুল এখানকার কয়েকটা ঘরে প্রদর্শিত হইতেছে। এগুলি দেখিতে ঠিক প্রাকৃতিক পদার্থের অনুরূপ। সম্মুখে দাঁড়াইয়াও বিশ্বাস হয় না যে এগুলি প্রকৃতির অনুকরণে মানুষের তৈয়ারী জিনিষ। জার্ম্মানির কয়েকজন শিল্পী এইরূপ কৃত্রিম উদ্ভিদ প্রস্তুত করিতে পটু। তাঁহাদের সঙ্গে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থা করিয়াছেন যে তাঁহারা অন্য কাহারও নিকট এই-সমুদয় বস্তু বিক্রয় করিতে পারিবেন না। যেমন যেমন দ্রব্যগুলি প্রস্তুত হয় তেমন তেমন এই-সমুদয় হার্ভার্ডের সংগ্রহালয়ে তাঁহারা পাঠাইয়া থাকেন। কাজেই প্রতিবৎসর সংগ্রহালয়ের দ্রব্যসংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। ক্রমশঃ উদ্ভিদবিজ্ঞানের সকল বিভাগই হয়ত এই-সমুদয় কাচের নমুনার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাইবে। জার্ম্মানিতে কাদামাটির কাজ, চীনামাটির কাজ ইত্যাদি অত্যুৎকৃষ্টরূপে করা হয়। অস্থিবিদ্যা জীব-বিদ্যা শরীর-বিদ্যা ইত্যাদি বিভাগের জন্য নানাপ্রকার 'মডেল' জার্ম্মান কুম্ভকারেরা প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এই সমুদয় মডেল

বা নিদর্শন দুনিয়ার সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং ল্যাবরেটরীতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কলিকাতায়ও এই-সমুদয় দ্রব্য দেখা যায়। কাচনির্ম্মিত মডেল এই প্রথম দেখিলাম। যেন তেন প্রকারেণ কাজ সারা নয়—এগুলি বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরীতে ব্যবহার করা চলিতে পারে। এই-সমুদয় মডেলে আকৃতির বৈচিত্র্য, রংয়ের বৈচিত্র্য ইত্যাদি সবই যথারীতি রক্ষিত হইয়াছে। প্রাকৃতিক বস্তুর অভাব হইলে আজকাল চিত্রের সাহায্যে উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান শিখান হয়। ভবিষ্যতে এই-সমুদয় কাচনির্ম্মিত নিদর্শনের ব্যবহার হইতে পারিবে।

প্রধানতঃ লোহিতাঙ্গ ইণ্ডিয়ান্‌দিগের জীবনযাত্রা বুঝাইবার জন্য এই সংগ্রহালয় প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু প্রাচীন মেক্সিকো ও পেরু এবং জগতের অন্যান্য স্থানেরও ন্যূনাধিক পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকগণ নৃতত্ত্ব শিখিবার জন্য এই সংগ্রহালয়কেই ল্যাবরেটরী ও বক্তৃতালয়রূপে ব্যবহার করেন। একগৃহে কতকগুলি মড়ার মাথা দেখিলাম। জগতের নানাস্থান হইতে নানাজাতীয় নরনারীর মাথা সংগৃহীত রহিয়াছে। ভারতীয় মস্তকও কতকগুলি দেখিলাম। অধ্যাপক লুশান বলিতেছিলেন এই মাথা-সংগ্রহে তিনি জগতে অদ্বিতীয়।

ভূতত্ত্ব, ভূগোল, ও খনিজতত্ত্ব-বিষয়ক গৃহে অন্যান্য সাধারণ বস্তুর সঙ্গে কতকগুলি প্রাচীন ইয়োরোপীয় মানচিত্র দেখিলাম। এডিনবারার 'আউটলুক টাওয়ারে' অধ্যাপক প্যাট্রিক গেডিজের সংগৃহীত মানচিত্রগুলি এইরূপ। এতদ্ব্যতীত অষ্টাদশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয়েরা কিরূপ গুলি-গোলা কামানবন্দুক ইত্যাদি ব্যবহার করিতেন তাহার সামান্য পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। সেগুলির সঙ্গে আজ-কালকার জার্ম্মান-আবিষ্কারসমূহের তুলনা করা বাতুলতা মাত্র। কিন্তু সেগুলির সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের শুক্রনীতি-বর্ণিত যুদ্ধসম্ভারের তুলনা সহজেই চলিতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর অষ্টেণ্ড বন্দর এবং ট্রিয়েষ্ট বন্দরও চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। চিত্রের মধ্যে দেখা গেল উত্তরসাগরে ব্যবহৃত এবং ভূমধ্যসাগরে ব্যবহৃত অর্ণবযান। এই-সমুদয় অর্ণবযানও সমসাময়িক ভারতীয় জাহাজ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বোধ হইল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর জগৎ সর্ব্বত্রই কি প্রায় একরূপ ছিল না?

সেমিটিক মিউজিয়াম দেখিলাম। ভারতবর্ষের পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ হইতে এশিয়ামাইনরের উপকূল পর্য্যন্ত জনপদের অতীত ইতিহাস এই সংগ্রহালয়ে বুঝিতে পারা যায়। প্রদর্শিত দ্রব্যনিচয়ের সংখ্যা ও পরিমাণ বেশী নয়। অধিকাংশই ব্রিটিশ মিউজিয়াম, পারীর লুভ্‌র্ মিউজিয়াম এবং বার্লিন ও কন্‌ষ্টান্টিনোপল নগরদ্বয়ের সংগ্রহালয়ে রক্ষিত নিদর্শনসমূহের নকলচিত্র অথবা নকলমূর্ত্তি। কিন্তু অল্প আয়াসে এশিয়ার এই অঞ্চলের মোটা কথা এখানে শিখিতে পারা যায়। প্রত্যেক দ্রব্য বুঝাইবার জন্য সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রথমে প্রাচীন এসিরিয়া ও ব্যাবিলনিয়ার সভ্যতা দেখা গেল। প্রাচীন মিশরের মূর্ত্তি, খোদিত লিপি ইত্যাদির কথা সহজেই মনে পড়িল। নরপতিগণের মূর্ত্তি এবং দেবগণের মূর্ত্তি একরূপ। মিশরেও অনেক ক্ষেত্রে রাজাই দেবতা। যুদ্ধবিগ্রহ, নগর-আক্রমণ, মৃগয়া, অশ্বপরিচালনা তীরধনুকপরীক্ষা, ইত্যাদি সামরিক চিত্রই বেশী। প্রাচীন মিশরের ফ্যারাওগণ এবং প্রাচীন পারস্যের হিটাইট সভ্যতার প্রবর্ত্তকগণ অনেকটা একধরণের জীবনযাপন করিতেন।

হিটাইটদের সভ্যতার নিদর্শন ধরিবার উপায় কঠিন নয়। মাথার টুপি, দাড়ি, এবং পোষাক দেখিলেই এসিরিয়া ও মিশরের প্রভেদ বুঝিতে পারা যায়। অবশ্য প্রত্নতত্ত্ব অত ছেলেমানুষি নয়।

মিশরের ছাঁচে এসিরিয়ায় ওবেলিস্ক নির্ম্মিত হইত। একটা ওবেলিস্ক দেখিলাম। তাহাতে খৃষ্টপূর্ব্ব নবম শতাব্দীর নরপতি শালমানেসার তাঁহার সামরিক কীর্ত্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ করাইয়াছেন।

প্রাচীন মিশর কিম্বা প্রাচীন এসিরিয়া ও ব্যাবিলনিয়ার কথা উঠিলে প্রাচীন ভারতের কথা সহজেই মনে আসে। কিন্তু বড়ই বিস্ময়ের কথা—ভারতবর্ষ সম্বন্ধে খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বস্তু বা ঘটনার অকাট্য প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

সেমিটিক সংগ্রহালয়ের দ্বিতীয় বিভাগ প্যালেষ্টাইন-

সম্পর্কিত। খৃষ্টানদিগের বাইবেলগ্রন্থে যে জনপদের উল্লেখ আছে সেই জনপদের ভূগোল ও ইতিহাস বুঝাইবার জন্য এই বিভাগ গঠিত। Old Testament অর্থাৎ ইহুদিদের প্রাচীন ধর্ম্মপুস্তকে যেরূপ ধর্ম্মজীবন, মন্দির, যজ্ঞশালা, পশুবলি, আচারব্যবহার ইত্যাদির বিবরণ পাওয়া যায় তাহা আজকাল সহজে বুঝিবার উপায় নাই। ডাক্তার কনরাড শিক (Dr. Conrad Schick) নামক এক ব্যক্তি জেরুজেলেমে বসিয়া সেই জীবন বুঝিবার প্রয়াস করিতেছেন। তিনি নানা উপায়ে প্রাচীন হীব্রুসভ্যতার চিত্র অঙ্কন করিয়া নানাস্থানে পাঠাইতেছেন। এখানে প্রাচীন ইহুদিমন্দির, সলমনের প্রাসাদ ও মন্দির, হীরডের ভবন ইত্যাদি কয়েকটি গৃহের কাল্পনিক চিত্র ও মডেল দেখিলাম।

প্রাচীন প্যালেষ্টাইন ও সীরিয়ার নরনারীদিগের জীবন-যাপন-প্রণালী ব্যতীত এই গৃহে আধুনিক এশিয়ামাইনরের দ্রব্যাদিও সংগৃহীত হইয়াছে। জীবজন্তু, কাষ্ঠ, ধাতু, পোষাক, অলঙ্কার ইত্যাদি নানাবিধ বস্তু দেখিতে পাওয়া গেল।

"সেমিটিক" শব্দে একপ্রকার বিশেষ ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে এরূপ জনগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বুঝায়। এইরূপ আর-একটি শব্দ "আর্য্য"। আর্য্য বলিলে পণ্ডিতেরা আর্য্যভাষা-ভাষী জনগণকে বুঝিয়া থাকেন। ভাষাব্যবহারের সঙ্গে রক্ত-সংমিশ্রণ অথবা বংশমর্য্যাদা কিম্বা জাতিকৌলীন্য ইত্যাদির কোন সম্বন্ধ নাই। নৃতত্ত্বের (Anthropology) শ্রেণী-বিভাগ অনুসারে আর্য্য বা সেমিটিক ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার হয় না। ভাষা-বিজ্ঞানের জাতিবিভাগ অনুসারেই এই-সমুদয় পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সেমিটিক ভাষাভাষী জনগণের সভ্যতা প্রধানতঃ তিনটি ক্ষেত্রে বিকাশলাভ করিয়াছে। প্রথমতঃ প্রাচীন এসিরিয়া ও ব্যাবিলনিয়ার হিটাইট্‌সভ্যতা। দ্বিতীয়তঃ প্রাচীন এশিয়ামাইনরের হীব্রু বা ইহুদিসভ্যতা। তৃতীয়তঃ বর্ত্তমান আরবের মহম্মদীয় সভ্যতা।

সুতরাং সেমিটিক সংগ্রহালয়ে মুসলমানী সভ্যতার নিদর্শনও থাকা আবশ্যক। হার্ভার্ডের মিউজিয়ামে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া গেল। ভারতবর্ষ, মিশর, পারস্য ও আরব ইত্যাদি নানাদেশ হইতে সংগৃহীত কয়েকখানা হস্তলিখিত কোরান-গ্রন্থ দেখিতে পাইলাম। কাইরোর আরবী মিউজিয়ামে এই-সমুদয় অসংখ্য দেখিয়াছি। বর্ত্তমান মুসলমান-জীবনও বুঝিতে পারা গেল।

আমেরিকা জাতি-তত্ত্ব-আলোচনার প্রধান কেন্দ্র। এজন্য Anthropology (নৃতত্ত্ব), Ethnology (মানব-জাতিতত্ত্ব) ইত্যাদি বিজ্ঞানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা সর্ব্বত্রই আছে। হার্ভার্ডবিশ্ববিদ্যালয়ে এজন্য নানাপ্রকার সুবিধাও প্রদত্ত হয়। ছাত্রবৃত্তি, পর্য্যটনের ব্যয়, নৃতত্ত্ববিষয়ক তথ্য-সংগ্রহ ইত্যাদি সকলদিকে সুযোগ পাওয়া যায়। নৃতত্ত্বসম্বন্ধীয় সংগ্রহালয়ও মন্দ নয়—ইহা ক্রমশই বাড়িয়াই চলিয়াছে।

ব্রিটিশ মিউজিয়ামে নিউইয়র্কের মিউজিয়ামে এবং হার্ভার্ডের এই মিউজিয়ামে—সর্ব্বত্রই লোহিতাঙ্গদিগের বৈষয়িকজীবন বেশ বুঝিতে পারা যায়। প্রধানতঃ চামড়ার কাজ এবং বেতের কাজে ইহারা দক্ষ। ইহাদের দেবদেবী, মুখোস, ইত্যাদি অন্যান্য স্থানীয় নরসমাজের উদ্ভাবিত ধর্ম্ম-কলারই অনুরূপ বোধ হয়। ইহাদের হস্তশিল্প দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। বর্ত্তমান যুগের বাষ্পশক্তিব্যবহারের পূর্ব্বে ইয়োরোপের জনসাধারণ কিরূপ ছিল? তাহা একবার কল্পনা করিয়া লইলে লোহিতাঙ্গ ইণ্ডিয়ান্‌দিগকে Primitive বা আদিম, অসভ্য, অথবা অর্দ্ধসভ্য বলিতে প্রবৃত্তি হইবে না। বস্তুতঃ রাগদ্বেষবিবর্জ্জিত, কুসংস্কারহীন ও নিরহঙ্কার দৃষ্টিতে যতই মানবাত্মার বিভিন্ন অভিব্যক্তি দেখা যাইবে ততই "সভ্যতা" শব্দটা নূতন করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইবে।

Comparative Zoology অর্থাৎ তুলনাত্মক জীববিদ্যা বিষয়ক সংগ্রহালয় নৃতত্ত্ববিষয়ক মিউজিয়ামেরই অনুরূপ। দুইই বহুকাল পূর্ব্বে প্রায় একসময়ে স্থাপিত। হার্ভার্ডে জীবতত্ত্ব ও প্রাণবিজ্ঞান সম্বন্ধে চর্চ্চা অনেকদিন হইতেই চলিতেছে। এখানকার জীবতত্ত্ববিৎ আগাসিজ জগৎপ্রসিদ্ধ ছিলেন। এই সংগ্রহালয়ের একটি ক্ষুদ্র গৃহে জীবজগতের সকলগুলি বিভাগই অতি সংক্ষেপে দেখান হইয়াছে। এই গৃহে ২।৪ বার যাওয়া আসা করিলে Zoology বা জীববিদ্যার প্রাথমিক জ্ঞান সহজেই লাভ করা যায়। এই হিসাবে নিউইয়র্কের (Botanical Museum) বোটানিক্যাল মিউজিয়ম ও বিশেষ উপকারী।

এই ক্ষুদ্র গৃহের জীবশ্রেণীগুলি দেখিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর অন্তর্গত জীব-সম্প্রদায় দেখিবার জন্য অন্যান্য গৃহে আসিতে হয়। এইরূপ বহু কুঠরী অতিক্রম করিলে জীবজগতের বৈচিত্র্য হৃদয়ঙ্গম করা যায়। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীনকালের জীবজন্তু বুঝাইবার ব্যবস্থাও আছে। এতদ্ব্যতীত সমুদ্রের অভ্যন্তর হইতে জীব-সংগ্রহ করিবার যন্ত্র, জাল, ইত্যাদিও দেখিতে পাইলাম।

মিউজিয়ামগুলি আয়তনে সুবৃহৎ নয় বলিয়া সহজে বুঝিতে পারা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ চালাইবার জন্য এইরূপ সংগ্রহই আবশ্যক। উচ্চ অঙ্গের অনুসন্ধান ইত্যাদির নিমিত্ত স্বতন্ত্র ল্যাবরেটরীর প্রয়োজন। মিউজিয়ামে তাহার ব্যবস্থাও আছে। একটা বিশেষ নিয়ম দেখিলাম। জনসাধারণ এই-সমুদয় সংগ্রহালয় বিনামূল্যে দেখিতে অধিকার পায়।

প্রাচীন ক্রীটের মিনোয়ান্ সভ্যতা।

একজন ইয়াঙ্কি বষ্টন-রমণীর গৃহে নিমন্ত্রণ ছিল। ইঁহার গৃহ যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলে—নিগ্রোজাতীয় লোকেরা সাধারণতঃ ঐ অঞ্চলে বাস করে। এই ইয়াঙ্কিরমণী কুমারী অভিংটনের ন্যায় নিগ্রোসমাজের অন্যতম হিতৈষী—কিছুকাল হইতে উত্তরে আসিয়া বাস করিতেছেন।

ইনি প্রথমেই বলিলেন "মহাশয় পৃথিবীর সভ্যতা এতদিন পুরুষের হাতে ছিল—ক্রমশঃ নারীজাতির হাতে আসিতেছে। ভবিষ্যতে মানবসমাজ রমণীতন্ত্র হইবে তখন সভ্যতার নূতন রূপ দেখিতে পাইবেন।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কিরূপ হইবে তাহার ইঙ্গিত করিতে পারেন কি?" ইনি বলিলেন—"জগতে যুদ্ধবিগ্রহ মারামারি কাটাকাটি থাকিবে না। আমার বিশ্বাস বর্ত্তমানে যে সংগ্রাম চলিতেছে ইহাই পৃথিবীর শেষ সমর। এই-খানেই পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত সভ্যতার চরম। রমণীর বাণী যদি আদৃত হইত তাহা হইলে যুদ্ধ বাধিত না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"রমণী-জাতি কি যুদ্ধ চাহে না? স্ত্রীলোকেরা কি দেশের গৌরব ও সম্মান রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে না?" ইনি বলিলেন—"পুরুষেরা ওজর দেখায় যে তাহারা রমণী-জাতির শোচনীয় পরিণাম নিবারণ
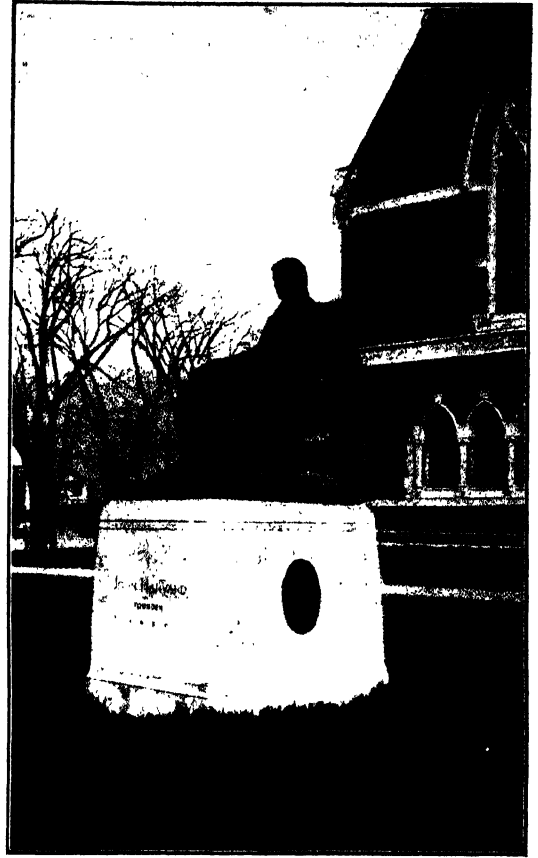
জন হার্ভার্ড, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রপাত-কর্ত্তা।

করিবার জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে রক্তারক্তির ফলে স্ত্রীলোকের এবং পরিবারের সুখবৃদ্ধি ত হয়ই না—শেষ পর্য্যন্ত দেশের মুখ উজ্জ্বলও হয় না। প্রথমতঃ, জননীরা তাহাদের কর্ম্মঠ সন্তানগণকে স্বচক্ষে মরিতে দেখে। যুদ্ধে যেসকল পুরুষ প্রাণত্যাগ করে তাহাদের কষ্ট একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। কিন্তু রমণীরা স্বামীপুত্রগনভাবে প্রতিদিন তিল তিল করিয়া মরিতে থাকে। এই কষ্ট পুরুষেরা বুঝিবে না। তারপর যুদ্ধের সময়ে অবলা রমণী কোথায় না লাঞ্ছিত অপমানিত ও নির্য্যাতিত হইয়াছে? একে প্রিয়জনের বিয়োগ, তাহার উপর শত্রুহস্তে অমানুষিক অত্যাচার—প্রত্যেক সংগ্রামে রমণীসমাজকে এই দুই প্রকার দুর্দ্দৈব ভোগ করিতে হয়। কাজেই যেদিন হইতে রমণীজাতি রাষ্ট্রশাসনে যথার্থ

অধিকার পাইবে সেদিন হইতে যুদ্ধবিগ্রহ সংসার হইতে উঠিয়া যাইবে। পুরুষের নিকট নারী-জাতি যত অত্যাচার সহ্য করিয়াছে তাহার মধ্যে যুদ্ধসংঘর্ষ অন্যতম। পুরুষদিগের উত্তেজনা উদ্দীপনা এবং অদূরদর্শিতার ফলে রমণীকে কষ্টভোগ করিতে হয়। কিন্তু নারীর বাণী আর বেশী দিন চাপা থাকিবে না ;. রাষ্ট্রমণ্ডলে পুরুষের একাধিপত্য অল্পকালের ভিতর ঘুচিয়া যাইবে।"

এই রমণী একজন চিত্রকর এবং নানাবিধ লোকহিতবিধায়ক কর্ম্মে লিপ্ত। ঐতিহাসিক আলোচনায় ইঁহার যথেষ্ট উৎসাহ। ইঁহার গৃহে আর-একজন রমণীর সঙ্গে আলাপ হইল। ইনিও চিত্রকর এবং চিত্রসমালোচক। সম্প্রতি ইয়োরোপীয় চিত্রশিল্পের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ বুঝিতেছেন। ইঁহার হাতে Religious Art of France in the XIIIth Century নামক ফরাসীগ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ দেখিলাম।

বসিবার ঘরে ছোটবড় নানাপ্রকার বিদেশীয় দ্রব্য সাজান রহিয়াছে—পিত্তলের কাজ, রূপার বাসন, কার্পেটের থলে, চিত্র ইত্যাদি। রমণী বলিলেন—"এইগুলি আমার বিদেশ পর্য্যটনের ফল। কোনটা রুশিয়া হইতে আমদানী, কোনটা স্পেন হইতে আমদানী, কোনটা এশিয়ামাইনার হইতে আমদানী।"

ইনি ৩।৪ বার ইয়োরোপের নানাদেশ দেখিয়া আসিয়াছেন। একবার ঐতিহাসিক অভিধানের চিত্রকরস্বরূপ গিয়াছিলেন। কয়েকবৎসর হইল পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে ক্রীটদ্বীপে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান পরিচালিত হয়। ঐতিহাসিকগণ খননকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন—এই রমণী খনন-লব্ধ সকলদ্রব্যের যথাযথ চিত্র আঁকিয়া দিতেন। রমণী এই অনুসন্ধানের প্রকাশিত সচিত্র বিবরণ দেখাইলেন, ইঁহার অঙ্কিত চিত্রগুলিই মুদ্রিত হইয়াছে।

ক্রীটদ্বীপ সম্বন্ধে ভারতবাসীর অভিজ্ঞতা আশা করা যায় না। মাস কয়েক হইল শ্রীযুক্ত আনন্দকুমার কুমারস্বামী Ostasiatich Zeitschrift নামক প্রাচ্যসভ্যতাবিষয়ক জার্ম্মান ত্রৈমাসিকে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধ পরে আমাদের মডার্ণরিভিউ পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে এবং প্রবাসীর পঞ্চশস্যে তাহার আভাষ দেওয়া হইয়াছিল। লেখক প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কারশিল্পে ক্রীটীয় শিল্প-রীতির প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। এই প্রবন্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সঙ্গে ক্রীটের কোনরূপ সম্পর্ক সম্বন্ধে বোধ হয় কোনপ্রকার আলোচনা হয় নাই।

বস্তুতঃ ক্রীটসম্বন্ধে ঐতিহাসিক আলোচনা এবং মানবেতিহাসে, বিশেষতঃ ইয়োরোপের ইতিহাসে, ক্রীটীয় সভ্যতার মূল্য-নির্দ্ধারণ ও স্থান-নির্ণয় অতি অল্পদিনের কথা। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ ক্রীটসম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ নানাবিস্ময়বিজড়িত তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষে অধ্যাপক ব্যুরি (Bury) প্রণীত History of Greece সুপরিচিত। এই গ্রন্থে ক্রীটীয় সভ্যতার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। তাহা হইতে বুঝা যায়—আজকালকার পণ্ডিতেরা ক্রীটের প্রাচীন সভ্যতাকে ইয়োরোপীয় সভ্যতার আদিম স্তর বিবেচনা করিতেছেন। এতদিন প্রাচীনগ্রীসকে ইয়োরোপীয় মানবের শৈশবলীলাক্ষেত্র বিবেচনা করা হইত। বিগত ত্রিশ বৎসরের আবিষ্কারের ফলে সপ্রমাণ হইতেছে যে প্রাচীন গ্রীস প্রাচীনতর ক্রীটীয় সভ্যতার উত্তরাধিকারী মাত্র। সেই প্রাচীনতর সভ্যতাকে (Aegean) ইজিয়ান সভ্যতা বলা হয়। ইজিয়ান সাগরের দ্বীপাবলির ভিতর এই সভ্যতার কেন্দ্র অবস্থিত ছিল বলিয়া ইহার নাম এইরূপ। কেহ কেহ ইহাকে মিনোয়ান (Minoan) সভ্যতা বলিয়া থাকেন। ক্রীটদ্বীপের রাজগণের মিনস্ (Minos) উপাধি ছিল।

অধ্যাপক বারোজ্ (Burrows) প্রণীত The Discoveries in Crete—and their bearing on the history of ancient civilisation গ্রন্থে ক্রীটতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। ক্রীটের সঙ্গে ভূমধ্যসাগরের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম উপকূল, দক্ষিণ রুশিয়া, মধ্য ইয়োরোপ, মিশর ও এশিয়ামাইনর ইত্যাদি জনপদের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল তাহা এই গ্রন্থের নিম্নলিখিত অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে ;—

CRETE AND THE EAST: Minoan and Semitic religion—Minoan and Egyptian reli-

gion—The Distinctive Element in Cretan Orientalism – Babylon and the Mediterranean —The Red men of the Aegean—Carians and Phœnicians— The coming of the Greeks— The Mediterranean Race.

2. THE NEOLITHIC POTTERY OF SOUTH RUSSIA AND CENTRAL EUROPE: The Neolithic spiral area—Theory of Aegean Origin— Theory of Indo European Origin Mediterranean Race Theory.

3. Crete and the Homeric Poems:

4. Egyptian chronology: The Great gap in Egyptian history—the continuity of Egyptian Art—Points of contact between Minoan and Egyptian Art

প্রাচীন মিশরে যে সময়ে ফ্যারাওগণ রাজত্ব করিতেন তখন অবশ্য প্রাচীনগ্রীসের কোন প্রতিপত্তি ছিল না। কিন্তু তখন প্রাচীন ক্রীটের সভ্যতা বিকশিত হইয়াছিল। ফ্যারাও-প্রবর্ত্তিত সভ্যতা এবং মিনোয়ান সভ্যতা উভয়ের পরস্পর আদানপ্রদানও কথঞ্চিৎ সাধিত হইয়াছিল। কাজেই মিশরীয় সভ্যতার ইতিহাসে ক্রীটের স্থান আছে।

মিনোয়ান সভ্যতা প্রায় ২০০০বৎসর বিরাজ করিয়াছিল। পরে এই সভ্যতা ধ্বংস করিয়া ঈজিয়ানসাগরের অভ্যন্তর-স্থিত দ্বীপপুঞ্জে এবং চতুষ্পার্শ্বে, অর্থাৎ গ্রীস, এশিয়ামাইনর ইত্যাদি জনপদে উত্তর ইয়োরোপ হইতে সমাগত জনগণ নূতন নূতন জীবন-কেন্দ্র স্থাপন করে। সে প্রায় খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেরও ১৫০০ বৎসরের কথা—ইহারাই গ্রীক নামে পরিচিত—হোমারীয় কাব্য এই যুগের রচনা। সুতরাং হোমার প্রাচীন গ্রীসের জন্মকালে এবং প্রাচীনতর ক্রীটের মৃত্যুকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ফলে হোমারীয় সাহিত্যে মিনোয়ান বা ঈজিয়ান সভ্যতারই সবিশেষ পরিচয় পাই। ক্রীটতত্ত্ব আলোচনার ফলে হোমারতত্ত্ব-সম্বন্ধে নূতন মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল।

দেখাশুনা।

বষ্টনে যাওয়া আসা করিতেছি। পুরাতন নগরের অলিগলির পার্শ্বে নিউইয়র্কের ধরণে রাস্তাঘাট ক্রমশঃ নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানকার শিক্ষাসংগ্রহালয় দেখিলাম। ভবনটি বেশীদিনের পুরাতন নয়—সংগ্রহও দিন দিন বাড়িতেছে। নিউইয়র্কের মিউজিয়ামে ফরাসী চিত্রকরগণের কার্য্য বেশী দেখিয়াছি। বষ্টনেও তাহাই দেখিতেছি। ইয়াঙ্কিরা মিশরীয়দিগের ন্যায় ফরাসীকে সত্য সত্যই ভালবাসে। ফরাসীবীর লাফেয়েত ইয়াঙ্কিস্থানের স্বাধীনতা সমরে সাহায্য করিয়াছিলেন।

মিউজিয়ামে প্রাচীন ক্রীট-সম্পর্কিত দ্রব্যনিচয় দেখিলাম। খৃষ্টপূর্ব্ব ৪০০০ হইতে খৃঃ পূঃ ১৫০০ পর্য্যন্ত কালের প্রস্তরপাত্র, পিত্তল ও হস্তীদন্ত-নির্ম্মিত দ্রব্য, দেবীমূর্ত্তি ইত্যাদি নানাবিধ পদার্থ সংগৃহীত রহিয়াছে। সংগ্রহের পরিমাণ বেশী নয়। জাপানী ও চীনা গৃহে অনেক জিনিষ দেখা গেল। এখানে মধ্যযুগের জাপানী চিত্রাবলীর সংখ্যা মন্দ নয়; জাপানীরা তরুলতা পশুপক্ষী বনপর্ব্বত ইত্যাদি আঁকিতে সিদ্ধহস্ত। নিউইয়র্কে একদিন চীনা চিত্রশিল্পের প্রদর্শনী দেখিয়াছিলাম। তাহাতে খৃষ্টীয় ৬০০ হইতে ১৪০০ পর্য্যন্ত কালের কার্য্য দেখান হইয়াছিল। এই শিল্পেও প্রাকৃতিক-পদার্থ-চিত্রণের সৌষ্ঠব লক্ষ্য করিয়াছি। বষ্টনের সংগ্রহলয়ে জাপানী কুম্ভকারের কার্য্যও বহুল পরিমাণে রক্ষিত হইয়াছে। মোটের উপর ধারণা জন্মিল যে গ্রীস মিশর ইত্যাদি অপেক্ষা ফ্রান্স ও জাপান এই মিউজিয়ামে লোকের দৃষ্টি বেশী আকর্ষণ করে। বোধ হয় জাপানের সংবাদ ইয়াঙ্কিদের সম্প্রতি বিশেষভাবে রাখা আবশ্যক। বষ্টননগরে অনেক Social Service Settlements অর্থাৎ সমাজ-সেবকদের বাসকেন্দ্র আছে। ইয়োরোপ ও আমেরিকার প্রায় প্রত্যেক বড় জায়গায়ই এইরূপ সমাজ-সেবার কেন্দ্র বা লোকহিতবিধায়িনী সমিতি আজকাল দেখা যায়। যেখানে যত টাকাপয়সা ও বিলাসভোগ সেই-খানেই তত দারিদ্র্য দুর্দ্দশা ও অধোগতি! বষ্টনের এক কর্ম্মকেন্দ্রে উপস্থিত হইলাম। কয়েকজন রমণী ও একজন পুরুষের সঙ্গে আহার করা গেল। পুরুষটি আমারই মত অভ্যাগত। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলে জর্জিয়া প্রদেশের আটলাণ্টানগরে শিক্ষাপ্রচার করেন। জর্জিয়া প্রদেশ নিগ্রোপ্রধান। ইনি একটি নিগ্রো-বিদ্যালয়ের পরিচালক। ইঁহাকে দেখিয়া শ্বেতাঙ্গ ইয়াঙ্কি বলিয়া বোধ
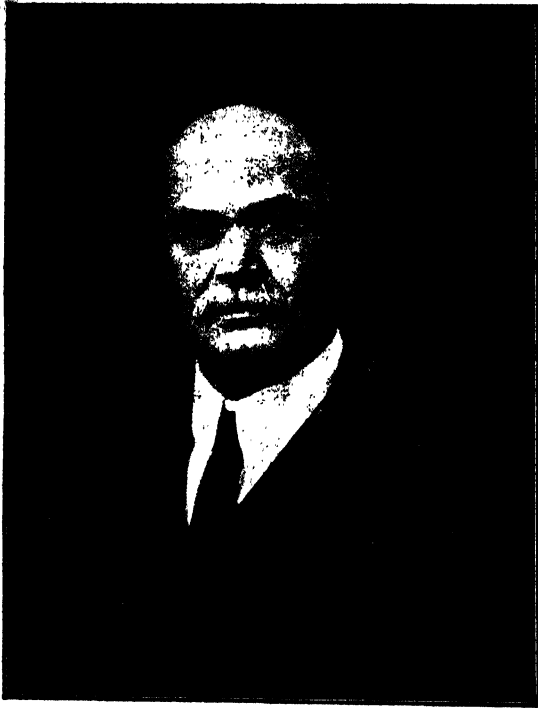
ধন-বিজ্ঞানের অধ্যাপক টাওসিগ।

হয়। এমনকি নিগ্রোসুলভ কোঁকড়াচুলও ইঁহার নাই। ইনি চলিয়া গেলে ইয়াঙ্কি রমণীরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই ব্যক্তি যে নিগ্রো তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন কি?" এইরূপ দোআঁস্‌লা নিগ্রোর সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রে ১০ লক্ষ অর্থাৎ সমগ্র নিগ্রোসংখ্যার দশমাংশ।

ইয়াঙ্কি রমণীগণ পাড়ার দরিদ্র বালকবালিকাদিগকে বিনামূল্যে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। বিদ্যালয়ের কার্য্য রাত্রিতে চালান হয়। রন্ধন হইতে ব্যায়াম ও নৃত্যকলা পর্য্যন্ত সকল বিদ্যা শিখাইবার ব্যবস্থা আছে। নিগ্রো-ইয়াঙ্কি সকলবর্ণের লোকই এই সেবা-কেন্দ্রের উপকার লাভ করে। ইয়াঙ্কিরমণীগণ ভারতবর্ষের নাম শুনিয়াছেন; ইঁহাদের কোন কোন আত্মীয় দক্ষিণভারত, পঞ্চনদ এবং অন্যান্যস্থানে খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণের সঙ্গে কর্ম্ম করিতেছেন।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের একটা আড্ডা আছে। তাহার নাম (Colonial Club) কলোনিআল ক্লাব। ইঁহাদের নিমন্ত্রণে বাহিরের লোকেরা এই ক্লাবের মেম্বার হইতে পারেন। এ দেশের অন্যান্য সাধারণ ক্লাবের মত ইহা একটা হোটেলবিশেষ। পাঠাগারে নানাপ্রকার সংবাদপত্র রক্ষিত হয়। ক্ষুদ্র লাইব্রেরীও আছে। ছাত্রদের আড্ডার নাম (Harvard Union) হার্ভার্ড ইউনিয়ন। বিলাতী অক্‌সফোর্ড ও কেম্ব্রিজে এইপ্রকার ইউনিয়ন আছে। এই ইউনিয়নের সভ্যেরা খেলাধূলা, নাচগান ইত্যাদি সকলপ্রকার ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

অধ্যাপক টাওসিগ (Taussig) হার্ভার্ডে ধনবিজ্ঞান বিভাগের কর্ত্তা। ইনি ভারতবর্ষে বোধহয় সুপরিচিত নন। ইঁহার প্রণীত গ্রন্থ কয়েকবৎসর মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের দেশে এতকাল মিলের যুগ চলিতেছিল—সম্প্রতি অধ্যাপক মার্শ্যালের যুগ চলিতেছে। টাওসিগের গ্রন্থে কথঞ্চিৎ নূতন আকারের কতকগুলি সমস্যার আলোচনা করা হইয়াছে।

টাওসিগ বলিলেন "মহাশয়, আপনারা যদি ভারতবর্ষে ধনবিজ্ঞান চর্চ্চার যথার্থ ব্যবস্থা করিতে চাহেন তাহা হইলে বিগত এক হাজার বৎসরের আর্থিক ও বৈষয়িক ইতিহাস বুঝিতে চেষ্টা করুন। কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত ছাত্রকে Economic History অর্থাৎ বার্ত্তাশাস্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করিতে নিযুক্ত করুন। তাহার জন্য ইঁহাদিগকে জার্ম্মানি, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় আসিতে হইবে। আমার মতে ইঁহাদের কোন একদেশে থাকিবার প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক ছাত্রকে তিনদেশেই একএক বৎসর করিয়া থাকিতে হইবে। আমেরিকায়ও ধনবিজ্ঞান-চর্চ্চা এই উপায়েই স্থিরপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। কলাম্বিয়ার সেলিগ্‌ম্যান, উইস্কন্সিনের ইনাই ইত্যাদি আজকালকার প্রসিদ্ধ ইয়াঙ্কি অধ্যাপকগণ এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়াছিলেন। পরে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা অনুসারে অধীতবিদ্যার প্রয়োগ করিতেছেন। আজকাল আমরা ইয়াঙ্কিস্থানে নূতন মতের ধনবিজ্ঞান প্রচার করিতেছি। প্রথম যুগে আমরা ইংরেজ পণ্ডিতগণের বুলি আওড়াইতাম মাত্র। ১৮৭০ সালের পর বিশবৎসর কাল আমরা জার্ম্মান মত অবলম্বন করিয়া ছিলাম। এক্ষণে আমাদের স্বতন্ত্র ইয়াঙ্কি-মতবাদ চলিতেছে বলিতে পারি।"

কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের ইতিহাস সম্বন্ধে খানিকক্ষণ আলোচনা হইল। যাহাকে Industrial Revolution শিল্পবিপ্লব বলা হয়—ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই বাষ্প-

চালিত-শিল্পের বিকাশ বাজারের আয়তন বৃদ্ধির উপর নির্ভর করিয়াছে। বিলাতের মালগুলি যদি একমাত্র বিলাতী লোকের অভাবনিবারণের জন্য প্রস্তুত হইত তাহা হইলে বিরাট কারখানা যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত কারবার শ্রমবিভাগ-নীতির প্রবর্ত্তন ইত্যাদি বেশী হইতে পারিত কি? কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের বাজার বিলাতের হস্তগত ছিল। এজন্য বহু নরনারীর বহুবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হয়। তাহার ফলেই বড় বড় ফ্যাক্টরী, সুবৃহৎ অনুষ্ঠান ইত্যাদির প্রচলন হইতে পারিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ বিলাতের বাজার না থাকিলে বড় বড় কারখানা খুলিয়া ইংরেজের কোন লাভ হইত না। অতএব দেখা যাইতেছে যে ইংরেজেরা নিষ্কণ্টক সাম্রাজ্যের একচেটিয়া বাজার না পাইলে বৈজ্ঞানিক কলকারখানার ব্যবহার, সময়লাঘবকারী যন্ত্রাদির প্রয়োগ, নব নব আবিষ্কার—এক কথায় শিল্প-বিপ্লব—দেখা দিত না।

টাওসিগের মতে নিষ্কণ্টক সাম্রাজ্যভোগ অথবা একচেটিয়া বাজারের অধিকার না থাকিলেও Large Scale Production সুবৃহৎ শিল্পকারখানা এবং বড় বড় ফ্যাক্টরী ইত্যাদি চলিতে পারিবে। "আজকাল নানা-কারণে প্রত্যেকদেশই একহিসাবে অন্যান্য সকল দেশের বাজারস্বরূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন দেশ-সমূহের লোকেরা পরস্পর দ্রব্যবিনিময় না করিয়া পারিবে না। ভবিষ্যতে বাজারের আয়তন কোন মতেই কমিবার সম্ভাবনা নাই। World market বা বিশ্ববাজার জগতে থাকিয়া গেল। কাজেই কোন দেশে বিরাট কারখানা খুলিয়া একসঙ্গে বহুপরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিলে কারবারওয়ালাদিগকে খরিদদার খুঁজিবার জন্য বসিয়া থাকিতে হইবে না—অথবা একমাত্র স্বদেশীয় ক্রেতাদিগের উপর নির্ভর করিতে হইবে না। পৃথিবীর নানাস্থান হইতেই অর্ডার যথাস্থানে আসিতে থাকিবে।"

টাওসিগ যুক্তরাষ্ট্রের কথা পাড়িলেন। ইনি বলেন যে, ইয়োরোপ অথবা এশিয়ার সকলদেশের সঙ্গে ইয়াঙ্কিদের ব্যবসায় ও বাণিজ্য যদি নিতান্তই স্থগিত হইয়া যায় তথাপি আমেরিকায় বড় বড় ফ্যাক্টরীর কাজ চলিতে পারিবে। যুক্তরাষ্ট্রের পঁয়তাল্লিশ প্রদেশের অভাবমোচন করিবার জন্য সুবৃহৎ কারখানাসমূহের সুযোগগুলি ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক থাকিবে। কুটির-শিল্প, এবং ক্ষুদ্র কারবার কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত চিরকালই থাকিবে। কিন্তু মোটের উপর বিংশশতাব্দীতে উনবিংশশতাব্দীর Industrial Organisation বা শিল্পব্যবস্থাই বজায় থাকিবে।

ভারতবর্ষের অনেকেই সংস্কৃতাধ্যাপক ল্যানম্যানের নাম শুনিয়াছেন। ইনি Harvard Oriental Series বা হার্ভার্ড প্রাচ্য গ্রন্থপর্য্যায়ের সম্পাদক। এই গ্রন্থমালায় সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বেল্‌ভেলকার এম্-এ, পিএইচ-ডির (হার্ভার্ড) 'উত্তরচরিত' গ্রন্থের সটীক সানুবাদ সংস্করণ বাহির হইতেছে।

ল্যান্‌ম্যানের গৃহে সংস্কৃত এবং পালির ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক ইংরেজী ফরাসী ও জার্ম্মান গ্রন্থ ও পত্রিকার সংগ্রহ দেখিলাম। ভারতবর্ষে এরূপ একটা লাইব্রেরী পাইলে আমাদের ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ যথার্থ উচ্চ শ্রেণীর কার্য্য করিতে সমর্থ হন। এইরূপ গ্রন্থালয়ের অভাবে আমাদের অধিকাংশ কার্য্যই মধ্যম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর পদার্থ থাকিয়া যাইতেছে। ইহাই ভারতীয় গ্রন্থকারের প্রণীত এবং ভারতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর যথোচিত সমাদর না হইবার অন্যতম কারণ।

ভারতবর্ষের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম অঞ্চলের নানা কেন্দ্র হইতে আজকাল সংস্কৃত প্রাকৃত বা পালিসাহিত্যের প্রচার হইয়া থাকে। ল্যান্‌ম্যান্ প্রত্যেক কেন্দ্রের নামই জানেন। ইহার গৃহে সকলস্থানের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী দেখিতে পাইলাম। আমরা ভারতবর্ষে থাকিয়াও সকল গ্রন্থাবলী একসঙ্গে চোখে দেখিয়াছি কি?

ল্যানম্যান্ ভারতীয় প্রকাশক ও সম্পাদকগণকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"মহাশয়, এইসকল গ্রন্থমালা সম্পাদনে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য প্রযুক্ত হইতেছে সকলেই মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য। কিন্তু এরূপ বিশ্রীভাবে গ্রন্থ প্রকাশ করিবার রীতি বোধ হয় জগতে আর কোথাও নাই। আজকাল জ্ঞানের রাজ্য প্রতিদিন বাড়িয়া যাইতেছে—কম সময়ে প্রত্যেককে বেশী কাজ করিতে হইবে। কোন একটা খুঁটিনাটি লইয়া সময় খরচ করা অসম্ভব। কিন্তু ভারতে প্রকাশিত কোন গ্রন্থের মলাটে

হয়ত নামই লিখিত থাকে না। কোন গ্রন্থে সূচীপত্র পশ্চাতে। নির্ঘণ্ট ইত্যাদি প্রস্তুত করা কোন গ্রন্থকারই কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করেন না। পাতা কাটা, বাঁধান, মলাট ইত্যাদি বিষয়েও সকলেই অমনোযোগী। তাহার পর ধারাবাহিকরূপে যে-সকল পত্রিকা মাস মাস বাহির হয় তাহাদের সম্পাদকগণ নিতান্তই কাণ্ডজ্ঞানহীন। হয়ত চারিখানা গ্রন্থের কিছু কিছু অংশ প্রথম সংখ্যায় বাহির হইল। দ্বিতীয় সংখ্যায় হয়ত মাত্র দুইখানা গ্রন্থের পরবর্ত্তী কিয়দংশ বাহির হইল। তৃতীয় সংখ্যায় হয়ত আবার চারিখানা গ্রন্থেরই কিছু কিছু অংশ বাহির হইল। এইরূপে হয়ত আট সংখ্যায় চারিখানা গ্রন্থ সমাপ্ত হইবে। কিন্তু বলুন ত—এই চারিখানা গ্রন্থ স্বতন্ত্র করিয়া বাঁধাইতে এবং স্বতন্ত্রভাবে রক্ষা করিতে পাঠকের কি অসুবিধা? এত অসুবিধা ভোগ করা আজকালকার দিনে একবারে অসাধ্য। কাজেই ভারতীয় প্রকাশকগণের কার্য্য ইয়োরোপে এবং আমেরিকায় আদৃত হয় না।"

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

ধর্ম্মপাল

[নৌকাডুবি হইতে রক্ষা পাইয়া বরেন্দ্রমণ্ডলের মহারাজা গোপালদেব ও তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপাল সপ্তগ্রাম হইতে গৌড় যাইবার রাজপথে যাইতে যাইতে পথে এক ভগ্নমন্দিরে রাত্রিযাপন করেন। প্রভাতে ভাগীরথীতীরে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে দস্যুলুণ্ঠিত এক গ্রামের ভীষণ দৃশ্য ও অরাজকতা দেখাইলেন। সন্ন্যাসীর নিকট সংবাদ আসিল যে গোকর্ণ দুর্গ আক্রমণ করিতে শ্রীপুরের নারায়ণ ঘোষ সসৈন্যে আসিতেছেন; অথচ দুর্গে সৈন্যবল নাই। সন্ন্যাসী তাঁহার এক অনুচরকে পার্শ্ববর্ত্তী রাজাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনার জন্য পাঠাইলেন এবং গোপালদেব ও ধর্ম্মপালদেব দুর্গরক্ষার সাহায্যের জন্য সন্ন্যাসীর সহিত দুর্গে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দুর্গ শীঘ্রই শত্রুর হস্তগত হইল। ঠিক সেই সময়ে উদ্ধারণপুরের দুর্গস্বামী উপস্থিত হইয়া নারায়ণ ঘোষকে পরাজিত ও বন্দী করিলেন। সন্ন্যাসীর বিচারে নারায়ণ ঘোষের মৃত্যুদণ্ড হইল। দুর্গস্বামিনী কন্যা কল্যাণীকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিবার জন্য মহারাজ গোপালদেবকে অনুরোধ করিলেন। গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করার উৎসবের দিন মহারাজের সভায় সপ্ত সামন্ত রাজা উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাসীর পরামর্শক্রমে তাঁহাকে মহারাজাধিরাজ সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিলেন।

গোপালদেবের মৃত্যুর পর ধর্ম্মপাল সম্রাট হইয়াছেন। তাঁহার পুরোহিত পুরুষোত্তম খুল্লতাত-কর্ত্তৃক হৃতসিংহাসন ও রাজ্যতাড়িত কান্যকুব্জরাজের পুত্রকে অভয় দিয়া গৌড়ে আনিয়াছেন। ধর্ম্মপাল তাঁহাকে পিতৃসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এই সংবাদ জানিয়া কান্যকুব্জরাজ গুর্জ্জররাজের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া দূত পাঠাইলেন। পথে সন্ন্যাসী দূতকে ঠকাইয়া তাহার পত্র পড়িয়া লইলেন। গুর্জ্জররাজ সন্ন্যাসীকে বৌদ্ধ মনে করিয়া সমস্ত বৌদ্ধদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিবার উপক্রম করিলেন। এদিকে সন্ন্যাসী বিশ্বানন্দের কৌশলে ধর্ম্মপাল সমস্ত বৌদ্ধকে প্রাণপাত করিয়া রক্ষা করিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন। সম্রাট ধর্ম্মপাল সামন্তরাজাদিগকে সঙ্গে লইয়া কান্যকুব্জ রাজ্য জয় করিতে যাত্রা করিলেন। এই যুদ্ধের মধ্যে গুর্জ্জরেরা গোকর্ণ দুর্গ আক্রমণ করিতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে জানিয়া ধর্ম্মপাল তাঁহার বাগ্‌দত্তা পত্নী কল্যাণীকে লইয়া প্রস্থান করিলেন; পথে কল্যাণী অপহৃত ও ধর্ম্মপাল আহত হইয়া বন্দী হইয়াছিলেন। পরে ধর্ম্মপাল কল্যাণীকে লইয়া সেখান হইতে পলায়ন করিয়া নিজের সেনাদলে মিলিত হইয়াছেন।]

নবম পরিচ্ছেদ।

গোবিন্দের চক্রধারণ।

সহসা যুদ্ধ থামিয়া গেল। গুর্জ্জরসেনা যখন প্রায় গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে, তখন গৌড়ীয় সেনাপতিগণ একদিন বিস্মিত হইয়া শুনিলেন যে দলে দলে গুর্জ্জরসেনা পশ্চিমাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। প্রমথসিংহ অজয়তীরে শিবিরে গুর্জ্জরসেনা কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি একদিন প্রভাতে যুদ্ধারম্ভ করিতে গিয়া শুনিলেন যে, শিবির উঠাইয়া গুর্জ্জরসেনা রাত্রিকালে প্রস্থান করিয়াছে। রাঢ় ও বরেন্দ্রের সর্ব্বত্র একই সময়ে গুর্জ্জরসেনা আক্রমণ পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে ফিরিল। গৌড়ীয় সেনানায়কগণ বিস্মিত হইয়া রহিলেন। তাঁহারা নগর দুর্গ ছাড়িয়া তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিতে সাহসী হইলেন না। প্রমথসিংহের সাবধানতা সকলের মনঃপূত হইল না, বিমলনন্দী অশ্বারোহী সেনা লইয়া রাত্রিযোগে পলায়ন করিয়া গুর্জ্জরসেনার অনুসরণ করিলেন। ধর্ম্মপাল তখন নিরুদ্দেশ।

গুরুদত্ত যেদিন নিরুদ্দিষ্ট গৌড়েশ্বরের ও ভাবী পট্টমহাদেবী কল্যাণীদেবীকে লইয়া ঢেক্করী নগরীতে ফিরিয়া আসিতেছেন, তখন গুর্জ্জরসেনা গৌড় অঙ্গ মগধ ছাড়িয়া করূষদেশে চলিয়া গিয়াছে। দুইদিন পরে বিমলনন্দী সংবাদ পাঠাইলেন যে, শোণ পার হইবার সময়ে গুর্জ্জরদিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল, যুদ্ধকালে জয়বর্দ্ধন ও ভীষ্মদেব আসিয়া পড়ায় গুর্জ্জরগণ পরাজিত হইয়াছে, সহস্র সহস্র গুর্জ্জরসেনা বন্দী হইয়াছে।

ধর্ম্মপাল ও কল্যাণীকে লইয়া গুরুদত্ত যখন ঢেক্করীতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন নগরময় রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর নবপরিণীতা পত্নীকে লইয়া নগরে আসিতেছেন। দলে দলে নাগরিক ও নাগরিকা উৎসবের বেশে সজ্জিত হইয়া রাজা ও রাজ্ঞীর সম্বর্দ্ধনার জন্য তোরণের বাহিরে পথের ধারে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নগরে নাগরিকগণ মাল্য পুষ্প পত্র দিয়া গৃহের সম্মুখ সাজাইল, দুয়ারে দুয়ারে পূর্ণঘট ও কদলীবৃক্ষ স্থাপিত হইল। সকলেই জানিল যে, মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বরের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এমন কি কমলসিংহও বিশ্বাস করিলেন যে, কল্যাণীর সহিত ধর্ম্মপালের বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

সম্রাট আসিলেন। ঢেক্করী নগরে তাঁহার উপযুক্ত গৃহ ছিল না, সুতরাং নগরমধ্যে তাঁহার জন্য বস্ত্রাবাস স্থাপিত হইল; পরিচারিকা ও সখীবৃন্দের অভাবের জন্য কল্যাণীদেবী ধর্ম্মাধিকারের গৃহে আসিলেন। ধর্ম্মপাল যেদিন ঢেক্করীতে আসিয়া পৌঁছিলেন, সেই দিন অপরাহ্নে কমলসিংহ শিবিরে বসিয়া গৌড়েশ্বরের সহিত আলাপ করিতে করিতে কহিলেন, "মহারাজ! আপনি যখন কল্যাণীর স্বামী, তখন সম্পর্কে আপনি আমার কনিষ্ঠ। আমার স্বর্গীয়া পিতৃব্যপত্নী যে কল্যাণীর বিবাহ দিয়া মরিতে পারিয়াছেন—ইহাই আমাদিগের সৌভাগ্য।"

ধর্ম্মপাল বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি? গোকর্ণের দুর্গস্বামিনীর কি মৃত্যু হইয়াছে?"

"হাঁ; আপনি কি সে সংবাদ পান নাই?"

"না।"

"তবে কল্যাণীও তাহার মাতার মৃত্যুর কথা জানে না?"

"না।"

"গুরুদত্ত কি এসংবাদ আপনাকে দেয় নাই?"

"না; দুর্গস্বামিনীর কি প্রকারে মৃত্যু হইল?"

"মহারাজ! আপনার শ্বশ্রূ পতিকুলের দুর্গ রক্ষার্থ অসিহস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন।"

"গোকর্ণদুর্গ কি তবে গুর্জ্জরেরা অধিকার করিয়াছিল?"

"না; পিতৃব্যপত্নী শত্রুসেনার গতিরোধের জন্য অমৃতানন্দ ও গুরুদত্তের সহিত দুর্গপ্রাকারে দাঁড়াইয়া সৈন্য চালনা করিতেছিলেন; এই সময়ে শত্রুপক্ষের শরাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। গুরুদত্ত আপনাকে এই সংবাদ দিতে গোকর্ণ হইতে ঢেক্করী আসিয়াছিল।"

"কিন্তু গুরুদত্ত ত আমাকে এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলে নাই? সে কোথায়?"

"মহারাজ যখন নগর প্রবেশ করিলেন, তখন গুরুদত্ত আপনার পার্শ্বে ছিল।"

"তাহার পর হইতে তাহাকে আর দেখিতে পাই নাই।"

"তাহার সন্ধান করিব কি?"

"আপনি অপেক্ষা করুন, আমিই সন্ধান করিতেছি।"

গৌড়েশ্বরের আহ্বানে জনৈক দণ্ডধর বস্ত্রাবাসের মধ্যে প্রবেশ করিল। ধর্ম্মপাল তাহাকে গুরুদত্তের সন্ধানে যাইতে আদেশ করিলেন। দণ্ডধর প্রস্থান করিলে, গৌড়েশ্বর কহিলেন, "মহানায়ক! আপনিই এখন মহাদেবীর নিকট-আত্মীয়। কল্যাণীর মাতৃবিয়োগসংবাদ আপনিই তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়া আসুন?"

কমলসিংহ কহিলেন, "মহারাজ! কল্যাণী ধর্ম্মাধিকার বরাহরাতের অন্তঃপুরে আছেন, এ সংবাদ ধর্ম্মাধিকারের পত্নী অথবা ভগিনীর মুখে ব্যক্ত হওয়াই উচিত।"

গৌড়েশ্বরের আদেশে আর-একজন দণ্ডধর ধর্ম্মাধিকার বরাহরাতের সন্ধানে গেল। ধর্ম্মপাল তখন কমলসিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন গোকর্ণদুর্গের কি ব্যবস্থা করিবেন?"

"মহারাজ, আমি কি ব্যবস্থা করিব? গৌড়েশ্বরের পট্টমহাদেবী কল্যাণীই এখন গোকর্ণদুর্গের অধীশ্বরী, গৌড়েশ্বরীর অধিকার রক্ষা করিবার জন্য মহারাজকে একজন রাজভৃত্য নিয়োগ করিতে হইবে।"

ধর্ম্মপাল উত্তর না দিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে একজন দণ্ডধর আসিয়া সংবাদ দিল যে, মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বরের সমীপে বর্দ্ধমান ভুক্তির ধর্ম্মাধিকার বরাহরাত শর্ম্মা সাক্ষাৎপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ধর্ম্মপাল তাঁহাকে কক্ষে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। অবিলম্বে বরাহরাত শর্ম্মা সশীর্ষ নারিকেল লইয়া গৌড়েশ্বরের সমীপে উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মপাল তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসন দিয়া কহিলেন, "ধর্ম্মাধিকার! অদ্য একটি বিশেষ কার্য্যের জন্য আপনাকে

আহ্বান করিয়াছি। আপনার সাংসারিক সমস্ত কুশল ত?”

বরাহরাত কহিলেন, “মহারাজ, গত দুই বৎসর যাবত আমরা বড়ই মানসিক অশান্তিতে দিনযাপন করিতেছি।”

“কি হইয়াছে?”

“মহারাজ, গুর্জ্জরযুদ্ধের প্রারম্ভে আমার ভগিনীপতি সর্ব্বানন্দ ন্যায়ালঙ্কার সামান্য কারণে গৃহত্যাগ করিয়াছেন।”

“তাঁহার কি কোন সন্ধান পান নাই?”

“শুনিয়াছি সর্ব্বানন্দ গৌড়েশ্বরের সেনাদলে প্রবেশ করিয়াছেন। এই সংবাদ শুনিয়া আমি গর্গদেবকে ও মহাকুমার বাক্‌পালদেবকে তাঁহার সন্ধান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তখন কোন সন্ধান পাই নাই। সম্প্রতি গুরুদত্ত নামক মহারাজাধিরাজের একজন সেনানায়ক আপনার সন্ধানে গোকর্ণ হইতে ঢেক্করীতে আসিয়াছিল; সে যখন মহানায়ক কমলসিংহের সন্ধানে আমার গৃহে আসিয়াছিল, তখন আমার ভগিনী কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাঁহাকে চিনিয়াছিল, তদবধি গুরুদত্ত বা সর্ব্বানন্দের সন্ধানে ফিরিতেছি।”

“মহানায়ক, গুরুদত্ত কি ব্রাহ্মণ?”

কমল।— উদ্ধবের মুখে শুনিয়াছিলাম যে গুরুদত্ত-ব্রাহ্মণ।

ধর্ম্ম।— সর্ব্বানন্দ ন্যায়ালঙ্কার ন্যায়শাস্ত্রের ফক্কিকা ছাড়িয়া অসি ধারণ করিল কেন?

বরাহ।— মহারাজ! সর্ব্বানন্দ আমার ভগিনীকে বড়ই ভাল বাসিত; সে তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া অর্থোপার্জ্জনে মনোযোগী হয় নাই। কুক্ষণে একদিন আমার ভগিনী, আমার পত্নীর অঙ্গে নূতন অলঙ্কার দেখিয়া সর্ব্বানন্দের নিকটে সেইরূপ অলঙ্কার চাহিয়াছিল। তখন তাহার অলঙ্কার দিবার সঙ্গতি ছিল না। সেইদিন সর্ব্বানন্দ দুঃখে ক্ষোভে গৃহত্যাগ করিয়াছে।

ধর্ম্ম।— কিন্তু গুরুদত্ত অশ্বারোহণে ও অস্ত্রচালনে যেরূপ সুদক্ষ তাহাতে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে হয় না?

বরাহ।— মহারাজাধিরাজ! স্বর্গীয় গৌড়েশ্বরের রাজ্যারম্ভের পূর্ব্বে দেশ যখন অরাজকতায় উচ্ছন্ন যাইতেছিল, তখন গৌড়বঙ্গবাসী জাতিনির্ব্বিশেষে অস্ত্রবিদ্যা শিখিত। সর্ব্বানন্দ সুদক্ষ অশ্বারোহী, ধনুর্ব্বিদ্যায় আমাদিগের মণ্ডলে তাহার সমকক্ষ ছিল না, অসি চালনা করিয়া সে বহুবার গৌড়েশ্বরের সৈনিকদিগকে পরাজিত করিয়াছে।

ধর্ম্ম।— গুরুদত্তের আকৃতি কিরূপ?

কমল।— মহারাজের কি স্মরণ নাই যে, গুরুদত্ত সর্ব্বদা বর্ম্মাবৃত হইয়া থাকিত?

ধর্ম্ম।— হাঁ; সে কখনও অধিক কথা কহিত না।

এই সময়ে একজন দণ্ডধর আসিয়া সংবাদ দিল যে, বিশ্বানন্দ ও উদ্ধবঘোষ দাক্ষিণাত্য হইতে যাত্রা করিয়াছেন। রাষ্ট্রকূটরাজ গোবিন্দ গৌড়েশ্বরের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া গুর্জ্জররাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন। কমলসিংহ হাসিয়া কহিলেন, “মহারাজ, গোবিন্দ এতদিনে চক্রধারণ করিয়াছেন। এইবারে জয় অবশ্যম্ভাবী।”

ধর্ম্মপাল ম্লানমুখে কহিলেন, “মহানায়ক, শেষ রক্ষা হইয়াছে বটে, কিন্তু বৌদ্ধ সঙ্ঘ আমাকে যে নীতি শিক্ষা দিয়াছে, তাহা আমি কখনও বিস্মৃত হইব না।”

এই সময়ে আর-একজন দণ্ডধর আসিয়া সংবাদ দিল যে, সেনানায়ক গুরুদত্ত স্কন্ধাবারে অনুপস্থিত, তাঁহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। তখন গৌড়েশ্বর ধীরে ধীরে কহিলেন, “ধর্ম্মাধিকার, সর্ব্বানন্দ ন্যায়ালঙ্কার যদি সত্য সত্যই গুরুদত্ত নাম ধারণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি তাহাকে ধরিয়া আনিয়া দিব, দুই একদিন বিলম্ব হইবে মাত্র। আপনাকে যে কার্য্যের জন্য আহ্বান করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন,—আমি ঢেক্করীতে আসিয়া শুনিলাম, যে মহাদেবী কল্যাণীর মাতৃবিয়োগ হইয়াছে। মহাদেবী গোকর্ণের দুর্গবাসিনীর একমাত্র সন্তান, তিনি মাতৃবিয়োগ-সংবাদ শ্রবণ মাত্র অতিশয় কাতরা হইয়া পড়িবেন, অতএব আমার অনুরোধ যে, মহাশয় আপনার পত্নী অথবা ভগিনীর দ্বারা এই সংবাদ তাঁহার নিকট ব্যক্ত করুন।”

বরাহরাত কিয়ৎক্ষণ অবনত মস্তকে চিন্তা করিলেন, এবং তাহার পরে কহিলেন, “কার্য্যটি অত্যন্ত দুরূহ, তবে সম্রাট যখন আদেশ করিতেছেন, তখন তাহা প্রতিপালিত হইবে।” ধর্ম্মাধিকার এই বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ধর্ম্মপাল কমলসিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহানায়ক, গুরুদত্ত কে?”

"সমস্যা।"

"পূরণ করিবে কে ?"

প্রেম।"

দশম পরিচ্ছেদ

চক্রের পরিবর্ত্তন।

সন্ধ্যাকালে পথিপার্শ্বে আম্রকুঞ্জে স্থাপিত শিবিরে বসিয়া একজন গৈরিকধারী সন্ন্যাসী ও একজন বর্ষীয়ান যোদ্ধা আলাপ করিতেছিলেন। গ্রীষ্মকাল। বস্ত্রাবাসের অভ্যন্তরে তাপ অসহ্য। সেইজন্য পান্থদ্বয় বৃদ্ধ-সহকারতলে শয্যা বিছাইয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। কিঞ্চিদ্দূরে বৃক্ষতলে শতাধিক সেনা ও পরিচারক রন্ধনের উদ্যোগ করিতেছিল; বস্ত্রাবাসের চারিকোণে চারিজন অস্ত্রধারী সেনা প্রতীহার রক্ষায় নিযুক্ত আছে। বৃদ্ধ বলিতেছেন, "প্রভু, জীবনের সকলকার্য্যই শেষ করিয়া আনিয়াছি, একটিমাত্র অবশিষ্ট আছে।"

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেটি কি ?"

"কল্যাণীর বিবাহ। কল্যাণীকে গৌড়েশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিলেই, আমি নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিব।"

"এইবারে যুদ্ধ শেষ হইবে, সুতরাং কল্যাণীর বিবাহের অধিক বিলম্ব নাই।"

"প্রভু! বহুকাল পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে, জ্যোতিষ-শাস্ত্রে আপনার অসাধারণ অধিকার আছে। কবে কল্যাণীর বিবাহ হইবে; কবে আমার মুক্তি হইবে—অনুগ্রহ করিয়া গণিয়া বলিয়া দিবেন কি ?"

সন্ন্যাসী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "কল্যাণীকে না দেখিয়া কেমন করিয়া তাহার ভাগ্য গণনা করিব ? চল দেশে ফিরিয়া কল্যাণীর ভাগ্য পরীক্ষা করিব।"

"প্রভু! আমার মুক্তি কবে হইবে তাহা কি গণিয়া বলিতে পারেন না ?"

"পারি, তুমি অগ্রসর হইয়া আইস।"

বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর নিকটে সরিয়া বসিলেন। সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ তাহার হস্ত পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, "উদ্ধব! কল্যাণী কবে জন্মিয়াছিল, তাহা কি তোমার স্মরণ আছে ?"

"আছে; যে বৎসর আশ্বিন মাসের ঝড়ের দিন ভূমিকম্প হইয়াছিল, সেই বৎসর ভূমিকম্পের অর্দ্ধদণ্ড পরে কল্যাণীর জন্ম হইয়াছিল।"

সন্ন্যাসী উদ্ধবঘোষের হস্ত পরিত্যাগ করিলেন। এবং শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড গ্রহণ করিয়া ভূমিতে রেখাঙ্কণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন, "উদ্ধব, কল্যাণীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে।"

"অসম্ভব প্রভু! আমার অনুপস্থিতিতে কি কখনও কল্যাণীর বিবাহ হইতে পারে ?"

"হাঁ, কল্যাণীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে, নয় তাহার সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে।"

এই সময়ে আম্রকুঞ্জ মুখরিত করিয়া করুণ কোমলকণ্ঠ হইতে সঙ্গীতধ্বনি উঠিল,

পথ দেখায়ে দে,
তোরা পথ দেখায়ে দে।
আমি পথ-হারা,—
ও গো দিশে-হারা,—
আমায় পথ দেখায়ে দে ॥

সন্ন্যাসী কাষ্ঠখণ্ড ফেলিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া গান শুনিতে লাগিলেন। সঙ্গীতধ্বনি ক্রমে নিকটে আসিতে লাগিল। উদ্ধবঘোষ দেখিলেন একটি কৃষ্ণকায় মলিন-ছিন্নবস্ত্র-পরিহিত শীর্ণদেহ বালক পথ ধরিয়া উত্তর দিকে চলিয়াছে। উদ্ধবঘোষ ও সন্ন্যাসী বিশ্বানন্দ যে পথ অবলম্বন করিয়া গৌড়ে ফিরিতেছিলেন, সে পথ পুরুষোত্তমের পথ। সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও গৌড় হইতে পুরুষোত্তম যাইবার সুন্দর পথ ছিল। মুসলমান ও ইংরেজরাজার নির্ম্মিত পথের পার্শ্বে এখনও হিন্দু রাজার নির্ম্মিত পথ স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা লৌহবর্ত্ম বা বর্ত্তমান রাজপথ ছাড়িয়া, শ্বাপদসঙ্কুল বনমধ্যে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের সন্ধান করে তাহারা এখনও উড়িষ্যার পথে শত শত স্থানে প্রাচীন যুগের প্রশস্ত রাজপথের চিহ্ন দেখিতে পায়। তখনও সকল সময়ে সহস্র সহস্র যাত্রী নীলপর্ব্বতে পুরুষোত্তম দর্শনের মানসে এই পথে যাতায়াত করিত। পথে দরিদ্র ভিক্ষুকেরও অভাব ছিল না। সুতরাং পুরুষোত্তমের পথে সঙ্গীতধ্বনি তেমন আশ্চর্য্যজনক ছিল না। বিশ্বানন্দ ও উদ্ধবঘোষ গায়কের সুশিক্ষা ও মধুর কণ্ঠ শুনিয়াই আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন,

ভিক্ষুক-সম্প্রদায়ের মধ্যে সচরাচর এমন সুশিক্ষিত ও সুকণ্ঠ গায়ক দেখিতে পাওয়া যায় না। বালক গাহিতে লাগিল,—

তোরা চোখের ভরে বলীয়ান,
চলে যাস্ দর্প-ভরে,
আমি অন্ধ আতুর পথহারা,—
দেখিস না'ক বারেক ফিরে।

শিবিরের নিকটে আসিয়া বালক রাজপথ ছাড়িয়া বস্ত্রাবাসের দিকে আসিতে লাগিল—

ভাগ্যচক্রে বদ্ধ মোরা
তোরা আস্‌বি ফিরে একই স্থানে,
অন্ধ বলে অবহেলে
আমায় যাসনে ফেলে যাস্‌নে (রে) ॥
আমায় পথ দেখায়ে দে।

বালক নিকটে আসিয়া বস্ত্রাবাসের সম্মুখে দাঁড়াইল এবং আর-একবার গীতটি গাহিল, তাহার পরে ভিক্ষাপাত্র বাহির করিয়া কহিল, "ভিক্ষা দাও।"

তখন বিশ্বানন্দ কহিলেন, "বালক। এইদিকে আইস।" বালক তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া বৃদ্ধ সহকারের নিম্নে আসিয়া দাঁড়াইল। বিশ্বানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালক, তুমি কে?"

"আমি ভিখারী—"

"তোমার নাম কি?"

"আমার নাম কাণা।"

"তোমার কি অন্য কোন নাম নাই?"

"না; সবাই ত এই বলিয়া ডাকে।"

"তোমার নিবাস কোথায়?"

"এখন পথে পথে।"

"পূর্ব্বে কোথায় ছিল?"

"মা বলিত কোথায় যেন আমাদের নিবাস ছিল।"

"সে কোথায়?"

"তাহা ত জানি না।"

"তুমি কোথায় যাইবে?

"গৌড়ে।"

"তোমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া বোধ হইতেছে যে তুমি গৌড়ীয়; গৌড়নগরে কি তোমাদের বাস ছিল?"

"তাহা ত জানি না, তবে গৌড়ের নাম করিলে মা কাঁদিত।"

"তোমার মাতা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন কেন?"

"পিতা মরিয়া গেলে অন্নাভাবে।"

"তোমাদের কি আর কেহ ছিল না?"

"তাহা ত জানি না। আপনারা কি ভিক্ষা দিবেন?"

"দিব; সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?"

"বাবা, অনেকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া শেষে মারিয়া তাড়াইয়া দেয়।"

"তোমার পিতা কি কাজ করিতেন জান?"

"জানি; তিনি রাজার সৈনিক ছিলেন। যুদ্ধ করিতে গিয়া মরিয়া গিয়াছেন।"

"তাহার পর?"

"তাহার পর মা অন্নাভাবে আমাকে কোলে লইয়া ভিক্ষায় বাহির হইতেন। গ্রামের লোক নিত্য ভিক্ষা দিত না, সেইজন্য মা আমার দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।"

উদ্ধবঘোষের শীর্ণগণ্ডস্থল বহিয়া দুই-এক কোঁটা উষ্ণ অশ্রুজল গড়াইয়া পড়িল। বিশ্বানন্দের কণ্ঠস্বর গম্ভীরতর হইয়া উঠিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা কি তোমাদের জন্য কোন ব্যবস্থা করেন নাই?"

"যে রাজার জন্য বাবা প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় হইয়াছিল।"

"তোমার কেমন করিয়া দিন চলে।"

"ভিক্ষা করিয়া; বাবা, কে যেন দিন চালাইয়া দেয়; কোন দিন ভিক্ষা মিলে; যে দিন মিলে না, সে দিন কে যেন কোথা হইতে আহার জুটাইয়া দেয়; যখন তৃষ্ণা পায় তখন কে কোথা হইতে আমাকে জলাশয়তীরে আনিয়া রাখিয়া যায়। কে যেন আমাকে পথ দেখাইয়া দেয়, অথচ দূরে দূরে পলাইয়া বেড়ায়, আমি সারাদিন তাহাকে ধরিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াই, তাহার ছায়ামাত্র দেখিতে পাই কিন্তু তাহাকে ত দেখিতে পাই না?"

বৃদ্ধ বিশ্বানন্দ কাঁদিতে কাঁদিতে অন্ধ বালককে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। বালক বিস্মিত হইয়া দৃষ্টিহীন নেত্র তাঁহার মুখের দিকে ফিরাইল। বিশ্বানন্দ কহিলেন, "বাপ, আমি

গৌড়ীয়, আমি সন্ন্যাসী, তুমি কোমল বয়সে অনেক কষ্ট পাইয়াছ, তুমি আমার সহিত গৌড়ে আইস, যদি পারি তাহা হইলে তোমার দুর্ব্বল জীবনের গুরুভার লঘু করিব।"

বালক বিস্মিত হইয়া সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "বাবা, তুমি অমন করিতেছ কেন? কত লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, কত লোককে এই কথা বলিয়াছি, কেহ বা ভিক্ষা দিয়াছে, কেহ বা প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে, কিন্তু কেহ ত তোমার মত কাতর হয় নাই?"

বিশ্বানন্দ আবেগভরে বালককে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, "বাপ, তুমি আমার সহিত গৌড়ে চল।"

অন্ধবালক ক্ষুণ্নমনে কহিল, "যাইতাম বাবা, কিন্তু এখন ত পারিব না।"

উদ্ধবঘোষ অবনত মস্তকে বসিয়া ঘন ঘন চক্ষু মার্জ্জনা করিতেছিলেন। তিনি বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন যাইবে না?"

বালক কহিল, "আমি এক বুড়ার সঙ্গে তাহাকে পথ দেখাইয়া গৌড়ে লইয়া যাইতেছি। আমি চলিয়া গেলে, খাইতে না পাইয়া সে মরিয়া যাইবে।"

বিশ্বানন্দ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "বাবা, তুমি অন্ধ, তুমি আবার কাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাও?"

"সে এক বুড়া, চলিতে পারে না; সে বলে যে, সে প্রায়শ্চিত্ত করিতে গৌড়ে যাইতেছে। আমাকে যে পথ দেখায়, সে তাহাকে পথ দেখায় না; কেন দেখায় না তাহা আমি বুঝিতে পারি না।"

"কেন?"

"সে বলে যে, সে মহাপাতকী, তাহার জন্য নাকি লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন নাশ হইয়াছে।"

"তাহাকে লইয়া আইস; আমরা তাহাকেও গৌড়ে লইয়া যাইব।"

বালক বিশ্বানন্দের বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইয়া পথের দিকে চলিল। বৃদ্ধ উদ্ধবঘোষ ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "চল আমি তোমাকে পথ দেখাইয়া দিতেছি।" বালক কহিল, "না, পথ দেখাইয়া দিতে হইবে না, সে ছায়ার মত আমার আগে আগে চলিয়াছে, আমি তাহাকে দেখিয়া পথ চিনিয়া লইব।"

বালক গীত গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল। উদ্ধবঘোষ কহিলেন, "বেশ গীতটি, গ্রাম্য কবির রচনা বটে কিন্তু ভাব অতি সুন্দর।" বিশ্বানন্দ উত্তর না দিয়া পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বালক জনৈক শীর্ণকায় বৃদ্ধের হস্ত ধরিয়া ফিরিয়া আসিল। বিশ্বানন্দ স্থিরনেত্রে বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া ছিলেন, তিনি বৃদ্ধকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাহা দেখিয়া উদ্ধবঘোষও দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধ নিকটে আসিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল এবং বিশ্বানন্দের পদদ্বয় আলিঙ্গন করিয়া কহিল, "বিশ্বানন্দ, রক্ষা কর, আমাকে রক্ষা কর।" সন্ন্যাসী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?" বৃদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "আমি বুদ্ধভদ্র।" বিস্মিত হইয়া বিশ্বানন্দ বৃদ্ধ সঙ্ঘস্থবিরের হস্তধারণ করিয়া উঠাইলেন এবং আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সঙ্ঘস্থবির, আপনি এখানে কেন?"

"তোমার নিকট আশ্রয়ভিক্ষা করিবার জন্য।"

"সেকি কথা! আপনি উত্তরাপথের সঙ্ঘস্থবির, আমি সামান্য চক্ররাজ মাত্র।"

"বিদ্রূপ করিও না বিশ্বানন্দ, আমার দর্প চুর্ণ হইয়াছে। আমার জন্য সদ্ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায়, আমার জন্য লক্ষ লক্ষ নর-নারীর জীবন বিনষ্ট হইয়াছে, আমাকে আশ্রয় দাও, আমাকে রক্ষা কর, আমাকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে দাও।" বৃদ্ধ সঙ্ঘস্থবির এই বলিয়া পুনরায় সন্ন্যাসীর পাদমূলে লুটাইয়া পড়িলেন। বিশ্বানন্দ পুনর্ব্বার তাঁহার হাত ধরিয়া উঠাইলেন; তখন বুদ্ধভদ্র বলিতে আরম্ভ করিলেন, "বিশ্বানন্দ, আমি সুবর্ণবণিকের পুত্র, বৃদ্ধ বয়সে সঙ্ঘে প্রবিষ্ট হইয়াও সুবর্ণের লালসা পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। বহু অর্থব্যয় হইতেছে দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম গুর্জ্জররাজের সহিত সন্ধি করিয়া বিনা অর্থব্যয়ে সদ্ধর্ম্মের কার্য্যসিদ্ধি করিব। বিশ্বানন্দ, বিশ্বাসঘাতকতার ফল ফলিয়াছে। গুর্জ্জর নিজমূর্ত্তি ধরিয়াছে, লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ নরনারীর রক্তে উত্তরাপথ রঞ্জিত হইয়াছে। আমার যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে, আমাকে রক্ষা কর। গৌড়েশ্বর ভিন্ন সদ্ধর্ম্মের গতি নাই, ধর্ম্মপাল ভিন্ন উত্তরাপথের গতি নাই। বিশ্বানন্দ, আমাকে পুনরায় গৌড়েশ্বরের সকাশে লইয়া চল।"

সহসা বিশ্বানন্দের মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "চলুন। কিন্তু প্রভু অন্ধবালকের আশ্রয় লইয়াছেন কেন?"

"ভাগ্যচক্র বিশ্বানন্দ! গণনায় দেখিয়াছি, আমার ও তোমার ভাগ্যচক্রের সহিত এই অন্ধবালকের ভাগ্যচক্র আবদ্ধ। যতদিন ইহার সাক্ষাৎ পাই নাই, ততদিন তোমার সন্ধান পাই নাই; যেদিন ইহার সাক্ষাৎ পাইলাম, সেইদিন গণনায় জানিলাম যে, ইহার সহিত গৌড়ের পথে যাত্রা করিলে তোমার সাক্ষাৎ পাইব।" বিশ্বানন্দ পুনরায় ঈষৎ হাস্য করিলেন।

চতুর্থভাগ সমাপ্ত

পঞ্চম ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেবমন্দিরে।

ঢেক্করী নগরের অনতিদূরে নদীতীরে একটি পাষাণ-নির্ম্মিত প্রাচীন দেবালয় ছিল, কালক্রমে বহু নিম্ব অশ্বত্থ বট প্রভৃতি দীর্ঘাকার বৃক্ষ তাহাতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; অশ্বত্থবৃক্ষের ভারে মন্দিরের চূড়াটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। নগর হইতে দলে দলে নরনারী নদীতে স্নান করিতে আসিত এবং স্নানান্তে দেবমন্দিরে পূজা করিতে যাইত। সন্ধ্যাকালে পুরমহিলাগণ ধূপ দীপ লইয়া মন্দিরে আরতি দেখিতে আসিতেন। মন্দির বহুপুরাতন; কে তাহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহা কেহই বলিতে পারিত না। মন্দিরের ভিতরের শিবলিঙ্গ মন্দির অপেক্ষাও পুরাতন; প্রতিষ্ঠাতা যে নাম দিয়াছিলেন তাহা ভুলিয়া গিয়া নাগরিকগণ তাহাকে বুড়াশিব বলিয়া ডাকিত। প্রভাতে ও সন্ধ্যায় বুড়াশিবের মন্দিরে ভীষণ জনতা হইত। মধ্যাহ্নে শ্রান্ত পথিকগণ নগরে আশ্রয় না পাইলে মন্দিরের পার্শ্বে বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিত, কারণ নদীতীরে বহুদূর পর্য্যন্ত তেমন স্নিগ্ধ ছায়াময় স্থান আর ছিল না।

বৈশাখ মাস। সমস্তদিন ভীষণ রৌদ্রে জগত দগ্ধ হইয়াছে। অপরাহ্ণে বায়ু বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, মৃতকল্প জগতে জীবনীশক্তি পুনরায় ফিরিয়া আসিতেছে। এই সময়ে একজন পথিক নদীতীর অবলম্বন করিয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে আসিতেছিল। তাহার পরিচ্ছদ মলিন, ধূলি-ধূসরিত, সে ধীরে ধীরে বহুকষ্টে দেহভার বহন করিয়া মন্দিরের দিকে যাইতেছিল। মন্দিরের নিকটে আসিয়া সে ব্যক্তি আর চলিতে পারিল না, একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করিল।

এই সময়ে কলহাস্যে দিগন্ত মুখরিত করিয়া কতকগুলি পুরাঙ্গনা কলস কক্ষে লইয়া নদীতীরে আসিতেছিল। পথিক তাহাদিগকে দেখিয়া বিরক্ত হইয়া বৃক্ষতল হইতে উঠিয়া মন্দিরের নিম্নে একটি বৃহৎ বটবৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মহিলাগণ নদীর জলে নামিয়া রহস্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। একজন কহিলেন, "আর শুনেছিস্? ধর্ম্মাধিকারের ভগিনী-পতি নাকি ফিরিয়া আসিয়াছে?" দ্বিতীয়া কহিলেন, "ধর্ম্মাধিকারের গৃহে গিয়া ত দেখিতে পাইলাম না।" রঙ্গ-প্রিয়া তৃতীয়া কহিলেন, "ওরে, জামাতা অনেকদিন পরে শ্বশুরগৃহে আসিয়াছিল, সেইজন্য লজ্জায় দিবালোকে মুখ দেখাইতে পারে নাই, সন্ধ্যাকালে আসিয়া রাত্রিশেষে পলায়ন করিয়াছে।"

প্রথমা।— তোরা ত কোন কথা জানিস্ না? ধর্ম্মাধিকারের ভগিনী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছে শুনিয়া আমি সেদিন সন্ধ্যাকালে তাহাদিগের গৃহে গিয়াছিলাম।

দ্বিতীয়া।— সে কতদিন পূর্ব্বে দিদি?

প্রথমা।— অষ্টাহ পূর্ব্বে। গিয়া দেখি মূর্চ্ছা টুর্চ্ছা কিছুই নহে, মাগী মূর্চ্ছার ভান করিয়া উঠানে শুইয়া আছে। শুনিলাম পূজার সজ্জা করিতে করিতে হঠাৎ নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া ঠাকুরাণীর মূর্চ্ছা হইয়াছে। আগা-গোড়া সমস্ত মিথ্যা।

বৃক্ষান্তরালে থাকিয়া পথিক রমণীগণের কথালাপ সমস্তই শুনিল। বিরক্ত হইয়া বৃক্ষতল পরিত্যাগ করিয়া স্নানের জন্য নদীর জলে নামিল। রমণীগণ দূরে থাকিয়া তাহাকে দেখিল। পথিকের পৃষ্ঠে একটি দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন ছিল, তাহা দেখিয়া প্রথমা রমণী দ্বিতীয়াকে কহিল, "ঐ মানুষটার পৃষ্ঠে কত বড় একটা দাগ দেখিয়াছিস্ ভাই?" দ্বিতীয়া কহিল, "হাঁ, বোধ হয় ওটা জড়ুল।" পথিক

গাহাদিগের কথায় কর্ণপাত না করিয়া স্নানান্তে অন্যস্থলে ফিরিয়া গেল।

এই সময়ে চারিজন নীচ জাতীয়া রমণী সম্মার্জনী হস্তে পথ পরিষ্কার করিতে করিতে নগর হইতে নদীতীরে আসিল; তাহাদিগের পশ্চাতে চারিজন পরিচারক পথের ধূলি নিবারণের জন্য কলস হইতে বারিসিঞ্চন করিয়া গেল। রমণীগণ তাহা দেখিয়া পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "কি ভাই, এত উদ্যোগ কেন?" প্রথমা কহিল, "উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর না কেন?" দ্বিতীয়া একজন পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এত উদ্যোগ কেন গা? রাজা আসিবেন নাকি?" পরিচারিকা সগর্ব্বে উত্তর করিল, "পট্টমহাদেবী গৌড়েশ্বরী দেবদর্শন-মানসে আসিবেন।" প্রথমা উত্তর শুনিয়া মুখ বাঁকাইয়া কহিলেন, "একবার সাধুভাষার ঘটাটা শুনিয়াছিস? রাজবাড়ীর পরিচারিকা কি না, অহঙ্কারে চোখে দেখিতে পাইতেছে না।" দ্বিতীয়া সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া পরিচারিকাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাণী আসিবেন, তাঁহার সঙ্গে আর কে কে আসিবেন?" পরিচারিকা কহিল, "মহারাণীর সঙ্গে ধর্ম্মাধিকারের ভগিনী অমলাদেবী, তাঁহার পত্নী চিত্রমতিকাদেবী এবং রাজপুরীর অন্যান্য দুই-একজন মহিলা আসিবেন।" দ্বিতীয়া তাহা শুনিয়া সোল্লাসে প্রথমাকে কহিল, "দিদি, আজি আর-একটু থাকিয়া যা, মহারাণীর সহিত দেখা করিয়া দুই একটা কথা কহিয়া যাইব।" প্রথমা অবজ্ঞাভরে উত্তর দিল, "তোর ত ভরসা কম নহে, তুই নদীর ঘাটে মহারাণীর সহিত কথা কহিবি? এখনই মহল্লিকারা আসিয়া তোকে দূর করিয়া দিবে।"

পরিচারিকাগণ তাহাদিগের কথা শুনিতে পাইয়া কহিল, "আপনারা স্বচ্ছন্দে থাকুন, আমাদিগের মহাদেবী তেমন নহেন, তিনি আপনাদিগের সহিত আলাপ করিয়া কৃতার্থ হইবেন।" প্রথমা পুনরায় মুখ বাঁকাইয়া কহিল, "দেখ ভাই! ইতর লোকের মুখে সাধুভাষা আমার গায়ে কাঁটার মত বিঁধিতেছে।"

এই সময়ে আট-আটখানি শিবিকা রক্ষীদিগের দ্বারা পরিবৃত হইয়া মন্দিরের নিকটে আসিল। রক্ষীগণ দূরে দাঁড়াইয়া রহিল, বাহকগণ নদীতীরে শিবিকা নামাইয়া দূরে চলিয়া গেল। কল্যাণী, চিত্রমতিকাদেবী, মহাদেবী ও অমলা সখীগণের সহিত জলে নামিলেন। মহাদেবী উপস্থিত কুলমহিলাদিগের সহিত কল্যাণী ও চিত্রমতিকাদেবীর পরিচয় করাইয়া দিলেন। নূতন পট্টমহাদেবীর অপরূপ সৌন্দর্য্য ও বিনয়-নম্র কথালাপ দেখিয়া শুনিয়া গৌড়ীয় নাগরিকাগণ বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া গেল। অমলাদেবী স্নানান্তে দূরে দাঁড়াইয়া পূজা করিতেছিলেন, তিনি কাহারও সহিত আলাপ করিলেন না। স্নান শেষ হইলে মহাদেবী ও অন্যান্য মহিলাগণ আর্দ্র বস্ত্রে মহাদেবের মন্দিরে গমন করিলেন। নাগরিকাগণ নগরে ফিরিল। পথে যাইতে যাইতে প্রথমা দ্বিতীয়াকে কহিল, "মাগীর অহঙ্কার দেখিয়াছিস, আমাদিগের সহিত একটাও কথা কহিল না।" দ্বিতীয়া কহিল, "মহারাণীর মত মানুষ কিন্তু ভাই দেখা যায় না।" তাহা শুনিয়া প্রথমা দন্তে অধরোষ্ঠ চাপিলেন, উত্তর দিলেন না।

কল্যাণী ও অন্যান্য মহিলাগণ দেবদর্শন করিয়া মন্দিরের বাহিরে আসিলেন, কিন্তু অমলা তখনও গর্ভগৃহে রহিলেন। কল্যাণী মন্দিরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি, তুমি ঠাকুরের কাছে নিত্য নিত্য এত কি প্রার্থনা কর?" মন্দিরাভ্যন্তর হইতে অমলাদেবী কহিলেন, "দেবি, আমি কি প্রার্থনা করি তাহা তুমি কি বুঝিবে, ভগবান করুন যেন কখনও তোমাকে তাহা না বুঝিতে হয়।" কল্যাণী ক্ষুণ্ণমনে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিত্য নিত্য কি প্রার্থনা কর বলনা?" অমলাদেবী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "দেবি, তুমি বালিকা, আমি নিত্য এই মন্দিরে আসিয়া দেবাদিদেবের চরণে এই নিবেদন করি,—দেব, আমার প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে, আর আমার মোহ নাই, বাসনা নাই, আমি যেমন ভাবে ছিলাম সেই ভাবে আমাকে রাখিয়া দাও, আমার সেই অবস্থা ফিরাইয়া দাও। আমি ঐশ্বর্য্য চাহি না, সম্পদ চাহি না, আর কখনও অলঙ্কার চাহিব না—।" বলিতে বলিতে অমলাদেবীর কণ্ঠরোধ হইল, কল্যাণী অপ্রতিভ হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অমলা গর্ভগৃহের বাহিরে আসিলেন। রক্ষীদিগের দ্বারা পরিবৃত শিবিকাগুলি নগরাভিমুখে যাত্রা করিল।

কিয়ৎক্ষণপরে আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত পথিক মন্দির-শীর্ষের অশ্বত্থবৃক্ষ হইতে নামিয়া আসিল, সে রক্ষীগণের ভয়ে বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিল; বৃক্ষে থাকিয়া সে অমলা ও কল্যাণীর সকল কথাই শুনিতে পাইয়াছিল। সে নামিয়া আসিয়া বুড়াশিবের সম্মুখে লুটাইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল, "দেব বল দাও, অমলার দুঃখ আর সহ্য হয় না। আমার মনে বল দাও, নতুবা হয়ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে। গৌড়েশ্বরের কার্য্যে জীবনপণ করিয়াছি, বহু শোণিতপাত করিয়াছি, কিন্তু প্রভু, অদৃষ্টদোষে আমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় নাই। কবে হইবে তাহা বলিতে পারি না। দেবাদিদেব মহাদেব, তুমি অন্তর্য্যামী, আমার মনে বল দাও, যে অলঙ্কারের জন্য সাধের সংসার পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, সে অলঙ্কার সংগ্রহ না করিয়া অমলাকে মুখ দেখাইব না, মনে বল দাও প্রভু!"

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে অন্ধকারে তাহার পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিয়া একজন কহিল, "গুরুদত্ত, গৃহে ফিরিয়া চল, আমি অলঙ্কার দিব।" গুরুদত্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মন্দিরদ্বারে বহু উল্কা জ্বলিয়া উঠিল, গুরুদত্ত উজ্জ্বল আলোকে সবিস্ময়ে দেখিতে পাইল যে, মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভাগ্য গণনা।

রাষ্ট্রকূটরাজ গোবিন্দ যখন ধর্ম্মপাল ও চক্রায়ুধের পক্ষ অবলম্বন করিয়া গুর্জ্জররাজ্য আক্রমণ করিলেন, তখন গুর্জ্জরসেনা গৌড়রাজ্য পরিত্যাগ করিল বটে, কিন্তু কান্যকুব্জ রাজ্য রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল। ভীষ্মদেব, জয়বর্দ্ধন, বিমলনন্দী ও রণসিংহ পুনরায় বারাণসী ভুক্তি আক্রমণ করিলেন। প্রমথসিংহ গৌড়রাজ্য রক্ষার্থ শোণতীরে নূতন মৃণ্ময়দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া শিবির স্থাপন করিলেন। মহাকুমার বাক্পাল দ্বিতীয় সেনাদল লইয়া মণ্ডলদুর্গে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। গুরুদত্ত অথবা সর্ব্বানন্দ, উদ্ধবঘোষ, কমলসিংহ এবং কল্যাণীদেবীর সহিত গৌড়েশ্বর দীর্ঘকালপরে গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পট্টমহাদেবীকে লইয়া নবীনসম্রাট রাজধানীতে ফিরিতেছেন শুনিয়া রাঢ় ও বরেন্দ্রমণ্ডলের প্রজাবৃন্দ মহা সমারোহে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার আয়োজন করিল। নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে প্রজাবৃন্দ গৌড়েশ্বর ও গৌড়েশ্বরীর আগমনের দিনে নৃত্য গীত বাদ্য প্রভৃতি মহোৎসব আরম্ভ করিয়া দিল। গৌড়নগরে সম্রাটের বিবাহ ও রাজধানীতে আগমনের সংবাদ যথাসময়ে প্রচারিত হইল। গৌড়ায় নাগরিকগণ গৌড়েশ্বর ও পট্টমহাদেবীর অভ্যর্থনার জন্য বিশাল সমারোহের উদ্যোগ করিল। নগর সজ্জা আরম্ভ হইয়াছে, রাজপথসমূহে শত শত দারুময় তোরণ নির্ম্মিত হইতেছে, নাগরিকগণ স্ব স্ব গৃহের জীর্ণ সংস্কার করিয়াছে। সম্রাটের আগমনের দিনে রাজমাতা দেদ্দদেবী গৌড়নগরের নাগরিক ও নাগরিকাগণকে ভোজন করাইবেন, মহামন্ত্রী গর্গদেব তাহার আয়োজন করিতেছেন। গৌড়ে সকলেই প্রফুল্লমনে মহোৎসবে যোগদান করিয়াছে। এই সময়ে একদিন প্রভাতে জনৈক স্থূলকায় ব্রাহ্মণ বিষণ্ণ বদনে গঙ্গাস্নানে চলিয়াছেন। কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে ব্রাহ্মণ দেখিতে পাইলেন যে প্রাসাদের দিক হইতে একজন দাসী পূজার সজ্জা লইয়া কোন মন্দিরাভিমুখে চলিয়াছে। ব্রাহ্মণ তাহাকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলেন, "মাধবি, বলি ও মাধবি!" দাসী কিন্তু তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া দ্রুতপদে চলিতে আরম্ভ করিল। ব্রাহ্মণ তখন ক্ষিপ্রগতিতে তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দাসী দ্রুততরবেগে চলিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ হ্রস্বাকার এবং স্থূলকায়, সুতরাং তাঁহার দ্রুতগতি ক্রমে ধাবনে পরিণত হইল। দাসী তাহার পদশব্দ শুনিয়া হাসিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল।

ব্রাহ্মণ যখন হাঁপাইতে হাঁপাইতে দাসীর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়াছে, শ্বাসরুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ স্বেদসিক্ত হইয়াছে। দাসী তাঁহাকে দেখিয়া ক্রোধের ভান করিয়া কহিল, "কে রে? কে তুই? জানিস্ আমি রাজবাড়ীর দাসী? রাজবাড়ীর লোকে এখনই মারিতে মারিতে তোর বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দিবে।" ব্রাহ্মণের বাক্‌শক্তি যখন ফিরিয়া আসিল, তখন তিনি কহিলেন, "মাধবি, আমার সময়টা এখন বড়ই মন্দ, সময়ের গুণে সবই হয়, তুমিও আমাকে চিনিতে

পারিতেছি না, সেই জন্য প্রভাতে উঠিয়া ভাগ্য গণাইতে চলিয়াছি।

কি হইয়াছে বল দেখি ?”

“দেখ অতবড় রাজাটাকে গৌড়ে লইয়া আসিলাম; ভাবিয়াছিলাম সে কান্যকুব্জের রাজা হইলে কোন্ না আমাকে দুই দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিবে। আমার সময় মন্দ বলিয়া সে রাজা হইয়া আবার ফিরিয়া আসিল।”

“তা বটে।”

“আবার দেখ, সকলেই জানিত যুদ্ধ শেষ হইলে মহারাজের বিবাহ হইবে। এখন শুনিতেছি, মহারাজের নাকি বিবাহ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং ফলাহার, দক্ষিণা, দান, উপহার, পুরস্কার সমস্ত ভরসাই গেল।

“ফলাহার ত একদিন মিলিবে।”

“কোথায় অষ্টাহ, আর কোথায় একদিন। মাধবি, আমার সময় বড়ই মন্দ পড়িয়াছে, সেই জন্য দৈবজ্ঞের গৃহে যাইতেছি। ভাগ্য গণাইয়া গ্রহ-শান্তি করাইতে হইবে। তুমি কোথায় যাইবে ?”

“প্রভাতে আর কোথায় যাইব—মন্দিরে।”

“তবে চল আমিও সেই দিকে যাইব।”

উভয়ে রাজপথ ধরিয়া দক্ষিণদিকে চলিল। কিয়দ্দূর গিয়া মাধবী দেখিতে পাইল যে, একজন জটাজুটধারী সন্ন্যাসী আসিতেছে। মাধবী তাহাকে কহিল, “ঠাকুর ইনি আমার প্রভু, ইনি বড় বিপদে পড়িয়াছেন, আপনি কি অনুগ্রহ করিয়া ইঁহার ভাগ্য পরীক্ষা করিবেন ?”

সন্ন্যাসী পুরুষোত্তমের মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, “তুমি ভাবিতেছ কেন ? গৌড়েশ্বরের প্রকৃত বিবাহ হয় নাই। মাত্র গান্ধর্ব্ব বিবাহ হইয়াছে। দক্ষিণাপথের রাজকন্যার সহিত ধর্ম্মপালের বিবাহ হইবে। তখন তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। মন হইতে পাপচিন্তা দূর কর, হৃদয় প্রশস্ত কর, মহাপুরোহিত পদের উপযুক্ত হও।”

পুরুষোত্তম ও মাধবী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পথের মাঝে দাঁড়াইয়া রহিল, সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন।

যখন পুরুষোত্তমের জ্ঞান হইল, তখন তাহারা উভয়ে বহু সন্ধান করিয়াও সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইল না।

ক্রমশঃ

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্যাকরণ-বিভীষিকা

(৬)

এইবার স ম্রা জ্ঞী। কথাটা লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে, আমিও একটু ইহাতে যোগ দিই।

বৈদিক হইতে লৌকিক পর্য্যন্ত ভারতীয় সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে স ম্রা টে র জায়াকে আমাদের দেশে ম হি ষী বলা হইত (ঋগ্বেদ, ৫.২.২, ইত্যাদি; তৈত্তিরীয় সংহিতা ১.৮.৯.১; শতপথ ব্রাহ্মণ, ৬.৪.১ ১,; ইত্যাদি; রামায়ণ—Gorresio, ১.১৯.৮)।* অতএব স ম্রা ট্ ও ম হি ষী বলিলে নির্বিবাদে ঠিক বলা হয়। ম হি ষী র স্থানে স ম্রা ট-ম হি ষী বলা “ফাঁকী দেওয়া” (—ললিত বাবু যেমন বলেন) হয় না, অনাবশ্যক পুনরুক্তি করা হয়। সর্ব্বত্র যে পুরুষবাচী পুংলিঙ্গ শব্দটিকেই স্ত্রীলিঙ্গের প্রত্যয় দিয়া জায়া-অর্থে ব্যবহার করিতে হইবে, তাহার নিয়ম নাই। তুলঃ পি তা-মা তা।

যাঁহারা বলেন স ম্রা ট্ পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয়ই হয়, তাঁহারা ঠিকই বলিয়া থাকেন। আমি বিবক্ষিত অর্থেই স্ত্রীলিঙ্গে একটা উদাহরণও দিতেছি—

“স ম্রা ড সি প্রতীচী দিক্।” † বাজসনেয়িসংহিতা, ১৫.১২।

বৈদিক সাহিত্যে স ম্রা জ্ঞী শব্দের বহুল প্রয়োগ রহিয়াছে। কয়েকটি প্রয়োগ তুলিয়া একটু আলোচনা করা যাউক। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে দুই একটা ব্যাকরণের কথা বলিয়া লইতে হইবে। পাণিনি বলিতেছেন—

“মো রাজি সমঃ ক্বৌ।” ৮.৩.২৫.

অর্থাৎ ক্বিপ্ প্রত্যয়ান্ত রাজ্-ধাতুর পদ পরে থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী সম্-উপসর্গের মকার মকারই থাকে, তাহার স্থানে অনুস্বার হয় না। অতএব সম্+রাজ=সম্রাট্। রাজ্-ধাতুর ক্বিপ্ ছাড়া অপর কোন প্রত্যয়ের পদ থাকিলেই সম্-এর মকার স্থানে সাধারণ নিয়মানুসারে অনুস্বার হইয়া যাইবে। এই জন্যই সম্+রাজিত=সংরাজিত, সম্রাজিত হয় না।‡

কিন্তু বৈদিক সাহিত্য পাণিনির এই নিয়মের মধ্যে ধরা পড়ে নাই। রাজ্ ধাতুর ক্বিপ্ ভিন্ন প্রত্যয়ের পদ থাকিলেও পূর্ব্ববর্ত্তী সম্ উপসর্গের মকার-স্থানে অনুস্বার হয় নাই। ঋগ্বেদে (১.২৭.১)—

“স ম্রা জ ন্ত ম্ অ ধ্ব রা ণা ম্।”

সায়ণ—সম্রাজন্তং=সম্রাট্স্বরূপম্। এখানে ইহা শতৃপ্রত্যয়ের পদ, এবং নিয়মানুসারে সং রা জ ন্তং হওয়া উচিত ছিল।

---

* সম্রাটের বহু জায়া থাকিলে প্রধানা জায়াই ম হি ষী নামে অভিহিত হইতেন।

† এখানে স ম্রা ট্ শব্দের অর্থপর্য্যালোচনার জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী “রা জ্ঞ্য সি প্রাচী দিক্” “বি রা ড সি দক্ষিণা দিক্” (১৫.১০,১১) দ্রষ্টব্য।

‡ সংক্ষিপ্তসারে (সন্ধিপাদ, ১২২) লিখিত হইয়াছে যে, রাজসূয়-যাজী ইত্যাদি অর্থ বুঝাইলেই স ম্রা ট্ পদ হইবে—

“রাজসূয়যাজ্যাদৌ সম্রাট্।”

সম্রাটের লক্ষণ—

“যেনেষ্টং রাজসূয়েন মণ্ডলস্যেশ্বরশ্চ যঃ।
শাস্তি যশ্চাজ্ঞয়া রাজ্ঞঃ স সম্রাড়ুচ্যতে বুধৈঃ।”

মুগ্ধবোধের টীকাকার (৫৩ সূত্র) দুর্গাদাস এই জন্যই বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত রূঢ়ি-অর্থ না বুঝাইলে, সম্-পূর্ব্বক ক্বিপ্-প্রত্যয়ান্ত রাজ্ শব্দ থাকিলেও সম্রাট্ পদ হইবে না, সংরাট্ হইবে।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে স ম্রা জ্ঞী পদ হইতে পারে না, স ম্রা জ ন্ শব্দও হইতে পারে না, অথচ স ম্রা জ ন্ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গের পদ স ম্রা জ্ঞী* বৈদিক সাহিত্যে বহুল প্রযুক্ত হইয়াছে। এবং পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, সম্রাট্ শব্দের যে রূঢ়ি-অর্থ (রাজচক্রবর্ত্তী) আছে, তাহাতেই উহা গৌণভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। নিম্নলিখিত মন্ত্রটি অথর্ব্ববেদ সংহিতায় (১৪.১.৪৩) রহিয়াছে—

যথা সিন্ধুর্নদীনাং সা ম্রা জ্যং সুষুবে বৃষা।
এবা ত্বং স ম্রা জ্ঞ্যে ধি পত্যুরস্তং পরেত্য॥

এই মন্ত্রে বিবাহের সময় কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করা হইতেছে যে, সিন্ধু-নদী যেমন নিজের প্রকৃত জলবর্ষণ (=দান) দ্বারা সমস্ত নদীর উপর সাম্রাজ্য (অর্থাৎ আধিপত্য) বিস্তার করিয়াছে, তুমিও সেইরূপ পতিগৃহে আগমন করিয়া স ম্রা জ্ঞী হও (আধিপত্য বিস্তার কর)।

নববধূকে গৃহের স ম্রা জ্ঞী হও বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে এ ভাব বুঝায় না যে, তুমি তোমার শ্বশুরশাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজন ও অন্যান্য পরিবারবর্গকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়া দণ্ড হস্তে অবস্থান কর; ইহার ভাবার্থ এই যে, তুমি গৃহের উপযুক্ত গৃ হি ণী হইবে, কুটুম্বের ভার নিজের উপরে গ্রহণ করিবে। তাই ঋগ্বেদের (১০.৮৫.৪৬) সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্রটিতে—

"স ম্রা জ্ঞী শ্বশুরে ভব
স ম্রা জ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব।
ননান্দরি চ স ম্রা জ্ঞী
স ম্রা জ্ঞী অধি দেবৃষু॥"

এবং ইহারই প্রতিধ্বনি অথর্ব্ববেদের (১৪. ১. ৪৪) মন্ত্রটিতে

স ম্রা জ্ঞ্যে-ধি শ্বশুরেষু
স ম্রা জ্ঞ্যু-ত দেবৃষু।
ননান্দুঃ স ম্রা জ্ঞ্যে-ধি
স ম্রা জ্ঞ্যু ত শ্বশ্র্বাঃ॥"

স ম্রা জ্ঞী পদের অর্থ ভয়েভয়ে 'বিরাজমানা' বা 'শোভমানা' করিবার প্রয়োজন নাই—যদিও আমিও স্থানান্তরে (বিবাহমঙ্গল, ১৫ পৃ.) করিয়াছি। হে বধূ, তুমি নিজের গুণে নিজের কর্ম্মতৎপরতায় শ্বশুর-শাশুড়ী দেওর ননদ সকলেরই নিকট আধিপত্য বিস্তার করিবে। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইল। আরও, উল্লিখিত দুইস্থানে সায়ণও কিছু ব্যাখ্যা করেন নাই, যদিও স্থানান্তরে (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে, ৩. ১০. ৬) "সম্যগ্ রাজমানা" করিয়াছেন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের ঐ স্থানের মূলটি এই—"রাজ্ঞী, বিরাজ্ঞী, স ম্রা জ্ঞী, স্বরাজ্ঞী।" দ্রষ্টব্য—এখানে পরবর্ত্তী শব্দত্রিতয় যথাক্রমে বি রা জ ন্, স ম্রা জ ন্ ও স্ব রা জ ন্ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গের পদ, যদিও পুংলিঙ্গে এই-সকল শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না, ইহাদের স্থানে যথাক্রমে বি রা জ্, স ম্রা জ্ ও স্ব রা জ্ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

বৈদিক শব্দটাকে যদি আমরা বাঙলায় ধরিয়া লই তাহা হইলে স ম্রা ট্ ও স ম্রা জ্ঞী বলা চলে; কিন্তু সংস্কৃত বাক্য-প্রয়োগ-রীতির অনুমোদিত হইবে না। ইহা অপেক্ষা,—এত গোলমালের প্রয়োজন নাই, পূর্ব্বপ্রচলিত প্রয়োগানুসারে স ম্রা ট্ ও ম হি ষী বলাই ভাল। ইহাতে খুঁতখুঁত করিবার কিছু নাই।

সম্বোধন-পদের ব্যবহার সম্বন্ধে (৪৫ পৃ.) ললিতবাবু বলিয়াছেন "কেহ সংস্কৃত ভাষার নিয়মে চলেন, কেহ চলেন না।" দ্বিতীয় শ্রেণীর দৃষ্টান্ত—ওহে মৃত্যু, ওরে মূঢ়মতি, হে কর্ত্তা, হে দাতা, হে পিতা ইত্যাদি। পালি-প্রাকৃত ভাষায় ব্যাকরণ-আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে এই-সমস্তই ঠিক। সূত্র আর কত তুলিব, যে-কোন ব্যাকরণ খুলিলেই বুঝা যাইবে (হেম ৮.৩.৩৮-৪১; সিংহরাজ—প্রাকৃতরূপাবতার, ৪. ৬৮, ৭০; ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)। পালি-প্রাকৃতে হে রাজা (রায়া) ভুল হয় না (পালিপ্রকাশ ৩ §৭৪; হেম ৮. ৩. ৪৯; সিংহরাজ, ৭. ১৮)। সম্বোধনে শ শি, ধ নি লিখিতে বলি না, কিন্তু পালিপ্রাকৃতে তাহা চলে (পালিপ্রকাশ, ৩ §৮৬)

অ ব্য য়ে বি ভ ক্তি যো গ অংশে (৪৬ পৃ.) কেবল দুইটি কথা বলিব। বা হি র পালি-প্রাকৃতে প্রসিদ্ধ, এবং বিশেষণরূপেও ইহার বহু প্রয়োগ পাইয়াছি। ই হ লো ক শব্দকে ভুল বলা ললিতবাবুর ভুল হইয়াছে, আমাদের মনে হয়।

এবার আমি আরও দ্রুতভাবে অগ্রসর হইব। ললিতবাবু সংস্কৃত ব্যাকরণবিষয়ক যে-সকল প্রশ্ন তুলিয়াছেন, সেগুলির সমস্ত আলোচনা করিবার মত অবসর এখন দুর্লভ। তাই প্রসঙ্গত দুই-একটি করিয়া বলিয়া চলিয়া যাইব।

সংস্কৃতে সা র্ব্ব জ নি ক ও স র্ব্ব জ নী ন এই দুইটি পদ হয় (পাণিনি, ৫. ১. ৯), সা র্ব্ব জ নী ন হয় না।

জ ল ন্ত, জী ব ন্ত প্রভৃতি পালি-প্রাকৃতে শতৃপ্রত্যয়ে প্রথমারই একবচনে হয়। বহুবচনের বিসর্গলোপ করিয়া নহে।

হ নু ম ন্ত, বু দ্ধি ম ন্ত প্রভৃতিও পালি-প্রাকৃতে প্রথমার একবচনে হয়। বৎ-মৎ (পালিতে বন্ত-মন্ত) প্রত্যয়ান্ত সমস্ত শব্দেরই এইরূপ হয়।

এই প্রসঙ্গেই য শো ম তী (অথবা যশমতী) শব্দটা আলোচনা করা যাউক। ললিতবাবু বলেন এখানে তদ্ধিত প্রত্যয়েও ভুল হইয়াছে (৬৯ পৃ.)। এরূপ ভুল আরো দেখা যায়, যথা, "তোহে কুল মতি রতি কু ল ম তি নারি।"—বিদ্যাপতি, ১০৩ পদ (৬৬ পৃ)। আবার ল ক্ষ্মী-মা ন্, ভা গ্য মা ন্ ইত্যাদি। কিন্তু পালি-প্রাকৃত হিসাবে এখানে ভুল হয় নাই। ইহাতে সংস্কৃতের ন্যায় বাঁধাবাঁধি কিছু নিয়ম নাই। প্রয়োগ দেখিয়া ঠিক করিতে হয় (মহাসদ্দনীতি, সিংহল, ৬৯২ পৃ ৭৯২-৭৯৩ সূত্র)। তাই পালিতে ম স্ সু বা (=শ্মশ্রুমান্), য স স্ সি বা (=যশস্বী) হয়। আবার প্রাকৃতে ধ ন ম ন্ত (প্রাকৃতপিঙ্গল, ১১৪ ও ১৪১ পৃ.), পু ণ ম ন্ত (পুণ=পুণ্য, ঐ, ১২৯, ১৩২ পৃ) গু ণ ম ন্ত (ঐ, ৮১, ১৬০ পৃ.) ইত্যাদি। বঙ্গভাষায় ইহা হইতেই এ-সব আসিয়াছে।

তুলঃ—গৃহ্যসূত্রসমূহের য ব ম তী (আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে, ১. ১১, ৩; খাদির গৃহ্যসূত্র, ৩. ৪. ৪.)। এইরূপ দ্রা ক্ষা ম ৎ, ব সা ম ৎ, ইত্যাদি। দ্রষ্টব্য পাণিনি, ৮. ২ ৯। আবার (সংজ্ঞার্থে) ক পী ব তী, ঋ ষী ব তী, মু নী ব তী, ইত্যাদি (ঐ, ৮. ২ ১১—১২)।

নি শি শব্দ নি শী থ হইতে আসে নাই। অপভ্রংশ প্রাকৃতের নিয়মে নি শা শব্দই নি শি আকার ধারণ করিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে ইহার প্রয়োগ রাশি রাশি রহিয়াছে। দ্রষ্টব্য—বিদ্যাপতি (পরি.) ৩২১ পৃ. ইত্যাদি; বৈষ্ণব পদাবলী (বসু.) ২৮, ৫০, ১১৯, ১২০, ১৯০ ইত্যাদি, ইত্যাদি। এইরূপেই বে লা—বেলি যথা—

"চেতন হেরল আলিঙ্গন বে লি।" বিদ্যাপতি, ১৯৭ পদ (১১৯ পৃ)।

জ গ ত জী ব ন, ইত্যাদি স্থলে "অকারান্ত ভ্রমে" যে, জ গ ত হইয়াছে তাহা নহে। প্রাকৃতের ধারাতেই হইয়াছে। প্রাকৃতের নিয়ম হইতেছে ব্যঞ্জনান্ত শব্দের অন্ত্য ব্যঞ্জন প্রায়ই লুপ্ত হয় (হেম, ৮. ১. ১১; শুভচন্দ্র, ১. ১. ২৫), আবার কখন কখন (হেম, ৮. ১. ১৮; শুভ, ১. ১. ৩৫) শেষে অকার আগম হয়। এই নিয়মেই জ গ ব জু শুনিতে পাওয়া যায়, এবং জ গ ত-জীবনও হইয়া থাকে। বোম্বাই'য় গান্ধর্ব্ব

* মনে রাখিতে হইবে স ম্রা জ ন্ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে স ম্রা জ্ঞী, স ম্রা জ্ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে নহে।

মহাবিদ্যালয়ের বালকগণের সারারাত্রি গান "জ গ ত জী ব ন জানকীজীবন" এখনো কানে লাগিয়া আছে।

সমাসস্থলে সন্ধির অভাবসম্বন্ধে (৬২ পৃ) এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পালি ও প্রাকৃতে সন্ধির নিয়ম বৈকল্পিক, কোনো স্থানে হয়, কোনো স্থানে হয় না। বলা বাহুল্য যেখানে শ্রুতিসুখকর হয়, সেখানেই করা হইয়া থাকে। একটি মাত্র উদাহরণ দিই—"বিয়লন্ত কণ্ঠ উ ট্‌ ঠ-উড্ডে" (সমরাইচ্চকহা, ৯ পৃ.) বি চ লং ক ণ্ঠৌ ষ্ঠ- পুটঃ। এ কথাটি স্বরসন্ধি-সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। পালি-প্রাকৃতে ব্যঞ্জনান্ত শব্দ নাই, অতএব ব্যঞ্জনসন্ধির কথাও নাই। বাঙ্‌লায় ব্যঞ্জনসন্ধির কোনো কোনো স্থানে অভাব দেখিয়া ললিতবাবু "বল মা তারা দাঁড়াই কোথা?" ডাক ছাড়িয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। আমাদের মনে হয় তাঁহার বস্তুত হতাশ হইবার কারণ নাই। স্বরসন্ধির ন্যায় ব্যঞ্জনসন্ধিও বাঙ্‌লায় বৈকল্পিক। এ কথা তিনিই শ র ৎ চ ন্দ্র প্রভৃতি পদ তুলিয়া (৬৫ পৃ) দেখাইয়া দিয়াছেন।

পত্নিপ্রেম (৫৮ পৃ) লিখিতে বলিতেছি না, কিন্তু যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও সূত্রে পত্নি শব্দের প্রচুর প্রয়োগ আছে। রামায়ণেও রহিয়াছে মুনি প ত্ন্যঃ (৭ ৪৯. ১৪)। সমাসস্থলে এই জাতীয় প্রয়োগ অন্যান্য শব্দেরও বহু পাওয়া যায়। যথা ন দি- দ্বীপ (আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র ১৫. ১৬. ২, ৩), গর্ভিণি-প্রায়শ্চিত্ত (ঐ, ৯. ১৯. ১৪), স্ত্রি-ব্যঞ্জন (ঐ, ৮. ৬. ১), লক্ষ্মি-বর্দ্ধন (রামায়ণ ১. ১৮. ২৮; ৬. ১০১. ২৪), কে ত কি-পুষ্প (ঐ, ৪. ২৮. ২৮.) সুদেবি- সূ নু (ভাগবত, ২.৭.১০)। এইরূপ আরও আছে। দ্রষ্টব্য—পালিপ্রকাশ, প্রবেশক, ৭৬ পৃষ্ঠা। এই সমস্তই প্রাকৃত প্রভাবের পরিচয়। প্রাকৃতের নিয়মই হইতেছে, সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব হয়, এবং সমাসস্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব হইতে পারে, আবার হ্রস্ব স্বরও দীর্ঘ হইতে পারে (হেম, ৮. ১. ৪; শুভ. ১. ১. ১৮) যথা ন ই-সোত্ত (=নদী-স্রোতঃ) ও ন ঈ-সোত্ত; গো রি- হ র (=গৌরী-হর) ও গো রী হ র; ব হু-মু হ (=বধূ-মুখ) ও বহু-মুহ, এই উভয় রূপই হইতে পারে। আকারান্ত-সম্বন্ধেও এইরূপ—জ উ ণ-য ড (যমুনা-তট) ও জ উ ণা-য ড, এই উভয়ই হয়।

বিদ্যাপতি (পরি ২৮৮ পৃ. ৪৭১ প. লিখিয়াছেন—"সুনি সি রি খ ণ্ড (=শ্রীখণ্ড) তরু সে সুবি গমন কর ছাড়ত মদন তনু তাপে।"

এই স্থানে মহাকবি কা লি দা সে র "বৈ দে হি ব ন্ধো- র্হৃদয়ং বিদদ্রে" (রঘু ১৪. ৩৩) মনে করিতে হইবে, এবং এইজাতীয় প্রয়োগের ব্যবস্থার জন্য পাণিনি মুনি যাহা বলিয়াছেন তাহাও (৬. ৩. ৬৩) স্মরণ রাখিতে হইবে। এই ব্যবস্থাতেই হয়—রে ব তি পু ত্র, রো হি ণি পু ত্র; আবার শি ল ব হ (শিলাবহ স্থানে), শি ল প্র স্থ (শিলাপ্রস্থ-স্থানে)। এসব সংজ্ঞা শব্দ। আবার ই ষ্ট ক চি ত (ইষ্টকা··· নহে) ইত্যাদি (পাণিনি, ৬. ৩. ৬৫)।

ললিতবাবু যো গী বে শ, ইত্যাদি অশুদ্ধ পদের উল্লেখ (৫৭ পৃ.) করিয়াছেন। ইহা মানিব বৈ কি, কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যে এইরূপও প্রয়োগ পাওয়া যায়। যথা—

যো গী বে শ ধরি আওল আজ।
কে ইহ সমুঝব অপরুব কাজ॥"
বিদ্যাপতি (পরি) ৩২৫ পৃ, ৫৩২ পদ;
বৈষ্ণবপদাবলী (বসু), ৩০ পৃ।

"কবীবর আদি না পায় সমাধি
ফিরিয়া চীৎকার করে।"
চণ্ডীদাস (বৈষ্ণবপদাবলী) ১০৩ পৃ,।

আবার "বাট বিকট ফ নি মা লা,"
বিদ্যাপতি (পরি) ১৮১ পৃ., ২৯৭ পদ।

"ঝাঁপল ফ নি ম নি দীপে।"
ঐ, ১৭৪ পৃ. ২৮৫ পদ।

বস্তুত দেখা যাইতেছে সমাসস্থলে পূর্ব্বোক্ত প্রাকৃত নিয়মই এইসকল স্থানে অনুসৃত হইয়াছে।

আর বাড়াইয়া কাজ নাই। কতকগুলি কথা আরো বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সম্প্রতি সময়ের অভাব বলিয়া তাহা ত্যাগ করিতে হইল; যদি সুযোগ হয় সময়ান্তরে বলিব।

উপসংহারে একটি কথা অবশ্যবক্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে। ললিতবাবু পুস্তিকাখানির বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন—"ইহা দ্বারা যাহাতে বাঙ্গালা ভাষার পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের উপকার হয় সে বিষয়ে সবিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছি।" যদি ছা ত্র ব র্গে র উ প কা রে তাঁহার স বি শে ষ লক্ষ্য থাকে, তবে তাঁহাকে একটি কাজ করিতে হইবে। তাঁহার রচনা-কৌশলে নীরস ব্যাকরণকথা সরস হইয়া উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু কয়েকটি স্থানে এত রসপ্রাচুর্য্য হইয়াছে যে, সেই স্থানগুলি প ঙ্কি ল হইয়া ছা ত্র-গ ণে র ত কথাই নাই, অন্যেরও অগম্য হইয়া পড়িয়াছে,—শ্রীহীন হইয়া অ শ্রী ল (= অশ্রীল) হইয়া উঠিয়াছে। যথা, ৪১ পৃ. ৭-৯ পং; ৪৩ পৃ. ৯-১০ পং; ৬৪পৃ. ১৬-১৭ পং। শেষোক্ত রচনাটি একবারে অসহ্য। পরবর্ত্তী সংস্করণে এইগুলি যত্নপূর্ব্বক শোধন করিতে হইবে।

১

নো মৎসরান্ন চ মনাগপি দৃপ্তভাবান্
নো দোষমাত্র-পরিদর্শন-নৈপুণাদ্ বা।
ত্বৎপ্রার্থনাপ্রণয়ভঙ্গভিয়ৈব কিন্তু
শ্রীমন্ ময়া স্বমতিতঃ কিল কিঞ্চিদুক্তম্।

২

তৎক্ষন্তুমর্হতি ভবানপি চেদযুক্তং
স্যাদুক্তমত্র, ননু কোঽস্তু নরোঽপ্রমত্তঃ।
মাভূদ্ ভ্রমেঽপি ভবতো ময়ি ভিন্নভাবঃ
সাহিত্যতো বিলসতাদ্ রসসন্ততিশ্চ।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

অর্থমনর্থম্

(প্রবাসীর চতুর্থ পুরস্কার প্রাপ্ত গল্প)

ডাক্তারীর শেষ পরীক্ষার ফল জানিয়া দেশে ফিরিলাম। মেডিকাল কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া কতকটা কৃপণের বাড়ী ভোজ খাওয়ার মত। আচমন করিবার পূর্ব্বে তাহা কোন মতেই প্রত্যয় করা চলে না। তাই কলেজের নোটিস-বোর্ডে ছাপার অক্ষরে যেদিন আমার নাম দেখা গেল তাহার পরদিন দীর্ঘ ছয়বৎসরের বাসার সহিত সবরকম দেনাপাওনা মিটাইয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

পরীক্ষার পর, বিশেষতঃ পরীক্ষা পাশ করার পর, দেশে যাওয়া ছাত্র-জীবনের চিরাগত প্রথা—তাহার মধ্যে কিছুই অপূর্ব্ব ছিল না। কিন্তু আমার দেশে যাওয়ার মধ্যে সে সহজ চিরন্তন কারণ ছাড়া গুরুতর কারণও বিদ্যমান

ছিল। কিছুদিন হইতে দেশে যাইবার জন্ত একটু বিশেষ-ভাবে আমার ডাক পড়িয়াছিল, এবং সে ডাকের মধ্যে যে-বিশেষ উদ্দেশ্যটি নিহিত ছিল তাহার রহস্যোদ্ভেদ করিবার পক্ষে যতটুকু বুদ্ধি এবং অনুমান-শক্তির প্রয়োজন তাহার অভাব আমার ঘটে নাই। আমি বুঝিয়াছিলাম বিবাহের জন্ত আমার ডাক পড়িয়াছে। যাঁহারা আমাকে ডাকিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রতি অথবা তাঁহাদের ডাকার উদ্দেশ্যের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা ছিল না। কারণ মেডিকাল কলেজের ছয় বৎসরের অনবসরের মধ্যে বিবাহ করিব না, এইরূপ একটা লোমহর্ষণকারী কাণ্ড আমার চিত্তের মধ্যে প্রবেশ করিবার সুবিধা খুঁজিয়া পায় নাই। শৈশব হইতে নিতান্ত সাদাসিধাভাবেই মানুষ হইতেছিলাম; লেখাপড়া শেষ করিয়া বিবাহ করিব এবং তাহার পর যথানিয়মে পিতা হইতে পিতামহ হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিব,—এইরূপ একটা নিতান্ত সহজ এবং সাধারণ ধরণের জীবন-কল্পনা আপনা-আপনিই আমার মনের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাই প্রথম যেদিন মেডিকাল কলেজের ছাড়-পত্র পাইলাম, বিলম্ব না করিয়া তাহার পরদিনই তল্পিতল্পা লইয়া দেশে রওয়ানা হইলাম।

দেশে আসিয়া দেখিলাম আমার অনুমান ভুল হয় নাই। বিবাহই বটে। তবে শুধু বিবাহ বলিলে সবটুকু বলা হয় না। তাহার সহিত আরও একটি বৃহত্তর এবং মহত্তর উদ্দেশ্য সফল হইবার অপেক্ষায় ছিল। আমার পিতা দরিদ্রই ছিলেন, এবং আমার ডাক্তারী পড়ার অমিত ব্যয়ভার বহন করিয়া সে দারিদ্র্য হ্রাস পায় নাই, তাহাও সত্য। সেই বহু-কষ্ট-অর্জ্জিত ডাক্তারী-শিক্ষাকে প্রথম হইতেই সার্থক করিবার উদ্দেশ্যে পিতা আমার দ্বারা আমাদের সংসারকে দারিদ্র্য-রোগ হইতে নিরাময় করিয়া লইবার জন্ত একটি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। একটি মানুষের পরিবর্ত্তে একটি পরিবারের চিকিৎসার ভার আমার উপর সর্ব্ব প্রথম পড়িয়াছিল।

আমাদের গ্রামের যিনি জমিদার তাঁহার অবিবাহিতা কিন্তু বিবাহযোগ্যা একটি কন্তা ছিল। সেই কন্তাটি তাঁহার একমাত্র কন্তা, যদিও একমাত্র সন্তান নহে। শুনিলাম সেই কন্তাটির সহিত আমার বিবাহ স্থির হইয়াছে, এবং রূপে ও গুণে কন্তাটি লক্ষ্মীস্বরূপা। রূপে লক্ষ্মী সেকথা আমার শুনিয়াই বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু গুণে যে লক্ষ্মী সে বিষয়ে সংশয়ের কোন কারণ ছিল না; কেননা কথা হইয়াছিল দশ হাজার টাকা নগদ এবং পাঁচ হাজার টাকার অলঙ্কার লইয়া আমাদের গৃহলক্ষ্মী আমাদের গৃহে শুভাগমন করিবেন, এবং তাঁহার পিতা, অর্থাৎ আমার ভাবী শ্বশুর, কলিকাতায় থাকিয়া ডাক্তারী ব্যবসায় চালাইবার মত আমার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। এমন কথাও নাকি তিনি বলিয়াছিলেন যে যতদিন আমি স্বাবলম্বী না হইব ততদিন তিনি আমাকে মাসহারা দিবেন। আমার প্রতি এই বিপুল কৃপাবর্ষণ করিবার কারণ এই যে তাহা হইলে তাঁহার কন্তাটি পরের হাতে পড়িয়াও পর হইবে না, এবং যাহার হাতে পড়িবে তাহার মত দ্বিতীয় পাত্র আমাদের অঞ্চলে বাহির করা যে অসম্ভব ছিল তাহা শত্রুপক্ষেরও অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না। তখন অকাল চলিতেছিল, তাই দিন পনের পরে কন্যাপক্ষ আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইবেন কথা ছিল, এবং তাহার দশ পনের দিন পরেই বিবাহ।

বাঙ্গলাদেশে পুরুষমানুষের বিবাহ কঠিন ব্যাপার নহে, বিশেষতঃ সেই-সকল পাত্রের পক্ষে যাহাদের কপালে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শেষ ছাপ পড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হওয়ার মধ্যে আনন্দের কথা থাকিলেও বিস্ময়ের কথা কিছু ছিল না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোত্তম পাত্রের জন্তও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ যতটা করিয়া যাইতে পারেন নাই, আমার জন্ত পিতা তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন! তাই, যে কিশোরীটির আমাদের অন্তঃপুরে এবং আমার হৃদয়পুরে আসিয়া প্রবেশ করিবার কথা, তাহার প্রবেশের জন্য আমরা ততটা ব্যগ্র হই নাই, যতটা হইয়াছিলাম সেই-সকল সামগ্রীগুলির জন্য যাহাদের লোহার সিন্দুকে আসিয়া প্রবেশ করিবার কথা ছিল। অর্থাৎ হৃদয়ের কবাট যথাকালে মুক্ত হইবার অপেক্ষায় ছিল, কিন্তু সিন্দুকের কবাট আমরা পূর্ব্বাহ্নেই খুলিয়া রাখিয়াছিলাম।

নগদ দশহাজার টাকার মধ্যে পছন্দর কোন কথা ছিল না। আমাদের সংসারের ইতিহাসে এমন কোনও বড়লোক জন্মগ্রহণ করেন নাই যিনি তাহা পছন্দ না করিতেন।

তাই টাকা এবং অলঙ্কারের সহিত রক্তমাংসের যে পদার্থটির আসিবার কথা ছিল, সংসারের লাভের খাতে তাহাকে স্থান দেওয়া হয় নাই; সকলেই সোনা এবং রূপার স্বপ্ন দেখিত। এমন কি আমারও কানে মলের রুনুঝুনু অপেক্ষা টাকার ঝনুঝনানিটাই বেশী বাজিত এবং নিরালা গৃহ-কোণে নোলকপরা একটি ঢলঢলে মুখ অপেক্ষা জমিদার শ্বশুর মহাশয়ের পুষ্ট গুম্ফের চিত্র বেশী মনে পড়িত।

আমাদের সংসারে সকলের মনের অবস্থা যখন ঠিক এইরূপ, তখন ঘটনাস্রোত ধীরে ধীরে অন্যদিকে ফিরিবার উপক্রম করিল। স্নবিধার পূর্ণিমায় আমাদের শীর্ণ সংসারে যে রূপার বান ডাকিবার কথা ছিল, দিনের পর দিন পলি পড়িয়া তাহার পথ বন্ধ হইয়া গেল। কেমন করিয়া, এই-বার সেই কথা বলিব।

ডাক-টিকিট কিনিবার জন্য সেদিন গ্রামের ডাকঘরে গিয়াছিলাম। দেখিলাম ঘরের মধ্যেস্থলে বসিয়া গৌরবর্ণ প্রৌঢ় একটি ভদ্রলোক সম্মুখে টাকা পয়সা সাজাইয়া নিবিষ্ট মনে হিসাব মিলাইতেছেন। বুঝিলাম তিনিই পোষ্টমাষ্টার এবং নূতন আসিয়াছেন। পাঁচটা বাজিতে তখন বেশী বিলম্ব ছিল না। আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "কি চাই আপনার?"

আমি কহিলাম, "চারখানা দুপয়সার টিকিট।"

গণনার মধ্যে ফরমাইস করিয়া ভদ্রলোককে একটু বিব্রত করিয়াছি তাহা বুঝিতে পারিলাম। তিনি একবার উঠিবার চেষ্টা করিলেন, একবার হিসাব এবং টাকাপয়সার দিকে চাহিয়া একটু চিন্তা করিলেন, তাহার পর ঘরের এক দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "মনুমা, এই চারখানা টিকিট বাবুকে দাও ত।"

একটি তের চৌদ্দ বছরের মেয়ে পোষ্টমাষ্টারের নিকট হইতে চারখানি টিকিট লইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। সহসা একটি প্রাপ্তবয়স্কা বালিকার সম্মুখীন হইয়া পড়ায় আমি হয়ত একটু থতমত খাইয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার লজ্জা বা সঙ্কোচের কোন লক্ষণ দেখিতে পাইলাম না। সে আমার হাতে টিকিট কয়েকখানি দিয়া তাহার বড় বড় চক্ষু দুটির গভীর দৃষ্টি আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া মূল্যের অপেক্ষায় চাহিয়া রহিল; এবং আমার নিকট হইতে মূল্য পাইবামাত্র মুহূর্তের মধ্যে পিতার টেবিলে তাহা স্থাপন করিয়া ঘরের কোণে মিশাইয়া গেল। দুইখানা পোষ্টকার্ড কিনিবারও প্রয়োজন ছিল, কিন্তু পুনরায় চাহিতে পারিলাম না, একটু সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। টিকিট লইয়া বাড়ী ফিরিলাম।

দুইদিন পরে পুনরায় টিকিট কিনিবার জন্য ডাকঘরে উপস্থিত হইলাম। সেদিন পোষ্টমাষ্টার ব্যাপৃত ছিলেন না, তিনি স্বয়ং উঠিয়া টিকিট দিলেন। খামে টিকিট মারিয়া বাক্সর ভিতর ফেলিয়া দিয়া গৃহে ফিরিব এমন সময় বৃষ্টি আসিয়া পড়িল। সেই স্বল্প-পরিসর ডাকঘরের বারাণ্ডায় অপেক্ষা করিব, না গাত্রবস্ত্র মাথায় দিয়া গৃহে ফিরিব, ইতস্ততঃ করিতেছি, এমন সময় পাশের ঘরের দ্বার খুলিয়া পোষ্টমাষ্টার আহ্বান করিলেন।

"আসুন, ভিতরে বসবেন আসুন। বৃষ্টি থামলে যাবেন।"

আমি কহিলাম, "আপনি ব্যস্ত আছেন, আপনার সময় নষ্ট করব না।"

পোষ্টমাষ্টার মৃদুহাস্য করিয়া কহিলেন, "সময় নষ্ট হবে না। আপনি দুমিনিট বসুন, আমি মেল রওয়ানা করে দিয়েই আসচি। তারপর আমার ছুটি।"

তখন বাহিরে বৃষ্টি একটু জোরেই আসিয়াছিল, আতিথ্য-গ্রহণ ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না। ঘরের ভিতরে গিয়া একটা চেয়ারে স্থান গ্রহণ করিলাম। পোষ্টমাষ্টার আমার সম্মুখে একখানা খবরের কাগজ আগাইয়া দিয়া একটু উচ্চস্বরে কহিলেন, "মনু, এখানে পান দিয়ে যাও ত মা!" বলিয়া তিনি মেল রওয়ানা করিতে চলিয়া গেলেন।

কিছু পরে পূর্ব্বদিনের পরিচিত সেই মেয়েটি একটি ডিবায় কতকগুলি পান আমার সম্মুখে রাখিয়া দিয়া চলিয়া গেল। তাহার আসা ও যাওয়ার মধ্যে কোন প্রকার সঙ্কোচ বা চঞ্চলতার লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। যেমন সহজ, তেমনি ধীর। গঠনটি ছিপ্‌ছিপে, বর্ণটি অরুণাভ, এবং যতটুকু দেখিতে পাইয়াছিলাম মুখখানি ফুটন্ত ফুলের মত ঢলঢলে। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া সহজ ঋজু ভঙ্গীখানি। খুব যে সুন্দরী তাহা নহে, কিন্তু দেখিলে তখনি যেন আবার দেখিতে ইচ্ছা করে।

একটা গান মুখে পুরিয়া খবরের কাগজ পড়িবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় পোষ্টমাষ্টার মেল রওয়ানা করিয়া আসিয়া বসিলেন।

শিষ্টাচার এবং আপ্যায়নের উদ্দেশ্যে আমি কপট বিনয়ের ভঙ্গীতে কহিলাম, "আপনাকে নিতান্ত বিব্রত করেছি।"

পোষ্টমাষ্টার সহাস্যে কহিলেন, "তার চেয়েও বিব্রত আপনাকে করতাম যদি এই বৃষ্টিতে আপনাকে ছেড়ে দিতাম। কিন্তু এই বৃষ্টি মাথায় করে গিয়েও যদি আপনার বিশেষ কোন সুবিধা বা উপকার হত তা হলে বলতে হবে আমিই আপনাকে বিব্রত করেছি।" বলিয়া তিনি উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিলেন।

যখন দেখা গেল কেহ কাহাকেও বিব্রত করি নাই, তখন পোষ্টমাষ্টার বেশ জমাইয়া গল্প আরম্ভ করিলেন। বাহিরে বৃষ্টিও বেশ জমিয়া আসিয়াছিল।

পোষ্টমাষ্টার এবং স্কুলমাষ্টার সম্বন্ধে আমার প্রায় অভিন্ন সংস্কার ছিল। উভয়ের কথা মনে হইলেই নিরীহ অথচ রুক্ষ স্বভাবের প্রাণীর কথা আমার মনে হইত। ইঁহার সহিত অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তার পরই কিন্তু বুঝিতে পারিলাম ইনি দলছাড়া লোক। রুক্ষ ত নিশ্চয়ই নহেন, বাক্যে এবং ব্যবহারে ইঁহার মত মসৃণ ব্যক্তি আমি দ্বিতীয় দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না; এবং নিরীহ শব্দ যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছি তাহাও ইঁহার উপর প্রয়োগ করা কোন মতে চলে না।

বাহিরে বৃষ্টি বোধ হয় থামিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আমার সেদিকে মন ছিল না। আমি তন্ময় হইয়া পোষ্টমাষ্টারের গল্প শুনিতেছিলাম। নিত্যকার সংসারের তুচ্ছ সুখদুঃখের সাধারণ গল্প তিনি করিতেছিলেন, কিন্তু তাহাতেই আমার মন এমন বসিয়া গিয়াছিল যে আমাদের কথাবার্ত্তার মধ্যে কোন্ সময়ে পোষ্টমাষ্টারের কন্যাটি ঘরে প্রবেশ করিয়া এক কোণে টেবিলের সম্মুখে একখানি বই লইয়া বসিয়াছে তাহা আমি লক্ষ্যই করিতে পারি নাই। পাশ হইতে তাহার মুখের একটা দিক দেখা যাইতেছিল, এবং কেরোসিন ল্যাম্পের উজ্জ্বল প্রভায় সেই আধখানি-দেখা মুখ একটি কমনীয় শ্রীতে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল।

এই মেয়েটি আমার নিকটে একটি রহস্যের মত হইয়া উঠিতেছিল। সে যে পোষ্টমাষ্টারের কন্যা তাহা অনুমান করিয়া লইয়াছিলাম, কিন্তু শুধু সেই পরিচয়েই নিবৃত্ত হইতে পারিতেছিলাম না। ইচ্ছা হইতেছিল পোষ্টমাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার সকল সংবাদ অবগত হই। কিন্তু কোন মতেই তাহা পারিয়া উঠিতেছিলাম না। আমার নিজের বিবাহের বয়স উপস্থিত হইয়া রহিয়াছে এবং অবিবাহিত জীবনের সীমা অতিক্রম না করায় এখনও নাবালকের শ্রেণীভুক্ত হইয়া রহিয়াছি এরূপ একটা অপরাধের জ্ঞান মনের মধ্যে সজাগ থাকায় একটি প্রাপ্তবয়স্কা এবং সুন্দর বালিকার কথা উত্থাপন করিতে বাধ-বাধ ঠেকিতেছিল। মনে হইতেছিল তাহা হইলে তখনই বিশ্বসংসার মনে মনে নিশ্চয় আমাকে সন্দেহ করিয়া বসিবে।

কিন্তু কিছু পরে পোষ্টমাষ্টার স্বয়ং কন্যার কথা তুলিলেন। সেইটিই তাঁহার একমাত্র দুহিতা এবং একমাত্র সন্তান। মাতৃহীনা হওয়ার পর হইতে তাঁহাকে পিতা এবং মাতা উভয়ের স্থান গ্রহণ করিতে হইয়াছে, কিন্তু মেয়েটি যেমন ক্রমশঃ বড় হইয়া উঠিতেছে ততই যেন তাঁহাদের মধ্যে সম্পর্কটা বিপরীত হইয়া দাঁড়াইতেছে। তাই তিনি মা ভিন্ন অপর সম্বোধন আর বড় ব্যবহার করেন না। বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

একজন অপরিচিত ব্যক্তির সম্মুখে নিজের বিষয়ে এরূপ অবাধ আলোচনা আরম্ভ হইল দেখিয়া 'মনু' (পরে জানিয়াছিলাম মনোরমা) একটু যেন বিব্রত হইয়া উঠিল, এবং দুই একবার একটু নড়িয়া চড়িয়া ইতস্ততঃ করিয়া পালাইয়া বাঁচিল।

প্রসঙ্গ উঠায় আমি সাহস করিয়া কহিলাম, "এ মেয়েটি যখন বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ী যাবে তখন দেখছি আপনার দিন কাটান ভার হবে।"

পোষ্টমাষ্টার আমার কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন; কহিলেন, "সে দুঃখ ত পরের কথা। তার জন্যে তত ভাবনা হয় না। সেই দুঃখ ভোগ করবার অবস্থায় কি উপায়ে উপস্থিত হব তাই হয়েছে এখনকার ভাবনার কথা। আহার করলে বদহজম হবার ভয় ত আছেই, কিন্তু সেই

আহার্য্য সংগ্রহ করবার জন্ত দুশ্চিন্তা তার চেয়ে কম প্রবল নয়!"

আমি কহিলাম, "কিন্তু আপনার এ মেয়েটির পক্ষে সে ভাবনার কোন কারণ নেই বলে আমার মনে হয়। আপনার মেয়েকে দেখে কেউ অপছন্দ করবে না।"

পোষ্টমাষ্টার কহিলেন, "আপনি যে কথা বলছেন সে কথা বাঙ্গালাদেশের পক্ষে খাটে না। টাকা দিয়ে যে-দেশে জামাই কেনবার প্রথা চলেছে সেখানে টাকার উপরই সব নির্ভর করে। আমার এ কথার প্রমাণস্বরূপ আপনাদের গ্রামেরই একটা নজীর দেখাতে পারি। এই গ্রামের কোন ভদ্রলোকের ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ে মনোরমার বিবাহের কথা পাকা হয়ে গিয়েছিল। পাত্রের দামও স্থির হয়ে গিয়েছিল তিন হাজার টাকা। ছেলেটি তখন ডাক্তারীপরীক্ষা দেবার জন্য কলিকাতায় ছিল বলে আমি আমার একজন বন্ধুকে চিঠি লিখে দিই। সে মেসে গিয়ে ছেলে দেখে এসে আমাকে জানায় যে পাত্রটি ভাল, দরে বিকোবার যোগ্য। কাজেই আমার মত লোককে তিন হাজার টাকাতেও রাজি হতে হয়েছিল। সমস্তই ঠিক হয়ে রইল, শুধু পাত্র এলে উভয় পক্ষে আশীর্ব্বাদ হয়ে যাবে। এমন সময় গ্রামের জমিদার সেই পাত্রের উপর দশ হাজার বিশ হাজার কি একটা মস্ত দর হাঁকলেন। কথার মূল্যের চেয়ে চাঁদির মূল্য ঢের বেশী। কাজেই কথা যা ছিল তা বদলে যেতে কিছুমাত্র বিলম্ব হল না। পাত্রের পিতা আমাকে লিখলেন তিনি দুঃখিত কিন্তু অক্ষম। দুঃখিত কথাটা একেবারে মিথ্যা, কিন্তু তিনি যে অক্ষম সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না!" বলিয়া পোষ্টমাষ্টার উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিলেন।

আমি জানি না কেমন করিয়া আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল "অন্যায়, ভয়ানক অন্যায়!" এবং একটা অপমান ও হীনতার বেদনায় আমার সমস্ত দেহ ভরিয়া উঠিল।

পোষ্টমাষ্টার কহিলেন, "ন্যায় অন্যায়ের বিচার ছেড়ে দিলেও অবস্থা ত এই! এতে আপনি কি করে বলেন যে মেয়ের বিবাহ সম্বন্ধে আমার কোন ভাবনার কারণ নেই?"

পোষ্টমাষ্টারের কথা ভাল করিয়া আমার কানে প্রবেশ করিতেছিল না। বিরক্তি ক্রোধ ও লজ্জায় আমার সমস্ত মন আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। এ আচরণ যে সামান্য সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে হইলেও লজ্জাজনক হইত। ভদ্রলোকের কথা এবং ভদ্রলোকের কন্যা কি এমনই তুচ্ছ জিনিষ যে তাহা লইয়া যেমন ইচ্ছা খেলা করা চলে! সে সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব, কোন সম্ভ্রমের প্রয়োজন হয় না! পিতার এই ব্যবহার স্মরণ করিয়া যতই মর্ম্মাহত হইতে লাগিলাম, মনোরমার সকরুণ মূর্ত্তিখানি ততই আমার মর্ম্মের মধ্যে অধিকার স্থাপন করিতে লাগিল। এই মনোরমা, যে আমার মনের অগোচরে এই দুইদিনে আমার হৃদয়ের মধ্যে এমন প্রবলভাবে অধিকার স্থাপন করিয়াছে, এই মনোরমা তাহার সমস্ত সম্পদ এবং সমস্ত মাধুর্য্য লইয়া আমার আশ্রয়ে উপনীত হইয়াছিল। কিন্তু অর্থের লালসা তাহাকে ঘৃণিত-ভাবে ফিরাইয়া দিয়াছে!

তখনও বৃষ্টি পড়িতেছিল। কিন্তু আর অপেক্ষা করিব না স্থির করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। বিশেষতঃ পোষ্টমাষ্টারের নিকটে পাছে আত্ম-পরিচয় দিতে হয় সেই ভয় হইতেছিল।

পোষ্টমাষ্টার কহিলেন, "বৃষ্টি এখনও থামেনি, এখনই কেন উঠছেন?"

আমি কহিলাম, "এ বৃষ্টি থামতে বিলম্ব আছে, আর দেরি করব না।"

পোষ্টমাষ্টার কহিলেন, "নিতান্ত যদি যাবেন তা হলে একটা ছাতি নিয়ে যান। কাল পাঠিয়ে দেবেন।" বলিয়া আমার আপত্তি সত্ত্বেও উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "মনু,—আমার ছাতিটা দিয়ে যাও ত মা!"

মনোরমা একটি ছাতি লইয়া উপস্থিত হইল এবং সেটা আমার সম্মুখে রাখিয়া তাহার পড়িবার স্থানে গিয়া বসিল।

কিন্তু মনে মনে যাহা ভয় করিতেছিলাম তাহাই ঘটিল। পোষ্টমাষ্টার কহিলেন, "আপনার সঙ্গে এতক্ষণ আলাপ করলাম, কিন্তু নামটি জানা হয় নি ত?"

কি করিব প্রথমটা ঠিক করিতে পারিলাম না। কিন্তু তখনই সামলাইয়া লইয়া বলিলাম, "আমার নাম বিনয়ভূষণ মিত্র।"

পোষ্টমাষ্টার যেন একটু চমকিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "আপনার পিতার নাম?"

"শ্রীযুক্ত পরেশনাথ মিত্র।"

পোষ্টমাষ্টার অল্পক্ষণ বিস্ময় বিহ্বল দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর সহসা উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন, "তাই বুঝি? তবে ত বেশ হয়েছে দেখচি! কিন্তু কিছু মনে করবেন না, আমি একটি কথাও অযথা বলিনি।"

দেখিলাম মনোরমা ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, এবং মনে হইল তাহারও মুখে যেন কৌতুকের একটি ক্ষীণ হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আমি কহিলাম, "আপনি অযথা কিছুই বলেন নি। এ বিষয়ে আমার যা বক্তব্য তা পরে জানাব।" বলিয়া প্রস্থান করিলাম।

বিপিন আমার খুড়তাত ভাই। আমরা প্রায় সমবয়স্ক, তাই উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক অনেকটা বন্ধুর মত দাঁড়াইয়াছিল। বাড়ী গিয়া বিপিনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখানকার পোষ্টমাষ্টারের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হয়েছিল?"

বিপিন কহিল, "তা তুমি জান না? কথা হয়েছিল কেন, স্থিরই ত হয়ে গিয়েছিল।"

"তবে ভাঙ্গল কেন?"

বিপিন কহিল, "আরও ভাল জুটে গেল বলে ভাঙ্গল।"

"আরও ভাল কিসে?"

"টাকায়।"

"তা হলে এখন যদি রাজার মেয়ে জুটে যায় তা হলে এ সম্বন্ধও ভেঙ্গে যাবে?"

বিপিন একটু চিন্তা করিয়া কহিল, "তা যেতে পারে।"

আমার সর্ব্ব শরীর জ্বলিতেছিল। পোষ্টমাষ্টার যে বলিয়াছিলেন কথার চেয়ে চাঁদির মূল্য ঢের বেশী তাহা আমার কানে তখনও বাজিতেছিল। কহিলাম, "তা যদি যেতে পারে ত তাই যাক, আমি জমিদারের মেয়েকে বিয়ে করব না।"

বিপিন হাসিয়া কহিল, "কেন? রাজার মেয়ে জুটেছে না কি?"

আমি কহিলাম, "হাঁ জুটেছে। রাজা আমাদের গ্রামের পোষ্টমাষ্টার, আমি তাঁর মেয়েকেই বিয়ে করব!"

বিপিন কহিল, "তা হলে শুধু টাকায় নয়, সবদিকেই তুমি ঠক্‌বে।"

আমি কহিলাম, "তা হলে মান বজায় থাকবে। টাকার চেয়ে যে ভদ্রলোকের কথার মূল্য কম সেটা প্রমাণ হবে না।"

বিপিন কহিল, "সে যা হোক, এসব কথা তুমি শুনলে কার কাছে?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া দেখিলাম গোপন করিবার কোন কারণই নাই। কহিলাম, "স্বয়ং পোষ্টমাষ্টারের কাছে, আমি তাঁর বাড়ী আজ প্রায় দুঘণ্টা ছিলাম।"

বিপিনের মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "পোষ্টমাষ্টারের মেয়েকে দেখেচ?"

"দেখেচি।"

"ওঃ তাই বল! পোষ্টমাষ্টারের মেয়েকে দেখে তোমার মনে প্রেম হয়েছে, তাই তোমার মাথার মধ্যে ন্যায়ের সেপাই-গুলো হঠাৎ দাপাদাপি লাগিয়ে দিয়েছে! জমিদারের মেয়েকে যদি প্রথমে দেখতে তা হলে এ রকমটা হত না।"

বিপিনের সহিত শুধু নয়, গৃহের আরও কয়েক জনের সহিত এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইল। পিতার কর্ণেও যে কথাটা পঁহুছিল তাহার প্রমাণ পাইলাম স্বয়ং পোষ্টমাষ্টারের নিকট হইতে দিন দুই তিন পরে।

পোষ্টাফিসে নিয়মিত চিঠি ফেলিবার অছিলায় বৈকালে বেড়াইতে গিয়াছিলাম।

পোষ্টমাষ্টার, সাক্ষাৎ হইতেই, কহিলেন, "আপনি এদিকে আসা বন্ধ করুন, এখানে ছেলেধরার ভয় হয়েছে!" বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

এ কথার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া কহিলাম, "কি রকম?"

পোষ্টমাষ্টার সহাস্যে কহিলেন, "আজ সকালে আপনার পিতার সহিত পথে সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁর মুখে শুনলাম আমি নাকি ছেলেধরা হয়েছি, আর আপনাকে ধরবার চেষ্টায় ব্যস্ত আছি। তাঁর মন থেকে এ অমূলক আশঙ্কা দূর করবার অভিপ্রায়ে তাঁকে জানিয়েছি যে আমার ডাকঘরে দুশো পাঁচশো টাকা ধরবার মতন থলেই আছে, তার মধ্যে এমবি-পাশকরা বলিষ্ঠ ছেলেকে ধরা সম্ভব নয়। জমিদারবাড়ী বিশহাজার পঁচিশহাজারের থলে আছে, সেখানে সে ব্যাপারটা খুব সম্ভব।" বলিয়া পোষ্টমাষ্টার উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিলেন।

পাশের ঘর হইতে চাপা হাসির শব্দ শুনা গেল না বটে, কিন্তু চুড়ি বালার ঠুংঠাং মৃদুমধুর শব্দের মধ্যে একটি কৌতুকস্মিত মুখ আমার চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল।

পোষ্টমাষ্টার কহিলেন, "কিন্তু আর-একদিক থেকে দেখলে এটা খুব স্বাভাবিকও বটে। আমি ঠকেছি বলে ওঁদের মনে মনে একটা আশঙ্কা আছে পাছে আমিও ঠকাই।"

তিনদিন পরে পোষ্টমাষ্টার কহিলেন, "আজ আবার এক নূতন ঘটনা ঘটেছে। সকাল বেলা জমিদারের এক গোমস্তা এসে হাজির। তাকে দিয়ে জমিদার মশায় বলে পাঠিয়েছেন যে আমি যদি বেশী চালাকি করি তা হলে গ্রামে বাস করা আমার দায় হবে। চালাকিটা কি জিজ্ঞাসা করায় বল্লে আমি নাকি আপনাকে ক্ষেপাচ্ছি। তার উত্তরে আমি বলে পাঠিয়েছি যে জমি মাত্রেই জমিদার বলে একপ্রকার জীব থাকে তা আমি এ গ্রামে এসে নতুন দেখ্‌ছিনে এবং সে সম্বন্ধে আমার বিভীষিকাও তেমন নেই, সুতরাং ও কথা বলে ভয় দেখিয়ে কোন ফল হবে না। তার চেয়ে জমিতে আর-একপ্রকার জীব চরে বেড়ায় তার শিং দেখলে অনেক সময় মনে বাস্তবিক ভয় হয়। ক্ষ্যাপানর কথায় বলেছি যে জমিদার যাঁর কথা বলে পাঠিয়েছেন তাঁর কথা বলতে পারিনে, কিন্তু জমিদার মশায় স্বয়ং যে ক্ষেপেছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।"

আমি কহিলাম, "এ কথা বলে আপনি জমিদারকে ক্ষমা করেছেন মাত্র। তার ঔদ্ধত্যের কোন দণ্ডই দেওয়া হয় নি। আমি যদি সে সময়ে উপস্থিত থাকতাম তা হলে গোমস্তাকে অত সহজে নিষ্কৃতি দিতাম না।"

পাশের ঘরে চুড়িবালার ঠুংঠাং শব্দ আজও বাজিয়া উঠিল, এবং আমার মনে হইল যেন তাহা অত্যন্ত প্রসন্ন স্বরে।

পোষ্টমাষ্টার কহিলেন, "রামচন্দ্রঃ! ঝগড়া করে কি হবে। ও-একটা পরিহাসের মত করে জবাব দেওয়া গেল। আপনার বিবাহের রাত্রে সেখানে গিয়ে দুখানা লুচি চিবতে হবে তার পথটাও রাখা চাই ত?" বলিয়া পোষ্টমাষ্টার তাঁহার স্বভাবানুরূপ উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিলেন।

উৎসাহে এবং আত্মসম্ভ্রমের তাড়নায় আমার মনের মধ্যে একটা প্রবল ঝোঁক আসিয়াছিল। মনে হইল এমন চমৎকার করিয়া একটা কিছু বলি যাহাতে পাশের ঘরে চুড়ি ও বালা আর-একবার মুখর না হইয়া থাকিতে পারিবে না। কিন্তু তেমন কিছু যোগাইয়া উঠিল না। কহিলাম, "এখনও ওপরিবারে আমার বিয়ে করবার প্রবৃত্তি আছে আমাকে এতটা নীচ মনে করে আমার প্রতি অবিচার করছেন!"

পোষ্টমাষ্টার আমার কথা শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কহিলেন, "না, না, ও কথা বলবেন না, তা হলে আমার নামে যে-সব দুর্নাম রটেছে সেগুলোর ভিত্তি বেঁধে যাবে। এতে আর জমিদার মশায়ের বিশেষ দোষ কি আছে? সকলেই যাতে নিজের অনিষ্ট বা ক্ষতি না হয় সেবিষয়ে সচেষ্ট হয়।"

কিন্তু পাঁচদিন পরে পোষ্টমাষ্টারের মুখে যে কথা শুনিলাম তাহাতে ধৈর্য্য রাখা অসম্ভব হইয়া উঠিল। সে-দিন সন্ধ্যার পর পোষ্টাফিসে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। পোষ্টমাষ্টার টেবিলের সম্মুখে বসিয়া পত্র লিখিতেছিলেন এবং মনোরমা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পত্রের দিকে চাহিয়া ছিল। পোষ্টমাষ্টার আমাকে দেখিয়া আহ্বান করিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়াই বুঝিলাম পিতা ও কন্যা উভয়েরই মুখ বিষণ্ন, চিন্তাক্রান্ত। পোষ্টমাষ্টার তাঁহার অভ্যাসানুযায়ী একবার হাসিবার চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু বর্ষাদিনের রৌদ্রের মত সে ফিকা হাসি নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী হইল; এবং বেদনার মূর্ত্তিই তাহার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

আমার মুখের ভাবে পোষ্টমাষ্টার বোধহয় আমার মনের কথা বুঝিতে পারিলেন। কহিলেন, "বিনয়বাবু, আপনাদের জমিদার আমাকে শুধু গ্রামছাড়া করেই নিশ্চিন্ত হতে পাচ্ছেন না, সরকারের অতিথিশালায় যাতে আমার একটা স্থান হয় তার বন্দোবস্তও তিনি করে দিচ্ছেন!"

আমি ব্যগ্রভাবে কহিলাম, "আবার কি হয়েছে?"

পোষ্টমাষ্টার তাঁহার তীক্ষ্ণ চক্ষুদ্বয় আমার মুখের উপর স্থাপন করিয়া কহিলেন, "আমি জমিদারের দুশ' টাকা চুরি করেছি! মাস খানেক হল জমিদারের নামে দুশ' টাকার একটা মনিঅর্ডার আসে। আমি সেটা পিয়ন দিয়ে জমিদারবাড়ী পাঠিয়ে দিই। পিয়ন সেদিন আমাকে এসে

বলে যে জমিদার তেল মাখছিলেন, তাঁর আদেশ-মত তাঁর একজন আত্মীয় জমিদারের নাম দস্তখত করে টাকা নিয়েছে। এখন জমিদার এই বলে রিপোর্ট করেছেন যে টাকা তিনি পাননি, যিনি টাকা পাঠিয়েছিলেন তাঁর কাছ থেকে তিনি জানতে পেরেছেন যে তাঁর নাম জাল করে কে টাকা নিয়েছে। এই ব্যাপার তদন্তের জন্ত তিন দিন পরে পোষ্টাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ আসবেন। এখন আমার যে প্রধান সাক্ষী পিয়ন জমিদারমশায় নিশ্চয় তাকে পয়সার পথ দেখিয়ে থাকবেন। সে যে জমিদারবাড়ী গিয়ে টাকা দিয়ে এসেছে সে কথা সে আমারই কাছে অস্বীকার করছে। কাজে-কাজেই দাঁড়াচ্ছে যে আমি কাউকে দিয়ে সই করিয়ে টাকাটা নিয়েছি। এখন মনিঅর্ডারে যে দস্তখত করেছিল তাকে খুঁজে বার করতে না পারলে আমার কি অবস্থা হবে বুঝতেই পাচ্ছেন!"

ক্রোধে এবং ঘৃণায় আমার মুখে বাক্য সরিতেছিল না। দেখিলাম মনোরমা আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আমার বক্তব্যের অপেক্ষায় রহিয়াছে। তাহার পিতার এই আসন্ন বিপদের মধ্যে তাহার লজ্জা বা সঙ্কোচ করিবার অবকাশ ছিল না। তাই আজ আমি আসাতেও সে এক পা না নড়িয়া যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল ঠিক সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

আমি কহিলাম, "জমিদার বলে সে কি মনে ভেবেছে যা ইচ্ছে তাই সে করতে পারে? আচ্ছা তা হলে একবার ভাল করে দেখা যাক আমরাও তাকে বিপদে ফেলতে পারি কি না!"

আমার কথা শুনিয়া পোষ্টমাষ্টার হাসিতে লাগিলেন। কহিলেন, "তা পারা যাবে না। মানুষকে পেষণ করবার সর্ব্বোত্তম অস্ত্র হচ্ছে টাকা, যেটা আমার হাতে নেই। তবে আপনার দ্বারা আমার এবিপদে কতকটা সাহায্য পাওয়া সম্ভব বটে।"

আমি ব্যগ্রভাবে কহিলাম, "বলুন কি করে। যদি অসম্ভব হয় তা হলে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব।"

পোষ্টমাষ্টার কহিলেন, "যদি কিছু মনে না করেন তা হলে বলি।"

আমি কহিলাম, "না বললেই মনে করব যে এখনও আমাকে পর মনে কচ্ছেন।"

পোষ্টমাষ্টার কহিলেন, "আমার মনে হয় আপনি জমিদারের মেয়েকে বিবাহ করতে অমত জানিয়ে থাকবেন, তাই আমার উপর এসব উৎপীড়ন আরম্ভ হয়েছে। আপনি যদি সেখানে বিয়ে করতে স্বীকৃত হন এবং যতদিন বিয়ে না হয় শুধু ততদিন যদি আমাদের সম্পর্ক ত্যাগ করেন তা হলে বোধহয় কোপটা অনেক কমে যায়। আপনাকে আমাদের নিতান্ত আত্মীয় বলে মনে করি বলেই এ কথা অকপটে বলতে সাহস করলাম।"

পোষ্টমাষ্টার এ অনুরোধ করিবেন জানিলে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতাম না। কিন্তু তাঁহার অনুমানে কোন ভুল ছিল না;—প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে আমিই যে তাঁহার সমস্ত বিপদের মূলে ছিলাম সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু অপরকে বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য নিজেকে এতটা বঞ্চিত করিবার মত শক্তি এবং আগ্রহ আমার ছিল না। কহিলাম, "আপনাদের সম্পর্ক ত্যাগ করলে যদি আপনাদের সুবিধার কোন সম্ভাবনা থাকে আমি এখনই তাতে রাজি আছি। কিন্তু জমিদারের মেয়েকে বিয়ে করব না তা আমি স্থির করেছি। সুতরাং সে প্রকারে আপনার উপকারে আসতে পারলাম না বলে আমাকে ক্ষমা করবেন!"

পোষ্টমাষ্টার কহিলেন, "আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করিয়ে নিয়ে নিজের সুবিধা করে নেব এতটা অবুঝ আমি নই। তবে এ কথাও আমি আপনাকে অকপটে জানাচ্ছি যে আমি নিপীড়িত হচ্ছি বলেই যে আপনাকে ক্ষতিগ্রস্থ হতে হবে তার কোন কারণ নেই। জমদিারবাড়ীতে বিয়ে করলেও আপনাকে এই গ্রামের মধ্যে আমাদের একমাত্র হিতৈষী বন্ধু বলে জানব।"

আমি কহিলাম, "আমি যে আপনাদের হিতৈষী আপনাদের সঙ্গে জমদিারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েই আমাকে তার পরিচয় দিতে দিন। জমিদারের মেয়েকে বিয়ে করে আমি সে পরিচয় দিতে চাইনে! সেজন্য আপনাদের সঙ্গে আমি সমস্ত নির্য্যাতন সহ্য করতে প্রস্তুত আছি।"

পোষ্টমাষ্টার কহিলেন, "শুধু আপনি হলে আমার কোন সঙ্কোচ থাকত না, কারণ আপনার পরিচয় প্রথম দিনেই পেয়েছি। কিন্তু ও বিষয়ে আপনাদের সমস্ত

পরিবারের স্বার্থ জড়িত। আমি যদি কোনপ্রকারে আপনাদের সংসারের ক্ষতির কারণ হই তাহলে আমি নিতান্তই দুঃখিত হব। তা ছাড়া আমার নিজের স্বার্থও এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে। জমিদারের মেয়েকে আপনি বিয়ে করলে হয়ত আমাদের উপর জমিদারের আক্রোশ কমে যাবে। আমার জন্য আমি একটুও ভাবিনে। কষ্ট পাবার ভয়ে দুর্বৃত্তের কাছে নত হব এত দুর্ব্বল আমি নই। আমি ভাবি শুধু মনুমার জন্যে। ধরুন আমার যদি জেল হয় মনু কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে?"

চাহিয়া দেখিলাম মনোরমার চক্ষুদুটি সজল হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহার সকরুণ মুখে একটা ভাষাহীন মর্ম্মান্তিক বেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে! মনে হইল তাহার আকুল-দৃষ্টি যেন বাহুর মত আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতেছে, "ওগো আমাদের বাঁচাও, বাঁচাও! এ বিপদে তুমিই আমাদের একমাত্র বন্ধু!"

সহানুভূতির তীব্র উত্তেজনা আমার মনকে যেন একটা নেশার মত চাপিয়া ধরিল। মাতালের মত লজ্জা সঙ্কোচ দ্বিধা কিছুই রহিল না। অসংলগ্ন ভাষায় অসম্বদ্ধভাবে কতকগুলা কি বকিয়া যখন চুপ করিলাম, দেখিলাম মনোরমার দুঃখ-পাংশু মুখখানি লজ্জায় গোলাপফুলের মত টকটকে হইয়া উঠিয়াছে এবং পোষ্টমাষ্টার সকৃতজ্ঞ-আনন্দে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিতেছেন, "তা'হলে জেলে গেলেও আমার কোন দুঃখ থাকবে না!"

সেদিন গৃহে ফিরিতে রাত্রি অনেক হইয়া গেল। বাড়ী আসিয়া বিপিনকে আনুপূর্ব্বিক সমস্তকথা খুলিয়া বলিলাম।

বিপিন সমস্ত শুনিয়া কহিল, "আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। কিন্তু আমার দ্বারা তুমি কি কাজ নেবে বলছ?"

আমি কহিলাম, "তুমি পিয়নকে ঠিক করবে। সে যাতে মিথ্যা কথা না বলে তার ব্যবস্থা করবে। এর জন্য যদি হাজার টাকা খরচ করতে হয় তাও করা যাবে। তাকে বলতে হবে সে জমিদারবাড়ী গিয়ে টাকা দিয়ে এসেছে, এবং যে সই করে টাকা নিয়েছে তার নাম আমাদের বলে দেবে, কিম্বা তাকে দেখিয়ে দেবে।"

বিপিন কহিল, "আচ্ছা সে চেষ্টা আমি সাধ্যমত করব। কিন্তু অত টাকা তুমি পাবে কোথায়?"

আমি কহিলাম, "সে টাকা পোষ্টমাষ্টার দেবেন। আমি তাঁকে বলেছি যে, যে টাকা পিয়নের জন্য খরচ করতে হবে শুধু সেই টাকাটাই আমি বিবাহের যৌতুক বলে গ্রহণ করব।"

বিপিনের মুখে দুষ্টামির হাসি দেখা দিল। আমি কহিলাম, "হাসছ যে?"

বিপিন কহিল, "একটা গান মনে পড়ছে—'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে।' জমিদারবাড়ীতে ধরা না পড়ে পোষ্টাফিসে তুমি ধরা পড়বে তা কে জানত বল? কিন্তু আমাদের যে দশ-পনেরহাজার টাকা লাভের পথ তুমি বন্ধ করলে সে ক্ষতি পূরণ কি রকম করে করবে শুনি?"

আমি কহিলাম, "তোমাদের ইজ্জত নষ্ট না হতে দিয়ে।"

পরদিন প্রাতে পিতা আমাকে ডাকাইয়া কহিলেন, "আজ বৈকালে তুমি কোথাও বেরিয়ো না—জমিদারমশায় তোমাকে আশীর্ব্বাদ করতে আসবেন।"

এতদিন পিতার সহিত প্রত্যক্ষভাবে ওবিষয়ে আমার কথাবার্ত্তা হয় নাই। কিন্তু একদিন যে হইবে তাহা আমি জানিতাম এবং সেজন্য প্রস্তুতও ছিলাম। আমার যাহা বক্তব্য তাহা সংক্ষেপে এবং সবিনয়ে নিবেদন করিলাম। আমার নির্লজ্জতা শুধু পিতাকে নহে আমাকেও বিস্মিত করিয়াছিল। বাল্যকাল হইতে গুরুজনকে যে ভক্তির দশগুণ ভয় করিয়া আসিয়াছে সহসা তাহার পক্ষে এতটা স্বাধীন হইয়া উঠা কম বিস্ময়ের কথা নহে!

আমার কথা শুনিয়া পিতা ধীরভাবে কহিলেন, "তুমি ত বলছ জমিদার অত্যাচারী লোক, তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত নয়। কিন্তু সেই অত্যাচারী লোক যদি হঠাৎ পোষ্টমাষ্টারকে ছেড়ে তোমার বাপের বিরুদ্ধে লাগে তখন তুমি তোমার বাপকে জেলে যেতে দেখে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে ত?"

আমি কহিলাম, "অত্যাচারী লোক কখন্ অত্যাচার করবে সেই ভয়ে তাকে ঘৃণা না করা দুর্ব্বলতা।"

পিতা কহিলেন, "তোমার সঙ্গে তর্ক করবার প্রবৃত্তি আমার নেই। তোমাকে পাঁচদিন সময় দিলাম। তুমি সমস্ত বিবেচনা করে তোমার মত আমাকে জানিয়ো।

তারপর আমিও আমার কর্ত্তব্য ভেবে দেখব। আজ আমি তাদের মানা করে পাঠাচ্ছি।"

পিতার নিকট হইতে কতকটা সহজে পরিত্রাণ পাইলাম বটে, কিন্তু গৃহের অপরাপর আত্মীয়বর্গের অত্যাচারে অস্থির হইয়া উঠিলাম। রাজার চেয়ে পেয়াদার জুলুমটাই বেশী হয় —বিশেষতঃ যখন তাহা রাজ-ইঙ্গিতের অধীন হইয়া চলে। রোগের কঠিন অবস্থায় যেমন মুরগীর ঝোল হইতে আরম্ভ করিয়া চরণামৃত পর্য্যন্ত নির্ব্বিচারে একসঙ্গে চলিতে থাকে, তেমনি আমার উপর স্তুতি এবং নিন্দা, অনুরোধ এবং অনুযোগ যুগপৎ চলিতে লাগিল। কেহ রাজ্যের প্রলোভন দেখাইল, কেহ বা রাজকন্যার কথা বলিল। কেহ দেখাইল রাজা তুষ্ট হইলে কত সুবিধা হইবে, এবং কেহ বুঝাইল রাজা রুষ্ট হইলে ভয়ানক বিপদ। কিন্তু বিকার আমাকে এমনই প্রগাঢ়ভাবে পাইয়া বসিয়াছিল যে কোন উপায়েই আমার চৈতন্য ফিরিয়া অসিল না।

পাঁচদিনের মধ্যে যেদিন দুইদিন বাকি সেদিন দ্বিপ্রহরে ডাকঘরের একজন পিয়ন আমার নামে একটা চিঠি লইয়া আসিল। খুলিয়া দেখিলাম পোষ্টমাষ্টার লিখিয়াছেন "আমার ভয়ানক বিপদ। দয়া করিয়া পত্রপাঠ একবার আসিবেন।"

ডাকঘরে যখন উপস্থিত হইলাম তখন পোষ্টমাষ্টার আফিসঘরে ব্যস্ত ছিলেন। আমি আসিয়াছি শুনিয়া তিনি আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিলেন।

আমি কহিলাম, "কি হয়েছে?"

পোষ্টমাষ্টার কহিলেন, "আজ সকালে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এসেছে। তার সঙ্গে দু-তিন দিন ধরে বোঝাপড়া চলবে। আমার ত এক মুহূর্ত্ত সময় নেই। এর মধ্যে বিপদের উপর বিপদ! কাল থেকে মনুর খুব জ্বর হয়েছে। বুকে এত বেদনা যে কথা কইতেও তার লাগছে। আজ সকালে বেণীডাক্তারকে আনতে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলে পাঠিয়েছিলেন যে বাবুদের বাড়ী হয়ে বেলা ১১টার সময় আসবেন। এখন একজন লোক বলে গেল যে বেণীডাক্তার আসতে পারবেন না। এ সবই জমিদারের কাণ্ড। সে-ই ডাক্তারকে আসতে মানা করে দিয়েছে। গ্রামে ত আর ডাক্তার নেই, তাই আপনাকে ডেকেছি। এ বিপদে একমাত্র আপনি সহায়। আমার বুদ্ধি লোপ পাবার মত হয়েছে। আপনি মনুর চিকিৎসা ও সেবা উভয়েরই ভার নিন।"

পোষ্টমাষ্টারের কণ্ঠের স্বর কাঁপিতেছিল এবং দেখিলাম তাঁহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। আজিকার এ নূতন বিপদে দেখিলাম তিনি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া পাশের ঘরে মনোরমাকে দেখিতে গেলাম।

মনোরমা শয্যায় পাশ ফিরিয়া শুইয়া ছিল। বোধ হয় একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। জ্বর পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার হাত ধরিতেই তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, এবং একটু চমকিয়া আমাদের দিকে ফিরিয়া চাহিল।

আমি কহিলাম, "কোনখানে তোমার ব্যথা বোধ হচ্ছে?"

মনোরমা হস্তের ইঙ্গিতে ডানদিকের বুক ও পিঠ দেখাইয়া দিল। পোষ্টমাষ্টারকে অফিস যাইতে বলিয়া ষ্টেথোস্কোপ আনিবার জন্য আমি গৃহে গেলাম। ষ্টেথোস্কোপ লইয়া আসিয়া মনোরমাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম ডানদিকের বুক ও পিঠ নিউমোনিয়ায় গুরুতর ভাবে আক্রান্ত হইয়াছে। এবং বামদিকেও রোগ সঞ্চারের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কর্ত্তব্যের অনুরোধে পোষ্টমাষ্টারকে মনোরমার পীড়ার গুরুত্বের কথা জানাইলাম; এবং তাহার ফলে যখন মনোরমার জীবনের পূর্ণ দায়িত্ব আমার উপর আসিয়া পড়িল তখন জীবন-পণ করিয়া মনোরমার সেবা ও চিকিৎসায় নিযুক্ত হইলাম। প্রয়োজনীয় ঔষধাদির তালিকা করিয়া সেই দিনই বিপিনকে ঔষধ আনিবার জন্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলাম।

বৈকালে মনোরমার জ্বর একটু কমিল। আমি মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "একটু ভাল বোধ করছ কি?"

মনোরমা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল ভাল বোধ করিতেছে। তাহার পর সহসা আমার মুখের প্রতি উৎসুক দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া বলিল, "সায়েবের সঙ্গে বাবার কি কথা হল?"

আমি কহিলাম, "সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নেই, সায়েব নিশ্চয়ই ভাল রিপোর্ট করবেন।"

কষ্টের মধ্যেও মনোরমার চক্ষু দুটি দীপ্ত হইয়া উঠিল। ব্যগ্রভাবে কহিল, "কেমন করে জানলেন ?"

মনোরমার এ প্রশ্নে আমি একটু বিপদে পড়িলাম; কারণ সাহেব যে ভাল রিপোর্ট করিবেন সে সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান ছিল না, শুধু মনোরমাকে একটু আশ্বস্ত করিবার উদ্দেশ্যে ওরূপ কহিয়াছিলাম। আমি কহিলাম, "পিয়নকে সত্য কথা বলতে রাজী করেছি। সে বলবে যে জমিদারের আদেশ-মত জমিদারের একজন আত্মীয়কে টাকা দিয়ে এসেছিল। তাহলে আর তোমার বাবার কোন ভয় থাকবে না।"

আমার কথা শুনিয়া মনোরমার চক্ষু দুটি কৃতজ্ঞতায় সজল হইয়া উঠিল।

আমি কহিলাম, "মনোরমা তোমার পুলটিস্ বদলে দেবার সময় হয়েচে।"

মনোরমা কহিল, "থাক, আর দিতে হবে না।"

"কেন ?"

মনোরমা ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়া, একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "আপনার হাতে অত গরম লাগে, ফোস্কা হতে পারে।"

আমি হাসিয়া কহিলাম, "সে জন্তে তোমার ভাবনা নেই, তুমি আগে ভাল হয়ে ওঠ, তারপর না হয় আমার ফোস্কার সেবা তুমিই কোরো।"

মনোরমার ক্লিষ্ট অধরে সলজ্জ হাসির রেখা স্ফুরিত হইয়া উঠিল। আমার কথার কোন উত্তর না দিয়া সে অন্যদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

হঠাৎ চিকিৎসা এবং সেবা আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়াই হউক কিম্বা যে কারণেই হউক সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মনোরমা অপেক্ষাকৃত ভালই ছিল। কিন্তু সন্ধ্যার পর হইতে জ্বর এবং অপরাপর উপসর্গ পুনরায় বৃদ্ধি পাইল। আমি ও পোষ্টমাষ্টার সমস্ত রাত্রি মনোরমার শিয়রে বসিয়া সেবা করিলাম কিন্তু কোন ফল হইল না। পরদিন প্রাতে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম মনোরমার ফুস্‌ফুস্ পরিপূর্ণভাবে আক্রান্ত হইয়াছে।

আমার ডাক্তারী-জীবনের প্রথম রোগী মনোরমা। কলেজের দীন অভিজ্ঞতার ঊর্দ্ধে এক ইঞ্চিও উঠিতে পারি নাই—কিন্তু ভোরের আলোয় মনোরমার মুখ দেখিয়া মনে হইল সে আর বাঁচিবে না। তাহার সুনির্ম্মল মুখের উপর সূক্ষ্ম অথচ স্পষ্ট এমন একটা ছায়া লক্ষ্য করিলাম যাহা দেখিয়া আমার মন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

আমার ডাক্তারী শিক্ষার সমস্ত শক্তি এবং জ্ঞান সঞ্চিত করিয়া প্রাণপণে আর-একবার মনোরমার চিকিৎসায় লাগিলাম। যাহা কিছু আমার জানা বা শুনা ছিল কিছুই বাকি রাখিলাম না। কিন্তু বৃথা! বৃথা! তখন ত আর ব্যাধির কোন কথা ছিল না, জগতের সমগ্র চিকিৎসাশাস্ত্রের সমবেত চেষ্টা যাহাকে প্রতিরোধ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম তাহাই মনোরমার দেহের মধ্যে ধীর এবং অপ্রতিহত ভাবে তখন প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। দেশ ভাসাইয়া বন্যা ছুটিয়াছিল, তাহার সম্মুখে এক মুঠা মাটি ফেলিয়া কোন লাভ ছিল না।

দ্বিপ্রহর হইতে মনোরমার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। মুখে তাহার আর কোন কথা রহিল না, শুধু প্রশান্ত দুটি চক্ষুর সকরুণ দৃষ্টি প্রভাত-আকাশের বিলীনোদ্যত তারকার মত আমাদের দিকে ক্ষীণভাবে সমস্ত দিন জাগিয়া রহিল! তাহার পর সন্ধ্যাকালে যখন একটির পর একটি করিয়া তারকা ফুটিয়া উঠিতেছিল তখন দেখিলাম মনোরমার চক্ষু-তারকা সেই সময়েরই একটি কোন্ মুহূর্ত্তে সহসা স্থির অপলক হইয়া গিয়াছে!

* * * *

সে ঘটনার কথা অবগত হইয়া জমিদার মহাশয় এবং আমার পিতা বোধ হয় কতকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু মনোরমার মৃত্যু দশ বৎসর হইয়া গিয়াছে, আমি এখনও নিশ্চিন্ত হইতে পারি নাই। আমার এখনও মনে হয়—'এ জীবনে যাহা ঘটিল না তাহা—'।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

পঞ্চশস্য

পথের গানে যুদ্ধের কথা—

ফ্রান্সের গল্‌ওা নামক খবরের কাগজে প্রকাশ যে পারী নগরের থিয়েটার নাচঘর প্রভৃতি যুদ্ধের দরুণ একরকম বন্ধ হইয়া গিয়াছে; এবং উৎকৃষ্ট অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের কর্ম্মের অভাবে কষ্টে পড়িতে হইয়াছে। কিন্তু পথে পথে যাহারা গান ফেরি করিয়া বেড়ায় তাহাদের ব্যবসা খুব জোরে চলিতেছে। ইহারা মহাসমরের কাহিনী কথায় ছন্দে গাঁথিয়া সুর করিয়া পথে পথে গাহিয়া বেড়ায়, এবং লোকেরা যুদ্ধব্যাপারের ব্যস্ততার মধ্যে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থিয়েটার দেখিতে পারে না বলিয়া এই-সমস্ত গায়কের চুটকি গানের দিকে অধিক আকৃষ্ট হইতেছে। এই-সমস্ত স্ত্রী বা পুরুষ গাইয়েরা ওস্তাদ গাইয়ে নহে; হয়ত বা চাকরী-হারা মুটে মজুর; তাহারা নিজেরাই কবি, নিজেরাই গানে সুর দিয়া নিজেরাই নিজের গান গাহিয়া বেড়ায়; সে গান শিক্ষাসাধনার কিছুমাত্র ধার ধারে না এবং এইজন্য তাহা সাধারণ লোকের অত্যন্ত প্রিয়, কারণ সাধারণলোকে যাহা নিজেরা সহজেই উপর-উপর দেখিয়াই বুঝে তাহাই ভালো বাসে, তলাইয়া কোনো জিনিসের রস বা সৌন্দর্য্য তাহারা ধরিতে পারে না।

উক্ত খবরের কাগজে কয়েকটি গানের নমুনা দেওয়া হইয়াছে, আমরা তাহার অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

একটি গানের নাম—ন্যায়ধর্ম্মের ক্ষুদ্র সেনা! তাহার সুর ও তাল সৈন্য চলার সঙ্গে তাল রাখিবার উপযোগী—

পড়ল পাশা—চলরে ছুটে সমুখ পানে!—
পবিত্র এ হুকুম এল ফ্রান্সে।
যুদ্ধ-দানব ছাড় পেয়েছে শিকল ছিঁড়ে,
খাচ্ছে শুষে দেশের ধন ও প্রাণ সে!
কৈজারটা পাগলা হয়ে দেয় লেলিয়ে;
জল্লাদেরা নিচ্ছে যে তার সঙ্গ;
সকল আশার বাঁধন ছিঁড়ে দানব ছেড়ে
পাগল এখন দেখছে তারই রঙ্গ!
আয় কে কোথায় আছিস বলী ধর হাতিয়ার,
শত্রু আসে বুকের পরে চড়াও হতে!
ছেড়েছুড়ে কারকারবার স্ত্রী-পরিবার
ঝাঁপ দিয়ে পড় সমর-স্রোতে!

এই গানের পরে সমবেত শত শত শ্রোতা একসঙ্গে কোরাস ধুয়া গাহিয়া উঠে—

মুক্ত স্বাধীন-জাত কি কখনো সমরে ডরে,
ন্যায়-স্বত্বের বলে যে তাহার হৃদয় বলী;
নির্ভয়ে আর অটল হয়ে আগ বাড়িবে,
বীর তোমরা, কাঁপবে ভয়ে রণস্থলী!

আর-একটি গানের নাম—দেশের জাগরণ! ইহাতে ইংলণ্ডের রাজা, রুশিয়ার জার ও ফ্রান্সের দেশমুখ পোঁয়াকারের সম্মানের পর বেলজিয়মের রাজার বন্দনা আছে। সেই গানটির ধুয়া এইরূপ—

"থাম্ দেখি তুই, আসছিস কে?"—সকল য়ুরোপ
তন্দ্রা হতে জেগে উঠে বলছে হেঁকে।
কে আছ গো, কোথায়, এস, এই সীমানায়
যে যার নিজের ঘাঁটি আগলে বোস্‌রে জেঁকে!
প্রাণে দেহে আমরা সবাই এক-কাঠ্‌ঠা—
শপথ নিয়ে শত্রুরোধে হওরে খাড়া,
মাটির পরে ফেলরে পেড়ে টুঁটি চেপে—
পড়পড়িয়ে সরীসৃপের ছালটা ছাড়া!

একটি মেয়ে তার পোষাকের বুকে পিঠে ফ্রান্স ও বেলজিয়মের জাতীয় পতাকা আঁটিয়া, মাথায় ফ্রান্সের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা-সূচক তিন রঙের নিশান বাঁধিয়া যখন "মরণের গান" গায় তখন তাহার অসুন্দর মুখখানিও করুণার দীপ্তিতে সুন্দর হইয়া উঠে। তাহার কণ্ঠ যেন রক্তে রাঙা মাটির উপর অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকে। সেই গানটির ধুয়ার দুটি লাইন মাত্র খবরের কাগজে উদ্ধৃত হইয়াছে; তাহা এইরূপ—

অজেয় অমর আত্মা মোদের মরণ-পার,
যশোমণ্ডিত দেশ-নিশানের পাহারাদার!

লেখক এই গায়িকাটিকে মূর্ত্তিমতী দেশপ্রীতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; এবং তাহার কণ্ঠের সুরে শ্রোতার হৃদয় দেশপ্রীতিতে স্পন্দিত হইয়া উঠে।

সন্ধ্যার পর পুলিশ আর কাহাকেও পথে গান করিতে দ্যায় না। তখন কনসার্টহলে এইরকম গান শোনা যায়। একটি গানের নাম—"শিশুর মরণ।" এই গানটিকে "ইতিহাসের এক পাতা, মাতাদের নামে উৎসর্গ করা" বলা হইয়াছে। একটি সাতবছরের ছেলে তার খেলনা বন্দুক জার্ম্মানদের দিকে তাগ করিয়াছিল বলিয়া জার্ম্মানরা বালককে বধ করে। এই ঘটনা লইয়া গানটি লেখা। গানের ধুয়া এইরূপ—

সাত বছরের বালক মাত্র।
মুখখানি তার হাস্য-উজ্জ্বল, চুলগুলি সব সোনা।
ছিল সে শুধুই সুখের পাত্র,
মনের জমিতে অশ্রু সেচিয়া দুঃখ হয়নি বোনা।
বাছা রে বাছা ঘুমা
মরণ-বুড়োর মুখের কাছে বজিয়ে দিয়ে তুড়ি।
যতেক মা যে খাচ্ছে আজি সোনা-মুখের চুমা,
কাঁদছে তারা পাপের তরে যাহার নাইক জুড়ি!

লেখক বলেন যে, এই গানটি শ্রোতাদের যেমন গভীর বেদনায় বিচলিত করে এমন আর কোনো গানে হইতে তিনি দেখেন নাই। এই গানটি হয়ত বহুকাল অমর হইয়া থাকিবে। যুদ্ধের যত রকম দিক হইতে ও থাকিতে পারে, সকল দিকের গানই রচিত হইয়াছে। কোনো কোনো গানে হয়ত কবিত্ব নাই। কিন্তু সেইজন্যই সেসব গান বেশী লোকের আদর পায়, কারণ তাহা বুঝিতে সাধারণলোকের একটুও কষ্ট হয় না, এবং তাহারা যেমন করিয়া ভাবে সে সব গানে ঠিক তেমনি ভাবেরই কথা আছে, নূতন চিন্তা বা প্রণালী বা রসমধুর কবিত্বের বালাই নাই।

* *
*

তুর্কী কবি—এসিয়াটিক রিভিউ নামক পত্রিকায় তুর্কী-সাহিত্যের একটি বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তুর্কীসাহিত্য বেশ উন্নত।

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে চল্লিশ জন অসমসাহসী ভাগ্যান্বেষী ওসমানলি এশিয়া হইতে একটা ভেলায় করিয়া বস্ফরাসপ্রণালী পার হইয়া য়ুরোপে উপস্থিত হন এবং তুর্কীসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করেন। তাঁহাদের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত অনেক তুর্কীকবি উৎকৃষ্ট কবিতা রচনার জন্য প্রসিদ্ধ হইয়াছেন; এবং চিত্তোন্মাদন বীরত্বগাথা প্রভৃতি বহু পুরাতন কবিতা এখনো তুর্কীতে প্রশংসিত পঠিত ও গীত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে চল্লিশ জন ওসমানলির একজন গাজি আব্দুল ফাজিল ৭৫৭ হিজরী ১৩৫৬ খৃষ্টাব্দে যে "কলক গজল" বা "ভেলার গান" রচনা করিয়াছিলেন, তাহা এখনো অত্যন্ত সমাদৃত হইতেছে।

গাজি সুলতান মহম্মদ খাঁ (দ্বিতীয়) রাজার অধীনে ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে তুর্কীরা কনষ্টাণ্টিনোপল জয় করেন। এই রাজা কবি ছিলেন। ইঁহার পরে দুজন স্ত্রীকবি জয়নাব খানুম ও মিহরী খানুম সুমধুর কবিতা রচনার জন্য প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। মিহরী খানুমের চৌদ্দবৎসর বয়সের রচনা "পাখীর গান" আজও তুর্কীরা বহুমূল্য জাতীয় কবিত্বসম্পদ বলিয়া সমাদর করিয়া থাকেন।

আর-একজন প্রসিদ্ধ কবি শেখ হারুন আবদুল্লা। ইঁহার জন্ম হয় ৯৬৪ হিজরী ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে। ইনি যৌবনে এক দরবেশ-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পরে তাহাদের শেখ বা প্রধান হন। ইনি অনেকগুলি সুন্দর ছোট কবিতা ও একখানি মহাকাব্য "মহম্মদ-বিন-কাশিম" রচনা করেন। ইঁহার অধিকাংশ কবিতায় ধর্ম্মপ্রাণতা, ঈশ্বর-প্রেম, মরমিয়াভাব প্রধান। "নূর-উল্লা" অর্থাৎ "ঈশ্বরের জ্যোতি" (২৬ লাইনের দ্বিপদী কবিতা), "তমসিল" বা "উপমা" (৩৪ লাইন), "দয়মা কাপালী কাপাসু" বা "সদারুদ্ধ দ্বার" (১৬ লাইনের চতুষ্পদী কবিতা) বিশেষ প্রসিদ্ধ। শেখের কবিতাটির সঙ্গে ওমার খায়ামের রুবায়াতের ভারি মিল আছে। ওমার খায়াম শেখের ৪০০ বৎসর পূর্ব্বেকার লোক; সুতরাং তাঁহার কবিতায় ওমারের কবিত্বের ছায়া পড়া আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু তাহাতে শেখের কবিযশ ম্লান হয় নাই। তিনি নিপুণ জহরীর মতন ওমর খায়ামের ভাবরত্নকে যে নূতন পরিবেষের মধ্যে বসাইয়া অভিনব অলঙ্কার গঠন করিয়াছেন তাহার গুণপনা ও সৌন্দর্য্য তাঁহার নিজস্ব। "পয়গম্বর ব য়হুদী" এবং "আক্রিমুঅল-হিররাঃ" কবিতা দুটি হজরৎ মহম্মদের জীবনের ঘটনা লইয়া লেখা। কতকগুলি কবিতা তুর্কী কিম্বদন্তী ও প্রবচন অবলম্বনে রচিত। "অল-মীরাজ" (৬০ লাইনের পয়ার) অর্থাৎ স্বপ্ন-নামক কবিতায় কবি পয়গম্বরের দেখা পাইয়াছেন; পয়গম্বর দর্পণে ছায়া দেখার মতন তাঁহার সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী এবং তাহার বাসিন্দাদের স্পষ্ট করিয়া উপস্থিত করিলেন।—

কত শত মহারাজা, প্রজা তাহাদের,
ইহুদি খৃষ্টান আর মোস্লেম কাফের;
ঘেঁসাঘেসি ঠাসাঠাসি করে কিলকিল
অপকর্ম্মে রত, বলে বচন অশ্লীল;
মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক খোসামুদে সব,
একজন নাহি দেখি আসল মানব।
হৃদয় স্তম্ভিত হল—পৃথিবী কি এই?
তবে এই নর-লোক ভরা নরকেই।

দুঃখে ও নিরাশায় কাতর কবি পয়গম্বরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

কি করিলে ঘুচে' পাপ পুণ্য জন্ম লবে,
নরক ত্যজিয়া ধরা স্বর্গ বুকে ববে?

এই প্রশ্নের উত্তরে পয়গম্বর বলিতেছেন—

পৃথিবীর পরিত্রাণ তখনি সম্ভব
কি যে শ্রেয় বুঝিবেক যখন মানব;
প্রাণ হবে প্রাণদান করিবারে পরে,
প্রত্যেকে রহিবে বেঁচে সকলের তরে।
ধরার ধূলি সে হবে স্বর্গের অমৃত,
মানুষ সোদর সব, মানুষ প্রকৃত।

এই কবিতার রূঢ় তিরস্কার রাজসরকারের গায়ে সহিল না; শেখ কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন। নির্ব্বাসনকালে তিনি "মহম্মদ-বিন-কাশিম" নামক মহাকাব্য রচনা করেন। এই কাব্যে মহম্মদ-বিন-কাশিমের সহিত হিন্দুরাজার যুদ্ধবৃত্তান্ত ও স্বামীর মঙ্গলের জন্য আমিনার আল্লার নিকট প্রার্থনা অত্যন্ত মনোরম। নির্ব্বাসনকালে শেখ ছোট কবিতাও অনেকগুলি লিখিয়াছিলেন, তাহার একটির নমুনা—

মুসালাহা (শান্তি)

আল্লা তোমাকে শান্তিসদনে আহ্বান করিতেছেন।—কোরান, য়ুনুস, সুরা ১০।

এই কর তুমি ওহে ভগবান,
পৃথিবীর নর হোক মহীয়ান,
সবারে সবাই করুক সম্মান,
শান্তি ও প্রেমে পরাণ খুলে।
সত্য ধর্ম্ম চিনে করুক পালন,
হোক সবে তব ভৃত্য-মতন,
করুক সকলে জীবন যাপন
প্রেমে মিলে মিশে, ঝগড়া ভুলে।
সর্ব্বজ্ঞ দয়াল তুমি ভগবান,
পয়গম্বরে তব দিলে মহাপ্রাণ
আদর্শ দেখায়ে করিতে মহান
মানব-সমাজে, বিরোধ ছেড়ে।
হে আল্লা আমার প্রার্থনাটুক—
ধরায় সেদিন শীঘ্র আসুক
যুদ্ধ হত্যা আর হিংসা মিটুক,
শান্তি বসুক জগৎ-জুড়ে।

কবিতার জন্য শেখের নির্ব্বাসন হইয়াছিল, কবিতার জন্যই তাঁহাকে রাজসরকার সমাদর করিয়া দেশে পুনরাহ্বান করিল ও বহুবিধ খেতাব ও খেলাত বকশিশ করিল। কিন্তু ইহার পর তিনি আর অধিক দিন জীবিত থাকেন নাই। শেখের শেষ কবিতা মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে রচিত। এই কবিতায় এই ধর্ম্মপ্রাণ বৃদ্ধ শেখের পৃথিবীত্যাগের শেষ মুহূর্ত্তের মনের ভাব স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। কবিতার মাথায় হজরৎ মহম্মদের উক্তি—"নিদ্রা মৃত্যুর ভগিনী"—উদ্ধৃত করিয়া পরে লিখিয়াছেন—

সদ্য জনমি শিশু যেই মেলে আঁখি, অমনি জনমে বসুন্ধরা,
মুগ্ধ শিশু চেয়ে থাকে অপলক আঁখি আনন্দ বিস্ময় প্রেমে ভরা!
পলকে দেখিল যাহা, তাই করে ক্লান্ত আঁখি তার, পিপাসা মিটায়ে
মার বক্ষস্বর্গ পরে ঘুমাইয়া পড়ে ধীরে চেতনা ও শরীর গুটায়ে।

ক্লান্ত কর্ম্মকার দীর্ঘ অফুরান দিনমান ধরি, কর্ম্ম করি ফিরে,
ক্ষুধা-তৃষ্ণা-অবসন্ন তনু, ঝাপসা কুয়াসা যেন চেতনারে ঘিরে।
শ্লথ অঙ্গ, বুদ্ধি হত, আঁখি দুটি তার মেলে থাকা হয়েছে কঠিন;
সকল বেদনা শ্রান্তি নিমেষে ঘুচায়, গাঢ় নিদ্রা শান্তিতে নিলীন।

তীর্থযাত্রী এ ধরার, তিরস্কার পুরস্কার যত, অবহেলা করি
চলিয়াছি যাত্রাপথে, পথমান পর-পর-রাখা বর্ত্ম ধরি ধরি।
সে শুভ মুহূর্ত্ত লাগি আছি অপেক্ষায়, আল্লা যবে করুণা করিয়া
প্রাণবায়ু ফিরে লয়ে শান্তিময় মৃত্যুঘুমে দিবে, সব আবরিয়া।

* *
*

সহরে বাদুড় পোষা—

আমেরিকার একজন ডাক্তার চোদ্দ বৎসর পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, বাদুড় ম্যালেরিয়া-বাহক মশকের শত্রু। এইজন্ত আমেরিকার প্রতি-সহরের মিউনিসিপালিটি এক-একটা বাদুড়ের বাসা

বাদুড়ের বাসা।

তৈয়ার করিয়া তাহাতে বাদুড় পুষিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই ডাক্তার ক্যাম্বেলের সহিত অষ্ট্রেলিয়া ও জাপানের গভমের্ণ্ট এবং আমাদের কাশ্মীর শ্রীনগরের রাজসরকার চিঠিপত্র লেখালিখি করিতেছেন। ইহা আমাদের এই ম্যালেরিয়া-জর্জ্জরিত বঙ্গদেশে বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

* *
*

ট্রেঞ্চের মধ্যে খবরের কাগজ—

অবাধ ছাপাখানার প্রচলন ও ছাপাখানার স্বাধীনতা লাভের পর যত অদ্ভুত জায়গায় খবরের কাগজ ছাপা ও প্রচারিত হইয়াছে তাহার মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে ট্রেঞ্চ বা খানার মধ্যে খবরের কাগজ প্রকাশ অদ্ভুততম। খবরের কাগজওয়ালারা জেলখানায় বন্দীদশায় কাগজ ছাপিয়া বাহির করিয়াছে শোনা গিয়াছে; ষ্টীমারে জাহাজে খবরের কাগজ প্রকাশ করা ত আজকাল খুব চলিতেছে; কিন্তু গোলাগুলির বর্ষণের মধ্যে ট্রেঞ্চে

যুদ্ধক্ষেত্রের ট্রেঞ্চে বন্দী ফরাসীদের ছাপা খবরের কাগজ।

বসিয়া খবরের কাগজ চালানো একটা খুব নূতন ব্যাপার বটে। পারীর গলওা নামক খবরের কাগজে ইহার সংবাদ বাহির হইয়াছে। এই-সমস্ত কাগজে সাধারণ অবস্থায় প্রকাশিত কাগজের ন্যায়ই নানাবিধ রসরচনা, রঙ্গ, রহস্য, খবর প্রভৃতি সবই থাকে। কানের পাশে যখন গোলাগুলি শনশন করিয়া ছুটাছুটি করে, তখন এই-সমস্ত সৈনিক কাগজওলারা দিব্য নিশ্চিন্তভাবে ছাপার কাজ করে,—ইহাতে তাহাদের বেপরোয়া ভাব প্রকাশ পায় এবং তাহাদের দেখিয়া বুকে সাহস বাঁধিয়া পরম উৎসাহে তাহাদের সঙ্গীরা যুদ্ধ করিতে থাকে।

এই-সমস্ত কাগজ হাণ্ড-প্রেসে ছাপা হয়; এবং তাহাতে যে ছবি থাকে তাহা লেখা ছাপার পর দ্বিতীয় বারে ছাপিয়া দেওয়া হয়। দুবার-ছাপা কাগজ সাধারণ অবস্থায় খুব দামী ও উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

একখানা কাগজের নাম The War Cry; তাহা Victory Street নামক ট্রেঞ্চ হইতে প্রকাশিত হয়; তাহার প্রথম সংখ্যা বাহির হইয়াছিল ১জানুয়ারী ১৯১৫, দ্বিতীয় সংখ্যার তারিখ ২১জানুয়ারী। এই কাগজে সেনাপতির আদেশ, উন্নয়ন পুরস্কার প্রশংসা যাহারা পাইয়াছে তাহাদের নাম ও বিবরণ, প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে হাসি মস্করা ঠাট্টা বিদ্রূপ, কবিতা গল্প, প্রবন্ধ সমালোচনা সবই থাকে; বিজ্ঞাপনও বাদ পড়ে না। বিজ্ঞাপনের নমুনা—জার্ম্মান দেশ ভাড়া, খুব ফর্দ্দা ফাঁকা দরাজ; নূতন-বৎসরের সওগাত, সন্দেশ মিষ্টান্ন আমরা ভারে ভারে আনিয়া কার্ত্তুজ-বেল্টে সাজাইতেছি, এবং খুচরা খুচরা বন্দুকে কামানে ভরিয়া জার্ম্মানদের বিলি করিয়া দিতেছি, জার্ম্মানরা সত্বর আসিয়া লইয়া যাও, বিলম্বে হতাশ হইতে হইবে।

যুদ্ধক্ষেত্রের ট্রেঞ্চে জার্ম্মানদের খবরের কাগজের ছাপাখানা।

অপরাপর কাগজের নাম The Cave Man, The Trench Gazette ইত্যাদি।

ফরাসী বন্দীরা জার্ম্মান দেশে বন্দী অবস্থাতেও এক খবরের কাগজ বাহির করিয়াছিল, তাহার নাম Le Heraut, মানে ইংরেজিতে Herald অর্থাৎ নকিব বা দূত, তাহার কাজ "ফ্রান্সে হাসির বিস্তার ও রক্ষা"। এই কাগজগুলির সমস্ত জার্ম্মানরা বাজেয়াপ্ত করিয়াছে; মাত্র এক কপি তাহাদের হাত ফস্কাইয়া এখনো বাঁচিয়া আছে।

* *
*

অন্তর্জ্জলী জাহাজে অ-তার টেলিগ্রাফ—

অধ্যাপক ফেসেণ্ডেন অন্তর্জ্জলী জাহাজের জন্য একপ্রকার অ-তার টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করিয়াছেন; তাহার দ্বারা কোথায় তুষারস্তূপ ভাসিতেছে, কোথায় অপর অন্তর্জ্জলী জাহাজ আসিতেছে, ধরা যাইবে এবং টেলিগ্রাফে দূর দূরান্তে খবর পাঠানো যাইবে ও অনুকূল অবস্থায় অপর ডুবো জাহাজের সঙ্গে কথা বলাও চলিবে। ইহা অন্তর্জ্জলী জাহাজের বাক্ ও শ্রবণশক্তি, ইহা শত্রুর গোপন গতিবিধি জানিয়া বন্ধুকে সতর্ক করিবার উপায়। এ একপ্রকার কম্পন উৎপাদক যন্ত্র, ইহা হইতে জলের ভিতর দিয়া বহু দূরে শব্দতরঙ্গ পাঠানো যায়; জলের ভিতর দিয়া শব্দ বাতাসের চেয়ে চারগুণ বেগে চলে, এবং বাতাসে ধোঁয়া কোয়াসা প্রভৃতি থাকিলে শব্দ যেমন বিচলিত ও পরাবর্ত্তিত হয়, জলের মধ্যে তেমন সহজে হয় না। ফেসেণ্ডেনের যন্ত্রের শব্দতরঙ্গ এত নীচু যে জলের উপরে একটু শুনিলেই কানে তালা ধরিয়া যায়; কিন্তু জলের তলে তত তীব্র শোনায় না; এবং এই শব্দতরঙ্গ এত দ্রুত যে একটা চৌবাচ্চার জলের ভিতর দিয়া চালাইয়া তাহাতে হাত ডুবাইলে হাতকে একটা মোচড় দিয়া উপরে তুলিয়া ফেলিয়া দ্যায়। জলে চাপ দিয়া জলকে সঙ্কুচিত করা দুষ্কর; কিন্তু এই শব্দতরঙ্গের চাপে জল এক ইঞ্চির হাজার ভাগের এক ভাগ সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। এই শব্দতরঙ্গ দূরে অপর যন্ত্রে আঘাত করিয়া বিন্দু ও দাঁড়ি চিহ্নের দ্বারা সাধারণ টেলিগ্রাফের ন্যায় খবর জানায়। যন্ত্রের মুখে একটি ইস্পাতের পটহ আছে; তাহার উপর কথা বলিলে দূরের অপর যন্ত্রে সেইরূপ পটহ হইতে সেই কথাগুলি উত্থিত হইতে শোনা যায়।

আমেরিকার অনেক অন্তর্জ্জলী জাহাজে এই যন্ত্র লাগানো হইয়াছে। ফেসেণ্ডেন বলেন যে যদি ইংলণ্ডের ডুবো জাহাজে এই যন্ত্র থাকিত তবে জার্ম্মান ডুবো জাহাজ কখনো ইংলণ্ডের চারিদিকে এমন রাহাজানি করিয়া ফিরিতে সাহস করিত না।

* *
*

রঙিন গান—

রুশিয়ার সঙ্গীতস্রষ্টা আলেকজাণ্ডার স্ক্রিয়াবিন তাঁহার সঙ্গীতে বর্ণ ও স্বরের মাধুর্য্য মিলাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ইনি যখন কোনো গান বা গৎ বাজান তখন প্রত্যেক সুরের সঙ্গে সঙ্গে সেই সুরের সহিত সঙ্গত করিয়া একএকটি রঙিন আলো শ্রোতাদের চোখের উপরে ফেলেন; ইহাতে গানটি মূর্ত্তিমান হইয়া উঠে। সেই আলোগুলি যেন পিয়ানোর পর্দ্দাপর্য্যায়; একএকটা চাবি টিপিলে যেমন একএকটা সুর বাহির হয় অমনি সেই সুরের সঙ্গে বিভিন্ন রঙের একএকটি আলোক শ্রোতাদের চোখে পড়ে; রঙে ও সুরে, শব্দ ও বর্ণে মিলিয়া পরিপূর্ণ সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়। মুনিকের সঙ্গীতস্রষ্টা ভাসিলি কাডিন্স্কি সঙ্গীত চিত্র করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; স্ক্রিয়াবিন কতকটা তাঁহারই পন্থা অবলম্বন করিতেছেন। স্ক্রিয়াবিনের প্রসিদ্ধ রঙিন গানের নাম—"অগ্নিদেবতা!" (Prometheus—the Poem of Fire)।

ইনি ওয়াগনারের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করিবার সঙ্কল্প করিয়া সকল ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য শিল্পকলার সকল অঙ্গ, রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধ সঙ্গীতে মিলাইতে চেষ্টা করিতেছেন। তাহা হইলে এক সঙ্গীতের মধ্যে কবিতা চিত্র মূর্ত্তি স্বাদ গন্ধ সমস্ত মিলিত হইবে। বর্ণগন্ধের আনন্দলীলা ললিত নৃত্যের সহযোগে বৃদ্ধি করা হইবে।

* *
*

চন্দ্রের ঋতুপর্য্যায়—

এ পর্য্যন্ত লোকের বিশ্বাস ছিল চন্দ্রে না আছে বাতাস, আর না আছে জল। কিন্তু সেখানে তাপ ও শৈত্য খুব পুরা মাত্রায় আছে। চান্দ্র মধ্যরাত্রিতে শূন্য ডিগ্রি শীত ও চান্দ্র মধ্যাহ্নে আমাদের পৃথিবীর বিষুব রেখার সমীপবর্ত্তী গরম দেশের মতন গরম হয়। অধ্যাপক পিকারিং বলেন, এই যে তাপ-বৈষম্য, ইহা জল বাতাস না থাকিলে হইতে পারে না; এবং দূরবীন দিয়া চন্দ্রে যে-সমস্ত পরিবর্ত্তন দেখা যায় তাহা সেই উর্ব্বর উপগ্রহের বুকে ঝড় জল কুয়াসা তুষার প্রভৃতির উপদ্রব ছাড়া আর-কিছু নয়।

দূরবীন দিয়া দেখিয়া চাঁদের মেরুপ্রদেশের ও প্রসিদ্ধ পিকো পাহাড়ের যে ছবি পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে চাঁদে বরফ পড়ে এবং তাহার পরিমাণ নানাসময়ে নানারূপ হয়। মাঝে মাঝে চাঁদের বুকে বরফের সাদা দাগে এত ঘন ঘন পরিবর্ত্তন ঘটে যে তাহাকে কুয়াসা বা বরফের ঝড় বলিয়া স্বীকার না করিয়া আর উপায় নাই। পিকারিং চন্দ্রে উষ্ণপ্রস্রবণের অস্তিত্বের প্রমাণ পাইয়াছেন এবং

চন্দ্রে ঋতুপর্য্যায়।
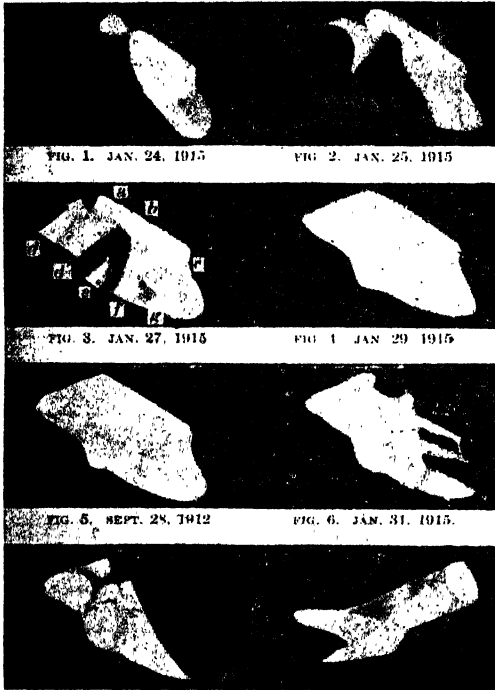
চান্দ্র প্রভাতে সূর্য্যকিরণ লাগিয়া বরফ গলিতেও তিনি দেখিয়াছেন। পিকো পাহাড়ের গায়ে যে সাদা দাগ দেখা যায় তাহার উপর যত বেশী সূর্য্যের আলোক পড়ে তত দাগ মিলাইতে দেখা যায়; অতএব সেই সাদা জিনিসটা বরফ ছাড়া আর কিছু নয়। এই যে বরফ, তাহা মাটিতে জমা হইয়া থাকে, না গুঁড়া গুঁড়া শূন্যে কোয়াসা বা মেঘের মতো ভাসিয়া বেড়ায়, তাহা ঠিক করা যায় নাই; তবে স্থানে স্থানে বোধহয় মাটিতেই জমিয়া আছে।

* *
*

পরের ভাষা শিক্ষার কারণ—

এতদিন পর্য্যন্ত জার্ম্মান দর্শন সাহিত্য বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ বলিয়া সমাদৃত হইত। এখন জার্ম্মানির সব খারাপ। মুনিবে করে হেলা ত চাকরে মারে ঢেলা! আমরাও আমাদের প্রভুদের দেখাদেখি জার্ম্মানিকে বেশী করিয়া তুচ্ছতাচ্ছিল্য করি—যেন আমাদের চেয়ে জার্ম্মানি সকল বিষয়েই হীন। ইংলণ্ডে একটি (Anti-German League) বা জার্ম্মান-বিরোধী সমিতি হইয়াছে; তাহাদের উদ্দেশ্য জার্ম্মান-বিদ্বেষ প্রচার করা, জার্ম্মান যা-কিছু তা ত্যাগ করা। জার্ম্মান ভাষা শিক্ষা করা এতকাল ভব্যতার একটা অঙ্গ ছিল। উক্ত সমিতি এখন সুয়ো রুশের ভাষা শিক্ষা করা উচিত বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। রুশভাষা অত্যন্ত কঠিন; য়ুরোপের অপর জাতিদের কাছে ইংরেজিভাষাও তুল্য কঠিন বলিয়া বিবেচিত হয়। অনেকের বিশ্বাস যে রুশিয়ানরা যে বহু ভাষায় অভিজ্ঞ হয় তাহার কারণ তাহাদের নিজেদের কঠিন ভাষা; তাহার তুলনায় অপর যে-কোনো ভাষা জলের মতো সহজ মনে হয়। ইংরেজ ও আমেরিকানদের ভাষা কঠিন হওয়া সত্ত্বেও তাহারা ভাষা আয়ত্ত করিতে পারে না বলিয়া একটা দুর্নাম আছে। ফরাসী ও ইটালিয়ান ভাষা খুব সহজ, তাহারা পরের ভাষা শিখিতে আরো অক্ষম। উৎকৃষ্ট সাহিত্য থাকিলেই যে পরের ভাষা শিখিবার আগ্রহ হয় তাহা নহে; ইবসেন বিয়র্ণসন ষ্ট্রিণ্ডবার্গ থাকা সত্ত্বেও কয়টা লোকে স্কাণ্ডিনেভিয়ার ভাষা শিখিতেছে? রুশিয়ার ঔপন্যাসিকেরা জগতের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের দলের; কয়টা লোক মূলগ্রন্থ পড়িবার জন্য রুশভাষা আয়ত্ত করিবার দারুণ কষ্ট স্বীকার করিতেছে? পরের ভাষা শিক্ষার প্রধান কারণ সেই জাতির উৎকৃষ্ট সাহিত্য নয়, সেই জাতির বাণিজ্যের বিস্তার ও প্রভাব বলিয়াই মনে হয়।

* *
*

করাত-গুঁড়ার উপর প্রতিষ্ঠিত সহর—

আমেরিকার আয়োওা জেলার মাস্কাটিন নামক সহর একপর্দ্দা করাতগুঁড়া বিছাইয়া তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; স্থানে স্থানে করাতগুঁড়া ১৫ ফুট্ পর্য্যন্ত গভীর। ইচ্ছা করিয়া করাতগুঁড়া বিছানো হয় নাই; ব্লুমিংটন নামক গ্রামে একটা বড় কাঠচেরা কল ছিল। সেই কলের করাতগুঁড়াগুলা ফেলিয়া দিতে হইবে, কোথায় ফেলা যায়, বরাবর চারাইয়া ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল; ক্রমে গ্রামের বিস্তৃতি হওয়াতে করাতগুঁড়ার ভিতের উপর সহর বসিয়া গেল; নাম হইল মাস্কাটিন। এই করাতগুঁড়ার বিস্তৃত ক্ষেত্র ঢাকিয়া গাছপালা জন্মাইবার জন্য একটা পাহাড় কাটিয়া মাটি আনা হইয়াছে; স্থানে স্থানে করাতগুঁড় অনাবৃতই আছে। যেসব রাস্তায় খুব গাড়ীর ভিড় সেসব রাস্তা পাঁচ ইঞ্চি পুরু কংক্রীট করা। সহরের জলনিকাশ খুব সহজে করাতগুঁড়ার ভিতর দিয়া হইয়া যায় বলিয়া সহর স্যাঁতা হয় না।

স্থিরপ্রসন্ন

(পাউ তা-শানের চৈনিক কবিতা হইতে)

মনে হয় বসন্তের কত দেরি আছে—
মল্লিকার দল খুলিবার,
প্রকাণ্ড গাছের কাণ্ড আজ ঢাকিয়াছে
থরে থরে ধবল তুষার।
আড়ষ্ট শীতের পাখী দেবদারু-শাখে।
বসি বসি কি জানি কি ভাবে!
বসন্ত থাকিতে মোর প্রাণ-মউচাকে
বারমাস (ই) মধুমাস যাবে।

মনে হয় কত দূরে—কত দূরে তুমি,
দৃষ্টি মোর পশে না সেথায়,
জ্বলে যেথা বাতি তব, ঝিলিমিলি খোলা,
কত চাঁদ হাসিয়া লুটায়!
শুধু-চোখে মনে হয় যেন কতদূরে
তোমার ও বরাননখানি,
কিন্তু তুমি বাস কর প্রাণ-অন্তঃপুরে
নিশিদিন, জানি ওগো জানি।

৺ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

"আরে মোরা সারেঙ্গিয়া, মোরা দিল-বিচ সব সুর বাজৈ "—মীরা বাঈ

চিত্রকর শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদারের সৌজন্যে মুদ্রিত।

U. RAY & SONS.

তাজ

কবর যে খুসী বলে বলুক তোমায়,
আমি জানি তুমি মন্দির !
চির-নিরমল তব মূরতির ভায়
মৃত্যু নোয়ায় নিজ শির !
প্রেমের দেউল তুমি মরণ-বেলায়,
শিরোমণি তুমি ধরণীর।

তীর্থ তুমি গো তাজ নিখিল প্রেমীর,
মরমীর হিয়ার আরাম,
অশ্রু-সায়রে তুমি অমল-শরীর
কমল-কোরক অভিরাম !
তনু-সম্পুট তুমি চির-ঘরণীর
মৃত্যু-বিজয় তব নাম !

ঘুমায় তোমাতে প্রেমপূর্ণিমা-চাঁদ,—
এমন উজল তুমি তাই,
চাঁদের অমিয়া পেয়ে এই আহ্লাদ
কোনো খানে কিছু ম্লানি নাই ;
ওগো ধবলিয়া মেঘ ! আলোর প্রসাদ
ঝরে ঘিরি' তোমারে সদাই !

যমুনা প্রেমের ধারা জানি ছুনিয়ায়,—
তীর তার ঘিরি চিরদিন
পিরীতির স্মৃতি যত জেগে আছে, হায়,
অতীত প্রেমের পদ-চিন্,
ব্রজে কিবা মথুরায় কিবা আগ্রায়
রাজা ও রাখাল প্রেমে লীন।

প্রেম-যমুনার জল প্রেমে সে বিধুর
কাজরী-কাফিতে উন্মাদ—
গোকুলে সে পিয়াইল রসে পরিপুর
পিরীতির মহুয়া অগাধ ;
শাজাহাঁ-তাজের প্রাণে সঁপিল মধুর
দম্পতী-প্রেমের সোয়াদ।

জগতে দ্বিতীয় রুরু রাজা শাজাহান
দেবতার মত প্রেম তার,
দিয়ে দান আপনার অর্দ্ধেক প্রাণ
মরণ সে ঘুচাল প্রিয়ার।
মরণের মাঝে পেল সুধা-সন্ধান
মৃত প্রিয়া স্মরণে সাকার !

কী প্রেম তোমার ছিল—চির-নিরলস,
কী মমতা হে মোগল-রাজ !
পালিলে শোকের রোজা কত না বরষ
ফল ভখি' পরি' দীন সাজ !
কৃচ্ছ্রের শেষে বিধি পূরাল মানস—
উদিল ইদের চাঁদ—তাজ।

ভেবেছিলে শোকাহত ! হারায়ে প্রিয়ায়
ভেবেছিলে সব হ'ল ধূল্ ;
হে প্রেমী ! বেঁধেছে বিধি একটি তোড়ায়
চামেলি ও আফিমের ফুল ;
ঝরেছে আফিম-ফুল মরণের ঘায়,
বাঁচে তবু চামেলি অতুল !

টুটেছে রূপের বাসা, জেগে আছে প্রেম,
বেঁচে আছে চামেলি অমল ;
মরণে পুড়েছে খাদ, আছে শুধু হেম
যাত্রীর চির-সম্বল,
কামনা-কাকুতি-হীন আছে প্রেম, ক্ষেম,
অমলিন আছে আঁখিজল।

রচিয়াছ রাজা-কবি ! কাহিনী প্রিয়ার,
আঁখিজল-জমানো বরফ-
সমতুল মর্ম্মর—কাগজ তুহার,
ছুনিয়ার মাণিক হরফ ;
বিরহী গেঁথেছ একি মিলনের হার !
কায়া ধরি' জাগে তব তপ !

ভালবাসা ভেঙে যাওয়া সে যে হাহাকার,—
তার চেয়ে ব্যথা নাই, হায় ;
প্রেম টুটিবার আগে প্রেমের আধার
টুটে যাওয়া ভাল বসুধায় ;

নিরাধার প্রেমধারা ভরি সংসার
উছলি পরশে অমরায়।

সে প্রেম অমর করে ধরার ধূলায়,
সে প্রেমের রূপ অপরূপ,
সে প্রেম দেউল রচি' আকাশ-গুহায়
জ্বালে তায় চির-পূজা-ধূপ ;
সম্রাট ! সেই প্রেম প্রাণে তব ভায়
মরলোকে অমৃত স-রূপ।

সে প্রেমের ভাগ পেয়ে শিলা মর্ম্মর
মর্ম্মের ভাষা কয় আজ,
কামিনী-পাপ্ড়ি হেন হয় প্রস্তর,
হয় শিলা ফুলময় তাজ !
চামেলি-মালতী-যূথীময় সুন্দর
ছত্রে বিরাজে মম্তাজ !

যে ছিল প্রেয়সী, আজি দেবী সে তোমার
তুমি তার গড়েছ দেউল,
অঞ্জলি দেছ রাজা ! মণি-সম্ভার
কাঞ্চন-রতনের ফুল।
ঢেকেছ মোতির জালে দেহ-বেদী তার
অশ্রু-মুকুতা-সমতুল।

সিংহলী নীলা, রাঙা আরবী প্রবাল,
তিব্বতী ফিরোজা পাথর,
বুন্দেলী হীরা-রাশি, আরাকানী লাল,
সুলেমানী মণি থরেথর,
ইরানী গোমেদ, মরকত থাল থাল
পোখ্‌রাজ, বুঁদী, গুল্‌নর,

চার-কো-পাহাড়-ভাঙা মসী-মর্ম্মর,
চীনা তুঁতী, অমল স্ফটিক,
যশল্‌মীরের শোভা মিশ্র-বদর
এনেছ ঢুঁড়িয়া সবদিক,
মধুমৎত্বিষ্ মণি ছুধিয়া পাথর
দেউলে দেওয়ালী মণি-শিখ !

সাত শো রাজার ধন মানস-মাণিক
সঁপেছ তা' সবার উপর,
তাই তো তাজের ভাতি আজো অনিমিখ্
তাইতো সে চিরসুন্দর ;
তাই শিস্ দিয়ে ফেরে নন্দন-পিক
গায় কানে গান মনোহর।

তাই তব প্রেয়সীর শুভ-কামনায়
ওঠে যবে প্রার্থনা-গান,
মর্ম্মর গুম্বজ ভরি' ধ্বনি ধায়,
পরশে সে সপ্ত বিমান,
লুফে লুফে ব্যোমচারী মুখে মুখে তায়
দেবতায় সঁপে সেই তান।

সে ছিল বধূ ও জায়া ; মাতা তনয়ের ;
তবু সে যে উর্ব্বশীপ্রায়
চিরপ্রিয়া, চির-রাণী, নিধি হৃদয়ের,
চির-প্রেম লুটে তার পায় ;
চির-আরাধনা সে যে প্রেম-নিষ্ঠের
চির-চাঁদ স্মৃতি-জ্যোৎস্নায়।

বাদ্‌শাহী উবে গেছে, ডুবেছে বিলাস,
ভালবাসা জাগে শুধু আজ,
জেগে আছে দম্পতী-প্রেম অবিনাশ
জেগে আছে দেহী প্রেম—তাজ ;
জগতের বুক ভরি উজলি' আকাশ
প্রিয়স্মৃতি করিছে বিরাজ।

উজ্জল টুক্‌রা তাজ চন্দ্রলোকের
পড়েছে গো খসে ছুনিয়ায়,
এ যে মহা-মৌক্তিক দিগ্‌বারণের
মহাশোক-অঙ্কুশ-ঘায়
এসেছে বাহিরি' ,—নিধি সৌন্দর্য্যের
প্রেমের কিরীটে শোভা পায়।

মনো-যতনের সনে মণি-রতনের
দিল বিয়া রাজা শাজাহান !

পুণ্য-প্রতিমা পানে চাহিয়া তাজের
কেটে গেল কতদিনমান !
বিরহীর অবসান হ'ল বিরহের
যেই ক্ষণে টুটিল পরাণ।

সাধক পাইল ফিরে সাধনার ধন,
প্রেমিক পাইল প্রেমিকায়,
হৃদয় হৃদয় পেল, মন পেল মন,
কবরে মিলিল কায়ে কায় ;
ঘটাইল বারে বারে নিয়তি মিলন
জীবনে,—মরণে পুনরায়।

* * * *

গোলাপ ফোটে না আর,—গোলাপের বাস
হেথা তবু ঘোরে নিশিদিন,
আকাশের কামধেনু ঢালে স্মিতহাস
শির্ণির ক্ষীরধারা ক্ষীণ ;
মৌন হাওয়ায় পড়ে চাপা নিশ্বাস
যমুনা সে শোনে তটলীন।

মরণের কালি হেথা পায় না আমল,
শ্মশান—ভীষণ তবু নয়,
বিলাস-ভূষণে তাজ নহে টল্‌মল্‌
রাজা হেথা প্রতাপী প্রণয় ;
মৃত্যুর অধিকার করিয়া দখল
জাগে প্রেম, জাগে প্রেমময়।

আজিকে দুয়ারে নাই চাঁদির কবাট—
মোতির কবর-পোষ আর,
তনু-বেদী ঘিরি' নাই কাঞ্চন-ঠাট,
বাগিচায় নাহিক বাহার ;
তবু এ অভ্রভেদী জ্যোৎস্না জমাট
রাজাসন প্রেম-দেবতার।

মখ্‌মল্‌-ঝল্‌মল্‌ পড়ে না কানাৎ
শাজাদীরা আসেনা কেহই,
করে না শ্রাদ্ধদিনে কেহ খয়রাৎ
খিবুনির তরুগুলি বই ;
বাদ্‌শা ঘুমান্‌ হেথা বেগমের সাথ,
অবাক ! চাহিয়া শুধু রই !

ঝরে গেছে মোগলের আফিমের ফুল—
মণিময় ময়ূর-আসন,
কবরে জেগেছে তার চামেলি-মুকুল
মরণের না মানি' শাসন ;
অমল সে ফুলে চেয়ে যত বুল্‌বুল্‌
জুড়িয়াছে পুলক-ভাষণ।

জিত মরণের বুকে গাড়িয়া নিশান
জয়ী প্রেম তোলে হের শির,
ধবল বিপুল বাহু মেলি চারিখান
ঘোষে জয় মৌন গভীর,
চির সুন্দর তাজ প্রেমে নিরমাণ
শিরোমণি মরণ-ফণীর।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

সতু

(প্রবাসীর সপ্তম পুরস্কার প্রাপ্ত গল্প)

"সতু" তার ডাক-নাম। আসল নামটি ছিল, "সতীশ"। গ্রামের সকলেই তাকে ভালবাসিত। কেহ কেহ বলিত, সতু বড় দুষ্ট ; কিন্তু যারা বলিত, তারাও সতুকে ভালবাসিত। তবে ইহাও সত্য বটে, যে, সে নিতান্ত নিরীহ গোবেচারী ছিলনা। সে সারাদিন হাটে মাঠে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইত, মাছ ধরিত, নদীর ঢেউয়ে ঝাঁপাইয়া সাঁতার কাটিত, গাছের ডালে ঝুলিয়া দোল খাইত, আবার জেলে কিম্বা মালীতে তাড়া করিলে, দূর হইতে তাদের লক্ষ্য করিয়া মাটির ঢেলা ছুড়িয়া পলাইত। ছেলেদের একটা দল ছিল ; সতু সেই দলের দলপতির স্থান অধিকার করিয়াছিল। বল ও বুদ্ধির তুলনায় সমবয়স্ক সকল বালককেই তার কাছে মাথাটি নীচু করিতে হইয়াছিল। যখন সদলবলে সতু পথে বাহির হইত, তখন গ্রামের অনেককেই ভয়ে ব্যস্ত হইতে হইত। কেননা, লুকাইয়া

চালের লাউটি ছিঁড়িতে, গৃহস্থের কলাগাছের বুকে ছুরি বসাইতে, নিদ্রিত ব্যক্তির মুখে চুনকালি মাখাইয়া মজা দেখিতে শ্রীমান সতুর ভারি আমোদ! একদিন গ্রামের গদাধর বৈরাগী ঘুম হইতে উঠিবার পর অনুভব করিল, যেন তার মাথাটা বিশেষ হাল্কা হইয়া গিয়াছে। সন্দেহের বশে বাবাজী মাথায় হাত বুলাইয়া সবিস্ময়ে দেখিল, যে, তার একহস্ত পরিমিত বহুদিনের যত্নবর্দ্ধিত তৈলসিক্ত শিখাটি মস্তকে নাই! টিকিটি যে কিরূপে অন্তর্হিত হইল, তাহা সে কিছুতেই অনুমান করিয়া পাইল না! অবশেষে ভৌতিক কাণ্ড বলিয়াই মনে মনে স্থির করিয়া লইল! কিন্তু কিছুদিন পরে তাহার সে সন্দেহ দূর হয়। একদিন সে দেখিতে পায়, সতু একজোড়া বিশাল কৃত্রিম গোঁফ পরিয়া সদলবলে হাসিতে হাসিতে রাস্তা গুলজার করিয়া চলিয়াছে! বাবাজী সেই গোঁফজোড়াটি দেখিয়াই নিঃসন্দেহে চিনিতে পারে, সে তাহারই মাথার কর্ত্তিত টিকি! সেই ইস্তক গদাধর কবাটে খিল না দিয়া ঘরে শুইত না।

তা, ইহাতে তোমরা সতুকে দুষ্টই বল, আর পাজীই বল, তার সুখ্যাতিও করিতে হইবে। শুধু দোষটি ধরিলে চলিবে কেন? তার গুণের দিকে চাহিয়া দেখ, দেখিবে, সে একটি অমল সরল প্রফুল্ল কুসুম! সমীরণে কুসুমের যে চপলতা, তা লোকের প্রীতিপ্রদই হইয়া থাকে। গোলাপের বোঁটায় কাঁটা থাকে, তাতে কি কেহ গোলাপের অনাদর করে? সতু দুষ্ট, তবু তাকে লোকে ভালবাসিত, তার অনেকগুলি কারণ ছিল। প্রথমতঃ, তার মুখখানিতে এমন একটা সরলতাময় সৌন্দর্য্য মাখান ছিল, যাতে লোকের মন সহজেই আকৃষ্ট হইত। তারপর তার গুণ। সেই এগার বৎসরের ছেলের প্রাণে যে-সকল উচ্চবৃত্তি লুকান ছিল, তাহা অনেক সাধুনামধারী ধার্ম্মিকাভিমানী ব্যক্তির হৃদয় খুঁজিলে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ! একদিন রামাবাগ্দীর বড় জ্বর হয়। রামচন্দ্রের এমন কেহই নাই, যে, তাহার রোগের একটু শুশ্রূষা করে। সতু সমস্ত দিনটি বসিয়া, তাহার মাথা টিপিয়া দিয়াছিল। এমন কে করে? এমন কাজ সে অনেক করিত। তবে সংবাদপত্রে তার নামটি বাহির হয় নাই বটে! তার কাছে আপন পর ছিলনা। সে লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া বেড়াইত, ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে কোলে করিয়া আদর করিত, বৌ'ঝিদের সঙ্গে গল্প করিত, গরুবাছুরের গলায় ফুলের মালা পরাইয়া, তাহাদের গলা জড়াইয়া আলাপ করিত! আবার, গাহিত, নাচিত, যাত্রার অভিনয় করিত। মেয়েমহলে সতুর খাতিরটা কিছু বেশী। তার মিষ্ট মিষ্ট কথাগুলি, মিষ্ট মিষ্ট গানগুলি মেয়েরা বড় আগ্রহের সহিত শুনিত। সতু গাহিত বেশ। গানও জানিত অনেক। প্রায় প্রত্যহই, দিবার শেষে,—কনকআভাদীপ্ত-গোধূলিতে,—যখন পশ্চিমদিগন্তে গগনচুম্বিত তরুরাজিশিরে মণিদীপ্তিখচিত কৌষেয় শয্যা পাতিয়া, শ্রান্ত রবি তাহার উপর অলসে ঢলিয়া পড়িত, তখন প্রায়ই দেখা যাইত, গ্রাম্যপথের ধারে গাছের তলায়, সেই চিকিমিকি ক্ষীণ রৌদ্রের উঁকিঝুঁকির মাঝখানে বসিয়া সতু গাহিতেছে। সে সময় তার গান বড় মধুর শুনাইত। সে গানের যে একটা কোমল প্রতিধ্বনি উঠিত, তাহা সেই তরু-ছায়া-স্নিগ্ধ বিহগকলরবময়ী পল্লীর ধূসররঞ্জিত বক্ষে স্বপ্নের শোভা জাগাইয়া দিত! তার কণ্ঠস্বর বড় মিষ্ট ছিল!

* * * *

সতুর পিতা যোগীনবাবু গ্রামের মধ্যে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। তিনি কলিকাতায় চাকরী করিতেন। প্রত্যেক শনিবারে দেশে আসিতেন। যোগীনবাবুর দুই বিবাহ। প্রথমা স্ত্রীই সতুর গর্ভধারিণী। সতু জননীর একমাত্র সন্তান। তার যখন ছয় বৎসরের বয়স সেই সময় তার মাতার মৃত্যু হয়। মাতার অভাবে সতুকে বিশেষ কিছু কষ্ট পাইতে হয় নাই; কেননা, পিতা ও গ্রামের আবাল-বৃদ্ধবনিতার অত্যধিক স্নেহ ও ভালবাসায় তার জননীর স্মৃতিটুকু ঢাকা পড়িয়াছিল। প্রথমা স্ত্রী বর্ত্তমানেই যোগীনবাবু দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন্। দ্বিতীয়া-পত্নীর একপুত্র ও এককন্যা। সতুর চেয়ে তার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা "কেবলরাম" প্রায় দুই বৎসরের ছোট। কেবলরামের সঙ্গে সতুর বড় একটা বনিবনাও হইতনা। কেবলরাম একটু রুক্ষ মেজাজের ছোকরা,—জননীর আদুরে-গোপাল!

সতুকে সকলেই ভালবাসিত, কিন্তু একজন তাকে দুটি চক্ষে দেখিতে পারিত না। সে তার বিমাতা—

মানদাসুন্দরী। সতুর উপর মানদাসুন্দরীর বড় আক্রোশ। তার কারণ, অন্যান্য সন্তান অপেক্ষা সতু পিতার একটু বেশী আদরের। সেই হিংসাটাই মানদার প্রবল। সতু প্রায়ই অকারণে তার বিমাতার নিকট তিরস্কৃত হইত। কিন্তু, সেগুলি সে বড় একটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিত না। বিমাতা যখনই তাকে গালি দিতেন, তখনই সে ফুল্ল হরিণ-শিশুটির মত নাচিতে নাচিতে বাটীর বাহির হইয়া যাইত। আবার খাইবার শুইবার সময় 'মা' 'মা' বলিয়া ছুটিয়া আসিত। মানদাসুন্দরী সতুকে দিবারাত্র তিরস্কার করিতেন বটে, কিন্তু স্বামীর ভয়ে কোনদিন তার গায়ে হাত তুলিতে সাহস করেন নাই। মনের রাগ মনে চাপিয়া রাখিতেন। চাপা রাগ বড় ভয়ানক! একদিন সেই চাপা আগুন জ্বলিয়া উঠিল! একদিন হইল কি,—কেবলরাম পাড়ার একটি মেয়ের হাতের চুড়ি ভাঙ্গিয়া দিল। বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে বালকদের মোড়ল মহাশয় সতুর কাছে নালিশ রুজু করিল। সতু তখনই কেবলরামকে গ্রেপ্তার করিয়া বালিকার সম্মুখে তার কান দুটি বেশ করিয়া নাড়িয়া দিল। শ্রীমান কেবলরামও কম যান না; সে সতুর হাত কামড়াইয়া ধরিল। তাহাতে সতু রাগিয়া কেবলরামের পৃষ্ঠে খুব দুই চারি ঘা কীল ও চাপড় বসাইয়া দিল। সেগুলি হজম করিতে কেবলরামের ক্ষমতায় কুলাইল না, কাজেই রণে পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে মাতার নিকট ছুটিল। মানদাসুন্দরী পুত্রের মুখে সবিশেষ শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। সেদিন আর তিনি রাগ চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। তখনই সতুকে ধরিয়া আনিবার জন্য বাটীর ভৃত্যের প্রতি আদেশ জারী হইল। ভৃত্যটি খুঁজিয়া পাতিয়া সতুকে ধরিয়া আনিল। রোষদীপ্তা বিমাতা বাঘিনীর মত সতুর ঘাড় ধরিয়া বলিলেন,—"হাঁরে মুখপোড়া লক্ষ্মীছাড়া, হাড়-জ্বালানে! কেবলাকে মেরেছিস কেন?"

সতু বলিল,—"কেবলা চারুর চুড়ি ভেঙ্গে দিয়েছে, তাই মেরেছি।"

মানদা। তুই মারবার কে, পোড়ারমুখো ডাকাত?

সতু। বাঃ! কেবলা একজনের জিনিষ ভেঙ্গে দিলে তার বেলায় বুঝি কোন দোষ হলো না!

মানদা। যার ভেঙ্গেছে, সে বুঝবে, তুই মারলি কেন?

সতু। তা, কেবলাও তো আমার হাত কামড়ে দিয়েছে!

মানদাসুন্দরী মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন—"বেশ করেছে।"

সতুরও কেমন একটু রোক হইল, বলিল,—"আমিও বেশ করেছি!"

মানদা রাগে অগ্নিমূর্ত্তি হইলেন, বলিলেন,—"কি! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! আমার মুখের ওপর চোপা!" এই বলিয়া সতুর গালে সজোরে এক চড় বসাইয়া দিলেন। নিকটে কেবলরাম দাঁড়াইয়া ছিল, সে হাততালি দিয়া হাঃ হাঃ শব্দে হাসিয়া উঠিল। বিমাতার সেই অপ্রত্যাশিত কঠিন ব্যবহারে সতু কিছু বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল। বিমাতা যে তাকে প্রহার করিবে, ভ্রমেও সে এ আশা করে নাই। তার কচিমুখখানি লাল হইয়া উঠিল! গালে পাঁচটি অঙ্গুলির দাগ বসিয়া গেল। সেই প্রথম তার সদানন্দদীপ্ত হাসিভরা মুখখানিতে বিষাদ-আকুলতা ফুটিয়া উঠিল! তার প্রাণে ব্যথা বাজিলেও সে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিল না। শুধু ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। একটা চড়ে মানদাসুন্দরীর তৃপ্তি হইল না, পুনরায় সতুর কান ধরিয়া বলিয়া দিলেন,—"এবার যদি আমার ছেলেদের গায়ে কখন হাত তুল্‌বি তো গলা টিপে মেরে ফেলব! মা মরে গিয়ে যেন ধরাকে সরা দেখছেন!"

সতুর বোধশক্তি ক্ষুদ্র হইলেও, কথাগুলি তার মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধিল! সেই দিন তার একটা বিশেষ জ্ঞান জন্মিল, যে, সে বিমাতার কেহ নয়! বহুদিনের বিস্মৃত স্নেহভরা একটি হাসি-হাসি মুখ,—যেন জ্যোৎস্নায় আঁকা একখানি স্বর্গের ছবি,—বিদ্যুৎ-স্ফুরণের মত সহসা তার প্রাণে জাগিয়া উঠিল! সে যেন কতদিনের স্বপ্ন,—তারই স্মৃতি! সে যেন কত আশা, কত তৃপ্তি, কত উল্লাস! সে সৌন্দর্য্যে মাতৃহীন বালকের ক্ষুদ্র হৃদয়খানি ভরিয়া গেল! তার প্রাণের ভিতর যে একটা শিহরণ উঠিল, তা তার বিমাতা বোধ হয় দেখিলেন না। সতু আড়ালে গিয়া একটু কাঁদিল।

সে দিন শনিবার। সন্ধ্যার পূর্ব্বে যোগীনবাবু কলিকাতা

হইতে বাটীতে পৌছিলেন। তখনও মানদাসুন্দরীর ক্রোধের কিছুমাত্র উপশম হয় নাই। স্বামীর নিকট সতুর বিরুদ্ধে একখানিকে পাঁচখানি করিয়া বেশ লাগাইলেন। যোগীনবাবু তাতিয়া পুড়িয়া আসিয়াছিলেন, পত্নীর কথাগুলি সেসময় তাঁর বড় ভাল লাগিল না। "বলি হাঁগা, সতুর বিপক্ষে কেবল তুমিই ত বল শুনি, কই, আর ত কেউ কোন কথাই বলে না?"

এই কথা শুনিয়া আদরিণী দ্বিতীয়া পত্নী অভিমানে গর্জ্জিয়া উঠিলেন! হাত নাড়িয়া, মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন,—"তবে কি আমি মিথ্যে বল্‌ছি? মিথ্যে বলি তো দুটি চক্ষের মাথা খাই। যেন তে-রাত্তির না পোহায়।"

যোগীনবাবু। সত্যমিথ্যা তুমিই জান। আমি তো দেখ্‌তে আসি না। তবে একটি কথা বলি, সতু ছেলে-মানুষ, তার কোন কথা কি গায়ে মাখ্‌তে আছে? তার মা নেই, তুমিই এখন তার মা। কেবলা যেমন তোমার, তেমনি সতুও!

মানদা। (নাসা কুঞ্চিত করিয়া) পোড়াকপাল অমন ছেলের!

কথাটা শুনিয়া যোগীনবাবুর একটু রাগ হইল। বলিলেন,—"তবে কি বল্‌তে চাও সতুকে মেরে ফেল্‌ব?"

মানদা। ওমা! আমি কি তা বল্‌ছি? আমার কথায় ছেলেকে শাসন কর্ত্তে যাবে কেন? বলে, "গাঁয়ে মানেনা আপ্‌নি মোড়ল!" আমার তাই হয়েছে! আমি বাড়ির দাসী বাঁদী বই তো নয়! তোমার ছেলেকে শাসন কর, না কর, আমার কি? তবে আমি ভাল বই মন্দ বলিনি; ছেলের লেখা নেই, পড়া নেই, দিন রাত্তির টৌ-টো করে ঘুরে বেড়ায়, দেখ্‌তে পারিনি, তাই বলি। তা, আমার বলাই ঝক্‌মারি! আর যদি কখনও বলি, তো আমার মুখে নুড়ো জ্বেলে দিও!"

যোগীনবাবু মনে মনে ভারি চটিলেন। তিনি তখনই সতুকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। সতু তখন মাঠে, গাছের তলায় কতগুলি ছেলেমেয়ের মাঝখানে বসিয়া গাহিতে-ছিল,—

"ওলো ও নাগরি রাই কিশোরি,
পায়ে ধরি ত্যজ মান।"

বিমাতার প্রহারের কথা সতুর মনেই ছিলনা। সরল বালক অশ্রুজল মুছিয়া হাসিতে হাসিতে আবার খেলাধূলায় মাতিয়াছিল! যোগীনবাবুর আদেশমত ভৃত্য তাহাকে ডাকিয়া আনিল। পিতাকে দেখিয়া সতু আনন্দে ছুটিয়া তার পিতার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। হাসিতে হাসিতে দুই হাতে পিতার কোমর জড়াইয়া ধরিল। আবদার করিয়া বলিল,—"হ্যাঁ বাবা, আজ তুমি এত দেরী করে এলে কেন?"

যোগীনবাবুর মেজাজ তখন ভাল নয়; রুক্ষস্বরে বলিলেন—"সে কথা পরে হবে, এখন আমার কথার উত্তর দে। তুই কেব্‌লাকে মেরেছিস্, তোর মাকে গাল দিয়েছিস্, এসব কি? শূয়ার! তুমি দিন দিন ভারি পাজী হচ্ছ!"

পিতার সেই আকস্মিক কঠোরতা দেখিয়া, সতু একটু দমিয়া গেল। পিতার মুখে তেমন কর্কশ বাক্য সে কখনও শুনে নাই। তার মুখখানি সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল। পিতার কোমর ছাড়িয়া দিয়া সভয়ে সে দুই পা পশ্চাতে হটিয়া দাঁড়াইল। যোগীনবাবু চোখ পাকাইয়া বলিলেন,—"চুপ করে রইলি যে, তোর মাকে গাল দিয়েছিস্ কেন? বল্।"

সতু শুষ্কমুখে বলিল—"মাকে ত আমি গাল দিইনি বাবা!"

"দিস্‌নি, দিস্‌নি! ওমা! কি মিথ্যেবাদী ছেলে গো! একরত্তি ছেলের এত মিথ্যে!"—এই বলিয়া মানদাসুন্দরী সাশ্চর্য্যে গণ্ডে অঙ্গুলি স্থাপন করিলেন। যোগীনবাবুর আর সহ্য হইল না। পত্নীর উপর রাগ করিয়া সতুর পৃষ্ঠে দুই-ঘা বেত বসাইয়া দিলেন। বেতগাছটা পিঠে সজোরে পড়িলেও সতু চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল না। অস্ফুটস্বরে কেবলমাত্র 'উঃ!' করিয়া উঠিল। কিন্তু চোখ দুটি তার জলে ভরিয়া গেল। সে নীরবে কাঁদিল বটে, কিন্তু তার ব্যথিত-ক্ষুদ্র-মর্ম্মের ভিতর ঘূর্ণবায়ুর মত যে একটা দারুণ দীর্ঘশ্বাস উঠিল, তাহা কেহ দেখিল কি? কে দেখিবে? মাতৃহীন শিশুর সজল চক্ষে যে কতখানি বিষাদ, কতখানি করুণ আবেদন, কতখানি সহানুভূতির আকাঙ্ক্ষা লোকের মুখ চাহিয়া থাকে, জগতের লোকে কে তার সন্ধান লয়?

তার পরদিন রবিবার। প্রত্যুষে উঠিয়া সতু কাহাকেও কিছু না বলিয়া চুপি চুপি বাটীর বাহির হইল। কেহ দেখিল না। সে কোনদিন অত ভোরে উঠে না। তার মুখখানি বড় বিষণ্ণ। তখন সবে পূর্ব্বাকাশপ্রান্তে প্রভাত-সূর্য্যের রক্তরেণুলেপিত মধুর হাসিটি মাত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। সূর্য্য উঠে নাই। দিক্‌দিগন্তের কোলে তখনও উষার সে রজতজ্যোতির সম্পূর্ণ প্রসার হয় নাই। তখনও পল্লীর ঘুমের ঘোর ভাঙ্গে নাই। আধঘুম—আধজাগরণ। তখন পাখী জাগিয়াছে, কৃষক জাগিয়াছে, আর দুই এক বাটীর বৌঝি জাগিয়াছে। তখনও ভূতনাথ মুদীর দোকানের ঝাঁপ বন্ধ।

সতু মাথাটি নীচু করিয়া চলিয়াছে। পথে এক কৃষকের সহিত সাক্ষাৎ। কৃষক ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"কম্‌নে গো গায়েন মোশায়! আজ্‌গা যে ভারি গীত গাইবার লাগ্‌ছোনি?"

সতু তাহার কথায় কোন উত্তর না দিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। সতুর এ ভাব দেখিয়া কৃষক একটু বিস্মিত হইল। কিছুদূর গিয়া, নদী তীর। সেখানে আর-একজনের সম্মুখে পড়িল। সে, হরিধন মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা নবদুর্গা। নবদুর্গা প্রাতঃস্নান করিয়া বাটী ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছিল। সতু দূর হইতে তাহাকে দেখিতে পাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। পাছে নবদুর্গা তার বিষণ্ণ বদন দেখিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করে, এই আশঙ্কায় সে শুষ্ক মুখখানিকে একটু সরস করিবার চেষ্টা করিল। অনিচ্ছা-সত্ত্বেও একটি গান ধরিল। গাহিল,—

আমি সই, আর রব না বৃন্দাবনে।
যেথা আমার গেছে কানু, যাব তারি অন্বেষণে॥

সেই শান্তপ্রভাতপ্রারম্ভে নীরব পল্লীর বুকে যে করুণস্বর কাঁপিয়া উঠিল, যদি কেহ তাহা একটু মনোযোগের সহিত শুনিত, তাহা হইলে, অনায়াসেই সে বুঝিতে পারিত যে সে গানের ভিতর তিলমাত্র প্রফুল্লতা নাই! শুধু অভিমান, বিচ্ছেদ ও নিরাশামথিত মরমের উচ্ছ্বসিত ব্যাকুলতা! সতুকে দেখিয়া নবদুর্গা বলিল,—"সতু, আজ যে এত সকালে উঠেছিস্?"

সতু গান বন্ধ করিয়া বলিল,—"ফুল তুল্‌তে যাচ্ছি।"

সতু হাজার লুকাইবার চেষ্টা করিলেও, নবদুর্গা তার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাতের চিহ্ন দেখিতে পাইল। চমকিত হইয়া বলিল,—"হাঁরে, তোর পিঠে ও কিসের দাগ?"

সতুর মুখ একটু ম্লান হইল। মাথাটি নীচু করিয়া বলিল, - "গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিলেম, তারই দাগ।"

নবদুর্গার বিশ্বাস হইল না। বলিল,—"কই, কাছে আয় দেখি!"

সতু ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"পরে দেখো, এখন আমি ঘুরে আসি।" এই বলিয়া আবার গান ধরিল,—

"আমি সই, আর রব না বৃন্দাবনে!"

আর সে সেখানে দাঁড়াইল না। গাহিতে গাহিতে ছুটিয়া পলাইল। নবদুর্গার প্রাণ একটু চঞ্চল হইল। সতুকে যে নিশ্চয়ই কেহ প্রহার করিয়াছে, সে বিষয়ে তার কোন সন্দেহ রহিল না। সেই মাতৃহীন বালককে নবদুর্গা একটু বেশী ভালবাসিত। যতক্ষণ সতুকে দেখা গেল, সে অনিমিষ-নয়নে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

সেদিন সতু আর গ্রামে ফিরিল না। গ্রামময় হুলুস্থূল পড়িয়া গেল! অনেক সন্ধান হইল। নবদুর্গার কথানুযায়ী নদীর তীর তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা হইল, কিন্তু কোথাও সতুকে পাওয়া গেল না। সন্ধ্যা হইয়া গেল, তখনও তার দেখা নাই। যোগীনবাবু বড় অস্থির হইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যার পর এক রাখাল আসিয়া সংবাদ দিল, যে, অপরাহ্ণে সে সতুর মত একটি বালককে নদীর ধারে একাকী বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছে। সে অনেক দূর। দুইটা গ্রামের শেষ। এই সংবাদ পাইবা মাত্র যোগীনবাবু তাঁর ভৃত্যকে সেই রাখালের সঙ্গে পুত্রের অন্বেষণে পাঠাইলেন; এবং বলিয়া দিলেন, যে, সতুকে আনিয়া দিলে, প্রত্যেককে দশ টাকা করিয়া পুরস্কার দিবেন।

* * * *

নবদুর্গার নিকট বিদায় লইয়া সতু নদীর ধার ধরিয়া অনেক দূর গেল। কত ঘর, কত গাছ, কত ধানের ক্ষেত, কত মরাই, কত নালা পশ্চাতে পড়িয়া রহিল,—সতু চলিল। কোথায় যাইতেছে, সে লক্ষ্য নাই। পা চলে না, তবু চলিতেছে। অনেক হাঁটিল। দুইটা গ্রামের সীমা পার হইয়া বালক একটু ক্লান্ত হইয়া পড়িল। বেচারা হাঁফাইতে

হাঁফাইতে এক গাছের তলায় বসিয়া পড়িল। তখন মধ্যাহ্ন। রৌদ্রের তেজ বড় প্রখর। সমীরণ যেন জ্বরাক্রান্ত রোগীর উত্তপ্ত নিশ্বাস। নদীর তরঙ্গে আগুনের ছড়াছড়ি। সেই রৌদ্রতপ্ত নির্জ্জন নদীতীর—শব্দহীন।—কেবল তরঙ্গকল্লোল, মাঝে মাঝে দুই একটা পাখীর অলস চীৎকার আর বায়ুপ্রবাহে শুষ্কপত্রের মর্ম্মর। একলাটি বসিয়া সতুর মন কেমন করিতে লাগিল। কে জানে, কিসের স্মরণে তার আয়ত চোখটি জলে ভরিয়া গেল। বসিয়া বসিয়া সে অনেকক্ষণ কাঁদিল! জ্ঞানহীন অবোধ শিশু, তার প্রাণেও আগুনের জ্বালা! বুঝি না, বিধাতার এ কেমন আইন! সতু চোখ মুছিয়া একবার ভাবিল,—বাড়ি ফিরিয়া যাই। আবার ভাবিল,—না, বাবা এসে আদর করে ডেকে নিয়ে যাবে, তবে যাব।—অভিমানী বালক উঠি উঠি করিয়াও উঠিল না। এইরূপে মধ্যাহ্ন কাটিল।

বিকাল বেলায় বেশ ফুরফুরে হাওয়া,—সতুর একটু তন্দ্রা আসিল। ঢুলিতে ঢুলিতে সে সেই গাছের তলাতেই শুইয়া পড়িল। ক্লান্ত শরীর, তার উপর সমস্ত দিন পেটে অন্ন পড়ে নাই, সহজেই গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। খুব ঘুমাইল।—যখন ঘুম ভাঙ্গিল, সভয়ে সে চাহিয়া দেখে,—চারিদিকে ঘোর অন্ধকার!—আকাশে তারা উঠিয়াছে আর ম্লান জ্যোৎস্না। দূরে গাছের সারি, সেখানে আরও অন্ধকার। গাছগুলা,—মাথায় জ্যোৎস্নার পাগড়ী, গায়ে আঁধারের আল্‌খাল্লা—যেন দৈত্যের দল! বাতাসের সাঁই সাঁই শব্দ, ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ঝিঁঝিঁ রব আর জোনাকীর চিকিমিকি।—দেখিয়া শুনিয়া সতুর মুখ শুকাইল। এমনটা যে হইবে, তা সে আগে ভাবে নাই। সে আশা করিয়াছিল, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তার পিতা আসিয়া তাকে বুকে করিয়া বাড়ি লইয়া যাইবে। কিন্তু হইল বিপরীত। অভিমানে দুঃখে সতুর চোখে জল আসিল। সে যে কোন্ দিক দিয়া আসিয়াছে, এবং কিরূপে যে বাড়ি ফিরিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না। ভয়ে ভয়ে সে উঠিয়া বসিল। সেই সময় তার বোধ হইল, কে যেন তার মাথায় হাত দিয়াছে! সতু চমকিয়া উঠিল! পশ্চাৎদিকে ফিরিয়া যাহা দেখিল,—তাহাতে তার শরীরের রক্ত জমাট বাঁধিবার উপক্রম হইল! দেখিল পশ্চাতে দাঁড়াইয়া দুইটা অদ্ভুত মূর্ত্তি! মূর্ত্তি দুইটার আপাদমস্তক শ্বেত-আবরণ! দুইটাই নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ! গাছের তলায় অন্ধকার, অস্পষ্টই দেখা যাইতেছিল। সতুর বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া উঠিল! সে অনেক ভূত ও শাঁকচুন্নীর গল্প শুনিয়াছে, সেইগুলি তার মনে পড়িল। ভাবিল, এ নিশ্চয় ভূত! আজ নিশ্চয় ঘাড় মটকাইবে! ভাবিতে তার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু চিরকালই তার সাহসটা একটু বেশী। সাহসে বুক বাঁধিয়া শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেগা?"

মূর্ত্তি দুইটার মুখ হইতে একটা বিকট হুঙ্কার উঠিল,—"হুঁ-হুঁ—হুঁম্!!" বালকের সাহস সেই মুহূর্ত্তেই সব ফাঁসিয়া গেল। আতঙ্কে জড়সড় হইয়া সে ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। চীৎকার করিবারও ক্ষমতা রহিল না। সেই সময় একটা মূর্ত্তি তার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল! সতু ভয়ে চক্ষু মুদিল। মুহূর্ত্তমধ্যে জ্ঞানশূন্য অসহায় শিশু মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। মূর্ত্তিটা তাড়াতাড়ি তাকে কাঁধের উপর ফেলিল।

* * * *

সতুকে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু আর এক বিপদ,—তার ভয়ানক জ্বর! দুইদিন সে একেবারে বেহুঁশ। গ্রামের ডাক্তার ত হার মানিয়াছেন, যোগীনবাবু কলিকাতা হইতে বড় ডাক্তার আনাইয়াছেন। তিনিও সতুর জ্বর দেখিয়া ভয় পাইয়াছেন। সতুর জন্য সকলেই উদ্বিগ্ন। যোগীনবাবু দিবারাত্রি কাঁদিতেছেন। নবদুর্গা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সতুর শুশ্রূষা করিতেছে। যোগীনবাবুর ভৃত্যের দোষেই যে এতটা কাণ্ড গড়াইয়াছে, তাহা কেহই জানে না। মূর্খ ভৃত্যটি রাখালের সঙ্গে মিলিয়া যে রাত্রে সতুকে ভয় দেখায়, সতু সেই যে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল, আর তার জ্ঞান হয় নাই। সেই অবধিই তার জ্বর।

আজ বুধবার। সতুর অসুখের বড় বাড়াবাড়ি! ডাক্তার বলিয়াছেন,—রাত্রি দশটার মধ্যে যাহা হউক একটা কিছু হইবে! গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা আজ সতুকে দেখিতে ছুটিয়া আসিয়াছে। সকলের চক্ষে অশ্রু! যোগীনবাবু পুত্রের রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া তার রোগবিবর্ণ মুখখানির প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন।

নবদুর্গা নীরবে সতুর মাথায় হাত বুলাইতেছে। সতু স্পন্দহীন। রাত্রি দশটা বাজিল। যোগীনবাবু কাঁপিতে কাঁপিতে পুত্রের কপালে হাত দিয়া দেখিলেন, বড় ঘাম হইতেছে! নিশ্বাসের টানটাও একটু বেশী বলিয়া বোধ করিলেন। তাঁর একটু ভয় হইল। সতুর বুকে হাত দিয়া কম্পিতকণ্ঠে "সতু! সতু!" বলিয়া দুইবার ডাকিলেন; কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। কাতরস্বরে আবার ডাকিলেন—বলিলেন,—"সতু! বাবা! একবার কথা কও!" —পিতার আহ্বানেই হউক, কিম্বা অন্য কারণেই হউক, সতু তখন ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিল। পিতার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে সে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। যোগীনবাবু তার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া, বলিলেন,—"আমায় চিন্‌তে পার্‌ছ না, বাবা?" সতু ফিক্ করিয়া হাসিল। শীর্ণমুখখানিতে যেন বিদ্যুতের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। যোগীনবাবু আবার বলিলেন, "সতু, আমায় চিন্‌তে পারছ না? বল দেখি আমি কে?" সতু আবার হাসিল। ক্ষীণ স্বরে বলিল,—"তুমি মা!" দুই দিন পরে সেই প্রথম তার কথা ফুটিয়াছিল। সকলেই বুঝিল, সেটা বিকারের ঝোঁকে প্রলাপ। সতু পুনরায় চক্ষু মুদিল। কথাটা শুনিয়া যোগীনবাবুর বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল! সতুর হাতে পায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, সমস্ত বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়াছে। তখনই ডাক্তারকে ডাকা হইল। ডাক্তার সেইখানেই ছিলেন, তাড়াতাড়ি শয্যাপার্শ্বে আসিয়া রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। সহসা ডাক্তারের মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল। সতু তখন বেশ জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলিতেছে! যোগীনবাবু ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি দেখ্‌লেন ডাক্তার মশায়?" ডাক্তার কিছু বলিলেন না। মুখ কুঞ্চিত করিয়া গৃহের বাহির হইয়া গেলেন। যোগীনবাবুর কিছু বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। পুত্রের চিবুক ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"সতু! মাণিক আমার! আজ অভিমান করে কোথায় যাচ্ছিস্ বাবা! তুই যে আমার সর্ব্বস্ব রে!"

সতুর জীবনপ্রদীপ তখন ক্রমেই নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু তার মৃত্যু-ছায়া-বিবর্ণ মুখখানিতে তখনও মৃদুহাসির রেখা! যোগীনবাবু পাগলের মত চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সতুর শীর্ণদেহখানি দুইহাতে জড়াইয়া ধরিয়া ভগ্নকণ্ঠে আবার ডাকিলেন,—"সতু!—আমার সোনার সতুরে!"

সতুর সর্ব্বাঙ্গ তখন স্থির। পিতার কথায় আর সে চাহিল না। কিন্তু তখনও অতি ক্ষীণস্বরে তার মুখ হইতে বাহির হইল,—"যাই।"—সেই তার শেষ কথা।

সেই নৈশনিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বায়ুপ্রবাহে একটা উচ্চ হাহা রোলের করুণ প্রতিধ্বনি উঠিয়া গ্রামময় জানাইয়া দিল, যে—"সতু আর নাই!"

* * * *

নবদুর্গা পর হইলেও, সতুর স্মৃতি সে জীবনে ভুলে নাই! অনেকদিন পর্য্যন্ত,—যখনই সে নদীতে স্নান করিতে যাইত, প্রায়ই তার মনে হইত, একটি ছোট ছেলে যেন করুণ স্বরে গাহিতেছে,—

"আমি সই, আর রবনা বৃন্দাবনে!"

সেটা যে তার মনের ভ্রম, নবদুর্গা পরে বুঝিতে পারিত। অশ্রুজল মুছিতে মুছিতে বিধবা বাটী ফিরিত!

শ্রীকালীকৃষ্ণ বসু।

গৌতম বুদ্ধের ধর্ম্ম

১। পালিপিটকের প্রাচীনতা ও মৌলিকতা।

পৃথিবীর ছয়-আনা লোক এখনও বৌদ্ধ। হাজার বৎসর পূর্ব্বে বোধ হয় পৃথিবীর আট-আনারও বেশী লোক বৌদ্ধ ছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম নানাযুগে নানাদেশে নানাজাতির লোকের মধ্যে নানাপ্রকার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। এই-সকল বিভিন্ন প্রকারের বৌদ্ধমতের মধ্যে কোন্ মতটি যে গৌতমবুদ্ধ স্বয়ং প্রচার করিয়াছিলেন তাহা নিরূপণ করা বৌদ্ধধর্ম্মের-ইতিহাস-আলোচনাকারীর প্রথম কর্ত্তব্য।

গৌতমবুদ্ধের রচিত কোনও গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। মূল বৌদ্ধশাস্ত্রনিচয়ে তাঁহার উক্তিগুলি নিবদ্ধ হইয়াছে। মূল বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যে যেগুলি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সেই-গুলির মধ্যে গৌতমবুদ্ধের স্বয়ং-প্রচারিত মত অবিকৃত-ভাবে রক্ষিত হইয়াছে এইরূপ অনুমান করাই সঙ্গত।

এখনকার পণ্ডিতেরা মনে করেন বৌদ্ধশাস্ত্রনিচয়ের মধ্যে পালিপিটকই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। একথা কিন্তু সকলে স্বীকার করিতে চাহেন না। একথা প্রসিদ্ধ রুষীয় পণ্ডিত মিনেফ (Minayeff) স্বীকার করিতেন না। কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণ এখন স্বীকার করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন না। * এদেশের কোন কোন পণ্ডিতের মনের এ বিষয়ে সংশয় এখনও দূর হয় নাই। পালিপিটকের প্রাচীনতা এবং মৌলিকতা সম্বন্ধে সংশয়ের কারণ এই,—পালিপিটক ভারতবর্ষে লিপিবদ্ধ হয় নাই, সিংহলদ্বীপে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল; এবং তাহাও বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের চারি-পাঁচশত বৎসর পরে। সুতরাং পালিপিটকের প্রাচীনতা সম্বন্ধীয় প্রমাণগুলির এখানে পুনরুল্লেখ প্রয়োজন।

যাঁহারা পালিপিটকের প্রাচীনতা স্বীকার করেন তাঁহারা বলেন ঋষিদিগের বাক্যের অর্থাৎ শ্রুতির ন্যায় বুদ্ধের বাক্যও মুখে মুখে রক্ষিত হইয়াছিল। ভারতীয় শ্রমণগণ বুদ্ধের উক্তিসকল মুখে করিয়া সিংহলে গিয়াছিলেন, এবং লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইলে সেইখানে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। পালিপিটকে যে-সকল কথা বুদ্ধের উক্তি বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে তাহার কিছু অংশ যে খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী হইতে ভারতবর্ষেও বুদ্ধের উক্তিরূপে প্রচলিত ছিল তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আছে।

অশোকের "ভাব্রার" অনুশাসনে কথিত হইয়াছে, "এ কেংচি ভংতে ভগবতা বুধেন ভাসিতে সবে সে সুভাসিতে" "হে ভদন্তগণ, ভগবান বুদ্ধ যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা ভালই বলিয়াছেন।" তারপর, বুদ্ধের যে-সকল উক্তি ভিক্ষু ভিক্ষুণী এবং উপাসক উপাসিকাগণের পুনঃ পুনঃ শ্রবণ এবং মনন করা কর্ত্তব্য, অশোক তাহার একটি তালিকা দিয়াছেন। অশোকের উল্লিখিত এই সাতটি উক্তির মধ্যে ছয়টি উক্তি পালিপণ্ডিতেরা পালি-পিটক হইতে বাহির করিয়াছেন। *

পালিপিটক তিনভাগে বিভক্ত; বিনয়পিটক, সুত্তপিটক এবং অভিধম্মপিটক। সুত্ত-পিটক আবার পাঁচটি নিকায়ে বা সংগ্রহে বিভক্ত—দীঘ, মজ্‌ঝিম, অঙ্গুত্তর, সংযুত্ত, এবং খুদ্দক। এই-সকল নিকায় এবং অন্যান্য পিটকের কোন কোন অংশ সুত্তন্ত নামেও পরিচিত। ভারহুতের স্তূপের চারিদিকের রেলিংএ যে-সকল লিপি আছে লিপিজ্ঞগণের মতে তাহা অশোকের অনতিকাল পরে খোদিত হইয়াছিল। এই সকল লিপির মধ্যে একখানি লিপিতে কথিত হইয়াছে, "এই সুচি (রেলিং) পেটকী আর্য্যজাতের দান।" † আর-একখানি লিপিতে কথিত হইয়াছে, "ইহা পঞ্চনেকায়িক বুদ্ধরক্ষিতের দান।" তৃতীয় একখানি লিপিতে আর্য্য ক্ষুদ্রকে "সুতংতিক" বলা হইয়াছে। § যিনি পিটকে অভিজ্ঞ তিনি পেটকী। "পঞ্চনেকায়িক" অর্থ পঞ্চনিকায়-বিদ্‌ এবং "সুতংতিক" অর্থ সুত্তংতবিদ্‌। সুতরাং এই লিপিত্রয় সপ্রমাণ করিতেছে, ইহাদের রচনাকালে, অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের তৃতীয় শতাব্দের শেষভাগে, সুত্তন্তসমন্বিত এবং পঞ্চনিকায়ে বিভক্ত বৌদ্ধপিটক প্রচলিত ছিল। অবশ্যই এখন যে আকারে নিকায়গুলি আমাদের হস্তগত হইয়াছে ভারহুতের রেলিং নির্ম্মাণের সময় উহাদের আকার ঐ-রূপ ছিল কিনা বলা যায় না। কিন্তু এই-সকল নিকায়ে প্রাচীন নিকায়ের কোন কথাই স্থানলাভ করে নাই এমনও মনে করা উচিত নহে।

পালিপিটকের ভাষাকে পিটকের ব্যাখ্যাতৃগণ মাগধ-প্রাকৃত নামে অভিহিত করিয়াছেন। এখন পণ্ডিতেরা বলেন পালি মাগধ-প্রাকৃত নহে। অধ্যাপক রিস ডেভিড্‌-

* "The discoveries and the researches of recent years have, at least partially, confirmed the views that Messrs. Oldenberg, Rhys Davids, and Widisch, not to mention others, had expressed concerning the antiquity of the Buddhist canons; they have, to a large extent, invalidated several of the objections of Minayeff. I am all the more bound in candour to recognise this, as I reproach myself with having formerly adhered on certain points to the scepticism, or if the expression is preferred, to the agnosticism of the great Russian savant."

Pofessor L de la Vallee Poussin in *Indian Anitquary* Vol. xxx (1908), p. 8.

* 'Indian Antiquary,' Vol. xx, pp. 165—166; Journal of the Royal 'Asiatic Society,' 1894, p. 639; V. A. Smith's 'Asoka' (2nd edition), pp. 153-154.

† Luder's 'List of Brahmi Inscriptions,' no. 857.

‡ Ibid. no 867.

§ Ibid. no. 797.

সের মতে কোশলের প্রচলিত প্রাচীন প্রাকৃত পালি নামে পরিচিত। পালি আদৌ মগধের ভাষাই হউক, আর কোশলের ভাষাই হউক, ভারতবর্ষে অনেকদিন পর্য্যন্ত যে পালিপিটকের পঠনপাঠন প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পালিপিটকের সহিত সংস্কৃত ললিতবিস্তর, দিব্যাবদান, অবদানশতক এবং মহাবস্তু অবদানের তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে এই-সকল সংস্কৃত গ্রন্থের কোন কোন অংশ পালিপিটকের অংশবিশেষের অনুরূপ—স্থলবিশেষে অক্ষরে অক্ষরে মিল আছে। * সারনাথ খননে আবিষ্কৃত একখানি শিলাফলকে খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দের ব্রাহ্মী অক্ষরে "চত্তারি ভিক্কবর ইমানি অরিয় সচ্চানি" ইত্যাদি পালিবচন খোদিত আছে। সারনাথে আবিষ্কৃত আর-একখানি ফলকে খৃষ্টীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দের অক্ষরে "যে ধম্মা হেতু প্রভবা" ইত্যাদি শ্লোকের পালিপাঠ প্রদত্ত হইয়াছে। † নেপালের মহারাজের পুস্তকাগারে অধ্যাপক বেণ্ডল গুপ্তাক্ষরে লিখিত তিনখানি তালপত্রে কয়েকটি পালিসূত্তের পালিভাষায় লিখিত সূচীপত্র পাইয়াছিলেন। ‡ কুমারিলভট্ট তন্ত্রবার্ত্তিকে (মীমাংসাসূত্র ১৩।১০) লিখিয়াছেন—

"বৌদ্ধ এবং জৈনগণের আগমাদি অসাধু শব্দে পরিপূর্ণ। অসাধু শব্দে নিবদ্ধ (ঐসকল আগমের) শাস্ত্রত্ব বা প্রামাণিকতা স্বীকৃত হইতে পারে না। (ঐসকল আগম) মাগধী প্রাকৃত, দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ অসাধু শব্দে নিবদ্ধ। যথা—'মম বিহি ভিক্খবে কম্মবচ্চ ইসী সবে। তথা উক্খিতে লোভম্মি উব্বে অত্থি কারণং পত্তনে নত্থি কারণম্। অনুভবে কারণং ইমে সংকতা ধম্মা সংভবন্তি সকারণা অকারণা বিনসন্তি। অণুপ্যত্তিকারণমিত্যাদি।'

"যে-সকল শব্দ অসত্য বা অসাধু তাহাদের অর্থ সত্য হইবে কেমন করিয়া। যে-সকল শব্দ অপভ্রংশরূপে দৃষ্ট হয় তাহারা অনাদি বা নিত্য হইবে কেমন করিয়া।"§

কুমারিল দৃষ্টান্তস্বরূপ যে চারিটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার প্রথম দুইটিতে "ভিক্খবে", "কম্ম", "অত্থি", "নত্থি", প্রভৃতি পদ আছে, উহা পালি। সুতরাং কুমারিলের সময় অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দ পর্য্যন্তও এদেশে পালিভাষায় রচিত বৌদ্ধ আগম প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল।

পালিপিটকের অংশবিশেষ অশোকের সময় প্রচলিত ছিল এবং খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে উহার কোন কোন অংশের পঠনপাঠন প্রচলিত ছিল, এই দুইটি সিদ্ধান্ত অনেকে মানিয়া লইতে পারেন। কিন্তু গৌতমবুদ্ধ স্বয়ং যাহা বলিয়াছিলেন তাহা যে পালিপিটকে অবিকল রক্ষিত হইয়াছে এবং পালিপিটকে যে গৌতমবুদ্ধের নিজের ধর্ম্মমত অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যাইতে পারে একথা প্রমাণ করা কঠিন। গৌতমবুদ্ধের নিজের মত সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িকগণের মধ্যে প্রচলিত জনশ্রুতি ভিন্ন আর কোন প্রমাণ নাই। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা বিভিন্ন মতকে গৌতমবুদ্ধের নিজের মত বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধ তান্ত্রিকেরা তাঁহাদের তন্ত্রকে বুদ্ধের নিজের উক্তি বলিয়া বিশ্বাস করেন। গৌতমবুদ্ধের মত সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক বিরোধভঞ্জনের একটি উপায় আছে। যে মত সকল সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা একবাক্যে স্বীকার করে—অর্থাৎ যে মত পালি এবং সংস্কৃত, উভয় ভাষায় নিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায় সেই মতকে গৌতমবুদ্ধের নিজের মত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

২। গৌতম বুদ্ধের ধর্ম্মমত।

পালিপিটকে এবং সংস্কৃত পিটকে গৌতম বুদ্ধের মতের সার কথা দুই আকারে পাওয়া যায়—প্রতীত্যসমুৎপাদ দ্বাদশনিদান এবং চারিপ্রকার আর্য্যসত্য। পালিবিনয় বা পিটকের অন্তর্গত মহাবগ্গে (১।১) এবং ললিতবিস্তরে (২২ অধ্যায়) কথিত হইয়াছে গৌতম উরুবিল্বায় বোধি-

* 'Journal of the Asiatic Society of Bengal,' 1913, p. 126.

† 'Epigraphia Indica', Vol. IX. pp. 291-293.

‡ Journal of the Royal Asiatic Society, 1899, p. 422.

§ তন্ত্রবার্ত্তিক (Benares Sanskrit Series), ১৭১ পৃ :—
অসাধু-শব্দ-ভূয়িষ্ঠাঃ শাক্য-জৈনাগমাদয়ঃ। অসন্নিবন্ধনত্বাচ্চ শাস্ত্রত্বং ন প্রতীয়তে।
মাগধ দাক্ষিণাত্য-তদপভ্রংশ প্রায়াসাধুশব্দ-নিবন্ধনা হি তে। মম… বিনসন্তি……ইত্যেবমাদয়ঃ।
ততশ্চাসত্য শব্দেষু কুতস্তেষ্বর্থসত্যতা।
দৃষ্টাপভ্রষ্টরূপেষু কথং বা স্যাদনাদিতা ॥

বৃক্ষের তলে বসিয়া সম্বুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে এইরূপ অনুভব করিয়াছিলেন—

পূর্ব্বজন্ম { "অবিদ্যা হইতে সংস্কার-সকল (কর্ম্ম) উৎপন্ন হয়। সংস্কারসকল হইতে বিজ্ঞান (আত্মবোধ) উৎপন্ন হয়।

বর্ত্তমান জীবন { বিজ্ঞান হইতে নামরূপ (মন ও দেহ) উৎপন্ন হয়। নামরূপ হইতে ষড়ায়তন (পাঁচ ইন্দ্রিয়ের এবং মনের কার্য্যক্ষেত্র) উৎপন্ন হয়। ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ উৎপন্ন হয়। স্পর্শ হইতে বেদনা (বাহ্য পদার্থের উপলব্ধি) উৎপন্ন হয়। বেদনা হইতে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। তৃষ্ণা হইতে উপাদান (আসক্তি) উৎপন্ন হয়। উপাদান হইতে ভব (হওয়া) উৎপন্ন হয়।

ভব (হওয়া) হইতে জাতি (জন্ম) উৎপন্ন হয়।

পরজন্ম { জাতি হইতে জরা, মরণ, শোক, পরিদেব, দুঃখ, বিষাদ, এবং নৈরাশ্য উৎপন্ন হয়। এইরূপে মহান দুঃখস্কন্ধ বা দুঃখসকল উৎপন্ন হয়।" *

এই কার্য্য-কারণ-সূত্রবদ্ধ দ্বাদশটি তথ্য "প্রতীত্য-সমুৎপাদ" বা নিদান (মহানিদান) নামে পরিচিত। চন্দ্রকীর্ত্তি নাগার্জ্জুনের "মূলমধ্যমক কারিকার" "প্রসন্নপদা" নামক বৃত্তির সূচনায় লিখিয়াছেন—

"প্রতীত্য শব্দোঽত্র ল্যবন্তঃ প্রাপ্তাবপেক্ষায়াং বর্ত্ততে। সমুৎপূর্বঃ পদিঃ প্রাদুর্ভাবার্থ ইতি সমুৎপাদ শব্দ, প্রাদুর্ভাবে বর্ত্ততে॥ ততশ্চ হেতুপ্রত্যয়াপেক্ষো ভাবানামুৎপাদঃ প্রতীত্য-সমুৎপাদার্থঃ॥"

"প্রতীত্য" শব্দ এখানে ল্যপ্ প্রত্যয়ান্ত এবং প্রাপ্তি বা অপেক্ষা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সমুৎপূর্ব্বক পদ্ ধাতুর অর্থ প্রাদুর্ভাব বা উৎপত্তি। এখানে "সমুৎপাদ" শব্দ উৎপত্তি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব প্রতীত্য-সমুৎপাদ শব্দের অর্থ কারণাধীনে ভাবনিচয়ের উৎপত্তি (dependent origination)।

দ্বাদশ নিদানের নানাপ্রকার ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে পালিপিটকের ব্যাখ্যাই প্রাচীনতর। বুদ্ধঘোষের মতে দ্বাদশনিদানের প্রথম দুইটি অবিদ্যা ও সংস্কার, পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে।* পূর্ব্বজন্মের অবিদ্যার বা অজ্ঞানের ফলে সংস্কার বা কর্ম্ম সঞ্চিত হয়। সেই কর্ম্মের ফলে বিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে।† মাতৃগর্ভে বিজ্ঞান নাম ও রূপ অর্থাৎ মন ও শরীর উৎপাদন করে। এই বিজ্ঞান উপনিষদুক্ত আত্মার স্থলবর্ত্তী নিত্য বস্তু নহে, অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর বস্তু; সংস্কার হইতে ইহার উৎপত্তি এবং নামরূপের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে ইহার বিলয়। দ্বাদশনিদানে নিবদ্ধ কারণবাদের বিশেষত্ব এই—ইহাতে মূলকারণস্বরূপ কোন পদার্থের (পরমাত্মা, ঈশ্বর) অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই, পরবর্ত্তী ঘটনার কারণ পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা এইমাত্র বলা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা বা অবস্থা হইতে কেন পরবর্ত্তী ঘটনা বা অবস্থা উৎপন্ন হয়, এই "কেনর" উত্তরে বৌদ্ধগণ বলেন "হয় বলিয়াই হয়, এইরূপ হওয়াই বিশ্বের নিয়ম।" প্রতীত্যসমুৎপাদকে দুই হিসাবে দেখা যাইতে পারে। এক হিসাবে এই নীতির দ্বারা জীবনরহস্য এবং জগৎরহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। মনুষ্যজীবন বা জন্মজন্মান্তর দ্বাদশ নিদানে নিয়মিত। বাহ্য জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, তাহা এই নিদানেরই অন্তর্ভূত। বিজ্ঞান হইতে নামরূপের উৎপত্তি; নামরূপ হইতে চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ ও মন এই ষড়্-ইন্দ্রিয়ের আয়তনের বা বিষয়ের উৎপত্তি। জড়জগৎ পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের আয়তন এবং ভাবজগৎ মনের আয়তন; উভয়ই নামরূপ হইতে উৎপন্ন এবং বিজ্ঞানমূলক। আর-এক হিসাবে দ্বাদশ নিদানে জীবনের সকল দুঃখের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। পালিপিটকে এবং সংস্কৃতপিটকে প্রতীত্য-সমুৎপাদ উল্লেখ করিয়াই এইরূপ উপসংহার-বাক্য প্রদত্ত হইয়াছে—"এবমস্য মহতো দুঃখ স্কংধস্য সমুদয়ো ভবতি।" "এইরূপে মহান দুঃখসকল উৎপন্ন হইয়াছে।" গৌতম বোধিদ্রুমের তলায় বসিয়া যেমন দুঃখের কারণ অনুভব

* রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত "ললিতবিস্তার," ৪৪২—৪৪৪ পৃঃ Senart সম্পাদিত "মহাবস্তু অবদানম্," Vol. III. p. 448.

* Rhys Davids 'Dialogues of the Buddha,' part II. London, 1910, p. 26, note 1.

† বিজ্ঞানাদি দশ নিদানের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার জন্য "মহা-নিদান-সুত্তন্ত" দ্রষ্টব্য। Dialogues, II. pp. 42-61.

করিয়াছিলেন তেমন দুঃখ নিরোধের বা নিবারণের কারণও অনুভব করিয়াছিলেন। যথা—

"অবিদ্যার নিরোধ হইতে সংস্কারের নিরোধ হয়।
সংস্কারের নিরোধ হইতে বিজ্ঞানের নিরোধ হয়।
বিজ্ঞানের নিরোধ হইতে নামরূপের নিরোধ হয়।
নামরূপের নিরোধ হইতে ষড়ায়তনের নিরোধ হয়।
ষড়ায়তনের নিরোধ হইতে স্পর্শের নিরোধ হয়।
স্পর্শের নিরোধ হইতে বেদনার নিরোধ হয়।
বেদনার নিরোধ হইতে তৃষ্ণার নিরোধ হয়।
তৃষ্ণার নিরোধ হইতে উপাদানের নিরোধ হয়।
উপাদানের নিরোধ হইতে ভবের নিরোধ হয়।
ভবের নিরোধ হইতে জাতির নিরোধ হয়।
জাতির নিরোধ হইতে জরামরণের নিরোধ হয়।
জরামরণের নিরোধ হইলে শোক, সন্তাপ, দুঃখ, বিষাদ এবং নৈরাশ্যের নিরোধ হয়। এইরূপে কেবল মহান্ দুঃখনিচয়ের নিরোধ হয়।"

প্রতীত্যসমুৎপাদে দুঃখের উৎপত্তি এবং নিরোধ কথিত হইয়াছে। গৌতমবুদ্ধের কথিত চারিপ্রকার আর্য্যসত্যের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সত্যের সহিত প্রতীত্যসমুৎপাদের সম্বন্ধ রহিয়াছে। গৌতমবুদ্ধ ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন-সূত্রে এই আর্য্যসত্য-চতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

উরুবেলায় অশ্বত্থ গাছের তলায় বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া বুদ্ধ বারাণসীতে মৃগদাবে যাইয়া আজ্ঞাত কৌণ্ডিণ্যাদি পঞ্চভদ্রবর্গীয়ের নিকট যে প্রথম উপদেশবাক্য বলেন তাহা ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনসূত্র নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সকল সম্প্রদায়ের বৌদ্ধের মতে ইহাই বুদ্ধের প্রথম বক্তৃতা। পালিভাষায় এই বক্তৃতা বা সূত্র তিনস্থানে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মহাবস্তু অবদানে এবং ললিতবিস্তরে এই সূত্রের সংস্কৃত অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন-সূত্রের সারকথা এই—

"যাঁহারা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন তাঁহারা দুই সীমা আশ্রয় করিয়া চলিতে পারেন। সেই দুই সীমা কি? এক সীমা কাম্যবস্তুর উপভোগ, ইহা নিরর্থক। আর এক সীমা দুঃখস্বীকার; ইহাও নিরর্থক। তথাগত এই দুই সীমান্ত পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণের মধ্যমা প্রতিপদা বা মধ্যপথ আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই মধ্যমা প্রতিপদা কি? এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ সেই মধ্যমা প্রতিপদা। যথা সম্যক্‌দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ কর্ম্ম, সম্যক্ আজীব বা সদুপায় অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করা, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ স্মৃতি এবং সম্যক্ সমাধি।

"চারি প্রকার আর্য্যসত্য। চারি প্রকার আর্য্যসত্য কি? দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখের নিরোধ এবং দুঃখনিরোধ-গামিনী প্রতিপদা বা পন্থা। দুঃখ কি? জন্ম দুঃখকর, জরা দুঃখকর, ব্যাধি দুঃখকর, অপ্রিয় বস্তুর সহিত যোগ দুঃখকর, অভিলষিত বস্তু না পাওয়া দুঃখকর ইত্যাদি। ইহাই দুঃখ-আর্য্যসত্য। যে তৃষ্ণা জন্মান্তর ঘটায়, ভোগ-সুখে রত করে তাহাই দুঃখের উৎপত্তির কারণ; তাহাই দুঃখসমুদয়-আর্য্যসত্য। যে বৈরাগ্য এই তৃষ্ণাকে দমন করে, তাহাই দুঃখের নিরোধ করে, তাহাই দুঃখনিরোধ-আর্য্যসত্য। সম্যক্‌দৃষ্টি প্রভৃতি এই যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ, ইহাই দুঃখনিরোধের পথ, ইহাই দুঃখনিরোধ-গামিনী-প্রতিপদা-আর্য্যসত্য। এই চারিপ্রকার আর্য্যসত্যের কথা কেহ কখনও শোনে নাই। ইহা প্রথমতঃ তথাগতের মনে উদয় হয়। এই চারিপ্রকার আর্য্যসত্যের জ্ঞানের বলে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন।"

দ্বাদশ নিদান এবং আর্য্যসত্য-চতুষ্টয় বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম্মের সার কথা। এই সার কথার আবার যাহা সার তাহা এই প্রসিদ্ধ শ্লোকে নিবদ্ধ হইয়াছে—

"যে ধর্ম্মা হেতুপ্রভবা হেতুস্তেষাং তথাগতো।
হ্যবদত্তেষাং চ যো নিরোধো এবং বাদী মহাশ্রমণঃ।"

"যে-সকল বস্তু (ধর্ম্ম) কারণ হইতে উৎপন্ন (হেতু-প্রভব) তথাগত তাহাদের কারণ এবং যে প্রকারে তাহাদের নিরোধ হয় তাহা বলিয়াছেন। মহাশ্রমণ এই প্রকারই বলিয়াছেন।"

এখন আলোচ্য, এই মতের মূল কোথায়, এই মত কোথা হইতে আসিল?

৩। বুদ্ধের ধর্ম্ম ও উপনিষদ্।

বুদ্ধের এই ধর্ম্মমতের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুই প্রকার মতবাদ চলিয়া আসিতেছে। একমত, ইহা উপনিষদ্ হইতে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে উৎপন্ন—উপনিষদ্ হইতে কিছু কিছু উপাদান আহরণ

করিয়া বুদ্ধ স্বমত গড়িয়াছেন। দ্বিতীয় মত, বুদ্ধের মত উপনিষদ্ হইতে পরোক্ষভাবে এবং সাংখ্যমত হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উৎপন্ন। প্রথমোক্ত মতের উদাহরণ-স্বরূপ প্রথমতঃ জয়সেনের মত উদ্ধৃত করিব। জয়সেন লিখিয়াছেন—

"চারিপ্রকার আর্য্যসত্যে নিবদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্মের মূলকথা এই—আমরা তৃষ্ণার নিরোধ করিয়া দুঃখের নিরোধ করিতে পারি। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য যাহা শিক্ষা দিয়াছেন এই-সকল এবং আরও অনেক বৌদ্ধমতের মধ্যে আমরা তাহা নূতন আকারে দেখিতে পাই। যদিও বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিপরীত ভাব অবলম্বন করিয়া আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করে, তথাপি এই অস্বীকার বহিরঙ্গমাত্র, কারণ বৌদ্ধধর্ম্ম পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল-জনিত জন্মান্তর স্বীকার করে। (জন্মান্তরের জন্য) কর্ম্মের অবশ্য একজন বাহক চাই। উপনিষদ্ এই বাহককে আত্মা বলে এবং বৌদ্ধেরা তাহার অস্তিত্ব অকারণ অস্বীকার করে।"*

দুই বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির এক অধিবেশনে অধ্যাপক ওল্ডেনবার্গ ঠিক এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। যথা—

"আমার মনে হয়, যে পূর্ব্বতন চিন্তার স্তর হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে তাহার পরিচয় প্রধানতঃ উপনিষদে পাওয়া যায়।...নশ্বর জগতে জীবনধারণ করা যে অবশ্য দুঃখময় এই ভাবের অঙ্কুর উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায় এবং বৌদ্ধধর্ম্মে তাহা প্রাধান্য লাভ করে। গৃহত্যাগ করিয়া ভিক্ষুকের ন্যায় বিচরণ করিলে মানুষ যে এই দুঃখের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে এই বিশ্বাসের অঙ্কুরও উপনিষদে প্রথম দেখিতে পাওয়া যায় এবং বৌদ্ধধর্ম্মে তাহা পূর্ণতা লাভ করে।...বৃহদারণ্যকে আমরা যে যাজ্ঞবল্ক্যের পরিচয় পাই বুদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্ম্ম তাহারই পরিণতি।" †

দুঃখবাদ এবং মুক্তির জন্য ভিক্ষাচর্য্যা এই দুই বস্তুই যে উপনিষদমূলক, "বৃহদারণ্যকোপনিষদের" একটি মাত্র অংশ (৩।৫।১) উদ্ধৃত করিলেই তাহা দেখা যাইবে। যথা—

"হে যাজ্ঞবল্ক্য, যাহা সকল জীবের মধ্যে আছে, সেই (আত্মা) কে? যাহা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা, মৃত্যুকে জয় করে (তাহা আত্মা)। এইরূপ আত্মাকে জানিয়া ব্রাহ্মণগণ পুত্রকামনা, বিত্তকামনা, স্বর্গাদি লোক-কামনা পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচর্য্যা গ্রহণ করে।"

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, পুত্রকামনা, বিত্তকামনা, স্বর্গাদিকামনা যে দুঃখকর এখানে এই কথা সূচিত হইয়াছে, এবং দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের জন্য ভিক্ষাচর্য্যা বিহিত হইয়াছে। আত্মা ছাড়িয়া দিলে যাজ্ঞবল্ক্যের এই উক্তিকে গৌতমবুদ্ধের উক্তিমধ্যে গণনা করা যাইতে পারে। অধ্যাপক জয়সেন বুদ্ধের ধর্ম্মের মধ্যে সাংখ্যের প্রভাবও স্বীকার করেন, এবং জেকবি ও গার্ব-প্রমুখ একদল পণ্ডিত বলেন উপনিষদের পরে এবং বুদ্ধের পূর্ব্বে সাংখ্যমতের অভ্যুদয়; সুতরাং বুদ্ধের ধর্ম্ম সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে সাংখ্যমূলক। কিন্তু এই-সকল পণ্ডিতের মত বিচারের পূর্ব্বে উপনিষদের প্রাচীনতা এবং প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যে একটি অভিনব মত প্রকাশিত হইয়াছে তাহার বিচার করা আবশ্যক। মতটি এই, "উপনিষদ্, বিশেষ তাহার অদ্বৈতবাদ, বুদ্ধদেবের সময় হইয়াছিল কি? প্রাচীন উপনিষদ্গুলি, যথা ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, ব্রাহ্মণের অংশ, যজ্ঞেই উহার ব্যবহার হইত।" "কালিদাস ও হর্ষ-রাজার সময়েই উপনিষদ্ একটা দার্শনিক মতের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল, কিন্তু সে ত বুদ্ধের বহুকাল পরে।" * প্রাচীন উপনিষদ্গুলি বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগের উপসংহার আরণ্যকের অন্তর্গত। আরণ্যকভাগ যে গৃহস্থ-যাজ্ঞিকের ব্যবহারের জন্য নহে, আরণ্যব্রতধারীর বা বানপ্রস্থ আশ্রমীর ব্যবহারের জন্য বা অরণ্যে পাঠের জন্য রচিত; "আরণ্যক" সংজ্ঞাই তাহার প্রমাণ। আরণ্যকের বেদান্তসংজ্ঞাও অতিপ্রাচীন। ধর্ম্মসূত্রনিচয়ের মধ্যে গৌতমের ধর্ম্মসূত্র সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া গণ্য। গৌতমের ধর্ম্মসূত্রে (১৭।১২) প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত "উপনিষদো বেদান্তঃ" জপের বিধান আছে। টীকাকার হরদত্ত লিখিয়াছেন, "উপনিষদো রহস্য ব্রাহ্মণান্তা-

* Indian Antiquary, Vol. XXIX, p. 398.

† J. A. S. B., 1913, p. 127.

* নারায়ণ, ১ম খণ্ড, ৩৯৩-৩৯৪ পৃঃ।

ধ্যাত্মিকানি তদ্ব্যতিরিক্তা আরণ্যকভাগা বেদান্তাঃ।" যদি ছান্দোগ্যউপনিষদ্ বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী হয় তবে "তত্ত্বমসি" বাক্যে নিবদ্ধ অদ্বৈতবাদও বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী। উপনিষদ্ বুদ্ধদেবের সময় হইয়াছিল কি? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। কেননা বুদ্ধদেবের সময় নিশ্চিতই হইয়াছিল এমন কিছু আমরা এখনও পাই নাই যাহার সহিত ছান্দোগ্যাদি উপনিষদের তুলনা করিয়া কোন্‌টি আগে কোন্‌টি পরে তাহা নিরূপণ করা যাইতে পারে। পাণিনির ব্যাকরণ অপেক্ষা বৃহদারণ্যকাদি উপনিষদ্ যে প্রাচীন এই-সকল উপনিষদের ভাষাই তাহার প্রমাণ।* উপনিষদের দার্শনিক মতও যে পাণিনির পূর্ব্বেই সূত্রাকারে নিবদ্ধ হইয়াছিল পাণিনির একটি সূত্র তাহা সপ্রমাণ (৪।৩।১১০) করে। এই সূত্রে পারাশর্য্য বা পরাশরতনয়-প্রণীত ভিক্ষুসূত্রের উল্লেখ আছে। ধর্ম্মসূত্রকার গৌতম চারিটি আশ্রমের নাম লিখিয়াছেন—"ব্রহ্মচারী গৃহস্থো ভিক্ষু বৈখানসঃ (১।৩।২)।" বৈখানস অর্থ বানপ্রস্থ। টীকাকার হরদত্ত লিখিয়াছেন, "বৈখানস-কথিত মার্গ যে অনুসরণ করে সে বৈখানস। বৈখানস নামক ঋষি প্রধানতঃ এই আশ্রমের বিধান করিয়াছেন।" হরদত্ত আপস্তম্বের ধর্ম্মসূত্রের টীকায় (২।৯।২১।২১) বৈখানসসূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। বৈখানস-সূত্রে যেমন বৈখানস বা বানপ্রস্থ আশ্রমের ব্যবস্থা ছিল, "ভিক্ষুসূত্রে" তেমনি ভিক্ষু আশ্রমের বিধান ছিল। ভিক্ষুর লক্ষ্য সম্বন্ধে আপস্তম্ব লিখিয়াছেন, আত্মজ্ঞানই ভিক্ষুর লক্ষ্য। আত্মজ্ঞান উপনিষদেরও লক্ষ্য। সুতরাং পাণিনিকথিত পারাশর্য্য "ভিক্ষুসূত্র" উপনিষদমূলক দার্শনিক গ্রন্থ ছিল একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। বর্ত্তমান ব্রহ্মসূত্র বোধ হয় সেই প্রাচীন পারাশর্য্য "ভিক্ষুসূত্রের"ই সংস্করণবিশেষ। আপস্তম্বের ধর্ম্মসূত্রের অধ্যাত্মপটলে (১।৯) যোগের দ্বারা দোষ নষ্ট করিয়া আত্মজ্ঞানের বলে মোক্ষলাভের কথা আছে। আপস্তম্বীয় ধর্ম্মসূত্রের প্রথম পটলের ২২-২৩ খণ্ড সম্বন্ধে বুহ্‌লার লিখিয়া গিয়াছেন—"But Khandas 22, 23 of the first Patala of the Dharma Sutra unmistakably contain the chief tenets of the Vedantists, and recommend the acquisition of the knowledge of the Atman as the best means of purifying the souls of the sinners. Though these two Khandas are chiefly filled with quotations, which, as the commentator states, are taken from an Upanishad, still the manner of their selection, as well as Apastamba's own words in the introductory and concluding Sutras, indicates that he knew not merely the unsystematic speculations contained in the Upanishads and Aranyakas, but a well-defined system of Vedantic philosophy identical with that of Badarayana's Brahma-Sutras (*Intro.* p. xxix)." আপস্তম্ব উত্তর মীমাংসা বা বেদান্তদর্শনের ন্যায় পূর্ব্ব বা কর্ম্মমীমাংসার সহিতও সুপরিচিত ছিলেন। পূর্ব্বমীমাংসার প্রাচীন নাম ছিল ন্যায়। আপস্তম্ব ন্যায়বিদ্ বা মীমাংসকের স্পষ্টোল্লেখ করিয়াছেন (২।৪।৮।১৩) এবং স্থানে স্থানে মীমাংসা-দর্শনের বিচারপ্রণালীর অনুসরণ করিয়াছেন (১।১।১৪। —১০৮; ১।৩।৩—৪)। বুহ্‌লার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, "But it is evident, that if Apastamba did not know the Mimamsā-Sutras of Jaimini, he must have possessed some other very similar work (p. xxix.)." বুহ্‌লার আপস্তম্বের ধর্ম্মসূত্রের ভাষা এবং অন্যান্য কথা বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আপস্তম্বকে খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দের পরে স্থাপন করা যাইতে পারে না এবং আপস্তম্বীয় ধর্ম্মসূত্র খুব সম্ভব উহার ১১০ হইতে ২০০বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ বুহ্‌লারের এই সিদ্ধান্ত একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

দার্শনিক মতের ক্রমপরিণতির হিসাবে দেখিতে গেলেও উপনিষদের কর্ম্মবাদ পূর্ব্ববর্ত্তী এবং বুদ্ধের কর্ম্মবাদ পরবর্ত্তী মনে করিতে হয়। উপনিষদের কর্ম্মবাদে জন্মজন্মান্তরের কর্ম্মফলের বোঝার একজন বাহক আছে—তাহার নাম আত্মা। বুদ্ধের কর্ম্মবাদে জন্মজন্মান্তরে কর্ম্মফলের বোঝা বাহিত হইতেছে—কিন্তু কোন একজন বাহকের দ্বারা নহে, বোঝা আপনি চলিতেছে। শুধু তাই নয়; বৌদ্ধ মতানুসারে পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণও করা যায়, অথচ স্মরণকর্ত্তা আত্মার

* Keith's 'Aitareya Aranyaka,' p. 47.

কোনও যায়গা সেখানে নাই। সুতরাং উপনিষদের কর্ম্ম-বাদ অপেক্ষা বুদ্ধের কর্ম্মবাদ যে অনেকগুণে জটিল তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। একই মতবাদ বা "theory" প্রথমতঃ সহজ আকারে প্রচলিত ছিল পরে জটিল ভাব ধারণ করিয়াছে, না প্রথমে জটিল ছিল পরে ক্রমশঃ সহজ হইয়া আসিয়াছে, এই সমস্যার একই মাত্র সমাধান হইতে পারে; সেই সমাধান এই—মতবাদের সহজ আকারই আদিম আকার, জটিল আকার পরবর্ত্তী। কর্ম্ম-বাদ যে-আকারে উপনিষদে পাওয়া যায় তাহাই উহার আদিম আকার, বুদ্ধের কর্ম্মবাদ উহারই বিকৃতি, অতএব তাহা পরবর্ত্তী।

৪। বুদ্ধের ধর্ম্ম ও সাংখ্যমত।

বুদ্ধের ধর্ম্ম যে সাংখ্যপ্রভাবপুষ্ট তাহার দুই প্রকার প্রমাণ দেওয়া হয়—ঐতিহাসিক প্রমাণ এবং দার্শনিক প্রমাণ। বৌদ্ধশাস্ত্রে পরিরক্ষিত জনশ্রুতি অনুসারে কপিল বুদ্ধের কয়েক পুরুষ পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। এই বিষয়ে মহাবস্তু অবদানে যে আখ্যায়িকা আছে তাহাই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। মহাবস্তু অবদানে কথিত হইয়াছে * শাকেত-নামক মহানগরে সুজাত নামক ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা ছিলেন। সুজাত তাঁহার ওপুরাদি পাঁচ পুত্র এবং পাঁচ কন্যাকে রাজ্য-হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। ওপুর তাহার ভ্রাতা-ভগিনীগণকে লইয়া হিমালয়ের পাদদেশে কপিলঋষির আশ্রমের নিকটে বনখণ্ডে আশ্রয় লইয়াছিলেন; পরে কপিলঋষির নিকট হইতে তাঁহার আশ্রম চাহিয়া লইয়া তথায় কপিলবস্তু নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মহাবস্তু অনুসারে গৌতমবুদ্ধের পিতা শুদ্ধোদন ওপুরের প্রপৌত্রের প্রপৌত্র। সাংখ্যপ্রবর্ত্তক কপিল যে অতি প্রাচীনকালে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন একথা ব্রাহ্মণদিগের শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে। গৌড়পাদ সাংখ্যকারিকার ভাষ্যের উপোদ্‌ঘাতে এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
আসুরিঃ কপিলশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা॥
ইত্যেতে ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ সপ্ত প্রোক্তা মহর্ষয়ঃ॥"

কপিলের সাংখ্যকে বুদ্ধ অপেক্ষা প্রাচীনতর মনে করিতে পারিলে বুদ্ধের মতকে সাংখ্যমতের রূপান্তর মনে করা অবশ্যম্ভাবী। বুদ্ধের ধর্ম্মের গোড়ার কথা যেমন দুঃখ-আর্য্যসত্য, সাংখ্যমতের গোড়ার কথাও "দুঃখত্রয়াভিঘাত"। বুদ্ধের মতে জন্মান্তরে কর্ম্মফলের বাহক যেমন আত্মা নহে, সাংখ্যমতেও জন্মান্তরে কর্ম্মফলের বাহক আত্মা নহে, আত্মা বা পুরুষ নির্লিপ্ত। সাংখ্যমতে লিঙ্গ-শরীরকে কর্ম্মফলের বাহক ধরা হইয়াছে; বুদ্ধ আর একটু অগ্রসর হইয়া কর্ম্মক্ষেত্র হইতে লিঙ্গ-শরীরকেও বিদায় করিয়া দিয়াছেন। উপনিষদের সহিত বুদ্ধের ধর্ম্মমতের যে সম্বন্ধ, সাংখ্যের সহিত বুদ্ধের মতের সম্বন্ধ তার চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু সাংখ্যকে বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী মনে করিবার এক গুরুতর অন্তরায়, আমরা যে-সকল গ্রন্থে এখন সাংখ্যমতের পরিচয় পাই তাহা অনেক পরবর্ত্তীকালের রচনা। যাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন এইসকল গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত আধু-নিক হইলেও এই-সকল গ্রন্থে যে মত নিবদ্ধ হইয়াছে তাহা অতি প্রাচীন, তাঁহারা অবশ্যই বুদ্ধের ধর্ম্মকে সাংখ্য-মূলকই মনে করিবেন। কিন্তু এইরূপ বিশ্বাস করা সকলের পক্ষে সহজ নহে।

এই সম্পর্কে অধ্যাপক ডয়সেন একটি "মধ্যমা প্রতিপদা" বাহির করিয়াছেন। মহাভারতের অন্তর্গত সনৎসুজাতপর্ব্ব, ভগবদ্গীতা, মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায় এবং অনুগীতা একত্র বিচার করিয়া ডয়সেন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে তিনটি স্বতন্ত্রযুগ ধরিতে হইবে। প্রথম যুগ, উপনিষদে নিবদ্ধ দার্শনিক মতের যুগ। তৃতীয় যুগ, সূত্র, কারিকা এবং ভাষ্যাদিতে নিবদ্ধ ষড়্‌দর্শনের যুগ। এই দুই যুগের মধ্যে দ্বিতীয় যুগ, মহাভারতীয় দর্শনের যুগ। উপনিষদের যুগের এবং মহাভারতীয় যুগের সন্ধিস্থলে কাঠক, শ্বেতাশ্বতর, মৈত্রায়ণীয় প্রভৃতি উপনিষদের দার্শনিক মত।* মহাভারতে নিবদ্ধ দার্শনিকমতকে ডয়সেন প্রাচীন সাংখ্য অথবা মায়াবাদবিহীন বেদান্ত (realistic Vedanta) সংজ্ঞা প্রদান করেন, এবং এই প্রাচীন মত হইতে ঈশ্বর-কৃষ্ণের কারিকার সাংখ্য এবং শাঙ্কর ভাষ্যের বেদান্ত উৎপন্ন

* Mahavastu, edited by Senart, Vol. I, pp. 348-352.

* "Journal of the Royal Asiatic Society," 1907, pp. 462-463.

হইয়াছে এইরূপ মনে করেন। বৌদ্ধমত সম্বন্ধে ডয়সন বলেন, "কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন বুদ্ধের ধর্ম সাংখ্যদর্শনের একটা শাখা, আবার কেহ কেহ বলেন বৌদ্ধধর্ম সাংখ্যের পূর্ব্ববর্ত্তী। উভয় সম্প্রদায়ই ঠিক কথা বলেন। এখন আমরা যাহাকে সাংখ্য বলি বৌদ্ধধর্ম নিশ্চয়ই তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী, কিন্তু মহাভারতীয় সাংখ্যের অনুগত।" * ডয়সেন বলেন, মহাভারতীয় সাংখ্যের সার-কথা, প্রকৃতি এবং বহুপুরুষ এই উভয়ই নিত্য, অথচ উভয়ের অতিরিক্ত ব্রহ্মের অনুগত। প্রমাণ-স্বরূপ মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের দুইটি শ্লোক (১১৭।৬-৭) উদ্ধৃত করা যাইতে পারে,—"তত্ত্ব জানিতে হইলে অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়কেই জানিতে হইবে। প্রকৃতি এবং পুরুষ হইতে যাহা স্বতন্ত্র এবং উচ্চতর সেই বিশিষ্ট বস্তুকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে বিচক্ষণ ব্যক্তি বিশেষভাবে দর্শন করিবেন। এই উভয়ই অর্থাৎ প্রকৃতি এবং পুরুষই আদি-অন্ত-রহিত এবং অলিঙ্গ।" † মহাভারতীয় দার্শনিক মতের মৌলিকতা এবং প্রাচীনতা সম্বন্ধে ডয়সেনের মত এখনও সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করে নাই। এখনও অনেকে মনে করেন মহাভারতীয় দার্শনিক মত সাংখ্য-বেদান্তের খিচুড়ী। কিন্তু মহাভারতীয় সাংখ্যের মৌলিকতা সম্বন্ধে অশ্বঘোষ-বিরচিত বুদ্ধচরিতের প্রমাণ উপস্থিত করা যাইতে পারে। বুদ্ধচরিত কাব্যের দ্বাদশ অধ্যায়ে অরাড়-কালাম কর্ত্তৃক ভাবী বুদ্ধের নিকট যে মত ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহার সহিত মহাভারতীয় সাংখ্যের বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। প্রকৃতি, তাহার বিকার এবং ক্ষেত্রজ্ঞ বা পুরুষ সম্বন্ধে অশ্বঘোষ লিখিতেছেন—

"তত্র তু প্রকৃতির্নাম বিদ্ধি প্রকৃতিকোবিদ।
পঞ্চভূতান্যহংকারং বুদ্ধিমব্যক্তমেব চ॥
বিকার ইতি বুদ্ধিং তু বিষয়ানিন্দ্রিয়াণি চ।
পাণিপাদং চ বাদং চ পায়ূপস্থং তথা মনঃ॥
অস্য ক্ষেত্রস্য বিজ্ঞানাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি সংজ্ঞি চ।
ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি চাত্মানং কথয়ন্ত্যাত্মচিন্তকাঃ॥"১৮-২০॥

মুক্তি বা মোক্ষ সম্বন্ধে অরাড় বলিতেছেন—

"ততো মুঞ্জাদ্ ইষীকেব শকুনিঃ পঞ্জরাদিব।
ক্ষেত্রজ্ঞো নিঃসৃতো দেহান্মুক্ত ইত্যভিধীয়তে॥
এতৎ তৎ পরমং ব্রহ্ম নির্লিঙ্গং ধ্রুবমক্ষরং।
যন্মোক্ষ ইতি তত্ত্বজ্ঞা কথয়ন্তি মনীষিণঃ॥"৬৪-৬৫॥

মুক্তক্ষেত্রজ্ঞ এবং পরমব্রহ্ম এক পদার্থ—অশ্বঘোষের এই বচন গীতার "ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত" স্মরণ করাইয়া দেয়। মোক্ষের উপায় ব্রহ্মচর্য্য এবং জ্ঞান সম্বন্ধে অশ্বঘোষ লিখিয়াছেন—

"তত্র সম্যগ্মতি বিদ্যান্মোক্ষকাম শ্চতুষ্টয়ং।
প্রতিবুদ্ধা প্রবুদ্ধৌ চ ব্যক্তমব্যক্তমেব চ॥
যথাবদেতদ্বিজ্ঞায় ক্ষেত্রজ্ঞো হি চতুষ্টয়ং।
আর্জবং জবতাং হিত্বা প্রাপ্নোতি পদমক্ষয়ং॥
ইত্যর্থং ব্রাহ্মণা লোকে পরমব্রহ্মবাদিনঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং চরংতীহ ব্রাহ্মণান্ বাসয়ংতি চ॥৪০-৪২॥"

এখানে দেখা যাইবে অশ্বঘোষের মতে অরাড় যেমন এক-দিকে জগতের মূলকারণ আত্মা হইতে পৃথক প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন, তেমন আর একদিকে তিনি পরমব্রহ্মবাদীও ছিলেন। ইহাই মহাভারতীয় সাংখ্য বা realistic Vedanta। অশ্বঘোষ এই মতকে সাংখ্যের এবং বেদান্তের খিচুড়ী মনে করিতেন না। একটা গোটা মৌলিক মত—কপিলের মত বলিয়া মনে করিতেন। কারণ তিনি এই প্রসঙ্গে কপিলেরও উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"সশিষ্যঃ কপিলশ্চেহ প্রতিবুদ্ধ ইতি স্মৃতিঃ।
সপুত্রঃ প্রতিবুদ্ধশ্চ প্রজাপতিরিহোচ্যতে॥২১॥"

অশ্বঘোষের সময়ে এই সাংখ্যই বোধ হয় বৌদ্ধমতের প্রধান প্রতিযোগী ছিল; তাই অশ্বঘোষ অরাড়ের মুখে এই মত বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়া ভাবী বুদ্ধের দ্বারা তাহা খণ্ডন করাইয়াছেন। অশ্বঘোষ আঠার শত বৎসর পূর্ব্বে

* "Some scholars maintain that the religion of Buddha is an off-shoot of the Sankhya system, others that Buddhism is anterior to the Sankhyam. Both are right. Buddhism certainly precedes what we call now the Sankhya system, but it depends on what is called Sankhyam in the Mahabharatam." Indian Antiquary, Vol. XXIX., p, 398.

† "তদেবমেতৌ বিজ্ঞেয়াবব্যক্ত পুরুষাবুভৌ।
অব্যক্তপুরুষাভ্যাং তু যৎ স্যাদন্যন্মহত্তরম্॥
তং বিশেষমবেক্ষেত বিশেষেণ বিচক্ষণঃ।
অনাদ্যংতাবুভাবেতাবলিংগৌ চাপ্যুভাবপি।
(শান্তিপর্ব্ব, ১১৭।৬-৭)

কণিষ্কের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। এখন জিজ্ঞাস্য, ডয়সেন যাহা বলিয়াছেন তাহাই কি ঠিক? এই সাংখ্যমত কি যথার্থই বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী? ডয়সনের সিদ্ধান্তের একটি আপত্তি, এই—শান্তিপর্ব্বের জনক-পঞ্চশিখ সংবাদে যেখানে (২১৮ অধ্যায়) এই সাংখ্যমত ব্যাখ্যাত হইয়াছে সেই-খানেই বৌদ্ধমতেরও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পঞ্চশিখ নাস্তিক বা লোকায়ত মত খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন—

"অবিদ্যা কর্ম্মচেষ্টানাং কেচিদাহুঃ পুনর্ভবে।
কারণং লোভমোহৌ তু দোষানাং তু নিষেবণম্॥
অবিদ্যাং ক্ষেত্রমাহুর্হি কর্ম্মবীজং তথাকৃতম্।
তৃষ্ণা সংজননং স্নেহ এষতেষাং পুনর্ভবঃ॥
তস্মিন গূঢ়ে চ দগ্ধে চ ভিন্নে মরণধর্ম্মণি।
অন্যোন্যাজ্জায়তে দেহ স্তমাহুঃ স্বত্বসংক্ষয়ম্।"
(২১৮।৩২-৩৪)

"কেহ কেহ বলেন অবিদ্যা (অজ্ঞান), কর্ম্মের চেষ্টা, লোভ, মোহ এবং দোষকর কার্য্যের অনুষ্ঠান পুনর্জ্জন্মের কারণ। অবিদ্যাক্ষেত্র, পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম-বীজ, তৃষ্ণা সেই ক্ষেত্রকে সিক্ত করিবার জল। এইরূপে অবিদ্যাদি পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয় (এবং তাহার ফলে পুনঃ পুনঃ জন্ম হয়)। (তাহারা) বলেন অবিদ্যাদি গূঢ়ভাবে বিদ্যমান থাকায় এই মরণশীল দেহের নাশ হইলে সেই অবিদ্যাদি হইতে অন্য দেহের উৎপত্তি হয়; (জ্ঞানের প্রভাবে অবিদ্যাদি) ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে দেহের নাশের পর মোক্ষলাভ হয়।"

এখানে আত্মার কথা নাই, অথচ কর্ম্মজনিত জন্মান্তরের কথা আছে। সুতরাং মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ যে লিখিয়াছেন, এই তিনটি শ্লোকে সৌগতমত উপন্যস্ত হইয়াছে তাহা ঠিক। মহাভারতে যখন সাংখ্য এবং বৌদ্ধ-মত পাশাপাশি উপন্যস্ত হইয়াছে তখন মহাভারতীয় সাংখ্যকে বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী মনে করা কঠিন। যতদিন না মহা-ভারতের রচনা-রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় ততদিন সাংখ্য আগে কি বুদ্ধ আগে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে না। *

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

* বঙ্গীয়সাহিত্য সম্মিলনের বর্দ্ধমান-অধিবেশনের দর্শনশাখায় পঠিত।

তাজের প্রথম প্রশস্তি

(সম্রাট শাজাহানের রচিত পার্শী আবেয়াৎ হইতে; মূল ছন্দের অনুসরণে।)

জগৎ-সার! চমৎকার! প্রিয়ার শেষ শেয!
অমল ভায় কবর ছায় তনুর তার তেজ!
উজল দিক্! শোভায় ঠিক্ স্বরগ্-উদ্যান;
সদাই তর্ সুবাস-ঘর,—যেমন প্রেম্-ধ্যান!
পরাগ-খোর আগুন-ভোর কুসুম-ভর্‌পুর,
ঘুচায় ধূল্—চোখের চুল বুলায় রোজ হুর!
রতন্-চয় দেওয়াল্-ময় মাণিক ছাদ ছায়,
হীরার হাই হেথায় তাই, মোতির শ্বাস বায়!
এ নির্ম্মাণ মেহেরবান প্রভুর প্রেম্-চিন্,
কৃপার নীর হিয়ার তীর ভাসায় দিন দিন।
কুসুম-ঠাম ধেয়ান-ধাম অমল মন্দির,—
ইহার পর ধাতার বর সদাই রয় থির।
পাতক হয় হেথায় ক্ষয় মনের তাপ শেষ,
শরণ যেই এঁঠাই লয় ফুরায় তার ক্লেশ।
আইন হায় যাহায় চায় এঁঠাই তার মাফ্,
দোষীর দোষ ও আফ্‌শোষ হেথায় হয় সাফ্।
হিয়ার মোর প্রিয়ার গোর শোকের মেঘ, হায়,
গভীর শোক চাঁদের চোখ স্যুরয্-লোক ছায়।
শোকীর গান এনির্ম্মাণ,—শোকের সৌরভ,
ইহার কাজ প্রচার—রাজ-রাজের গৌরব।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

দেশের কথা

দেশের নানাস্থান হইতে দুর্ভিক্ষের সংবাদ আসিতেছে। চারিদিকেই ঘোর অন্নকষ্ট। ইতিপূর্ব্বে চাঁদপুর, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থান হইতে স্বল্পাহার, অর্দ্ধাহার ও অনশনজনিত মৃত্যুকাহিনী আমাদিগের গোচরীভূত হইয়াছিল; এইবার রঙ্গপুর হইতেও ভীষণ দুর্ভিক্ষের সংবাদ আসিয়াছে। রঙ্গপুরের অন্তর্গত কুড়িগ্রাম মহকুমার নুনখাওয়া হইতে শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ লাহিড়ী "রঙ্গপুরদর্পণে" যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি—

গত বৎসর ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে, পাটের বাজার নিতান্ত মন্দা ছিল, এবং তজ্জন্য চাষীরা অতি অল্পমূল্যে পাট বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। তাহার পর হৈমন্তিক ধান্য রীতিমত না জন্মায় চাষীমহলে হাহাকার পড়িয়াছে। অধিকাংশ লোক একবেলা আহার করিয়া থাকিতেছে, কাহারও কাহারও প্রতিদিন আহার জুটিতেছে না। গতকল্য শুনিতে পাইলাম, অল্প খরচে চলিবে বলিয়া একব্যক্তি সাবুদানা ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছে। যে রঙ্গপুরে কোনও দিন অন্নকষ্টের কথা শুনা যায় নাই সেই রঙ্গপুরের লোক উপবাস আরম্ভ করিয়াছে।

পরবর্ত্তী সংখ্যাতে রেভারেণ্ড মিঃ এস, জি উইলাড্ মহোদয় লিখিতেছেন—

বলকুমার গ্রামের অধিবাসীবর্গের মধ্যে কলেরার ব্যাপককারণ অনুসন্ধান করিয়া অন্নাভাবই মুখ্যকারণ মনে হয়। এই গ্রামে সর্ব্বসমেত কুড়িজন নরনারী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। একটি গ্রামে দেখিলাম শিক্ষার উপায় থাকা সত্ত্বেও লোকে অন্ন ও বস্ত্রাভাবে শিশুসন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে পারিতেছে না। গোবিন্দগঞ্জ-অঞ্চলে জনসাধারণ কিছুকাল হইতে মেটে আলু আহার করিয়া জীবনধারণ করিতেছিল, বর্ত্তমানে লোকে এই-সমস্ত আলুও উপযুক্ত পরিমাণে পাইতেছে না।

কাকিনার "দিকপ্রকাশ" আরও মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন। "দিকপ্রকাশ" বলেন

নামুড়ী মদনপুর গ্রামের জিয়া পাইকারের জামাতা জ্বর হইতে উঠিয়া অন্নাভাবে চারি-পাঁচদিন মিঠকুমড়া খাইয়া খাইয়া জীবন রক্ষা করে, তৎপর মৃত্যু তাহার সকল যন্ত্রণার অবসান করিয়া দিয়াছে।

চাঁদপুরের কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দে মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রমে দেশবাসীর সেবা করিতেছেন—রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ম্মীদলও কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন। এক্ষণে সহৃদয় দেশবাসী মুক্তহস্তে ইঁহাদিগকে সাহায্য করিলে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ কিয়ৎপরিমাণে প্রশমিত হইতে পারে।

অন্নসমস্যার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের বহুস্থলে বন্যাসমস্যাও উপস্থিত। শিলচরের "সুরমা" বলিতেছেন—

পর্জ্জন্যদেব অবিশ্রান্তবর্ষণে আমাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিতেছেন। অবিরত বৃষ্টিপাতে শ্রীহট্ট কাছাড়ের নানাস্থান ভাসিয়া গিয়াছে। করিমগঞ্জ, মৌলবীবাজার, হবিগঞ্জ প্রভৃতি সাবডিভিসনের বহুস্থান বন্যা-প্রবাহে ডুবিয়াছে। মাঠের শস্য জলের নীচে পচিতেছে। আশু ধান্য ও পাটের আশা লোপ পাইয়াছে। ত্রিপুরাজেলার নানাস্থান হইতে বন্যাবিপ্লবের বার্ত্তা পাইতেছি। তথায় অনেক গৃহপালিত পশুপক্ষী ভাসিয়া গিয়াছে, দুই-তিনটি নরনারীর মৃত্যুসংবাদও আমাদের কানে আসিয়াছে। এক্ষণে দেশের অগ্রণীবর্গের নিকটও আমাদের যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। শিলচর ও শ্রীহট্টে বিগত বর্ষে যে দুইটি আর্ত্তত্রাণ-সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল আমাদের বিবেচনায় তাহাদের অস্তিত্ব-প্রদর্শনের সময় আসিয়াছে। এই সমিতিগুলি শ্রীহট্ট কাছাড়ের—

১। কৃষি ও কৃষকের অবস্থা
২। খাদ্যমূল্য
৩। গোগ্রাস
৪। তরিতরকারী।
৫। জ্বালানীকাষ্ঠ

এই পাঁচটি ও আবশ্যকত্ব-বিবেচনায় দেশের ভাবী দুরবস্থা নিবারণার্থ অপরাপর বিষয়ের তথ্য-সংগ্রহ করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট প্রেরণ করুন। দুর্দ্দিন না আসিতেই তাহার প্রতিষেধের জন্য প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য।

আমরা অবগত হইয়াছি যে শ্রীহট্টের জননায়ক শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চন্দের নেতৃত্বাধীনে উক্তরূপ একটি অনুসন্ধানকমিটি গঠিত হইয়াছে। বঙ্গে প্রতিজিলাতেই এক-একটি অনুসন্ধানসমিতি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আছে। উক্ত সমিতিগুলি দেশের স্বাস্থ্যের অবস্থা, সাংসারিক অবস্থা, শিক্ষার অবস্থা প্রভৃতি অনুসন্ধান করিয়া অভাব-অভিযোগ মোচনের উপায় সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত-সম্বলিত রিপোর্ট যদি "বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী" কিম্বা অন্য-কোনও নির্ব্বাচিত বিশেষ কোনও মণ্ডলীর নিকট প্রেরণ করেন তবে দেশের যথার্থ কল্যাণ-সাধনের উপায় হইতে পারে। জিলার জননায়কগণ একবার এইদিকে মনোনিবেশ করিবেন কি? বিগতবর্ষে মহামতি স্বর্গীয় গোপালকৃষ্ণ গোখলে-প্রতিষ্ঠিত "ভারতভৃত্য-সমিতির" পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত অমূল্যকৃষ্ণ বসু মহাশয় এইপ্রকার সংখ্যাতথ্য (statistics) সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় এই যে উপযুক্ত সাহায্যাভাবে তিনি উক্তকার্য্যে বিশেষ কৃতকার্য্য হয়েন নাই।

ক্ষুধার তাড়নায় উপায়ান্তর অভাবে লোকেরা লুটপাট আরম্ভ করিয়াছে। 'ত্রিপুরাহিতৈষী' সংবাদ দিতেছেন—

সেদিন লাকশামথানার অন্তর্গত ৬৪ জন লোক চাউল লুট করিয়াছে বলিয়া ধৃত হইয়া সহরে আনীত হইয়াছে। ক্ষুধার তাড়নায় ইহারা চাউল লুট করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এমন কি ইহারা স্ত্রীপুত্রসহ গ্রেপ্তার হইতে রাজী এইরূপ জনরব। ইতিমধ্যে কুঠিরবাজারের নিকট চাউল লুট হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। যে মহাজনের চাউল লুট হইয়াছে সে মোকর্দ্দমা করিতে নারাজ। সে বলিয়াছে মানুষ বিপদে পড়িয়া এই কাজ করিয়াছে, তাহাদিগের নিকট হইতে দুইদিন আগে বা পরে সে টাকা আদায় করিতে পারিবে, সুতরাং ইহাদিগের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিয়া ইহাদিগকে অধিকতর বিপদগ্রস্ত করিতে চায় না। মহানুভবতা বটে!

বাঙ্গলাদেশের সর্ব্বত্রই সুপেয় জলের অভাবে অপরিষ্কৃত বিষতুল্য জল পান করিয়া প্রতিবৎসর কত সহস্রসহস্র পল্লীবাসী নিদারুণ দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি-যন্ত্রণায় অকালে ইহলীলা সম্বরণ করিতেছে তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? অথচ সর্ব্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় এই জলকষ্ট নিবারণের জন্য জেলাবোর্ডে যে পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হয় সে পরিমাণে

ব্যয়িত হয় না। পাবনা জিলাবোর্ড সম্বন্ধে পাবনার "সুরাজ" এইরূপ সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিতেছে—

আমাদের নিতান্ত দুরদৃষ্ট, গভর্ণমেণ্ট এই জলকষ্ট নিবারণের জন্য বোর্ডের হাতে যে পরিমাণে অর্থ গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, বোর্ড তাহাও ব্যয় করিতে পারেন নাই। সমগ্র জেলার মধ্যে একটিমাত্রও জলাশয়-খননের বা সংস্কারের ব্যবস্থাও করিতে পারেন নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি জেলাবোর্ড যেরূপভাবে গঠিত তাহাতে আমরা বর্ত্তমানে ইহার অতিরিক্ত আশা করিতে পারি না।

লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। পাবনাজিলার এই কলঙ্ক যাহাতে স্খালিত হয় তজ্জন্য পাবনাবাসীসকলের সচেষ্ট হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

সমাজকর্ত্তৃক নিপীড়িত জাতিসমূহ যে নিজেদের উন্নতির জন্য স্বচেষ্ট হইয়াছেন তাহার পরিচয় নিয়তই পাওয়া যাইতেছে। রামপুরহাটের "বীরভূমবাসী" এইরূপ একটি চেষ্টার সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছেন। "বীরভূমবাসী" বলেন—

রামপুরহাট হাইস্কুল হইতে শ্রীমান আশুতোষ বীরবংশ নামক একটি ডোমছাত্র এবার ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে পাশ হইয়াছে। আমরা শুনিলাম যে ছাত্রটি বুদ্ধিমান; সাহায্য পাইলে সে উচ্চ পরীক্ষাগুলিও পাশ করিতে পারিবে। অনুন্নত শ্রেণীর সাহায্য করিতে যাঁহারা ইচ্ছুক তাঁহারা কি এই গরীব ছাত্রের বিদ্যাশিক্ষার কোনও উপায় করিয়া দিতে পারিবেন না?

আমরা অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতিবিধায়িনী সভার দৃষ্টি এইদিকে আকর্ষণ করিতেছি। ছাত্রটির উচ্চশিক্ষার সুবন্দোবস্ত যাহাতে হয় দেশহিতৈষীবর্গের সকলেরই সে চেষ্টা করা উচিত।

দেশের যে কয়েকটি সদনুষ্ঠান দেশবাসীর গৌরব রক্ষা করিতেছে বরিশাল মূকবধির বিদ্যালয় তাহাদিগের অন্যতম। "বরিশালহিতৈষী" ইহার কার্য্যবিবরণী প্রকাশ-কালে বলিতেছেন

বিদ্যালয়ের কার্য্য বেশ চলিতেছে। কয়েকটি ছাত্র নিম্নপ্রাইমেরী ও উচ্চপ্রাইমেরী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে বসিয়া হাতের তাঁতে উৎকৃষ্ট মশারির কাপড়, গামছা, ঝাড়ন প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছে। এবার ৬ হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক কয়েকটি মূক বধির বালককে ফ্রি বোর্ডিং দেওয়া হইবে।

এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবর্গ দেশবাসীর কৃতজ্ঞতার পাত্র।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

—

সেখ আন্দু

(৯)

সন্ধ্যার পর আলোকোজ্জ্বল কক্ষে বসিয়া জ্যোৎস্না সরসীকে তাহার পাঠ্য পড়াইতেছিল। ওদিকের নির্জ্জন ঘরে লতিকা বিকাল হইতে মাথা ধরিয়াছে বলিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিদ্রা যাইতেছে,—সময়টি অবশ্য নিদ্রার পক্ষে প্রশস্ত নহে, তবে অসুখের পক্ষে সবই সম্ভব। কয়দিন হইতে জ্বরের ছুতায় লতিকা নিজের আহার নিদ্রা ভ্রমণ ইত্যাদি সম্বন্ধে এমনি আশ্চর্য্য নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিয়াছিল, যে, বাড়ীর কেহই তাহার নাগাল ধরিতে পাইতেছে না,—সে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ ভাবে স্বতন্ত্র ব্যবস্থায় দিন কাটাইতেছে। বাড়ীর লোকদের প্রতি তাহার ব্যবহারেরও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু সে চিরদিনই রুক্ষ-প্রকৃতির একগুঁয়ে মানুষ, কেহই বড় একটা তাহার বাড়াবাড়ি আচরণগুলা গণনীয় বলিয়া ধরিতেছেন না। তা ছাড়া লতিকার বৈপরীত্য জ্যোৎস্নার পক্ষে বেশী ক্লেশকর হইতেছে বুঝিয়া, স্নেহময়ী শান্তস্বভাবা জননী কন্যার ব্যবহারগুলার উচ্ছৃঙ্খলতা যথাসাধ্য কাটিয়া ছাঁটিয়া স্বাভাবিক সহজ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এবং আহত ক্ষুব্ধ জ্যোৎস্না বিষম বিব্রত হইয়া স্পষ্ট বুঝিয়াছে, শুধু জননীর উৎপীড়নের জন্যই লতিকা এমন ঘোরতর রূপে অবাধ্যতা আরম্ভ করিয়াছে। তাহার অসন্তোষের সূত্র যে কোথায়, তাহা কিন্তু কেহই অনুভব করিতে সমর্থ নহে, বাস্তবিক তাহা অনুভব করাও অসম্ভব।

বারান্দায় যথেষ্ট আলোক থাকা সত্ত্বেও সিঁড়ির দ্বারে উঠিয়া চৌকাঠে হুঁচট্ খাইয়া অত্যন্ত ব্যস্তভাবে একজন কক্ষে ঢুকিল! জ্যোৎস্না সবিস্ময়ে দেখিল ব্যগ্র ব্যাকুল মুখে লতিকা! ভীতি-উত্তেজনায় তাহার মুখ চোখ এমনি অস্বাভাবিক ভাব ধারণ করিয়াছে, যেন সে এখনি কাহাকে খুন করিয়া আসিল। লতিকার অবস্থা দেখিয়া জ্যোৎস্না উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, "তুমি নীচে ছিলে নাকি?"

লতিকাও কক্ষে ঢুকিয়া অকস্মাৎ দুইজনকে সেখানে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া যেন হতভম্ব হইয়া গেল। তাহার

বোধ হয় এ কক্ষে আমার অভিপ্রায় ছিল না, হঠাৎ তাড়াতাড়িতে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। জ্যোৎস্নার প্রশ্নের উত্তরে প্রবল মাত্রায় চমকিয়া বিবর্ণ মুখে বলিল, "হাঁ—না, আমি এই নীচে গেছ্‌লুম।"

সহসা দিদিকে আসিতে দেখিয়া সরসীর গলার স্বর অনেকটা নামিয়া গেল। সে বইয়ের উপর যথাসাধ্য ঝুঁকিয়া জড়াইয়া জড়াইয়া ইংরেজীপড়া উচ্চারণ করিতে লাগিল। জ্যোৎস্না বলিল "তোমার কি অসুখ কচ্ছে ?"

লতিকা বিমূঢ়ার মত হঠাৎ বলিয়া ফেলিল "না।"—তারপর আত্মসম্বরণ করিয়া ত্রস্ত স্বরে বলিল "হাঁ শরীরটে বড় খারাপ হয়েছে—" সে আলোর দিকে পিছন করিয়া জ্যাকেটের হুক্ খুলিতে লাগিল। লতিকার মনে হইতেছিল, সে এখান হইতে ছুটিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু ইহাদের চোখের অন্তরালে যাইবার চেষ্টা করিলে, নিজেকে ইহাদের চোখে যে আরো বেশী করিয়া ধরাইয়া দেওয়া হইবে, সে সম্বন্ধেও তাহার লেশমাত্র সংশয় ছিল না ; তাই নিজের অতর্কিত-ত্রস্ত আগমনটা কাজের অছিলায় ঢাকিবার জন্য তাড়াতাড়ি জামাটা খুলিয়া খামকা আনলায় রাখিল। একটা শাল টানিয়া আপদমস্তক ঢাকা দিয়া কৌচে অর্দ্ধশায়িতভাবে শয়ন করিল। সরসীর পাঠের অবকাশ হইতে তাহার দ্রুত উত্তেজিত নিশ্বাসের পরিষ্কার শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। লতিকার মনে হইল তাহার সন্তর্পণে ত্যক্ত নিশ্বাস লইয়া শূন্যে অশরীরীগণ তীব্র বিদ্রূপে বিশ্বময় অট্টহাস্য ছড়াইয়া বেড়াইতেছে। সে আপনার দৃপ্ত অধীরতার সহিত যুঝিতে যুঝিতে হাঁফাইয়া উঠিল।

দিদির নিস্তব্ধতা সরসীর কাছে মহাবিভীষিকার মত লাগিল, তাহার পড়া কেবলই মুখে আটকাইতে লাগিল। অতি কষ্টে খানিকটা সময় অতিক্রান্ত করিয়া, সে পড়া বন্ধ করিল। আস্তে আস্তে ছড়ান বইগুলি গুছাইতে গুছাইতে অত্যন্ত লঘুস্বরে জ্যোৎস্নাকে বলিল "আজ থাক জ্যোৎস্না-দি, গ্রামারের পড়াটা কাল ছোড়্‌দাকে দেখিয়ে নেব।"

সরসী সরিয়া পড়িলে জ্যোৎস্নাকে নিতান্তই একা থাকিতে হয়, ঘরে মানুষ আছে অথচ কথা নাই, সে অবস্থা বড় সঙ্কটময় ; জ্যোৎস্না সরসীকে পড়িবার জন্য একটু পীড়াপীড়ি করিল। কিন্তু সরসী আপাদমস্তক-আবৃতা দিদির দিকে গোপনে ইঙ্গিত করিয়া অসম্মত হইল। বাস্তবিক দিদিকে সে মারাত্মক রকম ভয় করিত। সরসী উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই জ্যোৎস্না তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিল। কিন্তু আর তাহাদের কাহারও মুখে কথা ফুটিল না। খানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া সরসীর সঙ্গে সঙ্গে জ্যোৎস্নাও ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেল।

গ্রীষ্ম-রজনীর জ্যোৎস্নার রজতধারায় চারিদিক শুভ্রস্নাত ; ঘরের আলোকের উষ্ণতা হইতে বাহিরে আসিয়া জ্যোৎস্না বড় স্নিগ্ধতা অনুভব করিল ; দ্বিতলের বারান্দায় রেলিংয়ের উপর ভর দিয়া নীচে চাহিয়া দেখিল, নীচে লোকজনের ব্যস্ত কোলাহল খুব বেগে চলিতেছে। সে সরিয়া আসিয়া ছাদের দুয়ার খুলিয়া জ্যোৎস্না-পুলকিত নিস্তব্ধ ছাদে মুগ্ধ হৃদয়ে পদ-চালনা করিতে লাগিল।

কাল দাদাবাবু আসিবেন, কালই বেলা তিনটার গাড়ীতে সে কলিকাতা যাইবে। জ্যোৎস্না ভাবিতেছিল, আর কখনো ভাগলপুর আসা ঘটিবে কি না কে জানে, কিন্তু লতিকার অভাবনীয় আচরণগুলি তাহার চিরদিন মনে থাকিবে, কি দুর্জ্জয় কঠোর প্রকৃতি !

ভাবিতে ভাবিতে ছাদের শেষপ্রান্তে আসিয়া পৌঁছিল। সেখান হইতে চাকরদের টানা গৃহশ্রেণী দেখা যাইতেছিল। সর্ব্বপ্রান্তস্থ নিকটবর্ত্তী গৃহখানার উন্মুক্ত গবাক্ষপথ দিয়া আলোকময় গৃহের ভিতরকার কিয়দংশ দেখা যাইতেছিল ; জ্যোৎস্না দেখিল প্রশস্ত বাতায়নপথে চিম্‌নি রাখিয়া, সেলাইয়ের কলের সামনে মাথায় হাত দিয়া এক গৌরসুন্দর যুবামূর্ত্তি নতশিরে বসিয়া আছে ; আলোক মৃদু মৃদু বিকীর্ণ হইতেছে, তথাপি জ্যোৎস্নার চিনিতে বিলম্ব হইল না, এই যুবাই মোটর-চালক। জ্যোৎস্না সেখান হইতে চলিয়া আসিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় দেখিল যুবা আলোটি উজ্জ্বল করিয়া চিম্‌নি খুলিয়া অনাবৃত অগ্নিতে কতকগুলি কাগজ ছিঁড়িয়া পুড়াইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল, চিম্‌নি আবার পরাইয়া দিতেই উজ্জ্বলালোকে উপবিষ্ট যুবার পশ্চাতে দণ্ডায়মান আর-এক মূর্ত্তি দেখিয়া জ্যোৎস্না বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল, একি !

(১০)

পরিমলকে লইয়া আড্ডা হইতে আন্দু সকাল সকাল ফিরিয়া আসিয়া নিজের ঘরে গেল। বৈকালের শেষে ধনুকধারী আসিয়া সংবাদ দিয়া গেল, লছমীভকত মাতুলালয়ে চলিয়া গিয়াছে। আন্দু খুসী হইল। ধনুকধারীকে বিদায় দিয়া, সে আলো জ্বালিয়া জামাগুলি সেলাই করিতে বসিল। গোটা দুই জামা সেলাই করিয়া একবার বাহিরে ঘুরিয়া আসিতে গেল, দেখিল রহিম মশলা পিষিতে বসিয়াছে, রন্ধনের উদ্যোগ সবই প্রস্তুত। আন্দু রহিমকে উঠাইয়া নিজেই মশলা পিশিয়া রন্ধনে লাগিল। রহিম, শেষকালে তাহাকে ঠেলিয়া উঠাইয়া দিল। আন্দু কাজ আর বেশী নাই দেখিয়া জামা দুটি শেলাই করিবার জন্য গৃহাভিমুখে চলিল। মৃদু মৃদু গান গাহিতে গাহিতে বারান্দায় উঠিয়াই মনে হইল কে যেন ত্বরিতপদে তাহার ঘরের দিক হইতে অন্দরের দিকে চলিয়া গেল; স্বল্পান্ধকারে আন্দুর অনুমান হইল স্ত্রীলোক; গান বন্ধ করিয়া আন্দু দ্রুতপদে ঘরে আসিয়া ঢুকিল। সত্যই কে আসিয়াছিল বটে, তাড়াতাড়িতে ঘরে শিকল দিতে ভুলিয়া, নিজের গুপ্ত আগমনের প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছে। গুপ্ত আগন্তুকের বুদ্ধি-ভ্রংশতায় আন্দুর ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটিয়া মিলাইয়া গেল, অজ্ঞাতে একটা তীক্ষ্ণ সংশয় অন্তঃকরণ উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। আন্দু ঘরে ঢুকিয়া এদিক-ওদিক চাহিল, কোথাও কোন বৈলক্ষণ্য না দেখিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইল, নিজের ভ্রম মনে করিয়া ঘটনাটা মন হইতে সরাইয়া আবার সেলাই করিতে বসিল।

কলটি টানিয়া সরাইতেই নীচে একখানা পুরু সাদা খামে তাহারই শিরোনামা-লেখা পত্র পাওয়া গেল। আন্দুর চক্ষের সমক্ষে জগতের মূর্ত্তি ঝাপ্‌সা হইয়া গেল; এ যে মেয়েলি হাতের অক্ষর। শঙ্কিত হস্তে খাম ছিঁড়িয়া পত্র উল্টাইয়া স্বাক্ষর দেখিল—সুধু একটি অক্ষর রহিয়াছে। মুহ্যমান আন্দু দেখিল পত্রের প্রতি অক্ষরে লেখিকার আদ্যোপান্ত পুরা চেহারাটি স্পষ্ট দেদীপ্যমান!

অষ্টপৃষ্ঠা-ব্যাপী সুদীর্ঘ পত্র। আন্দু ঘৃণার ধাক্কায় আতঙ্ক সরাইয়া ধৈর্য্য ধরিয়া পত্রখানা পড়িতে লাগিল। চিঠিখানি যথেষ্ট সুরুচিপূর্ণ ভাষায় যথাবিহিত ঔপন্যাসিক বিধানে সুশ্রাব্য ভাবে লিখিত। আন্দুকে মানুষের মত মানুষ দেখিয়া লেখিকা তাহাকে বিবাহ করিতে চায়। কিন্তু চিঠি পড়িয়া আন্দুর মন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ধিক্কারে পূর্ণ করিয়া তুলিল।

আন্দু বাতি কমাইয়া দিয়া, মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে বসিল।

নিজের প্রতি অলক্ষ্যে একটা ঘৃণার তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। ছিঃ ছিঃ, এমনি অসতর্ক কুণ্ঠাহীন স্বভাব লইয়া সে রমণী-সমাজের সংস্রবে বাস করিতেছে! নিজের অজ্ঞাতে এতদূর অসংযতভাবে অপরের চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে? কি দুর্দ্দৈব!

আন্দুর মনে পড়িল সে আজই প্রাতঃকালে লছমীভকতকে কত সদুপদেশ দিয়াছে,—আজই সে পথের ধূলায় প্রাণের আনন্দ ছড়াইয়া আনন্দের আবেগে পূর্ণ হৃদয়ে জোর গলায় গাহিয়াছে,—

"তোমার নয়নে নয়ন রাখি
চলিব তোমার পথে!"

আন্দু চমকিয়া উঠিল, একটা শুভ্র সান্ত্বনার আলোকে অন্তরের সমস্ত অন্ধকার কাটিয়া গেল,—ঠিক ঠিক, এ যে বিধাতার হস্ত হইতে আসিতেছে—জীবনপরীক্ষার প্রশ্নপত্র।

হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত নির্দ্দোষব্যক্তি চরম বিচারে মুক্তিলাভ করিলে বন্দীর যেমন আনন্দ হয়, তেমনি মধুর নিঃশঙ্ক আনন্দোৎসাহে আন্দুর চিত্ত ভরিয়া উঠিল। অন্তরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার সমস্ত অসুস্থতা দূর হইল। পূর্ণ আশ্বাসে, অন্তরস্থ বিচারকের চরণে মাথা নত করিয়া, আন্দু মনে মনে বলিল, তোমার হস্ত হইতে যাহা আসিয়াছে তাহাই আমার শিরোধার্য্য, তোমার প্রশ্নের উত্তর তোমার চরণের উদ্দেশে উৎসর্গ করিব।—আমার অভিমান ক্ষমা কর।

শান্ত হইয়া বাতি উজ্জ্বল করিল, চিম্‌নি খুলিয়া চিঠিখানি ছিঁড়িয়া পুড়াইয়া ফেলিয়া দিল। তাহার মনের মধ্যে একটা উচ্ছল-আনন্দ-সঙ্গীতের স্রোত উল্লাসে অধীর হইয়া উঠিল। সে নিশ্চিন্ত হইয়া হাতের কাজটুকু সারিতে বসিল, জগতের কোথাও কোন সুরে যেন এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটে নাই!

দুটি স্কন্ধে অকস্মাৎ অপরিচিত কোমল হস্তের স্পর্শ-লাভে আন্দু চমকিয়া লাফাইয়া উঠিল।

আন্দু কক্ষ ছাড়িয়া উর্দ্ধশ্বাসে বারান্দা পার হইয়া, গেটের বাহিরে খোলা ময়দানে আসিয়া সটান নির্জ্জীবভাবে শুইয়া পড়িল। চন্দ্রালোকের দিকে চাহিয়া আন্দুর বড় দুঃখ হইল, আহা, এমন সুন্দর পৃথিবীর মাঝে, মানুষগুলোর প্রাণ এত কুৎসিত কেন? দোহাই পরমেশ্বর! মানুষকে মানুষের গৌরব ভুলিতে দিও না!

অবিলম্বে মালী আসিয়া পাশে ঘাসের উপর বসিল। আন্দু উঠিয়া বসিল। মালী বিদ্রূপের হাসিতে চোখ মুখ ঘুরাইয়া বলিল "কি ভাই, ভূত দেখেছ নাকি, লাফিয়ে ঘর থেকে চলে এলে?"

আন্দু উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল "তুমি কোথা ছিলে মালী?"

রঙ্গরসিক মালী হাসিয়া হাসিয়া বলিল—"আমি যেখানেই থাকি না, তুমি কোথায় ছিলে?"

রুদ্ধ কণ্ঠে আন্দু বলিল "কোথা ছিলে ঠিক বল,"—সে মালীর মণিবন্ধ দৃঢ় মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিল। মালী ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আঃ ছাড়, লাগে। আমি তোমার কাছেই যাচ্ছিলুম, হঠাৎ তুমি ছিট্‌কে বেরিয়ে আস্‌ছ দেখে, থমকে আকবরের ঘরের দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়েছিলুম,—"

আন্দু উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিল "তারপর? আমার ঘরে গিছ্‌লে?"

মালী রঙ্গ করিয়া বলিল "তুমি বেরিয়ে এলে তো আর কার কাছে—"

আন্দু রুষ্ট হইয়া কহিল "বস্‌ চুপ।"—

মালী বলিল—"কে এসেছিল মিঞা? ওধারের দুয়োর খুলে অন্দরের দিকে চলে গেল! অন্দর থেকে কেউ এসেছিল নাকি?"

তর্জ্জনীতে টানিয়া কপালের ঘাম ঝাড়িয়া ফেলিয়া আন্দু আশ্বস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, স্মিত মুখে বলিল, "হাঁ তিনি আমার মা!"

আন্দু চলিয়া গেল, মালী ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিয়া রহিল।

(১১)

গেটের বাম পাশে একটা শাখা-প্রশাখা-বহুল শিশু গাছ ছিল। মালীর কাছ হইতে উঠিয়া আসিয়া সেই গাছের তলায় দুই হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া আন্দু গভীর চিন্তায় মগ্ন হইল। ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্নার আলো মাটির বুকে লুটাইয়া পড়িয়া নীরবে হাসিতেছিল। সারা-দিনের গ্রীষ্ম গুমটের পর এতক্ষণে হাল্কা বাতাস ঝির্‌ঝির্‌ করিয়া বহিতেছে।

চিন্তার উত্তেজনার আধিক্যে বসিয়া থাকা আন্দুর পক্ষে অসম্ভব হইল। উঠিল বাড়ীর চারিপাশে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমশঃ তাহার চরণের গতি অতিরিক্ত প্রখর হইয়া উঠিল। নিজের অবস্থা নিজের অনুভব করিবার শক্তি যদি তাহার থাকিত, তাহা হইলে এরূপ অকারণ ব্যস্ত ভাবে আপনাকে ঘুরিতে দেখিলে, সে নিজেই হাসিয়া অস্থির হইত।

ইতিমধ্যে রাত্রি কয়টা বাজিল, ও সেই প্রকাণ্ড বাড়ী-খানা আন্দু কয়বার প্রদক্ষিণ করিল, তাহার হিসাব কেহই জমা-খরচের খাতায় টুকিল না। গাঢ় ভাবনায় ভ্রুকুটী-বদ্ধ ললাটে,নিষ্পলক দৃষ্টিতে, গ্রীবা উঁচাইয়া ঝোঁকের ভরে চঞ্চল চরণে সে অবিশ্রাম ঘুরিতেছিল। আন্দু মনে মনে হিসাব খতাইয়া দেখিতেছিল, যে, ঘটনাস্রোতের বিরুদ্ধে সে কি করিয়া মাথাটা সোজা করিয়া রাখিবে! সাঁতার কাটিতে অনেকে জানে, কিন্তু মাঝ দরিয়ায় পাছে হাতপা-গুলা অবাধ্য অসাড় হইয়া পড়ে, সাঁতার কাটিবার আগে নিজের শক্তি খতাইয়া ঐটুকু বিবেচনা করা দরকার।

উচ্চ কণ্ঠের ডাকাডাকি শুনিয়া আন্দুর চমক ভাঙ্গিল। চলিতে চলিতে থমকিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল—রহিম গেটের কাছ হইতে তাহাকে ডাকিতেছে। আন্দু গেটের নিকটে আসিতে রহিম বলিল—"রাত যে বারোটা বাজ্‌তে চল্ল, খাবে কখন?"

কথাটা কানে গেল বটে, কিন্তু মুহ্যমান আন্দু তাহার মানে কিছুই বুঝিল না, চিন্তাকুল মুখে দুই হাতে সজোরে মাথার চুলগুলো ধরিয়া টানিতে লাগিল। রহিম বিস্মিত হইয়া বলিল—"কি, রকম কি? নেশা টেশা কিছু করেছ নাকি? ও আন্দু, খাবে কখন?"

সবেগে মাথাটা ঝাড়া দিয়া আন্দু বলিল "খাওয়া? ওঃ! না চাচা, আমার আজ খিদে নেই। তুমি খেয়েছ ত? আচ্ছা শোও গে যাও, আমি খাবনা।"

রহিম ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল—"কেন, খাবে না কেন?"

বিকৃত মুখে কপাল টিপিয়া ধরিয়া আন্দু বলিল "বড় মাথা ধরেছে।"

রহিম অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল—"তা ধর্‌বে না মাথা, ঠিক্ দুপুরে রোদের তেজে মাথার চাঁদি উড়ে যায়, তখন তুমি টো টো করে ঘুরে বেড়াও, নাওয়া খাওয়া কিছুরই বিলি বন্দেজ নেই। তার পর মগজের কাছে আলো জেলে রেখে সন্ধ্যে থেকে কেবল সেলাই আর সেলাই!—তা যাও, ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন? একটু ঘুমুলে সেরে যাবে, শোও গে যাও।"

রহিম চলিয়া গেল। তখন চৌধুরী-বাড়ীর সকলেই প্রায় নিস্তব্ধ হইয়াছে। আন্দু ফটক বন্ধ করিয়া বারান্দা পার হইয়া নিজের ঘরে গিয়া দরজা দিল। অন্ধকারে বিছানায় পড়িয়া ভাবিতে লাগিল।

হঠাৎ বিছানা হইতে উঠিয়া দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল। আন্দু বারান্দার প্রান্তবর্ত্তী ঘরখানির সামনে আসিয়া শুকবিকৃত কণ্ঠে ডাকিল "ঠাকুরজী।"

ঘরে ঘরে চাকরেরা তখন সকলেই ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। কেবল ঠাকুরজীর ঘরে তখনো আলো জ্বলিতেছিল। দরজা জানালার ফাঁক দিয়া আলো দেখা যাইতেছিল, ঠাকুরজী অল্পক্ষণ পূর্ব্বে পাকশালা হইতে সকলের শেষে বাহির হইয়া আসিয়াছেন।

কাশিয়া কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া আন্দু আবার ডাকিল "ঠাকুরজী ঘুমিয়েছেন কি?"

এবার ভিতর হইতে জবাব আসিল। আন্দু বলিল "দোরটা একবার খুলুন, একটু দরকার আছে।"

আলো জ্বালিয়া বিছানা পাতিয়া সমস্ত কাজ কর্ম্ম সারিয়া ঠাকুরজী মেজেয় বসিয়া ধীরে সুস্থে আয়েস করিয়া পান দোক্তা চিবাইতেছিল, আন্দুর ডাকে উঠিয়া দরজা খুলিয়া দেখিল, দুই হাতে চৌকাঠের শুর্‌সী ধরিয়া সামনে ঝুঁকিয়া ক্লান্ত ভাবে আন্দু দাঁড়াইয়া আছে। ঠাকুরজী বলিল "এখনো জেগে কেন ভাই?" ঠাকুরজী উড়িষ্যাবাসী।

আন্দু মুক্ত দ্বারপথে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "ঘুম হচ্ছে না। আপনি দোয়াত কলমটা একবার দিন।"

দোয়াত কলম দিয়া ঠাকুরজী বলিল—"বস্‌বে না একবার?"

দ্বিরুক্তি না করিয়া দরজার পাশে দেয়ালে ঠেস্ দিয়া আন্দু তৎক্ষণাৎ বসিয়া পড়িল, যেন সে বসিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল। ঠাকুরজী মেজের উপর স্বতন্ত্র ভাবে বসিয়া বলিল "পান খাবে?"

আন্দু বলিল "দিন্, সাজা আছে? নেই? তবে থাক থাক—"

"না না এখুনি সেজে দিচ্চি" বলিয়া থলিয়ার ভিতর হইতে বটুয়া বাহির করিয়া ঠাকুরজী পান সাজিতে বসিল। একটু ইতস্তত করিয়া আন্দু বলিল—"ঠাকুরজী, আপনার ভাইঝির বিয়ে এখনো হয় নি?"

একটি ছোট নিশ্বাস ফেলিয়া দুঃখিত ভাবে ঠাকুরজী বলিল—"আর ভাই বিয়ে! ভাই মারা যাবার পর থেকে ভাইয়ের সংসার, নিজের সংসার, সবই আমার ঘাড়ে পড়েছে, পরের বাড়ী মাথা বিকিয়ে রইচি, যতক্ষণ এখান থেকে টাকাটি পাঠাচ্ছি ততক্ষণে হাঁড়ি চড়্‌ছে, এই ত অবস্থা; এদিকে মেয়েটিও বড় হয়ে উঠেছে, বিয়ে না দিলেই নয়। কি যে করি, কিছুই ভেবে পাচ্ছি নে।"

আন্দু সোজা হইয়া বসিল। "আচ্ছা বলুন দেখি কত টাকা হলে আপনাদের বিয়ে হয়?"

ঠাকুরজী বলিল—"তা যে যেমন খরচ করতে পারে। আমাদের মত লোকেরও দেড়শো দুশোর কম তো হবার যো নেই,—"

হঠাৎ অত্যন্ত উৎসাহিত ভাবে আন্দু বলিয়া উঠিল,—"শুনুন শুনুন একটা কথা বলি।"

ঠাকুরজী পানে চুন খয়ের দিয়া, তীক্ষ্ণধার ছোট স্বদেশী জাঁতিটিতে সুপারি কুচাইতেছিল; আন্দুর কথার ভঙ্গীতে কার্য্য স্থগিত রাখিয়া বলিল—"কি বল দেখি—"

"চৌধুরীসাহেবের কাছে আমার কিছু টাকা জমান আছে, জানেন বোধহয়—

"হাঁ তা জানি।"

"সেই টাকা আমি আপনাকে দিচ্ছি, আপনি দেশে গিয়ে ভাই-ঝিটির বে দেন।"

ঠাকুরজী চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। পানে সুপারি দিয়া পান মুড়িয়া আন্দুর হাতে দিল, তার পর সে-সব সরঞ্জাম গুটাইয়া বটুয়ায় পুরিল, পিতলের

বটুয়াটা আবার থলিয়ার মধ্যে পুরিয়া থলিয়ার মুখ বন্ধ করিয়া দিল। তারপর পরস্পর সম্বন্ধ হাত দুটি হাঁটুর উপর রাখিয়া, সোজাসুজি আন্দুর দিকে ফিরিয়া বসিল। বলিল "দেখছ তো ভাই আমার হাল চাল, সে টাকা যে শীগ্রী শোধ করতে পারব তাতো মনেই হয় না,—"

বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি আন্দু বলিল "না না, সেজন্য আপনার কিছু ভাবনা নেই, আমি আপনাকে তিন বচ্ছর সময় দিলুম, তিন বচ্ছর পরে যখন হোক আপনি দিবেন,—"

"তিন বচ্ছর কি, তিন মাস বল।"

"তিন মাস কেন?"

"তোমার নিজের বিয়ে থাওয়া আছে, সে সময় তো খরচ পত্র চাই।"

"আমার বিয়ে!"—আন্দু মৃদু হাসিল; "সে যাই হোক মোদ্দা আমি তিন বচ্ছরের মধ্যে আপনার কাছে টাকা চাইচি না এটা ঠিক।"

"ওঃ তাহলে আমার বড় উপকার করা হবে ভাই। তিন বচ্ছরের মধ্যে আমি যেমন করে হোক অল্পে অল্পে তোমার দেনা শোধ করে দেব।"—ঠাকুরজীর স্বর কৃতজ্ঞতায় ভরা।

আন্দু যেন একটা কঠিন দুর্দ্দশার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিল, আরামের সহিত আলস্য ভাঙ্গিয়া বলিল "বেশ কালই তা হলে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"একটা কথা, সুদ কত করে?"

"সুদ আবার কি?—চৌধুরী-সাহেবের কাছে আমার টাকা অমনি জমা আছে, আপনার কাছেও তাই থাকবে। ঠাকুরজী, আন্দু কি আপনার ছোট ভাই নয়?"

আন্দুর আব্দারের স্বরে ঠাকুরজীর চোথ ছলছল করিতে লাগিল, এমন স্নেহমাথা সহানুভূতি, কোমল-হৃদয় আন্দু ছাড়া আর কাহারো কাছে সে পায় না। একে এই দুঃসময়ে তাহার মত সঙ্গতিহীন দরিদ্রকে বিশ্বাস করিয়া এত অর্থ কর্জ্জ দেওয়া, তাহার উপর সুদ পর্য্যন্ত মকুব; কৃতজ্ঞতায় ঠাকুরজীর কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া গেল, তাহার অক্ষম রসনা, উচ্চারণের উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পাইল না।

গতিক বুঝিয়া আন্দু তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। "মনে রাখবেন, তিন বছরের পর এসে যদি ও-টাকার তাগাদা না করি, তা হলে জানবেন ও-টাকা আপনারই, আমি আপনাকে দিয়েছি, হাজার হোক ছোট ভাই তো!"

হাস্যোৎফুল্ল মুখে শেষের কথা কয়টি বলিয়া আন্দু চট্ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ঠাকুরজী কিছু বলিবার অবকাশ পাইল না।

(১২)

নিজের ঘরে আসিয়া দরজায় খিল লাগাইয়া আন্দু আলো জ্বালিল। বিছানার নীচ হইতে এক টুকরা কাগজ বাহির করিয়া দোয়াত কলম লইয়া লিখিতে বসিল। বারান্দার ক্লক-ঘড়িতে টং করিয়া একটা বাজিল।

আন্দু লিখিতে লাগিল,—

"শ্রীশ্রীহক পাক।

নবিজী রসুল।

শ্রীচরণে বহুৎ বহুৎ তস্‌লীম।—

কোন বিশেষ কারণ-বশতঃ অদ্য হঠাৎ আমি অন্যত্র চলিলাম, আপনাকে পূর্ব্বে জানাইতে পারি নাই, অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

আমি কত দিনে আবার ফিরিয়া আসিব, এবং পুনরায় ফিরিব কি না, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই, সে জন্য বিনীত নিবেদন এই যে, আমার স্বব্যবসায়ী বন্ধু পিয়ারী সাহেবকে অতঃপর আমার স্থানে নিযুক্ত করিবেন। সে বেকার বসিয়া আছে, তাহাকে খোঁজ করিবা মাত্র পাইবেন। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, তাহার দ্বারা আপনার কাজ কর্ম্ম সুশৃঙ্খলে চলিবে। আমি জানি লোকটি খুব সৎ এবং সাহসী, সেই জন্যই ভরসা করিয়া তাহার কথা জানাইতেছি; অবশ্য আপনিও পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

আমার দ্বিতীয় অনুরোধ—আমার পুরানো সেলাইয়ের কলটি খুকুমণি ক্রয় করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কলটি তাঁহাকে দিবেন। আমার মাহিনার দরুন মজুদ ১৬৫৲ টাকা যাহা আপনার নিকট আছে, তাহা ব্রাহ্মণ-ঠাকুরকে দিবেন, আমি ঐ সমস্ত টাকা তাহাকে দিলাম জানিবেন।

আমি এখন কোথায় যাইব, কি করিব, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই, সুতরাং সে সম্বন্ধে কিছুই জানাইতে

পারিলাম না, ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। আপনাদিগের যাহার নিকট যখন যে অপরাধ করিয়াছি, তাহা কৃপা করিয়া ক্ষমা করিয়া বিস্মৃত হইবেন। আমি অনুতপ্ত চিত্তে সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ইতি—

আজ্ঞানুবর্ত্তী—

আনোয়ার-উদ্দীন।"

চিঠিখানি ভাঁজ করিতে করিতে সুপ্ত পৌরবর্গকে স্মরণ করিয়া আন্দুর চক্ষু অশ্রুসজল হইল। তাড়াতাড়ি দুর্ব্বলতা দমন করিয়া পত্রখানি একটা শাদা খামে মুড়িয়া চৌধুরীসাহেবের নাম লিখিয়া বিছানার উপর রাখিল। তারপর আলোটা উজ্জ্বল করিয়া অসমাপ্ত জামা দুটি সেলাই করিতে বসিল। পরক্ষণে উঠিয়া চিঠির পশ্চাদ্দিকে লিখিল—"ধনুকধারী দুবের চারিটি জামা সেলাই করিয়া রাখিয়া চলিলাম, জামাগুলি যেন তাহার হস্তে পৌঁছে।"

আন্দু এবার নিশ্চিন্ত হইয়া সেলাই করিতে বসিল। তাহার পাশের তিনখানা ঘর, গাড়ী-ঘোড়া সম্পর্কীয় নানা রকম জিনিসে ভর্ত্তি থাকায় সে ঘরে কেহ শয়ন করিত না, সুতরাং কলের শব্দে কাহারই নিদ্রার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইল না।

দেখিতে দেখিতে দুইটা বাজিয়া গেল। আন্দুর সেলাই তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তাড়াতাড়ি অবশিষ্ট কাজটুকু সারিয়া লইয়া জামাগুলি ভাঁজ করিয়া কাগজে মুড়িয়া ফেলিল। কলকাটি, মাপকাটি, সমস্তই গুছাইয়া একপাশে সরাইয়া রাখিল। আলোটি হাতে লইয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, রাত্রি তখন আড়াইটা।

আর ত বেশী সময় নাই, এবার যাইতে হইবে।— "যাইতে হইবে!" আন্দুর সমস্ত বুকটা গভীর বেদনায় আকুলভাবে হায় হায় করিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া বিছানায় বসিয়া, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বালকের মত অধীর হইয়া আন্দু কাঁদিতে লাগিল। ওঃ কি মর্ম্মভেদী কষ্ট! সকলকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে? কতদিনের কত স্নিগ্ধ শান্তিময় স্মৃতিজড়িত,—বড় আদরের, বড় পূজনীয় ভাগলপুর! ভাগলপুরের মাটি যে সে মক্কার চেয়ে পবিত্র বলিয়া জানে, এর পঞ্জরে পঞ্জরে যে তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ ঘটনাগুলি গ্রথিত প্রোথিত;—এ যে তাহার পিতামাতার সমাধিস্বর্গ!—হায় সে যে কতদিন নির্জ্জন গোরস্থানে পিতামাতার সমাধিমূলে মাথা লুটাইয়া অতীত দেবদেবীর অতীন্দ্রিয় করুণা নবীন ঘনিষ্ঠতায় অনুভব করিয়া ধন্য হইয়াছে, সেখানকার মাটিতে মাথা রাখিয়া সে যে কত দিন কত বেদনা কত গ্লানি মোচন করিয়া আসিয়াছে, আজ সেই পুণ্যতম শান্তির ক্ষেত্র হইতে—হা বিধাতা,—কোন্ অপরাধে তাহার এ নির্ব্বাসন-শাস্তি!

বহুকষ্টে ব্যাকুল উদ্বেলিত চিত্তকে শান্ত করিয়া আন্দু ধৈর্য্য ধরিয়া চক্ষু মুছিল। নাঃ! সে কাহারো উপর অভিমান রাখিবে না; নিজের তপ্ত যন্ত্রণার জ্বালায়, পরের উপর বিদ্বেষের বিরোধ সে বৃথা টানিবে না। এ সমস্ত তাহারই কর্ম্মফল—তাহা এ জন্মেরই হোক্ আর পূর্ব্ব জন্মের হোক! তাহার নিয়তি তাহাকেই ভোগ করিতে হইবে, নিরীহ পর বেচারীর দোষ কি?—

জোর করিয়া আপনাকে সামলাইয়া আন্দু উঠিল। প্রভু-প্রদত্ত ট্রাঙ্কটি খুলিয়া নিজের পরিধেয় জামা কাপড় কেতাবগুলি বাহির করিয়া পুঁটুলি বাঁধিল। সেদিন চৌধুরীসাহেব কলিকাতা গিয়া যে নূতন পোষাকটি তাহাকে ক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন, সেইটি, এবং পুরাতন চালকের পরিচ্ছদটি আলনা হইতে লইয়া ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া সযত্নে ট্রাঙ্কে রাখিয়া দিল, ইহা তো আর তাহার দরকার নাই।

গত কল্য মাসকাবারি বেতনের দরুন পনের টাকা কাটিয়া রাখিয়া চৌধুরীসাহেব তাহাকে কুড়ি টাকা হাতখরচ দিয়াছেন। সে এ পর্য্যন্ত তাহার এক পয়সাও খরচ করিতে পায় নাই; প্রাতঃকালে আসিয়াই বালিশের নীচে কাগজে মুড়িয়া টাকাগুলি রাখিয়া দিয়াছিল, বাক্সতে রাখিবার অবকাশ হয় নাই, অথবা মনে পড়ে নাই। আন্দু টাকাগুলি বাহির করিয়া মোড়কসুদ্ধ জামার পকেটে রাখিয়া জামাটি পরিল। সাদা ফুলকাটা ছোট টুপীটি মাথায় চড়াইয়া জুতা পায়ে দিয়া গৃহকোণে ঠেসানো পিত্তল বাঁধানো বাঁশের লম্বা লাঠিতে মোটটি তুলিয়া কাঁধে ফেলিল। আল্লার নাম লইয়া অগ্রসর হইতেই "মচ" করিয়া জুতায় শব্দ হইল। আন্দু জুতা খুলিয়া হাতে লইয়া, আলো নিবাইয়া, বাহিরে আসিল, নিঃশব্দে বারান্দা পার হইয়া উঠানে নামিল।

বাহিরে দিব্য ঠাণ্ডা। চন্দ্রদেব ম্লান পাণ্ডুর মূর্ত্তিতে

ক্লান্ত হইয়া পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িয়াছেন। চোরের মত ভীত সন্তর্পণ পাদক্ষেপে প্রাঙ্গণে নামিয়াই আন্দু মুহূর্ত্তের জন্ম থমকিয়া দাঁড়াইল।

সবেগে মুখ ফিরাইয়া আন্দু গেটের দিকে চাহিল। ফটক ডিঙ্গাইয়া ঝুপ্ ঝাপ শব্দে ফটকের বাহিরে মোট লাঠি জুতা সমস্ত ফেলিয়া দিয়া, ফটকের মধ্যস্থ যোজক দণ্ডে পা দিয়া উঠিয়া নিজেও বাহিরে লাফাইয়া পড়িল। জুতা পায়ে দিয়া মোটটা পূর্ব্বের মত পিঠে ফেলিল।

তারপর একবার—একবার ব্যগ্র ব্যাকুল দৃষ্টিতে আন্দু বাড়ীখানির পানে ফিরিয়া তাকাইল। রুদ্ধ অশ্রু উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া সবেগে বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল। অধীর হৃদপিণ্ডটা করুণ কাতরতায় বক্ষের মধ্যে আছাড়ি-বিছাড়ি করিতে লাগিল, উঃ! কি যন্ত্রণা!

তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আন্দু পথ ছাড়িয়া সোজা ময়দান পার হইয়া ওদিকের রাস্তায় উঠিয়া দ্রুতপদে চলিল। গাছপালা সব যেন আজ গভীর শোকে নিস্তব্ধ মলিন হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সেই চিরপরিচিত পুরাতন পথ ঘাটগুলিকে বিদায়ের শেষ দেখা দেখিয়া লইতেও আন্দু ভাল করিয়া পাইল না, সবই তাহার অশ্রুসিক্ত চোখে ঝাপ্সা ঠেকিতে লাগিল, রাত্রিশেষে জ্যোৎস্নাও তখন ঘোলাটে হইয়া আসিয়াছিল।

আন্দু স্তব্ধ মূর্চ্ছিত পথ অতিবাহন করিয়া চলিল। তাহার সারা বুকটা যন্ত্রণার পীড়নে মুহুর্মুহু ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল।

(ক্রমশ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

বাঙ্গলার ইতিহাস *

মহাকবি বলিয়াছেন, "সময়ের অবধি নাই এবং পৃথিবী বিপুলা।" সজীব জাতিদিগের মধ্যে কালস্রোতের পরিচয় পাওয়া যায় পরিবর্ত্তন থেকে। রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের পন্থা বন্ধুর, তাহ'তে কখন পতন, কখন অভ্যুদয়; কিন্তু জাতিটির জীবন থাকিলে এই পথে যাত্রীর মত যুগে যুগে ধাবিত হইতে থাকে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তন ক্রমোন্নতির দিকে। বঙ্কিমের যুগে যাহা চরম ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গৃহীত হইত, আজ তাহা স্কুলের ছেলেরাও অবিশ্বাস করে; এবং যদি বাঙ্গালীজাতির মধ্যে জীবনের, চেষ্টার, জ্ঞানস্পৃহার মৃত্যু না হয় তবে আজ আমরা যে এত কষ্ট করিয়া ইতিহাস লিখিতেছি তাহা আমাদের প্রাজ্ঞ পৌত্রগণ কৃষ্ণদাস পালের মূর্ত্তির পদতলে "মুদ্রাঙ্কণব্যয় অপেক্ষাও কম মূল্যে বিক্রয়" করিবার জন্য পাঠাইয়া দিবে। সেই মহাপুরুষের করুণ আঁখি অচল ভাবে এই দৃশ্য যুগে যুগে দেখিতে থাকিবে।

অতএব এই ঘনপরিবর্ত্তনশীল জগতে আমাদের জ্ঞানের সালতামামী হিসাবটাও ঘন ঘন লইতে হইতেছে। কারবারের খাতাপত্র একদেশে নাই, একভাষায় লিখিতও নহে। আমেরিকা, জার্ম্মানী, হ্যানোয়া (ইণ্ডোচায়না), ইংলণ্ড,—সবদেশে আমাদের ইতিহাসের কুঠী আছে, জ্ঞানের আয়ব্যয় চলিতেছে; পুরাতন টাকা বাজাইয়া বাদ দেওয়া হইতেছে, অথবা গলাইয়া নূতনের অংশ করা হইতেছে। এ হেন কারবারের সম্পূর্ণ হিসাব নিকাশ দেখান এক "বিশ্বকোষ" ধরণের ব্যাপার। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া অবিচ্ছিন্নভাবে এই সমস্ত নানা দেশীয় পত্রিকা ও গ্রন্থ পড়িয়া তাহার চুম্বক করিয়া রাখিলে, তবে কেহ এই কার্য্য করিবার উপযুক্ত হইতে পারেন। জীবিত বাঙ্গালীদিগের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ভিন্ন আর কেহই এরূপ পূর্ণ অঙ্গের জ্ঞান সঞ্চয় করিবার সুযোগ পান নাই, অথবা সুযোগ পাইলেও তাহার চূড়ান্ত সদ্ব্যবহার করেন নাই।

সমগ্র প্রাচীন ভারতের এরূপ সমস্ত শ্রদ্ধার যোগ্য ও সমস্ত নবতম গবেষণার ফল-সম্বলিত ইতিহাস ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ লিখিয়াছেন; বঙ্গ-বিহারের ইতিহাস লিখিয়াছেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এই "বাঙ্গলার ইতিহাসে" প্রাচীনতম ঐতিহাসিক যুগ হইতে মুসলমান-বিজয় পর্য্যন্ত প্রায় পনের শত বৎসরের রাজা ও রাজ্যপরম্পরার সর্ব্বাপেক্ষা সম্পূর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ এবং সর্ব্ব-শেষ নির্দ্ধারিত তথ্যযুক্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক প্রণালীর ইতিহাসে যাহা হওয়া উচিত, এই গ্রন্থে পদে পদে প্রমাণপঞ্জী অতি সূক্ষ্ম ও বিশুদ্ধভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং সমস্ত পূর্ব্বতন মত আলোচনা করিয়া তবে গ্রন্থকারের মত স্থাপন করা হইয়াছে।

রাখালবাবু এখানে বঙ্গদেশের বা বাঙ্গালীজাতির হিন্দুযুগের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, "সংগৃহীত উপাদান অবলম্বনে যে ইতিহাসের কঙ্কাল যোজিত হইয়াছে, তাহাই প্রকাশিত হইল।" ইহা সাহসী ও সাধু ঐতিহাসিকের উক্তি। প্রতিমা গড়িতে হইলে প্রথমে বাঁশ খড় দিয়া কাঠাম তৈয়ার করিতে হয়। সে জিনিবটা দেখিতে অত্যন্ত কদর্য্য, কিন্তু অত্যন্ত আবশ্যক, কারণ কাঠামটি যত স্বাভাবিক, যত সত্য হইবে, মূর্ত্তিটি ততই স্থায়ী আদরের দ্রব্য হইবে। তেমনি, প্রাচীন বাঙ্গলার ঘটনাবলীর কাল এবং পরম্পরা নির্ণয় না করিয়া, জাতীয়শক্তির বিকাশের পথগুলি দেশের মানচিত্রে শুদ্ধভাবে না আঁকিয়া, যদি একখানা মনগড়া, রং-ফলান, নানাপ্রীতিকর ও 'স্বদেশী'-অহঙ্কারবর্দ্ধক কল্পনাজল্পনাপূর্ণ ইতিহাস লিখি, তবে তাহা কোন-না-কোন ঐতিহাসিক সমিতির ঘন করতালি পাইতে পারে, অথবা কোন-না-কোন মহাসম্মিলনে বরমাল্যে পূজিত হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে কালাপানির হাওয়া সহিবে না, বিলাত অবধি পৌঁছিয়া টিঁকিবে না; এবং পূর্ব্বোক্ত ঐতিহাসিক সমিতি বা মহাসম্মিলনের মহাপণ্ডিতগণও কিছুদিন পরে তাহাতে বিশ্বাস হারাইবেন।

প্রথমে বংশপরম্পরা, রাজাদের পর্য্যায়, এবং ঘটনার কাল নির্ণয় করিয়া তবে জাতীয় জীবনের বিশুদ্ধ ও স্থায়ী ইতিহাস লেখা সম্ভব। এই সত্যের ভিত্তিটি প্রস্তরের মত কঠিন, প্রস্তরের মত রসহীন, বর্ণহীন; কিন্তু যে পরিমাণে এই ভিত্তিতে অসত্য বা অসম্পূর্ণতা রহিবে সেই

---

* প্রথমভাগ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ৩২৭+৪২ পৃষ্ঠা, ৩২ খানি চিত্র সম্বলিত। (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়) ২।০

পরিমাণেই পরবর্ত্তী সমস্ত রচনা ও মতামত, বালুর স্তূপের উপর গাঁথা অট্টালিকার মত নশ্বর ও পরিশ্রমের অপব্যয়ের দৃষ্টান্ত হইবে। রাখাল-বাবু সমস্ত উৎকীর্ণ লিপি ও প্রাচীন মুদ্রা এবং হস্তলিপি অধ্যয়ন করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। পূর্ব্বভারতের হিন্দুযুগের এরূপ সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ ইতিহাস এপর্য্যন্ত জগতের কোন ভাষায় রচিত হয় নাই। তাই এ গ্রন্থ বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। ভিন্সেট স্মিথ দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন, "আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আর এখন বাঙ্গলা শিখিতে পারি না।" রাখালবাবুর ইতিহাস প্রকাশে তাঁহার দুঃখ বাড়িবে। আমাদের নানাস্থানের সাহিত্য-সভায় ও অসংখ্য মাসিকে যাঁহারা বাঙ্গলার হিন্দুযুগের ইতিহাসের আলোচনা করেন, তাঁহাদের নিকট এই গ্রন্থ অত্যাবশ্যক; এখানি সর্ব্বদা না দেখিলে ভ্রমে পতিত হইতে হইবে; অনেক তথ্য, অনেক তথ্যের আকর একেবারে দৃষ্টিপথের বাহিরে থাকিয়া যাইবে। এইজন্যই ইহাকে বঙ্গেতিহাসের বিশ্বকোষ বলিয়াছি। পাদটীকাগুলি বুদ্ধিমান ও চেষ্টাশীল ছাত্রদের নিকট অমূল্য।

কিন্তু ইহা শুধু বাঙ্গলার ইতিহাস নহে। বাঙ্গলার সহিত জড়িত বিহারের সমস্ত হিন্দুযুগব্যাপী এবং আর্য্যাবর্ত্তের অন্যপ্রদেশেরও অনেক অনেক রাজার সম্পূর্ণ ইতিহাস এখানে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বাঙ্গলা যে ভারতের একটি অঙ্গ, সমগ্র উত্তরাপথের ঐতিহাসিক জীবনের রক্ত, ব্যাধি ও শান্তি, সুখদুঃখ, অর্থ ও কলার প্রবাহ যে বাঙ্গলার মধ্য দিয়া বহিয়াছিল, তাহা গ্রন্থকার অতি সুন্দর, অতি বিস্তৃতভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন। এই হিসাবে রাখালবাবুর "বাঙ্গলার ইতিহাস" অতুলনীয়। তিনিই প্রথমে পাল ও প্রতিহার বংশের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইতিহাস পরিস্ফুট করেন (গ্রন্থের ৮ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। "প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে বাঙ্গলার ইতিহাসের সহিত দুশ্চেদ্য সম্বন্ধে জড়িত ভারতেতিহাসের অধ্যায়গুলির সারাংশ 'পরিশিষ্টে' সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।" অনেক স্থলে পরিচ্ছেদগুলির মধ্যেও এইরূপ ঐতিহাসিক দূরবীনের ব্যবহার করিয়া রাখালবাবু প্রাচীনবঙ্গের ঘটনাবলীর চরমসত্যে পৌঁছিতে সক্ষম হইয়াছেন। গ্রন্থে ভারতীয় রাজাবলীর ১৩টি বংশলতা দেওয়া হইয়াছে (পৃঃ ৪৪, ৭১, ৯৯, ১০০, ১০২, ১৭৬, ১৭৭-১৭৮, ২০৮, ২৭৮, ৩০৩); এগুলি বহুমূল্য এবং ইহার কয়েকটি *Epigraphia Indica*, Duff's *Chronology*, *Indian Antiquary* প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থে প্রদত্ত বংশলতা হইতে অধিকতর পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধ। বিশেষতঃ, পাল, গহড়বাল, বর্ম্ম, চেদি, রাষ্ট্রকূট প্রভৃতি রাজবংশের অন্তর্বিবাহে যে ভীষণ জটিল সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল তাহা ২৭৮ পৃষ্ঠায় অতি পরিষ্কার করিয়া দেখান হইয়াছে। অনেক পরিশ্রমের অনেক দীর্ঘগবেষণার ফলে রাখাল-বাবু এইসব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা "প্রবাসীর" পাঠকেরা জানেন। এগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ায় বাঙ্গলার ইতিহাস-পাঠক-দিগের বড়ই উপকার হইয়াছে।

বইখানির অক্ষর কাগজ এবং বাঁধা অতি চমৎকার। বিশেষতঃ ৩১ খানি হাফটোন এবং একখানি ত্রিবর্ণে মুদ্রিত ছবি এমন সুন্দররূপে ছাপা হইয়াছে যে সেরূপ কাজ ১২।১৩ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে হইতে পারিত না, বিলাতে করাইতে হইত। এই চিত্রমুদ্রণের জন্য শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায়ের দোকানকে সর্ব্বোচ্চ প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ভারতীয় কোন সাহেবকোম্পানী ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টভাবে চিত্র ছাপিতে পারে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ হইতে কাহিনী পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিবে। ইহাতে পালরাজগণের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের বঙ্গে অরাজকতা, বাহির হইতে আক্রমণ ইত্যাদি বর্ণিত আছে। সপ্তম হইতে দশম এই চারি অধ্যায়ে প্রথম ও দ্বিতীয় পাল-সাম্রাজ্যের বিস্তৃত ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে। ইহা বাঙ্গলার নিজস্ব, হিন্দু বাঙ্গলার সব-চেয়ে বেশী গৌরবের যুগ। যাঁহারা বাঙ্গলার ইতিহাসের চর্চ্চা করেন তাঁহাদের নিকট এই অধ্যায়-কটি অতি উপাদেয় হইবে, ইহাতে অনেক শিখিবার জিনিষ আছে, অনেক তথ্য একত্র সংগৃহীত দেখিতে পাওয়া যায়। সেনরাজগণ সম্বন্ধে যে নবনব সত্য গত দশ-বারো বৎসরের মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়ের বিষয়। মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গ ও বিহার বিজয়ের সমালোচনাপূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ শেষ অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। আশা করি এই গ্রন্থের বহুল প্রচার হইয়া পাল ও সেনরাজগণ সম্বন্ধে বর্ত্তমানসময়ের দেশব্যাপী বৃথা তর্ক বিতর্ক ভ্রান্ত জল্পনা ও অদ্ভুত মতামত অন্তর্হিত হইবে, বাঙ্গালী ঐতিহাসিক সত্যের পথে পথিক হইতে পারিবেন।

এমন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পড়িয়া বড়ই আক্ষেপ হয় যে ইহা সুখপাঠ্য নহে। পণ্ডিতগণ, তথ্যানুসন্ধানকারীগণ, ছাত্রগণ ইহা অমূল্য বলিয়া সর্ব্বদা কাছে রাখিবে; কিন্তু বাঙ্গলার লক্ষলক্ষ সাধারণ পাঠকগণের নিকট ইহার প্রচার হইলে বড়ই ভাল হইত; সত্য ঐতিহাসিক জ্ঞান দেশময় বিস্তৃত হইতে পারিত। রাখালবাবু সর্ব্বত্র সহজ ভাষার অনুশীলন করেন নাই; তাঁহার বর্ণনা এবং বিষয়-বিন্যাসও প্রাঞ্জল নহে। আর পুস্তক-খানির দশআনা তর্কবিতর্ক, ঐতিহাসিক প্রমাণসংগ্রহ। ইহাতে পাণ্ডিত্যের হিসাবে পুস্তকের মূল্য বাড়িয়াছে, কিন্তু আমাদের জনসাধারণ এরূপ গ্রন্থের দিকে আকৃষ্ট হইতে পারিবে না;—তাহারা যে প্রতি সংখ্যায় অন্ততঃ তিনটি ছোট গল্প না থাকিলে সে মাসিকপত্রিকা পড়ে না। রাখালবাবুর গ্রন্থে এরূপ তর্কবিতর্ক দেওয়া অনিবার্য্য ছিল, কারণ উহা না থাকিলে সত্য অনুসন্ধানের ও স্থাপনের ব্যাঘাত জন্মিত। আর, এতদিন পর্য্যন্ত আমাদের লেখকগণ হিন্দুযুগের বাঙ্গলার ইতিহাসকে আরব্যোপন্যাসের শাখাবিশেষ মনে করিয়া যাঁহার যেমন ইচ্ছা, বাজার-গুজব, জনশ্রুতি, খেয়াল ও বিকট কল্পনায় পুরাইয়া রাখিয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক এগুলির বিনাশ না করিয়া অগ্রসর হইতে পারেন না; তাই রাখালবাবুকে বেশী দোষ দেওয়া যায় না।

কিন্তু, কোথায়ও কোথায়ও অবান্তর কথা বাদ দিয়া গ্রন্থের কলেবর ছোট করা যাইতে পারিত। যেমন, বাঙ্গলার অনেকস্থানে দুটি চারিটি করিয়া প্রাচীন গুপ্তমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু বাঙ্গলাদেশ যে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল তাহার প্রমাণ ঐ মুদ্রাগুলি নহে; অন্য প্রমাণ আছে। অথচ রাখালবাবু চতুর্থ পরিচ্ছেদের অধিকাংশ এইসব মুদ্রার চিত্র প্রাপ্তিস্থান ও বর্ত্তমান আশ্রয় বর্ণনা করিয়া খরচ করিয়াছেন। বিষয়টি নূতন এবং কাহার কাহারও নিকট মনোরম সন্দেহ নাই; কিন্তু উহা বাঙ্গলার "ইতিহাসে" ২১ পৃষ্ঠার অধিক স্থান পাইবার অধিকারী নহে; এবং তাহাও পরিশিষ্টে, বর্জ্জাইস্ অক্ষরে।

দ্বিতীয়তঃ, অনেকগুলি প্রস্তরমূর্ত্তির সুন্দর পরিষ্কার ছবি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু গ্রন্থকার বঙ্গীয় কলাবিদ্যার ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা করেন নাই; তিনি আমাদিগকে কতকগুলি আস্ত গাছড়া দিয়াছেন, তাহা হইতে পাচনের কাথ বাহির করিয়া দেন নাই। সুতরাং প্রাচীন বঙ্গীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে অজ্ঞানতারূপ ম্যালেরিয়ায় পীড়িত বাঙ্গালী পাঠক ও লেখক এখানে সর্ব্বজ্বরমত্তগজ-সিংহ পাইবেন না। ভবিষ্যৎ সংস্করণে মুদ্রাতত্ত্বসংগ্রহ (numismatic date) নির্ম্মমভাবে ছাঁটিয়া দিয়া, স্থান বাঁচাইয়া, কলা সাহিত্য ও পালযুগের জাতি এবং ধর্ম্মতত্ত্বের বিবরণে পূর্ণ দুইটি নূতন অধ্যায় যোগ করিয়া দিলে গ্রন্থ পূর্ণাঙ্গ হইবে। বংশলতার একটি সূচী এবং প্রমাণপঞ্জীর বর্ণনাপূর্ণ তালিকা (critical bibliography) প্রথমবারে দেওয়া হয় নাই; কিন্তু এরূপ মূল্যবান্ গ্রন্থে তাহা আবশ্যক।

রাখালবাবুর বাঙ্গলার ইতিহাসে ভাবিবার, বিচার করিবার অনেক কথা আছে; এখানে দুই-চারিটি মাত্র উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(২৫ পৃষ্ঠা) 'বালাম নৌকা'র উল্লেখ মির জুম্‌লার আসামবিজয়ের ইতিহাসে আছে (*J. A. S. B.*, 1872, p. 73)। (২৮ পৃষ্ঠা) আর্য্যনাম লইলেই রাজারা অনার্য্য ভাষা ও রীতিনীতি পরিত্যাগ করিতেন না; দৃষ্টান্ত, ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের পরবর্ত্তী আহোম্ রাজবংশ। ২৯পৃঃ 'গঙ্গারিডি' (Gangaridæ)। গ্রীকভাষায় কোন লোকের বংশধর বুঝাইতে হইলে তাহার নামের মূল শব্দটির পর একবচনে ides যোগ করিতে হয়, বহুবচনে idæ, যেমন তপতীর "গোত্রাপত্য পুমান্" হয় তাপত্য; তেমনি Atreusএর বংশধরগণ Atridæ, এবং Seleukos-এর বংশধরগণ Seleuk-idæ. 'গঙ্গা' হইতে 'গঙ্গারিডি' (Gangaridæ) শব্দ উৎপন্ন; গ্রীক পর্য্যাটকগণ উহা "গঙ্গাবংশ" অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। কিছুদিন হইল পড়িলাম একজন বাঙ্গালী ঐতিহাসিক গঙ্গারিডির অর্থ করিয়াছেন গঙ্গা-রাঢ়ী, গঙ্গাতীরবাসী রাঢ় দেশীয় লোক! ইহার পর "হরে করকম্‌বা জিওবা রুদেরকারখান"ও আমাদের ইতিহাসে প্রবেশ করিবে। (৭১ পৃষ্ঠ) বংশলতায় অপত্যের নামের উপরকার লম্বা লাইনটি পিতামাতার বিবাহের চিহ্নের (=) ঠিক নীচে দেওয়া নিয়ম। (৭৯ পৃঃ) গৌড়রাজ শশাঙ্ক থানেশ্বরের সম্রাট রাজ্যবর্দ্ধনকে গোপনে নিহত করেন, বাণভট্টের এই উক্তি আধুনিক বাঙ্গালী ঐতিহাসিকগণ জাতীয় আত্মমর্য্যাদার পুনস্থাপনের জন্য খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কেন? ইংরেজীতে একটা ব্যঙ্গ উক্তি আছে যে প্রাচীন রোমের শাসন-কর্ত্তা জুলিয়াস্ সিজর আদিম ফ্রান্সের স্বদেশী বীর ভার্সিন্‌গেটোরিক্সকে বন্দী করেন বলিয়া ঘটনার ১৯০০ বৎসর পরে ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের নেতা-গণ সেই ঐতিহাসিক অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য আধুনিক রোমের শাসনকর্ত্তা পোপের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য পাঠাইয়া দেন। স্বদেশ-প্রিয় বাঙ্গালী কি সেইরূপ কিছু করিতে বাধ্য?

(১৪৫ পৃঃ) পালরাজগণের জাতি কি? রাখালবাবু বলেন "সমুদ্র-(দেবতার)-কুলে পালরাজগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না।" কিন্তু লম্পট দেব এবং প্রতারিতা রাজপত্নীর সন্তান এক নব রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এই জনশ্রুতি এত অধিক স্থানে প্রচলিত যে ঐতিহাসিকেরা ইহাকে ঘৃণায় ত্যাগ করেন। আসামের "হরগৌরী" নামক প্রাচীন ঐতিহাসিক পুঁথিতে ব্রহ্মপুত্রনদের দেবতা ও এক রাজ-পত্নীর মিলনে তথাকার রাজবংশের উদ্ভব লেখা আছে। তাহা কি আমরা গ্রহণ করিতে বাধ্য? মহাদেব এবং একজন মেচ্ জোৎদারের পত্নীর মিলনে বিশুয়া কোঁচ (কুচবিহার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা) জন্ম-গ্রহণ করেন বলিয়া অতি প্রাচীন প্রবাদ আছে। তাহাও কি রাখাল-বাবু 'নিঃসন্দেহে' বিশ্বাস করিতে চাহেন? ধর্ম্মপালকে রাজভটাদিবংশ-পতিত বলিয়া একজন সমসাময়িক লেখক বর্ণনা করিয়াছেন। 'রাজভট' শব্দকে 'রাজভৃত্য' অর্থে লওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে (১৪২পৃঃ)। কিন্তু রাজভট একটি প্রাচীন ভারতীয় জাতি; তাহাদের রাজাদের কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ গোরখপুর হইতে বুন্দেলখণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। তাহা-দের এক শাখার নাম "চেরো"। এই চেরো-বংশ ১৭ শতাব্দীতে পালামৌএ রাজত্ব করিত। ঐ জেলায় এখনও অনেক চেরো-জমিদার বাস করে, তাহারা রাজপুত বলিয়া পরিচয় দিতে চায়, এরূপ আমার একটি পালামৌবাসী শিশোদীয় ছাত্র বলিয়াছে। যদি অযোধ্যার বৈসওয়ারা হইতে আগত বৈস্ রাজপুতযোদ্ধা বাঙ্গলায় জমিদারী স্থাপন করিয়া, মুসলমান হইয়া ইসা খাঁ নামে রাজত্ব করিতে পারিয়াছিল, তবে গোরখপুর হইতে আগত রাজভট্-বংশীয় কোন ভাড়াটে সেনাপতি বঙ্গে পালবংশ স্থাপন করিয়াছিল, ইহা কি অসম্ভব? আর, এই রাজভটেরা গুর্জ্জর, গুহিলোট, রাষ্ট্রকুট, সোলাঙ্কি, বুন্দেলা প্রভৃতি তথা-কথিত রাজপুত জাতির মত শকবংশীয় (Scythian) না হইলে পাল-গাহড়বাল-রাষ্ট্রকুট-চেদিরাজগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বৈবাহিক সম্বন্ধস্থাপন (২১৮ পৃঃ) সহজ হইত না। পাল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল খুব সম্ভব বাঙ্গলায় ডোমিসাইল্ড্, "পশ্চিমে" ছিলেন, এবং তাঁহার বংশ প্রথমে মধ্য এসিয়ার অন্যান্য বর্ব্বর অশ্বারোহী ডাকাতদের সঙ্গে খাইবার গিরিসঙ্কট দিয়া ভারতে প্রবেশ করে।

যদুনাথ সরকার,
পাটনা কলেজের অধ্যাপক।

বরদাচরণ মিত্র

বিলাত না গিয়া এদেশ হইতেই পরীক্ষা করিয়া একবার যে কতকগুলি দেশী লোককে সিভিলিয়ানের পদ দেওয়া হইয়াছিল, বরদাচরণ মিত্র মহাশয় সেই ষ্টাটুটারী সিভিলিয়ান-দের অন্যতম ছিলেন। তিনি বহু বৎসর ব্যাপিয়া সুখ্যাতির সহিত দায়রার জজের কার্য্য করিয়া অকালে স্বর্গারোহণ
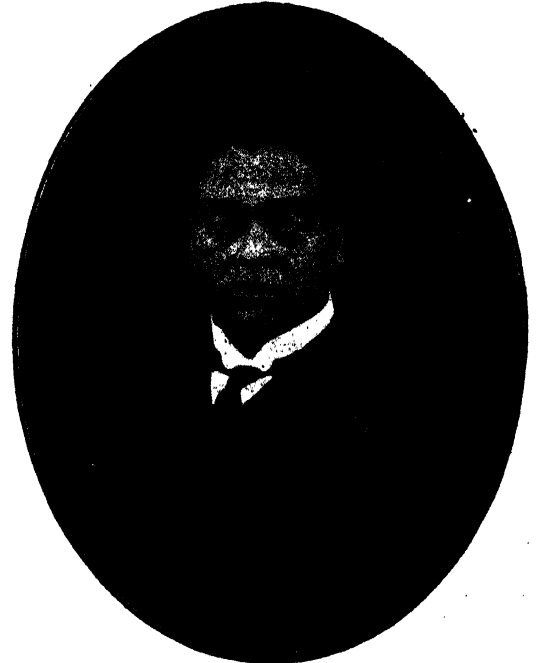
বরদাচরণ মিত্র।

করিয়াছেন। তিনি শুধুই জজ ছিলেন না। সেই দুরূহ আয়াসসাধ্য কার্য্য করিতে করিতে বীণাপাণির সেবা করিতেও তিনি বিস্মৃত হন নাই। অবসর পাইলেই মৌলিক কবিতা রচনা করিয়া ও সর্ব্বজনপূজিত কবিতার অনুবাদ করিয়া সেই বাণীর চরণে উপহার দিয়াছেন। ইঁহার অধিকাংশ কবিতাই মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

পরে কতকগুলি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে ছাপা হয়। ইহার নাম হইয়াছিল "অবসর"। কবি স্বাভাবিক বিনয়ের সহিত বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন, "সন্তানকে পূজার কাপড় পরাইয়া বাহিরে আনা, ও রচনা ছাপার অক্ষরে সজ্জিত করিয়া প্রকাশ করা, একই জাতীয় অভিলাষ বা দুর্ব্বলতা। সকলের নিকট তাহা মার্জ্জনীয় না হইলেও, তাহার কারণ সকলেরই বোধগম্য।" কিন্তু তাঁহার 'দুর্ব্বলতা'কে আমরা সাদরে গ্রহণ করিয়াছি। কারণ এ দুর্ব্বলতা ব্যতীত তাঁহার কবিতার রত্নরাজি আমাদের নয়নগোচর হইত না। ইহাতে নানা ছন্দের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা আছে। সকলি সুন্দর, কিন্তু টেনিসনের "Tears, idle tears, I know not what they mean" এবং "Home they brought her warrior dead" গান দুইটির অনুবাদে আসলের মাধুর্য্য যতদূর সম্ভব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এইরূপ অনুবাদে সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি হয়। শ্বেতদ্বীপের কাব্যোদ্যানের বসন্তের কলকণ্ঠ কোকিলের রবই কেবল যে তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল তাহা নহে। উজ্জয়িনীর মহাকবির বীণাতন্ত্রীর মধুরঝঙ্কারও তাঁহার মর্ম্মে পশিয়াছিল। তাই তিনি কান্তাবিরহে গুরুভারাক্রান্ত-হৃদয় যক্ষের আক্ষেপ অনূদিত করিয়া বঙ্গভাষাকে নব অলঙ্কারে ভূষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মেঘদূতের অনুবাদ পাঠে মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন—

"I do not think I am mistaken in believing that this translation will make a name for you in Bengali Literature."

তাঁহার ইংরেজি কবিতা রচনা করিবারও অসাধারণ শক্তি ছিল। সাহিত্যালোচনা তাঁহার জীবনের একটি প্রধান উপভোগ ছিল। আমাদের উভয়ের বন্ধু স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বৈঠকখানায় বরদা-বাবুর সহিত সাহিত্যালোচনায় যোগদান করিবার আমার সৌভাগ্য ও সুযোগ ঘটিয়াছিল। মাইকেল ও হেমচন্দ্র সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক হইয়াছিল। তিনি বলিতেন মেঘনাদবধ অপেক্ষা বৃত্রসংহার উচ্চতর আসনে অধিষ্ঠিত। তাঁহার মত শুনিয়া আমরা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলাম। প্রতিবাদের আশঙ্কা না করিয়া বলা যাইতে পারে তাঁহার মত সাধারণ মতের বিরোধী। কিন্তু ইহা তাঁহার স্বাধীন চিন্তার পরিচায়ক। তাঁহার সমালোচনা করিবার ক্ষমতা যে অতি উচ্চ দরের ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন। এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার কিছু পরে তিনি (Calcutta Review) কল্‌কাতা রিভিউএ English Influence on Bengali Literature অর্থাৎ বাংলাসাহিত্যের উপর ইংরেজির প্রভাব শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার কিছু পরে আমার অগ্রজ শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে এবারে কল্‌কাতা রিভিউতে বরদাচরণ মিত্র একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছে; তাঁহাকে জান। তিনি উত্তরে বলিলেন যে বরদা বাবু সম্প্রতি এম্-এ পাশ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র শুনিয়া কহিলেন, "ছোকরাটির বেশ ক্ষমতা আছে। তোমার বাবার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে ঠিক জিনিসটি ধরিয়াছে।" বরদা বাবু লিখিয়াছিলেন—

"A broad humanity and an ample power have saved Dinabandhu Mittra from those snares and pitfalls into which less wary writers have been betrayed."

ইহার কয়েক বৎসর পরে বঙ্কিমচন্দ্র আমার পিতৃদেবের গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণ উপলক্ষে "দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব" শীর্ষক সহানুভূতিপূর্ণ ভূমিকায় গুণের যে পূর্ণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহাতে প্রকারান্তরে বরদা বাবুর মতের পোষকতা করা হইয়াছে। বিচারকার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় তাঁহার প্রতিভা বিকাশের ব্যাঘাত হইয়াছিল কি না বলা কঠিন; তবে তাঁহার অকালমৃত্যুতে যে সে প্রতিভা পূর্ণ বিকশিত হইল না তজ্জন্য সাহিত্যানুরাগী মাত্রেই যারপরনাই দুঃখিত।

এবার ব্যক্তিগত-ভাবে তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। ইনি ৺ বেণীমাধব মিত্র মহাশয়ের পুত্র। তিনি অতি সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। পুত্রে সে গুণ সম্পূর্ণরূপে আসিয়াছিল। তাঁহার পিতা বহু বৎসর পেন্‌সন্ ভোগ করিয়া ৯১ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। সে প্রায় চারি বৎসর হইবে। তাঁহার জননী এক্ষণে

বর্ত্তমান। বৃদ্ধ বয়সে একমাত্র পুত্ররত্ন হারাইয়া তিনি যে দুর্ব্বিষহ শোকে ভুগিতেছেন স্বয়ং ভগবানই তাঁহাকে সে শোকে সান্ত্বনা দান করিবেন, মনুষ্যের পক্ষে তাহা অসাধ্য। তিনি পিতা মাতাকে ভগবানের প্রতিবিম্বরূপে পূজা ও ভক্তি করিতেন। তাঁহার বৈঠকখানায় অন্য ছবি থাকিত না, তাঁহার পিতা মাতার তৈলচিত্র প্রতিমার ন্যায় বিরাজ করিত। তাঁহার মাতার সিন্দূররঞ্জিত শুভ্র কেশ ও পবিত্র মূর্ত্তি দেখিলে মস্তক আপনা হইতেই নত হয়; হৃদয় ভক্তিতে আপ্লুত হয়। বরদা বাবু সাতিশয় বন্ধু-বৎসল ছিলেন। যাঁহারা তাঁহাকে বন্ধুরূপে পাইয়াছিলেন তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহাদের দুঃখ বর্ণনীয় নহে। বিপন্ন আর্ত্ত ও নিঃস্ব ব্যক্তিদিগকে সান্ত্বনা ও সাহায্য করা তাঁহার জীবনের আর একটি ব্রত ছিল।

তিনি সুন্দর কান্তিমান ছিলেন। তাঁহার আয়ত লোচনে প্রতিভা প্রতিফলিত ছিল। "লীলাবতী" নাটকে পড়িয়াছি—

> জ্ঞান-জ্যোতি-বিস্ফারিত আকর্ণ নয়ন,
> সতত সজল শোভা আভার কারণ।

বরদা বাবুতে এ বর্ণনার সার্থকতা পাওয়া যায়। তিনি যখন হেয়ার স্কুলে পড়িতেন শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে "that boy with large bright eyes" বলিয়া উল্লেখ করিতেন। কবিতা পাঠকালে তিনি কবির সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে বিভোর হইতেন এবং অতি সুন্দর ও মনোহর আবৃত্তি করিতে পারিতেন। কলিকাতায় সাহিত্যসম্মিলনের অধিবেশনে তিনি "মহিম্ন-স্তোত্রম্" অনুবাদ করিয়া পাঠ করেন। তাঁহার আবৃত্তি শুনিয়া একজন ভাবুক লিখিয়াছিলেন "সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াইয়া সৌম্যমূর্ত্তি বরদাচরণ যখন কবিতা পাঠ করিতেছিলেন, তখন আমাদের মনে হইয়াছিল কবির কণ্ঠস্বরের প্রত্যেক লহরীতে যেন অতৃপ্ত আকুল রসনার উচ্ছ্বাস তরঙ্গায়িত হইয়া, কোন্ সুদূর স্বপ্নরাজ্যের মাঝখানে স্বর্ণ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ঈপ্সিত চরণে কবির ভাব-প্রাণ-অনুভূতি-ময় হৃদয়ের আহ্বান-বারতা নিবেদন করিতেছিল।" তাঁহার নিবেদন সেই চরণে পৌঁছিয়াছিল, কারণ তিনি অচিরেই তথায় স্থান পাইয়াছেন।

শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র।

হারামণি

[এই বিভাগে আমরা অজ্ঞাত অখ্যাত প্রাচীন কবির বা নিরক্ষর স্বল্পাক্ষর গ্রাম্য কবির উৎকৃষ্ট কবিতা ও গান ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিব। প্রবাসীর পাঠকপাঠিকা এই কার্য্যে আমাদের সহায় হইবেন আশা করি। অনেক গ্রামেই এমন নিরক্ষর বা স্বল্পাক্ষর কবি মাঝে মাঝে দেখা যায় যাঁহারা লেখাপড়া অধিক না জানা সত্ত্বেও স্বভাবতঃ উৎকৃষ্ট ভাবের কবিত্বরসমধুর রচনা করিয়া থাকেন; কবিওয়ালা, তর্জ্জাওয়ালা, জারিওয়ালা, বাউল, দরবেশ, ফকির প্রভৃতি অনেকে এই দলের। প্রবাসীর পাঠক-পাঠিকারা ইহাঁদের যথার্থ কবিত্বপূর্ণ বা রসভাবপূর্ণ রচনা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলে আমরা সাদরে প্রকাশ করিব।]

(১)

যাইতে তো চায় না রে মন মক্কা মদিনা।
এই যে বন্ধু আমার আছে
আমি রই যে তারি কাছে,
পাগল হৈতাম দূরে রৈতাম তারে চিনতাম রে যদিনা।
নাদান হৈতাম দূরে রৈতাম ও সে ডাকতো রে যদিনা॥
আমার নাই মন্দির কি মসজেদ,
নাই পূজা কি বকরেদ,
তিল তিলে মোর মক্কা কাশী পল পলে সুদিনা॥

(২)

ত্রেথা তারে খুইজে মরা মাটির এই বৃন্দাবনে।
ভুইঞে নি সে বসবারি ধন, বসবে হিঞের সিংহাসনে।
ত্রেথা সে যমুনার কূলে
ত্রেথা সে কদম্ব-মূলে
ত্রেথা কুঞ্জে মরিস ভুলে,
দেখনা চেঞে আপন মনে॥
যৌবন / লগন } তো নয় সস্তা হাতে
ছড়িয়ে দিবি যাতে তাতে
যাচ্চে বয়ে দিনে রাতে,
দেখনা খুঁজে সযতনে॥

প্রথম গানটি নদীয়া জেলার জলাঙ্গী ষ্টেসনের কাছে মুসলমান বাউলদের কাছে পাওয়া। রচয়িতার পরিচয় বলিতে পারে না, বলে—পুরাতন সাধকের লেখা, নাম আনওার, দুইশত বৎসর পূর্ব্বেকার লোক বলিয়া অনুমান হয়, কারণ বাউলদের গুরুপরম্পরায় প্রায় দেড় শত বৎসর এই গান চলিতেছে।

দ্বিতীয় গানটি পুর্ব্বোক্ত স্থানেই হিন্দু বাউলদের কাছে পাওয়া। রচয়িতা গঙ্গারাম, জাতিতে নমশূদ্র। প্রায় ১৭৫ বৎসর পূর্ব্বের লোক। বাউলের দল দক্ষিণ সাহাবাজপুর (বরিশাল) হইতে মালদহ জেলার রামকেলীর মেলায় যাইতেছিল।

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন।

হরিকে কালী বলা ভুল,
কালীকে হরি বলা ভুল।
আমি ভেবে ভেবে হলাম পাগল,
পেলাম না তার মূলামূল।
ঘটা ক'রে ফোঁটা কেটে কত কাণ্ড করেছি,
তিন বেলা গঙ্গা নেয়ে কত মন্ত্র পড়েছি,
কর্‌তে কর্‌তে প্রাণায়াম,
জন্মিল হাঁপানির ব্যারাম,
দিন দু'চার উপোষ করে'
ফল পেলাম তার পিত্তশূল।
হরি হরি হরি বলে' বাজায় রে করতাল খোল,
গোটা দু'চার ষণ্ডা জুটে করে কেবল গণ্ডগোল,
রস পায়না একবিন্দু,
উথলে না প্রেম-সিন্ধু,
বিন্দু রস পেলে পরে
তার বাগানেতে ফুট্‌ত ফুল।

উপরোক্ত রহস্যসঙ্গীতটির রচয়িতা কেরামত আলি খাঁ মুন্সি। ইনি নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ মেহের কালীবাড়ীতে থাকিতেন। ইনি একজন ভাবোন্মত্ত সাধক ছিলেন।

কিরণচাঁদ দরবেশ।

নদিয়া জেলার অন্তঃর্গত কুষ্টিয়ার নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামে সেরাজ সাঁই ও লালন সা ফকিরের আস্তানা আছে। তাঁহাদিগের রচিত অনেক দেহতত্ত্ব গান এখন নদিয়া যশোহর ও ফরিদপুর অঞ্চলে গীত হইয়া থাকে। গানগুলি মুসলমান ফকিরের রচিত। প্রত্যেকটি গানই ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত ও ভাবপরিপূর্ণ। ফকিরদের দুইটি গান পাঠান হইল।

(১)

কথা কয় রে—
দেখা দেয় না।
নড়ে চড়ে হাতের কাছে—
খুজ্‌লে জনম- (আমরি)-ভ'র মেলে না॥
খুজি তারে আস্‌মান জমি।
আমারে চিনিনে আমি;
আমি একি বিষম ভুলে ভ্রমি!
আমি কোন্ জনা সে কোন্ জনা। (১)
রাম রহিম নাম বল্‌ছে কোন্ জন?
খতিজল (?) কিবা হুতাশন?
শুধাইলে তার অন্বেষণ
মূর্খ দেখে কেউ বলে না। (২)
(যদি) হাতের কাছে না হয় খবর
কি দেখ্‌তে যাও দিল্লি লাহোর?
সেরাজসাঁই কয় লালন রে তোর
সদাই মনের ভ্রম যায় না। (৩)

(২)

পাখী কখন যেন উড়ে যায়!
বদ্ হাওয়া লেগে খাঁচায়।
খাঁচার আড়া প'ল ধসে',
পাখী আর দাঁড়াবে কিসে?
এখন আমি ভাবি বসে'
সদা চমক-জ্বরা বচ্ছে গায়। (১)
কার বা খাঁচায় কার বা পাখী
কার জন্যে বা ঝরে আঁখি?
(পাখী) আমারি আঙ্গিনায় থাকি
আমারে মজাতে চায়। (২)
(যেদিন) সুখের পাখী যাবে উড়ে,
খালি খাঁচা রবে প'ড়ে;
(সেদিন) সঙ্গের সাথী কেউ হবে না
লালন ফকির কেঁদে কয়। (৩)

শ্রীসতীশচন্দ্র দাস।

(১)

আমি নিত্য নিত্য ভাসাই জলেরে ভাসাই জলে·
(আহা) আজ কেন ফুল উজান চলে—
ষড়দলের মাঝখানে ফুল ফুইটাছে ঐ কলে বলে
সাধু মুনি ঋষি তারা ঐ ফুলের
ভাবনা করে
ভাবনা করে॥

(২)

গুরু গম্য বিনে নেওয়া বিষম দায়
(হায়রে মন) যেন কারিকরে কল ঘুরায়
এ নায় দুটো কোণার গোলোই
(এই) করতেছে থৈ থৈ

বাতাস নাই তার তুফান এল কৈ
ঐ যে দাঁড়ি মাঝি গোলমাল করে
বুঝি মধ্য-গাঙে নাও ডুবায় ॥

এই গান দুটি বরিশাল জিলায় গৈলা গ্রামে ৺রাধানাথ দাস নামক একজন পাগলের তৈয়ারী। সে ভিক্ষা করিবার সময় এই রকম গান গাহিয়া ভিক্ষা করিত। প্রায় নয় দশ বৎসর পূর্ব্বের শোনা।

শ্রীসুহৃৎকুমার গুপ্ত।

(বাউলের সুর)

আজ আমার কাঁদা মাখাই সার হল!
ধর্ম্ম-মাছ ধরবো ব'লে, নাম্‌লাম জলে,
আমার ভক্তির জাল ছিঁড়ে গেল!
সত্য সেই ধর্ম্ম-বিলে,
সুরসিক বাগ্‌দি জেলে,
ছিট্‌কি জাল ফেলে এবার
তারাও মাছ ধরলো ভাল;
সারা বিল খুঁজে পাই চাঁদা পুঁটি,
তাও লোভ-চিলে নিয়ে গেল!
কুসঙ্গীর সঙ্গ নিলাম,
কুক্ষণে বিল গাবালাম,
ক্ষমা-খালই হারাইলাম
উপায় কি করি বল?
আমি হিংসা নিন্দা গুগ্‌লি ঝিনুক
তাই পেয়েছি কতগুলো।
মাছ ধরায় পেঁচ পড়েছে,
ছয়টা ভূত পাছ লেগেছে,
ভয়ে প্রাণ শুকায়ে গেছে
আরো বাদী দশজনা;
অধীন "জহর" বলে তাঁর চরণ ভুলে
আমি হয়েছি এলোমেলো।

একটি ভক্ত বাউল একতারা সহযোগে ঘরে ঘরে নৃত্য করিতে করিতে এই গানটি গাহিয়া গাহিয়া ফিরিত। সাধন-পথের বিবিধ পরিপন্থীর ভিতরে ভক্ত বাউল ধর্ম্মজীবনের ব্যর্থতার উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ করিতেছেন। রচয়িতা বাউলের নাম "জহর" ইহা গানের ভিতরেই প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীশশিভূষণ মিত্র।

মাঝি বাহিয়া যাও রে, এ লহর দরিয়া-মাঝে
আমার ভাঙ্গা নাও।
ঘরখানি ভাঙ্গা মনা-ভাই! দোর কেন বান্ধ;
(ওরে) আপনি মরিয়া যাইবা, পরের লাগি কান্দ
কুমারের হাড়ি পাতিল ভাঙ্গলে না যায় জোড়া,
এমন সোনার তনু, কেমনে যাইবে পোড়া।
সমুদ্রের মাঝে মনাভাই, ভাসিয়া ফিরে পানা,
কেমন গোয়ারে বলে, এ দেহ আপনা।
পুত্র হৈল পায়ের বেড়ী, স্ত্রী হৈল কাল,
(ওরে) ছাড়িয়া না ছাড়ে আমার এ ভবজঞ্জাল ॥

গান দুটি কাহার রচিত জানা নাই।

শ্রীক্ষিতিশচন্দ্র দস্তরায়।

গত আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে যে মনোমোহনের গান বাহির হইয়াছিল বহু লোকে তাঁহার পরিচয় জানাইয়াছেন। স্থানাভাবে প্রকাশ করা গেল না। মনোমোহন দত্ত মহাশয়ের জীবনী ও তাঁহার রচিত গানের বই 'মলয়া' আনন্দ আশ্রম, সাতমুড়া, ত্রিপুরা ঠিকানায় পাওয়া যায়—মূল্য এক টাকা ও আট আনা।—সম্পাদক।

কষ্টিপাথর

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম—হীনযান ও মহাযান।

হীনযান ও মহাযানে প্রভেদ কি? হীনযান বলিয়া কোন যান নাই। মহাযানেরা আগেকার বৌদ্ধদের হীনযান বলিত। যেহেতু তাহারা 'মহা', সুতরাং তাহাদের আগেকার যাহারা, তাহারা 'হীন' অর্থাৎ ছোট। আগে-কিন্তু দুটি যান ছিল,—(১) প্রত্যেকবুদ্ধযান বা প্রত্যেকযান আর (২) শ্রাবকযান। বুদ্ধদেবও প্রত্যেকবুদ্ধযান স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, যখন পৃথিবীতে কোন বুদ্ধ উপস্থিত নাই, তাঁহার মুখ হইতে ধর্ম্মকথা শুনিবার কোন সুবিধা নাই, তখনও লোকে আপনার চেষ্টায়, জন্মজরামরণাদির হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে। হিন্দুদের ঋষিরা এইরূপে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। এইরূপে যাহারা নিজের যত্নে, বুদ্ধের সাহায্য না পাইয়া, উদ্ধার হয়, তাহাদিগকে প্রত্যেকবুদ্ধ বলে; তাহাদের যান প্রত্যেকবুদ্ধযান। এই প্রত্যেকবুদ্ধেরা আপনিই উদ্ধার হইতে পারে, আর কাহাকেও উদ্ধার করিবার শক্তি ইহাদের নাই।

বুদ্ধের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিয়া যাহারা ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করে, তাহাদের নাম 'শ্রাবক'। তাঁহারা প্রথমে 'শ্রাবক' হন, তাহার পর 'ভিক্ষু' হন, বিহারে বাস করেন। অনেকদিন বিহারে থাকিতে থাকিতে 'স্রোতাপন্ন' হন, 'সকৃতাগামী' হন, 'অনাগামী' হন, পরে 'অর্হৎ' হইয়া যান। ইঁহারাও জন্মজরামরণাদি হইতে অব্যাহতি পান, কিন্তু ইঁহারাও কাহাকেও উদ্ধার করিতে পারেন না। ইঁহাদের যান, 'শ্রাবকযান'। বুদ্ধ নির্ব্বাণ পাইলে তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য হইতে যাঁহারা ধর্ম্মকথা শোনেন, তাঁহারা পর পর জন্মে ধার্ম্মিক বৌদ্ধ হইতে পারেন, কিন্তু আবার না যতদিন বুদ্ধদেবের প্রাদুর্ভাব হয় ততদিন তাঁহাদের মুক্তি পাইবার উপায় নাই। একজন বুদ্ধের শ্রাবক অনেক জন্মের পর আর-একজন বুদ্ধের কাছে উদ্ধার হইতে পারেন।

মহাযানের লোকেরা বলিত 'প্রত্যেক' ও 'শ্রাবক' এই দুই যানই হীন, কারণ ইহারা প্রত্যেকেই অত্যন্ত স্বার্থপর, ইহাদের কাছে যেন জগৎনাই। উহারা আপনাদিগকে মহাযান বলে,যেহেতু তাহারা আপনার উদ্ধারের জন্য তত ভাবে না, জগৎ-উদ্ধারই তাহাদের মহাব্রত। 'অবলোকিতেশ্বর' উদ্ধার হন হন,—মহাশূন্যে বিলীন হন হন, এমন সময়ে জগতের সমস্ত প্রাণী তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, আপনি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে কে আমাদের উদ্ধার করিবে? তাই শুনিয়া 'অবলোকিতেশ্বর' প্রতিজ্ঞা করিলেন, একটিও প্রাণী যতক্ষণ বদ্ধ থাকিবে, ততক্ষণ আমি নির্ব্বাণে প্রবেশ করিব না। এই যে করুণা, সর্ব্বভূতে দয়া, ইহাই মহাযানকে 'মহা' করিয়া তুলিয়াছে, আর ইহারই তুলনায় অপর দুই যানই হীন হইয়া গিয়াছে।

হীনযান অর্হত্ব পাইলেই খুসী, মহাযান বুদ্ধত্ব চায়। অর্হৎও নির্ব্বাণ পাইলেন, বুদ্ধও নির্ব্বাণ পাইলেন। উভয়েই জন্মজরামরণের হাত হইতে উদ্ধার পাইলেন। উভয়েরই বোধিজ্ঞান লাভ হইল। তবে অর্হতেরা হীনযান হইলেন, আর বুদ্ধ মহাযান হইলেন কেন? বুদ্ধ পরের উদ্ধারের জন্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন—তাই তিনি 'বুদ্ধ', আর তাঁহার শিষ্যেরা নিজেরাই উদ্ধার হইতেন—তাই তাঁহারা 'অর্হৎ'।

যখন মহাযান প্রচার হইতে লাগিল, তখন শ্রাবকযানেরা বলিল, এ একটা নূতন মত প্রচার হইতেছে, ইহা বুদ্ধের মত নহে। তখন মহাযানেরা বলিল, বুদ্ধদেব ত মগধের উদ্ধারের জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন। তোমরা ত তাহা কর নাই, সুতরাং তোমরা তাঁহার কথার মর্ম্ম বুঝ নাই। তোমরা বুদ্ধের অক্ষরার্থ গ্রহণ করিয়াছ, তাহার ভাবার্থ গ্রহণ করিতে পার নাই। তাহাতে শ্রাবকযান উত্তর করিল, বা! তা কি কখনও হয়,—'পরার্থে' কি উপদেশ হয়? উপদেশটা "স্বার্থের"ই হয়, সেটা 'পরার্থে' গিয়াই দাঁড়ায়। আমি তোমার উদ্ধারের জন্য উপদেশ দিলাম, তুমি উদ্ধার হইলে। আমার এ উপদেশটা কি 'স্বার্থে' উপদেশ হইল? আমি ত তোমাকে উদ্ধার করিয়া দিলাম, 'পরার্থে'ই উপদেশ দিলাম। এইরূপে রামের 'স্বার্থ', হরির 'স্বার্থ', শ্যামের 'স্বার্থ' হইতে হইতে সেই 'স্বার্থ'ই ত 'পরার্থ' হইয়া দাঁড়াইল। তবে তুমি আর 'পরার্থ' 'পরার্থ' বলিয়া একটা কি জাঁক করিতেছ? মহাযান বলিলেন, আমরা উহাকে 'পরার্থ' বলিতেছি না। তোমার উপদেশ যদি তোমার শিষ্যের স্বার্থের জন্যই হয়, সেটা 'স্বার্থোপদেশই' হইল। তুমি ত আর তোমার শিষ্যকে পরের উদ্ধারের জন্য উপদেশ দিতেছ না? তুমি সকলকেই উপদেশ দিতেছ, বাপু জগৎ উদ্ধার কর। তুমি সম্বোধি পাইলে বটে, যাহার চেয়ে আর বড় সম্বোধি নাই, সেই সর্ব্বোচ্চ সম্বোধি 'অনুত্তর-সম্বোধি' তুমি পাইলে কই? তোমাদের শ্রাবকযান ত কিছুতেই বুদ্ধ হইবার উপায় হইতে পারে না' কারণ তোমরা প্রত্যেকেই চাহ অর্হৎ হইতে; তোমরা বুদ্ধ হইবার উপায় জান না। তোমরা মহাযানের মর্ম্ম জান না, তোমরা হীনযানই থাকিবে।

তোমরা অর্হৎ হইতে চাও, 'বোধিসত্ত্ব' কাহাকে বলে তাহা তোমরা জান না। তোমরা জান বুদ্ধ এককালে বোধিসত্ত্ব ছিলেন, আর মৈত্রেয় একজন বোধিসত্ত্ব আছেন, তিনি একদিন বুদ্ধ হইবেন। তোমরা বোধিসত্ত্ব হইতে চাও না। কিন্তু বোধিসত্ত্ব না হইলে ত একেবারে বুদ্ধ হইবার যো নাই। বোধিসত্ত্ব হইবার উপদেশের 'আশয়' অতি উচ্চ; অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা, তাহার জন্য শিক্ষা, তাহার জন্য সাধনা, অতি উচ্চ; তাহার জন্য যে-সকল সামগ্রী আবশ্যক, তাহা অতি দুর্লভ; তাহার জন্য কত জন্ম যে সাধনা করিতে হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তোমাদের আকাঙ্ক্ষা অতি অল্প, উপদেশ সহজ, সাধনা সহজ, সামগ্রী অল্প ও সুলভ। তোমরা ত তিন জন্মেই আপনার কার্য্যসিদ্ধি করিয়া লইতে পার। এই-সকল কারণেই আমরা তোমাদের 'হীন' বলি। আর আমাদের আকাঙ্ক্ষা কত বড়, আমরা বুদ্ধ হইব; আমাদের উপদেশ কত বড়,—আমরা জগৎ উদ্ধার করিবার উপদেশ দিই; আমাদের সাধনা কত উচ্চ,—আমরা একাই জগৎ উদ্ধার করিব,—এই আমাদের সাধনা; আমাদের সামগ্রী ব্রহ্মাণ্ডময়, আর আমরা যত জন্মই যাউক না,—আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হইলে কিছুতেই বিরত হইব না। দেখ দেখি, আমাদের যান মহাযান কিনা?

শ্রাবকযান বলিতেছেন—তোমার বুদ্ধবচনের উপর বড়ই আদর দেখিতেছি, কিন্তু বুদ্ধবচন হইতে গেলে 'সূত্রে' ত থাকা চাই, 'বিনয়ে' ত থাকা চাই, 'অভিধর্ম্মে'ও থাকা চাই। এই লইয়াই ত 'ত্রিপিটক'। ত্রিপিটকের বাহিরে ত বুদ্ধবচন নাই। তোমাদের এসব কোথায়? তোমরা ত বলিয়া বেড়াও কোন ধর্ম্মেরই 'সত্তা' নাই,—'স্বভাব' নাই। তোমাদের মতে ত সবই অভাব,—সবই শূন্য। এ-সকল বুদ্ধবচন হইল কিরূপে? তাহার উত্তরে মহাযান বলিতেছেন—কেন আমাদের ত শত শত সূত্র রহিয়াছে। এক প্রজ্ঞাপারমিতাই ত সকল সূত্রের রাজা, তাহার পর আরও কত সূত্র আছে। বোধিসত্ত্বের বিনয়—সে অতি বড়। বিনয়ের উদ্দেশ্য ত ক্লেশনাশ, সমস্তা'বিকল্প' ক্লেশ। যখন 'পরমার্থ সত্য' জানিতে পারিব, সমস্ত বিকল্প নাশ হইয়া যাইবে। যখন নির্ব্বিকল্প হইয়া যাইব, তখনই আমাদের বিনয়ের চূড়ান্ত হইবে। আমাদের 'বিনয়' ছোটখাট কথা লইয়া ব্যস্ত থাকে না; আমাদের বিনয়ের উদারতা ও গভীরতা তোমাদের বিদ্যাবুদ্ধির অতীত। আর অভিধর্ম্ম ত ধর্ম্ম লইয়া। আমাদের ধর্ম্ম 'অনুত্তর-সম্যক্‌সম্বোধি' প্রাপ্তি। সুতরাং আমাদেরও 'সূত্র'ও আছে, 'বিনয়'ও আছে, 'অভিধর্ম্ম'ও আছে।

শ্রাবকযানে সর্ব্বপ্রথম 'ত্রিশরণ'গমন, তাহার পর 'পঞ্চশীল'গ্রহণ। এদুটি জিনিস গৃহস্থরাও করিত, ভিক্ষুরাও করিত। ইহার পর 'অষ্টশীল'-গ্রহণ অর্থাৎ ঐ পাঁচের উপর আরও তিন,—স্রক্‌চন্দনাদি ত্যাগ, রূঢ়বাক্যপ্রয়োগ ত্যাগ, গীতাদি ত্যাগ। এই যে তিনটি শীল, ইহা খুব উচ্চ ভক্ত গৃহস্থের জন্য। গৃহস্থ ইহার উপর আর যাইতে পারিবে না। ইহার উপর আর দুটি শীল দিলে দশ শীল হয়। সে দুটি উচ্চাসন-মহাসন-ত্যাগ ও কাঞ্চনত্যাগ। এ দুটি শীল শুধু ভিক্ষুদিগের জন্য, গৃহস্থের ইহাতে অধিকার নাই। এ দশ শীল ছাড়া শ্রাবকযানের আর একটা বড় জিনিস 'পোষধ'ব্রত, অর্থাৎ উপোষ করা। দুই অষ্টমীতে, দুই চতুর্দ্দশীতে, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় উপোষ করিয়া কেবল ধর্ম্মকথা শুনিবে। সেইদিন গৃহস্থ ও ভিক্ষু সবাই বিহারে আসিয়া ধর্ম্মচর্চ্চা করিবে।

মহাযানে আমরা ত্রিশরণগমনের কথা খুব পাই। শীলরক্ষার কথাও পাই। কিন্তু 'পোষধ'ব্রতের কথা বড একটা পাই না। শীল-রক্ষাটা শ্রাবকেরা যত বড় বলিয়া মনে করেন, বোধিসত্ত্বেরা তত বড় বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের ধর্ম্ম আর-একরূপ; তাঁহারা 'শরণ'-গমনের পরই কিসে বোধিলাভের জন্য একান্ত আগ্রহ জন্মে, তাহারই চেষ্টা করেন, ইহারই নাম 'চিত্তোৎপাদ' বা 'বোধিচিত্তোৎপাদ'। 'বোধিচিত্তোৎপাদের' পর আর দুইটি কথা শুনিতে পাই,—'পাপদেশনা' ও 'পুণ্যানুমোদনা' অর্থাৎ পাপ কাহাকে বলে তাহার উপদেশ ও পুণ্যের প্রতি আসক্তি। ইহার পর তাঁদের 'ষট্‌পারমিতা'। পারমিতা শব্দের অর্থ লইয়া বড় গোলযোগ আছে; অনেকে ইহার অর্থ করেন 'পারং ইতা' অর্থাৎ যে পারে গিয়াছে অর্থাৎ যে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। আর এক ব্যাখ্যাও আছে,—মিশ্রভাষায়, পরমস্য ভাবঃ—'পারম্যং' শব্দটি 'পারমি' হইয়া যায়। বৌদ্ধসংস্কৃতেও 'পারমি' শব্দের অনেক প্রয়োগ আছে। তাহার উপর ভাবে 'তা' করিলে, পারমিতা হয়। অর্থ হয়,—পরমের ভাব,—সর্ব্বোৎকৃষ্টের ভাব। তাহা হইলে দানপারমিতা শীলপারমিতা প্রজ্ঞাপারমিতার অর্থ হয়,—সর্ব্বোৎকৃষ্ট দানের ভাব, সর্ব্বোৎকৃষ্ট শীলের ভাব

ইত্যাদি। বোধিসত্ত্বগণ শীলরক্ষার জন্য বড় ব্যস্ত হইতেন না, অথবা সেটা তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধই হইয়া যাইত। তাঁহারা শীলের চরম উৎকর্ষ লাভ করিবার চেষ্টা করিতেন। এই জায়গায় মহাযান ও হীনযানে বড়ই তফাৎ দেখা যায়। হীনযানে 'বিরত' হইবার জন্য প্রতিজ্ঞা হইত, "আমি প্রাণাতিপাত হইতে বিরত হইব, মিথ্যা কথা হইতে বিরত হইব।" হীনযানের শিক্ষা নিষেধমুখে, মহাযানের উপদেশ বিধিমুখে। হীনযানের যেন জীবনীশক্তি কম,—নাই বলিলেই হয়। এটা করিও না, ওটা করিও না,—চুপ করিয়া থাক। মহাযানের এই জীবনীশক্তি বড় বেশী। তাঁহাদের একটি পারমিতার নামই 'বীর্য্য', অর্থাৎ বীরত্ব অর্থাৎ উৎসাহ। শীলরক্ষা করিয়া যাইব, ক্রমে এমন হইয়া উঠিবে যে আমি শীলরক্ষায় সকলের উপর উঠিব এবং অন্যে যাহাতে শীলরক্ষা করিতে বা জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে, তাহার উপায় করিয়া দিব। মহাযানে বীর্য্য একটি পারমিতার মধ্যে। শুধু সামান্য উৎসাহ নহে; এমন উৎসাহ যে উহা হইতে আর বেশী কল্পনা করা যায় না।

শ্রাবকযানে চারিটি ধ্যানের কথা খুব শুনা যায়। চারিটি ধ্যানের নাম পাওয়া যায় না। একটিতে বিতর্ক থাকে, আর একটিতে থাকে না। একটিতে প্রীতি থাকে, আর একটিতে থাকে না। একটিতে সুখ থাকে, আর একটিতে থাকে না। যাহাতে সুখও থাকে না দুঃখও থাকে না সেইটিই চরম ধ্যান। তাহার পর ভিক্ষু ক্রমে 'স্রোতাপন্ন' 'সকৃতাগামী' ও 'অনাগামী' হইয়া পরে অর্হৎ হন। মহাযানে ধ্যানের কথা আছে, এ চারিটি ধ্যানের কথাও আছে, কিন্তু ইহা ছাড়াও অসংখ্য ধ্যান ও সমাধির কথাও আছে। ধ্যান ও সমাধি লইয়া তাঁহাদের অনেক পুস্তক আছে। স্রোতাপন্ন, সকৃতাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ এসকল শব্দ মহাযানে পাওয়া যায় না। ইহার বদলে পাওয়া যায় 'দশবোধি সত্ত্বভূমি' অর্থাৎ বোধিসত্ত্ব যেমন ধ্যান, ধারণা, দান, শীল, ক্ষান্তি ইত্যাদিতে ক্রমে দক্ষ হইতে থাকেন, তাঁহার মনোবৃত্তি-সকলও সেইরূপ ক্রমে উচ্চে উঠিতে থাকে। মানুষের মনোবৃত্তি অনন্ত। প্রথম ভূমিতে কতকগুলি থাকে, কতকগুলি ত্যাগ করা হয় এবং কতকগুলি প্রবল হইয়া উঠে। দ্বিতীয় ভূমিতে আবার কতকগুলি আসে; প্রথমের কতকগুলি, হয় একেবারে চলিয়া যায়, নয় ত হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে বোধিসত্ত্ব দশটি ভূমি অতিক্রম করিলে তবে তিনি নির্ব্বাণপথের যথার্থ পথিক হইতে পারেন। সে করুণার নাম পর্য্যন্ত শ্রাবকযানে দেখা যায় না, সেটি বোধিসত্ত্বের চিরসহচর, যতই উচ্চ ভূমিতে উঠিবেন ততই করুণা প্রবল হইতে থাকিবে।

পাঁচটি পারমিতায় দক্ষতালাভ করিলে তাহার পর 'প্রজ্ঞাপারমিতা'। 'প্রজ্ঞাপারমিতাই' আসল পারমিতা। কিন্তু শুধু প্রজ্ঞাপারমিতাও ঠিক নহে। অপর পাঁচের সহিত প্রজ্ঞাপারমিতা মিলিত হইলে পূর্ণ পারমিতা হয়। প্রজ্ঞাপারমিতার মোট কথা এই যে সত্য দুই প্রকার—সাংবৃত সত্য ও পরমার্থ সত্য। সাংবৃত সত্য,—ব্যবহারিক সত্য। আমরা চারিদিকে যে-সকল জিনিস দেখিতে পাই সেগুলিকে সত্য বলিয়া ধরিয়া না লইলে ব্যবহার চলে না; তাই সেগুলিকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। কিন্তু বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই, যে, তাহার একটিও সত্য নহে। পরমার্থ সত্য কখনই অন্যথা হয় না, সে চিরকালই সত্য থাকে, সেটিকে মহাযানেরা শূন্য বলেন।

হীনযান ত্রিশরণগমনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মহাযানেরও ত্রিশরণগমনের ব্যবস্থা আছে। ত্রিশরণগমনের মন্ত্র দুই যানেই এক, তবে মহাযানে ত্রিরত্ন, বুদ্ধ ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ নহে, ধর্ম্ম বুদ্ধ ও সঙ্ঘ। মহাযানে শাক্যমুনি একটি 'মানুষী' বুদ্ধ। মানুষীবুদ্ধদের মধ্যেও তাঁহার স্থান সাতের দাগে। এখনকার মহাযানেরা বলেন আমাদের ধর্ম্ম আদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। যাঁহারা মত চালাইয়াছেন, তাঁহারা 'ধ্যানীবুদ্ধ'। 'অমিতাভ' একজন 'ধ্যানীবুদ্ধ'। মহাযানে তাঁহার প্রভাব খুব অধিক। জাপানে তাঁহার খুব উপাসনা হয়। বৈরোচন আর-একজন বড় 'ধ্যানীবুদ্ধ'। ক্রমে মহাযানেরা শেষ অবস্থায় পাঁচজন ধ্যানীবুদ্ধ মানিত। শাক্যসিংহ-বুদ্ধ পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের একপ্রকার দ্বারপাল। মহাযানেরা তাঁহাকে মানে, যেহেতু তিনি তাহাদের সব জিনিস কলমবন্দী করিয়া দিয়াছেন।

বুদ্ধ অপেক্ষা ধর্ম্ম মহাযানে বড়। স্তূপ বা চৈত্যই ধর্ম্ম। সেই চৈত্যের গায়ে পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের মন্দির, সুতরাং ধর্ম্মের সঙ্গে বুদ্ধের কি সম্পর্ক তাহা এইখানেই বুঝা গেল। নেপালের মহাযানদিগের মধ্যে সঙ্ঘ বলিতে গেলে একবিহারে যতগুলি ভিক্ষু থাকে তাহাদিগকে বুঝায়; কিন্তু উহারা বলে সঙ্ঘ ক্রমে বোধিসত্ত্বে পরিণত হইয়াছে।

পূর্ব্বে যাহা ধর্ম্ম বুদ্ধ ও সঙ্ঘ ছিল, মহাযান খুব বাড়িয়া উঠিলে তাহাই হইল প্রজ্ঞা উপায় ও বোধিসত্ত্ব। ধর্ম্ম হইলেন প্রজ্ঞা, কারণ বৌদ্ধেরা, বিশেষ মহাযানেরা, ঘোর জ্ঞানবাদী। তাহারা ভাবে জ্ঞানই মুক্তি। বুদ্ধ হইলেন—উপায়। তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া, তাঁহার উপদেশ লইয়া, বাস্তবিক তাঁহাকে উপায় করিয়া, আমরা জ্ঞান পাইতে পারি। প্রজ্ঞা ও উপায় যখন ধর্ম্ম ও বুদ্ধের স্থান অধিকার করিলেন, তখন বিহারবাসী ভিক্ষুরা ত আর সঙ্ঘ হইতে পারেন না, তখন সঙ্ঘ আর-একটা কিছু উঁচু জিনিস হওয়া চাই, তখন সঙ্ঘ হইলেন—বোধিসত্ত্ব।

এইরূপে আমরা হীনযান ও মহাযান যতই তুলনা করি, ততই দেখিতে পাই, যে, হীনযান ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি লইয়া ব্যস্ত, আর মহাযান দার্শনিক মত ও পারমিতা লইয়া ব্যস্ত। স্বভাবচরিত্র বিশুদ্ধ হইলে, মানুষ পৃথিবীর বস্তু ছাড়িয়া কোন উচ্চতর বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করিলে নিশ্চয়ই বড় হয়। হীনযান মানুষকে সেইরূপ বড় করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু মহাযান তাহাতে তৃপ্ত হইতেন না। তাঁহারা মানুষকে সর্ব্বময় সর্ব্বনিয়ন্তা করিবার চেষ্টা করিতেন। দর্শনে তাঁহারা শূন্যবাদী, নীতিতে তাঁহারা করুণাবাদী। তাই তাঁহারা আপনাদিগকে বড় বা 'মহা' মনে করিতেন ও শ্রাবক ও প্রত্যেকযানকে 'হীন' বা ছোট মনে করিতেন।

(নারায়ণ, আষাঢ়) শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

আলোচনা

ডেকরাপাড়া।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় আষাঢ়ের প্রবাসীতে "শ্রীবিক্রমপুর ও তাহার উপকণ্ঠ" নামক ঐতিহাসিক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে "যাহারা অনেক বয়সেও উলঙ্গ হইতে সঙ্কোচ বোধ করে না তাহাদিগকে ডেকরা বলিয়া গালি দেওয়া হয়। তাই ডেকরাপাড়া নামে বোধহয় গ্রামটিতে উলঙ্গ জৈনদিগের নিবাস ছিল।" ইহাতে মনে হয় ভট্টশালী মহাশয় কেবলমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে বজ্রযোগিনী গ্রামের দক্ষিণস্থ অংশ ডেকরাপাড়া (বর্ত্তমান দেপাড়া) নামক স্থানের ইতিহাস অন্যরূপ। অতি প্রাচীনকাল হইতে 'দেও' বংশ (বা 'দে' বংশ) তথায় বাস করিয়া আসিতেছেন এবং প্রাচীন একঘর 'কর' বংশকেও তথায় বাস করিতে দেখা যায়। 'দে' ও 'করের' বাসভূমি ডেকরাপাড়ার পুরাতন দলিলপত্রে ইহাকে 'দেকর'পাড়া নামে উল্লিখিত হইতে দেখা যায়। উক্ত গ্রামনিবাসী একটি বৃদ্ধ মুসলমান ও নিকটবর্ত্তী 'আলদি'-নিবাসী একজন প্রাচীন কুম্ভকার ইহাকে ডেকরপাড়া নামে অভিহিত করিত। সুতরাং কালসহকারে দেকরপাড়া পরিবর্ত্তিত হইয়া ডেকরপাড়া বা ডেকরাপাড়ায়

পরিণত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কোন সময়ে এখানে জৈন ছিল কি না বর্ত্তমান নামদ্বারা তাহা প্রমাণিত হয় না।

শ্রীযোগেশচন্দ্র দেওয়ানজি।

পুস্তক-পরিচয়

পূজা ও সমাজ—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত মূল্য পাঁচ সিকা, কাপড়ে বাঁধা দেড় টাকা।

লেখক বইখানিতে অনেক জটিল বিষয়ের মীমাংসা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রবন্ধগুলি সমস্তই সুচিন্তিত। হিন্দুধর্ম্মের পূজা-প্রসঙ্গে তিনি যে বিদ্যাবত্তা ও উদারতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। তাঁহার মতে, সম্মুখে একটা ধ্বজা খাড়া করিয়া সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ফুলজল ঢালিলে এবং উপবাস করিলেই ধর্ম্ম হয় না। জ্ঞান এবং কর্ম্মের সহিত ধর্ম্মের একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। ধর্ম্মার্জ্জন করিতে হইলে 'সত্যকে আশ্রয় করিয়া আগে জ্ঞানার্জ্জন করিতে হইবে, জ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনার দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ অবগত হইয়া ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত এবং চিত্তকে স্থির করিয়া তপস্যা করিতে হইবে—কর্ম্ম করিতে হইবে।' সমাজপ্রসঙ্গে তিনি বিদেশ ভ্রমণ, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি বহু বর্ত্তমান সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন। নিজের বক্তব্য বিষয়ের সমর্থনের জন্য তিনি বহু প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মত সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার সংগ্রহ সমস্তই সুন্দর। মোটের উপর বইখানি পড়িয়া আমরা বাস্তবিক আনন্দ লাভ করিয়াছি। দেশের এই দুর্দ্দিনে আমরা এরূপ পুস্তকের বহুল পরিমাণে প্রচার প্রার্থনা করি।

হট্টের ধনসম্পদ—শ্রীরজনীকান্ত দেব বি-এ প্রণীত।

দেশের ভিতর দারিদ্র্য যদি অটল আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকে তবে দেশের কোনো শক্তি এমন কি দেশের সাহিত্যও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে না—এই কথাটাই শ্রীহট্টের শিক্ষিত যুবকদের নিকট প্রবন্ধকার বিশেষ করিয়া নিবেদন করিয়াছেন। এযুগের সাহিত্য যে সাধারণ লোককে বাদ দিয়া চলিতে পারে না—যাহারা প্রতিদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া দেশের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিয়া দিতেছে সেই কৃষক ও কুলিমজুরদিগকেই কেন্দ্র করিয়া এখনকার সাহিত্য এবং কাব্য যে গঠিত হইয়া উঠিবে, ঋষি টলষ্টয়, টুর্গেনিভ, হুইটম্যান প্রভৃতি মনীষীগণ তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। দেশে সার্ব্বভৌম সাহিত্যচর্চ্চার প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে আগে দেশের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে হইবে। "চিন্তা-গ্রস্ত হৃদয়ে বুভুক্ষিত উদরে সার্ব্বভৌম সাহিত্যচর্চ্চা হইতে পারে না।" কি করিয়া শ্রীহট্টের ধনসম্পদ বৃদ্ধি হইতে পারে রজনীবাবু এই প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে অনেক কাজের কথার আভাস দিয়াছেন। আমরা শ্রীহট্টের শিক্ষিত যুবকসম্প্রদায়কে তাঁহার প্রবন্ধ বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

তপোবন, ধ্যানলোক—শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত।

এ দুইখানি কবিতাপুস্তক। বহু মাসিকের পৃষ্ঠায় কবির বহু কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং সাধারণের নিকট তাঁহার নাম অপরিচিত নহে। তাঁহার সাহিত্যসাধনা যে প্রশংসনীয় তাহাও অস্বীকার করিবার যো নাই। কিন্তু তিনি যে পথে তাঁহার সাধনার রথ পরিচালিত করিয়াছেন সে পথ নিজের শক্তিতে কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া লইবার মতো ক্ষমতা তাঁহার আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। Lyricএর (গীতি-কবিতার) ধর্ম্ম নিজের মনকে কেন্দ্র করিয়া এক একটি ভাব শতদল পদ্মের মতো শোভায় এবং সৌন্দর্য্যে, রঙে এবং মাধুর্য্যে অপরূপ করিয়া ফুটাইয়া তোলা। ভগীরথের মতো পথ দেখাইয়া ভাবের গঙ্গাকে মুক্তি দেওয়াতেই গীতি-কবিতার কবির সার্থকতা। সেখানে বাঁধা পথের সহজ ও স্বচ্ছন্দ গতি নাই। তাঁহার কাজ অনুকরণ নহে—সৃষ্টি করা। জীবেন্দ্র বাবুর এতগুলি কবিতার ভিতর আমরা কোথাও সে শক্তির পরিচয় পাই নাই। এতগুলি কবিতার ভিতর কোথাও ভাবের গভীরতা নাই। কেবল "কথার উপরে কথা।" অথচ সেই কথাগুলিও এত হাল্কা যে ছন্দ হাজার রাশ টানিয়াও তাহাদিগকে বশে রাখিতে পারে নাই। তাহাদের এতটুকু প্রাণ বঁড়শীর ফাতনার মতো যেখানে-সেখানে উপরে উপরে কেবল ভাসিয়াই বেড়াইয়াছে—আপনাকে আড়ালে রাখিয়া রসের দিকটা চোখের সামে তুলিয়া ধরিতে পারে নাই। ছন্দে কবির হাত একেবারে মন্দ নহে। কিন্তু তাহার আগা গোড়া সমস্তই রবীন্দ্রনাথের; এমন কি শব্দের বিন্যাসগুলিও রবীন্দ্রনাথের শব্দবিন্যাসের সহিত একেবারে মিশিয়া যায়; দুই-চারিটি কবিতার ভাবও যে না মিলে এমন নহে। তপোবন এবং ধ্যানলোকে বসিয়া কবি "ধার-করা ভাব আর জোর-করা ভাষার" ধ্যান করিয়াছেন দেখিয়া বাস্তবিকই দুঃখ হয়।

চন্দ—শ্রীবিপিনবিহারী নন্দী প্রণীত। মূল্য এক টাকা।

রাজপুতনার অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব্বের এক ঘটনা লইয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দে এই কাব্যখানি রচিত হইয়াছে। ভাষা এবং ছন্দের উপর কবির কৃতিত্বের পরিচয় অনেক যায়গাতেই পাওয়া যায়। বর্ণনাও স্থানে স্থানে বেশ হৃদয়গ্রাহী। বইখানি পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। কিন্তু এই গীতি কবিতার যুগে সাধারণের কাছে ইহা সমাদর পাইবে কি না তাহা বলিতে পারি না।

শ্রীহে—।

সাক্ষী—অর্থাৎ শ্রীকেশবচন্দ্র সেনের প্রকৃত ছবি; ভ্রাতৃসঙ্ঘ, ৮২ নং হ্যারিসন রোড হইতে প্রকাশিত। পৃঃ ২৬

বৈরাগী কেশব, বিনয়ী কেশব, বিশ্বাসী কেশব, পুণ্যবান কেশব, প্রেমিক কেশব, সৌখীন কেশব, ভক্ত কেশব, সাবধানী কেশব, যোগী কেশব—এই কয়েকটি বিষয় এই পুস্তিকায় আলোচিত হইয়াছে।

মহেশচন্দ্র ঘোষ।

রামেশ্বর-দুর্গ—(উপন্যাস) শ্রীঅমলানন্দ বসু প্রণীত। বহরমপুর হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।০ আনা। লেখা মন্দ নহে। তবে হাত এখনও বেশ পাকে নাই। চেষ্টা করিলে, গ্রন্থকার ভবিষ্যতে সুলেখক হইবেন। গ্রন্থকার বক্তব্যে জানাইয়াছেন "ঐতিহাসিক তত্ত্ব ভারতের স্থানে স্থানে লুক্কায়িত আছে। সেই তত্ত্বের উদ্ধারে যত্নবান্ হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু ইতিহাস নীরস, অনেকেই পড়িতে ভাল বাসেন না; তাই ইতিহাস-সম্বলিত উপন্যাস লিখিতে চেষ্টা করিলাম।" উপন্যাসে ঐতিহাসিক তত্ত্বের কিছুমাত্র মূল্য থাকে না। উপন্যাস না লিখিয়া গ্রন্থকার যদি পোড়াহাট বা চক্রধরপুরের এবং ঘরশুঁয়া ও সেরাইফুলার রাজবংশের প্রাচীনকাহিনী সংগ্রহ করিয়া তাহা প্রকাশিত করিতেন, তাহা হইলে তাহার মূল্য অধিক হইত। নীরস হইলেও, ইতিহাস আজকাল অনেকেই পড়িতেছেন।

দ।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অন্ধমুনি-তনয় সিন্ধু অন্ধ জনকজননীকে স্নান করাইতে লইয়া যাইতেছেন।

চিত্রকর শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দের সৌজন্যে মুদ্রিত।

U RAY & SONS.

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৫শ ভাগ, ১ম খণ্ড | ভাদ্র, ১৩২২ | ৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বিজ্ঞান-চর্চ্চা।

বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় এমাসের প্রবাসীর প্রথম প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে প্রাচীন কালের হিন্দু পণ্ডিতেরা কেবল [illegible] লইয়াই থাকিতেন না, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চর্চাতেও প্রাচীন ভারত তদানীন্তন অন্যান্য দেশের অপেক্ষা বহু পরিমাণে শ্রেষ্ঠ ছিল। প্রাচীন হিন্দুরা পরীক্ষা (experiment) দ্বারা বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার আবশ্যকতা কিরূপ বুঝিতেন, তাহা তিনি চুণ্ডুকনাথের একটি বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। চুণ্ডুকনাথ বলেন—

"যাহারা শিক্ষণীয় বিষয় পরীক্ষা দ্বারা দেখাইতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃত শিক্ষক। যে-সকল ছাত্র শিক্ষকের নিকট হইতে পরীক্ষাগুলি শিখিয়া নিজে নিজে সেইগুলি করিতে পারেন, [illegible] যথার্থ শিক্ষার্থী। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য শিক্ষক ও ছাত্রগণ রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা মাত্র।"

[illegible] প্রাচীন ভারতের প্রশংসা করিতে বড় ভয় পাই। প্রাচীন গৌরবের স্মৃতি আমাদিগকেও আনন্দ দেয় বটে, কিন্তু পাছে উহা আমাদিগকে আফিঙের নেশার মত পাইয়া বসে, পাছে উহা আমাদিগকে বর্ত্তমানে কর্ম্মবিমুখ করিয়া রাখে। [illegible] আমাদের [illegible] যে প্রাচীন ভারতে [illegible] বিজ্ঞানের চর্চ্চার [illegible] তুলিলাম, তাহা কেবল এই বিশ্বাসটা প্রাণে দৃঢ় করিয়া মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য যে আমরা স্বপ্নবিলাসীদের বংশধর নহি; আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আধ্যাত্মিক বিষয়ে যেমন সাধক, সিদ্ধ ও অগ্রসর ছিলেন, তেমনি কর্ম্মীও ছিলেন, এবং বৈজ্ঞানিক বিষয়ের সাধনাতেও সিদ্ধ ছিলেন। [illegible] করিয়া নিদ্রা দিবার জন্য প্রাণে এই বিশ্বাস আনিতে চাই না, কাজ করিবার জন্য এই বিশ্বাস চাই।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা বাংলা স্কুলে পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিচার, ভূবিদ্যা, প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বহি পড়িয়া [illegible] বৃত্তি পরীক্ষা দিয়াছিলাম। কখনও বৈজ্ঞানিক [illegible] দেখি নাই। অন্যান্য বহির মত বৈজ্ঞানিক বহিও মুখস্থ করিতাম, এবং কল্পনার সাহায্যে যথাসাধ্য বুঝিতে [illegible] করিতাম। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্য [illegible] দিগকে উদ্ভিদ্‌বিদ্যার প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া যায়। [illegible] পল্লীগ্রামতুল্য মফঃস্বলের ছোট সহরে পড়িতাম। [illegible] অনায়াসে আমাদের পাঠ্য যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের "উদ্ভিদ্‌বিচারে" উল্লিখিত উদ্ভিদ্ লতা, পাতা ফল ফুল [illegible] করা যায়। কিন্তু তথাপি আমাদের পণ্ডিত মহাশয় আমাদিগকে কোন দিন একটাও গাছগাছড়া সংগ্রহ করিতে বা দেখিয়া আসিতে বলেন নাই, নিজে যে কখন আমাদিগকে [illegible] নাই, [illegible] সংগ্রহ করিতে [illegible] নাই, [illegible] বাহুল্য মাত্র।

আমরা বরং শৈশবসুলভ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া দু-একটা উদ্ভিদ্ খুঁজিয়া বাহির করিতাম। অন্যান্য বিষয় পড়াইবার সময় যেমন করিতেন, উদ্ভিদবিচারের ঘণ্টাতেও তেমনি পণ্ডিত মহাশয় চটি-জুতা হইতে পা-দুখানি বাহির করিয়া টেবিলের উপর তুলিয়া দিতেন, এবং এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতেন, "মূল কাহাকে বলে?" আমরা অমনি মুখস্থ বলিতে আরম্ভ করিতাম, "উদ্ভিদের যে অংশটি মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত থাকে, যাহার বলে উদ্ভিদ্ মৃত্তিকার উপর সোজা থাকে, এবং যদ্দ্বারা মৃত্তিকার রস শরীরস্থ করিয়া উদ্ভিদ্ জীবিত থাকে, তাহাকে মূল কহে।" তখন পণ্ডিত মহাশয় হয় ত আবার প্রশ্ন করিতেন, "মূলের এই সংজ্ঞায় কি কি দোষ আছে?" তখন আমরা আবার গ্রামোফোনের মত বলিতাম, "মূলের উক্ত প্রকার নির্ব্বাচন করিলে তৎসম্বন্ধে কতকগুলি আপত্তি লক্ষিত হয়। যথা:— গিরিগুহা বা গৃহাদির উপরিভাগ হইতে লম্বমান উদ্ভিদের মূল অধোধাবিত না হইয়া উর্দ্ধে উঠে। এতদ্ভিন্ন বায়ব্য এবং জলীয় উদ্ভিদের মূল মৃত্তিকা পর্য্যন্ত নামিতে না পারে (এরূপ সচরাচরই ঘটিয়া থাকে), সুতরাং সে স্থলে উক্ত উদ্ভিদ্ পোষণসামগ্রী মৃত্তিকা হইতে আকর্ষণ করে না।"

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা এইরূপ চমৎকার প্রণালীতে সম্পন্ন হইত। গত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীতে কত আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই চল্লিশ বৎসরে জাপান "সেকেলে" অবস্থা হইতে আধুনিকতম জাতিদের প্রথমশ্রেণীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। এমন যে স্থিতিশীল দেশ চীন, তাহাও ঘুম ভাঙ্গিবার পর চোখ্ রগড়াইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ঘর গুছাইয়া নিজের বিষয়কর্ম্মে মন দিয়াছে। কিন্তু আমাদের বাংলা স্কুলগুলিতে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা পূর্ব্ববৎ চলিতেছে।

বাংলাস্কুলগুলির কথা এইজন্য বলিতেছি, যে, দেশের অধিকাংশ ছাত্রের শিক্ষা বাংলা স্কুল পাঠশালাতেই হয়; কলেজে পড়িবার সুযোগ কয়জনের হয়? অতএব শিক্ষার সংস্কার করিতে হইলে ঐ পাঠশালা ও বাংলা বিদ্যালয় হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে। পাঠশালা ও বাংলা বিদ্যালয়ে খুব অল্প বিজ্ঞান শিখান হয়, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু উহা পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা শিক্ষা দিতে হইবে। তজ্জন্য সামান্য যাহা জিনিষপত্র, সরঞ্জাম ও যন্ত্রের প্রয়োজন হইবে, তাহা গবর্ণমেণ্টকে দিতে হইবে।

ইংরেজী বিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞান শিখাইবার ত কোন প্রয়োজনই অনুভূত হয় না; কারণ ম্যাট্রিকুলেশন বা প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য বিজ্ঞান শিখিতে হয় না। ছাত্রেরা বিজ্ঞানের একটি বর্ণও না জানিয়া এম্-এ, ডি-লিট্, পিএইচ্ ডি, প্রভৃতি কত কি বড় বড় উপাধি পাইতে পারে,— বৈজ্ঞানিক যুগে আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার এমনি সুবন্দোবস্ত! তাহা অপেক্ষা আরও সুবন্দোবস্ত এই যে লাহোর কলিকাতার পূর্ব্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে, উর্দ্ধে বা অধোতে, কিম্বা পৃথিবী রসগোল্লার মত, বা শিংহাড়ার মত, বা লুচির মত, কিম্বা গজার মত, তাহা না জানিয়াও ছাত্রেরা এম্-এ, এম্-এস্ সি, ইত্যাদি কত কি হইতে পারে; কারণ ভূগোল না জানিয়াও ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারে, এবং তাহার পর আর ভূগোল জানার প্রয়োজন হয় না। বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ আচার্য্য ওল্ডেন্‌বার্গ বেথুন কলেজ দেখিতে গিয়া যখন শুনিয়াছিলেন যে সেখানে বিজ্ঞান শিখান হয় না, তখন কতক ক্ষণ, যেন অসম্ভব কিছু একটা শুনিলেন এই ভাবে, হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। তবু ত উহা কেবল মেয়েদের কলেজ, এবং তাহাতেই তিনি এত বিস্মিত হইয়াছিলেন। যদি পাশ্চাত্য দেশের বিদ্বান্ লোকেরা শুনে যে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়-সকলের অধিকাংশ উপাধিধারী বিজ্ঞানের এক বর্ণও জানে না, তাহা হইলে তাহারা কি মনে করিবে জানি না।

সত্য বটে, সকলে সকল বিষয়ে পণ্ডিত হইতে পারে না; কিন্তু তাহা হইলেও প্রধান প্রধান সকল বিষয়ের কিছু জ্ঞান সকল শিক্ষিত লোকেরই থাকা কর্ত্তব্য। এইজন্য পাঠশালা, বাঙ্গলা-বিদ্যালয় ও ইংরেজীবিদ্যালয়-সকলে পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার সাহায্যে অল্প অল্প বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া উচিত। এরূপ করিলে সর্ব্বপ্রধান সুফল এই হইবে যে আমাদের দেশের লোকেরা "সেকেলে" জাতি না থাকিয়া আধুনিক উন্নতিশীল জাতিদের সমকক্ষ হইবার উপায়স্বরূপ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা পাইবে। এই বিশ্বে সর্ব্বত্র নিয়মের রাজত্ব, স্বপ্নের মত অসম্বদ্ধ যা তা কোথাও

কিছু ঘটে না, ক্রমশঃ লোকের এইরূপ ধারণা জন্মিয়া অনেক কুসংস্কার নির্মূল হইবে। আনুসঙ্গিক সুফল এই হইবে যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিবার প্রণালী লোককে শিখান অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে। আরও অনেক বিষয়ে সুবিধা হইবে। এখন যাহারা এম্-এস্ সি, বি-এস্ সি পাস করে তাহাদের অনেকে আবার আইন পড়িয়া উকীল হয়, বা কেরাণীগিরি করে, বৈজ্ঞানিক কোন রকমের কাজ অল্প লোকেই পায়। কিন্তু সমুদয় এণ্ট্রেন্স্ স্কুলে যদি বিজ্ঞান পড়ান হয়, তাহা হইলে অনেক এম্-এস্ সি, বি-এস্ সি, বিজ্ঞানের শিক্ষকতা করিতে পারে। পাঠশালা ও বাংলাবিদ্যালয়ে যদি পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার (observation and experiment) সাহায্যে বিজ্ঞান শিখান হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞান-জানা অনেক এণ্ট্রেন্স্-পাস্ ছেলে তথায় শিক্ষকতা করিতে পারে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য যদি কতকগুলি কারখানা চলিতে থাকে, তাহা হইলে তাহাতেও ২।৪ জন করিয়া বি-এস্ সি, এম্-এস্ সি কাজ পাইতে পারে; যেমন বেঙ্গল কেমিক্যাল্ এণ্ড্ ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসে কয়েকজন রসায়নশাস্ত্রবিৎ এম্-এ কাজ করিতেছেন।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাযন্ত্রের কারখানা।

চলিত কথায় বলে, কান্ টান্‌লে মাথা আসে। কোন একটা দিকে দেশের উন্নতি করিতে গেলেই দেখা যায় যে আর কোন কোন দিকে উন্নতি না করিলে তাহা সম্ভবপর হয় না। বিজ্ঞান শিখাইবার জন্য যে-সকল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিতে হয়, তাহার নিমিত্ত নানাবিধ যন্ত্রের (apparatus.) প্রয়োজন হয়। বিদেশ হইতে যন্ত্র আনাইতে হইলে অনেক খরচ পড়ে। আমাদের দেশের গরীব পাঠশালা ও বিদ্যালয়-সকলে দামী বিদেশী যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভবপর নয়। যন্ত্রসকল এদেশেই নির্ম্মিত হওয়া উচিত। বাংলা ও ইংরেজী শিক্ষালয়-সকলে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের প্রয়োজন হইলে, একটি কারখানার সম্বৎসরের কাজ বেশ চলিতে পারে। যন্ত্রনির্ম্মাণ করিবার কারিগরের অভাব হইবে না। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের আবিষ্কৃত যে-সকল যন্ত্র দেখিয়া ইউরোপ আমেরিকার বৈজ্ঞানিকেরা বিস্মিত হইয়াছেন, সেগুলি সমস্তই ভারতবর্ষে দেশী মিস্ত্রীর দ্বারা নির্ম্মিত।

কোন জিনিষের জন্য বিদেশের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিলে আর-এক রকমের ব্যাঘাত হয়। তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। যুদ্ধের পূর্ব্বে ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষালয়-সকলে জার্ম্মেনী হইতে বিস্তর বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আমদানী হইত। ঐ-সকল কল ইংলণ্ডে প্রস্তুত হয় না। এখন যুদ্ধ চলিতেছে বলিয়া বিলাতের কোন কোন কলেজের পরীক্ষাগারে জার্ম্মেনী হইতে আমদানী বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ভাঙ্গিয়া বা বিগড়িয়া যাওয়ায় ঐ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষাকার্য্য বন্ধ রাখিতে হইয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে যতটা সম্ভব নিজের দেশের আবশ্যক সব-জিনিষ দেশেই প্রস্তুত করা উচিত। "যতটা সম্ভব" এই-জন্য বলিতেছি যে সবজিনিষ সবদেশে প্রস্তুত করা সুসাধ্য নয়। তাহার চেষ্টা করিতে গেলে তাহার ব্যয়ও অনেক সময় অত্যন্ত বেশী পড়ে।

অভিভাবক বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

কিছুদিন হইতে বিলাতের রাজমন্ত্রীরা বলিয়া আসিতে-ছেন যে যুদ্ধের শেষে যখন সন্ধি হইবে, তখন সন্ধির সর্ত্তগুলি সম্বন্ধে ব্রিটিশ উপনিবেশসকলের মত লওয়া হইবে, কারণ তাহারা যুদ্ধে ইংলণ্ডের অনেক সাহায্য করিতেছে। উপনিবেশ-সমূহের লোকদের আগে ভারতবর্ষের লোকেরা অর্থ দিয়া, লড়িয়া, রক্ত দিয়া, প্রাণ দিয়া, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু কেহ একথা বলিতেছেন না যে সন্ধির সর্ত্তগুলি সম্বন্ধে ভারতবর্ষেরও মত লওয়া হইবে। ভারতসচিব চেম্বার্লেন সাহেব, যিনি ভারতবাসীর প্রদত্ত ট্যাক্স হইতে মোটা বেতন পান, তিনিও চুপ করিয়া আছেন। সম্প্রতি উপনিবেশসচিব শ্রীযুক্ত বোনার ল সাহেব সন্ধির সর্ত্ত সম্বন্ধে পরামর্শদানের অধিকার ছাড়া উপনিবেশগুলিকে আরও একটি উচ্চ অধিকারের আশা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তাহারা সাম্রাজ্য-শাসনের কার্য্য ও উজ্জ্বলিত সম্মানের অংশীদার হইবে (they would "share with the Motherland

the duty and honour of governing the Empire" । উপনিবেশ-সকলের সমকক্ষ হইয়া সাম্রাজ্য শাসন করা, না, তাহাদিগেরও দ্বারা শাসিত হওয়া, কোন্ সম্মানটা ভারতবর্ষের অংশে পড়িবে, তাহা বোনার ল সাহেব বা আর কেহ বলেন নাই। ইহাতে ভারতবর্ষের কোন কোন সম্পাদক বড় ক্ষুব্ধ হইতেছেন। কিন্তু বিলাতের লোক ছাড়া ঔপনিবেশিকদের দ্বারাও শাসিত হওয়াই যদি ভারতবর্ষের অদৃষ্টে থাকে, তাহাতে বাস্তবিক আমাদের আহ্লাদে আটখানা হওয়াই উচিত। কারণ, পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনীতিজ্ঞদিগের মতে, ভারতবাসীরা চিরকেলে নাবালক জাতি, কখনও সাবালক হইবে না; অতএব তাহাদের অভিভাবকের সংখ্যা যত বাড়ে ততই ভাল। এপর্য্যন্ত বিলাতের লোকেরাই আমাদের অভিভাবক ছিলেন; অতঃপর যদি ঔপনিবেশিকেরাও অভিভাবক হন, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে? আর, এখনও ত ভারতবর্ষের উচ্চ উচ্চ রাজকার্য্যে ঔপনিবেশিকদের অধিকার আছে।

আগ্রা-অযোধ্যায় বাঙ্গালীর সংখ্যা।

১৯১১ সালের সেন্সস্-অনুসারে আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের কোন্ জেলায় কত বাঙ্গালী ছিলেন, নীচের তালিকায় তাহা দেওয়া হইল।

জেলা	মোটসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রীলোক
দেহরা দুন	৩৬	২৪	১২
সাহারানপুর	১৬৯	১৩৫	৩৪
মুজফ ফরনগর	৪৮	২৩	২৫
মীরট	১২৫	৬৭	৫৮
বুলন্দশহর	৫৮	৪৫	১৩
আলিগড়	৬০	৪৪	১৬
মথুরা	১৬৯২	৫১৪	১১৭৮
আগ্রা	২৫৭	১৩৬	১২১
ফররুখাবাদ	৩৮	৩১	৭
মৈনপুরী	৫০	২৭	২৩
এটাওা	৩৭	২২	১৫
এটা	১	০	১
বরেলী	১৬৪	১০৭	৫৭
বিজনোর	৮	৫	৩
বুদাওন	২০	১০	১০
মোরাদাবাদ	১৬৬	১৪২	২৪
শাহ জাহানপুর	৬৭	৩৬	৩১
পিলিভিত	৪৭	২২	২৫
কানপুর	২৮৫	১৮৩	১০২
ফতেপুর	৯	৪	৫
বাঁদা	২৭	১২	১৫
হামীরপুর	১	১	০
এলাহাবাদ	২২৭৫	১৩৪৬	৯২৯
ঝান্সী	২০১	১০৮	৯৩
জালাওন	৩০	১১	১৯
বেনারস	১২৬০৭	৫২৩৩	৭৩৭৪
মির্জাপুর	২১১	১৫০	৬১
জৌনপুর	৪৫	৩২	১৩
গাজীপুর	১৮১	১০৩	৭৮
বালিয়া	৪৮	৩৫	১৩
গোরখপুর	৪৭৫	২৪৪	১৮৭
বস্তী	৩৫	২২	১৩
আজমগড়	৫	৪	১
নৈনীতাল	৬৭	৪১	২৬
আলমোড়	১০	৫	৫
গড় ওাল	২	২	০
লক্ষ্ণৌ	২৪২৬	১৩৫৮	১০৬৮
উনাও	৩৫	১৮	১৭
রায়বরেলী	২৩	১৭	৬
সীতাপুর	৪৪	১৫	২৯
হর্দোই	৬৩	৩৯	২৪
খেরী	৫	৩	২
ফয়জাবাদ	১২৬	৬৫	৬১
গোণ্ডা	১৩৮	৭৩	৬৫
বাহ্রাইচ	২৬	১৫	১১
সুলতানপুর	১৮	১২	৬
প্রতাপগড়	৩০	৭	২৩
বারাবাঙ্কি	৯	৫	৪
রামপুর	১০৩	১০১	২
তেহ্রী-গঢ়ওাল	৯	৩	৬
আগ্রা-অযোধ্যা	২২৬১২	১০৭০১	১১৯১১

আগ্রা-অযোধ্যায় বাঙ্গালীছাত্রের কৃতিত্ব।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশ্যন পরীক্ষায় সুশীলকুমার প্রামাণিক নামক একটি বাঙ্গালী ছাত্র প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষাতেও জিতেন্দ্রনাথ মিত্র নামক একটি বাঙ্গালী ছাত্র প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। আগ্রা-অযোধ্যা প্রভৃতি প্রদেশে শিক্ষার জোরেই এখনও বাঙ্গালী টিকিয়া আছে। শিক্ষার প্রতি প্রবাসী বাঙ্গালীরা যে উদাসীন নহেন, তাহার লক্ষণ দেখিলে বড় আনন্দ হয়।

গায়ের রঙের বিচার।

বাঙলাদেশের অধিকাংশ লোক গৌরবর্ণ নয়। আমরা যতটা লক্ষ্য করিয়াছি, তাহাতে ভারতবর্ষেরও অধিকাংশ লোকের রং ফর্সা নয় বলিয়া বোধ হয়। অথচ যেখানেই যান দেখিবেন লোকে ফর্সা রঙের আদর করে। লোকে ফর্সা ছেলেমেয়ে চায়, টুকটুকে রাঙা বৌ চায়, ফর্সা জামাই চায়। "প্রজাপতির" সম্পাদক বলিতে পারিবেন, রঙের তারতম্যে পাত্রপাত্রীর বাজার-দর নরম বা চড়া হয় কি না। আমাদের বোধ হয় ইহাতে বাজার-দর উঠে নামে।

এই কালর দেশে গোরার এতটা আদর কেমন করিয়া হইল? প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বলেন ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীরা কৃষ্ণবর্ণ ছিল; পঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিম সীমা অতিক্রম করিয়া গৌরবর্ণ আর-এক জাতি দলে দলে আসিয়া ক্রমশঃ ভারতবর্ষের এক-একটি প্রদেশ অধিকার করিয়া বসে। ইহাদিগকে আর্য্য বলা হয়। ফর্সা রঙের আদর এই আর্য্যদের দ্বারা ভারতবর্ষ-বিজয়ের চিহ্ন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন, আর্য্যেরা কোন সময়েই অনার্য্য আদিম অধিবাসীদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী ছিল না। পাশ্চাত্য নৃতত্ত্ববিদের মতে ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক আর্য্যবংশীয় নহে। ইহাতে অনেকে ক্ষুণ্ণ হইবেন। কিন্তু আমরা যদি বাস্তবিক আর্য্য না-ই হই, তাহাতে কি আসিয়া যায়? অনার্য্যেরা কি মানুষ নয়? আর্য্যেরা যখন ভারত আক্রমণ করিয়াছিল, তখন তাহারা ভারতের অনার্য্য অধিবাসীদের চেয়ে বেশী সভ্য ছিল না। পাশ্চাত্য নৃতত্ত্ববিদ্দের মত যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা যে ফর্সা রঙের আদর করি, তাহা দ্বারা সেই প্রাচীনকালের বিজেতাদের খোসামোদ করা হয়।

এখন সকল প্রদেশেই যেমন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতিদের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ মানুষ দেখা যায়, তেমনি শূদ্রদের মধ্যেও ফর্সা মানুষ দেখা যায়। ইহা হইতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করেন যে বহু শতাব্দী ধরিয়া জাতিতে জাতিতে মিশ্রণ ঘটিয়াছে, এবং অনেক অনার্য্যজাতি দলে দলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়, হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে শাদা রঙের বিদেশী মানুষেরা বড় চাকরী পায়; ভারতবাসীদের রং তাদের চেয়ে ময়লা বলিয়া তাহারা তত বড় চাকরী পায় না। ইহার বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করি। কিন্তু ভারতবাসীদের মধ্যেই যাহারা ফর্সা, অন্য গুণ না থাকিলেও, তাহাদের এক রকম আদর দেখা যায়। খোকা খুকির মা তাহাদের শৈশব হইতে খোকার জন্য রাঙা বৌ ও খুকির জন্য রাঙা বরের সন্ধান লইতে থাকেন; কিন্তু খোকাখুকির বাবা খবরের কাগজে লিখিতে থাকেন এবং নানা সভায় বক্তৃতা করিতে থাকেন যে শাদা রঙের ইংরেজ এবং ময়লা রঙের ভারতবাসী উভয়ই তুল্যমূল্য, উচ্চ রাজপদে উভয়েরই সমান অধিকার থাকা উচিত, এবং একই কাজ করার জন্য শাদাকে ষোল আনা ও কালোকে দশ আট বা চারি আনা মজুরী দেওয়া ন্যায়সঙ্গত নহে। খোকা-খুকির মার গার্হস্থ্য নীতি এবং খোকাখুকির বাবার রাষ্ট্রনীতির মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান কেমন করিয়া হয়?

ধর্ম্মের ট্রেড্মার্কা।

পেটেণ্ট ঔষধ এবং অন্যান্য অনেক জিনিষের বিজ্ঞাপনে দেখা যায়, বিক্রেতারা বলিতেছেন, "আমাদের এই জিনিষটি খাঁটি, আর সব নকল; আমাদের শিশি, বোতল, কৌটা বা বাক্সের উপর হাঁসের বা বাঘের বা হাতীর ছবি, এবং আমাদের নাম, ইত্যাদি, দেখিয়া লইবেন। এই ছবি ও নাম আমাদের রেজিষ্টরী করা ট্রেড্মার্কা; আর কাহারও ব্যবহার করিবার অধিকার নাই।"

সংবাদপত্রের অনেক গালাগালি পড়িয়া মনে হয়, ধর্ম্মও ট্রেড-মার্কায় পরিণত হইয়াছে। সেদিন মুসলমানদের একখানি সাপ্তাহিক কাগজে তাঁহাদেরই একখানি মাসিক কাগজের সমালোচনা দেখিতেছিলাম। তাহাতে সমালোচক ঐ মাসিকের পরিচালকেরা যে খাঁটি মুসলমান নহেন, তাহাই প্রকারান্তরে অনেকবার বলিয়াছেন। তখন মনে হইল, ধর্ম্মকে ট্রেডমার্কা-রূপে ব্যবহার করার রোগ মুসলমান-দের মধ্যেও আছে। দুঃখের বিষয় এই রোগ নানা ধর্ম্মা-বলম্বীদের মধ্যে দেখা যায়। হিন্দু ধর্ম্ম কি, খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম কি, মুসলমান ধর্ম্ম কি, কি কি লক্ষণ দ্বারা হিন্দু, মুসলমান, বা

খ্রীষ্টান চেনা যায়, এ-সকল বিষয়ের শাস্ত্র ভাবে বিচার হইতে পারে, এবং হওয়া উচিত। কিন্তু কোনপ্রকার আর্থিক ব্যাপারের সংস্রবে এরূপ বিচার কেহ উপস্থিত করিলেই, ধর্ম তখন ট্রেড্ মার্কায় পরিণত হয়। হিন্দু, মুসলমান, বা খ্রীষ্টিয়ান নামটি কেহ পরমেশ্বরের নিকট হইতে রেজিষ্টরী-করা একচেটিয়া ট্রেড্ মার্কা-স্বরূপ প্রাপ্ত হয় নাই। এই-সকল নামকে ট্রেড্ মার্কা-রূপে ব্যবহার করা ধর্ম্মের জঘন্য অপব্যবহার। আমার গায়ে কোন একটি সম্প্রদায়ের ছাপ আছে, উহার গায়ে নাই; অতএব আমার জিনিষ ভাল, উহার ভাল নয়, এরূপ কথা নিরক্ষর বা অল্পশিক্ষিত মুদি-ময়রারাও বলে না। কিন্তু কোন কোন সাহিত্যব্যবসায়ী স্পষ্টভাবে বা প্রকারান্তরে এরূপ কথা বলিতে লজ্জা বোধ হয় না। অথচ দেখা যাইতেছে, পৃথিবীতে সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া কোন জিনিষেরই উৎকর্ষ, উৎপাদক ও বিক্রেতার ধর্ম্মসম্প্রদায়সূচক ছাপের উপর নির্ভর করে নাই। এই বাংলা দেশেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য লিখিয়া গিয়াছেন একজন খ্রীষ্টিয়ান, মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

অধিকতর দুঃখের বিষয় এই যে দুর্ভিক্ষ ও বন্যায় বিপন্ন লোকদের সাহায্য করার মত সাধুকার্য্যেও কেহ কেহ ধর্ম্মকে ট্রেড্ মার্কায় পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছে। এত বেশী লোকের অন্নকষ্ট হইয়াছে, বন্যায় এত বেশী লোক নিরাশ্রয় হইয়াছে, যে, যত দল লোক সাহায্যদানকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, সকলে খুব চেষ্টা করিলেও হয় ত কেহ কেহ সাহায্য পাইবে না। অথচ ইহাতেও, অমুক লোকেরা হিন্দু নয়, উহাদিগকে টাকা দিও না, এরূপ লেখা কাগজে বাহির হইতেছে। সাহায্যদান একটা ব্যবসা নয়, এবং মণ্ডলীবিশেষের নামও তাহার ট্রেড্ মার্কা নয়। যিনি যেভাবে কাজ করেন, তদনুসারে তিনি সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে চাঁদা পাইতে পারেন; সাহায্যদানকার্য্যে ব্রতী অন্য কোন দলকে গালি দিয়া টাকা সংগ্রহ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

যুদ্ধের সময় খোকাখুকির জন্মের হার।

গত অক্টোবর মাস হইতে অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভীয়েনা নগরে যত শিশুর জন্ম হইয়াছে, তাহার কিয়দংশের সংখ্যা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায় যে ৫৫৩টি শিশুর মধ্যে ৩১৪টি বালক। সাধারণতঃ ঐ সহরে ১০০ বালিকা জন্মিলে ১০৮টি বালক জন্মে; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সংখ্যাগুলি হইতে দেখা যায় যে ১০১টি বালিকা এবং ১২৮টি বালক, এই অনুপাতে শিশুগুলির জন্ম হইয়াছে। ভীয়েনার একটি শিশুদের তত্ত্বাবধায়কসমিতি বলেন যে তাঁহাদের যত্নাধীন পরিবার-সকলে ১০০বালিকা ও ১৪০ বালক এই অনুপাতে শিশু জন্মিতেছে। যমকের সংখ্যাও বাড়িয়াছে।

যুদ্ধের সময় স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের মৃত্যু অনেক বেশী হয়। তাহাতে যুদ্ধে লিপ্ত দেশসকলে নারী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অনেক কমিয়া যায়। এই অবস্থা স্থায়ী হইলে দেশের সকল প্রকার কাজেই অসুবিধা জন্মে এবং সামাজিক পবিত্রতা রক্ষা করাও কঠিন হয়। যুদ্ধের সময় বালক বেশী জন্মিলে দু-এক পুরুষে নরনারীর সংখ্যা আবার সমান হইয়া আসে। যাঁহারা আস্তিক তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে বিধাতার কোন নিগূঢ় নিয়ম অনুসারে এই প্রকারে সমাজের মঙ্গল সাধিত হয়। বিধাতার এই বিধান কি প্রণালীতে কাজ করে, তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই।

ভারতীয় বিজ্ঞানমন্দির।

রামমোহন লাইব্রেরীতে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু যে বক্তৃতা করেন, তাহার প্রারম্ভে তিনি বলেন যে তিনি কিছুদিন হইতে বিজ্ঞানের যে বিভাগে নূতন নূতন সত্য আবিষ্কার করিতেছেন, তাহাতে ভারতবর্ষ যে ইউরোপ আমেরিকা অপেক্ষা অগ্রসর তাহা ঐ দুই মহাদেশের বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করিয়াছেন। তথাকার কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিদ্যার্থীরা তাঁহার নিকট শিক্ষা পাইবার জন্য আবেদন করিয়াছে। এই প্রকার ঘটনার মধ্যেই প্রকৃত ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা দেখা যাইতেছে। এখন ভারতবর্ষে যে-সকল বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সেগুলিকে "ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয়" না বলিয়া বলা উচিত "ভারতবর্ষে স্থিত পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়।" কারণ এইগুলিতে ভারতবর্ষের নিজের জ্ঞানরত্ন আবিষ্কৃত, আহৃত বা বিতরিত হয় না, কিম্বা নিজের কোন শিক্ষাপ্রণালী অনুসৃত হয় না। নানা

প্রদেশে যে-সকল টোল আছে, তাহাদের নানা অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও বরং তাহাদিগকে ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয় বলা যায়; কারণ তথায় ভারতবর্ষের জ্ঞান ভারতবর্ষের প্রণালী অনুসারে ছাত্রগণ লাভ করে। আচার্য্য বসু মহাশয় তাঁহার বক্তৃতাতে যে বিদ্যামন্দিরের কথা বলিয়াছেন, যেখানে ভারতবর্ষীয় সত্যান্বেষী নিজের আবিষ্কৃত সত্য বিদ্যার্থীদিগের গোচর করিবেন, এবং তাহাদের প্রাণে সত্যজিজ্ঞাসার উদ্রেক করিবেন, সেই বিজ্ঞানমন্দিরই প্রকৃত আধুনিক ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইবে। তখন আবার, যেমন প্রাচীন নালন্দা তক্ষশিলায় নানাদেশ হইতে আগত ছাত্রেরা শিক্ষালাভ করিত, তেমনি সেখানে নানাদেশের ছাত্রেরা বিদ্যা অর্জ্জন করিবে। এই বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্থায়ী করিতে হইলে, কতকগুলি জ্ঞানতপস্বীর প্রয়োজন, যাঁহারা সাংসারিক সুখ ঐশ্বর্য্যের বিষয় ভাবিবেন না এবং যাঁহাদিগকে দেশবাসীগণ খাওয়াপরার জন্য উপার্জ্জনের উদ্বেগ হইতে মুক্ত রাখিবেন। তাঁহারা কেবল জ্ঞানলাভে ও জ্ঞানদানে ব্যাপৃত থাকিবেন।

ইংরেজেরা যখন আমাদিগকে চাকরীর প্রার্থী না হইয়া সত্যান্বেষী হইতে বলেন, তখন সে উপদেশ আমাদের ভাল লাগে না। কারণ, তাঁহারা মোটা বেতনের সব চাকরীগুলি একচেটিয়া করিয়া লইয়া টাকার থলিগুলির বোঝা বহন করিয়া নিজনিজ সিন্দুক পূর্ণ করিবার ভার নিজেদের উপর রাখেন এবং কেবল উপদেশের বোঝাটা আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেন। কিন্তু আমরা আমাদের নিজেদের মধ্যে শ্রমবিভাগ করিয়া লইতে চাই। সংবাদপত্রসম্পাদকগণ, ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ, কংগ্রেস কন্‌ফারেন্সের বক্তাগণ যোগ্য ভারতবাসীরা যাহাতে উচ্চবেতনের কাজ পান তদ্বিষয়ে চেষ্টিত থাকিবেন। কিন্তু যাঁহারা সত্যান্বেষী তাঁহারা টাকার জন্য হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিবেন না। তাঁহারা ভারতের ও জগতের জ্ঞানবৃদ্ধির চেষ্টাই একাগ্রচিত্তে করিবেন। বেশী টাকার চাকরী করিলেই ভারতের জ্ঞান গৌরব বাড়ে না। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় শিক্ষাবিভাগের প্রাদেশিক স্তরেই রহিয়া গেলেন; তাঁহার পর তাঁহার চেয়ে যোগ্যতর নহেন এমন ২।৪ জন ভারতবাসী উচ্চতর বিভাগে কাজ পাইয়াছেন। কিন্তু দেশের জ্ঞানগৌরব কাহার দ্বারা বাড়িতেছে, তাহা সকলেই জানেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু উচ্চতর বিভাগে কাজ করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু ভারতবর্ষের জ্ঞানগৌরব তিনি বড় চাকরী করিয়াছেন বলিয়া বাড়ে নাই, তাঁহার প্রতিভা, অধ্যবসায় ও একাগ্রতা দ্বারা বাড়িয়াছে।

আমরা জানি উচ্চতর বিভাগে কাজ পাইলে গবেষণার বেশী সুযোগ পাওয়া যায়; কিন্তু সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার কয় জন করে? পক্ষান্তরে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার ইতিহাসে দেখা যায় যে সামান্য ব্যয়ে ও সামান্য আয়োজনে গরীব লোকদের দ্বারা অনেক বড় আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে।

জাপান ও ভারতবর্ষ।

আচার্য্য বসু মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় বাণিজ্য শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে জাপানীরা যেরূপ সিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহার বর্ণনা করিয়া, জাপান যে ভারতবর্ষের আশঙ্কার একটি গুরুতর কারণ তাহার উল্লেখ করেন। আশঙ্কা দুই রকমের, বাণিজ্যিক ও রাষ্ট্রনৈতিক। বাণিজ্যিক আশঙ্কার কথা তিনি খুব খুলিয়া বলিয়াছেন, রাষ্ট্রনৈতিক বিপদ্ সম্বন্ধে কেবল ইঙ্গিত করিয়াছেন। আমরা প্রবাসীতে উভয় প্রকার বিপদের কথা বহু পূর্ব্ব হইতে বলিয়া আসিতেছি। জাপান কিরূপে আমাদের দেশে বাণিজ্যবিস্তার করিতেছে, এবং জাপানী জিনিষকে প্রায় স্বদেশীর সমান আদরণীয় মনে করা যে কিরূপ ভুল, তাহা আমরা অনেকবার বলিয়াছি। সম্প্রতি ভারতবর্ষের বাজারে অষ্ট্রিয়া, জার্ম্মেনী ও বেলজিয়মের সস্তা জিনিষ সব আর পাওয়া না যাওয়ায় জাপান সব রকম জিনিষে ভারতের বাজার পূর্ণ করিবার জন্য বিপুল উদ্যমে লাগিয়া পড়িয়াছে। জাপানীরা জার্ম্মেনদের চেয়েও সস্তা দরে জিনিষ বেচিতেছে। তাহার নানারকম কারণ আছে। জার্ম্মেনীর চেয়ে জাপানে মজুর সস্তা, জাপানীরা কৃষি ও শিল্প দুই একসঙ্গে চালাইতে অভ্যস্ত। এইরূপ আরও অনেক কারণ আছে। সময় থাকিতে সাবধান না হইলে জাপানীদের প্রতিযোগিতায় কেবল যে ভারতবর্ষীয় শিল্প নষ্ট হইবে তাহা নয়, ইংলণ্ডের ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যও নষ্ট হইবে। ইতিমধ্যেই তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। সকলেই জানেন।

ভারতবর্ষে সূতা ও কাপড়ের কারখানার প্রধান কেন্দ্র বোম্বাই। ঐ সহরের ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্মার কাগজে লিখিত হইয়াছে :—

"It is well-known that our local mills have for many years past competed successfully with foreign suppliers in the coarser varieties of unbleached cotton cloths. Japan has been a large buyer of Indian cotton which is used by our mills; but for the production of its factories it has so far looked to markets nearer home—chiefly China. Recently it has turned its attention to this country with the result that some lines of Japanese gray cloths are now being dumped down in Bombay at cheaper rates than our mills on the spot can quote. And Japan does not propose to do things by halves. Its latest feat, which has made a great stir in the piece goods markets both in Bombay and Calcutta, is the sale of cloths in the style of Manchester goods a long way below Manchester prices."

তাৎপর্য্য :—মোটা কাপড়ের ব্যবসাতে বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলগুলি অনেক বৎসর হইতে বিদেশী কলগুলির সঙ্গে টক্কর দিবার সামর্থ্য দেখাইয়া আসিতেছে। বোম্বাইয়ের কল-সকলে অনেক ভারতবর্ষের তুলা ব্যবহৃত হয়; জাপানীরাও এই তুলা কিনিয়া লইয়া যায়। এতদিন কিন্তু এই তুলা হইতে প্রস্তুত থান জাপানীরা তাহাদের দেশের কাছে, প্রধানতঃ চীনদেশে বিক্রী করিত। সম্প্রতি ভারতবর্ষের দিকে তাহারা মন দিয়াছে। ফলে তাহারা কয়েক প্রকারের কোরা জাপানী থান বোম্বাইয়ে আনিয়া ফেলিতেছে যাহার দর বোম্বাইয়ের কলে উৎপন্ন কাপড়ের চেয়ে সস্তা। জাপানীরা আধাসারা কাজ করিবার লোক নয়। তাহারা ম্যাঞ্চেষ্টারের ধরণে নির্ম্মিত কাপড় ম্যাঞ্চেষ্টারের চেয়ে অনেক সস্তা দরে বোম্বাই ও কলিকাতায় বেচিতেছে। তাহাদের এই বাহাদুরীতে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের কাপড়ের বাজারে সাড়া পড়িয়াছে।

শুধু ভারতবর্ষের শিল্পবাণিজ্য নষ্ট হইলে ইংরেজ বণিকেরা গবর্ণমেণ্টকে উহার জীবনরক্ষার জন্য কিছু করিতে বলিবে বা করিতে দিবে, এরূপ আশা খুব বেকুব ভারতবাসীও করে না। তবে ব্রিটিশ বাণিজ্যের বিপদের সম্ভাবনা ঘটিলে হয়ত কিছু হইতে পারে। ভারতবাসী ও গবর্ণমেণ্ট উভয়ের একাগ্র চেষ্টা থাকিলে বিপদ্ কাটিয়া যাইতে পারে। জাপানের গবর্ণমেণ্ট জাপানের শিল্পবাণিজ্যের জন্য যাহা করিতেছেন, আমাদের গবর্ণমেণ্ট সেরূপ চেষ্টা করিলে জাপান কখনই আমাদের শিল্পবাণিজ্য নষ্ট করিতে পারে না। আমাদের দেশেও মজুর সস্তা, আমাদের মজুর ও কারিগরেরা মোটের উপর পরিশ্রমী ও সচ্চরিত্র, তাহারা শিক্ষা করিতে সমর্থ ও ইচ্ছুক, এবং আমাদের দেশেও কৃষি ও শিল্প অনেকে একসঙ্গে চালাইতে পারে। অসংখ্য প্রকারের কাঁচা মাল জাপান অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে ভারতবর্ষে পাওয়া যায়।

জাপান হইতে অন্যবিধ বিপদের আশঙ্কা।

ইংরেজীতে একটি কথা আছে, বাণিজ্য জয়পতাকার পশ্চাদ্গমন করে (trade follows the flag); অর্থাৎ কোন জাতি কোন দেশ জয় করিলে জেতাদের ঐ দেশে খুব বাণিজ্য বিস্তার হয়। কিন্তু কখন কখন জয়পতাকাও বাণিজ্যের অনুসরণ করে (the flag follows trade); অর্থাৎ প্রথমে প্রবল কোন রাজ্যের লোক অন্যরাজ্যে বাণিজ্য করিতে গিয়া শেষে তথায় প্রভুত্ব স্থাপন করে। যেমন রুশিয়া অনেক বৎসর ধরিয়া পারস্যের উত্তর অংশে বাণিজ্য করিতেছিল, এখন সেই বাণিজ্য রক্ষার ওজুহাতে কার্য্যতঃ পারস্যের উত্তর অংশ দখল করিয়া বসিয়াছে। খুব সম্ভব, বাণিজ্য বিস্তার ও রাজ্য বিস্তারের এবম্বিধ পরস্পর সম্বন্ধ স্মরণ করিয়া আচার্য্য বসু তাঁহার বক্তৃতায় বলেন :—"যাহাদের সঙ্গে জাপানীরা শান্তিতে বাস করিতে চায়, তাহাদের সহিত ঝগড়া বিবাদ হইতে স্বদেশ রক্ষা করিবার জন্য তাহারা যে ভবিষ্যদ্দর্শিতার পরিচয় দিয়াছে, তাহা খুব প্রশংসনীয়। তাহারা বুঝে তাহাদের দেশের শিল্পবাণিজ্যে বিদেশী কোন জাতির অত্যধিক স্বার্থ ও হাত থাকিলে নিশ্চয়ই তাহাদের সঙ্গে মনোমালিন্য ও সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে। এইজন্য তাহারা বিদেশী পণ্যদ্রব্যের উপর খুব উচ্চ হারে শুল্ক স্থাপন করিয়া প্রায় কোন বিদেশী জিনিষকেই নিজেদের বাজারে স্থান পাইতে দেয় নাই।"

আচার্য্য বসু এই ইঙ্গিত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। মাননীয় ডাক্তার নীলরতন সরকার বঙ্গের ব্যবস্থাপকসভায় দেশী শিল্পসম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতায় জাপান হইতে ভারতের বাণিজ্যিক ও রাষ্ট্রীয় উভয়বিধ আশঙ্কার কথাই বলিয়াছেন। আমরা জার্ম্মেনী ও চীনের কল্পিত দৃষ্টান্ত দ্বারা শ্রাবণের প্রবাসীতে দেখাইয়াছি, কোন দেশে রাজা হইতে পারিলে সেই দেশে বাণিজ্যবিস্তার যেমন পূর্ণমাত্রায় করা চলে, এমন আর কোন উপায়েই চলে না। ভারতবর্ষে এখনও প্রাচীন বা আধুনিক যে ২।৪ টা শিল্প বাঁচিয়া আছে, জাপানের প্রতিযোগিতায় তাহা যদি নষ্ট হয়, এবং ক্রমশঃ যদি

এদেশে বিলাতী বাণিজ্যও ঐ কারণে কমিতে থাকে, তাহা হইলে জাপানের লোভ বাড়িতে থাকিবে। তখন যে জাপান ভারতবর্ষে রাজত্ব স্থাপন করিবার চেষ্টা করিবে না, কে বলিতে পারে? তাহাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাও আছে, শক্তিও আছে, আয়োজনও আছে। চীনে জাপানের নিযুক্ত লোকেরা ঝগড়া বাধাইবার চেষ্টা করে এই উদ্দেশ্যে যে তাহা হইলে আত্মরক্ষার ওজুহাতে তাহারা কতকগুলা সৈন্য তথায় স্থায়ীভাবে রাখিবার সুযোগ পায়। ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে তাহারা যে নানাপ্রকার চক্রান্ত করিবে না, তাহার প্রমাণ কি? অতএব সময় থাকিতে ভারতবাসীদিগের এবং তাহাদের শাসনকর্ত্তাদের সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

উদ্ভিদের প্রাণ সম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দু মত।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে এবং অন্যান্য কোন কোন গ্রন্থে উদ্ভিদের প্রাণবত্তা ও অনুভবশক্তির বর্ণনা আছে। রামমোহন লাইব্রেরীতে আচার্য্য বসুর সম্বর্দ্ধনা-উপলক্ষে দর্শনাচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় এই সকলের উল্লেখ করিয়া বলেন, "শ্রোতৃবর্গ যেন কল্পনা না করেন, এই সকল উক্তি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বা আবিষ্ক্রিয়ার সমান।" তাঁহার মতে এই সকল উক্তি পর্য্যবেক্ষণ ও একাগ্র চিন্তা-প্রসূত অনুমান মাত্র। ইহার এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের মধ্যে ব্যবধান অতি গভীর ও অতি বিস্তৃত।

সাহিত্যপরিষদে অধ্যাপক বসুর অভ্যর্থনা।

রামমোহন লাইব্রেরীর পর সাহিত্যপরিষৎ অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের অভ্যর্থনা করেন। তাঁহার প্রশংসাসূচক যে-সকল কথা বলা হয়, তাহার উত্তরে তিনি বলেন, যে বিদেশে বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার জন্য তিনি যে সম্মান পাইয়াছেন, তাহা তাঁহার দেশেরই প্রাপ্য।

বসুমহাশয়ের প্রীত্যর্থ পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ একখানা প্রহসনের অভিনয় করান যাহাতে শিক্ষিতা নারীদের এবং তাঁহাদের আত্মীয়দের হেয় চিত্র আঁকা হইয়াছে। সকলেই জানে ব্রাহ্মসমাজকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রহসন লেখা হইয়াছে। বসুমহাশয় ব্রাহ্মসমাজের লোক। তাঁহাকে সম্মান করিতে গিয়া এরূপ প্রহসনের অভিনয় না করিলে ভদ্রতা রক্ষা হইত। এতটুকু সুবিবেচনা পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষের কেন হয় নাই বলিতে পারি না।

হীরেন্দ্রবাবুর আচার্য্য-প্রশস্তি।

এই সম্বর্দ্ধনা-উপলক্ষে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় বলেন:—

"আচার্য্য জগদীশচন্দ্র যখন স্বদেশে ফিরিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী হয়েন, তখন যে-সকল ছাত্র তাঁহার পদমূলে উপবিষ্ট হইয়া বিজ্ঞানের ক, খ, শিখিয়াছিল, আমি তাহাদের অন্যতম। অতএব তাঁহার সম্বর্দ্ধনা-উপলক্ষে কিছু বলিতে সংকোচ বোধ করিতেছি। বিজ্ঞানক্ষেত্রে আচার্য্য মহাশয় যে অপূর্ব্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, যে জন্য ভারতবাসীর নাম জগতে এখন ঘোষিত হইতেছে, তজ্জন্য তাঁহার স্বদেশবাসী মাত্রেই গৌরব অনুভব করিতেছে। বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, দুই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক আছেন। প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা পরীক্ষা করিয়া Facts সংগ্রহ করেন, সজ্জিত করেন, ব্যাপার লিপিবদ্ধ করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক এই সকল facts ও ব্যাপার হইতে অদ্ভুত মনীষা-বলে সত্যের আবিষ্কার করেন, নিয়মের প্রতিষ্ঠা করেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র এই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক। প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানবিদ্‌কে যদি বৈজ্ঞানিক বলা হয়, তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈজ্ঞানিককে প্রাজ্ঞানিক বলা উচিত। বিজ্ঞানের উপর প্রজ্ঞান, সেই প্রজ্ঞান দ্বারা তাঁহারা তত্ত্বের আবিষ্ক্রিয়া করেন। এই প্রজ্ঞানকে পাশ্চাত্যগণ scientific imagination আখ্যা দিয়াছেন।

"জড়ের যে জীবন আছে, উদ্ভিদের যে প্রাণন আছে, উভয়ের যে ক্লান্তি স্ফূর্ত্তি আছে, উভয়ের মধ্যে যে প্রাণশক্তি ক্রীড়া করিতেছে, আমাদের দেশের প্রাচীন গ্রন্থে একথা অনেকস্থলে উল্লিখিত দেখা যায়। অতএব এ সকল কথা আমরা অনেক দিন শুনিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু কাণে শুনা আর চক্ষে দেখায় অনেক অন্তর। আমরা যে সকল কথা কাণে মাত্র শুনিয়াছিলাম, আচার্য্য মহাশয় তাহা আমাদিগকে চক্ষে দেখাইয়াছেন। এখন আমরা সেই সকল প্রাচীন উপদেশের সারবত্তা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। একজন

পাশ্চাত্য লেখক তাঁহাকে বৈজ্ঞানিক যাদুকর আখ্যা দিয়াছেন। এ-নাম তাঁহার সার্থক হইয়াছে।

"এ দেশে যাঁহারা সত্য দর্শন করিতেন, তত্ত্ব সাক্ষাৎ করিতেন, তাঁহাদিগের প্রাচীন নাম ছিল কবি। যিনি বৈদিক সত্যের আদি দ্রষ্টা, প্রাচীন শাস্ত্রে তাঁহাকে আদি কবি বলে :—

তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদি কবয়ে।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র সেই আদি কবির প্রতিচ্ছবি। তিনিও তত্ত্বদ্রষ্টা, সত্যের আবিষ্কর্ত্তা। অতএব তাঁহার সমক্ষে আমাদের শির আপনি প্রণত হইতেছে। ভগবান্ তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন।"

শিক্ষার বয়স।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ছাত্রসমাজ আচার্য্য বসু ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে যে সম্বর্দ্ধনা করেন, তদুপলক্ষে বসু মহাশয় এই মর্ম্মের কথা বলেন, যে তাঁহার শরীরে জরার লক্ষণ দেখা দিলেও তিনি এখনও ছাত্র। বাস্তবিক প্রকৃত জ্ঞানী ও জ্ঞানান্বেষীরা চিরজীবন শিক্ষা করেন, তাঁহাদের কৌতূহলের নিবৃত্তি হয় না, শিক্ষাও কখন সমাপ্ত হয় না। মূর্খেরাই মনে করে যে দুচারটা পাস করিলেই শিক্ষা সমাপ্ত হইয়া যায়।

পূর্ব্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ।

ইউরোপে যুদ্ধ হওয়ায় গত বৎসর পাটের কাট্‌তি কমিয়া যায়। তাহাতে কৃষকদিগকে পাট সস্তাদরে ছাড়িতে হইয়াছিল। ত্রিপুরা ও নোয়াখালী এই দুই জেলার পাট-চাষীরা এইকারণে আড়াই কোটি টাকা কম পাইয়াছে। পাট-উৎপাদক অন্যান্য জেলাতেও চাষীদের আয় এইরূপ কম হইয়াছে। তাহার উপর উফরা রোগে গত বৎসরের আমন ধানের খুব ক্ষতি হয়। গত বৎসর পাটের চাষে ক্ষতি হওয়ায় এবার লোকে পাটের আবাদ অনেক কম জমিতে করিয়াছে। তাহাতে ভূমিশূন্য মজুরদের অনেকের ক্ষেতে কাজ করিয়া রোজগারের পথ বন্ধ হইয়াছে। তাহার পর আবার বন্যায় লোকের ঘর-বাড়ী কোথাও ভাসিয়া, কোথাও ডুবিয়া, কোথাও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অস্থাবর সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে; শস্য কোথাও সম্পূর্ণরূপে, কোথাও বা অংশতঃ নষ্ট হইয়াছে। এইরূপে হাজার হাজার লোক গৃহহীন, অন্নহীন, বস্ত্রহীন হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে সাহায্য হইতেছে, কিন্তু তাহা যে যথেষ্ট নয়, তাহা সাহায্যকারী নানাদলের লোকদের কার্য্য-বিবরণ হইতেই বুঝা যাইতেছে। এইসময়ে সর্ব্বসাধারণ মুক্তহস্ত হইয়া টাকা দিলে বিস্তর লোকের প্রাণ বাঁচিবে। যিনি সাহায্যকারী যে দলের কার্য্যের বেশী খবর রাখেন, তিনি তাহাদিগকেই টাকা পাঠাইবেন। আমরা ভাল করিয়া জানি, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত রায় সাহেব রাজমোহন দাস, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায়, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দেব প্রভৃতি বিশেষ পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া কাজ করিতেছেন। রায়সাহেব নিজের তত্ত্বাবধানের অধীন সাহায্যদান-কেন্দ্রগুলিরই জন্য সপ্তাহে এক হাজার টাকা চাহিয়াছেন। আপাততঃ চাউল দিয়া মানুষগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। বর্ষার পর জল শুকাইয়া গেলে কার্ত্তিক মাস নাগাদ লোকের ঘরবাড়ী বাঁধিবার জন্য টাকার দরকার হইবে। তখন আর একবার সহৃদয় দানশীল ব্যক্তিগণকে অর্থসাহায্য করিতে হইবে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যে কার্য্য করিতেছেন, যাঁহারা তাহার সাহায্য করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা, শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, সম্পাদক, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ, ২১১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, এই ঠিকানায় টাকা পাঠাইবেন।

পূর্ব্ববঙ্গের দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট অধিকাংশ লোক মুসলমান। অথচ মুসলমানদিগকে সাহায্যদান-কার্য্যে বেশী অগ্রসর দেখিতেছি না। বল্কান-যুদ্ধের সময় বিপন্ন তুর্কদের সাহায্যার্থ বঙ্গের মুসলমানেরা অনেক টাকা তুলিয়াছিলেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে ইচ্ছা করিলে তাঁহারা বিপন্নের সাহায্য করিতে পারেন। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে করিতেছেন না কেন? ইহার পূর্ব্বেও পূর্ব্ববঙ্গে অন্নকষ্টের সময় লক্ষ্য করিয়াছি যে হিন্দুরা যেরূপ সাহায্য করিয়াছেন, মুসলমানেরা সেরূপ করেন নাই। ইহার কারণ কি?

বিদ্যাসাগর স্মৃতি-সভা।

প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এত প্রকারে মনুষ্যত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, এত প্রকারে জনসমাজের হিত করিয়া গিয়াছেন, যে সংক্ষেপে

তাঁহার চরিত্রের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিবার চেষ্টায় তাঁহার দয়া, তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা, তাঁহার সমাজহিতৈষিতা, তাঁহার স্বার্থত্যাগ, তাঁহার নির্ভীকতা, তাঁহার অটল প্রতিজ্ঞা, এবং তাঁহার অধ্যবসায়ের যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহার আর কোন কার্য্যে সেরূপ পাওয়া যায় না। বিদ্যাসাগরের মনুষ্যত্বের যদি পূজা করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার এই সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তিটিকে কোন মতেই বাদ দেওয়া যায় না। তাঁহা অপেক্ষা বড় লেখক বাংলা দেশে জন্মিয়াছে, তাঁহার মত স্কুল কলেজ স্থাপনও অপরে করিয়াছে, তিনি যত টাকা দান করিয়া গিয়াছেন, আর কেহ তত টাকা দেয় নাই, এমন কথাও বলা চলে না। কিন্তু সমাজসংস্কারে তাঁহা অপেক্ষা বেশী পৌরুষ কেহ দেখাইতে পারেন নাই। অতএব তাঁহার স্মৃতিসভায় বিধবা-বিবাহ প্রচলন চেষ্টার উল্লেখ না করা রামবিহীন রামায়ণ গান করার মত।

বালিকা বিধবাদের বিবাহ দেওয়াই তাহাদের মঙ্গল-সাধনের একমাত্র উপায়, ইহা আমরা মনে করি না। কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ইহাকেই সর্ব্বপ্রধান এবং স্বাভাবিক উপায় বলিয়া মনে করি। যিনি যাহা শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মনে করেন, কাজ করিয়া তাহা দেখান। কল্পনা দ্বারা কাহারও উপকার হয় না। হিন্দুবিধবাদিগকে "দেবী" বলিয়া প্রশংসা করিলেও কর্ত্তব্যের সমাপন হয় না।

বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে যাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতের সমর্থন করেন না, তাঁহারা তাঁহার স্মৃতিসভায় সে বিষয়ের উল্লেখ না করিলে তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু তাঁহার একজন জীবনচরিতলেখক যে বিধবার বিবাহ দেওয়ার জন্য বিদ্যাসাগরের নরকবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা গোঁড়ামির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। যমরাজ সম্ভবতঃ তাহা নামঞ্জুর করিয়াছেন। যমরাজের হুকুম যাহাই হউক, বিদ্যাসাগরের সহিত নরকবাস বাঞ্ছনীয়। যদি ঘটনাক্রমে বিদ্যাসাগর মহাশয় ও তাঁহার এই চরিতাখ্যায়ক একই লোকে হাজির হন, তাহা হইলে ঈশ্বরচন্দ্র নিশ্চয়ই রায়সাহেব যে লোক উজ্জ্বল করিবেন, তাহা সভয়ে পরিত্যাগ করিবেন।

কুচবিহারের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান

রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর, বি, এল ; সি, আই, ই।
জন্মস্থান মেড়াল, জেলা বর্দ্ধমান। জন্ম ১৮৪১ খ্রীঃ অঃ।

কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সংসারচন্দ্র সেন, রমেশচন্দ্র দত্ত, প্রভৃতির ন্যায় রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুরও বাঙ্গালীর রাজ্যশাসন ক্ষমতা সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জানকীবল্লভ বিশ্বাস তাঁহার নিম্নে মুদ্রিত জীবনচরিতটি পাঠাইয়াছেন :—
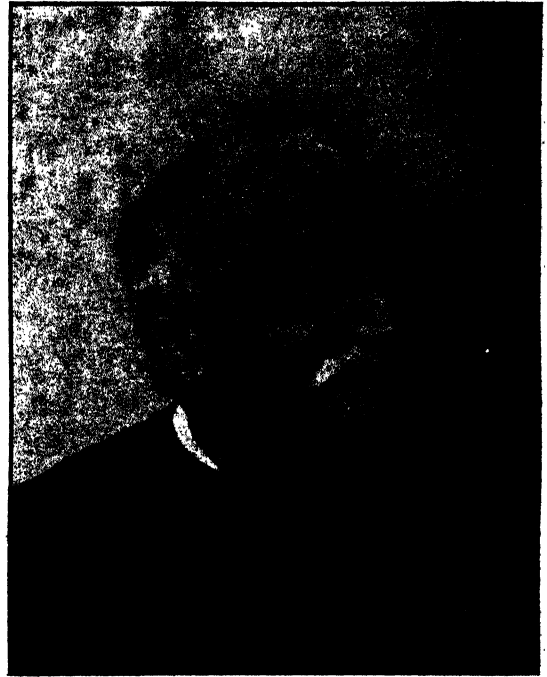
রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর।

"যে মনস্বীর মহাপ্রস্থানে বঙ্গমাতা আজ রত্নহারা, বর্দ্ধমান শোকাতুরা, কুচবিহার বিষাদপুরীতে পরিণত, সংক্ষেপে তাঁহার বিশেষ পরিচয় প্রদান করা সম্ভব নহে। স্বর্গীয় রায় বাহাদুর স্বনামধন্য পুরুষ ; তাঁহার কীর্ত্তিকাহিনী সর্ব্বজনবিদিত ; বহুবার ইংরেজি বাঙ্গলা পত্র-পত্রিকায় তাঁহার কার্য্যাবলী আলোচিত হইয়াছে ও হই-তেছে। কিগুণে তিনি লোকপ্রিয় হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কি মন্ত্রে তিনি কর্ম্মজীবনে সাফল্যের জয়মাল্যে ভূষিত হইতে পারিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ

না হইলেও, আজ তাহাই কেবল মনে পড়িতেছে। কার্য্যে একাগ্রতা, তাহা সুসম্পন্ন করিবার ঐকান্তিক চেষ্টা, শৃঙ্খলা, কর্ত্তব্যসম্পাদনে প্রাণপণ চেষ্টা, তাহাতে অতুল আনন্দ অনুভব, অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা; তাঁহার মধুর স্বভাব, মিষ্টভাষণ, গুণের সমাদর, অন্যায়ের অনাদর প্রভৃতি তাঁহার প্রতি কার্য্যে প্রতিভাত। আপ্যায়ন সমাদরে, আত্মীয়তা করিতে তিনি খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন; সময়ের সদ্ব্যবহারে, যথাসময়ে ঘড়ির কাঁটার ন্যায় কার্য্যসম্পাদনে, রাজকীয় কার্য্যকলাপে, আহারে নিয়মে, তিনি ছিলেন ইংরেজের মত। প্রতিদিন শয্যাত্যাগ করিতেন অতি প্রত্যুষে, ঠিক মিনিট ধরিয়া একই সময়ে; প্রাতঃকৃত্যেও সেই নিয়ম, ভগবানের আরাধনাতেও তাই। প্রার্থনাতেও। তৎপর লিখিতেন চিঠিপত্র, নিজের ও অর্দ্ধসরকারী। বাহিরে আসিতেন ঠিক সাতটায়; অর্দ্ধঘণ্টা সমাগত ভদ্রমণ্ডলীর সহিত আলাপ, আপ্যায়ন, এবং ব্যক্তিগত কার্য্যের কথা হইত। ৭॥ টায় সদর বৈঠকখানায় সমাগত-জনের প্রত্যেকের অভাব অভিযোগ শুনিয়া মিষ্ট কথায় সকলকে তুষ্ট করিতেন; উপস্থিত ভিক্ষার্থীদিগকে কিছু কিছু দান করিয়া ভ্রমণে বাহির হইতেন। প্রার্থীর অভাব মোচন করিতে সর্ব্বদা তিনি সচেষ্ট থাকিলেও, সকল সময় সকলের স্বার্থ রক্ষা করিতে পারিতেন না, বলাবাহুল্য; কিন্তু নিরাশ ব্যক্তিকেও বলিতে শুনিয়াছি, "লোকটার মুখ কি মিষ্টি, কথা শুন্‌লে আর কোন ক্ষোভ থাকে না।" কাহার কোথায় অসুখ, কোন্ পান্থশালা, ঠাকুরবাড়ী, অনাথ-আশ্রম কেমন চলিতেছে, সহরের কোন স্থানে কি হইলে সুবিধা হয়, ইত্যাদি তথ্য ভ্রমণকালে স্বয়ং স্থানে স্থানে উপস্থিত হইয়া সংগ্রহ করিতেন। বাসায় ফিরিতেন ঠিক সময়; স্নান করিতেন প্রতিদিন সমতাপবিশিষ্ট জলে, আহার রোজ সমওজনের তণ্ডুলের অন্ন, নিয়মিতসংখ্যক ব্যঞ্জন সহকারে। বিশ্রামের পর আদালতে যাইতেন ঘড়ির কাঁটার মত; ফিরিতেনও প্রায় এক সময়ে। বিশ্রাম, মুক্ত বায়ুসেবন, সন্ধ্যাবন্দনা, সকল কার্য্যেই তাঁহার বাঁধাবাঁধি নিয়ম ও নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল—বিশেষ কোন কার্য্য ব্যতীত তাহার অন্যথা কখনও হয় নাই। কর্ম্মবীর মহা শোকের কালেও কর্ত্তব্যকার্য্য নিয়মিত সম্পাদন করিয়াছেন,—কার্য্যে তিনি সংসারের সকল চিন্তা বিস্মৃত হইতেন, কর্ম্মই ছিল তাঁহার সুখ, শান্তি। রাত্রিতে রাজকার্য্য অতি অল্পই হইত। সেসময় বন্ধুবান্ধব, প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী লইয়া নানাবিষয়ের আলোচনায়, সাময়িক পত্র, ইংরাজি বাঙ্গালা মাসিক, নবপ্রকাশিত পুস্তকাদি পাঠে অতিবাহিত করিতেন। নিজে পড়িতেন; ছেলেরা পড়িয়া শুনাইত; এজন্য একজন কর্ম্মচারী ছিলেন, তিনি বিবিধ তথ্যের সার সঙ্কলন করিয়া সেই আসরে পাঠ করিতেন। ফলে, সভ্য জগতের জ্ঞাতব্য ঘটনা, মতবাদ, সাহিত্য প্রভৃতির নিত্য তাজা সংবাদ (up-to-date information) সংগ্রহে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। কোন বিষয়ে পশ্চাতে পড়িয়া থাকাকে তিনি অতি লজ্জার বিষয় মনে করিতেন। তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল—'অগ্রসর হও; নিজকে সম্পূর্ণতা দান কর, আরব্ধকার্য্যকে প্রাণপণ করিয়া ও সম্পূর্ণতা দিয়া অতুল আনন্দের অধিকারী হও।' এই মন্ত্রের বলেই, তিনি জীবনে জয়ী; বাল্যে 'বল্লার' পাঠশালায়, কৃষ্ণনগরের কলিজিয়েট স্কুলে, কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে মেধাবী ছাত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন, বি, এ, পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন। কি আইন পরীক্ষায়, কি মুন্‌সেফিতে, ডেপুটী গিরীতে, কুচবিহারের দেওয়ানরূপে, এই নীতিতেই তিনি সকল কাজে সম্পূর্ণ সাফল্য ও সুখ্যাতি অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮৬৯ খৃঃ যখন তিনি কুচবিহারের দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত হন, তখন উক্ত রাজ্যের অবস্থাই বা কি ছিল, আর যখন ১৯১১ সনে ৪২ বৎসরের উপর দেওয়ানী করিয়া কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তখনই বা কুচবিহারের কি উন্নত অবস্থা, তাহা পর্য্যালোচনা করিলেই এই মনস্বীর কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। রাজ্যের আয় তাঁহার কালে ১৪ লক্ষের উপর বৃদ্ধি পাইয়াছে ও পূর্ব্বে যেস্থান ব্যাঘ্রভল্লুকের আবাসভূমি ছিল, এখন সৌন্দর্য্যে, স্বাস্থ্যে ও নানা সুবিধার জন্য তাহা উত্তর বঙ্গের শীর্ষস্থানীয়। দেওয়ান বাহাদুর নিজে খুঁটিয়া খুঁটিয়া যে স্থানে যেটি হইলে নগর সুসজ্জিত, সুরম্য, ও সম্পূর্ণ হয়, সেখানে সেইটির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কলেজ, বোর্ডিং, অনাথ-আশ্রম, অতিথিশালা, পান্থশালা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির, হিন্দুর ধর্ম্মশালা, জেল, মন্দির, মহম্মদীয় মস্‌জিদ

ইত্যাদি তাঁহারই চেষ্টার ফল,—তাঁহারই মন্ত্রিত্বের কীর্ত্তি। কোথাও ষ্টেটের সাহায্যে, কোথাও বা ধনীকে উৎসাহিত করিয়া, অন্যত্র নিজ অর্থ সাহায্যে তিনি নানা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিকার্য্যই স্থায়ী ভাবে সম্পাদন করিবার চেষ্টা ছিল। ইহার ফলে কুচবিহাররাজ্য রাস্তাঘাটে, অট্টালিকা ইমারত প্রভৃতিতে এরূপ উন্নত। সাধারণ হিতকর কার্য্যে অধিবাসীগণ অপেক্ষা তাঁহার উৎসাহই বেশী ছিল, ধর্ম্ম-মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠাকল্পে সেই সেই ধর্ম্মাবলম্বী তাদৃশ তৎপরতাপ্রদর্শনে বিমুখ হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন "সে কি হয়? আপনাদের একটা সাধারণ উপাসনার স্থান থাকিবে না। লাগিয়া পড়ুন, পশ্চাতে আমিই আছি।" সকল কার্য্যেই ছিল তাঁহার এইরূপ উৎসাহ-উক্তি! কর্ম্মীপুরুষ কর্ম্মে আত্মহারা হইতেন। তাঁহার মধ্যে কবিত্বেরও অভাব ছিল না; আশ্রমাদির অবস্থান ও ব্যবস্থা দেখিলেই তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যখন সিবিলিয়ান হইয়া স্বদেশে ফিরিবেন, তখন দেওয়ান পুত্রকে লিখিয়াছিলেন, বিলাতের চিহ্ন আমার জন্য কি আনিবে? আনিও সেই পবিত্র রেণু—মহাকবি সেক্সপিয়র যেস্থানে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন—তাহার তুলনা আছে কি?" তাঁহার জন্মভূমি তাঁহার চক্ষে স্বর্গ ছিল, দেশের নিজ ক্ষেত্রের ধান্য তিনি ব্যবহার করিতেন, বলিতেন, "মেড়ালের তৃণগাছটিও আমার পক্ষে পবিত্র সংসারের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বস্তু!" মেড়ালে, তাঁহার স্ত্রীর স্মৃতি-মন্দির বিদ্যালয় ইত্যাদি প্রেম ও পুণ্যের নিদর্শন। কালিকাদাসের হৃদয় ছিল, ক্ষমতা ছিল। সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্য তাঁহার তিনি বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; প্রভুরূপে যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনিও ছিলেন মহাপ্রাণ, নানাগুণে ভূষিত মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর। এহেন মুক্তহস্ত কর্ম্মবীরের সহায়তায় কালিকাদাস এরূপভাবে সাফল্য লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রভুর প্রশংসা সহানুভূতির সহিত গভর্ণমেণ্টের প্রশংসা ও সি, আই ই উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। মহারাজা দেওয়ানকে বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন, কালিকাদাসও প্রভুর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন। প্রভু পরলোকে, প্রভুভক্ত অমাত্যও তাঁহার সহিত চির সুখময় রাজ্যে মিলিত হইলেন। ভগবান তাঁহাদের আত্মার কল্যাণ করুণ।

"দেওয়ান বাহাদুরের দুইটি কৃতী পুত্র ও তিনটি কন্যা এক্ষণে বর্ত্তমান। তাঁহাদের কর্ম্মবীর পিতা স্বকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া মহাসুখে স্বর্গরাজ্যে অবস্থিত,—ইহাই তাঁহাদের শান্তি।"

ভারতস্ত্রীমহামণ্ডল।

ভারতস্ত্রীমহামণ্ডলের কলিকাতা শাখার সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা কৃষ্ণভাবিনী দাস মহাশয়া লিখিয়াছেন:—

"মঙ্গলময় বিধাতার আশীর্ব্বাদে ভারতস্ত্রীমহামণ্ডল চারি বৎসর পূর্ণ করিয়া পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। এখনও অতি সন্তর্পণে অতিযত্নে ইহাকে পালন করিতে হইবে। অধ্যবসায় ও উৎসাহের বারিসেচনে ইহাকে পুষ্ট ও সতেজ রাখিতে হইবে। গত তিন বৎসরের বার্ষিক বিবরণীতে প্রবাসীর পাঠকপাঠিকারা জানিয়াছেন যে এই সমিতি ক্রমশঃ কার্য্য বিস্তার করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। বর্ত্তমান বৎসরের প্রথমেই ব্যয়ের অপেক্ষা আয় এত বেশী হইয়াছিল যে সমিতি এপ্রেল মাসে ১৯১৩ সালের ১৩০০৲ টাকা ঋণের মধ্যে ৮০০৲ টাকা পরিশোধ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

"হঠাৎ আগষ্ট মাসে ইউরোপে মহাসমর আরম্ভ হওয়ায় দেশের সর্ব্বত্র ভয়ানক হুলস্থুল পড়িয়া গেল। অন্যান্য অনেক দাতব্য কাজের ন্যায় ভারতস্ত্রীমহামণ্ডলেরও কিছু ক্ষতি হইতে লাগিল। উৎসাহদাতাগণ কেহ বা চাঁদা বন্ধ করিলেন, কেহ বা কমাইয়া দিলেন। আমরা কিয়ৎ পরিমাণে নিরাশ হইয়া পড়িলাম। কিন্তু ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া আমরা এই অন্তঃপুরস্ত্রীশিক্ষাকার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলাম, বিপদের সময়ও তাঁর দয়া ও ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া চলিতে লাগিলাম। নানারূপে ব্যয়ের লাঘব করিয়া, গাড়ী কমাইয়া দিয়া, কোনরূপে আয়ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চালাইতে লাগিলাম। এখানে ইহাও উল্লেখ করা উচিত যে ভারতস্ত্রীমহামণ্ডল একটি কো-অপারেটিভ ইনষ্টিটিউশন—অর্থাৎ সমবায়-সমিতির ন্যায়। ইহার প্রতি মেম্বর, প্রতি ছাত্রী, প্রতি শিক্ষয়িত্রী ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন। এই দুঃসময়ে ছাত্রীদের অভিভাবকগণ কেহ বা গাড়ী দিয়া, কেহ বা ২৲ টাকা বেশী বেতন দিয়া সমিতির সাহায্য করিতে লাগিলেন। শিক্ষয়িত্রীগণ ছুটির মাসে অর্দ্ধ-বেতনে এবং কয়েক মাস অল্প পারিশ্রমিক লইয়া কাজ করিয়াছেন। এ নিমিত্ত মহামণ্ডল শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীদের অভিভাবকগণের নিকট কৃতজ্ঞ।

"এইরূপে চারিদিকের সাহায্য পাইয়া, সমিতি যুদ্ধারম্ভে যে ধাক্কা পাইয়াছিল, বৎসরের শেষে তাহা সামলাইয়া লইল। সমস্ত বৎসরের আয়ব্যয় মিলাইয়া দেখা যাইতেছে যে গত বৎসর যুদ্ধের হাঙ্গাম সত্ত্বেও সমিতির আর্থিক অবস্থা অনেক ভাল ছিল। ঋণ পরিশোধ না করিলে প্রায় ১৩০০৲ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিত।

গত বৎসর সমিতির মোট আয় ছিল ৮১৫৫৲ টাকা,
মোট ব্যয় ৮১৬০৲ টাকা।

কেবল ৬৲ টাকা মাত্র ঋণ হইয়াছিল। ইহাতেই জানা যাইতেছে চার বৎসর কাজ করিয়া সমিতি এখন অনেকটা নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছে। এই চার বৎসরে শ্রীমহামণ্ডলের মেম্বর সংখ্যা ৭০০ জনের উপর হইয়াছে, সকল ধর্ম্ম ও সকল সম্প্রদায়ের নারীদিগেরই ইহার প্রতি সহানুভূতি ও কৃপাদৃষ্টি আছে। আশা করা যায় ভগবানের দয়ায় ও উদার মহোদয়দের সাহায্যে ও মেম্বরগণের উৎসাহে ইহা ক্রমশঃ একটি মহাসমিতিতে পরিণত হইয়া দেশের একটি প্রধান অভাব দূর করিতে সক্ষম হইবে।

"কতকগুলি মেম্বরের চেষ্টায় গত বৎসর একটী নিরাশ্রয়া ভবন খোলা হইয়াছে। এখানে অসহায়া স্ত্রীলোক দিগকে আশ্রয় ও শিক্ষা দিয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইতে শিখান হইতেছে। উপস্থিত ৫টী মেয়ে শিক্ষা পাইতেছে।"

"অস্পৃশ্য হিন্দু।"

মুসলমান সম্প্রদায়ের একখানি সাপ্তাহিক কাগজে "অস্পৃশ্য হিন্দু" কথা দুটির পুনঃ পুনঃ ব্যবহার দেখিলাম। আমরা মুসলমান শাস্ত্র পড়ি নাই; তাঁহাদের সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে খুব বেশী জ্ঞান আমাদের নাই। কিন্তু যতটুকু জানি, তাহাতে আমাদের এই ধারণা ছিল যে তাঁহাদের ধর্ম্মানুসারে মুসলমানেরা কোন ধর্ম্মাবলম্বী মানুষকে অস্পৃশ্য মনে করেন না। যিনি যাহাই মনে করুন, কোন মানুষই অস্পৃশ্য নহে। ভগবান্ সর্ব্বত্র আছেন; সুতরাং তিনি সকলকেই ছুঁইয়া আছেন এবং সকলের মধ্যে আছেন। তিনি যেখানে যাহার মধ্যে আছেন, তাহা অস্পৃশ্য, ঈশ্বরবিশ্বাসী কেমন করিয়া এরূপ মনে করিতে পারে, জানি না।

যাহাই হউক, ইতিহাস হইতে দেখা যাইতেছে, যাহারা কোন শ্রেণীর মানুষকে অস্পৃশ্য মনে করিয়াছে, তাহাদের সাতিশয় দুর্গতি হইয়াছে। অতএব, মানুষের স্পৃশ্যতা-অস্পৃশ্যতার বিচার যাঁহারা করেন, তাঁহারা সাবধান।

আফগানিস্তানের আমীরের স্বদেশপ্রেম।

আফগানিস্তানের আমীর হবীবুল্লা খাঁ স্বদেশপ্রেমিক বলিয়া বিখ্যাত। সংবাদপত্রে সম্প্রতি এই খবর বাহির হইয়াছে যে তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে যুবরাজ ও সভাসদ্‌বর্গসহ কাবুলের পশমিনা কারখানা দেখিতে যান। ঐ কারখানার উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি তাহাদিগকে বলেন, যে, তিনি ভারতবর্ষ ভ্রমণকালে তথাকার একটি পশমী কাপড়ের কারখানা দেখিতে যান। কারখানার লোকেরা এক জায়গায় একরাশি পশম দেখাইয়া বলে, উহা আফগানিস্তানের পশম, এবং উহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তখন আমীর বলেন, "খোদার যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আপনারা এই পশম আর পাইবেন না।" তখন কারখানার লোকেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে, তিনি কি ভারতবর্ষে আফগানিস্তানের পশম রপ্তানী বন্ধ করিবেন? আমীর বলিলেন, না আমি আমার রাজ্যেই পশমিনা কারখানা খুলিব; তাহাতে আমার দেশের পশম ব্যবহৃত হইতে থাকিলেই উহার রপ্তানী বন্ধ হইয়া যাইবে। নিজরাজ্যের কারখানাটির উৎপত্তি এইরূপে বর্ণনা করিয়া তিনি এরূপ কারখানার প্রয়োজন ও উপকারিতা বুঝাইয়া দিলেন। তিনি তাঁহার পার্শ্বচর সকলকে বলিলেন, "এইরূপ কারখানা সকল স্থাপিত হইলে তাঁহার জীবিত দেহের পোষাকের অভাব হইবে না, এবং মৃতদেহ আচ্ছাদন করিবারও বস্ত্রের অভাব হইবে না। ভগবানের কৃপায় এ পর্য্যন্ত তাঁহার এরূপ অভাব হয় নাই। কিন্তু বিদেশ হইতে ক্রীত বস্ত্রে তাঁহাকে শীত ও লজ্জা নিবারণ করিতে হয় বলিয়া তিনি আপনাকে নগ্ন মনে করেন। দেশে আরও কারখানা খোলা হইলে দেশের লোকের সমুদয় পরিচ্ছদ দেশেই প্রস্তুত হইবে। তখন সকলের নগ্নতা দূর হইবে।"

কাবুলের কারখানায় এখন রং প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইতেছে; কারণ যুদ্ধের জন্য বিদেশী রং পাওয়া কঠিন হইয়াছে।

আমীরের কার্য্য ও বক্তৃতা হইতে এই শিক্ষা লাভ হয়, যে, দেশের কাঁচা মাল বিদেশে যাইতে না দিয়া দেশেই তাহা হইতে নানাবিধ ব্যবহার্য্য শিল্পদ্রব্য ব্যবহার করা উচিত। দ্বিতীয় উপদেশ এই পাওয়া যায়, যে, বিদেশী কাপড়ে কোন জাতির লজ্জা নিবারণ হয় না; তাহাতে কেবল নগ্নতা বাড়িতে থাকে।

জাপানের উন্নতির দু একটি কারণ।

বোম্বাইয়ের অধ্যাপক নেল্‌সন্ ফ্রেজার জাপানে বেড়াইয়া আসিয়া তৎসম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিয়াছেন। তাহা হইতে জাপানের উন্নতির কয়েকটি কারণ অনুমান করা যায়। তিনি বলেন জাপানীরা সাধারণতঃ ভাত ও মাছ খায়। শিমের চাট্‌নী দিয়া তাহারা কাঁচা মাছ খায়। ধনী সম্ভ্রান্ত লোকেরাও রান্না লইয়া কোন হাঙ্গামা করে না। তাহারাও ভাত, মাছ, চাট্‌নী এবং এক পেয়ালা চায়ে সন্তুষ্ট, বাংলা দেশের ধনীদের ৫০ ব্যঞ্জন না হইলে চলে না। কখন কখন শতাধিক রকমের রান্নাও হয়। বঙ্গের সাধারণ গৃহস্থেরা যত রকম তরকারী খান, পশ্চিমের হিন্দুস্থানী ধনী লোকেরাও ততটা ঔদরিকতা দেখান না।

স্বর্গীয় ভাই প্রকাশ দেবজী একজন পঞ্জাবী প্রচারক ছিলেন। তিনি বাংলা জানিতেন, এবং বাঙ্গালীদিগকে ভাল বাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু তিনি বলিতেন, বাঙ্গালীর মেয়েদের নানা রকম তরকারী কুটিয়া রান্না করিতে এবং বাঙ্গালী পুরুষদের সেই সব জিনিষ খাইয়া হজম করিতে যেরূপ সময় ও শক্তি যায়, তাহাতে তাহারা ভাল কাজ করিবে কখন ও কিরূপে? ইহার মধ্যে পরিহাস ছিল, সত্য কথাও ছিল। বাস্তবিক, রান্না খাওয়ার এতটা বাড়াবাড়িতে যে কেবল সময় ও শক্তি যায়, তা নয়, অকারণ অর্থনাশও হয়, এবং বিলাসিতা অভ্যাস হইয়া যাওয়ায় মানুষ একটু অকেজোও হইয়া যায়। অবশ্য আমরা কাহাকেও জাপানীদের মত কাঁচা মাছ খাইতে বলিতেছি না, শুধু ভাত খাইয়াও থাকিতে বলিতেছি না। যথেষ্ট পরিমাণে অল্প কয়েক রকমের পুষ্টিকর সুখাদ্য খাইলেই হয়; পেটের পূজা জীবনের প্রধান বা অন্যতর উদ্দেশ্য নয়।

নেল্‌সন্‌ ফ্রেজার সাহেব জাপানীদের সম্বন্ধে আরও বলেন, যে, তাদের মেয়েদের গয়নার উপর কোন আসক্তি নাই। তাহারা গয়না পরে না বলিলেও চলে।

জাপানীরা সর্ব্ব প্রকার শিল্পে পূর্ণ দক্ষতা লাভ করিয়া নিখুঁত জিনিষ প্রস্তুত করিতে চায়। ইহাই তাহাদের লক্ষ্য। চরম উৎকর্ষ লাভের এই যে ইচ্ছা ও চেষ্টা ইহাই তাহাদের শিল্পে সিদ্ধিলাভের মূল কারণ। আমাদের দেশে যিনি যে কাজ করেন, তাঁহাকে তাহার দোষ দেখাইলে অনেক সময় তিনি "অপমান" বোধ করেন। যদি বলা যায়, ভারতবর্ষেই ইংরেজের দোকানে, কারখানায়, বা ছাপাখানায়, ইহা অপেক্ষা ভাল কাজ হয়, অমনি উত্তর পাওয়া যায়, আমাদের দ্বারা এর চেয়ে ভাল হইবে না। অথচ ভারতপ্রবাসী ইংরেজেরাও দেশী লোকের দ্বারা কাজ করায়, এবং আমরা যে সব যন্ত্র এবং মালমস্‌লা ব্যবহার করি, তাহারাও তাহাই করে। উচ্চ আদর্শ না থাকিলে, এবং নিজেদের শক্তির বিকাশের সম্ভাবনায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস না থাকিলে কোন জাতি কখন বড় হইতে পারে না। বিদেশীরা ত বলিবেই যে তোমরা অতি অপদার্থ, অকর্ম্মণ্য; তোমাদের দ্বারা কখন কিছু বড় বা সুন্দর কাজ হইবে না। কিন্তু আমরা তাহা মানিয়া লইব কেন?

ফ্রেজার সাহেব বলেন, চীনাদের দেহ জাপানীদের চেয়ে বলিষ্ঠ, এবং জাপানীরা রোগ ভোগ বড় করে কম নয়। তাহার একটা কারণ, চীনাদের খাদ্য জাপানাদের চেয়ে পুষ্টিকর। ফ্রেজার সাহেব যাহা বলিয়াছেন, তাহা মিথ্যা মনে করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু চীনারা জাপানীদের চেয়ে বলিষ্ঠদেহ ও সুস্থ হইলেও, চীনারা সংখ্যায় ৪০ কোটি এবং জাপানীরা মোটে ৫ কোটি হইলেও, এখন চীনকে জাপানের ধমক সহিতে হইতেছে; জাপানীরা পৃথিবীর যে কোন জাতির সমকক্ষ, চীনারা স্বাধীন থাকিতে পারিবে কি না, তাহা এখনও সন্দেহস্থল। জাপান একাগ্র স্বদেশপ্রেম দ্বারা, এবং সর্ব্ববিষয়ে যে শিক্ষা ও যে কার্য্যপ্রণালী সর্ব্বাপেক্ষা ফলদায়ক তাহা অবলম্বন করিয়া, শক্তিশালী হইয়াছে। নিজেদের মধ্যে দুর্ব্বলতার কারণ যাহা দেখিয়াছে, জাপানীরা তাহা নির্ম্মমভাবে পরিত্যাগ করিয়াছে ও করিতেছে, সবলতার কারণ বিদেশে যাহা দেখিয়াছে ও দেখিতেছে, তাহা সর্ব্বদা গ্রহণ করিতে উন্মুখ হইয়া হইয়া রহিয়াছে। স্বদেশের কোন প্রথা, কুসংস্কার বা বিশ্বাস তাহাদিগকে অন্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেছে না।

জাপান রুশিয়ার শিক্ষক।

দর্শন বা আধ্যাত্মিক বিষয়ে আমরা ইউরোপ আমেরিকাকে হয় ত কিছু শিখাইতে পারি, এ বিশ্বাস অনেকের আছে। কিন্তু মনুষ্যসংহার বিষয়ে বৈজ্ঞানিক কৌশল, কল ও সরঞ্জামের জন্য ইউরোপ এশিয়ার নিকট ঋণী হইবে, এ কল্পনা কিছু দিন পূর্ব্বে কেহ করে নাই। বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধে ইহাও কিন্তু ঘটিতেছে। জাপান রুশিয়াকে কেবল যে উৎকৃষ্ট কামান, কল, প্রভৃতি, এবং সৈনিকদের পোষাক, বুট, ঘোড়ার জিন, ইত্যাদি বিক্রী করিতেছে, তাহা নয়; জাপানী গোলন্দাজেরা রুশিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিয়া তোপ দাগিতেছে। শুধু কি তাই? রুশিয়ার গোলন্দাজরা যুদ্ধে যাইবার আগে জাপান হইতে আগত গোলন্দাজী-বিদ্যায় সুনিপুণ জাপানী সেনানায়কদের নিকট শিক্ষালাভ করিতেছে। পাইয়োনীয়রের টোকিওস্থ সংবাদদাতা এইসব খবর দিয়াছেন।

কবির পুরাতন কথা।

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দক্ষিণ আফ্রিকায় বূর যুদ্ধের সময় রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাহা তাঁহার "নৈবেদ্যে" মুদ্রিত আছে। আমরা কয়েকটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। বর্ত্তমান সময়ে এই কবিতাগুলি পড়িলে নানা বিষয়ে গভীর চিন্তার উদ্রেক হয়।

(১)

শতাব্দীর সূর্য্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে
অস্ত গেল,—হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
ভয়ঙ্করী! দয়াহীনা সভ্যতা-নাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমিষে,
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি' তীব্র বিষে।
স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত—লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম; প্রলয়-মন্থন-ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্ব্বরতা উঠিয়াছে জাগি'
পঙ্কশয্যা হ'তে। লজ্জা সরম তেয়াগি'

জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্ম্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।
কবিদল চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি
শ্মশান-কুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি।

(২)

স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে। অকস্মাৎ
পরিপূর্ণ স্ফীতিমাঝে দারুণ আঘাত
বিদীর্ণ বিকীর্ণ করি চূর্ণ করে তারে
কাল-ঝঞ্ঝাঝঙ্কারিত দুর্যোগ-আঁধারে।
একের স্পর্দ্ধারে কভু নাহি দেয় স্থান
দীর্ঘকাল নিখিলের বিরাট বিধান।
স্বার্থযত পূর্ণ হয় লোভ-ক্ষুধানল
তত তার বেড়ে ওঠে,—বিশ্ব ধরাতল
আপনার খাদ্য বলি' না করি' বিচার
জঠরে পুরিতে চায়!—বীভৎস আহার
বীভৎস ক্ষুধারে করে নির্দ্দয় নিলাজ।
তখন গর্জ্জিয়া নামে তব রুদ্র বাজ।
ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
বাহি' স্বার্থতরী, গুপ্ত পর্ব্বতের পানে।

(৩)

এই পশ্চিমের কোণে রক্তরাগ-রেখা
নহে কভু সৌম্যরশ্মি অরুণের লেখা
তব নব প্রভাতের! এ শুধু দারুণ
সন্ধ্যায় প্রলয়দীপ্তি। চিতার আগুন
পশ্চিম সমুদ্রতটে করিছে উদ্গার
বিস্ফুলিঙ্গ—স্বার্থদীপ্ত লুব্ধ সভ্যতার
মশাল হইতে লয়ে শেষ অগ্নিকণা!
এই শ্মশানের মাঝে শক্তির সাধনা
তব আরাধনা নহে, হে বিশ্বপালক!
তোমার নিখিলপ্লাবী আনন্দ-আলোক
হয়ত লুকায়ে আছে পূর্ব্ব সিন্ধুতীরে
বহু ধৈর্য্যে নম্র স্তব্ধ দুঃখের তিমিরে
সর্ব্বরিক্ত অশ্রুসিক্ত দৈন্যের দীক্ষায়
দীর্ঘকাল—ব্রহ্মমুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায়!

(৪)

শক্তি দম্ভ স্বার্থলোভ মারীর মতন
দেখিতে দেখিতে আজি ঘিরিছে ভুবন!
দেশ হতে দেশান্তরে স্পর্শবিষ তার
শান্তিময় পল্লী যত করে ছারখার!
যে প্রশান্ত সরলতা জ্ঞানে সমুজ্জ্বল,
স্নেহে যাহা রসসিক্ত, সন্তোষে শীতল,
ছিল তাহা ভারতের তপোবনতলে;
বস্তুভারহীন মন সর্ব্ব জলে স্থলে
পরিব্যাপ্ত করি' দিত উদার কল্যাণ,
জড়ে জীবে সর্ব্বভূতে অবারিত ধ্যান
পশিত আত্মীয়রূপে! আজি তাহা নাশি'
চিত্ত যেথা ছিল সেথা এল দ্রব্যরাশি,
তৃপ্তি যেথা ছিল সেথা এল আড়ম্বর,
শান্তি যেথা ছিল সেথা স্বার্থের সমর।

(৫)

কোরো না কোরো না লজ্জা হে ভারতবাসী,
শক্তিমদমত্ত ঐ বণিক বিলাসী
ধনদৃপ্ত পশ্চিমের কটাক্ষ-সম্মুখে
শুভ্র উত্তরীয় পরি' শান্ত সৌম্যমুখে
সরল জীবনখানি করিতে বহন!
শুনো না কি বলে তারা, তব শ্রেষ্ঠ ধন
থাকুক হৃদয়ে তব, থাক্ তাহা ঘরে,
থাক্ তাহা সুপ্রসন্ন ললাটের পরে
অদৃশ্য মুকুট তব! দেখিতে যা' বড়,
চক্ষে যাহা স্তূপাকার হইয়াছে জড়,
তারি কাছে অভিভূত হয়ে বারে বারে
লুটায়ো না আপনায়! স্বাধীন আত্মারে
দারিদ্র্যের সিংহাসনে কর প্রতিষ্ঠিত.
রিক্ততার অবকাশে পূর্ণ করি' চিত!

(৬)

হে ভারত, তব শিক্ষা দিয়েছে যে ধন.
বাহিরে তাহার অতি স্বল্প আয়োজন,
দেখিতে দীনের মত, অন্তরে বিস্তার
তাহার ঐশ্বর্য্য যত॥

আজি সভ্যতার
অন্তহীন আড়ম্বরে, উচ্চ আস্ফালনে,
দরিদ্ররুধিরপুষ্ট বিলাস-লালনে,
অগণ্য চক্রের গর্জ্জে মুখর ঘর্ঘর
লৌহবাহু দানবের ভীষণ বর্ব্বর
রুদ্ররক্ত অগ্নিদীপ্ত পরম স্পর্দ্ধায়
নিঃসঙ্কোচে শান্তচিত্তে কে ধরিবে, হায়,
নীরব-গৌরব সেই সৌম্য দীনবেশ
সুবিরল,—নাহি যাহে চিন্তা-চেষ্টালেশ!
কে রাখিবে ভরি' নিজ অন্তর-আগার
আত্মার সম্পদরাশি মঙ্গল উদার।

(৭)

অন্তরের সে সম্পদ ফেলেছি হারায়ে।
তাই মোরা লজ্জানত; তাই সর্ব্বগায়ে
ক্ষুধার্ত্ত দুর্ভর দৈন্য করিছে দংশন;
তাই আজি ব্রাহ্মণের বিরল বসন
সম্মান বহে না আর; নাহি ধ্যানবল
শুধু জপমাত্র আছে; শুচিত্ব কেবল,
চিত্তহীন অর্থহীন অভ্যস্ত আচার;
সন্তোষের অন্তরেতে বীর্য্য নাহি আর,
কেবল জড়ত্বপুঞ্জ;—ধর্ম্ম প্রাণহীন
ভারসম চেপে আছে আড়ষ্ট কঠিন!
তাই আজি দলে দলে চাই ছুটিবারে
পশ্চিমের পরিত্যক্ত বস্ত্র লুটিবারে
লুকাতে প্রাচীন দৈন্য! বৃথা চেষ্টা, ভাই,
সব সজ্জা লজ্জাভরা, চিত্ত যেথা নাই!

হিন্দু রসায়ন-শাস্ত্রের প্রাচীনত্ব

বহুবর্ষ পূর্ব্বে আমরা যখন বালক ছিলাম তখন ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গের মুখে শুনিতাম প্রাচীন কালের হিন্দু-পণ্ডিতেরা কেবল মনস্তত্ত্ব লইয়াই থাকিতেন। কিন্তু আধুনিক অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চর্চ্চাতেও প্রাচীন ভারত তদানীন্তন অন্যান্য দেশের অপেক্ষা বহু পরিমাণে শ্রেষ্ঠ ছিল। যখন সুশ্রুত, রসার্ণব-তন্ত্র, রসরত্নসমুচ্চয় প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থোক্ত পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ-সমূহের কথা পাঠ করি তখন মনে বড় ক্ষোভের উদ্রেক হয়। কি ছিল, কি হইয়াছে। যে দেশে সুশ্রুত বলিয়াছিলেন, 'শব-ব্যবচ্ছেদ ভিন্ন চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করা অসম্ভব', সেই দেশে শব স্পর্শ করা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইয়া গেল; যে দেশের অভিজাতবর্গ সুবর্ণ-রত্ন-পরীক্ষা, ধাতুবাদ (metallurgy), ধাতু ও ঔষধ-সমূহের সংযোগক্রিয়ার জ্ঞান, ক্ষার নিষ্কাসন প্রভৃতি বিবিধ কলায় ব্যুৎপত্তি লাভ গৌরবের বিষয় বিবেচনা করিতেন সেই দেশে স্যাকরা ও কামারের কাজ উচ্চ জাতির অবজ্ঞার বিষয় হইয়া উঠিল; যে দেশের মনীষী ঢুণ্ডুকনাথ বলিয়াছিলেন 'যাঁহারা শিক্ষণীয় বিষয় পরীক্ষা (experiment) দ্বারা দেখাইতে পারেন তাঁহারাই প্রকৃত শিক্ষক', সেই দেশের কবিরাজগণ শরীরবিজ্ঞান-বিষয়ক পরীক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া চিকিৎসাবিদ্যার শিক্ষকতা করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ যেদিন হইতে সমাজের বুদ্ধিমান ও বিদ্বান লোকেরা শিল্প-বিজ্ঞানের চর্চ্চা ত্যাগ করিয়া তাহার ভার অশিক্ষিত নিম্ন-শ্রেণীস্থ লোকের উপর অর্পণ করিলেন সেইদিন হইতে আমাদের কপাল পুড়িল। নাপিতের হস্তে অস্ত্র-চিকিৎসা ও বেদেদের হস্তে উদ্ভিদবিজ্ঞান আলোচনার ভার দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত মনে পরলোক-চিন্তায় ব্যস্ত হইলাম।

তবে সম্প্রতি দেশের হাওয়া ফিরিয়াছে। দেশে বিজ্ঞানের আদর বৃদ্ধিলাভ করিতেছে। ভারতবর্ষীয় যুবকগণের রসায়নবিজ্ঞান পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক মৌলিক গবেষণা-সমূহ পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে। ইহা দেখিয়া মনে স্বতঃই আশার উদ্রেক হয়।

আর আশার উদ্রেক হয় যখন ভাবি এই অধঃপতিত জাতিই এককালে বিজ্ঞানচর্চ্চায় জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। চরক ও সুশ্রুত, কণাদ ও বরাহমিহির, নাগার্জ্জুন ও ঢুণ্ডুকনাথের প্রতিভা আমরা উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করিয়াছি; তাই আজ প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানচর্চ্চা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

এই সম্পর্কে, ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলীর মুখপত্র নেচার (Nature) হিন্দুরসায়নশাস্ত্রের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সম্প্রতি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার স্থূল মর্ম্ম উল্লিখিত হইল। "আমরা যে-সকল আবিষ্কার পাশ্চাত্য জাতিগণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে মনে করিতাম, এখন দেখা যাইতেছে তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি প্রাচীন হিন্দু-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। রসার্ণব-তন্ত্র প্রভৃতি পুস্তকে ঊর্দ্ধপাতন অধঃপাতন তির্য্যক্‌পাতন ধাতুনিষ্কাসন প্রভৃতির বর্ণনা পাঠ করিলে তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে বেকন যে পরীক্ষাপদ্ধতির কথা প্রচার করেন এবং দ্বিতীয় চার্লসের সমসাময়িক রয়েল সোসাইটীর 'পরীক্ষা পরায়ণ দার্শনিকগণ' (exprimentarian philosophers) যে-সকল মতবাদ আলোচনা করেন, বহুকাল পূর্ব্বে প্রাচীন ভারতের বুধমণ্ডলীর নিকট তাহা সুপরিচিত ছিল।" তার পর ঢুণ্ডুকনাথের কথা উদ্ধৃত করিয়া 'নেচার' বলিয়াছেন যে "শিক্ষাদানকার্য্যে পরীক্ষার (experiment) সাহায্য যে কিরূপ ফলদায়ক তাহাও হিন্দুগণ বিস্মৃত হন নাই।"

সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে, তক্ষশীলার সুবিখ্যাত বিশ্ব-বিদ্যালয়ে, জীবক 'কোমার-ভচ্চ' আত্রেয় মুনির চরণোপান্তে উপবেশন করিয়া চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিম্বদন্তী আছে, যে, ব্যাকরণবেত্তা পাণিনি এবং প্রাচীন ভারতের 'ম্যাকিয়াভেলী' সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিবিশারদ চাণক্যও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। জীবক যে 'কোমার-ভচ্চ' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, সেই উপাধির অর্থ প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চ্চা সম্বন্ধে গবেষণা-কারী মাত্রেরই সুপরিজ্ঞাত। ইহা সংস্কৃত 'কৌমার-ভৃত্য'র পালি অপভ্রংশ। 'কৌমার-ভৃত্য' আয়ুর্ব্বেদের অষ্টশাখার অন্যতম। এক কথায় বলিতে গেলে, জীবক ধাত্রীবিদ্যা ও

তৎসংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। আমরা এক্ষণে সেই সুদূর অতীতের অবস্থা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করিতে অক্ষম। প্রাচীন ভারতে যে কেবল নানাবিধ শিল্প ও বিজ্ঞানের অনুশীলন হইত, তাহা নহে; পরন্তু কেহ কেহ ইহাদিগের মধ্যে কোনও একবিষয়ে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া, তদ্বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হইতেন। বাৎসায়ন-প্রণীত 'কামসূত্র' নামক প্রাচীন গ্রন্থে, যে চৌষট্টি 'কলা'র নাম লিখিত আছে, তন্মধ্যে 'সুবর্ণ রত্ন-পরীক্ষা', 'ধাতুবাদ' এবং 'মণিরাগাকরজ্ঞানম্' (অর্থাৎ, রত্নসমূহের রং ও তাহাদিগের খনি বিষয়ক জ্ঞান) এই কয়টি নামের উল্লেখ আছে।

বরাহমিহির-প্রণীত 'বৃহৎ সংহিতা' নামক গ্রন্থে লৌহ ও পারদ হইতে প্রস্তুত বলকারক ঔষধের কথা দেখিতে পাই। 'মহাভাষ্য'-প্রণেতা পতঞ্জলি লৌহ-ধাতুবাদ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই কয়টি বিষয় হইতে হিন্দু রসায়ন-শাস্ত্রের প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ হয়।

ভারতীয় রসায়ন-শাস্ত্রের মূল।

ইউরোপীয় জাতিদিগের এবং আরববাসীদিগের মধ্যে 'পরশ-পাথর' ও অমৃতের অনুসন্ধান হইতে রসায়ন-শাস্ত্রের প্রথম উৎপত্তি। প্যারাসেল্‌সসের সময় (১৪৯৩—১৫৪১ খৃষ্টাব্দ) হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত চিকিৎসা-বিদ্যার সহায়করূপে রসায়নের ক্রমবিকাশ সাধিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে ধর্ম্মসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ হইতে জ্যামিতি ও জ্যোতিষশাস্ত্রের উদ্ভব। ডাক্তার থিব প্রমাণ করিয়াছেন যে পাইথাগোরাসের দুই শত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুগণ বৈদিক যজ্ঞের বেদী-নির্ম্মাণ উপলক্ষে জ্যামিতির প্রথম অধ্যায়ের সপ্তচত্বারিংশৎ প্রতিজ্ঞার সত্য নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রোডারও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে এই গ্রীক দার্শনিক পাইথাগোরাস ভারতবর্ষের নিকট ঋণী। এই ভারতে যোগের অঙ্গরূপে রসায়নের সম্যক অনুশীলন হইয়াছিল। মামুদ গজনবীর সমসাময়িক অলবেরুণী তাঁহার ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় পুস্তকের একস্থানে লিখিয়াছেন যে পতঞ্জলির মতে রসায়ন মোক্ষলাভের একটি উপায়। ইহার পর, রসায়ন ক্রমশঃ তন্ত্রশাস্ত্রের সহিত ঘনিষ্ঠ হইতে ঘনিষ্ঠতররূপে সংসৃষ্ট হইয়া পড়িল। রসার্ণব নামক তন্ত্রসম্বন্ধীয় একখানি পুরাতন গ্রন্থে লিখিত আছে "ষড়্দর্শনের মতে দেহের মৃত্যুর পর মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু এরূপ মোক্ষ করতলন্যস্ত আমলকবৎ অনুভূত হয় না। সুতরাং পারদ ও ঔষধাদি দ্বারা দেহ রক্ষা করা কর্ত্তব্য।" 'রসহৃদয়' নামক আর-একখানি প্রাচীন তন্ত্রগ্রন্থেও পারদ হইতে প্রস্তুত ঔষধসমূহের গুণের ভূরি ভূরি প্রশংসা দৃষ্ট হয়। "যাঁহারা হর (পারদ) ও গৌরীর (অভ্র) ক্ষমতায় নিজ নিজ দেহত্যাগ না করিয়া নূতন নূতন শরীর লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা রসসিদ্ধ পুরুষ। সকল মন্ত্রই তাঁহাদিগের করায়ত্ত।" যে যোগী জীবিতাবস্থায় মোক্ষলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি প্রথমে নিজের দেহকে উন্নত করিতে চেষ্টা করিবেন। হর হইতে পারদ এবং গৌরী হইতে অভ্র উৎপন্ন। এই নিমিত্ত, হর ও পারদ একার্থবোধক; এবং গৌরী ও অভ্রও সেইরূপ। এ সম্বন্ধে একটি শ্লোকের অর্থ এইরূপ :—'অভ্র তোমার বীজ এবং পারদ আমার বীজ। এই দুইটির মিশ্রণে যে পদার্থের সৃষ্টি হয়, তাহা মৃত্যু ও দারিদ্র্য ধ্বংস করিতে সমর্থ।'

এইরূপে, রসায়ন একশ্রেণীর তন্ত্রের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িল। প্রাচীন হিন্দুগণের রসায়নজ্ঞান সম্বন্ধে যাঁহারা কোনও ধারণা লাভ করিতে চাহেন, রসার্ণব, রসহৃদয়, নাগার্জ্জুন-প্রণীত রসরত্নাকর, এবং রসসারে বর্ণিত রাসায়নিক প্রক্রিয়া-সমূহ যথাযথরূপে পরীক্ষা করা তাঁহাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই শ্রেণীর তন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা এতই অধিক অনুভূত হইয়াছিল, যে, পারদ সম্বন্ধে একটি নূতন দর্শন-শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। মাধবাচার্য্য-প্রণীত 'সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে' এই দর্শন অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। এই আদর্শ প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে আমরা এতদ্বিষয়ক একটি মত উদ্ধৃত করিলাম—'ন চ রসশাস্ত্রং ধাতুবাদার্থমেতি মন্তব্যং মুক্তেরেব পরম প্রয়োজনত্বাৎ' অর্থাৎ 'রসশাস্ত্র বলিতে কেবল যে রসায়নের একটি শাখা বুঝিতে হইবে তাহা নহে; পরন্তু পারদ হইতে প্রস্তুত ঔষধ সেবনে শরীরকে অমর করিয়া মুক্তিলাভের বিষয়ও রসশাস্ত্রের অঙ্গীভূত।'

এস্থলে 'রসায়ন' শব্দের অর্থ সম্বন্ধে দুই একটি কথা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সাধারণতঃ 'রস' শব্দের অর্থ পারদ; কিন্তু ইহা দ্বারা ধাতব ও খনিজ পদার্থসমূহও

বুঝায়। চরক ও সুশ্রুত গ্রন্থে ইহার অর্থ শোণিতাদির উৎপাদক শরীরস্থ রস। সুশ্রুতে রসক্রিয়া শব্দের অর্থ ঘন ক্বাথ। ইহার পর, তান্ত্রিক যুগে যখন কেবল উদ্ভিজ্জ ঔষধের পরিবর্ত্তে, পারদ ও অন্যান্য ধাতু হইতে প্রস্তুত ঔষধের প্রচলন আরম্ভ হইল, তখন শরীরস্থ রসের উপর পারদের আশ্চর্য্য শক্তি দেখিয়া, পারদের নাম 'রস' রাখা হইল। প্রাচীন গ্রন্থ-সকলে 'রসায়ন' শব্দের অর্থ বার্দ্ধক্য-নিবারক ও আয়ুর্বর্দ্ধক ঔষধ-বিশেষ। ক্রমশঃ কেবলমাত্র পারদ ও অন্যান্য ধাতু হইতে প্রস্তুত আয়ুর্বর্দ্ধক ঔষধকেই রসায়ন বলা হইত। রুদ্রযামল-তন্ত্রের অঙ্গীভূত 'ধাতুক্রিয়া' নামক পুস্তকে 'রসায়নী বিদ্যা' এই শব্দটি ইহার বর্ত্তমান (Chemistry) অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখিতে পাই।

পারদ হইতে নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত করিতে যে-সমস্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়া আবশ্যক, তাহাদিগের ক্রমবিকাশই হিন্দু রসায়নের ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়। কোনও চিকিৎসাগ্রন্থে কিংবা রাসায়নিক তন্ত্রে কিরূপভাবে পারদের ব্যবহারের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া ঐ পুস্তক কোন্ সময়ে লিখিত, তাহা নির্দ্ধারণ করা যায়। নবম শত খৃষ্টাব্দে বৃন্দ কর্ত্তৃক প্রণীত 'সিদ্ধযোগ' নামক পুস্তকে সর্ব্বপ্রথম চিকিৎসার্থ পারদ ব্যবহারের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে পারদ হইতে 'কজ্জলী' প্রস্তুত করিয়া ঔষধরূপে ব্যবহারের বিধি লিখিত আছে। একাদশ শত খৃষ্টাব্দে চক্রপাণি দত্ত এই 'কজ্জলী'র বিষয় লিখিয়াছেন। তিনি বৃন্দের নিকট তাঁহার ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। ইউরোপীয় রসায়নের ইতিহাসে দেখিতে পাই, যে, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (চক্রপাণির ছয় শত বৎসর পরে) তুর্কে দ্য মেয়ার্ণ (Turquet de Mayerne) এই বিখ্যাত ঔষধ প্রথম আবিষ্কার করেন। তিনি ইহার নাম রাখিয়াছিলেন 'ইথিয়োপীয় খনিজ'। ষোড়শ শতাব্দীতে প্যারাসেল্‌সস্ ইউরোপে সর্ব্বপ্রথম পারদ হইতে প্রস্তুত ঔষধের প্রচলন আরম্ভ করেন। প্যারিসের ঔষধসভা পারদঘটিত ঔষধ সেবন করিতে নিষেধ করেন।

রাসায়নিক তন্ত্রগুলির সংখ্যা এত অধিক, যে, তৎসমুদয়ের উল্লেখ করিলে প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত দীর্ঘ হইবে, এবং তাহাতে পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতির সম্ভাবনা। আমরা, এস্থলে, কেবল রসার্ণব নামক একখানি তন্ত্রের বিষয় কিছু বলিব। এই গ্রন্থখানি রসায়নীবিদ্যার আধার। ইহাতে তির্য্যক্‌পাতন, ঊর্দ্ধপাতন, দহন, প্রভৃতি প্রক্রিয়ার জন্য যে-সমস্ত চুল্লী ও যন্ত্রাদির প্রয়োজন তৎসমুদয়ের গঠন-বিষয়ে বিশদ বর্ণনা আছে। অধিকন্তু, ইহাতে তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কোনও ধাতুকে আগুনে ধরিলে যে রং দেখা যায়, তাহা হইতে ঐ ধাতুটির স্বরূপ নির্ণয়ের উপায় ইহাতে বিবৃত আছে। 'নেচার' (Nature) নামক ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক পত্র মৎপ্রণীত 'হিন্দুরসায়নের ইতিহাস' গ্রন্থের সমালোচনার কালে, এই বিষয়ে সমধিক মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। আমরা এইখানে একটি শ্লোকের অনুবাদ দিতেছি :—আগুনে ধরিলে তাম্র নীল রংএর আলো দেয়, টিন পারাবতের দেহের রংএর ন্যায় আলো দেয়, সীসক ফ্যাকাসে রংএর আলো দেয়।

রস্কো এবং শর্লেমার (Roscoe and Schorlemmer) এসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"Lead compound imparts a pale tint to the non-luminous gas flame."

কোনও ধাতু হস্তে ধারণ করিলে, তজ্জন্য হস্তে যে বিশেষ গন্ধ হয়, তাহা হইতে ঐ ধাতুটি কি তাহা জানা যায়। আধুনিক রসায়নগ্রন্থ-সমূহে এ বিষয়ে প্রায়ই কিছু লেখে না। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ এসোসিয়েসনের সভায় অধ্যাপক আয়ার্টন 'ধাতু-সকলের গন্ধ' বিষয়ে যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে তিনি এই বিষয়টির প্রতি শ্রোতৃবৃন্দের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন—'একখণ্ড সুপরিষ্কৃত তাম্র কিছুক্ষণ হস্তের মধ্যে রাখিলে, হস্তে তাম্রের গন্ধ পাওয়া যায়। এই উপায়ে, স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যতীত যাবতীয় ধাতু হইতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ গন্ধ বাহির হয়।' এই স্থলে, 'রস-রত্ন-সমুচ্চয়' হইতে সীসক সম্বন্ধীয় একটি শ্লোকের অনুবাদ প্রদত্ত হইল—সীসক সহজেই গলিয়া যায়; ইহা অত্যন্ত ভারী; ইহা ভাঙ্গিলে উজ্জ্বল কৃষ্ণ বর্ণ দেখায় এবং ইহা পূতিগন্ধ।

এই-সকল পুরাতন পুস্তকে পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। 'রসেন্দ্র-চিন্তা-

মণি' নামক তন্ত্রের রচয়িতা লিখিয়াছেন—'আমি নিজে পরীক্ষাদ্বারা যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি।' তন্ত্রানুযায়ী প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থের রচয়িতা ঢুণ্ঢুকনাথ, আরও লিখিয়াছেন—

অধ্যাপয়ন্তি যদি দর্শয়িতুং ক্ষমন্তে
সুতেন্দ্র কর্ম্মগুরবো গুরবস্ত এব।
শিষ্যাস্ত এব রচয়ন্তি গুরোঃ পুরো যে
শেষাঃ পুনস্তদুভয়াভিনয়ং ভজন্তে॥

'যাঁহারা শিক্ষণীয় বিষয় পরীক্ষাদ্বারা দেখাইতে পারেন তাঁহারাই প্রকৃত শিক্ষক। যে-সকল ছাত্র শিক্ষকের নিকট হইতে পরীক্ষাগুলি শিখিয়া নিজে নিজে সেইগুলি করিতে পারেন তাঁহারাই যথার্থ শিক্ষার্থী। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য শিক্ষক ও ছাত্রগণ রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা মাত্র।'

অস্ত্র-চিকিৎসা ও তৎসংক্রান্ত যন্ত্রাদি বিষয়ক নানাবিধ প্রয়োজনীয় তথ্যপূর্ণ প্রাচীন 'সুশ্রুত' গ্রন্থে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আবশ্যকতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকটি আছে—

প্রত্যক্ষতো হি যদ্দৃষ্টং শাস্ত্রদৃষ্টং চ যদ্‌ভবেৎ।
সমাসতস্তদুভয়ং ভূয়ো জ্ঞানবিবর্দ্ধনম্॥

যে দেশে একদা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের এত আদর ছিল, কালে সেই দেশেরই কবিরাজগণ শরীরতত্ত্বের প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ না করিয়াই চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কি পরিতাপের বিষয়! সেদিন যখন মধুসূদন গুপ্ত সহস্র-বর্ষব্যাপী কুসংস্কার পদদলিত করিয়া, কলিকাতা মেডিকেল কলেজে শবদেহে অস্ত্রপ্রয়োগ করিলেন, তখন তাঁহাকে উৎসাহপ্রদানার্থ ফোর্ট উইলিয়ম কেল্লা হইতে তোপ ছোড়া হইয়াছিল।

হিন্দুগণের রাসায়নিক সাহিত্যে যে-সকল প্রক্রিয়ার উল্লেখ আছে, তৎসমুদয়ের সবিশেষ বর্ণনা করিলে প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া যাইবে। সুতরাং আমি কেবল ঔষধ-প্রস্তুত-প্রণালী ও ধাতুবাদ (Metallurgy)—এই দুইটি বিষয়ের আলোচনা করিব।

ক্ষার-প্রস্তুত-প্রণালী।

উদ্ভিদের ছাই জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া লইয়া, উহার সহিত শামুকপোড়া চুন মিশাইয়া তীক্ষ্ণ ক্ষার প্রস্তুত করিবার প্রণালী আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত। সুশ্রুতে মৃদুক্ষার ও তীক্ষ্ণক্ষারের প্রভেদও বর্ণিত আছে। বস্তুতঃ, এই প্রণালীটি এমনই বিজ্ঞানসম্মত যে ইহা কোনও আধুনিক রসায়ন সম্বন্ধীয় পুস্তকে স্থান পাইতে পারে। সুবিখ্যাত ফরাসী রাসায়নিক বার্থেলো মৎপ্রণীত হিন্দু রসায়নের ইতিহাসের সমালোচনাকালে এই পদ্ধতিটির বৈজ্ঞানিকতা ও মৌলিকতা দর্শনে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যে, তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল যে সুশ্রুতের এই অংশটি ভারতবর্ষ ইউরোপীয়দিগের সংশ্রবে আসিবার পর লিখিত ও প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। কিন্তু, চুন মিশাইয়া মৃদুক্ষারকে তীক্ষ্ণক্ষারে পরিণত করিবার প্রণালী চক্রপাণি এবং বাগ্‌ভটেও দৃষ্ট হয়। সুতরাং, ইহা যে ইউরোপীয় রাসায়নিকদিগের নিকট হইতে গৃহীত হয় নাই তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। 'মিলিন্দপ্রশ্ন' নামক পালি গ্রন্থ পাঠে দেখিতে পাই, যে. প্রাচীন ভারতে তীক্ষ্ণক্ষার দ্বারা দুরারোগ্য ক্ষত-সকল পোড়াইয়া দিবার প্রণালী প্রচলিত ছিল।

হিন্দুগণ ধাতব পদার্থ প্রস্তুত করিতে যে অদ্ভুত নিপুণতা লাভ করিয়াছিলেন, কুতবমিনারের সন্নিকটবর্ত্তী সুবিখ্যাত লৌহস্তম্ভ তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বহুকাল যাবৎ এই লৌহস্তম্ভের বৃহৎ আকার রাসায়নিকগণের বিস্ময় উদ্রেক করিয়াছে। এ সম্বন্ধে রস্কো এবং শর্লেমার লিখিয়াছেন—"বর্ত্তমান কালে বৃহৎ যন্ত্রাদির সাহায্যেও এরূপ প্রকাণ্ড স্তম্ভ নির্ম্মাণ করা সহজ নহে। হিন্দুরা শুধু-হাতে কিরূপে ইহা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।"

আর-একজন উচ্চদরের রাসায়নিক বলিয়াছেন—"সে সময়ে এরূপ বৃহদায়তন লৌহস্তম্ভ প্রস্তুত করিবার উপযোগী যন্ত্রাদির যেরূপ অভাব ছিল, তাহা বিবেচনা করিলে, স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে তৎকালের কারিকরগণ পূর্ত্তকার্য্যে সুনিপুণ ছিলেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপ এবং আমেরিকার সমস্ত লোহের কারখানা একত্রিত হইয়া এরূপ বিশাল লৌহস্তম্ভ প্রস্তুত করিতে পারিত কি না তাহা সন্দেহস্থল।"

লৌহ সম্বন্ধে পারদর্শী স্যার রবার্ট হ্যাডফিল্ড প্রাচীন ভারতে লৌহ প্রস্তুত বিষয়ে গবেষণা করিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে হিন্দুগণই এ বিষয়ে অগ্রগামী।

'সুশ্রুত' হইতে আরম্ভ করিয়া 'রসরত্ন-সমুচ্চয়' পর্য্যন্ত গ্রন্থসমূহে ছয়টি ধাতুর উল্লেখ দে'খতে পাওয়া যায়। এই ছয়টি ধাতুর নাম—স্বর্ণ, রৌপ্য, রঙ্গ, সীসক, তাম্র ও লৌহ। শেষোক্ত গ্রন্থে পিত্তল ও কাংস মিশ্র ধাতু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। রাজা মদনপাল কর্ত্তৃক ১৩৭৪ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত চিকিৎসাবিষয়ক অভিধানে সর্ব্বপ্রথম দস্তার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

রসক হইতে সত্ত্বপাতন অর্থাৎ যশদ বা দস্তা নিষ্কাশনের প্রক্রিয়া।

দস্তা প্রস্তুত করিবার প্রাচীন হিন্দু প্রণালী (অধঃপাতন)।

হিন্দুগণই প্রথম রসক (calamine) হইতে দস্তা প্রস্তুত করেন। প্যারাসেল্‌সস্‌ দস্তার নাম করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহার প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহার কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল কি না তাহা সন্দেহজনক; কারণ তিনি বলেন ইহা ঘাতসহ নহে। রসার্ণব-তন্ত্রে দস্তা প্রস্তুত করিবার প্রণালী বর্ণিত আছে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে লিখিত 'রসরত্নসমুচ্চয়' নামক পুস্তকে দস্তা প্রস্তুত করিবার যে পদ্ধতি বর্ণিত আছে, তাহা অধুনাতন পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত পদ্ধতির অবিকল অনুরূপ। নব্য ইউরোপীয় প্রণালী এবং প্রাচীন হিন্দু প্রণালীর প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল। দুইটি প্রণালীই মূলতঃ এক এবং এই প্রণালীর প্রাচীন শাস্ত্রোক্ত নাম, অধঃপাতন, ইংরেজি পুস্তকোক্ত distillatio per descensum নামের সহিত একার্থ-বাচক। উভয় প্রণালীতেই একটি আচ্ছাদিত পাত্রের মধ্যে রসক ও কোনও অম্লজানহারী পদার্থ (ইংরেজি প্রক্রিয়ায় কয়লা এবং হিন্দু প্রক্রিয়ায় গুড়, লাক্ষা, সোহাগা ইত্যাদি) রাখিয়া উত্তপ্ত করা হয়। কিছুক্ষণ পরে দস্তা বাহির হইয়া, তাপহেতু বাষ্পআকার ধারণ করিয়া, পাত্র-নিম্নস্থ ছিদ্র দিয়া আর-একটি শীতল পাত্রের মধ্যে গিয়া পড়ে এবং জমিয়া কঠিন দস্তায় পরিণত হয়।
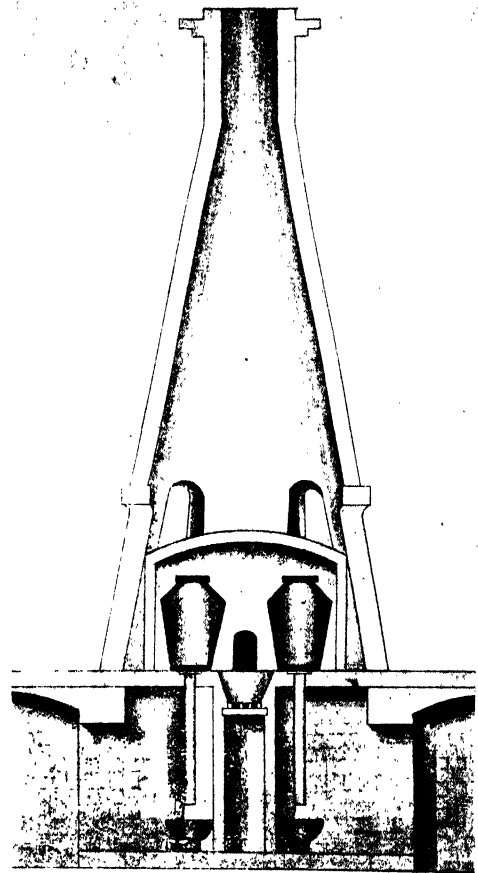
দস্তা প্রস্তুত করিবার নব্য ইউরোপীয় প্রণালী (Distillatio per descensum)।

যন্ত্রা জলবুতাং স্থালীং নিধনেং কোষ্টিকোদরে।
সচ্ছিদ্রং তন্মুখে মল্লং তন্মুখেঽধোমুখং ক্ষিপেৎ।
মুষোপরি শিখিত্রাংশ্চ প্রক্ষিপ্য প্রধমেদ দৃঢ়ম্।
পতিতং স্থালিকা নীরে সত্ত্বমাদায় যোজয়েৎ।
(রসরত্নসমুচ্চয়, ২য় অধ্যায়, ১৬৫-১৬৬ শ্লোক)

আমরা এখন জানি যে এই প্রক্রিয়ায় প্রথমে একাম্ল-অঙ্গারক গ্যাস (carbon monoxide) নির্গত হইয়া জ্বলিতে থাকে, ইহাতে শিখার রং নীল দেখায়। পরে যখন সমস্ত রসক দস্তায় পরিণত হয় তখন আর একাম্ল-অঙ্গারক গ্যাস বাহির হয় না, কাজেই শিখার রং শ্বেত হইয়া যায়। প্রাচীন হিন্দু রাসায়নিকগণ এই ব্যাপারটি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন—যদিও তাঁহারা ইহার কারণ জানিতেন না। রসরত্নসমুচ্চয়ে স্পষ্টই লেখা রহিয়াছে—"খর্পরে প্রহৃতে জ্বালা ভবেন্নীলাসিতা যদি।" (অর্থাৎ যদি নীলা জ্বালা (শিখা) সিতা ভবেৎ)।

তন্ত্রসমূহের কাল নির্দ্ধারণ করিতে বহু যত্ন ও বিবেচনার প্রয়োজন। এ বিষয়ে গবেষণা করিবার সময় যথোচিত নিরপেক্ষ হওয়া আবশ্যক, এবং হার্ব্বার্ট স্পেন্সার যাহাকে 'the bias of patriotism' বলেন, তাহার হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া উচিত। এতৎসম্বন্ধীয় পুস্তকের রচয়িতা যেন মনে রাখেন যে তিনি ইতিহাস লিখিতেছেন, কাল্পনিক উপন্যাস নহে। মৎপ্রণীত 'হিন্দু রসায়নের ইতিহাসে'র উপাদান সংগ্রহের কালে, আমি 'ধাতুক্রিয়া' নামক গ্রন্থের দুইখানি পুঁথি প্রাপ্ত হই—একখানি আলোয়ারের মহারাজের পুস্তকাগার হইতে, এবং অপরখানি কাশী হইতে সংগ্রহ করি। এই দুইখানি পুঁথির পরস্পরের মধ্যে বেশ ঐক্য দেখিতে পাই। দুইখানি পুঁথিই প্রাচীন রুদ্রযামল-তন্ত্রের অঙ্গীভূত বলিয়া পরিচিত। আমি অভিনিবেশ সহকারে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি। আপনারা সকলেই বোধ হয় অবগত আছেন যে অধিকাংশ তন্ত্রই শিবপার্ব্বতীর কথোপকথনচ্ছলে বিবৃত এবং এই জন্য বিশ্বাসী হিন্দুর নিকট ইহা নির্ভুল। কিন্তু এই "ধাতুক্রিয়া" গ্রন্থটি পাঠ করিয়া আমি দেখিয়াছি যে অন্ততঃ ইহার রাসায়নিক অংশটুকু অপেক্ষাকৃত আধুনিক। আমি ইহার আধুনিকতার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ইহাতে ফিরঙ্গ রোগের (syphilis) চিকিৎসার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। পর্ত্তুগীজগণ গোয়াতে উপনিবেশ স্থাপন করিবার পর ভারতবর্ষে ফিরঙ্গরোগের আবির্ভাব হয়। সুতরাং 'ধাতুক্রিয়া' ষোড়শ কিংবা সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে লিখিত হয় নাই। ইহাতে সেই সময়ের ভারতবর্ষের অনেক সংবাদ পাওয়া যায়।

চিকিৎসা ও ঔষধপ্রস্তুত বিষয়ে আরববাসীরা হিন্দুদিগের নিকট কিরূপ ঋণী তাহা মৎপ্রণীত 'হিন্দুরসায়নের ইতিহাসে' বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, আরববাসীরা ভারতবর্ষের বহুযুগসঞ্চিত জ্ঞানরাশি ইউরোপে লইয়া যান।

হিন্দুগণের পরমাণুবাদ।

আমি এক্ষণে, সাংখ্য পাতঞ্জল ও বৈশেষিক দর্শনে পরমাণুবাদের বিষয় যাহা লিখিত আছে, তৎসম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এম্পেডোক্লিস্, এনাক্সাগোরাস্, ডিমোক্রিটাস্ প্রভৃতি গ্রীক দার্শনিকগণের পরমাণুবাদের সহিত হিন্দুগণের পরমাণুবাদের কিছু সাদৃশ্য আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহা যথার্থ সাদৃশ্য নহে, বাহ্যিক সাদৃশ্য মাত্র।

কণাদের শব্দবিস্তার বিষয়ক মত আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত। ইহা পাঠ করিলে যুগপৎ বিস্ময় ও হর্ষের উদ্রেক হয়। নিম্নে ইহার একাংশের অনুবাদ উদ্ধৃত হইল—

একস্থানে উৎপন্ন শব্দ যে অন্যস্থানে শোনা যায়, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে শব্দ কোনও একটি কেন্দ্র হইতে চতুর্দ্দিকে তরঙ্গাকারে ছড়াইয়া পড়ে। প্রথম কিংবা মধ্যবর্ত্তী তরঙ্গসমূহ আমরা শুনিতে পাই না; কেবল শেষ যে তরঙ্গটি আমাদিগের কর্ণের সংস্পর্শে আসে তাহাই শুনিতে পাই। সুতরাং 'ঢাক শুনিয়াছি' এরূপ বলা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ নহে।

কণাদ বলেন যে উত্তাপ ও আলোক একই পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন আকার। চরক জল শব্দ ও আলোকের গতির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। চক্রপাণির মতে, শব্দতরঙ্গ জলের তরঙ্গ অপেক্ষা দ্রুততর বেগে এবং আলোকরশ্মি অপেক্ষা মন্দতর বেগে বিস্তার লাভ করে।

উল্লিখিত ঘটনাবলী হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানের সমধিক আলোচনা হইত, এবং বৈজ্ঞানিক

পরীক্ষা (Experiment) দ্বারা নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইত। জ্ঞানানুশীলন যথার্থ তপস্যার ন্যায় পরিগণিত হইত। ছাত্রগণ কিরূপ যত্নশীল ছিল, তাহা নাগার্জ্জুন-প্রণীত রসরত্নাকর গ্রন্থে রসায়নের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর উদ্দেশ্যে লিখিত নিম্নোদ্ধৃত প্রার্থনাটি পাঠ করিলে জানা যায়—

দ্বাদশানি চ বর্ষাণি মহাক্লেশঃ কৃতো ময়া।
যদি তুষ্টাসি মে দেবি সর্ব্বদা ভক্তিবৎসলে।
দুর্লভং ত্রিষু লোকেষু রসবন্ধং দদস্ব মে।

"আমি দ্বাদশবর্ষব্যাপী কঠোর পরিশ্রম করিয়াছি। হে দেবি! যদি আপনি সন্তুষ্টা হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এ তিনলোকে দুর্লভ রসায়নজ্ঞান প্রদান করুন।"

হিন্দুজাতির অতীত গৌরবমণ্ডিত। এই জাতির অন্তর্নিহিত শক্তি অতি বিশাল। সুতরাং, আশা করা যায়, ইহার ভবিষ্যৎ অধিকতর গৌরবে দেদীপ্যমান হইবে। আমি এই প্রবন্ধে যে-সকল কথা লিখিয়াছি, তদ্দ্বারা যদি আমার স্বদেশবাসীগণ মানবীয় জ্ঞানরাজ্যে তাঁহাদিগের পূর্ব্ব-স্থান পুনরায় লাভ করিবার চেষ্টা করিতে উৎসাহিত হন, তাহা হইলে আমার শ্রম সার্থক হইবে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

অদিনে যাত্রা

(রবীন্দ্রনাথের "পূজারিণীর" অনুকরণে)

ভূপতি কর্ম্মকার—
নামিয়া আইল তেতলা হইতে।
আজি পরীক্ষা তার।
স্থাপিলা কালীর প্রসাদ আননে,
ললাট উপরে রচিলা যতনে
অতি অপরূপ দধিময় স্তূপ,
শিল্পশোভার সার।

টেক্‌স্ট্‌ বুকের পাতার পকেট
ভরিয়া নিল নিরালা।
লিখি নিল ফুল-মোজার তলায়,
Cuffএর ভিতরে, কোটের গলায়,
আপনার হাতে, ঘড়ির ডালায়
প্রশ্নোত্তর-মালা।

গুরুর পুত্র, কম্পোজিটার
কহিল ছুটিয়া আসি
"পিতার ধর্ম্ম অনাচার-স্রোতে
মুছিয়া ফেলিছ আজকেরি হতে,
ছুটিছ অজ্ঞ নরক-আলোতে
না মানি শাস্ত্ররাশি!

ত্র্যহস্পর্শে করিছ যাত্রা!
কলিতে হল কি সবে?
দেবদেবী ছাড়া ভেবেছ কি আর
কিছু নাই ভবে ভয় করিবার?
অশ্লেষা, মঘা, বেম্পতিবার,
মিথ্যা কি এরা তবে?"

"খণ্ডেনা কভু ললাট-লিখন"
ভূপতি কহিল হাসি।
পুণ্যবচনে টলিল না হিয়া
দেখি যশীদাসী পড়ে মূরছিয়া,
বিরাজ-পিসীর নয়ন বাহিয়া
গড়াল অশ্রুরাশি।

শিহরি সভয়ে জননী কহিলা
"ভেবে দেখ্‌ বাছা মনে
বাহির হইবে আজিকে যে-জনা,
আছে তার ভালে মৃত্যু-ঘটনা,
অথবা ভুগিবে অশেষ যাতনা
বন্ধন, দংশনে।"

সেথা হ'তে ফিরি গেল চলি ধীরি
বধূ আতুরীর ঘরে।
সকাল হইতে, সমুখে মুকুর
রাখিয়া বাঁধিতেছিল সে চিকুর,
মুছিতেছিল সে হাতের সিঁদুর
পুঁথির পাতার পরে।

ভূপতিরে হেরি বাঁকি গেল রেখা,
কাঁপি গেল তার হাত।
কহিলা ভাসিয়া নয়নের জলে
আজিকে যাইবে কি সাহসবলে?
মাথা খাও, ফের, ঘটিবে না হ'লে
বিষম বিপদপাত।

দোক্তা ও পান গালে ঠাসি দিয়া
খোলা জানালার ধারে,
কুমারী সন্ন বসি একাকিনী
পড়িতে নিরত প্রণয়-কাহিনী,
সহসা শুনিয়া মস্ মস্ ধ্বনি
চমকি চাহিল দ্বারে।

গুলের কৌটা ফেলি রাখি ভূমে
গেল ভূপতির কাছে।
কহে সাবধানে, তার কানে কানে,
পাঁজির আদেশ আজি কে না মানে?
এমনি করে কি মরণের পানে
ছুটিয়া চলিতে আছে?

দ্বার হতে দ্বারে ফিরিল ভূপতি
নমিয়া দুর্গা কালী—
"গাড়ী ত আসেনি" শিবু হাঁকি কয়
"হ'ল যে বাবুর যাবার সময়।"
শুনি ঘরে ঘরে কেহ পায় ভয়,
কেহ দেয় তারে গালি।

আজকে লোকের নাহিক অন্ত
সেনেট-সৌধ পরে।
ক্রমে খুলি গেল কপাট কঠিন
কল-কোলাহল হয়ে এল ক্ষীণ
দশটা ঘণ্টা ধ্বনিল প্রাচীন
গোলাম-খানার ঘরে।

ভরি গেল টুল টেবিল মলিন,
দপ্তরী ছুটে চলে,
প্রশ্ন দেখিয়া শুকায় পরাণ,
ঘর্ম্ম গড়ায় মুক্তা সমান,
নড়িতে চড়িতে খালি "সাবধান!"
গার্ড ফুকারিয়া বলে।

হঠাৎ লাফায়ে উঠিল ভূপতি,
ছুটে আসে গার্ড যত,
"কি হ'ল কি হ'ল?" শুধায় তাহারে।
সে কয় কাঁদিয়া "গলার কলারে
ফুটিতেছে কেন যেন বারে বারে
ছুঁচের ডগার মত!"

মুক্ত করিতে জামার বক্ষ
সহসা ফুটিল হাসি—।
দেখে ছারপোকা অতি দুর্ম্মতি
প্লেটের উপরে চলে দ্রুতগতি,
অমনি তাহারে টিপিল ভূপতি,
নিমেষে ফেলিল নাশি।

সেদিন শুভ্র বসন-ফলকে
পড়িল রক্ত লিখা।
সেদিন ধর্ম্ম রটিল মহীতে,
পাঁজির বিধান ভাবিতে ভাবিতে
মুণ্ডিত শিরে কাঁপিল চকিতে
দেশের যতেক শিখা।

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়।

পাতঞ্জল সাঙ্খ্যে বা যোগদর্শনে ঈশ্বর

কপিলসাঙ্খ্য বলেন যে এই পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালে একটি অব্যক্ত মূল কারণ আছে। এই মূল কারণটি সর্ব্বদাই এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থাতে পরিণত হইতেছে, এবং এইরূপে কতকগুলি বিকৃতি সৃষ্টি করিতেছে। এই বিকৃতির মধ্য দিয়াই অব্যক্ত প্রকৃতি বা মূল কারণ ক্রমশঃ ব্যক্ত ও পরিস্ফুট হইতেছে। প্রকৃতিরই সত্তা বা উপাদানই এই বিকৃতির মধ্য দিয়া পরিস্ফুট ও পরিব্যক্ত হইয়া বিকাশ লাভ করিতেছে। কিন্তু এই বিকার বা বিকৃতিগুলির উৎপত্তি দ্বারা প্রকৃতির কোনও ক্ষয় হয় না। তাঁহার ভাণ্ডার অক্ষয় ও পরিপূর্ণ হইয়াই থাকে। সত্ত্ব, রজ, তম, এই তিনটি বস্তু লইয়াই প্রকৃতির নির্ম্মাণ। এই তিনটির কোনও একটিই আবার তুইটি ছাড়া থাকিতে পারে না। সত্ত্বের ধর্ম্ম "প্রকাশ", রজ ক্রিয়াত্মক এবং 'তম'র ধর্ম্ম আবরণ। এই তিনটিকেই ত্রিগুণ বলা হইয়া থাকে। যখন এই গুণত্রয় পরস্পরকে এমন করিয়া বাধা দেয়, যে, তাহাদের কোনটির ধর্ম্মই স্ফূর্ত্তি পায় না, পরস্পরের প্রতিঘাতে পরস্পরের ধর্ম্ম একেবারে আচ্ছন্ন বা তিরোহিত হইয়া থাকে, সেই অবস্থাকেই এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা বলা হয়, এবং এই সাম্যাবস্থাকেই প্রকৃতি বলা হয়। এই ত্রিগুণের কোনও একটি গুণ যখন অপরগুলি অপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠে, তখন তাহাকে গুণক্ষোভ বা গুণবৈষম্য বলা হয়। এই গুণক্ষোভের প্রথম অবস্থাতে, সত্ত্বগুণ প্রবল হইয়া উঠে, এবং তাহাতেই বুদ্ধিতত্ত্বের উৎপত্তি হয়। ইহার পর যখন রজোগুণ বাড়িয়া উঠে তখনই অহঙ্কারতত্ত্বের উৎপত্তি হয়। এই অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে তমোগুণের প্রাধান্যে পঞ্চতন্মাত্র, রজোগুণের প্রাধান্যে পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, সত্ত্বগুণের প্রাধান্যে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। এই পঞ্চতন্মাত্র অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইলেও, অহঙ্কার যখন বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই অবস্থাতেই বুদ্ধিতত্ত্বের মধ্যে উৎপাদধর্ম্মী অহঙ্কারের মধ্যেই ইহার আদ্য বিক্রিয়া আরম্ভ হয়। কাজেই ইহার বিকার দয়া পরিণতি বুদ্ধিতত্ত্বের মধ্যেই আরম্ভ হয় (লিঙ্গমাত্র সংসৃষ্টা বিবিচ্যন্তে)। এই পঞ্চতন্মাত্রই ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ও ব্যোম প্রভৃতি মহাভূতের সূক্ষ্ম কারণ; কারণ এই পঞ্চতন্মাত্রের মধ্যে যখন তমোগুণ বাড়িয়া উঠে তখনই পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হয়। এই পঞ্চমহাভূতের পরমাণুগুলি আবার পরস্পরের সহিত মিলিয়া নানাবিধ ধর্ম্ম উৎপন্ন করিয়া থাকে, এবং এই ধর্ম্মের ভেদ-অনুসারে বস্তুর ভেদ স্বীকৃত হইয়া থাকে। সূক্ষ্মতম বিকৃত বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্নগুণের ন্যূনাধিক্যবশতঃ স্থূল, স্থূলতর ইত্যাদিক্রমে মহাভূত পর্য্যন্ত বিকৃতির যে ভিন্ন ভিন্ন স্তর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগকে তত্ত্ব কহে, কিন্তু মহাভূতের পরমাণুগুলির পরস্পর বিভিন্ন ও বিচিত্র সন্নিবেশ-নৈপুণ্যে যে-সমস্ত জড় উদ্ভিদ্ প্রাণি-শরীর প্রভৃতি বস্তুসমূহ উৎপন্ন হয়, তাহা তত্ত্বোৎপত্তি নামে অভিহিত হয় না। কারণ পরমাণুর সঙ্ঘাত বা সংমিশ্রণসম্ভূত বস্তুগুলি বাহ্যদৃষ্টিতে যতই বিরূপ দেখাক না কেন, তাহাদিগকে কোনক্রমেই পরমাণু হইতে ভিন্ন বলিয়া অস্বীকার করা যায় না। বস্তুতঃ কাঠ খড় লোহা তামা সোনা পাথর লতাপাতা গাছ কীট পতঙ্গ পশুপক্ষী প্রাণিশরীর প্রভৃতি সংসারে যাবতীয় জড়পদার্থের কোনটি হইতে কোনটি একেবারে ভিন্ন নহে; প্রভেদমাত্র পরমাণুসন্নিবেশের; যে পরমাণুগুলির কোনও প্রকার সন্নিবেশবশতঃ আমরা তাহাদের উপচিত যৌগিক সমষ্টিকে কাঠ বলি, তাহারাই অন্য কোনও বিশেষ প্রকারে সন্নিবিষ্ট হইলেই সেই যৌগিক সমষ্টিকে হয়ত আমরা লোহা বা তামা বলিতাম, আবার তদপেক্ষা কোন বিশেষ প্রকারের সন্নিবেশকে হয়ত ফুল বা ফল বলিতাম। তবেই কোনও বস্তুর সহিত কোনও বস্তুর আত্যন্তিক ভেদ নাই। অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ হিসাবে কিংবা ধর্ম্মের বিবিধ পরিবর্ত্তনের হিসাবে যাহা কিছু ভেদ দেখা যায় তাহা কেবল পরমাণুসন্নিবেশের বৈচিত্র্য ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রতিক্ষণেই পরমাণুগণ রজোগুণের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া পরস্পর স্থানপরিবর্ত্তন করিতেছে, এবং তাহার ফলে একদিকে যেমন একই বর্ত্তমানক্ষণের মধ্যে সমস্ত অতীত বিধৃত হইয়া রহিয়াছে এবং ভবিষ্যৎ পরিণামের বীজও তাহারই মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া রহিয়াছে, তেমনি আবার অপরদিকে প্রতিক্ষণের নূতন সন্নিবেশের দ্বারা

নূতন নূতন গুণাধীন হইয়া ধর্ম্মপরিণামের দ্বারা নূতন নূতন বস্তুর উৎপত্তি বা আবির্ভাব হইতেছে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে যদি সকল বস্তু হইতেই সকল বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে তবে বাস্তবিকপক্ষে সেরূপ উৎপত্তি হইতে দেখা যায় না কেন? কেন শরিষা হইতেই তেল হয় আর বালি হইতে হয় না; কেন পাথর হইতে দধি হয় না, অথচ দুগ্ধ হইতে হয়? ইহার উত্তরে এই কথা বলা যাইতে পারে, যে, মূলতঃ কোনও বস্তু হইতে কোনও বস্তুর উৎপত্তির কোনও বাধা (সর্ব্বং সর্ব্বাত্মিকং) না থাকিলেও বস্তুতঃ সেরূপ উৎপত্তি বাধাশূন্য নহে। কারণ দেশকাল আকার নিমিত্ত প্রভৃতি হিসাবে পরমাণুসন্নিবেশের প্রতি স্বভাবতই একটা কঠিন শাসন বিদ্যমান রহিয়াছে; এই স্বভাবশাসনের প্রতিবন্ধকতা বা বাধার জন্যই প্রত্যেক বস্তুর নির্ম্মাণভূত পরমাণুগুলির সন্নিবেশ-পরিণামের একটা কঠোর নিয়ম রহিয়াছে; এবং সেইজন্যই সেই বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া যে-কোনও বস্তু হইতে যে-কোনও বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে না। প্রকৃতি এবং তাহার বিকৃতিগুলি সর্ব্বদাই ক্রিয়াশীল বা পরিণামশীল, এবং সেইজন্যই যে-পথে কোনও বাধা পায় না, সেই পথেই সেই শক্তি ব্যক্তরূপে পরিণত হইতে থাকে; যে দিকের বাধা উন্মোচিত হয় ক্রিয়াশক্তি কেদারস্থ জলপ্রবাহের ন্যায় সেইদিকেই ছুটিতে থাকে। কতকগুলি বাধা কারণব্যাপারের দ্বারা দূরীকৃত হয়, এই যেমন মন্থনের দ্বারা দুগ্ধ হইতে নবনীত হয়। এই বাধা দূর করাতেই কারণ-ব্যাপারের কারণত্ব; নচেৎ বাস্তবিক পরিণামব্যাপারের কোনও কারণতা নাই, কারণ সেই প্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম (নিমিত্তং অপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ) যে-দিকের বাধা পরমাণুগুলির স্বভাবনিষ্ঠ হইয়া গিয়াছে, এবং কোনও কারণ-ব্যাপারের দ্বারা তাহা দূর করা সম্ভব নয়, সেদিকের বাধা অতিক্রান্ত হয় না বলিয়াই, সেদিকে পরিণামশক্তির কোনও প্রবাহ ধাবিত হয় না, এবং কাজেই তাদৃশ পরিণামও সঙ্ঘটিত হয় না। কাশ্মীরেই কুঙ্কুম হয়, পাঞ্চালে হয় না, গ্রীষ্মে ধান্য পাকে না, মৃগীর গর্ভে মনুষ্য জন্মে না, এবং পাপীরও নিস্তরঙ্গ সুখোপভোগ হয় না (ব্যাস-ভাষ্য-৩।১৪)। প্রকৃতির মধ্যে কতকগুলি দিকে কেন এইরূপ স্বাভাবিক বাধা রহিয়াছে, কেনই বা কতকগুলি দিকের বাধা স্বভাবতই শিথিল ও সুখাপনেয় এবং কেনই বা কতকগুলি প্রতিবন্ধক কঠিন এবং সর্ব্বথা দুরপনেয়,—ইহার উত্তরে সাঙ্খ্য বলেন যে প্রকৃতির সহিত স্বভাবতই পুরুষ বা জীবের এই সম্বন্ধ রহিয়াছে, যে, তাহার পরিণামের দ্বারা জীবের সুখদুঃখাদি ভোগ এবং তদনন্তর কর্ম্মের পরিপাকের নিয়মে অপবর্গপ্রাপ্তি প্রভৃতি সমস্তই অনায়াসে সঙ্ঘটিত হইতে পারে।

পুরুষার্থের সহিত প্রকৃতির আত্মপরিণামের এই স্বভাবসিদ্ধ নিয়মের দ্বারাই প্রকৃতির পরিণাম নিয়ন্ত্রিত হইয়া রহিয়াছে। যে পথে শক্তি প্রবাহিত হইলে পুরুষার্থের উপযোগী হইবে না, পুরুষার্থের অনুপোযোগিত্ব-প্রযুক্তই সেই পথে প্রকৃতির শক্তি প্রবাহিত হইতে পারে না। অথচ যে প্রবাহিত হইলে পুরুষার্থ সুসম্পন্ন হইতে পারে, সেই পথের বাধা সহজেই অপনীত হয়, এবং প্রকৃতির শক্তি সেইদিকেই তাহার পরিণামকে আকৃষ্ট করিতে থাকে। প্রকৃতি জড় ও চিৎশূন্য হইলেও, তাহার স্বভাবনিষ্ঠ পুরুষার্থপরতার বলেই তাহার পরিণাম একটি সুনির্দ্দিষ্ট উপযোগী ও সুশৃঙ্খল প্রবাহে পরিচালিত হইতে পারে। কাজেই সেজন্য ঈশ্বর স্বীকার করিবার কোনও আবশ্যক নাই।

কিন্তু পতঞ্জলি বলেন যে প্রকৃতি যখন জড় তখন তাহার পরিণাম প্রবাহের সম্মুখে যে-সমস্ত বাধা প্রতিবন্ধক আছে তাহা দূর করিয়া, তাহার আচ্ছন্ন বা আবৃত পরিণামকে ব্যক্ত করিবার জন্য স্বতন্ত্র ঈশ্বর স্বীকার করিবার প্রয়োজন। সত্য বটে প্রকৃতির মধ্যেই পুরুষার্থ নিহিত হইয়া রহিয়াছে। এই স্বনিষ্ঠ পুরুষার্থপরতার দ্বারা কোনও বিশেষ পরিণামের দিকে প্রকৃতির শক্তি কেন্দ্রীভূত ও উন্মুখ হইয়া উঠে, ইহাও স্বীকার করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতির শক্তি যখন জড় তখন সে কি করিয়া জানিবে, কোন্ দিকের কোন্ বাধা উদ্ঘাটন করিলে পুরুষার্থোপযোগী পরিণাম-প্রবাহের মধ্যে সে আপনাকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারিবে। প্রকৃতির পুরুষার্থোপযোগিত্ব আছে বলিয়াই যে কোন্ পথে প্রবাহিত হইলে তাহার

শক্তি সার্থক হইতে পারিবে তাহা সে বুঝিতে পারিবে তাহা বলা যায় না। আর যদি পুরুষার্থের মধ্যেই এত বড় একটা প্রকাণ্ড বোধশক্তি জাগ্রত রহিয়াছে ইহা স্বীকার করা যায়, তবে ত তাহারই বলে প্রকৃতিকেই বাস্তবিক চেতন বলিয়া মানিতে হয়।

কাজেই স্বতন্ত্র এমন একটি ঈশ্বর স্বীকার করিতেই হয়, যাহার সান্নিধ্যপ্রযুক্তই যথানির্দ্দিষ্ট প্রতিবন্ধক অপনীত হইয়া প্রকৃতির শক্তি-প্রবাহ পুরুষার্থোপযোগী মার্গ অবলম্বন করিয়া যথানিয়মে পরিচালিত হইতে পারে (ঈশ্বরস্য প্রতিবন্ধাপনয় এব ব্যাপারঃ)। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির পুরুষার্থপরতা মানিতে হয়, কারণ তাহা হইলে ঈশ্বরের দ্বারা প্রতিবন্ধকগুলি অপনীত হইয়া প্রকৃতির পরিণাম-প্রবাহ সুসম্পন্ন হইলেও তাহা দ্বারা পুরুষের বা জীবের কোনও অর্থ বা প্রয়োজন সুসিদ্ধ হইতে পারে না। বস্তুতঃ প্রকৃতির মধ্যে পুরুষার্থতা না থাকিলে ঈশ্বর সত্ত্বেও পরিণামের দ্বারা পুরুষের কোনও উপোযোগিতা হইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, -দব একজন অত্যন্ত নিন্দিত কর্ম্ম করিল এবং তাহার ফল-ভোগের জন্য, তাহার জন্য প্রকৃতির একটি দুঃখময় পরিণাম হইল; এ অবস্থায় ঈশ্বরের ইচ্ছাতে তাঁহার সান্নিধ্যবশতঃই প্রকৃতির এরূপ বাধা উন্মোচিত হইল যে তাহাতে যে পরিণামটি সঙ্ঘটিত হইল তাহা দ্বারা বস্তুতঃ সে দুঃখ পাইতে পারে; কিন্তু প্রকৃতির মধ্যেই যদি পুরুষার্থপরতা না থাকিত তবে সেরূপ পরিণামের দ্বারাও পাপী দুঃখ পাইত না।

যাহাতে সুখকর বা দুঃখকর হইতে পারে বা যাহাতে কর্ম্মফলভোগ নিষ্পন্ন হইতে পারে, জীবের কর্ম্ম এই হিসাবেই পরিণামের নিয়ামক, এবং যেরূপ প্রবাহের পরিণামের দ্বারা এইটি সুসিদ্ধ হইতে পারে, সেই দিকের বাধা উন্মোচন করিয়া দেওয়াতেই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব। এই ঈশ্বরের দ্বারাই এই জগতের সমস্ত বস্তু বিধৃত হইয়া রহিয়াছে, ইহাঁর সান্নিধ্যপ্রযুক্তই প্রকৃতির ব্যাপার সফলকাম হইতে পারিতেছে। এই ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ; অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ প্রভৃতি কোনও ক্লেশাত্মিকা বৃত্তিরই তাঁহাতে কোনও সংস্পর্শ নাই। তাঁহার কোনও কর্ম্মও নাই, ফলও নাই, জননও নাই, ভোগও নাই। কোনও শ্রেণীর মুক্তপুরুষেরা পূর্ব্বে কোনও সময় বদ্ধ হইয়াছিলেন, পরে নিজকর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হইতে মুক্ত হইয়াছেন; আবার আর-এক শ্রেণীর সাধক আছেন, যাঁহারা কর্ম্মদ্বারা কিছুদিন মুক্তের ন্যায় প্রকৃতির মধ্যে লীন হইয়া থাকেন এবং পুনরায় কর্ম্ম-ক্ষয়ে বন্ধন প্রাপ্ত হন; ইহাঁদের কাহারও সহিতই ঈশ্বরের কোনও তুলনা হয় না। তাঁহার কোনও কালে কোনও বন্ধন ছিল না, এবং কোনও কালে কোনও বন্ধন থাকিবে না; তিনি সর্ব্বদাই মুক্ত সর্ব্বদাই ঈশ্বর (স তু সদৈব মুক্তঃ সদৈবেশ্বরঃ)। তাঁহার তুল্য ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন আর দ্বিতীয় কেহ নাই, তিনি অদ্বিতীয়, তাঁহার আজ্ঞা কেহ রোধ করিতে পারে না। তাঁহাতেই সর্ব্বজ্ঞত্বের চরমসমাপ্তি। তাঁহার নিজের কোনও প্রয়োজন নাই, জীবকে অনুগ্রহ-বিতরণ করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন। জীব যাহাতে পাপপুণ্য অনুসারে দুঃখসুখাদি ভোগ করিয়া ক্রমশঃ আত্মোপলব্ধির সন্নিকট হইতে পারে ও ক্রমশঃ মুক্তিপদে আরোহণ করিতে পারে এইজন্যই তিনি জীবের কর্ম্মফল-ভোগোপযোগী প্রকৃতিব্যাপারের নিয়ামক হইয়া থাকেন। জীব যদি ভক্তির সহিত কেবল তাঁহারই উপাসনা করে তাহা হইলেই সে অনায়াসে আপন চরম ও পরম স্বরূপ লাভ করিতে পারে, কোনও কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজন নাই, কোনও তত্ত্বোদ্ঘাটনের আবশ্যক নাই।

জীব কেবল তাঁহারই চরণকমলে ভক্তির অঞ্জলি উৎসর্গ করুক, তাহা হইলেই তাহার সকল কামনা সুসিদ্ধ হইবে। ব্যাধি, চিত্তের জড়তা, সন্দেহ, পথভ্রংশ, আলস্য, বিষয়তৃষ্ণা, মিথ্যা জ্ঞান, অস্থিরত্ব, প্রভৃতিকে দূর করিবার জন্য পৃথক-ভাবে কোনও উপায় অবলম্বন করিবার প্রয়োজন নাই, ভক্তিবিগলিত হইয়া তাঁহাতে মনঃসংযোগ করিলেই, তাঁহার কৃপায় সমস্ত বাধা, সমস্ত প্রতিকূলতা, সমস্ত অন্তরায় বিদূরিত হইয়া যাইবে। তাহার পক্ষে প্রকৃতির উন্মেষ ক্রমশঃ মঙ্গলময় আনন্দময় হইয়া উঠে, এবং সেই পরম কারুণিকের কৃপায় পুণ্যপথের সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ধ্বস্ত হওয়াতে প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিণামে সে ক্রমশঃ মুক্তিরাজ্যের নিকটবর্ত্তী হয় ও পরিশেষে আনন্দ-হ্রদাবগাঢ় হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়া কেবলী হয়।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত।

নারীর সৈনিক হওয়া উচিত কি না

আজকাল সভ্যজগতের প্রধান দুটি সমস্যার মধ্যে একটি শ্রমজীবী-সমস্যা অপরটি নারী-সমস্যা। শ্রমজীবী-সমস্যাটা লইয়া শুধু মূলধনী ও শাসনকর্ত্তারা মাথা ঘামাইলেই চলে, কিন্তু নারী-সমস্যাটা সকলের মস্তকই ঘর্ম্মাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। এই সমস্যাটা লইয়া দুইটা দল গড়িয়া উঠিয়াছে। একদল বলেন "পুরুষ ও নারীর অভেদ অধিকার"; অপরদল বলেন "অসম্ভব!"

অধিকারপ্রার্থিনী নারীর দল বলিতেছেন—"সকল বিষয়েই আমরা পুরুষের মত সমান ও অবাধ অধিকার চাই—শাসনকার্য্যেই বল, ডাক্তারী ওকালতি ইঞ্জিনিয়ারী ব্যবসাবাণিজ্য, পুলিশ রেল বা সৈন্যবিভাগের যে-কোন রাজকর্ম্মই বল—সকল বিভাগেই পুরুষের মত অবাধ অধিকারের আমরা দাবী করিতেছি। কারণ পুরুষের চেয়ে কোনো অংশে আমরা হীন নই।"

যুদ্ধসাজে রমণীকে কেমন দেখায়।

অপরপক্ষ প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন যে নারী ও পুরুষের অভেদ অধিকার সম্ভব নয়, যেহেতু নারী—নারী, ও পুরুষ—পুরুষ,—গোড়াতেই এই বিষম প্রভেদ! চিরদিনের অভ্যাস যেমন নারীকে গৃহকার্য্য ও এই শ্রেণীর কাজকর্ম্মে পটু করিয়া তুলিয়াছে, পুরুষও ঠিক ঐ কারণেই বাহিরের অন্যান্য কার্য্যে বিশেষভাবে দক্ষ। সুতরাং হঠাৎ কর্ম্মভেদের মামলা রুজু করিয়া নূতন ব্যবস্থা করিতে গেলে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে গিয়া চড়িবে। এরূপ চেষ্টাটা নিতান্তই হাতের পক্ষে মুখের অধিকার কাড়িতে যাওয়ার মত। আরও, ইহা ছাড়া নারীর কতকগুলা শারীরিক ও মানসিক অযোগ্যতা আছে যেজন্য তাহার পক্ষে পুরুষের সহিত সমান অধিকার লাভ করা সম্ভব নয়। প্রকৃতি প্রত্যেক জীবকেই বিশেষ বিশেষ কার্য্যের উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে, কিন্তু পুরুষ ও নারীকে ঠিক একই প্রকার কাজের জন্য সৃষ্টি করিয়াছে—উভয়ের গঠন দেখিয়া সেরূপ তো আদৌ মনে হয় না।

প্রতিপক্ষের শেষের যুক্তিটার পাশ কাটাইয়া ইঁহারা প্রতিবাদের এই উত্তর দেন যে—নারী পুরুষের চেয়ে দৈহিক বলে কোনো মতেই খাটো নয়। যেহেতু বর্ত্তমানে অনেক মেয়ে-পালোয়ান দৈহিক বলে পুরুষের মতই কৃতিত্ব দেখাইতেছে। রাষ্ট্রজগতে রাণী এলিজাবেথ, ভিক্টোরিয়া, রুশিয়ার রাণী ক্যাথারিন, অষ্ট্রিয়ার সম্রাজ্ঞী মেরিয়া থেরেসা প্রভৃতি, সাহিত্য-জগতে জর্জ্জ ইলিয়ট, জর্জ্জ স্যাণ্ড, মাদাম দে স্তেইল, সার্লট ব্রণ্টে, জেন অষ্টেন প্রভৃতি; বিজ্ঞানজগতে মাদাম কুরী; শিক্ষায় মন্তেসরী; এবং ইতিহাস-খ্যাত অন্যান্য নারীগণও পুরুষের অপেক্ষা কোনো অংশে হীন নয়। জোয়ানদার্ক, সার্লট কর্ডে, জ্যারাগোজার বীরাঙ্গনা, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, মাদাম রোল্যাণ্ড প্রভৃতি আরো কত বিখ্যাত নারীর নাম করা যায়। সুতরাং নারী পুরুষের সহিত সমান অধিকার পাইবে না কেন? হানা স্নেল বৃদ্ধ রাজা জর্জ্জের সেনাবিভাগে বহুকাল ধরিয়া দক্ষতা ও বীরত্বের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। আরো আধুনিক সময়ের কথা, গ্রীকবীরাঙ্গনা হেলেন কন্সট্যান্টিনাইডিস তুর্কীদের বিরুদ্ধে স্বদেশের স্বাধীনতা

ও উৎপীড়িত স্বজনবর্গের জন্য অশেষ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার বীরত্বে এথেন্সের সেনাদল মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে! বর্ত্তমানকালেও কত নারী যুদ্ধকার্য্যে অশেষ দক্ষতা দেখাইয়াছেন।

যে শারীরিক শক্তির অনুশীলন এতদিন পুরুষদের একচেটিয়া ছিল, আজ স্ত্রীলোকেরাও তাহাতে যোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক ছোড়া, তলোয়ার খেলা, ঘুষোঘুষি, পথচলার বাজী প্রভৃতি সকল শ্রমিক ব্যাপারেই আজকাল স্ত্রীলোকদের দেখা যায় এবং এ-সকল বিষয়ে তাঁহারা নিতান্ত অক্ষমও নন। প্রশ্নটা অনেকদিন হইতেই ছিল, তবে সম্প্রতি এই মহাযুদ্ধের মরশুমে চাঙ্গা হইয়া গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছে যে "স্ত্রীলোকদের যুদ্ধ করা উচিত কি না।" একদল ইহার উত্তরে বলেন—"তা আর বলিতে! একান্ত উচিত—অবশ্য কর্ত্তব্য।" অপরপক্ষ প্রতিবাদ করিতেছেন "কখনই তা হইতে পারে না।"

একজন স্ত্রীলোক বলেন যে—যুদ্ধটা আজকাল তো আর গায়ের জোরের কাজ নয়—নিতান্তই বিজ্ঞানের বাহাদুরী। আমি দেখিয়াছি একজন নিতান্ত ক্ষীণাঙ্গী অবলা নারী নায়েগ্রার লক্ষ অশ্বশক্তির তড়িৎপ্রবাহটাকে সামান্য একটি বোতাম একটুখানি টিপিয়াই চালাইয়া দিল। সুতরাং আজকালকার যুদ্ধে স্ত্রী পুরুষ প্রভেদ করা বৃথা।

চল্লিশবৎসর আগে আমেরিকার লুই রোজ তাঁহার বিখ্যাত ঘোষণাপত্রে স্ত্রীলোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, দৈহিক বলে আমরা অযোগ্য নই—জোয়ানদার্ক, ফরাসীবিপ্লব, পোলিশ ও মার্কিনবিদ্রোহের রমণীগণ তাহার দৃষ্টান্ত। জোর যার মুলুক তার—এই জোর নারীদের চাই, নইলে ন্যায্য অধিকারের মুলুকে আমরা ঢুকিতে পারিব না।

সম্রাজ্ঞী মেরী ইভানোভ্‌না মানবজাতিকে চারভাগে ভাগ করিয়াছিলেন। পুরুষ, মেয়ে, পুরুষ-মেয়ে ও মেয়ে-পুরুষ। তিনি বলিতেন—"চরকা যদি না কাটিতে পারে তো মাঠে গিয়া ওরা কুচকাওয়াজ করুক। স্বামী লাভ করিবার যদি ক্ষমতা না থাকে তো যুদ্ধে গিয়া জয়লাভ করুক। আমি বরঞ্চ তাদের অধ্যক্ষ হইতে রাজী আছি।"

তাঁহার কথা-মত তাঁহার কর্ম্মচারীরা অনুসন্ধানে গিয়া এই সংবাদ লইয়া শেষে ফিরিয়া আসিয়াছিল যে—যুদ্ধে যাইবার মত মোটে বারোটি স্ত্রীলোক জুটিয়াছে। নাম দিয়াছিল প্রথমটা অনেকেই—তবে অনুসন্ধানে একে একে বাহির হইয়া পড়িল যে তাহাদের মধ্যে কেহ বাগ্‌দত্তা, কাহারো বিবাহকার্য্য শীঘ্রই সমাধা হইবে—আর কেহ কেহ বা ইতিমধ্যে গোপনে বিবাহকার্য্য সারিয়াই রাখিয়াছে।

হানা স্নেল, ইনি সৈনিকের কাজ করিয়াছিলেন।

গ্রীক বীর-নারী হেলেনা কনষ্টান্টিনাইডিস।

অনেকে জানিতে ইচ্ছা করেন যে আজকালকার প্রধান প্রধান যুদ্ধব্যবসায়ী ও বিখ্যাত নারীদিগের এ সম্বন্ধে মত কি। এ সম্বন্ধে কয়েকজন বিখ্যাত সেনানায়ক ও মহিলার অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়া প্রত্যেককে নিম্নলিখিত কয়টি প্রশ্ন করিয়া পাঠানো হইয়াছিল। তাঁহারা যে উত্তর দিয়াছেন তাহাও প্রকাশিত হইল।

প্রশ্ন ক'টি এই—

১। স্ত্রীলোক অবিবাহিত, কর্ম্মঠ, স্বাস্থ্যসম্পন্ন হইলে তাহার পক্ষে সৈনিক হওয়া উচিত কি না।

২। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী স্ত্রীলোকরা যেমন দেশের জন্য যুদ্ধ করিয়াছিল আপনিও সেইরূপ দেশের জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছেন কি না। (এই প্রশ্নটি শুধু স্ত্রীলোক-দিগের জন্য)।

৩। আত্মরক্ষার জন্য মেয়েদের ব্যায়াম, কুচকাওয়াজ ও বন্দুকচালনা করাটা কি আপনি কিছু অসম্মানের কার্য্য বলিয়া মনে করেন? আপনি মেয়েদেরও ছেলেদের মতই শারীরিক শক্তির অনুশীলন দরকার মনে করেন কি?

ইহার উত্তরে সেনাধ্যক্ষ লর্ড রবার্টস্ লিখিয়াছেন—দেশের জন্য যে মেয়েরা যুদ্ধ করিতে যাইবে ইহা আমি কস্মিন্ কালেও সম্ভব বা বাঞ্ছনীয় মনে করি না। তবে মেয়েদেরও ছেলেদের মত শারীরিক শক্তির অনুশীলন দরকার—কিন্তু তাহা যুদ্ধ করা বা পুরুষের কাজ কাড়িয়া করিতে যাইবার জন্য নয়—শুধু প্রকৃত স্বাস্থ্যসম্পন্ন শক্তি-শালী জাতির জননী হইবার জন্য। তবে মেয়েরা যুদ্ধে আহতদিগের সেবা ও শুশ্রূষা করিতে শিক্ষা করে—এটা খুবই বাঞ্ছনীয় বটে—এবং যদি তাহারা দেশের কোনো কাজ করিতে পারে তো এই দিক দিয়াই পারিবে।

সেনাধ্যক্ষ সার জন ফ্রেঞ্চ তাঁহার মত প্রকাশ করিয়াছেন যে—দরকার পড়িলে মেয়েরা যে নিঃস্বার্থভাবে সাহসের সহিত দেশের জন্য লড়িবে তাহাতে তিনি সন্দেহ করেন না বটে, তবে, অন্যদিকে করিবার মত নারীদের যথেষ্ট কাজ আছে; যথা আহত সেনাদের সেবা ও শুশ্রূষা করা।

নারীদলের একজন সুযোগ্য নেত্রী মিসেস এম ই ব্যাক্সটার লিখিয়াছেন—স্ত্রীলোকদের কাজ সব সময়েই একটা নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ থাকা উচিত—তবে দরকার পড়িলে যুদ্ধকার্য্য হইতে তাহারা পশ্চাৎপদই বা হইবে কেন?

ভাইকাউণ্টেস হার্বার্টন—যে স্ত্রীলোক যুদ্ধকার্য্য গ্রহণ করিতে চায় তাহাকে তাহাতে বাধা দেওয়াই বা হইবে কেন? বড় বড় বিষয়ে পুরুষত্ব বা নারীত্বের চাইতে মনুষ্যত্বটাই আগে দেখা উচিত। মেয়েদের দৈহিকশক্তির অনুশীলনে আমি লজ্জার বিষয় কিছু দেখি না—বাস্তবিক লজ্জা ও অসম্মানের বিষয় যদি কিছু থাকে তো সে অবুঝের মত অর্থলোভী লোকেদের পাল্লায় পড়িয়া হুজুগের মাথায় কিম্ভূতকিমাকার যত সব পোষাক পরিয়া সঙ্ সাজিয়া নিতান্ত হাস্যাস্পদ হওয়ায়। যে বিষয় দেশের দিকে নারীদের চিত্তকে উদ্বোধিত করে তাহাতে বাধা না দেওয়াই সমস্ত দেশের ও জাতির পক্ষে কল্যাণকর সন্দেহ নাই।

বিখ্যাত সন্তরণকারিণী মিসেস্ এইচ এম প্রাইস-জোন্স্ মেয়েদের দৈহিক শক্তির অনুশীলনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে যুদ্ধ সম্বন্ধে সাবেক ব্যবস্থাটাই ঠিক—পুরুষরা যুদ্ধ করিতে যাইবে ও স্ত্রীলোকে কান্নাকাটি না করিয়া তাহাতে তাহাদের উৎসাহিত করিবে। তবে প্রস্তুত থাকাটা ভালো। সেইকারণে ছেলে মেয়ে সকলকেই রীতিমত যুদ্ধ শিক্ষা দেওয়া দরকার।

বিখ্যাত অভিনেত্রী ও উপন্যাস-লেখিকা মিস এলিজাবেথ রবিন লিখিয়াছেন—পুরুষের চেয়েও স্ত্রীলোকদের শারীরিক শক্তির অনুশীলন বেশী দরকার, যেহেতু পাশবিক অত্যাচারে পুরুষদের চেয়ে ভুগিতে হয় মেয়েদেরই বেশী এবং বিশেষতঃ পুরুষদের অপেক্ষা স্ত্রীলোকদের ভিতর অভ্যাস ও পোষাক প্রভৃতির জঘন্য কৃত্রিমতা এখনো ঢের বেশী পরিমাণে রহিয়াছে। সেটা যাওয়া দরকার। পৃথিবীতে যুদ্ধই যদি রহিয়া গেল তো পুরুষ স্ত্রী সকলেরই তাহাতে সমভাগী হওয়া উচিত। তবে একটা দিকে খুবই লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে স্ত্রীলোকদের সঞ্চিত শক্তির অপব্যয় না হয়, শুধু লোক ও সমাজের ধ্বংসকার্য্যে তাহা ব্যবহৃত না হইয়া তাহাদের গঠনকার্য্যে যেন নিয়োজিত হয়।

বিখ্যাত লেখিকা রেণ্টুল এজলারের মতে প্রকৃত গুণ-বতী রমণীর পক্ষে যুদ্ধের চাইতে শান্তির ভিতরেই বেশী করিবার মত কাজ আছে। তবে যুদ্ধ ঘটিলে, ইতিহাসের বীরাঙ্গনাদের দৃষ্টান্তের দ্বারা তাঁহার মনে হয় যে, স্ত্রীলোকেরা

রুষ-নারী সৈনিক

কিরা বাস্কিরা—বয়স আঠারো। নিকোলাস পপফ এই ছদ্ম নামে রুষ সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। সাহস প্রদর্শনের জন্য ইনি সেন্ট্ জর্জের ক্রুস্ পুরস্কার পাইয়াছেন।

বোধ হয় নিতান্ত অযোগ্যতা দেখাইবে না। ইংলণ্ড শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইলে তিনি যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে স্ত্রীলোকের সাহায্য ও উৎসাহ লাভ করিয়া পুরুষসৈন্যরা যদি দেশের জন্য লড়াই করিয়া মরে তখন বিজিত জাতির নারীদের অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়া থাকে তাহার জন্য প্রতীক্ষা করার চেয়ে যুদ্ধে হত পুরুষদের স্থানে গিয়া লড়াই করিয়া মরা তিনি খুব ভালো মনে করেন।

সফ্রেজিষ্টদলের একজন বিখ্যাত নায়িকা উল্‌ষ্টেনহোম এল্‌মি লিখিয়াছেন—সত্তর বছরের একজন বৃদ্ধা বন্দুক ঘাড়ে করিয়া যুদ্ধে যাইবে এরূপ আশা আপনারা নিশ্চয়ই কখনই করেন না। লর্ড রবার্টসের কথার উত্তরে আমি এই বলি যে, দেহের উৎকর্ষ সাধনের জন্য যুদ্ধশিক্ষার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। আর-এক কথা মেয়েদের পর্য্যন্ত লড়ায়ের দিকে টানিয়া শেষটা ফল হইবে এই যে দেশের মধ্যে মারামারি কাটা-কাটির প্রবৃত্তিটাকে অনর্থক অযথা বাড়াইয়া তুলিয়া শান্তি নামক পদার্থটার একেবারে বিলোপ সাধন করা হইবে।

হকি-খেলার ওস্তাদ ও পুরাদস্তুর পালোয়ান মিস অসব্যালডিষ্টন বলেন—প্রশ্নটা সময়োপযোগী বটে। পঁচিশ বৎসরের মধ্যে স্ত্রীলোকদের ভিতর যেন একটা যুগান্তর ঘটিয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকরা ক্রমশই দৈহিক শক্তিতে উৎকর্ষ লাভ করিতেছে আর পুরুষরা ক্রমশই বুকসরু লিকলিকে তালপাতার সেপাই হইতেছে। কথাটা 'অবলা' না হইয়া 'অবল' হইলেই মানেটা ঠিক হয়। শিক্ষা পাইলে স্ত্রীলোকরা ভালো সৈনিক হইতে পারিবে সন্দেহ নাই। স্ত্রীলোকদের যুদ্ধে যাওয়ার সপক্ষে আর-একটা যুক্তি এই যে সেবা ও শুশ্রূষার কার্য্যে পুরুষরাই নাকি আজ-কাল খুব ভালো বলিয়া জানা গিয়াছে এবং যেহেতু ইংলণ্ডে পুরুষের সংখ্যার চেয়ে নারীর সংখ্যা এক লক্ষেরও কিছু বেশী এবং এই একলক্ষ স্ত্রীলোকের অদৃষ্টে স্বামীলাভ যখন সম্ভব নয় তখন বাধ্যতামূলক যুদ্ধপ্রথা হইলেই বা যুদ্ধে যাইতে বাধা কি? অন্ততঃ আমি তো পিছপা নই।

মিস ইলেইন টেরিস—দরকার পড়িলে স্ত্রীলোকদেরও যুদ্ধে যাওয়া উচিত বটে এবং আমি নিজেও যাইতে প্রস্তুত। তবে আহতের সেবা ও শুশ্রূষার দিকে স্ত্রীলোকদের ক্ষমতা পরিচালনা করাটাই আমি বেশী দরকার মনে করি। তাহাদের দৈহিক শক্তির অনুশীলনও দরকার বটে। তবে সকল বিষয়েই আমরা একটু বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলি। আমার মনে হয় যে স্ত্রীলোকের দেহ খুব কঠিন কাজ করিবার মত করিয়া গঠিত নয়। পরস্পর দ্বন্দ্ব না করিয়াও পুরুষ ও নারী বেশ

সহজভাবে আপন আপন কাজ করিয়া যাইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস। পুরুষেরা যে যুদ্ধকার্য্যে বেশী দক্ষ ও স্ত্রীলোকেরা যে সেবা ও শুশ্রূষার কার্য্যেই বেশী পটু তাহাতে সন্দেহ নাই।

মিস উইনফ্রেড এমিরি—আত্মরক্ষার জন্য স্ত্রীলোকদের ব্যায়াম, বন্দুকছোড়া অভ্যাস করা দরকার বটে। তবে দেশ রক্ষার জন্য তাহারা যুদ্ধ করিতে যাইবে ইহা আমি কোনো মতেই বাঞ্ছনীয় মনে করি না। সৈন্যসংখ্যা পুষ্ট করিবার জন্য এক পুরুষজাতিই যথেষ্ট।

রাইফেল চালানোয় ওস্তাদ মিস এগনিস হার্ব্বার্ট লিখিয়াছেন—না, স্ত্রীলোক যে কখনো সৈনিক হইতে পারে এ আমি একেবারেই সম্ভব মনে করি না এবং সৈনিক হইবার জন্য নারীর যে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করাটা এত প্রয়োজন কেন তাহাও বুঝি না। সাধারণতঃ অবিবাহিতা ও বিধবাদের চেয়ে বিবাহিতা বৃদ্ধাদেরও বেশী সাহস দেখিতে পাওয়া যায় এবং বাস্তবিক তাহারাই বেশী যুদ্ধপটু যেহেতু সংসারের সহিত তাহারা নিত্যই যুদ্ধ করিতেছে। আপনারা যে কৌমার্য্যের কথা বলিয়াছেন, কর্ম্মঠ স্বাস্থ্যসম্পন্ন ও স্থিরচিত্ত হইতে হইলে তাহা ছাড়া আরো কিছুর প্রয়োজন আছে। পাঁচশত স্ত্রীলোকের ভিতর একজন কুমারী বাছিয়া লইলে হয় তো আপনারা যে আদর্শ চাহিতেছেন তাহার অন্ততঃ কাছাকাছিও হইতে পারে, কিন্তু যদি আপনারা এহেন কুমারীর দল কলের বলে হাজার হাজার তৈরি করিতে চান তাহা হইলে তাহার মূল্য ও কার্য্যকারিতা রহিল কোথায়? যুদ্ধে পুরুষসৈন্য নারীসৈন্যের বিরুদ্ধে অভিযান করিবে এরূপ কখনোই হইতে পারে না। কারণ সেটা প্রাকৃতিক নিয়মের একান্ত বিদ্রোহিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। স্ত্রী-পুরুষের জাতিগত যুদ্ধ একটা ঘোর প্রাকৃতিক বিপ্লব ছাড়া আর কি? কাজে কাজেই প্রমীলাদলকে প্রমীলার দলের বিরুদ্ধেই দাঁড় করাইতে হইবে। তারপর দেখিবেন, দুইদল মুখোমুখি করিয়া দাঁড়-করাইয়া প্রস্তুত হইতে হইতে কার্য্য আরম্ভ করিবার আগেই বিবাদের কারণটা যে কি তাহার আর কোনো পাত্তাই পাওয়া যাইবে না—পরস্পরের প্রতি জিঘাংসাও কোথায় উবিয়া যাইবে। কোথায় তখন যুদ্ধ আর কোথায় কি। বিশ্বের সর্ব্বত্রই স্ত্রীলোকেরা ঠিক এই এক ছাঁচেই তৈরি। তবে বিবাহের বাজারের সমস্যাটা সমাধান করিবার পক্ষে এ ব্যবস্থাটা মন্দ নয়। মেয়েদের যুদ্ধে পাঠাইলে আমাদের বর্ত্তমানের পুরুষ-পিছু-সাতটি-স্ত্রী-অবস্থাটা অনেক পরিমাণে সরল হইয়া যায়। আর একটা জিনিস—স্ত্রীলোকেরা মোটেই দলবদ্ধ জীব নয় অথচ জগতের একমাত্র মাংসাশী দলবদ্ধ জীব হইতেছে সৈনিকগণ। যাহা হোক ছেলেদের মত মেয়েদেরও শারীরিক শক্তির অনুশীলনের পরামর্শটা মন্দ নয়, ইহার দ্বারা তাহাদের মানসিক উন্নতিও হইতে পারে। ইংলণ্ডে নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকরা ভয়ঙ্কর মূঢ় ও অশিক্ষিত এবং মানসিক অবস্থায় তাহারা একই স্তরের পুরুষদের চাইতেও ঢের নীচে। এবং ইহাদের পুত্রসন্তানরা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কন্যা-সন্তানদের চাইতে ঢের বেশী মানসিক উৎকর্ষ লাভ করে। স্ত্রীলোকদের যুদ্ধ করিতে হইলে সব সৈন্যই কিছু বড়-ঘর হইতে লওয়া চলিবে না—ডাকপিয়নের দিদি, কনেষ্টবলের পিসি, টমি এট্‌কিনের বোন এই-সব অশিক্ষিত মোটাবুদ্ধি নিম্নশ্রেণী হইতে অধিকাংশ সৈন্য সংগ্রহ করিতে হইবে—ইহা অস্বীকার করিলে চলিবে না। এইসব নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকগুলাকে যুদ্ধশিক্ষা দিয়া তাহাদের যদি ওয়েলিংটনের মত করিয়া তোলা যায় তথাপি ইহাদের উপর নির্ভর করা ভয়ানক বিপজ্জনক। কারণ এক মুহূর্ত্তের বিপত্তিতে কত বছরের শিক্ষাসাধনা চকিতে কোথায় ভাসিয়া যাইতে পারে তাহার ঠিক ঠিকানা নাই। বন্দুকছোড়া আমি লজ্জার কথা তো মনেই করি না বরং দরকারী মনে করি। কি-জানির কথা বলা যায় না—উহারই উপর হয় তো একদিন পেটের ভাত নির্ভর করিতে পারে। ভয় দেখাইয়া দুষ্ট লোকরা যে ইংলণ্ড-আক্রমণের কথা রটাইতেছে, বাস্তবিকই যদি তাহাই ঘটে তবে সেরকম বিপদকালে আমি অবশ্যই কামানের পিছনে পুরুষ-সৈন্য তার পিছনে যে নারী সৈন্য তার পিছনে থাকিয়া ইংরেজ নারীর গৃহরক্ষার জন্য প্রাণপণে সাহায্য করিতে রাজী আছি। আবার বলি, সৈনিক হইয়া দেশের জন্য লড়িতে আমি রাজী নই। তবে যুদ্ধের সময় আমি

প্রমীলা সৈন্যদলের সহিত যত্রতত্র গিয়া যুদ্ধের সংবাদ-দাতার কাজ করিতে পারি। আমার বিশ্বাস সে লেখাগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিবার মত হইবে।

ড্রুরিলেন থিয়েটারের বিখ্যাত মিস মারী জর্জ্জ লিখিয়া-ছেন—বিপদে পড়িলে স্ত্রীলোকরা পুরুষের মত দেশের জন্য লড়িলেও লড়িতে পারে এবং আত্মরক্ষার জন্য বন্দুক ছুড়িতে শেখার প্রয়োজনীয়তা আমি স্বীকার করি। কিন্তু তাহারা যে সৈনিক হইবার উপযুক্ত, বা কখন তাহার উপযুক্ত হইবে, এরূপ বিশ্বাস আমার নাই। গৃহই স্ত্রীলোকের যোগ্য স্থান, যুদ্ধক্ষেত্র নয়। পুরুষ বেচারাদের জন্য কিছু কাজ রাখিতে হইবে বৈকি নহিলে তাহারা আর করিবে কি ?

অবশেষে আমরা বিখ্যাত ফরাসী অভিনেত্রী সারা বার্ণহার্ডটের অভিমত তুলিয়া দিতেছি—আমার মনে পড়ে আমি যখন প্রথম ডিউক রিকষ্ট্যাডের ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে আসিয়া নামি তখন আমার মনে হইয়া-ছিল যে কোনো বড় কাজ করিতে গেলে আমরা স্ত্রীজাতি বলিয়া বিশেষ কিছুই আসিয়া যায় না। আমি শুধু রঙ্গমঞ্চে বড় লোক সাজিবার কথা বলিতেছি না, প্রকৃত জীবনের কথাই বলিতেছি। দুর্ব্বল চরিত্রের স্ত্রী-লোকরাই অবলা—সকলে নহে। বিপ্লবের সময় রণরঙ্গিণী নারীর দল ষোড়শ লুইকে যখন ভার্সেঈ হইতে টানিয়া আনিয়াছিল তখন ফরাসীরাজ নিশ্চয়ই নারীজাতিকে নিতান্ত অবলা ঠাওরান নাই। দেখিয়া শুনিয়া যাহা বুঝিয়াছি তাহাতে মনে হয় অন্য সকল দেশের স্ত্রীলোকের চেয়ে ফরাসী স্ত্রীলোকরাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সাহসী ও উপযুক্ত বেশী। বিপদে পড়িলে শত্রুর কাছে তাহারা নারীত্বের দোহাই দিয়া প্রাণ বাঁচাইতে চাহে না। জাঁদার্ক যেমন একজন যুদ্ধনায়িকা হইয়াই জন্মিয়াছিলেন—তেমনি পুরুষ-দের অবস্থা যদি স্বভাবতই শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে অমন অনেক নারীযোদ্ধাই বাহির হইয়া লেডী ম্যাক-বেথের মত গর্জ্জন করিয়া বলিতে পারে—"আমায় দাও ছোরাখানা, আমায় দাও।"

নানান মুনির নানান মত হইবেই। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাইতেছি য়ুরোপের যুদ্ধে স্ত্রীলোকরা যোগ দিয়াছেন। আয়ার্লাণ্ডের পুরুষেরা যুদ্ধে
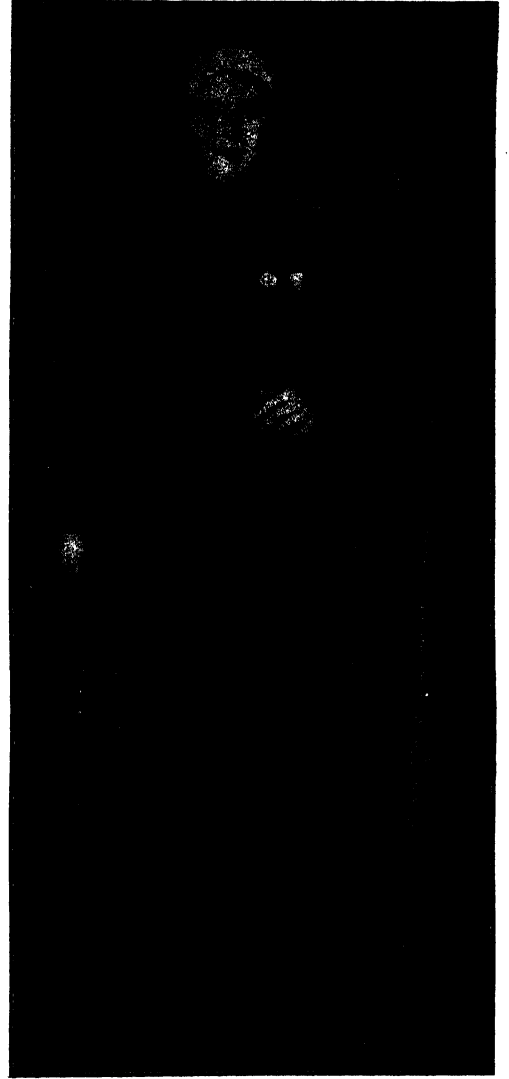
রুশ-নারী সেনাধ্যক্ষ।
মাদাম কোকোভৎসেভা ৬নং উরাল কসাক রেজিমেণ্টের কর্ণেল ; তিনি যুদ্ধে দুইবার আহত হইয়াছেন ; বীরত্বের জন্য সেণ্ট জর্জ্জের ক্রুশ পুরস্কার পাইয়া সম্মানিত হইয়াছেন।

গিয়াছেন, গৃহরক্ষার জন্য স্ত্রীলোকেরা সৈন্যদল গঠন করিয়াছেন ; বেলজিয়ম ও ফ্রান্সের অনেক নারী সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইয়া বীরত্ব দেখাইয়া পুরস্কৃত ও উচ্চ সম্মান (Legion d'honneur) পাইয়াছেন ; সম্প্রতি রুশিয়ার সেনা-বিভাগে ৪০০ নারী ছদ্মবেশে ভর্ত্তি হইয়া যুদ্ধে গিয়া

ধরা পড়িয়াছেন। মাদাম কোকোভ্‌ৎসেভা এক কসাক রেজিমেণ্টের কর্ণেল পদে উন্নীত হইয়া যুদ্ধে বীরত্বপ্রকাশের জন্য সেণ্টজর্জের ক্রুশ পুরস্কার পাইয়া সম্মানিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান যুদ্ধে বীরত্বের জন্য বিখ্যাত এরূপ বহু নারীর নাম বিবিধ সংবদাপত্রে প্রায়ই প্রকাশিত হইতেছে।

আমাদের দেশেও বীরনারীর অভাব নাই। রাণী সংযুক্তা, রিজিয়া, অহল্যাবাই, দুর্গাবতী, লক্ষ্মীবাই, বেগম সমরু প্রভৃতি অনেকের নাম করা যাইতে পারে।

ইহা হইতে ইহাই প্রমাণ হয় যে কোনো জাতি বা সম্প্রদায় একেবারেই কোনো-একটা কাজের যোগ্য নয়, এমন হইতেই পারে না। সকলের মধ্যেই সকল কাজ করিবার মতন যোগ্যতা আছেই—বেশী কম, সুবিধা ও অভ্যাসের উপর নির্ভর করে মাত্র।

শ্রীক্ষীরোদকুমার রায়।

বিমানবিহার

বহু প্রাচীনকাল হইতে মানুষ আকাশপথে ভ্রমণ করিবার বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছে। প্রত্যেক জাতির ইতিবৃত্তে ইহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুদিগের মহাকাব্য রামায়ণে আছে—শ্রীরামচন্দ্র পুষ্পকরথে লঙ্কা হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। গ্রীক্‌-পুরাণে আছে—ফ্রিক্সাশ এবং হেল্‌ তাহাদের বিমাতা ইনোর আক্রোশ হইতে নিস্তার লাভ করিবার জন্য এক স্বর্ণরোম মেষের পিঠে চড়িয়া শূন্যপথে পলায়ন করিয়াছিলেন। ইংরেজী গ্রন্থেও এইরূপ একটি পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। জাট্‌লাণ্ডের রাজা নিডাঙ্গের আদেশে তাঁহার অনুচরগণ ওয়েলেণ্ড নামক কোন অপরাধীর পদদ্বয়ের শিরা ছিন্ন করিয়া দিয়াছিল; রাজার আক্রোশ হইতে পরিত্রাণ-লাভের আশায় ওয়েলেণ্ড পালকের জামা প্রস্তুত করিয়া শূন্যপথে স্বদেশে পলায়ন করিয়াছিল। আরব্য-উপন্যাসের উড্ডয়নক্ষম গালিচা ও পারস্য-উপন্যাসের উড্ডয়নক্ষম সিন্দুকের গল্প সকলেরই জানা আছে। এইরূপে প্রত্যেক জাতির পৌরাণিক ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিলে আকাশভ্রমণের দুই চারিটি কাহিনী প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই-সকল বৃত্তান্ত হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে মানব আদিমকাল হইতে পক্ষীর মত বায়ুমণ্ডলে ভ্রমণ করিবার প্রবল ইচ্ছা পোষণ করিয়া আসিতেছে এবং বায়ুমণ্ডলে প্রভুত্ব-লাভ করিবার জন্য বহু কাল্পনিক উপায় উদ্ভাবন করিয়া আংশিক পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে। এক দিনের কাল্পনিক বিষয় কালক্রমে আজ সত্যকার বস্তুতে পরিণত হইয়াছে, মানবের বহুদিনের সাধনা চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে। মানুষ সাধনাবলে কত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, কত জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিয়া সাধনার ফল প্রাপ্ত হয়—জগতের ইতিহাস তাহারই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কেমন করিয়া মানুষ ক্রমে ক্রমে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে আপনার আয়ত্তে আনিযাছে, সেই রহস্যময় ইতিহাসের অনুসন্ধানে মানব চিরকাল ঔৎসুক্য দেখাইয়াছে। মানবের কল্পনাজগৎ হইতে বাহির হইয়া কিরূপে সেই ব্যোমযান বাস্তব মূর্ত্তি ধারণ করিল ও মানুষের পরিশ্রম-সাফল্যের পরিচয় দিল তাহার বিবরণ বাস্তবিকই কৌতূহলোদ্দীপক।

ইটালিদেশীয় লেখক লিয়োনার্দো দা ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯) সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার গ্রন্থাবলীতে আকাশপথে ভ্রমণ করিবার একটি উপায়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন। বলিতে গেলে, তিনিই সর্ব্বাগ্রে কল্পনার বস্তুকে বাস্তব মূর্ত্তি প্রদান কবিবার উপায় লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন পাখীর ন্যায় কতকগুলি বিভিন্ন-অংশযুক্ত ডানা মানুষের শরীরে সংযুক্ত করিয়া দিলে এবং তৎসমুদয় হস্ত ও পদদ্বারা চালনা করিলে শূন্যপথে উঠিবার সম্ভাবনা আছে। যখন উপরে উঠিতে হইবে তখন ডানাগুলিকে প্রসারিত অবস্থা হইতে কুঞ্চিত করিতে হইবে এবং অবতরণ করিবার সময় কুঞ্চিত অবস্থা হইতে প্রসারিত করিতে হইবে। কাগজের সাহায্যে অনেকেই উক্তপ্রণালী অনুসারে পরীক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইহার কিছুকাল পরে ফাউষ্ট ভেরাঞ্জিও নূতন উপায় অবলম্বন করিয়া আংশিকভাবে সফলতালাভ করিয়াছিলেন। সমদৈর্ঘ্য চারিখণ্ড কাষ্ঠকে চতুর্ভুজ আকারে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া তিনি উহার চারিদিকে একখণ্ড অত্যন্ত পুরু বস্ত্রকে উত্তমরূপে সংযুক্ত করিয়া দেন। ইহাতে ছাতার আকারে একটি বেলুন
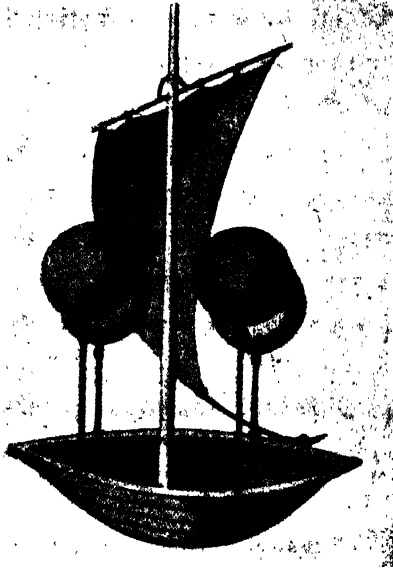
ফ্রান্সিস্কো ডু লানা কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত বায়ু-যান।

প্রস্তুত হয়। তাহাতে আরোহণ করিয়া তিনি ভিনিস্ নগরীর একটি উচ্চ স্তম্ভ হইতে ভূমিতে অবতরণ করিয়াছিলেন।

১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে বেস্নিয়ে নামক একজন কুলুপ-ব্যবসায়ী দুইটি সমান্তরাল কাষ্ঠদণ্ডকে তাঁহার স্কন্ধোপরি স্থাপন করিলেন এবং ইহাদের প্রান্তদেশে পুস্তকের মত দুইটি পরস্পরযুক্ত সমতল কাষ্ঠ সংবদ্ধ করিলেন। উপরি উক্ত কাষ্ঠদণ্ড দুইটি উপরের বা নীচের দিকে টানিয়া ইহাদিগকে পুস্তকের মত এক-একবার আবদ্ধ ও উন্মুক্ত করিতে পারিতেন। এই যন্ত্রের ডানা পর্য্যায়ক্রমে মেলিয়া ও মুড়িয়া তিনি উড়িতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কিছুকাল পরে মার্কুইঁ দ্য বাকেভিল্ এই যন্ত্রটির সংস্কার সাধন করিলেন এবং ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সৌধের গবাক্ষ-পথ হইতে উক্ত যন্ত্রে আরোহণ করিয়া নিকটবর্ত্তী একটি উপবন অতিক্রম করিয়া সীন্ নদীতে অবতরণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি এ বিষয়ে অন্য অপেক্ষা অধিকতর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

এ পর্য্যন্ত শূন্যপথে ভ্রমণ করিবার যে-সকল যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছিল তাহার সমস্তই পক্ষীর পাখার অনুকরণে প্রস্তুত।

১৬৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সিস্কো ডি লানা নৌকায় শূন্যপথে ভ্রমণের একটি উপায়ের কথা বলেন। তাঁহার মতে চারিটি বায়ুশূন্য তাম্রগোলক একখানি হাল্কা নৌকায় সংবদ্ধ করিয়া উহাতে পাল সংযুক্ত করিতে হইবে। তাম্রগোলক চারিটি বায়ুশূন্য, সুতরাং উপরে উঠিবার চেষ্টা করিবে। তাম্রগোলকগুলি কত বড় হওয়া উচিত, তিনি তাহার একটি হিসাব করিলেন এবং দেখিলেন যে ২৫ ফুট ব্যাস এবং ১/১২০ ইঞ্চি পুরু গোলকের সাহায্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপ বায়ুশূন্য চারিটি গোলক প্রায় ১৫ মণ ভারী কোন পদার্থকে টানিয়া উপরের দিকে তুলিতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক এত অল্প-পুরু গোলক বায়ুর চাপে যে একেবারে ভাঙ্গিয়া যাইবে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। ডি লানা অনেক যুক্তির সাহায্যে এই আপত্তি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা যে কার্য্যতঃ অসম্ভব, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন।
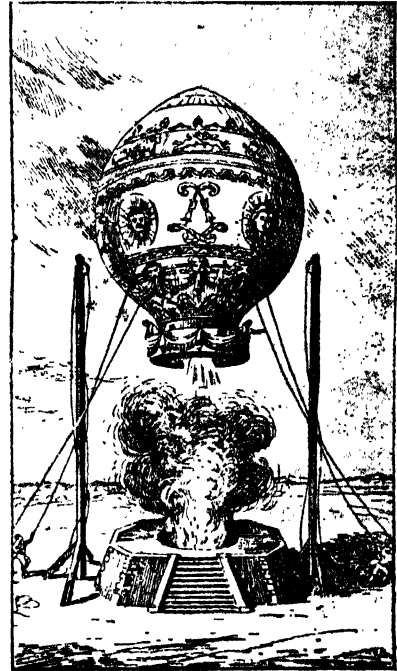
মণ্টগলফিয়ের বেলুন।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ষ্টিফেন ও যোসেফ্ মণ্টগলফিয়ে নামক লিয়ন নগরোপকণ্ঠবাসী জনৈক কাগজ-ব্যবসায়ীর দুই পুত্র বায়ুমণ্ডলে মেঘ কিরূপে ভাসমান অবস্থায় থাকে তাহা লক্ষ্য করিলেন এবং মনে করিলেন যে একটি থলিয়া কোন

বায়বীয় পদার্থে পূর্ণ করিয়া বায়ুতে ছাড়িয়া দিলে তাহা মেঘের মত ভাসমান অবস্থায় থাকিতে পারে। তাঁহারা প্রথমে বাষ্পের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া বিফল হইয়া অত্যন্ত সন্দিহান হইলেন। কিন্তু অবশেষে তাঁহারা একটি থলিয়াকে অগ্নির উপরে ধরিয়া তদুত্থিত ধূম্র ও গ্যাসের দ্বারায় থলিয়াকে পরিপূর্ণ করিয়া বায়ুতে ছাড়িয়া দিলেন এবং দেখিলেন যে উহা বায়ুমণ্ডলে কিছুদূর পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। তখন আরও প্রশস্ত প্রণালীতে তাঁহারা উক্ত পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ১০৫ ফুট পরিধি বিশিষ্ট একটি বস্ত্রনির্ম্মিত গোল থলে খড়ের ধূমে পূর্ণ করিয়া বায়ুর মধ্যে ছাড়িয়া দিলে উহা অনেক উচ্চ পর্য্যন্ত উঠিল এবং বায়ুর মধ্যে ১০ মিনিট পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া ১½ মাইল দূরে গিয়া পড়িল। অল্প সময়ের মধ্যে এই কৃতকার্য্যতার সংবাদ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং অচিরেই নগরে বিভিন্ন প্রণালীতে পরীক্ষা আরব্ধ হইল। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বাপেক্ষা হাল্‌কা গ্যাস হাইড্রোজেন আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং এই সময়েই ডাক্তার ব্লেক্ কোন গোলককে হাইড্রোজেনে পরিপূর্ণ করিলে শূন্যে উড়িবার সম্ভাবনার বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন। যখন ষ্টিফেন এবং মণ্টগলফিয়ে এই দুইজনের পরীক্ষার সংবাদ পারীতে পৌঁছিল, তখন বিজ্ঞানবিদ্ চার্লস্ বলিলেন শীতল বায়ু অপেক্ষা উষ্ণবায়ু লঘুতর বলিয়া উহা সর্ব্বদা উপরে থাকিতে চেষ্টা করে; কোন ব্যোমযান হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ করিয়া পরীক্ষা করিলে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্যতা লাভ করা যাইবে। ১৩ ফুট ব্যাসের বার্ণিশ-করা রেশমের একটি ব্যোমযান প্রস্তুত করা হইল এবং তাহা উক্ত গ্যাসে পূর্ণ করিয়া ছাড়িয়া দিলে ৩০০০ ফুট পর্য্যন্ত উর্দ্ধে উঠিয়াছিল এবং প্রায় ৪৫ মিনিট বায়ুমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিয়া ১৫ মাইল দূরে পতিত হইয়াছিল। পতন-স্থানের কৃষকগণ এই অদৃষ্টপূর্ব্ব আবির্ভাবকে কোন সয়তানের আগমন অনুমান করিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত চিত্তে উহাকে একটি অশ্বের লাঙ্গুলে বাঁধিয়া দিল এবং অশ্ব যখন উহাকে টানিয়া টানিয়া খণ্ড খণ্ড করিল, তখন তাহারা নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

ইহার কয়েক মাস পরে যোসেফ্ মণ্টগলফিয়ে একটি ব্যোমযান তৈয়ার করিলেন এবং উহা উষ্ণগ্যাসে পূর্ণ করিয়া বহু দর্শকমণ্ডলীর সমক্ষে বহু উর্দ্ধে উড়াইয়া তাঁহার কৃতকার্য্যতা সকলকে দেখাইয়াছিলেন।

১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে যোসিও পিলাত্রে দি রোজিএ সর্ব্বপ্রথম পৃথিবীর সহিত কোন বন্ধনরজ্জুর যোগ না রাখিয়া এক মুক্ত ব্যোমযানে আকাশমার্গে উড়িয়াছিলেন। দুই বৎসর পরে এই দুঃসাহসিক বিমানবিহারী ৩০০০ ফুট উচ্চ হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি হাইড্রোজেন এবং উষ্ণবায়ুর সাহায্যে একটি বেলুন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। দুইটি শূন্য গোলকের একটি হাইড্রোজেনে এবং অপরটি উত্তপ্ত বায়ুতে পূর্ণ করিয়া তাহাদিগকে উপর্য্যুপরি স্থাপিত এবং পরস্পর-সংবদ্ধ করিলেন। কারণ তাঁহার বিশ্বাস ছিল—হাইড্রোজেন গ্যাস লঘু বলিয়া স্বভাবতঃই উপরের দিকে উঠিতে চেষ্টা করিবে এবং নিম্নস্থ গোলকে যে বায়ু ছিল তাহাকে উত্তপ্ত করিলে তাহা প্রসারিত হইতে চেষ্টা করিবে, সুতরাং বেলুনটিকেও উপরের দিকে টানিয়া লইয়া যাইবে, পরে ঠাণ্ডা হইয়া সঙ্কুচিত হওয়ার দরুণ অপেক্ষাকৃত ভারী হইবে, এবং তখন নিম্ন দিকে তাহার গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এরূপ যন্ত্রে কি বিপদ প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে তাহা তাঁহার জানা ছিল না। বায়ুর সঙ্গে হাইড্রোজেন মিশ্রিত হইবার সময়ে অগ্নি সংযোগ হইলেই সশব্দে বিদীর্ণ হইয়া যায়। এই অজ্ঞতার দরুন অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল নিরাপদে ভ্রমণ করার পর যন্ত্রটিতে অগ্নি সংযোগ হওয়ায় তাঁহার শোচনীয় পরিণাম ঘটিয়াছিল।

ব্যোমযানকে আকাশপথে পরিচালিত করিবার জন্য অনেকে আশা পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। কেহ কেহ মনে করিলেন—একটি গোলাকৃতি ব্যোমযানকে দাঁড় পাল ইত্যাদির সাহায্যে বায়ুর মধ্য দিয়া ইচ্ছামত চালান যাইতে পারে।

ব্যোমযানকে ইচ্ছামত পরিচালিত করিবার জন্য যাঁহারা বহু শক্তি সামর্থ্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে জেনারেল ময়েস্‌নিয়ের নামই বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে ব্যোমযানকে স্বেচ্ছাচালিত করিবার জন্য যে-সকল উপায়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন বর্ত্তমান সময়ে অনেক ব্যোমযানেই তাহা অবলম্বিত হইয়া

থাকে। তাঁহার মতে বেলুনকে লম্বা আকৃতির করিয়া তাহার উপরিভাগ আবরণের দ্বারা বেষ্টন করিতে হইবে; ত্রিকোণ পাল সংযুক্ত করিয়া উত্তপ্ত বায়ুতে পূর্ণ থলে বাঁধিবার এবং বেলুনের পিছনে বাষ্পীয় পোতের চাকার মত একপ্রকার চাকা ব্যবহার করিবার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। মেসনিয়ের উদ্ভাবিত বেলুনের চাকা মনুষ্যশক্তি দ্বারা চালিত হইত।

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে পারীনগরে রবার্ট নামে দুই ভ্রাতা একটি বেলুন নির্ম্মাণ করিলেন। তাহা স্তম্ভাকৃতি, কিন্তু দুই প্রান্ত গোলকার্দ্ধ-সদৃশ (Hemispherical)। ইহা দাঁড়ের সাহায্যে পরিচালিত করিবার চেষ্টা হইল। তাঁহাদের চেষ্টা প্রথমে ব্যর্থ হইয়া গেল। কিন্তু দ্বিতীয় বারের উদ্যমে তাহা প্রশান্ত বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া বৃত্তাভাস-পথে পরিভ্রমণ করিয়াছিল।
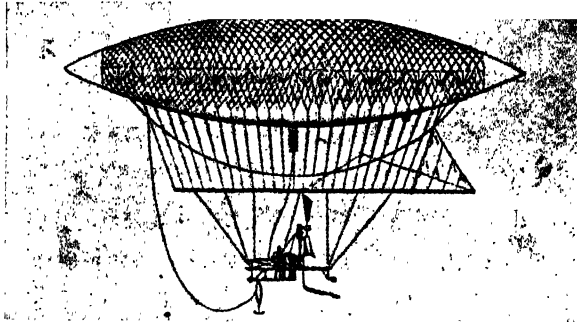
গিফার্ডের বায়ু-যান।

বৈজ্ঞানিক জগতে গিফার্ড বাষ্পজনকযন্ত্রে (Steam boiler) জল-সরবরাহকারী একটি যন্ত্র (Injector) আবিষ্কারের জন্য সর্ব্বত্র সুপরিচিত। তিনি বহুদিন হইতে একটি স্বল্পভারী অথচ বহুশক্তিবিশিষ্ট ইঞ্জিন্ উদ্ভাবনের ব্যাপারে ব্যাপৃত ছিলেন এবং তাহার ফলস্বরূপ পাঁচ অশ্ববল ও একমণ দশসের ভারী একখানি ইঞ্জিন তৈয়ার করিতে সমর্থ হইলেন। তিনি মনে করিলেন—এইরূপ একখানি ইঞ্জিনের সাহায্যে ব্যোমযানকে স্বেচ্ছাচালিত করা যাইতে পারে। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে পারী নগরে তিনি এইরূপ একটি ব্যোমযানও নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহার আবিষ্কৃত ব্যোমযান তাঁত-কলের মাকুর মত; ইহা ১৪৪ ফুট লম্বা এবং মধ্যভাগের বৃহত্তম অংশের পরিধি ৪০ ফুট এবং অভ্যন্তরে ৯০০০০ ঘন ফুট স্থান ছিল। ইহার উপরিভাগে রজ্জুনির্ম্মিত জালের আবরণ ছিল এবং নিম্নদেশে ৬০ ফুট হইতে অল্পাধিক লম্বা একটি দণ্ড বহুসংখ্যক রজ্জুর সাহায্যে ঝুলাইয়া তাহাকে উপরি-উক্ত জালের দুই প্রান্তদেশে সংযুক্ত করা হইয়াছিল। অন্যান্য কতকগুলি রজ্জুর সাহায্যে উক্ত দণ্ড হইতে একটি নৌকা ঝুলাইয়া তাহার উপরে তিন অশ্ববলের একটি ইঞ্জিন্ রক্ষিত হইয়াছিল। এই ইঞ্জিন্ বৈদ্যুতিক পাখার মত ত্রিফলক একটি পাখাকে প্রতি মিনিটে ১১০ বার ঘুরাইত। উক্ত সমান্তরাল দণ্ডের এক প্রান্তে ত্রিকোণ হাল সংযুক্ত ছিল।

গিফার্ডের আবিষ্কৃত ব্যোমযানের এখানে যে বর্ণনা প্রদত্ত হইল তাহা হইতে দেখা যাইতেছে—তাঁহার যন্ত্রটির মধ্যে দুইটি দোষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রথমতঃ নৌকাটি যেভাবে ব্যোমযান হইতে লম্বিত হইয়াছিল, তাহাতে চলিবার সময় ব্যোমযান কম্পিত না হইলেও ইঞ্জিনের কম্পনে সমস্ত ব্যোমযানটি কম্পিত হইতে পারিত। দ্বিতীয়তঃ ব্যোমযানকে হাইড্রোজেন বা কয়লার গ্যাসের (coal gas) মত কোন গ্যাসে পরিপূর্ণ করিয়া তাহার নিকটে অগ্নি রাখিলে যে কি অনর্থ ঘটিতে পারে—তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। গিফার্ড শেষোক্ত দোষটি দূর করিবার জন্য অগ্নিকুণ্ডের মুখ তারের সূক্ষ্ম জাল দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতেন এবং দগ্ধপদার্থগুলি চিমনির সাহায্যে নিম্নদিকে নিষ্কাষিত করিতেন। এই ব্যোমযানকে গিফার্ড প্রতি সেকেণ্ডে ৬ ফুট হইতে ৮ ফুট পর্য্যন্ত চালিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তিন বৎসর পরে আরও বৃহদায়তনের (১১৩০০০ ঘন ফুট) ব্যোমযান নির্ম্মাণ করিতে অনেকে পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। আকাশপথে ব্যোমযান চলিবার সময় বায়ু যে ইহার গতির বিপরীত দিকে বাধা প্রদান করে তাহা হ্রাস করিবার জন্য ইহার দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি এবং অপরাপর অনেকাংশের পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। এতদিন ব্যোমযান হইতে যে লৌহদণ্ড ঝুলাইয়া রাখা হইত—তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া ব্যোমযানের উপর একখানি শক্ত আবরণ এবং তাহার সঙ্গে একখানি জাল সংযুক্ত করা হইল।

এই জালের চারিকোণের চারিটি রজ্জুর সহিত একখানি হালকা চতুষ্কোণ গাড়ী ঝুলাইয়া রাখিয়া তদুপরি পূর্ব্বোক্ত ইঞ্জিন্ রক্ষিত হইল। সর্ব্বশেষে পূর্ব্বের মত ব্যোম-যানের সঙ্গে একটি পাল জুড়িয়া দেওয়া হইল।

এই বায়বীয় যানে আরোহণ করিয়া গিফার্ড বায়ুর গতির বিপরীত দিকে চলিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু অবতরণ করিবার সময় ভূমির সংস্পর্শে আসিয়া ইহার এক-দিক উপর দিকে উঠিয়া যাওয়ায় সমস্ত যন্ত্রটি একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। তিনি আরও অনেকপ্রকার ব্যোমযান প্রস্তুত করেন। কিন্তু এস্থলে যেটির বর্ণনা প্রদত্ত হইল তাহা অপেক্ষা আর কোনটিই উন্নতস্তরের নহে।

১৮৭২ সালে পাউল হেনলাইন নূতন প্রণালীতে একটি ব্যোমযান প্রস্তুত করিলেন। এই ব্যোমযানের আকৃতি একটু অদ্ভুত রকমের। পূর্ব্বে মাকুর আকারের যে বেলুনের কথা বলা হইয়াছে তাহার দুইদিক সরু হইয়া গিয়াছে। ইহার কিন্তু কেবল একদিক সরু। সেখান হইতে ক্রমশঃ মোটা হইয়াছে। এই ব্যোমযান কয়লার গ্যাসে (coal gas) পরিপূর্ণ করিয়া নিম্নে একটি ইঞ্জিনের সহিত সংযুক্ত করা হইত এবং গ্যাসকে প্রজ্জলিত করিয়া ইঞ্জিন্ চালিত হইত। উক্তরূপ ব্যোমযান হইতে গ্যাসের ক্ষয় হওয়ায় ব্যোমযানের আকৃতি ক্ষুদ্র হইয়া যাইতে পারে, এই দোষ দূর করিবার জন্য পম্পের সাহায্যে ব্যোমযানের মধ্যস্থ অন্য একটি গোলকে অবিরত বায়ু পূর্ণ করা হইত। উক্ত ইঞ্জিন্ একখানি Trapezium আকৃতির পাখাকে ঘুরাইলে সমস্ত যন্ত্রটি চলিতে আরম্ভ করিত। এই ব্যোমযান প্রতিসেকেণ্ডে প্রায় ৫ ফুট বেগে চলিতে পারিত। কিন্তু ইহার নির্ম্মাণকারী অর্থাভাবপ্রযুক্ত অন্য কোন পরীক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স ও প্রুশিয়ার যুদ্ধের সময় ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ ডুপয় ডি লোমকে একখানি ব্যোমযান নির্ম্মাণ করিতে নিযুক্ত করিলেন। ইতিপূর্ব্বে যেসমস্ত ব্যোমযান প্রস্তুত হইয়াছিল তাহাদের কতকগুলি বৈদ্যুতিকশক্তি-চালিত মোটর অথবা গ্যাসচালিত ইঞ্জিনের সাহায্যেই বায়ুমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিত; কিন্তু ডি লোম সে-সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে মনুষ্য-শক্তিতে চালাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। তিনি তাঁহার নবোদ্ভাবিত ব্যোমযানে একটি বায়ুপূর্ণ গোলক ব্যবহার করিয়াছিলেন। উক্ত গোলকের সঙ্গে রজ্জুর সাহায্যে একখানি পক্ষসংযুক্ত শকট ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। আটজন লোক অত্যন্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া এই পাখা ঘুরাইলে যন্ত্রটি প্রতি সেকেণ্ডে ৪ ফুট গতিতে চলিতে পারিত এবং বায়ুর গতির অভিমুখ হইতে ইচ্ছামত ১০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত দিক্‌পরিবর্ত্তন করিয়া গমন করিতে সমর্থ হইত।

ডি লোমের পরেও ফ্রান্সে নূতন প্রণালীতে দুই চারিটি বেলুন প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহাদের প্রায়গুলিই বৈদ্যুতিক-শক্তি-চালিত মোটরের সাহায্যে ভ্রমণ করিত। ইহার পরিবর্ত্তীকালে সেনাপতি রেনার্ড এবং ক্রেবস্ যে ব্যোমযান আবিষ্কার করিলেন, তাহাই স্বেচ্ছাচালিত ব্যোমযানের দ্রুত উন্নতির নূতন পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। তাঁহারা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে যে ব্যোমযান প্রস্তুত করিলেন তাহা দেখিতে অনেকটা মৎস্যের মত এবং পূর্ব্বনির্ম্মিত বেলুন অপেক্ষা অত্যন্ত বৃহৎ। নয় অশ্ববল একখানি অত্যন্ত হাল্‌কা বৈদ্যু-তিক মোটর একখানি পাখাকে প্রতি মিনিটে ৫০ বার ঘুরাইত। এই পাখা সম্মুখভাগে সংযুক্ত হইয়াছিল। কারণ ইহার আবর্ত্তনকালে সমস্ত যন্ত্রটি বায়ুর মধ্য দিয়া অনায়াসে চলিতে পারিত। বেলুনের নিম্নদেশে বসিবার যে আসন ছিল, তাহা রজ্জুর সাহায্যে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে উপরিস্থিত মৎস্যাকৃতি যন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করা হইয়াছিল এবং বেলুনের ভারকেন্দ্র কোন প্রকারে স্থানচ্যুত হইলে তাহা ঠিক রাখিবার জন্য আসনের সঙ্গে একটি ভার ঝুলান ছিল। তাহা একদিক হইতে অন্যদিকে সরাইয়া সমস্ত যন্ত্রটির আন্দোলন নিবারিত হইত। এই বেলুনের নামকরণ হইয়াছিল—'লা ফ্রাঁস'। প্রথমে ইহার নির্ম্মাতাগণ কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে উক্ত যানে আরোহণ করিয়া পারী নগরীর উপরিভাগে অনায়াসে অনেকবার ভ্রমণ করিয়া আবার পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রত্যাগত হইলেন। কোন স্থান হইতে যাত্রা করিয়া আবার সেই স্থানে নিজশক্তিতে প্রত্যাবর্ত্তন এই প্রথম। এই যন্ত্র প্রতি-সেকেণ্ডে ২১ ফুট বেগে কম্পিত না হইয়া চলিতে পারিত।

বর্ত্তমান সময়ে যে-সকল প্রণালী অবলম্বনে ব্যোমযানের

উন্নতি সাধিত হইয়াছে, সার জর্জ্জ কেয়েলি একশত বৎসর পূর্ব্বে অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে এতদ্সম্বন্ধীয় বহুপ্রশ্নের মীমাংসা করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন এবং কতকাংশে সফলতাও লাভ করিয়াছিলেন। এই জন্যই বোধ হয় তাঁহাকে 'Father of British Aeronautics' বলা হইয়া থাকে।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বেন্‌হাম বহুদিন পর্য্যন্ত বিবিধ পক্ষীর উড়িবার প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছিলেন। অভিজ্ঞতার ফলে তিনি আবিষ্কার করিলেন "যখন কোন হেলান সমতল (Inclined plane) বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া চলিতে থাকে তখন বায়ু তাহাতে ঊর্দ্ধমুখে যে চাপ প্রয়োগ করে তাহা উক্ত তলের সকল স্থানে সমানভাবে প্রযুক্ত হয় না ; কেবল সম্মুখস্থ কতিপয় অংশেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং সম্মুখস্থ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি না করিয়া লম্বভাবে (Perpendicularly) যন্ত্রটির পরিসর বৃদ্ধি করা উচিত। অপিচ তিনি আরও লক্ষ্য করিলেন কিরূপে একটি বৃহৎ পক্ষী আহার পক্ষদ্বয় একেবারেই কম্পিত না করিয়া প্রশান্ত-ভাবে অনায়াসেই চলিয়া যাইতে পারে। ইহা হইতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে পক্ষী উক্ত অবস্থায় উড়িবার সময় বায়ুর অত্যন্ত পাতলা স্তর স্থানচ্যুত হইয়া থাকে ; সুতরাং বায়ুমণ্ডলে চালিত হইবার সময় কোন ভারী পদার্থকে নির্ভরশীল করিতে হইলে পূর্ব্বলিখিত সম্মুখদেশের সমতলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং তৎসমুদয় সমান্তরাল ভাবে মধ্যস্থলে অল্প পরিসর স্থান বাদ দিয়া উপর্য্যুপরি স্থাপন করিতে হইবে। বোধ হয় ইহা হইতেই বাইপ্লেন, ট্রাইপ্লেন ইত্যাদি সৃষ্টি হইয়াছে। বেন্‌হাম শুধু গভীর পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতার বলে উপরোক্ত যে সমুদায় সত্য আবিষ্কার করিলেন তৎসমুদায় মানবজগতে চিরদিন অমর হইয়া থাকিবে। তিনি কোন প্রকার যন্ত্র প্রস্তুত না করিয়া অথবা কোন পরীক্ষাব্যাপারে লিপ্ত না হইয়া কেবল পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে প্রকৃতি-রাজ্যের এক মহারত্ন আহরণ করিলেন।

বেন্‌হামের আবিষ্কৃত তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া ফিলিপ্‌স্ পরীক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া এক যন্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন। পরীক্ষার ফলে দেখা গেল—যন্ত্রটি ভূমি হইতে শূন্যপথে অনায়াসেই উঠিতে পারে, কিন্তু ভ্রমণকালে উহা সাম্যাবস্থা রক্ষা করিতে অক্ষম। এইপ্রকার বেলুনকে Captive Baloon বা 'বন্দীবেলুন' বলা হইয়া থাকে, কারণ উহা একস্থানে দড়ি বাঁধিয়া উড়াইয়া উর্দ্ধ হইতে চারিদিক পর্য্যবেক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়, গমনাগমন করিতে উহা ব্যবহার করা চলে না।

এই সময়ে আমেরিকা, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশে বেলুনের উন্নতি-সাধনের জন্য প্রভূত চেষ্টা চলিতেছিল। আমেরিকা এবং জার্ম্মানী এই ব্যাপারে সর্ব্বশেষে হস্তক্ষেপ করিয়াছে।

আমেরিকান্ পদার্থবিজ্ঞানবিদ্ এস্ পি লেঙ্গলি বহু-গবেষণার ফলে ব্যোমযানের উন্নতিসাধন করিয়া যান।

এই সময়ে পরীক্ষকগণ পক্ষীর পাখার সদৃশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্র এবং পরে তদনুরূপ বৃহৎ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া পর্ব্বত বা কোন উচ্চ স্থান হইতে উক্ত যন্ত্রে আরোহণ করিয়া নিম্ন ভূমিতে অবতরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।
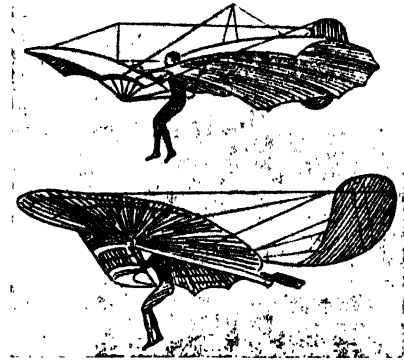
লিলিয়েনথালের উদ্ভাবিত উড়িবার কল।

এই কার্য্যে সর্ব্বপ্রথমে অটো লিলিয়েন্থাল্ নামক একজন জার্ম্মান ইঞ্জিনিয়ার আত্মনিয়োগ করিলেন এবং তাঁহার পরীক্ষাপ্রণালী আজ পর্য্যন্ত জগতে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। পক্ষীর ডানার মত দুইখানি ডানা তাঁহার পৃষ্ঠদেশে আবদ্ধ করিয়া দেখিলেন ৪৫ ফুট উচ্চস্থান হইতে উড়িয়া প্রায় ৪৫০ ফুট দূর ভূমিতে নিজের ইচ্ছামত শরীর আন্দোলন ও দিক পরিবর্ত্তন করিয়া উপনীত হইতে পারেন। পরে তিনি মোটরের সাহায্যে পরীক্ষা করিতে প্রয়াসী হইলেন এবং তাহা ব্যবহার করিবার জন্য প্রত্যেক পার্শ্বে দ্বিসমতল-পৃষ্ঠ-বিশিষ্ট ব্যোমযান নির্ম্মাণ করিলেন।

তাঁহার উদ্ভাবিত প্রণালী আমেরিকায় হেরিং, ইংলণ্ডে

পিল্‌সার এবং ফরাসীরাজ্যে ফারবার্ গ্রহণ করিয়া তাহার প্রসার সম্যকরূপে বৃদ্ধি করিলেন।

পিলসারের পরে এতদতিরিক্ত মৌলিক গবেষণা ইংলণ্ডে কেহই করেন নাই। কেবল কোডি এবং এ ভি রো এই দুইজন বিমানবিহারী একটি ট্রাইপ্লেন ব্যবহার করিয়াছিলেন।

রাইট নামে দুই ভ্রাতা লিলিয়েন্থালের গবেষণা-প্রণালী পাঠ করিয়া একখানা উন্নত ধরণের বাইপ্লেন উদ্ভাবন করিলেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ফার্‌বার্ নামক একজন ফরাসী সেনানায়ক লিলিয়েন্থালের প্রণালী অবলম্বনে ব্যোমযানে অনেকগুলি পক্ষ সংবদ্ধ করিয়া ইহার সঙ্গে মোটর এবং ঘূর্ণায়মান পক্ষ সংযোগ করিলেন এবং উহার সাহায্যে ভ্রমণ করিয়া তাঁহার অধ্যবসায়ের সার্থকতা প্রদর্শন করিলেন।
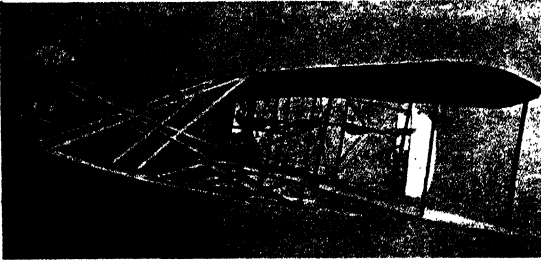
রাইট বাইপ্লেন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে সেন্‌টচ্-ডুমণ্ট নামক এক গগন পর্য্যটক পরীক্ষা-ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। ৮৩ ফুট দীর্ঘ স্থান ভ্রমণ করার জন্য তিনি আর্‌কডেকন পুরস্কার লাভ করিলেন। বলিতে গেলে এডার ব্যতীত ইউরোপে তিনিই সর্ব্বপ্রথম অত্যন্ত কৃতকার্য্যতার সহিত আকাশপথে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এক মাস পরে তিনি প্রায় ৭৪০ ফুট ভ্রমণ করিতে সমর্থ হইলেন। ১৯০৮ সালে হেন্‌রি ফার্‌মান্ ৩৩০০ ফুট পরিধির একটি ত্রিকোণাকার ভূমি পরিভ্রমণ করার জন্য তিন লক্ষ টাকার আর্‌কডেকন-ডিট্‌ক্স পুরস্কার লাভ করিলেন।

এই সময়ে ফরাসী-ভূমিতে ব্যোমবিহারের জন্য বহু যন্ত্র প্রস্তুত হইতে থাকে। তন্মধ্যে অনেকগুলি পরীক্ষাকালে বিনষ্ট হওয়ায় বহু লোকের প্রাণনাশ ঘটে। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় উইলবার রাইট্ ব্যোমযানের সাহায্যে অনেক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পন্ন করায় কিছু কালের জন্য সকলের দৃষ্টি আমেরিকার দিকে আকৃষ্ট হইল। কিন্তু ইহার পরে যখন ফারমান্ সেলনস্ হইতে রিম্‌স্ নগরে ১৭ মাইল পথ ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন আবার ইউরোপের দিকে সকলের দৃষ্টি পতিত হইল। ইহার অব্যবহিত পরে লুইস্ ব্লেরিয়ট ১৯ মাইল ভ্রমণ করিয়া আবার যথাস্থানে প্রত্যাগত হইলেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে লেথাম্ ইংলিস চ্যানেল অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু প্রথমবার বিফলপ্রযত্ন হওয়ার পরে ব্লেরিয়টের নিকট তাঁহার যন্ত্রটি বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। ব্লেরিয়ট ২৫ শে জুলাই তাহার সাহায্যে সর্ব্বপ্রথম ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম

জার্মেন নৌ-প্রদর্শনীতে জেপেলিন।

করিলেন। ইহার পরে কোম ডি লাম্বার্ট পারী নগরীর উপরে ঈফেল স্তম্ভের চতুর্দ্দিকে ১০০০ ফুট উচ্চে ভ্রমণ করিলেন এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে মরিস্ ফারমান্ ৫০ মিনিটে ৪৭ মাইল পথ অতিক্রম করিলেন।

ইহার পরবর্ত্তী সময়ে পূর্ব্ববর্ণিতরূপ ব্যোমপথে ভ্রমণ অনেকেই করিয়াছিলেন। ব্যোমযানে সুদীর্ঘ ভ্রমণ করা ইহার পরে সহজ হইয়া উঠে। তবে যাঁহারা আকাশে অত্যন্ত উচ্চে উঠিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে লেথাম্ এবং কেডেজের নামই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ইঁহাদের পরেও লেগাগ্‌নে ১০৭৪৬ ফুট উচ্চে উঠিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

লিলিয়েন্থালের সময় হইতে জার্ম্মানীতে প্রথম বেলুন নির্ম্মাণের সূচনা হয় এবং তৎপরে দ্রুতগতিতে এই কার্য্য

চলিতে থাকে। খুব সম্ভব জার্ম্মান কর্ত্তৃপক্ষ অন্যান্য দেশের অজ্ঞাতসারে যুদ্ধবিভাগে ব্যবহারার্থ ব্যোমযান নির্ম্মাণে উৎসাহ দান করিয়া আসিতেছিলেন এবং বিপুল অর্থব্যয়ে ও প্রভূত যত্ন সহকারে অল্প কালের মধ্যে ইহাকে অত্যাশ্চর্য্য উন্নত অবস্থায় আনয়ন করিয়া সমস্ত জগৎকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে জার্ম্মানীতে ব্যোমযানের উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে বিপুল আয়োজন ও পরীক্ষা চলিতে থাকে। এই কর্ম্মান্দোলনের মধ্যে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে কাউন্ট জেপেলিন অবতীর্ণ লইলেন এবং ব্যোমবিহারের এক অদ্ভুত যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া সকলকেই বিস্মিত করিয়া দিলেন। তাঁহার নিজের নামানুসারেই এই যন্ত্রের নাম রাখিলেন—জেপেলিন। ইঁহার জীবনকাহিনী বড়ই বিস্ময়কর। আত্মবিশ্বাসবলে মানব কিরূপে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নির্ভীকচিত্তে স্বকার্য্য সাধনে অগ্রসর হইতে পারে আমরা ইঁহার জীবনে তাহারই পূর্ণ অভিব্যক্তি দেখিতে পাই।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কাউন্ট জেপেলিন কনষ্টেন্স্ হ্রদে একটি গির্জ্জায় জন্ম গ্রহণ করেন। কোন প্রণয়-ব্যাপারে আবদ্ধ হইয়া যৌবনে আমেরিকায় আগমন করেন এবং প্রায় ২৫ বৎসরের সময় আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ 'ঘরোয়া যুদ্ধে' যোগদান করেন। এই সময়ে তিনি জীবনে সর্ব্বপ্রথম ব্যোমযানে আরোহণ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন এবং ইহার ফলেই ব্যোমযান-বিদ্যায় সামান্য অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ভাবীজীবনে জগৎব্যাপী যশ অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আমেরিকার যুদ্ধ শেষ হইলে তিনি জার্ম্মানীতে প্রত্যাগমন করেন এবং পরবর্ত্তী সময়ে অষ্ট্রিয়া এবং প্রুশিয়া ও অষ্ট্রিয়া এবং ফ্রান্সের মধ্যে যে যুদ্ধ উপস্থিত হয় এই উভয় যুদ্ধে তিনি উপস্থিত থাকিয়া বীরত্ব প্রদর্শন করেন।

যুদ্ধকার্য্যে যদিও তিনি একজন অসাধারণ সুদক্ষ সৈনিকপুরুষ ছিলেন, তথাপি তাঁহার মন যুদ্ধব্যবসা হইতে আবিষ্কারব্যাপারে নিযুক্ত হইবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। ২৫ বৎসর সৈনিকবিভাগে কাজ করিবার পর ব্যোমভ্রমণ-বিষয়ে অনুশীলন করিতে মনঃপ্রাণ নিয়োগ করিবেন বলিয়া জেনারেলের পদ পরিত্যাগ করিয়া উক্ত বিষয়ে আত্মনিয়োগ করিলেন। এই জন্য তাঁহাকে পঞ্চাশাধিক বয়ঃক্রমকালে তড়িৎবিজ্ঞান, শক্তিবিজ্ঞান (Mechanics) এবং বায়ুবিজ্ঞান (Meteorology) উত্তমরূপে আয়ত্ত করিতে হইল।

ইহার পরে তিনি মনস্থ করিলেন যে ব্যোমযান রাখিবার জন্য এবং বহুপ্রকার ব্যয়সাধ্য পরীক্ষা সাধন করিতে একটি সুবৃহৎ গৃহ নির্ম্মাণ করিবেন। এই অভিপ্রায়ে কনষ্টেন্স্ হ্রদের নিকটবর্ত্তী ফ্রিড্রিকসাফেন নামক স্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন এবং ব্যোমযান হইতে পতনজনিত দুর্ঘটনা নিবারণ করিবার জন্য উক্ত হ্রদের উপরে এমন এক নৌসেতু নির্ম্মাণ করিলেন, যে, ইহাকে ইচ্ছামত চারিদিকে ঘুরাইতে পারা যাইত। পরীক্ষাকালে বাত্যাপ্রবাহ ব্যোমযানের উপর পতিত হইলে অনিষ্টের সম্ভাবনা বা বাধা জন্মিতে পারে এই আশঙ্কা দূর করিবার জন্য নৌসেতুখানি ইচ্ছামত ঘুরাইয়া বায়ুপ্রবাহের অভিমুখে স্থাপন করিতেন।

পরীক্ষা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কাউন্টের ৩৭৫০০০ টাকার সম্পত্তি ছিল। কিন্তু তিনি উহা অল্পকালের মধ্যে পরীক্ষা সম্পন্ন করিতে নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন। কাজেই তিনি উক্ত বিষয়ে আরও অধিক অনুশীলন করিবার জন্য বন্ধুবান্ধব, সমস্ত স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি এবং সর্ব্বশেষে সম্রাট কাইজারের নিকট অর্থ প্রার্থনা করিলেন। অবশেষে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার অদৃষ্টের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। জার্ম্মানগবর্ণমেণ্ট বহুদিন হইতে কাউণ্টের কার্য্যপ্রণালীর দ্রুত উন্নতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছিলেন। অনতিবিলম্বে জার্ম্মান-সম্রাট কাইজারের আনুকূল্যে জার্ম্মানীর সমস্ত সহর ও নগরে একটি জেপেলিন-অর্থভাণ্ডার স্থাপিত হইল। প্রায় একমাসেই পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা উক্ত ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইল।

এই অর্থের সাহায্যে কাউন্ট তাঁহার কার্য্যপ্রণালীর অত্যধিক প্রসার সাধন করিতে সমর্থ হইলেন এবং অল্পকালের মধ্যেই অসংখ্য ব্যোমযান নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু প্রথমাবস্থায় পরীক্ষাকালে ভূমিতে অবতরণের সময় বাত্যাপ্রবাহ ও বহুবিধকারণে অনেক যন্ত্রই নষ্ট হইয়া গেল।

কাউন্ট প্রথমাবস্থায় যখন আবিষ্কার-কার্য্যে লিপ্ত

ছিলেন তখন অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী বিদেশের গভর্মেণ্ট তাঁহাকে অর্থপ্রলোভন প্রদর্শন করিয়াছিল। কিন্তু তিনি কোন-প্রকার প্রলোভনে পড়িয়া স্বদেশের নিকট বিশ্বাসঘাতক হইলেন না এবং যাহাতে তাঁহার আবিষ্কার কোন প্রকারে বিদেশীদের নিকট প্রকাশিত হইয়া না পড়ে, সেজন্য যথাসাধ্য সাবধানতা অবলম্বন করিলেন। কেহই অনুমতি ব্যতীত কারখানার নিকটে যাইতে পারিত না, কারিকর এবং ব্যোমযান-পরিচালকগণ এই-সকল বিষয় যাহাতে সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখেন তজ্জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। কিন্তু এই-সকল সাবধানতা-সত্ত্বেও ফরাসীজাতি ভাগ্যক্রমে ইহার প্রস্তুতপ্রণালী অবগত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে একখানি জেপেলিন ফ্রান্সে লুভ্যাঁ নামক স্থানে অবতরণ করিতে বাধ্য হইল; তখন ব্যোমযানবিদ্যায় সুদক্ষ ব্যক্তিগণ ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত তাহা আবদ্ধ রাখিয়া এই বিরাট যন্ত্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লইলেন। তথাপি আকাশযানে জার্ম্মানীই এখনো প্রধান হইয়া আছে; এবং সম্প্রতি নূতন ধরণের বলিষ্ঠ রকমের ট্রাইপ্লেন উদ্ভাবনের সংবাদ রয়টারের টেলিগ্রামে পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দত্তগুপ্ত।

শিক্ষকের আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ

জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'তে 'শিক্ষকের আশা ও আশঙ্কা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছি। তৎসম্বন্ধে আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে কেহ আলোচনা করিতে পারেন এই আশায় ছিলাম, সে আশা পূর্ণ হয় নাই। এক্ষণে তৎপ্রসঙ্গে আরও কিছু বলিতে চাহি।

উল্লিখিত প্রবন্ধে বাঙ্গালা-সাহিত্যের সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলিয়াছি, ইংরেজি-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেই কথাগুলি পরখ করিতে গেলে দেখিতে পাই যে, পূর্ব্বের অবস্থা যাহাই হউক, গত পঞ্চাশ বৎসরে বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত, ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি শাস্ত্রে গবেষণামূলক গ্রন্থাদি রচনা, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও সন্দর্ভরচনা, সাহিত্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, কাব্য-সমালোচনা, কাব্যাদি-সম্পাদন, কবিজীবনচরিত-রচনা, প্রাচীন সাহিত্যের অনুবাদ, অভিধান-সঙ্কলন, প্রভৃতি কার্য্য শিক্ষক-সম্প্রদায়ের একপ্রকার একচেটিয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নামনির্দ্দেশ নিষ্প্রয়োজন, এই-সকল শ্রেণীর যে-কোন পুস্তক খুলিলেই এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। এতজ্জাতীয় লেখকদিগের বোধ হয় সাড়ে পনর আনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বা স্কুলের শিক্ষক। ধর্ম্মযাজকদিগকেও যদি শিক্ষকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তাহা হইলে ত অনুপাত আরও বাড়িয়া যায়। সম্ভবতঃ ফ্র্যান্স, জার্ম্মানি ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ প্রভৃতি দেশেও এই অবস্থা।

এক্ষেত্রে বিলাতের শিক্ষকসম্প্রদায়ের কৃতিত্বের তুলনায় আমাদের দেশের শিক্ষকসম্প্রদায়ের কৃতিত্ব নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তবে এই প্রভেদের কয়েকটি কারণ মনে রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ, ঐ-সকল দেশে জ্ঞানলাভ ও জ্ঞানের পরিচয়প্রদান উভয়ই মাতৃভাষার ভিতর দিয়া ঘটে। আমাদের দেশে উভয় কার্য্যই পরের ভাষার ভিতর দিয়া সম্পন্ন করিতে হয়, সুতরাং উভয় কার্য্যই সহজসাধ্য নহে। পরের ভাষার ভিতর দিয়া জ্ঞানসঞ্চয় করা বরং অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু সেই ভাষার ভিতর দিয়া গবেষণার পরিচয় দেওয়া সুকঠিন। যাহা হউক, তথাপি শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, শ্রীযুক্ত হীরালাল হালদার, শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রভৃতি পরের ভাষার ভিতর দিয়া স্ব স্ব জ্ঞানগবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন, তর্কশাস্ত্র অর্থনীতি প্রভৃতিতে কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তক এতদ্দেশীয় শিক্ষকদিগের দ্বারা বিদেশী ভাষায় প্রণীত হইয়াছে, কতকগুলি ইংরেজি-সাহিত্যের ব্যাখ্যাপুস্তকও সঙ্কলিত হইয়াছে। ভরশা করি, ভবিষ্যতে সংখ্যা আরও বর্দ্ধিত হইবে। তবে এগুলি বিলাতী অধ্যাপক প্রভৃতির প্রণীত পাঠ্যপুস্তক ও ব্যাখ্যাপুস্তকের সমকক্ষ, কি কেবল পরস্বাপহরণে অধিকাংশেরই কলেবর পূর্ণ, সে প্রশ্নের বিচার বিশেষজ্ঞগণ করিবেন।

দ্বিতীয়তঃ, এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান ও পরীক্ষাগ্রহণ বিদেশী ভাষার ভিতর দিয়াই হয়, সুতরাং পাঠ্যপুস্তক-প্রণয়নে মাতৃভাষার কোন উপকার হয় না।

যদি কখন ভবিষ্যতে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান ও পরীক্ষাগ্রহণের প্রথা অবলম্বিত হয়, তখন এক্ষেত্রে এতদ্দেশীয় শিক্ষকদিগের কর্ত্তব্যের পরিসর অনেক বর্দ্ধিত হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নতম পরীক্ষায় কেবল একটি বিষয়ে মাতৃভাষার ভিতর দিয়া শিক্ষাদান ও পরীক্ষাগ্রহণ বৈকল্পিকভাবে (optional) প্রচলিত হইয়াছে। এক্ষেত্রে সুযোগ পাইয়া দুই একজন শিক্ষক দুই একখানি পাঠ্যপুস্তক-প্রণয়নও করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, সুযোগ পাইলে এ পথ অবলম্বন করিয়া আমাদের দেশের শিক্ষকগণ দেশভাষা ও সাহিত্যের অনেক উপকার করিতে পারেন। নিম্নশিক্ষার ক্ষেত্রে দেশভাষায় নানাবিষয়ে পুস্তক-প্রকাশের অবসর আছে, অনেক শিক্ষক সেদিকে কৃতিত্ব লাভও করিয়াছেন। তবে এই শ্রেণীর পুস্তক যে-নিয়মে রচিত হয়, তাহাতে যে দেশভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, এ কথা বলিতে পারি না।

পক্ষান্তরে, বৃহৎ কাব্য বা ক্ষুদ্র কবিতা, বৃহৎ আখ্যায়িকা বা ছোট গল্প, হাস্যরসাশ্রিত, ব্যঙ্গ্যবিদ্রূপাত্মক সাহিত্য (comic, humorous, satirical literature) প্রভৃতি সুকুমার সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইংরেজ শিক্ষকশ্রেণীর বড় একটা কৃতিত্ব দেখা যায় না। জন্‌সন্ ও গোল্ডস্মিথ্ জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য নানারূপ উঞ্ছবৃত্তির মধ্যে শিক্ষকতাও কিছু-দিন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ধর্ত্তব্য নহে—কেননা তাঁহারা যখন কাব্যাদি রচনা করিয়াছিলেন তখন তাঁহারা সাহিত্যসৃষ্টিই বৃত্তিস্বরূপ অবলম্বন করিয়াছিলেন। মিল্‌টনের শিক্ষকতাও ধর্ত্তব্য নহে। শেক্‌স্‌পীয়ার সম্বন্ধে নানা আজগবী কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে, তিনি কিছুদিন স্কুলমাষ্টারী করিয়াছিলেন, এ কথাও শুনা যায়। কিন্তু এসব কথা অশ্রদ্ধেয়। কবি গ্রে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে নামমাত্র অধ্যাপক ছিলেন। কার্লাইল কিছুদিন গৃহশিক্ষক ও স্কুলমাষ্টার ছিলেন, কিন্তু সেই অজুহাতে তাঁহাকে শিক্ষকশ্রেণীর মধ্যে ধরিলে নিতান্ত গা-জুরী হইবে। তাঁহাকেও জন্‌সন্ প্রভৃতির মত সাহিত্যব্যবসায়ীর মধ্যেই ধরিতে হইবে। জন্ রাস্কিন্ ও জন্ উইল্‌সন্ (ক্রিষ্টোফার নর্থ ছদ্ম-নামে পরিচিত) শেষজীবনে যথাক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে সুকুমারকলা ও নীতিবিজ্ঞানের অধ্যাপক হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই তাঁহারা সাহিত্যসৃষ্টি-কার্য্যে নিপুণতা দেখাইয়াছিলেন। এক্ষেত্রে শিক্ষকশ্রেণীর একমাত্র গৌরবস্থল সুকবি ও বিখ্যাত সমালোচক ম্যাথিউ আর্ণল্ড; তাঁহার সমালোচনাশক্তি অসাধারণ নহে, কেননা বহু অধ্যাপকই এই ব্যবসায়ে কৃতিত্বলাভ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার কবিশক্তি এই সম্প্রদায়ের মধ্যে সুদুর্লভ।

এই আলোচনা হইতে বুঝা গেল যে ইংরেজি-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও শিক্ষক-সম্প্রদায় কাব্যাদি-রচনাকার্য্যে অতি অল্প অনুপাতেই ব্যাপৃত হইয়াছেন। অতএব আমাদের দেশেও যদি এইরূপ ঘটিয়া থাকে, তাহাতে বিস্মিত বা ব্যথিত হইবার কারণ নাই। ইহা সম্ভবতঃ মনোজগতের কোন গুহ্য নিয়মের ফল। এবিষয়ে আমার পূর্ব্বপ্রবন্ধ-সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয়ের আলোচনার শেষ অনুচ্ছেদ (প্রবাসী-জ্যৈষ্ঠ) প্রণিধানযোগ্য।

এক্ষণে এই প্রসঙ্গে অন্যভাবে একটু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। পূর্ব্বপ্রবন্ধে বলিয়াছি, শিক্ষকগণ জ্ঞান-উপার্জ্জনে ও জ্ঞানবিতরণে সমস্ত জীবন ভরিয়া ব্যাপৃত থাকেন, সুতরাং তাঁহারা সদ্‌গ্রন্থ রচনা করিয়া সাধারণের সমক্ষে নিজেদের উপার্জ্জিত জ্ঞানের পরিচয় দিবেন, ছাত্র-সম্প্রদায়ের মধ্যেই জ্ঞানদানকার্য্য নিবদ্ধ রাখিবেন না—এরূপ আশা করা বাহিরের লোকের পক্ষে স্বাভাবিক। শিক্ষকগণও বহু জ্ঞান লাভ করিয়া শুধু ছাত্রদিগকে তাহার স্বাদগ্রহণ করিবার অধিকার দিয়া তৃপ্ত হন না, সাধারণ-সমক্ষে জ্ঞানপ্রচার করিবার একটা প্রবল উত্তেজনা অনুভব করেন, ইহা বোধ হয় অসঙ্গত নহে।

আর-একটি কারণে, শিক্ষকদিগের গ্রন্থরচনা দ্বারা সাধারণ-সমীপে স্ব স্ব উপার্জ্জিত জ্ঞানের প্রচার করিবার ঝোঁক হওয়া সম্ভব। যশের লিপ্সা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। কিন্তু যশের প্রকারভেদ আছে। কতকগুলি বৃত্তি ও ব্যবসায়ে যশস্বীদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্যের স্থূল নিদর্শন থাকিয়া যায়। স্থপতি, ভাস্কর, চিত্রকর, প্রভৃতি যে-প্রতিভার পরিচয় দেন, তাহার স্থূল নিদর্শন বহু শতাব্দী, এমন কি বহু সহস্র বৎসর, জগতে স্থায়ী হয়। দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, কবি প্রভৃতি যাঁহারা গ্রন্থরচনাদ্বারা কীর্ত্তি স্থাপিত করেন, তাঁহারাও এইরূপ স্ব স্ব প্রতিভার স্থূল

নিদর্শন রাখিয়া যান, কেননা সুরম্য হর্ম্ম্য, প্রস্তরমূর্ত্তি, চিত্র প্রভৃতির ন্যায় গ্রন্থাদিও বহুশতাব্দী, বহু সহস্র বৎসর থাকে। এই-সকল স্থূল নিদর্শন যতদিন বর্ত্তমান থাকে, ততদিন নির্ম্মাতা, রচয়িতা প্রভৃতির কীর্ত্তিলোপের আশঙ্কা নাই। পক্ষান্তরে গায়ক, বাদক, নর্ত্তক, নট, কথক, বাগ্মী, ব্যবহারাজীব, বিচারক, ব্যবস্থাপক, শিক্ষক, প্রভৃতির কীর্ত্তি অন্য শ্রেণীর। ইঁহারা সমসাময়িক প্রত্যক্ষদ্রষ্টা বা শ্রোতার প্রশংসালাভ করেন বটে, কিন্তু মরণান্তে আর তাঁহাদিগের কৃতিত্বের কোন স্থূল নিদর্শন থাকে না। অবশ্য জীবনচরিত বা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁহাদিগের কীর্ত্তিকাহিনী ঘোষিত হইতে পারে; ব্যবস্থাশাস্ত্রে ব্যবস্থাপকদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্যের বিবরণ থাকিতে পারে ইত্যাদি। কিন্তু তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহাদিগের কৃতিত্বের সুস্পষ্ট স্মৃতি অপেক্ষাকৃত সহজে ও অল্প সময়ে লুপ্ত হইয়া যায়, কিংবদন্তীর ন্যায় কেমন আবছায়া-আবছায়া (vague) ভাব আসিয়া পড়ে, ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দিগের তেমন সুস্পষ্ট উপলব্ধি বা সম্পূর্ণ আস্থাস্থাপন ঘটে না; এমন কি, কৃতীর জীবদ্দশায়ই অনেক সময় তাঁহার অতীত জীবনের কৃতিত্ব ম্লান হইয়া পড়ে।

শিক্ষকগণ এই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। বিলাতে ডকটর আর্নল্ড বা জাওয়েট, ভারতে ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন্ বা ডিরোজিও, ৺রাজনারায়ণ বসু বা ৺রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শিক্ষকের নাম আজিও অনেকে জানেন, কিন্তু শত বা সহস্রবর্ষ পরে সে জ্ঞান শুধু কিংবদন্তীতে দাঁড়াইবে, ধারণার স্পষ্টতা ও সজীবতা থাকিবে না। তাঁহাদিগের যশ কিছুদিন অব্যাহত থাকিবে, কিন্তু পরে তাহা পুঁথিগত ও (অসার না হইলেও) অসাড় হইয়া পড়িবে। স্থূলনিদর্শনের অভাবে ক্রমেই তাঁহাদিগের কীর্ত্তিস্মৃতি নির্জ্জীব ও দুর্ব্বল হইয়া যাইবে।

পূর্ব্ববর্ণিত কারণে অনেক সময় শিক্ষকগণের গ্রন্থরচনা দ্বারা বিদ্যাবত্তার স্থূল নিদর্শন রাখিয়া যাইবার প্রবল ইচ্ছা জন্মে। তবে ধরিতে গেলে, গ্রন্থরচনা দ্বারা তাঁহারা পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া যাইতে পারেন, কিন্তু শিক্ষাদান-নৈপুণ্যের স্থূল নিদর্শন এ উপায়েও প্রতিষ্ঠিত হইবে না। ভবিষ্যদ্‌বংশীয়গণ তাঁহাদিগকে জ্ঞানী ও সাহিত্যসেবক হিসাবেই জানিবে, নিপুণ শিক্ষক বলিয়া জানিবে না। জানিলেও তাহার কোন প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইবে না।

যাহা হউক, গ্রন্থরচনাদ্বারা স্থায়ী কীর্ত্তিস্থাপনের প্রবল আকর্ষণ সত্ত্বেও বহু শিক্ষক গ্রন্থরচনা দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জগৎসমক্ষে নিজেদের জাহির করেন নাই, বিনা আড়ম্বরে নিজেদের অবলম্বিত বৃত্তির কর্ত্তব্যসাধন করিয়াছেন বা করিতেছেন; ইঁহাদিগের জীবনব্যাপি-সাধনা ব্যর্থ, একথা বোধ হয় কেহই বলিবেন না। গ্রন্থরচনায় ইঁহাদিগের ঝোঁক না থাকা অক্ষমতার পরিচয় বলিয়া মনে করাও ভুল। অনেক শিক্ষক মনে করেন যে, সাহিত্যনির্ম্মাণ প্রভৃতি অবান্তর কার্য্যে মনোনিবেশ করিলে তাঁহারা নিজেদের অবলম্বিত বৃত্তির ক্ষতি করিয়া, কর্ত্তব্যের ত্রুটি করিয়া, তবে সাহিত্যক্ষেত্রে কৃতিত্ব লাভ করিতে পারেন। শিক্ষকের প্রকৃত কার্য্য গ্রন্থরচনা নহে। এই ধারণায় ইঁহারা 'নীরব কবি' হইয়া থাকাই শ্লাঘ্য বিবেচনা করেন।

এই ধারণা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। যেমন অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকের স্ব স্ব বৃত্তির নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিয়াও জগৎকে সাক্ষাৎ সম্পর্কে শিক্ষা দিবার অধিকার এবং দায়িত্ব আছে, তেমনই শিক্ষক-সম্প্রদায়েরও এ বিষয়ে অধিকার ও দায়িত্ব আছে। তাঁহারা কেন এই বিধিদত্ত অধিকার হইতে আপনাদিগকে বঞ্চিত করিবেন? অন্য সম্প্রদায়ের লোকে যদি অবলম্বিত বৃত্তির ক্ষতি না করিয়া এই কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন, শিক্ষক-গণই বা পারিবেন না কেন? বরং তাঁহারা আজীবন সঞ্চিত মার্জ্জিত জ্ঞানের অংশ যে-পরিমাণে সর্ব্বসাধারণকে দিতে পারিবেন, অন্য সম্প্রদায়ের লোকের নিকট তাহা আশা করা যায় না। তাঁহারা জগৎকে শিক্ষা দিতে ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য।

আর এক কথা—জগতের উপকার করা ছাড়া তাঁহা-দিগের নিজের উপকারের জন্যও এ বিষয়ে উদ্যোগী হওয়া উচিত। শিক্ষক অনন্যকর্ম্মা হইয়া অধ্যয়ন-অধ্যাপনে চির-জীবন ব্যাপৃত থাকিবেন, ইহা খুব উচ্চ আদর্শ বটে; কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য এবং মানসিক শক্তির সর্ব্বতোমুখ বিকাশের জন্য (all-round development) শিক্ষকের কর্ম্মবৈচিত্র্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সাক্ষাৎ ভাবে জগতের

সহিত সম্বন্ধস্থাপন করিতে না পারিলে, ছাত্রমণ্ডলীর সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে জীবন কাটাইলে, তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও 'কূপমণ্ডূক' হইয়া পড়িবার আশঙ্কা প্রবল।

অবশ্য এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, ছাত্রদিগের প্রতি কর্ত্তব্য তাঁহার মুখ্য কর্ম্ম, সমগ্র জগতের প্রতি কর্ত্তব্য তাঁহার গৌণ কর্ম্ম; আবার, ছাত্রদিগের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া তিনি পরোক্ষভাবে জগতের প্রতি কর্ত্তব্যও সংসাধন করিতেছেন। অতএব ছাত্রদিগের শিক্ষাবিধান করিয়াই যদি তিনি ক্ষান্ত হন, তাহাতে তাঁহাকে দোষ দেওয়া চলে না। ইহার অধিক যদি তিনি করিতে পারেন, খুব ভাল কথা; যদি না পারেন বা না চাহেন, তাহা হইলেও তিনি যাহা করিলেন, সমাজ তাহাতেই সন্তুষ্ট হইবে। এক্ষণে এই মুখ্য কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষকের আদর্শ বিচার করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

আদর্শ-শিক্ষকে অন্ততঃ দুইটি গুণ থাকিতেই হইবে। এই দুইটি গুণ, শিক্ষাদানে নৈপুণ্য এবং শিক্ষাদানে আনন্দ ও উৎসাহ। তিনি এমন সুকৌশলে শিক্ষাদান করিবেন যে বিষয়টি যতই কেন কঠিন ও নীরস হউক না কেন, ছাত্র তাহা অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিবে, এবং জ্ঞানলাভে সুখ পাইবে। শিক্ষকের কার্য্যে কখন অবসাদ আলস্য শৈথিল্য ঔদাস্য বিরাগ আসিবে না, তিনি সহিষ্ণুতার সহিত ছাত্রের শিক্ষার পথের সমস্ত বাধা দূর করিবেন, সদাপ্রফুল্লচিত্তে ছাত্রকে জ্ঞানদান করিবেন। জ্ঞান উপার্জ্জনে কি সুখ, তাহা তিনি শুধু মৌখিক উপদেশে নহে, নিজের জ্বলন্ত উৎসাহ ও অনুরাগের দৃষ্টান্ত এবং নিজের জীবনযাত্রার প্রণালী দ্বারা ছাত্রের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দিবেন। Gladly would he learn and gladly teach—তিনি সানন্দে নব নব জ্ঞান অর্জ্জন করিবেন এবং সানন্দে তাহা ছাত্রদিগের মধ্যে বণ্টন করিবেন, ইহাই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র হইবে।

আবার, শিক্ষক শুধু অল্পাধিক পরিমাণ বিদ্যা ছাত্রের মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইয়াই নিজের কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন হইল, ইহা মনে করিবেন না। বিদ্যাদান ঠিক পূর্ণকুম্ভ হইতে শূন্যকুম্ভে জল ঢালার মত ব্যাপার নহে। ছাত্রের সুপ্ত চিন্তাশক্তি উন্মেষিত করা শিক্ষাদানের প্রকৃত প্রণালী। এই প্রণালী ভিন্ন স্থায়ী মঙ্গল হয় না। ছাত্রগণ যাহাতে সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্রে স্বাধীনচিন্তা ও গবেষণার প্রণালী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, এবং ভবিষ্যতে সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস প্রভৃতির চর্চ্চায় নিজেদের পথ নিজেরা চিনিয়া লইতে পারে, মৌলিক আবিষ্কার প্রভৃতি কার্য্যে পারগ হইতে পারে, তাহার ভিত্তি শিক্ষকই তাঁহার শিক্ষাদানপ্রণালী দ্বারা প্রতিষ্ঠা করিবেন। শুনিয়াছি, বিলাতে বহু বৈজ্ঞানিক এই ভাবে ছাত্র প্রস্তুত করিয়া থাকেন এবং এইজন্যই সেদেশে ছাত্রপরম্পরায় বিজ্ঞানচর্চ্চা উন্নতি লাভ করিতেছে। আমাদের দেশেও শুনিয়াছি এই ভাবে বিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছাত্র প্রস্তুত করিতেছেন। এই রূপে ছাত্রদিগের চিন্তাশক্তির উন্মেষ করা, রসগ্রহণ-শক্তির উদ্বোধন করা, জ্ঞানার্জ্জনে অনুরাগের উদ্রেক করা, নেশা জমাইয়া দেওয়া, শিক্ষকের কৃতিত্বের, কার্য্যকুশলতার প্রকৃত নিদর্শন। বীজের পরিণাম যেমন বৃক্ষে ও বৃক্ষের পরিণাম ফুলফলে, শিক্ষকপ্রদত্ত শিক্ষারও পরিণাম সেইরূপ ছাত্রদিগের চরিত্রগঠনে, ছাত্রদিগকে মানুষ করিয়া তোলায়।

কিন্তু, ছাত্রের চরিত্রের উপর শিক্ষকের প্রভাব এবং শিক্ষকপ্রদত্ত শিক্ষা দ্বারা ছাত্রের চরিত্রগঠন—অনেকে ইহা অপেক্ষাও ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেন।

এক সময়ে আমাদের দেশে ধর্ম্মশিক্ষা, নীতিশিক্ষা ও সাধারণ বিদ্যাশিক্ষার মধ্যে ভেদ ঘটে নাই। উভয় শিক্ষাই গুরুগৃহে হইত। গুরু শুধু প্রগাঢ়বিদ্বান্ হইতেন না, পরন্তু পূতচরিত্র হইতেন। এখনও অনেকে চাহেন যে, শিক্ষকগণ শুধু বিদ্বান্ হইবেন না, পূতচরিত্র নির্ম্মলস্বভাব হইবেন। লোকে আশা করে যে, শিক্ষকগণ অমায়িক, নিরহঙ্কার, নির্লোভ, জিতেন্দ্রিয়, সরলপ্রকৃতি, সত্যবাদী, দয়ালু, পরোপকারী, উন্নতচেতা ও সর্ব্বাংশে দোষমুক্ত হইবেন। এবং তাঁহাদের সংসর্গে ও দৃষ্টান্তে, তাঁহাদের চরিত্রপ্রভাবে ও তাঁহাদের প্রদত্ত শিক্ষার গুণে ছাত্রগণও সুচরিত্র হইবে। অপরিণতবয়স্ক অগঠিতচরিত্র কোমলহৃদয় ছাত্রগণ শিক্ষককে জ্ঞানের মূর্ত্ত অবতার বলিয়া প্রগাঢ় ভক্তি করে। সুতরাং তাহাদের চরিত্রের উপর শিক্ষকের প্রভাব সহজেই অনুমেয়।

শিক্ষকের চরিত্রপ্রভাবে ও তৎপ্রদত্ত শিক্ষাগুণে ছাত্রগণের চরিত্রগঠনের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বিলাতের ডক্‌টর আর্নল্ড। আমাদের দেশেও শুনা যায়, ৺রামতনু লাহিড়ী ও ৺রাজনারায়ণ বসুর এইরূপ প্রভাব ছিল। পক্ষান্তরে ডিরোজিওর দৃষ্টান্তে, প্রভাবে, সংসর্গে এবং সাক্ষাৎ শিক্ষাদানের ফলে তাঁহার ছাত্রগণ উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির হইয়া উঠিয়াছিলেন। এখনও আমাদের দেশে আদর্শচরিত্র শিক্ষকের অভাব নাই। এই প্রসঙ্গে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পরলোকগত ৺গৌরীশঙ্কর দে, ৺হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, * ৺মোহিতচন্দ্র সেন, ৺বিনয়েন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি এবং জীবিত শিক্ষকদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

শিক্ষক সর্ব্বগুণাধার হইলে সমাজের প্রভূত মঙ্গলের কথা। কিন্তু দেশে যত শিক্ষক আছেন, সকলেই সর্ব্বগুণাধার হইবেন ইহা আশা করা যায় না। মানুষমাত্রেই দোষে গুণে জড়িত, শিক্ষকের বেলায় একথাটি ভুলিলে চলিবে না। শিক্ষাদাননৈপুণ্য ও শিক্ষাদানে আনন্দ, এই দুইটি গুণের উপর যদি শিক্ষকের আদর্শচরিত্র হয়, তবে ত সে মণিকাঞ্চনযোগ। কিন্তু আদর্শচরিত্রের অভাব হইলেও পূর্ব্বকথিত দুইটি গুণের সমাবেশ অপরিহার্য্য। শুনিয়াছি ক্যাপ্টেন ডি এল রিচার্ডসনের চরিত্রে গুরুতর কলঙ্ক ছিল, কিন্তু তাঁহার অসাধারণ শিক্ষাদাননৈপুণ্য ও শিক্ষাদানে প্রবল অনুরাগের জন্য ছাত্রসম্প্রদায় তাঁহার গুণমুগ্ধ ছিল। অধিক আলোচনা বাঞ্ছনীয় নহে।

আর-এক কথা। শিক্ষক যতই আদর্শচরিত্র হউন না কেন, তাঁহার সকল ছাত্রই যে সেই ছাঁচে ঢালা হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। ছাত্রের চরিত্রগঠন করিতে না পারিলে তাহা শিক্ষকের অক্ষমতার পরিচয় নহে। যেমন শিক্ষক প্রতিভাশালী হইলেও সকল ছাত্রকে বিদ্বান্ করিয়া তুলিতে পারেন না, সকল ক্ষেত্রে তাঁহার শিক্ষাদাননৈপুণ্যের সফলতা ঘটে না, এই সফলতা ছাত্রের বুদ্ধিবৃত্তি ও শিক্ষাগ্রহণ-ক্ষমতার উপর নির্ভর করে,

বিতরতি গুরুঃ প্রাজ্ঞে বিদ্যাং যথৈব তথা জড়ে
ন চ খলু তয়োর্জ্ঞানে শক্তিং করোত্যপহন্তি বা।
ভবতি চ তয়োর্ভূয়ান্ ভেদঃ ফলং প্রতি তদ্যথা
প্রভবতি শুচির্বিম্বোদ্‌গ্রাহে মণির্ন মৃদাং চয়ঃ॥

সেইরূপ শিক্ষক চরিত্রবান্ হইলেও সকল ছাত্রকে সুচরিত্র করিয়া তুলিতে পারেন না। ছাত্রের বংশ, সংস্কার, সংসর্গ প্রভৃতির বদ্ধমূল প্রভাব শিক্ষক কয়েক ঘণ্টা উপদেশদানে বা সঙ্গদানে মুছিয়া ফেলিতে পারেন না। সক্রেটিসের ছাত্র চরিত্রহীন এল্‌কিবায়েডিস্ ও অত্যাচারী ক্রিটিয়াস্, এরিষ্টট্‌লের ছাত্র রণরঙ্গমত্ত এলেকৃজ্যাণ্ডার, ও সেনেকার ছাত্র দুরাচার নীরো ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

দুইটি প্রবন্ধে শিক্ষকের আশা, আশঙ্কা, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ সম্বন্ধে বিশৃঙ্খলভাবে অনেক কথা বলিলাম। পঁচিশ বৎসরের অধিক কাল শিক্ষকতাকার্য্যে ব্রতী থাকিয়া শিক্ষকের জীবন সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছি, প্রবন্ধদ্বয়ে তাহাই প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। যদি কোথাও স্ব-সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করিয়া থাকি, তবে তাহা পাঠকবর্গ অজ্ঞানকৃত অপরাধ বলিয়া মার্জ্জনা করিবেন, এই প্রার্থনা।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্নেহহারা

(প্রবাসীর পঞ্চম পুরস্কার প্রাপ্ত গল্প)

(১)

কলিকাতা হইতে বিশ পঁচিশ মাইল দূরে ছোট একখানি পল্লীগ্রাম। বড় বড় গাছ, ছোট-খাট বেড়া-দেওয়া বাগান, অধিকাংশ বাড়ীই কুঁড়ে-ঘরের সমষ্টিমাত্র। দু'দশটা বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারের পাকা বাড়ীগুলা আশপাশের কুঁড়েগুলির সম্ভ্রম ও ঈর্ষা প্রায় সমানভাবে আকর্ষণ করিতেছে।

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন। সেদিন বিদ্যালয়ের ছুটি। একটা কোঠা-বাড়ী হইতে বালক ভোলানাথ লাফাইতে লাফাইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহার বয়স বার তের বৎসর হইবে।

---

* ইনি ভাগলপুর কলেজের প্রিন্‌সিপ্যাল ছিলেন; ইঁহার কার্য্যক্ষেত্র মফস্বলে ছিল বলিয়া ইনি সকলের নিকট তেমন সুপরিচিত নহেন কিন্তু ইঁহার নির্ম্মল চরিত্রের কথা ইঁহার সকল ছাত্রই জানেন।

সেদিন বোধ হয় খেলার কোন সঙ্গী জুটে নাই—বালক গম্ভীর মুখে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

হঠাৎ কাহাদের বাগানের মধ্যে একটা জামরুল গাছের দিকে ভোলার দৃষ্টি পড়িল। গাছটায় অজস্র জামরুল ফলিয়াছে। বেড়ার ধারে দাঁড়াইয়া বালক চারিদিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিল—কেহ কোথাও নাই। কতকগুলা বড় বড় ইট কুড়াইয়া সে ধপাধপ্ শব্দে বাগানের মধ্যে ফেলিতে লাগিল—কোন মালী তাড়া করিয়া আসিল না। তখন ভোলা ধীরে ধীরে বেড়া ডিঙাইয়া বাগানে প্রবেশ করিল। বৃক্ষের তলদেশে গিয়া ঊর্দ্ধমুখে গাছের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। তাহার উৎসুক নেত্রদ্বয় আনন্দ এবং বিস্ময়ে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে আর-একবার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া গাছে উঠিয়া পড়িল।

গাছের একস্থানে দুইটা শাখা মিলিয়া দিব্য একখানি আরাম-কেদারার মত হইয়াছে। ভোলা সেইখানে উঠিয়া পত্রপুঞ্জের অন্তরালে নিশ্চিন্ত মনে শয়ন করিল। হাতের কাছেই থোলো থোলা জামরুল। সে একটা একটা ছিঁড়িয়া অদূরবর্ত্তী পাথরখানাকে লক্ষ্য করিয়া ছুড়িতে লাগিল। চারি পাঁচটা জামরুলের একটাও পাথরখানায় লাগিল না। তখন সে প্রত্যেক ফলের আধখানা কামড়াইয়া লইয়া অপরার্দ্ধ ছুড়িতে লাগিল। বাগানের ভিতর পুষ্করিণীর জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। বহুদূর হইতে একটা ফটিকজল পাখীর করুণ চীৎকার ভোলার কানে আসিয়া পৌঁছিতেছে। মধ্যাহ্নের বাতাস থাকিয়া থাকিয়া জামরুল-গাছের শাখাপ্রশাখায় দোল দিয়া যাইতেছে। পরের বাগান না হইলে ভোলার নিদ্রাকর্ষণ হইত সন্দেহ নাই।

এমন সময় বাগানের দ্বারের নিকট বালককণ্ঠে একটা অস্ফুট কলরব শোনা গেল। ভোলা চমকিয়া ফিরিয়া দেখিল, একটি বালিকা বেণী দোলাইয়া ছুটিয়া আসিতেছে এবং তাহার পশ্চাতে একটি উলঙ্গ শিশু টলিতে টলিতে যথাসাধ্য দ্রুতবেগে তাহার দিদিকে ধরিতে আসিতেছে। ভোলার ইচ্ছা হইল ছুটিয়া পলাইয়া যায়; কিন্তু সে দেখিল বৃক্ষ হইতে নামিতে গেলেই এই দুটি মূর্ত্তিমান উপদ্রবের চক্ষে পড়িতে হইবে। তখন সে মনকে সাহস দিবার জন্ম কহিল—"কি! এই দুটো ছোট ছেলেমেয়ের ভয়ে পালিয়ে যাব! কখনই নয়!" এই বলিয়া সে ঘনতর পত্রপুঞ্জের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

বালিকা এবং তাহার ছোট ভাইটি অকারণ আনন্দে ছুটাছুটি করিয়া কলকাকলীতে বাগানটাকে মুখর করিয়া তুলিল। ছোট ছোট গুল্মের উপর ফড়িংগুলা নিশ্চিন্তভাবে পাখা মেলিয়া বসিয়া আছে; শিশু অতি সন্তর্পণে গুটি গুটি তাহাদের নিকটস্থ হইয়া হাত বাড়াইবা মাত্র তাহারা উড়িয়া যায় এবং কিছুক্ষণ সূর্য্যকিরণে ভাসিয়া আবার গাছে আসিয়া বসে। বালক আবার ধরিতে যায় এবং নিষ্ফল হইয়া বাতাসে ভাসমান পতঙ্গকুলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটাছুটি করিয়া, হাসিয়া, হাততালি দিয়া, আপন অক্ষমতা গোপন করিবার চেষ্টা করে। বালিকা একটু ভারিক্কি ভাব ধারণ করিয়া ভ্রাতাকে উপদেশ দেয়—ছিঃ! ফড়িং ধল্লে আর-জন্মে ফড়িং হতে হয়।

দিদির উপদেশের জন্যই হউক কিংবা দুর্ব্বৃত্ত ফড়িং-গুলার অতিরিক্ত সাবধানতার জন্যই হউক, বালক নিবৃত্ত হইল। পরক্ষণেই জামরুল-গাছের দিকে চাহিয়া কহিল—দিদি, জামরুল খাব।

গাছের উপর ভোলা জড়সড় হইয়া গুটি মারিয়া বসিল।

জামরুলের প্রতি দিদির অনাসক্তি ছিলনা, কিন্তু তখন ভ্রাতাকে সদুপদেশ দিবার স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিল; কহিল—ছিঃ! জামরুল খেলে পেট কামড়ায়।

বালক দিদির আঁচল টানিয়া কহিল—না, কামড়াবে না। তুই জামরুল পাড়।

ভোলা নিশ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করিয়া রহিল।

অবোধ বালক দিদির উপদেশের মহিমা বুঝিল না দেখিয়া বালিকা কহিল—বাপ্‌রে! ওগাছে ভূত আছে! তার চেয়ে আমরা মাছ দেখিগে চল।

এই বলিয়া দিদি বালককে পুকুরধারে লইয়া গেল। এক ঝাঁক খোর্‌সোলা মাছ জলের উপর সাঁতার দিতে-ছিল। বালক কিছুক্ষণ গবেষণাপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া দেখিয়া দিদির মুখের দিকে চাহিয়া মাছগুলোর চরিত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল। পুকুরপাড়ের গাছে একটা জবাফুলের দিকে দিদির নজর পড়িয়াছিল। বালিকা ফুলের দিকে হাত বাড়াইয়া কহিল—মাছগুলো ভারী দুষ্টু, আমাদের খোকা লক্ষ্মী।

খোকা উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া মাছগুলোকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে কহিল—"দাঁড়া ত রে!" এবং এই বলিয়া একখণ্ড ইষ্টক খুঁজিয়া আনিল। তারপর দুষ্ট মাছগুলোকে লক্ষ্য করিয়া হাত ঘুরাইয়া যথাসাধ্য বলে ইট ছুড়িতে গিয়া নিজেই টলিয়া পাড়ের উপর পড়িয়া গেল। বালক সামলাইতে পারিল না; গড়াইতে গড়াইতে একেবারে জলে গিয়া পড়িল।

বালিকার আরক্ত মুখমণ্ডল এক মুহূর্ত্তে সাদা হইয়া গেল। সে ব্যাকুল নেত্রে একবার চারিদিকে চাহিয়া উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

জামরুল-গাছ সবেগে নড়িয়া উঠিল। বালিকা দেখিল, কে একজন গাছের ডাল ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িয়া মাটির উপর লাফাইয়া পড়িল, এবং তিন লাফে জলে পড়িয়া নিমগ্ন বালককে তুলিয়া ফেলিল। বালক খানিকটা জল খাইয়াছিল মাত্র; তখনি উঠিয়া বসিল।

বালিকার চক্ষে জল, মুখে হাসি; যেন এক পশলা বৃষ্টির পর রৌদ্র উঠিয়াছে।

বয়সে ভোলা বালিকার অপেক্ষা বেশী বড় হইবে না। সে গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করিল—তোমার নাম কি খুকী?

বালিকা তাহার ভাসাভাসা কৃতজ্ঞ চোখদুটি তুলিয়া কহিল—কল্যাণী।

(২)

সাত আট বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ভোলা এখন কলিকাতায় বি-এ পড়ে। বাল্যকালেই তাহার মাতা পিতা স্বর্গে গিয়াছিলেন। তখন হইতেই সে কাকাবাবু এবং কাকিমার কাছে মানুষ হইয়াছে। ভোলার খুড়তুতো ভাই নগেন ভোলার সমবয়সী। নগেন এবং ভোলা দুজনে কলিকাতায় একটা দোতলা বাড়ীর উপরের দুইখানা মাত্র ঘর ভাড়া করিয়া থাকিত এবং এককলেজে লেখাপড়া করিত। ভোলা নগেনের একক্লাস উপরে পড়িত। সমবয়সী বলিয়া দুই ভাইয়ে যথেষ্ট ইয়ার্কি চলিত।

ভোলা ছিল অত্যন্ত হুজুকপ্রিয়। কোথাও বক্তৃতা হইলে ভোলাকে তাহা শুনিতেই হইবে। উৎসব, সমারোহ, মেলা—যেমনই হউক না কেন—ভোলানাথ সেখানে উপস্থিত থাকিবেই। ফুটবল ম্যাচে বাঙ্গালী জিতিবে কি ইংরেজ জিতিবে, এই ভাবিয়া রাত্রে তাহার ঘুম হইত না। ক্রিকেট্ ম্যাচে কে ক'টা রান্ (run) করিল সে সম্বন্ধে খবরের কাগজওয়ালারও ভুল থাকিতে পারে, কিন্তু ভোলার হিসাব একেবারে নির্ভুল। এই বিশাল কলিকাতার কোথায় কোন্ ক্ষুদ্র গলিটির কি নাম,—ভোলার তাহা অজ্ঞাত ছিল না। পৃথিবীর সমুদায় দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য এবং জ্ঞাতব্য চক্ষুকর্ণের মধ্য দিয়া আত্মসাৎ করিতে পারিলে, তবেই যেন সে তৃপ্ত হয়।

ভোলার পরোপকার করিবার একটা বাতিক ছিল। তাহাদের গ্রামের লোক কলিকাতায় আসিলেই ভোলার ঘাড়ে গিয়া চাপিত। পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী বলিয়া ভোলা হয়ত পাঠ্য পুস্তকগুলির ধূলা ঝাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময়ে গ্রামের প্রতিবেশী অতিথিরূপে দেখা দিলেন। ভোলাকে সঙ্গে লইয়া আজব সহর কলিকাতা পরিদর্শন করিয়া বেড়াইলেন, যেখানে যে জিনিষটি সুলভে পাওয়া যায়, তাহা খরিদ করিলেন, থিয়েটার দেখিলেন, সার্কেশ দেখিলেন এবং দিবারাত্র নানাপ্রকার গল্পগুজবে ভোলাকে পরম আপ্যায়িত করিয়া দিনসাতেক পরে গা তুলিলেন।

নগেন সেণ্টিমেণ্টের ধার ধারিত না এবং চক্ষুলজ্জা নামক জিনিষটাকে বড় একটা আমল দিত না। সেইজন্য তাহার কাছে ঘেঁষিতে কেহ সাহস করিত না। সে জানিত, পরোপকার করিবার সময় যথেষ্ট পাওয়া যাইবে কিন্তু পরীক্ষায় পাশ করিবার এমন সুবর্ণ সুযোগ আর আসিবে না।

একদিন নগেনদের বাসার পাশের বাড়ীর এক ভদ্রলোক তাঁহার ছেলেটিকে লইয়া ভোলার কাছে হাজির হইয়া কহিলেন—দেখুন মশায়, আজ তিন চার দিন হ'ল ছেলেটার মাষ্টার আসে না। তা' আপনি যদি ওর পড়াগুলো রোজ সকালে একটু দেখে দেন—

ভোলা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বালককে জিজ্ঞাসা করিল—তোমার মাষ্টার মশায়ের অসুখ করেছে বুঝি?

বালক কহিল—আরে রাম বল! সে বেটার কথা বলেন কেন মশাই! বেটা কোন গতিকে এম্-এ পাশ করেছে,—খালি ফাঁকি দিয়ে টাকা নেবার ফিকির।

মাষ্টারের প্রতি তুখোড় বালকের এই শ্রদ্ধাধিক্য

দেখিয়া ভোলা মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। নিকটেই ছিল নগেন। সে একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া কহিল—দেখ হে ছোক্‌রা, তোমার যা' লেখা পড়া হ'বে সে আমি বুঝতেই পারছি। মিছে কেন বাপ মায়ের টাকাগুলি জলে ফেল্‌ছ!

বালকের পিতা নগেনের প্রতি সক্রোধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেলেন। ভোলা বালককে লইয়া পড়াইতে বসিল।

সে বৎসর ভোলা নিরুপদ্রবে বি এ ফেল্ করিয়া নগেনের সঙ্গে এককাসে পড়িতে লাগিল। নগেন কহিল—পরোপকারের প্রবৃত্তিটা একটু কমাও হে! নিজের উন্নতি না হলে পরের উন্নতি করবে কোথা থেকে?

কিন্তু বাল্যকাল হইতেই ভূতের ব্যাগার খাটা ভোলার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। ছোট ছেলেদের যত্ন করিয়া পড়ান এবং বন্ধু বান্ধবদিগকে প্রাণপণে সাহায্য করার অভ্যাস তাহার রক্তমাংসের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। পরের কার্য্য সে সহজ আনন্দের সহিত সম্পন্ন করিত। এজন্য নিজের কোন ক্ষতিকে ক্ষতি বলিয়া গ্রাহ্য করিত না। দিবাভাগের এক মুহূর্ত্তও তাহার বিশ্রাম ছিল না; অথচ 'পরোপকার' কথাটি পর্য্যন্ত কেহ কখন তাহার মুখে শুনে নাই।

নগেন ভোলার উন্নতি কামনা করিত। সেই জন্য যে-সে লোক ভোলাকে দিয়া ব্যাগার খাটাইয়া লইতে আসিলে সে অত্যন্ত বিরক্ত হইত। ভোলাকে বারবার তাহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিয়াও যখন কোন ফল হইল না, তখন নগেন ক্লাসের মধ্যে ভোলাকে 'উপকারী' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল।

(৩)

নগেনের দিদির শ্বশুরবাড়ী ভবানীপুরে। ভগ্নীপতি উপেনবাবু একজন বড় উকিল। উপেনবাবুরা না ব্রাহ্ম, না হিন্দু; আজকালকার উচ্চশিক্ষিত বড়লোকেরা প্রায় যেমন হইয়া থাকেন তেমনই। বাড়ীতে উপেনবাবুর বিধবা মা ছিলেন কর্ত্রী। ভগিনী নির্ম্মলা তখনও অবিবাহিতা।

সেদিন নগেন এবং ভোলা দিদিকে দেখিতে গিয়াছিল। উপেনবাবু এবং তাঁহার মা তাহাদিগকে বাহিরের ঘরে বসাইয়া যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি কোর্টে বাহির হইয়া গেলে দিদি আসিয়া নগেন এবং ভোলার নিকট সকলের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

মধ্যাহ্নভোজন সমাপ্ত হইলে দিদি নগেনকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গিয়া একেবারে নির্ম্মলের ঘরে প্রবেশ করিলেন। নির্ম্মল সসঙ্কোচে বাহির হইয়া গেল। দিদি হাসিয়া কহিলেন—কেমন রে নগেন, আমার ননদকে তোর পছন্দ হয়?

নগেন প্রফুল্লমুখে কহিল—তুমি পাগল হয়েছ দিদি!

দিদি নগেনকে তাঁহাদের নবনির্ম্মিত বাড়ী, ঘর, পুস্তকাগার প্রভৃতি দেখাইতে লাগিলেন।

ভোলা ততক্ষণ বাহিরের ঘরে একা বসিয়া বসিয়া ছাদের কড়ি বরগাগুলা গণিয়া ফেলিল। হঠাৎ দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিল বছর পাঁচেকের একটি মেয়ে সকৌতুকে উঁকি মারিতেছে। ভোলা স্নেহপূর্ণস্বরে ডাকিল—এসনা খুকী! শুনিবামাত্র খুকী হাসির লহর তুলিয়া ছুটিয়া পলাইল এবং ক্ষণকাল পরেই আবার আসিয়া উঁকি মারিল। ভোলা পুনরায় আহ্বান করিল এবং খুকী সহাস্য দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। ভোলা বুঝিল যে, ইহা ধরা দিবার পূর্ব্বলক্ষণ; সে দ্বারের পাশে লুকাইয়া রহিল। এবার ধরা পড়িয়া খুকী আঁকিয়া বাঁকিয়া পলাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া অবশেষে কাঁদিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। তখন ভোলা তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া কৃত্রিম ক্রন্দনের অভিনয় আরম্ভ করিল। ক্রমে বালিকার মুখে হাসি ফুটিলে ভোলা আবার তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া কহিল—তোমার নামটি আমাকে বলবে না ত?

বালিকা কহিল—আমার নাম সুশীলা।

সুশীলা দিদির কন্যা। দেখিতে দেখিতে ভোলা-মামার সঙ্গে সুশীলার অত্যন্ত ভাব হইয়া গেল। সে তাহার খেলানার বাক্স আনিয়া তাহার যত কিছু সম্পত্তি ভোলা মামাকে দেখাইতে লাগিল। আরও কি কি খেলানা হইলে বাক্সটি পরিপূর্ণ হইতে পারে ভোলা-মামা তাহার একটা সুবৃহৎ তালিকা লইয়া, উপেনবাবুর মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া একাকী প্রস্থান করিল।

বাহির হইয়া কোমল কণ্ঠে ডাকিল—ভোলামামা! ও ভোলামামা! আমার খেলনা এনেছ?

বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া সস্নেহে হাসিতে গিয়া ভোলা মামার চোখ দুটো জলে ভরিয়া উঠিল। সে রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল—ভুলে গেছি; আর একদিন আন্‌বো।

ভোলা দ্রুত প্রস্থান করিল।

(৭)

নগেন দুই তিন দিনের জন্য বাসায় গিয়া উত্তীর্ণ বন্ধুদিগকে অভিনন্দন করিয়া এবং অনুত্তীর্ণদিগের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া আবার ভবানীপুরে ফিরিয়া আসিল। সেখানে নগেন সদ্য-পাশ-করা জামাতার মত অজস্র খাতির যত্ন উপভোগ করিতে থাকিল। দিদি তাঁহার কৃতী ভ্রাতার সহিত নির্ম্মলের বিবাহ দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন এবং দেশে পিতামাতার অনুমতি চাহিয়া পত্র লিখিলেন। উৎসাহটা একটু কমিলে বেচারা ভোলার কথা একবার দিদির মনে পড়িল। তিনি কহিলেন—হাঁারে নগেন, আমাদের উপকারীর খবর কি?

নগেন।—ক'দিন তার একটু একটু জ্বর হচ্ছে। আমি ওষুধ পত্তর জহরলালকে বুঝিয়ে দিয়ে এসেছি।

জহরলাল ভোলাদের বাসার ভৃত্য। নগেনের কথাটা নির্ম্মলের কানে গেল।

(৮)

সেদিন সন্ধ্যার সময় ভোলাদের বাসার দ্বারে একখানা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। রমেশ এবং কল্যাণী নামিয়া আসিয়া ভোলার ঘরে গিয়া দেখিল, সে একলা জ্বরে বেহুঁস হইয়া পড়িয়া আছে। ঘরে প্রদীপ জ্বলে নাই। রমেশ আলো জ্বালিল। জহরলালকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। আজ সকাল বেলা রমেশ ভোলার হাতে যে সোনার আংটী দেখিয়া গিয়াছিল তাহা নাই। টেবিলের উপর যে ঘড়িটা ছিল, তাহাও দেখা গেল না।

কল্যাণী ভোলার কপালে হাত দিয়া দেখিল, তাহা আগুনের মত উত্তপ্ত। ললাটে কোমল শীতল স্পর্শ অনুভব করিয়া ভোলা রক্তবর্ণ চক্ষু মেলিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। উন্মাদের মত শূন্য দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ কল্যাণীর দিকে চাহিয়া কহিল—ও! দিদি এসেছেন বুঝি! আপনার সুশীলা ভাল আছে? দেখুন সে আমাকে বড্ড ভালবাসে।

কল্যাণী উৎকণ্ঠিত মুখে রমেশের দিকে চাহিল। রমেশ তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া সাবধানে ভোলাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া কহিল—এ যে বিকারের লক্ষণ দেখ্‌ছি।

ভোলা কহিল—কে মশায় আপনি? জহরলালকে একবার ডেকে দিতে পারেন? জহরলাল! আরে এ জহরলাল! পাজি বেটা কানের মাথা খেয়েছ? ওরে, দিদি এসেছেন যে! আসনটাসন একখানা দেখে দে না বাবা! আর দেখ, আমার বাক্সটা থেকে—

ভোলা আবার নিঝুম হইয়া পড়িল। রমেশ কল্যাণীকে কহিল—তুমি একটু সাবধানে বসে থাক, ওঁকে উঠতে দিওনা। আমি ঝাঁ করে একজন ডাক্তার ডেকে আনি।

সাতদিন ধরিয়া যমের সহিত লড়াই করিয়া দম্পতি পরাজিত হইল।

* * * *

শুনা যায়, নির্ম্মল নাকি তাহার মাতা এবং দাদার নিকট চিরকুমারী থাকিবার অনুমতি চাহিয়াছে।

শ্রীক্ষেত্রমোহন সেন।

গৌড়ীয় শিল্পরীতি

বৈশাখের প্রবাসীতে ধীমান ও বীতপাল নামক শিল্পীদ্বয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলাম। আমি ভাবিয়াছিলাম যে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে "বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি" সারসত্য অনুসন্ধানের অনুরোধে, নূতন প্রমাণ আবিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত, ধীমান ও বীতপাল সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বিরত থাকিবেন। কিন্তু আষাঢ়ের প্রবাসীতে দেখিলাম যে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় আমার প্রবন্ধের বিরুদ্ধে কিছু লিখিয়াছেন।

আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমি এইমাত্র প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় গৌড়রাজমালার মুখবন্ধে ধীমান ও বীতপাল সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। মৈত্রেয় মহাশয় বলিয়াছেন
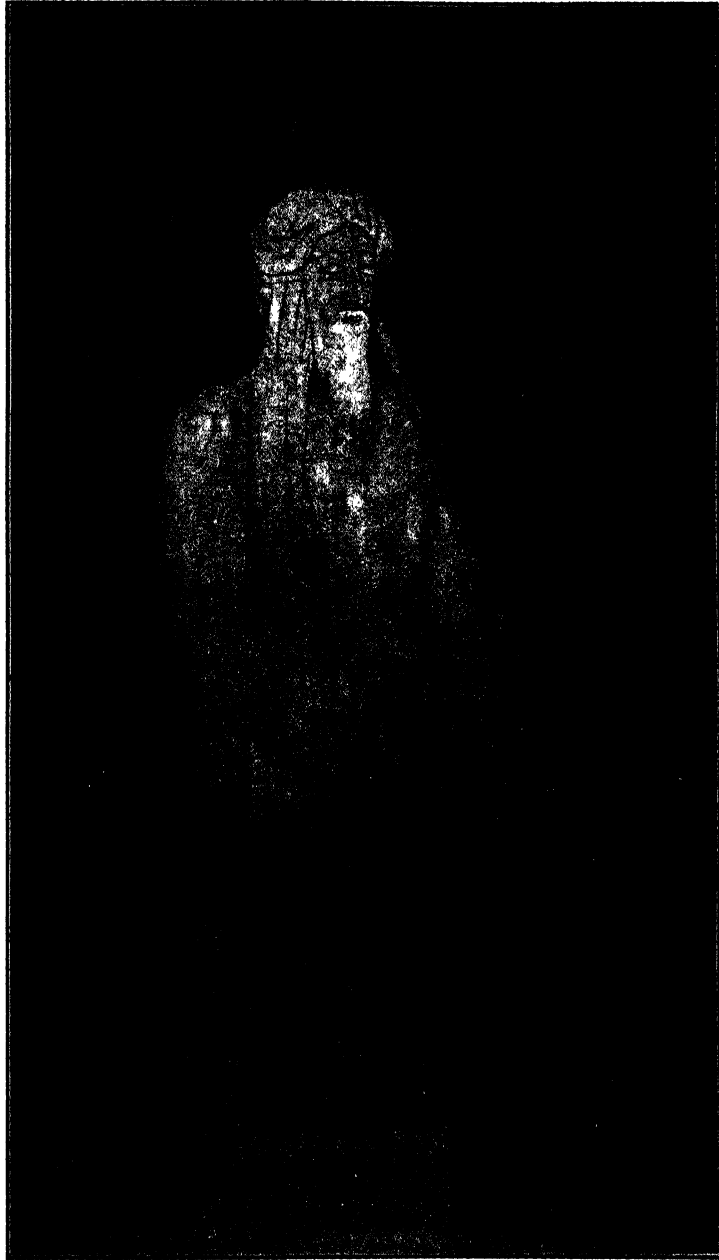
অন্ধ ফকির

চিত্রকর শ্রীযুক্ত দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের সৌজন্যে মুদ্রিত।

U. RAY & SONS.

"এই যুগে [ধর্ম্মপাল ও দেবপালের শাসনকালে] ধীমান এবং তৎপুত্র বীতপাল গৌড়ীয় শিল্পে যে অনিন্দ্যসুন্দর রচনাপ্রতিভা বিকশিত করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ শিল্পকলায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।"

ধীমান ও বীতপাল নামক শিল্পীদ্বয় গৌড়ীয় শিল্পে যে কোনও কালে "অনিন্দ্যসুন্দর রচনাপ্রতিভা বিকশিত করিয়াছিলেন," তাহার কি কোনও প্রমাণ আছে ? প্রমাণ একমাত্র তারানাথের উক্তি। স্বয়ং মৈত্রেয় মহাশয় ও তৎপরিচালিত "বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি" অদ্যাবধি ধীমান ও বীতপালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে অপর কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। পারিলে প্রতিবাদকর্ত্তা রমাপ্রসাদবাবু তাঁহার প্রবন্ধে নিশ্চয়ই উহার উল্লেখ করিতেন।

রমাপ্রসাদবাবু তাঁহার প্রবন্ধের একস্থানে বলিয়াছেন —"তারানাথের লেখার উপর নির্ভর করিয়া ধীমানকে পালযুগের শিল্পীগোষ্ঠীর ওস্তাদ বলিয়া স্বীকার করা যায় কিনা, তাহার বিচার করা যাক্।" আমার প্রবন্ধে আমি এই কথারই বিচার করিয়াছি। আমি উক্ত প্রবন্ধে ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে তারানাথের "ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইতিহাস" নামক গ্রন্থের সকল কথাই বিশ্বাসযোগ্য নহে। অদ্যাবধি যেসকল অকাট্য ঐতিহাসিক প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার উজ্জ্বল আলোকে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে তিব্বতদেশীয় ঐতিহাসিকের কতকগুলি উক্তি সত্য এবং কতকগুলি কাল্পনিক। তারানাথ বলিয়াছেন :—

১। গোপাল প্রজাবৃন্দ কর্ত্তৃক রাজা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। খলিমপুরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনেও এই কথা দেখিতে পাওয়া যায়।

২। গোপাল প্রথমে বাঙ্গালার রাজা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন অর্থাৎ বাঙ্গালাদেশ তাঁহার জন্মভূমি বা নিবাসক্ষেত্র। কমৌলীতে আবিষ্কৃত কামরূপরাজ বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে এবং সন্ধ্যাকরনন্দীবিরচিত রামপালচরিতে বরেন্দ্রদেশ পালরাজগণের পিতৃভূমি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

৩। ধর্ম্মপাল কামরূপ, গৌড়, তীরভুক্তি প্রভৃতি দেশ স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজ্য পূর্ব্বদিকে সমুদ্র পর্য্যন্ত, উত্তরে জলন্ধরের সীমা হইতে দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বতের পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; এই কথা খালিমপুরের তাম্রশাসন, ভাগলপুরে আবিষ্কৃত নারায়ণপালের তাম্রশাসন, প্রথম অমোঘবর্ষের একখানি অপ্রকাশিত তাম্রশাসন এবং মহেন্দ্রপালের তাম্রশাসন হইতে সত্য বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে।

কিন্তু তারানাথের ইতিহাসের কতকগুলি উক্তি যে একেবারে কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন ও বিশ্বাসযোগ্য নহে, তাহারও প্রমাণের অভাব নাই। নিম্নে আমি কয়েকটি উদাহরণ দিলাম :—

১। গোপালের পুত্রের নাম দেবপাল। ধর্ম্মপাল দেবপালের পৌত্র এবং তথা গোপালের প্রপৌত্র। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মপাল গোপালের পুত্র এবং দেবপাল ধর্ম্মপালের পুত্র। রমাপ্রসাদবাবুকেও এই স্থানে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে "এ কথা তাম্রশাসনে প্রদত্ত বংশাবলীর বিরোধী।"

২। যক্ষপাল রামপালের পুত্র এবং তিনি তাঁহার পিতার সহকারী ছিলেন। রামচরিতে রাজ্যপাল নামক গোপালের এক পুত্রের নাম আছে। যক্ষপাল নামক রামপালের কোনও পুত্র যে রামপালের জীবিতকালে, অথবা তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মদনপালের রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্বে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই, ইহা নিশ্চয়। কারণ যক্ষপাল রামপালের জীবিতকালে সিংহাসনে আরোহণ করিলে রামচরিতকার নিশ্চয়ই তাহার উল্লেখ করিতেন, এবং মদনপালের পূর্ব্বে যক্ষপাল সিংহাসন লাভ করিলে মনহলির তাম্রশাসনে নিশ্চয়ই তাঁহার উল্লেখ থাকিত। মদনপালের প্রশস্তিকায় যেসকল পালবংশীয় ব্যক্তিগণ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই নাম দিয়াছেন। যক্ষপাল নামে একজন রাজা রামপালের রাজত্বকালে অথবা তাঁহার কিঞ্চিৎপূর্ব্বে গয়ায় রাজত্ব করিতেন। কারণ তাঁহার পিতা বিশ্বরূপ, রামপালের পিতা তৃতীয় বিগ্রহপাল ও পিতামহ নয়পালের সমসাময়িক। এই যক্ষপাল পালবংশীয় নহেন, কারণ তিনি ব্রাহ্মণ। সুতরাং যক্ষপাল সম্বন্ধে তারানাথের উক্তি কাল্পনিক।

৩। তারানাথের ইতিহাসে পালরাজগণের যে নাম পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশ কাল্পনিক। আমার পূর্ব্ব-প্রবন্ধে তারানাথ-প্রদত্ত পালরাজগণের তালিকা উদ্ধৃত করিয়াছি। গোপালের পরে এবং রামপালের পূর্ব্বে পালরাজবংশে (১) রসোপাল, (২) মন্থরক্ষিত, (৩) বনপাল, (৪) শামুপাল (৫) শ্রেষ্ঠপাল, (৬) চণকপাল, (৭) বীরপাল (৮) অমরপাল, (৯) হস্তিপাল, (১০) শান্তিপাল প্রভৃতি যে দশজন রাজার নাম দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারা যদি পালবংশজাত হইতেন, এবং গোপাল ও রাম-পালের রাজত্বের মধ্যবর্ত্তী সময়ে গৌড়-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে মনহলির তাম্র-শাসনে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ থাকিত।

এখন আর বোধ হয় রমাপ্রসাদবাবু অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে তারানাথের ইতিহাসে বিশ্বাসযোগ্য এবং অবিশ্বাস্য, দুই শ্রেণীর কথাই আছে। যে গ্রন্থে সত্য এবং কাল্পনিক উভয় প্রকার উক্তিই আছে, সে গ্রন্থের কথা ইতিহাস রচনাকালে অতি সাবধানে গ্রহণ করা উচিত। বিশ্বাসযোগ্য অন্য প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত না হইলে এই শ্রেণীর গ্রন্থকারের অথবা গ্রন্থের উক্তি প্রকৃত ইতিহাসে সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। গোপালের নির্ব্বাচন, তাঁহার নিবাসক্ষেত্রের নাম, ধর্ম্মপালের রাজ্য বিস্তারের কাহিনী একাধিক তাম্রশাসন, শিলালিপি ও সম-সাময়িক গ্রন্থ দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে, সেই জন্যই এই-সকল কথা ঐতিহাসিক সত্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ধীমান ও বীতপালের নাম তারানাথ ব্যতীত কোনও শিলালিপি তাম্রশাসন বা সমসাময়িক গ্রন্থে পাওয়া যায় নাই। তারা-নাথের ধীমান ও বীতপাল সম্বন্ধে উক্তির সমর্থক কোনও প্রমাণ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। মৈত্রেয় মহাশয় এই সম্পূর্ণরূপ অবিশ্বাস্য গ্রন্থের প্রমাণ, অন্য প্রমাণ দ্বারা অসমর্থিত দেখিয়াও সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই গ্রন্থের প্রমাণের বলে ইতিহাস সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ইহাই আমাদিগের আক্ষেপের কারণ।

তারানাথের গ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোনও স্থানে ধীমান ও বীতপালের নাম পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না; সুতরাং ধীমান ও বীতপালের নাম বাঙ্গালা দেশের অথবা বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে স্থান পাইতে পারে না। প্রকৃত ইতিহাস কঠোর ও নিষ্ঠুর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠাপিত। প্রকৃত ইতিহাসের রাজ্যে বংশগরিমা, স্বজাতিপ্রিয়তা এবং local patriotism অর্থাৎ প্রদেশ-বৎসলতার স্থান নাই। রমাপ্রসাদবাবু বলেন যে তাঁহাদের কথা "*scientific induction*" অনুমোদিত। আমার বোধ হয় রমাপ্রসাদ বাবু বলিতে চাহেন যে তাঁহারা এই শিল্পীদ্বয় সম্বন্ধে যে উপসংহারে উপনীত হইয়াছেন তাহা *scientific method* অথবা *logical induction* অনুমোদিত। কারণ scientific induction বলিয়া কোনও কথা এ পর্য্যন্ত ইংরেজী, ফরাসী, জর্ম্মন বা ইতালীয় ভাষায় লিখিত কোনও ন্যায় বা দর্শন গ্রন্থে পাওয়া যায় নাই। সাধারণ ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিলে ইহার কোনও অর্থই উপলব্ধি হয় না। আমার বোধ হয় রমাপ্রসাদ বাবু দুইটা কথায় গোল করিয়া ফেলিয়াছেন (১) scientific method, এবং (২) logical induction.

এখন দেখা যাউক যে রমাপ্রসাদবাবু ও মৈত্রেয় মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তা ন্যায়ের অধিরোহণ প্রণালীর (logical induction) কতটা অনুমোদিত। কোনও সাধারণ তথ্যে উপনীত হইতে হইলে কয়েকটি বিশেষ তথ্যের সত্য নিরূপণ করিতে হয়। এই বিশেষ তথ্যগুলি যদি সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে সাধারণ তথ্যের সম্বন্ধে নিঃসন্দিহান হইতে পারি। কিন্তু এই-সকল বিশেষ তথ্যগুলির কোনটি যদি অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় তাহা হইলে আমাদের পূর্ব্বকথিত সাধারণ তথ্যও অপ্রামাণ্য হইবে। ধীমান ও বীতপাল সম্বন্ধে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির উক্তির বিশ্লেষণ করিলে আমরা এই বুঝি যে উক্ত সমিতি ধরিয়া লইয়াছেন যে তারানাথ যাহা গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য ও অকাট্য। কিন্তু ইহা pure assumption, logical induction নহে। এই সাধারণ তথ্যের বিরুদ্ধে আমি কয়েকটি প্রমাণ উপরে প্রদান করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে সত্য-মিথ্যায় মিশ্রিত তারানাথের উক্তিসমূহের ঐতিহাসিকের নিকট কোনও মূল্য নাই। আর যে ইতিহাস-প্রণেতা এই-সকল উক্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়া গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইবেন তাঁহার গ্রন্থ

সুলিখিত উপন্যাসসমূহের মধ্যে স্থান পাইতে পারে, কিন্তু উহা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (scientific method) অনুসারে লিখিত ইতিহাস আখ্যা পাইবে না।

রমাপ্রসাদ বাবু বলিয়াছেন, "তারানাথের গ্রন্থে গোপালের এবং ধর্ম্মপালের ইতিহাসের এতগুলি খাঁটি কথার উল্লেখ দেখিয়া অনুমান হয়—এই যুগের ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের কোনও নির্ভরযোগ্য আকর—কোনও গ্রন্থ বা লিপি—গ্রন্থ রচনার সময় তারানাথের হাতের কাছে ছিল। একখানি স্তম্ভলিপির আভাস তারানাথ স্বয়ংই দিয়াছেন। তিনি ধীমান ও বীতপাল সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অমূলক নাও হইতে পারে।" কিন্তু ইহাই কি বিজ্ঞানানুমোদিত তথ্যানুসন্ধান ? এইরূপ যুক্তির বিরুদ্ধে দার্শনিক লিউইস (G. H. Lewes) তাঁহার দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস (History of Philosophy) নামক গ্রন্থের উপক্রমণিকায় বলেন—

"To reach the unknown we must pass by the objective method through the avenues of the known ; we must not attempt to reach it through the unknown......The philosophical mind is very little affected by guarantees of respectability......In the delicate and difficult question of science *paroles d'honneur* have a quite inappreciable weight."

তারানাথ দুই তিন খানি অধুনা-লুপ্ত গ্রন্থ অবলম্বনে তাঁহার ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ইতিহাসেই এই-সকল গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই-সকল গ্রন্থ যে "ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের নির্ভরযোগ্য আকর" নহে তাহার প্রমাণ আমি পূর্ব্বেই দিয়াছি। এই গ্রন্থগুলি যদি অভ্রান্ত হইত তাহা হইলে দেবপাল কখনও ধর্ম্মপালের পিতামহ বলিয়া উল্লিখিত হইতেন না; এবং মহরক্ষিতের নাম পালরাজগণের তালিকায় স্থান পাইত না। তারানাথ খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর লোক, সুতরাং তিনি অষ্টম শতাব্দীর ইতিহাস রচনাকালে যে-সকল ভুল করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের স্মৃতিশক্তির অথবা পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির অভাবজনিত নহে, কারণ তিনি ত সমসাময়িক ঘটনার ইতিহাস লিখেন নাই। যে-সকল প্রমাণ বা ঐতিহাসিক গ্রন্থ অবলম্বনে তিব্বতদেশীয় ইতিহাসকার স্বীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এই-সকল ভুল সেই-সকল গ্রন্থ বা প্রমাণের ভুল। সমর্থনের উপায় না পাইয়া তারানাথ পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারগণের ভ্রমাত্মক উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তারানাথের গ্রন্থ রচনায় সময়ে যে-সকল উপাদান তাঁহার গোচর হইয়াছিল, সেগুলিকে "নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের আকর" বলিলে অথবা "অনুমান" করিলে ঐতিহাসিক সত্যের অবমাননা করা হয়। তারানাথের উপাদানসমূহ সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য ছিল না বলিয়াই যতদিন পর্য্যন্ত ধীমান ও বীতপালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আবার প্রমাণ আবিষ্কার না হয় ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের নাম বা বৃত্তান্ত প্রকৃত ইতিহাসে স্থান পাইতে পারে না। "যিনি ধর্ম্মপালের খালিমপুরের তাম্রশাসন আবিষ্কারের পূর্ব্বে আমাদিগকে গোপালের নির্ব্বাচনের কথা শুনাইয়াছিলেন, এবং নারায়ণ পালের ভাগলপুরের তাম্রশাসন আবিষ্কারের পূর্ব্বে চক্রায়ুধের কথা শুনাইয়াছিলেন" সেই তারানাথই ধর্ম্মপালকে দেবপালের পৌত্র এবং মহরক্ষিতকে দেবপালের পরবর্ত্তী গৌড়েশ্বর বলিয়া তাঁহার ইতিহাসের সত্যমূলাভাব প্রমাণ করিয়াছেন, সুতরাং "সেই তারানাথের কথার অনুসরণ করিয়া" "গৌড়ীয় শিল্পরীতির জন্মস্থান ধীমান ও বীতপালের কারখানা" এইকথা "আপাতত" বলাও "বিজ্ঞানসম্মত" ঐতিহাসিক রচনা-প্রণালীর বিরুদ্ধ।

রমাপ্রসাদবাবু অনুগ্রহ করিয়া আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন, কারণ আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম "বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি স্থির করিয়াছেন যে তাঁহাদের সংগৃহীত মূর্ত্তিসমূহের মধ্যে ধীমান-নির্ম্মিত কতকগুলি প্রস্তর-মূর্ত্তি আছে।" রমাপ্রসাদবাবু বলেন, "এখানে আছে, ১১, ১৪, ৩৪ এবং ৯৫ নং মূর্ত্তি 'নির্ব্বিবাদে' (safely) ধীমান অথবা তাঁহার নিজ শিষ্যগণের নির্ম্মিত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে (may be attributed); সুতরাং বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি কোনও মূর্ত্তি 'ধীমান-নির্ম্মিত মনে করিয়াছেন' একথা বলা ঠিক হয় নাই।"

"নির্ব্বিবাদে ধীমান অথবা তাঁহার নিজ শিষ্যগণের নির্ম্মিত" বলিলে বুঝিতে হইবে যে হয় "মূর্ত্তিগুলি ধীমান-

নির্ম্মিত", না হয়, "ধীমানের নিজ শিষ্যগণের নির্ম্মিত"; সুতরাং "বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি তাঁহাদের সংগৃহীত মূর্ত্তিগুলির মধ্যে ধীমান-নির্ম্মিত কতগুলি প্রস্তরমূর্ত্তি আছে স্থির করিয়াছেন" এইকথা বলায় যে কি দোষ হইয়াছে তাহা পাঠকবর্গের বিচার্য্য। "...No 5, 11, 14, 34, 95 and 99...may be safely attributed to Dhiman" এই কথা, এবং "বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি" ১১, ১৪, ৩৪, ৯৫ ও ৯৯ সংখ্যক মূর্ত্তি ধীমান-নির্ম্মিত মনে করিয়াছেন, এই কথায় কতটুকু প্রভেদ আছে, পাঠকবর্গের বিচার্য্য। আমি ইচ্ছা করিয়াই 'followers' কথাটার উল্লেখ করি নাই। কারণ, যখন ধীমানের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই, তখন তৎপ্রতিষ্ঠিত শিল্পীগোষ্ঠীর অস্তিত্ব কেমন করিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে?

রমাপ্রসাদ বাবু লিখিয়াছেন "উক্ত পাঁচটি মূর্ত্তি যে অভিনব শিল্পরীতির উদ্ভাবনকারী ওস্তাদের বা তাঁহার শিষ্যগণের তৈয়ারী বলিয়া মনে হয় না, স্বচক্ষে না দেখিয়া কলিকাতায় বসিয়া, সুরেন বাবু কি প্রকারে যে স্থির করিলেন তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।" রমাপ্রসাদ বাবু অনুগ্রহ করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীর ২৯৮ পৃঃ পাঠ করিলে কারণ দেখিতে পাইবেন।

"বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি যে কয়টি মূর্ত্তি ধীমান-নির্ম্মিত মনে করিয়াছেন, তাহার কোনটিতেই খোদিত লিপি নাই। থাকিলে তালিকায় অবশ্যই তাহার উল্লেখ থাকিত।"

খোদিত লিপির অভাবে কোনও মূর্ত্তির কাল নির্দ্দেশ করা সম্ভবপর নহে। ভারতবর্ষে নির্ম্মাণপদ্ধতি (technique) দেখিয়া কাল নির্দ্দেশ করিবার সময় এখনও আসে নাই। যাঁহারা এই কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারাই লাঞ্ছিত হইয়াছেন। সত্য বটে, য়ুরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ নির্ম্মাণকৌশল দেখিয়া প্রাচীন গ্রীক মূর্ত্তির কাল নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে খোদিতলিপিযুক্ত অথবা শিল্পী কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত মূর্ত্তির নির্ম্মাণকৌশল শতাব্দী কাল ধরিয়া বিশ্লেষণ করিয়া, বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে রচিত ইতিহাস অবলম্বন করিয়া তবে কোনও শিল্পীর মূর্ত্তি দেখিয়া কাল নির্দ্দেশের কার্য্যে সক্ষম হইতে হইয়াছে। তথাপি এই রীতি এখনও বিশেষজ্ঞগণের নিকট সহজ বলিয়া মনে হয় না। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি কোন্ রীতি অবলম্বনে উক্ত পাঁচটি মূর্ত্তি ধীমান অথবা তাঁহার নিজ শিষ্যগণের নির্ম্মিত বলিয়া নির্ব্বিবাদে মনে করা যাইতে পারে স্থির করিলেন, এবং কেমন করিয়া এই মূর্ত্তিগুলির কাল নির্দ্দেশ করিলেন, তাহা জানাইলে বোধ হয় জনসাধারণের উপকার হইত। এবং মূর্ত্তিগুলির চিত্র প্রকাশ করিয়া বিদেশীয় অনুসন্ধিৎসুগণের আলোচনার পথ প্রশস্ত করিয়া দিলে যে উদারতা হইত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

রমাপ্রসাদ বাবুর প্রবন্ধের সহিত যে চর্চ্চিকাদেবীর মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার নির্ম্মাণ-কৌশল অট্টহাসে আবিষ্কৃত দেবীমূর্ত্তির কলাকৌশল অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের রচিত "বর্দ্ধমানের ইতিকথার" সহিত অট্টহাসের মূর্ত্তির একটি ক্ষুদ্র চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে; পাঠকবর্গ এই মূর্ত্তিদ্বয়ের চিত্র তুলনা করিয়া দেখিলেই আমার উক্তির যাথার্থ্য অনুভব করিতে পারিবেন। তারপর প্রতিবাদকর্ত্তা রাজসাহীতে বসিয়া, মূর্ত্তির চিত্র পর্য্যন্ত না দেখিয়া, কি করিয়া ইহাকে চর্চ্চিকামূর্ত্তি বলিয়া স্থির করিয়া ফেলিলেন, তাহা সমস্যা বটে।

রমাপ্রসাদ বাবু বলিয়াছেন "এই সিদ্ধান্তও আমরা চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া ধরিয়া থাকিতে চাই না"। তাঁহাকে কি বলিয়া দিবার প্রয়োজন আছে যে অপরাপর বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তসমূহের ন্যায় ইতিহাসের কোনও সিদ্ধান্ত চরম হইতে পারে না, অতএব রমাপ্রসাদ বাবুর সে কথা বলাই বাহুল্য। তাঁহাদের বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত যে বিজ্ঞানসম্মত নহে তাহা আমি আমার পূর্ব্বপ্রবন্ধে এবং এই বর্ত্তমান প্রবন্ধে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। রমাপ্রসাদ বাবু বলেন "তিনি (তারানাথ) ধীমান ও বীতপাল সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা অমূলক নাও হইতে পারে।" কিন্তু যতটা পরিমাণ বল তিনি সংগ্রহ করিয়া বলিতে পারিয়াছেন যে তারানাথের উক্তিসকল "অমূলক নাও হইতে পারে," ঠিক ততটা জোরের সহিত আমরা বলিতে পারি যে উহা অমূলক হইলেও হইতে পারে। যাহা হউক, রমাপ্রসাদ বাবুর ন্যায় ঐতিহাসিকের নিকট এরূপ কথার প্রত্যাশা করি নাই।

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি তাঁহাদের Guide Bookএর অপর একস্থানে লিখিয়াছেন:—

"We have to look to Varendra for the fountain-head of Mediaeval art in Northern India."

বলা বাহুল্য যে ইহা ঐতিহাসিকের কথা নহে। ভিন্সেণ্ট স্মিথের A History of Fine Art in India and Ceylon অসম্পূর্ণ গ্রন্থ—ইহাতে গুপ্তাধিকার ও পরবর্ত্তী কালের সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক বিবরণ নাই। উত্তরাখণ্ডের শিল্পেতিহাসের বিস্তৃত বিবরণ এখনও লিখিত হয় নাই। মৈত্রেয় মহাশয় কিন্তু পরম নিশ্চিন্তমনে তারানাথের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া বলিয়া ফেলিলেন যে বরেন্দ্রমণ্ডলে ধর্ম্মপাল ও দেবপালের রাজ্যকালে জন্মগ্রহণ করিয়া ধীমান ও বীতপাল "গৌড়ীয় শিল্পে অনিন্দ্যসুন্দর রচনা-প্রতিভা বিকশিত করিয়াছিলেন"। ইহাই কি বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস-রচনা-প্রণালী? ইহা আর যাহাই হউক, ইতিহাস নহে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার।

এই বিষয়ে আর কোন বাদপ্রতিবাদ "প্রবাসীতে" মুদ্রিত হইবে না।—সম্পাদক।

রুদ্রকান্ত

(প্রবাসীর ষষ্ঠ পুরস্কার প্রাপ্ত গল্প)

খুব সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিবার কোন উৎসাহ না থাকিলেও, সংসারে সচরাচর সংঘটিত ব্যাপারগুলা রুদ্রকান্ত নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সহিত উড়াইয়া দিয়া নিরুদ্বেগে দিন কাটাইবার পাত্র ছিল না। বাল্যকালে পিতৃ-মাতৃবিয়োগ হওয়ায়, আযৌবন মাতুলের অনুগ্রহে যত্নে লালন পালন হইলেও তাহার স্বভাবের নিজস্ব তেজটুকু নির্জ্জীব হীনতার মাঝে মোটেই ডুবিয়া যায় নাই। অবশ্য পরান্নভোজী জীবের স্বাতন্ত্র্যের স্পর্দ্ধা জগতের চক্ষে কখনই মার্জ্জনীয় নহে, রুদ্রকান্তকেও বড় একটা কেহ সন্তোষের দৃষ্টিতে দেখিত না; যাহারা মুখের উপর বলিতে পারিত না, তাহারা অন্তরালে, এবং যাহারা স্পষ্টাক্ষরে বলিবার ক্ষমতা রাখে, তাহারা সুবিধামত ঠারে ঠোরে সে কথাটা তাহাকে অনেকবার বুঝাইবার চেষ্টা করিত, কিন্তু পরিণামে রুদ্রকান্তের অবজ্ঞা ও একগুঁয়েমির সীমা উর্দ্ধে উঠা ছাড়া কোন বিশেষ ফল হইত না। আর মাতুলও তাহাকে যথার্থ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন।

ভয়ের শাসন নামক বস্তুটা একেবারে রুদ্রকান্তের প্রকৃতির অভিধানবহির্ভূত জিনিস, অথচ কেহ তোষামোদ করিয়াও কখনো তাহাকে একটা কাজ করাইতে পারে নাই। তাহার চরিত্রে এমনি একটা কঠিন দৃঢ়তা ছিল, যে, নিতান্ত অভাবে পড়িয়াও একটি ক্ষুদ্র 'হাই'ও সে বাজে খরচ করিবার পাত্র ছিল না। যেখানে কাজ, রুদ্রকান্ত ঠিক প্রয়োজনের মুহূর্ত্তে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইত, কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে প্রয়োজন ফুরাইত, তাহার পর-মুহূর্ত্তে আর কেহ তাহাকে ত্রি-সীমানার মধ্যে খুঁজিয়া পাইত না; বিপন্নের সহিত অতি অক্লেশে খুব অন্তরঙ্গতা পাতাইয়া ফেলিত, একটি নিমেষে,—কিন্তু দায় উদ্ধারের পরদিবস কত-সময় তাহার নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইত; তাহার প্রকৃতির এমনিই আশ্চর্য্য বিশেষত্ব ছিল যে, কোন কাজের পরিণামে কেহ কখনো তাহাকে আনন্দ বা অনুতাপ করিতে দেখে নাই। যে বিষয়ে সে মনোযোগ করিত, সেটায় যদি উৎসাহ পাইত তাহা হইলে সমান তালে বেশ সাধারণ ভাবে চলিত; কিন্তু যদি বাধা হইত, তাহা হইলে অন্ধ জেদে, উত্তেজিত হইয়া সেইটার সংসাধনে লাগিয়া পড়িত।

বাল্যকালে গ্রাম্য পাঠশালায়, বুদ্ধি সম্বন্ধে নীরিহ এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে উদ্ধত কয়েকটি মাত্র সহাধ্যায়ীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মারামারিতে ছাড়া, বিশেষ কোনই কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই। কিন্তু যখন দশ বৎসর বয়সে মাতুলের অনুগ্রহে জেলা স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ছত্রিশ জন বালকের নীচে ক্রমিক সংখ্যানুসারে স্থান লাভ করিয়া প্রবিষ্ট হইল, তখন তাহার এমনি নিষ্করুণ রোক চাগিয়া উঠিল যে, গভীর গ্রীষ্মে, ঘোরতর বর্ষায়, ও নিদারুণ শীতে, শরীর সম্বন্ধে লেশ মাত্র আরাম উপভোগের অবসর না রাখিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এরূপে প্রস্তুত হইল যে, বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলে দেখা গেল, যে, ছত্রিশ জনের মধ্যে সেই প্রধান হইয়াছে। এইরূপে বৎসর বৎসর প্রতি শ্রেণীতে অবাধে উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভে কুড়ি বৎসর বয়সে যখন সে পরিচিত আত্মীয় বন্ধুগণের শ্রদ্ধা সম্ভ্রম ও ইতর

সাধারণের ভক্তি-মিশ্রিত ভয় উৎপাদন করিয়া সসম্মানে বিএ পাশ করিয়া ফেলিল, তখন তাহার ভাগ্যলক্ষ্মী, বোধ হয় অতিরিক্ত স্তুতিবাদের সংঘাতে, অকস্মাৎ বিমুখ হইয়া বসিলেন।

রুদ্রকান্তের অভিভাবক মাতুল সারদাপ্রসন্ন বসু মহাশয় তালুকদার মানুষ; সুতরাং আইন-ব্যবসায়ই তাঁহার চক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা মনুষ্যত্বের পরিচায়ক বিদ্যা। কাজেই তিনি ভাগিনাকে অতঃপর আইন অধ্যয়ন করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু ভাগিনা রুদ্রকান্ত অত্যন্ত দৃঢ় অথচ পরিষ্কার ভাবে লিখিয়া পাঠাইল, যে, বাক্য বিক্রয় করিয়া জীবিকা অর্জ্জন তাহার মত ক্ষুদ্রপ্রকৃতি লোকের সম্ভবপর নহে, বরং এম্‌এ পাশ করিয়া অধ্যাপনার কার্য্যে ব্রতী হওয়াই তাহার পক্ষে বাঞ্ছনীয় পথ। মাতুল একটু উষ্ণ হইয়া তাহাকে জেদ ত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন। রুদ্রকান্ত রুষ্ট হইয়া পত্রের জবাব দিল না।

সেই সময় আর-একটি ঘটনা ঘটিল। রুদ্রকান্তের পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়ার সংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইলে, রুদ্রকান্তের পৈত্রিক বাসস্থান তাবিজপুরের জমিদার বক্রেশ্বর বসু, কন্যার সহিত রুদ্রকান্তের সম্বন্ধ স্থির করিবার জন্য, সারদা বাবুর নিকট অবিলম্বে ঘটক পাঠাইলেন।

দুর্দ্ধর্ষপ্রতাপ জমিদারকে বৈবাহিক সূত্রে সখ্য-বন্ধনে আবদ্ধ করিতে সারদাবাবুর অবশ্য বিশেষ রকম আগ্রহ থাকিতে পারে, কিন্তু রুদ্রকান্ত সে সম্বন্ধে একেবারে সম্পূর্ণ উদাসীন; সে মাতুলের উচ্চ বংশের সহিত কুটুম্বিতার সাধ, এবং আপনার ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের আশ সম্বন্ধে বিশদ বর্ণিত পত্রের উত্তরে বাটী ত আসিলই না, পরন্তু যথেষ্ট সম্মানের সহিত মাতুলকে প্রণাম নিবেদন করিয়া অত্যন্ত সংক্ষেপে, সোজা কথায়, সেই লোভনীয় সম্বন্ধ সম্বন্ধে এমনি গুটিকতক কথা লিখিল, যাহাতে সারদা বাবু বক্রেশ্বর বাবুর প্রস্তাবিত বিষয়ে একেবারে নিরুত্তর হইয়া গেলেন, ও অকৃতজ্ঞ অবাধ্য ভাগিনেয়ের সহিত পত্রালাপ বন্ধ করিলেন।

এই সামান্য ঘটনাটির সূত্র ধরিয়া মাতুল ও ভাগিনেয়ে, জমিদার ও তালুকদারে রীতিমত মনান্তর হইয়া গেল। উদ্ধত অভিমানী রুদ্রকান্ত এই ব্যাপারে আপনার শিক্ষার সহিত স্নেহময় পরাঙ্মুখবর্ত্তিতার দৈন্য অকস্মাৎ তীব্ররূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া পড়াশুনা সব বন্ধ করিল। কলিকাতায় পড়িতে গিয়া অবধি সে বরাবরই মাতুলের ব্যয় লাঘবের জন্য টিউশনী করিয়া পড়ার খরচ অর্দ্ধেক জুটাইয়া লইত, এবং ইচ্ছা করিলে বাকী অর্দ্ধেক খরচ সংগ্রহ করা তাহার মত পরিশ্রমী উদ্যমশীল লোকের পক্ষে অসম্ভব ছিল না; কিন্তু রুদ্রকান্ত কিছুই করিল না। মাতুলের সহিত মতদ্বৈধ হওয়ায় তাহার অন্তরে কেমন একটা নিগূঢ় অভিমানের বেদনা সঞ্চারিত হইয়াছিল। তাহাতে সে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে লেশমাত্র দ্বিধা সংশয় না করিয়া,—তাবিজপুরের নিকটস্থ শান্তিপুর গ্রামে গবর্ণমেণ্টের স্থাপিত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের তৃতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া পৈত্রিক ভদ্রাসন পুনঃসংস্কৃত করিয়া বসবাস আরম্ভ করিল, মাতুলালয়ে গেল না, শুধু পত্র দ্বারা মাতুলকে সংবাদটা জ্ঞাপন করিতে হয় তাই করিল। মাতুল পত্রের উত্তর দিলেন না, রুদ্রকান্তও আর পত্র লিখিল না।

রুদ্রকান্ত দিবসে বিদ্যালয়ের কাজ করিত এবং রাত্রে বাটীতে একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া স্বয়ং বিনা বেতনে গ্রামস্থ ইতর ভদ্র নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর বালক-বালিকাদিগকে পাঠাভ্যাস ব্যতীতও মুখে মুখে নানা বিষয় শিক্ষা দিত; অবসর-কালে, গ্রামস্থ সকল সম্প্রদায়ের সহিত মিশিয়া তাহাদের অভাব অভিযোগের তত্ত্ব লইয়া অর্থে সামর্থ্যে যথাসাধ্য প্রতিকারের চেষ্টা করিত। নির্ব্বিচারে পীড়িতের সেবা, মৃতের সৎকার ও দরিদ্রের অন্নসংস্থানের চিন্তায় তাহার সমস্ত সময় কাটিয়া যাইত।

ওদিকে জমিদার বক্রেশ্বর বাবু একটা খুব বড় রকমের প্রতিশোধের চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু দিন কতকেই এই স্পষ্টবক্তা, নির্ভীক, সাধারণের প্রিয়পাত্র যুবাটির আপনার শত সহস্র অসুবিধা উৎপীড়নের প্রতি নির্দ্দয় তাচ্ছিল্য দেখিয়া একটু বিস্মিত ও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন—তিনি বুদ্ধিমান লোক, বুঝিলেন শিক্ষিতের সহিত তুচ্ছ ছুতায় বিবাদ বাঁধান, বা নির্য্যাতন করা সম্ভবপর নহে; তিনি সময়ের প্রতীক্ষায় রহিলেন। ওদিকে একরোখা রুদ্রকান্ত কুমীরের সহিত বিবাদ করিয়া জলে বাস নামক প্রচলিত প্রবাদটা যতই স্মরণ করিতে লাগিল, ততই সেটাকে ব্যর্থ করিবার জন্য তাহার জেদের দৃঢ়তা বাড়িতে লাগিল।

এইরূপে বৎসরাবধি কাটিয়া গেল। অকস্মাৎ রুদ্রকান্তের মাতুল মৃত্যুরোগে পীড়িত হইলেন। সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র কঠোরপ্রকৃতি রুদ্রকান্ত বিনা দ্বিধায় অযাচিত ভাবে আসিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত মাতুলের প্রাণপণ সেবা শুশ্রূষা করিল। মাতুল মৃত্যুকালে তাহাকে অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়া অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রগণের বিষয় সম্পত্তি সমস্ত তত্ত্বাবধানের ভার একমাত্র রুদ্রকান্তের উপর দিয়া গেলেন।

শ্রাদ্ধান্তে মাতুলানীর সস্নেহ অনুরোধ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করিয়া রুদ্রকান্ত নিজালয়ে চলিয়া গেল, এবং শিক্ষকতার সহিত সমস্ত নিয়মিত কর্ম্মের পর রাত্রি জাগিয়া এমএ পরীক্ষার জন্য পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিল। বৃদ্ধাবস্থায় প্রবল ব্যাধি বলিয়া বন্ধুগণ পরিহাস করিল, রুদ্রকান্ত কোন উত্তর দিল না।

মাস ছয়ের পরে সে এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিল,—আত্মীয় স্বজন কাহাকেও কিছু না বলিয়া বিনা আড়ম্বরে, গ্রামস্থ মুমূর্ষু দরিদ্র বিধবার অরক্ষণীয়া কন্যাকে বিবাহ করিয়া শূন্য গৃহে লইয়া আসিল। বিধবার মৃত্যু হইল বিবাহের পরদিনই। মৃত্যুকালে পরিপূর্ণ শান্তিতে জামাতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। অবশ্য এই বিবাহ-ব্যাপার লইয়া চারিদিকে একটা প্রবল ছিছিক্কারের ঢেউ উঠিল, কিন্তু রুদ্রকান্ত চিরদিন যেমন নিঃশব্দে মানুষের রসনা-উৎসৃষ্ট কুৎসা নিন্দা অগ্রাহ্য করিয়া আসিয়াছে, এবারেও তাহাই করিল।

ওদিকে রুদ্রকান্তের বিবাহের দিন পনের পরেই জমিদার বক্রেশ্বর বাবু অন্যগ্রামের এক বর্দ্ধিষ্ণু জমিদারের এক আকাট মূর্খ পুত্রের সহিত অন্যতমা কন্যার প্রচুর ধুমধাম করিয়া বিবাহ দিলেন, এবং গ্রামস্থ সকলেই উৎসবে নিমন্ত্রিত হইল, বাদ পড়িল শুধু রুদ্রকান্ত মিত্র।

মাস কয়েক পরেই এক নিঃস্ব নির্ব্বান্ধব সমাজত্যক্ত চণ্ডালের মৃতদেহ বহন ও দাহন করার অপরাধে রুদ্রকান্ত সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে নিষ্ঠুররূপে সমাজত্যক্ত হইল, এবং প্রতিবাসী যুবকেরা তাহার বৈঠকখানায় পান তামাকের ধ্বংস ও পাড়ার ব্যাঘাত করিতে আসা বন্ধ করায় রুদ্রকান্ত সমাজকে ধন্যবাদ দিয়া অত্যন্ত আরাম অনুভব করিল। কিন্তু গৃহের অভ্যন্তরের অবস্থা হইল ঠিক তদ্বিপরীত, দাসী গৃহকার্য্য করিতে আসিল না, পরিশ্রমী পত্নী সুষমার তাহা গায়ে লাগিল না বটে, কিন্তু প্রতিবেশিনী মহিলাবৃন্দের কোলাহলময় সংসর্গ হইতে সে যে কিরূপ নির্দ্দয়রূপে বঞ্চিত হইল, সে কথা স্মরণ করিয়া সে রুদ্রকান্তকে কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিল না, রুদ্রকান্ত বাড়ী ঢুকিতেই, ছলছল নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া বলিল "একি হলো ?—"

রুদ্রকান্ত নিঃসঙ্কোচে হাসিয়া বলিল "অন্ততঃ পরচর্চ্চা পরকুৎসায় তোমার সময়ের বাজে-খরচটা বন্ধ হলো, এবার নিশ্চিন্দি হয়ে পড়াশুনো কর !"

সুষমা কিন্তু একথায় মোটেই আশ্বস্ত হইতে পারিল না। রুদ্রকান্ত স্কুলে চলিয়া গেলে মৃতা জননীকে স্মরণ করিয়া সে খুব এক প্রস্থ কাঁদিয়া লইল। যথাসময়ে রুদ্রকান্ত বাটী আসিয়া, তাহাকে মৃদু ভৎর্সনার সহিত অল্প বিস্তর সান্ত্বনা দিল, এবং তাহার পরদিনই সেই মৃত চণ্ডালের নিঃসন্তান বিধবা পত্নীকে আনিয়া মাতৃ সম্বোধনে অনুগত করিয়া বাটীতে স্থান দিল। সুষমা রাগে জ্বলিয়া কহিল,—"তোমার কি সবই গোঁয়ারতুমি ?"—

রুদ্রকান্ত হাসিয়া বলিল "আগা গোড়া।—কিন্তু তোমার একটু কাজ করতে হবে, বেচারীকে দুপুর বেলা মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব একটু একটু পড়ে শুনিও, মানে বুঝিয়ে দিও,—বুঝ্‌লে !"

প্রতিবেশিনীদিগের পরচরিত্র-সম্বন্ধীয় অন্ধচর্চ্চা-সমিতি-গঠিত মন্তব্য অনুসারে সুষমা বলিল "তোমার যত ছোট-লোক নিয়ে কারবার—ভদ্রলোকের সঙ্গে মিশ্‌তে পার না ?"

রুদ্রকান্ত নিরুদ্বেগে বলিল "ভদ্রদের সঙ্গে মেশ্‌বার ঢের লোক আছে, এদের খোঁজ নেবার কিন্তু কেউ নেই !"

সুষমা আর কথা কহিল না। সযত্নে শোকসন্তপ্তা চণ্ডালবধূকে নানারূপ সান্ত্বনা দিয়া দীর্ঘ দ্বিপ্রহর ধরিয়া মহাভারত পড়িয়া তাহাকে অনেক সদুপদেশ দিল। বৈকালে রুদ্রকান্ত বাড়ী আসিয়া পাঠাগারে সুষমার ক্ষুদ্র শেল্‌ফের উপর হইতে একেবারে তাহার টেবিলে হার্বার্ট স্পেন্সারের উপর মহাভারতখানি স্পষ্ট বিদ্রূপের বেশে বিরাজমান দেখিয়া একটু হাসিল।

(২)

যথাসময়ে স্কুলের কর্ম্মে ছুটি লইয়া রুদ্রকান্ত কলিকাতা গিয়া যথাবিহিত বিধানে পরীক্ষা দিয়া যেদিন বাটী ফিরিল, তাহার পরদিন প্রাতঃকালে ওপাড়ার তিনুশেখ আসিয়া কাঁদিয়া বলিল, রুদ্রকান্তের অনুপস্থিতিকালে জমিদারের কোপে তাহার সর্ব্বনাশ হইতে বসিয়াছে,—তাহার বাটীর প্রবেশপথে সরকারী সঙ্কীর্ণ রাস্তায় দুই তিনটি বিস্তৃতশাখা নারিকেল-গাছ জন্মিয়া পথটি চলাচলের পক্ষে অত্যন্ত অপরিষ্কার করিয়া তুলিয়াছিল বলিয়া, সেগুলি সে প্রায় পাঁচমাস পূর্ব্বে কর্ত্তন করিয়া দিয়াছিল; এখন জমিদার বক্রেশ্বর বসু সেই তুচ্ছসূত্র ধরিয়া মামলা বাঁধাইয়া তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিবার উপক্রম করিয়াছেন। এমন কি স্ত্রীলোকদের পর্য্যন্ত সম্ভ্রম রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিয়াছে!

রুদ্রকান্ত তখনি তাহার সহিত ঘটনাস্থলে গিয়া স্বচক্ষে সব দেখিয়া এবং তাহার মুখে জমিদারের অন্যায় অত্যাচারের কাহিনী সব শুনিয়া অত্যন্ত উষ্ণ হইয়া উঠিল, এমন নরাধম উচ্চ লোকদের কাছে স্তুতি মিনতির সহিত মামলা তুলিয়া লইবার অনুরোধ করার কল্পনার বিরুদ্ধে তাহার চিত্ত একেবারে উদগ্র হইয়া বাঁকিয়া বসিল। রুদ্রকান্ত সজোরে তিনুশেখকে জিজ্ঞাসা করিল,—"সাক্ষী আছে কে?"

তিনুশেখ বলিল তাহার মাতুল জমিদারের নায়েব নসীরুদ্দীন শেখ একজন, দ্বিতীয় ব্যক্তি জমিদারেরই অনুগ্রহ-পালিত ব্যবসাদার সাক্ষী।

নসীরুদ্দীন শেখকে রুদ্রকান্ত বিশেষভাবে চিনিত, এক সময় সে তাহার মাতুলের নিকটই গোমস্তা ছিল, এখন কর্ম্মদক্ষতার গুণে বক্রেশ্বর বসুর সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারীরূপে পরিগণিত হইয়াছে। নসীরুদ্দীন লোকটির বয়স হইয়াছে, এবং সকল দিকে একরকম শান্ত শিষ্ট বুদ্ধিমান হইলেও প্রজা পীড়নের কার্য্যে একেবারে নির্ম্মমরূপে ধর্ম্মহীন,—এ স্বভাব অনেকটা প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্যও বটে।

রুদ্রকান্ত তৎক্ষণাৎ সেই বেশে দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে লাঙ্গল-কর্ষিত উত্তপ্ত মাঠ অতিক্রম করিয়া তিনুশেখকে সঙ্গে লইয়া তাবিজপুরের জমিদারী কাছারীতে গিয়া উপস্থিত হইল।

দ্বারে ঝাঁকড়া-কোঁকড়া চুলো গালপাট্টা-বাঁধা নিটোল-মসৃণ-কৃষ্ণকান্তি বাগ্দী জাতীয় নগ্দীর দল অতিক্রম করিয়া সবেগে কাছারীর মধ্যস্থলে গিয়া রুদ্রকান্ত দাঁড়াইল। জমিদার বাবু তখন স্নানাহারে উঠিয়া গিয়াছেন, নায়েব গোমস্তার দল তল্পীতল্পা গুটাইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে।

হাতকাটা লংক্লথের মেরজাই গায়ে নায়েব নসীরুদ্দীন শেখ শট্‌কা টানিতেছিলেন, এবং নিকটে মাসিক ৬ টাকা মাহিনার আলবার্ট-টেড়ি-কাটা আদ্দির-পাঞ্জাবী-গায়ে ফিতা-পেড়ে-ধুতি-পরণে সদ্গোপ জাতীয় এক ছোকরা গোমস্তা কি একটা রেজেষ্ট্রী দলিল অত্যন্ত দ্রুতস্বরে পড়িয়া শুনাইতেছিল। ময়লা-জুট্‌ফ্লানেলের-কামিজ-গায়ে, চটি-পায়ে শুষ্ক-কঠোর-মূর্ত্তি রুদ্রকান্ত অকস্মাৎ সামনে আসিয়া দাঁড়াইতে নসীরুদ্দীনের শট্‌কা স্তব্ধ হইয়া গেল, বিস্মিত হইয়া বলিলেন "একি?"

রুদ্রকান্ত ভূমিকা মাত্র না করিয়া একেবারে পার্শ্ববর্ত্তী তিনুশেখকে টানিয়া সামনে আনিয়া দৃঢ়স্বরে—অনুরোধ নয়—স্পষ্ট আদেশ করিল—"দরিদ্রকে উৎপীড়ন করিলে চলিবে না, অন্যায় মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিওনা।"

মলিনবেশী অপরিচিত লোকটির অপরিসীম ধৃষ্টতায় আশ্চর্য্য হইয়া ছোক্‌রা গোমস্তাটি দ্রুত রুক্ষস্বরে শুধাইল, "তুমি কেহে? পাগল নাকি?"

রুদ্রকান্ত তাহার প্রতি-দৃকপাত করিল না। পুনশ্চ কঠোর স্বরে নসীরুদ্দীনকে আপনার বক্তব্য বুঝাইয়া দিল, এবং তিনকড়ি শেখ যখন ধর্ম্মাবতাররূপী মাতুলের উদ্দেশে কাঁদ-কাঁদ সুরে ধর্ম্মের দোহাই, রক্তের সম্পর্ক, নাড়ীর টান, ইত্যাদি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব লইয়া বক্তৃতা করিবার উপক্রম করিল, তখন রুদ্রকান্ত বজ্রগর্জ্জনে তাহাকে নিরস্ত হইতে এমনই আদেশ দিল যে তিনকড়ির আর বাক্য-স্ফূর্ত্তির ক্ষমতা রহিল না।

নসীরুদ্দীন রুদ্রকান্তকে বিশেষ রকম চিনিত; এক সময় তাহাকে ভয়ও বিলক্ষণ করিত,—কিন্তু এখন উষ্ণ-মস্তিষ্কে ক্ষুধাপূর্ণ উদরে, ধর্ম্মঘাতী স্নেহের ছলে বিরক্ত হইয়া,

জলিতচিত্তে প্রৌঢ় নসীরুদ্দীন স্বভাবসিদ্ধ মৃদুবচনে তিনকড়িকে গোটাকতক মর্ম্মান্তিক তীক্ষ্ণ কথা শুনাইয়া বুদ্ধিমান রুদ্রকান্ত বাবুকে অনধিকারচর্চ্চা ছাড়িয়া আপনার চরকায় তৈল প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিলেন। অসহিষ্ণু হইয়া রুদ্রকান্ত বলিল "আমি কথা নিয়ে ঝগড়া করতে আসিনি, এসেছি কাজের জন্তে।"

পরম ঔদাস্তে চক্ষু হইতে চশমা খুলিয়া, নসীরুদ্দীন মিষ্ট মিষ্ট বচনে বলিল "তা অবশ্য, কিন্তু সে কথা ত আমার সঙ্গে হবে না, কর্ত্তার হাত সে, তিনি আস্থন"—

ছোক্‌রা গোমস্তাটি লঘু কণ্ঠে দ্রুতস্বরে বলিল "কর্ত্তা আস্‌বেন বেলা চাট্টেয়, হয় সেই পর্য্যন্ত বসে থাক, না হয় ফিরে যাও।"

রুদ্রকান্ত বসিলও না, ফিরিলও না, ক্ষিপ্ত ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিল "তুমি সাক্ষী?—নসীরুদ্দীন সাহেব, জানোয়ারের চামড়া পরে জানোয়ারের কাছে নায়েবী করতে এসেছ? জীবন মরণের তোয়াক্কা ছেড়ে—হাতের জোরে গরীবের গলায় ছুরী দাও? খাওয়া অভাবে যে হতভাগারা প্রাণে মরে রয়েছে, জলে ভিজে রোদে পুড়ে শোকে রোগে দেহ পাত করে যারা তোমাদের ডান হাতের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে,—বছরে কিস্তি কিস্তি যাদের রক্ত শুষে চর্ব্বি ফোলাচ্ছ—তাদের নির্দম করে পিষে ফেলবার জন্তে, গাঁটের টাকা খরচ করে আইন আদালত করবে? তোমরা উচ্ছন্ন যাও, তোমাদের জমিদারী উচ্ছন্ন যাক, তোমার জমিদার উচ্ছন্ন যাক। চলে এস তিনকড়ি, দেখা যাক কি হয়। জানোয়ার সবাই নয়, মানুষও আছে!"

তিনকড়িকে টানিয়া লইয়া রুদ্রকান্ত দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

নসীরুদ্দীন উঠিয়া দাঁড়াইল, ছোকরা গোমস্তা দলিল-হাতে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল, বহির্দ্বারে নগদীর দল লাঠি ঘাড়ে তুলিয়া পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল।

(৩)

অনেক উদ্যোগ আয়োজনে, অনেক কাট খড় পুড়াইয়া, যথাকালে তিনকড়ি শেখের মামলাপর্ব্ব শেষ হইল; রুদ্রকান্ত স্বয়ং দেনা করিয়া, ভাল ভাল উকীল মোক্তার লাগাইয়া, প্রচুর তদ্বিরের দ্বারা মোকদ্দমা চালাইল। ফলে তিনকড়ি শেখ বে-কসুর অব্যাহতি লাভ করিল, এমন কি কর্ত্তিত গাছ তিনটির মূল্য বাবদ, যে এক টাকা দশ আনা দুই পয়সা দণ্ড দিতে বাধ্য হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তাহাও নাকি প্রধান সাক্ষী নসীরুদ্দীনের দোষে রদ্ হইয়া গিয়াছে, সাক্ষীর কাটগড়ায় দাঁড়াইয়া, একবার নাকি তিনি "হাঁ" বলিতে ভুলিয়া "না" বলিয়া ফেলায়, উক্ত বিপত্তির ভিত্তি স্থাপন হয়—পরে উকীলের মুখে জিলীপির পাক সদৃশ সুসম্বদ্ধ জেরা-সমষ্টির প্রবল আবর্ত্তে পড়িয়া সোজা মামলাটি একেবারে বাঁকিয়া চুরিয়া নিঃশেষে উৎসন্ন হয়।

তিনকড়ির মামলার রায় বাহির হইবার পরদিনই রুদ্রকান্তের পরীক্ষার ফল বাহির হইল, সে প্রথম স্থান লাভ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। রুদ্রকান্ত সংবাদটা শুনিল মাত্র, বিশেষ উৎসাহিত হইতে পারিল না, কেননা সে তখন পরিপূর্ণ চেষ্টায় দেনা পরিশোধে মনোযোগী। যতক্ষণ কাজ সামনে পড়িয়া থাকে ততক্ষণ সে শুধু পূর্ণোদ্যমে খাটিতে থাকে, কাজটা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত নূতন চিন্তায় নূতন সঙ্কল্প গঠন তাহার দ্বারা সম্ভবপর নহে। অক্লান্ত পরিশ্রমে চেষ্টা করিয়া পশ্চিমে এক প্রসিদ্ধ উকীলের দুইটি ছেলেকে পড়াইবার চাকরী যোগাড় করিল, বেতন দুই শত টাকা; চাকরী ঠিক হইবামাত্র একটি দিন বৃথা নষ্ট না করিয়া, রুদ্রকান্ত সরাসর একাকী পশ্চিম চলিয়া গেল। বাটীতে গিয়া পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কান্নাকাটির আড়ম্বরে বিদায়ের ব্যাপারটা খুব জাঁকাইয়া তুলিবার লেশমাত্র ইচ্ছা ছিল না, সুতরাং চণ্ডালবধূর তত্ত্বাবধানে পত্নীকে রাখিয়া, তিনকড়ি প্রভৃতিকে মৌখিক খোঁজ খবর লইতে বলিয়া, আপনি চলিয়া গেল। নৈশবিদ্যালয় তখন অবশ্য উঠিয়া গিয়াছিল।

কৃতজ্ঞ তিনকড়ি শেখ বাড়ীতে আসিয়া দুটি বেলা মাতৃ-সম্বোধিতা সুষমার তত্ত্ব লইয়া যাইত, এবং প্রত্যহ রাত্রে সপরিবারে আসিয়া আপনি রুদ্রকান্তের বহির্বাটীতে শয়ন করিত ও পত্নীকে বাটীর মধ্যে শিশুপুত্র লইয়া শয়ন করিতে পাঠাইয়া দিত।

জমিদার পক্ষ লজ্জায় অপমানে যেন মুসড়িয়া পড়িলেন। দিনকতক পরে হাঁপানি রোগী নসীরুদ্দীনের ব্যারাম বৃদ্ধি হওয়ায় সে কর্ম্মত্যাগে বাধ্য হইল; মাস দুই তিনে, রোগের তাড়না ও মনের দুর্ভাবনায় লোকটা কঙ্কালসার হইয়া শয্যা লইল। সে আর কাহারো সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিত না, সর্ব্বদা আপনার ঘরে প'ড়িয়া থাকিত। তাহার জানালার নীচে রাস্তা দিয়া যখন জমিদারের নগদী প্রজাদের প্রহার করিতে করিতে ধরিয়া লইয়া যাইত, তখন বৃদ্ধ চক্ষু বুজিয়া ভগবানের নাম করিত।

মামা ভাগিনেয়তে বাক্যালাপ ক্রিয়াকলাপ সব বন্ধ রহিল, মামাও মুখ তুলিয়া ডাকিলেন না, ভাগিনেয়ও মাথা নীচু করিয়া গিয়া দাঁড়াইল না।

মাস ছয়ের পরে রুদ্রকান্তের সব দেনা পরিষ্কার হইয়া হাতে কিছু টাকা জমিল, স্ত্রীকে লিখিল আমি শীঘ্রই বাড়ী যাইতেছি।

উৎসাহিত তিনকড়ি শেখ কয়দিন ধরিয়া প্রাণপণে খাটিয়া বাটীর চতুষ্পার্শ্বস্থ ঘাস জঙ্গল কাটিয়া ছাঁটিয়া জঞ্জাল পুড়াইয়া বাড়ীখানা বেশ পরিষ্কার ঝরঝরে করিয়া তুলিল। নির্দ্দিষ্ট দিনে নানা স্থান হইতে দুষ্প্রাপ্য আনাজ-পাতি সংগ্রহ করিয়া, পুষ্করিণী হইতে মৎস্য ধরাইয়া, গোয়ালা-বাড়ীতে দধি দুগ্ধের ফরমাস দিয়া, অত্যন্ত ধুমধাম বাধাইয়া তুলিল। যথাসময়ে কোরা ধুতি ও নূতন ডোরাকাটা লাল গামছায় সুসজ্জিত হইয়া নিজের গোযান লইয়া ষ্টেশন হইতে বাবুকে আনিতে চলিল।

ট্রেন আসিলে বাবু ব্যাগ ও ট্রাঙ্ক লইয়া নামিয়া তিনকড়িকে সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিল। তিনকড়ি উপর্য্যুপরি সেলাম করিয়া খুব উৎসাহে গ্রামের আদ্যোপান্ত সংবাদের মাথা মুণ্ড বাদ দিয়া সমুদায় নিবেদন করিতে করিতে বাবুকে গাড়ীতে লইয়া নানা বিচিত্র শব্দে ল্যাজ মলিয়া গরু তাড়াইয়া সাঁটা হাঁকাইয়া দীর্ঘপথ অতিবাহন করিয়া বাড়ী ফিরিল।

ব্যাগ-হাতে বাবুর সহিত ট্রাঙ্ক ঘাড়ে করিয়া তিনকড়ি বাড়ীর রোয়াকে উঠিল। চণ্ডালবধূ ঘোমটা টানিয়া দূর হইতে বাবুকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, প্রতিনমস্কার ও কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া রুদ্রকান্ত ঘরে ঢুকিল। বাহির হইতে কে তিনকড়িকে ডাকিল, সে ট্রাঙ্ক রাখিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

রুদ্রকান্ত ঘরে ঢুকিতেই উৎসুকনয়না উৎফুল্লবদনা স্মিতমাধুরীমণ্ডিতা পরিচ্ছন্নসজ্জিতবেশা সুষমা, চুড়ির শব্দে মাথার কাপড় টানিয়া কক্ষপ্রান্তে সরিয়া গেল,—যত পুরাতনই হৌক, অনেক দিনের পর দেখিলেই যে একটু লজ্জা করে! রুদ্রকান্ত ব্যাগটা টেবিলে রাখিয়া প্রসারিত হস্তে স্ত্রীকে ধরিয়া টানিয়া কাছে আনিল, সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিল "কেমন আছ?"

সুষমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, সে শুধু বলিল "তুমি?"

ঠিক সেই সময় অদূরে অস্পষ্ট ক্রন্দনধ্বনি শোনা গেল, সচকিতে স্ত্রীকে ছাড়িয়া রুদ্রকান্ত বলিল "ওকি!"

সুষমা ম্লান হইয়া বলিল "ও পাড়ায় নসীরুদ্দীনের বড় অসুখ, তিনকড়ি যখন ষ্টেশন যায় তখন তাকে ডাকৃতে এসেছিল, কিন্তু সে..... ..."

রুদ্রকান্ত বেগে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল, বহির্দ্বারে তিনকড়ি শেখ দাঁড়াইয়া একজন প্রতিবাসীর সহিত কথোপকথন করিতেছিল, সে তিনকড়িকে ডাকিতে আসিয়াছে—।

রুদ্রকান্ত দমকা বাতাসের মতন আসিয়া দৃপ্তস্বরে ডাকিল "তিনকড়ি—"

ত্রস্ত হইয়া তিনকড়ি যোড় হাতে বলিল "হুজুর।"

রুদ্রকান্ত বিনা বাক্যে তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে উন্মুখ হইয়া ছুটিল, প্রতিবাসী বিস্মিত হইয়া পাছু পাছু চলিল।

তাহারা যাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই নসীরুদ্দীনের মৃত্যু হইয়াছিল; তাহার শোকবিহ্বলা পত্নী তখন পায়ের কাছে কাঁদিয়া লুটাইতেছিল; আর একমাত্র শিশুপুত্র রুগ্ন শীর্ণ তিন বৎসর বয়স্ক বালক 'খইরু' কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, মাতার ক্রন্দনে ভয়ে অধীর হইয়া, মৃতের বক্ষের উপরে পড়িয়া মুখে হাত দিয়া আকুল আর্ত্তনাদ করিতেছিল।

রুদ্রকান্ত ছুটিয়া গিয়া শিশুকে বক্ষে তুলিয়া লইল। চীৎকারক্লান্ত শিশু হাঁপাইতে হাঁপাইতে রুদ্ধস্বরে বলিল "জল জল—একটু জল।"

তাহাকে বক্ষে করিয়া রুদ্রকান্ত দ্রুতপদে নিজের বাড়ীতে আসিয়া রোয়াকে বসিল, সুষমাকে ডাকিয়া বলিল "ঘরে দুধ আছে? না থাকে একটু জল দাও—"

সুষমা দুধের বাটি লইয়া নিকটে আসিল। শিশুকে রুদ্রকান্তের কোল হইতে সযত্নে আদর করিয়া নিজের কোলে লইতে গেল।

ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়া রুদ্রকান্ত বলিল—"আমি যে মড়া ছুঁয়েছি।"

সুষমা স্বামীকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইয়া বলিল "তুমি পবিত্র!"

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

কষ্টিপাথর

মহাযান কোথা হইতে আসিল ?

অনেকেই মনে করেন যে নাগার্জ্জুনই মহাযানমত চালাইয়া দেন; তাঁহার 'মাধ্যমকবৃত্তি মহাযানের প্রথম গ্রন্থ; তিনিই পাতাল হইতে প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র উদ্ধার করিয়াছিলেন; তাঁহারই শিষ্য আর্য্যদেব এই মত চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু নাগার্জ্জুনের পূর্ব্ব হইতেই মহাযানমত চলিতেছিল। নাগার্জ্জুনের দুই পুরুষ পূর্ব্বে অশ্বঘোষ 'মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদসূত্র' নামে এক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' ও 'সৌন্দরানন্দ' মহাযানমতে ভরপূর। 'লঙ্কাবতার' প্রভৃতি তিনখানি মহাযানসূত্র অশ্বঘোষের পূর্ব্বেও চলিত ছিল; সুতরাং মহাযানের আদি ঠিক বলিয়া উঠা কঠিন।

বৌদ্ধেরা বলে বুদ্ধদেবের মৃত্যুর প্রায় একশত বৎসর পরে বৌদ্ধসঙ্ঘের মধ্যে ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হয়। স্থবিরেরা, বুদ্ধদেব যেরূপ বিনয়ের বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা হইতে একচুল তফাৎ হইতে চাহিত না; কিন্তু যাহাদের বয়স অল্প, তাহারা অনেক বিষয়ে স্থবিরদিগের মতে চলিত না। বুদ্ধদেবের কঠিন শাসন ছিল—বারটার পর কেহ আহার করিবে না, তাহারা বলিত এক আধ ঘণ্টা পরে খাইলে দোষ কি? বুদ্ধদেব ভিক্ষুদিগকে কিছুই সঞ্চয় করিতে দিতেন না, তাহারা বলিত শিংএর ভিতর যদি একটু নুন সঞ্চয় করিয়া রাখা হয়, তাহাতে কি দোষ হইতে পারে? এইরূপে দশটি বিষয় লইয়া স্থবিরদিগের সহিত তাহাদের মতের অনৈক্য হয়। এইরূপ অনৈক্য হওয়াতে যাঁহারা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাঁহারা একটি সভা করিয়া এসকল বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে চান। বৈশালীতে এক মহাসভা হয়। এই সভায় কিছুই মীমাংসা হইল না; বৌদ্ধদিগের মধ্যে দুইদল হইল,—স্থবিরবাদ বা থেরাবাদ ও মহাসাঙ্ঘিক। একে ত মহাসাঙ্ঘিকদিগের দলে লোক অধিক ছিল, তার পর আবার তাহাদের বয়স অল্প, উহারা মহা উৎসাহে আপনাদের মত প্রচার করিতে লাগিল। উহারা প্রথম হইতেই লোকোত্তরবাদী হইল, অর্থাৎ বুদ্ধদেব সামান্য মানুষ ছিলেন না, তিনি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, তিনি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেও জগৎব্যাপ্ত হইয়া আছেন, যখন তাঁহার মত চলিতেছে, যখন তাঁহার মতে লক্ষ লক্ষ লোক পৃথিবীতে আপনার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, আপনাদিগের আচার-ব্যবহার স্থির করিয়া লইতেছে, তখন তিনি শুধু মরিলে কি হইল? তাঁহার একটা অলৌকিক অনির্ব্বচনীয় অস্তিত্ব আছেই। লোকোত্তরবাদীরা যতই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দার্শনিক মত বাহির করিতে লাগিল, স্থবিরবাদীরা ততই বিনয় সম্বন্ধে বেশী কড়া হইতে লাগিল। দুইদলে যে আর কখনও মিল হইবে, তাহার আর সম্ভাবনা রহিল না। অশোকরাজা স্থবিরবাদীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, সুতরাং তাঁহার সময়ে এই মতই অনেক স্থানে চলিয়া গিয়াছিল। তিনি সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম অধিকপরিমাণে প্রচার করেন, সুতরাং সিংহলে স্থবিরবাদ চলিয়া যায় ও এখনও চলিতেছে। মগধ ও বাঙ্গালায় এই মতেরই লোক অধিক ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যভাগে অযোধ্যা, মথুরা প্রভৃতি স্থানে এবং পঞ্জাবে মহাসাঙ্ঘিকেরাই প্রবল হইয়া উঠে। ক্রমে এই দুই দলই নানা শাখায় ভাগ হইয়া যায়। স্থবিরবাদের প্রধানতঃ দুই শাখা হয়,—'মহীশাসক' ও 'বজ্জিপুত্তক'। মহীশাসকেরা আবার দুইভাগ হয়,—'সর্ব্বথবাদী' ও 'ধর্ম্মগুপ্তিক'। সর্ব্বথবাদ ক্রমে কশ্যপীয়, সংকান্তিক, ও সুত্তবাদ হইয়া যায়। বজ্জিপুত্তকদের চারি শাখা হয়,—'ধম্মথানীয়', 'ছন্দাগারিক', 'ভদ্দজানিক' ও 'সম্মতীয়'।

মহাসাঙ্ঘিকদিগের দুই দল হয়,—'গোকুলিক' ও 'একব্যোহারিক'। গোকুলিকদিগের আবার তিন শাখা হয়,—'পন্নত্তিবাদ', 'বাহুলিক' ও 'চেতিয়বাদ'। এতদ্ভিন্ন দেশভেদেও অনেকগুলি শাখা হয়,—'হেমবন্ত', 'রাজগিরীয়', 'সিদ্ধত্থক', 'পূর্ব্বশেলিয়', 'অপরশেলিয়', 'বাজিরীয়'। কিন্তু কি লইয়া যে এই সকল শাখাভেদ হয় তাহা আমরা এখনও জানিতে পারি নাই।

এই-সকল ভিন্নশাখার মধ্যেও পরস্পর বিবাদবিসম্বাদ ছিল। বিবাদ-বিসম্বাদ হইলেই লোকে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এইরূপ দুর্ব্বল অবস্থাতেই সামবেদী শুঙ্গগোত্রের ব্রাহ্মণেরা অশোকের রাজ্য ধ্বংস করিয়া নূতন রাজ্যস্থাপন করিলেন। প্রথমেই পাটলিপুত্রে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া অশোকের উপর তাঁহাদের যে রাগ ছিল, সে রাগ তুলিলেন। এই বংশের প্রথম রাজা পুষ্যমিত্র, ঘোর বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। এখনও অনেক বৌদ্ধ পুষ্যমিত্রের নাম মুখে আনে না, এবং তাঁহার নাম শুনিলে গালি দেয়। একে ত নানাশাখা হওয়ায় বৌদ্ধেরা আপনা-আপনিই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল,—পুষ্যমিত্রের নির্যাতনে তাহাদের দুর্ব্বলতা আরও বাড়িয়া গেল।

সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে পশ্চিমাঞ্চলে শক, যবন ও পহ্লব প্রভৃতি জাতির রাজত্ব হইল। মহাসাঙ্ঘিকেরা সেখানে যাইয়া বিদেশীয় রাজগণকে আপনাদের মতে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল,—ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্যও হইল। কিন্তু এরূপ কৃতকার্য্য হইতে প্রায় দুই-শত বৎসর লাগিয়াছিল। নির্যাতন হইলেই আপনার ঘর একটু বাঁধিয়া উঠে। অনেক বৌদ্ধ আপনার শাখার অস্তিত্ব ভুলিয়া বৌদ্ধধর্ম্মেরই যাহাতে রক্ষা হয় তাহারই চেষ্টা করিতে থাকে। মহাসাঙ্ঘিকেরা কণিষ্ক রাজার সময় জলন্ধরে একটি মহাসভা করে। সে সভায় স্থবিরবাদীরা বড় স্থান পায় নাই। ঐ সভায় তাহারা আপনাদের ধর্ম্মপুস্তক ও তাহার টীকা ও আপনাদের ধর্ম্মমত স্থির করিয়া লয়। কণিষ্করাজার গুরু অশ্বঘোষ। এই সভায়ই মহাসাঙ্ঘিকেরা মহাযানরূপে পরিণত হয়, কারণ মহাসাঙ্ঘিক ও মহাযানে অনেক বিষয়ে মতের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। মহাসাঙ্ঘিকেরাও বুদ্ধত্ব লাভের প্রয়াসী ছিল, মহাযানেরাও তাহাই ছিল। মহাসাঙ্ঘিকেরা দশভূমি মানিত, ইহারাও দশভূমি মানিত। মহাসাঙ্ঘিকেরা উচ্চ দার্শনিক মতের পক্ষপাতী ছিল, মহাযানেরাও তাহাই ছিল। তবে মহাসাঙ্ঘিকদিগের মধ্যে বোধিসত্ত্ববাদ তত প্রবল হয় নাই,—করুণাবাদের ত নামও শুনিতে পাওয়া যায় না।

ছিল 'মহাসাঙ্ঘিক' হইতে মহাযানমতে উপস্থিত হইতে তিন শত বৎসর লাগিয়াছিল। মহাসাঙ্ঘিকদিগের একখানিমাত্র পুস্তক পাওয়া গিয়াছে ও প্রকাশিত হইয়াছে—সেখানি "মহাবস্তু অবদান"। এইখানি যে কি ভাষায় লেখা, তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না। 'মহাবস্তু অবদানে'র ভাষা মিশ্রভাষা। এ ভাষায় 'বাস্তু' 'বস্তু' হইয়া যায়, তাই যেখানে অশ্বঘোষ কপিলবাস্তু লিখিয়াছেন, সেখানে 'মহাবস্তু অবদানে' 'কপিলবস্তু' লেখা আছে। যাঁহারা আমাদের ইতিহাস অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের বিশেষ করিয়া এই ভাষাটির আলোচনা করা উচিত।

কণিষ্কের সময় যে-সকল পুস্তক লেখা হইয়াছিল, তাহার একখানিও এখনও পাওয়া যায় নাই। চীনে তাহার কয়েকখানা পুস্তকের তর্জ্জমা আছে। 'মহাবস্তু অবদানে'র পর এবং নাগার্জ্জুনের পূর্ব্বে যত পুস্তক রচনা হইয়াছিল তাহার মধ্যে আমরা 'লঙ্কাবতার সূত্র' দেখিতে পাই, আর অশ্বঘোষের তিন চারিখানি পুস্তক দেখিতে পাই। ইহাতেই দেখা যায় যে মহাযানের মূল মতগুলি ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে।

অনেকে মনে করেন, হিন্দু ও বৌদ্ধদিগকে মিলাইবার জন্য নাগার্জ্জুন মহাযানমতের সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, যে, বুদ্ধদেবের পর কোন মহাপ্রতিভাশালী ব্যক্তি "ভগবদ্গীতা" রচনা করেন। ভগবদ্গীতার মত মহাসাঙ্ঘিকদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মহাযান হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই, বরং ইহার বিরুদ্ধ মতের অনেক প্রমাণ আছে।

নেপালীরা বলে খাঁটি ধর্ম্ম দুরকম ছাড়া তিন রকম হইতে পারে না। সেই দুই প্রকার ধর্ম্ম,—(১) দেবভাজু (২) গুভাজু। হয় দেবতাকে ভজনা কর, না হয় গুরুকে ভজনা কর। ব্রাহ্মণেরা দেবভাজু, বৌদ্ধেরা গুভাজু। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম কিছুতেই মিশিতে পারে না। তবে এক কথা,—একদেশে যদি দুই তিন ধর্ম্মের লোক থাকে, তবে তাহাদের আচার ব্যবহার ক্রমে কতকটা এক হইয়া যায়।

মহাযানের কিন্তু বাহাদুরী আছে। যতদিন মহাসাঙ্ঘিক ছিল, ততদিন তাহাদের মধ্যে নানারূপ মতভেদ ছিল, আর পরস্পর বেশ রেষারেষিও ছিল, কিন্তু মহাযানের পর সেটা আর বড় দেখা যায় না। সবাই আপনাকে মহাযান বলিয়া পরিচয় দিতেই ব্যগ্র হয়। শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদ মহাযানের দুইটা প্রকাণ্ড দার্শনিক মত, কিন্তু উভয়ই মহাযান, এবং মহাযান বলিয়া উভয়েই স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যে অন্য কোন বিষয় লইয়া দলাদলি আছে তাহা বোধ হয় না। আর মহাযান হইতে এই যে মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান প্রভৃতি নানাযানের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারাও সকলে আপনাদিগকে মহাযান বলিয়াই স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে। মহাযান-ধর্ম্মের উদারতাই এরূপ হইবার কারণ। জগৎ-উদ্ধারই আমাদের উদ্দেশ্য। যে যে প্রকারই করুক না কেন, তাহাতে আমাদের বৃদ্ধি বই ক্ষতি নাই। সুতরাং আমাদের পরস্পর বিবাদবিসম্বাদ কেন? জগৎ একটা প্রকাণ্ড বস্তু, একা কিছু উদ্ধার করা যায় না। সুতরাং তুমি যাহা করিলে, সেও আমার কার্য্য, আমি যাহা করিলাম, সেও তোমার কার্য্য। তাহা লইয়া তোমায় আমায় ঝগড়া হইবে কেন?

মহাযান কোথা হইতে আসিল ইহার উত্তর এই যে, মহাসাঙ্ঘিকেরাই ক্রমে মহাযান হইয়া গিয়াছে; ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সহিত উহার কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই। ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধের সামঞ্জস্য করিবার জন্য মহাযানের সৃষ্টি হয় নাই; মহাযানের উদ্দেশ্য মহৎ, উহা সকল ধর্ম্মকেই আপনার ক্রোড়ে টানিয়া লইতে পারে।

(নারায়ণ, শ্রাবণ) শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

* *

মিউজিয়ম।

যেখানে (Muse) মিউজগণ সর্ব্বদা গমনাগমন করিতেন, যেখানে তাঁহারা থাকিতে ভাল বাসিতেন, তাঁহাদের সেই প্রিয় স্থানের নাম যবন-ভাষায় মিউজিয়ম ছিল। ইঁহারা Zeus অর্থাৎ দিব দেবতার কন্যার কন্যা। ইঁহারা ফোয়ারা বা ওগোলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছিলেন। গান, কবিতা, নাট্য এ সকলই ফোয়ারার নিকট নির্জ্জন স্থানে ভাল লাগে। মিউজেরা নয় ভগ্নী, ফোয়ারা হইতে তাঁহারা ক্রমে মহাকাব্য, গীতিকাব্য, নাট্য, প্রহসন, প্রেমগীতি, স্তবস্তুতি, ইতিহাস, জ্যোতিষ ও গান এই সকলের দেবতা হইয়া উঠিলেন। যেখানে এই-সকলের চর্চ্চা হইত তাহাকে মিউজিয়ম বলিত। আরিস্‌টটেল আলেকসন্দারের গুরু ছিলেন, তাঁহার মিউজিয়ম ছিল, উহাতে সকল বিদ্যার চর্চ্চা হইত। পদার্থবিদ্যার চর্চ্চা তিনি প্রথম আরম্ভ করেন। তাঁহার শিষ্যগণ, নানা দেশ হইতে নানা উপায়ে নানা লোকের দ্বারা নানা প্রকার পদার্থ সংগ্রহ করিয়া দিতেন, তিনি ঘরে বসিয়া সেইগুলি পরীক্ষা করিতেন, তাহাদের শ্রেণী বিভাগ করিতেন, তাহাদের গুণাগুণ নির্ণয় করিতেন, এইরূপে তিনিই সর্ব্বপ্রথম পদার্থবিদ্যার পুস্তক লিখেন। এইসময় হইতেই মিউজিয়মে পদার্থ সংগ্রহ হয়। আলেকজেন্দ্রিয়ায় একটি প্রকাণ্ড মিউজিয়ম ছিল, সেখানকার পুস্তকালয় উহার একটি অংশ মাত্র।

কোন আশ্চর্য্য জিনিস দেখিলে তাহা সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক এবং যাহার যেরূপ শক্তি সকলেই কিছু কিছু আশ্চর্য্য জিনিস সংগ্রহ করিয়া থাকে। রাজারা সকলেই এরূপ আশ্চর্য্য জিনিস সংগ্রহ করেন। মন্দিরে মন্দিরে অনেক আজব জিনিস সংগ্রহ হইত।

এখনকার মিউজিয়মের তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য যথা—(১ম) আনন্দ (২য়) লোকশিক্ষা (৩য়) আবিষ্কার।

(১) আনন্দ—মিউজিয়মের বাড়ীটি সুন্দর স্থানে হইবে, ঘরগুলিতে জিনিসপত্র ভাল করিয়া সাজান হইবে, আলো ও বাতাসের অভাব থাকিবে না, জিনিসগুলি সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে, কেবল বাছা বাছা জিনিস দেখান হইবে, অনেক জিনিস সাজাইয়া ভিড় করা হইবে না। ঐ বাড়ীতে ঢুকিলেই মন যেন প্রফুল্ল হয়, তাহা হইলেই যে-সকল জিনিস দেখিবে সেগুলি অনেক দিন মনে থাকিবে।

(২) শিক্ষা—জিনিসগুলি সাজান দেখিয়াই যেন মনে করিতে পারা যায় যে, পর পর কত উন্নতি হইতেছে। সাজান তিন রকম হইতে পারে—(ক) উপাদান লইয়া। উপাদানের এক এক বস্তু এক এক জায়গায় থাকিবে। সোনার জিনিস এক জায়গায়, রূপার জিনিস এক জায়গায়, লোহার জিনিস এক জায়গায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। (খ) কাল অনুসারে। উপাদান লইয়া সাজান হইলে, তাহার মধ্যে আবার কালানু-সারে সাজাইতে হইবে। প্রত্যেক স্থলেই দেখাইতে হইবে পর পর উন্নতি হইতেছে, না অবনতি হইতেছে। যদি দেখা যায় পর পর উন্নতিই হইতেছে, কিন্তু মাঝে এক জায়গায় দিনকতক অবনতি হইয়া গেল, এইরূপ অবনতি হইল কেন তাহার কারণ অনুসন্ধান করার নাম Research বা অন্বেষণ। (গ) দেশানুসারে। দেশ অনুসারে সাজান হইলে এক দেশের পদার্থের সঙ্গে অন্য দেশের পদার্থের কত প্রভেদ তাহা দেখিতে পাওয়া যায় এবং সেই প্রভেদের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেশের লোকের প্রকৃতিগত যে ভেদ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা একটি প্রয়োজনীয় অন্বেষণ।

(৩) আবিষ্কার—অনেক সময়ে মিউজিয়মের সাজান জিনিস দেখিলেই মনে হয় যেন কোন জায়গায় শিকল কাটিয়া গিয়াছে, তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে, তখন আবার অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হয়। সেই কাটা শিকল বা ছেঁড়া তার মিলাইয়া দেওয়া মিউজিয়মের প্রধান

কাজ। এই-সকল আবিষ্কার মিউজিয়ম হইতে হয় এবং তদ্দ্বারা জগতের অনেক উপকার হয়। মিউজিয়মে এইরূপ আবিষ্কারের যাহাতে সুবিধা হয় তাহা করিয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক।

১৪৫৩ খৃঃ অব্দে ইউরোপে একটি বিষম ঘটনা ঘটে, তদ্দ্বারা পশ্চিম ইউরোপের সৌভাগ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপের দুর্ভাগ্যের উদয় হয়। ঐ খৃঃ অব্দে তুর্কীরা কনষ্টান্টিনোপল দখল করে। বহুকাল হইতে গ্রীকেরা বিদ্যার চর্চ্চা করিতেছিল, সুকুমার কলা শিক্ষা করিতেছিল, ঐ সময়ে তাহাও শেষ হইল। অনেক গ্রীক পণ্ডিত তাঁহাদের পাঁজি-পুথি ও দেখিবার-মত ভাল জিনিস লইয়া ইউরোপের পশ্চিমাঞ্চলে পলায়ন করেন। পশ্চিম ইউরোপের বিশেষতঃ ইতালীর সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁহাদিগকে পরম আদর করিয়া দেশে রাখেন। পশ্চিম ইউরোপে গ্রীকবিদ্যার চর্চ্চা আরম্ভ হয়, প্রধান প্রধান গ্রীক পণ্ডিতদিগের পুস্তকের পঠনপাঠন আরম্ভ হয়। গ্রীকদিগের ভাস্করকার্য্যের প্রতি লোকের অনুরাগ হয়। নূতন বিদ্যার একরূপ নেশা হইয়া দাঁড়ায়। লোকে যাহা কিছু গ্রীক সব সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে। সংগ্রহটা এই কালেই বেশী হয়। পূর্ব্ব হইতে ইতালীতে রোমানদিগের অনেক কীর্ত্তিকলাপ ছিল, তাহার উপর গ্রীক আসিয়া জুটিল, গ্রীক ও রোমান কীর্ত্তিতে ইতালী ছাইয়া গেল। ইউরোপে ইতালী একটি পুণ্যভূমি হইয়া গেল। লেখাপড়া শিখিবার পর একবার ইতালী বেড়াইয়া না আসিলে পাঠ সমাপ্ত হইত না। নেপোলিয়ানের সময়, ইতালীর এই-সব কীর্ত্তিকলাপ লুণ্ঠিত হইয়া ফ্রান্সে আসিল। ১৮১৫ খৃঃ অব্দে প্রধান প্রধান জিনিসগুলি ফিরাইয়া দেওয়া হয়, কিন্তু অনেক জিনিস ফ্রান্সে পড়িয়া থাকে এবং এখনও আছে। মোটামুটি বলিতে গেলে ফরাসীবিপ্লবের সময় হইতে মিউজিয়ম করার লক্ষ্য স্থির হয়। মিউজিয়ম কিরূপ বাড়ীতে রাখিতে হইবে, কেমন করিয়া জিনিসপত্রগুলি সাজাইতে হইবে, কি উপায়ে লোকের আনন্দ ও শিক্ষা হইতে পারে, কি উপায়ে পণ্ডিতগণ নিত্য নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিতে পারেন, এ-সকল কথা খৃষ্টীয় ১৯ শতের আরম্ভ হইতে লোকের মনে উদয় হইতে থাকে। ১৮৭০ সালে এক ইউরোপীয় মহাপণ্ডিত এ বিষয়ে যে-সকল বক্তৃতা করিয়াছিলেন, পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে ইউরোপের মিউজিয়মগুলি নবজীবন লাভ করিয়াছে। তাঁহার প্রধান কথা এই যে যিনি মিউজিয়মের কর্ত্তা হইবেন, তাঁহার একজন মানুষের মত মানুষ, পণ্ডিতের মত পণ্ডিত হওয়া আবশ্যক। তিনি মিউজিয়ম যেমন করিয়া সাজাইবেন, লোকে সেইরূপই বুঝিবে, সুতরাং ঐ জায়গায় পাকা লোক দেওয়া চাই।

কয়েক বৎসর হইল মিউজিয়ম ও পুস্তকালয় করিবার জন্য ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্ট বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়রলণ্ডে বিজ্ঞানের জন্য প্রায় দুই হাজার এবং নানাবিধ শিল্পের জন্যও ৩৩৮টি মিউজিয়ম আছে।

মিউজিয়মে কি দেখাইতে হইবে? পরমেশ্বর যাহা করিয়াছেন সেই সবই দেখাইতে হইবে; ইহার নাম বিজ্ঞান-মিউজিয়ম। মানুষে যাহা করিয়াছে তাহাও দেখাইতে হইবে; ইহার নাম Anthropological Museum। শিল্প-সম্বন্ধে যে-সকল মিউজিয়ম আছে তাহা এই Anthropological Museumএর কণামাত্র। কলিকাতায় যে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম আছে উহার উৎপত্তিস্থান এসিয়াটিক সোসাইটী। এসিয়াটিক সোসাইটীর উদ্দেশ্য এই যে, এসিয়া মহাদেশের সীমার মধ্যে ঈশ্বর যাহা করিয়াছেন আর মানুষে যাহা করিয়াছে তৎসমস্তের আলোচনা। মান্দ্রাজ বোম্বাই মিউজিয়মও এই ছাঁচে ঢালা হইতেছে। বরোদায় এই প্রকারের একটি মিউজিয়ম আছে।

কিন্তু এদেশে সম্প্রতি আর কতকগুলি মিউজিয়ম হইয়াছে তাহার দৌড় এত বেশী নয়। তাহারা ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস লইয়াই ব্যস্ত। এই প্রকারের মিউজিয়মের মধ্যে পেসোয়ার মিউজিয়ম খুব ভাল। যে জায়গায়ই যাও একবার চোখ বুলাইয়া গেলেই পেসোয়ারের পুরাণ সময়-তালিকা ঠিক বুঝিতে পারিবে। সব সময় ধরিয়া সাজান। পেসোয়ারের পর লাহোর মিউজিয়ম; সমস্ত পাঞ্জাব প্রদেশের ইতিহাসের যাহা কিছু সব এখানে সংগ্রহ হইয়াছে। খৃঃ পূর্ব্ব দুই শত হইতে খৃঃ পর দুই শতাব্দ পর্য্যন্ত পাঞ্জাব অঞ্চলে যে-সকল পাথরের কাজ হইত তাহাতে গ্রীকদিগের প্রভাব খুব ছিল, কারণ সেই সময় অনেক গ্রীক ঐ অঞ্চলে বাস করিয়াছিল। তক্ষশীলা তখন ঐ অঞ্চলে একটি প্রধান নগর ছিল। পেসোয়ারও অনেক সময়ে রাজধানী ছিল। সুতরাং পেসোয়ারের অনেক জিনিস ও তক্ষশিলার সব জিনিস লাহোরে আছে।

লাহোরের পর দিল্লী মিউজিয়ম। ইহাতে মুসলমান আমলের ও মোগল আমলের জিনিসই অধিক। মথুরায় একটি মিউজিয়ম আছে। কনিষ্কের একটি পাথরের মূর্ত্তি এখানে সংগৃহীত হইয়াছে।

ইহাদের পর লক্ষ্ণৌ মিউজিয়ম, একেবারে ওয়াজিদ আলি সার মহলগুলির মাঝখানে, আর সেই মহলের সঙ্গে ঠিক সাবুদ করা। বহুকাল হইতে খৃষ্টীয় তিনশত বৎসর পর্য্যন্ত দ্রোণের রাজধানী অহিচ্ছত্র ব্রাহ্মণদের একটা প্রধান জায়গা ছিল। সেই অহিচ্ছত্র হইতে চৌদ্দ হাজার কাজ-করা পাথর লক্ষ্ণৌ মিউজিয়মে আসিয়াছে। শ্রাবস্তী এক কালে কোশল দেশের রাজধানী ছিল, এখন নিবিড় জঙ্গল। শ্রাবস্তী খুঁড়িয়া যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাও লক্ষ্ণৌ মিউজিয়মে আছে। কাশী হইতেও অনেক জিনিস লক্ষ্ণৌ মিউজিয়মে আসিয়াছে। লক্ষ্ণৌ মিউজিয়মের দরজার সামনে প্রকাণ্ড পাথরের ঘোড়া, সে ঘোড়াটি সমুদ্রগুপ্তের অশ্বমেধের ঘোড়ার প্রতিমূর্ত্তি।

ইহার পর সারনাথ মিউজিয়ম। গত দশ বার বৎসর সারনাথ খুঁজিয়া যাহা পাওয়া গিয়াছে সব এইখানে আছে। সারনাথে বুদ্ধদেব ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করান, সুতরাং সেটি বৌদ্ধদের প্রধান তীর্থ; তাহার উপর আবার হিন্দুদের বারাণসীর নিকটে, গঙ্গা হইতেও বেশী দূর নয়, সেখানে অনেক বৌদ্ধ বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের স্থানটি মিউজিয়ম হইতে অল্পদূরে। সেইখানে একটি অশোকস্তম্ভ ছিল, তাহার মাথায় চারিটি সিংহ আছে, বোধ হয় যেন তাহারা জীবন্ত। মিউজিয়মের পার্শ্বে ধামেক একটা প্রকাণ্ড স্তূপ, এখনও ১০০ ফুটের উপর উচ্চ।

রঙ্গপুরে মিউজিয়ম খোলা হইতেছে, ইহারও উদ্দেশ্য বাঙ্গালাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের মাল-মসলা সংগ্রহ করা। রঙ্গপুর বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত। বরেন্দ্রভূমি এক কালে ভাস্করকার্য্যের জন্য সমস্ত ভারতবর্ষে বিখ্যাত হইয়াছিল। আর্য্যাবর্ত্তে অনেক শিলাপত্র বারেন্দ্র শিল্পীর দ্বারা খোদিত। ধাতুকার্য্যে বারেন্দ্রশিল্পী যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখাইয়া গিয়াছে। রঙ্গপুরের অদূরে মহাস্থান-গড়, বল্লালের সময়ে একটা প্রধান তীর্থস্থান ছিল, কেহ কেহ বলেন উহাই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, তাহা হইলে উহা একটি অতি প্রাচীন স্থান। অশোক রাজা তাঁহার একটি ভাইকে এইখানে রাখিয়াছিলেন। এই মিউজিয়ম এখন মাল-মসলা সংগ্রহ করিয়া দেখান যে মহাস্থান পৌণ্ড্রবর্দ্ধন কিনা। মহাস্থান-গড়ে যে-সকল দেবমূর্ত্তি পাওয়া যায় সব এইখানেই রাখা হউক। কামতাপুরও রঙ্গপুর জেলার নিকট, উহাও এক কালে উত্তরবঙ্গের একটি প্রধান রাজ্যের রাজধানী ছিল। সেখান হইতে অনেক মাল-মসলা সংগ্রহ হইবে। ঘোড়াঘাট আর-একটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান, সেখান হইতেও অনেক মাল-মসলা সংগ্রহ হইতে পারে। রাজসাহীতে মিউজিয়ম করিয়া বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, ইঁহারাও সেই পথে চলুন এবং আপনাদের ইতিহাস উদ্ধার করুন।

রঙ্গপুরের আর-একটা সুবিধা আছে, এরূপ সুবিধা বাঙ্গালার আর

কোথাও নাই। রঙ্গপুর বাঙ্গালার সীমান্তপ্রদেশ, ইহার ওপারেই এক কালে নিবিড় জঙ্গল ছিল, তথায় নানা জাতি অসভ্য লোক বাস করিত। অনেকে এখন সভ্য হইয়াছে আর অনেকে এখনও বনে বাস করে। উহাদের ইতিহাস সংগ্রহ করা, উহারা কি খাইত কি করিত, কিরূপ ঘরে বাস করিত, কিরূপে শীকার করিত, কিরূপে কৃষিকার্য্য করিত এ-সকল সংগ্রহ করা রঙ্গপুর মিউজিয়মের একটা উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তাহা হইলে রঙ্গপুর মিউজিয়ম যে কেবল ইতিহাসেরই উন্নতি করিবে এমন নহে Anthropology বা মানবতত্ত্বেরও অনেক সহায়তা করিতে পারিবে। আপনারা আমাকে এই মিউজিয়মযজ্ঞের পৌরোহিত্যপদে বরণ করিয়াছেন, আমি বলি "অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু"।

(রঙ্গপুর-সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা) শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

* * *

অমর কবি হাফেজ।

"যাহার হৃদয় প্রেমে জাগ্রত হইয়াছে, সে কখনও মরে না।
জগতপৃষ্ঠায় আমাদের অমরত্ব স্থির নিশ্চিত।" —হাফেজ।

কবিতা—এবং প্রকৃত কবিতা—মানব-হৃদয়ে সুক্ষ্মতম প্রবৃত্তিনিচয়কে জাগরিত এবং সম্মোহিত করে।

পারশ্য কাব্য-সাহিত্য বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—কসিদা, মাসনভী এবং গজল ইত্যাদি। কসিদাতে সাধারণতঃ ব্যক্তিবিশেষের গুণকীর্ত্তন অথবা দোষবর্ণন হইয়া থাকে; মাস্নভীতে ঐতিহাসিক বিবরণ, পৌরাণিক উপাখ্যান এবং প্রেমিকদিগের মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী বর্ণিত হয়; এবং গজলে কবি স্বীয় হৃদয়ের আশা, নৈরাশ্য ও সুখ দুঃখ ইত্যাদি প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই গজলই পারশ্য কাব্যের প্রাণ, এবং ইহাতেই তাহার স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব।

পারশ্য কবিদিগের মধ্যে গজল-লেখকের সংখ্যা অনেক হইলেও সাদী, খোস্রো (খুসরু ?), হাফেজ, ফোগানী, জামী এবং সায়েব প্রভৃতির ন্যায় গজল-লেখক—যাঁহারা নূতন নূতন ভাব ও সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া পারশ্য সাহিত্যকে সম্পদশালী করিয়া গিয়াছেন—খুব কম। ইঁহাদিগের মধ্যে আবার হাফেজই, অধিকাংশের মতে, সর্ব্বোচ্চস্থানের অধিকারী। পারশ্য কাব্যের অন্যতম স্তম্ভ—মৌলানা জামী, খাজা হাফেজকে স্বর্গের বীণা এবং রহস্যোদ্ঘাটক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ হাফেজ স্বর্গীয় প্রেমের সুক্ষ্মতম ভাবগুলি এবং আধ্যাত্মিক জগতের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ, এরূপ সুন্দর এবং প্রাণস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করেন যে, তাহা পাঠ করিলে মনে হয়, যেন স্বর্গীয় দূত আসিয়া কবির কানে কানে, এই কথাগুলি কহিয়া যাইতেছে;—

"কবিতা-সুন্দরীর প্রসাধনের পর, তাহার বিশ্ববিমোহন মুখ-চন্দ্রমা হইতে, হাফেজের ন্যায় বিচক্ষণতার সহিত অন্য কেহই অবগুণ্ঠন-উন্মোচন করিতে সমর্থ হন নাই।"

কবির নাম মহম্মদ, উপাধি সামসুদ্দীন এবং তাখাল্লোস হাফেজ। হাফেজের পিতামহ পল্লীবাস পরিত্যাগ করিয়া শীরাজ নগরে আসিয়া ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেন। অনুমান ৭১৫ হিজরী সনে শীরাজ নগরে হাফেজের জন্ম হয়।

শীরাজনগরে খাজু নামে একজন ঋষিকল্প কবি বাস করিতেন। হাফেজ তাঁহার সহিত পরিচিত হইলেন, এবং প্রধানতঃ তাঁহারই উপদেশ এবং উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। উত্তরকালে হাফেজ কাব্য-শাস্ত্রের সর্ব্ব-সম্মত গুরুরূপে সম্মানিত হইয়াও সর্ব্বদা সাধু খাজুকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন।

মহাত্মা সাদীর সময় পর্য্যন্ত পারস্য কবিতা কেবল প্রেমিকের আনন্দোচ্ছ্বাসে অথবা নিরাশ প্রণয়ীর তপ্তশ্বাসে পর্য্যবসিত ছিল। সারেখ সাদী সর্ব্বপ্রথম পার্থিব ও স্বর্গীয় প্রেমের সমন্বয় এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহের বিশ্লেষণপূর্ণ কবিতা রচনা করিয়া দেশবাসীর হৃদয়তন্ত্রীগুলিকে নূতন সুরে বাজাইয়া তুলেন।

উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক কবিতা রচনায় যদি কেহ সাদীর সমকক্ষতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তবে তিনি খাজা হাফেজ। হাফেজের কবিতার রসাস্বাদনে সমগ্র দেশ উন্মত্ত হইয়া উঠিল। রাজন্যবর্গ তাঁহাকে রাজকবি-রূপে প্রাপ্ত হওয়ার নিমিত্ত লালয়িত হইয়া উঠিলেন, এবং প্রধান প্রধান রাজ-দরবারের পক্ষ হইতে তাঁহার নিকট অনুরোধপূর্ণ নিমন্ত্রণ আদিতে আরম্ভ হইল। কিন্তু এই কাব্যজগতের রাজা স্বদেশ ও স্বাধীনতা ছাড়িয়া কোন রাজ-দরবারে যাইতে সম্মত হইলেন না।

দক্ষিণভারত হইতে সোলতান মাহমুদ বাহমনী হাফেজের নিকট নজর-স্বরূপ কিছু স্বর্ণমুদ্রা প্রেরণ করেন এবং দাক্ষিণাত্যে পদার্পণ করিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষরূপে অনুরোধ করেন। সোলতানের আগ্রহাতিশয্যে কবি দাক্ষিণাত্যে আগমন করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জাহাজ উপকূল ছাড়িয়া অধিক দূরে অগ্রসর না হইতেই ভয়ানক ঝড় আরম্ভ হইল। হাফেজ তীরে অবতরণ করিলেন, এবং ভারতে আগমনের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন।

বঙ্গাধিপতি সোল্তান গেয়াসউদ্দিনও কবিকে আনয়ন করিবার জন্য বিশ্বাসী ভৃত্য ইয়াকুতকে শীরাজ নগরে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু খাজা সাহেব আগমন করেন নাই। কেবল একটি উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

"এই পারশ্য মিঠায়ের (যাহা বাঙ্গালায় প্রেরিত হইয়াছে) রসাস্বাদন করিয়া ভারতীয় তোতাকুলের কণ্ঠ মধুর হইবে।"

খাজা হাফেজ বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। একজন কৈশোরের প্রারম্ভেই মারা যান। দ্বিতীয় পুত্রের নাম শাহ্ নো'মান ছিল। ইনি ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন। বোরহানপুর নগরে ইঁহার মৃত্যু হয়। বোরহানপুর দুর্গে এখনও ইঁহার সমাধি-মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে।

হিজরী ৭৯১ সনে, ৭৬ বৎসর বয়সে অমর কবি হাফেজের মৃত্যু হয়। মোসল্লার উপবন এবং রোকনাবাদের প্রস্রবণ তাঁহার অতিশয় প্রিয় স্থান ছিল। তিনি বলিয়াছেন:—

"হে সাকী! অবশিষ্ট মদিরাটুকুও দান কর; মোসাল্লার কুঞ্জবন এবং রোকনাবাদের প্রস্রবণ (এর ন্যায় মদিরা পান করিবার উপযুক্ত স্থান) স্বর্গেও তুমি পাইবে না।" "মোসাল্লা উপবনের মৃদুমলয় ও রোকনাবাদ উৎসের নির্ম্মল সলিল আমাকে অন্যস্থানে যাইতে অনুমতি দ্যায় না।" মৃত্যুর পর ভক্তগণ তাঁহাকে এই উপবনেই সমাহিত করেন। মোসাল্লা উদ্যানের যে অংশে তাঁহার মজার রহিয়াছে, অদ্যাবধি তাহা হাফিজিয়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তাঁহার প্রিয়তম "খাকে মোসাল্লা" (=৭৯১) হইতেই তাঁহার মৃত্যুর তারিখ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

হিজরী ৮৫৫ সনে সম্রাট বাবর শাহের মন্ত্রী মৌলানা মোখাম্মায়ী কবির সমাধি-মন্দিরের উপর একটি সুন্দর গুম্বজ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। করিম খাঁ জেন্দ তাঁহার শাসন-কালে মোসাল্লা তপোবনের সংস্কার করেন এবং তথায় দরবেশ-(ব্রহ্মচারী)-দিগের অবস্থান করিবার সুবিধার জন্য একটি আশ্রমও প্রস্তুত করিয়া দেন। তিনি একখণ্ড সুন্দর মর্ম্মর প্রস্তরের উপর একটি কবিতা উৎকীর্ণ করাইয়া সমাধি-মন্দিরে স্থাপন করিয়াছিলেন।

(আল-এসলাম, জ্যৈষ্ঠ) মোহাম্মাদ আব্দুলাহেল বাকী।

বাঙ্গালায় মুসলমানজাতির জনবহুলতা।

কিঞ্চিদধিক সাড়ে পাঁচশত বৎসর কাল মুসলমান-শাসনাধীনে থাকিবার ফলে সুবিশাল ভারতবর্ষে মুসলমান জাতির বসবাস সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে অন্যান্য জাতির অনুপাতে বাঙ্গালা দেশে অধিক পরিমাণে মুসলমানদিগের বসতি স্থাপিত হইয়াছে। এমন কি, আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান এবং তুর্কীস্থান প্রভৃতি মুসলমান-প্রধান রাজ্যগুলির নিতান্ত সন্নিহিত পাঞ্জাব প্রদেশও এবিষয়ে সুদূরবর্ত্তী বঙ্গভূমিকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। বিগত 'আদম-শুমারীর' তালিকা-অনুযায়ী খাস বাঙ্গলার মুসলমান-সংখ্যা দুইকোটী বিয়াল্লিশ লক্ষের উপর; কিন্তু পাঞ্জাবের মুসলমান-সংখ্যা ন্যূনাধিক সওয়া কোটী মাত্র। ভারতীয় প্রদেশসমূহের মধ্যে মুসলমান-জনসংখ্যার অনুপাতে এই বাঙ্গাল দেশই প্রথম এবং পাঞ্জাব প্রদেশ দ্বিতীয় স্থানীয় বলিয়া গণনীয়।

সমগ্র ভারতের মুসলমান-সংখ্যা একুনে যত হইবে, তাহার কিঞ্চিদধিক তৃতীয়াংশ এই বাঙ্গালা দেশেই অবস্থান করিতেছে। হিন্দু প্রভৃতি জাতিই সমধিক প্রাচীনকাল হইতে এতদ্দেশের প্রধান অধিবাসীরূপে বসবাস করিতে থাকিলেও, এই কয়েক শত বৎসরের মধ্যে মুসলমানজাতির জনসংখ্যা আশাতিরিক্ত গতিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ইতিমধ্যেই বিপুল হিন্দু-জন-সংখ্যাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। এই বাঙ্গালা দেশের 'আদম-শুমারীর' ধারাবাহিক তালিকা দৃষ্টে বুঝিতে পারা যায় যে এতদ্দেশে মুসলমান-জন-সংখ্যা কিরূপ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যাইতেছে।

বাঙ্গালার আদম-শুমারীর রিপোর্ট-অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের (বর্দ্ধমান বিভাগের) সমগ্র অধিবাসীর ষষ্ঠাংশ মাত্র মুসলমান; অর্থাৎ ঐ বিভাগে প্রতি পাঁচজন হিন্দু-অধিবাসীর অনুপাতে একজন মাত্র মুসলমান প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত, অপরাপর বিভাগত্রয়ের মধ্যে যথাক্রমে মধ্য-বঙ্গের (প্রেসিডেন্সী বিভাগের) হিন্দু-জন-সংখ্যা প্রায় সমানাংশ; উত্তরবঙ্গের (রাজসাহী বিভাগের) হিন্দুর সংখ্যার দেড়গুণ, এবং পূর্ব্ব-বঙ্গের (ঢাকা চট্টগ্রাম বিভাগের) হিন্দু-সংখ্যার কিঞ্চিৎ অধিক দ্বিগুণ মুসলমান অবস্থিতি করিতেছে।

বাঙ্গালাদেশবাসী মুসলমানদিগের যেরূপ বংশবৃদ্ধি লক্ষিত হইতেছে, তাহা নিতান্তই অসাধারণ।

"১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে বাঙ্গালার লোকসংখ্যা গণনা ও তুলনা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক দশ সহস্র লোকের মধ্যে ১০০ জন করিয়া উত্তরবঙ্গে, ২৬২ জন করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে, এবং ১১০ জন করিয়া পশ্চিমবঙ্গে, অথবা সমগ্র বঙ্গে গড়পড়তা ১৫৭ জন করিয়া মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের বৃদ্ধিলাভ ঘটিয়াছে। মুসলমানদিগের বর্দ্ধনশীলতা প্রকৃতই অত্যধিক। যদি এইরূপেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তবে মোহাম্মদীয় ধর্ম্ম খাস বাঙ্গালার সার্ব্বজনীন ধর্ম্মরূপে পরিব্যাপ্ত হইতে সাড়ে ছয়শত বৎসর লাগিবে। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের তাদৃশ অবস্থা হইতে আরও কম সময়ের দরকার; মাত্র চারিশত বৎসরের মধ্যে উহা সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা। * * * উনিশ বৎসর পূর্ব্বে খাস বাঙ্গালায় হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানের সংখ্যা হইতে প্রায় পাঁচ লক্ষ অধিক ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী কুড়ি বৎসরের মধ্যে মুসলমানগণ হিন্দুদিগের সহিত তুলনায়, তাহাদের ন্যূনসংখ্যা পূর্ণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, বরং পনের লক্ষ অধিক হইয়া পড়িয়াছে।" ইহা ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের আদম-শুমারীর অবস্থা।

১৯০১ হইতে ১৯১১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত দশ বৎসর কালের মধ্যে, বঙ্গের হিন্দু-সংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, মুসলমান বৃদ্ধির পরিমাণ তাহা অপেক্ষা প্রায় তিন গুণ বেশী। সমগ্র বঙ্গে হিন্দুরা বাড়িয়াছে—শতকরা ৩.৯ অর্থাৎ প্রায় চারিজন; আর মুসলমান বাড়িয়াছে, শতকরা ১০.৪ অর্থাৎ প্রায় সাড়ে দশজন; এতদ্দ্বারা মুসলমানদিগের বৃদ্ধির পরিমাণ বোধগম্য হইতেছে। বাঙ্গালা দেশের মুসলমান অধিবাসীদিগের এতাদৃশ দ্রুত বৃদ্ধি ঘটিতে থাকিলে কয়েক শত বৎসরের মধ্যে যে এদেশ একটা মুসলমান-প্রধান দেশ বলিয়া পরিগণিত হইবে, ১৮৯১ সনের আদম-শুমারীর মন্তব্য-লেখক তাহা বিশদরূপেই দেখাইয়াছেন। এই সংখ্যার সহিত নবগঠিত বাঙ্গালাপ্রেসিডেন্সির বহির্ভাগে আসাম প্রদেশের জেলাগুলির মুসলমান-সংখ্যা সংযোজিত হইলে, বাঙ্গালাভাষী মুসলমান-সমাজের জন-সংখ্যা যে আরও বর্দ্ধিত দৃষ্ট হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। যেহেতু আসামপ্রদেশভুক্ত উপরিলিখিত জেলাসমূহে বাঙ্গালা-ভাষী মুসলমানগণের সংখ্যা বিশ লক্ষেরও অধিক বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের (বর্দ্ধমান বিভাগের) মুসলমান-সংখ্যা শতকরা ১৩ জন। মধ্যবঙ্গে (প্রেসিডেন্সী বিভাগে) তাহাদের সংখ্যা শতকরা ৪৮ জন। উত্তরবঙ্গে (রাজশাহী বিভাগে) তাহারা শতকরা ৫৯ জন। (কিন্তু এই বিভাগস্থিত বগুড়া জেলার মুসলমান-সংখ্যা শতকরা ৮২ জন।) অতঃপর পূর্ব্ববঙ্গের (ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগদ্বয়ে) মুসলমান সংখ্যা শতকরা ৭০ জন বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।

(আল-এসলাম, জ্যৈষ্ঠ) আবুল কাছেম আমিনুল্লাহ।

* *
*

শিল্পক্ষেত্রে মুসলমান।

মোস্‌লেম সভ্যতার উন্নতিযুগে, এস্‌লাম-জগতের সর্ব্বত্রই, শিল্প বাণিজ্য ও আবিষ্কার উদ্ভাবনের পূর্ণপ্রভাব বিদ্যমান ছিল। পশ্চিম তুর্কিস্থানের প্রধান নগর 'সমরকন্দ' সহরে কাগজ প্রস্তুত করার বহু-সংখ্যক কারখানা স্থাপিত ছিল। 'এস্পাহানে' অত্যুৎকৃষ্ট তরবারি এবং নানাবিধ যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুত হইত। 'হলব' নগরে ভুবনবিখ্যাত আয়নার কারখানা ছিল, আজও বাজারে উৎকৃষ্ট আয়নাসমূহ হলবী আয়না নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পারস্যের তাব্রিজ নগর কার্পেট বা গালিচা শিল্পের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। 'সুসন' নগরের 'সুসী' নামক বস্ত্র-শিল্প অতিশয় খ্যাত। মিসরে উৎকৃষ্ট মিছরি ও নানাবিধ সুখাদ্য মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইত। 'মরক্কো' নগরে চর্ম্ম-শিল্পের যে অসাধারণ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহার সেই খ্যাতি প্রতিপত্তি আজও বিলীন হয় নাই। এমন প্রদেশের রেশম-শিল্প পৃথিবীময় খ্যাত ছিল। টিউনিসের বন্দর "তরসানা" অর্থাৎ রণতরী ও বাণিজ্য-জাহাজ-নির্ম্মাণের কারখানার জন্য অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল। ৭১১ খৃষ্টাব্দের পর হইতে স্পেন-বিজয়কাল পর্য্যন্ত, পশ্চিম আফ্রিকার তাৎকালীন গবর্ণর বীরবর মুসা, টিউনিসের এই কারখানায় নির্ম্মিত রণতরী-বহরের সাহায্যেই দিগ্বিজয়ে সাহসী হইয়াছিলেন। বাগদাদে বারুদ প্রস্তুত হইত। কাগজ ও বস্ত্রশিল্পের বহুসংখ্যক বৃহৎ কারখানাও সেখানে ছিল।

ফলতঃ যখন সমগ্র পৃথিবী, শিল্পচর্চ্চা ও ব্যবহারিক শিল্পবিজ্ঞান সম্বন্ধে ঘোর অন্ধকারে অবস্থিত ছিল, তখন মুসলমানগণই জগতে বিবিধ নূতন শিল্পদ্রব্যের আবিষ্কার ও প্রচলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

স্পেনের পশ্চিম প্রান্তে শাস্তরিন নামক একটি নগর সূক্ষ্মতম মসৃণ বস্ত্রশিল্পের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। উক্ত নগরে এরূপ একপ্রকার "জরবাফ্‌ত" বা স্বর্ণতার মিশাইয়া সূক্ষ্মতম বস্ত্র প্রস্তুত হইত, যাহার সমকক্ষ বস্ত্র তখন পৃথিবীর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হইত না। এই বস্ত্র নানাবর্ণে রঞ্জিত ছিল; উহার সৌন্দর্য্য ও সম্মান-হেতু মূল্য একসহস্র স্বর্ণমুদ্রা হইতেও অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সে যেন মাকড়সার জাল হইতেও সূক্ষ্মতম, মসৃণ ও মোলায়েম।

আরবগণ, তাঁহাদের অসভ্যতা ও মূর্খতার যুগেও শিল্পের প্রতি কম অনুরাগী ছিলেন না। মিঞ্জিনিক যন্ত্র (Crane) অর্থাৎ যে যন্ত্রসাহায্যে অধিক গুরুভার বস্তু স্থানান্তরে নিক্ষেপ করিতে পারা যায় অথবা উর্দ্ধে বা অধোদেশে সহজে স্থাপন করা যায় তাহা, আরবজাতিরই আবিষ্কার। পাদুকা এবং মোমবাতিও আরব কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত। তাহাদের সেই প্রকৃতিগত শিল্পানুরাগ ও আবিষ্কার-স্পৃহা এস্‌লামের প্রভাব বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ মাত্রায় বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

মুসলমানগণ যেমন ব্যবহারিক শিল্পের অসাধারণ উৎকর্ষসাধন করিয়াছিলেন, পক্ষান্তরে শিল্পসংক্রান্ত পুস্তকাদি রচনাক্ষেত্রেও তাঁহারা তদ্রূপ উৎসাহ উদ্যমের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

মুসলমানেরাই পৃথিবীতে সর্ব্বাগ্রে চিনি প্রস্তুতের কলকারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। কেবল দেশের বাদশাহ ও বাণিজ্যব্যবসায়ীগণই যে শিল্পানুরাগী ছিলেন, তাহা নহে, দেশের আমির ওমরা এবং ধনী ব্যক্তিবর্গের মধ্যেও অনেকে শিল্পোন্নতিসাধনের প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। এক-একজন বড়লোক বহু শিল্পসংক্রান্ত কল-কারখানার পরিচালক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

খলিফা দ্বিতীয় আব্দুর রহমান পাইপের সাহায্যে সহরের সর্ব্বত্র জল-সরবরাহের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আবু আব্দুল্লা মস্তন্‌সারের উদ্যানস্থিত অত্যাশ্চর্য্য প্রমোদ-সরোবরে যে উপায়ে জল সরবরাহ করা হইত, তাহাকে আধুনিক জলের কলের পূর্ব্ব সংস্করণ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। বর্ত্তমানে, নগরের জল-সরবরাহের গুরুভার একমাত্র গবর্ণমেন্টের ঘাড়েই বিন্যস্ত; কিন্তু মুসলমান-আমলদারীতে নগরবাসীরা আমাদের ন্যায় কেবল রাজানুগ্রহের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতেন না, তাঁহারা সেরূপ মুখাপেক্ষাকে জাতীয় গৌরব ও আপনাদের কর্ত্তব্যপালনের প্রতিকূল বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাই অনেকস্থলে তাঁহারা নগরে বন্দরে কূপের জল সরবরাহের গুরুভার দায়িত্ব নিজেরাই বহন করিতেন। ধনী মুসলমানগণ এরূপ জনহিতকর কার্য্যে প্রাণ খুলিয়া অর্থব্যয় করিতেন। অনেকেই এতদর্থে প্রচুর ভূসম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করিয়া যাইতেন। দীন দরিদ্র বা নগরবাসী লোকদিগকে পানীয় জলের জন্য বর্ত্তমানের ন্যায় কোনরূপ "জলকর" বা ট্যাক্স বহন করিতে হইত না। আমীর ওমরাদের প্রদত্ত সম্পত্তির আয় দ্বারা চিরকাল জল-সরবরাহের কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। বসরা নগরে জল-সরবরাহের একটি বৃহৎ কারখানা ছিল। সম্রাট আওরঙ্গজেব, আওরঙ্গাবাদে জল-সরবরাহের কল স্থাপন করিয়াছিলেন; তাহার ভগ্নাবশেষ ও পাইপের চিহ্নাদি এখনও পর্য্যটকগণের নয়নপথে পতিত হইয়া থাকে। ফতেপুর শিক্‌রিতে উত্তরে দক্ষিণে, জল সরবরাহ করার দুইটি বৃহৎ কল স্থাপিত হইয়াছিল। শীতকালে জনসাধারণের ব্যবহারার্থে পাইপের সাহায্যে সর্ব্বত্র তপ্তজল সরবরাহ করা হইত। এই কারখানার ভগ্নচিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। আগ্রা নগরীতে, বিশেষতঃ ভুবনপ্রসিদ্ধ তাজমহলের প্রাঙ্গণে ও তাহার বিস্তৃত সীমার মধ্যে, মিনাবাজার উদ্যান ও তৎপ্রান্তদেশবর্ত্তী অট্টালিকাদিতে যমুনা হইতে জল সরবরাহ করার যে কল ছিল, তাহার পাইপ প্রভৃতির ভগ্নচিহ্ন তাজের সিংহদ্বারের একটি প্রকোষ্ঠে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তাজমহলের পশ্চিম-পার্শ্বের মস্‌জেদ-সংলগ্ন দক্ষিণাংশে গোলকধাঁধার ন্যায় যে হাম্মাম বা স্নানাগার আছে, তাহা যমুনার জলধারা হইতে অনেক উচ্চে নির্ম্মিত, কিন্তু যেরূপ অপূর্ব্ব কৌশলে সেখানে অদৃশ্য পাইপের সাহায্যে জল সরবরাহ করা হইত, তাহা বিশেষ বিস্ময়কর। বর্ত্তমানে কলকারখানার কোন চিহ্ন নাই, কিন্তু তথাপি আমরা আগ্রা ভ্রমণকালে উক্ত স্নানাগারে যমুনার জল দর্শনে বিস্মিত হইয়াছিলাম। দিল্লীর লাল কেল্লাতে দরবারেখাসের বামে দক্ষিণে মর্ম্মর-মণ্ডিত ভূমিদেশে যে 'নহর' খনিত হইয়াছিল, তাহার কতকাংশ এখনও বিদ্যমান আছে। মক্কা শরীফের প্রসিদ্ধ জোবেদা খাতুনের নহর নির্ম্মাণে শিল্পীগণ অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

স্পেনের খলিফা আব্দুলমোমেন এবনে আলী, নানাবিধ যন্ত্র ও অস্ত্রাবিষ্কারে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময় বিলাসব্যসন ও সমৃদ্ধিজনক এবং যুদ্ধবিদ্যায় ব্যবহারযোগ্য নানাবিধ যন্ত্র, যান, ও বহুল অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। শিল্পাগারসমূহের তত্ত্বাবধান-কার্য্য তিনি স্বয়ং নির্ব্বাহ করিতেন, এবং শিল্পজাত দ্রব্যাদি নিজের কর্ত্তৃত্বাধীনে প্রস্তুত করাইতেন। আব্দুলমোমেনের আবিষ্কৃত মস্‌জেদের মেম্বর বা বেদী একপ্রকার অত্যুৎকৃষ্ট সুগন্ধযুক্ত কাষ্ঠফলক দ্বারা নির্ম্মিত। তাহার সর্ব্বাঙ্গ নানাবিধ ফল ফুলের বিচিত্র শিল্পচাতুর্য্যে বিভূষিত এবং বেদীর আংটা ও ঠাপসমূহ স্বর্ণমণ্ডিত কারুকার্য্যবিখচিত অপূর্ব্ব শোভাসৌন্দর্য্যে অলঙ্কৃত ছিল। বেদীটি যথেচ্ছা স্থানান্তরিত হইতে পারিত। তাহা স্থানান্তর করিতে কোনরূপ অপ্রীতিকর ও অশান্তিকর খরখর শব্দ হইত না। নমাজীদের 'জায়-নমাজ'-সমূহ অতিসূক্ষ্ম ও সুশোভন কারুকার্য্য এবং শিল্পচাতুর্য্যে বিখচিত ছিল। সে-সকল আবশ্যক-মতে অতি সহজেই স্থানান্তর করিতে পারা যাইত। বেদীটির আর-একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে, খতিব বা বক্তা মেম্বরের একটি সোপানে পাদবিক্ষেপ করা মাত্র প্রকোষ্ঠরূপ বেদীর দ্বারসমূহ নিজ হইতে উদ্ঘাটিত হইয়া যাইত, আবার বক্তার অবতরণের সঙ্গে সঙ্গেই উহার দ্বার-সমূহ অবরুদ্ধ হইয়া পড়িত। এই বেদীর শিল্পী আরও বহু প্রকার নূতন প্রণালীর যুদ্ধাস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার আবিষ্কৃত শিল্পজাত দ্রব্য স্পেনের প্রসিদ্ধ সৌধমালার সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি ও সাজসজ্জার প্রধান উপকরণরূপে সাদরে সংগৃহীত হইত।

সিরিয়া প্রদেশের হেমছ নগরের জামে মস্‌জেদের তোরণদেশের গুম্বদে, লৌহ-নির্ম্মিত স্তম্ভে একটি মানুষের প্রতিকৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল। মূর্ত্তিটির দুই হস্তই মুষ্টিবদ্ধ, কেবল উভয় হস্তের তর্জ্জনী মুক্ত এবং সরলভাবে উর্দ্ধদিকে সংস্থাপিত ছিল। বায়ুর গতি নির্ণয় করার জন্য এই যন্ত্রটি। বায়ুর গতি যখন যেদিকে ফিরিত, অঙ্গুলিদ্বয় সেইদিকেই ঝুঁকিয়া পড়িত। এই মানবমূর্ত্তিটি যেন সাক্ষাৎভাবে লোকদিগকে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে বায়ুর গতি নির্ণয় করিয়া দিত। এই যন্ত্রের নাম 'আবুরিয়াহ" অর্থাৎ বায়ুর পিতা।

মুসলমানগণের উন্নতি-যুগে, বিভিন্ন প্রকারের ঘড়ি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মস্তনসারিয়া মাদ্রাসায় একটি আশ্চর্য্যধরণের ঘড়ি স্থাপিত হইয়াছিল। আকাশমার্গের ন্যায় একটি গোলকাধারে, একটি ঘূর্ণায়মান গতিশীল সূর্য্য স্থাপন করা হইয়াছিল; তদ্দ্বারা স্পষ্টতর সময়নির্ণয়কার্য্য সম্পন্ন করা হইত। দমাস্ক নগরের ভুবনবিখ্যাত জামে মস্‌জেদে যে ঘড়ি স্থাপন করা হইয়াছিল, তাহা আরও বিস্ময়কর ব্যাপার। মস্‌জেদের মিনারের গাত্রে একটি গবাক্ষদ্বারে ছোট ছোট দ্বাদশটি পিত্তল-নির্ম্মিত সোপানশ্রেণী বিরাজমান ছিল, আবার প্রত্যেক সোপানে দ্বাদশটি ক্ষুদ্র বাতায়ন ছিল। প্রথম ও শেষ সোপানে, পিত্তলের পাত্রোপরি দুইটি সুদৃশ্য বাজপক্ষীর অবয়ব নির্ম্মিত ছিল। এক ঘণ্টা সময় উত্তীর্ণ হইলে, উভয় বাজপক্ষী, ঈষদ্ভাবে গ্রীবা লম্বা করিয়া স্ব স্ব চঞ্চুর সাহায্যে নির্দ্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষিত এক-একটি পিত্তলের গুলি সজোরে তাহাদের সম্মুখস্থ পিত্তলপাত্রে নিক্ষেপ করিত। তাহাতে যে শব্দ হইত তৎদ্বারা সময়-নিরূপণ-কার্য্য অতি সহজেই সম্পন্ন হইত। বর্ত্তমানসময়ে গির্জ্জা ও মনুমেণ্টগাত্রে যেরূপ ঘড়ি স্থাপন করা হয়, এবং লোকে ঘণ্টাধ্বনি-শ্রবণে সময় নিরূপণ করে, মুসলমান-আমলে সর্ব্বত্রাচর মস্‌জেদের মিনারে সেইরূপ বৃহৎ ঘড়ি স্থাপন করা হইত এবং নগরবাসী ঘড়ির শব্দশ্রবণে সময়-নিরূপণ-কার্য্য সম্পন্ন

করিয়া লইত। ফরাসী শাস্ত্রী জারবার্ট (Gerbert) সাহেব ইউরোপে দোলকযুক্ত ঘড়ির ব্যবহার-প্রচলন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা মুসলমানগণের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি যে-সময় স্পেনের একটি মুসলমান-বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ করিতেছিলেন, তখনই এই দোলক-ব্যবহার-প্রণালী মুসলমান-শিল্পীদের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন। খলিফা হারুনর্-রশিদ ফ্রান্সের রাজা শার্লামেনকে একটি ঘড়ি উপহার পাঠাইয়াছিলেন। তদানীন্তন ফ্রান্সের রাজদরবারের বৈজ্ঞানিক-সমাজ উক্ত ঘড়ির প্রস্তুত-কৌশল বুঝিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মুসলমান ভৃত্য বা ক্রীতদাসগণ পরাধীনতা-নিবন্ধন অনুশীলন, স্বাধীন-চিন্তাশীলতা, আবিষ্কার-উদ্ভাবন ও গবেষণার সুযোগ পাইত না; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে অনেকেই শিল্পবিদ্যার ও স্থাপত্যবিদ্যায় বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছে। ইতিহাসে বহু ক্রীতদাস শিল্পী, ইঞ্জিনিয়ার, স্থপতি ও আবিষ্কারকের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। সেকালে জ্ঞানার্জ্জন, শিক্ষা-চর্চ্চা ও শিল্পাবিষ্কারাদি সর্ব্বসাধারণের কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। মুসলমানগণ আপন-আপন সন্তানসন্ততিবর্গের শিক্ষাসৌকর্য্যের জন্য যেরূপ চেষ্টা করিতেন, বাড়ীর ভৃত্য ও দাসদাসীগণের প্রতিও সেইরূপ অনুগ্রহ ও উদার দৃষ্টি রাখিতেন।

মুসলমান-আমলে স্ত্রী-শিক্ষা ও তাহাদিগের মধ্যে শিল্প-চর্চ্চা জাগরূক রাখা সমাজের সাধারণ ও স্বাভাবিক কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। সৈয়দা আজলিয়া নাম্নী একটি মহিলা তাৎকালীন প্রসিদ্ধ শিল্পাবিষ্কর্ত্তৃগণের অগ্রণী ছিলেন।

আব্বাসবংশীয় খলিফাগণের আমলে এক ব্যক্তি মানমন্দিরের ব্যবহার্য্য "জাতল হলক" নামক একপ্রকার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে আবু-এস্‌হাক এব্রাহিম-এব্‌নে হাবিব ফজারী মুসলমানগণের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে দূরবীক্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে মুসলমানগণ গভীর গবেষণার পরিচয় দিয়াছিলেন, এবং মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্বোদ্ঘাটনের সুবিধাকল্পে তাঁহারা একপ্রকার বিশেষ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

ইসলাম-জগতের প্রসিদ্ধ শিল্পীগণের নাম।

১। আবু নছর ফারাবী। ইনি 'কানুন' বাদ্য-যন্ত্রের আবিষ্কারক বলিয়া খ্যাত।

২। শের মাদা দেলেমী ইনি 'তব্‌লে কুলঞ্জ' নামক শূলপীড়ার উপশম-কারক যন্ত্রের আবিষ্কারক। কেহ কেহ মুসা নছরানীকেও এই যন্ত্রের আবিষ্কারক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

৩। হাকিম মকন্না। পার্সী সাহিত্যে 'মাহেনখ্‌শব' বা 'নখ্‌শব চন্দ্রিকা' নামে একটি কৃত্রিম চন্দ্ররূপ যন্ত্রের বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বলেন উক্ত আশ্চর্য্য যন্ত্রের আবিষ্কারকের নাম 'আতা'। "বর্ণিত পণ্ডিত প্রবর ম্যাজিক ও কৌতুকবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি তাঁহার অসাধারণ জ্ঞানপ্রভাবে 'নখ্‌শবের' কূপ হইতে গোলাকার অথচ অত্যুজ্জ্বল একপ্রকার প্রদীপ-বৎ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই অদ্ভুত আলোকের প্রভা চতুর্দ্দিকে ৬ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইত, এবং ঘোর অন্ধকার রাত্রিও শুক্লপক্ষের রজনীর ন্যায় উজ্জ্বল হইত।"

৪। এয়াকুব কুন্দী "কোমকামে নববাখ" নামক অদ্ভুত যন্ত্র, দূরবীক্ষণ, এবং সূর্য্যঘড়ি নির্ম্মাণে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

৫। নোহাস দেমশকী। ক্রুসেড যুদ্ধের সময় খৃষ্টান আক্রমণকারী সৈন্যদল 'আক্কা' নগর আক্রমণকালে তিনটি প্রকাণ্ড সামরিক বুরুজ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহার উপরিভাগে এমন একপ্রকার রাসায়নিক বস্তু লেপিয়া দিয়াছিল যে তাহাতে কোনরূপ অগ্নি-সংযোগ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। খৃষ্টান সৈন্যগণ এ-সকল বুরুজের অভ্যন্তরে অবস্থান করিয়া এরূপ সুকৌশলে "গ্রীকফায়ার" অর্থাৎ অনলবর্ষী পিচকারীর সাহায্যে নগরবাসীদের প্রতি অনলবর্ষণ করিতেছিল যে, তাহাতে মুসলমানগণের অত্যন্ত ক্ষতি সাধিত হইতেছিল। মুসলমানগণ শত্রুপক্ষের এবম্বিধ অদ্ভুত কৌশল দর্শনে ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়িল। এরূপ দুঃসময়ে উল্লিখিত শিল্পী নোহহাস দেমশকী রাসায়নিক সংযোগে এক প্রকার তরল দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা বুরুজসমূহে অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইয়া অভ্যন্তরস্থ সৈন্যগণ সহ সমস্তই ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল।

৬। বদী ওস্তর্লাবী। খগোলশাস্ত্র-সংক্রান্ত যন্ত্রাদি আবিষ্কারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

৭। নজমুদ্দিন এব্‌নে ছাবের। ইনি একজন প্রসিদ্ধ কবি। "তিনি, 'মেনজেনিক' যন্ত্র আবিষ্কার সম্বন্ধে শিল্পী-সমাজের আদর্শ ছিলেন।"

৮। এবনে বাজা সলম। এই মহাত্মা অত্যুৎকৃষ্ট শ্রেণীর জ্যোতির্ব্বিদ্যা-সংক্রান্ত যন্ত্র-নির্ম্মাণে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি তদীয় পিতা পণ্ডিত-প্রবর হাসনের নিকট এই যন্ত্র-বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলেন।

৯। মোহাজ্জবুদ্দীন এবনে আবদুর রহিম এবনে আলী। যন্ত্র-বিজ্ঞানে তাঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। তাঁহার নিকট এত অধিক পরিমাণ উৎকৃষ্ট যন্ত্রাদি ছিল যে, অন্যত্র তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া দায় ছিল।

১০। নওয়াব জয়নল আবেদীন। ইনি দিল্লীর রাজমন্ত্রী দবির-উদ্দৌলা খাজা ফরিদউদ্দিনের (১২৪৪ হিঃ) পুত্র। মাধ্যাকর্ষণ ও জ্যোতির্ব্বিদ্যা-সংক্রান্ত নানাপ্রকার যন্ত্র তিনি স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সাক্ষাৎ-প্রকোষ্ঠটি (Visiting Room) দেখিলে রসদখানা বা মানমন্দির বলিয়া ভ্রম হইত। তাঁহার পিতা আল্লামা তফজ্জল হোসেন খাঁ লক্ষ্ণৌএর রাজমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনিও জ্যোতির্ব্বিদ্যা-সংক্রান্ত যন্ত্রবিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

১১। শেখ শরফুদ্দীন তূসী। ইনি একজন প্রসিদ্ধ শিল্পী, দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সংস্কারক এবং দূরবীক্ষণ-রূপ যষ্টিযন্ত্রের আবিষ্কারক। শেখ শরফুদ্দীন তূসীর সময়ে তিনি সৌরমণ্ডলের সমুদায় গোলক ও দূরবীক্ষণের আবশ্যকতার বিষয় আছা নামক একখানি পত্রে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছিলেন।

(আল-এসলাম, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়) ইসলামাবাদী।

* *
*

আরব ও ভূগোল শাস্ত্র।

আমেরিকার একখানি সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, যখন আরবগণ স্পেন জয় করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহারা আমেরিকাতেও গিয়াছিলেন। তথাকার গ্রীষ্মাধিক্য দেখিয়া তাঁহারা সেই স্থানকে "কাল্‌ফোরণ" ('ফোরণ' অর্থ রুটি ভাজিবার তাওয়া, এবং 'কা'র অর্থ মত) অর্থাৎ এই স্থানটি তাওয়ার ন্যায় অত্যধিক উষ্ণ বলেন। জনসাধারণ এই নামের পরিবর্ত্তন করিয়া, বর্ত্তমান সময়ে আমেরিকার পশ্চিমভাগকে 'কালিফর্ণিয়া' নামে অভিহিত করিতেছে। আরবের অনেক খ্যাতনামা 'আলেম' একত্রিত হইয়া ভূগোল-আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। ৯০০ খৃষ্টাব্দে, একদল এসিয়ার পূর্ব্বাংশের শেষ আবিষ্কারের জন্য, এবং অন্যদল ইউরোপের দিকে ধাবিত হন। শেষোক্ত দল পর্ত্তুগাল হইতে অর্ণবযান-যোগে পশ্চিমদিকে যাত্রা করিয়া, ২৪ দিন পরে কোনও দ্বীপে উপস্থিত হন। জবখশারী, ইদ্রিছি, এবনে-বতুতা, আবুল ফেদা এবং ইয়াকুত হামবী প্রভৃতি আলেমগণ বিখ্যাত।

ফিনিসিয়া, গ্রীস, রোম, পারস্য, ভারতবর্ষ ও চীনে যদিও অতি প্রাচীনকালেই সভ্যতার বিস্তার হইয়াছিল, এবং তাঁহাদের নিকট হইতে আরবগণ বহু বিষয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের মধ্যে ভূগোল-চর্চার কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। আরবীরাই ভূগোল শাস্ত্রের একরকম আবিষ্কর্ত্তা।

প্রাচীনকালে আরবেরা অন্যান্য দেশের বিষয় ভালরূপে অবগত না থাকায়, প্রথমে তাঁহারা আরবের ভৌগোলিক বৃত্তান্তই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই-সকল পুস্তকে আরবের পর্ব্বত, পর্ব্বত-গুহা, কূপ, এবং নহর (প্রবাহ) ইত্যাদির কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

(আল-এসলাম, আষাঢ়)

আবু-এহিয়া মোহাম্মদ আবদুল জব্বার রোকনী।

দিল্লী-নামা

প্রথম কলি

অতুল ! বিরাট ! বিপুল দিল্লী !
শত-সম্রাট-প্রেয়সী অয়ি !
গজমোতি-গুঁড়া তব পথ-ধূলা,
মোহিনী ! রূপসী ! মহিমাময়ী !
তুমি চির-রাণী, চির-রাজধানী,
চির-যৌবনা উর্ব্বশী যে,
ইন্দ্রের তুমি মর্ত্ত্য-বিলাস
ইন্দ্রপ্রস্থ তুমি যে নিজে !
তুমি অতুলন ময়ূর-আসন,
শত ফুলবন কলাপ তব ;
চির-শূর-বীর দিগ্বিজয়ীর
তুমি গো বাহন যুবন-নব।
সাতটি রাজার নিধি সে মাণিক
দাম তার কেউ বলিতে নারে,
সাতশো রাজার নিধি তুমি তব
পায়জোর ভারী মাণিক-ভারে।
দিলু কি দিলীপ নাম দিল তোরে
দিল্লী গো দিলদার-নগরী !
ভুলে গেছি মোরা পুরাণো সে কথা
ভুলে গেছি রাজ-রাজেশ্বরী !
জানি শুধু তুমি চির-লোভনীয়া
কামনার ধন অবনীতলে,
রজোগুণে রাঙা আগুনের শিখা
দীপিছ, দহিছ হাজার ছলে !
তুমি বিচিত্রা ! তুমি যাদুকরী !
শত রাজা লুটে ওই চরণে ;
শোণিত-মদ্যে অভিষেক তব
যুগে যুগান্তে রণাঙ্গনে।

* * *

দ্বিতীয় কলি

হাজার হাজার বীরের রুধিরে
আঁকিয়াছ ভালে রক্তটীকা,
গড়-কেল্লার কঙ্কাল-জালে
সাজিয়াছ আজ তুমি কালিকা !
ভৈরবী তুমি, ভুবনেশ্বরী !
যুগে যুগে তব শব-সাধনা,
শবের পাহাড় তব পাদপীঠ
আসন তোমার বাসুকী-ফণা !
হিন্দুর দৃঢ় লোহার কীলক
বিঁধে আছে সেই ফণার পরে,
অযুত যুগের স্তম্ভ অটল
রাজদণ্ড সে তোমার করে।
উগ্র তোমার আঁখির দৃষ্টি,
ব্যগ্র তোমার অধরে হাসি,
আগ্রহ তব পাষাণ-মুঠিতে,
তবু অদৃষ্টে তুমি উদাসী !
খর্পরে পান করিয়াছ তুমি
দুঃশাসনের দর্প-মোহ,
কুরু-চৌহান মারাঠা-পাঠান
তোমর-মোগল-শিখের লোহ !
কত ভূপতির শ্মশান তুমি যে
করিব তাহার কি লেখা জোখা ?
কুমোর-পোকার কেল্লা গড়িয়া
কত মরে গেছে কুমোর-পোকা !

* * *

তৃতীয় কলি

মোগল মরেছে, মরেছে পাঠান,
জেগে আছে তার কীর্ত্তি যত,
কেল্লা-কসর পাহাড়-সোসর
বুরুজ-মীনার সমুদ্যত।
পাণ্ডব নাই, যজ্ঞের তার
কুণ্ড বৃহৎ আজিও রাজে,
নাই পৃথুরাজ, রায়-পিথোরার
প্রাচীর এখনো দাঁড়ায়ে আছে।
রয়েছে 'কুতব', নাই কেহ সেই
কুতরাজ ক্রীতদাসের কুলে,
শের শাহ নাই, শের-মণ্ডলে
আজিকে কেবল বাদুড় ঝুলে।
কাব্য-রসিক হুমায়ুন নাই,
রয়েছে তাহার কেতাব-খানা,
দীনহীন বেশে আছে দাঁড়াইয়া
'দীন্-পানা' আর 'জাহান্-পানা'।
তোগলকাবাদে শৃগাল ফিরিছে,
বাওলিতে ভেক নাহিছে শুধু,
ফিরোজাবাদের শূন্য মহল,
শুষ্ক নহর করিছে ধুধু।
ধর্ম্মাশোকের মনের মূরৎ
স্তম্ভ উখাড়ি' দিল্লী'পরে
স্থাপিল যে, হায়, সে আজ কোথায় ?
ঘুমায় সে কোন্ ধূলির স্তরে !
কত অতিকায় কামনার কায়া
কঙ্কাল-সার পড়িয়া আছে,—
অতীত জীবের শিলা-পঞ্জর
পাষাণী গো ! তোর পায়ের কাছে।

* * *

চতুর্থ কলি

কতবার হাসি' কত নির্ম্মোক
ত্যজিলে হেলায় দিল্লীপুরী !
কত বেশে আহা কালে কালে তুমি
জগতের মন করিলে চুরি !
ভাবিনী ! তোমার অশেষ ভাবন,
সোনালি তোমার রঙীন পাশি,
শিলার সাঁজোয়া গুম্বজ-তাজে
সাজিয়াছ তুমি রাজার রাণী ;
সপ্ত শিঙার সজ্জা তোমার,—
তোমারে ঘিরিয়া রয়েছে পড়ি ;
যে শাড়ীটি দিল অনঙ্গপাল
পড়ে আছে তার পাড়ের জরি।
তাতারীর বেশ পড়ে আছে তব
বিপুল কুতব-মীনার-ঘরে,
খিল্জাই সাজ এসেছ ছাড়িয়া
কখন্ আলাই-দরোজা পরে।
রঙীন ফিরোজী পেশোয়াজ তুমি
অশোকের লাটে লুটালে হোথা,
ছাড়িলে ঘাঘরি তোগ্লকি স্মরি'
পিতৃঘাতের পাপ-বারতা।
পাঠান-পোষাক শের-মস্জিদে,
মোগল-পোষাক সাজাহাঁবাদে,
লোদির দত্ত বোরকা তোমার,
কে জানে সে কোন্ ধূলায় কাঁদে ?

* * *

পঞ্চম কলি

তোমার বক্ষ আসন করেছে
কত রাজা, কত বাদ্শাজাদা,
উচ্চাভিলাষ-বিলসিত ভূমি !
আধা মধু তব মদিরা আধা !
ভারত-মৃগীর তুমি মৃগনাভি
সৌরভ তব ভুবন জুড়ি',
তুমি রমণীয় ইন্দ্রের প্রিয়
তুমি—তুমি পারিজাতের কুঁড়ি !
মোগল বাগিচা সাজায়েছে হেথা,
পাঠান গেঁথেছে মীনার তার,
ওরূপ লোলুপ কত ভূপ, হায়,
করেছে রাজ্য-বলাৎকার।

কত তৈমুরে পশিল এপুরে
বাদ্‌শার পরে বাদ্‌শা হয়ে,
ক্ষমতা-মদের লক্ষ মাতাল
ঘুমাল ওবুকে প্রলাপ কয়ে।
কত হানাহানি, কত কানাকানি,
কত সন্ধি, ষড়যন্ত্র কত,
রাজ্য-কামুক কত কালামুখ
ন্যায়-ধরমেরে করিল হত।
ধরম তেয়াগি' শুধু তোর লাগি
পিতায় ভ্রাতায় বধিল প্রাণে;
আপন ছেলের আঁখি উপাড়িল,
আয়ু নিল হরি আফিম-দানে!
ন্যায়ের নিখ্‌তি আঁখি-আগে রাখি'
শত অন্যায় করিল, মরি,—
দিল্লীশ্বর হইবার লোভে,—
জগদীশ্বরে তুচ্ছ করি!

* * *

ষষ্ঠ কলি

তুমি অপরূপ! হে চিরজীবিনী!
ঘুমের বুড়ীর চাইতে বুড়া,
তরুণীর চেয়ে সুন্দরী তবু
মোহিনী তুমি গো নগরী-চূড়া!
যা দেখেছ আর যে ভোগ ভুগেছ,
যা পেয়েছ তার নাই তুলনা,
চাঁদ কবি গান শুনায়েছে তোরে
পদ-নখে তোর চাঁদের কণা।
মিশ্র শুনাল ভামিনী-বিলাস,
শ্লোক—কনোজিয়া ভূষণ কবি,
আফগান কবি রচিল কি রুবা—
খুশ্‌হাল্ পৌরুষের ছবি।
আমীর-খশ্রু বিরচিল হেথা
দেবল-দেবীর মিলন-গাথা,
মিঞা তান্‌সেন রাগ আলাপিল
নীরব ভজর আগারে গাথা!

কত ওস্তাদ নক্সা-নবীশ
আলোকিল তোর প্রাচীর-পুঁথি।
কত ঝাটমল, পীরু, বনোয়ারী
পরাল শিলায় করবী যূথী।
অঙ্গে তোমার রয়েছে জড়ায়ে
ওস্তাদ মন্‌সুরের স্মৃতি,
জড়ায়ে রয়েছে অণুতে অণুতে
নবজাত কত রাগিণী-গীতি।
চলমান কাল ধরা দিয়েছিল
তোর যন্তর-মন্দিরেতে,
একটিও ছোটো পল কি বিপল
দৃষ্টি এড়ায়ে পারেনি যেতে।
জঙ্গীজ যবে জগতের আগে
দেখাল আপন পাঞ্জা খুনী—
মিলিল দিল্লী-দরবারে ভীত
এশিয়ার যত কবি ও গুণী;
তাহারা তোমার বন্দী ও ভাট,—
বন্দনা-গান গিয়েছে রচি,
মর্ত্ত্যভুবনে তুমি অতুলন
সপত্নীহীন তুমি গো শচী!

* * *

সপ্তম কলি

দুহিতা তোমার নারী-সুল্‌তান্
পুরুষ-বেশিনী রিজিয়া রাজা,
পালিতা তোমার রাণী নূরজাহাঁ
জিনি তলোয়ার ধারালো মাজা।
কত বীর, হায়, পূজিল তোমায়,
ভজিল তোমায়, মজিল রূপে,
অন্তিমে শেষ বিছাল ও-বুকে
দেশী ও বিদেশী কত না ভূপে।
নব-গ্রহের নয় মঞ্জিল্
কোনো সুল্‌তান্ স্থাপিল হেথা,—
ভাঙি' তেত্রিশ ঠাকুর-দুয়ারা
একের দেউল—কোনো বিজেতা।

কেহ রাজপুত বীরের মূরৎ
দ্বারপাল করি' রাখিল দ্বারে,
হিন্দুরে কেহ বন্ধু মানিয়া
আধা-রাজকাজ সঁপিল তারে।
দিবালোকে তুমি "আরব-রজনী"
খেয়ালীর চিরধাত্রী তুমি,
কত মিঞা আবু হোসেনে ক্ষেপালে
কৌতুকময়ী স্বপন-ভূমি!
আইন্ করিয়া বেশ্যার বিয়া
দেওয়াইল হেথা আলমগীর,
পৌত্র তাহার তারি তাজ পরি
যত অবীরার হইল বীর।
আরাকান্ হতে ইরান অবধি
হেথা বসি' কেউ বিথারে বাহু,
দস্যুর পায়ে তাজ রাখে কেউ
রোহিলা পাঠানে মানে গো রাহু।
কোনো বাদ্‌শার কায়া ঢাকি হেথা
কোটি মুদ্রার কবর রাজে,
গোলামের হাতে পরাণ হারায়ে
কেহ পচে পড়ি পথের মাঝে।
অনেক দেখেছ অনেক যুগেতে
এখনো অনেক দেখিতে আছে,
ধূলীভূত সোনা শোণিতের কণা
তোমারে ঘিরিয়া ঘুরিয়া নাচে!

* * *

অষ্টম কলি।

হাওয়ার দাপটে আকাশের পটে
পথ-ধূলি তোর মূরতি ধরে,—
সৈন্যের ব্যূহ—চলে সমারোহ—
বাদ্‌শা-বেগম—সফর করে।
তাঞ্জাম চলে হাওদার পিছে,
নাকাড়া সে বাজে, নকীব হাঁকে,
চলে চোবদার ধ্বজা-বর্দ্দার,
চোখ-বাঁধা বাজ চলেছে ঝাঁকে,
বাদ্‌শার পর বাদশা চলেছে
মিলায় চোখের পলক পাতে,
কারো হাতে ফুল কারো হাতিয়ার
শটকার নল কাহারো হাতে,
কেহ বা খেলায় সারা দুনিয়ায়,
কেহ ক্রীড়নক পরের তাঁবে,
কেহ জেগে আছে সদা-সতর্ক
কেহ বা ঘুমায়, কেহ বা ভাবে।
অকালে নিদ্রা ভেঙে গেল কার!—
জাগিল তৃষিতে মরণে কেবা!
রুটি কে সেঁকায় বেগমেরে দিয়া,
কেবা লয় লাখ লোকের সেবা!
দুই হাতে কেহ করি' লুণ্ঠন
উড়ায়ে দিতেছে খেয়াল-পিছু,
খাজানা প্রজার গচ্ছিত জানি'
কে ওই নিলনা ছুঁলনা কিছু!
পুত্রের ব্যাধি আপনি লইয়া
কে ও স্নেহী রাজা অকালে মরে;
সাত বছরের ছেলে কোলে নিয়া
কে ওই শাজাদা যুদ্ধ করে!
আমারীতে কেও মরণ-আহত
আমীরে কহিছে "ধর হে মোরে;
জয় নিশ্চয়, শুধু ভয় পাছে
ঢলে পড়া দেখে সিপাহী সরে।"
শাজাদীরে কেও আইবুড়ো রাখে,—
পায়না কুলীন দুনিয়া খুঁজে।
নর্ত্তকী কার হইল মহিষী
মোসাহেবে কে ও উজীর বুঝে।
নূতন ধর্ম্ম প্রচারিতে চায়
কে ওই খিলিজী সুরায় মাতি।
সকল গোঁড়ামি হাসিয়া উড়ায়
কে ওই বাদ্‌শা ইলাহি-সাথী।
পঙ্ক-লিপ্ত কৃশ হাতী পরে
কে ওই চলেছে বন্দীবেশে?
ওকি গো দিল্লী-বল্লভ দারা?
আগুলিছে পথ ভিখারি এসে।

গায়ের ওড়ন দিয়া শেষ দান
 রিক্ত চলেছে মৃত্যু-মুখে !
নিরীহের লোহে স্নান করি' হোথা
 নমাজ পড়ে কে কম্প্রবুকে ?
দিনে দুপহরে মরীচিকা একি
 সৃজিছে রবির মরীচি-মালা ?
দিল্লী, তোমার পানে চেয়ে চেয়ে
 নয়ন কখনো হ'ল না আলা ।

* * *

নবম কলি

তোমার ধূলিতে মিশে গেছে আহা
 ক্ষয় পেয়ে কত হাতের সোনা—
কত রাঙা হাত মণি-বলয়িত
 লীলা-চপলিত না যায় গোণা ।
কত বেসরের নীলা আর চুনী,
 কণ্ঠীর মুগা, কানের মোতি,
কত মরিয়ামা, তাম্রা, আজবা,
 কত দাল্‌চিনা হারাল জ্যোতি ।
পোয়া ওজনের পান্না তোমার,
 চৌদ্দ ভরির পদ্মরাগ,
ছটায় অনুপ ছটাকী হীরক
 ধূলায় তোমার হয়েছে খাক ।
যাদের অঙ্গে সাজ্জিত সে-সব
 কোথায় তাহারা ? জান কি তুমি ?
যাদের গহনা নকল করিয়া
 প্রতিমা সাজায় বঙ্গভূমি ?
কোথা কাশ্মীরী বেগম ? কোথায়—
 ইস্তাম্বুলী ? কান্দাহারী ?
কোথা যোধপুরী ? কোথা মরিয়ম ?
 কোথা উদিপুরী ? রোকিয়া নারী ?
কোথা নূরজাহাঁ ? কোথা মম্‌তাজ ?
 দিল্‌রাস্‌ বানু আজ কোথায় ?
কোথায় দারার প্রেয়সী নাদিরা ?
 হামিদা, মাহম কোথায় ? হায় !

কোথা জাহানারা ? শষ্প-শয়ান !
 কোথা রোশিনারা ? রৌদ্রে দহে !
কিশোরী সুরিয়া কোথায় জিনৎ ?
 কেবা জানে হায় কে তাহা কহে ?
যমুনা দেখিতে উচ্চ মীনারে
 চড়িত যাহারা কই গো তারা ?
কই দিল্লীর আদিম রাণীরা ?
 তোর ধূলিতলে হয়েছে হারা ।
পৃথ্বীর সংযুক্তা মহিষী—
 কোথা সেই সতী ? সেই রূপসী ?
সব রূপসীর রূপ হরি', বুঝি,
 দিল্লী গো তুমি চির-ষোড়শী !

* * *

দশম কলি

দর্পদলনে তুমি মাতঙ্গী,
 আগুন জ্বালাতে উগ্রতারা,
অভিষেক-ঘট ধরিয়া তোমার
 দশ-দিগ্‌গজ ঢেলেছে ধারা !
রক্ত দেখেছ ছিন্নমস্তা
 যুগে যুগে নিজ বুক চিরিয়া,—
দেখেছ নাদীরী রুধিরোৎসব
 সুনেহলি মস্‌জিদ ঘিরিয়া ।
মুণ্ড-মালায় কালিকা সাজাল
 তোরে তোগ্‌লকী মহম্মদ,
বেড়া-আগুনের ধূমে তৈমুর
 দিল ধূমাবতী-পরিচ্ছদ !
বারে বারে তুমি দগ্ধ হয়েছ
 তুমি অবিনাশ অমর-পাখী,
আপন ভস্ম-কুণ্ডলি মাঝে
 প্রাণ পেয়ে পুন মেলেছ আঁখি !
ভৈরবী তুমি ভুবনেশ্বরী !
 জিহ্বা টানিতে তুমি বগলা,
সাজা দিতে তব অতুল প্রতিভা,—
 করেছ রচনা শাস্তি-কলা !

গরু ও গাধার কাঁচা চাম্‌ড়াতে
সিঞায়ে মেরেছ বিদ্রোহীরে,
সন্দেহে, হায়, কত রূপসীরে
জ্যান্তে গেঁথেছ তুমি প্রাচীরে!
কারো দুই কান সদ্য ফুড়িয়া
পায়রার ঘুড়ি দিয়েছ জুড়ে,
কোমর অবধি পুঁতেছ কারেও,
গজাল ঠুকেছ কাহারো মুড়ে।
কান্না দেখেছ, হাস্য দেখেছ,
দেখেছ লোভীর লোভের ধাঁধা,
গালে চুন-কালি ওম্‌রার গলে
দেখেছ ঘোড়ার তোব্‌ড়া বাঁধা!
আপনার হাতে কতশত বার
ঘুরায়েছ তুমি যমের জাঁতা,
পূত মস্‌জিদে সায়েদ রাজার
দেখেছ খসিয়া পড়িতে মাথা।
অতীতের রাখী রক্তে রঙীন্!
অতীত-সাক্ষী দিল্লী! তুমি,
তুমি দশমহাবিদ্যা-রূপিণী
শক্তির তুমি লীলার ভূমি।

*　*　*

একাদশ কলি

শক্তিবিহীনে তুমি ঘৃণা কর
থাকনা গো দুর্ব্বলের বশে,
শক্তি-শিবের বিয়া যে ঘটায়
তার কাছে রহ তুমি হরষে।
কালরূপা তুমি পাপের প্লাবনে
দেখিছ সাঁতারি' সাঁচা ও ঝুটা,
অট্ট হাসিয়া দিতেছ দেখায়ে
দিগ্বিজয়ীর রিক্ত মুঠা!
মরণ-মরুর মধ্যে দাঁড়ায়ে
করিছ পরখ জীবন-মণি
দেখেছ দেখিছ অনিমেষ চোখে
মনু-কামনার অগাধ খনি।

দেখেছ অশেষ তাণ্ডব-লীলা
মোগল-কুলের অধঃপাতে,
দেখেছ—ঘেসেড়া দলমস্তিয়া
এসেছে লড়িতে বাদ্‌শা সাথে!
দেখেছ নিলাজ জাহান্দরের
সাধারণী রাণী লাল-কুঁয়ারী,
অশ্বশালায় বাদ্‌শা ঘুমায়
নগরেতে ঢিঢি কেলেঙ্কারী।
শিখ্ বৈরাগী বান্দাকে হায়
এই অমানুষ মেরেছে প্রাণে!
দরবারে শিশু-হত্যা দেখেছে,
দিল্লী! সে কথা কেবা না জানে?
লোদির হিন্দু-বিরাগ দেখেছ,—
চুল-দেওয়া মানা-মানৎ মেনে,
দেউলে বন্ধ শঙ্খধ্বনি,—
হুকুম জাহির ফৌজ এনে!
দেখেছ আবার আকবর শার
মার শোকে গোঁফ দাড়ি মুড়ানো,
মহলের মাঝে গণেশের পূজা
দিল্লী গো তুমি সকলি জানো।
তব ইঙ্গিতে দিল বাদ্‌শাহ
ভূমিদান গুরু অমরদাসে,
হিন্দু জৈন খ্রীষ্টীয় যত
সাধু সজ্জনে আনিল পাশে।
তোমারি অঙ্কে তেগ বাহাদুর,
আলমগীরের আরাম-শনি,—
লাঞ্ছনা সহি' দিল নিজ মাথা,
দিল না ধরম মাথার মণি!
মারাঠা-জাঠের হল্লা শুনেছ
দুরানী শিখের হুহুঙ্কার,
কেঁদেছ কি, হায়, হেসেছ? জানি না,
সম সুখ দুখ দুই তোমার।

*　*　*

দ্বাদশ কলি

আউলিয়া সাধু নিজামুদ্দিন
সঁপিল তোমায় স্বরগ-জ্যোতি,
কবরে যাহার খিরনির ফুল
শোভা পায় উট্‌পাখীর মোতি।
তোমারে নরক করিতে চাহিল
দুর্লোভী দুই সৈয়দ্‌ ভ্রাতা,
স্বর্গ নরক তোমারে ঘিরিয়া
রচিল রুধির-অশ্রু-গাথা।
দেখেছ দিল্লী! জীবে দয়াশীল
অশোকের অনুশাসন-আগে
কত যে গো-বধ—নর-নারী-বধ
খুনের তুফান রাগে-বিরাগে।
ব্রহ্মবাদী সে বোধন বিপ্রে
বধিল হেথায় কালান্দারে,
বিচারে জিতিয়া হেরেছিল সে যে
হিন্দু জাতির জাতীয় হারে।
ন্যাংটা ফকীর শর্ম্মদ শাহ
না মানি আরংজেবের কথা
নগ্ন রহিল; তারে প্রাণে মারি
বাদ্‌শা ঘুচাল অশ্লীলতা!
হোথা গাজী হ'ল মানুষ মারিয়া
কালা মস্‌জিদে তুর্কমান্‌,
হেথা ঝরোকার পর্দ্দা তুলিয়া
কুতুহলী নারী হারাল প্রাণ!
বাহাদুর শাহ হইল সে শিয়া,
মোল্লা রাখিল মনের মত,
সুন্নি শাজাদা দিনে দুপহরে
মস্‌জিদে তারে করিল হত!
তুমি বিচিত্র, তুমি গো মুখর
মানস-ঝড়ের মন্ত্র-গানে,
বন্ধুর তুমি বল-বান্ধবী!
পতনে এবং সমুত্থানে।

* * *

ত্রয়োদশ কলি

দীপ্ত দুপরে হে চির-নগরী!
তপ্ত ধূলার বোরকা টানি,
তিরিশ-হাজারী বাগিচার ছায়
আনমনে কিবা ভাব না জানি!
মাসে মাসে আর নাই খুশ-রোজ,
নও-রোজ নাই নব-বরষে,
মোদা-হাওদায় বাদ্‌শাজাদীরা
চলে না দোলায়ে দিল্‌ হরষে,
নাই সমারোহ, পথের দু'ধারে
কোরান রচেনা দীপের মালা,
হাব্‌সী, তাতার সৈন্য ঘেরে না
সিদি মৌলার অতিথশালা;
বাঘ চলে নাকো শিকল পরিয়া
বাদ্‌শাজাদার ঘোড়ার সাথে,
হাতীর লড়ায়ে পাখীর লড়ায়ে
মাকোষা-লড়ায়ে দেশ না মাতে।
মুসাফের রোজ আসে নাকো আর
ম্লান মুসাফের-খানার আলো,
থেমেছে ডঙ্কা, তুমি ভাবিছ কি?
সুখের চাইতে স্বস্তি ভালো?

* * *

চতুর্দ্দশ কলি

যন্ত্র-হাতীর দিন চ'লে গেছে
তবু আজো, হায়, মনে কি পড়ে,
শত শিবিকায় রাজপুত সেনা
নারী-বেশে কবে পশিল গড়ে,—
কে যে কবে ঐশ্বর্য্য-গরবে
চেয়ে বসেছিল কাহার নারী,—
অপমানে কারা হইল মরীয়া
আজো কি স্মরিছ কাহিনী তারি।
পিপা পিপা সুরা আরক উজাড়ি
কে বহাল স্রোত নগরী-পথে,
সপ্তাহ যায়, আঙুর রসের
কর্দ্দম হায় ঘোচে কি মতে?

মনে পড়ে কে সে রাজ্যের বাঁশী
সেতার কাড়িয়া চাঁদনী-চকে—
জড়ো করি দিল আগুন জ্বালায়ে,
মনে আছে সেই গীত-মূরখে ?
পাহারা এড়ায়ে পেঁড়ার ওড়ায়
দিল্লী ! কে যায় নিজেরে ছাপি ?
বেদের ঝোড়ার ভিতরে কে নড়ে ?—
নীচে ও উপরে সাপের ঝাঁপি !
গুম্ হ'ল কারা ? গায়েব হ'ল কে ?
হে নগরী ! সবি তোমার জানা,
শত শাজাদায় দেখিয়াছ তুমি
তপ্ত সূচীতে হইতে কানা।
ধর্ম্মের ধ্বজা ধূলায় লুটিতে
দেখেছ গো তুমি দেখেছ চোখে,
পাপের বিজয়-ডঙ্কা শুনেছ
ভরেছে দু'চোখ বজ্রালোকে।

* * *

পঞ্চদশ কলি

ময়ূর-আসন চোরে নিয়ে গেল,
কোহিনূর গেল সাগর-পারে,—
কিছু না কহিলে মৌন রহিলে,
গরবী ! এই তো সাজে তোমারে।
কালে কালে তুমি কত তেয়াগিলে
পুরাণো শরীর—পুরাণো শাড়ী,
গীতার বাণী যে কানে আজো বাজে,
কুরুক্ষেত্র—তোমার বাড়ী।
স্থির হ'য়ে বসে আছ তুমি একা
অবিরাম যাওয়া-আসার স্রোতে,
সৃজিয়া তোমায় স্থাপিল বিধাতা
মরতে তিলোত্তমার ব্রতে।
রজোগুণময়ী ! রাজ্য-কামনা !
সজীব তোমার শিলাব্রজ,
রাজা-মহারাজা ফিরেও দেখ না,—
রাজাগণ তব পথের রজ।

শত শত রাজ-মুকুটের মণি
ধূলা হয়ে আছে তোমার পায়ে,
দর্প ও মান গুঁড়া হয়ে আছে
তোমার পায়ের ডাহিনে বাঁয়ে।
ধৃত-রাষ্ট্রের কত ছেলে এল
গায়ের বসন করিতে ঢিলা,
দিল্লী গো তোর দ্রৌপদী-শাড়ী
যোজন জুড়িয়া হ'ল যে শিলা !
ধ্বংসের মাঝে বসে আছ তুমি
জীবনের রণে হারিয়া জিনি
ধর্ম্মের জয় দেখিবার লাগি
চির-রাণী ওগো, চির-যোগিনী !

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

ধর্ম্মপাল

[নৌকাডুবি হইতে রক্ষা পাইয়া বরেন্দ্রমণ্ডলের মহারাজা গোপালদেব ও তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপাল সপ্তগ্রাম হইতে গৌড় যাইবার রাজপথে যাইতে যাইতে পথে এক ভগ্নমন্দিরে রাত্রিযাপন করেন। প্রভাতে ভাগীরথীতীরে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে দস্যুলুণ্ঠিত এক গ্রামের ভীষণ দৃশ্য ও অরাজকতা দেখাইলেন। সন্ন্যাসীর নিকট সংবাদ আসিল যে গোকর্ণ দুর্গ আক্রমণ করিতে শ্রীপুরের নারায়ণ ঘোষ সসৈন্যে আসিতেছেন; অথচ দুর্গে সৈন্যবল নাই। সন্ন্যাসী তাঁহার এক অনুচরকে পার্শ্ববর্ত্তী রাজাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনার জন্য পাঠাইলেন এবং গোপালদেব ও ধর্ম্মপালদেব দুর্গরক্ষার সাহায্যের জন্য সন্ন্যাসীর সহিত দুর্গে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দুর্গ শীঘ্রই শত্রুর হস্তগত হইল। ঠিক সেই সময়ে উদ্ধারণপুরের দুর্গস্বামী উপস্থিত হইয়া নারায়ণ ঘোষকে পরাজিত ও বন্দী করিলেন। সন্ন্যাসীর বিচারে নারায়ণ ঘোষের মৃত্যুদণ্ড হইল। দুর্গস্বামিনী কন্যা কল্যাণীকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিবার জন্য মহারাজ গোপালদেবকে অনুরোধ করিলেন। গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করায় উৎসবের দিন মহারাজের সভায় সপ্ত সামন্ত রাজা উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাসীর পরামর্শক্রমে তাঁহাকে মহারাজাধিরাজ সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিলেন।

গোপালদেবের মৃত্যুর পর ধর্ম্মপাল সম্রাট হইয়াছেন। তাঁহার পুরোহিত পুরুষোত্তম খুল্লতাত-কর্ত্তৃক হৃতসিংহাসন ও রাজ্যতাড়িত কান্যকুব্জরাজের পুত্রকে অভয় দিয়া গৌড়ে আনিয়াছেন। ধর্ম্মপাল তাঁহাকে পিতৃসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এই সংবাদ জানিয়া কান্যকুব্জরাজ গুর্জ্জররাজের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া দূত পাঠাইলেন। পথে সন্ন্যাসী দূতকে ঠকাইয়া তাহার পত্র পড়িয়া লইলেন। গুর্জ্জররাজ সন্ন্যাসীকে বৌদ্ধ মনে করিয়া সমস্ত বৌদ্ধদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিবার উপক্রম করিলেন। এদিকে, সন্ন্যাসী বিশ্বানন্দের কৌশলে ধর্ম্মপাল সমস্ত বৌদ্ধকে প্রাণপাত করিয়া রক্ষা করিবেন

প্রতিজ্ঞা করিলেন। সম্রাট ধর্ম্মপাল সামন্তরাজাদিগকে সঙ্গে লইয়া কান্যকুব্জ রাজ্য জয় করিতে যাত্রা করিলেন। এই যুদ্ধের মধ্যে গুর্জ্জরেরা গোকর্ণ দুর্গ আক্রমণ করিতে যাইবার উদ্‌যোগ করিতেছে জানিয়া ধর্ম্মপাল তাঁহার বাগ্‌দত্তা পত্নী কল্যাণীকে লইয়া প্রস্থান করিলেন; পথে কল্যাণী অপহৃত ও ধর্ম্মপাল আহত হইয়া বন্দী হইয়াছিলেন। পরে ধর্ম্মপাল কল্যাণীকে লইয়া সেখান হইতে পলায়ন করিয়া নিজের সেনাদলে মিলিত হইয়াছেন।]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মিত্রতার মূল্য।

গুর্জ্জরসেনা যেমন বিদ্যুদ্বেগে আসিয়াছিল, তেমনই বিদ্যুদ্বেগে অন্তর্হিত হইল। নাগভট্ট আত্মরক্ষার জন্য সমস্ত গুর্জ্জরসেনা মরুভূমিতে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। বিমলনন্দী ও জয়বর্দ্ধন অবলীলাক্রমে বারাণসী ও প্রতিষ্ঠান পুনরধিকার করিলেন। ক্রমে চক্রায়ুধের সমগ্র অধিকার গৌড়ীয় সামন্তগণকর্ত্তৃক বিজিত হইল। গৌড়েশ্বর সামন্তচক্র সমভিব্যাহারে গৌড়নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

গৌড়েশ্বরের বিবাহ। গৌড় নগর উৎসব-সজ্জায় সজ্জিত হইয়াছে। সমগ্র সাম্রাজ্য—রাঢ় বঙ্গ মগধ ও গৌড়—উৎসুকচিত্তে নবীন সম্রাটের বিবাহ দিনের প্রতীক্ষা করিতেছে। সম্রাটের সহিত বৃদ্ধ উদ্ধব ঘোষ কল্যাণীকে লইয়া গৌড়ে আসিয়াছেন। প্রমথসিংহ, রণসিংহ, কমলসিংহ প্রমুখ রাঢ়ীয় সামন্তরাজগণ কল্যাণীর বিবাহের অপেক্ষায় গৌড়ে আছেন; বিবাহ সম্পন্ন হইলেই, তাঁহারা মহাকুমার বাক্‌পালের সহিত গুর্জ্জররাজ্য আক্রমণ করিতে যাইবেন। প্রতিদিন রাজসভায় কলিঙ্গ, ওড্র, কামরূপ ও চেদিরাজগণের দূতসমূহ উপহারসম্ভার লইয়া উপস্থিত হইতেছে। অদ্য রাজসভায় মহাসমারোহ, রাষ্ট্রকূটরাজ গোবিন্দের দূত যুদ্ধের সমাচার লইয়া দক্ষিণাপথ হইতে গৌড়ে আগমন করিয়াছেন। সম্রাট-সভায় তাঁহার অভ্যর্থনা করিবেন সেই জন্য পাত্র মিত্র কর্ম্মচারী সেনানী ও সৈনিকগণ প্রত্যূষে রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছেন। নাগরিকগণ দলে দলে রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, পুরমহিলাগণ শুভ্র লাজ ও শ্বেতপুষ্প বর্ষণ করিয়া ধূসরবর্ণ রাজপথ আচ্ছাদিত করিয়া দিয়াছেন।

যখন তোরণে তোরণে দিবসের প্রথম প্রহরান্তে মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল, তখন নগর-প্রান্তের শিবির হইতে সপ্তদশজন অশ্বারোহী নগর-তোরণে প্রবেশ করিল। সর্ব্বপ্রথমে গৌড়ের মহাপ্রতীহার পদব্রজে চলিয়াছেন, তাঁহার পরে দ্বাদশজন দণ্ডধর সুবর্ণদণ্ড হস্তে চলিয়াছে। তাহাদিগের পরে শ্বেতবর্ণ বনায়ুজ অশ্বপৃষ্ঠে শুভ্রবর্ম্মাবৃত রাষ্ট্রকূট-রাজদূত, তাঁহার পশ্চাতে শ্বেতবর্ণ অশ্বপৃষ্ঠে শুভ্রবর্ম্মাবৃত ষোড়শজন রাষ্ট্রকূট অশ্বারোহী এবং সকলের শেষে দলে দলে গৌড়ীয় অশ্বারোহী। মহাপ্রতীহার নগরে প্রবেশ করিবামাত্র সহস্র সহস্র মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, সহস্র সহস্র তূরী ও ভেরীর শব্দে নাগরিকগণের কর্ণ বধির হইল। বাতায়ন ও গবাক্ষ হইতে শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় রাশি রাশি শ্বেতপুষ্প বর্ষিত হইতে লাগিল।

শোভাযাত্রা যখন প্রাসাদের তোরণে পৌছিল, তখন অশ্বারোহীগণ অশ্ব পরিত্যাগ করিলেন। প্রাসাদ-তোরণে মহানায়ক প্রমথসিংহ ও মহামন্ত্রী গর্গদেব তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। শ্বেতপুষ্প ও মুক্তার সুদীর্ঘ চন্দ্রাতপতল দিয়া মহাপ্রতীহার ও রাজদূত রক্ষীগণে পরিবৃত হইয়া সভামণ্ডপের দ্বারে আসিলেন। মণ্ডপের তোরণে কান্যকুব্জরাজ মহারাজাধিরাজ চক্রায়ুধদেব ও মহাকুমার পরম ভট্টারক মহারাজ শ্রীবাক্‌পালদেব তাঁহাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। চক্রায়ুধ ও বাক্‌পাল দূতকে মধ্যে লইয়া সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। তাহা দেখিয়া পরমেশ্বর পরম ভট্টারক পরম সৌগত মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপালদেব সিংহাসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সভামণ্ডপে সমবেত জনসঙ্ঘ আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইল, সেনানী ও সৈনিকগণ অসি কোষমুক্ত করিয়া অভিবাদন করিল, সহস্র সহস্র শঙ্খ ঘণ্টা ও তূরী বাজিয়া উঠিল।

রাজদূত সিংহাসনের বেদীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তরবারি কোষমুক্ত করিয়া সম্রাটের চরণতলে স্থাপন করিলেন। বাক্‌পাল ও চক্রায়ুধ স্ব স্ব অসি কোষমুক্ত করিয়া ললাটে স্পর্শ করাইলেন। সম্রাট রাজদূতের অসি নিজ মস্তকে স্পর্শ করাইয়া তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন এবং নিজ খড়্গ কোষ হইতে বাহির করিয়া তিন জনকেই অভিবাদন করিলেন। গৌড়েশ্বরের পিতৃদত্ত অসি গুর্জ্জর-যুদ্ধে ভগ্ন হইয়াছিল, কিন্তু ধর্ম্মপাল তাহা পরিত্যাগ করেন নাই। ভগ্নশীর্ষ অসি দেখিয়া গৌড়ীয় সেনাগণ তুমুল

জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। সামরিক রীতির অভিবাদনে সহস্র সহস্র অসি কোষমুক্ত হইয়া সূর্য্যকিরণে জ্বলিয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া সপ্তদশ রাষ্ট্রকূটবীরের অসিও অভিবাদনের জন্য কোষমুক্ত হইল, সৈনিক ও নাগরিকগণ পুনঃ পুনঃ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। তদনন্তর সম্রাটের আদেশে সকলে আসন গ্রহণ করিলেন। রাষ্ট্রকূট রাজদূত বেদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "গৌড়েশ্বর, ধ্রুবের পুত্র গোবিন্দ, গোবিন্দের কৃপায় দক্ষিণাপথের যিনি একমাত্র অধীশ্বর, নারায়ণের কৃপায় যিনি গুর্জ্জর সমুদ্র মন্থন করিয়াছেন, কেশিমথনের দাসানুদাস গোবিন্দ আপনাকে কিঞ্চিৎ উপহার প্রেরণ করিয়াছেন।" দূতের ইঙ্গিতে গৌড়ীয় মহাপ্রতীহার সভামণ্ডপের বাহির হইতে চারিজন উপহার-বাহী রাষ্ট্রকূট-পরিচারককে ডাকিয়া আনিলেন। তাহারা বেদীর সম্মুখে চারিটি গুরুভার আধার স্থাপন করিল। রাষ্ট্রকূটদূত স্বহস্তে আধারের আবরণ মোচন করিলেন, গৌড়েশ্বর ও সমবেত সভাসদগণ বিস্মিত হইয়া দেখিলেন যে আধার-চতুষ্টয় শত শত ভগ্ন অসি ও শিরস্ত্রাণে পরিপূর্ণ। এই সময়ে বৃদ্ধ ভীষ্মদেব আসন ত্যাগ করিয়া বেদীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং দূতকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "দূতপ্রবর, আজ গৌড়েশ্বর সম্মানিত, ইহাই বীরের উপযুক্ত উপহার। মহারাজাধিরাজ রাষ্ট্রকূটরাজ গুর্জ্জর-যুদ্ধে লব্ধ ধনরত্ন মিত্রকে উপহার দিয়াছেন।" গৌড়েশ্বর আসন ত্যাগ করিয়া অভিবাদন করিলেন, সমবেত জনসঙ্ঘ উঠিয়া রাষ্ট্রকূটরাজের অপূর্ব্ব উপহারকে অভিবাদন করিল। গৌড়েশ্বর উপবেশন করিলে, রাষ্ট্রকূটরাজদূত পুনরায় কহিলেন, "মহারাজাধিরাজ, ধ্রুবের পুত্র গোবিন্দ, দাসানুদাসের মুখে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন যে, নাগভট্টের রাজ্য প্রায় অধিকৃত হইয়াছে, মরুবেষ্টিত ভিল্লমালনগরী তাঁহার করতলগত হইলে দ্বিতীয় দূত আসিবে।"

ধর্ম্মপাল কহিলেন, "উত্তম! রাষ্ট্রকূটরাজের নিকটে আমি দুশ্ছেদ্য ঋণপাশে আবদ্ধ আছি।"

দূত।—মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বরের সেনানায়ক বিমলনন্দী ও জয়বর্দ্ধন যমুনা ও চর্ম্মণ্বতীর মধ্যে বার বার গুর্জ্জরগণকে পরাজিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের বাহুবলে পঞ্চনদের গুর্জ্জর-নায়কগণ নাগভট্টের সঙ্গ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। রাষ্ট্রকূটরাজের সমস্ত সেনা নাগভট্টের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে। ধ্রুবের পুত্র গোবিন্দ সবিনয়ে গৌড়েশ্বরকে পঞ্চনদে নূতন সেনা প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, গান্ধার হইতে কীর পর্য্যন্ত বিজিত হইলে গুর্জ্জররাজচক্র অতি শীঘ্র দন্তে তৃণ ধারণ করিবে।

ধর্ম্ম।— দূতপ্রবর, বাক্‌পাল অতি শীঘ্র লক্ষাধিক সেনা লইয়া পঞ্চনদ আক্রমণ করিবে।

দূত।—মহারাজাধিরাজের জয় হউক। ধ্রুবের পুত্র গোবিন্দ মিত্ররাজ গৌড়েশ্বরের নিকট একটি প্রার্থনা জানাইয়াছেন, গৌড়েশ্বর-সমীপে তাঁহার একটি ভিক্ষা আছে।

ধর্ম্ম।—দূতপ্রবর, রাষ্ট্রকূটরাজ বোধ হয় আমাকে উপহাস করিয়াছেন, তাঁহার অনুগ্রহে আজি আমি উত্তরাপথের অধীশ্বর, তাঁহার অনুগ্রহে আজি ভণ্ডীর-বংশধর কান্যকুব্জসিংহাসনে উপবিষ্ট, তাঁহারই জন্য সুন্দর গৌড়ীয় সাম্রাজ্য শ্মশানভূমিতে পরিণত হইতে পারে নাই, তিনি আমার নিকট কি প্রার্থনা করিবেন?

দূত।—মহারাজাধিরাজ, দাস দূত মাত্র, রাজ্যেশ্বর যদি রাজ্যেশ্বরকে উপহাস করিয়া থাকেন তাহা বুঝিবার ক্ষমতা আমার নাই। গৌড়েশ্বর, ধ্রুবের পুত্র গোবিন্দ সত্য সত্যই গৌড়েশ্বরের সমীপে কিঞ্চিৎ যাচ্ঞা করিয়াছেন।

ধর্ম্মপাল সিংহাসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং কোষ হইতে অসি ও মস্তক হইতে মুকুট গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রকূটরাজদূতের হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন, "দূত, মুকুটাপেক্ষা অধিক মূল্যবান দ্রব্য রাজার আর কিছুই নাই, খড়্গ অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান ক্ষত্রিয়ের আর কিছুই নাই; যদি গোবিন্দের আবশ্যক হয় তাহা হইলে পিতৃদত্ত মুকুট এবং বহু গুর্জ্জরযুদ্ধে ভগ্ন অসি রাষ্ট্রকূট-সিংহাসনের সম্মুখে স্থাপিত হইবে।

সভাসদ্‌গণ বিস্মিত হইয়া ধর্ম্মপালের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিলেন, তাঁহার উক্তি শেষ হইলে সকলে সমস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। রাষ্ট্রকূটদূত মুকুট ও খড়্গ গৌড়েশ্বরের হস্তে ফিরাইয়া দিয়া অভিবাদন করিলেন এবং অতি বিনীত ভাবে কহিলেন, "মহারাজাধিরাজ, ধ্রুবের পুত্র গোবিন্দের প্রার্থনা অতি সামান্য—"

এই সময়ে মণ্ডপের তোরণে কোলাহল উত্থিত হইল। গৌড়েশ্বর দূতের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কহিলেন, "দূত-প্রবর! গোবিন্দের প্রার্থনা যাহাই হউক না কেন তাহা পূর্ণ হইবে।"

এই সময়ে জনৈক কৃশকায় বৃদ্ধ দ্রুতপদে সভামণ্ডপে প্রবেশ করিল এবং উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "মহারাজ, সর্ব্বনাশ করিবেন না, সর্ব্বনাশ করিবেন না।"

ধর্ম্মপাল বিস্মিত হইয়া উহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? কি বলিতেছ?"

বৃদ্ধ সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অবনত মস্তকে কহিলেন, "মহারাজাধিরাজ, আমি বিশ্বাসঘাতক, আমি নরঘাতী, আমি বুদ্ধভদ্র।"

ধর্ম্মপাল ঈষৎ হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে? সঙ্ঘস্থবির? আপনি গৌড়রাজ্যে কেন? গুর্জ্জররাজ কি দূত প্রেরণ করিয়াছেন?"

বৃদ্ধ মস্তকোত্তোলন করিয়া কহিলেন, "গৌড়েশ্বর, তুমি বালক, বৃদ্ধকে উপহাস করিও না। আমি সঙ্ঘস্থবির নহি, নরঘাতক পিশাচ, ভগবান বুদ্ধ আমার শাস্তি বিধান করিয়াছেন। চক্রের পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারি নাই, আমি বণিকের পুত্র, সুবর্ণের লালসায় অন্ধ হইয়া গুর্জ্জররাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। সহস্র সহস্র নরনারীর রক্ত-স্রোতে আর্য্যাবর্ত্ত প্লাবিত করিয়া আমার মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। বৃদ্ধকে উপহাস করিও না; তুমি গৌড়েশ্বর হইলে কি হয়, সামান্য জীবের ন্যায় তুমিও চক্রে আবদ্ধ। আপনার সর্ব্বনাশ করিও না, গোবিন্দের প্রার্থনা পূরণ করিও না, তাহা হইলে জন্মের মত শান্তি হারাইবে—ইহাই বিধিলিপি।"

এই সময়ে বিশ্বানন্দ সিংহাসনের নিকটে গিয়া বৃদ্ধকে কহিলেন, "সঙ্ঘস্থবির আপনি কি বলিতেছেন?" বৃদ্ধ তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া কহিলেন, "সত্য কহিতেছি, গণনা মিথ্যা হইবার নহে; গোপালের পুত্র ধর্ম্মপাল, তুমি যদি আজ ধ্রুবের পুত্র গোবিন্দের প্রার্থনায় কর্ণপাত কর, তাহা হইলে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে।"

গৌড়েশ্বর ধীর স্বরে কহিলেন, "সঙ্ঘস্থবির, আপনি গৌড়রাজ্যের মিত্র কি শত্রু তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। রাষ্ট্রকূটরাজ গোবিন্দ আমার রক্ষাকর্ত্তা, তিনি আর্য্যাবর্ত্তের পরিত্রাতা, তাঁহাকে অদেয় আমার কিছুই নাই, আমি এইমাত্র মহারাজাধিরাজ গোবিন্দের প্রার্থনা পূরণ করিব স্বীকার করিয়াছি।"

বৃদ্ধ ধীরে ধীরে অবনত মস্তকে কহিলেন, "ধর্ম্মপাল, বিধিলিপি অখণ্ডনীয়, আমি কীটাণুকীট, চক্রের গতিরোধ করি আমার কি সাধ্য আছে।" বৃদ্ধ এই বলিয়া ধীরে ধীরে সভা-মণ্ডপ পরিত্যাগ করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে গৌড়েশ্বর রাষ্ট্রকূটরাজদূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দূতপ্রবর, রাষ্ট্রকূটরাজ কি প্রার্থনা করেন?"

দূত কহিলেন, "গৌড়েশ্বর, ধ্রুবের পুত্র গোবিন্দের প্রার্থনা এই যে গৌড়েশ্বর এক রাষ্ট্রকূট-রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে গৌড় সাম্রাজ্যের পট্টমহাদেবী-রূপে গ্রহণ করেন।"

পরমেশ্বর পরম ভট্টারক পরম সৌগত মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপালদেব বাত্যাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় সিংহাসনে পতিত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মোক্ষমার্গ।

সভামণ্ডপে গৌড়েশ্বর যখন রাষ্ট্রকূটরাজদূতের অভ্যর্থনা করিতেছিলেন, তখন মহাদেবী দেদ্দদেবী কল্যাণীদেবী ও অমলা অন্তঃপুরে লোকনাথের মন্দিরের সম্মুখে মণ্ডপে উপবেশন করিয়া পুরমহিলাদিগের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। সেই সময়ে একজন মহল্লিকা আসিয়া মহাদেবীকে প্রণাম করিয়া কহিল, "দেবী, জনৈক ভিক্ষু দেব-দর্শন-মানসে অন্তঃপুরের তোরণে দাঁড়াইয়া আছেন, আপনারা লোকনাথের মন্দিরে আছেন শুনিয়া অন্তঃ-প্রতীহার তাহাকে প্রবেশের অনুমতি দিতে পারিতেছেন না। ভিক্ষু মহাদেবী ও পট্টমহাদেবীর সমীপে দেব-দর্শন-বাঞ্ছা জ্ঞাপন করিতে কহিয়াছেন।" দেদ্দদেবী কহিলেন, "ভিক্ষু দেবদর্শনে আসিবেন ইহাতে দোষ কি? তুমি অন্তঃপ্রতীহারকে পথ ছাড়িয়া দিতে বল।" মহল্লিকা পুনরায় প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। দেদ্দদেবী তখন পুরমহিলাদিগের সহিত বাক্যালাপ আরম্ভ করিলেন।

সেদিন যুদ্ধের কথা হইতেছিল। গুর্জ্জরযুদ্ধে বহু গৌড়ীয় বীর প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিল, তাহাদিগের স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজন যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল, তাহারা সাশ্রুনেত্রে যে যে যুদ্ধে তাহারা জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিল, সেই-সকল যুদ্ধের কথা বলিতেছিল। মহাদেবী বাক্‌পাল কর্ত্তৃক গুর্জ্জর রাজ্য আক্রমণের কথাই বলিতেছিলেন। এইবার গৌড়ীয় সেনা কান্যকুব্জ পার হইয়া বহুদূরে যাইবে। ইতিহাসপুরাণবিশ্রুত শতদ্রু বিপাশা ও ইরাবতী পার হইয়া সিন্ধুতীর পর্য্যন্ত যাইতে হইবে। যাহারা যাইবে তাহাদিগের কয়জন ফিরিবে? ধর্ম্মপালের সহিত যাহারা চক্রায়ুধের রাজ্য উদ্ধার করিতে গিয়াছিল, তাহাদিগের অর্দ্ধেকও ফিরে নাই, যাহারা ফিরিয়াছিল, তাহারা মগধে গৌড়ে এবং রাঢ়ে স্বদেশ রক্ষার্থ প্রাণত্যাগ করিয়াছে। গুর্জ্জররাজের সাহায্যে যুদ্ধ জয় হইয়াছে বটে কিন্তু চারিদিকে হাহাকার ব্যতীত অন্য শব্দ শুনা যায় না। বাক্‌পালের সহিত যাহারা পঞ্চনদে যাইবে তাহারা পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী—স্ত্রী পুত্র কন্যার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। একজন বিধবার চারিজন পুত্র সমরক্ষেত্রে শয়ন করিয়াছে, কনিষ্ঠ পুত্র মহাকুমারের সহিত যুদ্ধে যাইবে বলিয়া মাতার নিকট বিদায় লইয়াছে। অভাগিনী মাতা সংসারের সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া মহাদেবীর আশ্রয়ে আসিয়াছে।

এই সময়ে একজন ভিক্ষু লোকনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মন্দিরাভ্যন্তর হইতে গম্ভীর মধুর কণ্ঠে লোকনাথসাধন উচ্চারিত হইতে লাগিল :—

"লোকনাথং শশিপ্রভং
হ্রীঃ কারাক্ষরসম্ভূতং জটামুকুটমণ্ডিতং
বজ্রধর্ম্মজটান্তঃস্থং অশেষরোগনাশনং
বরদং দক্ষিণে হস্তে বামে পদ্মধরং তথা
ললিতাক্ষেপসংস্থং তু মহাসৌম্যং প্রভাস্বরং
বরদোৎপলকা সৌম্যা তারা দক্ষিণতঃ স্থিতা
বন্দনা দণ্ডহস্তস্তু হয়গ্রীবোথ বামতঃ
রক্তবর্ণো মহারৌদ্রো ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর প্রিয়ঃ
ওঁ হ্রীঃ স্বাহা।"

সে শব্দ শ্রবণ মাত্র রমণীগণের কথালাপ বন্ধ হইয়া গেল, দুই একজন পুরমহিলা মন্দিরের নিকটে আসিয়া স্তম্ভের অন্তরালে দাঁড়াইয়া ভিক্ষুর পূজা দেখিতে লাগিলেন। পূজা সমাপ্ত হইলে ভিক্ষু মন্দিরের বাহিরে আসিয়া অবনত মস্তকে প্রস্থান করিতেছিলেন, এই সময়ে যে বিধবা রমণীর চারিজন পুত্র হত হইয়াছে, সে ভিক্ষুর সম্মুখে যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। ভিক্ষু বাধা পাইয়া দাঁড়াইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি কি চাও?" রমণী কহিল, "প্রভু, অভাগিনীর চারি পুত্র যুদ্ধে নিহত হইয়াছে, সর্ব্বশেষে পঞ্চম পুত্র মহাকুমারের সেনাদলে যোগদান করিয়াছে, সে কি ফিরিবে?"

"মা, আমি কেমন করিয়া বলিব?"

"প্রভু, আপনারা সর্ব্বজ্ঞ, আমি অনাথিনী, এই যুদ্ধে আমার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। আমার সংসার ছিল, গুর্জ্জর যুদ্ধে তাহা ছারখার হইয়া গিয়াছে। প্রভু তিনটি বিধবা বধূ আর বৃদ্ধ বয়সের শেষ অবলম্বন অন্ধের যষ্টি সপ্তদশ বর্ষীয় বালক লইয়া বাস করিতেছিলাম, রাজার আহ্বানে সেও যুদ্ধে চলিয়া গিয়াছে। তাহাকে বুকের ভিতরে চাপিয়া রাখিয়াছিলাম কিন্তু সে বন্ধন ছিঁড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। প্রভু, সে কি আর আসিবে না? বলুন, আপনার কথা অচল।" রমণী এই বলিয়া ভিক্ষুর পদযুগল ধারণ করিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণের পাষাণে মস্তক ঠুকিতে লাগিল। তখন ভিক্ষু ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "মা, অধীরা হইও না, উঠ।" রমণী উঠিল, তাহার কপাল কাটিয়া গিয়াছিল, রক্তধারায় শুভ্র বস্ত্র রঞ্জিত হইয়া গিয়াছিল। ভিক্ষু কহিলেন, "মা, তোমার হাত দেখাও।" রমণী তাহার বাম হস্ত প্রসারিত করিল, ভিক্ষু তাহা পরীক্ষা করিয়া মন্দিরের পাষাণাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণে বসিয়া রেখাঙ্কণ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে পুরমহিলাগণ আসিয়া ভিক্ষু ও পূর্ব্বোক্তা রমণীকে বেষ্টন করিলেন, সকলেই ভাগ্যগণনার জন্য ব্যস্ত। ভিক্ষু কিয়ৎক্ষণ পরে গণনা শেষ করিয়া কহিলেন, "মা, কোন ভয় নাই, তোমার কনিষ্ঠপুত্র ফিরিয়া আসিবে।" রমণী কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ভিক্ষুর পদতলে লুটাইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে দুই দণ্ড অতিবাহিত হইয়া গেল; ভিক্ষু মহিলাগণের হস্ত পরীক্ষা করিয়া ভাগ্যফল বলিতে লাগিলেন। সর্ব্বশেষে

অমলাদেবী কল্যাণীদেবীর হস্তধারণ করিয়া ভিক্ষুর নিকটে আসিলেন, তাঁহাদিগকে দেখিয়া পুরমহিলাগণ পথ ছাড়িয়া দিলেন। অমলাদেবী কহিলেন, "ঠাকুর! অনুগ্রহ করিয়া এই বালিকাটির ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখুন।" ভিক্ষু কল্যাণীদেবীর বাম হস্ত লইয়া বলিয়া উঠিলেন, "মহাদেবীর জয় হউক, আপনি গৌড়েশ্বরী।" অমলাদেবী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "ঠাকুর, ইহার এখনও বিবাহ হয় নাই।"

"তথাপি ইনি গৌড়েশ্বরী। দেবি! আপনি শীঘ্রই গৌড় সিংহাসনে পট্টমহাদেবীরূপে অভিষিক্তা হইবেন।"

"ঠাকুর, ইহার ভবিষ্যতে আর কি দেখিতে পাইতেছেন?"

"দেবি, ভবিষ্যৎ অন্ধকার, অনিশ্চিত কর্ম্মফলের উপরে নির্ভর করে, কিন্তু বর্ত্তমান উজ্জ্বল। মহাদেবি, শত শত জন্মের সুকৃতির ফলে জীব এমন অদৃষ্ট লইয়া জগতে আসিয়া থাকে। সহস্র সহস্র করকোষ্ঠি গণনা করিয়াছি, কিন্তু এমন রেখাঙ্কণ কখনও দেখি নাই; দেবি! মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আপনার জন্ম হইয়াছে। আপনার দ্বারা সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের কল্যাণ সাধিত হইবে। দেবি, সার্দ্ধ সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে আচার্য্যগণ শাক্যসিংহ বোধিসত্ত্বের কোষ্ঠি গণনা করিয়া এই সকল লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছিলেন। শত শত জীবন আর্ত্ত দরিদ্র বিপন্ন ত্রাণের জন্য উৎসর্গ করিয়া গৌতম মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সকল সত্ত্বের মোক্ষমার্গ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। দেবি, আপনি নির্ব্বাণের পথে, আপনি বালিকা কিন্তু সত্বর আপনি জন্মমৃত্যু জরাব্যাধি অতিক্রম করিবেন, অনন্তজালচক্রে আপনার পরিক্রমণ শেষ হইয়া আসিতেছে। নির্ব্বাণ-মার্গের উদ্দেশ পাইয়া বৃদ্ধ ভিক্ষুকে বিস্মৃত হইবেন না।"

বৃদ্ধ বলিতে বলিতে কল্যাণীদেবীর চরণযুগল জড়াইয়া ধরিল। অমলাদেবী ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঠাকুর কর কি? বালিকার অকল্যাণ করিও না।"

ভিক্ষু কহিতে লাগিলেন, "রমণি, এই বালিকা সামান্য নহে, মহাপ্রজাবতী গৌতমীর অংশরূপে অবতীর্ণা, একদিন শত শত ভিক্ষু, স্থবির, মহাস্থবির, ও অর্হৎ ঐ চরণযুগলের উদ্দেশ্যে নতশির হইবে। শুন দেবি, সময় নিকট, কোমলহৃদয় দৃঢ় কর, তুমি অনন্তশূন্যের তোরণে উপস্থিত, আমি লক্ষ যোজন দূরে থাকিয়া তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। জাতক শ্রবণ কর—যুগে যুগে ভগবান ধরণীতলে অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্বসত্ত্বহিতার্থ আত্মত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন। সর্ব্বার্থ পরিত্যাগ ব্যতীত নির্ব্বাণ লাভ হয় না। বোধিসত্ত্ব একবার বারাণসী রাজ্যে মৃগযূথপতিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 'একবার ব্যাধের দল আসিয়া যূথবেষ্টন করিল। মৃগগণ প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। সেই দলে একটি গর্ভবতী মৃগী ছিল, সে পলায়ন করিতে পারিল না। পথে একটি ক্ষুদ্রা নদী ছিল, অন্য মৃগগণ তাহা স্বচ্ছন্দে লম্ফ দিয়া পার হইয়া গেল কিন্তু মৃগী নিরুপায় হইয়া তাহার পারে দাঁড়াইয়া রহিল। যূথপতি বোধিসত্ত্ব তাহার অবস্থা দেখিয়া নদীগর্ভে লম্ফ প্রদান করিলেন, মৃগী তাঁহার পৃষ্ঠে পদরক্ষা করিয়া উদ্ধার পাইল কিন্তু ব্যাধগণের শত শত চর আসিয়া যূথপতির জীবনের অবসান করিল।' শত শত জীবনে গৌতম আত্মোৎসর্গ করিয়া জীবের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ নরনারী এখনও কৃতজ্ঞচিত্তে জাতকমালা গান করিয়া থাকে। দেবি, মহাশূন্যের দ্বার চিররুদ্ধ, আত্মোৎসর্গ ব্যতীত তাহা মুক্ত হয় না। পরীক্ষা সন্নিকট, প্রস্তুত হও। হৃদয় কঠিন কর। দেবি, সর্ব্বার্থসিদ্ধি করিয়া বৃদ্ধকে মনে রাখিও, জন্মে জন্মে যেন তোমার চরণ দর্শন পাই।" বৃদ্ধভিক্ষু কল্যাণী দেবীকে প্রণাম করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। কল্যাণী ও অমলা বিস্মিতা হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

এই সময়ে মহাদেবী দেদ্দদেবী তাঁহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমলা, কি হইয়াছে?" অমলাদেবী কহিলেন, "দেবি, বৃদ্ধ ভিক্ষু দুইবার কল্যাণী দেবীকে প্রণাম করিলেন এবং কত কথা কহিয়া গেলেন তাহা ত বুঝিতে পারিলাম না।"

"কি কথা।"

"মোক্ষ, নির্ব্বাণ, এই সমস্ত।"

"অমঙ্গলের কথা কিছু বলেন নাই ত?"

"দেবি, মঙ্গল কি অমঙ্গল তাহা কিছু বুঝিলাম না।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রগৃহ।

সন্ধ্যাকালে গৌড়নগরে রাজপ্রাসাদে গঙ্গাতীরবর্ত্তী একটি কক্ষে মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর, মন্ত্রী নায়ক ও সামন্তগণে বেষ্টিত হইয়া উপবিষ্ট আছেন। দূরে স্বতন্ত্র আসনে মহাস্থবির বুদ্ধভদ্র ও চক্ররাজ বিশ্বানন্দ আসীন রহিয়াছেন। সকলেরই মুখ গম্ভীর ও দুশ্চিন্তাক্লিষ্ট। সম্রাট সামান্য কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট আছেন, তাঁহার কপোল দক্ষিণ হস্তে সংলগ্ন, পার্শ্বে মহাকুমার বাক্‌পাল অলিন্দের স্তম্ভে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সম্রাটের সম্মুখে বৃদ্ধমন্ত্রী গর্গদেব অবনত মস্তকে বসিয়া আছেন। সামন্তচক্রের সম্মুখে রাঢ়রাজ রণসিংহ, প্রমথসিংহ, ও কমলসিংহ আসীন, সকলের পশ্চাতে বৃদ্ধ উদ্ধবঘোষ উপবিষ্ট।

বহুক্ষণ পরে বিশ্বানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, কি করিবেন স্থির করিলেন? সমস্যা পূরণের অধিক সময় নাই। এখনই রাষ্ট্রকূটরাজদূত গৌড়েশ্বরের উত্তর শ্রবণের জন্য সভায় আগমন করিবেন, তাঁহাকে উত্তর দিবার জন্য প্রস্তুত হউন।"

গৌড়েশ্বর ধীরে ধীরে মস্তকোত্তোলন করিয়া কহিলেন, "কি উত্তর দিব প্রভু, আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে।"

বিশ্বানন্দ কহিলেন "গৌড়েশ্বর, দুইটি মাত্র পথ দেখিতেছি, প্রথম পথ সরল—ইহার অর্থ রাষ্ট্রকূটরাজের প্রার্থনা পূরণ এবং রঘুসিংহের কন্যাকে প্রত্যাখ্যান; দ্বিতীয় পথ বন্ধুর, ইহার অর্থ রাষ্ট্রকূটরাজের সহিত যুদ্ধ, গুর্জ্জরের সহিত যুদ্ধ, চক্রায়ুধের রাজ্যনাশ এবং বহুবর্ষব্যাপী পরিশ্রমের ফলনাশ। তৃতীয় পন্থা নাই।"

কমলসিংহ কহিলেন, "মহারাজ, এই দুই পথ ভিন্ন অন্য পথ নাই, প্রভু বিশ্বানন্দ সত্য কহিয়াছেন। রাষ্ট্রকূটরাজ-দূত শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন, চিত্ত স্থির করুন।"

ধর্ম্মপাল ভীষ্মদেবকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "তাত, আপনি পিতৃতুল্য, এই বিষম বিপদ হইতে আমাকে পরিত্রাণ করুন। পিতা গোকর্ণের দুর্গস্বামিনীকে বাক্যদান করিয়া গিয়াছিলেন যে স্বর্গীয় রঘুসিংহের কন্যার সহিত আমার বিবাহ দিবেন, সময়াভাবে বিবাহ হয় নাই। পিতা যে-রাত্রিতে রঘুসিংহের দুর্গরক্ষা করিয়াছিলেন, সেই রাত্রিতে তাঁহার আদেশে কল্যাণীকে লইয়া আমি একাকী গোকর্ণদুর্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। দুইদিন জনশূন্য বনে ভ্রমণ করিয়া প্রভুদত্ত ও বিমলনন্দীর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম, তদবধি কল্যাণী আমার ভাবী পত্নীরূপে পরিচিতা। গুর্জ্জরসেনা যেদিন গোকর্ণ দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিল, সেদিন মৃতা দুর্গস্বামিনী কুমারী কন্যাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া তাহাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কল্যাণীকে লইয়া ঢেক্করী যাত্রার কালে গুর্জ্জরসেনা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলাম, সঙ্গীহীন হইয়া দুইজনে বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছি। কল্যাণী দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়াছে, আমি একাকী তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছি, অবশেষে গুরুদত্ত আসিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছে। ঢেক্করী নগরে কল্যাণীদেবী আমার ধর্ম্মপত্নীরূপে গৌড়সাম্রাজ্যের পট্টমহাদেবীরূপে পরিচিতা হইয়াছে। মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কল্যাণীর সহিত আমার বিবাহ হয় নাই বটে কিন্তু নিখিল জগতের চক্ষে কল্যাণী আমার ধর্ম্মপত্নী। পক্ষান্তরে হর্ষবর্দ্ধনের মাতুলপুত্র ভণ্ডীর-বংশধর মহারাজাধিরাজ চক্রায়ুধ আমার আশ্রিত। আবক্ষ গঙ্গাসলিলে নিমগ্ন থাকিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ-দিনে চক্রায়ুধকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছি। সহস্র সহস্র গৌড়ীয় বীর চক্রায়ুধের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া গৌড়দেশের নাম উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। দুর্দ্ধর্ষ গুর্জ্জরসেনা বার বার পরাজিত হইয়াছে। অবশেষে বৌদ্ধ সঙ্ঘস্থবিরগণের সুবর্ণ-লালসার জন্য আমাদিগকে পরাজিত হইতে হইয়াছিল। বহু-কষ্টার্জ্জিত কান্যকুব্জরাজ্য যখন গুর্জ্জরকরকবলিত, গুর্জ্জরসেনা যখন বর্দ্ধমান ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তি অধিকার করিয়াছে, তখন নিরুপায় হইয়া রাষ্ট্রকূটরাজের সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলাম। গৌড়সাম্রাজ্যের ঘোর দুর্দ্দিনে সদাশয় দক্ষিণাপথেশ্বর নাগভটের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহারই সাহায্যে শত্রুসেনা গৌড়সাম্রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়াছে, তাঁহারই জন্য চক্রায়ুধের রাজ্যের পুনরুদ্ধার হইয়াছে। অসময়ের মিত্র গোবিন্দ আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহা অন্য সময়ে হইলে অতি সামান্য কথা, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় অতি গুরুতর। কল্যাণীকে পরিত্যাগ করিলে কোন

ক্ষত্রিয় যুবক কি তাহার পাণিগ্রহণ করিবে? রঘুসিংহের কন্যা পিতৃমাতৃহীনা অনাথা মৃতা দুর্গস্বামিনী আমার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন, এখন আমি তাহার অভিভাবক। রাষ্ট্রকূটরাজের প্রার্থনা পূরণ না করিলে তিনি বিরূপ হইবেন, গুর্জ্জরসেনা হয়ত রাষ্ট্রকূটসেনার সহিত মিলিত হইয়া আর্য্যাবর্ত্ত আক্রমণ করিবে, তাহা হইলে কান্যকুব্জ ও গৌড়সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ হইবে। তাত কি করিব?"

ভীষ্মদেব নীরবে অবনতমস্তকে বসিয়া রহিলেন। তাহা দেখিয়া বৃদ্ধ সঙ্ঘস্থবির উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "মহারাজ, জীবনে একমাত্র পথ—ধর্ম্মপথ, অন্য পথ নাই। ইহা রাজা ও প্রজা উভয়ের পক্ষেই সমান।"

ধর্ম্মপাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধর্ম্মপথ কি প্রভু? তাহাও চিনিতে পারিতেছি না।"

"আর্ত্তত্রাণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌগতধর্ম্ম, কল্যাণী আশ্রয়হীনা, অনাথা, ধর্ম্মের নিকটে তিনি আপনার পত্নী। চক্রায়ুধ আপনার আশ্রিত বটে কিন্তু চক্রায়ুধ রাজা, চক্রায়ুধের রাজ্যে চক্রায়ুধের পরিবর্ত্তে হয়ত অন্য রাজা আসিবে। চক্রায়ুধের ক্ষতিপূরণ হইবে, কিন্তু কল্যাণীর ক্ষতিপূরণ হইবার নহে। গৌড়েশ্বর ইহাই ধর্ম্মপথ।"

বৃদ্ধ ভীষ্মদেব একলম্ফে আসন ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "সাধু মহাস্থবির, সাধু। সত্য সত্যই ইহা ধর্ম্মপথ। মহারাজ ইহাই ক্ষত্রধর্ম্ম, এই কথা বৃদ্ধের জিহ্বাগ্রে আসিয়াছিল, কিন্তু গৌড়সাম্রাজ্যের অবশ্যম্ভাবী দুরবস্থা কল্পনা করিয়া উচ্চারণ করিতে পারিতেছিলাম না।"

তখন গৌড়েশ্বর সিংহাসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন "সামন্তবর্গ ইহাই ধর্ম্মপথ এবং একমাত্র পথ। আমি লক্ষ্য স্থির করিয়াছি, সভায় চলুন। সমবেত নায়কমণ্ডলী যদি একবাক্যে কল্যাণীকে ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিতেন, তাহা হইলেও তাহা সম্ভব হইত না, গৌড়রাজ্যের মঙ্গলের জন্য গৌড়সিংহাসন ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু বন্ধুবর্গ, কল্যাণীকে ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প মনেও আনিতে পারি নাই।"

সকলে স্থির হইয়া গৌড়েশ্বরের উক্তি শ্রবণ করিলেন। সহসা কমলসিংহ লম্ফ দিয়া আসন ত্যাগ করিয়া গৌড়েশ্বরকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ভীষ্মদেব প্রমথসিংহ, রণসিংহ প্রভৃতি অন্যান্য নায়কগণ আসন ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপালকে বেষ্টন করিল। সহসা মন্ত্রগৃহ কম্পিত করিয়া ভীষণ জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। মন্ত্রগৃহের বহির্দ্দেশে সমবেত সেনাপতি ও সেনানায়কগণ যুদ্ধযাত্রার আদেশ হইয়াছে মনে করিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে গর্গদেব কহিলেন, "মহারাজ, সভামণ্ডপে যাইবার আবশ্যকতা নাই, রাষ্ট্রকূটরাজদূতকে মন্ত্রগৃহে আহ্বান করুন, তিনি এই স্থানেই গৌড়েশ্বরের উত্তর শ্রবণ করিবেন।"

গৌড়েশ্বর সম্মতি প্রদান করিলেন। জনৈক দণ্ডধর গর্গদেবের আদেশে রাষ্ট্রকূটরাজদূতকে আনয়ন করিতে গেল। একদণ্ড পরে রাষ্ট্রকূটরাজদূত মন্ত্রগৃহে প্রবেশ করিলেন। তখন সভা নীরব, নিস্তব্ধ। ধর্ম্মপালের একপার্শ্বে গর্গদেব ও অপর পার্শ্বে ভীষ্মদেব দণ্ডায়মান। দূত আসন গ্রহণ করিলে, ভীষ্মদেব কহিলেন, "দূতপ্রবর, পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরমসৌগত মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বরের আদেশে তাঁহার সমক্ষে ও গৌড়ীয় সামন্তচক্রের সমক্ষে আপনার প্রার্থনার উত্তর প্রদান করিতেছি,—'গৌড়েশ্বর গোকর্ণদুর্গস্বামীর কন্যার সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ। যথারীতি বিবাহ হয় নাই বটে কিন্তু গান্ধর্ব্ব বিবাহ হইয়া গিয়াছে। দেশান্তরে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে প্রথমা পত্নী ধর্ম্মপত্নী এবং পট্টাভিষিক্তা। লোকাচারানুসারে গৌড়েশ্বর দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করিতে পারেন না। সুতরাং গৌড়েশ্বরকে জামাতারূপে প্রার্থনা করিয়া রাষ্ট্রকূটরাজ যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করা গৌড়েশ্বরের পক্ষে সম্ভব নহে। রাষ্ট্রকূটরাজ মিত্র, অসময়ের বন্ধু, বিপদে ত্রাণকর্ত্তা, তাঁহাকে অদেয় গৌড়রাজ্যে কিছুই নাই, তবে ধর্ম্মরক্ষা করিয়া রাষ্ট্রকূটরাজ-কন্যার পাণিগ্রহণ ধর্ম্মপালের পক্ষে অসম্ভব। দক্ষিণা-পথেশ্বরকে জানাইবেন যে ধর্ম্মপাল ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার অপর সমস্ত আদেশ পালন করিবেন।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ভীষ্মদেব।

যথাসময়ে কল্যাণীদেবীর সহিত ধর্ম্মপালের বিবাহ হইয়া গেল, কল্যাণীদেবী গৌড়-সাম্রাজ্যের পট্টমহাদেবীরূপে

অভিষিক্ত হইলেন। বাক্‌পাল গৌড়ীয় সামন্তরাজগণের সহিত লক্ষাধিক সেনা লইয়া পঞ্চনদে গুর্জ্জররাজচক্রের অধিকার আক্রমণ করিতে যাত্রা করিলেন। ছয়মাস নির্ব্বিবাদে কাটিয়া গেল, গৌড়ীয় সেনা গঙ্গা যমুনা অতিক্রম করিয়া শতদ্রু ও বিপাশার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ আক্রমণ করিল। শীতের মধ্যভাগে সংবাদ আসিল যে, রাষ্ট্রকূট-রাজ গোবিন্দ ও মহানায়ক জয়বর্দ্ধন ভিল্লমাল নগর অধিকার করিয়াছেন, গুর্জ্জররাজ গোবিন্দের অধীনতা স্বীকার করিয়া সন্ধি প্রার্থনা করিয়াছেন।

বাক্‌পালের বাহুবলে শতদ্রু ও বিপাশাতীরে গুর্জ্জরের অধিকার লুপ্ত হইল, শত শত বর্ষ পরে কৌরব, ও যাদব বংশীয় রাজগণ প্রাচীন অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন, সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত গৌড়ীয় বীরগণের যশঃসৌরভে পূর্ণ হইল। বাক্‌পালের সেনা যখন বিপাশা পার হইয়া বিশালকায়া ইরাবতী-তীরে পৌঁছিয়াছে, তখন গৌড়ে সংবাদ আসিল যে, অসংখ্য সেনা লইয়া দক্ষিণাপথেশ্বর গোবিন্দ কান্যকুব্জে আগমন করিয়াছেন। তিনি গুর্জ্জররাজের সহিত সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিবার জন্য গৌড়েশ্বরের প্রতিনিধিকে কান্যকুব্জে আহ্বান করিয়াছেন। এই সন্ধিসূত্রে গুর্জ্জররাজ নাগভট্ট উত্তরে যমুনা এবং দক্ষিণে নর্ম্মদা গুর্জ্জর সাম্রাজ্যের সীমা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং পঞ্চনদবাসী গুর্জ্জরগণের সহিত যোগ দিবেন না অঙ্গীকার করিয়াছেন। বাক্‌পাল দূতমুখে সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, প্রাচীন ভোজ, মৎস্য, কুরু, যদু, যবন, গান্ধার ও কীরদেশে গৌড়ীয় সেনার বাহুবলে ক্ষত্রিয়রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহামন্ত্রী গর্গদেব সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিবার জন্য গৌড় হইতে যাত্রা করিলেন। বসন্তকাল আসিল, সকলে ভাবিল যে অতি দীর্ঘকালস্থায়ী গুর্জ্জর-যুদ্ধের এতদিনে অবসান হইল।

হঠাৎ একদিন সংবাদ আসিল যে, ভীষ্মদেব মগধে ফিরিয়াছেন, তিনি সত্বর সম্রাটের সহিত সাক্ষাতের জন্য গৌড়ে আসিয়াছেন। সংবাদ পাইয়া ধর্ম্মপাল অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। তিনি বৃদ্ধ মহানায়ককে বাক্‌পালের রক্ষার জন্য নিয়োজিত করিয়া পঞ্চনদে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এখন ভীষ্মদেব একাকী ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া তিনি ঘোরতর বিপদ আশঙ্কা করিতে লাগিলেন।

একদিন অপরাহ্ণে ভীষ্মদেব প্রাসাদের তোরণে আসিয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলেন। প্রতীহার ও দণ্ডধরগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সম্রাটসকাশে লইয়া গেল। ধর্ম্মপাল আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাত, সংবাদ কি? আপনি একাকী ফিরিলেন কেন?"

বৃদ্ধ মহানায়ক আসন গ্রহণ করিয়া ললাটের স্বেদ মোচন করিতে করিতে কহিলেন, "পুত্র, বিপদ উপস্থিত। গৌড়-সিংহাসন দৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপন বোধ হয় ভগবানের অভিপ্রেত নহে।"

"কি হইয়াছে?"

"আমি ইরাবতীতীরে শুনিতে পাইলাম যে, রাষ্ট্রকূটসেনা যমুনার তীর্থগুলি অধিকার করিয়াছে, লক্ষাধিক সেনা স্থাণীশ্বর ও পৃথূদক দুর্গে প্রবেশ করিয়াছে। ততোধিক সেনা লইয়া রাজপুত্র কক্ক মথুরায় সেনানিবাস স্থাপন করিয়াছেন। কান্যকুব্জের রাষ্ট্রকূট-সেনা উৎসবে উন্মত্ত নহে, তাহারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। পঞ্চনদে যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, কিন্তু বাক্‌পালের ফিরিবার উপায় নাই। ভিল্লমালে জয়বর্দ্ধন ও বিমলনন্দী গুর্জ্জররাজের অনুমতি ব্যতীত প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবে না। গৌড়ে তুমি একা। সেই জন্য প্রমথসিংহ ও কমলসিংহ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। রাষ্ট্রকূটসেনার যুদ্ধোত্তম কিসের জন্য? উত্তরাপথে বা দক্ষিণাপথে আর ত শত্রু নাই। নাগভট্ট বন্দী, চক্রায়ুধ গোবিন্দের করতলগত, এখন গোবিন্দ পুনরায় যুদ্ধসজ্জা করিতেছেন কেন তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। পুত্র বিষম বিপদ উপস্থিত, সমগ্র গৌড়ীয় সেনা মালবে ও পঞ্চনদে। গোবিন্দ যদি গৌড়দেশ আক্রমণ করে, তাহা হইলে সাম্রাজ্য রক্ষা করিবে কে?"

"গোবিন্দ বিরূপ হইলেন কেন?"

"রাষ্ট্রকূট-রাজকন্যার পাণিগ্রহণে অসম্মত হইয়াছিলে তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছ?"

"না।"

"দক্ষিণাপথেশ্বর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রাষ্ট্রকূটরাজকন্যাকে গৌড়েশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, গৌড়েশ্বর সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন; উত্তরাপথে

ও দক্ষিণাপথে গ্রামে গ্রামে সে সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে। রাষ্ট্রকূটরাজ সে অপমান বিস্মৃত হন নাই। গোবিন্দ রাষ্ট্রকূটনীতিকুশল, নাগভট্টের যতদিন শক্তি ছিল, ততদিন তিনি মিত্রবিচ্ছেদ করেন নাই, এখন যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে, বিশেষতঃ গৌড়েশ্বর এখন দুর্ব্বল, সমগ্র গৌড়ীয়-সেনা বিদেশে, অবসর বুঝিয়া রাষ্ট্রকূটরাজ প্রতিশোধ লইতে উদ্যত। পুত্র, ভীষণ পরীক্ষার দিন সমাগত, এইবার বৃদ্ধ ও বালক লইয়া গৌড়সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে হইবে। বৃদ্ধ সেইজন্য পঞ্চনদ হইতে আসিয়াছে।"

"তাত, নিরর্থক বলক্ষয়ে প্রয়োজন নাই, আমি সিংহাসন ত্যাগ করিতেছি। বাক্‌পালকে সিংহাসন প্রদান করুন, সে অবিবাহিত, সুতরাং রাষ্ট্রকূট-রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া পট্টমহাদেবীরূপে গৌড়সিংহাসনে বসাইতে পারিবে।"

"পুত্র, তাহাতে গোবিন্দের অপমানকালিমা ক্ষালন হইবে না। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।"

"কেন? গোবিন্দ রাষ্ট্রকূটরাজকন্যাকে গৌড়ের পট্টমহাদেবীরূপে অধিষ্ঠিতা দেখিলেই ত সন্তুষ্ট হইবেন।"

"না; কান্যকুব্জের পথে পথে রাষ্ট্রকূটগণ বলিয়া বেড়াইতেছে যে, ধর্ম্মপালের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া রাঢ়ীয় সামন্তকন্যাকে গৌড়সিংহাসন হইতে দূর করিয়া দিতে হইবে। ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রকূটরাজকন্যার পাণিগ্রহণ না করিলে তাহার সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।"

"তবে যুদ্ধ।"

"হাঁ পুত্র, যুদ্ধ। বিশাল রাষ্ট্রকূটবাহিনীর বিরুদ্ধে বৃদ্ধ ও বালকের যুদ্ধ। পুত্র, সেইজন্য দ্রুতবেগে পঞ্চনদ হইতে গৌড়ে আসিয়াছি, বৃদ্ধের যুদ্ধে বৃদ্ধ ব্যতীত কে সেনা চালনা করিবে। বৃদ্ধ ভীষ্ম গোপালের পুত্রের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিতে আসিয়াছে।"

বৃদ্ধ মহানায়কের শীর্ণ গণ্ডস্থল বাহিয়া দুইটি অশ্রুবিন্দু তুষারশুভ্র শ্মশ্রুরাজির মধ্যে পতিত হইল। ধর্ম্মপাল ভীষ্মদেবের পদবন্দনা করিলেন। বৃদ্ধ তাঁহাকে উঠাইয়া কহিলেন, "দুঃখ কি পুত্র? দিন গিয়াছে, বৃদ্ধ বয়সে গোপালের পুত্রের জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিব ইহা অপেক্ষা গৌরব আর কি হইতে পারে? সময় নাই, প্রস্তুত হও, পঞ্চবিংশ সহস্র লইয়া লক্ষ লক্ষের গতিরোধ করিতে হইবে। শোণতীর ও মণ্ডলার গিরিসঙ্কট ব্যতীত গৌড়সাম্রাজ্যে অপর যুদ্ধক্ষেত্র নাই, গুর্জ্জরযুদ্ধে শতবার তাহা পরীক্ষিত হইয়াছে। সামান্য সেনা লইয়া শোণতীর রক্ষা করা অসম্ভব, আমি মগধের সমস্ত সেনা মণ্ডলায় সমবেত করিয়াছি। গৌড়রাষ্ট্রে কে আছে? মাতৃভূমি রক্ষার্থ কে জীবনদান করিবে? যাহারা আসিবে তাহাদিগকে আমার সহিত পাঠাইয়া দাও। পুত্র, বারাণসী হইতে মণ্ডলা অধিক দূর নহে, আমি কল্যই যাত্রা করিব।"

ধর্ম্মপাল সাশ্রুনয়নে কহিলেন, "তাত, পঞ্চনদ অভিযানের ভীষণ পরিশ্রমের পরে আপনি যুদ্ধযাত্রা করিলে লোকে কি বলিবে? আমি জীবিত থাকিতে আপনাকে প্রেরণ করিলে আর্য্যাবর্ত্তবাসী চিরকাল আমার অপযশ ঘোষণা করিবে।"

"শুন পুত্র, বৃদ্ধ প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। তুমি এবং আমি ব্যতীত গৌড়সাম্রাজ্যে নায়ক নাই। একজনকে দ্বার রক্ষা করিতে হইবে, অপর জন গৌড় রক্ষা করিবে। আমি মগধের নায়ক, সুতরাং মগধ রক্ষা আমারই কার্য্য। যদি তুমি মণ্ডলায় যাও, তাহা হইলে তোমার মৃত্যুর সহিত গৌড়সাম্রাজ্যের আশা-ভরসা শেষ হইবে, কিন্তু ভীষ্ম মরিলে তুমি থাকিবে। বৃথা বাক্যব্যয় করিও না, প্রস্তুত হও, যাহারা প্রত্যাবর্ত্তনের আশা রাখে না, এমন সেনা আমার সহিত দিও।"

ভীষ্মদেব বিদায় গ্রহণ করিলেন কিন্তু ধর্ম্মপাল বিষণ্নবদনে কক্ষের বাতায়নে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে নূতন যুদ্ধের কথা গৌড়নগরময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। গৌড়বাসী বিষাদে নিমগ্ন হইল। তখনও গৌড়ে জীবন ছিল, মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া শত শত বৃদ্ধ বিকলাঙ্গ সৈনিক প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা বৃদ্ধ মহানায়কের আহ্বান শুনিয়াছিল, প্রত্যাবর্ত্তনের আশা, জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া ভীষ্মদেবের সহিত গৌড়সাম্রাজ্যের তোরণ রক্ষার্থ যাত্রা করিতে প্রস্তুত লইল।

ক্রমশঃ

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

— —

বিশ্বসাহিত্য

আমাদের দেশের খবরের কাগজ এবং সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রগুলিকে আমরা ঘরে বসিয়া যথেষ্টই নিন্দা করিয়া থাকি। বাহিরে আসিয়া বুঝিতেছি আমরা সত্যসত্যই বেশী নিন্দার পাত্র নহি। বিলাতে এবং আমেরিকায় সংবাদপত্রগুলি বিশেষ কোন যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত হইয়া থাকে বলিয়া মনে হয় না। কি বিষয়-নির্ব্বাচন, কি তথ্যসংগ্রহ, কি সম্পাদকীয় মন্তব্যপ্রকাশ—কোন বিষয়েই বিলাতী ও ইয়াঙ্কি কাগজওয়ালারা ভারতীয় সহযোগীদিগকে বেশী পশ্চাতে ফেলিতে পারেন না। তবে সমগ্র পাশ্চাত্য-মণ্ডলে রাষ্ট্রীয় সামাজিক ও শিক্ষাবিষয়ক চিন্তা ও জীবনই উচ্চতর—এইজন্য স্বভাবতই এখানে ভারতবর্ষ অপেক্ষা সাময়িক সাহিত্যের সুর কিছু উন্নত। তাহা ছাড়া পরিচালনা সম্বন্ধে এখানে যৎপরোনাস্তি উৎকর্ষ দেখা যায় সন্দেহ নাই। মাসিকই হউক বা দৈনিকই হউক—প্রত্যেক পত্রই এক-একটা বিরাট লাভজনক ব্যবসায়-বিশেষ। এই ব্যবসায়-চালাইবার দিক্ হইতে ভারতবর্ষের প্রত্যেক কাগজ-পরিচালকই যে-কোন পাশ্চাত্য পরিচালকের নিম্নে পড়িবেন—একথা বলিতে বাধ্য। কিন্তু সম্পাদনহিসাবে এলাহাবাদের দৈনিক লীডার (Leader), মান্দ্রাজের সাপ্তাহিক হিন্দু (Hindu), কলিকাতার মাসিক মডার্ণ রিভিউ (Modern Review) এবং মহারাষ্ট্র ও বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান মাসিক পত্রিকাগুলি এই ধরণের বিদেশী পত্রিকাবলীর সমকক্ষ। অবশ্য আমাদের দেশে বিশেষজ্ঞ-সম্পাদিত বৈজ্ঞানিক দার্শনিক বা ঐতিহাসিক পত্রের অভাব যৎপরোনাস্তি। দাক্ষিণাত্যের দি ওয়েলথ্ অফ ইণ্ডিয়া (The Wealth of India), কলিকাতার বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা, শ্রীযুক্ত গঙ্গানাথ ঝার ইণ্ডিয়ান থট (Indian Thought) এবং পাণিনি আফিসের (The Sacred Books of the Hindus Series) হিন্দুদিগের শাস্ত্রগ্রন্থমালা ত্রিশকোটি নরনারীর দেশে নগণ্য বলিলেই চলে। খাঁটি বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক পত্রিকা বোধ হয় একখানাও নাই। এইখানেই আমরা বর্ত্তমানজগতের নরসমাজ হইতে পশ্চাতে পড়িয়া আছি। এই মাপকাঠিতে আমাদের স্বাধীনচিন্তার অভাব, আমাদের মৌলিকতার অভাব, আমাদের উদ্ভাবনীশক্তির অভাব সহজেই বুঝিতে পারি।

বিলাতের এবং ইয়াঙ্কিস্থানের দৈনিক ও মাসিক পত্রে চিত্রশিল্প স্থাপত্য এবং নাটক নৃত্যকলা সঙ্গীত ও সাধারণ সাহিত্য সম্বন্ধে সমালোচনা প্রায়ই বাহির হইয়া থাকে। আমাদের দেশেও সাময়িক পত্রিকায় এবং খবরের কাগজে সমালোচনার স্তম্ভ আছে। সর্ব্বত্রই ধরণধারণ, লিখিবার ভঙ্গী, সমালোচনার রীতি প্রায় একরূপ। এই রচনাগুলিকে বাস্তবিকপক্ষে সমালোচনা বলা অন্যায়—চিত্রপরিচয়, চিত্রকর-পরিচয়, শিল্পী-পরিচয়, গ্রন্থের বিবরণ, নর্ত্তকীর বিবরণ, ওস্তাদের জীবনবৃত্তান্ত ইত্যাদি বলাই কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য মহলেও ভারতবর্ষ অপেক্ষা উচ্চতর প্রণালী দেখিতে পাই না। আমাদের সম্পাদক ও "শ্রীসমালোচক"-গণকে বিশেষ দোষী বিবেচনা করিবার কারণ নাই। পুস্তকসমালোচনা করিতে হইলে লেখকগণ ভূমিকা সূচীপত্র নির্ঘণ্টপত্র এবং অভ্যন্তরের কোন অর্দ্ধ অধ্যায় হইতে বাছিয়া দুই চারি পংক্তি উদ্ধৃত করেন। কোন নটী অথবা গায়ক এবং চিত্রাঙ্কণ বা মূর্ত্তির বিবরণ প্রদান করিতে হইলে লেখক গৃহসজ্জার কথা, শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনের কথা ইত্যাদি অবতারণা করিয়া কার্য্য সাধিতে চেষ্টা করেন। রবিবাবুর গ্রন্থাবলী বিলাত ও আমেরিকার কত কাগজে প্রশংসিত হয়। সমালোচনার রীতি সেই মামুলিধরণের—

"ম্যাক্‌মিলান যখন প্রকাশক, নোবেল-প্রাইজ-প্রাপ্ত রবিবাবু যখন লেখক বা অনুবাদক, ভারতীয় "মিষ্টিক" চিন্তায় যখন এই গ্রন্থ ভরপুর, তখন বলাই বাহুল্য এই গ্রন্থের বিশেষ আদর হইবে। পাঠকগণকে কবিতার (অথবা রচনার) রস আস্বাদন করাইবার জন্য কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।* * * আর একটা নমুনা দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলাম * * *।"

এই ধরণের সমালোচনা বা শিল্পী-পরিচয় বিলাতী ও ইয়াঙ্কি সাময়িক পত্রে সাধারণতঃ দেখিতে পাই। সুতরাং ভারতবাসীর অত্যধিক আত্মনিন্দা করিবার প্রয়োজন নাই মনে হইতেছে।

যথার্থ সমালোচনাপদবাচ্য রচনা এই-সকল দেশের পত্রিকায় মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই রচনা-সমূহে লেখক কাব্য সঙ্গীত ও সুকুমার শিল্পের ভিতরকার

কথা টানিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করেন। কবি গায়ক ও শিল্পীর বাণী—তাঁহাদের অন্তর্জ্জগৎ এই-সমুদয় রচনায় স্পষ্টরূপে প্রচারিত হয়। উৎকৃষ্ট কাব্য চিত্র ও সঙ্গীতের ন্যায় এই ধরণের সমালোচনাও বিরল। কারণ এই সমালোচনা প্রকৃত প্রস্তাবে মৌলিক সৃষ্টিশক্তির পরিচয়—দার্শনিক মনীষার সাক্ষ্য—দর্শনশাস্ত্রেরই এক অঙ্গ বা বিভাগ।

প্রকৃত সমালোচক বঙ্গসাহিত্যের আসরেও দেখা দিয়াছেন। আমাদের সমালোচনার ঘর নিতান্ত শূন্য নয়। বঙ্কিম, চন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, ও রামেন্দ্রসুন্দর, ইঁহারা সমালোচনাসাহিত্যে বাঙ্গালীর প্রতিনিধি। বিলাতী সমালোচকগণের সঙ্গে তুলনা করিতে হইলে বলিব ব্যাজহট (Bagehot), লেসলী ষ্টিফেন (Leslie Stephen) এবং ম্যাথিউ আর্ণল্ড (Matthew Arnold) ইত্যাদির প্রবর্ত্তিত সমালোচনাপ্রণালী ইঁহাদের রচনাতেও দৃষ্ট হইয়াছে। ইঁহারা সমালোচ্য সাহিত্যের বিশ্লেষণ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা ভাষ্য ও টিপ্পনী লিখিয়াছেন।

সাহিত্যসমালোচনার অন্য এক রীতি আছে। সেই রীতি দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ-প্রণীত The New Essays in Criticism নামক গ্রন্থে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের নাম পর্য্যন্ত অনেকেই জানেন না। ইহার প্রভাবও ভারতবাসীর ইংরেজী এবং বাঙ্গালা সাহিত্যে বিন্দুমাত্র পড়ে নাই। ইহাতে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সমালোচনা এবং পাশ্চাত্য সমালোচকগণের সমালোচনা আছে। তাহা ছাড়া উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্যের ক্রমবিকাশ বুঝান হইয়াছে। গ্রন্থনিবদ্ধ প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে বর্ত্তমান জগতের চিন্তামণ্ডলে ভারতবর্ষের স্থান সহজেই ধরিতে পারা যায়। দুঃখের কথা, গ্রন্থের ভিতর বিশ্বসাহিত্যের উল্লেখ এবং পাণ্ডিত্যের অবতারণা এত অধিক যে পৃথিবীর বেশী লোক ইহা সহজে বুঝিতে পারিবে না—বাঙ্গালী বা ভারতবাসীর ত কথাই নাই। ইহার প্রাঞ্জল সংস্করণ এবং ভাষ্যস্বরূপ বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক।

ব্রজেন্দ্রনাথ যেরূপ তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক আলোচনা-প্রণালীর পক্ষপাতী, চট্টগ্রামের কবি শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন স্বাধীনভাবে সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়াই সমালোচনার আসরে নামিয়াছেন। ইঁহার রচনাবলী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলে এই-সমুদয়ের যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হইবে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" ঐতিহাসিক গ্রন্থ। লেখককে স্থানে স্থানে সমালোচকের কার্য্যও করিতে হইয়াছে। ইঁহার সমালোচনায় সাধারণতঃ ম্যাথিউআর্নল্ড্ বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদির ব্যাখ্যা-প্রণালীই বিশেষ প্রকটিত—কিন্তু মাঝে মাঝে দ্বিতীয় প্রণালীর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দীনেশবাবুর "History of Bengali Language and Literature" নামক ইংরেজী গ্রন্থে এই রীতির পরিচয় বেশী।

বর্ত্তমান বাঙ্গালাসাহিত্যের আসরে মামুলি গ্রন্থপরিচয় অথবা "শ্রীসমালোচক"-লিখিত শিল্প-পরিচয় ব্যতীত যথার্থ সমালোচনার প্রয়াসও আছে। বিগত সাতবৎসরে সমালোচনার ঘরে লেখকের সংখ্যা বাড়িয়াছে—রবীন্দ্রনাথের নোবেল-প্রাইজ লাভের পর সাহিত্য-সমালোচনায় বাঙ্গালাসাহিত্য সবিশেষ পুষ্টিলাভের পথে অগ্রসর হইতেছে। আগামী কয়েক বৎসরের ভিতর নিরেট ফল পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা। সম্প্রতি আমাদের দেশে সমালোচনার দুই রীতিই অবলম্বিত হইয়া থাকে।

বিলাতে থাকিয়া ইয়োরোপের কথা বেশী শুনিতাম না—বিশ্বচিন্তা, বিশ্বসাহিত্য ইত্যাদির সংবাদ পাইতাম না। অক্‌স্‌ফোর্ড, কেম্ব্রিজ, এডিনবারা ইত্যাদি বড় বড় চিন্তা-কেন্দ্রগুলি যেন জমাটবাঁধা প্রাচীর-বেষ্টিত চর বা দ্বীপ-স্বরূপ। দুনিয়ার ভাব-স্রোত এই-সমুদয় 'চরে' সহজে প্রবেশ করে না। ইয়াঙ্কিস্থানে দেখিতেছি—সমগ্র ইয়োরোপই আমার সম্মুখে। এখানকার চিন্তামণ্ডলের আব্‌হাওয়ার সঙ্কীর্ণতা প্রাদেশিকতা গতানুগতিকতা যেন একেবারেই নাই বোধ হইতেছে। কলাম্বিয়াবিশ্ববিদ্যালয় ও হার্ভার্ডবিশ্ববিদ্যালয় দুই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তারাই ইয়োরোপের সকল প্রদেশকে নিজ নিজ কেন্দ্রে টানিয়া আনিতে সচেষ্ট। ফরাসী, ইটালীয়, রুশ, জার্ম্মান ইত্যাদি সকল জাতীয় চিন্তাই ইয়াঙ্কি-প্রতিষ্ঠানে মর্য্যাদা লাভ করে। ইয়োরোপের বিভিন্ন সাহিত্য কলা ও সভ্যতা শিখাইবার জন্য এখানে বিশেষ ব্যবস্থা আছে। ফলতঃ ফ্রান্স, জার্ম্মানী

ইত্যাদি দেশের পরিচয় ইংরেজীভাষায় পাইতে হইলে বিলাতে না যাইয়া আমেরিকায় আসাই সুবিধাজনক। হার্ভার্ড- ও কলাম্বিয়াবিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ ইয়োরোপের নানা সাহিত্য ও সভ্যতা সম্বন্ধে যে-সকল গ্রন্থ লিখিয়াছেন, বিলাতের ইংরেজী-সাহিত্যে সে-সমুদয় দেখিতে পাওয়া যায় না।

বাঙ্গালাদেশে এক্ষণে সাহিত্যসমালোচনা, সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা, শিল্পরীতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান ইত্যাদি চলিতেছে। এদিকে উপযুক্ত ব্যক্তিগণের দৃষ্টিও পড়িয়াছে। এইসময়ে আমরা বিশ্বসাহিত্যের সংবাদ রাখিতে চেষ্টা করিলে সবিশেষ উপকৃত হইব। আমরা তুলনামূলক ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক আলোচনাপ্রণালী নানাক্ষেত্রে অবলম্বন করিতে প্রবৃত্তও হইয়াছি। কাজেই দুনিয়ার চিন্তাশক্তি হইতে তথ্য ও তত্ত্বসংগ্রহ করিয়া স্বকীয় স্বাস্থ্য ও কলেবর পুষ্ট করা আমাদের পক্ষে কঠিন হইবে না। আমরা যেপথে অগ্রসর হইয়াছি সেই পথই আরও প্রশস্ত ও বিস্তৃত হইতে পারিবে।

এইজন্য এক্ষণে তুলনামূলক সমালোচনা-প্রণালীর প্রবর্ত্তকগণের গ্রন্থ আমাদের দেশে অধীত ও প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। ফরাসী তেন (Taine), এদমঁ শেরার (Edmond Scherer) এবং স্যাঁৎ ব্যভ (Sainte Beuve), ডেন্‌মার্কের জর্জ ব্রাণ্ডেস (Georg Brandes) এবং আয়র্ল্যাণ্ডের ডাউডেন (Dowden) ইত্যাদির রচনাবলী সুপ্রচলিত হইলে সাহিত্য ও জাতীয় জীবনের পরস্পর সম্বন্ধ বুঝিতে বিশেষ সুবিধা হইবে। চিত্রকলা, সঙ্গীত, স্থাপত্য, নাটক, কাব্য, উপন্যাস ইত্যাদির মূল্য নূতনভাবে সমাজে প্রচারিত হইতে থাকিবে। বস্তুতঃ সাহিত্য-সমালোচনার ভিতর দিয়া জাতীয় চরিত্রগঠনের সুযোগ আসিবে। এই ধরণের সমালোচক যথার্থভাবে দার্শনিক —অর্থাৎ পথপ্রদর্শক—নূতন চিন্তার প্রবর্ত্তক—সুতরাং জাতীয়জীবনের নিয়ামক।

হার্ভার্ডবিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কুনো ফ্রাঙ্কা জার্ম্মান-সাহিত্য সম্বন্ধে একখানা সমালোচনাগ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহাও এইসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য কোন দার্শনিক, সমালোচক বা ঐতিহাসিকের মতবাদ অভ্রান্ত সত্যরূপে গ্রহণ করা যায় না। ব্রাণ্ডেস্, ডাউডেন অথবা ফ্রাঙ্কার সিদ্ধান্তগুলি সম্বন্ধেও এই কথাই খাটিবে। কিন্তু ইঁহাদের আলোচনাপ্রণালী লক্ষ্য করিবার জন্যই ইঁহাদের আদর প্রধানতঃ হওয়া উচিত।

ফ্রাঙ্কা-প্রণীত Social Forces in German Literature গ্রন্থের ভূমিকায় আলোচনাপ্রণালীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে :—

"There seems to be a decided need of a book which should give a coherent account of the great intellectual movements of German life as expressed in literature; which should point out the mutual relation of action and reaction between these movements and the social and political condition of the masses from which they sprang or which they affected; which in short, should trace the history of the German people in the works of its thinkers and poets."

অর্থাৎ, জার্ম্মানীর সাহিত্যের মধ্য দিয়া জার্ম্মান জীবনের বুদ্ধিবিদ্যা সম্পর্কীয় যে-সমস্ত প্রচেষ্টার আভাস পাওয়া যায় তাহার একটি ধারাবাহিক ও সুসংলগ্ন পরিচয় দিতে পারে এমন একখানি গ্রন্থের নিতান্ত প্রয়োজন আছে; এই সমস্ত প্রচেষ্টা, যে জনসাধারণের মধ্যাহইতে জন্মলাভ করিয়াছে বা যাহাদিগের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার সহিত উক্ত প্রচেষ্টা-সকলের ঘাত-প্রতিঘাত ও পরস্পরের সম্পর্ক সেই গ্রন্থ ধরিয়া বুঝাইয়া দিবে। এক কথায় বলিতে গেলে উক্ত গ্রন্থ জার্ম্মান জাতির চিন্তাশীল ব্যক্তিদের ও কবিদের রচনা হইতে সমগ্র জার্ম্মান জাতির ইতিহাস উদ্ধার করিবে।

গ্রীন (John Richard Green)-প্রণীত History of the English People গ্রন্থ ভারতবর্ষে সুপরিচিত। এই গ্রন্থের সাহিত্যসংক্রান্ত অধ্যায়গুলিতে এই ধরণের সমালোচনাপ্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে।

জর্জ্জ ব্রাণ্ডেসের সেক্সপীয়ার-বিষয়ক গ্রন্থের নাম বোধ হয় অনেকেই শুনিয়াছেন। তাঁহার আর একখানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ছয়খণ্ডে বিভক্ত। নাম Main Currents in Nineteenth Century Literatures। এতদ্ব্যতীত নরওয়ের নাটককার ইব্‌সেন, জার্ম্মান শ্রমজীবীর বন্ধু ফার্ডিনাণ্ড ল্যাসেল এবং পোলিশ জার্ম্মান দার্শনিক নীট্‌শে সম্বন্ধে জীবনী ও সমালোচনা-গ্রন্থ ইঁহার প্রণীত। Main Currents গ্রন্থের বিভাগগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

1. The Emigrant Literature.
2. The Romantic School in Germany.
3. The Reaction in France.
4. Naturalism in England.
5. The Romantic School in France.
6. Young Germany.

আর্ণল্ড্‌, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদির অবলম্বিত ব্যাখ্যা-ভাষ্যরীতি এবং ব্রজেন্দ্রনাথ ডাউডেন ইত্যাদির অবলম্বিত তুলনামূলক ঐতিহাসিক ও দার্শনিক আলোচনা-প্রণালীর প্রভেদ জর্জ ব্রাণ্ডেসের ভাষায় দেখাইতেছি :—

"Regarded from the merely aesthetic point of view as a work of art, a book is a self-contained, self-existent whole, without any connection with the surrounding world. But looked at from the historical point of view, a book, even though it may be a perfect, complete work of art, is only a piece cut out of an endlessly continuous web. Aesthetically considered, its idea, the main thought inspiring it, may satisfactorily explain it, without any cognisance taken of its author or its environment as an organism; but historically considered, it implies, as the effect implies the cause, the intellectual idiosyncrasy of its author, which asserts itself in all his productions which condition this particular book, and some understanding of which is indispensable to its comprehension. The intellectual idiosyncrasy of the author, again, we cannot comprehend without some acquaintance with the intellects which influenced his development, the spiritual atmosphere which he breathed.

সৌন্দর্য্য ও রসবোধের তরফ হইতে দেখিতে গেলে, গ্রন্থ তাহার আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ, আশেপাশের জগৎ-ব্যাপারের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই; কিন্তু ইতিহাসের তরফ হইতে দেখিলে, কোনো গ্রন্থ আর্ট হিসাবে যতই সম্পূর্ণ ও নিখুঁত হোক না কেন তাহা স্ব-তন্ত্র ভাবে একটা বিরাট অ-শেষ প্রবাহের একটি ঢেউ মাত্র। সৌন্দর্য্যের হিসাবে হয়ত উহার অন্তর্গত আইডিয়া ও যে প্রধান ভাব তাহার উদ্ভবের ও অনুপ্রেরণার কারণ তাহাই, গ্রন্থকার বা আশেপাশের ঘটনা বা সংস্থান প্রভৃতিকে আমল না দিয়া, বেশ সন্তোষজনকরূপে উহার অস্তিত্বের আবশ্যকতা প্রমাণ করিতে পারে; কিন্তু ইতিহাসের হিসাবে, উহা তাহার রচয়িতার ব্যক্তিগত বুদ্ধিবৃত্তির খেয়ালের ফল ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু গ্রন্থরচয়িতার বুদ্ধিবৃত্তির খেয়ালকে ঠিকমতে বুঝিতে হইলে, যে বুদ্ধি বিদ্যা মনন ও আধ্যাত্মিক আবহাওয়ায় গ্রন্থকার জীবনীশক্তি লাভ করিয়াছেন তাহার সহিত পরিচয় থাকা আবশ্যক।

এই ধরণের সাহিত্যসমালোচনা সভ্যতার ইতিহাসের এক অধ্যায়স্বরূপ। ফরাসী অধ্যাপক গেরার (Guerard)-প্রণীত French Prophets of Yesterday: A Study of Religious Thought under the Second Empire এই শ্রেণীর সমালোচনাগ্রন্থ। ইহাতে গীজো (Guizot), শেরার (Scherar), কীনে (Quinet), মিশলে (Michelet), হ্যুগো (Victor Hugo), স্যাঁ সিমঁ (Saint Simon), প্রুধঁ (Proudhon), ভিঞি (Vigny), লীল (Lisle), স্যাঁৎ বাভ (Sainte Beuve), তেন্ (Taine), রেনাঁ (Renan) ইত্যাদি লেখকগণের সাহিত্য-জীবন ও চিন্তাপ্রণালী ঐতিহাসিক ও দার্শনিকের রীতিতে আলোচিত হইয়াছে। ১৮৪৮ খ্রীঃ অঃ হইতে ১৮৭০ সাল পর্য্যন্ত ফরাসীদিগের জাতীয় জীবন এই সাহিত্যসমালোচনার গ্রন্থে বিশদরূপে বুঝিতে পারা যায়। লেখক ক্যালিফর্ণিয়ার লীল্যাণ্ড ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

৫।৭ বৎসর হইল হার্ভার্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ে "জার্মান-সাহিত্যে ভাবুকতা" সম্বন্ধে কতকগুলি বক্তৃতা হইয়াছিল। সেগুলি Romanticism and the Romantic School in Germany নামে গ্রন্থাকারে প্রচারিত হইয়াছে। লেখকের প্রণালী নিম্নে বর্ণিত হইতেছে :—

"The results to which I have been led are essentially founded on the works of the authors themselves; these I have endeavoured to understand in their historical setting and their relation to our time."

লেখকের রচনা অবলম্বন করিয়াই আমি যে-কোনো সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছি; সেইসমস্ত রচনা তাহাদের ঐতিহাসিক পারিপার্শ্বিক সংস্থান ও আমাদের নিজেদের সময়ের সঙ্গে সম্পর্ক বিচার করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এইরূপ তুলনামূলক ঐতিহাসিক ও দার্শনিক প্রণালীতেই সাহিত্যসমালোচনা শিখাইবার প্রয়াস চলিতেছে। সাহিত্যের অভ্যন্তরে মানবাত্মার ক্রমিক অভিব্যক্তি এবং সভ্যতার বিকাশ বুঝাইবার জন্যই বিভিন্ন কেন্দ্রে Comparative Literature অর্থাৎ তুলনামূলক সাহিত্য অথবা Literary Criticism অর্থাৎ সাহিত্য সমালোচনার পাঠচর্চ্চা নির্দ্ধারিত হয়। হার্ভার্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যসমালোচনা-বিভাগের পাঠ্য-তালিকায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে :—

1. The Relations of Semitic Literatures to the Literature of Europe.
2. The Relations of the Literature of India to the Literature of Europe.
3. The Relations of Greek Literature to European Literature in other tongues.
4. The Relations of Latin Literature to European Literature in other tongues.
5. The Relations of Irish and Welsh Literatures to the Literature of Europe in other tongues.
6. The Relations of Icelandic Literature to European Literature in other tongues.
7. The Relations of Provencal Literature to European Literature in other tongues.

8. The Relations of Spanish Literature to European Literature in other tongues.
9. The Relations of Middle High German Literature to European Literature in other tongues.
10. The Relations of Slavic Literatures to European Literature in other tongues.

এই পাঠ্যতালিকা হইতে হার্ভার্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত সমালোচনা-রীতির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে সাহিত্যের ভিতর দিয়া জাতির সঙ্গে জাতির সম্বন্ধ এবং আদান প্রদান বাহির করা হয়। সাহিত্যমণ্ডলে বিনিময় এবং লেনদেন ও পরস্পর প্রভাববিস্তার কতটা সাধিত হইয়াছে তাহার পরিচয় প্রদানই সাহিত্যসমালোচকগণের লক্ষ্য। ইঁহারা ইউরোপীয় সাহিত্যকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্বশক্তির পরিচয় লইয়াছেন। আমরাও এই প্রণালীতে ভারতীয় সাহিত্যকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্বশক্তির পরিচয় লইতে পারি। অথবা ক্ষেত্র আরও সঙ্কীর্ণ করিলে,—বাঙ্গালা-সাহিত্যের সঙ্গে বিভিন্ন ভারতীয় সাহিত্যের সম্বন্ধ ও আদান-প্রদান বুঝিতে অগ্রসর হইতে পারি। এইরূপ সাহিত্য-সমালোচনার ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং বাঙ্গালার ইতিহাস স্পষ্ট ও সজীব হইয়া উঠিবে। একটা কথা উঠিতে পারে যে, আমরা নরওয়ে সুইডেন ডেন্‌মার্কের ভাষাও জানি না অথবা ঐ-সকল দেশের সাহিত্যরথীদিগের রচনার অনুবাদও কখন পাঠ করি নাই। সুতরাং বয়েজেন (Boyesen)-প্রণীত Essays on Scandinavian Literature পড়িয়া লাভ কি? সেইরূপ কেহ কেহ বলিতে পারেন যে অষ্ট্রীয়ার কোন সাহিত্যসেবীর নাম পর্য্যন্ত আমরা জানি না—পোলক (Pollak)-প্রণীত Franz Grillparzer and the Austrian Drama বুঝিব কি করিয়া? সেইরূপ পোল্যাণ্ডের সাহিত্যবীর মীকীভিক্‌স্ (Mickiewicz) এবং রুশিয়ার আধুনিক উপন্যাস-লেখকগণের রচনা-বিষয়ক ইংরেজী সমালোচনা-গ্রন্থ সম্বন্ধেও এই প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। যে গ্রন্থের নাম পর্য্যন্ত শুনা নাই তাহার সমালোচনা পড়িয়া কি হইবে? যাঁহারা সমালোচনা-সাহিত্যকে অন্য কোন সাহিত্যের আনুষঙ্গিক মাত্র বিবেচনা করেন তাঁহারা এইরূপই ভাবিবেন। কিন্তু সমালোচনার যে বিবরণ প্রদত্ত হইল তাহাতে ইহা স্বয়ংই মৌলিক সাহিত্য দর্শন ইতিহাস ইত্যাদি বিজ্ঞানের ন্যায় স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষণীয়। মের্ট্‌স (Merz)-প্রণীত History of European Thought in the Nineteenth Century আমাদের যে ভাবে আলোচ্য, ঠিক সেই ভাবেই আমাদিগের রুশ, পোল, সুইডিশ, জার্ম্মান, স্পেনিশ, কেল্‌টিক, জাপানী, চীনা, আরবী, ফারসী ইত্যাদি সকল সাহিত্যের ইংরেজী ফরাসী অথবা জার্ম্মান সমালোচনা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। ইহাতে বিভিন্ন জাতির চিন্তাসম্পদ এবং ভাবরাশি আয়ত্ত হইতে থাকিবে। অধিকন্তু সমালোচকগণের বৈজ্ঞানিক প্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞান দৃঢ় হইবে। বহুবিধ সমালোচনার নমুনা পাইতে থাকিলে সমালোচনা-বিজ্ঞানের নিয়মগুলি সহজেই আয়ত্ত হইয়া আসিবে।

বাঙ্গালীর "কবিকঙ্কণচণ্ডী" অথবা ভারতবাসীর "রঘুবংশম্" এই সমালোচনা-বিজ্ঞানের নিয়মে বুঝিতে হইলে তিন শ্রেণীর তথ্য সংগ্রহ করা আবশ্যক :—

(১) এই গ্রন্থদ্বয়ের প্রতিপাদ্যবিষয় অথবা রচনা-রীতি জগতের যে যে গ্রন্থে অবলম্বিত হইয়াছে সেই-সকল গ্রন্থের আলোচনা। বাল্মীকির রামায়ণ, গেটের ফাউষ্ট দান্তের ডিভাইন কমেডি, হোমারের ইলিয়াড ইত্যাদি কোন গ্রন্থই বর্জ্জন করিলে চলিবে না।

(২) কালিদাস অথবা মুকুন্দরামের যুগে সামাজিক, আর্থিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় এবং শিক্ষাবিষয়ক সকলপ্রকার তথ্যের আলোচনা। গ্রন্থকারদিগের জীবন সেই যুগের সাধারণ শক্তিপুঞ্জ হইতে কতখানি রসগ্রহণ করিয়াছিল এবং গ্রন্থকারেরা তাঁহাদের সমসাময়িক সমাজকে কতখানি প্রভাবান্বিত করিয়াছিলেন তাহা জানিতে হইবে।

(৩) সমগ্র ভারত অথবা বাঙ্গালার ইতিহাসে কালিদাসের যুগ অথবা মুকুন্দরামের যুগ কোন্ স্থান অধিকার করিতেছে তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। কালিদাসকে বুঝিতে হইলে সংস্কৃত সাহিত্য এবং ভারতীয় ইতিহাসের ধারা বুঝিতে হইবে। সেইরূপ কবিকঙ্কণকে বুঝিতে হইলে বাঙ্গালাসাহিত্য এবং বঙ্গীয় ইতিহাসের ক্রমবিকাশ বুঝিতে হইবে।

আমাদের বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, নীতিশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র, পদাবলী, অভঙ্গ, দোঁহা, আনন্দমঠ, গোরা ইত্যাদি যে-কোন গ্রন্থের আলোচনায়ই এই তিনপ্রকার

তথ্যের অবতারণা আবশ্যক। ধর্ম্মসাহিত্যই হউক অথবা লোক-সাহিত্যই হউক, সকল সাহিত্যকেই এই তুলনামূলক প্রণালী (Comparative Method) অথবা ঐতিহাসিক প্রণালী (Historical Method) দ্বারা যাচাই করিয়া দেখিতে হইবে। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইল ইয়োরোপে খ্রীষ্টধর্ম্ম এইরূপ সমালোচনার কষ্টিপাথরে ঘষা সুরু হইয়াছে। সেই সমালোচনার নাম উচ্চাঙ্গের সমালোচনা—'Higher Criticism"। ইয়াঙ্কি পাদ্রী সাণ্ডারল্যাণ্ড (Sunderland)-প্রণীত The Origin and Character of the Bible এই প্রণালীতে লিখিত অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ভারতবাসী মাত্রেরই ইহা পাঠ করা কর্ত্তব্য।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

আলোচনা

কপিলবাস্তু।

বুদ্ধদেব যে-নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সাহিত্যিকগণ পূর্ব্বে তাহাকে ক পি ল ব স্তু বলিতেন। ললিতবিস্তর (২৮, ১১৬, ১২৮, ১৩৭, ইত্যাদি), দিব্যাবদান (৯০, ৩৯১) প্রভৃতি মহাযানীয় গ্রন্থে সাধারণত * ঐ শব্দই দেখা যায়। যাহারা হীনযানের পালি, এবং মহাযানের গাথা ও তথা-কথিত সংস্কৃত আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা স্পষ্টই দেখিতে পাইয়াছেন পালি-শব্দগুলিকে মহাযানের ঐ দুই ভাষায় কিরূপ সংস্কৃতে পরিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, এবং বহু স্থানে সেগুলি কিরূপ কিম্ভূতকিমাকার হইয়া পড়িয়াছে, এবং সংস্কৃত অনুশাসন অবজ্ঞাত হইয়াছে। একটা স্থূল উদাহরণ দিই। গৌতম বুদ্ধের পিতার নাম পালিতে সু দ্ধো দ ন, মহাযানের গ্রন্থে ইহার অনুবাদ করা হইয়াছে শু দ্ধো দ ন; সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতবিদ্‌গণও ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, খাঁটি সংস্কৃতে লিখিত গ্রন্থেও এই শব্দই ভূরি-ভূরি প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু সত্য বলিতে গেলে স্বীকার করিতেই হইবে পালি সু দ্ধো দ ন শব্দের আসল সংস্কৃত হইবে শু দ্ধো দ ন (শুদ্ধ+ওদন)। শুদ্ধোদনের ভ্রাতার নাম শু ক্কো দ ন। ইহার শুদ্ধ সংস্কৃত শু ক্লৌ দ ন। এইরূপেই পালি ক পি ল ব ত্থু শব্দের মহাযানীয় গ্রন্থের বহু স্থলে অনুবাদ হইয়াছে ক পি ল ব স্তু, কিন্তু খাঁটি অনুবাদ হইবে ক পি ল বা স্তু। পালিতে ব ত্থু শব্দের সংস্কৃত ব স্তু বা স্তু এই দুইই হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত বিষয়ে ব স্তু অনুবাদ হইতে পারে না, কেননা ইহার অর্থের সহিত কোনো যোগ নাই; যোগ আছে বা স্তু শব্দের অর্থের সহিত। যেহেতু আলোচ্য নগরে ক পি ল মুনির বা স্তু অর্থাৎ গৃহ-ভূমি (অভিধানপ্পদীপিকা, ২২৫) ছিল (দ্রঃ—সৌন্দরনন্দ ১ম সর্গ) সেই জন্য ইহার নাম ক পি ল বা স্তু। মহাযানীয় গ্রন্থসমূহে ভ্রমপূর্ণ অনুবাদ ক পি ল ব স্তু চলিয়া গিয়াছে। মহাযানীয় সংস্কৃত ও গাথার প্রকৃতি বিশেষজ্ঞেরা জানেন, তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া ক পি ল ব স্তু শব্দই আমাদিগকে বলিতে হইবে, ইহা হইতে পারে না, এবং হয়ও নাই। সংস্কৃত মহাকবির প্রয়োগে আমরা উভয়ই দেখিতে পাই। অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিতে (১.২) লিখিয়াছেন :—

"পুরং মহর্ষেঃ কপিলস্য ব স্তু।"

আবার সৌন্দরনন্দে (১ ৫৩) লিখিয়াছেন :—

"কপিলস্য চ তস্যর্ষেস্তস্মিন্নাশ্রম বা স্তু নি।
যস্মাৎ তে তৎ পুরং চক্রুস্তস্মাৎ কপিল বা স্তু তৎ।"

আবার (৩.১)

"তপসে ততঃ কপিল বা স্তু
হয়গজরথৌঘসঙ্কুলম্।"

মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণকে কপিল বা স্তু লিখিতেই দেখিতেছিলাম, তাহাই চলিতেছে। কিন্তু আষাঢ়ের প্রবাসীতে পু রা বৃ ত্ত-আ লো চ না য় (৪১২ পৃ.) শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় মহাযানীয় মহাবস্তু-নামক গ্রন্থের বচন তুলিয়া বলিতে চাহেন কপিল ব স্তু শব্দই ঠিক, কপিল বা স্তু ঠিক নহে। পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় দেখা যাইবে, উভয়ই চলিতে পারে, কিন্তু কপিল বা স্তু লেখাই সঙ্গততর।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

* * *

আমাদের বক্তব্য।

মাননীয় সম্পাদক মহাশয় "পাঞ্জাবে ও পূর্ব্ববঙ্গে স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার" শীর্ষক সম্পাদকীয় মন্তব্যে মুসলমান-সমাজের প্রতি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে মুসলমান-সমাজের পক্ষ হইতে কিছু বলিবার আছে। নিম্নে তাহা প্রকাশ করিতেছি।

(১) পূর্ব্ববঙ্গে ও পাঞ্জাবে মুসলমান গুণ্ডারা হিন্দু স্ত্রীলোকদের প্রতি যে অত্যাচার করে, তাহার মধ্যে পাঞ্জাব-সীমান্তের কথা স্বতন্ত্র। পাঞ্জাব সীমান্তে লুটের সঙ্গে স্ত্রীলোকদিগকেও পাঠানেরা বন্দী করিয়া লইয়া যায়। এ প্রথা বীর * জাতির মধ্যে চিরকালই চলিয়া আসিতেছে। তবে ইসলামের প্রাদুর্ভাবে † ও আধুনিক সভ্যতার আবির্ভাবে এই প্রথা সভ্য-সমাজে দূষণীয় বলিয়া প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু কাজে কর্ম্মে বিজয়ী জাতি বিজিতদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহার পরিচয়স্বরূপ সভ্যতা-ও-জ্ঞান-গর্ব্বিত ফরাসী জার্ম্মান প্রভৃতি সুসভ্য জাতি বর্ত্তমান মহা যুদ্ধে নারীদিগের প্রতি দূরে থাকুক, নির্দ্দোষ শিশুদের প্রতি স্থলবিশেষে কিরূপ নৃশংস অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে তাহা কাহারও অবিদিত নহে। বিগত বল্কান যুদ্ধে মুসলমান রমণীদিগের প্রতি খৃষ্টানগণ যেরূপ অমানুষিক ও পৈশাচিক অত্যাচার করিয়াছিল, তাহাও বোধ হয় ভুলিয়া যান নাই। এ অবস্থায় সীমান্তের দুর্দ্দান্ত পাঠানেরা মধ্যে মধ্যে লুট করিতে আসিয়া দুই চারিজন স্ত্রীলোককে বন্দী করিয়া লইয়া যায়, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই।‡ তাহার পর, কেবল যে তাহারা নারীদিগকেই বন্দী করিয়া

---

* দিব্যাবদানে (৬৭) ক পি ল বা স্তু শব্দও আছে।

* এস্থলে বীর কথাটির প্রয়োগ না করিলে ভাল হইত। কারণ যাহারা নারী অপহরণ করে, তাহারা যদি অন্য দিকে বীর হয় ত তাহা হইলেও তাহাদের এ কার্য্য দস্যুতা ভিন্ন আর কিছু নয়।—সম্পাদক।

† মুসলমান বিজেতারা অন্যধর্ম্মাবলম্বী বিজেতাদের চেয়ে নারী অপহরণ কম করিয়াছে, ইতিহাসে তাহার কোন প্রমাণ আমরা পাই নাই।—সম্পাদক।

‡ ইউরোপীয়েরা খুব বেশী পরিমাণে কোন পাপকার্য্য করিলে অন্যের কৃত সেই পাপকার্য্য ক্ষমার যোগ্য হইতে পারে না। বিশেষতঃ ইউরোপীয়েরা যুদ্ধের উত্তেজনার মধ্যে যে-সব পাপকার্য্য করিতেছে, শান্তির সময় অপরে তাহা করিলে অধিকতর নিন্দাজনক অপকর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।—সম্পাদক।

লইয়া যায়, তাহাই নহে, পুরুষদিগকেও বন্দী করে।¶ ফলে গবর্ণমেণ্ট কিম্বা বন্দীভূত নরনারীর আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে তাহারা নিষ্ক্রয় (Ransom) স্বরূপ অর্থ পাইয়া থাকে। পাঠানেরা অর্থলাভের জন্যই এরূপ করিয়া থাকে। তদ্ব্যতীত স্ত্রীলোকের উপরে বলাৎকার বা সতীত্ব হরণ ইত্যাকার জঘন্য পাপাচার তাহাদের দ্বারা কখনও সংঘটিত হইতে দেখা যায় না। আমরা প্রত্যক্ষভাবে পাঠানদিগের বীর-চরিত্রের মহিমা অবগত আছি। তবে ব্যক্তিবিশেষে অথবা ঘটনা-ক্রমে সকল বিষয়েরই বিকার বা ব্যভিচার ঘটিয়া থাকে।

(২) তারপর পূর্ব্ববঙ্গের কথা। পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্রই যে নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানেরা হিন্দু স্ত্রীলোকদের প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকে তাহা নহে। এইরূপ অত্যাচারের রিপোর্ট, যাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহা প্রায়ই ময়মনসিংহ জেলা সংসৃষ্ট। অন্যান্য জেলায় এরূপ ঘটনা একেবারেই হয় না তাহা অবশ্য বলিতেছি না। এই শ্রেণীর গুণ্ডাদিগের মধ্যে হিন্দু গুণ্ডার নামও মাঝে মাঝে দেখা যায়। তবে মুসলমানের সংখ্যা যে বেশী, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু তাহাতেও আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। কারণ পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান সংখ্যার অনু-পাত অনুযায়ী মুসলমান গুণ্ডার সংখ্যা হিন্দু গুণ্ডা অপেক্ষা বড় কিছু বেশী নহে।

এই-সব পৈশাচিক ব্যাপারে একটি চিন্তার বিষয় এই যে গুণ্ডারা (কি হিন্দু কি মুসলমান) হিন্দু স্ত্রীলোক ব্যতীত, মুসলমান স্ত্রীলোকের উপরে অত্যাচার করে না। ইহার কারণ কি? আমরা জ্ঞানতঃ ও কাষ্যতঃ যাহা বুঝিতে ও প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি, নিম্নে তাহা বিবৃত করিতেছি।

(৩) যে পরিমাণ ঘটনার কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় তাহা অপেক্ষা পঁচিশ গুণ ঘটনার কথা সংবাদপত্রে আদৌ প্রকাশিত হয় না। পূর্ব্ববঙ্গে প্রতি বৎসর অন্ততঃ হাজার হইতে দেড় হাজার পর্য্যন্ত হিন্দু স্ত্রীলোক স্বেচ্ছায় মুসলমান স্বামী গ্রহণ করিতেছে। অবশ্য ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই বিধবা। এমন ব্যাপারও আমরা অবগত আছি যে হিন্দু পিতা দায়ে পড়িয়া মান সম্ভ্রম রক্ষার জন্য অতি সংগোপনে তাঁহার যুবতী বিধবা কন্যাকে মুসলমানের হস্তে সম্প্রদান করিয়াছেন। এই-সমস্ত ঘটনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, হিন্দু-সমাজে যুবতী বিধবার আধিক্যই হইতেছে এই-সকল ব্যাপারের প্রধান কারণ। অনেক বিধবা রমণী স্বেচ্ছায় গুণ্ডাদের সহিত পাপকার্য্যে লিপ্ত হয় এবং অনেকে কুলের বাহির হইয়াও চলিয়া আইসে। ইহার ফলে গুণ্ডারা বিধবা দেখিলেই লোভ সম্বরণ করিতে পারে না। তবে যখন কোনও সতী বিধবার প্রতি তাহারা অত্যাচার করিতে যায়, তখনই একটা হৈ চৈ পড়িয়া যায়। তখনই শুধু এই ঘটনার কথা হিন্দু সংবাদপত্রে আলোচিত হইতে থাকে। তাহা না হইলে, এই যে প্রতি সপ্তাহে§ "মহাম্মদী" কিম্বা "মোস্‌লেম-হিতৈষী" প্রভৃতি মুসলমান সংবাদপত্র-গুলিতে হিন্দু রমণীর ইস্‌লাম ও মুসলমান স্বামী গ্রহণের বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে, তৎসম্বন্ধে হিন্দু-সমাজ সম্পূর্ণ উদাসীন!!

তৎপর হিন্দু-সমাজের মধ্যে কোন কোন নিম্নশ্রেণীর [illegible] অবনতি ঘটিয়াছে যে, তাহারা স্ত্রীলোকদিগের ব্যভিচার [illegible] একেবারেই উদাসীন। সঞ্জীবনী পত্রিকায় জনৈক প্রসিদ্ধ হিন্দু লেখক এক সময়ে অতি দুঃখের সহিত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে কলিকাতা সহরে এমন অনেক হিন্দু আছে যে, তাহারা আত্মীয় স্ত্রীলোকদিগকে ব্যভিচারের বা বেশ্যাবৃত্তির প্রশ্রয় দিয়াও অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী হইলেও, মুসলমান বেশ্যার সংখ্যা হিন্দু বেশ্যা অপেক্ষা অনেক কম, ইহা অবশ্য সর্ব্ববাদীসম্মত। এই-সমস্ত বিষয়ে অনুধাবন করিলে হিন্দু-সমাজের বিধবার প্রাচুর্য্য, স্ত্রীলোকদের সংরক্ষণের প্রতি ঔদাসীন্য প্রভৃতিই হইতেছে মুসলমান ও হিন্দু গুণ্ডাদিগের চরিত্রভ্রষ্টতার প্রধানতম কারণ। তবে ইহাও আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, মুসলমান গুণ্ডাদিগকে কঠোর সামাজিক দণ্ডে দণ্ডিত করা মুসলমানদের অবশ্যকর্ত্তব্য। সেজন্য আজকাল আমাদের ধর্ম্মপ্রচারক ও মৌলবী মোল্লাগণ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। কারণ ব্যভিচার ও স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার সকল ধর্ম্মে ও সকল জাতির মধ্যে ঘৃণিত ও মহাপাপ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইলেও ইস্‌লাম ধর্ম্মে উহা যেরূপ কঠোর ও প্রচণ্ড ভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে এরূপ আর কোথায়ও নহে। তবে কথা হইতেছে এই যে হিন্দু-সমাজ নিজেরা বিশেষ সাবধান না হইলে বিশেষতঃ বিধবা-বিবাহের অবাধ প্রচলন না করিলে আমরা এই মহাপাপ হইতে দুষ্ট শ্রেণীর লোকদিগকে সর্ব্বতোভাবে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিব না। যেহেতু—

"লোভের আগেতে যদি ফাঁদ পাতা যায়,
দেব, দৈত্য, নর, পশু কেহ না এড়ায়।"

সৈয়দ ইস্‌মাইল হোসেন সিরাজী।
(ইস্‌লাম-প্রচারক)

* * *

বাঙ্গালা শব্দ-কোষ।

শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এ মহাশয় ১৩২১ বাং ফাল্গুনের প্রবাসীতে কয়েকটি শব্দ ব্যুৎপত্তি-নির্ণয়ার্থ উপস্থিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে দুইটি মাত্র শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে আমি যাহা অনুমান করিতে পারিয়াছি, তাহাই উপস্থিত করিলাম। অধ্যাপক মহাশয় ও পাঠকবর্গ বিচার করিয়া দেখিবেন ইহা গৃহীত হইতে পারে কি না।

১। মালঞ্চ—পুষ্পোদ্যান, পুষ্পবাটিকা। "মা" শব্দের অর্থ শোভা, লক্ষ্মী, শ্রী, সৌন্দর্য্য, আর "লোচ" অর্থ দীপ্তি পাওয়া, মা+লোচ, সৌন্দর্য্য-বিভাসিত। এই মালোচ হইতে মালঞ্চ হওয়া বিচিত্র নহে। অথবা "মাল" অর্থ বন, উদ্যান আর অন্চ অথণ্ড অর্থ পূজন, ভূষণ, মাল+অন্চ = মালঞ্চ। আবার (অন্চ+ত) অঞ্চিত অর্থ পূজিত, ভূষিত, সুন্দর, গ্রথিত, সুতরাং মালঞ্চের ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ—শোভনোদ্যান।

২। প্রজাপতি (পতঙ্গ) প্রজা—প্র+জন্ অর্থে পুনরায় জন্মে, পত্=পক্ষ+গম্, পক্ষ দ্বারা গমন করা; সুতরাং প্রজাপতির ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ—যে পুনরায় জন্মিয়াই পক্ষদ্বারা গমন করে। বলা বাহুল্য প্রজাপতির দ্বিজত্ব সর্ব্বজনবিদিত।

শ্রীশশিভূষণ দত্ত তত্ত্বনিধি।
কুণ্ডা, ত্রিপুরা।

¶ পাঠানেরা স্ত্রীলোক বা পুরুষ বন্দী করে, তাহা আমাদের লক্ষ্যস্থল ছিল না। তাহারা বাছিয়া বাছিয়া হিন্দু পুরুষ ও নারীদিগকেই বন্দী করে। ভারতবর্ষের সীমান্তে এবং ভারতবর্ষের মধ্যে মুসলমানদের শত্রুতা হিন্দুদের বিরুদ্ধে এই প্রকারে সূচিত হওয়া দুর্লক্ষণ।—সম্পাদক।

§ "প্রতি সপ্তাহে" বলা অত্যুক্তি। কিন্তু এরূপ ঘটনা যে ঘটে, তাহা স্বীকার্য্য।—সম্পাদক।

হারামণি

[এই বিভাগে আমরা অজ্ঞাত অখ্যাত প্রাচীন কবির বা নিরক্ষর স্বল্পাক্ষর গ্রাম্য কবির উৎকৃষ্ট কবিতা ও গান ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিব। প্রবাসীর পাঠকপাঠিকা এই কার্য্যে আমাদের সহায় হইবেন আশা করি। অনেক গ্রামেই এমন নিরক্ষর বা স্বল্পাক্ষর কবি মাঝে মাঝে দেখা যায় যাঁহারা লেখাপড়া অধিক না জানা সত্ত্বেও স্বভাবতঃ উৎকৃষ্ট ভাবের কবিত্বরসমধুর রচনা করিয়া থাকেন; কবিওয়ালা, তর্জ্জাওয়ালা, জারিওয়ালা, বাউল, দরবেশ, ফকির প্রভৃতি অনেকে এই দলের। প্রবাসীর পাঠক-পাঠিকারা ইঁহাদের যথার্থ কবিত্বপূর্ণ বা রসভাবপূর্ণ রচনা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলে আমরা সাদরে প্রকাশ করিব।]

চলচে মানুষ বঙ্কনালে।

আমার হৃদয়-কমল খুলবে যে দল খপর তারে
কে জানালে?
(ওরে গন্ধ তাহার কে ছড়ালে)
(আমার) কমল-রসে ডুব্‌বে বলে' বন্ধু তুমি
ভ্রমর হলে।
(এখন) চল্‌ছ ফিরে গুনগুনিয়ে কমল যে তার
দল না মেলে।

পদ্মলোচনের লুপ্ত পদ। পুরা পদ পাই নাই। ইনি নরহরি বাউলের শিষ্য, ইনিও খুব পুরাতন রচয়িতা। এই গান কেন্দুলীতে জয়দেবের মেলায় শুনি, গায়ক মেদিনীপুরের লোক।

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন।

"ভাবের ভাবুক প্রেমের প্রেমিক যেই জনা
সে করে রূপ সাধন (রে ভুলা-মন)—
রূপ কোথায় ছিল কে আনিল
কৈল রূপের গঠন (রে ভুলা-মন)—
সাক্ষী আছে (রে ভুলা-মন)—
ভাগ্যে যদি হয় মিলন
সে যে করে রূপ সাধন—মানুষ যে জন॥
বানিয়া যেজন সে জানে সুনার সরন
সুনার মাঝে সুহাগা দিলে (রে ভুলা-মন) —
সুনায় রূপায় হয় যে মিলন।
ভবেরই বাজারে আসি রূপ চিনে না যেই জন
সে ত দিনের কানা, রাইত দেয়ানা (রে ভুলা-মন)—
পায়না রূপের অন্বেষণ
সে যে করে রূপ সাধন!
দইখুরা পাগলে কয় পাইবা রূপের অন্বেষণ
উন্টা-কলে দাড় বাইলে (রে ভুলা-মন)—
পাইবার বন্ধের দরশন॥"

উপরোক্ত গীত দুইখুরা নামীয় একজন ফকিরের রচিত। এখনও তাঁহার শিষ্যবর্গের মুখে এই গীতটি নিশীথ কালের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে। অনেক মাঝি-মল্লাদের মুখে ইহার প্রতিধ্বনি মদনদীর তীরস্থ পল্লীবাসীদের নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকে। উক্ত ফকিরের গীত আরও আছে বলিয়া অনুমান হয়। যত্ন করিলে তাঁহার রচিত বিলীন-প্রায় গীতগুলির পুনরুদ্ধার হইতে পারে। লোকের কথায় আমার অনুমান হয় যে তিনি উনবিংশ শতাব্দীর লোক ছিলেন।

শ্রীসৈয়দ আজিজুর রহমান।

গুরু তোমার লীলা খেলা বুঝা ভার।
পাটের দর হৈল সস্তা, পস্তানি হৈয়াছে সার॥
নারানগঞ্জ, মদনগঞ্জ, (পাটের) যত ছিল খরিদ্দার॥
(তারা) কেউ করেনা বেচাকিনা, বন্ধ কৈরাছে কারবার।
(তাতে) খোরাক কিনা, পাট বিকায়না, যন্ত্রনার নাই
পারাপার।
সে আশা নিরাশা হৈল, দু-টাকা হৈল বাজার॥
ধান বুনব, আর পাট বুনব না, খোদায় বাঁচাইলে
এইবার।
(বাউল) দীন কাঙ্গালে ভেবে বলে, গুরু বিনে নাই
নিস্তার॥

ঢাকা জিলার অন্তঃপাতি, নরসিংদির বাউলদের ওস্তাদ 'কাঙ্গালী বাউলের' রচিত। উক্ত বাউলেরা দেশপ্রসিদ্ধ। তাহারা যেসকল গান গাহিয়া বেড়ায়, তাহার অধিকাংশই 'কাঙ্গালী বাউলের' রচিত। 'কাঙ্গালী বাউলের' গানগুলিতে, অনেক গ্রাম্য শব্দের সমাবেশ আছে বটে, কিন্তু উহাতে গানগুলি গ্রামবাসীদের নিকট আরও প্রিয়তম হইয়া উঠিয়াছে। উক্ত গানটি, গত বৎসর পাটের দরুন, কৃষকদের দুর্দ্দশা দেখিয়া রচিত। তাহার অধিকাংশ গানই এইরূপ কোনও একটি বিশেষ ঘটনা লইয়া রচিত।

শ্রীহুরসকুসুম সেন।

(১)

সাঁইজী কোন রঙ্গে বেঁধেছো ঘর মিছে ধন্দবাজী।
মিছেমিছি ঘুরে মলাম বুঝলাম না তোর কারসাজী॥
হাড়ের ঘরখানি, চামের ছাউনী, বন্দে বন্দে জোড়া;
তাহার মধ্যে মনোহর মুরারী ডাক্‌লে না দেয় সাড়া।
কেশ পাকিবে, দন্ত পড়িবে,
যৌবনে পড়ে যাবে ভাটি;
(যেমন) দিনে দিনে ঝড়িয়া পড়ে সে, রঙ্গিলা দালানের মাটি।

গানটি আমাদের ডাক-হরকরার নিকট হইতে সংগৃহীত। ইহার অবশিষ্ট অংশ বা কাহার রচিত সে জানে না।

(২)

দেখনা মন ঝকমারি, এই দুনিয়াদারী।
আচ্ছা মজা কপনি-ধ্বজা উড়ালে ফকিরী॥
যা কর যা করবে মন, তোর পিছের কথা রেখো স্মরণ
বরাবরই;
(ও তোর) পিছে পিছে ঘুরছে শমন,
কখন হাতে দিবে দড়ী।
(তখন) দরদের ভাই বন্ধু জনা, সঙ্গে তোমার
কেউ যাবে না, মন তোমারি;
তারা একা পথে খালি হাতে বিদায় দিবে তোমারি।
বড় আশার বাসাখানি, কোথায় পড়ে রবে মন
তোর ঠিক না জানি;
সেরাজ সাঁই কয় লালন ভোরো তুই করিস্‌রে
কার এন্‌তাজারী।

গানটি সেরাজ সাঁই ফকিরের রচনা।

(৩)

খুল্‌বে কেন সে ধন, (ও তার) গায়েক বিনে।
(কত) মুক্তামণি রেখেছে সে ধনী, (সে ধন)
বাধাই করে সে দোকানে॥
সাধু মহাজন যারা, মালের মূল্য জানে তারা,
মূল্য দিয়ে লন অমূল্যরতন, সেধন জেনে শুনে
তারাই কেনে।
মাখাল ফলের বরণ দেখে, (যেমন) ডালে বসে
নাচে কাকে,
তেমনি আমার মন চটকে বিমন (মন তুই) দিন
ফুরালি দিনে দিনে।
মন তোমার গুণ জানা গেল, পিতল কিনে সোনা বল,
অধীন লালন বলে মন চিন্‌লিনে সে ধন
মূল হারালি (মন তুই) নিজের গুণে।

প্রসিদ্ধ লালন সা ফকিরের রচনা। বোধ হয় সহস্র গান আছে। ডাক-হরকরার নিকট সংগৃহীত।

(৪)

চরণ ভিক্ষা দাও সাঁই মোরে।
ঠেলোনা ঠেলোনা দয়াল এ অধীনেরে॥
নেকি, বদি, তুমি সাঁই, আমি কিছু জানি নাই
(মনরে);
নেকি বান্দার হও ভাল, বদির কি আর নাইরে।
আসবার সময় একাই এলাম, যাবার বেলাও
একাই হলাম (মনরে);
লাভে মূলে সব খোয়ালাম সঙ্গের সাথী নাইরে।
জগতের স্বামী যে, আমারে কি মিলিবে, আমার
কি এত ভাগ্য হবে;
ফেলোনা ফেলোনো দয়াল এ কাঙ্গালেরে।
অধীন পাণ্ডু ভেবে বলে, কি করিতে ভবে এলে,
চিনির বলদ চিনি বলি বুঝলি না তার স্বাদ রে।

(৫)

হায় চিরদিন পুষলাম আমি কি এক অচিন পাখী।
বেদ-পরিচয় দেয় না রে পাখী, সদায় ঝরে আঁখি।
আট-কুঠুরীর খাঁচাতে, কোন্ সন্ধানে যায় আসে
(দিয়ে ঝাঁকি)
কোন্ দিন যেন যাবে ছেড়ে পাখী, ধুলো দিয়ে
দুই চোখি।
পাখী বুলি বলে শুন্‌তে পাই, রূপ কেমন তা দেখি নাই,
করি কি উপায়;
চেনাল পেলে চেনাইতাম যেতো রে ধুক্‌ধুকি।

জনৈক মুসলমান ঘরামীর নিকট হইতে সংগৃহীত, বাড়ী নদীয়া জেলায়।

(৬)

ওরে আমার মন-রসনা;
জনম পেয়েছো ভালো হরি বলনা।
(হরি বলনা, বলনা, বলনারে।)
অকস্মাৎ জোয়ার এসে, মালামাল সব গেল ভেসে,
কি কর মন বসে বসে বাঁধ নদীর মওনা কসে;
তোমার সময়ে সাধনা না হলে, অসময়ে কিছুই হবেনা।
আগে আমি জান্‌তাম যদি, বেঁধে রাখতাম শাওনা
নদী,
তাতে মন মোর হ'ল বাদী, বান্‌তে পারলাম না
মায়া-নদী;
টলটলাটল অটল-নদী সে নদী দেখলে জীবের জ্ঞান
থাকে না।

(২)

কে গঠেছে এমন তরী, কোন খানে সে মিস্তরী।
আমি উদ্দেশ পেলে তার সনে যেতাম চলে তার বাড়ী।
দিয়ে তিনশ ষাটের জোড়া, তরী বেঁধে করে খাড়া;
মন-পবনে চালায় তরী, গলুইতে তার দুই দাঁড়ী।
কলঘরেতে আগুন জ্বলে, মাস্তুলেতে ধুম্রো ওড়ে,
শুকনোর পরে চলে তরী, বাহাদুরী কারিগরী।

উপরোক্ত দুইটি গান শ্রীসতীশচন্দ্র বিশ্বাস নামক জনৈক নমঃশূদ্র ভদ্রলোকের তৈয়ারী। তাঁহার নিজের নিকট হইতে সংগৃহীত।

শ্রীকরুণাময় গোস্বামী।

শশাঙ্ক *

শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত ঐতিহাসিক ব্যক্তি। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ইনি মগধ ও গৌড়ের অধীশ্বর ছিলেন। ইঁহারই জীবন ও রাজত্বকালের প্রধান ঘটনাবলী অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাসখানি রচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন:—"ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালাভাষায় বহু উপন্যাস রচিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী, রাজসিংহ, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর ও আনন্দমঠ অমরত্বলাভ করিয়াছে। এই-সকল গ্রন্থের মধ্যে মৃণালিনী ব্যতীত অপর সমুদায়-গুলির (?) আখ্যানবস্তু মুসলমানবিজয়ের পরবর্ত্তীকালের ইতিহাস হইতে গৃহীত। দুঃখের বিষয়, যাঁহারা মুসলমানবিজয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী-কালের ঘটনা লইয়া উপন্যাস-রচনার উদ্যম করিয়াছেন, তাঁহারা ঐতিহাসিক ঘটনা অক্ষুন্ন রাখিয়া কথাসাহিত্যের উন্নতিসাধন করিতে পারেন নাই। আমরা মুসলমানবিজয়ের পূর্ব্বে জীবিত ছিলাম, মুসলমান কর্ত্তৃক বিজিত হইয়া আমরা মরিয়াছি। ভারতবাসীর জীবনকালের ঐতিহাসিক ঘটনাবলম্বনে উপন্যাস রচনা হইতে পারে, ইহারই নিদর্শনস্বরূপ 'শশাঙ্ক' রচিত হইল।" গ্রন্থকার যে উদ্দেশ্যটি মানবচক্ষুর সম্মুখে রাখিয়া "শশাঙ্ক" রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা সফল হইয়াছে। "শশাঙ্ক" যে সুন্দর ঐতিহাসিক উপন্যাস হইয়াছে তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। কিন্তু আমরা তাঁহার লেখনী হইতে উপন্যাসসৃষ্টির প্রত্যাশা করি নাই। আমরা তাঁহার রচিত ভারতের প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিতে ইচ্ছুক। বাঙ্গালাসাহিত্যে উপন্যাসের অভাব নাই; প্রকৃত ইতিহাসেরই অভাব আছে। সেই অভাব পূর্ণ করিবার নিমিত্ত রাখালবাবু লেখনীধারণ করিয়াছেন। তাঁহার লেখনীর উপর পুষ্পচন্দন বর্ষিত হইবে।

রাখালবাবু লিখিয়াছেন "আমরা মুসলমানবিজয়ের পূর্ব্বে জীবিত ছিলাম; মুসলমান কর্ত্তৃক বিজিত হইয়া আমরা মরিয়াছি।" কথাটি কি সম্পূর্ণরূপে সত্য? মুসলমানবিজয়ের পূর্ব্ব হইতেই কি মৃত্যু তাহার করাল প্রভাব আর্য্যসমাজ-দেহের উপর বিস্তার করে নাই? "শশাঙ্কে" তিনি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আর্য্যসমাজের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সেই চিত্রে কি মৃত্যুর তামসী ছায়া লক্ষিত হয় নাই? মুসলমানবিজয়ের পূর্ব্বেই আমরা মরিয়াছিলাম; নতুবা মুসলমানসেনাপতি অবলীলা-ক্রমে মগধবিজয় করিতে পারিতেন না, এবং কেবলমাত্র অষ্টাদশ অশ্বারোহীর সাহায্যে বাঙ্গালার রাজধানী নবদ্বীপ অধিকার করিতে পারিতেন না।

রাখালবাবুর আর-একটি উক্তি সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিব। মুসল-মানবিজয়ের পূর্ব্ববর্ত্তীকালের ঘটনা লইয়া যাঁহারা উপন্যাসরচনার উদ্যম করিয়াছেন, তাঁহারা কেন যে ঐতিহাসিক ঘটনা অক্ষুন্ন রাখিয়া কথাসাহিত্যের উন্নতিসাধন করিতে পারেন নাই, তাহার কারণ তিনি যেরূপ জানেন, অপরের পক্ষে সেরূপ জানা অসম্ভব। প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি এখনও কালের প্রগাঢ় তিমিরগর্ভে নিমজ্জিত। অনুসন্ধানের ক্ষীণ আলোকরশ্মির সাহায্যে দুই-একটি পুরাতত্ত্ব কচিৎ আবিষ্কৃত ও উদ্ধৃত হইতেছে। অধিকাংশ পুরাবৃত্তই কিম্বদন্তী ও অনুমানমূলক। সুতরাং যাঁহারা এইরূপ পুরাবৃত্ত অবলম্বন করিয়া উপন্যাসরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন বা হইবেন, তাঁহাদের পক্ষে ঐতিহাসিক ঘটনা অক্ষুন্ন রাখা অসম্ভব। প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানাভাবের দৃষ্টান্তস্বরূপ দিগ্বিজয়ী ভারতসম্রাট্ সমুদ্র গুপ্তের উল্লেখ করিতেছি। পনর বৎসর পূর্ব্বে ইঁহার নাম কয়জন শিক্ষিতলোকে জানিতেন? ইতিহাসবেত্তা মিঃ ভিনসেণ্ট স্মিথ, তাঁহার রচিত প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের একস্থলে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন:—

"By a strange irony of fate, this great king—warrior, poet and musician—who conquered nearly all India, and whose alliances extended from the Oxus to Ceylon, was unknown even by name to the historians of India until the publication of this work," (about fifteen years ago).

যাঁহারা ইতিহাস-বেত্তা, প্রাচীনভারত সম্বন্ধে যখন তাঁহাদেরই এরূপ জ্ঞানাভাব ছিল, তখন উপন্যাসরচয়িতৃগণ "ভারতবাসীর জীবনকালে"র চিত্রাঙ্কণে যে যথোচিত সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। সৌভাগ্যক্রমে, এখন আমাদের অনু-সন্ধিৎসা জাগরিত হইয়াছে, এবং বহুস্থানে প্রাচীনমুদ্রা, প্রাচীন-শিলালিপি ও প্রাচীনতাম্রশাসন প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়া প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্ত সঙ্কলনের সুবিধা করিয়া দিতেছে। এদেশে যেরূপ বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস রচিত হইতে থাকিবে, সেইরূপ মনোরম ঐতিহাসিক উপন্যাসও রচিত হইয়া বাঙ্গালা-কথা-সাহিত্যের উন্নতিসাধন করিবে। প্রমাণ-স্বরূপ আমরা "শশাঙ্কে"র উল্লেখ করিতেছি।

গ্রন্থকার পাঠকবর্গকে প্রথমেই সতর্ক করিয়া দিয়াছেন:—"ভরসা করি, কেহ 'শশাঙ্ক'কে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে রচিত ইতিহাসরূপে গ্রহণ করিবেন না।" কিন্তু এই সতর্কতাসত্ত্বেও, "শশাঙ্ক" পাঠ করিতে করিতে আমাদের অনেকবার মনে হইয়াছে, যেন আমরা সত্যসত্যই ইতিহাস পাঠ করিতেছি। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে প্রাচীনভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অবস্থার চিত্র গ্রন্থকারের তুলিকায় সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, এবং প্রাচীন সংস্কৃতকাব্য ও নাটকাদি পাঠ করিতে করিতে আমরা প্রাচীনভারতের যেরূপ আভাস পাই, "শশাঙ্ক"-পাঠেও আমরা প্রাচীনভারতের একটি যুগের তদ্রূপ বা তদপেক্ষাও উজ্জ্বলতর আভাস পাইয়াছি। তাহার প্রধান কারণ এই যে, শশাঙ্ক ঐতিহাসিক ব্যক্তি। শশাঙ্কের শৌর্য্য,

---

* শশাঙ্ক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা, ২০১ কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট্, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। ৪৫৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ২৲ টাকা।

বীর্য্য, যুদ্ধকাহিনী, বৌদ্ধনির্য্যাতন সমস্তই ইতিহাসের কথা। বঙ্গ-গৌড়-মগধের অধীশ্বর বঙ্গ-গৌড়-মগধবাসীর সাহায্যে তাঁহার সাম্রাজ্যের ও প্রখ্যাত গুপ্তরাজবংশের প্রণষ্ট গৌরবের সমুদ্ধার করিবার জন্ত যে প্রাণপণ প্রয়াস করিয়াছিলেন, "শশাঙ্কে" তাহা অতিশয় নিপুণতার সহিত কীর্ত্তিত হইয়াছে। বাঙ্গালাসাহিত্যে "শশাঙ্কে"র স্থায় সুলিখিত ঐতিহাসিক উপন্যাস একান্ত বিরল। ইহা পাঠ করিয়া আমরা "জীবিত ভারতবাসী"র সহিত পরিচিত হইয়াছি, বাঙ্গালী ও মগধবাসীর শৌর্য্য-বীর্য্য যেন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং বিশ্বাস করিতে পারিয়াছি যে, সমুচিত শিক্ষা ও উৎসাহ পাইলে, তাহারা পুনর্ব্বার তাহাদের বিলুপ্ত শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় দিতে পারিবে। এই হিসাবে, "শশাঙ্ক" অমূল্য ঐতিহাসিক উপন্যাস, এবং লোকসাধারণের মধ্যে প্রাচীনভারতসম্বন্ধীয় জ্ঞান বিকীর্ণ করিবার পক্ষেও ইহা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। বাঙ্গালী মাত্রেরই এই গ্রন্থ পাঠ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ ইতিহাসিক উপন্যাস যতই রচিত ও পঠিত হইবে, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল হইবে।

কিন্তু "শশাঙ্ক" উপন্যাস না হইয়া যদি প্রকৃত ইতিহাস হইত, তাহা হইলে, ইহার মূল্য যেন শতগুণে বর্দ্ধিত হইত। সত্য বটে, ইতিহাস লিখিবার সমুদায় উপকরণ এখনও সংগৃহীত হয় নাই, এবং উপকরণাভাবে একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা, কল্পনার সাহায্যে অন্ততঃ একখানা ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করাও সমধিক বাঞ্ছনীয়। কিন্তু উপন্যাসের এরূপ মোহিনী শক্তি যে, গ্রন্থকার পাঠকবর্গকে সতর্ক করিয়া দিলেও, তাহারা উপন্যাসে বর্ণিত প্রত্যেক ঘটনাকেই সত্য মনে না করিয়া থাকিতে পারিবে না। এস্থলে একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট করিব। মিঃ ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ্ তাঁহার ইতিহাসে শশাঙ্ক সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য লিখিয়াছেন :—

"The king of Central Bengal, Sasanka, who has been mentioned as the treacherous murderer of Harsha's brother, and probably was a scion of the Gupta Dynasty, was a worshipper of Siva, hating Buddhism, which he did his best to extirpate. He dug up and burnt the holy Bodhi tree at Bodh Goya, on which, according to legend, Asoka had lavished inordinate devotion ; broke the stone marked with the foot-prints of Buddha at Pataliputra ; destroyed the convents, and scattered the monks, carrying his persecutions to the foot of the Nepalese hills." (*The Early History of India* P. 374 Third and Revised Edition, 1914).

ঐতিহাসিকের মতে, শশাঙ্ক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হর্ষবর্দ্ধনের ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধনের প্রাণনাশ করিয়াছিলেন, এবং বৌদ্ধগয়ায় মহাবোধি-দ্রুমকে উৎপাটিত করিয়া, পাটলিপুত্রে বুদ্ধদেবের পবিত্র পদচিহ্ন বিনষ্ট করিয়া, বৌদ্ধমঠ ও সঙ্ঘারামসমূহকে বিধ্বস্ত করিয়া এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসী-বৃন্দকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। জানি না, ঐতিহাসিকের এই চিত্র সত্য কি না। কিন্তু রাখালবাবু তাঁহার উপন্যাসে শশাঙ্কের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া পাঠকের মনে তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার ধারণাই বদ্ধমূল হইবে। রাখালবাবুর মতে মহাবোধিদ্রুমের উৎপাটনের কারণ স্বতন্ত্র; শশাঙ্ক রাজ্যবর্দ্ধনকে প্রকাশ্য দ্বন্দ্বযুদ্ধে বিনষ্ট করিয়াছিলেন; তিনি নিরীহ বৌদ্ধগণের উপর অকারণ অত্যাচার করেন নাই। পরন্তু বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণই হিন্দু-সাম্রাজ্য-ধ্বংস ও বৌদ্ধ সাম্রাজ্যস্থাপনের জন্ত নানা প্রকার ষড়যন্ত্র করিয়া শশাঙ্ককে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন ও শশাঙ্কের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন। শশাঙ্ক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণের অত্যাচারে ক্রুদ্ধ হইয়া পরিশেষে পাটলিপুত্রনগরের উপর অভিশাপ প্রদান করেন, এবং এই প্রাচীন রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া ভাগীরথীতীরে কর্ণসুবর্ণ নামক স্থানে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। ভিন্সেণ্ট স্মিথের ইতিহাস ও উপন্যাসের ঘটনাগুলি এইরূপ বিভিন্ন বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। ভিন্সেণ্ট স্মিথের ইতিহাসের পর নূতন আবিষ্কৃত তথ্য লইয়া রাখাল বাবু বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিয়াছেন, তিনিই এ বিষয়ের উপযুক্ত বিচারক। বলা বাহুল্য যে, উপন্যাসের শশাঙ্ক বীর, উন্নতমনা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুসাম্রাজ্যের প্রাধান্যরক্ষায় একান্ত যত্নবান এবং বঙ্গগৌড়-মগধের শেষ প্রধান সম্রাট। গ্রন্থকারের রচনা-নৈপুণ্যে শশাঙ্কের চিত্র সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

রাষ্ট্রবিপ্লবকালে যেখানে সর্ব্বদা অস্ত্রের ঝঞ্চনাশব্দ শ্রুত হয়, সেখানে প্রেমের সুমধুর মুরলীধ্বনির অবসর নাই। মুরলীধ্বনি হইলেও তাহা কাহার কর্ণকুহরে প্রবেশলাভ করে না। এই কারণে, "শশাঙ্কে"র নারীচিত্র-গুলি আশানুরূপ হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। তরলার তরল রসিকতা, যূথিকার প্রগাঢ় প্রেম, চিত্রার প্রেমবৈচিত্র্য ও লতিকার আত্মবিসর্জ্জন অন্তসময়ে ও অন্তক্ষেত্রে পাঠকের হৃদয়ে বিচিত্রভাবের ঝঙ্কার তুলিতে পারিত; কিন্তু শশাঙ্কের কঠোর ব্রতোদ্যাপনের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও একনিষ্ঠতার মধ্যে, এবং গুপ্তসাম্রাজ্যের নষ্টপ্রায় গৌরবসমুদ্ধারের জন্ত সমবেত প্রচেষ্টার কোলাহলে, বিরহিণীর দীর্ঘশ্বাস, প্রেমিকার ক্ষুব্ধ হৃদয়ের হাহাকার, ও প্রেমের মর্ম্মস্পর্শিনী করুণ গীতি কোথায় ডুবিয়া গিয়াছে। কাহারও সেদিকে দৃষ্টিপাত বা কর্ণপাত করিবার প্রবৃত্তি বা অবসর হয় নাই। দোষ গ্রন্থকারের চিত্রতুলিকার নহে। যদি দোষ থাকে, তবে তাহা তাঁহার আখ্যানবস্তুর নির্ব্বাচনের ও প্রেমের বিরহসঙ্গীত অপেক্ষা এই পুস্তকে স্কন্দগুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্তের বীরত্বগাথা অধিকতর সুসঙ্গত ও চিত্তাকর্ষক হওয়ার।

"শশাঙ্ক" বাঙ্গালাসাহিত্যে একটি অভিনব ও অপূর্ব্ব ঐতিহাসিক উপন্যাস হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা ও রচনা সুন্দর। স্থানে স্থানে সামান্ত ত্রুটি লক্ষিত হয় বটে ; কিন্তু তাহা ধর্ত্তব্য নহে। পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণ ও বাঁধাই মনোরম।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

সেখ আব্দু

আব্দু ষ্টেশনে আসিয়া যখন পৌঁছিল তখন ঘোর-ঘোর ভোর। ষ্টেশনে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল তখনো পশ্চিমের ট্রেন আসিতে আধ ঘণ্টা দেরী। তাইত, আধ ঘণ্টা কাটে কি করিয়া ?—

একটু এদিক ওদিক করিয়া আব্দু টিকিট কিনিয়া, কাঠের সিঁড়ি বাহিয়া ওদিকের প্লাটফরমে যাইতেছে। সিঁড়ি হইতে প্লাটফরমে নামিতেই, তাহার পায়ে কি একটা বস্তু ঠেকিল ; হেঁট হইয়া দেখিয়া জিনিষটা আব্দু কুড়াইয়া লইল। সেটা একটা মনিব্যাগ।

কে এখানে ব্যাগ ফেলিয়া গেল ? অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে

আন্দু একবার চারিদিকে তাকাইল,—কিন্তু ব্যাগ হারাইবার উপযুক্ত পাত্রের কিছুমাত্রই সন্ধান পাইল না। আন্দু ভাবিতে লাগিল, তাইত, কি করা যায়?

ক্ষণপরে আপনা-আপনি বলিয়া উঠিল, "যাঃ, ভালই হয়েছে, কি করে আধঘণ্টা কাটাই তাই ভাবছিলেম, ঈশ্বর একটা কাজ জুটিয়ে দিয়েছেন, দেখি ব্যাগের মালিকের সন্ধান করে, একান্ত না পাই, শেষ ষ্টেশন-মাষ্টারের জিম্মা করে দেওয়া যাবে।"

কর্ম্মপ্রিয় আন্দু কর্ম্মের উদ্যমে মর্ম্ম-বেদনা ভুলিয়া, উৎসাহিতপদে প্লাটফরমে আসিল। প্লাটফরমে রীতিমত সজীব চঞ্চলতা; মোট পুঁটুলী ঝোড়াঝুড়ি বাক্‌স ট্রাঙ্ক লইয়া, যাত্রীগণ ইতস্ততঃ বিশৃঙ্খল ভাবে ছড়াইয়া রহিয়াছে। দূর হইতে যাত্রীদের অবস্থান মন্দ দেখাইতেছে না, কিন্তু কাছাকাছি হইলে বিষম বিসদৃশ ঠেকিতেছে।

আন্দু আসিয়া একটা আলোক-স্তম্ভের নীচে পুঁটুলী ও লাঠিটি ফেলিল। তারপর—যতদূর দৃষ্টি চলে—উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, ষ্টেশনে অধিকাংশই ইতর শ্রেণীর হিন্দুস্থানী; ভদ্রপরিচ্ছদধারী কতকগুলি যাত্রী ছিল, তাহাদের একবার ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে আন্দু অগ্রসর হইল।

প্রথমেই একজন সম্ভ্রান্ত ধরণের প্রৌঢ় হিন্দুস্থানীকে পাইল। কাছে গিয়া সেলাম বাজাইয়া আন্দু বলিল "জী,—আপ্‌কো মনিব্যাগ হ্যায়?"

"জী"-চিহ্নিত লোকটা গঞ্জিকা-রঞ্জিত চক্ষু ঘুরাইয়া তাহার পানে চাহিল, মেজাজটা তখন দস্তুরমত রংচংয়ে ভোর ছিল, সুতরাং কথাটা বোধগম্য হইল না। দ্বিতীয় প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন বোধে আন্দু সেখান হইতে সরিয়া গেল।

তাহার পরই একজন নব্যসভ্যতা-মণ্ডিত চশমাওয়ালা বাঙ্গালী-যুবকের পালা। যুবকটি শ্বশুরবাড়ীর ফেরৎ পিত্রালয় যাইবে, সুতরাং পরিচ্ছদের জাঁকজমক খুব। আন্দু কাছে গিয়া, পকেট হইতে বহুদিনের পুরাতন একটা পাইপ-সুদ্ধ সিগারেট বাহির করিয়া, পাইপটা খুলিয়া পুনশ্চ পরাইতে পরাইতে বলিল "বাবু আপনার কাছে দেশলাই আছে?"

বাবু এপকেট ওপকেট হাতড়াইয়া দেশলাই বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন, আন্দু বুঝিল তাহার পকেটের জিনিসপত্র সবই যথাস্থানে আছে,—আন্দু সিগারেট ধরাইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। আসলে সে সিগারেট খাইত না, সুতরাং আলোক-স্তম্ভের অন্তরালে গিয়া দেয়ালের গায়ে ঘসিয়া সেটা নির্ব্বাপিত করিয়া ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের অনিশ্চিত সম্ভাবনায় পুনরায় পকেটে ফেলিল।

ব্রাউন রংয়ের বুট পরিয়া, চুড়িদার পাঞ্জাবী গায়ে, টেরি এবং ছড়িযুক্ত এক ইংরেজীনবিশ হিন্দুস্থানী যুবক, প্রবল গাম্ভীর্য্যে প্লাটফরমের ধারে পাদ-চালনা করিতেছিল। আন্দু তাহাকে গিয়া পাকড়াইল। সৌজন্যের সহিত বিনীত ভাবে বলিল "দোস্ত সাহেব, আপ্‌কো মনিব্যাগ ঠিক রাখিয়ে, টিশন্ ভির এক আদমী-কো বেগ্ হেরায়া।"

তীক্ষ্ণবুদ্ধি দোস্ত সাহেব এই অপরিচিত লোকটির অযাচিত উপদেশে সন্ত্রস্ত হইয়া একবার বুক পকেটে হাত দিলেন, তারপর তাচ্ছিল্যভরে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেলেন। আন্দু দেখিল ব্যাগের জন্য এ লোকটির কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা নাই।

মনিব্যাগ রাখিবার উপযুক্ত যতগুলি লোককে আন্দু দেখিল, সকলগুলিকেই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া প্রশ্ন করিয়া জানিল, ব্যাগের জন্য তাহারা কেহই ব্যস্ত নহে। বিফল-প্রয়াস আন্দু তথাপি হাল ছাড়িল না। ট্রেন আসিতে আরো দশ মিনিট দেরী আছে দেখিয়া, সে পাঁচ মিনিট আরো ব্যাগের মালিককে খুঁজিতে মনস্থ করিল। নবোদ্যমে পুনরায় সেই আলোকোদ্ভাসিত কোলাহল-মুখরিত ষ্টেশনের আদ্যোপান্ত চাহিয়া দেখিল। তারপর দ্রুতপদে অগ্রসর হইল।

প্লাটফরমের পশ্চিমে কোলাহল-বিরল স্বল্পালোকিত স্থানে, দুইজন ইংরেজ-মহিলা পাদচালন করিতেছিলেন, একজন প্রৌঢ়া, অপরা তরুণী; সম্ভবতঃ মাতা কন্যা। সহসা আন্দু ব্যস্তভাবে কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই শ্বেতাঙ্গনাদ্বয়ও দাঁড়াইলেন। আন্দু কুর্নিশ করিয়া কহিল "মেম-সাহেব, আপ্‌লোক্-কো রূপেয়া ভাঙ্গানী চাহিএ।"

"নেহি"—মেম-সাহেবরা চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। উদ্বিগ্ন আন্দু বলিয়া উঠিল "নোট নোট, দ্যাশ্ রূপেয়াকা নোট ভাঙ্গানী?"

"নোট"—মাতা, কন্যার মুখপানে চাহিলেন।

"ও, হাঁ—তাতে অবশ্য সুবিধা আছে," কন্যা ইংরেজীতে বলিলেন। পরক্ষণেই ব্যস্তসমস্ত হইয়া জামার ভিতর দিকে খুঁজিতে লাগিলেন। "যাঃ, কোথা গেল, কোথা গেল, আমার মনিব্যাগটা কোথা গেল"—কন্যা ত্রস্ত চকিত নয়নে ইতস্ততঃ চাহিতে লাগিলেন।

"ব্যাগ! সেকি, ব্যাগ নাই!"—মাতাও উৎকণ্ঠিত। আব্দুর মুখ প্রফুল্ল হইল।

"নিশ্চয় সে নিশ্চয় এই প্লাটফরমেই পড়ে গেছে, আমি সিঁড়ি পর্য্যন্ত সেটা দেখছি,"—

"যাঃ! চল চল দেখা যাক, এখন পাওয়া গেলে হয়।"

"ট্রেনটা বোধ হয় মিস্ কর্ত্তে হবে, সেটা কিন্তু ঠিক এইখানেই পড়েছে।"

"চল চল"—উভয়ে দ্রুতপদে চলিলেন।

"আপ্‌কো ব্যাগ হেরায়া মেম-সাহেব?" আব্দু সুধাইল।

"হাঁ হাঁ ঢুঁড়কে দেখো, যিস্‌কো মিলেগা—"

"কসুর মাপ কিজিয়ে মেম-সাব, এই-ঠো দেখ্‌নেকো মর্‌জি—" আব্দু বয়স্কার হাতে ব্যাগ দিল।

"হাঁ হাঁ এই আমার ব্যাগ, বহু ধন্যবাদ"—আনন্দোৎফুল্ল যুবতী, তাড়াতাড়ি মাতার হাত হইতে ব্যাগটা লইয়া খুলিয়া ফেলিলেন। তাহার অভ্যন্তরে কয়েকখানি নোট, এবং দুইখানি ভাগলপুর হইতে টুণ্ডলা জংসন পর্য্যন্ত রেলওয়ে টিকিট, এবং কয়েকটি টাকা ও দুটি সিকি।—"সবই ঠিক আছে, লোকটাকে কিছু বখশীস্।"

"হাঁ অবশ্য"—মাতা ব্যাগ হইতে দুইটি টাকা তুলিয়া লইলেন।

আব্দু হাত ছয়েক দূরে সরিয়া গিয়া, একটা আলোক-স্তম্ভে ঈষৎ হেলিয়া ঠেস্ দিয়া কোমরে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মেম-সাহেব কাছে আসিয়া বলিলেন "তুমি এটা কোথা পেলে?"

সবিনয়ে আব্দু বলিল "সিঁড়ির নীচে পড়ে ছিল মেম-সাহেব। প্লাটফরমের সকল যাত্রীকেই জিজ্ঞাসা করেছি, কারুর নয়, তাই আপনাদের ব্যাগ সন্দেহ করে টাকা ভাঙ্গাবার অছিলায় সন্ধান নিতে এসেছিলুম, মাফ করুন।"

মেম-সাহেব বলিলেন "খুব ভাল, তোমার সততা প্রশংসনীয়, আমরা খুসী হয়েছি, এই টাকা দুটি—"

"মাফ করুন মেম-সাহেব, আপনাদের খুসীতেই গরীবের আনন্দ, টাকা চাই না।"

"না না, আমরা তা হলে বড় দুঃখিত হব।"

"আপনার অনুরোধে আমি তার চেয়ে দুঃখিত হলুম। মা, টাকাই কি জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিস?"

"ধন্যবাদ যুবক, তোমার নাম?"—যুবতী মেম-সাহেব অগ্রসর হইয়া স্মিতমুখে প্রশ্ন করিলেন "তোমার নাম?"

"আমার নাম শেখ আনোয়ার উদ্দীন।"

যুবতী নোটবুকে নাম টুকিয়া লইল। "তোমার বাড়ী কোথা?"

"পূর্ব্বে ভাগলপুরে ছিল, এখন নির্দ্দিষ্ট কোথাও নাই।"

"এখন কোথায় যাবে?"

"সম্ভবতঃ দিল্লী।"

"দিল্লী? কেন?"

"জীবিকা উপার্জ্জনে।"

"কি কাজ কর?"

"পূর্ব্বে দর্জ্জি ছিলাম, এখন মোটরকারের ড্রাইভারি করি।"

"ড্রাইভারি কর"—তরুণীর উজ্জ্বল নীলচক্ষু আনন্দে হাসিয়া উঠিল। অর্থসূচক দৃষ্টিতে কন্যা মাতার মুখপানে তাকাইলেন। মাতা বলিলেন "শোনো যুবক, আমি টুণ্ডলা যাচ্ছি; যদি আমার দ্বারা কোন উপকার হয় তো বল, আমি করতে প্রস্তুত আছি, আমি সেখানকার ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী।"

ভূমিস্পর্শ করিয়া আব্দু অভিবাদন করিল। সসম্ভ্রমে বলিল, "আপনার অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ মেমসাহেব, আমি দিল্লীতে যাচ্ছি,—"

অধীর হইয়া ছোট মেমসাহেব বলিলেন, "তুমি যদি টুণ্ডলা যাও, তা হলে, আমাদের দ্বারা তোমার ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা আছে,—"

"সেলাম, ঐ ট্রেন আসছে, আর দেরী নাই, ক্ষমা করুন"—আব্দু নিজের মোট লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। যাত্রীর দল তখন যথেষ্ট ব্যস্ততার সহিত মোটঘাট লইয়া উৎকণ্ঠিত কোলাহলে ট্রেনে উঠিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। ছোট মেমসাহেব পিছন হইতে হাঁকিয়া বলিলেন "তা হলে তুমি টুণ্ডলা ষ্টেশনে নেমো, নিশ্চয় নেমো, বুঝলে? নেমো।"

আন্দু সে কথা কানে তুলিল না। দ্রুতবেগে ভিড়ে মিশিয়া পড়িল।

ভীষণ শব্দে ষ্টেশন কাঁপাইয়া ঝাঁ ঝাঁ করিয়া ট্রেন আসিয়া পড়িল। একটা শৃঙ্খলাহীন হাঁকডাকের উচ্চ রোল পড়িয়া গেল। লোকজনের হুড়াহুড়ি, ছুটাছুটি, জিনিসপত্র নামান উঠান,—'কুলী' 'পান সিগারেট' 'পানিপাঁড়ে' 'খাবার-ওয়ালা' সব ক'টার চীৎকার আওয়াজ যুগপৎ জড়াইয়া, সারা ষ্টেশনটা সর্‌গরম্ হইয়া উঠিল।

আন্দু তাড়াতাড়ি তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিয়া বেঞ্চির উপর নিজের লাঠি ও মোটটা ফেলিল। তারপর নামিয়া আসিয়া উৎফুল্ল-বিক্রমে ছুটাছুটি করিয়া, অন্যান্য যাত্রীদের মোট পুঁটুলি অযাচিত ভাবে গাড়ীতে তুলিতে নামাইতে লাগিল। আন্দুর কল্যাণে অক্লেশে দলে দলে অক্ষম দুর্ব্বল শিশু বৃদ্ধ স্ত্রীলোক গাড়ী হইতে নামিতে ও গাড়ীতে উঠিতে লাগিল। একজন শীর্ণকায়া হিন্দুস্থানী রমণী একটা প্রকাণ্ড গাঁটরী মাথায় করিয়া ভিড়ের বেগে গাড়ীতে উঠিতে না পারিয়া অতি কষ্টে ছুটাছুটি করিয়া ঘুরিতেছিল। আন্দু তাড়াতাড়ি তাহার ভারি গাঁট্‌রীটা নিজের ঘাড়ে টানিয়া লইয়া, মেয়েদের কামরার দরজা খুলিয়া মোট-সুদ্ধ তাহাকে উঠাইয়া দিয়া, আবার অন্যত্র ছুটিল। উপকৃতা বৃদ্ধা দুই হাত তুলিয়া অপরিচিত যুবাকে আশীর্ব্বাদ করিল।

মধ্যম শ্রেণীর একটা কামরার দরজা-গোড়ায় দুইজন কুলী একটা ট্রাঙ্ক লইয়া ঠেলাঠেলি করিতেছিল, কিছুতেই সেটা কামরার ভিতর তুলিতে পারিতেছিল না। হঠাৎ আন্দু ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া, বিনাবাক্যে এক ধাক্কায় সামনের কুলীটাকে সরাইয়া সবেগে দ্বিতীয় ধাক্কায় ট্রাঙ্কটা কামরার মধ্যস্থানে পৌঁছিয়া দিয়া আবার অন্যদিকে চলিল। হাসিতে হাসিতে, উদ্দেশে ওস্তাদকে অভিবাদন করিয়া মনে মনে বলিল, "কুস্তি শিক্ষার সার্থকতা এইখানে,—কাজের মাঝে।"

ট্রেনে উঠিবার সময় এক আরোহী ভদ্রলোকের হাত হইতে দৈবক্রমে একখানি বই লাইনের নীচে পড়িয়া গিয়াছে, ভদ্রলোকটি সাগ্রহে চার-পাঁচজন কুলীকে পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া বইখানি তুলিয়া দিবার জন্য বারম্বার অনুনয় বিনয় করিতেছেন। কিন্তু ট্রেন তখন ছাড়ে-ছাড়ে হইয়াছে, সুতরাং প্রাণের ভয়ে সে সময় নীচে ঝুঁকিতে কেহই সাহস করিতেছে না। দূর হইতে তাহাদের ভাবগতিক দেখিয়া আন্দু সেখানে ছুটিয়া আসিয়া হাজির হইল। ভদ্রলোকটির কাতরোক্তি শ্রবণ মাত্রে অকুতোভয়ে তৎক্ষণাৎ মাটিতে বুক দিয়া শুইয়া হাত বাড়াইয়া অতিকষ্টে বইখানা তুলিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ট্রেন ছাড়িল। ভদ্রলোকটির হাতে বইখানা দিয়া, আন্দু কোনদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, ছুটিয়া আসিয়া, নিজের কামরার দরজা খুলিয়া ট্রেনে উঠিল।

পাদানিতে পা দিয়াছে, এমন সময় হঠাৎ অন্যদিকে নজর পড়িল। দেখিল তিনখানা গাড়ীর পর দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার জানালা হইতে বুক পর্য্যন্ত বাহির করিয়া গাড়ীর পিত্তল-দণ্ড ধরিয়া ছোট মেমসাহেব ঝুঁকিয়া পড়িয়া ব্যগ্র দৃষ্টিতে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছেন!

চোখোচোখি হইবামাত্র হর্ষবিকশিত নয়নে, তীক্ষ্ণ উচ্চকণ্ঠে মেমসাহেব বলিলেন "টুণ্ডুলায় নাম্‌বে, টুণ্ডুলা জংসন।"

আন্দু গাড়ীতে উঠিয়া হাতল ঘুরাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তখন ট্রেন প্লাটফরম ছাড়াইয়াছে, চারিদিক ফর্শা হইয়া আসিয়াছে।

(১৪)

কাজের হুড়াহুড়ি যখন একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গেল, তখন আন্দু নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া, বিক্ষিপ্ত চিত্তটাকে শৃঙ্খলা-সূত্রে টানিয়া বাঁধিতে বসিল। আন্দু মনকে বুঝাইয়া কঠিন নির্ম্মম করিল। সে অতীতের জন্য,—অতীত সুখের জন্য স্বার্থপরের মত হা-হুতাশ করিবে না,—সে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য দৃঢ়ভাবে প্রস্তুত হইবে। ভগবান তাহাকে যে শক্তি কটা দিয়াছেন, সব কটাই সে কার্য্যের শানে তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল করিয়া লইয়া জটিল সংশয়াকুল জীবন-যাত্রাটা সহজ শান্ত করিবে। অসীম বেদনার মধ্য হইতে, কঠিন সন্তোষ সবলে আকর্ষণ করিয়া পৌরুষের মর্য্যাদা সে সযত্নে বজায় রাখিবে। নিঃসম্বল নিরাশ্রয় হইয়া স্বেচ্ছায় অকুতোভয়ে সে যেমন পথে দাঁড়াইয়াছে, তেমনি সদর্পে স্বাবলম্বন ধরিয়া সে অদৃষ্টকে উপেক্ষা করিয়া যাইবে।

হঠাৎ আন্দুর মনে পড়িল কাল দ্বিপ্রহরের পর সে আহার করিয়াছে, তাহার পর আর জলস্পর্শ করে নাই; উদ্বেগ-আকুল চিত্তের দুরন্ত উৎক্ষেপ-বিক্ষেপে ক্ষুধা তৃষ্ণার অনুভবশক্তি এতক্ষণ মোটে অনুভূত হয় নাই; এখন কাজ নাই, তাই আলস্যের ঝোঁকে ক্ষুধা তৃষ্ণা তন্দ্রা সবাইকে মনে পড়িতেছে। আন্দু অভ্যাস-বশে পাদচালনার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু এখানে ঘুরিবে কোথা, এ যে জনপূর্ণ চলন্ত গাড়ী! আন্দুর চিত্ত-শক্তিটা এমনি একমুখী একগুঁয়ে, যে, যখন যে-বিষয়টা ভাবিতে বসে, তাহারই তলায় গভীর ভাবে তখন ডুবিয়া যায়। এই প্রকাণ্ড গাড়ীভরা এতগুলো বিভিন্ন শ্রেণীর বিচিত্রপ্রকৃতির লোকও এতক্ষণ তাহার দৃষ্টির কৌতূহলশক্তি উদ্বোধিত করিতে পারে নাই। হঠাৎ সমস্ত গাড়ীটার পানে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া আন্দু অবাক হইয়া গেল। আন্দুর বেঞ্চির সামনের বেঞ্চিতে বসিয়া মোটে ঠেস দিয়া এক সৌম্যমূর্ত্তি হিন্দুস্থানী বৃদ্ধ অনেকক্ষণ হইতে প্রাতঃস্মরণীয় সংস্কৃত শ্লোকসমূহ আবৃত্তি করিতেছিলেন। আন্দু এতক্ষণ কান দেয় নাই, এখন কানে যাইতেই আন্দু সোজা হইয়া উন্মুখ নয়নে বৃদ্ধের পানে চাহিয়া বসিল। সংস্কৃতপ্রিয় ভবতারণের সংসর্গে পড়িয়া আন্দুর সংস্কৃত শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা ছিল, নিজের উদ্যমে সংস্কৃত শ্লোকও কিছু কিছু শিখিয়াছিল; সে প্রায়ই ভবতারণের কাছে গিয়া গীতা ও মোহমুদ্গরের সব্যাখ্যা শ্লোক শুনিত; ভবতারণের কাছে সেও মধ্যে মধ্যে নমাজের রেকার মর্ম্ম, এবং কোরানের বয়েদ আবৃত্তি করিয়াছে। তাহাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের মাঝে পরস্পরের ধর্ম্মের প্রতি সম্মানের ভাবটি বড় স্নিগ্ধ মধুময় ছিল।

সমস্ত গাড়ীর মধ্যে আন্দু এই বৃদ্ধের শান্ত মুখচ্ছবিতে একটি বিশেষ রকম মাধুর্য্য লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বৃদ্ধের চেহারায় সুপুরুষতার চিহ্নমাত্র ছিল না, দেখিতে তিনি নিতান্তই সাধারণ শ্রেণীর মানুষ। কিন্তু তাঁহার বার্দ্ধক্য-শ্লথ শরীরের মধ্যে অমনি একটি সৌম্য সহিষ্ণু মহানুভবতার জ্যোতি মৃদু শক্তিতে বিকীর্ণ হইতেছিল যে দেখিলেই ভক্তি করিতে ইচ্ছা হয়। বৃদ্ধের সহিত আলাপ করিবার জন্য আন্দু উৎসুক হইয়া উঠিল।

আন্দুর পিছন দিকের বেঞ্চিতেও কি একটা গল্পস্রোতের গোলমাল প্রবলভাবে চলিতেছিল, আন্দু ফিরিয়া সেদিকে চাহিল। দেখিল লাটুদার-পাগড়ী মাথায় গোঁফ দাড়ি কামান, এক পণ্ডিত-গোছের ফোঁটা-পরা হিন্দুস্থানী মধ্য-বয়স্ক ব্যক্তি উষার আলোকে জানালার কাছে গিয়া একজনের কর্কোষ্ঠি দেখিয়া অনর্গল বকিয়া যাইতেছেন, আর লোকটা যেন নিতান্ত গো-বেচারীর মত 'হুঁ হাঁ' দিয়া যাইতেছে।

সে লোকটির কোষ্ঠিফল যথাবিহিত বর্ণিত হইলে আর-একজন উঠিয়া আসিয়া হস্ত প্রসারণ করিল। আন্দু দেখিল, তিনি প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে যাহা বলিয়াছিলেন ইহাকেও প্রায় তদনুযায়ী বলিলেন, অধিকন্তু একটি সদ্যসমাগত বিপদের প্রতিকারের জন্য শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিতে আদেশ করিলেন।

তৃতীয় ব্যক্তি আসিতে তাহাকেও ঠিক ঐরূপ ভাবে অতীত জীবনের কথা বলিলেন। লোকটা ভক্তি-গদ্গদপ্রাণে, অকুণ্ঠিত চিত্তে সমস্ত মানিয়া লইয়া নিজের স্থানে গিয়া বসিল।

আন্দুর কৌতূহল বাড়িয়া উঠিল, সেও উঠিয়া আসিয়া গণকের সামনে দাঁড়াইল, হাসিয়া বলিল "আমি একবার হাত দেখাতে পারি কি?—কিন্তু আমি মুসলমান।"

গণক-ঠাকুর দুই মুহূর্ত্তের জন্য আন্দুর পানে খর দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর অবিশ্বাস্য ভাবে মাথা নাড়িয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন "তুমি আমায় ঠকাতে এসেছ?—তুমি মুসলমান নও।"

গণক-ঠাকুরের জ্যোতিষ-জ্ঞানের প্রাখর্য্যে আন্দু চমৎকৃত হইল। হাস্য সম্বরণ করিয়া অবিচলিত ভাবে বলিল "হাঁ ঠাকুর, সত্যিই আমি মুসলমান।"

গাড়ীর লোকগুলা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। গণক-ঠাকুরের দম্ভ-কঠিন মুখমণ্ডল একটু নিষ্প্রভ হইল, বলিলেন "বস, দেখ্ছি।"

আন্দু বসিয়া হাত বাড়াইল। গণক-ঠাকুর পুনরায় পূর্ব্বানুবৃত্তিরূপে যোগিনী-দোষ হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রহসংস্থান পর্য্যন্ত একই সুর ভাঁজিয়া গেলেন। তারপর বলিলেন "তোমার ধনস্থানে বৃহস্পতি আছেন, যথেষ্ট অর্থাগম হবে, কিন্তু তুমি রাখ্তে পারবে না,—"

আন্দু বিন্দুমাত্র উৎসাহ না দেখাইয়া বলিল "আচ্ছা বিদ্যাস্থানে?"

গণক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া করকোষ্ঠি দেখিতে লাগিলেন, বলিলেন, "বিদ্যাস্থানে বুধ, কিন্তু শনির কোপ আছে, সেজন্য উপস্থিত সময় পর্য্যন্ত তোমার কিছু হতে দিচ্ছে না, ভবিষ্যতে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। বুদ্ধিতে কিন্তু বাপু তুমি অদ্বিতীয় লোক হবে, তা থেকেই ধনবান হবে।"

আন্দু হাসিল—"আচ্ছা ধর্ম্মস্থানে কি দেখুন।"

গণক সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন, "পরমায়ু যথেষ্ট আছে, আশী বছর পর্য্যন্ত; ভাগ্যে দ্বি-পত্নী যোগ আছে। তোমার বয়স কত?—"

আন্দু বলিল "তেইশ বছর।"

গণক গম্ভীর মুখে বলিলেন "শীঘ্রই তোমার পত্নীবিয়োগ-যোগ আছে, তবে এখনি ওর একটু প্রতিকার করুলে মঙ্গল হবে, খরচ করতে পারবে?"

আন্দু অট্ট-হাস্য দমন করিয়া বলিল "ঠাকুর, আমি যে অবিবাহিত।—"

ঠাকুর রুষ্ট হইয়া বলিলেন "তুমি কি জ্যোতিষ-শাস্ত্রকে ব্যঙ্গ কর্ত্তে চাও,—"

আন্দু সবিনয়ে বলিল "আজ্ঞে না, সত্যই আমি অবিবাহিত।"

দর্শকগণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। গণক-ঠাকুর আন্দুর হাতের উপর ভ্রূকুটীবদ্ধ ললাটে অত্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিজের অভ্রান্ত গণনা-বিদ্যার আকস্মিক ভ্রমের তদন্তে নিযুক্ত হইলেন। আন্দু তাঁহার বিপদ দেখিয়া সদয় হইয়া বলিল "আচ্ছা ঠাকুর, ধর্ম্মস্থানে কি রকম কি দেখছেন?"

ঠাকুর রেখা-বিজ্ঞানের দুরূহ শ্লোকরাশি আবৃত্তি করিয়া বলিলেন "জীবনে তুমি দুবার সাংঘাতিক পীড়ায় ভুগেছ।"

আন্দু অস্বীকার করিয়া বলিল "আজ্ঞে না, একবার।"

"আরো একবার, তত বেশী না হোক, তবে তেমনি—"

আন্দু বলিল "একবার নয়, অল্প ভোগ তিনবার ভুগেছি। আচ্ছা সে যাক, আপনি অতীতকে ছেড়ে দিয়ে ভবিষ্যৎ দেখুন। ধর্ম্মস্থানে আমার কি যোগ আছে?"

এমন নিতান্ত অবাধ্য, সমস্ত-অস্বীকারকারী, শাস্ত্র-জ্ঞান-হীন নাস্তিককে লইয়া কি গণনা-বিদ্যা চলে?—আন্দু তৃতীয় বার ধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি প্রবল তাচ্ছিল্যে তাহার হাত ছাড়িয়া বিজ্ঞভাবে চোখ মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন, "ধর্ম্ম, ধর্ম্ম! ধর্ম্মের কথা আমি কিছু বলব না, তোমার মুখে এখনো দুধের গন্ধ রয়েছে, ছেলেমানুষ তুমি, ধর্ম্মের কি বুঝ্‌বে?"

তাঁহার কথা কহিবার সদম্ভ-ভঙ্গীতে আন্দুর নির্ঘাত পরাভব স্থির করিয়া দর্শকের দল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। যেমন বাহাদুরী করিতে আসিয়াছিল লোকটা তেমনি জব্দ হইয়াছে!—

আন্দু কিন্তু হটিবার পাত্র নহে। দৃঢ়স্বরে বলিল "ও কি বলছেন, জ্যোতিষ-বিজ্ঞানে ধর্ম্মের জন্যে বয়সের মাপ জোক আছে না কি?—সে হবে না, আপনি ঠিক করে বলুন, ধর্ম্মস্থানে আমার কি গ্রহ আছে।"—আন্দু হাতখানা আবার বাড়াইল।

তিনি পুনশ্চ হাতটা ঠেলিয়া দিয়া সগর্ব্বে হাসিয়া বলিলেন "ধর্ম্মের আর কি দেখ্‌ব, বলেছি তো তোমার ধন হবে।"

আন্দু বলিল "ধনের জন্যে আমি লালায়িত নই, সত্যি বলছি, আমি ধর্ম্মস্থানটা জানবার জন্যে ব্যস্ত।"

গণক-ঠাকুর মুরুব্বি-আনা ধরণে হাই তুলিয়া আলস্য ভাঙ্গিয়া বলিলেন "শুভ হবে, শুভ যোগ আছে, যখন হবে তখন আর ভাবনা কি? ধনই তো ধর্ম্ম!"

চমৎকার! ধনই ধর্ম্ম!

আন্দু আর বসিল না, উঠিয়া বলিল, "ঠাকুরজী, ধন তো বাহ্যিক সম্পদ, তার সঙ্গে ধর্ম্মের সম্পর্ক কি? ধর্ম্ম যে আধ্যাত্মিক ব্যাপার!"

গণক-ঠাকুরের মাথায় সে কথার সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য ঢুকিল না। পুনঃ পুনঃ হাই তুলিয়া বলিলেন, "কেন, ধনের দ্বারাই তো সব, দান ধ্যান—"

বাধা দিয়া আন্দু বলিল "ঐ একটি কাজ দান—কিন্তু ধনের দ্বারা তো ধ্যান চল্‌বে না ঠাকুরজী—ধ্যান যে মনের সম্পত্তি!"

গণক-ঠাকুর ফাঁফরে পড়িলেন। আজ পর্য্যন্ত এসব জটিল তর্ক লইয়া তিনি মাথা ঘামান নাই, সুতরাং পরাভবের দৈন্যে অপমানে রুষ্ট হইয়া বলিলেন "তোমাদের ম্লেচ্ছ

শাস্ত্রে, ঐ রকম বলুক, আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে ধনই ধর্ম্মের মূল বলে।”

“ভুল কথা!”—ও ধারের বেঞ্চি হইতে সেই সৌম্যদর্শন বৃদ্ধটি জবাব দিলেন “ভুল কথা। ধর্ম্মের পথে, ধনের আনুসঙ্গিক প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু ধনই যে ধর্ম্মের মূল একথা হিন্দুশাস্ত্রে নেই!”

বৃদ্ধটি এতক্ষণ দর্শকদিগের কোলাহলে আকৃষ্ট হইয়া হাসি-হাসি মুখে আন্দুর সহিত গণক-ঠাকুরের তর্কযুদ্ধ দেখিতেছিলেন, এইবার জবাব দিয়া প্রীতিভরে হস্তের ইঙ্গিতে আন্দুকে ডাকিয়া সস্নেহে বলিলেন “এস ভাই নাস্তিক সাহেব, আমি তোমাকে ধর্ম্মস্থানের শুভাশুভ গণনা-সঙ্কেত বুঝিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু, সে গণনা সাধনসাপেক্ষ, চিত্তস্থিরই সে জ্যোতিষীর মূল বিজ্ঞান।—ভাইসাহেব, ভবিষ্যৎকে জানবার জন্যে অন্যায় চেষ্টা ছেড়ে, বর্ত্তমানের কর্ত্তব্যগুলো ভগবানের নামে নির্ভর রেখে করে চল ভাই, চেষ্টার পরিমাণেই সফলতার স্ফূর্ত্তি!—আমি বলছি, তোমার ধর্ম্মস্থানে যত বড়ই অশুভগ্রহ থাক, তুমি যদি পরিপূর্ণ চেষ্টায় ধর্ম্মসাধন কর, তাহলে দুষ্টগ্রহ নিশ্চয় হার মানবে!—”

সরিয়া আসিয়া আন্দু তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বেঞ্চির উপর হাত রাখিয়া তাঁহার পায়ের কাছে বসিল।

(১৫)

বৃদ্ধ সমাদরে আন্দুকে তুলিয়া আগ্রহে তাহার সহিত আলাপ জুড়িলেন। আন্দু শুনিল, তাঁহার নাম রামশঙ্কর চৌবে, তিনি বঙ্গদেশের কোন চতুষ্পাঠীতে এতদিন সংস্কৃতাধ্যাপকের কার্য্য করিয়া এখন অবসর লইয়া বাটীতে রহিয়াছেন, সেকেন্দ্রাবাদে তাঁহার নিবাস, সম্প্রতি দোলযাত্রা উপলক্ষে পুরীতে গিয়াছিলেন, এখন পুরী হইতে ফিরিতেছেন, পণ্ডিতজীর সংসারে কেহই নাই, একটিমাত্র দৌহিত্র আছে, সেও কলিকাতায় পিতৃব্যের নিকট থাকিয়া লেখাপড়া করিতেছে। পণ্ডিত নিজের কাহিনী সব কহিয়া স্মিত হাসিতে উপসংহার শেষ করিলেন, বলিলেন, “সংসারের মধ্যে আমায় তিনি কেমন করে রেখেছেন জান?—শিকলকাটা পাখীর মত, কিন্তু তবু আমি দাঁড় কামড়ে বসে আছি। কেন জান? মায়ায় নয় ভাই, মনস্থির করবার জন্যে।”

ওদিকে গণক-ঠাকুর, অবিশ্বাসী অধার্ম্মিকদিগের নিকট জ্যোতিষশাস্ত্রের রহস্যোদ্ঘাটনে কিরূপ কঠিন নিষেধ আছে, তাহাই অস্পষ্ট ইঙ্গিতে তীব্রস্বরে সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব মর্য্যাদা কিন্তু আর ফিরিল না, ভক্তদলে আর ভক্তি-উৎসাহের সাড়া পাওয়া গেল না। তাহারা হাত দেখাইতে চায় হুজুগের খাতিরে, হুজুগ যদি ব্যর্থ হইল, তাহা হইলে তাহার কঙ্কালসার দেহটার উপর তাহাদের কিসের মমতা! যাহাই হউক এ দুর্ভোগ তাহাদের বেশীক্ষণ সহ্য করিতে হইল না, পরবর্ত্তী ষ্টেশনে গণক-ঠাকুর নামিলেন। তিনি অদৃশ্য হইবামাত্র যাত্রীদলে পরম উল্লাসে তাঁহার কুৎসা কীর্ত্তন আরম্ভ করিল। আন্দুকে বিশেষভাবে শুনাইয়া শুনাইয়া তাহারা ভবিষ্যৎবক্তা গণক-ঠাকুর যে লোক-তিনটির হাত দেখিয়াছিলেন তাহাদের ভবিষ্যতে সম্ভাবিত ধন-দৌলত আসবাব-পত্রের ধুয়া ধরিয়া স্পষ্ট ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতেও ছাড়িল না। লঘুচেতা লোকের প্রকৃতিই এই,—যতক্ষণ যেটাকে সত্য বলিয়া জানে, ততক্ষণ সেটা অন্ধভাবে আঁকড়াইয়া থাকে, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সেটা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, সেই মুহূর্ত্তে তাহার উপর নির্ম্মম খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। তাহাদের হাস্য পরিহাসের মাত্রা এত উর্দ্ধে উঠিল, যে, বিরক্ত হইয়া আন্দু তাহাদের ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করিল। এবং একটিমাত্র অনভিজ্ঞের অপরাধে সমস্ত জ্যোতিষশাস্ত্র যে ভ্রান্ত, এ ধারণা তাহাদের ত্যাগ করিতে বিনীতভাবে উপদেশ দিল।

এদিকে অল্পক্ষণের আলাপেই পণ্ডিতজীর সহিত আন্দুর এমনি গাঢ় সৌহৃদ্য জমিল যে, হঠাৎ দেখিলে অনেকেই মনে করিত যে, ইহারা বুঝি বহুদিনের পরিচিত, দুই নিবিড় ঘনিষ্ঠতা-আবদ্ধ আত্মীয়। আন্দুও ভাবিয়া বিস্ময় বোধ করিল, এত সহজে এমন গভীর আলাপ তাহার আর কাহারো সহিত কখনো হয় নাই! অপরিচিত লোকের সহিত সে সহজে মিশিতে ডরাইত। এই ভক্তিভাজন বৃদ্ধটি তাহার শ্রদ্ধার উপর এমনি গভীর এমনি মধুর আধিপত্য অক্লেশে বিস্তার করিয়া বসিলেন, যে, আন্দু তাঁহার সরল

প্রীতিপূর্ণ আচরণের মধ্যে নিজের পিতার কোমল সাদৃশ্য অনুভব করিয়া মুগ্ধ তৃপ্ত হইয়া গেল।

একটা ষ্টেশনে কয়েকজন কাবুলী মোটঘাট লইয়া গাড়ীতে উঠিল। অন্যান্য যাত্রীরা আপত্তি করিয়া গাড়ীতে স্থানাভাব দেখাইয়া তাহাদের অন্য গাড়ীতে যাইতে উপদেশ দিল, কিন্তু তাহারা নিতান্ত অগ্রাহ্যভাবে সকলের মোট পুঁটুলী সরাইয়া স্থান করিয়া লইল। দুইজন তরুণবয়স্ক কাবুলী সেরূপ দক্ষতার অভাবে নিজেদের বিশেষ সুবিধা করিতে না পারিয়া কড়া আওয়াজে পূর্ব্বাগতদের সহিত বিরোধের উপক্রম করিতেই পণ্ডিতজী ব্যস্ত হইয়া নিজের মোটটি বেঞ্চির তলায় রাখিয়া তাহাদের নিজের পাশে জায়গা দিলেন, এবং মহানির্ব্বাণতন্ত্রখানি কোলের উপর লইয়া সরল স্বচ্ছন্দ মুখে তাহাদের সহিত আলাপ করিতে বসিলেন।

আন্দু এই পরম হিন্দুর অসঙ্কোচ উদারতায় বিস্মিত ও অভিভূত হইয়া পড়িল। বৃদ্ধ সার্থক বিদ্যা শিখিয়াছেন, পরের সুখ সুবিধার অপেক্ষা কোন্ সঙ্কীর্ণ শুচিতা শ্রেষ্ঠ! আন্দু যে-বেঞ্চিতে বসিয়াছিল, সে-বেঞ্চিতে সবকটিই হিন্দুস্থানী, কাহার কুর্মি জাতীয় যাত্রী ছিল। আন্দু নিজের মোটটি ইতিপূর্ব্বেই গাড়ীর হুকে টাঙ্গাইয়া পাশের যাত্রীকে স্থান দিয়াছিল। দুইজন বিরাটকায় দুর্গন্ধ-দুষ্ট মলিন-পরিচ্ছদ কাবুলীর মাঝে স্বল্পপরিসর স্থানে এই সদানন্দ বৃদ্ধকে স্বচ্ছন্দে সঙ্কুচিতভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে মনে মনে ক্লিষ্ট হইয়া উঠিল। পাশের যাত্রীকে অনুনয় করিয়া তাহার মোটটি হুকে টাঙ্গাইয়া দিয়া নিজে উঠিয়া তাহার স্থানে পণ্ডিতজীকে বসিতে অনুরোধ করিল। পণ্ডিতজী শান্ত মিষ্ট হাসিতে তাহাকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন "কেন দাদা, আমার তো কিছুই কষ্ট হয়নি, অন্তর ঘৃণিত হলেই বাইরের উপর ঘৃণার প্রকোপ বাড়ে। পরমাত্মার অংশ নিয়ে যখন সমস্ত জগতের অস্তিত্ব বিকাশ, তখন অপবিত্রতা কোথায় বল ত ভাই!"—বলিয়াই অশ্রু-সজল নেত্রে আনন্দ-গদ্গদকণ্ঠে মোহমুদ্গারের শ্লোক আবৃত্তি করিলেন—

"ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুঃ
ব্যর্থং কুপ্যসি ময্যসহিষ্ণুঃ।
সর্ব্বং পশ্যাত্মন্যাত্মানং
সর্ব্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানং।"

পণ্ডিত বলিতে লাগিলেন, "বাবা, বাইরের বিচার, সে শুধু মনের বিকার। বিচার তো মনে! শুচিতার দরকার চিত্তে।—নিন্দুকের চোখে সবই কুৎসিত; পাড় সরুই হোক আর মোটাই হোক, কাপড় হলেই আমি পরবার উপযুক্ত মনে করি; পাড়ের বাহার খোঁজা, নিজের সখের জন্য। মুখে কথা অনেক কওয়া যায়, কিন্তু কথার সঙ্গে যথার্থ মর্ম্মের যোগ থাকলেই সেই কথাই সত্য। ভেদ যত বাড়াবে ততই বাড়বে। তুমি বস।"

আন্দু ভক্তিভরে তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল। কোন কথা না কহিয়া নিজের স্থানে বসিল। পণ্ডিতজী মহানির্ব্বাণতন্ত্রখানা তুলিয়া শান্তমুখে পড়িতে বসিলেন।

সুদীর্ঘ পথ উভয়ে অনেক বাক্যালাপ করিলেন। আন্দু সংক্ষেপে যখন নিজের জীবনী বর্ণন করিয়া দিল্লী যাত্রার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিল, তখন পণ্ডিতজী উৎসাহিত হইয়া বলিলেন "বেশ বেশ! তুমি যুদ্ধে ঢোকবার চেষ্টা করছ, সে ত ভালই। যুবার শরীরে যুবার মত বিক্রমের চর্চ্চাই তো ধর্ম্ম। হাইদ্রাবাদে নিজামের অধীনে আমার এক আত্মীয় আছেন, তিনিও আগে গবর্ণমেণ্টের কাজ করতেন, তিনি সুবিধা করে দিতে পারেন। তোমার যখন তেমন অভিভাবক কেউ নাই, তখন যদি বল তো আমি তাঁকে দিয়ে চেষ্টা করতে পারি।"

পণ্ডিতজীর সহৃদয়তায় আন্দু প্রফুল্লচিত্তে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল এবং অনিশ্চিত সফলতার পরিবর্ত্তে নিশ্চিত চেষ্টাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিয়া, দিল্লী গমনের সঙ্কল্প ছাড়িয়া সেকেন্দ্রাবাদ গমনের সঙ্কল্প স্থির করিল। মেমসাহেবদের আগ্রহ-স্মৃতি, নবোদ্যমের নীচে কোথায় চাপা পড়িয়া গেল, সে আর তাহার সন্ধানই লইল না।

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

"মার্সেইয়েজ"

স্বরলিপি

("মার্সেইয়েজ"-এর মূল-সুর-অনুসারে)

II I I I I I । I রা-I রা । পা-I পা-I । ধা-I ধা ধা I র্রা-I-I-না । পা-পপা না-নপা ।
আ য়্ রে আ য়্ দে ০ শে ০ র, স ন্তা ০ ০ ন্ গৌ ০ র বে ০ র্

। গা-I র্সর্া-I । -I-I ধা-ক্ষা । পা-I-I-I । I I পা ধা । না-I-I-I । না-I র্সা-না ।
দি ন্, এ ০ ০ ০ সে ০ ছে ০ ০ ০ অ ত্যা চা ০ ০ র্ ঐ ০ স্বা ধ্

। না ধা ধা-I । I I ধা-না । র্সা-I র্সা-I । র্সা-I র্রা র্সা I না-I-I-I । I I র্রা-I ।
গ ০ গ নে ০ র ০ ক্র ০ ধ্ব ০ জা ০ তু লে ছে ০ ০ ০ র ০

। র্রা-I না পা র্রা-I না I I রা-I-I-I । I রা রা ক্ষা । ধা-I-I-I । ধর্সা-I ধা ক্ষা I
ক্র ০ ধ্ব ০ জা ০ তু লে ছে ০ ০ ০ শু নি ছ না ০ ০ ০ ক্ষে ০ ত্র, মা

। পা-I-I-I । মা-I-I-I । গা-I পা-I । পা-I ক্ষা পা । ধা I-I-I । I-I I ধধা ।
ঝে ০ ০ ০ ভী ০ ০ ষ ণ্ সৈ ০ ন্যে ০ র, হুং কা ০ ০ র্ ওরা

। ণণা-I-I-I । ধা ণা র্সা ণা ধা-I-I-I । I I ণা ধা । পা-I-I-I । পা ণা-ধা পা ।
আসে ০ ০ বু কে র, প বে ০ ০ ক রি তে ০ ০ ০ স্ত্রী পু ০ ত্র

। পা ক্ষা-I I । I I I র্রর্া । র্রর্া-I-I-I । -I I ণণা পা I -ধা-I-I-I । I I I র্রর্া ।
সং হা ০ র্ ধর অস্ত্র ০ ০ ০ ০ পৌর জ ০ ০ ন্ কর

। র্রর্া-I-I-I । I I ণা পা । রা-I-I-I । I I রা I । পা-I-I-I । -I-I পা-I ।
ব্যূহ ০ ০ ০ ০ ০ সং গ ঠ ০ ০ ন্ চ ০ লো ০ ০ ০ ০ ০ চ ০

। না-I-I-I । না-I না-I । র্সা-I-I-I । র্রা-I র্গা I । ধা-I-I-I । -I-I-I র্গা ।
লো ০ ০ ০ মো ০ দে র্ ক্ষে ০ ০ ০ ত্রে ০ শ ০ ত্রু ০ ০ ০ ০ ০ ০ র

। র্রর্া-I-I-I । -I না র্সা ধা I পা-I I-I । -I-I রা-I । পা-I-I-I । -I-I পা-I । না-I-I-I ।
ক্ত ০ ০ ০ ০ গোক্, সি ঞ্চ ০ ০ ০ ০ ন্, চ ০ লো ০ ০ ০ ০ ০ চ ০ লো ০ ০ ০

। না-I না I । র্সা-I I-I । র্রা-I র্গ-I । ধা-I-I-I । -I-I-I র্গা । র্রর্া-I-I-I ।
মো ০ দে র্ ক্ষে ০ ০ ০ ত্রে ০ শ ০ ত্রু ০ ০ ০ ০ ০ ০ র ক্ত ০

। -I-না র্সা ধা I পা-I-I-I । -I I-I-I । I I I I । I I I I IIII
০ ০ গোক্, সি ঞ্চ ০ ০ ন্ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

ফরাসী রাষ্ট্র-সঙ্গীত *

"লা-মার্সেইয়েজের"

বঙ্গানুবাদ

ও

স্বরলিপি।

[যে মার্সেইয়েজ গান ফরাসী জাতিকে মাতাইয়া তুলে, যাহা গাহিয়া ও বাজাইয়া ফরাসী ও ইংরেজ সৈন্য পরিপূর্ণ উৎসাহে তাহাদের উভয়ের শত্রু জার্ম্মানদের সহিত যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিতেছে, যাহা ভারতের পাঠান সৈন্যেরা বাজাইয়া, ফরাসী জাতির সহিত সমপ্রাণতা দেখাইয়া, তাহাদিগকে উৎফুল্ল ও উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল বলিয়া সম্প্রতি রয়টার সংবাদ দিয়াছেন, সেই মার্সেইয়েজ গানের মূল-সুরের অনুগত বঙ্গানুবাদ ও তাহার স্বরলিপি, এই য়ুরোপীয় মহাসমরের দিনে প্রবাসী-পাঠকদিগের কতকটা কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিতে পারিবে মনে করি।]

বঙ্গানুবাদ

আয় রে আয় দেশের সন্তান
গৌরবের দিন এসেছে;
অত্যাচার ঐ দ্যাখ্—গগনে
রক্ত-ধ্বজা তুলেছে।
শুনিছ না ক্ষেত্র-মাঝে
ভীষণ সৈন্যের হুঙ্কার?
ওরা আসে বুকের পরে
করিতে স্ত্রীপুত্র সংহার।
ধর অস্ত্র পৌরজন
কর ব্যূহ সংগঠন;
চলো—চলো—মোদের ক্ষেত্রে
শত্রু-রক্ত হোক্ সিঞ্চন॥

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* Allons, enfants de la patrie | Le jour de gloire est arrivé | Contre nous de la tyrannie | L'etendard sanglant est levé | Entendez vous dans ces campagnes | Mugir ces feroces soldats | Ils viennent jusque dans vos bras | Egorger vos fils vos compagnes | Aux-armes citoyens | Formez vos bataillons | Marchons, marchons | Qu'un sang impur abreuve nos sillons.

বাংলায় উহার উচ্চারণ এইরূপ হইবে—আলোঁজ্-আঁফাঁ। দ্য লা পাত্রি। ল্য জুর দ্য গ্লোআর এৎ-আরিভে। কন্ত্র্ নু দ্য লা তিরানী। লেতাঁদার্ সাঁগ্লাঁৎ-এ ল্ভে। আঁতাঁদে ভু দাঁ সে কাঁপাঞ্। ম্যিজির্ সে ফেরোস্ সল্দা। ইল্ ভিয়েন্ জিস্ক্ দাঁ ভো ব্রা।। এগর্জে ভো॥ফিস্, ভো কঁপাঞ্। ওজ্-আর্ম্ সিতোয়াইয়াঁ, ফর্মে॥ভো বাতাইয়োঁ।!॥ মার্শঁ, মার্শঁ! ক্যাঁ সাঁক্-আঁপ্যির আব্রিভ্ নো সিয়োঁ।

সার্ভিয়ার কথা

সার্ভিয়া য়ুরোপের একটি ছোট দেশ। উহার নাম সম্প্রতি সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল অষ্ট্রিয়া ও সার্ভিয়ার মধ্যে, ক্রমশঃ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। যুদ্ধের প্রারম্ভে কিছুকাল ধরিয়া সার্ভিয়া অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যথেষ্ট বীরত্বের সহিত লড়িয়াছিল।

সার্ভিয়ার স্ত্রীলোক

সার্ভিয়া তুরস্কের অধীনে ছিল। ১৭৭৮ সালের স্তান্‌ ষ্টিফানোর সন্ধি অনুসারে সার্ভিয়া স্বাধীনতালাভ করে। তুরস্কের কঠোর শাসনের ছাপ সার্ভিয়াবাসীর মন হইতে এখনো সম্পূর্ণ মুছিয়া যায় নাই। সে-শাসনের প্রভাব বিশেষ করিয়া পুরানো সার্ভিয়ার কৃষকদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

সার্ভিয়েরা সদয়, অতিথিবৎসল ও স্বদেশপ্রেমিক; তবে সকলে সরল অকপটচিত্ত নয়। সার্ভিয়ার এক শ্রেণীর লোক বেজায় ভীরু। তাহাদের কথাবার্ত্তা সুদীর্ঘ বিলাপকাহিনীর মত শুনায়, সর্ব্বদাই তাহারা নিজ নিজ দুরদৃষ্টের জন্য আক্ষেপ করিয়া থাকে। তাহারা যে অত্যাচারে ক্লিষ্ট সে কথা হতাশভাবে উল্লেখ করে; কিন্তু বিস্তারিত বিবরণ কেহ শুনিতে চাহিলেই আর মুখে কথা থাকে না, একেবারে চুপ। কিছুতেই যেন তাহারা সুস্থির হইতে পারে না। গোপনীয় কিছু না হইলেও তারা কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ফিশফিশ করিয়া কথা কয়—কিছু বলিবার আগে একবার চারিদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া লয়। রাষ্ট্র সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করিবার সময় পেঁচানো ভাষা ব্যবহার করে, ভয় পাছে অন্তরাল হইতে কোনো গুপ্তচর কিছু শুনিয়া ফ্যালে।

সার্ভিয়ার কৃষকরমণী।

সার্ভিয়ার পুরাতন পুরুষবেশ।

সার্ভিয়ার সেকেলে সহুরে মহিলা।

অন্য এক শ্রেণীর সার্ভিয় আছে তারা এমন নয়। নিজ নিজ মতামত সরলভাবেই ব্যক্ত করে। কাফি-পানের আড্ডা, গ্রাম্য সরাইখানা, যেখানে-সেখানে তারা চীৎকার করিয়া তর্ক বা আলোচনা করিতে কুণ্ঠিত নয়। সকল নিমন্ত্রণ ও বৈকালিক সভাতেই উহারা প্রচুর বক্তৃতা করে।

নগরবাসীদের তুলনায় পল্লীবাসীরা খুব চাপা প্রকৃতির। তারা শিষ্ট কথায় লোককে তুষ্ট করিতে মজবুত, কিন্তু কখনো মনের কথা খুলিয়া বলে না।

সার্ভিয়াতে একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রচলন যথেষ্ট ছিল,

সার্ভিয়ার আধুনিক স্ত্রীবেশ।

সার্ভিয়ার আধুনিক পুরুষবেশ।

ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। এরূপ এক-একটি পরিবারে ৮০ হইতে ১০০ জন লোক পর্য্যন্ত বাস করিত। এই বৃহৎ পরিবারের কর্ত্তা কিন্তু একজন, তিনি যথেচ্ছাচারে সকলকে শাসন করিতেন। সেই সর্ব্বময় কর্ত্তার অনুমতি বিনা কেহ কেনাবেচা শস্যবপন বা কর্ত্তন ও বিবাহাদি করিতে পারিত না। সার্ভিয়ার একান্নবর্ত্তী পরিবারকে 'জাডরুগা' বলে—একান্নবর্ত্তী পরিবারের অসুবিধা যেমন তেমনি সুবিধাও 'জাডরুগা'তে বিদ্যমান, যেমন বৃদ্ধ অক্ষম ও অসহায়দের অন্নসংস্থান ও প্রতিপালন। মোটামুটি আরামে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সকল জিনিসই সার্ভিয়াতে প্রচুর পরিমাণে মেলে, অভাব কেবল টাকার। তবে, তাহাতে বিশেষ আসে যায় না, কারণ প্রায় সব-কিছুই তারা নিজেরাই তৈরি করিয়া লয়।

দেশে যখন রাস্তা তৈরি হয় তখন কৃষকদিগকে হয় কয়েক মুদ্রা চাঁদা দিতে হয়, নয় বিনিময়ে দুই তিন দিন বেগার খাটিয়া দিতে হয়। সাধারণতঃ শেষোক্ত উপায়ই অবলম্বন করে। কৃষকেরা সাদা-সিধা ধরণের, কোনো আড়ম্বরের ধার ধারে না। ধনী কৃষকেরাও সাধারণ কৃষকের ন্যায় ঘরে-তৈরি মামুলি পোশাক পরে, আহারও করে তাদেরই মত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সার্ভিয়ার লোকেরা খুব অতিথি-বৎসল। সকলেই বিদেশীকে সাদর অভ্যর্থনা করে। তাহাদিগকে ভালো খাবার খাইতে দ্যায়। অভ্যাগত আসিলে বিশেষ রকম ভোজের আয়োজন হয় এবং অভ্যাগতের কল্যাণে বাড়ীর লোকেরও সুখাদ্য জোটে বলিয়া সার্ভিয়েরা বলে—অভ্যাগতকে আদর করিয়া অভ্যর্থনা করা উচিত। ভোজের বিবিধ আহার্য্যের মধ্যে আগুনে-ঝলসানো মেষশাবক বা শূকরশাবকই প্রধান।

সার্ভিয়ায় নানারকম পোশাকের প্রচলন আছে। সার্ভিয়েরা নৃত্যগীতের বড় পক্ষপাতী। কখনো কখনো সারা সন্ধ্যাবেলাটা গান গাহিয়া কাটাইয়া দ্যায়। গানের

সার্ভিয়ার নববিবাহিত দম্পতি।

সুর সাধারণতঃ বড়ই করুণ ও অলস—যেন ঘুমে ভরা। গানগুলি প্রায়শঃই প্রাচীন কালের ঘটনাবিশেষ অবলম্বনে রচিত। সার্ভিয়ের নিকট ইতিহাস বড় প্রিয়, তাই তারা রাষ্ট্রনীতির আলোচনা অপেক্ষা ই'তিহাসের আলোচনাই বেশী করে।

সার্ভিয়ায় নানান্ অদ্ভুত রকমের কুসংস্কারের প্রচলন দেখা যায়। নূতন বাড়ীর ভিত গাঁথিবার সময় মানুষের ছায়া ঐ ভিতের মধ্যে চাপা দেওয়া প্রয়োজন, এরূপ একটি বিশ্বাস প্রচলিত আছে। রাজ-মিস্ত্রীরা নানা ছলে কোনো লোককে ভুলাইয়া রোদের সময় সেই ভিতের পাশে লইয়া যায় এবং যেই ভিতের মধ্যে তার ছায়া পড়ে অমনি ছায়ার উপর ভিত গাঁথিয়া ফ্যালে। সার্ভিয়েরা একটি ছায়া-ধরা ব্যাপারের উল্লেখ করে—যে-ব্যক্তির ছায়া ধরা পড়িয়াছিল সে রোদে চলিলেও তার আর ছায়া পড়িত না! লোকটি অবিলম্বে মারা পড়িল এবং তারপর অবশ্য ভূত হইয়া সেইখানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ভ্যাম্পায়ার বা কাল্পনিক রক্তপায়ী জীবের অস্তিত্বে বিশ্বাস প্রায় সকলেই করে। এই জীব মানুষের আকার ধারণ করে, দেখিতে অতি সুন্দর। কি করিয়া শীকারের রক্ত পান করিবে এই সুযোগই সে সর্ব্বদা খুঁজিয়া ফেরে। গ্রামের মধ্যে এক সুদর্শন যুবক আসিয়া এক রূপসী যুবতীকে বিবাহ করিল এবং তারপর একদিন সুবিধামত তাহার রক্ত পান করিয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া দিল, এমন গল্প প্রায়ই শোনা যায়। রসুনের তাগা পরিয়া থাকিলে নাকি ভ্যাম্পায়ারের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

সার্ভিয়ের ধর্ম্মভাব গভীর নয়; গির্জ্জায় যখন উপাসনা হয় তখন বাহিরে গির্জ্জার উদ্যানে দাঁড়াইয়া থাকিলেই কর্ত্তব্য শেষ হইল বলিয়া তাহারা মনে করে। তাহারা খুব নিয়মিত উপবাস করে, কিন্তু তাহাও সম্ভবত কুসংস্কার ও ভয়ের বশবর্ত্তী হইয়া, পাছে শাস্ত্র-নিয়ম লঙ্ঘন করিলে কোন দৈব বিপদ ঘটে।

ধনীর অর্থ কাড়িয়া লইয়া দরিদ্রের দুঃখমোচন করে, রবিন হুডের মত এমন অনেক দস্যুর কাহিনী শোনা যায়। সার্ভিয়েরা যে-ভাবে দস্যু সম্বন্ধে আলোচনা করে ও মতামত প্রকাশ করে তাহা শুনিয়া মনে হয় আইন-কানুন ও শান্তি-রক্ষার জন্য তাহাদের বিশেষ মাথাব্যথা নাই।

সার্ভিয়ার কর্ত্তৃপক্ষেরা দস্যুদিগকে কঠোরভাবে দমন করে। তাহাদিগকে শীকারের মত তাড়া করিয়া ফেরে। ধরিতে পারিলে বড়ই উল্লসিত হয়। ভারি ভারি লোহার শিকল পরাইয়া তাহাদিগকে ভূগর্ভস্থ কুঠরিতে বন্ধ করিয়া রাখে। দোষ স্বীকার করাইবার জন্য কখনো কখনো কয়েকদিন ধরিয়া তাহাদিগকে জল পর্য্যন্ত পান করিতে দ্যায় না।

১৯০৩ সালের রাষ্ট্রবিপ্লবের পর হইতে সার্ভিয়ার অধিবাসীবৃন্দ ও সৈন্যদল ক্রমশঃ রাজা পিটারের অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পঞ্চশস্য

প্রাচীন হিন্দুদিগের নীলনদীর উৎপত্তিস্থান আবিষ্কার—

আজ-কাল নানাভাবে হিন্দুজাতির অতীত গৌরবকাহিনীর আলোচনা হইয়া থাকে। দেশী ও বিদেশী বহুসংখ্যক পণ্ডিত নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে হিন্দুদিগের সাহিত্য, দর্শন, অঙ্কশাস্ত্র, শিল্পকলা, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে নানারূপ গবেষণা করিয়া থাকেন। কিন্তু হিন্দুর পুরাতন ভূগোলশাস্ত্র সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত কেহ বড় একটা কোনও আলোচনা করিয়াছেন শুনা যায় না। এই বিষয়টির আলোচনার নিমিত্ত একশত বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে একবার মাত্র চেষ্টা হইয়াছিল। সেই চেষ্টার প্রবর্ত্তক কে এবং তাহা কিরূপ ফল প্রসব করিয়াছিল সেই সম্বন্ধে ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জয়সওাল এম্‌এ মহাশয় 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহারই সারসংগ্রহ করিয়া দিলাম।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফ্রান্সিস উইলফোর্ড নামক ভারতীয় সৈনিক বিভাগের একজন ইংরেজ কর্ম্মচারী হিন্দুদিগের পুরাণগুলি যত্নসহকারে পাঠ করিয়া সেই সম্বন্ধে কতকগুলি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে একটি প্রবন্ধে "হিন্দুর প্রাচীন গ্রন্থরাজি হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া ইথিওপিয়ার কালী বা নীলনদীর সন্নিকটস্থ ইজিপ্ট ও অন্যান্য স্থানের বিবরণ" লিখিয়াছিলেন। প্রবন্ধগুলি ১৭৯১ খৃঃ "এশিয়াটিক রিসার্চে" (Asiatic Researches) প্রথম মুদ্রিত হয়। পরে ১৭৯৯ খৃঃ লণ্ডনে উহার পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রণ হয়।

উইলফোর্ড যখন এদেশে ছিলেন হিন্দুদিগের মধ্যে তখনও পুরাতন ভূগোল সম্বন্ধে নানাকথা প্রচলিত ছিল। সেই-সকল কথা তিনি কাশী ও অন্যান্য স্থানে যাইয়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং এইরূপ কথা সংগ্রহের

নীল নদীর উৎপত্তিস্থানের হিন্দু মানচিত্র।
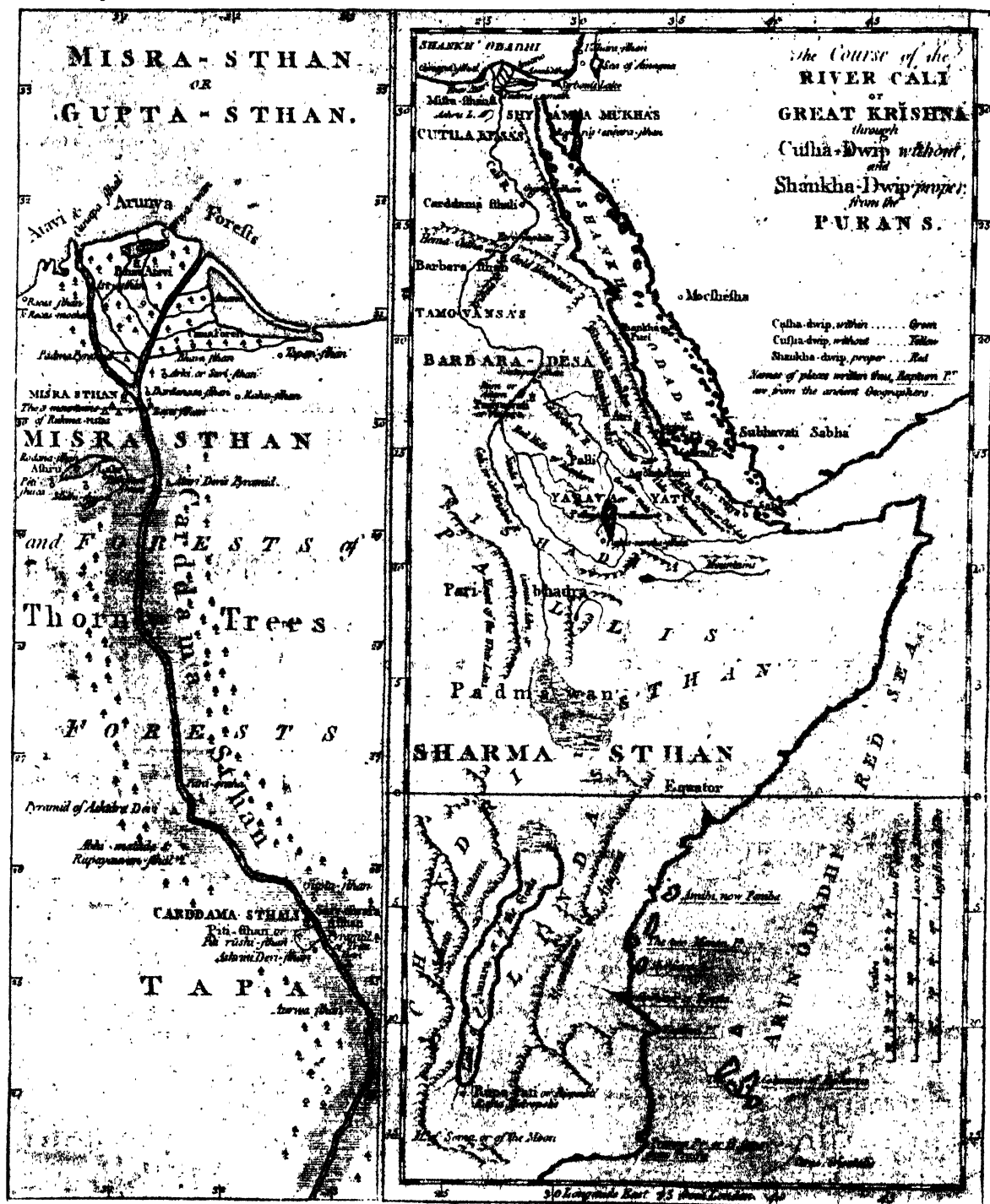
দ্বারা তাঁহার প্রাচীন ভূগোল আলোচনার অনেকটা সুবিধা হইয়াছিল। উদাহরণ-স্বরূপ তাঁহার প্রবন্ধ হইতে ভূগোল সম্বন্ধে তৎকাল-প্রচলিত দুই-একটি কথা উদ্ধৃত হইল। উইলফোর্ড লিখিতেছেন—

"আমি নিশ্চিতরূপে জানিয়াছি যে আজও হিন্দুদিগের মধ্যে কেহ কেহ কুশদ্বীপমধ্যে অবস্থিত দুইটি জ্বালামুখী দেখিতে গিয়া থাকেন। প্রথম জ্বালামুখী টাইগ্রীস নদীর নিকট এবং দ্বিতীয়টি বাকুর নিকট অবস্থিত; তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম অনায়াস'; ষ্ট্রাবো এই দেবীর নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। শুনা যায় কোনও যোগী একদল তীর্থযাত্রীসহ মস্কোপর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন।" "অনেক ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন যে পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্যদেশের মধ্যে লোকের যথেষ্ট গতিবিধি ছিল।"

হিন্দু ভৌগোলিকের মতে পৃথিবীর সুমেরু ও কুমেরু নামক দুই প্রধান বিভাগ। সুমেরু বর্ত্তমান সমরখণ্ড। ইহা আবার নানা দ্বীপ ও উপদ্বীপে বিভক্ত। পুরাতন ভূগোলে দেশের বিবরণের মধ্যে নদী হ্রদ পর্ব্বতাদির নাম এবং জল বায়ু ও ফল ফুল সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত কথা লিখিত আছে। এই-সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া উইলফোর্ড বলেন নানাপ্রকার প্রমাণ ও পুরাণোক্ত বিবরণের সাহায্যে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে "কুশদ্বীপ" নীলনদীর মোহানা এবং ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বসীমা হইতে ভারতবর্ষের প্রান্তস্থিত সিরহিন্দ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আবার হিন্দুরা যে-স্থানকে কুশদ্বীপের প্রান্তভাগ বলিয়া অভিহিত করিতেন সেই স্থানের বর্ণনা পাঠ করিয়া উইলফোর্ড বর্ত্তমান আবিসিনিয়া ও ইথিওপিয়াই সেই স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তৎপরে পুরাণ হইতে নীলনদীর নিম্নোক্তপ্রকার বর্ণনা সংগৃহীত হইয়াছে।—পবিত্রসলিলা কালী বা কৃষ্ণানদী (অথবা নীলা) অমর হ্রদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই অমর হ্রদ অজগর ও শীতান্ত পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী শর্ম্মস্থান নামক দেশে অবস্থিত। অজগর ও শীতান্ত সোমগিরি নামক পর্ব্বতের অংশ। সোমগিরির চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানকে চন্দ্রস্থান (আধুনিক Moon-land) বলে। কৃষ্ণানদী বর্ব্বরদেশের মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়া তপসারণ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং তৎপরে কুশদ্বীপস্থ মিশ্রদেশের মধ্য দিয়া শঙ্খ-অব্ধি বা শঙ্খসাগরে পতিত হইতেছে।"

এক্ষণে পুরাণোক্ত এই বর্ণনা যে প্রকৃত নীলনদীরই তাহা প্রমাণের সাহায্যে দেখান যাইতেছে।—

১। কালী বা কৃষ্ণা এবং নীলনদী একই; কারণ শৈবরত্নাকর নামক গ্রন্থের একটি গল্পে বর্ব্বরদেশ মিশ্রদেশ ও অর্ব্বস্থান (আরব) প্রভৃতির সহিত নীলা নদীর নামোল্লেখ আছে। কালী বা কৃষ্ণা বর্ব্বরদেশ ও মিশ্রদেশ দিয়া প্রবাহিতা। সুতরাং কৃষ্ণা বা নীলা একই নদী।

২। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে "মিশ্র" ইজিপ্টেরই বহু পুরাতন নাম। মিশ্রদেশে প্রস্তুত মিষ্টান্নের নাম মিশ্রী বা মিছরী; এবং মিশ্র দেশের আধুনিক নাম মিশর। ইজিপ্টদেশের লেখমালা হইতে জানিতে পারা যায় যে ঐ দেশেরই এক সম্প্রদায় লোক বর্ব্বর নামে অভিহিত হইত। সেই দেশকে এখনো বর্ব্বর বলে। "কুশ" আবিসিনিয়ার প্রাচীন নাম। সুতরাং বর্ত্তমান ভূগোলের ইজিপ্ট দিয়া প্রবাহিতা নীলনদী এবং পুরাতন ভূগোলের মিশ্র ও বর্ব্বরদেশ দিয়া প্রবাহিতা কৃষ্ণা বা নীলা একই নদী। ভাষাতত্ত্বের প্রমাণের দ্বারা উইলফোর্ডের কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়।

৩। পুরাণ ঐ-সকল দেশের লোককে "কুটিলকেশ" "শ্যামমুখ" বর্ব্বর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে এইরূপ আকৃতির লোকই এখনও ঐ দেশে বাস করে। আবিসিনিয়ার লোকেরা পরবর্ত্তী কালে হাবসী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল।

১৮৬২ খৃঃ স্পিক নীলনদের উৎপত্তিস্থান পুনরাবিষ্কার করেন। স্পিকের আবিষ্কারের বিবরণ হইতেই আমরা উইলফোর্ডের কথার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ প্রাপ্ত হই। শুদ্ধ তাহাই নহে, কেবলমাত্র হিন্দুরাই যে নীলনদীর উৎপত্তিস্থান আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন স্পিকের কথায় তাহাও স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়।

৪। উৎপত্তিস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া শঙ্খসাগরসঙ্গম (Mediterranean Sea) পর্য্যন্ত সমস্ত দেশের নীলনদীর পুরাণে যেরূপ বর্ণনা আছে উইলফোর্ড নিজপ্রবন্ধে তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং সেই বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়া তিনি নীলনদীর ও তন্নিকটস্থ দেশের একখানি মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। নদীর এই বিস্তৃত বিবরণ ও মানচিত্রখানি ১৮৬০ খৃঃ স্পিকের নিজের নিকট ছিল। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন—

"নীলনদী ও সোমগিরির (Mountains of the Moon) মানচিত্র-সম্বলিত একটি প্রবন্ধ আমি কর্ণেল রিগবির নিকট প্রাপ্ত হই। হিন্দুদিগের পুরাণ হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া লেফ্‌টেন্যাণ্ট উইলফোর্ড এই প্রবন্ধটি রচনা করিয়াছিলেন। হিন্দুরাই নীলনদীর উৎপত্তিস্থানকে অমর-নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। ভিক্‌টোরিয়া নিয়াঞ্জা নামক উত্তরপূর্ব্বদিকস্থ দেশ আজও অমর নামেই অভিহিত হয়।"

উইলফোর্ডের বিবরণ অনুসারে স্পিক সোমগিরির (আধুনিক ইংরেজী নাম Mountains of the Moon) নিকট উপস্থিত হইয়া একটি হ্রদের অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করিয়াছিলেন। নীলনদী ঐ হ্রদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। স্পিক ঐ অমর হ্রদ আবিষ্কার করিয়া অমর হইয়াছেন। তিনি ঐ হ্রদের নাম মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নামে ভিক্টোরিয়া নিয়াঞ্জা রাখিয়াছিলেন, এবং ঐ হ্রদ এখন নূতন আবিষ্কারকের প্রদত্ত আধুনিক নামেই সমধিক পরিচিত হইতেছে। ঐ হ্রদের সন্নিকটস্থ স্থান কিন্তু আজিও হিন্দুদের প্রদত্ত অমর নামেই অভিহিত হয়। তথাকার অধিবাসীবৃন্দ আজও সোমগিরিকে দেশীয় ভাষায় সোমগিরি নামেই অভিহিত করিয়া থাকে।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে নীলনদী সম্বন্ধে যে ব্যক্তি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তিনি লিখিয়াছেন যে "নীল" নাম কোথা হইতে আসিল তাহা জানা যায় না। গ্রীক ও লাটিন ভাষা হাতড়াইয়া তিনি কোনো হদিস ঠাহর করিতে পারেন নাই। কিন্তু নীলনদী সম্বন্ধে হিন্দুর পুরাণোক্ত বিবরণ পাঠ করিলে তিনি বহুদিন পূর্ব্বে এই বিষয়ের সু-মীমাংসা করিতে পারিতেন। আরব ভূগোলবেত্তা আস-সাবানী কিন্তু নীলনদীর নাম যে হিন্দু-ভাষা হইতে আগত তাহা বহু পূর্ব্বে ধরিয়া লিখিয়া গিয়াছেন।

* * *

দুর্ভিক্ষের খাদ্য করাতগুঁড়া—

জার্ম্মান জাতি দূরদৃষ্টি ও নূতন-তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য প্রসিদ্ধ। জার্ম্মান প্রিভি-কাউন্সিলার অধ্যাপক হাবেরলাণ্ট খ্যাতনামা উদ্ভিদবিজ্ঞানবিদ্, তিনি উদ্ভিদ-দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত। তিনি বলেন যে গৃহপালিত যে-সব পশুকে শস্য দানা খাওয়াইতে হয়, তাহাদের ঘাস খড় সানির সঙ্গে গাছের বাকলের ঠিক নীচের কাঠের গুঁড়া মিশাইয়া দিলে পশুর পুষ্টির ব্যাঘাত হয় না, অধিকন্তু পশুর দানার শস্যগুলি বাঁচাইয়া মানুষের খোরাকে লাগাইতে পারা যায়। মানুষেও স্বচ্ছন্দে এই "কাঠের আটা" খাইতে পারে। যে-সমস্ত গাছের বৎসর বৎসর পুরাতন পাতা ঝরিয়া পড়ে তাহাদের কাঠে মানুষের পুষ্টিকারক পদার্থ থাকে; বিশেষত শীতকালে সেই-সব গাছের কাঠে চিনি তেল ও শ্বেতসার পদার্থ বেশী রকম জমে; এবং বসন্তকালে সেই-সমস্ত পদার্থ নূতন পাতা ও ফুল গজাইয়া তুলিতে খরচ

হইয়া যায়; কিন্তু তখনো সরু ডাল ও বোঁটায় বোঁটায় ঐ-সমস্ত পদার্থ বেশ পাওয়া যায়। তারপর আবার গ্রীষ্মকালে কাঠের কোষগুলি ঐ-সমস্ত পদার্থে পূর্ণ হইতে থাকে। গাছের ছালের নীচেই যে কাঠ থাকে তাহাতে শতকরা ২০ হইতে ২৬½ ভাগ শ্বেতসার থাকে। শুকনো গাছের কাঠ কিন্তু একেবারে নিঃসত্ব। যে গাছে ধুনো রজন জাতীয় আঠা থাকে তাহাতে খাদ্যের সহিত ট্যানিন প্রভৃতি অহিতকর পদার্থও থাকে। সুতরাং কাষ্ঠ নির্ব্বাচনের সময় সতর্ক হওয়া আবশ্যক। শ্বেতসার শর্করা ও স্নেহপদার্থ গাছের কোষের মধ্যে আবদ্ধ থাকে, সেই-সব কোষের আবরণ কঠিন কাষ্ঠ; সেই কাষ্ঠ মানুষের দেহের হজমী রসে শীঘ্র জীর্ণ হয় না—অজীর্ণ কোষগুলি দেহের পুষ্টিসাধন না করিয়া গোটাই বাহির হইয়া যায়। বরং যে-সমস্ত প্রাণী চর্ব্বিতচর্ব্বণ করে তাহারা উহা সহজে কতকটা জীর্ণ করিতে পারে। কোষগুলির কঠিন আবরণ ভাঙিয়া তাহার মধ্যকার পুষ্টিকর সামগ্রী আত্মসাৎ করিতে হইলে কাঠ খুব মিহি করিয়া গুঁড়া করা দরকার; সাধারণ করাতগুঁড়ায় এই কাজ কতকটা হয়; ভালো করিয়া গুঁড়া করিতে হইলে আরো জোরালো উপায় আবিষ্কার করা দরকার। যদি কোনো গতিকে প্রচুর কাঠের আটা প্রস্তুত করার উপায় করা যায়, তবে গম যবের আটার সঙ্গে মিশাইয়া কাঠের আটা বেশ স্বচ্ছন্দে খাওয়া চলিতে পারে। গাছের ডালের ডগা শুকাইয়া গুঁড়া করিলে তাহাতে পুষ্টিকর পদার্থ আরো বেশী পাওয়া যায়। কিন্তু কাঠের আটায় অকেজো অংশ এত বেশী যে শুধুই উহা খাওয়া চলে না, অন্য খাদ্যের সঙ্গে মিশাইয়া খাইতে হয়। আমাদের এই চির-দুর্ভিক্ষের দেশে আমাদিগকে শীঘ্রই ইহা পরীক্ষা করিতে হইবে হয়ত।

* * *

মহাসমরের সরঞ্জাম—

আজকালকার-যুদ্ধ বিজ্ঞানের কারসাজি ও মস্তিষ্কের বাহাদুরীতে। আমাদের পৌরাণিক যুদ্ধে যেমন সর্পবাণের প্রতিষেধক গরুড়বাণ, তাহার প্রতিষেধক বিষ্ণুচক্র; আবার অগ্নিবাণের প্রতিষেধক বরুণবাণ, ও বরুণবাণের প্রতিষেধক পবনবাণ ইত্যাদি, তেমনি এই যুদ্ধে এক পক্ষ একটা যেই নূতন ফন্দি বাহির করিতেছে অপর পক্ষ অমনি তাহা নিবারণের উপায় সঙ্গে-সঙ্গেই আনিয়া হাজির করিতেছে। ডুবো জাহাজ হইল, তাহা ধ্বংস করিবার জাহাজ পিছু লইল; উড়ো জাহাজ উৎপাত জুড়িল, উড়ন্ত টরপেডো তাড়া করিল; উড়ো জাহাজ রাত্রে চোরা গোপ্তা শেল মারিতে লাগিল, ঊর্দ্ধমুখ তীব্রদৃষ্টি তল্লাসী-আলো মোটর-গাড়ীতে চড়িয়া সহর পাহারা দিতেছে বলিয়া সম্প্রতি খবর পাওয়া গেল; অন্ধকারে শত্রুর থানা আক্রমণ করিয়া অতর্কিতে শত্রুবধ হইতেছিল, অমনি উজ্জ্বল উল্কাবর্ষী কামান সৃষ্টি করিয়া অন্ধকার ঘুচাইয়া গুপ্ত আক্রমণ ব্যর্থ করা হইতে লাগিল; কাঁটা-দেওয়া তারের বেড়ায় ঘিরিয়া সেই তারের মধ্যে দিয়া তাড়িত-প্রবাহ চালাইয়া শত্রুর গতি-রোধ করা হইতেছিল, কামান হইতে ঘুরঘুরে ছুরি ছুড়িয়া তার কাটার ব্যবস্থা হইয়াছে; রাতারাতি ৫।৭ ক্রোশ দূরে শত্রু অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে, ঘাড়ে আসিয়া পড়িল বলিয়া, কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে দূরবীন অন্ধ, শত্রুর সংস্থান স্থির করিতে না পারিলে গোলন্দাজ সৈন্য কিছুই করিতে পারে না, অমনি উপায় হইল খুব উঁচু থাম্বার উপর তল্লাসী আলো চড়াইয়া শত্রুর সংস্থান আবিষ্কার করিয়া আগুনের পর্দ্দা খাটাইয়া তাহার আড়াল হইতে দুড়দাড় করিয়া গোলা-বর্ষণ চলিতে লাগিল, শত্রুর লুকাইয়া আক্রমণের সমস্ত আয়োজন নিমেষে পণ্ড! আজ-কাল বুদ্ধি যার জয় তার! কিন্তু বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের সন্তান-সন্ততি কলকৌশলের যুদ্ধ হইতে মানুষগুলা একেবারে বাদ থাকিলে মন্দ হইত না—কলে কলে যুদ্ধ হইত, সেরা কল যার তার জয় হইত, মানুষগুলা বাঁচিয়া বর্ত্তিয়া থাকিয়া মজা দেখিত তবে না।

* * *

মানুষ ও উদ্ভিদের লম্বা বা বেঁটে হওয়া বংশগত—

আমেরিকার কনেকটিকাট কৃষি-কলেজের অধ্যাপক ব্লাকেসলী পরীক্ষা করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে মানুষ বা উদ্ভিদ লম্বা বা বেঁটে হয় তাহার বংশের গুণে বা দোষে। লম্বা বংশের লোক বা গাছ লম্বা হয়। ঘটনাচক্রে বা অবস্থার ফেরে পড়িয়া ঢ্যাঙা পিতা-মাতার সন্তান বেঁটে হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু বেঁটে জনকজননীর সন্তান ঢ্যাঙা হয় না।

* * *

প্রতিভা ও আবহাওয়ার সম্পর্ক—

আমেরিকার অধ্যাপক জে ম্যাককীন কাটেল 'পপুলার সায়ান্স মান্থলী' নামক কাগজে প্রশ্ন করিয়াছেন মার্কিনের উত্তর-দেশী লোকের ছেলের বৈজ্ঞানিক হওয়ার শতকরা ৫০ রকম সম্ভাবনা যদি থাকে ত দক্ষিণ-দেশীর থাকে এক। যে-সমস্ত উত্তর-দেশী লোক বৈজ্ঞানিক বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন, জন্মমাত্র তাঁহাদিগকে দক্ষিণ-দেশে লইয়া গেলে বা দক্ষিণ-দেশে জন্মিলে তাঁহারা খুব সম্ভব বৈজ্ঞানিক হইতেন না। কেন? কতকটা বংশদোষে, কতকটা অবস্থার ফেরে, কতকটা আশপাশের প্রভাবে, আর অনেকখানি আবহাওয়ার জন্য। মানুষের কর্ম্ম করিবার শক্তি ও নিপুণতা তাহার বংশের ও জন্মলব্ধ বুদ্ধি ও পটুতার পুঁজি মূলধনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। কিন্তু উহার কতটুকু বংশগত, কতটুকু আশপাশের অবস্থাগত, তাহা এখনো ঠিক করিতে পারা যায় নাই। মানুষে মানুষে শক্তি ও নিপুণতার তারতম্যের কারণ খানিকটা স্বাভাবিক প্রকৃতিগত, আর খানিকটা সুযোগ ও সুবিধা-গত। ১৮০৯ সালে ডারউইন যদি চীন দেশে জন্মিতেন, ডারউইন হইতেন না, আমেরিকার ঘরোয়া যুদ্ধ না ঘটিলে লিন্‌কল্‌ন্ লিন্‌কল্‌ন্ হইতেন না; আবার ডারউইন আমেরিকায় ও লিন্‌কল্‌ন্ ইংলণ্ডে জন্মিলে বা জন্মমাত্র রপ্তানি হইলে কোনো জনই যাহা হইয়াছিলেন তাহা হইতে পারিতেন না। ডারউইন স্বাভাবিক নিপুণ কুশল ধনী পরিবারের সন্তান, বিশেষ সুযোগ ও সুবিধার মধ্যে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া ডারউইন হইতে পাইয়াছিলেন; লিন্‌কল্‌নের পিতৃমাতৃবংশ নিপুণতা কুশলতা ধনশালিতার দাবী রাখেন না, অবস্থার ফেরে তাঁহার নিজের সহ-জ গুণপনা ফুটিয়া উঠিবার অবকাশ পাইয়াছিল। ঈগলের ডিমে মুরগীকে দিয়া তা দেওয়াইয়া বরং ঈগলের ছানা জন্মান সম্ভব, কিন্তু মুরগীর ডিমে ঈগলের তা লাগিলে মুরগীর ডিম পচিয়া যাইবে নিশ্চয়। কিন্তু মুরগীর বাসায় যে ঈগল জন্মিবে সে নিরীহ পোষা রকমের ঈগল হইবে। কাফ্রি ও য়ুরোপীয় লোকের বুদ্ধি ও নিপুণতার উত্তরাধিকারে যথেষ্ট প্রভেদ; কিন্তু আবহাওয়া ও অবস্থার ফেরে নিকৃষ্ট পুঁজির লোককে উৎকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট পুঁজির লোককে নিকৃষ্ট হইতে দেখা যায়। দক্ষিণ আফ্রিকায় য়ুরোপীয়রা মাত্র দু-তিন পুরুষ বাস করিতেছে। ঠাণ্ডা দেশের য়ুরোপীয়রা দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়া গরম দেশে বাস করিতেছে বলিয়া এই অল্প দিনেই তাহারা নিকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছে; আর নিরক্ষবৃত্তের বিষুব রেখার নিকটবর্ত্তী দেশের জুলু ও বাসুতোজাতীয় লোকেরা অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডাদেশ দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস করিয়া বুদ্ধিতে নিপুণতায় উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিতেছে, এবং তাহাদের কাছে দক্ষিণ আফ্রিকার য়ুরোপীয় লোকেরা ক্রমশ হটিয়া যাইতেছে।

উক্ত অধ্যাপক নিম্নলিখিত পাঁচ জায়গার দেশগুলিকে সফলতা ও নিপুণতা প্রকাশের উপযোগী মনে করেন—পশ্চিম য়ুরোপ, উত্তর-পূর্ব্ব মার্কিন যুক্তরাজ্য, জাপান, আমেরিকার প্রশান্ত উপকূল, দক্ষিণ-পূর্ব্ব অষ্ট্রেলিয়া ও নিউ-জীলণ্ড। আবহাওয়া-জনিত শক্তির কুশলতা দেশের শীত বা গ্রীষ্মের প্রাধান্যের উপর ততটা নির্ভর করে না, যতটা ঋতু-বৈচিত্র্যের উপর নির্ভর করে। যে দেশের বাতাসে সাইক্লোন বা ঘূর্ণা বাতাসের পরিবর্ত্তন যত বেশী সে দেশ তত উৎকৃষ্ট লোককে জন্ম দ্যায়। প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রগুলি—মেসোপটেমিয়া, ভারতবর্ষ চীন—ষড়ঋতুর বৈচিত্র্যে ও হাওয়ার উদ্দাম ঝড়ের খামখেয়ালিতে পূর্ণ ছিল; সেই অবস্থার পরিবর্ত্তনে দেশের লোকগুলাও অধম অকর্ম্মণ্য বুদ্ধি-শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে।

মানুষকে প্রকৃতি নানা রকমে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। মনুষ্যত্ব সেইখানেই, যে, সে প্রকৃতির ফন্দি ফাঁশাইয়া নানা উপায়ে প্রকৃতির উপর জয়ী হইতে নিরন্তর উদ্দাম চেষ্টা করিতে থাকিবে।

* * *

বহু বা অল্প সন্তান মানেই কু-সন্তান—

ইংলণ্ডের গ্যালটন ইউজেনিক ল্যাবরেটারীর প্রধান অধ্যক্ষ ডাঃ পিয়ার্স ন সুপ্রজনন-বিদ্যার পরীক্ষায় লিপ্ত থাকিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বহু সন্তান হওয়াও খারাপ, অল্প সন্তান হওয়াও খারাপ। সন্তানের সংখ্যা পাঁচের কম ও আটের বেশী হওয়া উচিত নয়। অগ্রজন্মা ও পরজন্মা সন্তানগুলি তেমন সুস্থ ও নিপুণ হয় না; মাঝেরগুলি হয় উৎকৃষ্ট। সুতরাং অনেক রাজবংশে যে জ্যেষ্ঠাধিকার প্রচলিত আছে তাহা রাজ্যের পক্ষে কল্যাণকর নয়। প্রথম ও সপ্তম সন্তান বুদ্ধি ও নিপুণতায় প্রায় সমান হয়; চতুর্থের চেয়ে তৃতীয়, তৃতীয়ের চেয়ে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ। প্রথম সন্তান হইবার সময় জনক জননী নানা বিষয়ে অজ্ঞ থাকে; এজন্য প্রথম সন্তান যত অধিক সংখ্যক মারা পড়ে এমন দ্বিতীয় তৃতীয় সন্তান নহে; চতুর্থ হইতে আবার মৃত্যুর হার বাড়িয়া সপ্তম ও পরবর্ত্তী পর্য্যন্ত চলে। প্রথম ও সব-শেষের দিককার সন্তানদের মধ্যে 'জড়ভরত' ন্যালাক্ষেপা বোকা পাগল বেশী হইতে দেখা যায়। চোর ছ্যাঁচড় বেশী হয় প্রথম ও দ্বিতীয় সন্তান; যক্ষা ক্ষয় রোগও প্রথম ও দ্বিতীয়ের একচেটিয়া; জন্মগত ছানি প্রথম সন্তানই পিতৃপিতামহের নিকট উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে তৃতীয় চতুর্থ সন্তানই বংশ ও জাতি রক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কিন্তু আমাদের দেশে অষ্টম গর্ভের ছেলের বড় আদর। সেটা বোধহয় শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান ছিলেন বলিয়া।

* * *

অম্লজান জীবনরক্ষার জন্য অপরিহার্য্য নহে—

অধ্যাপক ডি ডি মেইন তাঁহার নূতন পরীক্ষার ফলে যে তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা হইতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে অম্লযান আমাদের জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য্য নহে এবং কারবন ডাই-অক্সাইড নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিলেও তাহাতে মানুষের মৃত্যু ঘটে না। তাঁহার মতে শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে আগেকার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত ভ্রমাত্মক। তিনি বলেন—লোমকূপ হইতে বহির্নিঃসৃত ক্লেদই ভয়ানক বিষাক্ত জিনিষ এবং অম্লযানপ্রবাহ হইতে দূরে রক্ষিত লোকের জীবনের পক্ষে তাহা বিশেষরূপে বিপজ্জনক। তাঁহার এই মত সত্য বলিয়া প্রমাণের জন্য তিনি একটি গোবৎসকে কোনোরূপে বাতাস প্রবেশ করিতে না পারে এমন একটি ঘরের ভিতরে এবং অন্য একটি গোবৎসকে একটি খোলা ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। প্রথম জন্তুটিকে অম্লযান হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরে রাখা হইয়াছিল। কয়েক দিন পরে ঘরটি খুলিয়া দেখা গেল যে প্রথম জন্তুটি দ্বিতীয় জন্তুটির মতোই সবল ও সুস্থ ভাবে বাঁচিয়া আছে। তিনি কেবল মাত্র পরস্পরের স্থানের পরিবর্ত্তন করিয়া জন্তু দুটির উপর আবার পরীক্ষা করেন। তাহাতেও দেখা যায় যে দুইটি জন্তুই বিনা অম্লযানে বাঁচিতে পারে এবং নিজেদের ফুসফুস-নিঃসৃত কারবন ডাই-অক্সাইড তাহাদের কোনো অপকার করে না।

* * *

ওয়াটার-প্রুফ দেশালাই-এর কাঠি—

খানিকটা ঈষদুষ্ণ বিগলিত মোমের ভিতর কতকগুলি দেশলাইয়ের কাঠি ডুবাইয়া ধরিলে তাহার উপর মোমের একটা পাতলা আবরণ পড়িয়া যায়। মোম জুড়াইলে এই আবরণগুলি জমাট বাঁধিয়া শক্ত হয়। তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া জলের ভিতর ডুবাইয়া রাখিলেও দেশালাই নষ্ট হয় না। ব্যবহারের সময় প্রথমে একটি ঘা দিয়া মোমের আবরণটি ভাঙ্গিয়া দিতে হয় এবং পরে দ্বিতীয় ঘা দিতেই কাঠিগুলি অতি সহজে জ্বলিয়া উঠে। ভিজে দেশালাই লইয়া আমাদিগকে অনেক সময় বিশেষ বিব্রত হইতে হয়। এই সহজ পদ্ধতিটি জানা থাকিলে মোটেই সে বিপদে আর পড়িতে হয় না।

* * *

চন্দ্রের উদ্ভব—

লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের এই পৃথিবী আর আকাশের ঐ চাঁদ এক দেহে একই সঙ্গে মিশিয়া ছিল। কিন্তু তখনকার ঘূর্ণ্যমান পৃথিবী ঠিক এখনকার পৃথিবীর মতো ছিল না—ইহা অপেক্ষা অধিক ভারি ও তরল ছিল—অধিক কাঁপিত এবং অনেকটা বেশী চঞ্চল হইয়া উঠিত। হঠাৎ একদিন পৃথিবীটা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। তারই এক ভাগ চন্দ্র। প্রথম প্রথম চাঁদ পৃথিবীর গায়ে গায়ে লাগিয়াই ঘুরিত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে দূরে সরিতে সরিতে অবশেষে সে বর্ত্তমানের এই দূরত্বে গিয়া পৌঁছাইয়াছে। বলা বাহুল্য বিচ্ছিন্ন হইবার সময় ভয়ঙ্কর একটা দাহ্য শক্তির উৎপত্তি হইয়াছিল। এবং পৃথিবীর দেহবিচ্ছিন্ন পিণ্ডগুলি সেই সময় অনন্ত আকাশের ভিতর ছড়াইয়া গিয়াছে—কতকগুলি ছোটখাট পিণ্ড নির্গমশীল গ্যাসের বেগে বহুদূর এমন কি পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তির বাহিরেও ছটকাইয়া পড়িয়াছে। আমরা উল্কা আকারে যাহা দেখিতে পাই তাহা সেই-সমস্ত পিণ্ডগুলির দূরদেশ হইতে ধরিত্রী-মাতার বুকে প্রত্যাবর্ত্তন ভিন্ন আর কিছুই নহে।

* * *

বিনা তারে বিদ্যুতের আলো—

ডাক্তার মিলনার নামক জনৈক আমেরিকান একটি নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি এই যন্ত্রের সহায্যে নাকি অনেক মাইল পর্য্যন্ত বিনা তারে বৈদ্যুতিক আলো জ্বালিতে পারিবেন।

* * *

অপরিষ্কার ঘরে পাখার বাতাস—

ক্রমাগত পরীক্ষার দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে পাখা (Ventilator) হইতে যে বাতাস পাওয়া যায় তাহা উপকার অপেক্ষা, বীজাণুপূর্ণ ধূলিকণাকে নাড়াচাড়া দিয়া বেশীর ভাগ অপকারই করিয়া থাকে। ভেন্টিলেটার প্রকৃতিতে দেখা গিয়াছে সাধারণতঃ বাতাসের প্রত্যেক

"রিজেন্সিক থিয়েটারে" পাখা চলিবার পূর্ব্বে ১০,০০০ হইতে ২০,০০০ বীজাণু থাকে; কিন্তু পাখা চলিবার পর হইতে দেখা যায় এক ঘণ্টার মধ্যে এই বীজাণুর সংখ্যা বাড়িয়া ১৭,০০০ হইতে ৪৮,০০০ দাঁড়াইয়াছে এবং দুই ঘণ্টা চলিতে না চলিতেই ২৭,০০০ হইতে ৮৫,০০০ বাড়িয়া উঠিয়াছে। ক্ষয় রোগের প্রতিষেধক তৈয়ার নিমিত্ত বিখ্যাত ল্যাবরেটারীগুলিতে এই পাখা এক ঘণ্টা চলিবার পর বীজাণুর সংখ্যা ৮,০০০ হইতে ৪৫,০০০ বাড়িয়া উঠে এবং দুই ঘণ্টার পরে তাহাদের সংখ্যা ৭৫,০০০ হইতে দেখা যায়। সাধারণ বাস-গৃহগুলিতে পাখা চলিবার পূর্ব্বে বীজাণুর সংখ্যা ৬৫০ থাকে কিন্তু পাখা এক ঘণ্টা চলিবার পর তাহাদের সংখ্যা ২,৫০০ এবং দুই ঘণ্টা পরে ৪,০০০ গিয়া দাঁড়ায় এবং পাখা বন্ধ করিবার দুই ঘণ্টা পরে তাহাদের সংখ্যা আবার ৭০০ নামিয়া পড়ে।

* * *

কোন্ আলো বেশী দূর হইতে দেখা যায়—

লাল আলো সকল আলো অপেক্ষা অধিক দূর হইতে দেখা যায়। এক-বাতি জোরের লাল আলো এক মাইল দূর হইতে, তিন-বাতি জোরের দুই মাইল দূর হইতে, দশ-বাতি জোরের আলো দূরবীক্ষণের সাহায্যে চারি মাইল দূর হইতে এবং তেত্রিশ-বাতি জোরের লাল আলো ৫ মাইল দূর হইতেও চোখে পড়ে। অত্যন্ত পরিষ্কার রাত্রিতে ৩২-বাতি জোরের সাদা আলোও তিন মাইল দূর হইতে দেখা যায়।

* * *

রক্তই চোখের জল—

একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক চোখের জলের সম্বন্ধে কতকগুলি অদ্ভুত তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন মানুষ যখন শোকে অভিভূত হয় তখন মাথার ভিতর রক্তের চাপ কমিয়া যায়। যে পদ্ধতিতে মাথার ভিতর রক্তের চাপ কমিয়া যায় এবং তৎসময়ের জন্য মস্তিষ্ককে অবশ করিয়া চিত্তকে জড়বৎ ও উদাসীন করিয়া ফেলে চোখের জল বিশেষ ভাবে সেই পদ্ধতিকে সাহায্য করিতে পারে। চোখের জল এবং রক্ত একই পদার্থ, কেবল অশ্রু-নিঃসারক গ্রন্থির (Lachrymal gland) ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় বর্ণের পরিবর্ত্তন হইয়া যায় মাত্র। ঔষধ ও মদ প্রভৃতি দ্বারা মানুষের চেতনা যেমন বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া যায়, তেমনি চোখের জলে শোককেও ডুবাইয় দেওয়া যায়। বালক ও স্ত্রীলোকদের স্নায়ুমণ্ডল খুব সুকুমার। সুতরাং মাঝে মাঝে কাঁদা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। ইহাতে তাহাদের মস্তিষ্ক অনেক পরিমাণে ভারমুক্ত হয়।

* * *

ফেনা কেন সাদা হয়—

জল যতই নীল হউক না কেন তাহার ফেনা সেই সাদাই থাকে। ঘন কৃষ্ণ কালির উপরে যে ফেনা পড়ে সে ফেনাটিও দুধের মতো সাদা। আমরা প্রতিফলিত আলোকের সাহায্যে সমস্ত বস্তুই দেখিয়া থাকি। যে বস্তুতে সমস্তগুলি কিরণই প্রতিফলিত হয় সেই বস্তুটিই সাদা, আর যে বস্তুটি সমস্তগুলি কিরণকেই শোষণ করিয়া ফেলে তাহাই কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কালি সবগুলি কিরণই গ্রাস করিয়া ফেলে, কাজেই কালির রং কালো। কিন্তু সেই কালিই যখন আবার ঘাত প্রতিঘাতে ফেনার আকারে ফুলিয়া উঠে তখন তাহার উপরিভাগে আলো পড়িলেই তাহা প্রতিবিম্বিত হয়, সুতরাং ফেনার রং সাদা।

দেশের কথা

ভীষণ বন্যার উৎপাতে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামপ্রদেশের দারুণ দুরবস্থা ঘটিয়াছে। গত বৎসর দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় বর্দ্ধমান জেলায় ও তৎসন্নিহিত স্থলে যেরূপ প্রলয়-সম্ভাবনা হইয়াছিল, এবারের বন্যায় শ্রীহট্ট কাছাড় শিলচর হাইলাকান্দি ত্রিপুরা কুমিল্লা ঢাকা মৈমনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলের তদ্রূপ সর্ব্বনাশ হইয়াছে। এই দুর্দ্দৈবে একদিকে যেমন জনসাধারণের অধিকাংশকে গৃহহীন ও আশ্রয়শূন্য হইতে হইয়াছে, অন্যদিকে গবাদি পশুর মৃত্যুতে ও শস্যনাশে দেশের ভবিষ্যৎ অবস্থাও দারুণ সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মফঃস্বলস্থ পত্রিকাসমূহ তাই সর্ব্বোপরি ঐ-সকল বন্যা-পীড়িত স্থানের অধিবাসীর ব্যথায় আকুল হইয়া তারস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে 'সুরমা' ও 'ঢাকাপ্রকাশ' যে চিত্রের অবতারণা করিয়াছেন তাহা শুধু করুণা-উদ্দীপক নহে, ভবিষ্যতের বিষাদকালিমার রেখায় তিমিরাচ্ছন্ন। 'ঢাকাপ্রকাশে' প্রকাশ—

"ভীষণ বন্যার জলস্রোতে সমগ্র হালিয়াকান্দি জিলা ডুবিয়া গিয়াছে। এ প্রকার ভীষণ বন্যা এদেশে আর কেহ কখন দেখে নাই। বিগত ১৮১৩ সালের বন্যায় যত জল হইয়াছিল এবার তদপেক্ষা ৪ ফুট জল বেশী হইয়াছে। জেলার সকলগুলি রাস্তাঘাটই এক্ষণ জলের নীচে। * * প্রবল বন্যাস্রোতে রেল-লাইনের অনেক স্থান বসিয়া গিয়াছে। সাহেবদিগের বড় বড় বাঙ্গলা-গৃহ হইতে আরম্ভ করিয়া, দীনদুঃখীর পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত সমস্তই আজ জলমগ্ন। অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খড়ের ঘর জলস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। এই বন্যাতে বহু লোকের জীবননাশ ঘটিয়াছে। চাউল ডাইল প্রভৃতি একান্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। গো-মহিষাদি গৃহপালিত পশু যে কত মারা গিয়াছে তাহার সংখ্যা করা সহজ নহে। * * * পাহাড়ের উপর দাঁড়াইলে ভীষণ দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। পর্ব্বতের পাদমূল পর্য্যন্ত কেবলই জলরাশি,—রাস্তা নাই, আবাস-ভূমি নাই, মধ্যে মধ্যে কেবল গাছগুলি মাথা তুলিয়া রহিয়াছে।

আসামের ভীষণ বন্যার জলে কুমিল্লা সদর সব্‌ডিভিসনের কতকাংশ ও সমগ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও নবীনগর সব্‌ডিভিসন ডুবিয়া গিয়াছে।

সুরনগর—ত্রিপুরায় ধান-ক্ষেতগুলির উপর ৪।৫ হাত জল হইয়াছে। আশু ধান্য ও নাগিতা সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে। গবাদি পশুর ঘাস জুটিতেছে না।

শিলচর অঞ্চলে বন্যার উপর আবার ভীষণ বন্যা হইয়াছে। কেবল উচ্চ টিপি ও বড় বড় গাছগুলি মাথা তুলিয়া আছে। শিলচর নগরের অধিবাসীরা জিনিষপত্র ফেলিয়া নগরের উচ্চ অংশে আশ্রয় লইয়াছে। বারাক নদীর জল এত ফুলিয়া উঠিয়াছে যে, ষ্টীমারগুলি ফানেল নামাইয়াও বদরপুরের রেলওয়ে-সেতুর নীচ দিয়া যাইতে পারিতেছে না। রেলপথ ভাঙ্গার দরুণ বদরপুর ও শিলচরের মধ্যে ট্রেন যাতায়াত বন্ধ। করিমগঞ্জ ও শিলচরের মধ্যে তারের সংবাদও আসিতেছে না।

লাবাকের তড়িতবার্ত্তায় প্রকাশ, সমস্ত জেলা জলে ডুবিয়া গিয়াছে। এক স্থান হইতে অন্যস্থানে গমনাগমন দুষ্কর, কারণ সমস্ত পথই জলমগ্ন। সন্নিহিত সমস্ত গ্রাম ও বাজার এবং বাগানের সমস্ত নিম্নভূমি বন্যার জলে প্লাবিত হইয়াছে। গ্রামবাসীগণের দুর্দ্দশার সীমা নাই।

'সুরমা'য় শ্রীহট্ট কাছাড় প্রভৃতি স্থলের দুর্দ্দশার যে চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহারও সারমর্ম এই—

আকস্মিক জলের আগমনে অধিবাসীবৃন্দ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া বাড়ীঘর জিনিষপত্র গো মহিষাদি ফেলিয়া স্ত্রী-পুত্র নিয়া পলাইতে থাকে; পলাইবারও স্থান নাই—অসীম বারিসমুদ্র; অনেক গো মহিষ ঘোড়া ইত্যাদি ভাসিয়া কোথায় গিয়াছে কিনারা নাই। * * সাধারণ লোক অনেকে অনশনে মৃত্যুমুখে চলিয়াছে; কেহ কেহ বা দিনান্তে কেহবা ২।৩ দিনে অর্দ্ধাশনে কষ্টের দীর্ঘ দিনযামিনী অতিক্রান্ত করিতেছে। কচিৎ কাহারও কাহারও ঘরে বা সামান্য কিছু ধান্য আছে, কিন্তু শুকাইবার এবং কুটিবার স্থানের অভাবে উপবাস করিতে বাধ্য হয়। দোকান-পাট, ক্রয়-বিক্রয় একেবারে বন্ধ হওয়ায় লোকের দুর্দ্দশা শতগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। অনেকের ঘরে যা-কিছু ধন ছিল লোকে প্রথম বন্যার পরই ভবিষ্যতে "শুভ অগ্রহায়ণের" আশায় রোপণ করিয়া ফেলিয়াছিল; কিন্তু এখন না আছে ঘরে ধান, না হইবে মাঠে কৃষি।'

'২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ' ইহার উপর ঢাকা ও মৈমনসিংহ অঞ্চলের সংবাদ দিয়া বলিতেছেন—

সোনারগাঁ ও মহেশ্বরদী পরগণার অধিকাংশ গ্রাম জলে ডুবিয়া গিয়াছে।

ময়মনসিংহ জলপ্লাবনে ভাসিয়া গিয়াছে, এ সংবাদ নানা স্থান হইতে পাওয়া যাইতেছে।

এইরূপ জলপ্লাবনে যাহারা গৃহশূন্য বা অন্নহীন হইয়াছে তাহাদের অভাব মোচনার্থ কোন কোন স্থলে সরকার-বাহাদুর, কোন স্থলে বা হৃদয়বান বা শক্তিমন্ত স্থানীয় ভদ্রলোকগণ উদ্যোগী হইয়াছেন। 'সুরমা'য় প্রকাশ—

স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজ গৃহের সুন্দর সুন্দর দালান ও গৃহ এবং নবনির্ম্মিত রেবতীরমণ-মধ্যইংরেজী স্কুলের বাড়ী নিরাশ্রয় নরনারীর আশ্রয়ের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। শত শত গৃহশূন্য অন্নশূন্য পরিবারকে আশ্রয় ও অন্ন এবং অর্থসাহায্যে মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্তি দিয়াছেন এবং অদ্যাপি দিতেছেন, শত শত গো-মহিষাদিও তাঁহার আশ্রয়ে রক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছে। তাঁহারই চেষ্টা ও সাহায্যে শ্রীহট্টের সদাশয় ডেপুটী কমিশনার মহাশয় বন্যা ও দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত লোককে কিঞ্চিৎ অর্থসাহায্য ও অনেককে প্রায় সপ্তাহকালের উপযোগী অন্ন বিতরণ করিয়াছেন।

শিলচরের অবস্থা-বর্ণনপ্রসঙ্গে 'ঢাকাপ্রকাশ'ও বলেন—

নিরাশ্রয় ব্যক্তিগণের জীবনরক্ষার নিমিত্ত ডিপুটী কমিশনর বাহাদুর কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন, ও এক সহস্র মণ চাউল আনাইয়া নিরন্ন ব্যক্তিবর্গের অন্নের সংস্থান করিয়াছেন। স্বেচ্ছা-সেবকগণ প্রাণপণে বিপন্ন ব্যক্তিগণের সেবা করিতেছেন।

কিন্তু এরূপ সাহায্যের চেষ্টা হইলে কি হয়,—আমাদিগকে 'সুরমা'র ভাষায়ই বলিতে হয়—

কিন্তু এই দুর্ভিক্ষ সপ্তাহে শেষ হইবার নহে; দারিদ্র্য-বন্যাপীড়িত লোক সপ্তাহ পরেই আবার পেটের দায়ে এবং ক্ষুধা শিশু পুত্র-কন্যা এবং পত্নীর কাতরক্রন্দনে হাহাকার করিবে।

এদেশে নিত্য-নিরন্নতা যেরূপ মৌরষীপাট্টার বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে তাহাতে সাহায্যভাণ্ডারের বিস্তৃতি ঘটাইয়া উহাকে স্থায়ী অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া না লইতে পারিলে সুফলের আশা করা বিড়ম্বনামাত্র। 'বরিশাল-হিতৈষী'ও আক্ষেপের স্বরে সেই কথাই বলিয়াছেন—

'মানুষ তখনই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পতিত হয়, যখন হতাশ হইয়া আত্মপ্রত্যয় ভুলিয়া যায়। আজ বাঙ্গলা দেশের সমস্ত যেন শিথিল, যেন হিম হইয়া গিয়াছে, নতুবা এই যে গৃহে গৃহে অন্নাভাবে লোক হাহাকারও করিতে না পারিয়া নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে তৎসম্বন্ধে এখনও যাহারা দুবেলা উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিতেছে তাহারা নীরব কেন! সত্য বটে জমিদার হইতে সাধারণ গৃহস্থ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা দেশে আজ কাহারও স্বচ্ছলতা নাই, তথাপি এখনও এমন লোক অনেক আছে যাহারা পুষ্পকরথের স্বপ্ন দেখে। তাহাদের কর্ণে দেশের আর্ত্তনাদ পৌঁছাইতে পারিলে হয়ত কতক লোককে প্রাণে বাঁচাইয়া রাখা যাইত। কিন্তু চীৎকার করিবার মানুষ কৈ? আজ সকলে আপনাকে নিয়া ব্যস্ত—সে ১৩১৩।১৪ সনের কর্ম্ম-প্রবাহ যেন আজ শুষ্ক! কলিকাতার নেতৃবৃন্দ আজ স্বরাজ-প্রাপ্তির আশায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, ক্ষুধিতের পেটে অন্ন জোগাইবার যাহা কিছু চেষ্টা রামকৃষ্ণ মিশন করিতেছে! গত বৎসর দেশে পাট হইয়াছিল, তাহা বিক্রয়ও হইয়াছে; কিন্তু যাহাদের পাট তাহারা টাকা পায় নাই, পাইতেছে আজ কলের মালিকেরা! আর শুকাইয়া মরিতেছে যাহারা পাট জন্মাইয়াছিল তাহারা! ষ্টেট্‌সম্যান ঐ-সমস্ত লাভবান বণিকদিগকে যুদ্ধের জন্য সরঞ্জামাদি সরবরাহ করিতে উদ্বোধিত করিতেছেন এবং সপ্তাহের মধ্যে ৩ লক্ষাধিক টাকা আদায় করিয়াছেন। কিন্তু যাহাদের শ্রমলব্ধ সম্পত্তিতে বণিকের দান করিবার শক্তি জন্মিয়াছে তাহাদের প্রতি করুণা-কণা বিতরণের কথাও ভাবিতে হয়। আমাদের দেশীয় লোকেরা বাণিজ্যে লাভ করিতেছে না বটে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট-পৃষ্ঠপোষিত অনেক লোক আজ বেশ উদর পূর্ত্তি করিতেছেন—তাঁহাদের কর্ণে দেশের ক্রন্দনরোল প্রবেশ করাইতে পারিলে দেশের অন্নের কাঙ্গালগণ হয়ত কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে। আমরা কি আশা করিতে পারি না, মেসার্স এস, পি, সিং প্রভৃতি এই দিকেও দৃষ্টি প্রদান করিবেন! তাঁহারা একদিনে যত টাকা গবর্ণমেণ্ট হইতে পাইতেছেন তাহা দান করিলে দেশের অন্নকষ্টের আংশিক লাঘব হইতে পারে।

দেশের অবস্থা কিরূপ ভয়ানক তাহা প্রত্যক্ষ না করিলে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নহে। আজ ভদ্র গৃহের কুল-বধূ ক্ষুধার জ্বালায় লজ্জাসরম ত্যাগ করিয়া পরের গৃহে অন্নের ভিখারী হইতেছে।

আজ দরিদ্র নিম্নশ্রেণী ভোজনোপবিষ্ট অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান ব্যক্তির আসন আক্রমণ করিতেছে।

জানি আমাদের অক্ষমতা আজ আমাদিগকে আড়ষ্ট করিতেছে, তথাপি একবার সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করিয়া ক্ষুধার্ত্তদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক, আর নীরব থাকিবার উপায় নাই। গ্রামে গ্রামে ক্ষুধিতের তালিকা সংগ্রহ করা আবশ্যক, ধনীর দুয়ারে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া গমন করা আবশ্যক। তাহাতে সকলকে না পারি যাহাকে পারি তাহাকে রক্ষা করিতে পারিব। জানি গবর্ণমেণ্ট আজ যুদ্ধে ব্যাপৃত, তথাপি তাঁহাদের নিকটে আমাদের দুঃখের কথা জানাইতে হইবে।

তাই বলি, আর নীরব নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। একবার জাগ। ধনী—ধন দাও; কর্মী—কর্ম দাও; সকলে কর্ম-ক্ষেত্রে অগ্রসর হও।'

'বরিশালহিতৈষী'র এ বাক্য শক্তি-সঞ্চয়ের উদ্বোধন-মন্ত্র-বিশেষ। আমাদের আনন্দ ও আশার কথা—এ মন্ত্র উচ্চারিত হইবার পূর্ব্বেই কতিপয় ধনী ও কর্ম্মী জাগরিত হইয়া দেশের কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। যাহাদের মুখে আমরা এই-সকল দেশসেবীর সন্ধান পাইয়াছি তাহাদেরই ভাষায় উঁহাদের কর্ম্ম-পরিচয় নিম্নে সঙ্কলন করিতেছি।

১। নোয়াখালীর দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিদের জন্য চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী নিত্যানন্দ কুণ্ডু মহাশয়ের পুত্র ২৭০ মণ রেঙ্গুনী চাউল দান করিয়াছেন।

২। জেলা বোর্ড রামকৃষ্ণ মিসনের হস্তে ২০০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন।—(নোয়াখালী-সম্মিলনী)

বরিশালের রামকৃষ্ণ মিশন সমিতি ত্রিপুরা ও নোয়াখালী দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে ১০০৲ টাকা দিয়াছেন।—(বরিশাল-হিতৈষী)

সন্তোষের রাণী শ্রীমতী দীনমণি চৌধুরাণী মহাশয়া তাঁহার প্রজাদিগের অন্নকষ্ট-নিবারণ-করণে ইতিমধ্যে প্রায় ২০,০০০ বিশ হাজার টাকা অগ্রিম দিয়াছেন।—(পুরুলিয়া-দর্পণ)

কলিকাতার "ইম্পিরিয়াল ওয়ার-রিলিফ-ফণ্ড"-এর কর্তৃপক্ষগণ নোয়াখালী জেলার দুর্ভিক্ষ-নিবারণার্থ দুই হাজার টাকা দান করিয়াছেন। কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর পূর্ব্বে ১০০৲ একশত টাকা পরে আরও ৪০০৲ চারিশত টাকা দান করিয়াছেন।

সুত্রাপুর বাজারের তামা-কাঁসার দোকানদার ভজহরি গত বৃহস্পতিবার ৺জগন্নাথ দেবের পুনর্যাত্রা উপলক্ষে প্রায় ৪০০ চারশত কাঙ্গালীকে পরিতোষসহকারে ভোজন করাইয়াছেন। (ঢাকাগেজেট)

কলিকাতাপ্রবাসী প্রসিদ্ধ ঔষধব্যবসায়ী বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহোদয়ের জন্মস্থান কুমিল্লা জেলায়। তাঁহার মাতৃভূমির বর্ত্তমান ভীষণ দুর্ভিক্ষ-সংবাদ অবগত হইয়া, তিনি ৭ সহস্র টাকা লইয়া কলিকাতা হইতে দেশে গমন করিয়াছেন। তিনি দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট কৃষকদিগকে বিনা সুদে এই ৭ হাজার টাকা ধার দিতে অগ্রসর হইয়াছেন। অধিকন্তু, তিনি তাঁহার কলিকাতাস্থ কর্ম্মচারীদিগকে এরূপও আদেশ প্রদান করিয়া আসিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন তাঁহার আবশ্যক মত টাকা প্রেরণ করেন।

কুমিল্লা জেলার দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যকল্পে ভাগ্যকুলের দানশীল রাজা শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় বাহাদুর, রায় জানকীনাথ রায় বাহাদুর এবং রায় সীতানাথ রায় বাহাদুর এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন।—(২৪ পরগণা-বার্ত্তাবহ)

কুমিল্লা ইউছফ স্কুলের ছাত্রগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দরিদ্রনারায়ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে। তাহারা প্রতি রবিবারে সহরে মুষ্টি-ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া দুর্ভিক্ষ-সাহায্য-ভাণ্ডারে প্রদান করিয়া থাকে।

চাঁদপুর মডেল বালিকা বিদ্যালয়ের অল্পবয়স্ক ছাত্রীগণ আপনারা পুরস্কার গ্রহণ না করিয়া সেই অর্থ অনশনক্লিষ্টের সাহায্যের নিমিত্ত প্রদান করিয়াছে।—(ত্রিপুরা-হিতৈষী)

চট্টগ্রাম মেসেনেল স্কুলের শিক্ষক এবং ছাত্রগণ একত্র হইয়া সেবা-ভাণ্ডার নামে একটি ভাণ্ডার খুলিয়াছেন। এই ভাণ্ডার দরিদ্র ছাত্র যাহারা খরচাভাবে শিক্ষালাভ করিতে অসমর্থ এবং অন্ধ আতুরদের সাহায্য করিবে। সম্প্রতি চাঁদপুরের অন্নক্লিষ্টদের জন্যও কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন। শীঘ্রই আরও কিছু পাঠাইবেন। ইঁহারা দ্বারে দ্বারে যাইয়া মুষ্টি-ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেছেন।—(বীরভূম-বার্ত্তা)

আমাদের শ্রীযুক্ত নীলকৃষ্ণ রায় নোয়াখালী ও কুমিল্লার দুর্ভিক্ষ-পীড়িত স্থানসমূহে বিতরণ করিবার জন্য ২৭০ মণ চাউল দান করিয়াছেন।

সন্দীপের পত্রে জানা যায়, তথায় লোকের অত্যন্ত অন্নাভাব উপস্থিত হইয়াছে। তথাকার মুন্সেফ ও ডেপুটী মহাশয়েরা ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদানের জন্য প্রাণপণ খাটিতেছেন। মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বকুলাল বিশ্বাস মহাশয় অনবরত বারিবর্ষণের মধ্যেও নাকি লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া চাউল বিতরণ করিতেছেন।

চাঁদপুরের সচ্চিদানন্দ শ্যামসুন্দর হরিসভার সেবাধর্ম্ম-বিভাগ হইতে চাঁদপুর মহকুমার দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের মধ্যে তণ্ডুলাদি বিতরণকার্য্য বিগত ১২ই জ্যৈষ্ঠ আরম্ভ হয়। প্রথমে ৪।৫টি গ্রাম লইয়া কার্য্যারম্ভ হইয়াছিল, এইক্ষণ প্রায় ৪০টি গ্রামে সাহায্য বিতরিত হইতেছে।

"সঞ্জীবনী" বলিতেছেন, পূর্ব্ববঙ্গের অন্নাভাব-পীড়িত লোকদের দুর্গতির কাহিনী শুনিয়া কলিকাতা রাজধানী আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে ব্যগ্র হইয়াছে। কলিকাতার ভারত-সভা জনসাধারণের প্রতিনিধি। ভারত-সভা কলিকাতাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। ভারত-সভা কলিকাতার বিভিন্ন পল্লীতে সভা করিয়া অর্থসংগ্রহের আয়োজন করিতেছেন। প্রথম সভা হইয়াছিল, গত শুক্রবার সুবিখ্যাত কলেজ স্কোয়ারে। কলেজ স্কোয়ার ছাত্রমণ্ডলীর কেন্দ্রস্থান। সভাস্থলে ১৩৩৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। এই টাকার মধ্যে ৫০৲ টাকা নোয়াখালী ও ৫০৲ টাকা ত্রিপুরায় পর দিনই প্রেরিত হইয়াছে।

সভাপতি (শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র) কলিকাতার প্রতি বাটী হইতে অর্থসংগ্রহের জন্য ভলাণ্টিয়ার আহ্বান করেন। কলিকাতার প্রত্যেক কলেজের ছাত্রগণ অতি আগ্রহের সহিত এই কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। ৩।৪ জন ছাত্র লইয়া এক এক দল গঠিত হইয়াছে। ইঁহাদের হস্তে ভারত-সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার, সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ধনাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসুর নামাঙ্কিত আবেদন-পত্র ও অর্থ-সংগ্রহ-পুস্তক প্রদান করা হইয়াছে। যিনি যে টাকা প্রদান করিবেন, তাহা পুস্তকে লিখিয়া দিবেন।

রবিবার বিডনস্কোয়ারে সভা হইয়াছিল। সভাস্থলে প্রায় ৩১৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল।

অনাহারে একটি প্রাণীকেও মরিতে দেওয়া হইবে না, কলিকাতা এই দৃঢ় সঙ্কল্প করিতেছে।—(জ্যোতিঃ)

শুধু এই এক বিভাগে নহে, অন্যান্য কতিপয় প্রয়োজনীয় কর্ম্মক্ষেত্রেও দেশভক্তগণের এহেন আত্মশক্তিনিয়োগের যে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহাও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। 'মেদিনীপুর-হিতৈষী' বলেন—

রঙ্গপুরকলেজ-ফণ্ডে তাজহাটের রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর এক লক্ষ টাকা এবং কাশীমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয় পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

'২৪ পরগণা বার্ত্তাবহে' প্রকাশ—

২৪ পরগণা-মজিলপুরের স্বর্গগত জমিদার বাবু নরেন্দ্র নারায়ণ দত্ত মহোদয়ের পুণ্যশীলা পত্নী শ্রীযুক্তা শতদলবাসিনী দত্ত মহোদয়া সম্প্রতি তাঁহার স্বগ্রামস্থ এম-ই স্কুলের গৃহটির সংস্কারার্থে ১৩০০৲ শত টাকা দান করিয়াছেন।

বসিরহাটের অন্তর্গত বর্দ্ধনপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীঅনাথ দাস মহাশয় তাঁহার নিজ গ্রামে সাধারণের হিতার্থে একটি বোর্ড স্কুল স্থাপনের জন্য গভর্ণমেন্টকে এক বিঘা জমি দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে এই মহাত্মা বসিরহাটে একটী স্বজাতীয় স্কুল বোর্ডিংএর জন্ত দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

'প্রতিকার' লিখিয়াছেন—

কলিকাতা বঙ্গীয় হিত-সাধন-মণ্ডলীর সম্পাদক ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র দরিদ্র ছাত্রদিগের পাঠের সুবিধার জন্ত পুরাতন পুস্তক সংগ্রহ করিতেছেন। কোন ছাত্র বা ভদ্র মহোদয় ইচ্ছা করিলে তাঁহার নিকট পুস্তক পাঠাইতে পারেন।

শিক্ষার উন্নতিকামীদের এহেন প্রয়াসের সঙ্গে 'রঙ্গপুর দিকপ্রকাশে'র বর্ণিত অপর একটি দৃষ্টান্তও এস্থলে প্রকাশ-যোগ্য। উহার মর্ম্ম এই—

মেদিনীপুরের ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের অফিসে দশ টাকার একটি প্রবেশনারী পোষ্ট খালি হয়, সতীশচন্দ্র পাল নামক একটি যুবক তজ্জন্ত দরখাস্ত করে। সতীশ এ বৎসর আই-এ পাশ করিয়াছে। ইঞ্জিনিয়ার মিঃ এন, এন, বসু মহোদয় তাহাকে ডাকাইয়া বলেন যে, আই-এ পাশ করিয়া দশ টাকার এপ্রিন্টিসী কর্ম্ম তোমার পক্ষে কষ্টকর হইবে। তুমি বি-এ পড়িবার চেষ্টা কর, আমি মাসিক পাঁচ টাকা করিয়া তোমার সাহায্য করিব। এজন্ত একাউন্টান্টকে তাঁহার বেতন হইতে মাসিক পাঁচ টাকা কাটিয়া লইয়া সতীশ যেখানে থাকিবে তথায় পাঠাইতে আদেশ দিয়াছেন। এইরূপ মানুষকে দেখিলেই প্রাণ বলিয়া উঠে—ইনিই আমার স্বদেশবাসী!

'স্বদেশবাসী'দের এহেন স্বদেশ বা স্বজাতি-প্রীতি বিবিধ কর্ম্মক্ষেত্র অবলম্বন করিয়া দিন দিন যে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতেছে তাহার দৃষ্টান্ত যথেষ্ট না হইলেও বিরল নহে। সংপ্রতিও ইহার দুই একটি নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। '২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ' এ বিষয়ের সাক্ষ্য দিতেছেন—

যুক্তপ্রদেশের গেজেটে প্রকাশ—গত বর্ষে অর্থাৎ ১৯১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তপ্রদেশবাসীগণ মোটের উপর সাড়েতিন লক্ষ টাকা ধর্ম্মশালা দাতব্য চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং কূপ ও সেতু নির্ম্মাণ প্রভৃতি সাধারণ হিতকর কার্য্যে দান করিয়াছেন।

'জ্যোতিঃ' উহার পরিপোষণকল্পে দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া বলিতেছেন—

শ্রীযুক্ত নীলকৃষ্ণ রায় সম্প্রতি স্থানীয় জেনেরেল হস্পিটালে চক্ষু-রোগাক্রান্তদের থাকিবার ঘরের জন্ত ২০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে চাকৃতাই খোল-নির্ম্মাণের সমস্ত ব্যয় নিজে বহন করিয়াছিলেন।

'মেদিনীপুর-হিতৈষী'তে তৃতীয় দৃষ্টান্ত প্রকাশ—

খ্রীষ্টান সমাজের শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের সহোদরা শ্রীমতী ম্রি, সি, দত্ত মহোদয়া স্কটীশ-চার্চ্চেশ মিশনের হস্তে কলিকাতার দরিদ্র ও রুগ্ন খ্রীষ্টানদিগের উপকারার্থে ২০,০০০৲ বিশ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন। বিগত ২১শে পৌষ মহাশয় ডাক্তার ওয়াটের হস্তে ২০,০০০ টাকার কোম্পানীর কাগজ দিয়া আসিয়াছেন। এই টাকার সুদ দরিদ্র ও রুগ্ন খ্রীষ্টানদিগের অবস্থানুসারে তাহাদিগের সাহায্যার্থে ব্যয়িত হইবে।

'সঞ্জীবনী' এ বিষয়ের অন্যতম নিদর্শন প্রদর্শন করিতে গিয়া পুলক-কম্পিতস্বরে জানাইয়াছেন—

মোহনলাল মিত্র মহাশয়ের বংশ ধনে মানে সুবিখ্যাত। মিত্র মহাশয়ের পুত্রদ্বয় কলিকাতার সম্ভ্রান্ত সমাজে এক সুন্দর প্রথা প্রবর্ত্তনের উদ্যোগ করিয়াছেন। রায় প্রমথনাথের ভ্রাতা রায় চন্দ্রনাথ মিত্রের বিবাহ উপস্থিত; তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনগণ বিবাহ-উপলক্ষে নাচ, থিয়েটার, তাড়িতের রোসনাই ও গোরার বাদ্য প্রভৃতির আয়োজন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন; ইহার জন্ত অন্যূন ৯ হাজার টাকার ফর্দ্দ প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু সুশিক্ষিত ভ্রাতৃদ্বয় এক রাত্রির আমোদে এত টাকা অপব্যয় না করিয়া তাহার দ্বিগুণ অর্থ নানাপ্রকার সৎকার্য্যে ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। আমরা অবগত হইলাম—ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাদের পিতা মোহনলাল মিত্র ও মাতা আদ্যাসুন্দরীর নামে ২ জন রোগীর বাসের জন্ত এলবার্ট ভিক্টর হাস্পাতালে ৬ হাজার, এলবার্ট ভিক্টর কলেজ স্থাপনের জন্ত ১ হাজার, কাশীর রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে তাঁহাদের পিতার নামে রোগীনিবাস নির্ম্মাণার্থ ৬ হাজার, কলিকাতা অনাথাশ্রমে ১ হাজার, কলিকাতা আতুরাশ্রমে ১ হাজার, শোভাবাজার দাতব্য সভায় ১ হাজার, ডিষ্ট্রীক্ট চেরিটেবল সোসাইটীতে ১ হাজার, অন্ধ স্কুলে ১ শত, বোবা স্কুলে ১ শত, মহাকালী পাঠশালায় ১ হাজার, বারাসত হাস্পাতালে ১ শত, গয় কুষ্ঠাশ্রমে ১ শত, লওনা হাসপাতালে ১শত, বঙ্গীয় এম্বুলেন্স কোরে ১ শত, কিংস হাস্পাতালে ১ হাজার, টালীগঞ্জ সেবাশ্রমে ১ শত, মোট ১৮,৭০০ টাকা দান করিয়াছেন। কলিকাতার এক সম্ভ্রান্ত বংশ যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন, আমরা আশা করি, যাঁহারা ভদ্রলোক তাঁহারা সকলেই তাহার অনুসরণ করিবেন।

এ গেল জনসাধারণের কথা। সংপ্রতি খাস সরকার ও দেশীয় রাজন্যবর্গের প্রচেষ্টাও শিল্পোন্নতির ভার গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এরূপ দেখা যাইতেছে। ইহা অবশ্য আশা আনন্দ ও সৌভাগ্যের বিষয়। দেশীয় রাজন্যবৃন্দের মধ্যে মহীশূর-রাজ সংপ্রতি এক্ষেত্রে যে উদ্যোগের পরিচয় দিয়াছেন তাহা সফল হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবার সম্ভাবনা ঘটিবে, নিঃসন্দেহে আশা করা যায়। 'চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহ' মহীশূর রাজসরকারের বর্ত্তমান আয়োজনের পরিচয়-প্রসঙ্গে বলেন—

'মহীশূর রাজ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতিসাধনের জন্ত শিল্পোন্নতির চেষ্টা চলিতেছে। ভারতে ব্যবসায় বাণিজ্যের পসার না হইলে, ভারতের আর্থিক উন্নতিসাধন যে একান্তই সুদূরপরাহত, একথা বোধ হয় এক্ষণে আর কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। বিশেষতঃ ইউরোপের-মহাযুদ্ধের ফলে এদেশে আজকাল অনেক জিনিষই দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং এ সময়ে মহীশূর রাজ্যে শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিসাধন-চেষ্টার কথা শুনিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। মহীশূরবাসীগণ সম্প্রতি যে-সকল দ্রব্যের ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

(১) কাপড়ের কল—ষোল লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া মহীশূর রাজ্যে একটি কাপড়ের কল স্থাপন করা হইবে। এই কলে ২৫ হাজার চরকা ও ৫ শত তাঁত থাকিবে। প্রতিদিন এই কলে ১৬ লক্ষ সের সূতা ও ৯ লক্ষ সের বস্ত্র প্রস্তুত হইবে।

(২) সাবানের কল—মহীশূরবাসীগণ এতদ্দ্বারা সাবান প্রস্তুত করিতেছেন। এই কলের কার্য্য চালাইবার নিমিত্ত একজন কার্য্যকুশল বাঙ্গালীকে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

(৩) কাচের কারখানা—মহীশূরের কাচের জিনিষ নির্ম্মাতা কারিকরদিগকে ভারতের অন্যান্য স্থানের কারখানাগুলি দর্শনের জন্য প্রেরণ করিয়া উৎকৃষ্ট কাচ নির্ম্মাণের আয়োজন করা হইবে।

(৪) দিয়াশলাইর কল—মহীশূরের সিমোগা নামক স্থানে একটি দিয়াশলাইয়ের কল স্থাপনের জন্য ৫০ হাজার টাকা মূলধন সংগৃহীত হইয়াছে।

(৫) কাগজের কারখানা—মহীশূর-রাজ্যে কাগজ-নির্ম্মাণোপযোগী ঘাস ও বাঁশ বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। মহীশূর-জাত বাঁশের মণ্ডে কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত সম্প্রতি সে দেশ হইতে ৫৪০ মণ বাঁশের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া ভারতের কোনও কাগজের কলে প্রেরিত হইয়াছে। এই মণ্ডে ভাল কাগজ প্রস্তুত হইতে পারিলে মহীশূরে কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এই প্রসঙ্গে 'যশোহর' আরো সংবাদ দিয়াছেন—

মহীশূরের মহারাজা রাজ্যের শিল্পের উন্নতির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, তিনি আদেশ করিয়াছেন আগামী ৫ বৎসরকাল প্রতি বৎসর শিল্পের উন্নতিপ্রয়াসীগণকে ঋণস্বরূপ ৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে।

মহারাজা দেওয়ানকে বলিয়াছেন শিক্ষার জন্য ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইও না। এই ত রাজার ধর্ম্ম। আমরা আশা করি শীঘ্রই মহীশূর ব্যবসা বাণিজ্য এবং শিক্ষায় ভারতের আদর্শ স্থল হইবে।

মহীশূররাজ-সরকারের ন্যায় যুক্তপ্রদেশের খাস-সরকারও এ দেশের শিল্পোন্নতির প্রতি মনোযোগী হইয়াছেন। 'চারুমিহিরে' প্রকাশ—

যুক্তপ্রদেশের লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর সম্প্রতি নাইনিতালে বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ লইয়া এই জন্য এক বৈঠক করিয়াছিলেন। ঐ প্রদেশে তৈলের কল স্থাপনের জন্য গবর্ণমেণ্ট বিশেষ বন্দোবস্ত করিতেছেন। সুগন্ধি দ্রব্য, কাচের জিনিষ, বেলোয়ারি চুড়ি এবং চামড়া ইত্যাদি প্রস্তুতের জন্য ব্যবসাদারদিগকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করা হইতেছে। এবং যাহাতে এইসকল দ্রব্য সহজে ও সুলভে প্রস্তুত হইতে পারে তাহার জন্য ঐ গবর্ণমেণ্ট বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

যুক্তপ্রদেশের গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টান্তে—

এলাহাবাদ গভর্ণমেণ্ট সে অঞ্চলে "কাচের কারখানা" খুলিবার উদ্যোগ করিতেছেন। বিলাত হইতে দুইজন সুদক্ষ কারিকর প্রেরণের জন্য ছোটলাট বাহাদুর ভারত-সচিবের নিকট চিঠি লিখিয়াছেন।—(চুঁচুড়াবার্ত্তাবহ)

শিল্পোন্নতির প্রচেষ্টায় গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগ শুধু কলকারখানা-প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধেই পর্য্যবসিত নহে, 'রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ' এ সম্বন্ধে অভিনব তথ্যের সন্ধান দিয়া বলিতেছেন—

সম্প্রতি রেলওয়ে বোর্ড স্বদেশী শিল্পজাত দ্রব্যের রেলভাড়া কমাইবার জন্য এদেশের সকল রেল-কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এক একখানি কমিউনিক পাঠাইয়াছেন। কমিউনিকের মর্ম্ম এই যে, রেলের মাশুল কমাইলে রেলে অধিক পরিমাণে স্বদেশী মাল যাতায়াত করিবে এবং তাহার ফলে রেলকর্ত্তৃপক্ষ ও স্বদেশী ব্যবসাদারেরা পরস্পর অধিকতর লাভবান হইবেন।

বড়োদার মহারাজা গায়কওাড় তাঁহার রাজ্যের স্থানে স্থানে বহু স্থাবর ও জঙ্গম লাইব্রেরী স্থাপন করিয়া প্রজা-সাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারের সাধু চেষ্টা করিতেছিলেন। খাস বড়োদায় কেন্দ্র লাইব্রেরী। সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে কেন্দ্র লাইব্রেরীতে একটি শিশু বিভাগ খোলা হইয়াছে। সেখানে ছেলেদের উপযোগী ছবির বই, নানা-বিধ খেলা প্রভৃতির আয়োজন থাকিবে এবং গল্প বলিয়া ও বায়োস্কোপ দেখাইয়া ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি সহজে শিক্ষা দিবারও ব্যবস্থা হইবে। মহারাজা গায়কওাড় বুঝিয়াছেন, যে, অজ্ঞানতা অঙ্কুরেই বিনষ্ট না হইলে কুসংস্কার গোঁড়ামি প্রভৃতির আগাছায় মানুষের মন জঙ্গলে জঞ্জালে ভরিয়া উঠে। অজ্ঞানতা দূর হইলে তবেই মানুষ ধর্ম্ম কি, কর্ত্তব্য কি, স্বত্ব কি, সত্য কি বুঝিতে পারে; জোর করিয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে, সাহস করিয়া ন্যায্য দাবী করিতে, দুঃখ প্রতিকার করিতে পারে। এই যে আমরা দলে দলে অনাহারে রোগে মরিতেছি, কোনো প্রতিকার করিতে চেষ্টা পর্য্যন্তও করিতেছি না, এ জড়তা অজ্ঞানেরই ফল। জ্ঞানে যেদিন দেশবাসীর মোহ জড়তা দূর হইবে সেইদিন আমরা বাঁচিতে পারিব, সেইদিন আমাদের জীবন জীবন্ত হইবে।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত।

পুস্তক-পরিচয়

মন্দার-কুসুম (উপন্যাস)—কুমারী প্রফুল্লনলিনী ঘোষ প্রণীত। মূল্য ।০ আনা।

রচনা বড় কাঁচা। গল্পও সাধারণ রকমের। ভাব ও চিন্তা পরিপুষ্ট না হইলে, উপন্যাস লিখিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। লোকশিক্ষাও হয় না, আর অর্থনাশ এবং মনঃকষ্টও হয়। সাহিত্যেরও সাধনা আছে, ইহা মনে রাখিয়া চলিলে ভাল হয়। সাধনায় অন্ততঃ কিছু সিদ্ধিলাভ না করিয়া কলম ধরা উচিত নহে। লেখিকা নিরাশ হইবেন না। সাধনা করিতে থাকুন। সিদ্ধি অবশ্যই হইবে। দা।

ঈশ্বরঘোষের তাম্রশাসন

এই তাম্রশাসনখানি বহুদিন যাবৎ দিনাজপুর জেলার মালদোয়ার ষ্টেটের দপ্তরখানায় রক্ষিত আছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির পরিচালক পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়, মালদোয়ার ষ্টেটের বর্ত্তমান অধিকারী কুমার শ্রীযুক্ত ছত্রনাথ ও শ্রীযুক্ত টঙ্কনাথ চৌধুরী মহাশয়দ্বয়ের অনুমতিক্রমে এই তাম্রশাসনের প্রতিকৃতি ও পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন। এই তাম্রশাসন প্রকাশিত হওয়ায় বঙ্গদেশের একটি প্রাচীন রাজবংশের পরিচয় জনসমাজে প্রকাশিত হইয়াছে। এই তাম্রশাসন দ্বারা ঈশ্বরঘোষ নামক ঘোষবংশজাত রাঢ়েশ্বর, রাঢ়ে ঢেকরী নগর হইতে ভট্টশ্রী নিবোকশর্ম্মাকে একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। প্রদত্ত গ্রামের জন্য যে তাম্রশাসন প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা হইতে ঈশ্বরঘোষের তিন পূর্ব্বপুরুষের নাম অবগত হওয়া গিয়াছে :—

ধূর্ত্তঘোষ
|
বালঘোষ
|
ধবলঘোষ — সদ্ভাবা
|
ঈশ্বরঘোষ

তাম্রশাসনখানি ঈশ্বরঘোষের রাজ্যের ৩৫শ সম্বৎসরে প্রদত্ত হইয়াছিল। মৈত্রেয় মহাশয়ের উদ্ধৃতপাঠ ১৩২০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সময়ে প্রকাশিত প্রতিকৃতির সহিত মৈত্রেয় মহাশয়ের পাঠ মিলাইয়া দেখিয়া অনেকগুলি ভ্রম দেখিতে পাইয়াছিলাম। মৈত্রেয় মহাশয় কর্ত্তৃক তাম্রশাসনের উদ্ধৃত পাঠের যে যে স্থান আমার নিকট যথার্থ বলিয়া বোধ হয় নাই, তাহা অবলম্বন করিয়া একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলাম এবং উহা প্রকাশার্থ সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম। প্রবন্ধ প্রেরিত হইবার পরে আষাঢ়ের সাহিত্যের ২৭৬ পৃষ্ঠায় মৈত্রেয় মহাশয় তৎকৃত উদ্ধৃত পাঠের একটি শুদ্ধিপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই শুদ্ধিপত্রে মুদ্রাকর-প্রমাদ-বশতঃ প্রকাশিত উদ্ধৃতপাঠে যে-সকল ভ্রম ছিল, তাহার কতকগুলি সংশোধিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে মৈত্রেয় মহাশয় বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসনের পাঠমুদ্রাঙ্কণ-সময়ে প্রুফ হারাইয়া মুদ্রাকর অনেকগুলি ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইয়াছিলেন। নিম্নে কতকগুলি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল।"

যে কয়স্থানের সংশোধিত পাঠ প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত আরও অনেকস্থানে ভ্রমপ্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। ভরসা করি বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি গৌড়লেখমালার দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশ-কালে এই-সকল ভ্রমের সংশোধন করিবেন। দুই এক স্থানে যে দুই একটি ভুল রহিয়াছে তাহা মুদ্রাকরের দোষজনিত বলিয়া বোধ হয় না। তাম্রশাসনের প্রথম পৃষ্ঠায় ১৫শ পংক্তিতে 'মহাবলাকোষ্টিক' পাঠ করা হইয়াছে, কিন্তু মূলে 'মহাবলংকোষ্টিক' লিখিত আছে। ষোড়শ পঙ্ক্তিতে যে শব্দটি 'ঐদ্বিতাসন্নিক' পাঠ করা হইয়াছে, উহার প্রকৃত পাঠ 'ঔখিতাসনিক'। এই শব্দের প্রথম অক্ষরটি 'ঔ', 'ঐ' নহে এবং দ্বিতীয় অক্ষরটি 'খি'। তাম্রশাসনের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ৩০শ পঙ্ক্তিতে দুইবার 'ঔর্ব্ব্য' শব্দ লিখিত আছে, এই দুই স্থানের 'ঔ'-এর সহিত 'ঔখিতাসনি'কের 'ঔ' মিলাইয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, ষোড়শ পঙ্ক্তিতে 'ঔ' লিখিত আছে, 'ঐ' নহে। এই শব্দের দ্বিতীয় অক্ষরটি যে 'দ্বি' নহে, তাহার প্রমাণও এই তাম্রশাসনেই পাওয়া যায়। ১২শ পঙ্ক্তিতে 'মহাসান্ধিবিগ্রহিক' শব্দে 'ন্ধি' যে প্রকারে লিখিত হইয়াছে, ১৫শ পঙ্ক্তির 'ঔখিতাসনিক' শব্দের দ্বিতীয় অক্ষর তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। মৈত্রেয় মহাশয় ইচ্ছা করিলে ব্যাকরণশাস্ত্র পীড়ন করিয়া 'ঐদ্বিতাসনিক' পদ সিদ্ধ করিয়া উহার ব্যাখ্যা বাহির করিতে পারিবেন বটে, কিন্তু তাহা হইলে উদ্ধৃত পাঠ মূলানুগত হইবে না। এতদ্ব্যতীত তাম্রশাসনের অনেক স্থানে পাঠাশুদ্ধি আছে, কিন্তু সেগুলি এই দুইটির ন্যায় অধিক প্রয়োজনীয় নহে। মৈত্রেয় মহাশয়ের ন্যায় সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতের ভ্রম-প্রদর্শন আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে সহজসাধ্য নহে। পাঠকবর্গ আমার উক্তিতে, বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারেন এই ভয়ে আরও দুই একটি পাঠাশুদ্ধি এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম—

১। ৩৪শ পঙ্ক্তিতে মৈত্রেয় মহাশয় পাঠ করিয়াছেন '[নর] কপতনভয়াৎ সর্ব্বৈরেব,' কিন্তু মূলে লিখিত আছে '[নর]ক পতনভয়াচ্চ সর্ব্বৈরেব'।

২। ৪১শ পঙ্ক্তিতে মৈত্রেয় মহাশয় প্রথমে পাঠ করিয়াছিলেন, 'দাচ্ছ্রেয়োঽনুপালনং।' আষাঢ় মাসে শুদ্ধিপত্রে লিখিত আছে 'দানচ্ছ্রেয়োঽনুপালনং'। মূলে দেখিতে পাওয়া যায় 'দানোচ্ছ্রেয়োঽনুপালনং।' ইহার শুদ্ধপাঠ 'দানাচ্ছ্রেয়োঽনুপালনং'।

৩। ৬৩শ পঙ্ক্তিতে মৈত্রেয় মহাশয় পাঠ করিয়াছেন, 'সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ," কিন্তু মূলে আছে 'সকলমিদ-মুদাহৃতং চ'।

স্বর্গীয় ডাঃ থিয়োডর ব্লক ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নিকটে আমরা যখন অক্ষরতত্ত্ব শিক্ষা

করিতাম তখন আমরা মূলানুগত পাঠ লিখিলে সংস্কৃত কলেজের অথবা এসিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিত মহাশয়েরা উদ্ধৃত পাঠের বর্ণাশুদ্ধি কাটিয়া 'শুদ্ধ করিয়া দিতেন'। এই 'শুদ্ধির' জন্য পদে আমাদিগকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত। এইরূপে আমাদিগকে মূলানুগত পাঠোদ্ধার করা শিক্ষা করিতে হইয়াছিল। মুদ্রাযন্ত্রের বিভ্রাটে প্রাচীন শিলালিপি বা তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধারে যে-সকল ভ্রমপ্রমাদ ঘটিয়া থাকে তাহা বাঙ্গালা ভাষায়ই অধিক। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় যে কয়খানি তাম্রশাসনের উদ্ধৃত পাঠ প্রকাশ করিয়াছিলাম, মুদ্রাযন্ত্রের অনুগ্রহে তাহা এমন বিকৃত আকারে মুদ্রিত হইয়াছিল যে, মৈত্রেয় মহাশয় ও শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয়কে তাহার প্রকৃতপাঠ নির্ণয়ের জন্য বহু পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। সাহিত্যের সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় পরবর্ত্তী সংখ্যায় শুদ্ধিপত্র প্রকাশ করিয়া মৈত্রেয় মহাশয়ের উদ্ধৃত পাঠ বিকৃতি হইতে রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার তাৎকালীন সম্পাদক প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বহু অনুরোধ সত্ত্বেও শুদ্ধিপত্র প্রকাশ করা আবশ্যক মনে করেন নাই।

ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসনে যে-সকল রাজপুরুষের উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে কতকগুলি অধিকাংশ তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং কতকগুলি সম্পূর্ণ নূতন। মহাকরণাধ্যক্ষ, মহাসর্ব্বাধিকৃত, মহাপাদমূলিক, মহাকায়স্থ, মহাবলৎকোষ্ঠিক, মহাকটকঠকুর, অঙ্গীকরণিক, কোট্টপতি, হট্টপতি, ভুক্তিপতি, ঔত্থিতাসনিক, অন্তঃপ্রতীহার, দণ্ডপাল, খণ্ডপাল, বাসাগারিক, খড়্গগ্রাহ, শিরোরক্ষিক, বৃদ্ধধানুষ্ক, একসরক, খোলদূত ও পানীয়াগারিক উপাধিগুলি এই জাতীয়। একই তাম্রশাসনে মহাকরণাধ্যক্ষ ও মহাকায়স্থ এই দুইটি পদের উল্লেখ দেখিয়া বোধ হয় যে, করণ ও কায়স্থগণ এক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। করণ ও কায়স্থ এই দুই শব্দেরই অর্থ লেখক। মৈত্রেয় মহাশয় 'গৌড়কবি সন্ধ্যাকর নন্দী' নামক প্রবন্ধে (সাহিত্য ১৩১৯ পৃঃ ৯৪৭) অজয় পালের 'নানার্থ সংগ্রহ' হইতে করণ শব্দের যে অর্থ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, করণ শব্দে কায়স্থ এবং বর্ণ-শঙ্কর এই দুইই বুঝাইত। এই স্থানে কায়স্থ অর্থে কায়স্থ জাতি নহে, লেখক বা লিপিকার। কায়স্থগণ সকল জাতি হইতেই সংগৃহীত হইত। করণ বলিলে যে বর্ণশঙ্কর বুঝায় —তাহা বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির চেষ্টায় প্রকাশিত সামন্তরাজ লোকনাথের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়। সামন্তরাজ লোকনাথ শূদ্রার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে জাত পারশবের দৌহিত্র এবং করণ জাতীয় অথবা করণ-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত কায়স্থ এবং করণশব্দ জাতিবাচক ছিল বলিয়া বোধ হয় না। "Two works just mentioned (Rajtarangini and Ksemendra's Lokaprakasa) as well as other contemporaneous ones, designate the writers also by the term Kayastha, which first occurs in the Yajnavalkya-smriti, I. 335, and even at present is common in Northern and Eastern India" —Buhler's Indian Palaeography, English Edition, p. 101. ফরিদপুর হইতে যে চারিখানি জাল তাম্রশাসন বাহির হইয়াছে, তাহার মধ্যে একখানিতে জ্যেষ্ঠকায়স্থ উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। মহাকায়স্থ এবং জ্যেষ্ঠকায়স্থ এতদুভয়ের অর্থ একই, ইঁহারা লিপিকারগণের শ্রেষ্ঠ বা হেড্ ক্লার্ক (Head clerk) ছিলেন। স্বর্গগত ডাঃ কিলহর্ণের মতানুসারে করণিকগণ আইন-সংক্রান্ত দলিলপত্রের লেখক ছিলেন। সুতরাং মহাকরণাধ্যক্ষ সম্ভবতঃ ব্যবহারশাস্ত্র-বিভাগের লেখকদিগের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং মহাকায়স্থ সাধারণ লোকদিগের অধ্যক্ষ ছিলেন। মহাপাদমূলিক শব্দে বোধ হয় পরিচারকগণের অধ্যক্ষকে বুঝাইত। একখানি প্রাচীন খোদিতলিপিতে পাদমূলিক শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। উড়িষ্যার খণ্ডগিরিতে তাতোয়া গুহায় খৃঃ-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর যে খোদিত লিপি আছে, তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, উক্ত গুহা কুসুম নামক জনৈক পাদমূলিক কর্ত্তৃক খাত হইয়াছিল (Luders List [illegible]4)।

মৈত্রেয় মহাশয় ঈশ্বর ঘোষকে জাতিতে কায়স্থ বলিয়া পরিচিত করিয়া বিজ্ঞানানুমোদিত ঐতিহাসিক রচনা-প্রণালীর সীমা অতিক্রম করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বে উপাধি দেখিয়া জাতি নির্ণয় করা একরূপ অসম্ভব। ঈশ্বর ঘোষ করণ ছিলেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে, কারণ মৈত্রেয় মহাশয় তাম্রশাসনের ২০-২১শ পঙ্‌ক্তিতে "স [কর] ণ ব্রাহ্মণমাননাপূর্ব্বকং" পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু মূল তাম্রশাসনে ২০শ পঙ্‌ক্তির শেষে, 'স'এর পরে 'কর' এই অক্ষর দুইটি নাই, সুতরাং ইহা আনুমানিক পাঠ। এই প্রমাণ লইয়া মহামণ্ডলেশ্বর ঈশ্বর ঘোষের জাতি নির্ণয় করা সুকঠিন।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন

এবারে একটি গল্পও পুরস্কারের যোগ্য বিবেচিত হয় নাই। —প্রবাসীর সম্পাদক।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"আনন্দময়ীর আগমনে
আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।
হের ওই ধনীর দুয়ারে
দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।"

রবীন্দ্রনাথ।

চিত্রকর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকিলের সৌজন্যে মুদ্রিত।

U. RAY & SONS

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৫শ ভাগ
১ম খণ্ড

আশ্বিন, ১৩২২

৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পূজা ও সেবা।

পূজা আসিতেছে। সমস্ত বঙ্গবাসী হিন্দু জগৎ-জননীর পূজা করিবেন বলিয়া প্রস্তুত হইতেছেন। দেশব্যাপী এই ভাব অ-হিন্দুদিগকেও স্পর্শ করিতেছে; তাহাদেরও প্রাণে পূজার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে। পূজা মানে আপনাকে নিবেদন করিয়া দেওয়া; জগৎ-জননীর সেবায় আপনাকে নিয়োজিত করা। জগৎ-জননীর সেবা তখনই প্রকৃত ও সার্থক হয় যখন আমি আপনাকে জগৎবাসীর সেবায় উৎসর্গ করিয়া দিতে পারি।

মানুষের দুঃখের অন্ত নাই, অভাবের শেষ নাই। কায়-মনে এইসব অভাব ও দুঃখ অপনোদনের চেষ্টা করাই সেবার উদ্দেশ্য। সেবায় চিত্তের প্রসার ও প্রসন্নতা বৃদ্ধি পায়; জগৎবাসীর সহিত আত্মীয়তা জন্মে।

সেবার কার্য্যের প্রকৃতি অনুসারে সেবা আংশিক বা পূর্ণ হইয়া থাকে। কেহ জলে ডুবিতেছে দেখিয়া তাহাকে জল হইতে ডাঙায় তোলা সেবা—কিন্তু আংশিক; পূর্ণতর সেবা তাহার শুশ্রূষা করিয়া তাহাকে সুস্থ সচেতন করিয়া তোলা; সম্পূর্ণ সেবা হইবে তাহাকে সাঁতার শেখানো, যাহাতে সে ভবিষ্যতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। দুর্ভিক্ষে যাঁহারা সাহায্য করিতেছেন তাঁহারা সেবা করিতেছেন, কিন্তু তাহা আংশিক সেবা; সম্পূর্ণ ও প্রকৃত সেবা হইবে দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধান ও নির্দ্ধারণ করিয়া সেইসমস্ত বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া দেশ হইতে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা দূর করা; য়ুরোপে পূর্ব্বে সকল দেশেই দুর্ভিক্ষ হইত, কিন্তু দেশবাসীর চেষ্টার ফলে এখন এক রুশিয়া ছাড়া আর কোনো দেশে দুর্ভিক্ষ হয় না। মহামারী উপস্থিত হইলে সে সময়ে পীড়িত নরনারীর চিকিৎসা ও শুশ্রূষা মহৎ সেবা বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ ও প্রকৃত সেবা তিনিই করিবেন যিনি দেশ হইতে মহামারীর কারণ দূর করিয়া দেশবাসীদিগকে স্বাস্থ্যতত্ত্বে শিক্ষিত করিয়া তুলিয়া ভবিষ্যৎ মহামারীর সম্ভাবনা দূর করিতে পারিবেন; এইরূপ উপায়ে য়ুরোপ ও আমেরিকা হইতে ম্যালেরিয়া প্লেগ প্রভৃতি দূর করা সম্ভব হইয়াছে। মানুষ যখন ছোট থাকে তখন সে অশক্ত দুর্ব্বল অজ্ঞান থাকে বলিয়া তাহার সকল কাজ করিয়া দিয়া তাহার সেবা করিতে হয়; যেমন যেমন সে বড় হইয়া উঠে তেমন তেমন অপরে তাহার কাজ অল্প করিয়া দ্যায়—চিরজীবন তাহাকে অসহায় অশক্ত অজ্ঞান নাবালক রাখিয়া বরাবর তাহার সমস্ত প্রয়োজন অপরে সম্পন্ন করিয়া দিলে তাহার প্রতি যে খুব ভালবাসা ও যত্ন দেখানো হইতেছে তাহা বলা যায় না, বরং তাহার শত্রুতা ও অপকার করা হইতেছে বলিতে হয়। মানুষের সেই সেবাই শ্রেষ্ঠ সেবা

যাহার ফলে তাহার নাবালকত্ব ঘুচে, এবং সে নিজে নিজের দুঃখ ও অভাবের কারণ বুঝিতে পারিয়া নিজেই নিজের শক্তিতে তাহার প্রতিকারের উপায় করিতে পারে। জ্ঞান দান করিয়া মানুষের সুপ্ত শক্তিসকলকে উদ্বোধিত করিয়া মানুষ কতবড় বলবান ও অদ্ভুতকর্ম্মা তাহাই বুঝাইয়া দেওয়া প্রকৃত ও সম্পূর্ণতম সেবা। কেবল ক্ষুধিতকে অন্ন ও রুগ্নকে ঔষধ দিলেই সেবা করা হইবে না; চিত্তের গতানুগতিকতা দূর করিয়া স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন কর্ম্মের শক্তি জাগাইয়া তুলিতে হইবে। সমগ্র জাতির আত্মা কি চিরকাল নাবালক থাকিবে? যাঁহারা নিজের অজ্ঞ দেশবাসীদিগকে যত্নের দ্বারা আত্মীয় করিয়া লইয়া তাহাদের সকল দুঃখের মূল অজ্ঞান পরমুখাপেক্ষিতা পরনির্ভরতা অনুদ্যম দূর করিয়া তাহাদিগকে জ্ঞান দান করিয়া আত্ম-শক্তির উদ্বোধনের ফলে পূর্ণ মনুষ্যত্বের অধিকারী করিয়া স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে পারিবেন তাঁহারাই দেশের সর্ব্বাঙ্গীন ও সম্পূর্ণ সেবা করিবেন—তাঁহারাই দেশের প্রকৃত সেবক।

পূজার ছুটি।

পূজার ছুটি অনেকের আরম্ভ হইয়াছে; অনেকের শীঘ্র আরম্ভ হইবে। সেই অবকাশে অনেক প্রবাসী ঘরে ফিরিয়া যাইবেন, অনেকে প্রবাসে স্বাস্থ্যসঞ্চয়ে যাইবেন। যাঁহারা প্রবাসে যান তাঁহারা প্রায়ই বিহার ছোটনাগপুর উড়িষ্যা আগ্রা-অযোধ্যার যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে গিয়া থাকেন। ছুটি মানে তাঁহারা কর্ম্ম হইতে অবসর মনে না করিয়া কর্ম্মান্তর গ্রহণের সুযোগ মনে করিলে দেশের অনেক কল্যাণকর কর্ম্ম অতি সহজে অনুষ্ঠিত হইয়া যাইতে পারে। যাঁহারা স্বগ্রামে ঘরে ফিরিয়া যাইবেন তাঁহারা যদি দেশের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য গ্রামের অবস্থা অভাব অভিযোগ প্রভৃতি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেন, গ্রামবাসী সকল শ্রেণীর সকল জাতের লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা বৃদ্ধি করেন, তাহাদিগকে উপদেশ ও উৎসাহ দিয়া দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গ্রামের অভাব দূর করিতে উদ্বুদ্ধ ও নিযুক্ত করেন তবে তিনি নিজের আনন্দ ও বিশ্রামের মধ্যেও দেশের অনেকখানি কাজ করিয়া তুলিতে পারিবেন। হয়ত একটা পথে প্রত্যেক বৎসর অত্যন্ত কাদা হয়; এক হাঁটু জল কাদা ভাঙিয়া গ্রামের বৌঝিরা প্রত্যহ দুদশবার সেই পথ দিয়া জল আনিতে যায়, গরু বাছুর মাঠে চরিতে যায়, কৃষাণ কৃষিতে যায়; পাশের পগার হইতে পাঁচ কোদাল মাটি তুলিয়া একটা আল বাঁধিয়া দিলে অথবা খান চার-পাঁচ বাঁশ কাটিয়া একটা সাঁকো বানাইয়া দিলে সহজেই উহার প্রতিকার হয়; কিন্তু সে বোধ, সে উদ্যম, সে কর্ম্মোৎসাহ পল্লীর অশিক্ষিত লোকের প্রায়ই দেখা যায় না; শিক্ষিত লোকের উচিত নিজে উদ্যোগী হইয়া দৃষ্টান্ত দেখাইয়া এই অসুবিধার প্রতিকার করা। তেমনি গ্রামে জলাশয়ের অভাব থাকিলে মজা পুষ্করিণী ঝালানো বা নূতন কূপ খোঁড়ানো, জল নিকাশের ব্যবস্থা ও জঙ্গল সাফ করা, নিরক্ষরদিগের অক্ষর পরিচয় করাইয়া দেওয়া প্রভৃতি কাজ সামান্য চেষ্টায় সম্পন্ন হইতে পারে অথচ তাহার ফল দেশের মহৎ কল্যাণ। যাঁহারা প্রবাসে বেড়াইতে যাইবেন তাঁহাদের উচিত প্রবাসী বাঙালীদের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া তাহাদের মধ্যে বাঙালীত্ব উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা, তাহাদিগকে বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গদেশের সহিত ঘনিষ্ঠ করিয়া তোলা; সঙ্গেসঙ্গে সেইদেশবাসী লোকদের সঙ্গেও আত্মীয়তা করা, তাহাদের সদ্‌গুণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা, এবং উভয়ের একই মাতৃভূমি স্বদেশকে হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করা কর্ত্তব্য; সর্ব্বোপরি কর্ত্তব্য প্রবাসে বাঙালীর সুনাম রক্ষা করা, এমন কিছু না করা যাহাতে বাঙালীর অর্জ্জিত খ্যাতি ক্ষুণ্ণ বা ম্লান হয়—কোনো কার্য্যের দ্বারা সে সুনাম বর্দ্ধিত করিতে পারিলে ত ভালই। যাহারা দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানে যাইবেন তাহাদের সেইখানকার আর্ত্ত নরনারীর দুঃখমোচন ও সেবা বিশেষ লক্ষ্য হওয়া উচিত। দেশ ও দেশবাসীকে সর্ব্বদা মনের সম্মুখে প্রধান ও স্পষ্ট করিয়া রাখিলে সকল সমস্যার শীঘ্র সমাধান হইয়া যায়—দেশের কল্যাণ ও আত্মতৃপ্তি দুইই হয়।

৩০শে আশ্বিন।

সে বেশীদিনের কথা নয় যখন ৩০শে আশ্বিন বাঙালীকে কতবিধ নব নব আশা আনন্দ উৎসাহ ও

সৌহৃদ্য আনিয়া দিত। এখন তাহার স্মৃতি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। প্রতিজ্ঞা ও পরস্পরের প্রতি প্রীতি রাখিবার নিদর্শন রাখী পর্য্যন্ত আমরা আর রাখি নাই। সে দিন কি শুধু বঙ্গবিচ্ছেদের স্মরণচিহ্ন হইয়া আমাদের সম্মুখে আসিয়াছিল, যে, বঙ্গের মিলনে তাহার কাজ শেষ হইয়া গেল? বঙ্গের মিলনের সঙ্গে-সঙ্গে কিয়ৎপরিমাণে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদও আবার নূতন করিয়া ত হইয়াছে। সে দিন যে দেশাত্মবোধের জন্মদিন, জড় চিত্তের উদ্বোধনের দিন, নিজের স্বত্ব দাবী করিতে শিখিবার দীক্ষার দিন! আমাদের দেশের সকল অভাব অভিযোগ কি পূরণ হইয়া গিয়াছে? সব চাওয়া কি নিঃশেষে পাওয়া হইয়াছে? এ দিন আমাদের পবিত্র দিন; ইহা আমাদের পালনীয় জাতীয় পার্ব্বণ। উৎসাহ লোপ পাইলেও আশা ত লুপ্ত হয় নাই; সুপ্ত আশাকে উদ্বোধিত করিয়া যে কবি

ভাই ভাই এক ঠাঁই,
ভেদ নাই, ভেদ নাই,

মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আমরা প্রার্থনা করি—

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবস শর্ব্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্ব্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্ম্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করেনি শতধা; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব্ব কর্ম্ম চিন্তা আনন্দের নেতা—
নিজ হস্তে নির্দ্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত।

“নীতিরঞ্জন” লর্ড কারমাইকেল।

সম্প্রতি লর্ড কারমাইকেল নবদ্বীপের প্রাচীন শিক্ষাস্থল টোল দেখিতে গিয়া বাংলা ভাষায় পণ্ডিতদিগকে সম্বোধন করিয়া বাঙালী মাত্রকেই প্রীত করিয়াছেন। প্রীত পণ্ডিতমণ্ডলী গভর্ণার বাহাদুরকে “নীতিরঞ্জন” উপাধি দিয়া সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন।—পণ্ডিতমণ্ডলী বলিয়াছেন যে তিনি প্রজারঞ্জনে সমর্থ এবং শাসনকার্য্যে উৎকৃষ্ট নীতি অবলম্বন করেন, এজন্য তিনি “নীতিরঞ্জন”। লর্ড কারমাইকেল বরাবর সত্য সরল বিনয়নম্র মিষ্ট-ভাষের জন্য লোকপ্রিয়। তিনি পণ্ডিতদিগের উপাধিদানের প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন যে “আমি এই উপাধির ঠিক উপযুক্ত নই, তবে আমি ইহা আমার কর্ম্মের আদর্শরূপে গ্রহণ করিলাম।” লর্ড কারমাইকেলের বক্তৃতায় ও কথায় বার্ত্তায় তাঁহার মনের ভাবের যে পরিচয় পাওয়া যায় সেই ভাবের অনুযায়ী নীতিতে বাংলা দেশ শাসিত হইলে তিনি নীতিরঞ্জন উপাধির সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইতেন এবং দেশও যথেষ্ট উপকৃত হইয়া তাঁহাকে দেশনায়করূপে পাওয়ার জন্য ধন্য হইত। কিন্তু যে কারণেই হৌক তাঁহার বাক্যে সমর্থিত ও বিঘোষিত নীতি শাসনকার্য্যে প্রকৃত প্রস্তাবে অবলম্বিত হয় নাই। সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে তাঁহার অধীন বাংলাপ্রদেশেই প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়াছে, অন্যত্র সব প্রদেশে বাড়িয়াছে। বঙ্গের শিক্ষার বিস্তার যে কমিয়াছে তাহা পাঠশালা ও ছাত্রের সংখ্যা দুইয়েতেই। ভারতগভর্মেণ্ট ১৯১৩-১৪ সালের শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে প্রদেশ অনুসারে একবৎসরে পাঠশালা স্কুল ও কলেজে শতকরা কত ছাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা দেখানো হইয়াছে—

প্রদেশ	শতকরা
মান্দ্রাজ	৭.৯
বোম্বাই	৪.২
বাংলা	১.৭
যুক্ত প্রদেশ	৮.০
পাঞ্জাব	৭.২
বর্ম্মা	৯.৯
বিহার-উড়িষ্যা	১.৭
মধ্য-প্রদেশ	৮.৯
আসাম	১০.৭
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১৫.৫
কুর্গ	৬.৫
দিল্লী	১৪.৭
মোট	৫.০ শতকরা।

এই তালিকায় দেখানো হইয়াছে যে বৃদ্ধি সকল প্রদেশেই হইয়াছে—বাংলা ও বিহার-উড়িষ্যায় কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কম,

নাম মাত্র ১.৭। এই ১.৭ বৃদ্ধিও বাস্তবিক বৃদ্ধি নয়; কারণ ১৯১১ সালের আদম-সুমারি অনুসারে যে লোক-সংখ্যা জানা গিয়াছিল, তাহারই অনুপাতে এই বৃদ্ধি। কিন্তু দেশের জনসংখ্যা ক্রমে বর্দ্ধমান—এই তিন-চার বৎসরে যত লোক বাড়িয়াছে তাহা ধরিয়া হিসাব করিলে ঐ ১.৭ বৃদ্ধিও পাওয়া যাইবে না। ইহা দেশনায়কের প্রশংসার কারণ নহে। একসময়ে লর্ড কারমাইকেল বাহাদুরের প্রথম শাসনকালে আমাদের আশা হইয়াছিল যে দেশে পানীয় জলের সুব্যবস্থা হইবে; এখন পর্য্যন্ত সে আশা নিষ্ফল হইয়াই আছে। তবে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের হাতে রোড-সেসের সমস্ত টাকা যাওয়াতে ঐ আশা সফল হইবার সম্ভাবনা লর্ড কারমাইকেলের দ্বারাই হইয়াছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে তৎপরে দেশকে নিরুৎসাহ পঙ্গু দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবার প্রধানতম যে কারণ ম্যালেরিয়া তাহা বিদূরিত করিবার একাগ্র বিশাল প্রবল চেষ্টার আশাও এখন পর্য্যন্ত ফলবতী হয় নাই। দেশের প্রাচীন শিল্প পুনরুজ্জীবিত, এবং নূতন শিল্প প্রবর্ত্তিত করিবার কোন সমুচিত আয়োজন এখনও হয় নাই। অনেকগুলি জেলাকে খণ্ড-বিখণ্ড করিবার প্রস্তাব হইয়াছে, এবং কার্য্যেও তাহা সম্পন্ন হইবে; কিন্তু ইহা প্রজাদের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধেই করা হইতেছে। ইহা প্রজারঞ্জন নহে। কলিকাতা মিউ-নিসিপালিটিতে মুসলমানদিগকে স্বতন্ত্র প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার অধিকার দিবার যে প্রস্তাব হইয়াছে, তাহা উদার-নীতিসম্মত নহে। এইরূপ সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন পঞ্জাবে সুফলপ্রদ হয় নাই, তাহা গমর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে স্বীকৃত হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাল কাজ লর্ড কারমাই-কেলের আমলে কিছুই হয় নাই, এরূপ অপ্রকৃত কথা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু শাসননীতির পরিবর্ত্তন, উদারনীতির প্রবর্ত্তন হয় নাই বলিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হয় না। আমাদের বিশ্বাস তাঁহার নিজের ইচ্ছামত কাজ করিবার সুযোগ ও সুবিধা থাকিলে তাঁহার আমলে অনেক কাজ হইতে পারিত, কারণ আমরা জানি যে তিনি "সৌজন্যরঞ্জন" বটে।

সাহিত্যসম্মিলন ও বর্দ্ধমানরাজ।

আগামী সাহিত্যসম্মিলনের সভাপতির পদে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি দেশের লোককে শিক্ষা দিয়া যে যুক্তি দেখাইয়া সেই গৌরবের পদ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন তাহাতে তিনি আপন বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া লোকের প্রীতি-ও-কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। তাঁহার প্রত্যাখ্যানের তিনটি কারণ এই দেখাইয়াছেন যে—(১) সাহিত্যসম্মিলনে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার অভিজ্ঞতা হইয়াছে, যিনি সভাপতি হইবেন তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ও গবেষণা থাকা দরকার;—ইহা তাঁহার নাই। (২) যিনি আজীবন একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবক এবং জীবিত প্রধান সাহিত্যসেবীদের মধ্যে অন্যতম, এ পদে অধিকার তাঁহারই;—তিনি এ পদ দাবী করিবার অনুপযুক্ত। (৩) গত সম্মিলন বর্দ্ধমানে হইয়াছিল, তাহার পরই তাঁহার নির্বাচন অশোভন; অর্থাৎ গত বৎসর বর্দ্ধমানসম্মিলনে সমবেত সাহিত্যিকমণ্ডলী তাঁহার আতিথ্যে সৌজন্যে যেরূপ প্রীত ও বাধ্য হইয়া ফিরিয়াছিলেন তাহারই ফলে তাঁহার সৌজন্যের নিষ্ক্রয়স্বরূপ এই সম্মান, এইরূপ অনুমান অনেকে করিতে পারে; অতএব ইহা তাঁহার অগ্রাহ্য। এই তিনটি যুক্তির মধ্যে মহারাজাধিরাজের অকপট সরলতা, স্পষ্টবাদিতা, বিচক্ষণ প্রাজ্ঞতা প্রকাশ পাইয়াছে। যাহারা অর্থকেই সকল গুণের আকর মনে করিয়া অর্থশালিতার সমাদর করিতেই ব্যগ্র, মহারাজাধিরাজ তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া জ্ঞানচক্ষু উন্মোচন করিয়া দিয়াছেন। আশা করি আমাদের এই শিক্ষা চিরকাল স্মরণ থাকিবে এবং সেজন্য আমরা মহারাজের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব।

সাহিত্যসম্মিলনের সভাপতি।

মহারাজাধিরাজ পদত্যাগ করাতে নূতন সভাপতি নির্ব্বাচন করা আবশ্যক হইয়াছে। সাহিত্যসম্মিলনের সভাপতি যে কেবলমাত্র সাহিত্যব্যবসায়ীরাই হইবার উপ-যুক্ত বা হইয়া থাকেন এমন নজির নাই; যাঁহারা কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়া দেশের জ্ঞান ও

বিদ্যার বৃদ্ধি করিয়াছেন, বিদেশের নিকট স্বদেশকে সম্মানিত ও পরিচিত করিয়াছেন তাঁহারাও সভাপতি হইবার অধিকারী—যেমন ইহার আগে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়েরা নির্বাচিত হইয়া সাহিত্য-সম্মিলনকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সেই নজির অনুসারে আমরা প্রস্তাব করি যে যিনি দেশে জাতীয়-ধারায় চিত্র-বিদ্যাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া নূতন পথে চালনা করিয়াছেন, শিল্পক্ষেত্রে বিদেশের কাছে যিনি আমাদের দেশের প্রতিনিধি, যিনি শিষ্যগণসহ জগৎসভায় আমাদের চিত্রসম্বন্ধে বর্ত্তমান দীনতা কিঞ্চিৎ পরিমাণেও ঢাকিতে সমর্থ হইয়াছেন, সাহিত্য-ক্ষেত্রেও যাঁহার লেখনী চিত্রময়ী ভাষার ইন্দ্রজাল রচনা করিতে সিদ্ধ, সেই শিল্পগুরু শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এবারকার সাহিত্যসম্মিলনের সভাপতি নির্বাচিত হউন।

যদি কেহ অবনীন্দ্রনাথের বয়োবৃদ্ধতার অভাব লইয়া আপত্তি তুলেন তবে আমাদের দ্বিতীয় প্রস্তাব এই যে বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানে গরীয়ান সাহিত্যের সাধক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি অথবা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় সভাপতি নির্বাচিত হউন। ইঁহারা তিনজনেই সম্যক্‌রূপে উপযুক্ত ও যথার্থ অধিকারী। কিন্তু আমাদের মতে এ বৎসর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কেই নির্বাচন করা উচিত।

সাহিত্যসম্মিলনের সভাপতি নির্বাচনের প্রণালী।

সাহিত্যসম্মিলনের সভাপতিনির্বাচনের প্রণালী একটা বিধিসঙ্গত প্রকৃষ্ট ধারা অনুসারে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। ঐ ক্ষমতা কেবলমাত্র স্থানীয় অভ্যর্থনাসমিতি অথবা সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির হাতে থাকা উচিত নয়। অভ্যর্থনা-সমিতি, সাহিত্যপরিষৎ, সাহিত্যসভা প্রভৃতির ন্যায় বিবিধ সাহিত্যসমিতি দুই তিনজন করিয়া উপযুক্ত লোকের নাম প্রস্তাব করিয়া পাঠাইবেন; এই প্রস্তাবের মধ্যে যাঁহার নাম অধিক সমিতি হইতে আসিবে সম্মিলিত সাহিত্যিকদের মতে তিনিই সম্মিলনের সভাপতি নির্বাচিত হইবেন। এইরূপ প্রণালীতে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইয়া থাকেন। এই প্রণালী বা প্রকৃষ্টতর অন্যকোনো প্রণালী ভাবিয়া স্থির করিয়া দেশের অধিকাংশের মত লইয়া এই কার্য্য সম্পন্ন হওয়া উচিত, তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার থাকে না, কাহাকেও বচনীয় হইতেও হয় না।

অসম্পূর্ণ একপেশে শিক্ষা।

পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা ছিল যে ছাত্রদিগকে কিছুদিন পর্য্যন্ত সকল বিষয়ে একটা মোটামুটি জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া লইয়া পরে নিজের রুচি ও শক্তির অনুকূল কোনো বিশেষ পন্থা অবলম্বন করিতে দেওয়া হইত। ইহাতে তাহারা জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সহিত কিঞ্চিৎ পরিচিত হইয়া জগৎব্যাপার সহজে আয়ত্ত করিতে ও বুঝিতে পারিত। কিন্তু নূতন নিয়মে ছাত্রদিগকে অল্প বয়সেই নিজের রুচি ও শক্তির পরিচয় পাইবার পূর্ব্বেই জ্ঞানের একটা বিশেষ শাখা অবলম্বন করিতে হয়। ইহাতে তাহারা অপরাপর বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ অন্ধ হইয়া থাকে। এ ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করা নিতান্ত আবশ্যক। বিশেষজ্ঞ হইতে হইলে যে অপর বিষয়ে অজ্ঞ থাকিতে হইবে এমন ত কথা নয়। কিন্তু যতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন না হইতেছে ততদিন অন্য উপায়ে ঐ ত্রুটির কথঞ্চিৎ প্রতিকার হইতে পারে। আজকাল সকল সভ্য দেশেই একের জ্ঞানকে দশের জ্ঞান করিয়া তোলা হইতেছে; কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ একজন অধ্যাপক থাকিলে অপর দশটা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া তাঁহার জ্ঞানের অংশভাজন হয়। তেমনই আবার বিশেষজ্ঞেরা সর্ব্বসাধারণের জন্য বক্তৃতা দিয়া থাকেন। ইহাকে University Extension বা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসারবৃদ্ধি বলে। সেইরূপে College Extension অর্থাৎ কলেজের প্রসারবৃদ্ধি করা যাইতে পারে। কলেজের ছাত্রগণ দুই শাখায় বিভক্ত—আর্টস্ ও সায়ান্স। প্রত্যেক কলেজ ব্যবস্থা করিবেন কলেজের সময়ের পরে আর্টস্ ছাত্রদের বৎসরে কয়েকদিন ধরুন ১২টা বক্তৃতা দ্বারা সহজ ভাবে মোটামুটি রকমে সায়ান্সের মূল-

তত্ত্বগুলি অধ্যাপকেরা বুঝাইয়া দেখাইয়া শিখাইয়া দিবেন এবং সায়ান্সের ছাত্রদের ইংরেজি সংস্কৃত বাংলা প্রভৃতি সাহিত্য ও ইতিহাস দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে ১২টা করিয়া বক্তৃতা করিয়া শিক্ষা দিবেন। এইরূপ বিভিন্ন শাখার জ্ঞানের আদানপ্রদান হইতে থাকিলে ছাত্রদের শিক্ষা আর অসম্পূর্ণ একপেশে হইয়া থাকিবে না। কলেজের কর্তৃপক্ষ অতি সহজেই এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া দেশের শিক্ষা-বিস্তার ও সম্পূর্ণতাবিধানে সহায়তা করিতে পারেন।

উড়িষ্যায় বাঙালী।

"ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার" বলেন,

১৯১১ খৃষ্টাব্দের সেন্সস অনুসারে উড়িষ্যাদেশে নানা জাতির ১১৩,০০০ জন বাঙালী বাস করে। ইহারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ ত্যাগ করিয়া জগন্নাথের দেশে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেকে ওড়িয়া-ভাষায় কথা বলে এবং অনেকে আবার একপ্রকার বিকৃত বাংলায় কথা বলে; ওড়িয়ারা এই ভাষাকে অবজ্ঞাসূচক কেরা নাম দিয়াছে, উক্ত ভাষা ব্যবহার করে বলিয়া কেরা-ভাষীগণও কেরা নামেই পরিচিত। সমগ্র ওড়িষ্যাপ্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে ৯০০০ কায়স্থ। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে টোডর-মল্লের নির্দ্ধারিত রাজস্বের বন্দোবস্ত স্থায়ী করিবার জন্য সম্রাট আকবর ভদ্রক জলেশ্বর ও কটক এই তিনটি সরকারের সদর কানুনগোরূপে এবং প্রত্যেক পরগণার গোমস্তারূপে যেসকল বাঙালীকায়স্থকে উড়িষ্যায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, ইহারা তাঁহাদেরই বংশধর। মোগলগণ উড়িষ্যা জয় করিবার পূর্ব্বেও বাঙালীরা উড়িষ্যায় অনেক দায়িত্বপূর্ণ ও উচ্চ রাজকার্য্য করিয়াছিলেন। তোগলক রাজত্বের শেষভাগে পুরন্দর বসু সর্ব্বাধিকারী উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই সময় নিশ্চয়ই অনেক বাঙালী তাঁহাকে মুরুব্বী ও অভিভাবক পাকড়াইয়া মহানদীতীরে বাসস্থাপন করিতে গিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগেও উড়িষ্যায় সুবাদার দুর্লভরাম সোম নামক একজন বাঙালী শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইঁহার পিতা মহারাজা জানকীনাথ সোম একসময় বেহারের নায়েববাহাদুর ছিলেন এবং পরে (১৭৬৫ খৃঃ) নবাব মীরজাফরের মন্ত্রী-পদ লাভ করেন। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে বাংলার সমীপবর্ত্তী উড়িষ্যাদেশে মোগলরাজত্বকালে এবং তৎপূর্ব্বেও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত ও কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয় অপেক্ষা উচ্চপদধারী রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। কটকের নরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় নামক একজন বাঙালীই ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর কর্ণেল হারকোর্টকে উড়িষ্যার সমুদয় জমিদারী ও তাহাদের রাজস্বের তালিকা দিয়াছিলেন; ইহা অবলম্বন করিয়াই ইংরেজ-রাজস্বের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। ইঁহারা সকলেই প্রবাসী (domiciled) বাঙালীর তালিকাভুক্ত। সকল শ্রেণীর ও সকল জাতির ওড়িয়ারাই ইঁহাদের অপেক্ষা উচ্চতর অধিকার লাভ করিয়া থাকেন। (বাংলা গবর্ণমেণ্টের ২৪শে জুন তারিখের ১১৭৫ নং আদেশ দেখুন; ইহাতে বিশেষ করিয়া ওড়িয়া গ্র্যাজুয়েটদিগকে চারিটি আইন পড়িবার বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে এবং ওড়িয়া ও বাঙালী উভয় শ্রেণীর যে-কেহ প্রতিযোগিতায় লাভ করিবেন বলিয়া মাত্র দুইটি বৃত্তি রাখা হইয়াছে।) কটকের রাভেন্সা কলেজ-সংশ্লিষ্ট আইনের ক্লাশ উঠিয়া যাইবার পরে এই বৃত্তিগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-কলেজের হাতে আসে, সেখানেও সেগুলি এরূপভাবে বিতরণ করা হয়, যাহাতে প্রবাসী (domiciled) বাঙালীদিগকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়। তিন শত বৎসর ধরিয়া উৎকল প্রদেশে বাস করিয়াও ইহারা সেই দেশের সন্তানপদবাচ্য হইবার উপযুক্ত অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই। প্রবাসী বাঙালীরা এই অবিচারের স্পষ্ট প্রতিবাদ করিয়াছে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু ফল হয় নাই। কি স্বদেশে, কি বিদেশে সরকারী মোটা মাহিনার চাকরীর প্রতি বাঙালীর বিতৃষ্ণা ত দেখা যায়ই না, অধিকন্তু এ কার্য্যে তাঁহাদের আশ্চর্য্য আগ্রহ ও বিশেষ দক্ষতাই সুপরিচিত। কিন্তু উড়িষ্যাপ্রবাসী বাঙালীর ভাগ্য এদিকেও অপ্রসন্ন। স্বর্গীয় রায় বৈকুণ্ঠনাথ দে বাহাদুর ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে "নব্য প্রবাসী বাঙ্গালী সমিতি"র বাৎসরিক সভায় সভাপতিরূপে বলিয়াছিলেন -

> "ভদ্রমহোদয়গণ, যদিও উড়িষ্যার গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে বত্রিশ জন অর্থাৎ সমগ্রের এক-তৃতীয়াংশ বাঙালী, তথাপি তাঁহাদের মধ্যে মাত্র তিনজন শাসন বিভাগে কার্য্য পাইয়াছেন এবং আর দুইজন মাত্র মাসিক এক শত টাকা ও তদূর্দ্ধ বেতনে কার্য্য করিতেছেন; ইহা দ্বারাই এদেশে আমাদের অবস্থা কিরূপ তাহা আপনারা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিতেছেন। অপর পক্ষে ওড়িয়া গ্রাজুয়েটদের এক-তৃতীয়াংশ (৬৫) শাসন বিভাগে কর্ম্ম করিতেছেন এবং অবশিষ্ট কয়জনেরও প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মাসিক একশত টাকা ও তদূর্দ্ধ বেতনে তাঁহাদের উপযুক্ত কার্য্য করিতেছেন।"

এই নয় দশ বৎসরের মধ্যে সে অবস্থার বিশেষ অনুকূল পরিবর্ত্তনের কোন প্রমাণ আমরা পাই নাই। কিন্তু একথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে (গড়জাত মহল বা করদরাজ্যসমূহ বাদ দিয়া) উড়িষ্যার এক-তৃতীয়াংশ প্রবাসী বাঙালীগণের ও কতকগুলি বাঙালী জমিদারের অধিকৃত। বঙ্গের বাঙ্গালীরা বঙ্গপ্রবাসী ওড়িয়াগণের কোন

প্রকার উপার্জ্জনের চেষ্টায় বাধা দেয় না। তাহারা কখন আপনার প্রবাসী ভ্রাতার এই দুর্দ্দশা দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে থাকিতে পারে না। আমাদের প্রাদেশিক সমিতিতে যে-সকল বিষয়ের বিচার হইয়া থাকে, প্রবাসী বাঙালীগণের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা তন্মধ্যে স্থান পাওয়া উচিত। আমরা আমাদের সাহিত্যপরিষদকে অনুরোধ করি যে তাঁহারা উড়িষ্যার বিভিন্ন কেন্দ্রে তাঁহাদের শাখা স্থাপন করিয়া এই-সকল প্রবাসী বাঙালীর ভাষা মার্জ্জিত করিয়া তুলুন এবং তাঁহাদিগকে আমাদের জীবন্ত ও সতেজ বঙ্গসাহিত্যের সহিত যুক্ত করিয়া রাখুন। উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর ও বেহারের প্রবাসী বাঙালীগণ সকলপ্রকার অসুবিধার প্রতিকার করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া মিলিত হউন। এই নূতন প্রদেশের ছোটলাট বেলী সাহেব স্থায়ী বাসিন্দা বাঙালীদিগকে সকল কার্য্যে ওড়িয়া ও বেহারীর সমান বলিয়া ধরিতে ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন। যখনই তাঁহার ইচ্ছার বিপরীত কার্য্য করা হইবে তখনই সেইসকল ব্যাপার তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করা উচিত। প্রবাসী বাঙালীর প্রতি সুবিচারের জন্য মিলিত বঙ্গের দাবী বড়লাট বাহাদুরের সভায় পৌঁছুক। স্বদেশে ও বিদেশে সর্ব্বত্রই বাঙালী এক।

ওড়িষ্যাপ্রবাসী বাঙালীদের একখানি খুব উৎকৃষ্ট সংবাদপত্র থাকা উচিত। "ষ্টার্ অব্ উৎকলে" তবু কিছু কাজ হইত; কিন্তু তাহার নিকট গবর্ণমেণ্ট ২০০০৲ টাকা জামিন চাওয়ায় তাহাও উঠিয়া গিয়াছে। উহার সম্পাদক বড়লাটের নিকট জামিন হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। তাহা মঞ্জুর হইলে ভাল। নতুবা নূতন করিয়া একখানি কাগজ বাহির করা কর্ত্তব্য।

ফ্রান্স দেশে হিউগেনট নামে পরিচিত খৃষ্টিয়ানদের উপর ষোড়শ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া ঘোরতর অত্যাচার হয়। ফলে তাহাদের অনেকে ইংলণ্ডে পলায়ন করে। তাহাদের বংশধরেরা এবং অন্য অনেক আগন্তুক ফরাসীর বংশধরেরা এখন খাঁটি ইংরেজের পূর্ণ অধিকার ইংলণ্ডে পাইতেছে। অনেকে খুব বিখ্যাত হইয়াছেন। যেমন দার্শনিক মার্টিনো। কিন্তু এই-সকল ইংলণ্ডে-পলাতক ফরাসীর বহু পূর্ব্বে যে-সকল বাঙ্গালী উড়িষ্যায় বসবাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখনও ওড়িয়ার সকল অধিকার পান নাই! অথচ সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে মাতৃভূমি জ্ঞান করিতে আমাদিগকে উপদেশ দেওয়া হয়।

বিহার ও উড়িষ্যায় প্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্রদের কৃতিত্ব।

"বেহার হেরাল্ড" বলেন—

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় বেহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের স্কুল ও কলেজসমূহে বাঙালীছাত্রদের ফল বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে। বাঙ্গালীছাত্রদের মধ্যে সচরাচর পরীক্ষোত্তীর্ণের সংখ্যা যেরূপ অধিক হয় এবং তাঁহারা যেরূপ উচ্চজ্ঞানের পরিচয় দিয়া থাকেন, এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে।

বি-এসসি পরীক্ষায় বেহারী কলেজসমূহ হইতে আট জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে চারিজন অর্থাৎ শতকরা ৫০ জন বাঙালী ও অপর চারিজন বেহারী হিন্দু। পরীক্ষোত্তীর্ণদের মধ্যে মুসলমান কিম্বা ওড়িয়া নাই। সমস্ত প্রদেশের মধ্যে মাত্র একজন সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন; তিনি বাঙালী। এই ছাত্রটি জড়বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। এই প্রদেশের যে তিনটি ছাত্র যোগ্যতার সহিত বি-এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে দুই জন বাঙালী।

বি-এ পরীক্ষার ফলে দেখিতে পাই এই প্রদেশের কলেজ্ হইতে উত্তীর্ণ ১৯৯ জন ছাত্রের মধ্যে ৪১ জন অর্থাৎ শতকরা ২০.৬ জন বাঙালী, ৩১ অর্থাৎ শতকরা ১৫.৫ জন মুসলমান, ১০০ অর্থাৎ শতকরা ৫০.৪ জন বেহারী হিন্দু, ২৪ অর্থাৎ শতকরা ১২.১ জন ওড়িয়া এবং মাত্র ৩ অর্থাৎ শতকরা ১.৫ জন খৃষ্টান। যাঁহারা সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যেও বাঙালীরা বেশ উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ ১৪ জনের মধ্যে ৪ অর্থাৎ শতকরা ২৮.৫ জন বাঙালী। ইঁহাদের মধ্যে তিনজন ইংরেজী সাহিত্যে যথাক্রমে দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও দ্বাবিংশ স্থান অধিকার করিয়াছেন।

বেহার ও উড়িষ্যার কলেজ হইতে আই-এসসি পরীক্ষায় ৭৫ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ৩১ অর্থাৎ শতকরা ৪১.৩ জন বাঙালী, ৮ অর্থাৎ শতকরা ১০.৭ জন মুসলমান, ৪১ অর্থাৎ শতকরা ২৮ জন বেহারী হিন্দু এবং ১৫ অর্থাৎ শতকরা ২০ জন ওড়িয়া।

আই-এ পরীক্ষায় ৩৩৮ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তন্মধ্যে ৫৬ অর্থাৎ শতকরা ১৬.৫ জন বাঙালী, ৫২ অর্থাৎ শতকরা ১৫.৩ জন মুসলমান, ১৮৭ অর্থাৎ শতকরা ৫৫.৬ জন বেহারী হিন্দু, ৪১ অর্থাৎ শতকরা .৬ জন খৃষ্টান।

আই-এ এবং আই-এসসি উভয় পরীক্ষাতেই বাঙালীছাত্রেরা বেশ উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন। আই-এ

এবং আই-এসসি উভয় পরীক্ষার ফল একত্র করিয়া যে বৃত্তির তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় এই প্রদেশের প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ও পঞ্চম স্থান বাঙালী অধিকার করিয়াছেন। প্রতিযোগিতার জন্য যে ১৭টি বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে ১১টি বাঙালীছাত্রেরা পাইয়াছেন। ২৫৲ টাকা করিয়া যে ৫টি প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি দেওয়া হয়, তাহার মধ্যে ৪টিই বাঙালী পাইয়াছেন।

আই-এ পরীক্ষায় রাভেন্সা কলেজের একটি ছাত্র এই প্রদেশের মধ্যে প্রথমস্থান পাইয়াছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রদের মধ্যে গুণানুসারে ষষ্ঠ হইয়াছেন। ইনি একজন বাঙালী। আই-এসসি পরীক্ষায় এ প্রদেশে একজন ওড়িয়া প্রথম হইয়াছেন, তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। এই প্রদেশের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছাত্র কিন্তু বাঙালী। তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রয়োদশ ও অষ্টাদশ স্থান লাভ করিয়াছেন। কিন্তু বৃত্তির তালিকায় দেখা যায়, যে, বাঙ্গালীছাত্রেরা আই-এসসি পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান-প্রাপ্ত ওড়িয়াছাত্র অপেক্ষা অধিক নম্বর পাইয়াছেন এবং সেইজন্য বৃত্তির তালিকায় তাঁহাদেরই নাম প্রথমে।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় এ প্রদেশের ১২৯১ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তন্মধ্যে ২৭৬ অর্থাৎ শতকরা ২১·৪ জন বাঙালী, ২৪৪ অর্থাৎ শতকরা ১৮·৮ জন মুসলমান, ৫৬৪ অর্থাৎ শতকরা ৪৩·৭ বেহারী হিন্দু, ১৮৪ অর্থাৎ শতকরা ১৪·৩ জন ওড়িয়া, ২৩ অর্থাৎ শতকরা ১·৮ জন খ্রীষ্টান। বৃত্তির তালিকায় দেখা যায় এ প্রদেশের তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান বাঙালীরা লাভ করিয়াছেন। প্রতিযোগিতার ৩৩টি বৃত্তির মধ্যে বাঙালীরা ১৬ অর্থাৎ শতকরা ৪৮·৫টি পাইয়াছেন।

এই প্রদেশের পরীক্ষার ফল সংক্ষেপে এইরূপে দেওয়া যাইতে পারে—

পরীক্ষোত্তীর্ণের শতকরা হার

	বি,এস-সি,	বি,এ,	আই,এস-সি,	আই,এ,	ম্যাট্রিক
বেহারী হিন্দু	৫০	৫০·৩	২৮	৫৫·৬	৪২.৭
বাঙালী	৫০	২০·৬	৪১·৩	১৬·৫	২১.৪
মুসলমান	০	১৫·৫	১০·৭	১৫·৩	১৮.৮
ওড়িয়া	০	১২·১	২০	১২	১৪.৩
খৃষ্টান	০	১·৫	০	‘৬	১.৮

এই-সকল পরীক্ষ'র ফলে আমরা আর-একটি বিশেষত্ব দেখিতে পাই। কেবলমাত্র বেহারের পরীক্ষোত্তীর্ণ বালকদের এক-চতুর্থাংশেরও অধিক বাঙালী কর্তৃক পরি-চালিত বাঙালীদের বিদ্যালয়ের ছাত্র। খাস বেহারে ৫৭টি উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় আছে, তন্মধ্যে ৯ অর্থাৎ শতকরা ১৫·৮টি বাঙালীদের সম্পত্তি এবং তাঁহাদের দ্বারাই পরি-চালিত। প্রবেশিকা পরীক্ষায় বেহারের বিদ্যালয়সমূহ হইতে যে ৮২৪ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ২১৪ জন অর্থাৎ শতকরা প্রায় ২৬ জন বাঙালীদের বিদ্যালয়ের ছাত্র। যদি আমরা পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা দ্বারা বিদ্যালয়গুলির বিচার করি তাহা হইলে দেখিতে পাই সমগ্র প্রদেশের মধ্যে রাভেন্সা কলেজিয়েট স্কুল প্রথম স্থান লাভ করে; ইহা হইতে ৪৫ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বাঁকিপুরের টি কে ঘোষের একাডেমি দ্বিতীয়, ইহা হইতে ৪২ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন; বিদ্যালয়টি বাঙালীদের সম্পত্তি ও তাঁহারাই পরিচালনা করেন। তৃতীয়স্থানপ্রাপ্ত ছাপরার শরণ-একাডেমি (Saran Academy of Chuprah) হইতে ৩৯ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত বিদ্যালয় যে-বাঙালীভদ্রলোকগণের সম্পত্তি ইহাও তাঁহাদেরই।

সমগ্র প্রদেশের মধ্যে এমন একটি সহর নাই যেখান হইতে বাঙালীছাত্র উত্তীর্ণ হন নাই; ইহাও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইহা দ্বারা বোঝা যায় যে বাঙালীরা এই প্রদেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছেন! বাঙালীছাত্রদের প্রবেশিকাপরীক্ষার ফল নিম্নে দেওয়া গেল—

	বাঙালীর সংখ্যা
বেহার	১১২
সাঁওতাল পরগণা	৩৯
ছোটনাগপুর	৮১
উড়িষ্যা	৩৮
প্রাইভেট	৬
মোট	২৭৬

এই প্রদেশের রাজধানী পাটনায় দুইটি উল্লেখযোগ্য উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় আছে। একটি গভর্ণমেণ্টের সম্পত্তি পাটনা কলেজিয়েট স্কুল, অপরটি স্বর্গীয় বাবু বিশ্বেশ্বর সিংহ ও শালিগ্রাম সিংহ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বেহার ন্যাশন্যাল কলেজিয়েট স্কুল। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে এই দুইটি বিদ্যালয় হইতে একটিও বাঙালী ছাত্র উত্তীর্ণ হন নাই। আমরা অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে এই বিদ্যালয় দুইটিতে একটিও বাঙালী ছাত্র নাই। ইহার কারণ কি?

উপরে যে সংখ্যাগুলি দেওয়া হইল তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে বেহার-উড়িষ্যা প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে হাজারে ছয়জন মাত্র প্রবাসী বাঙালী। শিক্ষার জোরেই বঙ্গের বাহিরে বাঙালীর প্রতিষ্ঠা। শিক্ষায় তাঁহারা এখনও পশ্চাতে পড়েন নাই দেখিয়া আনন্দ হয়। কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষালাভের সুবিধা ক্রমশঃ কমিতেছে। তাহা বেহার হেরাল্ড হইতে সংকলিত নিম্নলিখিত বিষয়টি হইতে বুঝা যাইবে।

বিহার ও উড়িষ্যায় প্রবাসীবাঙ্গালীর চিকিৎসা শিক্ষা।

"বেহার হেরাল্ড" বলেন—

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই আগষ্ট তারিখের বেহার ও উড়িষ্যা গেজেটে—বেহার ও উড়িষ্যার মেডিকেল স্কুলে প্রবেশের ও শিক্ষার পরিবর্ত্তিত নিয়মসকল প্রকাশিত হইয়াছে। এ প্রদেশে মাত্র দুইটি মেডিকাল স্কুল আছে; একটি পাটনার টেম্পল মেডিক্যাল স্কুল, অপরটি কটকের উড়িষ্যা মেডিক্যাল স্কুল। দুইটি বিদ্যালয়েই ঊর্দ্ধ পক্ষে কতগুলি ছাত্র লওয়া যাইতে পারে তাহা স্থির হইয়া গিয়াছে। পাটনা টেম্পল মেডিক্যাল স্কুলে ১৭০ জনের অধিক এবং উড়িষ্যা মেডিক্যাল স্কুলে ১৬০ জনের অধিক ছাত্রের প্রবেশের অধিকার নাই। এখন অধ্যয়নকাল ৪ বৎসর হওয়াতে পাটনা বিদ্যালয়ে গড়ে প্রতি শ্রেণীতে ৪২ জন ও উড়িষ্যা বিদ্যালয়ে ৪০ জন করিয়া ভর্ত্তি হইতে পারে।

এই পরিবর্ত্তিত নিয়মপ্রণালীর পঞ্চম ধারার একটি টিপ্পনীতে আছে :—"বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের প্রবেশের পর যে-সকল স্থান খালি থাকিবে টেম্পল মেডিক্যাল স্কুলে সেই-সকল অপূর্ণ স্থানে বেহারী প্রার্থীদের এবং উড়িষ্যা মেডিক্যাল স্কুলে ওড়িয়া প্রার্থীদের দাবী থাকিবে। অন্যান্য প্রার্থীদের পূর্ব্বে তাঁহারা মনোনীত হইবেন। ছোটনাগপুর-বাসীগণও এবিষয়ে উপরোক্ত দুই বিদ্যালয়ে যথাক্রমে বেহারী ও ওড়িয়াদের সমান অধিকার পাইবেন।" তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে বিদ্যালয়ে প্রবেশের বিষয়ে ছোট-নাগপুরবাসীগণ বেহারী ও ওড়িয়াগণের সমান অধিকার পাইলেও, এই প্রদেশের স্থায়ী বাঙ্গালীবাসিন্দাগণ ও বেহার ও উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী অস্থায়ী বাঙ্গালীবাসিন্দা-গণের পুত্রগণ এই অধিকারে বঞ্চিত। আমরা এই পার্থক্যের কোন কারণ খুঁজিয়া পাইতেছি না।

বৃত্তিদান বিষয়েও বেহারী ওড়িয়া ছোটনাগপুরী ও বাঙ্গালীদের মধ্যে পার্থক্য রাখা হইয়াছে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে মাসিক দশ টাকা করিয়া ২৪টি বৃত্তি দেওয়া হয়; এই ২৪টি বৃত্তি চারিটি বাৎসরিক শ্রেণীতে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। নিয়মপ্রণালীর বিংশধারা অনুসারে ২৪টি বৃত্তির মধ্যে ৪টি সেই প্রদেশের যে অংশে বিদ্যালয়টি স্থাপিত সেই অংশের খাঁটি অধিবাসীদিগকে অর্থাৎ টেম্পল মেডিক্যাল স্কুলে বেহারীদিগকে এবং উড়িষ্যা মেডিক্যাল স্কুলে ওড়িয়াদিগকে প্রদত্ত হয়। প্রত্যেক বাৎসরিক শ্রেণীতে একটি করিয়া বৃত্তি একটি ছোটনাগপুরের খাঁটি অধিবাসীকে দেওয়া হয়, সেরূপ কেহ না থাকিলে তাহা টেম্পল মেডিক্যাল স্কুলে কোন বেহারীকে এবং উড়িষ্যা মেডিক্যাল স্কুলে কোন ওড়িয়াকে দেওয়া হয়। পরিশেষে বাঙালীছাত্রদের জন্য প্রতি বাৎসরিক শ্রেণীতে একটি করিয়া বৃত্তি দেওয়া হয়; এই ছাত্রকে হয় এই প্রদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হইতে হইবে নয় বেহার ও উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মচারীর সন্তান হইতে হইবে।

এই প্রদেশের দুইটি বিদ্যালয়েই পরীক্ষায় প্রতি-যোগিতার দ্বারা প্রবেশ লাভ করিতে হয়। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রগণকে এই প্রতিযোগী পরীক্ষার ফল দেখিয়াই বৃত্তি দেওয়া হয়; দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদিগকে বাৎসরিক পরীক্ষার ফল দেখিয়া বৃত্তি দেওয়া হয়। উপরোক্ত নিয়ম অনুসারে, যে বাঙালী এই প্রদেশের স্থায়ী বাসিন্দা কিম্বা কোন গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর পুত্র নহেন, তিনি বৃত্তিলাভের জন্য কোন পরীক্ষা দিবারও অধিকারী নহেন। উপরোক্ত নিয়মপ্রণালীর একাদশ ধারার দ্বিতীয় ব্যতিক্রম আপত্তি-জনক। ইহা বলে—এই প্রদেশবাসী বা ভিন্নপ্রদেশীয় স্থায়ী বাসিন্দা বা গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর পুত্র ভিন্ন অন্য কোন প্রার্থীকে যদি এইসকল বিদ্যালয়ে গ্রহণ করা হয় তবে তাঁহাকে ১০৲ টাকা প্রবেশ-ফি দিতে হইবে। এই নিয়ম কোন্ নীতিশাস্ত্র অনুসারে করা হইয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। এই প্রদেশীয়, এই প্রদেশের স্থায়ী ভিন্নপ্রদেশীয় বাসিন্দা এবং বেহার ও উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীর পুত্র ভিন্ন অন্য কোন লোক, (ধরুন একজন বাঙালী কি উত্তরপশ্চিম অঞ্চলবাসী) যদি এদেশে বহুকাল বাস করিয়াও স্থায়ী বাসিন্দারূপে পরিচিত না হন, কিম্বা যদি খাঁটি ভিন্নপ্রদেশীয়ই হন, তবে বিদ্যালয়ে প্রবেশেচ্ছু হইলে এবং সে ইচ্ছা সফল হইলে তাঁহাকে ১০৲ টাকা প্রবেশ-ফি দিতে হইবে, কিন্তু খাঁটি এই প্রদেশীয় অথবা এই প্রদেশের স্থায়ী বাসিন্দা কিম্বা গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর পুত্র হইলে মাত্র ২৲ টাকা লাগিবে।

এ প্রদেশের স্থায়ী বাঙালীগণ যে কেন ঐ দুইটি বিদ্যালয়ে প্রবেশের ও বৃত্তিলাভের বেলা খাঁটি এইপ্রদেশীয়-দের সমান অধিকার পাইবেন না, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে হইলে ভিন্ন-প্রদেশীয়গণকে যে কেন বেশী টাকা দিতে হইবে তাহাও বুঝিলাম না। প্রথমেই যখন বলা হইয়াছে যে খাঁটি এই প্রদেশের ছাত্রদের ব্যবস্থা হইয়া যাইবার পর অন্য প্রদেশের ছাত্রদের প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে, তখন আবার বেশী প্রবেশ-ফি'র সৃষ্টি করিয়া আর-একটা বিঘ্ন জন্মাইবার কি কোন আবশ্যক ছিল? এই নিয়মগুলি কি বাঙালীছাত্রদের এ দেশে আসিবার পথ বন্ধ করিয়া দিবার জন্য কল্পিত হইয়াছিল?

প্রথমাবস্থায় বাঙালীরাই এই দুইটি বিদ্যালয়ের প্রধান অবলম্বন ছিলেন। এখনও উভয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে যথেষ্ট বাঙালী আছেন। গত বৎসর টেম্প্‌ল মেডিক্যাল স্কুল হইতে ১৬ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ৬ জন বাঙালী। একজন বাঙালীই প্রথমস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। উড়িষ্যা মেডিক্যাল স্কুল হইতে ১৫ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ৯ জন বাঙালী। প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান দুই জন বাঙালী কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল।

শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাদের ও অন্য প্রদেশীয় জনসাধারণের মধ্যে পার্থক্যসৃষ্টির আমরা একেবারেই সমর্থন করি না। কোন ভারতবাসী যদি ইংলণ্ডে যান, তবে তাঁহাকে সেই দেশীয় ছাত্রদের সহিত প্রতিযোগিতায় প্রবেশ করিতে ও তথাকার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার কি বৃত্তি লাভ করিতে কেহ বাধা দেন না। কিন্তু ভারতবর্ষে এক প্রদেশের লোককে বলা হয় তোমার পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশে তোমার এ অধিকার নাই। খাঁটি স্বদেশী লোককে চিকিৎসাশাস্ত্র-অধ্যয়নে উৎসাহিত করার বিষয়ে আমাদের কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু বিদ্যালয়ে সকল জাতীয়ের প্রতি সমান ব্যবহারেরই আমরা সমর্থন করি।

স্কুলকলেজে ভর্ত্তি হওয়া বা সরকারী বৃত্তি পাওয়ার অধিকার আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের অন্য অধিবাসীদের যেমন প্রবাসী বাঙালীদেরও তেমনি। ভারতবর্ষের ছাত্রেরা জার্মেনী আমেরিকা গেলে সেখানেও পড়িবার ও বৃত্তি পাইবার সমান অধিকারী হয়। আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ একই রাজার অধীন। ইহার এক অংশ হইতে অন্য অংশে পড়িতে গেলে, বা কাহারও পূর্ব্বপুরুষ ভিন্ন প্রদেশ হইতে আসিয়া থাকিলে, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে শিক্ষার পথে এত বাধা দেওয়া অনুচিত।

জল ছাড়িয়া যেমন মাছ বাঁচিতে পারে না, প্রবাসী বাঙালীও তেমনি শিক্ষাব্যতিরেকে বাঁচিতে পারে না। অতএব প্রবাসী বাঙালীরা শিক্ষালাভের অধিকার কোন মতেই যেন খর্ব্ব হইতে না দেন। আন্দোলন ও আত্মনির্ভর দ্বারা যাহা কিছু হইতে পারে, তাঁহারা করিতে থাকুন। বাঙ্গলার অধিবাসী বাঙালীদের কাছে প্রবাসী বাঙালীরা কিরূপ সহযোগিতা চান, বলুন; আমরা তাঁহাদের সহযোগী ও সহকারী হইতে প্রস্তুত আছি।

ভারতস্ত্রীমহামণ্ডল।

ভারতস্ত্রীমহামণ্ডলের ষাণ্মাসিক অধিবেশনে উহার কলিকাতা শাখার সম্পাদিকা এই রিপোর্টটি পড়িয়াছিলেন।

বর্ত্তমান বৎসরে গত জানুয়ারী হইতে জুন পর্য্যন্ত ভারতস্ত্রীমহামণ্ডলের আয় হইয়াছে ৩৬২১৲ টাকা—
আর ব্যয় হইয়াছে ৩০৪৯৲ টাকা

টাকা ৫৭৫৲ হাতে জমা আছে।

আপনাদের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন যে গত ডিসেম্বর মাসে শ্রীমতী সরলাদেবী আসিয়া সমিতির আর্থিক অবস্থার উন্নতি-কল্পে ৩ মাস কলিকাতায় ছিলেন। এবং কয়েকজন উৎসাহী ও সহযোগী মেম্বরের সাহায্যে গত ফেব্রুয়ারী মাসে মাননীয়া লেডি কারমাইকেলের সমক্ষে সম্ভ্রান্ত বালিকাদের দ্বারা 'সাত ভাই চম্পা' নাট্যাভিনয় করান। সর্ব্বসুদ্ধ পাঁচবার অভিনয় হইয়াছিল এবং টিকিট বিক্রয়ের দ্বারা ২০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে সমস্ত খরচ বাদ দিয়া ৩০০৲ টাকা যুদ্ধ-ফণ্ডে দেওয়া হয়, ৫০০৲ টাকায় ভারতস্ত্রীমহামণ্ডলের পূর্ব্ব বৎসরের ঋণ শোধ যায়। আর হাতে ২৫০৲ উদ্বৃত্ত থাকে। আপনারা শুনিয়া সুখী হইবেন গত জুলাই মাসে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস ব্যারিষ্টার মহাশয় তাঁহার 'সাগর-সঙ্গীত' পুস্তকের লাভাংশ ৪০০৲ টাকা ভারতস্ত্রীমহা-মণ্ডলকে দান করিয়াছেন। এই-সব টাকা একত্র করিয়া উপস্থিত স্ত্রীমহামণ্ডল-ফণ্ডে ১২২৫৲ টাকা জমা আছে।

১৯১৪ সালে আগষ্ট মাসে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় সমিতির ২।৪ জন ধনী পৃষ্ঠপোষক যখন চাঁদা কমাইয়া দিবেন বলিলেন, আমরা তখন একটু ভয় পাইয়া ভাবিয়াছিলাম তবে কি সমিতির কাজ কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখিতে হইবে? নতুবা আমরা কি করিয়া খরচ চালাইব? কিন্তু যে কাজের মূলে ভগবানের দয়া ও প্রেরণা থাকে, যে কাজের জন্য সাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি পাওয়া যায়, সে কাজের কখন বিনাশ নাই। আপনারা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন এ বৎসর সমিতির আয় কমিয়া যাওয়ার পরিবর্ত্তে সমস্ত ধার শোধ গিয়া ১২০০৲ টাকা হাতে জমিয়াছে। ইংরেজীতে একটি কথা আছে—Strike the iron when it is hot, অর্থাৎ লোহ যখন গরম হয় তখন উহাতে ঘা মার—তাহা হইলেই কাজ হইবে।

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যখন শ্রীমতী সরলাদেবী ভারতস্ত্রী-মহামণ্ডলের শাখা কলিকাতায় প্রতিষ্ঠা করেন তখনই তিনি বলিয়াছিলেন ইহার অধীনে একটি শিক্ষয়িত্রী-ভবন

না খুলিলে ইহার অন্তঃপুর-শিক্ষার কাজ সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারা যাইবে না। ভগবানের দয়ায় এবং আপনাদের আশীর্ব্বাদে আজ আমরা স্ত্রীমহামণ্ডলের সেই শিক্ষয়িত্রী-আশ্রমের জন্য সাধারণের কাছে উপস্থিত হইয়াছি। এই আশ্রমের জন্য কেবল ১২০০০৲ বার হাজার টাকা মাত্র আবশ্যক। আমার বোধ হইতেছে পাঠকপাঠিকাদের মধ্যে অনেকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিতেছেন—এই দুর্বৎসরে অত টাকা কি করিয়া উঠিবে? কিন্তু আমার প্রাণের মধ্যে যেন আকাশবাণী হইতেছে—অবশ্য উঠিবে, নিশ্চয় উঠিবে।

জানি—বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য এ বৎসর সমগ্র পৃথিবী-বাসী লোকের মধ্যে মহা হুলস্থুল উপস্থিত হইয়াছে! জানি—স্থানে স্থানে অনাবৃষ্টি বা জলপ্লাবনে ভারতের দেশে দেশে হাহাকার উঠিয়াছে! লক্ষ লক্ষ লোক যুদ্ধাহুতিতে বলিদান পড়িতেছে! হাজার হাজার নরনারী অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে! কিন্তু আমাদের দেশের কজন ধনী-লোক সেইকারণে নিজেদের আমোদবিলাসের তিলার্দ্ধ কমাইয়াছেন? আমি মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কথা বলিতেছি না, তাঁরা সব সময়েই মিতব্যয়ী ও পরদুঃখকাতর। কিন্তু যাঁরা দেশের মধ্যে সম্পত্তিশালী, সকল দেশেই যাঁদের অর্থে অনেক সৎকাজ প্রতিষ্ঠিত ও চালিত হয়, আমাদের দেশের সেই শ্রেণীর ভিতরে কি আপনারা কোন অভাব কষ্টের লক্ষণ দেখিয়াছেন? এই যে গত ৩ মাসের মধ্যে কেবল এক কলিকাতা সহরেই প্রায় ৫০০ টা বড় বড় বিবাহ হইয়া গেল তাহাতে কি আপনারা কেহ বাজনাবাদ্যের কম আওয়াজ শুনিয়াছেন—আলোর চাকচিক্য ও শোভাযাত্রার কি কম আড়ম্বর দেখিয়াছেন? দেশের দুর্ব্বৎসর বলিয়া কোন পাত্রের পিতা কন্যার অভিভাবকের নিকট হইতে কিছু কম পাওনা লইয়াছেন? কোন কোন স্থলে দেখা গিয়াছে কন্যাকর্ত্তারা নিজেই কন্যার দান সম্বন্ধে এত বাড়াবাড়ি করিয়া অযাচিত ভাবে ঢালিয়া দিয়াছেন যে ভাবিলে কষ্ট হয়! মনে হয় আহা! ঐ বাড়তি দানে কত গরীবের মেয়ে উদ্ধার হইতে পারিত! আপনারা বলিতে পারেন আপনার বাড়ীর পাশে ঐ লক্ষপতির গৃহিণী কি এ বৎসর একখানা গহনা কম গড়াইয়াছেন? না দুইখানা ঢাকাই কাপড় বা দুইটা লেসওয়ালা ব্লাউস কম কিনিয়াছেন? কোন ধনী গৃহলক্ষ্মী কি চারিজন দাসীর স্থানে দুইজন কমাইয়া নিজে সংসারের কাজ করিতেছেন? আপনারা বলিবেন—যাঁদের টাকা আছে তাঁরা কেন ভোগ করিবেন না? আমিও ত তাই বলিতেছি—তাঁরা জন্ম জন্ম সুখে স্বচ্ছন্দে থাকুন। দেশে ধনী লোক না থাকিলে দরিদ্র প্রতিপালিত হইবে কি-প্রকারে?

সকল দেশেই ধনীদের অর্থে দরিদ্রদের শিক্ষার আয়োজন হইয়া থাকে, বড়লোকদের ধনের সাহায্যেই দেশের গরীবদের ও অভাবগ্রস্ত লোকদের দুঃখ দূর করা হয়। তবে আমাদের দেশের সম্পত্তিশালী লোকেরা অপেক্ষাকৃত অভাবগ্রস্ত ভগিনীদের প্রতি চাহিবেন না কেন? ঈশ্বরদত্ত অর্থে তাঁহারা ভগবানের কাজ করিতে বিমুখ থাকিবেন কেন? কেবল নিজেদের ও নিজের সন্তানসন্ততির সুখ-স্বচ্ছন্দতার বিধান করিয়া ক্ষান্ত হইলে ত চলিবে না? কেবল ধনীর গৃহিণী নয়, আমাদের দেশে ধনী বিধবাও অনেক আছেন যাঁহাদের অর্থের কোনপ্রকার সদ্ব্যবহার হয় না, তাঁহাদের সকলের কাছেই আমার এই নিবেদন যে এই যে দেশের অন্তঃপুরিকাদের শিক্ষার জন্য ও দরিদ্র মেয়েদের অভাব মোচনের জন্য একটা মহৎ কাজের ভিত্তি স্থাপিত হইতেছে ইহাতে সকলেই সাধ্যমত দান দিয়া আমাদের এই সৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করুন।

ভারতস্ত্রীমহামণ্ডল কেবল ধনী মহিলাদের নিকট সাহায্য চাহিয়া নিরস্ত হইবে না। প্রতি মধ্যবিত্তের গৃহিণী, প্রতি গৃহস্থের মেয়ের ইহাতে যোগ ও সাহায্যের আবশ্যক। বৎসরে একটি মাত্র টাকা দিয়া সকলে ইহার মেম্বর হউন, যাঁহারা মেম্বর আছেন তাঁহারা আত্মীয়স্বজনদের মেম্বর করাইয়া দিন; তাহা হইলে অতি শীঘ্র আমাদের ৭০০ শত মেম্বর ৭০০০ সাত হাজারে উঠিবে। এই সমিতি নারী-পুঞ্জের একটি প্রবল শক্তি হইয়া দেশের সহস্র সহস্র দুর্ভাগ্য নারীর দুঃখ দূর করিতে ও অভাব মোচন করিতে সক্ষম হইবে। নিষ্পেষিত নারীজাতি হইলেও আমাদের ভিতরে যে মহত্ত্ব আছে, বঙ্গের কোমল রমণী হইলেও আমাদের অন্তরে যে সাধনা আছে, 'অকেজো' বলিয়া উপেক্ষিত হইলেও আমাদের মনে যে কার্য্যশক্তি আছে, তাহারই দ্বারা এই ভারতস্ত্রীমহামণ্ডল স্থাপিত ও চালিত হইতেছে এবং তাহারই বলে বর্দ্ধিত ও ফলপ্রদ হইবে। ঈশ্বর করুন আমাদের এই শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ।

বাঁকুড়ায় অন্নকষ্ট কয়েক মাস হইতে হইয়াছে। এখন উহা ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। এ বিষয়ে আমরা কয়েকটি চিঠি পাইয়াছি। তিনখানি হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। কেঞ্জাকুড়া গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত রামানুজ কর লিখিয়াছেন:—

বাঁকুড়া জেলায় এবৎসর বড়ই জলাভাব। জলাভাবে ধানের চারাগাছ মরিয়া যাইতেছে। এতদিন পর্য্যন্ত কৃষকেরা পুষ্করিণী হইতে জল সেচন করিয়া বীজ বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল কিন্তু এখন পুষ্করিণীতেও জল নাই। চারা বাঁচাইবার আর কোন উপায়ই

দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, এজন্য কৃষকেরা চারা কাটিয়া গোরুকে খাওয়াইতেছে। দুরবস্থায় কৃষকগণ ধান্য কর্জ্জ পাইতেছে না; মহাজনগণ অনাবৃষ্টি দেখিয়া হাত গুটাইয়াছে।

বাঁকুড়া জেলার কেঞ্জাকুড়া গ্রামে অন্যূন ৮৫ ঘর কামারের বাস। পূর্ব্বে ঘর প্রতি একটী বা ততোধিক বাসনের কারখানা ছিল। এ জন্য পূর্ব্বে এই গ্রামে ৮৫টী কারখানা ছিল। এই সকল কারখানায় প্রধানতঃ কাঁসার বাটি প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বে এখানের কারখানায় থালা কি গ্লাস প্রস্তুত হইত না; এখন তাহাও তৈয়ার হয়। প্রতি কারখানায় প্রত্যহ ৬ জন লোক কাজ করিত। এজন্য পূর্ব্বে এই-সকল কারখানায় ৫১০ জনেরও অধিক লোক কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। প্রতি কারখানায় অন্যূন ।০ সের বাটি প্রস্তুত হইলে প্রত্যহ ২১।০ মন বাটি প্রস্তুত হইত। এই সকল বাটি এখান হইতে বাঁকুড়া ও রাণীগঞ্জ চালান যায়। তথা হইতে ভারতবর্ষের নানাস্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে। কলিকাতা, পূর্ব্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, আসাম, বিহার, ছোটনাগপুর, যুক্তপ্রদেশে, এমন কি ব্রহ্মদেশেও রপ্তানি হইয়া থাকে।

যুদ্ধ আরম্ভ হইতেই বাসনের কাজ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছিল, এ-জন্য অনেক কারখানা বন্ধ হইয়া যায়; এখন কেবলমাত্র ৬০টী কারখানা বর্ত্তমান আছে। পঞ্চশতাধিক লোক যে-সকল কারখানায় কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত এখন তাহা একেবারে বন্ধ হওয়ায় তাহাদের অন্নাভাব ঘটিয়াছে।

গ্রামে মৎস্য ধরিবার জন্য ছোট বড় সকল রকমের কাঁটা প্রস্তুত হয়। মাছে টোপ খাইলে কাঁটা সোজা করিয়া দিতে পারে না ইহাই এখানের কাঁটার বিশেষত্ব। কয়েকজন কামার কাঁটা কাটিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত।

গ্রামে শতাধিক ঘর তাঁতী ও পোদ্দারের বাস। এখানে সূতা ও তসরের নানাপ্রকার জামার থান, বিছানার চাদর, লেপের খোল, গামছা, কাচা, মটাভুনি (শাড়ী), তসরের চাদর ধূতি ও শাড়ী প্রভৃতি তৈয়ার হয়। অন্যান্য বৎসর অনেক মহাজন বর্ষাকালে তাঁতের কাপড় কিনিয়া ধরিয়া রাখিত এবং শীতকালে কাপড়ের টান হইলে উচ্চ মূল্যে বিক্রী করিত; কিন্তু এ বৎসর কোন মহাজন কাপড় কিনে নাই।

গত আষাঢ় মাসে টাকায় ২২ সের ধান পাওয়া গিয়াছিল। এখন টাকায় ১৬।১৭ সের ধান পাওয়া যাইতেছে না। চালের দর টাকায় ৬ সের ৬॥ সের, চালেরও আমদানী নাই। গত ২রা ভাদ্র কেঞ্জাকুড়া বাজারে চাল পাওয়া যায় নাই। সেদিন অনেক তাঁতী কামারকে ময়দা খাইয়া দিন কাটাইতে হইয়াছিল। কামার তাঁতিদের মধ্যে কাহারও দুই বেলা অন্ন জুটিতেছে না। অনেকে অন্যান্য গ্রামে মাথায় মোট করিয়া কাপড় ও বাসন বিক্রয় করিতে লইয়া যায় কিন্তু বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে।

এ অঞ্চলে পয়সা দিয়া কাজ করাইবার রীতি নাই. মজুরেরা কাজ করিলে দৈনিক ৪।৫ পাই ধান্য পাইত; ঠিকায় যত মাটী কাটিলে ৫।৬ পাই ধান্য পাইত এখন ২ পাই ধানে তত মাটী কাটিতে স্বীকৃত হইলেও তাহারা কাজ পাইতেছে না। ভদ্রলোকেরা ঘরের দুধ স্বয়ং না খাইয়া, এমন কি ছোট ছোট ছেলেদিগকেও খাইতে না দিয়া, বিক্রয় করিয়া যাহা পাইতেছে তদ্দ্বারা সংসার চালাইতেছে।

পানীয় জলকষ্টের বিষয় আর কি বলিব। পল্লীগ্রামে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাসেই জলাভাব থাকে, কিন্তু এই ভাদ্র মাসেও এক বিন্দু সুপেয় জল পাওয়া যাইতেছে না। বীজ বাঁচাইবার জন্য জলসেচন করায় অনেক পুষ্করিণী নিঃশেষ হইয়াছে; যে-সকল পুষ্করিণী গভীর এবং যাহাতে জলসেচন করিবার সুবিধা নাই, সেই-সকল পুষ্করিণীর সামান্য কর্দ্দমাক্ত ঘোলাটে জল লোকে পান করিতেছে। বিষাক্ত জলপান করার পরিণাম এখন হইতেই দেখিতে পাইতেছি। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে কেঞ্জাকুড়া গ্রামে কলেরা হওয়ায় অনেক লোকের মৃত্যু হইয়াছে। একটি পল্লীগ্রামে দুই মাস কলেরা থাকা সহজ কথা নহে। অন্যান্য পল্লীগ্রামেও কলেরা হইতেছে, তাহার সংবাদ পাইতেছি। এখন হইতেই অনেক লোকের জ্বর হইতেছে, ২।১ জন মারা যাইতেছে। আশ্বিন মাস ম্যালেরিয়ার সময়, তখন এ অঞ্চলে কিরূপ দুরবস্থা হইবে তাহাও চিন্তার বিষয়।

যদি কোন পরদুঃখকাতর, দয়ার্দ্র হৃদয় ব্যক্তি জলাশয় খনন করাইয়া দেন তাহা হইলে অল্প বেতনে অনেক মজুর পাওয়া যাইবে এজন্য কম খরচে বৃহৎ জলাশয় হইবে। এবং এ স্থানের জলকষ্ট নিবারিত হইবে।

জামজুড়ী গ্রাম হইতে কোন ভদ্রলোক লিখিয়াছেন—

এ বৎসর আমাদের দেশে যে অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ হইয়াছে ইহা বোধ হয় আপনি অবগত হইয়াছেন। আমাদের জামজুড়ী গ্রামে কাহারো অন্ন নাই। এই বর্ষব্যাপীকাল কি উপায়ে অতিবাহিত হইবে তাহা ভাবিয়া জীবন্মৃত হইয়াছি। যে-সকল স্থানে ধান্য রোপণ হইয়াছিল তাহা সমস্তই শুখাইয়া গিয়া ধান্যের চারা মরিয়া গিয়াছে, এক ছটাক ধান্য পাইব না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব দুই বৎসর সামান্য পরিমাণ ধান্য হওয়ায় যাহা মজুত ছিল তাহাও নিঃশেষ হইয়াছে। এক্ষণে নিরুপায়।

বাঁকুড়া-কলেজ-হষ্টেল হইতে একজন ছাত্র লিখিয়াছেন—

দিন কয়েক পূর্ব্বে আমরা ৩ জন কলেজের ছাত্র ইন্দপুর থানায় কয়েকটি গ্রাম দেখিতে গিয়াছিলাম। ইন্দপুর গ্রামের প্রায় পঞ্চাশ ঘর তাঁতির দুরবস্থা দেখিলে অশ্রুসংবরণ করা যায় না। অনেকেই দুই তিন দিন অনশনে আছে—তাহা ছাড়া আরও অন্যান্য দুই তিনটি গ্রামের মধ্যে প্রায় দেড়শত লোকের অবস্থা অতীব শোচনীয়। হীরাসোল গ্রামে কাহারও ঘরে এক দিনেরও অন্নের সংস্থান নাই। আমরা আরও তিন চারিটি গ্রাম দেখিয়াছিলাম—সকলেরই অবস্থা একরূপ; আমরা যেখানে গিয়াছি সেইখানেই দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত নরনারীর হৃদয়স্পর্শী ক্রন্দন-ধ্বনি।

খাতড়া থানার অবস্থাও প্রায় ঐরূপ। গঙ্গাজলঘাটী থানার অবস্থা অতীব শোচনীয়। অদ্য বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম তথায় তিনজন লোক অনশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। সেখানে চাউল প্রভৃতি এক গাড়ী প্রেরিত হইল।

দেশ হইতে দলে দলে লোক কাজের চেষ্টায় বর্দ্ধমান হুগলি প্রভৃতি স্থানে যাইতেছে এবং নিরাশ হইয়া দেশে 'মরিবার জন্য' ফিরিয়া আসিতেছে। দেশে ভিক্ষা মিলিতেছে না। একজন লোক শ্রাবণ মাসের শেষে বারবিঘা শোল জমি (যাহা অন্য সময়ে বারশত টাকাতেও কেহ দেয় না) ৪৫০৲ সাড়ে চারিশত টাকায় বিক্রয় করিয়াছে, কিন্তু এক্ষণে অল্পমূল্যেও ক্রয় করিবার লোকের অভাব। অনেকে দুই তিন দিন উপবাসে কাল কাটাইতেছে। ইহার পর যে দেশের কি অবস্থা হইবে তাহা ভগবান জানেন।

কল্য দুইশত পঞ্চাশ জন সাঁওতাল (ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব না থাকায়) জজ সাহেবকে বলে—আমাদিগকে হয় আহার দিন নতুবা হত্যা করুন—জজ সাহেব তাহাদিগকে সংগৃহীত করিয়া তাহাদিগকে মুড়ি খাইতে দেন।

দারাপুর গ্রাম হইতে কোন ভদ্রমহিলা লিখিয়াছেন—

এখানে অত্যন্ত অন্নকষ্ট হইয়াছে; এমন বিপদ কখন হয় নাই। মানুষের এত কষ্ট হইতেছে যে চক্ষে দেখা যায় না। টাকাতে ৪ সের

ওজনি চাউল ও পাঁচ সের ময়দা হইয়াছে। এখানকার লোকের ভয়ানক কষ্ট, কারণ সকলেই প্রায় ঘরে বসিয়া আছে। এখানের লোকের পয়সা খুব কম, ধানের উপরেই সব নির্ভর, ধান না হওয়াতে একেবারে মহা বিপদ পড়িয়াছে। ১৫ দিন হইল, এখানের নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে এক ভদ্রলোক দুই তিন দিন ধরিয়া চারিটি ছেলে লইয়া উপবাস করিয়া, কাহাকেও কিছু বলিতে না পারিয়া স্ত্রীপুরুষে একদিন গলায় দড়ি দিয়া মারা গিয়াছেন। প্রতিদিন নানা রকমের কথা শুনিয়া ভয়ে অস্থির হইতেছি, কি করিয়া এ বৎসর যাইবে জানি না। এত আক্রার চাল কিনিতে কোথা হইতে টাকা জুটবে? এক মাস দুই মাস নয়, এখনও পুরা এক বৎসর, কি করিয়া কাটিবে? ছেলেগুলি লইয়া বোধহয় খাদ্য অভাবে মারা যাইতে হইবে।

লোকের প্রাণরক্ষার দায়িত্ব গবর্ণমেণ্টেরই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। অথচ আমরা নানাসূত্রে অবগত হইতেছি যে বাঁকুড়ার মাজিষ্ট্রেট কুকসাহেব এ বিষয়ে কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিতেছেন না। ইঁহার কার্য্যের উপর গবর্ণমেণ্টের লক্ষ্য রাখা উচিত।

গভর্মেণ্টের পরই জমিদারদের দায়িত্ব। কিন্তু বাঁকুড়ার সকল স্থানীয় জমিদারই ছোট, তাঁহাদের আয় অল্প; তাঁহাদের নিকট বিশেষ কিছু আশা করা যায় না। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজের বিস্তৃত জমিদারী বাঁকুড়া জেলায় আছে; তিনি অনুগ্রহ করিয়া ক্ষুধিতকে অন্নদান-সেবার ব্রত গ্রহণ করিলে অনেক প্রাণ রক্ষা পাইতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে আমরা মহারাজাধিরাজের সৎকর্ম্মানুষ্ঠান-প্রবৃত্তি ও উদ্যোগ উদ্যমের পরিচয় পাইয়াছি; আমরা আশা ও অনুরোধ করি যে তিনি এই ব্রত গ্রহণ করিয়া দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হউন।

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে বঙ্গীয় হিতসাধন-মণ্ডলী ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বাঁকুড়ায় সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। রামকৃষ্ণ মিশন কাজ সুরু করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের কার্য্য অভাবের অনুপাতে সামান্যই হইবে। এজন্য সাধারণের ও বদান্য ধনীদের সাহায্য পাওয়া নিতান্ত আবশ্যক। আশা করি দেশ মুক্তহস্তে প্রাণরক্ষায় অগ্রসর হইবেন।

বিবাহের সর্ত্ত।

আমাদের দেশের জামাইবাবুরা এক-একটি ক্ষুদ্র নবাব বিশেষ—তাঁহার নানা অজুহাতে রাজকর জোগাইতে জোগাইতে শ্বশুর বেচারাকে ব্যতিব্যস্ত ত থাকিতেই হয়, সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িতেও হয়। আমাদের দেশে মেয়ের যেন কোনো মূল্যই নাই, অনুগ্রহ করিয়া যিনি কন্যা-"দায়" হইতে উদ্ধার করেন নানা উপায়ে তাঁহার ক্ষতিপূরণ করিয়া মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতে হয়। আমাদের দেশে আগে কন্যার পিতারাই ধনুক-ভাঙা পণ করিতেন, এবং সেইটাই স্বাভাবিক; এখন অস্বাভাবিক রকমে বর বা বরের বাপ পণ করেন। এই স্বভাব-ও-প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ব্যাপার অনেক সময় বরের শ্বশুরদের অন্যায় করিতেও প্রবর্ত্তিত করায়। আপিসে একটি কাজ খালি আছে, আপিসের যোগ্যতর কর্ম্মচারীদের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া বা যোগ্যতর প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করিয়া সে কাজ বড়বাবুর জামাইকে দেওয়া হয়; না দিলে তাঁহার কন্যাকে শ্বশুরবাড়ীতে উঠিতে বসিতে গঞ্জনা ও দুঃখ পাইতে হইবে।

সম্প্রতি আমেরিকার একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টপন্থীদিগের সংবাদপত্র বষ্টন সহরের ক্রিশ্চান রেজিষ্টার একটি বিপরীত রকমের সংবাদ দিয়াছেন। আমেরিকার এক প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের কন্যার পাণিপ্রার্থী হন। অধ্যক্ষ এই সর্ত্তে বিবাহ দিতে স্বীকার করেন যে তাঁহার ভাবী জামাতা তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরীতে ইস্তফা দিয়া চাকরী ছাড়িয়া যাইবেন, কারণ কোনো লোক তাহার আত্মীয় সম্বন্ধে নিরপেক্ষ বিচারক হইতে পারে না। বিবাহার্থী এই সর্ত্তেই চাকরী ছাড়িয়া প্রার্থিতা কন্যাকে গ্রহণ করিয়াছেন। এই আমেরিকান অধ্যাপকটি নারীর মর্য্যাদা ও প্রেমের মূল্য ঠিক্ বুঝিয়াছেন। তিনি জীবনের প্রকৃত সঙ্গিনী পাইবার জন্য চাকরীকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন।

এই দৃষ্টান্তটি আমাদের দেশের সকলকার লক্ষ্য করিবার বিষয়। এখানে কোন আফিসের বড়বাবু যদি তাঁহার ভাবী জামাতা কোন অধস্তন কর্ম্মচারীকে বলেন, "বাপু, যদি আমার জামাতা হইতে চাও, তাহা হইলে আমার আফিসের চাকরীটি তোমাকে ছাড়িতে হইবে," তবে তাঁহাকে লোকে হয়ত পাগলা-গারদে যাইবার উপযুক্ত মনে করিবে।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ উপনিবেশী কর্ম্মচারী।

গত ৮ই সেপ্টেম্বর বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জানিতে চাহেন যে ভারতবর্ষে রাজকার্য্যে ব্রিটিশ উপনিবেশের কতজন লোক নিযুক্ত আছে। তদুত্তরে মাননীয় সার রেজিনাল্ড ক্রাডক সংখ্যা জানাইয়াছেন—৬৭ জন। ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে একজন ভারতবাসীরও পা দিবার অধিকার নাই; যাহারা পূর্ব্বে গিয়া পড়িয়াছিল তাহাদের অপমান ও লাঞ্ছনারও অন্ত নাই; অথচ সেইসব দেশের ৬৭ জন লোক আমাদের উপর প্রভুত্ব করিতেছে এবং সম্ভবতঃ বেশ মোটা বেতনই নিরন্ন ভারতবাসীর প্রদত্ত অর্থ হইতে তাহারা পাইতেছে। ঐ ৬৭ জন ভদ্রলোকের ইহাতে লজ্জা হওয়া উচিত; ভারতবাসীর প্রতি তাহাদের ভাই-বন্ধুরা যে কু ব্যবহার করিয়া আসিতেছে ভারতবাসীরা যদি তাহাদের প্রতি সেইরূপ করিয়া পাল্টা জবাব দিতে পারিত, তাহা হইলে সে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই প্রীতিজনক হইত না; ভারতবাসীরা যে ভদ্র ব্যবহার করিতেছে ইহাতে তাহারা তাহাদের ভাইবন্ধুদের ব্যবহারের জন্য নিশ্চয়ই মনে মনে লজ্জা ও গ্লানি অনুভব করিতেছে—ভদ্রলোক হইলে সেইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। ভারত-গভর্মেণ্টের তরফ হইতে তাহাদিগকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করা ন্যায়সঙ্গত হয় নাই। যাহারা ভারতকে অপমান করে, ভারতকে হীন মনে করে তাহারা ভারতের রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে ইহা বাঞ্ছনীয় নহে এবং ভারতগভর্মেণ্টের পক্ষেও গৌরবের ব্যাপার নহে। ভারতবর্ষের রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইবার উপযুক্ত কেবল তাহারা যাহারা ভারতবর্ষকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে। ভারতবর্ষ ভারতবাসীর জন্মভূমি; তাহার রাজকার্য্যে তাহাদেরই জন্মগত অধিকার; গভর্মেণ্টের উচিত তাহাদের দিয়াই যতদূর সম্ভব সমস্ত কাজ করাইয়া লওয়া; যদি একান্তই শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারী রাখা রাজনীতির খাতিরে আবশ্যক বোধ হয় তবে আমাদের মতে খাস ইংলণ্ডের অধিবাসী ইংরেজদেরই রাজকার্য্যে নিযুক্ত করা উচিত; যোগ্য ইংরেজের এমন অভাব হয় নাই যে শ্বেতাঙ্গ বিদেশী বা ভারতের অপমানকারী উপনিবেশীদিগকে ভারতের ভাগ্যবিধাতা দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা করিয়া রাখিতে হইবে। আমরা আশা করি শীঘ্রই উপনিবেশসমূহ ব্রিটিশরাজত্বের সকলপ্রজার প্রতি সমদর্শী হইয়া এইসব বৈষম্যের প্রতিকার করিবে। লর্ড হার্ডিং বাহাদুর এ বিষয়ে যথেষ্ট ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন; তাঁহার আমলে ইহার একটা শেষ মীমাংসা হইয়া যাওয়া উচিত; আমরা আশা করি তিনি এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়া ভারতবাসীকে অপমান হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদের চিরকালের স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

রাজনৈতিক কয়েদী।

রাজনৈতিক অপরাধ সকলস্থলে সবসময়ে ঠিক নৈতিক অপরাধ নয়। চুরি, ডাকাতি, খুন প্রভৃতি নৈতিক অপরাধ—সকল সভ্যদেশেই উহা দণ্ডনীয়। কিন্তু রাজনৈতিক অপরাধ ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার অনুসারে ভিন্ন ব্যবস্থায় বিচারিত ও গণ্য হয়; অথবা একই দেশে অবস্থার পরিবর্ত্তনে নূতন ব্যবস্থায় ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া দাঁড়ায়; একই রাজার অধীন দুই দেশেও দ্বিবিধ হইতে পারে। যেকার্য্য ইংলণ্ডে রাজদ্রোহ বলিয়া গণ্য নয়, তাহা ভারতবর্ষের আইন-অনুসারে রাজদ্রোহ হইতে পারে; যাহা দশ বৎসর আগে রাজদ্রোহ হইত না, এখন তাহা নূতন আইনে রাজদ্রোহ বলিয়া গণ্য হইবে হয়ত। সুতরাং সাধারণ নৈতিক অপরাধীদের ন্যায় সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক অপরাধীদের দণ্ডিত করা উচিত নয়, এবং কোনো সভ্যদেশে তাহা করাও হয় না। আয়ার্লাণ্ডের রাজনৈতিক কয়েদী মাইকেল ডেভিট অথবা লেডী কন্সটান্স লীটন প্রভৃতি দাঙ্গাকারিণী নারী-অধিকার প্রার্থিনীর দলের যেরূপ গুরুতর অপরাধ তাহাতেও তাঁহাদিগকে সাধারণ কয়েদীদের ন্যায় পীড়াদায়ক ব্যবস্থায় কয়েদ রাখা হয় নাই, বিশেষ ব্যবস্থায় বিশেষ অবস্থায় রাখা হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের দেশের রাজনৈতিক কয়েদীদিগকে সাধারণ কয়েদীদিগের ন্যায়ই কঠিন দুঃখ দিয়া রাখা হয়। ইহা সভ্যদেশের ব্যবস্থার অনুমোদিত নহে।

বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রাজনৈতিক কয়েদী নগেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া মাননীয় সার ক্রাডক সাহেবের নিকট উত্তর পাইয়াছেন—নগেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র সাত বৎসরের জন্য কয়েদ হইয়া মুলতান জেলে আছে; ১৯১০ সালের অক্টোবর মাসে প্রথম কয়েদ হইবার সময় তাহার ওজন ছিল ১১১ পাউণ্ড; ১৯১৪ সালের জুলাই মাসে মুলতান জেলে বদলী হইবার সময় হয় ১০৪ পাউণ্ড; তাহার পর ওজন ৯৬ হইতে ১০৬ পাউণ্ডের মধ্যে উঠা নামা করিয়াছে। প্রথমে তাহাকে সুর্থী কুটিতে, পরে কূপের জল তুলিতে নিযুক্ত করা হয়। সম্প্রতি তাহাকে শিক-জোড়া বেড়ী পরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল; তখন তাহাকে কূপে জল তুলিতে নিযুক্ত করা হইত না; সে কূপে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিল—ইহা ঠিক কথা নয়। তাহাকে পৃথক (নির্জ্জন নহে) কারাবাসে রাখা হয় ৬ মাস, তখন তাহাকে প্রত্যহ ১২ সের শস্য পিষিতে হইত; তখন সে পীড়া হইতে সুস্থ হইয়া উঠিতেছিল এবং ডাক্তার বলিয়াছিল সে ঐটুকু কাজ করিতে পারিবে। ১৯১৫ সালের ১২ই এপ্রিল তাহাকে ১৫ ঘা বেত মারা হয়—অবশ্য ডাক্তার বলিয়াছিল যে সে অত ঘা বেত সহ্য করিতে পারিবে। সে তখন বুকে কোনোরূপ বেদনা থাকার কথা প্রকাশ করে নাই। সে ক্রমাগত কাজ করিতে অস্বীকার করিয়া আসিতেছিল বলিয়াই ঐ শাস্তি; নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কর্ম্ম করিয়া উঠিতে পারে নাই বলিয়া নহে।

রাজনৈতিক কয়েদীদের এরূপ সাজা দেওয়া উচিত কিনা তাহা গভর্মেণ্টের বিচার্য্য। আমরা গভর্মেণ্টকে উক্ত উত্তরের মধ্যে যে অল্প-স্বল্প অসম্পূর্ণতা আছে তাহা পূরণ করিয়া দিতে অনুরোধ করি। (১) কয়েদী শুধু-শুধু রোগা দুর্ব্বল বা পীড়িত হইয়া পড়ে না; নগেন্দ্রের সেইরূপ হওয়ার কারণ কি? (২) শিক-জোড়া বেড়ী দুর্দ্দান্ত কয়েদীদের পরানো হয়; নগেন্দ্রের বেলা তাহার ব্যবস্থা হইয়াছিল কেন? (৩) কেন তাহাকে পৃথক কারাবাসে রাখা হইয়াছিল? (৪) সে কূপে লাফাইয়া পড়িয়াছিল—এ জনরবের কারণ কি? (৫) সদ্যপীড়ামুক্ত কয়েদী ১২ সের শস্য পিষিতে পারে ইহা কোন্ ডাক্তারের অভিজ্ঞতা এবং অপরাপর ডাক্তারদেরই বা এ সম্বন্ধে মত কি? (৬) সদ্যপীড়ামুক্ত রাজনৈতিক কয়েদী কাজ করিতে অস্বীকার করিলে তাহাকে ১৫ ১৫ ঘা বেত খাইতে হয় ইহাই কি নিয়ম? (৭) সে ভদ্রলোকের ছেলে; যে-সব কাজ তাহাকে করিতে বলা হয়, তাহা তাহার সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত, এবং তাহার পক্ষে অতি কঠিন, বলিয়াই সে অনিচ্ছা প্রকাশ করে কি না, নির্দ্ধারণ করা উচিত।

কয়েদীরা যে প্রদেশের লোক সেই প্রদেশের জেলেই তাহাদিগকে রাখা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে তাহার সুবিধা অসুবিধা তাহার আত্মীয় স্বজনের কর্ণগোচর হইতে পারে এবং তাহারা কর্ত্তৃপক্ষকে ও গভর্মেণ্টকে আবেদন করিয়া দুঃখ-প্রতিকারের উপায় করিতে পারে। প্রত্যেক জেলখানা যেরূপ সুরক্ষিত তাহাতে রাজনৈতিক কয়েদী হইলেও তাহাদের পলায়নের সম্ভাবনা অতি অল্প; এমন অবস্থায় রাজনৈতিক কয়েদীদিগকে ভিন্ন প্রদেশে বন্দী রাখার ব্যবস্থা অনাবশ্যক বলিয়াই মনে হয়। এ বিষয়ে গভর্মেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

রাজা রামমোহন রায়ের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ।

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর রাজা রামমোহনের ব্রিষ্টল সহরে মৃত্যু হয়। আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর ১০ই আশ্বিন সোমবার ভারতের নানা স্থানে তাঁহার শ্রাদ্ধসভা হইবে। শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির শ্রাদ্ধ তর্পণ তখনই যথার্থ হয় যখন তাঁহার বিশেষ ভাবটি আমরা হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারি। রামমোহন বিশ্বমানবের একত্ব ও ঈশ্বরের একত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং তাহাই তাঁহার জীবনের প্রধান বিশেষত্ব ও কৃতিত্ব; তা ছাড়া সহমরণ নিবারণ, শিক্ষার বিস্তার, রাজনৈতিক অধিকার লাভে স্বদেশবাসীকে উৎসুক ও ব্যগ্র করিয়া তোলা প্রভৃতি তাঁহার অপরাপর কীর্ত্তি। তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার গুণকীর্ত্তনের সময় বিভিন্ন সভার বক্তারা এই কয়টি কথা স্মরণ রাখিয়া শ্রোতাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিলেই তাঁহার প্রকৃত শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করা হইবে।

বড়োদায় শিক্ষাবিস্তার।

১৯১৩-১৪ সালের শিক্ষাবিবরণী হইতে আমরা জানিতে পারি যে বড়োদা রাজ্যের মোট ২০,২৯,৩২০ জন লোকের মধ্যে ১৮,৬১,১৬৮ জন লোকের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সহর ও গ্রামের সংখ্যার অনুপাতে কলেজ স্কুল পাঠশালা প্রভৃতির সংখ্যা শতকরা ৯৯·৭। ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষে ১৯১১-১২ সালে ঐ সংখ্যা ছিল মাত্র ৩০। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে বড়োদায় প্রায় প্রত্যেক গ্রামে পর্য্যন্ত একটি করিয়া বিদ্যালয় আছে, কিন্তু ব্রিটিশ-ভারতে শতকরা ৭০টি জায়গায় কিছুই নাই।

বড়োদায় বালক-বালিকারা লেখাপড়া শিখিতে আইন অনুসারে বাধ্য—বালককে ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত ও বালিকাকে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত পঞ্চম মান অবধি লেখাপড়া শিখিতেই হইবে।

ভারতবর্ষের অপরাপর করদ রাজ্যেও এইরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত। কোথাও কোথাও হইতেছে। এবং আমরাও বহুকাল হইতে ভারতগভর্মেণ্টের নিকট এইরূপ প্রার্থনাই করিয়া আসিতেছি। শিক্ষা সকল দুঃখ দুর্গতির মূল নষ্ট করে; সেই শিক্ষা আমাদের চাইই-চাই।

সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ।

ভারতবর্ষে শিক্ষার উন্নতি যতই মন্থর গতিতে হোক একটা জিনিস খুব দ্রুত চলিতেছে—সরকারী আদেশে সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করা হইতেছে। এপক্ষে পেনাল কোড যথেষ্ট না মনে করিয়া সিডিশান বা রাজদ্রোহ আইন পাশ করা হয়, তাহাতেও তৃপ্তি না হওয়াতে সংবাদপত্রের জন্য বিশেষ আইন করা হয়—প্রত্যেক কাগজওয়ালাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে একরার-নামা দিতে হইবে এবং ম্যাজিষ্ট্রেট ইচ্ছা করিলে তাহার নিকট হইতে নগদ জামিন আদায় করিয়া ছাড়িতে পারেন, এবং পুলিশের আবেদন অনুসারে সেই জামিনের পরিমাণ বৃদ্ধি বা জামিন বাজেয়াপ্ত করা যাইতে পারে। তাহার উপর আবার দেশরক্ষা-বিষয়ক নূতন আইন পাশ হইয়াছে। এক্ষণে প্রায়ই শুনা যাইতেছে কোনো কাগজের জামিন বৃদ্ধি করা হইতেছে, কোনোটাকে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে; এবং জামিন চাওয়ার জন্যও কোনো কোনো কাগজ আপনিই বন্ধ হইয়া যাইতেছে।

হাইকোর্টের বিচারপতি সার লরেন্স জেঙ্কিন্স মহোদয় "কমরেড" কাগজের মামলা উপলক্ষ্যে বলিয়াছিলেন যে ঐসব আইন অত্যন্ত অস্পষ্ট, সুতরাং ইচ্ছা করিলে অনেক রকম মানে করা যাইতে পারে এবং খুব উৎকৃষ্ট লেখকের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সম্বন্ধে এই আইন খাটান যাইতে পারে। সুতরাং রাজকর্ম্মচারীদের খেয়াল খুসীর উপর সংবাদপত্রের টিকিয়া থাকা না-থাকা নির্ভর করিতেছে। ভারতবর্ষের রাজকর্ম্মচারীরা প্রায়ই অকারণে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া রাজদ্রোহের সম্ভাবনা দেখিতেছেন ও সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। ব্রিটিশ রাজত্ব কি এমনই ঠুনকো যে দু-একটা সংবাদপত্রের ফাঁকা কথার ধাক্কাতেই ভাঙিয়া যাইবে? সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা কি এমনই স্বার্থান্ধ ও নির্বোধ যে তাহারা খামখা রাজদ্রোহের ঘোষণা করিতে থাকিবে? দেশের অভাব অভিযোগ রাজকর্ম্মচারীদের কর্ণগোচর করা বা দেশের লোকের দেশশাসন করিতে ভাগ চাওয়ার দাবী রাজদ্রোহ নহে। ভারতবাসী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ব্রিটিশ প্রজার পূর্ণ অধিকার চায় এবং সেই অধিকার চাওয়া কিছু রাজদ্রোহ নহে। মানুষের জন্মগত অধিকার যাহা সেই স্বায়ত্ত-শাসন ভারতবর্ষ বহুকাল হইতে দাবী করিয়া আসিতেছে; ভারতবাসী যে সে কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত তাহা আর প্রমাণ-সাপেক্ষ নহে, প্রমাণিত হইয়া চুকিয়াছে; বর্ত্তমান যুদ্ধে বিশেষ করিয়া প্রমাণিত হইয়াছে যে ভারতবাসীর ধনপ্রাণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কল্যাণের জন্য অকাতরে ব্যয়িত হইতে প্রস্তুত হইয়াই আছে। এখনো ভারতবাসীকে মানুষের অধিকারে বঞ্চিত রাখিয়া তাহাদের মনের ভাবকে নানান আইনের জগদ্দল পাথর দিয়া চাপিয়া রাখা গভর্মেণ্টের উচিত হইতেছে না। ভারতবাসী বিশ্বাস ও সমান অধিকার পাইলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য চতুর্গুণ বলশালী হইয়া উঠিবে।

সাহিত্যসম্মিলনের সভাপতি নিয়োগ।

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সাহিত্যসম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নির্ব্বাচন উপযুক্ত ও উত্তম হইয়াছে। আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের নাম আমাদের প্রস্তাবের মধ্যে উল্লেখ করিতে পারি নাই, তাহার কারণ তিনি বহুকাল হইতে অত্যন্ত অসুস্থ আছেন; তিনি সভাপতির গুরু কার্য্য করিতে পারিবেন কি না আমাদের আশঙ্কা ছিল; তিনিও ঐ পদ গ্রহণ করিবার সময় নিমন্ত্রণকর্ত্তাদের ঐ কথাই বলিয়াছেন শুনিলাম, যে, "আমার শরীর কখন কেমন থাকে ঠিক নাই, তথাপি আমি এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম।" আমরা আশা করি তিনি সুস্থ থাকিয়া সম্মিলনের কার্য্য পরিচালনা করিতে পারিবেন।

গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী।

গোলাপচন্দ্র সরকার, শাস্ত্রী, এম-এ, বি-এল, মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গদেশ একজন উঁচুদরের পণ্ডিত, বিজ্ঞ উকিল, হিন্দু-আইনের বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষক হারাইল। তাঁহার বিয়োগে বহু দিকে ক্ষতি হইল।

দেওয়া নেওয়া

তুমি দেবে, তুমি মোরে দেবে,
গেল দিন এই কথা নিত্য ভেবে ভেবে।
সুখে দুঃখে উঠে নেবে
বাড়ায়েছি হাত
দিন রাত;
কেবল ভেবেছি, দেবে, দেবে,
আরো কিছু দেবে।

দিলে, তুমি দিলে, শুধু দিলে;
কভু পলে পলে তিলে তিলে,
কভু অকস্মাৎ বিপুল প্লাবনে
দানের শ্রাবণে।
নিয়েছি, ফেলেছি কত, দিয়েছি ছড়ায়ে,
হাতে পায়ে রেখেছি জড়ায়ে
জালের মতন;
দানের রতন
লাগিয়েছি ধূলার খেলায়
অযত্নে হেলায়,
আলস্যের ভরে
ফেলে গেছি ভাঙা খেলাঘরে।
তবু তুমি দিলে, শুধু দিলে, শুধু দিলে,
তোমার দানের পাত্র নিত্য ভরে' উঠিছে নিখিলে।

অজস্র তোমার
সে নিত্য দানের ভার
আজি আর
পারিনা বহিতে।
পারিনা সহিতে
এ ভিক্ষুক হৃদয়ের অক্ষয় প্রত্যাশা,
দ্বারে তব নিত্য যাওয়া-আসা।
যত পাই তত পেয়ে পেয়ে
তত চেয়ে চেয়ে
পাওয়া মোর চাওয়া মোর শুধু বেড়ে যায়;
অনন্ত সে দায়
সহিতে না পারি হায়
জীবনে প্রভাত সন্ধ্যা ভরিতে ভিক্ষায়।

লবে তুমি, মোরে তুমি লবে, তুমি লবে,
এ প্রার্থনা পূরাইবে কবে?
শূন্য পিপাসায় গড়া এ পেয়ালাখানি
ধুলায় ফেলিয়া টানি,—
সারা রাত্রি পথ-চাওয়া কম্পিত আলোর
প্রতীক্ষার দীপ মোর
নিমেষে নিবায়ে
নিশীথের বায়ে,
আমার কণ্ঠের মালা তোমার গলায় পরে'
লবে মোরে লবে মোরে
তোমার দানের স্তূপ হ'তে
তব রিক্ত আকাশের অন্তহীন নির্ম্মল আলোতে।

১৩ই পৌষ,
শান্তিনিকেতন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বঙ্গে জ্যোতিষ-মানমন্দির

বঙ্গে জ্যোতিষ-মানমন্দির-প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইয়াছে। এখানে উহার প্রয়োজন স্পষ্ট করা যাইতেছে।

পাজি লইয়া প্রয়োজন বোঝা যাউক। পাঁজি দ্বারা তিন প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। (১) লোকব্যবহারে কালগণনা, (২) স্ব স্ব বিশ্বাসে শুভাশুভ-কালনির্ণয়, (৩) প্রয়োগে জ্যোতিষসিদ্ধান্ত-শিক্ষা। হিন্দুর বারমাসে তের পার্বণ। যে-সে দিনে পার্বণ হয় না। পাঁজিতে পার্বণের দিন লেখা থাকে। অনেকে শুভাশুভকাল মানেন। বারবেলা, কালবেলা, অষ্টমী একাদশী অমাবস্যা পূর্ণিমা প্রভৃতি তিথি, মঘা অশ্লেষা, দিকশূল যোগিনী প্রভৃতি নানা ইষ্টানিষ্টকারক দিনক্ষণ মানিতে গেলেই পাঁজি চাই। যাঁহারা এসব মানেন না, তাঁহাদেরও পাঁজি চাই। কি হিন্দু কি মুসলমান কি খ্রিষ্টান, সকলকেই সন তারিখ বার জানিতে হয়। সন তারিখ বার, কালগণনা মাত্র। পাঁজিতে সর্বসাধারণের ব্যবহারোপযোগী কালগণনা পাই। তোমার ভাষা আমার

ভাষা এক না হইলে লোকব্যবহারে সংসারযাত্রা-নির্বাহে বিঘ্ন হয়; তোমার কালগণনা আমার কালগণনা এক না হইলেও হয়। ৫-টার সময় সভা হইবে। যদি সে সভায় তোমাকে আমাকে উপস্থিত হইতে হয়, তাহা হইলে তোমার আমার ঘড়ী দেশের ঘড়ীর অনুযায়ী করিতে হইবে। তুমি ঘড়ীতে রেলের সময়, আমি কলিকাতার সময় রাখিতে পারি বটে, কিন্তু দুই ঘড়ীর সময়ের অন্তর জানিয়া রাখিতে হইবে। কোন্ বঙ্গাব্দে কোন্ খ্রিষ্টাব্দ, কিংবা বাঙ্গালামাসের কোন্ দিন ইংরেজী মাসের কোন্ দিন, কিংবা কোন্ দিনে কি বার, এ সব জানিতে পাঁজি সর্ব্বদা দেখিতে হয়।

দেশের রাজা লোকব্যবহার নির্দেশ করেন। ব্যবহারে দোষ হইলে রাজা দোষীকে দণ্ড দেন। তিনি দেশের মাস নিরূপিত ও নির্ধারিত করিয়া দেন। বাজারের দোকানদার ছোট গজ ছোট সের দিয়া পণ্য মাপিলে দণ্ডনীয় হয়। মান-নিরূপণ রাজার কর্তব্য। বহুপূর্বকাল হইতে এই বিধি চলিয়া আসিতেছে। কারণ রাজা সকলের নিমিত্ত রাজা। রাজা চন্দ্রগুপ্তের সময়ে মানাধ্যক্ষ নিযুক্ত থাকিতেন। মানাধ্যক্ষ (superintendent of measures) দেশমান (measure of length) ও কালমান (measure of time) দেশে ঠিক রাখিতেন। অঙ্গুল মুষ্টি ধনু রজ্জু যোজন প্রভৃতি দেশমান, নিমেষ কাষ্ঠা কলা দণ্ড মুহূর্ত দিবস রাত্রি পক্ষ মাস ঋতু অয়ন সম্বৎসর যুগ প্রভৃতি কালমান নির্দিষ্ট রাখিতেন। পৌতবাধ্যক্ষ (superintendent of the measures of mass and capacity) তুলামান ও প্রস্থ-মানাদি নির্মাণ করাইতেন এবং দেশে তদনুরূপ চলিতেছে কি না দেখিতেন। (পৌতব, অন্য নাম যৌতব; সামান্য অর্থ, পরিমাণ, a measure)। চাণক্য তাঁহার "অর্থশাস্ত্রে" তৎকালে প্রচলিত মানের বিবরণ দিয়া গিয়াছেন। সে আজি তেইশ শত বৎসর পূর্বের কথা। ইহার পূর্বেও রাজা কালমানাদি নির্দেশ করিতেন, পরেও করিতেন। এদেশের প্রাচীন প্রধান প্রধান জ্যোতিষী এক-এক রাজার নিযুক্ত বা অনুগৃহীত ছিলেন। এখনও দেশীয় রাজ্যে রাজ-জ্যোতিষী নিযুক্ত আছেন। নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ঘড়ীয়াল নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি ঘটিকা বা দণ্ড পরিমাণ করিতেন। ইহা ত সেদিনকার কথা। ওড়িশায় "পহরাজ" প্রহর দণ্ড পরিমাণ করিতেন। ইঁহারা রাজ-জ্যোতিষীর অনুবর্তী থাকিতেন। আমাদের সম্রাটেরও কালমানাধ্যক্ষ আছেন, জ্যোতিষী আছেন। তাঁহার নির্দিষ্ট কালমান—ইংরেজী অব্দ মাস, মাসের দিন, ঘণ্টা মিনিট, ইত্যাদি দেশে অল্পে অল্পে প্রচলিত হইতেছে।

কিন্তু এ দেশের কালমান ও সম্রাটের কালমান এক নহে; দেশের পাঁজি ও সম্রাটের পাঁজি একেবারে ভিন্ন। সম্রাট আমাদের পাঁজি স্বীকার করেন না, অস্বীকারও করেন না। লোকব্যবহারে যতটুকু আবশ্যক, ততটুকু স্বীকার করেন। স্বীকার করেন; কিন্তু সত্য মিথ্যা বিচার করেন না। সম্রাট উদাসীন। এমন অবস্থায় আমাদের পাঁজি আমাদিগকে ঠিক রাখিতে হইয়াছে। রাজার বলে সমাজের বল, কিংবা সমাজের বলে রাজার বল। আমাদের সমাজকে এক-এক রাজার, দেশীয় রাজার আশ্রয় লইতে হইয়াছে। বহুকাল হইতে নবদ্বীপাধিপতি দেশের পাঁজি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। কয়েকবৎসর হইতে বর্দ্ধমানাধিপতি ও কাশিমবাজারাধিপতি দেশের পাঁজির সংশোধন ও প্রচার করাইতেছেন। ধনবল ও মানবল, দুইবল না জুটিলে দেশের কালমানজ্ঞাপক পাঁজি রক্ষা হইতে পারে না। রাজার নামে কিংবা প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদের নামে দেশের পাঁজির নাম হইতে পারে। দোকানের নামে কিংবা দোকানদারের পাঁজি বিজ্ঞাপনের পাঁজি হইয়া দাঁড়ায়। ইহাতে প্রামাণিকতার লাঘব হয়। ইংরেজীতে অনেক বিজ্ঞাপনের পাঁজি আছে, কিন্তু সে-সবের গ্রহগণিত সম্রাটের পাঁজি হইতে গৃহীত।

কারণ, সমাজের মাথা রাজা। রাজাই সমাজ শাসন করেন, রক্ষা করেন। আদিম কালের পাঁজি সহজ হয়। তখন রাজ-বল আবশ্যক হয় না। সূর্য দিবারাত্রি বিভাগ করিতেছে। আদিম মানব দিনের পর দিন স্বচ্ছন্দে গণিয়া যাইতে পারে। দিবারাত্রি প্রাকৃতিক বিভাগ। কিন্তু প্রতিদিনের সূর্য একইপ্রকার; আজির দিনে ও কালির দিনে প্রভেদ পাওয়া যায় না। প্রতিরাত্রির চন্দ্র এরূপ নহে। আশ্চর্য, কোন রাত্রে চন্দ্র দেখিতে পাওয়া যায় না, কোন রাত্রে সম্পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ণিমা রাত্রি হইতে পূর্ণিমা রাত্রি গণনা স্বাভাবিক। ইহার নাম "মাস"গণনা। ত্রিশ রাত্রিতে "মাস" পূর্ণ হয়। এই ত্রিশ রাত্রির নাম তিথি। প্রাচীন কালের এইরূপ রাত্রি-গণনা আমাদের দেশে এখনও প্রচলিত আছে। শিশুর জন্মের পর ছয় রাত্রি ষট্‌রাত্রি বা ষেটেরা, নবরাত্রি নবনক্ত বা নত্তা নামে খ্যাত আছে। মাসের দুই পক্ষ গণনাও স্বাভাবিক। এক পক্ষে প্রথম রাত্রে চন্দ্র দেখিতে পাওয়া যায়, অপর পক্ষে যায় না। রাত্রে চন্দ্র দেখিতে দেখিতে নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। আজি যে নক্ষত্রের (তারা-সমষ্টির) নিকট চন্দ্র দেখা যাইতেছে, কালি সে নক্ষত্রের নিকট ছিল না। ২৮ রাত্রির পূর্বে যে নক্ষত্রে চন্দ্র ছিল, আজি সেই নক্ষত্রে দেখা যাইতেছে। "মাস"-এর আর এক ভাগ পাওয়া গেল। ২৮ নক্ষত্রে এক মাস। ইহার নাম নক্ষত্র-মাস। ২৮ নক্ষত্রে মাস-গণনা কতকাল গিয়াছে কে জানে। পরে দেখা গেল ২৮ নক্ষত্র অপেক্ষা ২৭ নক্ষত্র গণনা ঠিক। তদবধি "মাসে" ২৭ নক্ষত্র গণ্য হইয়া আসিতেছে। নক্ষত্র চিনিবার সঙ্গে-সঙ্গে এক-এক নক্ষত্রের সহিত সূর্যাস্ত লক্ষ্য হইল। দেখা গেল সূর্য প্রত্যহ একই নক্ষত্রের সহিত অস্ত যায় না। আজি যে নক্ষত্রে সূর্যাস্ত হইল, ৩৬৬ দিন পূর্বে সেই নক্ষত্রে হইয়াছিল। ৩৬৬ দিনে বৎসর গণিত হইল। এই গণনার পূর্বে ৩৬০ দিনে বৎসর গণিত হইত। সাধারণ লোকে এত কথা জানিত না। তাহারা জানিত বর্ষাকাল, শীতকাল। এক বর্ষা হইতে অপর বর্ষা এক বর্ষ। বর্ষ ও বৎসর এক। এক শীত হইতে অপর শীতও এক বৎসর। আমাদের দেহের ছায়া, গাছের ছায়া প্রত্যহ মধ্যাহ্নে সমান দীর্ঘ থাকে না। এক বৎসরে রবির দুই অয়ন হয়, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন; উত্তর দিকে আগমনের সময় রবি ক্রমশঃ মাথার উপরে আসিতে থাকে, মধ্যাহ্নে আমাদের দেহের ছায়া হ্রস্ব হইতে থাকে। দক্ষিণ দিকে গমনের সময় ইহার বিপরীত হয়। ক্রমে চান্দ্রমান ও সৌরমানের ঐক্যসাধন আবশ্যক বিবেচিত হইল। দেখা গেল ৩৫৪ অহোরাত্রে দ্বাদশ "মাস" হয়, কিন্তু বৎসর পূর্ণ হইতে ১২ অহোরাত্র থাকে। আড়াই বৎসরে এক "মাস" অধিক হয়। এই অধিক মাসের নাম অধিমাস। এক বৎসরে দ্বাদশ "মাস" হইলে সুন্দর হইত; এই অধিমাস তস্করের ন্যায় বৎসরে প্রবেশ করিয়া গণনার বিঘ্ন করে। আড়াই বৎসর গণাও সুবিধাজনক নহে। পাঁচ বৎসরে দুই অধিমাস গণিলে লোকব্যবহারে সুবিধা হয়। পাঁচ বৎসরে যুগ হইল। পাঁচ বৎসরে দুই অধিমাস ত্যাগ করিলে চন্দ্রসূর্য আবার একসঙ্গে চলিতে থাকে; যেন লাঙ্গলের এক জোড়া গোরু সমান চলিতে থাকে। যুগ শব্দের অর্থ জোড়া, যুগল। অনেক কাল এইরূপ কালগণনা চলিল। ক্রমে শুক্র বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহের পরিচয় হইল। পাঁচ বৎসরে এক যুগ তত দীর্ঘকাল বোধ হইল না। বার বৎসরে বৃহস্পতি নক্ষত্র-চক্র একবার ঘুরিয়া আসে। দেখা গেল বৃহস্পতি সূর্যাপেক্ষা দীর্ঘকাল পরিমাণ করে। ১২ যুগে বৃহস্পতির বর্ষ-গণনা আরম্ভ হইল। কিন্তু বৃহস্পতির বর্ষও তত দীর্ঘ নহে, ৬০ বৎসর মাত্র। এক শত বৎসরে সপ্তর্ষির বর্ষ গণ্য হইল। ইহার পূর্বে রবিশশী ব্যতীত অন্য পাঁচ গ্রহের নক্ষত্রচক্রভোগ-কাল পরিমিত হইয়াছিল। এখন এমন যুগ চাই যাহার আদিতে সব গ্রহ একত্র হইয়াছিল। ইহার নাম কলিযুগ। এক কলিযুগেও (৪৩২,০০০ বৎসরে) সব গ্রহ ঠিক এক স্থানে আসে না। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি লইয়া এক মহাযুগ কল্পিত হইল। মহাযুগ অপেক্ষাও দীর্ঘকাল আছে। মন্বন্তর, কল্পাব্দ, ভূ-সৃষ্টি-অব্দ ইত্যাদি অতি দীর্ঘকালের সংজ্ঞা মাত্র।

অহোরাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া মাস, বৎসর, যুগ, ইত্যাদি দীর্ঘকাল পাওয়া গেল। অহোরাত্রের দুই ভাগ, দিবা ও রাত্রি স্বাভাবিক। দিবা ও রাত্রির ভাগ চাই। ৩০ তিথিতে "মাস"। দিবারাত্রিও ৩০ ভাগে বিভক্ত হইল। এই ভাগের নাম মুহূর্ত। ৩০ কলায় মুহূর্ত, ৩০ কাষ্ঠায় কলা, ১৫ নিমেষে কাষ্ঠা। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রদেশে এই সকল ভাগের ন্যূনাধিক্য হইত। মাপিবার উপায় হইতে অন্য নামও হইয়াছিল। ইদানী দণ্ড পল বিপল গণি। ৬০ সম্বৎসরে বৃহস্পতির বর্ষ। ৬০ দণ্ডে দিবারাত্রি। দণ্ড অর্থে যষ্টি, দাঁড়। যষ্টির ছায়া মাপিয়া কাল পরিমিত হইত। মেঘাচ্ছন্ন দিনে, বিশেষতঃ রাত্রে ছায়া মাপা চলে না। ছিদ্রযুক্ত তাম্রপাত্র জলে ভাসাইয়া

কাল পরিমিত হইত। এক দণ্ড সময়ে ৬০ পল জল পাত্রে প্রবেশ করিত। ৬০ পলে দণ্ড। নলাকার পাত্রের অধোদেশে ছিদ্র করিয়া জলে ভাসাইয়া পাত্র জলপূর্ণ করা হইত। ইহা হইতে, ৬০ নালিকায় অহোরাত্র। নালিকা শব্দ উচ্চারণভেদে নাড়িকা হয়। নাড়িকা ও নাড়ী এক। ৬০ নাড়ীতে অহোরাত্র, ৬০ বিনাড়ীতে নাড়ী, ৬ প্রাণে (শ্বাসপ্রশ্বাস-কাল) বিনাড়ী। পূর্বকালে ৩৬০ দিনে বৎসর গণ্য হইত। নক্ষত্রচক্র ৩৬০ অংশে বিভক্ত হইয়াছিল। এক অংশে ৬০ কলা। নক্ষত্রচক্রে ২১৬০০ কলা। নক্ষত্র-অহোরাত্রে ২১৬০০ প্রাণ। অতএব এক প্রাণ সময়ে (৪ সেকেণ্ড) নক্ষত্রচক্রের এক কলা আবর্ত্তিত হয়। এই কালবিভাগে জ্যোতিষীগণের সুবিধা হইয়াছিল। অপর দিকে শ্বাসপ্রশ্বাসের কাল ৪ সেকেণ্ডও বটে।

কোন্‌কালে বা কতকালে এই-সব কালগণনা প্রচলিত হইয়াছিল, কে জানে। কিন্তু দেখা যাইতেছে, কালগণনার মূল প্রাকৃতিক। চন্দ্রসূর্যের গতি যত দৃষ্ট ও পর্যালোচিত হইতে থাকিল, প্রথম গৃহীত সহজ সম্বন্ধে তত সংশয় জন্মিল। প্রকৃতির সহিত গণনা মিলাইবার চেষ্টা হইতে লাগিল; কালমান সূক্ষ্ম হইল, কিন্তু পুরাতন নাম থাকিয়া গেল। দিন, মাস, বৎসর নানাবিধ হইল, তিথি নক্ষত্রের অর্থ পরিবর্তিত হইয়া গেল। চন্দ্রসূর্য ব্যতীত অন্য গ্রহের গতি পর্যালোচিত হইল। স্থূল হইতে সূক্ষ্ম গতি নির্ধারিত হইল, সহজ সুবোধ্য পাঁজির স্থানে কৃত্রিম দুর্বোধ্য পাঁজি চলিত হইল।

বাস্তবিক, পাঁজিতে জ্যোতির্বিদ্যার ইতিহাস পাই, জ্যোতিবিদ্যার প্রয়োগ পাই। একদিন সকলে একত্র বসিয়া বারমাসে তের পার্বণ নির্দিষ্ট করেন নাই। শুভাশুভ দিনক্ষণ, বিধিনিষেধ একে একে বহুকালে জুটিয়াছে। এ দেশে যাহা ছিল, তাহারই চাপে লোকে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। মন্বাদি শাস্ত্রকার, পুরাণকার নক্ষত্রসূচকের (আজিকালির ফলগণক) নিন্দা করিতে লাগিলেন। গ্রহাচার্য ব্রাহ্মণশ্রেণী হইতে পতিত হইলেন। যবনসম্পর্কে যবনজাতির শুভাশুভ বিশ্বাস আর্যসমাজে প্রবেশ করিল। মানুষের সম্পদ্-বিপদ্ আছেই আছে, ভাগ্য জানিবার উৎকট আকাঙ্ক্ষা আছে। বৃহস্পতির বারবেলা ভয়ঙ্কর, শনিমঙ্গলবার অশুভ, ইত্যাদি নানা বিশ্বাস লোকের মন সহজে অধিকার করিল। রবি-সোমাদি যে সপ্তবার গণিতেছি, তাহার মূল নৈসর্গিক নহে, ফল-জ্যোতিষে বিশ্বাস। অনুমান হয়, ইহা গ্রীকদিগের নিকট হইতে আসিয়াছে। গর্গ নামে অনেক জ্যোতিষী ছিলেন। অনুমান হয়, এক গর্গ কালযবন (Chaldeans ?)-দিগের বহু বিশ্বাস আমাদের প্রাচীন বিশ্বাসের ষোল আনাকে আঠার আনা করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এখন হিন্দুর যাবতীয় কর্ম কঠিন লৌহনিগড়ে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ইহার উপর, নূতন নূতন পঞ্জিকাকার পুরাতন পুঁথী ঘাঁটিয়া নূতন নূতন নিগড়ের প্রচলন করিতেছেন, বাঙ্গালীর জীবন দুর্বহ করিয়া তুলিতেছেন। যাত্রার শুভদিন পাওয়া কঠিন; কিন্তু সে কথা চাকরি ও ব্যবসায় মানে না, রেলগাড়ী ও ষ্টীমার মানে না।

পাঁজির গণিত ভাগেই এত নূতন জুটিতেছে যে পাঁজিতে সে-সবের স্থান হওয়া কঠিন। সেকালে কেবল শকাব্দ বা কল্যব্দ দিলে চলিত; এখন বঙ্গাব্দ দিতে হইতেছে। পূর্বে মেষ-বৃষাদি সৌরমাস এবং বৈশাখাদি চান্দ্রমাস দিলে চলিত; এখন বাঙ্গালা মাস, মুসলমানী মাস, ইংরেজী মাস দিতে হইতেছে। পূর্বে দিবামান, তিথি-নক্ষত্র-যোগ, দণ্ডপলে দিলেই হইত; এখন ঘণ্টামিনিটেও লিখিতে হইতেছে। সূর্যোদয় সূর্যাস্তকাল ঘণ্টামিনিটে জানাইতে হইতেছে, কালসমীকরণ যোগবিয়োগ করিয়া দিতে হইতেছে। পূর্বে এক-এক মাসের গ্রহসঞ্চার দিলেই হইত, কবে কোন্ নক্ষত্রে কোন গ্রহ যাইবে, তাহা জানাইলেই চলিত; এখন প্রতিদিনের গ্রহস্থান লিখিত হইতেছে। গ্রহস্থান গণনা অল্পশ্রমসাধ্য নহে। পঞ্জিকা-কার অকাতরে পরিশ্রম করিতেছেন, পঞ্জিকাপ্রকাশক বহু গণকের বহু স্মার্তপণ্ডিতের বহু পরিশ্রমলব্ধ ফল দুই আনায় বিক্রয় করিয়া দেশে জ্যোতিষজ্ঞান প্রচার করিতেছেন।

তথাপি আমরা সকলে তুষ্ট নই। কেহ কেহ পাঁজির পত্র গণিয়া প্রশংসা করেন, কেহ বা না পড়িয়া না বুঝিয়া করেন, কেহ বা পড়িয়া বুঝিয়া নিন্দা করেন। পঞ্জিকায় কি থাকিবে কি না থাকিবে; রেলভাড়া থাকিবে কি আদালতের ষ্টেম্প-খরচা থাকিবে; পূজার উপকরণের

তালিকা থাকিবে কি দেবদেবীর ধ্যানও থাকিবে, ঔষধের নাম ও গুণ বর্ণিত থাকিবে কি মুদ্রিত পুস্তকের দাম লেখা থাকিবে; এ সবের কিছুই নিশ্চয় নাই। পঞ্জিকা শব্দ এতকাল এক অর্থে ব্যবহৃত হইত। এখন পঞ্জিকার অর্থ পরিবর্তিত হইয়াছে, ইংরেজী calendar শব্দের অর্থ পাইতেছে। পঞ্জিকা শব্দটাও নূতন। পুরাতন সংস্কৃত শব্দকোষে নাই। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের হেমচন্দ্র কোষে পদ ভঞ্জিকা অর্থাৎ দুরূহ পদের ব্যাখ্যার নাম পঞ্জিকা। (নিরন্তর ব্যাখ্যার নাম টীকা)। পঞ্জি বা পঞ্জী শব্দও পুরাতন সংস্কৃত কোষে নাই। যখন সংস্কৃতে প্রথম প্রবেশ করে, তখন অর্থ হয় তুলার পাঁইজ। তাকুড়ে কিংবা চরকায় সুতা কাটিতে তুলার পাঁইজ লাগে। বোধ হয় সংস্কৃত পিঞ্জ হইতে এই পঞ্জির উৎপত্তি। পিঞ্জন অর্থে পেঁজা। নলে গুটাইয়া তুলার পাঁইজ করিতে হয়। ইহা হইতে, যে কাগজ গুটাইয়া রাখা হয় (a roll of paper), তাহাও পঞ্জি। ইহা হইতে লম্বা কাগজ, হিসাবের বিবরণের কাগজও পঞ্জি হইয়াছে। পঞ্জিকার অর্থে লেখকজাতি, কায়স্থ ও করণজাতি। কুলপঞ্জি বা কুলজি গ্রন্থে কুলের বিবরণ থাকে। যাহাতে বর্ষের বিবরণ থাকে, তাহাও পঞ্জি বা পাঁজি। কিন্তু এদেশে কাগজ বহুকাল চলিত হয় নাই। পুথীর আকারে পাঁজি লেখা হইত, অদ্যাপি অনেক স্থানে (যেমন ওড়িশায়) তালপাতে লেখা হয়। এ কারণ, কেহ কেহ মনে করেন, সংস্কৃত পঞ্চাঙ্গ শব্দের অপভ্রংশে পঞ্জিকা শব্দ। বার তিথি নক্ষত্র যোগ করণ, এই পাঁচ যাহার অঙ্গ বা যে গ্রন্থে থাকে, তাহা পঞ্চাঙ্গ। কিন্তু পঞ্চাঙ্গ স্থানে পঞ্জিকা শব্দ সহজে আসে না। জানি না, সংস্কৃতে পঞ্জিকা শব্দ ছিল কি না। বোধ হয়, ফার্সী পঞ্জ (সংস্কৃত পঞ্চ) শব্দ লইয়া পঞ্জিকা শব্দ নূতন রচিত হইয়াছিল।

আমার বক্তব্যের নিমিত্ত পঞ্জিকা বা পাঁজি শব্দের প্রাচীন পঞ্চাঙ্গ অর্থ গ্রহণ করিব। যে পুস্তকে বর্ষের গ্রহগণিত থাকে তাহাকে পঞ্জিকা বা পাঁজি বলিব। গ্রহগণিত অবলম্বন করিয়াই পাঁজির তিথি-নক্ষত্র-মাস মাসের দিন প্রভৃতি গণিত হয়। বারগণনা এরূপ নহে, কিন্তু ইহাকে এখন বাদ দেওয়া চলে না। সিদ্ধান্তে গ্রহগতি বর্ণিত আছে। গ্রহগতি সুপরিমেয় সুবোধ্য হইলে নানা সিদ্ধান্ত হইত না। যিনি যেমন মাপিয়াছিলেন, গণিয়াছিলেন, বুঝিয়াছিলেন, তিনি তেমন সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। আমাদের পাঁজির সিদ্ধান্ত সূর্যসিদ্ধান্ত। এই নামের উৎপত্তি জানিয়া ফল নাই। এই সূর্য আকাশের সূর্য হইলে নামটা কাল্পনিক। তবে যদি সূর্য-সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত মনে করি, তাহাতে আপত্তি হইতে পারে না। যাহাই হউক, দেখা যাইতেছে এই সিদ্ধান্তের কর্তা জানা নাই। কবে ইহার উৎপত্তি তাহাও জানা নাই। পণ্ডিতেরা বলেন, বর্তমান সূর্য-সিদ্ধান্ত প্রাচীন নহে। একথা ঠিক, সে-কালে ইহার খ্যাতি বা প্রতিপত্তি এ-কালের তুল্য ছিল না। যদি থাকিত, যদি ইহা অভ্রান্ত গণ্য হইত, তাহা হইলে অন্য সিদ্ধান্ত করা কাহারও সাধ্য হইত না। আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্করাচার্য এদেশের এক এক জ্যোতিষীরত্ন ছিলেন। কই, তাঁহারা সূর্য-সিদ্ধান্তের উল্লেখ পর্যন্ত করেন নাই! ভাস্করাচার্য এক সৌরসিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা বর্তমান-প্রচলিত সূর্য-সিদ্ধান্তে নাই। এক এক প্রদেশে সূর্য-সিদ্ধান্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিল। প্রায় আটশত বৎসর পূর্বে পুরীর শতানন্দ নামক জ্যোতিষী সূর্য-সিদ্ধান্ত আশ্রয় করিয়া ভাস্বতী নামক করণগ্রন্থ করিয়াছিলেন। সিদ্ধান্ত ধরিয়া পাঁজিগণনায় বহু পরিশ্রম হয়। সিদ্ধান্ত মূল করিয়া পাঁজি গণনার উপযোগী সহজ সূত্র ও সারণী বা পদক (tables) দিয়া করণ (Handbook) লিখিত হইয়াছিল। ভাস্বতী এইরূপ এক করণ। সূক্ষ্ম ফল অক্লেশে পাইবার নিমিত্ত শতানন্দ অঙ্ক শতগুণ করিয়া লইয়াছিলেন, আধুনিক দশমিক ভগ্নাংশ গণনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। শত-সংখ্যায় তাঁহার আনন্দ হইত বলিয়া তিনি শতানন্দ নামে খ্যাত হইয়াছেন। অনেক কাল বঙ্গ ও উৎকলে ভাস্বতী পাঁজিগণনার একমাত্র করণ হইয়াছিল। এখনও উৎকলের স্থানবিশেষে ভাস্বতী অনুসারে পাঁজি গণিত হইতেছে। এইরূপ, প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে দক্ষিণদেশের গণেশদৈবজ্ঞ গ্রহলাঘব নামে এক অতিসহজ করণ লিখিয়াছিলেন। গ্রহলাঘব নাম হইতেই প্রকাশ যে সুলঘুপ্রকারে গ্রহস্থান আনয়ন ইহার উদ্দেশ্য। বঙ্গদেশে গ্রহলাঘব চলিত হয় নাই। পশ্চিম দেশে ইহার সমধিক প্রচার আছে এবং অনেক পাঁজি এই করণ অনুসারে গণিত হইতেছে। তিনশত বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশে রাঘবা-

নন্দ নামে এক জ্যোতিবী প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি সূর্য্য-সিদ্ধান্ত রহস্য নামে এক করণ লিখিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে গুপ্তপ্রেসের পাঁজি, বাকৃচির পাঁজি প্রভৃতি বাঙ্গালা পাঁজি গণিত হইতেছে। রাঘবানন্দ প্রত্যক্ষের সহিত গণিত গ্রহ-স্থান মিলাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন সূর্যসিদ্ধান্তের কোন কোন পরিমাণ ঠিক নহে, কোন কোন পরিমাণে কিছু কিছু সংস্কার না করিলে প্রত্যক্ষের সহিত মেলে না। এই সংস্কার তিনি বীজসংস্কার বলিয়া-ছেন। বীজ শব্দের সামান্য অর্থ ধরিলেই এই সংস্কারের গুরুত্ব উপলব্ধ হইবে। তাঁহার নিবাস কোথায় ছিল, জানি না। বোধ হয় নবদ্বীপে কিংবা ইহার নিকটবর্তী স্থানে ছিল। কারণ তিনি স্বদেশের অক্ষাংশ ২৩।১৮ (২৩ অংশ ১৮ কলা) এবং উজ্জয়িনী হইতে দেশান্তর ১৪ অংশ অর্থাৎ ৫৬ মিনিট ধরিয়াছেন। নদীয়া কৃষ্ণনগরের অক্ষাংশ ২৩।২৪, উজ্জয়িনী হইতে দেশান্তর ৫১৷৷০ মিনিট। তাঁহার স্বদেশ নবদ্বীপ হইতে তাঁহার নিরূপিত দেশান্তর অনেকটা ঠিক হইয়াছিল। পূর্ব-কালে দেশান্তর নিরূপণ সহজ ছিল না। রাঘবানন্দ স্বদেশে পরমদিবামান ৩৩।৪০ দণ্ডপল অর্থাৎ ১৩।২৮ ঘণ্টামিনিট পাইয়াছিলেন। স্বদেশের অক্ষাংশ ২৩।১৮, এবং রবির পরম ক্রান্তি ২৪ অংশ হইলে দিবামান অতই হয়। কিন্তু তাঁহার সময়ে পরমক্রান্তি ২৪ অংশ ছিল না। পূর্বকালে ভারত-বর্ষের সর্ব্বত্র তিথি গণিয়া দিন সংখ্যা করিতে হইত। রাঘবানন্দ তিথি না গণিয়া দিন সংখ্যা আনয়নের সূত্র দিয়াছেন। বোধ হয়, তাঁহার পূর্ব হইতে সৌরমাস গণনা বঙ্গদেশে প্রচলিত হইয়াছিল। তিথিগণনা ব্যতিরেকে দিন-গণনার দ্বারা জ্যোতিষের উন্নতি বুঝিতে পারা যায়। বঙ্গদেশ এ বিষয়ে গৌরব করিতে পারে। বঙ্গের সঙ্গে উৎকলও গৌরবের ভাগ লইতে পারে। কিন্তু মাস বলিলে চান্দ্র-মাস কি সৌর-মাস বুঝিতে পারা যায় না। উৎকলে বৈশাখাদি চান্দ্রমাস, মেষবৃষাদি সৌরমাস অদ্যাপি পৃথক আছে। এই রূপ, ভারতবর্ষের অন্যত্র। এ বিষয়ে বঙ্গদেশের ভাষা অস্পষ্ট। পারিভাষিক শব্দের অস্পষ্টতায় লোকের জ্ঞানের অস্পষ্টতা সূচিত হয় না কি ?

রাঘবানন্দ করণ লিখিয়াছিলেন, সিদ্ধান্ত লেখেন নাই। সূর্যসিদ্ধান্তোক্ত গ্রহগতি-পরিমাণে ভুল আছে কি না, তাহা কিছু কিছু জানিয়াও পরিমাণ সংশোধন করেন নাই। ভুল আছে কি না, তাহা জানিবার একমাত্র উপায়, গ্রহ-পর্যবেক্ষণ। যন্ত্রদ্বারা গ্রহ ও তারার অন্তর মাপিয়া মাপিয়া গেলে গ্রহের গতিকাল নিরূপিত হয়। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে জয়পুর-প্রতিষ্ঠাতা রাজা জয়সিংহ ভারতবর্ষের পাঁচ নগরে পাঁচ মানমন্দির করাইয়াছিলেন। তিনি বালককাল হইতে গণিত ও জ্যোতিষ ভাল বাসিতেন। তাঁহার সময়ে দেশের প্রবল অশান্তির অবস্থা। ঔরংজেব গত, মহম্মদ-শাহ সম্রাট হইলেন। জয়সিংহ চুয়াল্লিশ বৎসর রাজত্বের মধ্যে অল্পকাল শান্তিতে কাটাইতে পারিয়াছিলেন। যুদ্ধবিপ্লবের মধ্যেও তিনি জ্যোতিষ ও ইতিহাস চর্চা করিতেন। মহারাষ্ট্রীয় জগন্নাথ, বাঙ্গালী বিদ্যাধর, জয়সিংহের জ্যোতিষী ছিলেন। এক মানমন্দিরে যন্ত্রের দোষ, দর্শনের দোষ ঘটিতে পারে। এক স্থানে দৃষ্ট গ্রহগতি অন্য স্থানে দৃষ্ট ফলের সহিত মিলাইয়া সত্যলাভের নিমিত্ত জয়সিংহ পাঁচ বিভিন্ন দূরবর্তী স্থানে পাঁচ মানমন্দির করাইয়াছিলেন। ইহার পর তিনি মহম্মদ-শাহের অনুমতি লইয়া পাঁজি গণিবার সারণী করাইলেন। ডাঃ হণ্টার সাহেব এই সারণীর ভূমিকার ইংরেজী অনুবাদ দিয়া গিয়াছেন। তাহাতে দেখিতেছি, মঙ্গলাচরণের পর জয়সিংহ হিপার্কস্-কে বর্বর, টলেমী-কে বাদুড় বলিয়া উপহাস করিয়াছেন, ইয়ুক্লিডের প্রতিপাদন ভগবানের রচনাবৈচিত্র্যের অসম্পূর্ণ আভাস বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "সওয়াজী জয়সিংহ দেখিয়াছেন, মুসল-মানী সারণী, হিন্দু সারণী, কিংবা ইয়ুরোপীয় সারণী হইতে গ্রহস্থান গণনা করিলে অনেকস্থলে প্রত্যক্ষের সহিত মেলে না। গ্রহের উদয়াস্তে, চন্দ্রসূর্যের গ্রহণে দৃগ্‌গণিতের ঐক্য হয় না। অথচ, কি ধর্ম-কর্মানুষ্ঠানে কি প্রজাপালনে গ্রহস্থান ঠিক জানা আবশ্যক।" জয়সিংহ এদেশেই মুসলমানী সারণী পাইয়াছিলেন। তথাপি সমরখণ্ড হইতে লোক আনাইয়া-ছিলেন। পাদ্রি মানুএল সহিত ইয়ুরোপে দক্ষ জ্যোতিষী পাঠাইয়া সেখানকার সারণী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার মানমন্দিরে দক্ষ দক্ষ বেধক নিযুক্ত ছিলেন। জয়পুরে ও দিল্লীতে প্রত্যহ সূর্য বেধ করা হইত। জয়সিংহের রচিত সিদ্ধান্তসম্রাটে লিখিত আছে, "ভবিষ্যতে যিনিই দেশের রাজা হউন, যন্ত্র নির্মাণ করাইয়া গ্রহগতি নিরূপণ করাই-

বেন। দৃষ্ট ফলেই বিশ্বাস করিতে হইবে। প্রচলিত গ্রন্থ হইতে গণিত ফল প্রত্যক্ষের সহিত মেলে না। অপর কথা কি, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত ও সূর্যসিদ্ধান্ত হইতে গণনাও মেলে না।"

মেলে না দেখিয়াই পঞ্চাশবৎসর হইল ওড়িশার চন্দ্রশেখর-সিংহ সিদ্ধান্ত-দর্পণ নামে নূতন সিদ্ধান্ত রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মানমন্দির ছিল না, বৃহৎ মানযন্ত্রও ছিল না, নানাবিধ যন্ত্রও ছিল না। ছিল জ্যোতিষে প্রগাঢ় অনুরাগ, অদম্য অধ্যবসায়, ও সত্যে একান্ত ভক্তি। ইঁহার তুল্য হিন্দুধর্মে নিষ্ঠাবান্ অধিক পাওয়া যাইবে না। জয়সিংহও নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। ঔরংজেব বাদশাহ কাশীর বিশ্বেশ্বর ও মথুরার গোবিন্দজীর মন্দির-লুণ্ঠনের অভিপ্রায় করিয়াছিলেন। জয়সিংহ জানিতে পারিয়া মথুরা হইতে গোবিন্দজীর বিগ্রহ নিজে আনিয়া জয়পুরে স্থাপন করিয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর বর্ষমান ব্যতীত অন্য সব পরিমাণের পরিবর্তন করিয়াছেন। কিন্তু এজন্য তাঁহাকে অ-হিন্দু বলা দূরে থাক, পুরীতে জগন্নাথদেবের নিত্যনৈমিত্তিক যাবতীয় নীতি তাঁহার সিদ্ধান্তমতে গণিত পাঁজি অনুসারে সম্পন্ন হইতেছে। ইংরেজী জ্যোতির্বিদ্যার সহিত তুলনায় সিদ্ধান্তদর্পণ-গ্রন্থে অনেক ভুল বা অন্তর আছে। কিন্তু সূর্যসিদ্ধান্তের অপেক্ষা অল্প আছে।

কিন্তু সকলে চন্দ্রসূর্যাদি বেধ করিতে পারেন না। এ নিমিত্ত বিদ্যা চাই, যন্ত্র চাই, অভ্যাস চাই। কয়জন নিজের ঘড়ী ঠিক রাখিতে পারেন? কয়জন ঘড়ী মিলাইবার অবসর পান? অথচ ঘড়ী আমাদের নিত্যসঙ্গী হইয়াছে। কেহ রেল-ষ্টেসনে গিয়া, কেহ পোষ্ট-আপিশে কিংবা তার-আপিশে গিয়া, কদাচিৎ কেহ বা সূর্য-ঘড়ী বা ছায়াঘড়ী দেখিয়া নিজের ঘড়ী মিলাইয়া রাখেন। অর্থাৎ একটা-না-একটা প্রমাণ ধরিতে হয়।

আমাদের নিজের মানমন্দির নাই, বেধক নাই। যাঁহাদের আছে, যাঁহাদের বেধকগণ দিবারাত্র গ্রহবেধ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে সম্প্রতি প্রমাণ অর্থাৎ নির্ভর-সাক্ষী করা যাউক। আমাদের মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইলে, গ্রহবেধ করিবার অভ্যাস জন্মিলে, গ্রহবেধ দ্বারা গ্রহগতি নিরূপিত হইলে, অন্যকে নির্ভর-সাক্ষী করিতে হইবে না। বঙ্গে জ্যোতিষ-মানমন্দির প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন এই।

জ্যোতির্বিদ্যা বিজ্ঞান বিশেষ। এই বিদ্যা কলেজে কলেজে শেখানা হইতেছে। আমরা অন্যান্য বিজ্ঞান যেমন মানি, জ্যোতির্বিজ্ঞানও তেমনই মানি। অতএব আমাদের বর্তমান নির্ভরসাক্ষী একেবারে অপরিচিত বিদেশী নহে। ইয়ুরোপে ইহার জন্ম ও বৃদ্ধি বটে, কিন্তু তা বলিয়া অবিশ্বাস হইতে পারা যায় না। অতএব ইংরেজী জ্যোতিষের সহিত আমাদের সূর্যসিদ্ধান্তের কয়েকটা নিরূপণের তুলনা করা যাউক। আমাদের পাঁজি প্রায় সূর্যসিদ্ধান্ত অনুসারে গণিত হইয়া থাকে।

এক তারা হইতে গিয়া সে তারার নিকট উপস্থিত হইতে কোন্ গ্রহের কত দিন লাগে তাহা দেখাইতেছি।

গ্রহ	সূর্যসিদ্ধান্তমতে	ইংরেজী সিদ্ধান্ত মতে
রবি	৩৬৫.২৫৮৭৫	৩৬৫.২৫৬৩৭
চন্দ্র	২৭.৩২১৬৭	২৭.৩২১৬৬
বুধ	৮৭.৯৫৮৫	৮৭.৯৬৯২
শুক্র	২২৪.৬৯৮৫	২২৪.৭০০৭
মঙ্গল	৬৮৬.৯৯৭৫	৬৮৬.৯৭৯৪
বৃহস্পতি	৪৩৩২.৩২০৬	৪৩৩২.৫৮৪৮
শনি	১০৭৬৫.৭৭৩০	১০৭৫৯.২১৯৭
রাহু	৬৭৯৪.৩৯৫	৬৭৯৮.২৭৯

দেখা যাইতেছে চন্দ্রে প্রভেদ অল্প, শনিতে অধিক, সাড়ে ছয়দিন। শনি প্রায় ২৯৷৷০ বৎসরে রাশিচক্র একবার ঘুরিয়া আসে। এত দীর্ঘকাল লাগে বলিয়া ইহার এক নাম আছে, মন্দ। মন্দগতি বলিয়া কবে শনি তারার নিকটবর্তী হইল তাহার নিরূপণ কঠিন হইয়া পড়ে। দূরবীক্ষণে দেখিলে তত কঠিন হয় না বটে, কিন্তু সেকালে দূরবীক্ষণ ছিল না। রাহুর কালে চারিদিন প্রভেদ দেখা যাইতেছে। রাহু দৃশ্য নহে, অদৃশ্য; গণিত করিয়া ইহার স্থিতি ও গতি বুঝিতে হয়। কিন্তু রাহু কেতু নইলে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহণ হয় না। গ্রহণ এক-একজন জীবনকালে বহুবার দেখিতে পারেন, কিন্তু যে গ্রহণে রাহুস্থান সূক্ষ্মরূপে নিরূপিত হইতে পারে, সে গ্রহণ সাধারণ নহে। তা ছাড়া, পূর্বকালে দণ্ডপল পরিমাণের সূক্ষ্ম যন্ত্র ছিল না। এখন একটা সামান্য ঘড়ীতে যত সূক্ষ্ম কাল পাওয়া যাইতেছে, তখন তাহা পাইবার সম্ভাবনা ছিল না।

বোধ হয়, এই কারণে রবির পরিভ্রমণকালে অন্তর ঘটিয়াছে, আমাদের বর্ষমান প্রকৃত অপেক্ষা দীর্ঘ ধরা হইয়াছে। এক হিসাবে এই দীর্ঘ বর্ষমানে বড়-একটা আসিয়া যায় না। রবি-সোমাদি সপ্তবার যেমন পর পর আসিতেছে, তেমন বর্ষও পর পর আসিতেছে। বর্ষমান ৩৬০ দিন কিংবা ৩৬৬ দিন হইলেও বর্ষগণনায় বিঘ্ন হইত না। কিন্তু মানব-মনে সত্যের প্রতি যে স্বাভাবিক অনুরাগ আছে, তাহা কৃত্রিম বর্ষমানে তৃপ্ত হয় না। বর্তমান সূর্য-সিদ্ধান্ত-মতে বর্ষমান ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ১২ মিনিট ৩৬.৫৬ সেকেণ্ড। ইংরেজী জ্যোতিষ-সিদ্ধান্তমতে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ৯ মিনিট ৮.৯৭ সেকেণ্ড। এই যে ৩৷৷০ মিনিটের প্রভেদ, ইহা থাকিতে দিলে সত্যানুরাগে ব্যাঘাত পড়ে। যদি সত্য না ধরিয়া সুবিধা ধরিতে চাই, তাহা হইলে ঘণ্টা মিনিট সেকেণ্ড গণিবার প্রয়োজন থাকে না, ৩৬৫ দিনে বর্ষ গণিলে ভাল হইত। মানমন্দির ও পঞ্চাঙ্গ-শোধন-সমিতি না থাকিলে এ সব বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে না।

ইংরেজী সিদ্ধান্তের তুলনায় আমাদের সূর্য সিদ্ধান্তের গ্রহপরিভ্রমণকাল (পারিভাষিক নাম, ভগণ-কাল। ভ—নক্ষত্র; সপ্তবিংশতি নক্ষত্রভোগকাল) অশুদ্ধ দেখা যাইতেছে। গণিত হাজার করি, মূলে ভুল থাকিলে ফলে ভুল হয়।*

কিন্তু এরূপ কদাচিৎ ঘটে। গুপ্তপ্রেশ-পাঁজিতে প্রতিদিনের গ্রহস্থান দেওয়া হইয়া থাকে। ইংরেজী পাঁজির সহিত তুলনা করা যাউক। অর্থাৎ ইংরেজী "নাবিক পঞ্জিকা" সম্প্রতি আমাদের নির্ভরসাক্ষী হউক। কিন্তু তুলনা বড় সোজা নহে। গ্রহস্থান অর্থে এক নির্দিষ্ট স্থান হইতে গ্রহের অন্তর। এই নির্দিষ্ট স্থান রাশিচক্রের (যে চক্র বা বৃত্ত দ্বাদশ রাশিতে বিভক্ত কল্পিত হয় সেই বৃত্তের —ক্রান্তিবৃত্তের) আদিবিন্দু। ইংরেজী জ্যোতিষে যে বিন্দু আদি, আমাদের জ্যোতিষে সে বিন্দু আদি নহে। ইংরেজী জ্যোতিষে সে বিন্দু বিলক্ষণ জানা আছে। রবি উত্তরায়ণ-কালে বিষুব-বৃত্তের যে বিন্দু অতিক্রম করে, ইহা সে বিন্দু। ইহার নাম মহাবিষুবপাত। (পাত অর্থে পতন, উৎপতন। বিষুববৃত্তের সেখানে সূর্য আসিয়া পড়ে। কেহ কেহ ক্রান্তিপাত বলেন। কিন্তু তদপেক্ষা বিষুবপাত সংজ্ঞা ভাল)। সূর্য এই পাতে আসিলে দিবারাত্রি সমান হয়। ২১শে মার্চ গত সনের ৭ই চৈত্র। সেদিন কলিকাতার ঘড়ীর রাত্রি ১০টা ৪৪ মিনিটের সময় সূর্য বিষুবপাতে আসিয়াছিল। গুপ্তপ্রেশ-পাঁজির গণনায় সেদিন নহে, ৯ই চৈত্র ২৩ মার্চ প্রাতে সূর্য বিষুবপাতে আসিয়াছিল। আমাদের পঞ্জিকাগণক অয়নাংশ নামে একটা অন্তর গণেন। ৩৬০ অংশ হইতে অয়নাংশ বাদ দিলে যত থাকে, রবির স্থান তত হইলে সে স্থান বিষুবপাতে হয়। এই অঙ্গীকার ভুল বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি না। কারণ অয়নাংশ ঠিক জানা নাই। অতএব আমাদের রাশিচক্রের আদি বিন্দু পাইতে অন্য উপায় ধরা যাউক। ২১শে মার্চ কলিকাতার রাত্রি ১০টা ৪৫ মিনিটের সময় গুপ্তপ্রেশ পাঁজির গণনায় রবি-স্থান ৩৩৭।২৭।৫৪ অংশ কলা বিকলা হইয়াছিল। অতএব ৩৬০ অংশ পূর্ণ হইতে ২২।৩২।৬ অংশাদি বাকি ছিল। আমাদের পাঁজির ও ইংরেজী পাঁজির রাশিচক্রের আদি বিন্দুদ্বয়ের অন্তর এত। ইংরেজী পাঁজিতে প্রদত্ত গ্রহস্থান হইতে অত অংশাদি বিয়োগ করিলে আমাদের রাশিচক্রে গ্রহস্থান নিরূপিত হইবে।

এখন দুই পাঁজি মিলাইবার একটা উপায় পাওয়া গেল। মিলাইয়া দেখা যাউক। ৭ই চৈত্র সূর্যোদয়-সময়ে (৬ টা ১০ মিনিট) গুপ্তপ্রেশ-পাঁজির গ্রহস্থান মিলানা যাউক। লণ্ডন হইতে কলিকাতার পূর্বদেশান্তর ৫ ঘণ্টা ৫৩ মিনিট ধরা গেল।

গ্রহ	ইং-পাঁজি	বাং-পাঁজি	অন্তর অংশাদি
রবি	৩৩৬।৪৭	৩৩৬।৪৭	——
চন্দ্র	৩৪।৩৯	৩৫।৩৫	+ ০।৫৬
মঙ্গল	৩১৬।৩০	৩১৪।৪৪	— ১।৪৬

* কখন কখন ভুলে ভুলে কাটাকাটি হইয়া ফল প্রায় ঠিক দাঁড়ায়। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। গুপ্তপ্রেশ পাঁজির প্রদত্ত দিবামান বা সূর্যোদয়াস্তকাল দেখুন। এই দুই বরং নবদ্বীপের পক্ষে ঠিক, কলিকাতার পক্ষে নহে। কিন্তু আবহ-বশতঃ সূর্যবিম্ব উৎক্ষিপ্ত দেখায়। ফলে প্রকৃত দিবামান অপেক্ষা প্রত্যক্ষ দিবামান দুই তিন মিনিট দীর্ঘ হয়। এই কথা মনে রাখিলে পাঁজির লিখিত দিবামান ও সূর্যোদয়াস্তকাল কলিকাতার পক্ষে প্রায় ঠিক দেখা হয়। অনুমান হয়, পূর্বকালের কোন কোন জ্যোতিষী রবির মেষপ্রবেশদিন নিরূপণ করিতে দিবারাত্রির পরিমাণের উপর নির্ভর করিতেন। ইহাতে প্রকৃত দিন ছাড়িয়া দুই তিন দিন পরে আসিয়া পড়িতেন। এই রীতিতে বর্তমানকালে ৭।৮ই চৈত্র না পাইয়া ৯।১০ই চৈত্র পাওয়া যাইত। পরে অয়নাংশ দেখুন।

বুধ	৩০৯।৫	৩০৯।২১	+ ০।১৬
বৃহস্পতি	৩১৮।১৪	৩১৮।৪৫	+ ০।৩১
শুক্র	২৯৩।৫৮	২৯৪।১৬	+ ০।১৮
শনি	৬৩।২০	৬৪।৩৮	+ ১।১৮

গত ৭ই চৈত্রের গ্রহদিগের গতিকলা মিলাইয়া দেখা যাউক। ইহাতে অয়নাংশ লাগিবে না।

গ্রহ	ইং-পাঁজি	বাং-পাঁজি	অন্তর অংশাদি
রবি	৫৯।৩৬	৫৯। ৬	+ ০।৩০
চন্দ্র	৭১১।৪১	৭২০।১	+ ৮।২০
মঙ্গল	৪৭	৪৭	০
বুধ	৬১	৭৫	+ ১৪
বৃহস্পতি	১৪	১৪	০
শুক্র	৬৯	৭১	+ ২
শনি	৩	২	— ১

সে দিন তিথি গুপ্তপ্রেশ পাঁজিতে শুক্লপঞ্চমী প্রায় ৬ দণ্ড, ইংরেজী পাঁজি হইতে আসে প্রায় ১২ দণ্ড।

তিথিতে প্রভেদ পড়া বড় গোলের কথা। ভিন্ন ভিন্ন পাঁজিতে তিথির ঐক্য না হওয়াতেই পঞ্জিকা-সংস্কারের কথা উঠিয়াছে। এখানে আগামী ২৮, ২৯, ৩০ আশ্বিনের তিথি গুপ্তপ্রেশ-পাঁজি, ওড়িয়া পাঁজি ও ইংরেজী পাঁজির মতে কলিকাতার ঘড়ীর সময়ে দেওয়া যাইতেছে। ওড়িয়া পাঁজি সিদ্ধান্তদর্পণ অনুসারে পুরীর নিমিত্ত গণিত।

	২৮শে		২৯শে		৩০শে	
বাঙ্গালা পাঁজি	৭মী	১২।৩১	৮মী	১০।২১	৯মী	৮।২৪
ওড়িয়া "	"	৯।১০	"	৭।২০	১০মী রাঃ	৪।৪৮
ইংরেজী "	"	৮।৪১	"	৬।৫৭	" "	৪।৪৫

দেখা যাইতেছে, ইংরেজী ও ওড়িয়া পাঁজির তিথি বরং কাছাকাছি, বাঙ্গালা পাঁজির দূরে। ইংরেজী ও ওড়িয়া পাঁজি অনুসারে ৩০শে আশ্বিন ক্ষয় নবমী। আর দুই দিনের তিথি দেখা যাউক। আগের অমাবস্যা ও পরের পূর্ণিমা মিলানা যাউক। কলিকাতার সময়।

	২১ আশ্বিন	৫ কার্ত্তিক
বাঙ্গালা পাঁজি	অমা রাঃ ৩।৩৫	পূর্ণিমা রাঃ ২।১৬
ওড়িয়া "	" " ৩।৩১	" " ৫।৪৯
ইংরেজী "	" " ৩।৩৫	" পরদিন প্রাতে

প্রভেদের কি কারণ, কে জানে। কোন্‌টা ঠিক, তাই বা কে জানে। বোধ হয়, ইংরেজীটাই ঠিক। কারণ ইংরেজী পাঁজি হইতে চন্দ্র সূর্য গ্রহণ গণিলে প্রত্যক্ষের সহিত মেলে।* চন্দ্রশেখর আমাদের জ্যোতিষের বহু সংশোধন করিয়াছেন, কিন্তু সব পারেন নাই। কোন কোন বিষয়ে ভুল হইয়া গিয়াছে। যেমন, উজ্জয়িনী হইতে দেশান্তর ওড়িশাতে পূর্বে ধরা হইত ১৮৪ যোজন; চন্দ্রশেখর ২০০ যোজন ধরিয়া পুরীকে নদীয়া জেলার পূর্বাংশে লইয়া গিয়াছেন। (যদি কেহ ওড়িয়া পাঁজি হইতে তিথ্যাদি মিলাইতে চান, তাঁহারা মনে রাখিবেন যে সে পাঁজির সূর্যোদয় ঘণ্টা আমাদের ঘড়ীর মধ্যমকাল নহে, ঘড়ীর স্ফুটকাল।)

এই-সব বাদ-বিসম্বাদ মিটাইবার এক উপায় মানমন্দির-প্রতিষ্ঠা ও গ্রহ-বেধ। বেধ করিবার পর বলিতে পারিব আমাদের গণনা ঠিক, কি ইংরেজী গণনা ঠিক। ইংরেজী জ্যোতিষ মানি না এমন নহে; কিন্তু মানা এক, অনুভব অপর। দুই তিন বৎসর গ্রহবেধের পর পাঁজি গণিবার নূতন সারণীর কথা উঠিবে। সারণী-নির্মাণ সহজ কাজ নহে। বোধ হয় সে সময়ে সূর্য স্থির পৃথিবী অস্থির স্বীকার করিয়া পুরাতন মত বিসর্জন করিতে হইবে। নূতন মত সত্য হউক মিথ্যা হউক, সে মতে গ্রহগতি সহজে বুঝিতে পারা যায়, গণনাও সহজ হয়। গুপ্তপ্রেশ-পঞ্জিকার প্রকাশক ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "বিজাতীয় হইতে জ্ঞানার্জ্জনের যিনি পরিপন্থী তিনি অপণ্ডিত। কিন্তু জাতীয় সত্ত্বে বিজাতীয়ের যিনি পক্ষপাতী তাঁহার বিবেক-বুদ্ধি প্রশংসনীয় বলিতে পারি না।" ঠিক কথা। এই পঞ্জিকার গণক সচ্ছন্দে বলিতে পারেন, সূর্যসিদ্ধান্তরহস্যের সহিত মিলাইলে

* লণ্ডনের রাজকীয় মান-মন্দিরের অধ্যক্ষ মহাশয় গত বর্ষের কার্য্য-বিবরণীতে লিখিয়াছেন, যে সারণী অনুসারে চন্দ্রস্থানের গণিত হইতেছে চন্দ্র সে সারণী হইতে দূরে পড়িতেছে। অর্থাৎ চন্দ্রের গণিত স্থান ও দৃষ্ট স্থান এক হইতেছে না। তিনি দেখিয়াছেন গত বৎসর চন্দ্রের গণিত বিষুবাংশে প্রত্যক্ষ অপেক্ষা ০·৯০ বিকলা অধিক হইয়াছিল। ১৯১৩ সালে এই ভুল ০·৮৩ বিকলা ছিল। অধ্যক্ষ মহাশয় শেষে লিখিয়াছেন, গত বিশ বৎসর চন্দ্রের স্থান বর্ষে বর্ষে আধ বিকলা করিয়া বাড়িয়া আসিতেছে। এই বিবরণ হইতে স্পষ্ট হইবে, কত যত্নে কত পরিশ্রমে গ্রহগতি নিরূপিত হইতেছে। ইহা হইতে আরও দেখা যাইবে যে চন্দ্রগণিত ইয়রোপেও এখনও ঠিক হয় নাই।

পঞ্জিকায় ভুল পাইবেন না। কিন্তু কথাটা আরও গভীর দাঁড়াইয়াছে। আমরা চাই, আমাদের পাঁজিতে গ্রহের যে স্থান লিখিত হইবে, সে স্থানে আকাশে গ্রহ দেখিতে পাওয়া যাইবে। সেরূপ "বঙ্গ-পঞ্চাঙ্গ" নাই। বিদ্যায় চি দিন পরমুখাপেক্ষী থাকা কলঙ্কের কথা। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রেরা জ্যোতির্বিদ্যা শিখিবার নিমিত্ত মান মন্দির পাইয়াছে, অথচ বাঙ্গালী জাতির ধর্মকর্ম যে পাঁজি অনুসারে চলিতেছে, তাহার সত্যাসত্য-পরীক্ষার উপায় নাই! "সত্যাসত্য পরীক্ষা" না বলিতে চান না বলুন। দৃগ্‌গণিত ঐক্য করিবার উপায় নাই বলা অল্প কলঙ্কের কথা নহে। মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র মানমন্দিরের মাসিক ব্যয় নির্বাহ করিবেন। মনে করুন, মহারাজাধিরাজ স্যর বিজয়চন্দ মানমন্দির নির্মাণ করাইয়া আবশ্যক যন্ত্র দান করিলেন, এবং নবদ্বীপাধিপতি ক্ষৌণীশচন্দ্র আবশ্যক পুস্তক সংগ্রহ করিয়া দিলেন। মহারাজাধিরাজ বংশপরম্পরায় জ্ঞানদান করিয়া আসিতেছেন। নবদ্বীপাধিপতি পুরুষানুক্রমে পঞ্জিকার পৃষ্ঠপোষক হইয়া আছেন। ইঁহাদের যে-কেহ মন করিলে কি না করিতে পারেন? আর রাজার অনুগ্রহ ব্যতীত কোন্ দেশে কোন্ কালে বিদ্যার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে? বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ উদ্‌যোগী হইলে বঙ্গ-পঞ্চাঙ্গ প্রণয়ন আরম্ভ করিতে অধিক কাল লাগিবে না। "বঙ্গ-পঞ্চাঙ্গ" বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করিতেছি। ইহাতে দৈনন্দিন গ্রহস্থান লিখিত হইবে, কিন্তু ফল-জ্যোতিষের কিছুমাত্র থাকিবে না। যাঁহার ইচ্ছা হইবে, তিনি এই পঞ্চাঙ্গ ধরিয়া ফলগণনা করিয়া ব্রত-উপবাস পূজাপার্ব্বণের দিন ব্যবস্থা দিয়া পাঁজি রচনা করিতে পারিবেন। পঁচিশ ত্রিশ পৃষ্ঠায় "বঙ্গপঞ্চাঙ্গ" সম্পূর্ণ হইতে পারিবে। হয়ত ইংরেজী হইতে অনেক লইতে হইবে, কিন্তু নিজস্ব করিয়া লইতে পারিলে পরস্বগ্রহণে পাপ আছে কি? যাহাদের পিতামহগণ যবনাচার্যের কত মত গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে যবনবিদ্যা দুষ্য হইতে পারে কি? জ্যোতিষের অত্যাবশ্যক "কেন্দ্র" শব্দটাই নাকি যবনজাতির! ইহাতে পিতামহগণের নিন্দার কথা নাই, প্রশংসার কথা আছে। বিদ্যায় জাতিবিচার নাই, ইহা বিদ্যার প্রয়োগে তাঁহারা দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন।

পরিশেষে আমাদের পঞ্জিকাপ্রকাশকগণের নিকট সবিনয়ে নিবেদন করি, কাহারও নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। [illegible]াদের পাঁজিতে কি পাই, তাহাই যথাবুদ্ধি [illegible]খতে চেষ্টা করিয়া দেশের অভাবমোচনের আকাঙ্ক্ষা ও উপায় প্রদর্শন করিয়াছি।

কটক। ভাদ্র। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

শ্যামে হিন্দুধর্ম্ম

বর্ত্তমান প্রবন্ধে "হিন্দু" অর্থে কেবল সাধারণতঃ হিন্দু নামে পরিচিত ভারতীয় জাতিকেই বুঝিতে হইবে। বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি সম্প্রদায়-বিশেষ উহার অন্তর্গত নহে।

সংস্কৃতের সাহায্যে শ্যামভাষা বর্দ্ধিত এবং পরিপুষ্ট হইয়াছে। তাহাদের ভাষার প্রায় সমগ্রশব্দ প্রাচীন আর্যগণের নিকট হইতে গৃহীত। তাহাদের ধর্ম্ম ও রাজকীয় অধিকাংশ ক্রিয়াকাণ্ড প্রাচীন আর্য্যরীতি অনুসারে সুসম্পন্ন হয়। তথায় ব্রাহ্মণগণের সংস্কার, ব্রাহ্মণ দৈবজ্ঞ-গণের নিকট হইতে সর্ব্বদা পরামর্শ গ্রহণ, বেদাদির প্রবর্ত্তিত নিয়ম প্রতিপালন এবং ব্রাহ্মণগণের ক্রিয়াকলাপাদি সর্ব্বকার্য্যে বিহিত হইয়া থাকে। প্রতি উচ্চ রাজকার্য্যে ব্রাহ্মণগণই নিযুক্ত। তাঁহারা এইপ্রকার উচ্চকার্য্যে বিনিযুক্ত থাকিয়াও যথার্থ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য সম্পাদন করেন। ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব দেবমন্দিরে দেবারাধনা করিয়া থাকেন। সেই মন্দিরে শচীপতি ইন্দ্র, ব্রহ্মা ও অন্যান্য হিন্দু দেবদেবী বিদ্যমান। বস্তুতঃ তথায় জাগতিক সৃষ্টির ধারণা ও পৌরাণিকী কথা প্রভৃতি হিন্দুগণের নিকট হইতে সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হইয়াছে। বৈদিক-যুগে ভারতবর্ষে হিন্দুরাজগণ কোন ক্রিয়া-কলাপাদি নিষ্পন্ন করিবার জন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিযুক্ত করিতেন। যজ্ঞাদি কার্য্যেও ঐরূপ হইত। ব্রাহ্মণগণই তাঁহাদের পারিবারিক দৈবজ্ঞরূপে কার্য্য করিতেন। ভারতবর্ষের ন্যায় শ্যামদেশে বর্ত্তমান সময়েও শ্যামরাজগণ কতিপয় ব্রাহ্মণ দৈবজ্ঞ অথবা ভবিষ্যদ্বক্তাকে প্রতিপালন করেন। ব্রাহ্মণগণের কার্য্য শুভদিন এবং মাহেন্দ্রযোগ ও শুভ মুহূর্ত্ত নির্দ্ধারণ এবং রাজকীয় তাবৎ ক্রিয়াদি পরিদর্শন করিয়া তাহার সুব্যবস্থা ও সুসম্পন্ন করণ।

শ্যামবাসীর ধর্ম্মগ্রন্থে এবং তিনবেদ ও হিন্দুশাস্ত্রের পুনঃপুন উল্লেখ এবং বেদের সার-সংগ্রহ দৃষ্ট হয়। শ্যামভাষায় তিন বেদকে "ত্রৈইফেৎ" কহে এবং শাস্ত্রকে "সাং" বলে। উক্ত শাস্ত্রে মহাপুরুষের দ্বাত্রিংশৎ চিহ্নের উল্লেখ আছে। তাহারা বলে, মহাব্রহ্মা ব্রাহ্মণবেশে স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া জনগণকে বেদ শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। তাহারা তিন বেদেরই উল্লেখ করে, অথর্ব্ব বেদকে বেদমধ্যে গণ্য করে না। তাহারা ঋগ্‌বেদের কতিপয় অংশ, যজুর্ব্বেদের কতিপয় শাখা এবং সামের অধিকাংশ স্থান লইয়া তিন বেদ গণ্য করে। কোন ব্যক্তি একটি বেদে পারদর্শী হইলে তাহাকে বেদপারগ ব্রাহ্মণ বলিয়া তাহারা গণ্য করে না।—তিন বেদেই সম্যকরূপে অধিকারী হওয়া চাই। বেদের বহুস্থান শ্যামবাসীর গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়া থাকে। তাহারা ভারতীয় আইনকর্ত্তা মনু প্রভৃতির আইনের অধিকাংশ গ্রহণ করে নাই। *

শ্যামবাসী ব্রাহ্মণগণের বিষয় বহু পুস্তকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সর্ব্বাগ্রে উত্তর-শ্যামে কিলো-অম্নুলকে আধিপত্য স্থাপন করিবার সময়ে ব্রাহ্মণগণের প্রভাব তথায় পূর্ণমাত্রায় লক্ষিত হইত এবং দক্ষিণ-শ্যামে রাজধানী স্থাপিত হইলে তাঁহাদের প্রভাব হ্রাস হইয়া পড়ে। শ্যামবাসীগণ বলে, বেদের মধ্যেই উপাসনাদির পদ্ধতি, চিকিৎসা ও জ্যোতিষ-শাস্ত্র লিপিবদ্ধ আছে।

শ্যামবাসীগণ বলে, ফ্রামণ (ব্রাহ্মণ), ক্ষত্রিয় (ক্ষত্রিয়), কাহাবদি (গৃহপতি),—এই তিন জাতিই তথায় সর্ব্বপ্রধান। তথায় ব্রাহ্মণগণ পঞ্চতপ করেন। তাঁহারা চারিদিকে অগ্নি রাখিয়া মধ্যস্থলে উপবেশন করিয়া জপাদি ক্রিয়া সম্পাদন করেন। শ্যামভাষায় "ঋৎ" বাক্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা সংস্কৃত "ঋদ্ধি"রই অপভ্রংশ।

দার্শনিকগণ বলেন, তথায় দুইটি সম্প্রদায় আছে। (১) ব্রাহ্মণোয়ম্ ও (২) সামান্যেয়ম্। যাঁহারা ব্রহ্মা ইন্দ্র জগদীশ্বর অন্যান্য দেবগণ পিতৃপুরুষগণ এবং অপর শুভাকাঙ্ক্ষীগণের অর্চ্চনা করেন, তাঁহারাই "ব্রাহ্মণ্যেয়ম্" পদবাচ্য। অপর দল যাহারা পরজন্ম স্বীকার করে না, কাহারও উপাসনা করে না ও মৃত্যুর পর কি ঘটিবে তাহা পরিজ্ঞাত নহে তাহারাই "সামান্যেয়ম্"। *

শ্যামদেশে ব্রাহ্মণধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এখনও তথায় বহুব্যক্তি উক্তধর্ম্মের অনুবর্ত্তী। এক্ষণে তাহা বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সেই ব্রাহ্মণদিগের মত এই যে এই জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড "থাও মহাফ্রোম" হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। ভগবান ব্রহ্মাকে শ্যামভাষায় "থাও মহাফ্রোম" কহে।

তথাকার ব্রাহ্মণগণের বিশ্বাস যে "বলি" প্রদান করিলে পুণ্যলাভ হয়। ত্রিমুখ-বিশিষ্ট এবং ষড়ভুজ-যুক্ত কোন এক দেবতার সম্মুখে তাঁহারা পশু "বলি" দান করিতেন। তাঁহারা বলেন, তিনটি দেবতা এক মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছেন। সেই হেতুই উক্ত মূর্ত্তি ত্রিমুখ ও ষড়ভুজ। "বলি" একটি দেবতাকে প্রদান করিলেই তিনটি দেবতাকে প্রদান করা হইল। কখনও কখনও তাঁহারা পৃথক পৃথক তিনটি মূর্ত্তি গঠন করিয়াও পূজাদি করিতেন।

শ্যামবাসীর 'দেওদা' (দেবতা) হস্তে তরবারি ও পঙ্কজ ধারণ করেন। ব্রহ্মাও তাহাদের দেবতা। তাহারা বলে দেবাতুংশ পর্ব্বত মেরুপর্ব্বতের সমতুল্য। তথায় ইন্দ্রের রাজপ্রাসাদ বিদ্যমান। ইন্দ্রের উদ্যানে "কল্পবৃক্ষ" আছে। শ্যামভাষায় তাহাকে "কামফ্রুক" (কামবৃক্ষ) বলে। উক্ত বৃক্ষ দেবগণের প্রার্থিত বস্তু প্রদান করিয়া থাকে। যম বায়ুমণ্ডলে বসতি করেন। শ্যামবাসী বলে, স্বয়ং ভগবান বুদ্ধদেব ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে 'তুসিতে' বা 'তুসিতে' অবস্থান করিতেন। সেই 'তুসিত'ই স্বর্গ বলিয়া কথিত। শ্যামবাসী স্বর্গকে "তুসিত" বা "তুসিত" বলিয়া থাকে। সর্ব্বাগ্রে তুসিত, পরে নিমনরাদি। অবশেষে

* (a) Dictionnaire Francais Siamois par M. N. Lunt de Lajonquiere, 1904, Pp. 324, 326, Liv. II.

(b) Voyage de Siam des Peres Jesuites Envoyez par le Roy aux Indes & à la Chine, pp. 96, 97, 309, 311 ; tome I.

(c) H. Albaster's The Wheel of the Law, Vide Religion, and Dr. Bastian's Reisen in Siam, Regarding Vedas. Livre II,. V

* Voyage de Siam des Peres Jesuites Envoyez par le Roy aux Indes & à la Chine, pp. 99, 97.

পবনির্ম্মিত বসবদি, তদুপরি কামদেব অবস্থান করেন। সেই স্বর্গে "করবেক" নামে একপ্রকার পক্ষী আছে। এই-প্রকার কিম্বদন্তী যে উক্ত বিহঙ্গের মিষ্টস্বরে অরণ্যানীর সমগ্র প্রাণী মুগ্ধ হইয়া থাকে। শ্যামবাসীগণ গরুড়কে 'গুরুদাস' বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। সে নাগগণের শত্রু।

ব্রহ্মা, মহাদেব, বিষ্ণু, ইন্দ্র, যম, গরুড়, নাগ, বায়ু, বরুণ, বীণাপাণি প্রভৃতি বহুদেবদেবীর মূর্ত্তি শ্যামবাসীগণ অর্চ্চনা করে। *

তাহারা দেবদেবী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করে। দেবদেবী মহৎযোনিসম্ভূত। তাঁহারা জরা-মরণ-বর্জ্জিত। তাঁহাদের গলদেশের পুষ্পমাল্য কদাপি নিষ্প্রভ হয় না। তাঁহাদের গাত্র হইতে কদাপি ঘর্ম্ম নির্গত হয় না। তাঁহাদের শীত গ্রীষ্ম নাই। দেবগণের শরীরের অসম্পূর্ণতা পরিলক্ষিত হয় না। পুরুষ বা অঙ্গনা সকলেরই অক্ষুণ্ণ চিরযৌবন। তাঁহারা স্বেচ্ছানুসারে অপর প্রাণীর হৃদয়ে প্রবেশলাভ করিতে সক্ষম। শ্যামবাসীর মতে বহু নিম্নশ্রেণীর দেবতা আছে। নিম্নশ্রেণীর দেবগণের পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। জ্যোতির্ব্বেত্তার ন্যায় তাঁহারা ভূকম্পন, চন্দ্র সূর্য্যাদির 'গ্রহণ' এবং কু-নক্ষত্রাদির অভ্যুত্থান ও উদয়ের সময় নির্দ্দেশ করিতে পারেন।

শ্যামবাসীগণ নাগগণের উল্লেখ করিয়া থাকে। নাগগণ কোনও কোনও অংশে দেবগণের সমতুল্য প্রভাবসম্পন্ন। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, ভগবানের চিহ্নস্বরূপ বলিয়া ঐ দেশে উক্ত দেবচিহ্ন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছে। প্রাচীনকালে শ্যামবাসীগণ বৃক্ষ পূজা করিত। গীতায় অশ্বত্থবৃক্ষ পূজার্হ বলিয়া উল্লিখিত আছে। বৌদ্ধগণ আগমন করিবার বহুপূর্ব্বে এখানে বৃক্ষপূজা হইত। তথায় ভগবান বুদ্ধ-দেবের হস্তে বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র দৃষ্ট হয়। ইন্দ্রের বজ্রও কখন কখন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

শ্যামবাসীর মধ্যে বহু শৈব দৃষ্ট হইত। শিব ত্রিশূল ধারণ করেন। শ্যামভাষায় তাহাকে "ত্রি" বলে। উক্ত ত্রিশূলে বুদ্ধদেবের কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হয় না। বুদ্ধদেব শান্তির অবতার। যুদ্ধবিগ্রহাদি তাঁহার মধ্যে কোন-প্রকারেই স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে না। সুতরাং উহা শিবের ত্রিশূল ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়া উপলব্ধি করা যায় না। উহা হিন্দুগণেরই উপাস্য দেবতার নিদর্শন।

শ্যামদেশের ললনাগণ গুরুজনের সম্মুখীন হইয়া বাক্যোচ্চারণ করে না। তাহারা নদী তড়াগাদি হইতে কলসী করিয়া জল আনয়ন করে।

আমাদের দেশের ন্যায় শ্যামদেশের স্ত্রীলোকেরা বেণী বন্ধন করিয়া মস্তকের পশ্চাৎদিকে খোঁপা বাঁধিয়া থাকে।

"জীবহিংসা করিও না। অপহরণ করিও না। ব্যভি-চার করিও না। মিথ্যাকথা বলিও না। মদ্যপান করিও না।" এই নিয়মগুলি ভঙ্গ করিলে সকলেই তাহার দুর্নাম রটনা করে। উক্ত নিয়মাবলী পালন করিলে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। শ্যামদেশের পুরোহিত-গণ এই-সকল নিয়ম প্রতিপালন করেন। শ্যামে পৌত্তলিকতা অত্যধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। তাহারা একবার সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিলে আর গৃহস্থাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে না। তাহাদের বাসোপযোগী বহু গুম্ফা বা গুহা পরিদৃষ্ট হয়। সন্ন্যাসীগণ যাবজ্জীবন অবিবাহিত থাকিতে বাধ্য। তাহারা ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকার্জ্জন করে। পুরোহিতগণ মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া স্বায়ংকালে যে সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিতে থাকেন তাহা প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূর হইতে শ্রুতিগোচর হয়। অতঃপর ঢক্কা-নিনাদ দ্বারা সন্ধ্যার্চ্চনাদি সম্পূর্ণ হইবার বার্ত্তা দেশবাসীকে বিজ্ঞাপিত করা হয়।

শ্যামবাসীগণ তদ্দেশে বিভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বীকে দর্শন করিলে ঈর্ষাপরায়ণ হয় না। তাহারা বলে ধর্ম্ম একপ্রকার নহে। যাহার যে প্রকার ইচ্ছা, সে তাহাই সম্পন্ন করুক। রাজাই সে দেশের ধর্ম্মের নেতা।

তাহারা কিন্তু শিক্ষা-ব্যাপারে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। শিক্ষিত যাজকগণ অধুনা সংস্কৃত ভাষা কিঞ্চিৎ পরিজ্ঞাত আছেন। পরন্তু তথায় পালিভাষারই প্রচলন অধিক।

ভারতীয় জ্যোতিষ ব্রহ্মবাসীর মারফতে শ্যামদেশবাসী গ্রহণ করিয়াছে। উহার কিয়দংশ ইউরোপ মহাদেশেও গিয়াছে।

* Livre II, 308, 309, 310, 311, 387, 412 Liv. V. and H. Albaster's Wheel of the Law. Vide the Chap. on Religion.
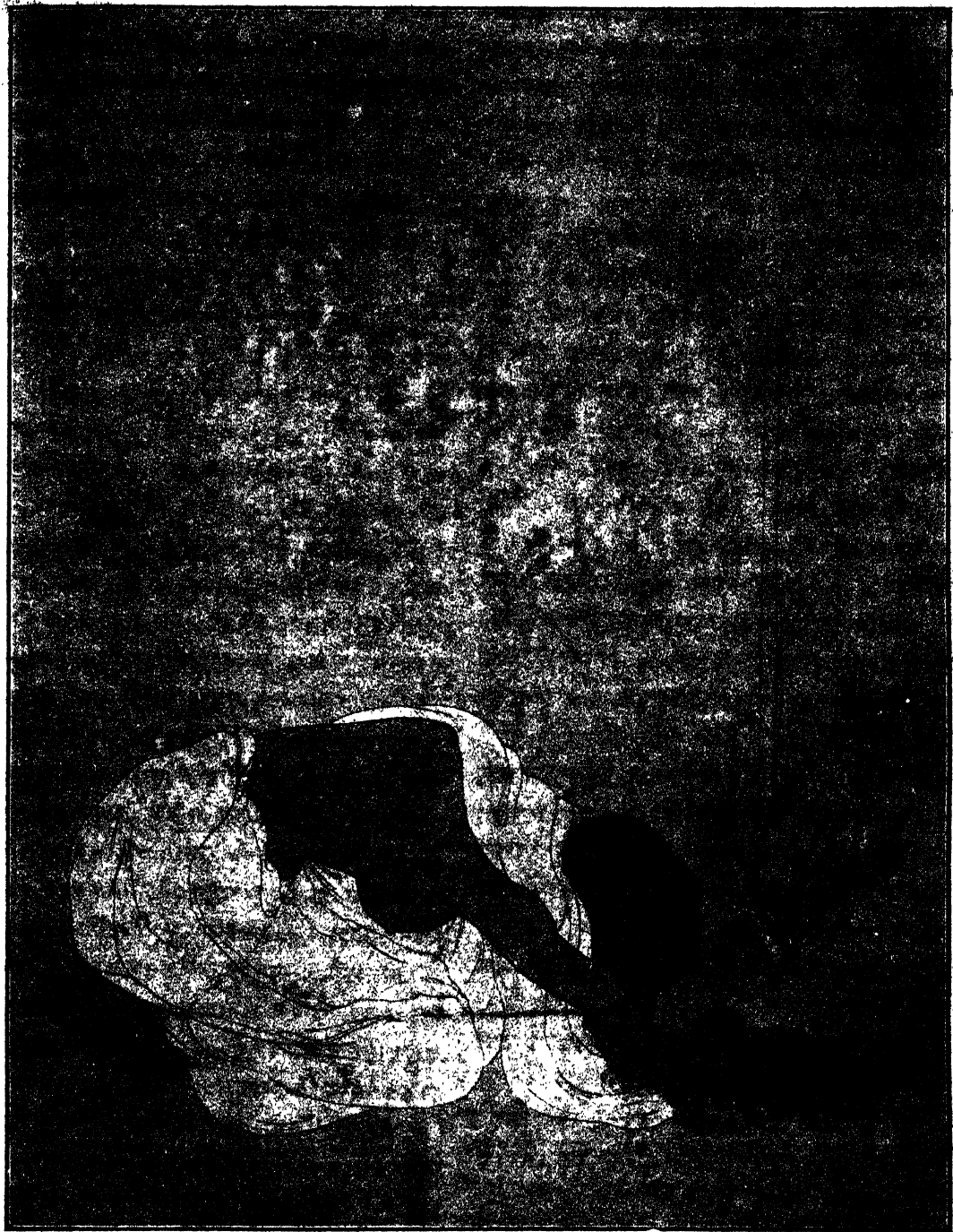
প্রণাম

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার কর্ত্তৃক অঙ্কিত ও চিত্রাধিকারী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে মুদ্রিত।

U. RAY & SONS.

তথায় রামচন্দ্রের সম্বন্ধে চারিশত সর্গ বা খণ্ডের এক পুস্তক বিদ্যমান আছে। রামচরিত সম্বন্ধে নাটক আছে। তাহা এত সুদীর্ঘ যে সম্পূর্ণ নাটক অভিনয় করিতে হইলে ছয় সপ্তাহ লাগে।

ভারতের হিন্দুগণের ন্যায় শ্যামদেশের অধিবাসীগণ মস্তকে "শিখা" রাখিয়া থাকে। উক্ত শিখা দৈর্ঘ্যে এক ইঞ্চি হইতে দুই ইঞ্চি পর্য্যন্ত। ইহারা দেখিতে অনেকটা তৈলঙ্গীগণের ন্যায়। শ্যামবাসীগণ মস্তকের উপর প্রায় চারি ইঞ্চি পরিমিত স্থানে কেশ রাখে। অবশিষ্ট কেশ মুণ্ডন করিয়া ফেলে। শ্যামবাসীগণের মধ্যে কেহ কেহ মস্তকে দুই ইঞ্চি লম্বা করিয়া কেশ রাখে। তখন তাহাদের শিখা চারি ইঞ্চি পরিমিত রাখিতে হয়। কিন্তু শ্যামদেশের ললনাগণ মস্তক মুণ্ডন করে না। বঙ্গবাসীর ন্যায় শ্যামবাসীগণ অনাবৃত মস্তকে ও নগ্নপদে গমনাগমন করে। এক কথায় কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ কেহই মস্তকে কোন-প্রকার আবরণ প্রদান করে না। তবে রাজকর্ম্মচারীগণ সভায় গমনকালে পাগড়ী ব্যবহার করে। কাম্বোজিয়গণও শ্যামবাসীগণের ন্যায় পরিচ্ছদাদি ব্যবহার করে। ভারতের হিন্দুগণের মধ্যে যেমন শ্বেত পরিচ্ছদ শোকের নিদর্শন, শ্যামদেশেও তদ্রূপ।

ভারতবাসীর ন্যায় শ্যামদেশের অঙ্গনাগণ কণ্ঠভূষণ, বলয়, মাদুলি ব্যবহার করে। কিন্তু তাহারা উল্কি পরে না।

তাহারা হিন্দুগণের নিকট হইতে রাশিচক্রাদির নামও গ্রহণ করিয়াছে এবং অমাবস্যা পূর্ণিমা ও একাদশী তিথি পালন করে। উক্ত তিথিতে তদ্দেশের রাজা মন্দিরাদিতে গমন করেন এবং অর্থ ও তণ্ডুলাদি বিতরণ করেন। চাতুর্ম্মাস্য ব্রত আছে। উক্ত ব্রত পূর্ণ হইলে তাহারা অত্যন্ত আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকে। *

প্রজার কোন মোকর্দ্দমা যথার্থরূপে মীমাংসিত না হইলে রাজা স্বয়ং তাহার বিচার করেন। মোকর্দ্দমার আপীল রাজার নিকট করিতে হয়। মনুর আইন তথায় কিঞ্চিন্মাত্রায় প্রচলিত আছে। আদালতে সাক্ষীকে আনয়ন করিলে সে যাহা বলিয়া শপথ করে তাহার মধ্যে হিন্দুদেবদেবীর উল্লেখ আছে। শপথবাক্য যথা :—"যদ্যপি আমি সত্য ভিন্ন মিথ্যাবাক্যের অবতারণা করি তাহা হইলে আমি যে-স্থানে গমন করি না কেন আমি যেন কদাপি বিপদ হইতে রক্ষা না পাই। তস্কর, দস্যু, দৈত্য, দানব, ভূত, প্রেত, পবন, বরুণ, প্রভৃতি সকলে যেন আমাকে ভীষণ দণ্ড প্রদান করেন। আমার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হয়। যম যেন আমাকে বিশেষ যন্ত্রণা দিয়া হনন করেন।" কোন স্ত্রীলোক বক্তা অপেক্ষা স্বল্প-বয়স্কা হইলে বক্তা তাহাকে 'ভগিনী' বলিয়া সম্বোধন করিবে। পরন্তু অধিক-বয়স্কা হইলে বক্তা তাঁহাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনী বা মাতা বলিয়া সম্বোধন করিবে। শ্যামবাসীরা ম্যাজিষ্ট্রেটকে 'প্রিয়চিকীর্ষু' প্রভৃতি বাক্যে সম্বোধন করে। কোন ব্যক্তি রাজা বা পূজনীয় ব্যক্তির নিকট হইতে কোন আদেশ প্রাপ্ত হইলে আদিষ্ট ব্যক্তি "শিরোধার্য্য-রূপে গ্রহণ করিলাম" ইত্যাকার বাক্য উচ্চারণ করে। তাহারা কোন তারিখ বলিতে হইলে তিথির উল্লেখ করিয়া থাকে। যথা অমুক মাসের শুক্ল পক্ষীয় ত্রয়োদশী তিথিতে অমুককার্য্য সংঘটিত হইয়াছিল। অতি প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণগণ শ্যামদেশে ভারত হইতে বর্ণমালা লইয়া গিয়াছিলেন।

অন্যায় অত্যাচার করিয়া কাহারও নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিলে মৃত্যুর পর তাহাকে পাপের যথোপযুক্ত দণ্ড-গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাও তাহাদের বিশ্বাস আছে। *

"ত্রেয়াই শরণ" অর্থাৎ ত্রিশরণ বা কোন মন্ত্রাদি তিন বার উচ্চারণ করিবার প্রথা তথায় আছে। শ্যামবাসী যাজকগণ বলেন, সর্ব্বদাকল্যে দ্বাবিংশতি স্বর্গ ও অষ্টবিধ নরক বিদ্যমান আছে। বহুজন্ম পরিগ্রহ করিয়া জীব তাহার সুকৃতি বা দুষ্কৃতি অনুসারে স্বর্গ বা নরক ভোগ করে। তাঁহারা অধিকন্তু বলেন, স্বর্গে গমন করিলে পূর্ণ শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। নরকগুলিতে তদ্রূপ মহাভীতি, উৎপীড়ন এবং বহু অমানুষিক দণ্ড ভোগ করিতে হয়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে অষ্টবিধ বৃহৎ নিরয়। প্রত্যেকটিতে আবার ষোলটি ক্ষুদ্র নিরয়। প্রত্যেক বৃহৎ নিরয় দৈর্ঘ্যে

---

* Voyage de Siam—pp. 320 Liv. V & pp. 326-35 Liv. V.

* Voyage de Siam, des Peres Jesuites Envoyez par le Roy aux Indes & à la Chine, pp. 99 Liv. II.

প্রস্থে ও উচ্চতায় ৪৫ ক্রোশ। তন্মধ্যে লবণাক্ত নদী। পাপাত্মাগণ উক্ত নিরয়মধ্যে সমুপস্থিত হইলে কতিপয় উত্তপ্ত লৌহশলাকা তাহাদের অঙ্গমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়। যদ্যপি তাহারা যন্ত্রণায় জল প্রার্থনা করে, যমদূত তৎক্ষণাৎ গলিতলৌহ তাহাদের মুখবিবরে ক্ষেপণ করে। তথায় এইপ্রকার ভীষণভাবে নিরয়চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

শ্যামদেশে রাজা ব্রাহ্মণগণকে পোষণ করেন। রাজ্যের অর্থে তাঁহাদের পূজার মন্দির প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়, উক্ত মন্দিরাদি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের অর্চ্চনার্থ প্রতিষ্ঠা করা হইয়া থাকে। * বহু প্রকারের হিন্দু দেবদেবী এই মন্দিরসমূহে দৃষ্ট হয়। এই ব্রাহ্মণ দৈবজ্ঞগণের নিকট রাজা বা রাজপ্রতিনিধি তাবৎ কার্য্যে উপদেশ গ্রহণ করেন সকল কার্য্যই ব্রাহ্মণগণের কথিত শুভদিন শুভক্ষণে আরম্ভ করা হয়।

শ্যামবাসীগণের মধ্যে হিন্দুগণের সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতের ব্যবস্থা আছে। ভারতীয় ও চীনের চিকিৎসাপ্রণালী ইহারা গ্রহণ করিয়াছে।

শ্যামবাসীগণের মধ্যে ব্রাহ্মণপ্রাধান্যের সময় হইতে শবদাহপ্রথা প্রচলিত আছে। বৌদ্ধপ্রাধান্যের সময়েও উহার শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিয়া বৌদ্ধগণ উহার বিলোপসাধন করেন নাই। হিন্দুগণ ভারতবর্ষে যেমন মৃতের সহিত কড়ি ও স্বর্ণখণ্ড প্রদান করেন, শ্যামদেশেও তদ্রূপ বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্যাদি প্রদানের ব্যবস্থা আছে। শনি বা মঙ্গলবারে মৃত্যু হইলে বাঙ্গালাদেশে যেমন তুলসী ও কদলীবৃক্ষ শবদাহ-স্থানে লইয়া গিয়া রাখিয়া দিতে হয়, শ্যামদেশেও তদ্রূপ বিভিন্ন প্রকারের বৃক্ষাদি প্রদানের বিধি আছে। শ্যামদেশের সকল শ্রেণীর লোকেই মৃতদেহ দাহ করে। উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিগণ মৃতদেহ বহুদিন পর্য্যন্ত শবাধারে সুগন্ধ ঔষধিদ্বারা সিক্ত করিয়া রাখে ও পরিশেষে তাহা সমারোহে দগ্ধ করে। এদেশের নরপতির বা অবস্থাপন্ন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তদীয় দেহ ভস্মসাৎ করিয়া সেই ভস্ম কোনস্থলে প্রোথিত করে এবং তদুপরি একটি সুরম্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে নীল-পীতাভ বিবিধ চিত্রাদি অঙ্কন করে। উক্ত মন্দিরের শিরোদেশে নিরেট স্বর্ণালঙ্কারাদি দোদুল্যমান থাকে। এইপ্রকার মহামূল্য মণিমাণিক্যাদি দ্বারা শ্মশানগৃহ সজ্জিত করা হয়। হিন্দুগণের ন্যায় মৃতের পুত্রাদির মস্তক মুণ্ডন করিতে হয়।

শবদাহনের পূর্ব্বেই গরিব দুঃখীকে অর্থাদি বিতরণ করা হয়। অবশেষে পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করিলে মৃতের পুত্র বারত্রয় মৃতের দেহ প্রদক্ষিণ করিয়া মুখে অগ্নি প্রদান করে। দাহকার্য্য সম্পন্ন হইলে আত্মীয়স্বজনগণ মৃতের জন্য রোদন করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করে। এই সকলই হিন্দুরীতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। *

শ্যামদেশে ব্রাহ্মণপ্রাধান্যের সময়ে যদ্যপি কেহ পাপানুষ্ঠান করিত সকলেই তাহাকে ভারতবর্ষে গমন করিয়া গঙ্গানদীতে অবগাহন স্নানের ব্যবস্থা প্রদান করিত। সে ভারতে গমন করিয়া গঙ্গায় স্নান করিয়া পাপের স্খালন করিত। মৃত্যুকাল সমুপস্থিত হইলে গঙ্গা বা অপর কোন নদীর তীরে লইয়া গিয়া মুখে জল প্রদান করা হইত। এইসকল ভারতবর্ষের হিন্দু আচার। বহু দূরবর্ত্তী শ্যামদেশেও এই আচার প্রচলিত ছিল।

শ্যামদেশের অন্তর্গত ওঙ্কারে ভগ্নাবশেষ স্তূপাদি দৃষ্ট হয়। সেই সুদৃশ্য মন্দিরগাত্রে বিবিধপ্রকারের বহু চিত্র দৃষ্ট হয়। উক্ত ভাস্কর্য্য-চিত্রাদি হিন্দু পৌরাণিক বিষয় ও রামায়ণ হইতে গৃহীত। ওঙ্কারের মন্দিরগাত্রে রামায়ণ মহাকাব্য সম্পূর্ণরূপে চিত্রাকারে খোদিত রহিয়াছে। যেন পঞ্চবিংশতি সহস্র শ্লোকে পূর্ণ একখানি রামায়ণ মহাকাব্য মন্দিরগাত্রে লিখিত রহিয়াছে। উক্ত মন্দিরের প্রাচীরের উপর লক্ষাধিক পৃথক পৃথক চিত্র খোদিত আছে। উহা বহুদিন ধরিয়া পাঠ করিলেও বোধহয় শেষ হইবার নহে। এতদ্ভিন্ন তথায় আরও বহু চিত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। উহাতে রথ, অশ্ব, গজ প্রভৃতি যুদ্ধার্থ গমন করিতেছে

* Le Siam Ancien par Lucien Fournereau, Paris, Ernest Leroun, Editeur, 1895. Premiere Partie. Civa, Vishnu, pp. 54. & H. Alabaster's The Wheel of the Law, Vide the Chap. on Religion.

* Voyage de Siam, pp. 385, Liv. VI. and also vide H. Alabaster's The Wheel of the Law, Chap. on Funeral Ceremony, and Voyage de Siam, pp. 266-67 Liv. IV.

অজন্তাগুহার চিত্রাবলী

অজন্তার আধ্যাত্মিক ও ঐতিহাসিক চিত্রগুলি যেমন ভাববিকাশক ও উপদেশাত্মক, আলঙ্কারিক চিত্রাবলী তেমনি মনোহারী ও স্নুরুচিসম্পন্ন। এসকল চিত্র কেবল গুহার ছাদ ও স্তম্ভের উপর অঙ্কিত। গুহার সৌন্দর্য্য সংবর্দ্ধন করিবার জন্যই এ-সকল চিত্রের অনুষ্ঠান। কিন্তু কেবল শোভা ছাড়াও ইহাদিগের দ্বারা আর-এক ইষ্টসাধন হইত। পবিত্রতার সহিত সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধ নিত্য। যাহা পবিত্র তাহা সুন্দর, যাহা সুন্দর তাহা পবিত্র। সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতার কল্পনা পরস্পরানুজীবী। যাহা শ্রীভ্রষ্ট বা বিরূপ তাহা নৈতিক আদর্শ বা সুরুচির বিরুদ্ধ। সৌন্দর্য্য পবিত্রতার অনুগামী। অজন্তার পুণ্যময় মন্দিরগুলি এই জন্যই সুদৃশ্য ও শ্রীসম্পন্ন চিত্রাবলীতে সুশোভিত হইয়াছিল।

১।—অজন্তার আলঙ্কারিক চিত্র।

২।—অজন্তার আলঙ্কারিক চিত্র।

আলঙ্কারিক শিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য কোন বস্তু বা স্থান সুশোভিত করিয়া শ্রীসম্পন্ন করা। যে বস্তু বা স্থান সাজাইতে হইবে তাহার আকার ও আশপাশের বস্তুর সহিত আলঙ্কারিক চিত্র বা নক্সার আকার ও গঠনের সুসঙ্গত সামঞ্জস্য
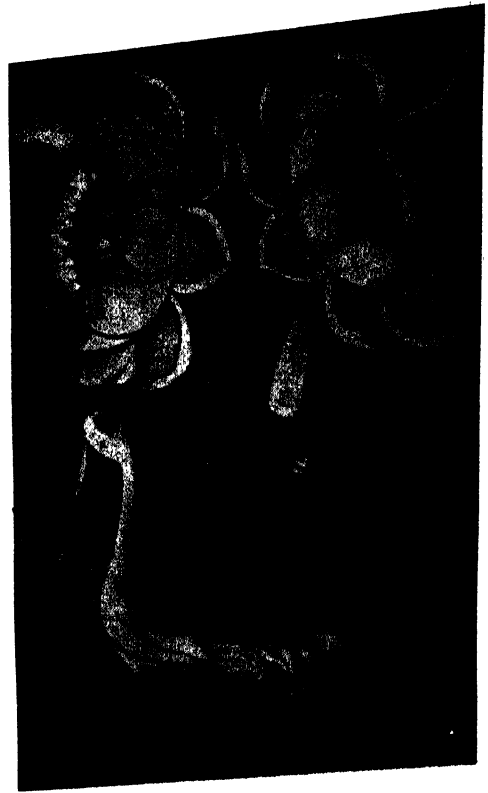
৩।—অজন্তার আলঙ্কারিক চিত্র।

৪।—অজন্তার আলঙ্কারিক চিত্র।

৫।—অজন্তার আলঙ্কারিক চিত্র।

৬।—অজন্তার আলঙ্কারিক চিত্র।

থাকা প্রয়োজনীয়। নক্সার অলাস সৌন্দর্য্য রেখা সম্পাতে। বর্ণ ও রচনাকৌশলে নক্সার উৎকর্ষ জন্মে, কিন্তু রেখাঙ্কণেই সৌন্দর্য্যের আসল ভিত্তি। রেখা দুইপ্রকার; সোজা ও বাঁকা। সোজা রেখার কোন সৌন্দর্য্য নাই। জ্যামিতিক হিসাবে উহার প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু শিল্পে উহার মূল্য অতি অল্প, কারণ শিল্পে উহার প্রয়োগ অতি পরিমিত। বাঁকা রেখাই শিল্পের সকল গঠনের প্রাণ। আলঙ্কারিক শিল্পের সকল রচনার উৎকর্ষ এই বাঁকা রেখার তরঙ্গপ্রবাহের উপর নির্ভর করে।

৭।—অজন্তার আলঙ্কারিক চিত্র।

নক্সার গঠন বা ধাঁচ স্থির হইলে নক্সার বিভিন্ন সূক্ষ্মাংশ কিরূপে সাজাইয়া লইতে হইবে স্থির করিতে হয়। গঠন যত সরল হইবে তাহার সৌন্দর্য্যও ততই মৌলিক এবং অকৃত্রিম হইবে। পাঁচরকম নক্সার মিলন হইলেই যে সুদৃশ্য হয় তাহা নয়। কোন একটা আকারের প্রাধান্য রাখিয়া তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া নক্সার রচনাবৈচিত্র্য দেখাইতে হয়। গাছের কাণ্ডের মত সকল আলঙ্কারিক নক্সার একটি প্রধান অংশ থাকা চাই। তাহাকে বেষ্টন করিয়া লতাপাতা ফুলফলের মত নক্সার অন্য সূক্ষ্মাংশ থাকিবে। আলঙ্কারিক শিল্পে কিছু শিখিবার নাই, যাহা হয় একটা কিছু রচনা করিয়া খাড়া করিলেই শিল্প হইল, এমন নয়। আলঙ্কারিক শিল্পেও শিখিবার বিষয় অনেক আছে এবং যদিও ইহা মানসিক বা আধ্যাত্মিক শিল্পের মত অলৌকিক বা প্রেমরসাত্মক নয়, তথাপি ইহাতে কল্পনা ও দক্ষতার যথেষ্ট প্রয়োজন হয়।

প্রকৃতিতে আমরা সচরাচর যাহা দেখিতে পাই তাহারি ছায়া শিল্পে প্রকাশ পায়। প্রকৃতিতে লতাপাতা ফুলফল অলঙ্কারের মত দেখায়। আলঙ্কারিক চিত্রে ফুলফলের নক্সাই অধিকাংশ ব্যবহার হয়। বিভিন্ন দেশীয় শিল্পে ভিন্নভিন্ন ফুলফলের প্রয়োগ দেখা যায়, এবং এক-একটি দেশের শিল্পে সেই দেশীয় একটা জাতীয় বিশেষত্ব আসিয়া পড়ে। অতি প্রাচীন সময় হইতেই শতদলের সহিত আমাদের জাতীয় ধর্ম্ম ও শিল্পের সংযোগ দেখা যায়। মোগলশিল্প বিদেশী ও আমাদের জাতীয় ধর্ম্মের বিরুদ্ধ। সেইজন্য তাহাতে পদ্মফুলের ব্যবহার নাই। কিন্তু মোগল আমলের পূর্ব্বের হিন্দু ও বৌদ্ধ আলঙ্কারিক শিল্পের প্রধান অঙ্গ শতদল পুষ্প। অজন্তার প্রভূত আলঙ্কারিক শিল্প কেবল এই একমাত্র পুষ্পের আদর্শে গঠিত। এই এক ফুলের আকৃতি হইতে অসংখ্য অভিনব রূপান্তর দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। একই ফুল সর্ব্বত্র, অথচ রচনাবৈচিত্র্যের কৌশল এমন যে কোথাও পুনঃরুক্তি লক্ষিত হয় না। এমন সুকৌশল অভিনব রচনা-
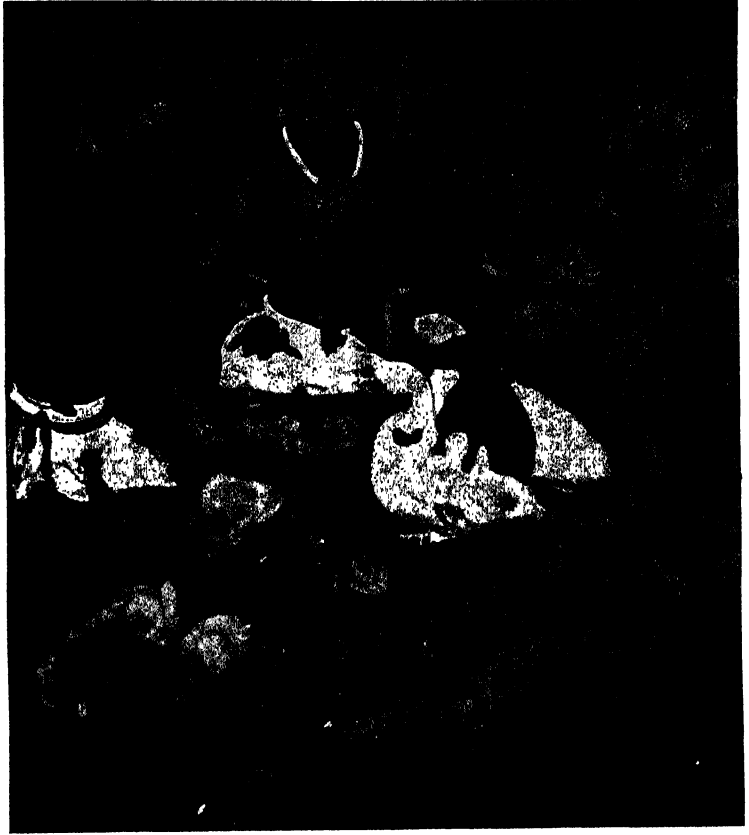
৮।—অজন্তার আলঙ্কারিক চিত্র।

অজন্তার আলঙ্কারিক শিল্প সাদাসিধা ও অতি-রঞ্জিত এই দুই প্রকারই আছে। অলঙ্কার-হিসাবে উভয়ই সুন্দর। ৮ম ও ৯ম চিত্রের পরিকল্পনা অত্যন্ত সাদাধরণের। ১০ম, ১১শ ও ১২শ চিত্রে বিভিন্ন প্রকার কারুকার্য্যের প্রতি-লিপি দেখান হইয়াছে। এতগুলি নক্সায় কোথাও কোন গঠনের পুনঃকৃতি নাই। সকলগুলির গঠনে স্বাতন্ত্র্য আছে। ১৩শ ও ১৪শ চিত্র দুইটি প্রকোষ্ঠের ছাদের উপর চিত্রিত কারু-কার্য্যের প্রতিলিপি। এই বিচিত্র চন্দ্রাতপগুলি যে কি সুদৃশ্য তাহা আসল না দেখিলে বোঝা যায় না। প্রতিলিপিতে যদিও গঠনের একটা আন্দাজ পাওয়া যায় কিন্তু তাহাতে মূল চিত্রের আকার-গঠনসৌষ্ঠব ও বর্ণবৈচিত্র্যের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিতে পারে না।

সাধারণতঃ চিত্রশিল্পের দুই রূপ; আধ্যাত্মিক ও আলঙ্কারিক। আধ্যাত্মিক শিল্পের সম্বন্ধ অন্তরাত্মার সহিত; আলঙ্কারিক শিল্পের সম্বন্ধ বহির্জ্জগতের সহিত। আধ্যাত্মিক শিল্প হৃদয় স্পর্শ করে, অন্তরের উৎকর্ষ জন্মাইয়া দেয়। এ শিল্পে প্রেমের বাস্তবতার সহিত পরিচয় হয়। আলঙ্কারিক চিত্র নয়নতৃপ্তিকর, গঠনসৌন্দর্য্যের জন্য ইহার অনুষ্ঠান। এ শিল্পের সম্বন্ধ কেবল বাহিরের সহিত। বাহিরের সৌন্দর্য্যের কতকটা প্রয়োজন আছে, তাহার সাফল্যও আছে। ভাব ব্যতিরেকে শিল্পের কারুকার্য্যেরও আদর আছে। এই কারুকার্য্য শিল্পের সাজসজ্জা। শিল্পের সাজসজ্জার পরিকল্পনার মূলে সাধারণতঃ সৌন্দর্য্যের বিকাশই লক্ষিত হয়, কিন্তু সময় সময় এ সাধারণ ও সঙ্গত নিয়মের

বৈচিত্র্যে কতটা মৌলিকতার প্রয়োজন তাহা চেষ্টা করিয়া বুঝিতে হয় না। উর্দ্ধে, নিম্নে, প্রাচীরে, ছাদে, সর্ব্বত্রই শতদলের বিচিত্র পরিকল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই চিত্রাবলী দেখিলে মনে হয় যেন শতদলের অপূর্ব্ব গঠনসৌন্দর্য্য শিল্পীদিগের নিকট শতধা হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল এবং শিল্পীগণ মাতোয়ারা হইয়া সেই রূপ-মাধুর্য্য তাহাদের শিল্পে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল।

অজন্তার আলঙ্কারিক শিল্প কি পরিণতি লাভ করিয়াছিল তাহা ১ম হইতে ৭ম চিত্র দেখিলে কতকটা বোঝা যায়। এবং ইহাও বোঝা যায় শিল্পীগণ নানাবিধ পুষ্প ও ফলের সহিত কিরূপ পরিচিত ছিল এবং তাহারা কি দক্ষতার সহিত সেইসকল বস্তুর আকার তাহাদের শিল্পে ব্যবহার করিত। অজন্তার আলঙ্কারিক চিত্রাবলীতে একবার ব্যবহৃত নক্সার নকল বা পুনঃকরণ অতি বিরল। এই বিশেষত্বে শিল্পীদিগের প্রতিভা, রচনায় মৌলিকতা ও নূতনত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

৯।—অজন্তার আলঙ্কারিক চিত্র।

ব্যতিক্রমও দেখা যায়। নয়নতৃপ্তিকর সুন্দর পরিকল্পনার মত আলঙ্কারিক শিল্পে ভীতিপ্রদ ও বীভৎস রূপেরও অবতারণা হয়। ভাব ও আনন্দের হিসাবে যদিও শিল্পের এই অংশ শিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্যের বিপরীত, কিন্তু শিল্পের আদর্শ হইতে ইহা ত্যাজ্য নহে। কারণ সুন্দর ও ভাবপূর্ণ পরিকল্পনায় যেরূপ মনের পরিণতি প্রয়োজন, অভিনব বীভৎস রূপের সৃষ্টির জন্যও সেইরূপ কল্পনাশক্তি দক্ষতা ও এমন কি প্রতিভারও প্রয়োজন হয়।

ধর্ম্মে অনেক সময়ে বীভৎস ও ভীতিপ্রদ রূপের অনুষ্ঠান দেখা যায়। প্রকৃত ভক্তি—প্রেমে; কিন্তু সময় সময় সম্ভ্রম ও ভক্তি আনিবার জন্য ভীতির আশ্রয় লইতে হয়। অতি প্রাচীনকাল হইতে শিল্পেও অস্বাভাবিক কিম্ভূতকিমাকার পরিকল্পনার প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু শিল্প শ্রদ্ধেয় করিবার জন্য যে বীভৎস রূপের অনুষ্ঠান প্রয়োজন তাহা মনে হয় না। ইহা আলঙ্কারিক শিল্পের আনুসঙ্গিক রচনাবৈচিত্র্য বলিয়া মনে হয়।

যদি কোন শিল্পে বিকটাকার ও ভীতিপ্রদ রূপের ব্যবহার দেখা যায় তাহা হইলে তাহাকে বর্ব্বর বা রুচি-বিরুদ্ধ অসংস্কৃত শিল্প বলিতে হইবে এমন নহে। জগতে যে-সকল শিল্প খুব পরিণতি লাভ করিয়াছিল তাহাদের সকলকার মধ্যেই এরূপ কদাকার অনুষ্ঠান দেখা যায়। অজন্তার অলৌকিক ভাব ও সৌন্দর্য্যভাণ্ডারের মধ্যেও বীভৎস ও কুৎসিত পরিকল্পনার অভাব ছিল না। যদিও এই সকল চিত্রাবলী চিত্ত বা নয়নতৃপ্তিকর নহে তথাপি শিল্পের আদর্শে ইহাদিগের মর্য্যাদা কম নহে। দেখিতে কদর্য্য হইলেও এগুলির রচনায় যথেষ্ট কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রকৃতির একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে। যেখানে সে

১০।—অজন্তার আলঙ্কারিক চিত্র।

১১।—অজন্তার আলঙ্কারিক চিত্র।

১২।—অজন্তার আলঙ্কারিক চিত্র।
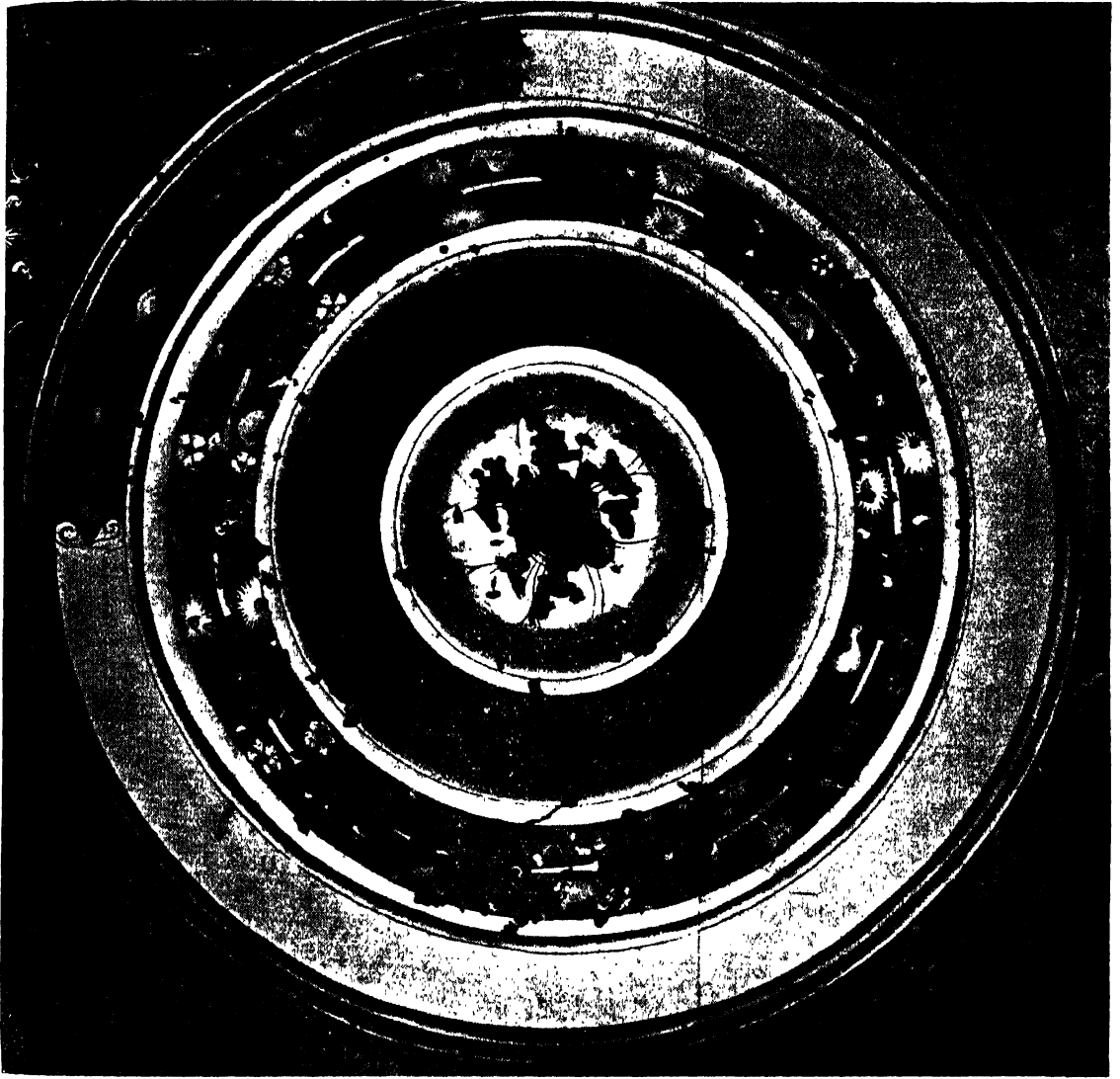
১৩।—অজন্তার আলঙ্কারিক চিত্র।

নিয়মের ব্যতিক্রম সেইখানেই এক বিকৃত রূপের সৃষ্টি হয়। চিত্রশিল্পে কিম্ভূতকিমাকারের সৃষ্টিও এইরূপে হয়। বামনের আকৃতি অস্বাভাবিক ও বিকৃত। ভারতীয় ভাস্কর্য্য ও চিত্রশিল্পে উহার প্রয়োগ অনেক স্থানে পাওয়া যায়। অজন্তায় লতাপাতার মিশ্রিত কারুকার্য্যের মধ্যে স্থানে স্থানে বামন ও খর্ব্বাকৃতি মানুষ অঙ্কিত আছে। ১৫শ চিত্র তাহার একটি উদাহরণ। কিম্ভূতকিমাকার কল্পনার আর-একটি উপায়—বিভিন্ন জীবজন্তুর শরীরাবয়বের সহিত লতাপাতা ইত্যাদির সংযোগ করা। গরুড়, মকর, কিন্নর ইত্যাদির পরিকল্পনা এই জাতীয়। অজন্তায় এরূপ কিম্ভূত-কিমাকার রচনার অভাব নাই। ১৬শ ও ১৭শ চিত্রে কুক্কুট ও মহিষের অবয়ব পুষ্পপত্রের আকারের সহিত সুকৌশলে যুক্ত করা হইয়াছে। ১৮শ চিত্রে মানবাকৃতির সহিত কাল্পনিক পত্রের আকার যোগ করিয়া এক বীভৎস আকারের সৃষ্টি হইয়াছে। উনবিংশতি চিত্র একটি ছাদের কোণে অঙ্কিত একটি বীভৎস মুখের পরিকল্পনা।
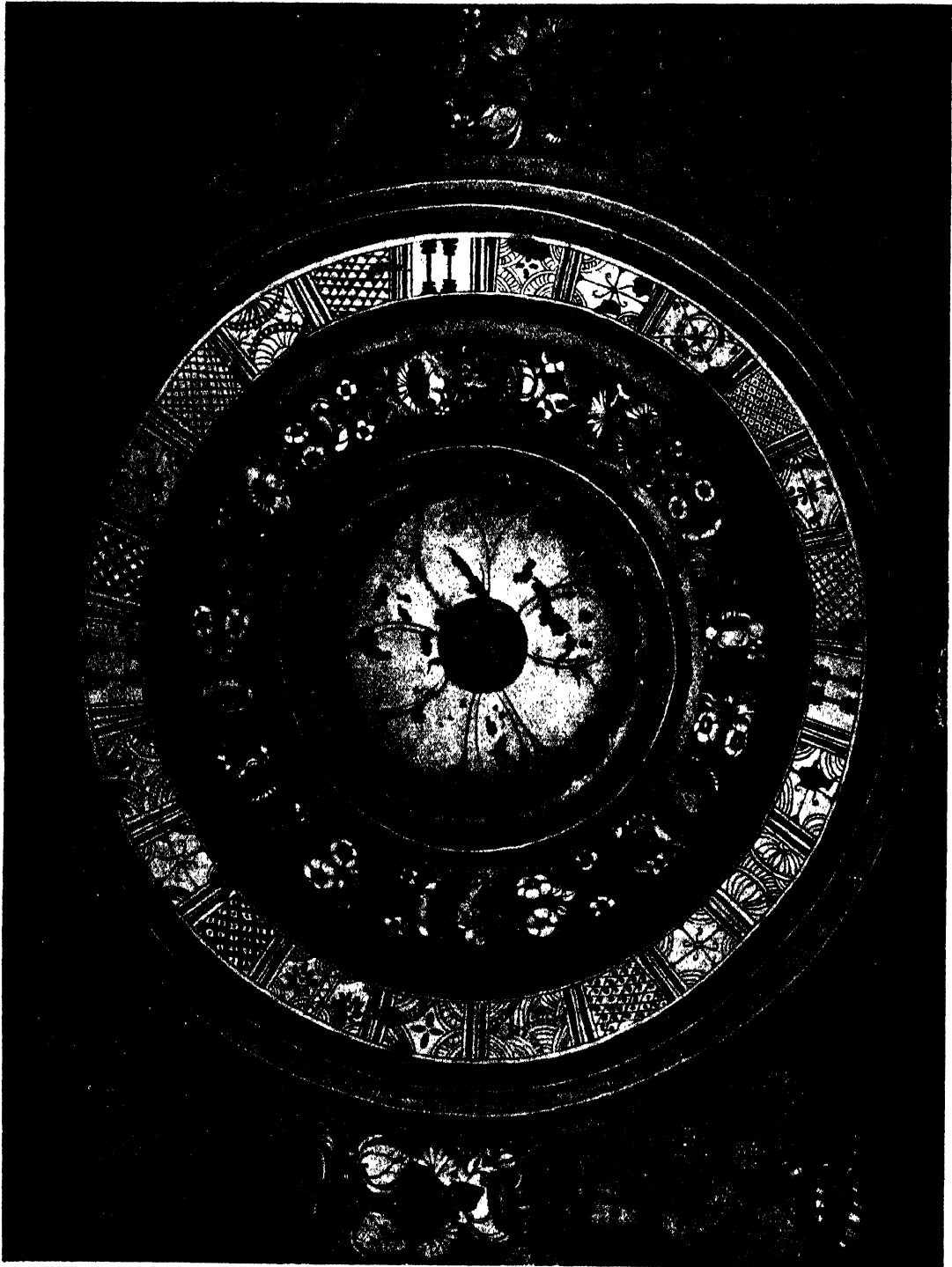
১৪।—অজন্তার আলঙ্কারিক চিত্র।

১৫।—অজন্তার আলঙ্কারিক ও কিম্ভূতকিমাকার চিত্র।
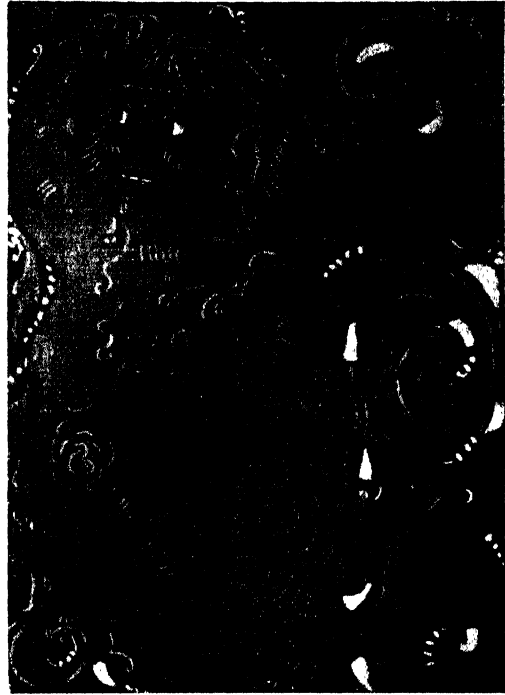
১৬।—অজন্তার কিম্ভূতকিমাকার চিত্র।

১৭।—অজন্তার কিম্ভূতকিমাকার চিত্র।

১৮।—অজন্তার কিম্ভূতকিমাকার ধরণের দুজন লোকের গোপন কথা বলার চিত্র।

১৯।—অজন্তার কিম্ভূতকিমাকার ধরণের দুজন লোকের বাদ্য-সঙ্গতের চিত্র।

২০।—অজন্তার কিম্ভূতকিমাকার চিত্র।

বিংশতি চিত্রে আরও ভীষণদর্শন এক কিম্ভূতকিমাকার মূর্ত্তি।

অজন্তায় হাস্যোদ্দীপক চিত্রও আছে। সেগুলির অঙ্কন-প্রণালী দেখিলেই মনে হয় যে কৌতুকের জন্যই যেন তাহাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। একবিংশতি হইতে দ্বাত্রিংশতি চিত্রাবলী তাহার নমুনা।

এই কয়েকটি প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে অজন্তা গুহার চিত্রাবলীর প্রধান প্রধান বিশেষত্বের সহিত পাঠকদিগের

২১।—অজন্তার কিম্ভূতকিমাকার চিত্র।

২২।—অজন্তার কিম্ভূতকিমাকার চিত্র।

২৩।—অজন্তার কিম্ভূতকিমাকার চিত্রে বাবুর ব্যঙ্গ্য প্রতিকৃতি।

২৪।—অজন্তার কিম্ভূতকিমাকার চিত্রে বাবুর ব্যঙ্গ্য প্রতিকৃতি।

২৫।—অজন্তার কিম্ভূতকিমাকার চিত্রে বাবুর ব্যঙ্গ্য প্রতিকৃতি।

২৬।—অজন্তার কিম্ভূতকিমাকার ধরণের একজন চলন্ত মানুষের চিত্র।

২৯।—অজন্তার কিম্ভূতকিমাকার ধরণের দুজন লোকের বাদ্য-সঙ্গতের চিত্র।

২৭।—অজন্তার কিম্ভূতকিমাকার ধরণের একজন মোটবাহকের চিত্র।

২৮।—অজন্তার কিম্ভূতকিমাকার ধরণের দুজন লোকের গোপন কথা বলার চিত্র।
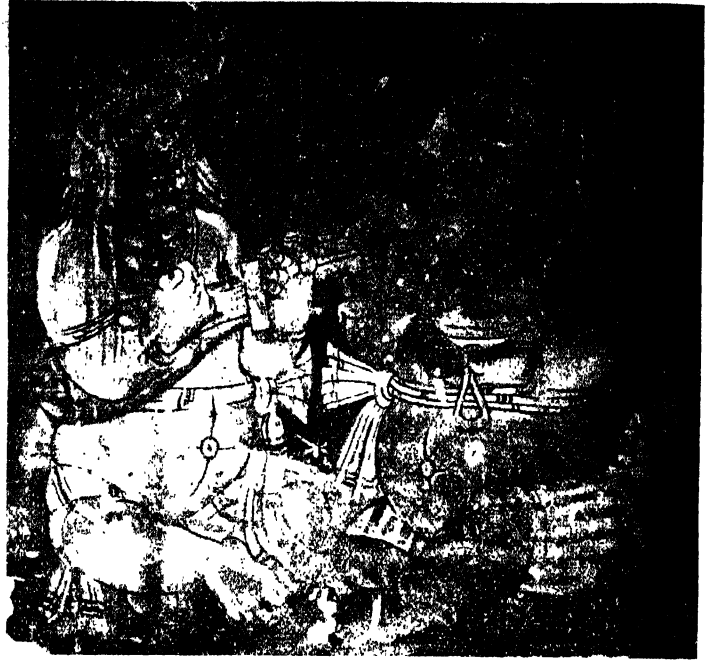
৩০।—অজন্তার কিম্ভূতকিমাকার ধরণের দুজন লোকের বাদ্য-সঙ্গতের চিত্র।

পরিচয় করাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছি। বর্ণনা করিয়া এ চিত্রগুলির সম্যক পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। প্রতিলিপিতে মূল চিত্রের আকার-বর্ণ বা রেখাসম্পাতের কোন বিশেষত্বই প্রকাশ পায় না। অজন্তা-শিল্পের মাহাত্ম্য বুঝিতে হইলে

৩১।—অজন্তার কিম্ভূতকিমাকার চিত্রে পারসিকের মদ্যপানের ব্যঙ্গচিত্র।

৩২।—অজন্তার কিম্ভূতকিমাকার চিত্রে মাতাল পারসিকের প্রতি ব্যঙ্গ।

মূল চিত্রগুলি দেখা প্রয়োজন। যাঁহারা ভারতীয় চিত্রশিল্পের বিষয়ে কিছু জানিতে চাহেন—বা যাঁহারা ভারতশিল্প অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন—তাঁহাদের উভয়েরই অজন্তায় যাওয়া উচিত। চাক্ষুষ সাক্ষাৎ হইলে পরিচয় সহজেই হয়। "আত্মানং বিদ্ধি।" আপনাকে বোঝা দরকার। ঘরের কথা বুঝিতে পারিলে বহির্জগতে নিজের ঘরের কি আদর তাহা বোঝা যায়। আত্মজ্ঞান উন্নতির প্রথম সোপান। আমাদের চিত্রশিল্প এককালে কি অপূর্ব্ব পরিণতি লাভ করিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারিলে জগত শিল্প-সভায় আমাদের কি স্থান ছিল এবং এখন আমাদের কোন্ স্থান অধিকার করিতে হইবে তাহা বুঝিতে পারিব।

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

পূজার পর্য্যটন

হাওড়া ষ্টেশনে দশ নম্বর প্ল্যাটফর্মে একটি বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এবারে হুগলী ভ্রমণ নাকি? বলিলাম, আরও একটু পশ্চিম যাইবার ইচ্ছা আছে,—চুণার পর্য্যন্ত।

রাত ঠিক দশটায় দিল্লী এক্সপ্রেস ছাড়িল। সঙ্গীদের মধ্যে হিতু শুইল না, সে সীতাভোগ এবং মিহিদানার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। নিদ্রা সম্বন্ধে আমার পক্ষে বাড়ীতে এবং গাড়ীতে প্রভেদ বিস্তর; খানিকক্ষণ চেষ্টার পর তন্দ্রাবেশ হইয়াছে, এমন সময় হঠাৎ মনে হইল, হাতে খাবারের ঠোঙ্গা ঠেকিল। স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু! ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। দেখিলাম, সঙ্গীদের প্রত্যেকেই দক্ষিণহস্তের ব্যাপারে ব্যস্ত। কাল, অর্থাৎ নিশীথসময়, মিষ্টান্নভোজনের সম্পূর্ণ অনুকূল না হইলেও দেশ এবং হস্তস্থ পাত্র বিচার করিয়া ঠোঙ্গাটি মুহূর্ত্তমধ্যে উজাড় করিয়া ফেলিলাম।

প্রত্যুষে কিউল ষ্টেশনে পৌছিলাম। এটা মেইন ও লুপ লাইনের সন্ধিস্থল। জংশন হইতে একটুখানি সরিয়া লুপ্ত-অকারের মত লক্ষীসরাই; কোন গাড়ী আর বড় একটা এখানে দাঁড়ায় না। মোকামার অব্যবহিত পূর্ব্বে বামদিকে বিস্তীর্ণ জলরাশি দেখিতে পাইলাম। সঙ্গীদের কেহ কেহ সন্দিগ্ধ ভাবে প্রশ্ন করিলেন, এই কি গঙ্গা? কিন্তু গঙ্গা ত দক্ষিণে; রেলকোম্পানির নলরূপী এঞ্জিনিয়রগণ এদিকে ত তাঁহার বুকের উপর সেতুবন্ধন করেন নাই। অচিরেই সন্দেহভঞ্জন হইয়া গেল। ট্রেন বিসর্পিত গতিতে মোকামা-ঘাটে প্রবেশ করিতেই গঙ্গার প্রকৃত মূর্ত্তি স্পষ্ট প্রতিভাত হইল। উত্তরবিহারের যাত্রীদের জন্য পীতবর্ণের একখানি ষ্টীমার অপেক্ষা করিতেছে। আমাদের গাড়ী হইতে নামিয়া পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় জনস্রোত সেই জাহাজের দিকে চলিল।

বেলা দুইপ্রহরের সময় মোগলসরাই আসিলাম। তখন প্রখর রৌদ্র; বাহিরে আগুন, পেটেও আগুন। ষ্টেশনের মাড়ওয়ারী রিফ্রেশমেণ্ট রুমে লুচিপুরীর ব্যবস্থা আছে। কিন্তু 'ছাতু'র ধাতু পুরীর যেমন উপযোগী,

বাঙ্গালীর ভেতো নাড়ী তেমন নয়। টাকাটাকাসের বৃহদাকার আঙ্গুর আপেল ও নাসপাতি কিনিয়া ক্ষুন্নিবারণের চেষ্টা করা গেল। মোগলসরাই ছাড়াইলে দূরে বারাণসীতে বেণীমাধবের ধ্বজা দেখিতে পাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটি দেবালয়ের চূড়াও দৃষ্টিগোচর হইল। বিশ্বেশ্বরের আসন মনে করিয়া কেহ কেহ যুক্তকরপুটে উদ্দেশে মন্দিরকে নমস্কার করিলেন। পরে যখন শুনিতে পাওয়া গেল মন্দিরটি রামনগরের, তখন সঙ্গীদের ভাবনা হইল,—কাশীর প্রণাম পড়িল কিনা ব্যাসকাশীতে! উল্টা উৎপত্তি না হয়! তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিলাম, জনার্দ্দনের ন্যায় বিশ্বেশ্বরও ভাবগ্রাহী, সন্দেহ নাই! পথে বিন্ধ্যাচল হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকারী মোটর কোচ আমাদের বিপরীত দিকে চলিয়া গেল। দেখিলাম, মোটর কারে এবং মোটর কোচে প্রভেদ আছে। মোটা মোটা টায়ারওয়ালা মোটর গাড়ী সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ভ্রমণবিলাসীদের সোহাগের সামগ্রী, কিন্তু মোটর কোচ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীতে পরিপূর্ণ।

বেলা প্রায় তিনটার সময় অনতিদূরে চুণারের অনুচ্চ গিরিশ্রেণী দেখিতে পাইলাম। চারিদিকে নয়নাভিরাম সবুজ শোভা, মাঝে মাঝে পাহাড়ের গায় কাঁকরের আখরে কে যেন হিজিবিজি লিখিয়া রাখিয়াছে। গিরিশৃঙ্গের উপর একখানি অট্টালিকা। শুনিলাম, পাহাড়ের নীচে একটা ইঁদারা হইতে বাড়ীর জলসরবরাহ হইয়া থাকে। এই কাজে নাকি প্রায় এক ডজন লোক লাগাইতে হয়। এইরূপ অন্তরীক্ষবাসীদের পক্ষে বায়ুসেবনের সুযোগ অবশ্য যথেষ্টই আছে, কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য গুরুতর সামগ্রীর সহিত সম্পর্ক রাখা তাঁহাদের কিঞ্চিৎ কষ্টকর বলিয়া বোধ হইল। একখানি ঠিকাগাড়ীতে নিজেরা চাপিয়া এবং খানকয়েক এক্কায় বোচকাবুচকি চাপাইয়া সহরের দিকে চলিলাম। ঠিক যাত্রারম্ভের সময় চুণারপ্রবাসী ভরতদাদা উড়ানিতে কোমর বাঁধিয়া আমাদের অভ্যর্থনার জন্য আসিয়া পৌছিলেন এবং এক্কা হইতে নামিয়াই পুনরায় আমাদের গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন।

ষ্টেশনের পাশে সড়কের দুই দিকে পাথরের কারখানা। এ অঞ্চলের কোঠাবাড়ী সমস্তই প্রস্তরে প্রস্তুত। পাথর কাটিয়া ছাঁটিয়া ঘষিয়া মাজিয়া গৃহনির্ম্মাণের উপযোগী করা হইতেছে। চুণারকে এ দেশের লোকে 'পাথরগড়' বলে। অনতিদূরেই পাহাড়ের উপর গড় দেখিতে পাইলাম। গুহক বিক্রমাদিত্য এবং শেরশাহের লীলাস্থল দুর্গটি এখন যুক্তপ্রদেশের রিফরমেটরি বা তরুণ অপরাধীদের বন্দীশালায় পরিণত হইয়াছে।

আমরা যে তিনতলা বাড়ীতে উঠিলাম তৎসংলগ্ন শিলালিপি পাঠে জানিতে পারা গেল, বাড়ীখানি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জনৈক পর্ত্তুগীজ কাপ্তেনের তৈয়ারি। এ বিবরণের অনুকূল প্রমাণও যথেষ্ট ছিল। দেখিলাম, বাড়ীর অধিকাংশ চৌকাঠেই কপাট নাই এবং প্রায় সমস্ত বাতায়নেই বাতাসের অবাধগতির সুবিধা রহিয়াছে। ভরতদাদা বলিলেন, কি কষ্টে যে তিনি এই সুন্দর বাংলাটি খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন তাহা কহতব্য নয়; হাওয়া খাইতেই পশ্চিমে আসা; সেই হাওয়া অবলীলাক্রমে গৃহের সর্ব্বত্র প্রবেশ লাভ করিবে; অধিকন্তু তিনি আশা করিলেন, আমাদের মত সাহিত্যিক লোকে এই গৃহে বসিয়া যত্নপূর্ব্বক প্রত্নতত্ত্বের অনুশীলন করিলে অনেক সুফল ফলিবে!

সুফলের আশা পরে; দেখিলাম আপাততঃ বাংলার সম্মুখের জমীতে বড় বড় কুমড়া ফলিয়াছে বিস্তর। অদূরে ইঁদারা; পাশে একটি পুষ্পিত কৃষ্ণচূড়ার গাছ। বাগিচার ফাঁকে 'বজেড়া'র ক্ষেত, ক্ষেতের নীচেই পূর্ণাঙ্গী গঙ্গার জলরাশি। পরপারে সুদূরবিস্তৃত শ্যামল ভূমির শেষে আকাশের কোলে নীলাভ বনশ্রেণী।

সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে বাহির হইলাম। বাংলার সম্মুখের রাস্তাটি কেল্লা হইতে ক্যান্টনমেণ্ট পর্য্যন্ত গিয়াছে। পথের দুই দিকে তরুবীথী; মৃদু বায়ুহিল্লোলে গাছের পাতাগুলি ঝুরঝুর করিয়া কাঁপিতেছে। রিফরমেটরির বালকবন্দীরা হকি খেলিয়া ফিরিতেছে, তাহাদের বৃদ্ধ সাহেব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাইকে চলিয়াছেন। একটি লোক লাঠিহাতে একপাল 'টার্কি' তাড়াইয়া আসিতেছে। গোরু চরাইবার মত এখানে মুরগী চরাইবারও চলন আছে দেখিতেছি। ফোর্টের পাহাড় একেবারে নদীগর্ভ হইতে উঠিয়াছে। সেখানে বাঁকের মাথায় এক ঝাঁক নৌকা। দেহাতী লোকে বোঝাই হইয়া দিনশেষের শেষ খেয়া ওপারে চলিয়াছে।

প্রত্যহ বায়ুসেবী বাবুর আমদানী হইতেছে। মহারাজ রাজারামজীর বাংলা একখানিও আর খালি নাই। বাকী দুইজন বাড়ীওয়ালা হনুমানপ্রসাদ এবং ভাগবন্তপ্রসাদের প্রসাদলাভও এখন অসম্ভব। ক্যান্টনমেণ্টে দুই-একটা বাড়ী খালি আছে দেখিলাম, কিন্তু সেখানে দেশীয়দিগের প্রবেশ নিষেধ।

বাজারে নাকি আগে চার পয়সা ছ' পয়সা সের মাছ বিকাইত; এখন দর চড়িয়া চার আনায় উঠিয়াছে। আলু কিছু আক্রা, কিন্তু অন্যান্য তরকারি কলিকাতার তুলনায় সুলভ। মাংস বেশ সস্তা, চৌদ্দ পয়সায় এক সের পাওয়া যায়, তবে তেমন সুস্বাদ নয়; বিশেষতঃ ঘন ঘন খাইয়া অরুচি ধরিবার উপক্রম হইয়াছে। পাণ মাগ্‌গি—বজেট বাঁধিয়া খরচ করিতে হয়।

নগ্নদেহে গঙ্গাস্নানের পথে পোষ্টাফিসে চিঠি ফেলিতে গিয়াছিলাম। ডাকঘর মেরামত হইতেছে। একজন মজুর চুনসুরকি বহিয়া সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে সম্মুখে পথরোধকারী আমাকে দেখিয়া বলিল, পণ্ডিতজি, যানে দেও! নিরক্ষর লোকেও আমার বিদ্যার পরিচয় কেমন করিয়া পাইল ভাবিতেছি, হঠাৎ মনে পড়িল; এদেশে ব্রাহ্মণমাত্রেই না পড়িলেও পণ্ডিত।

স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া চুণারে অনেক অবসরপ্রাপ্ত সাহেবের বাস। একদিন কোম্পানি-বাগে বেড়াইতে বেড়াইতে একটি বৃদ্ধ ইংরেজ সৈনিকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইনি লর্ড রবার্টসের কাবুল অভিযানে যুদ্ধ করিয়াছিলেন; এখন দৈনিক এক শিলিং পেন্সন পান। এই সামান্য আয়ে নিজের ও রুগ্না পত্নীর খোরপোষ চলা অসম্ভব, তাই কিছু জমি লইয়া চাষ করিতেছেন। এ ছাড়া এই কোম্পানিবাগে জন খাটাইবার চাকরীও পাইয়াছেন। জমির তদ্বির করেন ইনি, কিন্তু বাগান জমা লইয়াছে একজন মালী; সেই ফল বিক্রয়ের ফলভোগী। তিনটি ছেলে আছে, সকলেই বেশ দু'পয়সা রোজগার করে। একজন লিভারপুলে, একজন দিল্লীতে এবং কনিষ্ঠ পুত্রটি কানাডায় থাকে। ছোট ছেলেটি কালেভদ্রে কিছু কিছু পাঠায়, বড় দুইটির কোন খবর বহুদিন পাওয়া যায় নাই। ফিরিবার সময় সাহেবকে বলিলাম, আগামী বৎসর যদি আসি আবার এই বাগানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ লাভের আশা করি। তিনি হাসিয়া কহিলেন, এখানে যদি দেখা না হয়, কবরখানায় হইবে।

একদিন রামবাগ ও রামসরোবর দেখিতে গিয়াছিলাম। রামায়ণের রামচন্দ্রের সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই এবং রামদা এবং রামছাগল প্রভৃতি শব্দে যেরূপ, রাম বিশেষণটি এক্ষেত্রে সেরূপ বৃহদর্থবাচকও নহে। স্থানীয় ভূস্বামী 'মহারাজ রাজারামজী' মালিক বলিয়া এ দু'টির এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। রামবাগে কতকগুলি ফুল ও ফলের গাছ আছে, এ ছাড়া একটা ঝরণার উপর ঘাট বাঁধিয়া সেখানে নিভৃত বিরামকুঞ্জ নির্ম্মিত হইয়াছে।

মহাষ্টমীর সন্ধ্যাকালে দুর্গাবাড়ী সন্দর্শনে চলিলাম। রেলওয়ে ষ্টেশনের সন্নিহিত মাঠ ছাড়াইলেই পাহাড়; অনুন্নত গিরির মেখলার মত সুপরিসর পাষাণপথটি আঁকিয়া বাঁকিয়া উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড; তাহাদের রিক্তদেহ সিক্ত করিয়া নৃত্যশীলা নির্ঝরিণী কল-ধ্বনি তুলিয়া ছুটিয়াছে। দুই দিকে অসংখ্য শিউলী গাছ; সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে নির্জ্জন বনপ্রদেশ শেফালীর মৃদু সৌরভে ভরপুর। শরদারাধনায় প্রকৃতির প্রেমাঞ্জলির মত ফুলগুলি নিঃশব্দে ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। ক্ষণকাল পরে ঝরণার উপর একটা পোল পাওয়া গেল। ওপারে দুর্ভেদ্য দুর্গের ন্যায় মন্দিরটি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। একটি অতিক্ষুদ্র দ্বারপথে দেবীর সম্মুখে প্রবেশ লাভ করিলাম। বাঙ্গালার মৃণ্ময়ী দশভুজায় এবং এখানকার ধাতুমূর্ত্তিতে অনেক প্রভেদ। এ পূজার আয়োজনেও সে উৎসবের সাদৃশ্য নাই।

প্রায় একপ্রহর রাত্রে বাজারের কাছে রামলীলা দেখিতে গেলাম। ষ্টেজ বাঁধিয়া থিয়েটারী কেতায় অভিনয় হইতেছে। লোকজনের খুব সমারোহ। কয়েকটা মিষ্টান্ন এবং পাণের দোকান বসিয়া গিয়াছে। ঢোল করতাল লইয়া একপাশে একদল গায়ক রামায়ণ কীর্ত্তন করিতেছেন। শুনিলাম, গায়কেরা আদিকাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া আজকার বর্ণনীয় বিষয়ে পৌঁছিবামাত্র যবনিকা তোলা হইবে। একজন বাঙ্গালী চিত্রকর দৃশ্যপটগুলি আঁকিয়া-ছেন। সেদিন হনুমানের সমুদ্রলঙ্ঘন ও অশোকবনে সীতা-

সম্ভাষণের পালা। প্রকাণ্ড দণ্ড ঘাড়ে করিয়া মহাবীর আসরে নামিলেন। মুখসে মুখের পরিকল্পনা হইয়াছে। সাটিনের পোষাক ফুলমোজা প্রভৃতি ইদানীন্তন সামগ্রী সমস্তই আছে, নাই কেবল সেই চিরন্তন লাঙ্গুল! রঙ্গমঞ্চে এমন অঙ্গহীন ব্যাপার দেখিয়া বড় আপশোষ হইল। ডেনমার্কের যুবরাজকে বাদ দিয়া হ্যামলেট অভিনয় বরং চলিতে পারে, কিন্তু লেজবর্জ্জিত পবনাত্মজের কল্পনাও করিতে পারি না—লেজ মনে পড়িলেই হনু মনে পড়ে, হনু মনে পড়িলেই লেজ মনে পড়ে। কর্ম্মকর্ত্তারা ভাবের সাহচর্য্যকে এমনভাবে উপেক্ষা করিলেন, ইহাই আশ্চর্য্য!

বারাণসীর বিজয়া দেখিবার আশায় নবমীর দিন অপরাহ্ণে সেখানে পৌছিলাম। বাঙ্গালীটোলার গলিগুলি একটা গোলকধাঁধা; সাথীদের লইয়া আতিপাতি করিয়া খুঁজিয়া ভরতদাদার বাড়ী আবিষ্কার করিলাম। তিনি মহাখুসী; রাত্রিভোজনে একেবারে মাংসের বন্দোবস্ত হইয়া গেল। কাশীতে পদার্পণ করিয়াই জীবহিংসা!—মন সংশয়দোলায় দুলিতে লাগিল। ভরতদাদা অভয় দিলেন, আমরা শাক্তমতের লোক, সুতরাং ঠিক পূজার উপলক্ষে না হউক, পূজার মধ্যে কাটা পাঁঠায় দোষ নাই!

সন্ধ্যার পর ঘুরিতে ঘুরিতে দশাশ্বমেধ ঘাটে আসিলাম। এবারে যেমন বর্ষা হইয়াছে এমন নাকি বহুকাল হয় নাই, কাশীর প্রধান শোভা ঘাটগুলি সমস্তই জলের তলে। ছোটখাটো কয়েকটি মন্দির একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে; নীচে যুদ্ধ করিয়া উপরে ক্রুদ্ধ জল পাক খাইয়া ঘুরিতেছে। দুই-একটি মন্দিরের কণ্ঠে ও চূড়ায় প্রতিহত প্রবাহ বিপরীতমুখ; সেখানে ছোট নৌকা অনায়াসে উজানে চলিয়াছে। সম্মুখে জলোচ্ছ্বাসে ছলচ্ছলশব্দময়ী গঙ্গা, আকাশে শুভ্রলঘু মেঘে নবমীর অপরিস্ফুট জ্যোৎস্না। ধন্য তুমি বিশ্বনাথের পুণ্যপীঠ কাশী! আজ এই কলুষনাশিনী গঙ্গার শতসৌধমণ্ডিত তীরে দাঁড়াইয়া তন্দ্রাময় চন্দ্রালোকে তোমার কি অপরূপ স্বপ্নমূর্ত্তি দেখিলাম! অগণিত ঋষির পূত চরণরেণু তোমার পথের ধূলায় পুঞ্জীভূত; তোমার ঘাটে বাটে মাঠে সহস্রযুগের অজস্র কাহিনী; অনন্ত অন্তরের ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি তোমার মন্দিরে মন্দিরে নির্ম্মাল্যরূপে সঞ্চিত। জীবনে তোমার যোগমন্ত্র, বিয়োগে তুমি অভয়দাতা। তোমাকে প্রণাম করি।

পরদিন প্রভাতে দল বাঁধিয়া প্রাতঃস্নান করিলাম। খানকয়েক এক্কা এবং একখানি ঠিকাগাড়ীতে সমস্ত সহর প্রদক্ষিণ করিয়া আসা গেল। বিশ্বেশ্বর এবং অন্নপূর্ণার ত কথাই নাই, অন্যান্য মন্দিরেও দেবতাদর্শন হইল। সেণ্ট্রাল হিন্দুকলেজটির ঘরে ঘরে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলাম। কাশীর সারস্বত ক্ষেত্রে প্রাচ্যপ্রতীচ্য শিক্ষাসমন্বয়ের এই সদনুষ্ঠানটি সকলেরই শ্রদ্ধার উদ্রেক করে।

অপরাহ্ণে বিসর্জ্জন দেখিবার জন্য কেদারঘাটের কাছে বজরায় উঠিলাম। অনুকূল স্রোতে নৌকা মণিকর্ণিকার দিকে চলিল। এবারে লড়াই বাধায় লোকের অর্থব্যয় করিবার সামর্থ্য কমিয়াছে, তাই কাশীতে বাঙ্গালীর সমাগম আশানুরূপ হয় নাই। তথাপি দেশী ও বিদেশী লোকের খুব ভিড়—তীরে ঘাটে ঘাটে এবং প্রতিসৌধশিখরে লোকারণ্য। জনতা দশাশ্বমেধেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কড়া জলে নৌকাচড়ার সখ বেশি লোকের হয় নাই,—নদীতে পান্‌সীর সংখ্যা অল্প। কাশীরাজের একখানি মোটর বোট বাহার দিয়া ছুটাছুটি করিতেছিল। সন্ধ্যার সময় আমরা বাড়ীর দিকে ফিরিলাম। মাল্লারা কাছি ধরিয়া বজরাখানা ডাঙ্গার কাছাকাছি টানিয়া লইয়া চলিল। মাঝি আমাদিগকে উপদেশ দিল, একেবারে 'তরাজুকা তৌল পর' থাকিতে হইবে, যেন নৌকা কোন দিকে কাৎ না হয়। জলেস্থলে পরস্পর প্রতিকূল আকর্ষণে পান্‌সী ঘন ঘন হেলিতেছিল; বারে বারে পাষাণ-ভাঙ্গিয়া বসিয়া অনেক কষ্টে নৌকা ঘাটে পৌছিলে অত্যন্ত আসান বোধ করা গেল।

একাদশীর দিন বেলা তৃতীয় প্রহরে বিন্ধ্যাচলে উপস্থিত হইলাম। পাণ্ডাদের হাতে পড়িয়া দফা শেষ হইবার উপক্রম হইয়াছিল; একজনের সহিত মাথাপিছু দু'আনায় রফা করিয়া বাকী সকলের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিলাম। বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির হইতে এক্কার রাজসংস্করণ টোঙ্গায় চড়িয়া প্রায় এক ক্রোশ দূরে পাহাড়ের উপর অষ্টভুজা সন্দর্শনে চলিলাম। পথের দুই ধারে অনেকগুলি ঘর বাটনা-বাঁটা শিলে বোঝাই; পাহাড়ের নীচে গাছের তলায়

পর্য্যন্ত ছোট বড় শিলনোড়া ছড়ানো। ইচ্ছা করে কুড়াইয়া বাড়ীর রন্ধনশালায় আনিয়া হাজির করি! কিন্তু দুঃখের বিষয়, কলিকাতার বাজার-দর রেলের মাশুলেই উন্মুল হইয়া যাইবে! রৌদ্রে অনেকেরই পিপাসা হইয়াছিল। ঝরণার নির্ম্মল জল অঞ্জলি ভরিয়া পান করিলাম। দেবীদর্শনের পর আমাদের টোঙ্গা ষ্টেশনের দিকে চলিল। সূর্য্য তখন অস্তগত; অগস্ত্যের বিস্মৃতির মত গোধূলির অন্ধকার যুগযুগান্তের প্রতীক্ষায় নতশির গিরিকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করিতেছিল।

বিন্ধ্যাচলে সন্ধ্যাযাপন করিয়া রাত্রি এক প্রহরের সময় চুণারে ফিরিয়া আসিলাম।

শ্রীভূপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

কামাখ্যা-ভ্রমণ

সুযোগ পাইলেই মানুষ একটু আনন্দ উপভোগ করিয়া লইতে চায়। সেইরূপ ইচ্ছা-প্রণোদিত হইয়াই আমরা একবার ছুটিতে কামাখ্যা-দর্শনে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম।

কামাখ্যা-মন্দির।

নীলগিরি বা কামাখ্যা-পাহাড়ের শিখরদেশ হইতে প্রকৃতির যে অপরূপ সৌন্দর্য্য চোখে পড়ে ভাষায় তাহা সম্যক বর্ণনা করা যায় না। সে সৌন্দর্য্য যে দেখিয়াছে সে বুঝিয়াছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কোলাহল ও তুচ্ছতার তুলনায় তাহা কত উদার—কী মহান্।

ধাবমান মৃগ ও শৃগাল দেখিতে দেখিতে আসামের জঙ্গল পার হইয়া যখন আমরা ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্ত্তী আমিনগাঁও পৌঁছিলাম তখন দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। নদীর স্বচ্ছ জলের উপর দিয়া আমরা পরপারে পাণ্ডু নামক স্থানে পৌঁছিলাম এবং সেখান হইতে রেলে কামাখ্যা যাত্রা করিলাম। পাহাড়ের পাদদেশে রেল-ষ্টেসন। সেখান হইতে কয়েক পদ ব্যবধানে একটি পথ পর্ব্বতশীর্ষে কামাখ্যা-মন্দিরে গিয়া পৌঁছিয়াছে। কামরূপ-রাজ নরকাসুর এই পথটি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। নরকাসুরের পুত্র রাজা ভগদত্তের রঙ্গপুরে একটি প্রমোদোদ্যান ছিল। শোনা যায় এই প্রমোদোদ্যানের নাম রঙ্গপুর হইতেই ঐ জেলার নামের উৎপত্তি। মহাভারতে দেখিতে পাই রাজা ভগদত্ত কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে অনুমান হয়
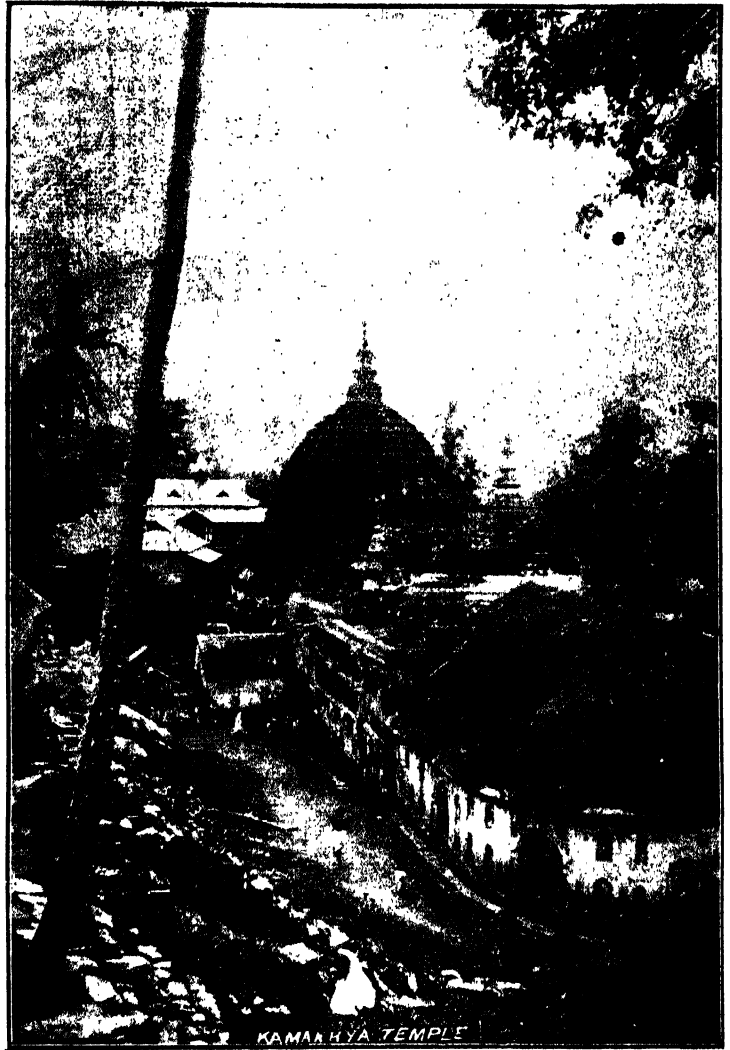
উমানন্দ।

অশ্বক্রান্তা।
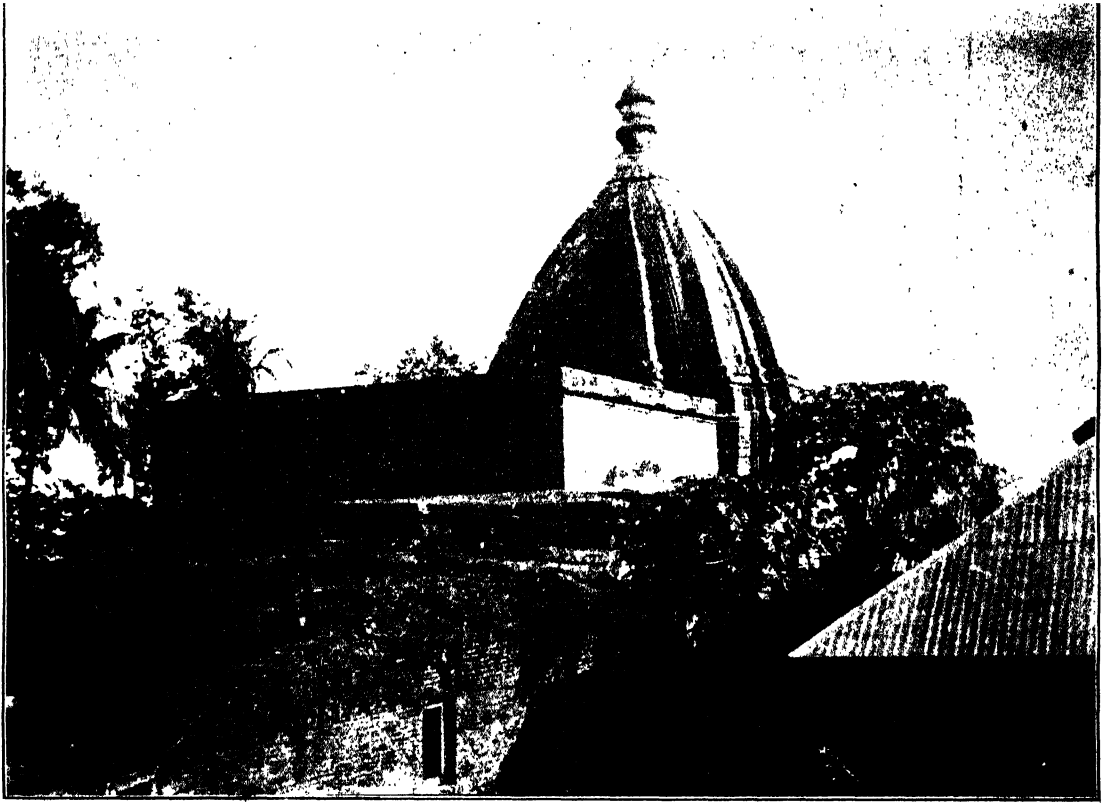
বশিষ্ঠ-আশ্রম।

কামাখ্যা-মন্দিরের পথটি অতি প্রাচীন। কথিত আছে এই পথের পাথরের সিঁড়িগুলি কুচবিহার-রাজ শুক্লধ্বজ মন্দির মেরামত করাইবার সময় তৈরি করাইয়াছিলেন। গয়ার রামশিলা বা ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের উপর যে পৈঠা, এ পৈঠাগুলি তেমন নয়। বিশৃঙ্খল ও অমসৃণ হইলেও পৈঠাগুলি মন্দিরে যাইবার সহায়তা করে। পাহাড়ের গায়ে ইঁদুরের উপর একটি গণেশমূর্ত্তি খোদিত। তা' ছাড়া বুদ্ধদেব ও অসুরেরও দুইটি খোদিত মূর্ত্তি দেখিলাম। পথের ধারে গুহাভ্যন্তরে কয়েকজন সাধুও দেখিলাম।

পথটি বন্ধুর। বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ও শিশুদের পক্ষে মন্দিরে যাওয়া কষ্টকর ব্যাপার। তবে পাহাড়ের পূর্ব্বদিকে আর-একটি পথ আছে, সেটি অপেক্ষাকৃত সহজ। এ পথটি ব্রহ্মপুত্রের স্নানের ঘাট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সাধারণত ঘাটটি হরিশ্চন্দ্র-ঘাট নামে পরিচিত। এই পথ নির্ম্মাণের সমস্ত ব্যয়ভার মৈমনসিংহের ভূতপূর্ব্ব রাজা হরিশ্চন্দ্র বহন করিয়াছিলেন। সেইজন্যই বোধ হয় এরূপ নামকরণ হইয়াছে। আমিনগাঁও হইতে নৌকায় বা পাণ্ডু রেল-ষ্টেসন হইতে সহজেই এই ঘাটে পৌছান যায়।

কামাখ্যা-পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরে ভুবনেশ্বরী-মন্দির অবস্থিত। ভূকম্পের পর দ্বারবঙ্গের মহারাজা মন্দিরটি ভাল করিয়া মেরামত করাইয়া দিয়াছেন। মন্দিরের পার্শ্ব ও পশ্চাত হইতে গৌহাটি নগর, ব্রহ্মপুত্র নদী এবং রেল-লাইনের চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়।

কামাখ্যা-মন্দিরের কিছু নীচে পূর্ব্বদিকে একটি পাহাড়ের মাথায় অভয়ানন্দ তীর্থস্বামী বহু পরিশ্রমে একটি ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।

কামাখ্যার পাণ্ডারা কাশী গয়া প্রভৃতি অন্যান্য তীর্থ-স্থানের পাণ্ডার মত নয়—তাহারা যথেষ্ট বিনয়ী ও অতিথি-বৎসল। ধনী দরিদ্র সকলকেই তারা সমান আদর যত্ন করে, যাহা পায় তাহাতেই খুসী। অনুসন্ধানে জানিলাম

বশিষ্ঠ জল-প্রপাত।

যাত্রীগণের নিকট হইতে অধিক দক্ষিণা আদায় না করিলেও তাহাদের কোনো অভাব নাই।

কামাখ্যা হইতে আমরা নৌকায় উমানন্দের মন্দিরে গেলাম। মন্দিরটি ব্রহ্মপুত্রের একটি দ্বীপের উপর অবস্থিত—গৌহাটির খুব নিকটে। মন্দিরটি দেখিলে মনে হয় যেন ব্রহ্মপুত্রের স্বচ্ছ নির্ম্মল জলে একখানি ছবি ভাসিতেছে। ফিরিবার পথে অশ্বাক্রান্তা মন্দিরে গিয়াছিলাম। মন্দিরটি ব্রহ্মপুত্রের বাম তীরে একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণপাথরে খোদিত একটি সুন্দর অনন্তশয্যা-মূর্ত্তি আছে।

নিকটেই আর-একটি দর্শনীয় স্থান—বশিষ্ঠ-আশ্রম। কামাখ্যা-মন্দিরের পাদদেশ হইতে প্রায় সাড়ে পাঁচ ক্রোশ দূরে। গৌহাটি নগর হইতে আশ্রম যাইবার একটি সুন্দর রাস্তা আছে। একটি ডাকবাংলা আছে, সেখানে লোকে বিনা খরচে থাকিতে পারে—নিকটবর্ত্তী মুদির দোকান হইতে আহার্য্য সংগ্রহ হইতে পারে। আশ্রমের পশ্চাতে একটি সুন্দর জলপ্রপাত আছে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন।

নাম গান

এ মোর ধেয়ান-মৌন অন্তরের মাঝে
একতারা শুধু এক নিশিদিন বাজে;—
বন্ধু, সে তোমারি নাম কোমল মধুর,
না জানি কি বলে মোরে, গাহে কোন সুর!
আমি শুধু কায়মন আরো স্তব্ধ করে
স্বপ্ন-সমাহিত হই মহানন্দ-ভরে!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

"একলা পথে কে তুমি যাও ধীরে
আঁচল-আড়ে প্রদীপখানি ঢেকে ?"

রবীন্দ্রনাথ।

চিত্রকর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়ের সৌজন্যে মুদ্রিত।

U RAY & SONS.

বিদ্যাপতির শিবগীতি

বিদ্যাপতিকে আমরা বৈষ্ণব কবি অথবা প্রেমিক কবি বলিয়াই জানি, অতএব সেই ভাবেই তাঁহার সমালোচনা করিয়া আসিতেছি। বিদ্যাপতির যশ তাঁহার বৈষ্ণব-পদাবলীর উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও ইদানীং অনেকে এই সন্দেহের উত্থাপন করিতেছেন যে তিনি আদৌ বৈষ্ণব ছিলেন কি না। তাঁহার দেশে নাকি তিনি শৈব কবি বলিয়া পরিচিত। তাঁহার বৈষ্ণবপদাবলীর সংখ্যার তুলনায় তাঁহার শৈব কবিতাগুলির সংখ্যা তো নগণ্য, কিন্তু অবৈষ্ণব মিথিলায় তাহাদেরই প্রতিষ্ঠা বেশী, বৈষ্ণব বঙ্গে সেগুলি অনেকে জানেনই না। তাঁহার শৈবত্ব-প্রতিপাদক উপাখ্যানও মিথিলায় প্রচলিত আছে। এ গল্পটিও যেমন অবিশ্বাস্য, বঙ্গে প্রচলিত বিদ্যাপতির লছিমা-প্রসক্তি সম্বন্ধীয় গল্পটিও তেমনি অবিশ্বাস্য; ইহাদের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার ধর্ম্মমত কি ছিল তাহা নিঃসংশয় ভাবে স্থাপন করিবার প্রয়াস নিষ্ফল। যদি কবির হৃদয় তাঁহার ধর্ম্মমতের প্রমাণ বলিয়া ধরা যায় তাহা হইলে তাঁহাকে বৈষ্ণব না বলিয়া উপায় নাই। প্রাচীন বয়সে যে-কবির হৃদয়ে সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত স্বহস্তে লিখিবার প্রবৃত্তি ও উৎসাহ আসিয়াছিল তাঁহাকে বৈষ্ণব না বলি কেমন করিয়া? যে-কবির হৃদয়-প্রস্রবণ হইতে অজস্র ধারায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমরস নিঃসৃত হইয়া ভক্তহৃদয়ে আনন্দ ও উৎসাহের এবং প্রেমিকের হৃদয়ে অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তির সৃষ্টি করিয়াছে, তিনি শৈবকুলজাত বা কোনও সময়ে শৈবমতাবলম্বী হইলেও যে বৈষ্ণবধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন না, এ কথার সারবত্তা কোথায়?

ফলকথা এই যে বিদ্যাপতির দেশে ধর্ম্মমতের জন্য দ্বন্দ্ব কখনই এত প্রখরতা লাভ করে নাই যে বৈষ্ণব হইলেই শৈবের নিন্দা করিবে, অথবা শৈব হইলেই বৈষ্ণব-বিদ্বেষী হইবে। প্রায় সকল প্রাচীন কবিই বিভিন্ন ধর্ম্মমতগুলির মধ্যে সমন্বয়-স্থাপনের পক্ষপাতী; বিদ্যপতিও সেই ভাবেই বৈষ্ণব হইয়াও শিবের গীত, শক্তির গীত, রামবন্দনা, গঙ্গা-বন্দনা প্রভৃতি গান করিয়াছেন, এই মতই বোধহয় সমীচীন।

বিদ্যাপতির শিবগীতির চর্চ্চা করিলে তাঁহাকে যে একজন বিশিষ্ট শৈব বলিয়া মনে হয় তাহা নহে। বরঞ্চ বেশ বুঝা যায় যে ঐ শিবগীতির উপলক্ষে বিদ্যাপতি একটি গৃহচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। সেই গৃহচিত্রে আমরা অনেক-গুলি সজীব মূর্ত্তি দেখিতে পাই; অনেকগুলি সামাজিক রহস্যও জানিতে পারি। প্রাচীন কাব্যগুলির মধ্যে যে একটা প্রাণময়ত্ব দেখা যায় বিদ্যাপতির শিবগীতির মধ্যে তাহা বেশ অনুভব করিতে পারা যায়। বিদ্যাপতির দেশে সে সময়ে মুসলমানপ্রভাব খুব বিস্তৃত হয় নাই সত্য, কিন্তু চতুর্দ্দিকের প্রভাব মিথিলাতেও অল্পবিস্তর প্রবেশ করিতে-ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ফলে ধনী ও নির্ধনের ভেদ তখনই বেশ সূচিত হইয়াছিল। বিদ্যাপতি দুঃখ করিয়া বার বার সে কথার উল্লেখ করিয়াছেন। সমাজে গুণের পরিবর্ত্তে ধনের আদর হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। বিদেশী রাজা হওয়ার ফলে কাচ ও কাঞ্চন সমান দরে বিকাইতে-ছিল। রাজার কাছে প্রতিপত্তি লাভ করিত সংসারে প্রতিষ্ঠাশীল আড়ম্বরপূর্ণ লোকে; নিস্পৃহ নির্ধন গুণবান্ ব্যক্তিও তাহাদের সমক্ষে হীন বলিয়া গণ্য হইত। বিদ্যা-পতির শিবগীতিতে এই ভাবটি বেশ ফুটিয়াছে। অমন যে সর্ব্বগুণসম্পন্ন শিব, ধনী হিমালয়ের গৃহে তাঁহারও আদর নাই। জামাই আসিয়াছেন, ধনী শ্বশুর মুখ ফিরাইয়াও দেখেন না, তাঁহার অনুচরবর্গ শিবকে উপহাস করে। ঐশ্বর্য্যমদমত্ত বিদেশীয়ের করকবলিত হওয়ায় ভারতের আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তনের ইহাই প্রথম নিদর্শন।

বিদ্যাপতির শিব-পার্ব্বতী-সম্বন্ধীয় পদাবলী শিবভক্তের হৃদয়োচ্ছ্বাস নয়, এ কথার প্রমাণ সেই গীতগুলিই, অন্য প্রমাণের আবশ্যক করে না। এখানে মহাদেবের মহাদেবত্ব একেবারে বিলুপ্ত, গৌরীরও জগৎমাতৃত্ব নিঃশেষরূপে লুক্কায়িত। কুমারসম্ভবের মহান্ আদর্শ খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে; এখানে হিমালয় ও মেনকা সম্পন্ন দম্পতীমাত্র, হরপার্ব্বতী নির্ধন গৃহস্থ দম্পতী ভিন্ন আর কিছুই নয়। হিমালয় সদ্বংশ-জাত বৃদ্ধ ও নির্ধন বরে কন্যাসম্প্রদানে কৃতসংকল্প হইয়া-ছেন; মেনকা কাঁদিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছেন এবং যে পঞ্জী-কার শিবের সহিত গৌরীর বিবাহসম্বন্ধ করিয়াছেন তাহাকে গালি পাড়িতেছেন। বঙ্গে যেমন কুলজী গ্রন্থ থাকিত, মিথিলাতেও তেমনি পঞ্জীগ্রন্থ থাকিত যাহাতে

বিশিষ্ট ব্রাহ্মণবংশীয় ব্যক্তিবৃন্দের জীবনী বংশাবলী প্রভৃতি লেখা হইত। এই পঞ্জীগ্রন্থ হইতেই বিদ্যাপতির জীবনের অনেক কথা জানা গিয়াছে। যদিও মিথিলায় কখনও কৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত হয় নাই, সে পাপ হতভাগ্য বঙ্গ-দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল, তথাপি সেখানেও সদ্বংশজাত গৃহস্থ যদি নির্ধন ও বৃদ্ধও হয় তথাপি সেইরূপ ঘরে কন্যাসম্প্রদান করিবার প্রথা ছিল। বিদ্যাপতির শিবগীতি হইতে আমরা সে কথা জানিতে পারি। এইরূপ বিবাহে দাম্পত্যজীবন যে খুব সুখের হয় না কবি তাহাও উজ্জ্বলরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। ঘর দেখিয়া বিবাহ দিলেন বটে, কিন্তু বিবাহের পর হইতেই হিমালয়ের মনে জামাতার প্রতি উপেক্ষার ভাব জাগিয়া উঠিল। মেনকার মনে দুঃখ, যে, জামাই ঘোড়া না চড়িয়া বলদে চড়ে, তাঁহার অর্থ নাই। মেয়ের সুখে মায়ের সুখ; কন্যার সুখ হইবে না ভাবিয়া মা'র মন অস্থির। গিরি-রাণীর জামাই বলদে চড়িয়া বেড়ায়, ইহাতে প্রতিবেশীরা উপহাস করে, ইহাতে মেনকার খেদ; মেনকা ইহা সহ্য করিতে পারে না, জামাইয়ের সঙ্গে কলহ করে। জামাই কখনও মিনতি করে, কখনও রাগ করিয়া চলিয়া যায়। কন্যা গৌরী মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে না, লজ্জায় মরিয়া যায়; আবার পতি রাগ করিয়া চলিয়া গেলে তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়ায়। পতি যেমনই হউক, সতী স্ত্রীর পতিই সর্ব্বস্ব, তাই পিতৃগৃহে স্বামীর অপমানে মনে মনে গৌরী ক্লিষ্ট।

এই তো গেল বাপের বাড়ীর কথা, তার পর নিজের ঘরেও গৌরীর "শতেক খোয়ার"। স্বামী নির্ধন, সর্ব্বদাই অভাব, অভাবের জন্য মনোমালিন্য। এখানেও প্রায়ই স্বামী রাগ করিয়া চলিয়া যান, গৌরী পথে পথে খুঁজিয়া বেড়ান, খুঁজিয়া পাইলে আহ্লাদে মগ্ন হন। স্বামী ভিক্ষা করিয়া বেড়ান, স্ত্রীর মাথা হেঁট হয়, তাই স্ত্রী স্বামীকে বলেন "ভিক্ষা করিয়া বেড়াও কেন,—তোমার গৌরবের হানি হয়,—দেখ তোমার ভাগ্যে ধুতুরার ফুল, বিষ্ণুর ভাগ্যে চাঁপা ফুল। ভিক্ষা ছাড়—কৃষি কর, ত্রিশূল কাটিয়া ফাল কর, বলদ জুতিয়া দাও, গঙ্গার জলে পাট কর।" গৌরী রাজার মেয়ে, সাংসারিক জ্ঞান তাঁহার মন্দ ছিল না, "ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ" এ তথ্য তিনি জানিতেন ও আপাততঃ প্রাণে প্রাণে তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছিলেন। যে কাল পড়িয়াছিল সে কালে ব্রাহ্মণেরও আর ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। এই-সকল কথা ভাবিয়া চিন্তিয়া, সবদিক্ দেখিয়া গৌরী স্বামীকে আপদ্ধর্ম্মরূপে কৃষিকার্য্যে প্ররোচিত করিতেছেন। তখন বোধ হয় অনেক ব্রাহ্মণই কৃষিকার্য্য করিতেন—অধ্যাপনায় সকলের চলিত না। কিন্তু গৌরীর এই সুন্দর উপদেশ তাঁহার "উমতা" পতির সম্বন্ধে বিশেষ কার্য্যকর হইল না। কথায় বলে "স্বভাব যায় মলে"। মহাদেবের ভিক্ষা করাটা স্বভাবে পরিণত হইয়াছিল, তাই গৌরীর উপদেশ তিনি কানে তুলিলেন না বোধহয়, কারণ ইহার পরেও তাঁহাকে ভিক্ষাতেই প্রবৃত্ত দেখিতে পাই। মহাদেবকে কবি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রূপেই চিত্রিত করিয়াছেন; কারণ যখন পঞ্জীর উল্লেখ রহিয়াছে তখন কবির উদ্দেশ্য তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত করা।

এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সংসারে ভোজনের অংশী হইয়া দুইটি পুত্রের আবির্ভাব হইল—স্থূলোদর গণেশ এবং সুপুরুষ কার্ত্তিক। বুড়া বাপ ভিক্ষা করিয়া আনেন আর ছেলেরা বসিয়া বসিয়া খায়। বৃদ্ধের মনে ইহাতে বিরক্তির উদয় হয়। একদিন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভিক্ষাটনে পরিশ্রান্ত হইয়া ঘরে ফিরিলেন এবং গণেশকে দেখিয়াই তাহার উপর তম্বি আরম্ভ করিলেন —"আমি বুড়া বাপ, আমি প্রতিদিন ভিক্ষা মাগিয়া ফিরিব, তোমরা কেহ সাহায্য করিবে না, বসিয়া বসিয়া খাইবে, আমি গেলে কি হবে, তখন কি ইহকালে উপবাস করিয়া পরকালের কাজ করিবে?" জগতে মা'র প্রাণ সর্ব্বত্রই সমান, মা'র প্রাণে পুত্রের "খোয়ার" সহ্য হয় না, তাই গৌরী সুর করিয়া কোন্দল আরম্ভ করিলেন—"কেন অত বলা, বাছা পেটের ভরে নড়্‌তে পারে না, তুমি ওকে দেখ্‌তে পার না তাই অত বল, তার চেয়ে দাও না ওকে বিদায় করে, আমার নাম নিয়ে ভিক্ষে মেগে খাবে—সবাই দেখুক্ কি কপাল করে এসেছি, মানুষের দুর্দ্দশা হ'লে কতই হয়, নিজের ছেলে, তার ওপর এত! ও গো লোক হাসিও না, লোক হাসিও না।" এর ওপর আর কথা চলে না, বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যার শক্ত শাসন।

এ গেল আব্‌দারের এক পালা। অপর পালা আরও

চমৎকার। এদিকে খাইবার সংস্থান থাকুক বা না থাকুক, ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয় হউক, মার মনে সখ তো আছে, একটি টুক্‌টুকে বৌ ঘর আলো করিয়া বেড়ায় এ ইচ্ছাটা কোন্ মা'র মনে না হয়। অতএব এবার গৌরী বুড়া স্বামীর কাছে আবদার ধরিলেন "ছেলে বড় হ'ল, আমাদের বয়স গেল, কবে ছেলের বিয়ে দেবে? অত বড় ছেলে কুমার, তোমার মনে কি চিন্তা হয় না? লোকে বল্‌বে হীন বংশের ছেলে, তাই অতদিন কুমার রয়েছে।" শিব হাসিয়া উত্তর দিলেন "বলি সব জেনে শুনে ন্যাকা সাজ কেন? দেখ্‌চ তো একটা ভাল মেয়ের সন্ধানে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তা তোমার ছেলের উপযুক্ত মেয়ে তো দেখ্‌তে পাই না।" কার্ত্তিক আড়াল থেকে সব শুনিতেছিল, ক্রমে কলহ বা বাড়ে এই আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া মাবাপকে বলিতে লাগিল, "বাবা, মা, তোমরা ঝগড়া ক'র না, আমি বিয়ে করব না, আমার বিয়ের কাজ নাই, আমি কুমার থাক্‌ব।" এইরূপে সেযাত্রা বিবাদের মীমাংসা হইল। আমরা জানিতে পারিলাম যে বিদ্যাপতির সময়ে সদ্বংশজাত সন্তানগণের বিবাহব্যাপার অল্প বয়সেই সমাপ্ত করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল; সে প্রথা বঙ্গেও অনেকদিন প্রচলিত ছিল, বোধহয় এখন আর ততটা নাই; কিন্তু বিহারে এখনও খুব আছে। বয়স যদি বাড়িত তাহা হইলে লোকে কুল ধরিয়া নিন্দা করিত; এখনও বঙ্গদেশে কন্যা সম্বন্ধে এ ভাব অনেকটা বিদ্যমান আছে।

তারপর এই গৃহচিত্রের আর-এক অংশ বড় সরস। আমরা বলিয়াছি যে সংসারে দুঃখে পড়িয়া ঝগড়া কলহ হউক, কিন্তু গৌরীর মনে বৃদ্ধপতির প্রতি অনুরাগ কম ছিল না। কবি ইহার পরবর্ত্তী কবিতায় স্বামী লইয়া গৌরী ও লক্ষ্মীর বিবাদ বর্ণনা করিয়াছেন, লক্ষ্মীর মুখে স্বামীর নিন্দা শুনিয়া গৌরী তাহার কড়া প্রতিবাদ করিতেছেন, আবার লক্ষ্মী দুকথা শুনাইতেছেন; এই প্রকারে দুইটি রমণীর কলহের ছবি কবি আঁকিয়াছেন। এ একটি সংসারের খাঁটি চিত্র। এ সংসারে অনেক রমণী এমন আছে যাহারা নিজের সৌভাগ্যগর্ব্বের পরিচয় দিবার জন্য হয় প্রতিবেশিনীর স্বামীর সাক্ষাৎ নিন্দাবাদ করে, নয় সহানুভূতির ছলে নিজ গর্ব্বের প্রকাশ করে। লক্ষ্মী আর গৌরী নাম দেবতার বটে, কিন্তু চরিত্র দুইটি রমণীর; তা এই হরপার্ব্বতী-সঙ্গীতে কবি দুএকটা নমস্কার বা প্রার্থনাবাক্য প্রয়োগ করিলেও তিনি যে নিত্যদৃষ্ট মনুষ্যচরিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন সে বিষয়ে মতভেদ হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক এ চিত্রের পরিসমাপ্তি আনন্দে। কলহাদি শেষ করিয়া সকলে মিলিয়া মিশিয়া ফাগ খেলিয়া সময়টা আনন্দে কাটাইতেছেন, এই দৃশ্যে কবি তাঁহার হরপার্ব্বতীসঙ্গীত সমাপ্ত করিয়াছেন। তারপর প্রার্থনা, সেটুকু এই গৃহচিত্রের বহির্ভূত। এই প্রার্থনার ভিতর এমন একটা পদ আছে যাহা হইতে সাহিত্যপরিষৎ হইতে প্রকাশিত বিদ্যাপতির পদাবলীর সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলিতে চাহেন যে বিদ্যাপতির শৈবত্ব প্রতিপাদিত হয়। এই পদে যে তাঁহার শিবভক্তি প্রকাশিত হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা দ্বারাই নিঃসংশয় প্রমাণ হয় না যে বিদ্যাপতি শৈব ছিলেন।

সে কথা যাউক—আমরা যে চিত্রের কথা বলিতেছি তাহারই বিষয়ে আরও দু-একটা কথা লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথম এই পদগুলির ভাষা। একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে বিদ্যাপতি তাঁহার কৃষ্ণসম্বন্ধীয় পদাবলীতে যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন তাহার সহিত এই গীতাবলীতে ব্যবহৃত ভাষার বিলক্ষণ পার্থক্য আছে। পার্থক্য স্পষ্টতঃ বিষয়গত; প্রথমশ্রেণীর পদাবলীগুলি একটা গূঢ় রূপক, সেইজন্য তাহার ভাষা অলঙ্কারও সংস্কৃতবহুল; দ্বিতীয়শ্রেণীর পদাবলী একটা গৃহচিত্র, অতএব ভাষাও তেমনি ঘরোয়া, ইহাতে সাজসজ্জা নাই, কেবল সহজ সরল কথায় সংসারের একটি করুণোজ্জ্বল দৃশ্য আমাদের সমক্ষে ধৃত হইয়াছে। প্রথমটি কাব্য—দ্বিতীয়টি নাটক। রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় পদাবলীতে বিদ্যাপতির কাব্যশিল্প চরমে উপনীত হইয়াছে, শিবপার্ব্বতী সম্বন্ধীয় পদাবলীতে তাঁহার সাংসারিক বুদ্ধি ও খুঁটিনাটি দেখিবার শক্তি বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। একটিতে একটা উচ্চভাবের পরিণতি, অপরটিতে নিত্যদৃষ্ট সাংসারিক ব্যাপারের যথাযথ চিত্রণ, ছোটকথা ছোটভাব সোজাভাষায় বর্ণিত। বিদ্যাপতির ভাষা হইতে, ভাষাতত্ত্ববিষয়ক যে-সকল তথ্য আবিষ্কার করা যায় তাহা এ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য নহে—অন্য কোনও সময়

তাহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। বিদ্যাপতির যে নাট্যশক্তিও যথেষ্ট ছিল, বাঙ্গালী পাঠক তাহা ততটা লক্ষ্য করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। বিদ্যাপতির বৈষ্ণব-পদাবলীই বঙ্গে পঠিত গীত ও আলোচিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু তাঁহার শিবগীতির ভিতর কতটুকু কবিত্ব বা শক্তি নিহিত আছে তাহা কেহ এতাবৎ বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই, বুঝান তো দূরের কথা। তাঁহার শৈবগীতাবলী ৺ কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ বহুদিন পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন; ইদানীং সাহিত্যপরিষৎ-সম্পাদিত পদাবলীতে সেগুলি আরও বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, ইহাও প্রায় পাঁচবৎসর হইতে চলিল; তথাপি এই শ্রেণীর গীতগুলির কোনও সমালোচনা হয় নাই দেখিয়া অযোগ্যতা সত্ত্বেও ইহাদের সম্বন্ধে দুএকটি কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

বিদ্যাপতির শিবগীতির সম্বন্ধে লক্ষ্য করিবার দ্বিতীয় বিষয়—বঙ্গে প্রচলিত শিবগীতির সঙ্গে ইহাদের বিস্ময়জনক সাদৃশ্য। বঙ্গে অনেকগুলি শৈবকাব্য আছে, ইহাদের সমগ্র রচনা কেবল শিবপার্ব্বতী সম্বন্ধে, যেমন শিবায়ণ প্রভৃতি; আবার অনেকগুলি এমন কাব্য আছে যাহাতে প্রসঙ্গক্রমে শিবপার্ব্বতীর দাম্পত্যচিত্র চিত্রিত হইয়াছে, যেমন মুকুন্দরামের চণ্ডী, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি। আমরা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হই যে এই কাব্যগুলিতে শিবপার্ব্বতীর বিবাহ সম্বন্ধে মেনকাদির যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, শিব-পার্ব্বতীর দাম্পত্য ও গৃহস্থালির যে ভাবে বর্ণনা আছে, সে-গুলি যেন হুবহু বিদ্যাপতির অনুকরণে চিত্রিত। বঙ্গে যে বিদ্যাপতির শিবগীতি কখনও প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, তাহা আমরা জানি না, এমন কি কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের সংস্করণের পূর্ব্বে ইহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কাহারও অবগতি ছিল তাহাও বোধ হয় না; অথচ চিত্রের যে এমন ঐক্য তাহার কারণ কি? তাহার একমাত্র কারণ, যে, বঙ্গেই হৌক বা মিথিলাতেই হৌক, সে-সময় দেবতা সম্বন্ধে ধারণা নিতান্ত ঘরোয়া হইয়া পড়িয়াছিল, দেবতার বিষয়ে আমাদের এই ধারণা দাঁড়াইয়াছিল যে তাঁহারা সমস্ত মনুষ্যসম্ভব ব্যবহারই করিতে পারেন; অতএব কুমারসম্ভবের আদর্শ মহাযোগী, পুরাণের বিশ্ববিষপায়ী নীলকণ্ঠ, নিঃস্ব ভিক্ষাজীবী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণে ও জগজ্জননী উমা সেই দরিদ্র গৃহস্থের বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যায় দাঁড়াইয়াছেন। তাই কোনও কবিই এই শিবপার্ব্বতীর চরিত্রব্যপদেশে ঘরের কথা বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। মায়ের মন মিথিলাতেও যেমন বঙ্গেও তেমন, গর্ব্বিত ধনীর চরিত্র জগতে সর্ব্বত্রই সমান, অন্নাভাবক্লিষ্ট দরিদ্রপরিবারের মূর্ত্তি বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার হিসাবে বিভিন্ন হয় না, সবদেশেই একই প্রকার। যদি সেই-সকল চরিত্র যথাযথ ভাবে, অক্‌বর মত বিকৃত না করিয়া চিত্রিত হয়, তাহা হইলে বঙ্গের চিত্রে ও মিথিলার চিত্রে প্রভেদ না হওয়াই ঠিক। কাজেই বঙ্গের চিত্রে ও বিহারের চিত্রে ঐপ্রকার বিস্ময়জনক সাম্য দেখা যায়।

বিদ্যাপতির অথবা মুকুন্দরাম প্রভৃতির শিবসঙ্গীতে কোনও জটিল মনস্তত্ত্বের মীমাংসা নাই, কোনও একটা উচ্চ আদর্শসৃষ্টির প্রয়াসও লক্ষিত হয় না। সেগুলি দৈনিক জীবনের সুখদুঃখসম্বলিত গার্হস্থ্য চিত্রাবলী। ম্যাথ্‌-আর্ণল্ড্ বলেন যে মনুষ্যজীবন যথাযথ অঙ্কন কবিত্বের প্রধান লক্ষণ ও লক্ষ্য। তা যদি হয়, তাহা হইলে এই চিত্রগুলিতে বিদ্যাপতির কবিত্ব যথেষ্ট পরিমাণে বিকশিত হইয়াছে বলিতে হইবে। কোনও বড় সমস্যার বা আদর্শের চিত্র না হইলেও ইহাদের ভিতর যে একটি কোমল অথচ নিবিড় আত্মীয়তার ভাব, সর্ব্বাবস্থাপরাজয়ী স্নেহের রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে ইহা লইয়াই আমাদের সংসার। আমাদের দেশ দারিদ্র্যকে কোনও দিনই ভয় করিতে শেখে নাই, কেননা আমাদের অভাব এত কম ছিল যে কোনও না কোনও উপায়ে লোকের সংসার চলিত। দারিদ্র্যের কারণে স্বামীস্ত্রীর স্নেহবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইত না। গৃহে কলহ করিয়া শিব বাহিরে চলিয়া যাইতেন—গৌরী তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেন, একথা আমরা বলিয়াছি; সেই অন্বেষণবিষয়ক কবিতার সাহায্যে বিদ্যাপতি একটি সরস স্নেহময় হৃদয়ের চিত্র তুলিয়াছেন—সেই চিত্র হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে হরপার্ব্বতীর বিবাদের মধ্যে বিষ নাই! এইরূপ বিবাদ নিত্য হইলেও স্ত্রীপুরুষের হৃদয়ে পরস্পারের প্রতি স্নেহের ও বিশ্বাসের অভাব ছিল না। এইপ্রকার স্নেহ ও বিশ্বাসের উপরই সংসারের স্থিতি। আমার পাগল কোথায় গেল, আহা কোথায় কখন কি বিপদে পড়িবে;

ঘরে তাহার সব সামান রহিল সে কোথায় রহিল ; কে আমার স্বামীকে এমন উন্মত্ত করিল ;—এই-সকল কথার মধ্যে একটি স্নেহস্নিগ্ধ হৃদয়ের স্পন্দন বেশ অনুভব করা যায়। ইহার উপর পরস্পরনির্ভরতা। স্ত্রী স্বামীকে ও স্বামী স্ত্রীকে সকল মনের কথাই ব্যক্ত করেন। স্ত্রী স্বামীকে মধুর শাসনবাক্যে প্রবোধিত করিয়া বলেন—"হে আমার উন্মত্ত ! তুমি আমার কথা শোন না বলিয়াই তো তোমার এত নাকাল, সংসারে গৃহিণীর কথা তো সকলেই শোনে, তুমি কেন শোন না—কে তোমায় এমন বুদ্ধি দিল ?" স্বামী স্ত্রীকে বলে, "দেখ দেখি কি কাণ্ড, তোমার গণেশের মূষিক আমার মাথায় বসিয়া গঙ্গাজল পান করে—তোমার কার্ত্তিক এক ময়ূর পুষিয়াছে যাহাকে দেখিয়া আমার সাপগুলা ভয়ে অস্থির হয়, তুমি একটা সিংহ পুষিয়াছ যে আমার বৃষকে ভয় দেখায়। আমি করি কি—যাই কোথায় ?" হৃদয়ের এমন বিশ্রব্ধভাব যত দিন থাকে ততদিন শত দুঃখদারিদ্র্যের মধ্যেও সুখ থাকে, উহা ভাঙ্গিলে সংসার ভাঙ্গিয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "কৃষ্ণকান্তের উইলে" এবং জর্জ্জ এলিয়ট তাঁহার "রমোলায়" সেই তথ্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বিদ্যাপতির শিবগীতির এই সরস উপাদানটি সর্ব্বান্তঃকরণে উপভোগ্য।

গৌরী কর্তৃক শিবান্বেষণ-বিষয়ক পদাবলী হইতে আমরা দুইটি সামাজিক তথ্য জানিতে পারি। বিদ্যাপতির সময়ে অবরোধপ্রথা প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না; তাঁহার সময় মিথিলায় মুসলমানপ্রভাব সম্পূর্ণমাত্রায় বিস্তৃত হয় নাই, সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আজকাল বঙ্গে বিহারে ও পশ্চিমাঞ্চলে যে ভাবে অবরোধপ্রথা চলিয়াছে, সে সময় তেমন ছিল না, তাহা হইলে সম্ভ্রান্তবংশীয়া ব্রাহ্মণমহিলা পথে পথে স্বামীর অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে সাহস করিতেন না। অপর তথ্য এই যে হিন্দুর সংসারে গৃহিণীর যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল, তাহা গৌরীর আচরণে ও কথাবার্ত্তায় স্পষ্ট লক্ষিত হয়। কবে কোন্ অবস্থায় অবরোধপ্রথা আমাদের সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল তাহা নিঃসংশয় মীমাংসা করিবার উপায় নাই।

বিদ্যাপতির সূক্ষ্মদৃষ্টি সাংসারিক সকল ব্যাপারেই প্রসৃত ছিল, তাহাও এই গীতগুলি হইতে জানিতে পারি। দুঃখের বিষয় হরগৌরীর বিবাহপ্রসঙ্গে তিনি মৈথিল বিবাহপদ্ধতির সবিশেষ পরিচয় দেন নাই, দিলে আমরা ইহার একটি অবিকৃত চিত্র পাইতাম। তিনি কেবল "কোবর" অর্থাৎ কৌতুকাগারে (বাসরঘরে) স্ত্রীলোকেরা পরস্পরের সহিত রঙ্গরহস্য করে—এইটুকুই জানিতে দিয়াছেন। আমাদের বিবাহব্যাপারে এবং বিহারের বিবাহব্যাপারে বিস্তর প্রভেদ আছে। কি কি বিষয়ে প্রভেদ তাহা আমরা বিদ্যাপতির কাছ হইতে জানিতে পারি না। যাহা হউক কবি তৎকালপ্রচলিত কতকগুলি কুসংস্কারের পরিচয় দিয়াছেন, যথা মূর্চ্ছিত হইলে ভূতাবেশ হইয়াছে ভাবিয়া রোজা বা ওঝা ডাকা; "যাদুটোনায়" বিশ্বাস, "নজর" লাগায় বিশ্বাস ইত্যাদি। ঐতিহাসিকের কাছে এই-সকল কথার মূল্য আছে। তাঁহার কৃষ্ণসঙ্গীতেও এই-সকল বিশ্বাসের অল্পবিস্তর উল্লেখ দেখিতে পাই। বিদ্যাপতি নিজে এই-সকলে বিশ্বাস করিতেন বলিয়া মনে হয় না, কারণ তিনি কোনও পাত্রপাত্রীকে বশীকরণাদি ঔষধসেবনের ব্যবস্থা দেন নাই; হৃদয় দিয়া হৃদয়-বশীকরণই যে সকল বশীকরণ অপেক্ষা ফলপ্রদ সেকথা তিনি জানিতেন ও শিখাইয়াছেন। তবে অনেকে যে এই-সকল ব্যাপারে আস্থা স্থাপন করিত তাহা তিনি দেখাইয়াছেন।

বিদ্যাপতির শ্রীকৃষ্ণসঙ্গীতেও তাঁহার সাংসারিক অভিজ্ঞতা সবিশেষ প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ পদাবলীগুলি ভাবের চিত্র বলিয়া সেখানে তাঁহার সংসারজ্ঞান ও উপদেশ সূত্রাকারে প্রকটিত। উহাতে আমাদের শিখিবার ও বুঝিবার অনেক কথা আছে, অন্য কোনও সময় সে বিষয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। বিদ্যাপতির শিবগীতিতে তাঁহার সংসারজ্ঞান নাটকীয় কৌশলে ব্যক্ত হইয়াছে তাহা আমরা এতক্ষণ দেখিয়াছি। বিদ্যাপতির সমগ্র শক্তি বুঝিতে হইলে এই গীতগুলির প্রতি অমনোযোগী হইলে চলিবে না। এগুলিকে বিচার করিয়া ভবিষ্যৎ সমালোচক বিদ্যাপতি সম্বন্ধে মতস্থাপন করেন এই উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধে উহাদের যৎকিঞ্চিৎ আভাস দিবার প্রয়াস করিয়াছি।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

রাজা

নাটকীয় পাত্রগণ।

বালকগণ
গোত্রপাবন—একটি বালক
সন্ন্যাসীগণ
মোহান্ত
একজন সৈনিক
যোদ্ধৃগণ

স্থান—একটি প্রাচীন মঠ।

দৃশ্য—মঠের সম্মুখস্থ ময়দান। নেপথ্যে সন্ন্যাসীদের স্তোত্রগান। স্তোত্রগানের আওয়াজ ছাপাইয়া সহসা তূর্য্যধ্বনি হইল। একটি ছোট ছেলে চকিত ভাবে মঠের বাহিরে আসিল। এবং তূরীর আওয়াজ লক্ষ্য করিয়া তাকাইয়া রহিল।

বালক

কুনাল! দধিমেধ! গোত্রপাবন!

বালকগণ (নেপথ্যে)

হাঁ—হাঁ......

প্রথম বালক

উত্তর দিক্ থেকে মস্ত একটা পল্টন আস্‌ছে।

(বালকগণের প্রবেশ)

দ্বিতীয় বালক

কই? কোথায় পল্টন? কোনদিকে?

প্রথম বালক

দ্যাখ্ নীচের দিকে তাকিয়ে,—ঐ পাহাড়তলীতে।

তৃতীয় বালক

ও যে রাজার পল্টন।

চতুর্থ বালক

রাজা বোধ হয় লড়ায়ে যাচ্ছে।

(আবার তূর্য্যধ্বনি)
(বালকগণ মঠের মূর্চ্চ'বন্দী প্রাচীরে উঠিয়া পড়িল। নেপথ্যে চলন্ত পল্টনের মৃদু কোলাহল)

প্রথম বালক

আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি—ঘোড়া, ঘোড়-সওয়ার—সব দেখ্‌তে পাচ্ছি।......

দ্বিতীয় বালক

শড়কী, তলোয়ার—কত কী হাতিয়ার!......

চতুর্থ বালক

আবার ঝাণ্ডা-নিশান—রঙ্-বেরঙের—কত কি দেখ্‌তে পাচ্ছি।......

তৃতীয় বালক

আমি রাজার ধ্বজা দেখতে পেয়েছি—ওই যে ওই!...

চতুর্থ বালক

আমি রাজাকে দেখতে পাচ্ছি।

প্রথম বালক

কই কই রাজা কোন্‌দিকে?

চতুর্থ বালক

ওই যে কালো ঘোড়ায় চড়ে—লম্বামত লোকটি—ওই।

গোত্রপাবন

ওরে তোরা জয়ধ্বনি কর্, মহারাজের জয়ধ্বনি কর্।

সকলে

যুদ্ধে তোমার জয় হউক্ মহারাজ! যুদ্ধে তোমার জয় হউক্ মহারাজ!

(নেপথ্যে অস্ত্রের ঝঞ্জনা এবং রণবাদ্যের মধ্যে যোদ্ধৃগণ মহারাজের জয়ঘোষণা করিতে করিতে যেন দূরে চলিয়া গেল)

প্রথম বালক

দ্যাখ্, আমার বড় রাজা হ'তে ইচ্ছে করে।

গোত্রপাবন

কেন বল্ ত?

প্রথম বালক

যে রাজা হয় তার কত সোনা থাকে, কত রূপা থাকে......

দ্বিতীয় বালক

কত জহরত থাকে......

তৃতীয় বালক

রাজার কেমন ছিপছিপে ঘোড়া সব! কেমন সব শিকারী কুকুর......

চতুর্থ বালক

কেমন ঝক্‌ঝকে ধারালো সোনা-বাঁধানো তরোয়াল! কেমন সব নীল রঙের শড়কী, কেমন ঝক্‌ঝকে টক্‌টকে ঢাল। দেশে আমি যখন বাবার কাছে ছিলুম তখন ওঁকে আমাদের বাড়ীতে আস্‌তে দেখেছি।

প্রথম বালক

কি রকম দেখ্‌তে?

চতুর্থ বালক

যেমন লম্বা তেমনি চওড়া—মানুষের মতন মানুষ! যেমন ছাতি তেমনি গর্দ্দান, কি তার গায়ে জোর! সিংহের

কেশরের মত চুল! গম্ভীর চেহারা, চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ! গায়ে সাদা রেশমের আঙ্‌রাখা তার উপরে অঙ্গত্রাণ, তার উপর আগুন-ধোঁয়ায়-মেশানো রঙের উত্তরীয়। রামধনুকে যত রং—রাজার ওই আঙ্‌রাখা অঙ্গত্রাণ আর রাজ-উত্তরীয় মিলিয়ে ঠিক্ তত রঙ। মাথার মুকুট ঝক্‌মক্ করছে। মুকুটের ঠিক্ উপরে শ্যেনপাখীর ডানার মতন দুটি ডানা উঠেছে। ভারী চমৎকার! রাজাটি দেখ্‌তে ভারী চমৎকার!

দ্বিতীয় বালক

মুখের চেহারা কেমন?

তৃতীয় বালক

দেখলে কি রাগী বলে মনে হয়?

চতুর্থ বালক

এক এক সময়ে মনে হয় বটে।

প্রথম বালক

কি বল্‌লে? হাসিহাসি মুখ?

চতুর্থ বালক

সমস্ত দিনের ভিতর তাঁকে মোটে একবার মাত্র হাসতে দেখেছিলুম।

দ্বিতীয় বালক

মোটের উপর কেমন মনে হলো? গম্ভীর, না হাসি-হাসি?

চতুর্থ বালক

মোটের উপর বল্‌তে গেলে—গম্ভীর। যখন যোদ্ধাদের সঙ্গে কথা কইছিলেন তখন খালি-খালি মুখের চেহারা বদ্‌লাচ্ছিল—এই প্রফুল্ল, এই বিরক্ত, এই গম্ভীর। যখন চুপ্ করে একলা ছিলেন, তখন যেন ভারী বিষণ্ণ।

প্রথম বালক

রাজার আবার দুঃখ কি ভাই?

চতুর্থ বালক

কি জানি ভাই, শুনেছি হাজার হাজার মানুষ মেরেছে, তাই বোধ হয় অমন।

দ্বিতীয় বালক

হাঁ, আমিও শুনেছি ও কত দেবত্তর কত মঠের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে, তাই মনে সুখ নেই।

তৃতীয় বালক

আর কত সব যুদ্ধে হেরে ফিরেছে।

গোত্রপাবন

আহা রাজার কত দুঃখ!

দ্বিতীয় বালক

আচ্ছা গোত্রপাবন, তোমার রাজা হ'তে ইচ্ছে হয় না।

গোত্রপাবন

না, একটুও না। তার চেয়ে সন্ন্যাসী হয়ে এই সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মঠে থাক্‌তে আমার বেশী ইচ্ছে। তা হলে আমি এই রাজার হয়ে ভগবানের কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা কর্‌তে পারব।

চতুর্থ বালক

আমার বাবা বলেন—আমাদের বংশে রাজরক্ত আছে, একদিন চাই কি আমিই এই দেশের রাজা হতে পারি।

দ্বিতীয় বালক

আমার বাবাও রাজার জ্ঞাতি।

তৃতীয় বালক

আমারও, আমারও।

চতুর্থ বালক

আমি তোদের কাউকে রাজ্য নিতে দিচ্ছিনে। রাজ্য আমার।

দ্বিতীয় বালক

কখ্‌খনো না! রাজ্য আমার।

তৃতীয় বালক

যার খুসী তার হোক্, রাজ্য দখল্ করব আমি, দেখে নিয়ো।

দ্বিতীয় বালক

না, তা হচ্ছে না, তোদের গোষ্ঠীর কাউকে নিতে দেবো না।

চতুর্থ বালক

তাই নাকি? যখন আমার তলোয়ার তোদের সবাইকে ছোব্‌লাবে তখন বিষিয়ে মরতে হবে! বুঝেছিস্? শত্রুদের গ্রাস থেকে আমি রাজ্য রক্ষা কর্‌তে জানি, বুঝেছিস্? গোত্রপাবন! রাজার জন্যে তুমি স্বস্ত্যয়ন কোরো।

(নেপথ্যে মঠের মধ্যে ঘণ্টাধ্বনি)

গোত্রপাবন

মঠে ঘণ্টা বাজছে। সন্ন্যাসীরা সন্ধ্যা-বন্দনা সুরু করেছেন।

(মোহান্ত এবং সন্ন্যাসীরা একে একে মঠ-সম্মুখস্থ ময়দানে আসিয়া পড়িল। বালকেরা একটু তফাতে সরিয়া দাঁড়াইল। নেপথ্যে যুদ্ধ-কোলাহল)

মোহান্ত

বৎসগণ, আজ আমাদের রাজা শত্রুসম্মুখীন হয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত।

প্রথম সন্ন্যাসী

আচ্ছা গুরুদেব, আমাদের রাজা যতবার যুদ্ধে গেছেন ততবারই পরাজিত হয়েছেন। একটি বারও জয়লাভ করতে পারেননি। অতি অদ্ভুত ব্যাপার নয়?

মোহান্ত

কাল রাত্রে ভগবানের স্বপ্নাদেশ হয়েছে, এ যুদ্ধেও রাজাকে ছত্রভঙ্গ হয়ে ফিরতে হবে।

সকলে

দুর্ভাগ্য! দুর্ভাগ্য!

প্রথম সন্ন্যাসী

গুরুদেব, পুনঃ পুনঃ এই পরাজয়ের কারণ কি, তা আমাদের বল্‌তে হবে। রাজা একবারও কৃতকার্য্য হতে পাচ্ছেন না—এর মানে কি?

মোহান্ত

তোমরা কি ভেবেছ, অশুচি হাত থেকে ভগবান পূজা গ্রহণ করবেন? এই রাজা একাধিক বার নিরপরাধের রক্তপাত করেছেন। ইনি লুণ্ঠনকারী, সময়ে সময়ে অত্যাচারী, ইনি দরিদ্র প্রজার রক্ত শোষণ করেন। যিনি অসহায়ের সহায়, তাঁকে ইনি পরিত্যাগ করে দুরাকাঙ্ক্ষার বশে দুর্বৃত্তদের সহায়তায় সিদ্ধিলাভের আশা কর্‌ছেন।

প্রথম সন্ন্যাসী

যা বল্লেন তা ঠিক্—সবই ঠিক্—কিন্তু এবারের যুদ্ধ তো প্রজাদের রক্ষার জন্য। এবার তো কোনো অন্যায় ঘটেনি। তবে কেন জয়ী হতে পারবেন না।

মোহান্ত

দেবশিশুর দরকার, শুদ্ধসত্ত্ব দেবশিশুর দরকার। সে যদি নিজে পূজা-বলির আয়োজন করে তাহলে সিদ্ধিলাভ হলেও হতে পারে। অশুচি রাজার হাত দিয়ে যোদ্ধৃগণের বীরহৃদয়ের রক্তদান করলে চল্‌বে না। অপরাধীর হুকুমে নিরপরাধের দেহপাত হলে চল্‌বে না। আমি বলে রাখছি তোমাদের, এমন হলে পূজা-বলি গ্রাহ্য হবে না।

প্রথম সন্ন্যাসী

তা হলে রাজার পাপে কি রাজ্যসুদ্ধ লোক পাপের ভাগী হবে? রাজা যদি পরাজিত হন্ তা হ'লে যে দেশসুদ্ধ লোকের দুঃখের পরিসীমা থাক্‌বে না। রাজার পাপের ভোগ রাজ্যের লোক কেন ভুগতে যাবে? যে পাপী, দেবতার অভিশাপ তাকেই দগ্ধ করুক।

মোহান্ত

জেনো বৎস, রাজার পাপ রাজ্যকেও স্পর্শ করে; আমি বলে রাখছি—যে পর্য্যন্ত না এই দেশ ধর্ম্মিষ্ঠের নিষ্কলঙ্ক মাথায় মুকুট দিচ্ছে ততদিন এর উদ্ধার নেই।

দ্বিতীয় সন্ন্যাসী

তেমন রাজা কোথায়?

মোহান্ত

ঠিক্ বলতে পারিনে, হয়তো এই ছোট ছেলেদের ভিতর থেকেই পাওয়া যাবে।

(সাগ্রহে বালকেরা মোহান্তকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল)

প্রথম সন্ন্যাসী

আর যতদিন না সেই খোকা-মহারাজ যোদ্ধৃপদবাচ্য হন্ ততদিন কি দেশ দুর্গতির মধ্যে ডুবে থাক্‌বে? রাজার দুর্দ্দশায় আমার দুঃখ হয় না, কিন্তু দেশের লোকের দুর্গতির কথা ভাবলে মন অস্থির হয়ে ওঠে। কাল রাত্রে এই দিকে কোথায় স্ত্রীলোকের কান্না শোনা যাচ্ছিল, মেয়েরা কি চার যুগ ধরে কেবল কেঁদেই দিন কাটাবে? হত্যাকাণ্ড বন্ধ হবেনা?

তৃতীয় সন্ন্যাসী

কাল যখন মঠের বাহিরে গিয়েছিলাম, দেখলাম ঝোপের ধারে একটা মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। ওঃ! যুদ্ধ অতি জঘন্য জিনিস। বীভৎস!

দ্বিতীয় সন্ন্যাসী

ও কথা বোলো না, যুদ্ধ গৌরবের জিনিস। যখন আমরা সন্ধ্যা-বন্দনা করছিলাম তখন ঘন ঘন তুরীর আওয়াজ হচ্ছিল। সন্ধ্যা-বন্দনা ভুলে যাচ্ছিলাম, আমার হৃদয় উল্লাসে লাফিয়ে উঠছিল। মনে হচ্ছিল সন্ধ্যা-বন্দনা সব ছেড়ে এক লম্ফে ওই বীরোচিত বাদ্যধ্বনির অনুসরণ করি। তুরীর আওয়াজ শুনতে পেলে আর এই যমের মুখে এগিয়ে যেতে ভয় করি না। মনে হয় তাতে আমার পা একটুও কাঁপে না।

মোহান্ত

এই তো—এই তো তরুণ হৃদয়ের কথা! বুড়োরা মৃত্যুর জন্যে প্রতীক্ষা করে বসে আছে, কিন্তু যে তরুণ সে

মৃত্যুকে আগ্ বাড়িয়ে বরণ করে নিতে চলেছে। আজ যদি এই শান্ত আশ্রমে সন্ন্যাসীদের জপতপের নির্জ্জন গৃহে ছেলেদের এই নিরীহ খেলাধূলার জায়গাটিতে—আজ যদি যুদ্ধক্ষেত্র হতে রক্তাক্ত কলেবরে কেউ এসে আমাদের সকলকে তার অনুসরণ করতে বলে তাহলে আমি ছাড়া বোধ হয় কেউই পিছ্‌পা হবে না। এই স্থবিরকে ফেলে সবাই দৌড়বে, সবাই লড়তে যাবে। লড়াইয়ের বাজনা তরুণ হৃদয়ে মদের মত কাজ করে।

দ্বিতীয় সন্ন্যাসী

অল্প যাদের বয়স তাদের এ-রকম মদের ওপর টান থাকা ভাল।

প্রথম সন্ন্যাসী

ছি ছি! তুমি এ কি বলছ! এ পাপের কথা! এতে মনের অধোগতি হয়! এতে অপরাধ হয়!

মোহান্ত

দেখ, এ তো আর সত্যি মদ নয়, এ জিনিস প্রত্যেক তরুণের পান করা কর্ত্তব্য। এ ফেনিল সুরা যে পান করেনি, মিছে তার মনুষ্যজন্ম, মিছে তার জীবন ধারণ করা। এই মদেই ত ভগবান ভক্ত সাধুদের মাতাল করে রেখেছেন। বৎসগণ, আমি তোমাদের এই তারুণ্যের নেশা সংযত কর্‌তে চেষ্টা করব না।

প্রথম সন্ন্যাসী

আমি আপনার কথার মর্ম্ম গ্রহণ কর্‌তে পারলাম না। এ যেন হেঁয়ালি। এ আমাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে।

মোহান্ত

তুমি বল্‌ছ কি? আজ যদি ওই ঘোড়া-ঘোড়সওয়ার-তুরী-ভেরী-বাদ্যভাণ্ডের মায়ারাজ্য থেকে আহ্বান আসে—কৌতূহলী তরুণ হৃদয়ের চিরপ্রিয় ভীষণ মধুর অপূর্ব্ব স্বরের রেশ কানে পৌঁছায় আর তাতে যদি কেউ মেতে ওঠে, যদি ডাক শুনে সঙ্গে ছোটে, তবে কি আমি তাকে মানা করব? ধরে রাখ্‌ব? সেই ভীষণ-মধুর আহ্বান, সেই মৃত্যু-দেবতার আহ্বান, যদি তোমাদের কাউকে সত্যই আকর্ষণ করে, এমন কি এই দুধের ছেলেদের মধ্যে কাউকে ডাকে, তা হলে তাদেরই কি আমি আটকে রাখতে পারি? না না, আমি তোমাদের কাউকে আটকাতে পারব না। দেবতার তুরী যদি টানে, ছেড়ে দিতে হবে, কি করব। জানি আমায় একলা থাক্‌তে হবে, দিন আমার কাটিতে চাইবে না, তবু আটকাব না, কাউকে বাধা দেবো না।

দ্বিতীয় বালক

গুরুদেব, গোত্রপাবন কিন্তু যাবে না বল্‌ছিল।

মোহান্ত

কেন?

দ্বিতীয় বালক

ও বল্‌ছিল, ও সন্ন্যাসী মোহান্ত হবে, মঠে থাক্‌বে।

মোহান্ত

গোত্রপাবন! তুমি লড়ায়ে যাবে না?

গোত্রপাবন

হাঁ, যাব। আমি রাজার সেবক হ'য়ে যাব। যখন সব্বাই তাঁকে ছেড়ে যাবে, আমি তখনও তাঁর সঙ্গে থাক্‌ব। তা হলে আমি হয়তো তাঁর উপকার করতে পারব, তাঁর সেবা কর্‌তে পারব।

মোহান্ত

কিন্তু তোমাকে যে দেবতার সেবায় উৎসর্গ করা হয়েছে, সাধু সন্ন্যাসীদের সেবায় সঁপে দেওয়া হয়েছে। তুমি ত রাজার সেবার জন্যে নও।

গোত্রপাবন

হলই বা, তাতে দোষ কি? যুদ্ধ ভেঙে গেলে রাজাকে হার্‌তে দেখে একে একে যখন সবাই তাঁকে ছেড়ে চলে যাবে, তখন এই নিতান্ত ছোট সেবকটি তাঁর সেবা কর্‌তে পারবে।

মোহান্ত

ঠিক্ বলেছে বালক, ঠিক্ বলেছে। আমরা আত্ম-গৌরবের কথা ভাবছি, ও ভাবছে সেবার কথা।

(নেপথ্যে আশা-ভঙ্গ ও আশঙ্কা-সূচক কোলাহল)

প্রথম সন্ন্যাসী

গুরুদেব! আমার কেন যেমন মনে হচ্ছে—আমাদের রাজা বুঝি পরাজিত হলেন। হেরে গেলেন, হেরে গেলেন।

মোহান্ত

তুমি মঠের মূর্চ্চাবন্দী প্রাচীরে পাহারা-ঘাঁটিতে যাও। দেখ দেখ কি হলো।

প্রথম সন্ন্যাসী (প্রাচীরে উঠিয়া)

একজন লোক ঘোড়া ছুটিয়ে এদিকে আস্‌ছে। বোধ হয় পালিয়ে আসছে।

দ্বিতীয় সন্ন্যাসী

কি রকম লোক? কে লোক?

প্রথম সন্ন্যাসী

দেহ রক্তে ভেসে গেছে। ঘোড়ার উপর এলিয়ে পড়েছে। লেশ মাত্র শক্তি অবশিষ্ট নেই।

দ্বিতীয় সন্ন্যাসী

ও কি আমাদের রাজার লোক?

প্রথম সন্ন্যাসী

হাঁ তাই বটে। হায়, হায়, রাজার হার হয়ে গেল! হার হয়ে গেল!

সন্ন্যাসীগণ

দুর্ভাগ্য! দুর্ভাগ্য!

প্রথম সন্ন্যাসী

হেরে গেল! রাজা হেরে গেল! হায়! পূজাপাঠ-পরায়ণ সন্ন্যাসীগণ, তোমাদের দ্বারা কোন সাহায্যই হল না। রাজার পরাজয় হল।

মোহান্ত

রাজাকে দেখতে পাচ্ছ? রাজা কোথায়?

প্রথম সন্ন্যাসী

ঐ যে আস্‌ছেন—এই দিকেই আস্‌ছেন। এই যে...এই যে...একেবারে আমাদের মঠের দরজায়।

মোহান্ত

রাজা! এসেছেন! রাজা! রাজা!

সকলে

রাজা! রাজা!

রাজা

আমি কথা বল্‌তে পার্‌ছিনা। কে আমায় একটু জল দেবে?

মোহান্ত

দাও দাও মহারাজকে জল এনে দাও।

(গোত্রপাবন রাজাকে জল পান করাইল)

রাজা

আমার এক এক জন যোদ্ধা দশ দশ জনের মোহড়া রেখেছে। কিন্তু এত করে ফল কি হল? হেরে গেলাম, পালিয়ে এলাম, আমার শত শত যোদ্ধা আজ ময়দান-সই হয়েছে।

সন্ন্যাসীগণ

মনস্তাপ! মনস্তাপ!

(যোদ্ধৃগণ ও যোদ্ধৃসহায় নামক দেবযোনিগণ একত্র হুড়মুড় করিয়া ঢুকিয়া পড়িল। রাজা নতজানু হইয়া মোহান্তের চরণে আপনার তরবারি রাখিলেন)

রাজা

মোহান্ত মহারাজ! আপনি সিদ্ধবাক্‌ ঈশ্বরজ্ঞানিত ব্যক্তি। আপনি আমাকে অভিশাপ দিন, আমার প্রায়শ্চিত্ত হোক, শীঘ্র আমার মৃত্যু হোক্‌। হার হয়েছে, আমার হার হয়েছে। আমার দেশের হার হয়েছে, আমার জাতির হার হয়েছে। দশবার আমি শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছি, দশবারই পরাজিত হয়েছি। আমার জন্যে আমার দেশের ওপর বিধাতা বিমুখ। আপনি তাঁকে বলুন—তিনি আমার দণ্ড দিন, আমার প্রজাদের মার্জ্জনা করুন—তারা নিষ্কলঙ্ক নির্দ্দোষ।

মোহান্ত

ভগবানের রাজ্যে নির্দ্দোষ কখনই দণ্ডিত হবে না।

রাজা

ভগবান আমায় পরিত্যাগ করেছেন।

মোহান্ত

না, তুমিই ভগবানকে পরিত্যাগ করেছ, তুমি ভগবানকে ভুলে আছ।

রাজা

ভগবান আমার প্রজাদের পরিত্যাগ করেছেন।

মোহান্ত

ভুল কথা, তিনি পরিত্যাগ করেননি, তিনি পরিত্যাগ করেন না। যাদের পরিত্যক্ত ভাবছ এই জাতি যদি ধর্ম্মিষ্ঠ রাজাকে সিংহাসন দান করে তা হলে ভগবান আবার প্রসন্ন হবেন, দেশ আবার মুক্তিলাভ করবে।

রাজা

তা হলে একজন ধর্ম্মিষ্ঠ রাজার সন্ধান আমায় বল। দাও একজন সন্ন্যাসীকে—না হয় একটি নিষ্কলঙ্ক বালককে সিংহাসনে বসিয়ে দাও; এবারকার যুদ্ধের সকল ভার তোমার হাতে মোহান্ত মহারাজ।

মোহান্ত

তা কখনো হতে পারে না। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী যুদ্ধের ভার নিতে পারে না। যুদ্ধের নির্ভর ন্যায়নিষ্ঠ রাজার তলোয়ারের উপর। বৎসগণ! তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিষ্কলঙ্ক এবং ধর্ম্মিষ্ঠ কে? তোমরা কাকে সবচেয়ে নিষ্কলঙ্ক মনে কর? বল অসঙ্কোচে আমায় বল।

প্রথম সন্ন্যাসী

পাপে আমাদের জন্ম, পাপই আমাদের কর্ম্ম ! গুরুদেব, আমি নিষ্কলঙ্ক নই।

দ্বিতীয় সন্ন্যাসী

পাপোঽহম্ পাপকর্ম্মাহম্ পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ ! গুরুদেব আমিও নিষ্পাপ নই।

তৃতীয় সন্ন্যাসী

ঠাকুর, আমরা সবাই পাপে অন্তর্বিদ্ধ, কেউ শুদ্ধসত্ত্ব নই।

মোহান্ত

বৎসগণ ! আমার চিত্তও যে অতি শুদ্ধ এমন কথা আমি জোর করে বল্‌তে পারি না। মানুষের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব নেই বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। বড় সহজে বড় শীঘ্র আমরা শৈশবের সত্য জ্ঞান এবং পুণ্য শুচিতা হতে ভ্রষ্ট হয়ে বয়স্ক লোকের প্রগল্‌ভ মূঢ়তার মধ্যে মগ্ন হয়ে যাই। শিশুরাই বাস্তবিক জ্ঞানী। ওরা খেলার ছলে ধূলা মাখে। তাতে ধূলাই উজ্জ্বল হয়, ওরা নিষ্কলঙ্ক থাকে। আর আমরা বাহিরের ধূলা যথাসাধ্য বর্জ্জন করেও পাপের ধূলা মেখে পঙ্কিল হই। আমি বেশ বুঝতে পার্‌ছি, ঠিক্ দেখতে পাচ্ছি—এই নিষ্কলঙ্ক শিশুদের ভিতর থেকেই এবার আমাদের রাজা নির্ব্বাচন কর্‌তে হবে। বল বৎসগণ, তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে নিষ্কলঙ্ক। বল।

বালকগণ (সমস্বরে)

গোত্রপাবন ! গোত্রপাবন !

মোহান্ত

গোত্রপাবন ! যে সকলের ছোট ! যে সকলের পরিচর্য্যা করে বেড়ায় ? ঠিক্ হয়েছে। ঠিক্ বলেছ তোমরা। সকলের নীচে যার জায়গা মহোচ্চপদ তো কেবল তারই জন্যে সৃষ্টি হয়েছে। রাজমুকুট ত তাকেই সাজে। গোত্রপাবন, তুমি এদেশের রাজা হবে ?

গোত্রপাবন

রাজা ? আমি যে ছেলেমানুষ। আমার যে খুব জোর নেই।

মোহান্ত

এস বৎস, আমার কাছে এস। (গোত্রপাবন কাছে গেল) বৎস ! আমরা তোমায় মানুষ করেছি, আমরা তোমায় শিক্ষা দিয়েছি, তুমি আমাদের কথা রাখবে না ?

গোত্রপাবন

অবাধ্য হতে নেই, আমি অবাধ্য হব না।

মোহান্ত

লড়ায়ে গিয়ে কি তুমি ভয় পাবে ? ফিরে আস্‌তে চাবে ?

গোত্রপাবন

রাজারা যা করে আমি তাই কর্‌ব।

মোহান্ত

দেখ বাবা, যুদ্ধের ব্যাপারে গেলে কিছুরই ঠিক্ নেই। এতে মানুষ মারাও পড়ে।

গোত্রপাবন

ভগবানের যদি তাই ইচ্ছা হয় তাই পড়ব। তাতে আর ভয় কি ?

মোহান্ত

দেখ, দেখ, আমি ত গোড়াতেই বলেছি অল্প যাদের বয়েস মরণকে তারা কিছুমাত্র ভয় করে না। ওরা যেন মৃত্যুকে সন্ধান করে বেড়াচ্ছে। শীকারের জন্তুর মত মৃত্যুকে তাড়া ক'রে ফির্‌ছে। বুড়োরা জীবনকে যক্ষের মতন আঁকড়ে বসে থাকে আর ছেলেরা তা নিয়ে এমনি কাণ্ড করে যেন দেউলে হবার ভয় নেই। আমরা যা এড়িয়ে যেতে চাই, ওরা তাকেই তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। এই দুধের ছেলে, রুদ্র দেবতার ভীষণ-মধুর আহ্বান এ শুনেছে। সে আহ্বান এর কানে পৌঁছেছে। ওগো দূত ! ওগো মৃত্যু ! তোমার দাবী এবার পূর্ণ হবে। আমার এই স্বহস্ত-পালিত স্নেহের পুতুলটিকে অকুণ্ঠিত চিত্তে তোমার হাতে আজ সঁপে দিলাম।

রাজা

ঠাকুর, আমার কর্ত্তব্য আমিই করব। আমার জন্যে যে যুদ্ধের উদ্যম সে যুদ্ধে মরতে হয় ত আমিই মরব। আমার জন্যে শিশু-হত্যা হতে দেবো না।

মোহান্ত

রাজা ! তোমার তলোয়ার তুমি আমায় দিয়েছ, আমি সে তলোয়ার এই শিশুর হাতে সমর্পণ করেছি। যুদ্ধের মর্ম্মস্থল হ'তে যে তীব্র-মধুর আহ্বান এসেছে তার মনোহারিত্ব বিধাতা কেবল এই বালককেই জানিয়েছেন।

গোত্রপাবন

মহারাজ ! তুমি আমায় বারণ কোরো না। আমি

গুরুদেবের অবাধ্য হতে পারব না। আমি ছেলেমানুষ, তা হলেও আমি তোমার ঝাঁণ্ডা-নিশান নীচু হতে দেবো না। আর যুদ্ধের পর তোমার এই তলোয়ার তোমার হাতেই ফিরিয়ে দেবো। আমি যেন তোমার বালক-বেতাল। তুমি ক্লান্ত হয়ে ঘুমুবে, আমি সারাদিন তোমার শিয়রে চৌকি দেবো। কিন্তু রাত্রিবেলা আমি আজ ঘুমুবো, তুমি আজ পাহারা দিয়ো।

রাজা

মনস্তাপ! মনস্তাপ!

গোত্রপাবন

কাল রাত্রিবেলায় তুমি রাত জেগে ঘুটঘুটে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে পল্টন নিয়ে যাচ্ছিলে, আমরা ঘুমুচ্ছিলাম। তুমি অনেক রাত জেগেছ, লড়ায়ের সাজে অনেক কুচ্‌কাওয়াজ করেছ। আমি বেশী রাত জাগব না, বেশী কুচ্‌কাওয়াজ করব না, শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর সেরে ফেলব।

মোহান্ত

মহারাজ, শিশুর কথা আপনাকে রাখতে হবে। আমি বলছি—এ বিধাতার ইঙ্গিত, এ দৈববাণী।

রাজা

আমি তোমার বিধাতার বিধি-বিধান কিছু যে বুঝতে পারিনে ঠাকুর।

মোহান্ত

তাঁর বিধান কে বুঝবে? তাঁর বিধান বোঝবার নয়, মেনে নেবার। এই শিশু তাঁকে প্রাণ দিয়ে মান্‌তে জানে। আর সেই জন্যেই একে দিয়ে তিনি মহৎ কাজ করাবেন। রাজা! এ বিষয়ে তুমি দ্বিধা করলে চল্‌বে না। বিধাতার বিধান—এ তোমাকে মাথা পেতে নিতে হবে, মেনে নিতে হবে।

রাজা

নিলাম, ওগো মেনে নিলাম। হায় দুর্ভাগ্য! এত বড় যুদ্ধে এত লোকের জীবন গেল, আমার মৃত্যু হল না!

মোহান্ত

ছেলেটির পুরাণো পোষাক ছাড়িয়ে ওকে রাজার সাজে সাজিয়ে দাও।

(ঐরূপ করা হইল; গায়ে অঙ্গত্রাণ ও পায়ে উপানৎ পরানো হইল)

দাও, উত্তরীয় গায়ে দিয়ে দাও, মাথায় মুকুট দাও।

(রাজা নিজের মুকুট ও উত্তরীয় বালককে পরাইয়া দিলেন। ঢাল-বর্দ্দার ঢাল উঁচু করিয়া ধরিল। বালকের বাম বাহুতে ঢাল সংন্যস্ত হইল। মাটি হইতে তলোয়ার তুলিয়া লইয়া রাজা উহার কটিদেশে বাঁধিয়া দিলেন। তলোয়ার কোষমুক্ত করিয়া বালক উহা দক্ষিণহস্তে ধারণ করিল)

ভগবানের কৃপায় এই তলোয়ার জয়যুক্ত হোক্।

যোদ্ধ্‌গণ

তলোয়ার জয়ী হোক্!

মোহান্ত

আমি ভগবান্‌কে সাক্ষী করে এই বালককে রাজা বলে স্বীকার করছি। আজকের যুদ্ধের জয়ের ভার এরই হাতে রইল।

রাজা (বালকের সম্মুখে নতজানু হইয়া)

বালক, আমি তোমাকে রাজা বলে স্বীকার করছি। আজকের যুদ্ধে একা তোমার উপরেই নির্ভর।

সকলে (নতজানু হইয়া)

রাজা, আমরা তোমায় স্বীকার করছি। আজকের যুদ্ধে তুমিই একমাত্র ভরসা।

গোত্রপাবন

আজকের যুদ্ধে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব এই আমার প্রতিজ্ঞা। ভগবান আমার সাক্ষী।

মোহান্ত

রাজা! রাজা! তুমি এইবার যুদ্ধের দিকে মুখ ফেরাও। যুদ্ধের অভিমুখে দাঁড়াও।

গোত্রপাবন (নতজানু হইয়া)

ঠাকুর, আমায় আশীর্ব্বাদ করুন।

মোহান্ত

জয়ী হও বৎস, এই আমার আশীর্ব্বাদ!

যোদ্ধ্‌গণ (সমস্বরে)

জয়ী হও রাজা! যুদ্ধে জয়ী হও!

(গোত্রপাবন যোদ্ধ্‌গণের সহিত যুদ্ধ-ক্ষেত্রের অভিমুখে চলিয়া গেল। সকলে উহাদের দিকে উৎসুকভাবে তাকাইয়া রহিল)

মোহান্ত

রাজা! আমার শ্রেষ্ঠরত্ন আমি আজ তোমাদের মঙ্গলের জন্যে সমর্পণ করলুম। ছেলেটি আমাদের ভারি প্রিয় ছিল।

রাজা

মোহান্ত মহারাজ ! আমার সামন্ত রাজাদের কাছ থেকেও আমি কখনো এমন মূল্যবান জিনিষ উপহার পাইনি।

প্রথম সন্ন্যাসী

পৌচেছে—কেল্লার ময়দানে পৌচেছে ! ভগবানের কাছে জয়কামনা ছাড়া এখন আর আমাদের অন্য কাজ নেই।

মোহান্ত

ভগবান ! শক্তিমূর্ত্তি ভগবান ! এই বালকের বাহুতে শক্তিসঞ্চার কর, ওর জানু জঙ্ঘা দৃঢ়তর করে দাও, ওর তলোয়ার খরধার হোক্। বালকের অন্তরের স্বাভাবিক পবিত্রতা ওর সৎসাহসকে উদ্দীপিত করুক ! ওর শান্তশীলতা ওর চিত্তকে প্রশান্ত রাখুক, প্রফুল্ল রাখুক। দৈবী সেনা ওকে ঘিরে থাকুক, ওকে জয়ী করুক ! হে ভগবান ! শক্তি দাও, বালককে জয়ী কর !

সন্ন্যাসী ও বালকগণ

শক্তি দাও ! জয়ী কর ! স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি !

মোহান্ত

হে সর্ব্বশক্তিমান ! এই নিষ্কলঙ্ক বালকের তলোয়ার যেন এই জনপদের উদ্ধারের হেতু হয়।

রাজা

হে ভগবান ! হে দেবতা ! যুদ্ধ হতে শিশুটিকে নিরাপদে অক্ষত শরীরে ফিরিয়ে দাও !

মোহান্ত

মহারাজ, স্বাধীনতা সস্তায় পাবার জিনিস নয়। ওর জন্যে অনেক দাম দিতে হয়, যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করতে হয়।

(তূর্য্যধ্বনি)

যাও, যাও, প্রাচীরের উপর কেউ যাও, ব্যাপার কি বল।

(প্রথম ও দ্বিতীয় সন্ন্যাসী প্রাচীরের উপর উঠিল।)

প্রথম সন্ন্যাসী

দুইদল একেবারে মুখোমুখি হয়ে লড়ছে, আমাদের বালক-রাজা পল্টনের আগে আগে ফিরছে, দেবসেনার উজ্জ্বল ছটা ওকে যেন দুর্নিরীক্ষ্য করে রেখেছে।

দ্বিতীয় সন্ন্যাসী

ইস্ ! বিপক্ষ পল্টন ভয়ঙ্কর বেগে বালক-রাজাকে যেন গ্রাস করতে আসছে !

প্রথম সন্ন্যাসী

দুইদল একেবারে সাম্‌নাসাম্‌নি !

দ্বিতীয় সন্ন্যাসী

দস্তুরমত লড়াই বেধেছে—কী ভয়ঙ্কর লড়াই !

প্রথম সন্ন্যাসী

একি !—আমাদের সেনা ভঙ্গ দিচ্ছে।

দ্বিতীয় সন্ন্যাসী

অমন কথা মুখে এনো না।

প্রথম সন্ন্যাসী

হায়, হায় ! দুর্ভাগ্য !—ভঙ্গ দিচ্ছে।

দ্বিতীয় সন্ন্যাসী

বালক-রাজা রুখে এগোচ্ছে !

প্রথম সন্ন্যাসী

ও কি যমের মুখের ভিতরে প্রবেশ করতে চায় !

দ্বিতীয় সন্ন্যাসী

হাঁ, হাঁ, একেবারে মৃত্যুর মাঝখানে।

সন্ন্যাসী ও বালকগণ

জয়ী হও মহারাজ—জয়ী হও !

দ্বিতীয় সন্ন্যাসী

ভয়ঙ্কর লড়ছে এইবার।

প্রথম সন্ন্যাসী

ময়দানের মাঝখানে যেন দুই সমুদ্রে ধাকাধাক্কি চল্‌ছে।

দ্বিতীয় সন্ন্যাসী

দুই ক্রুদ্ধ সমুদ্রের সংগ্রাম !

প্রথম সন্ন্যাসী

একটা সমুদ্র হটে যাচ্ছে, আর-একটা যেন গিল্‌তে আস্‌ছে।

দ্বিতীয় সন্ন্যাসী

হটে যাচ্ছে—শত্রুরা হটে যাচ্ছে !

প্রথম সন্ন্যাসী

আমাদের বালক-রাজা শত্রুপল্টনের ভিতর দিয়ে ঘোড়া চালিয়েছে—তীরের মত একেবারে ফেড়ে চলেছে।

দ্বিতীয় সন্ন্যাসী

চড়ুই পাখীর ঝাঁক ভেদ করে শ্যেনপক্ষীর মত চলেছে।

প্রথম সন্ন্যাসী

ভেড়ার পালের মধ্যে বাঘের মত চলেছে।

দ্বিতীয় সন্ন্যাসী

ঝরণার মত পাথর চিরে চলেছে।

প্রথম সন্ন্যাসী

যে দিকে যাচ্ছে সে দিক সমভূম করে যাচ্ছে। জিতেছে—জিতেছে,—আমাদের বালক-রাজা জিতেছে!

দ্বিতীয় সন্ন্যাসী

ভয়ানক কোলাহল! যে দিকে রাজা চলেছে সেই দিকেই কোলাহল। জিতেছে—জিতেছে!

প্রথম সন্ন্যাসী

মরি মরি! মহামারীর মাঝখানে আমাদের বালক-রাজার সোনার মুকুট জ্বলজ্বল করছে; ওর উজ্জ্বল তলোয়ার ক্রমাগত ঝক্‌মক্ করছে, উঠছে আর পড়ছে!—জিতেছে—জিতেছে—রাজা আমাদের জিতেছে!

দ্বিতীয় সন্ন্যাসী

শত্রু পালাচ্ছে—শত্রুপল্টন পালাচ্ছে। হেরে গিয়ে কুকুরের মত পালাচ্ছে।

প্রথম সন্ন্যাসী

পালাচ্ছে—মার খেয়ে পালাচ্ছে—মহামৃত্যুর রাঙা রাস্তা ধরে পালাচ্ছে। জয়ধ্বনি কর—সবাই জয়ধ্বনি কর—এ কি? এ কি? কি সর্ব্বনাশ!

দ্বিতীয় সন্ন্যাসী

কি হল—অ্যাঁ কি হল?

প্রথম সন্ন্যাসী

দুর্ভাগ্য—দুর্ভাগ্য!

মোহান্ত

কি—কি!

প্রথম সন্ন্যাসী

বালক ঘোড়া থেকে পড়ে গেছে, আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

মোহান্ত

জয় হয়েছে ত? জয় হয়েছে ত?

প্রথম সন্ন্যাসী

হয়েছে, কিন্তু নিজে বেচারা ঘোড়া থেকে পড়ে গেছে, আর তার সোনার মুকুট দেখতে পাচ্ছিনে, তলোয়ারও আর ঝল্‌সে উঠছে না। মনস্তাপ—মনস্তাপ! অচেতন অবস্থায় তাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহন করে নিয়ে আস্‌ছে।

মোহান্ত

শত্রুপল্টন পালাচ্ছে?

দ্বিতীয় সন্ন্যাসী

হাঁ পালাচ্ছে। আমাদের পল্টন তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে—তাই পালাচ্ছে, ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে, কুয়াশার মত মিলিয়ে যাচ্ছে, আর ওদের দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে না।

মোহান্ত

ভগবানের কৃপা—ভগবানের কৃপা! (নেপথ্যে ক্রন্দন-ধ্বনি) রুদ্র! তুমি যা চেয়েছ তা ত দিলাম! তোমার আহ্বান ব্যর্থ হয় নি, আমাদের সকলের স্নেহের জিনিস তোমার চরণে আজ বলি দিয়েছি।

দ্বিতীয় সন্ন্যাসী

আহা—ছেলেটির মৃতদেহ নিয়ে আস্‌ছে।

রাজা

বালক বলেছিল—আজ রাত্রে সে ঘুমবে আমাকে পাহারায় থাক্‌তে হবে।

(যোদ্ধৃগণ গোত্রপাবনের দেহ বহন করিয়া আনিল ও শবাধার মাঝখানে রাখিল)

রাজা

আমার তলোয়ার ফিরিয়ে এনেছে, বালক আমার ঝাণ্ডা-নিশান নীচু হতে দেয়নি!

মোহান্ত

(শবাধার হইতে তলোয়ার তুলিয়া) নাও মহারাজ, তোমার তলোয়ার নাও!

রাজা

যে আজ তলোয়ারের মর্য্যাদা রেখেছে তলোয়ার তারই কাছে থাক্—রাজাকে যে তলোয়ার সঙ্গে নিয়ে ঘুমতে হয়! আর এই বালকই ত আমাদের সত্য সত্য রাজা—পরাক্রম-শালী রাজা।

(তলোয়ার লইয়া শবাধারে রাখিলেন এবং নতজানু হইলেন)

হে মৃত! হে রাজা! আমি তোমায় রাজপূজা দিচ্ছি; আমি তোমার শুভ্র ললাট সসম্ভ্রমে চুম্বন করছি; তোমারই পবিত্রতায় আজ আমার প্রজাপুঞ্জ মুক্তিলাভ করেছে!

(গোত্রপাবনের শিরশ্চুম্বন করিলেন। সকলে নীরবে কাঁদিতে লাগিল)

মোহান্ত

এ ছেলের জন্যে কাঁদতে নেই, কারণ এ আমাদের মুক্তি-দাতা! তোমরা সকলে আমাদের যুদ্ধে-মৃত বালক-রাজার জয়ধ্বনি কর,—এর আত্মার কল্যাণ-কামনায় ভগবানের নাম স্মরণ কর!

(সকলে শবাধার উঠাইল)

সকলে (গান)

ভগবান! তব পায়—
সঁপি তায়, সে ঘুমায়!
তব জয়! প্রেমময়!
দয়াময়! তব জয়!

(যবনিকা)*

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

সেখ আন্দু

(১৬)

যথাসময়ে আন্দু সেকেন্দ্রাবাদে পণ্ডিতজীর বাটীতে আসিয়া পৌছিল। হাইদ্রাবাদের আত্মীয়কে পত্র লিখিয়া পত্রের উত্তরের প্রতীক্ষায় পণ্ডিতজীর নারীসংসর্গশূন্য বহিঃপ্রকোষ্ঠে আন্দু আশ্রয় লইল। আন্দু পণ্ডিতজীর শান্তিময় সাহচর্য্যে আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিল।

কয়েকদিন অতিবাহিত হইল, পত্রের উত্তরের সময় বহিয়া গেল। পণ্ডিতজী পুনরায় তাঁহাকে পত্র লিখিলেন। ইতিমধ্যে প্রতিবেশীবর্গ সকলেই আন্দুর পরিচিত হইয়া উঠিল এবং সহরের রাস্তাঘাটগুলোর নূতনত্ব ঘুচিয়া গেল। কর্ম্মহীন সময় কাটান আন্দুর পক্ষে ক্রমশঃ অসহ্য হইয়া উঠিল।

কাজের লোকের কাজ না থাকিলে মাথায় নানান খেয়াল আসিয়া জুটে, নানা উপসর্গ মানুষকে চাপিয়া ধরে। স্বাভাবিক কর্ম্মপ্রবৃত্তি রীতিমত খোরাক না পাইলেই নির্জ্জীব হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকূল বৃত্তিগুলিও মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিবে। এবং একবার তাহাদের কবলিত হইলে আর মুক্তি নাই। জন্মজন্মান্তর ধরিয়া নাকি তাহার জের চলিতে শুনা যায়। আন্দু আলস্যের অবসাদে পরের গলগ্রহ হইয়া দিব্য আরামে অবনতির দিকে ঝুঁকিতে বুঝি উদ্যত হইয়াছে,—এমনি একটা দুশ্চিন্তা হঠাৎ আন্দুর মাথায় জাগিল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় কতকগুলো ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে আবার একটা নূতন কল্পনা মাথায় উদয় হইতেই আন্দু পণ্ডিতজীর কাছে অকস্মাৎ প্রস্তাব করিয়া বসিল, "আমায় সংস্কৃত শেখাতে হবে।"

পণ্ডিতজী তখন শঙ্করাচার্য্যের মণিরত্নমালা লইয়া নাড়া-চাড়া করিতেছিলেন, আন্দুর প্রস্তাবে মুহূর্ত্তের জন্য কৌতুক-বিস্মিত দৃষ্টি তুলিয়া তাহার পানে চাহিলেন, তার পর হাসিয়া বলিলেন "বেশ ত। শিক্ষার আবার শেষ কোথা?—জন্ম হতে মৃত্যু পর্য্যন্ত শিক্ষার সময়, তুমি স্বচ্ছন্দে শিখতে আরম্ভ কর।"

পরদিন হইতে আন্দু শিখিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সে শিখিতে বসিল, কিম্বা শিক্ষা তাহাকে গড়িতে বসিল সেকথা বলা কঠিন। এমনি অখণ্ড মনোযোগ প্রবল উদ্যমে সে শিক্ষার মধ্যে ডুব দিল, যে, আহারনিদ্রার জন্যও তাহার ধ্যানভঙ্গ দুরূহ হইয়া উঠিল। রন্ধনাদি নিজ হাতে করিতে চিত্তবিক্ষেপ জন্মে বলিয়া নিকটস্থ হোটেলে দিনের আহারের ব্যবস্থা করিয়া লইল। রাত্রে পড়াশুনার ব্যাঘাত হয় বলিয়া অনাহারই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিল, কিন্তু পণ্ডিতজীর তাড়নায় কিঞ্চিৎ জলযোগে শেষে বাধ্য হইতে হইত। এরূপে শিক্ষা চলিল, ওদিকে হস্তও রিক্ত হইয়া আসিল। আন্দুর আবার ভাবনা ধরিল।

পণ্ডিতজীর অমায়িক উদার শ্রদ্ধা আন্দুর উপর দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল। অধ্যয়নে আন্দুর ব্যগ্র উৎসাহ দেখিয়া তিনি প্রায়ই বলিতেন, "তুমি বড় বেশী ঝোঁকাল লোক। তুমি খুব সাবধানে থাক্‌বে, যদি জীবনে উন্নতির পথে যাও তো মহাউন্নতি লাভ করবে, কিন্তু যদি মন্দর দিকে নামো তো সর্ব্বনাশের বাকী রাখবে না।—তোমার মনেরি তেজ বড় প্রবল, খুব সাবধান।"

আন্দু হাসিত। পণ্ডিতজীকে "পণ্ডিতজী" বলিয়া ডাকিলে তিনি প্রতিবাদ করিয়া পরিহাস করিতেন,

---

*The King : A Morality. Translated from the Irish of P. H. Pearse.

বলিতেন "পণ্ডিত পণ্ডিত কয়ে আমায় যে মূর্খ করে তুলছ!—"

পাড়ার সকলে এই সদানন্দ মহাশয় বৃদ্ধকে "দাদাজী" বলিয়া ডাকিত, তাই আন্দুও দাদাজী বলিতে আরম্ভ করিল।

(১৭)

নিরন্তর লেখাপড়ার পরিশ্রমের অবসাদে প্রতিবাসীগণের ফরমাস খাটিয়া গল্পবাজ যুবকদের সহিত ব্যায়ামের ব্যর্থচেষ্টা করিয়া, আন্দু নির্জ্জন মাঠে বা স্তূপপৃষ্ঠে ছুটাছুটি লাফালাফি দ্বারা শ্রান্তি অপনোদন করিত। বৃদ্ধ দাদাজী অনেক সাহায্য করিতেছেন, কিন্তু নিজের খাওয়াপরার খরচটা নিজেকে সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে বৈকি। আন্দু দাদাজীর অজ্ঞাতে কাছাকাছি একটা চাকরীর যোগাড় দেখিতে সচেষ্ট হইল।

সেদিন বিকালবেলা যখন দাদাজীর কাছে পাড়ার একটি দরিদ্র বিধবার পুত্র স্কুলে প্রমোশন পাওয়ার সংবাদ সহ তাহার পাঠ্য পুস্তকগুলি কিনিয়া দিবার জন্য ছলছল নেত্রে অনুনয় করিতেছিল, তখন নিকটস্থ আন্দুর চিত্ত অকস্মাৎ কেমন বিকল হইয়া উঠিল। নিজের মধ্যে অক্ষম দৌর্ব্বল্য অনুভব করিয়া সে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। চারিদিকে এত দারিদ্র্য, এমন অসহ্য অভাব,—আর সে পরিশ্রমী উপার্জ্জনক্ষম হইয়াও এই বলিষ্ঠ দেহকে, সূক্ষ্ম জ্ঞানচর্চ্চায় অযথা আবদ্ধ রাখিয়া, একি আত্মবাসনার পূজা করিতে বসিয়াছে। না না, উপার্জ্জন চাই, উপার্জ্জন চাই, চারিদিকের এত দরিদ্রতার মধ্যে সে যদি আপনার পরিশ্রমকে বিক্রয় করিয়া একটি কপর্দ্দক সংগ্রহ করিতে পারে—নিজের বক্ষের রক্ত খরচ করিয়া একজন ক্ষুধিতের ক্ষুধা মুহূর্ত্তের জন্য শান্ত করিতে পারে, তাহা হইলে যথেষ্ট,—তাহাই ঢের!—না, সে আপনার কর্ত্তব্য প্রাণপণে পালন করিবে। ভগবান তাহার সকল বন্ধন সকল দিক হইতে ছেদন করিয়া তাহাকে সকলের জন্য বিশ্বে ছাড়িয়া দিয়াছেন। নিজের কৌতূহলকে কেন্দ্র করিয়া অনির্দ্দিষ্ট ভাবে পৃথিবীর বক্ষে খেলা করিয়া বেড়াইলে চলিবে না, খাটিতে হইবে,—খাটিতে হইবে, চতুর্দ্দিকে অসংখ্য সাহায্যপ্রার্থী তাহার কর্ম্মঠ হস্ত দুইটির কাছে কিছু-না-কিছু প্রার্থনা করিতেছেই করিতেছে। সে কি স্বভাবের দাবী হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র বদ্ধ করিয়া গড়িতে বসিয়াছে!—চুলোয় যাউক তাহার ক্ষুদ্র আগ্রহ!—সে আপনাকে পরের জন্য ছাড়িয়া পরের করিয়া পরের জন্য সর্ব্বস্ব বিলাইয়া নিজের নীচত্বের শুদ্ধি সংস্কার করিয়া লইবে। আন্দু অকস্মাৎ সবেগে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

রাস্তার ধারে একটি বড়লোকের বাড়ীর দাসী-পুত্র ছয় বৎসর বয়স্ক বালক কোথা হইতে একমুঠা কিস্‌মিস্ সংগ্রহ করিয়া খাইতে খাইতে আসিতেছিল; দৈবক্রমে হুঁচট্ খাওয়াতে রাস্তার পাশে খাদের মধ্যে কিস্‌মিস্‌গুলি ছড়াইয়া পড়িয়া গেল। বালকটি আকুল ক্রন্দনে অধীর হইয়া উঠিল। ঠিক সেই সময় আন্দুও সেখানে আসিয়া পড়িল।

অন্য সময় হইলে সে হয়ত অন্য খাদ্যে বালকের ক্ষোভ দূর করিত, কিন্তু আজ সে নিজেই ক্ষুব্ধ; কাজেই বালককে আশ্বাস দিয়া তৎক্ষণাৎ সেই আবদ্ধ গভীর, জঞ্জাল-কণ্টকাকীর্ণ খাদে অবতরণ করিয়া সযত্নে বালকের কিস্‌মিস্ কটি খুঁটিয়া খুঁটিয়া কুড়াইয়া দিল। বালক খুসী হইয়া চক্ষু মুছিয়া কিস্‌মিস্ ধুইয়া লইতে ছুটিল।

আন্দু ঘাটে গিয়া হাত পা ধুইয়া উঠিতেছে, এমন সময় হাজা হাত পায়ে চূন সুর্‌কি মাখিয়া রাজমিস্ত্রীর দল হাত-পা ধুইতে ঘাটে নামিল। দলে ছাপ্পান্ন বৎসরের বৃদ্ধ হইতে তের চৌদ্দ বৎসরের বালক অবধি সকল বয়সের লোকই ছিল। তাহাদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আন্দু ভাবিল ইহারা সকলেই কাজের লোক; কিন্তু সে? একেবারে নিষ্কর্ম্মা।

দলের মধ্য হইতে একটি বলিষ্ঠকায় যুবা, আন্দুর বলিষ্ঠ পেশীপূর্ণ গৌরসুন্দর দেহটির পানে ঘন ঘন মুগ্ধ নয়নে চাহিতেছিল। তাহার চাহনি দেখিয়া আন্দু অত্যন্ত ব্যগ্রতার সহিত তাহার সহিত আলাপ করিয়া ফেলিল। যুবাটির নাম মহম্মদ খাঁ। বয়সে নবীন হইলেও সেই লোকটাই দলের সর্দ্দার। আন্দু তাহার কঠিন হস্তটা দুই হাতে মুঠাইয়া ধরিয়া অত্যন্ত আবেগের সহিত নিজের বক্ষের কাছে টানিয়া ধরিল, মনে মনে ভাবিল, ইহারই জোরে লোকটা ঐ ছাপ্পান্ন বৎসরের বৃদ্ধের উপর ক্ষমতা

চালনার অধিকার পাইয়াছে।—আর সে?—তাহাকেও তো ভগবান পর্য্যাপ্ত ক্ষমতা দিয়া জগতে পাঠাইয়াছেন, তবে সে কি দুঃখে এমন অপর্য্যাপ্ত অক্ষমতার মধ্যে ডুব দিয়া সকলকে ফাঁকি দিয়া নিজেও ফাঁকে পড়িতেছে।

দলের অপর সকলে যখন হাস্যপরিহাসে পরস্পরের ত্রুটি উল্লেখে পরস্পরকে বিদ্রূপ করিতেছিল, তখন সর্দ্দারের সহিত আন্দু ঠিকানা বদল করিয়া আলাপপরিচয় পাকা-পাকি করিয়া তাহার কাছে বিদায় লইয়া বেড়াইতে বাহির হইল। বৃষ্টিস্নাত পৃথিবীর উপর তীব্রোজ্জ্বল সূর্য্যালোক যেমন গভীর আবেগে হাসিতে থাকে, আন্দুর চিত্তটাও তেমনি এই সামান্য লোকটার সামান্য পরিচয়ে তৃপ্ত আশান্বিত হইয়া উঠিল। সূক্ষ্ম আঘাতে তাহার মন যেমন গভীরভাবে আহত হইত—সূক্ষ্ম আশ্বাসেও তেমনি পরিপূর্ণ-রূপে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিত।

সেখান হইতে আসিয়া নানাকথা ভাবিতে ভাবিতে এমনি দ্রুতপদে পথাতিবাহন করিয়া চলিল, যেন কি বিশেষ প্রয়োজন আছে, কতদূরে যে আসিয়া পড়িল ঠিক নাই। দুহাতের আঙুল পরস্পর সংলগ্ন করিয়া সবেগে ঘষিতে ঘষিতে রাস্তার মোড়ের প্রান্তে এক বাগিচার কাছে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। ঠিক রাস্তার কোণেই একটি নারিকেল-গাছের তলায় কয়েকজন বলিষ্ঠাকৃতি ইতর শ্রেণীর লোক কি কথা লইয়া তর্কবিতর্ক করিতেছিল। সকলের চেয়ে লম্বাগোছের লোকটা দা দিয়া নারিকেল গাছের গায়ে খাঁক কাটিতে কাটিতে মাথা নাড়িয়া বলিতেছে, "সো হাম নেহি সেকেঙ্গে। ঝুমুয়া উঠ।"

ঝুমুয়া প্রতিবাদ করিয়া জানাইল সে কখনো গাছে উঠে নাই, এবং গোঁয়ারতুমি করিয়া গাছে উঠিয়া জীবনটা নষ্ট করিতে সে নারাজ। তৃতীয় ব্যক্তি একটু বর্দ্ধিষ্ণু গোছের চেহারার লোক, কাজেই গম্ভীর বদনে তাহাদের ঝুটা কাজিয়া বাদ দিয়া গাছে উঠিতে আদেশ দিল।

ঝুটা কাজিয়ার অপবাদে লম্বাকৃতি লোকটা চটিয়া বলিল, উপদেশ রাখিয়া সে ব্যক্তি যদি সদৃষ্টান্তের দ্বারা শিক্ষা দেয় তাহা হইলেই গাছে-উঠা-ব্যাপারটা তাহাদের বিশেষরূপে বোধগম্য হইবে।

কৌতূহলী আন্দু অগ্রসর হইয়া বলিল "ক্যা হুয়া জী?"

তাহারা গাছে উঠিয়া ডাব পাড়িবার সমস্যাবার্তা সবিশেষ নিবেদন করিলে, আন্দু তৎক্ষণাৎ মালকোঁচা মারিয়া হাঁটুর কাপড় গুটাইয়া, নিজেই গাছে উঠিতে উদ্যত হইল। দৃঢ়বদ্ধ কটিবস্ত্রে দা আট্‌কাইয়া, লোকগুলার সন্দেহ ও বিস্ময়, অবজ্ঞা করিয়া, সুদক্ষ আরোহীর মত অক্লেশে গাছে উঠিয়া পড়িল। অর্থের অভাব, সংস্কৃত ব্যাকরণের কৃৎতদ্ধিত, অধিক কি সদ্যপরিচিত রাজ-মিস্ত্রীটির কথা অবধি, কিছুই আর মনে রহিল না, তড়তড় করিয়া সে গাছের মাথায় উপস্থিত হইল।

এ-সব দেশে নারিকেল-গাছ দুষ্প্রাপ্য। বাগিচাস্বামী বিশেষ সখ করিয়াই এই গাছক'টি আনাইয়া এখানে রোপণ করিয়াছেন, এ-সব দেশের লোক কাজেই নারিকেল-গাছের তত্ত্ব সবিশেষ অবগত নহে। আন্দুও অভিজ্ঞ নহে, একথা অবশ্য আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য, তবে সে কলিকাতায় থাকিবার সময় মাঝে মাঝে নিকটস্থ পল্লী-অঞ্চলে বেড়াইতে গিয়া, এইসব উদ্ভিদতত্ত্ব স্বচক্ষে কিছু কিছু দেখিয়াছিল মাত্র। আজ সেই বিস্মৃতপ্রায় স্মৃতি, অভাবের ক্ষেপে, সাহসের ঠেলায় সজীব হইয়া, তাহার কার্য্যোদ্ধারের সহায়তা করিল।

বাল্‌দোর উপর ভর রাখিয়া দা'য়ের সজোর আঘাতে ডাব কাটিয়া, ঝুপঝাপ করিয়া আন্দু ফেলিয়া দিতে লাগিল। চাকর তিনটি কুড়াইয়া লইয়া, বাগিচার ওদিকে প্রভুর বাটীর অন্তঃপুরে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতে লাগিল।

যথেষ্ট ডাব পাড়া হইলে, আন্দু দা ফেলিয়া গাছ হইতে নামিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় দূরে, হঠাৎ ভয়ানক কলরব উঠিল। আন্দু গাছের উপর হইতেই তীক্ষ্ণদৃষ্টি যথাসাধ্য বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়া দেখিল, দূরবর্ত্তী রাস্তার দিকে কোলাহল; ওদিকের রাস্তা হইতে লোকগুলা যে যেদিকে পারিতেছে পলায়ন করিতেছে, সকলেরই ভয়-ব্যাকুলিত ঊর্দ্ধশ্বাসের প্রবলবিক্রমলাঞ্ছিত মূর্ত্তি! ক্ষণপরেই দেখিতে পাওয়া গেল, এক প্রকাণ্ড শাদা ধবধবে অশ্ব রাশ ছিঁড়িয়া আরোহীপৃষ্ঠে উন্মত্ত বেগে ছুটিয়া আসি-তেছে। পিছনে দশ বারো জন বলবান লোক হল্লা করিয়া ঘোড়াটাকে অতিকতর ক্ষিপ্ত করিয়া ছুটিয়া

আসিতেছে। অশ্বারোহী সাহেবটি চীৎকার করিয়া কি বলিতেছেন বুঝিতে পারা গেল না।

আন্দু দৃষ্টিশক্তি সংযত করিয়া উপস্থিত-বুদ্ধিকে বিদ্যুৎ-বেগে সচেতন করিয়া লইল। ধীরে সুস্থে নামিয়া সাহেবের সাহায্য করিতে গেলে, ঘোড়াসুদ্ধ সাহেবটি বহুদূর চলিয়া যাইবে। উপায়?—নির্ম্মম উত্তেজনা নির্ভীক বিক্রমে চকিতে মস্তিষ্কের মাঝে খেলিয়া গেল। ভাবিয়া পুরাপুরি দরদস্তর করিবার অবকাশ রহিল না। আন্দু প্রস্তুত হইল, সাহেবটির সঙ্কট যে আসন্ন।

ঘটিকাযন্ত্রের মুহূর্ত্তের ক্ষুদ্র কাঁটাটি টিক্‌টিক্ করিয়া অবিশ্রাম ক্ষীণ শব্দে নিজের কাজ করিয়া যায়, মিনিটের কাঁটাটিও ততোধিক শান্ত নিস্তব্ধভাবে আপন কাজটি যথারীতি সম্পাদন করে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অলস মন্থর নিতান্ত নিরীহ ধরণের ঐযে ঘণ্টার কাঁটাটি ওটি সকলের চেয়ে নিশ্চিন্ত আকৃতির বস্তু হইলেও ঠিক ঘণ্টার মুহূর্ত্তে সশব্দে আপনার সজীবতার গৌরব দেখাইয়া সঙ্গী দুটিকে নিষ্প্রভ করিয়া দেয়। মানবচরিত্রের বিভিন্ন বৃত্তির সন্দেহ-জনক নীরিহ অস্তিত্বের প্রবল বিকাশও অনেক সময় সেই-রূপ হইয়া থাকে, তবে ভিতরে প্রাণস্পন্দনটি থাকা চাই।

ইতিমধ্যে অশ্বভীতির তাড়নায় সেই জোয়ান লোক তিনটি কোন্ নিরাপদ স্থানে যে অন্তর্হিত হইয়া গেল, আন্দু তাহা মোটেই টের পাইল না। ঘোড়াটা ছুটিয়া গাছের কাছাকাছি রাস্তায় আসিয়া পড়িল। আন্দু চারিদিকে চাহিল, তাহার পর অকস্মাৎ উচ্চ গাছের উপর হইতে সবেগে ভূমে লাফাইয়া পড়িল। অতর্কিতে সাম্‌নে গুরুভার পতনে বিষম চমক খাইয়া, ক্ষিপ্ত অশ্ব সামনের পা উচুঁ করিয়া আরোহীসুদ্ধ সোজা হইয়া দাঁড়াইল। অবলম্বনহীন আরোহী পিছনে কাৎ হইলেন, পড়েন আর কি!—

নিমেষমধ্যে প্রচণ্ড লম্ফ দিয়া অসীমসাহসী আন্দু উন্মুখ অশ্বের লাগামসুদ্ধ লোহার সাজ দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া ফেলিয়া সজোরে এক ঝাঁকুনি মারিয়া, ঘোড়ার মুখ নামাইল। আরোহী সোজা হইল।

উন্মত্ত দুরন্ত ঘোড়া সহসা স্থির হইল; অশ্বচরিত্রে সুপণ্ডিত আন্দুর শিক্ষিত করস্পর্শে ঠাণ্ডা হইয়া শিশুর মত তাহার কাঁধে মাথা রাখিয়া ঘন ঘন শ্রমক্লান্ত নিঃশ্বাস ফেলিয়া হাঁপাইতে লাগিল। আন্দু বজ্রনিনাদে পিছনের লোকগুলাকে শান্ত হইতে উপদেশ দিল।

সাহেব লাফাইয়া মাটিতে পড়িলেন। পিছনের ভিড় হইতে দুইজন পুলিশ কনেষ্টবল ছুটিয়া আসিয়া ঘোড়াটাকে দুইদিক হইতে ধরিয়া টহলাইয়া দম সাম্‌লাইতে লইয়া গেল। জনতা উৎসুক-কৌতূহলে সাহেব ও আন্দুকে ঘিরিয়া পুরস্কারের বহর দেখিতে দাঁড়াইল। নগ্নগাত্র নগ্নপদ অসভ্য দরিদ্র সাহসী যুবাকে সাহেবটি বিকৃত হিন্দিতে ইংরেজীর গন্ধ মিশাইয়া ধন্যবাদ দিয়া পুরস্কার চাহিতে হুকুম দিলেন। আন্দু সেলাম দিয়া সাহেবের জাতীয় ভাষায় জানাইল,—সাহেবের প্রাণ রক্ষাই তাহার প্রচুর পুরস্কার হইয়াছে, সে অন্য পুরস্কার চাহে না।

সাহেব স্তব্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ নয়নে ক্ষণকাল তাহার আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করিলেন। আন্দু নিরুদ্বেগে রাস্তার ধূলায় বসিয়া মচকান পায়ের যন্ত্রণাযুক্ত স্থানের উপস্থিত শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। সাহেব অক্ষত দেহে বাঁচিয়া গিয়াছেন, আর তাঁহার দিকে লক্ষ্য রাখিবার প্রয়োজন কি?

সাহেব আরো দুই চারিটি কথা কহিলেন, আন্দু বেশ শিষ্টাচারের সহিত তাহার জবাব দিল। সাহেব তাহার পা-টি আহত হওয়ার জন্য কিঞ্চিৎ সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া অত্যন্ত গম্ভীরভাবে নিজের কার্ড বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া আগামী কল্য প্রাতঃকালে পুলিশ-ষ্টেশনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আদেশ করিয়া দ্রুত দীর্ঘ-পাদক্ষেপে চলিয়া গেলেন।

এতক্ষণ যাহারা গৌরাঙ্গ গৌরবে আন্দুর কাছে ঘেঁসিতে সঙ্কুচিত হইতেছিল, তাহারা এইবার হুড়াহুড়ি করিয়া আন্দুকে ঠাসিয়া ধরিল। এই কৌতুকপ্রিয় লোকগুলির কাছে পায়ের যন্ত্রণার কোনো প্রতিকার পাওয়া দুঃসাধ্য বুঝিয়া আন্দু উঠিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে দাদাজীর বাসার দিকে চলিল,—পা-টা আজ বড়ই জখম হইয়াছে।

রাস্তার ধারে একজন ইংরেজীনবিশ বাঙ্গালী যুবক এক বৃদ্ধের সহিত অশ্ববিভ্রাটের কথা আলোচনা করিতে-ছিল। খঞ্জ-গমন আন্দুকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল, "এই যে ইনি। পা-টা কি ছড়ে গেছে?"

"না" বলিয়া আন্দু চলিয়া যাইতেছিল। বৃদ্ধ সাগ্রহে বলিলেন "তুমি কোথা থাক বাবা ?"

আন্দু ফিরিয়া দাঁড়াইল। দাদাজীর বাসার উল্লেখ করিতেই বৃদ্ধ বলিলেন, "হাঁ হাঁ, আমি যে তোমায় সেদিন ওখানে দেখেছি।"

আন্দু অভিবাদন করিল, ইনি দাদাজীর বন্ধু। যুবকটি সোৎসাহে অগ্রসর হইয়া বলিল, "আপনার নাম কি মশায় ?" আন্দু নাম বলিল।

যুবক পুনরপি প্রশ্ন করিল "আপনার কে আছে ?"

আন্দু হাসিয়া বলিল "কেউ নাই, 'বাপ মা সব মারা গেছেন।"

যুবক বলিল "স্ত্রীপরিবার, ছেলেমেয়ে; বিয়ে করেন নি নাকি ?"

আন্দু "না" বলিয়া পুনশ্চ অভিবাদনে বৃদ্ধকে সম্মান জ্ঞাপন করিয়া অগ্রসর হইল। বিস্মিত যুবক, এতক্ষণে বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল "হুঁ!"—অর্থাৎ কেউ কোথায় নাই, তাই তুমি অমন দুঃসাহীর কাজে জীবনটা স্বচ্ছন্দে তস্রূপাতে উদ্যত হইয়াছিলে—না হইলে পারিতে না।

প্রশংসার ঝঞ্ঝায় মাথা ঠিক রাখিয়া তিষ্ঠান বড় শক্ত সমস্যা; দুই-একজন লোক পুনরায় আলাপ করিতে উদ্যত দেখিয়া আন্দু ত্রস্ত হইয়া চরণবেগ বর্দ্ধিত করিতে গিয়া আহত হইল।

লোকগুলা শুনাইয়া শুনাইয়া বলিল "পুলিশ সাহেবের জীবনরক্ষা করিয়া সে নিজের ভবিষ্যতের সম্বন্ধে খুব পরিষ্কার রাস্তা তৈরী করিয়াছে।"

(১৮)

আন্দু পরদিন নূতন উৎসাহে নবীন সঙ্কল্প স্থির করিয়া পুলিশষ্টেশনে গিয়া সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিল। সাহেব খুব সমাদরে বসাইয়া তাহার পায়ের বেদনার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার পর অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া আন্দুর সুগঠিত শরীর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ প্রশংসা করিয়া সাহেব তাহাকে পুলিশে কর্ম্ম লইতে অনুরোধ করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, আন্দু তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। তারপর যথাবিধানে যথাস্থানে আবেদননিবেদনের পর, আন্দু একেবারে পুলিশের জমাদার হইল। দাদাজী মাথা নাড়িয়া বলিলেন "যেখানে খুসী স্বচ্ছন্দে যাও, কিন্তু সাম্‌লে থেকো।"

পুলিশে ঢুকিবার পাঁচ-ছয় দিন পরে, দাদাজীর আত্মীয় মহাশয়ের পত্র আসিল। তিনি পীড়িত হইয়াছিলেন বলিয়া পত্রের উত্তর দিতে পারেন নাই, এক্ষণে জানাইতেছেন যে যেব্যক্তি যুদ্ধবিভাগে কর্ম্ম করিতে চাহে, তাহাকে সত্বর হাইদরাবাদে পাঠাইবেন, তিনি নিজামের অধীনে তাহাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দিবেন। আন্দু শুনিয়া বলিল "আপনি লিখে দিন, যে, আমি সংস্কৃত এবং অসংস্কৃত এই দুটোর মাঝে পড়ে বিষম হাবুডুবু খাচ্ছি। এখান থেকে বিযুক্ত হলেই তাঁর কাছে গিয়ে নিযুক্ত হব।"

দাদাজী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "পুলিশের কাজ যদি ছাড়বেই জান, তবে কাজে ঢুক্‌লে কেন ?"

আন্দু সংস্কৃত বইখানি তুলিয়া লইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল "দেখে যাই এদের ব্যাপারটা কি ?"

দাদাজী চিন্তিতভাবে বলিলেন "দেখ আন্দু, আমি তোমায় একটা কথা বলব কদিন থেকে মনে করছি,—পুলিশলাইনের লোকেদের স্বভাবচরিত্র প্রায়ই মাটি হয়ে যায়—"

বাধা দিয়া হাসিয়া আন্দু বলিল "আমি যে নিজে পাথর।"

দাদাজী হাসিয়া বলিলেন, "পরশ!—কিন্তু নারে দাদা, সত্যি বলছি আমার ভাবনা হচ্ছে, শাদায় ময়লা ধরে বড় শিগ্‌গির। তুমি বিয়ে কর, একটা পেছটান রাখ,"—

আন্দু বইখানা তুলিয়া বলিল, "এই যে চমৎকার রয়েছে।" দাদাজী চশমাটি চোখে পরিয়া বলিলেন, "ওতে কি বরাবর নিজেকে আট্‌কে রাখ্‌তে পারবে ভাই ? তুফান যদি জোরে আসে তা'হলে যে নোঙ্গর সুদ্ধ উপড়ে ফেলে।"

আন্দু তাঁহার পায়ের কাছে মাথা ঠেকাইয়া বলিল "আমি যে বন্দরে আশ্রয় নিয়েছি।"

দাদাজী সস্নেহে তাহার শিরশ্চুম্বন করিয়া বলিলেন "ভগবান তোমায় রক্ষা করুন। আমি কিন্তু ঘট্‌কালি সুরু করি।"

আন্দু ব্যগ্রভাবে হাতজোড় করিয়া বলিল "আর কিছু

দিন যাক, সংস্কৃত শেখা শেষ হয়ে যাক্‌ দাদাজী, তারপর আপনার যা খুসী হয় করবেন।"

দাদাজী তাহাকে টাকা কড়ি জমাইয়া ঘরবাড়ী করিতে উপদেশ দিলেন। আব্দু হাসিল।

থানা হইতে দাদাজীর বাড়ী অনেক দূর বলিয়া আব্দু প্রত্যহ দাদাজীর কাছে আসিতে পারিত না। দুই এক দিন অন্তর আসিয়া পাঠাভ্যাস করিয়া পরীক্ষা দিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া যাইত।

এইরূপে চার মাস বেশ কাটিল। তাহার কর্ম্মকুশলতা ও দয়াদাক্ষিণ্যের প্রভাবে, চারিদিকে সম্ভ্রম এবং শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়া উঠিল।

মুসলমানপাড়ায় সর্দ্দার-মিস্ত্রি মহম্মদের বাড়ীতে এক কুস্তির আড্ডা পাতিয়া প্রতি-সপ্তাহে দুই দিন করিয়া আব্দু বালক ও যুবকদের পর্য্যায়ক্রমে কুস্তিখেলা শিখাইতে আরম্ভ করিল। মহম্মদের সহিত তাহার বন্ধুত্বও খুব গাঢ় হইল। জনপ্রিয় আব্দুকে সকলেই বিশেষ রকম শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত ভালবাসিত। আব্দু ব্যায়ামের মাহাত্ম্য নিজের জীবনে ভালরকম বুঝিয়াছিল বলিয়া সকলকেই সেটা বুঝাইবার জন্য ব্যগ্র ছিল।

আব্দুর বিস্তর রকমের বিস্তর বন্ধু জুটিয়া গেল। কাহারো প্রতি তাহার ঔদাসীন্য ছিল না, তাহার অসীম উদারতার নিকট সকল কার্পণ্য পরাভব মানিত। বিচিত্র চিত্তের বিচিত্র সংঘাতে যখন নিজের চিত্তের মাঝে ক্লান্তি বা উত্তেজনা অনুভব করিত, তখনই সে দাদাজীর বাসায় ছুটিত। দাদাজীর শান্ত সংসর্গটিই তাহার জীবনের এখন শ্রেষ্ঠ সম্পদ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে আপনার মধ্যে দাদাজীকে ঘনিষ্ঠভাবে অবলম্বন করিয়া সমস্ত সংসারের মধ্যে আপনাকে নির্ভীক তৃপ্তিতে ছাড়িয়া দিল। মানুষে মানুষের নির্ভর,—কথাটা শুনিলে আব্দু আগে হাসিত, কিন্তু এখন নিজের মধ্যে, মানুষের পক্ষে মানুষের প্রয়োজন কিরূপ গুরুতর, তাহা অনুভব করিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। ইহা কি হৃদয়ের প্রেমপ্রশস্তির লক্ষণ, —না দীনদৌর্ব্বল্যের পরিচয়? (ক্রমশ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

বুস্থু

[জাপানী রহস্য-চিত্র]

জমিদার

তারো } ভৃত্যদ্বয়
জিরো }

দৃশ্য—কক্ষ।

জমিদার - আমি এখানকার জমিদার। সফরে বেরুচ্ছি —চাকরগুলোকে ডেকে একবার কাজকর্ম্ম বাংলে দিই। তারো, কোথায় রে?

তারো—এই যে মহারাজ।

জমিদার—এসেচিস?

তারো—আজ্ঞে হ্যাঁ, হুকুম করুন।

জমিদার—বা রে! আজ যে বেজায় সকাল-সকাল উঠেচিস দেখচি। যা জিরোকে ডেকে আন।

তারো—যে আজ্ঞে মহারাজ। ওরে জিরো, শীগগির আয় মহারাজ ডাকছেন।

জিরো—কি বলচেন মহারাজ?

জমিদার—আমি আজ সকালে সফরে বেরুচ্ছি। তোরা দুজনে বাড়ীঘরদোর আগলাবি। আমি না থাকার দরুন যেন কোন গোলমাল না হয়, খবরদার!

তারো ও জিরো (সমস্বরে)—আজ্ঞে তাও কখনো হয়!

জমিদার—আর একটা কথা। আমার ঘরে একরকম বিষ আছে, তার নাম 'বুস্থ'। সাবধান! তা নিয়ে নাড়াচাড়া করিসনে যেন।

(জমিদারের বহির্গমন)

তারো—এ তো বড় আশ্চর্য্যি! মহারাজ তো এর আগে কখনো বেরুবার সময় আমাদের ডেকে এমন করে সাবধান করে যেতেন না। এর মানে কি?

জিরো—ঠিক বলেছিস। এর আগে তো মহারাজ আমাদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন, আর একজনের ওপর বাড়ী পাহারার ভার দিয়ে যেতেন। তাজ্জব ব্যাপার —হুঁ!

তারো—কেন, কেন, হল কি ?

জিরো—আমি ঐ বিষটার সামনাসামনি দাঁড়িয়েছি। বাতাসে বিষের গন্ধ আসচে। উঃ! অসহ্য! চল্ চল্ ওখানে গিয়ে কথা কই।

তারো—'বুসু'র পাত্রটা খুলে দেখি একবার।

জিরো—খবরদার! বাঁচতে চাস তো ওসব কিছু করিসনে! থাম্ ভাই থাম্—বিষ-ফিস থাকুকগে একধারে।

তারো—ভয় কি রে! পাত্রটার ওদিকে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি। গন্ধটা ভয়ানক সন্দেহ নেই! বাতাসের মুখে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালে ভয় থাকবে না। ডালাটা যখন খুলব খুব বাতাস করবি আমাকে, বুঝেছিস ?

জিরো—আচ্ছা খোল্।

তারো—কৈ রে বাতাস কচ্ছিস না? বাতাস কর; বাতাস কর!

জিরো—থাকগে ভাই থাক্। ভালো কচ্ছিস না কিন্তু বিষ-ফিস ঘাঁটাঘাঁটি করে।

তারো—ভালো আবার নয় কেমন করে? বলিস কি? দড়ি তো খুলে ফেলেচি, এখন ডালা তুললেই হয়। বাতাস কর বলছি, বাতাস কর!

জিরো—নে নে বাতাস কচ্ছি।

তারো—যাক! ডালা খুলেচি। দেখি একবার বিষের চেহারাটা।

জিরো—দেখ্, দেখ্, বেশ করে দেখ্।

তারো—বাঃ! ঐ যে দেখা যাচ্ছে!

জিরো—কি রকম দেখতে ভাই ?

তারো—তা কেমন করে বল্ব? এমন জিনিস কি আর কখনো দেখেচি! কালো কালো চাঁই চাঁই কেমন যেন কি রকম দেখতে। কিন্তু খাসা গন্ধ, দেখি একটু চেকে।

জিরো—চাকবি কি রে? বিষ চাকবি? তুই পাগল হলি না কি? নে, চলে আয়, কাজ নেই আর।

তারো—তা পারব না। যেতে পারব না। কিছুতেই না। 'বুসু' আমাকে পাগল করেছে। ওর হাত এড়াবার শক্তি আমার নেই। গন্ধ শুঁকেই খাবার লোভ সম্বরণ করতে পারচি না। দে ভাই দে, একগাল খেতে দে।

জিরো—কিছুতেই না। আমি থাকতে নয়। ছুঁসনি বলছি। খেলি, খেলি যে! গেছিস, গেছিস, আর রক্ষে নেই, এইবার মরলি বলে!

তারো—যা যাঃ! মরব না হাতি। এটা চিনি রে চিনি।

জিরো—চিনি? বলিস কি রে? সত্যি?

তারো—সত্যি নয় তো মিথ্যে না কি? ডাহা চিনি রে ডাহা চিনি।

জিরো—তাই না কি রে। এই চিনির জন্যে এত!

তারো—বিশ্বাস না হয় খেয়ে দেখ না।

জিরো—চিনিই তো রে! নির্ঘাত চিনি!

তারো—মহারাজ বলে গেলেন এটা বিষ, যা-তা একটা নাম দিয়ে গেলেন বুসু, বোধ হয় যাতে আমরা ভয় পেয়ে না খাই সেই জন্যে—কি বলিস?

জিরো—বল্ব আর কি? আপাতত তো দেখচি তুই প্রায় সব সাবাড় করে ফেললি। আমাকেও একটু খেতে দে।

তারো—খা না। বারণ করছে কে।

জিরো—কিন্তু অত খাসনি। তুই ত দেখচি ঠেসে ঠেসে পুরছিস। আস্তে আস্তে খা।

তারো—কি করি বল্, বেড়ে খেতে লাগচে, তর সয় না। এমন সুযোগ কি সহজে আসে? জীবনে একবার আসে তো ঢের! জিরো! থাম বলছি! করছিস কি? মহারাজ ফিরে এলে টেরটা পাবি। এসে যখন দেখবেন চিনির চাঁই ফর্সা, তখন! যদি কিছু বলেন, আমার কি, আমি বলে দেবো কিছুতেই তোকে বাধা দিতে পারলুম না, তুই সব খেয়ে সাবাড় করলি।

জিরো—দেখ, মিথ্যে কথা বলিসনি। আমিই তো তোকে বারণ করেছিলুম। তুই ভ্রূক্ষেপ না করে গিলতে লাগলি। আমি তো ডালাটা পর্য্যন্ত খুলতে বারণ করেছিলুম। উল্টে আবার আমার ঘাড়ে দোষ চাপানো! আসুন তিনি আমি সব ফাঁশ করে দেবো।

তারো—আরে না না! ঠাট্টা বুঝিস না। যাক, এখন কি উপায় করা যায় বল দেখি। ঠিক হয়েছে। ঐ দেয়ালের গায়ে টাঙানো ছবিখানা ছিঁড়ে ফ্যাল্ খুব রগড় হবে!

জিরো—বেশ। ছিঁড়ছি।

তারো—আরে থাম্ থাম্! করিস কি? জানিস ও ছবিখানার দাম কত। কত বড় ওস্তাদের আঁকা! মহারাজ এসে তোর মাথা গুঁড়ো করবে।

জিরো—কিন্তু তুই তো আমায় বল্লি। এখন আবার অন্য রকম বলচিস যে?

তারো—আচ্ছা আচ্ছা। বেজায় মজা!

জিরো—এখন মজা হতে পারে। মহারাজ ফিরলে অন্য রকম মজা টের পাবে!

তারো—এই দেখ একটা চমৎকার চায়ের পেয়ালা। এটাকেও ভাঙি আয়।

জিরো—না ভায়া আরো মজা করতে চাও তো ঝক্কির ভাগ তোমাকেও নিতে হবে। পেয়ালার একধার তুমি ধর, একধার আমি ধরি, তারপর মাঝখানে ফেলে দিলেই চলবে। ব্যস, চুকে গেছে...

জমিদারের প্রবেশ

জমিদার—কিরে ব্যাপার কি? দু বেটাই যে একেবারে বোবা বনে গেলি। বল্ কি হয়েছে, শীগগির বল্।

তারো—বল্ না রে জিরো, বল্ না।

জিরো—তুই বল্ না।

তারো—আজ্ঞে তবে বলি। এই দেখুন, আমরা একটু কুস্তি লড়ছিলুম। জানেন তো মহারাজ, জিরো বেজায় ওস্তাদ। আমাকে ধরে মাথার ওপর তুলে আছাড় দ্যায় আর কি! কি করি প্রাণের দায়ে ছবিখানা চেপে ধরেছি, আর অমনি ওখানা ফ্যাঁশ করে ছিঁড়ে গেল।

জিরো—আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ, সব সত্যি। তারপর যখন তারো আমায় ছুড়ে ফেলে দিলে, পড়বি তো পড় গিয়ে পড়লুম কি না একেবারে চায়ের পেয়ালার ওপর। পেয়ালা অমনি চুরমার।

জমিদার—অসহ্য! অসহ্য উৎপাত। বদমায়েস দুটোকে চূড়ান্ত শাস্তি দেবো।

তারো—জানি মহারাজ জানি। যে দোষ করেছি তার শাস্তি মৃত্যু। মরতেই যখন হবে তখন আর বিলম্বে দরকার কি, তাই আগে থাকতেই আমরা আপনার 'বুসু' খেয়ে মরণের অপেক্ষায় বসে আছি।

জমিদার—'বুসু' খেয়েছিস? অ্যাঁ! বলিস কি রে! 'বুসু' খেয়েছিস? তাহলে আর দেরী নেই—ঐ দোরের পেরেকের মত শক্ত কাঠ হয়ে গেলি বলে!

তারো (কাঁদুনে সুরে)—আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ 'বুসু'ই খেয়েছি। ভেবেছিলুম খুব তেজি বিষ, তাই প্রথমে একটু-খানি খেয়েছিলুম। দেখলুম কোনো ফল হল না। তাই মাত্রা একটু বাড়িয়ে দিয়ে আবার খেলুম। কিন্তু কোনো কিছু অস্বস্তি বোধ করলুম না। তাড়াতাড়ি মরবার জন্যে আমরা অনবরত মাত্রা বাড়িয়ে চল্লুম! কিন্তু কি করি মহারাজ! এত চেষ্টা সত্ত্বেও পোড়া প্রাণ বেরোয় কই! একটুমাত্র বিষ অবশিষ্ট রাখিনি মহারাজ, সব চেটে পুটে খেয়ে ফেলেছি!

জমিদার—তবে রে বেটা পাজি বেয়াদব বেল্লিক ছুঁচো! দাঁড়া একবার মজা দেখাচ্ছি।

'মাপ করুন মহারাজ' বলিতে বলিতে তারো ও জিরো ছুটিয়া পালাইল। জমিদারমহাশয় তাদের পিছু পিছু ছুটিলেন।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পৌরাণিকী

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা। এই কালসমরে ভারতের বীর্য্য ও পরাক্রম বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহার্ণবের ন্যায় তরঙ্গিত বীর্য্য ও পরাক্রম বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। কুরুক্ষেত্রে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী যুদ্ধ করিয়াছিল; ইহার সমস্ত সৈন্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়; রাজন্যকুল ধ্বংসমুখে পতিত হন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরেও স্থানে স্থানে তৎসাময়িক রাজবংশ বিদ্যমান ছিল। তদ্বংশীয়গণ দীর্ঘকাল রাজত্বও করিয়াছিলেন। কিন্তু জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশ অমানিশার ঘোর অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া ছিল; তমসাচ্ছন্ন আকাশতলে দুই-একটি নক্ষত্র প্রকাশিত থাকিয়া সে অন্ধকার ভীষণতর করিয়া তুলিতে-ছিল। কুরুক্ষেত্রের পরবর্ত্তীকালে অভিনব রাজবংশ-সকলের অভ্যুদয় হইয়া ভারত-আকাশ-ব্যাপ্ত ঘোর অন্ধকার দূরীভূত করিয়াছিল, নূতন-কিরণ-সম্পাতে পুনর্ব্বার ভারতের মুখশ্রী উজ্জ্বল করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু

পূর্ব্ব সমৃদ্ধি আর ফিরিয়া আইসে নাই। পরবর্ত্তীকালের রাজন্ত ও বীরবৃন্দ, কুরুপাণ্ডবের আহ্বানে সমবেত মূর্ত্তিমান রাজশ্রী ও বীরত্বের তুলনায় ক্ষীণপ্রভ ছিল।

কোন্ সময়ে কুরুক্ষেত্রের মহাসমর সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে। কুরুক্ষেত্রের সমর সম্বন্ধে নানাবিধ মত দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এখানে সমস্ত মতেরই উল্লেখ করিতেছি। পাশ্চাত্য পণ্ডিত বেণ্টি সাহেব বিষ্ণুপুরাণোক্ত পরীক্ষিতের সময় জ্যোতিষিক নির্দ্দেশ অনুসারে গণনা করিয়া খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মহাভারতের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আরো ২।১ জন ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এইরূপ সময়ের অনুমোদন করিয়াছেন। এক্ষণে একটি দেশীয় মতের উল্লেখ করা যাইতেছে। কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে যে, কাশ্মীরের প্রথম নরপতি গোনর্দ্দ জরাসন্ধ রাজার সুহৃদ ছিলেন। তাঁহার অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণকে অপমানিত করিবার জন্য গোনর্দ্দ মথুরা আক্রমণ করেন। এই আক্রমণের ফলে তিনি বলরামের হস্তে নিহত হন। অতএব গোনর্দ্দ যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক অধিপতি ছিলেন। রাজতরঙ্গিণীর মতে নরপতি গোনর্দ্দ কলির প্রবর্ত্তনের ৬৫৩ বৎসর পরে রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময় হইতে ন্যূনাধিক ৫০১৩ বৎসর অর্থাৎ খৃষ্টের জন্মের প্রায় ৩১০০ বৎসর পূর্ব্বে কলির প্রারম্ভ। এই ৩১০০ হইতে উক্ত ৬৫৩ বাদ দিলে খৃষ্টের জন্মের প্রায় ২৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের সময় পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণের মতানুসারে এতদপেক্ষা প্রায় ৫০০ বৎসর পরে কুরুক্ষেত্রের সমর সংঘটিত হইয়াছিল। আমরা এখানে এ মতের পরিচয় দিতেছি। বিষ্ণুপুরাণের ৪ অংশ ২৪ অধ্যায় ৩৪ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে, কলির আরম্ভের দ্বাদশ শত বৎসর পরে পরীক্ষিত রাজপদে অভিষিক্ত হন। খৃষ্টের জন্মের প্রায় ৩১০০ বৎসর পূর্ব্বে কলির প্রারম্ভ। এই ৩১০০ হইতে ১২০০ বৎসর বাদ দিলে আমরা খৃঃ পূঃ ১৯০০ অব্দে উপনীত হই। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণেরই অন্যত্র আর-একপ্রকার সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণের ঐ ৪ অংশ ২৪ অধ্যায়ের একস্থানে লিখিত আছে যে, পরীক্ষিতের জন্মের ১০১৫ বৎসর পরে মহারাজ নন্দের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের মতে ১১১৫ বৎসর পরে এই অভিষেক হইয়াছিল। বায়ু ও মৎস্য পুরাণকারগণ একমত, তাঁহারা ১০১৫ বৎসর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণের মতে মহারাজ নন্দ এবং তদ্বংশীয়গণ একশত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। অপর তিনখানি পুরাণেও এইরূপ সময়ই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত রাজ্য অধিকার করেন। তাঁহার রাজত্বকালের প্রারম্ভ ৩২০ খৃঃ পূঃ অব্দ।

প্রাগুক্ত হিসাব অনুসারে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের নিম্নলিখিত সময় পাওয়া যায়—

	বিষ্ণুপুরাণ,	শ্রীমদ্ভাগবত,	বায়ুপুরাণ,	মৎস্যপুরাণ.
পরীক্ষিতের জন্মের যতবৎসর পরে নন্দের রাজত্ব আরম্ভ হয়—	১০১৫	১১১৫	১০৫০	১০৫০
নন্দবংশের শাসনকাল	১০০	১০০	১০০	১০০
	১১১৫	১২১৫	১১৫০	১১৫০
খৃষ্টের জন্মের যত বৎসর পূর্ব্বে নন্দবংশের ধ্বংস এবং চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটে	৩২০	৩২০	৩২০	৩২০
	১৪৩৫	১৫৩৫	১৪৭০	১৪৭০

উক্ত চারি মতের মধ্যে বেশী কমি সামান্য। অতএব দেখা যাইতেছে, খৃষ্টের জন্মের প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতও এইরূপ সময়ের পক্ষপাতী।

আমরা প্রাগুক্ত মহাজনদের অনুসরণ করিয়া ঐমত গ্রহণ করিলাম। চারিখানি পুরাণেই পরীক্ষিতের জন্ম ও নন্দবংশের অভ্যুদয়ের ব্যবধান প্রায় একরূপ নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে তাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। এতদপেক্ষাও প্রবল কারণ এই যে, মহাভারতে ভীষ্মের দেহত্যাগের

সময় সম্বন্ধে জ্যোতিষিক যে নির্দ্দিশ আছে, তদনুসারে গণনা করিলে এইরূপ সময়েই উপস্থিত হইতে হয়। তবে প্রশ্ন হইতে পারে যে, বিষ্ণুপুরাণোক্ত পরীক্ষিতের জন্মসময় সম্বন্ধে জ্যোতিষিক নির্দ্দেশ-অনুসারে বেণ্টি সাহেবের গণনা পরিত্যাগপূর্ব্বক এই গণনা গ্রহণ করিবার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর জ্যোতিষশাস্ত্রপারদর্শী পণ্ডিতবর্গই দিতে পারেন। আমরা কেবল মহাজনদের অনুসরণ করিলাম।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরবর্ত্তীকালে অর্থাৎ খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে সমগ্র ভারতবর্ষে যে-সকল অভিনব রাজবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তৎসমুদয়ের বিবরণ প্রদান করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

কুরুক্ষেত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজবিবরণ রামায়ণে, সমকালবর্ত্তী রাজবিবরণ মহাভারতে এবং পরবর্ত্তী আংশিক রাজবিবরণ পুরাণে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এই-সকল গ্রন্থের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ করিয়া থাকেন। তাহার কারণ এই যে, তৎসমুদয়ে অনেক অনৈসর্গিক অলৌকিক এবং স্পষ্টতঃ অলীক বৃত্তান্ত স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এই-সকল অনৈসর্গিক অলৌকিক এবং স্পষ্টতঃ অলীক ব্যাপার বাদ দিয়া যেসকল তথ্য পাওয়া যায়, সেসমস্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি নাই। বিশেষতঃ এই-সকলের অনেক তথ্যের উল্লেখ অন্যান্য গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণ এবং মহাভারতের বিষয়ীভূত রাজবিবরণ আমাদের উদ্দিষ্ট নহে। পুরাণশাস্ত্রের বিষয়ীভূত রাজবিবরণই আমাদের আলোচ্য। আমরা প্রথমে পুরাণশাস্ত্রের বিবরণ প্রদান করিব। তারপর এই-সকল বিবরণের পরিপোষক যেসমস্ত প্রমাণ বৌদ্ধশাস্ত্র, গ্রীক ইতিহাস, সংস্কৃত গ্রন্থ এবং প্রস্তরলিপি ইত্যাদিতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিব।

মহাভারতের আদিপর্ব্ব ৩০৭ শ্লোকে পুরাণশাস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল মহাভারত নহে, আরো অনেক প্রাচীনগ্রন্থেই পুরাণশাস্ত্রের উল্লেখ আছে। এই উল্লেখ বিচিত্র নহে। কারণ,

"পুরাণ, অর্থে আদৌ পুরাতন; পশ্চাৎ পুরাতন ঘটনার বিবৃতি। সকল সময়েই পুরাতন ঘটনা ছিল, এজন্য সকল সময়েই পুরাণ ছিল। * * * [এই সকল পুরাণশাস্ত্র অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায়] অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে লিপিবিদ্যা অর্থাৎ লেখাপড়া প্রচলিত থাকিলেও * * মুখে মুখে রচিত, অধীত এবং প্রচারিত হইত। প্রাচীন পৌরাণিক কথা-সকল ঐরূপ মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া অনেক সময়েই কেবল কিংবদন্তী মাত্রে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। পরে সময়-বিশেষে ঐ-সকল কিংবদন্তী এবং প্রাচীন রচনা একত্র সংগৃহীত হইয়া এক একখানি পুরাণ সঙ্কলিত হইয়াছিল।" *

পুরাণশাস্ত্রের সংখ্যা অষ্টাদশ। আমাদের দেশের বিশ্বাস যে, সমস্ত পুরাণই কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই মত সঙ্গত নহে। পুরাণ-সকলে পরস্পরবিরোধী অনেক মত পরিব্যক্ত হইয়াছে। এই-সকল মতবিরোধ সামান্য নহে, গুরুতর। অনেক পুরাণে এক বিষয়ই পুনঃপুনঃ বর্ণিত হইয়াছে। এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক সমস্ত পুরাণ সঙ্কলিত হইয়া থাকিলে ঐরূপ গুরুতর মতবিরোধ এবং পুনরুক্তি অসম্ভব হইত। এজন্য আমরা বিবেচনা করি যে, পুরাণ-সকল একাধিক ব্যক্তি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। দুই কারণে অষ্টাদশ পুরাণের সঙ্গে ব্যাসের নাম সংযোজিত হইয়া থাকা সম্ভব। প্রথম, পুরাণ-সঙ্কলন-কর্ত্তাদেরও ব্যাস উপাধি ছিল। দ্বিতীয় কারণ নিম্নে লিপিবদ্ধ হইতেছে। এই দ্বিতীয় কারণই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। আমরা বিষ্ণুপুরাণ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। পুরাণার্থবিৎ বেদব্যাস আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পশুদ্ধি দ্বারা পুরাণসংহিতা করিয়াছিলেন। লোমহর্ষণ নামে সুত বিখ্যাত ব্যাসশিষ্য ছিলেন। ব্যাসমহামুনি তাঁহাকে পুরাণসংহিতা দান করিলেন। সুমতি, অগ্নিবর্চ্চা, মিত্রয়ু, শাংসপায়ন, অকৃতব্রণ, সাবর্ণি, তাঁহার এই পঞ্চ শিষ্য ছিল। (তাহার মধ্যে) কাশ্যপ, সাবর্ণি ও শাংসপায়ন সেই লোমহর্ষণিকা মূল সংহিতা হইতে তিনখানি সংহিতা প্রস্তুত করেন।

"এই-সকল বচনে জানিতে পারা যাইতেছে যে, এক্ষণকার প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণ বেদব্যাস-প্রণীত নহে। তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ পুরাণ-সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন; তাহাও এক্ষণে প্রচলিত নাই, যাহা প্রচলিত আছে, তাহা কাহার প্রণীত, কবে প্রণীত হইয়াছিল, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।" †

তারপর বর্ত্তমান সময়ে আমরা যে অষ্টাদশ পুরাণ দেখিতে পাই, তৎসমুদয় সঙ্কলিত হইবার পরও তাহাতে পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন এবং পরিবর্জ্জন ঘটিয়াছে বলিয়া

* কৃষ্ণচরিত্র।

† কৃষ্ণচরিত্র।

ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। খ্যাতনামা উইলসন সাহেবের মতে নানাবিধ ধর্ম্মমতের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারকল্পে পুনঃ পুনঃ অষ্টাদশ পুরাণের রূপান্তর সাধিত হইয়াছিল।

পুরাণের সংখ্যা অষ্টাদশ। ইহার সমস্ত পুরাণে কুরুক্ষেত্রের পরবর্ত্তী কালে অভ্যুদিত রাজবংশসকলের বিবরণ প্রদত্ত হয় নাই। মৎস্য, বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড, বিষ্ণু, ভাগবত, গরুড় এবং ভবিষ্য, কেবল এই সাতখানি পুরাণে আমাদের উদ্দিষ্ট রাজবংশসমূহের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। এতন্মধ্যে ভবিষ্য পুরাণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, ইহাতে যে রাজবিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই অন্যান্য পুরাণে গৃহীত হইয়াছে। এই ঋণের বিষয় মৎস্য এবং বায়ু পুরাণে স্পষ্টতঃ স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত পুরাণোক্ত বিবরণের মূল এক হইলেও তাহাদের মধ্যে স্থানে স্থানে অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণসকল পৌরব অধিপতি অথবা নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিবৃন্দের নিকট পরিব্যক্ত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু প্রধানতঃ মগধের অধিপতিদের বৃত্তান্তই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পৌরব এবং ইক্ষ্বাকুবংশের বিবরণ সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রত্যেক দুইজন রাজার জন্য অর্দ্ধ-শ্লোক মাত্র রচিত হইয়াছে; কোন রাজত্বের সময় নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। পক্ষান্তরে মগধের বার্হদ্রথবংশের প্রত্যেক রাজার জন্য অর্দ্ধশ্লোক রচিত হইয়াছে এবং রাজত্বের সময়ও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মগধ এবং অন্যান্য স্থানের কুরুক্ষেত্রের সমবর্ত্তী প্রাচীন রাজবংশসমূহ ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে যেসমস্ত অভিনব বংশের অভ্যুদয় হয়, তন্মধ্যে কেবল মগধে যাহাদের রাজসিংহাসন সংস্থাপিত অথবা প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কেবল তাহাদেরই সাধারণ বিবরণ ঐ-সকল পুরাণে প্রদত্ত হইয়াছে। অন্যান্য স্থানের রাজবংশসমূহের বৃত্তান্ত কেবল মূলতঃ লিপিবদ্ধ আছে; একমাত্র বিদিশাবংশের সাধারণ বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইয়াছে।

মৎস্য, বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড, বিষ্ণু, ভাগবত, গরুড় এবং ভবিষ্য পুরাণে কুরুক্ষেত্রের পরবর্ত্তী কালে অভ্যুদিত রাজবংশসকলের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এতন্মধ্যে মৎস্যপুরাণে অন্ধ্রবংশের বিলোপ পর্য্যন্ত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অন্ধ্রবংশ ২৩৬ খৃষ্টাব্দে অথবা কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাতে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড, গরুড়, বিষ্ণু এবং ভাগবত পুরাণে গুপ্তবংশের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ৩২০ খৃষ্টাব্দে রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। এজন্য আমরা নির্দ্দেশ করি যে, মৎস্যপুরাণ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে এবং বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড, গরুড়, বিষ্ণু এবং ভাগবতপুরাণ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই ছয়খানি পুরাণই রাজবংশের বিবরণের জন্য ভবিষ্য পুরাণের নিকট ঋণী বলিয়া কথিত হইয়াছে। মৎস্যপুরাণে ২৩৬ খৃষ্টাব্দের পরবর্ত্তী বিবরণ লিপিবদ্ধ না থাকায় এবং অন্য পাঁচখানি পুরাণে পরবর্ত্তী বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকায় আমরা বিবেচনা করি যে, ভবিষ্যপুরাণ ২৩৬ খৃষ্টাব্দের সম-সময়ে সঙ্কলিত এবং তাহার অল্পকাল পরেই তদবলম্বনে মৎস্যপুরাণোক্ত রাজবিবরণ লিখিত হইয়াছিল। তারপর ৩২০ খৃষ্টাব্দের সম-সময়ে ভবিষ্যপুরাণ পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহার অল্পকাল পরেই পরিবর্দ্ধিত ভবিষ্য পুরাণ অবলম্বনে অন্য চারিখানি পুরাণোক্ত রাজবিবরণ লিখিত হইয়াছিল।

এই-সকল পুরাণ খৃষ্টের পরবর্ত্তী তৃতীয় এবং চতুর্থ শতাব্দীতে সঙ্কলিত হইয়া থাকিলেও বহু পূর্ব্বকালের রচনা-রূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। এজন্য কুরুক্ষেত্রের পরবর্ত্তী-কালে অভ্যুদিত রাজবিবরণ ভবিষ্যদ্বাণীরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে মগধে বার্হদ্রথবংশ বিদ্যমান ছিল। তারপর প্রদ্যোত বংশের অভ্যুদয় হয়। আমরা অতীত ঘটনারূপে প্রদ্যোত বংশ হইতে বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলাম।

প্রদ্যোত-বংশ।

মগধের বার্হদ্রথ বংশীয় শেষ রাজা রিপুঞ্জয়ের সুনিক নামে এক অমাত্য ছিল। এই অমাত্য স্বামী রিপুঞ্জয়কে হত্যা করিয়া প্রদ্যোত-নামা স্বকীয় পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। তিনি পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যবৃন্দকে অধীন করিতে সমর্থ হন। তাঁহার রাজনীতি উৎকৃষ্ট ছিল না। তিনি সচ্চরিত্র ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব ২৩ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। প্রদ্যোতের পালকনামা পুত্র ২৪ বৎসর, তৎপুত্র বিশাখযূপ ৫০ বৎসর, তৎপুত্র অজক (মতান্তরে জনক অথবা রজক) ২১ বৎসর এবং তৎপুত্র নন্দীবর্দ্ধন ২০

বৎসর রাজত্ব করেন। এই পাঁচজন নরপতি একশত অষ্টাত্রিংশৎ (মৎস্য পুরাণের মতে ৫২, কিন্তু মৎস্যপুরাণের কতিপয় পুঁথি অনুসারে ১৫২) বৎসর পৃথিবী ভোগ করেন।

শিশুনাগ-বংশ।

শিশুনাগ প্রদ্যোত-বংশীয়দের গৌরব ধ্বংস করিয়া রাজা হন। তিনি স্বীয় পুত্রকে বারাণসী ধামে স্থাপন করিয়া নিজে গিরিব্রজে বাস করেন। শিশুনাগের রাজত্ব চল্লিশ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। তদীয় পুত্র কাকবর্ণ ৩৬ বৎসর (মৎস্য পুরাণের মতে ২৬ বৎসর), তৎপুত্র ক্ষেমবর্ম্মা ২০ বৎসর, তৎপুত্র ক্ষত্রোজাঃ ৪০ বৎসর (মৎস্য পুরাণের মতে ২৪ বৎসর), তৎপুত্র বিম্বিসার ২৮ বৎসর, তৎপুত্র অজাতশত্রু ১৫ বৎসর, তৎপুত্র দর্শক ২৫ বৎসর রাজত্ব করেন। অতঃপর উদয়াশ্ব রাজপদাধিকারী হন, তাঁহার রাজত্ব ৩৩ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। উদয়াশ্ব স্বীয় রাজত্বের চতুর্থ বর্ষে গঙ্গানদীর দক্ষিণতীরবর্ত্তী কুসুমপুরে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। উদয়াশ্বের পুত্র নন্দীবর্দ্ধন ৪০ বৎসর এবং তৎপুত্র মহানন্দী ৪৩ বৎসর রাজত্ব করেন। শিশুনাগবংশের নৃপতির সংখ্যা ১০, ইঁহারা তিন শত বাষট্টি বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকেন।

নন্দ-বংশ।

শিশুনাগবংশের শেষ রাজা মহানন্দীর শূদ্রাগর্ভজাত অতিলোভী মহাপদ্মনন্দ নামে এক পুত্র হয়। এই ব্যক্তি দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় অখিল ক্ষত্রিয়কুলের বিনাশ করেন। এই সময় হইতে শূদ্রগণের রাজ্যাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। মহাপদ্মনন্দ অনুল্লঙ্ঘিত শাসনে একচ্ছত্রা পৃথিবী ভোগ করেন। তিনি ৮৮ বৎসর পৃথিবীতে স্থায়ী হন। তাঁহার আট পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম সুকল্প। ইঁহারা নন্দের পরবর্ত্তীকালে দ্বাদশ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। অতঃপর একজন ব্রাহ্মণ-বংশীয় কৌটিল্য তাঁহাদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করেন। তাঁহারা একশত বৎসরকাল পৃথিবী ভোগ করিলে মৌর্য্য-বংশীয়দের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

মৌর্য্য-বংশ।

কৌটিল্য চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব ২৪ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। তৎপুত্র বিন্দুসার ২৫ বৎসর, তৎপুত্র অশোক ৩৬ বৎসর, তৎপুত্র কুনাল ৮ বৎসর রাজত্ব করেন। কুনালের পরবর্ত্তী বংশাবলী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মৎস্যপুরাণের মতে		ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে	
বন্ধুপালিত	৮ বৎসর	বন্ধুপালিত	৮ বৎসর
দশন	৭ "	ইন্দ্রপালিত	৮ "
দশরথ	৮ "	দেবধর্ম্ম	৭ "
সম্প্রতি	৯ "	শতধনু	৮ "
শালিশুক	১৩ "	বৃহদ্রথ	৭ "
দেবধর্ম্ম	৭ "		
শতধন্বা	৮ "		
বৃহদ্রথ	৭০ "		
এই দশ জন মৌর্য্য পূর্ণ ১৩৭ বৎসর পৃথিবী ভোগ করেন। *		এই নয় জন মৌর্য্য পূর্ণ ১৩৭ বৎসর পৃথিবী ভোগ করেন।	

শুঙ্গ-বংশ।

মৌর্য্য-বংশের শেষ নরপতি বৃহদ্রথের সেনাপতি পুষ্পমিত্র স্বামীকে হত্যা করিয়া রাজ্য অধিকার করেন। পুষ্পমিত্রের রাজত্ব ৩৬ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। এই পুষ্পমিত্রের পুত্র অগ্নিমিত্র ৮ বৎসর, তৎপুত্র বসুজ্যেষ্ঠ (মতান্তরে সুজ্যেষ্ঠ) ৭ বৎসর, তৎপুত্র বসুমিত্র ১০ বৎসর, তৎপুত্র অন্ধ্রক ২ বৎসর, তৎপুত্র পুলিন্দক ৩ বৎসর, তৎপুত্র ঘোষবসু ৩ বৎসর, তৎপুত্র বজ্রমিত্র ৯ বৎসর, তৎপুত্র ভাগবত ৩২ বৎসর, তৎপুত্র দেবভূমি বা ভূতি ১০ বৎসর রাজত্ব করেন। এই শুঙ্গ-বংশীয় ১০ জন ভূপতির রাজত্ব একশত বার বৎসর স্থায়ী ছিল।

কণ্ব (শুঙ্গভৃত্য)-বংশ।

বসুদেব-নামা কণ্ব-বংশীয় একজন শুঙ্গ-বংশের অমাত্য ব্যসনাসক্ত শুঙ্গ বংশীয় রাজা দেবভূমি বা ভূতিকে হনন করিয়া নিজেই পৃথিবী ভোগ করেন। তাঁহার রাজত্ব ৯ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। তদীয় পুত্র ভূমিমিত্র ১৪ বৎসর, তৎপুত্র নারায়ণ ১২ বৎসর এবং তৎপুত্র সুশর্ম্মা ১০ বৎসর রাজত্ব করেন। ইঁহারা শুঙ্গভৃত্য কণ্বরাজ নামে কীর্ত্তিত হইতেছেন। এই কণ্ববংশীয় ৪ জন ব্রাহ্মণ ৪৫ বৎসর রাজত্ব ভোগ করিয়াছিলেন। ইঁহারা পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যবর্গকে অধীন করেন এবং ন্যায়পরায়ণ অধিপতি ছিলেন।

* প্রকৃতপক্ষে ১২ জন রাজার নাম প্রদত্ত হইয়াছে।

অন্ধ্র-বংশ।

অন্ধ্র জাতীয় শিপ্রক (মতান্তরে সিমুক অথবা সিন্ধুক) নামের একজন ভৃত্য নিজ বংশীয় সুশর্ম্মার ভৃত্যবর্গ লইয়া কণ্ব বংশীয়দিগকে এবং সুশর্ম্মাকে আক্রমণ করেন এবং শুঙ্গশক্তির অবশিষ্টাংস ধ্বংস করিয়া রাজ্যাধিকারী হন। শিপ্রকের রাজত্ব ২৩ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। শিপ্রকের রাজত্ব-শেষে তদীয় ভ্রাতা কৃষ্ণ সিংহাসনে আরোহণপূর্ব্বক ১০ বংসর রাজত্ব করেন। কৃষ্ণের পরবর্ত্তী বংশতালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

(১)	শ্রীশাতকর্ণি	১০ বৎসর
(২)	পূর্ণোৎসঙ্গ	১৮ „
(৩)	স্কন্ধ অষ্টমন্তি	১৮ „
(৪)	শাতকর্ণি	৫৬ „
(৫)	লম্বোদর	১৮ „
(৬)	দ্বিবিলক (অপিলক)	১২ „
(৭)	মেঘস্বাতি	১৮ „
(৮)	স্বাতি	১৮ „
(৯)	স্কন্ধসাতি	৭ „
(১০)	মৃগেন্দ্র স্বাতিকর্ণ	৩ „
(১১)	কুণ্ডল স্বাতিকর্ণ	৮ „
(১২)	স্বাতিবর্ণ	১ „
(১৩)	পটুমান (পুলোমাভি)	৩৬ „
(১৪)	অরিষ্টকর্ম্মা	২৫ „
(১৫)	হাল	৫ „
(১৬)	পত্তনক (মণ্ডলক)	৫ „
(১৭)	প্রবিল্ল সেন	২১ „
(১৮)	সুন্দর শাতকর্ণি	১ „
(১৯)	চকোর শাতকর্ণি	৬ মাস
(২০)	শিবস্বাতি	২৮ বৎসর
(২১)	গোমতিপুত্র (গৌতমিপুত্র)	২১ „
(২২)	পুলিমান	২৮ „
(২৩)	শাতকর্ণি শিবশ্রী	৭ „
(২৪)	শিবস্কন্ধ শাতকর্ণি	৩ „
(২৫)	যজ্ঞশ্রী শাতকর্ণিকা	২৯ „
(২৬)	বিজয়	৬ „
(২৭)	চন্দ্রশ্রী শাতকর্ণি	১০ „
(২৮)	পুলোমাচি	৭ „

এই ৩০ জন অন্ধ্র রাজার রাজত্ব ৪৬০ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল।

গুপ্ত-বংশ।

গুপ্ত-বংশীয় রাজন্যগণ গঙ্গার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ প্রয়াগ অযোধ্যা (সাকেত) এবং মগধ ভোগ করেন।

কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের পরে মগধে যেসকল রাজবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল অথবা মগধ যেসকল রাজবংশের প্রভুত্বাধীন হইয়াছিল, আমরা তৎসমুদয়ের বিবরণ প্রদান করিলাম। এই-সকল বংশের সমকালে অন্যান্য প্রদেশে যেসকল পুরাতন রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন, অথবা নূতন রাজবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহাদের নাম প্রদত্ত হইতেছে।

(১) ইক্ষ্বাকু (২) কুরু (৩) পাঞ্চাল (৪) বিতিহোত্র (৫) হৈহয় (৬) মৈথিল (৭) কাশী (৮) অশ্মক (৯) সুরসেন (১০) কলিঙ্গ।

(১) বিদিশা, (২) শক (৩) যবন (৪) গর্দ্দভিল (৫) তুসার (৬) আভীর (৭) মুন্দ (মুরুন্দ) (৮) মৌন (হুন) (৯) কৈলকিল যবন।

(১) বাহ্লীক (২) পুষ্পমিত্র (৩) পটুমিত্র (৪) মেকল (৫) মেঘ (৬) নিষধ।

(১) কৈবর্ত্ত (২) কটু (যদু অথবা মদ্রক) (৩) পুলিন্দ (৪) যৎসাদি।

(১) চম্পাবতীর নাগ (২) মথুরার নাগ (৩) মণিধান্য (৪) দেবরক্ষিত (৫) গুহ (৬) কনক (৭) পতিত ব্রাহ্মণ, আভীর ও শূদ্র।

আমরা পুরাণশাস্ত্রধৃত রাজবংশসমূহের বিবরণ পাঠকদিগকে উপহার দিলাম। এই-সমস্ত রাজবংশের রাজত্বকাল যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। পুরাণশাস্ত্রমতে পরীক্ষিতের জন্মের কিঞ্চিদধিক একসহস্র (১০১৫-১০৫০) বৎসর পরে মগধে নন্দবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল। কিন্তু পুরাণশাস্ত্র-অনুসারেই পরীক্ষিতের সমসাময়িক বার্হদ্রথবংশীয় সমাধি এবং তাঁহার অধস্তন একুশজন নরপতি ৯৯০ বৎসর *,

* বার্হদ্রথ-বংশীয় শেষ ১৬ জন নরপতি ৭২৩ বৎসর রাজত্ব করেন বলিয়া লিখিত আছে। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ৫ জন এবং সমাধি মোটের উপর কত রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা লিখিত নাই। তবে তাঁহাদের প্রত্যেকের রাজত্বের যেসময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে ২৬৭ বৎসর পাওয়া যায়। অতএব ২৬৭+৭২৩=৯৯০ বৎসর দাঁড়াইতেছে। কিন্তু বার্হদ্রথ-বংশীয় ৩২ জন নরপতি ১০০০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ২২ জন নরপতির জন্য ৯৯০ বৎসর গেলে ১০ জন নরপতির জন্য মাত্র ১০ বৎসর অবশিষ্ট থাকে। এই সময় একেবারে অসম্ভব, ঐ ১০ জন নরপতির অন্তর্গত মহারাজ জরাসন্ধই সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের উৎকট সাধনাবলে এই-সকল রাজবংশের মনোজ্ঞবিবরণ সংকলিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষের নানাস্থানে অপবংশের অভ্যুদয় দেখিয়া পুরাণকার ঋষিগণ ভীত চিত্তে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, বালক এবং স্ত্রীলোকদিগকে হত্যা করিয়া এবং পরস্পরের হনন দ্বারা রাজন্যগণ কলি-যুগের শেষ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিবেন; অনবরত নূতন নূতন বংশের অভ্যুদয় হইবে, এই-সকল আকস্মিক বংশের উত্থানের সঙ্গে-সঙ্গেই পতন হইবে; এই-সকল বংশের রাজন্যগণ ধর্ম্ম-প্রীতি-এবং-অর্থহীন হইবেন। পুরাণকার-গণের ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হইয়াছে; চতুর্থ শতাব্দী এবং তৎপরবর্ত্তীকালেও অনেক ভারতগৌরব রাজবংশের অভ্যুদয় হইয়াছে। তৎসমুদয়ের সৌষ্ঠবে ভারতবর্ষ অলঙ্কৃত হইয়াছিল। আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতবর্গ অসাধারণ অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমবলে ঐ-সকল রাজবংশ সম্বন্ধেও অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন।*

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

* এইপ্রবন্ধ রচনাকালে নিম্নলিখিত পুস্তক হইতে সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

1. Dynasties of Kali Age (Pargiter)
2. Works of H. H. Wilson, Vols. III & VI
3. কৃষ্ণচরিত (বঙ্কিমচন্দ্র)
4. আরতি (প্রথম খণ্ড)
5. History of India (Sastri)
6. Ancient India (R. C. Dutt)
7. Buddhist India (Rhys Davids)
8. বিষ্ণুপুরাণ (বঙ্গবাসী)
9. শ্রীমদ্ভাগবত (বঙ্গবাসী)
10. মৎস্যপুরাণ (বঙ্গবাসী)
11. Ancient India (Vincent A. Smith)

ধর্ম্মপাল

[নৌকাডুবি হইতে রক্ষা পাইয়া বরেন্দ্রমণ্ডলের মহারাজা গোপালদেব ও তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপাল সপ্তগ্রাম হইতে গৌড় যাইবার রাজপথে যাইতে যাইতে পথে এক ভগ্নমন্দিরে রাত্রিযাপন করেন। প্রভাতে ভাগীরথীতীরে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে দস্যুলুণ্ঠিত এক গ্রামের ভীষণ দৃশ্য ও অরাজকতা দেখাইলেন। সন্ন্যাসীর নিকট সংবাদ আসিল যে গোকর্ণ দুর্গ আক্রমণ করিতে শ্রীপুরের নারায়ণ ঘোষ সসৈন্যে আসিতেছেন; অথচ দুর্গে সৈন্যবল নাই। সন্ন্যাসী তাঁহার এক অনুচরকে পার্শ্ববর্ত্তী রাজাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনার জন্য পাঠাইলেন এবং গোপালদেব ও ধর্ম্মপালদেব দুর্গরক্ষার সাহায্যের জন্য সন্ন্যাসীর সহিত দুর্গে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দুর্গ শীঘ্রই শত্রুর হস্তগত হইল। ঠিক সেই সময়ে উদ্ধারণপুরের দুর্গস্বামী উপস্থিত হইয়া নারায়ণ ঘোষকে পরাজিত ও বন্দী করিলেন। সন্ন্যাসীর বিচারে নারায়ণ ঘোষের মৃত্যুদণ্ড হইল। দুর্গস্বামিনী কন্যা কল্যাণীকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিবার জন্য মহারাজ গোপালদেবকে অনুরোধ করিলেন। গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করার উৎসবের দিন মহারাজের সভায় সপ্ত সামন্ত রাজা উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাসীর পরামর্শক্রমে তাঁহাকে মহারাজাধিরাজ সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিলেন।

গোপালদেবের মৃত্যুর পর ধর্ম্মপাল সম্রাট হইয়াছেন। তাঁহার পুরোহিত পুরুষোত্তম খুল্লতাত-কর্ত্তৃক হৃতসিংহাসন ও রাজ্যতাড়িত কান্যকুব্জরাজের পুত্রকে অভয় দিয়া গৌড়ে আনিয়াছেন। ধর্ম্মপাল তাঁহাকে পিতৃসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এই সংবাদ জানিয়া কান্যকুব্জরাজ গুর্জ্জররাজের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া দূত পাঠাইলেন। পথে সন্ন্যাসী দূতকে ঠকাইয়া তাহার পত্র পড়িয়া লইলেন। গুর্জ্জররাজ সন্ন্যাসীকে বৌদ্ধ মনে করিয়া সমস্ত বৌদ্ধদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিবার উপক্রম করিলেন। এদিকে সন্ন্যাসী বিশ্বানন্দের কৌশলে ধর্ম্মপাল সমস্ত বৌদ্ধকে প্রাণপাত করিয়া রক্ষা করিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন। সম্রাট ধর্ম্মপাল সামন্তরাজাদিগকে সঙ্গে লইয়া কান্যকুব্জ রাজ্য জয় করিতে যাত্রা করিলেন। এই যুদ্ধের মধ্যে গুর্জ্জরেরা গোকর্ণ দুর্গ আক্রমণ করিতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে জানিয়া ধর্ম্মপাল তাঁহার বাগ্‌দত্তা পত্নী কল্যাণীকে লইয়া প্রস্থান করিলেন; পথে কল্যাণী অপহৃত ও ধর্ম্মপাল আহত হইয়া বন্দী হইয়াছিলেন। পরে ধর্ম্মপাল কল্যাণীকে লইয়া সেখান হইতে পলায়ন করিয়া নিজের সেনাদলে মিলিত হইয়াছেন। মহারাজ ধর্ম্মপালের সহিত কল্যাণী দেবীর বিবাহের উৎসব আরম্ভ হইয়াছে এমন সময় গুর্জ্জরযুদ্ধে ধর্ম্মপালকে সাহায্যকারী রাষ্ট্রকূটরাজের দূত আসিয়া ধর্ম্মপালকে রাষ্ট্রকূটরাজকন্যার পাণিগ্রহণের অনুরোধ জানাইল। ধর্ম্মপাল প্রবলপরাক্রম রাষ্ট্রকূটরাজের এই প্রস্তাব বিনীত ভাবে প্রত্যাখ্যান করিলেন। ক্রুদ্ধ রাষ্ট্রকূটরাজ ধর্ম্মপালের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন।]

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আহ্বান।

গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের পট্টমহাদেবী হইয়াও কল্যাণীদেবীর মুখে হাসি ছিল না, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহারই জন্য ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রকূটরাজের সহিত বিবাদ করিয়াছেন। যাহাদিগের আত্মীয় স্বজন যুদ্ধে গিয়াছিল, অথবা যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তাহারা প্রকাশ্যে কিছু বলিত না বটে কিন্তু কল্যাণী অন্তরে বুঝিতে পারিতেন যে সহস্র সহস্র কন্যা পত্নী ও মাতার অভিশাপ প্রতিনিয়ত তাঁহার শিরে বর্ষিত হইতেছে।

যাহারা স্বেচ্ছায় মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া, গৌড়মণ্ডলের দ্বার রুদ্ধ করিতে ভীষ্মদেবের সহিত মণ্ডলায় গিয়াছিল, তাহা-দিগের সংখ্যা পঞ্চ সহস্রের অধিক নহে। অবশিষ্ট সেনা

লইয়া গৌড়েশ্বর গৌড়নগরী রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। অস্ত্রধারণক্ষম পুরুষ ব্যতীত বৃদ্ধ বালক ও রমণীগণকে দূরবর্ত্তী গ্রামসমূহে প্রেরণ করা হইল, তিন বৎসরের উপযোগী শস্য সংগৃহীত হইল এবং ভাগীরথী ও কালিন্দী হইতে প্রাকার-বেষ্টিত নগরমধ্যে পানীয় জল আনয়নের জন্য পয়ঃপ্রণালী খাত হইল। গৌড়নগরী সুরক্ষিত করিয়া ধর্ম্মপাল রাজবংশীয়া মহিলাগণকে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন। স্থির হইল যে, উত্তররাঢ়মণ্ডলে ঢেক্করীয় দুর্গে দেদ্দদেবী ও কল্যাণীদেবী বাস করিবেন। যাত্রাদিনে মাতা ও পত্নী উভয়েই অবরোধকালে গৌড়নগর ত্যাগ করিতে অসম্মত হইলেন। ধর্ম্মপাল কোনও উপায়ে তাঁহাদিগকে সম্মত করিতে না পারিয়া অবশেষে মণ্ডলা রক্ষার জন্য দ্বিতীয় সেনাদলসংগ্রহে মনঃসংযোগ করিলেন।

মণ্ডলার জন্য যে দ্বিতীয় সেনাদল সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা দ্বিসহস্রের অধিক নহে। গৌড়েশ্বর স্বয়ং সেই সেনা লইয়া মণ্ডলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যে দিন প্রভাতে ধর্ম্মপাল গৌড়নগর ত্যাগ করিলেন, সেই দিন কল্যাণীদেবী প্রাসাদশীর্ষে দাঁড়াইয়া গতিশীল গৌড়ীয় সেনার ধ্বজলাঞ্ছন পতাকা স্থির দৃষ্টিতে দেখিতেছিলেন। এমন সময়ে অমলাদেবী পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাঁহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিলেন, কল্যাণী চমকিয়া উঠিলেন। অমলা কহিলেন, "মহাদেবি, ভাবিয়া কি হইবে! চল স্নান করিতে যাই।"

কল্যাণী।—দিদি, আপনি আমাকে মহাদেবী বলেন কেন? আমার বড় লজ্জা করে।

"তবে কি বলিয়া ডাকিব?"

"কেন, কল্যাণী বলিয়া।"

"তাহাও কি কখনও হয়!"

"কেন হইবে না?"

"তুমি এখন গৌড়সাম্রাজ্যের পট্টমহাদেবী; তোমাকে নাম ধরিয়া ডাকিলে লোকে আমাকে পাগল বলিবে।"

"দিদি! আমাকে মহাদেবী বলিয়া ডাকিলে, আমার বক্ষের মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠে—তখনই আমার মনে হয় যে, আমার জন্য শ্বশুরকুলের সর্ব্বনাশ হইতেছে, স্বামীর সর্ব্বনাশ হইতেছে, রাজ্য উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, শত সহস্র প্রজার জীবন নাশ হইতেছে। প্রতিদিন গৃহে গৃহে সহস্র সহস্র পুত্রহীনা মাতা, পতিহীনা বিধবা, পিতৃহীনা পুত্রকন্যা আমাকে অভিসম্পাত করিতেছে। দিদি, আমি গৌড়রাজ্যের দোষগ্রহ।"

"ছি, ওকথা বলিতে নাই, তুমি রাজ্যের লক্ষ্মী। পূজার বিলম্ব হইয়া যায়, তোমার শাশুড়ী হয়ত তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, চল স্নানে যাই।"

উভয়ে প্রাসাদ-শিখর হইতে নিম্নতলে নামিয়া আসিলেন। অসংখ্য দাসী মহল্লিকা ও পুরমহিলা-পরিবৃতা হইয়া গৌড়েশ্বরী গঙ্গাস্নানে চলিলেন। প্রাসাদের যে ঘাটে একদিন ধর্ম্মপালদেব ভণ্ডীরবংশধর চক্রায়ুধকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন, মহিলাগণ সেই ঘাটে স্নান করিতে নামিলেন। সর্ব্বাগ্রে পট্টমহাদেবীর স্নান শেষ হইল। কল্যাণীদেবী আর্দ্র বসনে ঘাটের উপরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সহসা আম্রবৃক্ষের ছায়া হইতে একটি কৃষ্ণকায় অন্ধবালক বাহির হইয়া ডাকিল, "মা, তুমি কোথায় মা!" কল্যাণীদেবী বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে বাবা?"

"আমি কাণা।"

"তুমি কি চাও?"

"কিছু না, কেবল তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি, তুমি কবে যাইবে মা?"

"কোথায় যাইব বাবা?"

"যেখানে শোক দুঃখ জরা মৃত্যু নাই।"

"সে কোথায়?"

"তাহা জানি না; কে যেন বলিল সকলে সেখানে যাইতে পায় না, তবে তুমি যাইবে।"

"বালক তুমি কে?"

"আমি অন্ধ।"

"তোমার নাম কি?"

"কেউ অন্ধ বলিয়া ডাকে, কেউ কাণা বলিয়া ডাকে। আর ত কোন নাম নাই মা।"

"তোমার কে আছে?"

"এই তুমি যেমন মা আছ, এমনি আমার কত মা, কত বাপ আছে।"

উভয়ে কথা কহিতে কহিতে ভাগীরথী-তীরস্থ আম্র-

কাননে প্রবেশ করিলেন। পট্টমহাদেবী আসিতেছেন দেখিয়া কাননরক্ষী মহল্লিকাগণ দূরে সরিয়া গেল। এক বিশালকায় প্রাচীন সহকার বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়া গৌড়েশ্বরী অন্ধবালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, শোক নাই, দুঃখ নাই, সে কোন দেশ ?" বালক কহিল, "মা, সে দেশ কোন পথে তাহা জানি না, তবে সে বলিয়াছে যে, সে দেশ আছে, সে তোমার দেশ, সে তোমার রাজ্য, সে রাজ্যের সিংহাসন শূন্য পড়িয়া আছে, তুমি তাহা পূর্ণ করিবে।"

"কে বলিল, কে সে ?"

"সে একজন, সে কে তাহা জানি না, তাহার রূপ রস গন্ধ নাই; তবে সে একজন আছে মা। যে অন্ধকে পথ দেখাইয়া দেয়, পদে কণ্টকটি পর্য্যন্ত বিদ্ধ হইতে দেয় না, দাসের মত ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল যোগাইয়া দেয়, সে সেই। তাহাকে দেখি নাই, তাহাকে স্পর্শ করি নাই, দূর হইতে শুষ্ক পত্রের মর্ম্মরধ্বনির মত তাহার বাক্য আমার কানে আসিয়া পৌছে, আমি শুনিয়াছি, দেখি নাই।"

"সেই কি তোমাকে পাঠাইয়া দিয়াছে ? সে কি বলিল ?"

"এই মাত্র সে বলিয়া গেল যে, মা তুমি গঙ্গাস্নান করিতেছ, তুমি যখন স্নান করিয়া উঠিবে, তখন তোমাকে এই কথা বলিতে বলিয়া গেল; মা! তুমি শীঘ্র তোমার দেশে যাইবে। তোমার রাজ্যে যাইবে, তাহারা তোমাকে লইতে আসিবে। তোমার স্বামীর মনে ব্যথা লাগিবে, তোমার পিতার বৃদ্ধ ভৃত্যের মনে ব্যথা লাগিবে, কিন্তু তুমি তাহাতে ব্যথিত হইও না। সর্ব্বজগতের হিতসুখের জন্য তোমার জন্ম। তুমি কায়া পরিত্যাগ করিলে, তোমার জন্ম-জন্মান্তরার্জ্জিত পুণ্যফলে গৌড়দেশ উদ্ধার হইবে, গৌড়-বাসীর দুঃখশোকের উপশম হইবে। সে বলিয়াছে, তুমি ভয় পাইও না, তোমার পদে কুশাঙ্কুরও বিঁধিবে না। মা! তুমি এদেশের নহ, এ জগতের নহ; তোমার দেশ, তোমার জগত তোমার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে, এদেশে বড় দুঃখ, বড় কষ্ট, তুমি শীঘ্র চলিয়া যাইবে।"

"যাইব বাপ; তাহাকে জিজ্ঞাসা করিও আমি চলিয়া গেলে কি আমার শ্বশুরবংশের অমঙ্গল দূর হইবে? গৌড়রাজ্যে আবার শান্তি ফিরিয়া আসিবে? গৌড়বাসীর শোকদুঃখ বিমোচন হইবে!"

"হাঁ মা, সে তাহাও বলিয়াছে,—যেদিন তুমি গৌড়-বাসীর জন্য আত্মোৎসর্গ করিবে, এ জগৎ সেইদিন শান্ত হইবে, তোমার পুণ্যধারায় অগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে। আমি যাই মা, তুমি আসিও, আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। সে ডাকিতেছে, আমি যাই।"

অন্ধবালক নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া পালাইল, কল্যাণী বৃক্ষ-তলে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার সমস্ত শরীর কম্পিত হইতে লাগিল।

এই সময়ে বিশ্বানন্দ উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া ঘাটের উপরে দাঁড়াইলেন এবং অতি ব্যস্তভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। দূরে একজন মহল্লিকা দাঁড়াইয়া-ছিল, তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই স্থানে এক অন্ধ বালককে দেখিয়াছ?" মহল্লিকা কহিল, "কই প্রভু না।" বিশ্বানন্দ তাহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কল্যাণী কোথায়?" উত্তর হইল, "পট্টমহাদেবী স্নান করিয়া এইমাত্র আম্রকাননে প্রবেশ করিয়াছেন।" তখন বিশ্বানন্দের আহ্বানে পরিচারিকা মহল্লিকা ও পুরমহিলা-গণ কল্যাণীর সন্ধানে ছুটিলেন। সর্ব্বাগ্রে বিশ্বানন্দ দেখিতে পাইলেন যে, সহকারতলে বেতসীলতার ন্যায় কম্পমানা গৌড়েশ্বরী কল্যাণীদেবী দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, কি হইয়াছে?" কল্যাণী উত্তর না দিয়া চক্ষু মার্জ্জনা করিলেন। বিশ্বানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, দক্ষিণাপথ হইতে ফিরিবার সময়ে এক অন্ধ অনাথ বালককে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলাম, সে কি তোমার নিকট আসিয়াছিল?"

"হাঁ পিতা, আসিয়াছিল।"

"সর্ব্বনাশ, কল্যাণি! সে তোমাকে কি বলিয়া গিয়াছে?"

"মঙ্গলসংবাদ পিতা। সে বলিয়া গিয়াছে যে আমার আহ্বান আসিয়াছে; স্বামীর মঙ্গলের জন্য, শ্বশুরকুলের মঙ্গলের জন্য, গৌড়রাজ্য ও গৌড়বাসীর শোকদুঃখ নিবার-ণের জন্য আমাকে যাইতে হইবে। পিতা আমি মোহমুগ্ধা, সে কোন পথ? আমাকে পথ দেখাইয়া দিন।"

সহসা বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বালকের ন্যায় রোদন করিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন, "মা, সে কোন্ পথ, সে কিসের পথ এবং কে আহ্বান করিল—এ ষষ্টিবর্ষ বয়সেও তাহা বুঝিতে পারি নাই। তোমার রাজ্য, তোমার সিংহাসন, তোমার স্বামী, তোমার ঐশ্বর্য্যসম্পদ ফেলিয়া কোথায় যাইবে মা ?"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মণ্ডলার যুদ্ধ

একপার্শ্বে গঙ্গা, অপরপার্শ্বে গগনস্পর্শী বিন্ধ্যপর্ব্বত, মধ্য দিয়া সঙ্কীর্ণ পথ ; এই পথ মগধ ও অঙ্গ হইতে গৌড়ে আসিবার একমাত্র পথ। এই স্থানের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে পথ বিন্ধ্যের পৃষ্ঠ লঙ্ঘন করিয়া আসিয়াছে, সেইস্থানে গিরিশীর্ষে প্রস্তরনির্ম্মিত ভীষণদর্শন মণ্ডলাদুর্গ অবস্থিত। লোকে বলিত দুর্গ হইতে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটে গৌড়-আক্রমণকারী সেনার গতিরোধ করা যায়।

এক দিন দিবসের প্রথম প্রহরে একজন অশ্বারোহী গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়া দুর্গের নিম্নে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বক্র পার্ব্বত্যপথ অবলম্বন করিয়া দুর্গে উঠিতে লাগিল। তোরণের রক্ষীগণ তাহার পরিচয় গ্রহণ করিয়া তোরণ মুক্ত করিল, অশ্বারোহী দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। সেই সময়ে উদ্দণ্ডপুরের মহাসামন্ত বৃদ্ধ মহানায়ক ভীষ্মদেব দুর্গপ্রাঙ্গণে উপবিষ্ট ছিলেন, অশ্বারোহী তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিল, "মহারাজ, রাষ্ট্রকূটসেনা কল্য সন্ধ্যাগমে চম্পানগর অধিকার করিয়াছে, তাহারা অদ্য মণ্ডলা আক্রমণ করিতে যাত্রা করিবে।" ভীষ্মদেব কহিলেন, "উত্তম। নগরপ্রবেশকালে কেহ বাধা দিয়াছিল কি ?" "না ; নাগরিকগণ আপনার আদেশে নগরপ্রতীহারকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল,রাষ্ট্রকূটরাজ নগরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে মুক্তি দিয়াছেন।"

"রাষ্ট্রকূটসেনার সেনাপতি কে ?"

"রাষ্ট্রকূটরাজ গোবিন্দ স্বয়ং এবং তাঁহার ভ্রাতা কক্করাজ।"

"উত্তম ; তুমি বিশ্রাম কর।"

ক্ষণকালপরে ভীষ্মদেবের আদেশে দুর্গরক্ষী দশসহস্র সেনা প্রাঙ্গণে সমবেত হইল। বৃদ্ধ মহানায়ক প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "বন্ধুগণ, কল্য প্রাতে মণ্ডলাদুর্গ শত্রুসেনা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবে। দুর্গমধ্যে দশসহস্রের উপযোগী সপ্তাহের মাত্র আহার্য্য সঞ্চিত আছে, সুতরাং অর্দ্ধাশনে থাকিলেও পঞ্চদশ দিনের অধিককাল দুর্গরক্ষা করা অসম্ভব। এখনও যাহারা ফিরিয়া যাইতে চাহে, তাহারা ফিরিয়া যাউক। যাহারা রাষ্ট্রকূটযুদ্ধে মণ্ডলা রক্ষা করিবে, তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে না, সুতরাং এই যুদ্ধে প্রত্যাবর্ত্তন নাই। এই যুদ্ধে এই গিরিসঙ্কটে গৌড়সাম্রাজ্যের ভাগ্যপরীক্ষা হইবে। যাহার প্রাণের মমতা আছে, পুনরায় আত্মীয়স্বজনের মুখ দেখিবার অভিলাষ আছে, তাহাদিগের জন্য তোরণ এখনও মুক্ত আছে ; যাহারা দুর্গরক্ষা করিতে থাকিবে, তাহারা প্রস্তুত হউক। বন্ধুগণ, কল্যকার যুদ্ধে গৌড়েশ্বরের জয় হইতে পারে কিন্তু আমাদিগের প্রত্যাবর্ত্তন নাই।"

দশসহস্রের মধ্যে একজন সেনাও উত্তর দিল না। একজন গৌড়ীয় ও একজন মাগধ সেনানীশ্রেণী হইতে অগ্রসর হইয়া মহানায়ককে অভিবাদন করিল এবং কহিল, "মহারাজ, যাহারা আপনার সহিত মণ্ডলা রক্ষা করিতে আসিয়াছে, তাহাদিগের কেহই প্রত্যাবর্ত্তনের আশা রাখে না, দশসহস্রের মধ্যে একজনও দুর্গ পরিত্যাগ করিবে না।"

সন্ধ্যাকালে বিন্ধ্যের পাদমূলে সহস্র সহস্র অগ্নিকুণ্ড জ্বলিয়া উঠিল। রাষ্ট্রকূটসেনা আসিয়াছে দেখিয়া ভীষ্মদেব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। পরদিন প্রত্যূষে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে রাষ্ট্রকূটসেনা দুর্গ আক্রমণ করিল। সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্য পথে একত্র অধিক সেনার সমাবেশ অসম্ভব, এইজন্য দিবসের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রহরে রাষ্ট্রকূটসেনা দুর্গের দিকে অগ্রসর হইতে পারিল না। মুষ্টিমেয় গৌড়ীয় ও মাগধসেনা বারবার তাহাদিগকে পরাস্ত করিল। তখন রাষ্ট্রকূট সেনানায়কগণ গিরিসঙ্কটের চতুষ্পার্শ্বস্থিত পর্ব্বতশীর্ষগুলি অধিকারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, সহস্র সহস্র রাষ্ট্রকূটসেনা পর্ব্বতের নানাস্থান আক্রমণ করিল। ভীষ্মদেবের অধীনে দশসহস্রের অধিক সেনা ছিল না, তিনি গিরিসঙ্কট ও দুর্গরক্ষার জন্য দ্বিসহস্র সেনা রাখিয়া অবশিষ্ট পর্ব্বতশীর্ষসমূহে সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। বৃহদাকার প্রস্তরাঘাতে শত শত রাষ্ট্রকূটসেনা নিহত হইল, সহস্র সহস্র আহত

হইল, তথাপি গৌড়ীয়সেনা পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল। একজন রাষ্ট্রকূট নিহত হইলে দশজন তাহার স্থান অধিকার করে, কিন্তু একজন গৌড়ীয় বা মাগধ হত হইলে তাহার মৃতদেহ বহন করিবার লোকাভাব হয়। সন্ধ্যার পূর্ব্বে গৌড়ীয়সেনা মণ্ডলাদুর্গের পশ্চিমদিকের গিরিশীর্ষসমূহ হইতে তাড়িত হইল। তখন রাষ্ট্রকূট সেনা সাহস পাইয়া গিরিসঙ্কট আক্রমণ করিল। ভীষ্মদেব দেখিলেন যে, গিরিসঙ্কট রক্ষা করিতে হইলে বহু বলক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। তিনি গৌড়ীয় সেনাকে দুর্গমধ্যে ফিরিয়া আসিতে আদেশ করিলেন এবং হতাবশিষ্ট মাগধসেনা গৌড়ের পথ রক্ষার্থ নিযুক্ত করিলেন।

সন্ধ্যা হইল, যুদ্ধ থামিল না। সহস্র সহস্র উল্কা জ্বলিয়া উঠিল। রাষ্ট্রকূটগণ গিরিসঙ্কটে প্রবেশাধিকার পাইয়া একই সময়ে দুর্গ ও গৌড়ের পথ আক্রমণ করিল। এইবার স্রোত ফিরিল। অন্ধকারে মুষ্টিমেয় গৌড়ীয়সেনা দুর্গের নিম্নে গিরিসঙ্কটে রাষ্ট্রকূটগণকে বার বার পরাজিত করিল। গোবিন্দ বুঝিলেন যে, অন্ধকারে মণ্ডলাদুর্গ অধিকার করা তাঁহার সাধ্যাতীত। তখন ভীষ্মদেবের অর্দ্ধাধিক সেনা হত ও আহত হইয়াছে, অনুমান দ্বিসহস্র সেনা দুর্গমধ্যে এবং সার্দ্ধদ্বিসহস্র দুর্গের পশ্চাতে গিরিসঙ্কটে অবস্থান করিতেছিল।

দ্বিপ্রহর রাত্রিতে দুর্গাধিকার অসম্ভব দেখিয়া রাষ্ট্রকূটরাজ যখন রাত্রির মত যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইতেছেন, তখন সহসা মণ্ডলাদুর্গের পশ্চাতে গঙ্গাতীরে পর্ব্বতশীর্ষে সহস্র সহস্র উল্কা জ্বলিয়া উঠিল। উল্লাসে রাষ্ট্রকূটসেনা গর্জ্জন করিয়া উঠিল, জয়ধ্বনিতে পর্ব্বতশ্রেণী কম্পিত হইল। চারিসহস্র গৌড়ীয় বীর প্রমাদ গণিল। গোবিন্দ অপরাহ্নে দশসহস্র সেনার সহিত একজন নায়ককে বিন্ধ্যের পৃষ্ঠে অপরপথ সন্ধানের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। মণ্ডলার পশ্চাতে গিরিশীর্ষে উল্কার আলোক দেখিয়া রাষ্ট্রকূটসেনা ভাবিল যে, তাহাদিগের সঙ্গীগণ অন্যপথে পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া মণ্ডলা আক্রমণ করিতে আসিতেছে। গৌড়ীয় ও মাগধগণ জানিত যে, তাহাদিগকে সাহায্য করিবার কেহই নাই; তাহারা ভাবিল যে অন্ধকারে দুরারোহ পর্ব্বতশীর্ষ অতিক্রম করিয়া আর-একদল রাষ্ট্রকূট সেনা পশ্চাৎ হইতে দুর্গআক্রমণ করিতে আসিতেছে। যুদ্ধব্যবসায়ে পক্বকেশ ভীষ্মদেব ভাবিলেন যে, সম্মুখে রাষ্ট্রকূট ও পশ্চাতে রাষ্ট্রকূট, সুতরাং যুদ্ধ শেষ হইয়া আসিয়াছে।

বৃদ্ধ মহানায়ক একবার গৌড়ের দিকে চাহিয়া অশ্রুমোচন করিলেন; তাহার পরে নায়কগণকে কহিলেন, "বন্ধুগণ, যাহা হইয়াছে তাহা তোমরা বুঝিতে পারিতেছ। অতঃপর গিরিসঙ্কট রক্ষা করা অসম্ভব। আমরা দুর্গে বসিয়া থাকিলে হয়ত রাষ্ট্রকূটগণ সপ্তাহকাল আমাদিগের কিছুই করিতে পারিবে না, কিন্তু তাহা হইলে গোবিন্দ দুর্গ অবরোধের জন্য সামান্য সেনা রাখিয়া অবশিষ্ট সেনা লইয়া আমাদের সম্মুখ দিয়া গৌড় আক্রমণ করিতে চলিয়া যাইবেন।

এই সময়ে মণ্ডলার পশ্চাতে বহু সেনা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। ভীষ্মদেব ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আর সময় নাই, পশ্চাতের শত্রুসেনা দুর্গের নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। বন্ধুগণ, আমরা যে কয়জন আছি, সেই কয়জন আজি মণ্ডলা শত্রুশূন্য করিয়া মরিব।" মহানায়কের সম্মুখে একজন সেনানায়ক দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দ্বিসহস্র সেনা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। ভীষ্মদেব সেনানায়ককে কহিলেন, "গুরুদত্ত, দুর্গে অগ্নি সংযোগ কর।" গুরুদত্তের আদেশে দুর্গের বাসগৃহসমূহের শত শত স্থানে শত শত উল্কা সংযুক্ত হইল, দেখিতে দেখিতে মণ্ডলাদুর্গ ভীষণ অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হইল।

সশব্দে দুর্গের একমাত্র তোরণ মুক্ত হইল। গিরিসঙ্কটের গৌড়ীয়সেনা ও রাষ্ট্রকূটসেনা বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখিল যে, অশীতিপর মহানায়ক গুরুভার চক্রধ্বজ দক্ষিণহস্তে ধারণ করিয়া বিংশতি বর্ষীয় যুবকের ন্যায় লম্ফে লম্ফে সোপানশ্রেণী দিয়া অবতরণ করিতেছেন। তাহা দেখিয়া তাহারা সিংহনাদ করিয়া উঠিল, সম্মুখের রাষ্ট্রকূটসেনা ভয়ে দুইপদ হটিয়া গেল। রাত্রি ঘোর অন্ধকার, মণ্ডলার দুর্গশীর্ষের অগ্নিশিখা গগনস্পর্শ করিতেছিল, সেই আলোকে সমস্ত গৌড়ীয়সেনা বিদ্যুৎবেগে শত্রুসেনার উপরে গিয়া পড়িল। রাষ্ট্রকূটসৈন্য পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল! স্বয়ং গোবিন্দ আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন, তথাপি গৌড়ীয়সেনার গতিরোধ হইল না। রাষ্ট্রকূটসেনা সিংহবিক্রমে যুদ্ধ করিতে

লাগিল কিন্তু সেই মুষ্টিমেয় গৌড়ীয় সেনার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিল না। তিন দিক হইতে সহস্র সহস্র রাষ্ট্রকূট আসিয়া সেই চারি সহস্র গৌড়ীয় ও মগধবীরকে আক্রমণ করিল, তথাপি তাহাদিগের গতিরোধ হইল না। গোবিন্দ স্বয়ং ধীরে ধীরে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিলেন।

চারি সহস্রের মধ্যে যখন চারিশতও অবশিষ্ট নাই, তখন গিরিসঙ্কট শত্রুশূন্য হইল। রাত্রির তৃতীয়প্রহর শেষ হইয়াছে, দুর্গশীর্ষে অগ্নি ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছে, এই সময়ে বৃদ্ধ মহানায়ক ভীষ্মদেব গিরিসঙ্কটের পশ্চিমমুখে সহসা ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন। গুরুদত্ত তাঁহার পশ্চাতে ছিলেন, তিনি বৃদ্ধের মস্তক অঙ্কে গ্রহণ করিয়া উপবেশন করিলেন। বৃদ্ধের দেহে ত্রয়োদশ স্থান হইতে অস্ত্রাঘাত-জনিত রক্তস্রাব হইতেছিল, তথাপি তিনি কহিলেন, "গুরুদত্ত, চক্রধ্বজ তুলিয়া ধর, তাহা না দেখিতে পাইলে সেনাগণ হতাশ্বাস হইবে। উঠ, আমার স্থান গ্রহণ কর। সেনাগণকে বলিও যে, একজন সেনা জীবিত থাকিতেও যেন যুদ্ধ শেষ না হয়।" বৃদ্ধ এই বলিয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ঢলিয়া পড়িলেন। অবশিষ্ট সেনা ও সেনানীগণ শান্তনুনন্দন-তুল্য সত্যব্রত বৃদ্ধ মাগধ মহানায়কের মৃতদেহের চারিপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, সেই সময়ে রাষ্ট্রকূটসেনা পুনরায় ভীষণবেগে গিরিসঙ্কটের মুখ আক্রমণ করিল। সৈনিকগণ মৃতসেনানায়কের দেহ পশ্চাতে রাখিয়া গিরিসঙ্কট রক্ষার্থ ছুটিল, গুরুদত্ত গুরুভার চক্রধ্বজ স্কন্ধে তুলিয়া দাঁড়াইলেন। ভীষণ বেগে চারিশত বীর রাষ্ট্রকূট সেনা আক্রমণ করিল। রাষ্ট্রকূটগণ সে আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিল।

চতুর্থ প্রহরের শেষে পূর্ব্বাকাশে যখন উষার আলোক দেখা গিয়াছে, তখন রক্তস্রাবে ক্ষীণ দীর্ঘযুদ্ধে পরিশ্রান্ত দ্বাবিংশ জন গৌড়ীয় ও মাগধসেনা চক্রধ্বজের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। দুর্গশীর্ষে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে, ভস্মাবশেষ হইতে রাশি রাশি ধূম নির্গত হইতেছে, উষার আলোকে বিন্ধ্যের নীল শিখরগুলি শুভ্র হইয়া উঠিয়াছে, আকাশের মেঘগুলি রক্তবর্ণ হইয়াছে। দশসহস্রের অবশিষ্ট দ্বাবিংশজন চক্রধ্বজ বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। গুরুদত্তের দেহে তখন বহু অস্ত্রাঘাত হইয়াছে, চক্রধ্বজ টলিতেছে। গৌড়ীয়গণ একহস্তে চক্রধ্বজ ও অপরহস্তে অসি ধারণ করিয়া শেষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। এই সময়ে মণ্ডলাদুর্গের সোপানাবলীর নিম্নে একজন অশ্বারোহী আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার পশ্চাতে বহুসেনা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। তখন চতুর্দ্দশজন গৌড়ীয় অবশিষ্ট আছে, তাহারা চক্রধ্বজ রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল। ক্ষীণস্বরে গৌড়েশ্বরের জয়ধ্বনি উচ্চারিত হইল। অশ্বারোহী অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "উদ্ধব, এ যে চক্রধ্বজ?" ধর্ম্মপাল ও উদ্ধবঘোষ অগ্রসর হইয়া আসিলেন, পশ্চাতে শত শত গৌড়ীয় সেনা গৌড়েশ্বরের নাম গ্রহণ করিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। চতুর্দ্দশজন গৌড়ীয়সেনা গৌড়েশ্বরকে অভিবাদন করিল। গুরুদত্ত টলিতে টলিতে গৌড়েশ্বরের নিকটে আসিয়া তাঁহার হস্তে চক্রধ্বজ প্রদান করিলেন। গৌড়-সাম্রাজ্যের তোরণ রক্ষিত হইল, কিন্তু দশসহস্রের মধ্যে চতুর্দ্দশজন সেনা অবশিষ্ট ছিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

তোরণরক্ষা

অশ্রুঅন্ধনয়নে চক্রধ্বজ গ্রহণ করিয়া গৌড়েশ্বর অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং ভীষ্মদেবের মৃতদেহ দেখিতে চাহিলেন। একজন আহত সৈনিক দূরস্থিত মৃতদেহের স্তূপ দেখাইয়া দিল। ধর্ম্মপাল চক্রধ্বজ লইয়া বৃদ্ধ মহানায়কের শবের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। পঞ্চসহস্র গৌড়ীয় সেনা পর্ব্বত পার হইয়া গিরিসঙ্কটের মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। উদ্ধবঘোষ সম্রাটের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি কহিলেন, "মহারাজ, শত্রুসেনা এখনই হয়ত আক্রমণ করিবে, মহানায়কের দেহ সৎকার করিতে আদেশ করুন।" সহসা গৌড়েশ্বরের মুখশ্রী পরিবর্ত্তিত হইল, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "উদ্ধব, ভীষ্মদেবের দেহের সৎকার আমি করিব না, আমার পরে যিনি গৌড়েশ্বর হইবেন, ইহা তাঁহার কার্য্য। উদ্ধব, আমার জন্য দশসহস্র গৌড়ীয় বীর জীবন পণ করিয়া এই গিরিসঙ্কট রক্ষা করিতে আসিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে চতুর্দ্দশজন মাত্র অবশিষ্ট আছে। তুমি কি ভাবিতেছ আমি গৌড়ে ফিরিব? আজি এই মণ্ডলায় গৌড়রাষ্ট্রকূটদ্বন্দ্ব শেষ করিয়া যাইব—আজি যুদ্ধের শেষ দিন।"*

সম্রাটের কথা শুনিয়া বৃদ্ধের নয়নদ্বয় জ্বলিয়া উঠিল, উদ্ধবঘোষ কহিলেন, "মহারাজ, সে ত আনন্দের কথা; উঠুন বিলম্বে প্রয়োজন নাই, অদ্যই যুদ্ধ শেষ হইবে।" উভয়ে ভীষ্মদেবের মৃতদেহ পরিত্যাগ করিয়া গিরিসঙ্কটের মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ধর্ম্মপাল বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, দূরে বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালে রাষ্ট্রকূটশিবিরে যুদ্ধের উদ্যম বা উৎসাহ নাই, শিবির নীরব। কিঞ্চিদ্দূরে দুইজন অস্ত্রহীন ব্যক্তি নগ্নশীর্ষে, নগ্নপদে গিরিসঙ্কটের দিকে আসিতেছে। তাহারা নিকটে আসিয়া বস্ত্রখণ্ডদ্বারা স্ব স্ব চক্ষু আবদ্ধ করিল। গৌড়ীয় সেনাগণ তাহাদিগকে দূত বলিয়া বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগকে নিকটে লইয়া আসিল। গৌড়েশ্বর তাহাদিগের চক্ষুর বন্ধন খুলিয়া দিতে আদেশ করিলেন। তখন তাহারা কহিল, "আমরা মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ, দক্ষিণাপথরাজ গোবিন্দের আদেশে গৌড়ীয় সেনাপতির নিকটে আসিয়াছি; আমাদিগকে সেনাপতিসকাশে লইয়া চলুন।"

একজন সৈনিক কহিল, "ব্রাহ্মণ, মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর স্বয়ং তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান।"

"রাজাধিরাজ গৌড়েশ্বরের জয় হউক।"

গৌড়েশ্বর তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি চাহ?"

"কল্য রাত্রিতে যিনি মণ্ডলা রক্ষা করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহি।"

"কেন?"

"দক্ষিণাপথেশ্বর গোবিন্দ তাঁহার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন।"

"মগধের অধীশ্বর মহানায়ক ভীষ্মদেব কল্য মণ্ডলাদুর্গ ও গিরিসঙ্কট রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ! গোবিন্দ তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবেন না, ভীষ্মদেব বহুদূরে গমন করিয়াছেন।" ধর্ম্মপাল ব্রাহ্মণদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া ভীষ্মদেবের মৃতদেহের নিকটে গেলেন। তখন সৈনিকগণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে শত শত শূল ও বর্শা সংগ্রহ করিয়া ভীষ্মদেবের জন্য শয্যা-রচনা এবং শয্যার পার্শ্বে চিতা-রচনা করিতেছিল। ব্রাহ্মণদ্বয় শব দেখিয়া অধোবদন হইল এবং গৌড়েশ্বরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্ব-শিবিরে ফিরিল।

দুইদণ্ড পরে একজন সৈনিক আসিয়া গৌড়েশ্বরকে সংবাদ দিল যে, ব্রাহ্মণদ্বয় পুনরায় গিরিসঙ্কটের দিকে আসিতেছে। ধর্ম্মপাল কহিলেন, "তাহাদিগকে লইয়া আইস।" কিয়ৎক্ষণ পরে ব্রাহ্মণদ্বয় আসিলে, গৌড়েশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ?" তাহারা আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল, "গৌড়েশ্বর জয়যুক্ত হউন। মহারাজাধিরাজ গোবিন্দ গৌড়েশ্বরের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন; অনুমতি পাইলে একাকী নিরস্ত্র অবস্থায় গৌড়েশ্বরের সকাশে উপস্থিত হইবেন।" ধর্ম্মপাল বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কি জন্য?"

"মহারাজ, আমরা তাহা অবগত নহি।"

"উত্তম।"

ব্রাহ্মণদ্বয় প্রস্থান করিল। দুইদণ্ড পরে একজন সৈনিক আসিয়া কহিল, "দুই ব্যক্তি রাষ্ট্রকূটশিবির হইতে গিরিসঙ্কটের দিকে আসিতেছে।" ধর্ম্মপাল এক বৃক্ষতলে তৃণক্ষেত্রে উপবেশন করিয়া ছিলেন, তিনি সৈনিকের কথা শুনিয়া গিরিসঙ্কটের মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গৌড়েশ্বর দেখিতে পাইলেন যে, শুভ্র-কৌষেয়বসন-পরিহিত একজন দীর্ঘাকার গৌরবর্ণপুরুষ শিবিরের দিকে আসিতেছেন। ধর্ম্মপাল কখনও গোবিন্দকে দেখেন নাই, কিন্তু তথাপি বুঝিতে পারিলেন যে রাষ্ট্রকূটরাজ স্বয়ং আসিতেছেন। গৌড়েশ্বর তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য একাকী গিরিসঙ্কটের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং গোবিন্দ নিকটে আসিলে অসিদ্বারা তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া অসি দূরে নিক্ষেপ করিলেন। দীর্ঘাকার পুরুষ দূর হইতে কহিলেন, "আপনিই কি গৌড়েশ্বর?" উত্তর হইল, "হঁা, আমিই ধর্ম্মপাল।" পরক্ষণেই দীর্ঘাকার পুরুষ ধর্ম্মপালকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিলেন। ধর্ম্মপাল বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। গোবিন্দ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "গৌড়েশ্বর, মহাপুরুষের সাক্ষাৎলাভে বঞ্চিত হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে আসিয়াছি।"

গৌড়েশ্বর ধূলিমলিন ললাটের স্বেদমোচন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ, আপনি কি বলিতেছেন, আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না?"

"গৌড়েশ্বর, কালিকার যুদ্ধ দেখিয়া দিবসে বিস্মিত হইয়াছিলাম, রাত্রিতে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, প্রভাতে বীরের পদধূলি গ্রহণ করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তখন

শুনিলাম তিনি বহুদূরে। ধর্মপালদেব আমি প্রৌঢ়। কিশোর বয়স হইতে যুদ্ধব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছি, পিতার সহিত সমগ্র উত্তরাপথে ও দক্ষিণাপথে যুদ্ধ করিয়া বেড়াইয়াছি, কিন্তু এমন অদ্ভুত বীরত্ব, অপূর্ব্ব কৌশল ও অসাধারণ আত্মত্যাগ আর কখনও দেখি নাই। আমাকে ভীষ্মদেবের দেহের নিকটে লইয়া চলুন।”

উভয়ে ধীরে ধীরে মহানায়কের মৃতদেহের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাষ্ট্রকূটরাজ মৃতদেহকে প্রণাম করিয়া স্বীয় মস্তকে বৃদ্ধ মহানায়কের পদধূলি ধারণ করিলেন। ভীষ্মদেবের শিয়রে একজন আহত সৈনিক বসিয়া ছিল, সে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চসহস্র গৌড়ীয় সেনা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

গোবিন্দ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং গৌড়েশ্বরের হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, “গৌড়েশ্বর, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন, আমার শোণিতপিপাসা মিটিয়াছে, দগ্ধ আর্য্যাবর্ত্ত শান্ত হউক।” এই সময়ে সেই আহত সৈনিক ছুটিয়া আসিয়া রাষ্ট্রকূটরাজকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল, “রাষ্ট্রকূট-রাজ, তুমি বীর, বীরের পূজা করিতে শিখিয়াছ, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি তোমার মঙ্গল হউক।” সে গুরুদত্ত।

সহসা ধর্ম্মপাল গুরুদত্তের হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, “গুরুদত্ত, স্থির হও। মহারাজ, আপনি কি বলিতেছেন— আমি বুঝিতে পারিতেছি না; আপনি শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করুন, যুদ্ধ আরম্ভ হউক।”

গোবিন্দ অবনত মস্তকে কহিলেন, “গৌড়েশ্বর, যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, আর আরম্ভ হইবে না।” উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া গৌড়েশ্বর বলিয়া উঠিলেন, “না মহারাজ, তাহা হইবে না, যুদ্ধ চাই, গৌড়নগরে এ মুখ আর দেখাইব না। এই গিরিসঙ্কটে দশসহস্র প্রভুভক্ত ভৃত্য, স্বামীভক্ত পিতৃবন্ধু আমার জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন, আমি তাহা ভুলিতে পারিব না। রাষ্ট্রকূটরাজ, শিবিরে ফিরিয়া যাও, এই মণ্ডলা ধর্ম্মপালের সমাধিক্ষেত্র। সন্ধ্যাকালে পঞ্চদশসহস্র গৌড়ীয় সেনার চিতাশয্যা রচনা করিতে হইবে। অধিক সময় নাই, যুদ্ধ আরম্ভ হউক। গোবিন্দ, কন্যা বাক্‌পাল গৌড়েশ্বর হইবে, তাহার সহিত রাষ্ট্রকূটনন্দিনীর বিবাহ দিও।”

কম্পিতকণ্ঠে রাষ্ট্রকূটরাজ কহিলেন, “বন্ধু, তুমি পূজ্য-স্থানীয়, তোমার পাদস্পর্শ করিয়া অকল্যাণ করিব না। আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর, যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, আমার পরাজয় হইয়াছে, ভীষ্মদেব এই মণ্ডলায় গিরিসঙ্কটে কল্য রাত্রিতে বহুবার আমাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন।”

গৌড়েশ্বরের চরণদ্বয় টলিল। তাঁহাকে মূর্চ্ছিতপ্রায় দেখিয়া গোবিন্দ তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন এবং কহিলেন, “পুত্র, আমার জন্য তুমি অনেক সহ্য করিয়াছ, গোবিন্দ যতদিন জীবিত থাকিবে, ততদিন তোমার পায়ে কুশাঙ্কুরও বিঁধিবে না।” ধর্ম্মপাল মূর্চ্ছিত হইলেন।

রাষ্ট্রকূট, মাগধ ও গৌড় সকলে মিলিয়া যে বিশাল চিতাশয্যা রচনা করিয়াছিল, সহস্র বৎসর পরে বিন্ধ্যের পাদমূলে বর্ব্বর হলকর্ষণকালে তাহার ভস্মাবশেষ এখনও দেখিতে পায়। যতদিন ভারতে তথাগতের ধর্ম্ম ছিল, ততদিন সদ্ধর্ম্মিগণ সেই চিতাভস্মের উপরে নির্ম্মিত বিশাল চৈত্যের অর্চ্চনা করিতে আসিত।

সেইদিন সন্ধ্যাকালে একজন ধূলিধূসরিত অশ্বারোহী গৌড়েশ্বরের নিকটে আসিয়া কহিল, “মহারাজ, আমি অমৃতানন্দ। প্রভু বিশ্বানন্দ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। রাজ্যের মঙ্গলের জন্য, প্রজার মঙ্গলের জন্য, মহাদেবী কল্যাণী লোকনাথের পাদমূলে দেহত্যাগ করিয়াছেন। যুদ্ধের প্রয়োজন শেষ হইয়াছে, গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করুন।”

সংবাদ শুনিয়া উদ্ধবঘোষ বালকের ন্যায় রোদন করিয়া উঠিলেন, গৌড়েশ্বরের মস্তক ঘূর্ণিত হইল। সেই রাত্রিতে গোবিন্দ, ধর্ম্মপাল, উদ্ধবঘোষ, অমৃতানন্দ ও রাষ্ট্রকূটসেনা-পতি কর্করাজ পঞ্চাশৎজন রক্ষী সমভিব্যাহারে গৌড়াভি-মুখে যাত্রা করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

বলি

প্রত্যূষে গৌড়নগরের প্রান্তে গঙ্গাতীরে এক দাসী পূজার সজ্জা লইয়া পুরোহিতের অপেক্ষায় বসিয়া ছিল। উপনগরের রাজপথ তখনও জনশূন্য। দাসী থাকিয়া থাকিয়া নগরের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। একদণ্ড পরে নগরের পথে একজন মনুষ্য দেখা গেল, দাসী উৎসুকচিত্তে উঠিয়া

দাঁড়াইল। মনুষ্যমূর্ত্তি ক্রমে রাজপথ ছাড়িয়া মন্দিরের নিকটে আসিল। তখন দাসী জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর, আপনি এখানে ?" আগন্তুক রাজপুরোহিত পুরুষোত্তম শর্ম্মা। তিনি কহিলেন, "কে মাধবি ? অনেকদিন বুড়াশিবের পূজা করিয়া আসিয়াছি, কোন দিন কিছু চাহি নাই, আজি একটা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি।"

"কি প্রার্থনা ঠাকুর ?"

"প্রার্থনা আর কি ? আজ মহারাজের আসিবার কথা। মহাদেব অনুগ্রহ করুন, মহারাজের সহিত মহাদেবীর যেন একবার শেষ সাক্ষাৎ হয়।"

"ঠাকুর, মহাদেবী তবে বাঁচিয়া আছেন ?"

"হঁা।"

"আমি তবে চলিলাম, আপনি ধ্যান করুন। পূজার সজ্জা রাখিয়া গেলাম, পুরোহিত আসিলে পূজা করিতে বলিবেন।"

"মাধবি, আজি আমার মন বড় চঞ্চল, কথা হয়ত মনে থাকিবে না, তুমি কোথায় যাইবে ?"

"ঠাকুর, মহাদেবীকে একবার জন্মের শোধ শেষ দেখা দেখিয়া আসি। অমন সতী দেখিলেও পুণ্য হয়। কত পাপ করিয়াছিলাম, সেইজন্য দাসী হইয়া জন্মিয়াছি, হয়ত মহারাণীর পাদস্পর্শে আমার মুক্তি হইবে।"

দাসী উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল। পুরুষোত্তম শর্ম্মা গঙ্গাস্নান করিয়া মন্দিরদ্বারে শয়ন করিলেন। অর্দ্ধদণ্ড পরে দূরে অশ্বপদশব্দ শ্রুত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে একজন অশ্বারোহী মন্দিরের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল এবং উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "মন্দিরে কে আছ ?" পুরুষোত্তম শর্ম্মা তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কহিলেন, "কে অমৃতানন্দ ? মহারাজ কি ফিরিয়াছেন ?"

অশ্বারোহী কহিল, "হঁা, তুমি কে ?"

"আমি পুরুষোত্তম, জয় বিশ্বনাথ।"

"সংবাদ কি ?"

"শীঘ্র লোকনাথের মন্দিরে যাও, মহাদেবী এখনও জীবিত আছেন।"

অশ্বারোহী দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রস্থান করিল। পরক্ষণেই রাজপথে অশ্বপদশব্দ শ্রুত হইল। তখন পুরুষোত্তম মন্দিরস্থিত শিবলিঙ্গকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৃদ্ধেশ্বর, আমার অপরাধ গ্রহণ করিও না, আমিও মহাদেবীকে দেখিতে চলিলাম। তোমার পূজার ব্যবস্থা আজি তুমিই করিও।" পুরুষোত্তম শর্ম্মা মন্দিরদ্বারে পূজার সজ্জা পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

সেইদিন প্রত্যূষে গৌড়ের তোরণে প্রতীহারগণ গৌড়েশ্বরকে মাত্র চারিজন সঙ্গী লইয়া ফিরিতে দেখিয়া বিস্মিত হইল। তাহারা গোবিন্দকে কখনও দেখে নাই, অমৃতানন্দের নিকটে তাঁহার পরিচয় পাইয়া অধিকতর বিস্মিত হইল। জাগরিত গৌড়জানপদগণ পরক্ষণেই শ্রবণ করিল যে, রাষ্ট্রকূটযুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রকূটরাজ সমগ্র দক্ষিণাপথের একচ্ছত্র অধীশ্বর ধ্রুবের পুত্র গোবিন্দ একাকী গৌড়েশ্বরের সহিত গৌড় নগরে আগমন করিয়াছেন।

লোকনাথের মন্দির-সম্মুখে জনতার অন্ত নাই। মহামন্ত্রী গর্গদেব মন্দিরের মণ্ডপে কুশাসনে উপবিষ্ট আছেন, তাঁহার সম্মুখে তখনও ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিতেছে। দূরে স্তম্ভসমূহের অন্তরালে মহল্লিকা ও পরিচারিকাগণ বসিয়া আছে। মন্দিরদ্বারে বসিয়া বিশ্বানন্দ ধীরে ধীরে প্রজ্ঞাপারমিতা পাঠ করিতেছেন। মন্দির-মধ্যে বৃদ্ধা মহাদেবী দেদ্দদেবী কল্যাণীদেবীর মস্তক অঙ্কে লইয়া বসিয়া আছেন। ব্রহ্মশিলা-নির্ম্মিত লোকনাথমূর্ত্তির পদতলে মহাদেবী কল্যাণী কুশাসনে শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহার পার্শ্বে মঞ্জরীদেবী ও অমলাদেবী বসিয়া আছেন। মন্দিরমধ্যে ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিতেছে। সকলেই নীরব, কেবল দেদ্দদেবী মধ্যে মধ্যে বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছেন। কল্যাণী কয়দিনে শুখাইয়া গিয়াছেন, কষিতকাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ পাণ্ডু হইয়া গিয়াছে। কল্যাণী ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, কে আসিতেছে ?" দেদ্দদেবী চক্ষু মুছিয়া কহিলেন, "কৈ মা, কেহই ত আসে নাই ?"

এই সময়ে গোবিন্দ ধর্ম্মপাল উদ্ধবঘোষ সর্ব্বানন্দ বা গুরুদত্ত এবং অমৃতানন্দ মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। পদশব্দে চমকিত হইয়া গর্গদেব আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন। দূর হইতে তাঁহাদিগকে দেখিয়া বিশ্বানন্দ

পাঠত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন, "ধর্ম্ম, তুমি আসিয়াছ?" তাঁহার কথা শুনিয়া মঞ্জরীদেবী ও অমলাদেবী মন্দিরের এককোণে গমন করিলেন। ধর্ম্মপাল গোবিন্দ ও বিশ্বানন্দ মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেদ্দদেবীর শীর্ণগণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছিল, তিনি রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "পুত্র, কল্যাণী যে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিল।" ধর্ম্মপাল আকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কল্যাণি, কি হইয়াছে?" কল্যাণীদেবীর নয়নদ্বয় সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তিনি গৌড়েশ্বরকে তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিতে ইঙ্গিত করিলেন। ধর্ম্মপাল মন্দিরতলে ভূমিতে উপবেশন করিলেন। তাহা দেখিয়া গোবিন্দও তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। পশ্চাৎ হইতে বিশ্বানন্দ কহিলেন, "ধর্ম্ম, চক্রের পরিবর্ত্তন অনির্ব্বচনীয়, দেশব্যাপী হাহাকার কল্যাণীর কোমল হৃদয় ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। কল্যাণীর জন্য গৌড়রাজ্যের, গৌড়বাসীর, পালবংশের এবং তোমার সর্ব্বনাশ হইতে বসিয়াছে ইহা বুঝিতে পারিয়া কল্যাণীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সেই জন্যই কল্যাণী চলিয়াছেন।"

ধর্ম্মপাল কল্যাণীকে আশ্বাস দিবার জন্য কহিলেন, "কল্যাণি! দুঃখের দিন অবসান হইয়াছে, যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, এই দেখ রাষ্ট্রকূটরাজ একাকী আমার সহিত গৌড়ে আসিয়াছেন।"

ক্ষীণস্বরে কল্যাণীদেবী কহিলেন, "তোমাকে আরএকবার দেখিব বলিয়া এখনও যাইতে পারি নাই, তুমি আসিয়াছ, আমি চলিলাম। আমার একটি অনুরোধ রাখিও, রাখিবে বল? আমি মরিলে রাষ্ট্রকূটরাজকন্যাকে বিবাহ করিও।"

ধর্ম্মপাল কল্যাণীর উভয় হস্ত ধারণ করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "কি বলিতেছ কল্যাণি?"

"শুন—আমার আর অধিক সময় নাই, আমাকে স্পর্শ করিয়া অঙ্গীকার কর, সে বলিয়াছে আমার সময় হইয়াছে, আমার নূতন জগৎ হইতে আমাকে আহ্বান করিতে আসিয়াছে।"

"কে বলিয়াছে, কি বলিয়াছে কল্যাণি?"

পশ্চাৎ হইতে বিশ্বানন্দ বলিয়া উঠিলেন, "ধর্ম্ম, দক্ষিণাপথ হইতে ফিরিবার সময় পথে এক অন্ধবালককে কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম, তাহাকে গৌড়ে লইয়া আসিয়াছিলাম। সেই কল্যাণীকে বলিয়াছে যে তাহার মুক্তির দিন আসিয়াছে, জন্মজন্মান্তর ধরিয়া সে নির্ব্বাণের পথ প্রশস্ত করিয়াছে, এইবার তাহার বন্ধন-মুক্তি হইবে। কল্যাণীর আত্মত্যাগে গৌড়রাজ্য, গৌড়বাসী এবং গৌড়রাজের দোষগ্রহ শান্ত হইবে। ধর্ম্ম সেই অন্ধ বালকের কথা শুনিয়া কল্যাণী লোকনাথের পাদমূলে আত্মবলি দিয়াছে।" বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর কণ্ঠরুদ্ধ হইল, শীর্ণ গণ্ড ও দীর্ঘ শ্মশ্রু বহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল।

কল্যাণী পুনরায় কহিলেন, "অঙ্গীকার কর। পিতৃগৃহে যেদিন মাতা আমাকে তোমার হস্তে সঁপিয়া দিয়াছিলেন, যেদিন আমাকে পৃষ্ঠে লইয়া গোকর্ণদুর্গের পরিখায় লাফ দিয়াছিলে, সেইদিনের কথা স্মরণ করিয়া আমার শেষ অনুরোধ রক্ষা কর।"

ধর্ম্মপাল কল্যাণীকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিয়া উঠিলেন।

গোবিন্দ এতক্ষণ পাষাণপ্রতিমার ন্যায় নিশ্চল হইয়া বসিয়া ছিলেন, এইবার তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইল, তিনি আকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "মা, অপরাধ আমার। নাগভটের পরাজয়ের পরে বলহীন গৌড়ে যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে তাহার জন্য আমি অপরাধী। তুমি ভুল করিয়াছ, আমার অপরাধের জন্য তুমি কেন শাস্তি গ্রহণ করিবে?"

কল্যাণী কহিলেন, "পিতা, আমার কর্ম্মফল আমি ভোগ করিতেছি, আপনার অপরাধ কি! সে বলিয়াছে—আমার বন্ধন মোচনের দিন আসিয়াছে। আপনি পিতা, বাধা দিবেন না।"

পশ্চাৎ হইতে বিশ্বানন্দ কহিলেন, "ধর্ম্ম, সে অবধি সেই অন্ধ বালককে কেহ গৌড়ে দেখে নাই। তাহাকে দেখিতে পাইলে জিজ্ঞাসা করিতাম—কে তাহাকে এ-সকল কথা বলিয়া গেল।"

কল্যাণী কহিলেন, "প্রভু, আমার সময় হইয়াছে, আকাশপথে দাঁড়াইয়া কে আমাকে ডাকিতেছে। বল, অঙ্গীকার কর?"

গৌড়েশ্বর প্রবেশ করিতে করিতে কহিবেন, "কি অঙ্গীকার করিব কল্যাণি?"

"বল, আমাকে স্পর্শ করিয়া শপথ কর, যে, আমার পরে রাষ্ট্রকূটদুহিতাকে বিবাহ করিবে?"

ধর্ম্মপাল কল্যাণীর হস্ত দিয়া মুখ ঢাকিলেন।

"শীঘ্র বল, আর যে সময় নাই?"

"করিব।"

"করিও, তাহা না হইলে গৌড়ে শান্তি থাকিবে না। প্রভু, মুখ তোল, আমি একবার দেখিয়া যাই। তোমার মুখ দেখিতে দেখিতে চলিলাম - ইহা অপেক্ষা সুখ আর কি আছে?"

এই সময়ে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বৃদ্ধ উদ্ধবঘোষ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া কল্যাণীর পদতলে আছাড় খাইয়া পড়িল এবং কহিল, "মা, তুই যাইবি, আর আমি দাঁড়াইয়া দেখিব? ইহার জন্যই কি রঘুসিংহ আমাকে রাখিয়া গিয়াছিল? কল্যাণি আমাকে সঙ্গে লইয়া যা।"

কল্যাণীদেবী ক্ষীণতরকণ্ঠে কহিলেন, "উদ্ধব, কাঁদিও না, বড় আনন্দে মরিতেছি। স্বামীকে দেখিতে দেখিতে, রাজ্যের দেশবাসীর শ্বশুরকুলের আর স্বামীর মঙ্গলের জন্য রঘুসিংহের কন্যার ক্ষুদ্র প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছি, ইহা আমার পিতৃকুলের গৌরব। প্রভু তবে যাই—"

সহসা কল্যাণীর শীর্ণ মুখমণ্ডলে বিমল হাস্য ফুটিয়া উঠিল, পরক্ষণেই সমস্ত শেষ হইয়া গেল। হাহাকার করিতে করিতে ধর্ম্মপাল কল্যাণীর বক্ষের উপরে পতিত হইলেন।

সমাপ্ত

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

কষ্টিপাথর

গ্রাম ও স্বদেশ-সেবা

দেশের শুষ্ক কলেবরে ধীরে ধীরে প্রাণসঞ্চার হইতেছে। যাহা এককালে নীচ ঘৃণ্য বোধে আমরা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, তাহাই আবার নূতন জ্ঞানে এবং আনন্দে আদর করিয়া বরণ করিতেছি। মানসিক শারীরিক সুখের আশায় অ মরা বিলাসিতায় ডুবিতেছিলাম; যখন যাহা যায়-যায়, তখন ঠেকিয়া শিখিলাম—শারীরিক পরিশ্রমই শারীরিক সুখের কারণ। পরিশ্রম ঘৃণা করিতাম, সমাজকে অবহেলা করিতাম, জাতীয়তা একটা শুষ্ক কথা মনে করিতাম, দেশ একটা মাটির পিণ্ড, [illegible] চরম লক্ষ্য—এই জ্ঞান নিয়া একদিন বড় হইতেছি বলিয়া বড়াই করিতেছিলাম; কিন্তু ধীরে ধীরে বুঝিতে পারিলাম যে দিন দিন ক্রমশঃ ছোট হইতেছি, মৃত্যুর দিকে চলিয়াছি। নিজের স্বার্থ রক্ষা করিতে হইলে, নিজকে বাঁচাইতে হইলে, নিজে বড় হইতে হইলে, সমাজ ও দেশকে উন্নতির ভিত্তি করিতে হইবে। সমাজের ভিতর দিয়া আত্মবিকাশ ও উন্নতিসাধন করিতে হইবে। 'Die to live—প্রকৃত মানবজীবন যাপন করিতে হইলে, প্রথমে নিজকে সমাজের ভিতর হারাইয়া ফেলিতে হইবে, আত্মবলি দিতে হইবে, তবেই পুনর্জীবন লাভ হইবে। যে মরিতে না জানে, সে বাঁচিতে পারে না। সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য নিজের সুখসুবিধা ত্যাগ করিতে পারিলে, প্রকৃত জীবন লাভ করা যায়, মানুষ দেবত্ব প্রাপ্ত হয়।

বর্ত্তমানে বড় ছোট সকলেরই একদিকে লক্ষ্য, সকলেই দেশমাতার সেবায় নিজকে নিয়োজিত করিতেছেন। এককালে যেমন অনেকেরই দৃষ্টি বাহিরের দিকে ছিল, এখন আবার তেমনি ঘরমুখো হইবার চেষ্টা চলিতেছে। বিদেশে নিজকে বিকাইবার চেষ্টা এখন স্বদেশে আপনাকে বিলাইবার ইচ্ছায় পরিণত হইতেছে। স্বদেশ ও সমাজের ভিতর দিয়া আত্মোন্নতির চেষ্টা এবং আত্মবিকাশের চিহ্ন দেখা দিয়াছে। বড় বড় স্কুল কলেজ, কারখানা, রামকৃষ্ণমিশন, দামোদর-বন্যা প্রভৃতি আমাদের জাতীয় গৌরববৃদ্ধির বিশেষ সহায়তা করে সন্দেহ নাই; কিন্তু শুধু এগুলি দিয়াই দেশকে প্রকৃতভাবে বিচার করা চলে না। স্বদেশী আন্দোলনের মত বিরাট ব্যাপারকেও সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করা যায় না, কারণ ইহা আন্দোলন, সাগরতরঙ্গের ন্যায় উপরেই অধিকাংশ আধিপত্য বিস্তার করে, নিম্নস্থিত জলরাশি হয় ত ইহা অনুভব করে না পূর্ব্বের মতই থাকিয়া যায়।

সমাজ বা জাতির প্রাণ গ্রামে, দরিদ্রের কুটিরে বাস করে। ইংরেজীতে বলে, 'A nation lives in a cottage'। সেই নীরব আড়ম্বরশূন্য লোকালয়ে যে স্পন্দন অনুভূত হয়, তাহাই জাতির প্রাণ। সহরের জীবন ত toilette-করা সাহেবীমুখ, সে ত শুধু মনভুলানো লোক-দেখানো সাজ।

ঐ গ্রামের উঠানামার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করিতে হইবে। ইহাই আমাদের মাপকাঠি। এই কঠিন মাপকাঠির দ্বারা বিচার করিয়া যদি দেশে জাতীয় জীবনসঞ্চারের সংবাদ পাই তবেই বুঝিব দেশের প্রকৃত অবস্থা কি, দেশ উন্নতির পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং হইতেছে। গভীর আনন্দের কথা যে এখন গ্রামগুলিতে বিদ্যোন্নতি, স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা, ভ্রাতৃভাব, আত্মনির্ভরের সংবাদ চারিদিক হইতে শুনা যাইতেছে। বর্ত্তমানে এসকল সংবাদের বিশেষ মূল্য আছে।

আমাদের বিদ্যালয়ে বিদ্যা শিখান হয়, যথা জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা, ভূগোলের দশ বিশটা নাম, সাহিত্যের রক্তমাংস-ছাড়া কতকগুলি হাড়ের মত শুষ্ক গল্প। ইহাতে না আছে প্রাণ, না আছে অনুভূতি। এগুলি শিখান সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বলিতেছি না। তবে এগুলিতে প্রাণসঞ্চার হওয়া আবশ্যক। মানুষকে কতকগুলি কথামাত্র শিখাইলে সে একটা বইয়ের আলমারি পর্য্যন্ত হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত মানুষ তৈয়ারি হইবে কি? তাহাকে পর-সেবা, পরোপকার, আত্মনির্ভর, আত্মবিশ্বাস ইত্যাদি মহৎভাবগুলি শুধু ঠোঁটে ঠোঁটে শিখাইলে চলিবে না, সেগুলি তাহার প্রাণ দিয়া স্পর্শ করাইতে হইবে। যেমন বিজ্ঞান অথবা সূত্রধরের কাজ practical শিক্ষা দেওয়া হয়, সেরূপ উচ্চভাব ও নীতিশিক্ষাও হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত থাকা উচিত। ছেলেরা যেন রোগীকে সেবা করিয়া সেবাধর্ম্ম শিখিতে পারে, নিজ হাতে ছোট বড়

কাজ করিতে করিতে অজ্ঞাতসারে অনেকের আত্মবিশ্বাস শিথিলাত করিতে পারে। যাঁহারা সহরের ব্যবসায়াদিতে বাস করিয়া জর্জ্জর ও নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা কোন গ্রামে যাইয়া শক্তশ্যামল মাঠ, গ্রামবাসীর ভালবাসা, অকৃত্রিম সরলতা ও প্রকৃত স্বদেশসেবা দেখিয়ে হৃদয়ে বল পাইতে পারিবেন, বুকে আশার সঞ্চার হইবে ও স্বদেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল প্রতীয়মান হইবে,—সর্ব্বশ্রেষ্ঠলাভ, প্রকৃত মনুষ্যত্বের সাক্ষাৎ পাইয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন।

Example is better than precept—অনেক বক্তৃতায় যাহা সাধিত হইতে পারে না, তাহা দৃষ্টান্তের বলে নীরবে অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া যায়। কে বলে আমরা conservative, স্থিতিশীল? প্রকৃত উন্নতির আশা পাইলে আমরা নূতন শিক্ষা গ্রহণ ও অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত নই। তবে আমাদের হইয়, আমাদের অবস্থা বিচার করিয়া এ-সকল শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিবার লোকের অভাব। বর্ত্তমানে উপযুক্ত ছাত্রের অভাব হইবে না, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব লক্ষিত হয়। অবশ্য গ্রামের আর-একটা দিক আছে যাহা দেখিলে অনেকেই ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দৃষ্টি অপসারিত করিবেন। গ্রামের ঐ কদর্য্য দৃশ্যও আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে রাখিতে হইবে যেন ধীরে ধীরে উহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি। সুন্দর দিকটা যতই ফুটিয়া উঠিবে, বিপরীত দৃশ্যটি ততই কদর্য্য ও ভয়াবহ হইতে থাকিবে। উচ্চভাব ও কর্ম্মের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের পাপ লজ্জা-পাইয়া আপনা হইতেই অদৃশ্য হইয়া যাইবে।

বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, ধর্ম্মই ভারতের জীবন। ধর্ম্মভাবের ভিতর দিয়াই ভারত আপনার উন্নতিসাধন করিবে। "ত্যাগ ও সেবা" এ জাতির প্রধান অস্ত্র ও বল। এই শক্তিবলেই ভারত এতদিন আপনাকে জীবিত রাখিয়াছে এবং এই শক্তি দ্বারাই ভারত দিগ্বিজয়ে সমর্থ হইবে—ইহা খুব কঠিন ব্যবস্থা সন্দেহ নাই। ত্যাগ ও সেবা ত মানব-ইতিহাসের শেষ অধ্যায়। ভারত অন্যদিকে যেরূপ হউক, দুনিয়ায় পার্থিব সমৃদ্ধি-লাভে যতই হীন হউক, সহস্র বৎসরের সাধনার ফলে ত্যাগ ও সেবা ভাবুতের অন্তর্নিহিত শক্তিরূপে চিরকাল বিরাজমান রহিয়াছে। যদিও বর্ত্তমানে ইহার যথেষ্ট বিকাশ ও পরিচয় নাই, তবু ইহা যে প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়কন্দরে বাস করিতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সময়ের সাড়া পাইয়া ইহা যে আবার অতি সহজে জাগরূক হইয়া উঠিবে তাহা বুঝা যাইতেছে। দেশের ও দশের 'সেবা,' সমাজের 'সেবা,' সেবা করিবার জন্য 'ত্যাগ' ধীরে ধীরে দেশময় ছড়াইতেছে। এই নূতন আশা, নূতন বাণী সর্ব্বত্র শুনা যাইতেছে। ভারতে প্রাণসঞ্চারের সংবাদ জগৎময় প্রচারিত হইয়াছে।

উপযুক্ত শিক্ষা ও বিকাশ লাভ করিয়া আমাদের গ্রামের এই সহজ ও সাধারণ ভাবগুলি ত্যাগ ও সেবাধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া উঠিবে। এই ত্যাগ ও সেবা আমাদের জাতীয় জীবনের মূলমন্ত্র; এবং ইহা শিক্ষা ও সাধন করিতে হইবে—আমাদের সমাজে, আমাদের গ্রামে। গ্রামই জাতির প্রাণ। যদি জাতীয় প্রাণ ও শক্তি অনুভব করিতে চান, যদি নিজের প্রাণ উপলব্ধি করিতে চান, তবে গ্রামে যান, পথে ঘাটে বেড়ান, নিরক্ষর শ্রমজীবী ও সাধারণ গৃহস্থের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করুন। এই গ্রামের সেবা করিতে হইবে, এই গ্রাম্যসমাজের উন্নতি-সাধন করিতে হইবে। "এই গ্রামবাসী আমার প্রাণ, এই গ্রাম আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী" বলিয়া হৃদয়ে স্থান দিতে হইবে, আর সকল জাতির নিয়ন্তা সেই জগৎ-পিতা পরমেশ্বরের শ্রীচরণে একান্ত-হৃদয়ে প্রার্থনা করিতে হইবে যে আমাকে সে ভাবুকতা দাও, যে ভাবুকতায় লোকে বর্ত্তমান ক্ষুদ্র স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া ভবিষ্যতের মহতী সিদ্ধি উপলব্ধি করিতে পারে, আমার আয়ত্তের মধ্যে অন্তর্নিহিত সমগ্রতা অনুভব করিয়া তাহাতেই সম্পূর্ণ জীবন উৎসর্গ করিতে উৎসাহিত হয়; যে ভাবুকতায় অনুপ্রাণিত হইয়া বিদ্যাদান ব্যক্তি সমাজের কীর্ত্তি বা প্রতিষ্ঠালাভের অপেক্ষা না করিয়া বিদ্যাদান ও শিক্ষাবিস্তারেই আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন, বরং বিদ্যালাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়া দেশের জন্য শিক্ষালাভের সুবিধা সৃষ্টি করিতেই জীবন অতি-বাহিত করিতে পারেন; যে ভাবুকতায় ধনবান সমগ্র সমাজকে বিদ্যায় ধনে ধর্ম্মে উন্নীত করিবার নিমিত্ত বদ্ধ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া জলদান অন্নদান ঔষধদান ও বিদ্যাদানের ব্যবস্থা করিবার জন্য ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত রাখিয়া ঐশ্বর্য্যের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ; যে ভাবুকতায় ভগবান যাহাকে যে শক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী করিয়া জগতে প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি পরোপকারে এবং সকল-প্রকার দারিদ্র্যমোচনে সেই শক্তির প্রয়োগকেই জীবনের ধর্ম্ম মনে করেন; যে ভাবুকতায় চিত্তের উন্মাদনা না হইয়া উৎপ্রেরণা হয়, যাহার ফলে শক্তি বিক্ষিপ্ত না হইয়া সংহত ও সংক্ষিপ্ত হয়, যাহার বশে মানব গৃহত্যাগ করিয়া স্থির ও সংযতভাবে সমাজ ও সংসারের উন্নতিকামনা প্রচার করিতে সমর্থ হয়।"

(গৃহস্থ, আষাঢ়) শ্রীগ্রামবাসী।

* *
*

গম্ভীরা-উৎসবে লোক-শিক্ষা

মালদহের 'গম্ভীরা' লোকশিক্ষার একটি অত্যুৎকৃষ্ট উপায়। উৎসবের ভিতর দিয়া অজ্ঞাতসারে জনসাধারণ গম্ভীরা-উৎসব হইতে অনেক শিক্ষা করিয়া থাকে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই মালদহবাসী গম্ভীরা-উৎসব করিয়া আসিয়াছে। কালের কুটিল গতিতে এই গম্ভীরা উৎসব শিক্ষিতের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি, জনসাধারণও গম্ভীরা-উৎসবে ততটা আগ্রহ দেখাইত না। লোকশিক্ষার এই অনুষ্ঠানটি আস্তে আস্তে লোপ পাইতে বসিয়াছিল। কিন্তু বিগত ৪।৫ বৎসর ধরিয়া মহান্ত বলদেবানন্দ গিরি মহাশয়ের উৎসাহে ও চেষ্টায় এবং সহর ও মফঃস্বলের বহু ভদ্রলোকের সহানুভূতিতে মালদহের এই লোকশিক্ষার অনুষ্ঠানটি নূতন জীবন লাভ করিয়াছে।

গম্ভীরা-উৎসবে জাতিভেদ নাই। হিন্দু-মুসলমান সকলেই সমভাবে এই উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন। সকলেই সঙ্গীত রচনা করিতে ও গাহিতে পারেন। এই উৎসব উপলক্ষে যে-সকল ব্যঙ্গ-সঙ্গীত রচিত ও গীত হইয়া থাকে, তাহাতে সমাজের ও ব্যক্তিবিশেষের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়া থাকে।

গম্ভীরা-সঙ্গীত-লেখকগণের মধ্যে অনেকে অশিক্ষিত। কেহ কেহ আবার অক্ষর-জ্ঞানবিরহিত।

আমরা আমাদের পাঠকবর্গের জন্য এস্থানে কয়েকটি সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

চক্ষুদান

রচয়িতা—শ্রীগোপালচন্দ্র দাস

(পূজার ছুটিতে অনেক বাবু বাড়ী যাইতেছিলেন। পথে এক কৃষকের সহিত সাক্ষাৎ ও দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে বাদ-প্রতিবাদ)

কৃষক—তোরা বিলাসিতার দিক্ ঝুঁকিয়া,
হে বাবু ঘরের রেশাত দিলি ফুঁকিয়া।
বাবু সেজে চশমা এঁটে, বেড়াস্ সারা সহর ঘেটে,
পকেটে মদের বতল লুকিয়া।

বাবু—তোরা বুদ্ধির দোষে সব হারিয়া, যে চাষা এখন পড়েছিস্
হাল ছাড়িয়া।

আমরা মধু তোরা বলি, টাকার লোভে সব খোয়ালি
(দেশে) আকাল কেলে দিলি মারিয়া।
কৃ—আমরা যেমন শরীর খাটিয়া, ফসল জন্মাই মাটি কাটিয়া,
তোরাও যদি আসিস্ ছুটিয়া,
(লোকে) মর্‌বে কেন অনাহারে শুকিয়া।
বাবু—আমরা যদি তোদের কোদাল করি ঘাড়ে,
শাসন বিচার শিক্ষা কাজের ভার দিই কারে,
দেখেক বিচার করে ধান গম ছেড়ে,
(এবার) এদশা পাটের বীচন গাড়িয়া।
কৃ—না হয় পাট্‌কাট্ বুন্‌বো না আবার, ঘরে অভাব হবে না খাবার,
(তোদের) চাকুরীর মাহিনা বাড়িবে না আর,
মাথার চুল যাবে বিকিয়া।
বাবু—অকারণ মোদের দোষ দিস্ কেবল,
মেঘে নাই বৃষ্টি কিসে বাঁচাবে ফসল,
কোন্ বুদ্ধি দিয়ে করি তোদের মঙ্গল
(এতো) বুদ্ধিশুদ্ধি গেছে হারিয়া।
কৃ—মুনি ঋষি আগে যাগযজ্ঞ করে, অনাবৃষ্টি হ'লে মেঘ আন্‌তো ধরে,
এখন বিজ্ঞানের জোড়ে কৃত্রিম মেঘ করে
(সবাই) ফসল জন্মায় বুক ঠুকিয়া।
তোরা বাণীর বরপুত্র গিয়ে দেশান্তরে, যা' পাস্ কুড়ায়ে আনিস্ যদি ঘরে,
আমরা যেমন দেখি (যদি) দেখিস্ তেমনি করে
(তবে) মরি কি পরের মুখ তাকিয়া।
(বাবু ও কৃষকের প্রস্থান)
বাবুর পুনঃপ্রবেশ ও জনৈক শিল্পীর সহিত
সাক্ষাৎ ও কথোপকথন।

গীত

শিল্পী :—
বাবু, ধনে প্রাণে সবাক্ মারিলি হে তোরাই এদেশটাকে মারিলি।
চাকুরীর দিকে সবাই ঝুঁকে' দুখের কাদায় মোদের সারিলি।
কামার কুমার ছুতার, শাঁখারি মালাকার, বিদ্যা শিখে
ধরলে চাকুরী হে
যা কিছু আছে, মূর্খের কাছে তাকেও পরিষ্কার না করিলি।
আগে মোদের দেশে, কত শিল্পী এসে, শিখে গেছে শিল্প-বিদ্যা হে;
তাজমহল, মিনা, গৌড় আদিনা দেখেও পরের রূপে ভুলিলি।
লেখা পড়া শিখে, যায় না চাকুরীর দিকে, অন্য দেশের লোকে
ভুলিয়া হে,
করে জ্ঞানোন্নতি, কর্ম্মে হয় ব্রতী, (তোরা) সে সব ভালবাসা ছাড়িলি।
আমরা মূর্খের দল, নাইক'ভাষার বল, তোরা এলে উঠি জাঁকিয়া হে;
গায়ে বল করে, চাকুরী ছেড়ে, না এসেই সকলে মরিলি।
(বাবু ও শিল্পীর প্রস্থান)
বাবুর পুনঃপ্রবেশ ও জনৈক দস্যুর সহিত সাক্ষাৎ,
দস্যুর হাতে সর্ব্বস্বান্ত।

গীত

দস্যু :—
বাবু আমার ননীর পুতুল, হাত দিলে গা করে তুল-তুল,
কলম-ঘুরা চাকুরী ধরে ভুঁড়ি করেছে ছুল। (কোরাস্)
মোটা টাকা উপায় করে, মনের বল দিয়েছে সেরে,
খোসামুদি ধরে,
আত্মরক্ষায় নাই ক্ষমতা টেড়িকাটা চুল।
শুধু সঞ্চয় ক'লে চলবে না ভাই, রক্ষা করাও শক্তিটি চাই
নৈলে দুনিয়ায় চলা দায়।
লেখা পড়া লাঠি ধরা দুটাই কাজের মূল।
যা ছিল সব নিলাম কেড়ে, ইচ্ছা করলে গলাটি ধরে
দিতে পারি মেরে;—
দিলাম ছেড়ে যা'গো ঘরে, এখনও চোখ খুল।
(দস্যুর প্রস্থান)
জন্মভূমির প্রবেশ ও গীত
ছি ছি স্নেহে গড়া অঙ্কের নয়নতারা মায়ের বুকভরা
ধন তোরা—রে।
তোরা মলে মা মা বলে কে তুল্‌বে ব্যাকুল সারা—রে। (কোরাস্)
শিল্পী দস্যু কৃষি আমিই সেজে আসি, (তোদের) অবিদ্যা
সাধনা ভাঙিতে;
বিদ্যান মূর্খ বলে তোরা দুটি ছেলে, মায়ের ঘর
আলো-করা—রে।
(তোরা) বিলাস ভালবাসি, চাকুরী অভিলাষী,
তোদের চাকুরীর জন্য বিদ্যা শিখা;
পরের মন যোগায়ে, মনের বল হারায়ে,
তোরা হয়েছিস্ জীয়ন্তে মরা—রে।
কৃষি শিল্প যত, মূর্খের অনুগত, শিক্ষিত সাহায্য না পেয়ে
দিন দিন ক্ষীণ, ক্রমে জ্যোতিঃহীন তাতেই এ ছলনা করা—রে।
তোরা চাকুরী ছেড়ে, শিল্প কৃষি ধরে,
লুপ্ত বিদ্যার উদ্ধার করা-রে।
চাকুরীর চেয়ে বেশী, রোজগার হবে বসি,
প্রাণে হাসি যাবে ধরা—রে।
বড় যেই হয়, বড় কষ্ট পায়, (বড়) বড় গাছেই হাওয়া লাগে—রে;
গন্তব্য চিনে চল, শুখাবে আঁখিজল,
গোপাল কাঁদে আগা গোড়া—রে।

শিবের বন্দনা

(রচয়িতা—শ্রীমহম্মদ সুফি রহমান)
বলি একব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি (তবে) দুই ভাবাও দেব কেন?
(আজ) হিন্দু মুসলমান এক করে দাও ভেদ থাকে না যেন।
পুনর্জ্জন্ম নাই কোরানে, আছে শুধু বেদ পুরাণে,
(বল) কোন্ শাস্ত্রটী সত্য মেনে, হৃদে-দিব স্থান। (হর)
একই রক্ত অস্থি চর্ম্ম, এক সৃষ্টি কেন ভিন্ন ধর্ম্ম,
দেখে তোমার এসব কর্ম্ম, হইহে তত্ত্বহীন। (হর)
যে দিন দেহ ছেড়ে প্রাণ হবে শূন্য, একই বেশে সবাই গণ্য,
রাজাধিরাজ মহামান্য, শ্মশানে সমান। (হর)
আব্ আতস্ খাক্ হাওয়ায় হয়, উভয় জাতি সৃষ্টি কয়,
তবে কেন ভাবান্তর, হিন্দু মুসলমান। (হর)
(তোমার) সৃষ্টির দিকে করি লক্ষ্য, পশু পক্ষীতে নাই পার্থক্য
ঘোড়া চিলের রব ঐক্য, সেরূপ বিড়াল শিখিন্। (হর)
দেখি তোমার জগন্নাথ-ক্ষেত্র জাতিভেদ নাই অভেদ তন্ত্র,
দাস, ঘোষ, গুপ্ত, সাহা, মৈত্র, একত্র ভোজন। (হর)
ঠিক থাকিলে একের গোড়া হরিদাস খেত না কোড়া,
(আর) মহম্মদের তীক্ষ্ণ ছোড়ায়, হারাত না কেউ প্রাণ। (হর)
সুফী বলে যত ভাব সবই ভুল, জ্ঞানচক্ষুই দেখ ঠিক একের মূল
রাম রহিম ভিন্ন নয় একচুল, নাম ভেদমাত্র জেনো। (হর)

শিবের গম্ভীরা

শিব মনের কথা দু'টা রাখিব
এসে জড়জগতে, ঘুরাও নানা পথে
কোথা গেলে দেখা পাইব। (কোরাস্)
পড়ে শুনে শিখি শুধু তুমি বিশ্বেশ্বর
বচন আউড়াতে আমরা হয়েছি খুব দড়
ভুলে গেছি তব পূজা, তাই আমরা পাচ্ছি সাজা
দুঃখের কথা কারে কহিব।
ধরমের সার গেছে কাল-স্রোতে ভেসে
সংস্কার রয়েছে এ পোড়া দেশে
বল পুনঃ কিসে ধর্ম্ম ফিরে আসে
সেই উপায় আমরা শিখিব।
নিজ নিজ স্বার্থ হ'ল ধর্ম্ম কর্ম্ম
এই কি শিব তোমার সনাতন ধর্ম্ম
বুঝে দশের মর্ম্ম করিব যে কর্ম্ম
খাটি কর্ম্মী এবার হইব।
ত্যাগী বেশে তুমি এসো এই গম্ভীরায়
মনসাধে পূজি মোরা ভাই বোনে সবায়,
হায় একি হ'ল দায়, নিজে ত্যাগী হ'তে নাহি চায়
এ ছলনা আমরা ছাড়িব।
বৃথা নাহি পূজিব পত্র-পুষ্প-ফলে
বিবেক-ফুল মাখিয়ে ভক্তি-গঙ্গাজলে,
শরৎ দাসে বলে দিব পদে তুলে,
জনম সফল আমরা করিব।

সম্বৎসরের বিবরণ

রচয়িতা—শ্রীশরৎচন্দ্র দাস।
সম্বৎসরের বলব কিছু বিবরণ
ও ভাই শুন সবে দিয়ে মন। (কোরাস্)
ম্যালেরিয়ায় সেরে দিলে দেশ
সে কথা বলব কি বিশেষ,
গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে দেখ সুখের নাইক লেশ
(আবার) মৃত্যুবহ্নি দেখলে পরে ঝরবে তোমার দু'নয়ন।
কলেরা এসে সহরে, দেখা দিল প্রায় ঘরে ঘরে,
কত বাঁচল, কত মলো, কে তার খোঁজ করে,
এই কলেরায় হারিয়েছি ভাই প্রাণের রাধিকারঞ্জন।
(গম্ভীরা, আষাঢ়) ইত্যাদি

* *
*

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম

(সহজযান)

মহাযানমতে নির্ব্বাণ লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। কত জন্মজন্মান্তর ধরিয়া ধ্যান ধারণা সমাধি করিয়া 'দশভূমি' অতিক্রম করিয়া শূন্যের উপর শূন্য, তা'র উপর শূন্য পার হইয়া, তবে নির্ব্বাণ-পদ লাভ হয়। এত ত লোকে করিয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং একটা সহজ পথ চাই। সে সহজ পথ কোথা হইতে আসে?

মহাযানে ত 'সাংবৃত সত্য' বা সংসারকে একেবারে উড়াইয়া দিয়াছে। এবং "পরমার্থ সত্য"কে শূন্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। নির্ব্বাণ ও শূন্য একই। মাধ্যমিকেরা শূন্যকে "চতুষ্কোটি-বিনির্ম্মুক্ত" বলিয়াছে—অতএব উহা 'অস্তি'ও নয়, নাস্তি'ও নয়, 'তদুভয়'ও নয়, 'অনুভয়'ও নয়। তবে উহা কি?—অনির্ব্বচনীয় রূপ। কিন্তু উহার ধারণা ভাবরূপে হয়, অভাবরূপে নয়—ইংরেজীতে যাহাকে বলে 'Positive', 'Negative' রূপে নয়। যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদীরা বলেন যে ঐ অবস্থায় শুদ্ধ বিজ্ঞানমাত্র। ইহাও 'ভাব'। সহজবাদীরা বলিলেন, তোমাদের সংসারও যেমন মিথ্যা, নির্ব্বাণও তেমনই মিথ্যা। মানুষ সকলেই নিত্যমুক্ত, পাপ পুণ্য বলিয়া কোন জিনিসই নাই।

সহজধর্ম্মের অনেক বই বাঙ্গলায় লেখা। যদি নির্ব্বাণটাকে সহজই করিতে হয়, তবে উহাকে সংস্কৃত দিয়া কঠিন না করাই ঠিক হইয়াছিল।

যোগাচারমতে যেমন—কিছুই থাকে না, বিজ্ঞানমাত্র থাকে; সহজ-মতে তেমনই—কিছুই থাকে না, আনন্দমাত্র থাকে। এই আনন্দকে তাঁহারা সুখ বলেন, কখনও বা মহাসুখ বলেন। ইঁহাদের মতে চারিটি শূন্য আছে—নীচের শূন্য কয়টি কিছুই নয়, আলোকমাত্র; চতুর্থ শূন্যের নাম প্রভাস্বর। সে শূন্য আপনি উজ্জ্বল। সেই শূন্যে চিত্তরাজ গিয়া উঠিলেন, তাহার পর নিরাত্মাদেবীর সহিত মহাসুখে মগ্ন হইয়া 'নিঃস্বভাব' হইয়া গেলেন।

সহজযানের মূল কথা—বজ্রগুরু ব্যতিরেকে নির্ব্বাণপদ পাওয়া যায় না। শূন্যতাই বজ্র। উহা ছেদ করা যায় না, ভেদ করা যায় না, দগ্ধ করা যায় না, বিনাশ করা যায় না, উহাতে ছেদা করা যায় না—উহা অতি দৃঢ় ও সারবান্। যে গুরু এই শূন্যতাবজ্রের উপদেশ দেন, তিনিই বজ্রগুরু।

সহজযানে গুরুর উপদেশই লইতে হয়। ইন্দ্রিয় নিরোধের চেষ্টা করা বৃথা, পাপপরিহারের চেষ্টা বৃথা, কঠোর ব্রতধারণের চেষ্টা বৃথা, কঠিন কঠিন নিয়মপালন করাও বৃথা। এই-সকল সহজপন্থীর শাস্ত্র স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেছে, যে, যদি তোমার বোধিলাভের ইচ্ছা থাকে, তবে পঞ্চকাম উপভোগ কর। মানুষমাত্রেই পঞ্চকামোপভোগ করে। কিন্তু তাহাতে তাহারা পাপপুণ্যে লিপ্ত হয়। কিন্তু যখন বজ্রগুরু বুঝাইয়া দেন, যে, সবই শূন্য, কিছুরই স্বভাব নাই, তখনই সহজীয়ারা পঞ্চকামোপ-ভোগ করে ও পাপপুণ্যে লিপ্ত হয় না।

মহাসুখ লাভ করিলে সহজীয়াদের অনির্ব্বচনীয় অবস্থা হয়, শরীর যখন সংসুখে মূর্চ্ছিত হয়, তখন ইন্দ্রিয়সকল যেন ঘুমাইয়াই পড়ে, মন মনের ভিতর ঢুকিয়া যায়। শরীরের কোনরূপ চেষ্টা থাকে না।

এই মত সাধারণ লোককে একেবারে মাতাইয়া তুলিয়াছিল; লোকে যাহা চায়, সহজীয়ারা তাহাই দিল; কেবল বলিল গুরুর কাছে উপদেশ লও। শুধু কথায় বলিয়াই নিশ্চিন্ত রহিল না। তাহারা নানা রাগ-রাগিণীতে এই-সকল গান গাহিয়া বেড়াইত, এবং দেশের লোককে একেবারে মাতাইয়া তুলিত। তাহারা কি কি যন্ত্র ব্যবহার করিত, জানা যায় না। তবে একতারা ডমরু, মাদল ও ঢোল ছিল বলিয়া জানা যায়।

তাঁহারা যে-সকল রাগে গান গাহিতেন, তাহার অনেকগুলি রাগ এখনও সঙ্কীর্ত্তনে চলিতেছে। যথা:—রাগ পটমঞ্জরী, রাগ বরাড়ী, রাগ গুঞ্জরী, রাগ শীবরী, রাগ কামোদ, রাগ মল্লারি, রাগ দেশাখ, রাগ ভৈরবী, রাগ মালসী, রাগ গবুড়া, রাগ রামক্রী, রাগ বঙ্গাল ইত্যাদি।

পদকর্ত্তারা সন্ধ্যাভাষায় গান করিতেন। সন্ধ্যাভাষা অর্থাৎ আলো-আঁধারে ভাষা। উপরে কথায় কথায় একরূপ মানে হয়, অথচ ভিতরে অন্যরূপ গূঢ় অর্থ থাকে। বৌদ্ধ-সঙ্কীর্ত্তনে যাঁহারা গান লিখিতেন, তাঁহাদিগকেও পদকর্ত্তা বলিব। তাঁহারা যে গান লিখিতেন তাহার নাম চর্য্যাপদ বা গীতিকা। তাঁহারা চর্য্যাপদ ছাড়া আরও পদ লিখিতেন—যেমন বজ্রপদ বা বজ্রগীতিকা, উপদেশপদ বা উপ-দেশগীতিকা।

তখন অনেক বড় বড় লোকেও গীতিকা লিখিতেন। যিনি

[illegible] করিয়া [illegible]
ছিলেন, সেই [illegible] অতিশয় [illegible] বাঙ্গলার [illegible] লিখিতেন। [illegible] লিখিতেন, [illegible] লিখিতেন। অনেক বৌদ্ধ বাঙ্গালী [illegible] ও [illegible] টীকা লিখিতেন।

সহজ ধর্ম্মের গুরুদিগকে সংস্কৃতে বজ্রগুরু বলিত, বাঙ্গলায় বাজিল বা বজ্র বলিত। লোকে মনে করিত ইহাদের নানারূপ অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। ইঁহারা ঢাড়ীগোঁপ কামাইতেন, মাথায় বড় বড় চুল রাখিতেন, আলখেল্লা পরিতেন। এখন যেমন আউলেরা, তাঁহারাও কতকটা তেমনই গান করিয়া বেড়াইতেন। ইঁহাদিগকে সময়ে সময়ে সিদ্ধাচার্য্য বলিত। তিব্বতদেশে এখনও সিদ্ধাচার্য্যের পূজা হইয়া থাকে। অনেক সিদ্ধাচার্য্যের মূর্ত্তি তাঁহাদের দেশে আছে। লুইপাদ সিদ্ধাচার্য্যদের আদি। সর্ব্বশুদ্ধ চুরাশি জন সিদ্ধাচার্য্য। লুইএর বাড়ী বাঙ্গলাদেশে। তিব্বতদেশের সাহিত্যে তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া উল্লেখ করা আছে। তিনি মৎস্যের অন্ত্র বা মাছের পোঁটা খাইতে ভাল বাসিতেন, সেইজন্য তাঁহার নাম হইয়াছিল মৎস্যান্ত্রাদ। রাঢ়দেশে যাহারা ধর্ম্মঠাকুর মানে, তাহারা অনেকেই লুইকেও মানে এবং লুইএর উদ্দেশে পাঁটা ছাড়িয়া দেয়। লুইএর পূজার দিন তাহারা সেই পাঁটা বলি দেয়। যদি কেহ সেই পাঁটা চুরি করিয়া খায়, তবে তাহার অত্যন্ত অমঙ্গল হয়। ময়ূরভঞ্জের যে অংশটুকুকে রাঢ় বলে, সেখানেও লুইএর পূজা হইয়া থাকে। লুইএর বংশে আরও কেহ কেহ সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন, এবং বাঙ্গলায় গান লিখিয়াছিলেন।

তখন ব্রাহ্মণদিগের এত প্রাদুর্ভাব হয় নাই। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণে তখন হাজার ঘরও ছিল কি না খুব সন্দেহ। সুতরাং ব্রাহ্মণধর্ম্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল বলিয়া বোধ হয় না। সিদ্ধাচার্য্যগণ ও তাঁহাদের চেলারা দেশের একরূপ কর্ত্তা ছিলেন। একে ত তাঁহাদের ধর্ম্ম অতি সহজ, মানুষে যাহা চায় তাই তাঁহারা দিতেন। তাহাও আবার বক্তৃতায় ছটায় নয়, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া নয়, সংস্কৃতের ব্যাখ্যায় নয়, উপদেশ দিয়া নয়। গানে, নানা সুরে, নানা বাদ্যের সঙ্গে, গান করিয়া তাঁহারা লোকদের বলিয়া দিতেন, "বাপুহে সবই ত শূন্য,—সংসারও শূন্য, নির্ব্বাণও শূন্য—তবে যে আমি আমি বলিয়া বেড়াই, এটা কেবল ধোকা মাত্র। এই ধোকার পর্দ্দা নামাইয়া ফেল। তখন দেখিবে কিছুই কিছু নয়। সুতরাং আনন্দ কর। আনন্দই শেষ থাকিবে। আদিতেও আনন্দ, মধ্যেও আনন্দ, শেষেও আনন্দ।'

এই যে আনন্দময় উপদেশ, ইহার ফলে দেশের লোক মাতিয়া উঠিয়াছিল। যাঁহারা মাতাইয়াছিলেন, তাঁহারা খুব ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন, মানুষের মনের উপর কিরূপে প্রভুত্ব করিতে হয়, তাহা তাঁহারা বেশ জানিতেন। তাঁহারা গুরুগিরি করিয়া বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু চেলাদের যে কি পরিণাম হইবে, তাহা তাঁহারা একেবারেই ভাবেন নাই। তবে তাঁহারা আমাদের একটা বড় উপকার করিয়া গিয়াছেন—তাঁহারা বাঙ্গলাভাষাটিকে সজীব সতেজ সরল ও মধুর করিয়া গিয়াছেন এবং বৌদ্ধজগতে তাহাকে একটি উচ্চস্থান দিয়া গিয়াছেন। তজ্জন্য বঙ্গবাসী মাত্রেরই ইঁহাদের উপর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

[illegible] যে সহজ ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, সে ধর্ম্ম এখনও [illegible] তবে ইহার রূপ বদলাইয়া গিয়াছে। তখন সহজীয়ারা [illegible] ভাবে [illegible] থাকিতেন, এখন সহজীয়ারা দেবতাদের [illegible] হইয়া আছেন।

(নারায়ণ, ভাদ্র) শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

* * *

[illegible]

কালিদাসের [illegible] কায়দা আছে। কালিদাস সরস্বতীর [illegible] সরস্বতীর বন্দনা আরম্ভ করিয়া [illegible] মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সরস্বতীর রূপবর্ণনা করেন। কালিদাস কুমারসম্ভবে যখন পার্ব্বতীর রূপবর্ণনা করেন, তখন মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত বর্ণনা না করিয়া পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়াছেন। মেয়েকে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গের রূপবর্ণনা কালিদাসের এই প্রথম ও এই শেষ। লোকে বলে কালিদাস সরস্বতীর কাছে যে পাপ করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই প্রায়শ্চিত্ত। কালিদাস কুমারসম্ভবে উনিশটি কবিতায় পার্ব্বতীর রূপবর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু [illegible] রূপবর্ণনায় তাঁহার একটি মাত্র শ্লোক খরচ হইয়াছে এবং তাহাতে উনিশটি মাত্র কথা আছে। আবার রঘুবংশে ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরে তিনি ইন্দুমতীর রূপবর্ণনা করিয়াছেন, একটিও কবিতা খরচ করেন নাই, দাঁড়াইয়া সর্ব্বাঙ্গ বর্ণনা করেন নাই, কিন্তু সুনন্দা যখন ইন্দুমতীকে এক রাজার কাছ হইতে অন্য রাজার কাছে লইয়া যাইতেছে, তখন এক একটি করিয়া উনিশটি মাত্র বিশেষণ দিয়াছেন। তাহাতেই একটা [illegible] রূপবর্ণনা হইয়া গিয়াছে।

নাটকের রূপবর্ণনা কিন্তু আর-এক রকম। প্রতি নাটকেই প্রথমেই তিনি মেয়ে দেখাইয়াছেন। মেয়েটিকে তিনটি ভঙ্গীতে দাঁড় করাইয়া অন্য ব্যক্তির মুখে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের বর্ণনা করাইয়াছেন। কোন নাটকেই তিনের উপর চার অবস্থা দেখান নাই। বাস্তবিকও দেখাইতে গেলে একটু একঘেয়ে হয়। তাই কালিদাস তিনেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং এক-একবার তিন তিন অবস্থা দেখাইয়া জগতের সম্মুখে এক-একটি অপরূপ রূপ দেখাইয়া গিয়াছেন।

(নারায়ণ, ভাদ্র) শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

* * *

অনুর্ব্বরা ভূমি উর্ব্বরা করিবার উপায়

কৃষি-কার্য্যের উন্নতির জন্য পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা যে কত চেষ্টা করিতেছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহাদিগের এই চেষ্টার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকার ক্ষেত্রসমূহ দিন দিন অধিকতর শস্যশালী হইতেছে এবং সেইজন্য ঐসকল দেশে অন্নাভাব হয় না। আমাদের দেশে ভূমির অভাব নাই। কত যে পতিত জমি আগাছা ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ রহিয়াছে তাহার সীমা নাই, কিন্তু উপযুক্তরূপ চাষ আবাদের অভাবে সেই-সকল ভূমি কোন ফল প্রসব করে না।

আমাদের দেশে কর্ষিত কৃষিক্ষেত্রসমূহ বহুকাল ধরিয়া শস্য প্রসব করিয়া ক্রমেই শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে। আমরা তাহার শক্তিবৃদ্ধি করিতে পারিতেছি না। প্রাচীনকাল হইতে যেপ্রথায় সার দিয়া ভূমির উর্ব্বরতাশক্তি রক্ষা করিবার ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, আমরা কোনরূপে সেই প্রথারই অনুসরণ করিয়া আসিতেছি। বর্ত্তমানকালে ভূমির অবস্থা বিবেচনা করিয়া ও সেই প্রথার পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য কোন উৎকৃষ্টতর প্রথা প্রবর্ত্তন করা যায় কিনা সে বিষয়ে চিন্তাও করি না, এবং কেনই বা পূর্ব্বাপেক্ষা ভূমির উর্ব্বরতা হ্রাস হইতেছে তাহারও কোন আলোচনা করি না। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের বৈজ্ঞানিকেরা কেবল ফলশালিনী ভূমির শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য [illegible] নহেন, যাহাতে দেশের পতিত উর্ব্বরতাশক্তিহীন ভূমি-[illegible] হয় সে জন্য তাঁহারা নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। [illegible] তাঁহারা অনুর্ব্বরা ভূমিকে উর্ব্বরা করিবার [illegible] এই প্রবন্ধে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি।

পটাস ফস্ফরাস নাইট্রোজেন প্রভৃতি পদার্থ উদ্ভিদের আহার্য্য-সামগ্রী। যে-সকল ভূমিতে এই-সকল পদার্থ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে সেই ভূমিস্থ উদ্ভিদ যখন ভূমি হইতে ঐ সকল পদার্থ শোষণ করিয়া ফেলে তখন ভূমি নিঃস্ব হইয়া পড়ে এবং উদ্ভিদকে পোষণ করিবার শক্তি আর তাহার থাকে না। এইজন্যই ভূমিতে সার দেওয়া মানে পটাস ফস্ফরাস ও নাইট্রোজেন প্রভৃতি পদার্থের প্রয়োগ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভস্ম পটাস সরবরাহ করে, অস্থিচূর্ণ ফস্ফরাস যোগায় এবং পশ্বাদির মলমূত্র নাইট্রোজেন প্রদান করিয়া থাকে। কেহ কেহ জমীতে সোরা দিয়া থাকেন, সোরাতে যথেষ্ট পরিমাণে নাইট্রোজেন বিদ্যমান আছে। পটাস, ফস্ফরাস ও নাইট্রোজেন এই তিনটি পদার্থের মধ্যে শেষোক্তটি উদ্ভিদকে পরিপুষ্ট ও ফলশালী করে, অপর দুইটি পদার্থের দ্বারা সেরূপ হয় না। এইজন্য ভূমি নাইট্রোজেনশূন্য হইলে তাহা ফলশস্যপ্রসবে একপ্রকার অসমর্থ হয়। নাইট্রোজেন দুষ্প্রাপ্য নহে, আমাদিগের চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুমণ্ডলের পাঁচভাগের চারিভাগ বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন। কিন্তু আশে-পাশে নাইট্রোজেন বিদ্যমান থাকিলেও, বৃক্ষাদি যে নাইট্রোজেনের অভাবে মারা যায়, ইহার কারণ আর কিছুই নহে—উদ্ভিদ স্বয়ং বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন গ্রহণে অক্ষম। মাটির সহিত এমোনিয়া সোরা প্রভৃতি যৌগিক পদার্থ মিলাইয়া দিলে, তাহা যখন রসরূপে পরিণত হয় তখন উদ্ভিদসকল মূল দ্বারা নাইট্রোজেন শোষণ করিয়া লয়। মটরকলাই প্রভৃতি কতকগুলি শুঁটীধারী উদ্ভিদের বায়ু-মণ্ডল হইতে ভূমিতে নাইট্রোজেন আকর্ষণ করিবার শক্তি আছে। এরূপ দেখা গিয়াছে যে, কোন একটি ক্ষেত্রে নাইট্রোজেন অভাবে গম বা যব প্রভৃতি শস্য ভালরূপ জন্মিতে পারে না, কিন্তু সেই ভূমিতে একবার সীম মটর মসুর প্রভৃতি কলাই বপন করিবার পর তাহার উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে এবং তখন গম বা যব বপন করিয়া অত্যাশ্চার্য্যরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে। যে-সমস্ত শুঁটীপ্রসবকারী উদ্ভিদের মূলে ফোস্কার মত গাঁইট (nodule) দেখা যায় তাহারাই নিঃস্ব ভূমিতে ভালরূপ জন্মে, কিন্তু যাহাদের মূলে সেরূপ গাঁইট নাই সেগুলি তত ভালরূপ জন্মে না। ঐ গাঁইটগুলি এক-প্রকার মৃত্তিকাস্থ উদ্ভিদাণু Bacteria র‍্যাডিওকোলা (Radiocola)। নাইট্রোজেন-শূন্য ভূমিতে উক্ত উদ্ভিজ্জাণু মিশাইয়া শস্য বপন করিলে তাহা অদ্ভুতরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তদ্দারা জর্ম্মানদেশে ও আমেরিকাতে কৃষি-কার্য্যের বস্তুতঃ এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। শুঁটীধারী উদ্ভিদের মূলস্থ ফোস্কাযুক্ত গাঁইটের অণু হইতে এক বীজ (serum) প্রস্তুত হইয়াছে। যেমন রোগীকে বসন্তের টীকা দেওয়া হয় বা প্লেগের বীজ শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়, তেমনি এই উদ্ভিদাণুর বীজ গোধুম ভুট্টা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শস্যের বীজে সঞ্চারিত করিয়া দিয়া অনুর্ব্বরা ক্ষেত্রে বপন করিলে তাহা প্রচুর পরিমাণে ফলশালী হয়। এই বীজস্থ নাইট্রোজেনভুক্ উদ্ভিদাণু যদি মৃত্তিকায় নাইট্রোজেন প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে আর তাহারা বায়ু-মণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন আহার করিতে প্রয়াস পায় না, সুতরাং ইহাতে ভূমিস্থ নাইট্রোজেন বরং নিঃশেষিত হয়। কিন্তু ভূমিতে যদি নাইট্রোজেন না থাকে তাহা হইলে উদ্ভিদাণুসকল উহা বায়ু-মণ্ডল হইতে আহরণ করিয়া আপনাদিগকে রক্ষা করে এবং ভূমিকেও তাহার অংশ প্রদান করে।

সহজলভ্য সার—গোবর ও ছাই। ধইঞ্চা, বর্ব্বটী, শণ, নীল, এইরূপ কয়েকটি শুঁটীধারী শস্য জন্মাইলে বা নদীর বানে পলি পড়িলে জমির উর্ব্বরতা-শক্তি অনেক বৃদ্ধি হয়। পুষ্করিণী ও নালার মৃত্তিকা ফাল্গুন চৈত্র মাসে উঠাইয়া শুষ্ক করিয়া পরে জমিতে ছিটাইয়া দিলে পলি ও গোবর সারের ন্যায় কার্য্য করে।

সারের শ্রেণী-বিভাগ—সার-সমুদায় পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়।

সাধারণ সার—যাহাতে যবক্ষারজান, ফস্ফরাস্, পটাশ, চুন, লৌহ, গন্ধক ইত্যাদি উদ্ভিদের আহারীয় পদার্থ সমস্তই কিছু-না-কিছু পরিমাণে উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী অবস্থায় বর্ত্তমান আছে; যথা, জন্তুদিগের মল-মূত্র, পলুর নাদি, রেশম-কুঠীর আবর্জ্জনা (চোক্‌ড়ি), নানাপ্রকার খৈল, রক্ত-মাংস, পচা বা শুষ্ক মৎস্য, ঘাস, পাতা, বিচালি, পুষ্করিণী সমুদ্র ও আর আর জলাশয়ের পলি-মাটি, পুষ্করিণী ও নালার পাঁক মাটি (শুষ্ক অবস্থায়), পানা ও আগাছা, সহরের আবর্জ্জনা, নীল-সিটি, তাহাই সাধারণ সার নামে অভিহিত।

ফস্ফরাস্ সার—যাহাতে ফস্ফরাস-অম্লের পরিমাণ শতকরা ৫ ভাগের অধিক বর্ত্তমান আছে; যথা আপেটাইট্ প্রস্তর, জন্তুদিগের অস্থি ইত্যাদি। খৈলে ও ছাইয়ে শতকরা ১ হইতে ৪ ভাগ পর্য্যন্ত ফস্ফরাস্ সার বিদ্যমান থাকে বলিয়া যেখানে ফস্ফরাস্ প্রয়োগের আবশ্যক সেখানে যদি আপেটাইটাদি অথবা অস্থিচূর্ণ প্রয়োগ অসম্ভব হয়, তবে খৈল ও ছাই প্রয়োগ দ্বারা কতক ফস্ফরাস্ সারের কার্য্য সাধিত হয়।

যবক্ষারজান ঘটিত সার বা নাইট্রোজেন সার—যাহাতে যবক্ষারজানের পরিমাণ শতকরা ৫ ভাগের অধিক বর্ত্তমান আছে; যথা, সোডিয়াম্ নাইট্রেট্, এমোনিয়ম্ সালফেট্, সোরা, মৎস্যের সার, রেড়ির খৈল, চীনাবাদামের খৈল, খোসা ছাড়ান কার্পাস বীজের খৈল, পোস্তদানার খৈল, কুসুম ফুলের বীজের খৈল, শুষ্ক শোণিত, মাংস, ছিন্ন পশমীবস্ত্র ইত্যাদি। মৎস্য সারে, খৈলে, রক্ত-মাংসে, ছিন্ন পশমী বস্ত্রে বিশিষ্ট পরিমাণ ফস্ফরাস্ ও পটাশাদি সারও বর্ত্তমান আছে বলিয়া এসকল সামগ্রী সাধারণ সারেরও অন্তর্ভুক্ত। পাকশালার ঝুলে শতকরা ২।৩ ভাগ যবক্ষারজান আছে, এ কারণ ইহাও সারপদার্থ এবং ইহার কীট-নাশক গুণ থাকাতে ইহার ব্যবহার দ্বারা কপির চারা প্রভৃতিতে পোকা লাগিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

পটাশ—যাহাতে শতকরা পাঁচ ভাগের অধিক পটাশ বা ক্ষার আছে; যথা, ছাই, কাইনিট, সোরা ইত্যাদি। সোরাতে যবক্ষারজান ও পটাশ উভয় উপাদানই শতকরা ৫ ভাগের উপর আছে বলিয়া যবক্ষারজান ঘটিত সার প্রয়োগের আবশ্যক হইলেও এই সামগ্রী ব্যবহার করা যাইতে পারে, পটাশ-সার প্রয়োগের আবশ্যক হইলেও ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। সকল ছাইয়ে সমান পরিমাণে পটাশ থাকে না। নব-পল্লব ও পত্র শুষ্ক করিয়া জ্বালাইয়া, যে ক্ষার পাওয়া যায় উহাতে শতকরা ১৪।১৫ ভাগ পটাশ থাকে; বিচালি জ্বালাইয়া যে ক্ষার হয় উহাতে ৪।৫ ভাগ মাত্র পটাশ থাকে; কাঠ জ্বালাইয়া যে ক্ষার হয় উহাতে আরও কম পরিমাণ পটাশ থাকে। সকল রকম ক্ষার মিশ্রিত করিলে গড়ে শতকরা ১০।১১ ভাগ পটাশ উহার মধ্যে আছে এরূপ ধরা যাইতে পারে। কলার পাতা বা খোলা পুড়াইয়া যে ছাই হয় তাহাতে পটাশের পরিমাণ ১০।১২ ভাগ থাকে।

চূণ সার—যাহাতে শতকরা ৫ ভাগের অধিক খাঁটি চূণ আছে; চূণ, শম্বুক, ঝিনুক, গুটিং, জিপ্সম্ ইত্যাদি।

ফস্ফরাস, যবক্ষারজান, পটাশ অথবা চূণ-ঘটিত সারকে বিশেষ সার বলা যাইতে পারে। অনেকগুলি বিশেষ সারের দ্বারা সাধারণ সারেরও কার্য্য হইয়া থাকে। হাড়ের গুঁড়া প্রধানতঃ ফস্ফরাস-ঘটিত সার বটে, কেননা ইহাতে শতকরা ২৩।২৪ ভাগ ফস্ফরাসাম্ল বিদ্যমান। কিন্তু হাড়ের গুঁড়াতে ৩।৪ ভাগ যবক্ষারজান, সামান্য পরিমাণে পটাশ ও বিশেষ পরিমাণে চূণও বিদ্যমান আছে। কাজেই এই সার প্রয়োগ করাতে ফসলের সকল অভাব দূর হইতে পারে। হাড়ের গুঁড়ার দোষ

এই, ইহাতে গলিত বা গলনশীল ভাবে অতি সামান্য পরিমাণ উপাদান বর্ত্তমান থাকে, কাজেই ইহার প্রয়োগ দ্বারা হাতে হাতে ফল পাওয়া যায় না। অন্ততঃ দশ বৎসর ধরিয়া এই সার জমির কিছু কিছু উপকার করিয়া থাকে। সালফিউরিক এসিড দ্বারা হাড়ের গুঁড়া ও এপেটাইটাদি প্রস্তরের গুঁড়া গলনশীল অবস্থায় পরিণত করিয়া ব্যবহার করিলে ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়।

(কৃষক, জ্যৈষ্ঠ)। শ্রীশশিভূষণ সরকার।

* * *
*

সূত্র-প্রদানকারী উদ্ভিদ

সূত্র-প্রদানকারী উদ্ভিদের মধ্যে সাধারণতঃ পাট, শণ, ধঞ্চে, তুলা প্রভৃতি কয়েকটি প্রধান।

রিয়া-সূত্র—রেশম অপেক্ষা শক্ত। ইহার সূত্র অতি কোমল, রৌপ্যবৎ শুভ্র। রেশম ব্যতীত অন্যান্য সূত্র অপেক্ষা অনেকাংশে ভাল, সুতরাং দামী।

বিছুতি বা চিচিরা—বন্য অবস্থায় ইহা হইতে তত উৎকৃষ্ট সূত্র জন্মে না, এজন্য মান্দ্রাজে ইহার রীতিমত চাষ হইয়া থাকে এবং চাসে এই জাতীয় সূত্র দিন দিন উৎকর্ষ লাভ করিতেছে। এই সূত্র এরূপ সূক্ষ্ম, দৃঢ়, কোমল ও রেশমের ন্যায় ঔজ্জ্বল্যবিশিষ্ট যে মসিনার সূতা বলিয়া ভ্রম জন্মে, তৎপরিবর্তে শিল্পেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা হইতে উৎকৃষ্ট সূতা ও টোয়াইন প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার ফেঁশো (Tow) অর্থাৎ সূতার ছাট গারোপর্ব্বতের তুলার ন্যায় কোমল ও স্থিতিস্থাপক। এজন্য ছাগমেষাদি-জাতীয় পশুলোমের (Wool) সহিত মিশ্রিত হইয়াও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তিসি-সূত্র—তিসির সূতাকেই Flax বলে। ইহা হইতে সুপ্রসিদ্ধ linen নামক বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সূত্র-নির্ম্মিত বস্ত্রকে ক্ষৌম বসন বলে। তিসির সূতা শুভ্র ও রেশমের ন্যায় ঔজ্জ্বল্য-বিশিষ্ট বলিয়া স্থূল সূক্ষ্ম উভয়বিধ বস্ত্রশিল্পে, নানাপ্রকার টোয়াইন Twine, বোরা ও নানাজাতীয় সূত্রে মিশ্রণের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সূত্রনির্ম্মিত শিল্পাদি বহুমূল্য।

আকন্দ-সূত্র অর্ক-সূত্রও বলে। আকন্দ হইতে ক্ষৌম-সূত্রের (Flax) ন্যায় উৎকৃষ্ট ও সূক্ষ্ম বস্ত্রবয়নোপযোগী সূত্র পাওয়া যায়। ব্যবসায়ী-মহলে এই সূত্রের নাম "yercum" য়ার্কম অর্থাৎ সংস্কৃত অর্কশব্দের রূপান্তর। এই সূত্র মণ প্রতি ১৬৲ হইতে ২৬৲ টাকা পর্য্যন্ত দরে বিক্রয় হয়। ইহা অত্যন্ত দৃঢ়, শুভ্র, সূক্ষ্ম ও চিক্কণ বলিয়া অনেকে ইহার দ্বারা বস্ত্র-বয়নের পক্ষপাতী, আবার কেহ কেহ অত্যন্ত দৃঢ় বলিয়া রশারশি প্রস্তুতের পরামর্শ দিয়া থাকেন।

ম্যানিলা কদলী—একপ্রকার কদলী হইতে এই সূত্র প্রস্তুত হয়। ইহা মুসা টেক্সটাইল (Musa textiles) নামক কদলীর সূত্র—মানিলা কদলীর আঁশের নাম আবাকা (Abaca)।

মূর্ব্বা—যদিও পূর্ব্বকালে ধনুকের ছিলার নিমিত্ত আকন্দের সূতার ব্যবহার হইত, তথাপি মৌর্ব্বীকল্পে মূর্ব্বারই প্রাধান্য ছিল এবং অধুনাতন কাল পর্য্যন্ত ইহাই প্রচুর পরিমাণে ছিলার নিমিত্ত ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। মূর্ব্বা হইতে মৌর্ব্বী শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। মূর্ব্বার সূত্র কেশের ন্যায় কোমল, দৃঢ় ও সূক্ষ্ম এবং অতিশয় শুভ্র ও চাকচিক্যশালী, উত্তমরূপে প্রস্তুত করিতে পারিলে রেশমের সহিত ইহার প্রভেদ নির্ণয় করা কঠিন। উদ্ভিদজাত সূত্রসমূহের মধ্যে ইহা দেখিতে অনেকটা আনারসের সূতার ন্যায়। সরু, মোটা নানাবিধ টোয়াইন সূতা, রশারশি, এমন কি ইহার সরু আঁশ (Fibre) দ্বারা সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়নোপযোগী ক্ষৌম সূত্রের (Flax) কার্য্যও সম্পন্ন হইতে পারে। কাগজ প্রস্তুতের ইহা একটি উৎকৃষ্ট উপাদান। আজকাল বিলাত হইতে লক্ষ টাকার পুস্তক বাঁধিবার, মাছ ধরিবার, জাল বুনিবার, ঘুড়ি উড়াইবার, নানাপ্রকার সূতা ও রঙ্গিন টোয়াইন্ আমদানী হইতেছে। মূর্ব্বা হইতে এ-সকল সুন্দর প্রস্তুত হইতে পারে।

আনারস—উদ্ভিদজাত সূত্রের মধ্যে আনারসের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও দৃঢ়তম সূত্র অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। ইহা রেশমের ন্যায় কোমল, শুভ্র ও সুচিক্কণ এবং ক্ষৌম সূতার (Flax) উৎকৃষ্ট অনুকল্প (Substitute), মূর্ব্বার সূত্র ইহার নিম্নে পরিগণিত হয়। ফিলিপাইন দ্বীপের প্রসিদ্ধ অনারসী বস্ত্র (Pineapple cloth) ও পিনা (Pina) নামক সুসূক্ষ্ম বস্ত্র, ইহার রেশমবৎ সূক্ষ্ম তন্তু হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত টোয়াইন ডোর, সূতা ও নানাবিধ সূক্ষ্ম বস্ত্রশিল্পের জন্যও ইহার প্রচুর ব্যবহার হয়। জাপান ও জর্ম্মনীতে ইহার পত্র হইতে পার্চ্চমেণ্টের ন্যায় উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হয়; শুনা যায় জর্ম্মনীতে রাসায়নিক দ্রব্যান্তর সংযোগে ইহার পত্র হইতে এরূপ কঠিন কাচবৎ পিজবোর্ড প্রস্তুত হয় যে তদ্দ্বারা রেলগাড়ীর চাকা ও অন্যান্য অংশ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। আনারসের সূতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জলসহনশীল অর্থাৎ সহজে জলে পচিয়া নষ্ট হয় না। এদেশে আনারস কাটিয়া লইলে গাছটি শুকাইয়া মরিয়া যায়, কোন কাজে লাগে না; আমরা সচেষ্ট হইলে এই পত্র হইতে ডোর, ঘুড়ি উড়াইবার সূতা, টোয়াইন প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারি, এজন্য পরের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না।

এগেভ সূত্র বা মুগা সূত্র—এই জাতীয় সূত্র হইতে রশারশি, দড়ি, পাপোষ, প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। মণ প্রতি ৫।৬ টাকা দরে এই সূতা বিক্রয় হয়।

সিসল হেম্প—এদেশে ইহা প্রচুর উৎপন্ন হয়। সাহেবেরা ইহার চাষে আজকাল অধিক মনোযোগী হইয়াছেন, কারণ এই জাতীয় সূত্র অতি উৎকৃষ্ট ও পরিমাণে প্রচুর উৎপন্ন হয় এবং উদ্ভিদজাত সূত্রসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জলসহনশীল। জাহাজের কাছী ও সমুদ্র-মধ্যগত টেলিগ্রাফের তারের (Cable rope) জন্য ইহার দড়ি অপর্য্যাপ্ত ব্যবহার হয়। ইহার চাষ দিন দিন যত বৃদ্ধি পাইতেছে সূত্রও তত উৎকর্ষ লাভ করিতেছে। বৎসরে প্রতি-গাছ হইতে আধসেরের উপর সূত্র উৎপন্ন হয়। ১০ হইতে ১৫ টাকা মণ দরে এই সূতা বিক্রয় হয়। ইহার বৃহৎকায় মাংসল সুদীর্ঘ পত্র হইতে অতি দৃঢ়, শুভ্রবর্ণ ও চিক্কণ সূত্র পাওয়া যায়। ইহার দ্বারা রশারশি, বোরা প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে।

বেড়েলা সূত্র—পীত বেড়েলা ও শ্বেত বেড়েলা। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই নানাজাতীয় বেড়েলা বন্যভাবে জন্মে। এই উদ্ভিদের চাষ কদাচ দৃষ্ট হয়। বেড়েলা জাতি মাত্রই সূত্রপূর্ণ, কিন্তু উপরোক্ত দুইটি হইতে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সূত্র পাওয়া যায়। এই সূত্র অতিশয় শুভ্র, কোমল ও উজ্জ্বল, দেখিতে মূর্ব্বা বা তিসির সূতার মত এবং পাট অপেক্ষাও দৃঢ়, বহুগুণে উৎকৃষ্ট ও মূল্য অধিক। ইহাদের চাষ, আবাদ-প্রণালী ও ফলন পাটের মত হইতে পারে। ইহা হইতে টোয়াইন, সূতা, ক্যাম্বিশ, বোরা, দড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে এবং পাটের ন্যায় নানাবিধ বস্ত্রশিল্পে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

ঢেঁড়শ সূত্র—এই জাতীয় অধিকাংশ উদ্ভিদ হইতেই রেশমের ন্যায় উজ্জ্বল, সূক্ষ্ম ও দীর্ঘতন্তু সূত্র পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টগুলি তিসির সূতার পরিবর্তে ব্যবহার হইতে পারে; অবশিষ্টগুলি দড়ি, কাছী, সূতা, টোয়াইন, বোরা, ক্যাম্বিশ, আসন প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য বিশেষ উপযোগী। ঘনভাবে বীজবপন করিলে গাছ শাখাপ্রশাখা-বিহীন সুতরাং সূত্রও দীর্ঘ হয়। যখন গাছে প্রচুর পরিমাণে ফুল ও অল্পপরিমাণে ফল ধরিতে আরম্ভ হয়, তখনই গাছগুলি সূত্র প্রস্তুতের

উপযোগী হইয়াছে বুঝিতে হইবে, এই সময়ে গাছ কাটিলে সূতাও পরিমাণে অধিক পাওয়া যায়। যে-সকল উদ্ভিদ হইতে সূতা পাওয়া যায় তাহাদিগকে জলে ফেলিবার পূর্ব্বে ২।১ দিবসের অধিক শুকাইতে দিলে গাছের রস অত্যধিক শোষিত হওয়ার জন্য সূত্র দাগী হয়, এজন্য আবশ্যকানুযায়ী সামান্য মাত্র শুকাইয়া জলে পচানই শ্রেয়, ইহাতে সূত্র শুভ্রতর ও দৃঢ় হইয়া থাকে।

বনঢেঁড়শ—ইহার পত্র পুষ্প ও ফলাদি লতাকস্তুরীর ন্যায়, তবে বীজ মৃগনাভি-সুগন্ধি নহে। ইহার সূতা লতাকস্তুরীর মত শুভ্রবর্ণ, চিক্কণ ও দৃঢ়, পাট শণের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গাছগুলি ৫।৬ হস্ত দীর্ঘ হয়। ইহার অপক্ব ভলের রস গুড়-পরিষ্কারক; উত্তর পশ্চিমের বিখ্যাত কৃষিবিদ হার্দীসাহেব ইহা হইতে চিনি পরিষ্কার করিয়া থাকেন। ইহার চাষ আবাদ ও সূত্র-প্রস্তুত-প্রণালী অবিকল ঢেঁড়শের ন্যায়; সূত্র দীর্ঘ করিতে হইলে, গাছ ঘন জন্মান আবশ্যক। বর্ষাকালে কলিকাতার উপকণ্ঠবর্ত্তী খালধারের উভয়পার্শ্বের জঙ্গলে ৩।৪ হস্ত দীর্ঘ একজাতীয় বনঢেঁড়শ স্বভাবতঃ জন্মিতে দেখা যায়; ইহার দণ্ড ও পত্র অত্যন্ত রোমবহুল, পত্র বৃহৎকায় এবং উৎপন্ন সূত্র নিকৃষ্টজাতীয় হইলেও সাধারণ বন্ধনকার্য্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এসকল গাছ যথাসময়ে আপনা-আপনি জন্মিতেছে, মরিতেছে, কেহ কোন তত্ত্ব লয়না।

আমলাপাট—এই গাছ দেখিতে অনেকটা মেস্তার মত, গাছে অল্পবিস্তর অতি সূক্ষ্ম কাঁটা আছে, পত্র অম্লাস্বাদন; গাছগুলি ৫।৬ হস্ত দীর্ঘ হয়। কেহ কেহ ইহাকেও মেস্তাপাট বলে। ইহার চাষ আবাদ সূত্রনিষ্কাশন ও ব্যবহার-প্রণালী অবিকল শণের মত; রাজমহল অঞ্চলে পাটের প্রণালীক্রমে সূত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার সূত্র প্রচুর পরিমাণে জন্মে এবং ফলন শণেরই মত। ঢেঁড়শজাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে ইহার সূত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও দৃঢ়, পাটের সহিত অনেক সময় ইহার ভেজাল চলিয়া থাকে। সূত্র দৃঢ় বলিয়া শণের পরিবর্ত্তেও ব্যবহার হইয়া থাকে কিন্তু শণের দৃঢ়তা অপেক্ষা ইহার ঔজ্জ্বল্য অধিক। এই জাতীয় সূত্র হইতে নানাবিধ টোয়াইন, সূতা, বোরা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

মেস্তা—পশ্চিমাঞ্চলে ইহার ফলকে কুদ্রুম বলে। নানাবিধ মোরব্বা, আচার ও অম্লের জন্য ফল প্রচুর ব্যবহার হয়। ফলের কাপ হইতে মিষ্টসংযোগে অতি উপাদেয় আসব প্রস্তুত হয়। এই জাতীয় সূত্র আম্লাপাটের ন্যায় সূক্ষ্ম ও চিক্কণ, এই পাটে শণের কার্য্য উত্তম নির্ব্বাহ হইতে পারে এবং দড়ি, সূতা, টোয়াইন প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। পুষ্পিত অবস্থায় গাছ কাটিলে পরিমাণে অধিক সূত্র জন্মে ও উৎকৃষ্ট হয়, নোনাজলে পচাইলে সূত্র শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়, এজন্য নির্ম্মল জলে ইহার সূতা প্রস্তুত করা উচিত।

স্থলপদ্ম—বৎসরে ২।৩ বার গাছ ছাঁটা যাইতে পারে। নূতন শাখার সূত্র সূক্ষ্ম ও কোমল এবং পরিপক্ব শাখার সূত্র কড়া (Coarse)। ইহার বল্কলজাত সূত্র পাটের ন্যায় নানাবিধ কার্য্যে লাগিতে পারে।

(কৃষক, জ্যৈষ্ঠ)

* *
*

গোবর ও গোমূত্র সংরক্ষণ—

আমাদের কৃষকগণ কখনও উপযুক্তরূপে গোবর রাখে না। গোমূত্র যে একটি বিশেষ সারবান পদার্থ তাহা হয়ত অনেকের জানাই নাই। বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের অভিমত এই যে, গোশালার মেঝে সমান করিয়া পিটিয়া এক দিক (যদি দুই সারি করিয়া গরু রাখা হয় দুই দিকেই), একটু ঢালু করিয়া লইবে। ঐ ঢালের পাদদেশ দিয়া নালা কাটিয়া দিবে এবং ঐ নালার অথবা নালাগুলির মুখ গোশালার বাহিরে একটি বড় মাটির গামলা বা অন্য কোন পাত্রে যাইয়া মিশিবে, যেন গোমূত্র অনায়াসে সেই গামলায় বা পাত্রে জমা হইতে পারে। নিকটে গোবর ইত্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্য একটি বড় রকমের গর্ত্ত করিয়া উহার চারিধার ও তলদেশ খুব এটেল মাটি ও গোবর দ্বারা লেপন করিয়া লইবে যেন সহজে সারভাগ ভিতরে শুষিয়া না যায়। রক্ষিত সার বৃষ্টি কিংবা রৌদ্র হইতে রক্ষা করিবার জন্য ঐ গর্ত্তের উপর একখানা চালা উঠাইয়া দেওয়া আবশ্যক। চতুষ্পার্শ্বস্থ জমীর জল যাহাতে ঐ গর্ত্তের ভিতর আসিয়া না পড়িতে পারে সেজন্য গর্ত্তের উপরে চারিধারে অনুমান একহাত পরিমাণ উচ্চ করিয়া একটি দেওয়াল তুলিয়া দিবে। গর্ত্তের আয়তন গরুর সংখ্যা অর্থাৎ তদনুযায়ী গোবরের পরিমাণের উপর নির্ভর করিবে। চালাও সেই অনুসারে বড় বা ছোট হইবে। একজন সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে ৭ হাত দৈর্ঘ্য ও ৪ হাত প্রস্থ এবং দুই হাত গভীর একটি গর্ত্ত হইলেই প্রথম চলিতে পারে; প্রতিদিন প্রাতঃকালে গোশালার গোবর, খড়পাতা ও গৃহের অন্যান্য আবর্জ্জনা ঐ গর্ত্তে নিক্ষেপ করিবে। তৎপর উপরোক্ত গামলার গোমূত্র ঐ আবর্জ্জনা-মিশ্রিত গোবরের উপর ছিটাইয়া দিবে। ২।৪ দিন পর পর গর্ত্তস্থিত গোবর আবর্জ্জনা ইত্যাদি কোদালের সাহায্যে টানিয়া সমভাবে বিছাইয়া ও কোদালের পৃষ্ঠদ্বারা পিটাইয়া চাপিয়া যথাসম্ভব সমতল ও দৃঢ় করিয়া দিবে। সার আলগাভাবে রাখিতে নাই, কেননা তাহা হইলে উহার মূল্যবান পদার্থ উড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। দৃঢ়রূপে চাপা থাকিলে ঐগুলি আস্তে আস্তে সমভাবে পচিয়া অতি উৎকৃষ্ট সারে পরিণত হয়। গোশালার মেঝেতে অনেক পরিমাণ মূত্র শুষিয়া যায় বলিয়া উহার মাটি মাঝে মাঝে কোদালিদ্বারা তুলিয়া লইয়া ঐগর্ত্তে ফেলিলে উহা হইতেও যথেষ্ট পরিমাণ সার পাওয়া যাইতে পারে। আবার নূতন করিয়া মাটি দিয়া মেঝে পূর্ব্বমত প্রস্তুত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ক্রমে যখন একটি গর্ত্ত পরিপূর্ণ হইয়া আসিবে তখন পূর্ব্বের ন্যায় আরও একটি গর্ত্ত করিয়া লইবে। ইহার খরচ এত কম এবং লাভের আশা এত বেশী, আশা করা যায় খুব শীঘ্রই বিস্তৃত ভাবে ইহার প্রচলন হইবে।

(কৃষক, জ্যৈষ্ঠ)

* *
*

অন্ধ কবিওয়ালা তারাচাঁদ—

অনুমান বঙ্গাব্দ ১২৪৭ কি ১২৪৮ সালে ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত রামপুরের সুপ্রসিদ্ধ নন্দীবংশীয় পরলোকগত গোলকচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে তারাচাঁদের জন্ম হয়; তাঁহার পিতার নাম বলরাম দে। সামান্য অক্ষর-পরিচয় মাত্র করিয়াই তাঁহার বিদ্যা শেষ হইয়াছিল। তাঁহার বয়স যখন ১৬ কি ১৭ বৎসর তখন দারুণ বসন্তরোগে তিনি আক্রান্ত হন। মৃত্যুর দ্বার হইতে তিনি ফিরিয়া আসিলেন বটে কিন্তু 'নব্বই হাজার মুদ্রা' মূল্যের দুইটি চক্ষু-রত্নই তিনি চিরকালের জন্য হারাইয়া ফেলিলেন।

"লক্ষ টাকা কর্জ্জ কইরে ভবের হাটে আই,
(হায় গো)
পরে হিসাব কিতাব কইরে দেখি, মা, মাগো
আসলে নব্বই হাজার নাই!
আমি দশ হাজারে, কেমন কইরে,
দেনা হ'তে মুক্তি পাই?
তারিণী, দীনতারিণী গো, অধীনের গতি
কেমনে পাই?

হ'ল না আমার হাট-বাজার,
আসতে পথে দিন কাবার,
আমার বিকি-কিনি নাই ?
আছি বদ্ধ হ'য়ে অন্ধকারে
পথ দেখনের চক্ষু চাই !

যৌবনের প্রারম্ভেই অন্ধ হইয়া জীবনের সকল সুখ হইতেই কবি বঞ্চিত হইলেন।

"মাগো, আমারে আনিয়া ভবে
করলে আমার কি সর্ব্বনাশ,
ভবের হাটে, এ সঙ্কটে, দিলে পাঠাইয়ে,
করব বলে সুখের গৃহ-বাস।
তা'তে অন্ধ হয়ে বদ্ধ থাকায়
চিন্তা হইয়াছে,
ধরায় সুহৃৎ কে আছে, মা আমার গো,
কেবল নামে মাত্র হই তারা-চান্,
দিবারাত্র রাখছ সমান,
তা'তে দুই কাঠা দর লেগেছে ধান,
মাগো, প্রাণ কেমনে বাঁচে ?
দিবানিশি থাকি বসি, কম্ম জানি না,
নাই সুহৃৎ একজন, বাচায় এ জীবন,
ঐ চিন্তায় নিদ্রা হয় না।
দুর্গে গো, দিলে সবারে সম্পদ্
আমার দুঃখ যে মা—চক্ষু দিলে না !"

গ্রামে গ্রামে তখন সখের কবির দলের সৃষ্টি হইয়াছিল। বাংলার প্রাচীন কাব্য-সাহিত্য ও আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের মাঝখানে সেতু-স্বরূপ এই কবিওয়ালাদের গান।

চন্দনকান্দী গ্রামের শ্রীযুক্ত আনন্দকিশোর চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও ভবানীপুর-নিবাসী পরলোকগত জীবন মজুমদার মহাশয়গণের কবিগান শুনিয়াই কবি তারাচাঁদের কবিগানের প্রতি আসক্তি ও কবিগান শিক্ষায় আগ্রহ জন্মে। চন্দনকান্দী গ্রামে সূর্য্যকান্ত নন্দী চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে কবি তারাচাঁদ আশ্রয়লাভ করেন। স্বর্গীয় সূর্য্যকান্ত চৌধুরী মহাশয় নিজেও অনেক গান রচনা করিয়াছেন—এতদঞ্চলে তাঁহার রচিত কবিগান ও হরি-সংকীর্ত্তন ঘরে ঘরে আদৃত ও গীত হইয়া থাকে। কবি রামু, রামগতি সরকার সমাজের নিম্ন সোপানে অবস্থিতি করিলেও কায়স্থকুলতিলক কবি সূর্য্যকান্ত ইঁহাদিগকে যে কি পরিমাণ শ্রদ্ধা করিতেন ও ইঁহাদের গুণাবলীতে তিনি কি পরিমাণ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহারি রচিত একটি কবি-সঙ্গীতে প্রকাশ পায়—

"গোবরেতে পদ্ম ফোটে সে তো মিথ্যা কথা না,
তা' সাক্ষাতে সব সাক্ষ্য পেলাম, রামু-রামগতি দুজনা।
তারা জন্মকুলের ধর্ম্ম ছেড়ে করেছে উত্তমেরি কাজ,
বাগ দেবীর কৃপাবলে অনর্গল শাস্ত্র বলে
মাথাতে দিচ্চে তুলে সাচ্চা জরীর তাজ !
যেমন, আম্‌ড়া গাছে আম ধরেছে, নিমগাছে বাদাম,
যেমন ফণীর মাথায় মণি আছে, ঝিনুকেতেও মতি হয়,
ঐ রামগতি নাপিত বটে, নামে বই কাজে নাপিত নয়।
লয় না সে চাম্‌ড়া হাতে,
বেড়ায় না বড়বাজারের পথে পথে দিনে রাতে,
আবার গৌরবচনের মতে মতে
পাঁচালীতেই ছড়া কয় !
সকলে তাই জানে, দু'জনে দিচ্ছে পরিচয়,
যেমন ডুমুর-গাছে ফুল ফোটেনা
কেবল কথামাত্রই হয় !
রামু-ডুমুরের গাছে ভুঁইচাঁপা ফুল ফুটিয়াছে,
রামগতি-প্রতিপদে চন্দ্রেরই উদয় !
যেমন পাশাপাশি দুটি তারা কালিদাস বরুচ
এসে বাংলা দেশে জংলাতে ভাই
ক'রে গেল দিগ্‌-বিজয়
রামগতি নাপিত বটে, নামে বই কাজে নাপিত নয় !'

একবার রামগতি ও রামু সরকার যখন আসরে কবির লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন উভয় দলের একটা মীমাংসা করিয়া কবি সূর্য্যকান্ত যে ছড়াটি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিবার লোভ আমরা সংবরণ করিতে পারিলাম না।

"হায়, আমোদে প্রমাদ ঘটায়ে বসেছি
দেখ্ দেখিরে ভাই,
রামগতি আর রামু চাঁদে,
পাঁচালীর ছড়াতে লড়াই !
যেমন শান দিয়ে ক্ষুর প্রাণে হানে,
(নাপিত) রামগতি করছে হাল বেহাল,
রামু (মালী) তাই শান দিয়ে চলে ঝাঁঝটের কাঁটা খুলে,
রামগতির মাঝ-কপালে বসাবে কোদাল !
কেমন নরসুন্দর ভূমিসুন্দরে বিবাদ,
যেমন, রাক্ষসে বানরে যুদ্ধ কেউ হতে কেউ নয়রে কম,
রামুচাঁদ ভাবছ কিহে, রামগতি আজ গাঁজায় দিচ্ছে দম !
যায় জাঁকজমকে ধূয়া গেয়ে
ছড়া কয় চোটপাটে ভ্রূকুটী দিয়ে, কাঁপ্‌ছে হিয়ে,
আবার তোর পানে চায় মিটমিটায়ে,
ঠিক যেমন কালনেমির যম !
রামুচাঁদ ভাবছ কিহে রামগতি আজ গাঁজায় দিচ্ছে দম !
এখন ঝকমারি কাজ গেছে
হয়েছে সরকারি 'ইন্‌কম্'।'
আবার দেখ্‌না চেয়ে যাচ্ছে গেয়ে
রামগতির মুখে ক্ষুরের ধার,
যায় আবার ছড়া গেয়ে, চাম্‌টি দেয় র'য়ে র'য়ে,
আড়, চৌতাল বাজায়ে উড়াচ্ছে বাহার !
এতো মাটী কাটা নয়রে রামু, এক কাটায় কাজ হয়,
তুমি পড়েছ চুল-কাটার হাতে খসাবে তোর খাসা লোম,
রামচাঁদ ভাবছ কিহে রামগতি আজ গাঁজায় দিচ্ছে দম !"

তারাচাঁদ প্রথম যৌবনে বাবসার সখে সুসঙ্গরাজের বংশধরগণের পূর্ব্ববলাগ রাজবাড়ীতে শারদীয়া পূজা উপলক্ষে উপর্য্যুপরি সাত বৎসর পর্য্যন্ত বিভিন্ন কবির সরকারের সঙ্গে গান গাহিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা রামু সরকার ও রামগতি সরকারের সঙ্গেও আমাদের এই অন্ধ কবিওয়ালার প্রতিযোগিতা ছিল। কিন্তু রামু রামগতির সহিত তারাচাঁদের যেমন হৃদ্যতা ছিল, এমন আর কাহারো নহে—তাই, যখন রামগতি সরকার ইহলোক ত্যাগ করেন, কবিওয়ালাগণের আশ্রয়দাতা ও পৃষ্ঠপোষক "কবির জাহাজ" সূর্য্যকান্ত চৌধুরী মহাশয়ও যখন নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন, রামু সরকার তখনও জীবিত ছিলেন। ইঁহাদের পরলোকপ্রাপ্তিতে কবি তারাচাঁদ বড় দুঃখে গাহিয়াছেন—

"এ লোকে গণ্যমান্য ধন্য ছিল
কবি সে রামগতি সরকার,

তার পরে ঐ রামু সরকার এই
বঙ্গদেশে উড়াচ্ছে বাহার !
ওঁদের কবিত্বগুণ ছিল ভারি,
নামজারি দেশে বিদেশে হয়,
মঙ্গলসিধ, চন্দ্রনাথ চৌধুরী,
হারাইল্ বিশ্বাস চারগাতিয়া বাড়ী,
ছিল কবির জহুরী
আজও লোকে কয় !
যেমন কালিদাস বরুচের প্রায় রামু রামগতি,
কেবল আছে মাত্র রামু সরকার
আজও চলে কবির কাজ,
বাবু সূর্য্যকান্তের জীবনান্তে
এককালে ডুব্‌ল কবির জাহাজ !
ছিল হরেকৃষ্ণ সে রামকানাই,
পরাণ মরেছে রামগতিও নাই,
গুণী আর নাই
ইচ্ছা হয় আমিও ম'রে যাই,
ভবে রাখ্‌লে কেন ধর্ম্মরাজ ?
বাবু সূর্য্যকান্তের জীবনান্তে
এককালে ডুবল কবির জাহাজ!
(খাদ)—আপশোষে হায় মরি, কি করি
আর যাই না লোকসমাজ !
দেশে হয় না গুণী একটা প্রাণী
এদেশে আর গুণী হবে না,
বিজয় ঠাকুর কবি হলো
এক রকম মন্দ, না ভালো,
কালী সরকার শম্ভু ঝালো
ওদের কবি বলি না !
ওদের কবি বলিলে চামচড়াও পাখী বলতে হয় !
এখন তারাচাঁদে বসে কাঁদে
বেঁচে থেকেই হচ্চে লাজ !
বাবু সূর্য্যকান্তের জীবনান্তে
এককালে ডুবল কবির জাহাজ !''

তারাচাঁদ হাস্য রসিকতাতেও কম পটু নহেন। একবার কবিওয়ালা কুটীশ্বর পালের সহিত তারাচাঁদ কবিগানের আসরে নামিলেন। ধর্ম্মালোচনা ছাড়িয়া হঠাৎ কুটীশ্বর পাল তারাচাঁদকে শূদ্র ও সে লোটা-গামছা বহন করে বলিয়া একটু বিদ্রূপ করেন। তারাচাঁদ অতি নিপুণ ভাবে তাহার উল্টা জবাব রচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রতিপক্ষীয় সরকারকে এমন ভাবে শুনাইয়া দিলেন যে তিনি আর এ প্রসঙ্গে কোন কথা কহিবারই সাহস পাইলেন না। তারাচাঁদের গানটি এই—

"আমের গুড়ি বেলের মুথাড়ি
উপরে তার জড়ি মাকড়ি !
লম্বা তক্তা উপরে পাথর
ঘুরছে ঘুরঘুরি
পালের পুত, বড়াই কর কি ?
এক ছটাক তেল কম হইলে
বুড়া তেলী এ চোখ ঘুরায়,
হইল না টাক, পনেরো ছটাক্
পালের পুত আর চারটা পাক্ ঘুরিয়া আয় !
ফাটা চণ্ডীর মধ্য দিয়া
ঝির্‌ঝিরাইয়া তেল চুয়ায়,
হইল না টাক্ পনেরো ছটাক্
পালের পুত আর চারটা পাক্ ঘুরিয়া আয়।"

কিছুকাল পূর্ব্বে কোনো কার্য্যোপলক্ষে কবি তারাচাঁদ একজন লোক সঙ্গে লইয়া ফরিদপুর গিয়াছিলেন। পথভ্রমণে পরিহিত বস্ত্রাদি মলিন হইয়া যাওয়াতে সেখানকার থানার মুন্সি ও এক কনেষ্টবল তাঁহাদিগকে "জংলী" বলিয়া ঠাট্টা করেন। গ্রাম্য-কবি স্বদেশাভিমানে আঘাত পাইয়া একটি রচনা শুনাইয়া দিলেন ; তাহাতে মুন্সী ও কনেষ্টবল কবিকে কিছু পুরস্কার দিয়া আপ্যায়িত করিলেন—রচনাটি এই :—

"বঙ্গদেশে বাড়ী আমার,
আমি "জংলী'' কেম্‌নে হই ?
বলেন মুন্সি মহাশয়, আবার কনেষ্টবলেও কয়,
এইদেশে মানুষ পাইনা কই !
যেমন রাম গেছিলেন বনবাসে,
ঠাট্টা করছিল রাক্ষসে,
সেই দশাই ঘট্‌ছে আমার এদেশে !
থানার এক কনেষ্টবল, বুদ্ধি রাখে তিন ডবল,
মরি আপ্‌শোষে !
রাং কি সোনা চিন্‌তে পায় না,
চিন্‌বেই বা কেম্‌নে বহুঁষে !''

বৎসরের শেষে একবার করিয়া পূর্ব্ব ময়মনসিংহের জমিদার মহোদয়গণের নিকট তারাচাঁদ তাঁহার রচনা শুনাইয়া ভূমি, বস্ত্র, অর্থ ইত্যাদি পুরস্কার স্বরূপ সংগ্রহ করিতেন।

গ্রাম্য কবি-ওয়ালা তারাচাঁদ গ্রামের কৃষকদের দুর্দ্দশা দুর্গতি দেখিয়া জারিগানের সুরে যে একটি রচনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে কৃষকদের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিবার অবসর পাওয়া যায়।

"এই সব গৃহস্থের মন হ'য়ে গেল ফানা,
মাগী পোলার খানা পিনা সকলের চলবেনা,
রে ভাই !
মহাজনেরে কি বুঝাইব, রাজার খাজনা,
দিনে দিনে খোদায় বুঝি উঠাইবেন দানা,
রে ভাই !
(এই) জ্যৈষ্ঠ মাসে বর্ষা হৈল এমন আর শুনিনা
শাইল নিল নাইল্যা নিল, সঙ্গে গেল চিনা,
রে ভাই !
নাইল্যা করা গৃহস্থেরা টাকার করে বড়াই,
ইংরেজ-জর্ম্মনে এখন লেগেছেরে লড়াই,
রে ভাই !
খবরের কাগজে শুনি হইল নাকি সন্ধি
ইংরেজে বাণিজ্য করবে রাস্তা করছে বন্দী,
রে ভাই !
কোঠা কইরা নষ্ট পাইবা পড়বে বিষম ফাঁদে,
সময় থাকতে ধান কর ভাই বলে তারাচাঁদে
রে ভাই !''

(সৌরভ, শ্রাবণ) শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরী।

* *
*

পল্লীশিক্ষার উন্নতি চিন্তা

পল্লীর অধিবাসীগণকে নানাপ্রকার রোগে যেমন ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে, শিক্ষার অভাবেও তাহাদের সর্ব্বস্ব ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছে। এক কথায় এই শিক্ষার অভাবই তাহাদের অধঃপাতের একমাত্র কারণ। আমাদের অনেক গিয়াছে, যাইতেও বসিয়াছে। গ্রামের অবৈতনিক শিক্ষার স্থান "টোলগুলি" ক্রমে ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে। প্রাচীন গুরুগৃহই বর্ত্তমানে টোলের আকার ধারণ করিয়াছে। গুরুগৃহের অন্যান্য শিক্ষা উঠিয়া গিয়াছে; আছে কেবল জ্ঞানদানের ক্ষীণ বাসনাটুকু। গুরুগৃহের দ্বার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য তিনবর্ণের জন্য সর্ব্বদাই উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান টোলগুলি অনেকদিন যাবৎ কেবল ব্রাহ্মণ ছাত্রদের দ্বারাই পূর্ণ রহিয়াছে। পূর্ব্বের চেয়ে টোলের সংখ্যা অনেক কম হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহার প্রধান কারণ অন্নসংস্থানের অভাব। বর্ত্তমানসময়ে শিক্ষাক্ষেত্রে যেরূপ দুরবস্থা দেখা যাইতেছে, তাহাতে টোলের শিক্ষা, শিক্ষাপ্রচারের পক্ষে উপযুক্ত হইবে বলিয়া আশা করি। পল্লীতে এবম্বিধ অবৈতনিক শিক্ষাই যথেষ্ট উপকারী। যদি প্রাথমিক শিক্ষার দ্বারাও পল্লীর শিক্ষাপ্রচার অবৈতনিক হইয়া টোলের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে অতি অল্প সময়ে আমাদের সাধারণ শিক্ষা-বিভাগ উন্নত হইবে। টোলের শিক্ষা বহুমুখী হইলে অনতিদূর ভবিষ্যতে সুফল পাওয়া যাইবে। অনেক পিতা পুত্রদিগকে ইংরেজী-স্কুলে পড়িতে দিয়া অবশেষে চারিদিকের ব্যয়বৃদ্ধি হেতু পড়াইতে অক্ষম হইয়া পড়েন। কাজেই ছাত্রগণ উচ্চ শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইয়া জীবনকে ভারবোধ করিতে থাকে। টোলের শিক্ষাপ্রণালী বহুকাল যাবৎ এক নিয়মে চলিয়া আসিতেছে। যাঁহারা দর্শন পড়েন তাঁহারা কাব্য পাড়েন না, যাঁহারা ন্যায় পড়েন তাঁহারা স্মৃতি পড়েন না। খুব কম লোকই দেখা যায় যাহারা দুই তিনটি বিষয়ে কৃতী হইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে চলিতে হইলে অনেক দিক আয়ত্ত করা দরকার। বিভিন্ন দেশীয় জ্ঞানের মাত্রা ধরিতে না পারিলে নিজের পূর্ণতালাভ অসম্ভব। অভিজ্ঞতার তুলনায় দেখা যায়, ইংরেজীশিক্ষার্থী ও টোলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা বড় রকমের পার্থক্য রহিয়াছে। ইংরেজী স্কুলের ছাত্রগণ দেশের সকল আন্দোলনের সংবাদ জানিতে পায়। টোলের ছাত্রগণ পরের উপর নির্ভর করিতেছে। ২।৩টি টোল ব্যতীত বিখ্যাত ও মূল্যবান গ্রন্থসমূহ খুব কম টোলেই আছে। অধিকাংশ লোকেরই জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকিয়া যায় এবং ইহাই তাহাদের সংসার-জীবনের একমাত্র অবলম্বন। যে প্রণালীতে টোলে শিক্ষা দিবার কল্পনা চলিতেছে তাহা প্রচলিত হইলে টোলের শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হইবে। বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজী বিশ্ববিদ্যালয়েও ভূগোল শিক্ষা দেওয়া একপ্রকার বন্ধ হওয়ার মধ্যে। শিক্ষার দ্রুত উন্নতি দেখিতে হইলে, অধ্যাপকদিগকে সাংসারিক চিন্তা হইতে দূরে রাখা দরকার। অধ্যাপক ও ছাত্রদিগের ব্যয়ভার গ্রামের শিক্ষিত লোকদিগের উপর নির্ভর করিতেছে। টোলের পণ্ডিতগণের পারিবারিক ভাষা বাঙ্গলাকে সম্মানের চক্ষে দেখা উচিত। বৈদেশিক ভাষার গ্রন্থ অনুবাদ দ্বারা যেমন জাতীয় সাহিত্য পুষ্টিলাভ করে, তেমনি নিজদেশের প্রাচীন জ্ঞানের খনি হইতে অপরিচিত রত্নসমূহ সাধারণের নিকট উপস্থিত করা কর্ত্তব্য। মৌলিক ও অনুবাদগ্রন্থ বাঙ্গালায় প্রকাশিত হইয়া বিক্রয় হইলে, টোলের একটা নির্দ্দিষ্ট আয়ের পথ হইবে। ছাত্রগণেরও শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপকদিগকে সহায়তা করা উচিত। দুই দিকেই লাভ হইবে। বর্ত্তমান সময়ে টোলের ছাত্রগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিতেছেন। ইহাতে বেশ বোঝা যায়, তাহারা নানা বিষয়ের শিক্ষার জন্য ব্যগ্র।

(গৃহস্থ, ভাদ্র) শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী।

আমেরিকার কথা

লোহিতাঙ্গ ইণ্ডিয়ান্।

সাত সাত বৎসরের পর হার্ভার্ডের অধ্যাপকেরা এক-বর্ষব্যাপী বিদায় পাইয়া থাকেন। এইরূপ এক ছুটিতে নৃতত্ত্বের অধ্যাপক ডিক্‌সন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। কাশ্মীরের পার্ব্বত্যপ্রদেশ, হিমাচল, পঞ্চনদ, আসাম ইত্যাদি স্থান পর্য্যটন করিয়া দেশে ফিরেন। কলিকাতা মিউজিয়ামের মারাঠা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গুপ্তে মহাশয়ের সঙ্গে ইঁহার আলাপ হইয়াছিল। ইনি বলিলেন—"আমি আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলের প্রাচীন ও বর্ত্তমান নরসমাজ সম্বন্ধেই বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতাম। ক্রমশঃ ভাবিলাম বোধ হয় যে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ-পুঞ্জে আমার সমস্যাসমূহের আনুষঙ্গিক তথ্য কিছু কিছু পাওয়া যাইবে। এই বুঝিয়া ফিলিপাইন সুমাত্রা অষ্ট্রেলিয়া ইত্যাদি দেশ পর্য্যন্ত পৌঁছিলাম। ক্রমশঃ দেখিলাম আমার অনুসন্ধানের ক্ষেত্র দক্ষিণ এশিয়ার দেশ-সমূহেও বিস্তার করিতে হইবে। এই সূত্রে আমার ভারত ভ্রমণ। আবার যাইব আশা আছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"হার্ভার্ডে শরীরতত্ত্বের দিক্ হইতে নৃতত্ত্বের আলোচনা কতদিন হইল সুরু হইয়াছে?" ইনি বলিলেন—"এ সম্বন্ধে আমরা এখনও অতি হীন অবস্থায় রহিয়াছি। চিকিৎসাবিভাগের কোন কোন ছাত্র এই বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। একজন অধ্যাপকও আছেন। কিন্তু মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে এখনও আমরা Anthropometry বা নৃতত্ত্বে বিশেষ কিছু করি নাই। বস্তুতঃ যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যাপক বোয়াজ্ ব্যতীত আর কোন পণ্ডিত এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না বলিলেই চলে। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন আছেন। এই বিষয়ের আলোচনা অক্‌স্‌ফোর্ডে কিছু কিছু হইয়া থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে জার্ম্মানিই এই বিদ্যার কেন্দ্র। পারিতেও এই আলোচনা প্রসার লাভ করিতেছে। আমেরিকায় আমরা প্রাচীন ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব (archaeology) সম্বন্ধেই বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছি। আমাদের নৃতত্ত্ববিভাগ ঐতিহাসিক বিবরণেরই এক অধ্যায়। আমরা শরীরতত্ত্ব অথবা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের

দিক্ হইতে মানবজাতির পরিচয় লইতে এখনও সবিশেষ চেষ্টা করি নাই—সমাজতত্ত্বের এক শাখা-স্বরূপ নৃতত্ত্বের আলোচনা চালাইয়া থাকি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"সর্ব্বত্রই দেখিতেছি—নৃতত্ত্ববিদেরা প্রাচীন মানবের অথবা বর্ত্তমান যুগের "অসভ্য" ও অর্দ্ধসভ্য জাতিপুঞ্জের তথ্য সংগ্রহে ব্যস্ত। দুনিয়ার অলিগলিতে আজকাল নৃতত্ত্বাভিযান পাঠান হইতেছে। যাহাদিগকে সভ্য বলা হয় সেই-সকল জাতির মধ্যযুগ অথবা প্রাচীন যুগের আলোচনা নৃতত্ত্ববিদেরা করেন না কেন? বিশেষতঃ উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইউরোপের সভ্য মানব এবং এশিয়ার সভ্য মানব প্রাচীন গ্রীস, প্রাচীন ক্রীট, প্রাচীন মিশর, প্রাচীন চীন, প্রাচীন এসিরিয়া, এবং এমন কি প্রাচীন লোহিতাঙ্গ ইণ্ডিয়ান্ এবং বহু বর্ত্তমান "অসভ্য" ও "অর্দ্ধসভ্য" সমাজেরই অনেকটা সমান ছিল না কি? বাষ্পশক্তির প্রয়োগে বিগত একশত বৎসরে যত পরিবর্ত্তন হইয়াছে বোধ হয় প্রাচীনতম ফ্যারাও সম্রাটের আমল হইতে চতুর্দ্দশ লুইয়ের যুগ পর্য্যন্ত ৮০০০ বৎসরের ভিতর তত পরিবর্ত্তন হয় নাই। কাজেই নৃতত্ত্ববিদ্গণ অসভ্য, অর্দ্ধ-সভ্য, প্রাচীন বা আদিম মানব বলিলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত সমগ্র জগতের নরনারীকে বুঝেন না কেন?"

ডিক্সন বলিলেন—"ঠিক কথা। এখন পর্য্যন্ত ইতিহাস ও নৃতত্ত্ব—এই দুই বিদ্যার সন্ধি স্থাপিত হয় নাই। ইতিহাস-বিদ্যা তথাকথিত সভ্য জাতিগুলির আলোচনা করিতেছে। নৃতত্ত্ব প্রাচীন, আদিম এবং নূতন নূতন জাতির বিবরণ দিতেছে। নৃতত্ত্বের তথ্যগুলি ক্রমশঃ ইতিহাসবিদ্যার মশলা বা উপকরণে পরিণত হইতেছে। কিন্তু কালে বোধ হয় ৫০ বৎসর পরে নৃতত্ত্ব ও ইতিহাসে কোন প্রভেদ থাকিবে না।

"বর্ত্তমানে আরও কিছুকাল পর্য্যন্ত নৃতত্ত্ববিদ্গণের স্বতন্ত্র দায়িত্ব রহিয়াছে। প্রাচীন মানব, আদিম মানব অথবা অসভ্য মানব জগতে আর থাকিবে না। আধুনিক সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই-সকল জাতির বিশেষত্ব শীঘ্রই লুপ্ত হইয়া যাইবে। বিভিন্ন সভ্য ও অর্দ্ধসভ্য নরনারীর সঙ্গে এই-সমুদয় আদিম মানবের রক্ত সংমিশ্রণও ঘটিতে থাকিবে। কাজেই এক্ষণে নৃতত্ত্ববিদেরা অন্যান্য সকল বিভাগ ছাড়িয়া দুনিয়ার বনজঙ্গলে অলিগলিতে এবং কোণে ঘোঁচে প্রবেশ করিতেছেন। এই ধরণের তথ্য ভবিষ্যতে আর পাওয়া যাইবে না।"

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগ প্রাচীন মেক্সিকোর য়্যাজটেক সভ্যতার পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান করিতেছেন। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিভাগ পেরুর প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য একজন ধনবানের অর্থসাহায্য পাইয়াছেন। এই ব্যক্তি বৎসরে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা খরচ করিতেছেন। হার্ভার্ডের কর্ত্তারা মধ্য-আমেরিকা অর্থাৎ ইউকুটান, হণ্ডুরাস ইত্যাদি জনপদের ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই তিন জনপদের প্রাচীন সভ্যতায় কোনরূপ আদান প্রদান ছিল কি? আমেরিকায় যখন ইউরোপীয়েরা বসতি স্থাপন করিতে আসে তখন ত এখানে লোহিতাঙ্গ ইণ্ডিয়ান বাস করিত। এই-সকল ইণ্ডিয়ানেরা কি প্রাচীন মেক্সিকো, পেরু ও হণ্ডুরাসের নরনারীগণের উত্তরাধিকারী?"

ডিক্সন বলিলেন—"মহাশয়, এই-সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড়ই কঠিন। মেক্সিকোর সঙ্গে মধ্য-আমেরিকার বিনিময় ও আদান প্রদান বোধ হয় চলিত। দুই অঞ্চলের পঞ্জিকা, দিনগণনা, কালনিরূপণ-প্রথা ইত্যাদি একরূপ। কিন্তু পেরুর সঙ্গে ইহাদের কোনটির সম্বন্ধ ছিল কিনা আন্দাজ করিবার উপায় নাই। বিশেষতঃ এখন পর্য্যন্ত এই তিন জনপদের প্রাচীন সভ্যতার কাল নিরূপিত হয় নাই। কেহ বলিতেছেন—এই-সকল স্থানে খৃষ্টপূর্ব্ব দশম শতাব্দীতে মানব-সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কেহ বলিতেছেন খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে এখানে সভ্যতা ছিলই না। বলা বাহুল্য এই-সকল সমস্যার মীমাংসা হইবে না।"

লোহিতাঙ্গ ইণ্ডিয়ানেরা প্রাচীন য়্যাজ্টেক ইত্যাদি জাতিপুঞ্জের বংশধর কিনা তাহা বলা কঠিন। লোহিতাঙ্গদিগের সমাজে কোন সাহিত্য গড়িয়া উঠে নাই। ইহারা গান করিত, ছবি আঁকিত, কিন্তু লিপিপ্রণালী অথবা বর্ণমালা উদ্ভাবন করিতে শিখে নাই। ইহাদের ধর্ম্ম

কর্ম্ম সাংসারিক কাজ সবই মুখে মুখে চলিত। কাজেই সংস্কার বা রীতিনীতির ধারা বুঝিতে পারা নিতান্তই কঠিন। এইজন্যই কালনিরূপণ দুঃসাধ্য। তবে মেক্সিকোতে চিত্রের সাহায্যে ভাব প্রকাশ করিবার রীতি অবলম্বিত হইয়াছিল। কিন্তু এগুলি পরিপুষ্ট হইয়া উঠে নাই। জমিজমার হিসাব এবং পূজাপাঠ ছাড়া অন্য কোন দিকে (Picture writings) চিত্রলেখের ব্যবহার হইত না।

ডিক্‌সন্ যুক্তরাষ্ট্রের লোকগণনা বিভাগের এক শাখার বিবরণ সম্পাদন করিতেছেন। ইনি বলিলেন—"যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ লোহিতাঙ্গ নরনারী আছে—ক্যানাডায় প্রায় এক লক্ষ। মেক্সিকো এবং দক্ষিণ-আমেরিকায় লোহিতাঙ্গদিগকে স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করা হয় না।"

হার্ভার্ড ক্লাবে নেশভোজন।

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে দেখিতে পাই পণ্ডিতেরা গ্রন্থ রচনা করিয়া নিজের নাম প্রকাশ করিতেন না। গ্রন্থগুলি গুরুর নামে প্রচারিত হইত। বর্ত্তমানকালেও ভারতবর্ষে এই সনাতনী গুরুভক্তির ধারা চলিতেছে। অমুক টোলের ছাত্র অমুক গুরুর শিষ্য ইত্যাদি বলিয়া শিক্ষিতেরা গৌরব বোধ করিয়া থাকেন। চেলায় চেলায় অথবা শিষ্যে শিষ্যে সদ্ভাব এবং বন্ধুত্ব এই উপায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। "গুরুভাই" শব্দ আমাদের ধর্ম্মজীবনে এবং শিক্ষা-সংসারে সুপরিচিত।

পাশ্চাত্যসমাজে alma mater একটা পারিভাষিক শব্দ আছে। ইহার দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় অথবা কোন শিক্ষা-কেন্দ্র বুঝান হয়। এই-সকল দেশে লোকেরা ভারতবাসীর মত জন্মভূমিকে কখনও "মা" বলিয়া ডাকে না। কিন্তু বিদ্যালয়গুলি ছাত্রদের নিকট মাতৃস্বরূপ। এক জননীর সন্তানের ন্যায় ছাত্রেরা ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ চিরজীবন রক্ষা করিয়া চলে। এইজন্য ইহার বিদ্যালয় হইতে বাহির হইবার পর নানাপ্রকার ক্লাব সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া পুরাতন ছাত্রজীবনের স্মৃতি জাগরুক রাখিতে চেষ্টা করে। অক্‌সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের ছাত্রদের Old Boy's Assoication এর কথা সুবিদিত। ইয়াঙ্কিস্থানেও এই ব্যবস্থা বেশ লক্ষ্য করিতেছি। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন ছাত্রেরা আমেরিকার নানা স্থানে হার্ভার্ড ক্লাব স্থাপন করিয়াছেন।

নিউইয়র্কের হার্ভার্ড ক্লাবে বাস করিয়া হার্ভার্ডের চালচলন খানিকটা বুঝিয়াছিলাম। আজ বষ্টনের হার্ভার্ড ক্লাবে নিমন্ত্রণ। প্রায় এক হাজার লোক উপস্থিত। এক ভোজনালয়ে একসঙ্গে এতগুলি ব্যক্তির খাওয়া দাওয়া হইল। ধূমপানের গৃহে দেখি সম্মুখেই এক টেবিলের উপর কতকগুলি বিজয়চিহ্ন "Cup" সাজান রহিয়াছে। একজন বলিলেন—"এই যে সর্ব্বমধ্যে প্রকাণ্ড Cupটি দেখিতেছেন উহা আমরা বিলাত হইতে কাড়িয়া আনিয়াছি। অক্‌স্‌ফোর্ডের সঙ্গে হার্ভার্ডের একবার নৌচালন সম্বন্ধে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এজন্য হার্ভার্ড ক্লাবের নৌচালন সমিতি লণ্ডনে তাঁহাদের দল পাঠাইয়াছিলেন। টেম্‌স্ নদীতে বাঁহিচ হয়। অক্‌স্‌ফোর্ড পরাজিত হন।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনাধ্যাপক উড্‌স্ বলিলেন—"পূর্ব্বে বষ্টনে কোন হার্ভার্ড ক্লাব ছিল না। আমরা ভাবিতাম পুরাতন ছাত্রের প্রয়োজন হইলে বষ্টন হইতে দশ মিনিটের ভিতর কেম্ব্রিজে আসিতে পারে। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়েরই কোন গৃহে Old Boys' Meeting ইত্যাদি পরিচালিত হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু এই-সকল সভায় পুরাতন ছাত্রের সংখ্যা অত্যধিক হইত। বষ্টনে আজকাল প্রায় ৬০০০ হার্ভার্ড গ্র্যাজুয়েট বাস করেন। ইঁহাদের অনেকেই পুরাতন-ছাত্র-সভার সভ্য হইলেন। কাজেই একটা স্বতন্ত্র ভবন তৈয়ারী করা আবশ্যক হইল। এত বড় বাড়ী তৈয়ারী করা হইয়াছে—তথাপি স্থানাভাব—শীঘ্রই ইহাকে আবার বাড়াইতে হইবে।" আমি বলিলাম—"নিউইয়র্কের ক্লাবও সর্ব্বদা লোকে ভরা থাকে।" উড্‌স্ বলিলেন—"বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি ছাত্রদের এরূপ টান না থাকিলে হার্ভার্ড উন্নত হইতে পারিত না। আমরা গবর্মেণ্টের অথবা ধর্ম্মসভার সাহায্য পাই না—ধনী ছাত্রদিগের দানেই বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছে। হার্ভার্ড-ক্লাব খোস গল্পের একটা আড্ডা মাত্র নয়—কার্য্যকরী মাতৃভক্তি ও গুরুভক্তির কেন্দ্র বিশেষ।"

উড্‌স্‌ দুই তিনবার ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। কাশী, পুণা, কাশ্মীর ইত্যাদি স্থানে সর্ব্বসমেত দুই বৎসর কাটাইয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্য ও হিন্দুদর্শন শিক্ষা করাই উদ্দেশ্য ছিল। সম্প্রতি ইনি যোগশাস্ত্র ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। এই অনুবাদ ভূমিকাসহ Harvard Oriental Series অর্থাৎ হার্ভার্ড প্রাচ্য গ্রন্থমালা পর্য্যায়ে প্রকাশিত হইতেছে। ইনি বলিলেন "যোগশাস্ত্রের ভিতর Psychology বা মনোবিজ্ঞান-বিষয়ক বহু তথ্য পাওয়া যায়। সেগুলি স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।"

আমি বলিলাম—"গ্রীক দর্শন অথবা জার্ম্মান দর্শন আলোচনা করিবার সময়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা গ্রীস ও জার্ম্মানির পূর্ব্বাপর সকল ঘটনা বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন। প্লেটো, য়্যারিষ্টটল, কাণ্ট, ফিক্টে ইত্যাদি দার্শনিকগণকে সমগ্র জাতীয় জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে গ্রথিতরূপে বুঝান হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের উপনিষৎ, দর্শন ইত্যাদি গ্রন্থ, কিম্বা দার্শনিক, টীকাকার, ভাষ্যকার ইত্যাদি গণকে এইভাবে বুঝিবার চেষ্টা করা হয় কি? ভারতের আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার সঙ্গে এই-সকল দর্শনবাদের সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করিবার প্রয়াস কেহ করিতেছেন কি? আমাদের এই চিন্তাগুলি আকাশ হইতে পড়ে নাই। আমাদের দেশের লোকেরা খাওয়া পরা করিত, রাষ্ট্রশাসন করিত, ব্যবসায় বাণিজ্য চালাইত, নাচ গান করিত, কবিতা লিখিত, নাটকাভিনয় দেখিত—তাহার সঙ্গে সঙ্গে দর্শনালোচনা এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনও করিত। কাজেই ভারতীয় দর্শন বুঝিবার জন্য ভারতবাসীর জাতীয় জীবনের সকল-প্রকার অনুষ্ঠান বুঝিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নয় কি?" উড্‌স্‌ বলিলেন—"ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক ও বৈষয়িক তথ্য নিতান্ত অল্পমাত্র সংগৃহীত হইয়াছে। সেগুলির সঙ্গে মিলাইয়া দর্শনালোচনা করিবার সম্ভাবনা এক্ষণে খুব কম। আমরা বর্ত্তমানে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত দার্শনিক গ্রন্থ-নিচয়ের অনুবাদ করিয়া যাইতেছি মাত্র। আপনি যে প্রস্তাব করিতেছেন তাহা ভবিষ্যতে হয়ত কার্য্যে পরিণত হইবে।"

আমি উড্‌সকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"হার্ভার্ডে চীনা জাপানী এবং ভারতীয় ছাত্রের সংস্পর্শে আপনি আছেন। ইহাদের তুলনা করিয়া কখনও দেখিয়াছেন কি?" ইনি উত্তর করিলেন—"চীন জাপানের ছাত্রগণ প্রায় সকলেই উত্তম শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদিগকে গবর্মেণ্ট উচ্চবৃত্তি প্রদান করিয়া পাঠাইয়া থাকে। দেশে যাহারা যথেষ্ট উন্নতি দেখাইতে পারিয়াছে তাহাদের মধ্য হইতেই নির্ব্বাচন করা হয়। কাজেই হার্ভার্ডে ইহারা সুফল প্রদর্শন করে। কিন্তু ভারতীয় ছাত্রদের এরূপ কোন অভিভাবক বা "সংরক্ষক" নাই। ইহারা নিজ চেষ্টায় নানা স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে হয়ত হার্ভার্ডে আসিয়া উপস্থিত হয়। গৃহ হইতে উপযুক্ত অর্থ-সাহায্য আসে না। তাহার উপর ছাত্রেরাও যে ভারতবর্ষে উচ্চ শ্রেণীর অন্তর্গত তাহাও বোধ হয় না। কাজেই ভারতীয় ছাত্রেরা আমাদের সুদৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। তবে কয়েকজন ছাত্রের সুখ্যাতি না করিয়া থাকা যায় না। কয়েক বৎসর হইল জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের বৃত্তি পাইয়া চারিজন ছাত্র হার্ভার্ডে আসিয়াছিল। তাহারা সত্যসত্যই উচ্চ শ্রেণীর অন্তর্গত—এখানে আসিবার পূর্ব্বে স্বদেশেও ইহাদের সুনাম ছিল। এইরূপ বাছা ছাত্র আসিয়াছিল বলিয়া ইহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ নাম করিতে পারিয়াছে। একজন বোধ হয় এবার পি-এইচ্‌ ডি, উপাধি পাইবে। ইহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পুরস্কার এবং ছাত্রবৃত্তি লাভ করিয়াছিল। এরূপ ভারতীয় ছাত্রেরই হার্ভার্ডে আসা উচিত।"

পরলোকগত অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের নাম করিয়া উড্‌স্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি তাঁহাকে জানিতেন কি?" আমি বলিলাম—"আমি তাঁহার ছাত্র ছিলাম।" উড্‌স্‌ বলিলেন—"আমরা তাঁহার পাণ্ডিত্য এবং সুমধুর বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। একদিন আমি আমার ছাত্রগণকে ডেকার্টের দর্শনবাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছিলাম। অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেই গৃহে উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার শেষে আমি তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিলাম। ভাবিয়াছিলাম যে তিনি হয়ত দুই চারিটা ভদ্রতাসূচক সাধারণ কতকগুলি কথা বলিয়া ছাত্রগণকে সন্তুষ্ট করিবেন। কিন্তু দেখিলাম ডেকার্টের দার্শনিক মত সম্বন্ধেই বক্তৃতা করিলেন। আমি যে পর্য্যন্ত বলিয়াছিলাম আপনার শিক্ষক ঠিক তাহার পর হইতে সুরু করিলেন।

তাঁহার পাণ্ডিত্য দেখিয়া ছাত্রগণ বিস্মিত হইল। আমিও স্তম্ভিত হইলাম। বিশেষভাবে প্রস্তত না হইয়া ছাত্রগণের নিকট বক্তৃতা করিতে পারা সহজ কথা নয়। সেই সময়ে অধ্যাপক জেম্‌স্‌ জীবিত ছিলেন। বিনয়েন্দ্রনাথের দার্শনিকতা এবং বাগ্মিতা দেখিয়া তিনিও পুলকিত হন।" আমি বলিলাম—"দেশেও তাঁহার এই যশ ছিল।"

উড্‌স্‌ ভারতীয় ছাত্রগণের বন্ধু ও সহায়ক। অনেক সময়ে টাকার অভাব হইলে ভারতীয় ছাত্রেরা ইঁহার নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে। দুই একজন অভাবগ্রস্ত ছাত্রের পারিবারিক অবস্থা বুঝিবার জন্য ইনি আমার সঙ্গে আলোচনা করিলেন। দূর বিদেশে ঋণদাতা পাওয়া সৌভাগ্যের কথা। উড্‌স্‌ একজন পয়সাওয়ালা লোক, কাজেই টাকা ধার দেওয়া ইঁহার পক্ষে সহজ। অন্যান্য অধ্যাপকগণের অন্নচিন্তা আছে, তাঁহারা বেতনের উপর নির্ভর করেন, ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহারা অপরকে ধার দিয়া সাহায্য করিতে অসমর্থ।

উড্‌স্‌ যখন কাশীতে ছিলেন তখন জাপানী বৌদ্ধ আনেসাকিও সেখানে সংস্কৃত শিক্ষা করিতেছিলেন। এক্ষণে আনেসাকি হার্ভার্ডের অধ্যাপক। উড্‌সের পরামর্শেই বিশ্ববিদ্যালয় আনেসাকিকে পদ দিয়াছেন। উড্‌স্‌ পুণায় থাকিবার সময়ে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের পালির অধ্যাপক ধর্ম্মানন্দ কোশাম্বীর সঙ্গে পরিচিত হন। উড্‌স্‌ হার্ভার্ডে ফিরিয়া আসিয়া কোশাম্বীকে এখানে আনাইয়াছিলেন। কোশাম্বী অধ্যাপক ল্যান্‌ম্যান এবং উড্‌স্‌কে পালি শিখাইয়া স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছেন।

নৈশ ভোজনের পর একটা বক্তৃতা হইল। গত বৎসর ক্যানাডা রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে উত্তর মেরু অনুসন্ধানের জন্য অভিযান অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই অভিযানের জাহাজের কাপ্তেন বক্তৃতা করিলেন। আলোকচিত্রের সাহায্যে সমগ্র অভিযানের বিবরণ প্রদত্ত হইল। এই বক্তৃতা শুনিবার জন্যই আজ বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল।

ইয়াঙ্কিস্থানের অন্যান্য সকল সভায় রমণীর প্রাধান্য দেখিতে পাই। কিন্তু হার্ভার্ড-ক্লাবে রমণীর স্থান নাই বোধ হইতেছে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আব্‌হাওয়ায় নারীজাতির অধিকার কিছু খর্ব্ব।

রুশ অধ্যাপক।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে রুশ এবং পোলিশ ভাষা ও সাহিত্য শিখাইবার ব্যবস্থা আছে। বিশেষভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারাই আলোচিত হইয়া থাকে। এই বিভাগের কর্ত্তা অধ্যাপক উঈনার একজন রুশ। ইনি টলষ্টয়ের গ্রন্থাবলী ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। এই জন্য ইঁহাকে আড়াই বৎসর দিনরাত খাটিতে হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত The Anthology of Russian Literature নামক এক ইংরেজী গ্রন্থে ইনি রুশ সাহিত্যের ধারাবাহিক পরিচয় দিয়াছেন। ইহা একখানা ইতিহাসগ্রন্থ মাত্র নয়, রুশিয়ার প্রাচীন ও আধুনিক সকল সাহিত্যরথীদিগের রচনার ইংরেজী নমুনা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাকে ইংরেজী "Typical Selections from the Best English Authors"এর ন্যায় বিবেচনা করা যাইতে পারে। আমরা একমাত্র টলষ্টয়ের নামই এতদিন জানিতাম। সম্প্রতি তুর্গেনেভ এবং ডষ্টয়েবস্কিও ভারতে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। উঈনার-প্রণীত এই নমুনা-সঙ্কলন গ্রন্থে সমগ্র রুশ সাহিত্যের পরিচয় পাইতে পারি।

উঈনার বলিলেন—"আমি সম্প্রতি আর-একখানা গ্রন্থে হাত দিয়াছি। এই দেখুন পাণ্ডুলিপি। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। ইহাতে রুশজাতির সভ্যতা সম্বন্ধে সাধারণ কতকগুলি কথা বলিয়াছি। রুশিয়ার সঙ্গীত ও চিত্রকলা, রুশ সাহিত্য, রুশিয়ার রমণীসমাজ, প্রাচীন রুশ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা থাকিবে। ইহাকে রুশ জাতীয়-জীবনের দার্শনিক ব্যাখ্যা বলা যাইতে পারে।" গ্রন্থের নাম Russian Soul। ইহাতে একটা সুবিস্তৃত Bibliography বা প্রমাণপঞ্জী সংযুক্ত থাকিবে। তাহা দেখিলে ইংরেজী ভাষায় লিখিত রুশিয়া-বিষয়ক প্রবন্ধ ও গ্রন্থসমূহের নাম জানা যাইবে। ভারতবাসী রুশিয়া সম্বন্ধে বেশী ইংরেজী গ্রন্থের নাম জানেন না। এই পুস্তক পাঠ করিলে অনেক তথ্য হস্তগত হইবে। জগতের হাভভাব দেখিয়া বিশ্বাস হইতেছে যে, বিংশশতাব্দীর মধ্যভাগে রুশিয়া জগতে শীর্ষস্থানীয় মর্য্যাদা লাভ করিবে। সুতরাং যাঁহারা বর্ত্তমান-জগতের শক্তিপুঞ্জ বুঝিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে রুশ

তন্ত্বের আলোচনা করিতে হইবে। এই হিসাবে উঈনারের যন্ত্রস্থ গ্রন্থ ভারতবাসী মাত্রের অবশ্যপাঠ্য। গ্রন্থের আকার বৃহৎ হইবে না বুঝিলাম।

উঈনার রুশ-তত্ত্বে বিশেষজ্ঞ। কিন্তু কেবল মাত্র স্লাভ জাতিপুঞ্জের ভাষা, চিন্তা, রীতিনীতি লইয়াই ইনি সময় কাটান না। পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতেরা সকলেই নানা-ভাষায় সুপণ্ডিত। তিনচারিটা ভাষা জানেন না এরূপ অধ্যাপক ইয়োরোপ ও আমেরিকায় বিরল—অবশ্য নাম-জাদা সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর অধ্যাপকগণের কথা বলিতেছি। তাহার পর যাঁহারা কোন ভাষা বা সাহিত্যের অধ্যাপক তাঁহারা সকলেই বহুভাষায় ব্যুৎপন্ন এবং বহুসাহিত্যে সুপণ্ডিত। Comparative philology বা তুলনাসিদ্ধ ভাষা-বিজ্ঞান শিক্ষা না করিয়া কেহই ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হন না। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন তাঁহারা নিজ মাতৃভাষার অতিরিক্ত গ্রীক ল্যাটিন ফরাসী জার্ম্মান এবং হীব্রু অথবা আরবী ভাষাও জানেন। অধ্যাপক উঈনার এইরূপ একজন বহুভাষাভিজ্ঞ বহু-সাহিত্যাভিজ্ঞ পণ্ডিত। ইনি ইয়োরোপের প্রায় সকল ভাষাই জানেন এবং দুনিয়ার অন্যান্য ভাষাসমূহের সাধারণ সংবাদ রাখেন। ভারতীয় ভাষাপুঞ্জের সম্বন্ধেও আলোচনা ইঁহার সঙ্গে হইল। ইনি বলিলেন—"আপনি তিন বৎসর পর যদি আবার হার্ভার্ডে আসেন, আপনার সঙ্গে বাঙ্গা-লায় কথা বলিব।"

উঈনার একখানা বিরাট গ্রন্থে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ইনি বলিলেন "ইয়োরোপের মধ্যযুগ সম্বন্ধে আমাদের ঐতিহাসিকগণের যে-সকল ধারণা আছে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে সেগুলি বদলাইয়া যাইবে। আমি প্রাচীন দলিলপত্র আলোচনা করিয়া বুঝিতেছি যে এতদিন আমরা ইয়োরোপের রাষ্ট্রীয় ও আইন সম্বন্ধীয় ক্রমবিকাশ-বিষয়ে ভুল ধারণা পোষণ করিয়াছি।" ইনি ২৫০,০০০ দলিল দানপত্র নিয়োগপত্র ইত্যাদি পাঠ করিয়াছেন। এইগুলি ল্যাটিন ভাষায় লিখিত। খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কালের ভিতর এই-সকল দলিল প্রস্তুত হইয়াছিল। ইয়োরোপের নানা দেশ হইতে এই আড়াই লক্ষ চুক্তিপত্র সংগৃহীত হইয়াছে।

ইনি জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়, ভারতবর্ষে এই ধর-ণের প্রাচীন দলিলাদি অনুসন্ধান ও সংগ্রহের প্রয়াস আছে কি?" আমি বলিলাম "মহারাষ্ট্রে, তামিলদেশে এবং বাঙ্গালায় মাতৃভাষার সেবকগণ এই দিকে নজর দিয়াছেন। গবর্ণমেন্টের Archaeoloigical বা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ হইতেও এই সমুদয় বস্তু অনুসন্ধান করা হইতেছে। কিন্তু আইনের ক্রমবিকাশ, আর্থিক অবস্থা, অথবা সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি বুঝিবার জন্য এগুলি এখনও বিশ্লেষিত ও আলোচিত হয় নাই। প্রধানতঃ রাষ্ট্রীয় ঘটনাপুঞ্জের সন তারিখ নির্ণয়ই এখন পর্য্যন্ত আমাদের ঐতিহাসিক ও প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্গণের লক্ষ্য। রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের একটা কাঠামো দাঁড়াইয়া গেলে জাতীয়জীবন বুঝিবার জন্য অন্যান্য দিকে অনুসন্ধান চলিবে আশা আছে।"

উঈনার বলিলেন—"মহাশয়, আজকাল ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে মাতৃভাষার পুষ্টি ও উন্নতির জন্য নানা আন্দোলন চলিতেছে শুনিতে পাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আমাদের ইয়োরোপেও এইরূপ আন্দোলন চলিয়াছিল। তাহার নাম Romantic Movement। এই রোমান্টিক আন্দোলনের ফলে আজ পাশ্চাত্যজগতে মহা অনৈক্য, বৈষম্য ও বিভিন্নতার সৃষ্টি হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইয়োরোপে জাতিতে জাতিতে যত প্রভেদ দেখিতে পাই অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম বা মধ্যভাগে তাহার অর্দ্ধাংশও ছিল না। রোমান্টিক আন্দোলনের ফলে ইয়োরোপের সর্ব্বত্র nationalityর আন্দোলন বা জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের আন্দোলন সুরু হয়—ইয়োরোপে ঐক্য ও সাম্য লুপ্ত হইয়া যায়। আমার সন্দেহ হইতেছে—ভারতবর্ষেও ইয়োরোপের এই অনৈক্য আসিয়া না জুটে।"

আমি বলিলাম—"রোমান্টিক আন্দোলনের ফলে ইয়োরোপের ঐক্য নষ্ট হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাতে ইয়োরোপীয় নরনারীর ক্ষতি হইয়াছে বলিতে পারেন কি? আপনি 'যেন তেন প্রকারেণ' ঐক্য রক্ষা এবং শান্তি রক্ষা চাহেন—না দুনিয়ার সর্ব্বত্র মনুষ্যত্ব বিকাশ ও ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি চাহেন? অস্বাভাবিক ঐক্য অপেক্ষা চরিত্রগঠনোপযোগী বৈচিত্র্য ভাল নয় কি?

আমার মতে একতার জন্য মনুষ্যত্ব ও স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব-বিকাশ বর্জ্জন করা যাইতে পারে না।"

উঈনার বলিলেন—"মহাশয়, অনেক সময়ে জোর করিয়া অনৈক্য ও বৈচিত্র্য ডাকিয়া আনা হয়। ইয়োরোপে এইরূপ দেখিতে পাই। ফরাসী রুশো Emile গ্রন্থে প্রকৃতিপূজার অবতারণা করিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফ্রান্স ও জার্ম্মানি ভরিয়া রুশোর শিষ্যবৃন্দ প্রকৃতি, প্রাকৃতিক জীবন, সরলতা, অকৃত্রিম স্বভাব, শিশু-চরিত্র, দরিদ্র কৃষকসমাজ, জনসাধারণ ইত্যাদির মহিমা প্রচার করিতে লাগিলেন। সাহিত্যের বাজারে "অসভ্যতা," লোক-সাহিত্য, পল্লীভাষা ইত্যাদি সমাদর করা একটা ফ্যাশনে পরিণত হইল। হার্ডার, ক্লপষ্টক, গ্রিম্ ইত্যাদি সাহিত্যসেবীগণ জার্ম্মান ভাবুকতার আন্দোলনে ধুরন্ধর। ইহাঁদিগের দেখাদেখি ইয়োরোপের অলিগলিতেও এইরূপ পল্লী-মাহাত্ম্য, শ্রমজীবী-মাহাত্ম্য, জনসাধারণ-মাহাত্ম্য প্রকৃতি-মাহাত্ম্য ইত্যাদি প্রচারিত হইতে লাগিল। সকল স্থানেই নিজ নিজ কেন্দ্রের বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে ঐতিহাসিক গবেষণা চলিল। যে-সকল স্থানে প্রাচীনত্বের কোন চিহ্ন নাই সেই সকল স্থান হইতেও প্রাচীন সরলতার নিদর্শনসমূহ আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। রুশোপন্থী ভাবুকেরা সেই-সমুদয় দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইলেন! মহাশয়, এই প্রণালীতে আজ নরওয়ে সুইডেন ও ডেন্‌মার্ক তিনটি ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়াছে—অথচ ইহাদের লোক-সংখ্যা সর্ব্বসমেত এক কোটি মাত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই তিন দেশের লোকেরা বৈচিত্র্যের কথা স্বপ্নেও ভাবে নাই—রোমাণ্টিক আন্দোলনের পাল্লায় পড়িয়া আজ ইহারা তিনটি স্বতন্ত্র (nation) নেশনে পরিণত। এই ক্ষেত্রে দেখিতেছি সাহিত্যসেবীদিগের হুজুগে অনর্থক অনৈক্য সৃষ্ট হইয়াছে। সেইরূপ সার্ভিয়া, বুল্‌গেরিয়া, ক্রোয়েশিয়া ইত্যাদি জাতির বৈচিত্র্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে কেহ কখনও শুনে নাই। আজ এমন কি আল্‌বেনিয়ারও একটা স্বতন্ত্র জাতিগত ভাষা সৃষ্ট হইতে চলিয়াছে। কবে শুনিব বাঙ্গালাদেশেও উত্তরবঙ্গ পূর্ব্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ নামে তিনটি nation গড়িবার আন্দোলন চলিতেছে!"

উঈনার নিজের পুত্রকন্যাগণকে গৃহে শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইঁহার শিক্ষাপ্রণালীর গুণে কম সময়ে অধিক শিখিতে পারা যায়। ইঁহার প্রথম পুত্র এই উপায়ে বিশ বৎসরের পূর্ব্বে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ ডি উপাধি পাইয়াছে। সাধারণতঃ ২৫ বৎসরের পূর্ব্বে কোন ছাত্র এই ডিগ্রি লাভ করিতে পারে না।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

মুসলমানদেশের নারীসমাজ

আজকাল সমস্ত জগৎ জুড়িয়া একটা পরিবর্ত্তনের হাওয়া উঠিয়াছে। পুরাতনের শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া জগৎ নবীনের সন্ধানে ছুটিয়াছে। রক্ষণশীলতার যুগ কাটিয়া গিয়াছে; প্রাচীন প্রথার নিকট মাথা নত করিয়া চিরকালের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে কেহ আর রাজি নয়। এই উৎসাহের আগুন যে কেবল পুরুষের অধিকৃত আধখানা পৃথিবীতেই লাগিয়াছে তাহা নয়, নারীর অন্তঃপুরেও গিয়া পৌঁছিয়াছে। কেহই স্থির থাকিতে পারিতেছে না, অচলায়তনের পুরাতন প্রাচীর ভাঙ্গিয়া সকলে মুক্ত আকাশের তলে দাঁড়াইয়া আপন-আপন কাজ বুঝিয়া লইতেছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সকল দেশেই নারী পুরুষের অনেক নীচে পড়িয়া রহিয়াছে; কিন্তু এই অস্বাভাবিক নিয়ম চিরস্থায়ী হইতে পারে না; প্রকৃতি কাহাকেও আপনার অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিতে দিবে না।

প্রতীচ্যজগতে নারীর অধিকার লইয়া প্রলয়ব্যাপার বাধিয়া গিয়াছে। তাঁহারা স্বাধীনতার স্বাদ বহুপূর্ব্ব হইতেই কিয়ৎপরিমাণে পাইয়াছেন বলিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রাচ্যরমণীর অগ্রগামিণী হইয়াছেন, কিন্তু অন্তঃপুরে আবদ্ধা অবগুণ্ঠিতারও বিদ্রোহধ্বজা তুলিয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার দিন আসিয়াছে। অসূর্য্যম্পশ্যা মুসলমানরমণীও বহির্জগতে আপনার অধিকার লইতে অগ্রসর হইয়াছেন।

তুরস্কদেশীয়া মুসলমানরমণীর অভ্যুত্থান এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। আমরা এতদিন ইহার বিশেষ বিবরণ কিছুই জানি নাই। তুর্কিরমণীর বিষয়ে যে-সকল ইংরেজী পুস্তক আজ পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, তাহাদের জীবনে সুখ নাই, হৃদয়ে অসন্তোষের বহ্নি জ্বলিয়াছে;

নিষ্ঠুর আইন ও দেশাচার বহু শতাব্দী ধরিয়া তাহাদের পায়ে যে নিগড় পরাইয়া রাখিয়াছে তাহার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য এই অসহায় রমণীগণ এতদিন পর্য্যন্ত কেবল নিষ্ফল ষড়যন্ত্র ও ছলচাতুরীর শরণ লইয়াছে।

কিন্তু উন্নতির পথ এরূপ নয়। পরিবর্ত্তনের চেষ্টা সফল করিতে হইলে সাক্ষাৎভাবে ও পরোক্ষভাবে চেষ্টা করিতে হইবে; ভাঙ্গা ও গড়া উভয়েরই প্রয়োজন। পুরাতন প্রথাকে কেবল এড়াইয়া চলিলেই হইবে না, তাহাকে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। ইহা অতি কঠিন ব্যাপার; ইহাতে সাহস চাই, দক্ষতা চাই, অধ্যবসায় চাই। তুরস্কের এই নারীসমস্যার মীমাংসা এখনও অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই, কিন্তু তথাপি এই আন্দোলন আজকাল খুব সজীব ভাবে চলিতেছে। উদারমতাবলম্বী অনেক সংবাদপত্রে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই-সকল পত্রে স্ত্রীজাতির সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এবং কোন মুসলমানরমণী নিজের সহরের কিম্বা দেশের কোনও কার্য্যে সহায়তা করিলে তাঁহাদের কথা বিশেষরূপে উল্লেখ করা হয়। এতদ্ব্যতীত ইস্তাম্বুলে বিশেষ করিয়া রমণীদিগের জন্য "নারীজগৎ" (The Women's World) বলিয়া একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। ইহা মুসলমানমহিলাগণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগের দ্বারাই পরিচালিত। ইহার প্রবন্ধাদির মধ্যে পুনরুক্তি, অনাবশ্যক দীর্ঘতা ও অপরিণত চিন্তা প্রভৃতি কতকগুলি দোষ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পুরুষ-পরিচালিত পত্রে যে এগুলির একান্তই অভাব, তাহা ত বলা যায় না; অধিকন্তু এই পত্রে সদুপলব্ধি ও সূক্ষ্মদর্শিতারও অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহাতে অনাথা বালিকাদের জন্য আশ্রম স্থাপনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে, নারী-সম্মিলনী আহ্বান করা হইয়াছে এবং তুরস্কের শ্রমজীবী-রমণীগণের করুণকাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে,—এই দরিদ্র রমণীগণকে মাত্র সাত আট আনা পয়সার জন্য প্রত্যহ চোদ্দঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হয়। তুরস্কের গবর্ণমেণ্ট দুইবার এই কাগজখানি বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, ইহা হইতেই বুঝা যায় যে 'নারীজগতের' যথেষ্ট তেজ ও বীর্য্য আছে। সম্পাদিকা বলেন যে, কাগজখানির উদ্দেশ্য ভুল বুঝিয়া বন্ধ করা হইয়াছিল। তিনি সেইসঙ্গে আরও দু-একটি তীক্ষ্ণ কথা শুনাইয়া দিয়াছেন—"পুরুষজাতি যদি অবাধে নারীজাতির সকলবিষয়ের সমালোচনা করিয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে এই মাতৃজাতি পাল্টা জবাবে কোন কথা বলিতে গেলেই তাঁহাদের পৃষ্ঠে গুরুতর দায়িত্বের বোঝাটা যেন তুলিয়া দেওয়া না হয়। যে-সকল বিষয় আমাদের কোমলতর মনোবৃত্তিসকলের সহিতই বিশেষরূপে সংসৃষ্ট সে-সকল বিষয়ের সঙ্গত ব্যাখ্যা করিবার ও পক্ষসমর্থন করিবার পুরুষ অপেক্ষা আমাদেরই অধিক দাবী আছে।

"যদি আমাদের জাতি ভবিষ্যতে সামাজিক এবং নৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধিলাভ করিতে চায় তবে এই মাতৃজাতিকেই আমাদের কন্যাদিগকে শিক্ষিত করিতে হইবে, এবং তাহাদের মন ও চরিত্র গঠিত করিয়া তুলিতে হইবে, কেননা তাহা হইলেই আমাদের ও তাহাদের পুত্রগণ স্বদেশের প্রেম ও বিদেশের শ্রদ্ধা লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারিবে, এবং তাহা হইলেই তাহারা আমাদিগকে সম্মান করিতে এবং প্রকৃত সঙ্গিনা জ্ঞান করিয়া তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্রে আনন্দিত চিত্তে আমাদের সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে।"

আর-একটি প্রবন্ধেও এই-সকল উন্নত চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়—"সকলেই জানেন পারিবারিক জীবনের আদর্শ হইতে আমাদের সমাজ কতদূরে পড়িয়া আছে। কত নববধূর মধুর আশা ও ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন দুদিনের মধ্যে নির্দ্দয় আঘাতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অচিরেই সে বুঝিয়া লইয়াছে যে এ সংসারে সে অসহায় দাসীমাত্র; আর না হয় বড়জোর স্বামীর ক্রীড়াপুত্তলি, তাঁহার ভাল না লাগিলেই তিনি ফেলিয়া দিবেন। তাই সে স্বামীকে ভাল না বাসিয়া ভয় করিতে শিখিয়াছে, সেইসঙ্গে পরিত্যক্তা হইবার দিনটি পিছাইয়া রাখিবার জন্য অনেক কল-কৌশলও শিখিয়াছে। আমাদের গৃহে প্রকৃত প্রেম এক অজানা অতিথি। স্বামীর শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্ব আমাদের অভিজ্ঞতার বাহিরে। তবুও আমরা কেবলমাত্র নারীজাতিই যাহা করিতে পারে এমন একটি উচ্চ আকাঙ্ক্ষাকে মনে স্থান দিয়াছি; আমরা আমাদের তুর্কিজাতিকে সংখ্যায় বাড়া-

ইতে এবং শক্তিতে চিরস্থায়ী ও উন্নত করিতে চাই। কিন্তু এইটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকিলে আমাদের চলিবে না। কেবল আমাদের অধিকার এই সুখেই পর্য্যবসিত নয়, কেবল ইহার দাবীই আমাদের কর্ত্তব্য নয়। ধনীর অন্তঃপুরে প্রায়ই যে স্বার্থময় অবসাদের প্রবাহ দেখা যায়; তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে ত আমরা কিছুতেই পারি না। যতদিন না আমরা নিঃস্বার্থভাবে অপরকে সুখী করা ও সেই সুখের উপযুক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া বুঝিব ততদিন অপরের নিকট হইতে সুখী হইবার আশা করিবার আমাদের কোনও অধিকার নাই। আমরা যদি প্রকৃত সুখের সন্ধান না পাই তবে তাহা আমাদের গ্রহদোষ নয়, আমাদের নিজেদেরই দোষ। আমাদের দেশের পুরুষগণ আজ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইয়াছেন যে, আমাদের সমগ্র জাতির ভবিষ্যৎ মঙ্গল ও সফলতা বহুলপরিমাণে আমাদের অর্থাৎ মাতৃগণ ও কন্যাগণের উপরেই নির্ভর করিতেছে। শিক্ষা, স্বাধীনতা, এবং নৈতিক ও মানসিক উন্নতি ইহাই আমাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু ও উদ্দেশ্য হইবে। 'কে আমাদের সুখী করিবে ?' এ প্রশ্নের কোনও আবশ্যকতা নাই; 'আমরা কেমন করিয়া স্বজাতি ও স্বদেশের কাজে লাগিতে পারি' তাহাই ভাবিতে হইবে।"

তুরস্করমণীদের প্রতিনিধিস্বরূপ এই মহিলার প্রবন্ধে স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতি, আত্মোন্নতির ইচ্ছা ও আপনাদের হীনাবস্থার অতৃপ্তি প্রভৃতি অনেকগুলি গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। আত্মতৃপ্তির মূলে কুঠারাঘাত করিতে না পারিলে কখনও কোন জাতির উন্নতি হয় না। সেই সুলক্ষণ ইহাদের মধ্যে দেখা দিয়াছে।

উপরোক্ত পত্রিকা 'স্ত্রীজাতির অধিকাররক্ষা সমিতি' হইতে প্রকাশিত। নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে ইহাদের বিশেষ লক্ষ্য :—

১। তুরস্করমণীর বহির্গমনের পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তন।

২। বিবাহপ্রণালীর উৎকর্ষসাধন।

৩। স্ত্রীজাতি যাহাতে পরিবারের মধ্যে লাঞ্ছিত বা উৎপীড়িত না হন, এরূপ ব্যবস্থা করা, এবং এরূপভাবে তাহাদের বল বিধান করা।

৪। মাতৃগণকে আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান অনুসারে সন্তানপালনে ও তাহাদিগকে শিক্ষাদানে সমর্থ করা।

৫। তুরস্করমণীকে সামাজিকজীবনে শিক্ষিত ও অভ্যস্ত করা।

৬। তুরস্করমণীর বর্ত্তমান দুঃখ দূর করিবার জন্য তাহাদিগকে স্বীয় জীবিকা-উপার্জ্জনে উৎসাহিত করা ও তাহাদের কাজ খুঁজিয়া দেওয়া।

৭। তুরস্কবালিকাদিগকে দেশের অভাবমোচনের উপযোগী শিক্ষা দিবার জন্য নূতন বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন ও বর্ত্তমান বিদ্যালয়গুলির উৎকর্ষসাধন।

হঠাৎ দেখিতে গেলে উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে প্রথম পাঁচটিই অধিকতর প্রয়োজনীয় এবং অবিলম্বে সাধনীয় বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু শেষোক্ত দুইটিই এই বিরাটসমস্যার সোনার কাঠি, কেননা স্ত্রীজাতির আর্থিক স্বাধীনতা ও মানসিক শিক্ষার মধ্যেই তাহার সামাজিক অবস্থার রহস্য নিহিত।

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীজাতির উন্নতির দিকে তুরস্ক গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়াতে উপরোক্ত সমিতির কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। সম্প্রতি শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রী একটি বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন; তাহাতে দেখা যায় গভর্ণমেণ্ট স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার করিতে, তাহাকে পূর্ণাঙ্গ ও নির্দ্দোষ করিতে এবং তাহাকে বর্ত্তমান শতাব্দীর সভ্যতা ও উন্নতির উপযোগী করিতে অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিতেছেন! এই উদ্দেশ্যেই অনেকগুলি সাহিত্যসমাজ (Lycees), শিক্ষকদিগের জন্য নর্ম্মালস্কুল ও গার্হস্থ্যবিদ্যাশিক্ষালয় স্থাপনের সংকল্প করা হইয়াছে। তুরস্কের ভাবী বধূ ও মাতৃগণের মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য গভর্ণমেণ্ট অশেষপ্রকারে চেষ্টা করিতেছেন।

নিয়মতন্ত্রশাসনপ্রণালীর পূর্ব্বে বালিকাদিগের শিক্ষার দিকে কাহারও কোনও দৃষ্টি ছিল না বলিলেই চলে। মুসলমানবালিকারা এগার বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মসজিদ-সংসৃষ্ট বিদ্যালয়ে যাইত, না হয় ত গভর্ণমেণ্ট স্কুলের নিম্নতম শ্রেণীতে পড়িত; এখানে তাহারা সামান্য লিখিতে পড়িতে, কিছু অঙ্ক কষিতে, একটু সূচিশিল্প করিতে ও কিঞ্চিৎ কোরান পড়িতে শিখিত। আজকালকার বাঙ্গালী মেয়ের

তুর্কী-রমণী-নেত্রী।
মাননীয়া শ্রীযুক্তা আজিজ হাইদার হানুম, তুর্কী-রমণীর স্বত্বসংরক্ষণ সভার নেত্রী, ইনি মাতৃগণের শিক্ষালয় স্থাপনের জন্য আপনাকে নিরাভরণ করিয়া সর্ব্বস্ব দান করিয়া স্বদেশকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন।

শিক্ষারই অনুরূপ আর কি। কোন কোন ধনীপরিবারের কন্যারা বাড়ীতে বিদেশী গৃহশিক্ষয়িত্রীর নিকট শিক্ষা করিতেন। কিন্তু মোটের উপর ধরিতে গেলে তাহাদের শিক্ষা গান বাজনা, রেখাঙ্কণ, চিত্রাঙ্কণ, সূচিশিল্প ও ফরাসী-ভাষা শিক্ষাতেই পর্য্যবসিত। নূতন শাসনপদ্ধতি বালিকা-বিদ্যালয় ও বালকবিদ্যালয় উভয়কেই নূতন ছাঁচে গড়িতে চেষ্টা করিতেছেন; ইতিমধ্যেই বালিকাবিদ্যালয়সমূহকে একটু উচ্চশ্রেণীর করিবার কিছু কিছু উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। সাধারণতঃ গবর্ণমেণ্ট বালিকাবিদ্যালয়ে তিনবৎসর কিণ্ডারগার্টেন ও প্রাথমিক শিক্ষা এবং তিনবৎসর তার চেয়ে উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ইস্তাম্বুলের বাহিরে বালিকাদের জন্য কেবলমাত্র এইরূপ শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। ইস্তাম্বুলে তিনটি উচ্চতর শ্রেণীর বিদ্যা-লয় আছে; প্রথম, 'সুলতানী'—এখানে উচ্চতর শ্রেণীর সাধারণশিক্ষার ব্যবস্থা আছে; দ্বিতীয়, 'দার-উল মৌআলিমত'—শিক্ষয়িত্রীদিগের শিক্ষার জন্য; তৃতীয়, 'সেনায়ে'—এখানে জীবিকা-অর্জ্জনের জন্য নানারূপ বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া হয়।

'দার-উল মৌআলিমত' হামিদীয় শাসনপ্রণালীর সময় হইতেই ইস্তাম্বুলে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু সেই যুগের সকল ব্যাপারেরই মত এতদিন ইহাও একটি নিস্ফল ব্যাপার মাত্র ছিল। এই বিদ্যালয় এক নিদ্রাতুর বৃদ্ধ গুরুমহাশয়ের তত্ত্বাবধানে থাকিত। তিনি আপনার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যকক্ষে সটান শুইয়া পড়িয়া ধূমপান ও কাফিপান করিয়াই দিন কাটাইয়া দিতেন; আবশ্যক বোধ হইলে মাঝে মাঝে পাঠ আরম্ভ হইত, বেশী পড়িলে পাছে বালিকাদের সুকুমার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের কিছু হানি হয় সেই ভয়ে পড়াও তথৈবচ হইত। নিয়মতন্ত্রশাসনপ্রণালীর পর হইতে বিদ্যালয়টি আবার সম্পূর্ণরূপে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলা হইয়াছে। ইহার বাড়ী ও অবস্থান পরিবর্ত্তন করিয়া ইহা একটি সুন্দর বাগানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন ইহা একজন সুইসমহিলা ও একজন তুর্কিসহযোগিনী দ্বারা পরিচালিত। শিক্ষাবিভাগের একজন মন্ত্রী ইহার তত্ত্বাব-ধায়ক।

গবর্ণমেণ্ট প্রথমে স্থির করিয়াছিলেন যে ইস্তাম্বুলের বালিকাদের এখানে শিক্ষিত করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষ-য়িত্রীরূপে দেশের অন্যান্য স্থানে প্রেরণ করিবেন। কিন্তু তুরস্ক-সমাজে নারীগণ অত্যন্ত নিকট আত্মীয় ভিন্ন কাহারও সহিত মিশিতে পারেন না বলিয়া এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইল না। অগত্যা অন্য সকল প্রদেশের বালিকাদের শিক্ষাকালের সমস্ত ব্যয় প্রভৃতি দিবার লোভ দেখাইয়া এই বিদ্যালয়ে আনা স্থির হইল। এইখানে শিক্ষালাভ করিয়া তাহারা দেশে ফিরিয়া আপনাদের পরিবারে থাকিয়া শিক্ষাদানের কার্য্য করিতে পারে। এই ব্যবস্থা আশ্চর্য্য-রূপ সফল হইয়াছে, এখন প্রায় দেড়শত ছাত্রী এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। ইহাদের মধ্যে তুরস্কসাম্রাজ্যের সকল প্রদেশের, এমন কি সিরিয়া কুর্দ্দিস্তান ট্রিপোলি প্রভৃতিরও, ছাত্রী আছেন। মুসলমান ও অমুসলমান সকল তুরস্ক-রমণীরই এই বিদ্যালয়ে আসিবার অধিকার আছে।

এই বিদ্যালয়ে তুর্কি রীতিনীতি ও প্রথাসকলের প্রতি

বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চলা হয়। পুরুষশিক্ষক থাকেন বলিয়া পড়িবার সময় বালিকাদিগকে অবগুণ্ঠনের অন্তরালে থাকিতে হয়। বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে খুব কড়াকড়ি আছে। ছাত্রীদিগকে মুসলমান-ধর্ম্মমত-অনুসারে প্রত্যহ পাঁচবার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রক্ষালণ ও নমাজ করিতে হয়। উপাসনা-গৃহে মক্কার দিকে মুখ করিয়া বসিবার জন্য বাঁকা-ভাবে সারি সারি কম্বল পাতা থাকে। কোরানগুলি কারুকার্য্য-করা কালো কাপড়ে ঢাকা থাকে, পাশেই নানা-রূপ চিত্রখচিত কোরানাধারগুলি থাকে। এই প্রায় দেড়-শত ছাত্রী প্রত্যহ ভোর হইবার পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিয়া ও পরে আবও চারিবার নমাজের পূর্ব্ববর্ত্তী অঙ্গপ্রক্ষালণাদি করে কিনা তাহার পরিদর্শন এক বিরাট ব্যাপার; তাহার জন্য একজন রমণী বিশেষ করিয়া নিযুক্ত আছেন। এই দীর্ঘ ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য সুশৃঙ্খলার সহিত কার্য্যপরিচালন কিছু শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। আজকালকার মানুষের জীবন জটিল কর্ম্মজালে জড়িত, সময়ের একান্তই অভাব, কাজেই প্রত্যহ পাঁচবার আচমন ও পাঁচবার নমাজের ব্যাপারটি তাহাদের নিকট গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিদ্যালয়ের যে ছাত্রীরা মুসলমান নয় তাহাদিগকে এই ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগ দিতে ও ধর্ম্মশিক্ষা লাভ করিতে হয় না।

কেবল বিদ্যার্জ্জন ভিন্ন অন্যান্য কার্য্য শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও গবর্ণমেণ্ট করিয়াছেন। এই শিক্ষালয় স্ত্রীলোক-দিগকে সামাজিক কর্ত্তব্যসাধনে ও আপন আপন জীবিকা-অর্জ্জনে পটু করিবার জন্য স্থাপিত; ইহা একজন বেলজিয়ান মহিলা কর্ত্তৃক পরিচালিত। এ দেশে এইরূপ শিক্ষার এত বেশী আদর যে বিদ্যালয়টি অতি অল্পদিনমাত্র স্থাপিত হওয়া সত্বেও প্রায় ছয়শত ছাত্রী পাইয়াছে, স্থানাভাব-বশতঃ আরও অনেকে আসিতে পারিতেছে না। এখানে তিন বৎসর শিক্ষার পর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। শিক্ষা সমাধা করিবার জন্য ইহার পর আর এক বৎসর এইরূপ কোনও বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করিতে হয়!

সেদিন পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট স্কুলের কাজ প্রকৃত পক্ষে তুরস্কের বাহিরের লোকের সাহায্যেই হইয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু অত্যন্ত সুখের বিষয় যে আজকাল তুরস্ক-গভর্ণমেণ্ট স্বদেশীয়া মহিলাদিগের দ্বারা সেই কার্য্য করাই-বার জন্য তাঁহাদিগকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছেন। নিয়মতন্ত্রশাসনপ্রণালী স্থাপনের অব্যবহিত পরেই কয়েক-জন অমুসলমান তুর্কিমহিলাকে ইয়ুরোপে শিক্ষার জন্য পাঠান হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দেশে ফিরিয়া সেখানকার বিদ্যালয়সমূহে কাজ করিতেছেন। ইস্তাম্বুলে বালিকাদিগের জন্য যে আমেরিকান কলেজ আছে, সেই কলেজে পাঠান্তে কয়েক বৎসর দেশের বিদ্যালয়ে কাজ করিয়া দিবার সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট আট জন বালিকাকে পড়াইতেছেন। এতদ্ব্যতীত শিক্ষাপ্রণালী ও চিত্রবিদ্যা শিখিবার জন্য সম্প্রতি কয়েকজন মুসলমানরমণীকে সুইজারল্যাণ্ডে প্রেরণ করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা বেশ বোঝা যাইতেছে যে, তুরস্ক আজকাল নিজকার্য্য নিজহস্তেই সমাধা করিতে চেষ্টা করিতেছেন, পূর্ব্বের ন্যায় আর সম্পূর্ণরূপে পরমুখাপেক্ষী হইয়া আপনার প্রকৃত উন্নতির পথে অন্তরায় হইতেছেন না।

অতি অল্পদিন হইল ইস্তাম্বুলের রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্ত্রীলোকদিগকে তথায় প্রবেশের অধিকার দিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার বিরোধী কুসংস্কার-সকল অল্পে অল্পে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। ইহার মধ্যেই দুইশত ছাত্রী ইহাতে যোগ দিয়াছেন। তাঁহারা শিক্ষাপ্রণালী, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, পারিবারিক অর্থনীতি, ইতিহাস-বিজ্ঞান ও স্ত্রীজাতির অধিকার প্রভৃতি বিষয়ের অধ্যাপনায় উপস্থিত থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বাড়ী প্রত্যহ সন্ধ্যায় এই কার্য্যের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হয়, কারণ গৃহ-লক্ষ্মীরা গৃহকার্য্যের অনুরোধে সকালে পড়িতে আসিতে পারেন না। তাঁহাদের ক্লাশ যে পুরুষদিগের ক্লাশ হইতে ভিন্ন সে কথা ত বলাই বাহুল্য। ইঁহাদিগকে চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে যাইতে দিবার প্রতিশ্রুতিও করা হইয়াছে।

তুর্কিরমণীরা এতদিন অর্থ ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইলেও তাঁহাদের সেদিকে প্রকৃত স্বাধীনতা ছিল না। তাঁহাদের সম্পত্তি তাঁহাদের পুরুষ আত্মীয়দিগের হাতেই থাকিত। এতদিন অজ্ঞানতা ও অশিক্ষার ফলে তাঁহারা আপনার সম্পত্তি পরিদর্শন করিতে কিম্বা স্বার্থপর পিতা ভ্রাতা ও স্বামীদিগের ষড়যন্ত্রের কবল হইতে রক্ষা করিতে

পারিতেন না। স্বোপার্জ্জিত অর্থের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। কারণ সেটা প্রথম হইতেই রমণীর নিজস্ব। নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানরমণীরা অনেকদিন হইতেই উপার্জ্জন ও তাহা উপভোগ করিয়া আসিতেছে। ধাত্রীবিদ্যা তাহাদের প্রাচীন ব্যবসায়, আবার রেশম কার্পেট ডুমুর প্রভৃতির কারখানায় অতি অল্পবেতনের অনেক কাজও তাহারা করিয়া থাকে। গ্রাম্য কৃষকবধূরা কৃষিকার্য্যে পুরুষদিগের যে সহায়তা করে সেটাও উপেক্ষার বিষয় নয়।

তুরস্কে আজকাল ইহা অপেক্ষাও লক্ষ্য করিবার উপযুক্ত ঘটনা ঘটিতেছে। স্মীর্ণাতে একদল রমণী সেখানকার উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য একটি দোকান ও মুসলমান-বালিকাদিগের জন্য একটি দর্জ্জির দোকান খুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। বিদ্যালয়ের কার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া এই-সকল কর্ম্ম পর্য্যন্ত সব বিষয়েই তুর্কি রমণীরা আগ্রহের সহিত যোগ দিতেছেন। কয়েকমাসের মধ্যে আর-একটি খুব বড় পরিবর্ত্তন হইয়াছে, 'সুলতানী' বালিকাবিদ্যালয়ে এক মুসলমানশিক্ষয়িত্রী ব্যায়াম শিক্ষা দিতেছেন।

সব দেশের মত তুরস্কের শিক্ষিতা মহিলারাও শিক্ষা-দানের কার্য্যটাই সর্ব্বপ্রথমে আরম্ভ করিয়াছেন।

কার্য্যক্ষেত্রের অন্যান্যবিভাগে প্রবেশলাভও যে সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত তাহা বোধ হয় না। ইতি-মধ্যেই কয়েকটি মহিলা গদ্য- ও পদ্যলেখিকারূপে সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছেন। আদালতে সাক্ষী, বাদী ও প্রতিবাদীরূপে স্ত্রীলোকের উপস্থিতি দেখিয়া বোধ হয় তাঁহারা কালে উকীলও হইতে পারেন। চিকিৎসা ও শুশ্রূষাক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য ইঁহাদের খুব আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার প্রয়োজনও খুবই বেশী। তুরস্করমণী অন্তঃপুর-কারাগারের বন্দিনী, সেইজন্য অন্তিমকালেও অনেকসময় তাঁহাদের চিকিৎসা হয় না; কেবলমাত্র স্ত্রীচিকিৎসকের অভাবে অনেক জীবন অকালেই ঝরিয়া পড়িয়াছে। ইঁহাদের অতিরিক্ত পর্দ্দার বিষয়ে ইস্তাম্বুলের এক বিখ্যাত চিকিৎসক একটি গল্প বলিয়াছেন। এক মুসলমানরমণীকে দেখিতে গিয়া ডাক্তার পীড়িতার স্বামীর সঙ্গে অন্তঃপুরে চলিলেন; সেখানে তাঁহাকে বসিবার ঘরে বসাইয়া বলা হইল—পাশের ঘরে রোগী আছেন, জিজ্ঞাসাবাদ করিবার জন্য মাঝের দরজাটি খুলিয়া দিতেছি। ডাক্তার রোগনির্ণয় করিবার জন্য রোগীকে পরীক্ষা করিবার ও তাঁহার নাড়ী দেখিবার জন্য পীড়াপীড়ি করাতে স্বামী মহাশয় এক মুহূর্ত্ত একটু ভাবিয়া লইলেন, তখনই তাঁহার মাথায় এক চমৎকার উপায় আসিল। তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী দরজার আড়ালে হাতে একটা তার বাঁধিয়া দাঁড়াইবেন এবং ডাক্তার সেই তারের সাহায্যে অন্যঘর হইতে তাঁহার নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করিবেন। আজকাল রাজধানীর অনেক লোকে পুরুষচিকিৎসক দ্বারা অন্তঃপুরিকাদের চিকিৎসা করাইয়া থাকেন বটে, কিন্তু অন্য জায়গার অবস্থা প্রায় এ গল্পেরই মত।

আজকাল তুরস্কের দৃষ্টি এদিকে বেশ পড়িয়াছে, দৈনিক ও অন্যান্য পত্রে ইহার খুব আলোচনা চলিতেছে। অদ্যা-বধি মহিলাদিগকে নিয়মিত ভাবে কোনরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় নাই বটে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিশ্রুতি অনুসারে শীঘ্রই তাহার ব্যবস্থা হইবে। আজকাল দুই-একজন অমুসলমান মহিলা 'লাইসেন্স' না লইয়াই চিকিৎসা করিয়া থাকেন।

তুরস্ক-বলকান সমরের সময় শিক্ষিতা শুশ্রূষাকারিণীর একান্তই অভাব হইয়াছিল। প্রথমে এই কার্য্যের সাহায্যের জন্য একজনও তুর্কিরমণীকে পাওয়া যায় নাই; কিন্তু এই অভাবপূরণের জন্য হাসপাতালে ক্লাশ খোলা মাত্র সব-ধর্ম্মাবলম্বী তুর্কি বালিকা ও বয়স্থা রমণীরা উৎসাহের সহিত যোগ দিতে আরম্ভ করিলেন। তুরস্কের ইতিহাসে ইহা এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। ইহা সত্য বটে যে এই শুশ্রূষা-কারিণীরা কার্য্যোপযোগী শিক্ষা লাভ করেন নাই, কিন্তু তাঁহাদের অনুরাগ ও একাগ্রতা দেখিলেই বোঝা যাইত যে পথ খোলা পাইলে ইঁহারা এই কার্য্যের মধ্যে মহা উৎসাহের বন্যা আনিয়া ফেলিবেন।

রাজকুমারী নিমতের (Princess Nimet) অধীনে মুসলমানরমণীদের যে লোহিত-চন্দ্রকলা-সমিতি (Red Crescent Society) বল্কানযুদ্ধের সময় বহু পীড়িত ও আহতের সেবা করিয়াছেন, সেই সমিতি স্ত্রীলোকদিগকে শুশ্রূষা শিক্ষা দিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন। বল্কানযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ইস্তাম্বুলের কাদির্গা হাসপাতালে এই সমিতি কর্ত্তৃক একটি শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; যুদ্ধের

সময় অনেক আহত সৈন্য আসায় স্থানাভাববশতঃ তাহা উঠিয়া যায়, তাহার পর আবার চলিতে আরম্ভ করে। ইঁহারা একটি হাসপাতাল নির্ম্মাণ করিবার ও তৎসঙ্গে শুশ্রূষাকারিণীদিগের জন্য একটি শিক্ষালয় স্থাপন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

তুরস্কে নারীজাতির মধ্যে এই যে আন্দোলন ও বিবিধ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে তাহা অত্যন্ত অল্পদিনের হইলেও তাহার মূল্য আছে। ইহার মধ্যে যে স্বাধীনতার ও স্বাবলম্বনের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহাকে খাটো করিয়া রাখিবার কাহারও শক্তি নাই। ইহা নারীজাতিকে যে মহাশক্তিতে মণ্ডিত করিয়া তুলিতেছে তাহার দ্বারা তাঁহারা স্ত্রীজাতির প্রতি অন্যায় অত্যাচারের স্পষ্ট প্রতিবাদ করিতেছেন। এখন আর কেহ সে প্রতিবাদ হাসিয়া উড়াইতে পারিতেছেন না।

তাঁহাদের মধ্যে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এতদিন নিহিত ছিল আজ বাতাস পাইয়া তাহা জ্বলিয়া উঠিয়াছে, সকল পাপ ভস্ম করিয়া তবে তাহা শান্ত হইবে। এতদিনে তাঁহারা আপনাদের শক্তির মূল্য বুঝিয়াছেন, স্বজাতির কল্যাণের জন্য তাহার সদ্ব্যবহার করিতে আজ তাঁহারা অগ্রসর হইয়াছেন।

মুসলমানসমাজের পর্দ্দা ও বহুবিবাহ, এই দুইটি দূষনীয় প্রথার বিরুদ্ধেই তাঁহারা বিশেষভাবে লাগিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে মহম্মদ অবগুণ্ঠন ধারণ মুসলমানধর্ম্মের একটি অপরিবর্ত্তনীয় অঙ্গস্বরূপ বলিয়া যান নাই, কোরানের যে অংশে ইহার উল্লেখ আছে সে অংশ সময়োচিত প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে। তাঁহারা বলেন এই বিংশশতাব্দীর আর্থিক ও সামাজিক অবস্থায় লক্ষ লক্ষ মনুষ্য আধুনিক কার্য্যক্ষেত্রের উৎসাহের বাহিরে অবগুণ্ঠিত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়া থাকিলে কিছুতেই চলিবে না। সেইজন্য তাঁহারা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন যে জগতের ও তাঁহাদের মধ্যে যে অবগুণ্ঠন অন্তরাল হইয়া রহিয়াছে তাহাকে তুলিয়া দেওয়া হউক। কিছুকাল পূর্ব্বে ইস্তাম্বুলের কোন মেলায় তুর্কিমহিলারা অবগুণ্ঠন খুলিয়া গিয়াছিলেন।

বহুবিবাহের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধঘোষণা হইতেছে তাহারও ইহার সহিত যোগ আছে। আজকাল অর্থাভাবে অনেক পুরুষই একের অধিক বিবাহ করিতে না পারায় বহুবিবাহ আপনা হইতেই কমিয়া আসিতেছে। নারীজাতির প্রতিবাদও একেবারে নিষ্ফল হয় নাই। (Izzet Fuad Pasha) জেনারেল ইজ্জত ফুআদ পাশা বলেন যে আজকালকার দিনে এই সামাজিক প্রথার ব্যয়নির্ব্বাহ করা যে অসম্ভব তাহা তুর্কিগণ বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন। তিনি তাঁহার শ্বশুরের দৃষ্টান্ত দিয়া বলেন যে ইনি কুড়ি লক্ষ পাউণ্ডের (তিন কোটি টাকার) সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন, কিন্তু চল্লিশ বৎসর বয়সে মৃত্যুকালে তাঁহার কিছুই ছিল না। জীবিতাবস্থায় তাঁহাকে চারি পত্নী ও পাঁচশত দাসীর পৃথক পৃথক সংসারনির্ব্বাহের ব্যয় যোগাইয়া আসিতে হইয়াছিল। সংসারের এইরূপ ব্যয়ই তুরস্কের ধ্বংসের কারণ হইয়া উঠিতেছে। পরিবারের জন্য যদি এইরূপ অর্থ ব্যয় করিতে হয় তবে ব্যবসাবাণিজ্যের মূলধনের জন্য আর কিছু থাকে না। কাজেই গ্রীক ও আর্ম্মিনীয়ান প্রভৃতি অন্যান্য জাতিগণ সেইস্থান অধিকার করিয়া লইতেছেন। তবে যতদিন মুসলমানধর্ম্ম, দেশাচার ও আইন এই বিবাহপ্রথার অনুমোদন করিবে ততদিন এই পাপের মূলচ্ছেদ হইবে না। পর্দ্দা ও বহুবিবাহের তিরোধানের দিন এখনও বহুদূরে, কিন্তু স্ত্রীজাতির আর্থিক ও সামাজিক শক্তির বৃদ্ধির সহিত ইহার প্রকোপ বহুল পরিমাণে কমিয়া আসিবে। তাঁহারা যে-পরিমাণে স্বীয় জীবিকা উপার্জ্জন করিতে ও বিশেষতঃ যুক্তযুক্তভাবে আপনাদের অধীনতার প্রতিবাদ করিতে সক্ষম হইবেন সেই পরিমাণেই ইহার হ্রাস হইবে।

কেবল যে তুরস্কের মুসলমানমহিলারাই স্বাধীনতা ও শিক্ষার জন্য তুমুল আন্দোলন করিতেছেন তাহা নহে, পারস্য মিশর প্রভৃতি দেশের অন্তঃপুরিকারাও আপনাদের মনুষ্যত্ব ফিরিয়া পাইবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। মিশরের বর্ত্তমান খেদিবের মাতা তাঁহার স্বজাতীয় সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ ও কাইরোপ্রবাসী বিশিষ্ট বিদেশী মহিলাদিগকে লইয়া এক নারীশিক্ষাসমিতি গঠন করিয়াছেন।

(১) সকল জাতীয়া নারীদিগের মিলন ও তদ্দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার, (২) মাতা ও শিক্ষয়িত্রীগণকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-

প্রণালী শেখান ও পরস্পরের অভিজ্ঞতার বিনিময়ের জন্য তাঁহাদের মিলন, (৩) শারীরিক মানসিক ও নৈতিক শিক্ষার বিষয়ে বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করণ, (৪) এবং শিক্ষিতা বালিকা ও তরুণীদিগকে জগতের ক্রমবর্দ্ধনশীল জ্ঞানের সহিত ও সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সমর্থ করা ও তজ্জন্য অধিকাংশের বোধগম্য ভাষায় একটি মাসিকপত্রিকা প্রচার, এই কয়েকটি উদ্দেশ্যেই উপরোক্ত সমিতি স্থাপিত।

আফ্রিকান টাইম্‌স্ এণ্ড ওরিয়েণ্ট রিভিউ (African Times and Orient Review) বলেন শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে মিশরের নেতাগণ বুঝিতে পারিয়াছেন স্ত্রীজাতির শারীরিক ও মানসিক উন্নতির এবং ধর্ম্মনামধারী দেশাচারের কবল হইতে তাহাদের উদ্ধারসাধনের উপর সমগ্র দেশের উন্নতি বহুলপরিমাণে নির্ভর করিতেছে। পুরুষগণ যেমন শিক্ষালাভ করিতেছেন সেই সঙ্গে তাঁহারা তাঁহাদের মত উপযুক্ত শিক্ষিতা জীবনসঙ্গিনী খুঁজিতেছেন, ইহার ফলে একস্ত্রী-গ্রহণ প্রথা সর্ব্বত্র বিশেষতঃ উচ্চশ্রেণীর ও উপাধিধারীদিগের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। মিশরের সংবাদপত্রসকল উৎসাহের সহিত পর্দ্দাপ্রথার উচ্ছেদ ও স্ত্রীস্বাধীনতার প্রবর্ত্তনের সমর্থন করিতেছেন। সাধারণের মতও ক্রমশঃ এই পক্ষে আসিতেছে।

এই নারীশিক্ষা-সমিতি এই মানসিক আন্দোলনেরই অন্যতম ফল, এই আন্দোলনকে সফল করিবার জন্য শীঘ্রই আরও কয়েকটি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে। স্ত্রীশিক্ষাকে আরও অগ্রসর করিবার জন্য বাল্যবিবাহের ফলে অকালে যাহাদের শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে তাহাদেরও শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা হইবে।

শিক্ষিত মিশরবাসীগণ সকলেই জ্ঞানবিদ্যাবতী ও অবরোধমুক্তা স্ত্রী চান বলিয়া বোধ হয়, এই সমিতির চেষ্টা শীঘ্রই সুফলে ভূষিত হইবে।

পারস্যদেশীয়া স্ত্রীলোকদের অবস্থাও অন্যান্য মুসলমান স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষা কিছুমাত্র লোভনীয় ছিল না। কিন্তু গত কয়েক বৎসর ধরিয়া তাঁহারাও দ্রুতবেগে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন। এমন কি রাজনীতিক্ষেত্রেও তাঁহারা অগ্রণী হইতে ছাড়েন নাই। কিছুকাল পূর্ব্বে পারস্যে নিয়মতন্ত্রপ্রণালী প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টার আগুন যে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তাহা ক্ষণস্থায়ী হইলেও তাহার পরিচালনা অত্যন্ত বিস্ময়কর। ইহা বিদেশীদের সাহায্যে নির্ব্বাপিত করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ইহার মূলে যদি পারস্যদেশের তথাকথিত আসবাবপত্রের সামিল রমণীদিগের প্রভাব না থাকিত তাহা হইলে ইহা অচিরেই একটি শৃঙ্খলাবিহীন অসম্বদ্ধ প্রতিবাদরূপে লুপ্ত হইয়া যাইত। পারস্যের জনসমূহ নিয়মতন্ত্রশাসনপ্রণালীর প্রতিষ্ঠার জন্য এবং রাজনৈতিক ও বাণিজ্যসংক্রান্ত পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রবর্ত্তনের জন্য যে জাতীয় আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, ইঁহারাই গৃহকোণের ভিতর হইতে তাহার ইন্ধন যোগাইতেছিলেন।

স্বদেশপ্রেমের অগ্নি তাঁহাদের অবগুণ্ঠিত দৃষ্টির ভিতর হইতেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। শাহগণ যে অসহ্য উৎপীড়ন ও অত্যাচারে দেশ প্লাবিত করিতেছিলেন তাহা তাঁহাদিগকেও ঘা দিয়াছে। স্বাধীনতালাভের আগ্রহে তাঁহারা স্ত্রীজাতির অলঙ্ঘনীয় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বহু প্রথা ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছেন।

পাশ্চাত্য রমণীগণ বহুকাল হইতেই পুরুষদিগের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছেন। কিন্তু এই পূর্ব্বদেশীয়া কন্যাগণ কখন্ যে রাতারাতি লেখিকা শিক্ষয়িত্রী রাজনৈতিক বক্তা ও নারীসমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী হইয়া বসিয়াছেন, মনে করিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। সম্পূর্ণরূপে অনভ্যস্ত মনও যে কি করিয়া নূতন চিন্তা ও মত-সকলকে অতি অল্পদিনে একেবারে আপনার করিয়া লয়, পারস্যরমণীগণ জগৎকে তাহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। রাজনীতিক্ষেত্রের সকল বিভাগেই ইঁহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। তাঁহাদের উদ্দেশ্যসাধনের ও দেশের মঙ্গলের জন্য তাঁহারা অনেক সমিতি স্থাপন করিয়াছেন এবং সেইজন্য ইংরেজপুরুষের নিকট বাদপ্রতিবাদ ও পরামর্শ প্রভৃতি করিতে যাইতেও পশ্চাৎপদ হন না। অতিদরিদ্র শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণও এইসকল কার্য্য করেন।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে রুশিয়াগভর্ণমেণ্ট পারস্যকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে পারস্যকে তাঁহাদের কথিত কয়েকটি সর্ত্ত গ্রহণ করিতে হইবে। এই সর্ত্তগুলি রক্ষা করিতে হইলে রুশিয়ার পদতলে পারস্যের স্বাধীনতা

বিসর্জ্জন করিতে হইত। কাজেই পারস্যের 'জাতীয় মহা-সভা' তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। মন্ত্রীগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। রুশিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার শক্তি ত তাঁহাদের নাই! তাঁহারা আবার কিছুদিন পরে 'জাতীয় মহাসভা'কে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা দ্বিতীয়বার প্রত্যাখ্যান করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "আল্লার ইচ্ছা হইলে আমাদের স্বাধীনতা লুপ্ত হইবে, কিন্তু তাহাকে স্বহস্তে বিসর্জ্জন দিতে আমরা পারিব না।" তেহারান ও সমস্তদেশময় তাঁহাদের জয়জয়কার পড়িয়া গেল।

কিন্তু আবার সংশয়ের অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। রুশিয়ান গুপ্তচরগণ 'সভা'র সভ্যগণকে নানারূপ ভয় ও প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন। দেশের সকলের প্রাণে ভয় ঢুকিল, এবার আর বুঝি 'জাতীয় মহাসভা' স্থির-প্রতিজ্ঞ থাকিতে পারেন না! এইবার নারীশক্তির আবির্ভাব হইল। অন্তঃপুরের প্রাচীরের বাধা অতিক্রম করিয়া তিনশত পারস্যরমণী দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ভূষণে ভূষিত হইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। প্রত্যেকের মুখে ওড়না ঢাকা ও অনেকের হস্তে পিস্তল। তাঁহারা সোজা 'মহা-সভা'য় উপস্থিত হইয়া সভাপতি মহাশয়কে বলিলেন 'আমাদিগকে মহাসভায় প্রবেশ করিতে অনুমতি প্রদান করুন।' সভাপতির মনে তখন কি ভাবের উদয় হইয়া-ছিল ইতিহাস তাহা লেখে নাই। তিনি তাঁহাদিগকে নারীসমাজের প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করিতে রাজি হইলেন। তখন তাঁহারা ওড়না ছিঁড়িয়া ফেলিয়া পিস্তল তুলিয়া ধরিয়া জানাইয়া দিলেন যে, স্বদেশের রক্ষার ও তাহার প্রতি কর্ত্তব্যসাধনের পথ হইতে যদি তাঁহাদের স্বামীপুত্রগণ একচুলও বিচলিত হন, তবে সেই মাতা ও পত্নীগণ স্বহস্তে তাঁহাদিগকে দেশের নিকট বলিদান দিয়া সেই সঙ্গে আপনা-দিগকেও উৎসর্গ করিবেন।

দুই এক সপ্তাহ পরে রুশিয়ার অর্থে বশীভূত দেশ-দ্রোহীরা এই 'মহাসভা'কে নষ্ট করিয়া ফেলিল। কিন্তু দেশের স্বাধীনতা বিক্রয়ের কলঙ্ক সভ্যগণকে একটুও স্পর্শ করিতে পারে নাই।

ধন্য পারস্যের অন্তঃপুরিকা! চিরকাল পুরুষের অধীন থাকিয়া, শিক্ষার বিন্দুমাত্রও সুবিধা না পাইয়া, বন্দিনীর মত সর্ব্বদা পাহারার মধ্যে থাকিয়াও ইঁহারা দেশের কাজে আপনাদের শক্তি নিযুক্ত করিয়াছেন; যে দুর্দ্দিনে পুরুষের অন্তঃকরণও কাঁপিয়া উঠিয়াছে এবং বীরশ্রেষ্ঠের হৃদয়েও কারাগৃহের অত্যাচার ও যুদ্ধক্ষেত্রের গোলাগুলির ছবি ভীষণমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইতেছে তখনও তাঁহারা বিচলিত হয়েন নাই।

পারস্যের হৃদয়ের আশা নির্ম্মূল হইয়াছে বটে কিন্তু এই বীররমণীগণের স্মৃতি সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে ন্যায়প্রিয় পুরুষের হৃদয়ে উদ্দীপনার সঞ্চার করিবে।

সর্ব্বত্রই নারীজাতি লাঞ্ছিতা ও নিষ্পেষিতা হইয়া আসিতেছেন। কোন কোন বিষয়ে মুসলমানরমণীগণের অবস্থা বোধহয় সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। কিন্তু চিরকাল কেহ এরূপ অবমাননা সহ্য করিয়া থাকিতে পারে না। তাই ইঁহাদের মধ্যেও জাগরণের দিন আসিয়াছে। আমরা দেখিলাম এতদিনের অধীনতায়ও ইঁহাদের উৎসাহ নিভিয়া যায় নাই, হৃদয় জড়তা প্রাপ্ত হয় নাই। যে দিকেই সুযোগ পাইতেছেন সেই দিকেই আগ্রহের সহিত ইঁহারা অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহাদের শক্তি নাই একথাও বলা যায় না, কারণ তাঁহারা বহুবিষয়ে সফলতা লাভ করিতেছেন। নিষ্ফলতা তাঁহাদের উৎসাহকে নির্ব্বাপিত করিতে পারিতেছে না।

শ্রীশান্তা চট্টোপাধ্যায়।

জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার

বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার আবিষ্কারের বিবরণ বিদেশের বৈজ্ঞানিকদিগের নিকটে প্রকাশ করিবার জন্য বৎসরাধিককাল য়ুরোপ আমেরিকা ও জাপান প্রভৃতি দেশে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। কয়েক সপ্তাহ হইল তিনি নিরাপদে স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। আবিষ্কারবিবরণ প্রচারের জন্য ইহাই তাঁহার প্রথম বিদেশ যাত্রা নয়, আরো তিনবার তাঁহাকে এই উদ্দেশ্য লইয়াই বিদেশে বহির্গত হইতে হইয়াছিল।

নির্জ্জীব ধাতুপিণ্ড আঘাতে উত্তেজনা পাইলে সজীব
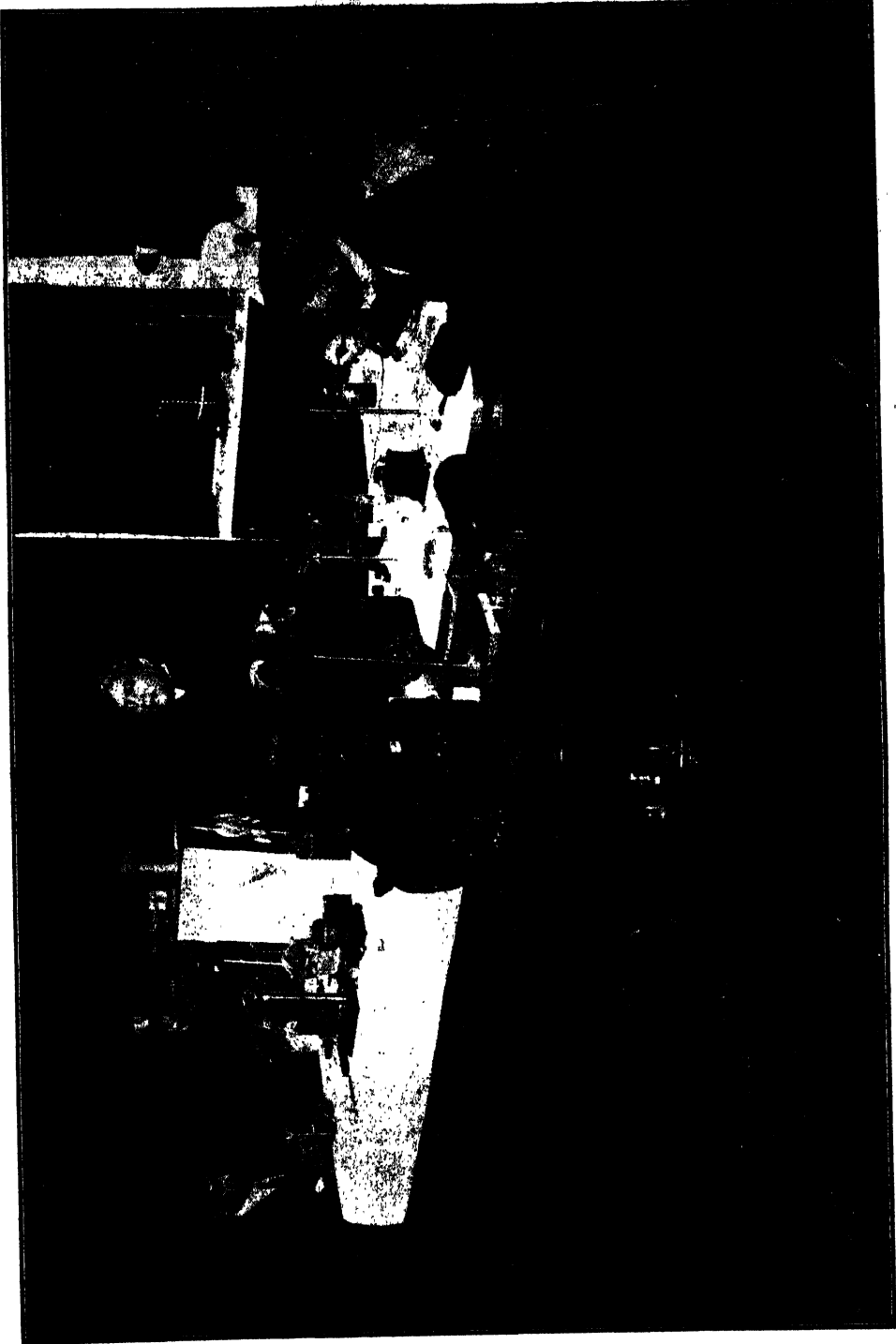
বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ রয়াল ইন্‌ষ্টিটিউশানে ডেভি, ফ্যারাডে প্রভৃতি অমর বৈজ্ঞানিকগণের বক্তৃতা-টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার নূতন গবেষণা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছেন। এ সভায় বক্তাকে শ্রোতাদের নিকট পরিচিত করিয়া দেওয়া হয় না, অর্থাৎ প্রসিদ্ধ ও খ্যাতনামা বক্তা ব্যতীত অপর যে-সে কেহ এখানে কিছু বলিবার অধিকার পান না।

প্রাণীর ন্যায় সুখদুঃখ প্রকাশ করার মত সাড়া দেয়, ইহাই প্রচার করা বসু মহাশয়ের প্রথম বৈজ্ঞানিক অভিযানের বিষয় ছিল। ইহা পনেরো ষোল বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। জগদীশচন্দ্র ধ্যানমগ্ন মুনির ন্যায় নীরবে যে সাধনা করিতেছেন, তাহার ইতিহাস যাঁহাদের জানা আছে, তাঁহাদের কাছে ষোলবৎসর পূর্ব্বেকার কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বিজ্ঞান-পরিষদ তখন তাঁহার পরীক্ষাগুলি দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। প্রচলিত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সহিত জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত তথ্যগুলি খাপ খায় না, গোঁড়া বৈজ্ঞানিকগণ ঈর্ষান্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সংবাদপত্রে ও বৈজ্ঞানিক সাময়িকপত্রে তখন জগদীশচন্দ্রের কথাই প্রকাশ হইত; তিনি এক পৃথিবীব্যাপী বিরাট আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। মাদকদ্রব্য প্রয়োগে প্রাণী উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশ করে এবং বিষে মরিয়া যায়, ইহা আমাদের জানা কথা। বিদ্যুতের সাহায্যে প্রাণীর এইসকল অবস্থার কথা শারীরবিদ্‌গণ প্রাণীদের দিয়াই লিখাইয়া লইতে পারেন। কিন্তু মাদকদ্রব্য প্রয়োগ করিলে যে ধাতুপিণ্ডও উত্তেজনা প্রকাশ করে এবং বিষে জর্জ্জরিত হইয়া মরিয়া যায়,—ইহা কাহারো জানা ছিল না। জগদীশ-চন্দ্রের গবেষণার ফলে ইহা জানিয়াই সকলে চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

ইহার পরে জগদীশচন্দ্র আরো দুইবার বিদেশ-যাত্রা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে য়ুরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে প্রাণী ও উদ্ভিদ সম্বন্ধীয় তাঁহার অনেক আবিষ্কারের কথা প্রচারিত হইয়াছিল। উদ্ভিদের যেসকল জীবন-ক্রিয়ার ব্যাখ্যান আধুনিক বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরাও দিতে পারেন নাই, বসুমহাশয় সেইগুলিরই অতি সহজ ব্যাখ্যান দিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। তিনি কেবল বক্তৃতা করিয়া ব্যাখ্যান দেন নাই, নিজের পরিকল্পিত অতি সুন্দর সুন্দর যন্ত্রের সাহায্যে প্রত্যেক উক্তির প্রমাণ দেখাইয়া সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহাতে উদ্ভিদতত্ত্বের অনেক রহস্যের মীমাংসা হইয়া গিয়াছিল।

এবারেও উদ্ভিদের জীবনক্রিয়ার আরো নূতন নূতন তত্ত্বপ্রচারের জন্য জগদীশচন্দ্র বিদেশযাত্রা করিয়াছিলেন। প্রাণী-জীবনের যে-সকল কার্য্য কেবল প্রাণীরই বিশেষত্ব বলিয়া জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ এতকাল মানিয়া আসিতেছিলেন তাহা উদ্ভিদের জীবনেও দেখা যায়, ইহাও প্রমাণিত করা তাঁহার লক্ষ্য ছিল। ভিয়েনা, পারিস, অক্সফোর্ড, কেম্‌ব্রিজ, সিকাগো, কলম্বিয়া এবং তোকিয়ো প্রভৃতির বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানপরিষদ্ সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার আবিষ্কারের বিবরণ শুনিয়াছিলেন।

প্রাচীন বিশ্বাসকে ত্যাগ করিয়া সহজে কেহই নূতনকে গ্রহণ করিতে চায় না। যাঁহারা বিজ্ঞানের সত্য লইয়া নাড়াচাড়া করেন, তাঁহাদেরও মধ্যে এই প্রকারের গোঁড়ামি বিরল নয়। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারগুলি উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব ও শারীরতত্ত্বের প্রাচীন সিদ্ধান্তের বিরোধী। কাজেই যে-সকল প্রবীণ বৈজ্ঞানিক প্রাচীন সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করিয়া আসিতে-ছিলেন, তাঁহাদিগকে নূতনের দিকে টানিয়া আনা সহজ কাজ ছিল না। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র এবারে এই দুঃসাধ্য সাধনেও কৃতকার্য্য হইয়াছেন। চক্ষুর সম্মুখে শত শত পরীক্ষা দেখাইয়া তিনি যে সকল সত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, প্রবীণ বৈজ্ঞানিকেরাও তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই। জড় ও জীবের দুই বৃহৎ রাজ্যের মাঝামাঝি যে স্থানটি চিররহস্যময় ছিল, আমাদের স্বদেশবাসী জগদীশচন্দ্রই যে তাহাতে নূতন আলোকপাত করিয়া সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন, জগতের সকল বৈজ্ঞানিকই তাহা এখন স্বীকার করিতেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মভূমি য়ুরোপকে এখানে ভারতের নিকটে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। এখন বিদেশের চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বলিতে-ছেন, য়ুরোপের বৈজ্ঞানিকগণ প্রকৃতিকে এ পর্য্যন্ত খণ্ড খণ্ড করিয়াই দেখিয়া আসিয়াছেন; কাজেই তাহার সুন্দর পূর্ণ মূর্ত্তিখানি কাহারো নজরে পড়ে নাই। প্রাচ্য বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রই প্রকৃতিকে দৃষ্টির সীমার মধ্যে আনিয়া তাহার পূর্ণমূর্ত্তি দেখাইবার উপক্রম করিয়াছেন।

আমন্ত্রিত হইয়া জগদীশচন্দ্র য়ুরোপ ও আমেরিকার প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ও সভাসমিতিতে যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার বিবরণ এখনো আমাদের হস্তগত হয় নাই। সম্প্রতি ম্যাক্‌লিয়োর মাগাজিন্ (McClure Magazine) নামক প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রে বসুমহাশয়ের

আবিষ্কার সম্বন্ধে যেসকল কথা প্রকাশিত হইয়াছে আমরা পাঠকের নিকটে তাহারি মর্ম্ম উপস্থিত করিতেছি। "প্রবাসীর" নিয়মিত পাঠক জগদীশচন্দ্রের নূতন ও পুরাতন আবিষ্কারের অনেক কথাই অবগত আছেন। লেখক সেইসকল কথাকেই সংক্ষেপে গুছাইয়া লিখিয়াছেন বলিয়া ইংরেজী প্রবন্ধটি উপাদেয় হইয়াছে।

উপাধি গ্রহণ করিয়া জগদীশচন্দ্র যখন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহিরে আসিয়াছিলেন, তখন জড়বিজ্ঞানের অবস্থা এখনকার মত ছিল না। তারহীন টেলিগ্রাফ্ তখন উদ্ভাবিত হয় নাই। ঈথরের তরঙ্গই যে বিদ্যুৎ তাপ এবং আলোক উৎপাদন করে, ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ক্লার্ক ম্যাক্স্ওয়েল সাহেব তাহা কাগজে-কলমে প্রমাণিত করিয়া তখন পরলোকগত। কেবল জর্ম্মান্ পণ্ডিত হার্জ সাহেবই সেই সময়ে ম্যাক্সওয়েলের আবিষ্কারের সূত্র ধরিয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন। হার্জ সাহেবের এই পরীক্ষাগুলি জ্ঞানপিপাসু জগদীশচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

হার্জসাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছিলেন, কৃত্রিম উপায়ে বিদ্যুতের তরঙ্গ ঈথরে উৎপন্ন করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার পরিচয় আমাদের চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় গ্রহণ করিতে পারে না। কাজেই ইহার পরিচয় লইতে হইলে কোনপ্রকার যন্ত্রের সাহায্য প্রয়োজন। ইংরেজ বৈজ্ঞানিক লজ্ সাহেব এই কথা শুনিয়া অল্পদিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাহাই এখন কোহেরার (Coherer) নামে খ্যাত হইয়াছে। কাচের নলে আবদ্ধ ধাতুচূর্ণ যন্ত্রটির প্রধান উপাদান। বিদ্যুতের অদৃশ্য তরঙ্গ ঈথরে উৎপন্ন হইয়া ধাতুচূর্ণে আসিয়া ঠেকিলে ধাতুর বিদ্যুৎ-পরিবাহন-শক্তি কমিয়া আসিত এবং ইহা দেখিয়াই অদৃশ্য বিদ্যুৎ তরঙ্গের অস্তিত্ব বুঝা যাইত। কিন্তু যন্ত্রটিকে কার্য্যক্ষম রাখিবার জন্য প্রত্যেক পরীক্ষার পরে ধাতুচূর্ণগুলিকে ঝাঁকাইয়া না দিলে চলিত না। যে ধাতুচূর্ণে একবার তরঙ্গের স্পর্শ লাগিয়াছে, ঐ প্রকারে ঝাঁকাইয়া না দিলে তাহা আর বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সাড়া দিত না। যাহা হউক, লজ্ সাহেবের এই যন্ত্রে বৈজ্ঞানিকগণ বিদ্যুৎতরঙ্গের পরিচয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং এই অদৃশ্য তরঙ্গের চালনা করিয়া সংবাদ আদানপ্রদানের সুবিধা খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু নলে আবদ্ধ ধাতুচূর্ণের পরিচালন-শক্তি কেন বিদ্যুৎ-তরঙ্গের স্পর্শে পরিবর্ত্তিত হয়, এবং কেনই বা তাহাতে ঝাঁকুনি না দিলে কাজ চলেনা, এই-সব প্রশ্নের উত্তর অমীমাংসিত থাকিয়া গেল। আমাদের জগদীশচন্দ্রই ইহার কারণ অনুসন্ধানে লাগিয়া গেলেন। ইহাই তাঁহার প্রথম গবেষণা।

কোন্ সূত্রে কোন্ তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহার হিসাবপত্র করিয়া তত্ত্বান্বেষীরা চলেন্ না। পূর্ব্বোক্ত যে বিষয়টি লইয়া জগদীশচন্দ্র প্রায় কুড়িবৎসর পূর্ব্বে গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাই যে জীবের জীবত্বের ও জড়ের জড়ত্বের মূল কথা বলিয়া দিবে, তাহা তিনিও সেই সময়ে ক্ষণকালের জন্য মনে করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, বিদ্যুৎ-তরঙ্গের স্পর্শে লৌহচূর্ণ কেন বিদ্যুৎ-পরিচালনার ধর্ম্ম হারায়, তাহার অনুসন্ধান করিতে গিয়া জগদীশচন্দ্র দেখিয়াছিলেন, প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন পুনঃ পুনঃ সঞ্চালনে অসাড় হইয়া যায়, বিদ্যুৎ-তরঙ্গের বার বার আঘাতে লৌহচূর্ণও সেইপ্রকারে অসাড় হইয়া পড়ে। তাই তাহার ভিতর দিয়া তখন বিদ্যুৎ-পরিচালনা হয় না। আবার কাজ পাইতে হইলে, সেই অসাড় ধাতুচূর্ণকে ঝাঁকুনি দিয়া উত্তেজিত করিতে হয়।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র নিজের এই আবিষ্কারে নিজেই বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং নানা জড়পদার্থের উপর পুনঃ পুনঃ আঘাত-উত্তেজনা দিলে কি ফল হয়, তাহা পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রাণীদেহের যে সকল ক্রিয়া চোখে দেখিয়া, কানে শুনিয়া বা স্পর্শ করিয়া বুঝা যায় না, প্রাণীতত্ত্ববিদ্গণ তাহা বিদ্যুৎ-প্রবাহের দ্বারা বুঝিতে পারেন। জগদীশচন্দ্র ঐপ্রকারে বিদ্যুতের সাহায্য লইয়া জড়ের নানা অবস্থা পরীক্ষা করিতে সুরু করিয়াছিলেন। সজীব প্রাণীর পেশী বা স্নায়ু উত্তেজিত করিলে উত্তেজনাপ্রাপ্ত অংশে অতি মৃদু বিদ্যুতের উৎপত্তি হয়; খুব ভাল তড়িৎবীক্ষণযন্ত্রে সেই বিদ্যুৎ ধরা পড়ে। কিন্তু মৃত প্রাণীর দেহে অবিরাম আঘাত দিলেও তাহাতে বিদ্যুৎ জন্মে না। ধাতু লইয়া পরীক্ষা করায় জগদীশচন্দ্র দেখিয়াছিলেন, সজীব প্রাণীর ন্যায় ধাতুও আঘাতের উত্তেজনায় সাড়া দেয়; তাহারও জীবন মরণ

স্ফূর্ত্তি ও ক্লান্তি আছে। কেবল তাহাই নয়, প্রাণীর পেশী যেমন ঠাণ্ডা পাইলে নিস্তেজ হয়, বিষে মৃতপ্রায় হয় এবং ঔষধে পুনর্জ্জীবিত হয়, ধাতুপিণ্ডেও ঐ-সকল প্রক্রিয়ায় অবিকল একই ফল প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। সজীব মাংস-পেশীতে চিম্‌টি কাটিলে তাহা বেদনায় উত্তেজিত হয় এবং সঙ্গে-সঙ্গে সেখানে বিদ্যুতের উৎপত্তি হয়। ধাতুপিণ্ডে চিম্‌টি কাটিয়া জগদীশচন্দ্র ঠিক্ সেইপ্রকার বেদনা-জ্ঞাপক বিদ্যুতের উৎপত্তি দেখিয়াছিলেন। মাংসপেশীতে পুনঃ পুনঃ আঘাত দিলে তাহা অসাড় হইয়া যায়, কিন্তু বিশ্রামের অবকাশ দিলে তাহাতেই সাড়া দিবার শক্তি আবার ফিরিয়া আসে। অবিরাম আঘাত দিয়া জগদীশচন্দ্র ধাতুপিণ্ডেও ঠিক ঐপ্রকার অসাড়তা দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং বিশ্রামের অবকাশ দিয়া তাহাকেই আবার সসাড় করিয়া তুলিয়াছিলেন।

আঘাতে সাড়া দেওয়াই জীবের জীবত্ব বলিয়া যে একটি সংস্কার স্মরণাতীত কাল হইতে বদ্ধমূল ছিল, বসু মহাশয়ের পূর্ব্বোক্ত আবিষ্কারে তাহার উচ্ছেদ হইয়াছিল। সকলে বুঝিয়াছিলেন, অজৈব পদার্থ মাত্রই মৃত নয়।

এই আবিষ্কারের বিবরণ রয়াল সোসাইটি প্রভৃতি বিজ্ঞান-সভায় প্রচারিত হইলে বৈজ্ঞানিকগণ জগদীশচন্দ্রকে কি প্রকারে সম্মানিত করিয়াছিলেন, আমরা পূর্ব্বেই তাহার আভাস দিয়াছি। আর কোনো গবেষণায় হাত না দিয়া তিনি যদি এইখানে সকল গবেষণা হইতে বিরত হইতেন, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত আবিষ্কারটিই জগদীশচন্দ্রের নাম বিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিত। কিন্তু সম্মানলাভ তাঁহার গবেষণার লক্ষ্য ছিল না, প্রকৃতির কার্য্যের মূল রহস্য আবিষ্কার করিয়া সমগ্র সৃষ্টির সহিত পরিচয় লাভ করাই তাঁহার জীবনের সাধনা হইয়াছিল। কাজেই এত সম্মান এত সাধুবাদ তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ধাতুর সহিত সাধারণ সজীব বস্তুর যখন এত নিকট সম্বন্ধ, তখন সাবধানে পরীক্ষা করিতে পারিলে উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনের কার্য্যে নিশ্চয়ই অনেক মিল দেখা যাইবে।

উদ্ভিদের জীবনের কার্য্য পরীক্ষা করিবার জন্য এপর্য্যন্ত জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ অনেক যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন, কিন্তু এই-সকল জগদীশচন্দ্রের নিকটে এত স্থূল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল যে, তিনি নিজেই মনের মত যন্ত্র প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত হইলেন। অল্পদিনের মধ্যে অনেক যন্ত্র প্রস্তুত হইল। এগুলি এত কার্য্যোপযোগী হইল যে, শীতগ্রীষ্মে বা আঘাতের উত্তেজনায় দৈহিক অবস্থার যে অতি সামান্য পরিবর্ত্তন হয়, তাহাও উদ্ভিদ্‌গণ যন্ত্রের লেখনীর সাহায্যে যন্ত্র-সংলগ্ন লিপিফলককে লিখিয়া জানাইতে লাগিল। জগদীশচন্দ্র দেখিলেন, কেবল জীবনমৃত্যু ক্ষয়বৃদ্ধি প্রভৃতি স্থূল ব্যাপারেই যে, প্রাণী ও উদ্ভিদের একতা আছে, তাহা নয়; প্রাণীর জীবনের কার্য্যে যে সকল খুঁটিনাটি ব্যাপার দেখা যায়, সেগুলি উদ্ভিদেও ধরা পড়ে।

চিম্‌টি কাটিলে বা আঘাত দিলে প্রাণীর দেহে বেদনার সঞ্চার হয় এবং তাহার লক্ষণ দেহের আকুঞ্চনে বা বিদ্যুৎ-প্রবাহে প্রকাশ পায়। তাজা ফুলকপির ডাঁটায় চিম্‌টি কাটিয়া জগদীশচন্দ্র অবিকল সেইপ্রকার বেদনা-জ্ঞাপক লক্ষণ তাঁহার যন্ত্রে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তা ছাড়া বিষ, মাদক দ্রব্য, অবসাদক বা উত্তেজক বস্তু প্রাণীদেহে যেপ্রকার ক্রিয়া করে, উদ্ভিদদেহেও যে অবিকল তাহাই করে, জগদীশচন্দ্র ইহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। পরীক্ষা-কালে উদ্ভিদগণ যন্ত্রের লেখনী দিয়া দৈহিক অবস্থার কথা নিজেরাই লিখিয়া দেখাইয়াছিল।

শ্রমসাধ্য কাজ বার বার করিতে থাকিলে খুব বলশালী প্রাণীও অবসন্ন হইয়া পড়ে। তখন তাহার বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। বিশ্রামে অবসাদ দূর হইলে, আবার সে শ্রম করিতে পারে। জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদকেও ঐপ্রকারে পরিশ্রান্ত হইতে দেখিয়াছিলেন এবং বিশ্রামের অবকাশ দিয়া তাহাকে কার্য্যক্ষম করিয়া তুলিয়াছিলেন। যে ঘোড়া গাড়ি টানিতে গিয়া বেশী লাফালাফি করে, সে শীঘ্রই পরিশ্রান্ত হয়; কাজেই তাহার বিশ্রামেরও শীঘ্র প্রয়োজন হয়। লজ্জাবতী গাছে বসুমহাশয় ঐপ্রকার উত্তেজনাশীল প্রাণীর সকল লক্ষণই দেখিতে পাইয়াছেন। সামান্য উত্তেজনায় লজ্জাবতী অধিক সাড়া দিয়া শীঘ্র অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে, অন্ততঃ পনেরো মিনিটকাল বিশ্রামের অবকাশ না দিলে সে পূর্ব্বের স্ফূর্ত্তি ফিরিয়া পায় না।

দেহে আঘাত দিলে আঘাতের সঙ্গে-সঙ্গেই প্রাণীরা বেদনা বুঝিতে পারে না। আঘাত-প্রাপ্তি ও বেদনা-অনুভূতির মধ্যে একএকটু সময়ের ব্যবধান থাকে। উদ্ভিদেও আঘাত-প্রাপ্তি ও বেদনা-অনুভূতির মধ্যে যে একটু অবকাশ আছে তাহাও জগদীশচন্দ্র তাঁহার যন্ত্রের সাহায্যে দেখাইয়াছেন। এমন সূক্ষ্ম-সময়-পরিমাপক যন্ত্র এপর্য্যন্ত কোনো বৈজ্ঞানিকই উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই।

মদ খাইয়া মানুষ যখন মাতাল হয়, তখন তাহার চালচলন কিপ্রকার অদ্ভুত হইয়া দাঁড়ায়, তাহা কখন কখন পথে ঘাটে দেখা যায়। জগদীশচন্দ্র কিছুকাল আলকোহল বাষ্পের মধ্যে রাখিয়া লজ্জাবতী লতাকে উন্মত্ত করাইয়াছিলেন এবং তাহাতে একে একে মাতালের সকল লক্ষণই দেখিতে পাইয়াছিলেন। গাছের হাত পা নাই, বাকশক্তিও নাই; কাজেই লজ্জাবতী ঐ অবস্থায় মাতালের মত টলিতে পারে নাই বা উচ্ছৃঙ্খলভাবে হাসিকান্না দেখাইতে পারে নাই। কিন্তু যন্ত্রে সে নিজে যে-সকল সাড়া লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাতেই মাতালের সকল উচ্ছৃঙ্খলতার লক্ষণ একে একে প্রকাশ পাইয়াছিল। ঠাণ্ডা এবং নির্ম্মল বাতাসের সংস্পর্শে মাতালের নেশা ছুটিয়া যায়। আলকোহলের বাষ্পপ্রয়োগ বন্ধ করিয়া লজ্জাবতীকে নির্ম্মল বাতাসে রাখা হইয়াছিল; ইহাতে সে কিছুকালের মধ্যেই প্রকৃতিস্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কেবল মাদক দ্রব্য নয়; যে দ্রব্য প্রাণীদেহে যে ক্রিয়াটি দেখায়, উদ্ভিদদেহে প্রয়োগ করায় বসুমহাশয় অবিকল সেইক্রিয়াই দেখিতে পাইয়াছিলেন।

এ পর্য্যন্ত জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ প্রাণী ও উদ্ভিদকে দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্ জাতীয় জীব বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছিলেন। তাহাদের জীবনের কার্য্যের মধ্যে যে কোনো ঐক্য আছে তাহা ইঁহাদের মধ্যে কেহই স্বীকার করিতেন না। বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রের এই-সকল আবিষ্কারে এখন পণ্ডিতেরা বুঝিয়াছেন, প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনের কার্য্যে কোনো পার্থক্যই নাই; বিধাতা উভয়কে একই গুণবিশিষ্ট করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। বিচিত্র অবস্থার মধ্যে পড়িয়া সেই আদিম গুণগুলিই বিচিত্ররূপ গ্রহণ করিয়া আমাদের মোহ উৎপাদন করিতেছে।

এগুলি খুবই উচ্চ অঙ্গের কথা। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কার্য্যে কতটা লাগিবে, তাহা চিন্তা করিলে দেখা যায়, এই হিসাবেও আবিষ্কারগুলির মূল্য কম নয়। চিকিৎসার জন্য ঔষধ নির্ণয় করা বড়ই কঠিন কাজ। কোনো পদার্থের রোগ নাশ করিবার শক্তি জানা গেলেও, তাহা মানুষের উপরে হঠাৎ প্রয়োগ করা যায় না। কাজেই অনেক নিরীহ প্রাণীর উপর দিয়া নূতন ঔষধাদির গুণাগুণ পরীক্ষা করিতে হয়। মানুষের সুবিধার জন্য এইপ্রকারে আজকাল যে কত প্রাণীহত্যা করিতে হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। এখন উদ্ভিদের উপরে পরীক্ষা করিয়া ঔষধের গুণাগুণ বিচার করা চলিবে বলিয়া মনে হইতেছে।

জর্ম্মানির প্রধান উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ পেফার্ (Pfeffer) এবং হাবেরলাণ্ড (Haberlandt) সাহেব নানা পরীক্ষায় লজ্জাবতীর ন্যায় উদ্ভিদেও স্নায়ুমণ্ডলীর অস্তিত্ব ধরিতে পারেন নাই। ইঁহারা লজ্জাবতীকে ক্লোরোফরমের বাষ্পে রাখিয়াছিলেন এবং তাহার ডাঁটা পুড়াইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি লজ্জাবতী সাড়া দিতে ছাড়ে নাই। ইহা দেখিয়াই সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, লজ্জাবতীর দেহে স্নায়ুমণ্ডলী নাই; থাকিলে তাহার কার্য্য ক্লোরোফরমের স্পর্শে ও তাপে লোপ পাইয়া যাইত এবং সঙ্গে-সঙ্গে লজ্জাবতীর সাড়া-দেওয়া বন্ধ হইত। আগুনে-পোড়া শাখার ভিতর দিয়া উত্তেজনার চলা-ফেরার কারণ দেখাইতে গিয়া ইঁহারা বলিয়াছিলেন, জলপূর্ণ রবারের নলের একপ্রান্তে চাপ দিলে তাহাতে যেমন সেই চাপ নলের অপরপ্রান্তে গিয়া পৌঁছায়, লজ্জাবতীর দেহের উত্তেজনা ঠিক সেইপ্রকারেই দেহের ভিতরকার জলের সাহায্যে দগ্ধ শাখার ভিতর দিয়াও চলে।

পেফার ও হাবেরলাণ্ডের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া জগদীশচন্দ্র যেসকল পরীক্ষা দেখাইয়াছেন তাহা বড়ই আশ্চর্য্যজনক। তিনি একটি লজ্জাবতী গাছকে চারা অবস্থা হইতে সাবধানে পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। যাহাতে সেটি শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া পুষ্টাঙ্গ হয় তাহার জন্য যখন যে ব্যবস্থা প্রয়োজন তখনি তাহা করা হইত এবং যাহাতে উহার পাতায় বা ডালে কোনো প্রকার আঘাত না লাগে, তাহার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা

লজ্জাবতীর সাড়া লেখা।
সাড়া-লেখ যন্ত্র (Resonant Recorder) উদ্ভিদের মত্তাবস্থা বিষ-প্রয়োগের অবস্থা, স্ফূর্ত্তি ক্লান্তি শীত গরম প্রভৃতির অবস্থা অনুসারে সাড়ার চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়া থাকে। এ যন্ত্র জগদীশ-চন্দ্রেরই উদ্ভাবন।

হইত। হাত-পা বাঁধিয়া যদি কোনো লোককে পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ানো যায়, তাহা হইলে লোকটির দেহ বেশ পুষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহার হাত-পা আড়ষ্ট হইয়া যায়। সযত্নে পালিত লজ্জাবতী গাছটির অবস্থাও কতকটা সেই রকমই হইয়াছিল; দেখিলে গাছটিকে খুবই সুস্থ বলিয়া মনে হইত, কিন্তু মৃদু আঘাত-উত্তেজনায় সাড়া দিতে পারিত না। ইহা দেখাইয়া জগদীশচন্দ্র লজ্জাবতীর স্নায়ুর অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছিলেন। জলই যদি উত্তেজনার বাহক হইত, তবে এই পরীক্ষায় গাছে সাড়ার অভাব হইত না। কাজেই স্বীকার করিতে হয়, দেহস্থ জলের চাপ উত্তেজনার বাহক নয়। লজ্জাবতীর দেহে প্রাণীদেহের ন্যায় স্নায়ুজাল বিস্তৃত আছে, তাহাই অনভ্যাসে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই লজ্জাবতী সাড়া দেয় নাই।

ব্যবহারের অভাবে স্নায়ুমণ্ডলী বিকল হইলে যাহার হাত-পা আড়ষ্ট হইয়া যায়, তাহাকে জোর করিয়া কিছুদিন চলাফেরা করাইলে স্নায়ু প্রকৃতিস্থ হইয়া পড়ে; তখন সে সুস্থ ব্যক্তিরই ন্যায় হাত-পা নাড়িতে পারে। পূর্ব্বোক্ত অসাড় লজ্জাবতীর দেহে উপর্য্যুপরি আঘাত দিয়া এবং সর্ব্বাঙ্গে সেক দিয়া জগদীশচন্দ্র তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় সে সুস্থ গাছের মতই সাড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

স্নায়বিক শক্তি সকল প্রাণীর সমান নয়। মানুষের মধ্যেই ইহার অনেক বৈচিত্র্য দেখা যায়। এমন লোক আছেন, যাঁহারা স্লেটের উপরে পেন্সিল-ঘষার শব্দ সহ্য করিতে পারেন না। বালি দিয়া বাসন মাজার সময়ে যে শব্দ হয়, তাহাও অনেকের স্নায়ুমণ্ডলীকে পীড়া দেয়। উদ্ভিদ-জাতির মধ্যে জগদীশচন্দ্র স্নায়বিক শক্তির এই বৈচিত্র্যও আবিষ্কার করিয়াছেন। কতকগুলি গাছ খুব উত্তেজনার মধ্যেও তাহাদের স্নায়ুকে সবল রাখিতে পারে; আবার কতকগুলি দুর্ব্বল মানুষের ন্যায় অল্প উত্তেজনাতেই অধীর হইয়া পড়ে।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর এই ঐক্য সকলকেই বিস্মিত করিয়াছে। প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌গণ বৃক্ষকে স্নায়ুবর্জ্জিত মনে করিয়া যে, সত্যই ভুল করিয়া আসিতেছিলেন, এখন পণ্ডিতমণ্ডলী তাহা স্বীকার করিতেছেন।

গাছের ডাল পোড়াইলে এবং তাহার গায়ে ক্লোরোফর্মের বাষ্প লাগাইলেও, শাখা দিয়া যে উত্তেজনার চলাচল লক্ষ্য করা হইয়াছিল, তাহা স্নায়বিক উত্তেজনারই ফল। উদ্ভিদের স্নায়ুজাল দেহের গভীর প্রদেশে বিস্তৃত থাকে, তাই বাহিরে প্রযুক্ত তাপাদি সহসা ভিতরে প্রবেশ করিয়া স্নায়ুমণ্ডলীকে উত্তেজিত করিতে পারে না।

স্নায়ুর সাহায্যে উত্তেজনা প্রবাহিত হইতে একটু সময় লয়। মানব দেহের স্নায়বিক উত্তেজনা প্রতি সেকেণ্ডে একশত দশ ফুট করিয়া চলে। কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর স্নায়ু এমন অপূর্ণ যে, কোনো উত্তেজনাকে তাহা সেকেণ্ডে দুই ইঞ্চির অধিক দূরে লইয়া যাইতে পারে না। উদ্ভিদের স্নায়ু থাকিলে তাহার উত্তেজনা-পরিবাহনের নির্দ্দিষ্ট বেগ থাকারও সম্ভাবনা। জগদীশচন্দ্র নানাজাতীয় উদ্ভিদের স্নায়বিক বেগও আবিষ্কার করিয়াছেন। সতেজ

লজ্জাবতী-লতার স্নায়ু সেকেণ্ডে চৌদ্দ ইঞ্চি বেগে উত্তেজনা বহন করিতে পারে। গাছ যখন পরিশ্রান্ত হইয়া দুর্ব্বল থাকে, তখন এই বেগের পরিমাণ কমিয়া আসে, বিশ্রাম লাভ করিলে সেই বেগই বৃদ্ধি পায়। অনেক নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর তুলনায় লজ্জাবতীর স্নায়ু অধিকতর সবল ও কার্য্যক্ষম।

আমাদের ঘরকন্নার দিক দিয়া দেখিলে, পূর্ব্বোক্ত আবিষ্কার হইতে অনেক উপকার হইবে বলিয়া মনে হয়। মানুষের স্নায়ুমণ্ডলী কিপ্রকারে বিকল হইয়া পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগের উৎপত্তি করে, তাহা আমাদের ঠিক জানা নাই, কাজেই এই-সকল ব্যাধির চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান নিতান্ত অল্প। তার উপরে উচ্চশ্রেণীর প্রাণীর স্নায়ুমণ্ডলী এত জটিল যে, সেই জটিলতা ভেদ করিয়া স্নায়বিক বিকৃতির কারণ নির্ণয় করা অসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু উদ্ভিদের স্নায়ুজাল একেবারে জটিলতা-বর্জ্জিত। সুতরাং উদ্ভিদের স্নায়ু কিপ্রকারে বিকল হয় এবং সেই বিকলতাকে কি ঔষধ প্রয়োগ করিয়া দূর করা যায়, তাহা নির্ণয় করা কঠিন নয়। মানব-দেহের স্নায়বিক পীড়ার চিকিৎসা-প্রণালী গাছের চিকিৎসার দ্বারা আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া খুবই আশা হইতেছে।

প্রাণীর হৃদপিণ্ড একটি অদ্ভুত যন্ত্র। ভ্রূণ-অবস্থা হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইহার কার্য্যের বিরাম নাই। ইহাকে চালাইবার জন্য চেষ্টার প্রয়োজন হয় না, তালে তালে আপনিই চলিয়া প্রাণীর সর্ব্বাঙ্গে নিয়ত রক্তের প্রবাহ বহাইতে থাকে। শারীর-বিজ্ঞানের এত উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও হৃদ্‌যন্ত্রের কার্য্যের অনেক ব্যাপার আজও রহস্যাবৃত হইয়া রহিয়াছে। সেইসকল রহস্যের মীমাংসা করিতে গেলে প্রাণীর হৃদ্‌পিণ্ডের ন্যায় জটিল যন্ত্রকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া পরীক্ষা করিলে চলে না; সরল যন্ত্রের কাজ বুঝিয়া ক্রমে জটিলতার দিকে অগ্রসর হইতে পারিলেই শুভফল পাওয়া যায়।

প্রাণীর হৃদ্‌পিণ্ডের ন্যায় কোনো যন্ত্র যে উদ্ভিদ্-দেহে আছে, এপর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা তাহা জানিতেন না। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র "বনচাঁড়াল" গাছে হৃদ্‌পিণ্ডের অনুরূপ একটি অংশ আবিষ্কার করিয়াছেন, এবং তাহা যে হৃদ্‌যন্ত্রের মতই তালে তালে চলে তাহা দেখাইয়াছেন। বনচাঁড়ালের পাতার উঠানামার কথা উদ্ভিদ্‌বিদ্‌গণ জানিতেন, কিন্তু উপযুক্ত যন্ত্রের অভাবে কেন এই গাছের পাতা আপনা-আপনি নড়াচড়া করে তাহা নির্ণয় করা হয় নাই। জগদীশচন্দ্র ইহাকে তাঁহার স্বহস্ত-নির্ম্মিত যন্ত্রে ফেলিয়া এবং তাহার হাতে কলম গুঁজিয়া দিয়া, নিজের বৃত্তান্ত নিজেকে দিয়াই লিখাইয়া লইয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, বনচাঁড়ালের পাতার নৃত্য এবং প্রাণীর হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন একই ব্যাপার।

হৃদ্‌যন্ত্রের উপরে ঈথর নামক রাসায়নিক দ্রব্যটির অনেক কাজ দেখা যায়। অল্প ঈথরে যন্ত্রের ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়; অধিক প্রয়োগ করিলে অবসাদ আসে এবং শেষে ক্রিয়া লোপ পাইয়া যায়। সুস্থ বনচাঁড়ালকে কাচের আবরণের মধ্যে রাখিয়া বসু মহাশয় পরীক্ষা করিয়াছিলেন। অল্প ঈথর বাষ্প পাত্রে প্রবিষ্ট হইবামাত্র উহার পাতা জোরে জোরে উঠানামা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু বাষ্পের পরিমাণ অধিক হইলে সেরকম জোরে পাতা নড়িতে পারে নাই। অধিক ঈথর-প্রয়োগে যেমন হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া ক্রমে লোপ পাইতে থাকে, গাছটির পাতার নৃত্য সেইরকমে বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল।

প্রাণীর হৃদ্‌যন্ত্রে ক্লোরোফরমের যেসকল কাজ দেখা যায়—বনচাঁড়ালে জগদীশচন্দ্র অবিকল সেইসকল দেখিতে পাইয়াছেন। বেশী ক্লোরোফর্ম দিবামাত্র পাতার স্পন্দন বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল; তার পরে আধ ঘণ্টাকাল নানা প্রকারে সেবাশুশ্রূষা করায়, তাহাতে মৃদু স্পন্দন সুরু হইয়াছিল।

প্রাণীর ন্যায় উদ্ভিদেরও হৃদ্‌যন্ত্র আছে কিনা, এই প্রশ্নের মীমাংসায় যে, জীববিজ্ঞানের খুব গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে একথা আমরা মনে করি না। উদ্ভিদের দেহে হৃদ্‌যন্ত্রের ন্যায় কোনো অংশে স্বতঃস্পন্দন ধরা পড়ায়, প্রাণীর স্বতঃ-স্পন্দনের যে ব্যাখান পাওয়া যাইতেছে, তাহাই উল্লেখ-যোগ্য। প্রাণীর হৃদ্‌পিণ্ড কেন আপনা হইতে স্পন্দিত হয়, জিজ্ঞাসা করিলে প্রাণীবিদ্‌গণকে নিরুত্তর থাকিতে দেখা যায়। খুব চাপাচাপি করিয়া ধরিলে তাঁহারা বলেন, দেহের ভিতর হইতে শক্তি সঞ্চয় করিয়া যন্ত্র স্বতঃস্পন্দন দেখায়। সেই সঞ্চিত শক্তিই "জীবনী শক্তি"। বলা বাহুল্য এই

বন-চাঁড়াল গাছের পত্রস্পন্দন ও প্রাণীর হৃৎস্পন্দনের সমতা পরীক্ষা। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র যন্ত্রের পরীক্ষায় প্রমাণিত করিয়া দেখাইয়াছেন যে বন-চাঁড়াল গাছে বিষ গ্যাস প্রভৃতি প্রয়োগ করিলে তাহার যেরূপ পত্রস্পন্দন হয় উহা সম-অবস্থায় প্রাণীর হৃৎস্পন্দনের অবিকল অনুরূপ।

ব্যাখ্যানকে কখনই সং ব্যাখ্যান বলা যায় না। জগদীশচন্দ্র ইহা গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি বলেন, বাহিরের শক্তি দিয়া যে স্পন্দনকে রুদ্ধ করা যায় এবং চালানো যায়, তাহা মূলে ভিতরকার শক্তির কাজ হইতে পারে না। তাঁহার মতে প্রাণী এবং উদ্ভিদের স্বতঃস্পন্দন বাহিরের শক্তিরই কার্য্য। বাহিরে শক্তির অভাব নাই,—জল বাতাস আলোক বিদ্যুৎ সকলি শক্তিময়। ঈথর এবং ক্লোরোফরম্ প্রভৃতি দ্রব্যের শক্তি যেমন বাহির হইতে আসিয়া দেহের উপরে কার্য্য দেখায়, সেইপ্রকার জলবায়ু ও তাপালোক প্রভৃতির শক্তিও নিয়ত দেহের উপরে পড়িয়া স্বতঃস্পন্দন সুরু করে। জগদীশচন্দ্রের সিদ্ধান্তটি মোটামুটি এই যে, জীবনধারণের জন্য যতটুকু শক্তির প্রয়োজন উদ্ভিদ্‌গণ তাহার চেয়ে অনেক অধিক শক্তি বাহির হইতে সংগ্রহ করিয়া নিজেদের দেহে সঞ্চিত রাখিতে চায়, কিন্তু এইপ্রকার শক্তিকে সংযত করিয়া রাখার ব্যবস্থা তাহাদের দেহে নাই। কাজেই অতিরিক্ত শক্তি উদ্ভিদেরা পাতার উঠানামা প্রভৃতি স্বতঃস্পন্দনে দেখাইয়া ব্যয় করে।

উদ্ভিদ্ কিপ্রকারে বৃদ্ধি পায়, ইহাও বিজ্ঞানের একটা প্রকাণ্ড সমস্যা। পুঁথিপত্রে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে মনের খট্‌কা মিটে না। পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের সাহায্যে উদ্ভিদের বৃদ্ধিরও ব্যাখ্যান পাওয়া গিয়াছে।

জগদীশচন্দ্রের নিজের পরিকল্পিত "ক্রেস্কোগ্রাফ" নামক যন্ত্রটি অতি আশ্চর্য্যজনক। ইহার সাহায্যে তিনি উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানের অসাধ্য সাধন করিতে বসিয়াছেন। কোনো গাছ প্রতিদিন কতখানি করিয়া বাড়িল, তাহা সপ্তাহ বা মাসের গড় হিসাব করিয়া আমরা বলিতে পারি। বলা বাহুল্য এইপ্রকার হিসাব কখনই সূক্ষ্ম হয় না, একটা মোটামুটি আন্দাজ পাওয়া যায় মাত্র। পূর্ব্বোক্ত যন্ত্রটি দিয়া গাছ প্রতি-সেকেণ্ডে কতখানি করিয়া বাড়িতেছে তাহা হাজার লোককে একসঙ্গে দেখানো চলে। যন্ত্রটি কিপ্রকার আশ্চর্য্যজনক একবার ভাবিয়া দেখুন। কোন্ সার কোন্ গাছের বৃদ্ধির অনুকূল, স্থির করিতে হইলে কৃষিতত্ত্ববিদ্‌কে মাসের পর মাস পরীক্ষা করিতে হয়। কিন্তু বসুমহাশয়ের এই যন্ত্রটির সাহায্যে তাহা কয়েক সেকেণ্ডে স্থির হইয়া যায়।

বৃদ্ধি রোধ হইলে জীবদেহে ক্ষয়ের সুরু হয় এবং ক্ষয়ের পরিমাণ অধিক হইলে মৃত্যু দেখা দেয়। ইহাই মৃত্যুর নিয়ম। প্রাণীর মৃত্যুকাল নির্ণয় করা কঠিন নয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার সর্ব্বাঙ্গে আক্ষেপ দেখা যায় এবং তারপরে সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও দেহযন্ত্র নিশ্চল হইয়া আসে। ইহাই প্রাণীর মৃত্যু। কিন্তু মৃত্যু উদ্ভিদ্‌কে এমন ধীরে ধীরে আসিয়া আক্রমণ করে যে, ঠিক কোন্ সময়ে তাহার মৃত্যু হইল, তাহা ঠিক্ বলা যায় না। পাতা বা ডালের অবস্থা দেখিয়া মৃত্যু ধরা যায় না; মৃত্যুর পরেও অনেকদিন পর্য্যন্ত শাখাপল্লবকে তাজা দেখিতে পাওয়া যায়। জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের মৃত্যুলক্ষণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া, তাহাতে প্রাণীর মৃত্যুজ্ঞাপক প্রত্যেক লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে তিনি যেসকল পরীক্ষা দেখাইয়াছেন, তাহা অতি বিস্ময়কর। প্রথমে লজ্জাবতী লতাকে লইয়াই পরীক্ষা চলিয়াছিল। লজ্জাবতীর পাতা যন্ত্রের লেখনীর সহিত সূক্ষ্মসূতা দিয়া বাঁধা ছিল। পাতা হেলিয়া-দুলিয়া উঠিয়া-নামিয়া লেখনীর সাহায্যে নিজের অবস্থার কথা নিজেই ঢেউ-খেলানো রেখা টানিয়া ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইহার ধারে লজ্জাবতীর গায়ে তাপ দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ঠাণ্ডায় গাছে ভাল সাড়া পাওয়া যায়

না; কাজেই যখন একটু একটু করিয়া তাপ বাড়ানো হইয়াছিল, তখন লজ্জাবতী বেশ জোরে সাড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তখনো সে আসন্ন মৃত্যুর কথা বুঝিতে পারে নাই। তাপের পরিমাণ ত্রিশ ডিগ্রি হইতে ক্রমে চল্লিশ এবং তারপরে পঞ্চাশ ও পঞ্চান্ন হইয়া দাঁড়াইলে যন্ত্রের লিপিফলকে সাড়ার পরিমাণ কমিয়া আসিতে লাগিল। বোধ হয় এই সময়েই লজ্জাবতী বুঝিয়াছিল, অবস্থা ভাল নয়। তারপরে উষ্ণতার পরিমাণ সেণ্টিগ্রেডের ষাইট্ ডিগ্রি হইবামাত্র, সেই তাপক্লিষ্ট লজ্জাবতী হঠাৎ একটা প্রবল সাড়া দিয়া নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়াছিল।

এই পরীক্ষা দেখিলে মৃতপ্রায় লজ্জাবতীর শেষ প্রবল সাড়াটিকে মৃত্যুর আক্ষেপ (spasm) ব্যতীত আর কিছু বলা যায় কি? একবার নয় বারবার পরীক্ষা করিয়া জগদীশচন্দ্র ঠিক্ ষাইট্ ডিগ্রি উষ্ণতায় সুস্থ উদ্ভিদ্‌মাত্রকেই মরিতে দেখিয়াছেন। তাজা পাতা পোড়াইতে গেলে তাহা আকুঞ্চিত হইয়া নিজেই নড়াচড়া করে। কেবল তাপই এই আকুঞ্চনের একমাত্র কারণ নয়, পাতার মৃত্যু-যন্ত্রণার আক্ষেপও ইহার অন্যতম কারণ। উদ্ভিদের এইপ্রকার করুণা-উদ্দীপক মৃত্যুর বিষয় যে শীঘ্র আবিষ্কৃত হইবে, কোনো বৈজ্ঞানিক কিছুদিন পূর্ব্বেও তাহা কল্পনা করিতে পারেন নাই।

একই বোঁটায় অনেক সময়ে বিচিত্র রঙের ফুল ফুটিয়া থাকিতে দেখা যায়। এই-সকল ফুলের বর্ণ দিনে দিনে পরিবর্ত্তিত হয়। পাতাবাহার গাছে দিনে দিনে কত বিচিত্র রঙের ছিটাফোঁটা প্রকাশ পায়। আচার্য্য বসু মহাশয় এগুলির উৎপত্তি-প্রসঙ্গে যে সকল কথা বলেন, তাহাও বিস্ময়কর। তাঁহার মতে পুষ্পপত্রের ঐ বর্ণ-বৈচিত্র্য তাহাদের মৃত্যুলক্ষণ। পাতা ও ফুলের দেহের বিশেষ বিশেষ স্থান যখন প্রাণহীন হয়, তখনি সেইসকল স্থানে বিচিত্র বর্ণ প্রকাশ পায়। উদ্ভিদের যে-সৌন্দর্য্যকে আমরা এত আদর করি, তাহা মৃত্যুর বিবর্ণতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

সহ্য-গুণ সকলের সমান নয়। যুবক ও সবল ব্যক্তি যে-পীড়ার যন্ত্রণা সহ্য করিয়া আরোগ্যলাভ করে, তাহাতেই বালক বৃদ্ধ এবং দুর্ব্বল ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। প্রাণীর এই ধর্ম্মটিও জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদে দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি সদ্য-অঙ্কুরিত গাছে তাপ-প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছিলেন, তাহার মৃত্যুর জন্য তাপের পরিমাণ ষাইট্ ডিগ্রি পর্য্যন্ত বাড়াইতে হয় নাই। অল্পতাপেই তাহার মৃত্যু হইয়াছিল, —এ যেন দুর্ব্বল শিশুর মৃত্যু। সবল ও সুস্থ গাছকে তিনি বিদ্যুতের প্রবাহ দ্বারা প্রথমে দুর্ব্বল করিয়া লইয়াছিলেন এবং পরে তাহাতে তাপ দিয়াছিলেন। দুর্ব্বল গাছ সাঁইত্রিশ ডিগ্রি উষ্ণতায় মরিয়া গিয়াছিল। তারপরে তুঁতের জল দিয়া একটি গাছকে অসুস্থ করাইয়া তাহাতে তাপ দেওয়া হইয়াছিল; বিয়াল্লিশ ডিগ্রিতেই সে মৃত্যু-লক্ষণ দেখাইয়াছিল।

এপর্য্যন্ত যে-সকল আবিষ্কারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল, তাহার কথা আলোচনা করিলে জগদীশচন্দ্রের চিন্তার ধারা কোন্ পথে চলিয়া গবেষণাকে সার্থক করিয়াছে, পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। জগৎ যতই বিচিত্র হউক না কেন, তাহার অণু-পরমাণু যে একই মহাপ্রাণে প্রাণবান হইয়া আছে, তাহা জগদীশচন্দ্র এই ভারতের অতি-প্রাচীন ঋষিবাক্য হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহাতে বিশ্বাস করিতেন। এইজন্যই তিনি সজীব-নির্জ্জীব ও প্রাণী-উদ্ভিদের বাহ্য অনৈক্যে আস্থা স্থাপন না করিয়া, অন্তরের কথা জানিবার জন্য সকলেরই কাছে উপস্থিত হইতে সাহসী হইয়াছিলেন। কেহ কোনো কথা গোপন করে নাই; সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিল,—"আমরা সবাই এক"। এখনকার বৈজ্ঞানিক জাতিভেদের দিনে সত্যের সন্ধানে জড় প্রাণী ও উদ্ভিদের দ্বারস্থ হইয়া জগদীশচন্দ্র যে সাহসের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত পুরস্কারই তিনি লাভ করিয়াছেন।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

— —

মৌন

এপ্রেম করিয়া লীন অন্তর-শয়নে
আমি চেয়ে রব শুধু নীরব নয়নে;
বীণার রাগিণী যথা বচন-অতীত
তন্ত্রীর মর্ম্মের মাঝে রহে তিরোহিত,
যন্ত্রী যাদুকর তার যত দিনে আসি
মন্ত্রস্পর্শে নাহি তোলে মূর্চ্ছনা বিকাশি।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

পঞ্চশস্য

যুদ্ধে বিষাক্ত গ্যাসের প্রতিকার—

জার্ম্মানরা বিষাক্ত গ্যাস ছাড়িয়া শত্রুসৈন্যকে কাবু করিবার মতলব করিয়াছিল। অমনি ইংরেজ ও ফরাসী বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিকেরা মিলিয়া গ্যাসের বিষ ব্যর্থ করিবার ফন্দি উদ্ভাবনে লাগিয়া গেল—ফলে গ্যাস-প্রতিরোধক নানাবিধ মুখোস তৈয়ারি হইল। ক্লোরিন গ্যাস নিশ্বাসে মিশিলে দম বন্ধ হয়; ক্লোরিন-প্রতিকারের সহজ উপায় সৈন্যরাই প্রথম উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছিল—এক খানা ভিজে তোয়ালে মাথায় জড়াইয়া তাহাতে নাক-মুখ ঢাকিয়া তাহারা ক্লোরিনের আক্রমণ ব্যর্থ করিত। পরে অক্সিজেন-জনক মুখোস তৈয়ারি হইল। লা নাতিয়ুর্ (La Nature) নামক

বিষাক্ত গ্যাসের প্রতিরোধক ইংরেজী মুখোস। ইহা বিশেষ কার্য্যকর হয় নাই।
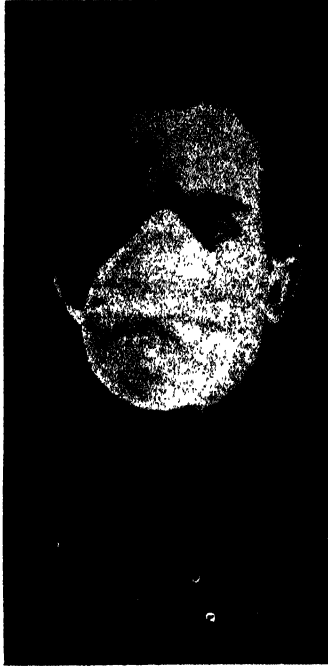
ফরাসী কাগজে তাহার একটি বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছে। একজন ডাক্তার বলেন—সকল বৈজ্ঞানিক এই যুদ্ধে হত্যাকর্ম্মে দক্ষতা দেখাইবার চেষ্টায় ব্যস্ত, ডাক্তারেরা শুধু রক্ষাকর্ম্মে নিযুক্ত আছেন। জার্ম্মান বৈজ্ঞানিকগণ যখন বিজ্ঞানের কর্ম্মশালাকে সয়তানের কারখানা করিয়া বিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্রকে শত্রুবধে লেলাইয়া দিলেন, তখন তাহার প্রতিকারের ভার পড়িল ডাক্তারদের উপর। ইংরেজরা গ্যাসপ্রতিরোধের জন্য প্রথমে জালি কাপড়ে তূলোর গদি করিয়া নাক ও মুখ ঢাকিবার ব্যবস্থা করেন; কিন্তু ইহা দুই কারণে নিষ্ফল প্রমাণিত হইল —(১) বিষাক্ত গ্যাস শোষণ করিবার বস্তু ও ক্ষেত্রের অল্পতা ও (২) তূলা ভিজিয়া গেলে গদি নাক ও মুখের উপর চাপিয়া বসিয়া নিশ্বাস বন্ধ করিয়া তুলিত। ঠেকিয়া শিখিয়া ফরাসীরা যে মুখোস তৈয়ারি করিলেন তাহা যাহাতে নাক ও মুখের উপর চাপিয়া ন' বসে এজন্য কলাই-করা লোহার তারের কাঠামোর মধ্যে তূলার গদি ভরিয়া তৈয়ার করা হইল। মুখের উপর একটা সাদা মুখোস শত্রুপক্ষের গোলন্দাজদের লক্ষ্য করিবার সুবিধা করিয়া দিতে পারে ভাবিয়া মুখোসের রং খাকী করা হইয়াছে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে মুখোসের মধ্যেকার তূলা শুকনা থাকিলে গ্যাস শীঘ্রই নাকে মুখে ঢুকিয়া কাশাইয়া তোলে; জলে ভিজা থাকিলে দু তিন মিনিট দেরী হয়; হাজার ভাগ জলে এক ভাগ হাইপোসালফাইট সোডা গুলিয়া সেই দ্রবে তূলা ভিজাইলে চার পাঁচ মিনিট বিষাক্ত গ্যাস প্রতিরোধ করা চলে; কিন্তু শতকরা ৫ ভাগ হিসাবে মিশাইলে অনেকক্ষণ প্রতিরোধ করা যায়। প্রত্যেক সৈন্যের মুখে ঐরূপ একটি মুখোস ও সঙ্গে আধা আধি মাপের সোডা-গোলা জলের একটা করিয়া হলদে কাচের বোতল থাকে, দরকার-মত তাহারা জল মিশাইয়া সোডা-দ্রব পাতলা করিয়া লয়। এইরূপ মুখোস আনাড়িতেও আধ ঘণ্টায় একটা গড়িতে পারে—এমনি ইহা সহজ। খরচ পড়ে এক আনা আন্দাজ।

* *
*

যুদ্ধখাতের কবি-শেখর—

তেওদোর বত্রেল্ একজন ছড়া রচনায় ওস্তাদ। তাঁহার ছড়া শুনিয়া ফরাসী সৈন্যেরা নাকি একেবারে ক্ষেপিয়া উঠে, তাহাদের মাথায় খুন চাপে। এজন্য ফরাসী সমর-সচিব মিলের‍্যাঁ তাঁহাকে যুদ্ধখাতের কবি-শেখর উপাধি দিয়া সৈন্যদিগকে উত্তেজিত করিবার কাজে লাগাইয়াছেন। বত্রেল সৈন্যদের ব্যারাকে, সৈন্যবাহী রেলগাড়ীতে ও যুদ্ধখাতের মধ্যে ছুটাছুটি করিয়া ছড়া আওড়াইয়া গাহিয়া সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন। ফরাসীরা ইহাকে কামান প্রভৃতি যুদ্ধ-সরঞ্জামের ন্যায়ই যুদ্ধের অঙ্গ বলিয়াই মনে করিতেছেন।

* *
*

ফরাসীর ও ইংরেজের উদ্ভাবিত নানাপ্রকারের যুদ্ধ-মুখোস।
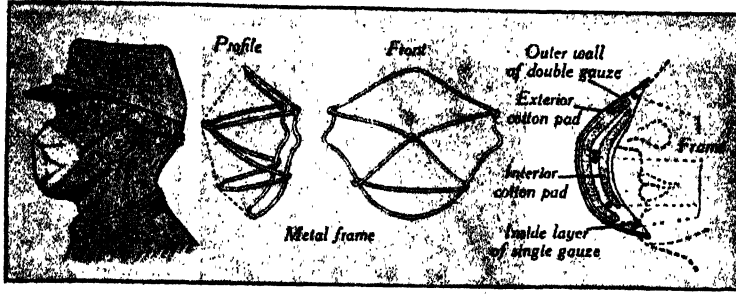
ফরাসী যুদ্ধ মুখোসের গঠন-কৌশল।

মুসলমানী শিল্পে পৌত্তলিকতা—

মুসলমানের ধর্ম্ম পৌত্তলিকতার বিরোধী। যখন আরবদেশ ঘোরতর কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার মধ্যে নিমজ্জিত থাকিয়া অন্ধ হইয়া ছিল, তখন মহাপুরুষ মহম্মদ ঐ অবস্থার প্রতিবাদ-স্বরূপ মোসলেম ধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহার অনুশাসনের মধ্যে একটি এই, যে, পরিমিত সৃষ্ট সামগ্রীর কেহ পূজা করিতে পারিবে না। য়িহুদি ধর্ম্মের প্রতিবাদী খ্রীষ্টেরও ধর্ম্ম। কিন্তু খ্রীষ্ট আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন বলিয়া খ্রীষ্টিয়ানেরা তাঁহাকেও ঈশ্বরের প্রায় সমকক্ষ করিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করেন। মহম্মদ ইহা দেখিয়াই আপনাকে কেবলমাত্র ঈশ্বরের প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত সাধারণ লোক বলিয়া প্রচার করিয়া মুসলমানদিগের পৌত্তলিকতায় প্রত্যাবর্ত্তনের পথ রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। মুসলমানী শিল্পে মানুষ পশু পক্ষী প্রভৃতির আকৃতি চিত্র করা পর্য্যন্ত নিষেধ। কিন্তু মানুষের মন ফাঁকি দিতে পারিলে ছাড়ে না; নিরন্তর ভাবনাচিন্তার কষ্ট স্বীকার না করিয়া বাঁধা পথে নিশ্চিন্ত হইয়া চলিতে পাইলেই সে আরাম অনুভব করে। তাই ক্রমশঃ মুসলমানদের কাছে মহম্মদ প্রায় ভগবানের অবতার হইয়া উঠিয়াছেন; তাঁহার বাক্য পবিত্র, তাঁহার দেহ পবিত্র। তাঁহার দাড়ির একএকগাছি চুল যত্ন করিয়া বড় বড় মসজিদে রাখা হয়, এবং যে মসজিদে মহম্মদের কোনো সামগ্রী থাকে তাহা মহাতীর্থ মনে করা হয়। কিন্তু মুসলমানেরা মহম্মদের অনুশাসন লঙ্ঘন করিয়া যে সৃষ্ট পদার্থের অনুকরণ শিল্পে করিয়াছে তাহার প্রমাণ মিশর, মেসোপটেমিয় এশিয়া মাইনর, স্পেন প্রভৃতি স্থানে যথেষ্টই পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষেও মানুষের জীব- জন্তুর ফুলফলের প্রতিকৃতি ছবিতে ও মূর্ত্তিতে মুসলমানশিল্পী গঠন করিতে বিরত থাকে নাই। সম্রাট জাহাঙ্গীর চিতোরের রাণা অমরসিংহ ও তাঁহার পুত্রের মর্ম্মরমূর্ত্তি গঠন করিয়া নিজের ঘরের জানলার তলে খাড়া করাইয়া দিয়াছিলেন; আগ্রার কেল্লার ফটকের উপর দুজন স্পষ্টবক্তা নিহত রাজার হাতীচড়া মূর্ত্তি স্থাপন করাইয়াছিলেন; ফতেপুর সিক্রিতেও ফটকের ধারে মাহুত-সওয়ারী হাতীর মূর্ত্তি আছে। নাগপুরে একটি মুসলমানী মহিলার কবরের উপর তাঁহার বেণীর একটি সুন্দর প্রতিকৃতি পাথরে খোদাই করা আছে। শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ইহার চিত্র মডার্ণ রিভিউ পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন।
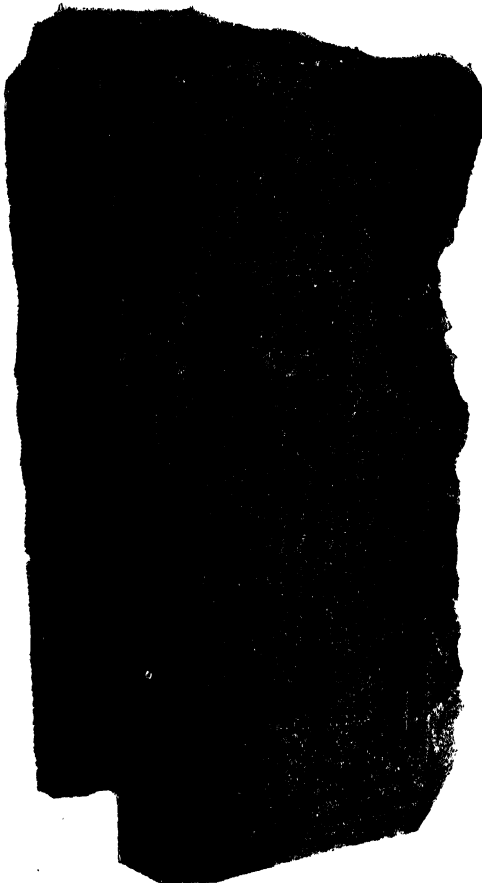
মৃত সুন্দরীর সুন্দর কবরী কবর-ফলকে।

* *
*

ভাস্কর্য্য শিল্পে যুদ্ধ—

শিল্পের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি। যুদ্ধের ন্যায় বীভৎস কুৎসিত ব্যাপারও কিন্তু শিল্পীদের সৃজনী শক্তি কালে কালে উদ্বোধিত করিয়া আসিয়াছে। সম্প্রতি এই মহাসমরের দিনে আমেরিকার অনেকগুলি বিশিষ্ট লোক নবীন শিল্পীদের উৎসাহিত করিবার জন্য বারোটি পুরস্কার ঘোষণা করেন; প্রতিযোগিতার বিষয় নির্দ্দিষ্ট ছিল—যুদ্ধ। ১২৩ জন শিল্পী যুদ্ধের ভাস্কর্য্য মূর্ত্তি গঠন করিয়া প্রেরণ করিয়াছিল। অতগুলি নমুনার মধ্যে মাত্র ৫।৬টি মূর্ত্তিতে যুদ্ধের গৌরব মহিমা আত্মত্যাগ সৎসাহস প্রভৃতি গুণ প্রদর্শিত হইয়াছে; অধিকাংশ শিল্পীর কাছেই যুদ্ধ ভয়ানক অত্যাচার শোক ধ্বংস অমানুষ ব্যবহারের ব্যাপাররূপেই প্রতিভাত হইয়াছে। একটি মূর্ত্তিতে যুদ্ধদানব সভ্যতার টুঁটি টিপিয়া মারিতেছে; একটিতে পুতনা রাক্ষসী একটি শীর্ণ শিশুকে স্তন দান করিতেছে; একটিতে একটা শকুনী আহত সৈনিকের উপর আসিয়া পড়িয়াছে; একটিতে বর্ম্মাবৃত দৈত্য একটি সুকুমার তরুণকে রথের চাকায় পিষিয়া চলিয়াছে; একটিতে, মাত্র একটি সওয়ারহীন ক্লান্ত আহত ঘোড়া; একটিতে একটা প্রকাণ্ড কঙ্কাল বিনাশে উদ্যত খড়্গ ধরিয়া আছে; একটিতে কঙ্কালরূপী মৃত্যুর ভগ্নরথ টানিয়া ক্লান্ত ঘোড়া স্থাপত্য শিল্প

প্রভৃতি সভ্যতার নিদর্শন ও আবালবৃদ্ধবনিতাকে পদদলিত করিয়া দিয়া চলিয়াছে।

* * *

উড়ো-জাহাজের রাত্রে গৃহাগমন—

উড়ো-জাহাজ রাতকাণা। রাত্রে উড়িতে পারে কিন্তু পথ চিনিয়া ঘরে ফিরিতে পারে না, আনোথা জায়গায় পড়িয়া বেঘোরে মারা পড়ে। ইহা জানিয়াই জার্ম্মানরা বেলজিয়মের বন্দর অষ্টেণ্ড হইতে এমন সময়ে উড়োজাহাজ রওনা করে যে ইংলণ্ডে পৌছিয়া রাত্রি হয়; রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা হইয়া ইংলণ্ডের বুকে শেল মারে, রাতকাণা কামান-গুলো এলোধাপাড়ি গোলা ছুড়িয়া মেঘনাদদের বড় কিছু করিতে পারে না; ইংরেজদের উড়ো-জাহাজ শত্রুর উড়ো-জাহাজকে আক্রমণ
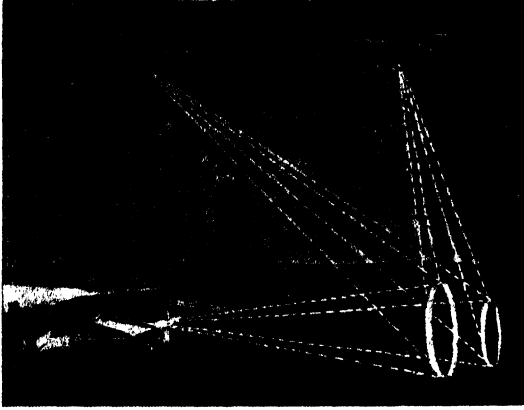
উড়ো-জাহাজের পথপ্রদর্শক আলোকচক্র।
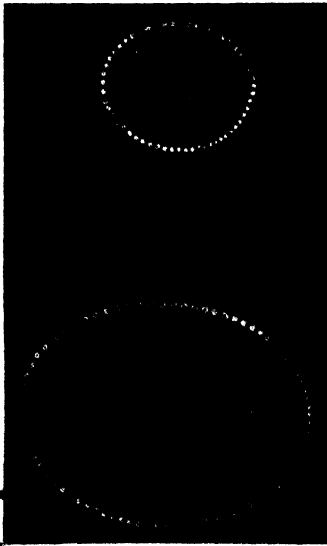
করিয়া খেদাইয়া দিতে পারিত, কিন্তু তাহারাও রাতকাণা, উড়িতে সাহস করে না। অন্ধকারে জঙ্গলকে মাঠের মতন দেখিতে লাগে, সেখানে নামিতে গেলে গাছে আটকাইয়া জাহাজ জখম হয়। এ অসুবিধা জার্ম্মানীকেও ভোগ করিতে হইতেছিল। কিন্তু জার্ম্মানীর উর্ব্বর বুদ্ধি এই মুস্কিলের আসান আবিষ্কার করিয়াছে। এড্গার হয়্নিগ আকাশযানকে রাত্রে পথ দেখাইবার জন্য এক-প্রকার আলোকচক্র প্রস্তুত করিয়াছেন,

আলোকচক্রের ইঙ্গিত—আরো নীচে।

তাহা তাঁহার নামেই পরিচিত হইয়াছে। জাহাজের আড্ডার পশ্চাতে একটি বড় অত্যুজ্জ্বল বিদ্যুৎ-প্রদীপ হইতে রশ্মি বিকীর্ণ হইয়া দূরে মাটি হইতে একটু উঁচুতে বড় আলোকচক্র সৃষ্টি করে। সেই বড় প্রদীপের সম্মুখে অবস্থিত আর একটি ছোট প্রদীপ হইতে রশ্মি বিকীর্ণ হইয়া বড় আলোকচক্রের সম্মুখে
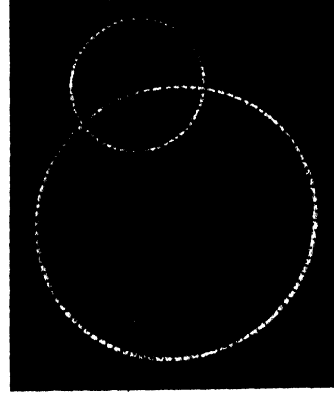
আলোকচক্রের ইঙ্গিত—আরো নীচে।

একটি ছোট আলোকচক্র সৃষ্টি করে; আলোকচক্র দুটি সমকেন্দ্রিক। চক্রের কেন্দ্রের সমসূত্রে দৃষ্টি না থাকিলে চক্রটিকে ঠিক গোল মনে হয় না, একটু চেপটা লাগে। উড়ো মাঝি যতক্ষণ সেই আলোকচক্র চেপ্টা বা উভয়ে কাটাকাটি বা বড়টার মধ্যে ছোটটাকে এক-পেশে দেখিবে ততক্ষণ

আলোকচক্রের ইঙ্গিত—আরো বাঁয়ে।
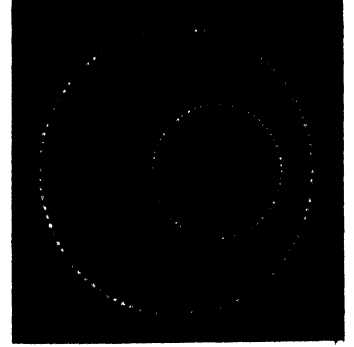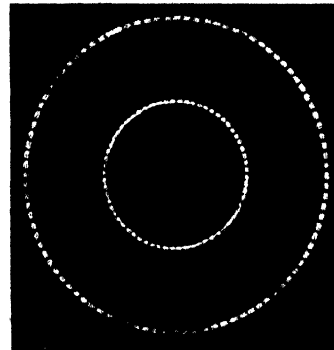
সে বুঝিবে যে আড্ডা-ঘরের দরজায় ঠিক রুজুরুজু সে আসে নাই। যেই দুটি চক্র সমকেন্দ্রিক হইয়া উঠিবে অমনি বুঝিবে যে এইবার নাক-বরাবর সোজা চলিয়া গেলেই ঘরে পৌছিবে। সীপ্লেন বা সমুদ্রচারী উড়ো জাহাজ জলে স্থলে অন্তরীক্ষে লিতে পারে, কিন্তু জল নিস্তরঙ্গ ও বাতাস স্বচ্ছ থাকিলে উপর হইতে কোথায় জল আছে বুঝিতে পারা যায় না। সেক্ষেত্রে উপর হইতে হাল্কা কিছু ফেলিয়া জলে তাহার ভাসা দেখিয়া বা ভারি কিছু ফেলিয়া জল কাঁপাইয়া তুলিয়া জলের অস্তিত্ব ধরিতে হইত। এখন হয়্নিগ আলোকচক্র জলাবতরণেরও পথ নির্দ্দেশ করিতে পারিবে। এই উপায় অল্প খরচে ও সহজে অবলম্বন

আলোকচক্রের ইঙ্গিত—বাস, সোজা যাও।

করা যায় এবং একস্থান হইতে অন্যত্র লইয়া যাওয়াও বিশেষ দুরূহ ব্যাপার নহে। রঙিন ঘূর্ণিত আলোকচক্র দিয়া দূরে খবর সঙ্কেত করিতেও এই উপায় অবলম্বিত হইতে পারিবে বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন।

* *
*

বন্দুক বিদায়—

ব্ল্যাকউড্‌স্ ম্যাগাজিনে একজন ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার অফিসার বর্ত্তমান যুদ্ধে সাধারণ বন্দুকের চিরবিদায়ের সম্ভাবনার সংবাদ দিয়াছেন। যুদ্ধ-ব্যাপারের বিশেষজ্ঞ লর্ড সিডেনহাম তাঁহার মত সমর্থন করিয়াছেন, এবং লণ্ডনের ডেলি মেল কাগজে মিঃ জেম্‌স্ ডান্ ঐ উক্তির প্রতিধ্বনি তুলিয়াছেন। ইঁহারা বলেন যে, সকল জাতি ব্যবস্থার সহিত অবস্থাকে খাপ খাওয়াইবার চেষ্টা করিয়া থাকে, কিন্তু জার্ম্মানী ব্যবস্থাকেই অবস্থার সহিত বদল করিয়া চলে। কল্যকার উপযোগী কাজ আজই করিয়া রাখে। সে যুদ্ধ করিতে নামিয়া দেখিল যে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে কেহ কম নহে; অস্ত্রে শস্ত্রে সে কাহারও অপেক্ষা এতকালের আয়োজন সত্ত্বেও বিশেষ শ্রেষ্ঠ হইতে পারে নাই। তখন সে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে

জুনকে কলের-কামান।

লাগিয়া গেল —গ্যাস ছাড়িয়া পণ্টনকে-পণ্টন কাবু করিতে লাগিল। প্রতিদ্বন্দ্বীরা তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকারের উপায় আবিষ্কার করিল। তখন জার্ম্মানী দেখিল যে বন্দুক কামানের মারই সেরা মার। কিন্তু একজন মানুষ একটা বন্দুক ছুড়িয়া একটা একটা করিয়া যতক্ষণে যতগুল লোক মারিতে পারে বোমা ফেলিয়া ততক্ষণে একজন সৈন্য বোমার শতখণ্ডে শতগুণ শত্রু ধ্বংস করিতে পারে। জর্ম্মানীর প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরেজ ফরাসীও এই তত্ত্ব জানে যখন দেখা গেল তখন জার্ম্মানী গুল্‌তি ধনুকে বাঁটুল ছোড়ার মতন ধনুকে করিয়া বোমা ছুড়িবার ব্যবস্থা করিল। কিন্তু উহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের বুদ্ধিও ত কম নয়, তাহারাও ঐরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া জার্ম্মানীর ফন্দি ফাঁশাইয়া দিল। দুহাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন রোম ও গ্রীসে পাথর ছুড়িবার জন্য যেরূপ ঢেঁকিকল (Catapult or Ballista) ব্যবহৃত হইত, রুশিয়া সেইরূপ এক কল তৈয়ারী করিয়া স্প্রিং-যুক্ত কাঠের হাতলের জোরে বোমা ছুড়িবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। এখন জার্ম্মানী সৈন্যদের বন্দুকের

রুশিয়ার উদ্ভাবিত বোমা ছোড়ার ঢেঁকিকল।

বদলে এক-একটা ছোট ছোট হাল্কা কলের-কামান দিয়াছে; আগে এই কলের-কামান বহিতে ও ছুড়িতে দুজন লোক লাগিত, এখন একজনেই পারিবে। শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হইয়া জনাজাত সৈন্য কামান পাতিয়া কার্ত্তুজের বেল্ট পরাইয়া হাতল ঘুরাইতে থাকিবে এবং অবিশ্রাম গোলাবর্ষণ করিয়া শত্রুকে কাবু করিয়া তুলিবে। এই কলের-কামান বন্দুক অপেক্ষা ভারী। কিন্তু ১৮১৫ সালে ওয়াটার্লু যুদ্ধের সময় ইংরেজ ও ফরাসীর বন্দুক এই রকমই ভারী ছিল; তাহা লইয়া যদি যুদ্ধ সম্ভব হইয়া থাকে তবে এ কামানেও যুদ্ধে বাধা হইবে না বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা মনে করিতেছেন। ইংরেজ গোলন্দাজ জার্ম্মানীর সৈন্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অব্যর্থ-লক্ষ্য; জার্ম্মানী তাহার সৈন্যের এই অক্ষমতা শক্তিশালী অস্ত্রশস্ত্র জোগাইয়া পূরণ করিবার চেষ্টায় আছে। আগে ছিল চকমকিঠোকা বন্দুক; তাহাকে বিদায় দিল ক্যাপওয়ালা বন্দুক; ক্যাপওয়ালা ঠাসা বন্দুককে বিদায় দিল কার্ত্তুজের বন্দুক; তাহাকে বিদায় দিতে আসিয়াছে ছোট হাল্কা কলের-কামান। ২।৩ মাস আগে ৫০ হাজার ছোট কলের-কামান জার্ম্মান সৈন্যকে দেওয়া হইয়াছিল; এতদিনে ঐ সংখ্যা চতুর্গুণ হইয়া থাকিবে। জার্ম্মান সৈন্যেরাও এই কামান খুব পছন্দ করিতেছে। কারণ, ইহা রাইফল বন্দুক অপেক্ষা আকারে ছোট; ইহার অংশ খুলিয়া খণ্ড খণ্ড করা যায় এবং কোনো অংশ খারাপ হইয়া গেলে তাহা সহজে বদলানো যায়; ইহাকে ছুড়িবার সময় রাইফলের মতন বহন করিতে হয় না, মাটিতে বসাইয়া তাহার পাশে আরামে বসিয়া পিচকারী হইতে জল ছড়ানোর মতন চারিদিকে প্রচুর মৃত্যু ছড়াইতে পারা যায়; শক্তিমান অস্ত্র কাছে থাকাতে আপনাকে অধিক নিরাপদ ও শক্তিশালী বলিয়া মনে হয়; শত্রু যতক্ষণে পাঁচ গুলি মারিবে ততক্ষণে আমি যদি একশ গুলি মারিতে পারি তবে আমার বাঁচিবার শতকরা ৯৫ রকম সম্ভাবনা আছে মনে করিয়া মনে

যথেষ্ট সাহস পাওয়া যায়; শত্রুপক্ষের হতাহতের তালিকা প্রস্তুত করিতে কলের-কামান শত জিহ্বায় সাহায্য করে। সুতরাং কলের-কামানের আবির্ভাবে বন্দুকের তিরোধান নিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। জার্ম্মানীর আয়োজন ব্যর্থ ও পণ্ড করিবার জন্য তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীরাও চুপ করিয়া থাকিবার পাত্র নয়,তাহারাও বকেয়া বন্দুককে বিদায় দিয়া ঐরূপ কলের-কামান প্রভৃতি নব নব উপায় উদ্ভাবন করিয়া জার্ম্মানীকে জব্দ করিতে চেষ্টা করিবে। অতএব হিংসার শেষ কোথায়?

***

নিষ্ঠুর গাছ—

বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে উদ্ভিদেরও মানুষের ন্যায় সুখদুঃখের অনুভূতি আছে। কিন্তু উদ্ভিদের যে বুদ্ধি বা ইচ্ছা-প্রণোদিত কোনো ভাব আছে তাহা বলা যায় না। গাছ আলোর দিকে ডাল বাড়াইয়া পাতা মেলিয়া ধরে; আত্মরক্ষার জন্য অপর গাছকে চাপিয়া মারে; বংশরক্ষা ও বংশবৃদ্ধির জন্য নানা উপায়ে বীজ দিকে দিকে ছড়াইয়া ফেলে; ইহা আমরা জানি। কিন্তু এগুলিকে সচেতন কার্য্য বলা যায় না। গাছের তিক্ত রস, তীব্র নির্য্যাস বা কটু আঠা, কাঁটা, শোঁয়া প্রভৃতি তাহার আত্মরক্ষার উপায়। কিন্তু কোনো কোনো গাছ তাহাদের আততায়ীর উপর অনাবশ্যক নিষ্ঠুর আচরণ করিয়া থাকে—ততটা না করিলেও তাহার আত্মরক্ষার কোনো ব্যাঘাত হয় না। সায়েন্টিফিক আমেরিকান পত্রে তাহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেখানো হইয়াছে। কোনো কোনো গাছ নাইট্রোজেনময় খাদ্য লাভের জন্য কীট পতঙ্গ ভক্ষণ করিয়া থাকে; কিন্তু তাহারা সেই দুর্ভাগ্য কীটপতঙ্গকে ধরিয়াই বধ করে না, দগ্ধাইয়া দগ্ধাইয়া অল্পে অল্পে মারে। প্রিয়তমের কোল (Darlingtonia) গাছের ভাণ্ড-আকৃতির পাতার মধ্যে মধুস্রাব দেখিয়া লুব্ধ পতঙ্গ যেই তাহার মধ্যে ঢোকে, অমনি ভাণ্ডের ঢাকনা বন্ধ হইয়া যায়; ঢাকনায় ছোট ছোট শার্শি-দেওয়া জানলার ন্যায় স্বচ্ছ অংশ থাকে, তাহার ভিতর দিয়া আলো আসিতে দেখিয়া বন্দী পতঙ্গ পলাইতে যায় এবং বার বার বাধা পাইয়া পাইয়া মাথা খুঁড়িতে খুঁড়িতে মরিয়া যায়। তখন সেই মধুর মধ্যে পতিত তাহার দেহটি গাছ জীর্ণ করিয়া আবার ভাণ্ডের মুখের ঢাকনা খোলে। রতির ফাঁদ (Venus Fly-trap) গাছে পতঙ্গ বসিলেই তাহার পা আটকাইয়া যায়; পতঙ্গ বেচারা ছাড়াইবার বৃথা চেষ্টায় ছটফট করিতে করিতে মারা পড়ে। গ্যম (Geum) গাছের ফলগুচ্ছ এক-একটি বঁড়শীর মতন; তাহার উপর মক্ষি পতঙ্গ বসিলেই বঁড়শীতে বিঁধিয়া আটকাইয়া যায়, কিছুতেই পরিত্রাণ পায় না, ছটফট করিতে করিতে অবশেষে মরিয়া বাঁচে। এইসব হত্যা অকারণে নিষ্প্রয়োজনে; কারণ পতঙ্গ মারিয়া এসব গাছের পুষ্টি বৃদ্ধি প্রভৃতি কোনো উপকারই হয় না। দক্ষিণ-আমেরিকার মারধুনিয়া (Martynia) গাছের ফলের গায়ে ৫।৬ ইঞ্চি লম্বা লম্বা ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ দাড়া থাকে; বংশবিস্তারের জন্য এই গাছ যখন ফলগুলিকে ছিটকাইয়া ছড়াইয়া ফেলিতে থাকে তখন কোনো পশুর গায়ে পড়িলে দুয়ে গিয়া
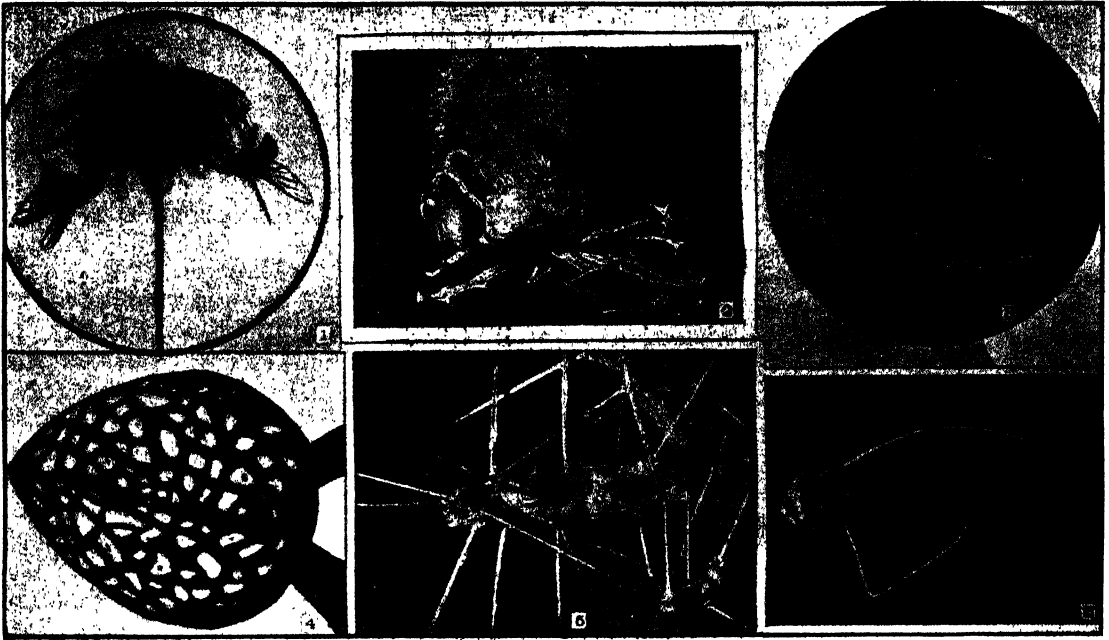
নিষ্ঠুর গাছের আয়ুধাবলী।

(১) গ্যম গাছের ফলের বঁড়শীতে পতঙ্গ শিকার। (২) ও (৩) আঁকড়া-ফলের বঁড়শী জানোয়ারের গায়ে পায়ে ফুটিয়া যায়। (৪) প্রিয়ের-কোল ফুলের ঢাকনিতে স্বচ্ছ আবরণে ঢাকা জানলা, বন্দী পতঙ্গ ঐ পথে বাহির হইবার চেষ্টা করিতে গিয়া মাথা খুঁড়িয়া মারা পড়ে। (৫) মনসা-সিজের ভীষণ সোজা কাঁটা, গায়ে ফুটিয়া গেলেই ভাঙিয়া যায় এবং সহজে বাহির করা যায় না। (৬) মারধুনিয়া ফলের গায়ের প্রকাণ্ড দাড়া, কোনো জন্তু নিকটে গেলেই মথ্‌থম ফুটাইয়া দ্যায়।

পড়িবার জন্য ইহা এমন নিষ্ঠুরভাবে দাড়া ফুটাইয়া তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরে যে সেই আহত পশু যন্ত্রণায় অস্থির পাগল হইয়া উঠে; ষাঁড় মহিষের ন্যায় প্রকাণ্ড জন্তুও উহার দাড়ার আঘাতের জ্বালায় উদ্দাম হইয়া ছুটাছুটি করে; ইহাতে গাছের বীজ দূর দূরান্তে ছড়ায় বটে কিন্তু উপায়টা বড় দুরন্ত রকমের নিষ্ঠুর বলিতে হইবে। দক্ষিণ-আফ্রিকার আঁকড়া-ফল (Grapple-fruit) কাঁঠালের মতন খুব বড় হয় এবং তাহার গায়ে চোখা কাঁটা থাকে, এবং কাঁঠালের ন্যায়ই ইহ গাছের নীচের দিকেই বেশী ফলে। গরু ছাগল হরিণ এই ফল মাড়াইলেই তাহাদের পায়ের খুরের পাশে নরম জায়গায় উহার কাঁটা গভীর হইয়া ফুটিয়া যায়। দুর্ভাগ্য পশুরা সেই প্রকাণ্ড ফলটাকে পায়ে করিয়া টানিয়া টানিয়া খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া যন্ত্রণা পাইয়া বেড়ায়, এবং এই দুঃখের বোঝা দুতিন হপ্তা পরে তাহার পা ছাড়িয়া নামে; ইহাতে তাহার পায়ে যে ক্ষত হয় অনেক সময় তাহাতেই সে মরে, কিংবা বোঝা নামাইবার আগেই কোনো হিংস্র পশুর সামনে পড়িয়া পলাইতে না পারিয়া তাহার সকল দুঃখের সহিত জীবনেরও অবসান হইয়া যায়। কিন্তু হিংস্র পশুরাও হিংসা করিতে গিয়া কম বিপদে পড়ে না; হরিণের পায়ে আঁকড়া-ফল আঁকড়াইয়া আছে, সিংহ তাড়া করিল, হরিণ পালাইতে পারিল না, সিংহের স্ফূর্ত্তি দেখে কে? কিন্তু মৃগমাংস ভক্ষণ করিবার সময় মৃগের পায়ের আঁকড়া-ফল ছাড়াইতে গিয়া পশুরাজ নিজেই কণ্টকবিদ্ধ হইয়া জব্দ হন; মুখে আটকাইয়া গেলে বেচারা যন্ত্রণায় ও অনাহারে শীঘ্রই মৃগের অনুসরণ করে। জীবজন্তুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য গাছপালার আয়ুধের দরকার স্বীকার করিতেই হয়; কিন্তু এইরূপ ব্যাপার অকারণ নিষ্ঠুরতার বড় বেশী কাছাকাছি। সাধারণ বিছুটিগাছের পাতায় ডাঁটায় সরু সরু শোঁয়া থাকে; জীবজন্তুর গায়ে লাগিলেই শোঁয়া ত ফুটিয়া যায়ই, অধিকন্তু একপ্রকার চিড়বিড়ে বিষ নিষেক করে, তাহার জ্বালা কয়েক ঘণ্টা ধরিয়াই থাকে। আলকুশীর ফুল বাতাসে উড়িয়া আসিয়া গায়ে ঠেকিলেই সে স্থান চুলকাইতে চুলকাইতে ফুলিয়া উঠে। হিমালয় প্রদেশে মেয়ালুম-মা নামক একরকম বিছুটির গাছ হয়, উহা ১৫ ফুট উঁচু; বড় বড় চকচকে পাতার গায়ে অতি সূক্ষ্ম চক্ষুর অগোচর শোঁয়া থাকে, গায়ে ঠেকিলেই প্রথমে অল্প জ্বালা করে, কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরেই মনে হয় যেন সে-জায়গাটা তপ্ত লোহা দিয়া পুড়াইয়া দেওয়া হইতেছে; তারপরে সমস্ত শরীরে যন্ত্রণা হয়, চোয়াল আটকাইয়া যায়, ধনুষ্টঙ্কার হয়, ভালো হইতে নয় দশ দিন লাগে। ইহা কি ঐ গাছের পক্ষে অনাবশ্যক নিষ্ঠুরতা নহে। মরুভূমির গাছপালা, বিশেষত মনসা-সিজ, আত্মরক্ষার উপায়টাকে চমৎকার কলাকৌশলে পরিণত করিতে পারিয়াছে। কোনো জন্তু সিজের গায়ে গা ঘসিলে কাঁটা ত ফুটিয়া যায়ই, এবং কাঁটাগুলি সিজের শিরের উপর এমন আল্‌গা ভাবে জন্মায় যে জন্তুর গায়ে ফুটিয়া গেলেই কাঁটা গাছ হইতে ছাড়িয়া যায়। বিদ্ধ কাঁটার ক্ষত শীঘ্র সারিতে চায় না। একটু-দাঁড়াও জাতের মনসা-সিজের গায়ে দুরকম কাঁটা থাকে—লম্বা সোজা ও বাঁকা বঁড়শী; বাঁকা কাঁটা মানুষের কাপড় পশুর লোম আটকাইয়া টানিয়া বলে একটু দাঁড়াও, আর সেই অবকাশে লম্বা কাঁটা মখ্‌থম বেঁধা বিঁধিতে থাকে। এইসব খোঁচাখুঁচি অনাবশ্যক নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর কিছু বলিয়া এখনো জানা যায় নাই।

* *
*

লুসিটানিয়া জাহাজ কি করিলে বাঁচিতে পারিত—

ডুবো জাহাজের চোরা ঘাইএ লুসিটানিয়া ডুবিয়াছে। জলের উপর হইতে ডুবো জাহাজের চোরা চলন দেখা যায় না; কিন্তু উড়ো জাহাজ
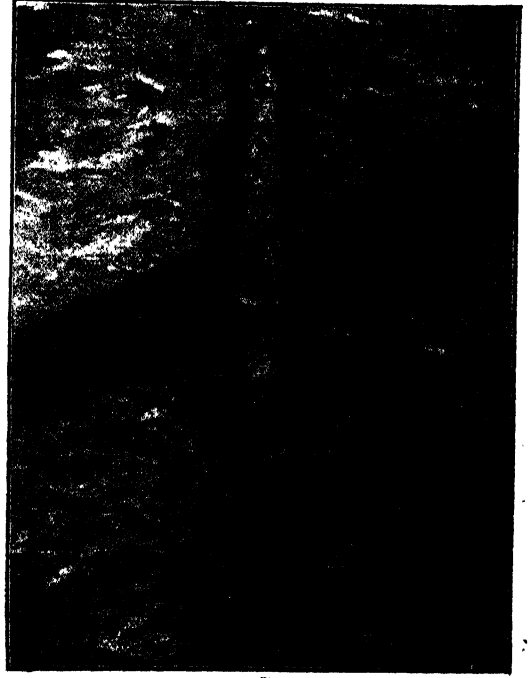
উড়ো জাহাজ হইতে ডুবো-জাহাজের চুরি ধরা।
উড়ো জাহাজ হইতে জলের তলে ডুবো-জাহাজকে যেরূপ দেখিতে লাগে।

হইতে জলের তলে অনেক নীচেও ডুবো জাহাজের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। তাই বিশেষজ্ঞরা বলিতেছেন যে যুদ্ধের সময় প্রত্যেক জাহাজের সঙ্গে-সঙ্গে যদি একএকখানা জল-আকাশ-চারী জাহাজ থাকে তবে আর কোনো বিপদেরই সম্ভাবনা থাকে না। ঠেকিয়া শিখিয়া ইংরেজরা এখন উড়ো জাহাজের পাহারায় সৈন্যবাহী জাহাজ ইংলিশ চ্যানেল পার

ইংরেজদের সৈন্য-রসদ-বাহী জাহাজ উড়ো-জাহাজের পাহারায় ইংলিশ চ্যানেল পারাপার করিতেছে।

করিতেছেন এবং এ পর্য্যন্ত কোনো দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে নাই। লুসিটানিয়া জাহাজখানি যদি এই সতর্কতা অবলম্বন করিত তবে ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অকাল তিরোধানে আমাদিগকে শোক করিতে হইত না। য়ুরোপের যুদ্ধে কত লক্ষ লক্ষ লোক মরিয়াছে, সে বেদনার চেয়ে এই বেদনা হৃদয়ের খুব নিকটে বাজিয়াছে বলিয়াই বড় বোধ হইতেছে।

চিন্তা করিয়া কাজ করিতে সক্ষম কল—

যে-সময়ের যে কাজটি যেমন করিয়া করিলে ভ'লো হয় এরূপ চিন্তা ও স্মৃতিশক্তি মানুষেই সম্ভবে। কিন্তু আমেরিকার একজন ইঞ্জিনিয়ার মিঃ এস বেণ্ট রাসেল একটি যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন যাহা মনুষ্য-মস্তিষ্কের ন্যায় স্মরণ ও চিন্তা করিয়া যথাসময়ে যথাযথ কাজটি সম্পন্ন করিয়া দিতে পারিবে। এই যন্ত্রটি যেন মস্তিষ্ক; মস্তিষ্ক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহিরের উত্তেজনা পায় এবং সেই উত্তেজনা শরীরের স্নায়ু পেশী প্রভৃতিতে ফিরাইয়া পাঠাইয়া ক্রিয়া ও কার্য্য উৎপন্ন করে; মস্তিষ্ক-যন্ত্রের সঙ্গে সংলগ্ন অপর একটি যন্ত্রে চক্ষু ও কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রতিনিধিস্বরূপ সেলেনিয়মের ঘট বা সেল ও বাদ্য-চিমটা (tuning fork)সংযুক্ত থাকে; সেই ঘটে বিদ্যুৎ চালিত করিয়া বা বাদ্য-চিমটা বাজাইয়া শব্দতরঙ্গ তুলিয়া মস্তিষ্কযন্ত্রে উত্তেজনা পাঠাইলেই তাহা ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়। ইন্দ্রিয়-যন্ত্র যত ঘনঘন উত্তেজনা পাঠায় মস্তিষ্কযন্ত্রের কার্য্যক্ষমতা তত বাড়িতে থাকে। ইহা মানুষের প্রথম অনুভূতি লাভের পর ইচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া কার্য্যের অনুরূপ।

টেকনিক্যাল ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিন এই যন্ত্রের বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহার একটি ত্রুটি এই যে মনুষ্য-মস্তিষ্কে লক্ষ কোটি স্নায়ু-কোষ থাকে, ইহার মাত্র একটি কোষ। সুতরাং এই যন্ত্র মাত্র একটি সরল উত্তেজনার সাড়ার কাজ করিতে পারে; মনুষ্য-চিন্তার মধ্যে যে জটিল উত্তেজনা ইচ্ছাকে প্রণোদিত করে সেরূপ কোনো কার্য্য ইহার নিকট প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু হয়ত কালে মনোবিজ্ঞানবিদ্ শারীর-বিজ্ঞানবিদ স্নায়ুতত্ত্ববিদ্ প্রভৃতির সাহায্যে এই মস্তিষ্ক-যন্ত্রে বিভিন্ন অংশ সংযোজিত হইয়া ইহার ইচ্ছামত কার্য্য করিবার শক্তি জন্মিতে পারিবে। এখন ইহা স্বাধীনভাবে স্বয়ং কার্য্য করিবার উপযোগী না হইলেও পরের কাজের গলদ ধরিয়া দিবার শক্তি ইহার হইয়াছে। কোনো ষ্টিমার কোনো পথে নিত্য যাতায়াত করে; সেই ষ্টিমারের উপর এই যন্ত্র থাকিলে গন্তব্য পথ অল্পদিনেই ইহার স্মৃতিতে মুদ্রিত হইয়া যাইবে; তখন কোনো দিন মাঝি ভুল পথে ষ্টিমার চালাইলেই যন্ত্র বাঁশী বাজাইয়া চীৎকার করিয়া প্রতিবাদ করিবে। ক্রমে তাহার হাতে সেই ষ্টিমার চালাইবার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যাইবে, যন্ত্র লোকের সাহায্য বিনাই নিত্য নিয়মিত পথে ষ্টিমার চালাইতে থাকিবে। স্বয়ংচল গাড়ীর মোটর অস্খলিত-গতি কি না পরীক্ষা করিতে হইলে ষ্টেথোস্কোপ দিয়া উহার চলন-শব্দ লক্ষ্য করিতে হয়; কিছুদিন মসৃণ-গতি কয়েকটা মোটরের চলন-শব্দ স্মরণক্ষম যন্ত্রটিকে শুনাইয়া রাখিলে কখনো স্খলিত-গতি মোটরের সাক্ষাৎ পাইলেই সে চীৎকার করিয়া জানাইবে যে এ মোটরটি যেমন হওয়া উচিত তেমন নহে।

এই যন্ত্রকে প্রথম কোনো একটা কাজে নিযুক্ত করিলে অশিক্ষিত আনাড়ি লোকের মতন প্রথমটা একটু থতমত খাইতে থাকে; বল-খেলার সময় বা লাঠিখেলার সময় প্রথমটা খেলোয়াড়ের মন থতমত খায়, ক্রমে অভ্যাস হইয়া গেলেই সে বেশ বুঝিতে পারে কোন্‌দিকে কতখানি ঝুঁকিলে আঘাত বাঁচাইতে বা আঘাত করিতে পারা যাইবে; তখন সেই বাঁকা ঘোরা নত হওয়া মগ্নচেতন অবস্থাতেই আপনা-আপনি হইতে থাকে। চিন্তাশীল কলটিরও ঠিক এইরকম ব্যাপার। অজ্ঞান শিশু প্রথম যেদিন আগুনে হাত দায় বা ভনভন করিতে দেখিয়া সুন্দর বোল্‌তাকে মুঠা করিয়া ধরে সেদিন আগুনের বা হুলের জ্বালা শিশুর মস্তিষ্কের মধ্যে একটা বেশ গভীর ছাপ রাখিয়া যায়, তারপর আর যখনই সে আগুনের মতন বা ভনভনে কোনো পদার্থ দেখে তখনি সেই রূপ বা শব্দ তাহার মস্তিষ্কের পুরাতন ছাপের সঙ্গে এমন ঝটিতি মিলিয়া যায় যে শিশু অমনি না ভাবিয়াই হাত টানিয়া লয়। রাসেলের মস্তিষ্ক-যন্ত্রও তেমনি একবার একটা কোনো কার্য্যের ছাপ পাইলে চিরদিনই তাহা মনে করিয়া রাখে এবং আপনাআপনি যথাকর্ত্তব্য সম্পাদন করে। কিন্তু মাঝে মাঝে ইহাকে স্মরণ করাইয়া নূতন অভিজ্ঞতা না দিলে হুঁসো ছেলেদের মতো এ গত ঘটনা অল্পে অল্পে ভুলিতে থাকে।

অনেকে আশা করিতেছেন যে মস্তিষ্ক যখন পাওয়া গিয়াছে তখন তাহাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিতে পারিলে এই যন্ত্রকে দিয়া অক্লেশে বড় বড় কারখানার তদারক করাইয়া লইতে পারা যাইবে; এ হুঁসিয়ার ম্যানেজারের মতো সকল দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া ত্রুটি সংশোধনও করিবে এবং স্বয়ং কাঁচা মাল ওজন ঝাড়াই বাছাই করিয়া তাহা হইতে যে বস্তু প্রস্তুত হইবার প্রস্তুত করিয়া প্যাক ও গুদাম-জাত পর্য্যন্ত করিতে পারিবে।

মিশর-রহস্য

বিশ্ববিশ্রুত পিরামিড, কোন্ অজানা উদ্দেশ্যের সুবিপুল স্ফীংকসমূর্ত্তি ও অসংখ্য সৌধস্তম্ভমালার ময়দানবীয় কীর্ত্তি-কলাপের ধ্বংসাবশেষ লইয়া প্রাচীন সভ্যতার শিলাময় শ্মশান মিশরভূমি যুগযুগান্ত কাল হইতে এক অপার রহস্য-নিকেতনের মত এতদিন আধুনিক জগতের অন্তরে একটা গভীর বিস্ময়-ভরা সম্ভ্রম জাগাইয়া তুলিতেছিল। তাহার সমুন্নত পিরামিডের দুর্ভেদ্য শৈলাবরণ, তাহার শব্দিত মেম্ননের বিচিত্র স্বর-ভঙ্গিমা, পৃথিবীর চিরজাগন্ত বিজন-প্রহরীর মত স্ফীংক্স-মূর্ত্তির অন্তহীন জাগরণ, কার্ণাকের সুবিস্তৃত স্তম্ভবীথি, তাহার বিচিত্র চিত্রময়ী ভাষা ও নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ তন্ত্রমন্ত্র ও পূজাপদ্ধতি তাহার সেই দুরতিক্রম্য মরুপ্রান্তরের মতই মিশর-রহস্যের মরুযাত্রী পণ্ডিতদিগের চেষ্টাকে অতি নিষ্ঠুর ভাবে বার বার ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে।

কিন্তু মানুষের অদম্য অধ্যবসায় ও চেষ্টা আজ প্রকৃতির উপরে জয়ী হইয়াছে। পঞ্চাশ বৎসরের সাধনা ও একাগ্রতার বলে কৌশলী মানব মূক প্রকৃতির মুখ খুলিয়া আজ তাহাকে কথা কহাইয়াছে। মিশর-রহস্যের হারানো চাবির আজ সন্ধান মিলিয়াছে।

আজ তাই জানা গিয়াছে যে বিশ্বের বিস্ময় পিরামিড-গুলি এক-একটি প্রবলপ্রতাপান্বিত নৃপতির স্বরচিত সমাধি-স্তূপ বই আর কিছুই নয়। যে কৌশলবলে মিশরের মেম্ননমূর্ত্তি উষার প্রথম-কিরণ-পাতে ও আসন্ন-আঁধার গোধূলি সন্ধ্যায় বিচিত্র স্বরলহরে তাহার বিচিত্র ভৈরবী ও পূরবীতে তান ধরিয়া নানাদেশের কৌতূহলী শ্রোতাদের

মিশরের বৃহত্তম পিরামিড ও স্ফীঙ্কস্. গিজের প্রান্তরে খেয়প বা চেয়পের পুত্র খেফ্রেন বা চেফ্রেন কর্ত্তৃক তাঁহারই মুখানুরূপ করিয়া নির্ম্মিত।

একদিন সে অপার বিস্ময়ে অভিভূত করিত, দুরন্ত বিজ্ঞান আজ তাহাও ফাঁস করিয়া দিয়াছে—তাহা যে উষ্ণতার তারতম্যে প্রস্তর গাত্রের বিস্ফারিত বা সঙ্কুচিত ছিদ্রে বাতাসের কূজন মাত্র তাহা ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু গিজের ঐ মহাকায় স্ফীংকস-মূর্ত্তি—কোন্ কাল-কালান্ত হইতে মিশরের ধূধূ মরু-প্রান্তরের অবিশ্রাম ঝঞ্ঝাবর্ত্তের মাঝখানে অবিকল উন্নতশিরে তুফানময় নীলনদের পরপারে উদয়াচলের পানে পলকহীন চাহনি মেলিয়া কিসের আশায় আজও সে বসিয়া আছে! দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, শতাব্দীর পর শতাব্দী মিশরের সেই অন্তহীন অতীত যুগের প্রেতাত্মার মত মিশরের গৌরব-রবির পুনরভ্যুদয়ের প্রতীক্ষায় পূর্ব্বাশার দ্বারে নিমেষহীন নয়নে চাহিয়া মিশরের ভাঙা-হাটে বসিয়া আজও সে প্রহরা দিতেছে—কবে কাহার সঞ্জীবন করস্পর্শে প্রস্তরীভূত মিশরের ঘুমন্ত পুরীতে তাহার শৈশব কালের সমবয়সী প্রগলভ জীবন জাগিয়া উঠিবে! সত্যই কি যে তাহার নিগূঢ় উদ্দেশ্য, কোন্ সার্থকতা সাধনে সে যে স্পন্দহীন প্রয়াসী, মানুষের অপরিসীম অধ্যবসায় এতদিন পর্য্যন্ত সে রহস্য উদ্ঘাটিত করিতে পারে নাই! কিন্তু আজ ঐ সূর্য্যদগ্ধ নিষ্কম্প ললাটে শ্রান্তির স্বেদধারার সঙ্গে তাহার জীবন-ইতিহাসের লিখনচিহ্ন ধরা পড়িয়াছে। তাহার জীবন-রহস্য আজ আর মানুষের কাছে গোপন নাই।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, যে জাতি মরুভূমির মাঝখানে একটা জীবন্ত পাহাড় কাটিয়া একদিন এই বিরাট স্ফীংক্স-মূর্ত্তি রচনা করিয়াছিল তাহারাও ইহার জন্ম-ইতিহাস একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। পরবর্ত্তী সময়ে ধূর্ত্ত পুরোহিতের দল ইহার একটা সুবিধামত অর্থ খাড়া করে এবং ইহাকে অবলম্বন করিয়া যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন-মূল্যেরও ব্যবস্থা করিয়াছিল। এমন কি নিজেদের এই সাধু উদ্দেশ্যের পরিপোষক একটি শিলালিপি পর্য্যন্ত তাহারা প্রস্তুত করে। এই শিলালিপি আজও স্ফীংক্সের সম্মুখে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে লেখা আছে যে চতুর্থ থথমিস বালুকারাশির ভিতর হইতে ইহাকে বাহির করিয়া তাহার পূজার প্রবর্ত্তন করেন। পরবর্ত্তী কালের পুরোহিতগণ যখন যেমন সুবিধা সেই অনুসারে ইহার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছিল।

পুরোহিতদিগের এই ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ মিথ্যা ব্যাখ্যাগুলি মিশরতত্ত্ববিদ পণ্ডিতদিগকে কম কষ্ট দেয় নাই। কারণ মিশরবাসীদের নিজেদের পিরামিড ও স্ফীংক্স সম্বন্ধে তাহাদের কোনো জ্ঞানই নাই একথা তাঁহারা ভাবেন নাই। বর্ত্তমানে মিশর-ইতিহাসের বহুতথ্য আবিষ্কৃত হওয়াতে স্ফীংক্সের অন্তহীন সমস্যার আজ সমাধান হইয়াছে।

খৃঃ পূঃ ২৮০০ অব্দে মিশরের মরুভূমির মাঝখানে জীবন্ত পাহাড় কুঁদিয়া এই বিরাট স্ফীংক্স-মূর্ত্তি প্রস্তুত হয়। পাথরের কাজ মিশরে ঐ সময়ের মাত্র আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছিল। মিশরের সর্ব্বপ্রথম পাথরের কাজ হইতেছে দ্বিতীয় রাজবংশের সম্ভবতঃ শেষ রাজা খা-সেখেমুয়ের সমাধি। তাহার পূর্ব্বতন গৃহাদি সবই মাটির ইটে প্রস্তুত।

খা-সেখেমুয়ের পরবর্ত্তী রাজা জোসার পিরামিড রচনায় প্রথম হাত দেন। তাহার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে খৃঃ পূঃ ২৯৫০ অব্দে স্নেফ্রুই বস্তুত প্রথম পিরামিড নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার পরই খেয়প বা চিয়পের অভ্যুদয়।

চিয়প যখন গিজের প্রান্তরে প্রথম পিরামিডটি নির্ম্মাণ করেন তখন নিকটস্থ পাহাড় হইতে বাজে পাথরে তাহার
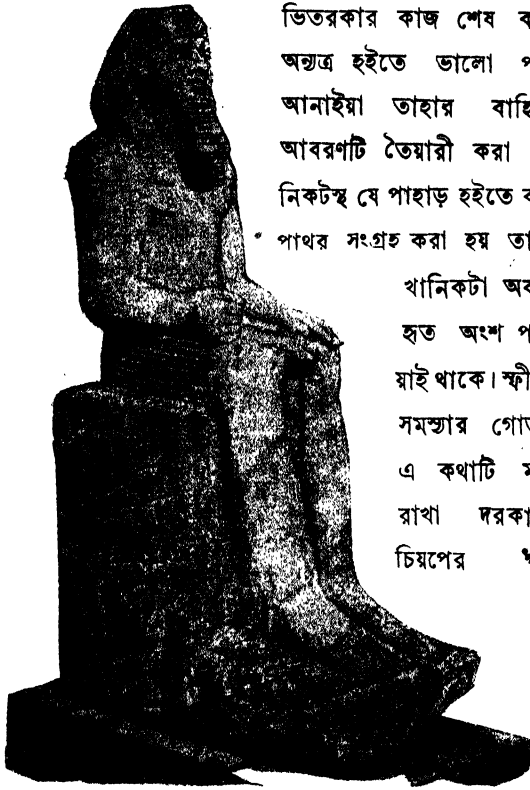
ভিতরকার কাজ শেষ করিয়া অন্যত্র হইতে ভালো পাথর আনাইয়া তাহার বাহিরের আবরণটি তৈয়ারী করা হয়। নিকটস্থ যে পাহাড় হইতে বাজে পাথর সংগ্রহ করা হয় তাহার খানিকটা অব্যবহৃত অংশ পড়িয়াই থাকে। স্ফীংক্স-সমস্যার গোড়ায় এ কথাটি মনে রাখা দরকার। চিয়পের পুত্র

মিশর-রাজ খেয়প বা চেয়পের প্রস্তরমূর্ত্তি।

খেফ্রেন বা চিফ্রেন তাহার নিকটেই "সুমহান চিফ্রেন" নামের পিরামিডটি রচনা করেন। তাঁহার রচনা-পদ্ধতি ঠিক তাঁহার পিতার অনুরূপই ছিল। উভয়েই যথাকালে নিজ নিজ রচিত পিরামিডে সমাধি লাভ করেন।

মিশরীয় সমাধি-মন্দিরকে সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। মাটির নীচে একটি প্রকোষ্ঠে শব রক্ষিত হয়। প্রকোষ্ঠটির চারিদিকে প্রাচীর গাঁথা, বায়ু আলোক প্রবেশের ছিদ্র পর্য্যন্ত নাই। তাহার ঠিক উপরিভাগে পাথর বা ইটের ছোট স্তূপের দ্বারা সমাধি-স্থানটি চিহ্নিত করা হয়। সেখানেই মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে খাদ্য পানীয় উৎসর্গ করিবার ও তন্ত্র মন্ত্র পাঠ প্রভৃতির জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। অবশ্য একথা মনে রাখা দরকার যে, মিশরবাসীরা জন্মান্তরবাদী ও তাহাদের ধারণা যে মৃত্যুর পর আবার নূতন জন্ম গ্রহণ করিবার কালে ঐ দেহেই আবার নবজীবন লাভ করিতে হয় এবং ঐ দেহেই স্বর্গেও যাইতে হইবে। ইহাই তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের মূলতত্ত্ব। এই কারণে দেহ যাহাতে বিকৃত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয় সেই-জন্যই নানা উপায়ে দেহটাকে কোনা-মতে টিকাইয়া রাখিবার জন্য তাহারা এত চেষ্টা করিয়া থাকে। মিশরের 'মামি' তাহাদের এই ধর্ম্মবিশ্বাসের ফল ছাড়া আর কিছুই নয়। এই জন্যই তাহারা সমাধিস্থ করিবার সময় মৃত ব্যক্তির সঙ্গে তাহার নিত্যব্যবহার্য্য জিনিসপত্র ও খাদ্য পানীয় প্রভৃতি দিয়া থাকে। ইহা তাহাদের ধর্ম্মের একটি বিশেষ অঙ্গ। মাঝে মাঝে মৃত ব্যক্তির সমাধির নিকটে গিয়া তাহার উদ্দেশ্যে খাদ্য ও পানীয় উৎসর্গ করা আত্মীয় স্বজনদের একটা প্রধান কর্ত্তব্য। মিশরের রাজারা সেইজন্যই মৃত্যুর পর আহার-বিহার ও সুখ সুবিধার একটা ব্যবস্থা বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতেই করিয়া যাইতেন।

পিরামিডগুলি প্রকৃতপক্ষে সাধারণ সমাধির রাজসংস্করণ ব্যতীত আর কিছুই নয়। একটি পার্ব্বত্য অধিত্যকার উপর এগুলি অবস্থিত। সুবিধার জন্যই হৌক বা অন্য যে কারণেই

খেফ্রেন বা চেফ্রেন, প্রথম স্ফীংক্স্ নির্ম্মাণের প্রবর্ত্তক, ইহাঁরই প্রতিমূর্ত্তি-রূপে গিজের প্রান্তরের নরসিংহ-মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল।

হৌক, পিরামিডের নীচের উপত্যকায় একটি মন্দির নির্ম্মাণ করা হয়। এই মন্দিরটি পিরামিডের উপরকার মন্দিরটির সহিত একটি সরু রাস্তা দ্বারা সংশ্লিষ্ট। দ্বিতীয় অর্থাৎ চিফ্রেনের সমাধি পিরামিডটি ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জানা গিয়াছে যে উহা বস্তুত একটি অতি জটিল ব্যাপার। প্রথমতঃ পিরামিডটি বহু অংশে বিভক্ত। চিফ্রেনের সমাধি ও তৎসংশ্লিষ্ট পূর্ব্বদিকে অবস্থিত উৎসর্গের স্থান, এবং ইহার চারি ধারে একটি চতুষ্কোণ প্রাচীর এবং এখান হইতে উপত্যকার পাথরের মন্দির (স্ফীঙ্কস্-মন্দির) পর্য্যন্ত একটি রাস্তা ও খাস মন্দিরটি, এ সমস্তই দ্বিতীয় পিরামিডের অঙ্গ : এমনকি বিরাট স্ফীঙ্কস্-মূর্ত্তিটি পর্য্যন্ত ইহার অঙ্গবিশেষ বলিয়া বোধ হয়, আরও মনে হয় যে এটি চিয়পের পিরামিডের পরিত্যক্ত পাহাড়ের অংশ হইতেই কাটিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। কিন্তু মানুষের মত মুখ ও সিংহের মত অবয়বের এই অদ্ভুত মূর্ত্তিটি চিফ্রেনের সমাধির সহিত কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংশ্লিষ্ট হইয়াছিল এখন তাহাই নির্ণয় করা আবশ্যক।

একটা সৌভাগ্যের বিষয় যে মিশরে স্ফীঙ্কস্‌মূর্ত্তির আদৌ অভাব নাই, প্রায় অধিকাংশ মিশরীয় স্তূপেই প্রস্তরমূর্ত্তিতে তক্ষণ-চিত্রে মণিরত্নাদিতে ও কবচে পর্য্যন্ত স্ফীঙ্কস্-মূর্ত্তি অনুকৃত দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। অনেকগুলি স্ফীঙ্কস্-মূর্ত্তিতে সিংহের দেহে রাজার মাথা বসানো। এগুলি কোনো-না-কোনো একটি পবিত্র স্থানের রক্ষক দেবতা। স্ফীঙ্কসের অন্যান্য অনুকৃতিগুলিও ঐরূপ কবরের হিসাবেই ব্যবহৃত হয়।

এইখান হইতেই স্ফীঙ্কস-সমস্যাটা বহুল পরিমাণে সরল হইয়া আসে। কিন্তু তথাপি কয়েকজন পণ্ডিতের তর্কবিতর্ক ও বাক্‌বিতণ্ডার ফলে প্রকৃত মীমাংসায় উপনীত হইবার পথে সমূহ বাধা উপস্থিত হয়। স্ফীঙ্কসের উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত হইবার পর কে তাহার রচয়িতা এই লইয়া পণ্ডিতমহলে খুব আন্দোলন হয়। একদল বলেন স্ফীঙ্কস-মূর্ত্তি পূর্ব্বতন সাম্রাজ্যের চতুর্থ রাজবংশের রাজা চিফ্রেনের কীর্ত্তি—অপর দল বলেন যে পরবর্ত্তীকালে অর্থাৎ ষড়বিংশ রাজবংশের শাসনকালে যখন চিফ্রেন-প্রবর্ত্তিত পূজাপদ্ধতির পুনরভ্যুদয় হয় সেই সময়েই উহা তৃতীয় এমেনেমহাতে
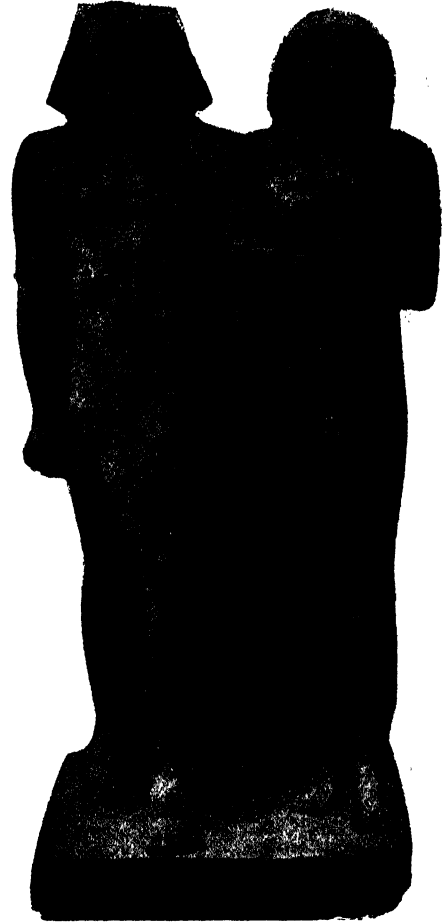
মিশররাজ মাইসেরিনাস ও তাঁহার মহিষীর স্লেটপাথরে নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি।

কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। বহুকাল পরে, সম্প্রতি মাইসেরিনাসের উপত্যকা-মন্দিরের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। যে যে বিশেষত্বের উপর নির্ভর করিয়া বলা হইয়াছিল যে স্ফীঙ্কস-মূর্ত্তি ষড়বিংশ রাজবংশের শাসনকালে নির্ম্মিত, সেই বিশেষত্বগুলি যে চতুর্থ রাজবংশের শাসনকালেও প্রচলিত ছিল—তাহা মাইসেরিনাসের অতি প্রাচীন মন্দিরের ভিতর অন্যান্য মূর্ত্তি প্রভৃতির আবিষ্কারের সহিত প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। চতুর্থ রাজবংশের অন্যান্য মূর্ত্তির সহিত স্ফীঙ্কসের প্রবল সাদৃশ্য পর্য্যন্ত ধরা পড়িয়াছে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে চতুর্থ রাজবংশের কোন্
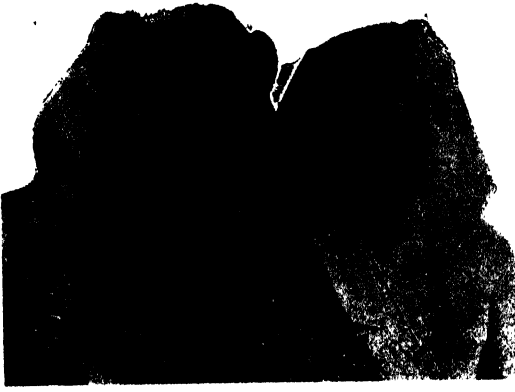
মিশররাজ তৃতীয় এমেনেমহাতের প্রতিমূর্ত্তির দক্ষিণ পার্শ্বে তাঁহার মুখাবয়ব-বিশিষ্ট নরসিংহ-মূর্ত্তি স্ফীঙ্কসের উদ্দেশ্য ও রহস্যের জটিল সংশয় পরিষ্কার ব্যাখ্যা করিয়া দিতেছে যে স্ফীঙ্কস-গুলি নরসিংহ রাজাদিগেরই প্রতিকৃতি মাত্র।

রাজা স্ফীঙ্কসমূর্ত্তির নির্ম্মাণ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইহার উত্তর—চিফ্রেনই নিঃসন্দেহরূপে ইহার প্রথম নির্ম্মাতা। তাহার কারণ উপত্যকার মন্দিরে উৎসর্গীকৃত দ্রব্যাদি গ্রহণের জন্য চিফ্রেনের যে প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহার সহিত গিজে প্রান্তরের প্রসিদ্ধ ও প্রকাণ্ড স্ফীঙ্কসের মুখের অদ্ভুত সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুত সিংহ-অবয়ব চিফ্রেনের প্রতিকৃতিই স্ফীঙ্কস-মূর্ত্তিতে ইতিহাসের অতীতকাল হইতে আপনার সমাধি পিরামিডের প্রহরায় মিশরের মরুময় প্রান্তরে আজও অচলভাবে বসিয়া আছে—পাছে শত্রু বা অত্যাচারীরা আসিয়া তাঁহার সমাধি-মন্দির ধ্বংস বা অপবিত্র করে। এই অপূর্ব্ব প্রহরী স্ফীঙ্কসের বিচিত্র পরিকল্পনাকে চিফ্রেনই যে প্রথম মূর্ত্তি দিয়া যান ও গিজের ঐ বিরাট মূর্ত্তিই যে মিশরের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদায়তন ও আদিম স্ফীঙ্কস তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই অপরূপ মূর্ত্তিটি কতকাল ধরিয়া কত দেশবিদেশের কতশত ভ্রমণকারীর অন্তরে এক অপূর্ব্ব মায়ামন্ত্র বিস্তার করিয়া কি গভীর বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছে ও তাহাকে অবলম্বন করিয়া শতশতাব্দী ধরিয়া কতশত বিচিত্র গল্পেরই যে সৃষ্টি হইয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কিন্তু আজ সে আর দুর্জ্জেয় নহে, তাহার গোপন কথাটি আজ আমরা জানিতে পারিয়াছি। এক-একটা স্ফীঙ্কস ভিন্ন ভিন্ন রাজার প্রতিমূর্ত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। বহু রাজার প্রতিমূর্ত্তি ও মামির মুখের সহিত বহু স্ফীঙ্কসের মুখের হুবহু সাদৃশ্য ধরা পড়িয়াছে। মাইসেরিনাসের পিরামিড-সন্নিহিত মন্দির হইতে তাঁহার বহু প্রতিমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হওয়াতে এই স্ফীঙ্কস্-সমস্যার মীমাংসা সহজ হইয়া পড়িয়াছে। মাইসেরিনাস্ খুব সম্ভবত চিফ্রেনের পৌত্র।

কিন্তু স্ফীঙ্কস-রহস্য অপেক্ষাও একটি গুরুতর রহস্য বর্ত্তমানে মিশরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের চিত্তকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে—সেটি হইতেছে মিশর-রহস্য। অর্থাৎ মিশরের সভ্যতা কোথা হইতে আসিল—উহা স্থানীয় কি অন্যদেশ হইতে আগত, এবং অন্য দেশাগত হইলে কোন সে দেশ যাহা জগতের প্রাচীনতম সভ্যতার জননী হইবার গৌরবের দাবী করিতে পারে?

মিশর দেশের প্রাচীন টুপি।

মিশরের সভ্যতা যে স্থানীয় সভ্যতা নয় তাহা স্থির। কারণ যতই তাহার পুরাতত্ত্বের আবিষ্কারের কার্য্য অগ্রসর হইতেছে ততই তাহার সভ্যতার পূর্ণতর ও সর্ব্বাঙ্গীন মূর্ত্তিই দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এখন প্রশ্ন—এ সভ্যতা কোথা

য়ুকাটান পেরু মেক্সিকো প্রভৃতি মধ্য-আমেরিকার দেশের টুপি। মিশরের টুপির সহিত ইহার প্রভেদ মাত্র এই যে, মিশরীরা আমেরিকার টুপিটাকে সামনের দিক পিছনে ও পিছনের দিক সামনে করিয়া উল্টাইয়া পরিয়াছে।

হইতে আসিল ও কে ইহা আনিল। এফ জে লী তাঁহার "বৃহত্তর দেশান্তর যাত্রা"য় (The Greater Exodus) লিখিয়াছেন,—"প্রাচীন মিশরীয় স্তূপাদিতে বিশেষতঃ সেসোষ্ট্রীসের দিগ্বিজয়-সম্পর্কিত যে-সকল চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়—এ পর্য্যন্ত সেগুলির মোটেই কোনোরূপ সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় নাই। এগুলি সব লালচর্ম্ম, শ্মশ্রুহীন ও মাথায় কতকটা আমেরিকার পেরুদেশে ব্যবহৃত প্রাচীন ধরণের টুপি-পরা একদল লোকের কীর্ত্তি।"

মিশররাজ দ্বিতীয় রামেসেসের মামি বা মৃতদেহ, ইহার উন্নত নাসা ও গণ্ড-অস্থি বা হনু প্রভৃতি আদিম আমেরিকা-বাসীদের অবিকল অনুরূপ।

বাস্তবিকই দ্বিতীয় রামেসিসের 'মামির' দিকে চাহিয়া দেখিলেই তাহার নাক, তাহার উঁচু চোয়ালের হাড়, আমেরিকার রেড-ইণ্ডিয়ানদের সহিত তাহার আশ্চর্য্য সামঞ্জস্যের কথা মনে জাগাইয়া তুলে।

সত্যসত্যই এই মিশর-রহস্যের হারানো চাবি আমেরিকার যুকাটান প্রদেশে আজ খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে। এই অমূল্য আবিষ্কারের জন্য যদি কেহ জগতের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের পাত্র হন—তো সে ডাক্তার ল্য প্লঁজিওঁ ও তাঁহার পত্নী। এই নূতন আবিষ্কারের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যে দেশকে আমরা অতি অর্ব্বাচীন স্থির করিয়া তাহাকে 'নূতন জগৎ' বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলাম, অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে একদিন সেই জগৎ পৃথিবীর আদিমতম সভ্যতার জনয়িতা বলিয়া প্রকাশ হইয়া পড়িবে। দুহাজার বৎসরেরও বেশী যে সত্য মানুষের কাছে গোপন রহিয়াছিল এবং দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ প্লেটো তাঁহার সুবিখ্যাত প্রশ্নোত্তরে (Dialogues) যে সত্যের আভাস দিয়াছিলেন—আজ অবশেষে তাহা সার্থকতার আলোকে সজীব হইয়া দেখা দিয়াছে।

হাজার হাজার বছর আগে মধ্য-আমেরিকায় যে জাতি বাস করিত, পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে আজ তাহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত মুছিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাদের যে-সকল ধ্বংসাবশেষ আজও বর্ত্তমান অছে তাহার মধ্যে পবিত্রপুরী 'চিচেন-ইটজার' ধ্বংসস্তূপই সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। তাহাও এতদিন গভীর জঙ্গলের মধ্যে গাছপালার ঘনান্তরালে লোকচক্ষুর অগোচরে ঢাকা পড়িয়া ছিল। মিশর ব্যাবিলন ও এসিরিয়ার সভ্যতার যখন সূচনা পর্য্যন্ত দেখা দেয় নাই এবং উহারা যখন অসভ্য বর্ব্বর জাতির লীলাস্থল ছিল মাত্র, তখন মধ্য-আমেরিকায় এক অপূর্ব্ব সভ্যতা প্রায় পূর্ণাবয়ব লাভ করে। চিচেনে আজও সেই অত্যুন্নত সভ্যতার বহুতর ধ্বংসচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। চিচেনে দুই মাইল স্থানের মধ্যে দুটি বিভিন্ন ধ্বংসস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমটিতে নয়টি, ও দ্বিতীয়টিতে সাতটি, সমাধি সৌধ মন্দির প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে।

ডাক্তার প্লঁজিওঁ ও তাঁহার পত্নী এই ধ্বংসাবশেষগুলির পর্য্যবেক্ষণ ও ইহার তথ্য আবিষ্কারের কার্য্যে প্রাণপণে ব্রতী হন। ডাক্তার প্লঁজিওঁর একটা পরম সুবিধার বিষয় এই ছিল যে যুকাটানের 'মায়া' ভাষায় তাঁহার পূরা দখল ছিল এবং সেইজন্যই তথাকার চিত্রময়ী ভাষায় লিখিত লিপির পাঠোদ্ধার করিতে তিনি সহজেই সমর্থ হইয়াছিলেন।

ঐ ধ্বংসস্তূপের সর্ব্বাপেক্ষা বড় অংশটি সাধারণতঃ 'সন্ন্যাসিনীনিবাস' (Nunnery) বলিয়া পরিচিত। উহা একটি বিচিত্র ও বিরাট ব্যাপার। প্রথমেই একটি আশ্চর্য্যজনক দৃশ্য লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সৌধটির

মালার তুলনামূলক চিত্রে দেওয়া হইয়াছে। তারপর চিত্রের চারিধারে যে ঢেউ-খেলানো চিহ্ন দেখা যাইতেছে উহার দ্বারা জল সূচিত হইয়াছে। অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাণ্ডটি অন্তহীন সলিল-রাশির উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু ঐরূপ তরঙ্গাকৃতি চিহ্নের দ্বারা মায়া ভাষায় 'ন' অক্ষরটি লিখিত হইয়া থাকে। মায়া ভাষায় ম.হ.ন. এই তিনটি অক্ষরের উচ্চারণ 'মেহেন'—ও ইহার অর্থ 'জনিত' 'উৎপাদিত' বা 'সৃষ্ট'। বিখ্যাত মিশরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত শাঁপোলিয়ঁ (Champollion) মিশরীয় ভাষায় ইহার ঐ একই অর্থ করিয়াছেন। মিশরের প্রথা অনুসারে এই ডিম্বটির স্বর্গীয় পবিত্রতা সূচিত করিবার জন্য ইহাকে যে নীলরঙে লিপ্ত করা হইয়াছিল তাহারও নির্ভুল প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই 'সন্ন্যাসিনীনিবাসের' উত্তর দিকে পঞ্চাশ ফুট চওড়া চল্লিশটি ধাপের একটি সিঁড়ির পাশে মিশরীয় সমাধির প্রাচীরগাত্রে অঙ্কিত চিত্রের মত ছবির চিহ্নও পাওয়া গিয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় ৩০০০ ফুট ব্যাপী দেয়ালের গায়ে একদিন যে চিত্রাবলী অঙ্কিত ছিল আজ তাহার অতি অল্প পরিমাণ চিহ্নই অবশিষ্ট আছে।

আমেরিকার প্রাচীন মায়া ভাষা ও প্রাচীন মিশরীয় ভাষার বর্ণমালার সাদৃশ্য বিচার। বাঁ দিকে মায়া-বর্ণমালা ও ডাহিনদিকে মিশরীয় বর্ণমালা প্রদর্শিত হইয়াছে।

সম্মুখের তোরণের খিলানের ঠিক উপরেই একটি অদ্ভুত তক্ষণকার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। এটিকে ভারতবর্ষের "মানবধর্ম্মশাস্ত্রে" বর্ণিত "সৃষ্টিতত্ত্বের" পরিকল্পনার একান্ত অনুগত চিত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য এই তত্ত্বটি প্রায় খৃঃ পূঃ ১৩০০ অব্দে মনুসংহিতায় সংগৃহীত হইবার বহুপূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষে পরিজ্ঞাত ও প্রচলিত ছিল। খিলানের এই সৃষ্টিতত্ত্বের দুই পার্শ্বে যে কয়েকটি অর্থজ্ঞাপক অক্ষর খোদিত আছে—আশ্চর্য্য এই যে, সেগুলি খাঁটি মিশরীয় অক্ষর! চিত্রটি হইতেছে এই—ব্রহ্মাণ্ড বা সৃষ্টির ডিম্বের চারিধার আঁসে ঘেরা, ও তাহার ভিতরে ষড়ৈশ্বর্য্যসূচক কিরণচ্ছটার বেষ্টনের ভিতর সৃষ্টির আদিবীজ নিহিত। এই কিরণচ্ছটার বাহিরে দুই পার্শ্বে মিশরীয় ভাষায় ম.হ.ন. এই তিনটি অক্ষর লেখা আছে। অক্ষরগুলির মিশরীয় রূপ মিশর ও মায়া ভাষার বর্ণ-

এই-সকল ধ্বংসাবশেষের মধ্যে 'কুনা' বা 'ঈশ্বরের আবাস' নামের ধ্বংসস্তূপটি বাস্তবিকই বিস্ময়জনক। ইহা একটি ঘরমাত্র—পশ্চিমদিকে মুখ এবং মাত্র একটি দ্বার। গাঁথিবার পূর্ব্বে পাথরের গায়ে বিচিত্র ভাবে খোদাই-করা কয়েকটি অক্ষরের সমন্বয়ে একটি প্রকাণ্ড ও অদ্ভুত জীবের মুখ গাঁথিয়া তোলা হইয়াছে। ইহার আকৃতিটা কতকটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের ধ্বংসপ্রাপ্ত একপ্রকার হস্তীর মত (mastodon)। এসিয়াখণ্ডে হাতীকে যেমন সম্ভ্রমের চক্ষে দেখা হয়, সেইরূপ প্রাচীনকালে য়ুকাটানেও ঐরূপ (আমেরিকার Pachyderm জাতীয়) একপ্রকার হাতী এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জীব বলিয়া বিবেচিত হইত। ঐ "ঈশ্বরের আবাসের" প্রাচীরগাত্রে তক্ষিত হস্তীমূর্ত্তিটির

নীচে 'স্বর্গীয় সৃষ্টিকর্ত্তা" এই কথাটি লিখিত আছে। এবং তাহার নীচে পূজা-ও-ভক্তি-জ্ঞাপক, মৌমাছির চাকের মত কয়েকটি ত্রিকোণাকার চিহ্ন খোদিত আছে। মায়া ও মিশরীয় উভয় জাতির নিকটেই উহার ঐ একই অর্থ।

আরও কয়েকটি ধ্বংসস্তূপ খননের ফলে প্রাচীন মিশরের মত সমাধি, পূজাবেদী ও নানাদ্রব্য এবং উপকরণ ইত্যাদি বাহির হইয়াছে। মিশরের সমাধিস্থানের উৎসর্গের বেদীর মত পনেরটি মূর্ত্তির উপর অবস্থিত সাড়ে ছয়ফুট লম্বা ও আট ইঞ্চি চওড়া একটি বেদী পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে উহা মেক্সিকোর জাতীয় যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে। ঐ বেদীটির পায়ার একটি স্ত্রীমূর্ত্তি বাস্তবিকই অতি কৌতুহল-

যুকাটানের চিচেন-ইটজা নামক স্থানের প্রস্তরখিলানে তক্ষিত সৃষ্টিতত্ত্ব ভারতীয় সৃষ্টিতত্ত্বের অনুরূপ ও কথা লিখিবার অক্ষর মিশরীয় অক্ষরের অনুরূপ।

জনক। তাহার সারা মুখটি অসংখ্য সাপে প্রায় আবৃত। ইহার অর্থ যে মূর্ত্তিটি একটি রাজবংশীয়া রমণীর। মায়ার রাজবংশের চিহ্ন ছিল সর্প। মিশরের রাজবংশের চিহ্নও যে সর্প, তাহাও কাহারো অবিদিত নাই। ইহার আরো একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে এই রমণীমূর্ত্তিটির কেশরাশি মুখের উপর একধারে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। মিশরে ইহার দ্বারা সধবাদের শোকের চিহ্ন সূচিত হয়। এই সৌধটির মূলদেশে আরো বহুবিধ চিত্র ও ভাস্কর্য্যে এবং টুপি প্রভৃতির আকারে মিশরের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা ধরা পড়ে।

অন্যান্য আরো ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যুবরাজ 'ক'য়ের

যুকাটানের একটি সমাধি-মন্দিরে বেদীর পায়ার নারীমূর্ত্তি। ইহার মাথার চুল আঁচড়াইয়া একপাশে ঝুলানো আছে; এরূপ করা শোকের চিহ্ন; প্রাচীন মিশরেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল।

স্মৃতিস্তূপ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই রাজকুমারের বিয়োগান্তক প্রণয়কাহিনীর সহিত মিশরের ইসিস্ ও অরিসিসের প্রণয়কহিনীর আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই গল্পটি কোনো-না-কোনো আকারে পৃথিবীর সকল জাতির ভিতরই প্রচলিত আছে। বাইবেলেও জেনিসিস খণ্ডের প্রথমাংশে ইভের প্রবঞ্চনার পর এই গল্পটির উল্লেখ আছে।

মিশরীয় গল্পের "প্রতীচ্য রাজ" অরিসিসের চিহ্ন হইতেছে চিতাবাঘ এবং তাহার পুরোহিতও নিজ পৌরোহিত্যের পোষাকের উপর সর্ব্বদা একটি চিতাবাঘের চর্ম্ম
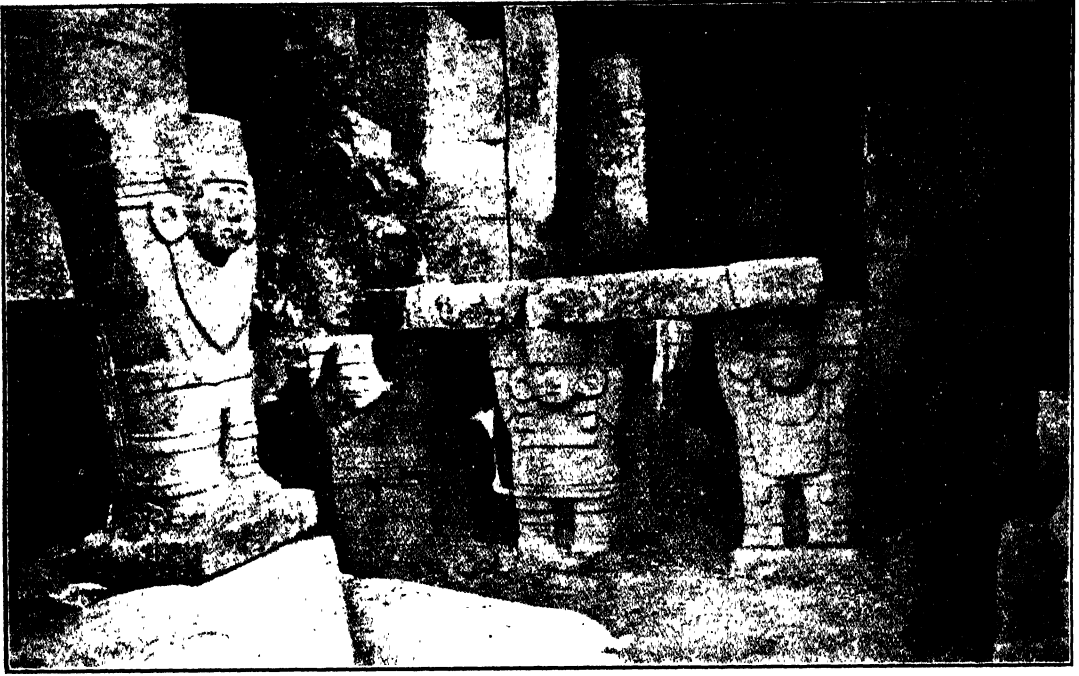
যুকাটানে আবিষ্কৃত অতি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পূজা-বেদী ও তাহার সর্পভূষণ নরমূর্ত্তির পায়া মিশরের সহিত ঘনিষ্ঠ ঐক্য সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে।

পরিধান করিয়া থাকেন। চিচেমের রাজকুমার 'ক'য়ের নামের অর্থও চিতাবাঘ। মিশরের অরিসিসের দুই ভগিনী ছিল—একজনের নাম 'মাউ' বা 'ইসিস', অপরের নাম 'নিকে'। রাজকুমার 'ক'য়েরও দুই বোন ছিল—এক জনের নাম 'মু' ও অপরের নাম 'নিকে'। 'মাউ' বা ইসিসের সহিত অরিসিসের প্রণয়সঞ্চার হয় এবং 'মু'ও যুবরাজ 'ক'য়ের প্রণয় আকর্ষণ করেন। উভয় প্রণয়ের ফলেই এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। মিশরের স্ফীঙ্কস্-মূর্ত্তিটি 'ইসিস' ও 'অরিসিসের' মন্দিরের মাঝখানে তাহাদের প্রণয়-জাত সন্তান 'হর' কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। 'মাউ' ও 'ক'য়ের সন্তানের নাম 'হাল'। 'হাল' নামটি অনেকটা 'হরের'ই কাছাকাছি। মায়া ভাষায় 'র' নাই। তাহার স্থানে সচরাচর 'ল'ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রাজকুমার কয়ের সমাধির উপরিভাগেও একটি স্ফীঙ্কসমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে—দেহটা তাহার চিতাবাঘের ও মুখটা মানুষের মুখের মত।

প্রাচীনকালে রাজবংশের পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য মিশরের মত যুকাটানেও ভ্রাতা ভগ্নীর বিবাহের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। ক্লিওপেট্রারও বিবাহ হইয়াছিল তাঁহার ভ্রাতার সহিত।

তবে মিশরের প্রণয়কাহিনীটির সহিত এখানকার প্রণয়-কাহিনীটির এইটুকু মাত্র প্রভেদ যে 'মু'র প্রণয় লাভে হতাশ 'ক'য়ের অপর একটি ভ্রাতা বিদ্বেষবশতঃ প্রতিদ্বন্দ্বী 'ক'কে হত্যা করে।

মায়া ভাষায় 'মু'র অর্থ—বিচিত্র বর্ণের টিয়াপাখী। আশ্চর্য্য এই যে মিশরীয় গল্পটিতে 'মাউ' বা 'ইসিস'কে বার বার নানা বর্ণের পালকে খচিত বসনে ভূষিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এইরূপে আরো নানা বিষয়ে এই বিপুল ব্যবধানের দুটি মহাভূমির প্রণয়কাহিনীর মধ্যে আশ্চর্য্যরূপে সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজকুমার 'ক'য়ের সমাধি খনন করিয়া প্রায় বিয়াল্লিশ মন ওজনের একটি বিরাট পাথরের মাথা পাওয়া গিয়াছে। তাহার সঙ্গে দুটি গুরুভার পাথরের পাত্রও ছিল। একটির ভিতরে চিতাভস্ম ও অপরটির ভিতরে একটি বহু

মেক্সিকো দেশের স্ফীঙ্কস্।
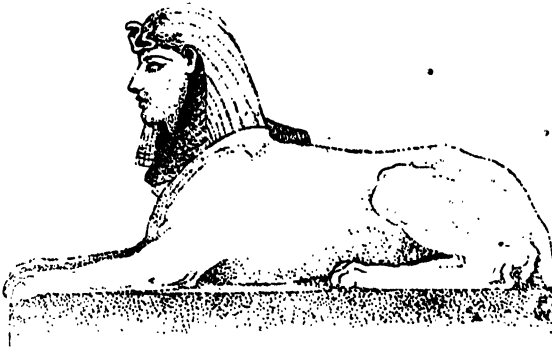
মিশর দেশের স্ফীঙ্কস্।

প্রাচীন শুষ্ক জৈবিক পদার্থ পাওয়া যায়। রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে যে উহা মানুষের হৃদ্‌পিণ্ড। প্রাচীন মিশরেও এইরূপ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল।

বহুদিনের খনন ও পরিশ্রমের ফলে একটি বিরাট অর্দ্ধ-শয়ান প্রস্তরমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভূগর্ভ হইতে সেটিকে তুলিবার জন্য ষোলো জন লোকের প্রবল শক্তির প্রয়োজন হয়। সমাধিটি খনন করিতে করিতে আরও একটি প্রকাণ্ড আধার বাহির হয়। তাহার ঢাকনীটি তুলিতে চারিজন লোকের দরকার হইয়াছিল। তাহার ভিতরে চিতাভস্ম ও একটি ছোট স্ফটিক-প্রস্তর রত্নাদি ও সবুজ ধাতুময় একপ্রকার পদার্থ প্রভৃতি আরও অনেকগুলি জিনিস পাওয়া গিয়াছে। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে উহা একজন ভবিষ্যৎবাদী সাধুর সমাধি ছিল। কারণ ভবিষ্যৎ-বাদীদিগের স্ফটিকের দ্বারা নানা বিষয় নির্ণয় করিবার প্রথা স্মরণাতীত যুগ হইতে প্রচলিত আছে। আধারটির সম্মুখে দুটি বর্শাফলক উহার দিকে মুখ করিয়া শায়িত ছিল এবং তাহাদের ঠিক মধ্যস্থলেই একটি কুম্ভীর-শাবকের কঙ্কাল সযত্নে রক্ষিত। মিশর দেশেও কুম্ভীর অতি পবিত্র জীব বলিয়া গণ্য হইত। ঐ ভস্মের আধারটির চারি পাশে বিচিত্র আকারে সজ্জিত দ্বাদশটি প্রস্তর-গঠিত সর্পের মাথা পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের প্রত্যেকের মাথায় অগ্নিশিখাকৃতি একটি চূড়া আছে। ইহার অর্থ যে কি তাহা বর্ত্তমানে সঠিক নির্দ্ধারণ করা কঠিন। ইহাদের প্রত্যেকের মাথায় রাজকীয় চিহ্নসূচক দুইটি করিয়া শৃঙ্গ আছে। স-শৃঙ্গ সাপ মিশরেও রাজকীয় চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হইত। ডাক্তার প্লঁজিওঁর আবিষ্কারের ফলে জানা গিয়াছে যে অতি প্রাচীনকালে মায়া দেশে এক রাজবংশ রাজত্ব করিত—তাহাদের উপাধি ছিল, 'কান' (Can)। মায়া ভাষায় 'কান' কথার বহু অর্থ আছে—তাহার মধ্যে একটি —সর্প। বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের যেমন সিংহ, রুষের ভল্লুক এবং জার্ম্মানী অষ্ট্রিয়া ইটালি ও আমেরিকার ঈগল পক্ষী ধ্বজচিহ্ন, সেইরূপ সর্প তাহাদের রাজকীয় চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হইত।

অতি প্রাচীনকাল হইতে সর্প অতি ধূর্ত্ত বুদ্ধিমান ও পবিত্র জীব বলিয়া পরিগণিত হইত। বাস্তবিকই 'কান' ধাতু হইতেই শক্তি বুদ্ধি জ্ঞান প্রভৃতি অনেক কথারই উৎপত্তি হইয়াছে। ইংরেজী কথা 'can'এর মূলেও ঐ শক্তির কথা। এখনও প্রাচ্য জগতের বহু নৃপতিই খাঁ নামে অভিহিত হন এবং তাঁহাদের ধ্বজায় প্রায়ই সর্প ড্র্যাগন প্রভৃতি আজও অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। সেদিন পর্য্যন্ত অর্থাৎ স্পেন কর্ত্তৃক আমেরিকা জয়ের সময়েও মায়া দেশ "বিরাট সর্পের দেশ" বলিয়া কথিত হইত।

মায়া ও মিশরীয় ভাষায় আশ্চর্য্য মিল দেখিতে পাওয়া যায়, অক্ষরগুলি প্রায় সবই এক। ব্যাকরণের নিয়মগুলিও প্রায় একরূপই। মিশরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মতে যাহা আসল মিশরীয় ভাষা তাহার তিন ভাগের এক ভাগ খাঁটি মায়া ভাষা। আরও একটি মজার বিষয় এই যে গ্রীক ভাষায়ও অনেক মায়া ভাষার ধাতু দেখিতে পাওয়া যায়—পণ্ডিতবর ব্রাসিউর দে বুর্বুর্গ (Brasseur de Bourbourg) তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। মায়া দেশে ক্রুশের চিহ্ন জল-দেবতার সঙ্কেতরূপে ব্যবহৃত হয়, ইহার কারণ সাদৃশ্য

ক্রশ নক্ষত্রপুঞ্জ বরাবরই আসন্ন বর্ষার, ও প্রখর গ্রীষ্মের পর নবজীবনের সূচনা করিয়া থাকে। মিশর দেশেও নবজীবনের চিহ্নরূপে ইহা মামিদের হাতে ও বুকে রাখিয়া দেওয়া হয়। গ্রীক জলদেবতা নেপচুনের ত্রিশূল ও হিন্দুর মহাদেবের ত্রিশূল অনেকটা ক্রশেরই রূপান্তর।

বৃষ্টি না হইলে মিশরে যেমন কুমারীদিগকে নীলনদে নিক্ষেপ করিবার প্রথা ছিল, মায়াদেশেও সেইরূপ অনাবৃষ্টি হইলে কুমারীদিগকে একটি নির্দ্দিষ্ট পবিত্র কূপে বলি দেওয়া হইত।

অন্যান্য অনেক দেবদেবতার পূজার সঙ্গে মায়া জাতি মিশরীয়দের মত এক নিরাকার ভগবানেরও আরাধনা করিত।

মায়া ও মিশর উভয় দেশেই জুলাইয়ের মাঝামাঝি হইতে নূতন বৎসর আরম্ভ হয় এবং উভয়েরই বৎসরের মধ্যে পাঁচটি অতি খারাপ দিন আছে। সে দিনে তাহারা কোনো কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিবে না।

মিশরীয়দিগের মধ্যে একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে কুমারের চাকের সাহায্যে ও মৃত্তিকার উপাদানে মানুষ গঠিত হইয়াছে। স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে রক্ষিত 'টোরানো' নামক প্রাচীন মায়া গ্রন্থের কয়েকটি চিত্রে এই ধারণাটি চিত্রিত দেখিতে পাওয়া যায়।

অস্ত্রশস্ত্র ধ্বজচিহ্ন ও পোষাক প্রভৃতি সকল বিষয়েই এই উভয় দেশবাসী লোকের ভিতর একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়। উভয় জাতির লোকেই সাধারণতঃ সাদা সূতার কাপড় পরিত ও উভয় জাতিই অতি নিপুণ রঞ্জক ছিল।

নীল নদীর তীরবর্ত্তী স্থানে গেলেই যেমন মাদুলী-গলায় উলঙ্গ ছোট ছেলের দল দেখিতে পাওয়া যায়, য়ুকাটানেও ছেলেদের ডাইনী প্রভৃতির দৃষ্টি হইতে ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য তাহাদের রক্ষা-কবচ পরাইয়া দেওয়া হইত।

উভয় জাতিরই বসিবার মোড়া, সম্ভ্রম জানাইবার ভঙ্গি ও ধরণ ঠিক একরূপই। এমনকি মিশরে যেমন বাচ্ছা কুকুরদের ল্যাজ পাকানো করিবার জন্য তাহাতে গিরা বাঁধিয়া দেওয়া হয়—মায়া দেশেও এই অবিকল রীতিটি প্রচলিত আছে।

মায়া কথাটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে নিম্নলিখিত অর্থ দাঁড়ায়। মা—(স্থান, ভূমি, মাটি) য়—(ইহা 'য়িটেল' কথার সাঁট, অর্থ—'সহ') আ (া)—(জল)। অর্থাৎ 'জল সহ ভূমি'। মায়া কথার এই যদি অর্থ হয় তাহা হইলে কোনো দেশের ইহা অপেক্ষা ভালো নাম আর কিছু আছে কি না সন্দেহ।

এককালে মিশর ও য়ুকাটানে যে একটা অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল তাহা সমর্থন করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটিতে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। কেননা তাহা না থাকিলে এই যোজনব্যাপী ব্যবধানের দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের মহা-দেশে ঠিক একই সভ্যতা, রীতি নীতি আচার ব্যবহার, ও স্থাপত্য-পদ্ধতির উদ্ভব হইতে পারে না। খুব সম্ভব, যে বিরাট সভ্যতা মিশর দেশের অতিকায় পিরামিড-রাজিতে আপনাকে বিপুল গৌরব ও গরিমার সহিত প্রকাশ করিয়া গিয়াছে, য়ুকাটান তাহারই শৈশবের মাতৃক্রোড় ও ক্রীড়া-ভূমি ছিল।

এখনও য়ুকাটানে অনেক আশ্চর্য্যজনক আবিষ্কারের প্রবল সম্ভাবনা নিহিত আছে। যে-সকল পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতরা ব্যাবিলন এসিরিয়া ও মিশরের ধ্বংসাবশেষের নূতনতর তথ্যের অনুসন্ধানের জন্য নিজেদের জীবনব্যাপী সাধনা ও শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন তাঁহারা সেই উদ্যম লইয়া যদি মেক্সিকোর বনভূমিতে গিয়া অবতীর্ণ হন তাহা হইলে সেখান হইতে এখনও এমন বহু নূতন সত্য উৎখাত হয় যাহা নিমেষে হয়তো পৃথিবীকে বিস্ময়াভিভূত করিয়া দিতে পারে।

শ্রীক্ষীরোদকুমার রায়।

অভিব্যক্তি

শুক্তিপুটে মুক্তাসম, সুপ্ত নয়নের সমাহিত আলোকের প্রায়,
প্রেমের বসতি বন্ধ অলক্ষ্যে নিয়ত, নিশিদিন গোপন হিয়ায়,
অগাধ করিয়া ভেদ, আসে যদি কভু, অতলের সম্পদ-প্রেমিক,
জাগাতে নিদ্রিত আঁখি জাগে যদি আলো তেজোময়পূর্ণ অতুল নির্ভীক,
শুক্তি দেয় মুক্তা তার, উন্মুক্ত নয়ন আলোকের আনে প্রতিদান,
সিন্ধুর রহস্য ব্যক্ত, নব জীবনের শুভ গ্রহে আসে অভিজ্ঞান।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

রঙের ছোপ

সদ্য বিবাহের পর সান্ত্বনা ও সুবিমল অরসিকের আনাগোনার ভয়ে একেবারে পরিচিতের রাজ্য ছাড়িয়া সটান ভুটানে পলায়ন করিয়াছে। সেখানে তাহারা এ উহার সঙ্গী, তাহাদের অবিচ্ছিন্ন মিলনের মধ্যে কোনো সৎপ্রসঙ্গ আলোচনার উপদ্রবের ভয় কিছুমাত্র নাই। তাহারা দুজনে দাণ্ডিতে চড়িয়া পাহাড়ীদের কাঁধে কাঁধে একস্থান হইতে অপরস্থানে নিজেদের ডেরা-ডাণ্ডা নাড়িয়া বেড়ায়—দুদিন কোথাও স্থির হইয়া থাকে না; ভয়, পাছে কেহ আলাপ জমাইয়া শেষে তাহাদিগকে পাইয়া বসে।

একদিন এক গ্রামে গিয়া শুনিল সেখানে একটি বাঙালী আছে। বাঙালীর নামে সুবিমল চমকিয়া উঠিল। সান্ত্বনা বলিল—আর এক দণ্ড এখানে থাকা নয়! সর্ব্বনাশ! অবাঙালীর দেশে বাঙালীর কবলে পড়ার চেয়ে বাঘের কবলে পড়িলেও রক্ষার তবু সম্ভাবনা আছে!

পাহাড়ীরা বলিল—ভয় নাই; সে ভকত মানুষ, মৌনী, রাতদিন দেবী-পূজন করে, কখনো কাহারো সহিত একটিও কথা বলে না।

সান্ত্বনা ও সুবিমল আরামের নিশ্বাস ফেলিল। কিন্তু সাবধানের মার নাই মনে করিয়া সেখানে না থাকাটাই স্থির করিল। সেই ভুটানীদের দেশে নির্ব্বাসিত বাঙালী বেচারা বাধ্য হইয়াই হয়ত মৌনী হইয়াছে; বাঙালী দেখিলেই তাহার এতকালের বেকার রসনা বশ না মানিতেও পারে চাই কি।

ভুটানীরা কিন্তু অভয় দিল যে সে বাঙালী বটে কিন্তু ভারি সাধুপুরুষ! রাতদিন দেবীপূজন করে, ঘর হইতে বাহির পর্য্যন্ত হয় না। উহাকে তাহারা মৌনী ভকত বলে। এই মৌনী ভকতকে একবার দর্শন না করিয়া বাবু সাহেবের যাওয়া হইতেই পারে না।

সুবিমল বড় বিপদেই পড়িল। হতভাগা বাঙালীটা মরিবার আর জায়গা পায় নাই!

সান্ত্বনার কৌতূহল হইতেছিল। বলিল—চলই না একবার দেখেই আসি, এত করে এরা বলছে।

দেখবে আর কি ছাই! ছাই ভস্ম মেখে জটা পাকিয়ে বসে আছেন এক বুজরুক; বোমার মামলার ফেরারী আসামী টাসামী হবে। ভেড়াগুলোকে ঠকিয়ে দিব্যি সুখে স্বচ্ছন্দে খাচ্ছে দাচ্ছে আছে।

তবু চল একবার দেখাই যাক।

মরীয়া হইয়া সুবিমল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—চল।

একখানি পর্ণকুটিরে ঢুকিয়াই সুবিমল চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—এ যে তোমার ছবি!

একখানি প্রমাণ-সই চিত্রকে পাহাড়ী ফুলের অঞ্জলিতে অঞ্জলিতে সাজাইয়া একটি লোক একদৃষ্টে সেই চিত্রের আনন্দময়ী সুন্দরীর মুখের দিকে তাকাইয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে। সুবিমলের চীৎকারেও তাহার ধ্যানভঙ্গ হইল না।

সান্ত্বনা সুবিমলের হাত ধরিয়া বিষণ্ণ মৃদুস্বরে মিনতি ভরিয়া বলিল—চলে এস।

ও সেই বোবা চোরটা!

এস তুমি।—সান্ত্বনা সুবিমলের হাত ধরিয়া বাহির হইয়া গেল।

এত গণ্ডগোলেও মৌনী ভকতের অপলক দৃষ্টি ছবি ছাড়িয়া একবারও ফিরিয়াও তাকাইল না যে তাহার দ্বারে আসিয়া কে আবার চলিয়া গেল।

সান্ত্বনার যখন বিবাহ স্থির হইল তখন তাহার বাবা শ্রীমন্ত বাবু তাঁহার একমাত্র কন্যাকে পরের ঘরে বিদায় দিবার আগে তাহার একখানি প্রমাণসই অবিকল ছবি আঁকাইয়া লইবার সঙ্কল্প করিলেন। চিত্রকর যে নিযুক্ত হইল সে কালা বোবা। বিবাহের আর চারমাস মাত্র দেরী আছে; তিন মাসে ছবি শেষ করিয়া দিতে হইবে। রোজ পাইবে সে দশ টাকা।

বোবা চিত্রকর রোজ আসে; ইজেলের সামনে টুলে বসিয়া একদৃষ্টে সান্ত্বনাকে দেখে, আর নরম তুলিতে পটের উপর রঙের পর রং বুলাইয়া তাহার রূপ, কলিকা হইতে ফুলের মতো, অল্পে অল্পে সুষমা সৌন্দর্য্যে ভরিয়া ফুটাইয়া তোলে। সান্ত্বনার পায়ের কাছে কাত হইয়া বসিয়া বসিয়া অবিরাম বকিয়া যায় সুবিমল এবং থাকিয়া

থাকিয়া সান্ত্বনার মুখে খেলিয়া যায় ক্ষণপ্রভা হাসি, আর বোবা কালা চিত্রকর চিত্রে ফুটাইয়া তোলে অনিন্দ্য লীলায় শ্রী ও হ্রীর অপরূপ হিল্লোল। রসের আবেশে ভুলের ভরে সান্ত্বনার মুখ একটু ফিরিয়া গেলে বোবা চিত্রকর নীরবে টুল ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়া সান্ত্বনার সম্মুখে দাঁড়ায়, দৃষ্টিতে মার্জ্জনার প্রার্থনা ভরিয়া ধীরে ধীরে তাহার মুখখানি ধরিয়া ঘুরাইয়া দ্যায়; গায়ের কাপড় পায়ের আঁচল একটুখানি সরিয়া গেলে সে তাহা স্তরে স্তরে কুঞ্চিত করিয়া ঠিক করিয়া দিয়া যায়। বোবার মনের ভাবের-কাঁপন তাহার আঙুলের ডগে সান্ত্বনা টের পায়; সান্ত্বনার মুখে যে লজ্জিত কুণ্ঠার অপূর্ব্ব শ্রীটি ফুটিয়া উঠে বোবা তাহা প্রাণের রং দিয়া ছবিতে আঁকে।

এমনি করিয়া তিনমাসে ছবি সম্পূর্ণ হইয়া উঠিল। যে দেখিল সেই বলিল সান্ত্বনার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের সহিত তাহার অন্তরের নারীমূর্ত্তিটিও ছবির রঙে বন্দী হইয়াছে। শ্রীমন্ত বাবু মহাখুসী। হাজার টাকার নোট লইয়া চিত্রকরকে বকশিশ দিতে গেলেন। চিত্রকর ঘাড় নাড়িয়া হাত নাড়িয়া বুঝাইতে চাহিল ছবি এখনো শেষ হয় নাই, কাজ এখনো বাকী আছে। টাকা এখন সে লইবে না।

অবাক করিল বোবাটা! এখনো বাকী কি? অবিকল ছবি ত হইয়াছে।

না, এখনো হয় নাই।

হয় নাই? তিন মাস চুক্তির মেয়াদ ত উতরিয়া গেল?

অক্ষম আমি, চুক্তির সময়ের মধ্যে শেষ করিয়া উঠিতে পারি নাই।

শ্রীমন্ত বাবুর বিজ্ঞ বন্ধুরা বলিল—বোবাটার বেশী টাকা লইবার ফন্দী।

চিত্রকর লিখিয়া জানাইল—বেশী কিছু সে চাহিবে না।

বিজ্ঞগণ বলিল লিখিয়া দিয়াছে, দলিল রহিল।

চিত্রকর বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে রঙের তক্তার ফুটো পরাইয়া সরু মোটা এক গোছা তুলি ধরিয়া টুলের উপর বসিয়া বসিয়া সান্ত্বনার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। সুবিমলের রসের কথায় চাপা হাসি হাসিতে গেলে সান্ত্বনার গালে আর চিবুকের মাঝে যে টোলটি পড়ে তাই একটু একটু করিয়া ছবিতে সে ধরে। হাতের মণিবন্ধে আর আঙুলের পাশে জোড়া তিলটি তাহার দৃষ্টি এড়ায় না—রং-ভরা তুলির চুম্বন যত্নে সেটি চুনিয়া রাখে।

বিজ্ঞগণ গম্ভীর ভাবে বলিল—বাজে!

শ্রীমন্ত বাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—আমার সান্ত্বনার জন্যে সান্ত্বনা-মাকে চার মাস কয়েদ খাটালাম! ঠায় এক-জায়গায় আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকা!

সান্ত্বনা আড় চোখে সুবিমলের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—আমার কিচ্ছু কষ্ট হয়নি বাবা! ... ছবিটা কি বাবা ঠিক আমার মতন হয়েছে?

অবিকল! তোর গালের টোলটি, হাতের তিলটি পর্য্যন্ত! হঠাৎ মনে হয় তুইই মা যেন এই বুড়ো বাপকে হাসিমুখে সান্ত্বনা দিচ্ছিস! তুই আর আমায় একেবারে ছেড়ে যেতে পারবিনে!

বৃদ্ধের চোখ ছলছল করিতে লাগিল। সুবিমল অপরাধীর ন্যায় মাথা নত করিয়া কার্পেটের নক্সায় আঙুল বুলাইতে লাগিল। সান্ত্বনা কথাটা পাল্টাইবার জন্য তাড়া-তাড়ি বলিল—চিত্রকর কালা বোবা, কিন্তু বেশ ওস্তাদ দেখছি!

কালা বোবা বলেই ও সকল প্রাণ দিয়ে ছবির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। ও নিজে বঞ্চিত কিনা তাই বোধহয় ও আমার মনের ভাবটা ঠিক ধরতে পেরেছিল।

শ্রীমন্ত বাবু কাগজে লিখিয়া চিত্রকরকে জানাইলেন—কাল সান্ত্বনার বিবাহ, আর দেরী করিলে চলিবে না।

আর দেরী হইবে না; কাল ছবি সম্পূর্ণ হইবে।

বিবাহের পর শ্রীমন্ত বাবু ও তাঁহার পত্নী এবং তাঁহাদের আত্মীয় বন্ধুগণ বর ও বধূকে লইয়া ঘরে ঢুকিয়াই চমকিয়া বলিয়া উঠিলেন—ছবি!

ছবির পটখানি নাই। ইজেলের উপর শূন্য বাহু মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে শুধু তাহার কঙ্কাল কাঠামোখানা!

চিত্রকর! চিত্রকর! কোথায় সে?

বিবাহের সময় সে ছিল, এখন তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

শ্রীমন্ত বাবু গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—তবে সে-ই চোর! পুলিশে শিগগির খবর দাও!

সান্ত্বনা অগ্রসর হইয়া আসিয়া বাবার হাত ধরিয়া ধীর মৃদু স্বরে বলিল—সে ত বাবা এক পয়সাও নেয়নি।

বিজ্ঞগণ বলিল—ছবিখানা উতরে গিয়েছিল ভালো, বেচে বেশী দাঁও মারবার মতলব। দাও পুলিশ লেলিয়ে!

সান্ত্বনা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীর মৃদু স্বরে বলিল—আজ শুভ উৎসবের দিনে কারো অনিষ্ট কোরো না বাবা!

শ্রীমন্ত বাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। শুভ উৎসব সকলের কাছেই বড় ম্লান নিরানন্দ মনে হইতে লাগিল। কি একটা বোবা দুঃখ সান্ত্বনার মনের মধ্যে রক্তের ফোঁটার মতো চুঁয়াইয়া জমা হইতেছিল।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রেমের অমরতা

আপনি অমর হব, তোমায় করব অমরী,
ওগো আমার হৃদ্‌কমলের মুগ্ধা ভ্রমরী।
নীহারিকার প্রাণের কথা, লক্ষযুগের স্বপন-ব্যথা
বিশ্বভুবন-মৃণাল-শিরে উঠল ফুটিয়া,
আমার হৃদয়পদ্ম পড়ে শোভায় লুটিয়া।
এই যে সফলতার বেদন আপনারে এই নিবেদন
এই যে ক্ষুদ্র আমার মাঝে আপন পিরিতি
এ যে অসীম ভবিষ্যতের আশা-সুদূর-স্মিরিতি।

হৃদয় আমার পাখার মত সুবাস বিথারি
এক নিমিষে ছুট্‌ল কোথা অসীম-বিহারী;
সকল গ্লানি সকল মরণ কেমনে কে করল হরণ
সঞ্চারিল গোপন সুধা মর্ম্মকুহরে,
ভেসে গেল মরণ-ফেনা জীবন-লহরে।
তোমার ব্যাকুল গুঞ্জরণ সে কেমন করে লাগে
কোন্ পাতালের ভোগবতী পরাণে মোর জাগে।
ডুবে' মরি' অতল নীরে উঠি চির-জীবন-তীরে
তোমার প্রেমে অমর তোমায় করব অমরী,
ওগো আমার হৃদ্‌কমলের মুগ্ধা ভ্রমরী।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

ভাল্লুক

(রুষ গল্প)

১৮৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সহরে একটা ভয়ানক হৈচৈ পড়িয়া গেল। গবর্ণমেণ্ট হইতে ভাল্লুক বধ করিবার যে হুকুম জারি হইয়াছিল তাহা তামিল করিবার সময় আসিয়াছে।

চারিদিক হইতে ডুগডুগিহাতে বাজীকরের দল ছাগল-ঘোড়া-ভাল্লুক-সমেত সারা সংসারটি ঘাড়ে করিয়া বিষণ্ণ মনে সহরে সমবেত হইতেছিল।

সহরে প্রায় শতাধিক ভাল্লুক জড়ো হইয়াছে। তার মধ্যে এতটুকু বাচ্ছা হইতে আরম্ভ করিয়া বয়সের পরিপক্কতায় গায়ের রং কটা হইয়া গেছে এমনধারা প্রকাণ্ড-চেহারা বুড়ো ভাল্লুক পর্য্যন্ত—সব রকমের ভাল্লুকই ছিল।

রাজসরকারের মেয়াদ ছিল—পাঁচ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে আর কেহ ভাল্লুক লইয়া খেলা দেখাইতে পারিবে না। সে মেয়াদ এইবার ফুরাইয়াছে। এখন সকলকে নিজের নিজের ভাল্লুক লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমবেত হইতে হইবে এবং নিজের হাতে তাদের বধ করিতে হইবে।

ডুগডুগি-হাতে ছাগল-ভাল্লুক-সঙ্গে বাজীকরের দল তাদের শেষ-ঘোরা শেষ করিয়াছে। এই শেষ বারের মতো গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দূরে মাঠের মধ্য হইতে তাদের সাড়া পাইয়া উর্দ্ধশ্বাসে তাদের দিকে ছুটিয়া গিয়াছে এবং সবাই মিলিয়া মহা গণ্ডগোল করিতে করিতে গ্রামের মধ্যে তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া আনিয়াছে। সেখানে একটা রীতিমত মেলা জমিয়া গিয়াছিল।

সে কী মজা!—যেন একটা মহোৎসব! ভাল্লুকেরা নিজ নিজ কেরামতি দেখাইতে লাগিয়া গেছে;—নাচিতেছে, ধ্বস্তা-ধ্বস্তি করিতেছে, ছেলেরা কেমন করিয়া খাবার চুরি করিয়া খায় তাহা দেখাইতেছে। যুবতীর ঢলঢলে গতি, বুড়ীর থপথপে চলা, এঁকে-বেঁকে চলা একেবারে অবিকল নকল করিতেছে। এই শেষ বারের মতো, মামুলী পুরস্কার তাড়ির ভাঁড় তাদের হাতে দেওয়া হইয়াছে;—তাহারা দুপায়ে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া ভাঁড়টাকে বড় বড় নখওয়ালা থাবা দিয়া ধরিয়া ঘাড়টা পিছন দিকে নীচু করিয়া গলার মধ্যে ঢক্‌ঢক্ করিয়া তাড়ি ঢালিতেছে। ভাঁড়

শেষ হইয়া গেলে জিব দিয়া ঠোঁটটা একবার মুছিয়া লইতেছে তারপর তৃপ্তির উচ্ছ্বাসে একটা অদ্ভুত রকমের শব্দ করিয়া গভীর নিশ্বাস ছাড়িতেছে।

এ সুযোগ ইহজীবনে আর মিলিবে না! যত বুড়োবুড়ি তাদের নাছোড়বান্দা ঘ্যান্‌ঘেনে রোগ সারাইবার জন্য ভাল্লুকের শরণাপন্ন হইয়াছে। এ একেবারে অব্যর্থ! বহু পরীক্ষিত! ভাল্লুকের স্পর্শ—যত বড় দুরারোগ্য রোগ হোক না কেন, নিশ্চয় আরাম করিবে। গ্রামবাসীদের দ্বারে দ্বারে ভাল্লুক লইয়া বেড়ানো হইতেছে। ভাল্লুক যার ঘরের দরজা ঠেলিয়া দয়া করিয়া একবার প্রবেশ করিতেছে তার সৌভাগ্য যে-ঘরে বাঁধা এ তো ধরা কথা! সকলে তার শুভসূচনায় আনন্দ-কোলাহল করিয়া উঠিতেছে। কিন্তু অনেক সাধ্যসাধনা করিয়াও যে-ঘরে ভাল্লুকের শুভাগমন হইতেছে না সে গৃহস্থ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িতেছে;—তার অমঙ্গল-আশঙ্কায় আর সকলে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছে।

সে-দিন সকাল হইতেই মেঘ করিয়া আছে। মধ্যে মধ্যে এক এক পশলা বৃষ্টিও হইতেছে। পথে কাদা। এ সব অসুবিধা সত্ত্বেও সহরের ছেলেবুড়ো স্ত্রীপুরুষ সকলেই যেদিকে ভাল্লুক মারা হইবে সেইদিকে ছুটিয়াছে। সহর প্রায় শূন্য। যত যানবাহন ছিল কোনোটারই অবসর নাই। সবগুলো বাজীকরদের আড্ডার দিকে দৌড়িয়াছে। লোক বোঝাই করিয়া সেখানে আনিয়া ফেলিতেছে, এবং আবার নূতন বোঝাইয়ের জন্য সহরের দিকে ছুটিতেছে। বেলা দশটার মধ্যে সহরের যত লোক ঝাঁটাইয়া সেখানে উপস্থিত হইল।

বাজীকরের দল হতাশে একেবারে মুহ্যমান। তাহাদের তাঁবুর মধ্যে আর সাড়াশব্দটি নাই। পাছে এই ভীষণ হত্যাকাণ্ড চোখের সম্মুখে ঘটে সেই ভয়ে কাচ্ছাবাচ্ছা লইয়া মেয়েরা তাঁবুর ভিতর লুকাইয়া পড়িয়াছে। পুরুষেরা কেমন একটা উত্তেজিত ব্যস্ততার সহিত শেষ কাজের সব বন্দোবস্ত করিতেছিল। ঠেলাগাড়িগুলো তাহারা বধ্যভূমির এক কিনারায় টানিয়া আনিয়াছে এবং তাহার ডাণ্ডায় ভাল্লুকগুলোকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

সহরের কোতোয়াল ঐ হতভাগ্যদের সারের সমুখ দিয়া একবার চলিয়া গেল। ভাল্লুকগুলা বেশ একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সবই তাদের চোখে কেমন নূতন ঠেকিতেছিল। অদ্ভুত রকমের আয়োজন, অসম্ভব জনতা, একসঙ্গে এত ভাল্লুকের ভিড়—এই সমস্ত ব্যাপার তাদের মধ্যে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি করিতেছিল। গলায়-বাঁধা শিকলটার উপর তারা এক-একবার হেঁচকা মারিতেছিল; একএকবার সেটা সজোরে কামড়াইয়া ধরিতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে একটা অর্দ্ধস্ফুট গর্জ্জন করিয়া উঠিতেছিল। বৃদ্ধ আইভান রাগের ভরে বাঁকিয়া তাহার সেই প্রকাণ্ড ভাল্লুকটির সামনে দাঁড়াইয়া ছিল; কাছে তাহার পুত্র—আধা-বয়সী, কাঁচায় পাকায় চুল—এবং তাহার পৌত্র, ভয়ঙ্কর মুখ এবং রক্তবর্ণ চক্ষু লইয়া ভাল্লুকটিকে বাঁধিতেছিল। কোতোয়াল সাহেব এই তিন প্রাণীর কাছ-ঘেঁসিয়া আসিয়া হুকুম দিল—"ব্যস্! এইবার কাজ সুরু করতে বল।"

একটা উত্তেজনার প্রকাণ্ড ঢেউ দর্শকমণ্ডলীর উপর দিয়া খেলিয়া গেল। মুহূর্ত্তের মধ্যে কথাবার্ত্তার গুঞ্জন দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। কিন্তু অল্পক্ষণেই সব চুপ। তখন সেই গভীর নিস্তব্ধতার মধ্য হইতে কাহার তেজ-গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া উঠিল। আইভান কথা আরম্ভ করিয়াছে।

—"মশায়গণ, আমায় কিছু বলতে দিন!"

তারপর বাজীকরদের দিকে ফিরিয়া সে বলিতে লাগিল —"বন্ধুগণ, ক্ষমা কোরো। আমি সব-প্রথমে বলবার জন্যে দাঁড়িয়েছি। আমি তোমাদের সকলের চেয়ে বয়সে বড়—নব্বই বছরে পড়তে আমার আর দেরী নেই। এই এতটুকু বেলা থেকে আমি ভাল্লুক নাচাচ্চি, আমার সমবয়সী ভাল্লুক এই এত তাঁবুর মধ্যে একটিও নেই।"

সে তাহার সেই পাকা মাথা একবার নীচু করিল;—কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ তার বুকের উপর আসিয়া পড়িল; মাথাটা সে একবার এধার-ওধার-করিয়া নাড়িল, তারপর বদ্ধমুষ্টির এক ঝট্‌কানিতে চোখ দুটা মুছিয়া লইল। এবং আগের চেয়ে উচ্চ এবং দৃঢ়স্বরে আরম্ভ করিল—

—"সেই জন্যই আমি সবপ্রথম বলবার দাবী করচি। আমি ভেবেছিলুম আজকের এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য এ বুড়োকে আর দেখতে হবে না;—আমার ভাল্লুকের আগে আমারই

দেহপাত হবে। কিন্তু অদৃষ্ট বিরূপ! এই নিজের হাতে আজ তাকে বধ করতে হবে! যে আমার চিরজীবনের সঙ্গী, যে বন্ধুর মতো উপকারী, যে চিরদিন আমায় অন্নদান করেছে, যার দৌলতে আমার সংসার প্রতিপালন হয়েছে—তাকেই আজ স্বহস্তে বধ করতে হবে! ভাসিয়া! ওর বাঁধন খুলে দে! ভয় নেই, পালাবে না। আমাদের মতো বৃদ্ধদের যেমন মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ নেই, ওরও তেমনি পালাবার যো নেই। ভাসিয়া খুলে দে! বেঁধে মারতে আমি পারব না।"

ভাল্লুকের বাঁধন খুলিয়া দিবার কথা শুনিয়া দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে ভয়ের একটা চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইল। আইভান তাহাদের দিকে ফিরিয়া বলিল—"ভয় নেই, ভয় নেই! ও আমার কিছু বলবে না!"

যুবক আসিয়া ভাল্লুকের গলার শিকলটা খুলিয়া দিল এবং ঠেলাগাড়িটার কাছ হইতে তাহাকে কিছু দূরে সরাইয়া লইয়া গেল। ভাল্লুকটা মাটির উপর উবু হইয়া বসিল—তার সামনের থাবা দুটো শিথিলভাবে ঝুলিয়া এধারওধার দুলিতে লাগিল। একটা ঘড়ঘড়ে নিশ্বাস তার বুকের ভিতর হইতে অতি কষ্টের সহিত বাহির হইতেছিল।

বাস্তবিকই সে অত্যন্ত বৃদ্ধ; দাঁতগুলা একেবারে হলদে হইয়া গেছে, গায়ের লোমগুলার উপরে একটা লালচে ছোপ পড়িয়াছে, লোমও উঠিয়া যাইতেছে। একটা স্নেহ-পূর্ণ অথচ করুণ চাহনি লইয়া একচোখে সে তাহার প্রভুর পানে চাহিতে লাগিল। চারিদিকে গভীর স্তব্ধতা,—কেবল মধ্যে মধ্যে বন্দুকে টোটা পুরিবার একটা শব্দ সেই স্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল।

বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া উঠিল—"দে, আমার বন্দুকটা এনে দে!"

পুত্র বন্দুক আনিয়া দিলে সে গ্রহণ করিল। তারপর বন্দুকের চোঙ ভাল্লুকের বুকের উপর রাখিয়া বলিতে লাগিল —প্রতাপ! আর মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার হাতে তোমার জীবন শেষ হয়ে যাবে। ঈশ্বর করুন এ সময় যেন আমার হাত না কাঁপে, গুলি যেন একেবারে তোমার মর্ম্মস্থলে গিয়ে বিদ্ধ হয়—দগ্ধে যেন তোমায় মরতে না হয়। হে আমার চিরদিনের বন্ধু! আমি তোমায় যন্ত্রণা দিতে পারব না! তুমি যখন এতটুকু তখন তোমায় ধরেছিলুম। একটি চোখ তোমার গেছে, শিকলের ঘস্ড়ানিতে নাক তোমার ক্ষয় হয়ে এসেছে, ভিতরেও তোমায় ক্ষয়রোগে ধরেছে। ছেলের মতো তোমায় বুকে করে মানুষ করেছি। সেই এতটুকু থেকে দেখতে দেখতে তুমি কী প্রকাণ্ড, কী বলবান হয়ে উঠলে।—আজকের এই এত ভাল্লুকের মধ্যে তোমার জুড়ি তো একটি দেখি না। আমার সেই স্নেহযত্ন তুমি ইহজীবনে একমুহূর্ত্তের জন্যও তো ভোলোনি;—তোমার মতো এমন বন্ধু আমি কোথায় পাব? আমার কাছে তুমি কী শান্ত, কী স্নেহশীল ছিলে! যখন যে খেলা শিখিয়েছি কখনো অবহেলা করনি—কোনো রকম খেলা শিখতে তোমার আর বাকি নেই। তোমার মতো গুণ কার আছে? তুমি আমার ঘরে না এলে আমার কী দুর্দ্দশা হ'ত কে জানে! তোমারই পরিশ্রমে আমার সংসার প্রতিপালন হয়েছে—আমার এত সুখস্বচ্ছন্দ। তোমার দৌলতে আমার কি না হয়েছে?—শীতে আশ্রয় পেয়েছি, ক্ষুধায় অন্ন পেয়েছি;—আমার এতবড় সংসারে ছেলেবুড়ো কাউকে তুমি কোনো দুঃখ পেতে দাওনি। আমি তোমাকে ভালোও বেসেছি—প্রহারও করেছি। যদি কোনো অপরাধ হয়ে থাকে ক্ষমা কোরো।"

বলিয়া সে ভাল্লুকের পায়ের কাছে একেবারে প্রণত হইয়া শুইয়া পড়িল। ভাল্লুকটা কেমন একটা করুণ স্বরে গুমরাইতে লাগিল। আইভানের সমস্ত শরীরটা একটা উচ্ছ্বসিত কান্নার হিল্লোলে কেবল উঠিতে-পড়িতে লাগিল।

বৃদ্ধ উঠিয়া বন্দুক তুলিয়া ধরিল। ভাল্লুক মনে করিল বুঝিবা তাহাকে লাঠির সঙ্কেতে নাচিতেই বলা হইতেছে। সে পিছনের পায়ে ভর দিয়া দুপায়ে দাঁড়াইয়া নানান ভঙ্গিতে নাচিতে সুরু করিয়া দিল।

—"বাবা! গুলি কর! এ দৃশ্য অসহ্য!" বলিয়া তার ছেলে চীৎকার করিয়া উঠিল।

আইভান পিছে হটিয়া দাঁড়াইল। তার চোখে আর জল নাই। মুখের উপর এক রাশ কুঞ্চিত কেশ আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহা সে উঠাইয়া দিল। তার পর দৃঢ় গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিল—"এইবার আমার হাতে তোমার শেষ! এই হুকুম যে 'ঐই বুড়োকেই নিজের হাতে

তোমার বুকে গুলি দাগ্‌তে হবে! ইহলোকে থাকবার আর তোমার অধিকার নেই! কিন্তু কেন?—ভগবান আমাদের বিচার করুন!"

আইভান বন্দুকের ঘোড়া টিপিয়া ধরিল এবং দৃঢ় অকম্পিত হস্তে ভাল্লুকের বুকের বাম দিকে লক্ষ্য করিল।

ভাল্লুক এইবার বুঝিতে পারিল। সে অবাক হইয়া তার প্রভুর দিকে চাহিল। একটা মর্ম্মান্তিক করুণ কান্নার শব্দ তাহার বুক ফাটিয়া বাহির হইয়া গেল। সে পিছনের পায়ে ভর দিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল এবং সামনের থাবা দুটা মুখের কাছে তুলিয়া ধরিল—যেন ঐ ভয়ঙ্কর বন্দুকটার দিকে সে চাহিতে পারিতেছে না!...বাজীকরদের ভিতরে চতুর্দ্দিকে একটা মর্ম্মভেদী হাহাকার উঠিল; জনতার মধ্যে কাহারো কাহারো চোখে অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। বৃদ্ধ আইভান্ একবার ফোঁপাইয়া উঠিয়া হাতের বন্দুকটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল; সঙ্গে সঙ্গে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। তাকে তুলিয়া লইবার জন্য তার পুত্র দৌড়িয়া আসিল; পৌত্র বন্দুকটা তুলিয়া হাতে করিয়া দাঁড়াইল।

জ্বলন্ত চক্ষু লইয়া উন্মাদের মতো চীৎকার করিয়া সে বলিল—"ভাইগণ! যথেষ্ট হয়েছে! আর নয়—এইবার শেষ করে ফেল!"

বলিয়া সে ভাল্লুকটার দিকে ছুটিয়া গেল; তার কানের দিকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছাড়িল। মুহূর্ত্তের মধ্যে ভাল্লুকটা একটা প্রকাণ্ড নির্জীব স্তূপের মতো পড়িয়া গেল।

খানিকক্ষণের জন্য তার থাবাগুলোর মধ্যে কেবল একটা স্পন্দন দেখা গেল—তারপর সব ঠাণ্ডা!

চারিদিকে তখন কেবল বন্দুকের আওয়াজ—রমণী ও শিশুদের শোকার্ত্ত কান্নার শব্দ!

একটা হাল্‌কা হাওয়া—ধোঁয়ার পুঞ্জকে ধীরে ধীরে নদীর দিকে ঠেলিয়া লইয়া গেল।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

দেশের কথা

অনাবৃষ্টিতে শস্য পুড়িয়া গিয়াছে বা অতিবৃষ্টিতে নদীর জল বৃদ্ধি পাইয়া জলপ্লাবনে দরিদ্রের কুটীর গরু মহিষ ধানের গোলা শস্যক্ষেত্র সমস্ত ভাসিয়া গিয়াছে—অর্দ্ধ বাংলার হাজার হাজার নরনারী অর্দ্ধাশনে বা অনশনে দিন কাটাইতেছে, অন্নাভাবে তাহারা হাহাকার করিতেছে, কেহ বা আত্মহত্যা করিতেছে—আপাতত ইহাই দেশের কথা। ত্রিপুরা, পাবনা, শ্রীহট্ট, কাছাড়, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। অন্নকষ্ট কিরূপ নিদারুণ, আমাদের দেশবাসীর কী ভয়ঙ্কর দুর্গতি হইয়াছে তাহা মফঃস্বলের কাগজগুলির উক্তি বুঝাইয়া দিবে।

ত্রিপুরার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ত্রিপুরা হইতে প্রকাশিত "ত্রিপুর-গাইড" নামক সংবাদপত্র লিখিয়াছেন—

অন্নাভাবে চতুর্দ্দিকে ভীষণ হাহাকার উঠিয়াছে। নিদারুণ অনশন-যন্ত্রণায় গ্রামবাসীগণ কঙ্কালসার হইতেছে, শিশুদিগের আর্ত্তনাদ আর সহ্য করা যায় না। শত শত পরিবারের লোক একদিন অন্তরও এক-বেলার অন্নের সংস্থান করিতে পারিতেছে না। কত কত পরিবারের লোক কচুর শাক ও আলুসিদ্ধ খাইয়া দিন কাটাইতেছে। অনেক স্থলে পরিবারের অভিভাবক নিজ পরিবারের অন্নের সংস্থান করিতে না পারিয়া শিশু এবং স্ত্রীলোকদিগকে ফেলিয়া স্থানান্তরে লুকাইতেছে, কেহ কেহ প্রকাশ্যভাবে লুটপাট ও দুষ্কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। নানাস্থানে পরিবারের অভিভাবকগণ দুইদিন পর্য্যন্ত অন্নের সংস্থান করিতে না পারিয়া জঠর-জ্বালায় চির-শান্তি লাভ করিবার জন্য গলায় দড়ি লাগাইয়াছিল, অন্যেরা টের পাইয়া তাহাদিগের জীবন রক্ষা করিয়াছে। অনেক অনাথা পরিবারের নিরাশ্রয়া স্ত্রীলোকগণ নিজ শিশু সন্তানদের খাওয়া দাওয়ার সংস্থান করিতে না পারিয়া জলে ডুবিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করিতেছে, এবং কোন কোন নিরাশ্রয়া ও অনাথা স্ত্রীলোক নিজ শিশু পুত্রগণকে স্বত্ব ত্যাগ করিয়া স্বজাতীয় যে-কোন ব্যক্তিকে পেটের দায়ে চিরকালের জন্য দিয়া ফেলিতে প্রস্তুত হইয়াছে।

"পাবনা বগুড়া-হিতৈষী" বলেন—

পাবনা জেলার প্রায় সমগ্র লোকের মধ্যেই ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। বহু দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত পরিবার অনাহারে দিন যাপন করিতেছে। কৃষক ও মজুরের দল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছে। কোন স্থানে একটি টাকাও ধার মিলিতেছে না। ঘটি, বাটি, লাঙ্গল, গরু প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া এতদিনও কোনরূপে দিন যাপন করিতেছিল কিন্তু এইক্ষণ কিছুই মিলিতেছে না। কোন কোন স্থানে কচু মেলাও ভার হইয়া উঠিয়াছে। দুই তিন দিন অনশনে থাকিয়া তাহারা প্রাণবিসর্জ্জন করিতেছে।

"মেদিনীপুর-হিতৈষী" বলেন—

গড়বেতা অঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষের সূচনা দেখা দিয়াছে। কেহ বা

দিনান্তে বহুকষ্টে একবার অর্দ্ধাশন করিতেছে, কেহ বা সমস্ত দিনেও কিছুমাত্র সংগ্রহ করিতে না পারিয়া অনশনে দিনপাত করিতেছে।

গত বৎসর ভাদ্র মাস হইতে অনাবৃষ্টি ও তজ্জনিত শস্যাভাব এই দুর্ভিক্ষের আদি কারণ এবং এ বৎসর এ পর্য্যন্ত প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি না হওয়াই ইহার প্রত্যক্ষ কারণ। এ পর্য্যন্ত বৃষ্টির অভাবে আশু ধান্য পর্য্যন্ত আবাদ হয় নাই। আশু ধান্যের সময় অতীত হইয়াছে, হৈমন্তিক ধান্যেরও সময় অতীত হইতে চলিল, তথাপি বৃষ্টি না হওয়ায় মহাজনগণ ধান্য দাদন বন্ধ করিয়াছেন! কৃষককুল হাহাকার করিতেছে, সেই সঙ্গে-সঙ্গে মজুর শ্রেণীর লোকের কার্য্যাভাব ঘটিয়াছে। তাহার উপর লোকে টাকা দিয়া ধান্য খরিদ করিতে পাইতেছে না, ধান্যের দর মহার্ঘ হইয়া উঠিয়াছে।

"রত্নাকর" মজঃফরপুর জেলার জলপ্লাবনের সংবাদ দিয়াছেন—

মজঃফরপুর জেলার উত্তর দিকে বৃষ্টি হওয়ায় লালবাকিয়া ও বাগমতী নামে দুটি নদীর অত্যন্ত জলবৃদ্ধি পায়। এই জলপ্লাবনে রেলওয়ে লাইন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আবার বান্ধানদীর জল বৃদ্ধি পাওয়াতে এক স্থানে ৭ শত ফুট লাইন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আরও স্থানে স্থানে রেলওয়ে লাইন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। হাতীতে করিয়া যাত্রীদিগকে পার করা হইতেছে। আবার আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের ভৈরব শাখার রেল-রাস্তাও অতিবৃষ্টিতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কোথাও অনাবৃষ্টিতে হাহাকার পড়িয়াছে, আবার কোথাও বা অতিবৃষ্টিতে দেশ ভাসিয়া যাইতেছে, দুদিকেই বিপদ।

সম্প্রতি আবার গোমতী নদীর জল বৃদ্ধি হইয়া লক্ষ্ণৌ শহর ও সন্নিহিত জনপদ জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। পাঞ্জাবে ও দাক্ষিণাত্যেও জলপ্লাবনের সংবাদ আসিতেছে। অথচ এদিকে 'বাঁকুড়া-দর্পণে' প্রকাশ—

বর্ষা ঋতু গত হইয়া গেল, শরতেরও এক পক্ষ অতীত-প্রায়, অথচ বৃষ্টির অভাব ঘুচিল না। বৃষ্টির অভাবে এ বৎসর যেরূপ অল্প জমি আবাদ হইয়াছে সেরূপ অল্প আবাদ এ জেলায় কখনও হয় নাই। স্বচ্ছল বৃষ্টি না পাইয়া অনেকে বাঁধ কাটাইয়া শোল জমিগুলি আবাদ করিয়াছিল, কিন্তু বৃষ্টির অভাবে সে-সকল জমির অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইতেছে। বাঁকুড়া জেলার অনেক গ্রামেই ধান্য ও চাউল আর খরিদ করিতে পাওয়া যায় না। মোটা ধান প্রায় ৩৷৷০ মণ হিসাবে বিক্রয় হইতেছে।

আজ আমাদের দেশবাসী সহস্র সহস্র নরনারী একমুঠি অন্নের কাঙাল—এ দুর্দ্দিনে কেমন করিয়া তাহাদিগকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করা যায় সেই চিন্তাই সকল চিন্তার আগে করিতে হইবে। যে-সকল ধনী, জমিদার, মহারাজা অধুনা-প্রবর্ত্তিত নানা ফণ্ডে টাকা দিতে কিছুমাত্র কার্পণ্য করেন নাই, বারংবার ভিন্ন ভিন্ন বিদেশী আর্ত্তসেবা-ভাণ্ডারে টাকা দিয়াছেন, দেশবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতেছি। বেলজিয়ম বা অন্য কোনো যুদ্ধ-পীড়িত দেশের দুঃস্থ অধিবাসীবৃন্দের অভাব মোচন করিবার জন্য সমগ্র য়ুরোপ ও আমেরিকা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে, তাহারা আমাদের ধারণাতীত রকমের ধনী, সেখানে কোটি কোটি মুদ্রা চাঁদা উঠিতেছে, কিন্তু আমাদের দুর্দ্দশার কথা আমাদিগকেই ভাবিতে হইবে। গভর্মেণ্ট অনশন-ক্লিষ্ট লোকদের সাহায্যের জন্য যাহা করিতেছেন, তদতিরিক্ত যাহা দরকার তাহা আমাদেরই করিতে হইবে। নির্ধনকে দেওয়াতেই ধনীর অর্থের সার্থকতা। যাঁহারা ক্ষুধিতের মুখে অন্ন দিতেছেন তাঁহারা সকলেই আমাদের নমস্য। মফঃস্বলের কাগজ হইতে আমরা এরূপ কয়েকটি নাম সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

চরামদ্দির জমিদার মাননীয় শ্রীযুক্ত মহম্মদ ইস্‌মাইল খাঁ সাহেব ও তাঁহার সরিক শ্রীযুক্ত মৌলবী সৈয়দ মহম্মদ মলীহ সাহেব তাঁহাদের জমিদারীর অন্তর্গত চরামদ্দি ষ্টেটের অন্নক্লিষ্ট প্রজাগণের সাহায্যকল্পে প্রতি সপ্তাহে ২০ মণ করিয়া চাউল দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বরিশালের উকিল সম্প্রদায় কুমিল্লা নোয়াখালী ও শিলচরের দুর্ভিক্ষের সাহায্যকল্পে ৩০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

আমতলী থানার অধীন কুকুয়া-গ্রাম-নিবাসী বিখ্যাত ধনী ও মহাম্মদ সোনাউল্লা তালুকদার এই দুর্দ্দিনে অন্নক্লিষ্ট গ্রামবাসীদিগকে প্রায় বিশ হাজার টাকা এই বৎসর দাদন দিয়াছেন।

রেঙ্গুনের ধনকুবের ব্যবসাদার মিষ্টার এ, কে, এ, এস্, জামাল পূর্ব্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষে সাহায্য করিবার জন্য চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের হস্তে পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

কলিকাতার বড়বাজার লোহাপট্টিতে এক সভায় তথাকার বার-ওয়ারী তহবিল হইতে ২০০০৲ দুইহাজার টাকা পূর্ব্ববঙ্গের দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ প্রদত্ত হইয়াছে।

কিন্তু দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ যে-পরিমাণ চাঁদা উঠিতেছে তাহা অভাবের তুলনায় কিছুই নয়। লক্ষ লক্ষ টাকা তুলিতে হইবে। সকলেই যদি যথাসাধ্য দান করেন তবেই ইহা সম্ভবপর। এক আনা হউক, চার আনা হউক, এক টাকা হউক, যাহার যাহা সাধ্য তিনিতাহাই দিন। এই তো সেদিন কলিকাতায় দুই সপ্তাহের মধ্যে সাড়ে চারি লক্ষ টাকা উঠিয়া গেল—অবশ্য গবর্ণমেণ্টের উদ্‌যোগে যুদ্ধ-ভাণ্ডারের জন্য। আমরাই বা পারিব না কেন?

উচ্চবর্ণের লোকেরা অনেকে মনে করেন যে সমস্ত সদ্‌গুণাবলি তাঁহাদেরই একচেটিয়া। দেশের যাহারা অস্থিমজ্জা সেই শ্রমজীবী সম্প্রদায়কে তাঁহারা নাম দিয়াছেন 'ছোটলোক'! তাহাদের ছোঁয়া জল পান করিলে এই তথাকথিত উচ্চবর্ণের লোকদের নাকি 'জাত যায়'! "কাশীপুর-নিবাসী"তে প্রকাশিত নিম্নলিখিত সংবাদটি তাঁহাদের জন্য উদ্ধৃত করিলাম।

বরিশাল চামারপট্টির লালামুচী গত ২৫শে আষাঢ় সকালবেলা বরিশাল কাশীপুর রাস্তায় তাহার আড্ডায় বসিয়া জুতা মেরামত করিতেছিল। বেলা ৮ ঘটিকার সময় এক ব্রাহ্মণ আসিয়া ৩০০৲ শত টাকার একটি তোড়া সহ জুতা সারাইতে বসে। ব্রাহ্মণের জুতা সারা হইলে সে ভ্রমবশতঃ ঐ টাকার তোড়া ফেলিয়া চলিয়া যায়, অনেকক্ষণ পরে তোড়াটির অনুসন্ধানে আসিয়া নানাস্থানে অনুসন্ধান করতঃ অবশেষে প্রায় ১১॥ ঘটিকার সময় লালামুচীর দোকানে আসিয়া তাহার নিকট উহা প্রাপ্ত হয়। লাল', ব্রাহ্মণের সমস্ত অবস্থা শুনিয়া ও ব্রাহ্মণের বিষণ্ণ বদন দেখিয়া টাকার তোড়াটি বাক্স হইতে বাহির করিয়া দিল, ব্রাহ্মণ উহা পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া লালা মুচিকে ৫৲ টাকা পুরস্কার দিয়াছিল, লালা তাহা গ্রহণ করে নাই।

য়ুরোপের যুদ্ধ আমাদের দেশের এবং অন্যান্য অনেক দেশের শিল্পবাণিজ্যের অবনতির কারণ হইয়াছে, আবার অনেক শিল্প-প্রতিষ্ঠার পথও উন্মুক্ত করিয়াছে। চট্টগ্রামের "জ্যোতি"তে প্রকাশিত নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে তাহা উপলব্ধি হইবে।

পুরাকাল হইতে ভারতের নীল পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সমাদৃত হইয়া আসিতেছিল। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে বিহার অঞ্চলের জনৈক ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট এদেশে নূতন প্রথায় অর্থাৎ বিলাতী কল কৌশল খাটাইয়া নীল প্রস্তুতের কথা কল্পনা করেন। সফলকাম ব্যবসায়ীর কল্পনা কথনো ব্যর্থ হয় না। তিনিই প্রথম বিলাতী নিয়মে নীল প্রস্তুত আরম্ভ করেন। দেখিতে দেখিতে শত শত বিলাতী নীলের কুঠি বিহার প্রদেশ ছাইয়া ফেলিল। বহু ইংরেজ কোটী কোটী টাকা অর্জ্জন করিয়া স্বদেশে লইয়া গেলেন। ১৮৯৭ সালে জার্ম্মেন রসায়নবিদেরা সিন্থে-টিক নীল প্রস্তুত করিয়া বাজারে উপস্থিত করেন, তাহাতে ভারতীয় নীলের কাট্‌তি কমিতে আরম্ভ করে। সেই বৎসর ১,৭১,০০০ মণ নীল বিকাইয়াছিল; তৎপূর্ব্ব বৎসর বিকাইয়াছিল ২,১৫,০০০ মণ। আর গত সনে (১৯১৪) ভারতে মাত্র ৮০০০ মণ নীল জন্মিয়াছিল। সমস্ত পৃথিবীতে বৎসরে অন্ততঃ ৫ কোটি টাকার নীলের কাট্‌তি হইতেছে। এত বড় একটা ব্যবসায় জার্ম্মেনির ব্যবসায়ীরা একচেটিয়া করিয়া নিয়াছিল। ১৮৯২।৯৩ সালে ভারতের নীল প্রতি-মণ ৩০০-৩১০ টাকা দরে বিকায়; তৎপর ক্রমে ১৭০ টাকাতে আসিয়া নামে। গত সন যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর জার্ম্মেন ব্যবসায়ীদের দ্বার বন্ধ হওয়ায় আবার ভারতের নীলের দর চড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। গত বৎসর আগষ্ট মাসের সূচনায় লণ্ডন নগরে ভারতের নীলের দর মণপ্রতি ৩০০ টাকা ছিল; তৎপর সেপ্টেম্বরের প্রারম্ভে ৪০০, শেষ ভাগে ৫৪০ এবং অক্টোবরের মধ্যে ৭০০ টাকায় উঠে; এখন প্রতিমণ ৮০০৲ টাকা দরে বিকাইতেছে। শীঘ্র শীঘ্র যুদ্ধ থামিয়া যাইবে, এই আশায় বিলাতী ব্যবসায়ীরা বহু ব্যয়সকুল কল কারখানা লইয়া পুনরায় এদেশে নীলের ব্যবসায় আরম্ভ করিতেছেন না। এই সময়ে গবর্ণমেণ্ট দেশীয় নীলের কৃষকদের উৎসাহিত করিলে গরীব লোকেরা ঘরে ঘরে ইহার ব্যবসায় আরম্ভ করিতে পারে।

"স্বরাজ"-এ বরপণ গ্রহণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ দুইটি প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম বিবরণে যে-ঘটনাটি বিবৃত হইয়াছে সেরূপ ঘটনা আমাদের দেশে এত বিরল যে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। দ্বিতীয় ঘটনাটি অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই, আমাদের দেশের "শিক্ষিত" সম্প্রদায়ের কাহারও কাহারও মনের ভাব ও ভাষা ঐ রকম।

জনৈক যুবক কলেজের উচ্চতম এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে চতুর্দ্দিক হইতে কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ তাহাকে কন্যা দানের জন্য ব্যাকুল হইল। পাত্রের পিতা অর্থোপার্জ্জনের মাহেন্দ্রক্ষণ বুঝিয়া পাঁচ সহস্র মুদ্রা পণ গ্রহণপূর্ব্বক মহা ধুমধামে পুত্রের বিবাহ সুসম্পন্ন করিলেন। কন্যার পিতা তাঁহার সর্ব্বস্ব ব্যয় সঙ্কল্প করিয়াও পণের টাকা সংগ্রহ করিতে না পারিয়া ভদ্রাসন বাটী পর্য্যন্ত বন্ধক দিয়া বহুকষ্টে পণের টাকা সংগ্রহ করিলেন। বিবাহের পর পুত্র বাড়ী যান না, পিতা অনেক প্রকার অনুরোধ করিয়াও পুত্রকে বিদেশ হইতে বাড়ী আনিতে পারেন না। পুত্র নানাপ্রকার ওজর আপত্তি করিয়া বিদেশেই থাকেন। পুত্র ক্রমে আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উকীল হইলেন। কিছু কিছু উপার্জ্জনও করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোনক্রমেই বাড়ীতে আসেন না। পিতা তাহাকে বাড়ী আনিবার নিমিত্ত বিশেষ পীড়াপীড়ি করায় পুত্র বলিলেন আমার কিছু ঋণ আছে তাহা পরিশোধ না করা পর্য্যন্ত আমি কোনক্রমেই বাড়ী যাইতে পারি না। তাহাতে পিতা আশ্চার্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন তোমার যখন যাহা আবশ্যক হইয়াছে আমি তৎক্ষণাৎ তাহা দিয়াছি তথাপি কি কারণে তোমার কত টাকা ঋণ হইল জানিতে ইচ্ছা করি। তদুত্তরে পুত্র পিতাকে জানাইলেন যে আপনি আমার আবশ্যকীয় সমস্ত ব্যয় নিরাপত্তিতে দিয়াছেন বটে কিন্তু আপনি আমার বিবাহে পাঁচ হাজার টাকা পণ লইয়া আমার শ্বশুরের সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছেন, ভদ্রাসন বাড়ী পর্য্যন্ত এখনও রেহানে আবদ্ধ আছে, তিনি এখন নিরন্ন। বিবাহের ব্যয় আমার বহন করা উচিত। কিন্তু শক্তি অভাবে আমি তাহা দিতে পারি নাই। যে পর্য্যন্ত আমি উক্ত পাঁচ হাজার টাকা, সুদসহ পরিশোধ করিতে সক্ষম না হইব ততদিন আমি কোনক্রমেই বাড়ী যাইব না। আমি এখন উপার্জ্জনশীল হইয়াছি, যত সত্বর পারি উক্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া বাড়ী যাইব।" পিতা অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন পুত্র যাহা উপার্জ্জন করে তন্মধ্যে নিজের অত্যাবশ্যক ব্যয় বাদে যাহা কিছু বাঁচে তাহা গোপনে তাহার শ্বশুরের নিকট পাঠাইয়া দেয়। তখন তিনি তাঁহার বৈবাহিককে ভদ্রাসন বাড়ী রেহান-মুক্ত করিয়া দিয়া পণের টাকা সুদসহ ফেরত দেওয়ার বিষয় পুত্রকে জানাইলেন এবং পুত্রকে বাড়ী আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তাহাতে পুত্র বাড়ী আসিল। পিতা তাহার শ্বশুরকে যত টাকা দিয়াছেন তাহা ঋণস্বরূপে গণ্য করতঃ সে ক্রমে পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে লাগিল। উক্ত ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্য্যন্ত সে কর্ম্মস্থলে পরিবার লইয়া গেল না।

২। জলপাইগুড়ী কমিশনার অফিসের কোন সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারী বাড়ী যাইতেছিলেন। তিনি যখন গোয়ালন্দ। ষ্টিমারে উঠেন তখন তিনটি যুবকও সেই ষ্টিমারে উঠিল। তন্মধ্যে গল্পচ্ছলে একটি যুবক বলিল "শ্বশুর শালা বড় পাজী। বিবাহের সময় আমাকে সোনার ঘড়ি চেইন দিতে চাহিয়া-ছিল, কিন্তু কোনক্রমেই শালার নিকট হইতে তাহা আদায় করিতে পারিলাম না। কত অপমান করিলাম কিছুতেই বেটা ঘড়ি চেন দিল না। কেবল নেকাম করিয়া বলে কন্যার বিবাহ দিতে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি ঘড়ি চেন কোথা থেকে দিব।" একটা কটুক্তি করিয়া বলিল "যদি শক্তি নাই তবে বিবাহ দিতে গিয়াছিলি কেন?" তদুত্তরে দ্বিতীয় যুবকটি বলিল "আমারও শ্বশুর শালা আমাকে ঐরূপ ঠকাইয়াছে। দিতে চেয়ে দেয় নাই, শালা এমনি পাজী।" তখন তৃতীয় যুবকটি বলিল "ছেড়ে দাও ভাই, শ্বশুর শালাদের গতিকই ঐরূপ। শালাদের কান ধরে চুক্তি-মোতাবেক সমস্ত বুঝিয়া লয়ে বিবাহ করা উচিত।" অনু-সন্ধানে জানা গেল তিনটি ছেলেই বি, এ, পাশ।

আহুতি

(গল্প)

হিমালয় অঞ্চলে ক্ষুদ্র একটা পাহাড়ের এক অংশে মনিয়ার মায়ের কুটীর। দূরে—উত্তর দিকে—উচ্চশীর্ষ রজতশুভ্র তুষারমণ্ডিত কয়েকটা গিরিশৃঙ্গ আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। দক্ষিণে দিগন্তবিস্তৃত উপত্যকা। পূর্ব্বে ও পশ্চিমে জঙ্গলপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়শ্রেণী। উত্তরের একটা গিরিনদী পাহাড়গুলিকে শাখাপ্রশাখায় বেষ্টন করিয়া উপত্যকার মধ্য দিয়া বক্রগতিতে দূরে—বহুদূরে—গঙ্গায় মিশিয়াছে। নদীতে সকল সময়ে জল থাকে না। দূরের পর্ব্বতশৃঙ্গে সঞ্চিত তুষারস্তূপ নিদাঘসমীরণস্পর্শে দ্রবীভূত হইয়া প্রবল উচ্ছ্বাসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়গুলিকে দ্বীপের আকারে পরিণত করিয়া প্রলয়-হুহুঙ্কারে উপত্যকার উপর দিয়া ধাবিত হয়। সে একটা ভীষণ দৃশ্য! সেই দুই চারিদিন কেহই পাহাড়ের নীচে—দূর লোকালয়ে—যাইতে পারে না। স্রোতের বেগ মন্দীভূত হইলে দূর-পল্লীতে বনজাত কাষ্ঠাদি বিক্রয় করিয়া আহার্য সংগ্রহের জন্য তাহারা দলে দলে ভেলা ভাসাইয়া দেয়। এই পাহাড়-গুলির কত লোক কত দিন গিরিনদীর বিষম আবর্ত্তে ভাসিয়া কোন্ অজ্ঞাত লোকে চলিয়া গিয়াছে, তথাপি এই স্থানের অধিবাসীরা বাস ত্যাগ করিতে পারে না, বাসত্যাগের কল্পনাও তাহাদের মনে আসে না। ব্যয়ের অনুরূপ আয়ের উপায়—বনজাত প্রচুর কাষ্ঠ ও স্তূপীকৃত শালপত্র—পাহাড় ছাড়িয়া আর তাহারা কোথায় পাইবে? অসংখ্য হরিণ, এত শাকসব্জী, কত খরগোস—আর কোথায় আছে? আকাশের এমন মুক্ত বায়ু, গিরি-নির্ঝরিণীর এত মিষ্ট জল সকল স্থানে যে পাওয়া যায় না। যেটুকু কষ্ট, যাহা কিছু অসুবিধা, অভ্যাসের বলে সহ্য করিয়া তাহারা বেশ আছে।

* * * *
* * *
* *

সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। প্রতিদিনের ন্যায় আজও বালকেরা তীরধনুক লইয়া উপত্যকা-অঞ্চলে খেলিয়া বেড়াইতেছে। মনিয়াও একদিন তাহাদের সঙ্গে এই সময়ে এই ভাবে খেলিত। কিন্তু এই এক বৎসর এ সংসারে নাই।

মনিয়ার বাপ যখন জীবিত ছিল, সেই সময়ে প্র সন্ধ্যায় এই পাহাড়ের কত অধিবাসী তাহাদের এই কুটী অনতিদূরে ঐ শালগাছটার তলায় বসিয়া গল্প করি অতীতের সাক্ষী হইয়া গাছটি এখনও তেমনি ভা দাঁড়াইয়া আছে। সন্ধ্যাকালে সেদিকে চাহিলে মনিয় মায়ের মনে কত কথাই জাগিয়া উঠে।

সে ভাবে,—দুঃখভোগের জন্যই যদি এই পৃথিবীর স হইয়া থাকে, তবে মানবজীবনে সুখ আসে কেন? আ কের পর আবার অন্ধকারের সৃষ্টি—প্রকৃতির এ কি র —ঈশ্বরের এ কি লীলা!

সে কত কথাই ভাবে,—ভাবিয়া কাঁদে, এবং কাঁদি ভাবে। সন্ধ্যাকালে কুটীরদ্বারে বসিয়া জনশূন্য নিরানন্দ বৃক্ষটির দিকে চাহিয়া চাহিয়া সে দেখিতে পায় যেন, ম য়ার বাপ গাছটির নীচে ঘুমাইয়া রহিয়াছে, আর মনি কুটীরের মধ্যে বনকাঠের মাচার উপর অঘোর নিদ্রায় অ ভূত! সেই বা জাগিয়া থাকিবে কেন? বি ওটা কি? ও ত মনিয়ার বাপ নহে, ওযে গাছের এ মোটা শিকড়। বিছানায় ত মনিয়া নাই, ও যে তাহা তৈলসিক্ত মলিন উপাধান!

মনিয়ার মা সময়ে সময়ে জোর করিয়া চিন্তাকে করিয়া দিতে চাহে, কিন্তু চিন্তা তাহাকে ছাড়ে না। জন্য তাহার মনে হয়—সে যেমন ছিল, তেমনি আছে কিন্তু পরক্ষণেই একটা দীর্ঘশ্বাস আসিয়া তাহাকে স্ম করাইয়া দেয়—যাহারা ছিল, তাহারা গিয়াছে,—এ সে সংসারে একা!

* * * *
* * *
* *

সংসারের এই হাসিখেলার মধ্যে কত সন্ধ্যা মনিয় মায়ের জীবনের উপর দিয়া গিয়াছে। আবার এক সন্ধ্যা আসিতেছে।

প্রতিবেশিনী রমণীগণের সঙ্গে সে প্রতিদিন দূরপল্লী কাঠ বেচিয়া আসে। দুইদিন জ্বরে পড়িয়া কুটীরের বাহি যাইতে পারে নাই। পূর্ব্বদিন কয়েকজন তাহার সঙ্গী

লইয়াছিল। আজ আর কেহই আসে নাই। উদরান্নের সংস্থানের জন্য যাহারা এ সংসারে ছুটিয়া বেড়াইতে আসিয়াছে, পরের দিকে চাহিবার অবসর তাহাদের কোথায়? আজ সে নীরস কাঠের বোঝা বহিয়া মুদীদের দ্বারে দ্বারে দর যাচাই করিতে যায় নাই, পোড়াজীবনের কিছু সম্বল আঁচলে বাঁধিয়া আজ তাহাকে শুষ্ককণ্ঠে শূন্যগৃহে ফিরিয়া আসিতে হয় নাই। কিন্তু রোগশয্যায় শুইয়া তাহার কণ্ঠ তেমনি শুকাইয়াছে; মাথায় বোঝা না বহিয়াও মনের মধ্যে সে আজ যে বোঝা চাপাইয়াছে, তাহা আরও ভারি!

আজ তাহার অবসর—প্রাণ খুলিয়া কাঁদিবার দিন। কেহই বাধা দিবার নাই।

না—যাহারা গিয়াছে, তাহাদের জন্য আর সে ভাবিবে না। যাহাদের জন্য সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া দিন কাটাইতেছে, তাহারা ত তাহার জন্য কাঁদে না; তবে সে তাহাদের জন্য আর ভাবিবে কেন? একটা ভীষণ রুক্ষতা শুষ্কপত্রাচ্ছাদিত কুটীরে শুষ্কশয্যায় শায়িতা মনিয়ার মায়ের বহিরন্তর অধিকার করিল।

সেই একটা দিন—সন্ধ্যার পূর্ব্বে, এমনি সময়ে—মনিয়ার বাপ তখনও মরে নাই ভাবিয়া, সে তাহার মুখে একটু জল দিয়াছিল। আর মনিয়া—মনিয়া মরিবার সময়ে পিপাসা বোধ করে নাই। সে যে জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। না—মরিবার সময়ে বাছার কোনই কষ্ট হয় নাই! তবে যাহারা গিয়াছে, তাহাদের জন্য সে আর ভাবিবে না। কিন্তু এই কঠিন শৈলবক্ষে জল ঢালিয়া সে একটা শ্যামালতাকে বাঁচাইয়াছে, বড় করিয়াছে। তাহারই সিঞ্চিত জলে বর্দ্ধিত হইয়া লতাটির অগ্রভাগ বেড়ার ফাঁক দিয়া কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সরসতার আনন্দে দুলিতেছে। আর এখন দারুণ পিপাসায় তাহার বুক ফাটিয়া যায়, এসময়ে সে কি একবিন্দু জল পাইবে না? স্বামীপুত্রকে বিদায় দিয়া সে কতদিন কতবার মৃত্যুকে সাদরে আহ্বান করিয়াছে, কিন্তু সে ত জানিত না মৃত্যু একদিন এই রুক্ষ শুষ্ক রুদ্রবেগে আসিয়া অদূরে দাঁড়াইবে!

"দিলি না, দিলি না, একটু জল দেরে!"—আপন মনে বলিয়া সে নীরব হইল। পরক্ষণেই তাহার মনে হইল, তাহার যে কেহই নাই, সে কাহার কাছে জল চাহিতেছে?

* * * * * * * * *

সূর্য্যাস্তের আর বিলম্ব নাই। পশ্চিমদিকের বেড়ার ফাঁক দিয়া অস্তগামী সূর্য্যের লোহিত রশ্মিখণ্ডগুলি মলিন শয্যার উপর পড়িয়া ঝিকিমিকি জ্বলিতেছিল। মনিয়ার মা শয্যার উপর বসিয়া, পূর্ব্বদিকের বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখিল, প্রতিবেশীদের ছেলেরা উপত্যকায় বহুদূরে তখনও খেলা করিতেছে। কিন্তু সহসা বাহিরে ঐ কিসের শব্দ? ঐ শব্দ যে তাহার পরিচিত! নদীতে বান ডাকিলে এমনি ভাবে সেও কতদিন সকলের সঙ্গে চীৎকার করিয়া দূর উপত্যকাক্ষেত্রের লোকদিগকে বিপদবার্ত্তা জানাইতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছে। রাক্ষসী পার্ব্বতী নদী একদিন মনিয়াকে গ্রাস করিয়াছে, আর আজ কত মনিয়া ভাসিয়া যাইবে!—তাহারই মত কত মনিয়ার মায়ের মুখে জল দিবার কেহই থাকিবে না!

সে টলিতে টলিতে দুয়ারের কাছে গেল। দুয়ারের নীচে যে মোটা পাথর চাপান ছিল, তাহা ধরিয়া যতদূর সাধ্য সরাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু নড়াইতে পারিল না। অন্যদিন সে সামান্য চেষ্টায় পাথরখানা সরাইয়া রাখে, কিন্তু আজ তাহার সে শক্তি নাই। পাথরখানা আজ মৃত্যু ও জীবনের ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া ভাগ্যের মত অটল হইয়া চাপিয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু এই কঠিন পাথরের শীতলতা ত এতটুকু যায় নাই! প্রকৃতির নির্ম্মমতার মধ্যে এই শীতল স্পর্শ আর-একদিন মনিয়ার মৃতদেহ দুই হাতে বুকে তুলিয়া সে অনুভব করিয়াছিল।

তাহার পর সে শয্যায় গিয়া বসিল, আবার বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখিল—তখনও ছেলেরা তেমনি ভাবে খেলিতেছে।

তবে উপায়? তাহার নিজের জীবনের বিনিময়েও কি সে এতগুলি প্রাণীর জীবন রক্ষা করিতে পারে না? অন্তরের গোপনতম প্রদেশ হইতে কে যেন তাহাকে সাড়া দিল—মরণেই ত তোমার সুখ!

মনিয়ার মা আর স্থির থাকিতে পারিল না, একটা দিয়াশালাইয়ের কাঠি জ্বালিয়া হাত বাড়াইয়া বেড়ায় লাগাইয়া দিল।

দেখিতে দেখিতে অগ্নিদেব ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া কুটীরখানির চারিদিকে ব্যাপ্ত হইলেন। ক্রমে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অদূরবর্ত্তী শালগাছটিকেও দগ্ধ করিতে লাগিল।

দূর হইতে পাহাড়ের উপর আগুন দেখিয়া বালকেরা সেই দিকে ছুটিয়া চলিল। অগণিত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—জল, জল, জল!

জল কোথায়? অভাগী মনিয়ার মা কিছু পূর্ব্বে এক বিন্দু জলের জন্য কত কাঁদিয়াছে!

কিন্তু জল আসিল। ভয়ঙ্করী নদী উন্মাদিনী শঙ্করীর ন্যায় তাণ্ডব নৃত্যে ছুটিয়া আসিল। অব্যবহিত পূর্ব্বে বালকেরা পাহাড়ের উপর উঠিয়াছে।

* * * *
* * *
* *

সূর্য্যদেব তখন অস্তাচলচূড়ার অপর দিকে লুকাইয়াছেন। ছায়া তলদেশ হইতে ধীরে ধীরে উঠিয়া পাহাড়টিকে আচ্ছাদিত করিতেছিল। তখনও মনিয়ার মায়ের চিতা নির্ব্বাপিত হয় নাই,—শালগাছটার শাখাপ্রশাখা লইয়া অগ্নিদেব তখনও খেলা করিতেছিলেন।

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

একলব্য

নমি পায় হে নিষাদ, হে অনার্য্য আর্য্যের প্রধান,
হীনজন্মা বলি তোমা গুরুকুলে দেয়নিক স্থান।
একলব্য, বীরখ্যাতি বিশ্বমাঝে একলভ্য তব
তোমার চরণে রাজে বীরত্বের সমগ্র বৈভব।
চিত্তবিত্ত সঙ্গে যার সে কখনো নহেক ভিখারী,
ত্যাগের আদর্শ যেবা সে কিসের নহে অধিকারী?
অখণ্ড যে জ্ঞানব্রহ্ম, অংশ তার প্রজ্ঞাবীজময়
কাননে কান্তারে শৈলে যথা রোক হবে অভ্যুদয়
উজ্জ্বল প্রফুল্ল সাজে! কে তাহারে রাখিবে বাঁধিয়া
গণ্ডী দিয়া ভিত্তি দিয়া বাহিরের নয়ন ধাঁধিয়া?
কে পারে রোধিতে বিশ্বে পঙ্কমাঝে কমল-বিকাশ
খনির তিমির-মাঝে মাণিক্যের নিভৃত নিবাস?
প্রবুদ্ধ যা' উদ্গত যা' মানসের অন্তস্তল হতে
কেমনে রাখিবে বাঁধি দ্বিজত্বের বাঁধা রাজপথে?
জাহ্নবী ছুটিবে চলি' অবিচারে গিরি বনে মাঠে
কে তারে বাঁধিতে পারে বারাণসী প্রয়াগের ঘাটে?
মানব-সমুদ্র মাঝে কে করিবে শাশ্বত বিভাগ,
বাঁধ বাঁধি? বিরাটের দেহ-মাঝে কে কাটিবে দাগ?
যে শক্তি নিহিত মূলে কেমনে তা' করিবে উচ্ছেদ,
শাখার ছেদনে বলো? অখণ্ড সে, মূলে নাহি ভেদ।
চাহনিক রাজছত্র, দিগ্বিজয়, রত্নের ভাণ্ডারে,
বসালে সবার শীর্ষে মানবের চিত্ত-দেবতারে।
যেখানে মানব রাজে, সেইখানে দেবতা বিরাজে,
কোনো খানে বাঁধা নাই আভিজাত্য পিঞ্জরের মাঝে।
তুমি দেখায়েছ আরো, কভু নহে সাধনা বিফল,—
সকলেই অধিকারী লভিবারে তপস্যার ফল।
কাম্য কিছু নাহি তব, যোগ্যতার করেছ প্রমাণ,
মহাভারতের মাঝে বীরদর্পে লভিয়াছ স্থান।
উদ্ধারেছ যেই সীতা আজীবন সাধনার ফলে
নিমেষে ত্যজেছ তাই—উচ্চতর বীরত্বের বলে।
শক্তি সে যে ব্রহ্মময়ী, ত্যাগ সে যে চির সত্যময়,
আর্য্যের নাহিক লজ্জা তার কাছে লভি পরাজয়।
সত্য চির হোক্ প্রিয় মিথ্যা হোক চির অপসৃত,
মহাভারতের কথা তাই গেয়ে হউক অমৃত।
দীক্ষার দক্ষিণা-ছলে প্রবঞ্চক রাজপুত্রগণে
দিয়াছ ঘৃণার দান ত্যাগদীপ্ত উজ্জ্বল বদনে,
লক্ষগুণ প্রতিশোধ হে বীরেন্দ্র, দিয়েছ ঘৃণার,
নিমেষে দিয়েছ হাসি চিরার্জ্জিত জীবনের সার।
আর্য্য সে করুক গর্ব্ব ছিন্ন করি অঙ্গুষ্ঠটি তব,
ত্যাগে তুমি কর ভোগ হে অনার্য্য ভারত-গৌরব।
আর্য্যেরা রেখেছে তোমা ঘৃণাভরে সরাইয়া দূরে,
কৃপা করিবার স্পর্দ্ধা রাখ তুমি আর্য্যের গুরুরে।
জাগ তুমি হে নিষাদ, ভারতের আর্য্যগণ-মাঝে
পশুমাংসে পুষ্টদেহ—মৃগচর্ম্ম-শৃঙ্গ-স্নায়ু-সাজে,
শুনায়ে অপ্রিয় সত্য মিথ্যামত্তে, জাগ ত্যাগবীর,
নত হোক্ পদে তব যত ভ্রান্ত গর্ব্বোন্নত শির।

শ্রীকালিদাস রায়।

আলোচনা

গত আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে স্ত্রীলোকের প্রতি মুসলমানগুণ্ডাদের অত্যাচার সম্বন্ধে একটি মন্তব্য প্রকাশিত হয়। ভাদ্র মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত সৈয়দ ইস্মাইল হোসেন সিরাজী সাহেব তৎসম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিখিয়াছেন। তাঁহার কথাগুলি মোটের উপর এই :—

(১) পঞ্জাব-প্রান্তের দুর্দ্দান্ত মুসলমানগণ যখন ব্রিটিশরাজ্য আক্রমণ করিতে আইসে তখন অন্যান্য বীর শক্তজাতির ন্যায় তাহারা স্ত্রীলোকদিগকেও বন্দী করিয়া লইয়া যায়। এ প্রথা সর্ব্বত্র বিদ্যমান।

(২) পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে সাধারণতঃ মাত্র ময়মনসিংহ জেলাতেই এইসকল ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

(৩) এইসকল ঘটনাসংসৃষ্ট স্ত্রীলোক হিন্দু, মুসলমান স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এরূপ ঘটনা ঘটে না।

(৪) এইসকল হিন্দু বিধবা অধিকাংশস্থলেই ইচ্ছাপূর্ব্বক মুসলমান গুণ্ডাদের সহিত প্রণয় স্থাপন করিয়া থাকে।

(৫) হিন্দুরমণীর মুসলমানধর্ম্মগ্রহণ।

(৬) হিন্দুসমাজে বিধবার প্রাচুর্য্য।

(৭) স্ত্রীলোকদিগের সংরক্ষণের পক্ষে হিন্দুসমাজের ঔদাসীন্য।

(৮) মুসলমান বেশ্যার সংখ্যা হিন্দুবেশ্যার সংখ্যা অপেক্ষা কম।

(৯) সম্প্রতি মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারক ও মৌলবী মোল্লাগণ ইহা নিবারণের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

সিরাজী সাহেবের অধিকাংশ কথাই ভ্রমপূর্ণ। তিনি ময়মনসিংহ হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়াই এসকল বিষয়ে এ জেলা সম্বন্ধে ভাসাভাসা রকমে যাহা ধারণা করিয়াছেন তাহাই লিখিয়াছেন। এ জেলায় অবস্থিতি করিয়া এবং এ সম্বন্ধে যে মামলামোকদ্দমা হয় তাহা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিয়া আমাদের যে বিশ্বাস জন্মিয়াছে তাহা নিম্নে লিখিলাম।

(১) পঞ্জাবপ্রান্তে বীর মুসলমানগণের হিন্দুরমণী হরণ করা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কোনও জ্ঞান নাই। তবে গত মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসে পঞ্জাবের কয়েকটি জেলায় যে দস্যুতা আরম্ভ হইয়াছে তাহা বীর জাতির বিজয়কার্য্য নহে, প্রবল দস্যুর দুর্ব্বল গৃহস্থের প্রতি অত্যাচার। দুর্ব্বৃত্তগণ সকলেই ইংরেজের প্রজা এবং তাহারা ধৃত হইয়া কিরূপে সকল সংস্রব অস্বীকার করিয়া মোকদ্দমা হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করিয়াছিল তাহা সিরাজী সাহেব অবগত আছেন। ইহাদিগের কার্য্যকে বীরত্ব আখ্যা দেওয়া ভুল ও মারাত্মক।

(২) পূর্ব্ববঙ্গের শুধু ময়মনসিংহ জেলায় এইপ্রকার ঘটনা ঘটিয়া থাকে তাহা ঠিক নহে। চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, ঢাকা, পাবনা, বগুড়া, নোয়াখালি, ত্রিপুরা ইত্যাদি জেলাতেও এইসকল ঘটনা ঘটিতেছে। ময়মনসিংহ অতি বৃহৎ জেলা। বগুড়া নোয়াখালি ইত্যাদির ন্যায় ৪।৫ জেলা একত্র করিলে ময়মনসিংহের সমান হইতে পারে। কাজেই দূর হইতে এখানে সকল বিষয়েরই সংখ্যাধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ময়মনসিংহের কয়েকটি লোক ও স্থানীয় সংবাদপত্র এবিষয়ে আন্দোলন করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। অন্যস্থানে উহার অভাব।

(৩) এইসকল ঘটনাসংসৃষ্ট স্ত্রীলোক সকলেই হিন্দু—ইহা সিরাজী মহাশয়ের নিতান্ত ভ্রম। বাস্তবিকপক্ষে, এ জেলার স্ত্রীলোকঘটিত মোকদ্দমার অধিকাংশ স্ত্রীলোক—প্রায় শতকরা ৭৫ জন—মুসলমান। মুসলমানস্ত্রীলোক সম্বন্ধে এখানে সর্ব্বদা নানা শ্রেণীর মোকদ্দমা হইতেছে। একজনের স্ত্রীকে অন্যের স্ত্রী বলিয়া দাবি করা, স্ত্রীলোকের পক্ষে বিবাহ অস্বীকার করা, চক্রান্তপূর্ব্বক বিবাহের দাবি স্থাপন করা ইত্যাদি বিষয়ে অহরহ মুসলমানস্ত্রীলোক-ঘটিত মোকদ্দমা হইতেছে। এইসকল ঘটনা লইয়া সময় সময় প্রকাশ্য আদালতের সম্মুখে দুই দলে যে মল্লযুদ্ধ হইয়া থাকে তাহাও ময়মনসিংহবাসীর পক্ষে বিরল ঘটনা নহে। স্থানীয় সংবাদপত্র মুসলমানস্ত্রীলোক-ঘটিত এইসকল সংবাদ আর এখন প্রকাশ করেন না ইহা দুঃখের বিষয়। সম্ভবতঃ এসকল মোকদ্দমা সম্বন্ধে কোনও আন্দোলন না থাকায় এবং ক্ষুদ্র কাগজের পক্ষে সংখ্যা অত্যধিক বলিয়া উহা প্রকাশিত হয় না। বিশেষতঃ মুসলমানসমাজে কোনও স্ত্রীলোককে ঘরের বাহির করিয়া লইলে তাহার জাতি যায় না। স্বসমাজেই পূর্ব্ব মান মর্য্যাদা লাভ করিয়া সে বিবাহিত জীবন যাপন করিতে পারে। হিন্দুসমাজে তাহা হইবার উপায় নাই। কাজেই হিন্দুস্ত্রীলোক সম্বন্ধে এইরূপ ঘটনা ঘটিলে একটা আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়া থাকে। কিন্তু মুসলমানস্ত্রীলোক সম্বন্ধে এরূপ কোনও আন্দোলনের সৃষ্টি হয় না। বাস্তবিকপক্ষে মুসলমান-স্ত্রীলোক-ঘটিত মোকদ্দমা ময়মনসিংহ জেলায় অত্যন্ত বেশী। যে কোনও একবৎসরের মোকদ্দমার নথি দেখিলেই উহা প্রমাণিত হইবে। সুতরাং কেবল হিন্দুরমণীগণের উপর এইরূপ অত্যাচার হয় বলিয়া সিরাজী সাহেব যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চাহেন, সে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কোনও উপায় নাই।

(৪) হিন্দুবিধবাগণ অধিকাংশস্থলেই মুসলমানগুণ্ডাদের সহিত প্রণয় স্থাপন করে ইহা প্রায় সর্ব্ব স্থলেই মিথ্যা। যাঁহারা হিন্দু ও মুসলমানগণের বসবাসের রীতিনীতি এবং ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির বিষয় অবগত আছেন তাঁহারাই ইহা স্বীকার করিবেন। বিশেষতঃ যে-সকল মুসলমান এই গুণ্ডাশ্রেণীভুক্ত তাহারা সমাজের সর্ব্বনিকৃষ্ট জীব। তাহাদের আদবকায়দা রীতিনীতি কাহারও প্রশংসা আকর্ষণ করিতে পারে না। মুসলমানসমাজেও তাহারা ঘৃণার পাত্র। তাহারা সর্ব্বদা চুরী বদমায়েসী কার্য্যেই রত থাকে। এহেন গুণ্ডাদের প্রতি কি মুসলমান কি হিন্দু কোনও সমাজের স্ত্রীলোকেরই প্রীতি জন্মিতে পারে না। স্ত্রীলোকের নিকট তাহারা সর্ব্বদাই ভয়ের সামগ্রী। ইহাদের গার্হস্থ্যজীবনের অবস্থা যাঁহারা জানেন তাঁহারাই এ কথার যথার্থতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

সকলেই জানেন ময়মনসিংহ পাট-প্রধান জেলা। পাট দ্বারা এই জেলায় প্রতিবৎসর বহু টাকা আগমন করিয়া থাকে। এই গুণ্ডাশ্রেণীর হাতে যখন এইপ্রকারে অর্থ সঞ্চিত হয় তখন তাহারা স্থির থাকিতে পারে না। লোকের সহিত ঝগড়া বিবাদে প্রবৃত্ত হয় এবং নানা প্রকারের ফৌজদারী মোকর্দ্দমা আরম্ভ করিয়া দেয়। এই জেলার শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেকে অনেক সময় ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। স্ত্রীহরণ তাহার অন্যতম।

যেসকল স্ত্রীলোক এইপ্রকার অত্যাচারের বিষয়ীভূত তাহারা অধিকাংশ স্থলেই চরিত্রভ্রষ্টা তাহাতে সন্দেহ নাই। এই চরিত্রহীনতার জন্যই গুণ্ডাগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে। মোকদ্দমা বিচারকালে সুচতুর উকীল ব্যারিষ্টারগণ আসামীপক্ষে অনেকস্থলেই প্রণয়কাহিনী উপস্থিত করেন। সময় সময় তাঁহারা উহাতে ফললাভও করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত অবস্থা জানেন তাঁহারা ঐসকল কাহিনীর মূল্য কি তাহাও জানেন। সিরাজীসাহেব সম্ভবতঃ তাহা অবগত নহেন।

সত্য বটে আসামীগণ এইপ্রকারের নানারূপ জবাব দিয়া অনেক-সময়ে মোকদ্দমা হইতে নিষ্কৃতি পায়। কিন্তু অত্যাচারিত ব্যক্তিগণ যেরূপ নিঃসহায় অবস্থায় এই মোকর্দ্দমা করিতে বাধ্য হয়, হিন্দু হইলে এই লজ্জাজনক অপমান প্রকাশ করিতে যেরূপ সঙ্কোচ বোধ করিয়া থাকে এবং গুণ্ডাগণ যেরূপভাবে অর্থের লোভ ও ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া থাকে তাহাতে আদালতে নিষ্কৃতি লাভ করা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। এ জেলার জুরীপ্রথাও এইজন্য অনেকটা দায়ী।

(৫) হিন্দুরমণীর মুসলমানধর্ম্মগ্রহণ সম্বন্ধে সিরাজীসাহেব যাহা লিখিয়াছেন তদ্বিষয়ে স্থানীয় লোকে বিশেষ কিছু অবগত নহে। প্রণয়ঘটিত ব্যাপার না হইলে শুধু একটি রমণী ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবে তাহা সম্ভবপর নহে। সিরাজী সাহেবও তাহাই বলিয়াছেন। প্রণয়-কাহিনী সম্বন্ধে উপরে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতেই এ কথারও উত্তর প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। যে-সকল রমণীর উপর দুর্ব্বৃত্তগণ অত্যাচার করিয়া থাকে তাহাদিগকে প্রায়ই আর হিন্দুসমাজে ফিরাইয়া লওয়া হয় না। বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে অনেক সময় মুসলমানসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এইপ্রকারে হিন্দুরমণী মুসলমান হইয়া থাকে। এইস্থলে আরও একটি কথা বলা আবশ্যক। এ অঞ্চলের মুসলমানগণের বেশ্যা বিবাহ করা একটি অতি প্রচলিত প্রথা। অনেকেই গর্ব্ব করিয়া বলিয়া থাকে বেশ্যা বিবাহ করা একটা পুণ্যকার্য্য। তদ্দ্বারা একটা বেশ্যাকে গৃহস্থ করিয়া দেওয়া হয়। মুসলমানসমাজে এই বেশ্যা বিবাহ দ্বারা অনেকসময়ে নানাপ্রকার গোলমাল ও মামলা মোকদ্দমার সৃষ্টি হয়। অনেক বেশ্যাই একটু বয়স হইলে এইরূপে গৃহস্থ সাজিয়া থাকে। অন্যদিকে বেশ্যাগণ সকলেই কি হিন্দুসমাজ হইতে আগত কি মুসলমানসমাজ হইতে আগত—বেশ্যা হওয়ার পরে সখের হিন্দু নাম গ্রহণ করিয়া থাকে। হিন্দুনামযুক্ত বেশ্যাগণ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিবাহদ্বারা মুসলমান-গৃহে প্রবেশ করিবার কালেও হিন্দু মুসলমান হইতেছে বলিয়া বোধ হয় ধরিয়া লওয়া হয়। এই দুইপ্রকার ব্যতীত অন্যরূপে হিন্দুরমণী মুসলমান হওয়ার বিষয় আমরা জ্ঞাত নহি। সম্ভবপরও নহে।

(৬) হিন্দুসমাজে বিধবার প্রাচুর্য্য আছে তাহা কেহই অস্বীকার করিবে না। কিন্তু গুণ্ডাগণ যে-সকল রমণীর উপর অত্যাচার করে তাহারা সকলেই বিধবা ইহা অতি ভুল। গুণ্ডাগণ বিধবা সধবা বা হিন্দুমুসলমান-নির্ব্বিশেষে রমণীগণের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে। যে কোনও কোর্টের কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ের কাগজ পরীক্ষা করিলেই তাহা অনুমিত হইবে। স্বামী বাদী হইয়া এই শ্রেণীর মোকর্দ্দমা চালাইতেছে এরূপ মোকর্দ্দমার সংখ্যা এ জেলায় কম নহে।

(৭) স্ত্রীলোকদিগের সংরক্ষণের পক্ষে হিন্দুসমাজের কোনও ঔদাসীন্য আছে তাহা মনে হয় না। তবে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ সর্ব্ববিষয়েই নিতান্ত দুর্ব্বল। আত্মরক্ষা করিবার শক্তি বা সাহস তাহাদের নাই। মুসলমানগুণ্ডা কোনও স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিলে তাহাকে পরিত্যাগ করা ব্যতীত অন্য কোনও প্রতীকার আছে তাহা তাহারা ভাবিয়া উঠিতে পারে না।

(৮) মুসলমান বেশ্যার সংখ্যা হিন্দু বেশ্যা অপেক্ষা কম এই সিদ্ধান্তে সিরাজীসাহেব কিরূপে উপনীত হইলেন তাহা আমরা জানি না। সর্ব্বদা যাহা দেখিতে পাই তাহা হইতে আমাদের ধারণা মুসলমান বেশ্যার সংখ্যা অনেক বেশী। অনুসন্ধানে জানিলাম বর্ত্তমান সময়ে ময়মনসিংহনগরে যে-সকল বেশ্যা আছে তন্মধ্যে প্রায় শতকরা ৯০ জন মুসলমান জাতীয়া। এ জেলার শতকরা ৭০ জন লোক মুসলমান। সুতরাং ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। তবে একটি বিষয় এইখানে মনে রাখা উচিত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ অঞ্চলের বেশ্যাগণ বেশ্যা হইবার পরেই সখের হিন্দুনাম গ্রহণ করে। কি হিন্দু-সমাজ হইতে আগত কি মুসলমানসমাজ হইতে আগত, বেশ্যা হইলেই প্রায় নামপরিবর্ত্তন করিয়া মনগড়া নাম (fancy name) গ্রহণ করিয়া থাকে। কাদম্বিনী, সুরমা, সুষমা, গোলাপী, চন্দনা, ডালিম, আঙ্গুর ইত্যাদি নাম দ্বারা বেশ্যার পূর্ব্বজাতি নির্ণয় করা যাইতে পারে না। বোধ হয় এইরূপ নাম গ্রহণ করা তাহাদের ব্যবসার জন্য আবশ্যক। সুতরাং এইরূপ নাম দেখিয়া ভুল হওয়া অসম্ভব নহে। ফলতঃ এ সম্বন্ধে যাঁহাদের জানা-শুনা আছে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা ক[রিলে] তাঁহারা কেহই সিরাজীসাহেবের উক্তি শুদ্ধ বলিয়া মনে করেন না।

(৯) সম্প্রতি মুসলমানধর্ম্মপ্রচারক ও মৌলবী মোল্লাগণ [এই অত্যাচার] নিবারণের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন জানিয়া আমরা সন্তোষ [লাভ] করিলাম। কিন্তু স্থানীয় লোকে এপর্য্যন্তও এই চেষ্টার কোনও [ফল] দেখিতে পাইতেছে না। অবশ্য উচ্চশিক্ষিত মুসলমানগণ এই-স[কল] ঘটনার প্রতি যথেষ্ট ঘৃণা প্রদর্শন করিতেছেন। কিন্তু গুণ্ডাগ[ণের] উপর উচ্চশিক্ষিত মুসলমানগণের প্রভাব অতি সামান্য।

সিরাজীসাহেবের এইসকল অত্যাচার দমনের আন্তরিক [ইচ্ছা] আছে। ইহার প্রতীকারকল্পে মুসলমানসমাজ কি করিতে পা[রে] তদ্বিষয়ে আমাদের যে ধারণা হয় তাহা সিরাজীসাহেবের নিকট [ক্ষমা] চাহিয়া নিম্নে বিবৃত করিলাম ;—

(ক) অনুতপ্ত ও যথার্থ ভাবে পবিত্র হইতে ইচ্ছুক নয় [এরূপ] বেশ্যার বিবাহপ্রথা মুসলমানসমাজে রহিত করা। এই প্রথা যত[দিন] বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন সামাজিক পবিত্রতার ভাব জাগ[রিত] হইতে পারিবে না। এই প্রথা দ্বারা মুসলমানসমাজ নানাপ্রক[ারে] ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে।

(খ) যে-সকল লোক প্রকাশ্যভাবে অন্য স্ত্রীলোককে ঘরের বা[হির] করিয়া নেয় এবং অন্যপ্রকারে ব্যভিচারের কার্য্যে রত থ[াকে] তাহাদিগকে অন্য প্রায় সকল সমাজই সামাজিক শাসনে দ[ণ্ডিত] করিয়া থাকেন। অন্ততঃ সমাজে তাহাকে নিতান্ত লজ্জিত অব[স্থায়] থাকিতে হয়। কিন্তু মুসলমানসমাজে এই ভাবের অস্তিত্ব দেখা [যায়] না। অনেক স্থানেই অপরাধী তাহার কৃতকার্য্যের জন্য বাহবা পা[ইয়া] থাকে। এই দুর্ব্বৃত্তগণ যাহাতে অপকার্য্য করিয়া সামাজিক লোক[ের] নিকট দণ্ডপ্রাপ্ত হয়, অন্ততঃ পক্ষে সমাজে অবজ্ঞাত হইয়া থ[াকে] মুসলমানসমাজের তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

(গ) অন্যান্য সমাজ যে-সকল লোককে অকর্ম্মণ্য ও অপর[াধী] জ্ঞানে পরিত্যাগ করে মুসলমানসমাজ তাহাকে অবাধে গ্রহণ কা[রিয়া] থাকেন। অপরাধীকে সমাজে গ্রহণ করিতে হইবে না তাহা আ[মরা] বলিতেছি না। কিন্তু চিরাভ্যস্ত অপরাধীর দণ্ড ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে সমাজে গ্রহণ করিলে তাহা দ্বারা সমাজ উন্নত হইয়া অবনত হইতে থাকে। এই শ্রেণীর লোকের আকর্ষণ বশ[তঃ] মুসলমানসমাজ যথারীতি ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিতেছে না তাহাতে বে[হ] সন্দেহ করিবে না। অবশ্য সমাজের এক অবস্থায় যে-কোনও প্রক[ারে] হউক সংখ্যাবৃদ্ধি আবশ্যক হইয়া থাকে। কিন্তু মুসলমানসমা[জ] সে অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়াছে। তাঁহাদের সম্মুখে এখন উন্নতির যুগ। অন্ধ, বধির, মূক ও পঙ্গু (সামাজিক হিসাবে) চতুর্দ্দিক হইতে ঝু[লিতে] থাকিলে কাহারও পক্ষে ঊর্দ্ধে উত্থিত হওয়া কষ্টকর।

ভরসা করি আমি যে ভাবে কথাগুলি বলিলাম। সিরাজীসা[হেব] ও মুসলমান পাঠকগণ সেই ভাবেই তাহা গ্রহণ করিবেন।

(১০) কিজন্য স্থানবিশেষে এবং সময় বিশেষে এই-স[কল] অত্যাচারের ভাব জাগরিত হইয়া উঠে তাহা ভাবিবার বিষয়। পঞ্জ[াবে] ও পূর্ব্ববঙ্গে এই ভাব মধ্যে মধ্যে দেখা দিয়া থাকে তাহা সকলেই স্বীক[ার] করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও মুসলমান আছে, হি[ন্দু] বিধবা রমণী আছে। কিন্তু সে-সকল স্থানে এই ভাব দেখা যায় [না।] সুতরাং প্রণয়কাহিনী দ্বারা এই অত্যাচারের বুঝ পাওয়া যাইতে না। পঞ্জাবে ও বঙ্গদেশে বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানের সং[খ্যা] বেশী। এইসকল গুণ্ডা কেন গুণ্ডামি করিতে অভ্যস্ত হয় ত[াহা] আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। কেন পঞ্জাবে ও পূর্ব্ববঙ্গেই এই [সকল] গুণ্ডামি হইয়া থাকে তাহার কারণও সহজেই বুঝা যায়।

কোন্ সময়ে এই গুণ্ডামির ভাব জাগ্রত হইয়া উঠে তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। গ্রীস ও তুরস্কের মধ্যে যুদ্ধ হইয়া যখন তুরস্ক জয়লাভ করে তখন পঞ্জাবে ও পূর্ব্ববঙ্গে এই ভাব বিশেষ-ভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তখনই ময়মনসিংহ জেলায় এই শ্রেণীর মোকদ্দমা প্রথম আরম্ভ হয়। কলিকাতাও তখন এই শ্রেণীর দাঙ্গা হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। যাহা হউক গবর্ণমেণ্টের কঠিন শাসনে ঐ অত্যাচারের ভাব তখন নিবৃত্ত হইয়াছিল। পুনর্ব্বার যখন পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম-গবর্ণমেণ্টের শাসনকার্য্য উচ্ছৃঙ্খলভাব ধারণ করে তখন আবার পূর্ব্ববঙ্গে ঐ ভাব জাগরিত হইয়া উঠে। হিন্দুসমাজের যুবক-গণ প্রতিবিধানে উদ্যত হওয়ায় তখন তাহা থামিয়া যায়। বর্ত্তমান যুদ্ধে তুরস্ক জার্ম্মানির সহিত যোগ দেওয়ার পর যে সময় হইতে জার্ম্মানির জয় লাভ ঘটিতেছে সেই সময় হইতেই পঞ্জাবে ও পূর্ব্ববঙ্গে এই অত্যাচারের ভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। খুলনা ও ঢাকা জয়দেবপুরে সম্ভ্রান্তবংশের রমণীদিগকে গুণ্ডাগণ সম্প্রতি কিরূপ লাঞ্ছনা করিয়াছে তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন। অবশ্য ইহাতে কোনও রাজনৈতিক ভাব নাই। কিন্তু নিরক্ষর অজ্ঞ গুণ্ডাগণের গুণ্ডামি-ভাব এইসকল সংবাদে জাগ্রত হইয়া উঠে তাহাতেও সন্দেহ নাই।

মৈমনসিংহবাসী।

মাননীয় ইসলামপ্রচারক মহাশয়ের "আমার বক্তব্য" মন্তব্যে স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার সম্বন্ধে যে-মত প্রকাশ করিয়াছেন তৎ-সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার মনে করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন এই-সব পৈশাচিক ব্যাপারে একটি চিন্তার বিষয় এই যে গুণ্ডারা (কি হিন্দু কি মুসলমান) হিন্দুস্ত্রীলোক ব্যতীত মুসলমান-স্ত্রীলোকের উপরে অত্যাচার করে না। তিনি কিরূপে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন বুঝিতে পারিলাম না। একটি মুসলমান-প্রধান সবডিভি-সনে (মুসলমানের সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা দেড়গুণ) আড়াই বৎসর কাল চাকুরী-উপলক্ষে থাকিয়া আমি দেখিতে পাইয়াছি এই অত্যাচার সম্বন্ধীয় যে-সমস্ত ঘটনা বিচারার্থ আদালতের সাহায্য নেয় মুসলমানগুণ্ডাদ্বারা মুসলমান-স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার হিন্দুস্ত্রীলোকের উপর অত্যাচারের মামলার ১৬ গুণেরও অধিক হইবে।

অনেক সময় দেখা যায় দীর্ঘকাল স্বামীর (মুসলমান) অবর্ত্তমানে মুসলমানগুণ্ডা তাহার স্ত্রীকে ভুলাইয়া নিয়া যায়, তৎপর স্বামী উপায়ান্তর না দেখিয়া স্ত্রীকে ছাড়িয়া দেয় এবং তাহাদের মধ্যে বিবাহ হয়। বয়স্থা অবিবাহিতা মেয়ে চুরী করিয়া দীর্ঘকাল পরে বিবাহ করা অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হয় না। এসব ঘটনায় বীরত্ব কিছুই দেখি না, বরং পশুত্বেরই অভিনয় মনে হয়।

আমি জানি একটি মুসলমান নমঃশূদ্রজাতীয়া একটি বেশ্যাকে বিবাহ করিয়াছে—সমাজ তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। সামাজিক শাসনের অভাবেই মুসলমানগুণ্ডারা স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করিতে উৎসাহিত হয়। ধর্ম্মশাসন, সামাজিকশাসন ও রাজশাসন দ্বারাই ব্যক্তিগত শাসন হয়। রাজশাসন দ্বারা গুণ্ডাদের শাসন হয় না, দৃষ্টান্ত জেলে পুরাতন পাপীর সংখ্যাধিক্য। জ্ঞান ও ভক্তি ছাড়া ধর্ম্ম হয় না, কাজেই গুণ্ডাদের শাসন ধর্ম্মদ্বারা হইবে না। যদি মুসলমানসমাজ সামাজিক শাসনের ব্যবস্থা করেন তবেই এসব অত্যাচারের সমূল বিনাশের আশা করা যায়। স্বদেশী আন্দোলনের সময় সামাজিক শাসনের ফলে হিন্দুদের মধ্যে স্বদেশী জিনিষের ব্যব-হার ধর্ম্মরূপে গৃহীত হইয়াছিল।

মাননীয় মহাশয় আরও বলিয়াছেন প্রতিবৎসর অন্ততঃ হাজার হইতে দেড়হাজার পর্য্যন্ত হিন্দুস্ত্রীলোক স্বেচ্ছায় মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করে। তিনি কিরূপে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন জানি না।

শ্রীসুরেন্দ্রপ্রসাদ দাস,
এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন, কহিমা, নাগা হিল, আসাম।

সম্পাদকের মন্তব্য—এ বিষয়ে আর কোনো বাদানুবাদ ছাপা হইবে না।

পুস্তক-পরিচয়

মণিমঞ্জুষা।—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। মূল্য পাঁচ সিকা।

এখানি কবিতার বই; ইহাতে ঋগ্বেদ হইতে রবীন্দ্রনাথ, ও ভলসাঙ্গা হইতে আধুনিকতম বেলজিয়মের কবি, মিশরের কৃষক কবি হইতে আমাদের দেশের সাঁওতাল কবি প্রভৃতি বহু দেশের সকল কালের খ্যাত অখ্যাত বহু কবির উৎকৃষ্ট কবিতার সরস সুন্দর বঙ্গানুবাদ আছে। কবিতাগুলির ছন্দ-বৈচিত্র্য, ললিত শব্দবিন্যাস, খাঁটি বাংলাভাষা ও সর্ব্বোপরি ভাব-ঐশ্বর্য্য পরম উপভোগ্য ও আনন্দের কারণ হই[illegible]। ইহা কবির পূর্ব্বজাত তীর্থসলিল ও তীর্থরেণু নামক কাব্য[illegible] অনুজ হইলেও ইহা পরিণত লেখনীর মুখের বিজয়-টীকা পরিয়া আসিয়াছে। বঙ্গসাহিত্যের আধুনিক যুগের কবিসম্প্রদায়ের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের আসন যে সর্ব্বোচ্চ তাহা অবিসংবাদী; এই অনুবাদ-কাব্য তাঁহার সে যশ ক্ষুণ্ণ করে নাই। তিনি বিশ্বসাহিত্যের কত দুর্গম দুর্জ্জেয় খনি হইতে যে-সব মণি রত্ন আহরণ করিয়া অসাধারণ অধ্যয়ন ও অধ্যবসায়ের ফলস্বরূপ এই মণিমঞ্জুষা পূর্ণ করিয়াছেন তাহা বঙ্গবাণীর ভাণ্ডার সমৃদ্ধ ও সুশোভিত করিয়াছে। এজন্য তিনি বঙ্গবাসীমাত্রেরই শ্রদ্ধা ও সমাদরের পাত্র। এই গ্রন্থে জগতের বিভিন্ন জাতির কবির রচিত একই ভাবের বহু কবিতা একস্থানে পাশাপাশি সন্নিবেশিত থাকাতে জগতের মহামানব-সমাজের ভাবের ও চিন্তার ঐক্য অতি সহজে ধরিতে পারা যায়, বুঝিতে পারি যে সকল মানুষই এক গোষ্ঠীর। এই মণিমঞ্জুষা পাঠ করিয়া আমরা অল্লায়াসে ও অল্প খরচে বিশ্বসাহিত্যের আস্বাদ পাইতে পারিব এবং পণ্ডিত কবি বহু অধ্যয়নে যাহা সঞ্চয় করিয়াছেন আমরা তাহা অনায়াসে আয়ত্ত করিয়া লইব। সুতরাং এই পুস্তক প্রত্যেক জ্ঞানপিপাসু ও রসলিপ্সু ব্যক্তির পাঠ করা উচিত।

ওডাসিয়ুস (ওডীসির গল্প)—শ্রীকুলদারঞ্জন রায় প্রণীত। প্রকাশক—সিটিবুক সোসাইটী। ৭৯ পৃষ্ঠা। মূল্য মাত্র চার আনা। উ রায়ের ছাপাখানার পরিষ্কার ছাপা এবং বহু চিত্রে সুশোভিত। চিত্রগুলি বিলাতী শিশুপাঠ্য বই হইতে গৃহীত বোধহয়, সুতরাং সু-অঙ্কিত ও সুদৃশ্য।

হোমারের অমর কাব্য ওডীসির কৌতুকজনক গল্প ছেলেদের অত্যন্ত প্রিয়। সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক পুরাণের সেনাপতি ওডিসিয়ুসের অত্যাশ্চর্য্য বীরত্বের কাহিনী, জলপথে বিচরণকালে দেবতাদিগের কোপানলে পড়িয়া তিনি কিরূপ অদ্ভুত ও উৎকট রকমের বিপদে পড়িয়াছিলেন, আবার দেবতাদিগেরই কৃপায় তিনি কিরূপে রক্ষা পাইয়াছিলেন, অতি বিস্ময়কর সেই গল্পকে অতি সরলভাবে গল্প-বলার ভাষায় বিবৃত করায় ইহা যেমন সুখপাঠ্য তেমনি চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। মাঝে মাঝে কথ্য ও লেখ্য ভাষার বর্ণনাভঙ্গী ও শব্দ মিশ্রিত হইয়া যাওয়াতে গদ্যের ছন্দপতন হইয়াছে। কিন্তু ইহা যাহার ভাষার গঠন সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য আছে তাহার ছাড়া অপরের কানে বাজিবে না—ভাষা এমনই মোলায়েম হইয়াছে। বালকবালিকারা এই সুদর্শন সুপাঠ্য

দেখানো যে ভগবান যাহাকে দান সেই পায়, মানুষ কাহাকেও কিছু দিতে পারে না; (৭) কৃষ্ণকুমারী, উদয়পুরের মহারাণার ইতিহাস-বিখ্যাত কন্যা, যিনি স্বদেশের শান্তিরক্ষার জন্য হাসিমুখে বিষপান করিয়াছিলেন; (৮) এপনিনা, পরাধীন গলের বিদ্রোহী স্বাধীনতাকামী স্যাবাইনাসের পত্নী, ইনি দুর্দ্ধর্ষ রোমক শক্তির দ্বারা পরাজিত ও পলায়িত স্বামীকে দুঃখে বিপদে সেবা ও রক্ষা করিয়া শেষে স্বামী ধৃত হইলে স্বেচ্ছায় স্বামীর সহিত প্রাণ দিয়াছিলেন; (৯) ঠগী, ঠগীদের লুট করিবার একটি কাহিনী। রচনার বিষয়গুলি ভালো।

বৈজ্ঞানিক জীবনী—শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী প্রণীত ও প্রকাশিত, রাজসাহী। ২০০ পৃষ্ঠা। মূল্য ১।০, বাঁধানো ১৷৷০ টাকা।

ইহাতে আটজন দেশী বিদেশী প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকের জীবনী আছে—(১) সুশ্রুত, (২) গেলিলিও, (৩) ল্যাভোয়াসিয়ে, (৪) মাইকেল ফ্যারাডে, (৫) নিউটন, (৬) নাগার্জ্জুন, (৭) আর্য্যভট্ট, (৭) ডারুইন। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

এই গ্রন্থখানিতে আমি একদিকে সুশ্রুত নাগার্জ্জুন আর্য্যভট্ট প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় ও গেলিলিও নিউটন প্রভৃতি ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণের জীবনবৃত্তান্ত ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দি[illegible]ষ্টা করিয়াছি। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণের জীবনবৃত্তান্ত ও কার্য্যা[illegible] [illegible]দিত; কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক কার্য্যাবলী স্বল্প-বিদিত বা অজ্ঞাত। সেই কারণে এই দুই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকগণের জীবনবৃত্তান্তের লিখনপদ্ধতির মধ্যে একটু বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হইবে। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণের জীবনবৃত্তান্তগুলি একটু অসরল হইয়া পড়িয়াছে। যেমন কবিতা সম্যক বুঝিতে হইলে কবিকে জানা আবশ্যক, সেইরূপ কোনও বৃহৎ বৈজ্ঞানিক সত্য বুঝিতে হইলে উহার আবিষ্কারককে জা[illegible]না উচিত। কিরূপে তিনি ক্রমে ক্রমে সেই সত্য নিরূপণ করিতে সমর্থ হইলেন তাহার বর্ণনা কেবল কৌতূহলোদ্দীপক নহে, প্রকৃত বৈজ্ঞানিক শিক্ষার উপাদানও বটে। সেইজন্য প্রত্যেক বৈজ্ঞানিকের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিবার সময় তাঁহার প্রত্যেক খুঁটিনাটি ছোট ছোট বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরিচয় দিতে প্রয়াস পাই নাই; যে বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারের জন্য তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ সেই সত্য কিরূপে তিনি ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলেন তাহার বিশদ পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই গ্রন্থখানিতে মাত্র কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের কার্য্যাবলীর পরিচয় আছে। ইহার দ্বিতীয় ভাগে ব্রহ্মগুপ্ত বরাহমিহির ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি ভারতীয় ও জন ওয়াট লিনিয়স ওয়ালার কেলভিন প্রভৃতি ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণের জীবনবৃত্তান্ত লিখিবার ইচ্ছা আছে।

গ্রন্থখানি উপকারী ও সময়োপযোগী হইয়াছে। ইহাতে শিখিবার জানিবার অনেক কথা আছে।

আবে হায়াত—শ্রীশেখ হবিবর রহমান প্রণীত। যশোহর-খুলনা সিদ্দিকিয়া সাহিত্যসমিতি হইতে প্রকাশিত। সিদ্দিকিয়া লাইব্রেরী ১১নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৮২ পৃষ্ঠা। মূল্য ৷৶০ আনা।

"এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে কতকগুলি পারস্য গজলের অনুবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে। এবং অনেকগুলি মৌলিক বাঙ্গালা গজলও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।··· যে-সমস্ত গজল মৌলিক, সেগুলিও পারসী গজলের আদর্শে লিখিত।··· এই পুস্তকে দুই এক স্থানে বাঙ্গলা-সাহিত্যে প্রচলিত পার্সি শব্দ ব্যবহার করিয়াছি; যে-সমস্ত শব্দ হিন্দু মুসলমান সকলেই বুঝিতে পারেন, এরূপ শব্দই ব্যবহার করা হইয়াছে।··· যখন রংমহল, নুরমহল, নওগাত, খেয়াল ইত্যাদি নামীয় হিন্দু-লিখিত পুস্তক বাঙ্গলা-সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে, তখন আবে-হায়াত নামটিও আপত্তিজনক হইবে বলিয়া [illegible]নে [illegible]রি না।" আবে-হায়াত মানে জীবন-বারি, যাহা পান করিলে অমরতা লাভ করা যায়, অমৃত।

ফার্সী শব্দ ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের গ্রন্থকারকে বক্তব্য এই—যাহা চলতি তাহা নিরাপত্তিতে ব্যবহার করা চলে। কিন্তু আবে-হায়াতের অর্থ ফুটনোট করিয়া বুঝাইতে যখন হইয়াছে তখন ইহা চলতি নহে বুঝিতে হইবে। অনুবাদের মধ্যেও এমন সাধারণের দুর্ব্বোধ্য দুই চারিটি কথা আছে দেখিলাম।

রচনা সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা করিবার কিছু পাইলাম না। ফার্সী কবিতার অনুবাদ; যাঁহারা ফার্সী কবিতার মর্ম্মগ্রহণ করিতে চান তাঁহারা ইহার ভিতর দিয়া তাহার কতকটা আভাস পাইতে পারিবেন; এইজন্য ইহা সমাদরের ও পাঠের যোগ্য। কবিতার যাহা প্রাণ—সরসতা, কোমলতা, ললিত শব্দের বিন্যাস ও ঝঙ্কার, অনাহত ছন্দের গতিলীলা এবং সূক্ষ্ম মধুর ভাবের ইঙ্গিত ও অনুস্মৃতি—তাহা এই গ্রন্থের রচনায় বহু স্থানেই পীড়িত ও নষ্ট হইয়াছে। মুদ্রারাক্ষস।

জাতিভেদ—শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। কলিকাতা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১৲ টাকা।

এই পুস্তকখানির নাম সংবাদপত্রে বিশেষরূপে বিঘোষিত না হইলেও বঙ্গভাষায় সম্প্রতি যে কয়েকখানি খাঁটি বই লিখিত হইয়াছে, ইহা তাহাদের অন্যতম একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। পুরাণ, সংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে বহুতর প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে গ্রন্থকার জাতিভেদের ভীষণ অনিষ্টকারিতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিখ্যাত ইংরেজ লেখকদিগের পুস্তক হইতেও মধ্যে মধ্যে সারসংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকখানি ভারতীয় অন্ত্যজ জাতিসমূহকে উৎসর্গ করা হইয়াছে। 'ধ্বংসোন্মুখজাতির' লেখক প্রসিদ্ধ ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। তিনি সত্যই বলিয়াছেন যে পুস্তকখানিতে ভাবিবার ও শিখিবার অনেক বিষয় আছে। বইখানি ২২৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, এই হিসাবে মূল্য যৎ-সামান্য বলিতে হইবে। দুর্ব্বল, ক্ষীণ, অত্যাচারক্লিষ্ট, নীচ হিন্দুজাতি-সমূহের সহিত লেখকের সমবেদনা সর্ব্বত্র পরিস্ফুট। ভবিষ্য হিন্দুসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষা ও গভীর স্বদেশবৎসলতা লেখকের ভাষাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। এজন্য ভাষা স্থলে স্থলে তীব্র হইলেও অসঙ্গত হয় নাই। এই পুস্তকের বহুল প্রচার প্রার্থনীয়। লেখক প্রকৃত ব্রাহ্মণের ন্যায় সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হইয়াছেন। হিন্দুসমাজ নিজকে বিলোপ হইতে রক্ষা করিতে চাহিলে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে।

এম-এ, বি-এল।

বিজয়াবসান—শ্রীবসন্তকুমার রায় এম্ এ, বি এল্ প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

এখানি কাব্যগ্রন্থ। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে গৌড়ের বাদসা সেকন্দর সাহ হিজলি রাজ্য অধিকার করিবার জন্য হিজলির চতুষ্পার্শ্বস্থ পার্ব্বত্য-রাজাদিগকে হস্তগত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু হিজলিরাজের শ্রেষ্ঠতর রাজনীতিকুশলতায় বাদসার এই প্রয়াস ব্যর্থ হয় এবং অবশেষে তিন দিন যুদ্ধের পর তিনি সন্ধি করিতে বাধ্য হন।

এই ঐতিহাসিক ঘটনার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া গ্রন্থকার তাঁহার এই নাতিক্ষুদ্র কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন। কবির শব্দ-চয়নে নিপুণতা প্রশংসনীয়। কিন্তু তাঁহার রচনা এতই সংস্কৃত-ভাঙ্গা যে তাহাকে মোটেই বাংলা বলা চলে না। আমরা এরূপ রচনা-পদ্ধতির পক্ষপাতী নহি। বাংলা চিরকালই বাংলা। তাহাকে তাহার স্বাতন্ত্র্য হইতে বঞ্চিত করিলে কিছুতেই চলিবে না। এমন ভাবে সংস্কৃতের সহিত তাহাকে মিশাইয়া দিলে, আমাদের বিশ্বাস, জগৎ-সাহিত্যের মন্দির-তোরণে তাহার যে আসনটি ধীরে ধীরে এতদিন ধরিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে খর্ব্ব করিয়া ফেলা হয়।

ভালবাসা—শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ প্রণীত মূল্য বাঁধা এক টাকা ও আবাঁধা বারো আনা।

এখানি উপন্যাস। গ্রন্থকারের ভাষা মার্জ্জিত ও সুন্দর—আধুনিক রচনা-ভঙ্গির বিশেষত্ব-বর্জ্জিত নহে। তাঁহার চরিত্রাঙ্কণের ভিতরেও বেশ একটা নিপুণতার ছাপ আছে। তবে তাহাতে অসংযমের ছাপও নেহাৎ কম নাই; অনেক স্থলে অনঙ্গতি দোষ ঘটিয়াছে। দেবব্রতের মত গভীর-চরিত্র লোকের পক্ষে "সোনার চাঁদ আমার" প্রভৃতি সম্বোধনের দ্বারা যুবতী পত্নীর আদর কুড়াইতে যাওয়া এ৯ান্তই অশোভন হইয়াছে। তাহার নিকট হইতে পাঠক যাহা আশা করে তাহা স্থির গভীর মৌন ভালবাসা যাহা আষাঢ়ের মেঘের মতো আপনার হৃদয়-শোণিতের প্রতি-বিন্দুটি প্রেমাস্পদের জন্য উৎসর্গ করিয়া দিতে পারে কিন্তু কথার ছন্দবন্ধের দ্বারা তাহা প্রচার করিতে জানে না বা প্রচার করাটাকে প্রেমের অগৌরব বলিয়াই মনে করে। কাঞ্চনের চরিত্রটা চিত্তবৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাতে, প্রবৃত্তি এবং ত্যাগের সংঘর্ষে মন্দ ফোটে নাই, কিন্তু এখানেও একটু বাড়াবাড়ি হইয়া পড়িয়াছে। গ্রন্থকার নারী-হৃদয়ের দুর্ব্বোধ্য ও জটিল অংশটাকে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে গিয়া মাত্রা ঠিক রাখিতে পারেন নাই বলিয়াই মনে হয়। আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে সেই 'ক্ষণেক দেখা' ইন্দুনিভাননীকে। গ্রন্থের ভিতর দুই এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথের চোখের বালির ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে।

"আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী ভোগের দাসী নই"

কবিতাটিও প্রাচীন কবি হইতে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ। গ্রন্থকার সে কথা স্বীকার করেন নাই, বরং পড়িয়া এই মনে হয় যে ইহা গ্রন্থকারের দ্বারাই রচিত হইয়াছে। কবিতাটি যদি রবীন্দ্রনাথের কোন পুস্তকে ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইত তবে এসম্বন্ধে আমরা কোনো কথাই বলিতাম না। কিন্তু তাহা হয় নাই, প্রবাসীতেই প্রকাশিত হইয়াছে, বলিয়াই ইহার কোনো স্বীকারোক্তি না দেখিয়া আমরা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছি। গ্রন্থের ভিতরকার দ্বিতীয় গানটি সম্ভবতঃ গ্রন্থকারের নিজের তৈরী। তাহার কোনো স্থানে এতটুকুও কবিত্ব নাই—শব্দসম্পদেও সেটি অত্যন্ত দীন। গানটি লইয়া শ্রীপতি বাবুকে যখন অনেকখানি নাড়াচাড়া করিতে হইয়াছে তখন সেটির উপর তাঁহার আরও সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত ছিল। গ্রন্থে ছাপার ভুলও অনেকগুলি রহিয়া গিয়াছে। মোটের উপর উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। এখানি বাজারের অজস্র 'রাশি' উপন্যাসের মতো নহে।

বিজন-বিজয়া—শ্রীআশুতোষ দাশগুপ্ত মহলানবীশ প্রণীত মূল্য আট আনা—বাঁধাই বারো আনা।

গ্রন্থকার তাঁহার পত্নী বিজনবাসিনী দেবীর মৃত্যুতে এই কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন। কাব্যহিসাবে ইহার কোনোই মূল্য নাই। গ্রন্থের প্রারম্ভে আশুতোষ বাবু তাঁহার সাধ্বীপত্নীর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনীও সংলগ্ন করিয়া দিয়াছেন।

ঢাকার লাড্ডু ও অন্যান্য গল্প—শ্রীসত্যরঞ্জন নাগ প্রণীত মূল্য ছয় আনা।

ইহাতে পাঁচটি গল্প আছে; লেখকের ভাষা চলনসই। কিন্তু গল্প-গুলিতে আর্টের বিন্দুবিসর্গও নাই। গল্পাংশও অতি অল্পই আছে এবং যাহা আছে তাহাও তিনি যথাযথ ভাবে সাজাইতে পারেন নাই। সমাজ সম্বন্ধে লেখকের মত অতি সঙ্কীর্ণ। 'পরিণাম' গল্পটিতে তিনি সুধা ও তাহার স্বামীর যে চিত্র দাগিয়াছেন তাহা কেবল মাত্র অসুন্দর নহে তাহা অত্যন্ত বিশ্রী—অত্যন্ত কুৎসিত। 'জীবন-পথে' গল্পটিতে বীণার আত্মহত্যা লইয়া দেশের হুজুগপ্রিয় সংবাদপত্র ও হুজুগ-প্রিয় সমাজকে গালি দিতে গিয়া এমন রসভঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছেন যে তাহাতে সমস্ত গল্পটাই মাটি হইয়াছে। গল্পগুলির প্লটের ভিতর কোনো নূতনত্ব নাই এবং কোনো গল্পতেই রসের দিকটা জমাট বা ঘোরালো ভাব ধারণ করিবার অবকাশ পায় নাই।

ইন্দুমতী—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য একটাকা চারি আনা।

এখানি কাব্যগ্রন্থ, অধিকাংশই অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। ভাষায় কোনই মাধুর্য্য নাই। জায়গায় জায়গায় হঠাৎ দুই একটা লাইন গ্রন্থকারের হাত ফস্কাইয়া একটু আধটু কবিত্বের ছাপ লইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু বেশীর ভাগ লাইনই গদ্য। ছোটখাট কথোপকথনের ভিতরই গ্রন্থকারের অক্ষমতা বিশেষভাবে ধরা পড়িয়াছে। স্থানে অস্থানে নৈতিক লেকচারের ছড়াছড়ির জন্য পাঠকের মনে তাহা কোনোই দাগ বসাইতে পারে না। পুস্তকের প্রধান চরিত্রগুলির একটিও তেমন ভালো করিয়া ফুটে নাই—সমস্ত গ্রন্থের ভিতরে কেবলমাত্র সদ্য-পুত্রশোক-বিধুরা পঙ্কজিনীর চরিত্রের দৃঢ়তায় পাঠকের মন ক্ষণকালের জন্য একটু অভিভূত হইয়া পড়ে, কিন্তু সমগ্র ব্যাপারটার অসম্ভবত্বের দিকে দৃষ্টি পড়িলেই এই ক্ষণিকের মোহটাও কাটিয়া যায়। গল্পাংশের ভিতরেও কোনো বিশেষত্ব বা নূতনত্ব নাই।

?

সনেট-সুন্দরী

সনেট্-সুন্দরী আমি; রক্ত চেলী করে ঝলমল্
অঙ্গে মম; ভালে জ্বলে লালচুনি—কি মোহন টিপ্।
কবির হৃদয়-রাজ্যে আমি চিরবিজয়ী অধীপ!
চতুর্দ্দশ পাপড়ির আমি ফুল্ল রক্ত শতদল—
শব্দের মৃণালে ফুটি করিতেছি রূপে ঢল-ঢল
সৌন্দর্য্য-সায়রে! হের, শ্রবণে দোদুল দোলে নীপ্;
খোঁপায় হাসিছে চাঁপা; কেশরাশি, হয়ে অন্তরীপ,
পরশিতে নাহি চাহে অনন্তের আঁধার অতল!

কতই সোহাগ মোর; আমি যেন আনন্দের ঝাঁপি
কল্পনা লক্ষ্মীর! হের, নন্দনের ফুল্ল ফুলরাজী
থরে থরে রাজে অঙ্গে,—আমি যেন ক্ষুদ্র ফুলসাজি!
ছিনু সুপ্তা কালো কালিন্দীর তীরে,—থর্থর কাঁপি
জাগিনু আনন্দে আজি আহা কার মুরলীর রবে?
কুহুকুহু ডাকে পিক-হাসে বন বসন্ত-উৎসবে।

৮ই সেপ্টেম্বর ১৯১৫
ডেরাডুন্

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

২১০।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।